

মাসিক সমালোচনী পত্রিকা

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত

চতুর্থ খণ্ড

[illegible]

২৫

কলিকাতা

আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য [illegible] মাশুল সমেত [illegible] টাকা।

ভারতী

হিমমুকুল।

বিংশ পরিচ্ছেদ—গুপ্ত শক্র।

সেই দিন সন্ধ্যাকালে প্রমোদ পদব্রজে যামিনীনাথের বাটী-অভিমুখে আসিতে-ছিলেন। ক্রমে আসিতে আসিতে চৌরঙ্গির দীপ-মালা শোভিত পথ ছাড়াইয়া ভবানীপুরে পদার্পণ করিলেন। ক্রমে সন্ধ্যাও অতীত হইল। রজনী অন্ধকার, রাস্তা-ঘাট দীপমালাতে উজ্জ্বলিত নাই, পথপার্শ্বস্থ বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা অন্ধকারাচ্ছন্ন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর সকল অন্ধকারাচ্ছন্ন, পথ সকল অন্ধকারাচ্ছন্ন। কেবল আকাশে কৃষ্ণবর্ণ মেঘে দুই একটি নক্ষত্র হাসিতেছিল, নীচে আঁধারময় অট্টালিকা-প্রাচীরে মাঝে মাঝে দুই একটি খদ্যোত জ্বলিতেছিল, এবং অট্টালিকা-শ্রেণীর মুক্ত বাতায়ন-পথ দিয়া গৃহ-মধ্যস্থ আলোক দৃষ্ট হইতেছিল। সেই অন্ধকারময় পথে কখনো কখনো দুই একটি গ্রাম্য কুকুর চীৎকার করিয়া প্রমোদের পথ-পার্শ্ব দিয়া দৌড়িয়া যাইতেছিল, কখনো বা মাথার উপর দিয়া কোন নিশাচর পক্ষী কর্কশ রবে চিন্তামগ্ন প্রমোদের ক্ষণেকের জন্য চিন্তা ভঙ্গ করিয়া উড়িতেছিল। পথে মাঝে মাঝে দুটি একটি লোক চলিতে-ছিল, অন্ধকারে তাহাদের স্পষ্ট চেনা যায় না, প্রমোদও তাহাদের চিনিতে বড় একটা উৎসুক ছিলেন না। তিনি সেই অন্ধকার-ময়ী স্নিগ্ধ রজনীতে কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন মনেই চলিতেছিলেন। সহসা তাঁহার সেই চিন্তা ভঙ্গ হইল, সহসা পিস্তলের বিকট শব্দে চমকিত হইয়া তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, অমনি দুই জন মনুষ্য তাঁহার পশ্চাৎ হইতে দৌড়িয়া চলিয়া গেল। তাহাতে তাঁহার স্পষ্ট মনে হইল, তাঁহার প্রতিই পিস্তল লক্ষ্য করিয়া তাহারা পলাইল। যদিও তাহারা কোথায় গেল অন্ধকারে স্পষ্ট লক্ষিত হইল না, কিন্তু প্রমোদের মনে হইল একটি অট্টালিকা-প্রাচীরে তাহারা মিশাইয়া গেল। তিনি চৌকিদার চৌকিদার করিয়া হাঁকিয়া উঠিলেন। চৌকিদার তখন মোড়ের মাথায় একটি রেল ঠেসান দিয়া দিব্য ঘুমের ঘোরে সরকন্ সাহেবের উগ্রমূর্ত্তি স্বপ্নে দেখিতেছিল। প্রমোদ আ-সিয়া তাহাকে ধাক্কা মারাতে সে অস্তে

উঠিয়াই দীর্ঘ সেলাম ঠুকিয়া চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে বীর-বিক্রমে লাঠি বাগাইয়া ধরিল। প্রমোদ বলিলেন "দেখ্‌তানেই কোন্ হাম্‌কো মার্‌নেকো ওয়াস্তে পিস্তল চালায়া, আওর তোম হিঁয়া নিদ্ যাতা"

চৌকিদার তখন সদর্পে বলিল "নেই বাবু সাব, ও কোই লেড়কা পট্‌কা চালাতা, কুছ ডর নেই।"

প্র। "নেই নেই ও পিস্তলকা আওয়াজ—হম্ শুনা—আবি জলদি হামারা সাথ আও, ও বড়া কোঠীকা অন্দর ও পিস্তলওয়ালা ভাগকে গিয়া, জলদি হামারা সাথ আও"

চৌ। "চলিয়ে সাব, লেকেন ও কোঠীকা ভিতর এক—তোবা তোবা আল্লা আল্লা—আপতো চলিয়ে"

"জলদি হামারা সাথ আও" বলিয়া প্রমোদ ঊর্দ্ধ মুখে ছুটিলেন। চৌকিদারও চলিল, কিন্তু "কোন হ্যায়রে, কোন হ্যায়রে" করিতে করিতে দিঙ্‌মণ্ডল ফাটাইয়া দিয়া মৃদু পদে প্রমোদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। যে প্রাচীরের কাছে তাহারা মিশাইয়া গিয়াছিল, প্রমোদ সেই স্থানে দৌড়িয়া আসিয়া দেখিলেন সে স্থানটি একটি অট্টালিকার পশ্চাৎভাগ। সেখানে আসিয়া প্রমোদ কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু আবার সহসা তখনি পিস্তলের শব্দ হইল, তখনি কিছু দূরে আবার দুই ব্যক্তিকে ছুটিয়া পলাইতে দেখিলেন। পিস্তলের গুলি ভাগ্যবশতঃ তাঁহার অর্দ্ধ হস্ত পশ্চাৎ দিয়া গিয়া সেই প্রাচীরে সজোরে লাগিল। পিস্তল যে তাঁহার উদ্দেশেই ছোড়া হইতেছে এবার আর তাহাতে তাঁহার বিন্দু মাত্রও সন্দেহ রহিল না। প্রমোদ সেই লক্ষ্য দেখিয়া সহসা আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত ভাবে মুহূর্ত্তকাল দাঁড়াইয়া আবার তাহাদের অনুসরণে চলিলেন। ইতস্ততঃ করতঃ কিছুই দেখিতে না পাইয়া আবার সেই অট্টালিকার পশ্চাৎভাগে আসিয়া অন্বেষণ করিলেন, এবারেও সেখানে কাহাকে না পাইয়া তিনি ঘুরিয়া অট্টালিকার সদর দ্বারে আসিলেন। সেখানে আসিয়া দেখিলেন দ্বার মধ্যে আলোক জ্বলিতেছে এবং এক জন দ্বারবান সেই দ্বার মধ্যে বসিয়া আছে। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এখনি এই বাটী মধ্যে কেহ হঠাৎ প্রবেশ করিয়াছে কি না, কিম্বা এই দ্বারের নিকট দিয়া পিস্তলহস্তে কাহাকেও পলাইতে দেখিয়াছ কি না।" দ্বারবান বলিল "না কিছুই দেখি নাই" তখন প্রমোদ সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দ্বারে পদার্পণ করিলেন। এই সময় দেখিলেন অট্টালিকার আর এক দ্বার দিয়া এক ব্যক্তি ত্রস্তে বাটী মধ্যে প্রবেশ করিয়া অমনি উপরে চলিয়া গেল। যাইবার সময় একটি দীপালোক মুখে পড়ায় প্রমোদ হিরণকুমারকে চিনিতে পারিলেন। প্রমোদ দেখিলেন হিরণের হস্তে পিস্তল, বেশ ভূষা ছিন্নভিন্ন, এবং ব্যস্তভাবে দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছেন। এই অবস্থায় পিস্তল হস্তে হিরণকে বাড়ী প্রবেশ

করিতে দেখিয়া সহসা প্রমোদ চমকিয়া উঠিলেন। হঠাৎ তাঁহার একটি সন্দেহের ভাব মনে আসিল। ভাবিলেন "একি! হিরণের হস্তে পিস্তল! হিরণের এই ছিন্ন ভিন্ন বেশ! তবে কি হিরণই আমাকে মারিতে সঙ্কল্প করিয়াছিল?" আবার ভাবিলেন "কিন্তু তাহা কি করিয়া হইবে? তাহা অসম্ভব। হিরণ আমাকে মারিতে যাইবে কেন? আমাকে মারিয়া তাহার কি লাভ? আমি জানি হিরণ আমাকে দেখিতে পারে না, আমি জানি সেই জন্যই হিরণ আমাকে অন্যায় দোষী ভাবিয়া মকদ্দমায় দণ্ড দিয়াছে। কিন্তু দেখিতে পারে না বলিয়াই বা আমাকে মারিতে সঙ্কল্প করিবে কেন? এই আমিতো হিরণকে দেখিতে পারি না, উহাকে দেখিলেই তো আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায় কিন্তু কই উহার অনিষ্ট-চিন্তাও তো আমার কখনো মনে আসে না, আর কেবল আমাকে দেখিতে পারে না বলিয়া হিরণ ঐরূপ ভয়ানক কার্য্যে ব্রতী হইবে? না না ইহা হইতেই পারে না। বিনা কারণে এরূপ মনে আসাই আমার অন্যায়, এরূপ চিন্তাকে মনে স্থান দিলে আমারি মন নীচ হইবে। কিন্তু একটা কথা—এই সময় হিরণকে পিস্তলহস্তে দেখা কি আশ্চর্য্য নয়! এরূপ অবস্থায় কার না সন্দেহ হয়? যখনি আমি বাটীর পশ্চাৎ দিকে আমার প্রতি পিস্তল ছুড়িতে দেখিলাম, তাহারি কিছু পরে বাটীর মধ্যে হিরণ পিস্তলহস্তে ঢুকিল—ইহাতে কি হিরণকে দোষী মনে হয় না? নহিলে এই সময়ে হিরণের পিস্তলহস্তে থাকিবার অন্য কি কারণ হইতে পারে? কিন্তু তাই বা কেন? তাহার পিস্তলহস্তে থাকিবার আর সহস্র কারণ থাকিতে পারে। সে কারণ আমি জানি না বলিয়া, এবং অবস্থাটা একটু সন্দেহ-জনক তাহা বলিয়াই কি সে বিনা কারণে দোষী? এক জন ছোট লোক হইলে বুঝিতাম আমার ঘড়ী লইবার জন্য, আমার টাকা লইবার জন্য আমাকে মারিতে গিয়াছিল, কিন্তু আর যাই হোক হিরণ ভদ্রলোক, তাহার কিছু চুরীর অভিপ্রায় হইতে পারে না। আর তাহা না হইলে ইহার আর কোন কারণই নাই। তবে অকারণে সে আমায় মারিতে যাইবে কেন? তবে এইটুক স্বীকার করি ইহাতে একজনের ধাঁ ধাঁ লাগিতে পারে বটে। কিন্তু আমি আর এরূপ নীচ ভাবে মনকে কলঙ্কিত করিব না, যাহার কোন কারণই নাই তাহা হওয়া অসম্ভব। কিন্তু যদিও অসম্ভব তথাপি এরূপ স্থলে হিরণের হস্তে পিস্তল অতিশয় আশ্চর্য্য! আসল কথা আমিতো ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, দেখি যামিনীনাথ কি বলেন।" প্রমোদ যাহা দেখিলেন তাহাতে একবার সন্দেহে একবার বিশ্বাসে তাঁহার মন আন্দোলিত হইতে লাগিল, যাহা দেখিলেন তাহা তাঁহার নিকট হেঁয়ালি স্বরূপ বোধ হইল। তিনি নিজে সে হেঁয়ালি ভাঙ্গিতে অপারগ হইয়া যামিনীনাথকে বলিতে দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। রাস্তায় পদার্পণ করিলে চৌকিদারের সহিত সাক্ষাৎ

হইল। তাঁহার অনুবর্ত্তী হয় নাই ব-লিয়া প্রমোদ তাহাকে ধমকাইতে লাগিলেন। ধমক খাইয়া সে বলিল সে তাঁহাকেই এতক্ষণ খুজিতেছিল, তিনি দৌড়িয়া কোথায় গেলেন, সে বুঝিতে পারে নাই বলিয়া পশ্চাৎ যাইতে অসমর্থ হইয়াছিল।' অন্ধকারে আর এখন সেই পলাতক ব্যক্তিদের ধরা অসম্ভব জ্ঞানে চৌকিদারকে তাহা বুঝাইয়া তিনিও সে আশা ত্যাগ পূর্ব্বক আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত ভাবে ভাবিতে ভাবিতে আবার যামিনীনাথের বাড়ীর দিকে চলিলেন। তিনি কখন কাহার কি এমন অনিষ্ট করিয়াছেন যে সে তাঁহাকে বধ করিতে পারে ইহা তিনি কোন মতে খুজিয়া পাইলেন না—তাঁহার এমন কে গুপ্ত শত্রু আছে যে এই রাত্রে তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল তিনি কোন মতে তাহা বাহির করিতে কৃতকার্য্য না হইয়া ভাবিতে ভাবিতে যামিনীর বাটীতে আসিয়া পহুঁছিলেন। তাঁহাকে দেখিবা-মাত্র ব্যগ্র ভাবে যামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন "একি,তুমি যে আজ এত দেরিতে আসিলে? তোমার ৯টার সময় আসিবার কথা ছিল, প্রায় দুঘণ্টা দেরি হইয়াছে, এখন দেখ এগারটা?' তখন প্রমোদ প্রথমেই পথের সমস্ত বিবরণ বলিলেন। যামিনী শুনিয়া কহিলেন "কি ভয়ানক।" বলিয়াই হঠাৎ যামিনীর মনে আর একটি অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার ভাব উদয় হইল, তিনি এই সময় তাহার বিলক্ষণ সুবিধা দেখিলেন। তিনি এক বাণে দুইটি পাখী মারিতে স্থির করিলেন। পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদের ঘটনা হইতে যামিনী হিরণের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, হিরণই সন্ন্যাসীর নিকট তাঁহাকে দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন,হিরণই যামিনীর সহিত নীরজার বিবাহে বাধা দিয়া প্রমোদের পক্ষ লইয়াছিলেন, যামিনী তাঁহার কর্ম্মের প্রতিফল দিবার এখন উত্তম সুযোগ দেখিলেন। প্রমোদের কথায় যামিনী লাফাইয়া উঠিয়া বিস্ফারিত নেত্রে বলিয়া উঠিলেন "হিরণকে তুমি ছদ্মবেশে পিস্তলহস্তে হঠাৎ দ্বারে প্রবেশ করিতে দেখেছ? এতে আমার চক্ষের সামনে আসল ব্যাপার সকল খুলে গেল, আমি এখন সকল বুঝতে পারছি' প্রমোদ সবিস্ময়ে বলিলেন "কি! তোমার কথাতো আমি কিছু বুঝতে পারিতেছিনে, তোমারও কি আমার মত হঠাৎ সন্দেহ হইতেছে? "যামিনী তাহার উত্তর না দিয়া বলিলেন "সদর দ্বারের পরিবর্ত্তে অন্য দ্বার দিয়া তাহাকে বাড়ী ঢুকিতে দেখেছিলে?"

প্র। "হঁা।"

যা। "বেশভূষা এলোথেলো—চঞ্চল পদে বাড়ী এল? যেন কোন মহাব্যাপার করে উপস্থিত?'

প্র। "মহাব্যাপারই বটে?'

যা। "ঠিক ঠিক, তবেই হয়েছে, আর কোন ভুল নেই—সেই পাষণ্ডেরই এই কাজ' প্রমোদ আবার বলিলেন "কি কাজ? আমাকে মারিতে যাওয়া? কিন্তু—কিন্তু যাহার কারণ নাই—"

যা। "কারণ নাই কি! এই জঘন্য

ঘাতকের কাজ তাহারি।" প্রমোদ তখন শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন "হিরণকে আমি যতই ঘৃণা করিনা কেন, তাহাকে এরূপ কার্য্যে পারগ মনে করিতে পারি না। বিশেষতঃ তাহাতে তার লাভ কি? হঠাৎ তাহাকে দোষী মনে হয় বটে, তবুও আমার কেবল *সন্দেহ ছাড়া উহা সত্য মনে হয় না, না, না যাহার কারণ নাই তাহা অসম্ভব।"

যা। 'তুমি জাননা বলিয়া এ কথা বলিতেছ। হিরণ তোমাকে কতদূর শত্রু মনে করে জানিলে একথা বলিতে না। তুমি জান, হিরণ সন্ন্যাসীর কোন সম্পর্কীয় ব্যক্তি?'

প্র। "না।"

যা। "নীরজাকে লইয়া যাইবার সময় সন্ন্যাসী হিরণকে সঙ্গে আনেন, সেই সময় কথায় কথায় দেখিলাম হিরণ তোমাকে কতদূর ঘৃণা করে" প্রমোদ একটি ছোট দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিলেন "সন্ন্যাসী তবে নীরজাকে লইয়া গিয়াছেন?"

যা। "হাঁ। সে সব ব্যাপার বলিতেই তো তোমাকে ডাকিয়াছিলাম।'

প্র। "কি তবে বল?"

যা। "কথায় কথায় তোমার কথা উঠিল। সন্ন্যাসী তোমার অতিশয় প্রশংসা করিলেন। কথায় কথায় আমি বলিলাম হাঁ প্রমোদ সর্ব্বপ্রকারে নীরজার উপযুক্ত একটি সুপাত্র বটে, এই কথা শুনিয়া হিরণ ভাবিল, সন্ন্যাসী তোমার সহিত নীরজার সম্বন্ধ করিয়াছেন, সে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, তোমার চরিত্রের উপর কতশত অপবাদ দিতে লাগিল তাহার ঠিক নাই। আমি ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম, আমাদের দুজনে একটু বিবাদ হইল, হিরণ তাহাতে অপমান বোধ করিয়া চলিয়া গেল। তাহার পর আমি সন্ন্যাসীর নিকট শুনিলাম হিরণ নীরজার একজন হস্তপ্রার্থী। শুনিয়া আমি হিরণের রাগের কারণ বুঝিলাম। তাহার পর তোমার মুখে আজিকার রাত্রের ঘটনা শুনিয়া নিশ্চয়ই তাহাকে দোষী মনে হইতেছে। তুমি কি বুঝিতেছ না তোমাকে কণ্টক বিবেচনায় তাহার পথ হইতে সরাইবার অভিপ্রায়ে ছিল?" প্রমোদ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। এতক্ষণে তিনি সকল বুঝিতে পারিলেন। এইবার কারণ পাইয়া প্রমোদেরও হিরণকে দোষী বলিয়া মনে হইল। অকারণে অন্য কেহ তাঁহার প্রাণবধের চেষ্টা করিবে তাহা আর মনে করিতে পারিলেন না। তিনি হিরণকেই সম্পূর্ণ দোষী ভাবিয়া বলিলেন "পাষণ্ড! তাহার তো আমি কোন অনিষ্টই করি নাই কিন্তু সেই বাল্যকাল হইতে সে আমার সহিত শত্রুতাব্রতে ব্রতী হইয়াছে।"

যামিনী আপন অভীষ্ট সিদ্ধির সুযোগ হইতেছে দেখিয়া বলিলেন "আমার তো রাগে শরীর কাঁপিতেছে, কি করিয়া সে পাষণ্ডকে শাস্তি দেওয়া যায়? খুনের দাবীতে তাহাকে বিচারালয়ে লইয়া গিয়া শাস্তি দিতে হইবে।" এই কথায় প্রমোদ কিছু ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিলেন "উহার নামে নালিশ করিতে গেলেও আমার

অবনতি স্বীকার করা হয়, তাহা আমি করিব না।” যামিনী হিরণকুমারের শাস্তির ইচ্ছায় তাহার নামে অভিযোগের নিমিত্ত প্রমোদকে অনেক বলিলেন। প্রমোদ কোন মতে স্বীকৃত হইলেন না। যামিনী-নাথের বিশেষ পীড়াপিড়িতে শেষে বলিলেন “তাহার বিরুদ্ধে তো তেমন প্রমাণ কিছুই নাই, কি বলিয়াই বা নালিশ করিব? তাহাকে এক পিস্তল হস্তে মাত্র দেখিয়াছিলাম এই যা বলিবার কথা, তাহা সে অস্বীকার করিতে পারে।”

যা। “প্রমাণ বিশেষ না থাকিলে শাস্তি না হইতে পারে, কিন্তু বিচারালয়ে ঐ দাবীতে তাহাকে যাইতে হইলেই তো বিলক্ষণ অপমানও হইবে।” প্রমোদ বলিলেন “না, তাহাতে আর কাজ নাই। এই মকদ্দমা লইয়া আর আমার নিজের নাম জারী করিয়া কাজ নাই, হিরণকে চিনিয়া থাকিলাম এই যথেষ্ট।” কোন মতে না পারিয়া অগত্যা যামিনী সে চেষ্টা হইতে ক্ষান্ত হইলেন। তখন ক্রমে অন্যান্য কথা আসিয়া পড়িল। নীরজার কথা পাড়িতে প্রমোদ বড়ই ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু সে কথা কহিতে গেলেই আপনা হইতে মুখ বন্ধ হইয়া যায়, লজ্জা সঙ্কোচ কতকি ভাব আসিয়া তাঁহার ইচ্ছার উপর আধিপত্য করে। নীরজা যামিনীর বাড়ী আছে জানিয়া অবধি কতবার প্রমোদের আবার আসিয়া দেখা করিতে ইচ্ছা করিত কিন্তু আসিতে পারিতেন না, যদি বা একদিন দুদিন আসিয়াছিলেন তথাচ নীরজার সহিত দেখা করিবার কথা তুলিতে পারেন নাই। যামিনীও আপনি সে কথা কিছুই বলেন নাই সুতরাং সেই রাত্রে হঠাৎ ছাড়া আর নীরজার সহিত প্রমোদের দেখা হয় নাই। প্রমোদ আজ কি করিয়া নীরজার কথা পাড়িবেন ভাবিয়া না পাইয়া বলিলেন “সন্ন্যাসীর যে আমাদের উপর হইতে সে সন্দেহ ঘুচিয়াছে ইহাতে আমি বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছি।”

যামিনী বুঝিলেন নীরজার বিষয়ে প্রমোদের কথা কহিবার ইচ্ছা। জানিয়া বলিলেন “হাঁ ভাই তোমাকে এতক্ষণ একটা কথা বলা হয় নাই। সন্ন্যাসী আমার প্রত্যুপকার স্বরূপ নীরজাকে অর্পণ করিতেছেন। আমি তাঁহাকে যদিও বলিলাম, নীরজার আমি যোগ্যপাত্র নহি, প্রমোদই তাহার সুপাত্র, তথাপি তিনি আমাকেই জামাতা করিতে স্থির করিয়াছেন” শুনিয়া প্রমোদের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, কথাটি তীক্ষ্ণ শেল স্বরূপ হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। কিন্তু তিনি তাহা সামলাইয়া লইতে চেষ্টা করিলেন। তিনি বুঝিলেন ওরূপ মনে লাগা তাঁহার অন্যায়, সেই হেতু সে ভাব অতিক্রম করিতে মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি ভাবিলেন যামিনী নীরজার স্বামী হইবে ইহাতো সৌভাগ্যের কথা, প্রমোদ যদি নীরজাকে যথার্থ ভাল বাসেন ইহাতে তাঁহার আনন্দ হওয়াই উচিত। এইরূপে মনকে যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া প্রমোদ মনে মনে স্থির করিলেন যতই কষ্ট হোক, ভবিষ্যতে তিনি আপন স্বার্থময় ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া নীরজার সুখেই

সুখী হইতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু ঐ কথা শুনিবার পর হইতে প্রমোদ কেমন নিস্তব্ধ হইয়া পড়িলেন, সহস্র চেষ্টা করিয়াও আর আগের মত কথা কহিতে সক্ষম হইলেন না। এক দিকে মনকে বুঝাইবার ইচ্ছা, অপর দিকে হৃদয়ের সহজ উচ্ছ্বাসের প্রবল তরঙ্গ বহিতে লাগিল। প্রমোদের চক্ষে ভীষণ চিন্তার ভাব, অথচ অধরে অনিচ্ছা হাসির নিরুজ্জ্বল আভাস। যদিও তিনি হৃদয়ের ভাব ঢাকিতে বলপূর্ব্বক হাসিতেছেন, কিন্তু অনিচ্ছার সেই মৌখিক হাসিতে তাহার বিষাদ ভাব দ্বিগুণ প্রকাশিত হইতেছিল। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া যামিনীও কিছু পরে মৌন হইয়া পড়িলেন। অনেক চেষ্টাতেও কোন মতেই তাঁহার সে মৌন ভাব ঘুচিল না, তখন তিনি আর বেশীক্ষণ সেখানে না থাকিয়া বাটী চলিয়া আসিলেন। আসিতে আসিতে প্রমোদ তাঁহার মনের ভাব দমন করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু দেখিলেন মন ইচ্ছার বশবর্ত্তী নহে।

প্রমোদ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার চক্ষে সকলি শূন্য বোধ হইতে লাগিল। পৃথিবী যেন শূন্য, আকাশ যেন শূন্য। পৃথিবীতে যেন লোক নাই, বৃক্ষ নাই, আলো নাই, কিছুই নাই, পৃথিবী যেন শূন্যময় অন্ধকার। আকাশে যেন চাঁদ নাই, তারা নাই, মেঘ নাই, আকাশও যেন শূন্যময়। প্রমোদ এবার বাহ্য জগৎ হইতে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ খুঁজিয়া দেখিলেন, দেখিলেন হৃদয়ের মধ্যেও অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নাই।

... ...

ইহারই তিন চারি দিন পরে কনকের এক পত্রে প্রমোদ অবগত হইলেন সুশীলা শয্যাগত পীড়িত। শুনিয়া প্রমোদ সেই রাত্রেই রেল গাড়ীতে এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন। গাড়ীতে যামিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাহার কাছে শুনিলেন সন্ন্যাসী যামিনীকে কানপুরে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। এলাহাবাদে আসিয়া প্রমোদ যামিনীকে দুই এক দিনের জন্য এখানে থাকিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। নীরজাকে নিশ্চয় লাভ করিবেন জানিয়া এখন যামিনীরও আর সে বিষয়ে তত ব্যগ্রতা ছিল না। তিনি প্রমোদের অনুরোধে দুই এক দিন এলাহাবাদে কাটাইয়া পরে কানপুরে যাওয়াই স্থির করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ—বিভীষিকা।

সুশীলার পীড়ার অগ্রে যে একটি ঘটনা হইয়াছিল তাহা আমরা এই পরিচ্ছেদে বলিতেছি। কনকের শান্তির ১২ দিন এখনো ফুরায় নাই। রাত্রি অন্ধকার, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, তাহাতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে এবং মাঝে মাঝে মেঘ গর্জ্জন পৃথিবী কাঁপাইয়া তুলিতেছে। এই সময় দীপশূন্য অন্ধকারময় একটি কক্ষে, এই মেঘ বৃষ্টির শব্দের মধ্যে বালিকা একাকী শুইয়াছিল। সহসা বজ্রের কড়মড় শব্দে চমকিয়া উঠিল। অন্ধকারে ভীত হইয়া উঠিয়া

বসিল, আলোক পাইবার নিমিত্ত বিছানা হইতে হাত বাড়াইয়া কক্ষের একটি বাতায়ন খুলিয়া দিল। অমনি সহসা সুমধুর সঙ্গীত ধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল শুনিল—

"রিমঝিম ঘন বরিষে—সখিলো,
বিরহী নয়ন-ধারা, ঢালিছে শ্রাবণ ধারা,
কি জ্বলে মরমে জ্বালা, নিভাই কেমনে সে,
গুরু গুরু গর্জ্জনে, গর্জ্জে নবীন ঘন,
দলকে দামিনী বিকাশে।"

এই সময় আর একবার বজ্রের কড়মড় শব্দ হইল, গান থামিয়া গেল, অমনি সুশীলা এই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঝড় বৃষ্টির প্রারম্ভে কনক একাকী আছে বলিয়া তাঁহার কষ্ট হইতেছিল। কিন্তু তিনি মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিয়াছিলেন যে তাহাকে আপনার দোষেই এইরূপ একাকী থাকিতে হইতেছে—তিনি কি করিবেন। পরে যখন একবার বজ্রধ্বনিতে বাড়ী কাঁপাইয়া তুলিল, বজ্রাগ্নি তাঁহার চক্ষু ঝলসিত করিয়া কিছু দূরে কনক যে কক্ষে বাস করিত সেই কক্ষের সম্মুখস্থ উদ্যানে গিয়া পড়িল, তখন সুশীলার মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইল। সুশীলার ভয় হইল কনকের কক্ষে তাহা হয়তো পড়িয়াছে। তিনি ব্যাকুল ভাবে সেই গৃহের দিকে ছুটিলেন, মনে হইল তিনিই কনকের হত্যাকারী, তাঁহার নিমিত্তই বজ্রাঘাতে কনকের মৃত্যু হইল। বারাণ্ডা দিয়া ছুটিয়া আসিতে আসিতে আকাশ পানে তিনি দেখিতে পাইলেন যেন সেই বজ্র বৃষ্টি বিদ্যুতের মধ্যে কনকের মাতা দাঁড়াইয়া বলিতেছেন "তুমিই আজ কনককে মারিয়া ফেলিলে,তোমার কঠোরতাতেই তাহার জীবন বিনষ্ট হইল।" সুশীলা তখন সে দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া "কনক কনক" করিয়া ছুটিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন কনক শয্যায় উপবিষ্টা। তাহাকে জীবিত দেখিয়া তিনি যেন পুনরায় জীবন প্রাপ্ত হইলেন, সকল দোষ ভুলিয়া গিয়া সহর্ষে বালিকার মুখ চুম্বন করিলেন। এই সময় আবার গীত ধ্বনি উথলিয়া তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল—

"জনম আমার সুধু সহিতে যাতনা"—

গানটি শুনিবার জন্য সুশীলা কান পাতিলেন কিন্তু গান এই খানেই থামিয়া গেল। কে গান গাহিতেছে দেখিবার জন্য তিনি বাতায়নে দাড়াইলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল সম্মুখস্থ জাহ্নবীনদীর তরঙ্গ উচ্ছাস সেই অন্ধকারের মধ্যেও তাঁহার চক্ষে প্রতিভাত হইল। তাহা ছাড়া তীরে মনুষ্যের চিহ্নও দেখিলেন না, কিন্তু মনে হইল প্রাচীরের নিকট হইতে গীত-ধ্বনি উঠিতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া আবার কে গাহিয়া উঠিল—

"জীবন ফুরায়ে এল আঁখি জল ফুরালোনা।"

গান শুনিয়া সুশীলার মাথা ঘুরিয়া আসিল, তাঁহার কত কথাই মনে পড়িয়া গেল, সেই বালিকাজীবন, বাল্যের সুখ দুঃখ সমস্তই মনে পড়িয়া গেল। সুশীলা আশ্চর্য্য হইয়া নিস্পন্দে আবার সেই গানটির শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন কিন্তু আর কেহই গাহিল না। তখনি তিনি

সেই প্রাচীরের অভিমুখে একজন লোককে আসিতে দেখিলেন। ক্রমে সে নিকটে আগমন করিল। অমনি এই সময় একবার বিদ্যুৎ হানিল, সেই আলোকে সে ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে পাইল, সুশীলাও তাহাকে দেখিতে পাইলেন। সুশীলা স্তম্ভিতের ন্যায় তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহাদের চক্ষে চক্ষে সংলগ্ন হইল, অমনি সুশীলা বাত্যাহত বৃক্ষের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমি-শায়িত হইলেন।

সৌন্দর্য্যতত্ত্ব।

সৌন্দর্য্যের কোন একটি অপরিবর্ত্তনীয় আদর্শ মানব-মনে নিহিত আছে কি না তদ্বিষয়ে নানা পণ্ডিতের নানা মত। একটি বস্তুকে আমরা কেনই বা সুন্দর বলি, আর একটিকে কেনই বা কুৎসিত বলি তাহার কি কোন কারণ নাই? সৌন্দর্য্যের কি কোন নির্দ্দিষ্ট মূল নিয়ম নাই? কালিদাস বলিয়াছেন "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ"—এ বচনটির সত্যতা বিষয়ে কে অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু আমাদিগের অন্যান্য তাবৎ মানসিক বৃত্তির ন্যায়—এই সৌন্দর্য্য-রুচিও কি উন্নতি-সাপেক্ষ নহে? সমস্ত সৃষ্টি-ব্যাপারই যে ক্রমোন্নতি ও ক্রমাভিব্যক্তির নিয়মাধীন, এই সৌন্দর্য্য-রুচিই একমাত্র কি সেই নিয়মের ব্যভিচার-স্থল হইবে? সমস্ত সৃষ্টিই কোন একটি পূর্ণ আদর্শের সমীপবর্ত্তী হইবার জন্য ক্রমাগত যুঝাযুঝি করিতেছে—ও যতখানি সেই আদর্শের সমীপবর্ত্তী হইতে সমর্থ হইতেছে ততখানিই তাহার উন্নতি। এই যুঝাযুঝির বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখিয়া সহসা মনে হইতে পারে যে উহা নিতান্ত উদ্দেশ্য-বিহীন ও সকল প্রকার নিয়মের বহির্ভূত। কিন্তু সকল যুদ্ধ ব্যাপারই যে অন্তিম চিরস্থায়ী শান্তি ও সুশৃঙ্খলা স্থাপনের সোপান মাত্র ও সকল যুদ্ধের মধ্যেই যে শান্তির বীজ নিহিত আছে তাহা আমরা সহসা উপলব্ধি করিতে পারি না। মানব-জাতির সৌন্দর্য্য-রুচি সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে। বিচিত্র মনুষ্য-জাতির মধ্যে রুচিও যে বিচিত্র, এ কথা প্রমাণ করিবার জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না—ইহার নিদর্শন সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই রুচি-গত বিচিত্রতার অন্তর্নিহিত কোন প্রকার ধ্রুবত্বের নিয়ম লক্ষিত হয় কি না তাহাই বিবেচ্য।

সৌন্দর্য্য-লালসা সমস্ত মানব জাতির মধ্যেই দৃষ্ট হয়—কিন্তু এই সৌন্দর্য্যের আদর্শ সকল দেশে সমান দেখা যায় না। অতীব অসভ্য বন্য জাতিদিগকেও শারীরিক শো-

ভা-বর্দ্ধনের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইতে দেখা যায়—বেশ ভূষা অলঙ্কারের প্রতি তাহাদিগের অত্যন্ত অনুরাগ। কোন এক জন ইংরাজ পণ্ডিত এতদূর পর্য্যন্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শোভাবর্দ্ধনের জন্যই কাপড় পরার রীতি প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, শরীরের তাপ রক্ষার জন্য নহে। Professor Waitz বলেন "একজন মানুষ যতই দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত হোক না কেন, আপনার শোভাবর্দ্ধনে তাহার একটি সুখ বোধ হয়।" "রেন-ডীয়র" নামক হরিণের সমকালবর্ত্তী য়ুরোপীয় অসভ্য লোকেরা কোন উজ্জ্বল বস্তু পাইবা মাত্রই তাহা সংগ্রহ করিয়া তাহাদের গহ্বর মধ্যে আনিত। বর্ত্তমান কালের বন্য জাতীয়েরা সর্ব্বত্রই পালক, কণ্ঠহার বাজুবন্দ কানবালা প্রভৃতি অলঙ্কার দ্বারা আপনার শরীর বিভূষিত এবং বিচিত্র রঙ্গে রঞ্জিত করে। Humboldt বলেন "পরিচ্ছদধারী জাতিদিগের ন্যায় যদি রঞ্জিত জাতীয়গণের প্রতি ততদূর মনোযোগ দেওয়া হইত, তাহা হইলে দেখা যাইত—যে, কি রঙ্গের বিচিত্রতা কি কাপড়ের ঢং উভয়ই এক ফলবতী কল্পনা ও ক্ষণ-পরিবর্ত্তনশীল খেয়াল হইতে প্রসূত।"

আফ্রিকার কোন অংশের অধিবাসীগণ চখের পাতা কাল রং দিয়া এবং কোন অংশের অধিবাসীগণ নখ্ পীত কিম্বা বেগ্নি রং দিয়া রঞ্জিত করে। অনেক স্থানে কেশও নানা প্রকার রঙ্গে রঞ্জিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে দাঁতে কাল, লাল নীল প্রভৃতি নানা প্রকার রং দিবার রীতি আছে এবং মালাই দ্বীপপুঞ্জ নিবাসীগণ কুকুরের ন্যায় দাঁত সম্পূর্ণ সাদা হওয়া অত্যন্ত লজ্জার বিষয় মনে করে। সকল অসভ্য জাতির মধ্যেই তো অনেক দেশে যত্ন পূর্ব্বক কেশ বিন্যাস করে, আবার কোন কোন দেশে মস্তক একেবারে মুণ্ডন করিয়া ফেলে। এমন কি, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা দেশের লোকেরা ভ্রূ পর্য্যন্ত উৎপাটন করিয়া ফেলে। উপরিতন নীল নদী-কূলস্থ প্রদেশ-নিবাসী মনুষ্যগণ সাম্‌নেকার চারিটা দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলে। তাহারা বলে যে, সামনের দাঁত রাখিয়া তাহারা পশু-তুল্য হইতে ইচ্ছা করে না। আরও দক্ষিণে, লিভিংষ্টোন সাহেব বলেন, বোটোকা নামে এক জাতি আছে, তাহারা সামনের উপরকার স্তবকের দুইটা দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলে; তৎপ্রযুক্ত তাহাদিগের নিম্ন চোয়াল বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদিগকে অত্যন্ত কদাকার দেখায় কিন্তু তাহারা মনে করে যে ঐ স্থানের দাঁত থাকিলে বরং আরও বিশ্রী দেখিতে হয়। তাহারা কতকগুলি য়ুরোপীয়কে দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল "দেখ দেখ—বড় বড় দাঁতগুল দেখ।" আফ্রিকার বিভিন্ন প্রদেশে এবং মালাই দ্বীপপুঞ্জে সামনের দাঁত ঘসিয়া করাতের মত ছুঁচাল করে, অথবা ছিদ্রিত করিয়া তাহার মধ্যে গোঁজ পুরিয়া রাখে। উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন জাতি, উপরের কিম্বা নিম্নের ওষ্ঠ ছিদ্রিত করে—বোটোকুডো জাতীয়েরা নিম্ন-ওষ্ঠে ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে ৪ ইঞ্চি পরিধি পরিমাণ

কাঠের গোঁজ পুরিয়া রাখে। মধ্য আফ্রিকার স্ত্রীলোকেরা নিম্ন ওষ্ঠ কুঁড়িয়া তাহাতে একটি স্ফটিক-খণ্ড পুরিয়া রাখে। লাটুকা প্রদেশের সর্দারের স্ত্রী বেকর্ সাহেবকে বলিয়াছিল যে,—"যদি তোমার স্ত্রী সামনেকার নিম্ন স্তবকের দাঁত উঠাইয়া তাঁহার ওষ্ঠে সুচ্যাগ্রবৎ মসৃণীকৃত স্ফটিকখণ্ড ধারণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার অনেকটা শ্রী ফিরিয়া যায়।" আরও দক্ষিণে, মালকোলো জাতীয়েরা উপরকার ঠোঁট ফুঁড়িয়া তাহাতে একটি বৃহৎ ধাতুখণ্ড এবং বংশের বলয় পরিধান করে। ইহাকে তাহারা 'পেলে' বলে। বেকর সাহেব বলেন, ইহার দরুন স্ত্রীলোকের ওষ্ঠ, নাসিকার অগ্রভাগ হইতে দু ইঞ্চি পরিমাণ ঝুঁকিয়া পড়িতে তিনি দেখিয়াছিলেন। যখন স্ত্রী লোকটি মৃদু মধুর হাস্য করিল—মাংসপেশী কুঞ্চিত হওয়া প্রযুক্ত ওষ্ঠটি চক্ষু ছাড়িয়া উর্দ্ধে উঠিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাদের স্ত্রীলোকে কেন এই সকল বস্তু পরিধান করে?" তাহাদের প্রবীণ সর্দার চিনসুর্দি এই প্রশ্নটি নিতান্ত নির্বোধের প্রশ্ন মনে করিয়া বিস্মিত হইয়া উত্তর করিল "কেন, সৌন্দর্য্যের জন্য। স্ত্রীলোকদের ঐ যা একমাত্র সৌন্দর্য্যসাধক বস্তু আছে—পুরুষদের দাড়ি আছে—স্ত্রীলোকদের তো কিছুই নাই। এই 'পেলে' না থাকিলে স্ত্রীলোকদের কি অদ্ভুত দেখ্‌তেই হয়—দাড়ি নেই অথচ পুরুষের মত মুখ—সে স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকই নয়" Hearne যিনি আমেরিক ইণ্ডিয়ানদিগের সহিত অনেকবার বাস করিয়াছিলেন তিনি বলেন "একজন উত্তর প্রদেশস্থ ইণ্ডিয়ান্‌কে জিজ্ঞাসা কর সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে? সে উত্তর করিবে—চওড়া-পারা সমতল-মুখ, খুদে খুদে চোখ্—উঁচু উঁচু চোয়ালের হাড়, প্রত্যেক গালে তিন চারটে করে চওড়া চওড়া কাল রেখা—ছোট কপাল—বৃহৎ চওড়া দাড়ি(chin)—গ্যাব্‌দা গ্যাব্‌দা হুকের মত নাক—পিঙ্গলবর্ণের চামড়া—এবং কোমোর পর্য্যন্ত লম্বমান স্তন—ইহাকেই বলে সৌন্দর্য্য।" Pallas যিনি চীন রাজ্যের উত্তরাংশে গমন করিয়াছিলেন তিনি বলেন "যাহাদের চওড়া মুখ, উচ্চ চোয়াল—খুব চওড়া নাক এবং প্রকাণ্ড কান, সেই সকল স্ত্রীলোককেই লোকে পছন্দ করে; Vogt বলেন যে, চীন ও জাপান বাসীগণের এমনিই তো চোক্ উপর দিকে টানা, তারা যখন আবার ছবি আঁকে তখন ছবিতে সৌন্দর্য্য বাড়াইবার জন্য চোক আরও উপর-টানা করিয়া আঁকে। পাদ্রি Huc সাহেব পুনঃ পুনঃ অনেক স্থলে বলিয়াছেন যে, আভ্যন্তরিক প্রদেশস্থ চীনেরা য়ুরোপীয়দিগের সাদা চর্ম্ম এবং উন্নত নাসিকা থাকা প্রযুক্ত তাহাদিগকে অতি কদাকার বলিয়া মনে করে। সিংহল বাসীগণের নাক এমনিইতো বসা-বসা, কিন্তু সপ্তম শতাব্দির চীনগণের, মোগল জাতির সমতল মুখশ্রী দেখাই অভ্যাস ছিল সুতরাং তাহারা সিংহলবাসীগণের অত্যুন্নত নাক দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। Thsang বর্ণনা করেন যে তাহারা "মনুষ্যের ন্যায় শরীর-

বিশিষ্ট কিন্তু তাহাতে পাখির ঠোঁট্ সংযুক্ত।" প্রসিদ্ধ পর্য্যটক মঙ্গো পার্কের সাদা রং ও উন্নত নাক দেখিয়া নিগ্রোরা তাহার প্রতি উপহাস করিয়াছিল। আফ্রিকা-বাসী মুর-জাতীয়েরাও তাঁহার সাদা রং দেখিয়া "ভ্রু যুগল কুঞ্চিত করিয়া একেবারে শিহরিয়া উঠিয়াছিল।" পূর্ব্ব উপকূলে, বর্টন সাহেবকে দেখিয়া নিগ্রো বালকেরা বলিয়া উঠিয়াছিল "দেখ দেখ একটা সাদা মানুষ —ওকে একটা সাদা বাঁদরের মত ঠিক দেখাচ্চে না?" রীড্ সাহেব বলেন নিগ্রোরা কাল রং খুব পছন্দ করে—আবার কাফির জাতীয়েরা কাফ্রিদিগের ন্যায় অত কাল নয়—কাল ও লাল রঙ্গে মিশ্রিত—তাহারা এই জন্য শ্যামল বর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা পছন্দ করে—তাদের মধ্যে একজনের রং দুর্ভাগ্যক্রমে ফর্সা হওয়ায় কোন স্ত্রীলোক তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি হয় নাই। কোচিন চীনের একজন মনুষ্য একজন ইংরাজ দূতের স্ত্রীর রূপ সম্বন্ধে এইরূপ ঘৃণাব্যঞ্জক মত প্রকাশ করিয়াছিল "ওর দাঁত কুকুরের মত সাদা, আর ওর রং আলু ফুলের মত গোলাপি।" ডারুয়িন বলেন—এই একটি বড় আশ্চর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, যে দেশের লোকেরা স্বভাবতঃ শ্মশ্রু-বিহীন তাহারাই মুখ ও শরীরের লোম রাখিতে ভাল বাসে না—যদি কোথাও দুই এক গাছা লোম থাকেতো তাহা তাহারা যত্ন পূর্ব্বক উৎপাটিত করিয়া ফেলে। কালমক্ জাতীয়েরা শ্মশ্রুবিহীন —তাহারা শরীরের লোম উন্মূলিত করে —মালাই ও শ্যামীয় জাতীর কিয়দংশ লোকের মধ্যেও এই রীতি প্রচলিত আছে। নব জীলাণ্ড নিবাসীরা শ্মশ্রুহীন —তাহারাও মুখের লোম উৎপাটিত করে; তাহাদিগের মধ্যে এই একটি কথা প্রচলিত আছে যে, "লোমশ পুরুষের ভাগ্যে কোন স্ত্রী নাই।"

পক্ষান্তরে শ্মশ্রু-বিশিষ্ট জাতীয়গণ শ্মশ্রুর প্রতি যত্ন ও আদর প্রদর্শন করে। অ্যাংগ্লো স্যাকসনদিগের আইন-অনুসারে মনুষ্য শরীরের প্রত্যেক অংশের একএকটা মূল্য নির্দ্দিষ্ট ছিল—"শ্মশ্রুর ক্ষতি পূরণ হিসাবে ১০টাকা ও জানু-অস্থি ভঙ্গের ক্ষতি পূরণ হিসাবে ৬টাকা মাত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল"—প্রাচ্য দেশ সমূহে দাড়ি স্পর্শ করিয়া শপথ করিবার রীতি দৃষ্ট হয়। প্রশান্ত সমুদ্রের ফিজি জাতীয়দিগের দাড়ি প্রচুর ও ঝাকড়া ঝাকড়া এবং দাড়িই তাহাদের একটা অহংকারের বিষয়—আবার এদিকে তাহাদের পার্শ্বস্থ দ্বীপ পুঞ্জ নিবাসী টাঙ্গা ও স্যামোয়া জাতীয়েরা স্বভাবতঃ শ্মশ্রুহীন, সেইজন্য দাড়ির প্রতি তাহাদিগের অত্যন্ত বিদ্বেষ।

ডারুয়িন বলেন "এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে Humboldt যে নিয়ম অনেক দিন হইল ব্যক্ত করিয়াছিলেন সেই নিয়মই অনেকটা যথার্থ বলিয়া উপলব্ধি হয়।" তিনি বলিয়াছিলেন—"প্রকৃতি মানুষকে যে সকল বিশেষ লক্ষণ প্রদান করেন, মানুষ সেই সকল বিষয়কেই প্রশংসা ও আদর করে এবং অনেক সময় তাহারই বাড়াবাড়ি করিতে চেষ্টা করে" শ্মশ্রু

হীন জাতীয়দিগের মধ্যে শ্মশ্রুর চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলোপ ও শরীরের সমস্ত লোমোৎপাটন করিবার রীতি এই নিয়মের একটী দৃষ্টান্ত স্থল। ডারুয়িন আরও বলেন "সাধারণতঃ এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, আমাদিগের বোধ-শক্তি সকল বাহ্য ব্যাপারের সহিত এপ্রকার উপযোগী করিয়া নির্ম্মিত যে, কতকগুলি আকার, উজ্জ্বল রং—সমবিভক্ত ছন্দোবদ্ধ শব্দ প্রভৃতিতে আমাদিগের সুখ বোধ হয়, এবং তাহাদিগকেই আমরা সুন্দর বলিয়া থাকি। আগুনে হাত দিলে শরীরে কেন যন্ত্রণা উপস্থিত হয় কিম্বা সুখস্পর্শ মলয়-সমীরণে কেনই বা আমাদিগের সুখ বোধ হয়—ইহার যেরূপ আমরা কারণ বলিতে পারি না, কোন কোন আকার কেনইবা আমাদিগের ভাল লাগে অর্থাৎ সুন্দর বলিয়া বোধ হয়, এবং কোন কোন আকার কেনই বা খারাপ লাগে অর্থাৎ কুৎসিত বলিয়া বোধ হয়, তাহারও আমরা কোন কারণ নির্ণয় কবিতে পারি না।" অতএব, যদি প্রত্যেকের ভাল লাগার উপরেই সৌন্দর্য্য নির্ভর করে, তাহা হইলে যার যাতে ভাল লাগে, তার নিকটে তাহাই সুন্দর। তবে কি, সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের মূলে কোন প্রকার বিশ্বজনীন মূলতত্ত্ব নাই ?

কিন্তু এই একটি বিষয় আমরা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই যে, পৃথিবীতে যত সাধারণ সভ্যতার উন্নতি হইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যের আদর্শও ক্রমশ একতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই জন্যই আমাদের প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন হইলেও সেক্‌সপিয়রের সৌন্দর্য্য আমরা অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি, আবার য়ুরোপীয়গণ শকুন্তলার সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে অনুভব করিতে পারিতেছেন—আমরা রোমের Saint Peter কিম্বা রুসিয়ার Kremlin দেখিয়া যেরূপ আশ্চর্য্য হইতেছি, আমাদের দেশের তাজমহল দেখিয়া য়ুরোপীয়েরা তেমনি আবার বিমোহিত হইতেছেন। যদি সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের মূলে কতকগুলি সাধারণ মূল তত্ত্ব না থাকিবে, তবে এ প্রকার ঘটনা কেন হয় ?

আমরা সুন্দর পদার্থ সকলকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তাহার মূলে দুইটি মূল-উপকরণ দেখিতে পাই। সমতা ও বিচিত্রতা। এই সমতা ও বিচিত্রতার সামঞ্জস্যের নাম সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্য আপেক্ষিক—তুলনা সাপেক্ষ। যদি সমস্তই একাকার হইত, কোন প্রকার ভিন্নতা না থাকিত, তাহা হইলে সৌন্দর্য্য আমরা আদৌ অনুভব করিতে পারিতাম না। কিন্তু এই বিভিন্নতা—এই বিচিত্রতার মধ্যে যতক্ষণ না আমরা সমতা উপলব্ধি করিতে পারি ততক্ষণ আমাদিগের সৌন্দর্য্য-বোধের উদ্রেক হয় না।

কোন পদার্থের সহিত কোন পদার্থের মিল দেখিতে যেমন আমরা ভাল বাসি, সেইরূপ ভিন্নতা দেখিতেও ভাল বাসি—বস্তুতঃ এক বস্তুর সহিত আর এক বস্তুর মিল আছে, এ কথা বলিলে এই বুঝায় যে কোন কোন সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে মিল আছে এবং কোন কোন সম্বন্ধে অমিলও আছে। কেন না, যদি উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে

অর্থাৎ সর্ব্বাংশে ও সর্ব্ব-সম্বন্ধে মিল থাকে, তাহা হইলে আর উভয় শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে না, তাহা হইলে সে একই বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। সৌন্দর্য্য কি? না—সাম্য ও বৈষম্যের সামঞ্জস্য। উহাতে সাম্যও থাকা চাই এবং বৈষম্যও থাকা চাই এবং এই সাম্য বৈষম্যের মধ্যে আবার সামঞ্জস্য থাকা চাই। এক্ষণে মনে কর একটি সম চতুষ্কোণ আর একটি সম্পূর্ণ অসমরেখা-বিশিষ্ট আকার আছে। এই উভয়ের মধ্যে কোন্ আকারটি আমাদিগের নিকট সুন্দর বলিয়া বোধ হয়? সমচতুষ্কোণ আকারটি যে অপেক্ষাকৃত সুন্দর তাহা বোধ হয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবে। কেন সুন্দর বোধ হয়? যেহেতু উহাদের মধ্যে পরস্পর সৌসাদৃশ্য আছে (সাদৃশ্য আছে বলিয়াই বোঝায় যে তাহাদিগের মধ্যে ভিন্নতাও আছে) কোন পদার্থের বা কোন আকারের সম বিষম অংশগুলি যখন এ প্রকারে কৌশলে যোগাযোগ করা হয় যে তাহাদিগের পরস্পর সামঞ্জস্য একেবারেই সহজে আমাদিগের চক্ষে প্রতিভাত হয়—তখনি তাহাকে আমাদিগের সুন্দর বলিয়া উপলব্ধি হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, কেবলমাত্র ভিন্নতা কিম্বা বিচিত্রতাতে আমাদিগের সৌন্দর্য্য-বোধ তৃপ্ত হয় না। বিচিত্রতার মধ্যে যতক্ষণ না আমরা সমতা দেখিতে পাই, ততক্ষণ আমাদিগের সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের উদ্রেক হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে সমতাই সৌন্দর্য্যের মুখ্য উপকরণ এবং বিচিত্রতা গৌণ উপকরণ। কোন নিতান্ত বাঁকা-চোরা রেখা অপেক্ষা যে একটি সরল রেখা সুন্দর তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঁকা-চোরা রেখার মধ্যে বিচিত্রতা অনেক আছে কিন্তু সে বিচিত্রতায় আমাদিগের সৌন্দর্য্য-বোধের উদ্রেক হয় না—কিন্তু সেই একটি বাঁকা-চোরা রেখার সঙ্গে আর একটি ঠিক তদ্রূপ বাঁকা-চোরা রেখা যদি এরূপ কৌশলে সংযোজিত করা যায় যে তাহাদিগের বাঁকা-চোরা রূপ বিচিত্রতার মধ্যে আবার একটি সমতা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, তখন তাহাই আবার সুন্দর হইয়া পড়ে। অতএব সমতাই সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের অন্ন—এবং বিচিত্রতাই তাহার ব্যঞ্জন-স্বরূপ। সৌন্দর্য্যের পক্ষে উভয়ই প্রয়োজনীয়।

ক্রমাগত এক-ঘেয়ে সাম্য-রস আস্বাদন করিয়া করিয়া আমাদের সৌন্দর্য্য রুচির পাছে অরুচি উপস্থিত হয়, এই জন্যই বিচিত্র সাম্যের প্রয়োজন। এর সঙ্গে ওর মিল, ওর সঙ্গে এর মিল—এইরূপ মিলের বিচিত্রতা আমরা ভাল বাসি।

সৌন্দর্য্য দুই প্রকার—সাদা-সিধা সৌন্দর্য্য ও জম্‌কাল সৌন্দর্য্য। যে সৌন্দর্য্যে তত বিচিত্রতা নাই—সে সৌন্দর্য্য অপেক্ষাকৃত সাদা-সিধা এবং যাহাতে বিচিত্রতার আধিক্য, তাহার সৌন্দর্য্যও সেই পরিমাণে অধিক জম্‌কাল। সমচতুষ্কোণ, সমত্রিকোণ প্রভৃতি আকার সাদা-সিধা সৌন্দর্য্যের দৃষ্টান্ত—সাদা-সিধা আকারের মধ্যে চক্র আকারই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। তাহার কারণ

এই যে, চক্র আকারে—সাম্য ও বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্য অতি সুন্দররূপে রক্ষিত হইয়াছে। চক্রাকারের প্রত্যেক অংশ পৃথক করিয়া ধরিতে গেলে প্রত্যেক অংশ প্রত্যেক অংশ হইতে ভিন্ন—অথচ সেই সকল অংশগুলি এরূপ অল্পে অল্পে ক্রমশ ভিন্ন হইয়া বেমালুম পরস্পরের সহিত মিলিয়া গিয়াছে যে তাহা হইতে একটি সমগ্র সামঞ্জস্যের ভাব স্ফূর্ত্তি পাইয়া আমাদিগের সৌন্দর্য্য-বৃত্তিকে তৃপ্ত করে।

একটি সমচতুষ্কোণ আকার অপেক্ষাও চক্রাকার এই জন্য অধিক সুন্দর। এই জন্য প্রকৃতিতে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর তাহা সমস্তই প্রায় গোলাকারের দিকে উন্মুখ। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র পুষ্প ফল প্রভৃতি সুন্দর পদার্থ সকল এই জন্য ন্যূনাধিক গোলাকার।

ফল হইতে প্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌন্দর্য্য অধিক জমকাল কেন? না—যেহেতু ফল অপেক্ষা পুষ্পের বৈচিত্র্য অধিক।

চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় যে সকল সুন্দর পদার্থ তাহার সৌন্দর্য্যের আর একটি উপকরণ রং। বিচিত্রতাই রঙ্গের প্রধান উদ্দেশ্য—কিন্তু রঙ্গের বিষয়েও সাম্য বৈষম্যের সামঞ্জস্য দ্বারাই রঙ্গের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়।

চক্ষুরিন্দ্রিয়-গত সৌন্দর্য্যের আর একটি উপকরণ উজ্জ্বলতা। কোন দ্রব্যের যদি উজ্জ্বলতা ভিন্ন আর কোন সৌন্দর্য্যের উপকরণ না থাকে তথাপি সেই উজ্জ্বলতার জন্যই আমরা তাহাকে সুন্দর বলি। তবে, আকার-গত সাম্য বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্যের সঙ্গে যদি আবার কোন পদার্থের উজ্জ্বলতা গুণ থাকে—তাহা যে কেবলমাত্র উজ্জ্বলতা-বিশিষ্ট পদার্থ অপেক্ষা সুন্দর তাহাতে সন্দেহ নাই।

সচরাচর, ফল অপেক্ষা ফুলে রং ফলান অধিক—আকার-গত বৈচিত্র্যও অধিক—এই জন্য ফল অপেক্ষা ফুলের সৌন্দর্য্য অধিক জমকাল। পূর্ণচন্দ্রকে কেন আমরা এত সুন্দর বলি? সৌন্দর্য্য-উপকরণের মধ্যে গোলাকার ও উজ্জ্বলতা এই যে দুইটি উপকরণ ইহা পূর্ণচন্দ্রে আছে বলিয়াই তাহাকে সুন্দর বলি—পূর্ণচন্দ্রের সৌন্দর্য্যের এতদ্ভিন্ন আর কি কোন উপকরণ নাই? আর একটি আনুসঙ্গিক উপকরণ আছে, তাহা বৈপরীত্য। অনন্ত নীল আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হওয়ায় উহার সৌন্দর্য্য আরও দীপ্তি পাইয়াছে।

নীল আকাশে পূর্ণচন্দ্র যখন উদিত হয়, কিম্বা শ্যামল সরোবর-সলিলে যখন পদ্ম বিকসিত হয়, তাহাদিগের নিজের সৌন্দর্য্য ছাড়া রঙ্গের বৈপরীত্যে আর একটি অভিনব আনুসঙ্গিক সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হয়। উজ্জ্বলতা সৌন্দর্য্যের একটি সামান্য উপকরণ নহে। অন্যান্য গুণের অভাব অনেক সময়ে উজ্জ্বলতায় ঢাকিয়া যায়। বিকসিত পদ্ম ও সমুদিত পূর্ণচন্দ্রমা এই উভয়ের মধ্যে কে অধিক সুন্দর, নির্ণয় করা সুকঠিন। চন্দ্র অপেক্ষা পদ্মের বৈচিত্র্য অনেক গুণে অধিক, যদি চন্দ্রের উজ্জ্বলতা গুণ না থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারিত

চন্দ্র অপেক্ষা পদ্ম সুন্দর। কিন্তু এক উজ্জ্বলতার গুরুত্বে পদ্ম অপেক্ষা চন্দ্রের সৌন্দর্য্য, তুলাদণ্ডে অধিক হইয়া পড়িয়াছে।

যাহা এতক্ষণ বলিলাম তাহা সমস্তই চক্ষুরিন্দ্রিয়-বিষয়ীভূত সৌন্দর্য্যের দৃষ্টান্ত। আমাদিগের যত ইন্দ্রিয় আছে, তাহার বিষয়ীভূত ততপ্রকার সৌন্দর্য্যও আছে। এতন্মধ্যে চক্ষু ও কর্ণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত সৌন্দর্য্যই শ্রেষ্ঠ। সঙ্গীতই শেষোক্ত সৌন্দর্য্যের বিষয়, অতঃপর ইহার বিষয় আলোচনা করা যাইবে।

ক্রমশঃ।

সুখের প্রেম।

যে অবধি আমি পাইনু জানিতে
যারে ভাল বাসি সে গো আমার,
সকল প্রকৃতি হাসিল হরষে,
বাজিয়া উঠিল হৃদয়-তার॥
বন হল আরো হরিত-বরণ,
নীল নভ হল সুনীলতর,
তারকা সকল ভাতিল দ্বিগুণ,
মলয়-অনিল মাতিল আরো॥
যত দিন ভাল বাসিতে জানি নি
বেড়াতেম খেলি বালির তীরে,
প্রসারিত এবে উদার সাগর,
কত চারু দ্বীপ দেখি সে নীরে॥
যে দিকে নেহারি মমতা-লহরী
উথলি উঠিছে সকল ধার।
চাবি-দেওয়া ছিল লুকানো প্রকৃতি
হঠাৎ খুলিল হৃদয় তার॥
লতা পাতা গাছ যত উপবন
চারি দিকে সুখ প্রচার করে,
মধুপ মধুর করে গুণগুণ
কোকিল মাতায় সুধার স্বরে॥

সকলি আমার সহৃদয় সখা
রবি শশি নীল গগন-তল,
খেচর ভূচর সব চরাচর,
ভূধর, অনিল, সাগর-জল॥
ওগো গিরি নদি! ওগো উপবন!
তপন, পবন, সুধাই সবে,
আমার প্রেয়সী, যেমন রূপসী
কে কোথায় বল দেখেছ কবে?
শুধু রূপে নয়, গুণে অতুলন,
যা কিছু মধুর প্রকৃতি-মাঝে
আমি দেখি যেন তাহারি শোভার
ছায়াতে পড়িয়া সবাই সাজে॥
কে জানে কি গুণ ধর ও গো প্রেম!
নূতন জীবন পাইনু প্রাণে,
কিসের কাজলে রাঙিলে নয়ান
প্রিয়ারে যে দেখি সকল স্থানে॥
প্রেম তুমি মোর জীবন মরণ,
তুমি গেলে প্রাণ জীবন ছাড়ে।
প্রেম দিলে পাই নূতন পরাণ
ফিরে গেলে—প্রাণ দ্বিগুণ বাড়ে॥

কাতন্ত্র-জীবনী।

চতুর্থ অধ্যায়।

(কাতন্ত্রের অতিরিক্ত গ্রন্থকারগণ।)

কাতন্ত্র অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মহাত্মা কর্ত্তৃক কত গ্রন্থ বিনির্ম্মিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া কাতন্ত্র সহযোগী যে সকল গ্রন্থাদির বিষয় জানিতে পারিয়াছি তাহার তালিকা প্রদত্ত হইতেছে।

১। দুর্গবোধ (দুর্গসিংহ কৃত টীকা)

২। দুর্গবাক্যপ্রবোধ বা "কুলচন্দ্র" (কুলচন্দ্রকৃত দুর্গসিংহের টীকার টীকা)

৩। বিদ্যাসাগর (দুর্গসিংহের টীকার টীকা)

৪। কাতন্ত্র পঞ্জিকা (ত্রিলোচনদাস কৃত)

৫। কলাপচন্দ্র (সুসেন কবিরাজ কৃত; এখানি ত্রিলোচনকৃত টীকার টীকা)

৬। হেমকর।

৭। কলাপতত্ত্বার্ণব বা "শিরোমণি" (রঘুনাথ শিরোমণি কৃত)

৮। বিল্বেশ্বর বা বিশ্বেশ্বর (ভট্টাচার্য্য)

৯। উমাপতি।

১০। ব্যাখ্যাসার।

১১। রামদাস।

১২। 'ষট্‌কারিকা' ও ষট্‌কারিকার ব্যাখ্যা (ভবসনন্দিকৃত)

১৩। রমাকান্ত।

১৪। কৃষ্ণমঞ্জরী (শিবরাম শর্ম্মকৃত)

১৫। কাতন্ত্রপরিশিষ্ট (শ্রীপতিদত্ত প্রণীত)

১৬। পরিশিষ্টপ্রবোধ' (গোপীনাথ তর্কাচার্য্য কৃত কাতন্ত্র পরিশিষ্টের টীকা)

১৭। রামচন্দ্র (কাতন্ত্রের পরিশিষ্টের টীকা)

১৮। গণ (কাতন্ত্র সম্মত ধাতুপাঠ)

১৯। মনোরমা (কাতন্ত্রগণের টীকা)

২০ হলায়ুধ (ঐ)

ইত্যাদি ইত্যাদি।

উল্লিখিত গ্রন্থাদি ব্যতীতও কাতন্ত্র সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ আছে। কাতন্ত্র সহযোগী গ্রন্থাদি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত দেখা যায়। এস্থলে যে যে গ্রন্থ কাতন্ত্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রচলিত আছে, আবার অন্য স্থলে তৎপরিবর্ত্তে অন্যান্য যে সকল গ্রন্থের প্রচলন দৃষ্ট হয়, বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া নানাস্থান হইতে সেই সকল গ্রন্থ সংগ্রহ না করিলে কাতন্ত্র-অন্বীয় যাবতীয় গ্রন্থের বিবরণ সহজে জানা যায় না।

গ্রন্থকারের যে নাম, অনেক স্থলে তৎ-প্রণীত গ্রন্থেরও সেই নাম হইয়া থাকে (যেমন ভট্টি, মাঘ, চরক, সুশ্রুত, চক্রদত্ত

ইত্যাদি) কাতন্ত্র টীকাদির প্রায় অনেকই গ্রন্থকারের নামে পরিচিত; ঐ সকল গ্রন্থের প্রকৃত নাম বলিলে তাহা কেহই চিনিতে পারে না। আমরা উপরের তালিকাস্থিত ৩।৪ খানা গ্রন্থ দেখিতে পারি নাই—দেখিবার যোও নাই, কেন না ঐ সকল গ্রন্থ প্রায় লোপ পাইয়াছে—সুতরাং এমন হইতে পারে যে, ঐ অপরিজ্ঞাত গ্রন্থ সম্বন্ধে একবার গ্রন্থকার-প্রদত্ত গ্রন্থের নাম ও একবার গ্রন্থকারের নাম দুই নামই উল্লেখ করিয়াছি; কিন্তু সে আশঙ্কা খুব অল্প।

কাতন্ত্রের যে সকল টীকা আছে, তাহার সমুদায় টীকাতেই যে কাতন্ত্রের চারি ভাগের ব্যাখ্যাদি আনুপূর্ব্বিক উল্লিখিত আছে তাহা নহে, কোন কোন টীকা কেবল অংশ বিশেষের ব্যাখ্যার জন্যও বিনির্ম্মিত হইয়াছে। যেমন, ষট্‌কারিকায় কেবল কারক সম্বন্ধেই অল্প কিছু বিবৃত আছে, কৃন্মঞ্জরীতে কৃৎ প্রকরণ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা আছে এবং বিল্লেশ্বর বিশেশ্বরে আখ্যাত সম্বন্ধে কয়েকটী কথা লিখা আছে।

কাতন্ত্রের অতিরিক্ত গ্রন্থকারদের, টীকাকার, পরিশিষ্টকার প্রভৃতির বিষয় আমরা যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাদের সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে—দুই চারি পংক্তি এই অধ্যায়ে বলিতেছি।

(কুলচন্দ্র)

কুলচন্দ্র একজন প্রাচীন টীকাকার। ইঁহার টীকার নাম "দুর্গবাক্য প্রবোধ।' দুর্গসিংহের টীকাই, কুলচন্দ্রকৃত টীকার আদর্শ স্বরূপ। কুলচন্দ্রের বৈয়াকরণিক নিপুণতা সুন্দর আছে। ইনি যে একজন প্রগাঢ় বিদ্বান ছিলেন তাহা ইঁহার কৃত টীকাই বিলক্ষণ সাক্ষ্য দিতেছে। কুলচন্দ্রের পিতার নাম মহীধর ১। ইঁহার আবির্ভাব কাল নির্ণয় করিবার উপায় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই অত্যুৎকৃষ্ট টীকা খানি প্রায় লোপ হইয়া যাইতেছে।

(বিদ্যাসাগর)

বিদ্যাসাগরকৃত টীকাও দুর্গসিংহকৃত টীকার টীকা স্বরূপ। বিদ্যাসাগরের টীকা অতি বিস্তীর্ণ এবং তর্ক বিতর্কে পরিপূর্ণ। ইনি যে তর্কশাস্ত্রে প্রবীণ ছিলেন, ইঁহার টীকার প্রতি পৃষ্ঠাতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই বিদ্যাসাগর কাহারও মতে দুর্গসিংহের শিষ্য ছিলেন ২। কিন্তু একথা

---

১ " শ্রীমহীধরাত্মজকুলচন্দ্রকৃতৌ দুর্গবাক্য প্রবোধে ... ... (কুলচন্দ্র)

২ আমরা পূর্ব্বেও এই কথা বলিয়াছি (ভারতী, ২য় ভাগ, চৈত্র ৫৩৮)। বিদ্যাসাগরকৃত গ্রন্থ এখন সংগ্রহ করা বড় দুর্ঘট; এদেশে উহা প্রায় লোপ হইয়াছে। পুস্তকের অভাবেই পুরাতত্ত্ব-অনভিজ্ঞ সংস্কৃতজ্ঞ লোকদের কথায় বিশ্বাস করিয়া পূর্ব্বেও বিদ্যাসাগরকে দুর্গসিংহের শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়া ছিলাম। সংপ্রতি একখানা বিদ্যাসাগরের টীকা দেখিয়া আমাদের ঐ সংস্কার দূর হইল কিন্তু ঐ গ্রন্থখানি পাইয়াও আমরা বিদ্যাসাগরের সমুদয় বিষয় সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলাম

নিতান্তই কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয় ; কেননা ইহার প্রণীত টীকায় শ্রীপতি, ত্রিলোচন, কলাপচন্দ্র প্রভৃতি দুর্গসিংহ অপেক্ষা অনেক পরকীয় লোক ও গ্রন্থাদির নাম উল্লেখ আছে সুতরাং এই বিদ্যাসাগরকে বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা ৪।৫ শতাব্দির অধিক পূর্ব্বের লোক বলিতে পারি না। বিদ্যাসাগর ভট্টি কাব্যেরও কাতন্ত্র-সম্মত এক খানা টীকা প্রণয়ন করেন। ভরতমল্লিকের যে একখানা ভট্টির টীকা আছে উহার অনেক স্থল প্রায় বিদ্যাসাগরের টীকার অনুলিপি মাত্র—প্রভেদ এই যে বিদ্যাসাগরের টীকা কাতন্ত্রসম্মত। ভরতমল্লিকের টীকা মুগ্ধবোধসম্মত। ইহাতেই বোধ হয় বিদ্যাসাগর ভরতমল্লিক অপেক্ষা কিছু পূর্ব্বের লোক। এখন কাতন্ত্রব্যবসায়ীদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের টীকারও তত প্রচলন দেখা যায় না ; বোধ হয় বিস্তারিত-দোষই ইহার একমাত্র কারণ—বিশেষতঃ ঐ টীকার সংস্কৃত কিছু কঠিন।

(ভব-সনন্দি;—ষট্‌কারিকা প্রণেতা)

ভবসনন্দি কৃত "ষট্‌কারিকা" অতি প্রাচীন গ্রন্থ—কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কলেবর বিশিষ্ট। ইহাতে কাতন্ত্র-সম্মত কারক, চতুর্দ্দশটী পদ্যময় কারিকায় বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও গ্রন্থকার আশ্চর্য্য কৌশলে উক্ত চতুর্দ্দশটী কারিকায় কারকের নিয়ম সকল, এরূপ সুন্দর প্রণালীতে ব্যক্ত করিয়াছেন যে তাহা বুঝিয়া পাঠ করিলে উহা দ্বারাই কারকের ভাল জ্ঞান হইতে পারে। এত অল্প কথায় যে গ্রন্থকার কারকের নিয়মাদি সুন্দর রূপ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা কেবল অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় নহে। গ্রন্থকার ঐ চতুর্দ্দশটী কারিকার টীকাও করিয়া গিয়াছেন। ইনি বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়া গিয়াছেন। (৩) ষট্‌কারিকার শেষ ভাগে লিখিত আছে যে "এই গ্রন্থ ৪১৯ অব্দে প্রণয়ন আরম্ভ হইয়া ৪২০ অব্দে প্রকাশিত হইল (৪)। তাহার লিখিত অব্দ শকাব্দা কি সংবৎ কিছুই উল্লেখ করে নাই। যদি শকাব্দা হয় তবে খৃষ্টীয় ৪৯৮ এবং যদি সংবৎ হয় তবে খৃষ্টীয় ৩৬৩ অব্দে তাহার ষট্‌কারিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। সুতরাং ভব-সনন্দি দুর্গসিংহের কিছু পূর্ব্বের অথবা সমসাময়িক লোক। বোধ হয় কাতন্ত্রের বৃত্তি প্রণয়ন হইবার পূর্ব্বে ইহাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল।

না। কেন না ঐ গ্রন্থের আদি অন্ত কিছুই নাই সুতরাং বিদ্যাসাগরের প্রকৃত নাম কি এবং তাঁহার টীকার আর কোন নাম আছে কি না তাহা উহা দ্বারা জানা গেল না।

(৩) জয়ং মারবলং যেন নির্জ্জিতং ভবপঞ্জরম্।
নির্ব্বাণ-পদমারূঢ়ং তং বুদ্ধং প্রণমাম্যহম্ ॥

(৪) উনবিংশতিসংযুক্তা গ্রন্থস্যাস্য চতুঃশতীং।
নির্ম্মিতা নিগদযোহ স্ফুটং ভব-সনন্দিনা ॥
ইমাং বিংশতি সংযুক্তা সাধবসা চতুঃশতীং।
আশ্রাং   *   *   *

(ত্রিলোচনদাস—কাতন্ত্রপঞ্জিকা প্রণেতা)

ইদানীং যতগুলি কাতন্ত্র-টীকা বিনির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ত্রিলোচনদাস-কৃত "কাতন্ত্র পঞ্জিকা" নামক টীকাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কাতন্ত্র-পঞ্জিকা সাধারণ্যে "পঞ্জি" নামেই বিখ্যাত। ত্রিলোচন বিশেষ সাবধানের সহিত পূর্ব্বাচার্য্যদের নানা গ্রন্থ হইতে সার সংকলন করিয়া তদীয় "কাতন্ত্র পঞ্জিকাকে" অপূর্ব্ব সাজে সাজাইয়াছেন। ত্রিলোচন অযথা আড়ম্বরে না যাইয়া তাহার গ্রন্থে সার কথাই অধিক বিনিবেশিত করিয়াছেন। অন্যান্য টীকাকার অপেক্ষা এখন ত্রিলোচনদাসই সমাদর পাইতেছেন—তাঁহার টীকাই এখন সর্ব্বত্র প্রচলিত। ত্রিলোচন দাস অম্বষ্ঠকুলোদ্ভব ছিলেন (৫) তাঁহার গ্রন্থে লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভা-পণ্ডিত গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন (৬)। লক্ষ্মণ সেনের প্রিয় মন্ত্রী হলায়ুধ আবার ত্রিলোচনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। (৭) সুতরাং ত্রিলোচন যে লক্ষ্মণসেনের সমকালে (খ্রীঃ ১১০১ হইতে ১১২১ অব্দ পর্য্যন্ত) বর্ত্তমান ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। (৮) ত্রিলোচনের ন্যায় ভাল টীকাকার খুব অল্প দেখা যায় কিন্তু তিনিও হলযুধের অব্যর্থ বাণ—নিন্দা হইতে অব্যাহতি পান নাই। হলায়ুধ ত্রিলোচনকে বলিয়াছেন "বুদ্ধিহীন ত্রিনেত্রঃ" অর্থাৎ ত্রিলোচন বুদ্ধিহীন। যিনি মহামহোপাধ্যায় দুর্গসিংহকে নিন্দা করিতে একটুকু কুণ্ঠিত হয়েন নাই তিনি যে ত্রিলোচনকে কেবল বুদ্ধিহীন বলিয়াই মুক্তি দিয়াছেন তাহাই ত্রিলোচনের পরম সৌভাগ্য কিন্তু তথাচ বলি, হলায়ুধের মুখে একথা একটুকুও শোভা পায় না—তিনি ত্রিলোচন অপেক্ষা বিদ্যা বিষয়ে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নন।

(সুসেন কবিরাজ—কলাপচন্দ্র প্রণেতা)

সুসেন কবিরাজ "কলাপ-চন্দ্র" নামক টীকা প্রণয়ন করেন (৯)। ত্রিলোচন দাস

৫ ইতি বৈদ্যমহামহোপাধ্যায় শ্রীত্রিলোচনদাস কৃত "কাতন্ত্র-পঞ্জিকা" ইত্যাদি।

৬ এবং ৭ তৃতীয় অধ্যায়ের, ২৭ এবং ২২ সংখ্যক টীকা দেখ।

৮ লক্ষ্মণসেন নানামতে কত বৎসর রাজত্ব করেন ও কোন্ সময়ে রাজত্ব করেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—লক্ষ্মণসেনের বঙ্গে ১২ এবং দিল্লীতে ১০ একুনে ২২ বৎসর রাজত্ব (বৈদ্যকুল পঞ্জিকা) আইন আকবরির মতে লক্ষ্মণসেনের ৭ বৎসর রাজত্ব। রাজাবলির মতে লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব ১০ বৎসর ৫ মাস। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব ১১০১ খৃষ্টাব্দ ও তদুত্তরাধিকারী মাধবসেনের ১১২১ খৃষ্টাব্দ সুতরাং লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল ২১ বৎসর। (I. A. S. of B. 1865 P. I Page 139.) সম্বন্ধ নির্ণয়ের মতে লক্ষ্মণ সেন ১১০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

৯ আচার্য্য কবিরাজেন সুসেনেন বিনির্ম্মিতঃ। আস্তাং কলাপচন্দ্রোঽয়ং কালাপানাং মনোমুদে॥ (কলাপচন্দ্র)

কৃত কাতন্ত্র পঞ্জিকাই ইহাঁর গ্রন্থের আদর্শ স্থল। ত্রিলোচনের সমালোচনা করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য, ইনি তাহা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন।(১০) সুসেন কবিরাজ ত্রিলোচনের পরে ও রঘুনাথ শিরোমনির প্রায় সমকালে কিংবা কিছু পূর্ব্বে "কলাপ-চন্দ্র" প্রণয়ন করেন। ইনি একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন; "কলাপচন্দ্রে" ইহাঁর বিলক্ষন বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটকচূড়ামনি দেবীবরের সমকালে একজন বিখ্যাত সুসেনের নাম দৃষ্ট হয় (১১) সম্বন্ধ নির্ণয় প্রণেতার মতে সেই সুসেনের উপাধি "মুখোপাধ্যায়" এবং সুসেন একজন পণ্ডিত ছিলেন (১২)। উক্ত গ্রন্থকার সুসেনকে, ১৪৭২ শকে (১৫৫০ খৃস্টাব্দে) বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া একটা মোটা মোটি অনুমান করিয়াছেন। তাঁহার মতে ঐ সময়েই চৈতন্য, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতিরও আবির্ভাব সময় (১৩)। আমাদের বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত দেবীবরের সমকালীন সুসেন পণ্ডিতই "কলাপচন্দ্র" প্রণয়ন করিয়াছেন। এখন কাতন্ত্র-ব্যবসায়ীদের মধ্যে সুসেনের কলাপচন্দ্র বিশেষ রূপে প্রচলিত দেখা যায়। এমন কি "কাতন্ত্র পঞ্জিকা" ও "কলাপচন্দ্র" যাঁহারা ভালরূপ পাঠ না করেন তাঁহারা কাতন্ত্র অধ্যয়ন করিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন না। "কলাপচন্দ্র" সাধারণো "কবিরাজ" বলিয়া বিখ্যাত।

(হেমকর)

ত্রিলোচনের "কাতন্ত্রপঞ্জিকা" হেমকরেরও আদর্শস্থল। তাঁহার কৃত নাতি-প্রসিদ্ধ টীকাও সম্ভবতঃ দশম খৃস্টাব্দের পরার্দ্ধে নির্ম্মিত হইয়াছিল। হেমকর অংঘষ্ঠ কুলোদ্ভব ছিলেন। হেমকরের টীকাও প্রায় লোপ হইয়া আসিল। হলায়ুধ, হেমকরকেও নিন্দা করিয়াছেন।

(উমাপতি)

উমাপতিধর লক্ষ্মণসেনের পঞ্চরত্ন সভার অন্যতম রত্ন ছিলেন (১৪)। ইনি কাতন্ত্র-সম্মত একখানি পদ্যময় টীকা

কোন কোন গ্রন্থে "আচার্য্য কবিরাজেন" ইহার পরিবর্ত্তে "শ্রীবিদ্যাভূষণাচার্য্য" এই রূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

১০ শ্রীমত্রিলোচন কৃতাখিল পঞ্জিকায়ু দোষান্ধকারনিকরং প্রতিপক্ষদত্তং।
কলাপচন্দ্র।

(১১) যোগেশ্বরো দিনেশশ্চ হরিবর্দ্ধর তথা।
পঞ্চাননঃ সুসেনশ্চ ষড়েতে চৈকমেলকাঃ। (ধ্রুবানন্দ মিশ্র)
পঞ্চাননে হয়কুল দিনকর বংশে।
সুসেন হয়েন মূল নৃসিংহের অংশে॥
সুসেন বলিলে হয় ত্রিযোগের সংজ্ঞা।
* * * *
চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কুলপঞ্জিকা"

(১২) " ৬। সুসেন (মুখোপাধ্যায়) পণ্ডিত।" "সম্বন্ধ নির্ণয়" ১৮৫ পৃষ্ঠা।

(১৩) " সম্বন্ধ নির্ণয় ১৮৬। ১৮৭ পৃষ্ঠা।

১৪ গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণসাচ।

প্রস্তুত করেন উহাকে সাধারণে "উমাপতির কারিকা" বলে। সুসেন কবিরাজ প্রভৃতি আধুনিক টীকাকারগণ অনেক স্থলে উমাপতির মত গ্রহণ করিয়াছেন। উমাপতি একজন বিশুদ্ধ সংস্কৃত লেখক। রাজসাহীর অন্তর্গত বারিণ্ নামক স্থানে যে প্রস্তর ফলক পাওয়া যায়, তাহার রচয়িতা উমাপতিধর (১৫)। উমাপতির সংস্কৃত ভারি কঠিন। ইনি একজন অত্যুক্তিভাষী কবি। গীতগোবিন্দকার জয়দেব উমাপতিকে পল্লবগ্রাহিতা দোষে দোষী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উমাপতি সম্বন্ধে মত এই—"প্রস্তরখোদিত শ্লোকের বিশুদ্ধ সংস্কৃত কিন্তু রচনা সাতিশয় অত্যুক্তিপূর্ণ। শ্লোকের রচয়িতা সামান্য তুলনায় সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহার কোন মন্দির বর্ণনার আবশ্যক হইলে তিনি তাহার বর্ণিত মন্দিরচূড়া সূর্য্যের গতিরোধক না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার বর্ণিত নৃপতিগণ রামায়ণ ও মহাভারতের নায়কগণকে বৃথাভিমানী এবং হঠাৎ অবতার বলিয়া তিরস্কার করে, এবং তাহার যুদ্ধ তরণী গুলি গঙ্গাসৈকতে ভগ্ন দশায় পতিত হইয়া চন্দ্রকেও তিরস্কৃত করে। (১৭)

উমাপতি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দির পরার্দ্ধে এবং একাদশ শতাব্দির পূর্ব্বার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন। কেহ অনুমান করেন উমাপতি অম্বষ্ঠকুলোদ্ভব ছিলেন,—ধর শব্দ অম্বষ্ঠদের উপাধিতেও প্রয়োগ হইয়া থাকে (১৮) এবং অনেক স্থলে উহা নামের অঙ্গীয় হইয়াও প্রয়োগ হয় সুতরাং উমাপতি অম্বষ্ঠ কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

(রঘুনাথ শিরোমণি—"কলাপতত্ত্বার্ণব"-প্রণেতা)

তর্ককেশরী রঘুনাথ শিরোমণি "কলাপ

---

১৫ নির্বিক্তসেনকুলভূপতিমৌক্তিকানা
মগ্রন্থিলগ্রথনপক্ষ্মল সূত্রবল্লী।
এষা কবেঃ পদ পদার্থবিচার শুদ্ধ
বুদ্ধে রুমাপতি ধরস্য কৃতিঃ প্রশস্তিঃ।
(রাজসাহী প্রাপ্ত প্রস্তর ফলকোদ্ধৃত
শ্লোক ৩৫)।

Journal of the Asiatic Society of Bengal P. 141 No 1 of 1865.

১৬ বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভ
শুদ্ধিং গিরাং,
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো
দুরূহ দ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎ প্রমেয়রচনৈ রা-
চার্য্য গোবর্দ্ধন—
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো
ধোয়ী কবি ক্ষ্মাপতিঃ।
(জয়দেব, ১সর্গ, ৪ শ্লো)

১৭ "On the Sena Raja of Bangal Journal of the Asiatic Society of Bengal. No 111 1865 P. 129, আমরা উল্লিখিত রাজেন্দ্র বাবুর মত, রাজা পার্ব্বতী শঙ্কর চৌধুরীর "আদিশূর ও বল্লাল সেন" হইতে উদ্ধৃত করিলাম।—

১৮ সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেবঃ করো
ধরঃ"।
রাজসোমশ্চ নন্দিশ্চ কুণ্ডশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ।
কুলপঞ্জিকাধৃত ব্যাস বচনম্ (শব্দ
কল্পদ্রুম বৈদ্য শব্দ দ্রষ্টব্য)

তত্ত্বার্ণব" নামক একখানা কাতন্ত্রটীকা প্রণয়ন করেন, উহা "শিরোমণি" নামেই বিখ্যাত। বোধ হয় তর্কাচার্য্য মহোদয়ের এই টীকা খানিই সর্ব্ব প্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থে মাঝে মাঝে বৈয়াকরণিক নিপুণতা প্রকাশ হইয়াছে। শিরোমণি যেমন বাস্তবিকই ভারতের শিরোভূষণ স্বরূপ——কলাপতত্ত্বার্ণব, তাদৃশ মহাত্মার প্রকৃত ক্ষমতার পরিচায়ক না হইলেও উহা একটী দেব আভরণ স্বরূপ। কলাপতত্ত্বার্ণব প্রণেতা আর কেহ হইলে তিনি উহা দ্বারাই যশস্বী হইয়া যাইতে পারিতেন। যেমন অমরাবতীর নিকট মানবীয় বহু সমৃদ্ধিশালিনী পুরীর তুলনা হইতে পারে না সেই রূপ রঘুনাথের তার্কিক গ্রন্থাদির সহিত কলাপতত্ত্বার্ণবের তুলনা না হইলেও উহা সাধারণ লোকের পক্ষে অতি দুর্ল্লভ।

কাহারও নিকট "কলাপতত্ত্বার্ণব" সাধারণ্যে প্রকাশিত হওয়া সম্বন্ধে একটী জনশ্রুতি শুনা যায় "স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সহিত তার্কিক রঘুনাথ শিরোমণির বড় সদ্ভাব ছিল না, যো পাইলে কেহই কাহাকে অপদস্থ করিতে ত্রুটী করিতেন না। শিরোমণি "কলাপ তত্ত্বার্ণব" প্রস্তুত করিলেন কিন্তু তাহা যাহাতে সাধারণ্যে প্রকাশ না হইতে পারে রঘুনন্দন সতত সেই চেষ্টা করিতেন, ও ঐ টীকার নানা দোষ লোকসমাজে ঘোষণা করিতেন; এ দিকে শিরোমণিও রঘুনন্দনের সংকলিত স্মৃতি সকল যাহাতে সাধারণ্যে প্রচার না হইতে পারে তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন ও লোকের নিকট বলিয়া ফিরিতেন যে, রঘুনন্দনের স্মৃতি কয় খানির একখানিও শাস্ত্রসম্মত হয় নাই, উহা প্রায়ই কাল্পনিক পুরাণাদি হইতে সংকলিত ও স্বকপোলকল্পিত। এইরূপ পরস্পর বিদ্বেষ হেতু কিছু দিন কাহার গ্রন্থই প্রচার হইতে পারিল না। একদিন কোন শ্রাদ্ধোপলক্ষে উভয় মহাত্মার সাক্ষাৎ হইল। তখন রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য শিরোমণিকে বলিলেন—রঘুনাথ! আমাদের পরস্পর বিদ্বেষ ভাব থাকাতে আমাদের উভয়ের পরিশ্রমার্জ্জিত গ্রন্থগুলির প্রচার সম্বন্ধে মহা প্রতিবন্ধক ঘটিতেছে—উহাতে উভয়েরই যশের হানি করিতেছে। আমি আজ প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমার গ্রন্থ যাহাতে সাধারণে প্রচলিত হইতে পারে তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিব—আর কোন বাধা দিব না। তোমারও আমার একটী অনুরোধ রাখিতে হইবে যে, অদ্য এই শ্রাদ্ধে যেন আমার স্মৃতি অনুসারে কার্য্য হয়। তখন শিরোমণি উত্তর করিলেন, যদি এমত হয়, তবে আমিও তোমার স্মৃতি কয় খানি অবশ্যই প্রচার করিয়া দিব। সেই দিন হইতে উভয় মহাত্মার সন্ধি হইল এবং তখন হইতে নির্ব্বিবাদে উভয়ের গ্রন্থ প্রচারিত হইতে লাগিল। ঐ জনশ্রুতিটী কতদূর সত্য, জানি না।

রঘুনাথ শিরোমণি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক লোক। চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে (১৪৮৫ খৃঃ অঃ) নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হইয়া

১৪৫৫ শকে (১৫৩৩ খৃ অব্দে) নীলাচলে (জগন্নাথ ক্ষেত্রে) তিরোভূত হয়েন ১৯। ঐ সময়েই তর্ককেশরী রঘুনাথ শিরোমণি দুর্ব্বিগাহ ধীষণাশক্তি সহকারে ন্যায়শাস্ত্রের নূতনরূপ পন্থা আবিস্কার করেন। এবং ঐ সময়েই স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহা পাণ্ডিত্য সহকারে তৎকালপ্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা সকল বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া অস্টাবিংশতি তত্ত্ব নামক অভিনব প্রকার স্মৃতি সংগ্রহের প্রণয়ন করেন। ২০

কাহারও মতে "স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য, শিরোমণি ও চৈতন্য একই সেময়ে নবদ্বীপে প্রাচুর্ভুত হয়েন। ... ... রঘুনাথ শিরোমণি "চিন্তামণি দীধিতি" নামক প্রসিদ্ধ ন্যায় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এবং মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রকে ২১ বিচারে পরাস্ত করিয়া ন্যায় বিষয়ে নবদ্বীপের মহিমা বিস্তার করেন।—২২ " আর একজনের মতে —"তখন কানাভট্ট শিরোমণি (রঘুনাথ শিরোমণি) পক্ষধর মিশ্রের নিকট পাঠ সমাপ্তি পূর্ব্বক মিথিলা হইতে ন্যায় শাস্ত্রের স্রোত ফিরাইয়া নবদ্বীপে আনয়ন করিয়া দেবলোকে অবস্থান পূর্ব্বক সর্ব্বদেশীয় নৈয়ায়িকদিগের মুখ হইতে স্বীয় প্রশংসা শ্রবণ করিতেছেন। তাঁহারা শিরোমণিকে গৌতমাদি অপেক্ষা কুশাগ্রবুদ্ধি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ২৩

যে বৃহস্পতিসম প্রভ, তর্ককেশরী রঘুনাথ শিরোমণি অপার্থিব প্রতিভা প্রভাবে তর্কশাস্ত্র বিষয়ে সমস্ত আর্য্যভূমির শীর্ষস্থান লাভ করিয়া অশ্রদ্ধেয় ক্ষীণজীবী

১৯ শাকে চতুর্দ্দশ শতে রবিবাজিযুক্তে
গৌরো হরি র্ধরণিমণ্ডল আবিরাসীৎ।
তস্মিংশ্চতুর্নবতিভাজি তদীয় লীলা
গ্রন্থোঽয়মাবিরভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ॥
(চৈতন্য চন্দ্রোদয়)

——শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্ট চর্ব্বিশবৎসর প্রকট বিহারী॥
চৌর্দ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌর্দ্দশত পঞ্চান্নে হইলা অন্তর্ধান॥
(চৈতন্য চরিতামৃত আদ্য কাণ্ড)

২০ বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" ৫৪ পৃষ্ঠা। 'ভারতী' প্রথমখণ্ড ৪২৫ পৃষ্ঠা।

২১ কেহ বলেন গীতগোবিন্দ জয়দেব পঠদ্দশায় এক এক পক্ষান্তে স্বীয় গুরুর নিকট পাঠ করিতেন বলিয়া পক্ষধরমিশ্র নামে অভিহিত হইতেন (কার্য্যকলাপ সম্পাদক পণ্ডিত হরিদাস হীরাচাঁদ এবং শ্রীযুক্ত ফিট্‌জ এডওয়ার্ড হল সম্পাদিত সাংখ্য প্রবচন ভাষ্য ভূমিকা ৬৩ পৃষ্ঠা) আবার কেহ বলেন চিন্তামণির আলোক" নামক ন্যায় গ্রন্থের টীকা পক্ষধর মিশ্রকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ (শব্দকল্পদ্রুম ১৭৯১ পৃষ্ঠা,) প্রসন্নরাঘবপ্রণেতা নিজকে তার্কিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন সুতরাং ঐ উপাধি প্রসন্নরাঘবপ্রণেতার হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ ইত্যাদি (জয়দেব চরিত ২৭।২৮ পৃষ্ঠা) আমরা বলি অনর্থক এত গোলমাল করিয়া ফলকি ? এ " পক্ষধর মিশ্র" এবং রঘুনাথ শিরোমণির আচার্য্য পক্ষধর মিশ্রকে অভিন্ন কল্পনা করিলে দোষ কি ?

২২ শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ বিএল প্রণীত "বাঙ্গালার ইতিহাস ৯ ম সংস্করণ। ৩৩পৃষ্ঠা।

২৩। "সম্বন্ধ নির্ণয়" ১৮৭ পৃষ্ঠা।

বাঙ্গালির,দেশদেশান্তরে গৌরব বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন, যিনি বাঙ্গালির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বপ্রথম গৌরবনিদান স্বরূপ যাঁহার দেবদুর্লভ মার্গ অনুসরণ করিয়া বঙ্গদেশ তর্ক বিজ্ঞানে, অন্যান্য পবিত্রকীর্ত্তি-বুধশ্রেণ্ঠ ভূমিরও শিক্ষাগুরু হইয়াছেন, —সেই বঙ্গপ্রভাকর কাতন্ত্রকে সমাদর করিয়া যে একটী সামান্য আভরণ প্রদান করিয়াছেন তন্নিবন্ধনও কাতন্ত্র বিশেষ উপকৃত ও গৌরবান্বিত হইয়াছে। (২৬)

শিবরাম শর্ম্মা (কৃন্মঞ্জরী-প্রণেতা)

শিবরাম শর্ম্মা অতি সংক্ষেপে কৃৎপ্রত্যয়াদি সম্বন্ধে কয়েকটী সার কথা বলিয়াছেন—

"সংক্ষেপতঃ শ্রী শিবরাম শর্ম্মা
—কৃন্মঞ্জরীং বালমুদে তনোতি।"

ইহার গ্রন্থের আয়তন ১০।১২ পৃষ্ঠার অধিক নয়। এই গ্রন্থখানি নিতান্ত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। অনেক স্থলে এই গ্রন্থখানি প্রচলিত দেখা যায়। বোধ হয় গ্রন্থখানির বয়ঃক্রম ৩০০ বৎসরের অধিক নয়।

ক্রমশঃ

প্রকৃতি এবং তাহার মূল-নিয়ম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উন্নতির নিয়ম।

ভারতীর ২ ভাগ ১২ সংখ্যা ৫৪৯ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্বে উন্নতির যে ছয়টি ধাপ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা যদিও বহির্বস্তুর সঙ্গ-সাপেক্ষ কিন্তু তাহার মূল আদর্শ আমাদের আপনার আপনার জ্ঞানাভ্যন্তরেই বর্ত্তমান

২৪ কেহ ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ প্রণীত "কারকচক্র" নামক ন্যায়ঘটিত পদার্থ গ্রন্থকেও কাতন্ত্র সহযোগী বলিতে চাহেন বাস্তবিক তাহা নহে কারকচক্রের সহিত কোন ব্যাকরণ বিশেষের সংস্রব নাই, উহাতে কেবল ন্যায়শাস্ত্র অনুযায়ী কারকের লক্ষণাদি বর্ণিত হইয়াছে;—

নত্বা কৃষ্ণপদদ্বন্দ্বং কারকার্থ নির্ণয়ঃ।
শ্রীভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশেন বিতন্যতে॥

তবে উদাহরণ স্থলে প্রায় কাতন্ত্রের উদাহরণ গুলিই অবিকল উদ্ধৃত করা হইয়াছে কিন্তু তাই বলিয়া কাতন্ত্রের সহিত উহার কোন সংস্রবও নাই। ভবানন্দ এক জন এদেশের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত। ইনি ন্যায়শাস্ত্রের একটী অমূল্য রত্ন। কাহারও মতে রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম গদাধর তর্কালঙ্কার জগদীশ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ বাঙ্গালি ও আমাদের গৌরবের স্থল (বঙ্গদর্শন ৩য় ভাগ ৪৮৮পৃ।) মাধব চম্পূ বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী প্রভৃতি প্রণেতা চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের পুত্র ছিলেন এবং রাঘবেন্দ্র ইহাঁর শিষ্য ছিলেন। (বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।)

আছে। দুই বিপরীত পক্ষের সঙ্গ হইতে তৃতীয়ের উৎপত্তি এই যে একটি ব্যাপার ইহা বহির্জগতে শুধু নয়, আমাদের জ্ঞানের মধ্যেও নিরন্তর সংঘটিত হইতেছে। প্রথমে জ্ঞান মূলতত্ত্ব সকলের সহিত এবং মন ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ার সহিত মিলিয়া মিশিয়া তন্ময়ীভূত হইয়া থাকে, এইটি প্রথম ধাপ; তাহার পরে মন জ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হইয়া আপনাকে জ্ঞানের হস্তে সমর্পণ করে; মন স্বয়ং কিছু নয়, তাহা জ্ঞানের বৃত্তি স্বরূপ, জ্ঞানের এই রূপ স্বামিত্ব তখন প্রকটিত হয়; জ্ঞান তখন মন-দ্বারা রঞ্জিত হয় এবং মন জ্ঞান-দ্বারা আবিষ্ট হয়; উভয়ের এই যে দাম্পত্য সম্বন্ধ এইটি দ্বিতীয় ধাপ; তাহার পর ভাবনাদি প্রকরণ-দ্বারা মন-হইতে বিশেষ বিশেষ নানাবিধ জ্ঞান প্রসূত হয়, এই রূপ বিশেষ বিশেষ জ্ঞান বিজ্ঞান-শব্দের বাচ্য; বিজ্ঞান যত আছে সকলই জ্ঞানের সন্তান-সন্ততি। বিজ্ঞানের প্রতি জ্ঞানের যে বাৎসল্য সম্বন্ধ, এইটি তৃতীয় ধাপ; বিজ্ঞানের সহিত বিজ্ঞানের ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ, বিজ্ঞান এবং শিল্পের মধ্যে ভ্রাতৃ-ভগিনী সম্বন্ধ, ইহাদের পরস্পর এই যে সৌহার্দ্দ সম্বন্ধ, এইটি চতুর্থ ধাপ; বিজ্ঞান-সমস্ত যখন সৌহার্দ্দে মিলিত হইয়া মূল-জ্ঞানের প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করে, মূল-জ্ঞানের প্রতি বিজ্ঞানের এই যে ভক্তি-সম্বন্ধ এইটি পঞ্চম ধাপ; এবং আদ্যোপান্ত সকলের মধ্যে একটি সম্বন্ধ-সূত্র সঞ্চারিত রহিয়াছে এই যে একটি সর্ব্ব-নির্বিশেষ উদার-প্রেম-সম্বন্ধ এইটি ষষ্ঠ ধাপ।

প্রথমে যখন মন দেখা-শুনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াতেই নিমগ্ন থাকে, তখনকার সে দেখা-শুনা শুদ্ধ কেবল অবস্থার পরিবর্ত্তন মাত্র, তখনকার সে দেখা দেখাই নহে, শুনা শুনাই নহে; তাহার পরে মন যখন জ্ঞানকে স্বামী রূপে বরণ করে, তখন দেখা-শুনা-রূপ ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া জানা-রূপ জ্ঞান-ক্রিয়া-দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়; তখন "আমি দেখিতেছি" এবং "আমি জানিতেছি যে আমি দেখিতেছি" এই দুইটি ব্যাপার এক সঙ্গে চলিতে থাকে। তাহার পর জ্ঞানাভ্যন্তরে বস্তুগুণ, কার্য্যকারণ, একানেক, ভাবাভাব, প্রভৃতি যে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব আছে তাহা দেখা-শুনা-রূপ ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ার মধ্যে প্রবাহিত হইয়া কেবল দেখা শুনা মাত্রকে নহে পরন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলাবদ্ধ বস্তু সমূহকে জ্ঞানায়ত্ত করে; জ্ঞান হইতে যে সকল মূলতত্ত্ব স্ফূরিত হয়, মন ভাবনা দ্বারা বিষয় সকলকে তাহার অধীনে সমর্পণ করে, এই রূপে জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি এবং মনের ভাবনা একত্র মিলিয়া বিজ্ঞান উৎপাদন করে। মূলতত্ত্ব সকলের উৎস স্বরূপ যে জ্ঞান, এবং সেই মূলতত্ত্ব সকলকে আত্মসাৎ করিয়া তাহাদিগকে বিশেষ-বিশেষ জ্ঞান-কার্য্যে ফলিত করে যে মন, বিজ্ঞানের প্রতি উভয়েরই পুত্রবাৎসল্য সমান। দর্শনশাস্ত্রে মূলজ্ঞান, এবং কারণ-রূপিণী ও কার্য্য-রূপিণী প্রকৃতি তত্ত্বশব্দে উক্ত হয়, এবং তদ্বিষয়ক যে জ্ঞান তাহা তত্ত্বজ্ঞান শব্দে উক্ত হয়। মন প্রকৃতির ছাঁচেই গঠিত; প্রকাশ

চাঞ্চল্য এবং বাধা—প্রকৃতির এই যে তিনটি অবয়ব যাহা সত্ত্বরজস্তমোগুণ বলিয়া উক্ত হয়, মন তাহাদেরই ক্রীড়া-ক্ষেত্র; মন, খণ্ড-প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে; এজন্য প্রকৃতিকে যেমন, মনকেও তেমনি তত্ত্বজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় বলিলে তাহাতে বিশেষ কোন অর্থ-বৈলক্ষণ্য ঘটে না। শৈশবাবস্থায় বিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানের আঁচল ধরিয়া চলে, এবং পুরুষাত্মক জ্ঞান অপেক্ষা প্রকৃতি-আত্মক মনের সহিত তাহার অধিক ঘনিষ্ঠতা-বশতঃ তাহা কল্পনার সবিশেষ বশবর্ত্তী হইয়া চলে। তাহার পর বিজ্ঞান বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, বিজ্ঞানের প্রতি বিজ্ঞানের অনুরাগ বল করিতে থাকে; বিজ্ঞানের এই অবস্থায় তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি, ব্যক্তি-বিশেষের থাকে, ব্যক্তি-বিশেষের থাকে না—জন-সমাজে এইরূপ দৃষ্ট হয়। বিজ্ঞানে বিজ্ঞানে যখন অনেক দূর পর্য্যন্ত সৌহার্দ্দ-বন্ধন বিস্তৃত হয়, তখন আবার সেই পুরাতন তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি তাহার অনুরাগ আবির্ভূত হয়; শৈশবাস্থায় বিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানের আঁচল ধরিয়া চলিত বটে কিন্তু তখন সে মনেরই (প্রকৃতিরই) বিশেষ পক্ষপাতী ছিল, কল্পনাই তাহার পথের সম্বল ছিল, এখন সে, জ্ঞানের (পুরুষের) পক্ষ হইতে তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হয়; বিজ্ঞান এখন আরোহ প্রণালীর চরম সীমায় পৌঁছিয়া অবরোহ-প্রণালীর পন্থা অন্বেষণ করে। মূল-জ্ঞান, সকল-প্রমাণের প্রমাণত্ব সাধন করে, এজন্য তাহা নিজে প্রমাণ-সাপেক্ষ নহে; এই কারণ বশত বিজ্ঞান, প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানকে আপনার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে, সম্যক আয়ত্তের মধ্যে, আনিতে পারে না; পারে কি—না তত্ত্বজ্ঞানের অধীনে আপনাকে সংযত এবং নিয়মিত করা-টি মাত্র। বিজ্ঞানের প্রতি তত্ত্বজ্ঞানের যেরূপ বাৎসল্য ভাব, তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি বিজ্ঞানের তদনুযায়ী শ্রদ্ধা ভক্তি হওয়াই নিয়ম-সংগত। বিজ্ঞান যখন তত্ত্বজ্ঞানের প্রসাদ অভ্যর্থনা করিয়া প্রাপ্ত হয়, এবং তদ্দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া অপার শান্তিরসে নিমগ্ন হয়, তখন সকল আবরণ ভেদ করত সকলের মধ্যে একটি প্রগাঢ় ঐক্য অনুভব করিয়া আপ্তকাম হয়; "আমি দেখিতেছি," এই গেল উপরের আবরণ; "আমি জানিতেছি যে আমি দেখিতেছি" "এই গেল মধ্যের আবরণ; এবং "আমি জানিতেছি যে আমি জানিতেছি," এই গেল ভিতরের আবরণ; আমি দেখিতেছি কি? না আকাশব্যাপী বস্তু-সকল; আমি জানিতেছি কি? না আকাশব্যাপী বস্তু এবং কালব্যাপী-দর্শন-ক্রিয়া, উভয়কেই; সে জ্ঞান-ক্রিয়া কোথায় প্রকাশিত হইতেছে না অপরিবর্ত্তনীয় সুতরাং কালাতীত মূল-জ্ঞান যাহা প্রজ্ঞান শব্দের বাচ্য সেইখানে। কিন্তু যে আমি জ্ঞান দ্বারা আপনার বিজ্ঞানকে জানিতেছি, সেই আমি বিজ্ঞান-দ্বারা বিষয় সকল জানিতেছি এবং সেই আমি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় সকল দেখিতেছি, এইরূপ এক আত্মার ভাব উচ্চ নীচ সমুদায়-বৃত্তিকে এক উদার আমায়িক ঐক্য-বন্ধনে আবদ্ধ করে। "আমি দেখিতেছি" এই

আবরণটি শারীরিক সুখ-দুঃখের আয়তন; "আমি জানিতেছি যে আমি দেখিতেছি বা দেখিয়াছি বা দেখিব" এই আবরণটি মানসিক সুখ দুঃখের আয়তন এবং "আমি জানিতেছি যে আমি জানিতেছি" এই আবরণটি আধ্যাত্মিক সুখ দুঃখের আয়তন স্বরূপ। মূল-জ্ঞানের সহিত সাময়িক জ্ঞান-ক্রিয়া সকলের যদি পূর্ব্বাপর ঐক্য হয় অর্থাৎ এখনকার জ্ঞান যদি সর্ব্বসময়-কার জ্ঞানের সহিত সুসঙ্গত হয় তাহা হইলেই সত্য জানা হয়, সত্য জানা হইলে এবং তদনুসারে কার্য্য-কৃত হইলে আধ্যাত্মিক আনন্দ হয়—আত্মপ্রসাদ হয়, তাহার অন্যথা হইলে আধ্যাত্মিক শূন্যতা অথবা আধ্যাত্মিক গ্লানি, ইহার একটি না একটি উৎপন্ন হয়। এইরূপ ত্রিবিধ পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন জীবাত্মা অপ-রিচ্ছন্ন পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ; কেননা মূলে অপরিচ্ছন্ন থাকিলে, তদবলম্বনেই পরিচ্ছন্ন দাঁড়াইতে পারে। এইরূপ দেখা যাই-তেছে যে বাহিরের জন-সমাজে উন্নতি-সো-পানের ছয়টি ধাপ যাহা নয়নগোচর হয়, আমাদের ভিতরে তাহার মূল আদর্শ বিদ্য-মান রহিয়াছে।

জ্ঞান-পক্ষীয় যে ছয়টি ধাপ তাহারও আদর্শ আমাদের ভিতরে বর্ত্তমান আছে। প্রথম ধাপ স্বার্থ;—মনের স্বার্থ বিশেষ বিশেষ বিষয়েতে নিবিষ্ট হইয়া থাকা, জ্ঞানের স্বার্থ সার্ব্বভৌমিক মূলতত্ত্ব সকলেতে ভর করিয়া থাকা। দ্বিতীয়—ধর্ম্ম; ধর্ম্ম ঐ দুই স্বার্থকে এক স্বার্থে পরিণত করে, অর্থাৎ মুখ্যরূপে যাহা মনের স্বার্থ, গৌণরূপে তাহা জ্ঞানের স্বার্থ এবং মুখ্যরূপে যাহা জ্ঞানের স্বার্থ, গৌণরূপে তাহা মনের স্বার্থ এইরূপ একটি ভাব দাঁড় করায়; মনের নিকট হইতে বিশেষ বিশেষ বিষয় না পাইলে জ্ঞান আপনার সার্ব্বভৌমিক তত্ত্ব-সকল কোথায় যে প্রয়োগ করিবে তাহার স্থান অন্বেষণ করিয়া পায় না, এবং জ্ঞানের নিকট হইতে মূলতত্ত্ব না পাইলে মন আপনার বিষয় সকলকে কোথায় যে সম্বদ্ধ করিয়া রাখিবে তাহার স্থান দেখিতে পায় না; একের স্বার্থে অন্যের স্বার্থ—এটি ধর্ম্মের ভাব। তৃতীয়—শক্তি; বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা মনোমধ্যে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া যখন সাধারণ তত্ত্বসকলেতে পরিণত হয়, তখন সেই বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব সকলেতে জ্ঞান এবং মন উভয়েরই শক্তি প্রতিফলিত হয়। চতুর্থ—সৌন্দর্য্য; বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-সকলের ইতরেতর আনুকূল্য ভাবের মধ্য হইতে সৌন্দর্য্যের ভাব নিশ্বসিত হয়; কিরূপ? না যেমন "মণিনা বলয়ং বলয়েন মণির্ম্মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ পয়সা কমলং কম-লেন পয়ঃ পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ," মণিতে করিয়া বলয়, বলয়েতে করিয়া মণি এবং মণি ও বলয় উভয়েতে করিয়া কর শোভা পায়, জলেতে করিয়া কমল, কম-লেতে করিয়া জল, এবং জল ও কমল উভয়েতে করিয়া সরোবর শোভা পায়; উদ্ভিদ্ বিদ্যা, জীবতত্ত্ব বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা প্রভৃতি, পরস্পর পরস্পরেতে প্রতিবিম্বিত হইয়া ঐরূপ সৌন্দর্য্য উদ্গীরণ করে; এক

একটি বিদ্যার শাখাগণের মধ্য হইতেও ঐরূপ সৌন্দর্য্য উদ্ভাবিত হয়। পঞ্চম—মঙ্গল; তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি বিজ্ঞানের যে গূঢ় একটি টান, বৈজ্ঞানিকেরা তাহা মানুন আর না মানুন, তাহাই বিজ্ঞানের উন্নতির মূল কারণ; সকল জগতের মধ্যে একটি যোগ-সূত্র রহিয়াছে এইটির প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে বিজ্ঞানের চর্চ্চায় কাহারো প্রবৃত্তি হইত না। তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি বিজ্ঞানের এই যে আকর্ষণ ইহারই উপরে বিজ্ঞানের মঙ্গল নির্ভর করে। ষষ্ঠ—সামঞ্জস্য; উচ্চ নীচ সকল ধাপের মধ্যে যে একটি একাত্ম ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহাতে সামঞ্জস্যের ভাব, শান্তির ভাব, সত্যের ভাব স্ফূর্ত্তি পায়।

ক্রমশঃ

জীব-রহস্য।

পৃথিবী কি রূপ উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং উহার অন্তর্গত পদার্থ গুলিই বা কি তাহা বলা আমাদের এক্ষণকার উদ্দেশ্য।

অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রস্তর মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে এই গুলিই পৃথিবীর একমাত্র উপাদান সামগ্রী। কিন্তু ঐ সকল প্রস্তর বা মৃত্তিকারাশি একই রূপ পদার্থ নহে। প্রত্যুত উহারা নানা স্থানে, নানা প্রকার খনিত হইতে উৎপন্ন হওয়াতে পৃথক পৃথক নামে অভিহিত হইয়াছে, যথা চূর্ণক granite কর্কর gravel, কর্দ্দম clay, বালুকা ও খড়ী ইত্যাদি। ভূতত্ত্বজ্ঞেরা অনেকেই এরূপ অনুমান করিয়া থাকেন যে পৃথিবীতে বহুবিধ জীবজন্তু উদ্ভিজ্জ জন্মিবার পূর্ব্বে তথায় বহুকাল ব্যাপিয়া ঐ সকল মৃত্তিকা-রাশি স্তরে স্তরে সংরক্ষিত হইয়াছে। এবং এই মৃত্তিকারাশির নিম্নে যে উত্তপ্ত তরল পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নাই, তাহারও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আগ্নেয় পর্ব্বত-উৎক্ষিপ্ত ধূম ও অগ্নিশিখা যাঁহারা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছেন এবং উহার শিখর-দেশ-নিঃসৃত দ্রবীভূত ধাতুময় পদার্থ দ্বারা যাহারা বহুতর জলস্থল বা নগর প্লাবিত ও উৎসন্ন হইতে দেখিয়াছেন, তাহাদের মনে পৃথিবীর অতি নিম্ন তলপ্রদেশ যে অগ্নিময় তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। এদিকে ভূমিকম্পের সময় পৃথিবী যেরূপ কম্পান্বিত হইয়া থাকে তাহা সকলে অবগত আছেন। কিন্তু স্পেন ইটালি ও দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি স্থান যে তদুপলক্ষে কোথাও দ্বি-ভাগে বিভক্ত এবং কোথাও বা বৃহদাকার অট্টালিকা সকল ভূমিসাৎ হয় তাহা অনে-

কেই জানেন না। এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে ভূপৃষ্ঠ ও ভূমধ্যভাগ এই দুয়ের প্রকৃতি অতিশয় বিভিন্ন প্রকার। প্রায় চারি পাঁচ বৎসর অতীত হইল, যৎকালে বিসুবিয়স নামক আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে অগ্ন্যুদ্গারের উপক্রম হয়, তখন নেপলস্‌বাসীরা উহার ভাবী পরিণাম ফল মনে করিয়া অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন, আবার এই ঘটনার কিছুকাল পরে ভূমিকম্প উপলক্ষে দক্ষিণ আমেরিকায় যেরূপ বহুসংখ্যক লোকের প্রাণ বিনাশ হয় তাহাও অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। ভারতবর্ষে এরূপ শোকাবহ ব্যাপার কখনই দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় না। এখানে মধ্যে মধ্যে অতি অল্প মাত্রায় ভূমিকম্প হইলেও, তজ্জন্য কাহারও প্রাণহানি বা অট্টালিকা স্থানভ্রষ্ট হয় না তথাপি এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ভূগর্ভমধ্যে যে এক প্রকার অসামান্য শক্তি ও উত্তাপ নিয়ত বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা স্পষ্টাক্ষরে বুঝা যাইতে পারে। এদেশের কোন হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্রে বা সুমচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে সহসা কাহারও মনে এরূপ উদয় হয় না যে পৃথিবীতে ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাত বলিয়া কোন ব্যাপার আছে। বস্তুতঃ যাহারা ভূমিকম্প স্বয়ং অনুভব করিয়াছেন, অথবা স্বচক্ষে তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ হইতে অগ্ন্যুদ্গীরণ হইতে দেখিয়াছেন, তাহাদের মুখে ঐ সকল কথা না শুনিলে, কিম্বা অপরাপর গ্রন্থে ঐরূপ বিস্ময়কর বিষয় পাঠ না করিলে আমরা কখনই উহা বিশ্বাস করিতাম না।

পুরাকালীন লোকেরা আগ্নেয় পর্ব্বতকে মহাবল প্রেতগণের আবাসভূমি ও কার্য্যালয় মনে করিতেন। তাঁহাদের মনে এরূপ কুসংস্কার জন্মিবার বিশেষ কারণও ছিল। এক্ষণে আগ্নেয় পর্ব্বত কি, তাহা আমরা সকলেই জানিয়াছি। সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর কাহারও মনে অন্য প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয় না।

অতঃপর, আমরা যে ভূপৃষ্ঠে অবস্থিতি করি তাহার প্রকৃতি যে ভূমধ্যভাগের প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে পৃথিবীর একাংশ অর্থাৎ ভূমধ্যভাগ যেরূপ উত্তপ্ত অপরাংশও সেইরূপ শীতল কেবল সূর্য্যের উত্তাপ জন্য ভূপৃষ্ঠে তাদৃশ শীতল বোধ হয় না।

যাঁহারা নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন তাঁহারা অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন, যে প্রস্তর বা মৃত্তিকার প্রকৃতি সকল স্থানে সমান নহে। প্রত্যুত স্থানবিশেষে ইহারা ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। যেমন খড়িমাটি, লোহিত প্রস্তর, কৃষ্ণ প্রস্তর, ইষ্টক নির্ম্মাণোপযোগী কর্দ্দম ও কর্কর। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, ইহাও জানা যাইতে পারে যে পৃথিবীতে এই সকল প্রস্তরগুলি বিশৃঙ্খলরূপে সংস্থিত নহে বরং ইহাদের অবস্থানের একটি রীতিমত ক্রম আছে। ইহাদের মধ্যে আবার কতকগুলি নিতান্ত পুরাতন এবং অপরগুলি নূতন

বলিয়া খ্যাত। এবং প্রায় সকলগুলির মধ্যেই কোন না কোন প্রকার খণিত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন প্রস্তরগুলি অতিশয় পুরাতন হইলে উহার খণিতের (Fossil) সহিত অধুনাতন জীবজন্তু ও বৃক্ষলতাদির অধিকতর প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু নূতন প্রস্তরস্থিত খণিতের ভাব আবার ইহার ঠিক বিপরীত।

অতঃপর পাঠকগণ ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে যখন উভয়বিধ প্রস্তর বা মৃত্তিকাই ভূপৃষ্ঠে লক্ষিত হইতেছে, তখন একটি অন্যটি অপেক্ষা অধিক পুরাতন ইহা কিরূপে স্থির করা যাইতে পারে। বস্তুত বহুকাল ব্যাপিয়া একাদিক্রমে পরিশ্রম না করিলে ইহা কখনই আপনাআপনি ঠিক করা যায় না। কিন্তু রেলওয়ের জন্য পর্ব্বত মধ্য দিয়া যে সকল পথ প্রস্তুত হইয়াছে, সেই সকল স্থান এবং অপরাপর গিরিগুহা ও খণির মধ্যে প্রবেশ করিলে, পূর্ব্বোক্ত বিষয় অনেক পরিমাণে বুঝা যাইতে পারে। কারণ এই সকল স্থানেই বিবিধ প্রকার প্রস্তর ক্রমান্বয়ে স্তরে স্তরে সংরক্ষিত আছে—তাহা স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পাওয়া যায়। এই রূপে ভূতত্ত্বজ্ঞেরা নানা স্থানে কূপ বা খাত খনন ও অপরাপর বহুবিধ অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছেন যে পৃথিবীর নিম্ন স্তরে চূর্ণক প্রভৃতি কঠিন প্রস্তরই লক্ষিত হয়, এবং তাহার পর ক্রমান্বয়ে অন্যান্য কোমলতর প্রস্তর ও মৃত্তিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—Slate, Sandstone, coal, Chalk, Clay ইত্যাদি। যেখানেই লোক অনুসন্ধান করুক না কেন, সকল স্থানেই পূর্ব্বোক্ত প্রস্তরগুলি এই নিয়মে অবস্থিতি করে। ইহার ব্যভিচার প্রায় কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। আর যখন ঐ রূপ সংঘটন হয়, অর্থাৎ কোন পুরাতন স্তর উপরে আইসে, তখন গুরুতর ভূমিকম্প বা ভূমধ্যস্থ অপর কোন নৈসর্গিক কারণ দ্বারা উহা সাধিত হইয়াছে, তাহাই মনে হয়। বাস্তবিক ঈদৃশ কারণ ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত ঘটনা কখনই সংঘটিতে পারে না।

অনন্তর যদি কেহ পাঁচ রকমের পাঁচ খানি প্রস্তরফলক উপর্য্যুপরি সাজাইয়া তন্নিম্নে অপর একখানি স্থূল প্রস্তর রাখিয়া দেন, তাহা হইলে পৃথিবীর প্রধান প্রধান মৃত্তিকাস্তর গুলি কি রূপে সংরক্ষিত হইয়াছে—তাহা কিয়ৎ পরিমাণে অনুমান করিতে পারেন। ভূতত্ত্বজ্ঞেরা এই ছয়টি স্তরের ছয়টি নাম দিয়াছেন। তন্মধ্যে যেটি সর্ব্বনিম্নে তাহাকে চূর্ণক বলে, তদুপরি কৃষ্ণ প্রস্তর বা শ্লেট—তৃতীয়টি শৈকত, চতুর্থ মৃদঙ্গার, পঞ্চম খড়িমাটি, ষষ্ঠটি গৃহাদি নির্ম্মাণোপযোগী মৃত্তিকা। এই ছয় প্রকার মৃত্তিকার মধ্যে মধ্যে আরও অনেক স্তর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এবং উহাদের নামও স্বতন্ত্র, কিন্তু এস্থলে আমরা প্রধান কয়েকটির নামোল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। অতঃপর ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে পৃথিবীর যেখানেই অনুসন্ধান করি না কেন, স্তর গুলির অবস্থান-রীতি একই প্রকার অর্থাৎ সর্ব্বনিম্নে চূর্ণক,

তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে আর আর স্তর লক্ষিত হয় *। খড়িমাটি কর্দ্দমসদৃশ মৃত্তিকা স্তরের উপর, অথবা মৃত্তিকা স্তর চূর্ণকের নিম্নস্থ, এবং মৃদঙ্গার খড়িমাটির পৃষ্ঠে, এরূপ দৃশ্য প্রায় কখনই কাহারও দৃষ্টি পথে পতিত হয় না। দুঃখের বিষয় এই যে বহুদূর পর্য্যন্ত ভূগর্ভ খনন করিলেও ঐ সমস্ত মৃত্তিকাস্তর এক স্থানে পাওয়া যায় না। কিন্তু আমরা যেখানে যতই নিম্নভূমি আবিষ্কার করি না কেন, সর্ব্বত্রই চূর্ণক স্তর সকলের নিম্নে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়।

কখন কখন আবার চূর্ণক প্রভৃতি প্রাচীন প্রস্তর সকল ভূগর্ভস্থিত কোন অসামান্য শক্তি প্রভাবে, উপরকার স্তর ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধগামী হয় ও অবশেষে বিশাল পর্ব্বতশ্রেণীর ন্যায় ভূপৃষ্ঠে বিরাজ করিতে থাকে মুঙ্গেরের পুরাতন দুর্গমধ্যে অনুসন্ধান করিলে এরূপ দৃশ্য অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ইংলণ্ডে, স্কটলণ্ডে আয়ারলণ্ডে ও উভয় আমেরিকার মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে ইহার নিদর্শন লক্ষিত হয়।

এইরূপ উৎক্ষেপের সময় উপরিস্থ স্তর গুলি চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খল ভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে সুতরাং তৎকালে উহাদের পরস্পরের যথানিয়মে অবস্থানেরও ব্যতিক্রম ঘটে। যেখানে এরূপ কোন দুর্ব্বিপাক উপস্থিত না হয়, সেখানে ঐ সকল যথাক্রমে উপর্য্যুপরি অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়।

চূর্ণক বা তদনুরূপ অপর কোন কঠিন প্রস্তরের সহিত খড়িমাটি, কর্দ্দম অথবা শৈকতের তুলনা করিলে উহাদের মধ্যে পরস্পরের কিছুমাত্র সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। বরং এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরের এতই ইতর বিশেষ যে ইহাদিগকে একবার দেখিলে ভবিষ্যতে একটিকে অপরটি বলিয়া আর কখন ভ্রম জন্মে না। এই গুলির মধ্যে চূর্ণকই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন প্রস্তর এবং পলিশ করিলে তন্মধ্য হইতে উজ্জ্বল শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের বিন্দু বাহির হওয়াতে উহা অতিশয় সুন্দর দেখায়। প্রধান প্রধান নগরের পথঘাট প্রস্তুত করিবার সময় ও রাজপ্রাসাদের থামের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহার বর্ণ কখন ঈষৎ লাল, কখন বা কিঞ্চিৎ নীল আভা বিশিষ্ট ধূসর। ইহার মধ্যে অধিকমাত্রায় স্ফটিকাকার পদার্থ দৃষ্টিগোচর হওয়াতে, অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে কোন না কোন সময়ে ভয়ানক উত্তাপ জন্য ইহা ভূগর্ভে দ্রবীভূত হইয়াছিল ও পরে শীতল হইয়া এক্ষণকার আকার ধারণ করিয়াছে। শৈকত ও খড়িমাটি কঠিন প্রস্তর মধ্যে গণ্য হইলেও চূর্ণকের সহিত ইহাদের তুলনাই হয় না।

অধুনাতন পণ্ডিতেরা এই চূর্ণকের উৎপত্তি বিষয়ে এই কথা বলিয়া থাকেন যে চূর্ণক যে সকল উপাদানে নির্ম্মিত, ঐ সকল সাধারণ তাপে দ্রবীভূত হয়

* যথা কৃষ্ণপ্রস্তর, শৈকত, মৃদঙ্গার, খড়িমাটি, ও ধূলিবৎ মৃত্তিকা বা কর্দ্দম।

নাই। এমন কি লৌহ গলাইতে যে তাপের প্রয়োজন হয়, তদপেক্ষা ইহাতে বেশী তাপ লাগিয়াছে। তাঁহারা ইহাতে পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছেন যে লৌহ যেরূপ সহজে দ্রবীভূত হয়, চূর্ণক পদার্থ সেরূপ নহে। আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে যে সকল দ্রবীভূত মৃত্তিকারাশি উত্থিত হয়, তাহার সহিতও এই চূর্ণক পদার্থের অনেক প্রকৃতিগত সৌসাদৃশ্য আছে। এই সকল অনুমান ব্যতীত চূর্ণকের উৎপত্তি-বিষয়ে ভূতত্বজ্ঞেরা আর কিছুই বলিতে পারেন না।

শৈকতের উৎপত্তি বিষয়ে ভূতত্বজ্ঞেরা তাদৃশ অনভিজ্ঞ নহেন। নদী বা সমুদ্রতীরে যেরূপ বালুকা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ রূপ বালুকাই ইহার এক মাত্র উপাদান সামগ্রী। ইহা কে না দেখিয়াছেন যে এক মুষ্টি বালুকা লইয়া সবলে চাপিয়া ধরিলে, উহার কণাগুলি কিছু কাল একত্রীভূত থাকে। সেইরূপ একটি বালুকাস্তরের উপর বহুদিন পর্য্যন্ত কোন প্রকার পর্ব্বতপ্রমাণ ভার সংরক্ষিত হইলে, উহার পেষণে যে ঐ বালুকারাশি জমাট হইয়া প্রস্তরের আকার ধারণ করিবে তাহা বিচিত্র নহে। বস্তুত এইরূপ পেষণগুণে ও কিঞ্চিৎ উত্তাপের সাহায্যে যে পূর্ব্বোক্ত প্রস্তর প্রস্তুত হইয়াছে তদ্বিষয়ে এক্ষণে আর কাহারও মনে সংশয় উপস্থিত হয় না। আদৌ এই সকল বালুকাকণা নদী বা সমুদ্রজলে ভাসমান থাকে, পরে ক্রমে ক্রমে উহারা তীরে নীত হয়। কালসহকারে আবার ইহাদের উপর কর্দ্দম বা অন্য প্রকার মৃত্তিকারাশি স্তূপাকারে সজ্জিত হইতে থাকে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বালুকাস্তরের উপর অধিক মাত্রায় ভার পড়াতে উহা অবশেষে প্রস্তররূপে পরিণত হয়। কিন্তু এইরূপ ব্যাপার অল্প দিনে সম্পন্ন হইবার নহে। বোধ হয় শত সহস্র বৎসর অতীত না হইলে আর ঈদৃশ প্রাকৃতিক ব্যাপার সাধিত হয় না।

প্রাসাদ বা গৃহনির্ম্মাণের জন্য বিলাতে এই সকল প্রস্তর ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু উহা অধিক দিন স্থায়ী হয় না। ভয়ানক শীতের সময় যখন বরফ পড়িতে থাকে, তখন ঐ সকল প্রস্তর আপনাপনি ফাটিয়া যায়, ও পরিশেষে স্ব স্থান হইতে স্খলিত হইয়া পুনরায় বালুকাকণায় পরিণত হয়। শৈকতের মধ্যে নানা প্রকার খনিতের চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে। এবং ঐ সকল খনিত যে সমকালীন নহে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইংলণ্ডের দক্ষিণ সীমায় যে সকল সমুচ্চ ধবল গিরিশ্রেণীর সৌন্দর্য্য দূর হইতে সহসা সন্দর্শন করিয়া পথিকগণ অতিশয় পুলকিত ও চমৎকৃত হন, ঐ গুলি যে তথাকার খড়িমাটির প্রধান আকরভূমি তাহা বলা বাহুল্য। পৃথিবীর নানা স্থানে এই রূপ পাহাড় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। রাসায়নিক পণ্ডিতেরা বলেন যে ইহা পরীক্ষা দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে যে উক্ত খড়িমাটিতে চূণ ও আঙ্গারিক অম্ল Carbonic acid ব্যতীত আর কোন পদার্থ নাই। কিন্তু ইহার উৎপত্তির নিয়ম স্বতন্ত্র; Foraminifera ও Ammor-

ite নামক দুই প্রকার জীবের দেহাবশেষ অর্থাৎ খনিত হইতেই খড়িমাটি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহারা এক প্রকার সামুদ্রিক জীব বিশেষ (shell fish) এবং দেখিতে সমঙ্গা জাতীয় উদ্ভিদের অস্ফুট তরুণ পত্রের ন্যায়।

আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের কোন কোন অংশে, এখনও ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব অসংখ্য পরিমাণে বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল প্রাণি যেমন মরিতে থাকে, অমনি উহাদের কঠিন অঙ্গাবরণ-গুলি সমুদ্রের তলদেশে নীত হয়, ও তথায় খড়ির ন্যায় এক প্রকার কর্দ্দমের আকার ধারণ করে।

যঃ নঃ মুঃ

ভানুসিংহের কবিতা।

মাধব! না কহ আদর বাণী,
না কহ প্রেমক নাম!
জানই ময়কো অবলা সরলা
ছলনা না কর শ্যাম!
কপট! কাহ তুঁহু ঝূট বোলসি
পীরিত করসি মোয়? (১)
ভালে ভালে হম অলপে চিহ্নুনু
না পতিয়াব রে তোয়!
তুঁহু না জানসি প্রেমক ধারা
কঠিন হৃদয় মধুভাষী—
পরশি দেহ মম সাঁচি বোল'অব
নহ তুঁহুঁ রূপ-পিয়াসী? (২)

যাও শ্যাম তব—মিলবে শত শত
হমসে রূপসি নারী।
তুচ্ছ বালি হম কাহ তু টূটসি
ক্ষুদ্র এ হৃদয় হমারি?
দূর রহই হম রহব তোঁহাঁরই,
(৩) সমরির তোঁহারি বাণী,
চিন্তই চিন্তই তোঁহারি বদন
তেয়াগব ক্ষুদ্র পরাণী!
(৪) ছিদল-তরী সম কপট-প্রেম পর
ডারনু যব মন প্রাণ,
বরখি নয়ন জল সহইব যাতন,
যহব কুফল সব কান!

(১) কপট, কেন তুমি মিথ্যা করিয়া বলিতেছ যে তুমি আমাকে ভাল বাস? আমি তোমাকে ভালয় ভালয় চিনিয়াছি আর আমি তোমাকে বিশ্বাস করিব না।

(২) আমার গা ছুঁইয়া সত্য করিয়া বল দেখি যে তুমি রূপ-প্রয়াসী কি না?

(৩) স্মরিব।

(৪) ছিদ্র বিশিষ্ট।

মাধব, কঠোর বাত হমারা
মনে লাগল কি তোর?
নিপট (৫) কঠিন দুখ সহই কহনু সব
ক্ষমগো কুবচন মোর!
মাধব! কাহতু মলিন করলি মুখ?
কুঞ্জে আসহ নাথ!
মধুর হাসি তুঁহু হাসহ-হাসহ
রাখহ কাতর-বাত!
নিদয়-বাত অব কবহুঁ ন বোলব
তুঁহুঁ মম প্রাণক প্রাণ!

অতি অবোধ হম—ব্যথিনু হিয়া তব
ছোড়ই কুবচন-বাণ!
বাতরাখ' মঝু বেরি বোল' পহু
হমকো করহ সিনেহ! (৬)
বেরি বোল পহু আদর বাণী
চলহ কুঞ্জ বন-গেহ!
মিটল মান অব—ভানু হাসয়ত
হেরই পীরিত-লীলা
কভু মানিনী কভু আদরিণী অতি
পীরিত-সাগর-বালা!

বঙ্গ-সাহিত্য।

মহাভারত ও কৃষ্ণ।

কথিত আছে যে সর্ আইজক্ নিউটন সমস্ত বিজ্ঞান আলোচনার পর এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে "আমি এতদিন ধরিয়া বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া দেখিলাম কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমি বিজ্ঞানরূপ সমুদ্রের বেলাভূমিতে শিশুর ন্যায় কেবল উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ করিয়াছি।" মহাভারতের সমালোচনা করিতে গেলে সমালোচকের মনেও সেই ভাবের উদয় হয়। যতই ইহার সমস্ত ভাগ নখ-দর্পণবৎ দেখিতে চেষ্টা পাওয়া যায়, যতই ইহার চিত্র-সমূহের বৈচিত্র্য আয়ত্ত করিতে আয়াস পাওয়া যায়, যতই ইহার নৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সামরিক, দার্শনিক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গের অসীম গভীরতার তলস্পর্শ করিতে যত্ন করা যায়, ততই হতাশ-হৃদয় ও শিথিল-প্রযত্ন হইয়া পড়িতে হয়। এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, মহাভারতের মত এক খানি চমৎকার গ্রন্থ কোন দেশে, কোন ভাষায় আর নাই। ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, মানব-চরিত্র-তত্ত্ব প্রভৃতি বিচিত্র উপাদানে গঠিত এই বিশালকায় মহাকাব্য পৃথিবীর একটি অদ্বিতীয় সামগ্রী। অভ্র-ভেদী হিমালয়ই, যে আর্য্যদিগের রক্ষা-প্রাচীর এবং বিপুল

(৫) অত্যন্ত।

(৬) আমার কথা রাখ একবার বল প্রভু যে তুমি আমাকে ভাল বাস।

জাহ্নবীই যাহাদের তর্পণ-নদী, রামায়ণ ও মহাভারত তাহাদেরই উপযুক্ত মহাকাব্য। আবার এই রামায়ণে ও মহাভারতে তুলনা করিতে গেলে রামায়ণের গভীর অথচ মহান্ কল্পনা-উচ্ছ্বাস দেখিয়া বাল্মীকিকে আমরা দেব-ভক্তি সহকারে প্রণাম করি, কিন্তু মহাভারতের বিচিত্র চমৎকারিত্ব দেখিয়া আমরা একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়ি। এই যে একটি লৌকিক প্রবাদ আছে যে "যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে"—সে প্রবাদ কতদূর যে যুক্তিমূলক তাহা কেবল মহাভারতের নির্ঘণ্ট দেখিলেই প্রতীয়মান হয়। আহার-বিহার-নিদ্রার সংযম হইতে আত্মার মুক্তি পর্য্যন্ত, মল্লযুদ্ধের প্রণালী হইতে দুর্ভেদ্য ব্যূহরচনার প্রথা পর্য্যন্ত, সামান্য আতিথ্যের নিয়ম হইতে বৃহৎ যজ্ঞের প্রণালী পর্য্যন্ত, মনুষ্য-চরিত্র বিষয়েও কুটিল ক্রূরমনা হীন ব্যক্তি হইতে মহান্ দেব-প্রকৃতি পর্য্যন্ত—মহাভারতের কবিত্বময় বর্ণনা-প্রাচুর্য্যে সমালোচকের হৃদয়-মন তরঙ্গাহত ছিন্ন তৃণের ন্যায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। কিন্তু মহাভারতকার যে রামায়ণ হইতে অশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এমন কি, মহাভারতের প্রধান প্রধান নায়কগণের চরিত্র রামায়ণের প্রধান প্রধান নায়কগণের চরিত্র অবলম্বন করিয়া গঠিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। রামের ধর্ম্মভয় যেমন যুধিষ্ঠির-চরিত্রের পত্তনভূমি বলিয়া মনে হয়, তেমনি লক্ষ্মণের ভ্রাতৃস্নেহ ও শৌর্য্য অর্জ্জুনে, মহাবীরের দুষ্কর্ষতা বৃকোদরে, ভরত শত্রুঘ্নের অমায়িকতা নকুল সহদেবে স্পষ্টাক্ষরে প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অনুকরণেই বল, আর সৌসাদৃশ্যতেই বল, মহাভারতের সঙ্গে রামায়ণ ব্যতীত আর পৃথিবীর কোন মহাকাব্যের সহিত তুলনা হইতে পারে না। যে ইংলণ্ডীয় কবি বলিয়াছেন যে হোমর মহান্ ভাব বিষয়ে ও বর্জ্জিল গম্ভীর সৌন্দর্য্য বিষয়ে জগতের সকল কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের অমূল্য সাহিত্য-রত্নের কথা কিছুই জানিতেন না। আমরা মহাভারত-প্রসঙ্গের উপসংহার-কালে এই সকল কবির গুণবিচারে প্রবৃত্ত হইতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব।

আপাততঃ দেখা যাইতেছে যে রামায়ণের কতকটা ছায়া অবলম্বন করিয়া মহাভারতের পত্তনভূমি নিহিত হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতে যে দুইটি বিশেষ চরিত্র আছে তাহা বাস্তবিকই অলৌকিক। সে দুইটি চরিত্র একটি কৃষ্ণের আর একটি দ্রৌপদীর। মহাভারত-কার কল্পনার সমুদ্র মন্থন করিয়া যত রত্ন সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, যা-কিছু অমৃত বা যা-কিছু গরল সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, সকলই বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে বিশ্লেষণ ও একত্রিত করিয়া কৃষ্ণ ও দ্রৌপদী-চরিত রচনা করিয়াছেন, এবং এ কথা আমাদের বোধ হয় বলাই বাহুল্য যে বেদব্যাসের রচনা ও বর্ণনা-কৌশলেই নিকুঞ্জ-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্মরূপে প্রায় সর্ব্বত্রই আরাধিত, এবং

বেদব্যাসেরই রচনা ও বর্ণনাকৌশলে পঞ্চপতি দ্রৌপদী পঞ্চসাধ্বীর মধ্যে পরিগণিত, ও তেজস্বিনী রাজপুত স্ত্রীজাতির বন্দনীয়।

চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা যজাতির জেষ্ঠ্য পুত্র যদু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা যজাতি শাপপ্রভাবে জরাগ্রস্ত হইলে তিনি তাঁহার পুত্রগণের নিকট যৌবন ভিক্ষা করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু অস্বীকার করাতে যজাতি তাঁহাকে এই অভিশাপ দেন যে, যদুর বংশে কেহই কখন রাজা হইতে পারিবে না। সুতরাং কালক্রমে যদুবংশীয়েরা ভারতবর্ষের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। এই যদুবংশীয়দিগের মধ্যে প্রভাবশালী এক দল আসিয়া মথুরা এবং তাহার সন্নিকটে রীতিমত বাস স্থাপনা করে। যে সময় রাজা কংস পিতৃনির্যাতন করিয়া মথুরার সিংহাসন অধিকার করে, সে সময় যদুবংশীয় বসুদেব মথুরার যাদবদিগের দলপতি-স্বরূপ ছিলেন। মথুরার সকল লোকই তাঁহার অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল,—কিন্তু রাজা কংস লোকদিগের অত্যন্ত অপ্রিয় ছিলেন। এই হেতু বসুদেবের সহিত তিনি আপন পিতৃব্য দেবকের কন্যা দেবকীর বিবাহ দিয়া আপন রাজ্যের ভিত্তিভূমি স্থির-প্রতিষ্ঠ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কংস এই আকাশ বাণী শুনিতে পাইলেন যে "হে কংস, দেবকীর গর্ভজাত পুত্রই তোমার নিধনকারী হইবে।" তখন কংস দেবকীকে হত্যা করিবার মানসে অসি নিষ্কোষিত করিলেন, কিন্তু বসুদেব এই সত্য করিয়া দেবকীর প্রাণরক্ষা করিলেন যে তাঁহাদের সন্তান হইলেই তাঁহারা তাহাকে কংসের হস্তে সমর্পণ করিবেন। কালক্রমে দেবকীর গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইল, এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই তাঁহারা তাহাকে যমুনার পরপার গোকুলে গোপনে পরহস্তে রাখিয়া আসিলেন। সেই সন্তানের নাম বলরাম। এই কথা জনরবে কংসের কর্ণগোচর হইলে এবং দেবকী পুনর্ব্বার গর্ভবতী হইলে তিনি তাঁহাকে বসুদেবের সহিত কারাগারে লৌহশৃঙ্খলে বাঁধিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পর বসুদেব কৌশল করিয়া তাহাকেও যমুনার পরপার গোকুলে গোকুলরাজ নন্দের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বলাই বাহুল্য যে ইনিই শ্রীকৃষ্ণ। গোকুলে কৃষ্ণ দিন দিন বর্দ্ধিতকায় ও বলিষ্ঠ হইতে লাগিলেন। দৈহিক ও মানসিক শক্তি প্রভাবে তিনি গোকুলের যুবক সম্প্রদায়ের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইয়া দাঁড়াইলেন, রাধিকা-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া ব্রজমণ্ডলকে যেন একটি প্রমোদ-কাননে পরিণত করিয়া তুলিলেন। এদিকে আবার কালিয়দমন, অসুরবধ প্রভৃতি নানা প্রকার বীরকার্য্য দ্বারা বন্ধুদিগের স্পর্দ্ধা ও শত্রুর মনে ভয় উৎপাদন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার শৌর্য্যের কথা রাজা কংসের কর্ণে গিয়া প্রতিধ্বনিত হইল,—তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, দৈববাণীর কার্য্য-গত পরিণাম

একেবারে এড়াইবার জন্য তিনি মথুরায় এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করিলেন, কৃষ্ণকে সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিয়া বিশেষ সম্মানার্থে বৃন্দাবনে আপনার রথ পর্য্যন্ত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রাজা কংসের অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইল না, কারণ কৃষ্ণ সেই মথুরায় আসিলেন, কিন্তু কংস দ্বারা তিনি নিহত না হইয়া কংসকে তিনিই নিহত করিলেন,—মথুরার সিংহাসন অনায়াসে অধিকার করিলেন, কারাবদ্ধ জনক জননীকে মুক্ত করিয়া সুখে মথুরায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ সুখের রাজত্ব বহুদিনের] হইতে পারিল না, কারণ মগধরাজ জরাসন্ধ নিজ জামতা কংসের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে মথুরায় যাত্রা করিলেন, এবং উপর্য্যুপরি কৃষ্ণ দ্বারা পরাজিত হইলেও পরিশেষে জয়লাভ করিয়া মথুরা অধিকার করিলেন। তথন কৃষ্ণ আপন পিতা মাতা, অনুচর বর্গ ও সৈন্য-সামন্ত লইয়া গুজরাটে আসিয়া দ্বারকা নামক মহানগরী স্থাপন করিলেন। দ্বারকা অল্পকাল মধ্যেই মহা সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল, এবং কৃষ্ণ তাঁহার নারায়ণী সৈন্যসহকারে রুক্মিণী হরণের সময় শিশুপালকে, উষাহরণের সময় মহাদেবকে, এবং পারিজাত হরণের সময় ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া আপন শৌর্য্যের মহাখ্যাতি আর্য্যাবর্ত্তময় প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

এ দিকে হস্তিনাপুরে ঘোরতর ব্যাপার উপস্থিত। দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর পাণ্ডবেরা কৌরবদিগের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিবেন, কিরূপে অপহৃত রাজ্যের অংশ দুর্য্যোধনের হস্ত হইতে ফিরিয়া লইবেন——সেই বিষয়ে সভা করিয়াছেন। এই সভাতে পাণ্ডব-পক্ষীয় প্রায় সকল রাজাই উপস্থিত ছিলেন, কৃষ্ণও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় যে, সমস্ত আর্য্যবর্ত্ত দুষ্টমতি কুরুকুলের অধীনস্থ না হইয়া পঞ্চপাণ্ডবদিগের ছত্রাধীন হোক। তিনি জানিতেন যে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ বাধিলে পাণ্ডবদিগের জয় অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং কুরুপাণ্ডবদিগের মধ্যে যে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হয়—ইহাই তাঁহার মর্ম্মান্তিক উদ্দেশ্য। কিন্তু তিনি পাণ্ডবদিগের যেমন আত্মীয় ও স্বসম্পর্কীয়, কৌরবদিগেরও যেমনি আত্মীয় ও স্বসম্পর্কীয়। হৃদয়ের ভাল বাসা পাণ্ডবদিগের প্রতি থাকিলেও কৌরবদিগের প্রতি তিনি লোকতঃ অনাত্মীয়তা প্রদর্শন করিতে পারেন না। সুতরাং এই পাণ্ডবসভায় সমবেত রাজাদিগের সম্মুখে কুরুপাণ্ডবদিগের সহিত তাঁহার যাহাই সম্পর্ক হউক না কেন, তিনি সে বিষয়ে নিতান্ত ঔদাস্য প্রকাশ পূর্ব্বক কেবল সত্য ও ধর্ম্মের সহায়তা করিবার জন্য যতটুকু যে ভাবে বলা উচিত তাহাই তিনি বলিলেন। তিনি বলিলেন—

"হে রাজন্যবর্গ! এই রাজা যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় সৌবল কর্ত্তৃক যেরূপ শঠতাপূর্ব্বক পরাজিত, হৃতরাজ্য ও বনবাসের

নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। পাণ্ডু-পুত্রগণ পৃথিবীমণ্ডল বলপূর্ব্বক স্বায়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াও কেবল সত্যপরায়ণতা প্রযুক্ত ত্রয়োদশ বৎসর এই দুরনুষ্ঠেয় ব্রত স্বীকার করিয়াছেন। বিশেষত অজ্ঞাত বাস-সময়ে আপনাদিগের নিবাসে দাসত্ব-পাশে বদ্ধ হইয়া দুঃসহ ক্লেশরাশি সহ্য করত দুস্তর ত্রয়োদশ বর্ষ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহাও আপনাদের অগোচর নাই। এক্ষণে কৌরব ও পাণ্ডবগণের পক্ষে যাহা হিতকর ধর্ম্ম্য, যশস্কর ও উপযুক্ত, আপনারা তাহাই চিন্তা করুন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অধর্ম্মাগত সুরসাম্রাজ্যও কামনা করেন না; কিন্তু ধর্ম্মার্থসংযুক্ত একটি গ্রামের আধিপত্যেও অধিকতর অভিলাষী হইয়া থাকেন। যদিও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ বল বীর্য্যে ইহাঁদিগকে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল শঠতা পূর্ব্বক পৈতৃক রাজ্য অপহরণ করত ইহাঁদিগকে অসহ্য ক্লেশানলে দগ্ধ করিয়াছেন; তথাপি ইহাঁরা তাঁহাদিগের অনাময়ই কামনা করিতেছেন। ইহাঁরা স্বয়ং ভূপতিগণকে নিপীড়িত করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; এক্ষণে কেবল তাহাই প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা এরূপ অসাধু যে, রাজ্য অপহরণ মানসে বিবিধ উপায় দ্বারা ইহাঁদিগকে বাল্যাবস্থাতেই সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। অতএব কৌরবগণের ঈদৃশ প্রবল লোভ, যুধিষ্ঠিরের ধার্ম্মিকতা ও ইহাঁদিগের পরস্পর সম্বন্ধ বিবেচনা করত আপনারা সমবেত বা পৃথকভূত হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করুন।

ইহাঁরা প্রতিজ্ঞাত সময় প্রতিপালন-পূর্ব্বক সত্যেরই অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু কৌরবেরা ইহাঁদিগের প্রতি সতত অন্যাযাচরণ করিতেছেন। অতএব পাণ্ডবগণ সমস্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রকে নিহত করুন কিম্বা সুহৃদগণ অসদৃশ কার্য্য সকল অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে নিবারিত করুন। যদি কৌরবগণ ইহাঁদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে ইহাঁরা আহত হইবামাত্র তাঁহাদিগকে নিহত করিবেন সন্দেহ নাই। যদ্যপি আপনারা এরূপ অনুমান করেন যে, পাণ্ডবগণ সংখ্যায় অল্প বলিয়া তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে অসমর্থ হইবেন, তাহা হইলে সকল সুহৃৎ মিলিত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্র-দিগকে সংহার করিতে যত্নশীল হউন। কিন্তু দুর্য্যোধন এবিষয়ে কি করিবেন, তাহার কিছুমাত্র জ্ঞাত হইতে পারি নাই; পরের অভিপ্রায় অবগত না হইয়া কার্য্যারম্ভ করা আপনাদের কি অভিপ্রেত? অতএব যাহাতে দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করেন, এইরূপ সন্ধির নিমিত্ত কোন ধার্ম্মিক কুলীন প্রমাদশূন্য পুরুষ দূত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করুন।" *

এই বলিয়াই তিনি নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রকৃত মনোগত ভাবের আভাস

* মৃত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্ব।

মাত্র দিয়া মুক্তকণ্ঠে যুদ্ধের উদ্যোগ বিষয়ে কিছুই বলিতে পারিলেন না, কারণ তাহা স্পষ্ট অক্ষরে প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত মন্দ দেখায়। কিন্তু দ্রুপদ রাজা সভাস্থলে মুক্তকণ্ঠে বলিলেন—

"দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে শান্ত বাক্য প্রয়োগ করা একান্ত অবিধেয়; মৃদুতা অবলম্বন করিলে সেই পাপাত্মা কদাচ বশীভূত হইবে না। যে ব্যক্তি দুর্য্যোধনের সহিত শান্ত ব্যবহার করে; সে তাহাকে মৃদু ও অসার বিবেচনা করিয়া থাকে। আমরা মৃদু হইলে সে নিয়তই এই রূপ অনুমান করিবে যে, আমি অনায়াসেই কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইব। অতএব আমাদিগের ঐ রূপ অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়ঃকল্প; এক্ষণে তদ্বিষয়ে যত্নবিধান কর। সৈন্যসংগ্রহ ও মিত্রগণের নিকট দূত প্রেরণ কর। দ্রুতগামী দূত সকল শল্য, ধৃষ্টকেতু, জয়ৎসেন ও সমুদায় কৈকেয়দিগের নিকট অবিলম্বে গমন করুক। দুর্য্যোধনও সর্ব্বত্র দূত প্রেরণ করিবে তাহার সন্দেহ নাই। সাধারণে এই রূপ একটি নিয়ম প্রচলিত আছে, যিনি অগ্রে দূত প্রেরণ করেন, সাধু লোকেরা তাঁহারই পক্ষ অবলম্বন করিয়া কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকেন; অতএব আমরা অগ্রেই সর্ব্বত্র দূত প্রেরণ করি; কারণ এক্ষণে আমাদিগকে নিতান্ত দুর্ভর কার্য্যভার বহন করিতে হইবে।" *

এই সকল কথা যখন দ্রুপদরাজ মুক্তকণ্ঠে বলিলেন তখন কৃষ্ণ সমস্ত সভাস্থ লোকের মনের ভাব বুঝিয়া এবং আপনারও অবসর পাইয়া সভাগণকে এই বলিলেনঃ—

"দ্রুপদরাজ, পাণ্ডবরাজের প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত যে কথার উল্লেখ করিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে কোন ক্রমেই অসম্ভাবিত বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। যদি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে তাঁহার আদেশানুসারে কার্য্য করাই আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; অন্যথাচরণ করিলে অতিশয় মূর্খতা প্রকাশ হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু কুরু ও পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদিগের তুল্যসম্বন্ধ; তাঁহারা কখন মর্য্যাদা লঙ্ঘনপূর্ব্বক আমাদিগের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করেন নাই। আমরা বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া এ স্থানে আগমন করিয়াছি এবং আপনিও সেই নিমিত্ত আসিয়াছেন; এক্ষণে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে; আমরা পরমাহ্লাদে নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করিব। আপনি বয়স ও জ্ঞানে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের সখা; রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও সর্ব্বদা আপনারে বহুমান করিয়া থাকেন; আমরা আপনার শিষ্য স্বরূপ; অতএব যে সকল বাক্য পাণ্ডবদিগের পক্ষে অর্থকর; আপনি তাহার উল্লেখ করুন; আপনার বাক্যে আমাদিগের সংশয় জন্মিবার কোন সম্ভাবনা নাই। যদি দুর্য্যোধন ন্যায়ত সন্ধি সংস্থাপন করেন, তাহা হইলে আর কুরুপাণ্ডবের সৌভ্রাত্রনাশ বা কুলক্ষয় হয় না। কিন্তু যদি দুর্ম্মতি

* কা, প্র, সি, অনুবাদিত মহাভারত।

দুর্য্যোধন দর্পান্বিত হইয়া মোহবশতঃ সন্ধি না করে; তাহা হইলে অগ্রে অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া পশ্চাৎ আমাদিগকে আহ্বান করিবেন। অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইলে দুর্ব্বুদ্ধিপরতন্ত্র দুর্য্যোধন, বন্ধু বান্ধব ও আমাত্যগণের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হইবে তাহার সন্দেহ নাই।”

কৃষ্ণ এইরূপে মহাভারতীয় মহা যুদ্ধের বীজ রোপণ করিয়া দ্বারকায় প্রতিগমন করিলেন। ক্রমে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। কুরু পাণ্ডব উভয়েই কৃষ্ণকে স্বদলভুক্ত করিতে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই উদ্দেশে দুর্য্যোধন স্বয়ং দ্বারকায় যাত্রা করিলেন। যে দিন দুর্য্যোধন দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন, সেই দিন অর্জ্জুনও একই উদ্দেশে তথায় উপনীত হইলেন। দুর্য্যোধন অগ্রেই কৃষ্ণের রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে কৃষ্ণ শয়ান ও নিদ্রাভিভূত। সুতরাং তিনি কৃষ্ণের জাগরণকাল অপেক্ষায় তাঁহার মস্তকসমীপস্থ দিব্য আসনে উপবিষ্ট রহিলেন। পরক্ষণেই অর্জ্জুনও সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া এবং দ্বারকাপতিকে নিদ্রিত দেখিয়া তাঁহার পদতল সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন। কৃষ্ণ প্রবুদ্ধ হইয়াই অর্জ্জুনকে দেখিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পরক্ষণেই তিনি মুখ ফিরাইয়া দুর্য্যোধনকে দেখিবামাত্র তাঁহাকেও আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন।

দুর্য্যোধন সহাস্য বদনে কহিলেন, “হে যাদব! এই উপস্থিত যুদ্ধে আপনাকে সাহায্য দান ক'রতে হইবে। যদিও আপনার সহিত আমাদিগের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ ও তুল্য সৌহার্দ্দ, তথাপি আমি অগ্রে আগমন করিয়াছি। সাধুগণ প্রথমাগত ব্যক্তিরই পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন; আপনি সাধুগণের শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়; অতএব অদ্য সেই সদাচার প্রতিপালন করুন ১।”

কৃষ্ণ কহিলেন, “হে কুরুবীর! আপনি যে অগ্রে আগমন করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু আমি কুন্তীকুমারকে অগ্রে নয়নগোচর করিয়াছি। এই নিমিত্ত আমি আপনাদের উভয়েরই সাহায্য করিব। কিন্তু ইহা প্রসিদ্ধ আছে, অগ্রে বালকেরই বরণ করিবে; অতএব অগ্রে কুন্তীকুমারের বরণ করাই উচিত।” এই বলিয়া ভগবান যদুনন্দন ধনঞ্জয়কে কহিলেন,‘হে কৌন্তেয়! অগ্রে তোমারই বরণ গ্রহণ করিব। আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে বিখ্যাত এক অর্ব্বুদ গোপ এক পক্ষের সৈনিক পদ গ্রহণ করুক; আর অন্য পক্ষে আমি সমরপরাঙ্মুখ ও নিরস্ত্র হইয়া অবস্থান করি; ইহার মধ্যে যে পক্ষ তোমার হৃদ্যতর হয়, তাহাই অবলম্বন কর ২।”

এই স্থলে কৃষ্ণের জটিল বুদ্ধি ও মানবপ্রকৃতির অভিজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার শয়ন-গৃহে দুর্য্যোধনের প্রবেশকালে তিনি যে নিদ্রিত ছিলেন সে কেবল নিদ্রার ভান মাত্র। তিনি জানিতেন যে উভয় পক্ষই তাঁহার সাহায্যার্থে তাঁহার নিকট আসিবে, তিনি নিশ্চয় জানিতেন

১।২ কা. প্র. সি. অনুবাদিত মহাভারত।

যে দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন উভয়েই দ্বারকায় উপস্থিত,—তিনি জানিতেন যে এই আত্মীয়দিগের মধ্যে যিনিই প্রথমে তাঁর শরণাপন্ন হইবেন তাঁহাকেই তাঁহার সাহায্য প্রদান করিতে হইবে,—তিনি জানিতেন যে তাঁহাকে নিদ্রাবস্থায় দেখিলে দুর্য্যোধন স্বীয় গর্ব্বিত ও দাম্ভিক প্রকৃতি বশতঃ কখনই তাঁহার শীয়রে ব্যতীত তাঁহার পদতলে আসন গ্রহণ করিবেন না, তিনি জানিতেন যে অর্জ্জুন আসিয়া তাঁহার পদতলে দণ্ডায়মান থাকিলে অর্জ্জুনকেই তিনি প্রথমে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে অর্জ্জুনকে প্রথমে দেখা ও দুর্য্যোধনের প্রথমে গৃহে প্রবেশ করা রূপ সমস্যাস্থলে ইতর-বিশেষ করিতে গেলে তাঁহার নিজের উদ্দেশ্য সফল হয় না ও নিজের অপক্ষপাতিত্বের ভান করা যায় না, তখন তিনি উভয়কেই সাহায্য প্রদানে স্বীকৃত হইলেন। এই সাহায্য প্রদানেও আবার তাঁর ঘোর কুটিল বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যখন তিনি দুর্য্যোধনের প্রকৃতি বিলক্ষণ বুঝিয়া বলিলেন যে "এক দিকে আমার জগদ্বিখ্যাত সশস্ত্র সমস্ত নারায়ণী সেনা ও অপরদিকে নিরস্ত্র একেলা আমিমাত্র,—" দুর্য্যোধন মহা আহ্লাদে সেই অসংখ্য নারায়ণী সৈন্যই গ্রহণ করিলেন—কিন্তু দুর্য্যোধন বুঝিলেন না যে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে কৃষ্ণেরই নারায়ণী সেনা কখনই বীরমদে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হইবে না। অথচ কৃষ্ণ নিরস্ত্র হইয়াও যদি অর্জ্জুনের সারথী ও পাণ্ডবদিগের মন্ত্রণাদাতা হয়েন তাহা হইলে পাণ্ডবদিগের জয় ত স্থিরনিশ্চয়। আর কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথী হইতেই প্রতিশ্রুত হইলেন। যাহা হউক, কৃষ্ণের অপক্ষপাতিত্বে ও উদারতায় অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধন উভয়েই মহা হর্ষে দ্বারকা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন।

ক্রমশঃ

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র।

বিশে সেপ্টেম্বরে আমরা "পুনা" ষ্টীমারে উঠ্‌লেম। পাঁচটার সময় জাহাজ ছেড়ে দিলে। আমরা তখন জাহাজের ছাতে দাঁড়িয়ে। আস্তে আস্তে আমাদের চোখের সামনে ভারতবর্ষের শেষ তট-রেখা মিলিয়ে গেল। চারদিকের লোকের কোলাহল সহিতে না পেরে আমি আমার নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পোড়লেম। গোপন কর্‌বার বিশেষ প্রয়োজন দেখ্‌ছিনে, আমার মনটা বড়ই কেমন নির্জ্জীব অবসন্ন ম্রিয়মান হোয়ে পোড়েছিল, কিন্তু দূর হোক্‌গে—ওসব করুণ-রসাত্মক কথা লেখ্‌বার অবসরও নেই

ইচ্ছেও নেই; আর লিখ্‌লেও, হয় তোমার চোখের জল থাকবে না, নয় তোমার ধৈর্য্য থাক্‌বে না।

সমুদ্রের পায়ে দণ্ডবৎ! ২০শে থেকে ২৬শে পর্য্যন্ত যে কোরে কাটিয়েছি তা' আমিই জানি! "সমুদ্র পীড়া" কাকে বলে অবিশ্যি জান, কিন্তু কি রকম তা জান না। আমি সেই ব্যামোয় পোড়েছিলেম, সে কথা বিস্তারিত কোরে লিখ্‌লে পাষাণেরও চোখে জল আস্‌বে! ৬ টা দিন, মশায়, শয্যা থেকে উঠিনি। যে ঘরে থাকতেম, সেটা অতি অন্ধকার, ছোট; পাছে সমুদ্রের জল ভিতরে আসে তাই চারদিকের জান্‌লা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। অসূর্য্যম্পশ্যরূপ ও অবায়ুস্পর্শ-দেহ হোয়ে ছয়টা দিন কেবল বেঁচে ছিলেম মাত্র। প্রথম দিন সন্ধ্যে বেলায় আমাদের একজন সহযাত্রী আমাকে জোর কোরে বিছানা থেকে উঠিয়ে খাবার টেবিলে নিয়ে গেলেন। যখন উঠে দাঁড়ালেম তখন আমার মাথাটার ভিতর যেন একটা বিপর্য্যয় ব্যাপার বেধে গেল, মাথার ভিতর যা কিছু আছে সবাই মিলে যেন মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ কোরে দিলে, চোখে দেখ্‌তে পাইনে, পা চলে না, সর্ব্বাঙ্গ টলমল করে, দুপা গিয়েই একটা বেঞ্চিতে বোসে পোড়লেম। আমার সহযাত্রীটি আমাকে ধরাধরি কোরে জাহাজের 'ডেকে' অর্থাৎ ছাতে নিয়ে গেলেন। একটা রেলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেম। তখন অন্ধকার রাত। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। আমাদের প্রতিকূলে বাতাস বইচে। সেই অন্ধকারের মধ্যে—সেই নিরাশ্রয় অকূল সমুদ্রে দুই দিকে অগ্নি উৎক্ষিপ্ত কর্‌তে কর্‌তে আমাদের জাহাজ একলা চোলেছে, যেখানে চাই সেই দিকেই অন্ধকার সমুদ্র ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে—সে এক মহা গম্ভীর দৃশ্য! জাহাজ যখন চলে তখন তার দুই দিকে যেন আগুন ভেঙ্গে পড়ে, অন্ধকার রাত্রে সে বড় সুন্দর দেখায়। একেই Phosphorescence বলে।

সেখানে বেশীক্ষণ থাক্‌তে পারলেম না। ভয়ানক মাথা ঘুর্‌তে লাগল। ধরাধরি কোরে আবার আমার ক্যাবিনে (ঘরে) এলেম। সেই-যে বিছানায় পড়্‌লেম, ছ দিন আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও মাথা তুলিনি। আমাদের যে ষ্টুয়র্ড্ ছিল, (যাত্রীদের সেবার জন্য জাহাজে যে সব চাকর থাকে)-কারণ জানিনে-আমার উপর তার কেমন বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল। দিনের মধ্যে যখন-তখন সে আমার জন্যে খাবার নিয়ে উপস্থিত কর্‌ত; না খেলে কোন মতেই ছাড়্‌ত না। সে বোল্‌ত, না খেলে আমি ইঁদুরের মত দুর্ব্বল হোয়ে পোড়্‌ব (weak as a rat) সে বোল্‌ত সে আমার জন্যে সব কাজ কর্‌তে পারে, আমি তাকে যথেষ্ট সাধুবাদ দিতেম, এবং জাহাজ ছেড়ে আস্‌বার সময় সাধুবাদের চেয়ে আরো কিঞ্চিৎ সারবান পদার্থ দিয়েছিলেম।

ছ দিনের পর আমরা যখন এডেনের কাছাকাছি পৌঁছলেম, তখন সমুদ্র কিছু শান্ত হোল। সে দিন আমার ষ্টুয়ার্ড্ এসে নোড়ে চোড়ে বেড়াবার জন্যে আমাকে

বারবার অনুরোধ কোরতে লাগল। আমি তার পরামর্শ শুনে বিছানা থেকে ত উঠলেম, উঠে দেখি যে সত্যিই ইঁদুরের মত দুর্ব্বল হোয়ে পোড়েছি। মাথাটা যেন ধার-করা, কঁধের সঙ্গে তার ভাল-রকম বনে না; চুরি-করা কাপড়ের মত শরীরটা যেন আমার ঠিক্ গায়ে লাগ্‌ছে না। ঘর থেকে বেরিয়ে ছাতের উপর গিয়ে একটা কেদারায় হেলান দিয়ে পোড়লেম। অনেক দিনের পর বাতাস পেয়ে বাঁচলেম। দুপর বেলা দেখি একটা ছোট নৌকা সেই সমুদ্র দিয়ে চোলেছে। চার দিকে ৯০ ক্রোশের মধ্যে আর ডাঙ্গা নেই, জাহাজ-শুদ্ধ লোক অবাক্। তারা আমাদের ষ্টীমারকে ডাকৃতে আরম্ভ করলে; জাহাজ থাম্‌ল। তারা একটি অতি ছোট নৌকায় কোরে কতকগুলি লোক জাহাজে পাঠিয়ে দিলে। এরা সকলে আরব দেশীয়, এডেন থেকে মস্কটে যাচ্চে। পথের মধ্যে দিক্‌ভ্রম হোয়ে গেচে, তাদের সঙ্গে যা জলের পিপে ছিল, তা ভেঙ্গে গিয়ে জল সমস্ত নষ্ট হোয়ে গেছে; অথচ যাত্রী অনেক। আমাদের জাহাজের লোকেরা তাদের জল দিলে। একটি ম্যাপ খুলে কোন্‌দিকে ও কতদূরে মস্কট, তাদের দেখিয়ে দিলে; তারা আবার চল্‌তে লাগ্‌ল। সে নৌকো যে মস্কট পর্য্যন্ত পৌঁছোবে, তাতে সকলেই সন্দেহ প্রকাশ কোরতে লাগ্‌ল।

২৮ শে সেপ্টেম্বর শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি, আমাদের সম্মুখে সব পাহাড় পর্ব্বত উঠেছে। অতি সুন্দর পরিষ্কার প্রভাত; সূর্য্য সবে মাত্র উঠেছে, সমুদ্র অতিশয় শান্ত। দূর থেকে সেই পর্ব্বতময় ভূভাগের প্রভাতদৃশ্য এমন সুন্দর দেখাচ্ছে যে কি বল্‌ব। পর্ব্বতের উপর রঙ্গিন্ মেঘগুলি এমন নত হোয়ে পোড়েছে, যে মনে হয় যেন অপরিমিত সূর্য্যকিরণ পান কোরে তাদের আর দাঁড়াবার শক্তি নেই, পর্ব্বতের উপরে যেন অবসন্ন হয়ে পোড়েছে। আয়নার মত পরিষ্কার শান্ত সমুদ্রের উপর ছোট ছোট পাল-তোলা নৌকোগুলি আবার কেমন ছবির মত দেখাচ্ছে!

এডেনে পৌঁছে বাড়িতে চিঠি লিখ্‌তে আরম্ভ করলেম। কিন্তু লিখ্‌তে গিয়ে দেখি যে এই কদিন নাড়াচাড়া খেয়ে মাথার ভিতরে যেন সব উলটো-পালটা হোয়ে গেছে; বুদ্ধির রাজ্যে একটা অরাজকতা ঘোটেছে; কি কোরে লিখ্‌ব, কেমন কোরে লিখ্‌ব ভাল মনে আস্‌চে না। ভাবগুলো যেন মাকড়্‌সার জালের মত, ছুঁতে গেলেই অমনি ছিঁড়ে খুঁড়ে যাচ্চে। কিসের পর কি লিখব, তার একটা ভাল রকম বন্দোবস্ত কোর্‌তে পারছিনে। এই অবস্থায় লিখ্‌তে আরম্ভ কর্‌লেম, এমন বিপদে পোড়ে তোমাকে যে লিখ্‌তে পারিনি তাতে তোমার ক্ষোভের কারণ কিছুই নাই।

দেখ, সমুদ্রের উপর আমার কতকটা অশ্রদ্ধা হোয়েছে। কল্পনায় সমুদ্রকে যা' মনে কর্‌তেম, সমুদ্রে এসে দেখি তার সঙ্গে অনেক বিষয় মেলেনা। তীর থেকে সমুদ্রকে খুব মহান্ বোলে মনে হয়, কিন্তু

সমুদ্রের মধ্যে এলে আর ততটা হয় না। তার কারণ আছে; আমি যখন বঙ্গের উপকূলে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখতেম তখন দেখ্‌তেম, দূর দিগন্তে গিয়ে নীল জল নীল আকাশে মিশিয়ে গিয়েছে, কল্পনায় মনে কর্‌তেম যে, একবার যদি ঐ দিগন্তের আবরণ ভেদ কোর্‌তে পারি—ঐ দিগন্তের যবনিকা উঠাতে পারি, অমনি আমার সুমুখে এক অকূল অনন্ত সমুদ্র একেবারে উথ্‌লে উঠ্‌বে। ঐ দিগন্তের পরে যে কি আছে তা আমার কল্পনাতেই থাক্‌ত, তখন মনে হোত না, ঐ দিগন্তের পরে আর এক দিগন্ত আসবে! কিন্তু যখন সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়ি, তখন মনে হয় যে, জাহাজ যেন চোল্‌চে না, কেবল একটি দিগন্তের গণ্ডীর মধ্যে বোসে আছে। আমাদের কল্পনার পক্ষে সে দিগন্তের সীমা এত সঙ্কীর্ণ যে মন কেমন তৃপ্ত হয় না। কিন্তু দেখ, এ কথা বড় গোপনে রাখা উচিত; বাল্মীকি থেকে বায়রণ পর্য্যন্ত সকলেরই যদি এই সমুদ্র দেখে ভাব লেগে থাকে, তবে আমার না লাগ্‌লে দশজনে যে হেসে উঠ্‌বে; গ্যালিলিওর সময়ে এ কথা বোল্লে হয়ত আমাকে কয়েদে যেতে হোত। এত কবি সমুদ্রের স্তুতিবাদ কোরেছেন যে আজ আমার এই নিন্দায় তাঁর বোধ হয় বড়-একটা গায়ে লাগ্‌বে না। স্বীকার করি, যখন তরঙ্গ ওঠে, তখন সমুদ্র বেশ দেখায়, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সমুদ্রে তরঙ্গ উঠলেই, আমার এমন মাথা ঘুর্‌তে থাকে যে আমার দেখাশুনো সব ঘুরে যায়।

আমি যখন ঘর থেকে বেরোতে আরম্ভ করলেম, তখন জাহাজের যাত্রীদের উপর আমার নজর পোড়্‌ল ও আমার উপর জাহাজের যাত্রীদের নজর পোড়্‌ল। আমি স্বভাবতই "লেডি"-জাতিকে বড় ডরাই। তাঁদের কাছে ঘেঁস্‌তে গেলে এত প্রকার বিপদের সম্ভাবনা যে, চানক্য পণ্ডিত থাকলে " লেডি "-দের কাছ থেকে দশ সহস্র হস্ত দূরে থাকতে পরামর্শ দিতেন। সর্ব্বদাই ভয় হয় পাছে কি কথা বোল্‌তে কি কথা বোলে ফেলি, আর আমাদের অসহিষ্ণু কোমল-স্বভাব লেডি তাঁদের আদব-কায়দার তিলমাত্র ব্যতিক্রম সইতে না পেরে দারুণ ঘৃণায় ও লজ্জায় একেবারে মূর্চ্ছা যান, আর দশদিক্‌ হোতে দশটা জেণ্টল্‌ম্যান্‌ একেবারে হাঁ হাঁ কোরে এসে পড়েন। পাছে তাঁদের গাউনের অরণ্যের মধ্যে পথহারা হোয়ে একেবারে ভেবাচেকা লেগে যাই; পাছে রাস্তায় পা ফেলতে তাঁদের গাউনের উপর পা ফেলি; পাছে আহারের সময় তাঁদের মাংস কেটে দিতে হয়, পাছে মাংস কাট্‌তে গিয়ে হাড় কেটে বসি—এই রকম সাত পাঁচ ভেবে আমি জাহাজের লেডিদের কাছ থেকে অতি দূরে থাক্‌তেম। আমাদের জাহাজে লেডির অভাব ছিল না, কিন্তু জেণ্টল্‌ম্যানরা সর্ব্বদা খুঁৎ খুঁৎ কর্‌তেন যে, তার মধ্যে অল্পবয়স্কা বা সুশ্রী একজনো ছিল না। একজন এত লম্বা, তাঁর ঠোঁট এত বন্ধুর, তাঁর মুখে এত দাগ, তাঁর দাঁতের এত দৈর্ঘ্য, তাঁর আহারের পরিমাণ এত অপ-

রিমিত যে, তেমন দুইটা পুরুষ সচরাচর খুঁজ্‌লে পাওয়া যায় না। একজন আছেন তাঁকে জ্যামিতি শাস্ত্রের রেখা (Length without breadth) বলা যেতে পারে। তাঁর শরীর লম্বা, মুখ লম্বা, হাত লম্বা, পা লম্বা, চোক ছোট, নাক ছোট, মাথা ছোট। এক জনের দাঁতের সম্পূর্ণরূপে অভাব ছিল, কিন্তু আহার-কালে দন্তবান্ ব্যক্তিরা তাঁর কাছে পরাস্ত মান্‌ত। জাহাজে কেবল একজন যুবতী আছেন মাত্র, কিন্তু জেণ্টল্‌ম্যান্‌দের পোড়া অদৃষ্টবশতঃ যাঁরা অধিক-বয়স্কা ছিলেন তাঁরাই যৌবনের মুখস পোরে নানা প্রকার হাবভাব কোরে পুরুষদের হৃদয়-রাজ্যে একটা গোলমাল বাধাবার জন্যে যথাসাধ্য বলপ্রয়োগ কর্‌তেন, আর যুবতীটি ছিব্‌লামীর বয়স গিয়াছে মনে কোরে ঘোম্‌টা (Veil) টেনে এক প্রান্তে সারাদিন বাইবেল পোড়্‌তেন। পুরুষদের মন লুটপাট কর্‌বার জন্যে এই দিদিমার বয়সী লেডিগণ যে রকম প্রাণপণে যত্ন কর্‌তেন, তা দেখ্‌লে তোমার মায়া হোত। পুরুষের কাছে তাদের সেই অতি মধুর ললিত-গলিত ভাবের হাসি, অতি ঢল-ঢল ভাবের অঙ্গ-ভঙ্গী দেখে আমার প্রচুর পরিমাণে হাস্য ও করুণরসের আবির্ভাব হোত। কাপড়ে চোপড়ে, রঙে-চঙে, তাঁরা তাঁদের ভাঙ্গা-চূরা রূপকে কোন প্রকারে ঠেকো দিয়ে রেখেছেন মাত্র!

পুরুষ যাত্রীদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হোয়েছিল। ব—মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হোয়েছিল। তিনি লোক বড় ভাল। এমন ধাঁচের লোক বড় সচরাচর দেখা যায় না। তাঁর কথা অনর্গল, হাসি অজস্র, আহার অপরিমিত। সকলের সঙ্গেই তাঁর আলাপ, সকলের সঙ্গেই তিনি হাসি তামাসা কোরে বেড়ান। তাঁর একটা গুণ আছে, তিনি কখনো বিবেচনা কোরে, ভেবে-চিন্তে, মেজে-ঘোষে কথা কন না; ঠাট্টা করেন, কিন্তু সকল সময়ে তার মানে থাকে না, কিন্তু না থাকুক্, তিনি নিজে হেসে আকুল হন। তিনি তাঁর বয়সের ও পদমানের গাম্ভীর্য্য বুঝে হিসাব কোরে কথা কন না, মেপে-জুকে হাসেন না ও দুদিক্ বজায় রেখে মত প্রকাশ করেন না, এই সকল কারণে তাঁকে আমার বড় ভাল লাগ্‌ত। তাঁর মনটা এখনো হামাগুড়ি দিচ্চে—কত প্রকার যে ছেলেমানুষী করেন তার ঠিক নেই; ঘোরতর বিজ্ঞতার আতিশয্যে মুখটা অন্ধকার কোরে তাঁকে মোটাগলায় কথা কইতে কখনো শুনি নি। বৃদ্ধত্বের বুদ্ধি, ও বালকত্বের সাদাসিদা নিশ্চিন্ত ভাব একত্রে দেখ্‌লে আমার বড় ভাল লাগে। তাঁর একটা স্বভাব আছে যে কাকেও তিনি তার পিতা মাত-প্রদত্ত নাম ধোরে ডাকেন না—তিনি নিজে স্বতন্ত্র নাম-করণ করেন। আমাকে তিনি "অবতার" বল্‌তেন, Gregory সাহেবকে "গড়্‌গড়ি" বলতেন, জাহাজের আর এক যাত্রীকে "রুহিমৎস্য" বোলে ডাক্‌তেন, সে বেচারীর অপরাধ কি তা জান? সাধারণ মানুষদের চেয়ে তার ঘাড়ের দিকটা কিছু খাটো ছিল, তার মাথা ও

শরীরের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র যোজক পদার্থ ছিল না বোল্লেও হয়। এই জন্যে ব—মহাশয় তাকে মৎস্য শ্রেণীভুক্ত করে ছিলেন। কিন্তু আমি যে কেন অবতার-শ্রেণীর মধ্যে পোড়ে গিয়েছিলেম, তার কারণ সহজে নির্দ্দেশ করা যায় না। খাবার সময়ে তাঁর এক গল্প ছিল যে, এক জন নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল, তার অপরিমিত আহার দেখে তার পাশের এক জন ভদ্র লোক বল্লেন, "মহাশয়, পরের খরচে আহার কোচ্চেন অতএব বড় ভাবনার বিষয় নেই বটে, কিন্তু মনে রাখবেন পেটটি আপনার।" কিন্তু ব—মহাশয় নিজে সকল সময় সেইটি মনে রাখেন্ না!

আমাদের জাহাজের Mr. T—মহাশয় কিছু নূতন রকমের লোক। তিনি ঘোরতর ফিলজফর মানুষ। তাঁকে কখনো চলিত ভাষায় কথা কইতে শুনিনি। তিনি কথা কইতেন না,বক্তৃতা দিতেন। এক দিন আমরা দু চারজনে মিলে জাহাজের ছাতে দুই দণ্ড আমোদ-প্রমোদ কর্‌ছিলেম, এমন সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে ব—মহাশয় তাঁকে বল্লেন "কেমন সুন্দর তারা উঠেছে,"এই আমাদের ফিলজফর মশায়,তারার সঙ্গে মনুষ্য-জীবনের সঙ্গে একটা উৎকট সম্বন্ধ বাধিয়ে দিয়ে বক্তৃতা সুরু কল্লেন—আমরা বেচারীরা "মুখেতে চাহিয়া থাকে ফ্যালফ্যাল্ করিয়া" রইলেম। গল্প-সল্প ঘুচে গেল,গান বাজনা থেমে গেল, জন দুয়েক ঢুলতে আরম্ভ কোর্‌লেন, জনদুয়েক হাই তুলতে আরম্ভ কোর্‌লেন—সমস্ত মাটি হয়ে গেল।

আমাদের জাহাজে একটি আস্তো জন্‌বুল্‌ ছিলেন। তাঁর তাল বৃক্ষের মত শরীর, ঝাঁটার মত গোঁফ, সজারুর কাঁটার মত চুল, হাঁড়ির মত মুখ, মাছের চোকের মত ভাব-বিহীন ম্যাড়্‌মেড়ে চোক, তাঁকে দেখ্‌লেই আমার গা কেমন কর্‌ত, আমি পাঁচ হাত তফাতে সোরে যেতেম। এক এক জন কোন অপরাধ না কোর্‌লেও তার মুখশ্রী যেন সর্ব্বদা অপরাধ কোর্‌তে থাকে। প্রত্যহ সকালে উঠেই শুন্‌তে পেতেম তিনি ইংরিজি. ফ্রেঞ্চ, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি যত ভাষা জানেন সমস্ত ভাষায় জাহাজের সমস্ত চাকর বাকরদের অপরিমিত গাল দিতে আরম্ভ কোরেছেন, ও দশদিকে দাপাদাপি কোরে বেড়াচ্চেন। তাঁকে কখনো হাস্‌তে দেখি নি; কারো সঙ্গে কথা নেই বার্ত্তা নেই, আপনার ক্যাবিনে গোঁ হোয়ে বোসে আছেন। কোন কোন দিন "ডেকে" বেড়াতে আস্‌তেন, বেড়াতে বেড়াতে যার দিকে একবার কৃপা-কটাক্ষে নেত্রপাত কর্‌তেন, তাকে যেন পিঁপড়াটির মত মনে কর্‌তেন।

প্রত্যহ খাবার সময়ে ঠিক্ আমার পাশেই Mr B—বোস্‌তেন। তিনি একটি ইয়ুরাসীয়। কিন্তু তিনি ইংরাজের মত গান গাইতে,শিষ দিতে, পকেটে হাত দিয়ে পা ফাঁক কোরে দাঁড়াতে সম্পূর্ণরূপে শিখেছেন। তিনি আমাকে বড়ই অনুগ্রহের চোখে দেখ্‌তেন। এক দিন এসে মহা গম্ভীর স্বরে বোল্লেন—'Young man,তুমি Oxford-এ যাচ্চ,Oxford University বড় ভাল বিদ্যালয়;'—এ কথা

তিনি না বোল্লে Oxford University যেন মাটি হোয়ে যেত! আমি এক দিন ট্রেঞ্চ সাহেবের "Proverbs and their lessons" বই-খানি পোড়্ছিলেম, তিনি এসে বইটি নিয়ে শিষ দিতে দিতে ছুচার পাত উল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে বল্লেন "হাঁ, ভাল বই বটে!" ট্রেঞ্চের শুভাদৃষ্ট!! আমার উপর তাঁর কিছু মুরুব্বিয়ানা ব্যবহার ছিল।

ক্রমশঃ

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মানস প্রসূন। শ্রী নগেন্দ্রনাথ ঘোষপ্রণীত, কাশীখণ্ড যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ।০ মাত্র।

ইহা একখানি কবিতা-পুস্তক। চারিটি প্রসঙ্গ লইয়া যে চারিটি কবিতা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, সে-গুলি স্বভাব-সম্পন্ন, হৃদয়-গ্রাহী ও প্রীতিকর। লেখকের মানস-প্রসূন প্রকৃত রূপে পরিস্ফুট হইলে লেখক বঙ্গসাহিত্য-মণ্ডলে যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

বিজন-সংগীত (কাব্য।) শ্রী যদুনাথ পালিত কর্ত্তৃক প্রণীত। বিডন যন্ত্রে মুদ্রিত—মূল্য ১ টাকা।

এই পুস্তক খানিও দ্বাদশটি ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গ লইয়া রচিত হইয়াছে। লেখকের সুন্দর ভাবুকতার পরিচয়-স্বরূপ আমরা পুস্তক খানি হইতে গুটিকতক কবিতা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি—

"নব বলয়িতা লতা বালিকা-যৌবন—
লাজহীন আগেকার সোজা গতি নাহি আর,
চলিতে জড়ায় এবে চরণে চরণ,
অগ্রসর হতে যেন নাহি সরে মন।

নব বলয়িতা-লতা বালিকা-যৌবন—
ভয়ে লাজে জড় সড়, সততই হয়ে পড়,
নিজ দেহ সঙ্কুচিত কর অনুক্ষণ,
শিহর, সরমে যদি পরশে পবন।

আর, ওই সুমধুর সলাজ ধরণ—
এই মুখ প্রকাশিয়ে আবার ঘোমটা দিয়ে,
বারিদে করিছে যেন চাঁদে আবরণ?—
আকুলিতে বুঝি মোর চকোর নয়ন।

আর, ওই সুমধুর সলাজ বীক্ষণ—
এই বেশ চোখ চেয়ে—আবার কি লাজ পেয়ে
মৃদু হেঁসে অধোপানে করিতে লোকন—
জড়িত জড়িত দৃষ্টি সুন্দর কেমন।

ওই তব সুমধুর সলাজ কথন—
ক'ব না ক'ব না করে, অস্পষ্ট প্রেমের স্বরে,
নিজ মনে নিজে যেন বলিতে যখন,
অধোমুখে প্রণয়ের সঞ্চার নূতন।"

নর্ম্ম্যান্ জাতি ও আঙ্গ্লো-নর্ম্ম্যান্ সাহিত্য।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

দ্বিতীয় ভাগ ১১ সংখ্যা ৫১২ পৃষ্ঠা ভারতীর পর।

আমরা "স্যাক্সন জাতি ও আঙ্গ্লোস্যাক্সন সাহিত্য" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, আঙ্গ্লোস্যাক্সন রাজত্বের পতনের কিছু পূর্ব্বে আঙ্গ্লোস্যাক্সন জাতি ক্রমশই অবনতির গহ্বরে নামিতে ছিল। মহাত্মা আল্‌ফ্রেড তাঁহার প্রজাদের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চা বিষয়ে যে উদ্যম উদ্রেক করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাহা ক্রমশঃ বিনস্ট হইয়া গেল। অকর্ম্মণ্যতা অজ্ঞতা ও আলস্যে সমস্ত জাতিই যেন জড়ীভূত ও অভিভূত হইয়া আসিতেছিল। টিউটনিক জাতির শিরায় শিরায় প্রধাবিত যে স্বাধীনতা-প্রিয়তার জ্বলন্ত-বহ্নি তাহাও যেন ক্রমশই নির্ব্বাপিত ও শীতল হইয়া আসিতেছিল। স্যাক্সনগণ যখন দিগ্বিদিক লুণ্ঠন করিবার মানসে দলবদ্ধ হইয়া সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করিত তখন তাহাদের দলপতি ছিল বটে কিন্তু রাজা ছিল না, তখন তাহারা সর্ব্বতোমুখী প্রভুতার অধীনে গ্রীবা নত করিতে পারিত না, কিন্তু যখন তাহারা ইংলণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করিল তখন দলপতি ও দলস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে ক্রমশঃ রাজা প্রজার সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, উভয়ের মধ্যে ঐক্যভাব ঘুচিয়া গেল, ও সাধারণ ব্যক্তিদের অপেক্ষা দলপতি ক্রমে উচ্চতর আসনে অধিষ্ঠিত হইল। দলপতির পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আরো কতকগুলি উচ্চ পদের সৃষ্টি হইল, এই রূপে অধিবাসিগণ উচ্চ ও নীচ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। যেখানেই উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর বিভাগ আছে, সেই খানেই যে উচ্চ শ্রেণী নীচ শ্রেণীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে তাহার আর কি কথা আছে? ডেনিষ দস্যুদের অত্যাচারে নিবাসীদের ধন প্রাণ এমন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল যে আল্‌ফ্রেডের সময় হইতে ইহা এক প্রকার স্থির হইয়া গিয়াছিল যে, সকলকেই এক জন Thign এর অর্থাৎ প্রভুর আশ্রয়ে থাকিতে হইবে; (Thign অর্থে ভৃত্য বুঝায় কিন্তু রাজার ভৃত্য হউক প্রজাদের প্রভু।) আশ্রয়দাতা ও আশ্রিতদের মধ্যে প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, এইরূপে সকল অধিবাসীর সমান অধিকার ক্রমশঃ বিনস্ট হইয়া গেল। বহিঃশত্রু ডেনিষ দস্যুদের দ্বারা স্যাক্সনেরা যথেস্ট নিপীড়িত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাই তাঁহাদের একমাত্র দুর্ভাগ্য নয়; তাহাদের আপনাদের মধ্যে ঐক্য ছিল না, ক্ষুদ্র ইংলণ্ড তখন খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল, প্রত্যেক প্রদেশস্বামী অপরাপর প্রদেশের উপর আধিপত্য স্থাপনের নিমিত্ত প্রাণপণ করিতেছিল। এইরূপ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন উপক্রত শ্রান্ত

দেশে সাহিত্যের যে যথেষ্ট অবনতি হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাহা সমগ্র জাতির হৃদয়ের কথা প্রকাশ না করে, সমগ্র জাতির হৃদয়ে যাহা প্রতিধ্বনিত না হয় তাহাকে আর জাতীয় সাহিত্য বলিব কি করিয়া? যে বিদ্যা কেবল ধর্ম্মাচার্য্যগণের অধিকারের মধ্যেই বদ্ধ ছিল ও যে সাহিত্য আশ্রম-গৃহের ধূলিময় গ্রন্থাধারের অন্ধকারের মধ্যেই আচ্ছন্ন ছিল, সে বিদ্যাকে সমগ্র জাতির উন্নতির চিহ্ন ও সে সাহিত্যকে সমস্ত জাতির হৃদয়ের কথা বলিতে পারি না। একেত বিদ্যাচর্চ্চা অতিশয় সঙ্কীর্ণ শ্রেণীতেই বদ্ধ ছিল, তাহাতে তাহার সীমা আরো ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণতর হইয়া আসিতে লাগিল, ধর্ম্মাচার্য্যদের মধ্যে ক্রমশঃ বিদ্যানুশীলন রহিত হইল। এই রূপে অজ্ঞতা অন্ধকারাচ্ছন্ন ইংলণ্ডে রক্তপাত ও অশান্তি রাজত্ব করিতে লাগিল।

এই রূপ অবস্থায় যখন নর্ম্ম্যানেরা ইংলণ্ডে আসিল তখন তাহারা সাহিত্যশূন্য নিষ্ফল স্যাক্সন ভাষা ও স্যাক্সন ভাষীদের প্রাণপণে ঘৃণা করিতে লাগিল। সুতরাং স্বভাবতই ফরাসী তখনকার সাধুভাষা, রাজভাষা ও লিখিবার ভাষা হইয়া দাঁড়াইল। পাছে অসভ্য স্যাক্সনদের সহিত মিশিয়া তাহাদের ভাষা ও আচার ব্যবহার কলুষিত হইয়া যায় এই জন্য নর্ম্ম্যাণেরা তাহাদের সন্তানদের ফ্রান্সে পাঠাইয়া দিত। পাঠশালে ও বিশ্ব বিদ্যালয়ে সকলকেই ফরাসী অথবা ল্যাটিন ভাষায় কথা কহিতে হইত। স্যাক্সন ইতর ভাষা হইয়া দাঁড়াইল। সে ভাষায় আর পুস্তক লিখা হয় না। তখন ত মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, সুতরাং অতি অল্প লোকেরই পুস্তক প্রাপ্তি ও পাঠের সুবিধা ছিল, সাধারণ লোকদিগের পাঠ করিবার অবসর, সুবিধা ও ক্ষমতা ছিল না; যাহাদের পুস্তক পাঠ করিবার ক্ষমতা ছিল তাহারা সঙ্গতিপন্ন উচ্চ শ্রেণীর লোক, তাহারা ফরাসী বা ল্যাটিন ছাড়িয়া গ্রাম্য স্যাক্সন পুস্তক পড়িতে স্বভাবতই সঙ্কোচ ও অরুচি অনুভব করিত। আমাদের দেশে যখন নূতন ইংরাজি শিক্ষা প্রচলিত হয়, তখন আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দুইছত্র ইংরাজি লিখিতে পারিলে যেমন বিদ্যা শিক্ষা সফল হইল মনে করিতেন, নর্ম্ম্যাণ অধিকারে স্যাক্সন যুবাদেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। শুদ্ধ তাহাই নহে, এরূপ অবস্থায় স্যাক্সন ভাষায় লিখিতে চেষ্টা করা হেয় কার্য্যের মধ্যে গণ্য হওয়াই স্বাভাবিক। স্যাক্সন ভাষায় পুস্তক লিখিতে গেলে পাছে কেহ মনে করে, তবে বুঝি লেখক ফরাসী জানে না, ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা কি আছে বল। কোন কোন কবি কয়েক ছত্র ফরাসি ও কয়েক ছত্র স্যাক্সন লিখিতেন, কেন না, এরূপ করিলে ফরাসী ভাষায় অজ্ঞতার অপবাদ লেখকের নামে পৌঁছাইতে পারে না," তাহা হইলেই তিনি এক প্রকার নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। নিম্নে একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি—

Len puet fere et defere,
Ceo fait-il trop sovent :

It nis nouther wel ne faire;
Therefore England is Shent.
Nostre prince de Englatere
Par le consail de sa gent
At Westministr after the feire
Made a gret parlement.

কেহ কেহ বা ল্যাটিন, ফরাসী ও চলিত ভাষা এই তিন মিশাইয়া কবিতা লিখিতেন—

When mon may mest do
Tunc ville suum manifestat
In donis also si vult tibi
Prœmia prœstat.
Ingrato benefac, post
Hœc a´peyne te verra;
Pur bon vin tibi lac non dat
Nec rem tibi rindra.

দুই তিনটি বিভিন্ন ভাষার এরূপ ঘোরতর মিশ্রণের ফল হয় এই যে, উহাদের কোনটা বিশুদ্ধ থাকিতে পারে না, সকল গুলাই বিকৃত হইয়া যায়। ফরাসীর মধ্যে স্যাক্সন ভাব ও কথা, স্যাক্সনের মধ্যে ফরাসী ভাব ও কথা প্রবেশ করিয়া ফরাসী ও স্যাক্সন উভয়ই ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে। ইংলণ্ডে তাহাই হইয়াছিল। নৰ্ম্মাণ আমীর-ওমরাওগণ স্যাক্সনমিশ্রিত ফরাসী কহিতে লাগিল ও সাধারণ অধিবাসীগণ ফরাসী মিশ্রিত স্যাক্সন কহিতে লাগিল। নৰ্ম্মাণেরা যে এত চেষ্টা করিয়াছিল, যাহাতে তাহাদের ভাষা বিশুদ্ধ থাকে, সে চেষ্টা সফল হইল না। যখন নৰ্ম্মান ও স্যাক্সনদের মধ্যে বিবাহের কোন বাধা ছিল না, তখন স্যাক্সন ও ফ্রেঞ্চ দুই ভাষার মিশ্রণ নিবারণের কোন উপায় ছিল না। এইরূপে যখন দুই ভাষা মিশিয়াছিল বা মিশিতে ছিল, তখনকার সাহিত্য Semi-Saxon অর্থাৎ অর্দ্ধ স্যাক্সন সাহিত্য নামে অভিহিত হইয়াছে।

সেমি-স্যাক্সন সাহিত্য আর কিছুই নহে, তাহা ইংরাজি সাহিত্যের বাল্যাবস্থা—সংগ্রহ, অনুকরণ ও অনুবাদের অবস্থা। ফরাসী সাহিত্যই তাহার আদর্শ। এ সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে Chivalryর বিষয় সংক্ষেপে অনুশীলন করা আবশ্যক।

"ইউরোপীয় ক্ষাত্র ধর্ম্ম" বলিলে Chivalry-র এক প্রকার বাঙ্গালা অনুবাদ করা হয়,কেবল আমাদের ক্ষাত্রধর্ম্মে মহিলা পূজা ছিল না, Chivalryতে তাহা ছিল। যদি "ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুদগ্রঃ, ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়ঃ।" হয়, তবে Chivalrous অর্থেও তাহাই বুঝায়। মধ্য-যুগে ইয়ুরোপে যখন বলের নামই ন্যায়, ধর্ম্ম, শক্তি ছিল, তখন সেই নির্দ্দয় বলের হস্ত হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করাই Chivalryর উদ্দেশ্য ছিল। যদিও ইহাই তাহার উদ্দেশ্য তথাপি ফলে Chivalry সেই উদ্দেশ্য হইতে অনেক দূরে পড়িয়া ছিল—প্রকৃত পক্ষে, যশের ইচ্ছা তৃপ্ত করিবার নিমিত্ত বিক্রম সাধন করিয়া বেড়ানই Chivalryর কার্য্য হইয়াছিল। আপনার বলের উপর বিশ্বাস থাকিলে সেই বল পরীক্ষা ও অনু-

শীলন করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী অন্বেষণের বাসনা হয়, এই নিমিত্ত মধ্যযুগের নাইটগণ (Knight) বিপদ অন্বেষণ ও দুঃসাহসিকতা অনুষ্ঠান করিয়া বেড়াইতেন। সমাজের আদিম অবস্থায় রক্ত-পিপাসা শান্তির নিমিত্তই লোকে রক্তপাত করিত, কিন্তু য়ুরোপের সমাজ যখন অধিকতর উন্নত হইল তখন যশ-ইচ্ছার নিমিত্ত রক্তপাত প্রচলিত হইল। সামাজিকতা বিষয়ে অনেক উন্নত না হইলে কখনো যশের ইচ্ছা জন্মিতে পারে না। সমাজে বিখ্যাত হইবার ইচ্ছাই সমাজের প্রতি অনেক পরিমাণে মমতা জন্মিবার চিহ্ন। Chivalryর আর এক ভাগ মহিলাপূজা। এই মহিলা-পূজা এমন অপরিমিত সীমায় পৌঁছিয়াছিল যে, তাহা সমূহ গর্হিত ও হাস্যজনক। ঈশ্বর ও মহিলাপূজা এক শ্রেণীর অন্তর্ভূত হইয়াছিল। বুর্ব্বোঁর ডিউক Louis II তাঁহার নাইটদিগকে বলিয়াছিলেন যে, "From them (ladies) after God comes all the honour that men can acquire." অ্যারাগণের অধিপতি James II নিয়ম করিয়াছিলেন যে, মহিলার সঙ্গে থাকিলে হত্যা ভিন্ন যে কোন দোষে কেহ দোষী হউক্ না কেন তাহাকে কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না। নর্ম্মাণেরা এই Chivalry ভাব ইংলণ্ডে আনয়ন করিল। Chivalrous কবিতা ও সঙ্গীতে Semi saxon সাহিত্য পূর্ণ করিল। ইহার পূর্ব্বে আংলো-স্যাক্সন সাহিত্যে রক্তপাত ও যুদ্ধের বর্ণনা অনেক ছিল, কিন্তু তাহার মধ্যে clivalry ভাব কিছু মাত্র ছিল না। এখন বীরত্বের গৌরব কীর্ত্তন, বিজয়-সঙ্গীত ও রমণীদের স্তুতিবাদে ইংরাজি সাহিত্যক্ষেত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কিন্তু সকলগুলিই প্রায় অনুবাদ, ও তাহাদের মধ্যে কবিত্ব-উচ্ছ্বাস কিছুমাত্র নাই। অতি পরিষ্কার ভাবে ছত্রের পর ছত্র আসিতেছে, গল্পের স্রোত অতি নির্ব্বিবাদে চলিয়া যাইতেছে, তাহার মধ্যে ভাব নাই, তুলনা নাই, কবিত্ব-পূর্ণ বিশেষণ নাই, কতকগুলি কথা ও ঘটনা জোড়া-তাড়া দিয়া এক একটা স্ফীতোদর পুস্তক রচিত হইয়াছে। লেখক অতিশয় বিরক্তিজনক অনর্গল বক্তার মত বকিয়া বকিয়া, গল্প টানিয়া বুনিয়া, কথা বিনাইয়া বিনাইয়া পাঠকের নিদ্রাকর্ষণ না করিয়া ক্ষান্ত নহেন। যত প্রকার অলীক অস্বাভাবিক, আশ্চর্য্যজনক কথা লেখকের কল্পনায় আসিতে পারে সকলি তিনি তাঁহার গল্পে গাঁথিয়া দিতে চাহেন। Romance of Alexanderনামক কাব্য গ্রন্থ হইতে দুই একটা নমুনা দিতেছি—

মকর নামেতে প্রাণী আশ্চর্য্য আকার
বলবান প্রাণী বটে, বড় জাঁক তার—
কুমীরের পরে যদি পড়ে তার চোখ,
তবে আর রক্ষে নেই, দেখে কেবা রোখ?
দুজনে লড়াই বাধে বড় ঘোরতর
প্রহারে দোঁহারে দোঁহে করে জর জর
মকর সেয়ানা বড় দোঁহার মাঝারে,
চুপি চুপি অমনি সে জলে ডুব মারে;
মুখে তার তীক্ষ্ণ অস্ত্র, কুমীরের পেটে
যেমন বিঁধিয়ে দেয়, মরে পেট কেটে॥

একটি ypotame-এর বর্ণনা শুনুন—

জলহস্তী বড়ই আশ্চর্য্য জানোয়ার,
হাতিও তেমন নহে কি কহিব আর !
ঘোড়ার মতন তার ঘাড়, পিঠ, জানি,
লেজ তার বাঁকা আর খাটো শুঁড় খানি !
পিচের মতন তার রঙ্গ বড় কালো
যত কিছু ফল খেতে বড় বাসে ভালো,
আপেল বাদাম আদি কিছু নাহি ছাড়ে,
কিন্তু সব চেয়ে তৃপ্তি মানুষের হাড়ে !

এইত কবিতার শ্রী। এরূপ বৈজ্ঞানিক শ্লোক সমূহ উদ্ধৃত করিতে আমরা ভয় করিতেছি, সুতরাং নিরস্ত হইতে হইল। কেবল তখনকার Romance নামক গ্রন্থ সকলের ভাব বুঝাইবার জন্য Geste of kyng Horn নামক গ্রন্থের মর্ম্ম পাঠকদের কহিতেছি। রাজা "মারে" যুদ্ধে বিধর্ম্মী স্যারাসীনদের দ্বারা হত হইলে পর তাঁহার পুত্র, গ্রন্থের নায়ক, হরন্ একটি ক্ষুদ্র নৌকায় কতকগুলি সঙ্গীর সহিত রাজা এমারের (Aylmer)দেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানকার রাজসভায় তিনি বিদ্যা শিক্ষা করেন। ক্রমে রাজা এমারের এক মাত্র কন্যা রিমেন্‌হিল্‌ড্ (Rimenhild) তাঁহার প্রেমে পড়িল। রাজকন্যা, হর্‌ণ্‌কে একটি মায়াময় অঙ্গুরী উপহার দেন। সেই অঙ্গুরী লইয়া তিনি স্যারাসীনদের সহিত যুদ্ধ করিতে বহির্গত হন, ও অঙ্গুরী প্রভাবে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পুনরায় এমারের সভায় ফিরিয়া আসেন। কিন্তু রাজা এমার হর্ণের সহিত তাঁহার কন্যার প্রেম বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া হর্‌ণ্‌কে নির্ব্বাসিত করিয়া দেন। হর্ণ্ তাঁহার প্রণয়িনীর সহিত বিদায় লইবার সময় বলিয়া গেলেন যে, রাজকন্যা যেন সাত বৎসর তাঁহার জন্য অপেক্ষা করেন—ইতিমধ্যে তিনি যদি না ফিরিয়া আসেন, তবে রাজকুমারী আর কাহাকেও বিবাহ করিতে পারেন। ইতি মধ্যে রাজা মোডি রিমেন্‌হিল্‌ড্‌কে বিবাহ করিবার পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। রাজ কুমার হর্‌ণ্ ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে অনেক বিপদ আপদ সহিয়া রাজা মোডির মুষ্টি হইতে রাজকন্যাকে মুক্ত করিয়া বিবাহ করিলেন। বিবাহের পর তিনি যুদ্ধ করিয়া তাঁহার মাতৃভূমি সুদীন Suddine শত্রু-হস্ত হইতে মুক্ত করেন। যখন তিনি যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তাঁহার কপট বন্ধু ফাইক্‌নিল্‌ড্ (Fykenild) সুযোগ পাইয়া রিমেন্‌হিল্‌ড্‌কে বল পূর্ব্বক বিবাহ করিতে চেষ্টা করিতেছিল। যুদ্ধাবসানে হর্‌ণ্ ফাইক্‌নিলডের দুর্গে বীণাবাদকের বেশে প্রবেশ করিয়া তাহাকে নিহত করিলেন ও তাঁহার প্রণয়িনীর সহিত মিলিত হইলেন। গল্প কিছু মন্দ নহে, কিন্তু লেখক এমন খুঁটিনাটি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন ও এমন শাদাশিদা ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইহাকে কবিতা বলিতে পারি না।

সেমি-স্যাক্‌সন ভাষায় অনেক প্রেমের কবিতা আছে, কিন্তু এমন ভাববিহীন অসার কবিতা অনুবাদ করিতে গেলে তাহার আর রস কস কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, এরূপ কবিতা অনুবাদ করিলে পাঠকদের কিছু লাভ নাই, কেবল অনুবাদকের যন্ত্রণা-

ভোগ। একটি অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি—

কথা মোর রাখ দেখি, একবার দেও সখি
প্রেমের আশ্বাস।
চাহি না কো আর কারে, যতদিন এসংসারে
করিতেছি বাস।
নিশ্চয় জানিও প্রিয়ে, এখনি জুড়াবে হিয়ে
তুমি মোরে ভাল বাস' যদি,
ওই অধরের শুধু—একটি চুম্বন মধু
হবে মোর দুখের ঔষধি।

দুই একটা স্বভাব-বর্ণনা অনুবাদ-সমেত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

Mury hit is in sonne risyng.
The rose openith and unspring ;
Weyes fairith, the clay's clyng ;
The maidenes flowrith, the foulis syng,
Damosele makith mournyng
Whan hire leof makith pertyng.

অনুবাদ

অতিশয় সুখকর সূর্য্য যবে ওঠে
গোলাপ ফুলের কুঁড়ি বাগানেতে ফোটে ;
রাস্তা হয় পরিষ্কার কাদা যায় এঁটে ;
পাখী গান গায়, ফুল ফোটে মাঠে মাঠে ;
প্রণয়ীদিগের সাথে হইয়া বিচ্ছেদ
বিরহিণী রমণীরা করে কত খেদ।

আর একটি—

Averil is meory, and lengith the day,
Ladies loven solas, and play ;
Swaynes, justes ; knyghtis, turnay ;
Syngith the nyghtyngale, gredeth thes fay ;
The hote sunne clyngeth the clay,
As ye will y-sun may.

অনুবাদ

এপ্রেল সুখের মাস, বেড়ে যায় বেলা ;
মহিলারা ভালবাসে আদর ও খেলা ;
চাষারা খেলায় জুষ্ট, টুর্ণি নাইটেরা ;
বুল্ বুল্ গান করে, চেঁচায় কাকেরা ;
কাদা সব এঁটে যায় খর রৌদ্র বলে
দেখিতেই পাও তাহা, জানত সকলে।

Chivalryর সঙ্গে সঙ্গে নর্ম্ম্যানেরা রাজসভার আড়ম্বর ও চাকচিক্য, য়ুরোপ হইতে আনয়ন করিয়াছিল। কপট যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ উৎসব আমোদ নর্ম্ম্যান ব্যারণদিগের দুর্গে দুর্গে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। প্রথম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে স্কট্‌লণ্ড্ অধিপতি শত সংখ্যক অশ্বারোহী নাইট সঙ্গে করিয়া লণ্ডনে আসিয়াছিলেন, তাহারা প্রত্যেকে অশ্ব হইতে নামিয়া বহু মূল্য আভরণ সমেত অশ্বগুলি অর্থীদিগকে দান করিয়া গেল। আর্চ্‌বিষপ্ এ বেকেট যখন ফ্রান্সে যান, তাঁহার সঙ্গে বিচিত্র বসন ভূষিত এক দল ভৃত্য, দুই শত নাইট্, বহু সংখ্যক ব্যারণ ও আমীর-ওমরাও, ছিল, আড়াইশত বালক তাঁহার সম্মুখে জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে চলিতেছিল, তদ্ভিন্ন গাড়ি ঘোড়া, প্রত্যেক ঘোড়ার পৃষ্ঠে এক একটি বানর ও মানুষ, অনুচর, সহচর, পুরোহিত, বন্ধু বান্ধবের আর অন্ত নাই। এইরূপ সকল বিষয়েই ধূমধাম। হাজারীর অধিপতি তাঁহার বিরহ

বিধুরা দুহিতাকে এইরূপে সান্ত্বনা করিতেছেন—

গাড়ি কোরে নিয়ে যাব শিকারে তোমায়,
সে গাড়িটি মুড়ে দেব লাল মকমলে ;
পদ্ম আঁকা সাটিন ও জরির চাঁদোয়া
ঝল মল করিবেক মাথার উপরে ;
পরিবি সোনার হার, সুনীল বসন ;
সাথে সাথে যাবে তোর স্পেনের ঘোটক,
মকমল দিয়ে তার পিঠ দিব ঢেকে ;
গান বাদ্য হবে কত বিবিধ আমোদ।
নানা মদ্য আনাইব নানা দেশ হোতে। *
পোড়া হরিণের মাস করিবি আহার,
যত ভাল মুর্গী পাই এনে দেব তোরে।
পাইবি কুকুর কত হরিণ হরিণী,
খেলা করিবিরে বাছা তাহাদের সাথে।
হরিণেরা এমনি মানিবে তোর পোষ,
ডাকিলেই আসিবেক মুঠির কাছেতে।
শিকারের শিঙ্গাধ্বনি করিলে শ্রবণ
মন হোতে রোগ তোর যাবে দূর হোয়ে।
অবশেষে বাড়ি ফিরে আসিবি যখন
নাচ গান কত হবে নাই তার ঠিক,
ছোট ছোট ছেলে মিলে কোকিলের স্বরে
গান শুনাইবে তোরে সে বড় মধুর।
অবশেষে আসিবেক সন্ধ্যার ভোজন ;
যাইবি হরিত কুঞ্জে তাঁবুটীর নীচে,
চুনি হীরে কাজ করা বিচিত্র-বসন
মাটির উপরে পাতা, বসিবি সেথায় ;
একশো নাইট মিলি বাজাবে বাজন।
সরোবরে দেখিবি মাছেরা খেলিতেছে,
মন তোর তুষ্ট হবে দেখিলে সে খেলা।
রোয়েছে একটি সাঁকো সরসীর পরে,
আধেক পাথর তার আধেক কাঠের।
নৌকা এক আসিবেক চব্বিশটি দাঁড়
বাজিবে বাজনা কত ভিতরে তাহার,
চড়ি সে নৌকার পরে যাবি হেথা হোথা,
জ্বলিবে সাঁকোর পরে চল্লিশটি বাতি,
গৃহে তোর ফিরে যাবি চড়ি সে নৌকায়।
বিছানাটি হবে তোর হীরা মনি গাঁথা,
সে কোমল বিছানায় শুইবি যখন
সোনার প্রদীপাধারে জ্বলিবেক আলো।
তবু যদি ঘুম তোর নাহি হয় বাছা
গায়কেরা গাবে গান সারারাত জেগে।

অসভ্য, মদ্যপানরত, কোলাহলপর, অপরিষ্কার, শিল্পজ্ঞানশূন্য স্যাক্সনদের সাহিত্যে এরূপ কবিতা নাই ও থাকিতে পারে না। স্যাক্সনদের আমোদের সহিত নর্ম্মানদের আমোদের অনেক প্রভেদ। নর্ম্মানদের আমোদের মধ্যে বিলাসের ভাব

* এখানে এত প্রকার মদ্যের নাম লিখিত আছে যে, তাহা বাঙ্গালা পয়ারের মধ্যে দিলে ভাল শুনায় না—নিম্নে মূল উদ্ধৃত করিলাম ---ইহার বানান আধুনিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

Ye shall have Rumney and malespine
Both hippocras and varnage wine:
Montrese and wine of Greek,
Both Algrade and dispice eke,
Antioch and Bastarde,
Pyment also and garnarde,
Wine of greek and Muscadel,
Both clare, pyment and Rochelle,
The reed your stomach to defy
And pots of osey sit you by.

অধিকতর পরিস্ফুট। ব্রিটন অধিপতি ভর্টিজরণ্ যখন স্যাক্‌সন দলপতি হেঙ্গিষ্টের শিবিরে নিমন্ত্রিত হইয়া হেঙ্গিষ্টের পরম রূপবতী কন্যা রোয়নকে দেখিলেন, একজন নর্ম্ম্যান কবি তখনকার বর্ণনা করিতেছে—

হেঙ্গিষ্ট করিল চেস্টা প্রাণপণ করি
রাজা ও নাইটগণ সুখী হয় যাতে।
আমোদে উন্মত্ত যবে হইল সকলে,
গৃহমধ্যে প্রবেশিলা রোয়েন সুন্দরী;
করে মদিরার পাত্র, সুচারুবসনা;
জানুপাতি বসিল সে রাজার সমুখে,
মদিরা করিল পান, চুম্বিলা রাজারে;
কেমন সুন্দর বপু, গৌর কান্তি তার,
কেমন সুন্দর ভূষা, নয়নরঞ্জন!
দেখিয়া উন্মত্ত হৈল নৃপতির মন,
মদ্যপানে ভ্রংশ-বুদ্ধি, মাগিলা ভূপতি,
বিধর্ম্মী সে রমণীরে বিবাহের তরে।

স্যাক্‌সনদের কঠোর লেখনী হইতে এরূপ মৃদু বিলাসময়ী কবিতা বাহির হইতে পারিত না।

কুমারী মেরীই মধ্যযুগের দেবতা ছিলেন। মহিলাপূজার উৎকর্ষ তাঁহাতে গিয়াই পৌঁছিয়াছিল। প্রথমতঃ তিনি খৃষ্টের জননী ছিলেন, দ্বিতীয়তঃ সাধারণ মহিলাদের তিনিই পূর্ণ প্রতিমা স্বরূপ ছিলেন। তখনকার লোকের রমণী-ভক্তি হইতেই তাঁহার স্তব উত্থিত হইত। একটি মেরীর স্তব উদ্ধৃত করিতেছি—

দেবী; তব হোক্ জয়, স্বর্গীয় আনন্দময়,
স্বর্গের মধুর পুষ্প তুমি!
মৃদুতার তুমি জন্ম-ভূমি!
দেবী, তব হোক জয়, উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যময়!
সব মম আশা তোমা পরি,
কিবা দিবা কিবা বিভাবরী!
নক্ষত্রের রশ্মি তুমি উজ্জ্বল বরণ,
দেখাওগো পথ মোরে দাওগো কিরণ,
দেবি, এই বসুন্ধরা মিথ্যা কপটতা ভরা
তুমিই আমারে হেথা করগো চালন!

রমনী-ভক্তির চর্চ্চা করিয়া করিয়া সে ভাব লোকের মনে সত্য সত্যই এমন বদ্ধ-মূল হইয়া গিয়াছিল, যে এরূপ স্তব হৃদয় হইতে না বাহির হইয়া থাকিতে পারে না।

সেমি-স্যাক্‌সন সাহিত্যের উপদেশ অংশ হইতে উদাহরণ স্বরূপ দুই একটা উদ্ধৃত করিতেছি। মৃত দেহের প্রতি দেহ-মুক্ত আত্মার উক্তি—

একদা শীতের রাত্রে আছিনু নিদ্রিত;
দেখিনু আশ্চর্য্য দৃশ্য; ভূমির উপরে
গর্ব্বিত ধনীর এক দেহ আছে পড়ি।
দেহ ছাড়ি আত্মা তার আসিল বাহিরে
ফিরিয়া দেখিল চাহি মৃত দেহ পানে।
কহিল সে, "ধিক্ রক্ত মাংস কলুষিত!
হতভাগ্য দেহ, কেন এমন অসাড়,
আগে যে বড়ই ছিলি উন্মত্ত, অধীর!
অশ্বে চড়ি হেথা হোথা বেড়াতিস ছুটি;
ছিলি সুগঠন, যশ ছিল দেশব্যাপী!
কোথা গেল গর্ব্ব তোর স্বর্গ ভেদী স্বর?
কেন পড়ি ভূমিতলে, বস্ত্র আচ্ছাদিত?
কোথা তোর দুর্গ, তোর গৃহ সুসজ্জিত?"
ইত্যাদি—

ইত্যাদি—পুরাণো কথা লইয়া অনেক

বকাবকি করা হইয়াছে। আনক্রেণ রিউল নামক গদ্যগ্রন্থ হইতে কতকটা উপদেশ-দায়ক বিভীষিকা অনুবাদ করিয়া দিতেছি। ইহাতে পাঠকেরা সেমি-স্যাক্সন গদ্য রচনা ও তখনকার লোকের অজ্ঞান কুসংস্কারের ভাব কতকটা বুঝিতে পারিবেন।

অলস ব্যক্তিরা ডেভিলের (devil) বুকে তাহার প্রিয় শিশুটির ন্যায় ঘুমাইতে থাকে, এবং ডেভিল তাহার কানে মুখ দিয়া কথা কয় ও তাহার মনের বাসনা ব ক্ত করে। যাহারা কোন সৎকর্ম্মে ব্যাপৃত না থাকে তাহাদের এইরূপ ঘটিয়া থাকে, ডেভিল ক্রমাগত কথা কহিতে থাকে, এবং অলস ব্যক্তি অতিশয় ভাল বাসার সহিত তাহার নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে। অলস ও নিশ্চিন্ত ব্যক্তিরা ডেভিলের বক্ষশায়ী bosom sleeper। ডুম্‌স্‌ডে দিবসে দেবদূতের ভেরীধ্বনিতে তাহারা সহসা চমকিত ও নরকের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিবে।

লোভী ব্যক্তি ডেভিলের ছাইকুড়ুনে Ash-gatherer,। সে ছাইয়ের উপর ক্রমাগত শুইয়া থাকে, ছাই রাশীকৃত করিতে মহা ব্যস্ত থাকে, ছাই রাশ করিয়া তাহাতে ফুঁ দিতে থাকে, ও ছাই উড়িয়া তাহাকে অন্ধ করিয়া তুলে, ছাইয়েতে খোঁচা মারে, ও তাহার উপরে জমা খরচের আঁক পাড়িতে থাকে। এই মূর্খের ইহাতেই আমোদ, ডেভিল তাহার এই সমস্ত খেলা দেখিতে থাকে এবং হাসিতে হাসিতে তাহার পেট ফাটিয়া যায়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সহজেই বুঝিতে পারেন যে, সোনা রূপা ও অন্যান্য পার্থিব ধনসম্পত্তি ছাই আর ধূলার রাশি মাত্র, যে ব্যক্তি তাহাতে ফুঁ দিতে যায় সেই অন্ধ হইয়া যায়, এই ছাই ভস্মের জন্য তাহাদের মনে শান্তি থাকে না, ইহাদেরি জন্য তাহারা গর্ব্বিত হইয়া পড়ে, যাহা কিছু সে রাশীকৃত ও সংগ্রহ করিতে থাকে এবং প্রয়োজনাতীত যাহা কিছু সঞ্চিত করিয়া রাখে তাহা ছাই ভিন্ন আর কিছুই নয়,নরকে গিয়া সে সমুদয় তাহার কাছে সাপ ও ব্যাং হইয়া দাঁড়ায়। ঈশায়া বলেন যে ব্যক্তি প্রার্থীদিগকে খাদ্য বস্ত্র না দেয় তাহার কাপড় চোপড় পোকার দ্বারা নির্ম্মিত হইবে।

লোভী পেটুক ডেভিলের খাদ্য যোগাইয়া থাকে এই জন্য তিনি সর্ব্বদাই রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘরে ঘুর্ ঘুর্ করিয়া বেড়ান। তাঁহার মন খাবার থালায়, তাঁহার সমুদয় চিন্তা টেবিলের চাদরে, তাঁহার প্রাণ হাঁড়িতে, তাঁহার আত্মা ঘড়ায় পড়িয়া থাকে। এক হাতে থালা, এক হাতে বাটি লইয়া কাদা-মাখা কালি-মাখা অবস্থায় সে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হয়। সে কতকি এলোমেলো বকিতে থাকে, মাতালের মত টলমল করিতে থাকে, আপনার ভুঁড়ির দিকে চাহিয়া থাকে, ও এই সকল দেখিয়া ডেভিলের এমন হাসি পায় যে তাহার পেট ফাটিয়া যায়। ঈশ্বর ঈশায়ার মুখ দিয়া এরূপ লোকদের এই বলিয়া ভয় দেখাইয়াছেন যে, "আমার ভৃত্যেরা আহার করিতে পাইবে, কিন্তু তোমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি

হইবে না।” তোমরা ডেভিলের খাদ্য স্বরূপ হইবে। “যে ব্যক্তি যত বিলাসে জীবন যাপন করিয়াছে তাহাকে তত যন্ত্রণা দেও।” “গলান তাঁবা তাহার গলায় ঢালিয়া দেও।” ইত্যাদি

নর্ম্ম্যাণ ও স্যাক্সন জাতিদ্বয়ের ভাব ও অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তখনকার সাহিত্য কেমন পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। যখন নর্ম্ম্যাণগণ প্রথম ইংলণ্ড অধিকার করিল, যখন স্যাক্সন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ অধঃকৃত হইল ও নবাগত বিজয়ীগণ তাহাদের ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করিল, যখন স্যাক্সন ধর্ম্মাচার্য্যগণ ধর্ম্ম-মন্দির হইতে বহিষ্কৃত হইল ও নর্ম্ম্যাণ পুরোহিতগণ বেদী অধিকার করিল, তখন স্যাক্সন সাহিত্যও ম্রিয়মাণ হইয়া ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া গেল ও ফরাসী সাহিত্য তাহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইল। যে দুই একজন লেখক প্রাচীন ভাষা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, নিম্ন শ্রেণী লোকদের পাঠের নিমিত্ত কাব্য রচনা করিয়াই তাহাদের আশা তৃপ্ত থাকিত, তাহাদেরো আদর্শ ফরাসী; ফরাসী পুস্তক হইতে অনুবাদ করাই তাহাদের একমাত্র গতি। কবি লেয়ামন Layamon একটি ল্যাটিন কাব্যের ফরাসী অনুবাদ হইতে এক কাব্য সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহার ভাষা বিকৃত ও তাহার ছন্দ রচনায় কোথাও প্রাচীন প্রথানুযায়ী যমক-পদ্ধতি, কোথাও বা ফরাসী-আদর্শ-অনুযায়ী মিলের নিয়ম। লেয়ামনের ভাষা বিকৃত স্যাক্সন বটে কিন্তু তাহাতে ফরাসী প্রবেশ করে নাই, অনভ্যাস ও অপ্রচলিত থাকা প্রযুক্ত তখন স্যাক্সন অনেক পরিমাণে বিকৃত হইয়াছিল কিন্তু তখনো ফরাসী এমন চলিত হইয়া যায় নাই যে স্যাক্সনের মধ্যে স্থান পাইতে পারে। নর্ম্ম্যাণদের যখন নূতন প্রভুত্ব, তখন স্যাক্সন সাহিত্যের এই দশা। যখন নর্ম্ম্যাণেরা কিছু দিন ইংলণ্ডে বাস করিল, যখন নর্ম্ম্যাণ ও স্যাক্সনদের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত হইল, যখন স্যাক্সন ভাষার সংস্পর্শে নর্ম্মাণ ফরাসী বিকৃত হইয়া গেল, ও সাধারণ অনক্ষর নর্ম্ম্যাণগণ বিশুদ্ধ ফরাসী অনেক পরিমাণে ভুলিয়া গেল, শুদ্ধ তাহাই নহে, হয়ত স্যাক্সনদের সহবাসে স্যাক্সনই তাহাদের ভাষা হইল, তখন স্যাক্সন ও ফরাসী মিশিয়া একটা ভাষা জন্মিতে লাগিল, কিন্তু সেই ভাষায় যে কিছু পুস্তক রচিত হইত, তাহার ভাব ফরাসী, তাহার রচনা-প্রণালী ফরাসী, শুদ্ধ তাহাই নহে, তাহা ফরাসী পুস্তকের অনুবাদ ও অনুকরণ! অবশেষে যখন স্যাক্সন ও নর্ম্ম্যান জাতিদ্বয় সম্পূর্ণ রূপে বা অনেক পরিমাণে মিশিয়াগেল, যখন জেতা ও জিত জাতির মধ্যে বিভিন্নতা রহিল না, তখন দেশে নূতন জাতীয় ভাবের সঞ্চার হইল। তখন সকলের ভাষাই অনেক পরিমাণে সমান হইল, তখনকার সাহিত্য সাধারণের সম্পত্তি হইল; তখন শ্রেণীবিশেষের জন্যই গ্রন্থ রচিত হইত না। তখন জাতির চক্ষুর সম্মুখ হইতে ফরাসী আদর্শ অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইল, লেখকেরা নিজের বুদ্ধি হইতে ও

নিজের হৃদয় হইতে অনেক পরিমাণে লিখিতে লাগিল। এমন কি একদল লেখক প্রাচীন আঙ্গ্লো স্যাক্সন আদর্শে লিখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কবি ল্যাংল্যাণ্ড Langland পিয়ার্সপ্লৌম্যান Piers Ploughman নামে এক কাব্য লিখিলেন, তাহাতে ছন্দ নাই, মিল নাই, কবি প্রাচীন স্যাক্সন-প্রণালী অনুযায়ী যমক-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। নূতন জাতীয় ভাবের সঞ্চার হইলে লোকের পুরাতন সাহিত্যের প্রতি টান পড়ে। পিয়ার্স্ প্লৌম্যান লেখক প্রাচীন আঙ্গ্লো স্যাক্সন রচনা-প্রণালীর অনুকরণ করিতে লাগিলেন ও একদল লেখক উত্থিত হইল, তাহারা পিয়ার্স প্লৌম্যান লেখকের অনুকরণ করিতে লাগিল। কিন্তু ফরাসী অনুকরণে কাব্যরচনার মিল ও ছন্দের নিয়ম তখনকার সাহিত্যে এমন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, তাহার মধ্য হইতে বিজাতীয়ত্ব দূর হইয়া গিয়া তাহাই স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এমন অবস্থায় কিছু হঠিয়া অসভ্য আঙ্গ্লো-স্যাক্সন রীতির অনুসরণ করিতে যাওয়া অনর্থক। ল্যাংল্যাণ্ডের অনুবর্ত্তী একদল উত্থিত হইল, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হইল না, প্রচলিত রীতি যদিও বিদেশীয় আদর্শ হইতে গৃহীত হইয়াছিল তথাপি তাহারি জয় হইল। ল্যাংল্যাণ্ডের কাব্য হইতে উদাহরণ স্বরূপ দুই এক শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

Hire robe was ful riche,
Of rud searlit engreyned,
With ribanes of rud gold
And of riche stones

ইহাতে ছন্দ নাই, মিল নাই, কেবল robi, riche, rud, ribans প্রভৃতি কথায় R অক্ষরের যমক আছে মাত্র।

ইয়ুরোপ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে ইংলণ্ড দ্বীপের একটা বিশেষ উপকার হইয়াছিল। যখন রোমে পোপের আসন অধিকারের জন্য বিবাদ বিদ্বেষ চলিতেছিল, যখন পোপেরা অধর্ম্মাচরণে রত ছিল, তখন ইংলণ্ড অমিশ্রভাবে থাকিয়া দূর হইতে অপক্ষপাতের সহিত বিচার করিতে পারিত, পোপের নর-দেবত্ব ভাব তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায় নাই। রোমীয় চর্চ্চের চরণে তাহাদের রাশি রাশি মুদ্রা ঢালিতে হইত, তাহাতে তাহারা মনে মনে অসন্তুষ্ট ছিল। ধর্ম্মাচার্য্যগণের অনেক পরিমাণে স্বাধীনতা থাকায় তাহারা অধর্ম্মাচরণে দারুণ রত ছিল, এই সকল কারণে তখনকার চর্চ্চের প্রতি ইংরাজদের অভক্তি জন্মিয়াছিল, এবং সাধারণ লোকের মুখপাত্র হইয়া ল্যাংল্যাণ্ড তাঁহার পিয়ার্স প্লৌম্যান কাব্যে তখনকার চর্চ্চ, ধর্ম্মাচার্য্য ও তখনকার নানা প্রকার কুনীতির প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা উইক্লিফ্ ইহার পরে যে ধর্ম্ম-সংস্কার করেন, রোমীয় চর্চ্চের শৃঙ্খল হইতে ইংলণ্ডকে মুক্ত করেন, এই প্রকার কবিতা তাহার পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিল। এই প্রকার কবিতা যখন লিখিত হইয়াছিল তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তখনকার

লোকের মনের ভাব এইরূপ ছিল, ল্যাং-ল্যাণ্ড তাহাই কেবল লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। এই কারণেই এই কাব্য তখন এমন সমাদৃত হইয়াছিল।

পিয়ার্স প্লোম্যান্ কাব্যই সেমি-স্যাক্সন সাহিত্যের শেষ সীমাচিহ্ন স্বরূপ করা গেল। তাহার পরেই গাউয়ার Gower ও চসারের Chaucer কাল। তখন হইতে প্রকৃত পক্ষে ইংরাজি সাহিত্য আরম্ভ হইল। এতকাল ইংরাজি ভাষা নির্ম্মিত হইতেছিল এতক্ষণে তাহা এক প্রকার সমাপ্ত হইল।

সাহিত্যপ্রিয় ব্যক্তিরা সেমি-স্যাক্সন সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া বড় আমোদ পাইবেন না। অনুবাদ অনুকরণ ভাবহীন কথার স্রোতেই এই সাহিত্যক্ষেত্র পূর্ণ। তবে ভাষা-তত্ত্ব-প্রিয় ব্যক্তি ইহা চর্চ্চা করিলে তাঁহাদের পরিশ্রমের অনেক পুরস্কার পাইবেন। সেমি-স্যাক্সন সাহিত্য প্রকৃত পক্ষে একটা বিশেষ সাহিত্য নহে, তাহা ইংরাজি সাহিত্যের সূত্রপাত মাত্র। তখন ব্যাকরণ বানান ও ভাষার কিছুই স্থিরতা ছিল না, একটি পুস্তকেই এক কথার নানা প্রকার বানান আছে, তাহাতে অর্থ বুঝিবার বড় গোল পড়ে। একটা স্থির আদর্শ না থাকাতে সকলেই নিজের ব্যাকরণে, নিজের বানানে, নিজের ভাষায় পুস্তক লিখিত। নর্ম্ম্যাণ ও স্যাক্সন জাতিদ্বয়ের অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তখনকার ভাষা ও সাহিত্য কেমন পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। অবশেষে কত প্রকার ঘাত সংঘাতে ইংরাজি সাহিত্য ও ভাষা নির্ম্মিত হইল। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে নর্ম্মাণেরা ইংলণ্ডে প্রবেশ করে, তখন হইতে যদি ইংরাজি সাহিত্যের নির্ম্মাণ-কালের আরম্ভ ধরা যায়, ও ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে চসার জন্মগ্রহণ করেন, তখন যদি তাহার শেষ ধরা যায় তবে ইংরাজি সাহিত্য ও ভাষা নির্ম্মিত হইতে প্রায় তিন শত বৎসর লাগিয়াছে বলিতে হইবে।

ছিন্নমুকুল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ—দোষী নির্দ্দোষ।

সেই মূর্চ্ছার পর হইতে সুশীলার জ্বর আরম্ভ হইল। বাল্যকাল হইতে শোক পাইয়া পাইয়া সুশীলার শরীরে আর কিছুই ছিল না, তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তিনি এক প্রকার চিররুগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি মরিলে প্রমোদ ও কনককে দেখিবার কেহই নাই ভাবিয়া তিনি এতদিন অতি যত্নে কেবল জীবন রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন মাত্র। কিন্তু সেই শরীরের উপর আর তাঁহার আধিপত্য চলিল না, এবার তাঁহার পীড়া সাংঘাতিক হইল।

কনকের সর্ব্বনাশ হইল, তাহার আহার নিদ্রা প্রায় রহিত হইল। সারাদিন কনক তাঁহার সেবা করে, পীড়ার কষ্টের উপর মনের কষ্ট ব্যতীত কনকের যত্নে তাঁহার আর কিছুই কষ্ট নাই। তাহার যত্ন দেখিয়া সুশীলা আশ্চর্য্য হইয়া ভাবেন "কনক চোর—কনক মিথ্যাবাদী, ঈশ্বরে কনকের মন নাই, তবে কনক দেবীর ন্যায় যত্ন শিখিল কোথায়? এরূপ ভালবাসা, এরূপ যত্ন করা তো অমানুষিক গুণ—" এই সকল ভাবিতে ভাবিতে যখন কনকের সেই বিষাদময় নির্দ্দোষ দেবী-প্রতিমার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িত, তিনি মুগ্ধ হইয়া তাহার পানেই চাহিয়া থাকিতেন, তাহার সেই আলুলায়িত কুন্তলজালে বেষ্টিত সরলতাময় বিষণ্ণ মুখকান্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া থাকিতেন। মনে মনে অমনি ভাবিতেন "কি ভয়ানক! এই দেবীমূর্ত্তির প্রশান্ত অমায়িকতা দেখিলে ইহার ভিতরে যে দোষ থাকিতে পারে তাহা কে বিশ্বাস করিবে? ইহাতে যদি দোষ থাকে তবে বুঝি পৃথিবীতে কিছুই নির্দ্দোষ নাই, তবে বুঝি পৃথিবীতে কাহাকেও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।' এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে সুশীলার চক্ষু হইতে কষ্ট-নিঃসৃত অশ্রু পড়িয়া বালিস ভিজিয়া যাইত। বালিকা কনক যথার্থ কারণ বুঝিতে না পারিয়া পীড়ার কষ্টে অশ্রুজল পড়িতেছে ভাবিয়া ব্যাকুল-চিত্তে কিসে সুশীলার কষ্ট নিবারণ করিবে খুঁজিয়া পাইত না।

এইরূপে দিন যাইতে লাগিল। প্রমোদকে কনক পীড়ার কথা টেলিগ্রামে-সংবাদ দিল। যামিনীনাথের সহিত একত্রে প্রমোদ বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাড়ী আসিয়াই প্রমোদ সুশীলার নিকট যাইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া সুশীলা আহ্লাদিত হইয়া একথা সেকথা কহিয়া কিছুপরে বলিলেন "তুমি আসিয়াছ ভালই হইয়াছে, মরিবার আগে তোমাকে কতকগুলি কথা বলিব।' কনক ঐ সময় সে গৃহে ছিল না, কোন কার্য্য বশতঃ সে কিছু পূর্ব্বেই অন্য গৃহে গিয়াছিল। সুশীলার কথায় প্রমোদ সজল নেত্রে বলিলেন "ওকি কথা—আপনি মরিবেন কেন?'

সু। "না, আমি এবার বাঁচিব না, আমার দিন ফুরাইয়াছে। আমাকে সকলে ডাকিতেছেন, সে দিন রাত্রে দিদিকে যেন দেখিলাম মনে হইল, তার পর—তার পর স্পষ্টরূপে—যেন"—বলিতে বলিতে তাঁহার কথা বাধিয়া গেল, সেই রাত্রের ঘটনা মনে করিয়া সুশীলা শিহরিয়া উঠিলেন, সেই যেন অন্ধকারময় ঘোর মেঘ-বৃষ্টির মধ্যে সহসা বিদ্যুতালোক হইল, তিনি আবার যেন তাহার মধ্যে সেই সে দিনকার মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। ভয়ে শিহরিয়া সুশীলা বলিয়া উঠিলেন, "ঐ দেখ আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি" বলিতে বলিতে ক্রমে তাঁহার ভয় দূর হইতে লাগিল—আনন্দচিহ্ন তাঁহার মুখে বিভাসিত হইল, তিনি আপন মনে অপরিস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন "এতদিন পরে আমাকে কি মনে পড়িল? আজ—আজ তুমি আমায় দেখা দিলে? আজ—অন্তিম

কালে—" সুশীলার কথায় প্রমোদ ভীত হইয়া বলিলেন "মা কি বলিতেছেন?" অমনি সুশীলার চমক ভাঙ্গল—কোথায় সে মূর্ত্তি—বিকারের অসম্বদ্ধ প্রলাপে শূন্যে চাহিয়া তিনি বকিতে ছিলেন। সুশীলা বলিলেন "একি-কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম—যাহা কখন আর এ অদৃষ্টে ঘটিবে না সে আশা কেমন করে হইতে ছিল জানি না। তা যাই হোক প্রমোদ একটি কথা তোকে বলিবার জন্য ছট্ ফট্ করিতেছি।"

প্র। "কি বলুন।"

সু। "আমি তো মরিতে বসিয়াছি, কনককে দেখিস্, উহার স্বভাব আজ কাল তেমন নাই, উহার স্বভাবটা তুই শোধরাইয়া দিস্—সে আমার মনে বড় আঘাত দিয়াছে" বলিয়া কনক কি কি গুরুতর দোষ করিয়াছে তাহা সবিশেষ প্রকাশ পূর্ব্বক সুশীলা দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে মনের কষ্টে বলিয়া উঠিলেন, "কনকের মন্দ স্বভাব প্রকাশ পাইবার আগে সে মরিল না কেন? প্রমোদ, কনকের স্বভাব ভাল করিতে চেষ্টার যেন ক্রটি না হয়।"

সমস্ত শুনিয়া প্রমোদের হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল, অনুতাপ ও কৃতজ্ঞতায় যুগপৎ তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। প্রমোদ দেখিলেন কনক তাঁহার জন্য বিস্তর সহ্য করিয়াছে, কনক তাঁহার জন্য অনেক কষ্ট অবিচলিতভাবে সহ্য করিয়াছে, প্রমোদ তখন সজল নেত্রে মুক্তকণ্ঠে আপনার দোষ সুশীলার নিকট ব্যক্ত করিলেন। প্রমোদই সুশীলার বক্সের বই গুলি ছড়াইয়াছিলেন, প্রমোদের জন্যই কনকের টাকার আবশ্যক হইয়াছিল, প্রমোদই সে কথা বিশেষরূপে গোপন রাখিতে বলায় বালিকা সে কথা কাহাকেও বলে নাই—প্রমোদ আপনার এই সমস্ত দোষ খুলিয়া বলিলেন।

তখন কনক নির্দ্দোষ জানিয়া সুশীলার আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না, তাঁহার বক্ষ হইতে যেন একটি গুরুভার নামিয়া গেল। মৃত্যুকালে কনককে নির্দ্দোষ জানিয়া মরিতে পারিবেন—ইহাতে তাঁহার হৃদয়ের দুঃখ সম্পূর্ণ দূর হইয়া গেল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—

দেব কি মানব।

এদিকে যামিনীনাথ দুই এক দিনের জন্য এখানে আসিয়া কনকের রূপ লাবণ্যে মোহিত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে আর নীরজা স্থান পাইল না। নীরজাকে ছাড়িয়া তাঁহার এখন কনকের দিকে চক্ষু পড়িল। নীরজা বনফুল, যেখানে অন্য ফুল মেলে না সেইখানে নীরজার আদর। নীরজা অরণ্যে একাকী ফুটিয়া তাহা শোভিত করে, কিন্তু কনক বিকসিত গোলাপ, সকল স্থানে সকল সময় তাহার সমান আদর। রাশি রাশি বিকসিত পুষ্প সমাকুল কাননের মধ্যে গোলাপ পরম আরাধ্য, গোলাপ কুসুমরাণী। সেই গোলাপটি দেখিয়া তিনি যে বনবালা নীরজাকে ভুলিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বিশেষতঃ যত দিন নীরজাকে পাইবার আশা ছিল না—তত দিন

তাঁহার লালসা অত্যন্ত প্রবল ছিল, কিন্তু তাহাকে পাইবেন জানিয়া তাঁহার নিকট নীরজার মর্য্যাদা অনেক কমিয়া আসিয়াছিল। এইরূপ মনের অবস্থায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী অন্য একটী রমণীকে দেখিয়া যামিনীর মনে নীরজা স্থান পাইবে আর কি রূপে? নীরজা মর্ত্ত্যজাত কুসুম—কনক স্বর্গের পারিজাত, সুতরাং যামিনী কনকের রূপে মুগ্ধ হইলেন।

নীরজাতে আর এখন তাঁহার মন নাই, এখন আর বিবাহের নিমিত্ত কানপুরে যাইতে তিনি ব্যস্ত নহেন। দুদিনের জন্য এখানে আসিয়া ৫।৬ দিন হইয়া গেল, তবু যামিনী কানপুর যাইবার নামও করিলেন না। যামিনীর এখন একমাত্র চিন্তা—কি উপায়ে তিনি কনককে লাভ করিবেন। যামিনী মনে মনে জানিতেন প্রমোদ নীরজাতে অনুরক্ত, ভাবিলেন যদি তিনি নীরজার সহিত প্রমোদের বিবাহ দিতে পারেন, তো প্রমোদ অনায়াসে তাহাকে ভগিনী সমর্পণ করিবেন। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া একদিন কথায় কথায় প্রমোদকে বলিলেন "প্রমোদ, দুদিনের জন্য আসিয়া—চার পাঁচ দিন কাটিয়া গেল—শীঘ্র যাইতে হইবে কিন্তু—"যামিনী এইখানে থামিলেন—বোধ হইল যেন কি একটি বিশেষ কথা চাপিয়া গেলেন। প্রমোদ তাহা বুঝিয়া সেই কথাটি শুনিবার নিমিত্ত বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, তখন তিনি বলিলেন, "দেখ, ক দিন হইতেই তোমাকে একটি কথা বলিব ভাবিতেছি কিন্তু কে জানে কেন বলিতে গেলেই বাধিয়া যায়" প্রমোদ হাসিয়া বলিলেন "কি না জানি কথা যে বলিতে বাধিয়া যায়।" প্রমোদের হাসিতে যামিনী একটুও হাসিলেন না—অতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন "না, তোমার কাছে আর লুকাইব না—যা বলিবার আছে বলি শুন। প্রমোদ, সন্ন্যাসী নীরজার সহিত আমার বিবাহ দিবার জন্য কানপুরে ডাকিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে বিবাহ করিতে আমার ইচ্ছা নাই, তাই সেখানে শীঘ্র যাইতে পারিতেছি না।' প্রমোদ আশ্চর্য্য ভাবে বলিলেন "তাহাকে বিবাহ করিতে তোমার ইচ্ছা নাই?"

যা। "না তাহাকে বিবাহ করিতে আমার ইচ্ছা নাই" এই কথায় প্রমোদ নিস্তব্ধভাবে বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে যামিনীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, যামিনী কাতর স্বরে আবার বলিলেন "প্রমোদ, তাহাকে বিবাহ করিতে আমার ইচ্ছা নাই ইহা সত্যই বিস্ময়ের কথা—কিন্তু তুমি বিস্মিত হইও না—প্রমোদ, ইহারও কারণ আছে।"

প্রমোদ তখন আস্তে আস্তে বলিলেন, ইহারও কারণ আছে! নীরজাকে কেহ কি ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে?"

যা। "তাহা ঠিক, প্রমোদ, তুমি ভাবিও না, তাহাকে আমি ভাল বাসি না বলিয়া তাহার সহিত আমার বিবাহে অনিচ্ছা। আমি তাহাকে জীবন অপেক্ষাও ভালবাসি। কিন্তু আমি তাহার অযোগ্য, আমি তাহাকে বিবাহ করিব না।'

প্র। "তুমি নীরজার অযোগ্য? তবে যে যোগ্য কে আমি তো তাহা বলিতে পারি না।'

যা। "লোকে যাহাই বলুক, আমি বাস্তবিকই তাহার অযোগ্য—নীরজা আমাকে ভাল বাসে না" এই কথায় প্রমোদ তাহার বিবাহের অনিচ্ছার কারণ বুঝিলেন, তাহার সেই বিষাদার্দ্র স্বরে তাহার হৃদয়ের গভীর যাতনাও অনুভব করিতে পারিলেন। সকল বুঝিয়া তিনি মর্ম্মপীড়িত হইয়া নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। যামিনী কিছু পরে আবার বলিলেন "প্রমোদ, তোমাকে বলিব? নীরজা কাহার প্রতি অনুরক্ত শুনিবে! নীরজা তোমাকেই ভালবাসে।"

বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু এই কথা শুনিয়া বন্ধুর গভীর দুঃখের মধ্যেও প্রমোদের হৃদয় সহসা যেন আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু আবার তখনি আপনাকেই যামিনীর কষ্টের কারণ ভাবিয়া আপনা হইতে সে উচ্ছ্বাস থামিয়া আসিল। যামিনী বলিলেন "ভাই আমি কি কিছু বুঝি না? তুমিও যে মনে মনে নীরজাকে ভালবাস তাহা আমি বুঝিয়াছি। বুঝিয়া কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি শুন—আমি তোমাদের পথের কণ্টক হইব না। আমি নিজে উদ্যোগী হইয়া তোমাদের বিবাহ দিয়া দিব এই আমার সঙ্কল্প।"

যামিনীর নিঃস্বার্থ ভাব দেখিয়া প্রমোদ বিস্ময়-উৎফুল্ল ভাবে চাহিয়া রহিলেন। যামিনী দেব কি মানব তাহা প্রমোদ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না—কিন্তু তিনি বলিলেন "আমিও তোমার মত বন্ধুর নিকট কিছু লুকাইব না—বাস্তবিকই আমি যে দিন হইতে নীরজাকে দেখিয়াছি, সেই দিন হইতে তাহাকে ভাল বাসিয়াছি। সে ছবি এখন পর্য্যন্তও হৃদয় হইতে উঠাইতে পারিলাম না। কিন্তু যাহা বলি বিশ্বাস করিও। তাহাকে আমি যতই ভাল বাসি না কেন, নীরজাকে না পাইলে যতই কষ্ট পাইনা কেন কিন্তু তোমাকে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে পাইতে ইচ্ছা আমি কখনই করিব না—সে লাভে আমি কখনই সুখী হইব না" যামিনী বলিলেন "তাহা ভাবিতেছ কেন? তুমি বিবাহ না করিলেও কিছু আমি তাহাকে বিবাহ করিব না। নীরজা আমাকে ভাল বাসে না জানিয়া আমি তাহা কি প্রকারে করিব। বরং তোমাদের উভয়ে বিবাহ হইলে নীরজা সুখী হইয়াছে জানিয়া আমিও সুখী হইতে পারিব।" প্রমোদ যামিনীর কথা বুঝিলেন, বুঝিলেন যামিনীর মত অবস্থায় পড়িলে তিনিও ঠিক ঐ রূপ করিতেন। আপন ইচ্ছানুসারে অতি সহজেই তাহার কথা যুক্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু তথাপি যামিনীকে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করাইবার নিমিত্ত তিনি অনেক বুঝাইলেন—কিন্তু যামিনী কিছুতেই না বুঝিয়া বলিলেন "তুমি ভাবিতেছ আমি এখন যাহাই বলি না কেন—বিবাহ না হইলে পরে নিশ্চয়ই অসুখী হইব—কিন্তু আমাকে তুমি বিশেষ রূপে জানিলে কখনই ওরূপ হীন মনে করিতে না। আমি যে কালে এ বিবাহের প্রস্তাব নিজেই করিতেছি, তুমি ভাবিওনা ইহাতে আমার একটুও অসুখ হইবে। তোমাদের বিবাহে আমি সুখীই হইব, যদি অসম্মত হও

তাহা হইলে বরং অত্যন্ত কষ্ট হইবে” প্রমোদ কিছু উত্তর না দিয়া আপন মনেই ভাবিতে লাগিলেন, নানা ভাবনায় তাঁহার মন তরঙ্গিত হইতে লাগিল, তিনি যামিনীর কথায় কিছুই উত্তর করিলেন না। যামিনী মৌন ভাবই সম্মতির লক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন “আজই আমি তবে কানপুরে চলিলাম, সন্ন্যাসীকে বলিয়া তোমার সহিত নীরজার বিবাহ নির্দ্ধারণ করিব।”

অনেক কথাবার্ত্তার পর যামিনী সেই দিনই কানপুর যাত্রা করিলেন। প্রমোদ সমস্ত দিন আহ্লাদে বিষাদে অভিভূত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। নীরজা তাঁহার হইবে। এই তাঁহার আহ্লাদ, যাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই, যাহা আশার অতীত সেই বিষয়ে আশার সঞ্চারই তাঁহার আহ্লাদ। আবার বিষাদ এই, তাঁহার পরম বন্ধু যামিনীকে তাঁহার জন্যই নিরাশ হইতে হইল।

যামিনী বাবুর নিঃস্বার্থ ভাব দেখিয়া প্রমোদ অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন। সমস্ত দিন মনে মনে তাঁহার অতুল গুণরাশির প্রশংসা করিতে লাগিলেন, প্রমোদ ভাবিলেন যামিনীর মত দ্বিতীয় লোক আর সংসারে নাই।

কাতন্ত্র-জীবনী।

চতুর্থ অধ্যায়।

(কাতন্ত্রের অতিরিক্ত গ্রন্থকারগণ।)

শ্রীপতি দত্ত (কাতন্ত্র পরিশিষ্ট প্রণেতা)

শ্রীপতিদত্ত কাতন্ত্র-পরিশিষ্ট প্রণয়ন করেন। ইহাঁরও ব্যাকরণ শাস্ত্রে অগাধ বিদ্যা ছিল। কাতন্ত্রে যে সকল বিষয়ে অভাব রহিয়া গিয়াছে শ্রীপতি নানা গ্রন্থ হইতে সেই সকল সংকলন করিয়া পরিশিষ্টে যোজনা করিয়াছেন; কেবল তাহাই নহে। অধুনাতন সাহিত্যকর্ত্তাগণ যে সকল নূতন নিয়মাদি প্রয়োগ করিয়াছেন শ্রীপতি তাহা হইতে নূতন বৈয়াকরণিক নিয়মাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় ইনি গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই;—কেবল সন্ধি ও চতুস্টয়ের (তদ্ধিত ব্যতীত) পরিশিষ্ট প্রণয়ন করিয়াছেন। বোধ হয় অকালে কালকবলিত হওয়াই—ইহার এক মাত্র কারণ। গোপীনাথ প্রভৃতির মতে শ্রীপতি দুর্গসিংহ অপেক্ষাও ব্যাকরণ শাস্ত্রে প্রবীণ ছিলেন; একথা আমরা একটুকুও স্বীকার করিতে পারি না, কেন না শ্রীপতি

দত্তের "কাতন্ত্র পরিশিষ্টে" যে সকল অতিরিক্ত বিষয় আছে—উহা প্রায়ই দুর্গসিংহের অতিরিক্ত সূত্র ও বক্তব্যের চর্ব্বিত চর্ব্বণ মাত্র। তবে শ্রীপতি যে কোন নূতন বিষয় যোজনা করেন নাই—তাহাও আমরা বলি না; নাম ধাতু,লিঙ্গ,স্ত্রী প্রত্যয় প্রভৃতি সম্বন্ধে শ্রীপতি অনেক কথা বলিয়াছেন, বিশেষতঃ শ্রীপতির সূত্রচয় অপেক্ষাকৃত প্রণালীক্রমে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীপতির এতগুলি গুণ থাকিলেও তাঁহাকে দুর্গসিংহ অপেক্ষা ব্যাকরণ শাস্ত্রে প্রবীণ বলা যাইতে পারে না। কেননা দুর্গসিংহই অতিরিক্ত সূত্র গুলির সৃষ্টিকর্ত্তা—তিনিই নানা শাস্ত্র মন্থন করিয়া ব্যাকরণ অমৃত উদ্ধৃত করিয়াছেন। বলিতে গেলে শ্রীপতি সেই সূত্রগুলিই শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন। একজনে একটি বিষয় আবিষ্কার করিয়া গেলে পরে একজন সামান্য লোকও তাহার কিছু উন্নতি করিতে পারে কিন্তু তাই বলিয়াই আবিষ্কারকের শতাংশের একাংশও যশ লাভ করিতে পারে না। যাঁহারা ঘটিকা, তাড়িত বার্ত্তাবহ প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পরকীয় লোক আবিষ্কারকগণ অপেক্ষা এখন ঐ সকল যন্ত্রাদির কত উন্নতি করিতেছেন কিন্তু ইহাঁদের নাম তো কেহই মুখে আনে না অথচ সৃষ্টিকর্ত্তাগণ প্রতিমুহূর্ত্তে কোটি কোটি লোকের মুখে উচ্চরিত হইতেছেন। সুতরাং দুর্গসিংহের নিকট শ্রীপতির এক টুকুও তুলনা হইতে পারে না। গোপীনাথ যে দুর্গসিংহকে নিন্দা করিয়া শ্রীপতির প্রশংসা করিয়াছেন—তাহার মূল কারণ এই যে গোপীনাথ শ্রীপতির পরিশিষ্টের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীপতিকে সম্মানিত করিতে পারিলে তাহার কৃত গ্রন্থেরও সমাদর বৃদ্ধি হয় অথচ দুর্গসিংহের প্রশংসা করিলে তাহার টীকার সম্মান রক্ষা পায় না। গোপীনাথ এক জন কৃতবিদ্য হইয়া যেন এইরূপ পাপে কলুষিত হইলেন, বুঝা যায়। কিন্তু গোপীনাথের এই গর্হিত কাজের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বিদ্যাসাগর নামক টীকাকার তাহাকে স্থানে স্থানে আচ্ছা জব্দ করিয়াছেন। এবং তিনি যে শ্রীপতিকে একেবারে স্বর্গে তুলিয়াছেন, বিদ্যাসাগর সেই শ্রীপতির চর্ব্বিত চর্ব্বণ বাক্যগুলির 'শ্রীপতি-প্রলাপ' নাম রাখিয়াছেন। বিদ্যাসাগর প্রায় সর্ব্বত্রই শ্রীপতিকে উপহাস করিয়াছেন। শ্রীপতির জীবনবৃত্তান্ত জানিবার কোনো উপায় নাই। ইনি অম্বষ্ঠ কুলোদ্ভব ছিলেন ২৫। ইহাঁর অনেক শাস্ত্রে বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বিশেষ অধিকার ছিল। ইহাঁর সময় নিরূপণ করিবারও কোন ভাল প্রমাণ পাওয়া গেল না, তবে ইনি হর্ষবিক্রম ও লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের প্রায় সন্ধিস্থলে বর্ত্তমান ছিলেন। বোধ হয় শ্রীপতি খৃষ্টীয় ৯ ম শতাব্দির লোক।

গোপীনাথ।

গোপীনাথ কাতন্ত্র পরিশিষ্টের পরি-

২৫ ইতি বৈদ্যমহামহোপাধ্যায় শ্রীশ্রীপতিদত্তবিরচিত "কাতন্ত্র পরিশিষ্ট ইত্যাদি (শ্রীপতি)।

শিষ্ট-প্রবোধ নামক টীকা প্রণয়ন করেন। গোপীনাথ পশুপতির পুত্র ছিলেন এবং তর্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন ২৬। কাতন্ত্রব্যবসায়ীগণ বলিয়া থাকেন গোপীনাথের ন্যায় পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ সমন্বয় রাখিয়া আর কোন টীকাকারই টীকা প্রণয়ন করিতে পারেন নাই।" বাস্তবিক গোপীনাথ একজন কৃতবিদ্য লোক ছিলেন। ইনি লক্ষ্মণসেনের পরে ও বিদ্যাসাগর প্রভৃতির পূর্ব্বে প্রায় খৃঃ চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি একজন পরনিন্দক ছিলেন।

গোপীনাথ-প্রণীত টীকার প্রথম শ্লোকে তাঁহার এই রূপ পরিচয় আছে যিনি (গোপীনাথ) চন্দ্ররশ্মিতে কুমুদশ্রেণীর ন্যায় শ্রীবিশিষ্ট, অপাপমানস, আচার্য্যশ্রেষ্ঠ শ্রীমান পশুপতি হইতে জন্ম গ্রহণ করেন, যিনি ধরণীধরেন্দ্র হিমাদ্রির তনয়া উমার পতির সমুজ্জ্বল চরণে আশক্তাত্মা ছিলেন, যিনি কীর্ত্তিরূপী লক্ষ্মীতে জয়শীল, দানালী স্বরূপ তরবারি দ্বারা শাসিতা ধরার দীনশ্রেণীর দীনতা রূপ অরির পরশু, সুরিসভা এবং সমাজে বিজয়ী, কামাভিরামাকৃতি, সত্যের উৎসেক বশীকরণ জন্য ঈশ্বরে মতিযুক্ত এবং যিনি শ্রীমতী যোজনা দেবীর সন্তান ছিলেন (তাঁহার মাতার নাম যোজনা) সেই মধুর ব্যাহার বাগীশ্বর তর্কাচার্য্যবর, সদর্থচতুর, সুবিদ্বান শ্রীযুক্ত গোপীনাথ এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন"। তথাহি——

যো জাতোধরণীধরেন্দ্র-
তনয়ানাথাঙ্ঘ্রি পাথোরুহা-
শক্তাত্মাহনঘনানসাৎ
পশুপতেরাচার্য্যসিংহাৎ সতঃ
কীর্ত্তি শ্রীজিতপীত রশ্মি-
কুমুদশ্রেণীশ্রিয়ঃ শ্রীমতো
দানালীতরধারিধারিত-
ধরাদীনালীদৈন্যারিতঃ ॥ ১
সোয়ং সুরিসভাসভাজিত-
মতিঃ কামাভিরামাকৃতিঃ,
সত্যোৎসেকবশীকৃতেশ্বর
মতিঃ শ্রীযোজনাসন্ততিঃ।
গোপীনাথ ইমঞ্চকার
মধুর ব্যাহার বাগীশ্বর
তর্কাচার্য্যবরঃ সদর্থ চতুরঃ
সশ্রীকবিদ্যাধরঃ ॥ ২

এই শ্লোক দুইটী ব্যতীত গোপীনাথের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বোধ হয় ঐ শ্লোক দুটী গোপীনাথের নিজকৃত নহে, পরে কেহ তাঁহার গ্রন্থে বিনিবেশিত করিয়া দিয়াছে, কেননা তিনি তাঁহার আপনাকে আপনি এত প্রশংসা করিতে পারিতেন না এবং "ইমঞ্চকার" এরূপও বলিতেন না।

২৬ শ্রীমদাচার্য্য পশুপতিতনুজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদগোপীনাথ বিরচিত "পরিশিষ্ট প্রবোধ" ইত্যাদি (গোপীনাথ)

হলায়ুধ।

লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী হলায়ুধ (খৃঃ ১১০১ —১১২১) কাতন্ত্রসম্মত গণের কবিরহস্য

নামক টীকা করেন। ইনি দক্ষের সন্তান ও চট্টবংশ সম্ভূত ২৭। হলায়ুধ নিজ পরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন যে লক্ষ্মণসেন তাঁহাকে কৈশোরাবস্থায় সভাপণ্ডিত পদে যৌবন অবস্থায় মন্ত্রীপদে এবং বার্দ্ধক্যে ধর্ম্মাধিকার-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন ২৮। হলায়ুধ প্রভৃতি বল্লালের নিকট তরুণ বয়সেই কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। হলায়ুধ তাঁহার যৌবনে অর্থাৎ কৌলীন্য প্রাপ্তির ২৩ বৎসর পরেই, লক্ষ্মণের সভা পণ্ডিত হয়েন। হলায়ুধ প্রভৃতির শেষাবস্থায় কৌলীন্যসমীকরণ কালে তাঁহারা লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক প্রপূজিত হইয়া ছিলেন। লক্ষ্মণের সভায় যে সকল সভাপণ্ডিত বিরাজ করিতেন তন্মধ্যে গোবর্দ্ধনাচার্য্য ২৯ ও হলায়ুধ কুলীনের মধ্যে অগ্রগণ্য বলিয়া কথিত আছে ৩০।

২৭ সম্বন্ধ নির্ণয় ১৬২ পৃষ্ঠা।

২৮ বভূব তস্যাং প্রকৃতের্ম্মহানিব
শ্রিয়ো নিবাসায়তনং হলায়ুধঃ।
যৎ কীর্ত্তিরম্ভোনিধিবীচিদণ্ড
দোলাধিরোহব্যসনং বিভর্ত্তি। ১

লব্ধং জন্ম ধনঞ্জয়াদ্ভগবতঃ শ্রীলক্ষ্মণ ক্ষ্মাপতে
রারত্যা লঘুতা নিজস্য বয়সঃ প্রাপ্তা মহাপাত্রতা।
শব্দব্রহ্মকরোদরামলকবত্তোগোস্তরা সৎক্রিয়ে।
অস্তি প্রার্থয়িতব্যমস্য কৃতিনঃ কিঞ্চিন্ন সাংসারিকং॥ ২

যেনাসীদজিতং ন সিন্ধুলহরীধৌতাঞ্চ নায়াং ক্ষিতৌ
যস্মাজ্জাতমভূন্ন সপ্তভুবনে নানাবিধং বাঙময়ং।
দেবঃ স ত্রিজগন্ময়স্য মহিমা শ্রীলক্ষ্মণ ক্ষ্মাপতি
র্নেতা যস্য মনীষিতাধিকপুরস্কারোত্তরাঃ সম্পদঃ। ৩

* বাল্যে খ্যাপিতরাজপণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংশু বিম্বোজ্জ্বল
চ্ছাত্রোৎসিক্ত মহামহত্তমপদং দত্বা নবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবনশেষযোগ্যমখিলক্ষ্মাপালনারায়ণঃ,
শ্রীমান লক্ষ্মণসেন দেব নৃপতির্ধর্ম্মাধিকারং দদৌ। ৪

(ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব)

২৯ ঘটকদিগের মিশ্রী গ্রন্থের কারিকায় পূতিতুণ্ড বংশের গোবর্দ্ধনাখ্য মহা কবির ও চট্টবংশীয় হলায়ুধের পরিচয় আছেঃ—

বহুরূপঃ সুচোনাম্না অরবিন্দো হলায়ুধঃ।
বন্দোলাশ্চ সমাখ্যাতাঃ পঙ্‌ক্তৌ চট্টবংশজাঃ। ১
পূতির্গোবর্দ্ধনাচার্য্যঃ শিবো ঘোষাল সম্ভবঃ।
গাঙ্গুলীয়ঃ শিশো নাম্না কুন্দো রোষাকরোপিচ॥ ২
জাহ্নুনাথ্যস্তথা বন্দ্যো মহেশ্বর উদারধীঃ।
দেবলো বামনশ্চৈব ঈশানো মকরন্দকঃ॥ ৩
উৎসাহগরুড়াখ্যাতৌ মুখবংশসমুদ্ভবৌ।
কানুকুতুহলানেতৌ কাঞ্জিকুলপ্রতিষ্ঠিতৌ।
উনবিংশতিসংখ্যাতা মহারাজেন পূজিতাঃ॥ ৪

(ধ্রুবানন্দ মিশ্র)

(৩০) সম্বন্ধ নির্ণয়; ২০৯। ২১০ পৃষ্ঠা।

হলায়ুধ ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব, কবিরহস্য নামক ধাতুপাঠ ও সংস্কৃত অভিধান প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। তাঁহার ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব ও অভিধান লোকসমাজে প্রসিদ্ধ। ইনি লক্ষ্মণের নিকট পরম মান্য ছিলেন। এতন্নিবন্ধন তৎকালে লোকসমাজে প্রায় দেববৎ পূজিত ছিলেন। হলায়ুধ একজন অসামান্য পণ্ডিত ও অলৌকিক প্রতিভা-বিশিষ্ট লোক ছিলেন। তাঁহার এতগুলি গুণ থাকিলেও তিনি একটী দোষ হইতে অব্যাহতি পান* নাই অর্থাৎ তিনি অপরের সৌভাগ্য দেখিতে পারিতেন না—ইনি দুর্গসিংহ সর্ব্ববর্ম্মা প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় ও অগাধবিদ্যাবিশারদগণকে সামান্য লোকের ন্যায় নিন্দা করিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

কয়েকটী অতিরিক্ত বক্তব্য।

গরুড়পুরাণে কাতন্ত্রের অপর নাম "কুমার" স্পষ্টাভিধানে উল্লিখিত আছে:—

"কাত্যায়নঃ কুমারস্তু জ্ঞাত্বা বিস্তরমব্রবীৎ"

ইতি গারুড়ঃ।

কেহ বলেন অগ্নিপুরাণেও কাতন্ত্রের নাম উল্লেখ আছে এমন কি উহাতে কাতন্ত্রের "সিদ্ধো বর্ণ সমন্বায়ঃ" প্রভৃতি শ্লোক ও উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে কাতন্ত্র বহু দিনের পুরাণ ব্যাকরণ; বাস্তবিক তাহা নহে, হয় উল্লিখিত পুরাণগুলি শালিবাহন রাজার পরে প্রণীত হইয়াছে নয় কেহ কাতন্ত্রের সম্মান বৃদ্ধি করিবার জন্য ঐ পুরাণ সকলে কাতন্ত্রসম্পর্কিত দুই এক কথা যোজনা করিয়া দিয়াছেন।

কাতন্ত্র সম্বন্ধে আরো দুইটী দেশ প্রচলিত শ্লোক :—

তস্য দুঃখস্য শান্ত্যর্থং কুমারং গিরিজাত্মজং
আররাধ ততঃ সোহপি বামহস্তেন তাড়িতঃ। (১)

তস্মৈ দাতুং বরং তেন
সিদ্ধ শব্দো জাহ্ন বকে (২)
পদ্য পাদং যুতং শাস্ত্রং
স্বয়মেবাকরোদদ্রুতং।
অধ্যাপনং ততশ্চক্রে
নিজ শিষ্যাং সমন্ততঃ ২ †

আমরা শকাব্দা আবিস্কারক বিক্রমাদিত্য ও হর্ষবিক্রম এ উভয় নৃপতিরই নিবাসভূমি উজ্জয়িনী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, ইহা যে কেবল আমাদের ভ্রম তাহা নহে; ইহার কোন্ বিক্রমাদিত্যের নিবাস কোথা, এবং নবরত্ন-সভা কোন্ বিক্রমাদিত্যের ছিল সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত; বাস্তবিক সে সম্বন্ধে এখনো কোন প্রামাণ্য ও সটীক যুক্তি কেহই প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। সে যাহা হউক, প্রথম

* শ্রীনাথ তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত "কোষরত্নাকর" ৭ পৃষ্ঠা।

† এই শ্লোক গুলি বোধ হয় একেবারে জনশ্রুতি নয়, ইহার কোন মূল অবশ্য আছে।

বিক্রমাদিত্যের নিবাস কাহার কাহারও মতে অবন্তী নগরে ছিল। ‡

অধ্যাপক লেথ্‌ব্রিজ সাহেবের মতেও কাত্যায়ণ পাণিনি সূত্রের সমালোচক ও কাত্যায়ণ পতঞ্জলির আচার্য্য ও সমসাময়িক লোক ছিলেন P। কাত্যায়ণ যে পতঞ্জলির আচার্য্য ছিলেন একথায় কেবল এক জন বাঙ্গালিই অযথা গোলমাল বাধাইয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের যে মত তাহা পূর্ব্বেই লিখা হইয়াছে।

আমরা সুসেন কবিরাজকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছি; কিন্তু অনেকে তাঁহাকে অম্বষ্ঠ কুলসম্ভূত বলিয়া থাকেন। কেননা কবিরাজ শব্দে চলিত ভাষায় আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসককে বুঝায়। কিন্তু কবিরাজ শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিলে উহা ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেই অধিক খাটে। কবি শব্দের এক অর্থ পণ্ডিত S সুতরাং কবিরাজ শব্দে "পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ" এই অর্থ হওয়াতে কোন দোষ দেখি না, তাহা হইলে সুসেন কবিরাজ অম্বষ্ঠ না হইয়া ব্রাহ্মণ হইলেও কোন অর্থের বিপর্য্যয় হয় না। তবে তিনি যে ব্রাহ্মণ সে সম্বন্ধে ও আমরা অকাট্য প্রমাণ দিতে পারি নাই। ফল কথা তিনি ব্রাহ্মণই হউন বা অম্বষ্ঠই হউন আমরা তাঁহার সম্বন্ধে যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছি বোধ হয়, তাহার বড় ব্যতিক্রম হইবে না।

শ্রীযাদবানন্দ গুপ্ত।

সৌন্দর্য্যতত্ত্ব।

চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত সৌন্দর্য্যের মূল উপকরণ যেরূপ আকার ও রং, কর্ণেন্দ্রিয়-বিষয়ীভূত সৌন্দর্য্যের মূল উপকরণ সেইরূপ সুর ও তাল এবং তাহাকেই সঙ্গীত বলে। সঙ্গীতে প্রথমতঃ সামান্য শব্দেরই প্রীতিপ্রদ নানা প্রকার বিচিত্রতা দৃষ্ট হয়—মধুর শব্দ, গম্ভীর শব্দ—ক্রম-বর্দ্ধমান ও ক্রম-হ্রসমান এইরূপ নানা প্রকার শব্দ—তৎপরে সাদাসিধা রাগ রাগিণী (Melody) ও নির্দ্দিষ্ট ভাগ-পরিমাণের নিয়মানুসারে

‡ জয়দেব নামক প্রস্তাব ৪৬ পৃষ্ঠা।

P The rules of Panini were criticised by Katyayana, were in all probability was the teacher of Patanjalio.

* E Leathbridge's 'History of India' (873) P 65 Sec. 106.

S। "বিদ্বান্ বিপশ্চিদ্দোষজ্ঞঃ সন্ সুধীঃ কোবিদো বুধঃ।
ধীরো মনীষী জ্ঞঃ প্রাজ্ঞঃ সংখ্যাবান পণ্ডিতঃ কবিঃ।" ইত্যমরঃ।
"———কবি বাল্মীকি শুক্রয়োঃ
সূরৌ কাব্যকরে পুংসি স্যাৎ খলীনেতু বোধিতি।

বিচিত্র সুরের সামঞ্জস্য (Harmony) লক্ষিত হয়।

কোন সমান ওজনের শব্দ অর্থাৎ যে শব্দে প্রতি সেকেণ্ডে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক স্পন্দন হয় তাহাকে সাঙ্গীতিক শব্দ, অর্থাৎ সুর বলে। এই স্পন্দনের সমতা হইতে আমাদিগের মনে এক প্রকার সুখ উৎপন্ন হয়। শব্দের অনিয়মিত স্পন্দন অপেক্ষা নিয়মিত স্পন্দন আমাদিগের নিকট অধিক সুখপ্রদ। সুর-সামঞ্জস্য (Harmony) কি? না—কোন সরল ভাগ-পরিমাণের নিয়মানুসারে দুই কিম্বা অধিক সমযোগী সুরের মধ্যে সাম্য ভাব। তাহার দৃষ্টান্ত, খরজ, গান্ধার, কোমল গান্ধার, এবং পঞ্চম, এই সমযোগী সুর গুলি বিভিন্ন হইলেও— ইহাদের মধ্যে পরস্পর একটি মিল আছে, এবং এই প্রত্যেক সুরের স্পন্দনের সংখ্যা সমান না হইলেও তাহাদের মধ্যে একটি ভাগের নির্দ্দিষ্ট সরল পরিমাণ আছে—যে সকল সুরে এই পরিমাণের নিয়ম যত সরল, সেই সকল সুরের মধ্যে সেই পরিমাণে তত মিল দৃষ্ট হয় এবং আমাদিগের নিকট ততই শ্রুতি-সুখকর হয়*। কোন গানে যত উচ্চ নীচ নানা সুরের সামঞ্জস্য থাকে, সেই গান সেই পরিমাণে সুর বিষয়ে সুন্দর এবং কোন গানে যে পরিমাণে সম বিষম নানা তালের সামঞ্জস্য থাকে, সে গান সেই পরিমাণে তাল বিষয়ে সুন্দর। সরল রেখা দ্বারা যে সকল আকার নির্ম্মিত হয়, সেই সকল আকারের প্রতিরূপ—য়ুরোপীয় সঙ্গীত, এবং সমবক্র রেখার দ্বারা যে সকল আকার গঠিত হয় তাহার প্রতিরূপ আমাদিগের দেশীয় সঙ্গীত। সমবক্র রেখা-গঠিত আকারে যেরূপ খোঁচা-খুঁচি থাকে না পরন্তু এক অংশের সহিত আর এক অংশ আস্তে আস্তে বেমালুম মিলিয়া যায়, আমাদিগের সঙ্গীত অনেকটা তাহারই প্রতিরূপ—ইংরাজদের সঙ্গীত আমাদিগের অপেক্ষা বোধ হয় অধিক খোঁচা খুঁচি-বিশিষ্ট—অর্থাৎ একটা সুর হইতে আর একটা সুর ক্রমশঃ না গড়াইয়া আসিয়া একটা সুর হইতে আর একটা সুর অকস্মাৎ উত্থিত হয়। এই জন্য ইংরাজি খোঁচা-খুঁচি সুরে আমাদিগকে জাগ্রত করিয়া তোলে এবং আমাদের গড়ানে সুর ইংরাজদিগের নিদ্রা আকর্ষণ করে। ইংরাজদিগের অপেক্ষা আমাদিগের মূল সুরগুলি (Melody) যে অধিক সুন্দর তাহাতে সন্দেহ নাই, ইংরাজদিগের মূল সুর হইতে যদি

* "If we sound together two notes whose vibration-ratio is expressed by two terms of the series of natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, &c, we shall have a musical concord more or less perfect or pleasing according to the simplicity of the numerical ratio and more or less displeasing as the ratio is more or less complex—the whole series of such notes is known in music as Harmonic Sound" by John Cook M A—Sound.

তাহার আনুসঙ্গিক-বিচিত্র সুর-সম্মিলন Harmony অপসারিত করা যায়, তাহা হইলে তাহা অতি সামান্য হইয়া পড়ে, অনেক সময়ে তাহাদিগের মূল সুরের দারিদ্র্য আনুসঙ্গিক সুর-বৈচিত্র্যে ঢাকিয়া যায়। Captain willard সাহেব তাঁহার প্রণীত "ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত" নামক গ্রন্থে বলেন—

"The modern melody has not the merit of the ancient and that harmony is used with the view of compensating for its poorness, and diverting the attention of the audience from parceiving the barrenness of genius."

যদিও আমাদিগের মূল সুরের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য এত অধিক যে তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য Harmony রূপ অলঙ্কারের তত প্রয়োজন হয় না, তথাপি আর একটু আনুসঙ্গিক সুর-বিচিত্রতা প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে বোধ হয় আমাদিগের সঙ্গীতের অপেক্ষাকৃত উন্নতি হয়—কিন্তু মূল রাগ রাগিণীর ভাব রক্ষা করিয়া Harmony প্রয়োগ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। বিচিত্রতার খাতিরে আমরা রাগ রাগিণী কিম্বা ভাবের বিশুদ্ধতা নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। Harmonyর দরুণ অনেক সময় যে গানের ভাব নষ্ট হয় তাহা কোন কোন বিচক্ষণ ইংরাজ গ্রন্থকার স্বীকার করেন— Dr Burney বলেন:—

If may indeed happen from the number of performers, and the complication of the harmony, that meaning and sentiment may be lost in the multiplicity of sounds; but this, though it may be harmony, loses the name of music"

সঙ্গীতের আবার দুইটি অংশ আছে একটি ইন্দ্রিয়ঘটিত, আর একটি মানসিক। গানের যেরূপ সুর ও তাল, সেইরূপ ভাবও একটি প্রধান উপকরণ। কিন্তু এই ভাবকে যদি সুর-তাল হইতে পৃথক করিয়া দেখি, তাহা হইলে তাহা কবিতার অধিকারের মধ্যে আসিয়া পড়ে। কিন্তু এই ভাবকে যখন সুর-তালের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখি তখনই সঙ্গীত-শাস্ত্রের অধিকারের মধ্যে আসিয়া পড়ে।

সুরের ভাব-সৌন্দর্য্য কাহাকে বলি না—যখন কোন মানসিক ভাবের সহিত সুর-তালের ঐক্য কিম্বা সামঞ্জস্য হয়। আমাদিগের ভৈরব ও পুরবী প্রভৃতি রাগ ভাব-সৌন্দর্য্যের জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত-স্থল। এই দুই রাগ প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যার ভাব মনোমধ্যে যে রূপ উদয় করিয়া দিতে পারে, এরূপ আর কোন রাগ করিতে পারে না। প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যার যেরূপ ঢুলু ঢুলু ঘুমন্ত ভাব—কড়ি কোমল প্রভৃতি অর্দ্ধ সুর প্রয়োগ করিয়া সুরের গড়ান-ভাব বিধান করিয়া—প্রাতঃ সন্ধ্যার ভাবের অনুকরণ করা হইয়াছে। এই রূপ বিশেষ বিশেষ সুরে আমাদের বিশেষ বিশেষ হৃদয়ের ভাব যে উদ্দীপিত হয়, তাহা অনুসঙ্গ-নিয়মেই (Association) হইয়া থাকে।

কিন্তু এই বিষয়ে Alison সাহেবের মতের সহিত আমাদিগের সম্পূর্ণ ঐক্য হয় না—তিনি বলেন শব্দ-সকলের কোন নিজস্ব মনোহারিতা নাই—শব্দের সহিত হৃদয়-ভাবের অনুসঙ্গ না হইলে শব্দের সৌন্দর্য্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না—তিনি বলেন উচ্চ নীচ, গম্ভীর তীক্ষ্ণ দীর্ঘ হ্রস্ব প্রভৃতি বিভিন্ন স্বরের সহিত বিশেষ বিশেষ হৃদয়ভাবের যোগ আছে—এবং ঐ সকল সুর বিশেষ বিশেষ হৃদয়ভাবকে উদ্রেক করে বলিয়াই সেই সকল সুরের সৌন্দর্য্য আমরা উপলব্ধি করি। যদিও আমরা স্বীকার করি, বিশেষ বিশেষ সুরই বিশেষ বিশেষ হৃদয়ের ভাব উদ্রেক করিতে পারে, কিন্তু ভাবকে ছাড়িয়া শুদ্ধ কি আমরা শব্দের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারি না? কোন কর্কশ শব্দ শুনিলে স্বভাবতই যেরূপ আমাদের বিরক্তি বোধ হয়, কোন মধুর শব্দ শুনিলে, শুধু আমরা সেই শব্দের মাধুর্য্যেই বিমোহিত হই, তবে, যতক্ষণ না ঐ সুরে কোন আনুসঙ্গিক মধুর হৃদয়-ভাবকে উদ্রেক করিতে পারে, ততক্ষণ অবশ্য আমাদিগের হৃদয়ে সঙ্গীতের পূর্ণ সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হয় না।

এই রূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে পৃথক্ পৃথক্ সৌন্দর্য্য-ক্ষেত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। আর একটি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর সৌন্দর্য্য-রাজ্য আছে—তাহা আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য। সামঞ্জস্য ও বিচিত্রতা আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যেরও মূল উপকরণ। দয়া প্রেম ভক্তি সৌহার্দ্য বাৎসল্য সরলতা—এ সমস্ত এক একটি বিশেষ বিশেষ আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য। পিতা ভিন্ন ব্যক্তি, পুত্র ভিন্ন ব্যক্তি, কিন্তু স্নেহ ভক্তির বন্ধনে উভয়ের মধ্যে যে যোগ তাহা হইতে একটি সৌন্দর্য্য ভাব প্রকাশ পায়—এই রূপ পিতা পুত্র, ভ্রাতা ভগিনী স্বামী স্ত্রী, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি বিচিত্র হইয়াও তাহাদিগের মধ্যে কেমন একটি সুন্দর যোগ আছে—যে পরিবারের মধ্যে এই বিচিত্রতার মধ্য হইতে সাম্য ভাবের স্ফূর্ত্তি পায়—সেই পরিবারের মধ্যে একটি অনুপম গার্হস্থ্য সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়। যার প্রতি যেরূপ সম্বন্ধ তাহার প্রতি সেইরূপ উপযুক্ত ব্যবহার করিলে যে সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়, তাহাকে আর এক কথায় নৈতিক সৌন্দর্য্য বলা যাইতে পারে। প্রজার সহিত রাজার যে সম্বন্ধ তাহাকে রাজনৈতিক সম্বন্ধ বলা যায়—এই সম্বন্ধের সামঞ্জস্য হইতে যে সৌন্দর্য্য নিঃসৃত হয় তাহাকে রাজনৈতিক সৌন্দর্য্য বলা যাইতে পারে।

প্রত্যেক প্রকার সৌন্দর্য্যের বিষয়ীভূত এক একটি শিল্প আছে। আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যের শিল্প কি? না—কবিতা—ইহাই অনুসঙ্গ নিয়মের অব্যবহিত অধীন। বাহ্য সৌন্দর্য্যের সহিত যখন হৃদয়-সৌন্দর্য্যের মিল হয় তখনই তাহা কবিতার বিষয় হইয়া পড়ে। যখন উষার বাহ্য-সৌন্দর্য্য, কবির আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যকে উদ্বোধিত করে, তখনই কবি উষাকে পবিত্র-মূর্ত্তি, স্নেহময়ী দেবী রূপে কল্পনা করিয়া এই রূপ বর্ণনা করেন:—"ঐ কে অমরবালা

দাঁড়ায়ে উদয়াচলে, ঘুমন্ত প্রকৃতি পানে চেয়ে আছে কুতূহলে!"

অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে বিচিত্রতা ও সামঞ্জস্য সকল প্রকার সৌন্দর্য্যেরই মূল নিয়ম। সৌন্দর্য্যের কোন একটি ধ্রুব আদর্শ না থাকিলেও তাহার মূলে কতক গুলি বিশ্বজনীন মূলতত্ত্ব নিহিত আছে এবং অন্যান্য মনোবৃত্তির ন্যায় সৌন্দর্য্য-রুচিও উন্নতিসাপেক্ষ, সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গেই সৌন্দর্য্য-রুচিও যে উন্নতি লাভ করে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে কখন কখন যে সম্পূর্ণ বিপরীত সৌন্দর্য্য-রুচির পরিচয় পাওয়া যায় তাহার কারণ আছে।

সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা এক কথা এবং সৌন্দর্য্য ভাব বাহিরে প্রকাশ করা স্বতন্ত্র কথা। কোন শ্রেষ্ঠ কবিকে জিজ্ঞাসা কর—তিনি যত খানি হৃদয়ে অনুভব করেন, তার শতাংশের একাংশও কবিতায় প্রকাশ করিতে পারেন কি না—যাঁর যে পরিমাণে এই প্রকাশ করিবার শক্তি আছে, তিনি সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ কবি। কোন ব্যক্তি সঙ্গীতের সমজ-দার হইতে পারেন কিন্তু নিজে গান করিতে গেলে হয় তো সকলের সমক্ষে তাঁহাকে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। Darwin যে বলেন "The idea also of beauty in natural scenery has arisen only within modern times"—এ কথা কতদূর সত্য সন্দেহস্থল। এ কথা স্বীকার করি—আমাদিগের অন্যান্য সকল বৃত্তির ন্যায় সৌন্দর্য্য-বৃত্তিও উন্নতি-সাপেক্ষ—কিন্তু অসভ্যেরা যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কিছু মাত্র অনুভব করিতে পারে না এ কথা বিশ্বাস হয় না। Darwin নিজেই বলিয়াছেন যে,অতীব অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও নানা প্রকার অলঙ্কার ব্যবহার প্রচলিত দেখা যায়। সেই অলঙ্কার সকল পরীক্ষা করিয়া দেখিলে নিশ্চয় প্রতীতি হইবে সেই সকল অলঙ্কার ফুল ও ফলের অসম্পূর্ণ অনুকৃতি মাত্র। কোন ফুলের অবিকল সৌন্দর্য্য অনুকরণ করা উৎকৃষ্ট শিল্পের কার্য্য। অসভ্যেরা ফুলের কিম্বা ফলের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারিলেও, তাহা শিল্পে প্রকাশ করা তাহাদের পক্ষে সহজ নহে। এই সৌন্দর্য্য-জ্ঞান শিল্পে প্রয়োগ করিবার সময়েই তাহাদিগের নানা প্রকার ভ্রম হইয়া পড়ে। তাহাদিগের অলঙ্কারের আকার যে প্রায়ই গোলাকার হয়, ইহাতেই বুঝা যায় যে, গোলাকারের সৌন্দর্য্য তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল এবং এই আকারটি মাত্র অপেক্ষাকৃত সাদা-সিধা বলিয়া তাহারা শিল্প কার্য্য দ্বারা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ফুল ও ফলের আকার-গত যে সামান্য সৌন্দর্য্য গোলাকৃতি সেইটুকু পর্য্যন্ত প্রকাশ করাই তাহাদিগের শিল্পের দৌড়; ফুলের পাপড়ি প্রভৃতি বিচিত্র সৌন্দর্য্যের অনুকরণ করা তাহাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। প্রস্ফুটিত কুসুমের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া প্রথমতঃ হয় তো তাহারা সেই সকল ফুল অঙ্গে ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হয়—পরে, যখন সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে শিল্পের অপেক্ষাকৃত উন্নতি হইল, তখন এই সকল প্রাকৃ-

তিক অলঙ্কার চিরস্থায়ী করিবার জন্য বোধ হয় উহারা তাহারই সাধ্যমত অনুকরণে ধাতু-নির্ম্মিত অলঙ্কার রচনা করিতে প্রথম আরম্ভ করে। বৃক্ষে রাশি রাশি পুষ্প-ফল লম্বিত দেখিয়া তাহারই অনুকরণে নাক কান ঠোঁট্ ফুঁড়িয়া পুষ্প ও ফলানুকৃতি অলঙ্কার সকল পরিবার রীতি বোধ হয় প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়।

যে অসভ্য মনুষ্য প্রথম এইরূপ অলঙ্কার পরিধান করিয়াছিল বোধ হয় তাহার মনে এই প্রকার কোন যুক্তি উপস্থিত হয় যে, ঐ পুষ্পসমূহে যখন বৃক্ষের শোভা বর্দ্ধিত হইতেছে, তখন তাহার অনুকরণে এই সকল কৃত্রিম অলঙ্কার সর্ব্বাঙ্গে বিলম্বিত করিলে অবশ্য শরীরের শোভা বৃদ্ধি হইবে—এই প্রকার একবার বিশ্বাস ও সংস্কার উৎপন্ন হইলে, ওষ্ঠ ফুঁড়িয়া "পেলে" নামক বালা পরিধান করা কুরুচির বিষয় মনে হইতে পারে না—বরং তাহাই সৌন্দর্য্য-সাধক বলিয়া সেই অসভ্যদিগের মনে হইবে। এবং তাহার দৃষ্টান্ত ও অনুকরণে তাহার স্বজাতীয়দিগের মধ্যে বংশপরম্পরাক্রমে এই প্রকার অলঙ্কার পরিধানের প্রথা প্রচলিত হইয়া এই প্রকার রুচি তাহাদিগের মধ্যে বদ্ধমূল হইবার কথা। এবং সৌন্দর্য্য-জ্ঞান মূলে থাকা সত্ত্বেও তাহার প্রয়োগে এই প্রকার ভ্রম হইয়া সুরুচিকেও ক্রমে কুরুচিতে পরিণত করিতে পারে। এই জন্য সকল দেশেই সৌন্দর্য্য-রুচি যেরূপ শিল্পের উপর প্রভাব বিস্তার করে, শিল্পও আবার সৌন্দর্য্য-রুচির উপর সেইরূপ প্রভাব প্রতিফলিত করে। অনুকরণ, অভ্যাস ও দৃষ্টান্তের প্রভাব মানব-প্রকৃতিতে অত্যন্ত বলবৎ; কুৎসিত বস্তুকে যদি আমরা সুন্দর বলিয়া রোজ রোজ দেখি, ক্রমে সেই বাস্তবিক কুৎসিত পদার্থও আমাদের চক্ষে সুন্দর হইয়া দাঁড়ায়। আমাদিগের বাজারে শিশুদের জন্য যে সব পুতুল বিক্রয় হয় তাহা অতি জঘন্য—এই বিশ্রী শিল্পকার্য্য ছেলেবেলা হইতে দেখিয়া দেখিয়া আমাদের শিল্পরুচি বিকৃত হইবার কথা। গুপ্ত Brothersকর্ত্তৃক এখন যে সচিত্র পঞ্জিকা প্রকাশিত হইতেছে তাহার চিত্র সকল অপেক্ষাকৃত অনেক উৎকৃষ্ট হওয়ায় সাক্ষাৎভাবে না হউক আনুসঙ্গিক ভাবেও সাধারণের সৌন্দর্য্য-রুচির উন্নতির পক্ষে যে সহায়তা করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অসভ্যদিগের অনেক বেশভূষা মূলতঃ সৌন্দর্য্য স্পৃহা হইতে উৎপন্ন না হইতেও পারে। সে বিষয়ে বিদেশীয় পর্য্যটকদিগের বুঝিবার ভ্রম হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। মালাই দ্বীপপুঞ্জ নিবাসী লোকেরা যে, কুকুরের ন্যায় দাঁত সম্পূর্ণ সাদা হওয়ায় লজ্জার বিষয় মনে করে, কিম্বা উপরিতন নীলনদকূলস্থ প্রদেশনিবাসী মনুষ্যগণ পাছে পশুর মত দেখিতে হয় বলিয়া যে সম্মুখভাগের দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলে তাহাতে কি প্রকাশ পায়? তাহারা কি সৌন্দর্য্যের জন্য এইরূপ করে? না, তাহারা পশুর হীনতা উপলব্ধি করিয়া যাহাতে কোন প্রকারে পশুদিগের মত দেখিতে না হয়, এই উদ্দেশেই এই প্রকার আচরণ করে? যে সকল লক্ষণকে পশুর বিশেষ লক্ষণ বলিয়া তাহাদিগের ধারণা হয়,

আপনাদিগের শরীরে সেই সকল লক্ষণের কিছুমাত্র আভাস থাকিলে তাহা সমূলে উৎপাটন করিতে প্রবৃত্ত হয়।

অনেক সময় কোন পদার্থ দেখিলে আমরা সুন্দর বলিয়া অনুভব করিতে পারি, কিন্তু কেন সুন্দর দেখাইতেছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারি না। অনেক সময়, সমস্ত অংশের সামঞ্জস্যে যে সৌন্দর্য্য উৎপন্ন হইতেছে তাহা আমরা বুঝিতে না পারিয়া তাহার কোন একটি অংশকে সৌন্দর্য্যের কারণ বলিয়া স্থির করি এবং এই রূপে ভ্রমে পতিত হই। মনে কর এক জনের মুখ-শ্রী আমাদিগের নিকট সুন্দর বলিয়া মনে হইল, কেন সুন্দর দেখাইতেছে, আমি তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কি বিশেষ লক্ষণ থাকায় অন্য মুখশ্রী অপেক্ষা তাহার মুখশ্রী সুন্দর হইয়াছে, তাহা বুদ্ধি দ্বারা নির্ণয় করিতে গিয়া হয় তো ভ্রমে পতিত হইলাম। আমার মনে হইল, সুবক্র "শুক-চঞ্চু জিনি" নাসিকাই তাহার মুখশ্রীর বিশেষ লক্ষণ—আমি এই স্থির সিদ্ধান্ত করিলাম শুকচঞ্চু বিনিন্দিত নাসিকাই তবে সৌন্দর্য্যের বিশ্বজনীন আদর্শস্থল। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে যেখানে সেখানে পাত্রাপাত্র ভেদ না করিয়া এই নিয়মের প্রয়োগ করিতে লাগিলাম, কাজেই সৌন্দর্য্য বিষয়ে আমার পদে পদে ভ্রম হইবার কথা। এক জনের মুখশ্রীতে চোক মুখ ঠোঁট প্রভৃতির যে রূপ গঠন, "শুক চঞ্চু জিনি নাসা" তাহারই মানানসই হওয়াতেই সেই মুখে সুন্দর দেখাইতেছে—কিন্তু তাই বলিয়া সকল মুখশ্রীতেই যে সেই "শুক চঞ্চু জিনি নাসা" সুন্দর দেখাইবে তাহার কোন অর্থ নাই। এক জনের অন্যান্য অংশের তুলনায় হয়তো তাহার ছোট কপাল মানাইতে পারে—কিন্তু সেই ছোট কপাল তাই বলিয়া সৌন্দর্য্যের বিশ্বজনীন আদর্শ হইতে পারে না। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব ধ্রুব হইলেও সৌন্দর্য্যের আদর্শ ধ্রুব হইতে পারে না। সকল সৌন্দর্য্যই আপেক্ষিক, তুলনাসাপেক্ষ। প্রত্যেক সুন্দর পদার্থের বিভিন্ন সৌন্দর্য্য সেই পদার্থগত অংশ-সমূহের বিভিন্ন প্রকার সংস্থান-প্রণালীর উপর নির্ভর করে, যে কোন সুন্দর পদার্থের যেরূপ সংস্থান-প্রণালী—তদনুসারেই তাহার সামঞ্জস্য বিধান হইয়া থাকে। এই জন্য পাত্রাপাত্র অবস্থা বিবেচনা না করিয়া এক জনের কিম্বা এক পদার্থের সৌন্দর্য্য আর এক জন কিম্বা আর এক পদার্থে আরোপ করিলেই ভ্রমে পতিত হইতে হয়। স্থূল কথা—কোন জীব-শরীরের অবয়ব-সংস্থানের নানা প্রকার প্রণালী হইতে পারে,—কিন্তু তাহাদিগের অবস্থাগত সামঞ্জস্য হইতেই তাহাদিগের বিশেষ সৌন্দর্য্য স্ফূর্ত্তি পায়। এই জন্য যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে—ঘোটক সুন্দর—না কুকুর সুন্দর—আর আমি যদি উৎকৃষ্ট আদর্শের ঘোড়া ও উৎকৃষ্ট আদর্শের কুকুর উভয়ই দেখিয়া থাকি—তাহা হইলে আমি কখনই বলিতে পারি না যে, ঘোড়া কুকুর অপেক্ষা সুন্দর,

কিম্বা কুকুর ঘোড়া অপেক্ষা সুন্দর—তাহাদের সৌন্দর্য্য আদর্শ স্বতন্ত্র—ঘোড়া ঘোড়ার হিসাবে সুন্দর—কুকুর কুকুরের হিসাবে সুন্দর। তাহার অর্থ এই, উহাদের মধ্যে যাহার যেরূপ শরীরের অবয়ব-সংস্থান প্রণালী তদনুসারেই তাহাদের প্রত্যেকের অবয়ব-সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। যাহার যে পরিমাণে এইরূপ সামঞ্জস্য থাকে, তাহাকে সেই পরিমাণে আমরা সুন্দর বলি।

আরব দেশীয় ঘোড়াকে এই জন্য আমরা ঘোটক জাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া থাকি। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আরব দেশীয় ঘোড়া সুন্দর না গাধা সুন্দর? গাধা অপেক্ষা আরব ঘোড়া যে অসংখ্য গুণে সুন্দর তাহাতে বোধ হয় কাহারো দ্বিরুক্তি হইবে না। কেন সুন্দর? না—যেহেতু গাধা অপেক্ষা আরব-ঘোড়ার অবয়ব-সংস্থানের অধিক সামঞ্জস্য আছে। পশু-সাধারণের মধ্যে শূকর গাধা প্রভৃতির কোন কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নিতান্ত অসামঞ্জস্য থাকা প্রযুক্তই তাহারা জন্তুর মধ্যে কুৎসিত বলিয়া পরিগণিত হয়। যাহা বিবৃত হইল তাহাতে বোধ হয়—যথেষ্ট প্রমাণ হইয়াছে যে সমতা ও সামঞ্জস্যই সৌন্দর্য্যের মূল উপাদান। কোন পদার্থ কিম্বা বিষয়ের সমতা কিম্বা সামঞ্জস্য দেখিয়া আমাদিগের মনে যে, সুখোদয় হয় তাহারই নাম সৌন্দর্য্য। যেহেতু সৌন্দর্য্য তুলনা-সাপেক্ষ—সেই হেতু তুলনা-বৃত্তি ও সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সৌন্দর্য্য-রুচিরও উন্নতি হইয়া থাকে।

গরবিনী।

১

গরবিনি! থাক তুমি আপন গরবে,
কে চায় গো—কে চায় গো—তব ভালবাসা?
নাগাল কি পায় তোমা অধম মানবে?
বহু দূর তুমি—তায় নাহি মোর আশা।

২

যদিও উজ্জ্বল তুমি তারার মতন
তোমার কিরণে মোর নাহি কোন ফল,
অত দূর হতে তব শীতল কিরণ
উত্তাপিতে পারে কি গো নিম্ন ধরাতল?

৩

জীবন-পথের মোর নাশিতে তিমির
নাহি চাহি দীপ্তিমান তারকার ভাতি,
চাহি মাত্র দীপ এক মলিন মাটির—
কুটীর করিবে আলো হবে যবে রাতি।

৪

চাহি না গো বট-বৃক্ষ উন্নত মহান্
ছাইবার তরে মোর এ ক্ষুদ্র কুটীর,
চাই, যেন নম্র মুখী লতার বিতান
ঘন আলিঙ্গনে ছায় আমার প্রাচীর।

৫

না চাহি হীরক-খণ্ড উজ্জ্বল অতুল,
মণি মুক্তা মাণিক্যের কোন অলঙ্কার.
আমার সে মনোনীত—ভুঁই-চাঁপা ফুল,
দাও মোরে, রাখি তারে হৃদয় মাঝার।

৬

তোমার রূপের যশ গাক্ ত্রিভুবনে,
তোমা পানে সকলের হোক দৃষ্টিপাত,
আমি যারে ভাল বাসি, চাহি তার সনে
প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া থাকি দিবা রাত।

৭

না রাখি তোমার কোন ভাল বাসা-ধার,
সে প্রত্যাশা নাহি মোর, শোন গরবিনি,
ঝলসিয়া দাও নেত্র অন্য যার তার,
বাঁধিতে নারিবে কভু আমারে, মোহিনি!

প্রকৃতি এবং তাহার মূল-নিয়ম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উন্নতির নিয়ম।

ভারতীর ৩ ভাগ ১ সংখ্যা ২৯ পৃষ্ঠার পর।

উন্নতির নিয়ম আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছি একবার প্রণিধান করিয়া দেখা যাউক্। প্রথমে বলিয়াছি যে, সৃষ্টির যত কিছু ব্যাপার সমস্তই সাম্যবৈষম্য দুয়ের সংযোগসাপেক্ষ; কেবলি যদি সাম্য ভাব থাকে, বৈষম্য কিছুই না থাকে, তাহা হইলে সে নির্জীব ভাবের থাকা না-থাকারই মধ্যে, কেবলই যদি বৈষম্য ভাব থাকে সাম্যভাব কিছুই না থাকে তাহা হইলে সে বিশৃঙ্খল-ভাবের থাকাও না-থাকারই নামান্তর; এক যাহা আছে তাহাই থাকিয়া যাইতেছে, তাহা হইতে নূতন কিছুই হইতেছে না, এরূপ "এক" শূন্যের ন্যায় নিস্ফল,—শূন্যকে যত দিয়া গুণ কর না কেন তাহা শূন্যই থাকিয়া যায়; আর এখন যাহা আছে পর মুহূর্ত্তে যদি তাহার চিহ্ন মাত্রও না থাকে, আদ্যোপান্ত সর্ব্বাংশে বিভিন্ন আর একটি সামগ্রী উপস্থিত হয়, এইরূপ যদি ক্রমাগতই সম্পূর্ণ নূতন নূতন ব্যাপার নিরবচ্ছেদে সংঘটিত হইতে থাকে, তাহা হইলে, শুদ্ধ একটি মাত্র মুহূর্ত্ত যেমন তাহার অব্যবহিত পর মুহূর্ত্ত এবং পূর্ব্বমুহূর্ত্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে একেবারেই শূন্য হইয়া যায়, তেমনি সেইরূপ-একটি মুহূর্ত্তের উপর ভর করিয়া ঘটনা ঘটিতেছে, পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের ঘটনার সহিত কোন অংশেই তাহার সাম্য নাই, সমস্ত ঘটনাই এরূপ হইলে সেই অসম্বদ্ধ মুহূর্ত্ত-টুকুর ন্যায় শূন্যত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে নিতান্ত

বৈষম্য-রহিত সাম্য কিংবা নিতান্ত সাম্য-রহিত বৈষম্য সৃষ্টির কুত্রাপি সম্ভবে না। অতএব সৃষ্টিতে আপেক্ষিক সাম্য-বৈষম্য ভিন্ন ঐকান্তিক সাম্য-বৈষম্য স্থান পাইতে পারে না। পরে বলিয়াছি যে, উচ্চশ্রেণী অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীতে অভাবের আধিক্য সুতরাং বৈষম্যের আধিক্য। পরস্পর-সঙ্গ দ্বারা পরস্পরের অভাব দূর হইলে বৈষম্য ক্রমশই সাম্যে পরিণত হয়, এইরূপ করিয়া নীচ শ্রেণী উচ্চ শ্রেণীর সহিত সাম্য লাভ করে, ইহারই নাম উন্নতি।

পরে বলিয়াছি যে, বৈষম্য হইতে পর্য্যায় ক্রমে সাম্যে উত্থান করিবার ছয়টি ধাপ নির্দ্দিষ্ট আছে। বৈষম্য সম্বন্ধ যেখানে, সেখানে অভাব পূরণের চেষ্টা, এবং সাম্য সম্বন্ধ যেখানে, সেখানে ভাব সংস্থাপনের চেষ্টা বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। প্রথম ধাপে বিষয়াসক্তি; এইধাপে স্বার্থ অভাব-পূরণ-মানসে আমাদিগকে অর্থ সংগ্রহ করিতে পরামর্শ দেয়। দ্বিতীয় ধাপে দাম্পত্য প্রেম; এই ধাপে ধর্ম্ম ভাব-সংস্থাপন-মানসে আমাদিগকে ন্যায়-সঙ্গত ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেয়। তৃতীয় ধাপে বাৎসল্য; এই ধাপে অভাব-পূরণ-মানসে শক্তি আমাদিগকে কর্ত্তৃত্ব করিতে পরামর্শ দেয়; চতুর্থ ধাপে সৌহার্দ্দ; এই ধাপে ভাব-সংস্থাপন-মানসে সৌন্দর্য্য আমাদিগকে শোভন ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেয়; পঞ্চম ধাপে ভক্তি; এই ধাপে অভাব পূরণ-মানসে মঙ্গল আমাদিগকে হিতানুষ্ঠান করিতে পরামর্শ দেয়। ষষ্ঠ ধাপে সর্ব্বনির্ব্বিশেষ শৃঙ্খলমুক্ত প্রেম, এই ধাপে ভাব-সংস্থাপনার্থে সত্য আমাদিগকে বহির্জগৎ অন্তর্জগৎ আত্মা পরমাত্মা সকলের সহিত সামঞ্জস্য সাধনে পরামর্শ দেয়।

সঙ্গীতের যেমন সপ্তক-প্রবাহ অনন্ত, উন্নতির ঐ ধাপ কয়টিও সেইরূপ। যদিও ছয়টি ধাপ মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে কিন্তু তাহার আদিতে আত্মার অপরিস্ফুট জ্ঞান প্রেম এবং তাহার চরম প্রান্তে আত্মার পরিস্ফুট জ্ঞান-প্রেম,দুই দিক্‌কার দুই ষড়জ সুরের (সা—এই আদি সুরের) ন্যায় গণ্য হইতে পারে। অতঃপর ভূতসৃষ্টি হইতে মনুষ্যসৃষ্টি পর্য্যন্ত, সমস্ত জগৎ কি প্রণালীতে এক সপ্তক হইতে উচ্চতর আর এক সপ্তকে উত্থান করে তাহা প্রদর্শন করা যাইতেছে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত মনুষ্য এবং মনুষ্যের মনোবৃত্তির মধ্যেই আলোচ্য-বিষয়ের অন্বেষণ-কার্য্য আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, এখন বহির্জগতে তাহাকে একবার বিচরণ করিতে দেওয়া যাউক।

ভৌতিক পদার্থ-সকলের গোড়ার ভাব আকাশ-ব্যাপ্তি; এবং বিক্ষেপ-শক্তিই সেই আকাশ-ব্যাপ্তি-প্রবর্ত্তক। ধূমরাশি যে শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমশই দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, আদিম কালের সূক্ষ্ম ভূত তাহা অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সেই বিক্ষেপ-শক্তির বশবর্ত্তী ছিল ইহাতে আর সংশয় নাই।

বিষয়াসক্তি এবং স্বার্থ যেমন মনুষ্য-সমাজে ব্যক্তিগণের পার্থক্য সাধন করে,

বিক্ষেপ-শক্তি সেইরূপ ভৌতিক রাজ্যে পরমাণুগণের পার্থক্য সাধন করে। তাহার পরে রাসায়নিক আকর্ষণের বশে পড়িয়া পরমাণু সকল সংহত-ভাব ধারণ করে, মনুষ্য-সমাজে যেমন দম্পতি-প্রেম, ভৌতিক রাজ্যে সেইরূপ রাসায়নিক আকর্ষণ। রাসায়নিক শক্তির গুণ এই যে তাহা ভূতদ্বয়কে বন্ধন করিয়া অল্প স্থানের মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া আনে এবং তাহাতে-করিয়া উত্তাপের উৎপত্তি হয়; ভূতদ্বয় যখন রাসায়নিক শক্তির বন্ধনে পড়িয়া একই বস্তু রূপে পরিণত হয়, তখন তাহা হইতে উষ্মা উদ্গীরিত হইয়া ভারাকর্ষণ বলে মূল বস্তুর আয়ত্তের মধ্যে বিধৃত হইয়া থাকে; মনুষ্য সমাজে যেমন বাৎসল্য ভাব, ভৌতিক রাজ্যে সেইরূপ ভারাকর্ষণ; গুরু জনের স্নেহ যেমন নীচগামী, গুরু বস্তুর ভারাকর্ষণও সেইরূপ। পরে উক্ত উষ্মরাশি লঘুত্ব গুরুত্ব অনুসারে দূর নিকটে প্রসারিত হইয়া যোগাকর্ষণ-বলে এক এক স্তরে এক এক দল মিলিয়া মিসিয়া স্থিতি করে; ইহাতে-করিয়া সেই মূল বস্তুর চতুর্দ্দিকে কতকগুলা সমকেন্দ্রিক চক্র-পরম্পরা আবির্ভূত হয়। মনুষ্য-সমাজে যেমন সৌহার্দ্দ ভৌতিক রাজ্যে সেই রূপ যোগাকর্ষণ। পরে কেন্দ্রাতিগ এবং কেন্দ্রানুগ শক্তির প্রভাবে প্রত্যেক বেষ্টন-চক্রের কোন না কোন স্থানে তদীয় সমস্ত পরমাণু জড় হইয়া ক্রমে ক্রমে গোলাকারে পরিণত হয়; সূর্য্য হইতে গ্রহগণ যখন এই রূপ দূরে সরিয়া দাঁড়ায়, অথচ সূর্য্যের আকর্ষণ মান্য করিয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করে, যেমন স্বাধীনভাব প্রাপ্ত হয় সেই সঙ্গে সূর্য্যের অধীনতা স্বীকার করে, মনুষ্য-সমাজে গুরু লঘু ব্যক্তির মধ্যে এই ভাবটি দৃষ্ট হইলে তাহা ভক্তি নামে অভিহিত হয়। তাহার পরে সূর্য্য এবং সমস্ত গ্রহগণের মধ্যে যখন একটি সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হয়, সকলের মধ্যে যখন একটি বাঁধা-প্রণালী অনুসারে স্থির ভাবে কার্য্য চলিতে থাকে, তখনকার সেই ভাবটি মনুষ্য-সমাজে দৃষ্ট হইলে তাহা বিশ্বব্যাপী প্রেম বলিয়া উক্ত হয়। এই ছয়টি ধাপের আদিতে জীবগণের বাসোপযোগী পৃথিবী সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্য একটি যাহা অব্যক্ত রূপে বর্ত্তমান ছিল, তাহা প্রথম সপ্তকের আদিসুর এবং তাহার অন্তে পৃথিবীর সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিটি দ্বিতীয় সপ্তকের আদিসুর।

পৃথিবীর সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিটি সৌর-জগতের সহিত সামঞ্জস্য-সাপেক্ষ, তাহার ব্যক্তি-গত স্বাতন্ত্র্যটি মূলগত ঐক্য-সাপেক্ষ, এজন্য বলা যাইতে পারে যে তাহা সাম্য-প্রধানও নহে বৈষম্য-প্রধানও নহে, পরন্তু তাহা দুয়ের মাঝা-মাঝি। অতঃপর দ্বিতীয় সপ্তকের অবশিষ্ট ছয়টি ধাপ প্রদর্শিত হইতেছে।

পৃথিবীর যে অবস্থায় বৈষম্যের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়া তাহার পরমাণু-সকল বিক্ষেপ-শক্তি দ্বারা দূরে দূরে প্রসারিত হয়, তাহাই তাহার উন্নতি সপ্তকের প্রথম ধাপ। তাহার পরে যখন রাসায়নিক আকর্ষণ-বশে তাহার আগের ভাব অভিব্যক্ত হয়,

সেই তাহার উন্নতি-সপ্তকের দ্বিতীয় ধাপ। তাহার পরে সেই আগ্নেয় পিণ্ড যখন জলরাশি দ্বারা পরিবৃত হয়, সেই তাহার উন্নতি-সপ্তকের তৃতীয় ধাপ; তাহার পর বায়ু হইতে অঙ্গারাদির মূল-উপকরণ-সকল পৃথক্-কৃত হইয়া যখন নানাবিধ ভূস্তর সংগঠিত হইতে থাকে, সেই তাহার উন্নতি-সপ্তকের চতুর্থ ধাপ; পৃথিবীর বায়বীয় অবস্থাতে বিক্ষেপ শক্তি, আগ্নেয় অবস্থাতে রাসায়নিক আকর্ষণ, জলীয় অবস্থাতে ভারাকর্ষণ, এবং মৃত্তিকাদির স্তর-নির্ম্মাণাবস্থাতে যোগাকর্ষণ বিশিষ্ট রূপে কার্য্য করিয়া থাকে। তাহার পর যখন পৃথিবীর জল বায়ু মৃত্তিকা প্রস্তর প্রভৃতি উচ্চ নীচ সমস্তের যাহার যে অধিকার তাহা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আনীত হয়, সেই তাহার উন্নতি-সপ্তকের পঞ্চম ধাপ; এবং তাহার পরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুষারখণ্ড জলে ভাষমান হইয়া সমুদ্র তলস্থিত উচ্চ নীচ ভূমি সকল মাজিয়া ঘসিয়া সমান করিয়া ফেলে; এবং কালে সেই-সকল ভূমি জলরাশি ভেদ করিয়া দ্যুলোকের আলোকে সমুত্থিত হয়, তখন তাহা মনুষ্যের বাসোপযোগী হয়, সেই তাহার উন্নতি-সপ্তকের চরম ধাপ; এক দিকে এই যেমন ভৌতিক সৃষ্টি, আর এক দিকে তেমনি অচেতন সচেতন জীবসৃষ্টি, উভয়ই পাশাপাশি উন্নতি-সোপান অবলম্বন করিয়া উচ্চ উচ্চ ধাপে আরোহণ করে।

এখন অবধি সপ্তকের উপমা-অনুসারে উন্নতি সোপানের এক একটি ধাপকে এক একটি সুর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইবে। সপ্তকের সুর-পরম্পরা এইরূপ একটি সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে যে, পরপরবর্ত্তী সুরের ভবিতব্যতা পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী সুরে বীজরূপে অবস্থিতি করে। যাহা কিছু আছে সমস্তটিকে যদি একটি সপ্তক বলিয়া ধরা যায়, তবে দাঁড়ায় এই যে তাহার প্রথম সুর (সা) পরমাত্মা এবং অষ্টম সুর (সা) মনুষ্য। মনুষ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী সুর—জীবজন্তু। মনুষ্য-সৃষ্টির পূর্ব্বে মনুষ্যের ভবিতব্যতা জীবজন্তুগণের ভিতরে বীজ ভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। জীবজন্তুগণের পূর্ব্ববর্ত্তী সুর—উদ্ভিদ। এক ত এই দেখা যায় যে জীবগণের যাহা কিছু মুখ্য প্রয়োজন সমস্তই কোথাও বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোথাও বা পরোক্ষ সম্বন্ধে উদ্ভিদরাজ্য হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে, তাহাতে আবার জীবোৎপত্তির পূর্ব্বে জীবগণের সমস্ত গঠনোপকরণ উদ্ভিদ-জগতের মধ্যেই পরিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। উদ্ভিদের পূর্ব্ববর্ত্তী সুর—ধাতু, ধাতু—অর্থাৎ রাসায়নিক মূল পদার্থ। ধাতুর পূর্ব্ববর্ত্তী সুর—আদিম পৃথিবী; আদিম কালের বাষ্পভূত পৃথিবীতে সকল ধাতুই একাকার অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল। আদিম পৃথিবীর পূর্ব্ববর্ত্তী সুর—জ্যোতিষ্ক জগৎ; তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সুর নৈহারিক Nebular জগৎ। সর্ব্বসমেত এইরূপ

নৈহারিক জগৎ
জ্যোতিষ্কজগৎ
পৃথিবী

ধাতু
উদ্ভিদ
জীবজন্তু
মনুষ্য

এই মূল সপ্তকের প্রতি প্রণিধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সকলের মধ্যে সাম্য ভাব যেটি তাহা বস্তুগত এবং বৈষম্য ভাব যেটি তাহা আকারগত এবং গুণগত। মনুষ্যের সমস্ত উপকরণ জীব-জগতে, জীব-জগতের সমস্ত উপকরণ উদ্ভিদ জগতে, এইরূপ করিয়া নৈহারিক জগৎ পর্য্যন্ত উঠিলে শেষোক্তে সর্ব্বজগতের সমস্ত উপকরণই বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি মনুষ্যে নিকৃষ্ট জীবে, নিকৃষ্ট জীবে উদ্ভিদে, উদ্ভিদে ধাতুতে, ধাতুতে আদিম পৃথিবীতে, আদিম পৃথিবীতে তৎপূর্ব্বের জ্যোতিষ্ক জগতে, জ্যোতিষ্ক জগতে নৈহারিক জগতে, অলঙ্ঘনীয় প্রভেদ বিদ্যমান। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে কার্য্য এবং কারণের মধ্যে যেমন বস্তুগত সাম্য তেমনি গুণগত বৈষম্য উভয়ই থাকিতে চায়। কোন একটি সুর ধরিয়া তাহার পূর্ব্ব সুরে উঠিতে হইলে বৈষম্য অবলম্বন ব্যতিরেকে কখনই তাহা সম্ভবে না; মনুষ্য হইতে জীব-জগতে যাও একটি স্বতন্ত্র রাজ্যে গিয়া পড়িবে; জীব হইতে উদ্ভিদরাজ্যে যাও সেখানেও ঐরূপ; সমস্ত জগতের লয়-স্থান স্বরূপ সেই যে আদিম নৈহারিক জড় জগৎ যাহার একমাত্র গুণ কেবল জড়ত্ব তাহার সম্বন্ধেও ঐরূপ; অর্থাৎ যেমন মনুষ্যের গুণ হইতে জীবের গুণ ভিন্ন, জীবের গুণ হইতে উদ্ভিদের গুণ ভিন্ন, সেইরূপ আবার যেখানে সকল জগতের গুণ জড়তারূপ একটি মাত্র গুণে পর্য্যবসিত হয় সেখান হইতে আর এক ধাপ উপরে উঠিতে হইলে জড়তা-গুণ-হইতে ভিন্ন আরেক প্রকার গুণ মানিতেই হয়; জড়তা কি? না অজ্ঞান; যাহা অজ্ঞান হইতে ভিন্ন তাহা অবশ্য জ্ঞান; অতএব জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাই সকল জগতের আদি সুর।

ক্রমশঃ

সামুদ্রানুমিতিবিদ্যা।

দ্বিতীয় ভাগ ১১ সংখ্যা ভারতীর ৫০৩ পৃষ্ঠার পর।

একজন বিদেশীয় বহুদর্শী পুরুষ বলিয়া গিয়াছেন, "মনুষ্যের মুখ, মনুষ্যের চরিত্রের সূচীপত্র।" দেশীয় পণ্ডিতদিগেরও বিশ্বাস ছিল "কিম্বিব ন ভাসতে মুখে?" মুখে কি না প্রকাশ পায়? অন্তরস্থ সারল্য কৌটিল্য সমস্তই প্রকাশ পায়।

মুখ দেখিয়া চরিত্রাদি অনুমান করা যায়, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এদেশের

পুরাতন সামুদ্রিকেরা যেরূপ যেরূপ লিখিয়া গিয়াছেন তাহার অনেকাংশই পাঠকগণের গোচর করা হইয়াছে। এবারে অন্যান্য অবয়বের কথা বলিব এবং উত্তমাঙ্গের কথা কিছু বলিব।

মূর্দ্ধা—মাথার উপরিভাগ।

মূর্দ্ধা বা মস্তকের গঠন সকলের সমান নহে। সকলের রুচিও সমান নহে। মস্তকের সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির কোন যোগ আছে তন্নিমিত্তই মস্তকের গঠন দেখিয়া তদন্তর্ব্বাসী মানব স্বভাব অনুমান করা যায়, ইহা সামুদ্রিকেরা বিশ্বাস করিতেন। তাহাদের পরীক্ষা বা বিশ্বাস অনুসারে লিখিত সিদ্ধান্ত এই যে, মনুষ্য অসংখ্য সুতরাং মস্তকের গঠনও অসংখ্য প্রকার সত্য; কিন্তু সাধারণ পক্ষ বিবেচনা করিলে মাথার গঠন অষ্ট প্রকার। পরিমণ্ডল, ছত্রাকার, চিপীট, করোটি, ঘট, দ্বিমস্তক, নিম্ন ও বহুনিম্ন। প্রধান কল্পে এই (৮) আট শ্রেণীর মস্তক; ইহাদের প্রত্যেক শ্রেণীর সংক্ষেপ ফলাফল এই—

পরিমণ্ডলৈর্গবাঢ্যাশ্ছত্রাকারৈঃ শিরোভিরবনীশাঃ।

চিপীটৈঃ পিতৃমাতৃঘ্না করোটিশিরসাং চিরাদ্মৃত্যুঃ।"

পরিমণ্ডল—অর্থাৎ গোল। যাহাদের মস্তক গোলাকৃতি তাহারা গবাঢ্য অর্থাৎ পশুভাগ্যসম্পন্ন ধনী হয়।

প্রাচীন কালে গো, মেষ, ছাগ, প্রভৃতি পশুবর্গই এদেশের ধন ছিল, সুতরাং তৎকালের ধনীতে আর এ কালের ধনীতে কিছু প্রভেদ আছে, থাকিলেও হানি নাই; যেহেতু ফল সমান। অতএব উক্ত বচন অনুসারে আমরা বলিতে পারিতেছি যে পরিমণ্ডল-মস্তক পুরুষেরা ধনী হয়। ধনী হয় কি? না তাহাদের ধনবুদ্ধি কিছু সাধারণাপেক্ষা বিশেষ থাকে।

ছত্রাকার—ছত্রাকার মস্তক কিরূপ? তাহা তাঁহারাই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন, যাঁহারা পুরাতন কালের ছত্র দেখিয়াছেন। এখন আর সে কালের ছাতা নাই, কি দেখাইয়া গঠনটী অনুভব করাইব? অগত্যা ভেকছত্র অর্থাৎ বেঙের ছাতা মনে কর। যাহাদের মস্তক তত্তুল্য গঠনসম্পন্ন তাঁহারা অবনীশ অর্থাৎ রাজা। রাজা কি সত্য সত্যই রাজা? তাহা নহে। রাজার ন্যায় সুখবুদ্ধি বা সুখী হয়।

চিপীট—চিঁড়ে। যাহাদের মস্তক চিঁড়ের মত চ্যাপ্টা তাহারা পিতৃমাতৃঘ্ন, অর্থাৎ নিষ্ঠুর। কোন প্রকার বল থাকিলে চ্যাপ্টা মাথার লোকদিগের নিষ্ঠুরতা কার্য্যে পরিণত হয়, বল না থাকিলে তাহা অন্তরে অন্তরে সঞ্চরণ করে মাত্র।

করোটি—মড়ার মাথার খুলি। মাথাটী যদি জীবন্ত অবস্থাতেও খুলি খানির মত হয় তাহা হইলে সে দীর্ঘায়ু হয়।

"ঘটমূর্দ্ধা ধ্যানরুচির্দ্বিমস্তকঃ পাপকৃদ্ধনৈস্ত্যক্তঃ।

নিম্নস্তু শিরোমহতাং বহুনিম্নমনর্থদং ভবতি।"

একটা ঘট উপুড় করিয়া রাখিলে যেরূপ দেখা যায়, যাহার মস্তকের গঠন তদ্রূপ, তিনি "ঘটমূর্দ্ধা।" এই ঘটমূর্দ্ধা ব্যক্তিরা চিন্তাশীল; কোন না কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারে না। [যদি "ধ্যান-রুচি" এমন পাঠ হয় তবে তাহার অর্থ শব্দ-রুচি। তাহারা শব্দ শুনিতে ভাল বাসে; অথবা সঙ্গীত শুনিতে ভাল বাসে]

দ্বিমস্তক—কপাল ও মূর্দ্ধা যেন যোড়া, যেন দুই থানা আলাহিদা। অর্থাৎ কপালের উপরে ও শিখা স্থানের নিম্নে একটী "থাক" থাকিলে তাহাকে দ্বিমস্তক বলা যায়। এই দ্বিমস্তক পুরুষ মাত্রেই পাপকৃৎ অর্থাৎ পাপমতি ও অন্তঃকুটিল। এরূপ ব্যক্তিরা কোন ক্রমেই ধনশালী হইতে পারে না।

নিম্ন—মাথার উপরি ভাগটা যুবতীর স্তনতুল্য উচ্চ না হইলেই তাহা নিম্নমস্তক। টিপি না থাকিলে ও সমোচ্চ সমতল সমগোল হইলেও নিম্ন শ্রেণীতে যাইবেক। এরূপ নিম্ন মস্তক মহৎ ব্যক্তিদেরই হইয়া থাকে। অর্থাৎ নিম্ন মস্তক দেখিলে তাহার অন্তরে কোন না কোন মহত্ত্ব থাকা অনুমিত হইবেক।

বহু নিম্ন—মস্তকের তালু উচ্চ এবং পশ্চাদ্ভাগও উচ্চ; মধ্য ভাগ তাহার সমান নহে অর্থাৎ "খাল" থাকিলে তাদৃশ মস্তকের নাম "বহুনিম্ন।" বহুনিম্ন মস্তক হইলে অনেকবিধ অনর্থ আনয়ন করে। অর্থ এই যে, যাহাদের মস্তক বহু নিম্ন তাহাদের বুদ্ধি অতীক্ষ্ণ ও অপরিষ্কৃত। তাহারা সকল কার্য্যেই অনর্থ ঘটায়। (অসার বুদ্ধি বলিলেও বলা যায়)।

হাস্য ও রোদন।

হাস্য ও রোদনের সহিত অন্তরের অতি নিকট সম্বন্ধ। অন্তরের ভাব অনুসারেই হাস্যের প্রবৃত্তি; অন্তরের ভাব অনুসারেই রোদনের উৎপত্তি। সদ্যঃপ্রসূত অবস্থা হইতেই এই দুইটী প্রতিক্ষণে উদ্ভূত হইতেছে; এজন্য হাস্যের ভঙ্গী ও রোদনের ভঙ্গী এক এক জনের এক এক প্রকার স্বভাবভুক্ত হইয়া গিয়াছে। সকলের মনে সমান ভাবে সুখ দুঃখ বিম্বিত হয় না; একারণ সকলের হাঁসি কান্না সমান স্বভাবের নহে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, সামুদ্রিকেরা হাঁসি কান্নাকেও চরিত্রানুমাপক বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহারা বিশ্বাস ও পরীক্ষালব্ধ প্রায়িক ফল অনুসারে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা এই:—

"রুদিতমদীনমনশ্রুস্নিগ্ধঞ্চ শুভাবহং মনুষ্যানাম।

রুক্ষং দীনং প্রচুরাশ্রু চৈব ন শুভপ্রদং পুংসাম।"।

যাহাদের রোদনকালে অত্যাল্প মাত্র অশ্রু বিসর্জিত হয়, চক্ষুতে দীনতা লক্ষ্য হয় না, স্নিগ্ধদৃশ্য হইয়া দাড়ায়; তাহাদের সে রোদন শুভ। অর্থাৎ এরূপ ভাবের রোদমান-স্বভাবেরা অতি ধীরান্তঃকরণের লোক। আর যাঁহাদের রোদনে প্রচুরতর অশ্রু আবর্জিত হয়, নেত্রে দৈন্য অবলম্বন করে এবং রুক্ষ দৃশ্য হইয়া দাড়ায় তাঁহাদের

সে রোদন শুভপ্রদ নহে। অর্থাৎ তাঁহারা লঘুচিত্তের শ্রেণীর লোক।

"হসিতং শুভদমকম্পং সনিমীলিত লোচনঞ্চ পাপস্য।

দুষ্টস্য হসিতমসকৃৎ সোন্মাদস্যাসকৃৎ-প্রান্তে।"

অকম্পহাস্য শুভপ্রদ আর যাঁহারা নিমীলিত লোচনে (চোক বুঁজিয়ে) হাসেন, তাঁহারা নিশ্চিত পাপী। তাঁহাদের হৃদয় দুরভিসন্ধিতে পরিপূর্ণ। যাঁহারা বার বার হাসেন, সর্ব্বদাই হাসেন, তাঁহারা দুষ্ট স্বভাবের লোক। সন্তোষ তাঁহাদেরই দাস। যদিও বায়ুরোগী অর্থাৎ পাগলেরা সর্ব্বদা হাসে সত্য; তথাপি পাগলের হাসিতে ও দুষ্টস্বভাবদিগের হাসিতে একটু প্রভেদ আছে। "সোন্মাদস্যাসকৃৎ প্রান্তে" উন্মাদের সার্ব্বকালিক হাস্য প্রান্তে ওষ্ঠের প্রান্তে অর্থাৎ সে হাসি ফাঁকা হাসি।

"চাউনি দেখিলেও লোকের অন্তর জানা যায়। অন্তঃস্বভাবের সহিত দৃষ্টির (চাউনির) সংযোগ থাকা সকলই স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। চক্ষুর গঠনভঙ্গী, চরিত্রের অনুমাপক, ইহা গত দ্বিতীয় সংখ্যক ভারতীতে প্রকাশ করা গিয়াছে. এবারে দৃষ্টির বিষয় বলা যাউক।

সামুদ্রিকানুমিতিবিদ্যার মতে, মনুষ্যের দৃষ্টি (চাউনি) ছয় প্রকার। স্থূল দৃষ্টি, দীন দৃষ্টি, স্নিগ্ধ দৃষ্টি, অনিমেষ দৃষ্টি, ও কুঞ্চিত দৃষ্টি।

স্থূল দৃষ্টি—পরিস্কার তরল দৃষ্টিকে স্থূলদৃষ্টি বলে। কোন বস্তু দর্শন কালে ভ্রূত্বক্ কুঞ্চিত হয় না, নেত্রচ্ছদ বিক্ষিপ্ত হয় না, সংযোগ মাত্রেই যেন দেখা শেষ হইয়াছে এবং নিমেষপাত না হইতেই যেন দৃষ্টি দৃশ্য বস্তুর অন্তর ভেদ করিয়া আসিয়াছে। এরূপ দৃষ্টিকে 'পরিস্কার তরল' বলা যাইতে পারে। 'মন্ত্রিত্বং স্থূলদৃশাং' এই পরিস্কার তরল দৃষ্টির পুরুষেরা মন্ত্রী হয় অর্থাৎ ইহাদের মন্ত্রণাশক্তি প্রবল *।

দীন দৃষ্টি—দীন দৃষ্টি কি? তাহা সকলেই অনুভব করিতে সমর্থ। দীন দৃষ্টি দরিদ্রতার চিহ্ন।

স্নিগ্ধ দৃষ্টি—স্নিগ্ধ দৃষ্টিও সহজবোধ্য। বিপুল ভোগশালী ব্যক্তিদেরই দৃষ্টি স্নিগ্ধতা প্রাপ্ত হয়। 'স্নিগ্ধা বিপুলার্থভোগবতাম্' ইত্যাদি সামুদ্রিক শাস্ত্রের বাক্যগুলি উদ্ধৃত না করিলেও ক্ষতি নাই।

সনিমেষ দৃষ্টি—সনিমেষ দৃষ্টি কাহাকে বলে, তাহা আমরা ঠিক অবগত নহি। বোধ হয় মিট্ মিটে চাউনিকেই সামুদ্রিকেরা সনিমেষ দৃষ্টি বলিয়াছেন। মিট্ মিটে দৃষ্টিতে ঘন ঘন পলক পড়ে, সুতরাং তাহা সনিমেষ।

ধূর্ত্তাঃ সনিমেষদৃষ্টয়ঃ
সাভিপ্রায়াঃস্যুঃকুঞ্চিতদৃষ্টয়ঃ।"

সনিমেষ দৃষ্টি স্বভাবের পুরুষেরা প্রায়ই ধূর্ত্ত হয় অর্থাৎ তাহাদের মন সরলধর্ম্মী নহে। কুঞ্চিতদৃষ্টি পুরুষেরাও সরল না হইতে পারে, হইতেও পারে, পরন্তু তাহা-

* যখন বার বার পুরুষের উল্লেখ করিতেছি তখন পাঠকগণ অবশ্য বুঝিবেন যে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে স্বতন্ত্র লক্ষণ বলিব।

দের অন্তরে কোন না কোন অভিসন্ধি জাগরূক থাকে।

কুঞ্চিতদৃষ্টি কিরূপ? ইহাও ঠিক্ বুঝা-যায় না। বোধকরি, যাঁহারা শ্রোতার মুখপানে চেয়ে কথা কন না, চক্ষু অন্যদিকে বাঁকাইয়া বাক্যালাপ করেন, অথবা যেন ঘোরতর চক্ষুলজ্জা, কিংবা অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার কালে চক্ষু ছোট হইয়া যায়, কি চক্ষুতে চক্ষুতে সংযোগ হইলে কুঁচ্‌ড়ে আইসে, এরূপ কোন দৃষ্টির নাম কুঞ্চিত দৃষ্টি। এই কুঞ্চিত দৃষ্টির লোকেরা বিনা অভিপ্রায়ে, বিনা অভিসন্ধিতে কাহারও সঙ্গে কোন কথা কহেন না, সুতরাং ইহারা "সাভিপ্রায়াঃ *।"

এস্থলে একটী গল্প স্মরণ হইল। আমরা কিম্বদন্তীক্রমে শুনিয়াছি যে, ইয়ুরোপে যখন ফিজিয়গনমী বিদ্যার বহুতর বিশ্বস্ত দাস উৎপন্ন হইয়াছিল, মহাত্মা সক্রেটীস্ যখন সে দেশ উজ্জ্বল করিয়া ছিলেন, তখন, সক্রেটীসের এক দল শিষ্য পরস্পর পরামর্শ করিল যে, "চল, অমুকের নিকট আমরা আমাদের গুরুকে লইয়া যাই, দেখা যাউক, উহারা কে কি বলে।"

পরামর্শান্তে তাহারা পরামর্শের অনুরূপ কার্য্যই করিল, সক্রেটীস্ শিষ্যমণ্ডলীতে বেষ্টিত হইয়া ফিজিয়গনমীর আলোচনা সভায় উপনীত হইলেন। সভ্যেরা তাঁহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে এক জন বলিয়া উঠিল, "এই সক্রেটীসের মনে অনেক পাপ আছে। ইনি কামুক, ইনি পরনিন্দা-প্রিয়, ইনি লুব্ধস্বভাব।

শুনিয়া সক্রেটীসের শিষ্যেরা হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল, বলিল, সক্রেটীসের মনে পাপ? তোমাদের সর্ব্বৈব মিথ্যা, সমস্তই ভণ্ডামি।"

এই সময়ে সক্রেটীস্ অতি গম্ভীর ভাবে ও অতিধীরতার সহিত শিষ্যদিগকে আহ্বান করিলেন, "তোমরা উপহাস কর কেন? মিথ্যা বলেন নাই, সত্যই বলিয়াছেন। যাহা যাহা বলিয়াছেন সমুদায়ই সত্য। আমার মনে উল্লিখিত পাপ-প্রবৃত্তি সকল উদিত হইয়া থাকে পরন্তু আমি তাহা জ্ঞানবলে ও অভ্যাসবলে দমন করিয়া থাকি।"

ক্রমশঃ

শ্রী কালীবর বেদান্তবাগীশ।

* আমরা যে দুরূহ সামুদ্রিকানুমিতি বিদ্যা অনুবাদ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতেছি ইহা আমাদের পক্ষে অন্যায় কার্য্য। কেন না আমরা এবিদ্যা গুরুর নিকট শিক্ষা করি নাই। এরূপ বিষয় শিখিতে হয়, না শিখিলে কোন ক্রমেই এরূপ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় না। এই যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও অবয়ব ভঙ্গী উত্থিত হইতেছে এ সকল না চিনিতে পারিলে সামুদ্রিক শাস্ত্রের উপর সত্য মিথ্যা কোন পক্ষই স্থাপন করা যায় না। তবে যে আমরা লিখিতেছি সে কেবল দেখাইবার জন্য এরূপ শাস্ত্র ও আমাদের আছে, কেবল ইহাই দেখান আমাদের উদ্দেশ্য।

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র।

তৃতীয় ভাগ ১ সংখ্যা ভারতীর ৪৮ পৃষ্ঠার পর।

এডেন থেকে সুয়েজে যেতে দিন পাঁচেক লেগেছিল। যারা ব্রিন্দিশি পথ দিয়ে ইংলণ্ডে যায় তাদের জাহাজ থেকে নেবে সুয়েজে রেলোয়ের গাড়িতে উঠে অ্যালেক্‌জান্দ্রিয়াতে যেতে হয়; আলেক্‌জান্দ্রিয়ার বন্দরে তাদের জন্যে একটা ষ্টীমার অপেক্ষা করে—সেই ষ্টীমারে চোড়ে ভূমধ্য-সাগর পার হোয়ে ইটালীতে পৌঁছিতে হয়। আমরা over-land যাত্রী, সুতরাং আমাদের সুয়েজে নাবতে হোল। আমরা তিন জন বাঙ্গালী ও এক জন ইংরাজ একখানি আরব নৌকা ভাড়া কর্‌লেম। মানুষের "divine" মুখশ্রী কতদূর পশুত্বের দিকে নাব্‌তে পারে, তা' সেই নৌকোর মাজিটার মুখ দেখলে জান্‌তে পারতে। তার চোক দুটো যেন বাঘের মত। কালো কুচ্‌কুচে রং। কপাল নীচু। ঠোঁট পুরু। সবশুদ্ধ মুখের ভাব অতি ভয়ানক। অন্যান্য নৌকোর সঙ্গে দরে বোন্‌ল না, সে একটু কম দামে নিয়ে যেতে রাজি হেল। ব—মহাশয় ত সে নৌকোয় বড় সহজে যেতে রাজি নন; তিনি বোল্লেন আরবদের বিশ্বাস কর্‌তে নেই—ওরা অনায়াসে গলায় ছুরি দিতে পারে। তিনি সুয়েজের দুই একটা ভয়ানক ভয়ানক অরাজকতার গল্প কোর্‌লেন। কিন্তু যাহোক, আমরা সেই নৌকোয় ত উঠলেম। মাজিরা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইংরিজি কয়, ও অল্প স্বল্প ইংরিজি বুঝ্‌তে পারে। আমরা ত কতক দূর নির্ব্বিবাদে গেলেম। আমাদের ইংরাজ যাত্রীটির সুয়েজের পোষ্টআপিসে নাব্‌বার দরকার ছিল। পোস্ট-আফিস অনেক দূর, এবং যেতে অনেক বিলম্ব হবে, তাই মাঝিটি একটু আপত্তি কোর্‌লে; কিন্তু শীঘ্রই সে আপত্তি ভঞ্জন হোল। তার পরে আবার কিছু দূরে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা কোল্লে "পোস্ট-অফিসে যেতে হবে কি? সে দুই এক ঘণ্টার মধ্যে যাওয়া অসম্ভব"—আমাদেররুক্ষ-স্বভাব সাহেবটি মহা খাপা হোয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন "your grand mother" এইতো আমাদের মাঝি রুখে উঠ্‌লেন, "What? mother? mother? what mother dont say mother' আমরা মনে করিলাম সে সাহেবটাকে ধরে বুঝি জলেই ফেলে দিলে, আবার জিজ্ঞাসা কোল্লে "what did say? (অর্থাৎ কি বল্লি?") আমরা রয়েছি বোলেই বোধ হয় সাহেব তাঁর রোখ ছাড়লেন না। আবার বল্লেন 'your grand mother' এইত আর রক্ষা নেই। মাঝিটা মহা তেড়ে উঠল। সাহেব গতিক ভাল নয় দেখে নরম হয়ে বল্লেন 'you don't

seem to understand what I say!' অর্থাৎ তিনি তখন grand mother বলাটা যে গালি নয় তাই প্রমাণ কোর্ত্তে ব্যস্ত। তখন সে মাঝিটা ইংরাজি ভাষা ছেড়ে ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল "বস্—চুপ!' সাহেব থতমত খেয়ে চুপ করে গেলেন, আর তাঁর বাক্য স্ফূর্ত্তি হল না! আবার খানিক দূর গিয়ে সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন "কতদূর বাকী আছে?" মাঝী অগ্নিশর্ম্মা হয়ে চেঁচিয়ে উঠল "Two shillings give, ask what distance" এই অপূর্ব্ব ইংরাজির ভাষান্তর হচ্চে "সবে দুশিলিং মাত্র ভাড়া দেবেন, তা আবার জিজ্ঞাসা করা হচ্চে কতদূর।" আমরা এই রকম বুঝে গেলেম যে, দুশিলিং ভাড়া দিলে সুয়েজ রাজ্যে এই রকম প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা আইনে নেই বুঝি! মাঝীটা যখন আমাদের এই রকম ধমক দিচ্চে, তখন অন্য অন্য দাঁড়িদের ভারি আমোদ বোধ হচ্চে, তারা ত পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি কোরে মুচকি মুচকি হাসি আরম্ভ কোল্লে। মাঝি মহাশয়ের অপরিমিত বদমেজাজ দেখে তাদের হাসি সামলানো দায় হোয়ে উঠেছিল। এক দিকে মাঝি ধম্‌কাচ্চে, একদিকে দাঁড়ি-গুলো হাসি জুড়ে দিয়েছে, আমরা নিরুপায়, রাগে ও লজ্জায় পুড়্‌ছিলেম। মাঝিটার উপর প্রতিহিংসা তোলবার আর কোন উপায় না দেখে আমরাও তিন জনে মিলে হাসি জুড়ে দিলেম—ও মনে মনে একটা সান্ত্বনা পেলেম যে 'নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে!' এরকম সুবুদ্ধি অনেক স্থলে দায়ে পড়ে খাটাতে হয়। মানে মানে সুয়েজ সহরে গিয়ে ত পৌঁছিলেম। আমার চক্ষে সুয়েজ সহরের নূতনত্ব এইটুকু লাগল যে, এর চেয়ে খারাপ সহর আমি আর দেখি নি। কিন্তু সুয়েজ সহর সম্বন্ধে আমার কিছু বল্‌বার অধিকার নাই, কারণ আমি সুয়েজের আদ মাইল জায়গার বেশী আর দেখি নি। সহরের চারি দিকে একবার প্রদক্ষিণ করবার বাসনা ছিল, কিন্তু আমার সহযাত্রীদের মধ্যে যারা পূর্ব্বে সুয়েজ দেখেছিলেন, তাঁরা বল্লেন, "এ পরিশ্রমে শ্রান্তি ও বিরক্তি ছাড়া অন্য কোন ফললাভের সম্ভাবনা নেই।" তাতেও আমি নিরুৎসাহ হইনি কিন্তু শুনলেম গাধায় চড়ে বেড়ান ছাড়া সহরে বেড়াবার আর কোন উপায় নেই। শুনে সহরে বেড়াবার দিকে টান আমার অনেকটা কোমে গেল, তার পরে শোনা গেল, এদেশের গাধাদের সঙ্গে চালকদের সকল সময়ে মতের ঐক্য হয় না, চালক যে দিকে যাবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, গাধাটির সকল সময়ে সেদিকে যাবার ইচ্ছে হয় না; তাঁরো একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন ইচ্ছে আছে; এই জন্যে সময়ে সময়ে দুই ইচ্ছের বিরোধ উপস্থিত হয়, কিন্তু প্রায় দেখা যায়, গাধার ইচ্ছে পরিণামে জয়ী হয়। সুয়েজে এক প্রকার জঘন্য চোকের ব্যামোর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব—রাস্তায় অমন শত শত লোকের চোখ ঐ রকম রোগগ্রস্ত দেখ্‌তে পাবে। এখানকার মাছিরা ঐ রোগ চারিদিকে বিস্তরণ কোরে বেড়ায়। রোগ-গ্রস্ত চোখ থেকে

ঐ রোগের বীজ আহরণ করে তারা অরুগ্ন চোখে গিয়ে বসে, এই রকমে চার দিকে ঐ রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

সুয়েজে আমরা রেলোয়ে উঠ্‌লেম। এ রেল গাড়ির অনেক প্রকার রোগ আছে। প্রথমতঃ শোবার কোন বন্দবস্ত নেই, কেন না, বস্‌বার জায়গা-গুলি অংশে অংশে বিভক্ত, দ্বিতীয়তঃ এমন গজ-গামিনী রেল গাড়ি সর্ব্বত্র দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। দুর্ভাগ্য ক্রমেই বল, আর সৌভাগ্যক্রমেই বল, আমরা রাত্রের যাত্রী ছিলেম, দুর্ভাগ্য-ক্রমে এই জন্য, যে, সমস্ত রাত বোসে বোসেই কাটাতে হোয়েছিল, আর সৌভাগ্য ক্রমে এই জন্য, যে, আফ্রিকার সে অসহ্য রৌদ্র-তাপ ভোগ কর্‌তে হয় নি। সমস্ত রাত্রিই গাড়ি চোলেছে, দিনের বেলা যখন জেগে উঠ্‌লেম তখন দেখ্‌লেম ধুলোয় আমাদের কেবল গোর হয় নি, আর সব হয়েছে। চুলে হাত দিতে গিয়ে দেখি, চুলে এমন এক স্তর মাটি জোমেছে যে, মাথায় অনায়াসে ধান চাস করা যায়। এই রকম ধুলোমাখা সন্ন্যাসীর বেশে আমরা অ্যালেক্‌জান্দ্রিয়াতে গিয়ে পৌঁছলেম। রেলের লাইনের দুপারে—সবুজ শস্য-ক্ষেত্র। জায়গায় জায়গায় খেজুরের গাছে থোলো থোলো খেজুর ফলে রোয়েছে। মাঠের মাঝে মাঝে কুণ্ড। মাঝে মাঝে দুই একটা কোঠা বাড়ি—বাড়ি গুলো চৌকোনা, থাম নেই, বারান্দা নেই—সমস্তটাই দেয়ালের মত, সেই দেয়ালের মধ্যে মধ্যে দুই একটা জানলা। এই সকল কারণে বাড়ি গুলোর যেন শ্রী নেই। যাহোক্ আমি আগে আফ্রিকার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত যে রকম অনুর্ব্বর মরুভূমি মনে কোরে রেখেছিলুম, চারদিক দেখে তা কিছুই মনে হোলনা। বরং চারদিককার সেই হরিৎক্ষেত্রের উপর, খেজুর-কুঞ্জের মধ্যে প্রভাতটি আমার অতি চমৎকার লেগেছিল। অ্যালেকজান্দ্রিয়া বন্দরে আমাদের জন্যে "মঙ্গোলিয়া" ষ্টীমার অপেক্ষা কোর্‌ছিল। এইবার আমরা ভূমধ্যসাগরের বক্ষে আরোহণ কর্‌লেম, আমার একটু একটু শীত-শীত কোর্‌তে লাগ্‌ল। জাহাজে গিয়ে খুব ভাল কোরে স্নান কর্‌লেম, আমার তো হাড়ে হাড়ে ধূলো প্রবেশ কোরেছিল। স্নান করার পর আলেক্‌জান্দ্রিয়া সহর দেখ্‌তে গেলেম। জাহাজ থেকে ডাঙ্গা পর্য্যন্ত যাবার জন্যে একটা নৌকা ভাড়া কর্‌লেম। এখানকার একটা একটা মাঝী সার উইলিয়ম জোন্সের দ্বিতীয় সংস্করণ বল্লেই হয়। তারা গ্রীক, ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ, ইংরিজি প্রভৃতি অনেক ভাষায় চলন-সই রকম কথা কইতে পারে। শুন্‌লেম ফ্রেঞ্চ ভাষাই এখানকার সাধারণ ভাষা। রাস্তা ঘাটের নাম, সাইন্‌বোর্ডে দোকানগুলির আত্ম-পরিচয়, অধিকাংশই করাসী ভাষায় লেখা। অ্যালেক্‌জান্দ্রিয়া সহরটি সমৃদ্ধি-শালী মনে হল। এখানে যে কত জাতের লোক ও কত জাতের দোকান বাজার আছে তার ঠিকানা নেই। রাস্তাগুলি পাথর দিয়ে বাঁধানো—তাতে বেশ পরিষ্কার থাকে, কিন্তু গাড়ির শব্দ বড় বেশী রকম হয়।

খুব বড় বড় বাড়ি—বড় বড় দোকান, সহরটি খুব জম্‌কালো বটে। অ্যালেক্‌জান্দ্রিয়ার বন্দর খুব প্রকাণ্ড। অসংখ্য অসংখ্য জাহাজ এখানে আশ্রয় পায়। ইয়ুরোপীয়, মুসলমান সকল প্রকার জাতিরই জাহাজ এ বন্দরে আছে, কেবল দুঃখের বিষয় হিন্দুদের জাহাজ নেই।

চার পাঁচ দিনে আমরা ইটালীতে গিয়ে পৌঁছলেম। তখন রাত্রি একটা দুটো হবে। গরম বিছানা ত্যাগ কোরে, জিনিষ পত্র নিয়ে আমরা জাহাজের ছাতে গিয়ে উঠ্‌লেম। জ্যোৎস্না রাত্রি, খুব শীত; আমার গায়ে বড় একটা গরম কাপড় ছিল না, তাই ভারি শীত কচ্ছিল। আমাদের সুমুখে নিস্তব্ধ সহর, বাড়ি গুলির জানেলা দরজা সমস্ত বন্ধ—সমস্ত নিদ্রামগ্ন। আমাদের যাত্রীদের মধ্যে ভারি গোল পোড়ে গেল, কখনো শুনি—ট্রেন পাওয়া যাবে, কখনো শুনি পাওয়া যাবে না। জিনিষ-পত্র গুলো নিয়ে কি করা যাবে ভেবে পাওয়া যায় না, জাহাজে থাক্‌ব কি বেরোবো কিছুই স্থির নেই। এক জন Italian officer এসে আমাদের গুণ্‌তে আরম্ভ কোর্‌লে—কিন্তু কেন গুণ্‌তে আরম্ভ কোর্‌লে তা' ভেবে পাওয়া গেল না, জাহাজের মধ্যে এই রকম একটা অস্ফুট জনশ্রুতি প্রচারিত হোল যে, এই গণনার সঙ্গে আর আমাদের ট্রেণে চড়ার সঙ্গে একটা বিশেষ যোগ আছে। কিন্তু সে রাত্রে মূলেই ট্রেন পাওয়া গেল না। শোনা গেল, তার পরদিন বলা তিনটের আগে ট্রেন পাওয়া যাবে না। যাত্রীরা মহা বিরক্ত হোয়ে উঠ্‌ল। অবশেষে সে রাত্রে ব্রিন্দিশির হোটেলে আশ্রয় নিতে হোল।

এইত প্রথম য়ুরোপের মাটিতে আমার পা পড়্‌ল। জানোই ত, আমি কি রকম কাল্পনিক, মনে কোরেছিলেম য়ুরোপে পৌঁছিয়েই কি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখের সুমুখে খুলে যাবে, সে যে কি, তা' কল্পনাতেই থাকে, কথায় প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে দেখে আস্‌ছি, কল্পনার সঙ্গে সত্য-রাজ্যের প্রায় বনে না। আমার স্বভাব দোষে অনেক জিনিষ ভাল কোরে ভোগ কর্‌তে পারি নে। কোন নূতন দেশে আস্‌বার আগেই আমি তাকে এমন নূতনতর মনে কোরে রাখি যে, এসে আর তা' নূতন বোলে মনেই হয় না; কোন মহান্ দৃশ্য দেখ্‌বার আগেই আমি তাকে এমন মহান্‌তর মনে কোরে রাখি যে, তা দেখে আর মহান্ বোলে মনে হয় না। ইউরোপ আমার তেমন নতুন মনে হয়নি শুনে সকলেই অবাক্!

আমরা রাত্রি তিনটের সময় ব্রিন্দিশির হোটেলে গিয়ে শুয়ে পোড়্‌লেম। সকালে একটা আধ-মরা ঘোড়া ও আধ-ভাঙ্গা গাড়ি চোড়ে সহর দেখ্‌তে বের হোলেম। সারথীর সঙ্গে আর গাড়ি ঘোড়ার সঙ্গে এমন অসামঞ্জস্য, যে কি বোল্‌ব! সারথীর বয়স চোদ্দ হবে—কিন্তু ঘোড়াটির বয়স পঞ্চাশ হবে—আর গাড়িটি পৌরাণিক যুগের মনে হোল। ছোট-খাটো সহর যেমন হোয়ে থাকে, ব্রিন্দিশিও তাই।

কতক গুলি কোঠা বাড়ি, দোকান বাজার, রাস্তাঘাট আছে, হাঁ কোরে দেখ্‌বার জিনিষ একটিও নেই। ভিক্ষুকেরা ভিক্ষা কোরে ফির্‌চে, দু চার জন লোক মদের দোকানে বোসে গল্প-গুজব কোর্‌চে—দুচার জন রাস্তার কোনে দাঁড়িয়ে হাসি-তামাসা কোরচে, লোক জনেরা অতি নিশ্চিন্ত-মুখে গজেন্দ্র গমনে গমন করচে; যেন কারো কোন কাজ নেই, কারো কোন ভাবনা নেই —যেন সহর শুদ্ধ ছুটি। রাস্তায় বড় গাড়ি ঘোড়ার সমারোহ নেই, লোক জনের সমাগম নেই। আমরা খানিক দূর যেতেই রাস্তা থেকে এক জন ছোকরা আমাদের গাড়ি থামিয়ে হাতে একটা তরমুজ নিয়ে গাড়োয়ানের পাশে গিয়ে বোস্‌ল। ব—মহাশয় বোল্লেন, "বিনা আয়াসে এঁর কিছু রোজগার করবার বাসনা আছে;" তিনি এসে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে মাঝে মাঝে আমাদের দেখিয়ে দিতে লাগ্‌লেন, "ঐটে চর্চ্চ, ঐটে বাগান, ঐটে মাঠ," ইত্যাদি; তাতে যে আমাদের বিশেষ কিছু উপকার হয়েছিল তা নয়, তাঁর টীকাতে আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞান বৃদ্ধি হয় নি, আর, তাঁর টীকা না হলেও আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞানের ব্যাঘাত হোত না। তাঁকে কেউ আমাদের গাড়িতে উঠ্‌তে বলে নি, কেউ তাঁকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসাও করে নি, কিন্তু তবু এই অযাচিত অনুগ্রহের জন্যে তাঁর যাচ্‌ঞা পূর্ণ কর্‌তে হোল। তারা আমাদের একটা কলের বাগানে নিয়ে গেল। সেখানে যে কত প্রকার ফলের গাছ, তার সংখ্যা নেই। চারদিকে আঙ্গুরে আঙ্গুরে আচ্ছন্ন। থোলো থোলো আঙ্গুর ফোলে রয়েছে। দু রকম আঙ্গুর আছে—কালো আর সাদা। তার মধ্যে কালো গুলিই আমার বেশী মিষ্টি লাগ্‌ল। বড় বড় গাছে আপেল, পিচ প্রভৃতি অনেক প্রকার ফল ধোরে আছে। এক জন বুড়ি (বোধ হয় উদ্যান-পালিকা) কতকগুলি ফল ফুল নিয়ে উপস্থিত কোর্‌লে, আমরা সে দিকে বড় নজর কল্লেম না; কিন্তু ফল বিক্রয় করবার উপায় সে বিলক্ষণ জানে। আমরা ইতস্ততঃ বেড়াচ্চি, এমন সময়ে দেখি একটি সুন্দরী মেয়ে, কতকগুলি ফল আর ফুলের তোড়া নিয়ে আমাদের সুমুখে হাজির হোল, তখন আর অগ্রাহ্য কর্‌বার সাধ্য রইল না।

ইটালির মেয়েদের বড় সুন্দর দেখ্‌তে। অনেকটা আমাদের দেশের মেয়ের ভাব আছে। সুন্দর রং, কালো কালো চুল, কালো ভুরু, কালো চোখ, আর মুখের গড়ন অতি চমৎকার। আমরা রাস্তায় ঘাটে কেবল ছোটলোকদের মেয়েদের দেখেছি মাত্র, কিন্তু তাদেরি এমন ভাল দেখ্‌তে যে কি বোল্‌ব।

তিনটের ট্রেনে আমরা ব্রিন্দিশি ছাড়লেম। রেলোয়ের পথের দুধারে আঙ্গুরের ক্ষেত্র, সে চমৎকার দেখ্‌তে। চারদিকের দৃশ্য এমন সুন্দর যে কি বোলব। পর্ব্বত, নদী, হ্রদ, কুটীর, ক্ষেত্র, ছোট ছোট গ্রাম প্রভৃতি যত কিছু কবির স্বপ্নের ধন, সমস্ত চারদিকে শোভা পাচ্চে। গাছ পালার মধ্যে থেকে যখন কোন একটি দূরস্থ নগর, তার

প্রাসাদ-চড়া, তার চর্চ্চের শিখর, তার ছবির মত বাড়িগুলি আস্তে আস্তে চোখে পড়ে তখন বড় ভাল লাগে। এক একটি দৃশ্য আমার এত ভাল লেগেছিল যে তা বর্ণনা কোর্‌তে আমার ইচ্ছে কোর্‌চে না। সন্ধ্যে বেলায় একটি পাহাড়ের নীচে অতি সুন্দর একটি হ্রদ দেখেছিলেম, তা আর আমি ভুল্‌তে পার্‌ব না, তার চারদিকে গাছপালা, সন্ধ্যার ছায়া জলে পোড়েছে, সে অতি সুন্দর, তা আমি বর্ণনা কোর্‌তে চাইনে!

রেলোয়ে কোরে যেতে যেতে আমরা mont cenis-এর বিখ্যাত tunnel দেখলেম। এই পর্ব্বতের এপাশ থেকে ফরাসীরা ওপাশ থেকে ইটালিয়নরা একসঙ্গে খুদ্‌তে আরম্ভ করে, কয়েক বৎসর খুদ্‌তে খুদ্‌তে দুই যন্ত্রীদল ঠিক মাঝামাঝি এসে পরস্পরের সমুখা-সমুখী উপস্থিত হয়। এই গুহা অতিক্রম কোর্‌তে রেল গাড়ির ঠিক আধ ঘণ্টা লাগ্‌ল। সে অন্ধকারে আমরা যেন হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিলেম। এখানকার রেলগাড়ির মধ্যে দিন রাত আলো জ্বালাই আছে, কেন না, এক-এক স্থানে প্রায় পাঁচ মিনিট অন্তর এক একটা পর্ব্বত-গুহা ভেদ কোর্‌তে হয়—সুতরাং দিনের আলো খুব অল্পক্ষণ পাওয়া যায়। ইটালী থেকে ফ্রান্স পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তা—নির্ঝর, নদী, পর্ব্বত, গ্রাম, হ্রদ দেখতে দেখতে আমরা পথের কষ্ট ভুলে গিয়েছিলেম—এই রাস্তাটুকু আমরা যেন একটি কাব্য পোড়্‌তে পোড়্‌তে গিয়েছিলেম।

সকাল বেলায় প্যারিসে গিয়ে পৌঁছলেম। কি জমকালো সহর! সেই অভ্রভেদী প্রাসাদের অরণ্যের মধ্যে গিয়ে পোড়্‌লে অভিভূত হোয়ে যেতে হয়। মনে হয় প্যারিসে বুঝি গরীব লোক নেই। আমার মনে হোল, এই সাড়ে তিন হাত মানুষের জন্যে এমন প্রকাণ্ড জমকালো বাড়িগুলোর কি আবশ্যক। একটা হোটেলে গেলেম, তার সমস্ত এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড, যে ঢিলে কাপড় পোরে যেমন সোয়াস্তি হয় না, সে হোটেলে থাক্‌তে গেলেও আমার বোধহয় তেমনি অসোয়াস্তি হয়। একটা ঘরের মধ্যে কোথায় মিশিয়ে যাই তার ঠিক নেই। স্মরণ-স্তম্ভ, উৎস, বাগান, প্রাসাদ, পাথরে-বাঁধানো রাস্তা, গাড়ি, ঘোড়া, জন-কোলাহল প্রভৃতি দেখে অবাক্ হোয়ে যেতে হয়। প্যারিসে পৌঁছিয়েই আমরা একটা "টার্কিস্ বাথে" গেলেম। প্রথমতঃ আমরা একটা খুব গরম ঘরে গিয়ে বোস্‌লেম, সে ঘরে অনেক ক্ষণ থাক্‌তে থাক্‌তে কারো কারো ঘাম বেরোতে লাগ্‌ল, কিন্তু আমার ত বেরোল না, আমাকে তার চেয়ে আর একটা গরম ঘরে নিয়ে গেল, সে ঘরটা আগুনের মত, চোক মেলে থাক্‌লে চোক জ্বালা কোর্‌তে থাকে, মিনিট কতক থেকে সেখানে আর থাক্‌তে পার্‌লেম না, সেখান থেকে বেরিয়ে আমার খুব ঘাম হোতে লাগ্‌ল। তার পরে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে আমাকে শুইয়ে দিলে—তার পরে ভীমকায় এক ব্যক্তি এসে আমার সর্ব্বাঙ্গ ডল্‌তে লাগ্‌ল। তার সর্ব্বাঙ্গ খোলা, এমন মাংস-পেশল চমৎকার শরীর আমি আর কখনো দেখিনি "ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ, শালপ্রাংশু মর্হাভুজঃ"। আমি

মনে মনে ভাব্‌লেম, ক্ষীণকায় এই মশকটিকে দলন করার জন্যে এমন প্রকাণ্ড কামানের কোন আবশ্যক ছিল না। সে আমাকে দেখে বোল্লে, আমার শরীর বেশ লম্বা আছে—এখন পাশের দিকে বাড়্‌লে আমি একজন সুপুরুষের মধ্যে গণ্য হব। আধ ঘণ্টা ধোরে সে আমার সর্ব্বাঙ্গ অবিশ্রান্ত দলন কোল্লে, ভূমিষ্ঠকাল থেকে আমি যত ধূলো মেখেছি, আমার শরীর থেকে সব যেন উঠে গেল। শরীরটিকে যথেষ্ট রূপে দলিত কোরে আমাকে আর একটি ঘরে নিয়ে গেল, সেখানে গরম জল-দিয়ে, সাবান দিয়ে, স্পঞ্জ দিয়ে শরীরটা বিলক্ষণ কোরে পরিষ্কার কোল্লে। পরিষ্করণ-পর্ব্ব শেষ হোলে আর একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে একটা বড় পিচ্‌কিরি করে গায়ে গরম জল ঢালতে লাগল—হঠাৎ গরম জল দেওয়া বন্ধ কোরে বরফের মত ঠাণ্ডা জল বর্ষণ কোর্ত্তে লাগল—এই রকম কখনো ঠাণ্ডা কখন গরম জলে স্নান কোরে একটা জলযন্ত্রের মধ্যে গেলেম—তার উপর থেকে, নীচে থেকে, চার পাশ থেকে, জল বাণের মত গায়ে বিঁধ্‌তে থাকে—সেই বরফের মত ঠাণ্ডা বরুণ-বাণের-বর্ষণের মধ্যে খানিক ক্ষণ থেকে আমার বুকের রক্ত পর্য্যন্ত যেন জমাট হোয়ে গেল—রণে ভঙ্গ দিতে হোল, হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এলেম। তার পরে এক জায়গায় পুকুরের মত আছে, আমি সাঁতার দিতে রাজি আছি কি না জিজ্ঞাসা কোর্‌লে,—আমি সাঁতার দিলেম না, আমার সঙ্গী সাঁতার দিলেন; তাঁর সাঁতার দেওয়া দেখে তারা বলাবলি কোরতে লাগল—দেখ, দেখ, এরা কি অদ্ভুত রকম কোরে সাঁতার দেয়, ঠিক কুকুরের মত।" এতক্ষণে স্নান শেষ হোল। আমি দেখ্‌লেম, টার্কিষ বাথে স্নান করা আর শরীরটাকে ধোপার বাড়ি দেওয়া এক কথা! তার পরে সমস্ত দিনের জন্য এক পাউণ্ড দিয়ে এক গাড়ি ভাড়া করা গেল। প্যারিস্ একৃজিবিষণ দেখ্‌তে গেলেম। তুমি এইবার হয়ত খুব আগ্রহের সঙ্গে কান খাড়া কোরেছ, ভাবছ আমি প্যারিস্ একৃজিবিষণের বিষয় কিনা জানি বর্ণনা কোরব। কিন্তু দুঃখের বিষয় কি বলব, কলকাতার য়ুনিবর্সিটিতে বিদ্যা শেখার মত আমি প্যারিস একৃজিবিষণের সমস্ত দেখেছি কিন্তু কিছুই ভাল কোরে দেখি নি। একদিনের বেশী আমাদের প্যারিসে থাকা হোল না—সে বৃহৎকাণ্ড একদিনে দেখা কারো সাধ্য নয়। সমস্ত দিন আমরা দেখ্‌লেম—কিন্তু সে রকম দেখায়, দেখ্‌বার একটা তৃষ্ণা জন্মালো কিন্তু দেখা হোল না। সে একটা নগর বিশেষ। এক মাস থাক্‌লে তবে তা বর্ণনা কর্‌বার দুরাশা করতেম। প্যারিস একৃজিবিষণের একটা স্তূপাকার ভাব মনে আছে কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাব কিছুই মনে নেই। সাধারণতঃ মনে আছে যে, চিত্রশালায় গিয়ে অসংখ্য অসংখ্য চমৎকার ছবি দেখেছি—স্থাপত্যশালায় গিয়ে অসংখ্য অসংখ্য প্রস্তরমূর্ত্তি দেখেছি—নানা দেশ বিদেশের নানা জিনিষ দেখেছি; কিন্তু বিশেষ কিছু মনে নেই। তার পর,

প্যারিস থেকে লণ্ডনে এলেম—এমন বিষণ্ণ অন্ধকার পুরী আর কখনো দেখিনি—ধোঁয়া, মেঘ, বৃষ্টি, কোয়াসা, কাদা আর লোক জনের ব্যস্ত-সমস্ত ভাব, এই হচ্চে লণ্ডনের যথা সর্ব্বস্ব। আমি দুই এক ঘণ্টা মাত্র লণ্ডনে ছিলেম—যখন লণ্ডন পরিত্যাগ করলেম, তখন নিশ্বাস পরিত্যাগ কোরে বাঁচলেম—আমার বন্ধুরা আমাকে বোল্লেন, লণ্ডনের সঙ্গে প্রথম-দৃষ্টিতেই ভালবাসা হয় না; কিছু দিন থেকে তাকে ভাল কোরে চিনলে তবে লণ্ডনের মাধুর্য্য বোঝা যায়।

নন্দন-কাননে।

আমার হৃদয় কই হ'ল রে আমার—
পড়িয়ে যাতনা-ভারে, বুঝালাম এত কোরে,
সাধিলাম, ফেলিলাম এত অশ্রুধার——
তবুও আমার হৃদি হ'ল না আমার।
দলিত মরম-মাঝে, যে প্রতিমা সদা রাজে
চাহিলাম অশ্রুজলে বিসর্জ্জিতে তায়—
তাহে যদি এ হৃদয়, ছিঁড়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়,
বহুক শোণিত-স্রোত অজস্র ধারায়—
তাহে যদি এ সংসার, ধরে রে শ্মশানাকার,
জ্বলুক চিতার অগ্নি আকাশ ছাইয়ে।
গৃধিনীর ঘোর রবে, আকুলিত দিক্ সবে,
ছুটুক আলেয়া-আলো দিগন্ত ব্যাপিয়ে।
—হোক্ তা শ্মশান ক্ষেত্র, চমকি হেরিবে নেত্র,
বিভীষিকা সমাকীর্ণ সীমান্ত আবরি,
নাহি সূর্য্য নাহি চন্দ্র, আঁধারে নাহিক রন্ধ্র
ঘোরা দ্বিপ্রহরা অমা সমেঘ শর্ব্বরী—
যা হোক্ তা হোক্ ধরা, আমি ত জীয়ন্তে মরা
আমার ত সব সাধ হোয়েছে নির্ব্বাণ,
আমার ত সুখ-আশা, আমার ত ভালবাসা
হ'য়েছে আমার তো রে সব অবসান।
শ্মশানে মশানে রই, সাগরে নিমগ্ন হই
প্রেম-সাধ, প্রাণ-সাধ সকলি ত গেছে।
অস্থি চর্ম্মময় কায়া, নাহি তাহে আর মায়া,
জীয়ন্তে শৃগাল-ভক্ষ্য হয়েই রয়েছে—

* * * *

যখনি পরেরি করে,——মরম-বিশ্বাস-ভরে
হৃদয়ের সব ভার করিনু স্থাপন,
যখনি আপনা ভুলে, সোহাগের সাধ তুলে,
করিনু প্রেমের নদে আত্ম-বিসর্জ্জন,
যখনি পরেরি টানে, বাঁধিনু স্বাধীন প্রাণে
আমার আমিত্ব যবে হোল অবসান,
কেন না ভাবিনু তবে, এই জন্মে এই ভবে,
আমার সুখের সাধ হোল সমাধান।
কেন না ভাবিনু হায়, অধীরে উন্মত্ত প্রায়
বিলায়ে আপন ধন ভিক্ষা হবে সার—
উপস্থিত হোলে দ্বারে গর্ব্বিতের অহঙ্কারে
বিফলে ফেলিতে হবে নয়ন-আসার।
যারি মন তারি আছে, আমি গেলে তার কাছে
কেনই বা অকাতরে করিবে সে দান,

যার মন রবে তার, আমার কি অধিকার
আমি যে সোহাগ ভরে দেখাইব টান!
সোহাগে, যতনে বলে, অথবা কৌশল কলে
কভু কি পরের মন হয় রে আপন,
ভিক্ষা চাও ভিক্ষা পাবে,নহিলে কাঁদিতে হবে,
অধিক কাঁদিলে হবে বিরক্তি ভাজন।
ধন মান হারাইলে, যত্নে পুনঃ সব মিলে
সম্পদ-বিপদ-চক্র ঘোরে অনিবার।
কিন্তু রে পরেরি মন করিলেও প্রাণ পণ,
পুনঃ ফিরে নাহি আসে গেলে একবার।
—নাই বা পরেরি মন হোল রে আমারি ধন,
আমার হৃদয় কেন হোল রে তাহার,
বিচিত্র কল্পনা রঙ্গে ফিরিছে তাহারি সঙ্গে
আমার হইয়ে যেন নহে সে আমার।
যার হৃদি হোক তারি, জন্ম জন্ম থাক তারি
আমারি, আমার হৃদি না হইল কেন।
দুর্জ্জয় পরেরি টানে, ছুটিল আপন মনে,
অস্থি চর্ম্মময় আমি কেহ নই যেন।
তবে আর কেন মোরে,ফেলিতে যাতনা ঘোরে
আনিলে সুষমাময় নন্দন কাননে?
ফুটুক কুসুম-রাশি, দশদিক্ পরকাশি,
দুলুক মাধবী-লতা মৃদুল পবনে,
গাহুক কোকিলে গান, পাপিয়া ধরুক তান,
বহুক অলস ভরে ধীর সমীরণ,
জ্বলুক তারকাদল আলো করি নভস্তল,
করুক পূর্ণিমা-শশি সুধা বরিষণ,
শোভার সুষমা আর নাহি লাগে মনে,
কেন গো আনিলে মিছে নন্দন-কাননে।

দেবি!
বরঞ্চ এমন স্থল নাহিকি ধরায়?——
বিদীর্ণ অনল-গিরি, অগ্নি উদ্গীরণ করি
ছাইছে দিগন্ত ব্যাপি অনল শিখায়,
পিণ্ড পিণ্ড অগ্নি-পিণ্ড ভীষণ উচ্ছ্বাসে
মাতিয়ে চৌদিকে ধায়,শব্দে ব্যোম ফেটে যায়
লণ্ড ভণ্ড ঘোর কাণ্ড অবনী আকাশে।
—তাহাতে প্রলয় ঝড়!—গিরিশৃঙ্গ দড়্মড়
আমূল কাঁপিছে গিরি কাঁপায়ে ধরায়,
শৈলখণ্ড চাপে চাপে উড়িছে ঝটিকা দাপে
পড়িছে—ছুটিছে পুনঃ কে জানে কোথায়,
অদূরে অরণ্য স্থলে, দাবানল ওঠে জ্বলে,
উচ্ছ্বাসি অনল শিখা নভস্তল ছায়।
অজগর ঊর্দ্ধশ্বাসে, চৌদিকে ছুটিছে ত্রাসে,
কেশরী ঊর্দ্ধ কেশরে গর্জ্জিয়ে পলায়।
থেকে থেকে ভূকম্পন হতেছে সঘনে,
বাসকি উঠেছে রেগে, জলধি উথলে বেগে
আলোড়িত বিশ্বকাণ্ড প্রলয় পীড়নে।
ধরাধর ধরাসাৎ, ঘন ঘন উল্কাপাত,
ধকধ্বক ধূমকেতু জ্বলিছে আকাশে,
ব্রহ্মাণ্ড স্বকেন্দ্র-ছিন্ন—বিভীষিকা সমাচ্ছন্ন—
শশাঙ্ক গ্রাসিত পুনঃ কাল রাহু গ্রাসে!
থাকে যদি হেন স্থান, ছিঁড়িয়ে সকল টান,
অবাধে পশিব সেই ভয়াবহ স্থানে,
ভয়ের ভীষণ ভাবে, হৃদয় স্তম্ভিত হবে,
প্রেমের উচ্ছ্বাস আর মাতিবে না মনে,
সভয়ে নয়ন-ধারা, জমাট তুষার পারা,
নয়নে আটকি রবে, ঝরিবে না আর,
আমাতেই আমি রব,কারো পানে নাহি চাবো,
আমারি হৃদয় পুন হইবে আমার।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

ভারত ভৈষজ্য তত্ত্ব।

দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীঅম্বিকাচরণ রক্ষিত কর্ত্তৃক সংকলিত—চিকিৎসা তত্ত্ব যন্ত্রে মুদ্রিত।

এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত শিক্ষাপ্রদ। গ্রন্থকার যেরূপ প্রভূত যত্ন ও গবেষণা সহকারে ভারতীয় গাছ গাছড়ার ও অন্যান্য দ্রব্যের গুণ নির্দ্দেশ ও রোগ বিশেষে তাহাদের ব্যবহার নির্দ্দেশ করিয়া সহজ-আকারে আয়ুর্ব্বেদকে জনসাধারণের করতলস্থ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে তিনি সকলেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই।—এই রূপ উপযোগি পুস্তক সমূহের প্রচার ও আদর বঙ্গ-সাহিত্য পক্ষে একটি বিপুল আশার সোপান বলিতে হইবে।

কানন কথা। নাটক, শ্রীযোগীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণি কর্ত্তৃক বিরচিত। কলিকাতা সত্য যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৺০ আনা মাত্র।

পুস্তকখানির ইংরাজি ভূমিকাতেই লেখক বলিয়াছেন যে "আমার কানন-কথা নাটকাকারে না ছাপাইলেও ছাপাইতে পারিতাম; কিন্তু বিষয়টি উচ্চ পদবীগত নয় বলিয়াই নাটক-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছি।" কানন-কথা শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসের কথা, সুতরাং এ বিষয়টিকে যে লেখক নিম্ন শ্রেণীগত মনে করেন ও নাটক রচনা তাহারি উপযুক্ত মাত্র বিবেচনা করেন, তাঁহার নাটক সম্ভবতঃ যে কি মেওয়া হইতে পারে তাহা বোধ হয় আর বলিবার আবশ্যক করে না।—বিরাধ রাক্ষস কর্ত্তৃক শ্রীরামচন্দ্র আহত হইলে সীতা এই বলিয়া কাঁদিতেছেন "হা হতোস্মি, হা দগ্ধোস্মি, রে বিধে, কেন আমার কমল প্রাণবল্লভকে হরণ করিলি! কেন আমার জীবন গেল না। হায়, পৃথিবি এত দিনে তুমি নিরাশ্রয় হইলে, হায় সত্য! আর কে তোমায় আশ্রয় করিবে"—ইত্যাদি।

মাসিক সমালোচক।—সর্ব্বশাস্ত্র বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচক, সম্পাদক শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়—১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা—বৈশাখ মাস। বহরমপুর অরুণোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা।

এই মাসিক পত্র খানিকে আমরা অতিশয় প্রীতির সহিত পাঠ করিলাম। "উত্তরে সখীর প্রতি" বলিয়া কবিতাটি যেমন সুন্দর হইয়াছে, "বাঙ্গলার বর্ত্তমান অবস্থা" বিষয়ক প্রবন্ধটিও তেমনি সৎচিন্তা-মূলক হইয়াছে—অন্যান্য প্রবন্ধগুলিও মন্দ হয় নাই।

ছিন্নমুকুল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ—মৃত্যু-শয্যা।

ক্রমে দিন যাইতে লাগিল। সুশীলার আরোগ্য লাভের স্থিরতা নাই। তাঁহার পীড়া দু দিন হয় তো বাড়িয়া ওঠে আবার দুদিন যেন বেশ সারিয়া যায়। প্রমোদ আর কতদিন কলেজ কামাই করিয়া থাকিবেন, সম্মুখেই তাঁহার পরীক্ষা। কিছু দিন দেখিয়া দেখিয়া তিনিও কলিকাতা যাত্রা করিলেন। প্রমোদ কলিকাতায় যাইবার তিন চারি দিন পরে সুশীলার পীড়া আরো বৃদ্ধি হইল, তিন চারি দিনেই জ্বর অতিশয় বৃদ্ধি হইল, ক্রমে বিকার হইয়া দাঁড়াইল। সুশীলা ক্রমাগত তাঁহার সম্মুখে সেই রাত্রের সেই মূর্ত্তিটী দেখিতে লাগিলেন, সেই দিনকার সেই গীতটি তাঁহার কাণে বাজিতে লাগিল—ক্রমাগত যেন তিনি শুনিতে লাগিলেন,

জনম আমার শুধু সহিতে যাতনা
জীবন ফুরায়ে এল আঁখি জল ফুরালো না।

কাছে কনক বসিয়াছিল, তাহাকে বলিলেন "কনক কি সুন্দর গান! আহা ঐ গানটি আমার স্বামীর, আমি গানটি জানি" বলিতে বলিতে সুশীলার চক্ষু দিয়া বারিধারা পড়িয়া বালিস ভিজিয়া গেল। থাকিয়া থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন "আহা ঐ গানটি এক দিন আমাকে গাহাবার নিমিত্ত স্বামী কতই চেষ্টা করিয়াছিলেন। পোড়া লজ্জা আসিয়া চাপিল কিছুতেই গাহিতে পারিলাম না। আজ কনক ঐ গানটি কে গাহিতেছে? ও গলা কার?" সুশীলা সেই গলা চিনিবার জন্য মনোযোগ পূর্ব্বক কিছু ক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন, পরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন "না না চিনিতে পারিলাম না। তাঁহাকে চিনিয়াছি কিন্তু কে গাহিতেছে তার গলা চিনিতে পারিলাম না। কনক কে গাহিতেছে?"

কনক সুশীলার কথায় কাঁদিতেছিল, অশ্রু জল মুছিয়া বলিল "আমি কই কিছুই শুনিতে পাইতেছি না।"

সু। "শুনিতে পাচ্ছিস না? ভাল-করে শোন। কনক আহা কি গাচ্ছে"

এই সময় চিকিৎসক আসিলেন। সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন, বুঝিলেন শীঘ্রই মৃত্যু হইবে, আর আশা নাই। তবু যদি কিছু করিতে পারেন ভাবিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া বাহিরে গিয়া বসিলেন। বলিয়া গেলেন লক্ষণের কোন রূপ পরিবর্ত্তন হইলেই যেন তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হয়। চিকিৎসক চলিয়া গেলে সুশীলা কনককে জিজ্ঞাসা করিলেন "ও কে? কেন আসিয়াছিল?" কনককে নিরুত্তর দেখিয়া সুশীলা আবার বলিলেন "কনক, ওই গানটি শুনে

আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, একি আমি কি আজ মরিব ! ঐ শোন গাচ্ছে,

এই শেষ দিনে সখি সেই বুকে মাথা রাখি,
ঘুমায়ে পড়িব আহা তাও তো হোল না
কাঁদিতে কাঁদিতে ওরে চলিনু জন্মের তরে
না পুরিল অভাগীর অন্তিম বাসনা---

আমারি মনের মত গান কে গাচ্ছে ? ঐ শোন ঐ শোন" এই সময় সহসা এক জন এই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সুশীলার মস্তকের দিকে দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া অমনি সুশীলা চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। আবার যখন চক্ষু খুলিলেন তখন তাঁহার যেন কিছু জ্ঞান হইয়াছে আর সে বিকারের ঘোর নাই, তিনি সেই দিকে চাহিয়া বলিলেন মৃত্যুকালে এখন আমাকে দেখা দিলে "

" প্রাণেশ্বরী সুশীলা " কোন্ মুখে আর তোমার কাছে আসিব" বলিয়া দয়ানন্দ সুশীলার হস্ত আপন হস্তে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। স্বামীর পানে চাহিয়া স্বামীর হস্তে হস্ত রাখিয়া সুশীলা প্রাণত্যাগ করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ—পূর্ব্ব-ঘটনা।

সুশীলা বিধবা বলিয়া পরিচিত, হঠাৎ কি করিয়া মৃত্যুকালে তাঁহার স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন? এই স্থানে ইঁহাদের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত কিছু বলা আবশ্যক। তারাকান্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা চারুশীলাকে তাহার স্বামী বিবাহের পরই সেই যে পিত্রালয় হইতে লইয়া গিয়াছিলেন সেই অবধি আর তারাকান্তের নিকট পাঠান নাই। তাহাকে আনিবার কথা বলিলেই বিনোদলাল কোন না কোন ওজর করিতেন, আসল কথা চারুশীলাকে ছাড়িয়া তিনি এক দিনের জন্যও থাকিতে চাহিতেন না। তাহা দেখিয়া তারাকান্ত সুশীলার বিবাহ দিয়া ছোট জামাতাকে ঘর-জামাই করিয়া রাখিলেন। পুত্রাদি আর কেহই না থাকায় তাঁহার মনে হইল, তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় দুই কন্যাকে কাছ ছাড়া করিয়া তিনি কি করিয়া থাকিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বিবাহের অল্পদিন পরেই এ জামাতার স্বভাবে একটি বিলক্ষণ দোষ জন্মিল। দয়ানন্দ কি প্রকারে মদ্যপানে শিক্ষিত হইলেন। সুশীলা তাহাকে শোধরাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। একদিন কোথা হইতে দয়ানন্দ মদ খাইয়া গৃহে আসিয়া ভৃত্যকে পুনরায় মদ আনিতে আদেশ করায় সুশীলা ভৃত্যকে বারণ করিয়াছিলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া, সেই মত্ত অবস্থায় অজ্ঞানে সুশীলাকে স্বামী মারিলেন। এই কথা কি করিয়া তারাকান্তের কর্ণে ওঠে। তিনি জামাতার আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহাকে অনেক তিরস্কার করেন। দয়ানন্দ ইহাতে অত্যন্ত অপমান বোধ করিলেন। ভাবিলেন তিনি শ্বশুরের ন্যায় ধনশালী হইলে, শ্বশুর ওরূপ করিয়া কখনই বলিতে পারিতেন না। তাহা হইলে দয়ানন্দ যাহা

ইচ্ছা করিতে পারিতেন, কিছুতেই তাঁহার উপর কেহ কথা কহিতে পারিত না। অপমানিত হইয়া সেই দিনই তিনি শ্বশুরালয় ত্যাগ করিলেন। তাহাতে সুশীলার অত্যন্ত মনস্তাপ হইল। যাইবার সময় স্বামী সুশীলাকে বলিলেন "সুশীলা, আমাদের বিবাহ অযোগ্য হইয়াছে আমরা সমকক্ষ নহি। আমি দরিদ্র, তুমি ধনবানের কন্যা। আমি চলিলাম, তুমি পিত্রালয়ে সুখে থাক" এই কথায় স্বামীর সমস্ত অসদ্ব্যবহার সুশীলা ভুলিয়া গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "তুমি আমাকে ওকথা বলিতেছ কেন? তুমি দরিদ্র, তবে আমি কি? তবে আমিও কি দরিদ্র নহি? আমিও দরিদ্রের পত্নী। পিতার ধন আছে তাঁহারি থাক, তোমার সহিত আমি ভিক্ষা করিয়া জীবন কাটাইব, তোমার সহিত বনবাসেও আমার সুখ, আমাকে সঙ্গে লইয়া চল।" পত্নীর করুণ বাক্যে দয়ানন্দ যেন কিছু নরম হইলেন। কিন্তু শ্বশুরবাটী ত্যাগ করিবেন এই যে তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প, তাহা কোন মতেই টলিল না। তিনি সেই দিনই তাহা ত্যাগ করিয়া গেলেন।

দিন যায় মাস যায়, দয়ানন্দের আর কোন খবর নাই, সুশীলা চাতকীর ন্যায় তাঁহার পত্রের জন্য হা-প্রত্যাশ করিয়া থাকেন, প্রত্যহই ভাবেন, আজ নিশ্চয়ই তাঁহার পত্র পাইব, শেষে রাত্রি হইলে হতাশ হইয়া অশ্রুবারিতে মনের জ্বালা নিবারণ করেন। যদি এই দুঃখময় পৃথিবীতে ঈশ্বর আমাদের অশ্রুজল না দিতেন, জানিনা তাহা হইলে কি হইত। ক্রমে একবর্ষ দুইবর্ষ অতীত হইল, তবুও কোন সংবাদ নাই। অবশেষে তৃতীয় বৎসরের শেষে জনরবে শোনা গেল, দয়ানন্দের মৃত্যু হইয়াছে। শুনিলেন কলিকাতা হইতে জাহাজে উড়িষ্যা গমন করিতে ছিলেন, ঝড়ে জাহাজ ডুবি হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। শুনিয়া সুশীলা অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হইলেন। তাহার পর হইতে সুশীলা বিধবার বেশ ধারণ করিলেন।

এদিকে দয়ানন্দ সেই যে শ্বশুরের উপর রাগ করিয়া জন্মের মত শ্বশুরবাটী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, সেই অবধি আর সুশীলার সহিত তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি তারাকান্তের প্রতি এত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, যে আর কখনো তাঁহার বাটীতে আসিবেন না, তাঁহার কন্যাকে লইবেন না এইস্থির করিয়া, আপন মৃত্যু-সংবাদ রটনা করিয়া আর একটি কন্যার পাণিগ্রহণ পর্য্যন্ত করিলেন। তাহার গর্ভেই নীরজার জন্ম। কিন্তু কন্যার জন্মের কয় বৎসর পরে, তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর মৃত্যু হইল। এই ঘটনায় দয়ানন্দ সন্ন্যাসী হইয়া আপন সম্পত্তি বিক্রয় পূর্ব্বক যাহা কিছু সম্বল হইল, তাহা লইয়া বেড়াইতেই বেড়াইতে কানপুর অরণ্যে আসিয়া কন্যার সহিত বাস করিতে লাগিলেন। অন্য সকল সংসার-সম্পর্ক ছাড়িয়া এখানে শাস্ত্র আলোচনায় নিযুক্ত হইলেন।

এদিকে যত দিন যাইতে লাগিল ততই দয়ানন্দ তাঁহার শ্বশুরকৃত অপমান ভুলিয়া

যাইতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে তখন আবার সুশীলাকে দেখিতে তাঁহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, কিন্তু কোন্ মুখে আর তখন দেখা করিতে আসেন? তাহাকে ত্যাগ করিয়া আবার বিবাহ পর্য্যন্ত করিয়াছেন, এখন তাহার নিকট কি করিয়া আসিবেন?

কিন্তু এইবার যখন নীরজাকে কলিকাতা হইতে লইয়া দয়ানন্দ কানপুর যাইতেছিলেন—এলাহাবাদে আসিয়া সুশীলার সংবাদ লইবার জন্য তাঁহার এত ইচ্ছা হইল—যে তিনি এলাহাবাদে নামিয়া, সেখানে দুদিন থাকিয়া লোকমুখে সুশীলার সমস্ত সংবাদ লইলেন। কিন্তু ইচ্ছা হইলেও লজ্জা বশতঃ দেখা করিতে কোন মতে পারিলেন না। এলাহাবাদে আসিয়া দয়ানন্দ প্রমোদের যথার্থ পরিচয় পাইলেন। তিনি সুশীলার বাড়ীর নিকট নদীতীরে একটি ক্ষুদ্র বাড়ী ভাড়া করিয়া সেখানে দুদিন রহিলেন। এখানে আসিয়া নীরজা সেই আগেকার মত রাত্রি হইলেই নদীতীরে নদীতীরে ভ্রমণ করিত। সে দিন বৃষ্টির দিনেও নীরজা সন্ধ্যাকালে নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছিল। সহসা বৃষ্টি আসায় সে নিকটস্থ অট্টালিকার প্রাচীর-নিম্নে আশ্রয় লইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সেই বৃষ্টি বজ্র বিদ্যুৎ দেখিয়া নীরজার হৃদয় একটী অপূর্ব্ব ভাবে মুগ্ধ হইল। নীরজার প্রকৃতিই এমন উপাদানে গঠিত—যে মেঘের ডাকে, তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠিত, বিদ্যুৎ চমকিলে সে যেন তাহা ধরিবার আশায় ছুটোছুটি করিত, মুষলের ধারে বৃষ্টি পড়িলে সে তার সেই দেহখানি, নিবিড় জলদবৎ কুন্তলরাশি, সকলি ভিজাইয়া দয়ানন্দের তিরস্কারের পাত্র পর্য্যন্ত হইত। সে দিন সে আপন মনে সেই বৃষ্টির ঝন ঝন শব্দের সহিত আপন মধুর তান মিশাইতে লাগিল। ছেলেবেলা সে যখন একাকী, সেই কানপুরে বনে বনে বেড়াইতে বেড়াইতে বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া গান গাহিত, সেইরূপ সে আজ ভিজিতে ভিজিতে গান গাহিতে লাগিল। অতীত কালের স্মৃতিতেই তাহার হৃদয় ভাসিয়া গেল—বর্ত্তমান তাহার নয়ন হইতে অপসৃত হইল। তাহারি গানে সে দিন কনক ও সুশীলা মুগ্ধ হইয়া ছিলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহারি গান সুশীলার কর্ণে লাগিয়াছিল। এদিকে তাহার পিতা বাড়ী ফিরিয়া তাহাকে গৃহে না দেখিয়া নদীতীরে খুঁজিতে আসিলেন—এই সময় সহসা বিদ্যুতালোকে মুক্ত বাতায়নে তিনি সুশীলাকে দেখিতে পাইলেন। একবার দেখিয়া তাহার পরদিন তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা আরো প্রবল হইল, কিন্তু আর দেখিতে আসিতে পারিলেন না। সেই দিন হইতে তাঁর আর একটি ইচ্ছার সঞ্চার হইল। তাঁহার নীরজার সহিত প্রমোদের বিবাহ দিতে ইচ্ছা হইল, সুশীলার পিতৃবংশ তাঁহার পিতৃবংশে এক করিতে তাঁহার অত্যন্ত আবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু দেখিলেন সে ইচ্ছা তাঁহার কখনই পূর্ণ হইবে না। যামিনী নীরজাকে রক্ষা করিয়াছে, যামিনীকে তিনি জামাতা করিবেন বলিয়া শেষ কালে এক রকম

কথা দিয়াছেন। এখন অন্য কোন কথা মনে আনাই অন্যায়—সুতরাং তিনি আর তাঁহার সে ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দিলেন না। পরদিনই দয়ানন্দ কন্যাকে লইয়া কানপুর যাত্রা করিলেন। দেখিলেন এখানে থাকিয়া সুশীলাকে দেখার ইচ্ছা দমন করা অত্যন্ত দুষ্কর। কিছু দিন পরে যখন যামিনী কানপুরে আপন বিবাহের নিমিত্ত গিয়া, প্রমোদের সহিত নীরজার বিবাহ প্রস্তাব করিলেন—তখন দয়ানন্দ মহা সন্তুষ্ট চিত্তে ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া এই উপলক্ষে বিবাহের কথা কহিতে লজ্জা সত্ত্বেও সুশীলার সহিত একবার দেখা করিতে আসিলেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহা দেখিবেন জানিলে হয়তো আসিতেন না।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ—দ্রুমচ্যুত বল্লরী।

সুশীলার মৃত্যুতে কনকের অত্যন্ত আঘাত লাগিল, সে যেন আজ অনাথা হইল। বাল্য কালে মাতাকে হারাইয়া সে সুশীলাকেই মা বলিয়া জানিত। বাস্তবিক কনককে সুশীলা মাতার ন্যায়ই ভাল বাসিতেন। কনক ভাবিল তাহার আর কেহ নাই, আজ হইতে আর তাহাকে কেহ স্নেহ করিবে না। কত অপরাধ করিয়াছে, তবুও সুশীলা তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। স্বভাব শোধরাইবার জন্য, কনকের ভালর জন্য তাহাকে শাস্তি দিয়া মনে মনে আবার তাঁহার সে নিমিত্ত কতই কষ্ট হইত। ছেলেবেলা হইতে কনক সকলকে ভালবাসে কিন্তু সুশীলা বই কেহ আর কনককে ভাল বাসেন নাই। পিতাকে তাহার বড় স্মরণ হয় না, তথাপি যেটুক মনে আছে, তাহাতে কনকের অপেক্ষা তাহার পিতা প্রমোদকে সহস্রগুণে অধিক ভাল বাসিতেন। প্রমোদের জন্য পিতা মাতার নিকট সে বাল্য কালে কত না ভৎ'সনা খাইয়াছে, একদিনও মা বাপের আদর পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তবুও সে জন্য কনক কখনো দুঃখ করিত না। কনক প্রমোদকে এত অধিক ভাল বাসিত যে পিতা মাতা তাহাকে অযত্ন করিয়া প্রমোদকে ভাল বাসিতেন বলিয়া তাহার সেই কষ্টের মধ্যেও একটি সুখ হইত। কিন্তু প্রমোদকে যে সে এত ভালবাসে তাহার কাছে প্রতিদান না পাইয়া তাহার বড় দুঃখ হইত। প্রতিদান পাওয়া দূরে থাকুক তাহার অসীম ভ্রাতৃস্নেহের প্রতিদানে সে উপেক্ষিত না হইলেই যথেষ্ট মনে করিত, কিন্তু তাহাও তার অদৃষ্টে বড় ঘটিত না। ভাল বাসিয়া সে সকল স্থানেই কষ্ট পাইয়া আসিতেছে, কেবল সুশীলার নিকটেই সে প্রতিদান পাইয়াছিল, সুশীলার ভালবাসাই তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল, আজ কনক সেই স্নেহময়ী মাতাকে হারাইল, আজ তাহার সর্ব্বস্ব হারাইল, এখন তাহার কি দশা হইবে?" বালিকা কনক সুশীলার সেই মৃতশয্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। দাসীগণ যখন তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিল তখন কনক দেখিল সে শয্যায় আর সুশীলা নাই। চমকিতভাবে অমনি বালিকা

উঠিয়া দাঁড়াইল। অশ্রু পূর্ণ নেত্রদ্বয় অঞ্চলে মুছিয়া কি ভাবে জানি না অশ্রুহীন নিরাশার গম্ভীর প্রস্তর-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মাতাকে কোথায় লইয়া গিয়াছে দেখিতে চলিল। এদিকে দাস দাসীগণ, সুশীলার সৎকার নিমিত্ত মৃতদেহ সাজাইয়া তাহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে ছিল। তাহারা মৃত দেহ গঙ্গাতীরে লইয়া গেল কনকও নিস্তব্ধে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

তখন সন্ধ্যাকাল অতীত হইয়াছে, রজনী অন্ধকারময়ী, সেই অন্ধকার নিশায় সেই ক্ষুদ্রবালিকা নির্ভয়ে শবের সহিত গঙ্গাতীরে আসিল। সুশীলাকে শ্মশানে আনিলে চিতায় অগ্নিসংযোগের পূর্ব্বে মৃতের অতি নিকটে আসিয়া কনক সেই মৃত মুখ একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। শেষবার ভাল করিয়া দেখিবার অভিপ্রায়ে দেখিতে লাগিল, আর তো কখনই দেখিতে পাইবে না। ক্রমে চিতায় অগ্নি প্রদান করিল, অল্পে অল্পে তাহা ধরিয়া উঠিল, সুশীলার গাত্রে অগ্নি স্পর্শ করিল কনক আর দেখিতে পারিল না, এতক্ষণ কষ্টে অশ্রুরাশি থামাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা আর পারিল না, উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। এদিকে তাঁহার সৎকার শেষ হইলে দাস দাসীগণ ঘাট হইতে কিছু দূরে স্নান করিতে লাগিল, একটি দাসী কনককে গৃহাভিমুখে যাইতে দেখিয়া নিকটে আসিয়া বলিল "এখন এবেশে ঘরে যাইতে নাই, নদীতে স্নান করিয়া চল পরে ঘরে যাইবে' কনকের আর তখন নিজের ভাল মন্দের বিবেচনা শক্তি ছিল না। দাসীর কথায় অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে নদীতীরে আসিল।

রজনী গভীর অন্ধকার, সেই আঁধার নিশীথে গঙ্গার অতল জলরাশির উপর দুইটি স্ত্রীলোক আসিয়া নামিল। আঁধারে আর কিছুই দেখা যায় না,কেবল উর্দ্ধে আকাশ নীচে জল। নীচে যে দিকেই দেখ সেই দিকেই জল—চরণতলে জলরাশি, সম্মুখে জলরাশি, আশে পাশে চারি দিকেই অতল জলরাশি, তল তল চল চল করিয়া যেন উদাস ভাবে চলিতেছে। আর উপরে তারকাখচিত অনন্ত আকাশ প্রসারিত। আবার সেই তারকাখচিত আকাশ নদীগর্ভে প্রতিবিম্বিত হইয়া, গঙ্গার সেই আঁধার বক্ষ কিছু উজ্জ্বল করিয়া, দূরের অন্ধকার আরো ঘনীভূত করিতেছে। সেই আকাশালোক ছাড়া মাঝে মাঝে গঙ্গা বক্ষঃস্থিত একখানি নৌকার প্রদীপ মিটমিট করিয়া এক এক বার আলেয়ার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল। কনক সেই আলোটির পানে চাহিয়া চাহিয়া জলে নামিল। দেখিতে দেখিতে সেই আলোটি আর দেখিতে পাইলনা, এই অনন্ত জলরাশির মধ্যে যে একটি আলোক ছিল, তাহাও যেন নিভিয়া গেল। কনকের সংসার-সমুদ্রের মধ্যেও তেমনি সুশীলা যে একটি আলো ছিলেন, তাহাও এইরূপ নিভিয়া গিয়াছে, কি দেখিয়া এখন কনক থাকিবে? ভাবনা পীড়িত কনক যাতনায় মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে করিতে ব্যাকুল ভাবে

ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিল। দেখিল সেই অনন্ত আকাশ কেমন নীরব, কেমন গম্ভীর, কেমন শোভাময়। মনে হইল যেন তাহার দুঃখে তারাগণ ভ্রুকুটী করিয়া হাসিতেছে। সহসা সেই তারকারাশির মধ্য হইতে একটি তারকা খসিয়া পড়িল। কনকের অমনি মনে হইল "আমি যদি একটি তারা হইতাম তাহা হইলে কি হইত? আমিও এক দিন ঐরূপ করিয়া খসিয়া পড়িতাম। তাহাতে আর কাহার কি হইত। একটি কমিয়াছে বলিয়া কেহ জানিতেও পারিত না। এই যে একটি খসিল, এই অসংখ্য তারকারাশির মধ্যে একটীর জন্য কাহার কি আসিবে যাইবে? আবার ভাবিল" এখানেই বা আমি কে? এই বিস্তৃত পৃথিবী তাহার মধ্যে আমি কে? আমি একটি তারকা হইতেও অধম। আমি খসিয়া পড়িলে কাহার কি আসিবে যাবে, আমার জন্য একবিন্দু অশ্রু ফেলিবারও এখন কেহই নাই" ভাবিতে ভাবিতে কনক আপন মনে একটী একটী করিয়া সোপানশ্রেণী অবতরণ করিতে লাগিল। ক্রমে সোপান গুলি ফুরাইয়া আসিল কিন্তু কনকের আর তাহা হুঁস হইল না, সে জলে নামিয়া যেমন আর একটি সোপানে পদার্পণ করিতে পা বাড়াইল, অমনি সেই গভীর অন্ধকারময়ী নিশীথে, সেই অনাথা বালিকা, সেই অরক্ষিতাবস্থায় গঙ্গার অতল জলরাশি মধ্যে ডুবিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে গঙ্গার কৃষ্ণকায়া মধ্যে কনক মিশিয়া গেল, দাসী তাহা দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চীৎকার করিতে করিতে উপরে উঠিয়া আসিল।

প্রকৃতি এবং তাহার মূল-নিয়ম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উন্নতির নিয়ম।

ভারতীর ৩ ভাগ ২ সংখ্যা ২৮ পৃষ্ঠার পর।

সৌর জগতের সপ্তক, ভূস্তর গঠনের সপ্তক, এবং মূল সপ্তক, যথা ক্রমে প্রদর্শন করা গেল, এক্ষণে উদ্ভিদ্ জাতি এবং জীবজাতির সপ্তক ক্রমান্বয়ে প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রকৃতির কি আশ্চর্য্য-শৃঙ্খলা—সম্পূর্ণাবয়ব একটি বৃক্ষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যেরূপ ক্রমাভিব্যক্তি, সমগ্র উদ্ভিদ্‌জাতিরও ঠিক সেইরূপ; যথা, প্রথম,—বীজ; সমুদ্রে একরূপ উদ্ভিদ পাওয়া যায়, যাহা শুদ্ধ কেবল একটি মাত্র কোষ-বিহীন, গর্ভাঙ্কুর-(Nucleus)-বিহীন বীজ, আর কিছুই নহে। দ্বিতীয়—মূল; দ্বিতীয় শ্রেণীর

উদ্ভিদ্ মূলরূপী; প্রথম শ্রেণী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পূর্ণতা-প্রাপ্ত বীজগণ একত্র গ্রথিত হইয়া বর্ত্তমান শ্রেণীর মূলরূপী উদ্ভিদে পরিণত হয়; ইহাও সামুদ্রিক উদ্ভিদ্। তৃতীয়,—স্তম্ব (Stem) শাখা প্রশাখা; সমুদ্রে একরূপ উদ্ভিদ্ জন্মে যাহার চরম-সীমা শাখা-বিস্তার মাত্রেই পর্য্যাপ্ত। চতুর্থ,—পল্লব; এক জাতীয় উদ্ভিদ আছে যাহাদের কেবল পল্লবোদ্গাম মাত্রই চরম-সীমা,—ইহাদের নাম দেওয়া গেল—পর্ণী (Fern) অথবা পর্ণতরু। পঞ্চম,—পুষ্প; এক জাতীয় বৃক্ষ এরূপ যে, তাহাদের পুষ্পাভ্যন্তরে বীজকোষ নাই; বীজ-কোষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেই তাহা ফলে পরিণত হয়, সুতরাং এ জাতীয় বৃক্ষের ফলোৎপত্তি সম্ভবে না, ইহাদের চরম সীমা পুষ্পোদ্গাম মাত্রেই পর্য্যাপ্ত। ষষ্ঠ,—অখণ্ড-বীজী ফল; তাল, নারিকেল, পূগ প্রভৃতি বৃক্ষ ফল-যাহা প্রসব করে তাহার বীজ অখণ্ডাকৃতি। সপ্তম,—দ্বিখণ্ড-বীজী ফল, আম্র নেবু চনক প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ-গুলির শাঁস, সর্ব্বদা দুই খণ্ডে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরি-উক্ত সপ্তকের যাহার পর যেটি ক্রমান্বয়ে ধরা হইয়াছে, বাস্তবিকই তাহার পর সেইটি যথাক্রমে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল ইহা ভূতত্ত্ববিদ্যার সিদ্ধান্ত। উক্ত সপ্তকের মধ্যে কাব্য এই একটি দেখা যায় যে, মূলরূপী উদ্ভিদ্ স্বার্থের ন্যায় একত্ত বিক্ষেপ শক্তির বশবর্ত্তী, কেননা একটি বীজ-পিণ্ডের মধ্যে ক্রমিক অংশ বিচ্ছেদ হইয়া ঐ প্রকার উদ্ভিদ্ পরিগঠিত হয়; তাহাতে আবার বিষয়াসক্তির ন্যায় শোষণ-কার্য্যেই তাহার বিশেষ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। স্তম্বশাখাদিরূপী উদ্ভিদ্ দাম্পত্য প্রেম এবং ধর্ম্মের ন্যায় বন্ধন-কার্য্যের সবিশেষ পরিচয় দেয়; বন্ধন-কার্য্য কি? না দুই বিপরীত পক্ষদ্বয়কে এক বন্ধনে বিধৃত করিয়া রাখা; মূল এক দিকে প্রসারিত হইতেছে, স্তম্ব শাখা অপর-দিকে প্রসারিত হইতেছে অথচ উভয়ের মধ্যে সাম্য রক্ষিত হইতেছে, ইহা ধর্ম্ম-ভাবের একটি বহিরাদর্শ; এরূপ সচরাচর দেখা গিয়া থাকে যে ঝটিকাঘাতে বৃক্ষ যদি একপার্শ্বে অধিক হেলিয়া পড়ে তবে তাহার বিপরীত পার্শ্বে প্রচুর পরিমাণে শাখা প্রশাখা উদ্ভূত হইয়া মূলের সহিত স্তম্বের বন্ধন যেমন তেমনি অব্যাহত রাখে। পর্ণী জাতীয় উদ্ভিদ্ পর্ণোৎপাদন করিয়াই স্থগিত থাকে; বৃক্ষের পত্র দেখিতে দেখায় ঠিক যেন স্তম্ব শাখা-প্রশাখার নূতন সংস্করণ; পত্রের বৃন্ত বৃক্ষের স্তম্ব, পত্রের শিরা উপশিরা বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা, দুয়ের মধ্যে এমনি মিল যে, প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির শিশু-সন্তান বলিলেই হয়; কর্তৃত্ব-শক্তির ন্যায়, বৃক্ষ আপনার পত্র গুলিতে আপনাকে নূতন নূতন করিয়া প্রতি-ফলিত করে। পুষ্প-তরুর পুষ্পোদ্গাম সৌহার্দ্দ এবং সৌন্দর্য্যের ন্যায় চমৎকার একটি নূতনভাব উদ্গীরণ করে; পুষ্প যদিও বৃক্ষের আপনার বস্তু, তথাপি দেখিতে দেখায় এমনি যেন তাহা শাখা পল্লবের

প্রবাহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে; স্তম্ব-শাখা-পল্লব যেমন ধারাবাহিক চলিয়া আসিতেছে, পুষ্পোৎপত্তি তাহা পশ্চাতে ফেলিয়া আর একটি যেন নূতন রাজ্য আনিয়া উপস্থিত করে; পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহারা যেমন পিতা মাতার আশ্রয়ে থাকিয়াও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন-পূর্ব্বক সৌহার্দ্দবন্ধনের দিকে আকৃষ্ট হয়, বৃক্ষের পল্লব যেন সেইরূপ বয়ঃপ্রাপ্তি-সুলভ সৌহার্দ্দ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পুষ্পের দলরাজি আকারে নূতন রূপে আবির্ভূত হয়। আবার এই দেখা যায় বন্ধুকে পুষ্প উপহার দেওয়াটি যেমন স্বাভাবিকী শোভা পায়, অন্য কোন বস্তু উপহার দেওয়া তেমন নহে। নারিকেলাদি অখণ্ড-বীজী তরুগণ ভিতর হইতে ভিতরে বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশই উপর হইতে উপরে উত্থান করে, ইহাতে উচ্চের প্রতি টান বুঝায়; এবং তাহাদের শাখাদিতে ভক্তির অবনম্র ভাব এবং সমগ্র অবয়বে মঙ্গলের ঊর্দ্ধগতি ভাব উভয় আদর্শই মূর্ত্তিমান দেখা যায়; নারিকেল কদলী প্রভৃতি আমাদের দে[illegible] কার্যে,ই বিশেষ রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহা হকাহারো অবিদিত নাই; আর একটি উপমা এই যে, বন্ধুকে পুষ্প উপহার দেওয়া যেমন শোভা পায়, রাজাবা উচ্চপদস্থিত ব্যক্তিকে ফল উপহার দেওয়া সেইরূপ শোভা পায়।

দ্বিখণ্ড-বীজী বৃক্ষ বাহির হইতে বাহিরে বর্দ্ধিত হয়, ইহাতে সকলের প্রতি প্রেম বিস্তারের লক্ষণ প্রকাশ পায়, এবং তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকল পরস্পর সাম্য রক্ষা পূর্ব্বক বর্দ্ধিত হয়, ইহাতে সামঞ্জস্যের লক্ষণ প্রকাশ পায়। অখণ্ড-বীজী তরুর ভাব এই—উচ্চের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট রাখিয়া ও আপনা[illegible] আপনি সংযত থাকিয়া বর্দ্ধিত হওয়া; দ্বিখণ্ড-বীজী তরুর ভাব এই—অসংকোচে মুক্ত ভাবে বর্দ্ধিত হওয়া; সাধনাবস্থা এবং সিদ্ধাবস্থার মধ্যে যে প্রভেদ এ দুই জাতীয় তরুর মধ্যে তাহারই উপমা বিদ্যমান দেখা যায়।

আদিম বীজ-রূপী বৃক্ষ যে উপকরণে নির্ম্মিত চরম পূর্ণাবয়ব বৃক্ষের বীজের সারাংশও সেই উপকরণে নির্ম্মিত; অথচ শেষোক্তের শক্তির পরিধি পূর্ব্বোক্ত অপেক্ষা কত বিস্তৃত। বৃক্ষের মৃত্তিকা-নিহিত বীজ তাহার প্রথম সুর এবং তাহার ফল-গর্ভস্থ বীজ অষ্টম সুর বলিয়া গণনীয়; শেষোক্ত বীজ হইতে পুনর্ব্বার যখন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তখন সে বৃক্ষ দ্বিতীয় সপ্তকের স্থান অধিকার করে এবং প্রথম সপ্তকের অষ্টম [illegible] সেই যে ফলগর্ভস্থ বীজ তাহা এক্ষণকার এই দ্বিতীয় সপ্তকের প্রথম সুর বলিয়া গণনীয়। এই উপমানুসারে বলা যাইতে পারে যে, চরম পূর্ণতাপ্রাপ্ত বৃক্ষের বীজসকল বৃক্ষজাতির অষ্টম সুর।

কিন্তু আর এক দিক্ দিয়া দেখিলে ইহা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, উপর্য্যুপরিস্থ দুইটি সপ্তক এক সঙ্গে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে; সে দুইটি সপ্তক কি? না উদ্ভিদ্ সপ্তক এবং জীব-সপ্তক; দুই স্বর-সপ্তকের দুইটি সমস্থানীয় সুর একত্র গীত হইলে যেমন উভয়ে উভয়ের পোষকতা করে, উদ্ভিদ্ এবং জীব এ দুই সপ্তকের মধ্যেও সেইরূপ

পরস্পর পোষকতার ভাব দৃষ্ট হয়। আদিম উদ্ভিদ্ যেমন বীজ-রূপী, আদিম জীবও সেইরূপ; বীজরূপী আদিম উদ্ভিদ্ প্রথম সপ্তকের প্রথম স্বর, বীজরূপী আদিম জীব প্রথম সপ্তকের অষ্টম স্বর এবং দ্বিতীয় সপ্তকের প্রথম স্বর; একজাতীয় সামুদ্রিক জীব আছে যাহারা মধ্যদেশ হইতে চতুর্দিকে মূল-বিস্তারের ন্যায় রজ্জুরূপী গুটি কত অঙ্গ বিস্তার করে। মূল-রূপী বৃক্ষ যেমন প্রথম সপ্তকের দ্বিতীয় স্বর, এই মূলাঙ্গী (Radiata) জীব সেইরূপ দ্বিতীয় সপ্তকের দ্বিতীয় স্বর। উদ্ভিদ্ পক্ষে শাখায়মান সামুদ্রিক উদ্ভিদ্ এবং জীব পক্ষে শাখাঙ্গী জীব (Articulata, কীট পতঙ্গ) তৃতীয় স্বর; বৃশ্চিকাতে শাখাঙ্গী-ভাব সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়; তাহার শরীরটি কতকগুলি শাখাঙ্গের সমষ্টি মাত্র। মধুমক্ষিকা পিপীলিকা প্রভৃতির প্রতি প্রণিধান করিয়া দেখিলেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে পারে যে, তিনটি শাখা-শরীর যুড়িয়া একটি সমগ্র শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে; এমন কি বোল্‌তার দেখা গিয়াছে যে তাহার ছিন্ন শাখাঙ্গ অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। উদ্ভিদ্ পক্ষে পর্ণীজাতীয় তরু এবং জীব পক্ষে মৎস্য, চতুর্থ স্বর; উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য এই যে, প্রথমতঃ পর্ণীজাতীয় তরুগণের মধ্যে প্রধানতম যে জাতীয় তরু তাহার গাত্র শল্কময়, তজ্জন্য তাহা শল্কী পর্ণতরু (Scale fern) বলিয়া উক্ত হয়; দ্বিতীয়তঃ—মৎস্যের শল্ক-পরিচ্ছদ এবং পর্ণীর পর্ণপরিচ্ছদ সামান্যত পরস্পর উপমেয় হইতে পারে; তৃতীয়তঃ উভয়েরই স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ নির্ণয় করা সুকঠিন। উদ্ভিদ্ পক্ষে ফলশূন্য তরু এবং জীব পক্ষে সরীসৃপ পঞ্চম স্বর, উভয়েরই স্ত্রীপুরুষ-ভেদ অতীব অস্পষ্ট। উদ্ভিদ্ পক্ষে নারিকেলাদি অখণ্ডবীজী তরু এবং জীব পক্ষে পক্ষীজাতি ষষ্ঠ স্বর; এজাতীয় তরুর শাখা পত্রের সহিত পক্ষীজাতির পক্ষের অবয়ব-সাদৃশ্য স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়; পাখীর পালখ আর তাল বা নারিকেল গাছের ডাল, দুইকে তুলনা করিয়া দেখিলেই উভয়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একই আদর্শে পরিগঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। দূর হইতে দেখিলেও তাল নারিকেলাদির শাখা-বিস্তার উড্ডয়নোদ্যত পক্ষীর পক্ষবিস্তারের ন্যায় প্রতিভাত হয়। উদ্ভিদ্ পক্ষে দ্বিখণ্ডবীজী বৃক্ষ এবং জীব পক্ষে স্তন্যপায়ী জীব সপ্তম স্বর; উভয়ই স্ব স্ব সপ্তকের চরম-সীমায় উপনীত হইয়াছে; এই জীব-সপ্তকের অষ্টম স্বর মনুষ্য।

সপ্তক-শ্রেণী যখন মনুষ্য অবধি পৌঁছিয়াছে তখন আড্ডায় পৌঁছিয়াছে, কেননা মনুষ্যই সৃষ্টির চরম অভিব্যক্তি, অতএব এখন তাহাকে বিশ্রাম দেওয়া হো'ক্। সপ্তক-শ্রেণীর সহিত আমরা এতটা পথ একত্রে যাপন করিলাম—সত্য, কিন্তু পর্য্যটন কার্য্যে শশব্যস্ত থাকাতে উহার সবিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে সময় পাওয়া যায় নাই, এখন স্থানে পৌঁছিয়া নির্ঝঞ্ঝাট হওয়া গিয়াছে—ইহার পর ধীরে সুস্থে উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

নিদ্রা, স্বপ্ন, মস্তিষ্ক ও আত্মা।

নিদ্রার সময় শারীরিক অবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় তদ্বিষয়ে নানা পণ্ডিতের নানা প্রকার মত শুনিতে পাওয়া যায়। কেহবা হৃদয়ে কেহ বা মস্তকে নিদ্রার উৎপত্তি-স্থান নির্ণয় করেন। কিছু দিন পূর্ব্বে এই মতটি বলবৎ ছিল যে, হৃৎ-পিণ্ডের-ক্রিয়া শিথিল হইয়া তথা হইতে রক্তরাশি মস্তিষ্ক মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হওয়া প্রযুক্ত মস্তিষ্ক মধ্যে রক্ত-রোধ (Congestion) উপস্থিত হয় এবং এই রক্তরোধের চাপে মস্তিষ্ক অসাড় ও অচেতন হইয়া পড়ে। ইহাকেই নিদ্রা বলে।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মতটি অপেক্ষা আধুনিক মতটি উৎকৃষ্ট বলিয়া সহজেই উপলব্ধি হয়। সে মতটি এই যে, মস্তিষ্ক হইতে রক্ত-রাশি আকৃষ্ট হইয়া যখন অন্যস্থানে প্রবাহিত হয় এবং এই রক্ত-শূন্যতা হেতু মস্তিষ্ক-সূত্রগুলি শিথিল হইয়া পড়ে, তখনই নিদ্রা উপস্থিত হয়। অতএব মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য নিদ্রার কারণ না হইয়া রক্তের অভাবই তাহার কারণ বলিয়া আজ কাল অবধারিত হইতেছে।

এই মতটি পরীক্ষার দ্বারাও সপ্রমাণ হইয়াছে। এক জন জীবন্ত মনুষ্যের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল যে, নিদ্রার সময় তাহার মস্তিষ্কের পাক্-গুলি (Convolutions) শিথিল হইয়া পড়িত, এবং জাগ্রৎ হইলেই আবার সে-সকল পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইত; মনের চালনা হইলেই মস্তিষ্কের পাক-গুলি ফুলিয়া উঠিত।

নিদ্রা হইতে যদি আমাদিগকে কেহ হঠাৎ জাগাইয়া দেয় মস্তিষ্কের মধ্যে বেগে রক্ত প্রবাহিত হওয়া প্রযুক্ত মস্তিষ্ক মধ্যে কেমন এক প্রকার প্রসার উপলব্ধি হয়—রক্তাগমে শিথিল মস্তিষ্ক-সূত্রগুলি দাঁড়াইয়া উঠে, এই জন্যই বোধ হয় ঐ প্রকার ভাব আমাদের মনে অনুভব হয়।

এই মতটির সত্যতা বিষয়ে আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। শারীরিক কিম্বা মানসিক কোন প্রকার উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বেগবান হইলে, কিছুতেই আমাদের চক্ষে নিদ্রা আইসে না। মস্তিষ্ক যতক্ষণ সক্রিয় থাকে ততক্ষণ নিদ্রাকর্ষণের সকল চেষ্টাই বিফল হইয়া যায়। নিদ্রাকর্ষণ করিবার জন্য আমরা সচরাচর কি উপায় অবলম্বন করি? যে ঔষধে বা যে উপায়ে মস্তিষ্ক হইতে রক্ত-রাশি চালিত হইয়া হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আনীত হয়, তাহাই প্রয়োগ করিয়া থাকি। উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলে কি জন্য নিদ্রাকর্ষণ হয়? মস্তিষ্ক হইতে রক্ত আকৃষ্ট হইয়া পাকাশয়ে প্রবাহিত হওয়া প্রযুক্ত মস্তিষ্কের রক্তাভাবই সেই সময়ে নিদ্রাকর্ষণের এক মাত্র কারণ।

নিদ্রা আসিবার সময় আমাদিগের মানসিক অবস্থা কিরূপ হয়? নানা প্রকার

কল্পনা-ছবি আমাদের মনে অনাহূত প্রবেশ করে—বাহ্য বস্তু-সকল নেত্র সমক্ষে অস্পষ্ট হইয়া যায়—এবং শব্দ সকল অতি মৃদু-ভাবে কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। আমরা বেশ উপলব্ধি করিতে পারি যে আমাদের ইচ্ছা-শক্তি শিথিল হইয়া গিয়াছে। হয় তো আমরা সেই ইচ্ছাকে পুনর্ব্বার আয়ত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করি—হয় তো সেই ইচ্ছা ক্ষণকালের জন্য আমাদের বশে আইসে—যে কর্ম্মে আমরা নিযুক্ত ছিলাম তাহাতে পুনর্ব্বার মনঃসমাধান করিতে হয় তো ক্ষণকালের জন্য সমর্থ হই—কিন্তু পরক্ষণেই আবার চিন্তা সকল বিক্ষিপ্ত হয়—মনশ্চক্ষুর সমক্ষে আবার নানা প্রকার অনাহূত ছবি আসিয়া চলা-ফেরা করিতে থাকে, আমরা বুঝিতে পারি শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া আসিতেছে, চক্ষের পত্র নিমীলিত হইয়া আসিতেছে—পরক্ষণেই বাহ্য অস্তিত্ব আমাদের অগোচর হয়, আমরা নিদ্রিত হই।

আমরা নিদ্রাকালে স্বপ্নাবস্থায় যে সকল ব্যাপার দেখিতে পাই, মানসতত্ত্ব কি আত্মতত্ত্ব-ক্ষেত্রে তদপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার আর কিছুই নাই। কিন্তু নিতান্ত পরিচিত বলিয়াই সেই সকল ব্যাপারে আমরা বিস্মিত হই না। সেই সকল ব্যাপার প্রতিদিন দেখিতে পাই বলিয়াই তাহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য আমাদের কৌতূহল হয় না।

জাগ্রৎ অবস্থা ও নিদ্রাবস্থার মধ্যে যে টুকু ব্যবধান তাহা অতি ক্ষণিক ও সঙ্কীর্ণ, অতি সূক্ষ্ম আত্মদর্শীরাও তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন না। কিন্তু ঐ এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হয়, কি বিষম মানসিক বিপ্লব উপস্থিত হয়। মনুষ্য যেন আর সে মনুষ্য থাকে না। তাঁকে আর বুদ্ধি-বিবেচনা-সমন্বিত উন্নত জীব বলিয়া বোধ হয় না, বাহ্য জগতের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়, তাহার নিকট যেন বাহ্য জগতের অস্তিত্বই থাকে না, তাঁহার ইচ্ছা—যাহা চেতনাবান আত্মার বাহ্য বিকাশের শক্তি মাত্র, সে ইচ্ছা-শক্তিও অসাড় ও নিস্পন্দ হইয়া পড়ে—তাঁহার চিন্তা ও ভাবের উপর তাঁহার আর কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না—তাঁহার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল তাঁহার আর বশে থাকে না। কিন্তু তাঁহার প্রাণ-ক্রিয়া পূর্ব্ববৎ অবিকৃত ভাবে ও সুশৃঙ্খল রূপে সমান চলিতে থাকে, তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় না—ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্য হইতে নিরস্ত হয় কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নহে—আমরা শুনিতে পাই কিন্তু অতি অস্পষ্ট রূপে, আমরা শব্দের পরিমাণ উপলব্ধি করিতে পারি না। অনেক সময় হয় তো উচ্চ শব্দও আমাদের কর্ণগোচর হয় না, আবার এক এক সময় সামান্য ফুস্ ফুস্ শব্দেই জাগিয়া উঠি—কিম্বা অতি মৃদু শব্দকেও কখন কখন আমাদের উচ্চ আওয়াজ বলিয়া বোধ হয়। দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াও যে একেবারে স্থগিত হয়, তাহাও ঠিক বলা যায় না—আস্বাদন ও ঘ্রাণ-শক্তি

মন্দীভূত হয় বটে কিন্তু একেবারে অপনীত হয় না। এই সকল তথ্য আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে যে, ইন্দ্রিয় সকল যখন আংশিক রূপে অসাড় হইয়া পড়ে, বাহ্য জগতের সহিত আমাদিগের মনের যে সকল অব্যবহিত যোগাযোগের স্থল—সে সকল স্থল সে সময় একেবারে অসাড় হয় না, পরন্তু ইন্দ্রিয় স্নায়ু সমূহের শেষ সীমা এবং মস্তিষ্ক এই উভয়ের কোন মধ্য দেশে, কিম্বা যেখানে চেতনাবান আত্মার সহিত মস্তিষ্কের অব্যবহিত যোগ সেই স্থলেই অসাড়তা উপস্থিত হয়। কি জাগ্রৎ অবস্থা কি নিদ্রাবস্থা সকল অবস্থাতেই স্নায়ুর উপরেই যে বাহ্য জগতের প্রতিবিম্ব সকল প্রকটিত হয় তাহাতে আর সংশয় নাই। এবং এই বাহ্য জগতের প্রতিবিম্ব সকল মস্তিষ্কমণ্ডলের তলদেশস্থ স্নায়ু-সঙ্গম-দেশে (ganglion) ইন্দ্রিয়-স্নায়ু কর্তৃক যে নীত হয় তাহার কতক প্রমাণ পাওয়া যায়। Professer Ferrier সাহেবের পরীক্ষা-সমূহে ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়-স্নায়ু সকল যেখানে গিয়া সম্মিলিত হয়, সেই মস্তিষ্ক-তল-দেশস্থ gangliionই এই কেন্দ্র-স্থল। এই কেন্দ্রস্থলে প্রথমে বাহ্য জগতের প্রতিবিম্ব সকল প্রবাহিত হয়—পরে, সেখান হইতে মস্তিষ্ক-মণ্ডলে নীত হয়—তখন আত্মা তাহাদিগের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে।

নিদ্রাবস্থায় মস্তিষ্ক শরীরের উপর হুকুম চালাইতে অসমর্থ হয়। স্নায়ু সকল তাহার হুকুম মানে না। কোন পদার্থ—যাহা মস্তিষ্ক এবং স্নায়ু-সমূহের মধ্যবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে এবং যাহা জাগ্রৎ অবস্থায় সক্রিয় থাকে—সেই পদার্থটি নিদ্রাকালে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে—সেই পদার্থটি কি?—না ইচ্ছা। এই ইচ্ছার কার্য্য স্থগিত হয়, এই জন্যই শরীরের উপর মনের আর কোন কর্তৃত্ব থাকে না—এই প্রণালী অনুসারেই শরীরের আবশ্যক বিরাম কার্য্য সাধিত হয়।

এই খানে এই প্রশ্নটি উপস্থিত হইতেছে, এই যে ইচ্ছা-শক্তির কার্য্য স্থগিত হয় এবং শরীর হইতে আত্মার কর্তৃত্ব আংশিক রূপে তিরোহিত হয়—এই পরিবর্ত্তনটি মানসিক যন্ত্রের কোন্ স্থানে সংঘটিত হয়? নিদ্রা দ্বারা এই মহান্ বিপ্লব কিরূপে সাধিত হয়? যদি সমুদায় যন্ত্র নিদ্রাবস্থায় নিষ্ক্রিয় থাকে তাহা হইলে সহজেই তো এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, "সমস্ত মস্তিষ্ক নিদ্রিত থাকা প্রযুক্তই সমস্ত মানসিক যন্ত্রের কার্য্য স্থগিত থাকে, জাগ্রদবস্থায় ঐ যন্ত্র যে সকল শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়, সেই সকল শক্তি স্বীয় স্বীয় কার্য্য হইতে কিয়ৎকালের জন্য নিদ্রাবস্থায় বিরত হয় বলিয়াই সমস্ত যন্ত্র স্থগিত হয়।" কিন্তু তাহা তো প্রকৃত ঘটনা নহে। সকল শক্তিই নিদ্রাবস্থায় তো স্বীয় স্বীয় কার্য্য হইতে বিরত হয় না। জীবনী শক্তি সে সময় সম্পূর্ণ রূপে কার্য্য করিতে থাকে—মনও একেবারে নিষ্ক্রিয় হয় না, যেহেতু মনে নানা প্রকার স্বপ্নের উদয়

হয়—তবে যদি মস্তিষ্কমণ্ডল উপরি ভাগে জাগ্রৎ থাকে এবং অবশিষ্ট শরীর নিম্ন ভাগে নিদ্রিত থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের মধ্যে যোগ ঠিক্ কোন স্থলে নিদ্রার সময় বিনষ্ট হয়?—যে মস্তিষ্ক-মণ্ডল বুদ্ধির যন্ত্র-স্বরূপ, সেই মস্তিষ্ক-মণ্ডলের কোন নিম্ন ভাগে অবশ্য সেই যোগের স্থান, অর্থাৎ যে বিন্দুতে মস্তিষ্কের শাখাপ্রশাখা স্নায়ু-মণ্ডলের সহিত সম্মিলিত হয়। এই বিন্দু দিয়া আমাদের ইচ্ছা-শক্তি শরীরের উপর অব্যবহিতরূপে কর্তৃত্ব করে।

Professor Ferrier সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, যে মস্তিষ্ক-মণ্ডল বুদ্ধির ইন্দ্রিয় স্বরূপ, সেই মস্তিষ্কমণ্ডলেই ইচ্ছা-শক্তির পরিচালনা হয়। জাগ্রৎ ও অবিকৃত অবস্থায় ইচ্ছা শক্তি শরীরের উপর কর্তৃত্ব করে। নিদ্রিত অবস্থায় কিম্বা শরীরের বিকৃত অবস্থায় ইচ্ছার আর সে কর্তৃত্ব শক্তি থাকে না। মস্তিষ্ক-মণ্ডল এবং শরীর-পরিচালক স্নায়ু সমূহ—এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী এমন কোন একটি স্থল আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যেখানে ইচ্ছা শক্তির কার্য্য অসাড় হইয়া পড়ে কিম্বা ইচ্ছা যে সকল আজ্ঞা শরীরের উপর প্রচার করে, সেই আজ্ঞাসকল যেখান দিয়া বহন করিতে নিরস্ত হয়। সে অংশ কি? শারীরবিধান বিদ্যার সাহায্যে আমরা দুইটি ganglionএর বিষয় অবগত হই। ইহার মধ্যে একটি ganglion ইন্দ্রিয়-স্নায়ু সমূহের সঙ্গম-কেন্দ্র।

আমরা ইহাও অবগত আছি যে, নিদ্রাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য প্রতিবিম্ব সকল বহন করিতে একেবারেই ক্ষান্ত হয় কিম্বা অতি অস্পষ্টরূপে বহন করে। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয়, এই gangliongই নিদ্রার আধারস্থান। এই ganglion নিদ্রিত হইয়া পড়ে বলিয়াই ইচ্ছার আজ্ঞা সকল মস্তিষ্ক হইতে শরীর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতে পারে না। এবং ইন্দ্রিয়-প্রেরিত সংবাদ সকলও মস্তিষ্ক মধ্যে নীত হয় না।

সমস্ত মস্তিষ্ক-যন্ত্র, না তাহার কতক গুলি অংশ মাত্র নিদ্রাবস্থায় পতিত হয়? আর যদি অংশমাত্রই নিদ্রিত হয় তাহা হইলে সে কোন্ কোন্ অংশ—ইহা সমস্যা-স্থল। কিন্তু সে যাহাই হউক, উপরে যে সকল তথ্য বিবৃত হইল তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে মস্তিষ্কের নিম্ন তলস্থ gangionই নিদ্রার আধার স্থান। ইহা নিশ্চিত যে, সমস্ত মস্তিষ্ক-মণ্ডল কখনই নিদ্রিত হয় না—তাহা যদি হইত তাহা হইলে কখনই স্বপ্ন হইত না। মস্তিষ্ক-কেন্দ্র (cerebral centre) এবং শরীর এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী যে gangliongটির অবস্থিতি—যেখান হইতে স্নায়ু সমূহ প্রবাহিত হয়—সেই gangliongটি নিদ্রাভিভূত হয় কি না আমরা নিশ্চিত রূপে অবগত নহি। নিদ্রিত হয় না বলিয়াই সহজে অনুমান হয়, কারণ, জীবনীশক্তি-গত ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়াকে যে সকল স্নায়ু পোষণ করে সেই সকল স্নায়ুকে কখনই নিদ্রিত হইতে দেখা যায় না। মস্তিষ্কযন্ত্রের অন্যান্য অংশে কেনই বা বিশ্রামের

প্রয়োজন হয় আর সেই সকল স্নায়ুর বিশ্রামের কেনই বা প্রয়োজন হয় না তাহা আমরা অবগত নহি। মস্তিষ্ক-যন্ত্রের যে ভাগটি ইচ্ছা শক্তির অধীন সেই খানেই বিশ্রামের প্রয়োজন আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

মস্তিষ্ক ও শরীর যে সকল বন্ধনে পরস্পর আবদ্ধ নিদ্রাকালে সেই সকল বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। তাহাদের উপর ইচ্ছা-শক্তির কর্ত্তৃত্ব তিরোহিত হয়। জড় শরীর বিশ্রাম করে। ইচ্ছা-শক্তি অনারূঢ় হইয়া পড়ে বলিয়াই বিশ্রাম করে। ইচ্ছা নিরপেক্ষ যে সকল শারীরিক ক্রিয়া, তৎ সমুদায়ের কিছু মাত্র ব্যাঘাত হয় না, বরং ইচ্ছা-শক্তির বাধা-বহির্ভূত বলিয়া আরও নিয়মিত রূপে ও সুচারু রূপে চলিতে থাকে।

কিন্তু এই যে ইচ্ছা-শক্তি—ইহা কি?

চেতনাবান আত্মার বহির্বিকাশ-শক্তি ভিন্ন ইহা আর কিছুই নহে। এই ইচ্ছা দ্বারা আত্মা জড় শরীরের উপর এবং জড়-শরীর দিয়া বাহ্য জড়-জগতের উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে।

কোন নিদ্রিত ব্যক্তিকে দেখিলে মনে হয় বুঝি সে একেবারে মৃতপ্রায় কিন্তু সেই নিদ্রিত ব্যক্তির সমক্ষে বহির্জগতের অস্তিত্ব যদিও লুপ্ত হয়, তথাপি সেই হত-চেতন নিদ্রিত ব্যক্তি সেই সময়ে আপনার অন্তরের মধ্যে একটি নূতন জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বিচরণ করে—শরীর নিদ্রিত হয় বটে কিন্তু তাহার মন নিদ্রিত হয় না। বরং জাগ্রৎ অবস্থা অপেক্ষা নিদ্রাকালীন মনকে আরও ক্রিয়াশীল বলিয়া বোধ হয়। সেই সময় মন কত প্রকার নাটক রচনা করে, কত নূতন ব্যাপারের সৃষ্টি করে, আত্মসৃষ্ট জগতের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, বৎসরব্যাপী ঘটনা সকল এক ঘণ্টার মধ্যে একত্র করে, কতকি দেখে, কতকি শোনে, কতকি অনুভব করে, জাগ্রৎ অবস্থায় তাহার শতাংশের এক অংশও দেখিতে, শুনিতে, বা অনুভব করিতে পারে না। এই সমস্ত ভাবিয়া দেখিলে কি আমাদের বিস্ময় উপস্থিত হয় না? স্বপ্ন যদি আমাদের সকলেরই পরিচিত বিষয় না হইত, তাহা হইলে কি আমরা উহাকে অবিশ্বাস্য অসম্ভব ঘটনা বলিয়া মনে করিতাম না? যদি কেহ আমাদের নিকট আসিয়া বলিত যে আমি নিদ্রাকালীন এই প্রকার ব্যাপার সকল দেখিয়াছি, তাহা হইলে কি আমরা তাহাকে প্রবঞ্চক প্রতারক মিথ্যাবাদী কিম্বা আশু-বিশ্বাসী বাতুল বলিয়া স্থির করিতাম না? স্বপ্ন ব্যাপারের তত্ত্বানুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে যে জড়-যন্ত্র তাহার উৎপাদনে সাহায্য করে তাহা প্রথমে বিবৃত করা আবশ্যক।

মেরুগ্রন্থির উপরিতন সীমান্তে প্রসারিত হইয়া যে ganglion অর্থাৎ যে স্নায়ু-সঙ্গম মস্তিষ্কের সহিত মিলিত হয়—সেই স্নায়ু-সঙ্গমকে Medulla oblongata বলে।

এই স্থলে আসিয়া মস্তিষ্ক শেষ হয় এবং

স্নায়ু-প্রণালীর আরম্ভ হয়। কিন্তু মস্তিষ্ক ও স্নায়ু-জাল এই উভয়ের কাহার কোথায় আরম্ভ বা শেষ তাহা উপলব্ধি করা সুকঠিন। সমস্ত স্নায়ু-জাল মস্তিষ্কের বিস্তৃতি ও অনুবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে—অঙ্গুলির অগ্রভাগে যদি কোন স্নায়ুর ঈষৎ উত্তেজনা হয়, তাহা হইলে সেই স্নায়ুর সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কও উত্তেজিত হয়। স্নায়ু ঐ বোধ-ক্রিয়াকে মস্তিষ্ক মধ্যে বহন করিয়া লইয়া গেলে মন তাহা অনুভব করে।

মেরু-গ্রন্থিতে যে স্নায়ুরাশি জড়ান আছে সেই স্নায়ু সমূহ এই ganglionএর শেষ সীমায় পরস্পরের উপর দিয়া পরস্পর টারচা ভাবে চলিয়া গিয়া মস্তিষ্ক এবং শরীরের পরস্পর-বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। যে সকল স্নায়ু শরীরের বাম ভাগকে চালিত করে তাহারা মস্তিষ্কের দক্ষিণ ভাগে চলিয়া গিয়াছে এবং যে সকল স্নায়ু শরীরের দক্ষিণ ভাগকে চালিত করে তাহারা মস্তিষ্কের বাম ভাগ চলিয়া গিয়াছে। এই প্রকার বৈপরীত্যের ফল এই হইয়াছে যে, মস্তিষ্কের দক্ষিণ ভাগ—শরীরের বাম ভাগের উপর কর্তৃত্ব করে এবং মস্তিষ্কের বাম ভাগ, শরীরের দক্ষিণ ভাগকে চালনা করে।

মস্তিষ্কের তলদেশস্থ এই ganglion-এর উপরে এবং ইহাতেই সংযুক্ত আর একটি ganglion আছে—শারীর-বিধানবিৎ পণ্ডিতেরা তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, কিন্তু আপাতত সমস্ত এক করিয়া ধরিয়া নিলে বুঝিবার সুবিধা হইবে। এই তলস্থ বৃহৎ gangliionটি হইতে ছোট ছোট সাদা-সাদা সূত্র সকল মস্তিষ্কমণ্ডলে প্রসারিত হইয়াছে।

এই তলদেশস্থ ganglionএর উপরি ভাগে আর একটি বৃহৎ ganglion আছে, তাহাকে Ceribellum অর্থাৎ পাশ্চাত্য মস্তিষ্ক বলে, এই Ceribellum আবার তলস্থ ganglionএর [illegible] দ্বারা সংযোজিত। পুরো-মস্তিষ্ক-মণ্ডলেরও সহিত দুইটি বন্ধনে আবদ্ধ। কেন্দ্রস্থ ganglionএর সহিত Ceribellum ganglion একটি সূক্ষ্ম [illegible] সংযুক্ত, এই [illegible] অন্যান্য ganglion পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই রূপে ইন্দ্রিয়-কেন্দ্র এবং গতি-কেন্দ্রের সহিত সকল ganglion-এরই যোগ রক্ষিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়-কেন্দ্র কি?—না, অর্থাৎ মস্তিষ্কের যে কেন্দ্র ইন্দ্রিয়-সকল হইতে সংবাদ গ্রহণ করে। গতি-কেন্দ্র কি?—না, ইচ্ছা-প্রচারিত আজ্ঞা সকল যে কেন্দ্র হইতে শরীরের নিকট প্রবাহিত হয়।

এই সকল ganglionএর উপরে এবং পুরোভাগে cerebrum অর্থাৎ পুরো-মস্তিষ্ক অবস্থিতি করে। এই পুরো-মস্তিষ্কই বুদ্ধির ইন্দ্রিয় স্বরূপ। এই পুরো-মস্তিষ্ক আবার দুইটি মণ্ডলার্দ্ধে বিভক্ত।

এই দুই বৃহৎ মণ্ডলার্দ্ধের প্রত্যেক মণ্ডলার্দ্ধ স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ গঠিত অথচ একার্দ্ধ হইতে সূত্র সকল অপরার্দ্ধে সঞ্চা-

রিত হইয়া উভয় অর্দ্ধকে একত্র সংযুক্ত রাখিয়াছে এবং এইরূপে উভয়ের কার্য্যগত একতা সম্পাদিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে যে মস্তিষ্কের কেন্দ্রগত ganglion-এর কথা বলা হইয়াছে, সেই gangliontি এই পুরোমস্তিষ্কের মণ্ডলার্দ্ধযুগলের ঠিক নিম্ন দেশে সংলগ্ন। যাবতীয় ইন্দ্রিয়-স্নায়ু আসিয়া এই gangliona সম্মিলিত হয় এবং এই ganglionএর প্রত্যেক অংশ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট। যেরূপ পুরোমস্তিষ্কের মণ্ডলার্দ্ধের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়ার আধার বলিয়া এক্ষণে সপ্রমাণ হইয়াছে অথচ সমস্ত মণ্ডলার্দ্ধ যেরূপ একটি সমগ্র পদার্থ সেইরূপ এই ganglion-এর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ক্রিয়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইলেও উহা একটি সমগ্র পদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

এই পুরোমস্তিষ্কের মণ্ডলার্দ্ধদ্বয় গোটানো সূত্র-বাণ্ডিল সমূহের মত প্রতীয়মান হয়—এবং এই সমস্ত মস্তিষ্ক এক প্রকার অসাধারণ বোধ-বাহী সূক্ষ্ম স্নায়বীয় আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত—অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে এই সূক্ষ্ম আবরণ থাকা প্রযুক্তই বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগ স্থাপিত হইয়া সমস্ত মস্তিষ্ক-যন্ত্রের একতা রক্ষিত হইয়াছে।

মস্তিষ্ক পদার্থ স্বয়ং অচেতন—যদিও উহাই শরীরের কিম্বা স্নায়ু সমূহের সুখ দুঃখের আধার বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। শরীর না বলিয়া স্নায়ু বলাই অধিক সঙ্গত, যেহেতু স্নায়ুতেই অনুভব-ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, মাংস অস্থিতে কিছু মাত্র অনুভব শক্তি নাই। যে সকল জড়বাদীরা বলেন যে সংজ্ঞা, মস্তিষ্ক কিম্বা জড় পদার্থের অবস্থা মাত্র, তাঁহাদিগের নিকট ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে—মস্তিষ্কের কোন ক্ষতি হইলে কিম্বা বিনাশ হইলে মস্তিষ্ক যখন তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না, তখন মস্তিষ্ক কিরূপে চেতনাবান পদার্থ হইতে পারে? কিন্তু এই মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম স্নায়বীয় আবরণ অতীব স্পর্শ-বোধবাহী—উহাই "মাথা-ধরা"—"মদ্য-বিকার" Delerium tremens,—মস্তিষ্ক জ্বর এবং অন্যান্য রোগের আধার স্বরূপ। ঐ সকল রোগ আমরা মস্তিষ্ক পদার্থের প্রতি আরোপ করি।

"আমরা" আরোপ করি—"কে" আরোপ করে?—"কি" আরোপ করে?—মস্তিষ্ক মস্তিষ্কের প্রতি আরোপ করে? কিম্বা মস্তিষ্কের এক অংশ অন্য অংশের প্রতি আরোপ করে? জড়বাদিগণ কি ইহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বুঝাইয়া দিবেন?

ইহা সম্ভব যে এই স্নায়বীয় আবরণ দ্বারা মস্তিষ্কের সকল অংশের সহিত পরস্পর যোগ রক্ষিত হইয়া সমস্ত মস্তিষ্কের কার্য্যগত একতা ও সহযোগিতা সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু কোন ঘোর-অন্ধ বিশ্বাসী জড়বাদীও কখন একথা স্বীকার করিবেন না যে এই স্নায়বীয় আবরণই সচেতন আত্মা।

Professor Ferrier ভুরি ভুরি সূক্ষ্ম পরীক্ষা সমূহের দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন

যে, প্রত্যেক Ganglionএরই যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য আছে শুদ্ধ তাহা নহে কিন্তু প্রত্যেক Ganglionএর প্রত্যেক অংশেরও স্বতন্ত্র কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে—অতএব যাঁহারা বলেন যে, কোন মানসিক ক্রিয়া সমস্ত মস্তিষ্কের কার্য্য তাহাদিগের মত সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইতেছে। ইহা দ্বারা এই অনুমানটি সিদ্ধ হয় যে, মস্তিষ্ক মনের বাহ্য ইন্দ্রিয় ভিন্ন আর কিছুই নহে—মস্তিষ্কের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অংশ—স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মানসিক ক্রিয়ার যন্ত্র-চক্র স্বরূপ। কিন্তু আমরা যাহাকে "আমি" বলি তাহাকে আমরা কথনই খণ্ড ভাবে ভাবিতে পারি না—সে "আমি" একটি অখণ্ড পদার্থ, সেই আমিই আত্মা—অতএব মস্তিষ্ক কখন আত্মা হইতে পারে না।

এই প্রশ্নটির মীমাংসা পক্ষে Professor Ferrier অনেক সাহায্য করিয়াছেন। মস্তিষ্কের নিম্নতলস্থ যে ganglia যাহা বুদ্ধি বৃত্তির আধার নহে, সেই gangliaর কি কি কার্য্য তাহা তাঁহার পরীক্ষা দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন কার্য্য বিষয়ে Professor Ferrier কি বলিয়াছেন শোনা যাউক, তিনি বলেনঃ—

"মস্তিষ্কই মনের ইন্দ্রিয় ও যন্ত্র-স্বরূপ এবং মস্তিষ্ক দ্বারা এবং মস্তিষ্কের মধ্যেই মানসিক ক্রিয়া সকল সম্পন্ন হয়। এই যে মতটি ইহা এক্ষণে এতদূর সুপ্রতিষ্ঠ ও সর্ব্বসাধারণের গ্রাহ্য হইয়াছে যে, এতৎসম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়া এই সুসিদ্ধান্ত সত্যটি হইতেই আমরা সূত্রপাত করিব।" তার পর তিনি বলিতেছেন "যাহা হউক মস্তিষ্কের শরীরতত্ত্ব-ঘটিত ক্রিয়াশীলতা উহার মনস্তত্ত্ব-ঘটিত ক্রিয়া সমূহের সহিত সমব্যাপক নহে। গতি ও ইন্দ্রিয়বোধের Presentative consciousness অর্থাৎ "সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় সংজ্ঞার যন্ত্র বলিয়া দেখিতে গেলে উহাকে দুই-অর্দ্ধ বিশিষ্ট একটি সমগ্র যন্ত্র বলিয়া দৃষ্ট হয়—এবং মনন ও কল্পনার (ideation) যন্ত্র বলিয়া দেখিতে গেলে, অর্থাৎ প্রতিফলিত সংজ্ঞার (representative consciousness) যন্ত্র বলিয়া দেখিতে গেলে উহাকে দ্বিগুণাত্মক (Dual) যন্ত্র বলিয়া উপলব্ধি হয়—অর্থাৎ উহার প্রত্যেক মণ্ডলার্দ্ধ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ।

যদি কোন রোগ বশতঃ মস্তিষ্কের এক মণ্ডলার্দ্ধ অপসারিত বা একবারে ধ্বংস হয়, তাহা হইলে একদিককার গতি ও বোধ ক্রিয়া তন্নিবন্ধন বিনষ্ট হয় বটে কিন্তু অপর মণ্ডলার্দ্ধের সাহায্যে মানসিক ক্রিয়া সকল সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত হইতে পারে। বিপরীত দিকের মস্তিষ্কে (মনে কর দক্ষিণ দিকের) কোন রোগ উৎপন্ন হইয়া যদি কোন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-বোধ এবং গতি-শক্তি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় তাহা হইলে তাহার মনও সেই সঙ্গে অসাড় ও অকর্ম্মণ্য হয় না—কারণ সেই ব্যক্তি অপর মণ্ডলার্দ্ধের সাহায্যে অনুভব করিতে পারে, ইচ্ছা করিতে পারে, চিন্তা করিতে পারে ও বুঝিতে পারে। এই সকল ক্রিয়া পূর্ব্বকার ন্যায় ততদূর বলবৎ ভাবে

না চলুক কিন্তু তাহাদিগের সমস্ততা সম্বন্ধে কোন ক্ষতি লক্ষিত হয় না।"

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন স্বতন্ত্র কার্য্য অনুসারে মস্তিষ্ককে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

মস্তিষ্কের তলদেশস্থ ganglion শরীরের কার্য্য সকলকে নিয়মিত করে।

মস্তিষ্কের কেন্দ্রস্থ ganglion ইন্দ্রিয়-পতিত বোধ-প্রতিবিম্ব সকলের আধার স্বরূপ হইয়া বাহ্য জগতের সহিত আমাদের যোগ নিবদ্ধ করে।

মস্তিষ্কের চূড়াদেশস্থ মণ্ডলার্দ্ধদ্বয় বুদ্ধির যন্ত্রস্বরূপ। প্রতি মানসিক ক্রিয়ায় সমস্ত মস্তিষ্কই কার্য্য করে ইহাই ডাক্তার কার্পে-ণ্টরের মত। এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন অং-শের বিভিন্ন ক্রিয়া নির্দ্দিস্ট, ইহাই ফ্রেনল-জিস্ট পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মত। এই দুই মতের মধ্যে কোনটি সত্য তাহাই অবধা-রিত করিবার জন্য ডাক্তার ফেরিয়র পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন।

এই সকল পরীক্ষা প্রধানতঃ বানর ও কুকুরের উপর প্রযুক্ত হইয়াছিল। বানরের উপর দিয়া যে পরীক্ষা হইয়াছিল তাহা অপেক্ষাকৃত অধিক প্রামাণ্য বলিতে হইবে, যেহেতু মনুষ্য-মস্তিষ্ক গঠনের সহিত, বানর-মস্তিষ্ক-গঠনের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে।

ঐ সকল জন্তুকে ক্লরফরম্ দ্বারা অচেতন করিয়া মস্তিষ্কের কোন কোন অংশ মস্তিষ্ক হইতে বাহির করিয়া কিম্বা দহন-ক্রিয়ায় তাহাকে বিনস্ট করিয়া এই সকল পরীক্ষা কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছিল। ঐ সকল অংশে Electrode নামক তাড়িৎ যন্ত্র প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগের ক্রিয়া সকল অতি সাব-ধানে পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছিল।

এই সকল পরীক্ষার তন্ন তন্ন বিবরণের উল্লেখ না করিয়া কেবল তাহাদের কতক-গুলি স্থূল সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিলেই এখানে যথেস্ট হইবে।

তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, সমস্ত মস্তিষ্কই বেণীবন্ধন (interlacing) প্রণালী-অনুসারে স্নায়ু-সমূহের সহিত সংযুক্ত।

শরীরের বাম ভাগ দ্বারা মস্তিষ্কের দক্ষিণ ভাগের এবং শরীরের দক্ষিণ ভাগ দ্বারা মস্তিষ্কের বাম ভাগের উত্তেজন-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই প্রকার প্রণালী অনু-সারে বুদ্ধিযন্ত্রগত মস্তিষ্কের ক্রিয়াও নিয়-মিত হয় কি না তাহা তিনি অবধারণ ক-রিতে পারেন নাই—যেহেতু, জন্তুদিগের উপর এই সকল পরীক্ষা হওয়ায়, তাহা-দিগের মস্তিষ্কের কোন্ অবস্থায় তাহা-দের মনে কিরূপ ভাব উত্তেজিত হয় তাহা জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস এই যে, বুদ্ধি-যন্ত্রগত মস্তিষ্ক মণ্ড-লার্দ্ধদ্বয়েও ঐ রূপ প্রণালী অনুসারে কার্য্য হয়।

মস্তিষ্কের তলদেশস্থ বৃহৎ ganglion বা উপমস্তিষ্ক তাড়িৎ দ্বারা উত্তেজিত ক-রিয়া কিম্বা দাহন দ্বারা বিনস্ট করিয়া পরীক্ষা দ্বারা এই ganglion সম্বন্ধেও এই একই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হইয়াছি-লেন। তাঁহার পরীক্ষাতে এই রূপ সপ্র-

মাণ হইয়াছে যে এই ganglion দুইটি অসদৃশ ও স্বতন্ত্র অর্দ্ধাংশে বিভক্ত হইলেও পরস্পর সংযুক্ত ভাবে থাকা প্রযুক্ত উহাদের কার্য্যগত সমানতা রক্ষিত হয় এবং এই প্রকার গঠন-প্রণালী ও ক্রিয়া-প্রণালীর বশবর্ত্তী হইয়া তদনুসারেই শরীরের গতিসমূহকে নিয়মিত করাই এই gangliönএর বিশেষ কার্য্য। আমাদের শরীর দুই ভাগে বিভক্ত, এই দুই ভাগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যেরূপ প্রত্যেকের স্বতন্ত্র গতি-ক্রিয়া আছে সেইরূপ তাহাদের উভয়ের মধ্যে একটা যোগের নিয়ম আছে—একটা পরস্পর সাপেক্ষিতার নিয়ম আছে—তদনুসারেই তাহাদিগের গতি সকল নিয়মিত হয়—এবং এই ganglion প্রত্যেক অর্দ্ধাংশের স্বতন্ত্র ক্রিয়া এবং দুই অংশের সম্মিলিত ক্রিয়া থাকা প্রযুক্তই পূর্ব্বোক্ত প্রকার নিয়মে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গতি সকল নিয়মিত হয়। এই তলস্থ ganglion যন্ত্রে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হইলে শারীরিক গতি-ক্রিয়ারও ব্যতিক্রম উপস্থিত হয়, এত দুর ব্যতিক্রম হয় যে, কোন জন্তুর উপর পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল যে "সিধে চলিবার" শক্তি তাহার একেবারে অপহৃত হওয়ায় সে চক্রাকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মস্তিষ্কের যেটি দ্বিতীয় বিভাগ যাহা সমস্ত মস্তিষ্কের কেন্দ্রদেশে অবস্থিত এবং যাহার উপরি ভাগে বুদ্ধিযন্ত্র-গত মস্তিষ্কমণ্ডল আধিপত্য করিতেছে, সেই মস্তিষ্ক-বিভাগের উপর সমস্ত ইন্দ্রিয়-স্নায়ু আসিয়া পুঞ্জীভূত হইয়াছে—ইহাও পরীক্ষাতে দৃষ্ট হইয়াছিল। এই দ্বিতীয় gangliönটি বাহ্য জগৎ প্রেরিত প্রতিবিম্ব সকলের কেন্দ্র-স্থল—ঐ স্থান হইতেই ঐ সকল প্রতিবিম্বের সংবাদ বুদ্ধিযন্ত্রগত মস্তিষ্কে নীত হয়। পরীক্ষা দ্বারা এইরূপ আরও আভাষ পাওয়া যায় যে এই ganglion স্থিত প্রত্যেক অংশ এক একটি স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়ের কার্য্য-ক্ষেত্র—এই সকল বিভিন্ন অংশের বিনাশে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য-নাশ কিম্বা কার্য্য-লাঘব উপস্থিত হয়। এই মস্তিষ্ক বিভাগ দ্বিগুণাত্মক—যেহেতু এই স্নায়ু-পুঞ্জীভূত উপমস্তিষ্কের (ganglion) দক্ষিণ দিক বিনষ্ট হইলে শরীরের বাম ভাগস্থ ইন্দ্রিয় সকলের পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়—এবং এই উপমস্তিষ্কের বাম ভাগ বিনষ্ট হইলে শরীরের দক্ষিণ ভাগস্থ ইন্দ্রিয় সকল অসাড় হইয়া পড়ে।

এই খানে একটি প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে। মস্তিষ্কের এই ইন্দ্রিয়বোধগ্রাহী অংশটির প্রকৃত কার্য্য কি? যে সকল প্রতিবিম্ব উহার নিকট আনীত হয়, নিজেই কি ঐ সকল প্রতিবিম্বের বোধ-গ্রাহী না উপরিস্থ মস্তিষ্কমণ্ডলে ঐ সকল প্রতিবিম্বের সংবাদ বহন করিবার দুত-স্বরূপ? সুস্থ অবস্থায় বহির্জগৎ হইতে যে সকল প্রতিবিম্ব উহার নিকট উপস্থিত হয়, উহা যে ঐ সকল প্রতিবিম্বের অবিকল সংবাদ উপরিস্থ মস্তিষ্কমণ্ডলে বহন করে তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়াতে তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে

পারি। ইহাও আমরা অবগত আছি যে, মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে নানা প্রকার মিথ্যা সংবাদ বুদ্ধির নিকট আনীত হয়। এই মস্তিষ্ক অংশটি স্বয়ং কর্ত্তা না ক্রিয়ার আধার মাত্র তাহা অবধারিত করিতে পারিলে নিদ্রা ও স্বপ্নবিষয়ক মানসিক তত্ত্বানুসন্ধান পক্ষে অনেক সুবিধা হয়।

আচার্য্য ফেরিয়রের পরীক্ষা সমূহ দ্বারা এই প্রশ্নটির এক প্রকার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। তিনি একবার একটা বানর ও একটা কুকুরের পুরোমস্তিষ্ক মণ্ডলার্দ্ধদ্বয় অপসারিত করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহাতে তাহাদের জীবনের কিম্বা স্বাস্থ্যের কিছু মাত্র ব্যাঘাত বা বৈলক্ষণ্য হয় নাই—কেবল তাহাদের বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছিল মাত্র। তাহাদিগের ইন্দ্রিয়-বোধ লোপ হয় নাই—ইন্দ্রিয়-স্নায়ু আনীত প্রতিবিম্ব সকল যে তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে তাহা স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল। বুদ্ধির যন্ত্র অপসারিত করিবার পূর্ব্বে বাহ্য জগৎ তাহারা যেরূপ উপলব্ধি করিত, এখনও সেইরূপ করিতে লাগিল। কিন্তু যখন আবার কেন্দ্রস্থ উপমস্তিষ্ক অপসারিত করা হইল, এবং যে তলস্থ উপমস্তিষ্ক শরীরের পৈষিক গতিকে নিয়মিত করে, সেই তলস্থ উপমস্তিষ্ক ভিন্ন মস্তিষ্কের আর কোন অংশ যখন অবশিষ্ট রহিল না তখন ইন্দ্রিয়বোধের ক্রিয়াও বন্ধ হইয়া গেল—কিন্তু তলস্থ উপমস্তিষ্ক তখনও থাকা প্রযুক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গতি ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হয় নাই।

ইন্দ্রিয়-বোধ ক্রিয়ার আধার স্বরূপ যে কেন্দ্রস্থ উপমস্তিষ্ক, তাহার উপর যে দুইটি মস্তিষ্ক মণ্ডলার্দ্ধ অবস্থিত, তাহাই বুদ্ধির যন্ত্র স্বরূপ। এই দুই মণ্ডলার্দ্ধের প্রত্যেক অর্দ্ধই স্বতন্ত্র ও স্বসম্পূর্ণ। প্রত্যেক অর্দ্ধই অপরার্দ্ধের সাহায্য ব্যতীত কার্য্য করিতে সক্ষম। উচ্চতর মানসিক ক্রিয়াই এই দুই মণ্ডলার্দ্ধের বিশেষ কার্য্য। উহাদের সাহায্যেই আমরা চিন্তা করি—বিচার করি এবং অনুভব করি। এই মস্তিষ্ক মণ্ডলার্দ্ধের কোন অংশ নষ্ট হইলে মনেরও কিয়দংশ অর্থাৎ কোন কোন মানসিক বৃত্তি নষ্ট হয়—সমস্ত মনের ক্রিয়াশক্তি নষ্ট হয় না।

এই মস্তিষ্ক মণ্ডলার্দ্ধদ্বয়ের সমস্তই নষ্ট হইয়া গেলে বুদ্ধি বিলুপ্ত হয় কিন্তু মৃত্যু সংঘটিত হয় না। পাঠকগণের এইটি যেন স্মরণ থাকে যে, সমস্ত মস্তিষ্কের তিনটি প্রধান বিভাগ। বুদ্ধির যন্ত্র স্বরূপ বিভাগটি চূড়ায় অবস্থিত—ইন্দ্রিয়ের যন্ত্র স্বরূপ বিভাগটি কেন্দ্র-দেশে অবস্থিত—এবং শারীরিক গতি-ক্রিয়ার যন্ত্র স্বরূপ বিভাগটি তলদেশে অবস্থিত।

১। পুরোমস্তিষ্ক।
২। কেন্দ্রস্থ উপমস্তিষ্ক।
৩। তলস্থ উপমস্তিষ্ক।

এই তিনটি প্রধান বিভাগের আবার অন্যান্য উপবিভাগ আছে—এ প্রসঙ্গে তাদের আলোচনা অনাবশ্যক।

জাগ্রৎ অবস্থায় কিম্বা প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সমস্ত মস্তিষ্কই জাগ্রৎ থাকে—এবং তাহার

সকল অংশই একত্র মিলিয়া কার্য্য করে—তাহাদের মধ্যে পরস্পর সাপেক্ষিতার ভাব আছে। বুদ্ধিবৃত্তি সকল ইন্দ্রিয়বোধদিগকে সংশোধন করে; ইন্দ্রিয়বোধ সকল কল্পনা বৃত্তিকে সংশোধন করে; বুদ্ধি হৃদয়-গত ভাবের উপর কর্তৃত্ব করে—হৃদয়ের ভাব-সকল ইচ্ছা-শক্তির বলবিধান করে—ইচ্ছা শক্তি সমস্তের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করিয়া বুদ্ধি এবং হৃদয়ের সম্মিলিত ক্রিয়াকে অর্থাৎ যাহাকে আমরা সচরাচর "মন" বলি সেই মনের ক্রিয়াকে—বাহ্য জগতের নিকট প্রকাশ করে।

নিদ্রাবস্থায় এই পারস্পরিক সম্বন্ধটি ভাঙ্গিয়া যায়। বুদ্ধিবৃত্তি সকল ইন্দ্রিয়-বোধদিগকে আর সংশোধন করে না—ইন্দ্রিয়-বোধ সকল কল্পনা-বৃত্তিকে আর সংশোধন করে না—হৃদয়ের ভাব-সকল ইচ্ছা-শক্তিকে সেরূপ আর উত্তেজিত করিতে পারে না—শরীর ও মনের উপর ইচ্ছা-শক্তির কর্তৃত্ব আর বলবৎ থাকে না। স্বপ্নহীন সুষুপ্তির সময় যাই হোক্ না কেন, কিন্তু স্বপ্নাবস্থার সমস্ত মস্তিষ্ক যন্ত্র যে নিদ্রিত হয় না তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। উহার কিয়দংশ অবশ্য জাগ্রৎ ও সক্রিয় থাকে—সেই জাগ্রৎ অংশটি কোন্ অংশ?

ইহা নিশ্চিত যে, স্বপ্নাবস্থায় চূড়ান্ত-মস্তিষ্ক মণ্ডলার্দ্ধদ্বয় সম্পূর্ণরূপে কিংবা আংশিকরূপে জাগ্রৎ থাকে। গভীর নিদ্রাবস্থায় ইন্দ্রিয়বোধের আধার—কেন্দ্রস্থ উপমস্তিষ্ক সম্পূর্ণরূপে নিদ্রিত হয়। নিদ্রার সকল অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়গণ নিদ্রিত থাকে—তবে, কখন কখন ততদূর গভীররূপে নিদ্রিত হয় না, যাহাতে করিয়া ইন্দ্রিয়-বাহিত প্রতিবিম্ব সকল চেতনাবান আত্মার একেবারেই অগোচর হইতে পারে। শারীরিক গতিক্রিয়াকে যে উপমস্তিষ্ক নিয়মিত করে, সেই তলস্থ উপমস্তিষ্কও নিদ্রার আয়ত্তাধীন। এইরূপেই নিদ্রার প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। শরীরের জড়-যন্ত্রকে বিশ্রাম দিবার নিমিত্ত—তাহার পরিবর্দ্ধন ও নবীকরণ-ক্রিয়ার জন্য তাহাকে সময় দিবার নিমিত্তই প্রধানতঃ নিদ্রার সৃষ্টি। এই নিমিত্তই, যে ইচ্ছা জাগ্রৎ অবস্থায় শরীরকে চালিত করে—নিদ্রাবস্থায় তাহার কর্তৃত্ব স্থগিত হইয়া যায়। স্বয়ং ইচ্ছা-শক্তি জাগ্রৎ থাকে—কারণ স্বপ্নাবস্থাতেও আমাদিগের ইচ্ছা অনুভব করিতে পারি—কিন্তু শরীরের জড়যন্ত্র নিদ্রিত থাকে বলিয়াই—আমাদিগের ইচ্ছার আজ্ঞা শরীর পালন করে না—এই মাত্র।

অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে—মস্তিষ্কের কেন্দ্রস্থ ও তলদেশস্থ বিভাগই নিদ্রার আধার স্বরূপ। তাহারা নিদ্রিত না হইলে আমরা নিদ্রিত হই না। যদিও পুরোমস্তিষ্ক মণ্ডলদ্বয়—সেই সময় সম্পূর্ণরূপে জাগ্রৎ থাকে তথাপি উপরোক্ত উপমস্তিষ্ক দ্বয় নিদ্রিত হইলেই আমরা নিদ্রিত হই।

ক্রমশঃ

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র।

আমি ইংলণ্ড দ্বীপটাকে এত ছোট, ও ইংলণ্ডের অধিবাসীদের এমন বিদ্যালোচনা-শীল মনে কোরেছিলেম যে, ইংলণ্ডে আস্‌বার আগে আমি আশা কোরেছিলেম যে, এই ক্ষুদ্র দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত বুঝি টেনিসনের বীণা-ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হোচ্চে, মনে কোরে-ছিলেম, এই দুই হস্ত-পরিমিত ভূমির যেখানে থাকি না কেন, গ্লাডস্টোনের বাগ্মিতা, ম্যাক্সমূলরের বেদ-ব্যাখ্যা, টিণ্ড্যালের বিজ্ঞানতত্ব, কার্লাইলের গভীর চিন্তা, বেনের দর্শনশাস্ত্র শুন্‌তে পাব, মনে কোরেছিলেম, যেখানে যাই না কেন intellectual আমোদ নিয়েই আবাল বৃদ্ধ বনিতা বুঝি উন্মত্ত, কিন্তু তাতে আমি ভারি নিরাশ হোয়েছি, মেয়েরা বেশ ভূষায় লিপ্ত, পুরুষেরা কাজকর্ম্ম কোর্‌চে, সংসার যেমন চোলে থাকে তেমনি চোল্‌চে, কেবল রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে যা কিছু কোলাহল শোনা যায়, তুমি যদি কোথা গেলে ত মেয়েরা জিজ্ঞাসা কোর্‌বে, তুমি Ballএ গিয়েছিলে কি না, কন্সর্ট কেমন লাগ্‌ল, থিয়েটরে একজন নতুন actor এয়েচে, কাল্‌ অমুক জায়গায় ব্যাণ্ড হবে ইত্যাদি। পুরুষেরা বোল্‌বে, আফ্‌গান যুদ্ধের বিষয় তুমি কি বিবেচনা কর? Marquis of Lorneকে লণ্ডনীয়েরা খুব সমাদর কোরে-ছিল, আজ দিন বেশ ভাল, কালকের দিন বড় miserable ছিল। এদের মেয়েতে মেয়েতে যে সব গল্প চলে তা' শুন্‌লে তোমার ভারি মজা মনে হবে, একটি কুশ্রী বালিকার সঙ্গে একটি ধনী ব্যারিষ্টরের বিয়ে হওয়াতে তাই নিয়ে একটি স্ত্রীসভায় যে সমালোচনাটা চোল্‌ছিল, তা শুনে আমার চক্ষুস্থির হোয়ে গিয়েছিল—কুশ্রী মেয়ের বিয়ে হোয়ে গেলে এদেশের মেয়ে-দের প্রাণে বোধ হয় বড় আঘাত লাগে, মাতৃ-শ্রেণীর মধ্যে ভারি চোক-টেপাটেপি পোড়ে যায়, তাঁরা মনের যন্ত্রণায় আর কিছু কোরতে না পেরে আড়ালে আব্‌ডালে সে বেচারীর প্রতি যথাসাধ্য বিদ্রুপের বাণ বর্ষণ কোরতে থাকেন। মাতৃদলের মধ্যে যাঁদের কুশ্রী মেয়ে আছে, তাঁরা মনে করেন অমুক মেয়েটার যদি অমন ভাল বিয়ে হোয়ে গেল তবে আমার মেয়েরা কি অপরাধ কোরলে; যাঁদের সুশ্রী মেয়ে আছে তাঁরা মনে করেন অমুক মেয়েটার বিয়ে হোয়ে গেল আর আমার মেয়েদের হোল না? আর সাধারণ মিস্‌শ্রেণীদের ত রাগে ঘৃণায় অভিমানে বুক ফেটে যায়, যে বেচারীর সৌভাগ্যক্রমে বিয়ে হোয়ে গেছে যেন তার কত অপরাধ! যাঁরা সেই কুশ্রী মেয়ের রূপ নিয়ে সমালোচনা কচ্ছি-লেন তাঁদের মধ্যে একটি মেয়েও সুশ্রী

ছিলেন না, পরের কুরূপ নিয়ে বিদ্রূপ করার অধিকার তাঁদের এক তিলও নেই। কাপড় চোপড় গয়না পত্র, কার চোক টেরা, কার নাক মোটা, কার ঠোঁট পুরু, কার বাঁ হাতের কোড়ে আঙুলের নখের কোন্ বাঁকা—এই সব নিয়ে এখানকার মেয়েতে মেয়েতে ভারি হাসি-তামাসা চোলে থাকে; আমার যত খানি অভিজ্ঞতা (যদিও খুব কম) তাতে তো আমি এই রকম দেখেছি। এদেশের মেয়েরা পিয়ানো বাজায়, গান গায়, আগুনের ধারে আগুন পোয়ায়, সোফায় ঠেসান দিয়ে নভেল পড়ে, ভিজিটরদের সঙ্গে আলাপ-চারি করে ও আবশ্যক বা অনাবশ্যক মতে যুবকদের সঙ্গে flirt করে, এইত আমার অভিজ্ঞতা। কিন্তু এদেশের old maid শ্রেণীরা ভয়ঙ্কর কাজের লোক। Temperance Meeting, Working men's Society প্রভৃতি যত প্রকার সংস্কারের কোলাহল আছে, সমুদয়ের মূলে তাঁরা আছেন। পুরুষদের মত তাঁদের আপিসে যেতে হয় না; মেয়েদের মত তাঁদের ছেলে পিলে মানুষ কোরতে হয় না, এদিকে হয়ত এত বয়স হোয়েছে যে "বলে" গিয়ে নাচলে বা flirt কোরে সময় কাটালে দশ জনে হাসবে, হাতে তাঁদের সময় অগাধ পোড়ে রোয়েছে, তাই জন্যে তাঁরা অনেক কাজ কোরতে পারেন, বাস্তবিক তাতে অনেক উপকার হয়, বিদেশ থেকে আমরা এই মেয়েদেরই নাম বেশী শুনতে পাই—কিন্তু এদের থেকেই যদি সমস্ত বিলিতি মেয়েদের বিচার কোরতে যাও তবে হয়ত ভ্রমে পোড়বে—এখানকার বিবিরা দরজি-শ্রেণীর জীবিকা, ফ্যাসান্-রাজ্যের বিধাতা ও যুবক দলের খেলানা স্বরূপ, খেলানা আমি এই অর্থে বলচি—যে, যখনি কারো সন্ধ্যের সময় একটু সময় কাটাবার আবশ্যক হোল, দুই একটি মিসের সঙ্গে হয়ত তিনি Sentimental অভিনয় কোরে এলেন। পুরুষদের মন ভোলানোই মেয়েদের জীবনের একমাত্র ব্রত, যদি এক জন পুরুষের মন ভোলাতে পারেন তবে মনে কোরলেন জীবনের একটা মহান্ লক্ষ্য সিদ্ধ হোল, পূর্ব্ব জন্মের অনেক তপস্যা সার্থক হোল, মন ভোলানো যজ্ঞে তাঁদের নিজের সুখ-স্বাস্থ্য বলিদান দিতে তাঁরা কুণ্ঠিত নন, কোমর এঁটে এঁটে তাঁরা বোলতার মত কোমর কোরে তুলবেন, তার জন্যে তাঁরা সকল প্রকার যন্ত্রণা সহ্য কোরতে ও সকল প্রকার রোগ সঞ্চয় কোরতেও রাজি আছেন। বাহারে কাপড় পোরে মাথায় গোটা কতক পালক গুঁজে দিন রাত্রি তাঁরা পুতুলটি সেজে আছেন, অভিনয় কোরে কোরে এমন তাঁদের অভ্যেস হোয়ে গেছে যে অস্বাভাবিকও তাঁদের স্বাভাবিক হোয়ে গেছে। যে মেয়ের সাজসজ্জা সৌন্দর্য্য বাইরে থেকে খুব স্বাভাবিক ও অযত্ন-সাধ্য বোলে মনে হয়, যাদের কথা বার্ত্তার মাধুরীতে আয়াসের লক্ষণ দেখা যায় না, মনে হয় affectation কাকে বলে জানে না, তারাই হয় তো পাকা affectation জানে। এমন হোতে পারে যে, একজন মেয়ে হয়ত পুরুষের প্রেমে পোড়েছে, সেই পুরুষের হৃদয় অধিকার করাই তার মুখ্য

উদ্দেশ্য, কিন্তু তাই বোলেই যে তিনি নিশ্চিন্ত হোয়ে বোসে থাকেন, তা প্রায় দেখা যায় না—যেমন অনেক শিকারী, খাবার জন্যে পাখী মারতে যায় না, তাদের বন্দুকের লক্ষ্য সিদ্ধ হোল বোলে আরাম পায়, হৃদয় অধিকার কোরতে এঁরাও সেই আরাম পান। আমি মন ভোলাবার জন্য এ রকম হাব ভাব, হাত পা নাড়া, গলা সেধে সরু করা, মিষ্ট ভাবের হাসি বের করা দু চক্ষে দেখতে পারিনে, হাব ভাবে আমার মন বোধ হয় কেউ ভোলাতে পারে না—পুরুষদের মন ভোলানো যাদের জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য, সেই মেয়েদের দেখলে আমার বড় মায়া হয়—যেন তাদের নিজের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। আমাদের দেশের মেয়েদের চেয়ে এদেশের মেয়েদের বেশী উন্নতি কি দেখছি জান?—না, এঁরা সাজগোজের শাস্ত্রে আমাদের চেয়ে বেশী ব্যুৎপত্তি লাভ কোরেচেন, আর লেখা পড়া শিখেছেন। লেখা পড়া শিখেছেন অর্থে এখানে এই রকম বোঝাচ্ছে যে নভেল পড়বার সময় এঁদের কখনো ডিক্সনারী খোলবার আবশ্যক হয় না। আমি মনে কোরতেম intellectual খাদ্যই এদেশের লোকদের মনের এক মাত্র খোরাক—আমি মনে কোরতেম, এদেশের মেয়েরাও intellectual আমোদকেই প্রধান আমোদ মনে করে ও নাচ তামাসাকে তার নীচে স্থান দেয়। যদিও এদেশের মেয়েদের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চা সুরু হোয়েচে, কিন্তু সে এত অল্প যে, তা' কারো নজরেই আসে না। বিলেতে এসে আমি অনেক বিষয়ে নিরাশ হোয়েছি। এখানে দ্বারে দ্বারে মদের দোকান। আমি রাস্তায় বেরোলে জুতোর দোকান, দরজীর দোকান, মাংসের দোকান, খেলনার দোকান রাশ রাশ দেখতে পাই কিন্তু বইয়ের দোকান দুটো দেখতে পাইনে—আমিত একেবারে আশ্চর্য্য হোয়ে গেছি। আমাদের একটি শেলীর কবিতা কেনবার আবশ্যক হোয়েছিল কিন্তু কাছাকাছির মধ্যে বইয়ের দোকান না দেখে এক জন খেলনা-ওয়ালাকে সেই বই আনিয়ে দিতে হুকুম কোরতে হোয়েছিল—আমি আগে জানতেম, এ দেশে একটা কসাইয়ের দোকান যেমন দরকারী একটা বইয়ের দোকানও তেমনি!

ইংলণ্ডে এলে সকলের চেয়ে চোখে কি পড়ে জান, লোকের ব্যস্তভাব। রাস্তা দিয়ে যারা চলে তাদের মুখ দেখতে মজা আছে—বগলে ছাতি নিয়ে হুস্ হুস্ কোরে চোলেছে, পাশের লোকদের ওপর ভ্রূক্ষেপ নেই, মুখে মহা ব্যস্ত ভাব প্রকাশ পাচ্চে—সময় তাদের ফাঁকি দিয়ে না পালায় এই তাদের প্রাণ পণ চেষ্টা। ইংলণ্ডে যে কত রেলোয়ে আছে তার ঠিকানা নেই—সমস্ত লণ্ডন-ময় রেলোয়ে—প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর এক একটা ট্রেন যাচ্চে। একটা রেলোয়ে ষ্টেশনে গেলে দেখা যায়, পাশাপাশি যে কত শত লাইন রোয়েছে তার ঠিক নেই। লণ্ডন থেকে ব্রাইটনে আসবার সময় দেখি, প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে—উপর দিয়ে

একটা, নীচে দিয়ে একটা, পাশ দিয়ে একটা, এমন চারদিক থেকে হুস্‌হাস্ কোরে ট্রেন ছুটেছে—সে ট্রেন-গুলোর চেহারা দেখ্‌লে আমার লণ্ডনের লোক মনে পড়ে—এদিক থেকে ওদিক থেকে মহা ব্যস্তভাবে হাঁস্‌ ফাঁস্' কোর্‌তে কোর্‌তে চোলেছে, এক তিল সময় নষ্ট কোরলে চলে না। দেশ ত এই এক রত্তি, নোড়ে চোড়ে বেড়াবার জায়গা নেই, দু পা চোল্লেই ভয় হয় পাছে সমুদ্রে গিয়ে পড়ি, এখানে এত ট্রেন যে কেন ভেবে পাইনে। আমরা এক বার লণ্ডনে যাবার সময় দৈবাৎ ট্রেন মিস্ কোরেছিলেম, কিন্তু তার জন্যে বাড়ি ফিরে আস্‌তে হয় নি, তার আধ ঘণ্টা পরেই আর এক ট্রেন এসে হাজির।

জীবিকার জন্যে এদেশে যেমন যুঝা-যুঝি এমন আর কোথাও দেখি নি। এ দেশের লোক প্রকৃতির আদুরে ছেলে নয়—কারু নাকে তেল দিয়ে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বোসে থাক্‌বার যো নেই—একেত আমাদের দেশের মত এদেশের জমীতে আঁচড় কাট্‌লেই শস্য হয় না, তাতে শীতের সঙ্গে মারামারি কোর্‌তে হয়—প্রথমতঃ শীতের উপদ্রবে এদের কত কাপড় দরকার হয় তার ঠিক নেই—তার পরে কম খেলে এ দেশে বাঁচ্‌বার যো নেই, শরীরে তাপ জন্মাবার জন্যে অনেক খেতে হয়, এ দেশের লোকের কাপড়, কয়লা, খাওয়া অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে না থাকলে চলে না, তার ওপরে আবার মদ আছে। আমাদের বাঙ্গলার খাওয়া নাম মাত্র, কাপড় পরাও তাই। এ দেশে Fittest রাই Survive করে, এ দেশে যার ক্ষমতা আছে সেই মাথা তুল্‌তে পারে, দুর্ব্বল লোকদের এখানে রক্ষা নেই—একে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ কোর্‌তে হয়, তাতে কার্য্য-ক্ষেত্রে সহস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা রোখারুখি কোর্‌চে।

এ দেশের ছোট লোকদের দেখ্‌লে মনে হয় না তাদের কিছু মাত্র মনুষ্যত্ব আছে—তারা যেন পশু থেকে এক ধাপ উঁচু। তাদের মুখ দেখ্‌লে—নিদেন তাদের মধ্যে এক এক জনের মুখ দেখ্‌লে আমার কেমন গা শিউরে ওঠে—তাদের মুখ দেখে আর কেউ "human face divine" বোল্‌তে পারে না—পশুত্ব ভাব-ব্যঞ্জক তাদের সেই লাল-লাল মুখ দেখ্‌লে কেমন ঘৃণা হয়! আর, তারা যে ময়লা তা' আর কি বোল্‌ব। এই সে দিন একটা পুলিষের মোকদ্দামা দেখ্‌ছিলেম; একটা ছোট লোকের ছেলে মজা দেখবার জন্যে একটা ঘোড়ার জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলেছিল, এমন পশুত্ব কখনো শুনেছ?

ক্রমে ক্রমে এখানকার দুই এক জন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হোতে চোল্লো। একটা মজা দেখ্‌চি, এখানকার লোকেরা আমাকে অতি-দুগ্ধ-পোষ্য বালকের মত মনে করে। মনে করে, ইণ্ডিয়া থেকে এসেচে কিছু জানে না, শোনে না, এ-কে দুচারটে জিনিষ দেখিয়ে-শুনিয়ে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে দেওয়া ভাল। এক দিন Dr—এর ভাইয়ের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়েছিলেম, সে যে আমাকে বিরক্ত কোরে

তুলেছিল তা আর বল্‌বার কথা নয়। একটা দোকানের সুমুখে কতকগুলো ফোটোগ্রাফ ছিল—সে মনে কোরেছিল, ফোটোগ্রাফ দেখে আমার একেবারে তাক্ লেগে যাবে—চক্ষু স্থির হোয়ে যাবে—সে আমাকে সেই খানে নিয়ে গিয়ে ফোটোগ্রাফের মহা ব্যাখ্যান কোর্‌তে আরম্ভ কোরে দিলে—সে আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে, এক রকম যন্ত্র দিয়ে ঐ ছবি-গুলো তৈরি হয়, মানুষে হাতে কোরে আঁকে না—আমার চার দিকে লোক দাঁড়িয়ে, আমার এমন লজ্জা কোচ্ছিল! আমি তাকে বিশেষ কোরে বল্লেম যে, আমি ও খবরগুলি বিশেষ কোরে জানি, কিন্তু সে বিশ্বাস কোরবে কেন? একটা ঘড়ির দোকানের সামনে গিয়ে, ঘড়িটা যে একটা খুব আশ্চর্য্য বস্তু তাই আমার মনে সংস্কার জন্মাবার জন্যে চেষ্টা কোর্‌তে লাগ্‌লেন; আমিত তাঁর অনুগ্রহের জ্বালায় একেবারে জ্বালাতন হোয়ে গিয়েছিলেম! একটা Evening party তে miss——আমাকে জিজ্ঞাসা কোর্‌ছিলেন, আমি এর পূর্ব্বে পিয়ানোর ডাক শুনেছি কি না? এ দেশের অনেক লোক হয়ত পরলোকের একটা ম্যাপ এঁকে দিতে পারে কিন্তু ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যদি এক বিন্দুও খবর জানে! ভারতবর্ষের লোকেরা গোখাদক নয় শুন্‌লে হয়ত তারা চার দণ্ড হাঁ কোরে থাকে—ইংলণ্ড থেকে কোন দেশের যে কিছু তফাৎ আছে তা তারা কল্পনাও কোর্‌তে পারে না। ভারতবর্ষের কথা দূরে থাক্—সাধারণ লোকেরা কত বিষয় জানে না তার ঠিক নেই। এই মনে কর,——ডাক্তারকে আমার „ শিক্ষক—— খুব educated man বোলে সুখ্যাতি কোরে থাকেন কিন্তু তিনি shelly বোলে যে এক জন কবি তাঁদের দেশে জন্মেছিল সেই খবর টুকু মাত্র জানেন, কিন্তু শেলী যে চেঞ্চি (Cenci) বোলে এক খানা নাটক লিখেছেন, বা তাঁর Episychidon বোলে যে একটি কবিতা আছে, তা' আমার মুখে প্রথম শুন্‌তে পেলেন!

ভগ্নতরী।

(গাথা)

প্রথম সর্গ।

ডুবিছে তপন, আসিছে আঁধার,
দিবা হোল অবসান!
ঘুমায় সাঁঝের সাগর, করিয়া
কনক-কিরণ পান!

অলস লহরী তটের চরণে
ঘুমে পড়িতেছে ঢুলি,
এ উহার গায়ে পোড়েছে জলিয়া
ভাঙ্গাচোরা মেঘ গুলি,

কনক-সলিলে লহরী তুলিয়া
তরণী ভাসিয়া যায়;
উড়িয়াছে পাল, নাচিছে নিশান,
বহে অনুকূল-বায়।
শত কণ্ঠ হোতে সাঁঝের আকাশে
উঠিছে সুখের গীত,
তালে তালে তার, পড়িতেছে দাঁড়
ধ্বনিতেছে চারি ভিত!
বাজিতেছে বীণা, বাজিতেছে বাঁশি,
বাজিতেছে ভেরী কত,
কেহ দেয় তালি, কেহ ধরে তান,
কেহ নাচে জ্ঞানহত!
তারকা উঠিছে ফুটিয়া ফুটিয়া,
আকাশে উঠিছে শশি,
উছলি উছলি উঠিছে সাগর
জোছনা পড়িছে খসি!
অতি নিরিবিলি, নিরালয় এক—
না মিশিয়া কোলাহলে—
ললিতা হোথায়, পতি সাথে তার
বসি আছে গলে গলে।
অজিতের গলে বাঁধি বাহুপাশ
বুকেতে মাথাটি রাখি,
ঢল ঢল দেহ—গল' গল' কথা
ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি।
আধো আধো হাসি অধরে জড়িত,
সুখের নাহিক ওর,
প্রণয়-বিভল প্রাণের মাঝারে
লেগেছে ঘুমের ঘোর!
পরশিছে দেহ নিশীথের বায়ু
অতি ধীর মৃদু-শ্বাসে,
লহরীরা আসি করে কলরব
তরণীর আশে পাশে।
মধুর মধুর সকলি মধুর—
মধুর আকাশ ধরা!
মধু-রজনীর মধুর অধর
মধুর জোছনা ভরা।
যেতেছে দিবস, চলেছে তরণী
অনুকূল বায়ু ভরে।
ছোট ছোট ঢেউ মাথা-গুলি তুলি
টল মল করি পড়ে।
প্রণয়ীর কাল যেতেছে তুলিয়া
শত বরণের পাখা—
মৃদু বায়ু ভরে লঘু মেঘ যথা
সাঁঝের কিরণ মাখা!
আদরে ভাসিয়া গাহিছে অজিত
চাহি ললিতার পানে—
মরম গলানো সোহাগের গীত
আবেশ-অবশ প্রাণে;—

পাগলিনী তোর লাগি কি আমি করিব বল?
কোথায় রাখিব তোরে খুঁজে না পাই ভূমণ্ডল
আদরের ধন তুমি—আদরে রাখিব আমি
আদরিণি,তোর লাগি পেতেছি এ বক্ষ স্থল।
আয় তোরে বুকে রাখি,তুমি দেখ আমি দেখি,
শ্বাসে শ্বাস মিশাইব আঁখি জলে আঁখি জল।

হরষে কভুবা গাইছে ললিতা
অজিতের হাত ধরি,
মুখ পানে তার চাহিয়া চাহিয়া
প্রেমে আঁখি দুটি ভরি।
ওই কথা বল সখা, বল আরবার,
ভাল বাস' মোরে তাহা বল বারবার!

কতবার শুনিয়াছি—তবুও আবার যাচি,
ভাল বাসো মোরে তাহা বল গো আবার!
... ...
সন্ধ্যে দিকবধূ স্তব্ধ ভয় ভারে,
একটি নিশ্বাস পড়ে না তার ;
ঈশান-গগনে করিছে মন্ত্রণা
মিলিয়া অযুত জলদ-ভার,
তড়িত-কৃপাণে বিঁধিয়া বিঁধিয়া
ফেলিছে আঁধারে শতধা করি,
দূর ঝটিকার রথ চক্ররব
ঘোষিছে অশনি ত্রিলোক ভরি।
সহসা উঠিল গরজন এক
প্রলয় ঝটিকা আসিছে ছুটে,
ছিন্ন মেঘ-জাল দিগ্বিদিক ধায়,
ফেনিল তরঙ্গ আকুলি উঠে,
পাগলের মত তরী-যাত্রী যত
হেথা হোথা ছুটে তরণী পরে,
ছিঁড়িতেছে কেশ, হানিতেছে বুক,
এ উহারে ডাকে অধীর স্বরে।
ছিন্ন-তার বীণা যায় গড়াগড়ি,
অধীরে ভাঙ্গিয়া ফেলেছে বাঁশি,
ঝটিকার স্বর দিতেছে ডুবায়ে
অযুত কঠোর বিলাপ রাশি!
তরণীর পাশে নীরব অজিত ,
ললিতা অবাক্ হিয়া—
মাথাটি রাখিয়া অজিতের কাঁধে
রহিয়াছে দাঁড়াইয়া।
কি ভয় মরণে, এক সাথে যবে
মরিবে দুজনে মিলি ?
মুকুতা শয়নে সাগরের তলে
ঘুমাইবে নিরিবিলি!

দুইটী প্রণয়ী বাঁধা গলে গলে
রহিয়াছে পাশাপাশি,
পশিবেনা সেথা দ্বেষ কোলাহল,
কুটিল কঠোর হাসি।
ঝটিকার মুখে দুরবল তরী
করিতেছে টলমল,
উঠিছে, নামিছে, আছাড়ি পড়িছে
ভিতরে উঠিছে জল।
বাঁধিল ললিতা অজিতের বাহু
দৃঢ় তর বাহু ডোরে,
আদরে অজিত ললিত-অধর
চুমিল হৃদয় ভোরে।
ললিতা-কপোলে বাহিয়া পড়িল
একটি নয়ন জল,—
একটু কেমন বিষাদের ঘোর
ঘিরিল হৃদয় তল!
"আয় সখি আয়," কহিল অজিত
হাত ধরাধরি করি—
দুজনে মিলিয়া ঝাঁপায়ে পড়িল,
অধীর সাগর পরি ॥

দ্বিতীয় সর্গ।

নবরবি সুবিমল কিরণ ঢালিয়া,
নিশার আঁধার রাশি ফেলিল ক্ষালিয়া।
ঝটিকার অবসানে প্রকৃতি সহাস,
সংযত করিছে তার এলোথেলো বাস।
খেলায়ে খেলায়ে শ্রান্ত সারাটি যামিনী,
মেঘ-কোলে ঘুমাইয়া পোড়েছে দামিনী।
শান্ত লহরীরা এবে শ্রান্ত পদক্ষেপে ;—
উপল রাশির গায়ে পড়ে কেঁপে কেঁপে।

দ্বীপের শৈলের শির প্লাবিত করিয়া,
অজস্র কনক ধারা পড়িছে ঝরিয়া।
মেঘ, দ্বীপ, জল, শৈল, সব সুরঞ্জিত,
সমস্ত প্রকৃতি গায় স্বর্ণময় গীত।
বহু দিন হোতে এক ভগ্নতরী জন
করিছে বিজন দ্বীপে জীবন যাপন।
বিজনতা-ভারে তার অবসন্ন বুক,
কত দিন দেখে নাই মানুষের মুখ।
এত দিন মৌন আছে না পেয়ে দোসর,
শুনিলে চমকি উঠে আপনার স্বর!
সুরেশ প্রভাতে আজি ছাড়িয়া কুটীর
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এল সাগরের তীর।
সাগর সে ভাষাহীন বান্ধব তাহার,
পেয়েছে কতনা তার অশ্রু উপহার।
বিমল প্রভাতে আজি শান্ত সমীরণ
ধীরে ধীরে করিতেছে দেহ আলিঙ্গন।
নীরবে ভ্রমিছে কত—একিরে—একিরে—
সুমুখে কি দেখিতেছি সাগরের তীরে?
রূপসী ললনা এক রোয়েছে শয়ান,
প্রভাত-কিরণ তার চুমিছে বয়ান;
মুদিত নয়ন দুটি, শিথিলিত কায়;
সিক্ত কেশ এলোথেলো শুভ্র বালুকায়।
প্রতিক্ষণে লহরীরা চলিয়া বেলায়,
এলানো কুন্তল লোয়ে কতনা খেলায়।
বহু দিন পরে যথা কারামুক্ত জন
হর্ষে অধীরিয়া উঠে হেরিয়া তপন,
বহুদিন পরে হেরি মানুষের মুখ,
উচ্ছ্বসি উঠিল হর্ষে সুরেশের বুক।
দেখিল এখনো বহে নিশ্বাস-সমীর,
এখনো তুষার-হিম হয়নি শরীর!
যতনে লইল তারে বাহুতে তুলিয়া,
কেশ পাশ চারি পাশে পড়িল খুলিয়া।
সুকুমার মুখ-খানি রাখি স্কন্ধোপরে,
দ্রুত পদে প্রবেশিল কুটীর ভিতরে।
কতক্ষণ পরে তবে লভিয়া চেতন,
ললিতা সুধীরে অতি মেলিল নয়ন।
দেখিল যুবক এক রোয়েছে আসীন,
বিশাল নয়ন তার নিমেষ বিহীন;
কুঞ্চিত কুন্তল-রাশি গৌর গ্রীবা পরে—
এলাইয়া পড়ি আছে অতি অনাদরে।
চমকি উঠিল বালা বিস্ময়ে বিহ্বল,
সরমে সম্বরে তার শিথিল অঞ্চল।
ভয়েতে অবশ দেহ, দুরু দুরু হিয়া—
আকুল হইয়া কিছু না পায় ভাবিয়া।
সহসা তাহার মনে পড়িল সকলি—
সহসা উঠিল বসি নব-বলে বলী।
সুরেশের মুখ পানে চাহিয়া চাহিয়া,
পাগলের মত বালা উঠিল কহিয়া;
"কেন বাঁচাইলে মোরে কহ-মোরে কহ—
দুই প্রণয়ীর কেন ঘটালে বিরহ?
অনন্ত মিলন যবে হইল অদূর—
দ্বার হোতে ফিরাইয়া আনিলে নিঠুর!
দয়া কর একটুকু দুখিনীর প্রতি,
দিওনা তাপস-বর বাধা এক রতি—
মরিব—নিভাব প্রাণ সাগরের জলে
মিলিব সখার সাথে নীল সিন্ধুতলে,
উপরে উঠিবে ঝড়—উর্ম্মি শৈলাকার,
নিম্নে কিছু পশিবে না কোলাহল তার!"

তৃতীয় সর্গ।

মরমের ভার বহি—দারুণ যাতনা সহি
ললিতা সে কাটাইছে দিন।

নয়নে নাই সে জ্যোতি—হৃদয় অবশ অতি
শরীর হইয়া গেছে ক্ষীণ।
আলু থালু কেশ পাশ, বাঁধিতে নাহিক আশ,
উড়িয়া পড়িছে থাকি থাকি।
কি করুণ মুখ খানি—একটি নাইক বাণী
কেঁদে কেঁদে শ্রান্ত ছুটী আঁখি।
যে দিকে চরণ ধায়, সে দিকে চোলেছে হায়,
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাই মনে,
গাছের কাঁটার ধার, ছিঁড়িছে আঁচল তার
লতা-পাশ বাধিছে চরণে।
একাকী আপন মনে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে বনে
যাইত সে তটিনীর তীরে,
লতায় পাতায় গাছে—আঁধার করিয়া আছে,
সেই খানে শুইত সুধীরে।
জল কলরব রাশি, প্রাণের ভিতরে আসি
ঢালিত কি বিষাদের ধারা!
ফাটিয়া যাইত বুক, বাহুতে ঢাকিয়া মুখ
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হোত সারা।
কানন-শৈলের পায়ে, মধ্যাহ্নে শৈলের ছায়ে
মলিন অঞ্চলে রাখি মাথা,
কতকি ভাবিত হায়—উচ্ছ্বসি উঠিত বায়
ঝরিয়া পড়িত শুষ্ক পাতা।
একাকী নীরব রাতে—উঠিয়া শৈলের মাথে
বসিয়া রহিত একাকিনী—
তারা-পানে চেয়ে চেয়ে, কতকি ভাবিত মেয়ে,
পড়িত কি বিষাদ কাহিনী!
কি করিলে ললিতার—ঘুচিবে হৃদয় ভার
সুরেশ না পাইত ভাবিয়া—
কাতর হইয়া কত, যুবা তারে শুধাইত,
আগ্রহে অধীর তার হিয়া।

"রাখ কথা, শুন সখি, একবার বল দেখি,
কি করিব তোমার লাগিয়া?
কি চাও, কি দিব বালা, বল গো কিসের জ্বালা?
কি করিলে জুড়াবে ও হিয়া?
বল কি করিতে পারি, মুছাতে ও অশ্রুবারি?
ও হৃদি-অনল নিভাইতে?
যদি বিন্দু হাসি-রেখা, ও অধরে দেয় দেখা
এ জীবন পারি সমর্পিতে!"
করুণ মমতা পেয়ে—সুরেশের মুখ চেয়ে
অশ্রু উচ্ছ্বসিল দর দরে।
ললিতা কাতর রবে রুদ্ধ কণ্ঠে কহে তবে
"সখা গো ভেবনা মোর তরে,
আমারে দিওনা দেখা—বিজনে রহিব একা
বিজনেই নিপাতিব দেহ।
এ দগ্ধ জীবন মোর, কাঁদিয়া করিব ভোর
জানিতেও পারিবে না কেহ!"
সুরেশ ব্যথিত-হিয়া, একেলা বিজনে গিয়া
ভাবিত-কাঁদিত আনমনে—
প্রাণপণ করি তার, তবুও ত ললিতার
পারিল না অশ্রু বিমোচনে।
সুরেশ প্রভাতে উঠি—সারাটি কানন লুটি
তুলিয়া আনিত ফুল-ভার,
ফুলগুলি বাছি বাছি, গাঁথি লোয়ে মালা গাছি
ললিতারে দিত উপহার।
নির্ঝরে লইত জল—তুলিয়া আনিত ফল
আহারের তরে বালিকার।
যতন করিয়া কত—পর্ণ-শয্যা বিছাইত
গুছাইত ঘর খানি তার।
... ...
শীতের তীব্রতা সহি—তপন কিরণে দহি
করিয়া শতেক অত্যাচার

মনের ভাবনা ভরে অবসন্ন কলেবরে
পীড়া অতি হল ললিতার।
অনলে দহিছে বুক—শুকায়ে যেতেছে মুখ
শুষ্ক অতি রসনা তৃষায়,
নিশ্বাস অনলময়—শয্যা অগ্নি মনে হয়
ছট ফট করে যাতনায়।
ত্যজিয়া আহার পান—সারা রাত্রি দিন মান
সুরেশ করিছে তার সেবা—
তৃষার্ত্ত অধরে তার—ঢালিছে সলিল ধার
ব্যজন করিছে রাত্রি দিবা।
নিশীথে সে রুগ্ন-ঘরে, একটি শিলার পরে
দীপ-শিখা নিভ' নিভ' বায়ে—
জ্যোতি অতি ক্ষীণতর,চু পা হোয়ে অগ্রসর,
অন্ধকারে যেতেছে হারায়ে।
আকুল নয়ন মেলি—সুধীরে নিশ্বাস ফেলি
সুরেশ সে ব্যাকুলিত হিয়া
শিয়রের সন্নিধানে বসিয়া, সে মুখ পানে
এক দৃষ্টে রহিত চাহিয়া।
বিকারে ললিতা যত—বকিত পাগল মত,
ছট ফট করিত শয়নে—
ততই সুরেশ হিয়া—উঠিত গো ব্যাকুলিয়া,
অশ্রুধারা পূরিত নয়নে।
যখনি চেতনা পেয়ে—ললিতা উঠিত চেয়ে,
দেখিত সে শিয়রের কাছে,
ম্লান-মুখ করি নত—নিস্তব্ধ ছবির মত
সুরেশ নীরবে বসি আছে।
মনে তার হোত তবে, এবুঝি দেবতা হবে
অসহায়া অবলা বালারে
করুণা-কোমল প্রাণে, এঘোর বিজন স্থানে
রক্ষা করে নিশার আঁধারে।

অশ্রুধারা দরদরি—কপোলে পড়িত ঝরি
সুরেশের ধরি হাত খানি
কৃতজ্ঞতা পূর্ণ প্রাণে, আঁখি তুলি মুখ পানে
নীরবে কহিত কত বাণী!
রোগের অনল-জ্বালা,সহিতে না পারি বালা
করিত সে এ পাশ ও পাশ!
হেরিয়ে করুণাময় সুরেশের আঁখিদ্বয়—
অনেক যাতনা হোত হ্রাস।
ফল মূল অন্বেষণে—যুবা যবে যেত বনে
একেলা ঠেকিত ললিতার।
চাহিত উৎসুক-হিয়া—প্রতি শব্দে চমকিয়া
সমীরণে নড়িলে দুয়ার।
বনে বনে বিহরিয়া—ফুল ফল আহরিয়া—
সুরেশ আসিত যবে ফিরে—
আঁখি পাতা বিমুদিত—অতিমৃদু উঠাইত
হাসিটি উঠিত ফুটি ধীরে।
দিন রাত্রি নাহি মানি—বনৌষধি তুলি আনি
সুরেশ করিছে সেবা তার।
রোগ চলি গেল ধীরে,বল ক্রমে পেলে ফিরে,
সুস্থ হোলো দেহ ললিতার।
রোগ-শয্যা তেয়াগিয়া—মুক্ত সমীরণে গিয়া,
মন-সুখে বনে বনে ফিরি,
পাখীর সঙ্গীত শুনি—সিন্ধুর তরঙ্গ গুণি,
জীবনে জীবন এল ফিরি!

চতুর্থ স্বর্গ।

বসন্ত-সমীর আসি, কাননের কানে কানে
প্রাণের উচ্ছ্বাস ঢালে নব-যৌবনের গানে।
এক ঠাঁই পাশাপাশি, ফুটে ফুল রাশি রাশি—
গলাগলি ফুলে ফুলে, গায়ে গায়ে ঢলাঢলি।

খেলি প্রতি ফুল পরে, সুরভি রাশির ভরে
শ্রান্ত সমীরণ পড়ে প্রতি পদে টলি টলি।
কোথায় ডাকিছে পাখী,খুঁজিয়া না পায় আঁখি
বনে বনে চারিদিকে হাসিরাশি বাদ্যগান।
দুরগম শৈল যত, ঢাকা লতা গুল্মে শত
তাদের হরিত হৃদে তিল মাত্র নাই স্থান।
ললিতার আঁখি হোতে শুকায়েছে অশ্রুধার।
বসন্ত-গীতির সাথে বাজিছে হৃদয় তার।
পুরাণো পল্লব ত্যজি নব-কিশলয়ে যথা
চারি দিকে বনে বনে সাজিয়াছে তরুলতা,—
তেমনি গো ললিতার হৃদয় লতাটি ঘিরে
নবীন হরিত-প্রেম বিকশিছে ধীরে ধীরে।
ললিতা সে সুরেশের হাতে হাত জড়াইয়া
বসন্ত হসিত বনে, ভ্রমিত হরষ মনে,
করুণ চরণ ক্ষেপে ফুল রাশি মাড়াইয়া!
একটি দুর্গম শৈল সাগরে পোড়েছে ঝুঁকি
অতি ক্লেশে সেথা উঠি, বসিয়া রহিত দুটি
সায়াহ্ন কিরণ, জলে করিত গো ঝিকি মিকি।
লহরীরা শৈল পরে, শৈবাল গুলির তরে
দিন রাত্রি খুদিতেছে নিকেতন শিলাসার।
ফুল ভরা গুল্মগুলি, সলিলে পোড়েছে ঝুলি
তরঙ্গের সাথে সাথে ওঠে পড়ে শতবার।
বিভলা মেদিনী বালা,জোছনা-মদিরা পানে,
হাসিছে সরসী এক কাননের মাঝ খানে,
সুরেশ যতনে অতি বাঁধি তরুশাখা গুলি,
নৌকা নিরমিয়া এক সরসে দিয়াছে খুলি,—
চড়ি সে নৌকার পরে,জ্যোৎস্না-সুপ্ত সরোবরে
সুরেশ মনের সুখে ভ্রমিতেছে ফিরি ফিরি,
ললিতা থাকিত শুয়ে— কোলে তার মাথাথুয়ে
মৃদুমৃদু মধুমাখা গান গেয়ে ধীরি ধীরি।
যদি কভু সায়াহ্নের বিষণ্ণ কিরণ-জালে,
অথবা জোছানা যবে ঘুমন্ত সৌন্দর্য্য ঢালে,
মৃদুমৃদু বসন্তের স্নিগ্ধ সমীরণ লাগি,
সহসা ললিতা-হৃদি—আকুলি উঠিত যদি—
সহসা দুয়েক কথা স্মরণে উঠিত জাগি,—
সহসা একটি শ্বাস বাহিরিত আনমনে,
দুইটি অশ্রুর রেখা দেখা দিত দুনয়নে!
অমনি সুরেশ আসি ধরি তার মুখ খানি,
কহিত করুণ-স্বরে কত আদরের বাণী।
মুছাইত আঁখি ধারা যতন করিয়া অতি,
শরত মেঘের মত হৃদয় আঁধার যত
মুহূর্ত্তে ছুটিত আর ফুটিত হাসির জ্যোতি।
অমনি সে সুরেশের কাঁধে মুখ লুকাইয়া
আধো কাঁদি আধো হাসি, হৃদয়ের ভার-রাশি
সোহাগের পারাবারে দিত সব বিসর্জ্জিয়া।

পঞ্চম সর্গ।

নারিকেল-তরুকুঞ্জে বসিয়া দোঁহায়
একদা সেবিতেছিল প্রভাতের বায়;—
সহসা দেখিল চাহি প্রাণ পণে দাঁড় বাহি
তরণী আসিছে এক সে দ্বীপের পানে,
দেখিয়া দোঁহার হিয়া, উঠিল গো উথলিয়া
বিস্ময় হরষ আর নাহি ধরে প্রাণে!
সহস্র ফুটুক ফুল, গাহুক বিহগ কুল
অনন্ত বসন্ত সেথা করুক্ বিরাজ—
তবু সে বিষণ্ণ ঠাঁই, যেথায় মানুষ নাই
মানুষ খুঁজিতে থাকে মনুষ্য সমাজ।
হরষে ভাবিল দোঁহে দেশে যাবে ফিরে
কুটীর বাঁধিবে এক বিপাশার তীরে।
দুখ শোক ভুলি গিয়া—একত্রে দুইটি হিয়া
সুখে জীবনের পথে করিবে ভ্রমণ
একত্রে দেখিবে দোঁহে সুখের স্বপন।

উঠিল তরণী পরে, অনুকূল বায়ু ভরে
স্বদেশে করিল আগমন ;
বাঁধিয়া পরণ শালা, না জানিয়া কোন জ্বালা
করিতেছে জীবন যাপন।
নির্ঝর কানন নদী, দ্বীপের কুটীর যদি
তাহাদের পড়িত স্মরণে
দুটিতে মগন হোয়ে, অতীতের কথা লোয়ে
ফুরাতে নারিত সারা ক্ষণে।
আধ' ঘুমঘোরে প্রাতে, পল্লব মর্ম্মর সাথে
শুনি বিপাশার কল স্বর—
স্বপনে হইত মনে, দূর সে দ্বীপের বনে
শুনিতেছে নির্ঝর ঝর্ঝর!
দ্বীপের কুটীর খানি, কল্পনার মনে আনি
ভাবিত সে শূন্য আছে পড়ি,
ভগ্ন ভিতে উঠে লতা, গৃহ সজ্জা হেথা হোথা
প্রাঙ্গণে যেতেছে গড়া গড়ি ;
হয় ত গো কাঁটা গাছে, এতদিনে ঘিরিয়াছে
ললিতার সাধের কানন—
এত দিনে শাখা জুড়ি, ফুটেছে মালতী কুঁড়ি
দেখিবার নাই কোন জন।
সেই যে শৈলেতে উঠি, বসিয়া রহিত দুটী
নারিকেল কুঞ্জটির কাছে—
চারি দিকে শিলা রাশি, ছড়াছড়ি পাশা পাশি
তাহারা তেমনি রহিয়াছে।
মজিয়া কল্পনা মোহে, কতকি ভাবিত দোঁহে
মাঝে মাঝে উঠিত নিশ্বাস
অতীত আসিত ফিরে, গায়ে যেন ধীরে ধীরে
লাগিত সে দ্বীপের বাতাস।
একদা জ্যোছনা রাতি, দুজনে প্রমোদে মাতি
গেছে এক বিজন-কাননে—
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা, কহিতে কহিতে কথা
কত দূরে গেল আন্‌মনে।
সহসা সে বিভাবরী, আইল আঁধার করি—
গগনে উঠিল মেঘ রাশি,
পথ নাহি দেখা যায় ক্ষণে ক্ষণে ঝলকায়
বিদ্যুতের নিদারুণ হাসি।
প্রতি বজ্র গরজনে, ললিতা শঙ্কিত মনে
দৃঢ় তর সুরেশে জড়ায়।
অবসন্ন পদ তায়, প্রতি পদে বাধা পায়
মাথা লাগে তরুর শাখায়।
ঝলিল বিদ্যুৎ-শিখা, ভগ্ন এক অট্টালিকা
অদূরেতে প্রকাশিল তথা—
কক্ষ এক হোতে তার, মুমূর্ষু-আলোক ধার
কহে কি রহস্যময় কথা!
চলিল আলয় পানে, দোহে আশ্বাসিত প্রাণে
সহসা জাগিল নীরবতা,
উঠিল সঙ্গীত-স্বর, বালার হৃদয় পর
প্রবেশিল দু একটি কথা—
"পাগলিনী তোর লাগি কি আমি করিব বল
কোথায় রাখিব তোরে খুঁজে না পাই ভূম-
গুল।"
কাঁপিছে বালার বুক, নীল হোয়ে গেছে মুখ
কপোলে বহিছে ঘর্ম্ম জল—
ঘুরিছে মস্তক তার, চরণ চলে না আর
শরীরে নাইক বিন্দু-বল।
তবুও অবশ মনে অলক্ষিত আকর্ষণে
চলিল সে ভীষণ আলয়ে
অঙ্গন হইয়া পার, খুলি এক জীর্ণ-দ্বার
গৃহে পদার্পিল ভয়ে ভয়ে।
ভগ্ন ইষ্টকের পরে, দীপ মিট্‌ মিট্‌ করে
বিদ্যুৎ ঝলকে বাতায়নে,

ভেদি গৃহ ভিত্তি যত, বটমূল শত শত
হেথা হোথা পড়িছে নয়নে।
বিছানো শুকানো পাতা, শুয়ে আছে রাখি মাথা,
পুরুষ একটি শ্রান্ত-কায়,
অতি শীর্ণ দেহ তার এলো থেলো জটা ভার
মুখশ্রী বিবর্ণ অতি তায়।
জ্যোতিহীন নেত্র তাঁর; পাতাটি ও তুলিবার
নাই যেন আঁখির শকতি ;
দ্বারে শুনি পদ ধ্বনি হৃদয়ে বিস্ময় গণি
তুলে মুখ ধীরে ধীরে অতি।
সহসা নয়নে তার জ্বলিল অনল !
সহসা মুহূর্ত্ত তরে দেহে এল বল।
"ললিতা" "ললিতা" বলি করিয়া চীৎকার—
ত্বরা হোয়ে অগ্রসর—কম্পবান কলেবর
শ্রান্ত হোয়ে ভূমি তলে পড়িল আবার।
করুণ নয়নে অতি—ললিতা-মুখের প্রতি
অজিত রহিল স্তব্ধ এক দৃষ্টে চাহি ;—
দীপ শিখা অতিস্থির—স্তব্ধ গৃহ সুগভীর
চারি দিকে এক টুকু শাড়া শব্দ নাহি !
দুই হাতে আঁখি চাপি, থর থর কাঁপি কাঁপি
মূর্চ্ছিয়া ললিতা বালা পড়িল অমনি;
বাহিরে উঠিল ঝড়, গর্জ্জিল অশনি,
জীর্ণ গৃহ কাপাইয়া—ভগ্ন বাতায়ন দিয়া
প্রবেশিল বায়ুচ্ছাস গৃহের মাঝারে,
নিভিল প্রদীপ,—গৃহ পূরিল আঁধারে।

বঙ্গ-সাহিত্য।

(কৃষ্ণ)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

কিছু দিবস পরে কৃষ্ণ পাণ্ডবমণ্ডলে উপস্থিত হইলে পর বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে দিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। প্রশান্ত-প্রকৃতি যুধিষ্ঠির সেই প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিতেই প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু কৃষ্ণ সেই খানে উপস্থিত ছিলেন—তিনিই আর্য্যাবর্ত্তের ভাবী দুর্দ্দশা কল্পনাতে দেখিতে পাইয়া যুধিষ্ঠিরকে সন্ধি স্থাপন হইতে নিরস্ত করিলেন ও সঞ্জয়কে দিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়া পাঠাইলেন যে পাণ্ডবেরা সমস্ত রাজ্যের অর্দ্ধেক অংশ না পাইলে কোন মতেই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবে না। বহুদিন গত হইলে কৌরবেরা কৃষ্ণের এই কথার উত্তর আর পাঠাইলেন না—তাহাতে পাণ্ডবেরা নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে কৌরব-সভায় দূতরূপে প্রেরণ করিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সন্ধি স্থাপনের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন কিন্তু অন্য সকলে—বিশেষতঃ দ্রৌপদী স্বীয়

অপমানের কথা উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণকে সমরানল প্রজ্বলিত করিতে অনুনয় করিয়া রাখিলেন। কৃষ্ণ মহাবিপদে পড়িলেন—এক দিকে যুধিষ্ঠিরের সন্ধি-স্থাপনের অনুরোধ এবং কৌরব পক্ষীয় সমস্ত আত্মীয় বন্ধুর একান্ত অভিলাষ, অপর দিকে রণস্থলেই সত্বাসত্বের কথা নিষ্পত্তি করা বিষয়ে নিজের ও ভীমার্জ্জুনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—এক দিকে কৌরব সভায় সমবেত রাজাদিগের সম্মুখে স্বীয় অপক্ষপাতিত্ব ও যুদ্ধবৈরাগ্য দেখাইতে হইবে—অপর দিকে তাঁহার উত্তেজনাতেই সেই কৌরব সভাতে যুদ্ধবিগ্রহের অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিতে হইবে। এরূপ স্থলে প্রকৃত মধ্যস্থের কার্য্য কত কৌশলে যে সম্পাদিত করা আবশ্যক, তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণ চতুরতা ও কৌশলে যেরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন, বাগ্মিতায়ও সেই রূপ পারদর্শী ছিলেন। এই জন্যই তিনি আপনিই পাণ্ডবদিগের দৌত্যকার্য্য আপন স্কন্ধেই লইলেন। তিনি জানিতেন যে বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রবাৎসল্য-প্রাচুর্য্যে দুষ্টমতি দুর্য্যোধনেরই হস্তগত প্রায়, তিনি জানিতেন যে অসার অথচ দাম্ভিক, মূর্খ অথচ দুর্জ্জন, দুর্য্যোধনকে সভামধ্যে তীব্র তিরস্কার করিলে, গর্ব্বিত ও পাণ্ডবদ্বেষী কর্ণের সম্মুখে পাণ্ডবদিগের অনুপম শৌর্য্য বীর্য্যের মহিমা কীর্ত্তন করিলে, তাহারা উভয়েই উন্মত্ত হইয়া উঠিবে এবং আপনার কৌশলময় সন্ধির প্রস্তাব ও সন্ধি বিষয়ক বাগ্মিতা আগ্নেয় তরঙ্গে ছিন্ন তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইবে। এই সকল বিলক্ষণ রূপে বিবেচনা করিয়া কৃষ্ণ কৌরব সভায় উপস্থিত হইলেন। যে দ্বারকাপতি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞস্থলে ভারতবর্ষের সমস্ত মহীপতিমধ্যে সর্ব্বপ্রাধান্যের নিদর্শন স্বরূপ অর্ঘ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি আজ কৌরব সভাতে উপস্থিত হইলে

* যেমন বারংবার অমৃত পান করিলে তৃপ্তি লাভ হয় না; তদ্রূপ ভূপতিগণ বহু ক্ষণ কৃষ্ণকে অবলোকন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। অতসী কুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পীতবসন জনার্দ্দন স্বর্বর্ণমণ্ডিত নীলকান্ত মণির ন্যায় সভামধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ সভায় সমুদায় সভাগণ এক মনে অনিমিষ নয়নে নারায়ণকে নিরীক্ষণ করত নিঃস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; কাহারও মুখে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না।

এই রূপে সমুদায় সভ্যগণ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া উপবিষ্ট রহিলে মহাত্মা মধুসূদন, বর্ষা কালীন সজলজলদগম্ভীর নিঃস্বনে সভামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে অবলোকন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে ভরতবংশাবতংস! আমার মানস যে, কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে সন্ধি স্থাপন হয়; বীর পুরুষগণের বিনাশ না হয়। আমি ইহাই প্রার্থনা করিতে

---

* এই প্রস্তাবে যে সমস্ত মহাভারতীয় অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তৎসমুদায়ই মৃত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আপনাকে অন্য কিছু হিতোপদেশ প্রদান করিবার আবশ্যক নাই; যাহা জ্ঞাতব্য আপনি তৎসমুদায় অবগত হইয়াছেন। হে রাজন্! আপনাদিগের কুল বিদ্যা সদাচার প্রভৃতি সমুদায় গুণসম্পন্ন ও অন্যান্য সমুদায় ভূপতিগণের কুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দয়া, অনৃশংসতা, সরলতা, ক্ষমা ও সত্য কুরুকুলে বিশেষ রূপে বর্ত্তমান আছে। অতএব এই কুলে বিশেষতঃ আপনা হইতে অযুক্ত কার্য্য সমুৎপন্ন হওয়া নিতান্ত অনুচিত। আপনি কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ ও শাসনকর্ত্তা থাকিতে কৌরবগণ গোপনে ও প্রকাশ্যে অনৃতব্যবহার করিতেছে। দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণ নিতান্ত অশিষ্ট, মর্য্যাদানাশক ও লোভপরতন্ত্র। উহারা ধর্ম্মার্থের উপর দৃষ্টিপাত না করিয়া স্বীয় বন্ধুগণের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিতেছে।

দেখুন এক্ষণে কুরুকুলে এই ঘোরতর আপৎ সমুত্থিত হইয়াছে; যদি আপনি ইহাতে উপেক্ষা করেন; তাহা হইলে ইহা পরিশেষে সমুদায় পৃথিবী বিনষ্ট করিবে। হে মহারাজ! আপনি মনে করিলেই এই আপৎ বিনাশ করিতে পারেন; বোধ হয় উভয় পক্ষের শান্তি হওয়া নিতান্ত দুষ্কর নহে। কুরুপাণ্ডবগণের শান্তি আপনার ও আমার অধীন। আপনি আপনার পুত্রগণকে শান্ত করুন; আমি পাণ্ডবগণকে নিরস্ত করিব। আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করা আপনার পুত্রগণের অবশ্য কর্ত্তব্য; আপনার শাসনে থাকিলে তাঁহাদের যথেষ্ট শ্রেয়োলাভ হইবার সম্ভাবনা। আপনি শান্তি সংস্থাপন করিলে কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই হিত হইবে; অতএব বৈর নিষ্ফল বিবেচনা করিয়া শান্তি সংস্থাপনে যত্নবান হউন; প্রাণ পণে যত্ন করিলেও পাণ্ডবগণকে পরাজয় করা অসাধ্য। হে রাজন! কৌরবগণ আপনার সহায় আছে; এক্ষণে পাণ্ডবগণকে সহায় করিয়া সচ্ছন্দে ধর্ম্মার্থ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া থাকুন। আপনি পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে ভূপতিগণের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও দেবগণ সমভিব্যাহারে আপনার প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না।

হে মহারাজ! সংগ্রাম মহা ক্ষয়ের হেতু। দেখুন, কৌরব ও পাণ্ডব এই উভয় পক্ষের কোন পক্ষ বিনষ্ট হইলেই আপনার যথেষ্ট হানি হইবে; পাণ্ডবগণ বা কৌরবগণ সংগ্রামে নিহত হইলে আপনার কি সুখোদয় হইবে? পাণ্ডবগণ সকলেই শূর, কৃতাস্ত্র ও যুদ্ধাভিলাষী, তাঁহারাও আপনার আত্মীয় অতএব আপনি তাঁহাদিগকে এই ভাবী বিপৎ হইতে রক্ষা করুন। আমাদিগকে যেন সমুদায় কৌরব ও পাণ্ডবগণকে সমরে ক্ষীণ ও রথিগণকে রথিগণ কর্ত্তৃক নিহত দেখিতে না হয়। ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত ভূপালেরা ক্রুদ্ধ হইয়া সমবেত হইয়াছেন; তাঁহাদের ক্রোধে সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! আপনি প্রজাগণকে রক্ষা করুন; উহারা যেন বিনষ্ট না হয়। আপনি প্রকৃতিস্থ হইলেই ইহাঁদের পরস্পর বিবাদ

ভঞ্জন হইবে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া পবিত্র কুলসম্ভূত বদান্য অতি যশস্বী, লজ্জাপরবশ, মহামান্য, পরস্পরমিত্রভাব-সম্পন্ন কুরুপাণ্ডবগণকে এই মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন। এই সকল ভূপতিগণ পরস্পর মিলিত হইয়া ক্রোধ ও বৈর পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্তম বসন ও মাল্য ধারণ করত একত্র পান ও ভোজন করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করুন। পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের সহিত আপনার যেরূপ সৌহৃদ্য ছিল; এক্ষণেও সেইরূপ হউক; আপনি সন্ধি সংস্থাপনে যত্ন করুন। পাণ্ডবেরা বাল্যাবধি পিতৃহীন হইয়া আপনা কর্ত্তৃক পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইয়া ছিলেন; অতএব এক্ষণে তাহাদিগকে ও স্বীয় পুত্রগণকে যথাবিধি প্রতিপালন করুন। পাণ্ডবগণ সকল সময়ে বিশেষত আপৎকালে আপনারই রক্ষণীয়; অতএব আপনি তাহার বিপরীতানুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মার্থ নাশ করিবেন না।

হে মহারাজ! পাণ্ডবেরা আপনারে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া কহিয়াছেন যে, আমরা আপনারে পিতা জ্ঞান করিয়া আপনার আদেশানুসারে দ্বাদশ বৎসর বনে বাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিয়া নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করিয়াছি। এই ব্রাহ্মণগণ জানেন যে, আমরা প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছি। অতএব এক্ষণে যাহাতে আমরা স্বীয় রাজ্যাংশ লাভ করিতে পারি এরূপ করুন। আপনি ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ; আমরা আপনারে গুরুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া অশেষ প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া আছি; অতএব এক্ষণে মাতা পিতার ন্যায় আমাদিগকে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে রাজন্! শিষ্যের গুরুর প্রতি যাদৃশ ব্যবহার করা উচিত; আমরা আপনার প্রতি সেই রূপ করিতেছি; আপনি আমাদিগের প্রতি গুরুর ন্যায় ব্যবহার করুন। আমরা উৎপথগামী হইলে আমাদিগকে সৎপথাবলম্বী করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব আপনি ধর্ম্মপথে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগকে সেই পথে আনীত করুন।

পাণ্ডবগণ সভাসদ্গণকেও কহিয়াছেন যে, ধর্ম্মজ্ঞ সভ্যগণ সে স্থানে থাকিতে অন্যায় কার্য্য হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। যদি সভাসদ্গণের সমক্ষে অধর্ম্মপ্রভাবে ধর্ম্ম ও অসত্যপ্রভাবে সত্য বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহারা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যদি কোন সভামধ্যে ধর্ম্ম অধর্ম্মস্বরূপ শল্যে বিদ্ধ হয়, আর তত্রস্থ সভ্য সেই শল্য ছেদন না করেন, তাহা হইলে তাঁহারাই সেই শল্যে বিদ্ধ হন। নদী যেমন তীরস্থ বৃক্ষ সমুদায় ভগ্ন করে; তদ্রূপ ধর্ম্ম উক্তরূপ সভ্যগণকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। যাঁহারা ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করত তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন, তাঁহারাই সত্য, ধর্ম্মানুগত ও ন্যায্য বাক্য কহিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! আমি পাণ্ডবগণকে রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত সন্ধি করা ভিন্ন আপনারে অন্য কিছু বলিতে পারি

না; অথবা অত্রস্থ পারিষদ্গণ এ বিষয়ে যাহা সঙ্গত হয়, বলুন। হে মহীপাল! যদি আমার বাক্য ধর্ম্মার্থসঙ্গত ও সত্য বলিয়া আপনার বোধ হইয়া থাকে; তাহা হইলে এই সমুদায় ভূপতিগণকে মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত করুন। হে ভরতকুলপ্রদীপ! এক্ষণে প্রশান্ত হউন, ক্রোধপরবশ হইবেন না; পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের পৈতৃক রাজ্যাংশ প্রদান পূর্ব্বক পুত্রগণ সমভিব্যাহারে সুখ সচ্ছন্দে বিবিধ ভোগ উপভোগ করুন। আপনি মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে সতত ধর্ম্মপথাবলম্বী বলিয়া জানিতেন। ঐ মহাপুরুষ আপনার ও আপনার পুত্রগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন; তাহা আপনার অবিদিত নাই। আপনি তাঁহারে দাহিত ও নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন; তিনি তথাপি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আপনিই আপনার পুত্রগণের পরামর্শানুসারে তাঁহারে ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তিনি তদনুসারে তথায় বাস করিয়া স্বপ্রভাবে সমুদায় ভূপতিগণকে বশীভূত করিয়া আপনারই অধীন করিয়াছিলেন; আপনার মর্য্যাদা কখনই অতিক্রম করেন নাই। কিন্তু সুবলনন্দন শকুনি আপনার মতানুসারে কপট যুদ্ধে তাঁহার রাজ্য ও ধন সম্পত্তি সকল অপহরণ করিল। তিনি সেই অবস্থায় সভামধ্যে দ্রৌপদীর অবমাননা নিরীক্ষণ করিয়াও ক্ষত্রধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইলেন না।

আমি এক্ষণে আপনাদের উভয় পক্ষের মঙ্গল বাসনায় এই সকল কথা কহিতেছি, আপনি প্রজাগণকে ধর্ম্ম, অর্থ ও সুখভ্রষ্ট করিবেন না। আপনার পুত্রগণ অনর্থকে অর্থ ও অর্থকে অনর্থ জ্ঞান করিতেছে; আপনি তাহাদিগকে শাসন করুন। ফলত পাণ্ডবগণ সন্ধি ও বিগ্রহ উভয়েই সম্মত আছেন; আপনার যাহা অভিরুচি হয়, করুন।

কৃষ্ণের বক্তৃতায় আশা অনুরূপ ফল উৎপন্ন হইল—ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম ও অন্য অন্য ভূপতিগণ পাণ্ডবীয় রাজ দূতের সরল উদারভাবে মোহিত হইয়া সন্ধি সংস্থাপনের জন্য ব্যাকুল হইলেন কিন্তু দুর্য্যোধন, কর্ণ ইত্যাদি পাণ্ডবশত্রুবর্গ একান্ত ক্রোধ পরবশ হইয়া যাহাতে সন্ধি স্থাপন না হয় সেই চেষ্টাতেই কৃতসংকল্প হইলেন। দুর্য্যোধন রোষ সংযত করিতে না পারিয়া উগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন।

হে কেশব! পাণ্ডবগণ প্রীতিপূর্ব্বক দ্যূতে প্রবৃত্ত হইলে শকুনি তাঁহাদের রাজ্য জয় করিয়াছিলেন; তাহাতে আমার অপরাধ কি? ঐ সময় পাণ্ডবগণের যে সমুদায় ধন পরাজিত হইয়াছিল; তাহা তাঁহাদের অসম্মতিক্রমে হয় নাই। অতএব অজেয় পাণ্ডবগণ যে দুরোদরমুখে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বনে গমন করিয়াছিলেন; তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র অপরাধ নাই। এক্ষণে সেই নিতান্ত অসমর্থ পাণ্ডবগণ কি বলিয়া হৃষ্টচিত্তে শত্রুর ন্যায় আমাদের সহিত বিরোধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন? আমরা তাঁহাদের কি করিয়াছি? তাঁহারা কি অপরাধে সৃঞ্জয়গণ সমভিব্যাহারে আমাদি-

গের অনিষ্ট চিন্তা করিতেছেন? আমরা উগ্র কর্ম্ম বা ভীষণ বচনে ভীত হইয়া সুররাজের সমীপেও নত হই না। হে কৃষ্ণ! আমি এমন কোন ক্ষত্রিয়কে অবলোকন করি না যে, যুদ্ধে আমাদিগকে পরাজয় করিতে উৎসাহযুক্ত হয়। পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, দেবগণও সংগ্রামে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকে পরাজয় করিতে পারেন না। যাহা হউক, আমরা স্বধর্ম্মে উপেক্ষা না করিয়া সংগ্রামে গমনপূর্ব্বক যদি অস্ত্রাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করি; তাহা হইলে স্বর্গ লাভ করিতে পারিব। সংগ্রামে শরশয্যায় শয়ন করা ক্ষত্রিয়গণের প্রধান ধর্ম্ম। যদি আমরা শত্রুগণের নিকট অবনত না হইয়া সংগ্রামে বীরশয্যা প্রাপ্ত হই; তাহা হইলে আমাদের নিমিত্ত কেহই অনুতাপিত হইবেন না। কোন্ সদ্বংশজাত ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি ভীত হইয়া শত্রুর নিকট অবনত হইতে সম্মত হয়? মাতঙ্গ মুনি কহিয়াছেন, "উদ্যমই পৌরুষ বলিয়া গণ্য; অতএব উদ্যম করা নিতান্ত আবশ্যক; নত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে; বরং অসময়ে ভগ্ন হইবে, তথাপি কোন ক্রমে নত হইবে না।" হিতাভিলাষী ব্যক্তিগণ মাতঙ্গের এই বচনানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। হে মহাত্মন্! মদ্বিধ ব্যক্তিরা কেবল ধর্ম্মের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণের নিকট প্রণত হইয়া থাকেন। অতএব অন্য কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া যাবজ্জীবন উক্তরূপ ধর্ম্ম আচরণ করিবে; ইহাই ক্ষত্রিয়ের যথার্থ ধর্ম্ম এবং আমারও এ বিষয়ে বিলক্ষণ সম্মতি আছে।

আমার পিতা যে পূর্ব্বে পাণ্ডবগণকে রাজ্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন; আমি জীবিত থাকিতে তাহা কখনই হইবে না। ফলত যে পর্য্যন্ত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র জীবিত থাকিবেন; তাবৎ আমরা বা তাহারা এক পক্ষকে অবশ্যই ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষুকের ন্যায় কালাতিপাত করিতে হইবে। হে কেশব! পূর্ব্বে আমি পরাধীন ও বালক ছিলাম; তৎকালে অজ্ঞানবশতই হউক বা ভয়প্রযুক্তই হউক, আমার অদেয় রাজ্য প্রদান করা হইয়াছিল; এক্ষণে আমি জীবিত থাকিতে পাণ্ডবগণ কদাপি তাহা প্রাপ্ত হইবে না। অধিক কি, সুতীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগ দ্বারা যে পরিমাণে ভূমিভাগ বিদ্ধ করা যায়; পাণ্ডবগণকে তাহাও প্রদান করিব না।

তখন কৃষ্ণ সর্ব্ব সমক্ষে উত্তর করিলেন।

হে দুর্য্যোধন! তুমি অমাত্যের সহিত বীরশয্যা লাভ করিতে বাসনা করিতেছ; তাহা তোমার অবশ্যই লাভ হইবে। স্থির হও; অচির কাল মধ্যেই মহৎ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইবে। হে মূঢ়! তুমি যে কহিলে, পাণ্ডবগণের প্রতি আমার কিছুমাত্র অত্যাচার নাই, অত্রস্থ ভূপতিগণ তাহা বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখুন। হে ভরতকুলকলঙ্ক! তুমি পাণ্ডবগণের সম্পত্তি দর্শনে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া শকুনির সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক কপট দ্যূতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। কপটাচারবিহীন অতি প্রধান তোমার জ্ঞাতিবর্গ কিরূপে কুটিল

ব্যক্তির সহিত অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল? অক্ষক্রীড়ায় সাধুগণের বুদ্ধিলোপ এবং অসাধুগণের ভেদ ও ব্যসন সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তুমি অসমীক্ষ্যকারিতা প্রযুক্ত সদাচারপরায়ণ পাণ্ডবগণের সহিত কপট দ্যূতক্রীড়া করিয়া এই ব্যসন সমুৎপন্ন করিয়াছ। তুমি কুলশীলসম্পন্না পাণ্ডবগণের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা মহিষী দ্রৌপদীরে সভামধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক যেরূপ অপমান ও কটূক্তি করিয়াছ আর কোন্ ব্যক্তি ভ্রাতৃভার্য্যার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতে পারে? পাণ্ডবগণের অরণ্য গমন সময়ে দুঃশাসন কুরুসভামধ্যে তাহাদিগকে যাহা যাহা কহিয়াছিল; কৌরবগণ তৎসমুদায় অবগত আছেন। ফলত তোমরা পাণ্ডবগণের প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছ; অন্য কোন ব্যক্তি স্বীয় বন্ধুগণের সহিত তাদৃশ অসৎ ব্যবহার করিতে পারে না। হে দুর্য্যোধন! তুমি, কর্ণ ও দুঃশাসন এই তিন জনে অনার্য্য ও নৃশংস পুরুষের ন্যায় তাঁহাদিগকে বারংবার বহুবিধ কটূক্তি করিয়াছ।

দেখ, তুমি পাণ্ডবগণের বাল্যাবস্থায় বারণাবত নগরমধ্যে তাঁহাদিগকে মাতৃ সমভিব্যাহারে দগ্ধ করিতে সবিশেষ যত্ন করিয়াছিলে; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। তাঁহারা সেই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মাতৃসমভিব্যাহারে একচক্রা নগরে ব্রাহ্মণের নিকেতনে বহুদিবস প্রচ্ছন্ন ভাবে বাস করিয়াছিলেন। তুমি বিষসর্প প্রভৃতি বিবিধ উপায় দ্বারা তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলে; কিন্তু কোন ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। তুমি উক্তরূপে বারংবার মহাত্মা পাণ্ডবগণের অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছ, অতএব পাণ্ডবগণের নিকট যে তোমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই ইহা কিরূপে বলিতে পারি।

পাণ্ডবগণ স্বীয় পৈতৃক রাজ্যাংশ প্রার্থনা করিতেছে; তুমি তৎপ্রদানে সম্মত হইতেছ না; কিন্তু অচিরাৎ তোমারে ঐশ্বর্য্য-ভ্রষ্ট ও নিপাতিত হইয়া তাহাদিগকে উহা প্রদান করিতে হইবে। তুমি পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের প্রতি নিতান্ত হীন ও নৃশংসের ন্যায় নানাবিধ অসদ্ব্যবহার করিয়া এক্ষণে পুনরায় তাঁহাদের সহিত বিবাদ করিতে বাসনা করিতেছ। তোমার পিতা, মাতা, ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর তোমারে শান্তিমার্গ অবলম্বন করিতে বারংবার অনুরোধ করিতেছেন; কিন্তু তুমি তাহাতে সম্মত হইতেছ না। হে দুর্য্যোধন! এক্ষণে সন্ধিস্থাপন হইলে তুমি ও যুধিষ্ঠির উভয়েরই যথেষ্ট লাভ হয়; কিন্তু তুমি অল্পবুদ্ধি প্রযুক্ত তাহাতে সম্মত হইতেছ না। তুমি সুহৃজ্জনের বাক্যে উপেক্ষা করিয়া নিতান্ত অধর্ম্ম্য ও অযশস্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছ; অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে তোমার শ্রেয় লাভ হইবে না।

এই কহিয়া কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের পক্ষ হইয়া কৌরব সভায় যুদ্ধঘোষণা পূর্ব্বক পাণ্ডব সমাজে ফিরিয়া আসিলেন।

উভয় পক্ষেই যুদ্ধের ঘোর আয়োজন হইতে লাগিল। শেষে কুরুপাণ্ডবগণ কুরু-

ক্ষেত্রে থাকিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। যখন অর্জ্জুন সম্মুখে আপনার ভাই, বন্ধু, আত্মীয়, পরিজন সমূহকে সমরানলের আহুতি স্বরূপ সজ্জিত দেখিয়া যুদ্ধে শিথিলপ্রযত্ন হইয়া পড়িলেন তখন কৃষ্ণের ভয় হইল, কারণ অর্জ্জুন শিথিলপ্রযত্ন হইলে পাণ্ডবদের আর জয়ের আশা থাকিবে না—এই অবস্থায় কৃষ্ণ স্বীয় গভীর দূরদর্শিতা প্রভাবে বেদান্ত-মিশ্রিত সাংখ্য দর্শনের গভীর তত্ত্ব সকল অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া তাঁহার সমরলিপ্সা আবার বলবতী করিয়া তুলিলেন। তখন প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে যে কৃষ্ণ না থাকিলে পাণ্ডবদিগের কখনই জয় হইত না তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। যদিও তিনি স্বয়ং অস্ত্রধারণ করেন নাই বটে, তবু তাঁহার কৌশলে তাঁহার চাতুরীতে কৌরব পক্ষীয় প্রধান প্রধান বীর পুরুষেরা নিহত হইয়াছিল। সে সকল কথার বহুল বিস্তারে প্রয়োজন নাই। পরিশেষে পাণ্ডবদিগের জয় হইলে তিনিই আবার এক দিকে যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন। আবার অপরদিকে গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রকে এমন বুঝাইলেন যে তাঁহারাও পাণ্ডবদিগের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন।

হস্তিনাপুরে যখন কৃষ্ণ এই রূপ নানা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তাঁহার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিল যে তাঁহার রাজধানী দ্বারকায় দারুণ অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে এবং পুরবাসীগণ বিশেষতঃ তাঁহারই পুত্র-পৌত্রেরা নানা প্রকার বিলাস ও মদ্য পানে অনুরক্ত হইয়া ঘোর উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা ক্রমে ক্রমে দ্বারকাপুরী ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং উন্মত্ততা ও যথেচ্ছাচারিতা সমস্ত রাজধানীতে সগর্ব্বে বিচরণ করিতে লাগিল। কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিয়া প্রভাস তীর্থে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, এবং সেখানে নানা প্রকার আমোদ প্রমোদের মধ্যে মদ্য পানও প্রভূত পরিমাণে চলিতে লাগিল। এই উৎসবের মধ্যে তাঁহাদিগের আপনাআপনির ভিতরে বিরোধ উপস্থিত হইল এবং সুরা-উন্মত্ত যাদবেরা আপনাআপনি হত্যাকাণ্ডে উপস্থিত, সকলেই নিহত হইল। এই সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া কৃষ্ণ ভগ্ন হৃদয়ে যে সময় একটি বিজন বনে একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি একটি ব্যাধ কর্ত্তৃক ভ্রম বশতঃ বিনষ্ট হইলেন।

চ্যাটার্টন—বালক-কবি।

And we at sober eve would round thee throng,
Hanging, enraptured, on thy stately song;
And greet with smiles the young-eyed Poesy,
All deftly mashed,as hear Antiquity."

Coleridge.

কবি যখন আপনার গুণ বুঝিতে পারিতেছেন, ও জগৎ যখন তাঁহার গুণের সমাদর করিতেছে না, তখন তাঁহার কি কষ্ট! যখন তিনি মনে করিতেছেন পৃথিবীর নিকট হইতে যশ ও আদর তাঁহার প্রাপ্য, তাঁহার ন্যায্য অধিকার, তখন তিনি যদি ক্রমাগত উপেক্ষা সহ্য করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, কিন্তু কি উপায়ে সে প্রতিহিংসা সাধন করেন? আপনাকে বিনাশ করিয়া! তিনি বলেন, পৃথিবী যখন তাঁহাকে অনাদর করিল, তখন পৃথিবী তাঁহাকে পাইবার যোগ্য নহে, তিনি আপনাকে বিনষ্ট করেন ও মনে করেন পৃথিবী এক দিন ইহার জন্য অনুতাপ করিবে। বালক কবি চ্যাটার্টন যখন যশ ও অর্থের নিমিত্ত লালায়িত হইয়া লণ্ডনে গেলেন ও যখন নিরাশ হইয়া অনাহারে দিন যাপন করিতেছিলেন, তখন একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, তিনি কেন তাঁহার লেখা ছাপাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করেন না, তখন কবি কহিলেন, পুরাণো বস্ত্র কিনিবার জন্য ও গৃহ সাজাইবার জন্য তিনি কোন কবিতা লেখেন নাই; পৃথিবী যদি ভালরূপ ব্যবহার না করে তাহা হইলে সে পৃথিবী তাঁহার কবিতার একটি ছত্রও দেখিতে পাইবে না! আরো কিছুদিন অপেক্ষা করিলেন; দেখিলেন পৃথিবী ভাল ব্যবহার করিল না, তখন তিনি তাঁহার সমস্ত অপ্রকাশিত কবিতা দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন ও আপনার প্রাণও নষ্ট করিয়া ফেলিলেন; পৃথিবী আজ অনুতাপ করিতেছে। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে যে পৃথিবী তাঁহার মৃত্যুর পর একটি অশ্রুজলও ফেলে নাই; ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সেই পৃথিবী তাঁহার স্মরণার্থে প্রস্তরস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ব্বকৃত অন্যায় ব্যবহারের যথাসাধ্য প্রতিকার করিবার চেষ্টা পাইল।

চ্যাটার্টন তাঁহার শৈশব কাল অবধি এমন সংসর্গে ছিলেন যে তাঁহার প্রতিভা কিরূপে স্ফূর্ত্তি পাইল ভাবিয়া পাওয়া যায় না। অনুকূল অবস্থায় অনেকের প্রতিভার বীজ অঙ্কুরিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় তাহা অতি অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। অবস্থা বিশেষে অনুকূল না হইলে অসময়ে শৈশবে প্রতিভার পূর্ণস্ফূর্ত্তি হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। পিতার মৃত্যুর তিনমাস পরে ব্রিস্টল নগরে চ্যাটার্টনের জন্ম হয়। তাঁহার মাতা, তাঁহার ধর্ম্মমা Mrs Edkins, ও তাঁহার অপেক্ষা দুই বৎসরের জ্যেষ্ঠা এক ভগিনী তাঁহার শৈশবের সঙ্গী ছিলেন। ইহাঁরা কেহই চ্যাটার্টনকে প্রকৃত প্রস্তাবে চিনিতে পারেন নাই। তাঁহার মাতা চ্যাটার্টনকে পাগল মনে করিয়া অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। প্রায় বালক মাঝে মাঝে অনেক ক্ষণ ধরিয়া আপনার মনে বসিয়া বসিয়া কাঁদিত অথচ কেহ তাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইত না; একবার তাঁহার এইরূপ চিন্তিত বিষণ্ণ অবস্থায় Mrs Edkins বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন "তোর বাপ যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তোকে সিধা করিতেন!" শুনিয়া বালক চমকিয়া

উঠিয়া কহিল, "আহা যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন।" বলিয়াই একটি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অনেক ক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল! কখন কখন অনেক ক্ষণ কি কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার কপোলে একটি একটি করিয়া অশ্রু বহিয়া পড়িত, তাহা দেখিয়া তাঁহার মাতা আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বালক যথার্থ কারণ বলিতে চাহিত না! আবার এক এক সময় কতক্ষণ নিস্তব্ধ বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ একটা কলম লইয়া অনর্গল লিখিতে আরম্ভ করিত, কিন্তু কি লিখিত সে বিষয়ে কাহারো কখনো কৌতূহল হয় নাই। এ সকল যে অসাধারণ অস্ফূর্ত্ত প্রতিভা উদ্ভূত, তাহা তাঁহার মাতা কি রূপে বুঝিবেন বল? স্কুলের শিক্ষক তাঁহাকে একটা গর্দ্দভ মনে করিত, তাঁহার সহপাঠীরা তাঁহার ভাব গতিক বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইত। বাল্যকালে তাঁহার পাঠে তেমন মন ছিল না—কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে এমন তাঁহার পড়িতে মন বসিয়া গেল যে, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই পড়িতে আরম্ভ করিতেন, ও ঘুমাইতে যাইবার সময়ে বহি বন্ধ করিতেন। যখন তিনি পাঠের গৃহে বসিয়া পাঠে মগ্ন থাকিতেন, তখন কিছুতেই আহার করিতে আসিতেন না, অবশেষে Mrs Edkins তাঁহার বাল্য-প্রিয়তমা Miss Sukey Willএর নাম করিলে তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিতেন।

যখন এমন কেহ তাঁহার সঙ্গী ছিল না, যে তাঁহাকে বুঝিতে পারিবে, তাঁহার সহিত সমানুভব করিবে, তখন ব্রিস্টলের এক অতি প্রাচীন গির্জ্জা, ও সেই গির্জ্জার মধ্যস্থিত অতি প্রাচীন কালের লোকদের পাষাণ-মূর্ত্তি সকলই তাঁহার সঙ্গী ছিল। শুনা যায়, প্রায় তিনি সেই গির্জ্জায় যাইতেন, ও ক্রীড়া সহচরদিগের মধ্যে তাঁহার বিশেষ সুহৃদদিগকে কবিতা শুনাইতেন। শৈশবে কি বিষয় লইয়া তিনি কবিতা লিখিবেন? স্কুলের হেড্‌মাষ্টার তাঁহাকে প্রহার করিয়াছিল, তাহার নামে ঠাট্টা করিয়া একটা কবিতা লিখিলেন, দুষ্টামি করিয়া পাড়ার একটা দোকানদারের নামে কবিতা লিখিয়া খবরের কাগজে ছাপাইয়া দিলেন। লোকে বলে এগারো বৎসরের সময় তিনি কবিতা লিখিতে সুরু করেন, কিন্তু তাহারো পূর্ব্বে দশ বৎসরের সময় তাঁহার একটি কবিতা পাওয়া গিয়াছে। কবিতাটি যিশুখৃষ্টের পৃথিবীতে অবতরণ সম্বন্ধে। আসলে এ কবিতাটির মূল্য তেমন কিছুই নহে,এ সম্বন্ধে তিনি স্কুলে যাহা পড়িয়াছেন তাহাই ছন্দে গাঁথিয়াছেন মাত্র, তথাপি দশ বৎসরের বালকের কবিতার একটা নমুনা পাঠকদের হয়ত দেখিতে কৌতূহল হইবে। অনুবাদ অবিকল করিবার মানসে অমিত্রাক্ষরে লিখিলাম——

উপর হইতে দেখ আসিছেন মেঘে,
বিচারক, বিভূষিত মহিমা ও প্রেমে!
আলোকের রাজ্য দিয়া আসিবারে তাঁরে
দ্বিধা হোয়ে গেল দেখ শূন্য একেবারে
বদন ঢাকিয়া তার ফেলিল তপন

বিশুর উজ্জ্বলতর হেরিয়া কিরণ
চন্দ্র তারা চেয়ে থাকে বিস্ময়ে মগন!
ভীষণ বিদ্যুৎ হানে, গরজে অশনি
কাঁপে জলধির তীর কাঁপিল অবনী!
স্বর্গের আদেশ—শৃঙ্গ বাজিল অমনি
জল স্থল ভেদি তার উচ্ছ্বাসিল ধ্বনি!
মৃতেরা শুনিতে পেলে আদেশের স্বর
পুণ্যবান হাসে, পাপী কাঁপে থর থর
ভীষণ সময় কাছে এসেছে এখন
উঠিবেক কবরের অধিবাসীগন
অনন্ত আদেশ তাঁর করিতে গ্রহণ।

ব্রিস্টলের রেড্‌ক্লিফ্ গির্জ্জায় (St. Mary Redcliffe Church) একটি ঘর ছিল, সেখানে কতকগুলি কাঠের সিন্ধুকে অনেক দিনকার পুরাণ নানা প্রকার কাগজ পত্র দলিল দস্তাবেজ থাকিত। সে সকল পুরাণ অক্ষরের পুরাণভাষার কাগজপত্রের বড় যত্ন ছিল না। চ্যাটার্টনের পিতা যখন গির্জ্জার কর্ম্মচারী ছিলেন, তখন মাঝে মাঝে সেই সকল সিন্ধুক হইতে রাশি রাশি লিখিত পার্চমেণ্ট লইয়া তাঁহার রান্না ঘরের জিনিষ পত্র সাফ করিতেন ও অন্যান্য নানা গৃহ কর্ম্মে নিয়োগ করিতেন। যাহা কিছু প্রাচীন তাহারি উপর চ্যাটার্টনের অসাধারণ ভক্তি ছিল। চ্যাটার্টণ সেই সকল কাগজ পত্র তাঁহার পড়িবার ঘরে লইয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া প্রাচীন অক্ষর ও ভাষা পাঠ করিতে চেষ্টা করিতেন, ও সেই সকল অক্ষর অনুকরণ করিতে প্রয়াস পাইতেন। এই রূপে প্রাচীন ইংরাজি ভাষা তাঁহার দখল হয়, ও তখন হইতে প্রাচীন কবিদের অনুকরণ করিয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সেই ক্ষুদ্র অন্ধকার পাঠ গৃহে দরজা বন্ধ করিয়া কতকগুলা রঙ্গ ও কয়লার গুঁড়া লইয়া স্তূপাকার প্রাচীন কাগজপত্রের মধ্যে চ্যাটার্টন কি করিতেন তাহা তাঁহার মাতা ভাবিয়া পাইতেন না। কিরূপ করিলে পার্চমেণ্ট্ প্রাচীন আকার ধারণ করে তিনি তাহা নানা বিধ উপায়ে পরীক্ষা করিতেন। এই সময়ে চ্যাটার্টন প্রাচীন ভাষায় কবিতা লিখিতেন ও অতি যত্নে তাহা লুকাইয়া রাখিতেন, ও যখন প্রকাশ করিতেন, কহিতেন রাউলি (Rowley) নামক এক জন ব্রিস্টলের অতি প্রাচীন কবি এই সকল কবিতা লিখিয়াছেন, তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া সেই সকল পুস্তক পাইয়াছেন। কেহ অবিশ্বাস করিত না, কে করিবে বল? কে জানিবে যে, এক জন পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক প্রাচীন কবিদের অনুকরণ করিয়া এই সকল কবিতা লিখিয়াছে। তাঁহার সঙ্গীদের মধ্যেই বা এমন কে ছিল যে সেই সকল প্রাচীন ইংরাজি ভাল করিয়া বুঝিবে? তাঁহার মাতা, তাঁহার ভগিনী, একটা অবৈতনিক বিদ্যালয়ের কতকগুলি মূর্খ বালক, ও তাহাদের অপেক্ষা জ্ঞানে দুই এক সোপান মাত্র উন্নত দুই একটি অল্প বেতনের শিক্ষক প্রাচীন ইংরাজি সাহিত্যের অতি অল্পই ধার ধারিত।

Town and Country Magazine নামক এক পত্রিকায় চ্যাটার্টন রাউলির ছদ্ম নাম ধারণ করিয়া "Elinoure and Juga"

"এলিনোর ও জুগা" নামক একটি গাথা প্রকাশ করিলেন। রুড্‌বোর্ণ নদী তীরে বসিয়া এলিনোর ও জুগা তাহাদের যুদ্ধ নিহত প্রণয়ীর জন্য শোক করিতেছে। জুগা কহিতেছে—

আয় বোন, করি মোরা হেথায় বিলাপ,
এই ফুলময় তীরে, বিষাদ যথায়
রোয়েছে তাহার দুটি পাখা ছড়াইয়া
উষার শিশির আর সায়াহ্নের হিমে
এই খানে বসি বসি ভিজিব দুজনে।
বজ্র-দগ্ধ, শুষ্ক দুই পাদপ যেমন
উভয়ের পরে রহে উভয়ে ঝুঁকিয়া।
কিম্বা জনশূন্য যথা ভগ্ন নাট্যশালা
হৃদয়ে পুষিয়া রাখে বিভীষিকা শত,
অমঙ্গল কাক যেথা ডাকে অবিরাম।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া পেঁচা জাগায় নিশিরে।
বংশীরবে উষা আর উঠিবে না জাগি
নৃত্যগীত বাদ্য আদি হবে নাকো আর।

এলিনোর।

ঘোটকের পদশব্দ শৃঙ্গের গর্জ্জনে
অরণ্যে প্রাণীরা আর উঠিবেনা কাঁপি!
সারা দীর্ঘ দিন আমি ভ্রমিব গহনে
সারা রাত্রি গোরস্থানে করিব যাপন
প্রেতাত্মারে কব যত দুখের কাহিনী।

যদিও চ্যাটার্টনের অহঙ্কার অতি অল্পই প্রশ্রয় পাইয়াছিল ও তাঁহার যশ-লালসা তৃপ্ত হয় নাই তথাপি তাঁহার অহঙ্কার ও যশের ইচ্ছা অতি বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত বলবান ছিল। তাঁহার বাল্যকালে তাঁহার মাতার এক কুম্ভকার বন্ধু চ্যাটার্টনকে একটি মৃৎপাত্র উপহার দিবার মানস করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে পাত্রের উপর কি চিত্র আঁকিবে। চ্যাটার্টণ কহিলেন—একটি দেবতা (angel) আঁক, তাহার মুখে একটি শৃঙ্গ দেও, যেন সমস্ত পৃথিবীময় সে আমার যশঃ কীর্ত্তন করিতেছে।" তাঁহার এমন প্রশংসা-তৃষ্ণা ছিল যে, যতদিন তিনি ব্রিষ্টলে ছিলেন, তিনি এমন একটি সামান্য কবিতা লিখেন নাই যাহা তাঁহার সহ পাঠীদের শোনান নাই; অনেক সময়ে সে বেচারীরা বিরক্ত হইয়া উঠিত। সন্দিগ্ধ লোকেরা কহিত, যাঁহার যশ-লালসা এত প্রবল, তিনি কোন্ প্রাণে নিজে কবিতা লিখিয়া ছদ্ম নামে প্রকাশ করিলেন? "রাউলি-রচিত কবিতা' গুলি চ্যাটার্টনের রচিত নয়, বলিয়া সন্দেহ করিবার এই একটি প্রধান কারণ। মানুষের চরিত্রে এত প্রকার বিরোধী ভাব মিশ্রিত আছে, যে, ওরূপ একদিক মাত্র দেখিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে গেলে ভ্রমে পড়িতে হয়। তাঁহার সহস্র অহঙ্কার থাক্, তথাপি কত কারণ বশতঃ যে তিনি তাঁহার নিজের নাম প্রকাশ করেন নাই তাহা কে বলিতে পারে? তাঁহার চলিত ভাষায় লিখিত ছোট খাট কবিতা গুলিতে তাঁহার নিজের নাম প্রকাশ করিতেন, ও তাহা লইয়া যথেষ্ট গর্ব্ব-অনুভব করিতেন, আর তাঁহার প্রাচীন ভাষায় রচিত কবিতাগুলি যদিও খুব গর্ব্বের সহিত সকলকে শুনাইতেন, তথাপি তাহাতে নিজের নাম ব্যবহার করিতেন না, ইহার কারণ

খুঁজিতে গেলে যে একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়িতে হয় তাহা নহে। যতদূর জানা যায়, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় তিনি তাঁহার নিজের লিখিত প্রাচীন ভাষার কবিতা গুলিকে অতিশয় ভক্তির চক্ষে দেখিতেন, যেরূপ ভক্তির সহিত লোকে অতি পুরাকালের গ্রন্থ সমূহকে পূজা করে, তাঁহার নিজ-রচিত কবিতার প্রতি তাঁহার ভক্তি যে তদপেক্ষা ন্যূন ছিল, তাহা নহে ; কল্পনার মোহিনী-মায়ার মানুষ নিজহস্তগঠিত প্রতিমাকে দেবতার মত পূজা করে ও সেই কল্পনার ইন্দ্রজালে চ্যাটার্চণ সাধারণ লোকের অনধিগম্য পবিত্র মৃত ভাষায় যে কবিতা লিখিতেন তাহা এক প্রকার সম্ভ্রমের সহিত নিরীক্ষণ করিতেন। যেন সে গুলি তাঁহার নিজের সাধারণত্ত কবিতা নহে, যেন প্রাচীন যুগের কোন মৃত কবির আত্মা তাঁহাতে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার মুখ দিয়া সেই কবিতা বলাইয়াছেন মাত্র। সামান্য সামান্য বিষয় মূলক-রাজনীতি বা বিদ্রূপ সূচক কবিতা লইয়া তিনি খবরের কাগজে ছাপাইতেন, নাম দিতেন, সকলকে শুনাইতেন—অর্থাৎ সে গুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে বড় সঙ্কোচ অনুভব করিতেন না, কিন্তু "রাউলি কবিতা" এক স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা অতি গোপনে লিখিতেন, গোপন রাখিতেন, যদি কখনো বাহিরে প্রকাশ করিতেন তবে সে প্রাচীন কালের ও অতি প্রাচীন লেখকের বলিয়া। দুই একবার, তিনি নিজে লিখিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু লোকের মুখে সন্দিগ্ধ উপহাসের হাসি দেখিয়া তখনি আবার ঢাকিয়া লইতেন। তাঁহার 'রাউলি কবিতা' লইয়া ওরূপ সন্দেহ, উপহাস তিনি সহিতে পারেন না, লোকের ঐ কবিতাগুলি ভাল লাগিলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। প্রথম প্রথম যখন তিনি প্রাচীন ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন হয়ত বালক-স্বভাব বশতঃ অনেককে ফাঁকি দিবেন ও মজা করিবেন মনে করিয়া ছদ্ম নাম ব্যবহার করেন, অথবা হয়ত মনে করিয়াছিলেন যদি তিনি নিজের নাম প্রকাশ করেন তাহা হইলে কেহ বিশ্বাস করিবে না এই ভাবিয়া একটা মিথ্যা নামের আশ্রয় লইয়া থাকিতেন। কিন্তু ক্রমে তিনি যতই লিখিতে লাগিলেন, ততই কল্পনা-চিত্রিত প্রাচীন পুরোহিত কবি রাউলি তাঁহার হৃদয়ে জীবন্ত হইয়া উঠিতে লাগিল, যেন সত্যই রাউলি এক জন কবি ছিলেন, রাউলিকে যেন দেখিতে পাইতেন, রাউলির কথা যেন শুনিতে পাইতেন। আর প্রথমে যে কারণ বশতই এই সকল কবিতা তাঁহার লুকাইয়া ও ঢাকিয়া ঢুকিয়া রাখিতে প্রবৃত্তি হৌক না কেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিজের চক্ষেও সেই সকল কবিতার উপর একটা রহস্যের আবরণ পড়িয়া গেল, তাঁহার নিজের কাছেও সে সকল কবিতা যেন কি একটি গোপনীয়, পবিত্র, প্রাচীন পদার্থ বলিয়া প্রতিভাত হইল। ইহা নূতন কথা নহে যে, অনেকে কোন একটি বিষয়ে অন্যকে প্রতারণা করিতে গিয়া সেই বিষয়ে আপনাকেও প্রতারণা করে। তাহা ছাড়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে এমন সব সঙ্গী ছিল, যাহারা প্রতারিত হইতে চায়। একটি প্রাচীন ভাষায় রচিত ভাল কবিতা শুনিলে তাহারা বিশ্বাস করিতে চায় যে, তাহা কোন প্রাচীন কবির রচিত। যদি তাহারা জানিতে পায় যে, সে সকল কবিতা একটি আধুনিক বালকের লেখা, যে বালক তাহাদেরি ভাষায় কথা কয়, তাহাদেরি মত কাপড় পরে—বাহিরের অনেক বিষয়েই তাহাদের সহিত সমান তাহা হইলে তাহারা কি নিরাশ হয়! তাহা হইলে হয়ত তাহারা চটিয়া যায়, তাহারা সে কবিতাগুলির মধ্যে কোন পদার্থ দেখিতে পায় না, নানা প্রকার খুঁটি নাটি ধরিতে আ-

রম্ভ করে, যদি বা কেহ সে সকল কবিতার প্রশংসা করিতে চায়, তবে সে নিজে একটি উচ্চতর আসনে বসিয়া বালকের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অতি গম্ভীর স্নেহের স্বরে বলিতে থাকে যে, হাঁ, কবিতাগুলি মন্দ হয় নাই, এবং বালককে আশা দিতে থাকে যে, বড় হইলে চেষ্টা করিলে সে একজন কবি হইতে পারিবে বটে! তাহাদের যদি বল, এ সকল একটি প্রাচীন কবির লেখা, তাহারা অমনি লাফাইয়া উঠিবে, ভাবে গদগদ হইয়া বলিবে, এমন লেখা কখনো হয় নাই হইবে না; কাগজে পত্রে একটা হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে—শত প্রকার সংস্করণে শত প্রকার টীকা ও ভাষ্য বাহির হইতে থাকিবে, এরূপ অবস্থায় এক জন যশোলোলুপ কবি বালক কি করিবে? সে আপনার নাম প্রকাশ করিয়া কতক গুলি বিজ্ঞতাভিমানী বৃদ্ধের নিকট হইতে দুই চারিটি ওজর করা ছাঁটা ছোঁটা মুরুব্বিয়ানা আদর-বাক্য শুনিতে চাহিবে, না যে নামেই হউক্ না কেন, নিজের রচিত কবিতার অজস্র অবারিত প্রশংসাধ্বনি শুনিয়া তৃপ্ত হইতে চাহিবে? যে যশোলালসার দোহাই দিয়া তুমি "রাউলি-কবিতা" গুলি বালকের লেখা বলিয়া অবিশ্বাস করিতে চাহ, সেই যশোলালসাই যে, তাহাকে আত্মনাম গোপন করিতে প্রবৃত্তি দিবে, তাহার কি ভাবিলে বল? লোকে যখন "রাউলি-কবিতা" বিষয়ে সাধ করিয়া প্রতারিত হইতে চাহিত, তখন কবি তাহাদের প্রতারণা করিতেন। ব্যারেট্ নামক এক জন লেখক ব্রিষ্টলের বিস্তারিত ইতিহাস লিখিতেছিলেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ সেই ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। এক দিন ক্যাট্কট নামক তাঁহার এক বন্ধু আনিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলেন, যে চ্যাটার্টন নামক এক বালক অনুসন্ধান করিতে করিতে অনেক গুলি ব্রিস্টলের প্রাচীন কবিতা ও বিবরণ পাইয়াছে; ব্যারেট্ চ্যাটার্টনের নিকট হইতে তাঁহার ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। বালকের ভাণ্ডার অজস্র, তুমি যে বিষয় জানিতে চাও, সেই বিষয়েই সে একটা না একটা প্রাচীন ভাষায় লিখিত প্রমাণ আনিতে পারে—ঐতিহাসিকের তাঁহাকে সন্দেহ করিবার বড় একটা কারণ ছিল না। চ্যাটার্টন তাঁহাকে অনর্গল প্রমাণ রচনা করিয়া আনিয়া দিতে লাগিলেন, তাঁহার ইতিহাস লেখাও অবাধে অগ্রসর হইতে লাগিল-তিনি গর্ব্বের সহিত লিখিলেন—"এই নগরের (ব্রিষ্টল) পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার উপযোগী প্রাচীন পুস্তকাদি আমি যেরূপে পাইয়াছি, এমন আর কাহারো ভাগ্যে কখনো ঘটে নাই।" তাহা সত্য বটে! ব্যারেট একবার "রাউলি-রচিত" "হেষ্টিংসের যুদ্ধ" নামক এক অসম্পূর্ণ কবিতা আনিবার জন্য চ্যাটার্টনকে পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করেন, চ্যাটার্টন সমস্তটা লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই; অনেক পীড়াপীড়ির পর তিনি স্বীকার করিলেন যে, সে কবিতাটি তাঁহার নিজের লেখা। সহস্র প্রমাণ পাইলেও ব্যারেট তখন বিশ্বাস করিতে চাহিবেন কেন? তাঁহার ইতিহাসের অমন সুন্দর উপকরণ গুলি এক কথায় হাতছাড়া করিতে ইচ্ছা হইবে কেন? তিনি প্রতারিত হইতে চাহিলেন, চ্যাটার্টন তাঁহাকে প্রতারণা করিলেন। চ্যাটার্টন তাঁহার অসম্পূর্ণ "হেষ্টিংসের যুদ্ধ" সম্পূর্ণ করিয়া আনিয়া দিলেন।

ক্রমশঃ

টঙ্ক পাষাণ-বিদারণ যন্ত্র।

আমরা ইতিপূর্ব্বে কিয়ৎ সংখ্যক ভারতীতে "প্রাচীন ভারতের শিল্প" ইত্যভিধেয় কতিপয় প্রস্তাব লিখিয়াছি। তাহাতে প্রাচীন কালের কাল-বিনির্ণায়ক শিল্প যন্ত্রের বিষয় বিবৃত করা হইয়াছে, দ্বি সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে এদেশে যে প্রকারান্তরের ঘড়ী ছিল এবং তদ্দ্বারা যে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে কাল নির্ণয় করা হইত, ইহা মনে হইলে মনোমধ্যে কেমন এক প্রকার কুতূহল উদিত হয়, তন্নিবন্ধন কিঞ্চিৎ আনন্দেরও সঞ্চার হয়। এতাদৃশ প্রবন্ধ পাঠে সকল পাঠকের মনোরক্তি সঞ্চার না হইতে পারে, কিন্তু পুরাতত্ত্ব-বিবিৎসু পাঠকের মনে কুতূহল সঞ্চারের সুসম্ভাবনা আছে। অদ্য এই প্রস্তাবে প্রস্তর কাটিবার যন্ত্রের যথা বলিব। ভারতবাসীদিগের মধ্যে কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা পাথর কাটিবার কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় হয় না। যে ঋগ্বেদ পৃথিবীর পুরাতন বলিলেও সম্ভবে তাহাতেও পাথরের অট্টালিকার উল্লেখ আছে। যথা—

"শতমশ্মন্ময়ীনাং পুরামিন্দ্রো ব্যাসাৎ।
দিবোদাসায় দাশুষে।

ইন্দ্রদেব দিবোদাস নামক নিজ যাজককে এক শত প্রস্তর-নির্ম্মিত পুরী দান করিয়াছিলেন।

পাথরের পুরী পাথর কাটিবার কৌশল না জানিলে হয় না। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বেদ, স্মৃতি, মহাভারতাদি ইতিহাস গ্রন্থেও লৌহস্তম্ভ ও প্রস্তর-স্তম্ভযুক্ত প্রস্তর-নির্ম্মিত অট্টালিকার ভূরি ভূরি বর্ণনা আছে। সুতরাং সহজে বলা যাইতে পারে যে, প্রস্তর কর্ত্তন ও লৌহদ্রবকরণের সুকৌশল তত্তৎ কালের বহু পূর্ব্ব হইতে এদেশের অধিবাসীরা অবগত ছিল সন্দেহ নাই *।

বৈদিক কালে কি রূপে প্রস্তর কর্ত্তন সিদ্ধ হইত তাহা আমরা জানি না। তখন পুস্তক লেখার প্রথা ছিল না বলিয়াই এখন জানিতে পারি না। যদিও তত পুরাতন পুস্তক নাই—অথবা ছিল কিন্তু আমরা পাই না—তথাপি উনবিংশ শতাধিক বৎসরের এক খানি জীর্ণ পুস্তক পাই তদ্দৃষ্টে বুঝা যায় যে, পাথর কাটিবার কৌশল এদেশে কত পূর্ব্বে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। সে পুস্তক খানির নাম "বৃহৎসংহিতা"। প্রস্তর কর্ত্তন

* কলিকাতার লৌহ কাণ্ড দেখিয়া নব্য জীবেরা সিদ্ধান্ত করেন যে, ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে এ দেশে এরূপ দুরূহ কাণ্ড কেহ কখন অবগত ছিল না। পূর্ব্বে যে এ দেশীয়রা লৌহদ্রবকরণ বিধি অবগত ছিল তাহা প্রস্তাবান্তরে সপ্রমাণ করা যাইবেক।

সম্বন্ধে বৃহৎসংহিতায় যাহা লেখা আছে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকগণ দেখুন যে, আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কিরূপ অভিজ্ঞতা ছিল।

"কৃষ্ণায়সৈঃ সুবিহিতৈর্ভবতঃ সুটঙ্কে ছেদায় ভেদায় চ প্রস্তরাণাম্।"

প্রস্তর সকলের ছেদ ও ভেদের নিমিত্ত কৃষ্ণায়স অর্থাৎ জাত্য লৌহ বা ইস্পাত দ্বারা দ্বিবিধ টঙ্ক নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

টঙ্কের লৌহ কিরূপ বিধানে প্রস্তত করিতে হয় তাহা আমাদের জানা নাই, লিখিতও নাই কিন্তু দুই প্রকার টঙ্কই আমরা দেখিয়াছি যাহা এক্ষণে সচরাচর প্রচলিত। এক প্রকার টঙ্ককে "বাঁটালি" বলে, দ্বিতীয় প্রকারকে "টাঁকি" বলে। বাঁটালি টঙ্কের দ্বারা ভেদ সিদ্ধি হয়, আর টাঁকি টঙ্কের দ্বারা ছেদ সিদ্ধি হয়। ছেদনের টঙ্কটী আর কিছুই নহে, একটী পাকা লৌহের "তার" মাত্র, ইহার দ্বারা করাতের নিয়মে কাটিতে হয় এবং ছেদ্য স্থানে মুহুর্মুহুঃ জল ও তীক্ষ্ণ বালুকা প্রক্ষেপ করিতে হয়।

বাঁটালী টঙ্কই হউক, আর টাকি টঙ্কই হউক, উভয়েরই "পান" (কর্ম্মকার প্রসিদ্ধ "পানান") উত্তম হওয়া আবশ্যক; নচেৎ ভাঙ্গিয়া বা কুণ্ঠিত হইয়া যায়। এক্ষণকার কর্ম্মকারেরা কিরূপ প্রকারে টঙ্কাস্ত্রের "পান" দিয়া থাকেন জানি না, পরন্তু শাস্ত্র অনুসারে পূর্ব্বকালের পান এইরূপঃ—

"আর্কং পয়ো হুড়ুবিষাণমসীসমেতং
পারাবতাখুশকৃতা চ যুতং প্রলেপঃ।
টঙ্কস্য তৈলমথিতস্য ততোঽস্য পানং
পশ্চাচ্ছিতস্য ন শিলাসু ভবেদ্বিঘাতঃ।"

অর্কক্ষীর (আকন্দ ফুলের নির্যাস,) হুড়ুশৃঙ্গের মসী অর্থাৎ কএলা, পায়রার বিষ্ঠা ও ইন্দুরের বিষ্ঠা একত্রিত করিয়া টঙ্কের সর্ব্বাঙ্গে প্রলেপ দিবেক। প্রলেপ দিবার পূর্ব্বে উত্তম রূপে টঙ্কের সর্ব্বাবয়বে তৈল মর্দ্দন করিবেক; পশ্চাৎ কথিত প্রকারে প্রলিপ্ত করিয়া পান দিবেক। (অস্ত্রাদিতে কোন বস্তু প্রলিপ্ত করিয়া পোড়ানকে কর্ম্মকারেরা "পান" দেওয়া বলে)। এই প্রকারে পান দিয়া পশ্চাৎ শাণ দিবেক। এই শাণিত টঙ্ক শিলাতে বিহত হইবে না।

প্রকারান্তর,—

"ক্ষারে কদল্যা মথিতে সতক্রে
দিনোষিতে পায়িতমায়সং যৎ।
সম্যক্ ছিতং চ শ্মনি নৈতি ভঙ্গম্
ন চান্য লোহেষ্বপি তস্য কৌণ্ঠ্যম্।"

কদলীক্ষার (ত্বক্ কি পত্র দগ্ধ করিয়া তজ্জাৎপন্ন ক্ষার) মর্দ্দন করিয়া এক দিন রাখিবেক। পর দিন তাহাতে "পান" দিয়া শাণ দিবেক। এইরূপ পানান লৌহ কিছুতেই ভাঙ্গে না এবং অন্য লৌহে ও কুণ্ঠিত হয় না। অর্থাৎ এতদ্দ্বারা লৌহও কর্ত্তিত হয়। এই রূপ টঙ্ক অথবা পাষাণ বিদারণ যন্ত্রের সৃষ্টি এদেশে কোন্ সময়ে হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা যায় না। আমরা যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম ইহা সম্বৎ অব্দের সৃষ্টি কর্ত্তার সমকালে-উৎপন্ন বৃহৎসংহিতা নামক গ্রন্থ হইতে

উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে পাষাণ শিল্পের কত রূপ অঙ্গ আবির্ভূত হইয়াছিল। আবার এমন কঠিন প্রস্তর আছে যে সে সকল প্রস্তর টঙ্ক যন্ত্রেরও অভেদ্য। যে সকল শিলা সহজে ছেদ ভেদ করা যায় না—সে সকল শিলার ছেদ ভেদ করিবার জন্য উপায়ান্তরও আবিষ্কৃত হইয়া ছিল। কি কি উপায়ে কঠিন প্রস্তরের ছেদ ভেদ সাধিত হয়—তাহা নিয়ে প্রচারিত করা গেল।

"ভেদং যদা নৈতি শিলা তদানীং
পালাশকাষ্ঠৈঃ সহ তিন্দুকানাম্।
প্রজ্বালয়িত্বানলমগ্নিবর্ণা
সুধাম্বুসিক্তা প্রবিদারমেতি *।"

যখন দেখা গেল যে শিলাস্তূপ কিছুতেই ভেদ করা গেল না, তখন এবম্বিধ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবেক। যথা—পলাশ ও তিন্দুক কাষ্ঠ একত্র করিয়া ভেদ্য স্থানে অগ্নি জ্বালিবেক। ভেদ্য স্থানটী যখন অগ্নিবর্ণ হইবেক তখন তাহাতে চূণের জল সিঞ্চন করিবেক। কিয়ৎপরে ভেদ্য স্থানটী আপনিই বিদীর্ণ হইয়া যাইবেক।

প্রকারান্তর।

"তোয়ং শৃতং মোক্ষকভস্মনা বা
যৎ সপ্তকৃত্বঃ পরিষেবনং তৎ।
কার্য্যং শরক্ষারযুতং শিলায়াঃ
প্রস্ফোটনং বহ্নি বিতাপিতায়াঃ।"

ভেদনীয় শিলাতে অগ্রে বহ্নির উত্তাপ লাগাইবেক। পশ্চাৎ সেই তপ্ত অবস্থায় তাহাতে "মোক্ষক" নামক দ্রব্যের ভস্ম আর উষ্ণ জল সেক করিবেক। পশ্চাৎ "শর" নামক তৃণের ক্ষার প্রক্ষেপ করিবেক। সপ্তবার এইরূপ ক্রিয়া অবলম্বন করিলেই স্তূপপ্রমাণ প্রস্তরও স্ফুটিত হইয়া যাইবেক।

তৃতীয় প্রকার।

"তক্রকাঞ্জিকসুরা সকুলত্থা
যোজিতানি বদরাণি চ তস্মিন্।
সপ্তরাত্রমুষিতান্যভিতপ্তাং
দারয়ন্তি হি শিলাং পরিষেকৈঃ।"

তক্র, কাঁজি, সুরা, কুলত্থ (কুত্তীকলায়), ও বদর (কুল) একত্র করিয়া প্রস্তরের উপর তাহার জল সপ্তাহ পর্য্যন্ত সেক করিয়া পশ্চাৎ উত্তাপ লাগাইবামাত্র প্রস্তর বিদীর্ণ হইয়া থাকে।

শিলা বিদারণের এইরূপ অনেক প্রক্রিয়া আমাদের পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। কাষ্ঠের তক্ষণ ও ছেদন করিবার ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়াও অদ্যাপি লিপিবদ্ধ অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। এক সময়ে যে এ দেশে বিলক্ষণ শিল্প চর্চার সূত্রপাত হইয়াছিল—তাহার নিদর্শনের স্বরূপ এই প্রস্তাবে যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করা গেল মাত্র।

শ্রী কালীবর বেদান্তবাগীশ।

* এই সকল প্রক্রিয়া কেবল উৎখাত ও ভেদ করণের নিমিত্ত অবধারিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখিয়া বিদীর্ণ করিবার উপায় স্বতন্ত্র।

ছিন্নমুকুল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—অঙ্কুর-বিকাশ।

প্রাতঃকালের মন্দমন্দ সমীরণ ভরে কম্পিত হইতে হইতে একখানি সুদৃশ্য বোট গঙ্গা-বক্ষ তরঙ্গিত করিয়া চলিতে ছিল। বোটে দুইটি কামরা, একটি কামরায় একখানি ক্ষুদ্র পালঙ্কে একটি পীড়িতা রমণী শয়ান, পার্শ্বে দুইটি যুবা দুইখানি চৌকিতে বসিয়া, আর নীচে পদপার্শ্বে এক জন দাসী। একটি যুবাকে অপর যুবা জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, আজ কেমন দেখিতেছেন? বাঁচিবার আশা কি আছে?" চিকিৎসক বলিলেন 'এদুই দিন হইতে আজ কিছু ভাল, তবে আরো দুইচারি দিন না গেলে ঠিক বলিতে পারি না'

দিন যাইতে লাগিল, রমণীর নিকট যুবা প্রায় সর্ব্বদাই আছেন, আবশ্যক না হইলেও ক্ষণে ক্ষণে নাড়ী টিপিয়া দেখিতেছেন, ক্ষণে ক্ষণে কপালের উষ্ণতা অনুভব করিতেছেন এবং 'রমণী এখন কেমন আছেন,' মাঝে মাঝে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া চিকিৎসককে বিরক্ত করিয়া তুলিতেছেন, কিন্তু চিকিৎসকের সাহস বাক্যে তাঁহার কিছুতেই প্রত্যয় জন্মিতেছে না। যখন অন্য কোন কাজ নাই, তখন যুবা রমণীর সেই অজ্ঞান সুষুপ্ত মুখ পানে চাহিয়াই আছেন, তাহার সেই অর্দ্ধনিমীলিত পদ্ম-কোরক-সদৃশ নয়নযুগলের পানে চাহিয়াই আছেন, পলকহীন স্থির দৃষ্টিতে বিষণ্ণ ভাবে চাহিয়াই আছেন—তাহা দেখিয়া তাঁহার কি তৃপ্তি হইতেছে তিনিই জানেন।

এইরূপে তিন চারি দিন অতীত হইল, রমণীর পীড়া ক্রমে উপশম হইয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে তিন চারি দিনে একটু একটু করিয়া তাহার চৈতন্য লাভ হইল। তিনি যখন মানুষ চিনিতে পারিলেন তখন এই অপরিচিত যুবাদিগের মধ্যে আপনাকে দেখিয়া যেন বিস্মিত হইলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে কনকের সমস্ত ঘটনা অল্পে অল্পে স্মরণ হইল। সুশীলার মৃত্যু ও সেই দিন তাঁহার নদীতে পতন ক্রমে মনে পড়িল। তাহা ছাড়া যদিও আর কিছুই মনে করিতে পারিলেন না তবুও কনক বুঝিলেন তাহার পর ইহাঁরা তাহাকে বাঁচাইয়াছেন। কনক ভাবিল ইহাঁরা কে? তাহাকে বাঁচাইল কেন? মরিলেই সব দুঃখ ফুরাইয়া যাইত, আবার তাহার যন্ত্রণা ভোগের জন্য ইহারা কেন বাঁচাইল? ভাবিতে ভাবিতে যুবার করুণ দৃষ্টিতে কনকের বিষণ্ণ দৃষ্টি সংলগ্ন হইল, অমনি আপনা আপনি কনকের চক্ষু নত হইয়া পড়িল, সেই পাংশুবর্ণ মুখ-মণ্ডলও ঈষৎ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। যুবা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ কি

আপনি ভাল আছেন?” চিকিৎসক তখন অপর কক্ষে ছিলেন। সহসা এই কক্ষে আসিয়া বলিলেন “উহাকে এখনো কথা কহাইও না, বড় দুর্ব্বল” কিন্তু যুবার সেই সকরুণ সোৎসুক জিজ্ঞাসায় কনকের নতচক্ষু আবার উন্নত হইল,কিছু আশ্চর্য্য ও সন্দিগ্ধ চিত্তে তিনি যুবার পানে আবার চাহিলেন। কনকের জন্য সুশীলা ছাড়া কেহ কখনো উৎসুক হয় নাই, আজ এই অপরিচিত যুবা তাহার জন্য কাতর হইবেন, ইহা যেন কনকের স্বপ্নবৎ বোধ হইল।

ক্রমে এক মাসের মধ্যে বালিকা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। তখন আর চিকিৎসকের আবশ্যক না থাকায় চিকিৎসক চলিয়া গেলেন। বালিকার পরিচয় পাইয়া তখন বোট লইয়া যুবা এলাহাবাদের দিকে আসিতে লাগিলেন। এই এক মাসে আস্তে আস্তে বালিকা, যুবকের সহিত পরিচিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার লজ্জা ভাঙ্গিতে লাগিল। প্রথমে একটি কথা কহিতেও তাহার লজ্জা হইত, ক্রমে অল্পে অল্পে একটি দুইটী করিয়া তাহার কথা ফুটিল। তখন যুবার জিজ্ঞাসায় কনক আপন পরিচয় সমস্তই দিল। পরিচয় না জানিলেই বা যুবা কি করিয়া তাহার আত্মীয় স্বজনের কাছে তাহাকে দিবেন? একবার লজ্জা ভাঙ্গিয়া গেলে বালিকা একটি একটি করিয়া তখন যুবার নিকট কত গল্পই করিল। একদিন কনকের শয্যার নিকট বসিয়া যুবা একটি কথার পর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বালিকার গল্প শুনিতেছিলেন। কথার মধ্যে যুবা একবার বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “আচ্ছা, তোমার পিতা যখন মরেন তখন তোমার বয়স কত? তখনকার কথা তোমার কি মনে আছে?” কনক বলিল “কিছু কিছু মনে পড়ে বই কি। বয়স তখন আর কত হবে, এই চার পাঁচ বৎসর ”

যু। “ উঃ তোমার তত ছোট বেলার কথা মনে আছে—আশ্চর্য্য তো? ”

ক। “ আমার তো আর তখনকার দিনগুলি বড় সুখে যায় নাই, অন্য ছেলেদের মত আদরে দিন কাটাইতে পারিলে আর অত ছোট বেলার কথা মনে থাকিত না। ” যুবা ব্যথিত হইয়া বলিলেন “কনক, তোমাব ঐ কথাটি শুনিয়া আমার বড় কষ্ট হইল? তুমি কি ছেলেবেলায় কাহারো কাছে একদিনও আদর পাও নাই? ”

ক। “কই মনে তো পড়ে না—তাহা হইলে মনে থাকিত” এই কথা শুনিবামাত্র যুবার চক্ষে যেন আপনা আপনি জল আসিল এবং তিনি মনে মনে করিতে লাগিলেন “এই হৃদয়ে যত দিন শোণিত-ধারা বহিবে তত দিন শত সহস্র জনক জননীর আদর আমি তোমাকে দিতে পারি। ” কনক তাঁহার অশ্রু পাত দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইল। কনকের বাল্য দুঃখে যুবা এতদূর দুঃখিত হইলেন যে তাঁহার চক্ষে জল পড়িল! কই কনকের দুঃখেতো কেহ কখনো কাঁদে নাই! কনক বিস্ময়-পূর্ণ দৃষ্টিতে যুবাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। যুবা তাহার এই সন্দেহের

ভাব যেন কিছু বুঝিতে পারিয়া তাহাতে মনে মনে দুঃখিত হইলেন। কিন্তু যুবার পানে চাহিয়া কনক যখন তাঁহার সেই স্নেহপূর্ণ মুখকান্তি দেখিল, অবিশ্বাস করিয়াছিল বলিয়া তাহার সেই মমতাময় চক্ষের নীরব অথচ করুণ তিরস্কার দেখিতে পাইল, তখন আর কনকের সন্দেহ রহিল না, তাঁহার স্নেহে তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। এই বিশ্বাসই কনকের কাল হইল, এই স্নেহের পরিবর্ত্তে অজ্ঞাত ভাবে বালিকা আপন হৃদয় বিনিময় করিয়া ফেলিল, যে কাহারো নিকট কখনও ভাল-বাসা পায় নাই, সে যে প্রথম নিঃস্বার্থ প্রেমের হস্তে আজ হৃদয় দান করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? যুবা ব্যাকুল ভাবে চক্ষু মুছিয়া আবার বলিলেন "কনক, ভাল করিয়া মনে করে দেখ দেখি কখনই কি কেহ তোমাকে বাল্য কালে আদর করে নাই?"

ক। "কই, কখনইতো আদর পাইয়াছি বলে মনে পড়ে না। সেই ছেলেবেলা একটি অপরিচিত যুবা আমার প্রতি যে দয়া দেখাইয়াছিলেন, সেটি পর্য্যন্ত আমার এখনো মনে আছে, আর কেহ আদর করিলে কি ভুলিতাম।"

যু। "কিরূপ দয়া, কনক?

ক। "সেরূপ দয়াও আমি আগে আর কখনো পাই নাই। তার আগে আমার পক্ষ হইয়া কেহ একটি কথাও বলে নাই। সেই জন্য সে দিনটি এখনো আমার বিশেষ রূপে মনে আছে। তার পর আমার মাসী-মার সহিত এলাহাবাদে আসিলে তিনি আমাকে আদর যত্ন করিতেন। কিন্তু ছেলে বেলার সেই অপরিচিত যুবার আদরটি কেমন আমার এখনো মনে পড়ে"— বালিকা এই বলিয়া, সেই ছেলেবেলা এক দিন প্রমোদ যখন তাহাকে মারিতে গিয়াছিল একটি যুবা যে হঠাৎ আসিয়া তাহাকে বাধা দিয়াছিলেন সেই গল্পটি করিল। সেই ক্ষুদ্র দয়াটি বালিকার হৃদয়ে এখনো গাঁথা রহিয়াছে দেখিয়া যুবা আশ্চর্য্য হইলেন। যুবা সে কথা আর না উঠাইয়া বলিলেন "কনক, তুমি বাঁচিয়াছ এই সং-বাদ তোমার দাদাকে লিখিয়াছি তা জান! প্রমোদের না জানি কতই আহ্লাদ হইবে।" কনক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল "তা কি হইবে!

যু। "ছিঃ কনক, তোমার কেন ওরূপ সন্দেহ হয়" এই তিরস্কার বাক্যে কনকের মুখটি যেন আরো ম্লান হইয়া পড়িল, যুবা বলিলেন "কনক, বাড়ী যাইবে, আবার তোমার সেই যতনের ভাইটিকে দেখিতে পাইবে, আহা তোমার কতদূর আহ্লাদ হইতেছে বল দেখি।" কনক একটু থামিয়া থামিয়া বলিল "হাঁ আহ্লাদ হয়েছে বই কি"

যু। "তোমার সেই স্নেহের রাজ্যে গিয়া কি আর কখনো এখানকার এই অপ-রিচিত পরের কথা মনে পড়িবে?" কনক এ কথার কিছুই উত্তর না করিয়া ভাবগর্ভ শূন্য দৃষ্টিতে যুবার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া যুবার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল,

তিনি তাহা ঢাকিতে সেই কক্ষ হইতে, উঠিয়া বোটের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—মিলন।

এই রূপে বোটের দিন গুলি কাটিতে লাগিল। বালিকার লজ্জা ক্রমে আরো ভাঙ্গিয়া আসিল। যুবার নিকট আস্তে আস্তে সে তাহার জীবনের কত গল্প করিত, কতই অর্থহীন অমৃতময় আবল-তাবল বকিত। কনক কখনো কাহারো নিকট জীবনে ওরূপ করিয়া গল্প করিতে পায় নাই, তাহার গল্প ওরূপ আগ্রহ সহকারে কেহই শুনে নাই। যদি কখনো একটি মনের কথা ছেলেবেলা সে প্রমোদকে শুনাইতে যাইত প্রমোদ বিরক্তির সহিত 'কাজ আছে' বলিয়া উঠিয়া যাইত, সুতরাং এখন যুবার নিকট এই রূপ মনের কথা খুলিয়া সে এক প্রকার নূতন আমোদ পাইত, এরূপ আমোদ সে জীবনে কখনো পায় নাই। যুবাও বালিকার সেই সকল অসংলগ্ন এলোথেলো অথচ মর্ম্ম-গাঁথুনীতে গ্রথিত কথাগুলি কতই আগ্রহ সহকারে শুনিতেন। সেই অর্থশূন্য কথায় তিনি যত অর্থ পাইতেন—তাহা যত সার কথা বলিয়া তাঁহার মনে হইত, জীবনে ওরূপ সার কথা তিনি আর কখনো শুনেন নাই। কত ঔৎসুক্যের সহিত তিনি তাহার মুখপানে চাহিয়া তাহার সেই কথা গুলি শুনিতেন বলা যায় না। জীবনে কিছু শুনিতে তাঁহার ওরূপ মিষ্ট লাগে নাই, কিছু দেখিয়া তাঁহার ওরূপ অতৃপ্তিময় তৃপ্তি জন্মায় নাই। গল্প করিতে করিতে যদি কোন কাজে যুবা উঠিয়া যাইতেন, অমনি বালিকার হৃদয়-মধ্যে মহা বিপ্লব উপস্থিত হইত, সমস্ত স্ফূর্ত্তি চলিয়া যাইত, কতক্ষণে তিনি ফিরিয়া আসিবেন, কতক্ষণে সে তাহার গল্পটি শেষ করিবে এই ভাবনায় অস্থির হইত। যুবা ফিরিয়া আসিলে তবে সে নিশ্চিন্ত হইত। তিনি ফিরিয়া আসিলে তখনই অমনি কথা কহিতে পারিত না কিন্তু নীরব নয়নে তাঁহাকে কত বকিত, কেন চলিয়া গেলেন বলিয়া কত মৃদু তিরস্কার করিত, মনে মনে বলিত "না, আমার মত আমার গল্প শুনিতে অথবা আমাকে দেখিতে তোমার কখনই ভাল লাগে না। কিন্তু তাহলে আমিই বা কেন তোমাকে শোনাবার জন্য এত ব্যাকুল হই" যুবা বুঝিয়া একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া একটু আদরের হাসি হাসিয়া বলিতেন "নিতান্ত দরকার ছিল তাই গিয়াছিলাম, দেখ দেখি কায অসমাপ্ত রেখেই আবার কত শীঘ্র এসেছি" অমনি বালিকা সকল ভুলিয়া যাইত, আবার গল্প করিতে আরম্ভ করিত, কিন্তু একটি গল্পও তাহার শেষ হইত না, একটি গল্পও যেন তাহার ভাল করিয়া বলা হইত না, সে সেই একটি গল্প কতবারই করিত তাহার ঠিক নাই।

কিন্তু তাঁহাদের সেই সুখ ফুরাইয়া আসিল। কনককে যুবা তাহার ভ্রাতার হস্তে সমর্পণ করিবার ইচ্ছায় বোট লইয়া এলাহাবাদের দিকেই আসিতেছিলেন, ক্রমে তাঁহারা এলাহাবাদে আসিয়া পঁহুছিলেন। তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা পাইয়া প্রমোদ

মহা আহ্লাদের সহিত কনককে লইবার জন্য যে ঘাটে বোট লাগিয়াছিল সেই ঘাটেই আসিলেন। কতদিন কনকের সহিত দেখা হয় নাই, আর যে কখনো দেখা হইবে তাহারো আশা ছিল না, এখন মনে মনে কনকের রক্ষাকর্ত্তাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে নদীতীরে আসিতে লাগিলেন। দূরে তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া তীরস্থ একখানি বোট হইতে একটি যুবা তীরে লাফাইয়া পড়িলেন। প্রমোদ তাহাকেই কনকের জীবনদাতা ভাবিয়া আলিঙ্গন করিবার অভিপ্রায়ে সোৎসুক চিত্তে তীরে আসিয়া পঁহুছিলেন। কিন্তু নিকটে আসিয়াই সহসা প্রমোদ একটু পিছাইয়া দাঁড়াইলেন, সহসা তাঁহার মূর্ত্তি কেমন ভিন্নভাব ধারণ করিল। প্রমোদ দেখিলেন তিনি যাহাকে আন্তরিক ঘৃণা করেন, তিনি যাহাকে শত্রু বলিয়া জানেন সেই হিরণই কনকের উদ্ধারকর্ত্তা। কি দৈব! হিরণের নিকট হইতে প্রমোদের আজ এমন উপকার গ্রহণ করিতে হইল! কনকের মৃত্যু ইহা অপেক্ষা যে ভাল ছিল!

হিরণকুমার প্রমোদের ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন, তাহাতে কিছু বিস্মিত হইলেন, কিন্তু ইহার কোন কারণই খুঁজিয়া পাইলেন না। প্রথম মনোবেগ কিছু শান্ত হইলে প্রমোদ ভাবিলেন "হিরণকুমার হাজার শত্রু হইলেও কনকের প্রাণ বাঁচাইয়াছে" ইহা ভাবিয়া প্রমোদ মনের অসন্তুষ্টি-ভাব দমন করিতে চেষ্টা করিয়া হিরণকুমারকে নিতান্ত কষ্টে-স্বস্টে সাধুবাদ দিয়া কনককে গৃহে লইয়া আসিলেন। যাহাই হোক প্রমোদের ব্যবহারে হিরণ সন্তুষ্ট হইলেন না।

কনক কতদিন পরে আজ প্রমোদকে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইল। দুই মাসের পর বাড়ী আসিয়া কনক অনেক পরিবর্ত্তন দেখিল। দেখিল তাহার ভ্রাতার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহার একটি সঙ্গিনী জুটিয়াছে। সুশীলার মৃত্যুর পর প্রমোদ সমস্ত বিভবের অধিপতি হইয়া নববধূ লইয়া এখন এলাহাবাদেই আছেন। প্রমোদ কলিকাতায় আর পড়েন না, স্ত্রী এবং বিদ্যা এই দুই রত্নের আদর এক সময়ে হয় না. প্রমোদের এখন পড়া সাঙ্গ হইয়াছিল। সুশীলার মৃত্যুর কিছু দিন পরেই প্রমোদের বিবাহ হইয়াছিল। সুশীলার মৃত্যু এবং কনকের জলমগ্ন-সংবাদ পরদিন তাড়িত-তারে পাইবামাত্র প্রমোদ কলিকাতা ছাড়িয়া তাহার পরদিন বাড়ী আসেন। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কনকের দেহ পর্য্যন্ত খুজিয়া পাইলেন না। এদিকে দয়ানন্দ কন্যা লইয়া এখানে আসিয়া কন্যার বিবাহ দিয়াই নিরুদ্দেশ হইলেন। সুশীলার মৃত্যুর এক মাস পরেই নীরজার বিবাহ হইল। কনকের মৃত্যু শুনিয়া যামিনীনাথ অত্যন্ত হতাশ হইলেন—যে লোভে নীরজাকে ছাড়িলেন তাঁহার সে লোভও ব্যর্থ হইল, অতি লোভে তাঁতিকুল বৈষ্ণবকুল উভয় কুলই তিনি হারাইলেন।

বাড়ী আসিয়া কনক নববধূ নীরজার সহিত সাক্ষাৎ করিল, অমন সুন্দরী বধূ

দেখিয়াও কনকের মনে হইল "দাদার সমযোগ্য বৌ হয় নাই"

নীরজা এখানে আসিয়া অল্প দিনের মধ্যেই কুলবধূর মত হইয়া পড়িয়াছে, এখন আর সে আগেকার মত আরণ্য বালিকা নাই, এখন নীরজা প্রমোদের কাছে থাকিয়া থাকিয়া সহরের অনেক হাব ভাব কথা বার্ত্তা শিখিয়া ফেলিয়াছে। দিন কতকের জন্য তাহার মনে যে বিষণ্ণ ভাব আসিয়াছিল তাহা গিয়া নীরজার হৃদয় এখন হর্ষ-উচ্ছ্বাসে পূর্ণ। মনের মত লোক পাইয়া এখন আর সে কাকাতুয়ার সহিত কথা কহে না, ফুল লইয়া খেলেনা, এখন তার খেলা আমোদ গল্প সকলি মানুষের সহিত। এখন লীলাময়ী যমুনার উপর, কূলস্থ বটবৃক্ষ পতনের মত নীরজার আরণ্য তরল স্বভাবে সাংসারিক ভাব আসিয়া পড়িয়াছে—এখন বনের পক্ষী পিঁজারায় আবদ্ধ হইয়া লোক-রঞ্জন কথা কহিতে শিখিয়াছে, এখন বনবালা নীরজা আবার গৃহস্থ নীরজা হইয়াছে। ক্রমে দিনে দিনে নীরজার সহিত কনকের বন্ধুতা জন্মিতে লাগিল।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ—মনের কথা।

অন্তঃপুরে প্রমোদের শয়ন-কক্ষে বসিয়া, কনক নীরজার চুল বাঁধিয়া দিতেছিল। এ বড় সাধের চুল বাঁধা, প্রমোদের মনে ধরাণ চাই, কিন্তু প্রমোদের মনে ধরিবে কি, না ধরিবে সে তো পরের কথা, কনকের এখন মনে ধরিলে হয়। কতবার যে কনক চুল খুলিয়া বাঁধিল তাহার ঠিক নাই, তথাপি কনকের মনে ধরিল না, বাঁধাও শেষ হইল না, বেচারী নীরজা আর সে চুল বাঁধা হইতে ত্রাণও পাইল না। এ চুল বাঁধার অন্ত নাই দেখিয়া নীরজা বলিল "নে ভাই, তোর কি আর হবে না নাকি? রাত হয়ে গেল যে।" কনক তাহার হেলিত মস্তক সমান করিয়া লইয়া বলিল "তুই ভাই সেই অবধি যে নড়ছিস তা কি করে হবে! তা নইলে এতক্ষণ হয়ে যেত। কতবার বাঁকা হয়ে গেল বলে যে খুলতে হোলো? তুই ভাই বনে থেকে থেকে বনের হরিণের মত চঞ্চল হয়ে পোড়েছিস"

নী। "আহা ভাই বনের হরিণ হওয়ায় যে কি সুখ তা ভাই তুই জানবি কি করে?

ক। "তুই সেই জন্যে বুঝি সাধ করে ব্যাধের হাতে ধরা দিলি"

নী। "আমি কি ভাই আর ইচ্ছা করে ধরা দিলেম?"

ক। "আমার দাদা তো পাখী শীকারে গেছলেন, তা তুই ধরা দিলি কেন।"

নী। "তা ভাই সাধ করে কি ধরা দিলেম?

ধরা পড়লেম ফাঁদে,
নইলে কোথায় হরিণবালা ব্যাধের লাগি
কাঁদে?"

তা যাক, এখন তোর পায়ে পড়ি ভাই

শীঘ্র বেঁধে নে, হাজার বাঁকা হলেও এবার খুলিস নে ভাই"

ক। "কেন, এর মধ্যেই তোর সাধ ফুরুলো? এই যে বাঁধবার সময় বল্লি 'সে দিনকার বাঁধাটা উনি প্রশংসা করেছেন সেই রকম করে বেঁধে দেও"

নী। "তা ভাই কি করব? আমার মাথা ব্যথা হয়ে গেছে আর পারিনে ভাই। তুই এতক্ষণে বাঁধতে পারলিনি আমি কি করব" কনক সোহাগ ভরে চুল বাঁধা রাখিয়া একটু অভিমান করিয়া বলিল "তবে এই রইল, আমি আর বাঁধব না, আমার মনের মত বাঁধতে দিবিনে তবে তোর যেমন ক'রে ইচ্ছা বাঁধগে"

নী। "রাগ! আচ্ছা আর বাপু বলব না, তুই যত ইচ্ছা দেরি কর সেই কাল সকাল বেলা উঠিস"

কনক। "অমনি আর কি! তোর ঐ এক কথায় বুঝি আমার রাগ যাবে! আজ তোকে পায়ে ধরে সাধাব তবে হবে। তুই যে বড় কথায় কথায় অভিমান করে দাদাকে সাধাস, আমার বুঝি তাতে রাগ হয় না? আমি আজ তার শোধ তুলব?'

নীরজা। "আচ্ছা তাই সই, কিন্তু ভাই সাধতে গেলেই গান গাইতে হয়, একটা সাধবার গান তুই আমাকে শিখিয়ে দে, আমি ভাই বুনোমানুষ ওসব গানের তো আমার বিদ্যে নেই" কনক এই কথায় ঠাট্টা ছাড়িয়া বলিল "ভাই নীরজা, আমার তো অদৃষ্টে কখনো অভিমানের পর আদর ঘটেনি, চিরকাল অভিমান করে মনে মনেই কষ্ট সহ্য করিয়া আসিতেছি। ভাই কষ্টের গান ছাড়া তো আর আমি কিছুই শিখিনি, যে তোকে শেখাব।" কনক এই বলিয়া যেন কিছু বিষণ্ণ হইল—পূর্ব্বের আমোদের ভাব ছাড়িয়া কনক আপন মনে গুন গুন করিয়া গাহিতে লাগিল—

"কে আছে রে অভাগিনী, আমার মতন,
জানিনে কখনো কি বা সোহাগ যতন।
জনম দুখিনী হায়, আপনারি ভাবি যায়,
ছুঁতে যাই, অমনি সে হয় অদর্শন—
পরিমলে মাখামাখি, একটি গোলাপ দেখি
আপনা ভুলিয়ে আহা মোহময় হরষে—
তুলিতে গিয়েছি যেই, প্রফুল্ল কুসুম সেই
অমনি ঝরিয়ে গেছে এ হাতের পরশে।
একটি পুষেছি পাখী যদি ভাল বাসিয়ে,
দুদিনে খাঁচাটি ভেঙ্গে গিয়েছে সে পালিয়ে,
কাঁদিয়ে জনম গেল, কেহ তো বাসেনি ভাল,
অনন্ত এ অশ্রুধারা করেনি কেহ মোচন।"

গানটি অনেক ক্ষণ শুনিয়া শুনিয়া নীরজা বলিল, "এই এতক্ষণ ভাই তুই কেমন ছিলি, কেন আমি মরিতে গানের কথা পাড়িলাম! তোর এই রকম ভাব দেখলে আমার বড় ভয় হয়, জানি যে তাহলে সমস্ত দিনটিই তোর এই ভাবে কাটিবে'

ক। "তা কাটলোই বা? তাহাতে কার কি এল গেল?'

নী। "তা বইকি? আমার সঙ্গে যে তাহলে সমস্ত দিন কথা কইবিনে? আমার যে একলাটি চুপকরে থেকে গুমরে মরিতে হবে।'

ক। "তা আমি নাইবা কথা কইলেম,

তুই দাদার গল্প করিস,আমি শুনিব এখন, তাহলেই তো তোর হোল ?'

নী। "সুধু ওরূপ করে শুনিয়ে কি তেমন মজা হয়"

ক। "তবে আবার কি চাই"

নী। "গল্প করিতে করিতে হেসে না শুনিলে আমি তোকে বলিব না"

ক। "তুই দেখিস দেখি, আমি তাই হেসে শুনব। তোর সুখের কথায় কি ভাই আমার আমোদ হয় না ?

নী। "আচ্ছা তা যেন তোর হয়, কিন্তু তুই ভাই মাঝে মাঝে অমন বিষণ্ন হোস কেন ?"

ক। "কি করে তা বলব ?"

নী। "আপনার মনের কথা আর আপনি বলতে পারিবি নি। তবে কি তোর দাদাকে ও কথা জিজ্ঞাসা করিব নাকি ?"

ক। "তা বইকি ? আচ্ছা তুই বল দেখি সে দিন কাঁদলি কেন ?"

ন। "সত্যি কথা বলব ? তোর দাদার উপর অভিমান হয়েছিল ?"

ক। "কেন গো"

নীরজা একটু হাসিয়া বলিল "ভাই ও কথা জিজ্ঞাসা করিসনে। অভিমানের কারণ কিছুই নেই, সুধু সুধু"

ক। "আমারো ভাই তবে এরূপ ভাবের কারণ কিছুই নাই, তোকে কি বলব !"

নী। "দূর ভাই তুই দেখছি ছাড়বিনে। কিন্তু সে পাগলামীর কথা বলতে বড় লজ্জা করে, নিতান্ত শুনবি ?'

ক। "যদি বলিস"

নী। "দেখ ভাই আমি নতুন তোর কাছে পান সাজতে শিখে, নিজে একটি পান সেজে বাইরে তাঁকে পাঠিয়ে দিই, রাত্রে দেখা হলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেম "খেয়েছিলে" তিনি বলিলেন, সেখানে একজন ভদ্রলোক ছিল, তাই তখন আপনি না খেয়ে তাঁকে দিতে হয়েছিল, এতেই ভাই আমার বড় দুঃখ হোল।"

তাহার অভিমানের কারণ শুনিয়া কনক একটু হাসিয়া বলিল "তোর ভাই এত অল্পে অভিমান হয় ?" সলাজে নীরজা বলিল "আমিতো এখন তোকে সব খুলে বল্লেম—এবার তুই বল দেখি তোর বিষণ্ন ভাবের কারণ কি ?"

ক। "কেন ভাই, তোর যখন এত অল্পে দাদার উপর অভিমান হয়, আমি দাদাকে এত ভালবাসি মনে কর-না যখন ভাবি তিনি আমাকে ভাল বাসেন না, তখন দুঃখ কি হয় না ?" এই কথা শুনিয়া নীরজার অতিশয় আহ্লাদ হইল। প্রমোদকে কেহ ভাল বাসিলে সে অত্যন্ত খুসী হইত, প্রমোদকে যে ভাল বাসিত নীরজাও তাহাকে ভাল বাসিত। যদি কেহ নীরজার প্রিয় পাত্র হইতে ইচ্ছা করিত তাহা হইলে প্রমোদের প্রশংসা করাই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার একটি সহজ ও অকাট্য উপায় ছিল। নীরজা কনকের কথায় আহ্লাদের হাসি হাসিয়া বলিল "আচ্ছা ভাই সত্যি তুই তোর দাদাকে খুব ভালবাসিস ? তোর দাদাও তোকে ভাল বাসেন, আর দুঃখ করতে হবে না ?"

ক। "তোমার আর আমাকে প্রবোধ দিতে হবে না ?"

নী। "আচ্ছা তা দিচ্ছিনে কিন্তু বল দেখি দাদাকে সত্যি খুব ভাল বাসিস।"

ক। "কেন তাহাতে তোর রাগ হয় নাকি! সেজন্য যেন আবার দাদার উপর অভিমান করে বসিসনে। হাঁ খুব ভালবাসি, তোর চেয়েও ভালবাসি" এই কথায় আ-হ্লাদে ঢল ঢল ভাবে নীরজা বলিল "তোর দাদাটি যে মিষ্টি তা আর ভাল বাসবিনে। কিন্তু ভাই দেখিস আমাকে ফাঁকি দিসনে ?"

ক। "নে ভাই তোর ঐ এক পচা পুরাণ. জঘন্য ঠাট্টা রেখে দে, আর বুঝি ঠাট্টা জানিসনে।"

নী। "আমি ভাই ঐ ঠাট্টাটি নতুন যে শিখেছি,তা ভাই তোর আজ এখন মন ভাল নেই. এখন যে কি ঠাট্টা তোর ভাল লাগবে, তাতো জানিনে। তোর দাদার মত করে ঠাট্টা করব ?" বলিয়া নীরজা কনকের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহার চিবুক ধরিয়া গাহিল—

আয়লো সরলে প্রাণের প্রতিমা,
আয়লো হৃদয়ে রাখি,
কতদিন হতে রয়েছি আশায়
বলিব কি বল সখি।
আয় আয় ভাই তেমনি করিয়ে
গানালো মধুর গান,
কি মোহিনীগুণ আছে ঐ গানে
পাই যেন নব প্রাণ,
পেয়েছি তোরেলো হাসিব এখনি
ভুলিব প্রাণের জ্বালা,
ও হাসি হেরিলে আঁধার এ হৃদে
জোছনা ভাতিবে বালা,
সরে আয় সখি, ভাল করে দেখি,
আজি এ কেমন বেশ,
নয়ন কমল, জলে ঢল ঢল,
এলানো ছড়ানো কেশ,
পারিনে পারিনে দেখিতে পারিনে
ওমুখ তোমার ম্লান,
মরমের শিরে কি যে বেঁধে শেল
ফেটে ওঠে যেন প্রাণ,
সরলে আমার সর্ব্বস্ব ধন
আয়লো হৃদয়ে রাখি,
ভাঙ্গা চোরা এই হৃদয় আমার
চিরদিন তোরি সখি।
তোমারি কারণে জীবন ধারণ,
আমি যে তোমারি, সখি—
প্রমোদ-মাখানো আশার প্রতিমা!
আয় তোরে হৃদে রাখি।

ভাই তোর দাদার কাছে গানটি শিখেছি" কনক নীরজার পানে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিয়া থাকিয়া তাহার গানটি শেষ হইলে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল 'দাদার কাছে শিখেচিস, বেশ করেছিস, এখন এদিকে মুখ ফিরিয়ে আমার যে কাজ বাড়ালি, তার কি বল দেখি ? তুই ভাই আজ দেখছি কোন মতে ভাল করে চুল বাঁধতে দিবিনে" নীরজা অপ্রস্তুত হইয়া হাসিয়া বলিল "তোর দাদার কথায় আমার ভাই জ্ঞান থাকে না; না ভাই আর করব না এবার, বেঁধে দে" নীরজার অসাবধানতায় অর্দ্ধ বিনাস্থিত একটি বিনুনি

কনকের হস্তচ্যুত হইয়া যে অংশ খুলিয়া গিয়াছিল, সেই বিনুনী কনক আবার হস্তে তুলিয়া লইয়া বিনাইতে বিনাইতে বলিল "

"গানটি ভাই কিন্তু বেশ। গানটি গেয়ে বুঝি দাদা তোর অভিমান ভাঙ্গিয়েছিলেন? অত অভিমান করিস কেন ভাই?"

নী। "তুই অত দুঃখ করিস কেন ভাই।"

ক। "নে ভাই তুই আবার আমার এত দুঃখ পেলি কোথা?"

নী। "পাব আর কোথা? দেখতে পাই। ছি ভাই দাদার উপর কি মিছে দুঃখ করতে আছে? তাঁর হোলো কনক-গত প্রাণ।"

ক। "অল্পোতেই কথায় কথায় তোর যে অভিমান, কনক-গত প্রাণ হলে কি আর রক্ষা থাকত!"

নী। "না ভাই তাতে কি অভিমান করি"

ক। "এখন বাসেন না তাই, দেখা যেত বাসলে করতিস কি না"

নীরজা বলিল "আমার সোনার চাঁদ কনক, তোকে পেয়েছি কত ভাগ্য, তোকে ভাল বাসলে কি রাগ করতুম? আমার ভাই ভাগ্যি যে তুই জলে ডুবে মরিসনি, তাহলে এমন করে বসে কার সঙ্গে গল্প করতুম? আচ্ছা ভাই কনক তোকে তীরে দেখে যখন হিরণকুমার বোটে তুলে নিয়ে এল, তখন তোর কি একটুও জ্ঞান ছিল না?"

ক। "আবার সেই জলে ডোবার গল্প? কত বার ঐ এক গল্প করব? এই নে ভাই চুল বাঁধা এবার শেষ হোলো"

তখন নিস্তার পাইয়া কনকের দিকে ফিরিয়া বসিয়া নীরজা বলিল "তা করিলেই বা এক গল্প কি আর করিতে নেই নাকি! আমার কি মনে হয় জানিস? ভাগ্যে যে তীরে হিরণের বোট লাগান ছিল সেখানে তুই এসে পড়েছিলি তাই তো সে বাঁচালে নইলে কি হোত ভাই? আচ্ছা ভাই বাড়ীর লোকেরা তোকে কেউ পেলে না কেন? ভাল করে খুঁজলে কি আর রাতেই পেতো না?"

ক। "বাড়ীতে আর কে ছিল বল্? এক চাকর দাসী? তা তারা মায়ের দাহ কাযেই ব্যস্ত। হিরণকুমারের কি না কি কাজের জন্য সেই রাত্রেই তীরে নামতে হয়ে-ছিল তাই ফিরে বোটে ওঠবার সময় আমাকে দেখতে পেলেন আর বাঁচাতে বোটে তুলে নিলেন! চাকররা তো আর সে রাত্রে সমস্ত গঙ্গার তীরে খুঁজতে পারে না"

নীরজা আবার বলিল "ভাগ্যে হিরণ-কুমার যে তীরে সে দিন বোট লাগিয়ে ছিল সেই তীরে তুই গিয়ে পড়ে ছিলি।"

কনক আর কিছুই উত্তর করিল না, এই জলমগ্নের কথা হইতে কনক আরো বিষন্ন হইয়া পড়িল। দেখিয়া নীরজা বলিল "কথায় কথায় তবু তোর বিষন্ন ভাব ঘুচে এসে ছিল আবার ভাই এভাব কেন বল দেখি! তুই ভাই বাস্তবিক কি একটী কথা আমার কাছে লুকাস। তুই আমাকে তোর দুঃখের যে কারণ বলিস তা ছাড়া

আর একটা কি নিশ্চয়ই তোর মনে আছে” কনক এই কথাটী শুনিয়া আর থাকিতে পারিল না তাহার চক্ষু হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রু বারি ধীরে ধীরে ভূমে পতিত হইল। নীরজা তাহা দেখিতে পাইল তাহাতে বুঝিল, নীরজার অনুমান সত্য, বাস্তবিক কোন লুকানো কথা কনকের হৃদয়ে আছে। নীরজা ব্যথিত হৃদয়ে বলিল “বলনা ভাই তুই আমার কাছে কি কথা লুকাচ্ছিস? কনক আমিতো ভাই তোর কাছে কিছু লুকাইনে” নীরজার স্নেহ বাক্যে কনকের ক্রন্দন দেখিয়া তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য নীরজা আপন মনে কতই প্রশ্নোত্তর করিতে লাগিল। কনকের হৃদয়ে যে একটি লুকানো ব্যথা জাগিতেছে তাহাতে আর তাহার সন্দেহ রহিল না। এখন সে ব্যথা কি? তাহাই নীরজা ভাবিয়া স্থির করিতে চেষ্টা করিল। ব্যথাটি যে গুরুতর তাহাও নীরজা মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া ভাবিল “কনকের হৃদয়ে দারুণ ব্যথাও ইহার কারণ? কনকের কথা বিশ্বাস করিতে গেলে ইহার কোন কারণই নাই। কিন্তু তাহা কি হয়? এত গুরুতর ব্যথা কি অমনি জন্মায়? ভাল বাসিলে তো এক এরূপ ব্যথা জন্মায়। কেননা আমি নিজেই দেখিছি যে যখন আমি প্রমোদকে ভালবেসে ফেলেছিলুম তখন প্রমোদের নাম শুনলেই, প্রমোদের কথা মনে এলেই, এমন কি তার সঙ্গে যে ফুলটী পর্য্যন্ত একত্রে দেখিছি সে ফুলটী দেখলেও মনটা ব্যাকুল হয়ে পড়ত, আপনা হতেই কেমন চোক দিয়ে জল আসত। এতো তাই নয়? কনক নিশ্চয়ই কাহাকে ভাল বাসিয়াছে। কিন্তু ভালই বা কাহাকে বাসিবে? প্রণয়ের পাত্র কই?” অমনি নীরজার মনে হইল অনেক দিন কনক হিরণের সহিত একত্রে বাস করিয়াছিল, হিরণই তাহাকে বাঁচাইয়াছে হিরণকে তো সে ভাল বাসে নাই?” নীরজা আপন বক্ষ হইতে কনকের মাথাটি তুলিয়া মুখটী মুছাইতে মুছাইতে জিজ্ঞাসা করিল “কনক তুই কি ভাই কাহাকেও ভাল বেসেছিস? বলনা ভাই? তুই কি হিরণকে ভাল বাসিস?” হিরণের নাম শুনিয়া কনকের মুখটী একটু আরক্তিম হইল, ক্রমে আবার সেই আরক্তিম বিষণ্ণ মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া আসিল, কনকের অধর প্রান্তে একটু সলাজ হাসির রেখা পড়িল। তাহাকে নিরুত্তর এবং তাহার ভাব দেখিয়া নীরজা বুঝিল কনক যথার্থই হিরণকে ভাল বাসে। বুঝিয়া কিন্তু নীরজা মনে মনে দুঃখিত হইল। প্রমোদের নিকট হিরণের কথা নীরজা যেরূপ শুনিয়া ছিল তাহাতে সে তাহাকে অতি মন্দ লোক বলিয়া ঘৃণা করিত, হিরণকে শত্রু বলিয়া জানিত। যাহাকে তাহারা শত্রু বলিয়া দেখিতে পারে না যাহাকে মন্দ লোক বলিয়া ঘৃণা করে তাহাকে কনক ভাল বাসিবে একথা মনে করিতেও তাহার কষ্ট হইল। যদি কোন মতে কনকের মন হইতে সে ভালবাসা ঘোচাইতে পারে এই চেষ্টায় বলিল “কেন ভাই তাকে তুই ভাল বাসলি? সে অতি মন্দলোক, সে তোর ভাইকে খুন করতে গিয়ে ছিল তাকে ভাই

তুই ভাল বাসলি? তাকে ভালবেসে তুইতো সুখী হবি নে" নীরজা বালিকা জানে না যে প্রণয়ের মূল উৎপাটন করিতে গেলেই আরো দৃঢ় হইয়া বসে। নীরজার কথায় কনকের বিষণ্ণ মুখমণ্ডল যেন সহসা জ্ব-লিয়া উঠিল, অশ্রু বারি শুকাইয়া গেল, কনক ধীর গম্ভীর ভাবে বলিল "হিরণ মন্দ লোক নহেন, হিরণ কখনও খুন করিতে যান নাই, একথা যে তোমাদের বলিয়াছে সে মিথ্যাবাদী, তাঁহাকে না জানিয়া কেন দোষ দাও?" এই খানেই তাঁহাদের কথোপকথন বন্ধ হইল, পরস্পর মনের ভাব দুজনে বুঝিয়া দুজনেই নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন। কনক ভাবিয়াছিল, এক দিন তাহার মনের কথা নীরজাকে বলিয়া সে এক জন ব্যথার ব্যথী পাইবে। কিন্তু আজ বুঝিল নীরজার নি-কট হইতে সে আশা আর নাই। সেই অবধি কনক নীরজার সহিত সে বিষয়ে ক-খনো কথা কহিত না। নীরজা সে কথা উঠাইলে কনক অন্য কথা দিয়া তাহা চাপা দিত। কনকের হৃদয় জ্বালা কনক লুকাইয়া লুকাইয়া একাকীই ভোগ করিত।

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র।

আমরা সে দিন "ফ্যান্সি-বলে" অর্থাৎ ছদ্মবেশ-নাচে গিয়েছিলেম—কত মেয়ে পুরুষ নানা রকম সেজে-গুজে সেখানে নাচ্‌তে গিয়েছিল—সে দেখ্‌তে বেশ জম্‌-কালো। প্রকাণ্ড ঘর, গ্যাসের আলোয় আলোকাকীর্ণ, চার দিকে ব্যাণ্ড্‌ বাজ্‌চে—৬। ৭০০ সুন্দরী, সুপুরুষ। ঘরে ন স্থানং তিল ধারয়েৎ—চাঁদের হাট ত তাকেই বলে—যে দিকে পা বাড়াই বিবিদের গাউন—যে দিকে চোক্‌ ফেরাই চোক্‌ ঝল্‌সে যায়—এক একটা ঘরে দলে দলে স্ত্রী পুরুষে হাত ধরা ধরি কোরে ঘুরে ঘুরে নাচ্‌তে আরম্ভ কোরেছে, দেখে মনে হয় যেন সবাই একেবারে আমোদে উন্মত্ত হয়ে গেছে—জ্ঞানশূন্য হয়ে যেন ঘোড়া-ঘোড়া পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্চে, এক একটা ঘরে এমন ৭০।৮০ জন যুগল-মূর্ত্তি ঘুর্‌চে—এমন ঘেঁসাঘেঁসি যে, কে কার ঘাড়ে গিয়ে পড়ে তার ঠিক্‌ নেই, একটা ঘরে শ্যাম্পে-নের কুরুক্ষেত্র পড়ে গিয়েছে, মদ্য মাংসের ছড়া ছড়ি, সেখানে লোকে লোকারণ্য; এক একটা বিবির খাবার বিরাম নেই, দু তিন ঘণ্টা ধোরে ক্রমাগত তার মুখ চোল্‌চে। এক একটা বিবির নাচের বিরাম নাই, দু তিন ঘণ্টা ধোরে ক্রমাগত তার পা চল্‌চে। সকলেরই মুখে হাসি, মন অধি-কার কর্‌বার যত প্রকার গোলাগুলি আছে, বিবিরা তা অকাতরে নির্দ্দয়-ভাবে বর্ষণ কর্‌চেন—কিন্তু ভয় কোরো না, আমা-দের মত পাষাণ হৃদয়ে তার একটু আঁচড়ও

পড়ে নি। এক জন বিবি Snow maiden অর্থাৎ নীহার-কুমারী সেজে গিয়েছিলেন, তাঁর সমস্তই শুভ্র, সর্ব্বাঙ্গে পুঁথির সজ্জা, আলোতে একেবারে ঝক্ মক্ কোর্‌চে, একজন মুসলমানিনী মেয়ে সেজে গিয়েছিলেন—একটা লাল ফুলো ইজের, ওপরে একটা রেসমের পেশোয়াজ, মাথায় একটা টুপির মত—এ কাপড়ে তাঁকে বেশ মানিয়ে গিয়েছিল। এক জন আমাদের দিশি মেয়ে সেজে গিয়েছিলেন—একটা সাড়ি ও একটা কাঁচুলি তাঁর প্রধান সজ্জা, তার উপরে একটা চাদর পোরেছিলেন, তাতে ইংরিজি কাপড়ের চেয়ে তাঁকে ঢের ভাল দেখাচ্ছিল। এক জন বিলিতি দাসী সেজে গিয়েছিল—যে রকম তার চেহারা, তাতে দাসীর পোষাক ছাড়া আর কিছুতে তাকে মানাতো না—এই রকম নানা লোক নানা রকম পোষাক পোরে গিয়েছিল। আমি বাঙ্গালার জমীদার সেজেছিলেম, জরী দেওয়া মখমলের কাপড়, জরী দেওয়া মকমলের পাগ্‌ড়ি প্রভৃতি পরেছিলেম। জনকতক ব্যক্তি মিলে পীড়াপীড়ি কোরে আমাকে একটা দাড়ি গোঁপ পরালেন, দুই এক জন মহিলা আমাকে দেখে বোল্লেন যে, সে দাড়ি গোঁপে আমাকে ভারি ভাল দেখাচ্চে, তাতে আমার স্বভাবতই ভারি গর্ব্বের আবির্ভাব হোল, আমি সেই দাড়ি গোঁপ পোরেই "বলে" গিয়ে উপস্থিত হলেম—কিন্তু দর্পহারী মধুসূদন আছেন, আমি যে নাকাল্‌টা হলেম তা আর বক্তব্যও নয়, শ্রোতব্যও নয়, তা' শুন্‌লে পাষাণেরও চোক্ ফেটে মুক্তার মত ডাগর ডাগর অশ্রুবিন্দু দরদর ধারে বিগলিত হয়ে ধরণীতল অভিষিক্ত করবে—যে সকল সুন্দরী বন্ধুদের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, আমার দাড়ি গোঁপ দেখে তাঁরা আর কেউ আমাকে চিন্‌তে পারেন না—অমুকের সঙ্গে সকলেই সেক্‌হাণ্ড কর্‌লে—অমুক বাবুর সঙ্গে সকলেই সেক্ হাণ্ড কোল্লে কিন্তু এ গরীবকে আর কেউ পোছে না। আমি যার কাছে যাই, সেই সোরে পড়ে, আমি তো রাগে, দুঃখে, অভিমানে, বিরক্তিতে, আত্ম-গ্লানিতে অভিভূত হয়ে সেই মুহূর্ত্তেই দাড়ি গোঁপ উৎপাটন কোরে একেবারে পকেটে গুঁজ্‌লেম, তখন সমস্ত ভালোয় ভালোয় মীমাংসা হয়ে গেল। আমাদের মধ্যে অমুক অযোধ্যার তালুকদার সেজে গিয়েছিলেন—সাদা রেশমের ইজের জরিতে খচিত, সাদা রেশমের চাপ্‌কান, সাদা রেশমের জোব্বা, জরীতে ঝক্‌মকায়মান পাগড়ি, জরীর কোমরবন্দ—এইতো তাঁর সজ্জা। অযোধ্যার তালুকদারেরা যে এই রকম কাপড় পরে তা মনেও কোরো না কিন্তু বিচার কর্‌বার লোক কোথায়? ধরা পড়্‌বার কোন সম্ভাবনা ছিল না। আমাদের মধ্যে অমুক বাবু আফগান সেনাপতি সেজেছিলেন।

গত মঙ্গলবারে আমরা অমুকের বাড়িতে নাচের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেম। সন্ধ্যে বেলায় কোথাও নিমন্ত্রণে যেতে হোলে কি রকম পোষাক পোর্‌তে হয় জান? এখানে

শীতের জন্য সচরাচর মোটা কাপড় পোরতে হয়, কিন্তু Evening party প্রভৃতিতে যেতে হোলে পাতলা কালো বনাতের কাপড় পোরতে হয়, কেননা নিমন্ত্রণ-সভায় খুব গ্যাস জ্বলে, অনেক লোকের সমাগম হয়, তাতে ঘর বেশ গরম হয়ে ওঠে, তা ছাড়া, যদি নাচ্‌তে হয় তা হোলে অত্যন্ত গরম হবার কথা। সন্ধ্যে পরিচ্ছদের কামিজটি একেবারে নিষ্কলঙ্ক ধব্‌-ধোবে শাদা হওয়া চাই, তার ওপরে প্রায় সমস্ত বুক-খোলা এক বনাতের ওয়েস্ট কোট থাকবে, কাল ওয়েস্ট কোটের মধ্যে শাদা কামিজের সুমুখ দিকটা বেরিয়ে থাক্‌বে, গলায় শাদা ফিতে (necktie) বাঁধা, সকলের ওপর একটি টেল্‌ কোট (লাঙ্গুল কোট)—টেল্‌-কোটের সুমুখ দিকটা কোমর পর্য্যন্ত কাটা, আমাদের চাপকান প্রভৃতি পোষাকগুলি যেমন হাঁটুপর্য্যন্ত পড়ে, এ তা নয়। এর সুমুখ দিকটার সীমা কোমর পর্য্যন্ত, কিন্তু পেছন দিকটা কাটা নয়, সুতরাং কতকটা ন্যাজের মত ঝুল্‌তে থাকে; আমরা যখন ইংরাজদের হনুকরণ করি, তখন বাধ্য হোয়ে এই ল্যাজ কোট্‌ পোরতে হোল, কেন না ল্যাজ কোট না পোর্‌লে হনুকরণ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয় না। নাচ-পার্টিতে যেতে হোলে হাতে এক জোড়া শাদা দস্তানা পোর্‌তে হয়, কারণ যে মহিলাদের হাতে হাত দিয়ে নাচ্‌তে হবে, তোমার খালি হাত লেগে তাঁদের হাত ময়লা হয়ে যেতে পারে কিম্বা তাঁদের হাতে যদি দস্তানা থাকে তাঁদের দস্তানা ময়লা হোয়ে যেতে পারে। অন্য কোন জায়গায় লেডিদের সঙ্গে সেক্‌হ্যাণ্ড কোরতে গেলে হাতের দস্তানা খুলে ফেল্‌তে হয়, কিন্তু নাচের ঘরে তার আর আবশ্যক হয় না। যাহোক্‌, আমরা তো সাড়ে নটার সময় তাঁদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেম। তখনও নাচ আরম্ভ হয় নি। ঘরের দুয়ারের কাছে গৃহকর্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি বিশেষ পরিচিতদের সঙ্গে সেক্‌হ্যাণ্ড কোর্‌চেন, অপরিচিতদের প্রতি শিরঃকম্পন কোর্‌চেন, সকলকে অভ্যর্থনা কোর্‌চেন। এ গোরাদের দেশে গৃহকর্ত্তার নিমন্ত্রণ-সভায় বড় উঁচু পদ নেই, তিনি সভায় উপস্থিত থাকুন বা শয়ন-গৃহে গিয়ে নিদ্রা দিন, তাতে কারো বড় কিছু এসে যায় না। আমরা ঘরে প্রবেশ করলেম, গ্যাসের আলোয় ঘর আলোকাকীর্ণ, কিন্তু শত শত রমণীদের রূপের আলোকে সে গ্যাসের আলো ম্রিয়মান হোয়ে পোড়্‌ছে, চার দিক উজ্জ্বল, হাস্যময়; রূপের উৎসব পোড়ে গিয়েছে, ঘরের ভিতরে প্রবেশ করবা মাত্রেই চোকে ধাঁধা লেগে যায়। ঘরের একপাশে পিয়ানো, বেহালা বাঁসি বাজচে, ঘরের চারিধারে কৌচ, চৌকি সাজানো রয়েছে। ইতস্ততঃ দেয়ালের আয়নার ওপর গ্যাসের আলো ও রূপের প্রতিবিম্ব পোড়ে ঝক্‌মক্‌ কোর্‌চে। নাচবার ঘরের মেজে কাঠের, তার ওপর কার্পেট প্রভৃতি কিছু পাতা নেই, সে কাঠের মেজে এমন পালিশ করা যে পা পিছ্‌লে যায়; এখানে ঘর যত পিছল হয় ততই নাচ্‌বার উপযুক্ত হয়, কেননা পিছল ঘরে

নাচের গতি খুব সহজ ও সুন্দর হয়, পা কোন বাধা পায় না, আর আপনা আপনি পিছ্লে আসে। ঘরের চার দিকে আশে পাশে যে সকল বারন্দার মত আছে, তাই একটু ঢেকে ঢুকে, গাছ পালা দিয়ে, দুই একটি কৌচ চৌকী রেখে Lover's bower (প্রণয়ীদের কুঞ্জ) নামে অভিহিত করা হোয়েছে। সেই খানে, নাচে শ্রান্ত হোয়ে বা কোলাহলে বিরক্ত হোয়ে দুই একটী যুবতী নিরিবিলি মধুরালাপে মগ্ন থাক্‌তে পারেন। ঘরে ঢোক্‌বার সময় সকলের হাতে সোনার অক্ষরে ছাপা এক এক খানি কাগজ দেওয়া হয়, সেই কাগজে কি কি নাচ হবে তাই লেখা থাকে। ইংরাজি নাচ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়,এক রকম হচ্চে স্ত্রী পুরুষে মিলে ঘুরে ঘুরে নাচা, তাতে কেবল দুজন লোক এক সঙ্গে নাচে ; আর একরকম হোচ্চে চারটি জুড়ি নর্ত্তক নর্ত্তকী সুমুখা-সুমুখী দাঁড়ায় ও হাত-ধরাধরি নানা ভঙ্গীতে চলা ফিরা কোরে বেড়ায়, কোন কোন সময় চার জুড়ী না হোয়ে আট্ জুড়িও হয়। ঘুরে ঘুরে নাচাকে Round dance বলে ও চলা-ফেরা কোরে বেড়ানোর নাম Square dance—নাচ আরম্ভ হবার পূর্ব্বে গৃহকর্ত্রী মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে আলাপ কোরে দেন। অর্থাৎ পুরুষ-অভ্যাগতকে সঙ্গে কোরে কোন এক অভ্যাগত-মহিলার কাছে নিয়ে গিয়ে বলেন "মিস্ অমুক্। ইনি হোচ্চেন মিষ্টার অমুক।" অমনি মিস্ ও মিষ্টার পরস্পর পরস্পরকে শিরঃকম্পন করেন। কোন মিসের সঙ্গে পরিচয় হবার পর তুমি যদি তাঁর সঙ্গে নাচ্‌তে ইচ্ছে কর, তা হলে পকেট্ থেকে সেই সোনার জলে ছাপানো Programmeটি বের কোরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করো "আপনি কি অমুক নৃত্যে বাকদত্তা হয়ে আছেন?' অর্থাৎ আর কেউ কি আগে থাক্‌তে আপনার সঙ্গে অমুক নাচের বন্দোবস্ত কোরে গেছেন?' তিনি যদি 'না' বলেন তাহলে তাঁকে বোলো 'তা" হোলে আমি কি আপনার সঙ্গে নাচ্‌বার সুখভোগ কর্‌তে পারি?" তিনি তোমাকে Thank you বোল্‌লে তুমি বুঝ্‌লে যে তোমার কপালে তাঁর সঙ্গে নাচ্‌বার সুখ আছে। অমনি সেই কাগজটীতে সেই নাচের পাশে তাঁর নাম লিখে রেখো। এবং তাঁর কাগজে তোমার নাম লিখে দিও। কাগজটা এই রকম,

PROGRAMME (নাচের নাম)	ENGAGEMENTS (নাচের সঙ্গে নাচিবার বন্দোবস্ত হল তাদের নাম।)
I Lancers	
II Valse	Miss Gordon
III Quadrille	
IV Galop	Mrs Egincourt
V Polka	
ইত্যাদি।	ইত্যাদি।

এক পাশে নৃত্যের নাম, অপর এক পাশে নর্ত্তক বা নর্ত্তকীর নাম। নাচের বাজ্‌না বেজে উঠল। অমনি শত শত যুগলমূর্ত্তী হাত ধরাধরি কোরে নাট্য-গৃহে নাচের জন্যে প্রস্তুত হোয়ে দাঁড়ালেন। নাচ আরম্ভ হোল। ঘুর্—ঘুর্—ঘুর্। একটা ঘরে মনে কর, চল্লিশ পঞ্চাশ যুড়ি নাচ্‌চে, ঘেঁসাঘেসি ঠেলাঠেলি, এ-ওর ঘাড়ে

পোড়ছে, এ-ওর গাউন মাড়িয়ে দিচ্চে, ঘুড়িতে ঘুড়িতে ধাক্কা-ধাক্কি, কিন্তু তবু ঘুর্—ঘুর্—ঘুর্। মনে হয় যেন আহ্লাদে পাগল হোয়ে সবাই মিলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে; তালে তালে বাজনা বাজ্‌চে, তালে তালে পা পোড়্‌চে, ঘর গরম হয়ে উঠেছে, আর সে যে কি একটা উত্তেজনার তরঙ্গ উঠেছে, সে কি বল্‌ব! কোন নর্ত্তক-যুগলের দুজনের দুজনকেই হয়ত খুব ভাল লেগেছে, তাদের দুজনের ঠোঁটে হাসি একেবারে ফেটে পোড়ছে। কোন যুবতীর ভাগ্যে এক রৃদ্ধ কুরূপ নর্ত্তক জুটেছে, তার মুখে আর হাসি নেই, সে অতি আড়ষ্ট ভাবে যন্ত্রের মত নাচ্‌চে। কোন লেডি partner (সহ-নর্ত্তক) পান নি, তিনি দেয়ালের কোণে দাঁড়িয়ে সদ্বেষ-নয়নে হাসিমুখ ঘূর্ণমান নর্ত্তক-যুগলকে নিরীক্ষণ কোর্‌চেন, আর বিফলে প্রফুল্লতার ভাণ কোরতে চেষ্টা কোর্‌চেন। একটা নাচ শেষ হোল, বাজনা থেমে গেল; নর্ত্তক মহাশয় তাঁর শ্রান্ত সহচরীকে আহারের ঘরে নিয়ে গেলেন, সেখানে টেবিলের উপর ফল মূল মিষ্টান্ন মদিরার আয়োজন; হয়ত আহার পান কোর্‌লেন, না হয় দুজনে নিভৃত কুঞ্জে বোসে রহস্যালাপ কোরতে লাগলেন. আমি নতুন লোকের সঙ্গে বড় মিলে মিশে নিতে পারিনে, যে নাচে আমি একেবারে সুপণ্ডিত, সে নাচও নতুন লোকের সঙ্গে নাচ্‌তে পারিনে, প্রতিপদে ভুল হয়, লোকের গাউন মাড়িয়ে দিই, প্রতি লোককে ধাক্কা দিই, বেতালে পা ফেলি, কখনো বা অসাবধানে আমার সহনর্ত্তকীর পাও মাড়িয়ে দিই, আর এই রকম নানা প্রকার গলদ্ কোরে অবশেষে নাচের মাঝখানে থেমে পড়ি ও আমার সহচরীর কাছ থেকে মার্জ্জনা ভিক্ষা কোরে সে দিক থেকে আস্তে আস্তে পিট্টান দিই! সত্যি কথা বোল্‌তে কি, আমার নাচের নেমন্তন্ন-গুলো বড় ভাল লাগে না। অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে ওরকম পাগলের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াতে আমার আদবে ভাল লাগে না। যাদের সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ আছে, তাদের সঙ্গে নাচ্‌তে আমার মন্দ লাগে না। miss অমুকের সঙ্গে আমার বেশ আলাপ ছিল, আর তাঁকে বেশ দেখ্‌তে, তাঁর সঙ্গে আমি gallop নেচেছিলেম, তাই জন্যে তাতে আমার কিছু ভুল হয় নি। কিন্তু miss অমুকের সঙ্গে আমি Lancers নেচেছিলেম তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না, আর তাঁকে অতি বিশ্রী দেখ্‌তে, তাঁর চোক দুটো বের করা, তাঁর গাল দুটো মোটা, দাড়ির দিকটা অত্যন্ত ছোট, সব চেয়ে তাঁর স্বভাব খিটমিটে। তাঁর সঙ্গে নাচ্‌তে গিয়ে যত প্রকার দোষ হওয়া সম্ভব, তা ঘোটেছিল। যেমন তাস খেল্‌বার সময়ে খারাপ partner পেলে তার পরে তার দলের লোক চোটে যায়, তেমনি নাচের সময় খারাপ partner পেলে মেয়েরা ভারি চোটে যায়। তিনি বোধ হয় নাচ্‌বার সময় মনে মনে আমার মরণ কামনা কোরে ছিলেন; নাচ ফুরিয়ে গেলে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেম, তিনিও নিস্তার পেলেন!

আমি একবার একটি সুন্দরী partner পেয়েছিলেম, তাঁর সঙ্গে না নাচতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা কোরেছিলেম, কিন্তু গৃহ-কর্ত্রী আমাকে বিশেষ কোরে নাচতে অনুরোধ কোর্‌লে, পীড়াপীড়ির পর নাট্যশালায় অবতরণ কোরলেম, কোন মতে নাচটা সমাপন কোরে দে ছুট্! প্রথমে নাচের ঘরে ঢুকেই আমি একেবারে চোম্‌কে উঠে ছিলেম; দেখি যে শত শ্বেতাঙ্গিনীদের মধ্যে আমাদের একটী ভারতবর্ষীয়া শ্যামাঙ্গিনী রয়েছেন। দেখেই ত আমার বুকটা একেবারে নেচে উঠেছিল। আমার তাকে এমন ভাল লাগল যে কি বলব! তার সঙ্গে কোন মতে আলাপ করবার জন্যে আমি ত ছচ্‌ফট্ কোরে বেড়াতে লাগলেম। কত দিন মনে কর কাল মুখ দেখিনি! আর, তার মুখে আমাদের বাঙ্গালী মেয়েদের ভালমানুষী নম্রভাব এমন মাখানো যে কি বলব! আমি অনেক ইংরেজ মেয়েদের মুখে ভালমানুষী নরমভাব দেখেছি কিন্তু এর সঙ্গে তার কি একটা তফাৎ আছে বল্‌তে পারি নে। তার চুল বাঁধা আমাদের দেশের মত, শাদা মুখ দেখে দেখে, আর উগ্র অসঙ্কোচ সৌন্দর্য্য দেখে দেখে, আমার মনটা ভিতরে বিরক্ত হোয়ে গিয়ে ছিল, এতদিনে তাই বুঝতে পারলেম। সেই শ্বেতাঙ্গিনীদের সভায় একটি কালো মিষ্টিমুখ দেখে আমার মনটা চুম্বকের মত সেই দিকে আকৃষ্ট হোয়েছিল। আমার বোধ হয় এরকম হবার মানে আছে হাজার হোক্, ইংরেজ মেয়েরা সম্পূর্ণ আ-লাদা জাত, তারা আমাদের কথাবার্ত্তা ভাবভঙ্গী আচার ব্যবহারের মর্ম্মের ভিতরে ঢুক্‌তে পারে না। আমি এতদূর ইংরিজি ভাব শিখিনি যে তাদের সঙ্গে বেশ খোলাখুলি পরিচিত ভাবে কথাবার্ত্তা কইতে পারি, তাদের সঙ্গে দেখা হোলে কথাবার্ত্তা কবার যে সকল বাঁধি গৎ আছে, সে-গুলি খুব ঝাড়তে পারি; আমি জিজ্ঞাসা কোরতে পারি, সম্প্রতি অপেরায় যাওয়া হয়েছিল কি না, অমুক থিয়েটরে অমুক অভিনেতার অভিনয় কেমন লাগল, আজ ভারি ভাল দিন, ইত্যাদি। এই সকল বাঁধি গতের সীমা লঙ্ঘন কোরতে সাহস হয় না, ইংরিজী মনের ভাব-গতি খুব ভাল রকম জানলে, তবে নির্ভয়ে স্বাধীন ভাবে দুই একটা কথাবার্ত্তা কওয়া যেতে পারে। ভারতবর্ষীয়েরা আমাদের আপনাদের লোক, তাদের কাছে আমাদের অধিকার অনেকটা বিস্তৃত, চন্দ্রলোকের একটা মেয়ে মনে কোরে তাদের কাছে ঘেঁস্‌তে তেমন একটু ইতস্ততঃ করবার ভাব আসে না। যাহোক্, দুঃখের কথা বোলব কি,যখন আমি একেবারে অত্যন্ত মুগ্ধ হোয়ে পড়েছি, তখন শোনা গেল যে সে একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে; শুনে আমার মনটা একেবারে বিগেড়ে গেল, আর, তার সঙ্গে আলাপ করা গেল না, কিন্তু কালো মুখের ছাপ আমার মনে রয়ে গেল!

আজ ব্রাইটনের অনেক তপস্যার ফলে সূর্য্য উঠেছেন। এদেশে রবি যে দিন মেঘের অন্তঃপুর থেকে বের হন, সে দিন এ দেশে একটি লোকও কেউ অন্তঃপুরে

থাকে না—সে দিন লোকেরা একটু বে-ড়িয়ে বাঁচে, সে দিন সমুদ্রের ধারে বেড়াবার রাস্তায় লোক বিল বিল্ কোর্তে থাকে—এদেশে যদিও, "বাড়ির ভিতর" নেই, তবু এদেশের মেয়েরা যেমন অসূর্য্যাম্পশ্য-রূপা এমন আমাদের দেশে নয়—এদেশের সূর্য্যই যথন অনেত্রস্পশ্যরূপ তথন এ দে-শের মেয়েরাও ত অসূর্য্যাম্পশ্যরূপা হবেই।

সাড়ে আটটার কমে আমাদের বিছানা থেকে ওঠা হয় না, ছটার সময় বিছানায় থেকে উঠ্‌লে এ দেশের লোকেরা এত আশ্চর্য্য হয় যে, আকাশ ভেঙ্গে পড়লেও তারা সে রকম আশ্চর্য্য হয় না—তার পরে উঠেই আমি রোজ ঠাণ্ডা জলে স্নান করি। এ দেশের লোকেরা যাকে স্নান বলে, আমি সে রকম স্নানের বিড়ম্বনা করি নে। আমি মাথায় জল ঢেলে স্নান করি; গরম জল নয়, এথানকার এই বরফের মত ঠাণ্ডা জল। মাথায় জল ঢেলে স্নান করাকে এ দেশের লোকে অসাধারণ বীরত্ব মনে করে, আমার নাম যে কেন এথনও ছাপার কাগজে উঠে যায় নি, আমি তাই ভাবচি। নটার সময় আমাদের থাবার আসে। এথানকার ৯ টা আর সেথানকার ৬ টা সমান। আমাদের আর একটি থাওয়া দেড়টার সময়, সেইটিই প্রধান থাওয়া—মধ্যাহ্ন ভোজন। প্রত্যহ——পার কর্‌চি তাতে কিছু মাত্র দ্বিধা নেই, মাঝে মাঝে ভেড়ার পদ-সেবাও কোরে থাকি, মধ্যে একবার চা রুটি প্রভৃতি আসে, তার পরে রাত আটটার সময় আর একটি সুপ্রশস্ত ভোজনের আয়োজন হয়ে থাকে, এই রকম আমাদের দিনের প্রধান কার্য্য হচ্চে থাওয়া। অন্ধকার হয়ে আস্‌চে, চারটে বাজে বোলে, চার্‌টে বাজ্‌লে পরে আলো না জ্বেলে পড়া দুষ্কর। এথানে প্রকৃত পক্ষে ৯টার সময় দিন আরম্ভ হয়, কেননা গড়ে রোজ আটটার কমে ওঠা হয় না। এথানকার লোকের ছটার সময় হয়তো দুক্ষর রাত্তির, এ দেশের প্যাঁচারা ছাড়া আর কেউ তথন জেগে নেই, তার পরে আবার বৈকাল চারটের সময়েই এথানকার দিনের আলো নিভে যায়, তাই এথানকার দিনগুল এমন ছোট মনে হয় যে কি বল্‌ব! এথানকার দিনগুল যেন দশটার সময় আপিস্ কর্‌তে আসে, আর চারটের সময় বাড়ি ফিরে যায়। এথানে কাজ কোরে অবসর পাওয়া দূরে থাক্, কাজ কর্‌বার অবসর পাওয়া যায় না। সন্ধ্যের পর আমার মনের জড়-অবস্থা হয়, এমন জড় অবস্থা হয় যে তথন আর কোন কাজ কর্‌বার শক্তি থাকে না—সুতরাং আমার এ রকম ছোট দিনের সঙ্গে কারবার করা পুষিয়ে উঠ্‌চে না—ট্র্যাক্-ঘড়ির ডালা থুল্‌তে থুল্‌তেই এ দেশের দিন চোলে যায়। এথানকার রাত্তির তেমনি ঘোড়ায় চোড়ে আসে, আর, পায়ে হেঁটে চলে যায়—সে আর ফুরোয় না। এথানকার দিনগুলি যে কেবল অচিরস্থায়ী তা নয়, যতক্ষণ থাকে তাই না হয় একটু ভদ্র লোকের মত থাক্, তা নয়—মুথ ভার কোরে খুঁৎখুঁৎ করতে করতেই তাঁর সমস্ত সময় চলে যায়।

মেঘ বৃষ্টি বাদল অন্ধকার শীত, এ আর এক দণ্ডের তরে ছাড়া নেই। আমাদের দেশে যখন বৃষ্টি হয়, তখন মুষল ধারে বৃষ্টির শব্দ, মেঘ, বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড়—তাতে একটা কেমন উল্লাসের ভাব আছে; এখানে এ তা নয়, এ টিপ্ টিপ্ কোরে সেই এক ঘেয়ে বৃষ্টি ক্রমাগতই অতিনিঃশব্দ-পদসঞ্চারে চোল্‌চে ত চোল্‌চেই—সে কেমন একটা ভিজে ভিজে ভাব, রাস্তায় কাদা-পত্রহীন গাছগুলো স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজ্‌চে, কাঁচের জান্‌লার উপর টিপ্ টিপ্ কোরে জল ছিটিয়ে পড়্‌চে, কেমন একটা অন্ধকার-অন্ধকার কোরে এসেছে, আমাদের দেশে যেমন স্তরে স্তরে মেঘ করে, এখানে আকাশ সমতল, মনে হয় না যে মেঘ করেছে, মনে হয় কোন কারণে আকাশের রংটা ঘুলিয়ে গিয়েছে; সমস্তটা জড়িয়ে স্থাবর জঙ্গমের সে কি একটা অবসন্ন মুখশ্রী দেখা যায় তা বর্ণনা করা যায় না। লোকের মুখে সময়ে সময়ে শুন্‌তে পাই বটে যে, কাল বজ্র হয়েছিল, কিন্তু বজ্রের নিজের এমন গলার জোর নেই যে, তাঁর মুখ থেকেই সে খবরটা পাই—এখানকার বজ্রধ্বনি শুন্‌তে গেলে বোধ হয় Microphone ব্যবহার কোর্‌তে হয়। সূর্য্যতো এখানে গুজবের মধ্যে হয়ে পড়েছে। যদি অনেক ভাগ্যবলে সকালে উঠে সূর্য্যের মুখ দেখ্‌তে পাই, তবে তখনি আবার মনে হয়—

"এমন দিন না রবে—তা' জান"

এই অন্ধকার দেশে আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি সমস্ত যেন ম্রিয়মাণ হয়ে গেছে, কিছু লেখা বেরোয় না, এমন কি গুছিয়ে একটা চিঠিও লিখতে পারিনে। চিঠি লেখ্‌বার বা অন্য কিছু লেখবার কথা মনে হোলেই আমার কেমন হাই উঠ্‌তে থাকে। দেশের সে সূর্য্যালোক ও জ্যোৎস্না কেমন সুখস্বপ্নের মত মনে পড়ে। আমাদের দেশের সেই সকাল সন্ধ্যার, ও জ্যোৎস্না রাত্রির মর্য্যাদা এ দেশে এসে বিশেষ কোরে বুঝ্‌তে পেরেছি!

দিনে দিনে শীত খুব ঘনিয়ে আস্‌চে, লোকে বল্‌চে, কাল পরশুর মধ্যে হয় ত আমরা বরফ পড়া দেখ্‌তে পাব—তাপমান যন্ত্র ৩০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত নেবে গিয়েছে সেই তো হচ্চে freezing Point—অল্প অল্প frost দেখা দিয়েছে। রাস্তার মাটি খুব শক্ত হয়ে গিয়েছে, কেননা তার মধ্যে যা জল ছিল সমস্ত জমাট্ হয়ে গিয়েছে, রাস্তার মাঝে মাঝে কাচের টুক্‌রোর মত শিশির খুব শক্ত হয়ে জোমে গিয়েছে, দুই এক জায়গায় ঘাসের মধ্যে কে যেন চুন ছড়িয়ে দিয়েছে, বরফের এই প্রথম সূত্রপাত দেখ্‌চি। খুবই শীত পড়েছে এক এক সময়ে হাত পা এমন ঠাণ্ডা হয়ে যায় যে জ্বালা কর্‌তে থাকে। সকালে লেপ থেকে বেরোতে যত ভাবনা হয়, সহমরণে যেতে হলেও আমার তত ভাবনা হয় না। কিন্তু আমার বীরত্বের কাহিনী শুনলে হয়তো তুমি অবাক্ হয়ে যাবে। সেই সকালে উঠেই আমি বরফের মত ঠাণ্ডা জল মাথায় ঢেলে স্নান করি, মনে হয়

মাথাটা যেন খোসে পড়্‌ল, সর্ব্বাঙ্গ অবশ হয়ে যায়—কিন্তু তার পরেই যে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়, তাতে সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে যেতে হয়।

আমাদের দিশি কাপড় দেখে রাস্তার এক এক জন সত্যি সত্যি হেসে ওঠে, এক এক জন এত আশ্চর্য্য হয়ে যায় যে তাদের আর হাস্‌বার ক্ষমতা থাকে না। কত লোক আমাদের জন্যে গাড়ি চাপা পড়্‌তে পড়্‌তে বেঁচে গিয়েছে, তারা আমাদের দিকে এত হাঁ কোরে চেয়ে থাকে যে পেছনে গাড়ি আস্‌চে হুঁস্ নেই। প্যারিসে আমাদের গাড়ির পিছনে পিছনে এক দঙ্গল ইস্কুলের ছোক্‌রা চীৎকার করতে করতে ছুটেছিল—আমরা তাদের সেলাম করলেম, এক এক জন আমাদের মুখের উপর হেসে ওঠে, এক একজন চেঁচাতে থাকে—"Jack look at the blackies!" কিন্তু আমি সে সব কিছুই গ্রাহ্য করি নি, আমার এক তিলও লজ্জা করে না।

এখানকার এক জন বাঙ্গালী একটা গান তৈরি করেছিল।

"এবার মোলে সাহেব হব,
কাল চামড়া দেখলে পরে ডার্কি(darkies) বোলে মুখ ফেরাব।"

যিনি লিখেছিলেন, তিনি মরা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন কি না সন্দেহ হয়!

আমরা সে দিন House of commonsএ গিয়েছিলেম, ভারি নিরাশ হোয়েছিলেম। পার্ল্যামেন্টের অভ্রভেদী চূড়া, প্রকাণ্ড বাড়ি। হাঁ-করা ঘরগুলো দেখ্‌লে খুব তাক্ লেগে যায়। কিন্তু ভিতরে গেলে তেমন ভক্তি হয় না। একটা বড় ঘরে House বসে, ঘরের চারদিকে গোল গ্যালারী, তার এক দিকে দর্শকেরা বসে, আর একদিকে খবরের কাগজের Reporterরা বসে। গ্যালারীর অনেকটা থিয়েটরের dress-circle-এর মত। গ্যালারীর নীচে অর্থাৎ থিয়েটরের জায়গায় stall থাকে, সেইখানে মেম্বররা বসে, তাদের জন্যে দুপাশে দশ দশখানি বেঞ্চি আছে, এক পাশের পাঁচখানি বেঞ্চিতে গবর্ণমেন্টের দল বসে, আর এক পাশের পাঁচ খানি বেঞ্চিতে বিপক্ষ দল বসে, আর সুমুখের একটা প্ল্যাটফর্ম্মের উপর একটা কেদারা আছে, সেই খানে প্রেসিডেন্টের মত এক জন (যাকে speaker বলে) মাথায় পরচুলা (wig) পোরে অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বোসে থাকেন। যদি কেউ কখন কোন অন্যায় ব্যবহার বা কোন আইন বিরুদ্ধ কাজ করে, তাহোলে speaker উঠে তাকে বাধা দেয়। যেখেনে খবরের কাগজের reporterরা সব বসে, তার পেছনে খড়খড়ি-দেওয়া একটা গ্যালারি থাকে, সেইখানে মেয়েরা বসে, বাইরে থেকে মেয়েদের দেখা যায় না; দেখেছো পার্ল্যামেন্টের মেয়েদের আব্রু কত! আমরা যখন গেলেম, তখন O'donnel বোলে একজন Irish member ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, Press Act-এর বিরুদ্ধে ও অন্যান্য নানা বিষয় নিয়ে তিনি আন্দোলন কোরছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে Irish member-রা houseএ অ-

ত্যন্ত অপ্রিয়—তার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হোয়ে গেল। House এর ভাবগতিক দেখে আমি ভারি আশ্চর্য্য হোয়ে গিয়েছিলেম, এমন ছেলেমানুষী সচরাচর দেখা যায় না। যখন একজন কেউ বক্তৃতা কোরচে, তখন হয়ত অনেক মেম্বর মিলে "ইয়া' 'ইয়া' 'ইয়া' 'ইয়া' কোরে জানোয়ারের মত চীৎকার কোরে ডাকাডাকি কোরচে, হাস্‌চে, এবং যত প্রকার অসভ্যতা করবার তা কোরচে,আমাদের দেশে সভায় ইস্কুলের ছোক্‌রারাও হয়ত এমন করে না। কিন্তু তাও দেখেছি, এখানকার অন্যান্য সভায় এ রকম গোলমাল চণ্ডীপাঠ হয় না। অনেক সময়ে বক্তৃতা হোচ্চে কিন্তু মেম্বরেরা কপালের ওপর টুপী টেনে দিয়ে অকাতরে নিদ্রা যাচ্চেন; একবার দেখলেম যে ভারতবর্ষীয় বিষয় নিয়ে একটা বক্তৃতার সময় ঘরে ৯।১০ জনের বেশী মেম্বর ছিল না, অন্যান্য সবাই ঘরের বাইরে হাওয়া খেতে, বা supper খেতে গিয়েছেন। আর যেই Vote নেবার সময় হোল অমনি সবাই চারদিক থেকে এসে উপস্থিত হোলেন; সবাই প্রায় ঘর থেকে ঠিক কোরে এসেছিলেন, কোন্ দিকে Vote দেবেন; বক্তৃতা শুনে বা কোন প্রকার যুক্তি শুনে যে কারো মত স্থির হয়, তাতো বোধ হয় না। অনেক সময় Patriotism, Parti-ism-এর কাছে পরাস্ত মানে। যতদূর দেখেছি আমার ত বোধ হয় Conservative রা অত্যন্ত অন্ধ ভাবে তাদের দলের গোঁড়া। Liberal দের কতকটা reasonable বোলে মনে হয়,তারা যা ভাল বোঝে তাই করে, তাই জন্যে liberal দের আপনাদের মধ্যেও এত মতভেদ। নাক কান চোকমুখ বুজে একটা দলস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে চোল্লে আর বড় একটা পরস্পরের মধ্যে মতভেদ থাকে না। যাহোক্, আমি ভাবছিলেম, এই রকম দলাদলির ছিবলেমির উপর কত কত রাজ্য দেশের শুভাশুভ নির্ভর কোরচে!

সাধের কুসুম-কলি।

(মৃত শিশু কন্যা স্মরণে)

সাধের কুসুম-কলি কেন সখি ঝরিল—
এই যে বিগত রেতে,না কহিতে না চাহিতে
আমারি চোখের পরে মুকুলিত হইল,
সহসা আবার কেন অকালে তা ঝরিল?

এই যে দেখিনু তায়, ঈষৎ বহিলে বায়
কিশোর কোমল বৃন্তে ঢোলে ঢোলে পড়িছে
নিশির শিশির ধার—ঝলকে অঙ্গেতে তার,
চাঁদের জোছানা মেখে হেসে হেসে উঠিছে,

এই যে সে রঙ্গ দেখে, কলিটি হৃদয়ে রেখে
চুমিলাম কতবার মরমের আদরে,
পল্লবে আটকি তায়, তাড়াইনু দুষ্ট বায়,
ঝড় হেরি রেখে দিনু হৃদয়ের ভিতরে,
ভাবিলাম ঝটিকায়, বরঞ্চ তেজিব কায়,
বরঞ্চ ধূলায় আমি ধূলা সহ মিশিব,
বুকের শোণিত দিয়ে, রাখিব তাহারে জীয়ে
তবুও পাপড়ীটি তার, খসিবারে না দিব।
দারুণ সে ঝড় শেষে—মিশিল দিগন্ত দেশে,
শারদ পূর্ণিমা পুনঃ চারিদিকে ছাইল—
আকাশে তারকা রাশি, ঝলকিল হাসি হাসি,
মধুর মৃদুল বায়—মন্দ মন্দ বহিল।
আমিও নিশ্চিন্ত হোয়ে, আশার ভরসা লয়ে,
অভয়ে আঁচল পেতে কুঞ্জধারে শুইনু।
স্নেহের প্রলাপভরে, কল্পনার মোহ ঘোরে,
জাগ্রতে স্বপনে তারে কত ভাবে দেখিনু—
দেখিনু যেন রে হায় পূর্ণ বিকশিত-কায়,
সাধের কুসুম কলি শতদলে ফুটেছে,
রেঙ্গেছে রঙ্গিল রং কতই বেড়েছে ঢং,
হেসে হেসে প্রেমাবেশে বায়ু সনে খেলিছে,
ফুটেছে কুসুম-কলি, মাধুরিতে পড়ে ঢলি,
ধীরে ধীরে প্রজাপতি আশে পাশে ঘুরিছে।
সোহাগের মিষ্ট রবে—ফুঁ দিয়ে উড়াই সবে,
ফুঁ ঘায়ে কীটের দল ঝোরে ঝোরে পড়িছে,
দেখিনু যেন রে হায় পূর্ণ বিকশিত কায়
সাধের কুসুম-কলি শতদলে ফুটেছে।
সুধীরে মলয় বয়, নিকুঞ্জ সুরভিময়,
আমারো আশার নদী শতধারে উঠেছে।
এ দিকে ওদিকে চাই, ওটিতেই চুম খাই,
ওটিতেই মাথা রাখি সন্তপণে সুধীরে,
ওটিকেই চোখে দেখে, ওটিকেই বুকে রেখে
ওটিকেই নেড়ে চেড়ে হৃদি প্রাণ শিহরে,
সহসা ভাঙ্গিল ঘুম, ভাঙ্গিল মোহের ধূম,
আচম্বিতে কুঞ্জপানে হেরে দেখি নয়নে—
বাগান আঁধার ময়—ঝড়গ্রস্ত সমুদয়,
ঘন ঘন বজ্ররাশি পড়িতেছে সঘনে;
আমার কুসুম কলি—সাধের কুসুম কলি!
কইরে নিশানা তার কিছুই না রয়েছে,
সেই কুঞ্জ, সেই বন, এই সেই তরুগণ,
আমারি কপালে শুধু কলিকাটি ঝরেছে।
সখি ওলো দুঃখিনীর সব সাধ ভাঙ্গিল,
সাধের কুসুম-কলি অকালেতে ঝরিল।

সেই যে লো সুকুমার অস্ফুটো মূরতি তার,
সেই তার পাপড়ি গুলি মনে জেগে উঠিছে,
এখনো ভাসিছে মনে লীলাময় বায়ু সনে
কেমন সে হেসে-হেসে ঢুলে ঢুলে পড়িছে,
এখনো পড়িছে মনে, সঙ্গোপনে সন্তর্পণে
রাখিলে সাধের ফুল হৃদয়ের মাঝারে
কি যে হোত সুখোদয়, মরম জোছানাময়,
স্বর্গ মর্ত্ত্য রুদ্ধ যেন একটী সে আধারে।
আদরে উচ্ছ্বাস-ভরে, বিহ্বল কল্পনা ঘোরে
এই তারে চুম খাই—পুনঃ তারে দেখি যে।
নাহি তৃপ্তি দেখিয়াই পুনঃ তারে "চুমি" খাই
পুনঃ তারে টেনে টেনে হৃদয়েতে রাখি যে,
সখি লো ভাবিতে তারে ভাবনা ফুরায় না,
ঝরিল কুসুম যদি—স্মৃতি কেন যায় না।

বঙ্গ-সাহিত্য।

(মহাভারতীয় কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম)

আমরা ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণের জীবনী বাহুল্য রূপে বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি। তাহার মধ্যে অনেক কথাই সাধারণে জানিতেন, সুতরাং সেই সকল চর্ব্বিত চর্ব্বন কতক অংশে বিরক্তিকর হইলেও হইতে পারে—কিন্তু যখন আমাদের উদ্দেশ্যই এই যে মহাভারতের সমগ্র কৃষ্ণকে তাঁহার স্বীয় পূর্ণ মহিমায় প্রকটিত করি; অপর সাধারণের চক্ষে কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব স্পষ্টাক্ষরে জাজ্বল্যমান করি; যমুনা-পুলিন-বিহারী রাধিকা-মনোরঞ্জন কৃষ্ণ, অর্জ্জুনের সারথী ও আর্য্যরাজকুলপতি কৃষ্ণ হইতে কতদূর প্রভিন্ন তাহা দেখাই, তখন পাঠকদের বিরক্তি-ভাজন হইবার আশঙ্কা-সত্বেও আমাদিগকে তাঁহার মহাভারতীয় কীর্ত্তি-কলাপ বাহুল্য রূপে বর্ণনা করিতেই হয়। আমরা তাহা করিয়াছি—এখন দেখিতে হইবে যে মহাভারতের কৃষ্ণ কিরূপে পর-ব্রহ্মের নামান্তর মাত্র হইয়া উঠিলেন, কি রূপে পাণ্ডব-সখা ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকের ইষ্টদেবতা হইয়া পূর্ণ ব্রহ্মের স্থলাভিষিক্ত হইলেন।

একথা বলাই বোধ হয় বাহুল্য যে ভালবাসার ন্যায় দেবভক্তিও মানব হৃদয়ের একটি অপরিহার্য্য কোমল বৃত্তি। লোক-সমাজে না থাকিলে আমাদের মনে দয়া দাক্ষিণ্য—প্রমোদ লালসা ও গৌরব আকাঙ্ক্ষা উত্তেজিত হইতে কখনই পারে না, কিন্তু আমরা যে অবস্থায় যেখানেই থাকি না কেন,—হেমগিরির সমুচ্চ শিখরেই বিহার করি অথবা বিপদ-সাগরে ছিন্ন তৃণের মত বিক্ষিপ্ত হই, সমাজ-কোলাহলের অভ্যন্তরেই অবরুদ্ধ থাকি, অথবা বিজন প্রান্তরে মুক্তভাবে বিচরণ করি, দেব-ভক্তি ও পার্থিব প্রেম আমাদের হৃদয়ের চিরঅনুগামী। সহসা কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে জনশূন্য বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে থাকিয়া মানুষ কিরূপে প্রেমের প্রভাব বুঝিতে পারিবে?—কি রূপে প্রেমের পদার্থ অবর্ত্তমানে, মানুষে সে প্রেম বাহিরে নিয়োজিত করিবে? তাহারা বলিবে যে, বিষয়ের অভাবে প্রবৃত্তিরও লোপ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সে কথা অমূলক। কারণ, ইতিহাস কাব্য নাটকে ইহা দেদীপ্যমান দেখাইয়া দিয়াছে যে মনের অন্য কোমল বৃত্তির মত পার্থিব প্রেম, বিষয়

সাপেক্ষ নহে। কেহ যদি আজন্ম হিমালয়ের অত্যুচ্চ শিখরে একাকী বাস করিয়া আইসে তাহা হইলেও যৌবনের প্রভাবে তাহার হৃদয়ে প্রেমের উদ্রেক হইতেই হইবে—প্রেমের পদার্থ বিহীনে তাহার মনে এক প্রকার অস্পষ্ট অস্ফুট প্রেমলালসার স্বপ্ন-আভাসময় কি এক রকম তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইতে থাকিবে—মনের মানুষ পাইলেই তাহাতেই তাহা সংযোজিত হইবে; না পাইলে কোন পশুপক্ষীর উপরও তাহা পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ হইবে। এমন কি,আমরা গৃহস্থ আশ্রমেও দেখিয়াছি যে সুকুমারমতি বালিকারা আজন্ম-নিহিত ভালবাসার উচ্ছ্বাস আবদ্ধ না রাখিতে পারিয়া কাঠের পুত্তল পুত্তলিকার প্রতি সমস্ত হৃদয় অর্পণ করে। পরে যৌবনে সেই স্নেহ, সেই ভালবাসা তাহারা একত্রীভূত করিয়া স্বামীর প্রতি সংযোজিত করে। দেব-ভক্তিও সেইরূপ। আদিম কালে নিঃসহায় নিরাশ্রয় দুর্ব্বল মানবজাতির স্বভাব-নিহিত দেবভক্তি আপন হৃদয়ে অবরুদ্ধ রাখিতে না পারিয়া, অথচ অন্ধজ্ঞানে দেব-ভক্তির প্রকৃত পদার্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, সামান্য তরুলতা পর্য্যন্ত পূজা করিতে ত্রুটি করে না। পরিশেষে, যখন দিব্যজ্ঞান সহকারে তাহারা পূর্ণব্রহ্মের আভাস পাইতে থাকে, তখন সেই ইতস্ততঃ পরিক্ষিপ্ত ভক্তি-রশ্মি তাহারা এক পরব্রহ্মতে কেন্দ্রীভূত করে। আদিম জ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অকিঞ্চিৎকর তরুলতার উপাসনা ত্যাগ করিয়া মহত্তর পদার্থে সেই ভক্তি সংযোজিত করে—ক্রমে অসাধারণ গুণশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি তাহা প্রযুক্ত করিতে আপনা-আপনি শিক্ষা লাভ করে। এই রূপেই মনুষ্যজাতি আবার মনুষ্যকে পূজা করিতে আরম্ভ করে। যে সময়ে মহাভারতের কৃষ্ণ আর্য্যাবর্ত্তে অবতীর্ণ হয়েন, সে সময়ে আর্য্যাবর্ত্তের প্রকৃত অবস্থা কি? আর্য্যজাতি তখন পূর্ব্বদিকে বঙ্গসাগর হইতে পশ্চিম দিকে মালাবার পর্য্যন্ত এবং হিমালয়ের দক্ষিণ হইতে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত বিজয়ী ভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল—এমন কি, সিংহলরাজা পর্য্যন্ত তাঁহাদের করপ্রদ ছিল। কিন্তু এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য কুশল ও শান্তিময় ছিল না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজারা পরস্পরের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ করিয়া ও মহত্তর নৃপতিরা পরস্পরের সহিত সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া এবং ক্ষুদ্রে ও মহতে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আকৃষ্ট হইয়া সমস্ত ভারত রাজ্যকে বিকম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল। আদিম জাতি পরাজিত হইলেও আর্য্যেরা আপনাআপনি কখন ঈর্ষা প্রযুক্ত, কখন লোভপরবশ হইয়া, কখন সামান্য ছল ধরিয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিল। শিল্প কার্য্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রণ-কৌশলের উন্নতি হইতে লাগিল,—এবং সামাজিক ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে আন্তরিক বৈরিতাও প্রবল হইতে লাগিল। এ দিকে আবার ধর্ম্মের মহা বিপ্লব উপস্থিত। মহাভারত যে সময়েই রচিত হউক না কেন,—ইহা

বোধ হয় নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে যে, সে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মরূপ ভাবী মহাবন্যার প্রথম তরঙ্গ ভারতবর্ষে তটাহত হইতে ছিল। অধুনাতন ঐতিহাসিক লেখকেরা মহাভারতের রচনা যীশুখ্রীস্টের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে অনুমান করেন,—তাহা হইলে মহাভারত বুদ্ধদেব জন্মাইবার পরে অবশ্যই হইবে, কেন না শাক্যসিংহ যিশুখ্রীস্ট জন্মাইবার ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাভারত যে সময়েই রচিত হউক না কেন,—তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম-সম্পর্কে এত উল্লেখ, এত কটাক্ষ, এত প্রাসঙ্গিক বিতণ্ডা আছে যে, সে সময়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের যে প্রথম হিল্লোল প্রবাহিত হইতেছিল, সে বিষয়ে আর কিছুই সংশয় হইতে পারে না। এই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম হিল্লোলে দার্শনিকদের নিরীশ্বরবাদ ও সেশ্বরবাদকে জাগরূক করিয়া ফেলিল,—এক দিকে প্রকৃতি ও পুরুষ—কামনা-বিশিষ্ট ঈশ্বর, ঈশ্বরই নহে—অথবা সকলই ব্রহ্মের ছায়ামাত্র, অপর দিকে বৌদ্ধধর্ম্মের কঠোর দেববৈরিতা আসিয়া হুলস্থূল বাধাইতে লাগিল। দর্শনে দর্শনে যেমন ঘরোয়া-বিবাদ ও মর্ম্মান্তিক সংঘর্ষণ উপস্থিত হইল, সেই রূপ সমগ্র দর্শনের বিরুদ্ধে শাক্য সিংহের সর্ব্ব-উচ্ছেদকারী মত ও বিশ্বাস মস্তকোত্তোলন করিয়া উঠিল। এই রূপে রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রতিদ্বন্দী স্বরূপ ধর্ম্ম-বিপ্লব সংঘটিত হইয়া সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত একটি বৈষম্য-তরঙ্গ-সমাকীর্ণ মহাসমুদ্রের মত তরঙ্গিত হইতে লাগিল। সেই তরঙ্গের প্রবল উচ্ছ্বাসে ইন্দ্র, ব্রহ্মা, মহাদেব আদি দেবতারা যে কোথায় ভাসিয়া গেলেন তাহার ঠিকানা পাওয়াই গেল না। আর্য্যাবর্ত্তে রাজনৈতিক স্থিরতা রহিল না, আর্য্যাবর্ত্তে ধর্ম্মের স্থিরতা রহিল না। এই রূপ ধর্ম্মবিপ্লবে আর্য্য-হৃদয় ক্ষুব্ধ সমুদ্রে কর্ণহীন তরীর মত আহত প্রতিহত হইয়া রাজনৈতিক বিপ্লবকে অধিকতর প্রবল করিয়া তুলিল। এই সময়ে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেন। সেই ক্ষুব্ধ সাগরে তিনি পর্ব্বতের মত উত্থিত হইয়া তরঙ্গের কোলাহল দেখিলেন ও ভাবিলেন যে এই দ্বিবিধ প্রতিদ্বন্দী তরঙ্গ সমূহ প্রশান্ত না হইলে আর্য্যাবর্ত্তের আর সম্পদ নাই। এই ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি স্থির করিলেন যে সমস্ত আর্য্য সাম্রাজ্য এক-ছত্র-ভুক্ত করিলেই রাজনৈতিক বিপ্লব শমিত হইবে, এবং স্ব স্ব বিদ্রোহী দর্শন সমূহের সামঞ্জস্য করিলেই ধর্ম্মবিপ্লব শান্ত হইবে। প্রথম উদ্দেশ্য সাধনার্থ তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক, অথচ সকল দিক বাঁচাইয়া কুরুপাণ্ডবদের যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিলেন, কারণ তিনি জানিতেন যে সেই যুদ্ধের পরিণামস্বরূপ একা যুধিষ্ঠিরই সমস্ত ভারতরাজ্যকে স্বীয় ধর্ম্মপ্রভাবে এক রজ্জুতে গ্রথিত করিতে পারিবেন। অপর দিকে তিনি ভগবদ্গীতা প্রচার করিয়া নিরীশ্বর ও সেশ্বর দর্শনদিগকে এক সেশ্বর-সূত্রেতে গ্রথিত করিলেন, কারণ তিনি জানিতেন যে এই সকল বিচ্ছিন্ন ও প্রভিন্ন মত ও বিশ্বাসকে যুক্তিময় এক সেশ্বরবাদিত্বে পরিণত করিলেই

তিনি ধর্ম্মবিপ্লবের ঝঞ্ঝা কিয়ৎ পরিমাণে নিরস্ত করিতে পারিবেন *।

স্বীয় বুদ্ধিবলে, স্বীয় কৌশল-চক্রে, স্বীয় পরিণাম-দর্শিতার অমোঘ প্রভাবে তিনি উভয় উদ্দেশ্যই সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। এক দিকে আর্য্যাবর্ত্তের কেন্দ্র-ভূমিতে যেমন যুধিষ্ঠিরের এক ছত্র প্রতিষ্ঠিত হইল, অপর দিকে বৈষম্যময় দর্শনের সামঞ্জস্যকারী ভগবদ্গীতাও সেই রূপ বদ্ধমূল হইয়া পড়িল। কিন্তু ভগবদ্গীতার সার তত্ত্ব চারিদিকে প্রচারিত হইলেই বা কি হইবে? দর্শন সমূহের সামঞ্জস্য সম্পাদিত হইলেও, বৌদ্ধধর্ম্মের অরাতি-প্রভাব কি রূপে বিনষ্ট হইবে? ভগবদ্গীতা দ্বারা যাহা সমর্থিত হইল, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবল স্রোতে তাহা উন্মূলিত হওয়াতে আর্য্য-হৃদয়ে কেবল স্তরে স্তরে মরু ভূমি সৃষ্ট হইতে লাগিল। আদিম দেবতারা মহাভারতের সাময়িক ধর্ম্মবিপ্লবে ত অন্তর্হিত হইয়াছিল, তার পরে বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শন সমূহের সংঘর্ষণ, তাহার পরিণাম স্বরূপ কতকটা নাস্তিকতার অবতারণা। তাহার পরে ভগবদ্গীতা ও বৌদ্ধধর্ম্মের সংঘর্ষণ, তাহার ফল স্বরূপ আর্য্য হৃদয়ে একটী কন্টকর, অন্ধকারময় শূন্যভাব। এই দিগন্তব্যাপী শূন্য ভাবে ক্রমে ক্রমে যখন আর্য্য হৃদয় শিথিল, অবসন্ন, মৃতকল্প হইয়া আসিতেছিল, সেই সময়েই শ্রীমদ্ভাগবতকার জন্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি ধর্ম্মের এই সাংঘাতিক অবস্থার শিরে শিরে প্রবেশ করিয়া নূতন এক দেবতার সৃজনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি কৃষ্ণকেই বিষ্ণুর এক অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। তিনি জানিতেন যে মহাভারত তখনও পর্য্যন্ত পরম্পরা ক্রমে সকলের মনেই জাগরূক রহিয়াছে—তিনি জানিতেন যে মহাভারতীয় বীর পুরুষেরাই তখনও পর্য্যন্ত সকলের মনে আরাধ্য হইয়া রহিয়াছেন, তিনি জানিতেন যে কৃষ্ণই সকল বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর পদবীতে সমারূঢ় হইয়া মহাভারতীয় মহিমার শিখর দেশে বিরাজ করিতেছেন—তিনি জানিতেন যে মহাভারত পর্য্যন্ত তাঁহাতেই দেবত্বের আভাস দান করিয়াছে, সুতরাং তিনিও সেই কৃষ্ণের দেবত্ব-আভাস লইয়া আর্য্য-হৃদয়রূপ মরুভূমিতে একটি মৃতসঞ্জীবন লীলাময় সুন্দর নদ প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতকারের গূঢ়-উদ্দেশ্য সমালোচনা করিতে করিতে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। মহাভারতের প্রকৃত নায়ককে দেবত্ব পদে অভিষিক্ত করাতে তাঁহার মনোবিজ্ঞানবিদ্যার বিশেষ পরিচয়

* কেহ কেহ বলেন বটে যে ভগবদ্গীতা বহুকাল পরে মহাভারতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমরা বিশেষ প্রমাণ না পাইলে সে মত গ্রাহ্য করিতে পারি না। শুদ্ধ এক লেখার তারতম্য দ্বারা কিছুই স্থিরীকৃত হইতে পারে না। আর ওয়েবর ও ল্যাশন প্রভৃতি যাঁরা ভগবদ্গীতাকে বাইবেল হইতে গৃহীত বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন, তাঁদের অগ্রে এইটিই প্রদর্শন করা উচিত যে ভগবদ্গীতা হইতে বাইবেল গৃহীত কি না।

দিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে অর্জ্জুনই মহাভারতের প্রকৃত নায়ক। আমরা সে কথা স্বীকার করি না, যদিও আমরা স্বীকার করি যে বেদব্যাস অর্জ্জুনকে বীরত্ব বিষয়ে যতদূর শ্রেষ্ঠতা প্রদান করা সম্ভব তাহা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু কাহার শৌর্য্যে অর্জ্জুনের শৌর্য্য?—কাহার বলে অর্জ্জুন বলীয়ান? যে অর্জ্জুন একা বিরাটপর্ব্বে তরঙ্গ-সমাকুল কৌরব-সাগর মন্থন করিয়া নিজ বীরত্বের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যে অর্জ্জুন কর্ণ আদি মহাশূরদিগকে ভূমিসাৎ করিয়াছিলেন, যে অর্জ্জুন দিগ্বিজয় করিতে গিয়া সমস্ত ভারতবর্ষে আপন অমোঘ শক্তির কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন, কেনই বা তিনি কৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর স্বীয় গাণ্ডীব ধনু পর্য্যন্ত তুলিতে অক্ষম হইয়াছিলেন? কেনই বা কৃষ্ণের মৃত্যুর পর তদীয় বিধবা রমণীকুলকে তাঁহার সমক্ষেই ইতর দস্যুরা পর্য্যন্ত অপমান করিতে সক্ষম হইয়াছিল? ইহাতে কি স্পষ্টই বোধ হয় না যে বেদব্যাস অর্জ্জুন অপেক্ষা কৃষ্ণের মাহাত্ম্য অধিকতর রূপে কীর্ত্তিত করিতে লালায়িত ছিলেন। মহাভারতে ভারত-কবি চারি জনকে বিশেষ চাকচিক্যে সমুজ্জ্বলিত করিয়াছেন। প্রথমে ভীষ্ম। কিন্তু ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড দেশীয় সূর্য্যের মত কুরুপাণ্ডব-সমরে তাঁহাকে উদিত করিয়াই অচিরাৎ অস্তমিত করিলেন। দ্বিতীয় কর্ণ। কিন্তু কর্ণ কুরুপাণ্ডব-সমরে দাবানলের মত প্রজ্জ্বলিত হইয়াই কৃষ্ণের কৌশলে অবিলম্বেই নির্ব্বাপিত হইলেন। তৃতীয়তঃ অর্জ্জুন। তিনি ভীষণ ধূমকেতুর মত অরাতি-অনিষ্টকারী হইলেও, কৃষ্ণ রূপ সূর্য্যের তেজেই তিনি তেজীয়ান হইয়াছিলেন। সুতরাং আপনার বলে বলী, আপনার তেজে তেজীয়ান, আপনার বুদ্ধিতে কৌশলী, আপনার অপ্রতিহত প্রতাপে প্রতাপান্বিত কৃষ্ণই বেদব্যাসের কল্পনার চরম শিখরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহাভারতকার শুদ্ধ তাঁহাকে ঐশিকী বলে বলীয়ান করেন নাই, শুদ্ধ তাঁহাকে পাণ্ডবদিগের মন্ত্রণাদাতা রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই—শুদ্ধ তাঁহাকে অর্জ্জুনের সারথীরূপে বর্ণনা করেন নাই। কৃষ্ণ স্বীয় অমোঘ বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া, স্বীয় নারায়ণী সেনাগণের উপর নির্ভর করিয়া রুক্মিণী হরণ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, স্বীয় দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপের উপর নির্ভর করিয়া যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় সমবেত আর্য্য ভূপতিগণের সমক্ষে শিশুপালকে স্বহস্তে বিনাশ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। কি রাজনৈতিক ব্যাপারে, কি শৌর্য্য-বিষয়ে, বেদব্যাস কৃষ্ণকে তাঁহার কল্পনার সকল প্রকার সার রত্নে, তাঁহার কবিতার সকল প্রকার সার বর্ণে, তাঁহার উল্লাসের সকল প্রকার সার উচ্ছ্বাসে, তাঁহার কারু কার্য্যের সকল প্রকার সার চাকচিক্যে বিভূষিত করিয়াছেন। মহাভারতীয় সময়ের যাহা কিছু লোকরঞ্জন, যাহা কিছু গৌরবান্বিত, যাহা কিছু দেব-প্রতিমতা তাহার দ্বারাই

কৃষ্ণকে গরীয়ান করিয়াছেন! মিল্‌টনকৃত প্যারাডাইজ্ লষ্টের্ যীশুখৃষ্টের মত, ব্যাসকৃত মহাভারতের প্রকৃত নায়কই কৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণকেই শ্রীমদ্ভাগবতকারের বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইবার কারণ কি? দার্শনিক কবি শ্রীমদ্ভাগবতকার জানিতেন যে, যে দেবতা মনুষ্যের পার্থিব দুঃখ বিমোচনের জন্য যুগে যুগে অবতার রূপে সময়োচিত আকার ধারণ করিয়াছিলেন, যে দেবতা মনুষ্যের দুঃখে সুখে মমতা অনুভব করিয়া বৈকুণ্ঠের সুখ সমৃদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, যে দেবতা শুদ্ধ সৃষ্টি করিয়াই পরিতৃপ্ত নহেন ও সংহারই যাঁহার মুখ্য সঙ্কল্প নহে, মনুষ্যের পার্থিব হৃদয়ের সহিত সেই দেবতারই অধিকতর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ হইবার সম্ভাবনা,—সেই দেবতাকেই তিনি আর্য্যহৃদয়ের মরুভূমির মধ্যে লীলাময় উৎসরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু কেন তাঁহাকে সহস্র গোপিকা-বিমোহনরূপে বর্ণনা করিলেন? কেন তিনি তাঁহাকে যমুনা-পুলিন-বিহারী, গোপিকার মনোরঞ্জন রূপে প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা পাইলেন? তিনি দেখিলেন যে আর্য্যাবর্ত্তে আর সে বীর-শঙ্খ বাদনের সম্ভাবনা নাই, তিনি দেখিলেন যে রাজনৈতিক সম্পর্কে কুরুপাণ্ডবদের যুদ্ধের পর সকলই কুশল ও শান্তিময়, সুতরাং তিনি সময়োচিত ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কৃষ্ণকে রাসলীলাময় গোপবালকরূপে বর্ণনা করিতে চেষ্টা পাইলেন। অস্ত্রের ঝঞ্ঝনাধ্বনি, রণ-শংখ্যের উন্মাদকারী, ও যুদ্ধের উন্মাদকারী ভীষণ ব্যোম-বিদারক শব্দের পরিবর্ত্তে তিনি সময় বুঝিয়া বিলাসের মন্দ মন্দ মধুর নিক্বনে আর্য্য হৃদয় আর্দ্র করিয়া মহাভারতের রাজনীতি-পারদর্শী ও রণ-বিশারদ কৃষ্ণের পরিবর্ত্তে লীলাময় কৃষ্ণকে আর্য্য-ধর্ম্ম-স্থলে আহ্বান করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে কৃষ্ণ কি রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন? তিনি মহাভারতের দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপময় সেনানায়ক নহেন, তিনি আর বীর-শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের সারথী নহেন, তিনি এখন "ললিতলবঙ্গলতা" সমাবৃত গোপ-নায়ক, এবং তিনি এখন গোপিনী-মনোরঞ্জন মুরলীবাদক। শ্রীমদ্ভাগবতকারেরই আশা ফলবতী হইল। তাঁহার রচনা-কৌশল ও বর্ণনা চাতুর্য্যের সহিত আর্য্য হৃদয়ের উত্তরোত্তর দুর্ব্বলতা এত-দূর মিলিয়া গেল যে, ব্রজবিলাসী কৃষ্ণের প্রভাবে মহাভারতীয় কৃষ্ণ একেবারে রাহুগ্রস্ত হইলেন। ভারতবর্ষের যে খানেই এখন কৃষ্ণের পূজা হউক না কেন, তিনি আর সুদর্শন-চক্রধারী নহেন, তিনি মুরলীধারী এবং তিনি আর নারায়ণী সেনার সেনাপতি নহেন, তিনি সহস্র গোপিকার প্রাণবল্লভ। এমন কি, কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিবামাত্রই লোকের মনে তাঁর মহাভারতীয় মহিমার কথা মনে আসে না, কেবল তাঁহার বিভ্রম বিলাসের কথাই মনে আসে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ হিন্দিতে অনুবাদিত হইয়া "প্রেম-সাগর" নামে আখ্যাত হইল, এবং শিথিলমনা

বঙ্গ-রাজ্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব প্রভৃতি কবিরা সেই দশম স্কন্ধ অবলম্বন করিয়া আদি রসের তুফান তুলিতে লাগিলেন। এই সকল বিলাসময় কবিতার পরিণাম স্বরূপ, কৃষ্ণ-ভক্তদের মধ্যে এত প্রকার জঘন্য রীতিনীতি-সম্পন্ন সম্প্রদায় উঠিতে লাগিল যে বর্ণনা করা যায় না। এখনো বঙ্গদেশের কোন কোন অংশে ও বম্বাই প্রদেশের স্থানে স্থানে বৈষ্ণব ধর্ম্মের নামে যদৃচ্ছাচারিতা এতদূর বলবতী, যে কোন কোন সময়ে পুলীসের সাহায্য লইয়া তাহার বিষময় স্রোত অবরুদ্ধ করিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের সময় হইতেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই আভাস ঈষৎ পরিমাণে বিকাশ পাইয়াছিল এবং এই জন্যই কেহ কেহ শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের গূঢ় অভিপ্রায় কেবল রূপক ব্যতীত যে আর কিছুই নহে তাহা প্রতিপন্ন করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পাইয়াছিলেন। প্রথমেই ত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণকার এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলেন যে রাধা কৃষ্ণের লীলা কেবল প্রকৃতি পুরুষের লীলার রূপক মাত্র। রাধিকা প্রকৃতি-রূপা ও কৃষ্ণ পুরুষ-প্রধান, মর্ত্ত্যলোকে মানবমাত্রেই ঐ প্রকৃতি ও পুরুষের সমষ্টি মাত্র, ঐ উভয়ের একতা ও এক সঙ্গে লীলাতেই মানবজন্মের সুখ দুঃখ এবং মোহমায়া। যখন প্রকৃতি হইতে পুরুষ বিচ্ছিন্ন হয়েন, তখনই নির্ব্বান মুক্তির পথ উদ্ঘাটিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতকারের উদ্দেশ্য বাস্তবিক এই রূপ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যে তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য এতদূর আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, সে উদ্দেশ্য অনুভূতির বিষয়ই নহে। বিশেষতঃ সাধারণে তাঁহার রূপকের ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া সহজেই কুপথের পথিক হইতেছে। বঙ্গদেশে আবার জয়দেব গোস্বামী "কোমল মলয় সমীরের" হিল্লোল তুলিয়া ও ললিত লবঙ্গ লতাকে মৃদু মন্দ কাঁপাইয়া কৃষ্ণের বসন্ত-বিহার যেরূপ কৌশল-সহকারে বর্ণনা করিলেন তাহাতে তিনিও বঙ্গদেশের বৈষ্ণবধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে কলঙ্কিত করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাঁহার আদি-রসময় তরল তরঙ্গে বঙ্গদেশ আপ্লুত না হইতে হইতেই চৈতন্য দেব নিজ বিশ্বাস ও বুদ্ধি বলে বিশেষ রূপে সে তরঙ্গের গতি রোধ করিতে পারিয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণকারের ন্যায় তিনিও কৃষ্ণের লীলা-বর্ণনা কেবল রূপকমাত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ আবার জয়দেব-বর্ণিত কৃষ্ণ-লীলাকে এইরূপে ভাঙ্গিলেন যে কবিবর আমাদের জীবাত্মাকে কৃষ্ণরূপে বর্ণনা করিয়াছেন,—রাধিকা, ধর্ম্মের বিমল আনন্দ, এবং গোপিকাকুল, মর্ত্ত্যের পার্থিব লালসা সমূহ।

কিন্তু রূপকের যাহাই অর্থ হউক, সাধারণ বৈষ্ণব সম্প্রদায় সে সকল অর্থ গ্রহণ করে না, এবং এই জন্যই বৈষ্ণব ধর্ম্মের দিন দিন এতদূর অবনতি হইয়া আসিতেছে।

নিদ্রা, স্বপ্ন, মস্তিষ্ক ও আত্মা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

আমাদের মনের প্রকৃতিই এই যে, একটি ভাবের সংসর্গ বা সংশ্রবে আর একটি ভাব পরম্পরাক্রমে উদ্বোধিত হয়। আমাদের মানসিক ভাব-প্রতিবিম্ব সকল পরস্পর এরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আছে যে, উহার একটির উদয় হইলে, আর কতকগুলি ভাব-প্রতিবিম্ব তাহার সঙ্গে সঙ্গে উদয় হয়। অনেক সময় আমাদের মনে এমন অনেক ভাবের উদয় হয়, যাহার সূত্র আমরা ধরিতে পারি না,কি প্রকার অনুসঙ্গ-নিয়মে তাহাদের উদয় হইল তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু ইহা বিলক্ষণ সম্ভব বলিয়া বোধ হয় যে ইন্দ্রিয়োপনীত কোন বাহ্য প্রতিবিম্ব আমাদের মনে অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করিয়া ঐ সকল ভাব কিম্বা চিন্তা-শ্রেণীর প্রথম সূত্রপাত করিয়া দেয়।

আমাদের জাগ্রৎ-অবস্থায় মনোমধ্যে ইন্দ্রিয়োপনীত অসংখ্য বাহ্য প্রতিবিম্ব সকল চারিদিক হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়—নিদ্রাবস্থাতে সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য যে একেবারে নিবৃত্ত হয় না, তাহা পাঠক মাত্রেই নিজ নিজ পরীক্ষায় অবগত আছেন। তবে, সে সময় যে সকল বাহ্য প্রতিবিম্ব ইন্দ্রিয় দ্বারা মনে উপনীত হয়, তাহার সংখ্যা অতি অল্প। নিদ্রার সময় কখন কখন কোন সামান্য মৃদু শব্দ কর্ণে পতিত হইলে মনে হয় বুঝি কামানের আওয়াজ হইল।

এইরূপে একবার কোন সূত্রে কোন একটি মানসিক প্রতিবিম্ব মনোমধ্যে উদ্বোধিত হইলেই তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য নানা প্রকার মানসিক প্রতিবিম্বের উদয় হয়। এবং ঐ সকল প্রতিবিম্বের উদয়ে জাগ্রৎকালে হৃদয়ের যে সকল ভাব হয়—স্বপ্নাবস্থাতেও ঠিক্ সেই সকল হৃদয়ের ভাব উত্তেজিত হয়। অতএব ঐ পর্য্যন্ত জানা যাইতেছে যে, নিদ্রাকালে স্বপ্নাবস্থায় মন ও হৃদয়ের ভাব সকল নিদ্রিত হয় না। সকল না হউক, কতকগুলি ভাব যে জাগ্রৎ-কালের ন্যায় সমানরূপে সক্রিয় ও ব্যস্ত থাকে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ইচ্ছাও নিদ্রিত হয় না—কেবল ইচ্ছার কর্তৃত্ব শক্তি তিরোহিত হয়। স্বপ্নাবস্থায় আমরা যে নানা প্রকার কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই—তবে আমাদের ইচ্ছার আদেশ শরীর পালন করে না এই মাত্র। আমরা অনেক সময়ে স্বপ্ন দেখি যেন আমরা কোন বিপদে পতিত হইয়াছি—সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাই-বার জন্য, সেই বিপদের স্থল হইতে পলা-ইবার নিমিত্ত, আমরা আমাদিগের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলকে চালিত করিবার জন্য

কত চেষ্টা করি এবং আমাদের চেষ্টার বিফলতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া স্বপ্নাবস্থাতেই কত সময় কষ্ট অনুভব করিয়া থাকি। নিদ্রাবস্থায় চূড়ান্ত মস্তিষ্ক-মণ্ডলদ্বয় জাগ্রৎ থাকে, আর কেন্দ্রস্থ ও তলস্থ উপমস্তিষ্ক দ্বয় নিদ্রিত হয়, এই যে মতটি—স্বপ্ন ব্যাপারের সহিত ইহার কোন বিরোধ দেখা যায় না, প্রত্যুত স্বপ্নব্যাপার দ্বারাই উহা সপ্রমাণ হয়। তবে এই চূড়ান্ত মস্তিষ্কমণ্ডলের মধ্যেও কতক অংশ নিদ্রিত ও কতক অংশ জাগ্রৎ থাকে কি না, তাহা আর একটি সমস্যা-স্থল।

আচার্য্য ফেরিয়ার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে প্রত্যেক উপমস্তিষ্কেরই যে স্বতন্ত্র কার্য্য শুদ্ধ তাহা নহে, প্রত্যেক উপমস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশেরও আবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য আছে। যদি উপমস্তিষ্ক গুলির প্রত্যেক অংশের স্বতন্ত্র কার্য্য থাকা সত্য হয়,—তাহা হইলে চূড়ান্ত মস্তিষ্ক মণ্ডলদ্বয়ের প্রত্যেক অংশেরও যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য নির্দ্দিষ্ট থাকিতে পারে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। কিন্তু আমরা অবগত আছি যে উহার অংশ সকল বেণী-বন্ধন প্রণালীর অনুরূপ পরস্পর সংজড়িত ভাবে না থাকুক, তাহারা পরস্পর অতি ঘনিষ্ট ভাবে একত্র আবদ্ধ আছে। এই জন্য সহসা অনুভব করিতে পারা যায় না যে, কি করিয়া উহার এক অংশ নিদ্রিত ও তৎসংলগ্ন অপর অংশটি জাগ্রৎ থাকিবে। বিশেষতঃ আমরা যখন আরও অবগত আছি যে, নিদ্রাবস্থায় রক্ত-রাশি মস্তিষ্কের অংশ মাত্র হইতে নহে, পরন্তু সমস্ত মস্তিষ্ক মণ্ডলার্দ্ধ হইতেই অপসৃত হইয়া যায়।

কিন্তু সে যাহাই হউক, স্বপ্নের প্রকৃতি-গত কোন কোন লক্ষণ দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে স্বপ্নাবস্থায় বুদ্ধি-যন্ত্র-গত কোন কোন অংশের ক্রিয়াও স্থগিত হয়। আমরা যাহা স্বপ্ন দেখি তাহা যে অবাস্তব ইহা স্বপ্নাবস্থায় আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারি না। যাহা অসঙ্গত ও অসম্ভব তাহা অসঙ্গত ও অসম্ভব বলিয়াই আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই না। অনেক দিনকার মৃত ব্যক্তিগণ স্বপ্নাবস্থায় যখন আমাদিগের নিকট উপস্থিত হন, তখন আমরা অনেক সময় বিস্মিত হই না। গভীর জলের উপর দিয়া আমরা হাঁটিয়া যাই, শূন্যে উড়িয়া বেড়াই, তাহাতে অনেক সময় আশ্চর্য্য হই না। যতই কেন অসাধ্য, যতই কেন অসম্ভব ব্যাপার হোউক না—তাহাতে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে।

মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের সাধারণ মতটি এই যে, নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য স্থগিত হয় বলিয়া তাহারা অন্যান্য মানসিক ক্রিয়ার ভ্রম সংশোধন করিতে পারে না।

মন, স্বসৃষ্ট ব্যাপারের সহিত কোন বাহ্য বস্তুর তুলনা করিতে পারে না বলিয়াই সেই সকল ব্যাপারকে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করে। জাগ্রৎ অবস্থার ঘটনা সকল মন যেরূপ অসন্দিগ্ধ ভাবে বিশ্বাস করে—স্বপ্ন-গত ঘটনা সকলের অস্তিত্বে

তেমনি তাহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে; যে হেতু সে সময় এই উভয়বিধ ঘটনার মধ্যে কি প্রভেদ তাহা উপলব্ধি করিবার কোন উপায় থাকে না।

কিন্তু Cox নামক কোন পণ্ডিত এই রূপ আপত্তি করেন—যে "ভাল, মানিলাম, মনের মধ্যে ঐ সকল অসম্ভব ঘটনার অস্তিত্ব উপলব্ধি করি বলিয়াই উহাদের বাহ্য অস্তিত্বেও আমাদের বিশ্বাস জন্মে; কিন্তু যখন মৃত ব্যক্তিকে সজীব দেখি, দূরকে নিকটে দেখি—অসম্ভব অসাধ্য ব্যাপারকে অনায়াসে সম্পন্ন করি; তখন আমরা বিস্মিত হই না কেন ? "

প্রথমতঃ এরূপ স্থলে যে বিস্ময় কখনই উদয় হয় না, তাহা কি সত্য ?

স্বপ্নব্যাপার সকলেরই পরীক্ষাধীন। আমি নিজ পরীক্ষার কথা বলিতেছি—আমি কোন অসম্ভব ঘটনার স্বপ্ন দেখিয়া কখন বা বিস্মিত হইয়াছি, কখন বা বিস্মিত হইও নাই। যখন মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে সজীব দেখিয়াছি—কিম্বা শূন্যে উড়িতেছি, তখন কখন বা আশ্চর্য্য হইয়াছি, কখন বা হই নাই। অধিকাংশ সময়ে যে আমরা আশ্চর্য্য হই না, তাহার কারণ এই যে, হাজার অসম্ভব ঘটনা হউক না কেন, যখন আমি মনের স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তখন অবশ্য উহা অসম্ভব নহে—উহা তো হইতেই পারে, উহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই—এই রূপ যুক্তি-পরম্পরা দ্রুতগতি মনোমধ্যে দিয়া চলিয়া যায়। জাগ্রৎ অবস্থায় যদি কোন অসম্ভব ব্যাপারের কল্পনা আমাদের মনোমধ্যে উদয় হয়—আর যদি সেই কল্পনা এতদূর দৃঢ়রূপে মনকে অধিকার করে যে আমাদিগের বাহ্যজ্ঞান পর্য্যন্ত কিয়ৎ কালের জন্য তিরোহিত হয়, তাহা হইলে কিয়ৎক্ষণের জন্য সেই কল্পনা-গত ব্যাপারকে জাগ্রৎ অবস্থাতেও বাস্তব বলিয়া বিশ্বাস হয়—কিন্তু যখনি আবার আমাদের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আইসে—তখনি কল্পনাগত বিষয়কে বাহ্য-পদার্থের সহিত তুলনা করিয়া সে ভ্রম দূর হইয়া যায়। স্বপ্নাবস্থায় যে আমাদের বিচার-শক্তি, তুলনা শক্তি একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়—এ কথা সত্য নহে। মনের মধ্যে যে সকল প্রতিবিম্ব বিচারের মূল-উপকরণ স্বরূপ বিদ্যমান থাকে সেই উপকরণ গুলি লইয়াই তখন মন বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয়—এবং সেই মূল উপকরণ গুলিকে পত্তনভূমি করিয়া যুক্তি-পরম্পরা-অনুসারে যেরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে, মন সেই রূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়। বিচারের উপস্থিত মূল উপকরণ ধরিতে গেলে—সে হিসাবে বিচারের সিদ্ধান্ত অনেক সময় যুক্তিসিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু আসলে সত্য নাও হইতে পারে। সে সিদ্ধান্ত যে সত্য হয় না, তাহা অনেক স্থলে বিচারের দোষে নহে পরন্তু উপস্থিত মূল উপকরণের অসম্পূর্ণতা হেতু। মন, মানসিক বিষয় গুলির সহিত বাহ্য বিষয়ের তুলনা করিতে পারে না বলিয়াই অনেক সময়ে স্বপ্নাবস্থার সিদ্ধান্ত সত্য হয় না। কিন্তু যে সকল স্থলে বাহ্য-বস্তুর সহিত

তুলনার আবশ্যক হয় না—স্বপ্নাবস্থায় সে সকল স্থলে মন অনেক সময়ে সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এরূপ তো অনেক শোনা গিয়াছে যে কোন কোন গণিত-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত যে সকল সমস্যা জাগ্রতাবস্থায় সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই, স্বপ্নাবস্থায় তাহার যথার্থ সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অনেক সময় আমরা স্বপ্নে বক্তৃতা করি—প্রবন্ধ লিখি; সেই সকল বক্তৃতা ও প্রবন্ধ অনেক সময় বেশ যুক্তিগর্ভ হয়। যুক্তিগর্ভ হইয়াছে বলিয়া যে শুধু আমরা স্বপ্ন দেখি তাহা নহে—জাগ্রৎ হইয়া যখন সে স্বপ্ন-গত বক্তৃতা কিম্বা প্রবন্ধ আমাদের স্মরণে আইসে, তাহাতে বাস্তবিকই কোন প্রকার যুক্তির দোষ দেখিতে পাই না।

অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, আমাদের মস্তিষ্কের তলস্থ উপমস্তিষ্ক, যাহা শরীরের গতিক্রিয়াকে নিয়মিত করে, সেই তলস্থ উপমস্তিষ্কের উপরেই নিদ্রার অধিক প্রভাব, তাহার নীচে ইন্দ্রিয়-প্রতিবিম্ব-গ্রাহী উপমস্তিষ্কের উপর—তাহার নিচে বুদ্ধির যন্ত্র-স্বরূপ চূড়ান্ত মস্তিষ্ক মণ্ডলের উপর। যখন আমাদিগর মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশগুলি নিদ্রিত হয়, কেবল এই বুদ্ধিযন্ত্রগত চূড়ান্ত মস্তিষ্কটি জাগ্রৎ থাকে—তখনই আমরা স্বপ্ন দেখি, এই স্বপ্ন ব্যাপার পরীক্ষা করিয়া আমরা মন ও আত্মার প্রকৃতি অনেক পরিমাণে নিরূপণ করিতে পারি। আর একটি সুবিধার বিষয় এই যে, স্বপ্ন-ব্যাপার পরীক্ষা করা সকলেরই আয়ত্তাধীন। আর, কি জড়বাদী কি প্রামানিক সম্প্রদায়, এ প্রকার পরীক্ষাকে কেহই অবজ্ঞা করিতে পারেন না। কারণ স্বপ্ন-ব্যাপারের অস্তিত্বকে কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। এই স্বপ্নাবস্থায় মন ও আত্মার কোন্ কোন্ বৃত্তি সক্রিয় থাকে, আর কোন্ বৃত্তিই বা নিষ্ক্রিয় হয় দেখা যাউক।

সে সময় কি আমাদের অহংবোধ তিরোহিত হয়? না—স্বপ্নের সময় আমাদের অহংবোধ বিলক্ষণ থাকে। স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি কখন মনে করে না যে সে অন্য ব্যক্তি। সে এরূপ স্বপ্ন দেখিতে পারে যে, সে যেন রাজা কিম্বা ভিখারী কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে, কিন্তু সে রাজাই হোক্, ভিখারীই হোক্,—বা অন্য যে কেহই হোক—সে যে, সেই আছে, তাহাতে তার কোন সন্দেহ থাকে না, সে কেবল অন্যের চরিত্র অভিনয় করিতেছে এই মাত্র।

আমাদের ইচ্ছা কি সে সময় একেবারে তিরোহিত হয়? তাহাও নহে। স্বপ্নদর্শী মন, সে সময় উপলব্ধি করিতে পারে যে, সে তার ইচ্ছাকে চালনা করিতেছে, এবং সে বিশ্বাস করে যে সে যেরূপ ইচ্ছা করিতেছে তাহাই সম্পন্ন হইতেছে। তাহার ইচ্ছা-শক্তি সে সময় সম্পূর্ণ থাকে, তবে তাহার ইচ্ছার আজ্ঞা শরীর বাস্তবিক পালন করে না। জাগ্রৎ অবস্থায় আমরা কথা কহিতে ইচ্ছা করি, দৌড়িতে ইচ্ছা করি, কিম্বা অন্য কোন কোন প্রকার কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি, স্বপ্নাবস্থাতেও আমরা ঠিক্

সেইরূপ করি। তবে প্রভেদ এই যে, আমাদের শরীরের স্নায়ুযন্ত্র সে সকল ইচ্ছাকে বাস্তবিক কার্য্যে পরিণত করে না।

কল্পনা শক্তি তো জাগ্রৎ অবস্থা অপেক্ষা স্বপ্নাবস্থাতে আরও অধিক বলবৎ ও সক্রিয় হয়। বুদ্ধিবৃত্তি সকলও সে সময় নিষ্ক্রিয় হয় না—কারণ স্বপ্নাবস্থায় আমরা বেশ বিচার করিতে পারি। তবে যে পূর্ব্বপক্ষ সমূহকে পত্তনভূমি করিয়া আমরা বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই—সেই পূর্ব্বপক্ষগুলি ঠিক না হইতে পারে, তৎপ্রযুক্ত আমাদিগের সিদ্ধান্তও অনেক সময় মিথ্যা হইয়া যায়। আমাদের অহংজ্ঞানের সমক্ষে যে কোন প্রতিবিম্ব উপস্থিত হয়, তাহাই আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করি এবং সেই সকল প্রতিবিম্ব-রূপ উপকরণ লইয়া আমরা বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই।

হৃদয়ের ভাব সকলও স্বপ্নাবস্থায় অন্তর্হিত হয় না। স্বপ্ন-কল্পিত ঘটনাগুলি সত্য হইলে জাগ্রৎ অবস্থায় আমাদের হৃদয়ের ভাব যেরূপ উত্তেজিত হইত, স্বপ্নাবস্থাতেও ঠিক্ সেইরূপ উত্তেজিত হয়। স্বপ্ন-কল্পিত ঘটনাগুলি আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি বলিয়াই ঐরূপ হয়। সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি কেন? না যেহেতু তাহাদিগের সত্তা আমরা মনোমধ্যে উপলব্ধি করি।

বাহ্য জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মন যখন কার্য্য করে—মনের এই বিচ্ছিন্ন অবঅবস্থার ক্রিয়া সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সর্ব্ব প্রথমে এই সত্যটি আমাদের মনে প্রতিভাত হয় যে, মনোমধ্যে এমন কোন একটি পদার্থ আছে যাহা বাহ্য জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র,ও স্বাধীন—বাহ্য জগতের অনস্তিত্বে তাহার অস্তিত্ব লোপ হয় না—সে আপনার অভ্যন্তরে আর একটি নূতন জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে থাকিতে পারে।

শুদ্ধ তাহা নহে। যে পদার্থ নিদ্রার সময় বাহ্য জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনাতেই আপনি অবস্থিতি করে, শরীর নিদ্রিত হইলেও যে পদার্থ নিদ্রিত হয় না—যাহার নিজ অস্তিত্ব-জ্ঞান বরাবর সমান থাকে—যাহার স্মরণ-শক্তি আছে, যাহার ইচ্ছা আছে—যাহার সুখ দুঃখের জ্ঞান আছে, সে যে জড়ীয় মস্তিষ্ক নহে—সে যে মস্তিষ্করূপ জড়পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, এই অনুমান, কি নিতান্ত অমূলক? শরীর নিদ্রার সময় মৃতবৎ হইলেও যে পদার্থটি জীবিত থাকিয়া কার্য্য করে—এই নিদ্রারূপ ক্ষনিক বিচ্ছেদের স্থলে মৃত্যু আসিয়া শরীরের সহিত যখন চির বিচ্ছেদ স্থাপন করে, তখনও কি সেই পদার্থ নূতন জীবনের উপযোগী অন্যান্য নূতন শক্তি লাভ করিয়া জীবিত থাকিতে পারে না?

স্বপ্ন-কল্পিত বিষয় সকলের অস্তিত্বে আমরা অসন্দিগ্ধচিত্তে বিশ্বাস করি কেন? বুদ্ধিবৃত্তি সকলের অন্তর্ধান তাহার হেতু নহে, যেহেতু বুদ্ধিবৃত্তি সকল সম্পূর্ণ রূপে সে সময় কার্য্য করে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, স্বপ্ন-কল্পিত ছবিগুলিকে

ইন্দ্রিয়োপনীত প্রতিবিম্ব বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি, এই জন্যই তাহাদিগকে বাস্তবিক বলিয়া আমাদের মনে হয়। আমরা সকল বাহ্য পদার্থই ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করি—কিম্বা মনের মধ্যেই কোন প্রতিবিম্ব উদিত হইলে উপলব্ধি করি, আমাদের সকল প্রকার বোধক্রিয়াই মানসিক। বাহ্য বস্তুকে আমরা অব্যবহিতরূপে দেখিতে পাই না—বাহ্য বস্তুর প্রতিবিম্ব মনোমধ্যে দেখিয়া তবে আমরা বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। অতএব মানসিক প্রতিবিম্ব-সকলের সহিতই আমাদিগের অব্যবহিত সম্বন্ধ।

কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থায় আমরা এই অন্তর-উৎপন্ন প্রতিবিম্ব এবং ইন্দ্রিয়োপনীত বাহ্য প্রতিবিম্ব সকলের মধ্যে কি প্রকারে প্রভেদ নিরূপণ করিতে সমর্থ হই? বাহ্য প্রতিবিম্ব গুলিকে বাস্তব ও অন্তরোৎপন্ন প্রতিবিম্ব গুলি অবাস্তব বলিয়া কি প্রকারে চিনিতে পারি? তাহার দৃষ্টান্ত, মনে কর কোন অনুপস্থিত বন্ধুকে তোমার কল্পনা-চক্ষে দেখিতেছ, তাঁহার একটি ছবি তোমার মনোমধ্যে উদয় হইল—এই ছবিটি সম্পূর্ণ রূপে তোমার বন্ধুর অনুরূপ নাও হইতে পারে, এক আধ টুকু তফাৎ হইতেও পারে। তার পরে মনে কর, সেই বন্ধুকে আবার চর্ম চক্ষে তুমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিলে, তাঁহার মূর্ত্তির ইন্দ্রিয়-বাহিত আর একটি প্রতিবিম্ব, আর একটি ছবি, আবার তোমার মনোদর্পণে পতিত হইল, এই কাল্পনিক ছবি এবং এই ইন্দ্রিয়বাহিত ছবি উভয়ই তোমার মনোমধ্যেই প্রতিবিম্বিত হওয়া প্রযুক্ত উভয়কেই মানসিক প্রতিবিম্ব বলিতে হইবে। এ উভয়ই মানসিক প্রতিবিম্ব, অথচ তুমি একটিকে কাল্পনিক এবং আর একটিকে বাস্তবিক বলিয়া জানিতেছ—তাহার অর্থ এই, একটির বাহ্য অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না—আর একটি তোমার মনের বাহিরে অবস্থিতি করিতেছে বলিয়া তুমি জানিতে পারিতেছ।

কি প্রণালী অনুসারে এই রূপ সিদ্ধান্তে তুমি উপনীত হইলে—উহাদের প্রভেদ নিরূপণ করিতে কি রূপে সমর্থ হইলে?

আর কিছুই নহে—তোমার ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াকে তুমি উপলব্ধি করিতে পারিতেছ বলিয়াই তুমি তাহাদের প্রভেদ নিরূপণ করিতে সমর্থ হইতেছ। তুমি অনুভব করিতে পারিতেছ যে তোমার চক্ষু তোমার বন্ধুর মূর্ত্তি দর্শনে নিযুক্ত হইয়াছে, আর ভূয়োদর্শনেও তোমার এই জ্ঞানটি জন্মিয়াছে যে ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক বাহ্য বস্তুর সংবাদ আসিলে তবেই তাহা বাস্তব বলিয়া তোমার গ্রাহ্য, নচেৎ নয়। আমাদিগের জাগ্রৎ অবস্থায় এই প্রণালী অনুসারেই ইন্দ্রিয়গণ মানসিক ক্রিয়াকে সংশোধন করে এবং ইন্দ্রিয়-প্রেরিত সংবাদ অবগত হইয়াই আমরা বাস্তব ও কাল্পনিকের মধ্যে প্রভেদ নিরূপণ করিতে সমর্থ হই।

অতএব স্বপ্নাবস্থায় কাল্পনিককে কেন আমরা বাস্তবিক বলিয়া গ্রহণ করি, তাহার কারণ এক্ষণে সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি হই-

তেছে। মন জাগ্রদবস্থায় যাহার সাহায্যে অবাস্তব ও বাস্তবের প্রভেদ নিরূপণ করিতে পারে, নিদ্রাবস্থায় সেই ইন্দ্রিয়গণ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রযুক্ত তাহা আর পারে না। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল এই হয় যে, যত কিছু প্রতিবিম্ব মনে পতিত হয়, মন সকলকেই এক প্রকার বলিয়া উপলব্ধি করে—সুতরাং সকলই বাস্তব বলিয়া তাহার নিকট প্রতীয়মান হয়। অতএব যে হেতু, মনের যত কিছু প্রতিবিম্ব, গোড়ায় ইন্দ্রিয় কর্তৃকই আনীত, সেই জন্য যখন কোন প্রতিবিম্ব মনোমধ্যে আসিয়া উদয় হয়, তখন মন নিরূপণ করিতে পারে না যে ঐ প্রতিবিম্বটি সদ্য বাহির হইতে মনোমধ্যে প্রবেশ করিল, না পূর্ব্বে যে প্রতিবিম্ব আসিয়া অবস্থান করিতেছিল তাহা উদ্বোধিত হইল মাত্র।

এই জন্যই মন স্বপ্নাবস্থায় স্বসৃস্ট কল্পনা গুলিকে বাস্তব বলিয়া না ভাবিয়া থাকিতে পারে না—এবং এই খণ্ড খণ্ড কল্পনাগুলি যখন আবার স্বপ্নে একটি নাটকাকারে সংসূত্রিত হয়, তখন মন ভাবে যে, এই নাটকবৎ স্বপ্ন-গত ঘটনাগুলি বাস্তবিক জগতে বুঝি সত্যই সংঘটিত হইতেছে!

ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে যে আমাদের অন্তরে এমন একটি পদার্থ বিদ্যমান আছে, যাহা মস্তিষ্ক-ক্রিয়া সকলের সমালোচক ও সাক্ষী স্বরূপ, সুতরাং মস্তিষ্ক হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। সেই পদার্থটিই আত্মা।

সৃষ্টির আণবীয় জড় অংশের সহিত যোগ স্থাপন করিবার উদ্দেশেই ইহলোকে আমাদের উন্নতির এই বর্ত্তমান সোপানে, আমাদের আত্মা আণবীয় জড়যন্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে মাত্র।

স্বপ্ন-ব্যাপার পরীক্ষা করিয়া আরও এই একটি বিষয় আমরা জানিতে পারি যে, যে সময় শরীরের সহিত মনের যোগ শিথিল হয় সেই স্বপ্নাবস্থায় আমাদের মানসিক বৃত্তি সকল নিস্তেজ হওয়া দূরে থাকুক, জাগ্রদবস্থা অপেক্ষা অসংখ্যগুণে স্ফূর্ত্তি লাভ করে। রচনাশক্তি কল্পনাশক্তি সে সময় অত্যন্ত প্রবল হয়। যে ব্যক্তি অত্যন্ত মূর্খ ও নির্ব্বোধ, সেও স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ কল্পনা-শক্তির পরিচয় দেয়—জাগ্রৎ অবস্থায়—যে সময় সকল মানসিক বৃত্তিই সম্পূর্ণরূপে আমাদের আয়ত্তে থাকে—তখন সেরূপ পারে না। প্রত্যেক স্বপ্নই এক একটি গল্প বিশেষ। অনেক স্বপ্ন আবার নাটকের ন্যায়—তাহাতে শুদ্ধ যে একটি গল্প মাত্র থাকে তাহা নহে—বাস্তবিক জীবন-রঙ্গ-ভূমিতে যেরূপ বিভিন্ন প্রকার চরিত্র দৃস্ট হয়, তাহাতেও সেইরূপ নানা প্রকার চরিত্র অভিনীত হয়। অতএব স্বপ্নদর্শী মন শুদ্ধ যে একটি গল্পমাত্র রচনা করে তাহা নহে, তন্মধ্যস্থিত পাত্রগণের চরিত্র পর্য্যন্ত রচনা করে। যে পাত্রের মুখে যে কথা শোভা পায়, তাহার মুখে সেই কথাই বসাইয়া দেয়। স্বপ্নে আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার এই দেখা যায় যে, মানসিক ক্রিয়ার বেগ সে সময় আশ্চর্য্যরূপ দ্রুত হয়। জড়-শরীরের জড়বৎ গতির বন্ধন হইতে মুক্ত

হইয়া স্বপ্নদর্শী মন জাগ্রদবস্থার কাল-পরিমাণকে অনেকগুণে অতিক্রম করে। যে ঘটনা পরম্পরা বাস্তবিক জীবনে সজ্ঘটিত হইতে অনেক দিন লাগিবার কথা, স্বপ্নাবস্থায় দুই চারি মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহা সংঘটিত হয়। স্বপ্নাবস্থার কাল-পরিমাণের সহিত জাগ্রদবস্থার কাল-পরিমাণের অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয়। স্বপ্নাবস্থায় আমাদের মানসিক শক্তি সকল জাগ্রদবস্থা-অপেক্ষা যে অনেক গুণে সতেজ হয়, তাহা বোধ হয় সকলেই নিজ নিজ পরীক্ষায় অবগত আছেন। আমরা স্বপ্নে কখন কখন এমন সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারি, প্রবন্ধ কিম্বা গান রচনা করিতে পারি, যাহা জাগ্রদবস্থায় বোধ হয় আমাদের সাধ্যাতীত। এরূপ স্বপ্ন-রচনার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কোল্‌রিজের কুব্‌লাই খাঁ নামক কাব্য-খণ্ডাংশটি এইরূপ স্বপ্ন-রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি স্বপ্নাবস্থায় সমস্ত কাব্যটি রচনা করেন। সেই স্বপ্নটি এত উজ্জ্বলরূপে তাঁর মানস-পটে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র তিনি তাড়াতাড়ি একটা কলম ধরিয়া সেই দীর্ঘ কাব্যটি লিখিতে বসিলেন। এই "কুব্‌লাই খাঁ" কাব্যের যে সুন্দর অংশটি মাত্র ইংরাজি সাহিত্যে রহিয়া গিয়াছে, তাহা লেখা শেষ করিয়াছেন, এমন সময় তাঁর নিকট সহসা কোন বিষয়-কর্ম্ম উপস্থিত হওয়ায় লেখার ব্যাঘাত হইল! বিষয়কর্ম্ম শেষ করিয়া আবার যখন লিখিতে বসিলেন তখন দেখেন যে অবশিষ্ট সমস্তই তাঁর স্মৃতিপট হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে।

মিস্‌কব্‌ এইরূপ স্বপ্ন রচিত আর একটি ফরাসিস্‌ কবিতার উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও অতি সুন্দর। তাহার অনুবাদ আমরা নিম্নে দিতেছি—

১

পুরাতন দুরগের প্রাকার উপরে
দাঁড়ায়ে প্রহরী প্রাতে উত্তুঙ্গ চূড়ায়,
হাঁকিতেছে মাঝে মাঝে উচ্চ কণ্ঠ স্বরে—
'কে যায় পথিক নিচে, কে যায় কে যায়?'

২

শুনি সে উত্তর সব—আশা-ভরপুর,
উপজিল মনে মোর অনির্দ্দেশ্য ভয়,
আশা হতে নৈরাশ্য জানি নহে দূর,
দিবা পিছু রাত্রি যথা আইসে নিশ্চয়।

৩

"কে যায় কে যায়?"—
সুন্দর যুবক এক অশ্ব আরোহিয়া
ঝকমকি অসি হস্তে—উড়ায়ে পতাকা
যাইতেছে রণ-ক্ষেত্রে আনন্দিত-হিয়া,
গাইতে গাইতে পথে গৌরব-গীতিকা।

৪

"কে যায় কে যায়?"
সুন্দরী বালিকা এক, যুবার পিছনে,
সাদা অশ্ব পরে চড়ি যোদ্ধৃ-দাস-বেশে,
"চোখে চোখে রাখি দিব মোর প্রাণধনে"
বলিয়া মুচকি হাসি চলে অনিমেষে।

৫

"কে যায় কে যায়?"
শুভ্র-বেশ বৃদ্ধ এক থলি হস্তে যায়,
তার মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা ঝকমক করে,

কাঁপিতে কাঁপিতে তাহা যতনে লুকায়,
বলে আর, মহাধনী হইব সত্বরে।

৬

"কে যায় কে যায় ?"

সুন্দর যুবক এক, ভগিনীরে লয়ে
ফুল তুলিবার তরে চলে মাঠ দিয়া,
"তোরে মা এসব দেব মোরা বাড়ি গিয়ে"
এই বলি দুজনায় উঠিল হাসিয়া।

* * * * *

৭

পুরাণ তুরগ পরে উতরিলা রাত্রি,
আবার প্রহরী সেথা উচ্চে হাঁক দ্যায়,
তুরগের নিচে দিয়া যায় যত যাত্রী,
সবারে ডাকিয়া বলে 'কে যায় কে যায় ?'

৮

রক্ত-মাথা সেই অশ্ব তেজে গ্রীবা-বাঁকা
শূন্য-জীন টানি লয়ে চলে বীরবরে,
মুমূর্ষু সে বীর ধরে সাপটি পতাকা,
প্রাণ বায়ু বহির্গত হইবে সত্বরে।

৯

"কে যায় কে যায় ?"

সুন্দরী বালিকা সেই অশ্ব আরোহণে
যোদ্ধ্-সেবকের বেশ পরিধান করি,
আকুল হইয়া চলে পিছনে পিছনে,
হাহাকার করে ঘোর গগন বিদরি।

১০

"কে যায় কে যায় ?"

সুবিষণ্ন বৃদ্ধ সেই অতি শুভ্র কেশ,
শূন্য থলি লয়ে হাতে আসিতেছে ধীরে,
কাঁপিতে কাঁপিতে বলে "কি বিষম ক্লেশ!
সরবস্ব ধন মোর হরিল তস্করে।"

১১

"কে যায় কে যায় ?"

সুন্দর বালক সেই—ভগিনীটি কোলে,
ভুজঙ্গে দংশিল তারে মাঠের মাঝার,
নিরশ্রু নয়নে বালা ঘুমায় অকালে,
ফেলিতে হবে না তারে অশ্রু কভু আর।

আর একটি স্বপ্ন-দৃষ্ট ইংরাজি কবিতার অনুবাদ নিম্নে দিতেছি—

১

ক্লান্ত আত্মা মোর-নাথ-চাহিছে সতত,
পশিবারে তার সেই বিশ্রামের ঘরে,
সেই দিকে মোর দৃষ্টি রয়েছে নিয়ত
পুণ্য-আত্মা সবে যথা আনন্দে বিচরে।

২

এখনো হয় নি শেষ ভবের সংগ্রাম,
বাহিরের অন্তরের ভীম শত্রুগণ
আক্রমিয়া পথমাঝে মোরে অবিরাম
দেখাইছে কত শত পাপ-প্রলোভন।

৩

হয়ে এই রণ-মাঝে দুর্ব্বল আহত,
সকাতরে ডাকি তোমা হাত যোড় করি,
রক্ষা কর রক্ষা কর ত্রিভুবন-পিতঃ
রক্ষা কর মোরে নাথ নতুবা যে মরি।

৪

হেন কালে ধীরে ধীরে মধুর বচন
ভয়-হর শান্তিপ্রদ পশে শ্রুতি-পুটে,
অবসন্ন মৃত আত্মা পাইল জীবন—
"ভয় নাই সাধুবর ঈশ্বর নিকটে।"

৫

সে বাক্য-অমৃত-পানে হয়ে বলীয়ান
আবার সেই সে পথে হয়ে অগ্রসর,

ঊর্দ্ধ দিকে শান্তি-ধামে রাখিয়া নয়ান
চলিলাম তাঁহা পরে করিয়া নির্ভর।

৬

লও নাথ, লও মোরে, ডাকি কর যোড়ে,
শান্তি-নিকেতন-দ্বার খোল আমা প্রতি,
লও নাথ সেই তব প্রেমময় ক্রোড়ে,
পাপ তাপ হতে প্রভু দাওগো নিষ্কৃতি।

ডাক্তার কার্পেণ্টরকে অনুসরণ করিয়া মিস্ কব্ বলেন—"আমাদের কার্য্য-সকল ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। Involuntary ইচ্ছা-নিরপেক্ষ (যথা হৃৎস্পন্দন—পরিপাক ক্রিয়া ইত্যাদি)—Voluntary ইচ্ছা-সাপেক্ষ এবং Volitional ইচ্ছা-চালিত। ইচ্ছা-সাপেক্ষ এবং ইচ্ছা চালিত এই উভয় জাতীয় কার্য্যের মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রথমোক্ত কার্য্যগুলি সম্পাদন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছার অনুমতি অপেক্ষা করে—এবং ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগে তাহা আবার স্থগিত করা যাইতে পারে মাত্র কিন্তু তাহাতে ইচ্ছাশক্তির অবিরত উদ্যম আবশ্যক হয় না। এবং ইচ্ছা-চালিত কার্য্যগুলি সম্পাদন করিবার জন্য ইচ্ছার অব্যবহিত অবিরত উদ্যম প্রয়োগ আবশ্যক হয়। এক্ষণে এই তিন শ্রেণীর কার্য্যের মধ্যে দেখা যাইবে, ইচ্ছা-সাপেক্ষ কার্য্যগুলি সংজ্ঞা-বহির্ভূত মস্তিষ্ক-ক্রিয়া দ্বারা সম্পাদিত হয়। তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ পদচারণা-ক্রিয়াকে আইস আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখি। আমরা এখানে কিম্বা ওখানে মনে কর যাইতে ইচ্ছা করিতেছি—এবম্বিধ ব্যাপার-সকলে "উদ্দেশ্য-বিষয় ইচ্ছা করা, আর উদ্দেশ্য সাধনের উপায়কে ইচ্ছা করা একই কথা"—আমরা প্রতি পদক্ষেপে তো এরূপ ভাবিয়া কাজ করি না যে "এক্ষণে আমরা দক্ষিণ পদ—এক্ষণে আমরা বাম পদ অমুক স্থলে ক্ষেপণ করিব।" আমাদের মাংসপেশীর যেন কোন অপরিজ্ঞাত নেতা এই সকল খুজরা কাজ সকল সম্পাদন করিয়া থাকে—আমরা যখন চলিতে থাকি—তখন আমাদিগের পদদ্বয়কে এ দিকে কিম্বা ওদিকে চালাইতে হইবে—সে বিষয়ে আমরা বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে সংজ্ঞাহীন থাকি। যে পথে আমরা চলিতেছি যদি তাহা আমাদের জানা-শুনা পথ হয়—তাহা হইলে সে পথের প্রত্যেক ঘোর-ফেরে আমরা সংস্কার বশত ঠিক মোড় লই, অথচ সেই সময় সমস্ত ক্ষণ অন্য কোন বিষয়ের চিন্তাতে হয় তো আমরা ব্যাপৃত থাকি। এই রূপ পদচারণা ব্যতীত পঠন, সীবন, লিখন কোন সঙ্গীত-যন্ত্র বাদন প্রভৃতির ন্যায় অন্যান্য কার্য্যেও একবার শিক্ষা লাভ হইলে—সে সকল কার্য্যের যান্ত্রিক অংশগুলি শীঘ্রই আমরা সংজ্ঞা-সাপেক্ষ উদ্যম ব্যতীত সম্পন্ন করিতে সমর্থ হই।" ডাক্তার কার্পেণ্টর ও মিস্ কব্, সংজ্ঞা-বিহীন মস্তিষ্কক্রিয়ার এই যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা প্রথমতঃ মস্তিষ্কক্রিয়া বলিয়া গণ্য হইতে পারে কি না, তাহাই সন্দেহ স্থল। Professor Ferrier সাহেবের পরীক্ষায় সপ্রমাণ হইয়াছে, যে শারীরিক গতি-বিধি

তলস্থ উপমস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে—তাহার উপর চূড়ান্ত মস্তিষ্কের অব্যবহিত আধিপত্য নাই। চূড়ান্ত-মস্তিষ্ক যন্ত্র দিয়া ইচ্ছা প্রবাহিত হইয়া ঐ উপমস্তিষ্ককে চালিত করিলে—তবে আমাদিগের শারীরিক গতিক্রিয়া সম্পাদিত হয়—প্রথম প্রথম যত দিন না অভ্যাস দ্বারা সহজ হইয়া আইসে, ততদিন যতক্ষণ কোন গতিক্রিয়া হইতে থাকে, ততক্ষণই ইচ্ছা শক্তিকে সমানরূপে তাহাতে প্রযুক্ত করিয়া রাখিতে হয়—কিন্তু অভ্যাস-নিয়মে উপমস্তিষ্ক যখন কার্য্যোন্মুখ ও পুনরাবৃত্তি-প্রবণ হইয়া পড়ে, তখন ইচ্ছা উপমস্তিষ্ককে একবার চালিত করিয়াই ক্ষান্ত হয়—তখন গতিক্রিয়া যন্ত্রের ন্যায় আপনা আপনি হইতে থাকে—সেই গতিক্রিয়া বন্ধ করিবার প্রয়োজন হইলে তখন আবার ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করিতে হয়—অতএব দেখা যাইতেছে পদচারণা প্রভৃতি অভ্যস্ত গতিক্রিয়া সকল প্রবর্ত্তিত করিবার সময় ও বন্ধ করিবার সময় ইচ্ছা-শক্তির সজ্ঞান উদ্যমের আবশ্যক হয়।

Unconscious cerebration বাক্যটি অতি অস্পষ্ট, যে সকল দৃষ্টান্ত মিস্ কব্ দিয়াছেন তাহাতে ইহার অর্থ কখন কখন সংজ্ঞা-নিরপেক্ষ মস্তিষ্কক্রিয়া বুঝায়, আবার কখন কখন ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মস্তিষ্কক্রিয়া বুঝায়। সমস্ত স্বপ্ন-ব্যাপারই যে সংজ্ঞাসাপেক্ষ তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে উহার সমস্তই ইচ্ছা-সাপেক্ষ কিনা তাহাই বিবেচ্য। Unconscious cerebration এর অর্থ যদি সংজ্ঞা-বহির্ভূত না হইয়া ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মস্তিষ্ক-ক্রিয়া হয়—তাহা হইলে জাগ্রদবস্থাতেও আমাদিগের মনে যত প্রকার ভাবোদয় হয়, তৎসমুদয়ই তো Unconscious cerebration এর মধ্যে গণ্য হইতে পারে।

কোন কোন জড়বাদী বলেন যে, অচেতন অবস্থায় আমাদের অজ্ঞাতসারে যদি আমরা কোন মানসিক ক্রিয়ার পরিচয় পাই, যদি আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের মস্তিষ্ক, মনন-ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ এরূপ সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি?

আমাদের অজ্ঞাতসারে যে সকল মনন-ক্রিয়া হয় তাহার নাম ডাক্তার কার্পেণ্টর "Unconscious cerebration" অর্থাৎ "সংজ্ঞা-বহির্ভূত মস্তিষ্ক-ক্রিয়া" রাখিয়াছেন। Miss Cobbe এই সংজ্ঞা বহির্ভূত মস্তিষ্ক ক্রিয়ার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—দৃষ্টান্ত-প্রদর্শিত ক্রিয়া সকল বাস্তবিক সংজ্ঞা-বহির্ভূত কি না তাহা, প্রথমে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। মিস্ কব্ বলেন—"ইহাতো আমাদিগের সকলেরই সচরাচর ঘটিয়া থাকে যে, কোন একটি বিশেষ কথা, কবিতার কোন চরণ, আমরা ভুলিয়া গিয়াছি—কিয়ৎকাল পরে যখন জ্ঞাতসারে কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক, তাহাদিগকে খুঁজিতে আর চেষ্টা না করি, তখন তাহা হঠাৎ আমাদের স্মরণে আইসে। আমরা প্রথমে হয়তো তাহাদিগকে মনে আনি-

বার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হই কিন্তু কিছুতেই মনে আনিতে পারি না—মাঁথা খোঁড়া-খুঁড়ি করিয়াও যখন তাহাতে কৃতকার্য্য হই না, তখন আমরা অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করি—ক্রমে ক্রমে যখন আমাদের সমস্ত মন অন্য কোন বিষয়ে একেবারে মগ্ন হয়—তখন আমরা হঠাৎ বলিয়া উঠি "মনে প-ড়েছে—সে কথাটি কিম্বা কবিতার চরণটি এই" এই প্রকার ঘটনা এত সচরাচর ও সর্ব্ব-জন-পরিচিত যে আমরা এই রূপ অবস্থায় প্রায় বলিয়া থাকি "যেতে দাও, ওতে যখন আর মন থাকিবে না, তখন আপনা আপনি কথাটা মনে আসিবে"।

কিন্তু এই দৃষ্টান্ত-গত মানসিক ক্রিয়া যে সম্পূর্ণ রূপে সংজ্ঞা-বহির্ভূত, তাহা এই দৃষ্টান্তে আমাদিগের মতে সপ্রমাণ হয় না। প্রথমতঃ একটা কোন কথা স্মরণ হইতেছে না বলিয়া মনে উদ্বেগ উপ-স্থিত হইলে তাহা স্মরণে শীঘ্র আইসে না। ভাবানুসঙ্গের নিয়মানুসারে আমাদিগের স্মরণ-ক্রিয়া সকল সম্পাদিত হয়। একটি কোন কথার সূত্র ধরিয়া আর একটি কোন কথা আমাদের মনে উদয় হয়, যখন আমরা কোন কথা মনে করিবার জন্য ব্যস্ত হই, তখন আমাদের মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে বলিয়া যথার্থ সূত্রটি ধরিতে সমর্থ হই না—সুতরাং সে কথাটি সে সময় কিছুতেই মনে আইসে না—যখন আমরা অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করি—তখন আমাদিগের উদ্বেগ অনেকটা প্রশমিত হয়—কিন্তু অন্য বিষয়ে আমরা যতই মগ্ন হইয়া যাই না কেন, এক একবার মুহূর্ত্তের জন্যও পূর্ব্ব বিষয়ে মন ধাবিত হয়—এত অল্প কালের জন্য যে, পরে তাহা আমাদিগের আর স্মরণ থাকে না—পূর্ব্ব-বিষয়ে যে আবার ক্ষণ মাত্রও মন ধাবিত হইয়াছিল, তাহা আমরা পরে আর মনে করিতে পারি না—আমরা মনে করি, বুঝি আমাদিগের বিনা মনোযোগেই সে কথা আমাদিগের মনে পড়িল—কিন্তু মনের ব্যস্ত অবস্থায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া চেষ্টা করিয়া যে বিস্মৃত কথার প্রকৃত সূত্রটি আমরা ধরিতে পারি নাই, মনের অপেক্ষাকৃত শান্ত অবস্থায় এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমরা সে সূত্রটি ধরিতে পারি। অতএব এই মানসিক ক্রিয়া আমাদিগের সংজ্ঞা-সাপেক্ষ ভাবে না হইয়া সঙ্গা-বহির্ভূত ভাবে সম্পাদিত হয় কি না, তাহার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই।

কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, আমাদিগের মনে যত প্রকার ব্যাপার উপস্থিত হয়, তাহা কতকটা আমা-দিগের আয়ত্তের মধ্যে এবং কতকটা আমা-দিগের আয়ত্তের বাহিরে—আমাদের অন্তরে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই বর্ত্তমান। আমা-দের মানসিক ক্রিয়া সকল কতকটা অবশ্য-ম্ভাবী নিয়মানুসারে যন্ত্রবৎ সম্পাদিত হয়—ইহাই প্রকৃতির কার্য্য এবং কতকটা আমা-দিগের ইচ্ছা দ্বারা নিয়মিত ও চালিত হয়—ইহাই পুরুষের কার্য্য। আমাদিগের মনে যত প্রকার ভাব ও চিন্তার উদয় হয়, তাহার অধিকাংশই একটি বিশেষ নিয়মানু-সারে হয়। তাহার নাম "অনুসঙ্গের নিয়ম।"

যাহা হউক যদিও ইহা সপ্রমাণ হয় যে unconscious cerebration বলিয়া কোন ব্যাপারের অস্তিত্ব আছে তাহাতেই বা কি? তাহার সঙ্গে ইহাও তো প্রতিপন্ন হইতেছে যে আর একটি সংজ্ঞা-সাপেক্ষ, ইচ্ছা-সাপেক্ষ মস্তিষ্কক্রিয়ারও অস্তিত্ব আছে। এক দিকে যন্ত্র—আর এক দিকে যন্ত্রের নিয়ন্তা —এক দিকে প্রকৃতি—আর এক দিকে পুরুষ —এক দিকে মন—আর এক দিকে আত্মা।

কেবল "মস্তিষ্ক ক্রিয়া" দ্বারা আমাদিগের সকল আভ্যন্তরিক ব্যাপার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না। ডাক্তার ফেরিয়ার মস্তিষ্ক ব্যাপারের তন্ন তন্ন পরীক্ষা করিয়া যে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। "শারীরতত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে মস্তিষ্কের এইরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে—মস্তিষ্ক কি? না গতিকেন্দ্রসমূহ ও বোধকেন্দ্র-সমূহের জটিল যন্ত্র বিশেষ। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, মস্তিষ্কের কার্য্য ও মানসিক ক্রিয়া উভয়ই এক কথা বুঝায় এবং মানসিক ক্রিয়া সকলের আলোচনা মনস্তত্ত্বের অধিকারের মধ্যে আইসে। মানসিক ক্রিয়ার তত্ত্বানুসন্ধান-প্রণালী, শারীর তত্ত্বের অনুসন্ধান-প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র। কেবল মাত্র শারীর তত্ত্বের অনুসন্ধান-প্রণালী অনুসারে কোন ক্রমেই অহংজ্ঞানের ব্যাখা করা যাইতে পারে না। ... ... "মস্তিষ্ক বোধ সমূহে যে সকল আণবিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, সেই সকল পরিবর্ত্তনের অনুরূপ পরিবর্ত্তন কি করিয়া সংজ্ঞাতেও আবার উপস্থিত হয়, তাহা বুঝা সুকঠিন। যথা, নেত্র-নিপতিত আলোকের কম্পনে দৃষ্টি-বোধ রূপ সংজ্ঞার পরিবর্ত্তন কিরূপে সংঘটিত হয়, তাহা সিদ্ধান্ত করা অতীব দুরূহ। কোন ইন্দ্রিয়বোধ মনোমধ্যে অনুভূত হইলে মস্তিষ্ক-কোষ মধ্যে যে সকল আণবিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়—তাহা হয়তো ঠিক্ নির্ণয় করা যাইতে পারে—কিন্তু তদ্দ্বারা সেই অনুভব-ব্যাপারের আসল প্রকৃতি বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞান বৃদ্ধি হয় না। উহার মধ্যে একটি—বাহ্যবিষয় সম্বন্ধীয় (objective) এবং আর একটি আভ্যন্তরিক বিষয়ী সম্বন্ধীয় (subjective)—অতএব বাহ্যবিষয়-সম্বন্ধীয় ব্যাপার-ঘটিত পরিভাষায়, আভ্যন্তরিক বিষয়ী-সম্বন্ধীয় ব্যাপার সকল ঠিক্ প্রকাশ করা যাইতে পারে না। আমরা এ কথা কখন বলিতে পারি না যে, শরীর ও মন উভয়ই এক পদার্থ কিম্বা এমনও বলিতে পারি না যে, একটি আর একটিতে বেমালুম মিশিয়া যাইতে পারে। তবে, Laycockএর ভাষায় অন্তত এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, মস্তিষ্ক ও মন উভয়ই উভয়ের অনুসঙ্গী (correlated) কিম্বা Bainএর ভাষায় বলিতে পারি যে, শারীরিক পরিবর্ত্তন ও মানসিক পরিবর্ত্তন সকল "দ্বিমুখী একতার" (double faced unity) বিষয়-সম্বন্ধীয় ও বিষয়ী-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন দিক্ মাত্র "

স্থূল কথা, আত্মা ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নয় বলিয়াই যে ইহা একেবারে অপরিজ্ঞেয়—জড়বাদীদিগের এই মতটি আমরা স্বীকার করিতে পারি না। আত্মপ্রত্যয়ই আত্মার

মুখ্য প্রমাণ। জড়বাদীগণ যদি সে প্রমাণ গ্রাহ্য না করেন, তবে তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টির জন্য বলা যাইতে পারে, তাড়িৎ magnetism এবং উত্তাপ প্রভৃতি সুক্ষ্ম পদার্থের সত্তা যে প্রকারে সপ্রমাণ হয় আত্মার অস্তিত্বও কি সেই একই প্রকারে সপ্রমাণ হয় না? তাড়িৎ প্রভৃতি পদার্থ ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য হইলেও অপরিজ্ঞেয় নহে, আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জড় জগতের উপর ঐ সকল পদার্থ যে ক্রিয়া প্রকটিত করে—তাহার দ্বারাই ঐ সকল পদার্থের সত্তা ও গুণ আমরা উপলব্ধি করি। প্রমাণের প্রণালী উভয় পক্ষেই সমান। যদি ঐ সকল সুক্ষ্ম পদার্থের পক্ষে এই প্রকার প্রমাণ গ্রাহ্য হয়, তবে অতীন্দ্রিয় আত্মার পক্ষে সেই একই প্রমাণ কেন না গ্রাহ্য হইবে। এই প্রণালী অনুসারে কতদূর প্রমাণ হইতে পারে, সে অবশ্য আলোচনার বিষয়—কিন্তু জড়বাদীরা যে বলেন, যে হেতু আত্মা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, অতএব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উহার অস্তিত্ব আদৌ সপ্রমাণ হইতে পারে না, সুতরাং উহা অপরিজ্ঞেয় ও চিরকাল অপরিজ্ঞেয় থাকিবে—উহাকে বিজ্ঞান-রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া উচিত—এই যে জড়বাদীগণের অন্ধ মত, ইহা আমরা কখনই গ্রাহ্য করিতে পারি না।

বঙ্গীয় গ্রন্থকার ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

ইদানিন্তন আমরা প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বিষয়ে এত দূর শিথিল-প্রযত্ন হইয়া পড়িয়াছি যে অনেক সময়ে তজ্জন্য গ্রন্থকারদের তিরস্কার-ভাজনও হইতে হইয়াছে। কিন্তু আমাদের নিবেদন এই যে, কথন ভারতীর স্থানাভাব প্রযুক্ত কখনো আমাদের সময়াভাব প্রযুক্ত এবং কথন বা (সত্য কথা বলিতে কি,) গ্রন্থ সমূহের ঐকান্তিক হীনতা প্রযুক্ত আমরা ঐ কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করিতে কতক অংশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম। কিন্তু সময়ে সময়ে এমন সুন্দর পুস্তকও প্রাপ্ত হইয়াছি যে তাহার সুরভি পাঠকমণ্ডলে বিকীর্ণ করিতে উৎসাহ ও উল্লাস পর্য্যন্ত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এরূপ অবসর আমাদের অদৃষ্টে অতি অল্প সময়ই ঘটিয়াছে। বঙ্গসাহিত্য-উদ্যান আজ কাল নানা ফুল ফলে সুশোভিত সন্দেহ নাই। সংস্কৃত মূল গ্রন্থ হইতে অনুবাদ, ইংরাজি কাব্য নাটকের অনুকরণে উপন্যাস ও কাব্য, নাটক ও নাট্য-গীতি প্রভৃতি দেশী বিলাতী সগুণ নির্গুণ নানা প্রকার "ইত্যাদিতে" চারিদিক সমাকীর্ণ। গ্রন্থকার হইবার উগ্র লালসায় কেহ পৈতৃক বিভব বিনষ্ট করিতেছেন, কেহ বা বিদ্যালয়ে পাঠ পরিত্যাগ করিতেছেন, কেহ বা সাংসারিক কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা দেখাইতেছেন, এবং কেহবা রোরুদ্যমান সন্তান সন্ততিকে প্রবঞ্চনা করিয়া যন্ত্রালয়ের ঋণ পরিশোধ করিতেছেন। অথচ গ্রন্থকার হইতেই হইবে। গ্রন্থকার না হইলে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই—

রাজ-কাছারিতে উত্তম পেশাদারীর সম্ভাবনা নাই, এমন কি, সময়ে সময়ে মনোমত বিবাহ হইবারও সম্ভাবনা নাই—সুতরাং গ্রন্থকার না হইলে আর উপায় নাই। স্বরস্বতী দেবীর উত্তেজনাতে না হউক, অবিশ্যকতার উপরোধে বঙ্গ-যন্ত্রালয় অনন্ত প্রসব-বেদনায় অস্থির। ইহার ফল স্বরূপ দেখিতে পাই, কোথাও হিড়িম্বা—কোথাও হিড়িম্বক। সময়ে সময়ে আমরা দু একখানি প্রকৃত প্রশংসার গ্রন্থ প্রাপ্ত হই কিন্তু তাহা বঙ্গদেশীয় সুন্দর বনের, বন-ফুলের মত অতিশয় যৎসামান্য। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্রের মর্ম্মভেদী ঔপন্যাসিক কবিত্ব, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর গভীর উচ্ছ্বাস, হেমচন্দ্রের নূপুর নিক্কন, নবীনচন্দ্রের ইংরাজি বীরভাব, ও আরও দু এক জন প্রশান্ত কবির জ্যোৎস্নাময় কল্পনা-লহরীর কথা যদি উল্লেখ না করি, তাহা হইলে বঙ্গসাহিত্যের বাস্তবিক অবস্থা কি? কেহ বা চর্ব্বিত চর্ব্বনের উপর চাকচিক্যের অবলেপন দিয়া, কেহ বা স্বকপোল কল্পিত বট্‌তলা উচ্ছ্বাসের তুফান তুলিয়া গ্রন্থকার পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইতে বাসনা করেন। সমালোচকেরই মহা বিভ্রাট; তিনি বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কখনই মিথ্যা চাটুবাক্যে অকিঞ্চিৎকর লেখকদিগকে স্ফীত করিতে চাহেন না, অথচ সত্য কথা বলিতে গেলে সরস্বতীর কৃত্রিম পোষ্যপুত্রেরা ক্রোধের বিষে জর্জ্জরীভূত হইতে থাকেন।

সুতরাং মধ্যে মধ্যে আমরা বাস্তবিক উত্তম ও সদ্ভাব সম্পন্ন গ্রন্থ পাইলে অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত তাহা সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই। সুখের বিষয় এই যে এবারে আমরা যে সকল গ্রন্থ সমালোচনা করিতেছি তাহার সমালোচনায় আমাদের কতকটা ঐ রূপ আহ্লাদ হইতেছে।

১। অবসর সরোজিনী, নিভৃত নিবাস নিশীথ চিন্তা, অনলেবিজলী, ভারত-গান এই কয় খানি পুস্তক শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া কলিকাতা আল্‌বার্ট প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। বঙ্গসাহিত্য-সমাজে তিনি বিশেষ রূপে পরিচিত আছেন, এবং তিনিও যার পর নাই যত্ন ও প্রভূত পরিশ্রম সহকারে দেশীয় সাহিত্যের উপকার ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। সকলেই সমস্বরে কাব্য বিষয়ে তাঁহার কল্পনার অরুণ বিকাশ, ভাষার স্ফটিক বিমলতা, ছন্দের মৃদুতরল গতির যথেস্ট প্রশংসা করিয়া আসিতেছে, এবং আমরাও সরল অন্তরে সে প্রশংসার অনুমোদন করি। কিন্তু এই প্রসিদ্ধ লেখক সম্বন্ধে আমাদিগের তিনটী বক্তব্য আছে—তাহা না বলিয়া নিরস্ত থাকিলে গ্রন্থকারের প্রতিই বোধ হয় অন্যায়াচরণ করা হইবে।

প্রথম। গ্রন্থকারের কবিতা পড়িয়া এমন বোধ হয় না যে তাঁহার মানস-প্রকৃতি কবিতার উপাদানে গঠিত। কবিতার বিমল উৎস তাঁর হৃদয়ে স্বতঃ উৎসারিত নহে,—তাঁহার মনশ্চক্ষু কবিতার অঞ্জনে রঞ্জিত নহে, তিনি প্রকৃতির অকৃত্রিম কবি নহেন। কিন্তু চেষ্টা ও যত্ন করিয়া তিনি যে সকল ভাব আয়ত্তীভূত করেন, তাহাতে তিনি সুন্দর রূপে কবিতার চাকচিক্য মাখাইতে পারেন, তাঁহাকে কবিতার স্বর্ণকার না বলিয়া গীল্‌টীকার বলিলে বিশেষ দোষ হয় না।

দ্বিতীয়। তাঁহার কল্পনা প্রায়ই মৃদু মধুর হইলেও সময়ে সময়ে তাহা অতি বিকটাকার ধারণ করে। আমরা একটি উদাহরণ দিয়া আমাদের মনোভাব প্রকাশ করিব। "অবসর সরোজিনীতে" "প্রিয়তমা হাসিল" বলিয়া একটি কবিতা আছে—তাহার ভাবার্থ এই—একজন প্রণয়ী তাঁহার প্রণয়িনীকে লইয়া সরসী-তীরে বসিয়া ছি-

লেন। প্রণয়িনী জলের দিকে চাহিবা মাত্রই প্রণয়ী ভাবিলেন সরোবরে "ইন্দীবর ছুটি বুঝি ফুটিল"—শুদ্ধ ভাবিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি হাত বাড়াইয়া তাহা তুলিতে পর্য্যন্ত জলে হাত ডুবাইলেন,—তাহা দেখিয়া ইন্দীবর-নয়না হাসিয়া ফেলিলেন; কিন্তু হাসিবা মাত্রই কুন্দদন্তপাঁতি বিশিষ্ট প্রণয়িনীর ফুটন্ত দন্তাবলী সরসী জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া পড়িল, অমনি উন্মত্ত প্রণয়ী পূর্ব্বের ভুল শুধরিয়া লইবার জন্য জল হইতে কুন্দফুলরাশি তুলিতে হাত বাড়াইলেন,—তখন প্রণয়িনী মনের সাধে আরও হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু আনতমুখী প্রণয়িনীর প্রতিবিম্বিত নাসিকা দেখিয়া কেন যে তিনি জলের ভিতর হইতে শুক পক্ষী ধরিতে গেলেন না, অথবা প্রতিবিম্বিত ভ্রূযুগল দেখিয়া নিমজ্জিত মদনের নিকট হইতে ফুলধনু কাড়িয়া লইতে কেন যে চেষ্টা পাইলেন না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। কারণ "ইন্দীবরই" হোক আর কুন্দফুলই হোক—উভয়েই স্বল্পকাল মধ্যে শুখাইয়া যাইবে, কিন্তু শুকপক্ষী হইলে তাহা হইতে পূর্ব্ব জন্মের অনেক জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা ছিল, আর ধনুক কাড়িয়া লইলে সংসারের বিস্তর মঙ্গল সাধন করিতে পারিতেন!

তৃতীয়। গ্রন্থকার কিঞ্চিৎ অকাতরে ইংরাজী কবি হইতে ভাব লুণ্ঠন করেন। স্থানে স্থানে দুএকটি ভাব দেখিতে পাইলে আমরা এ কথার উল্লেখই করিতাম না,—কিন্তু তাঁহার "নিভৃত নিবাস" নামক কাব্যের ৪৬ পৃষ্ঠা হইতে ৫৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত কেবল অপহৃত "বমালে" পরিপূর্ণ। ইংরাজি কবি শেলীর Queen Mab নামক কবিতার আরম্ভের সহিত পাঠকগণ উক্তদশ পৃষ্ঠার তুলনা করিলেই আমাদের কথার সার্থকতা বুঝিতে পারিবেন।

কিন্তু যাহাই হউক, গ্রন্থকার যে পরিমাণে বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত উপকারের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন, তাহা স্মরণ করিয়া আমরা তাঁহাকে সরল হৃদয়ে ধন্যবাদ দিতেছি।

সতীত্ব রক্ষিণী কাব্য। শ্রী অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। সোমপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা।

লেখক বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন যে "দুর্ভাগ্যক্রমে আমি জন্ম গ্রহণ করিবার কতিপয় দিবস পরেই সূতিকাগারে অন্ধ হই।" লেখকের বয়স এক্ষণে ১৮ বৎসর, অদ্যাপি তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ, সুতরাং একজন প্রায় আজন্ম অন্ধ বালক এরূপ একখানি সুন্দর কাব্য রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন ইহাই যথেষ্ট প্রশংসার কথা।

সন্তোষ প্রতিমা। বিডেন্ প্রেসে মুদ্রিত; মূল্য এক পয়সা।

ইহা এক খানি সাপ্তাহিক সাহিত্য সম্পর্কীয় পত্রিকা। কতকগুলি সুকুমারমতি বালক এই পত্রিকার অনুষ্ঠাতা। "বীণাপাণি" নামক ক্ষুদ্র অথচ সুকোমল কবিতাটি বিশেষ হৃদয়গ্রাহী। ভরসা করি ইহা শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিতকায় ও বর্দ্ধিতপ্রভ হইয়া বঙ্গাকাশকে উজ্জ্বল করিবে।

অরুন্ধতী বা বন্দী বরাঙ্গনা। সঙ্গীত রূপক। শ্রী রাজকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত। সুচারু যন্ত্রে মুদ্রিত। এই গ্রন্থখানি অনেক অংশে প্রীতিপ্রদ হইয়াছে বলিতে হইবে। ইহাতে কোথাও ভাব বা কল্পনার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গভঙ্গ নাই—সত্য বটে, কিন্তু ইহার নির্দ্দোষ মৃদু গতিতেই ইহার সৌন্দর্য্য। ভাদ্রমাসের উচ্ছ্বাসময়ী গঙ্গা অপেক্ষা বৈশাখের সঙ্কীর্ণ গঙ্গায় কোন কোন বিষয়ে রমণীয়তা আছে।

উদয়নাচার্য্য।

আমরা এই প্রবন্ধে ভারতীয় সাহিত্য-জগতের একটী অমূল্য-রত্ন-স্রষ্টা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব ; এ মহাত্মা কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা পরম পণ্ডিত উদয়নাচার্য্য। ইনি একজন মেদিনীর শীর্ষস্থানীয় গ্রন্থকার হইলেও ইহাঁর জীবন-বৃত্তান্ত আবিস্কার করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। উদয়নাচার্য্যকে লইয়া অনেকে দুই চারি কথা বলিয়াছেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে তাঁহার জীবনী আবিস্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন কি না জানি না। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত উদয়নাচার্য্য সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন "তিনি একটী ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় ভারতীয় সাহিত্য-গগনে আলোকিত হইতেছেন। কিন্তু কোন দূরবীক্ষণ যন্ত্রই তাহার ব্যাস নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহার নাম একটী আলোকের বিন্দু; কিন্তু সেই বিন্দুতে পার্থিব কোন পদার্থ আছে কি না তাহা আমরা নিরূপণ করিতে সমর্থ হই না। তাঁহার জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সম্বন্ধে সাহিত্য-গগন একেবারে শূন্য; এমন কি তিনি কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন তাহাও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রের একটী অনিশ্চিত পদার্থ হইয়া রহিয়াছে। (১) আমরাও যে মহাত্মা উদয়নাচার্য্যের জীবনী অবিকল আবিস্কার করিতে পারিব—তাহা বলি না। কিন্তু একটী বিষয় বারংবার আন্দোলিত হইলে তাহার তমসাচ্ছন্ন সোপানাবলী অনেক পরিমাণে আলোকিত হইয়া আইসে ; তাই, আমরা এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি। এমন হইতে পারে যে, আমরা ইহাতে অনেক স্থলে স্খলিতপদ হইব। কিন্তু যখন বিলুপ্ত পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে বসুন্ধরার শীর্ষস্থানীয় বুধমণ্ডলীও এই আশঙ্কা হইতে একেবারে অব্যাহতি পান নাই তখন আমাদের ভয় কি ?

"শঙ্কর দিগ্বিজয়", নামক সংস্কৃত মহাকাব্য-প্রণেতা "বিদ্বজ্জন-কুঞ্জর" মাধবাচার্য্যের মতে "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" কার

(১) "He shines like one of the fixed stars in India's literary firmament, but no telescope can discover any appreciable diameter ; his name is a point of light, but we detect therein nothing that belongs to our earth or material existence. The details of his life are a blank, and the very century in which he flourished is an unsettled question in Hindu literary history."—Preface to the Kusumanjali, Edited by Professor Cowell.

কবীন্দ্র শ্রীহর্ষ, বাণ, ময়ুর, উদয়নাচার্য্য এবং শঙ্করাচার্য্য এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। (২) শঙ্করদিগ্বিজয়ে উল্লেখ আছে যে খণ্ডনকার শ্রীহর্ষ ও তৎপরাজয়াসমর্থ উদয়নাচার্য্য, শঙ্কর কর্ত্তৃক পরাভূত হয়েন। (৩) যদি মাধবাচার্য্যের এই বাক্য প্রমাদশূন্য হইত তবে মহামহোপাধ্যায় উদয়নাচার্য্যের সময় লইয়া কোন গোলে পড়িতে হইত না; কেননা উল্লিখিত মহাত্মাদের এক জনের সময় নিরূপণ করিতে পারিলেই সকলের আবির্ভাব-কাল পাওয়া যাইত। কিন্তু তদুল্লিখিত সমকালবর্ত্তী মহাত্মাদের প্রায় অনেকেই এক সময়ে বর্ত্তমান থাকা দূরে থাকুক, দুই এক শতাব্দীর মধ্যেও বর্ত্তমান ছিলেন না। এমন কি, বাণভট্ট শ্রীহর্ষ হইতে প্রায় ৪।৫ শতাব্দীর পূর্ব্বের লোক। (৪) মাধবাচার্য্য এক জন সুপ্রসিদ্ধ কৃতবিদ্য লোক হইয়াও (৫) এই রূপ কালভ্রম করিলেন কেন? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে মাধবাচার্য্যের সময়ে এদেশে কোন সময়নির্ণায়ক ইতিহাস ছিল না। সুতরাং তখনকার লোক স্বীয় জন্মের পঞ্চাশৎ বৎসরের পূর্ব্বকার লোকের (যিনি ভিন্নদেশনিবাসী এবং যাঁহার সম্বন্ধে বৃদ্ধদের নিকট কোন জনশ্রুতি শুনা যায় নাই) এবং সহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকের আবির্ভাব-কালের পার্থক্য বুঝিতে পারিত না এবং দেশে ঐতিহাসিক চর্চ্চা না থাকাতে কেহ তাহা জানিবার জন্য বড় যত্নও করিত না। মনে কর আমরা যদি পাশ্চাত্য মহাত্মাদের নিকট পুনরায় ঐতিহাসিক চর্চ্চার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিতাম তবে মহাত্মা রামমোহন রায় এবং পরমভাগবৎ চৈতন্যদেব ইহাঁরা কে পূর্ব্বের লোক এবং কে পরের লোক তাহা লইয়া এখন আমাদের মুহুর্মুহু সন্দেহ উপস্থিত হইত। এ কথায় শুধু পুরাতত্ত্বচর্চ্চা-বিসর্জ্জিত হিন্দু সন্তানগণকে দোষ দিই না। যাঁহারা সংপ্রতি পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষাগুরু সেই পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিশারদ বুধমণ্ডলীও সময়ে সময়ে এসম্বন্ধে এমন লজ্জাকর ভ্রমে পতিত হই-

(২) ঐতিহাসিক রহস্য, ২য় ভাগ "বাণভট্ট" নামক প্রস্তাব এবং বঙ্গদর্শন, ৩য় খণ্ড ২৮ পৃষ্ঠা ও ২৬০ পৃ দেখ।

(৩) ১৫ শ "শঙ্কর দিগ্বিজয়" ১৫৭ শ্লোক।

(৪) ঐতিহাসিক রহস্যের "শ্রীহর্ষ" ও "বাণভট্ট" নামক প্রস্তাব মিলাইয়া দেখ।

৫ মাধবাচার্য্য সংস্কৃত সাহিত্য জগতে অপরিচিত নন। ইনি "বেদার্থ প্রকাশ" নামক প্রসিদ্ধ বেদ ব্যাখ্যা এবং শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে "শঙ্করদিগ্বিজয়" নামে ষোড়শ সর্গে এক মহাকাব্য প্রণয়ন করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে মাধবাচার্য্য খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন। See Wilsons—Mackenzie catalogue Vol 1 P CXI 2 Colebrooke's Essays Vol 1 P 100.

তেছেন যে তাহা দেখিয়া আমাদেরও হাসি পায়। মহাভারত হইতে রামায়ণ অনেক প্রাচীনতম গ্রন্থ একথা সহস্র সহস্র বর্ষ হইতে সর্ব্ববাদিসম্মত রূপে পরিগণিত হইয়া সমস্ত আর্য্য সন্তানের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে কিন্তু কোন শাস্ত্রদর্শী পাশ্চাত্য মহোদয় ৬ নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া এখন তাহার বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন!!! সুতরাং যখন পুরাতত্ব সম্বন্ধে আধুনিক পুরাবৃত্তস্পর্দ্ধী মহাত্মাগণও নিতান্ত স্খলিতপদ হইতেছেন, তখন সেই ঐতিহাসিক চর্চ্চারহিত অব্দীয় পরম পণ্ডিত মাধবাচার্য্যকে এ সম্বন্ধে একটুকু দোষ দিই না। পরন্তু এ দেশীয়দের একটী চিরন্তন অভ্যাস যে, সময়ের সামঞ্জস্য থাকুক আর না থাকুক তাঁহারা কয়েকটী দেবকল্প মহাত্মাকে একস্থানে সমাসীন দেখিতে বড় ভাল বাসেন। ভোজপ্রবন্ধ দেখ এক সভায় ভবভূতি, দণ্ডী, কালিদাস এমন কি মল্লিনাথকেও উপস্থিত দেখিবে। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ দেখ দেখিতে পাইবে দশরথের সভায় ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তথায় ব্যাসনন্দন শুকদেবের প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত আলোচিত হইতেছে। যখন এইরূপ অসম্ভাব্য বিষয়গুলি গ্রথিত রহিয়াছে তখন যে এদেশে শঙ্করাচার্য্য, শ্রীহর্ষ, বাণভট্ট, ময়ুরভট্ট, উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি একস্থলে উপস্থিত ছিলেন,—এরূপ উপন্যাস সেকালের লোকসমাজে প্রচলিত থাকিবে তাহা আশ্চর্য্য নহে। বোধ হয় "শঙ্করদিগ্বিজয়" প্রণেতা এবম্ভূত কোন লোকপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া ঐরূপ লিখিয়াছেন। নচেৎ তাঁহার ন্যায় একজন পরম ধার্ম্মিক একটী মিথ্যা উপন্যাস প্রস্তুত করিয়া কেবল শঙ্করের মানবৃদ্ধির জন্য তাহা গ্রথিত করিবেন, একথা আমরা একটুকু বিশ্বাস করি না। মাধবাচার্য্য শঙ্করবিজয়ের আর এক স্থলে প্রায় দেড় সহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাসদেবের সহিত শঙ্করাচার্য্যের শাস্ত্রালাপ করাইয়াছেন,—এই অদ্ভুত উপাখ্যানটীও যে এইরূপ কোন লোকপ্রবাদ হইতে গৃহীত তাহার কোন ভুল নাই, তবে মাধবাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন, অনেক স্থলে ভক্তি-অন্ধ হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অস্বাভাবিক বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শঙ্করদেবকে রুদ্রের অবতার করিয়াছেন ৭ নররূপী ব্রহ্মা ও ভারতীকে ৮ তাঁহার নিকট বিচারে পরাস্ত করাইয়াছেন—এ সকল উক্তি মাধবাচার্য্যের স্বকৃত কি দেশপ্রচলিত কিংবদন্তী হইতে গৃহীত আমাদের বলিবার সাধ্য নাই। তবে ভক্তিঅন্ধ ভক্ত কবি তাঁহার উপাস্য গুরুকে দেশকল্পিত উপাখ্যানে বিশ্বাস করিয়া তদবলম্বনে অথবা স্বীয় কল্পনাবলে ; দেবতা

৬ J. Talboys Wheeler

৭ শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ং। তয়োর্ব্বিবাদে সংপ্রাপ্তে কিংকরঃ কিংকরোম্যহং॥

৮ মণ্ডনমিশ্র ও তাহার স্ত্রী সারসবাণী।

সাজাইলে কাব্য গ্রন্থের পক্ষে তাহাতে কোন দোষ স্পর্শিতে পারে না; কেন না শঙ্করদিগ্বিজয়" জীবনচরিত বা ইতিহাস নহে;—উহা কাব্য। আমরা মূল বিষয় ছাড়িয়া একটুক তফাত আসিয়া পড়িলাম অতএব এ প্রসঙ্গ ছাড়িয়া এখন প্রকৃত প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করা যাউক।

এখন কথা এই "খণ্ডনকার কবীন্দ্র শ্রীহর্ষ, বাণ, ময়ূর উদয়নাচার্য্য এবং শঙ্করাচার্য্য এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন" এই কথা প্রমাদরহিত কি প্রমাদপূর্ণ আমরাও একবার তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি। পাঠকগণ মনে করিতে পারেন আমরা এই প্রবন্ধে উদয়নাচার্য্যের বিষয় লিখিব তবে আবার কেন শ্রীহর্ষ, বাণ প্রভৃতির বিষয় লিখিতেছি? একথায় আমাদের এইমাত্র বক্তব্য মহাত্মা মাধবাচার্য্যের লিখানুসারে অনেকের দৃঢ় সংস্কার আছে যে উদয়ন, বাণ শ্রীহর্ষ প্রভৃতি শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক লোক। যদি আমরা কেবল মুখের কথায় তাঁহার ন্যায় একজন ভারতবিখ্যাত মহোদয়ের মতকে উড়াইয়া দিই তবে আমাদের কথায় কেহই কর্ণপাত করিবেন না। আর ঐ সকল মহাত্মাদের বিষয় আলোচনা করিলে উদয়নাচার্য্য সম্বন্ধেও অনেক সত্য আবিস্কার হইবে। সেই জন্যই আমরা শ্রীহর্ষ বাণভট্ট, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির সম্বন্ধে কিছু বলিয়া তার পর উদয়নাচার্য্য সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিতেছি।

(শ্রীহর্ষ)

ভারতীয় সাহিত্য-সংসারে দুই জন শ্রীহর্ষ বিরাজমান ছিলেন। এক জন রত্নাবলী নামক প্রসিদ্ধ নাটকপ্রণেতা কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষ। অপর জন নৈষধ-কাব্য-প্রণেতা শ্রীহর্ষ। মাধবাচার্য্য নৈষধ-প্রণেতা শ্রীহর্ষকেই শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক লোক বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। কেন না তিনি "খণ্ডনকার শ্রীহর্ষ" এই রূপ বলিয়াছেন। নৈষধকার শ্রীহর্ষ তাঁহার নৈষধচরিতে লিখিয়াছেন যে তিনি "অর্ণব বর্ণন কাব্য" "নব সাহসাঙ্ক চরিত" "খণ্ডন খণ্ড খাদ্য" "গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তি" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন—

"সংদৃব্ধার্ণববর্ণনস্য নবমস্তস্য ব্যরংসীন্মহাকাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ।" ১

"দ্বাবিংশো নবসাহসাঙ্কচরিতে চম্পূকৃতোঽয়ং মহাকাব্যে তস্য কৃতৌ নলীয়চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ।" ২

"ষষ্ঠঃ খণ্ডনখণ্ডতোঽপি সহজাৎ ক্ষোদক্ষমে তন্মহাকাব্যেঽয়ং ব্যগলন্নলস্য চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ।" ৩

"গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তিভনিতিভ্রাতর্য্যয়ং তন্মহাকাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গোঽগমৎ সপ্তমঃ।" ৪

নৈষধ চরিতের আর এক স্থলে শ্রীহর্ষের নিজ পরিচয়-স্থলে লিখিত আছে যে তাঁহার পিতার নাম শ্রীহীরঃ এবং মাতার নাম মামল্ল দেবী। তিনি কান্যকুব্জেশ্বরের নিকট

সম্মানসূচক তাম্বূলদ্বয় ও আসন লাভ করিয়াছিলেন—

" শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালঙ্কার-হীরঃসুতং শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যং। " ১

"তাম্বূলদ্বয়মাসনংচ লভতে যঃ কান্যকুব্জেশ্বরাৎ। " ২

প্রবন্ধকোষপ্রণেতা জৈননিখ রাজশেখর বলেন শ্রীহীরসুত বারানশী নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। সেখানকার রাজা গোবিন্দচন্দ্রের তনয় মহারাজ জয়ন্তচন্দ্রের আজ্ঞায় " নৈষধ চরিত " প্রণয়ন করেন। জয়ন্ত পঙ্গুল নামে বিখ্যাত। শাস্ত্রদর্শী ডাক্তার বুলারের মতে জয়ন্তচন্দ্রের নামান্তর জয়চন্দ্র এবং ইনি ১১৬৮ এবং ১১৯৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কান্যকুব্জ ও বারানসীর অধিপতি ছিলেন। বাবু রামদাস সেন বলেন—রাজশেখরের বিবরণ প্রামাণিক বোধ হইতেছে; কেননা তাহার সহিত শ্রীহর্ষের নিজ পরিচয়ের ঐক্য আছে (৯) রামদাস বাবু আরো বলেন "পূর্ব্বেই লিখিয়াছি চাঁদ কবি শ্রীহর্ষের সম সাময়িক। চাঁদ কবি শ্রীহর্ষের মান বৃদ্ধির জন্য তাঁহার নাম পৃথ্বীরাজ চৌহান রাজের প্রস্তাবনায় কালিদাসের পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে "নরের প্রধান কবি, সার কবি শ্রীহর্ষ" বলিয়াছেন। শ্রীহর্ষ, কুমারপাল, হেমচন্দ্র, চাঁদ সকলেই খৃষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। (১০) প্রবন্ধচিন্তামণিরও ঐ মত। সুতরাং ডাক্তার বুলার, রামদাস বাবু প্রবন্ধচিন্তামণি প্রভৃতি সকলেই এক বাক্যে "প্রবন্ধ কোষের" বাক্যে আস্থাবান হইয়া নৈষধ-চরিত-প্রণেতা শ্রীহর্ষ খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন এবং ইনিই কান্যকুব্জেশ্বর জয়ন্তচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন এরূপ বলিতেছেন।

অনেকের মত (১১) এই যে আদিশূর অমঙ্গল শান্তির জন্য যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ (১২) আনয়ন করেন তাহার এক জনের নাম শ্রীহর্ষ ; সেই শ্রীহর্ষই "নৈষধচরিত" নামক মহাকাব্য প্রণয়ন করেন। এ সম্বন্ধে জনৈক মহাত্মার মত এই :—"আদিশূর যে পঞ্চ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন তাঁহারা সকলেই সুপণ্ডিত; তন্মধ্যে ভট্টনারায়ন

(৯) ঐতিহাসিক রহস্যের " শ্রীহর্ষ " প্রস্তাব দেখ।

(১০) বঙ্গদর্শন তৃতীয় খণ্ড ৮৪ পৃষ্ঠা।

১১ See Dr. Rajendra Lal Mitra's paper on Mahendra Pala in the journal of the Asiatic Society of Bengal. ঐতিহাসিক রহস্যের "শ্রীহর্ষ" নামক প্রস্তাব, "বঙ্গদর্শন তৃতীয় খণ্ড ২৪—২৯ পৃষ্ঠা। এবং "সম্বন্ধ নির্ণয়" ২১৩ পৃষ্ঠা।

১২ ভট্ট নারায়ণো দক্ষঃ বেদগর্ভোঽথ ছান্দড়ঃ।

অথ শ্রীহর্ষ নামাচ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ।১
শাণ্ডিল্য গোত্রজ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোঽথ কাশ্যপশ্রেষ্ঠো বাৎস্যশ্রেষ্ঠোঽথ ছান্দড়ঃ। ২
ভরদ্বাজ কুলশ্রেষ্ঠঃ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোঽথ সাবর্ণো যথাবেদ ইতিস্মৃতঃ। ৩

"বেণীসংহার নাটকের রচয়িতা সুতরাং হর্ষবর্দ্ধন শ্রীহর্ষ যে, নৈষধকার হইবেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে। তিনি গৌড়ে অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং গঙ্গাসাগর দেখিয়া ছিলেন, ইহা সম্ভব; সুতরাং নৈষধ লিখকের কয়েকটী পরিচায়ক লক্ষণ বঙ্গীয় ভরদ্বাজকুলপিতা শ্রীহর্ষে আছে। আর বাঙ্গালার আদি কবি বিদ্যাপতি তৎকৃত সংস্কৃত পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থে শ্রীহর্ষকে বাঙ্গলা দেশের কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (১৩) ইহাতে জানা যায় ৪০০ বৎসরের পূর্ব্বকার লোকেরাও শ্রীহর্ষকে কবি বলিয়া জানিত। তার পর, এই শ্রীহর্ষকে আদিশূরের সমকালীন বলিলে ইনি দশম খৃষ্টাব্দের লোক ছিলেন; কেননা আদিশূর সম্ভবতঃ ৯৯৫ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন ১৪ ভোজরাজকৃত "সরস্বতী কণ্ঠাভরণে" নৈষধ উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং নৈষধ ভোজরাজের (খৃঃ ১০৪২ অব্দের) পূর্ব্বেও রচিত হইয়াছে; অতএব তাহাকে আদিশূরের সমসাময়িক বলিলে দোষ হয় না। আর চীন পর্য্যটক হুয়েন্থ সঙের লেখায় সপ্তম শতাব্দিতে এক সাহসাঙ্ক রাজার উল্লেখ দেখা যায়। বিশ্বপ্রকাশ রচয়িতা মহেশ্বরের মতে খৃঃ দশম শতাব্দির মধ্য বা শেষ ভাগে এক সাহসাঙ্ক গাধিপুরে (কান্যকুব্জে) রাজত্ব করিতেন। ১৫ দশম শতাব্দীর নৃপতি সাহসাঙ্কের চরিত

১৩ পুরুষপরীক্ষা বিদ্যাপতি কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়। উহা ১৮১৫ খৃঃ অব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষদের নিয়োগ অনুসারে শ্রীহর্ষ প্রসাদ রায় কর্ত্তৃক বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হয় (Calcutta Review Vol XIII P. 189.) ঐ অনুবাদে শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে এই লিখা আছেঃ—

গৌড়দেশে শ্রীহর্ষ নামা এক পণ্ডিত তিনি অতিশয় কবি ছিলেন। এক সময়ে নল চরিত্র নামে কাব্য রচনা করিয়া * * * পশ্চাৎ শ্রীহর্ষ সেই কাব্য লইয়া পণ্ডিত সমাজের উদ্দেশে বারানসী গেলেন। সেখানে গিয়া ককোক নামা পণ্ডিতকে স্বাভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। মেধাবী কথা—পুরুষ পরীক্ষা।

১৪ আদিশূরের রাজত্বকাল—ক্ষিতীশ বংশাবলীর মতে ৯৯৯ শকে বা ১০৭৭ খৃষ্টাব্দে আদিশূর পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। কুলাচার্য্য গ্রন্থের মতে ৯৫৪ শকে বা ১০৩২ খৃষ্টাব্দে আনয়ন করেন; ঘটককারিকা অনুসারে ৯৯৪ শকের ১০৭২ খৃষ্টাব্দের কার্ত্তিক মাসে ব্রাহ্মণেরা বঙ্গে আসিয়াছিলেন। সম্বন্ধ নির্ণয় ক্ষিতীশ বংশাবলীর ৯৯৯ অব্দকে সংবৎ অর্থ করিয়া ৮৬৩ বা ৮৬৪ শকে ৯৪১। ৪২ খৃষ্টাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণের গৌড়ে আগমন ঠিক করিয়াছেন। কায়স্থ কৌস্তুভের মতে আদিশূর কর্ত্তৃক ৩৮০ বঙ্গাব্দে ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণ গৌড়ে আনীত হয়। আদিশূরের রাজ্যারম্ভ লঘুভারতের মতে ৯৫১ শক বা ১০২৯ খৃঃ অঃ। অধ্যাপক লাশেনের মতে ১০৩০ খৃঃ অঃ। ডাক্তার বকাননের মতে ১০৬৫ খৃঃ অঃ। বান্ধবের মতে ৯৫০ শক বা ৯০২৮ খৃষ্টাব্দ।

১৫ A Prince named Sahasanka must have occupied the throne of Kanoaj about the middle of the 10th century as Maheswara the auther of Viswaprakasa in the year 1111, makes himself sixth in desent from the

(১০ম শতাব্দীর ?) বঙ্গীয় শ্রীহর্ষ লিখিবেন বিচিত্র কি ? ১৬ অতঃপর চাঁদকবি নৈষধ প্রণেতা শ্রীহর্ষের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

"নররূপং পচদ্মা শ্রীহর্ষদারং
নলেরায়কণ্ঠ দিইল হৃদ্যহারং।" ১৭

দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের ১৮ লোক চাঁদ কবি যে খৃঃ দশম শতাব্দীতে বর্ত্তমান শ্রীহর্ষের কথা উল্লেখ করিবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে।"

যে সকল যুক্তি অনুসরণ করিয়া ডাক্তার বুলার প্রভৃতি নৈষধপ্রণেতা শ্রীহর্ষকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়াছেন; আমরা পরকীয় যুক্তি সকলে এমন কোন অকাট্য প্রমাণ দেখিতে পাইলাম না যাহার বলে উল্লিখিত মত সকল খণ্ডাইয়া আমরা শ্রীহর্ষকে খৃঃ দশম শতাব্দীর নৃপতি আদিশূরের সমকালবর্ত্তী বলিতে পারি। পরকীয় যুক্তিতে যে সকল প্রমাণ প্রকটিত হইয়াছে তাহার মধ্যে "স্বরস্বতী কণ্ঠাভরণে নৈষধের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে" এই কথাটী বলবান ছিল। কিন্তু এই প্রমাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান্ আছেন। রামদাস বাবু বলেন "আমার নিকট রত্নেশ্বরের টীকা সহিত সরস্বতী কণ্ঠাভরণ আছে কিন্তু তাহাতে নৈষধের প্রমাণ নাই। বুলার সাহেবও এই প্রমাণ উক্ত অলঙ্কার গ্রন্থে দেখেন নাই, আফেক্‌ট ও তাঁহার সুবিস্তীর্ণ সংস্কৃত গ্রন্থের তালিকায় একথা উল্লেখ করেন নাই,—কাজেই যদি অন্য কোন "সরস্বতীকণ্ঠাভরণে" নৈষধের শ্লোক থাকে তবে তাহা কোন আধুনিক পণ্ডিত দ্বারা সন্নিবেশিত বলিব—এজন্য উহা কৃত্রিম। ১৯ এখন দেখা যাইতেছে পরকীয় যুক্তিতে যেটী বলবৎ প্রমাণ ছিল তাহা বজায় রহিল না। ইহা ব্যতীত অন্যান্য যে সকল যুক্তি প্রকটিত হইয়াছে তাহা অনুমানসিদ্ধ কথা; ও সকল আমরা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। প্রত্যুত উহার কোন কোন যুক্তি অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়, কেন না তিনিই বলিয়াছেন আদিশূর ৯৯৫ খৃষ্টাব্দের লোক এবং সাহসাঙ্ক যে একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন তাহাও বিশ্বাস করিয়াছেন; ইহাও একরূপ ঠিক কথা যে যখন শ্রীহর্ষ আদিশূরের আহ্বানে গৌড়ে আসেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৮০ অশীতি বৎসরের উপরে ছিল ২০ সুতরাং যখন সাহসাঙ্কের জীবনী লিখিবার প্রকৃত সময় হয়—অর্থাৎ সাহসাঙ্ক রাজত্ব ছাড়িয়াছেন ও তাহার জীবনের ঘটনা শেষ হয়; হয়তো আদিশূর আনীত শ্রীহর্ষ তখন

---

physician of that monarch, Asiatic Researches Vol XV P 463.

১৬ বঙ্গদর্শন ৩য় খণ্ড, ২৩। ২৪। ২৫ পৃ

১৭ নরের প্রধান সার কবি শ্রীহর্ষ, যিনি নলরাজার কণ্ঠে হৃদ্য হার দিয়াছেন।

১৮ চাঁদ কবি পৃথুরাজের সমসাময়িক, পৃথুরাজ ১১৯২ খৃ অব্দে মহম্মদ ঘোরির সহিত যুদ্ধে নিহত হয়েন।

১৯ "বঙ্গদর্শন" তৃতীয় খণ্ড ৮৪ পৃষ্ঠা।

২০ সম্বন্ধ নির্ণয়-মতে এসময় শ্রীহর্ষের বয়ঃক্রম ৯০ বৎসর ছিল ১৬৩ পৃষ্ঠা।

পরলোক প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন অথবা চলৎ-শক্তি-রহিত বৃদ্ধ হইয়া ছিলেন সুতরাং "রাম না জন্মিতে রামায়ণের" ন্যায় তিনি সাহসাঙ্কের জীবনচরিত লিখিয়া ছিলেন!!! বাস্তবিক ন্যায়পথে চলিয়া যদি নৈষধকার শ্রীহর্ষের সময় পর্য্যালোচনা করা যায় তবে তাঁহাকে আদিশূরের সময়ের অনেক পরকীয় লোক বলিতে হইবে। অতএব ডাক্তার বুলার, রামদাস বাবু প্রভৃতি যে নৈষধকার শ্রীহর্ষকে খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক বলিয়াছেন একথাই আমাদের নিকট অধিক সারবান বলিয়া বোধ হয়।

পরন্তু আদিশূর-আহূত ভরদ্বাজ গোত্রীয় হর্ষবর্দ্ধন শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এপর্য্যন্ত একটী মহাভ্রম করিয়া আসিতেছেন। নৈষধকার শ্রীহর্ষ নিজ পরিচয়স্থলে তাঁহাকে শ্রীহীরের পুত্র বলিয়াছেন অথচ আদিশূর-আনীত শ্রীহর্ষের পিতা ক্ষিতীশাদি পঞ্চ বিপ্রের অন্যতম বিপ্র মেধাতিথি ছিলেন। ২১ সম্বন্ধ নির্ণয়ে লিখিত আছে "নৈষধে মুকুটালঙ্কারহীর" লিখা আছে সুতরাং মেধাতিথি নামটী মুকুটালঙ্কারহীরের নামান্তর কহিতে হইবে, একথা, আমরা একটুকও স্বীকার করিতে পারি না কেননা শ্রীহীরের নামান্তর যদি মেধাতিথি হইত, তবে নিশ্চয়ই তাহার কোন প্রমাণ থাকিত; যখন কোথাও নাই তখন স্বীকার করিতে হইবে যে ভরদ্বাজগোত্রীয় মেধাতিথিনন্দন শ্রীহর্ষই আদিশূর-আনীত পঞ্চ বিপ্রের অন্যতম বিপ্র, শ্রীহর্ষ। আর শ্রীহীরের পুত্রই নৈষধকার—শ্রীহর্ষ। ইঁহারা উভয়ে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কারণ এক জনের দুই পিতা থাকা অসম্ভব ও অলৌকিক ব্যাপার। সুতরাং এতদিন পুরাতত্ত্ববিশারদ মহোদয়গণ যে নৈষধকার হীরসুত শ্রীহর্ষকে আদিশূর-আহূত মেধাতিথি-নন্দন শ্রীহর্ষের সহিত অভেদ কল্পনা করিয়া তাঁহাকে বঙ্গীয় কবি সাজাইয়াছিলেন তাহার মূলে কুঠারাঘাত পড়িতেছে ২২। ইহা দুঃখের বিষয় বটে; কেননা নৈষধকার শ্রীহর্ষ যদি বাস্তবিকই বঙ্গীয় কবি হইতেন তবে আমরাও গৌরবান্বিত হইতাম। পুরাতত্ত্ব-লিখকগণ অযথা আদিশূরের পুরোহিত শ্রীহর্ষকে নৈষধ-প্রণেতা কল্পনা করিয়া এক গোলমাল বাঁধাইয়াছেন। বাস্তবিক নৈষধকার শ্রীহর্ষ যে আদিশূরের অন্যতম পুরোহিত হইতে অনেক পরকীয় স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং নৈষধকার যে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক তাহার কোন ভুল নাই।

কেহ বলিতে পারেন, যদি নৈষধপ্রণেতা শ্রীহর্ষ গৌড়ীয় নৃপতিগণের সহিত কিয়ৎ

২১ "সম্বন্ধ নির্ণয় ২১৩ পৃষ্ঠা।
শ্রীক্ষিতীশস্তিথির্মেধা বীতরাগ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা আগতো গৌড় মণ্ডলে।

২২ আমরা প্রস্তাব লিখিয়া শেষ করিয়াছি—এমন সময়ে হঠাৎ দেখিতে পাইলাম বান্ধবের কোন লিখকও এ মতটীর উদ্ভাবনা করিয়াছেন। বান্ধব, তৃতীয় খণ্ড, ৩৭৯ পৃষ্ঠা (১২৮৩)

কাল অতিবাহিত না করিতেন তবে তিনি গৌড়ীয় রাজাদের বিষয় এত পরিজ্ঞাত থাকিতেন না, কেননা তিনি "গৌড়োর্ব্বীশ-কুল-প্রশস্তি" অর্থাৎ গৌড়ীয় রাজবংশের বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন। বোধ হয় এই কথায় এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ভিন্ন দেশীয় লোক কর্ত্তৃক এরূপ গৌড়ীয় রাজবংশের বিবরণ লিখা তত আশ্চর্য্য নহে। হয় তো তিনি কখন গৌড়ে পর্য্যটন করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তখন তিনি গঙ্গাসাগর-সঙ্গম দেখিয়া গিয়াছিলেন এবং লোকের নিকট গৌড়ীয় রাজবংশের বিবরণ অবগত হইয়াছিলেন, সেই অভিজ্ঞতা অবলম্বন করিয়া নৈষধচরিতে গঙ্গাসাগর-সঙ্গম বর্ণনা করিয়াছেন এবং "গৌড়োর্ব্বীশ-কুল-প্রশস্তি" নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। অথবা গৌড়ীয় রাজকুলের ন্যায় প্রসিদ্ধ রাজবংশের সমুদয় বিবরণ লোকমুখে অথবা অন্য উপায়ে অবগত হইয়া দুই এক শতাব্দীর পর "গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তি" প্রণয়ন করিবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। সুতরাং আদিশূর প্রভৃতির অনেক পরবর্ত্তী লোক যে গৌড় রাজধানীতে অবস্থিতি না করিয়াও দূর দেশ হইতে সেই রাজবংশীয় ইতিহাস প্রণয়ন করিবেন তাহাও বিচিত্র নহে। যদি আশ্চর্য্য হও তবে বল দেখি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যুগযুগান্তপরে সপ্ত সমুদ্র পার হইয়া কিরূপে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ করিতেছেন? বলিতে পার পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের গবেষণা-শক্তি আছে কিন্তু হিন্দু সন্তানদের যে গবেষণা-শক্তি নাই তাহা বলা যায় না; হিন্দু সন্তানদের সংগ্রহ-গ্রন্থ দেখ টীকা-গ্রন্থ দেখ বুঝিতে পারিবে হিন্দু সন্তানগণ কীদৃশ গবেষণা-শক্তি-সম্পন্ন; তাঁহাদের সেই অলোকিক ক্ষমতার নিকট পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকে হীন-প্রভ বলিয়া বোধ হয়। তবে ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে তাঁহারা এ ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া তত আবশ্যক জ্ঞান করিতেন না। কিন্তু যখন হীরনন্দন শ্রীহর্ষ "সাহসাঙ্কচরিত" ও "গৌড়োর্ব্বীশ-কুল-প্রশস্তি" নামক দুই খানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তখন তিনি ঐতিহাসিক মহিমা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই; অতএব তিনি গবেষণার বলে অনেক পূর্ব্বকার ঘটনা সংগ্রহ করিয়া "গৌড়োর্ব্বীশ-কুল-প্রশস্তি" প্রণয়ন করিবেন তাহা একটুকুও অসম্ভব জ্ঞান করি না।

যদিও "গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তি" এখন পাওয়া যায় না কিন্তু যুক্তির আশ্রয় লইলে শুধু এই গ্রন্থের নামটী দেখিয়াই বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে তৎপ্রণেতা আদিশূরের অনেক পরবর্ত্তী লোক। কেননা তিনি যখন গৌড়ীয় রাজকুলের প্রশংসা লিখিয়াছেন তখন বোধ হয় তিনি আদিশূরের পরবর্ত্তী নৃপতিদের বৃত্তান্তও উহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কারণ, "রাজকুল" বলিলে উহার সীমা একটী রাজায় নিবদ্ধ থাকে না—"রাজকুল" শব্দে সমসাময়িক কিম্বা পুরুষপরম্পরাগত ধারাবাহিক কতকগুলি নৃপতিকে বুঝাইবে। আদি-

শূরের সময়, গৌড়দেশে আদিশূর ব্যতীত আর কোন বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন না। আদিশূরের পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতিগণ সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল, পরম হিন্দু হীরনন্দন যে হিন্দুবিদ্বেষী বৌদ্ধদের সম্মান বৃদ্ধির জন্য তাহাদিগকে প্রশংসা করিয়া তদীয় গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন, বোধ হয় না। সুতরাং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে যে হীরনন্দন শ্রীহর্ষ তাঁহার গৌড়োর্ব্বীশ-কুল-প্রশস্তিতে (২৩) অর্থাৎ গৌড়ীয় নৃপতি কুলের প্রশংসা বিষয়ক গ্রন্থে আদিশূর হইতে বল্লালসেন প্রভৃতি রাজাদের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব শুদ্ধ এই কথার বলেও তাঁহাকে আদিশূরের অনেক পরবর্ত্তী লোক বলা যাইতে পারে। এবং এই কথার বলে নৈষধকার শ্রীহর্ষকে খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক বলিলে দোষ হয় না।

শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহার পরিসমাপ্তি করিলাম, এখন বাণভট্ট, ময়ূরভট্ট ও শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই এক পংক্তি বলিয়া উদয়নাচার্য্যের জীবনীর আরম্ভ করিব।

ক্রমশঃ

প্রকৃতি এবং তাহার মূল-নিয়ম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উন্নতির নিয়ম।

ভারতীর ৩ ভাগ ৩ সংখ্যা ১০৬ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্বকার প্রতিজ্ঞা-অনুসারে এক্ষণে উন্নতি-সপ্তকের সবিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। কোথায় উদ্ভিদ-রাজ্য, কোথায় জীব-রাজ্য, কোথায় পৃথিবীর স্তর-সংস্থাপন, কোথায় সৌর জগৎ, সর্ব্বত্রই সপ্তক অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় বটে, কিন্তু কোথায় সূর্য্য কোথায় নক্ষত্র কোথায় একটি ক্ষুদ্র বালুকণা সর্ব্বত্রই একই আকর্ষণের নিয়ম বলবৎ, ইহা অপেক্ষা কি আর আশ্চর্য্যের বিষয়। কিঞ্চিৎ পরেই দেখা যাইবে যে, আকর্ষণ-বিক্ষেপের পর্য্যায়-ক্রম আপনা-আপনিই সপ্তকে পরিণত হয়।

জগতের সমস্ত ব্যাপারই নিয়মের অধীন,—নিয়মের নিকট ক্ষুদ্র-বৃহৎ দূর-নিকট আত্ম-পর সকলই সমান। যে বস্তু যেস্থানে

---

২৩ "গৌড়" "উর্ব্বী, ঈশ" (পৃথিবী-পতি) "কুল" "প্রশস্তি" (প্রশংসা) অর্থাৎ গৌড়ের নৃপতিকুলের প্রশংসা।

আছে, নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই তাহা সে-স্থানে আছে; সূর্য্য কেন ওস্থানে, পৃথিবী কেন এস্থানে, উদ্ভিদের মূল কেন নিম্নে, শাখা-প্রশাখা কেন উর্দ্ধে, মনুষ্যের চক্ষু কেন উচ্চ-স্থানে, রসনা কেন তাহার নিম্ন স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর এই যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থিতি—যাহা লইয়া সমুদায় জগতের স্থিতি-ব্যাপার—নিয়মই তাহার মূল;—এ ত গেল আকাশে অবস্থিতি; এমনি আবার ঘটনা-সকলের কালে-অবস্থিতিও নিয়ম-সাপেক্ষ; হিন্দুজাতির পতন কেন ঠিক এই সময়টিতে হইল, ফরাসিস্ রাজ্য-বিপ্লব কেন ঠিক অমুক সময়টিতে হইল, তাহার পূর্ব্বেই-বা না হইল কেন, তাহার পরেই-বা না হইল কেন? নিয়মই ইহার মূল।

বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন দেশাংশে অবস্থিতির যে নিয়ম, তাহা স্থিতির নিয়ম এবং বিভিন্ন ঘটনার বিভিন্ন কালাংশে অবস্থিতির যে নিয়ম তাহা গতির নিয়ম বলিয়া উক্ত হইতে পারে; কিন্তু স্থিতি এবং গতি উভয়ই পরস্পরকে অপেক্ষা করে, উভয়ের মধ্যে কেহ কাহাকে একেবারে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না;—বস্তু-সকল যখন অনেক দেশ-হইতে আসিয়া এক-দেশে মিলিত হয় তখন পরস্পরের গতি পরস্পর-কর্ত্তৃক প্রতিহত হইয়া বোধ হয় বুঝি-বা স্থগিত হইয়া গেল, কিন্তু বাস্তবিক তাহা হইতে পারে না; অধুনাতন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা ইহা একেবারেই স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কোন গতি একদিকে রুদ্ধ হইলে তাহা আর এক দিকে আর এক বেশে আবির্ভূত হইবেই হইবে; এক কথায় এই যে, চিন্তা-ব্যতিরেকে যেমন মন থাকিতে পারে না, গতি-ব্যতিরেকে তেমনি জড় বস্তু থাকিতে পারে না; অতএব আপেক্ষিক গতিরোধ-ভিন্ন স্থিতি-শব্দের আর কোন অর্থ হইতে পারে না; গতি-শব্দেও আপেক্ষিক অনবস্থিতি-ভিন্ন ঐকান্তিক অনবস্থিতি বুঝায় না; স্থিতি এবং গতি যখন এইরূপ পরস্পরাপেক্ষ, তখন ইহা নিঃসংশয় যে, বস্তু-সকলের স্থিতির নিয়ম—যাহা অসীম দেশ-হইতে প্রতি-দেশের এবং এক-দেশ হইতে অন্য-দেশের ভিন্নতা-সাধক সুতরাং সর্ব্বদেশব্যাপী, এবং তাহাদের গতির নিয়ম যাহা অসীম-কাল-হইতে প্রতি-মুহূর্ত্তের এবং এক-মুহূর্ত্ত-হইতে অন্য-মুহূর্ত্তের ভিন্নতা-সাধক সুতরাং সর্ব্বকালব্যাপী, সর্ব্বদেশব্যাপী এবং সর্ব্বকালব্যাপী এ-দুটি নিয়ম দুইটি স্বতন্ত্র নিয়ম নহে পরন্তু উহারা একই মূল-নিয়মের এপিট-ওপিট। বস্তু-সকলের অনেক দেশ-হইতে এক-দেশে মিলিত-হওয়া এবং এক-দেশ হইতে অনেক-দেশে ছটকিয়া পড়া, এ-দুটি ব্যাপার নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় জগতের সর্ব্বত্রই কোন-না-কোন আকারে বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহার প্রথমটিতে স্থিতির প্রাধান্য এবং দ্বিতীয়টিতে গতির প্রাধান্য বিশেষরূপে উপলব্ধি হয়; নিশ্বাস-প্রশ্বাস যেমন শরীর-ঘটিত নিয়মের অধীন, ও-দুটি ব্যাপার সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ড-ঘটিত নিয়মের অধীন, বিধিমত ধরিতে গেলে উভয়-ব্যাপারই একই মূল নিয়মের

অধীন;—উন্নতির নিয়মই সেই মূল নিয়ম;—দেশকালাশ্রিত তাবৎ ব্যাপারই স্থিতি এবং গতি উভয়ের মধ্যে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করত উন্নতি-পথে ধাবমান হইতেছে।

আমাদের দেশের পূর্ব্বতন শাস্ত্রকারেরা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের নিয়মকে সমুদায় জগতের মূল নিয়ম বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন,—আমরা তাঁহাদের কথা শিরোধার্য্য করিয়া বেশির ভাগ এই-আর-একটি কথা বলি যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের নিয়মই উন্নতির নিয়ম;—আমরা বলি, প্রলয়ের উত্তরকালীন যে নূতন সৃষ্টি তাহা পূর্ব্ব-সৃষ্টির নূতন সংস্করণ সুতরাং তাহা উন্নতি-সোপানের এক ধাপ উচ্চে অবস্থিত।

স্থিতি এবং গতি এই দুই মূল ব্যাপার বৈজ্ঞানিক ভাষায় আকর্ষণ-বিক্ষেপ, দার্শনিক ভাষায় স্থিতি-প্রলয়, সাংসারিক ভাষায় বন্ধন এবং বিশ্লেষণ, আর চলিত ভাষায় ভাঙন এবং গড়ন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে; এতদুপলক্ষে যাহা মনে রাখা কর্ত্তব্য তাহা আর কিছু নয়—উচ্চতর স্থিতির জন্যই (উন্নতির জন্যই) গতি, উচ্চতর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবার জন্যই বিক্ষেপ, উচ্চতর সৃষ্টির জন্যই প্রলয়, উচ্চতর বন্ধনের জন্যই বিশ্লেষণ, ভাল করিয়া গড়নের জন্যই ভাঙন,—এই। ভাবি জাগরণের সহিত সম্পর্ক-রহিত নিদ্রা, কিম্বা ভাবি নিদ্রার সহিত সম্পর্ক-রহিত জাগরণ, দুইই যেমন জীবনের বিরোধী—তেমনি ভাবি সৃষ্টির সহিত সম্বন্ধ-রহিত প্রলয় অথবা ভাবি প্রলয়ের সহিত সম্বন্ধ-রহিত সৃষ্টি দুইই জগৎসংসারের বিরোধী; এককথায় এই—স্থিতি-গতি বন্ধন-বিশ্লেষণ প্রভৃতি যে কিছু দ্বন্দ্ব-ব্যাপার সমস্তই আপেক্ষিক। জাগরণ, জীবন, বন্ধন, এ সমস্ত ব্যাপার স্থিতির দলে,—নিদ্রা, মৃত্যু, বিশ্লেষণ এ সমস্ত ব্যাপার প্রলয়ের দলে,—আর পুনর্জাগরণ, পুনর্জীবন, পুনর্মিলন, এসমস্ত ব্যাপার সৃষ্টির দলে; এইরূপ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ব্যাপার—বন্ধন বিশ্লেষণ এবং পুনর্মিলনের ব্যাপার—জগতের সকল ঘটনাতেই স্পষ্টাক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, সপ্তক-শ্রেণী যাহা আমরা ইতি-পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি, বন্ধন এবং বিশ্লেষণই তাহার মূল বৃত্তান্ত—সে যে কিরূপ তাহা এক্ষণে আনুপূর্ব্বিক প্রদর্শন করা যাইতেছে।

যে কোন বস্তু হউক্ না কেন—আর আর সমুদায় বস্তু-হইতে তাহাকে বিশ্লেষিত করিয়া না দেখিলে "এই একটি বস্তু" এরূপ করিয়া তাহাকে আমরা স্পষ্ট রূপে অবধারণ করিতে পারি না; তাহা কি একেবারেই স্বয়ংসিদ্ধ স্বতন্ত্র বস্তু—না আর আর বস্তুর সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত, ইহা পরের কথা, আপাতত তাহাকে স্বতন্ত্র একটি বস্তু বলিয়া ত ধরা যাউক্ তাহার পরে তাহার সহিত কাহার কিরূপ সম্বন্ধ তাহা অবধারণ করিবার চেষ্টা দেখা যাইবে; পরে যদি বুঝি যে, তাহা স্বতন্ত্র বস্তু নহে পরন্তু অন্য একটি ব্যাপক বস্তুর অন্তর্গত, তখন পূর্ব্ব-সিদ্ধান্তের ভ্রমাংশটুকু তদনুসারে সংশোধন করিয়া লওয়া যাইবে—এই

ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া অন্য সকল বস্তু-হইতে—সমুদায় জগৎ-হইতে—আপনাকে বিশ্লেষিত করিয়া পৃথক্-বস্তু-রূপে সমর্থন করা—আপনার স্পষ্ট অভিব্যক্তি সাধন করা—উন্নতির প্রথম প্রকরণ। কিন্তু আর এক দিকে দেখা যায় যে অন্যের সম্বন্ধেই আপনার অভিব্যক্তি-সাধন সম্ভবে, আপনার আপনিত্ব সাধন করিতে হইলে অন্যের অন্যত্ব সাধন করা সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যক হয়—সুতরাং আপনাকে অন্য-হইতে সহস্র বিশ্লেষিত করিলেও অন্যের সহিত আপনার সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইবার নহে। অতএব অন্য-হইতে আপনাকে যে বিশ্লেষিত করা তাহা কতক দূর পর্য্যন্তই ভাল, তাহার ওদিকে গেলে তাহা স্বভাব-বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়া পড়ে; মিলনের আনন্দ স্পষ্ট-রূপে উপভোগ করিতে হইলে তৎপূর্ব্বে কিছু-কালের জন্য বিচ্ছেদের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক বটে কিন্তু তাহা বলিয়া এমন বিচ্ছেদ কাহারো স্পৃহনীয় হইতে পারে না—যাহার সহিত ভাবী মিলনের কোন সম্পর্কই নাই; বীণার তার হইতে সুর বাহির করিতে হইলে তাহাকে অঙ্গুলি-তাড়না-দ্বারা, যেমন প্রসারণ করিতে হয়, তেমনি আবার প্রসারণের পরেই সঙ্কুচন আসিবে এটির প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হয়,—কেননা প্রসারণের অনুচিত মাত্রাধিক্য হইলেই তার ছিঁড়িয়া গিয়া সমস্তই ভণ্ডুল হইয়া যাইবে।

অতএব বিশ্লেষণের অর্থ আর কিছু নয়, কেবল আগমিষ্যৎ বন্ধনের জন্য প্রস্তুত হওয়া মাত্র। প্রথম বয়সে মনুষ্যের কর্ত্তব্য এই যে, সংসার-হইতে পৃথক্ থাকিয়া, নির্লিপ্ত থাকিয়া, সংসারের জন্য প্রস্তুত হওয়া; স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিদ্যা অর্থ প্রভৃতি পাথেয়-সম্বল উপার্জ্জন করা—আপনার উপকার সাধন করা;—অতএব এ-সময়ে অন্য-সমস্ত-হইতে আপনাকে বিশ্লেষিত করিয়া স্বকার্য্য-উদ্ধারে সবিশেষ যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু বিশ্লেষণের মাত্রা-পূরণ হইলেই বন্ধনের পালা উপস্থিত হয়, এবং এমনি নির্বিবাদে বন্ধন আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে যে, বন্ধনকে বিশ্লেষণ-হইতে পর বলিয়া মনে হয় না।

মনুষ্য প্রথম-বয়সে আপনাকে সমুদায় জগৎ-হইতে ভিন্ন করিয়া প্রতিপাদন করে, পারত-পক্ষে অন্যের অধীনতা স্বীকার করিতে চায় না; সচরাচর লোকে এই ভাবের উপর ভর করিয়া কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত বিদ্যা এবং অর্থ-প্রতিপত্তি উপার্জ্জনপূর্ব্বক আপনার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি সাধন করে; তাহার পরে সময়ের মাত্রা পূরণ হইলে যখন দম্পতি-প্রেম তাহার মনোমধ্যে প্রবেশ করে, তখন তাহার সে ভাবের একেবারেই ভাবান্তর হইয়া পড়ে,—অন্যের সহিত আপনার যোগের ভাব তখন স্পষ্টরূপে হৃদয়ের উপর আধিপত্য করে; তখন দেখিতে পায় যে অন্যের সহিত জড়িতভাব আপনার স্বতন্ত্র ভাবের হন্তারক নহে, পরন্তু তাহার আরো পরিপোষক; ছায়া এবং আলোকের মিলন যেমন উভয়েরই

স্পষ্ট অভিব্যক্তির পোষকতা করে, দম্পতির মিলনও সেইরূপ।

প্রথমে ব্যক্তি-বিশ্লেষণ, তাহার পর দাম্পত্য-বন্ধন, তাহার পর সন্তান-সন্ততি বিশ্লেষণ; যদি বল যে, স্নেহবন্ধন কি বন্ধন নহে—কেমন করিয়া বলি তাহা বিশ্লেষণ। ইহার উত্তর এই যে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি বন্ধনের সহিত সম্পর্ক রহিত বিশ্লেষণ অথবা বিশ্লেষণের সহিত সম্পর্ক-রহিত বন্ধন উভয়ই অসিদ্ধ; ব্যক্তি-বিশ্লেষণের কথা যাহা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি তাহার মধ্যে কি বন্ধনের ভাব কিছু মাত্র নাই? ব্যক্তি-বিশেষ যখন আর আর সমুদায় জগৎ হইতে বিশ্লেষিত হয়, তখন কি সমুদায় জগতের সঙ্গে সত্য-সত্যই তাহার কোন প্রকার যোগ থাকে না; জ্যোতিষ্ক জগতের সহিত যোগ থাকে না? না চন্দ্র সূর্য্যের সহিত যোগ থাকে না—না পৃথিবীর জল বায়ু মৃত্তিকার সহিত যোগ থাকে না—না রাজার সহিত যোগ থাকে না—না কৃষকের সহিত যোগ থাকে না—কাহার সহিত না তাহার যোগ থাকে? এমন কি কোন একটির অভাব হইলেই তাহার প্রাণ-সংশয় উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাতে আর সংশয় হইতে পারে না যে, আর আর সমুদায় জগৎ হইতে বিশ্লেষণের ভাবই তাহার ব্যক্তিত্বের মুখ্য উপাদান—সমুদায় জগতের সহিত তাহার বন্ধন আছে এবং তাহা ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুটও হইবে কিন্তু এখনকার এ সময়ে বন্ধনের ভাব আনুষঙ্গিক এবং বিশ্লেষণের ভাব মুখ্য-রূপ ধারণ করে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

পিতা মাতার সহিত সন্তান-সন্ততির যে বন্ধন তাহা ত থাকিবেই কিন্তু পিতা মাতা হইতে তাহারা বহুধা-বিভিন্ন আকারে পরিণত হইয়া সৃষ্টির নূতনত্ব সম্পাদন করিবে এই দিকেই তাহাদের গতি; পিতামাতার বাৎসল্য-ভাবের মূলেও—সন্তানগণেতে আপনাদের গুণ ভিন্ন অন্যান্য নূতন নূতন গুণের অভিব্যক্তি দেখিবার ইচ্ছা বিলক্ষণ কার্য্য করিতে থাকে; এরূপ যখন—তখন বিশ্লেষণই এখানকার প্রধান অঙ্গ তাহার আর সন্দেহ নাই।

এক মূল পরিবার হইতে যখন নানা শাখা-পরিবার বহুধা-বিভিন্ন হইয়া পরিণত হয়, তখন সৌহার্দ্দ-বন্ধনই তাহাদের সেই ভিন্নতার প্রতিবিধান করে; তাহারা এক আদর্শে গঠিত সুতরাং তাহারা সহস্র ভিন্ন হইলেও তাহাদের মধ্যেকার মূলগত ঐক্যটি বিলুপ্ত হইবার নহে; উক্ত আদর্শটি প্রত্যেক ব্যক্তিতে যদিও বিভিন্ন আকারে প্রতিফলিত হয়, তথাপি তাহা গোড়ায় এক এবং সেই আদর্শের মধ্য দিয়াই পরস্পর পরস্পরের ভাব-গ্রহণে সমর্থ হয়। সেই আদর্শটিই তাহাদের সকলকে এক বন্ধনে বাঁধিয়া রাখে; এইরূপ আদর্শ-মূলক বন্ধনের ভাবই বন্ধুতার প্রাণ-স্বরূপ। জাতীয় বন্ধনের মূলে জাতীয় আদর্শ, পারিবারিক বন্ধনের মূলে পারিবারিক আদর্শ, দল বন্ধনের মূলে দলীয় আদর্শ থাকা চাই, তাহারই উপর জাতীয় বন্ধুতা, পারি-

বারিক বন্ধুতা এবং দলীয় বন্ধুতা নির্ভর করে।

সৌহার্দ্দবন্ধনের মধ্যে যে একটি মূলের আদর্শ আছে তাহা শাখাগত ভিন্নতার মধ্যেই প্রতিভাত হয়; সেই ভিন্নতার মাত্রা বাহুল্য-বশত উক্ত আদর্শের একত্বটি কালক্রমে দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া পড়িতে পারে; তাহা যাহাতে না হয় এজন্য শাখা-প্রশাখা যত বিস্তৃত হয় মূল আদর্শের প্রতি ততই বিশেষ রূপে প্রণিধান করা আবশ্যক হয়। বর্ত্তমান সমাজ পিতৃ পুরুষদিগের আদর্শে গঠিত, কিন্তু গোড়ার সেই আদর্শ নানা প্রকার শাখা-সংস্কারের সহিত জড়িত হইয়া কালক্রমে তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে; তাহার প্রতিবিধান করিবার জন্য সেই আদর্শকে উক্ত শাখা-সংস্কার-সকল-হইতে বিশ্লেষিত করিয়া তাহার প্রতি ভক্তি সমর্পণ করা আবশ্যক। উন্নতির আর এক নাম—অভিব্যক্তি; যাহা অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাবে—জড়িত ভাবে—অবস্থিতি করে তাহাকে ব্যক্ত ভাবে পরিণত করাই উন্নতি। নিউটন বিজ্ঞানের যৎপরোনাস্তি উন্নতি করিয়াছেন ইহা কাহারো অবিদিত নাই, কিন্তু তাঁহার বৈজ্ঞানিক পূর্ব্ব পুরুষেরা যাহা আবিস্কার করিয়া গিয়াছিলেন তাহা-হইতে বাজে ডালপালা গুলি বাদ দিয়া সার সত্য-গুলি সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন মাত্র। আমাদের দেশের এক জন পূর্ব্বতন জ্যোতির্বেত্তা তাঁহার গ্রন্থে ভারাকর্ষণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা ত প্রত্যক্ষ-প্রমাণ; নিউটনের পূর্ব্বে ইউরোপ-দেশে ও-তত্ত্বটির একেবারেই যে কোথাও কোন উল্লেখ ছিল না ইহাও সম্ভব বোধ হয় না; কিন্তু নিউটন যেমন স্পষ্ট করিয়া তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাঁহার পূর্ব্ব-আচার্য্যদিগের মধ্যে কেহই তাহার দিকেও ঘেঁসিতে পারেন নাই—নিউটন তাঁহার পূর্ব্ব-আচার্য্যদিগের নিকট-হইতে ভক্তি পূর্ব্বক বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, ইহা যেমন সত্য—ইহা তেমনি সত্য যে, তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন সমস্তেরই পূর্ব্বাভাস তাঁহাদের স্থানে কোন না কোন আকারে বর্ত্তমান ছিল; নিউটন যে-জায়গায় আকর্ষণ-বিক্ষেপ বলিয়াছেন, তাঁহার গ্রীকদেশীয় বৈজ্ঞানিক পূর্ব্ব-পুরুষেরা নয় সেই জায়গায় রাগ-দ্বেষ (Sympathy—Antipathy) বলিয়াছেন—তাহাতে কি আইসে যায়? এক জড়-বস্তু দূরস্থিত অন্য একটা জড়-বস্তুকে ধরিয়া টানিতেছে—আর শেষোক্ত বস্তু অনুরাগ বশতঃ পূর্ব্বোক্ত বস্তুর নিকটস্থ হইতেছে, একই কথা;—প্রযত্নও মনের ধর্ম্ম রাগ-দ্বেষও মনের ধর্ম্ম, দুই ধর্ম্মই শুদ্ধ কেবল রূপকচ্ছলে জড়বস্তুতে প্রয়োগ করা হইতে পারে; কিন্তু সেই রূপক ভেদ করিয়া দেখিলে দুয়ের মধ্যে একই বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব নিউটনের নূতন আবিষ্কার একেবারেই নূতন নহে; তবে কি—না পূর্ব্বে তাহা তমসাচ্ছন্ন অস্ফুট-ভাবে ছিল, তিনি তাহাকে সুব্যক্ত এবং জ্যোতির্ম্ময় ভাবে পরিণত করিয়াছেন—

ইহাতেই তাঁহার এত মহিমা। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা আমাদিগকে যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহার প্রতি অবহেলা করিলে আমরা কখনই উন্নতি-লাভে সমর্থ হই না, পরন্তু সে-সকল বিষয়কে মাজিয়া ঘষিয়া জঞ্জাল-হইতে মুক্ত করাই উন্নতি-লাভের একমাত্র উপায়। মনে কর কোন ব্যক্তি আজ কৃষি-কার্য্য শিক্ষা করিল, কাল্ তাহার সহিত আর সম্পর্ক রহিল না—কাল শিল্প-কার্য্য শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল; পরশ্ব কৃষিকার্য্য গেল, শিল্পকার্য্য গেল, বাণিজ্য-ব্যবসায় শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, এইরূপ নিত্যই নূতন আরম্ভ, যাহার সহিত পুরাতনের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই তাহাতে মনুষ্য যত উন্নতি লাভ করে তাহা বুঝাই যাইতেছে; এ যেমন, তেমনি কোন সমাজ যদি পূর্ব্বের সহিত কোন সম্পর্ক না রাখিয়া কেবল নূতন পথেই ধাবমান হয় তাহারো সেই দশা উপস্থিত হয়; যে আদর্শ-অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করা হয় সেই আদর্শ-অনুসারেই কার্য্যের উন্নতি-সাধন করিতে হয়, সুতরাং পূর্ব্বের সঙ্গে পশ্চাতের মিল রাখা উন্নতি-সাধনের পক্ষে অতীব একটি প্রয়োজনীয় ব্যাপার,—এমনি প্রয়োজনীয় যে তা নৈলেই নয়। আধুনিক বঙ্গ-সমাজের এখন নাকি বিকার-দশা উপস্থিত, তাই সমাজ-সংস্কার আর পূর্ব্ব-পুরুষদিগের প্রতি অভক্তি এ-দুই বিরোধী ব্যাপারকে অনেকে একাসনে বসাইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না—সে যাহাই হউক—বড় বড় সমাজ-সংস্কারক-মাত্রেই পূর্ব্বপুরুষদিগের ভাব লইয়া তাঁহাদের অভীষ্ট কার্য্য আর-একধাপ উচ্চে অগ্রসর করিয়া দেন মাত্র; কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মঙ্গলই ভক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ভক্তিকে মঙ্গল-দ্বারা নিয়মিত করা আবশ্যক; পূর্ব্ব-পুরুষদিগের মন্দ-গুলি হইতে ভালগুলি বাছিয়া লওয়া আবশ্যক—আমাদের দেশের পূর্ব্বতন কোন মহর্ষি বলিয়াছেন "যানাস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরানি," আমাদের সুচরিত-গুলিই তোমা-কর্ত্তৃক উপাস্য, অন্য-গুলি নয়।

মূলের আদর্শকে শাখা-সংস্কার-সকলের জটিলতা-হইতে বিশ্লেষিত করিয়া দেখা, উচ্চকে নীচ-হইতে, আত্মাকে শরীর-হইতে, পরমাত্মাকে জগৎ-হইতে, বিশ্লেষিত করিয়া দেখা, ভক্তির পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক এ-জন্য বিশ্লেষণেরই এখানে সবিশেষ প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে। দম্পতি-বন্ধনের ফল যেমন সন্তান-বিশ্লেষণ, সমাজ-বন্ধনের ফল সেইরূপ আদর্শ-বিশ্লেষণ; দম্পতি-বন্ধন হইতে যেমন সন্তান প্রসূত হয়, সমাজ-বন্ধন হইতে সেইরূপ উচ্চ-হইতে উচ্চতর আদর্শ (Idea) প্রসূত হইয়া বিজ্ঞানশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, কাব্যশাস্ত্র, দর্শন-শাস্ত্র প্রভৃতি নানা আকারে পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত হয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, মূলের সেই যে আদর্শ তাহা পদার্থটা কি? ইহার উত্তর এই যে, জ্ঞান-ধর্ম্ম-প্রেম প্রভৃতি আধ্যাত্মিক-ভাবের অভিব্যক্তিই সমস্ত জগতের মূল আদর্শ, এবং সেই মূল আদর্শ

ব্যক্তি-বিশেষে, বংশ-বিশেষে, জাতি-বিশেষে প্রতিফলিত হইয়া বহুধা-বিচিত্র শাখা-আদর্শে পরিণত হয়; ইহাতে-করিয়া শাখা-আদর্শ-সকলেতে মূল-গত একত্ব এবং শাখা-গত বৈচিত্র উভয়ের সংযোগ-সংঘটন হয়; এখন বক্তব্য এই যে, শাখাআদর্শ হইতে ক্রমশঃ মূল আদর্শের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করাই ভক্তি এবং মঙ্গলের পথ। আধ্যাত্মিক ভাবের অভিব্যক্তিই সমুদায় জগতের মূল আদর্শ, কিন্তু সে অভিব্যক্তি সমগ্ররূপে কোন দেশেই সম্ভবে না, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অংশেই সম্ভবে; এক কথায় এই যে, আধ্যাত্মিক ভাবের ঐকাংশিক অভিব্যক্তি ভিন্ন ঐকান্তিক অভিব্যক্তি সৃষ্টির কোন প্রদেশেই সম্ভবে না। একটা কোন সমাজ ধরা যাউক্—যেমন বঙ্গ-সমাজ;—বঙ্গ সমাজে আধ্যাত্মিক ভাবের অভিব্যক্তি যে অংশে হইয়াছে তাহাই বঙ্গসমাজের সামাজিক আদর্শ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে; এবং বঙ্গ-সমাজের জন-সাধারণের মধ্যে যে-কিছু বন্ধুতার বন্ধন আছে তাহা কথিত সামাজিক আদর্শের উপরেই নির্ভর করে; বঙ্গ-সমাজের শাখা-আদর্শ-গুলির মধ্যে কোন্‌টি দেখিতে শুনিতে ভাল——সুরুচি সঙ্গত—সুন্দর, তাহার নির্ব্বাচন-কার্য্যে স্বভাবতই জন-সাধারণের প্রবৃত্তি যায়, এবং সেই সৌন্দর্য্য মূলক নির্ব্বাচনের গুণে কাল-ক্রমে নানা আদর্শের মধ্য হইতে বিশেষ কোন একটি আদর্শ বিশেষ মর্য্যাদা-ভাজন হইয়া দাঁড়ায়; এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সামাজিক সৌহার্দ্দ-বন্ধন সৌন্দর্য্য দ্বারাই নিয়মিত হয়। মূল-আদর্শের শাখা-আদর্শ বলিয়া যাহা কিছু প্রতিভাত হয় তাহাই সুন্দর-শব্দের বাচ্য;—মূল-আদর্শ অমূর্ত্ত—শাখা-আদর্শ তাহারই মূর্ত্তি-বিশেষ; অমূর্ত্ত আদর্শের মূর্ত্তিমান ভাবই সৌন্দর্য্য নামে অভিহিত হয়;—কথা-বার্ত্তাতেই হউক, আচার-ব্যবহারেই হউক্, আকার-অবয়বেই হউক্, ভাব-ভঙ্গিতেই হউক্, যাহাতে যে অংশে অমূর্ত্ত আদর্শ মূর্ত্তিমান হয় তাহা সেই অংশে সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হয়; কিন্তু সৌন্দর্য্য-হইতে মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইতে হইলে সেই অমূর্ত্ত আদর্শকে তাহার মূর্ত্তি-বিশেষ হইতে বিশ্লেষিত করিয়া তাহার প্রতি ভক্তি-সমর্পণ করা আবশ্যক——শাখা-সংস্কার-সকলের জটিলতা-হইতে সমাজের মূল পৈতৃক আদর্শ উদ্ধার করিয়া তৎপ্রতি ভক্তি-সমর্পণ করা আবশ্যক—ইহা ভিন্ন কোন সমাজেরই সামাজিক উন্নতির উপায়ান্তর নাই। সৌন্দর্য্য-হইতে মঙ্গলের দিকে উত্থান করা, এবং সৌন্দর্য্য-হইতে উচ্চতর সৌন্দর্য্যে উত্থান করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া—একই কথা;—সর্ব্বজগতে এক অদ্বিতীয় মূল আদর্শের মূর্ত্তিমান ভাবই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম সৌন্দর্য্য, ইহার কথা পরে আসিতেছে।

তাহার পরে আসিতেছে যে, সকল আদর্শই একই সার্ব্ব-ভৌমিক মূল-আদর্শের শাখা-প্রশাখা—সুতরাং প্রত্যেক শাখা-আদর্শের অভ্যন্তরেই মূল আদর্শ-

বর্ত্তমান, এবং মূল-আদর্শের মধ্যে সমস্ত শাখা-আদর্শ বর্ত্তমান; যে আদর্শ-অনুসারে জীবদেহে রক্ত-সঞ্চালন হইতেছে সেই আদর্শ-অনুসারে মহাকাশে গ্রহগণ সঞ্চরণ করিতেছে—প্রত্যেক আদর্শে সার্ব্বভৌমিক মূল-আদর্শ উপলব্ধি করিবার এই যে ভাব যাহা সমস্ত শাখা-আদর্শকে সার্ব্ব-ভৌমিক মূল-আদর্শ দ্বারা পরিবদ্ধ এবং পরিপূরিত দেখিতে চায়, ইহাই উন্নতি-সপ্তকের ষষ্ঠ ধাপ; এই ষষ্ঠ ধাপটিতে সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে এবং পরমাত্মাতে সর্ব্বভূতকে দর্শন করিবার ভাব, সার্ব্বলৌকিক বন্ধনের ভাব, অভিব্যক্ত হয়। সমস্ত কালের মধ্যে, সমস্ত আকাশের মধ্যে, অন্তর-বাহিরের মধ্যে, ভাব আবির্ভাবের মধ্যে, পরমাত্মা-জগতের মধ্যে কাহারো মধ্যে ব্যবধান নাই সকলের মধ্যে যোগ-সূত্র বহমান রহিয়াছে—সত্যের অনুমোদিত এই যোগের ভাবে উত্থান করা সাধনের চরম ফল।

যে ছয়টি ধাপ পরপর প্রদর্শিত হইল তাহা দুই থাকে বিভক্ত—প্রথম থাকটি নিম্নগামী অর্থাৎ কারণ-হইতে কার্য্যের দিকে তাহার লক্ষ্য—এবং দ্বিতীয় থাকটি উর্দ্ধগামী অর্থাৎ কার্য্য হইতে কারণের দিকে তাহার লক্ষ্য। সাংখ্য-ভাষায় প্রথম থাকটি অনুলোম-পদ্ধতি এবং দ্বিতীয় থাকটি প্রতিলোম-পদ্ধতি বলিয়া উক্ত হয়। কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তি হইবার জন্য যে-টি চাই তা' এই—কার্য্যোৎপাদন-ক্ষম বিশ্লেষিত ব্যক্তিদ্বয়ের সম্মিলন, কেননা কেবলমাত্র বিশুদ্ধ-এক-হইতে কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না,—দুয়ের সম্মিলন-জনিত যে, এক, সেই-এক-হইতেই কার্য্য প্রসূত হয়; শুদ্ধ কেবল বীজ অথবা শুদ্ধ কেবল মৃত্তিকাদি—বৃক্ষোৎপত্তির কারণ নহে, পরন্তু উভয়ের সংযোগই বৃক্ষোৎপত্তির কারণ; শুদ্ধ কেবল আত্মা অথবা শুদ্ধ কেবল শরীর দর্শন-শ্রবণাদির কারণ নহে, পরন্তু উভয়ের সংযোগই তাহাদের কারণ; অতএব কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে প্রথমতঃ ব্যক্তিদ্বয়ের বিশ্লেষণ দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তি-দ্বয়ের বন্ধন এই দুইটি প্রকরণ নিতান্তই আবশ্যক; কাজেই প্রথম থাকটিকে তিনটি ধাপে বিভক্ত হইতে হইয়াছে—যথা

১ ব্যক্তি-বিশ্লেষণ

২ দাম্পত্য-বন্ধন

৩ সন্তান-বিশ্লেষণ

এই গেল অনুলোম-পদ্ধতি; প্রতিলোম-পদ্ধতি কি? না কার্য্যেতে কারণ-মূলক আদর্শের যে মূর্ত্তিমান-ভাব তাহা হইতে উক্ত আদর্শের সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে উত্থান করা, ইহাকেই বলে কার্য্য-হইতে কারণে উত্থান করা। সন্তান-উৎপাদনই অনুলোম-পদ্ধতির চরম তাৎপর্য্য, পিতা মাতার বিশেষ-গুণ-গুলি বিশেষ-বিশেষ দেশ-কাল-অবস্থার বশবর্ত্তী হইয়া সন্তানগণেতে বিশেষ-বিশেষ রূপে প্রতিফলিত হয়, সুতরাং বর্ত্তমান পদ্ধতির গতি বিশেষ হইতে বিশেষের দিকে; প্রতিলোম-পদ্ধতির গতি ঠিক তাহার বিপরীত দিকে—সাধারণ হইতে সার্ব্বভৌমিকের দিকে; প্রথমতঃ সমাজ-বন্ধনের লক্ষ্য সাধারণের

প্রতি—জন-সাধারণের প্রতি; জন কি? না যে ব্যক্তি জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে—(এখানকার পরিভাষা-মতে) বিশেষ হইতে বিশেষে পরিণত হইয়াছে; সাধারণ কি? না যাহা তাহাদিগকে এক-সঙ্গে ধারণ করিয়া রাখে—বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে না দেয়—এমনি সকল ঐক্যবন্ধনের আদর্শ; দ্বিতীয়তঃ সমাজের উন্নতি-সাধন করিতে হইলে সেই আদর্শ-গুলিকে বাজে ডাল-পালা হইতে বিশ্লেষিত করিয়া লোকের চক্ষে ধারণ করা আবশ্যক; প্রথম সমাজ-বন্ধন-কালে লোকেরা সাধারণ আদর্শ এবং তাহার বিশেষ বিশেষ অবয়ব উভয়কে স্থূল-দর্শিতা-হেতু একাকার দেখে; বাল্মীকি রামের চরিত্র এরূপ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—যেন আধ্যাত্মিক আদর্শও যা রামও তা—দুয়ের মধ্যে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই;—আদর্শ এবং আদৃষ্টের মধ্যে এই রূপ যে একটি লপেট্-ভাব ইহা সৌন্দর্য্য-প্রধান—ইহা হইতেই কবিদিগের কাব্য উচ্ছ্বসিত হয়; এখন যেমন সংবাদ-পত্র সমাজের নিয়ামক, পূর্ব্বে সেইরূপ কবিদিগের কাব্য এবং গান সমাজের নিয়ামক ছিল—কিন্তু এরূপ অবস্থা চিরকাল টেঁকিতে পারে না; তাহার কারণ এই যে, লোকের সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মধ্যে গুণ-বৈচিত্রেরও বৃদ্ধি হইতে থাকে—এবং সেই বৈচিত্র্যের আধিক্য প্রযুক্ত একত্বের আদর্শ-গুলি ঢাকা পড়িয়া যায়; এই সময়ে ক্ষমতাবান্ ব্যক্তিরা উক্ত বৈচিত্র্যের মধ্য-হইতে সেই আদর্শ-গুলিকে উদ্ধার করিবার জন্য সচেষ্ট হন—এই সময়ে মনুর ন্যায় ব্যক্তিরা রাজ্য-শাসনের আদর্শ-গুলিকে তাহার বিশেষ-বিশেষ অবয়ব-সকল হইতে বিশ্লেষিত করিয়া শাস্ত্র-পদবীতে উত্তোলন করেন (শাস্ত্রের অর্থ আর কিছু নয় শাসন-প্রণালী,) ব্যাসের ন্যায় ব্যক্তিরা তত্ত্বজ্ঞানের আদর্শগুলিকে তাহার আশপাশের জটিলতা হইতে বিশ্লেষিত করিয়া লিপিবদ্ধ করেন, ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ সেই আদর্শগুলি সমুদায় জন-সাধারণের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে প্রবেশ করত প্রভূত বৈচিত্রের মধ্যে একত্ব-সাধন করে—এইখানে পৌঁছিলেই জন-সমাজ রীতিমত একটা আড্ডায় পৌঁছে।

অতএব প্রতিলোম পদ্ধতিরও অবয়ব তিনটি, কি? না কার্য্যেতে কারণ-ঘটিত আদর্শের মূর্ত্তিমান ভাব, কার্য্য হইতে উক্ত আদর্শের বিশ্লেষণ এবং কার্য্য-সকলেতে কারণের সর্ব্বময় ভাব; এই তিনটি ভাব নিম্ন-স্থিত তিনটি ধাপে পরিণত হয়, যথা—

১ আদর্শ-মূলক বন্ধন

২ আদর্শ-বিশ্লেষণ

৩ সার্ব্বভৌমিক বন্ধন

যেমন বীণা-তন্ত্রী অঙ্গুলি-তাড়িত হইলে তাহা এক-দিক্-হইতে অন্য-দিকে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করে সেই রূপ জগৎ-সংসার অনুলোম-পদ্ধতি-হইতে প্রতিলোম পদ্ধতিতে এবং প্রতিলোম পদ্ধতি-হইতে উচ্চতর অনুলোম-পদ্ধতিতে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করে; অতএব নিম্নে উক্ত পদ্ধতিদ্বয় পার্শ্বাপাশি সন্নিবেশিত হইল, এবং তাহাদিগকে যথা

ক্রমে সা রে গা মা পা ধা উপাধি দ্বারা চিহ্নিত করা হইল, যথা

অনুলোম-পদ্ধতি	প্রতিলোম-পদ্ধতি
সা—ব্যক্তি-বিশ্লেষণ	মা—বন্ধুতা-বন্ধন
রে—দাম্পত্য-বন্ধন	পা—আদর্শ-বিশ্লেষণ
গা—সন্তান-বিশ্লেষণ	ধা—সার্ব্বভৌমিক বন্ধন

এখন সপ্তম-স্বর-নিখাদ কি তাহা দেখা যাউক; প্রতিলোম-পদ্ধতি হইতে উচ্চতর অনুলোম-পদ্ধতিতে আরোহণ করা চাই, অর্থাৎ প্রথম সপ্তকের মা-পা-ধা-হইতে দ্বিতীয় সপ্তকের সা-রে-গাতে উত্থান করা চাই, কিন্তু এই প্রকার প্রতিলোম-পদ্ধতি-হইতে উচ্চতর অনুলোম-পদ্ধতিতে আরোহণ করিতে হইলে নিখাদ-স্বরের মধ্যস্থতা আবশ্যক হয়। সার্ব্বভৌমিক বন্ধনের ভাব মনুষ্যের আত্মাতে অভিব্যক্ত হইলে তাহার ব্যক্তিত্বের হানি হওয়া দূরে থাকুক প্রত্যুত সত্যের আলোকে তাহার স্বতন্ত্র-সত্তা-পূর্ব্বাপেক্ষা আরো জাজ্বল্যরূপ ধারণ করে; সার্ব্বভৌমিক বন্ধনের সহিত উচ্চতর ব্যক্তি-বিশ্লেষণের যে সংশ্লিষ্ট ভাব তাহাই প্রতিলোম পদ্ধতি হইতে উচ্চতর অনুলোম-পদ্ধতিতে আরোহণ করিবার সোপান—তাহাই নিখাদ-স্বর; পরব্রহ্মের মহান্ ভাবের প্রতি প্রতিলোম পদ্ধতির লক্ষ্য, জীবের আত্ম-প্রভাবের প্রতি অনুলোম-পদ্ধতির লক্ষ্য, উপরি-উক্ত সপ্তম স্বরে উঠিলে দুই পদ্ধতির সন্ধিস্থল পাওয়া যায়,—সেই সন্ধিস্থল——যেখানে আত্মপ্রভাব এবং দেব-প্রসাদ পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণে মিলিত হইয়া অভেদ বৎ প্রতীয়মান হয়; অতএব সর্ব্বশুদ্ধ এইরূপ পাওয়া যাইতেছে

অনুলোম পদ্ধতি	প্রতিলোম পদ্ধতি
সা—ব্যক্তি-বিশ্লেষণ	মা—বন্ধুতা-বন্ধন
রে—দাম্পত্য-বন্ধন	পা—মূল-আদর্শ-বিশ্লেষণ
গা—সন্তান-বিশ্লেষণ	ধা—সার্ব্বভৌমিক-বন্ধন

নি—উভয়-পদ্ধতির সন্ধিস্থান

অষ্টম সা—উচ্চতর ব্যক্তি-বিশ্লেষণ অর্থাৎ উচ্চতর অভিব্যক্তি-সাধন; এই সা হইতে আবার উচ্চতর রে গা মা পা প্রভৃতি চলিবে এবং তাহারও অষ্টম সা হইতে আরো উচ্চতর রে গা মা প্রভৃতি চলিবে—উন্নতি-সপ্তকের অনন্ত প্রবাহ কোন-কালেই অন্ত হইবার নহে।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে বন্ধন-বিশ্লেষণের পর্য্যায়-ক্রম এবং অনুলোম-প্রতিলোম পদ্ধতির পর্য্যায়-ক্রম মিলিত হইয়া সপ্তক উৎপাদন করে; আর এক কথা এই যে তিনটি ত্রিত্ব মিলিয়া একটি সপ্তক হয়, যথা (১) অনুলোম-পদ্ধতির তিনটি ধাপ; (২) প্রতিলোম পদ্ধতির তিনটি ধাপ; (৩) অনুলোম পদ্ধতি, প্রতিলোম-পদ্ধতি;—এবং উভয়ের সন্ধিস্থল এই তিনটি ধাপ, এই তিনটি ত্রিত্ব।

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র।

গত বৃহস্পতিবারে House of Commons-এ ভারতবর্ষ নিয়ে খুব বাদানুবাদ চোলেছিল, সে দিন ব্রাইট সিভিল সর্ভিস্ সম্বন্ধে ও গ্লাড্‌ষ্টোন তুলা-জাতের শুল্ক ও আফগান যুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয়দের দরখাস্ত দাখিল করেন। ৪ টার সময় পার্ল্যামেণ্ট খোলে; আমরা কতকগুলি বাঙ্গালী মিলে ৪টে না বাজ্‌তে বাজ্‌তে হোসে গিয়ে উপস্থিত হলেম; তখনো হৌস খোলে নি, দর্শনার্থীরা হৌসের বাইরে একটা প্রকাণ্ড ঘরে দাঁড়িয়ে আছে, ঘরের চার দিকে Burke, Fox, Chatham Walpole, প্রভৃতি রাজনীতিবিশারদ মহাপুরুষদের প্রস্তর মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে রোয়েছে, প্রতি দরজার কাছে পাহারাওয়ালা পাকাচুলের পরচুলা-পরা, গাউন-ঝোলানো পার্ল্যামেণ্টের কর্ম্মচারীরা হাতে দুই একটা খাতা পত্র নিয়ে আনাগোনা কোরছিলেন। তাঁদের মনে কি ছিল, আমি অবিশ্যি ঠিক কোরে বোল্‌তে পারিনে, কিন্তু তাঁদের সেই ভ্রূক্ষেপ-শূন্য মুখের ভাব দেখে আমার কল্পনা হোচ্ছিল, যেন তাঁরা মনে মনে দর্শনার্থীদের বোলছিলেন, "আমাদের দিকে একবার চেয়ে দেখ, আজকের কি হবে না হবে তাই দেখ্‌বার জন্যে তোমরাত দুয়ারের কাছে হাঁ কোরে দাঁড়িয়ে আছ, কিন্তু আমরা তা' সমস্ত জানি, এখন কিছু ভাংচিনে, ক্রমে ক্রমে সব টের পাবে।" তাঁদের দেখে আমার কি মনে পোড়ল জান? আমাদের দেশের গ্রেট্‌ন্যাশনেল্ থিয়েটরে যখন এখনো যবনিকা ওঠেনি, দর্শকেরা সব বোসে আছে, তখন ষ্টেজের সেই পাশের দরজা দিয়ে দুই একজন ষ্টেজ্‌সংক্রান্ত লোক একবার ষ্টেজ্ থেকে বেরোচ্ছেন, একবার ষ্টেজের মধ্যে ঢুকচেন, যেন তাঁরা দর্শকদের জানাতে চান "তোমরা ত এ ষ্টেজের মধ্যে ঢুকতে পার না, এর ভিতরে কি হোচ্চে কিছুই জান না, ঐ বেঞ্চিগুলো পর্য্যন্তই তোমাদের অধিকারের সীমা।" এই রকম তাঁদেরও সেই মহা রহস্যময় মুখের ভাব। এই উইগ-গাউন্-পরা ব্যক্তিগণ পার্ল্যামেণ্টের ক্লার্ক্। এঁদের হাতের কাগজ পত্রগুলো দেখ্‌লে গা-টা কেঁপে ওঠে। চারটের সময় হৌস্ খুলল। আমাদের কাছে Speaker's gallery র টিকিট ছিল। House of Commons-এ ৫ শ্রেণীর গ্যালারী আছে,—Stranger's gallery, Speaker's gallery, Diplomatic gallery, Reporter's gallery, lady's gallery—হৌসের যে কোন মেম্বরের কাছ থেকে বৈদেশিক গ্যালারির টিকিট পাওয়া যায়, আর, বক্তার অনুগ্রহ হোলে তবে বক্তার গ্যালারির টিকিট পাওয়া যেতে পারে। diplomatic galleryটা কি পদার্থ তা ভাল

কোরে বোল্‌তে পারিনে, আমি যে-কবার হৌসে গিয়েছি, দুই এক জন ছাড়া diplomatic galleryতে লোক দেখ্‌তে পাই নি। Stranger's gallery থেকে বড় ভাল দেখা শুনো যায় না, তার সামনে Speaker's gallery, speaker's galleryর সুমুখে diplomatic gallery। আমরা গ্যালারিতে গিয়ে ত বোসলেম। পরচুলা-ধারী speaker মহাশয় গরুড় পক্ষীটির মত তাঁর সিংহাসনে গিয়ে বোস্‌লেন। হৌসের সভ্যেরা-সব আসন গ্রহণ কোরলেন। কাজ আরম্ভ হোল। হৌসের প্রথম কাজ প্রশ্নোত্তর করা। হৌসের পূর্ব্ব অধিবেশনে এক এক জন মেম্বর বোলে রাখেন যে আগামী বারে আমি অমুক অমুক বিষয়ে জিজ্ঞাসা কোরব, তার উত্তর দিতে হবে। একজন হয়ত জিজ্ঞাসা কোরলেন, অমুক জেলায় একজন ম্যাজিস্ট্রেট অমুক আইন-বিরুদ্ধ কাজ কোরেছেন, সেক্রেটরী মহাশয় তার কি কোন সংবাদ পেয়েছেন, আর সে বিষয়ে কি কোন বিধান কোরেছেন? এবিষয়ে যিনি দায়ী, তিনি উঠে তার একটা কৈফিয়ৎ দিলেন। সেদিন O'donnel নামে একজন Irish member উঠে জিজ্ঞাসা কোরলেন যে, "Echo এবং আরো দুই একটি খবরের কাগজে জুলুদের প্রতি ইংরাজ সৈন্যদের অত্যাচারের যে বিবরণ বেরিয়েছে, সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কি কোন সংবাদ পেয়েছেন? আর সে সকল অত্যাচার কি খৃষ্টানদের অনুচিত নয়?" অমনি গবর্ণমেণ্টের দিক থেকে সার্ মাইকেল্ হিকস্‌বিচ্ উঠে ওডোনেলকে খুব কড়া কড়া দুই এক কথা শুনিয়ে দিলেন, অমনি একে একে যত আইরিষ্ মেম্বর ছিলেন, সকলে উঠে তার কড়া কড়া উত্তর দিতে লাগ্‌লেন, এই রকম অনেক ক্ষণ ঝগড়া ঝাঁটি কোরে দুই পক্ষ শান্ত হোয়ে বোসলেন। এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্তরের ব্যাপার সমস্ত হোলে পর যখন বক্তৃতা করবার সময় এল, তখন হৌস থেকে অধিক অংশ মেম্বর উঠে চোলে গেলেন। দুই একটা বক্তৃতার পর ব্রাইট উঠে সিভিল সর্ভিসের রাশি রাশি দরখাস্ত হৌসে দাখিল কোর্‌লেন। বৃদ্ধ ব্রাইট্‌কে দেখ্‌লে অত্যন্ত ভক্তি হয়, তাঁর মুখে ঔদার্য্য ও দয়া যেন মাখানো; ব্রাইট্‌কে যখন আমি প্রথম দেখি, যখন আমি তাঁকে ব্রাইট্ বোলে চিনতেম না, তখন অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর মুখ থেকে আমি চোখ্ ফেরাতে পারি নি। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রাইট্ সে দিন কিছু বক্তৃতা করলেন না। হৌসে অতি অল্প মেম্বরই অবশিষ্ট ছিলেন, যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিদ্রার আয়োজন কোর্‌ছিলেন, এমন সময়ে গ্লাড্‌ষ্টোন উঠ্‌লেন; গ্লাডষ্টোন্ ওঠবামাত্রেই সমস্ত ঘর একবারে ঘোর নিস্তব্ধ হোয়ে গেল, গ্লাডষ্টোনের স্বর শুনতে পেয়ে আস্তে আস্তে বাইরে থেকে দলে দলে মেম্বর আস্‌তে লাগ্‌লেন, দুই-দিকের বেঞ্চি পূরে গেল। তখন পূর্ণ উৎসের মত গ্লাডষ্টোনের বক্তৃতা উৎসারিত হোতে লাগ্‌ল, সে এমন চমৎকার যে কি বল্‌ব! কিছুমাত্র চীৎকার, তর্জ্জন গর্জ্জন

ছিল না, অথচ তাঁর প্রতি কথা, ঘরের যে-খানে যে কোন লোক বোসেছিল, সকলই একেবারে স্পষ্ট শুন্‌তে পাচ্ছিল। গ্ল্যাডষ্টোনের কি এক রকম দৃঢ় স্বরে বল্‌বার ধরণ আছে, তাঁর প্রতি কথা মনের ভিতর গিয়ে যেন জোর কোরে বিশ্বাস জন্মিয়ে দেয়। একটা কথায় জোর দেবার সময় তিনি মুষ্টি-বদ্ধ কোরে একেবারে নুয়ে নুয়ে পড়েন, যেন প্রত্যেক কথা তিনি একেবারে নিংড়ে নিংড়ে বের কোরচেন। আর সেই রকম প্রতি জোর-দেওয়া কথা দরজা ভেঙ্গে চুরে যেন মনের ভিতর প্রবেশ করে। আইরিষ্‌ মেম্বর সলিভানের সঙ্গে গ্ল্যাডষ্টোনের বাগ্মিতার তফাৎ কি জান? সলিভান খুব হাত পা নেড়ে, চেঁচিয়ে মেচিয়ে, হুটপাট কোরে বোলে যান, তাঁর বক্তৃতা মনে লাগে বটে, কিন্তু সে ভাব বড় বেশিক্ষণ থাকে না, তাঁর তর্জ্জন গর্জ্জনও যেমন থামে, শ্রোতাদের মনও অমনি জুড়িয়ে যায়। কিন্তু গ্ল্যাডষ্টোন্‌ অনর্গল বলেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রতি কথা ওজন-করা, তার কোন অংশ অসম্পূর্ণ নয়, তিনি বক্তৃতার প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত সমস্বরে জোর দিয়ে বলেন না, কেন না সে-রকম বলপূর্ব্বক বোল্‌লে স্বভাবতই শ্রোতাদের মন তার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়ায়, তিনি যে কথায় জোর দেওয়া আবশ্যক মনে করেন, সেই কথাতেই জোর দেন, তিনি খুব তেজের সঙ্গে বলেন বটে, কিন্তু চীৎকার কোরে বলেন না; মনে হয় যা' বোল্‌ছেন, তাতে তাঁর নিজের খুব আন্তরিক বিশ্বাস। গ্ল্যাডষ্টোনের বক্তৃতাও যেমন থাম্‌ল, অমনি হৌস্‌ শূন্যপ্রায় হোয়ে গেল, দুদিকের বেঞ্চিতে ৬।৭ জনের বেশী আর লোক ছিল না। গ্ল্যাডষ্টোনের পর স্মলেট্‌ যখন বক্তৃতা আরম্ভ কোরলেন; তখন দুই দিককার বেঞ্চিতে লোক ছিল না বোল্লেও হয়, কিন্তু তিনি ক্ষান্ত হবার পাত্র নন, শূন্য হাউস্‌কে সম্বোধন কোরে তিনি অত্যন্ত দীর্ঘ এক বক্তৃতা কল্লেন, সেই অবকাশে আমি অত্যন্ত দীর্ঘ এক নিদ্রা দিই; দুই একজন মেম্বর, যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা কেউ বা পরস্পর গল্প কোর্‌ছিলেন, কেউবা চোখের ওপর টুপি টেনে দিয়ে ডিস্‌রেলীর পদচ্যুতির পর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখ্‌-ছিলেন! হৌসে Irish memberদের ভারি যন্ত্রণা; সে বেচারীরা যখন বক্তৃতা কর্‌তে ওঠে, তখন হাউসে যে অরাজকতা উপস্থিত হয়, সে আর কি বল্‌ব! চারদিক থেকে ঘোরতর কোলাহল আরম্ভ হয়, অভদ্র মেম্বরেরা হাঁসের মত 'ইয়া ইয়া' কোরে চেঁচাতে থাকে, বিদ্রূপাত্মক hear hear শব্দে বক্তার স্বর ডুবে যায়, এই রকম বাধা পেয়ে বক্তা আর আত্মসম্বরণ কোর্‌তে পারেন না, খুব জ্বোলে ওঠেন, আর তিনি যতই রাগ কোরতে থাকেন ততই হাস্যাস্পদ হন। আইরিষ মেম্বরেরা এই রকম জ্বালাতন হোয়ে আজকাল খুব প্রতিহিংসা পরায়ণ হোয়েছেন। হাউসে যে কোন কথা ওঠে, প্রায় সকল বিষয়েই তাঁরা বাধা দেন, আর প্রতি প্রস্তাবে এক জনের পর আর

একজন কোরে উঠে দীর্ঘকালব্যাপী বক্তৃতায় হাউস্‌কে বিব্রত কোরে তোলেন। আমি ঠিক কোরে বোলতে পারিনে, যে, আইরিষ মেম্বরেরা আগে থাকতেই ঐ রকম আচরণ কোরতেন বোলেই অন্যান্য মেম্বরেরা তাঁদের প্রতি ঐ রকম অত্যাচার করেন, কি, অন্যান্য মেম্বরদের কাছে অত্যাচার সোয়ে সোয়ে আইরিষ মেম্বরেরা এই রকম প্রতিহিংসা তুলতে আরম্ভ কোরেছেন। আমার স্বভাবতই আইরিষ মেম্বরদের প্রতি টান, সুতরাং স্বভাবতই আমার বিশ্বাস হয় যে, পুর্ব্বোক্তটাই বেশী সম্ভব। এর কারণ সহজেই নির্দ্দেশ করা যায়, মনে কর, আইরিষদের অনুগ্রহ কোরে পার্লামেণ্টে স্থান দেওয়া হোয়েছে, আইরিষরা সেই অনুগ্রহ পেয়েই যদি শান্ত ছেলেগুলির মত হোসে বোসে থাক্‌ত, তাদের অস্তিত্ব আছে কি না আছে যদি জানা না যেত, তা হোলে অনুগ্রহ-কর্ত্তারা সন্তুষ্ট থাক্‌তেন, কিন্তু তারাও যদি অন্যান্য মেম্বরদের মত বাদানুবাদ কোর্ত্তে থাকে, নিজের মত প্রকাশ করে, অন্য লোকের মত প্রতিবাদ করে, তা হোলে সকলের চোটে ওঠা খুব স্বাভাবিক। ইণ্ডিয়া-কৌন্‌সিলে যদি এক দল ভারতবর্ষীয় মেম্বর থাকে, আর তারা যদি জুজুর মত বোসে না থাকে, সকল কথাতেই „"হাঁ।" না দিয়ে যায়, আর সঙ্কুচিত স্বরে কিছু বোলতে গিয়ে অম্‌নি গবর্ণমেণ্টের নীরব চোক্‌ রাঙানি দেখে থত মত খেয়ে যদি না বোসে পড়ে, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের উৎসাহজনক পিট-থাবড়া খেয়ে আহ্লাদে যদি গোলে না পড়ে, তাহোলে তাদের কি দুর্দ্দশা হয় মনে কোরে দেখ দেখি! তাহোলে দুদিন বাদেই তাদের ঘাড়ে হাতটি দিয়ে বলা হত, "বেরোও বেরোও বাপুগণ!" ইংলণ্ডে সভাদেশে, সমস্ত য়ুরোপের চোখের সামনে এ রকম ঘোটতে পারে না; একবার যখন তাদের অধিকার দিয়েছে, তখন আর ফিরিয়ে নিতে পারে না। তুমি নিজে রাজি হোয়ে তাদের সমান অধিকার দিলে, বোল্লে যে, তোমাতে আমাতে আর বিভিন্নতা রইল না, তবে আজ কেন খুঁৎ খুঁৎ কর? কিন্তু লোকে তা' ক'রে থাকে। আমাকে যদি কোন লেখক, তার লেখা শোনাতে আসে, আর বিশেষ কোরে বলে যে, "তুমি খুব স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ কোরো, আমার কিছু মাত্র কষ্ট হবে না।" তা শুনেই যে, আমি স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ করি তা' নয়, কেন না, আমি মনে করি ও-ব্যক্তি অত কোরে বোলছে যখন, তখন ওর ধ্রুব বিশ্বাস যে, ওর লেখায় এমন কোন দোষ নেই, যা' আমি বের করতে পারি। আমি এখেনে দুজন ব্যক্তিকে বাঙ্গলা পড়াতেম, তাঁদের দুজনের মধ্যে যিনি একটু ভাল পড়তে পারতেন, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন, যে, আমাদের দুজনের মধ্যে কে শীঘ্র শিখতে পারে; আমি একটু ইতস্ততঃ করাতে তিনি বোল্লেন, "তোমার কিছু মাত্র ভয় নেই, আমাকে নিন্দে কোরলে আমার তিল মাত্র কষ্ট হবে না।" অত কোরে কেন বোল্লেন, জান? তিনি মনে মনে বিলক্ষণ জানতেন যে, আমি তাঁর

প্রশংসা কোরবো। যিনি ভাল শিখতে পারতেন না, তিনি আমাকে ও-কথা জিজ্ঞাসাই কোরতেন না। এক দল বিজ্ঞ, বৃদ্ধ, তাঁদের সভায় আমাকে প্রবেশ কোর্‌তে অনুমতি দিয়ে বোল্‌তে পারেন যে, আমাদের সঙ্গে সমান ভাবে তর্ক বিতর্ক কোর্‌তে তোমাকে পূর্ণ অধিকার দিলেম, কিন্তু সমান ভাবে তর্ক বিতর্ক কোর্‌তে গেলে তাঁরা মনে মনে রাগ কোর্‌তে ত্রুটি করেন না। এর দুটো কারণ থাক্‌তে পারে; এক, তাঁরা যখন অধিকার দেন, তখন তাঁদের মনে মনে বিশ্বাস থাকে যে, বিজ্ঞতায় ও-বালকের চেয়ে আমরা এত শ্রেষ্ঠ যে, আমাদের কাছে ও ঠোঁট খুল্‌তে পার্‌বে না; নয়, তাঁদের সকলের মত এই যে, বালকের কাছ থেকেও জ্ঞান শিক্ষা করা যায়, কিন্তু সে মতের চারা গাছটি তাঁদের মাথায় সবে জোন্মেছে মাত্র, তার ডাল পালা হৃদয় পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে পারে নি; তাঁদের মত বটে যে, সকলকে সমভাবে দর্শন করা উচিত, কিন্তু সমভাবে দর্শন করা তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তাঁদের মত যত ক্ষণ কার্য্য-ক্ষেত্রে না নাবে, তত ক্ষণ তাঁরা সকলের প্রতি সমান ব্যবহার কোরতে পারবেন, এই কল্পনার উপর বিশ্বাস কোরে তাঁরা দশ জনকে সমবেত কোরলেন, কিন্তু যেই তাঁরা তাঁদের সঙ্গে সমান ব্যবহার কোরতে আরম্ভ কোরলেন, অমনি তাঁরা দেখলেন তাঁদের বুকের ভিতরে লাগে। আমার স্পষ্ট বোধ হয়, ইংরাজ মেম্বরদের সঙ্গে আইরিষ মেম্বরদের এই রকম সম্পর্ক। পার্ল্যামেণ্টের কথা তবে আজ এই পর্য্যন্ত থাক্।

এখন ইঙ্গ-বঙ্গ বোলে একটি অদ্ভুত নূতন জীবের বিবরণ বলি শোনো। "এই বেড়াল বনে গেলেই বন বেড়াল হয়।" তোমাদের সেই বন্ধু, যে "হংস মধ্যে বকো যথা" হোয়ে তোমাদের মধ্যে থাক্‌ত, যা'র বুদ্ধির অভাব দেখে তোমরা অত্যন্ত ভাবিত ছিলে, ইস্কুলের মাষ্টাররা যাকে পিটিয়ে পিটিয়ে ঘোড়া কর্‌বার আশা একেবারে পরিত্যাগ করেছিলেন, সেই যখন এ বন থেকে ফিরে যাবে, তখন তার ফুলোনো লেজ, বাঁকানো ঘাড়, নখালো থাবা, দেখে তোমরা আধখানা হোয়ে, পিছু হোটে হোটে দেয়ালের এক কোণে গিয়ে আশ্রয় নেবে। এ বিলেত-রাজ্য থেকে ফিরে গেলে পর বিক্রমাদিত্যের সিদ্ধ বেতালের মত আমার সঙ্গে সঙ্গে একটি "Oberon" ফির্‌বে, যে তোমাদের প্রতিলোকের চোখে এমন একটি মায়া-রস নিংড়ে দেবে যে, আমাকে যদি গর্দ্দভ-মুখসিত "Bottom"-এর মতও দেখ্‌তে হয়, তবু তোমরা মুগ্ধ হোয়ে যাবে।

বিলেতে নতুন এসেই বাঙ্গালীদের চোখে কোন্ জিনিষ ঠেকে, বিলিতি সমাজে নতুন মিশে প্রথমেই বাঙ্গালীদের কি রকম লাগে, সে সকল বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আপাততঃ কিছু বোল্‌ব না। কেন না, এ সকল বিষয় আমার বিচার করবার অধিকার নেই। যাঁরা পূর্ব্বে

বিলেতে অনেক কাল ছিলেন, ও বিলেত যাঁরা খুব ভাল কোরে চেনেন, তাঁরা আমাকে সঙ্গে কোরে এনেছেন, ও তাঁদের সঙ্গেই আমি বাস কোরছি। বিলাতে আস্বার আগেই বিলেতের বিষয় তাঁদের কাছে অনেক শুনতে পেতেম, সুতরাং এখানে এসে খুব অল্প জিনিষ নিতান্ত নতুন মনে হোয়েছে, এখানকার লোকের সঙ্গে মিশ্তে গিয়ে প্রতি পদে হুঁচট্ খেয়ে খেয়ে আচার ব্যবহার আমাকে শিখ্তে হয় নি। এখানকার সমাজের স্ফটিক-শালায় প্রবেশ কোরে, যখনি জল মনে কোরে কাপড় তুল্তে গিয়েছি, তখনি আমার সঙ্গী আমাকে চোখ টিপে বোলে দিয়েছেন "এ জল নয়, এ মেজে।" সুতরাং আমাকে অপ্রস্তুত হোতে হয় নি। এখানকার চাকচিক্যময় সমাজের দেয়াল-ব্যাপী আয়না দেখে আমি দরজা মনে কোরে যেমন সেই দিকে যাবার উদ্যোগ কোরেছি, আমার সঙ্গী অমনি আমার কানে কানে বোলে দিয়েছেন যে, "এ দরজা নয়, এ দরজা নয়; এ দেয়াল।" সুতরাং মাথা ঠুকে ঠুকে আমাকে শিখ্তে হয় নি যে, সেটা দরজা নয়, দেয়াল। অন্ধকারে প্রথম এলে কিছু দেখা যায় না, অনেক ক্ষণ থাক্লে, অন্ধকার চোখে অনেকটা সোয়ে গেলে তার পরে চার দিকের জিনিষ দেখা যায়, কিন্তু আমাকে সে রকম কোরে দেখ্তে হয় নি, আমার সঙ্গেই আলো ছিল। আমি তাই ভাব্ছি যে, আমার নিজের অভিজ্ঞতার বিষয় আপাততঃ তোমাদের কিছু বোল্‌ব না, এখানকার দুই এক জন বাঙ্গালীর মুখে তাঁদের যে রকম বিবরণ শুনেছি, তাই তোমাদের লিখ্ছি।

জাহাজে ত তাঁরা উঠ্লেন। যাত্রীদের সেবার জন্যে জাহাজে অনেক ইংরেজ চাকর থাকে, তাদের নিয়েই এঁদের প্রথম গোল বাধে। এঁরা অনেকে তাদের "সার্ সার্" (Sir বোলে সম্বোধন কোর্তেন, তাদের কোন কাজ কোর্তে হুকুম দিতে তাঁদের বাধো বাধো কোর্ত। জাহাজে তাঁরা অত্যন্ত সসঙ্কোচ ভাবে থাক্তেন। কোথায় কি কোর্ত্তে হবে রে বাপু, গোরা কাপ্তেন, গোরা মাঝি, পাছে রুখে দু কথা শুনিয়ে দেয়, নিতান্তই তাদের আশ্রয়ে আছি, কালো মানুষ দেখেও যে, টিকিট কিন্তে দিয়েছেন, এই তাঁদের যথেষ্ট অনুগ্রহ। তাঁরা বলেন, সকল বিষয়েই তাঁদের যে, ও রকম সঙ্কোচ বোধ হত, তার আর একটা কারণ ছিল—"এক জন ইংরাজ যাত্রীর চেয়ে আমাদের ওরকম সঙ্কোচের ত্রস্ত অবস্থা কেন হয়, জান? সেটা কেবল ভয়ে নয়, তার সঙ্গে কতকটা লজ্জাও আছে। আমাদের কপালে "নেটিব" বোলে একেবারে মার্কা মারা ছিল, আমরা যদি একটা কোন দস্তুর-বিরুদ্ধ কাজ করি, তা হোলে সাহেবরা হেসে উঠ্বেন, বল্বেন ওটা অসভ্য, কিছু জানে না। তাই জন্যে যে কাজ কোর্ত্তে যাই, মনে হয়, পাছে এটা বেদস্তুর হোয়ে পড়ে, আর বেদস্তুর কাজ কোরলে তারা হুট্ কোরে তাড়িয়েই বা দেয়, আর যদি বা তাড়িয়ে না দেয়, নেটিব

বোলে হেসেই বা ওঠে ; "জাহাজে ইংরাজদের সঙ্গে মেশা বড় হোয়ে ওঠেনা। যে সাহেবেরা তখন জাহাজে থাকেন, তাঁরা টাট্‌কা ভারতবর্ষ থেকে আস্‌চেন, সে "হুজুর, ধর্ম্মাবতার" গণ কৃষ্ণবর্ণ দেখ্‌লে নাক তুলে, ঠোঁট ফুলিয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে চোলে যান, ও এই ঘোরতর তাচ্ছিল্যের স্পষ্ট লক্ষণগুলি সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশ কোরে কৃষ্ণ-চর্ম্মের মনে দারুণ বিভীষিকা সঞ্চার কোরেছেন জেনে মনে মনে পরম সন্তোষ উপভোগ করেন। মাঝে মাঝে ভদ্র ইংরাজ দেখ্‌তে পাবে, যাঁরা হয়ত তোমাকে নিতান্ত সঙ্গীহীন দেখে তোমার সঙ্গে মিশ্‌তে চেষ্টা কোর্‌বেন, জান্‌বে তাঁরা যথার্থ ভদ্র, অর্থাৎ ভদ্র ও উচ্চ পরিবারের লোক, বংশাবলীক্রমে তাঁরা ভদ্রতার বীজ পেয়ে আস্‌চেন, তাঁরা এখানকার কোন অজ্ঞাত-কুল থেকে অখ্যাত নাম নিয়ে ভারতবর্ষে গিয়ে হঠাৎ ফেঁপে ফুলে ফেটে আট-খানা হোয়ে পড়েন নি। এখানকার গলিতে যে "জন জোন্স্‌, টমাস্‌" গণ কিল্‌বিল্‌ কোর্‌চে, যাদের মা, বাপ, বোনকে, একটা কসাই, একটা দরজী, ও এক জন কয়লা-বিক্রেতা ছাড়া আর কেউ চেনে না, তারা ভারতবর্ষের যে অঞ্চলে পদার্পণ করে, সে অঞ্চলে ঘরে ঘরে তাদের নাম রাষ্ট্র হোয়ে যায়, যে রাস্তায় তারা চাবুক হস্তে ঘোড়ায় চোড়ে যায় (হয়ত সে চাবুক কেবল মাত্র ঘোড়ার জন্যেই ব্যবহার হয় না) সে রাস্তা শুদ্ধ লোক শশব্যস্ত হোয়ে তাদের পথ ছেড়ে দেয়, তাদের এক একটা ইঙ্গিতে ভারতবর্ষের এক একটা রাজার সিংহাসন কেঁপে ওঠে, এরকম অবস্থায় সে ভেকদের পেট উত্তরোত্তর ফুল্‌তে ফুল্‌তে যে, হস্তীর আকার ধারণ কোরবে, আমি ত তাতে বিশেষ অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পাইনে। তারা রক্ত মাংসের মানুষ বৈত নয়, যে দেশেই দেখ না কেন, ক্ষুদ্র যখনি মহান পদ পায়, তখনি সে চোক রাঙিয়ে, বুক ফুলিয়ে মহত্বের একটা আড়ম্বর, আস্ফালন কোরতে থাকে; এর অর্থ আর কিছু নয়, তারা মহত্বের শিক্ষা পায়নি। যে সাঁতার জানে না, তাকে জলে ছেড়ে দেও, সে অবিশ্রান্ত হাত পা ছুঁড়তে থাক্‌বে, তার কারণ, সে জানে না যে, ভেসে থাক্‌বার জন্যে অন্য কৌশল আছে। যে কোন-জন্মে ঘোড়া চালায় নি, তাকে ঘোড়া চালাতে দেও, ঘোড়া বিপথে গেলে সে চাবুক মেরে মেরেই তাকে জর্জ্জর কোরবে ; কেন না, সে জানে না যে, একটু লাগাম টেনে দিলেই তাকে সোজা পথে আনা যায়। কিন্তু ভদ্র ইংরেজদের দেখ, তাদের কি সুন্দর মন! মাঝে মাঝে এক একটি ভদ্র সাহেবকে দেখা যায়, তাঁরা অ্যাঙ্গ্লো-ইণ্ডিয়ানত্বের ঘোরতর সংক্রামক রোগের মধ্যে থেকেও বিশুদ্ধ থাকেন, অপ্রতিহত প্রভুত্ব ও ক্ষমতা পেয়েও উদ্ধত গর্ব্বিত হোয়ে ওঠেন না। সমাজ-শৃঙ্খল ছিন্ন হোয়ে, সহস্র সহস্র সেবকদের দ্বারা বেষ্টিত হোয়ে ভারতবর্ষে থাকা, উন্নত ও ভদ্র মনের এক প্রকার অগ্নি-পরীক্ষা। দূর হোক্‌গে—আমি কি

কথা বোলতে কি কথা পাড়লেম দেখ! যাহোক্, এতক্ষণে জাহাজ সাউদাম্পটনে এসে পৌঁচেছে, বঙ্গ যাত্রীরা বিলেতে এসে পৌঁছলেন। লণ্ডন উদ্দেশে চোল্লেন। ট্রেণ থেকে নাব্‌বার সময় একজন ইংরাজ গার্ড এসে উপস্থিত হোল, দরজা খুলে দিলে, অতিশয় ভদ্রতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা কোল্লে, তাঁদের কি প্রয়োজন আছে, কি কোরে দিতে হবে। তাঁদের মোট নাবিয়ে দিলে, গাড়ি ডেকে দিলে; তাঁরা মনে মনে বোল্লেন "বাঃ! ইংরেজরা কি ভদ্র!" ইংরাজরা যে এত ভদ্র হোতে পারে, তা' তাঁদের জ্ঞান ছিল না; অবিশ্যি তার হস্তে একটি শিলিং গুঁজে দিতে হোল, কিন্তু তা হোক্, আমাদের দেশে শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে একটু আদর ও ভদ্রতা পাবার প্রত্যাশে রাজা রায় বাহাদুররা কত হাজার হাজার টাকা খরচ কোরচেন, তবুও ভাল কোরে কৃতকার্য্য হোতে পারচেন না; এ জেনে এক জন নবাগত বঙ্গ যুবক এক জন যে-কোন শ্বেতাঙ্গের কাছ থেকে একটি মাত্র সেলাম পেতে, অকাতরে এক শিলিং ব্যয় কোর্ত্তে পারেন। যাহোক্ বিলেতে প্রথম পদার্পণ করবামাত্রেই তাঁরা এই অতি নতুন ও আশ্চর্য্য জ্ঞান লাভ করেন যে, ইংরাজরা কি ভদ্র! আমি যাঁদের বিষয় লিখছি, তাঁরা অনেক বৎসর বিলাতে আছেন, বিলেতের নানা প্রকার ছোট খাটো জিনিষ দেখে তাঁদের কি রকম মনে হোয়েছিল, তা' তাঁদের স্পষ্ট মনে নেই। যে সব বিষয় তাঁদের বিশেষ মনে লেগেছিল, তাই এখনো তাঁদের মনে আছে।

তাঁরা বিলেতে আস্‌বার পূর্ব্বে তাঁদের বিলিতি বন্ধুরা এখানে তাঁদের জন্যে ঘর ঠিক কোরে রেখেছিলেন। ঘরে ঢুকে দেখেন, ঘরে কার্পেট পাতা, দেয়ালে ছবি টাঙ্গানো, একটা বড় আয়না এক জায়গায় ঝোলানো রোয়েছে, কৌচ, কতক গুলি চৌকি, দুই একটা কাঁচের ফুলদানী, এক পাশে একটি ছোট পিয়ানো। কি সর্ব্বনাশ! তাঁদের বন্ধুদের ডেকে বোল্লেন, "আমরা কি এখেনে বড়-মানুষী কোর্ত্তে এসেছি? আমাদের বাপু বেশী টাকা কড়ি নেই, এরকম ঘরে থাকা আমাদের পোষাবে না!" তাঁদের বন্ধুরা অত্যন্ত আমোদ পেলেন, কারণ তখন তাঁরা একেবারে ভুলে গেছেন যে, বহুপূর্ব্বে তাঁদেরো এক দিন এই রকম দশা ঘোটেছিল; নবাগতদের নিতান্ত অন্নজীবী বাঙ্গালী মনে কোরে অত্যন্ত বিজ্ঞতার স্বরে সেই বন্ধুরা বোল্লেন, "এখানকার সকল ঘরই এই রকম!" তাঁরা বোল্লেন "বটে!" দেশের উপর বৈরাগ্যের এই তাঁদের প্রথম সূত্রপাত হোল। তাঁরা বলেন "আমাদের দেশে সেই একটা সেঁৎ-সেঁতে ঘরে একটা তক্তা ও তার উপরে একটা মাদুর পাতা, ইতস্ততঃ হুঁকোর বৈঠক রোয়েছে, কোমরে একটু খানি কাপড় জড়িয়ে জুতো জোড়া খুলে দুচার জনে মিলে শতরঞ্চ খেলা যাচ্চে, বাড়ির উঠোনে একটা গরু বাঁধা, দেয়ালে গোবর দেওয়া, বারান্দা থেকে ভিজে কা-

পড় শুকোচ্ছে, ইত্যাদি; সেখান থেকে এসে এ কার্পেট-মোড়া, চিত্রিত দেয়াল, চৌকি-টেবিল-সমাকুল ঘরে বাস কোরতে পাওয়া অনেক জন্মের অনেক তপস্যার ফল বোলে মনে হয়!" তাঁরা বলেন, প্রথম প্রথম দিন কতক তাঁদের সে ঘর কেমন আপনার মত মনে হোত না, চৌকিতে বোস্‌তে, কৌচে শুতে, টেবিলে খেতে, কার্পেটে বিচরণ কোরতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হত। কৌচে বোস্‌তে হোলে অত্যন্ত আড়ষ্ট হোয়ে বোস্‌তেন, ভয় হোত, পাছে কৌচ ময়লা হোয়ে যায়, বা কোন প্রকার হানি হয়, তাঁদের মনে হোত, কৌচ-গুলো কেবল ঘর সাজাবার জন্যেই রেখে দেওয়া হোয়েছে, ও-গুলো ব্যবহার কোরতে দিয়ে মাটি করা কখনই ঘরের কর্ত্তার অভিপ্রেত হোতে পারে না। ঘরে এসে প্রথম মনের ভাব ত এই, তার পরে আর একটি প্রধান কথা বলা বাকি আছে।

বিলেতে ছোটখাট বাড়িতে, "বাড়িওয়ালা" বোলে একটা জীবের অস্তিত্ব আছে হয়ত, কিন্তু যাঁরা বাড়িতে থাকেন, "বাড়িওয়ালী"-র সঙ্গেই তাঁদের সমস্ত সম্পর্ক। ভাড়া চুকিয়ে দেওয়া, কোন প্রকার বোঝা পড়া, আহারাদির বন্দোবস্ত করা, সে সমস্তই বাড়িওয়ালীর কাছে। আমার বন্ধুরা যখন প্রথম বাড়িতে পদার্পণ কোরলেন, দেখলেন এক বিবি এসে অতি বিনীত স্বরে তাঁদের "সুপ্রভাত" অভিবাদন কোরলে, তাঁরা নিতান্ত শশব্যস্ত হোয়ে তার ভদ্রতার যথাযোগ্য প্রতিদান দিয়ে অতি আড়ষ্ট হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু যখন তাঁরা দেখলেন, তাঁদের অন্যান্য ইঙ্গ-বঙ্গ বন্ধুগণ তার সঙ্গে অতি অসঙ্কুচিত স্বরে কথাবার্ত্তা আরম্ভ কোরে দিলেন, তখন আর তাঁদের বিস্ময়ের আদি অন্ত রইল না। মনে কর একটা জীবন্ত বিবি—জুতো-পরা, টুপি-পরা, গাউন-পরা! তখন সে ইঙ্গ-বঙ্গ বন্ধুদের উপর সেই নবাগত বঙ্গ-যুবকের অত্যন্ত ভক্তির উদয় হোল, কোন কালে যে এই অসমসাহসিকদের মত তাঁদেরও বুকের পাটা জন্মাবে, তা তাঁদের সম্ভব বোধ হোল না। যা হোক্‌, এই নবাগতদের যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত কোরে দিয়ে ইঙ্গ-বঙ্গ বন্ধুগণ স্ব স্ব আলয়ে গিয়ে সপ্তাহকাল ধোরে তাঁদের অজ্ঞতা নিয়ে অপর্য্যাপ্ত হাস্য কৌতুক কোরলেন। পূর্ব্বোক্ত গৃহকর্ত্রী প্রত্যহ নবাগতদের অতি বিনীত ভাবে, কি চাই না চাই জিজ্ঞাসা কোর্ত্তে আস্‌ত। তাঁরা বলেন, এই উপলক্ষে তাঁদের অত্যন্ত আহ্লাদ হোত। তাঁদের মধ্যে একজন বলেন, প্রথম দিন যে দিন তিনি এই বিবিকে একটুখানি ধম্‌কাতে পেরেছিলেন, সে দিন সমস্ত দিন তাঁর মন অত্যন্ত প্রফুল্ল ছিল, জীবনের মধ্যে এই প্রথম একজন ইংরেজকে, একজন বিবিকে ধমকাতে পেরেছিলেন, অথচ সে দিন সূর্য্য পশ্চিম দিকে ওঠে নি, পর্ব্বত চলাফেরা কোরে বেড়ায়নি, বহ্নিও শীতলতা প্রাপ্ত হয় নি! কার্পেট-মোড়া ঘরে তাঁরা অত্যন্ত সুখে বাস কোরচেন। তাঁরা বলেন, "আমাদের দেশে আমার নিজের

ঘর বোলে একটা স্বতন্ত্র পদার্থ ছিল না; আমি যে ঘরে বোসতেম, সে ঘরে বাড়ির দশজনে যাতায়াত কচ্চে, আমি এক পাশে বোসে লিখচি, দাদা এক পাশে একখানা বই হাতে কোরে ঢুলচেন, আর এক দিকে মাদুর পেতে গুরু মশায় ভুলুকে উচ্চৈঃস্বরে সুর কোরে কোরে নামতা পড়াচ্চেন। এখানে আমার নিজের ঘর, আমার নিজের মনের মত কোরে সাজালেম, সুবিধামত কোরে বইগুলি এক দিকে সাজালেম, লেখবার সরঞ্জাম একদিকে গুছিয়ে রাখলেম, কোন ভয় নেই যে, এক দিন পাঁচটা ছেলে মিলে সে সমস্ত ওলটপালট কোরে দেবে; আর এক দিন ছুটোর সময় কালেজ থেকে এসে দেখব, তিনটে বই পাওয়া যাচ্চে না, অবশেষে অনেক খোঁজ খোঁজ কোরে দেখা যাবে বাড়ির ভিতরে মেঝ মাসীমার বুলুঙ্গির উপর একখানা, দাদার বালিশের নীচে একখানা, আর এক খানি নিয়ে আমার ছোট ভাগ্নীটি তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহচরীদের ডেকে ছবি দেখতে ঘোরতর ব্যস্ত আছেন। এখানে তোমার নিজের ঘরে তুমি বোসে থাক, দরজাটি ভেজানো, সট্ কোরে না বোলে কোয়ে কেউ ঘরের মধ্যে এসে পড়ে না, ঘরে ঢোকবার আগে দরজায় শব্দ করে, ছেলেপিলেগুলো চারদিকে চেঁচামেচি কান্নাকাটি জুড়ে দেয় নি, নিরিবিলি নিরালা, কোন হাঙ্গাম নেই।” স্বদেশের উপর ঘৃণা জন্মাবার সূত্রপাত এই রকম কোরে হয়। তার পরে একবার যখন তোমার মন বিগড়ে যায়, তখন তুমি খিটখিটে হোয়ে ওঠ, দেশের আর কিছুই ভাল লাগেনা, নানা প্রকার খুঁটিনাটি ধোরতে প্রবৃত্তি হয়। তার পরে যখন বিবিদের সমাজে মিশতে আরম্ভ কর, তখন দেশের উপর ঘৃণা বদ্ধমূল হোয়ে যায়। প্রায় দেখা যায়, আমাদের দেশের পুরুষরা এখানকার পুরুষ-সমাজে বড় মেশেন না; তার কতকগুলি কারণ আছে। এখানকার পুরুষ-সমাজে মিশতে গেলে এক-রকম বলিষ্ঠ স্ফূর্ত্তির ভাব থাকা চাই, মাথা চুলকোতে চুলকোতে বাধো-বাধো নাকি সুরে ছুচারটে সসঙ্কোচ ‘হাঁ না’ দিয়ে গেলে চলেনা, খুব প্রাণখুলে কথা কওয়া চাই, পাঁচটা লোক দেখেই একেবারে অভিভূত হোয়ে পোড়েছি—এ রকম ভাব প্রকাশ না পায়; রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অবাধে তোমার স্বাধীন মত ব্যক্ত কোর্ব্বে, তোমাকে কেউ ঠাট্টা কোরলে তুমি অমনি সরমে মোরে যেওনা, তুমিও তোমার আলাপীর সঙ্গে ঠাট্টা কোরে মজা কোরে ঘর সরগরম কোর্‌বে, বহুদিনের পর তোমার পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হোলে “Hallow my old boy” বোলে খুব সবল সেক্‌হ্যাণ্ড কোরবে, আর খুব গড়গড় কোরে কথা কোয়ে যাবে। কিন্তু বাঙ্গালীদের এ রকম ভাব প্রায় দেখা যায় না। বাঙ্গালী অভ্যাগত ডিনার-টেবিলে তাঁর পার্শ্বস্থ মহিলাটির কানে কানে অতি মৃদু ধীরস্বরে মিষ্টি মিষ্টি টুকরো টুকরো দুই একটি কথা আধ আধ গলানো সুরে কইতে পারেন, কোমল মধুর হাসি হাস্‌তে হাস্‌তে, ছুটো রস-গর্ভ বাক্য

বলতে পারেন, আর সে মহিলার সহবাসে তিনি যে, স্বর্গ-সুখ উপভোগ কোরচেন, তা তাঁর মাথার চুল থেকে বুট-জুতোর আগা পর্য্যন্ত প্রকাশ হোতে থাকে, সুতরাং বিবি-সমাজে বাঙ্গালীরা খুব পসার কোরে নিতে পারেন। এখানকার পুরুষ-সমাজে মিশতে গেলে অনেক পড়াশুনো থাকা চাই, নইলে অনেক কথায় অপ্রস্তুত হোতে হয়, একটা বড় কথা পোড়লে আমরা আমাদের পুরাতন চাণক্য ঋষির উপদেশ স্মরণ করি, অর্থাৎ "তাবচ্চ শোভতে মূর্খ যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাবতে!" কিন্তু পুরুষ সঙ্গী-দের কথাবার্ত্তায় খুব যোগ না দিলে তেমন মেশামেশি হবার কোন সম্ভাবনা নেই। মহিলাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে আমা-দের বড় শিক্ষার দরকার করে না, সে বিষয় আমাদের অশিক্ষিত পটুত্ব। আমাদের দেশের ঘোমটাচ্ছন্ন-মুখচন্দ্র-শোভী অনা-লোকিত অন্তঃপুরে থেকে এখানকার রূপের মুক্ত জ্যোৎস্নায় এসে আমাদের মন-চকোর প্রাণ খুলে গান গেয়ে ওঠে। এক-দিন আমাদের নবাগত বঙ্গযুবক তাঁর প্রথম ডিনারের নিমন্ত্রণে গিয়েছেন। নিম-ন্ত্রণ সভায় বিদেশীর অত্যন্ত সমাদর। তিনি গৃহস্বামীর যুবতী কন্যা Miss অমুকের বাহুগ্রহণ কোরে আহারের টেবিলে গিয়ে বোস্‌লেন। মিসের প্রতি হাসি, প্রতি কথা তাঁর হৃদয়ের সমুদ্রে একটা বিপর্য্যয় তরঙ্গ তুলতে লাগল। আমরা আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মুক্তভাবে মিশতে পাইনে, তার পরে নতুন নতুন এসে এখানকার স্ত্রী-লোকদের ভাবও ঠিক বুঝতে পারিনে, আমরা কোন অপরিচিত মহিলার মুখ থেকে দুটো কথা শুনতে পেলে আহ্লাদে গোলে পড়ি, সামাজিকতার অনুরোধে তাঁরা আমাদের মনোরঞ্জন করবার জন্যে যে সকল কথা বার্ত্তা হাস্যালাপ করে, আমরা তার ঠিক মর্ম্ম-গ্রহ কোরতে পারিনে, আমরা সহসা মনে করি, আমাদের ওপরেই এই মহিলাটির বিশেষ অনুকূল দৃষ্টি, নইলে এত হাসি, এত কথা কেন? যাহোক্, আমাদের বঙ্গ যুবকটি তাঁর এই প্রথম ডিনারের নিমন্ত্রণে এক জন মহিলা, বিশেষত একজন বিবির কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টহাসি ও মিষ্টালাপ পেয়ে অত্যন্ত উল্লসিত আছেন। তিনি মিস্‌কে ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত অনেক কথা বোল্লেন, বোল্লেন তাঁর বিলেত অত্যন্ত ভাল লাগে, ভারতবর্ষে ফিরে যেতে তাঁর ইচ্ছে করে না, ভারতবর্ষে অনেক প্রকার কুসংস্কার আছে; এ কথা বলার অভিপ্রায় এই যে, বিবিটির মনে বিশ্বাস হবে যে তিনি নিজে সমস্ত কুসংস্কার হোতে মুক্ত, শেষ-কালে দুই একটি মিথ্যে কথাও বোল্লেন; বোল্লেন, তিনি সুন্দর বনে বাঘ শিকার কোর্ত্তে গিয়েছিলেন, একবার নিতান্ত মোরতে মোরতে কেবল অসমসাহসিকতা কোরে বেঁচে গিয়েছিলেন। মিস্‌টি অতি সহজে বুঝতে পারলেন যে, এই যুবকের তাঁকে অতি ভাল লেগেছে, তিনি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হোলেন, ও তাঁর মিষ্টতম বাক্যবাণ যুবকের প্রাণে হান্‌তে লাগলেন। 'আহা কি গোছালো কথা! কোথায় আমাদের

দেশের মেয়েদের মুখের সেই নিতান্ত শ্রমলভ্য দুই একটি "হাঁ না," যা' এত মৃদু যে, ঘোমটার সীমার মধ্যেই মিলিয়ে যায়, আর কোথায় এখানকার বিম্বোষ্ঠ-নিসৃত অজস্র মধুধারা, যা' অযাচিত ভাবে মদিরার মত মাথার শিরায় শিরায় প্রবেশ করে!" প্রথম ডিনারের নিমন্ত্রণে আমাদের বঙ্গ যুবকের মনে এই কথা গুলি ওঠে। সেই দিনেই তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে চিঠিলেখা স্থগিত কোরলেন!

এখন তোমরা হয়ত বুঝতে পারচ, কি কি মস্‌লার সংযোগে বাঙ্গালী বোলে একটা পদার্থ ক্রমে বেঙ্গো-অ্যাঙ্গ্লিয়ান কিম্বা ইঙ্গ-বঙ্গ নামে একটা খিচুড়িতে পরিণত হয়। আমি অতি সংক্ষেপে তার বর্ণনা কোরেছি, সমস্ত প্রক্রিয়াটা বিস্তারিত কোরে লিখতে পারি নি। আমি তার বড় বড় দুই একটা কারণ দেখিয়েছি, কিন্তু এত সব ছোট ছোট বিষয়ের সমষ্টি মানুষের মনে অলক্ষিত পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে যে, সে সকল খুঁটি নাটি কোরে বর্ণনা কোর্ত্তে গেলে আমার পুঁথি বেড়ে যায়, আর তোমাদের ধৈর্য্যও কোমে যায়। সুতরাং এই খানেই সে সকল বর্ণনা সমাপ্ত করা যাক্‌। এখন মনে কর, এক বৎসর বিলেতে থেকে বাঙ্গালী তাঁর দেহের ও মনের প্রথম খোলষ পরিত্যাগ কোরেছেন, ও হ্যাট কোট পরিধান কোরে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হোয়েছেন, ও মনে মনে কল্পনা কোরচেন যে, এত দিনে তিনি গুটি-পোকাত্ব ত্যাগ কোরে প্রজাপতিত্বে উপস্থিত হোয়েছেন। এই অবস্থায় তাঁকে একবার আলোচনা কোরে দেখা যাক্‌। আমি দেখতে পাচ্চি, তুমি মহা চোটে উঠেছ; তুমি বোলচ, "বিলেতে গিয়ে বাঙ্গালীদের বর্ণনা কোরতে বসাও যা; আর গোলকুণ্ডায় গিয়ে রাণীগঞ্জের পাথুরে কয়লার বিষয় লেখাও তাই!" কিন্তু স্থির হও, আমি তোমাকে কারণ দেখাচ্ছি। আমি তোমার গা ছুঁয়ে বলতে পারি, "বিলাতী বাঙ্গালীর চেয়ে নতুন দ্রব্য বিলেতে খুব কম আছে। ইংরাজ ও অ্যাঙ্গো-ইণ্ডিয়ান যেমন দুই স্বতন্ত্র জাত, বাঙ্গালী ও ইঙ্গ-বঙ্গও তেমনি দুই স্বতন্ত্র জীব। এই জন্যে ইঙ্গ-বঙ্গদের বিষয়ে তোমাদের যত নতুন কথা ও নতুন খবর দিতে পারব, এমন বিলেতের আর খুব কম জিনিষের উপর দিতে পারব। ইঙ্গ-বঙ্গদের সংখ্যা এত সামান্য, যে, তুমি মনে কোরতে পার, আমি ব্যক্তি বিশেষদের উপর কটাক্ষ কোরে বোলছি কিন্তু তা' নয়; আমি ইঙ্গ-বঙ্গ দলের একটা সাধারণ আদর্শ কল্পনা কোরে নিয়েছি, আমার চার দিককার অভিজ্ঞতা থেকে স্বভাবতঃ ও সাধারণতঃ বাঙ্গালীদের বিলেতে এলে কি কি পরিবর্ত্তন হয় তাই ঠিক কোরেছি, ও সেই গুলি সমষ্টি-বদ্ধ কোরে একটা সমগ্র চিত্র আঁকতে চেষ্টা কোরছি।

ভাসিয়ে দে তরী।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল একতালা।

ভাসিয়ে দে তরী
তবে নীল সাগর পরি।
বহিছে মৃদুল বায়,
নাচিছে মৃদু লহরী।
ডুবেছে রবির কায়া,
আধো আলো আধো ছায়া,
আমরা দুটীতে মিলি যাই চল ধিরি ধিরি।
একটী তারার দীপ
যেন কনকের টীপ
দূর-শৈল- ভুরু-মাঝে রয়েছে উজলি।
নাহি সাড়া নাহি শব্দ,
মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ,
মরমের কথা এবে কহি এসো প্রাণ খুলি।

মনে আছে, কত জ্বালা
দুজনে সয়েছি বালা,
কত না ঝটিকা গেছে হৃদয়-কুসুম দলি!
কিসের ভাবনা আর,
ঘুচিল যাতনা ভার,
লাঞ্ছনা গঞ্জনা জ্বালা সকলি এলেম ফেলি।
নাহি হেথা নিন্দা গ্লানি,
নাহি মিথ্যা কানাকানি,
নাহি তীব্র কটাক্ষের বিষময় হাসি।
সিন্ধুর উদার বুকে,
ছুটিতে মনের সুখে,
যে দিকে তরঙ্গ যায়, সে দিকে যাইব ভাসি।

ছিন্নমুকুল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ—প্রস্তাব।

আরো দশ বার দিন গেল, প্রমোদ কলিকাতায় যামিনীনাথের নিকট গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিলেন।

প্রমোদ কলিকাতা যাইবার পূর্ব্বে হিরণকুমার কনকের হস্তপ্রার্থী হইয়া প্রমোদকে এক পত্র লেখেন। বলা বাহুল্য, প্রমোদ সে পত্র পাইয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু হিরণ কনককে রক্ষা করিয়াছে, হাজার হৌক তাঁর কাছে প্রমোদ ঋণী, এই ভাবিয়া সেই স্পর্দ্ধার মার্জ্জনা করিলেন এবং অভদ্রতা না করিয়া তাহার উত্তরও দিলেন। উত্তরে লিখিলেন "এখন শেষ নিশ্চিত উত্তর দিতে অক্ষম, কনককে জিজ্ঞাসা করিয়া পরে নিশ্চয় উত্তর দিব" কিন্তু সেই নিশ্চিত উত্তর প্রমোদ আজও দিলেন কালও দিলেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই, নিশ্চয়ই যখন প্রমোদ জানিতেন হিরণের সহিত কনকের বিবাহ দিবেন না—তখন হিরণকে

সেইরূপ স্পষ্ট লিখিয়া না দিয়া অন্যরূপ পত্র লিখিলেন কেন? তাহার কারণ—প্রমোদ যেমন বাল্য-বিবাহে ঘৃণা করিতেন—স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন—তেমনি বিবাহ সম্বন্ধেও তাঁহার সাধারণ হইতে ভিন্ন মত ছিল। বিশেষতঃ তাঁহার নিজের বাড়ীর নিজেই তিনি কর্ত্তা, সুতরাং সে সব বিষয়ে তাঁহার কাহারো মুখাপেক্ষা করিয়া কাজ করিতে হইত না। তাঁহার যেমন মত তিনি তেমনিই চলিতেন। বিবাহ বিষয়ে তাঁহার মনে হইত—যে যাহারা বিবাহ করিবে তাহাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরই বিবাহ নির্ভর করে, সুতরাং তাঁহার মতে, হিরণের পত্রের একেবারে শেষ উত্তর দিতে হইলেই—অবশ্য কনককে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া তবে লেখা আবশ্যক। যদিও তিনি জানিতেন—সে জিজ্ঞাসা করা কেবল তাঁহার আপন মনকে বোঝাইবার জন্য। তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে তাঁহার অনিচ্ছা জানিলে কখনই কনক হিরণকে বিবাহ করিতে চাহিবে না, যাহাই হৌক এক সময়ে কনককে জিজ্ঞাসা করিবার পর তাঁহাদের অনিচ্ছা হিরণকে লিখিয়া দিবেন মনে করিয়া—তখন হিরণকে ঐরূপ পত্র লিখিয়া দিলেন। কিন্তু হিরণকে লিখিবার পর হইতেই প্রমোদ সে কথা ভুলিয়া গেলেন। এদিকে কনক বাঁচিয়াছে শুনিয়া যামিনীনাথ প্রমোদের নিকট কনকের হস্ত প্রার্থনা করিলেন। যামিনীনাথের হস্তে কনক পড়িবে—ইহাতো কনকের সৌভাগ্যের কথা, অমন সুপাত্র কি আর মিলিবে? যামিনীনাথের প্রস্তাবে প্রমোদের আহ্লাদ ধরিল না। এই বিবাহ বিষয়ে কথা কহিতেই প্রমোদ কলিকাতায় গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া সমস্ত স্থির করিয়া শেষে আহ্লাদ-উৎফুল্ল হৃদয়ে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। এখন বিবাহের আগে কেবল একবার কনককে বলা মাত্র বাকী রহিল। তাহার মত পাইলেই শীঘ্র দিন স্থির করিয়া বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিলেন, প্রমোদ যে কালে এ বিবাহে অত্যন্ত ইচ্ছুক সুতরাং কনকেরও যে এ বিবাহে সম্পূর্ণ ইচ্ছা হইবে ইহাতে তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত রহিলেন।

বাড়ী আসিয়া আর সে রাত্রে কনককে কিছু বলা হইল না—পর দিন প্রাতেঃ বাহির বাটীতে তাঁহার বসিবার কক্ষে কনককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কনক যখন সেই কক্ষে প্রবেশ করিল তখন প্রমোদ একটি টেবিলের উপরে হস্তে মস্তক রক্ষা করিয়া অর্দ্ধশয়িত অবস্থায় ছিলেন, কি ভাবিতেছিলেন জানি না, কিন্তু চক্ষু সমধিক চঞ্চল ও সমুজ্জ্বল, প্রফুল্ল মূর্ত্তি সমধিক ঔৎসুক্যময়—প্রফুল্লতা-ব্যঞ্জক—তিনি যে কোন সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছিলেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কনক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল

দাদা, আমাকে ডাকিয়াছ?" প্রমোদ হাসিয়া বলিলেন।

"হাঁ ব'স্—তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে" কনক বসিয়া আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল "কি কথা ব'ল।"

প্র। "একটা বড় সুখের কথা। আচ্ছা আন্দাজ কর দেখি" কনক অনেক ভাবিয়া বলিল "না পারিলাম না—তুমি ভাই ব'ল।"

প্র। "বলিলে কি পুরস্কার দিবি।"

ক। "যাহা চাও দিব—তুমিতো আগে বল" কনকের কৌতূহল দেখিয়া প্রমোদ অনেক ক্ষণ এ কথা ও কথা কহিয়া তাহাকে অনেক জ্বালাইয়া অবশেষে বলিলেন" একটি বেশ ভাল বরের সহিত তোর সম্বন্ধ করিয়াছি—শীঘ্র বিবাহ হইবে—কেমন সুসংবাদ কি না?" প্রমোদের সুসংবাদ শুনিয়া কনক চমকিত হইল—তাহার শোণিত বেগে বহিতে লাগিল, মুখ শুকাইয়া গেল। কনকের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া প্রমোদ ভাবিলেন "উহা লজ্জার চিহ্ন।" প্রমোদ একটু একটু করিয়া বরের নাম ধাম রূপ গুণ বর্ণনা করিয়া চলিলেন, বরটি কেমন দেখিতে কেমন লেখাপড়া জানে—কেমন সৎস্বভাব, প্রমোদের কেমন হৃদয়-বন্ধু—এই সকল পরিচয় সবিশেষ প্রমোদ দিয়া চলিলেন। পরিচয় সমাপ্তে বলিলেন "কেমন?—শুনিয়া কেমন মনে হইল? বেশ বর নয়?"

যতক্ষণে সহর্ষে প্রমোদ তাঁহার ভাবী ভগিনীপতি যামিনী বাবুর পরিচয় দিতেছিলেন, কনক ততক্ষণ অন্যমনে চিন্তানিবিষ্ট ছিল। তাহার একটি কথাও কনকের কর্ণে প্রবেশ করে নাই। বিবাহ! ইহা সুসংবাদ! কি সর্ব্বনাশ, কনক অন্যের পত্নী হইতে চলিল, হিরণকে আর কখনো দেখিতে পাইবে না, হিরণের চিন্তা পর্য্যন্ত আর মনে স্থান দিবার অধিকার থাকিবে না, সে চিন্তা পর্য্যন্ত পাপ, উঃ কি ভয়ানক! বালিকার সমস্ত শোণিত চমকিয়া উঠিল। সমস্ত হৃদয় ভাবনায় আলোড়িত করিয়া তুলিল। বালিকা কখনো ভ্রাতার কথায় কথা কহে নাই, প্রমোদ যাহা বলেন তাহাই বেদবাক্যসদৃশ বলিয়া শীরোধার্য্য করে, কিন্তু আজ তাঁহার কথায় কনক কথা না কহিয়া থাকিতে পারিল না, যাতনা-কম্পিত স্বরে বলিল "দাদা, আমি বিবাহ করিব না" প্রমোদ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন না, ভাবিলেন বিবাহের কথায় প্রথমে তো স্ত্রীলোকেরা 'না' বলিয়াই থাকে, তাহাতে লজ্জা হয় বৈকি" তিনি হাসিয়া বলিলেন,

"কনক তোর আর লজ্জা কি! আজ হোক কাল হোক বিয়ে তো হবেই, তবে আর লজ্জা করে কি হ'বে!" কনক আবার বিষাদ-ব্যঞ্জক গম্ভীর স্বরে বলিল "দাদা আমি বিবাহ করিব না" প্রমোদ দেখিলেন সে লজ্জার স্বর নহে—সে স্বরে কিছুমাত্র বেসুর নাই—তাহা সুস্পষ্ট গম্ভীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যঞ্জক। প্রমোদ বুঝিলেন কনক যথার্থই তাহার মনের কথা বলিতেছে। ইহাতে প্রমোদ আশ্চর্য্য হইলেন, অথচ বিবাহের অনিচ্ছার বিশেষ কোন কারণ না পাইয়া ভাবিলেন বিবাহ হইলে প্রমোদকে ছাড়িয়া শ্বশুর বাড়ী যাইতে হইবে এই ভয়ে বুঝি কনকের বিবাহে আপত্তি। প্রমোদ বলিলেন "বিয়ে হলেই সব ছেড়ে শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে বোলে বুঝি তোর যত ভয়? তার ভয় কি? তোর যতদিন ইচ্ছা এখানে

থাকিস্—শেষে তোকে থাকিবার জন্য সাধাসাধি করিতে না হইলেই বাঁচি।"

কনক বলিল "না দাদা আমার এখন বিবাহ কেন?" প্রমোদ হাসিয়া বলিলেন, "চিরকাল আইবড় থাকিবি নাকি? অত লজ্জায় কাজ নেই। এখন বল দেখি তাহাকে দেখিতে চাস্ কি—না দেখিলেও হবে?' কনক আবার 'বিবাহ কেন' বলায় অনেক ক্ষণ ধরিয়া প্রমোদ আবার যামিনী বাবুর রূপ গুণের প্রশংসা করিয়া শেষে আরো বলিলেন যে তাহার বিবাহের পর সে যেখানে ইচ্ছা সেই খানেই থাকিবে, সে ভয়েও তাহার বিবাহে কুণ্ঠিত হইতে হইবে না। এই সকল বলিয়া অনেক প্রকারে প্রমোদ কনককে বোঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু তবুও কনকের সম্মতি না পাইয়া প্রমোদ আশ্চর্য্য হইলেন। কনক কখনো তাঁহার মতে অমত প্রকাশ করে নাই—কখনো একটি সামান্য বিষয়েও কনকের নিকট হইতে তাঁহার প্রতিবাদ সহ্য করিতে হয় নাই—সেই জন্য বাল্যকাল হইতে আপন সম্মতিতে কনকের সম্মতি, আপন ইচ্ছাই কনকের ইচ্ছা তাঁহার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল—উহা যেন তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়া বোধ হইত। বিপরীত হইলে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইত। কনককে আজ বিনা কারণে তাঁহার ইচ্ছার বিপরীতে, বিবাহে ঐরূপ নিতান্ত অনিচ্ছুক দেখিয়া প্রমোদ অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন, এবং শেষে কোন প্রকারে আপন মতে তাহাকে আনিতে না পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া রোষগম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন "কেন? বিবাহ করিবে না কেন?" তাহার ইচ্ছা নাই,, এই উত্তর ছাড়া ইহার উত্তর আর বালিকা কি দিবে। সে কোন উত্তরই খুজিয়া পাইল না। প্রমোদ আবার বলিলেন "কেন বিবাহ করিবে না আমাকে বুঝাইয়া দেও, তোমার আপত্তি কি সে?" বালিকাকে নিরুত্তর দেখিয়া প্রমোদ প্রতিবারে আরো ক্রুদ্ধ হইয়া আরো উচ্চৈঃস্বরে ঐ এক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আরো দুই এক বারেও উত্তর না পাইয়া প্রমোদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। প্রমোদ স্বভাবতঃ উদ্ধত এবং চিত্তদমনে অপটু, যাহা যখন মনে আসিত সেই মনের বেগ অনুসারেই চলিতেন, ভগিনীকে এই প্রকার নিরুত্তর দেখিয়া সরোষে টেবিলে আঘাত করিয়া আবার বলিলেন" কেন বিবাহ করিবে না বল" বালিকা ভয়ে জড় সড় হইয়া পড়িল, তাহার মস্তক ঘুরতে লাগিল, কি উত্তর দেওয়া উচিত, কি অনুচিত তাহা ভাবিবার ক্ষমতাও রহিল না। হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে আপনাআপনি আবার তাহার এই উত্তরটি উছলিয়া উঠিল "আমার বিবাহে ইচ্ছা নাই।"

প্র। "তোমার ইচ্ছা! বাঙ্গালির মেয়েদের আবার বিবাহে ইচ্ছা অনিচ্ছা কি? তোর ইচ্ছার উপর বিবাহের কি নির্ভর করিতেছে? আমার ইচ্ছাই কি যথেষ্ট না?"

বালিকা আর কোন উত্তর দিতে পা-

রিল না। যে উত্তর দিয়া ফেলিয়াছে তাহাতেই যেন অপ্রতিভ হইয়া প'ড়িল, শুষ্ক ওষ্ঠাধর ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল— বিশাল চক্ষুর শূন্য দৃষ্টি শূন্যেই সংলগ্ন হইল। তখন প্রমোদ আরো ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "আমার ইচ্ছাই যথেষ্ট, আমি যে তোর ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম সে অনুগ্রহ মাত্র। তোর ইচ্ছা শুনিতে চাই না আমার ইচ্ছাতেই তোর বিবাহ করিতে হইবে।" তখন বালিকা যেন কোন দৈব শক্তিতে উত্তেজিত হইয়া, যেন নিরাশার অপ্রতিহত তেজে উত্তেজিত হইয়া বলিল "দাদা, অনিচ্ছায় বিবাহ করিতে নাই, ইহা কি তোমার কাছেই শিক্ষা পাই নাই! তুমি আজ আপন কথার ব্যতিক্রম করিবে?" প্রমোদ এই কথায় ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন "হাঁ আমার সেই নির্ব্বুদ্ধিতার ফল আজ পাইলাম বটে। আচ্ছা তোর বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই, আমারো তোকে আর খাওয়াইতে পরাইতে ইচ্ছা নাই। তোর যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। আমি তোর মুখ দেখিতে চাহি না, দূর হইয়া যা" এই খাওয়া পরার কথাগুলি বালিকার বড়ই লাগিল, কথাগুলি হৃদয়ের স্তরে স্তরে বিদ্ধ হইল। সামান্য অন্ন বস্ত্রের কথা লইয়া প্রমোদ তাহাকে আজ মর্ম্ম-পীড়িত করিতে পারিলেন! বালিকা আর মনোবেগ থামলাইতে পারিল না। কষ্টে দুঃখে বালিকার মস্তক আপনিই নত হইয়া পড়িল। হস্তে মস্তক রাখিয়া কনক, যন্ত্রণার অশ্রুতে হস্ত ভাসাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া প্রমোদ নরম হইয়া পড়িলেন— তাঁহার মায়া হইল। প্রথম রাগের মাথায় অন্ন বস্ত্রের কথা বলিয়াই পরক্ষণে পশ্চাত্তাপ করিতে লাগিলেন। তিনি চৌকি হইতে উঠিয়া, কয়েক বার গৃহে পদচারণা পূর্ব্বক কনকের কাছে আসিয়া বলিলেন "কনক আর কাঁদিস নে। আপাততঃ এখনি আর তোর বিবাহের কথা তুলিব না—যা ঘরে যা" কনক আস্তে আস্তে সেখান হইতে উঠিয়া গেল। প্রমোদ রাগে দুঃখে অনুতাপে মুহ্যমান হইয়া বসিয়া রহিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ—মুক্ত কণ্ঠ।

সে দিন সমস্ত দিন কাঁদিয়াই কনকের কাটিয়া গেল। তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া ব্যথিত চিত্তে নীরজা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কনক সে দিনকার সমস্ত ঘটনাই তাঁহাকে খুলিয়া বলিল। নীরজার প্রথম তাহা শুনিয়া একটু মমতা হইল, কিন্তু আবার প্রমোদের কাছে সকল শুনিয়া কনকের দোষ বুঝিতে পারিল, নীরজা তখন কনকের প্রতি বিরক্ত হইল। নীরজা—বালিকা, স্বামীর দোষ কিছুই দেখিতে পায় না নীরজা জানে তাহার স্বামী যাহা বলেন তাহা কখনই অন্যায় হইতে পারে না, স্বামী যাহা কহেন সকলি উচিত বাক্য, সকলি বেদবাক্য। স্বামীর মতের কেহ বিরুদ্ধ বলিলে সে বিরক্ত হইত সে তাহার উপর চটিয়া যাইত। কনক বিবাহ করিতে অস-

স্মত হইয়াছে বলিয়া সেও কনকের প্রতি বিরক্ত হইল। অবশ্য কনক দোষী, নহিলে স্বামী কখনই বিরক্ত হইতেন না, স্বামী কখনই অন্যায় রূপে কাহারো উপর বিরক্ত হন না, তবে এরূপ স্থলে নীরজা দোষীর দুঃখে সমদুঃখী হইবে কি করিয়া? সে প্রথমে বিবাহের জন্য কনককে কত বুঝাইল, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া শেষে বিরক্ত হইয়া বলিল "তুই ভাই বড় এক রোকা মেয়ে, সাধে কি উনি রেগেছেন? আপনার দোষেরি শাস্তি। নে বাবু যা ইচ্ছা কর, তিনি যখন পারেন নি তখন আমিই কি তোকে পারিব, আমার চেষ্টা করাই বৃথা" বালিকা নীরজা আজ প্রৌঢ়ার ন্যায় কনককে বকিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেল। প্রমোদের কথায় অসম্মত হইল ইহাতেই বালিকার রাগ, প্রমোদের কথা লোকে কি রূপে না শুনিয়া থাকিতে পারে তাহা সে বুঝিতেও পারিত না। কনক একাকী সমস্ত দিন কাঁদিল। সমস্ত দিন রাগ করিয়া নীরজা আসিল না, সন্ধ্যাবেলা আর একবার নীরজা আসিয়া বলিল "কনক আমি তোর বিবাহের অনিচ্ছার কারণ জানি, তুই হিরণকে চাস? কিন্তু এ কথা জানিলে তোর দাদা তোর উপর আরো বিরক্ত হইবেন তা জানিস? আমি এই ভয়ে তাঁহার নিকট, তোর মনের কথা এখনো বলি নাই। যে লোক তোর দাদার পরম শত্রু, কনক তাহাকে তুই কি করিয়া ভাল বাসিলি। এই কি তোর অসীম ভ্রাতৃস্নেহ? কনক এখনো বল যামিনীনাথকে বিবাহ করিবি আমি দৌড়িয়া তোর দাদাকে বলিয়া আসি" কনক বলিল "হিরণ দাদার শত্রু কখনই না, কেমন করিয়া তাঁহার এ ভুল বিশ্বাস জন্মিল?" শুনিয়া আবার নীরজা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল "সকল জানিয়া শুনিয়া তবুও বলিবি তোর দাদার ভুল বিশ্বাস! তোর কাছে আজ কাল তোর দাদারি যত দোষ—আর তোকে কিছু বলিতে আসিব না—আমি চলিলাম, তোর যাহা ইচ্ছা কর" যে নীরজা কনককে এত ভাল বাসিত সেই আজ স্বামীর অসন্তুষ্টিবশত আপনিও কনকের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেল। সে রাত্রে কনকের আর নিদ্রা আসিল না। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া উষ্ণ মস্তিষ্ক শীতল করিতে কনক গঙ্গা তীরে আসিয়া, জলে পা রাখিয়া একটি সোপানে আসিয়া বসিল। যে দিন সুশীলার মৃত্যু হয় সে দিন এই খানে এই গঙ্গায় ডুবিয়া গিয়াছিল তাহা মনে পড়িল, মনে হইল আজ সেই খানে ডুবিলে তাহাকে রক্ষা করিবার আর কেহই নাই আজ আর হিরণকুমার তাহাকে রক্ষা করিতে আসিবেন না। বালিকা ভাবিতে ভাবিতে হস্তে মস্তক রক্ষা করিয়া, অশ্রুপূর্ণ নেত্রে আপন মনে মৃদু মৃদু গাহিতে গাহিতে প্রভাত-সমীরণে গঙ্গাবক্ষঃস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালাবিক্ষেপ দেখিতে লাগিল।

গাহিতে গাহিতে হঠাৎ একবার হস্ত হইতে মস্তক তুলিয়া অশ্রু মুছিতে গেল অমনি দেখিল নিকটে কে দাঁড়াইয়া।

কনক সেই মূর্ত্তি দেখিয়া চিনিল হিরণ-কুমার।

হিরণ শারীরিক অসুখ নিবন্ধন দুই মাসের ছুটী লইয়াছিলেন, সে ছুটির এখনো এক মাস বাকি আছে। কিন্তু সে ছুটীতে তিনি আর এলাহাবাদ ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইতে পারিতেছিলেন না। যত দিন বাকি আছে, তত দিন এলাহাবাদেই কাটাইবেন স্থির করিয়া এইখানে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া ছিলেন। কিন্তু সকালে বিকালে প্রায়ই তিনি নদীতে নৌকা করিয়া বেড়া-ইয়া বেড়াইতেন। নদীতে বেড়াইতে তাঁ-হার বড় ভাল লাগিত। শরীরের জন্য আর কোথাও যাওয়ার তাঁহার আবশ্যক বোধ হইত না। হিরণকে দেখিয়া আ-হ্লাদে বিস্ময়ে সলজ্জ ভাবে কনক তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া রহিল। অনেক ক্ষণ কাহারো মুখে কোন কথা ফুটিল না। অনেক ক্ষণ পরে হিরণ বলিলেন "আমি নৌকায় বেড়াইতে বেড়াইতে কতদিন তোমাকে দেখিয়া, এখানে আসিতে ইচ্ছা হইয়াছে কিন্তু এরূপ স্থলে তোমার সহিত দেখা করা অন্যায় বিবেচনায় সে লোভ কষ্টে সম্বরণ করিয়া আসিয়াছি। আজও আসিবার আগে কতবার ঐ কথা ভাবি-য়াছি ঠিক নাই কিন্তু আজ আর কোন মতে থাকিতে পারিলাম না। কনক, আ-মার অন্যায় মার্জ্জনা করিও আমি আর কখনো আসিব না—উঃ কত দিন তোমার সহিত দেখা হয় নাই"। হিরণ যে আসিয়া অন্যায় করিয়াছেন কনকও এই কথা মনে মনে ভাবিতেছিল কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না। হিরণ বলিলেন "কনক, তুমি বোট হইতে বাড়ী আসিবার পর হইতে আমার কি কষ্টে দিন অতিবাহিত হইতেছে বলিতে পারি না। সে কষ্ট আর সহ্য করিতে না পারিয়া আজ আমি তোমার নিকট আমার যাতনা খুলিয়া বলিতে আসিয়াছি, আমার এই অসম সাহস তুমি কি মাপ করিবে না! কনক, নিতান্ত অসহ্য না হইলে আমি আজ এরূপে ক-খনো আসিতাম না। আর আমি এরূপ গুমরিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কনক, প্রথম সাক্ষাতে আমি আপনার মন আপনি বুঝি নাই। বুঝিলেও তখন আমার হৃদয়ের কথা তোমাকে বলিতে সাহসী হইতাম না। তোমাকে ছাড়িয়া অবধি আমি যাই যাই হইয়াছি, পৃথিবীতে আমার সুখ নাই, শয়নে স্বপনে সকল সময়েই তোমার ঐ কনক-প্রতিমা বই আমি আর কিছু দেখিতে পাই না। কনক, আমি তোমার কাছেই হৃদয় হারিয়েছি। হিরণ মনের রোকে এক নিশ্বাসে সমস্ত কথা গুলি বলিয়া গিয়া নিশ্বাস লইবার জন্য থামিলেন। বালিকা আর তাঁহার কথার কি উত্তর দিবে? সেই পদ্ম নেত্রের নীরব অশ্রুই তাহার কথার উত্তর দিল। হিরণ আবার বলিলেন "কনক আমার একটি কথার উত্তর দেও। তোমার একটি কথার উপর, আমার জীবন মরণ সমস্ত নির্ভর করিতেছে, কনক আমার এই অসীম ভাল বাসার কি প্রতিদান পাইব!" কনক

মনে মনে বলিল আমার বুক চিরিয়া দেখাইবার হইলে ও কথা জিজ্ঞাসা করিতে না" কিন্তু তাহার মনের কথা মনেই মিশাইয়া গেল, মুখে ফুটিল না। হিরণ তাহার মৌনভাবে আশ্বাসিত হইয়া আবার বলিলেন "কনক, বল বল আর আশঙ্কার ব্যাকুলতায় রাখিও না। তুমি নিজে হস্তারক না হইলে আমার সুখে বাধা দেবার আর কিছুই নাই। আমি তোমার হস্ত প্রার্থনা করিলে তোমার ভ্রাতা এখনি তাহা দিবেন ইহা আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। কনক আমি তোমাকে বাঁচাইয়াছি, কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তোমার হস্ত আমাকে দিতে কখনই তিনি কুণ্ঠিত হইবেন না,এখন তোমার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর" এদিকে দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, গঙ্গাস্নানে আগমনকারী বৃদ্ধগণের কথোপকথনের রেশ আসিয়া প্রশান্ত গঙ্গাবক্ষে যেন ঈষৎ ধ্বনিত হইতে লাগিল, পাখীদের কলরবে, দূর-গ্রামস্থ লোকদের জাগ্রত কোলাহলের অস্পষ্ট গুণ গুণ শব্দে কনকের যেন মোহ ভাঙ্গিল। বালিকা দেখিল তাহাদের দুজনের এরূপ থাকা আর কোন মতে উচিত না—আর অধিক ক্ষণ হিরণ থাকিলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা কিন্তু তথাপি বুঝিয়াও কনক তৎক্ষণাৎ হিরণকে যাও বলিতে পারিল না। এক দিকে ন্যায় অন্যায় বিবেচনা অপর দিকে মনের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস, শেষে ন্যায়ই জয়ী হইল, কনক বলিল "তুমি আর বিলম্ব করিও না" হিরণের যেন হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল, দেখিলেন আর অধিক ক্ষণ থাকা বাস্তবিকই তাঁহার উচিত নহে তিনি বলিলেন "আচ্ছা আমি যাই—আবার কবে দেখা হইবে জানি না—আর কখনো হইবে কি না তাহাও জানি না। কিন্তু যাইবার আগে আবার ঐ কথাটি জিজ্ঞাসা করিতেছি তুমি আমার কথায় উত্তর দেও—কনক বল তুমি কি আমাকে ভালবাস? কনক ক্ষণেক নীরব ভাবে থাকিয়া আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে কতবার থামিয়া থামিয়া অবশেষে কষ্টে লজ্জা অতিক্রম করিয়া বলিল "বাসি।"

এই কথাটিতে হিরণের মাথার উপর দিয়া চকিতের মধ্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন ঘুরিয়া গেল, হৃদয়ের দ্বারে শোণিত উচ্ছ্বাস যেন বেগে আসিয়া ঝাঁপিয়া পড়িল; তখন কি বলিবেন, খুঁজিয়া না পাইয়া আহ্লাদে গদগদ কণ্ঠে হিরণ বলিলেন "তবে এখন চলিলাম।"

বলিয়া অদূরে তাঁহার জন্য যে নৌকা অপেক্ষা করিতেছিল তাহাতে গিয়া উঠিলেন।

নৌকায় উঠিয়া যতক্ষণ কনককে দেখা গেল সতৃষ্ণ নয়নে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রণয়ের আভাস ও অবসান।

(জনৈক সন্ন্যাসী প্রেরিত)

আমরা এত দিন পাঁচ ছয় জন সন্ন্যাসীতে একত্র হইয়া হিমালয়ের এই প্রশান্ত কন্দরে জ্যোৎস্নাময় শান্তির সুখ উপভোগ করিতেছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি আমাদের শান্তিতে একটি বিষম বিঘ্ন ঘটিয়াছে। পুণ্যবতী নামা আমাদের গুরুকন্যা সন্ন্যাসিনী হইয়া আমাদের সঙ্গিনী হইয়াছিলেন, সম্প্রতি স্বদেশ হইতে কি শোকের সংবাদ পাইয়া তাঁহার আর কষ্টের পরিসীমা নাই. তিনি আর আমাদের সঙ্গে একত্রে গঙ্গাস্নানে যাত্রা করেন না, আমাদের সঙ্গে রাত্রির উচ্ছ্বসিত দেব-স্তোত্রে সম্মিলিত হয়েন না, এমন কি, শয়ন আহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিমালয়ের নিভৃত এক প্রান্তে বসিয়া দিবা নিশি অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বীরশ্রেষ্ঠ নামে আমাদের গুরু এবং পুণ্যবতীর পিতা পুণ্যবতীকে এক দিন কঠোর তীব্র ধরণে ভয়ানক তিরস্কার করিলেন,—বলিলেন "তুমি গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন কর, তুমি বিবাহ করিয়া সংসারের অমৃতময় ফল উপভোগ কর, কণ্টকাকীর্ণ নীরস সন্ন্যাস ধর্ম্মে তোমার আবশ্যকতা কোথায়? আজও পর্য্যন্ত তুমি যদি পার্থিব সম্পর্কের অসারতা না বুঝিয়া থাক, সংসারের মায়ামোহের অকিঞ্চিৎকরতা না বুঝিয়া থাক, আত্মীয় জনের মমতার নির্ম্মমতা না বুঝিয়া থাক, প্রণয়-মরীচিকার প্রবঞ্চণা না বুঝিয়া' থাক, ত সন্ন্যাস ধর্ম্মকে এই প্রচণ্ড হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান কর, অনুতপ্ত হৃদয়ে সংসারকেই আবার গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া রাখো।" বীরশ্রেষ্ঠের তীব্র তিরস্কার শুনিয়া, পুণ্যবতীর স্বতঃউৎসারিত অশ্রু-লহরী দেখিয়া, আমি আর সেখানে না থাকিতে পারিয়া অদূরে একটি প্রান্তরে আসিয়া নানা প্রকার ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিলাম—হৃদয়ের দুর্ব্বলতা কি এতই ঘৃণাস্পদ? কিন্তু এই দুর্ব্বলতা না থাকিলে সংসারের অবস্থা আজ কি হইত? যদি পিতাপুত্রের সম্পর্ক কেবল কর্ত্তব্য-জ্ঞান দ্বারাই নিয়মিত হইত, যদি প্রণয়ী-প্রণয়িনীর সম্পর্ক কেবল স্বার্থপরতার বশীভূত হইত, যদি বন্ধু বান্ধবের সম্পর্ক কেবল বাধ্য-বাধকতার সঙ্কুচিত প্রণালীতেই আবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে কি এত দিনে সমস্ত মানব-সমাজ ভগ্ন তরীর ন্যায় ঝটিকা-ক্ষোভিত সাগরের প্রবল

তরঙ্গে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত না? যদি এক জনের চক্ষের জলে অন্যের হৃদয় দ্রবীভূত না হইত, যদি আত্মীয় জনের আমোদ উল্লাসে আত্মীয় জনের হৃদয় উল্লসিত না হইত, যদি এক জনের কাতর রোদনে অন্যের হৃদয়তন্ত্রে আঘাত না লাগিত;—এমন কি, যদি এক জনের করুণ কটাক্ষে অন্যের হৃদয় আপনাতে আত্মহারা না হইতে জানিত, তাহা হইলে এত দিনে কি মানব-সমাজ কেন্দ্রভ্রষ্ট ধূমকেতুর ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল ভাবে শূন্যে শূন্যে তাড়িত-প্রতাড়িত হইত না? গৃহস্থের গৃহবন্ধনের কারণ, হৃদয়ের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা; দেশে একতা-বন্ধনের কারণ, হৃদয়ের দুর্ব্বলতা; পৃথিবীর উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে যে হৃদয়ে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতে পারিতেছে তাহার কারণও এই দুর্ব্বলতা। আমি যদি আজ আপনার স্বার্থ বুঝিয়া তাহারি সাধনে মনোনিবেশ করি, তাহারি নিমিত্ত যদি সকল প্রকার বাধাবাধকতার নিয়ম-প্রণালী অনুসরণ করি, তাহা হইলে আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেও হইতে পারি, কতকটা নিঃসম্পর্ক হইলেও হইতে পারি, কিন্তু তাহাতে আমার সুখের উদ্দেশ্য কি সাধিত হইল? তাহাতে সমাজের আমি কি প্রয়োজনে আসিতে পারিলাম? আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি যে কবিরা যেমন বলেন যে দুর্ব্বলতাই নারী জাতির বল, তেমনি মানব হৃদয়ের দুর্ব্বলতাই সমাজের বল। আজ যদি মানব-সমাজ এই দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হয়, তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবী কি দানব-সমাকীর্ণ এক শ্মশান-ক্ষেত্র রূপে সহসা পরিণত হইয়া উঠে না? তাড়িৎ-উত্তেজিত কলের মানুষের ন্যায় সকলে যদৃচ্ছাক্রমেই বিচরণ করিতে থাকে, সকলেই স্ব স্ব প্রধান, সকলেই নিশ্চিন্ত, সকলেই জড়প্রকৃতি। দুর্ব্বলতাই সমাজের বল, দুর্ব্বলতাই মানব হৃদয়ের শোভা। এমন কি, এই সন্ন্যাস ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও উত্তেজক কি এই হৃদয়ের দুর্ব্বলতাই নহে? যদি হৃদয় সবল থাকে, যদি হৃদয়, বুদ্ধি বিবেকের বশবর্ত্তী হইতে পারে, যদি ন্যায়পরতার কঠোর নিয়ম দ্বারা হৃদয়ের তরঙ্গভঙ্গকে আবদ্ধ রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে সন্ন্যাস ধর্ম্মের আবশ্যকতা কোথায়? আমি স্বীকার করি যে এই দুর্ব্বলতার আতিশয্য নিজের ও সমাজের ঘোর অমঙ্গলকর এবং অসংযত হৃদয়-উচ্ছ্বাস সকল অনর্থের নিদানভূত,—কিন্তু অনেক বিজ্ঞ লোকেই সন্তপ্ত অশ্রুলহরি দেখিলেই, মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস শুনিলেই ঘৃণায় নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া তুলেন। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া বীরশ্রেষ্ঠের উপর আমার কতকটা বিরাগ জন্মিল,—এবং পুণ্যবতীর মনের কথা জানিবার জন্য আমার কতকটা কৌতূহল উপস্থিত হইল। ক্রমে রাত্রি অধিক হইলে যখন সকলে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন, তখন সেই পর্ব্বত-শিখরস্থ হোমাগ্নির পার্শ্বে পুণ্যবতীকে একলা পাইয়া আমি তাঁহাকে তাঁহার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে অশ্রু-

বিগলিত লোচনে বলিতে লাগিলেন——আমি কুলীন-কন্যা, সুতরাং যৌবন কালেও অবিবাহিতা ছিলাম। ক্রমে প্রায় সমবয়স্ক সুরেন্দ্র নামক একটি ব্রাহ্মণ সন্তানের প্রেমে আমি মুগ্ধ হইয়া পড়ি। প্রথমেই তাঁর রূপ গুণে বিমোহিত হইয়া যখন তখন তাঁহার কথা ভাবি, ক্রমে তাঁহাকে বারংবার দেখিবার লালসা, ক্রমে আত্মীয়তা বন্ধনের অভিলাষ, তৎপরে ঘনিষ্ঠতার দারুণ তৃষ্ণা, পরিশেষে প্রণয়ের অধীর উন্মত্ততা স্বভাবের স্বাভাবিক প্রণালী ক্রমে আমার হৃদয় মনকে নূতন ভাবে গঠিত করিয়া তুলিল। আমি তাঁহার চিন্তাতেই আত্মবিসর্জ্জন করিলাম। অথচ আমার পিতা মাতার কঠোর আজ্ঞানুসারে তাঁহাকে বিবাহ করিবার কথা দূরে থাকুক, তাঁহার নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করিতে আমার সাহস হইত না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, হৃদয়ের দুর্ব্বলতাই সকল শক্তির অপেক্ষা বলীয়ান, সুতরাং পিতামাতার আজ্ঞার বিরুদ্ধে, সমাজের বদ্ধপ্রতিষ্ঠ কঠোরতার বিরুদ্ধে, আপনার স্বার্থের বিরুদ্ধে, আমি তাঁহাতেই লিপ্ত, তাঁহাতেই মিলিত, তাঁহাতেই নিমগ্ন, তাঁহাতেই আত্মহারা হইয়া পড়িলাম।

আমি।—কি!—তুমি আজ যৌবন-সুলভ অকিঞ্চিৎকর প্রণয়ের অশ্রুধারাতে এই মহান হিমাচলকে কলঙ্কিত করিতেছ?

পুণ্যবতী।—কলঙ্কিত?—যদি তুমি প্রকৃত প্রণয়ের নিগূঢ় মর্ম্ম জানিতে, তাহা হইলে তুমি কখনই ও-কথা বলিতে না। হৃদয়ের যে ভাব এই ভোমাগ্নিকে অতিক্রম করিয়া সপ্তম স্বর্গ পর্য্যন্ত উত্থিত হইতে পারে,—যাহার অচল অটলতার সঙ্গে তুলনা করিলে এই দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হিমাচলকে পর্য্যন্ত চঞ্চল বলিয়া জ্ঞান হয়, যাহার উদারতা এই অনন্ত প্রসারিত গগনমণ্ডল অপেক্ষাও প্রশস্ততর, সেই প্রণয়কে "অকিঞ্চিৎকর" বলিতে আমি কখনই স্বীকার করিব না।

আমি। প্রণয় যদি এতদূরই পৃথিবীর পার্থিব পদার্থের মধ্যে অপার্থিব, তবে কেন তুমি প্রণয় ছাড়িয়া এই হিমালয়ের কঠোর বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ?

পুণ্যবতী। আমি সহজেই সমাজ পরিত্যাগ করি নাই। হৃদয়ের প্রতি হৃদয়ের অত্যাচার দেখিয়া, মৌখিক মমতার নির্ম্মমতা দেখিয়া, সাধের প্রণয়ের অপমান দেখিয়া, সমাজ পরিত্যাগ করিয়াছি। দেখিলাম, যে, হৃদয়ের বেগবান উচ্ছ্বাসের নিকট সমাজের ভয়, বিবেকের উপদেশ, পরিণামের অমঙ্গল আশঙ্কা পর্য্যন্ত ছিন্ন তৃণের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি হৃদয়ের দুর্ব্বলতার মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য সমাজ ছাড়িয়াছি। সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি, এবং অবশেষে হিমালয়ের এক প্রান্তে অবস্থিতি করিতেছি।

আমি। কিন্তু তুমি তোমার প্রণয়ের প্রণয়ীকে পাইয়াও কেনই বা এতদূর ত্যাগ স্বীকার করিলে? তোমার হৃদয়ের সুরেন্দ্র কি তোমাকে স্পষ্টাক্ষরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন?

পুণ্যবতী। না, তিনি আমাকে স্পষ্টাক্ষরে প্রত্যাখ্যান করেন নাই বটে—কিন্তু আমি নিজের মন দিয়া তাঁহার মন বুঝিতে পারিয়াছিলাম, আমার হৃদয়ের অণুবীক্ষণ দিয়া তাঁহার হৃদয়ের প্রতি শিরা দেখিতে পাইয়াছিলাম——সেই সকল দেখিয়া শুনিয়াই আমি সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি।

আমি। আমার এখন তবে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, তুমি তোমার আপনার কল্পনার দ্বারা প্রতারিত হইয়া, তুমিই তোমার প্রণয়ীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছ—তুমিই তোমার অনুভব ও অনুমানের বশবর্ত্তী হইয়া সুরেন্দ্রের সরল হৃদয়ে বিচ্ছেদের অগ্নি জ্বালিয়া আসিয়াছ। তোমার প্রণয়ী যখন স্পষ্টাক্ষরে কিছুই বলেন নাই, তখন স্বকপোল-কল্পিত বিরুদ্ধ অনুমান করিবার তোমার কোন অধিকারই নাই।

পুণ্যবতী। সুহৃদ্বর, তোমার কথার ভাবে সহসা বোধ হয়, যে তুমি কখনই প্রণয়ের অমোঘ প্রভাব অনুভব কর নাই। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে তাহা কখনই হইতে পারে না। তুমি যেরূপ গলদশ্রু লোচনে দেবীর আরাধনা কর, যেরূপ উন্মত্ত হৃদয়োচ্ছ্বাসে দেবীর স্তোত্র পাঠ কর, তাহাতে আমার কখনই বোধ হয় না, যে তুমি কখনও প্রণয়ের মধুর আস্বাদ গ্রহণ কর নাই। আমি মুক্তকণ্ঠে, উর্দ্ধকণ্ঠে বলিতে পারি যে পার্থিব প্রেমই অপার্থিব দেবভক্তির শিক্ষা-সোপান, এবং পার্থিব প্রেমের মধুরতাই দেবভক্তির প্রলোভন মাত্র।

আমি। আমার কথা যাহাই হোউক না কেন, কিন্তু তোমার মত আমি কখনই আকাশময় অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিতাম না।

পুণ্যবতী। কিন্তু আমি বলিয়াছি, যে প্রণয়-বিষয়ে মনের দ্বারাই মন বোঝা যায়, এবং হৃদয়ের দ্বারাই হৃদয় বোঝা যায়। আমার প্রণয়ী যখন আমার প্রণয়ের প্রতি মনে মনে অবজ্ঞা করিতেছেন, তখন তাঁহার প্রতি ব্যবহারে, প্রতি কথাতে, প্রতি কটাক্ষে, তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত এতদূর অনুভব করিতে পারিব, যে বাহিরের অন্য লোক ততটা করিতে সাহসও পাইবে না।

আমি। তোমার সমস্ত কথাগুলি আমাকে প্রহেলিকার মত বোধ হইতেছে।

পুণ্যবতী। প্রহেলিকা কিছুই নহে। সেই আমার প্রণয়ী যখন অন্য জনে অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন, যখন আমার হৃদয়ের অপমান করিয়া অন্যকে হৃদয় উৎসর্গ করিলেন, এবং আমার প্রেমকে অকিঞ্চিৎকর ভাবিয়া অন্যের প্রেমে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন, তখন আমি ব্যতীত কেহই আর তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল না—এমন কি, তিনি নিজেও তাঁহার নিজের ভাব বুঝিতে পারেন নাই।

আমি। অথচ তুমি তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ—ছিঃ ছিঃ কি নিষ্ঠুরতা!

পুণ্যবতী। কিছুই নিষ্ঠুরতা নহে। যখন দেখিলাম, ইন্দ্রাণীর সহিত সাক্ষাতের পর তিনি আমার সঙ্গে ক্রমাগত ইন্দ্রানীর কথা উত্থাপন করেন এবং পূর্ণ ইচ্ছার সহিত অনিচ্ছুক ভাবে ইন্দ্রাণীর কথা শুনিতেই ভাল বাসেন—যখন দেখিলাম, যে আমি সরল হৃদয়ে ইন্দ্রাণীর কোন নিন্দা করিলে তিনি অর্দ্ধস্ফুট স্বরে তাহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছেন, ও তাহার সুখ্যাতি করিলে, প্রগাঢ় আগ্রহে আমাকেই অনামনস্কে আলিঙ্গন করিতেছেন—যখন দেখিলাম"ইন্দ্র" শব্দ উচ্চারণ করিলে ইন্দ্রাণীর কথা তাঁহার মনে আসিতেছে, ও মমতাময় ঔদাস্যের সহিত ইন্দ্রাণীর কুশলবার্ত্তা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া কথাগুলি অধরে অর্দ্ধ সংলগ্ন হইয়া থাকিতেছে,তখনই আমার প্রণয়ীর মনের ভাব জ্বলন্ত অক্ষরে আমার সম্মুখে দেদীপ্যমান হইয়া পড়িল। ক্রমে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইল,—কিন্তু সে ঘনিষ্ঠতাতে আমার কি ক্ষতির সম্ভাবনা? হৃদয়ে হৃদয়ে বিজড়িত থাকিলে, মর্ম্মে মর্ম্মে গ্রথিত থাকিলে, গঙ্গা যমুনার মত দুই প্রাণ এক প্রাণগত থাকিলে সেই ঘনিষ্ঠতাতে আমার কি ক্ষতির সম্ভাবনা?—কিন্তু ক্ষতির সম্ভাবনা আমি আভাসেই অনুভব করিলাম। দেখিলাম, সেই ঘনিষ্ঠতার পর যখনই সুরেন্দ্র আমার নিকট আসিতেন, তখনই তাঁহার মুখে একটী গম্ভীর, একটী বিষণ্ন, অথচ ঔদাস্যময় ভাব দেখিতে পাইতাম। কারণ জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি বলিতেন 'কি জানি আমার মন কেন অকারণে—এমন উদাসীন হইয়া পড়িতেছে। শয়নে স্বপ্নে, আমোদে আহ্লাদে কিছুতেই যেন আমার তৃপ্তি নাই।' আমি প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহাই দেখিতে পাইতাম, সুতরাং সুরেন্দ্রের উপর অভিমান না করিয়া তাঁহার দুঃখে সম-দুঃখী হইয়া থাকিতাম। ক্রমে যখন দেখিতে পাইলাম যে ইন্দ্রাণীর নামে, ইন্দ্রাণীর গলার স্বরে, ইন্দ্রাণী আসিতেছে দেখিয়া সেই ঔদাস্য-রূপ ভস্মের মাঝারে অগ্নি জ্বলিয়া উঠে,—সমস্ত ভস্মরাশি ক্ষণেকের জন্যও উজ্জ্বল হইয়া পড়ে, অথচ সুরেন্দ্র আবার সেই অগ্নি ভস্মেই লুকাইতে চেষ্টা করেন, ক্রমে যখন দেখিতে পাইলাম, এই রূপ অবস্থাতে তিনি এতদূর অনামনস্ক হইয়া পড়েন যে আমার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে তিনি কখন কখন অসম্বদ্ধ কথা পর্য্যন্ত কহিয়া বসেন,—কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন যে, মনের তাঁর কিছুই স্থিরতা নাই,—অথচ যখন দেখিলাম আমার অসাক্ষাতে তাঁহাদের দুজনের গল্পের ছেদ থাকে না, মাথা মুণ্ড কি গল্প করেন তার ঠিকানা নাই, কিন্তু তাহাতেই তাঁহাদের মুখে যে প্রমোদময় কেমন-কেমন ভাব, চক্ষে আবেশময় কেমন-কেমন চাউনী,—দেখিলেই বোধ হয় যেন! তাঁহারা কি এক কবিতাময়, স্বপ্নময়, জ্যোৎস্না-তরঙ্গে হৃদয়ের মলয়মারুতহিল্লোলে ভাসিতেছেন, অথচ আমাকে সেই স্থানে দেখিবামাত্রই সহসা যেন তাঁহাদের সুখের স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া যায়, সহসা যেন তাঁহাদের নন্দনকানন

মরুভূমিতে পরিণত হয়, সহসা যেন হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত উৎস আপনা আপনি শুখাইয়া যায়, সহসা যেন সেই কপট ঔদাস্যে সুরেন্দ্র আমাকে প্রতারিত করিতে যত্নবান হন, এবং বিফল-প্রযত্ন হইয়া কেবল অস্ফুট, বা অর্দ্ধস্ফুট কতকগুলি অসংলগ্ন কথার দ্বারাই আপনিই আপনাকে ধরা দেন, তখনই আমি আমার প্রতি তাঁহার প্রেমের অবসান অনুভব করিতে পারিতাম। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ক্রমে আমার অভিমানের উদ্রেক হইতে লাগিল—প্রথমে সন্দেহ, পরে অভিমান। আমার অভিমান দেখিয়া সুরেন্দ্র আমাকে শত সহস্র প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন যে, "ধ্রুব নক্ষত্রের মত আমার প্রতি তাঁহার ভালবাসা স্থিরই আছে,—আর ইন্দ্রাণীর সহিত ভালবাসা কেবল চোখের আত্মীয়তা মাত্র। ইন্দ্রাণী অতি শান্ত ও সুশীল, ইন্দ্রাণী তাঁহাকে অত্যন্ত যত্ন করেন, ইন্দ্রাণীর গুণে (রূপে নয়) কতকটা বিমুগ্ধ হওয়া অসম্ভব নয়,—কিন্তু এ সকল সত্বেও ইন্দ্রাণীর সহিত সুরেন্দ্রের কেবল চোখের আত্মীয়তা মাত্র" —এই সকল ছলনাময় প্রলাপবাক্যে তিনি আমাকে প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা পাইতেন, কিন্তু প্রণয়ের দেবতা এত দূর সর্ব্বজ্ঞ, ভালবাসাময় হৃদয় এত দূর সর্ব্বদর্শী, যে সুরেন্দ্রের কথায় আমার যাতনা বাড়িত বই আর কমিত না। সুরেন্দ্র ক্রমে আমার প্রতি সমধিক যত্ন প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন, নিজের পরিজ্ঞাত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি আমাকে সমধিক যত্ন প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন,—তাহাতেও আমার হৃদয়ের যাতনা বাড়িত বই আর কমিত না।

ক্রমে যতই তাঁহাদেরই ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল ততই দিন দিন আমার যাতনা, যাতনা হইতে অভিমান তীব্রতর হইতে লাগিল।

অনেক দিন পর্য্যন্ত সেই যাতনা হৃদয়ের নিভৃত গহ্বরে লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু প্রতিক্ষণেই উচ্ছ্বসিত অশ্রুতরঙ্গ দ্বারাই আমি আপনিই সুরেন্দ্রের কাছে ধরা পড়িলাম। নির্জ্জনে বসিয়া উঁহাদিগের নূতন ভালবাসার কথা ভাবি, উভয়ের সম্মুখে যাতনার আভাস পর্য্যন্ত ছলনাময় ঔদাস্যে ঢাকিয়া রাখি, কিন্তু সুরেন্দ্রকে একেলা নির্জ্জনে পাইলে আপনার প্রতিজ্ঞা বিরুদ্ধেও হৃদয়সাগর মথিত হইয়া অশ্রু তুফান যেন আপনা আপনি উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে। কিন্তু সে অশ্রুধারার উত্তরে আমি সুরেন্দ্রের নিকট হইতে কি প্রতিদান পাইতাম? প্রথম প্রথম তিনি আমার অনলময় অশ্রুধারা দেখিয়া কতকটা কাতর হইতেন, ক্রমে গম্ভীর ভাবে আমাকে হৃদয়ের উদারতার বিষয়ে অজস্র উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন, পরে তাহাতেও কৃতকার্য্য না হইয়া আমার নির্দ্দোষী কল্পনাকে সকল দোষের দোষী সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। আমার বিষণ্ণ মুখ, আমার গভীর দীর্ঘনিশ্বাস, আমার বিগলিত অশ্রুধারা দেখিয়া তিনি ক্রমাগতই বলি-

তেন যে 'ইন্দ্রাণীর সঙ্গে আমার প্রণয়ই হয় নাই, সুতরাং তুমি যদি তোমার আপনার কল্পনার দোষে আপনি কষ্ট পাও, তাহা হইলে আমি তাহার কি করিব তুমি দেখাও, তুমি আমাকে বুঝাও যে আমি তোমা অপেক্ষাও ইন্দ্রাণীকে অধিক ভালবাসি।'——কিন্তু হে হৃদয়-দেবতা, তুমিই বল দেখি যে, হৃদয়ের দ্বারাই হৃদয় না বুঝিয়া ন্যায় শাস্ত্রের কূটতর্ক দ্বারা হৃদয়ের গতিবিধি কি সপ্রমাণ হইতে পারে? আমার কল্পনা সকল দোষে দোষী হইতে পারে——কিন্তু যে কল্পনাপ্রভাবে আমি এক সময়ে মর্ত্তালোকে সুরেন্দ্রকে দেবতা জ্ঞান করিয়াছি, যে কল্পনাপ্রভাবে সুরেন্দ্রের সহবাসকে আমি সপ্তম স্বর্গের শেষ পর্য্যন্ত মনে করিয়াছি, যে কল্পনাপ্রভাবে আমি সুরেন্দ্রের চরণযুগল অনন্দাশ্রুতে বিধৌত করিয়াছি, আজ কেনই বা সেই কল্পনা বিকৃত হইয়া সুরেন্দ্রের দোষ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবে—আজ কেনই বা সেই কল্পনাপ্রভাবে আমি সুরেন্দ্রের চরণযুগল বিগলিত হৃদয়ের অশ্রুধারা দ্বারা প্লাবিত করিয়া তুলিতেছি—হৃদয়-দেব! তুমি এই হৃদয়ের অকস্মাৎ বিকারের কারণ অবশ্যই জান। বুদ্ধির বিশ্বাস আর মর্ম্মের বিশ্বাস——দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ। বুদ্ধি ও বিবেচনার দ্বারা একটী বিষয় স্থির সিদ্ধান্ত হইলেও হৃদয় তাহা অকিঞ্চিৎকর ভাবিয়া অগ্রাহ্য করে। তাহার কারণ এই—ন্যায়শাস্ত্রের প্রচলিত প্রণালী অনুসারে বুদ্ধি একটী বিশ্বাসে আসিয়া উপনীত হয়, কিন্তু হৃদয় কেবল অনুভব দ্বারাই, একটী স্থির বিশ্বাসে আসিয়া উপনীত হয়। বুদ্ধির অগম্য, যুক্তির অগ্রাহ্য যে সূক্ষ্ম প্রণালীতে মর্ম্মের বিশ্বাস আসিয়া পড়ে, তাহা কেবল মর্ম্মান্তিক অনুভব-সাপেক্ষ। সুতরাং সুরেন্দ্রের কথাতে প্রতারিত না হইয়া তাঁহার তিরস্কারে আমার নির্দ্দোষ কল্পনাকে দোষী না করিয়া এবং ন্যায় শাস্ত্রের জটিল অরণ্যে, আমার মর্ম্মগত বিশ্বাস না হারাইয়া আমি বৈরাগ্য-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে চেষ্টা পাইতে লাগিলাম। জানিতাম যে, পদ্মানদীর কূলে একবার মাত্র একটী চিড় লাগিলে তাহা ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং পরিশেষে, সেই রেখাবৎ চিড় মাত্র অবলম্বন করিয়া, সেই সমস্ত পুলিন-দেশ পদ্মার গভীর গহ্বরে লয় প্রাপ্ত হয়। সেই রূপ ভালবাসাতে একবার মাত্র একটী চিড় উপস্থিত হইলে তাহা পূর্ণ না হইয়া উত্তরোত্তর বরং আরও বিস্ফারিত হইতেই থাকিবে। যখন দেখিলাম যে আমার প্রতি সুরেন্দ্রের ভালবাসার সেই চীড় পড়িয়াছে, যখন দেখিলাম যে কোন ওজর বা ছল করিয়া তিনি আমার নিকট হইতে ইন্দ্রাণীর কাছে যাইতে পারিলে আপনাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সুখী মনে করেন, যখন দেখিলাম যে তিনি সংসারের গুটি কতক অবশ্য বক্তব্য স্থূল কথা কহিয়া "আর কি গল্প করিব" বলিয়া আমার সঙ্গে কথা কহিতেও কৃপণতা প্রদর্শন করেন, যখন

দেখিলাম যে এত প্রকাশ্য কৃপণতা সত্বেও ইন্দ্রাণীর সঙ্গে বিজনে তাঁহার কথার আর পরিচ্ছেদ থাকে না,যখন ক্রমে ক্রমে আবার ইন্দ্রাণী বিষয়ে তাঁর সেই পূর্ব্বের কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত, সলজ্জ ভাব পর্য্যন্ত তিরোহিত হইতে লাগিল, তখন প্রেমের আশায়, সুখের আশায়, সোহাগের আশায়,একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া পিতার সহিত সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলাম।

আমি। কেন তুমি সুরেন্দ্রের কাছে তোমার মনের দুঃখ ও যাতনা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে ফিরাইতে চেষ্টা করিলে না?

পুণ্যবতী। হা অদৃষ্ট! তুমি কি জান না যে নদীর গতিরোধ বরং সহজ, তবুও নূতন প্রেমের গতিরোধ একেবারেই অসম্ভব। অরণ্যে রোদন করিলে তবুও ত রোদনের অনুরূপ প্রতিধ্বনি শুনা যাইতে পারে, কিন্তু সুরেন্দ্রের নিকট সে সময় রোদন করিলে বরং তাঁহার মনে বিরক্তির উদ্রেক হইবারই সম্ভাবনা। প্রথমে মমতা, পরে বোঝাবার চেষ্টা, তৎ পরে বিরক্তি, ক্রমে ঘৃণা, পরিশেষে কঠোর ঔদাস্য—প্রেমের অবনতির ও অবসানের এই নিদারুণ দৃশ্য পরম্পরা সম্যক রূপে দেখিবার পূর্ব্বেই আমি তাঁহার সহবাস পরিত্যাগ করিয়া হিমাচলে আসিয়াছি।"

এই কথা বলিতে বলিতে পুণ্যবতীর বিশাল বক্ষ দিয়া যে শ্রাবণধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া আমার হৃদয় একেবারে দ্রবীভূত হইয়া পড়িল, এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে দেখি রজনী প্রভাত হইয়াছে—হোমাগ্নি মলিন হইয়া আসিতেছে এবং সন্ন্যাসীদিগের প্রাতঃস্তোত্রে দিক-মণ্ডল রোমাঞ্চিত হইতেছে। সুতরাং পুণ্যবতীকে ছাড়িয়া আমাকেও সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গে দেব-আরাধনায় সম্মিলিত হইতে হইল।

শ্রী দঃ

Sep. 231

উদয়নাচার্য্য।

বাণভট্ট।

বাণভট্ট সংস্কৃত ভাষায় কাদম্বরী নামক সর্ব্বোৎকৃষ্ট গদ্য কাব্য প্রণয়ন করেন। বাণভট্ট গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই এজন্য উহার উত্তর ভাগ তদীয় পুত্র কর্ত্তৃক বিরচিত হয়। বাণভট্ট "হর্ষচরিত" "চন্দ্রিকাশতক" প্রভৃতি আরো কএক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সার্ঙ্গধরপদ্ধতির[১] মতে বাণভট্ট ময়ূরভট্ট ও মাতঙ্গদিবাকর শ্রীহর্ষ রাজার সভ্য ছিলেন ১ মাধবাচার্য্যের মতে বাণ ও ময়ূর অবন্তি-দেশবাসী ছিলেন। ময়ূরভট্ট বাণের শ্বশুর ছিলেন। রামদাস বাবু বলেন—

বাণভট্ট হর্ষচরিত-প্রণেতা। কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের সহিত তাঁহার বাল্যসখিতা ছিল এজন্য তিনি হর্ষচরিতে তাঁহার গুণাবলী বর্ণন করিয়াছেন। হর্ষবর্দ্ধন ৬০৭ খৃঃ অঃ হইতে ৬৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন কিন্তু চীনদেশীয় লেখক মাতনলিনের মতানুসারে তাঁহার ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিয়াঙ সিয়াঙ হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যশাসন সময়ে কান্যকুব্জে গমন করিয়াছিলেন। আবুরিহান কহেন এই হর্ষবর্দ্ধন কর্ত্তৃক "শ্রীহর্ষ-অব্দ" প্রচলিত হইয়াছিল। এই অব্দ ৬০৭ হইতে ১১০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কান্যকুব্জ ও মথুরায় প্রচলিত ছিল। এই শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন এবং ইনিই হিয়াঙসিয়াঙের শ্রীহর্ষ শিলাদিত্য। বাণভট্ট তাঁহার পারিষদ সুতরাং তিনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। ২

আমরা রামদাস বাবুর এই কথা অনাদর করি না, কেন না ডাক্তার হল ৩ মুসলমান-ইতিহাসলেখক আবুরিহান ৪ প্রভৃতির মতের সহিত তাহার ঐক্য আছে। খৃঃ দশম শতাব্দীর পরার্দ্ধের লোক ত্রিলোচনদাস ও নবম শতাব্দীর লোক মহা মহোপাধ্যায় শ্রীপতিদত্ত বাণভট্টের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ৫ এই সকল কারণে আমাদের নিকট রামদাস বাবুর যুক্তি প্রামাণ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু জর্ম্মান

১ অহো প্রভাবো বাগ্দেব্যা যন্মাতঙ্গদিবাকরঃ। শ্রীহর্ষস্যাভবৎ সভ্যঃ সমো বাণময়ূরকঃ।

২ ঐতিহাসিক রহস্য ২ ভাগ বাণভট্ট নামক প্রস্তাব দেখ।

৩ Dr. Holles Catalogue

৪ Aburihan. Translated by Whitney.

৫ ত্রিলোচন-কৃত "কাতন্ত্রপঞ্জিকা" এবং শ্রীপতিদত্ত-কৃত "কাতন্ত্রপরিশিষ্ট" দেখ।

ভাষায় কাদম্বরীর অনুবাদক শাস্ত্রদর্শী ভন্ বট্‌লার সাহেব বলেন বাণভট্ট অষ্টম শতাব্দীর মধ্য ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। ৬ "প্রাচ্য সাহিত্য" নামক গ্রন্থ-প্রণেতা টমসন্ সাহেবও ভন বট্‌লারের মতের অনুমোদন করিয়াছেন ৭ কিন্তু পরবর্ত্তী পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের উদ্ভাবিত মত হইতে আমাদের নিকট রামদাস বাবুর মতই অধিক সারবান বোধ হয়, অতএব আমরাও রামদাস বাবুর মতের অনুমোদন করিয়া বলিতেছি যে, বাণভট্ট খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

ময়ূরভট্ট।

ময়ূর বাণভট্টের শ্বশুর ও সমকালীন লোক ছিলেন। সার্ঙ্গধর, জৈন গ্রন্থ ও সূর্য্যশতকের টীকাকার মধুসূদন প্রভৃতিও একথা স্বীকার করিয়াছেন। রামদাস বাবুও তাঁহাদের কথা অনুমোদন করিয়াছেন। সুতরাং ময়ূরভট্টও খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর মধ্য ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। ময়ূরভট্ট ও কান্যকুব্জাধিপতি শ্রীহর্ষ হর্ষবর্দ্ধনের সভ্য ছিলেন। কাহারও মতে ৮ কুল্লুক ভট্ট প্রভৃতির সমকালে এক ময়ূরভট্ট ছিলেন। বোধ হয় ইনি একজন স্বতন্ত্র ময়ূরভট্ট। ৯

(শঙ্করাচার্য্য)

বৌদ্ধধর্ম্মের মূল-উচ্ছেদক ও বেদ-ভাষ্যকার ভুবনবিখ্যাত শঙ্করাচার্য্যের বিষয় অধিক লেখা বাহুল্য। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বঙ্গদর্শন প্রভৃতিতে শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে অনেক প্রস্তাব বাহির হইয়াছে বিশেষতঃ তাঁহাকে লইয়া এক খানি মহা কাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারত-বাসী মাত্রই তাঁহাকে দেবতার অবতার বলিয়া জানেন। খণ্ডনখণ্ডখাদ্য গ্রন্থে শঙ্করের নাম উল্লেখ আছে। ১০ ইহাতে জানা যায় শঙ্কর নৈষধকার শ্রীহর্ষের (খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের) পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য কাহারও মতে খৃঃ নবম শতাব্দীর প্রারম্ভের লোক ১১ ও কাহারও কাহারও মতে খৃঃ অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন। ১২

আমরা পূর্ব্ব সংখ্যক ভারতীতে মাধবাচার্য্যের কথার সত্যাসত্য বিচার জন্য যে যে

৬ ভন্‌বট্‌লার কৃত Annotations of Kadambari দেখ।

৭ টমসন্ কৃত Oriental Literature দেখ।

৮ বান্ধব; তৃতীয় ভাগ, ৩৮১ পৃষ্ঠা।

৯ আমাদের ময়ূরভট্ট সম্বন্ধে এক স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

১০ See The Khandana (Calcutta Edition) p. 2

১১ See Professor Cowell's preface of the Kasumanjali, page X.

১২ (1) Colebrookes Essays Vol 1. page 332 Also Colebrooke's Preface to his translation of the Dayabhaga.

(2) Wilson's preface to his Sanskrit Dictionary 1 st Ed page XV11 and Wilsons Essays on the Religion of Hindus Vol 1. p. 201.

প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলাম তাহাতে দেখা যাইতেছে যে মাধবাচার্য্যের কথা প্রায় সর্ব্বাংশে প্রমাদপূর্ণ। এখন যদি তাঁহার কথাকে অবাস্তবিক বলি, বোধ হয় তাহা হইলে একেবারে হাস্যাস্পদ হইব না; কেননা পুরাতত্ত্ব-বিশারদ পণ্ডিতগণের যুক্তি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টরূপে দেখা যায় যে বাণভট্ট ও ময়ূরভট্ট হইতে শঙ্করাচার্য্য প্রায় ১৭০ বৎসরের পরসাময়িক লোক—আবার শঙ্করাচার্য্য হইতে শ্রীহর্ষ প্রায় ৩৭০ বৎসরের পরবর্ত্তী লোক—আবার ময়ূর ও বাণ হইতে শ্রীহর্ষ প্রায় ৫৪০ বৎসরের পরসাময়িক লোক। এখন স্পষ্ট রূপে দেখা যায় যে ময়ূর ও বাণ ব্যতীত মাধবাচার্য্য যাঁহাদিগকে সমসাময়িক লোক বলিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেকের আবির্ভাব-কাল এত অন্তর যে তাহাদের কাহার সঙ্গেই কাহার কস্মিন কালেও দেখা হইতে পারে না। অতএব এখন যদি আমরা মাধবাচার্য্যের কথার উপর বিশ্বাস করিয়া চলি তবে আমাদিগকে পদে পদে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। তবে মাধবাচার্য্যের বাক্যের এই সার গ্রহণ করা যাইতে পারে যে তদুল্লিখিত সমকাল-আবির্ভূত মহাত্মাগণ সকলেই তাহা হইতে (খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে) পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। আমরা যে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ভারত বিখ্যাত মহাত্মার চিরস্মরণীয় নাম মুকুটস্থলে সংস্থাপিত করিয়া এই প্রস্তাব লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি এখন ভারতীয় সাহিত্য সংসারের সেই অতুল মণি উদয়নাচার্য্যের সময় নিরূপণ করিবার জন্য কোন্ সোপানের অনুসরণ করিব? যদি মাধবাচার্য্যের কথার উপর নির্ভর করি তবে উদয়নাচার্য্যকে কাহার সমসাময়িক বলিব? এখন যদি অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া একথার উত্তর দিই তবে দিশাহারা হইয়া অবশেষে "মাধবাচার্য্যের কথায় যখন কোনও সামঞ্জস্য নাই তখন গতিকেই তাঁহার কথা ছাড়িয়া সোপানান্তরের অনুসরণ করিতে হইবে" একথা না বলিয়া আর গত্যন্তর নাই। সুতরাং আমরা এখন মাধবাচার্য্যের কথা ছাড়িয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিতেছি:—

উদয়নাচার্য্য সম্বন্ধে অধ্যাপক কাউয়েল সাহেব যে সময় নির্ণয় করিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম এই—কাউয়েল সাহেব বলেন "উদয়নাচার্য্যের সময় নিরূপণ করিতে হইলে আমরা প্রাচীন ন্যায়-শাস্ত্রের অনুশীলন করিলে কিছু জানিতে পারিব। ন্যায়ের অতি প্রাচীন সূত্র সমূহ গোতম অথবা অক্ষপাদ ঋষির কৃত; এই সূত্রের "ন্যায়ভাষ্য" নামক পক্ষিলস্বামী অথবা বাৎস্যায়ন নামক জনৈক ব্রাহ্মণের ১৩ একখানা টীকা আছে; এই "ন্যায় ভাষ্যের"

১৩ সুপ্রসিদ্ধ চানক্য পণ্ডিতেরই অপর নাম পক্ষিলস্বামী ও বাৎস্যায়নঃ—
বাৎস্যায়নো মল্লনাগঃ কৌটিল্যশ্চনকাত্মজঃ।
দ্রাবিলঃপক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোঽঙ্গুলশ্চ সঃ।
হেমচন্দ্রকৃত অভিধান-চিন্তামণি মর্ত্ত্যকাণ্ড। চানক্য ন্যায় শাস্ত্রে পক্ষিল স্বামী ও বাৎস্যায়ন নাম ধারণ করেন (বান্ধব ১২৮৫ সন ১৫৪ পৃষ্ঠা)

উদ্যোতকর আচার্য্য ১৪ নামক এক ব্যক্তির "ন্যায়বার্ত্তিক" নামে এক খানা টীকা আছে। এই "ন্যায়বার্ত্তিকের" বাচস্পতিমিশ্র-কৃত একখানি টীকা আছে তাহার নাম "ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-টীকা।" আবার এই "ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য টীকার" "ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি" নামক উদয়নাচার্য্য-কৃত এক খানি টীকা আছে। যখন উদয়ন, বাচস্পতি মিশ্রের "ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-টীকার" "ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি" নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন তখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে উদয়নাচার্য্য বাচস্পতিমিশ্রের পরসাময়িক লোক। আবার মাধবাচার্য্য তাঁহার "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে অনেক স্থলে কুসুমাঞ্জলি উদ্ধৃত করিয়াছেন সুতরাং ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে উদয়ন, মাধবাচার্য্যের পূর্ব্বসাময়িক।"

কাউয়েল সাহেব আরো বলেন—"বাচস্পতিমিশ্র শঙ্করাচার্য্যের "বেদান্তসূত্র-টীকার" "ভামতি ১৫ নাম্নী এক টীকা প্রণয়ন করেন; সুতরাং ইহাতে জানা যায় যে বাচস্পতিমিশ্র শঙ্করাচার্য্যের পরসাময়িক। এখন আমরা শঙ্করাচার্য্যের বিষয় জানি যে তিনি খৃঃ নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন এবং মাধবাচার্য্যের বিষয় জানি যে তিনি খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং আমরা বিশেষ ভ্রমের আশঙ্কা না করিয়া বাচস্পতিমিশ্রকে খৃষ্টীয় দশম এবং উদয়নাচার্য্যকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করিতে পারি।" ১৬

কাউয়েল সাহেবের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া বোম্বাই হইতে পণ্ডিত কাশীনাথ তৈলঙ্গ ত্র্যম্বক যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই:—

"কাউয়েল সাহেব বলেন উদয়নাচার্য্য বাচস্পতিমিশ্রের "ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি" নামক এক টীকা প্রণয়ন করেন কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, যে উদয়ন "ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি" লিখিয়াছেন তিনিই যে "কুসুমাঞ্জলি" প্রণেতা উদয়ন তাহার প্রমাণ কি? পক্ষান্তরে আমরা এক প্রকার প্রমাণ দিতে পারিব যে তাহাতে কাউয়েল সাহেবের সিদ্ধান্ত ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। সে প্রমাণ এই:—

'কলিকাতার পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি বাচস্পতিমিশ্র-কৃত 'সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদী'

১৪ ডাক্তার হল সাহেব উদ্যোতকর ও উদয়নাচার্য্যকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু কাউএল তাঁহার মত খণ্ডাইয়া অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে উদ্যোতকর ও উদয়ন ভিন্ন ব্যক্তি Cowlls Edition of Kusumanjali priface X.

১৫ "ভামতি" এবং "ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকা" এ দুই খানি টীকাই যে বাচস্পতিমিশ্র-কৃত ইহা ভামতির তালিকায় উল্লেখ আছে। Dr. Halls Catalogue, page 87

১৬ See Cowell's preface to the Kusumanjali

নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। সেই পুস্তকের ভূমিকায় লেখা আছে যে বাচস্পতিমিশ্র শ্রীহর্ষের "খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের" খণ্ডনোদ্ধার নামক এক খানা উত্তর লিখিয়াছেন ১৭। পণ্ডিত মহাশয় কোথা হইতে এই বিবরণ সংগ্রহ করিলেন তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। বাচস্পতিমিশ্র "ভামতি" নাম্নী যে টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কৃত পুস্তকের এক তালিকা আছে, এবং ডাক্তার হল ভামতিতে যে তালিকা আছে তাহা সমস্তই উদ্ধৃত করিয়াছেন কিন্তু তাহাতে খণ্ডনোদ্ধারের নাম দৃষ্ট হয় না। সুতরাং যদি ডাক্তার হল বাচস্পতিমিশ্রের তালিকা সমস্তই উদ্ধৃত করিয়া থাকেন তাহা হইলে পণ্ডিত মহাশয়ের কথার কিছুই গুরুত্ব থাকে না। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়ের ন্যায় এক জন অসামান্য] সংস্কৃতজ্ঞ লোক যে কিছু না জানিয়াই খণ্ডনোদ্ধারকে বাচস্পতিমিশ্র-কৃত বলিবেন ইহাও বিশ্বাস হয় না; সুতরাং আমাদের এই বিশ্বাস যে বাচস্পতিমিশ্র "খণ্ডনোদ্ধার" গ্রন্থ ভামতি লিখিবার পর প্রণয়ন করেন। যদি পণ্ডিত মহোদয়ের কথা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে এই দেখিতে পাওয়া যায় যে বাচস্পতিমিশ্র উদয়নের পরসাময়িক। কারণ খণ্ডন-প্রণেতা শ্রীহর্ষ উদয়নকে প্রশ্নের উত্তর-স্থলে এই প্রকার বলিয়াছেন "সেই জন্য তর্কস্থলে ইহা আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয় যে তোমারই শ্লোক আমরা দুই একটী অক্ষর পরিবর্ত্তন করিয়া এস্থলে গ্রহণ করিতে পারি" ১৮ সে শ্লোক এই:—

"ব্যাঘাতো যদি শঙ্কাস্তি
নচেচ্ছঙ্কা ততস্তরাম্
ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা
তর্কশঙ্কাবধিঃ কুতঃ। ১

এই শ্লোকটী স্পষ্টতই কুসুমাঞ্জলির তৃতীয় স্তবকের সপ্তম শ্লোকের অনুরূপ মাত্র—

শঙ্কাচেদনুমাঽস্ত্যেব
নচেৎ শঙ্কা ততস্তরম্।
ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা
তর্কশঙ্কাবধির্ম্মতঃ।" ১৯

১৭ খণ্ডনোদ্ধার সম্বন্ধে এক জন বলেন "আমরা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়ে হস্তলিখিত গ্রন্থের মধ্যে বাচস্পতিমিশ্র-কৃত "খণ্ডনোদ্ধার" নামক এক খানি পুস্তক দেখিয়াছি, ইহাতে শ্রীহর্ষের খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের আপত্তি-মীমাংসা-চেষ্টা আছে। যদি এই বাচস্পতিমিশ্র "ভামতি" কার হয়েন তাঁহার উদয়নের পরবর্ত্তী হইবারই সম্ভাবনা; কিন্তু তিনি ভামতিকার কি না, তাহার প্রমাণ নাই। (বঙ্গদর্শন, ৩য় খণ্ড ২৮ পৃষ্ঠা)। বোধ হয় তর্কবাচস্পতি মহাশয় এই গ্রন্থ খানি দেখিয়া ভামতি ও এই গ্রন্থের গ্রন্থকারের নামসাদৃশ্য দেখিয়া উভয়কে অভিন্ন ব্যক্তি কল্পনা করিয়াছেন, বিশেষ কোন প্রমাণ না পাইয়া এরূপ কল্পনা করা তাঁহার ন্যায় এক জন প্রধান পণ্ডিতের অনুচিত।

১৮ এই অনুবাদের মূল শ্লোক এই—
"তস্মাদস্মাভিরপাস্মিন্নর্থে ন খলু দুষ্পটা।
ত্বদ্গাথৈর্বান্যথাকারমক্ষরাণি কিয়ন্ত্যপি

১৯ Indian Antiquary, part X.

পণ্ডিত কাশীনাথ ত্র্যম্বক তৈলঙ্গ মহোদয় মাহাত্মা কাউয়েল সাহেবের মত অযৌক্তিক প্রতিপন্ন করিয়া বাচস্পতিমিশ্রকে উদয়নাচার্য্যের পরবর্ত্তী লোক করিতে চাহেন; কিন্তু তাঁহার এ উদ্ভাবনা তত

Vol I, page 297 (1871) বঙ্গ দর্শনের একজন লেখকও প্রায় পণ্ডিত কাশীনাথ তৈলঙ্গ ত্র্যম্বক মহোদয়ের মতের অনুসরণ করিয়া কাউয়েল সাহেবের কথায় কিছু প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান এণ্টিকুইরির অনুকরণ করিয়া যে কএকটী আপত্তি করিয়াছেন তাহা আর বারম্বার উদ্ধৃত করিবার দরগার নাই! তিনি "সরস্বতি কণ্ঠাভরণে নৈষধ উদ্ধৃত হইয়াছে এই কথার বলে যে কয়েকটী আপত্তি করিয়াছেন তাহাও ধর্ত্তব্য নহে, কেননা রামদাস বাবু প্রভৃতির লেখানুসারে ও কথা কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে। তবে তাহার চতুর্থ আপত্তিটী এই স্থলে গ্রহণ করিতেছি—

"মাধবাচার্য্যের স্বকৃত শঙ্করদিগ্বিজয় নামক গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্য উদয়নাচার্য্য ও শ্রীহর্ষকে সমসাময়িক লোক বলিয়াছেন * * * গ্রন্থের অপর স্থলে লিখিত আছে সুরেশ্বর আচার্য্যকে শঙ্কর বলিতেছেন যে—'বাচস্পতিত্বমধিগম্য বসুন্ধরায়াং ভাষ্যং বিধাস্যসিতমাং মম ভাষ্যটীকাং' অর্থাৎ বাচস্পতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া তুমি বসুন্ধরায় জন্ম গ্রহণ করিবে এবং আমার ভাষ্যের টীকা বিধান করিবে (১৩) 'শঙ্করদিগ্বিজয়' ৭৩ শ্লোক। এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে মাধবাচার্য্য উদয়ন ও শ্রীহর্ষকে শঙ্করের ন্যায় প্রাচীন লেখক ভাবিতেন এবং বাচস্পতিমিশ্রকে তৎপরবর্ত্তী জ্ঞান করিতেন। (বঙ্গদর্শন, ৩য় খণ্ড ২৯ পৃষ্ঠা)

যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করি না। কেন না আমরা যতদূর জানি তাহাতে খণ্ডনোদ্ধারে এমন কোন প্রমাণ নাই যে তাহার বলে "ভামতি" কার বাচস্পতিমিশ্র ও খণ্ডনোদ্ধার-প্রণেতা বাচস্পতিমিশ্রকে অভিন্ন ব্যক্তি বলা যায়। তিনি কাউয়েল সাহেবের বেলায় অবাধে বলিতে পারিলেন "এখন জিজ্ঞাসা করি যে উদয়ন ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি লিখিয়াছেন সেই উদয়নই যে কুসুমাঞ্জলির প্রণেতা তাহার প্রমান কি?" কিন্তু তিনিই আবার বিশেষ প্রমাণ না পাইয়াই ভামতি-প্রণেতা ও খণ্ডনোদ্ধারপ্রণেতাকে অভিন্ন লোক বলিয়া বিশ্বাস করিলেন!! এখন আমরাও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি তাঁহার এই কথার অকাট্য প্রমাণ কি? তিনি বলিতে পারেন তিনি তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রকাশিত সাঙ্খ্যতত্ত্ব কৌমুদীর ভূমিকায় এই কথা দেখিয়াছেন। কিন্তু যখন উক্ত ভূমিকায় সে কথার কোনও প্রমাণ প্রকটিত হয় নাই তখন শুধু সেই মুখের কথা এমন কি প্রামানিক হইল এবং কাউয়েল সাহেবের কথা ইবা কেন উপেক্ষিত হইল? আমরাই একথার তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ হইলাম। ভামতিকার এবং খণ্ডনোদ্ধার-রচয়িতা যে অভিন্ন ব্যক্তি যদি একথার কোন প্রমাণ থাকিত তবে তর্কবাচস্পতি মহাশয় তাহা অবশ্যই উল্লেখ করিতেন, যখন কোন প্রমাণ লিখেন নাই তখন বলিতে হইবে যে একথার কোন বলবৎ প্রমাণ নাই। অতএব ত্র্যম্বক মহোদয়, যে যুক্তির অনুসরণ করিয়া

মহাত্মা কাউয়েল সাহেবের প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহার একটুকও গুরুত্ব লক্ষিত হয় না। সুতরাং আমরা তাঁহার বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া কাউয়েল সাহেবের যুক্তিকে উপেক্ষা করিতে সাহসী হইলাম না। তবে ভামতিকার এবং খণ্ডনোদ্ধারকার যে অভিন্ন ব্যক্তি এসম্বন্ধে যদি কোন অকাট্য প্রমাণ থাকে তবে এই বলিতে হয় যে খণ্ডনকার শ্রীহর্ষ, উদয়নাচার্য্য এবং বাচস্পতিমিশ্র, ইহাঁরা তিন জনই খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন, কেননা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি খণ্ডনকার শ্রীহর্ষ খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। এই শ্রীহর্ষ উদয়নাচার্য্যের কুসুমাঞ্জলির শ্লোক খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন, খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের প্রতিবাদ করিয়া আবার বাচস্পতিমিশ্র খণ্ডনোদ্ধার প্রণয়ন করিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য আবার বাচস্পতিমিশ্রের ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-টীকার "ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি" নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। সুতরাং এখন স্পষ্টতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীহর্ষ, উদয়ন এবং বাচস্পতি ইহাঁরা সকলেই সকলের গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন অতএব ইহাঁরা তিন জনই সমসাময়িক লোক। যদি এমত হয় তবে কাউয়েল সাহেব যে বাচস্পতিমিশ্রকে খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়াছিলেন তাহাতে প্রমাদ লক্ষিত হইতেছে কিন্তু তিনি উদয়নাচার্য্য সম্বন্ধে যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহা বজায়ই রহিল। বাচস্পতি মিশ্র নৈষধকার শ্রীহর্ষের সমকালে বর্ত্তমান ছিলেন কিনা এখনো তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না কিন্তু উদয়নাচার্য্য এবং শ্রীহর্ষ যে এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। তাহার প্রমাণ দিতেছি।

এখন আমরা উদয়নাচার্য্য সম্বন্ধে একটী সাধারণের সংস্কার-বহির্ভূত কথা বলিব; সুতরাং এ কথাটী একেবারে নূতন না হইলেও অনেকাংশে নূতন। বারেন্দ্র শ্রেণীর কাশ্যপ গোত্রীয় ভাদুড়ী ব্রাহ্মণগণ কহিয়া থাকেন আমাদের আদি পুরুষ কুলশাস্ত্রধাতা পরম পণ্ডিত উদয়নাচার্য্যই কুসুমাঞ্জলি প্রণয়ন করিয়াছেন। আমরা এতদিন মনে করিয়াছিলাম, যে ভাদুড়ীগণ নিজ বংশকে সম্মানিত করিবার জন্যই এইরূপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু এ কথাটি লইয়া যতই চর্চ্চা করা যায় ততই দেখা যায় একথাটি অমূলক নহে। কুলশাস্ত্র-বিশারদ দেবীবর ঘটক যেমন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণকে ছত্রিশ মেলে বিভাগ করেন; সেইরূপ দেবীবরের প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত-মুকুট-ভূষণ কুলশাস্ত্রবিধাতা মহামহোপাধ্যায় উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণকে উত্তমাধমতা পর্য্যালোচনা করিয়া আট পটীতে বা শ্রেণীতে বিভাগ করেন।[২০] ইনি বারেন্দ্র বিপ্র সমাজে সামাজিক শক্তিতে অসামান্য প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। বারেন্দ্র সমাজ ইহার

২০ আট পটির নাম ১ম নিরাবিল ২ সুবর্ণী, ৩ রোহিলা ৪ ভবানীপুর ৫ বেনী ৬ আলেখাণী ৭ কুতুবখানি ৮ জোনালী।

করতলস্থ ছিল। কাহারও মতে কুল্লূকভট্ট ময়ূরভট্ট ২১ ও মঙ্গল ওঝা প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় মহাত্মাগণ উদয়নাচার্য্যের সহকারী ছিলেন ২২।

কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ উদয়নাচার্য্যই যে বারেন্দ্র কুলের কাশ্যপ গোত্রীয় ভাদুড়ীদের আদি পুরুষ ছিলেন এ সম্বন্ধে যদিও খুব প্রাচীন প্রমাণ পাওয়া যায় না তথাচ ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে, একথা কখনই অবাস্তবিক নহে। কেন না রাজসাহী পাবনা ঢাকা ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় এখনো উদয়নাচার্য্যের বংশধরগণ অবস্থিতি করিতেছেন। ইহাঁদের সকলেই জানেন যে ইহাঁরা উদয়নাচার্য্যের বংশসম্ভূত। ইহাঁদের মধ্যে যাঁহারা সুবিজ্ঞ তাঁহারা অনেকেই বলিয়া থাকেন ইহাঁদের আদি পুরুষ উদয়নাচার্য্যই কুসুমাঞ্জলি প্রণয়ন করিয়াছেন। আমরা অন্যান্য স্থানের বিষয় তত ভাল জানি না। ঢাকা জিলার অন্তর্গত খল্লি নামে এক গ্রাম আছে তথায় উদয়নাচার্য্যের অধস্তন পুরুষগণ বাস করিতেছেন। ইহাঁদের মধ্যে শত শত বৎসর হইতে পুরুষপরম্পরা কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে যে ইহাঁরা কুসুমাঞ্জলিপ্রণেতা ও কুলশাস্ত্রধাতা পরম পণ্ডিত উদয়নাচার্য্যের সন্তান। ইহাঁরা উদয়নাচার্য্যের সন্তান বলিয়াই এদেশে বহুকাল হইতে বহুল সম্মান পাইয়া থাকেন। খল্লির ভট্টাচার্য্যেরা বহুকালের ধারাবাহিক পণ্ডিত। প্রায় সার্দ্ধ দ্বিশত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন পণ্ডিতের একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থের শেষ ভাগে তাঁহার নিজকৃত একটী শ্লোক আছে। তাহাতে জানা যায় কুসুমাঞ্জলি প্রণেতা উদয়নাচার্য্যই তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ। খল্লির ভট্টাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা উদয়নাচার্য্যই যে তাঁহাদের আদি পুরুষ, একথা ঘটককারিকায়ও উল্লেখ আছে। ঘটকগণ উদয়নাচার্য্যকে সূর্য্যের অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা কোন মহাত্মার নিকট একটী শ্লোক শুনিয়াছি তাহাতে জানা যায় যে কুসুমাঞ্জলিকার ও কুলশাস্ত্রধাতা উদয়নাচার্য্য অভিন্ন ব্যক্তি:—

সুধীন্দ্রোদয়নাচার্য্যো
বারেন্দ্রকাশ্যপোদ্ভবঃ।
কুসুমাঞ্জলিকারশ্চ
কুলশাস্ত্রবিশারদঃ॥

এই সকল কথার মূল কি যদিও আমরা ঠিক বলিতে পারি না এবং ঘটকদের কারিকা স্বচক্ষে এখনো দেখিতে পারি নাই তথাচ যে সকল মহাত্মাদের নিকট এই সকল কথা শুনিয়াছি তাঁহাদের কথা আমরা একটুও অবিশ্বাস করি না। বারেন্দ্রকুলের কাশ্যপ গোত্রীয় কুলশাস্ত্রবিশারদ পরম পণ্ডিত উদয়নাচার্য্যই যে কুসুমাঞ্জলিপ্রণেতা তাহাতে অণুমাত্র ও সন্দেহ নাই।

কুসুমাঞ্জলি প্রণেতা উদয়নাচার্য্য এবং

২১ বান্ধব তৃতীয় খণ্ড ৩৮১ পৃষ্ঠা। এ ময়ূরভট্ট অবশ্য বাণভট্টের শ্বশুর ও শ্রীহর্ষ রাজার সভ্য ময়ূরভট্ট হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

২২ বান্ধব ৩য় খণ্ড ৩৮১ পৃষ্ঠা।

কুলশাস্ত্রবিশারদ পরম পণ্ডিত উদয়নাচার্য্য যে অভিন্ন ব্যক্তি একথা সম্বন্ধ নির্ণয় প্রণেতাও শুনিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "কেহ কেহ বলেন কুলশাস্ত্রবিশারদ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীই কুসুমাঞ্জলির প্রণেতা। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী ঘটক নৃসিংহ লাহুড়ীর সমসাময়িক। ইহাঁর নিবাস নিশিন্দা গ্রাম জিলা রাজসাহী। সুতরাং ইহাঁকে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিতে হয়। কুসুমাঞ্জলির প্রণেতা উদয়নাচার্য্যকে এতদপেক্ষা প্রাচীনতম বলিয়া বোধ হয়।...... কুসুমাঞ্জলির প্রণেতা উদয়নাচার্য্যই কাশ্যপ গোত্রীয় বারেন্দ্র কুলের ভাদুড়ী গোষ্ঠী-সম্ভূত ২৩" সম্বন্ধ নির্ণয়ের এই কথার কোন সামঞ্জস্য নাই কেন না একবার তাঁহার সন্দেহ হইল, কুলশাস্ত্রবিশারদ উদয়নাচার্য্য হইতে কুসুমাঞ্জলিপ্রণেতা অনেক প্রাচীনতম লোক; আবার দুই ছত্র পরেই বলিলেন "কুসুমাঞ্জলি প্রণেতাই কাশ্যপ গোত্রীয় বারেন্দ্র কুলের ভাদুড়ী গোষ্ঠী সম্ভূত।" তিনি উদয়নাচার্য্যকে নৃসিংহ লাহুড়ীর সমসাময়িক লোক কল্পনা করিয়া তাহাকে পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিয়াছেন এটীও তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রম। সম্বন্ধনির্ণয়-প্রণেতা লোকমুখে এক এক অলৌকিক কিংবদন্তী শুনিয়া অনেক স্থলে একেবারে অস্বাভাবিক করিয়া ফেলিয়াছেন। যাহা হউক আমরা সম্বন্ধনির্ণয়ের ঐতিহাসিক সত্যের উপর বড় নির্ভর করিতে চাই না। উপরি উক্ত বিষয়ের সার গ্রহণ করিলে এইমাত্র জানা যায় যে সম্বন্ধনির্ণয়ের আন্তরিক বিশ্বাস কুলশাস্ত্রজ্ঞ উদয়ন ও কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা উদয়ন অভিন্ন ব্যক্তি কিন্তু তিনি কুলশাস্ত্রজ্ঞ উদয়নের একটী সময় নির্দ্দেশের কোন প্রমাণ না পাইয়া সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারেন নাই।

ক্রমশঃ

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র।

ইঙ্গ-বঙ্গদের ভাল কোরে চিন্‌তে গেলে তাঁদের তিন রকম অবস্থায় দেখতে হয়। তাঁরা ইংরাজদের সুমুখে কি রকম ব্যবহার করেন, বাঙ্গালীদের সুমুখে কি রকম ব্যবহার করেন ও তাঁদের স্বজাত ইঙ্গ-বঙ্গদের সুমুখে কি রকম ব্যবহার করেন। তাঁদের জিজ্ঞাসা কোর্‌লে তাঁরা বোল্‌বেন, "আমরা তিন জায়গায় সমান ব্যবহার করি, কেননা আমাদের একটা "principle" আছে।" কিন্তু সেটা একটা কথার কথা মাত্র, আমি সে কথা বড় বিশ্বাস করি নে।

২৩ "সম্বন্ধ নির্ণয়" পরিশিষ্টের ১০ পৃষ্ঠা

একটি ইঙ্গ-বঙ্গকে এক জন ইংরেজের সুমুখে দেখ, তাঁকে দেখ্‌লে তোমার চক্ষু জুড়িয়ে যাবে। কেমন নম্র ও বিনীত ভাব! ভদ্রতার ভারে প্রতিকথায় ঘাড় নুয়ে নুয়ে পোড়্‌ছে। মৃদু ধীর স্বরে কথাগুলি বেরোচ্চে; তর্ক কর্‌বার সময় অতিশয় সাবধানে নরম কোরে প্রতিবাদ করেন ও প্রতিবাদ কোর্‌তে হোলো বোলে অপর্য্যাপ্ত দুঃখ প্রকাশ করেন, অসংখ্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাঁর অজস্র ভদ্রতা দেখে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সন্তুষ্ট মনে প্রার্থনা কোর্ত্তে থাকেন যে, তিনি যেন জন্ম জন্ম এই রকম প্রতিবাদ করেন। কথা কোন্‌ আর না কোন্‌, এক জন ইংরেজের কাছে এক জন ইঙ্গ-বঙ্গ চুপ কোরে বোসে থাক্‌লেও তাঁর প্রতি অঙ্গভঙ্গী, প্রতি মুখের ভাবে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ হোতে থাকে কিন্তু তাঁকেই আবার তাঁর স্বজাতিমণ্ডলে দেখ, দেখ্‌বে, তিনিই এক জন মহা তেরিয়া-মেজাজের লোক। বিলেতে যিনি তিন বৎসর আছেন, এক বৎসরের বিলেত-বাসীর কাছে তাঁর অত্যন্ত পায়া-ভারি! এই "তিন বৎসর" ও "এক বৎসরের" মধ্যে যদি কখনো তর্ক ওঠে, তা' হোলে তুমি "তিন বৎসরে"র প্রতাপটা একবার দেখ্‌তে পাও। তিনি প্রতি কথা এমন ভাবে, এমন স্বরে বলেন যে, যেন সেই কথাগুলি নিয়ে সরস্বতীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ বোঝা-পড়া হোয়ে একটা স্থির-সিদ্ধান্ত হোয়ে গেছে। যিনি প্রতিবাদ কোর্‌চেন, তাঁকে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেন "ভ্রান্ত," কখনো বা মুখের ওপর বলেন, "মূর্খ"! তাঁর ভদ্রতা একটি গণ্ডীর মধ্যে বাস করে, তার বাইরে প্রায় পদার্পণ করে না। ব্যক্তি বিশেষের জন্যে তিনি তাঁর ভদ্রতার বিশেষ বিশেষ মাত্রা স্থির কোরে রেখেছেন। ইংলণ্ডে যারা জন্মেছে, তাদের জন্যে বড় চামচের এক চামচ, ইংলণ্ডে যারা পাঁচ বৎসর আছে, তাদের জন্যে মাজারী চামচের এক চামচ, ইংলণ্ডে যারা সম্প্রতি এয়েছে, তাদের জন্যে চায়ের চামচের এক চামচ ও ইংলণ্ডে যারা মূলে যায় নি, তাদের জন্যে ফোঁটা দুই তিন ব্যবস্থা! ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কের ন্যূনাধিক্য নিয়ে তাঁদের ভদ্রতার মাত্রার ন্যূনাধিক্য হয়। তাঁদের মাপাজোকা ভদ্রতায় পায়ে গড় করি, তাঁদের "Principle"-এর পায়ে গড় করি!

বিলেতে এলে লোকে "Principle" "Principle" কোরে মহা কোলাহল কোর্ত্তে থাকে, কিন্তু আমি ও-রকম বাক্যের আড়ম্বর সইতে পারিনে। আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা কোর্ত্তে চাই, "বাস্তবিক কি তোমরা একটা স্থির মত বেঁধেছ? আর সে মতগুলি বাঁধ্‌বার আগে কেন যে সে গুলি গ্রহণ কোর্‌লে তা' কি বিচার কোরে দেখেছ?" তাঁরা সকলেই বোলে উঠ্‌বেন "হাঁ;" কিন্তু আমি হলপ্‌ কোরে বোল্‌তে পারি, তাঁদের মধ্যে শতকরা নিরেনব্বুই জন তা' করেন নি! ইংরেজরা তাঁদের যদি বলে যে, কাকে তাঁদের কান উড়িয়ে নিয়ে গেছে, তা' হোলে কানে হাত না দিয়ে তাঁরা কাকের পশ্চাতে পশ্চাতে ছোটেন। সে

দিন এক জন গল্প কোরছিলেন, যে তাঁকে আর এক জন বাঙ্গালী জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন যে, "মশায়ের কি কাজ করা হয় ?" এই গল্প শুনবামাত্র আমাদের এক জন ইঙ্গ-বঙ্গ বন্ধু নিদারুণ ঘৃণার সঙ্গে বোলে উঠ্‌লেন, "দেখুন্ দেখি, কি Barbarous!" আমি আর থাক্‌তে পার্‌লেম না, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কোরলেম, "কেন Barbarous বুঝিয়ে দিন ত মশায়!" তিনি কোন মতে বোঝাতে পার্‌লেন না, তাঁর ভাবটা এই যে, যেমন মিথ্যে কথা না বলা, চুরী না করা নীতি-শাস্ত্রের কতকগুলি মূল নিয়ম, তেমনি অন্য মানুষকে তার জীবিকার কথা জিজ্ঞাসা না করাও একটা মূল নিয়মের মধ্যে, তার জন্যে অন্য কারণ অনুসন্ধানের আবশ্যক করে না! আমি তাঁকে বল্লেম যে, "দেখুন মশায়, ইংরেজরা একটা জিনিষ মন্দ বলে বোলে আপনি অবিচারে অকাতরে সেটাকে মন্দ বোল্‌বেন না। কেন ইংরেজরা মন্দ বোল্‌চে, সেটা আগে বিচার কোরে দেখ্‌বেন, তার পরে যদি যুক্তি-সিদ্ধ মনে হয়, তা হোলে না হয় মন্দ বোল্‌বেন। চাক্‌রীর কথা জিজ্ঞাসা করা ইংরাজেরা যে, কেন মন্দ বলে তার অবিশ্যি, কারণ আছে; অল্প বেতনে আপনি হয়ত অতি সামান্য চাকরী কোরচেন, আপনাকে চাকরীর কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌লে আপনার হয়ত উত্তর দিতে সঙ্কোচ বোধ হতে পারে। কিন্তু আপনি যখন barbarous বোলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন তখন এ সকল কারণ আপনি বিবেচনা করেন নি।" এর থেকে বেশ বুঝতে পারবে যে, যে ইঙ্গবঙ্গগণ আমাদের দেশীয়-সমাজে নানা প্রকার কুসংস্কার আছে বোলে নাসা কুঞ্চিত করেন, বিলেতে থেকে তাঁরা তাঁদের কোটের ও প্যান্টলুনের পকেট্ পুরে রাশি রাশি কুসংস্কার নিয়ে যান। কুসংস্কার আর কাকে বলে বল? যতক্ষণে তুমি তোমার বিশেষ সংস্কারের একটা সন্তোষজনক কারণ দেখাতে না পার, ততক্ষণ আমি তাকে কুসংস্কার বোল্‌ব। অতএব হে ইঙ্গ-বঙ্গ, তুমি ভারতবর্ষের প্রতি সামাজিক আচার ব্যবহারকে যে Prejudice বোলে ঘৃণা কর, সেই ঘৃণা করাটাই হয়ত এক প্রকার Prejudice। তুমি হয়ত জাননা যে তুমি কেন ঘৃণা কোরচ। তোমার হয়ত একটা দারুণ কুসংস্কার আছে, যে তুমি ব্যতীত তোমার স্বদেশ-জাত আর সমস্ত দ্রব্যই মন্দ। আমি এক এক সময় ভাবি, এক জন বুদ্ধিমান প্রাণীর মনে কি রকম কোরে এ রকম অন্ধ কুসংস্কার জন্মাতে পারে। সে দিন এক জায়গায় আমাদের দেশের শ্রাদ্ধের কথা হোচ্ছিল, বাপ-মার মৃত্যুর পর আমরা হবিষ্য করি, বেশ ভূষা করিনে ইত্যাদি শুনে একজন ইঙ্গবঙ্গ যুবক অধীর ভাবে আমাকে বোলে উঠলেন, যে, "আপনি অবিশ্যি মশায়, এ সকল অনুষ্ঠান ভাল বলেন না।" আমি বল্লেম "কেন নয়? মৃত আত্মীয়ের জন্যে শোক প্রকাশ করাতে আমিত কোন দোষ দেখিনে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে শোক প্রকাশ করবার ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম আছে। ইংরাজেরা কালো কাপোড় পোরে

শোক প্রকাশ করে বোলে শাদা কাপড় পোড়ে শোক প্রকাশ করা অসভ্যতার লক্ষণ মনে কোরো না; আমি দেখ্‌ছি ইংরেজরা যদি আত্মীয়ের মৃত্যু উপলক্ষে হবিষ্যান্ন খেত, আর আমাদের দেশের লোকেরা না খেত, তা হলে হবিষ্যান্ন খায় না বোলে আমাদের দেশের লোকের ওপর তোমার দ্বিগুণতর ঘৃণা হোত, ও মনে কোরতে, হবিষ্যান্ন খায় না বোলেই আমাদের দেশের এই দুর্দ্দশা, আর হবিষ্যান্ন খেতে আরম্ভ কোরলেই আমাদের দেশ উন্নতির চরম-শিখরে উঠ্‌তে পারবে।" এর চেয়ে কুসংস্কার আর কি হোতে পারে। ইঙ্গ-বঙ্গরা বলেন, দেশে গিয়ে দেশের লোককে সন্তুষ্ট করবার জন্যে দেশের কুসংস্কারের অনুবর্ত্তন করা ভীরুতা, শুদ্ধ তাই নয়, তাঁদের মহামান্য Principle-এর বিরুদ্ধাচরণ। এ কথা শুন্‌তে বেশ, কিন্তু এই মহাবীরদের একবার জিজ্ঞাসা কর, তাঁরা বিলেতে কি করেন। তাঁরা ঘাড় নত কোরে ইংরাজদের কুসংস্কারের অনুসরণ করেন কি না? তাঁরা জানেন সে গুলি কুসংস্কার, তবু জেনে শুনে সে গুলি পালন করেন কি না? তুমি হয়ত জান, ইংরাজেরা এক টেবিলে তেরজন খাওয়া অত্যন্ত অলক্ষণ মনে করেন, তাঁদের বিশ্বাস, তা হোলে এক বৎসরের মধ্যে তাঁদের এক জনের মৃত্যু হবেই। একজন ইঙ্গবঙ্গ যখন নিমন্ত্রণ করেন, তখন কোন মতে তেরজন নিমন্ত্রণ করেন না, জিজ্ঞাসা কোরলে বলেন, "আমি নিজে অবিশ্যি বিশ্বাস করিনে, কিন্তু যাঁদের নিমন্ত্রণ করি তাঁরা পাছে কষ্ট পান, তাই জন্যে বাধ্য হোয়ে এ নিয়ম পালন কোরতে হয়।" খুব উদার হৃদয় বটে! কিন্তু দেশে গিয়ে এই উদারতা কোথায় থাকে? তুমি হয়ত একটি সামান্য দেশাচার পালন কোরলে তোমার বাপ মা ভাই বোন তোমার সমস্ত দেশের লোক অত্যন্ত আহ্লাদিত হন, তখন কি তুমি তাঁদের সকলের মনে কষ্ট দিয়ে সেই দেশাচারের উপর তোমার বুট শুদ্ধ পদাঘাত কর না? এইরূপ পদাঘাত কোরতে পারলে বোলে কি সমস্ত বৎসরটা অত্যন্ত মনের আনন্দে থাক না? সে দিন একজন ইঙ্গ-বঙ্গ একটি বালককে রবিবার দিনে রাস্তায় খেলা কোরতে যেতে বারণ কোর্‌ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করাতে বোল্লেন, "রাস্তার লোকেরা কি মনে কোরবে?" রাস্তার লোকের কুসংস্কারের অনুবর্ত্তন কোরে তিনি যদি রবিবারে খেলা না করেন, তবে রাম-নবমীর দিনে তিনি দেশে গোমাংস ভক্ষণ করেন কেন?—Principle!!!

কুসংস্কার মানুষকে কতদূর অন্ধ কোরে তোলে, তা' বাঙ্গলায় অশিক্ষিত কুবীদের মধ্যে অনুসন্ধান করবার আবশ্যক করে না, ঘোরতর সভ্যতাভিমানী বিলিতি বাঙ্গালীদের মধ্যে তা দেখ্‌তে পাবে। হঠাৎ বিলেতের আলো লেগে তাঁদের চোক একেবারে অন্ধ হোয়ে যায়। কিন্তু বিলেতের কি দেখে তাঁরা এত মুগ্ধ হোয়ে পড়েন? আমি অনুসন্ধান কোরে দেখেছি, কেবল বাহ্য-চাকচিক্য! এ বিষয়ে তাঁরা

ঠিক বালকের মত! এক খানি বই দেখ্‌লে তাঁরা তার সোনার জলের চিত্র-করা বাঁধানো মলাট দেখে হাঁ কোরে থাকেন, তার ভিতরে কি লেখা আছে, তার বড় খবর রাখেন না! কতকগুলি বাঙ্গালী বলেন, "এখানকার মত ঘর ভাড়া দেবার প্রথা তাঁরা আমাদের দেশে প্রচলিত কোরবেন!" তাঁদের সেই একটি মাত্র সাধ আছে! তাঁদের চোখে বিলেতের আর কিছু তেমন পড়ে নি, যেমন, বিলেতের ঘর ভাড়া দেবার প্রথা! আর এক জন বাঙ্গালী, তিনি আমাদের বাঙ্গলা সমাজ-সংস্কার কোর্‌তে চান, তাঁর প্রধান বাতিক, তিনি আমাদের দেশের মেয়েদের নাচ শেখ্‌বার বন্দোবস্ত কোরে দেবেন; বিলেতের সমাজে মেয়েদের পুরুষদের সঙ্গে একত্রে নাচাটাই তাঁর চোখে অত্যন্ত ভাল লেগেছে, ও আমাদের সমাজে মেয়েদের না নাচাই তাঁর প্রধান অভাব বোলে মনে হয়, তিনি এখানকার সমাজ-সমুদ্র মন্থন কোরে ঐ নাচ টুকুই পেয়েছেন! এই রকম বিলেতের কতকগুলি ছোট-খাটো বিষয়ই তাঁদের চোখে পড়ে, তাঁরা বিশেষ কি কি কারণে বিলেতের ওপর এত অনুরক্ত ও আমাদের দেশের ওপর এত বিরক্ত হোয়ে ওঠেন, তা' যদি দেখ্‌তে যাও ত, দেখ্‌বে, সে সকল অতি সামান্য আমি পূর্ব্বেই তা' সংক্ষেপে বোলেছি। প্রথমতঃ এখানকার সুসজ্জিত, পরিষ্কার, পরিপাটী, নিরিবিলি বাসস্থানে স্বাধীন ভাবে বাস কর্‌বার বন্দোবস্ত। দ্বিতীয়তঃ এখানকার মহিলাদের সঙ্গে মেশামেশি; তাদের মৃদু হাসি, মিষ্টালাপ, শিষ্টাচার এক জন বঙ্গ-যুবকের মাথা অতি শীঘ্র ঘুরিয়ে দেয়। তিনি আমাদের দেশের মেয়েদের সঙ্গে এখানকার মেয়েদের তুলনা কোর্‌তে থাকেন; দেখেন এখানকার মেয়েরা কেমন স্পষ্ট ও মিষ্ট কথা কয়, একটা কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌লে তার উত্তর পাবার জন্যে বছর পাঁচেক অপেক্ষা কোর্‌তে হয় না, তাদের মুখের উপরও যেমন ঘোমটার আবরণ নেই, তেমনি তাদের প্রতি আচার ব্যবহারের উপরে এক প্রকার কষ্টকর সঙ্কোচের আবরণ নেই। এই রকম কতকগুলি সাধারণ বিষয়ে আমাদের দেশের ও এদেশের মেয়েদের অমিল দেখে তার পরে তিনি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয় নিয়ে ছেলে মানুষের মত খুঁৎ খুঁৎ কোর্‌তে থাকেন। যে বালকের মাটির পুতুল আছে, সে আর একটি বালকের কাঠের পুতুল দেখে প্রথমতঃ তার নিজের কাঠের পুতুল নেই বোলে কাঁদ্‌তে বসে, এই রকমে তার নিজের পুতুলের ওপর যখন একবার বৈরাগ্য জন্মায়, তখন সেই কাঠের পুতুলের কানে একটা মাকড়ি দেখে তার খুঁৎখুঁৎ দ্বিগুণ বেড়ে ওঠে, তখন বিবেচনা করেনা যে, সেই কাঠের পুতুলের কানে যেমন একটা মাকড়ি আছে, তেমনি তার মাটির পুঁতুলের গলায় একটা হার আছে; তার মা এসে বলে, "আচ্ছা বাপু তোর পুতুলের হাতে একটা বালা পরিয়ে দিচ্ছি।" সে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে মাটিতে পা ছুঁড়্‌তে ছুঁড়্‌তে

চিৎকার কোরে বোলে ওঠে "না আমার মাকৃড়ি চাই!" তার মা বলে,"আচ্ছা বাপু, একটা মল দিচ্ছি না হয়!" সে দ্বিগুণ পা ছুঁড়ে বোলে ওঠে, "না, আমাকে মাকৃড়ি দে!" ইঙ্গ-বঙ্গেরা কতকটা এই রকম ক-রেন। এক জন ইঙ্গ-বঙ্গ মহা খুঁৎ খুঁৎ কোর্‌ছিলেন যে, আমাদের দেশের মেয়েরা পিয়ানো বাজাতে পারে না, ও এখানকার মত visitorদের সঙ্গে দেখা কোর্‌তে ও visit প্রত্যর্পণ কোরতে যায় না! হরি হরি! তুমি কি কোরে আশা কোরতে পার যে, আমাদের মেয়েরা পিয়ানো বাজাতে পার্ব্বে? তা'হোলে একজন বাঙ্গালী এখানে এসে খুঁৎ খুঁৎ কোরতে পারে যে এদেশের মেয়েরা পান সাজতে পারে না। দেশে থাকতে একবার শুনেছিলেম যে আমাদের দেশের মেয়েদের উপর একজন বাঙ্গালীর অভক্তি জন্মাবার একটা প্রধান কারণ হোচ্চে এই, যে, "ইংরাজের মেয়েরা এমন সরেশ নেবুর আচার তৈরি কোরতে পারে যে, তার ভিতরে বিচি থাকে না, কিন্তু আ-মাদের দেশের মেয়েরা ত তা পারে না!" এ গল্পটা আমার নিতান্ত জনশ্রুতি মনে হয় না। কেন না মানুষের স্বভাবই এই যে, সাধারণতঃ এক জনের ওপর চোটে গেলে তার পরে তার খুঁটিনাটি ধোরতে আরম্ভ করে। সে দিন একজন বাঙ্গালী এখানকার সঙ্গে তুলনা কোরে আমাদের দেশের ভোজের প্রথা যে নিতান্ত barbar-ous তাই প্রমাণ করবার জন্যে বোল্লেন যে আমাদের দেশে খাবার সময় মাছি ভ্যান্ ভ্যান্ করে। আর আমাদের দেশের লোকেরা যে, barbarous তাই প্রমাণ করবার জন্যে বল্লেন যে, সেখেনে জুতো খুলে খেলে জুতো চুরী কোরে নিয়ে যায়। জানিনে হয়ত তাঁর বিশ্বাস, যে, মাছি যদি বিলেতে আস্‌ত, ত এত সভ্য হোয়ে যেত যে, খাবার সময় আর ভ্যান্ ভ্যান্ কোরত না! আর তিনি হয়ত ভুলে গিয়েছিলেন, যে এদেশের লোকেরা জুতো খুলে খায় না। খুলে খেলে এখানে চুরি যেত কি না, সে বিষয়ে বলা ভারি শক্ত, অতএব সে বিষয়ে কোন প্রকার তুলনা উত্থাপন না করাই শ্রেয়! এই রকম ক্রমাগত প্রতি ছোট খাটো বিষয় নিয়ে এদেশের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা কোরে কোরে তাঁদের চটা ভাব চটনমান যন্ত্রে blood heat ছাড়িয়ে ওঠে! একজন ইঙ্গবঙ্গ তাঁর সহানুভাবক বন্ধুদের দ্বারা বেষ্টিত হোয়ে বোলছিলেন যে, যখন তিনি মনে করেন যে, দেশে ফিরে গেলে তাঁকে চারদিকে ঘিরে মেয়ে গুলো প্যান্ প্যান্ কোরে কাঁদতে আরম্ভ কোরবে, তখন আর তাঁর দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না! অর্থাৎ তিনি চান্, যে, তাঁকে দেখ্‌বা মাত্রেই, dear darling বোলে ছুটে এসে তাঁর স্ত্রী তাঁকে আলিঙ্গন ও চুম্বন কোরে তাঁর কাঁধে মাথা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে! এইটুকু অভিনয়ের ওপর তাঁর দেশে ফিরে যাওয়া না যাওয়া নির্ভর কোরচে। তিনি তাঁর বাড়ির লোকদের ভালবাসার তত মূল্য দেখেন না, যত তাদের ভালবাসা অভিনয়ের! তিনি

তাঁর স্বীয় পরিবারদের কত ভাল বাসেন, এর থেকে একবার বিবেচনা কোরে দেখ। তাঁদের একটি মাত্র আচারের পরিবর্ত্তন হোলে তিনি বাড়ি ফিরে যেতে পারেন না, না জানি সে কি পরিবর্ত্তন। সে পরিবর্ত্তনে হয়ত চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্তের বন্দোবস্ত এ-কেবারে উল্টে যেতে পারে, প্রকৃতির একটা মহা বিপ্লব বাধ্‌তে পারে! সে পরিবর্ত্তন কি? না, S. K. Nandi Esjr-এর স্ত্রী পরিবারেরা যদি তাঁকে দেখে আনন্দের অশ্রু বর্ষণ না কোরে ছুটে তাঁকে আলিঙ্গন কোর্ত্তে আসে!! আমি আগেই বোলেছি বিলেতের কতকগুলি বাহ্যিক ছোট খাটো বিষয় বাঙ্গালীর চোখে পড়ে। তাঁরা যখন সাহেব হোতে যান, তখন সাহেবদের ছোট খাটো আচার গুলি নকল কোর্ত্তে যান। ছোট খাটো বিষয়ে তাঁদের খুটিনাটি যদি দেখ, তবে একেবারে আশ্চর্য্য হোয়ে যাও। ডিনারের টেবিলে কাঁটা ছুরী উল্টে ধোরতে হবে, কি পাল্‌টে ধোরতে হবে, তাই জান্‌বার জন্যে তাঁদের প্রাণপণ যত্ন, অন্বে-ষণ ও "গবেষণা" দেখলে তোমার তাঁদের উপর ভক্তির উদয় হবে। কোটের কোন্ ছাঁটটা fashionable হোয়েছে, আজকাল nobilityরা আঁটি প্যান্টলুন্ পরেন কি ঢল্‌কো প্যান্টলুন্ পরেন, waltg নাচেন কি Polka নাচেন, মাছের পর মাংস খান কি মাংসের পর মাছ খান, সে বিষয়ে তাঁরা অভ্রান্ত খবর রাখেন। তুমি যদি দস্তানা পরবার সময় আগে থাকতে বুড়ো আঙ্গুল গলিয়ে দেও, তিনি তৎক্ষণাৎ বোলে দেবেন, ও রকম দস্তুর নয়। ঐ রকম ছোট খাটো বিষয়ে একজন বাঙ্গালী যত দস্তুর বেদস্তুর নিয়ে নাড়া চাড়া করেন, এমন একজন জন্‌বুল্ করেন না! তুমি যদি মাছ খাবার সময় ছুরী ব্যবহার করো * তবে একজন ইংরাজ তাতে বড় আশ্চর্য্য হবেন না, কেন না, তিনি জানেন তুমি বিদেশী, কিন্তু এক জন ইঙ্গ-বঙ্গ সেখানে উপস্থিত থাকলে তাঁর স্মেলিংসল্টের আবশ্যক কোর্‌বে। তুমি যদি শেরী খাবার গ্ল্যাশে শ্যাম্পেন খাও তবে একজন ইঙ্গবঙ্গ তোমার দিকে তিন দণ্ড হাঁ কোরে তাকিয়ে থাকবেন, যেন এমন জানোয়ার তিনি কখনো দেখেন নি; যেন, একটা অভূতপূর্ব্ব নিদারুণ বিপ্লব বেধে গেল; যেন, তো-মার এই একটি অজ্ঞতার জন্যে সমস্ত পৃথিবীর সুখ-শান্তি নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে! সন্ধে বেলায় তুমি যদি Morning coat পর, তা' হোলে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হোলে যাবজ্জীবন তোমাকে দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা দেন! এক জন বিলাত-ফেরতা কাউকে মটন দিয়ে রাই দিয়ে খেতে দেখ্‌লে * বোল্‌তেন "তবে কেন মাথা দিয়ে চল না?" তাঁর চক্ষে রাই দিয়ে মটন্ খাওয়াও যা,' আর মাথা দিয়ে হাঁটাও তাই! এই রকম সব ছোটখাটো বিষয়েই ইঙ্গ-বঙ্গদের যত যুক্তি। ছোট খাটো বিষয়ে

---

* ইংরাজরা মাছ খাবার সময় কেবল মাত্র কাঁটা ব্যবহার করেন।

* বিলাতী ঔদরিক-শাস্ত্রে রাই দিয়ে মটন্ খাওয়া নিষিদ্ধ।

এত খুঁটি নাটি কেন, যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তার একটা কারণ দেখাতে পারি। বাঙ্গালী হোয়ে সাহেবের মুখষ্ পোরতে গেলে প্রতি পদে ভয় হয়, পাছে বাঙ্গালীত্ব বেরিয়ে পড়ে; সুতরাং প্রতি সামান্য বিষয়ে সাবধান হওয়া স্বাভাবিক। তোমার বুকটা ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কালো হোলেও হানি নেই, কেন না সে সব কাপড়ে ঢাকা থাকে, কিন্তু মুখটা এমন সাবধানে চুনকাম করা আবশ্যক যে, কোন জায়গায় কালো বেরিয়ে না থাকে। তুমি যদি সাহেব হোতে চাও, তবে সাহেবদের যত খানি বাইরে চর্ম্ম-চক্ষে দেখা যায়, তত খানি নকল কোরলেই যথেষ্ট। যে বাঙ্গালীরা বিলেতে আসেন নি, তাঁরা তোমার বাঁকানো ইংরিজি সুর, তোমার হ্যাট্ কোট্, ও তোমার উদগ্র-মূর্ত্তি দেখে তাক্ হোয়ে থাক্‌বেন। কিন্তু একটা মজা দেখেছি, ইঙ্গ-বঙ্গেরা পরস্পর আপনাদের চেনেন; তাঁরা দল-বহির্ভূত লোকদের কাছে যথেষ্ট আস্ফালন করেন বটে, কিন্তু তাঁদের পরস্পরের কাছে কিছু গোপন নেই, তাঁরা নিজে বেশ জানেন যে,

"কাকস্য পক্ষৌ যদি স্বর্ণযুক্তৌ,
মানিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য;
একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা,
তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ।"

সোনা দিয়ে বাঁধা হোক্ কাকটার ডানা,
মাণিক জড়ানো হোক্ তার পা দুখানা,
এক এক পক্ষে তার গজমুক্তা থাক্,
রাজ হংস নয় কভু তবুও সে কাক!

আমি আর একটি আশ্চর্য্য লক্ষ্য কোরে দেখেছি যে, বাঙ্গালীরা ইংরাজদের কাছে যত আপনাদের দেশের লোকের ও আচার ব্যবহারের নিন্দে করেন, এমন একজন ঘোর ভারতদ্বেষী অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান করেন না। তিনি নিজে ইচ্ছে কোরে কথা পাড়েন ও ভারতবর্ষের নানা প্রকার কুসংস্কার প্রভৃতি নিয়ে প্রাণ খুলে হাস্য পরিহাস করেন। তিনি গল্প করেন যে, আমাদের দেশে বল্লভাচার্য্যের দল বোলে এক প্রকার বৈষ্ণবের দল আছে, তাদের সমস্ত অনুষ্ঠান সবিস্তারে বর্ণনা কোর্ত্তে থাকেন, তিনি বলেন, ভারতবর্ষীয়েরা অত্যন্ত অসভ্য ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন; তিনি ভারতবর্ষীয়দের "নেটিব নেটিব" কোরে সম্বোধন করেন, সভার লোকদের হাসাবার অভিপ্রায়ে নেটিব nautch girl রা কি রকম কোরে নাচে, অঙ্গভঙ্গী কোরে তার নকল করা হয় ও তাই দেখে সকলে হাস্‌লে পরম আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁরা যখন ভারতবর্ষীয়দের নিন্দে কোর্ত্তে থাকেন, তখন তাঁরা মনে মনে কল্পনা করেন তাঁরা নিজে "নেটিব" দলের বহির্ভূত। তিনি হয়ত মনে করেন, তাঁর শ্রোতারা অন্যান্য ভারতবর্ষীয়দের সঙ্গে তুলনা কোরে তাঁকে পচা পুকুরের পদ্ম, কাঁটাবনের গোলাপ বোলে মাথায় কোরে নেবে। তাঁর বিশ্বাস, তিনি যখন ভারতবর্ষীয়দের 'প্রেজুডিসের' উপর কটাক্ষপাত কোরে অপর্য্যাপ্ত হাস্যকৌতুক করেন, তখন সকলে তাঁকে অবিশিষ্য সে সকল 'প্রেজুডিস্' হোতে মুক্ত বোলে

গ্রহণ কোরবেন। তাঁর নিতান্ত ইচ্ছে, তাঁকে কেউ ভারতবর্ষীয় দলের মধ্যে গণ্য না করে। আমার মনে আছে, আমি দেশে থাক্‌তে একজন সুশিক্ষিত উড়িষ্যাবাসী আমার কাছে কথায় কথায় বোলেছিলেন যে "উড়ে মেড়ারা বড় মূর্খ!" শুনে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বোলে গিয়েছিল। আমার এক বন্ধু পূর্ব্বাঞ্চলে তাঁর জমীদারী দেখতে গিয়েছিলেন, একজন মুষলমান তাঁকে কথা-প্রসঙ্গে বোলেছিল "মশায়, নেড়েদের কখনো বিশ্বাস কোর্ব্বেন না!" এই উড়িষ্যাবাসীর মনোগত ভাব এই যে, "আমি মূর্খ নই।" আর এই মুষলমানটি জানাতে চান যে, তিনি বিশ্বাস-পাত্র। কেন না, নিজে মূর্খ হোলে এই উড়িষ্যাবাসী কখনো অন্যের মূর্খতা নিয়ে বিদ্রুপ কোর্ত্তেন না, আর এই মুষলমানটির যখন স্বজাতির অবিশ্বাসিতার ওপর এত ঘৃণা, তখন তিনি নিজে বিশ্বাসী না হোয়ে যান্ না! এই রকম দেখ্‌তে পাবে যে, সাহেব-সাজা বাঙ্গালীদের প্রতি-পদে ভয়, পাছে তাঁরা বাঙ্গালী বোলে ধরা পড়েন। এক জন বাঙ্গালী একবার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁর কৃষ্ণ চর্ম্ম দেখে আর এক জন ভারতবর্ষীয় এসে তাঁকে হিন্দুস্থানীতে দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করে, তিনি মহা খাপা হোয়ে তার কথার উত্তর না দিয়ে চোলে যান। কিন্তু এত রাগ কর্‌বার তাৎপর্য্য কি? তাঁর ইচ্ছে, তাঁকে দেখে কেউ মনে না কোর্‌তে পারে যে, তিনি হিন্দুস্থানী বোঝেন। আহা, যদি টেমসের জলে স্নান কোর্‌লে রংটা বদ্‌লাতো, তবে কি সুখেরই হোত! এক জন ইঙ্গ-বঙ্গ একটি "জাতীয়-সঙ্গীত" রামপ্রসাদী সুরে রচনা কোরেছেন; এই গানটার একটু অংশ পূর্ব্বে পত্রে লিখেছি, বাকি আর একটুকু মনে পড়েছে, এই জন্য আবার তার উল্লেখ কর্চ্চি। যদিও এটা কতকটা ঠাট্টার ভাবে লেখা হোয়েছে, কিন্তু আমার বোধ হয় এর ভিতরে অনেকটা সত্যি আছে। এ গীত যাঁর রচনা, তিনি রামপ্রসাদের মত শ্যামার উপাসক নন, তিনি গৌরীভক্ত। এই জন্যে গৌরীকে সম্বোধন কোরে বলছেন।

"মা; এবার মোলে সাহেব হব;
রাঙা চুলে হ্যাট্ বসিয়ে, পোড়া নেটিব
নাম ঘোচাব!
শাদা হাতে হাত দিয়ে মা, বাগানে বেড়াতে
যাব,
(আবার) কালো বদন দেখলে পরে "ডার্কি"
বোলে মুখ ফেরাব!"

আমি পূর্ব্বেই বিলেতের Land lady (বাড়িওয়ালী) শ্রেণীর কথা উল্লেখ কোরেছি। তারা বাড়ির লোকদের আবশ্যক মত সেবা করে। অনেক ভাড়াটে থাক্‌লে তারা চাকরাণী রাখে, এবং অনেক সময়ে তাদের আপনাদের মেয়ে বা অন্য আত্মীয়েরা তাদের সাহায্য করবার জন্যে থাকে। এই Land lady শ্রেণীরা আমাদের বিদেশী ইঙ্গ-বঙ্গদের প্রবাস-দুঃখ অনেক পরিমাণে দূর করে, অনেক ইঙ্গ-বঙ্গ সুন্দরী Land lady দেখে ঘর ভাড়া করেন। এতে তাঁদের সময় কাটাবার যথেষ্ট সুবিধে হয়।

বাড়িতে পদার্পণ কোরেই তাঁর ল্যাণ্ড্-লেডির যুবতী কন্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কোরে নেন, দু তিন দিনের মধ্যে তার একটি আদরের নাম-করণ করা হয়, সপ্তাহ অতীত হোলে তার নামে হয়ত একটা কবিতা রচনা কোরে তাকে উপহার দেন। কোন সন্ধ্যে বেলায় হয়ত রান্না ঘরে গিয়ে ল্যাণ্ড-লেডি, তার কন্যা, ও ঘরের দাসী-টিকে বিজ্ঞান, দর্শন ও মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে দুই একটা বাঁধা গত শোনাতে থাকেন, তারা তাঁর লম্বা-চৌড়া কথা গুলো হজম কোর্ত্তে না পেরে হাঁ কোরে ভাবে, ইনি এক জন কেষ্ট বিষ্ণু র মধ্যে হবেন। কিন্তু Kitchen অঞ্চলে তিনি তাঁর গম্ভীর পাণ্ডিত্যের জন্যে তত বিখ্যাত নন; তাঁর নিজের বাড়ির ও পাশাপাশি দুয়েকটি বাড়ির দাসী শ্রেণীর মধ্যে তাঁর রসিকতার অত্যন্ত নাম-ডাক শোনা যায়। এই রকম জন শ্রুতি যে, সে দিন সন্ধ্যে বেলায় সিঁড়ির কাছে তিনি বাড়ির Kitchen maid Pollyর দাড়ি ধোরে এমন একটি ঠাট্টা কোরে-ছিলেন যে, সে হাস্‌তে হাস্‌তে ছুটে পা-লিয়ে যায়। সে দিন Land ladyর মেয়ে তাঁকে এক পেয়ালা চা এনে জিজ্ঞাসা করে-ছিল যে, চায়ে কি চিনি দিতে হবে? তিনি হেসে বোল্লেন, "না নেলি, তুমি যখন ছুঁয়ে দিয়েছ, তখন আর চিনি দেবার আবশ্যক দেখছি নে!" তুমি হয়ত এত কথা বি-শ্বাস কর্‌চ না; কিন্তু আমি যথার্থ কোরে বোল্‌ছি এর একটি কথাও বাড়ানো নয়। ইঙ্গ-বঙ্গগণ বিলেতের এই দাসি-শ্রেণীদের বিমল-সংসর্গে দিন দিন উন্নতি লাভ কোর্ত্তে থাকেন। আচ্ছা, মেয়েদের সঙ্গে যদি মিশতে চাও, তবে ভদ্রলোকের মেয়েদের সঙ্গে মেশ না কেন? কিন্তু কতকগুলি কারণ আছে, যে জন্যে ভদ্রলোকের মেয়ে-দের সঙ্গে তত মেশা হয় না। বাঙ্গালী-দের উদ্যমের অভাব ও আলস্য বিলেতে এসেও ভাল কোরে ঘোচে না। তারা যে, ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে শ্রম স্বীকার কোরে এক জনের বাড়ি গিয়ে দেখা কোরে দুদণ্ড কথা কোয়ে আস্‌বে তা' বড় হোয়ে ওঠে না। তার পরে আবার অনেক পড়া শুনো কোরে দেখা শুনো কোর্ত্তে যাবার বড় সময় পেয়ে ওঠেন না। তা' ছাড়া আমি দেখেছি, এক জন ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে ভদ্র স্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা, ও তাদের সঙ্গে নানা সামাজিক ভদ্র-তার নিয়ম পালন কোরে চলা অনেক বাঙ্গালীর পুষিয়ে ওঠে না; অনেকের দে-খেছি, এক জন ভদ্র স্ত্রীর কাছে সঙ্কোচে মুখ ফোটে না, কিন্তু এক জন নীচ-শ্রেণীর মেয়ের কাছে তার অনর্গল কথা ফুটতে থাকে। কিন্তু সকলের চেয়ে প্র-ধান কারণ এই যে, ভদ্র লোকের স্ত্রীদের সঙ্গে তাঁরা তেমন মনের মত স্বাধীন ব্যব-হার কোর্ত্তে পারেন না, ওরকম নিরামিষ মেশামেশি তাঁদের বড় মনঃপূত নয়। দাসীদের সঙ্গে তাঁরা বেশ অসঙ্কোচে অভদ্রতাচরণ কোর্ত্তে পারেন। আসল কথা কি জান? শাদা চামড়ার গুণে তাঁরা দাসীদের যথেষ্ট নীচ শ্রেণীর লোক বোলে

কল্পনা কোর্ত্তে পারেন না; এক জন বিবি দাসীকে তাঁরা ঠিক দাসী বোলে মনে কোর্ত্তে পারেন না। একটা শাড়ি পরা, ঝাঁটাহস্ত কালো মুখ দেখলে তবে তাঁদের দাসীর ভাব ঠিক মনে আসে। আমি জানি, এক জন ইঙ্গ-বঙ্গ তাঁর বাড়ির দাসীদের মেঝদিদি সেজদিদি বোলে ডাকতেন; শুনলে কি গা জ্বোলে ওঠে না? তাঁর বাড়িতে হয়ত তাঁর নিজের মেজদিদি সেজদিদি আছেন; যখন কতকগুলো নীচ শ্রেণীর দাসীকে সেই নামে ডাকচেন, তখন হয়ত তাঁর বিকৃত মনে একটু লজ্জা, একটু কষ্ট, একটু সঙ্কোচও উপস্থিত হচ্চে না। হা দুর্ভাগ্য! ছেলেবেলা থেকে যাঁদের দেখে আস্‌ছি, যাঁদের ভাল বাসা পেয়ে আস্‌চি, বিলেতে এমন কি জিনিষ থাকতে পারে যা' দেখে তাঁদের ভুলে যাব, তাঁদের ওপর থেকে ভালবাসা চোলে যাবে, শুদ্ধ তাই নয় তাঁদের ওপর ঘৃণা জন্মাবে। এই কতকগুলি নীচ শ্রেণীর দাসী, কতকগুলি হীন-স্বভাব ল্যাণ্ড-লেডির সঙ্গে বৎসর দুয়ের হীন আমোদে কাটিয়ে যদি তুমি তোমার স্ত্রীর ভালবাসা, তোমার বোনের স্নেহ ভুলে যেতে পার, কত বৎসরের স্মৃতি মুছে ফেলতে পার, বাড়ির সমস্ত টান ছিঁড়ে ফেলতে পার, তবে তুমি কি না কোরতে পার বল দেখি?

আমি এক জনকে জানি, তিনি তাঁর "মেজদিদি, সেজদিদি,"-বর্গকে এত মান্য কোরে চোল্‌তেন যে, তাঁর কৃষ্ণবর্ণ গুরু জনকে তার আর্দ্ধেক মান্য কোরলে, তাঁরা তাঁকে কুলের প্রদীপ ছেলে বোলে মাথায় কোরে রাখ্‌তেন। তাঁর ঘরে বা তাঁর পাশের ঘরে যদি এই দাসীদের মধ্যে কেউ উপস্থিত থাক্‌ত, তাহোলে তিনি সসম্ভ্রম সঙ্কোচে শশব্যস্ত হোয়ে পোড়্‌তেন। সে রকম অবস্থায় যদি তাঁর কোন ইঙ্গ-বঙ্গ বন্ধু গান কোরতেন বা হাস্য পরিহাস কোরতেন তা' হোলে তিনি অমনি মহা অপ্রতিভ হোয়ে বোলে উঠ্‌তেন, "আরে চুপ কর, চুপ কর, মিস্ এমিলি কি মনে কোর্ব্বেন?" বিলেতে এসে এঁরা এই রকম কতকগুলি নীচ শ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে মিশে বিবিদের সঙ্গে আলাপ কোরচি মনে কোরে মহা পরিতোষ লাভ করেন। আমার মনে আছে, দেশে থাক্‌তে একবার এক ব্যক্তি বিলেত থেকে ফিরে গেলে পর, আমরা তাঁকে খাওয়াই, খাবার সময় তিনি নিশ্বাস ত্যাগ কোরে বোল্লেন, "এই আমি প্রথম খাচ্চি, যে দিন আমার খাবার টেবিলে কোন লেডি নেই।" শুনে আমি একটু আশ্চর্য্য হোয়ে গিয়েছিলেম, আমি জান্‌তেম যে, কোন ভদ্র বিবি একজন অস্ত্রীক পুরুষের বাড়িতে দেখা কোরতে বা খেতে আসেন না। তবে এ ব্যক্তি বলে কি? এ বিলেতে যত দিন ছিল, নিমন্ত্রণ খেয়ে কাটিয়েছিল না কি? যা হোক্, তখন মনে কোরেছিলেম এ ব্যক্তি বিলেত থেকে আস্‌চে, অবিশ্যি সেখেনে এমন কিছু দস্তুর আছে, যা' আমি ঠিক জানিনে। ওমা, এখেনে এসে সব বুঝতে পারচি, ব্যাপার

খানা কি? এই সমস্ত ল্যাণ্ডলেডিবর্গের সঙ্গে প্রত্যহ আহার করা হোত, আর দেশে গিয়ে নিরীহ বঙ্গ-বাসীদের নিকট "প্রত্যহ বিবিদের সঙ্গে খেয়েছি" বোলে জাঁক করা হত। এক জন ইঙ্গ-বঙ্গ একবার তাঁর কতকগুলি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ কোরেছিলেন, খাবার টেবিলে কতকগুলি ল্যাণ্ডলেডি ও দাসী উপবিষ্ট ছিল, তাদের এক জনের ময়লা কাপড় দেখে নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা তাকে কাপড় বোদলে আস্‌তে অনুরোধ কোরেছিলেন, শুনে সে বোল্লে, "যাকে ভালবাসা যায়, তাকে ময়লা কাপড়েও ভালবাসা যায়!" যে দাসী এ রকম কোরে উত্তর দিতে পারে তা'কে কতদূর স্পর্দ্ধা দেওয়া হোয়েছে মনে কোরে দেখ। এ সকল দেখে এখানকার ইংরাজদের আমাদের বাঙ্গালীদের উপরে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সে দিন মিশেস্ উড্রো (পূজনীয় মৃত উড্রো সাহেবের বিধবা পত্নী) আমাকে বোলছিলেন, "শোনা যায়, এখানকার বাঙ্গালীরা অত্যন্ত ছোট লোকদের সঙ্গে মেশে ও একত্র খায়। একবার মনে কোরে দেখ দেখি, কতকগুলো বেহারা ও দরোয়ানের সঙ্গে তোমরা একাসনে বোসে খাচ্ছ, সে কি বিশ্রী দেখায়!" শুনে লজ্জায় আমার শির একেবারে নত হোয়ে গেল! হে ইঙ্গ-বঙ্গ, যদি ইংরাজদের মুখ থেকে এ বিষয়ে উপদেশ না শুনলে তোমাদের চৈতন্য না জন্মায়, তবে Thackeray এ বিষয়ে কি বলেন শোন।

"It may safely be asserted that the persons who joke with servants or barmaids at lodgings are not men of a high intellectual or moral capacity. To chuck a still-room maid under the chin, or to send Molly the cook grinning, are not, to say the lest of them, dignified act of any gentleman."

অতএব যাঁরা ভদ্র-সমাজে মিশতে চান ও ভদ্র বোলে আত্মপরিচয় দিতে চান, তাঁরা যেন কতকগুলো রাঁধুনি ঘর-ঝাঁটুনী দাসীদের সঙ্গে অযোগ্য ঘনিষ্ঠতা না করেন। বিলেতের Kitchen রাজ্যে যাঁরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কোরছেন, তাঁরা যেন দেশে গিয়ে না বলেন যে, বিলেত থেকে শিক্ষা পেয়ে এলেম। এইরূপ নীচ শ্রেণীর মেয়েদের উপরে ভালবাসা দেখিয়ে রুটি ও কয়লাওয়ালা যুবক বেচারীদের মনে ঈর্ষা জন্মিয়ে কষ্ট দেওয়া কি সদয়-হৃদয় ভদ্রলোকের কাজ? শোনা যায়, এখেনে যখন অল্প স্বল্প বাঙ্গালীর আমদানি ছিল, তখন এখানকার সমাজে তাঁ'দের অত্যন্ত মান ছিল। অনেক ভদ্রলোক আলাপ না থাকলেও তাঁ'দের নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠিয়ে দিতেন। এখানকার অনেক Lord ও Dukeগণ তাঁদের সাক্ষাৎ-সমাগমে আহ্বান কোর্ত্তেন। এখানকার ধনীলোকদের নিমন্ত্রণ-সভায় তাঁদের সমাদরের সীমা ছিল না। কিন্তু এখন সে সব নেই। এখন তুমি বিলেতে এলে তোমার ভাড়া-করা ক্ষুদ্র ঘরটিতে দিন-রাত বোসে

থাক, ডাক্তারি ও আইনের কেতাবের লম্বা লম্বা পরিচ্ছেদগুলো গলাধঃকরণ কর, Polly, Molly ও Nelly বর্গের সঙ্গে রসিকতার আদান প্রদান কর ও রাত্রি আড়াইটার পর বিছানায় গিয়ে নিদ্রা দাও। যদি তুমি স্বভাবত মিশুক্ লোক হও, তবে জোগাড় জাগাড় কোরে দুচারটে পরিবারের সঙ্গে কোন উপায়ে আলাপ কোরে নেও, কিন্তু পূর্ব্বকার মত সে রকম সমাদর আর নাই, ও ক্রমে ক্রমে হয়ত এমন দিন আস্তে পারে, যে দিন ভারতবর্ষের ইংরাজদের মত এখানকার ইংরাজেরাও আমাদের ঘৃণার চক্ষে দেখবেন, কিন্তু যদি সে দিন আসে,তবে ইংরাজদের দোষ দিও না। অনেক ভারতবর্ষীয় এখেনে এসে যে রকম অন্যায় ব্যবহার কোরে গেছেন, তা' আমি লিখ্‌তে চাইনে। ভারতবর্ষীয়দের সংখ্যা এখানে অত্যন্ত অল্প বোলে সে সকল কথা অধিক লোকের কানে ওঠে না; কিন্তু যখন ক্রমেই ভারতবর্ষ থেকে এখেনে যুবকদের যাতায়াত বৃদ্ধি পেতে লাগ্‌ল, যখন ক্রমেই তাঁদের দল পুষ্ট হোতে চোল্‌ল, তখন তাঁদের গুণাগুণ প্রকাশ হবার সম্ভাবনা বাড়তে লাগ্‌ল। এখন যেন তাঁরা মনে করেন যে তাঁরা যে সকল অন্যায়াচরণ কোর্ব্বেন তা'তে যে, কেবল মাত্র তাঁদের যশোহানি হবে তা' নয়, তাঁরা তাঁদের স্বদেশ ও স্বজাতির ওপরে কলঙ্ক আনয়ন কোরবেন।

এইবার ইঙ্গ-বঙ্গদের একটি অতি সাধারণ ও বিশেষ গুণ তোমাকে বলছি। এখানে যাঁরা যাঁরা আসেন, প্রায় কেউ কবুল করেন না, যে, তাঁরা বিবাহিত। যুবতী কুমারী-সমাজে বিবাহিতদের দাম অত্যন্ত অল্প। অবিবাহিত না হোলে কোন যুবতীর উপরে তুমি ভালবাসা দেখাতে পার না, সুতরাং বিলাতের অর্দ্ধেক আমোদ ভোগ কোর্ত্তে পার না। অবিবাহিত বোলে পরিচয় দিলে এখানকার অবিবাহিতদের সঙ্গে মিশে অনেক যথেচ্ছাচার করা যায়, কিন্তু বিবাহিত বোলে জান্‌লে তোমার অবিবাহিত সঙ্গীরা তোমাকে ও-রকম অনিয়ম কোরতে দেয় না; সুতরাং অবিবাহিত বোলে পরিচয় দিলে অনেক লাভ আছে। অনেকে, শুনেছি,ব্রাহ্মণ না হোলেও এখানে ব্রাহ্মণ বোলে আত্মপরিচয় দেন, কিন্তু এ মিথ্যা-ব্যবহারের একটা ভাল কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

যা' হোক্; এই সকল ত ইঙ্গ-বঙ্গদের আচরণ। অনেক ইঙ্গ-বঙ্গ দেখ্‌তে পাবে তাঁরা হয় ত আমার এই বর্ণনার বহির্গত। কিন্তু সাধারণতঃ ইঙ্গ-বঙ্গের লক্ষণগুলি আমি যত দূর জানি, তা' লিখেছি। আমার নিতান্ত ইচ্ছা, ভবিষ্যতে যে সকল বাঙ্গালীরা বিলেতে আস্‌বেন, তাঁরা যেন আমার এই পত্রটি পাঠ করেন। বাঙ্গালীদের নামে যথেষ্ট কলঙ্ক আছে, কিন্তু তাঁরা যেন সে কলঙ্ক আর না বাড়ান, তাঁরা যেন সে কলঙ্ক এ সাত-সমুদ্র পারে আর রাষ্ট্র না করেন। জোন্মে অবধি শত শত নিন্দা, গ্লানি, অপমান নতশিরে সহ্য কোরে আস্‌চি, এই দূর-দেশে এসে একটু মাথা তো-

লবার অবকাশ পাওয়া যায়, এখানকার লোকেরা আমাদের অনেকটা সমান ভাবে ব্যবহার করে বোলেই আমাদের পদাঘাত-জর্জ্জরিত-মন একটু বল পেয়ে আত্মনির্ভর স্বাধীনতা-প্রিয়তা প্রভৃতি অনেক গুলি পৌরুষিক গুণ শিক্ষা করবার সুবিধে পায়; কিন্তু এখানেও দলে দলে এসে তোমরা যদি হীন ও নীচ ব্যবহার কোরতে আরম্ভ কর, এখানকার লোকের মনেও বাঙ্গালীদের ওপর ঘৃণা জন্মিয়ে দেও, তা' হোলে এখেনেও তোমাদের কপালে সেই উপেক্ষা, সেই নিদারুণ ঘৃণা আছে। যে পথে যাবে, বাঙ্গালী বোলে তোমাদের দিকে সকলে আঙ্গুল বাড়াবে, যে সভায় যাবে, সভাস্থ লোকেরা তোমাদের দিকে তাচ্ছিল্যের ভ্রূ-কুঞ্চিত-কটাক্ষ বর্ষণ কোরবে। বিলেতের কুহক গুলি আগে থাকতে তোমাদের চক্ষে ধোরলেম, যখন বিলেতে আসবে, তখন সাবধানে পদ-ক্ষেপ কোরো। ইঙ্গ-বঙ্গদের দোষ গুলিই আমি বিস্তৃত কোরে বর্ণনা কোরলেম, কেন না লোকে গুণের চেয়ে দোষ গুলিই অতি শীঘ্র ও সহজে অনুকরণ করে।

যাহোক, বাঙ্গালীরা বিলাতের কামরূপে রূপান্তর ধারণ কোরে দেশে ফিরে চোল্লেন। এখন তাঁদের একটা ভয় হোচ্চে, পাছে বিলেতে আসবার আগে তাঁদের যে সকল বন্ধু ছিলেন, তাঁরা কাছে ঘেঁসে তাঁদের সঙ্গে আলাপ কোর্ত্তে আসেন। দেশে গিয়ে তাই তাঁদের বিশেষ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ কোরতে হয়। কারো বা অত্যন্ত ভাবনা হোচ্চে, দেশে গিয়ে কাকাকে কি কোরে প্রণাম কোরব? কারো বা তাঁর স্ত্রীর ঘোমটাচ্ছন্ন মুখ কল্পনায় এসে আপাদ-মস্তক জ্বোলতে আরম্ভ কোরেছে! যা' হোক, দেশেত পৌঁছলেন। তাঁর স্ত্রীকে যথাসাধ্য পালিশ ও বার্ণিষ কোরে "নেটিব" কাকেদের দল ছেড়ে ইংরেজ ময়ূরের দলে মিশতে চোল্লেন। আগে কে জানত বল যে, সেখানে গিয়ে অত ঠোকর খাবেন! ভারতীতে "ভারতবর্ষীয় ইংরাজ" বোলে প্রবন্ধের এক জায়গায় লেখা আছে;—

"আমরা বিলাতে যে, এই সকল চাকচিক্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই, তাহা আশ্চর্য্য নহে। এদেশে আমাদের চক্ষে এ সকল সচরাচর পতিত হয় না বলিয়া আমরা এক প্রকার সুস্থির থাকি; ইংলণ্ডে গিয়া ইংরাজ মহলে প্রবেশ করিয়া আমাদের মস্তক এমন ঘূর্ণিত হইয়া যায় যে, আপনাকে আপনারা স্থির রাখিতে পারি না। স্বদেশের প্রতি মমতা চলিয়া যায়, দেশীয়দিগের উপর অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া ঘৃণা জন্মে। যাহা ইংরাজী তাহাই সেব্য, যাহা দেশীয় তাহাই ত্যজ্য! হায়! ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের চক্ষু ফোটে, আমরা দেখিতে পাই, এ জাদুর রাজ্য আমাদের নহে, আমরা যে ইংরাজের পদধূলি লইতে যাই, তাহাদের পদাঘাত পাইয়া অবশেষে আমাদের চৈতন্য হয়!"

ভারতবর্ষে গিয়ে ইঙ্গ-বঙ্গদের কি রকম অবস্থা হয় সে বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতাও

নেই, বক্তব্যও নেই। কিন্তু কিছু কাল ভারতবর্ষে থেকে তার পরে ইংলণ্ডে এলে কি রকম ভাব হয় তা' আমি অনেকের দেখেছি। তাঁদের ইংলণ্ড আর তেমন ভাল লাগে না; অনেক সময়ে তাঁরা ভেবে পান না, ইংলণ্ড বোদলেছে, কি তাঁরা বোদলেছেন! আগে ইংলণ্ডের অতি সামান্য সামান্য জিনিষ যা' কিছু ভাল লাগত এখন আর তা' ভাল লাগে না। এখন ইংলণ্ডের শীত ইংলণ্ডের বর্ষা তাঁদের ভাল লাগচে না, এখন তাঁরা ভারতবর্ষে ফিরে যেতে হোলে দুঃখিত হন না। তাঁরা বলেন, আগে তাঁদের ইংলণ্ডের straw-berry ফল অত্যন্ত ভাল লাগত, এমন কি, তাঁরা যত রকম ফল খেয়েছেন, তার মধ্যে straw-berryই তাঁদের সকলের চেয়ে স্বাদু মনে হোত। কিন্তু এই কয় বৎসরের মধ্যে straw-berryর স্বাদ বোদলে গেল না কি! এখন দেখছেন straw-berryর চেয়ে অসংখ্য দিশি ফল তাঁদের ভাল লাগে। আগে Down-shire-এর ক্ষীর তাঁদের এত ভাল লাগত যে, তার আর কথা নেই, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এখন দেখছেন আমাদের দেশের ক্ষীর তার চেয়ে ঢের ভাল লাগে। প্রথম বারে বিলেতের মুখ যে রকম দেখাচ্ছিল, এবারে ঠিক সে রকম দেখাচ্ছে না। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! কিন্তু এর ভিতরে আমি তত আশ্চর্য্য কিছু দেখছিনে। এ রকম হবার কতকগুলি কারণ আছে। প্রধান কারণ হোচ্চে, বিলেত থেকে গিয়ে বিলেত ফেরতেরা সম্পূর্ণ বিলিতি চালে চলেন তাঁদের গৃহসজ্জা বিলিতি রকমের, বিলিতি বস্ত্র পরিধান, দগ্ধ গোষ্পদ সেবা করেন, তাঁদের স্ত্রী পরিবারদের ইংরিজি ভাবের আচার ব্যবহার; সুতরাং বিলেতের বাহ্য চাকচিক্য চোখে সোয়ে গেলে এখেনে আর তেমন কিছু জিনিষ থাকে না, যা' দেখে তাঁদের ধাঁধাঁ লেগে যায়। তা' ছাড়া তাঁরা ভারতবর্ষে গিয়ে স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে সংসারী হোয়ে পড়েন, রোজগার কোর্ত্তে আরম্ভ করেন, ভারতবর্ষের মাটিতে তাঁদের শিকড় একরকম বোসে যায়। ভারতবর্ষীয়দের একটু বয়স হোলেই তাঁদের মন কেমন শিথিল হোয়ে যায়, তখন তাঁরা পায়ের ওপর পা দিয়ে টানা পাখার বাতাস খেয়ে কোন প্রকারে দিন কাটিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত থাকেন। বিলেতে আমোদ ও বিলাস ভোগ কোর্ত্তে গেলেও অনেক উদ্যমের আবশ্যক করে। এখানে এঘর থেকে ওঘরে যেতে হোলে গাড়ি ডাকে না, হাত পা নাড়তে চাড়তে দশটা চাকরের ওপর নির্ভর কোরলে চলে না; কেন না এখানে গাড়ি ভাড়া অত্যন্ত বেশী, আর চাকরের মাইনে মাসে সাড়ে তিনটাকা নয়। এখানে একটা থিয়েটার দেখতে যাও; সন্ধ্যে বেলা বৃষ্টি পোড়ছে, পথে কাদা, একটা ছাতা ঘাড়ে কোরে মাইল কতক ছুটোছুটি কোরে তবে ঠিক সময় পৌঁছতে পার্ব্বে, যখন রক্তের তেজ থাকে, তখন এ সকল পেরে ওঠা যায়। যখন ছোট্ট নৌকাটির মত হাল্কা থাকা যায়,

তখন পালে একটু বাতাস লাগ্‌লেই, জলে একটু তরঙ্গ উঠ্‌লেই টলমল্ কোরতে থাকা যায়, কিন্তু যখন স্ত্রী, পুত্র, কাজ, কর্ম্ম নিয়ে ভারগ্রস্ত হোয়ে পড়া যায়, তখন আর, একটি অবলার একটি দীর্ঘ নিশ্বাসে উল্টে পোড়তে হয় না, ও একটি অশ্রু জল-ধারায় নৌকা ডুবি হয় না।

আমার চিঠি ক্রমেই বেড়ে যাচ্চে। আমার স্কন্ধে যখন উপদেশ-দানেচ্ছা চাপে, তখন আমি ঝট কোরে কলম থামাতে পারিনে; কিন্তু আর এক অক্ষরও লিখ-চিনে, এই খানেই থামা যাক্। কিন্তু আর একটি কথা না বোলে থাকতে পারচিনে। দেশ থেকে—আমার কোন মান্য বন্ধু-শিখরিণীচ্ছন্দে একটা কবিতা পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেইটে তোমাকে না শুনিয়ে নিশ্চিন্ত হোতে পারচিনে। সেইটে শোনা শেষ হোলেই নিষ্কৃতি পাবে।

"বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য-গৌড়ে,
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ-বিহগ-প্রাণ দৌড়ে।
স্বদেশে কাঁদে সে, গুরুজন-বশে কিচ্ছু হয় না,
বিনা হ্যাট্‌টা কোট্‌টা ধুতি-পিরহনে মান রয় না।
পিতা মাতা ভ্রাতা নব-শিশু অনাথা ছুট্ কোরে,
বিরাজে জাহাজে মসি মলিন কোর্ত্তা বুট্ পোরে,
সিগারে উদ্গারে মুহু মুহু [illegible] ধূম লহরী,
সুখ-স্বপ্নে আপ্নে বড় চতুর মানে হরি হরি।
ফিমেলে ফীমেলে অনুনয় করে বাড়ি ফিরিতে,
কি তাহে, উৎসাহে মগন তিনি সাহেব গিরিতে।
বিহারে নীহারে বিবিজন সনে স্কেটিঙ করি,
বিষাদে প্রাসাদে দুখিজন রহে জীবন ধরি।
ফিরে এসে দেশে গল-কলর (collar) বেশে হটহটে,
গৃহে ঢোকে রোখে, উলগ-তনু দেখে বড় চটে।
মহা-আড়ী সাড়ী নিরখি, চুলদাড়ী সব ছিঁড়ে,
ছুটা লাথে ভাতে ছরকট করে আসন পিঁড়ে।

এ কবিতাটি যদি সংস্কৃত ছন্দে না পোড়তে পার, তাহোলে এর মস্তক ভক্ষণ করা হবে। অতএব, নিতান্ত অক্ষম হোলে বরঞ্চ একজন ভট্টাচার্য্যের কাছে পড়িয়ে-নিও, তা' যদি না পার, তবে এ কবিতাটি তুমি না হয় পোড় না। ইতি

প্রকৃতি এবং তাহার মূল-নিয়ম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভারতীর ৩ ভাগ ৫ সংখ্যা ১১২ পৃষ্ঠার পর।

এক্ষণে উন্নতি-সপ্তকের ধাপ-গুলি এক-একটি করিয়া আলোচনা করা যাউক। উহার সাতটি ধাপে পৃথক পৃথক সাতটি নিয়মের আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম ধাপে স্বাতন্ত্র্যের নিয়ম, দ্বিতীয় ধাপে দ্বন্দ্বের নিয়ম, তৃতীয় ধাপে আবৃত্তির নিয়ম, চতুর্থ ধাপে সঙ্গের নিয়ম, পঞ্চম ধাপে উৎকর্ষের নিয়ম, ষষ্ঠ ধাপে পরিণতির নিয়ম. সপ্তম ধাপে সংক্রান্তির (Transition) নিয়ম অধিষ্ঠান করে।

প্রথম, স্বাতন্ত্র্যের নিয়ম; স্বাতন্ত্র্য-সাধন ভিন্ন অস্তিত্ব-সাধনই হইতে পারে না; আপনাকে যদি অন্য-সমস্ত-হইতে ভিন্ন বলিয়া না জানা যায় তবে আপনার অস্তিত্বই ঠিক্ করিতে পারা যায় না; যে বস্তু অন্য কোন বস্তু হইতে কোন অংশে ভিন্ন নহে তাহার আবার অস্তিত্ব কিরূপ? যদি দুই বস্তু এমন হয় যে, একটি যেখানে আছে অন্যটিও ঠিক্ সেইখানে আছে—তাহার এক চুলও এদিক্ ওদিক্ নহে, অর্থাৎ শর্করা-মিশ্রিত জলের মধ্যে যেমন যেখানে জল সেই খানে শর্করা দুয়ের মধ্যে তেমনি যদি স্থানের নৈরন্তর্য্য হয়, এবং দুয়ের যদি অবিকল একই প্রকার গুণ হয়, তবে দুই বস্তুর মধ্য হইতে একটার অস্তিত্ব লোপ পাইয়া যায়,—জলেতে দ্রবীভূত শর্করার সমস্ত গুণ যদি ঠিক জলের মত হয় তবে মধ্য-হইতে শর্করার অস্তিত্বটুকু লোপ পাইয়া যায়; উপরের দৃষ্টান্তে জল এবং শর্করা বাস্তবিকই যে একই স্থানে স্থিতি করে তাহা নহে, জলের ছিদ্রে ছিদ্রে শর্করার পরমাণু স্থিতি করে, কিন্তু যদি মনে করা যায় উল্লিখিত শর্করা এবং জল অবিকল একই স্থানে স্থিতি করিতেছে, উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র স্থান-ভেদ নাই—গুণ-ভেদও নাই—কোন প্রকারেরই কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, তাহা হইলে যে জল সেই জলই থাকে—যতটুকু জল ততটুকু জলই থাকে, মধ্য হইতে শর্করার অস্তিত্বটি উড়িয়া যায়। অতএব কোন বস্তুর অস্তিত্ব সাধন করিতে হইলে—বস্তুর বস্তুত্ব সাধন করিতে হইলে—অন্য-সকল বস্তু-হইতে তাহার স্বাতন্ত্র্য-সাধন করা নিতান্ত আবশ্যক; স্বাতন্ত্র্য-সাধন ভিন্ন অস্তিত্ব-সাধনই হয় না—উন্নতি-সাধন কিরূপে হইবে।

আমাদের দেশের কোন কোন নব্য-সম্প্রদায় বাঙ্গালি-জাতিকে ঠিক্ ইংরাজের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে চা'ন, বাঙ্গালি জাতির স্বাতন্ত্র্য ধ্বংস করিতে চা'ন, জাতীয় অস্তিত্ব লোপ করিতে চা'ন, অথচ বলিতে

ছাড়েন না যে বাঙ্গালি-জাতির উন্নতিই তাঁহাদের একমাত্র অভীষ্ট। ইহাঁদের যুক্তি এই যে, বাঙ্গালিও মনুষ্য, ইংরাজও মনুষ্য, ইংরাজ বাঙ্গালির মধ্যে প্রভেদ করা অনুদারতার লক্ষণ; ইহাঁদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে, যে ব্যক্তি পক্ষপাত-বর্জ্জিত গোঁড়ামি-বর্জ্জিত সেই ব্যক্তিই উদার-শব্দের বাচ্য, এবং যাহাতে পক্ষপাতিত্ব অথবা গোঁড়ামি দেখা যায় তাহাকেই অনুদার বলা যুক্তি-সঙ্গত; অতএব যাঁহারা সাধারণের গোঁড়া তাঁহারা কোন্ যুক্তিতে আপনাদিগকে উদার বলিয়া স্থির করিতেছেন; শুদ্ধ কি কেবল বিশেষের গোঁড়াই গোঁড়া, সাধারণের গোঁড়া কি গোঁড়া নহে? —যাঁহারা বিশেষের গোঁড়া তাঁহারা স্পষ্টবক্তা, তাঁহারা বাক্‌জাল দ্বারা আপনাদের গোঁড়ামি ঢাকা দিয়া রাখেন না, কিন্তু যাঁহারা সাধারণের গোঁড়া তাঁহারা কথাবার্ত্তা ভাবভঙ্গী প্রভৃতি বিজ্ঞাপন-দ্বারা আপনাদিগকে উদার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত হন—কিন্তু সে তাঁহাদের ভুল। সাধারণের প্রতি দৃষ্টি রাখা যেমন কর্ত্তব্য, বিশেষের প্রতি দৃষ্টি রাখাও তেমনি কর্ত্তব্য। সকল মনুষ্যকে সমান দৃষ্টিতে দেখিবে—এ যেমন একটি কথা, প্রত্যেক মনুষ্যকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিবে এও তেমনি একটি কথা; যাঁহারা সাধারণের গোঁড়া তাঁহারা শেষোক্ত কথাটি একবার অমান্য করিয়া দেখুন তাহা হইলেই তাঁহাদের চৈতন্য হইবে,—তাঁহাদের বিষয়-সম্পত্তিকে সাধারণের বিষয় সম্পত্তি জ্ঞান করুন, তাঁহাদের গৃহকে সাধারণের পান্থশালা জ্ঞান করুন, তাঁহাদের শরীর-মনকে সাধারণের শরীর-মন জ্ঞান করুন, এবং তদনুসারে কার্য্য করুন, অর্থাৎ তাঁহার ধন সম্পত্তি যাহার ইচ্ছা হয় লউক, তাঁহার গৃহে যাহার ইচ্ছা হয় বাস করুক, তাঁহার শরীর মনকে যে যত খাটাইতে পারে খাটা'ক তাহাতে তিনি কোন বাধা দিবেন না—তবেই আমরা বলিব যে, পৃথিবীর মধ্যে সাধারণী যদি কেহ থাকে—ইনিই তিনি। মনুষ্যে মনুষ্যে বৈষম্য আছে—সাধারণীদিগের তাহা পদে পদে মানিয়া চলিতে হইতেছে—তবে যে তাঁহারা আত্ম-পরের মধ্যে স্বজাতি-বিজাতির মধ্যে স্বদেশ-বিদেশের মধ্যে বৈষম্য যত-কিছু সমস্তই একেবারে উড়াইয়া দেন, তাহাতে তাঁহাদের উদারতা প্রকাশ পায় না, ব্যাপকতাই প্রকাশ পায়। যাঁহারা প্রকৃত-পক্ষে উদার তাঁহারা সাধারণীও নহেন বিশেষীও নহেন—তাঁহারা যখন গৃহের কার্য্য করেন তখন গৃহের স্বতন্ত্র যে একটি মর্য্যাদা তাহার প্রতি দৃষ্টি করেন, যখন দেশের কার্য্য করেন তখন দেশের স্বতন্ত্র যে একটি মর্য্যাদা তাহার প্রতি দৃষ্টি করেন, যখন বিশুদ্ধ সত্যের আলোচনা করেন তখন গৃহ-নির্বিশেষ দেশ-নির্বিশেষ ব্যাপক সত্যের স্বতন্ত্র যে একটি মর্য্যাদা তাহার প্রতি দৃষ্টি করেন, এবং সেই ব্যাপক সত্যকে যখন দেশ-কাল-বিশেষে প্রয়োগ করেন তখন সত্যের ব্যাপকতা, দেশের দৈশিকতা, কালের কালিকতা তিনের কি

রূপে সামঞ্জস্য করিবেন তাহার প্রতি দৃষ্টি করেন—ইনি বিশেষের পক্ষ হইয়া সাধারণের বিরুদ্ধে যষ্টি-হস্ত হন না, সাধারণের পক্ষ হইয়াও বিশেষের বিরুদ্ধে ব্যাপকতা করিয়া বেড়ান না—ইনিই বাস্তবিক উদার নামের যোগ্য।

আপনারই হউক আর আপন জাতিরই হউক্ বিশেষত্ব সাধন করা, স্বাতন্ত্র্য সাধন করা, উন্নতির প্রথম সোপান। আপনাকে কিংবা স্বজাতিকে বিশেষ করিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিলে, তবেই অন্যের সঙ্গে আদান প্রদান চালাইবার যোগ্যতা জন্মে। ব্যক্তির যেমন দেখা গেল কার্য্যেরও অবিকল সেইরূপ গতি—রীতিমত কার্য্য করিতে হইলে সেই কার্য্যকে অন্যান্য কার্য্য হইতে বিশেষিত করিয়া তাহার প্রতি মনোনিবেশ করা সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক; একটা বিশেষ কার্য্য ধরা যাউক—যেমন বিদ্যাশিক্ষা;—যাঁহারা একেবারে সকল বিদ্যা শিক্ষা করিতে যা'ন তাঁহারা কোন বিদ্যাই শিখিতে পারেন না; বিদ্যার্থী ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে বিশেষ কোন একটি বিদ্যা যাহা তাঁহার পক্ষে সুসাধ্য তাহাই তিনি সর্ব্বাগ্রে অভ্যাস করেন, তাহা হইলে উত্তরবর্ত্তী আর একটি বিদ্যা যাহা পূর্ব্বে তাঁহার পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য ছিল তাহা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত হইবে, এমনি করিয়া সুসাধ্য হইতে ক্রমে ক্রমে দুঃসাধ্যে আরোহণ করিলে অত্যন্ত দুঃসাধ্য বিষয় সকলও কালক্রমে সুসাধ্য হইয়া উঠে; যাঁহারা আত্মচেষ্টায় মহোচ্চ পদ লাভ করেন তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় মাড়াইয়া উচ্চ উচ্চ বিষয়ে প্রবেশ করেন; মনুষ্যের উন্নতিই হউক, জ্ঞানের উন্নতিই হউক, আর কাজের উন্নতিই হউক্ বিশেষের প্রতি মনোযোগী হওয়া সর্ব্ব-প্রথমে আবশ্যক; জ্ঞানোন্নতির পক্ষে প্রথম আবশ্যক এই যে, একটি কোন বিদ্যাকে অন্যান্য বিদ্যা হইতে পৃথক্ করিয়া তাহার প্রতি মনোনিবেশ করা, আত্মোন্নতির পক্ষে প্রথম আবশ্যক এই যে, অন্য হইতে আপনার যথাসম্ভব স্বাতন্ত্র্য সাধন করা, দেশোন্নতির পক্ষে প্রথম আবশ্যক এই যে, অন্যান্য দেশ হইতে আপনার দেশের স্বাতন্ত্র্য সাধন করা ইত্যাদি।

ইহার পরে আসিতেছে দ্বন্দ্বের নিয়ম;—উপরে দেখা গেল যে, বিশেষের দিকে অধিক ঝোঁক দিলেই শুধু যে পক্ষপাতিতা হয় তাহা নহে, সাধারণের দিকে অধিক ঝোঁক দিলেও সেই দোষে দূষিত হইতে হয়; সাধারণ এবং বিশেষ দুয়ের মধ্যে সাম্য রক্ষা করিবার যে নিয়ম তাহাই দ্বন্দ্বের নিয়ম বলিয়া উক্ত হয়। শুদ্ধ কেবল সাধারণ তত্ত্ব জানিলে হয় না তাহাকে বিষয়-বিশেষে কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয় তাহা জানা চাই—নহিলে ন্যায়-বিচারে সামর্থ্য জন্মে না—ধর্ম্মবুদ্ধি খেলিতে পায় না। সাধারণ মনুষ্যের হিতসাধন করা কর্ত্তব্য ইহা আমি জানি কিন্তু স্বদেশের হিতসাধন করিতে হয় ইহা আমি জানি না—এরূপ জানা ব্যাপকতার পক্ষে সবি-

শেষ প্রয়োজনীয় হইতে পারে কিন্তু ধর্ম্ম-সাধনের পক্ষে কিছুমাত্র উপকারে আইসে না। এক দিকে সাধারণ, অপর দিকে বিশেষ দুইকে এক বন্ধনে ধরিয়া রাখাতেই ধর্ম্ম-নামের যাথার্থ্য হইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিশেষ এই একটি প্রভেদ দেখা যায় যে, সাধারণের প্রতি পুরুষেরা এবং বিশেষের প্রতি স্ত্রীরা স্বভাবতঃ উন্মুখ; পুরুষকে স্ত্রী—বিশেষের দিকে (অর্থাৎ জন-সাধারণ হইতে গৃহের দিকে) টানিয়া রাখে, স্ত্রীকে পুরুষ—সাধারণের দিকে (অর্থাৎ গার্হস্থ্য ক্রিয়া-কর্ম্ম ব্যতীত সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম্মের দিকে) টানিয়া রাখে; এইরূপে সাধারণ বিশেষের মধ্যে সাম্য সংস্থাপিত হয়। কোন কারণ বশতঃ যদি স্ত্রী পুরুষের বিবাহ না ঘটে তাহা হইলেও স্ত্রীলোকেরা ঘর কন্নার খুঁটিনাটি লইয়া কালযাপন করে, পুরুষেরা জনসাধারণ-ঘটিত ব্যাপক বিষয় সকলেই ব্যাপৃত থাকে। নিউটন প্রচলিত অর্থে বিবাহ করেন নাই বটে—কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যা তাঁহার প্রেয়সী ভার্য্যা-স্বরূপ ছিল, রাফেএল আপনিই বলিয়াছেন যে, তিনি চিত্র-লেখার সহিত বিবাহ-সূত্রে গ্রথিত হইয়াছেন।

সাধারণের ব্যাপ্তি-ভাব এবং বিশেষের সংকোচ ভাব উভয়ের মধ্যে যোগ স্থাপন করা প্রকৃতির একটি মর্ম্মগত ভাব—প্রকৃতির যে কিছু ব্যাপার সকলেতেই উহার কোন না কোন প্রকার নিদর্শন আছেই আছে; আলোক পদার্থ একবার সংকুচিত একবার বিস্ফারিত হইতেছে; পৃথিবী একবার কেন্দ্রাতিগ বলের বশবর্ত্তী হইয়া সূর্য্য-হইতে দূরে গমন করিতেছে, একবার কেন্দ্রানুগ-শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া সূর্য্যের নিকটস্থ হইতেছে; একবার সমুদ্রের জল বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া আকাশে পরিব্যাপ্ত হইতেছে, একবার আকাশে ঘনীভূত হইয়া তথা-হইতে ভূতলে নিপতিত হইতেছে—প্রকৃতির সমস্ত ঘটনাই এইরূপ যমকচ্ছন্দে নৃত্য করিতে করিতে চলিতেছে;—এমন কি, দ্বন্দ্বের নিয়মও যা ছন্দের নিয়মও তা, একই কথা। যাঁহাতক ক্রিয়া তাঁহাতক প্রতিক্রিয়া—যাঁহাতক সংকোচের ভাব তাঁহাতক ব্যাপ্তির ভাব তাহার সঙ্গে লাগিয়াই আছে; নক্ষত্র-কুজ্ঝটিকা ঘনীভূত হইয়া যে মাত্র সূর্য্যাকারে পরিণত হয়, অমনি উত্তাপের প্রভাবে তাহা হইতে উষ্মা বিনির্গত হইয়া সুদূরে পরিব্যাপ্ত হয়; ঐ উষ্মা হইতেই যখন গ্রহগণ বিনির্ম্মিত হইয়াছে, তখন উহার লঘুতম অংশ দূরতম দেশে এবং গুরুতম অংশ নিকটতম দেশে প্রক্ষিপ্ত হইবেই ত, এজন্য সূর্য্য হইতে যে গ্রহ যত দূরে স্থিতি করে সে গ্রহ তত লঘু উপাদানে বিনির্ম্মিত দেখিতে পাওয়া যায়। কতক গুলি পরমাণু পুঞ্জীভূত হইয়া মৃগনাভি হইয়াছে, এটি যেমন সংকোচের ভাব জ্ঞাপন করিতেছে, তেমনি আবার তাহা-হইতে পরমাণু পুঞ্জ নিয়তই উদ্গীরিত হইয়া সৌরভে দিক্‌দিগন্তর আমোদিত করিতেছে, এটি তেমনি ব্যাপ্তির ভাব জ্ঞাপন করিতেছে; কিন্তু সে পরমাণুগণ কত সূক্ষ্ম তাহা একবার ভাবিয়া দেখ;

যদি এক খণ্ড মৃগনাভি হইতে বৎসর বৎসর ধরিয়া ঐরূপ করিয়া রাশি রাশি পরমাণু বহিষ্কৃত হয়, তথাপি তাহার গুরুত্বের এক চুলও হানি হয় না,—কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। গন্ধহীন বস্তু হইতেও অলক্ষিত রূপে পরমাণু-রাশি উদ্গীরিত হয়, নতুবা এ কথার কোন অর্থ থাকিত না যে, কালে সকল বস্তুই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়—ক্ষয় প্রাপ্ত না হইবে কেন, পরমাণু সকল এক দিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলে তাহারা আর এক দিক্ দিয়া পলাইবার চেষ্টা পাইবে ইহা ত ধরাই আছে, ক্রিয়া মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া হইবেই হইবে প্রকৃতির ইহা একটি মূল নিয়ম—এবং তাহাই এখানকার অভিধানে দ্বন্দ্বের নিয়ম অথবা ছন্দের নিয়ম বলিয়া শব্দিত হইয়াছে। ইহার পরে আসিতেছে আবৃত্তির নিয়ম—সন্তানগণেতে পিতা মাতার জীবন পুনরাবর্ত্তিত হয়; কাল-ক্রমে তাহারা পিতা মাতার পদবীতে দণ্ডায়মান হয়; পরদিন পূর্ব্বদিনের পদবীতে দণ্ডায়মান হয়, ঋতু মাস সম্বৎসর পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করে, ইহার যে একটি নিয়ম তাহাই এখানে আবৃত্তির নিয়ম বলিয়া সংজ্ঞিত হইতেছে। ইহারই বিষয় অতঃপর আলোচনা করা যাইবে।

ছিন্নমুকুল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ—রোষ।

কনকের সেই "বাসি" কথাটি নিশাকালের বীণা-ঝঙ্কারবৎ হিরণের কর্ণে লাগিয়া রহিল। অমন মিষ্ট কথা হিরণ আর কখনো শোনেন নাই, শুনিবেনও না। হিরণকুমার আবার সেই দিনেই কনকের সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিয়া প্রমোদকে এক পত্র লিখিলেন। প্রমোদ যে তাঁহার সহিত কনকের বিবাহে আপত্তি করিবেন তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। হিরণের পত্র পাইয়া প্রমোদের আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। একে পূর্ব্ব দিন সেই কনকের সহিত মনান্তর হওয়া পর্য্যন্ত তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন না; তার পর সেই অবস্থায় এই চিঠি পড়িয়া তাঁহার ক্রোধের আর সীমা রহিল না। তাঁহার বন্ধুর সহিত কনকের বিবাহ দিতে পারিলেন না, আর হিরণ কোথাকার কে? তাহার কথা আবার কনককে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে? তাহার সহিত কনকের বিবাহের কথা! হিরণের স্পর্দ্ধা তাঁহার মার্জ্জনীয় বোধ হইল না। কনকের সহিত হিরণের বিবাহ অসম্ভব ইহা তিনি তখনি স্পষ্ট করিয়া হিরণকে লিখিতে বসিলেন। কিন্তু বিবাহ না দিবার কি কারণ দিবেন? হিরণকে

কি লিখিবেন যে তুমি আমার শত্রু সেই জন্য কনকের রক্ষাকারী হইলেও আমি তাহাকে তোমায় দিব না? একথা তো আর লেখা যায় না, তবে কি কারণ দিবেন? কারণ কনকের বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই। প্রমোদ তাহাই লিখিবেন ভাবিয়া কনককে ডাকিলেন, তিনি জানিতেন যে কনক কখনই বিবাহ করিতে সম্মত হইবে না। তবে, কাল বিবাহের জন্য পীড়াপিড়ী করিয়া কনককে কষ্ট দিয়াছেন, রাগে যাহা ইচ্ছা বলিয়াছেন, আজ এক জনের বিবাহ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতেছেন বলিয়া একটু সন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছায় কনককে ডাকিলেন! আজ আবার না জানি কি হইবে ভাবিয়া বালিকা ভয়ে ভয়ে সেই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। যখন দেখিল প্রমোদের মুখে রাগের লক্ষণ কিছুই নাই তখন সে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। প্রমোদ হিরণের পত্র খানি দেখাইয়া বলিলেন "এই দেখ কনক, হিরণ আবার তোমার সহিত বিবাহ প্রার্থনা করিতেছে। কিন্তু আমরা এ প্রস্তাবে অসম্মত তাহাই এখন উত্তরে লিখিতে বসিয়াছি, কেমন আজ সন্তুষ্ট হইলে তো, আজ তো আমি তোমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে বলিলাম না।" এই বলিয়া হিরণের সেই পত্র খানি কনককে পড়িতে দিলেন, পত্র খানি কনক পড়িতে গেল। একবার তাহার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল কিন্তু হাত ঠিক রাখিয়া পড়িতে পারিল না, আপনা আপনি হাতটি যেন নীচু হইয়া পড়িল, কনকের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল, বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ওষ্ঠে ভালে রক্ত পদ্মে নীহারবৎ শোভিত হইল; বালিকা মৌনে সেই চিঠিখানি লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এক বর্ণও পড়িতে পারিল না। প্রমোদ তাহার ভাব দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন "বিবাহের প্রস্তাব পড়িতেও বুঝি কষ্ট হয়? তবে দাও—"বলিয়া চিঠিখানি তাহার হাত হইতে লইয়া তাহার উত্তর লিখিতে বসিলেন, কনক সেইরূপই দাঁড়াইয়া রহিল। লিখিতে লিখিতে একবার মুখ তুলিয়া প্রমোদ বলিলেন "তবে লিখিয়া দিই তোমার বিবাহে অনিচ্ছা। কেমন তা' হ'লে সন্তুষ্ট হবে তো?" এই কথায় কনককে যেরূপ হর্ষোৎফুল্ল দেখিতে আশা করিয়াছিলেন, তাহা দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন সেই মুখ অধিকতর গম্ভীর, আরক্তিম চক্ষু দুটি অশ্রু ভারাক্রান্ত, অথচ তাহাতে অশ্রুর চিহ্ন মাত্রও নাই। তিনি আশ্চর্য্য হইলেন; বলিলেন "কনক আজ তোমার ওরূপ ভাব হইল কেন? আজ তো আমি তোমাকে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনুরোধ করিতেছি না।" বালিকা কিছুই উত্তর করিল না, কেবল তাহার ওষ্ঠাধরে লজ্জার ঈষৎ মৃদু, অথচ অন্তিম হাসির ন্যায় শুষ্ক, হাসির রেখা পড়িল; হাসির আদর্শে ওষ্ঠাধর ঈষৎ কুঞ্চিত হইল মাত্র। কনককে কাল হইতে আজ পরিবর্ত্তিত দেখিয়া প্রমোদ কিছু আশ্চর্য্য হইলেন, নানা সন্দেহে তাঁহার মন আন্দোলিত হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কনক, তুমি কি ভাবিতেছ এ বিবাহে আ-

মার ইচ্ছা আছে, কেবল তোমার ইচ্ছার অনুরোধে আমার এরূপ পত্র লেখা? সেই ভাবিয়া কি খুসী হইয়াও হইতে পারিতেছ না? না, তাহা ভাবিয়া কষ্ট পাইও না। কাল যদিও তোমার অসম্মতিতে আমি কষ্ট পাইয়াছিলাম কিন্তু আজ এ বিবাহে আমারো অনিচ্ছা।"

এই আশ্বাস বাক্যেও কনককে কোন কথা কহিতে না দেখিয়া প্রমোদ অবাক হইয়া রহিলেন। কাল বিবাহের কথায় কনক অত দুঃখিত হইয়াছিল, আজ সেই বিবাহে প্রমোদকেও অসম্মত দেখিয়া কোথায় কনকের আহ্লাদ ধরিবে না—না আজ তাহার একি বিপরীত ভাব! প্রমোদের আশ্বাস বাক্যেও কেন কনক কথা কহিতে সঙ্কুচিত হইতেছে? আজ কি কনকের তবে বিবাহে ইচ্ছাই আছে? প্রমোদ বলিলেন "কনক তোমারি মনের কথা আমি লিখিতেছি—বিবাহে ইচ্ছা নাই ইহা তোমারি কথা, তবুও তুমি স্পষ্ট করিয়া আর একবার বল বিবাহ করিবে না, তাহা হইলে আমার পক্ষে লিখিবার আরো সুবিধা হইবে।" কিন্তু কনক পাষাণ-প্রতিমাবৎ নিরুত্তর; চক্ষে স্থির দৃষ্টি, তাহাতে পলক নাই, জ্যোতি নাই, আহ্লাদ নাই, বিষাদ নাই, বদনমণ্ডল পাংশুবর্ণ, হৃদয়েরক্ত-স্রোত বহিতেছে কি না সন্দেহ।

কনকের ভাব দেখিয়া প্রমোদ এবার একটু বিরক্তির ভাবে বলিলেন "কনক, কথা কও না, চুপ করিয়া রহিলে যে?"

কনক কি যেন বলিতে চেষ্টা করিল কিন্তু কথা আটকিয়া গেল, বলিতে পারিল না। প্রমোদ উত্তরের আশায় অনেক ক্ষণ মুখ পানে চাহিয়া চাহিয়া শেষে বিরক্ত হইয়া বলিলেন—

"কনক তুমি দেখছি আমাকে পাগল ক'রে তুলবে? এই কাল অত দৃঢ় ভাবে বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে আর আজ কথা কইতে কি হ'ল, বিবাহ করিবে নাকি? আমাকে উত্তর দেও।"

উত্তর অভাবে প্রমোদকে ক্রুদ্ধ হইতে দেখিয়া অতি কষ্টে লজ্জা চাপিয়া বালিকা ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে যেন মুখ খুলিল, কিন্তু এবারও বলিতে গিয়াই থামিয়া গেল, কোন মতে আর কথা মুখের বাহির হইল না। তাহার আর কিছু বলিবারও আবশ্যক ও রহিল না; বার বার তাহার ঐরূপ ভাব দেখিয়া প্রমোদ বুঝিলেন তাহার বিবাহে ইচ্ছা আছে; নহিলে, কথা কহিতে সঙ্কুচিত হইবার তো আর কোন কারণই দেখিলেন না। কাল কনক কোন মতেই যামিনীনাথের সহিত বিবাহে সম্মত হইল না, আর আজ তাহার হিরণকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা? প্রমোদের শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি এখন বুঝিলেন এই কারণেই তবে কনক কাল বিবাহে অসম্মত হইয়াছিল। হিরণকে তাঁহার কণ্টক স্বরূপ মনে হইল, মনে মনে তাহারি উপর ক্রুদ্ধ হইতে লাগিলেন। হিরণ না হইয়া অন্য কাহাকেও যদি আজ কনক বিবাহ করিতে চাহিত তাহা হইলে প্রমোদ সেই সম্মতির অন্য কোন কারণ দেখিতে পাইতেন, মনে করিতেন কাল

বিবাহে কনক অসম্মত হওয়াতে প্রমোদ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাই কনক আজ বিবাহে সম্মত হইল। কিন্তু হিরণ বলিয়া প্রমোদের একথা মনে আসিল না। তিনি রোষ-কম্পিত স্বরে বলিলেন—

"তুমি জান এ বিবাহে আমার বিশেষ অনিচ্ছা।"

বালিকা মৃদু ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল "না"।

প্র। "এখন তো জানিলে এখন কি করিতে প্রস্তুত আছ?" উত্তর না পাইয়া আবার বলিলেন—

"তুমি বিবাহ করিতে পার, আমি কিছুই বলিব না—কিন্তু তাহা হইলে তোমাতে আমাতে এই পর্য্যন্ত সম্পর্ক শেষ হইল—একথা যেন মনে থাকে।" প্রমোদ হিরণকে মনে মনে শত শত অভিসম্পাত দিতে দিতে ক্রোধ ভরে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

হিরণকে—তাঁহার চিরশত্রু হিরণকে কনক ভাল বাসিল! হিরণের জন্যই তাহার বন্ধুকে বিবাহ করিতে চাহিল না, হিরণের জন্যই তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিল, তাঁহার মনোরথ ব্যর্থ করিল! বার বার হিরণ হইতেই কি তিনি আঘাত পাইতেছেন না? তাঁহার শক্রতা করিতেই হিরণের জন্ম।

প্রমোদ তখনি হিরণের চিঠির উত্তর লিখিয়া দিলেন যে বিবাহ হইবে না।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দলিত কলি।

পর দিন সন্ধ্যাকালে কনক গঙ্গাতীরে বসিয়া নদী-জলের সহিত অশ্রু-জল মিশাইতে মিশাইতে গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতেছিল। গান গাওয়া কেমন কনকের অভ্যাস সে সর্ব্বদাই আপন মনে গুণ গুণ না করিয়া থাকিতে পারিত না। আজ গাহিতেছিল—

এ জনমের মত সুখ ফুরায়ে গিয়েছে, সখি,
এখনো তবুও হৃদে জ্বলিছে দুরাশা একি?
জানি এ অভাগী ভালে সুখ নাই কোন কালে,
দুরন্ত পিপাসা তবু থামিবার নহে দেখি,
এত যে যতন করি এ অগ্নি নিভাতে নারি,
প্রেমের এ দাবানল জ্বলি ওঠে থাকি থাকি।"

গুণ গুণ করিয়া বালিকা কিছু পরে থামিল। সোপানের সীমানা পার্শ্বে যে থানে জলে কতকগুলি ক্ষুদ্র গাছ গাছড়া লতা পাতা জন্মিয়াছিল, সেই খানে হাত বাড়াইয়া তাহা হইতে একটি ডাল ভাঙ্গিয়া লইল। ডালটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া জলে ফেলিয়া দিতে দিতে, সেই ভাসমান অংশ দেখিতে দেখিতে আপন মনে কত কি ভাবিতে লাগিল। কনকও এক দিন এই ক্ষুদ্র তৃণের মত ভাসিয়া গিয়াছিল, কেন কনকের মত অভাগিনীকে হিরণকুমার তখন বাঁচাইলেন? "হিরণকুমার কেন তুমি বাঁচাইয়াছিলে? বাঁচাইলেই বা কি করিয়া বলিব? যে প্রাণ দিয়াছিলে তাহাতো আপনিই আবার কাড়িয়া লইয়াছ, কেবল যাতনা বই কনকের জন্য আর কিছুই রাখ নাই। কেবল যাতনার জন্য কি জল হইতে না তুলিলেই ভাল ছিল না। এরূপ জ্বলন্ত আগুনে পোড়া অপেক্ষা কি

জলে ডুবে মরা ভাল ছিল না? না, না, বাঁচাইয়াছিলে বেশ করিয়াছ নহিলে এত যাতনা কে সহিত? নহিলে—নহিলে এত সুখই বা কে ভোগ করিত? নহিলে হিরণকুমার, তোমাকে দেখিবার সুখ কোথায় পাইতাম? এর পর এখন আজীবন কষ্ট পাই সেও ভাল।"

কনকের ভাবনা সহসা ভঙ্গ হইল। সহসা হিরণকুমার কনকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হিরণের মূর্ত্তি আজ বিষাদময়, প্রশস্ত ললাট ঘর্ম্মসিক্ত, চক্ষু আরক্তিম এবং ঈষৎ স্ফীত, মনে হয় অল্প ক্ষণ পূর্ব্বে যেন বিষম কষ্টের কান্না কাঁদিয়াছেন। সেই দুঃখের সময় সেই যাতনা-পীড়িত মনের অবস্থায় সহসা হিরণকে দেখিতে পাইয়া বালিকার মনের ভাব কিরূপ হইল, বালিকা কিরূপ শান্তি পাইল, তাহা বলিবার নহে। নিমেষে যেন মন্ত্র-বলে তাহার সকল দুঃখ দূর হইল। কিন্তু আবার অমনি সেই এক সময়েই তাহার মনে আসিল, এই সময় কি তাহাদের এরূপ সাক্ষাৎ দূষণীয় নহে? বাল্য কাল হইতে কনক যেরূপ শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছিল তাহাতে তাহার এইরূপ সাক্ষাৎ অনুচিত বলিয়া বোধ হইল। কনক সেই জনা মনের স্বাভাবিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলিল "আজ আবার তুমি আসিলে কেন? আমাদের এরূপ সাক্ষাৎ ———"

হিরণ বিষাদ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন "কনক আমার হৃদয় পুড়িতেছে এখন উচিত অনুচিত আমার জ্ঞান নাই। কিন্তু কনক যাহাতে তোমার এক বিন্দুও হানি হয় এমন কিছু আমা হইতে কখনই ঘটিবে না। চিরকাল পুড়িয়া মরি সেও স্বীকার তবু আমা হইতে তোমার তিল মাত্রও অপকার হইতে দিব না, কেহ আমাকে দেখিবার আগে আমি এখনি চলিয়া যাইব। কাল তো প্রতিজ্ঞাই করিয়াছিলাম যদি কখনো বিবাহ হয় তো আবার দেখিব নহিলে কালকের দেখাই শেষ। কিন্তু যখন প্রতিজ্ঞা করি, তখন আমার হৃদয় আশাপূর্ণ ছিল, তখন জানিতাম না যে ভগ্ন হৃদয়ে এইরূপ আবার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে আসিব। কনক আজ একটিবার জন্মশোধ তোমাকে দেখিতে আসিলাম। এ ইচ্ছাকে আমি কোন মতে দমন করিতে পারিলাম না। আমি অপরাধী কিন্তু অভাগা বলিয়া দোষ মাপ করিও।"

কনক ইহার আর কি উত্তর করিবে? সেই বালিকার হৃদয়তো আর পাষাণ-নির্ম্মিত নহে। হিরণ বলিলেন "কনক, সরলে, তোমার ভ্রাতার চিঠি পাইয়া অবধি আমাতে আর আমি নেই, তাঁহার এ বিবাহে অসম্মতির কারণ কি?" কনক অনেক ক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া শেষে বিষাদ-গম্ভীর স্বরে সজলনেত্রে উত্তর করিল "তিনি তোমাকে তাঁহার শত্রু মনে করেন।"

হি। "আমি তাঁহার শত্রু! কিসে এরূপ তাঁহার মনে হইল? আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিয়া তাঁহার ভ্রম দূর করিব।"

ক। "সে ভুল বিশ্বাস তাঁহার যাইবে বোধ হয় না।"

হিরণকুমার যাতনা-কম্পিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন "তবে কনক, আমার কনক কি আমার কখনই হইবে না?" কাহারো আর কথা কহিবার শক্তি রহিল না দু'জনে সেই নীরব সন্ধ্যাকালে নীরব অশ্রুবারি গঙ্গাবারিতে ঢালিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ কেহই কোন কথা কহিলেন না, কিন্তু পরস্পর দু'জনেই পরস্পরের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। কিছু পরে হিরণকুমার বলিলেন—

"কনক আমরা মনে মনে দু'জনকে দু'জনে ভালবাসিয়াছি—হৃদয়ে হৃদয়ে আমাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কনক, তোমার ভ্রাতার মতের বিরুদ্ধে কি আমাদের বিবাহ হয় না?

ক। উঃ! ও কথা মুখে আনিও না। তা'কি ক'রে হবে? আর তা'হ'লে কি দাদা আমার মুখ দেখিবেন।"

হিরণকুমার ভগ্ন হৃদয়ে বলিলেন "তুমি আমার মত আমাকে পাইতে ব্যগ্র নহ বলিয়া ওকথা বলিতে পারিলে, আমার মত ভালবাস না বলিয়া ওকথা বলিতে পারিলে, তোমাকে না পাইলে আমি চির কাল পুড়িয়া মরিব চিরকালের জন্য আমার সুখ বিনষ্ট হইবে, ইহা জানিয়াও তোমার ভ্রাতার একটু মনঃক্ষোভের ভয়ে তুমি আমাকে চিরকাল অসুখী করিতে ও প্রস্তুত। সরলে, তোমার নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃস্নেহ-কি জ্বলন্ত! কনক, আমি যদি তোমার ভাই হইতাম, তাহা হইলে এইরূপ স্বর্গীয় ভাল বাসা আমার হইত!"

হিরণের কথায় কনক নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিল, হিরণের প্রত্যেক কথা গুলি তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইতে লাগিল। "কনক হিরণকে তেমন ভাল বাসে না—এই কথা আজ হিরণকুমার নিজে বলিলেন! তা' যদি হইত তাহা হইলে কনকের এত কষ্ট পাইতে হইত না। কনকের কাহার জন্য এত কষ্ট? কাহার জন্য এত জ্বালা? কাহাকে হৃদয় দিয়াছে বলিয়া ভ্রাতার কথায় অসম্মত হইয়া ভ্রাতাকে কষ্ট দিল? কাহার জন্য আজ ভ্রাতার সহিত পর্য্যন্ত মনোবিচ্ছেদ ঘটিল? হিরণের অপেক্ষা প্রমোদকে ভাল বাসিলে কি তাহা হইত? ভ্রাতার অমতে কেবল কনক বিবাহ করিতে চাহে নাই বলিয়া কি হিরণের ঐরূপ ভাবা উচিত ছিল? বিবাহ না হইলে যে কনক চিরকাল জীবন্তে মরিবে তাহা কি হিরণের জ্ঞান হইল না? হিরণ আজ তাহাকে দোষী করিলেন! কনকের যতই কষ্ট হউক না, ন্যায়ের বিপরীতে কি করিয়া কাজ করিবে? ভ্রাতৃস্নেহ হইতে কনকের প্রণয় যতই বলবৎ হউক না ভ্রাতার অমতে কাজ করিয়া তাহাকে কষ্ট দিবে কি করিয়া? হিরণ কেন এসকল বুঝিলেন না?" হিরণ তুমি বড় নিষ্ঠুর! বালিকার এই দগ্ধ হৃদয়ে আরো জ্বালা দিলে। কনক যদি দেখাইতে পারিত তো দেখিতে সে তোমার অধিক তোমাকে ভাল বাসে কি না। কিন্তু কনক বালিকা, কথা কহিতে জানে না, প্রকাশে অক্ষম, তাই তুমি আজ ও কথা বলিয়া তাহাকে যাতনা দিতে পারিলে!

হিরণ আবার বলিলেন—"তবে, কনক, সরলে, আমি চলিলাম আজ অবধি সকল সুখে বিসর্জ্জন দিতে চলিলাম, তোমার জন্যই সকল জলাঞ্জলি দিব। আর আমার সংসারে কাজ কি ; অর্থে কাজ কি ? তোমাকে যদি না পাইলাম তবে আমার আর কিসে কাজ ? আমি ধন সম্পদের আকাঙ্ক্ষী নহি, আমি পদ-মর্য্যাদার জন্যও লালায়িত নহি। তোমাকে বিবাহ করিয়া কল্পনার মরুভূমেও যে নন্দনকানন সৃজন করেছিলেম, তুমিই স্বহস্তে যদি তাহাতে দাবানল জ্বালালে, তা হ'লে আমার এই শূন্য উদ্দেশ্যহীন জীবনে প্রয়োজন কি ? আমি সংসার ছাড়িব, দেশে দেশে বনে বনে সন্ন্যাসী-বেশে ভ্রমণ করিব, তাহাতে যদি তোমাকে ভুলিতে পারি তো ভুলিব, নহিলে তোমারি মূর্ত্তি আজীবন ধ্যান করিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইব। সরলে, তুমি অভাগাকে ভুলিয়া যাও, যদি কখনো মনে আসে মনে স্থান দিও না। আমার ভাবনা তোমাকে তিল মাত্রও যেন ব্যথা না দেয়। যদি জানিতে পারি আমাকে ভুলিয়া তুমি সুখে আছ, ভ্রাতার মতে বিবাহ করিয়া সাংসারিক সুখে প্রফুল্ল আছ, তাহা হইলে বনে জঙ্গলে অতি দীন ভাবে থাকিয়াও আমি সুখী হইতে পারিব। চলিলাম আর কখনো এই অভাগাকে দেখিতে পাইবে না।"

হিরণের অর্দ্ধেক কথাও কনকের কর্ণে প্রবেশ করিল না, কনক তখন আপনাতে আপনি ছিল না। যখন কনকের চমক ভাঙ্গিল যখন বালিকা কনকের আজ কথা ফুটিল যখন বালিকা বলিতে গেল "হিরণকুমার, আমার নিজের কষ্ট আমি আজীবন সহিতে পারি, কিন্তু তোমার কষ্ট কি করিয়া সহিব ? তোমার কনক তোমার জন্য সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত"। তখন মস্তক তুলিয়া কনক দেখিল সেখানে হিরণকুমার নাই, পিছনে সেই আজন্ম-পরিচিত পথ ঘাট ও বৃক্ষাবলী, সম্মুখে সেই অনন্ত কাল-প্রবাহিনী গঙ্গা। কনকের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। বোধ হইল তাহার চরণতলে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল পর্য্যন্ত যেন গহ্বর হইয়া গিয়াছে, কনক শূন্য অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। অজস্র অশ্রুধারা কনকের কপোল বাহিয়া পড়িতে লাগিল। হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে মর্ম্মভেদী কষ্টে অশ্রুধারা উথলিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কনক দ্রুতপদে ঘাট হইতে উঠিয়া খানিক দূর আসিল, কিন্তু আর অধিক দূর আসিতে পারিল না, ক্ষুদ্র বালিকা আর কত পারিবে ? তীরে একটি গাছ তলায় আসিয়া আশ্রয় জন্য একটি শাখা ধরিল, ক্রমে হস্ত পদ শিথিল হইয়া সেই বৃক্ষতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

নিন্দা-তত্ত্ব।

নিন্দা কা'কে বলে জিজ্ঞাসা কোর্‌লেই লোকে বলে, পরের নামে দোষারোপ করাকে নিন্দা বলে। লোকে তাই বলে বটে, কিন্তু লোকে তাই মনে করে না। কে এমন আছে বল দেখি যে,সে তার জীবনের প্রতিদিনই পরের নামে দোষারোপ না করে? পর যত দিন দোষ কোর্‌তে ক্ষান্ত না হবে, তত দিন দোষারোপের মুখ বন্ধ হবে না। যে হিসেবে সকল মানুষই স্বার্থপর, সে হিসেবে সকল মানুষই নিন্দুক। প্রতি মানুষের জীবনের সমস্ত কাজ তুমি রাশীকৃত কোরে পরীক্ষা কোরে দেখ, দেখ্‌বে, যে খনিতে জোন্মেছে তার গায়ে তা'র মাটি লেগে থাক্‌বেই থাক্‌বে। স্বার্থ যখন স্বার্থপরতার সাধারণ সীমা ছাপিয়ে ওঠে, তখনি আমরা তাকে স্বার্থপরতা বলি। নিন্দাও ঠিক তাই।

যদি বল যে, মিথ্যা দোষারোপ করাকেই নিন্দা বলে, তা হোলে নিন্দার অর্থ অসম্পূর্ণ থেকে যায়! মিথ্যা নিন্দা নিন্দার একটা অংশ মাত্র। কে না জানে, এমন অনেক সময় আসে, যখন পর-নিন্দা শোন্‌বার কষ্ট আমাদের নীরবে ধৈর্য্য ধোরে সহ্য কোর্ত্তে হয়, কেন না আমাদের কোন কথা বল্‌বার থাকে না, নিন্দুক ব্যক্তি প্রতি মুহূর্ত্তে বোলচে "সত্য কথা বল্‌চি, তা'র আর কি!" কিন্তু সে সহস্র সত্য কথা বলুক না কেন, তবুও নিন্দুক বোলে তা'র উপর কেমন এক প্রকার ঘৃণা জন্মে।

কিন্তু কেন? সত্যি কথা বোল্‌চ, তবু কেন তা'কে নিন্দুক বল? তার একটা কারণ আছে। সত্য হোক্‌ মিথ্যা হো'ক্‌, আমরা উদ্দেশ্য বুঝে নিন্দার নিন্দা করি। সকলেই স্বীকার করেন পরের প্রশংসা করা মাত্রকেই খোষামোদ বলে না। যখন কারো সদ্‌গুণ দেখে আমাদের উচ্ছ্বসিত হৃদয় থেকে প্রশংসা বেরোয় তখন, অবিশ্যি তা'কে কেউ খোষামোদ বলে না। কিন্তু যখন তুমি তোমার নিজের স্বার্থ বা অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রশংসা কর, সে প্রশংসা সত্য হোলেও তা'কে খোষামোদ বলে। নিন্দার সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা গুলি খাটে। তুমি এক জনের কুকার্য্য দেখে ঘৃণায় অভিভূত হোয়ে যদি বজ্র কণ্ঠে তা'র বিরুদ্ধে তোমার স্বর উত্থাপন কর, তা' হোলে নিন্দিত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ তোমাকে নিন্দুক বোল্‌বে না। কিন্তু যখন দেখ্‌ছি নিন্দা কোর্‌তে আমোদ পাচ্ছ বোলে তুমি নিন্দা কোর্‌চো, কাল যদি পৃথিবীতে সমস্ত কুকার্য্য রহিত হয় তা'হোলে তোমার জীবনের সুখের একটা উপাদান বিনষ্ট হয়, তা'হোলে তুমিও হয়ত অকাতরে তা'দের সঙ্গে সহমরণে যাবার আয়োজন কোর্ত্তে পার, তখন তুমি

যুধিষ্ঠিরের চেয়ে সত্যবাদী হওনা কেন, নিন্দুক বোলে আমি তোমার সঙ্গে কথা-বার্ত্তা রহিত করি। যখন তুমি সত্য কথা বল্‌বার জন্য নিন্দা কর না, কেবল নিন্দা করবার জন্য সত্য কথা বল, তখন তোমার সে সত্য কথা নীতির বাজারে মিথ্যা কথার সমান দরেই প্রায় বিক্রি হবে। অতএব নিন্দার যদি একটা বাঁধাবাঁধি ব্যাখ্যা স্থির কোর্ত্তে যাও, তা'হোলে বলা যেতে পারে যে, বিনা উদ্দেশ্যে বা হীন উদ্দেশ্যে পরের নামে সত্য বা মিথ্যা দোষারোপ করাকে নিন্দা বলে।

পরের নামে দোষারোপ কোর্ত্তে ও পরের নিন্দা শুন্‌তে সাধারণতঃ লোকের কেন অত ভাল লাগে? এক এক সময়ে ভেবে দেখ্‌তে গেলে আশ্চর্য্য হোতে হয়। মানুষের মনে সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা সর্ব্বদাই জেগে রোয়েছে। বীভৎস-আবর্জ্জনা-রাশি দেখতে ত আমাদের আমোদ বোধ হয় না, তবে পরের নিন্দে শুনতে কেন অত তৃপ্তি? অনেক দূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান কোরে এর মূল দেখ্‌তে গেলে আত্ম-শ্লাঘায় গিয়ে পৌঁছিতে হয়। নিন্দে শুন্‌লে অলক্ষিত ভাবে আমাদের মনে হয় যে, আমি হোলে এ কাজটা কোর্‌তেম না, কিম্বা আমি যে দোষ কোরে থাকি, অমুক লোকেরও তা' আছে, অমুক লোকের চেয়ে আমি ভাল কিম্বা আমি একলাই কেবল দোষী নই, এই দুটো কথা অজ্ঞাতসারে আমাদের মনে এক প্রকার গর্ব্ব-মিশ্রিত তৃপ্তি জন্মিয়ে দেয়। সকল মানুষের মনেই সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার ভাব রোয়েছে বটে, কিন্তু শিক্ষা ও চর্চ্চায় যে তার উন্নতি হয়, সে বিষয়ে ত আর কোন সন্দেহ নেই। তুমি হয়ত চর্ম্ম-চক্ষে একটা কুশ্রী জিনিষ দেখ্‌তে পার না, কিন্তু তোমার হয়ত সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা এত দূর প্রস্ফুটিত হয় নি, যে কুগুণ বা কুনীতির মত একটা নিরাকার পদার্থের অসৌন্দর্য্য বা কুশ্রীত্ব তোমার মনে তেমন আঘাত দেয়। সুশিক্ষার গুণে সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা যখন তোমার মনে যথেষ্ট বিকসিত হবে, তখন একটা কদাচরণের কথা শুন্‌লে ঘৃণায় তোমার গা শিউরে উঠ্‌বে কিম্বা লজ্জা ও সঙ্কোচে তোমার মাথা হেঁট হোয়ে যাবে বটে কিন্তু সেই কথা শুনে তোমার আমোদ বোধ হবে না, বা সেই কথা নিয়ে অবকাশের সময় বৈঠকখানায় বোসে দশ জনের কাছে দশটা রসিকতা ও হাস্য পরিহাস কোর্ত্তে রুচি হবে না। কিন্তু সৌন্দর্য্যের ভাব কজন লোকের মনে এমন প্রস্ফুটিত?

নিন্দা বিশ্বাস কর্‌বার দিকে আমাদের কেমন একটা টান্ আছে। একটা নিন্দা শুন্‌লে আমরা প্রায় তা'র প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিনে, আসল কথা হোচ্চে জিজ্ঞাসা কোর্ত্তে চাইনে। বোধ হয় আমাদের মনে-মনে এক প্রকার সূক্ষ্ম ভয় থাকে, পাছে তার ভাল প্রমাণ না থাকে। নিন্দা বিশ্বাস করবার দিকে সাধারণের এত অনুরাগ যে, চণ্ডীমণ্ডপের বিচারালয়ে নিন্দিত ব্যক্তি অপেক্ষা নিন্দুকের সাক্ষী অধিকতর প্রামাণ্য বোলে গৃহীত হয়। তুমি রাধামাধ-

বের নামে আমার কাছে একটা দোষো-খাপন কোর্‌লে, আমি কোন প্রমাণ না জিজ্ঞাসা কোরেও তা' বিশ্বাস কোরলেম, তা'র পরে রাধামাধব যদি বোল্‌তে আসে যে, আমি কোন দোষ করি নি, তা' হোলে আমি হয়ত প্রমাণ না পেলে তা' ঝট্‌ কোরে বিশ্বাস করিনে। নিন্দিত ব্যক্তির অত্যন্ত সঙ্কটের অবস্থা। আমরা সহজেই মনে করি, যে, দোষী ব্যক্তি ত স্বভাবতঃ আপনার দোষ ক্ষালন কর্ত্তে চেষ্টা পা-বেই। সুতরাং আমরা তা'র কথায় কান দিই নে। অনেক সময়ে "দোষ করিনি" ছাড়া আমাদের আর কিছু বক্তব্য থাকে না, আমরা অনেক সময়ে বিশেষ কতক গুলি গোপনীয় কারণে নির্দ্দোষিতার প্রমাণ থাক্‌তেও তা' আমরা প্রমাণ কোর্ত্তে পারিনে। এ রকম অবস্থায় দায়ে পোড়ে "দশচক্রে ভগবান ভূত" হোয়ে পড়েন। আমরা যে, নিন্দা বিশ্বাস কোর্ত্তে ভাল বাসি তা'র আর একটা প্রমাণ এই যে, মনে কর হরিহর রামধনের নামে তোমার কাছে একটা নিন্দা কোরেছে, তুমি সেটা বিশ্বাস কোরেছ ও সেই অবধি পরম আমোদে আছ, এবং দু দশ জন বন্ধুর কাছে গল্প কো-রেছ; আমি যদি আজ এসে তোমাকে বলি যে, হরিহর লোকটা অত্যন্ত নিন্দুক, তার কথা বিশ্বাস কর্ব্বার যোগ্য নয়, তা' হোলে তুমি কোন মতে তা' বিশ্বাস কর না, তুমি বল "না, না, তা' কি হয়? লো-কটা কি একেবারে খাঁটি মিথ্যে কথা বো-ল্‌তে পারে?" কি আশ্চর্য্য! হরিহরের মুখে তুমি যখন রামধনের নিন্দের কথা শুনেছিলে, তখন ত তুমি প্রশংসনীয় উদা-রতার সঙ্গে বল নি যে, "না, না, তা' কি হয়! সে লোকটা কি এমন কাজ কর্ত্তে পারে?" একটা নিন্দা তুমি অতি সহজে গলাধঃকরণ কোর্‌লে, কিন্তু আর একটা সেই শ্রেণীর নিন্দেই কেন তোমার গলায় হঠাৎ বাধ্‌ল? এর কারণ অবশ্য সকলেই বুঝ্‌তে পার্‌চেন। তিনি পরম আনন্দে একটি সুস্বাদ নিন্দা উপভোগ কোর্‌ছি-লেন, আর তুমি কি না আর একটি নীরস নিন্দা তাঁর হাতে দিয়ে সেটি তাঁর মুখ থেকে কেড়ে নিতে চাও? যে নিন্দুকের মুখ থেকে তিনি অমৃত পান করেন, তাকে তুমি আর যা' খুসী বোলে নিন্দে কর, কিন্তু মিথ্যেবাদী বোলে খবরদার নিন্দে কোরনা, তা'হোলে তুমিই মিথ্যাবাদী হোয়ে দাঁ-ড়াবে।

বিশ্বাস-পরায়ণতা মনের সুস্থ ও স্বাভা-বিক অবস্থা। যাঁরা পরনিন্দা শুন্‌লে অতি সহজেই তা বিশ্বাস করেন, তাঁদের হয়ত তুমি বিশ্বাস-পরায়ণ বোল্‌বে। আমি ত ঠিক তার উল্টো বলি। যেমন তুমি যখন বল, আমি চারদিক অন্ধকার দেখ্‌ছি, তখন তার অর্থ বোঝায়, আমি কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চিনে, অর্থাৎ অন্ধকার দেখা, কিছু না দেখার ভাষান্তর মাত্র, তেমনি নিন্দা-বিশ্বা-সিতা, অবিশ্বাসিতার অন্য একটি নাম। তুমি দেখ্‌তে পাবে, সন্দিগ্ধ ও কুটিল হৃদ-য়েরাই নিন্দা নিয়ে লেনা-দেনা কোরে থাকেন। তুমি যথার্থ সরল ও অসন্দিগ্ধ-

চিত্ত ব্যক্তির কাছে কারো নিন্দা উত্থাপন কর, তিনি বোলে উঠ্‌বেন "না, না, এমনো কি মানুষে কোর্‌তে পারে।" মানুষের চরিত্রের উপর তাঁর এত বিশ্বাস যে, তিনি, কেহ যে খারাপ কাজ কোরেছে, তা' শীঘ্র বিশ্বাস কোর্ত্তে পারেন না। মনে কর তোমার এক পরিচিত ব্যক্তি অত্যন্ত ধার্ম্মিক, তাঁকে তুমি প্রত্যহ দুই সন্ধ্যে দেবপূজা কোর্ত্তে দেখ, আমি তোমাকে এক দিন কানে কানে ফুস্‌ফুস্‌ কোরে বল্লেম যে, চক্রবর্ত্তী মশায় বৃহস্পতিবারে গোমাংস খেয়েছেন, অমনি তুমি তা' বিশ্বাস কোর্‌লে; তুমি কতদূর সন্দিগ্ধ হৃদয় বল দেখি! তুমি প্রত্যহ নিজের চক্ষে তাঁর ধার্ম্মিকতার প্রমাণ পাচ্ছ, আর এক দিন একটা কানে কানে কথা শুনেই সে সমস্ত তুমি অবিশ্বাস কোর্‌লে? চণ্ডীমণ্ডপে গুটি পাঁচেক বৃদ্ধ গৃহস্বামী বোসে ধূম-সেবন কোর্‌চেন, চানক্যের শ্লোক পাঠ কোরে ও বয়ঃপ্রাপ্তি অবধি চণ্ডীমণ্ডপের তাম্রকূট-ধূমাচ্ছন্ন ও নস্য-গন্ধী পর-চর্চ্চা শুনে সংসারের বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা অসাধারণ পক্কতা প্রাপ্ত হোয়েছে; রামশঙ্কর খুড়ো তাঁদের এসে বোল্লেন যে, মণ্ডলদের বাড়ির ছোট বৌ সমাজ-বিরুদ্ধ কাজ কোরেছে, তাঁরা অতি অল্প পরিশ্রমে সমস্ত সিদ্ধান্ত কোরে মহা বিজ্ঞভাবে বোল্লেন যে, "কিছু আশ্চর্য্য নয়, কারণ, "বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষুচ।" তাইত বলি, নিন্দা বিশ্বাস করা সন্দিগ্ধ-হৃদয়ের লক্ষণ। তবে কেউ কেউ আছেন, যাঁরা দূর অপেক্ষা আশু, অনুপস্থিত অপেক্ষা উপস্থিত, ও নিজের চোখের দেখা অপেক্ষা পরের মুখের কথা অধিক বিশ্বাস করেন। এখন তুমি তাঁকে একটি খবর দেও, তা' বিশ্বাস কোর্ত্তে তাঁর যত পরিশ্রম ও সময় ব্যয় হবে, দু ঘণ্টা পরে আর এক জন ঠিক তার বিপরীত খবর দিলে, তা' বিশ্বাস কোর্ত্তে তাঁর তার চেয়ে কিছু অধিক হবে না। এমন লোকের শিশু-প্রকৃতির একটা ঘোরতর ভ্রমের ফল। এ দলের সম্বন্ধে আমার অধিক কিছু বক্তব্য নেই। নিন্দা অবিশ্বাস কর্ব্বার ঝোঁক অনেকটা শিক্ষা ও অভ্যাস-সাপেক্ষ। এ বিষয়ে বিশেষ অভ্যাস ও বিবেচনা আবশ্যক। যে নিন্দা শুন্‌লে তোমার মনে কষ্ট হয়, তা' তুমি না বিশ্বাস কোর্ত্তেও পার, কিম্বা যে নিন্দায় তোমার কষ্ট বা সুখ কিছুই না জন্মায়, তা' তুমি বিশেষ প্রমাণ না পেলে অবিশ্বাস কোর্ত্তে পার, কিন্তু স্বার্থ-জড়িত কতকগুলি বিশেষ কারণে যে নিন্দা শুন্‌লে তোমার আমোদ জন্মা'বার সম্ভাবনা, তা' বিশেষ প্রমাণ না পেয়ে বিশ্বাস না করা শিক্ষিত মনের লক্ষণ। আর এক অবস্থায় আমরা নিন্দা অতি সহজে বিশ্বাস করি। আমরা একজন লোককে খারাপ বোলে জানি, তা'র নামে একটা নিন্দা শুন্‌বা মাত্রেই আমরা অনায়াসে বিশ্বাস করি, আমরা মনে করি এটা কিছুই অসম্ভব নয়। সুতরাং আমরা তা'র আর প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিনে কিন্তু শিক্ষিত-মনা ব্যক্তিরা তখন বলেন, যে, "সমস্ত সম্ভব ঘটনা পৃথিবীতে ঘটে না।"

একটা জিনিষ সম্ভব হোতে পারে কিন্তু সত্য নাও হোতে পারে। এক ব্যক্তি এসে যখন আমাদের কাছে একটা প্রিয়-নিন্দা উত্থাপন কোরে বলে যে "এই রকম ত সকলে বল্‌চে!" তখন আমরা আর কিছু বিচার করি নে, মনে করি "সকলে বোল্‌চে," এর চেয়ে সুদৃঢ় প্রমাণ আর কিছুই হোতে পারে না! কিন্তু এই "সকলে বোল্‌চে" কথাটি অত্যন্ত শূন্য-গর্ভ। একজন তোমাকে এসে বোল্লেন, সকলে বোল্‌চে অমুকে অমুক কাজ কোরেচে। সেখেনে "সকলে" অর্থে তিনি যে ব্যক্তির মুখে শুনেছেন, তুমি তাঁর ধুয়ো ধোরে আমাকে বোল্লে যে, সকলে অমুক কথা বোল্‌চে। আমি অকাতরে বিশ্বাস করি যে, যখন "সকলে বোল্‌চে" তখন অবিশ্যি সত্যি! আমাকে একজন এসে যদি জিজ্ঞাসা করে যে, "তুমি যে বোল্‌চ "সকলে বোল্‌চে," আচ্ছা, কে কে বোল্‌চে বল দেখি?" আমি ভেবে ভেবে এক জনের বেশী নাম কোর্‌তে পারিনে, অবশেষে অপ্রস্তুত হোয়ে আমি তোমাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি—"ওহে, কে কে বোল্‌চে বল দেখি?" তুমিও তথৈবচ। মূল অন্বেষণ কোর্ত্তে যতদূর পর্য্যন্ত যাওনা কেন, দেখ্‌বে তোমার চেয়ে এবিষয়ে কারু জ্ঞান অধিক নয়। "সকলে বোল্‌চে" কথাটা একটা সংক্রামক পীড়া। প্রথমতঃ এক জনের মুখ থেকে কথাটা বেরোয়, তা'র পরে দিবসান্তে সকলেরই মুখে শুন্‌তে পাবে "সকলে বোল্‌চে।" সকাল বেলায় যে কথাটি সম্পূর্ণ অলীক ছিল, সন্ধ্যে বেলায় সেটা সম্পূর্ণ সত্য হোয়ে দাঁড়ায়। আমি একটা বিশেষ নিয়ম কোরেছি যে, "সকলে বোল্‌চে" কথাটী যখনি শুনব, তখনি জিজ্ঞাসা কোর্‌ব "কে কে বোল্‌চে?"

শিক্ষিত ব্যক্তিরা যখন একটা নিন্দা শোনেন তখন অনেক রকম বিচার করেন। আমরা তিন রকম ব্যক্তির কাছে নিন্দা শুনি; (১) বিখ্যাত নিন্দুক, অর্থাৎ যাঁ'দের আমরা নিন্দুক বোলে জানি। (২) যাঁ'দের বিষয়ে আমরা কিছুই অবগত নই। (৩) যাদের আমরা সত্যবাদী বোলে জানি। প্রথমোক্ত ব্যক্তিদের মুখ থেকে যখন শিক্ষিত-মনা ব্যক্তি কোন নিন্দা শোনেন তখন তা' অবিশ্বাস কোর্ত্তে তাঁর বড় পরিশ্রম হয় না। দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তির মুখ থেকে যখন শোনেন তখন তাঁর একটা ভাবনা আসে; হয়ত মনে করেন যে, "এ লোকটার কথা অবিশ্বাস কর্ব্বার আমার কি অধিকার আছে?" কিন্তু এ ভাবনা কোন কাজের নয়, কেন না তখন আমাদের দুটো বিরোধী কর্ত্তব্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। আর এক জনের সচ্চরিত্রে অবিশ্বাস কর্ব্বার আমার কি অধিকার আছে? এ রকম অবস্থায় তিনি বিশ্বাসও করেন না, অবিশ্বাসও করেন না। বিশ্বাস ও অবিশ্বাস দুইয়েরি অধিকার-বহির্ভূত একটি দাঁড়াবার স্থান আছে। তিনি তখন সে নিন্দুককে বলেন যে, তোমার কথা সত্য হোতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ প্রমাণ না পাব ততক্ষণ তা' বিশ্বাস কোর্ব্বনা।" কিন্তু তৃতীয়োক্ত ব্যক্তির মুখে যখন তিনি নিন্দা শোনেন তখন তিনি যে

সকল যুক্তি অবলম্বন করেন সে বিষয় পরে বল্‌চি।

যা'কে তিনি নিন্দুক বোলে জানেন তা'র মুখ থেকে কোন নিন্দা শুন্‌লে তিনি এই সকল বিবেচনা করেন যে, "প্রথমতঃ এ-ব্যক্তির কোন অভিসন্ধি থাক্‌তে পারে, কিম্বা নিন্দার অভ্যাস থাকা বশতঃ নিন্দা কোর্‌চে। দ্বিতীয়তঃ. একটা সত্য কথার কিয়দংশ বাদ দিলে তা' মিথ্যে হোয়ে দাঁড়ায়; তুমি আমাকে এসে বোল্লে যে, অমুক মদ খেয়েছে, কিন্তু তুমি হয়ত বাদ দিলে যে, তা'কে ডাক্তারেরা মদ খেতে পরামর্শ দিয়েছিল; তুমি সত্য কথা বোল্লে বটে কিন্তু এ মিথ্যার রূপান্তর মাত্র, অতএব একটা কথার সমগ্র না শুন্‌লে সে বিষয়ে বিচার করা যায় না।

যাঁকে তিনি সত্যবাদী বোলে জানেন তাঁর কাছ থেকে যখন তিনি কোন নিন্দা শোনেন, তখন তিনি প্রথমতঃ মনে করেন, "ইনি হয়ত একটা গুজব শুনে তা'ই বিশ্বাস কোরেচেন। বিশ্বাস কর্ব্বার কি কারণ ছিল, জানিনা, কিন্তু হয়ত সে কারণ গুলি ভ্রমাত্মক।" দ্বিতীয়তঃ, ইনি হয়ত কতকগুলি কার্য্য দেখে একটা নিজের অনু-মান কোরে নিয়েছেন, সে কার্য্যগুলি সমস্ত সত্য হোতে পারে কিন্তু সে অনু-মানটা হয় তো সমস্তই অমূলক।" তৃতী-য়তঃ "তিনি হয়ত তাঁর নিজের কতক-গুলি বিশেষ সংস্কার বশতঃ একটা কাজ এমন খারাপ চক্ষে দেখ্‌চেন যে, তার তিল প্রমাণ দোষ স্বভাবতই তাঁর স্বমুখে তাল-প্রমাণ আকার ধারণ কোর্‌চে।" চতুর্থতঃ, অনেক সময় অনেক জিনিষ যা' আমাদের কল্পনায় সত্য বোলে প্রতি-ভাত হয়, তা' আসলে সত্য নয়। মনে কর, এক জন হিন্দু এক দিন রবিবারে গির্জ্জে দেখতে গিয়েছেন, সেই দিনকার বক্তৃতায় পাদ্রী সাহেব দৈবক্রমে Heathen দের বিরুদ্ধে দুই এক কথা উল্লেখ কো-রেছিলেন। সেই হিন্দু কল্পনা কোরলেন যে, পাদ্রী তাঁর প্রতি লক্ষ্য কোরেই ঐ বক্তৃতাটি করেন। এই কল্পনায় তাঁকে এমন অভিভূত কোরে তুল্লে যে, তাঁর মনে হোল, যেন, বক্তা একবার তাঁর দিকে বি-শেষ কোরে চেয়ে দেখ্‌লেন ও সেই সম-য়েই Heathen কথাটা বিশেষ জোর দিয়ে বল্লেন। সেই হিন্দুটি সত্যবাদী হোতে পারেন, পাদ্রী যে, সে দিন হীদেনদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা ক'রেছিলেন সে বিষয়ে আমি তিল মাত্র সন্দেহ করিনে, কিন্তু তিনি যে তাঁর দিকে চেয়ে হীদেন কথাটি বিশেষ জোর দিয়ে বোলেছিলেন, সে বিষয়ে আ-মার ঘোর সন্দেহ রোয়ে গেল! এই রকম কত শত বিচার কর্ব্বার জিনিষ রোয়েছে। আমার কাছে একবার একজন আমার এক পরিচিত ব্যক্তির নামে নিন্দা করেন, আমি তা' বিশ্বাস না করা'তে তিনি বলেন যে, তিনি সেই ব্যক্তির এক বাড়ির লো-কের কাছে শুনেছেন। আমি তাঁকে বল্লেম, "তা'তে বিশেষ কিছুই প্রমাণ হোচ্চে না। বাড়ির লোক বোলেছে বোলে বিশ্বাস কর্‌বার একটা প্রধান প্রমাণ

দেখাচ্ছ এই যে, বাড়ির লোক কখনো তা'র আত্মীয়ের নামে নিন্দা করে না। আচ্ছা ভাল। কিন্তু যখন দেখ্‌ছ, এক একটা "বাড়ির লোক" তার "বাড়ির লোকের" নামে নিন্দা কোরচে, তখন তার বাড়ির লোকত্ব পর-লোকত্ব প্রাপ্ত হোয়েছে! খুব সম্ভব, নিন্দিত ব্যক্তির সঙ্গে তা'র কোন কারণে মনান্তর হোয়েছে, তা' যদি হোয়ে থাকে তবে তা'র নামে অলীক অপবাদ রটা'তে আটক কি? বাড়ির লোক যখন তার আত্মীয়ের নিন্দা করে, তখন তাকে আমি সর্ব্বাপেক্ষা কম বিশ্বাস করি। অনেক লোক আছেন, তাঁরা পরের অনিষ্ট কোর্ব্বে বোলে নিন্দে করেন না। তাঁরা ভদ্রলোক, তাঁরা পরের মনে কষ্ট দিতে চান না। তাঁরা যখন নিন্দা করেন তখন তার ফল বিবেচনা কোরে দেখেন না। তাঁরা কৃষ্ণকান্ত বাবুর নামে একটা নিন্দা শুনেছেন, তাই জহরীলালের কাছে গল্প কোরে বোল্লেন "ওহে, শোনা গেল, কৃষ্ণকান্ত বাবু অমুক কাজ কোরেচেন।" জহরীলালের সঙ্গে কৃষ্ণকান্তের কোন আলাপ পরিচয় যোগাযোগ নেই, সুতরাং হঠাৎ তাঁদের মনে ঠেক্‌তে পারে না যে, এ নিন্দায় কোন দোষ আছে। দৈবক্রমে দূরতঃ তার একটা কুফল ঘোটতে পারে, তা' তাঁরা ভেবে উঠ্‌তে পারেন না। তা'ছাড়া অনাবশ্যক কারু নিন্দা কোর্ব্বে না, এমনো একটা নিয়ম তাঁরা বাঁধেন নি। যখন দশ জন বন্ধু দশ রকম কথা কোচ্চ, তখন জিব অত্যন্ত পিছল হোয়ে ওঠে, মনের কপাট আল্‌গা হোয়ে যায়, তখন বিশেষ একটা হানি না দেখ্‌লে একটা মজার কথা সাম্‌লে রাখা তাঁদের পক্ষে দায় হোয়ে ওঠে। তখন তাঁদের মনে করা উচিত যে, তাঁরা যদি শোনেন যে, নিতান্ত অপরিচিত রাস্তার লোকের কাছে এক জন তাঁদের নিন্দা কোরেছে, তা'হোলে তাঁরা রোষে একেবারে অধীর হোয়ে ওঠেন কি না? তখন তাঁরা কেন, মনকে বোঝান না যে, "আমরা কেইবা? আমাদের এক মুহূর্ত্তের একটা কাজ একটা মানুষ কতক্ষণই বা মনে রাখ্‌তে পার্ব্বে বল? আমরা আমাদের নিজের মনে সর্ব্বদাই এমন জাগ্রত রোয়েছি যে অন্য একটা অপরিচিত বা অল্প পরিচিত মানুষ আমাদের বিষয় কত কম ভাবে, তা' আমরা ঠিক মনে কোর্ত্তে পারি নে!" তখন তাঁরা কেন ভাবেন না যে, "এক জন অপরিচিত ব্যক্তি আমার দোষ জান্‌লেই বা তাতে কি ক্ষতি?"

খবর দেবার বাতিক অনেক লোকের আছে। একটা নতুন খবর দিতে পার্‌লে এক জন যত গর্ব্ব অনুভব করেন, এক জন লেখক তাঁর মনের মত রচনা শেষ কোরে ততটা অনুভব করেন না। খবর দেবার অতৃপ্ত পিপাসা তাঁদের একটা রোগ। এঁদের অনুগ্রহেই নিন্দার বাজারে যথেষ্ট মালের আমদানি হয়। এক জনের ঘরের খবর ফাঁকি দিয়ে জান্‌তে পার্‌লে লোকের ভারি আমোদ হয়। তুমি পর্দ্দার আড়ালে ঘোমটা নাচ্চো, তুমি মনে কোরচ আমি দেখতে পাচ্চি নে, অথচ আমি দেখে নিচ্চি

তাতে আমাদের অত্যন্ত তৃপ্তি হয়। একটা কাজ যতই দুর্জ্ঞেয় ও গোপনীয়, তা'র প্রকাশ বক্তার ও শ্রোতার মনে ততই আমোদ হয়। এক জন লোক একটা কোর্ত্তে গেল, কিন্তু আর একটা হোয়ে পোড়ল; সে মনে কোরচে এ কাজটা গোপন রইল, অথচ সেটা প্রকাশ হোয়ে পোড়ল, তা'তে আমাদের ভারি একটা মজা মনে হয়! হাস্য রসের বিষয়ে এমার্সণ্ বোলেছেন যে, "সমুদয় কৌতুক ও প্রহসনের মূল ও সার হচ্চে, উদ্দেশ্যের অসম্পূর্ণতা—যা' সিদ্ধ হ'বার কথা ছিল তা'র অসিদ্ধি; বিশেষত এক ব্যক্তি যখন সিদ্ধ হ'বার বিষয়ে উচ্চৈঃস্বরে আশা প্রকাশ কোর্‌চে তখন তা'র নিরাশ হওয়া। বুদ্ধির অসামর্থ্য, আশার হতসিদ্ধি, ও একটা কার্য্য-সূত্রের হঠাৎ মাঝখানে ছেদ হওয়ার নাম, comedy।" গুপ্ত নিন্দা শুন্‌তে আমাদের এই জন্যেই ভাল লাগে। একেত নিন্দা, তা'তে আবার গুপ্ত! এই জন্যেই যা'রা লোকের পরিবার সংক্রান্ত কোন খবর দিতে পারে, তা'রা আপনাকে কৃত-কৃতার্থ ও পূর্ব্ব জন্মের অনেক পুণ্যের অধিকারী মনে করে।

অনেকের বাড়িয়ে বলা স্বভাবসিদ্ধ। অনেক সময়ে তারা নিজে বুঝ্‌তে পারে না যে, তারা বাড়িয়ে বোল্‌চে। আমি জানি, গোবিন্দ বাবুর বাড়িয়ে বলা একটা বদ্ধমূল রোগ। তাঁতে আমাতে দুজনে মিলে যা' দেখেছি, তা'ও আমার সাক্ষাতেই আর এক জনের কাছে এমন বাড়িয়ে বলেন যে, আমি আশ্চর্য্য হোয়ে যাই। তিনি যা'কে পণ্ডিত বোলে প্রশংসা কোর্ত্তে চান, তা'কে বলেন তা'র মত পণ্ডিত ভারতবর্ষে নেই, এই রকম কোরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিনি নিদেন ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চাশ জনকে ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিতের যশ অর্পণ কোরেছেন। তাঁর প্রধান রোগ হোচ্চে (অনেক ঐতিহাসিকের এই রোগটি আছে।), যে একটা সত্য ঘটনা বলা তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য নয়, সেই কথাটি বোলে শ্রোতার মনে তাঁর অভিপ্রেত একটি ফল জন্মিয়ে দেওয়াই তাঁর মুখ্য অভিপ্রায়। যদি তিনি অসংলগ্ন দুই একটা কথা দৈবাৎ শুনতে পান, তা' হোলে নিজের ট্যাক থেকে দু চারটে কথা যোগ কোরে সেটা সংলগ্ন কোরে দেন, কেননা জানেন, নৈলে শ্রোতাদের মনে কোন ফল হবে না। যদি তিনি জানতে পারেন, একটা ঘটনা একটু মুচ্‌ড়ে, ইতস্ততঃ একটু ছেঁটে ছুঁটে দিলে শ্রোতাদের মনে অধিকতর ফল হবে, তা' হোলে সে পরিশ্রম-টুকু স্বীকার কোর্ত্তে তিনি কিছুমাত্র অসম্মত নন। সর্ব্বদাই তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলীকে হাঁ করিয়ে রাখা, তাঁর জীবনের প্রধান চেষ্টা। "ভয়ানক" "অসাধারণ" "আশ্চর্য্য", এই সকল বিশেষণে তাঁর তহবিল পূর্ণ রোয়েছে। এঁরা যে সকল নিন্দা ও মিথ্যে কথা বলেন, তার উদ্দেশ্য হোচ্চে, দশ জনকে তাক কোরে দেওয়া। এঁদের দল সংখ্যায় কম নয়।

এই রূপ যেমন নানা শ্রেণীর নিন্দুক

আছে, নিন্দা করবার প্রথাও তেমনি শত সহস্র। এক দল নিন্দুক আছে, নিন্দা করাই যে, তা'দের উদ্দেশ্য তা' স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু আর এক দল আছে, নিন্দা করা যেন তাদের বাসনা নয় এই রকম প্রকাশ পেতে থাকে। বলা বাহুল্য যে, শেষোক্ত দলই অধিকতর ফল-জনক। তাঁদের নিন্দা করবার পদ্ধতি নানাবিধ। তাঁদের নিন্দের দুচারটে নমুনা দিই।

অনেক সময়ে নীরবে নিন্দা করা যায়। পাঁচ জনে এক জনের খুব প্রশংসা কোরচে, তুমি সেখানে এমন রহস্যপূর্ণ ভাবে চুপ কোরে বোসে আছো, কিম্বা তোমার ঠোঁটের এক কোণে এমন এক রত্তি হাসি উঁকি মারচে, যে খানিক ক্ষণ তোমার এই রকম ভাবগতিক দেখে তা'দের মুখের কথা মুখে মোরে আসে, তা'রা মনে করে তুমি না জানি তা'র নামে কি একটা গুপ্ত সংবাদ জান, তোমাকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ কোরলে তুমি বল যে, "নাঃ, কিছু না।" এমন স্বরে বল যে, তার অর্থ এই হোয়ে দাঁড়ায় যে, "সে অনেক কথা!" আর এক রকম নিন্দে আছে, তা'কে বাজে নিন্দে বা উপরি নিন্দে বলা যেতে পারে। সে হোচ্চে, পাঁচ কথা বোলতে বোলতে এক কথা বলা। রামধন বাবুর কাল রাত্রে অত্যন্ত কাশী হোয়েছিল, এই গল্পটি বলবার সময় একটু সুবিধে, অবকাশ ও ছিদ্র পেলেই, সুদক্ষ নিন্দুক যেন বিশেষ কোন কথা-নয় এমনি ভাবে হরকুমার যে মদ-খায় সেই কথাটা সংক্ষেপে বোলে যান। গানের পক্ষে যেমন তান, গল্পের পক্ষে এরকম নিন্দাও তাই। যেমন গানের সুর ও তাল বজায় রেখে দুই একটা বাজে তান দিলে হানি নেই, গানের সুর বিগড়ে বা তাল মাটি কোরে একটা অসংলগ্ন তান দিলে শ্রোতাদের কানে ভাল শোনায় না, তেমনি গল্পের তাল বজায় রেখে ঠিক জায়গায় একটা উপরি কথা তুললে শ্রোতাদের মন্দ লাগে না; এরকম স্থলে বক্তার নিন্দুক বোলে বদনাম রটে না; মনে হয় পাঁচ কথা বোলতে এক কথা দৈবাৎ বেরিয়ে পোড়ল। যেকালে আছে, যে, এক এক জন বাজে কথায় চিঠি পূরিয়ে কাজের কথা পুনশ্চ নিবেদনের মধ্যে লেখেন। অনেক নিন্দুকও তাই করেন, সমস্ত কথার মধ্যে যে নিন্দাটা তাঁর বিশেষ বলা উদ্দেশ্য সেইটেকে তিনি এমন অপ্রাধান্য দিয়ে বলেন যে, মনে হয় যেন, সেটা বলবার জন্যে তাঁর বিশেষ মাথা-ব্যথা পড়েনি। আবার অনেকে ভান করেন যেন, দৈবাৎ তিনি এক কথা বোলে ফেল্লেন, আধ খানা বোলেই জিব কামড়ান. তার পরে পীড়াপীড়ির পর অতি আস্তে আস্তে সব বের কোরে ফেলেন। লোকে বোলবে তিনি ইচ্ছে কোরে পারত-পক্ষে কারু নিন্দে করেন নি। কেউ বা, যেন তিনি মনে কোরচেন যে তুমিত জানই, এমনি ভাবে তোমার কাছে একটা কথা বোলে ফেলেন; তার পরে যখন শোনেন যে, তুমি জানতে না, তখন ঘোরতর অনু-

তাপ আফশোষ কোর্ত্তে আরম্ভ করেন। আবার অনেকে নিন্দে করবার সময় এই রকম ভাব দেখান যে, যেন "সকলেই একথা জানে, তুমি জাননা, এভারি আশ্চর্য্য!" এ সকল নিন্দে নিন্দের নামে সংসারে গণ্য হয় না। সংসারে আর এক প্রকারের নিন্দা আছে, তা'কে আত্ম-নিন্দা বোলতে গেলে সকল সময়ে বিনয় বোঝায় না। অধিকাংশ আত্ম-নিন্দা গর্ব্ব থেকে উত্থিত হয়। তুমি সমস্ত সমাজকে উপেক্ষা কোরে বোলতে থাক যে, আমি পৃথিবীর নিন্দা গ্রাহ্য করিনে! আমি অমুক অমুক পাপাচরণ কোরেছি, এখন সমাজ! তুমি আমার কি কোর্ত্তে পার কর। সমাজের উপর মহা খাপা! কেন? না সমাজের শক্তি আছে বোলে। পাপাচরণ কোরলে সমাজ বলপূর্ব্বক শাসন করেন বোলে। সমাজের দুই একটি আদুরে ছেলে ছাড়া আর কেউ বিপথে গেলে সমাজ তাকে স্নেহের স্বরে উপদেশ দেন না, তা'কে কান ধোরে সিধা পথে আনেন। আদরের ও স্নেহের দানা দেখিয়ে তিনি ছিন্ন-রজ্জু ঘোড়াকে আস্তাবলে ফেরাতে চেষ্টা করেন না, তাঁর নিয়ম হোচ্চে চাবুকের ভয় দেখানো। কিন্তু এক একটা মানুষ আছে, যাদের মন্দ কাজ না কোর্ত্তে অনুরোধ কর, শুনবে, কিন্তু আদেশ কর, অমনি তা'র বিরুদ্ধে তারা কোমর বেঁধে দাঁড়াবে। আত্ম-নিন্দুক দলেরা অধিকাংশ এই শ্রেণীর লোক। বায়রণ তা'র একটি বিখ্যাত আদর্শ। পরনিন্দুকদের মত আত্ম-নিন্দুকদের সকল কথাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। আত্মনিন্দা যখন গর্ব্ব থেকে উত্থিত হোচ্চে, তখনো তা' অনেক পীড়াপীড়িতে দায়ে পোড়ে স্বীকার করা হয়, তখন যে তার অনেক কথা বাড়ানো থাকা সম্ভব, তা' বলাই বাহুল্য। এই রকম সমাজের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে তা'রা দুর্দ্দান্ত বলিষ্ঠ-হৃদয় লোক। কিন্তু একটা দেখা যায়, এক ব্যক্তির সমাজ বিদ্রোহিতা যতই বলবান হোক না কেন, তবু এতটুকু আত্মশ্লাঘা ও নিন্দা-ভীরুতা তার মনে অবশিষ্ট থাকবে যে, কতকগুলি ছোট-খাট দোষ সে সমাজের কাছে কোন মতেই প্রকাশ কোর্ত্তে রাজি হবে না। একজন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কোর্ত্তে পার্ব্বে যে, সে ডাকাতী কোরেছে, কিন্তু চুরী কোরেছে স্বীকার কোর্ত্তে সে কুণ্ঠিত হবে। কিন্তু এমন যদি কেউ থাকে যে, তার হৃদয়ের-বীভৎসতম স্থান পর্য্যন্ত লোকের চক্ষে অনাবৃত কোরে দিতে পারে, এমন কোন পাপ পৃথিবীতে নেই যা' সে প্রকাশ্য ভাবে আপনার স্কন্ধে না নিতে পারে, তবে সে নরকের এক খণ্ড। পাপ যে করে সে বিকৃত-চরিত্র, কিন্তু যে প্রকাশ্য ভাবে পাপ করে সে সে বিশেষণের অনধিকারী। আত্ম-নিন্দা ও বিনয় কেউ যেন এক পদার্থ মনে না করেন। বাঙ্গলা এক মহাকাব্যে মহাকবি রামের মুখে অনেক স্থলে "ভিখারী" বোলে আত্মপরিচয় বসিয়েছেন। যেমন "ভিখারী রাঘব; দূতি, বিদিত জগতে!" বোধ হয় কবি রামকে বিনয়ী কর্‌বার অভিলাষে

এই রকম কোরে থাক্‌বেন, কিন্তু আমরা একে বিনয় বোল্‌তে পারিনে। "আমি দরিদ্র" একথা বিনয়ে বলা যেতে পারে, কিন্তু আমি ভিক্ষা কোরে জীবিকা নির্ব্বাহ করি একথা বিনয়ের কথা নয়। দারিদ্র্য দোষের নয়, কিন্তু পরমুখাপেক্ষী হোয়ে ভিক্ষা কোরে জীবন ধারণ কর্ব্বার রুচি মনের একটা বিকৃত অবস্থা। কেউ কখনো আমি মিথ্যাবাদী বা আমি জুয়াচোর বোলে বিনয় প্রকাশ করে না।

আত্ম-নিন্দার ছলে অনেক সময়ে আমারা আত্ম-প্রশংসা করি। একজন নানা প্রকার ভূমিকা ক'রে বোল্লেন, যে "দেখুন মহাশয়, আমার একটা ভারি দোষ আছে, আমি তা' কোন মতেই ছাড়াতে পারিনে, আমার যা' মনে আসে আমি তা' স্পষ্ট না বোলে থাকতে পারিনে, আমি যা' বলি তা' মুখের সামনে বলি।" এ'কে বিনীত ভাবে অহঙ্কার করা বলে।

আমরা আর এক সময়ে আত্ম-নিন্দা করি। আমরা যখন মনে মনে জানি আমাদের একটা গুণ আছে, আমরা তখন কখনো কখনো আমাদের সেই গুণ নেই বোলে বাইরে প্রকাশ করি; তা'র তাৎপর্য্য এই যে শ্রোতা আমার কথার বিরুদ্ধে নিজের মত ব্যক্ত করুক, সেইটে আমাদের শোনবার ইচ্ছে। আমরা এক এক জনকে দেখেছি, তাঁ'রা বন্ধু-মণ্ডলীতে "লোকটা ত বড় খে লাখালা!" এই প্রশংসাটুকু পাবার জন্য আপনার কতকগুলি ছোটখাটো দোষের কথা হাস্‌তে হাস্‌তে উল্লেখ করেন, তাঁর নিন্দার মূল্যে প্রশংসা ক্রয় কোর্ত্তে চান।

এই রকম যত আত্ম-নিন্দা দেখ্‌বে, প্রায় দেখবে যে, বিনয়ের জমী থেকে তা'র চারা ওঠেনি। গর্ব্বই তার মূল। পর-নিন্দার মূলেও গর্ব্ব, আত্ম নিন্দার মূলেও গর্ব্ব। পরনিন্দাও যেমন দোষ, আত্ম নিন্দাও তেমনি। পরহত্যা ও আত্মহত্যার মধ্যে নীতিশাস্ত্রে যেমন কম তফাৎ দেখে, পরনিন্দা ও আত্ম-নিন্দার মধ্যেও তাই।

প্রতিমা বিসর্জ্জন।

সখি রে! আবার তারে কেন বল দেখিনু!
কেন রে আপনা ভুলে, চঞ্চল আঁখিটি তুলে,
আবার সে মুখ পানে চমকিয়ে চাহিনু?
না বুঝিয়ে, না ভাবিয়ে কেন পুনঃ দেখিনু!

বিষাদ-আনত মুখে, দুটি হাত দিয়ে বুকে,
উদাসীর ঘোর ব্রত যারি তরে করিনু—
মরমের প্রেমোচ্ছ্বাস, সুখের সাধের আশ,
মরম-অতলস্পর্শে আটকিয়ে রাখিনু—

কঠোর প্রতিজ্ঞা ভরে, সখীরে যাহারি তরে,
নয়ন-লহরী-উৎস পাথরেতে চাপিনু—
কিছুই না করি ভয়, গভীর যাতনাময়—
বৈরাগ্য-সাগর-গর্ভে অনায়াসে ঝাঁপিনু,
আবার কেন লো সখি, পুনঃ তাঁরে দেখিনু—
আবার সে মুখ-পানে কেন ফিরে চাহিনু ?
দেখিয়াই সখি ওলো, পলকেই একি হ'ল,
পলকেই হৃদি প্রাণ সিহরিল কেন লো,
মরমের স্তরে স্তরে, কাঁপিয়া উঠিল যে রে
অচল অটল গিরি ভূকম্পনে যেন লো,
অশ্রু উৎস পরকাশি, পড়িল পাথর খসি
না মানি বারণ বাধা, সে লহরী ছুটিল,
গণ্ড দেশ ভাসাইয়ে, বক্ষঃস্থল ভিজাইয়ে
অধীর উত্তপ্ত স্রোতে মহীতল প্লাবিল—
সখি রে, প্রতিজ্ঞা মম, অনলে তৃণের সম,
ছাই ভস্ম হ'য়ে বুঝি গেল ওলো গেল লো,
ওই রে পলক তরে, সে চারু চন্দ্রমা হেরে,
বৈরাগ্যেরি ব্রত বুঝি উদ্‌যাপন হ'ল লো !
হ'ক না তা উদযাপন, কেনই সে দৃঢ় পণ,
কেনই পরাণ মন পাথরেতে বাঁধিব ?
যাক্ সে কঠোর ব্রত—শ্মশানেতে পরিণত
মানস-কুসুমকুঞ্জ কেনই বা করিব ?
চন্দ্র হাসে, তারা হাসে,হাসি সূর্য্য পরকাশে,
হাসিয়ে কুসুম-কলি কত ভাবে ফুটিছে,
জগৎ সুষমাময়, মাতিয়ে মলয় বয়,
হরষে তরঙ্গ তুলি, তরঙ্গিণী ছুটিছে,
আমি তবে কি লাগিয়ে, সুখ সাধ পাসরিয়ে
অনন্ত বিষাদ অসি মরমেতে হানিব ?
বজ্র-দগ্ধ তরু প্রায়, অঙ্গার আকীর্ণ গায়,
প্রান্তরের এক ধারে শূন্য ভাবে রহিব ?
—কখনো কখনো নয়, বিসর্জ্জিব সমুদয়
তবুও তাহারে ভুলে কখনো না থাকিব.
কিসেরি প্রতিজ্ঞা ব্রত ? উন্মত্ত প্রলাপ যত,—
আমি তার সে আমার তাই ভেবে রহিব,
শুখায়ে সজল আঁখি, মরমে মরম ঢাকি
প্রকাশ্যে পাথর মূর্ত্তি হোয়ে দিন কাটাব,
প্রণয়ের কথা গুলি, হৃদয়ে রাখিব তুলি
মরম নিভৃত-কুঞ্জে ধ্যানে তাই ভাবিব—
চন্দ্রমা-তারকা পরে, সে প্রতিমা স্তরে স্তরে
স্বপ্নময় কল্পনার জোছনাতে আঁকিব,
প্রদোষ-জলদ মাঝে, হেরিব সে মূর্ত্তি রাজে
আবার নয়ন মুদি যোগে তারে জপিব !

* * * *
* * * *

আবার আবার ওই উন্মত্ত বাসনা ?
আবার আবার কিরে, ফিরে ঘুরে ঘুরে ফিরে
পড়িব অনল কুণ্ডে সহিতে যাতনা ?
যাক্ প্রেম রসাতল, ভস্ম হোক মর্ম্মস্থল,
ভালবাসা সুখ-আশা কায কি আমার ?
অদৃষ্ট, অদৃষ্ট ওরে, বল দেখি তুই মোরে
সাজে কি আমার আর সাধের বিকার ?
না হইতে আশা পূর্ণ, ছিন্ন ভিন্ন চূর্ণ চূর্ণ
হয় নে কি হৃদি মোর বজ্র ভীম বলে ?
তুই (ও) কি যাতনা মম, নেহারি পিশাচ সম
হাসিস্ নে উচ্চ হাসি দাঁড়ায়ে বিরলে ।
তুই (ও) কি ঈর্ষার ভরে, কুটিল কুচক্র ক'রে
আশার আলেয়া আলো সম্মুখেতে এনে—
প্রলোভনে প্রলোভনে, আকর্ষিয়ে প্রতিক্ষণে
নিরাশা-গরল হ্রদে ফেলিস্‌নে টেনে ?
তুই কি মরুর পরে মরীচিকা রূপ ধরে
আগ্নেয় বালুকা গর্ভে করিস্‌নে পাৎ ?
তুই কি আমার, হায়, (প্রলয় ঝটিকা প্রায়)

করিস্ নে আশালতা ভূমে ভূমিসাৎ!
মিছে তবে কেন আর সে যাতনা সহিব,
অনন্ত অনল কুণ্ডে কেন মিছে পুড়িব,
সাধ কোরে আপনার কেন চিতা সাজাব,
মরমের শিরে শিরে কেন বিষ মাখাব?
কঠোর বৈরাগ্য ব্রতে পুনঃ মন বাঁধিব,
আঁখি অশ্রু ফেলে যদি—আঁখি ছিঁড়ে ফেলিব,
থাকে প্রাণ, থাক্ প্রাণ, প্রাণ-আশা ত্যেজিব,
বিদায় সুখের কাছে জন্ম শোধ লইনু
সাধের প্রতিমা আজ বিসর্জ্জন করিনু!

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

অবসর-সরোজিনী—কাব্য, দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত। আলবাট প্রেস। মূল্য ১া০ আনা।

শুনিতে পাই, আমাদের গত বারের সমালোচনায় গ্রন্থকার মহাশয়ের সুক্ষ্ম শরীরে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে—এবং সেই বেদনায় অস্থির হইয়া তাঁহার লেখনীপুচ্ছ প্রচণ্ডভাবে আস্ফালন করিতেছেন, কিন্তু গ্রন্থকার মহাশয় আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন—অনর্থক তাঁহার মনে কষ্ট দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। সত্যের অনুরোধে—কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমরা দুই চারিটি কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আর একটি কথা, গ্রন্থকার হইলে অনেক সহ্য করিতে হয়—অত সুক্ষ্মচর্ম্মী হইলে চলে না। যাহোক এবার গ্রন্থকার মহাশয়ের সুরুচির নমুনা স্বরূপ একটি স্থল উদ্ধৃত করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইব।

"জলদে-বিজলী" নামক প্রবন্ধে লিখিতেছেন,

"প্রাণময়ী কাছে এল হৃদয় জুড়ায়ে গেল,
হৃদয়ে বসিল মোর হৃদয়ের ধন!
* * * * *
সে আমার হৃদি পরে, আমি তার হৃদি ধ'রে,
নয়ন যুগল মুদি হয়েছি তন্ময়।"

নব-প্রবন্ধ—শ্রীব্রজনাথ বিশ্বাস প্রণীত। ভারত-মিহির যন্ত্র। মূল্য ৸০ আনা।

এই গদ্য গ্রন্থ খানি সাহিত্য-সমাজের আদরণীয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধ গুলি যেমন সরল ও সুন্দর ভাষায় লিখিত, ভাব গুলিও তেমনি গভীর ও প্রীতিপদ। আমাদের বোধ হয় ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পক্ষে এই পুস্তক খানি উপযুক্ত।

উদয়নাচার্য্য।

বান্ধবের এক জন লেখকের কথায় জানা যায়, কুলশাস্ত্রবিশারদ উদয়ন ও কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা উদয়ন এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। কেননা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাউএল সাহেবের মতে কুসুমাঞ্জলিপ্রণেতা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। বান্ধবের লেখক বলেন বারেন্দ্র কাশ্যপ ভাদুড়ী কুলশাস্ত্রবিশারদ উদয়নাচার্য্য [illegible]৩ শকের (১১৭২ খৃষ্টাব্দের) সমকালে বর্ত্তমান থাকিয়া বারেন্দ্রকুলে পরিবর্ত্ত-মর্য্যাদা স্থাপন করেন (৪৬) ইহাতে বোধ হয় বান্ধবের লেখকেরও বিশ্বাস কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা ও কুলশাস্ত্র-ধাতা—এ উভয় উদয়নাচার্য্যই অভিন্ন ব্যক্তি ও এক সময়ের লোক। কেননা তাঁহার প্রবন্ধটী সম্বন্ধ-নির্ণয়ের সমালোচনের জন্য লেখা হইয়াছে, তিনি সম্বন্ধ-নির্ণয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষেরও প্রতিবাদ করিয়াছেন। সম্বন্ধনির্ণয়-প্রণেতা উভয় উদয়নাচার্য্যকে অভিন্ন বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, একথায় যদি তাঁহার কোন সন্দেহ থাকিত তবে তিনি অবশ্য উহার ও প্রতিবাদ করিতেন।

বঙ্গদর্শনের সম্পাদক কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা উদয়নাচার্য্যকে বঙ্গদেশবাসী বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। (৪৭)

আমরাও নিম্নলিখিত যুক্তির বলে বারেন্দ্র কুলের কাশ্যপ গোত্রীয় উদয়নাচার্য্যকে সমসাময়িক লোক দেখিতেছি:—

(১) সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কুল্লূক ভট্টের নাম উল্লেখ করিয়াছেন(৪৮) রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। কুল্লূক ভট্টের লিখানুসারে জানা যায়, তিনি বল্লালসেনের উত্তরবর্ত্তী ছিলেন (৪৯)। প্রাচীন প্রথা অনুসারে যদি কুল্লূকভট্টকে বল্লালের পরে ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের তিন শত বৎসরের পূর্ব্বের লোক বলি তবে বোধ হয় বড় দোষ হয় না। এমত হইলে কুল্লূকভট্ট খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। সম্বন্ধ-

---

৪৬ "বান্ধব" তৃতীয় খণ্ড ৩৮১ পৃষ্ঠা।

৪৭ বঙ্গদর্শন, তৃতীয় খণ্ড ৪৮৮ পৃষ্ঠা।

৪৮ রঘুনন্দন কৃত উদ্বাহ তত্ত্বে কন্যাদান প্রকরণ দেখ।

৪৯ গৌড়ে নন্দনবাসি নাম্নি সুজনৈর্বন্দ্যে বরেন্দ্র্যাংকুলে শ্রীমদ্ভট্টদিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্লূকভট্টোঽভবৎ॥ কাশ্যামুত্তরবাহিজহ্নুতনয়াতীরে সমং পণ্ডিতৈঃ॥ মীমাংসে বহুসেবিতাসি সুহৃদস্তর্কাঃ সমস্তাঃস্থ মে॥ বেদান্তাঃ পরমাত্মবোধগুরবো যূয়ং ময়োপাসিতাঃ। জাতা ব্যাকরণানি বালসখিতা যুষ্মাভিরভ্যর্থয়ে॥ প্রাপ্তোঽয়ং সময়োমনুক্ত বিবৃতৌ সাহায্য মালম্ব্যতাং॥

কুল্লূক ভট্ট।

নির্ণয় কুল্লূকভট্টকে ত্রয়োদশ শকের লোক মনে করেন; কিন্তু প্রমাণ নাই;—বান্ধবের লেখক উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীকে ১১৭২ খৃষ্টাব্দের লোক বলিয়াছেন এবং কুল্লূকভট্টকে তাহার সমসাময়িক লোক বলিয়াছেন সুতরাং তাঁহারও এই মত। কুল্লূকভট্ট উদয়নাচার্য্যের সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধীয় সহকারী ছিলেন সুতরাং সাময়িক লোক। কাউয়েলের মতে কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতাও দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। সুতরাং যখন এই উভয় উদয়নাচার্য্য এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তখন উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি হইলে আশ্চর্য্য কি?

(২) খল্লির ভট্টাচার্য্যদের বংশাবলী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, কুলশাস্ত্র-বিশারদ উদয়নাচার্য্য হইতে তৎ-কুলসম্ভূত বর্ত্তমান অধস্তন পুরুষ পর্য্যন্ত ২০ পুরুষ হইয়াছে (৫০) যদি উদয়নাচার্য্যকে খ্রীঃদ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক বলা যায়, তবে তদ্বংশীয় প্রত্যেক পুরুষের জীবিত কাল গড় পরতা ৩৪½ বৎসর ধরিতে হয়। খল্লির ভট্টাচার্য্যদের-ন্যায় সবল, দীর্ঘায়ুও বয়োধিক পরিণত বংশ সম্বন্ধে গড় হিসাবে ৩৪½ বৎসর

(৫০) আদি পুরুষ।
১ উদয়নাচার্য্য।
২ পশুপতি আচার্য্য।
৩ যগাই আচার্য্য।
৪ টীকাই আচার্য্য।
৫ বলাই আচার্য্য।
৬ হেরম্ব আচার্য্য।
৭ সহস্রাক্ষ আচার্য্য।
৮ রামানন্দ আচার্য্য।
৯ শ্রীরাম ভট্টাচার্য্য।
১০ বীরেশ্বর তর্কালঙ্কার।
১১ জয়হরি পঞ্চানন।
১২ রামচন্দ্র তর্কবাগীশ।
১৩ হরিনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার।
১৪ রামজীবন তর্কসিদ্ধান্ত।
১৫ রামকিশোর ভট্টাচার্য্য।
১৬ ভুবনমোহন তর্কভূষণ।
ইত্যাদি ২০ পুরুষ।

আমরা উদয়নাচার্য্য হইতে একটী বংশাবলীর এক শাখা মাত্র প্রদান করিলাম। উদয়নাচার্য্যের ছয় পুত্রের মধ্যে পশুপতি আচার্য্য কুলশ্রেষ্ঠ, আর পাঁচটী পতিত। কুলশাস্ত্রবিশারদ উদয়নাচার্য্যের অধঃস্তন পুরুষগণ এখন নিম্নলিখিত স্থান সমূহে অবস্থিতি করিতেছেন;—রাজসাহী জিলায়;—তাহিরপুরের রাজবংশ। হলিদা কুসুমীর ভাদুড়ী, হরীশপুরের খাঁ। ময়মনসিংহ জিলায়—সুসঙ্গের সিংহবংশ, মুক্তাগাছা। ঢাকা জিলায়—খল্লি। পাবনা জিলায়—বাজলা, ঝাইকান্দা, তারজা বাগমারা নাকালিয়া ইত্যাদি *। সুসঙ্গের মহারাজা প্রভৃতি এখন উদয়নাচার্য্যের বংশে কুলশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত।

* এই সকল স্থান ব্যতীতও অনেক স্থানে উদয়নের সন্তানগণ অবস্থিতি করিতেছেন।

(৫১) জীবন কাল হওয়া একটুকু আশ্চর্য্য নহে। উদয়নাচার্য্যের বংশাবলীতে অন্যান্য স্থানের কোন শাখায় ২৩ পুরুষ হইয়াছে; তাহা হইলে সেই শাখায় জীবন কাল প্রত্যেক পুরুষে গড় হিসাবে ২৯½ বৎসর হইয়াছে। সুতরাং ভাদুড়ী বংশীয় উদয়নাচার্য্যের বংশাবলী অনুসারে ও তাঁহাকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক বলিলে দোষ হয় না। ইনি এবং কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা যে এক সময়ে বর্ত্তমান, এ যুক্তিও তাহা বলিয়া দিতেছে সুতরাং ইহাদের উভয়কে অভিন্ন ব্যক্তি বলিলে তাহা অস্বাভাবিক হয় না।

(৩য়) ভট্টরাঘব নামক এক ব্যক্তি তাঁহার "ন্যায়সার বিজয়" গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্যের গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভট্টরাঘব ১২৫২ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। (৫২) ত্রয়োদশ শতাব্দির মধ্য ভাগের লোক দ্বাদশ শতাব্দির শেষভাগের লোক উদয়নাচার্য্যের গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। এ প্রমাণেও কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা ও কুল-শাস্ত্র-বিশারদ উদয়নাচার্য্যকে পৃথক সময়ের লোক বোধ হয় না।

যখন লৌকিক বিশ্বাস কিংবদন্তী যুক্তি ও সময় এ সকল দ্বারা দেখা যাইতেছে যে কুসুমাঞ্জলিপ্রণেতা উদয়নাচার্য্য এবং বারেন্দ্র কুলের কাশ্যপ গোত্রীয় কুল-শাস্ত্রধাতা পণ্ডিতসিংহ উদয়নাচার্য্যকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিলে কোন দোষ হয় না তখন আমরা অসন্দিগ্ধ চিত্তে বলিতেছি ইহারা উভয়ে অভিন্ন লোক ও খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। কেন না যে কুলশাস্ত্রবিধাতা অসামান্য বিদ্যাবত্তা ও অলৌকিক প্রতিভা-বলে সমাজ-নীতিতে সমস্ত বারেন্দ্র সমাজের নরেন্দ্র হইয়া ছিলেন, যাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যে ও অলৌকিক গুণে মোহিত হইয়া কুল্লুকভট্টের ন্যায় ভারতবিখ্যাত শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত-মণ্ডলী ও যাঁহার শক্তি সমর্থন জন্য সহকারিতা স্বীকার করিয়া ছিলেন সেই গৌতমকল্প উদয়নাচার্য্য যে কুসুমাঞ্জলি প্রণয়ন করিবেন তাহাতে আমরা এক টুকও আশ্চর্য্য হই না। আমাদের বিবেচনায় তিনিই ইহার উপযুক্ত পাত্র।

আমরা ভাণ্ডার বুলার রামদাস বাবু প্রভৃতির মত সমর্থন করিয়া খণ্ডনখণ্ড খাদ্য প্রণেতা শ্রীহর্ষকে খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক বলিয়াছি এখন উদয়নাচার্য্যকেও খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দির

---

৫১ ন্যূনকল্পে ১৬ বৎসর ও উর্দ্ধে ৩০ বৎসর প্রত্যেক পুরুষের গড় হিসাবে জীবন কাল ধরিবার প্রথা দেখা যায় কিন্তু এরূপ গণনা অনেক স্থলেই প্রমাদ-রহিত হয় না। গতিকেই আমরা এই সিদ্ধান্তকে বেদবাক্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। আমরা উদয়নাচার্য্যের বংশেই দেখিতেছি এক শাখায় গড় হিসাবে ৩৪½ বৎসর হইল অন্য শাখায় ২৯ বৎসর হইল। অন্যান্য বংশাবলী পর্য্যালোচনা করিলে ইহা হইতেও কম হইবার সম্ভব।

(৫২) Dr. Hall's Catalogue P. 26.

শেষ ভাগের লোক বলিলাম। কেহ মনে করিতে পারেন যখন শ্রীহর্ষ খণ্ডন গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যের কুসুমাঞ্জলির শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তখন উদয়ন তাহা অপেক্ষা অবশ্যই পূর্ব্ব সাময়িক লোক। এ কথায় আমরা এইমাত্র বলিব উদয়নাচার্য্য ও নৈষধকার শ্রীহর্ষ ঠিক এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন; তবে উদয়নের কুসুমাঞ্জলি শ্রীহর্ষের গ্রন্থাদির কিছু পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। যদিও লোকে সমকালবর্ত্তী লোকের লিখিত বিষয় উদ্ধৃত করিতে কিছু সঙ্কুচিত হয় তথাচ যে উদয়নাচার্য্যের শক্তিতে তৎকালিন সমাজ পরিচালিত হইত—যিনি সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে মহারাজ হইতেও অধিক ক্ষমতাবান ছিলেন, যাঁহার সমাজ-নীতিজ্ঞতা, অগাধ বিদ্যা, অলৌকিক প্রতিভা এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্যে বিমোহিত হইয়া শীর্ষস্থানীয় সুধীন্দ্রমণ্ডলীও পরম মান্য করিতেন সেই ঋষিকল্প উদয়নাচার্য্যের গ্রন্থের বিষয় তৎসাময়িক লোকেরা উদ্ধৃত করাতে অপমানিত হওয়া দূরে থাকুক আপনাকে আরো সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিতেন। আমরাও বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাত্মাদের লিখিত বিষয় পরম সমাদরে গ্রহণ করিতে পারি কিন্তু কোন ক্ষুদ্র লেখকের লেখা উদ্ধৃত করিতে সঙ্কুচিত হই। সুতরাং খণ্ডনখণ্ডখাদ্যপ্রণেতা শ্রীহর্ষ দূরবাসী হইলেও সমাজপূজনীয় দেশবিখ্যাত বুধকেশরী উদয়নাচার্য্যের গ্রন্থের শ্লোক উদ্ধৃত করিবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। কেননা উদয়নাচার্য্য যেরূপ দেশবিখ্যাত ছিলেন তাহাতে তাঁহার গ্রন্থ দেশমধ্যে প্রচারিত হইতে একটুকও বিলম্ব হয় নাই। অদ্য একজন প্রসিদ্ধ লোকের, যে গ্রন্থ খানি প্রচারিত হইতে ৫ বৎসর লাগে উদয়নাচার্য্যের ন্যায় সমাজ-বিখ্যাত লোকের সেইরূপ এক খানি গ্রন্থ প্রচারিত হইতে পাঁচ বৎসর লাগে কিনা সন্দেহ।

বাস্তবিক উদয়নাচার্য্য খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক তাহার কোন সন্দেহ নাই। কাউয়েল যে কথাটী সন্দেহ করিয়া বলিয়াছিলেন এখন আমরা দেখিতেছি তাহা প্রায় ঠিক। যদিও মাধবাচার্য্যের কথা প্রমাণ-রহিত না কিন্তু এখন দেখা যায় যে শ্রীহর্ষ ও উদয়ন আর ময়ূর ও বাণ ইহারা দুই জন করিয়া এক এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

পাঠকগণ দেখুন আমরা যদি পূর্ব্বে শ্রীহর্ষের একটী সময় নির্ণয় না করিয়া লইতাম তবে তাঁহাকে উদয়নের সমকালবর্ত্তী করিবার জন্য আবার কত কথা বলিতে হইত, সেকথা না বলিলেই চলিত না। উদয়নাচার্য্য দুইবার পাণিগ্রহণ করেন। প্রথম পক্ষে উমাপতি, ভূপতি, ভবানীপতি এবং রুদ্রপতি এই চারি পুত্র হয়। দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ব্ভে পশুপতি নামে এক পুত্র জন্মে সুতরাং উদয়নাচার্য্যের পাঁচ পুত্র ছিল (৫৩) উদয়নাচার্য্যের লীলাবতী

(৫৩) বান্ধবের লেখক ছয় পুত্রের কথা বলিয়াছেন অথচ পাঁচপুত্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

নাম্নী এক কন্যা ছিল। ঘটককারিকার মতে উদয়ন প্রথম পক্ষের চারি পুত্রকে উপেক্ষা করেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র পশুপতিকে কুলশ্রেষ্ঠ করিয়া যান।

উদয়নাচার্য্যের লীলাবতী নাম্নী কন্যাকে বল্লভাচার্য্য বিবাহ করেন। এই লীলাবতী পরম বিদ্যাবতী ছিলেন। কথিত আছে তিনি পতিশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া অশ্রু-মসী দ্বারা করুণ রসাশ্রিত এক সংস্কৃত কবিতা গ্রন্থ লিখেন। শুনা যায় ঐ গ্রন্থের অনুলিপি এখনো খল্লির ভট্টাচার্য্যদের নিকট আছে।

সম্বন্ধনির্ণয়ের মতে উদয়নাচার্য্যের নিবাস রাজসাহীর অন্তর্গত নিশিন্দা গ্রামে ছিল। আবার খল্লির ভট্টাচার্য্যেরা বলিয়া থাকেন মাণিকগঞ্জ বিভাগের অন্তর্গত বালীয়াটী গ্রামে উদয়নাচার্য্যের নিবাস ছিল, ঐ গ্রামে এখনো একটী উচ্চ স্থান আছে লোকে উহাকে "ভাদুড়ীর ভিটা!" বলে ভৌগোলিক চক্ষে দেখিলে মাণিক গঞ্জ অঞ্চলকে ৪। ৫ শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী স্থান বলা যায় না, প্রাচীন মানচিত্র দেখিলে দেখা যায় ঐ স্থানটী বিল ও নদীর সমষ্টি মাত্র তবে সাভার ভাওয়াল প্রভৃতি স্থান অনেক প্রাচীন। সাভারের নিকট অরণ্যমধ্যে একটী পুরীর চিহ্ন পাওয়া যায়, তথায় স্থানে স্থানে অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, লোকে উহাকে রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুরী বলিয়া থাকে, এরূপ জনপ্রবাদ আছে, ঐ সকল স্থানে পূর্ব্বে দেবাসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল। সে যাহা হউক এখন কথা এই যদি সাভার প্রভৃতি স্থানে উদয়নাচার্য্যের নিবাস হইত, তবে আমরা একথা অনেক বিশ্বাস করিতে পারিতাম। কিন্তু বালীয়াটী যে উদয়নাচার্য্যের নিবাস ছিল আমরা একথা একটুকও বিশ্বাস করি না; তবে এই হইতে পারে উদয়নাচার্য্যের বংশধর কোন পুরুষ প্রথম আসিয়া বালীয়াটী নিবাস স্থাপন করেন পশ্চাৎ তথা হইতে ক্রমে খল্লি গিয়াছেন এই জন্য তাহাদিগকে "বাল্লীয়াটীর ভাদুড়ী" বলে। উদয়নাচার্য্যের নিবাস যে রাজসাহীর অন্তর্গত নিশিন্দা গ্রামে ছিল এই কথাই অধিক প্রত্যয় হয়।

সম্বন্ধনির্ণয় উদয়নাচার্য্য সম্বন্ধে কতক গুলি ভ্রম করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে এসম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহার স্থূল মর্ম্ম এই;—শান্তিপুর নিবাসী নৃসিংহ লাহুড়ীর কন্যা মধু মৈত্রেয় বিবাহ করেন। তন্নিবন্ধন তিনি সমাজচ্যুত হয়েন। এই কথা রাজা কংশনারায়ণের কর্ণগোচর হয়। তিনি ইহা শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ উদয়নাচার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার সাহায্যে মধুমৈত্রেয়ের কুল রক্ষা করেন এবং স্বেচ্ছাক্রমে নিজকন্যা মধুমৈত্রকে সমর্পন করিয়া কুলীন হইতে শ্রোত্রিয় শ্রেণীতে অবতরণ করিলেন। এদিকে উদয়নাচার্য্যও তাঁহার কন্যা লীলাবতীকে মণ্ডনমিশ্রের সহিত বিবাহ দেন। মণ্ডনমিশ্র জলবিন্দুস্পর্শে ছিটকাপ হয়েন। এই লীলাবতীর গর্ব্ভে উমাপতি, ভূপতি, ভবানীপতি, রুদ্রপতি, এবং পশুপতি এই পাঁচ পুত্র হয়। (৫৫)

(৫৫) সম্বন্ধনির্ণয় ২৩৪। ২৩৫। ২৩৬।

এ কথায় বান্ধবের লেখক এইরূপ উত্তর দিয়াছেন।

প্রথম রাজা কংশনারায়ণ এবং উদয়নাচার্য্য এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন না। উদয়নাচার্য্য ১২৫০শকের সমকালে বর্ত্তমান থাকিয়া বারেন্দ্র কুলে পরিবর্ত্ত-মর্য্যাদা স্থাপন করেন। উদয়নের অধস্তন নবম পুরুষ কৃষ্ণভাদুড়ী (৫৬)। এই কৃষ্ণ ভাদুড়ী কংশনারায়ণের ভগিনীকে বিবাহ করেন। পক্ষান্তরে মধুমৈত্রের অধস্তন ৫ম পুরুষ-জাত দুর্ল্লভ মৈত্র কংশনারায়ণের সমসাময়িক। উদয়ন এবং কুল্লুক ভট্ট উভয়ে সমসাময়িক ***** কুল্লুক ভট্টের ভ্রাতা পুরুষোত্তম বৈদান্তিকের বংশে অধস্তন ১০ কি ১১ পুরুষে রাজা কংশনারায়ণের জন্ম হইয়াছিল।

*** উদয়নাচার্য্য লাহুড়ি-কুলোদ্ভব বল্লভাচার্য্যকে লীলাবতী নাম্নী কন্যা সমর্পন করেন। ভূপতি ভবানীপতি রুদ্রাণীপতি গৌরীপতি ও উমাপতি এই ছয় জন উদয়নাচার্য্যের পুত্র, দৌহিত্র নহে।

বান্ধবের এই লেখকের যুক্তি ঠিক হইয়াছে। কিন্তু বিষয়গত কিছু ভ্রম আছে। তিনি উদয়নাচার্য্যের ছয় পুত্রের কথা লিখিলেন কিন্তু পাঁচটীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ হয় পশুপতির নামটী ভ্রমক্রমে লিখেন নাই। এইরূপ আরও দুই একটী ভ্রম আছে কিন্তু আমাদের তাহা উল্লেখ করিয়া বিশেষ ফল নাই।

কুলীনের সহিত কুলীনের অথবা কাপের সহিত কাপের সম্বন্ধ বন্ধন কালে উভয় পক্ষে কুশময়ী কন্যার আদান প্রদান বিষয়ক মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক যে বাগ্‌দান হয় তাহার নাম "করণ"। সম্বন্ধ নির্ণয়ের মতে এই করণের সৃষ্টি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ কুলজ্ঞ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। (৫৭)

কেহ বলিয়া থাকেন পঞ্জাব দেশে উদয়নাচার্য্যের একটী সমাধিমন্দির আছে; কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ যদি থাকিত তাহা অবশ্য আবিষ্কার করিতেন। আর যদি সমাধি-মন্দির বাস্তবিকই থাকে, তবে তাহা এই উদয়নাচার্য্যের কি অন্য কোন উদয়নাচার্য্যের তাহা আমরা জানি না।

উদয়নাচার্য্য সম্বন্ধে একটী কিংবদন্তী শুনা যায় যে ইনি বৌদ্ধদিগকে প্রবোধ দিবার জন্যই কুসুমাঞ্জলি প্রণয়ন করেন। কোন সময়ে উদয়নাচার্য্যের সহিত এক-দল নাস্তিকের ঈশ্বর লইয়া তুমুল তর্ক-বিতর্ক হয় কিন্তু কাহারও কথাতেই কেহ আস্থাবান না হওয়াতে এই মীমাংসা হইল যে একটী অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া সেই জ্বলন্ত হুতাসনে উদয়নাচার্য্য এবং নাস্তিক-গণ প্রবেশ করিবেন, যদি ঈশ্বর থাকেন তবে উদয়নাচার্য্য সশরীরে রক্ষা পাইবেন

(৫৬) কৃষ্ণ (বা রামকৃষ্ণ) শ্রীরাম এবং রামচন্দ্র ইহারা তিন ভ্রাতা উদয়নের অধস্তন নবম পুরুষ ইহা খড়ির বংশাবলীতে ও উল্লেখ আছে।

(৫৭) সম্বন্ধ নির্ণয় ২৩৬ পৃষ্ঠা

নাস্তিকগণ ভস্ম হইয়া যাইবে। আর যদি ঈশ্বর না থাকেন তবে উদয়নাচার্য্য ভস্ম হইয়া যাইবেন—নাস্তিকগণ জীবিত থাকিবে এই পণ করিয়া সকলেই জ্বলন্ত অনলে ঝম্প প্রদান করিলেন; ক্ষণকাল মধ্যে নাস্তিকগণ ভস্ম হইয়া গেল, উদয়ন বিনা-ক্লেশে দিব্য শরীরে প্রজ্বলিত অনল মধ্যে বসিয়া রহিলেন। উদয়নাচার্য্যেরই জয় হইল বটে কিন্তু বিনাকারণে নাস্তিক-গণকে বধ করিলেন বলিয়া তাঁহার (উদয়নাচার্য্যের) অন্তরে এক বিষম ভাবনা প্রবেশ করিল, এই মহা পাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত আছে কিনা, তাহা, জানিবার বাসনায় উদয়ন শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের আদেশ লইবার জন্য গমন করিলেন। কিন্তু তিনি তথায় পৌছিবা মাত্র জগন্নাথের মন্দির-দ্বার অর্গলিত হইয়া গেল। উদয়নাচার্য্য জগন্নাথকে অনেক স্তব করিলেন, কিন্তু কিছুতেই দ্বারোদ্ঘাটিত হইল না। পরিশেষে এই দৈববাণী হইল "উদয়নাচার্য্য যে মহাপাপ করিয়াছে তাহার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই কিন্তু উদয়ন যদি তুষানলে প্রাণত্যাগ করে তবেই এই ঘোর পাপ হইতে অব্যাহতি পাইবে। জগন্নাথের এই দৈববাণী শুনিয়া মহাত্মা উদয়নাচার্য্য শ্রীক্ষেত্রেই তুষানলের অনুষ্ঠান করিলেন। পরে অম্লান বদনে প্রজ্বলিত হুতাসেন ঝম্প প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

আমরা এই অদ্ভুত কিম্বদন্তী লইয়া অধিক আলোচনা করিব না। আমরা উহাতে অভ্রান্ত চক্ষে এই সত্য দেখিতে পাই যে উদয়নাচার্য্য শ্রীক্ষেত্রে পার্থিব-লীলা সংবরণ করেন। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের মন্দির ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে বিনির্ম্মিত হয়। অনেকে অনুমান করেন মরকট কেশরী নৃপতির সময়ে এই মন্দির প্রস্তুত হইয়াছিল। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের মন্দির নির্ম্মাণ-কালকেও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ উদয়নাচার্য্যের আবির্ভাব সময়ের একটী সমসাময়িক ঘটনা বলিতে হইবে। বোধ হয় ঐ মন্দির নির্ম্মিত হইবার কতিপয় বৎসর পরেই মহাত্মা উদয়ন পৃথিবীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমরা এই স্থলেই মহাত্মা উদয়নাচার্য্যের জীবনী একরূপ পরিসমাপ্ত করিলাম। অতঃপর উদয়ন-সম্বন্ধীয় কতক গুলি ঘটককারিকা এবং বারেন্দ্র কুলের কাশ্যপ গোত্রীয় ভাদুড়ী গোষ্ঠী-সম্ভূত কুলশাস্ত্রবিশারদ উদয়নাচার্য্যই যে কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা তৎসম্বন্ধে আরো কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া অবসর অনুসারে একটী পরিশিষ্ট অধ্যায় লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র।

আমি বিলিতি মেয়েদের একটু নিন্দে কোরে লিখেছিলুম বোলে বুঝি সেটা ভাল লেগেছে। কিন্তু আমি সেটা কেবল এক শ্রেণীর মেয়েদের একটা ভাগ দেখিয়েছিলুম মাত্র, তাঁরা হোচ্চেন fashionable মেয়ে, তাঁদের দোরস্ত কোর্ত্তে হোলে দিন দুই আমাদের দিশী শ্বাশুড়ির ও ঘরের বিধবা ননদের হাতে তাঁদের রাখ্‌তে হয়। তাঁরা হোচ্চেন বড় মানুষের মেয়ে কিম্বা বড় মানুষের স্ত্রী, তাঁদের চাকর আছে, কাজ কর্ম্ম কোর্ত্তে হয় না, এক জন house-keeper আছে, সে বাড়ির সমস্ত ঘরকন্না তদারক করে, এক জন nurse আছে, সে ছেলেদের মানুষ করে, এক জন governess আছেন (governess ভদ্র লোকের মেয়েদের থেকে নেওয়া হয়) তিনি ছেলে পিলেদের পড়া শুনো দেখেন ও অন্যান্য নানাবিধ তদারক করেন; তবে আর তাঁর পরিশ্রম করার কি রইল বল, কেবল একটা ঘোরতর পরিশ্রম বাকি আছে, সেইটে তাঁর দিনের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রধান পরিশ্রম, অর্থাৎ সাজসজ্জা করা; কিন্তু তার জন্য তাঁর lady's maid আছে, সুতরাং এমন সাধের পরিশ্রমটাও সমস্তটা তাঁকে নিজের হাতে কোর্ত্তে হয় না; সকাল থেকে সন্ধ্যে-পর্য্যন্ত দিনটা তাঁর হাতে আস্ত পোড়ে রোয়েছে, সকাল বেলায় বিছানায় পোড়ে, দরজা জানালা বন্ধ-কোরে সূর্য্যের আলোক আস্‌তে না দিয়ে দিনটাকে কতকটা সংক্ষেপ করেন, বিছানায় শুয়ে শুয়ে breakfast খান ও এগারোটার আগে শয়ন-গৃহ থেকে বেরোলে যথেষ্ট ভোরে উঠেছেন মনে করেন। তার পরে সাজসজ্জা; সে বিষয়ে তোমাকে কোন প্রকার খবর দিতে পারছিনে। শোনা যায় খুব সম্প্রতি বিলেতে স্নানটা fashion হয়েছে, কিন্তু এ fashion টা খুব কম দূর ব্যাপ্ত হোয়েছে। সিমন্তিনীরা, হাতের যত টুকু বেরিয়ে থাকে-মুখটি ও গলাটি দিনের মধ্যে অনেকবার অতি যত্নে ধুয়ে থাকেন; বাকি অঙ্গ পরিষ্কার করবার তাঁরা তত আবশ্যক দেখেন না, কেননা মনোহরণের প্রধান সিঁধ মুখটিতে কোন প্রকার মোরচে না পোড়লেই হোল। মাসে দুবার একটা sponge-bath নিলেই তাঁরা যথেষ্ট মনে করেন; Sponge-bath-এর অর্থ হোচ্চে, একটা ভিজে স্পঞ্জ দিয়ে গা সাফ্‌ করে ফেলা অর্থাৎ একটা ভিজে গামছা দিয়ে গা মোছা আর কি। আমি একটা ইংরেজ পরিবারের মধ্যে বাস কর্ত্তে গিয়েছিলেম, তাঁরা আমি স্নান করি শুনে অত্যন্ত আশ্চর্য্য

হোয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের কোন প্রকার স্নানের সরঞ্জাম ছিল না, সমস্ত আমার জন্যে ধার কোরে আনতে হয়েছিল, এমন বিপদ! যা'হোক্ আমাদের বিলাসিনী স্নান কোর্‌লেন কি না বোল্‌তে পারিনে, তা'র পরে তাঁর সাজ-সজ্জার বিষয়ে আমি নিতান্তই অনভিজ্ঞ। কাপড়ের এখানে একটু ফিতে, ওখানে একটু পাড়, কোথাও একটু এলো-মেলো করে দেওয়া, কোথাও একটু পিন্ দিয়ে আটকে রাখা। কত প্রকার টুক্‌রো টুক্‌রো জিনিষ পত্র এঁটে সেঁটে, মুখে কত প্রকার রং চং লেপে মনোদুর্গ আক্রমণের জন্য প্রথাযোগ্য যুদ্ধ-সজ্জা সমাপ্ত হয়। তার পরে এই রকম বাহারে সাজসজ্জায় এক বাণ্ডিল রূপের মত drawing-room-এর (অভ্যর্থনা-শালার) কৌচে গিয়ে বসলেন; বাড়িতে লোক দেখা কোর্ত্তে এলে তাদের সঙ্গে আলাপচারী করা হচ্চে তাঁর কাজ, অনেক লোক একসঙ্গে এলে তাঁর কর্ত্তব্য হোচ্চে, তাঁর বাক্য ও হাসির অমৃত সকলকে সমান ভাবে বিতরণ করা, বিশেষ কারো সঙ্গে বেশী কথা কওয়া বা বিশেষ কাউকে বেশী যত্ন করা কোনমতে উচিত নয়; একাজটা অত্যন্ত দুরূহ, বোধ হয় অনেক অভ্যেসে দুরন্ত হয়; আমি লক্ষ্য করে দেখি তাঁরা কি কোরে এ কাজ সিদ্ধ করেন; আমি দেখেছি তাঁরা এক জনের মুখের দিকে চেয়ে একটা কথা কন, তার পরে শেষ করেই সকলের দিকে চেয়ে একবার হাসেন, কখনো বা তাঁরা এক জনের মুখের দিকে চেয়ে একটা কথা আরম্ভ করেন, তার পর বল্‌তে বল্‌তে এক এক বার করে সকলের মুখের দিকে চেয়ে নেন, কখন বা, তাস খেলবার সময় যে রকম করে চট্ পট্ তাস বিতরণ করে, তেমনি তাঁরা আগন্তুকদের একে একে করে একটি একটি কথার টুকরো ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেন, এমন তাড়াতাড়ি ও এমন সহজে করেন যে, তাঁদের হাতে যে অনেক কথার তাস গোছানো রয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। একজনকে বল্লেন, lovely morning, is n't it? তার পরেই তাড়াতাড়ি আর এক জনের মুখের দিকে চেয়ে বোল্লেন, কাল রাত্তিরে সঙ্গীতশালায় মাডাম্ নীল্‌সন্ গান করেছিলেন, "it was exquisite!" যত-গুলি মহিলা Visitor বসেছিলেন সকলে ঐ কথায় এক একটা বিশেষণ যোগ কর্ত্তে লাগ্‌লেন; একজন বল্লেন "oh charming" একজন বল্লেন "Superb" একজন বল্লেন "Something unearthly" আর একজন বাকী ছিলেন, তিনি বল্লেন "Is n't it?" এই রকম সর্ব্বদিকব্যাপী কথাবার্ত্তা চল্‌তে থাকে। আমার ত বোধ হয়, এ এক রকম সকাল বেলা উঠে কথোপকথনের মুগুর ভাঁজা। যা' হোক্ এই রকম মাঝে মাঝে visitor আনাগোনা কোর্‌চে। বাকী সময় তিনি কি করেন? Mudie's Library তে তিনি Subscribe করেন, সেখেন থেকে অনবরত নভেলগুলো তাঁর ওখেনে যাতায়াত কর্ত্তে থাকে। সেগুলো অনবরত গলাধঃকরণ করুচেন। তা'ছাড়া flirt করা আছে।

Flirt করা কি জান? ভালবাসার অভিনয় করা। দুই পক্ষেই জান্‌চেন যে, কেউ ভালবাস্‌চেন না, অথচ মিষ্টি হাসি ও মিষ্টি কথার অজস্র আদান প্রদান চল্‌চে; অভিনেত্রী হয়ত একটা অলীক ছুঁতো নিয়ে একটু অলীক অভিমান কোর্‌লেন, অভিনেতা অমনি একটু সান্ত্বনার অভিনয় কর্‌লেন; একটা হয়ত রসিকতার কথা বল্লেন, অমনি অভিনেত্রী তাঁর তুষার-হস্তে ক্ষুদ্র-মুষ্টি উদ্যত করে আদর মাখা রাগের অভিনয় কোরে বল্লেন, "oh, you naughty, wicked, provoking man!" naughty man অত্যন্ত তৃপ্তি-সূচক হাস্য কর্‌লেন। এই রকম রসিকতা হাসি তামাসা ও মিষ্টি কথার ক্ষণস্থায়ী গোলাগুলি বর্ষণের নাম Flirt করা। এতে অনেকটা সময় বেশ আমোদে কেটে যায়। তা'ছাড়া (যদি তিনি miss হন) love making আছে। flirt করার সঙ্গে হয়ত তার অল্প তফাৎ আছে। তবে এটা flirt করার চেয়ে আর একটু গম্ভীর ও স্থায়ী পদার্থ (যদিও সকল সময়ে স্থায়ী হয় কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত বল্‌তে পারিনে)। অনেক চোখের জল ও নিশ্বেস খরচ কর্ত্তে হয়, সহচরীদের কাছথেকে অনেক রহস্যপূর্ণ ঠাট্টা ও চোক টেপাটেপি খেতে হয়, ও দিনের মধ্যে দশবার করে blush কোর্ত্তে হয়। অজস্র নভেল পোড়ে মনটা এমন romantic হয়ে দাঁড়ায় যে, একটু অবসর পেলেই ভালবাসায় পড়তে ইচ্ছে করে, খাঁটি heroine-এর মত লম্বা চৌড়ো কাজ কোর্ত্তে ও লম্বা চৌড়ো কথা কইতে সাধ যায়। সুতরাং নভেল-পড়া মেয়েদের ভালবাসায় পড়া অত্যন্ত আমোদের অবস্থা। চোখের-জল ও নিশ্বেস ফেল্‌তে হয় বটে; কিন্তু অনেক দিন থেকে তাঁদের বড় সাধ ছিল যে, একদিন এই রকম চোখের-জল ও নিশ্বেস ফেল্‌বার উপযুক্ত অবসর পান। এই রকম visitor অভ্যর্থনা করা, visit প্রত্যর্পণ করা, নতুন নভেল পড়া, নতুন fashion সৃষ্টি ও নতুন fashion-এর অনুবর্ত্তন করা, flirt এবং love করা হোচ্চে তাঁদের কাজ। এই রকম ফড়িঙের মত ঘাসে ঘাসে লাফালাফি কোরে তাঁদের জীবনের বসন্তকাল কাটে। এঁরাই হোচ্চেন fashionable মেয়ের দল। আমি দেশে থাক্‌তে এখানকার মেয়েদের যে রকম মনে কোরেছিলুম, এখেনে এসে তা'র সঙ্গে ঢের তফাৎ দেখ্‌ছি। আমাদের দেশে যেমন ছেলেবেলা থেকে মেয়েদের বিয়ের জন্যে প্রস্তুত করে; লেখা পড়া শেখায় না, কেননা মেয়েদের আফিসে যেতে হবে না; এখেনেও তেম্‌নি মার্ষি দরে বিকোবার জন্য মেয়েদের ছেলেবেলা থেকে পালিষ কর্ত্তে থাকে; বিয়ের জন্যে যতদূর লেখা পড়া শেখা দরকার ততদূর শেখায়, তা'র বেশী শেখায় না, কেননা তা'দের ত আপিষে যেতে হবে না। একটু গান গাওয়া একটু

পিয়ানো বাজানো, ভাল কোরে নাচা, খানিকটা French, একটু বোনা ও শেলাই করা জান্‌লে একটি মেয়েকে বিয়ের দোকানের জানলায় সাজিয়ে রাখ্‌বার উপযুক্ত বেশ একটি রং চোঙে পুতুল গ'ড়ে তোলা হয়। এবিষয়ে একটা দিশি পুতুল ও একটা বিলিতি পুতুলের যত টুকু তফাৎ, আমাদের দেশের ও এ-দেশের মেয়ের মধ্যে ঠিক ততটুকু তফাৎ মাত্র। দিশি পুতুলের অত সাজ্‌গোজ রংচঙের আবশ্যক করে না, আমাদের দিশি মেয়েদের পিয়ানো ও অন্যান্য টুকিটাকি শেখ্‌বার আবশ্যক করে না, বিলিতি পুতুলের কিছু বাহার আবশ্যক করে, বিলিতি মেয়েদেরও অল্প স্বল্প লেখা পড়া শিখ্‌তে হয়, কিন্তু দুইই দোকানে বিক্রি হবার জন্যে তৈরি হয়। এখেনেও পুরুষেরাই হর্ত্তা কর্ত্তা, স্ত্রীরা তাঁদের সম্পত্তি; যেমন গাড়ি চালা-বার জন্যে ঘোড়া আবশ্যক করে, তেম্‌নি সংসার চালাবার জন্যে একটা স্ত্রীর দর-কার, স্ত্রী একটি আবশ্যক জিনিষ পত্রের মধ্যে। স্ত্রীকে আজ্ঞা করা, স্ত্রীর মনের মুখে লাগাম লাগিয়ে নিজের ইচ্ছে মত চালিয়ে বেড়ানো স্বামীরা ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট অধিকার মনে করেন। Fashionable মেয়ে ছাড়া বিলেতে আরো অনেক রকম মেয়ে আছে, নইলে বিলেতে সংসার চল্‌তোনা। মধ্যবিৎ গৃহ-স্থদের মেয়ের কতকটা মেহন্নত কর্ত্তে হয়, অতটা বাবুয়ানা করলে চলে না। সকালে উঠে একবার kitchen তদারক কর্ত্তে যেতে হয়, kitchen পরিষ্কার আছে কিনা, জিনিষ পত্র যথাপরিমিত আনা হয়েছে কিনা, যথাস্থানে রাখা হয়েছে কিনা, ইত্যাদি দেখা শুনা করেন; রান্না ও খাবার জন্য জিনিষ আনতে হুকুম দিতে হয়, পয়সা বাঁচাবার জন্য নানা প্রকার গিন্নিপনার চাতুরী খেলাতে হয়, কালকের মাংসের হাড় গোড় কিছু যদি অবশিষ্ট থাকে, তাহলে বন্দোবস্ত কোরে তার থেকে আজকের স্যুপ চালিয়ে নেন, পরশু দিনকার বাসী রাঁধা মাংস যদি খাওয়া দাওয়ার পর খানিকটা বাকী থাকে তা' হলে সেটাকে রূপান্তরিত কোরে আজকের টেবিলে আনবার সুবিধে করে দেন, এই রকম নানা প্রকার বন্দো-বস্ত কর্ত্তে হয়। তার পরে ছেলেদের জন্য মোজা কাপড় চোপড় নিজের হাতে তৈরি করেন, এমন কি নিজেরও অনেক কাপড় নিজে তৈরি করেন। এঁদের সকলের ভাগ্যে নভেল পড়া ঘোটে ওঠে-না; বড় জোর খবরের কাগজ পড়েন, তা'ও সকলে পড়েন না দেখেছি; অনে-কের পড়াশুনার মধ্যে কেবল চিঠি পড়া ও চিঠি লেখা, দোকানদারদের বিল পড়া ও হিসাব লেখা। খানিকটা লেখাপড়ার চর্চ্চা না থাকলে লেখাপড়ায় রুচি জন্মায় না। তাঁরা বলেন, Politics এবং অন্যান্য গোঁতারি বিষয় নিয়ে পুরুষরা নাড়াচাড়া করুন; আমাদের কর্ত্তব্য কাজ স্বতন্ত্র।" তাই জন্যে তাঁরা লেখাপড়া চর্চ্চা করেন না; যেন পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ কর্ত্তে নিতান্ত সঙ্কু-

চিত বোলেই তাঁরা লেখাপড়া করেন না, যেন নিতান্ত অনধিকার প্রবেশ হয় বোলেই তিনি প্রায় তাঁর স্বামীর Library তে পদার্পণ করেন না; কিন্তু আমি এর মধ্যে কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য কিছু দেখতে পাইনে, আসল কথাটা হচ্চে, ইচ্ছে নেই; লাইব্রেরি যদি Ball-room হোত, তা' হোলে তাঁরা অধিকার অনধিকার নিয়ে বড় মাথা ঘোরাতেন না, আর Politics যদি নভেলের ভায়রা-ভাই হোত, তা' হোলে তাঁরা পুরুষের পাত থেকে Politics নিয়ে দুহাতে করে গিল্‌তেন। দুর্ব্বলতা মেয়েদের একটা ভূষণ বোলে গণ্য, এই জন্যে দুর্ব্বলতা মেয়েদের একটা গর্ব্বের বিষয়; মেয়েরা দুপা চোলে একেবারে এলিয়ে পোড়্‌লে আমাদের চোকে সে কেমন একটু ভাল লাগে, আমার বোধ হয়, তার কারণ, ওরকম দেখ্‌লে আমাদের আশ্রয় দেবার প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়, আশ্রয় দেবার প্রবৃত্তি কতকটা গর্ব্ব থেকে হয়; নিজের শক্তি খাটাবার একটা অবসর পেলুম বোলে বেশ একটু তৃপ্তি হয়; বিশেষতঃ বেশ একটি সুন্দর পদার্থ যার দিকে আমাদের স্বভাবতঃ মনের টান, সে আমাদের আশ্রয়ে আমাদের ছায়ায় লতার মত জড়িয়ে থাকুক্ তা' আমাদের ইচ্ছে করে, এই জন্যে মেয়েদের দুর্ব্বলতা আমাদের ভাল লাগে, তাই জন্যে আমরা তা'র মধ্যে একটু সৌন্দর্য্য দেখি, সুতরাং অনেক মেয়ে শ্রান্ত না হোলেও এলিয়ে পড়েন, যিনি দশটা কাজ সহজে কোর্ত্তে পারেন, তিনি দেড় খানা কাজ কোরেই হাঁপাতে থাকেন। বুদ্ধি বিদ্যার বিষয়েও এই রকম; মেয়েরা জাঁক কোরে বলেন, "আমরা বাপু, ওসব politics, Science বুঝিনে শুঝিনে।" বিদ্যার অভাব, বুদ্ধির খর্ব্বতা একটা প্রকাশ্য জাঁকের বিষয় হোয়ে ওঠে! পুরুষরা অমনি অতি স্নেহপূর্ণ আদর কোরে তাঁদের বলেন "হাঁ, ঠাকরুণরা, তোমরা ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাক, ছেলে পিলে মানুষ কর, ওসকল শুষ্ক কাষ্ঠের বোঝা তোমাদের বইতে হবে না," ভাবটা, যেন, তোমাদের একটা মহা কষ্ট থেকে উদ্ধার কর্‌লেম্! কিন্তু বিদ্যা-চর্চ্চা রহিত কোরলে একটা ভার থেকে মুক্ত করা হয় না, একটা অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়! এখানকার মধ্যবিৎ শ্রেণীর মেয়েরা বিদ্যাচর্চ্চার দিকে ততটা মনোযোগ দেন না, তাঁদের স্বামীরাও তার জন্যে বড় দুঃখিত নন, তাঁদের জীবন হোচ্চে কতক গুলি ছোট খাটো কাজের সমষ্টি। যা'হোক, সমস্ত দিন এই রকম ছেলেদের দেখা শুনা করে, কাপড় বুনে, visitor দের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কোয়ে কেটে যায়। সন্ধ্যেবেলায় স্বামী কর্ম্মক্ষেত্র থেকে ফিরে এলেন, স্ত্রীর কাছ থেকে একটি আদরের চুম্বন উপার্জ্জন কোর্‌লেন, (পরিবার বিশেষে যে তা'র অন্যথা হয় তা বলাই বাহুল্য) ঘরে তাঁর জন্যে আগুন জ্বালানো আছে, খাবার সাজানো আছে। সন্ধ্যা বেলায় স্ত্রী হয়ত একটা সেলাই নিয়ে বোসলেন, স্বামী তাঁকে একটি নভেল চেঁচিয়ে পোড়ে শোনাতে

লাগ্‌লেন, সুমুখে আগুন জ্বোল্‌চে, ঘরটি বেশ গরম, বাইরে হয়ত বৃষ্টি হোচ্চে, জানলা দরজাগুলি বন্ধ। হয়ত স্ত্রী পিয়ানো বাজিয়ে স্বামীকে খানিকটা গান শোনালেন; কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, Courtship-এর সময় স্ত্রীর গলা অত্যন্ত ভাল লাগ্‌ত, কিন্তু বিয়ের পর স্ত্রীর গান শুনতে খুব কম লোকের আগ্রহ হয়, রোজ রোজ সেই একই রকম গলা, একই ধাঁচের গান শুনে খুব কম লোকেরই অরুচি না জন্মায়; গিন্নির গলা নেমন্তন্নের দিন কাজে লাগে, দশ-জন বন্ধু বান্ধবকে ডিনারে নেমন্তন্ন কর্‌লে যেমন টেবিল সাজাবার জন্যে অনেক জিনিষ সিন্দুক থেকে বেরোতে থাকে যা' সচরাচর ব্যবহার করা হয় না, তেমনি সেদিন স্ত্রীরও গলা বেরোয়। এখান-কার মধ্যবিৎ শ্রেণীর গিন্নিরা এই রকম শাদাসিদে, যদিও তাঁরা ভাল ক'রে লেখা-পড়া শেখেননি, তবু তাঁরা অনেক বিষয় জানেন, এবং তাঁদের বুদ্ধি যথেষ্ট পরি-ষ্কার; এদেশে কথায় বার্ত্তায় জ্ঞানলাভ করা যায়, তাঁরা অন্তঃপুরে বদ্ধ নন, বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কন, আত্মীয় সভায় একটা কোন উচ্চ বিষয় নিয়ে চর্চ্চা হোলে তাঁরা শোনেন ও নিজের বক্তব্য বোলতে পারেন, এই রকম কোরে অনেক জানতে পারেন ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা একটা বিষয়ের কতদিক দেখেন ও কি রকম চক্ষে দেখেন, তা' বেশ বুঝতে পারেন। সুতরাং একটা কথা উঠলে তিনি ভাল কোরে কইতে পারেন, কতকগুলো ছেলেমানুষী আকাশ থেকে-পড়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন না ও বুঝতে না পেরে তাঁকে হাঁ কোরে থাক্‌তে হয় না, বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে খুব সহজ ভাবে গল্প স্বল্প কোর্ত্তে পারেন, নিমন্ত্রণ সভায় মুখ ভার কোরে বা লজ্জায় অব-সন্ন হোয়ে থাকেন না, পরিচিতদের সঙ্গে অন্যায় ঘেঁসা ঘেঁসি নেই, কিম্বা তাদের কাছথেকে নিতান্ত অসামাজিক দূরেও থাকেন না। লোক-সমাজে মুখটি খুব হাসি খুসি, প্রসন্ন; যদিও নিজে খুব রসিকা নন, কিন্তু হাসি তামাসা বেশ উপভোগ কোর্ত্তে পারেন, একটা কিছু ভাল লাগলে মন খুলে প্রশংসা করেন, একটা কিছু মজার কথা শুন্‌লে প্রাণ খুলে হাসা করেন। ঠোঁট্‌ বন্ধ কোরে থাকা ও লজ্জায় ম্রিয়মান হোয়ে পড়া এখানকার মেয়েদের আচরণের আদর্শ নয়। মনে কোরে দেখ দেখি, একটি নিমন্ত্রণ সভায় ৩০টি মেয়ে ঘাড় হেঁট কোরে চুপচাপ বোসে আছেন, সে সভায় পুরুষদের কি দুরবস্থা, ক্রমে ক্রমে তাঁদেরও মুখবন্ধ হোয়ে আসে, মনের ভিতর এক রকম অসোয়াস্তি উপস্থিত হয়, ও ঘোমটা থাকলে ঘোমটা দিতে ইচ্ছে করে। লজ্জায় চুপচাপ কোরে থাকা অত্যন্ত অসামাজিক গুণ। তুমিত কতকগুলো বাঘের মধ্যে পড়নি, আপনার জাত, মানুষ, বিশেষতঃ ভদ্রলোক, কোন অভদ্র কুচরিত্র দলের মধ্যে গিয়ে পড়নি, তবে বেশ মিলে মিশে গল্প স্বল্প কোরবে না ত কি? লজ্জা দুদণ্ড দেখ্‌তে বেশ মন্দ লাগে না,

হয়ত তার মধ্যে বেশ কবিত্বমাখা মাধুর্য্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়; কিন্তু দিনরাত লজ্জার সঙ্গে কারবার করা অত্যন্ত যন্ত্রণা, দু তিন ঘণ্টা পরিশ্রম কোরে একটা কথার উত্তর পেলেম, একবার সওয়া গেল, কিন্তু দিন রাত যদি ঐ রকম একটা কথা শোন্‌বার জন্যে গলদ্ঘর্ম্ম হোতে হয়, তা' হোলেত বাঁচা যায় না! তুমি যদি আমার সঙ্গে মন খুলে আমোদ প্রমোদ না কর তা' হোলে দায়ে পোড়ে তোমার সংসর্গ ছেড়ে আমাকে অন্য সংসর্গ খুঁজ্‌তে হয়। বিয়ের মন্ত্র কিছু ভালবাসা জন্মাবার মন্ত্র নয়, বিয়ে হোলেই ভালবাসা হয় না, ভালবাসাও নেই, অথচ আমার স্ত্রী যদি আমাকে কথায় বার্ত্তায় আমোদে না রাখ্‌তে পারেন, তা' হোলে আমি আমার সেই মূক সঙ্গিনী ছেড়ে কি অন্যত্র আমোদের সন্ধান কোর্‌ব না? আমার তাই বোধ হয় মেয়েদের একটা অস্বাভাবিক লজ্জা ও সঙ্কোচ চোলে যাওয়া ভাল, যৌবনের একটা স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস, হৃদয়ের ও মনোবৃত্তির স্বাভাবিক বিস্তার শিক্ষা ও অভ্যেসের চাপে না পিষে ফেলা ভাল।

আমি দিন কতক আমার শিক্ষকের পরিবারের মধ্যে বাস কোরেছিলুম। সে বড় অদ্ভুত পরিবার। Mr. B— মধ্যবিত্ত লোক। তিনি লাটিন ও গ্রীক খুব ভাল রকম জানেন। তাঁর ছেলে পিলে কেউ নেই, তিনি তাঁর স্ত্রী, আমি আর একটা দাসী এই চার জন মাত্র একটি বাড়িতে থাকতুম। Mr.—আধবুড়ো লোক, অত্যন্ত অন্ধকার মূর্ত্তি, দিনরাত খুঁৎ খুঁৎ খিট্ খিট্ করেন, নিচের তলায় রান্নাঘরের পাশে একটি ছোট্টো জানলাওয়ালা দরজা-বন্ধ অন্ধকারঘরে থাকেন, একেত সূর্য্য-কিরণ সে ঘরে সহজেই প্রবেশ কোত্তে পারে না, তা'তে জানলার ওপর একটা পর্‌দা ফেলা, চারদিকে পুরোণো ছেঁড়া ধুলো মাখা নানাপ্রকার আকারের ভীষণদর্শন গ্রীক লাটিন বইয়ে দেয়াল ঢাকা, ঘরে প্রবেশ কোরলে এক রকম বদ্ধ হাওয়ায় হাঁপিয়ে উঠতে হয়। এই ঘরটা হোচ্চে তাঁর Study, এইখানে তিনি বিরক্ত মুখে পড়েন ও পড়ান। তাঁর মুখ সর্ব্বদাই বিরক্ত, আঁট বুট জুতো পোরতে বিলম্ব হোচ্চে, বুট জুতোর ওপর মহা চোটে উঠলেন, যেতে যেতে দেয়ালের পেরেকে তাঁর পকেট আট্‌কে গেল, রেগে ভুরু কুঁচ্‌কে ঠোঁট নাড়তে লাগলেন; তিনি যেমন খুঁৎ খুঁতে মানুষ, তাঁর পক্ষে তেমনি খুঁৎ খুঁতের কারণ প্রতিপদে জোটে, আস্‌তে যেতে তিনি চৌকাঠে হুচট খান, অনেক টানাটানিতে তাঁর দেরাজ খোলে না, যদি বা খোলে, তবু যে জিনিষ খুঁজছিলেন তা'পান না, এক এক দিন সকালে তাঁর Study তে এসে দেখি, তিনি অকারণে বোসে বোসে ভ্রূকুটি করে উ-আ কোরচেন, ঘরে একটি লোক নেই। কিন্তু B— আসলে ভালমানুষ, তিনি খুঁৎ খুঁতে বটে কিন্তু রাগী নন, তিনি খিট খিট করেন কিন্তু ধম্‌কান না। নিদেন তিনি মানুষের ওপর কখন রাগ প্রকাশ করেন না, Tiny বলে তাঁর একটা কুকুর আছে, তার ওপরেই

তাঁর যত আক্রোশ, সে একটু নোড়লে চোড়লে তাকে ধম্‌কাতে থাকেন, আর দিনরাত তাকে লাথিয়ে লাথিয়ে একাকার করেন। তাঁকে আমি প্রায় হাসতে দেখিনি। তাঁর কাপড় চোপড় ছেঁড়া অপরিষ্কার। মানুষটা এই রকম। তিনি এককালে পাদ্রি ছিলেন; আমি নিশ্চয় বোল্‌তে পারি, প্রতি রবিবারে তাঁর বক্তৃতায় তিনি শ্রোতাদের নরকের বিভীষিকা দেখাতেন। Mr.—র এত কাজের ভিড়, এত লোককে তাঁর পড়াতে হোত যে, এক এক দিন তিনি ডিনার খেতে অবকাশ পেতেন না। এক একদিন তিনি বিছানা থেকে উঠে অবধি রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত কাজে ব্যস্ত থাকতেন। এমন অবস্থায় খিট খিটে হোয়ে ওঠা কিছু আশ্চর্য্য নয়। Mrs B— খুব ভাল মানুষ, অর্থাৎ রাগী উদ্ধত লোক নন, এককালে বোধ হয় ভাল দেখ্‌তে ছিলেন, যত বয়স, তার চেয়ে তাঁকে বড় দেখায়, চোখে চসমা পরেন, সাজ গোজের বড় আড়ম্বর নেই। নিজে রাঁধেন, বাড়ির কাজকর্ম্ম করেন, (ছেলে পিলে নেই, সুতরাং কাজকর্ম্ম বড় বেশি নয়) আমাকে খুব যত্ন কোর্‌তেন, খুব অল্প দিনেতেই বোঝা যায় যে, Mr ও Mrs-এর মধ্যে বড় ভাল বাসা নেই, কিন্তু তাই বোলে যে, দুজনের মধ্যে খুব ঝগড়া ঝাঁটি হয় তা'নয়, নিঃশব্দে সংসার চোলে যাচ্চে। Mrs B— কখনো Mr B—র Study তে যান না, সমস্ত দিনের মধ্যে খাবার সময় ছাড়া দুজনের মধ্যে আর দেখা শুনা হয় না, খাবার সময়ে দুজনে চুপচাপ বসে থাকেন, খেতে খেতে আমার সঙ্গে গল্প করেন, কিন্তু দুজনে পরস্পর গল্প করেন না; Mr. B—র আলুর দরকার হয়েছে, তিনি গোঁ গোঁ কর্‌তে কর্‌তে Mrs B—কে বোল্লেন "Some Potatoes" (please কথাটা বোল্লেন না কিম্বা শোনা গেল না) Mrs. B—বোলে উঠ্‌লেন "I wish you were a little more polite" Mr. B—বোল্লেন "I did say "please" Mr. B—বোল্লেন "I didn't hear it" Mr. B. বোল্লেন "It was no fault of mine that you did'nt!" কাথাটা সমস্তটা ভাল কোরে শোনা গেল না, এই খেনেই দুই পক্ষ চুপকরে রইলেন। মাঝের থেকে আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুতে পোড়ে যেতেম। একদিন আমি ডিনারে যেতে একটু দেরী করেছিলেম, গিয়ে দেখি, Mrs. B. Mr. B.কে ধম্‌কাচ্চেন, অপরাধের মধ্যে Mr. B. মাংসের সঙ্গে একটু বেশী আলু নিয়েছিলেন, আমাকে দেখে Mrs B. ক্ষান্ত হোলেন, Mr. B. সাহস পেয়ে প্রতিহিংসা তোল্‌বার জন্যে দ্বিগুণ কোরে আলু নিতে লাগ্‌লেন, Mr. B. তাঁরদিকে একটি নিরুপায় মর্ম্মভেদী কটাক্ষপাত কোর্‌লেন। দুই পক্ষই দুই পক্ষকে dear বা darling বোলে ভুলেও সম্বোধন করেন না, কিম্বা কারো christian নাম ধোরে ডাকেন না, পরস্পর পরস্পরকে

Mr. B—ও Mrs B—বোলে ডাকেন। আমার সঙ্গে Mrs B. হয়ত বেশ কথা বার্ত্তা কচ্চেন, এমন সময় Mr.B. এলেন, অমনি সমস্ত চুপচাপ। দুই পক্ষেই এই রকম। একদিন Mr.B. আমাকে Piano শোনাচ্চেন, এমন সময় Mr. B. এসে উপস্থিত হোলেন, বোল্লেন, "when are you going to stop?" Mrs. B. বোল্লেন "I thought you had gone out" পিয়ানো থাম্‌ল। তা'র পরে আমি যখনি পিয়ানো শুনতে চাইতেম, Mrs বোল্‌তেন, "that horrible man" যখন বাড়িতে না থাক্‌বেন তখন শোনাব, আমি ভারি অপ্রস্তুতে পোড়ে যেতুম। দুজনে এই রকম অমিল, অথচ সংসার বেশ চোলে যাচ্চে; Mrs B. রাঁধচেন, বাড়চেন, কাজকর্ম্ম কোর্‌চেন Mr.B রোজগার কোরে টাকা এনে দিচ্চেন, দুজনে কখন প্রকৃত ঝগড়া হয় না, কেবল কখন কখন দুই একবার দুই একটা কথা কাটাকাটি হোত, তা' এত মৃদুস্বরে যে, পাশের ঘরের লোকের কান পর্য্যন্ত পোঁছোয় না। য' হোক্ আমি সে খানে দিন কতক থেকে বিব্রত হোয়ে সে অশান্তির মধ্যে থেকে চোলে এসে বেঁচেছি।

ছিন্ন মুকুল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মেঘে বিজুলি।

ইহার কয়েক দিন পরে হিরণকুমার কনককে একখানি পত্র লিখিতেছিলেন। অনেক কষ্টে, পত্রখানি সাঙ্গ করিয়া অশ্রুজল মুছিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সে অশ্রু শুকাইল, মুখে নিরাশার দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক ভাব প্রকটিত হইল। হিরণকুমার আবার কতকগুলি কাগজ পত্র লইয়া লিখিতে বসিলেন, বিষয় সম্পত্তির উইল করিয়া তাহা বাক্সে রাখিলেন; যাহাকে যাহাকে পত্র লিখিবার ছিল লিখিয়া সমস্ত পত্রগুলি ডাকে পাঠালেন। সঙ্গে যে সকল জিনিস পত্র ছিল, চাকরদের ডাকিয়া তাহা দিলেন; চাকরেরা তাহার কে কোনটি লইবে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করিল, হিরণকুমার অন্য গৃহে গিয়া বসিলেন। খানিক বসিয়া বসিয়া শুইলেন; ক্রমে সন্ধ্যা হইল, হিরণকুমার উঠিলেন না, রাত্রি নয়টা বাজিল, হিরণকুমার উঠিলেন না, বেগতিক দেখিয়া একজন ভৃত্য আসিয়া আহারের খবর দিল। এতক্ষণ হিরণকুমার ঘুমাইতেছিলেন কি না জানিনা, কিন্তু ভৃত্যের কথায় মুখ উঠাইয়া একবার তাহার পানে চাহিলেন। তাঁহার সেই পাংশুবর্ণ যাতনা-ব্যঞ্জক মুখ, তাঁহার সেই ভয়ানক দৃঢ়

সঙ্কল্প-বিশিষ্ট অথচ অন্তিম কালের ন্যায় অসরল দৃষ্টি দেখিয়া ভৃত্য চমকিয়া উঠিল, আশ্চর্য্য হইয়া মৌনে তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া রহিল, হিরণকুমার আবার মুখ নত করিয়া শুইলেন। ভৃত্য আর একবার বলিল, 'আহার প্রস্তুত।'

হিরণকুমার কোন উত্তরই করিলেন না, মুখ তুলিয়া চাহিলেনও না। ভৃত্য আবার বলিল, "খাবার কি এখানে আনব ?" তখন হিরণকুমার বিরক্তভাবে বলিলেন, 'আমার ক্ষিদে নেই, আজ খা'ব না।' ভৃত্য দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল, আর কথা কহিতে সাহস করিল না।

হিরণকুমার বিছানা হইতে উঠিলেন, উঠিয়া একটি টেবিলের সম্মুখে চৌকিতে বসিয়া দীপালোকে আবার কয়েকখানি পত্র লিখিতে লাগিলেন, মনে পড়িল, তাঁহার আরো দুই এক খানি পত্র লেখা আবশ্যক। এই সময় একজন ভৃত্য আসিয়া একটি পিস্তল দেখাইয়া বলিল,

'এইটি আপনি একদিন সাবধানে রাখতে বলেছিলেন, আস্‌বার সময় সঙ্গে এনেছিলেম, এটা কি করব ?'

ভৃত্য এই বলিয়া পিস্তলটি টেবিলে রাখিল। হিরণের মনে পড়িল, এক দিন একজন চোরের নিকট হইতে পিস্তলটি কাড়িয়া লইয়াছিলেন ; এবং সেই পিস্তল পুলিসে দেখাইয়া চোরের সন্ধান করিবার অভিপ্রায়ে তাহা সাবধানে রাখিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু পরে শারীরিক অসুস্থতার জন্য ও অন্যান্য নানা ঘটনায় এতদিন পর্য্যন্ত ওকথা আর মনে হয় নাই। হিরণ অজ্ঞাত ভাবে পিস্তলটি হস্তে উঠাইয়া লইলেন, এদিক ওদিক করিয়া দেখিতে লাগিলেন ; ভাবিলেন, ইহার একটি গুলিতেই তো আজ তাঁহার সমস্ত যাতনাই দূর হইতে পারে। লোভ অসম্বরণীয় দেখিয়া ত্রস্তে তাহা আবার টেবিলে রাখিলেন। কিন্তু মনে হইল তাঁহার ভয় বৃথা, উহাতে গুলি নাই। ভাবিতে ভাবিতে আবার তাহা হস্তে লইলেন, সর্প যেমন তুণ্ডিকের বংশী-ধ্বনি হইতে ফিরিতে অক্ষম, হিরণকুমার তেমনি সেই পিস্তল হইতে দৃষ্টি উঠাইতে অক্ষম হইলেন। এই সময় এক জন অপরিচিত লোকের সহিত একটি ভৃত্য এই গৃহে আসিয়া হিরণকে বলিল,

'কদিন হ'তে এই লোকটি চাকরীর উমেদারীতে আস্‌ছে আমাদেরও তো কিছুদিন হ'তে আর একজন চাকরের আবশ্যক হয়েছে, এ'কে কি রাখবেন ?'

হিরণকুমার এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না, তিনি তখন পিস্তল দেখিতে ব্যস্ত ছিলেন, দেখিতে দেখিতে পিস্তলের এক প্রান্তে মুদ্রাঙ্কণ অক্ষর দেখিলেন, পড়িয়া তাঁহার মুখ বিস্ময়-পূর্ণ হইল ; দেখিলেন ইংরাজি অক্ষরে লেখা 'যামিনী-নাথ রায়।' তিনি বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, 'চোরের নিকট পিস্তল কাড়িয়া লইয়াছিলাম, ইহাতে যামিনী বাবুর নাম !' নবাগত উমেদার উত্তর অপেক্ষায় সেই খানে দাঁড়াইয়া ঐ সকল দেখিতে

ছিল। হিরণের বিস্ময়-প্রসূত কথাটি শুনিয়া সে আস্তে আস্তে হিরণের একটু কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; পিস্তলটি বিশেষ লক্ষ্যের সহিত দেখিয়া দেখিয়া বলিল, "এতে যামিনী বাবুর নাম? আমাকে একবার দেখ্‌তে দেবেন?'

ইহাতে হিরণ কিছু বিস্মিত হইলেন, যামিনীকে তিনি যেরূপ মন্দ লোক বলিয়া জানিতেন তাহাতে এই কথায় তাঁহার মন সন্দিগ্ধ হইল; তিনি উমেদারের হস্তে পিস্তলটি দিয়া বলিলেন, "তোমার কথায় বোধ হইতেছে যে ইহার ভিতর কিছু গূঢ় ব্যাপার আছে?'

পিস্তলটি লইয়া সে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বিশেষ রূপে দেখিতে লাগিল, সেই মুদ্রাঙ্কণ অক্ষর গুলি দেখিল, তাহার মুখ চক্ষু আরক্তিম হইল, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া বলিল, "এ পিস্তল আমি চিনি, বাস্তবিকই এ যামিনী বাবুর পিস্তল।' হিরণ তাহার ভাবে, তাহার কথায় অবাক হইলেন; বলিলেন, "এ পিস্তল তবে চোরের হাতে পাইলাম কি করিয়া?'

ভৃ। "চোর! না সে চোর না—' বলিয়াই সে থামিল; কি একটি কথা বলিতে যেন সে ভয় পাইতেছিল। শেষে যখন তাহার কথায় অন্য সকল ভৃত্যকে প্রস্থান করিতে আদেশ করিয়া হিরণ শপথ করিলেন যে বলিলে কোন হানি হইবে না, তখন সে বলিল,

"মহাশয়, সে চোর না, যামিনী বাবুর একজন চাকর—'

হি। যামিনীর চাকর! সেকি পিস্তল চুরি করিয়াছিল?

ভৃ। "না, যামিনী বাবুর হুকুমে প্রমোদ বাবুকে মার্‌তে গিয়েছিল—

"যামিনী বাবুর হুকুমে প্রমোদকে মারিতে গিয়াছিল!' সহসা হিরণকুমারের মলিন-বিষাদ-গম্ভীর—মুখকান্তি জ্যোতিষ্মান হইল, তাঁহার নিকটে যেন একটি রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া গেল। তিনি কনকের কাছে শুনিয়াছিলেন প্রমোদের বিশ্বাস, হিরণ তাহাকে হত্যা করিতে গিয়াছিলেন, আজ সহসা তাহার কারণ বুঝিতে পারিলেন। হিরণ যামিনীকে মন্দ লোক বলিয়া জানিতেন; জানিতেন সে নীরজাকে বিবাহের অভিপ্রায়ে সন্ন্যাসীর নিকট প্রমোদকে দোষী সাব্যস্ত করিতে গিয়াছিল। তাহার পর সেই যামিনীকেই প্রমোদ কনককে দিবার জন্য ব্যস্ত, যামিনীকেই বিবাহ করিতে চাহে নাই বলিয়া প্রমোদ কনকের উপর অসন্তুষ্ট;—তাহাও হিরণ শুনিয়াছিলেন। ভৃত্যের কথায় এখন তাঁহার মনে হইল নীরজাকে পাইবার জন্য যামিনী যে প্রমোদকে মারিতে যাইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? পরে আপন দোষ হিরণের উপর অর্পণ করিয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। হিরণ ভাবিলেন, যদি যথার্থই যামিনী দোষী হয় এবং তিনি তাহা প্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে প্রমোদের ভ্রম ঘুচিতে পারে, হিরণ আবার সুখী হইতে পারেন; হিরণকুমার ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"যামিনী প্রমোদকে মারিতে পাঠান কেন ?'

ভৃত্য। 'যদিও তা' তিনি আমাকে বলেন নাই, কিন্তু আমি তা' বলতে পারি।'

হি। "কি ?"

ভৃত্য। "প্রমোদ-বাবুর সহিত নীরজার পাছে বিবাহ হয়, বোধ হয়, সেই ভয়ে—

হি। "তিনিই যে মারিতে পাঠাইয়াছিলেন ইহা তুমি কি করিয়া জানিলে ?

ভৃত্য। "আমাকেই প্রথমে মারতে বল্লেন, কিন্তু আমি নারাজ হই। শেষে অন্য এক চাকর টাকার লোভে রাজি হয়েছিল।'

হিরণ। "রাজি হইয়াছিল কি করিয়া জানিলে" উত্তর দিতে ভৃত্য ভীত হইল; যাহা বলিবে তাহাতে তাহার আত্মীয় এক ব্যক্তির কোন হানি হইবে না—এই শপথ করাইয়া শেষে বলিল,

"যামিনী বাবুর চাকরের সঙ্গে আমার একজন বন্ধুও ঐ কাজের ভিতর ছিল, তার কাছে আমি সব শুনেছি।'

হি। "মকদ্দমা হইলে তুমি যামিনীর দোষ সকল বলিতে স্বীকৃত আছ ? তাহার দোষ প্রমাণ করিতে পারিবে ?'

ভৃত্য সহর্ষে বলিল, "তা' আর পারব না ? যে আমার সর্ব্বনাশ করেছে, তার বিপক্ষে সাক্ষী দিয়ে শোধ তুলব না ? কিন্তু আমার বন্ধুর জন্যে ভয় হয়।

হি। "না, না, তার কোন ভয় নাই—তার সাক্ষ্যই বিশেষ দরকারী। তুমি কেবল তার কাছে শুনেছ বই তো নয় ? তোমার বন্ধু যদি সব খুলে বলে তো তাকে মহারাণীর সাক্ষী (Queen's evidence) দাঁড় করিয়ে খালাস দেওয়ান যেতে পারে। তুমি যে প্রতিশোধের কথা বল্‌ছ—কেন যামিনী তোমার কি করেছে ?'

ভৃ। "কি করেছেন ? তাঁর জন্যই তো স্ত্রী পুত্র পরিবার ফেলে এই বিদেশে পালিয়ে আসতে হয়েছে। নিমকহারামের জন্য আমি কি পাপই না করেছি! যামিনী-বাবু যখন লোক দিয়ে নীরজাকে চুরি করিয়ে আবার ফন্দি করে নিজেকেই সাধু দাঁড় করাবার মতলব করেন, তখন আমিই তো দাঁড়ি সেজে সব ঠিক্ ঠাক্ করি। প্রমোদ বাবু যেদিন কানপুরের বনে নীরজার সঙ্গে দেখা করতে যান, সে দিন আমিই তো তাঁর পিছনে লুকিয়ে গিয়ে জেনে আসি যে সন্ন্যাসী নৈমিষারণ্যে যাবেন, তাতেই তো পরের দিন চুরি হয়। তাঁর জন্য আমি কি না পাপ করেছি শেষে খুন করতে না পারায় তিনি আমার এই শাস্তি করলেন!'"

বলিতে বলিতে তাহার প্রতিহিংসা স্পৃহা জ্বলিয়া উঠিল। হিরণ তাহাকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন,

"যামিনী বাবু তোমার কি শাস্তি করিয়াছেন তাহা তো বলিলে না।'

ভৃ। "মিথ্যা চুরির দাবিতে আমাকে দোষী করে কয়েদ করবার চেষ্টা

কর্‌ছিলেন; সেই ভয়ে আমার এখানে পালিয়ে আসতে হয়েছে।'

ভৃত্যের কথায় হিরণের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল, তাঁহার সহসা নূতন আশার সঞ্চার হইল, তাঁহার হৃদয়ের দৃঢ়-সংকল্প যেন শিথিল হইল। তিনি সেই পিস্তল হস্তে লইয়া উঠিলেন, উমেদার ভৃত্যকে বলিলেন, "যদি প্রতিশোধ দিতে হয় তো আমার সঙ্গে এস।'

বলিয়াই অমনি দ্রুতপদে বাটী হইতে নিক্রান্ত হইলেন; উমেদারও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। হিরণকুমার একেবারে রেল গাড়ীর ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু এতদূর আসিয়া তাঁহার যেন চমক ভাঙ্গিল, দেখিলেন তাহার সঙ্গে টাকা কিছুই নাই, কি করিয়া তবে আজই কলিকাতায় যাইবেন? তিনি মাথা ধরিয়া দাঁড়াইলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রতিদ্বন্দ্বী।

দেখিতে দেখিতে কলিকাতার রেল গাড়িও ছাড়িয়া দিল, তখন হিরণকুমার হতাশচিত্তে সেই প্লাট-ফর্ম্মে এপাশ ওপাশ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সহসা কাহাকে কাছ দিয়া যাইতে দেখিয়া তিনি চমকিত হইলেন? দেখিলেন, তিনি যে জন্য কলিকাতায় যাইতেছিলেন, সেই যামিনীবাবুই আজ এলাহাবাদে আসিয়াছেন। হিরণকুমার বিস্মিত ও আহ্লাদিত চিত্তে গমনশীল যামিনী বাবুর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, ভৃত্য যামিনী বাবুকে দেখিয়া কিছু দূরে সরিয়া গেল, হিরণকে দেখিয়া যামিনীও দাঁড়াইলেন। হিরণ বলিলেন, 'মহাশয়, আমি যে আপনার জন্য কলিকাতায় যাইতেছিলাম।'

যামিনী কিছু বিস্মিত ভাবে বলিলেন 'আমার জন্য? কেন আমার এত সৌভাগ্য কি নিমিত্ত?'

হিরণকুমার পিস্তল দেখাইয়া বলিলেন, "ইহাকে ধন্যবাদ দিন, ইহার অনুগ্রহে।'

যামিনী অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আপনি কি বলিতেছেন?

হিরণ আবার পিস্তলটী দেখাইয়া বলিলেন, "চিনিতে পারেন কি? ইহা কাহার?'

যামিনী ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "মহাশয়, রাস্তায় আপনি অপমান করিবেন না, নিকটেই প্রহরী আছে।

হি। "যেদিন প্রমোদকে হত্যা করিবার আশে পিস্তলটি দিয়াছিলেন, সেদিন প্রহরীর ভয় হয় নাই?"

যামিনী চমকিয়া উঠিলেন, এতক্ষণে পিস্তলের অর্থ বুঝিলেন; কিন্তু যামিনী নিশ্চয় জানিতেন যে তাঁহার নামাঙ্কিত পিস্তল তিনি কখনই দেন নাই, সেই জন্য মুহূর্ত্ত মধ্যে সামলাইয়া বলিলেন "হিরণবাবু, আর সহ্য হয় না, তুমি নিতান্ত নরাধম, ভদ্র লোকের সহিত কথা কহিবারও অযোগ্য।'

হিরণ তাহার কথায় ভ্রূক্ষেপ না

করিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, "মহাশয় আপনি যে ভদ্র বলিয়া পরিচিত হইবারও অযোগ্য, দেখুন দেখি, পিস্তলে কাহার নাম।" হিরণকুমার তাঁহার কাছে পিস্তলটি ধরিলেন, নামটি পড়িয়া যামিনীর মুখের ভাব সহসা যেন পরিবর্ত্তিত হইল; দেখিলেন মনের ব্যগ্রতা বশতঃ বাস্তবিকই তাড়াতাড়িতে না দেখিয়া আপন নামাঙ্কিত পিস্তল দিয়াছিলেন; তাঁহার মস্তকে বজ্র পড়িল, সহসা যেন বাক্‌শক্তি-হীন হইলেন, তিনি অজ্ঞাতভাবে পিস্তল কাড়িয়া লইতে পিস্তলে হস্তার্পণ করিলেন, হিরণ ত্রস্তে তাহা সরাইয়া লইলেন, অমনি তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে যামিনী আত্মস্থ হইয়া বুঝিলেন এইস্থলে পিস্তল কাড়িতে গেলে যথার্থ দোষী বলিয়া প্রমাণ হইবেন অথচ কৃত কার্য্য হইবারও বড় সম্ভাবনা নাই। তিনি হৃদয়ের ভাব লুকাইয়া সরোষে বলিলেন, "একি, কি আশ্চর্য্য! এ চুরির পিস্তল আপনি পাইলেন কোথা?"

তাহার অতিরিক্ত সাহস দেখিয়া হিরণও একটু হাসিয়া বলিলেন, "চুরির জিনিস? সে সকল প্রমাণে যাহা হয় হইবে?"

যামিনী। "কি প্রমাণ? আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা তো প্রমাণ সাপেক্ষ; কিন্তু আপনার হস্তে চুরির জিনিস, আমি এখনি আপনাকে চোর বলিয়া ধরিব।"

হি। "প্রমাণ সাপেক্ষ বটে কিন্তু প্রমাণের অভাব নাই, আপনার আগেকার চাকর রামধন দাসকে মনে আছে কি? সে বর্ত্তমান।" হিরণ সেই ভৃত্যের জন্য একবার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন কিন্তু তখন আর তাহাকে নিকটে দেখিলেন না। কোথা হইতে প্রকাশ হইয়াছে যামিনী তখন সকল বুঝিলেন, দেখিলেন ইহার আশু উপায় না করিতে পারিলে তাঁহার সর্ব্বনাশ। যামিনী বলিলেন,

"যাকে চোর বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি, সে কিনা বলিতে পারে? কিন্তু তাহার মিথ্যা অপবাদে আমার কিছুই হইবে না, সেজন্য আমি কিছুমাত্র ভীত নহি।"

হি। "হ্যাঁ তা ভীত হইবেন কেন? শুধু এ খুনের কথাতো নয় নীরজার হরণ বৃত্তান্তও প্রকাশ হইয়াছে" হিরণ আপন মনে বলিয়া উঠিলেন এসকল কথা আমার প্রমোদকে এখনি লেখা উচিত, বাটী গিয়াই লিখিব, যামিনী বুঝিলেন তবে এখনো প্রমোদ কিছুই শোনেন নাই, সঙ্কল্প করিলেন তবে আর কখনোই শুনিবেন না। যামিনী বলিলেন, "যদি নিতান্তই আপন মন্দ করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আমার নামে মিথ্যা দোষ আনিবেন।"

বলিয়া ব্যগ্রচিত্তে ঐ বিপদ হইতে আশু রক্ষা পাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে করিতে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। যামিনী প্রমোদের নিকট এলাহাবাদে আসিয়া ছিলেন, কিন্তু আজ

আর সেখনে না গিয়া অন্যত্রে গমন করিলেন, যামিনীকে যাইতে দেখিয়া হিরণও বাড়ীর দিকে ফিরিলেন। এই সময় উমেদার-ভৃত্য তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া বলিল ?

"যামিনীবাবুকে আমার দেখা দেবার ইচ্ছা ছিল না, তাই দূরে ছিলেম। উহাঁকে বড় ভয় করে, আমি এখানে আছি জানলে, কি জানি চোর বলে পুলিষে যদি ধরিয়ে দেন। কিন্তু আপনার সঙ্গে কলিকাতায় গিয়ে আদালতে আমি নিশ্চয়ই সাক্ষী দেব তাতে সন্দেহ করবেন না।"

হিরণ। "আমি পরশু কলিকাতায় যাইব।'

ভৃ। তবে আমিও সেইদিন আসব, আজ মাসীর বাড়ী চল্‌লেম। শীঘ্র কলিকাতায় যাব শুনলে এ দুদিন আর মাসী আসতে দেবেন না।" এই বলিয়া ভৃত্য চলিয়াগেল। হিরণও বাড়ী গিয়া তখনি প্রমোদকে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। ভাবিলেন, কাল প্রমোদের উত্তর পাইয়া পরশু কলিকাতায় যাইবেন।

ভৃত্য পত্র হস্তে প্রমোদের বাটী অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে, এলাহাবাদের প্রশস্ত পথ জনশূন্য বলিলেই হয়, কদাচিৎ দুটি একটি লোক চলিতেছে কি না দেখা যায় না, মাঝে মাঝে দুটি একটি মুক্ত-দোকানে মাত্র মনুষ্য জীবনের ব্যস্ততা এখনো উপলব্ধি হইতেছে, তাহা ছাড়া চারিদিক নিস্তব্ধ। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর নিষ্কৃতি পাইয়া কোন দোকানি দিব্য আরামে দেয়াল ঠেশ দিয়া তামাক টানিতেছিল, কেহ বা কোন খরিদদারের সহিত এখনো দাম চুক্তি করিতেছিল, কেহ বা দৈনিক লাভের তালিকায় দ্বিগুণ লাভ দেখিয়া মনের স্ফূর্ত্তিতে কল্পনার সপ্তম-স্বর্গে উঠিতে উঠিতে বাদশাহের কন্যাকে বিবাহের আশা করিতেছিল। যাহা হউক প্রায় দোকানদারেরাই সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর কোন না কোন আমোদে নিযুক্ত। একটি দোকানে পাশা চলিতেছিল, ভৃত্যটি পাশা খেলার বিশেষ অনুরাগী, সে লোভ সামলাইতে না পারিয়া খেলা দেখিতে পত্র হস্তে সেই দোকানটার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখনি রাস্তার একদিক হইতে অপর একজন সেখানে আসিয়া হিন্দুস্থানীতে বলিল, "আঃ চাকরি করা কি অধর্ম্মের ভোগ, সমস্ত দিনেও তো একে একটু অবকাশ নেই, তাতে আবার একটু ত্রুটি হলেই সর্ব্বনাশ।" চাকরীর কথায় ভৃত্যের চিঠির কথা মনে পড়িল, খেলা হইতে চোখ উঠাইয়া নবাগতের দিকে চাহিয়া বলিল, "ঠিক্ বলেছ, দেখ দশটা বেজে গেছে এখনো আমার ছুটি নেই; এই দেখ চিটী নিয়ে চলেছি।'

নবাগত বলিল, "তুমিও চিঠি নিয়ে যাচ্ছ? আমিও এইমাত্র চিঠি দিয়েই আসছি, বলব কি দুঃখের কথা, বাবুর জরুরী চিঠি, না দিলে আমার মাথা

থাকতো না, আবার এদিকে প্রমোদ-বাবুর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, কত কষ্টে যে দরজা খুলিয়ে দিয়ে এসেছি তা ভগবানই জানেন,” ভৃত্য বলিল, “সে কি কথা! আমিও যে প্রমোদ বাবুকে জরুরি চিঠি দিতে যাচ্ছি, যদি দরজা বন্ধ হয়ে থাকে তো কি হবে? তুমি কি ক'রে দিলে?”

সে ব্যক্তি বলিল, “ফটকের বাইরে যে দরোয়ান থাকে, সে আমার বন্ধু তা'কে বিশেষ করে ধরায় দরজা খুলে সেই চিঠি খানি একজন চাকরের হাতে দিলে তাই রক্ষে।'

ছিরণের ভৃত্য বলিল, “তবে, কি আজ অন্য কারো চিঠি সে দরোয়ান প্রমোদ বাবুকে দিবে না?'

অপরিচিত বলিল, “না, তা দেবে না” এই কথায় ভৃত্য ভাবিয়া বলিল, “তবে কি কর্‌ব, তবে কি ফিরেই যাব? কিন্তু বাবু বলেছেন, খুব জরুরি চিঠি—এক বার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়ে দেখেই আসি।

সে ব্যক্তি বলিল “সে যাওয়া মিছে, আমি তো এই আসছি। দশটার সময় তাঁদের দরজা বন্ধ হয়।'

ভৃত্য বলিল, “তবে আজ যাই, কাল আস্‌ব।' অপরিচিত বলিল, “একি বিশেষ দরকারী চিঠি? আজ কি না দিলেই নয়?'

ভৃ। “বাবু তো বলেছেন খুব দরকারী।” সে ব্যক্তি বলিল, “আহা! তবে অমনি ফিরে যাবে, তাতে তো তোমার মনিব রাগ কর্‌বেন?”

ভৃ। “তা এতে আমার কি দোষ? সে ব্যক্তি একটু দুঃখের সুরে বলিল, “মনিবরা তা বুঝলে আর কি ভাবনা থাকত? তা, তাঁরা অত বুঝে দেখেন না। যত দোষ আমাদের গরীবদের উপর। এই আজ যদি আমি অত কষ্ট করে এই চিঠি খানি প্রমোদ বাবুকে না দিয়ে আসতেম, মনিব তাহলে নিশ্চয়ই আমার উপর রাগ করতেন।'

ভৃ। “তাকি রাগ করবেন? কিন্তু আমি কি কর্‌ব বল? আমার তো আর তোমার মত সেখানে কেউ বন্ধু নেই।”

তাহার কথায় সে ব্যক্তির বড়ই সহানুভূতি হইল, সে বলিল?

“ভাই, তা তো বুঝ্‌ছি। আহা! অমনি ফিরে যাবে, তোমার মনিব কতই রাগ কর্‌বেন। দাও তবে আমিই নিয়ে যাই, আর একবার বন্ধুটিকে বলে কয়ে চিঠি খানি প্রমোদ বাবুকে দিয়ে আসি।'

তাহার দয়া দেখিয়া ভৃত্য বড়ই আপ্যায়িত হইল, বড়ই আহ্লাদিত হইয়া বলিল, “তা আমার জন্য আবার তুমি সেখানে যাবে? বন্ধু কি আবার তোমার কথা রাখবে?'

অপরিচিত। “আহা! তোমার মনিব কত তোমাকে বকবেন, তোমার কত কষ্ট হবে, সে জন্য আর আমি এই-টুক যেতে পারিনে? তুমিও চাকর, আমিও চাকর, আমরা একজন অন্য জনের জন্য এই টুক কষ্ট করব না? একটু বিশেষ ক'রে ধরলেই বন্ধু আমার কথা রাখবে এখন।'

তখন ভৃত্য আহ্লাদে চিঠিখানি

তাহার হস্তে দিল, তাহাকে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ হইল না। চিঠি লইয়া যে কাহারো কোন কাজে লাগিতে পারে ইহা সে বেচারীর বুদ্ধির অতীত। পত্র লইয়া অপরিচিত প্রমোদের বাড়ী অভি-মুখে গমন করিল, দেখিয়া ভৃত্য ও বাড়ী ফিরিয়া আসিল। আসিয়া হিরণকে বলিল,

"প্রমোদ বাবুর দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কত করে চিঠি খানি দিয়ে এসেছি।'

হি। "উত্তর কোথায়?"

ভৃ। বাবুর সঙ্গে তো আমার "আর দেখা হয় নি, আমি বাবুর দরওয়ানের হাতে চিঠি দিয়েই চোলে এসেছি।"

পত্র খানি আজই প্রমোদ পাইয়াছেন জানিয়া হিরণ নিশ্চিন্ত হইলেন।

কিন্তু পত্র খানি কাহার হস্তগত হইল, তাহা নিশ্চয়ই বলা বাহুল্য।

ষড়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পরিত্যক্তা।

প্রমোদ আর কনককে তেমন ভাল বাসেন না, তাহার সহিত তেমন কথা কহেন না। স্বামী কনকের প্রতি অসন্তুষ্ট, নীরজাও আর কনককে দেখিতে পারেন না। কনক প্রমোদের কথা শুনিল না, কনক প্রমোদের বন্ধুকে বিবাহ করিতে অসম্মত হইল, তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা জানিয়াও বিবাহে অসম্মত হইল, আবার শেষে কিনা প্রমোদের শত্রু হিরণকে বিবাহ করিতে চাহিল, কি আশ্চর্য্য! ভ্রাতার শত্রুকে যেকালে বিবাহ করিতে চাহিল, সেকালে কনকও শত্রু হইল বই আর কি? বাবা! এমন মেয়ে নীরজা আর কখনো দেখেন নাই; কি বুকের পাটা! অমন ভায়ের কাছে কেমন ক'রে ওসব কথা বোল্লে! নীরজা আর কনকের কাছে বসে না, কনকের সহিত কথা কহে না, দেখা হইলে মুখ ভার করিয়া চলিয়া যায়, কনক কথা কহিতে গেলে নীরজা মুখ ফিরাইয়া অর্দ্ধ উত্তর দিয়া কাজে যায়। একদিন নীরজার মুখ খানি একটু শুষ্ক দেখিয়া কনক সাহসে ভর করিয়া বলিল, 'নীরজা কেন ভাই তোর মুখ খানি অত শুকনো? কিছু অসুখ করেছে?'

নী। 'কি আর অসুখ করবে?'

ক। 'তবে তোমার মুখ অত শুকনো কেন?'

নী। 'আমার ঐ রকমই মুখ।'

ক। 'আমি কি, ভাই, তোমার মুখ আর কখন দেখি নি?'

নী। 'আমার মুখ আর কেন তুমি দেখবে? তোমার দাদার মুখই বা কেন তুমি দেখবে? তোমার হিরণের মুখ দেখগে।'

কনক কষ্টে লজ্জায় অপমানে নিরুত্তর হইয়া রহিল। সেই দিন নীরজার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া প্রমোদ বলিলেন,

'নীরজা—আমার মনটা একে খারাপ হয়ে গেছে তা'তে তোমার ওরূপ বিষণ্ণ মুখ দেখলে যে, ভাই, বুক ফেটে যায়। চল, দিন কতকের জন্য তোমার সহিত কোথাও বেড়াইয়া আসি, এখানে থাকলে দেখ্‌ছি আমাদের এ বিষণ্ণতা ঘুচবে না।'

শুনিয়া নীরজার আহ্লাদ ধরিল না, কতদিন সে তাহার বাসস্থান অরণ্যটি দেখে নাই, সে ব্যগ্রভাবে বোটে করিয়া কানপুর যাইবার প্রস্তাব করিল। প্রমোদ তাহাতে আহ্লাদিত চিত্তে সম্মত হইলেন। ক্রমে তিন চারি দিনেই বেড়াইতে যাইবার সমস্ত উদ্যোগ হইয়া গেল।

সকলি প্রস্তুত। দ্রব্য সামগ্রী যা কিছু বোটে উঠিতে বাকী ছিল সকলি উঠিল, দাস দাসীর কোলাহল আরম্ভ হইল, আজ তাঁহাদের বোটে যাইবার দিন। কনককে একাকী ফেলিয়া আজ তাঁহারা বোটে যাইবেন। অন্য সময় হইলে তিন জনেই যাইতেন এখন কনক তাঁহাদের চক্ষুঃশূল, তাহাকে লইয়া যাইবেন কি করিয়া? তাহাকে একাকী কষ্ট ভোগ করিবার জন্য রাখিয়া তাঁহারা দুই জনেই বেড়াইতে চলিলেন।

কনক সেই সকাল হইতে একাকী বারান্দায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বোটে জিনিসপত্র ওঠান দেখিতেছিল এবং কাঁদিতেছিল। যে ভ্রাতার জন্য আপনার জন্মের সুখ বিসর্জ্জন করিল, আপনা হইতে আপনার হৃদয়-সর্ব্বস্ব হিরণকে পর্য্যন্ত আজীবন কষ্টে ফেলিল, যে ভ্রাতার কষ্ট হইবে বলিয়া সে হিরণকে বিবাহ করিতেও অসম্মত হইল, সেই ভ্রাতার আচরণে কাঁদিবে না?

নীরজা আজ আহ্লাদে পরিপূর্ণ। প্রথমতঃ, তাঁহারা কানপুরে বেড়াইতে যাইতেছেন, আবার নীরজা সেই বাল্য কালের অরণ্যটি দেখিতে পাইবে; যেখানে প্রমোদকে প্রথমে দেখিয়াছিলেন সেই খানে আবার একত্রে বেড়াইতে পারিবে, যদি সন্ন্যাসী সেখানে থাকেন তাহা হইলে আবার তাঁহার সহিত দেখা হইবে, এই সকল আশায় নীরজার তো আনন্দের সীমা নাই, তাহার পর আবার তাঁহার জন্যই এ সকল হইতেছে, নীরজার আহ্লাদ দেখে কে? তাঁহার উল্লাস-পূর্ণ ঈষৎ-গর্ব্ব-ময় চলন ফেরন, তাঁহার ওষ্ঠাধরের বিকসিত-ভাব তাঁহার চঞ্চল-চক্ষুর কটাক্ষ-আস্ফালন, সকলেই তাঁহার উল্লাস-ভাবের সাক্ষী প্রদান করিতেছে।

বেলা দ্বিপ্রহরে, নীরজা বোটে উঠিতে যাইবার সময় সিঁড়িতে নামিতে নামিতে আপন হস্তের পানের ডিবে দাসীকে দিয়া বলিল,

'যাদি, কনক, কি কর্‌ছে রে'?

বোধ হয় কনককে ঐরূপ অবস্থায় একাকী রাখিয়া যাইতে নীরজার এক একবার মন কেমন করিতেছিল। নীরজা হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত খুজিয়া দেখিলে হয়তো দেখিতে পাইত যে সে এখনো কনককে একটু একটু ভালবাসে, নহিলে

একটু একটু অমন কষ্ট হইবে কেন? নীরজার এক একবার মনে হইতে লাগিল, আহা কনক যদি আগেকার মতই থাকিত, না বদলিয়া যাইত তো বেশ হইত। নীরজার কথায় দাসী বলিল, "দিদিঠাকরুণ বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে জিনিসপত্র তোলা দেখছেন, আছা বৌঠাকরুণ তাঁকে সঙ্গে নিলে না কেন গা? আহা তাঁর মুখটি শুকিয়ে গেছে," শুনিয়া নীরজার একটু মমতা হইল। দাসী আবার বলিল, 'দেখ বৌঠাকরুণ, দিদিঠাকরুণ দিনকে দিন শুকিয়ে যাচ্চেন, তাই পাড়ার অনেকে অনেক বলে।'

নী। 'কি বলে?'

দাসী। 'বলে, ওমা অমন লক্ষ্মী বোনটি, যেমন রূপে তেমনি গুণে, মুখে যেন কথা নেই, তা ভাইটা বুঝি কষ্ট দেয় নইলে অমন শুকিয়ে যাচ্চে কেন? ভাইটা ছেলেবেলা হতে বড় দুরন্ত।'

শুনিয়া নীরজা জ্বলিয়া গেল। কনকের জন্য প্রমোদের এত জ্বালা, আবার তার উপর এই অপবাদ! কনক পোড়ারমুখী কি প্রমোদকে কষ্ট দিতেই জন্মিয়াছিল! কনকের জন্য স্বামীর অপবাদ শুনিয়া তাহার উপর নীরজার যে মমতা টুকুও হইয়াছিল তাহাও রহিল না, সে ক্রুদ্ধ হইয়া ভাবিল, বোটে গিয়াই ঐ কথা আগে স্বামীকে বলিয়া উহার একটা প্রতীকার বিধান করিবে।

ক্রমে ক্রমে তাঁহারা বোটে উঠিতে লাগিলেন, কনক দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। বোট ছাড়িয়া দিল, তাঁহারা দৃষ্টিপথের অতীত হইলেন, কনক ঘরে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ছিন্নতন্ত্রী।

ক্রমে অপরাহ্ণ কাল উপস্থিত হইল। অল্প অল্প মেঘ করায়, বিকালেই সন্ধ্যা সন্ধ্যা বোধ হইতেছে। বাতাস বড় না থাকাতে নদী এখন প্রশান্ত, নিস্তব্ধ, তাহাতে তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস নাই। নিঃশব্দে জাহ্নবী নদী মুমূর্ষু ব্যক্তির জীবনাশার ন্যায় বহিয়া যাইতেছে। সেই নদীর ধারে একটি বারাণ্ডায় বসিয়া কনক একখানি পত্র পড়িতেছিল। পত্রখানি হিরণের। কিছু পূর্ব্বে পত্রখানি কনক পাইয়াছে। কনকের মুখখানি কি মলিন, কি বিষণ্ণ, কি ভয়ানক যাতনাপীড়িত! দৃষ্টি যাতনাব্যঞ্জক, অথচ শূন্যময়, যেন কি দেখিতেছে কি পড়িতেছে সে কিছুই জানে না, কেবল যাহা পড়িতেছে তাহাতে একটি অসহ্য বেদনা অনুভব করিতেছে মাত্র। কনক চিঠিখানি দুই একবার মনে মনে পড়িল তাহাতে যেন ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়া, আর একবার পড়িতে আরম্ভ করিল, পড়িল,

'কনক, সরলে, আমার কনক—

কিন্তু এ জীবনে আর তাহা হইল না, তবুও একবার তবুও এই শেষবার, তোমাকে আমার বলিয়া চিরজীবনের অতৃপ্ত সাধ মিটাইব। কনক, আমার হৃদয়ের কনক, সরলে, কোন মনো-

ধনেই আমার আশা মিটিতেছে না, পৃথিবীতে আমার ভালবাসার মত কোন সম্বোধনই খুঁজিয়া পাই না, আমার সর্ব্বস্বধন, আমি চলিলাম।

"হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সম্বোধন করিয়া গেলাম, তুমি কি আমার স্পর্দ্ধায় দোষ লইবে? সরলে, অভাগা দুর্ভাগা দীন অসুখী বলিয়া, অপরাধীর মুক্ত কণ্ঠের এই শেষ উচ্ছ্বাসে দোষ লইও না। কনক, আমি তো মর্ম্মের নিভৃত বিজনে শত শতবার দিনে নিশীথে এইরূপ সম্বোধন করি, আজ মুক্তকণ্ঠে তোমাকে তাহা বলিলাম বলিয়া কি তুমি দোষ লইবে? আমার এই শেষ বিদায় বলিয়াও কি আমাকে ক্ষমা করিবে না? কনক তুমি মমতাময়ী, তুমি দেবী, তুমি এই অপরাধ কখনই লইবে না। অভাগার এই শেষ চিহ্ন বলিয়াও অন্তত মার্জ্জনা করিও। মুখে তোমাকে কখন সাহস করিয়া আমার বলিতে পারি নাই, পত্রে আজ জনমের মত সে সাধ মিটাইলাম, কনক ক্ষমা করিও। সরলে আমি ইহার মধ্যে এক দিন তোমার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ কামনায় গিয়াছিলাম, আমি যে তাঁহার শত্রু নহি, তাহা বলিবার অভিপ্রায়ে গিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমার সাক্ষাৎ-প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন, আমার সহিত তাঁহার আর দেখা হইল না, সুতরাং তোমাকে পাইবার আমার যে বিন্দুমাত্রও আশা ছিল, তাহাও অবসান হইল। এখন আমি দৃঢ়সঙ্কল্প; আমি চলিলাম। সমস্তই ঠিক, কাল প্রাতঃকালেই এস্থান হইতে চলিয়া যাইব। আমি কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম তাহার উত্তরের আশায় এ কয়েক দিন আমাকে এখানে থাকিতে হইয়াছিল, উত্তর পাইয়াছি কাল চলিয়া যাইব। এ কয়েক দিন ধরিয়া তোমাকে ভুলিবার জন্য কত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। যত চেষ্টা করি তোমার সেই প্রসন্নমূর্ত্তি তোমার সেই মমতাময়ীদেবীমূর্ত্তি আরো জ্বলন্তরূপে দেখিতে পাই, তোমাকে দেখিবার সাধ আরো বৃদ্ধি হয়। সরলে, আমি তোমাকে ভুলিতেও আর চেষ্টা করিব না—তুমি আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব, তুমি আমার দেবতা, তোমাকে পাইলাম না বলিয়া তোমাকে ভুলিব? আমার কনককে ভুলিব? না, না, চিরজীবন কষ্টে কাটুক, হৃদয় চিরজীবন যাতনায় দহিতে থাকুক, তবুও কনক তোমাকে ভুলিব না, মনে মনে আজীবন তোমাকে পূজা করিয়াই কাটাইব, ঐ মধুর প্রতিমা খানিই ধ্যান করিয়া জীবন কাটাইব।

সরলে! আমি যেদিন হইতে তোমাকে দেখিয়াছি সেই দিন হইতে এ হৃদয় তোমাতেই পূর্ণ, সেই দিন হইতে পৃথিবীর সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছি, কেমন করিয়া সেই হৃদয়াঙ্কিত কনককে আজ আমি ভুলিব? এক দিন আশা ছিল তোমাকে পাইয়া সুখী হইব, সে আশা আর নাই, তবে

আর কি আশে আমি থাকিব, আমি চলিলাম, ঐ প্রতিমা খানি পূজিয়া পূজিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে চলিলাম। সরলে, অভাগা হিরণের একমাত্র এই বাসনা,—একমাত্র এই প্রার্থনা,—তুমি সুখে থাক।”

কনক অভাগী—কনকের কেহই নাই কনক চির-দুঃখিনী। ভ্রাতার জন্য কনক চিরসুখ ত্যাগ করিল, ভাই তবুত কনককে ভাল বাসিল না। প্রাণের হিরণ, হৃদয়-সর্ব্বস্ব হিরণ, সেও আর কনককে ভাল বাসে না, নহিলে কেমন করিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া হিরণ চলিয়া যাইতেছেন, কনককে এই ঘোর যাতনা-সমুদ্রে ভাসাইয়া কেমন করিয়া হিরণ দেশত্যাগ করিবার কথা মনে আনিলেন? দেশে থাকিলে তবু কালে তাহাদের মিলন হইবার আশা থাকিত, তাহার ভ্রাতার কি ভ্রম আর কখনই ঘুচিত না? ভ্রাতার ভ্রম ঘুচুক আর নাই ঘুচুক সেই দূরকল্পিত আশাতেই কি তাহাদের কিছু সান্ত্বনা হইত না? হিরণ কনককে তেমন ভাল বাসেন না, তাই তিনি কনককে ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন, কনক তো এইরূপ অবস্থায় তাহা পারিত না। যতই কষ্ট হৌক না কেন, হিরণের সহিত এক দেশে আছে জানিতে পারিলেও কনক সুখী হইত। হিরণই যখন তাহাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন কনকের তখন আর বাঁচিয়া কি হইবে? কি আশে আর এই অসীম যাতনা সে সহ্য করিবে? সহসা এই সময় বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। সেই অল্প অল্প মেঘরাশি গাঢ়তর হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার করিয়া ফেলিল, বিকটগর্জ্জনে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে গভীর ঝঞ্ঝনায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। কনক সেই নিবিড়-মেঘাচ্ছন্ন অবিশ্রান্ত-বৃষ্টি-বর্ষণ-শীল আকাশের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। শূন্যময় দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া আপন মনে কাঁদিয়া উঠিল। আবার তখনি অশ্রু-বারি মুছিয়া আপন মনে কি ভাবিতে লাগিল, কি যেন একটী কথা মনে আনিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, সেই অন্ধকারময় আকাশ দেখিয়া কি একটি গান যে মনে আসিয়াও আসিতেছিল না—সহসা কনক গাহিয়া উঠিল—

আকাশের ঐ মেঘ এখনি তো ছুটিবে,
আবার জোছনা ভাতি এখনি তো ফুটিবে,
কিন্তু লো স্বজনি আর, হৃদয়ের এ আঁধার
এ জনমে অভাগীর কভু না ঘুচিবে।”

আবার সহসা বিকট গর্জ্জনে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, কনকের দৃষ্টি ঝলসিয়া দূরে বজ্র গিয়া পড়িল। বালিকা কখনো উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিত না, আজ অজ্ঞানের মত উচ্চৈঃস্বরে এই গানটি গাহিতে গাহিতে বজ্র ধরিবার আশায় ছুটিয়া বারাণ্ডা হইতে উঠিয়া গেল।

আজ ওরে বজ্র তোরে কখনো না ছাড়িব,
আটকি হৃদয়ে তোরে এ হৃদয় দহিব,
হৃদয়ে কি কাজ আর পুড়ে হোক ছারখার
হৃদয় সর্ব্বস্ব ছেড়ে হৃদয় কেন রাখিব?’

উদ্যানে আসিয়া গঙ্গাতীর দিয়া গাহিতে গাহিতে ছুটিয়া বাড়ীর সীমানা অতিক্রম করিল,

অনাথা উন্মাদিনী-বেশে সেই ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগে একাকিনী গান গাহিয়া গাহিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ঝড়বৃষ্টিতে দাসদাসীগণ কেহই কনককে বাটী ত্যাগ করিবার সময় দেখিতে পাইল না।

সম্পাদকের বৈঠক।

বৃদ্ধ কবি।

ভূপালী রাগিণী।

মন হোতে প্রেম যেতেছে শুকায়ে
জীবন হোতেছে শেষ,
শিথিল কপোল মলিন নয়ন
তুষার-ধবল কেশ!
পাশেতে আমার নীরবে পড়িয়া
অযতনে বীণাখানি,
বাজাবার বল নাইক এ হাতে
জড়িমা জড়িত বাণী!
গীতিময়ী মোর সহচরি বীণা!
হইল বিদায় নিতে;
আর কি পারিবি ঢালিবারে তুই
অমৃত আমার চিতে?
তবু একবার আর একবার
ত্যজিবার আগে প্রাণ,
মরিতে মরিতে গাহিয়া লইব
সাধের সে সব গান!
দুলিবে আমার সমাধী উপরে
তরুগণ শাখা তুলি,
বন দেবতারা গাইবে তখন
মরণের গান গুলি!

Translated from an English translation of the poem, by Talhaiarn the Welsh poet.

বেহাগ।

জাগি রহে চাঁদ আকাশে যখন
সারাটি রজনী!
শ্রান্ত জগত ঘুমে অচেতন
সারাটী রজনী!
অতি ধীরে ধীরে হৃদে কি লাগিয়া
মধুময় ভাব উঠেগো জাগিয়া
সারাটি রজনী!
ঘুমায়ে তোমারি দেখিগো স্বপন
সারাটি রজনী!
জাগিয়া তোমারি দেখিগো বদন
সারাটি রজনী!
ত্যজিবে যখন দেহ ধূলিময়
তখন কি সখি তোমার হৃদয়।
আমার ঘুমের শয়ন পরে
ভ্রমিয়া বেড়াবে প্রণয় ভরে।
সারাটি রজনী!

পূরবী।

পাতায় পাতায় দুলিছে শিশির
গাহিছে বিহগগণ,
ফুলবন হোতে সুরভি হরিয়া
বহিতেছে সমীরণ!
সাঁঝের আকাশ মাঝারে এখনো
মৃদুল কিরণ জ্বলে!
নলিনীর সাথে বসিয়া তখন
কতনা হরষে কাটাইনু ক্ষণ,
কে জানিত তবে বালিকা নিদয়
রেখেছিল ঢাকি কপট-হৃদয়
সরল হাসির তলে!
এইত সেথায় ভ্রমি, গো, যেথায়
থাকিত সে মোর কাছে,
প্রকৃতি জানেনা পরিবরতণ
সকলি তেমনি আছে!
তেমনি গোলাপ রূপ-হাসি-ময়
জ্বলিছে শিশির-ভরে,
যে হাসি-কিরণে আছিল প্রকৃতি
দ্বিগুণ দ্বিগুণ মধুর আকৃতি,
সে হাসি নাইক আর!

Translated from an English translation of an Irish Song.

পিলু।

বল, গো বালা, আমারি তুমি
হইবে চিরকাল!
আনিয়া দিব চরণ তলে
যা কিছু আছে সাগর জলে
পৃথিবী পরে আকাশ তলে,
অমুল মণি জাল!
শুনি আশার মোহন-রব
যা কিছু ভাল লাগিবে তব
আনিয়া দিব হও, গো, যদি
আমারি চিরকাল!
যেথায় মোরা বেড়াব দুটি,
কুসুমগুলি উঠিবে ফুটি,
নদীর জলে শুনিতে পাব
দেবতাদের বাণী!
তারকাগুলি দেখাবে যেন
প্রেমিকদেরি জগত হেন,
মধুর এক স্বপন সম
দেখাবে ধরা খানি!
আকাশ-ভেদী শিখর হোতে
পতন শীল নিঝর-স্রোতে
নাহিয়া যথা কানন-ভূমি
হরিত-বাসে সাজে,
চির-প্রবাহী সুখের ধারে
দোঁহার হৃদি হাসিবে হারে—
যেই সুখের মূল লুকানো
কলপনার মাঝে!
প্রেম দেবের কুহক জালে
হৃদয়ে যার অমৃত ঢালে,
সেই সে জনে করেন প্রেম
কত না সুখ-দান;
তবন তাঁর স্বরগ পরে,
যেথায় তাঁর চরণ পড়ে
ধরার মাঝে স্বরগ শোভা
ধরে, গো, সেই খান!

Moore's Irish Melodies.

গিয়াছে সে দিন, যে দিন হৃদয়
রূপের মোহনে আছিল মাতি,
প্রাণের স্বপন আছিল যখন
প্রেম প্রেম শুধু দিবস রাতি!

শান্ত আশা এ হৃদয়ে আমার
এখন ফুটিতে পারে,
সুবিমলতর দিবস আমার
এখন উঠিতে পারে!
বালক কালের প্রেমের স্বপন—
মধুর যেমন উজল যেমন
তেমন কিছুই আসিবে না,
তেমন কিছুই আসিবে না!
সে দেবী প্রতিমা নারিব ভুলিতে
প্রথম প্রণয় আঁকিল যাহা,
স্মৃতি-মরু মোর উজল করিয়া
এখনো হৃদয়ে বিরাজে তাহা!
সে প্রতিমা সেই পরিমল সম
পলকে যা লয় পায়,
প্রভাত কালের স্বপন যেমন
পলকে মিশায়ে যায়।
অলস প্রবাহ জীবনে আমার
সে কিরণ কভু ভাসিবেনা আর
সে কিরণ কভু ভাসিবেনা,
সে কিরণ কভু ভাসিবেনা!

"Love's young dream" in Moore's Irish Melodies.

রূপসী আমার, প্রেয়সী আমার,
যাইবি কি তুই যাইবি কি তুই,
রূপসী আমার যাইবি কি তুই,
ভ্রমিবারে গিরি-কাননে?
পাদপের ছায়া মাথার পরে,
পাখীরা গাইছে মধুর স্বরে
অথবা উড়িছে পাখা বিছায়ে
হরষে সে গিরি-কাননে!
রূপসী আমার প্রেয়সী আমার
যাইবি কি তুই যাইবি কি তুই,
রূপসী আমার, যাইবি কি তুই
ভ্রমিবারে গিরি-কাননে?
শিখর উঠেছে আকাশপরি,
ফেনময় স্রোত পড়িছে ঝরি,
সুরভি-কুঞ্জ ছায়া বিছায়ে
শোভিছে সে গিরি-কাননে!
রূপসী আমার, প্রেয়সী আমার,
যাইবি কি তুই যাইবি কি তুই,
রূপসী আমার, যাইবি কি তুই
ভ্রমিবারে গিরি-কাননে?
ধবল শিখর কুসুমে ভরা
সরসে ঝরিছে নিঝর-ধারা
উছসে উঠিয়া সলিল-কণা
শীতলিছে গিরি-কাননে!
রূপসী আমার, প্রেয়সী আমার,
যাইবি কি তুই যাইবি কি তুই,
রূপসী আমার, যাইবি কি তুই
ভ্রমিবারে গিরি-কাননে?
সুখ দুখ যাহা দিলেন, বিধি,
কিছুই মানিতে চায়না হৃদি,
তোমারে ও প্রেমে লইয়া পাশে
ভ্রমি যদি গিরি-কাননে!

Burns.

সুশীলা আমার, জানালার পরে
দাঁড়াও একটিবার!
একবার আমি দেখিয়া লইব
মধুর হাসি তোমার!
কত দুখ-জ্বালা সহি অকাতরে
ভ্রমি, গো, দূর প্রবাসে
যদি লভি মোর হৃদয়-রতন—
সুশীলারে মোর পাশে!

কালিকে যখন নাচ গান কত
হতেছিল সভা পরে,
কিছুই শুনিনি, আছিনু মগন
তোমারি ভাবনা ভরে
আছিল কতনা বালিকা, রমণী,
রূপসী প্রমোদ-হিয়া,
বিষাদে কহিনু 'তোমরাত নহ'
সুশীলা, আমার প্রিয়া!'
সুশীলে, কেমনে ভাঙ্গ' তার মন
হরষে মরিতে পারে যেই জন
তোমারি তোমারি তরে!
সুশীলে, কেমনে ভাঙ্গ' হিয়া তার
কিছু যে করেনি, এক দোষ যার
ভাল বাসে শুধু তোরে!
প্রণয়ে প্রণয় না যদি মিশাও
দয়া কোরো মোর প্রতি,
সুশীলার মন নহেত কখনো
নিরদয় এক রতি! Burns.

'কোরনা ছলনা কোরনা ছলনা
যেওনা ফেলিয়া মোরে!
এতই যাতনা দুখিনী আমারে
দিতেছ কেমন কোরে?
গাঁথিয়া রেখেছি পরাতে মালিকা
তোমার গলার পরে,
কোরনা, ছলনা কোরনা ছলনা,
যেওনা ফেলিয়া মোরে!
এতই যাতনা দুখিনী—বালারে
দিতেছ কেমন কোরে?
যে শপথ তুমি বোলেছ আমারে
মনে কোরে দেখ তবে,
মনে ক'র সেই কুঞ্জ যেথায়
কহিলে আমারি হবে।
কোরনা ছলনা—কোরনা ছলনা
যেওনা ফেলিয়া মোরে,
এতই যাতনা দুখিনী-বালারে
দিতেছ কেমন কোরে?'
এত বলি এক কাঁদিছে ললনা
ভাসিছে লোচন-লোরে
"কোরনা ছলনা—কোরনা ছলনা
যেওনা ফেলিয়া মোরে;
এতই যাতনা দুখিনী-বালারে
দিতেছ কেমন কোরে?'

Chappel

চপলারে আমি অনেক ভাবিয়া
দূরেতে রাখিয়া এলেম তারে,
রূপ-ফাঁদ হোতে পালাইতে তার,
প্রণয়ে ডুবাতে মদিরা-ধারে।
এত দূরে এসে বুঝিনু এখন
এখনো ঘুচেনি প্রণয়-ঘোর,
মাথায় যদিও চোড়েছে মদিরা
প্রণয় রোয়েছে হৃদয়ে মোর?
যুবতীর শেষে লইনু শরণ
মাগিনু সহায় তার,
অনেক ভাবি সে কহিল তখন
"চপলা নারীর সার।"
আমি কহিলাম 'সে কথা তোমার
কহিতে হবেনা মোরে—
দোষ যদি কিছু বলিবারে পারো
শুনি প্রণিধান কোরে।'
যুবতী কহিল 'তাও কভু হয়?
যদি বলি দোষ আছে—
নামের আমার কুযশ হইবে
কহিনু তোমার কাছে।'

রাখ মোর কথা, সখা, ভুলে যাও তারে,
কি হবে রাখিয়া মনে চপলা বালারে ?
করিছ নয়ন ক্ষয় অশ্রু বরষিয়া,
এ অশ্রুর যোগ্য সে কি, বল, সখা, বল দেখি
ছি, ছি, ছি, সরমে তাহা ফেলগো মুছিয়া !
তুচ্ছ সে হৃদয় তরে-চপলতাময়
মহান্-হৃদয় তব করিতেছ ক্ষয় !
তার কটাক্ষের হাসি, তাহার ঘৃণার রাশি,
করিবে কি তার সাথে অশ্রু বিনিময় ?
মন অধিকার করা যার ব্যবসায়,
মন লোয়ে দলিবারে আমোদ যে পায়,
ছেলে খেলা করে লোয়ে পরের হৃদয়,
নিত্য-নব-অনুরাগী, বল, সখা, তার লাগি
তিল মাত্র দুখ পেতে লাজ নাহি হয় ?
মুছ, সখা, মন হোতে মুরতি তাহার,
মুছ, সখা, আঁখি হোতে অশ্রু-বারিধার !
যোগ্যতর পাত্রে তব মন কর দান,
সে প্রেমের নিরাশাও পবিত্র মহান্ !

না, সখা, মনের ব্যথা কোরনা গোপন !
যবে অশ্রু-জল, হায়, বহিবারে বাহিরায়
চাপিয়া রেখোনা তাহা আমারি কারণ !
চিনি, সখা, চিনি তব ও দারুণ হাসি
ওর চেয়ে কত ভাল অশ্রু জল রাশি !
মাথা খাও, অভাগীরে কোরনা বঞ্চনা,
ছদ্মবেশে আবরিয়া রেখোনা যন্ত্রণা।
মমতার অশ্রুজলে নিভাইব সে অনলে ;
ভাল বাস যদি তবে রাখ এ প্রার্থনা !

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

কাছে তার যাই যদি, কত যেন পায় নিধি
তবু হরষের হাসি ফুটে ফুটে ফুটেনা !
কখনো বা মৃদু হেসে, আদর করিতে এসে
সহসা সরমে বাধে, মন উঠে উঠেনা !
রোষের ছলনা করি, দূরে যাই চাই ফিরি,
চরণ বারণ তরে উঠে উঠে উঠেনা !
কাতর নিশ্বাস ফেলি, আকুল নয়ন মেলি
চাহি থাকে, লাজবাঁধ তবু টুটে টুটেনা !
যখন ঘুমায়ে থাকি, মুখ পানে মেলি আঁখি
চাহি থাকে, দেখি দেখি সাধ যেন মিটেনা!
সহসা উঠিলে জাগি, তখন কিসের লাগি
সরমেতে মোরে গিয়ে কথা যেন ফুটেনা!
লাজময়ি ! তোর চেয়ে দেখিনি লাজুক মেয়ে
প্রেম-বরিষার স্রোতে লাজ বাঁধ টুটেনা !

দেশ।

বুঝেছি বুঝেছি সখা, ভেঙ্গেছে প্রণয়,
ও মিছা আদর তবে না করিলে নয় ?
ও শুধু বাড়ায় ব্যথা, সে সব পুরাণো কথা
মনে কোরে দেয় শুধু, ভাঙ্গে এ হৃদয় !
প্রতি হাসি, প্রতি কথা, প্রতি ব্যবহার,
আমি যত বুঝি তব, কে বুঝিবে আর ?
প্রেম যদি ভুলে থাকো, সত্য কোরে বল নাকো,
করিব না মুহূর্ত্তের তরে তিরস্কার।
আমিত বোলেই ছিনু ক্ষুদ্র আমি নারী,
তোমার ও প্রণয়ের নহি অধিকারী !
আর কারে ভাল বেসে, সুখী যদি হও শেষে
তাই ভাল বেসো, নাথ, না করি বারণ !
মনে কোরে মোর কথা, মিছা পেয়োনাকো ব্যথা,
পুরাণো প্রেমের কথা কোরো না স্মরণ !

এখন ত আর নাই কোন আশা
হইয়াছি অসহায়—
চপলা আমার মরমে মরমে
বাণ বিঁধিতেছে, হায়!
দলে মিশি তার ইন্দ্রিয় আমার
বিরোধী হোয়েছে মোর,
যুবতি আমার—বলিছে আমারে
রূপের অধীন ঘোর!

Lord Cantalupe.

প্রেমতত্ত্ব।

নিঝর মিশিছে তটিনীর সাথে
তটিনী মিশিছে সাগর পরে,
পবনের সাথে মিশিছে পবন
চির-সুমধুর প্রণয় ভরে!
জগতে কেহই নাইক' একেলা,
সকলি বিধির নিয়ম-গুণে,
একের সহিত মিশিছে অপরে
আমি বা কেননা তোমার সনে?
দেখ, গিরি ঐ চুমিছে আকাশে,
ঢেউ পরে ঢেউ পড়িছে ঢলি,
সে কুল-বালারে কে বা না দোষিবে,
ভাইটিরে যদি যায় সে ভুলি!
রবি-কর দেখ চুমিছে ধরণী,
শশি-কর চুমে সাগর জল,
তুমি যদি মোরে না চুম', ললনা,
এসব চুম্বনে কি তবে ফল?

Shelley.

নলিনী।

লীলাময়ী নলিনী,
চপলিনী নলিনী,
শুধালে আদর কোরে
ভাল সে কি বাসে মোরে,
কচি দুটি হাত দিয়ে
ধরে গলা জড়াইয়ে,
হেসে হেসে একেবারে
ঢলে পড়ে পাগলিনী!
ভাল বাসে কি না, তবু
বলিতে চাহেনা কভু
নিরদয়া নলিনী!
যবে হৃদি তার কাছে,
প্রেমের নিশ্বাস যাচে
চায় সে এমন কোরে
বিপাকে ফেলিতে মোরে,
হাসে কত, কথা তবু কয়না!
এমন নির্দ্দোষ ধূর্ত্ত
চতুর সরল,
ঘোমটা তুলিয়া চায়
চাহনি চপল
উজ্জ্বল অসিত-তারা-নয়না!
অমনি চকিত এক হাসির ছটায়
ললিত কপোলে তার গোলাপ ফুটায়,
তখনি পলায় আর রয়না!

Tennyson.

কি করিব বল, সখা, তোমার লাগিয়া?
কি করিলে জুড়াইতে পারিব ও হিয়া?
এই পেতে দিনু বুক রাখ, সখা, রাখ মুখ,
ঘুমাওগো পরিশ্রান্ত, রহিব জাগিয়া!
খুলে বল, বল, সখা, কি দুঃখ তোমার?

অশ্রুজলে মিশাইব অশ্রুবারি-ধার!
এক দিন বোলেছিলে মোর ভালবাসা
পেলেই পূরিবে তব হৃদয়ের আশা!
বোলেছিলে সব তব করিছে নির্ভর
পৃথিবীর সুখ দুঃখ আমার উপর!
কই, সখা, প্রাণ মন কোরেছি ত সমর্পণ,
দিয়াছি ত যাহা কিছু আছিল আমার,
তবু শুকালো না কেন অশ্রু-বারি-ধার?

ইংলণ্ডীয় রাজ্যতন্ত্র (Constitution)

যে ইংলণ্ড পৃথিবীর সকল অংশেই আপনার সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছে, কত শত বিভিন্ন রাজ্য সুনিয়মে শাসন করিতেছে, তাহার নিজের অভ্যন্তর রাজ্যপ্রণালী কিরূপে নির্ব্বাহিত হয়, তাহা সকলের বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয়দের আলোচনা করা আবশ্যক।

এই রাজ্যতন্ত্র রাজ-বিদ্রোহী লোক-দিগের বিজয়ের ফল বা কোন বদান্য রাজার অনুগ্রহ-প্রদত্ত নহে। ইহা কোন সনন্দ বা রাজা ও প্রজাগণের পরস্পর সম্মতি পত্র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ইহা বিশেষ বিশেষ সনন্দ ও মহাসভা-কৃত নিয়ম সকলের সমষ্টিও নহে, কারণ মহা-সনন্দের Magna charta র সময় হইতে একাল পর্য্যন্ত মহাসভা যে সকল নিয়ম ব্যবস্থাপন করিয়াছে, তাহা ইংলণ্ডের সমস্ত সাধারণ আইনের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। বস্তুতঃ সেই সনন্দাদি পুরাতন অলিখিত নিয়মের সাব্যস্তকারী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

ইংলণ্ডের রাজ্য-তন্ত্র অভাব, আশু-প্রয়োজন, ভিন্নদলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিজয়, স্বার্থপরতা, সুযোগ প্রভৃতি হইতে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াছে। যেমন যুবা-পুরুষের প্রধান প্রধান অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নবোৎপন্ন নহে, সে গুলি তাহার বাল্যাবস্থাতেও ছিল, কেবল এক্ষণে অধিকতর পরিপুষ্ট ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র, ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজ্য-তন্ত্রের প্রধান অংশগুলিও সেইরূপ। কোন বিপ্লব দ্বারা কখনো এদেশের নিয়মের মূল উচ্ছিন্ন হয় নাই; সময়ে সময়ে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা তাৎকালিক নিয়মের রক্ষার জন্য, কোন নূতন নিয়ম সংস্থাপন জন্য নহে।

মহাসভা (পার্ল্যামেণ্ট)।

রাজ্য-কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য এই মহা-সভা সর্ব্ব-প্রধান।

মহা সভা তিন ভাগে বিভক্ত। (১) রাজা বা রাজ্ঞী, (২) লর্ড, (৩) কমন্স।

পূর্ব্বে অ্যাঙ্গ্লো স্যাক্সনদের এক প্রধান জাতীয় সমাজ ছিল, তাহার নাম বিজ্ঞসমাজ (Witenagemot) এইসমাজ লোকদিগের নিমিত্ত ব্যবস্থা স্থাপন করিত, প্রধান প্রধান বিষপ, অ্যাবট্ প্রভৃতি জেলার প্রধান ভূম্যধিকারী এবং রাজ্যের অন্যান্য কুলীন ও বিজ্ঞলোক সেই সমাজের সভ্য ছিলেন। তাঁহারা কিরূপে নির্ব্বাচিত হইতেন, তাহা অবধারণ করা কঠিন। এই সমাজের সম্মতি ব্যতীত রাজা কোন কর বা নিয়ম স্থাপন করিতে পারিতেন না। বিজ্ঞসমাজের সভ্যগণ এই সমাজে আপন আপন মত দিতেন, কিন্তু বোধ হয় তাঁহাদের মধ্যে প্রতিনিধি দ্বারা মত দেওয়া প্রথা ছিল না। নর্ম্ম্যাণ অধিকারের পর (১০৬৬ খৃঃ অঃ) স্যাক্সনদের বিজ্ঞ-সমাজ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্বজাতীয় রাজ-নীতি বিষয়ক স্বত্ব একেবারে লুপ্ত হইয়াছিল। নর্ম্মাণ রাজাদের যে একটি সভা ছিল, তাহার নিয়ম ব্যবস্থাপনের কোন ক্ষমতা ছিল না। ইহার নাম রাজ-সভা (Curia-regis), রাজা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই এই সভায় আহ্বান করিতেন। এই সভায় বিচার সম্বন্ধীয় অনেক কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। পরাক্রম-শালী নর্ম্ম্যাণ রাজারা গত হইলে এই রাজসভা ক্রমশঃ বলবতী হইতে লাগিল। দ্বিতীয় হেনরী এই সভা রাজ্যের গুরুতর কার্য্য বিষয়ে পরামর্শ লইবার জন্য সর্ব্বদা আহ্বান করিতেন। কর ও ব্যবস্থা স্থাপন যে ব্যারণ দিগের বিশেষ অধিকার তাহা ১২১৫ খৃষ্টাব্দে মহা-সনন্দের (Magna-charta) দ্বারা প্রথম স্বীকৃত ও সাব্যস্ত হয়। এই মহা-সনন্দ ইংলণ্ডীয় রাজ্যতন্ত্রের এক প্রধান অঙ্গ, এজন্য এস্থলে তাহার সংক্ষেপ বিবরণ আবশ্যক।

দ্বিতীয় হেনরীর পুত্র যন ১১৯৯ খৃঃঅব্দে সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া আপন নির্ব্বুদ্ধিতা ও দুর্ব্বলতা-দোষে প্রথমতঃ ফ্রান্সদেশ-স্থিত আপন রাজ্যের অধিকাংশ হারাইলেন। এই সময়ে তৃতীয় ইনোসেণ্ট রোমের পোপ ছিলেন। তিনি আপন বুদ্ধিবলে প্রায় ইয়ুরোপীয় সমস্ত রাজমণ্ডলীকে এরূপ বশে আনিয়াছিলেন, যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন পোপ সেরূপ পারেন নাই। তিনি যনকে আপন বশে আনিবার জন্য প্রথমতঃ তাঁহাকে ধর্ম্ম-মণ্ডলী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তাঁহার স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ভয় দেখান। পরে ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ্ ও ইংলণ্ডের লোকদিগের তাঁহার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ ও তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিতে আজ্ঞা দেন। যন আপন প্রজা-গণের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্তির আশা না দেখিয়া পোপের বশীভূত হইলেন ও এক সনন্দে ইংলণ্ড ও আয়ার্লণ্ড, ঈশ্বর, সেন্ট পীটর্, সেণ্টপল্, পোপ্ ইনোসেণ্ট ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগকে দান করিলেন ও পোপের অধীনে এই রাজ্য শাসন করিতে ও তাঁহাকে প্রতি বৎসর করস্বরূপ ১০০০ মার্ক দিতে স্বীকার করিলেন। এই যনের ঔদ্ধত্যে ব্যারণগণ সতত অপমানিত হইতেন ও লাম্পট্যে তাঁহাদের

কুল-মর্য্যাদা বিনষ্ট হইত। বলপূর্ব্বক কর গ্রহণ ও অন্যান্য নানা প্রকার অত্যাচারে সকলেই ইহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল। যন নিজ রাজ্যের স্বাধীনতা পোপকে দান করিয়া সকল লোকের এরূপ ঘৃণাস্পদ হইয়া উঠিলেন যে, প্রধান প্রধান ব্যারণেরা আপনাদিগের স্বত্ব পুনঃস্থাপন ও রক্ষার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও অস্ত্রধারণ করিতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। লণ্ডনের প্রায় সকল লোক ও অনেক ছোট বড় ব্যারণ তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইল। যখন যন্ দেখিলেন যে, তাঁহার পক্ষীয় লোক অতি অল্প, ও অধিকাংশ লোক তাঁহার বিপক্ষ, তখন নিরুপায় হইয়া রণিমিড নামক স্থানে মহা-সনন্দে স্বাক্ষর করিলেন। এই সনন্দ দ্বারা সকল পদস্থ লোকেরই স্বাধীনতা ও স্বত্ব প্রদত্ত বা সংবক্ত ও রক্ষিত হইল। এই সনন্দের নিম্নলিখিত কয়েকটি ধারাই প্রধান।

(১) কোন পাদরির পদ শূন্য হইলে পাদরীরা সেই পদে অন্য লোক নিযুক্ত করিবেন। রাজা শুদ্ধ তাহাতে সম্মতি দিবেন। যদি না দেন, তথাপি সে নিয়োজন ব্যর্থ হইবে না।

(২) রাজ্যের প্রধান রাজ-সভার অনুমতি ব্যতীত রাজা কোন কর ব্যবস্থাপন করিতে পারিবেন না। রাজা রাজ্যের সকল বিষপ্, আর্‌ল ও প্রধান ব্যারণকে পৃথক পৃথক আজ্ঞাপত্র (Writ) দ্বারা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী-গণকে সরিফের সমন দ্বারা ঐ প্রধান রাজসভায় আহ্বান করিবেন।

(৩) লণ্ডন ও অন্যান্য নগরের স্বাধীনতা অক্ষত থাকিবেক ও প্রধান রাজসভার অনুমতি ব্যতীত রাজা সেই সকল নগর হইতে কোন কর গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৪) এক প্রকার ওজন ও মাপ সমস্ত রাজ্যে চলিবেক।

(৫) বিদেশীয় বণিকেরা রাজার অনুমতি বিনা ইংলণ্ডে বাণিজ্য করিতে পারিবে।

(৬) কোন ব্যারণ ব্যারণগণের বিচার ব্যতীত, এবং কোন স্বাধীন ব্যক্তি (Freeman) দেশীয় ব্যবহারানুসারে বিচারিত না হইলে ধৃত, কারারুদ্ধ বা নিষ্কর ভূমি হইতে বঞ্চিত, অথবা স্বাধীনতা বা অন্যকোন প্রকার স্বত্ব ও অধিকার হইতে বিচ্যুত, নির্ব্বাসিত, বা প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে না।

প্রসিদ্ধ আর্‌ল অব লেস্‌টর্‌ তৃতীয় হেন্‌রীর সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া সমস্ত রাজ্যের এক প্রকার প্রভু হইয়াউঠিলেন। তিনি আপনার আধিপত্য দৃঢ়ীভূত করণার্থ ১২৬৫ খৃঃঅব্দের ২০এ জানুয়ারী লণ্ডনে এক নূতন প্রধান রাজসভা আহ্বান করেন। তিনি আপন পক্ষীয় ব্যারণ ব্যতীত অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাদ্রি ও প্রতি জেলা (County) হইতে দুই দুইটি নাইট এবং প্রতি (Borough) হইতে দুই দুইটি প্রতিনিধি ঐ সভায় আহ্বান করেন। ইহার পূর্ব্বে কোন নগর বা জেলার সামান্য লোক প্রধান রাজ-

সভায় বসেন নাই। ইহাই হাউস্ অফ্ কমন্সের প্রথম বৈঠক।

ইহার পর প্রথম এডওয়াড্ও মহা-সভায় প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য প্রতি নগরে সমন্ পাঠাইয়া দেন। অনেকে মনে করেন যে, সাধারণ ব্যক্তিগণ Commons যখন প্রথম মহা সভায় প্রবেশ করেন, তখন ঐ সভা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল না। কিন্তু তৃতীয় এড্ওয়ার্ডের সময় যে, লড্স্ ও কমন্স এখন-কার মত পৃথক পৃথক বৈঠক করিতেন, তাহার সন্দেহ নাই। প্রধান ব্যারণ গণ ও বিষপেরা হাউস অফ লর্ডে ও নীচপদস্থ পাদরী ও নগর সকলের প্রতি নিধিগণ হাউস্ অফ্ কমন্সে বসিতেন।

ব্যারণেরা এক প্রকার জায়গীরদার বা ভূম্যধিকারী। নর্ম্যাণদিগের অধি-কার অবধি এই জায়গীরদারী বন্দোবস্ত ইংলণ্ডে প্রচলিত। প্রথম উইলিয়ম প্রায় ইংলণ্ডের সমস্ত ভূমি বিভাগ করিয়া আপন সেনাধ্যক্ষ ও সঙ্গীগণকে জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন। পূর্ব্বে যে সকল অ্যাঙ্গ্লো স্যা-ক্সন ভূম্যধিকারী ছিলেন, তাঁহারা এই নূতন জাগীরদারদিগের অধীনস্থ প্রজা হইয়া পড়েন। এই জাগীদারদিগকে ব্যারণ কহে। ইহাঁরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ ক্ষুদ্র ব্যারণ। ইহাদিগকে কেবল রাজার নাইট্-সর্বিস্ Knight-Service করিতে হইত; অর্থাৎ রাজার জন্য আপন প্রজাগণের মধ্য হইতে কতকগুলি যোদ্ধাকে অস্ত্রাদিতে সম্পূর্ণ-রূপে সজ্জিত করিয়া বৎসরে ৪০ দিন রাখিতে হইত।

(২) প্রধান ব্যারণ। ইহাঁদিগকে ক্ষুদ্র ব্যারণদের ন্যায় যুদ্ধে সাহায্য করিতে হইত, তাহা ভিন্ন ইঁহারা রাজার সহিত রাজ-সভায় থাকিতেন। ইহারা আপন আপন প্রজাগণের ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমা সকল বিচার করিতেন। ক্ষুদ্র ব্যারণ আপন প্রজাদের কেবল দেওয়ানী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারিতেন। এই প্রধান ব্যারণ সকল রাজকীয় ব্যারণ শব্দে উক্ত হইতেন, ইহাঁ-রাই প্রথমে হাউস্ অফ লর্ডসের মেম্বর হন। বিষপেরা অনেক ব্যারণী বা জাগীরের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, এজন্য ইহাঁরাও তাহার মেম্বর হন। ব্যারণেরা আপন জাগীর ও গড়বাড়ি হারাইলে আর লর্ডের সভায় বসিতে পারিতেন না।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, রাজা বা রাজ্যকর্ত্রী রাজ্ঞী * পার্ল্যামেণ্ট বা মহাসভার এক অংশ। বস্তুতঃ তিনি এই সভার সর্ব্বপ্রধান। মহাসভা কেবল ব্যবস্থাদায়িনী নহে, ইহা রাজার

*পাঠকেরা লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, আমরা এই প্রবন্ধে রাজ্ঞী ও রাজ্যকর্ত্রী রাজ্ঞী এই দুই কথা বিভিন্ন অর্থে ব্যব-হার করিয়াছি। রাজার স্ত্রী রাজ্ঞী; কিন্তু যে মহিলা স্বয়ং রাজ্য শাসন করেন, তিনি রাজ্যকর্ত্রী রাজ্ঞী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

প্রধান মন্ত্রণা-দায়িনী সভা ও সর্ব্বপ্রধান বিচারাগারে (High Court) যেমন রাজা সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছেন অনুমান করিয়া লইতে হয় মহাসভাতেও সেই-রূপ। অর্থাৎ তিনি হাউস্ অফ্ লর্ডস ও হাউস্ অফ কমন্স উভয় স্থানেই সর্ব্বদা আছেন এরূপ মনে করিয়া লইতে হইবে। প্ল্যাণ্টাজেনেট বংশীয় রাজাদিগের সময়ে এই রূপ নিয়ম ছিল যে, রাজাকে হাউস অফ্ লর্ডসে বসিতে হইত। ষষ্ঠ হেনরীর সময় এই নিয়ম হয় যে রাজা উপস্থিত না থাকিলেও হাউস অফ্ লর্ডসের কার্য্য চলিবে। দ্বিতীয় চার্লস্; দ্বিতীয় জেম্স, তৃতীয় উইলিয়ম ও অ্যান্ তথায় সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতেন। প্রথম জর্জের সময়াবধি রাজারা আর তথাকার তর্ক বিতর্ককালে যান না; লর্ড চ্যান্সেলর রাজার প্রতি-নিধি স্বরূপ তথায় থাকেন।

রাজার অনেকগুলি বিশেষ অধিকার আছে।

(১) কেহ রাজার নামে ফৌজদারী বা দেওয়ানী আদালতে নালিস করিতে পারিবে না। তাঁহার উপর যদি কাহার কোন দাওয়া থাকে তাহা হইলে দরখাস্ত করিয়া প্রথমে রাজার অনুমতি লইয়া তাহা আদালতে আনিতে হয়। ঐ দরখাস্ত হোম-সেক্রেটরির নিকট পাঠা-ইতে হয়। ঐ দরখাস্তের নাম, পিটিসন্ অফ রাইটস্ (Petition of Rights)।

(২) রাজা কোন অন্যায় করিতে পারেন না, এবং আপন কর্ম্মের নিমিত্ত কাহারো নিকট দায়ী নহেন। কোন অন্যায় কর্ম্ম করিলে তাঁহার মন্ত্রীরা তজ্জন্য দায়ী।

(৩) রাজা কখন অপ্রাপ্তবয়স্ক নহেন।

(৪) রাজা কখনো মরেন না, কারণ এক রাজার মৃত্যু হইল তাঁহার উত্তরা-ধিকারী তৎক্ষণাৎ রাজা হন।

(৫) রাজা ইংলণ্ডের সমস্ত ভূমির একমাত্র অধিকারী Owner। সমস্ত ভূমি তাঁহা কর্ত্তৃক জাগির স্বরূপ অন্যান্য লোক-দিগকে প্রদত্ত হইয়াছে।

৬। রাজাই কেবল ভিন্ন রাজ্যে আপন প্রজার প্রতিনিধি। তিনিই কেবল যুদ্ধ-ঘোষণা ও সন্ধি করিতে পারেন। ইংলণ্ডের আইন অনুসারে কোন লোক ভিন্ন দেশের সৈন্য-দলে প্রবেশ করিতে পারে না: কিন্তু রাজা তাহা করিতে অনুমতি দিতে পারেন।

৭। তিনিই দেশের প্রধান মাজিষ্ট্রেট, অন্য সকল মাজিষ্ট্রেট তাঁহার দ্বারা নিয়োজিত।

৮। রাজাই কেবল ভিন্ন রাজ্যে প্রতিনিধি পাঠাইতে ও প্রতিনিধি পরিগ্রহ (receive) করিতে পারেন।

৯। রাজাই কেবল ভিন্ন রাজ্যের সহিত সন্ধি (Treaty) ও মিত্রতা করিতে পারেন। সন্ধি অর্থে বাঙ্গালায় সচরাচর যুদ্ধের পর শান্তি স্থাপনা বুঝায়, কিন্তু এখানে দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; শান্তি-স্থাপনা ও পররাষ্ট্রের সহিত কোন একটি বিশেষ বন্দোবস্ত করা।

১০। তিনি ভিন্ন দেশীয় লোক-

দিগকে স্বরাজ্য হইতে দূর করিয়া দিতে পারেন।

১১। তিনিই কেবল ক্ষমা সম্বন্ধীয় কোন বিল মহাসভায় আনিতে পারেন।

১২। মহাসভার কোন বিধি তাঁহার বিনা সম্মতিতে প্রচলিত হইতে পারে না। তৃতীয় উইলিয়মের সময় অবধি আজ পর্য্যন্ত কোন রাজা উভয় house এর সম্মত বিলে সম্মতি দিতে অস্বীকার করেন নাই।

১৩। রাজা সমস্ত সেনার প্রধান সেনাপতি।

১৪। তিনি যে কোন প্রজার দেশত্যাগ বারণ করিতে পারেন।

১৫। তিনি দেশের সর্ব্বপ্রধান জজ্। অন্যান্য জজেরা তাঁহার প্রতিনিধি মাত্র।

১৬। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা ও কারারুদ্ধ ব্যক্তিকে মুক্ত করা রাজার অধিকারায়ত্ত।

১৭। মুদ্রা মুদ্রিত করা রাজার অধিকার, কিন্তু তিনি নিয়মাতিরিক্ত খাদ মিশাইতে পারেন না।

১৮। তিনি সকল দোষীদিগের ফরিয়াদী।

১৯। মর্য্যাদা-সূচক পদ, নূতন যন্ত্রাদির পেটেণ্ট ও নগরের বিশেষ বিশেষ অধিকার তিনি দান করেন।

২০। রাজা Church of England এর মস্তক স্বরূপ। তিনি ঘোষণাপত্র দ্বারা উপবাস ও উপাসনার দিন নির্দ্দিষ্ট ও রবিবারে তাস খেলা ও দুষ্কর্ম্মানুষ্ঠান নিবারণ করিতে পারেন।

২১। রাজা অন্য কোন ব্যক্তির সহিত কোন ভূম্যাদির সহাধিকারী হইতে পারেন না।

ইহা ভিন্ন রাজার আরো কতকগুলি অধিকার ও নিষেধ আছে, সে সকল উল্লেখ করা বাহুল্য। রাজার যে সকল বিশেষ অধিকার ও নিষেধ, সিংহাসনস্থা রাজ্ঞীর তাহাই। এই অধিকার ও নিষেধ সকল রক্ষা করিবার জন্য কঠিন আইন ধার্য্য হইয়াছে।

রাজা জারজ কন্যা ব্যতীত আর যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারেন। রাজ্যকর্ত্রী রাজ্ঞীর এই মাত্র বিশেষ অধিকার যে, তিনি বিবাহিতা হইলেও অন্যান্য বিবহিতা স্ত্রীর ন্যায় নহেন, এক স্বাধীনা অবিবাহিতা স্ত্রীর স্বরূপ অর্থাৎ অবিবাহিতাদিগের আইনানুসারে যে সকল অধিকার তাঁহারো তাহাই।

রাজা ও রাজ্যকর্ত্রী রাজ্ঞী উভয়ের শরীর-রক্ষার্থ কতকগুলি আইন আছে। রাজা বা রাজ্ঞীকে সংহার করিলে বা করিতে চেষ্টা করিলে রাজ-বিদ্রোহীর দণ্ড হয়। রাণী ব্যভিচার করিলে রাণী ও ব্যভিচারী উভয়েই রাজবিদ্রোহীর দণ্ড পায়। রাজ্যকর্ত্রী রাণীর স্বামী সেই রাণীর প্রজা স্বরূপ, রাজ্যশাসনে তাঁহার বিশেষ অধিকার নাই। কেহ রাজ্যের উত্তরাধিকারী যুবরাজ Prince of wales বা তাঁহার পত্নী বা রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী রাজবংশীয়া কোন

কন্যা ইঁহাদের কাহারো বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বা উক্ত নারীদিগের কাহার সহিত ব্যভিচার করিলে রাজ-বিদ্রোহীর দণ্ড পায়। যে সকল রাজবংশীয় কন্যাগণের ভিন্ন দেশে বিবাহ হইয়াছে তাঁহাদের সন্তানগণ ব্যতীত, অন্য কোন রাজ-বংশীয় স্ত্রী বা পুরুষ রাজার অনুমতি বিনা বিবাহ করিতে পারিবে না। কিন্তু যাঁহাদের ২৫ বৎসর অধিক বয়স তাঁহারা বিবাহের এক বৎসর পূর্ব্বে Parish এ বিজ্ঞাপন করিয়া রাজার বিনা অনুমতিতে বিবাহ করিতে পারেন। কিন্তু এক বৎসর গত হইবার পূর্ব্বে Parliament সেই বিবাহ বন্ধ করিতে পারেন।

পূর্ব্বে রাজা সরকারী রাজস্ব হইতে রাজ্য-শাসন সম্বন্ধে সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। ১৬৮৮ খৃঃ অব্দের বিপ্লবের পর সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সরকারী রাজস্ব হইতে রাজার বর্ষিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রথম জর্জের সময় ঐ বৃত্তি প্রায় ১০০০,০০০ পাউণ্ড (১ পাউণ্ড প্রায় ১০ টাকা) ছিল। ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে রাজার বার্ষিক বৃত্তি ৯০০০০০ পাউণ্ড নির্দ্ধারিত হয়। রাজার মৌরূসী ভূম্যাদির আয় তাহার অধিক হইলে সেই উদ্বৃত্তাংশ সরকারী ধনাগারে যাইত।

রাজার বার্ষিক বৃত্তি হইতে জর্জ ও ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্থাপিত প্রতিনিধি প্রভৃতির বেতন দিতেন। মহারাণী বিক্টোরিয়া সিংহাসন গ্রহণ করিলে এই স্থির হয় যে, রাণীর সমস্ত মৌরূসী ভূমির আয় সরকারী ধনাগারে যাইবে এবং তথা হইতে মহারাণী আমরণ আপনার ব্যয়ের জন্য ৬০০০০ পাউণ্ড ও সংসারিক ব্যয়ের নিমিত্ত ৩২৫০০০ মোট ৩৮৫০০০, পাউণ্ড এবং প্রিন্স অফ্ ওয়েল্‌স প্রভৃতি রাজপরিবারস্থ রাজপুত্র ও রাজ-কন্যাগণ মহাসভা দ্বারা নির্দ্ধারিত বার্ষিক বৃত্তি পাইবেন। মহারাণীর মৌরূসী ভূমির আয় (যাহা সমস্তই সরকারী ধনাগারে যায়) এক্ষণে খরচ বাদে ৪১০০০০ পাউণ্ড। এখন কোন সরকারী কর্ম্মচারী মহারাণীর বৃত্তি হইতে বেতন পান না। মহারাণীর খরচ উপরি উক্ত ৩৮৫০০০ পাউণ্ডের অধিক হইলে মহাসভার গোচর করিতে হয়।

প্রিভি-কৌন্সিল্।

প্রাচীন কালে, বিশেষতঃ দ্বিতীয় রিচার্ডের অপ্রাপ্তবয়স্কতা কালে প্রধান রাজসভা হইতে কতকগুলি প্রধান লোক মনোনীত হইয়া একটি বিশেষ রাজ-সভা

স্থাপিত হয়। ইহা রাজার মন্ত্রী-সভার স্বরূপ ছিল, রাজ্য-শাসন সম্বন্ধে রাজা সর্ব্বদা এই সভার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। এক্সচেকর (Exchequer) ও কিংসবেঞ্চ (Kings Bench) আদালতের জজেরাও এই এই বিশেষ রাজসভার সভ্য ছিলেন। পূর্ব্বে এই প্রিবি-কৌন্সিলের অনেক ক্ষমতা ছিল, এখন তত নাই, তথাপি ইহাকে রাজার এক প্রকার মন্ত্রি-সভা বলিতে হইবে। রাজার বিশেষ অধিকার সম্বন্ধীয় যে সকল কার্য্য মহাসভার দ্বারা নির্ব্বাহ হয় না, তাহা এই কৌন্সিলের দ্বারা হয়। Naturalized (অর্থাৎ বিদেশ হইতে আসিয়া যাহারা নিবাসী-শ্রেণীদের মধ্যে ভুক্ত হইয়া যায়) প্রজা ব্যতীত সকলেই প্রিভি-কৌন্সিলে সভ্য হইতে পারেন। মহাসভা বিশেষ বিধি দ্বারা কোন বিদেশীয় লোককেও ইহার অধিকার দিতে পারেন। প্রিভি-কৌন্সিলের লর্ড-প্রেসিডেণ্ট (যিনি সাধারণতঃ এক জন রাজ মন্ত্রী [Cabinet minister]) বিশেষ রাজকীয় পত্র দ্বারা নিয়োজিত ও অন্য মেম্বরেরা কেবল রাজার দ্বারা মনোনীত হন। ইঁহাদের মর্য্যাদাসূচক উপাধি Right-honorable লর্ড প্রেসিডেণ্ট ইঁহাদিগকে সমন দ্বারা আহ্বান করেন। রাজার মৃত্যুর ছয় মাস পর পর্য্যন্ত ইঁহারা ঐ কৌন্সিলের সভ্য থাকেন। সচরাচর নূতন রাজা তাঁহাদিগকেই বাহাল রাখেন। রাজা ইঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন, কিন্তু ১৮০৫ খৃঃ অব্দ হইতে এমন কখন ঘটে নাই। লর্ড প্রেসিডেণ্ট প্রিভি-কৌন্সেলের সকল ফৈসালা (Decision) ও করণীয় কার্য্য বিষয় রাজার গোচর করেন। লর্ড প্রিভি-সীল, Lord-Privy-Seal (অর্থাৎ যাঁহার নিকট রাজার মোহর থাকে) যে সকল রাজকার্য্যে রাজার সম্মতি আবশ্যক, তাহা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়া তৎসম্বন্ধীয় লেখ্যপত্রে সম্মতি-সূচক রাজকীয় মোহর মুদ্রিত করিয়া দেন। যদিচ রাজ্যের গুরুতর ব্যাপারে পরামর্শ লইবার জন্য রাজাকে প্রিভি-কৌন্সিল আহ্বান করিতে হয় তথাপি তিনি সেই কৌন্সিলের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য নহেন।

হৃদয়-মন্থন। (Obc p. 240)

(জনৈক সন্ন্যাসী-প্রেরিত।)

পুণ্যবতীর কথা শুনিয়া, তাঁহার সমস্ত হৃদয় বৃত্তান্ত শুনিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল হইয়াছে। আমি অবকাশ ও অবসর পাইলেই নিভৃতে পুণ্যবতীর গল্প শুনিতে ভালবাসি। এবং যাহা শুনি তাহা তোমাদের লিখিয়া পাঠাইতেও উৎসুক হই। তোমরা সহজেই মনে করিতে পার যে আমি কঠোর সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, হিমালয়ের নিভৃত নির্জ্জনে অবরুদ্ধ থাকিয়া, দেবী মহামায়ার চরণে আত্ম-উৎসর্গ করিয়া পার্থিব ভাবনা-চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়া অকিঞ্চিৎকর প্রেমের কথায় এতদূর সময় নষ্ট করা আমার পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়। কিন্তু আমি আজ মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আমাদের অনেক সন্ন্যাসী-সঙ্গীর জীবন বৃত্তান্ত শুনিয়াই বলিতেছি, আমার পূর্ব্বপঠিত পুরাণ কাব্য সকল স্মরণ করিয়া বলিতেছি, যে পার্থিব প্রেম উপহাসের সামগ্রী নহে, তাচ্ছিল্যের সামগ্রী নহে, বিজ্ঞতাভিমানীদের নাসিকা কুঞ্চনের সামগ্রী নহে। যদি কেহ মানব-হৃদয় তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন যে হৃদয়ের কেবল, দুইটী বৃত্তিই ইহকালের সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া পরলোকের সুদূর প্রান্ত পর্য্যন্তও প্রসারিত হয়। সেই একটী বৃত্তি পার্থিব প্রেম, অপরটি—দেবভক্তি। মানুষের ইহকালের অন্য সকল আশা ভরসা ইহকালেই পরিসমাপ্ত হয়, কিন্তু প্রেম ও দেব-ভক্তির অনন্ত উল্লাস যেন অনন্ত কালেও অবরুদ্ধ থাকিতে পারে না। পার্থিব প্রেম এই পবিত্র-সলিলা জাহ্নবীর মত পবিত্র,—এই জাহ্নবীর মত ইহা মর্ত্তেও প্রবাহিত এবং এবং স্বর্গেও তরঙ্গিত। ইহার প্রকৃত উচ্ছাস এই জাহ্নবীর মত সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে উৎসারিত, ইহা দেব-ভক্তির পূর্ব্বশিক্ষা—দেবভক্তির প্রথম সোপান, দেবভক্তির তরুণ অরুণ আলোক, এবং দেবভক্তিই ইহার চরম উৎকর্ষ।

আমি পর দিন রাত্রিকালে সন্ন্যাসীরা স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগত হইলে আবার সেই প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নির পাশে পুণ্যবতীকে নির্জ্জনে পাইয়া, পুণ্যবতীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যে তুমি কি সুরেন্দ্রের অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের পাত্র হইয়াই তবে সন্ন্যাসিনী হইয়াছ?

পু। না, আমি সুরেন্দ্রের একেবারে তাচ্ছিল্যের পাত্র হই নাই।

আ। তবে কি তিনি ইন্দ্রানীতে অনুরক্ত হইয়াও, তোমার প্রতি অনুরাগ দেখাইতেন?

পু। অনুরাগ দেখাইতেন কি? তিনি বরং সমধিক যত্নে, সমধিক স্নেহে আমাকে সমাদর করিতেন। পাছে এক মূহূর্ত্তের জন্যেও আমার মনে কষ্ট হয়, তিনি সেই ভাবনাতে সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকিতেন।

আ। তবে তুমি আরও কি চাও? আদর যত্ন, মমতা, স্নেহ পাইয়াও, কি তুমি সুরেন্দ্রের নিন্দা করিতে পার?

পু। জননী যোগমায়াই জানেন যে সুরেন্দ্রের নিন্দা আমার উদ্দেশ্য নহে। আদর, যত্ন, মমতা ও স্নেহের জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইতে পারি বটে, কিন্তু প্রেমের লালসা প্রেম বই আর কিছুতেই মিটিতে পারে না। প্রেম প্রেমই চাহে—প্রেমের প্রতিদান স্নেহ হইতে পারে না। তুমি যদি আজ কর্ত্তব্য জ্ঞানের বশীভূত হইয়া, তোমার প্রণয়িনীকে সপ্ত রাজ্যের রাজ্যেশ্বরী কর, তুমি যদি আজ কৃতজ্ঞতার অনুরোধে, আদর যত্নের প্রতিদানে, তোমার প্রণয়িনীকে স্বর্গ-রাজ্যের ইন্দ্রানী পর্য্যন্ত কর, তাহা হইলেই বা তুমি তাহার হৃদয়ের মর্ম্মান্তিক লালসার কি তৃপ্তি-সাধন করিতে পারিলে? পারিজাত কুসুম পারিজাত কুসুমই বটে, কিন্তু এক জন তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির নিকটে কর্ম্মনাশা-নদীর এক গণ্ডুষ জল যতদূর আদরণীয়, তাহার নিকটে তোমার পারিজাত পুষ্প পর্য্যন্ত ততদূর আদরণীয় কখনই হইতে পারে না।

আ। তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির নিকটে পারিজাতের মর্য্যাদা না থাকিতে পারে, কিন্তু স্নেহাতুর ব্যক্তি ও প্রেমাতুর ব্যক্তির চূড়ান্ত লালসা কি একই নয়?

পু। আমি তোমাকে ঠিক বুঝাইয়া দিতে পারিতেছি না। আমি মনোবিজ্ঞানের "ক" অক্ষর পর্য্যন্ত জানি না, কেবল মর্ম্মের স্তরে স্তরে এই মাত্র জানি যে স্নেহের প্রার্থী স্নেহেতেই পরিতৃপ্ত কিন্তু প্রেমের ভিখারী প্রেম ব্যতীত আর কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। কাহাকে স্নেহ বলে, কাহাকে যত্ন ও আদর বলে, আর কাহাকে প্রেম বলে তা আমি বিনা আয়াসে বুঝিয়া লইতে পারি কিন্তু বুঝাইতে পারি না। আমি যখন দেখিলাম যে সুরেন্দ্র আমাকে দেখিবা মাত্রই আর আনন্দে উথলিত হয়েন না, চক্ষুর যুগল তারা আর ভাবে ঢলিয়া পড়ে না, জড়িমা-জড়িত কথায় আর হৃদয়ের পূর্ণ ভাব অপরিস্ফুট

ভাষার প্রকাশ করিতে চাহেন না, আমাকে স্পর্শমাত্রেই আর লোমাঞ্চিতকায় হয়েন না, অকিঞ্চিৎকর গল্পের 'মধু মাখা ছাই পাঁশে' আর দ্রুতগতি সময়কে উপহাসে উড়াইয়া দিতে চাহেন না, অথচ যত্নের বা আদরের বা সোহাগের লেশ মাত্র ত্রুটী প্রদর্শন করেন না, তখনি জানিলাম যে আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে, পুণ্যবতীর পূর্ব্ব জন্মের সকল পুণ্যে ভস্মে ঘৃতাহুতি দেওয়া হইয়াছে এবং পরকালের অপার্থিব সম্মিলনের আশাও উন্মূলিত হইয়াছে।

এই কথা বলিতে বলিতে সেই প্রজ্বলিত হোমাগ্নির পার্শ্বে সাধ্বী সতী পুণ্যবতী অবসন্ন হইয়া ক্রমে ভূশায়ী হইলেন। শোকের তীব্র উচ্ছাসে বিহ্বল হইয়া তিনি মূর্চ্ছাপন্নের মত হইয়া পড়িলেন। এমন সময় ধীরানন্দ নামে আমাদের যুবক-সন্ন্যাসী-সঙ্গী আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কন্দরে ঘুমাইতে যাইবে না?

আ। না, এখন যাইব না। পুণ্যবতীর কথাতে আমি হতজ্ঞান হইয়াছি। প্রেমের অনুরূপ আদর যত্ন ও সোহাগ পাইয়াও পুণ্যবতী পার্থিব প্রেমের নিরাশায় কেমন করিয়া যৌবনে যোগিনী হইলেন? স্নেহেতে ও প্রেমেতে এমন কি জাতিগত প্রভেদ আছে যে একটির অবর্ত্তমানে আর একটি কথার কথা মাত্র বোধ হইতে পারে?

ধী। হা উন্মাদ! পুণ্যবতী সরল হৃদয়েই তাহার মনের কথা তোমার কাছে ব্যক্ত করিয়াছে। প্রেম ও স্নেহ নিতান্ত স্বতন্ত্র জাতীয় পদার্থ নহে সত্য বটে, কিন্তু এই উভয়েই আবার যে প্রভেদ আছে তাহা প্রণয়ী-ব্যতীত আর সহজে কেহই উপলব্ধি করিতে পারে না।

আ। কিন্তু প্রনয়ী আপনার ভ্রমেই সর্ব্বদা ভ্রান্ত। প্রণয়ীর কথায় বিশ্বাস কি?

ধী। প্রণয়ীর কথায় বিশ্বাস না করিবার কোন কারণ নাই, তবে অঙ্কশাস্ত্রের প্রতিমা স্বরূপ এবং গত বৎসরের 'নূতন পঞ্জিকা' স্বরূপ অনর্থক বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতের বা স্থির সিদ্ধান্তের সঙ্গে এক জন প্রকৃত প্রণয়ীর কথা না মিলিতে পারে কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে ইহা বলিতে পারি যে একজন প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তির হৃদয়োচ্ছাসের মত একজন প্রকৃত প্রণয়ী ব্যক্তির হৃদয়োচ্ছাস আপনা আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়ে। কপটতা বা আড়ম্বর সংসারের ভূষণ, কিন্তু তাহা ধার্ম্মিক বা প্রণয়ীর চক্ষে নিতান্ত হেয়। ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র স্বার্থসাধক উদ্দেশ্যবিশিষ্ট ইতর প্রণয়ীর কথা আমি বলিতেছি না, কিন্তু উদ্দেশ্যহীন স্বার্থহীন আত্ম-বিসর্জ্জন-কারী প্রকৃত প্রণয়ীর কথাই আমি বলিতেছি।

আ। একজন প্রকৃত প্রণয়ীর কথা নিতান্ত বিশ্বাস করিলেও, কে অস্বীকার করিবে যে সাধারণ সামাজিকতা, উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা, শ্রেষ্ঠতর গুণ বা সম্পর্কের উত্তরে ভক্তি, রক্তের টান বা চক্ষের মিলনে স্নেহ, প্রণয় এবং 'বিনা সূতায় হার গাথা' স্বরূপ প্রেম—এই কয়টী বৃত্তিই হৃদয়ে হৃদয়ে

দৃঢ় বন্ধনের সর্ব্ব প্রধান রজ্জু। কিন্তু সামাজিকতা তো নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, সঙ্কুচিত ও স্বার্থপরতাধীন। ইহা পার্থিব অপেক্ষাও পার্থিবতর। একে ত এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পৃথিবী, পৃথিবীর মধ্যে জনপদ, জনপদের মধ্যে সমাজ, সেই সমাজের অকিঞ্চিৎকর অনুরোধে যে সামাজিকতা, তাহা নিতান্ত তুচ্ছ ও তাচ্ছিল্যের পদার্থ। আর কৃতজ্ঞতা— তাহাতে উপকৃত ব্যক্তিরই উপর সমস্ত ভূধর-ভার অর্পিত হয়। কিন্তু তাহার সঙ্গে উপকারী ব্যক্তির আর কি স্বার্থহীন সম্বন্ধ থাকে? অর্থাৎ, উপকৃত ও উপকারী ব্যক্তির মধ্যে পরস্পরের কি মর্ম্মান্তিক সম্পর্ক থাকিবার সম্ভাবনা? ভক্তির কথা যদি উল্লেখ কর, তো একথা কে না স্বীকার করিবে যে ভক্তিতে ভক্তেরই সমস্ত প্রকৃতি নিয়মিত হইয়া পড়ে। যিনি সেই ভক্তির ভাজন তিনি হয় ত সম্পূর্ণ রূপে নিঃসম্পর্কীয় হইয়া থাকিতে পারেন। তাহাতে হৃদয়ে হৃদয়ে যে অকাট্য বন্ধন সম্পাদিত হইতে পারে এ কথা আমি স্বীকার করি না। এখন অবশিষ্ট রহিল কেবল স্নেহ, প্রণয় ও প্রেম। এই তিনটীই সর্ব্বাপেক্ষা উভয়-দেশ ব্যাপী, এই তিনটীই হৃদয়বন্ধনের সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তম রজ্জু, এই তিনটীই সাধারণত ভালবাসা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই তিনটীর মধ্যে যে সকল সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে তাহা কতক অনুভব করিতে পারিলেও বুঝিতে পারি না যে অবস্থা বিশেষ একটি আর একটির স্থানীয় হইতে পারে না।

ধী। কিন্তু সেই প্রভিন্ন পদার্থের প্রভেদ নির্ণয় করা সকলের পক্ষে সহজ নহে।

আ। কিন্তু প্রভেদের একটী আদর্শ তো চির বিদ্যমানই আছে—যেমন পিতা পুত্রে স্নেহের সম্পর্ক, বন্ধুতে বন্ধুতে প্রণয়ের সম্পর্ক এবং স্বামী স্ত্রীতে প্রেমের সম্পর্ক।

ধী। কিন্তু স্নেহের সম্পর্ক যে সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতে সকল দেশব্যাপী, তাহা আমি স্বীকার করি না। কারণ, স্নেহ নিম্নগামী, ইহা উত্তরোত্তর পুরুষ পরম্পরাক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু উজানে বহিয়া উচ্ছ্বসিত হইতে জানে না। এই নিম্নগামীত্বই স্নেহের একটি বিশেষ লক্ষণ। সংসার আশ্রমে অনেকবার আমি শুনিয়াছি, শত শত পিতা মাতা এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে আমাদের পুত্র কন্যারা আমাদিগের অপেক্ষা আমাদিগের পৌত্র দৌহিত্রদিগকে অধিকতর ভালবাসে। কিন্তু তাঁহারা ভাবেন না যে তাঁহারাও স্নেহের ঐ প্রণালী অবলম্বন করিয়াই আসিতেছেন। কিন্তু সে যাহাই হউক, স্নেহ প্রণয় ও প্রেম অপেক্ষা দৃঢ়তম রজ্জু আর কিছুই নাই। সাধারণত, অথবা অধিকাংশ স্থলে ইহারা উভয়-দেশ-ব্যাপী। কুসু-

ত্রের কঠোর ব্যবহারে, বা বন্ধুর নৃশংস বিশ্বাসঘাতকতায় বা ঔদাস্যের নির্মম-পীড়নে অনেক স্থলে স্নেহ প্রণয় ও প্রেমের হৃদয়-বিদারক অবমাননা দেখিয়াছি সত্য বটে, কিন্তু সে সকল প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত মাত্র। নতুবা যদি কোথাও হৃদয়ে হৃদয়ে সম্মিলন দেখিতে পাও, নিশ্চয় জানিবে যে সে স্থানে হয় স্নেহ, না হয় প্রণয় না হয় প্রেম অবশ্যই আছে——এক কথায়, ভালবাসার সম্পর্ক অবশ্যই আছে। এই স্নেহ কখনো ভক্তির সহিত, কখনো কৃতজ্ঞতার সহিত, কখনো আশার সহিত মিশ্রিত হইয়া রৌদ্রস্পৃষ্ট স্ফটিকের ন্যায় নানা বর্ণে ও নানা গুণে প্রতিভাত হয়। ভালবাসা-রূপ এক বৃক্ষে এই স্নেহ, প্রণয় ও প্রেমরূপ তিন প্রকারের পুষ্প বিকসিত হয় এবং সংসার-ক্ষেত্রে এই বৃক্ষ রোপিত না-হইলে সমস্ত সংসারই প্রায় মরুভূমিতে পরিণত হইত।

আ। যদি ঐ তিনটিই এক বৃক্ষের পুষ্প হইল, তাহা হইলে স্নেহ ও প্রণয়ের অপেক্ষা প্রেমের এত মহিমা কীর্ত্তন সর্ব্বত্রই কেন দেখা যায়! পিতা পুত্রের সম্পর্ক, বন্ধুযুগলের সম্পর্ক কি দাম্পত্য সম্পর্ক অপেক্ষা এতই হীনতর যে কেবল প্রেমের কথাতেই সাহিত্য-সাগর, ক্রমাগত তরঙ্গিত হইতে থাকিবে।

ধী। তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। আমি প্রণয়ের কথা এখন উল্লেখ করিব না,—কারণ প্রণয়, স্নেহ ও প্রেমের মধ্যগত,—ইহাতে কতকটা স্নেহের ও কতকটা প্রেমের প্রকৃতি সম্মিলিত আছে, ইহা প্রয়াগ তীর্থের মত গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল। যে বন্ধুত্বে স্নেহের সঙ্কীর্ণতা ও প্রেমের উদারতা নাই, "দুজনে একজন এবং একজনে দুজন" ভাবের পরিস্ফুট বিকাশ নাই, আমি সে অকিঞ্চিৎকর বন্ধুত্বের, সে অঙ্ক-শাস্ত্র গত প্রণয়ের কথা কহিতেছি না। আমি উচ্চ আদর্শের বন্ধুত্ব, প্রকৃত প্রণয়ের কথাই বলিতেছি।

ক্রমশঃ

(Vide p. 421)

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

কনক কানন, গীতিনাট্য। শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত প্রণীত ও প্রকাশিত, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা মাত্র।

অপ্সররাজ-কন্যা শৈলসুন্দরী এক দিন সখীগণ সঙ্গে সাগরে জলক্রীড়া করিতে যান, দূর হইতে তাঁহারা সেখানে একখানি তরী দেখিতে পান। সেই তরীতে সুরনাথ নামক রাজপুত্রকে

দেখিয়া শৈলসুন্দরীর মনে প্রণয় সঞ্চার হয়। পরে কিছু দিন কষ্ট ভোগ করিয়া পরস্পরের মিলন হয়। এই অপ্সরপ্রণয় লইয়া পুস্তক খানি রচিত হইয়াছে। পুস্তকের গল্পের ভাগটী যদিও অতি অল্প তথাপি গ্রন্থকার তাহা বেশ সাজাইয়াছেন, পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি

কবিতা-কল্প-লতিকা। শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত। রাজকীয় যন্ত্রে শ্রীশ্রীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, লেখকের ভাবুকতা ও কল্পনা যে সুন্দর তাহা আমরা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহি। পুস্তক খানির স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রসের যে অবতারণা আছে তাহাও নিতান্ত মন্দ হয় নাই। আ-মরা আশা ও ভরসার সহিত গ্রন্থ-কারের উত্তরোত্তর উন্নতি দেখিয়া আসিতেছি।

শ্মশানভ্রমণ। শ্রীমতী নবীনকালী দেবী প্রণীত। ভবানীপুর ওরিএণ্টাল প্রেসে শ্রীবরদাকান্ত বিদ্যারত্ন দ্বারা মুদ্রিত ভাদ্র ১২৮৬। মূল্য দুই আনা মাত্র। ইহা এক খানি পদ্য গ্রন্থ। শ্মশান ভ্রমণ সম্বন্ধীয় কতকগুলি ছোট ছোট পদ্য একত্র করিয়া এই পুস্তক খানি প্রকাশিত, এ পুস্তক খানির সকল কবিতাগুলি যদিও সুন্দর হয় নাই, তথাপি স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া ইহা প্রশংসনীয়। উদ্‌ভ্রান্ত স্বপ্ন দর্শন নামক প্রথম কবিতাটি সুন্দর হইয়াছে। আজ কাল স্ত্রীলেক গ্রন্থ-কর্ত্রীদের প্রাচুর্য্য দেখিয়া হৃদয়ে যে একটি আশার সঞ্চার হইতেছে তাহা কালে ফলবতী হইবে সন্দেহ নাই।

বিশ্ববিষ চিকিৎসা। শ্রীহরিমোহন সেন-গুপ্ত প্রণীত, প্রথম ভাগ। কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ যন্ত্রে মুদ্রিত। এই পুস্তক খানি উক্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় যেমন সাধারণ-হিতকর তেমনি প্রীতিপ্রদ, ইহাতে বিষাক্ত প্রায় সমস্ত হিংস্রক প্রাণীর বিষের উপযুক্ত ঔষধের বর্ণনা, ব্যবস্থা ও নির্ণয় আছে। পুস্তক খানি এত যত্নে রচিত হইয়াছে ও ইহাতে এত জ্ঞাতব্য কথার বিস্তৃত বিবরণ আছে যে ইহা সকলেরই একবার পাঠ করা উচিত।

প্রমাদিনী। উপন্যাস, প্রথম খণ্ড শ্রীযদুনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। নূতন বীডন যন্ত্র। মূল্য ।০ আনা মাত্র। এই ভগ্নাংশ উপন্যাসের আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। এই হস্তলিপি ও ছাপার অক্ষর সম্বলিত পুস্তক খানি ছাপাইতে গ্রন্থকার কেন যে কষ্ট স্বীকার করিলেন তাহা মনোবিজ্ঞানের একটি কূট প্রহেলিকা।

ছিন্নমুকুল।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ—অন্ধকারে তারকা।

রাত্রি অবসান প্রায়, ঝটিকাও প্রায় নিবৃত্তি হইয়াছে, আকাশও তেমন অন্ধকার নাই।

সমস্ত নিশার পর্য্যটনে অবসন্ন হইয়া, গাছে, শাখায়, কণ্টকে, দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া, দীনবেশে আলুলায়িত কুন্তলে উন্মাদিনী বালিকা গান গাহিতে গাহিতে গঙ্গাতীরস্থ একটি মুক্ত অট্টালিকা-দ্বারে প্রবেশ করিল। দ্বার মুক্ত পাইয়া বরাবর একটি কক্ষে প্রবেশ করিল, সেই খানে কাহারে দেখিয়া বালিকা সহসা অস্ফুট চীৎকার করত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কনক যাহাকে দেখিয়াছিল সে হিরণকুমার। হিরণকুমার এই বাড়ীতে থাকিতেন। এই কক্ষে একটি চৌকিতে তিনি বসিয়াছিলেন। সমস্ত রাত তিনিও চক্ষের পাতা বোজান্ নাই, যতক্ষণ ঝড় বৃষ্টি হইতেছিল বারান্দায় বসিয়া সেই আঁধার ঝটিকাময় নিশার সহিত আপন অদৃষ্টের তুলনা করিতেছিলেন। মধ্যরাত্রে কেবল একবার তাঁহার সে চিন্তা ভাঙ্গিতে হইয়াছিল। কতকগুলি "পুলিসের লোক" জন কয়েক দস্যুকে ধৃত করিয়া তাঁহার নিকট আনিয়াছিল। সে সকল বৃত্তান্ত অন্য পরিচ্ছেদে প্রকাশিত হইবে। তাহার পর ঝড় অবসানে তিনি গৃহে গিয়া চৌকিতে বসিয়াছেন মাত্র এই সময় সহসা কনককে এই অবস্থায় দেখিয়া তিনিও আশ্চর্য্য হইলেন। কনক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, তিনিও অজ্ঞানবৎ তখনি তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া পালঙ্কে শয়ন করাইলেন ও তাহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে কনকের মোহ ভাঙ্গিল. হিরণকে দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল,

"তুমি কে? দেবতা? আমি যে তোমাকে ধ্যানে দেখেছি। আমি কি গান গাহিতেছিলাম, মনে করিয়া দেও তো, আমি গাহিব।"

হিরণ দেখিলেন, কনক উন্মাদিনী। তাহার কথা শুনিয়া তাহার সেই মোহময় আলুথালু বেশ দেখিয়া হিরণের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

বলিলেন, "কনক আমার, আমি যে তোমার হিরণকুমার, আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?"

উন্মাদিনী বলিল, "হিরণকুমার! কই তোমার মুখ আমাকে ভাল করে দেখাও দেখি।" কনক শয্যা হইতে উঠিয়া বসিল, হিরণকুমারের মুখপানে অনেক ক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া তাহার হাতখানি সহস্তে লইয়া দেখিয়া দেখিয়া বলিল, "ঠিক বলেছ তুমিই হিরণকুমার; হিরণ, একটি গান কর না।

আমি গা'ব? তুমি শুনবে?" বালিকা গাহিল,

"আঁধার নিশীথে একা আমি অভাগিনী—

না একি! তুমি দেবতা! কই আমার হিরণ? হিরণ কোথায় গেলেন? হিরণ—হিরণ—বিদেশ—বিদেশ—কি?"

বালিকা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শয্যা হইতে উঠিয়া হিরণের পদ গ্রহণ করিয়া বলিল,

"দেব, আমি তোমার পূজা করিব, আমাকে বর দেও, আমার হিরণ কোথা?" হিরণকুমার তাহাকে উঠাইয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন,

"কনক, আমি যে তোমার হিরণ, কেন কনক তুমি উন্মাদিনী হইলে?"

কনক বলিল, "তুমি দেবতা, তুমিও কাঁদ, সকলেই কি কাঁদে, তবে আমিও কাঁদি।" বালিকা হিরণের গলদেশ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। হিরণ তাহাকে শোয়াইবার জন্য হাত ধরিয়া বিছানায় বসাইয়া বলিলেন' "কনক, শোও দেখি।"

নিদ্রায় শান্তি পাইয়া যদি কনকের জ্ঞান জন্মে, সেই জন্য তাহাকে ঘুম পাড়াইতে হিরণ ব্যস্ত হইলেন।

কনক বলিল "তুমি বসে থাকবে, আমি শোব কেন? তুমি দেবতা তুমি আগে শোও।"

হিরণ নিরুপায় হইয়া বলিলেন, "তুমি না শুইলে দেবতা রাগ করবে, তোমার কি ভয় হইতেছে না।"

ক। "রাগ করবে? তবে আমি পালাই।" বলিয়া বালিকা আপন আর্দ্র চুল লইয়া খেলিতে খেলিতে গুণ গুণ করিয়া গাহিয়া গাহিয়া বিছানা হইতে উঠিল। হিরণ বিপদে পড়িয়া বলিলেন "না, না, রাগ করব না, তুমি শোও দেখি।" বালিকা তাঁহার কথা না শুনিয়া আপন মনে হাসিয়া উঠিয়া উল্লাসে করতালি দিয়া বলিল;

"মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, সেই সুর! তোমার সেতার কই, বাজাও আমি গাই,

ধরি সুর তানে মরমের গানে,
অবাধে, লো সই, গাহিব আজ;
প্রাণ যারে চায়, মিলিবে লো তায়
লোকের কথায় পড়িবে বাজ।

হিরণ সেতার বাজাইতে জানিতেন, তাঁহার সেই ঘরেই সেতার ছিল; তিনি বলিলেন, "তুমি যদি শোও, তা' হলে আমি সেতার বাজাব।" হিরণকুমার তাঁহার সেতারটি আনিলেন। বালিকা সেতার শুনিতে বড় ভাল বাসিত, সে তাহা শুনিবার আশায় বিছানায় আসিয়া শয়ন করিল, বাজনার মধুর তানে কনককে ঘুম পাড়াইবার জন্য হিরণ আস্তে আস্তে সেতার বাজাইতে লাগিলেন। বালিকা শুনিতে শুনিতে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল,

"কই, কই, তোমার সে হাসি কই, তুমি আজ হাসবে না? তুমি যে আমার হিরণকুমার, একটিবার হাস দেখি।"

উন্মাদিনীর কথায় হিরণকুমারের গুঠা-

ধর ঈষৎ বিষাদময় হাসির রেখায় অঙ্কিত হইল, তাহা দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বালিকার চক্ষু বুজিয়া আসিল, ক্রমে ক্রমে সেই পদ্মনেত্র নিমীলিত হইল, বালিকা ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু তাহার সেই ঈষৎ-ভিন্ন ওষ্ঠাধরে মৃদু হাসির রেখা শোভিত হইয়াই রহিল।

হিরণকুমার তাহাকে নিদ্রিত দেখিয়া পরম আহ্লাদিত চিত্তে সেতার রাখিয়া সেই সুষুপ্ত-মুখ-কান্তি দেখিতে লাগিলেন। পাছে নিদ্রাভঙ্গ হয় সেই ভয়ে হিরণকুমার প্রতিক্ষণে ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। প্রত্যেক বায়ুর শব্দে হিরণের ভয় হইতে লাগিল বালিকা উঠিয়া পড়িবে। তিনি ভয়ে ভয়ে যাহাতে তাহার ঘুম না ভাঙ্গে তাহা দেখিতে লাগিলেন। এই সময় সহসা মনুষ্য-পদ-শব্দ হইল, হিরণ অমনি ভয়ে ভয়ে সেই দিকে কাণ পাতিলেন। পাছে এ গৃহে কেহ আসিয়া কনকের নিদ্রা ভঙ্গ করে—এই তাঁর ভয়। পদ-শব্দ আরো সুস্পষ্ট হইল, বুঝিলেন গৃহমধ্যে এখনি কেহ প্রবেশ করিবে। তিনি তাহা নিবারণ করিতে অতি ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া গৃহ হইতে উঠিয়া গেলেন।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ—নৌকা-যাত্রা।

এদিকে প্রমোদ ও নীরজা ঝড়ের উপক্রম দেখিয়া তীরে বোট লাগাইতে কহিলেন। কিন্তু বোট না লাগাইতে লাগাইতেই প্রবল বেগে বাতাস বহিতে লাগিল, মাঝিরা অতিশয় যত্ন করিয়াও শীঘ্র তীরে বোট লাগাইতে পারিল না। ঝড়ের অপ্রতিহত প্রভাবে বোট ক্রমাগত, উজানে তাঁহাদের বাটীর দিকেই যাইতে লাগিল; মাঝিরা ক্রমে হাল ছাড়িয়া দিবার উদ্যোগ করিল। প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল এবং চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, এক একবার কেবল বিদ্যুতের আলোকে গঙ্গার রুদ্র মূর্ত্তি, ও ছোট ছোট চূর্ণিত নৌকাগুলির ভাসমান ভগ্নাংশ দৃষ্ট হইতে লাগিল। নীরজা প্রমোদের ভয়-বিহ্বল বক্ষে মস্তক রাখিয়া অজ্ঞান প্রায় হইয়া পড়িলেন। প্রমোদ নিরাশার বলে বলিষ্ঠ হইয়া মাঝিদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বোট বাহিতে আজ্ঞা দিতে লাগিলেন।

এদিকে বোট বায়ুভরেই প্রধাবিত হইয়া কখনো নীচে কখনো উচ্চে, কখনো যেন পাতালে কখনো যেন পর্ব্বতে উঠিতে লাগিল। তাঁহাদের বাটী আর বহুদূর নাই কিন্তু বোটও আর তিষ্ঠায় না। বাতাসের একটি প্রবল ঝঙ্কারে বোটের মাস্তুল ভাঙ্গিয়া কোথায় উড়িয়া গেল, পরে বোট খানিও তরঙ্গপ্রভাবে তীরে ধাকা খাইয়া বিচূর্ণ হইল।

সুখের বিষয় এই যে প্রমোদ নীরজাকে বক্ষে লইয়া কূলে লাফাইয়া পড়িতে পারিয়াছিলেন। অজ্ঞান প্রায় নীরজা-বক্ষে তিনি কিনারায় কিনারায় বাটী অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু একে সেই বৃষ্টিধারাযুক্ত বাতাসের প্রবল আঘাত, তাহাতে আবার

উন্মূলিত বৃক্ষশাখা প্রভৃতি পদে ঠেকিয়া প্রতিপদে তাঁহার গমনে বাধা দিতে লাগিল। তিনি সত্বর অগ্রসর হইতে না পারিয়া মূর্চ্ছাপন্ন নীরজাকে লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সহসা কিছু দূরে বৃক্ষের অন্তরালে ক্ষীণ দীপালোক দৃষ্ট হইল, আশার আশ্বাসে তীর ছাড়িয়া বৃক্ষ কণ্টকাদির আঘাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দ্রুতপদে তিনি সেই দিকে চলিতে লাগিলেন। কিছু দূর আসিলে সেই আলোকটিও তাঁহার চক্ষের অগোচর হইল; তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। নীরজাকে লইয়া তিনি কোথায় যান? বৃক্ষতলে দাঁড়াইবার যো নাই, প্রতিক্ষণে ঝড়ের বেগে শাখা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তিনি নিরাশ চিত্তে অজ্ঞান প্রায় চলিতে লাগিলেন। সহসা সেই ঝড়-বৃষ্টিগর্জ্জনের মধ্যে কোন মনুষ্যের কাতর-চীৎকার তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। সহসা সেই সময় বিদ্যুতালোকে তিনি দেখিলেন, "এক জন মনুষ্য তাঁহার নিকট দিয়া অতি দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। আর একবার বিদ্যুৎ হানিল, তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার সম্মুখে কিছু দূরে এক ধবলাকার পদার্থ। ভগ্ন-অট্টালিকা হইবে আশা করিয়া সেই দিকে আসিলেন, কিন্তু সেখানে আসিয়া বিদ্যুতালোকে যাহা দেখিলেন, তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, একজন মৃতপ্রায় মনুষ্য কষ্ট-ব্যঞ্জক অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিতেছে।

প্রমোদ বুঝিলেন, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাহারি চীৎকার তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। এবং যে ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট দিয়া পলায়ন করিতে দেখিলেন, ভাবিলেন, সেই ইহাকে আহত করিয়া গিয়াছে।

মূর্চ্ছাপন্ন নীরজা বক্ষে, সম্মুখে মুমূর্ষু ব্যক্তি, হয়তো যত্ন করিলে সে এখনো বাঁচিতে পারে, প্রমোদ যে কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এই সময় আর এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, সে আসিয়া প্রমোদকে এবং ভূ-পতিত ব্যক্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়" আপনারা বিপদে পড়েছেন? আমি চীৎকার শুনেই দৌড়ে এসেছি, কাছেই এই গাছের আড়ালে আমার কুটীর, সেইখানে চলুন।"

তাহাকে দেখিয়া প্রমোদ যেন প্রাণ পাইলেন; বলিলেন, "আমি বিপদে পড়িয়া আসিতে আসিতে এই মুমূর্ষু ব্যক্তিকে দেখিলাম, কিন্তু আমার ক্রোড়ে এই অজ্ঞান স্ত্রীলোক, সুতরাং এই মুমূর্ষুর যত্ন করিতে অক্ষম, তুমি তবে উহাকে লইয়া কুটীরে চল।"

সে বলিল, "আপনি তবে যান, আমি ইহাকে লইয়া যাইতেছি।"

নীরজাকে লইয়া প্রমোদ তখন সেই অজ্ঞাত ব্যক্তির কুটীরে আসিয়া পঁহুছিলেন। কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গৃহপার্শ্বে একটি অগ্নিপাত্র, তিনি তাহার নিকটে একটি মাছুরে নীরজাকে শয়ন করাইয়া উত্তাপ দিতে দিতে ক্রমে তাহার জ্ঞান সঞ্চার হইতে লাগিল।

এদিকে অপর ব্যক্তি সেই আহত

ব্যক্তিকে কুটীরে আনিয়া দেখিল, একটি পিস্তলের গুলি তাহার স্কন্ধ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বুঝিল তাহা সাংঘাতিক হইবে না—যত্নে সে বাঁচিতেও পারে। তাহাকে অপর একটি মাদুরে শয়ন করাইয়া, কুটীর-স্বামী ক্ষতস্থান বন্ধনের পর তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। ইহার মধ্যে নীরজাও সজ্ঞান হইয়া বসিল। তখন প্রমোদ সুস্থির হইয়া আহত ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। নীরজাও বসিয়া তাহার পানে চাহিয়া দেখিল, দেখিবামাত্র সহসা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, প্রমোদও সন্ন্যাসীকে চিনিতে পারিলেন। চিনিয়া নীরজা পিতার নিকট আসিয়া ব্যাকুলভাবে তাহার সেবা করিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহাদের যত্নে সন্ন্যাসী অনেক শান্তিলাভ করিলেন। তাঁহার কথা কহিবার সামর্থ্য জন্মিল। তখন তিনি অতিব্যগ্রে বলিয়া উঠিলেন,

তোমরা একজন কেহ এখনি পুলিসে যাও। নহিলে আজ এখনি হত্যাকাণ্ড হইয়া যাইবে।"

সকলে আশ্চর্য্য ভাবে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল, যেন তাঁহার কথার অর্থ বুঝিতে অক্ষম। পিতাকে কথা কহিতে দেখিয়া আহ্লাদে নীরজা তাঁহার গলদেশ জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। সন্ন্যাসীও আহ্লাদে অভিভূত হইয়া কথা কহিতে অক্ষম হইলেন। সন্ন্যাসীকে ঈষৎ সুস্থ দেখিয়া কুটীর-স্বামী বলিল "মহাশয়, আর কিছুই ভয় নাই, গুলি বের হয়ে গেছে। অল্প দিনেই আরাম হবেন। কিন্তু কি ক'রে এ রকম হোলো?" কুটীর-স্বামীর প্রতি এবার প্রমোদের দৃষ্টি পড়িল, তিনি তাহাকেও চিনিতে পারিলেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইলেন, দেখিলেন সে যামিনীর পূর্ব্ব-ভৃত্য, যখন তাঁহারা কানপুর বেড়াইতে যান সে তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিল। নীরজাও তাহাকে চিনিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে বলিয়া উঠিল "আমি কি ঠিক দেখিতেছি? তুমি কি সেই নৌকার দয়াবান দাঁড়ি নও? তুমিই কি আমায় অসীম বিপদ মধ্যে প্রথমে আশ্বাস দাও নাই?"

নীরজা পিতার গলদেশ ছাড়িয়া উঠিল; কুটীর-স্বামী সন্ন্যাসীর মুখে ঔষধ দিতে দিতে বলিল, "হাঁ আমিই সেই দাঁড়ি।" পরে সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মহাশয় আর তো কিছুই ভয় নাই। আপনি কি করে এমন বিপদে পড়িলেন, সেইটি এখন বলুন।"

সন্ন্যাসী আরো কিছু সামর্থ্য পাইয়া বলিলেন, "আমি প্রয়োজন বশত প্রয়াগে একটি দেবালয়ে আসিতেছিলাম। আসিতে আসিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল, অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল, কি করি পথে একটি ভগ্ন দেবালয় মধ্যে আশ্রয় লইলাম। অনেকক্ষণ হইল, ঝড় থামিল না, কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় দেখিলাম তিন চারি জন মনুষ্য সেই দেবালয়ের দিকে আসিতেছে। বিদ্যুতালোকে তাহাদিগকে দেখিয়াই আমার দুষ্ট লোক বলিয়া বোধ হইল। ক্রমে তাহারা দেবালয়ের নিকটেই

আসিল কিন্তু গৃহমধ্যে না ঢকিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া কি কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিল—'

সকলেই উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কি কথা শুনলেন ?"

স। "আমি সকল কথা শুনিতে পাই নাই। কিন্তু কথার মধ্যে মধ্যে দুই একটা যা শুনিলাম তা'তে তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া চমকিয়া উঠিলাম—"

ব্যগ্রে আবার সকলে জিজ্ঞাসা করিল "কি বুঝিলেন ?"

স। "বুঝিলাম হিরণকুমার বলিয়া এক ব্যক্তিকে বধ করিতে যাইবার অগ্রে তাহারা কয় জনে মিলিয়া আর একজন সঙ্গীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। অনেক ক্ষণ হইল সেই প্রত্যাশিত ব্যক্তি না আসায় ঝড় বৃষ্টিতে আর অধিক ক্ষণ অপেক্ষা করিতে না পারিয়া একজন বলিল, "আর কতক্ষণ এরূপে এখানে থাকিব ? চল যাওয়া যাক।" আমার মনে হইল এই বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল।"

অন্য সকলে। 'তা'র পর।'

স। "তা'র পর, তাহারা গিয়াছে ভাবিয়া আমি ঐ অভিসন্ধির কথা গুলি প্রকাশের অভিপ্রায়ে ব্যগ্রভাবে মন্দির হইতে বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি, দস্যুদের মধ্যে একজন তখনো যায় নাই, কেবল মাত্র সেই যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। আমাকে দেখিয়া সে বুঝিল আমি তাহাদের সকল কথা শুনিয়াছি, অমনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িল, আমি পড়িয়া গেলেম, পরে কি হইল জানি না। যাহা হৌক, এখনি এ অভিসন্ধির কথা পুলিসে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।"

প্রমোদ বলিলেন, "বাস্তবিকই, তা' না হ'লে এ হত্যাকাণ্ড থামাইবার আর উপায় নাই।"

কুটীর-স্বামী এই কথায় সেই ঝড় বৃষ্টিতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পুলিসে সংবাদ দিতে চলিল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পাপের ফল।

কিছু পরে গৃহস্বামী কুটীরে প্রত্যাগমন করিল ; তাহার মুখ-চক্ষু ক্রোধ-পরিতৃপ্তি-জনিত-হর্ষ-বিকম্পিত। সে আসিয়া প্রমোদকে বলিল, "মশায়, খুনীদের মধ্যে যে প্রধান সেও ধরা পড়েছে। তিনি কে শুনবেন ?—তিনি আপনার বন্ধু যামিনী বাবু, আমার আগেকার মনিব।"

শুনিয়া প্রমোদ ও নীরজা অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, সন্ন্যাসী একটু শান্তি পাইয়া তখন অল্প ঘুমাইতেছিলেন, তিনি একথা শুনিতে পাইলেন না। প্রমোদের কিন্তু ও কথায় বিশ্বাস হইল না, তথাপি তিনি আশ্চর্য্য ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যামিনীবাবু ইহার মধ্যে কি করিয়া আসিবেন ? তিনি তো কলিকাতায়।"

সে বলিল, "মশায়, সবটা শুনুন তো ; আমি পুলিসে খবর দিলেই অমনি জনকতক পুলিসের লোক এসে হিরণবাবুর বাড়ীর

দুই পাশে লুকিয়ে রইল, আমিও তাদের সঙ্গে রইলাম।"

প্রমোদ বলিলেন, "একটা কথা আগে জিজ্ঞাসা করি, হিরণকুমারটা কে? সেকি এখানকার কোন বাসেন্দা?

গৃহ। না, তিনি আলিপুরের ডিপুটি-মেজিষ্ট্রেট, অল্পদিন হ'ল এখানে এসেছেন।"

প্রমোদ বুঝিলেন, সে কোন্ হিরণকুমার কিন্তু কিছুই বলিলেন না। গৃহস্বামী আবার বলিল,

"আমরা লুকিয়ে আছি, কিছু পরে চার-জন লোক আস্তে আস্তে এসে সদর দরজা হতে কিছু দূরে একটি পাঁচীলের কাছে দাঁড়াল, আর একজন দরজা খোলা দেখে আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকলো। তখনি আমরা সেই পাঁচ জনকেই ধ'রে ফেললাম, তা'র ভিতর দেখি—যামিনী বাবু একজন।'

প্রমোদ আশ্চর্য্য ভাবে বলিলেন, "তিনি তবে সেই সময় আর কোন কারণ বশত হিরণের নিকট যাইতেছিলেন, এক সঙ্গে ধরা পড়ে ঐ দলে মিশিয়ে গিয়াছেন।"

প্রমোদের অবিশ্বাস বাক্যে সে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "আপনি যামিনী বাবুকে দোষী মনে করছেন না। কিন্তু তাঁর স্বভাব জানলে আর ওরূপ ভাবতেন না। তিনিই তো আমার এই দশা করেছেন, তাঁর ভয়েই তো আমায় দেশ পরিবার ছেড়ে এই অবস্থায় থাকতে হয়েছে। আমার অপরাধের মধ্যে তাঁর কথায় আপনাকে মারতে রাজি হই নি।"

তখন রামধন নীরজার অপহরণের কথা, প্রমোদের হত্যা-সংকল্পের কথা, যাহা যাহা হিরণকুমারকে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিল সমস্তই বলিল। বলিতে বলিতে তাহার মুখ-চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। শুনিয়া নীরজার হৃদয় যেন স্তম্ভিত হইয়া আসিল, প্রমোদ যদিও কিছু বিস্মিত হইলেন কিন্তু অপ্রত্যয় ভাবে বলিলেন, "যামিনী যে আমার হত্যা মানস করিয়াছিলেন, ইহা তো হইতেই পারে না, আমি আসল হত্যাকারীকে পিস্তল হস্তে স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

গৃহ। "তাতো হ'তেই পারে, যামিনী বাবু তো আর নিজে মারতে যান নি।"

প্র। "না না আমি কোন ভদ্র লোককে পিস্তলহস্তে ছুটিয়া আপন বাড়ী ঢুকতে দেখিয়াছি, সে ব্যক্তি তো আর যামিনীর চাকর নয়।"

গৃহস্বামী শুনিয়া বলিল, "বুঝেছি আপনি কাকে দেখেছেন? বোধ করি হিরণ বাবুকে দেখে থাকবেন।"

প্রমোদ আশ্চর্য্যে বলিলেন, "তাহা তুমি কি প্রকারে বুঝিলে?"

সে বলিল "আমার বন্ধুর কাছে আগে শুনেছিলাম যে একটি ভদ্রলোক সে পিস্তল কেড়ে নিয়েছিলেন, তার পর সেদিন হিরণ বাবুর নিকট শুনলাম, তিনিই সেই ভদ্র লোক।" রামধন হিরণের বাড়ী গিয়া যাহা দেখিয়াছিল ও শুনিয়াছিল তখন সেই সকল বলিল।

প্রমোদ বলিলেন, "হিরণ তো ওরূপ

বলিতেই পারে তাহার কথায় বিশ্বাস কি? তোমার বন্ধুর মুখে কি শুনিয়াছ?" ভৃত্য প্রথমে তাহা বলিতে অস্বীকৃত হইল, ভয়, পাছে প্রমোদ শুনিলে বন্ধুর কোন হানি হয়, কিন্তু প্রমোদের সাহস-বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া বলিল,

"আমার বন্ধু যামিনী বাবুর একজন চাকর। আমি মারতে নারাজ হ'লে, টাকার লোভে সে এবং আর একজন রাজি হয়ে আপনাকে মারতে গিয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্য ঠিক না হওয়াতে দু'বারই তাদের চেষ্টা মিছে হয়। তখন আপনি তাদের ধরতে যাওয়ায় তারা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়।"

প্র। "তাহা তো আমি জানি, আমি দু'জনকে পলাইতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাহারা যে যামিনীর ভৃত্য তাহা আমি বিশ্বাস করিব কেন?"

গৃহস্বামী। "শুনুন না মশায়। পিস্তলের শব্দ শুনেও তারা পালাচ্ছিল দেখে চোর কিম্বা দুষ্ট লোক মনে করে পথে একজন ভদ্রলোক তাদের ধরতে যান, তখন জানতাম না ভদ্রলোকটি কে, কিন্তু আপনাকে তো বলেছি, যে তার পর দেখছি ভদ্রলোকটি হিরণ বাবু। হিরণ বাবুকে দেখে, তখন দু'জন দুই দিকে পালাল। যে ব্যক্তির হাতে পিস্তল ছিল, হিরণ বাবু দৌড়ে তার উপর এসে পড়ে তার হাত ধরতে গেলেন ভাগ্যে হাতের বদলে হিরণ বাবু পিস্তল ধরেছিলেন, তাই সে ব্যক্তি পিস্তল ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে পালাল। হিরণ বাবু তাকে আর ধরতে না পেরে চ'লে গেলেন। এই সকল কথা পরদিন আমার বন্ধুটি আমোদ করে আমাকে বলেছিল। আপনি বোধ হয় হিরণ বাবুকেই পিস্তল হাতে দেখে থাকবেন।"

শুনিয়া প্রমোদ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, তথাপি সম্পূর্ণ রূপে যামিনীকে দোষী ভাবিতে পারিলেন না। পরে এই বিষয়ের সম্পূর্ণ অনুসন্ধান করিতে স্থির করিলেন। এই সময় এক জন বৃদ্ধা এই কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা সেই ভৃত্যের মাসী। সে কিছু দূরে পর পারে, একটি দেবালয় দর্শনে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিবার সময় ঝড় বৃষ্টি পাইয়া ভিজিতে ভিজিতে অবশেষে গৃহে আসিল। এখানে অনেক লোক জন দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিন্তু তাহার বোনপোর নিকট শুনিল ইঁহারা ঝড় বৃষ্টিতে কাতর হইয়া এই কুটীরে আশ্রয় লইয়াছেন। তখন বৃদ্ধা আস্তে আস্তে আসিয়া অগ্নির নিকট বসিয়া হস্তপদ সেঁকিতে সেঁকিতে অর্দ্ধেক আপন মনে অর্দ্ধেক প্রকাশ্যে বলিল,

"তা বাপু বেশ—এই ঝড় বৃষ্টি—এ সময়ে কি পথ চলা যায় বাপু! তোমরা এসেছ বেশ করেছ—বাবা! কি এক রোখা মেয়ে গা?"

প্রমোদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার কথা বলিতেছ? কে বাপু?"

নীরজা ভাবিল, বৃদ্ধা তাহাকে ভাবিয়াই বলিতেছে, ঈষৎ ক্রুদ্ধ ঈষৎ অপ্রস্তুত ভাবে সে বলিল, "কেন বাপু আমি কি

করিয়াছি, আমাকে কিসে একরোকা দেখিলে ?"

বৃদ্ধা। "তুমি কেন গো? আজ এই দুর্যোগের সময় নৌকা হতে কত কষ্টে বেঁচে যখন নদীর ধার দিয়ে বাড়ী আসছিলেম তখন একটি পাগল মেয়ে,—আহা! এমন সুন্দর মেয়ে কেউ কখনো দেখেনি —একেবারে উন্মত্ত হয়ে দেখি ছুটে ছুটে বেড়াচ্চে। আহা! এক রাশি চুল সব এলোথেলো, বৃষ্টিতে ভিজে গিয়ে সব সোটা সোটা হয়ে পড়েছে, তা দিয়ে আবার ঝর ঝর জল ঝরছে।"

প্রমোদ ও নীরজা দু'জনেই একত্রে বলিয়া উঠিলেন, "আহা! কাদের মেয়ে গা ?"

বৃদ্ধা। "ওগো, কাদের মেয়ে জানি না, কেবল গান গায়। আমি শুধালাম, 'তুমি কাকে খুজছ গা ?' তা' সে বল্লে,

'হিরণ হিরণ সোনার বরণ,
যাঁরি হাতে বাঁচন মরণ।"

এই কথায় প্রমোদ অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "এ তো আমাদের কনক নয় ? তাহার বয়স কত গো ?"

বৃদ্ধা। "এই বাপু চৌদ্দ পনের বৎসর।'

এই কথা শুনিয়া নীরজা ও প্রমোদ যেন বজ্রাহত হইলেন ; অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত প্রমোদ নীরজাকে বলিলেন "তুমি এইখানে থাক। আমার নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে এ কনক, আমি তাকে খুঁজে আনিগে।"

নীরজা বলিল, "কনক যদি এতক্ষণে আর বারের মত জলেই বা পড়ে গিয়ে থাকে ?"

বৃদ্ধা। ওগো সে মেয়েটি জলে পড়েনি গো, আমি তাকে বল্লেম 'আমার সঙ্গে আসবে', তা সে অমনি গান গাইতে গাইতে ঐ মস্ত বাড়ীর ভিতর ঢুকলো, তার পর কি হয়েছে জানি না।"

বৃদ্ধা প্রমোদের সহিত কুটীরের বাহিরে আসিয়া সেই বাড়ী অঙ্গুলি দ্বারা চিনাইয়া দিল। তখন বিদ্যুতের মত প্রমোদ সেই কুটীর হইতে বাহির হইয়া সুদূরে সেই বাড়ীর নিকট দৌড়িলেন। ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দ্বিতলে উঠিলেন। কিন্তু হিরণ মনুষ্য-পদ-শব্দ পাইয়াই কক্ষের বাহিরে আসিলেন। প্রমোদ উন্মত্তের ন্যায় হিরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কনক কোথায় ?' কথার গোলে পাছে কনকের নিদ্রাভঙ্গ হয় এই ভয়ে হিরণকুমার তাহাকে ধীরে ধীরে বলিলেন, "এই কক্ষে, কিন্তু চুপ! চুপ! কনক ঘুমাইতেছে, গোল করিলে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে,এখন ও ঘরে যেয়োনা।' প্রমোদ তাহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। হিরণকুমার ব্যাকুল-ভাবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন। কনকের শয্যা-পার্শ্বে গিয়া প্রমোদ মনের ব্যগ্রতা ভরে ডাকিলেন,

"দিদি আমার, কনক।" হিরণ তাহা শুনিয়া মৃদুস্বরে ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "চুপ! চুপ! এখনি কনকের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে।" প্রমোদ সে কথা না শুনিয়া

আবার কনকের গলদেশ বেষ্টন করিয়া ডাকিলেন, "দিদি আমার, কনক ওঠ ওঠ আমার সহিত একটিবার কথা কও।"

কনক জাগিয়া উঠিল।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বিজয়া।

নিদ্রার মত মনের ব্যাধির পরম ঔষধ আর কিছুই নাই। কিছুক্ষণ ঘোর নিদ্রা মগ্ন থাকায় কনক যখন জাগিল, তখন যেন তাহার ভ্রংশ-বুদ্ধি কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। কিন্তু সহসা প্রমোদকে সেই আদরের ভাবে কথা কহিতে দেখিয়া, সম্মুখে হিরণ-কুমারকে ম্লান বিষণ্ণ ভাবে দাঁড়াইতে দেখিয়া, সে যেন কিছুই বুঝিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মুখে আনন্দ বিভাসিত হইল। তাহাকে জাগ্রত দেখিয়া প্রমোদ আহ্লাদে বলিলেন, "কনক, আমি তোমার কাছে কত অপরাধে অপরাধী, কনক, দিদিটি আমার, আমি সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব; হিরণ যাহাই হোক আমি তোর সঙ্গে বিবাহ দিবই দিব।"

অমনি সমস্ত ঘটনা কনকের মনে পড়িয়া গেল, ভ্রাতার নিষ্ঠুরতা, হিরণের পর্য্যন্ত নিষ্ঠুরতা মনে পড়িল। কতদিন পরে তাহার ভাই তাহাকে আদর করিয়া ডাকিলেন, আবার হিরণকুমার তাহার শয্যার পাশেই রহিয়াছেন, কনকের হঠাৎ এত আহ্লাদ আর সহ্য হইল না, কনক আবার অন্ধকার দেখিল, মস্তক আবার ঘুরিয়া আসিল, হৃদয়ে রক্তের প্রবাহ ভীষণ বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; কনক বলিল, "দাদা, ওরূপ আদরের কথা আমি যে তোমার মুখে অনেক দিন শুনি নি, আমার ভাগ্যে যে আর এরূপ সুখ কখনো হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি—"

কনকের উপধান অশ্রুসিক্ত হইয়া প্রমোদের হাত ভিজিতে লাগিল। আবার একবার ঈষৎ লজ্জা ঈষৎ অভিমান, ঈষৎ বিষাদে অর্দ্ধ-নিমীলিত চক্ষে হিরণকুমারের পানে চাহিল, অস্ফুট স্বরে বলিল,

"হিরণকুমার, এ জনমে আর হৃদয়ের সাধ পূরিল না—কিন্তু ঈশ্বর-উপাসনার যদি ফল থাকে, বিশুদ্ধ প্রেমের যদি পুরস্কার থাকে, তা হলে মরণে আমার দুঃখ নেই, তা' হলে পরলোকে আমাদের মিলন হবেই?' অতি কষ্টে এ কথা গুলি কহিয়াই কনক থামিল। কনকের কথার মর্ম্ম যেন হিরণকুমার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, যাতনা-ব্যঞ্জক শূন্য দৃষ্টিতে কেবল তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন মাত্র। প্রমোদ আর কান্না সামলাইতে পারিলেন না, নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। কনক আবার কথা কহিবার ইচ্ছায় মুখ খুলিল, অতি ধীরে ধীরে, অতি কষ্টে বলিল—"হিরণকুমার, আর যে দেখতেও পাচ্চিনে, একটিবার কাছে স'রে এস, শেষবার ভাল করে—"

এইটুকু বলিয়াই কনক আবার ঢলিয়া পড়িল; আর কথা কহিল না। প্রমোদ বলিলেন, "দিদি আমার, অমন করিতেছ

কেন ?” কনকের যন্ত্রণা বুঝিতে পারিয়া প্রমোদ কাঁদিয়া উঠিলেন; হিরণকুমার পাগলের মত প্রমোদকে বলিলেন, “চুপ! চুপ! কনকের ঘুম আসিতেছে, তুমি ঘুম ভাঙ্গাইও না।”

হিরণ আস্তে আস্তে কাছে বসিয়া শিশুর ন্যায় তাহাকে ঘুম পাড়াইতে লাগিলেন। কনক আর একবার কষ্টে চক্ষু খুলিয়া হিরণকে দেখিল, তাহার ওষ্ঠাধর মৃদু হাস্যে শোভিত হইল, মুখখানি একটি অপূর্ব্ব সুখের ভাবে পরিপ্লুত হইল, কনকের আবার চক্ষু মুদিয়া আসিল, ভ্রাতার হস্তে মস্তক রাখিয়া কনক অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইল, না ফুটিতেই মুকুল ঝরিয়া পড়িল; দীপ জ্বলিয়াই নির্ব্বাণ হইল।

প্রমোদ বুঝিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, হিরণকুমার আবার বালকের মত বলিলেন, “কাঁদিও না, কনকের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে।” হিরণের আশাই পূর্ণ হইল, কনকের ঘুম আর কখনই ভাঙ্গিল না; কুসুম-কলিকা ছিন্ন হইল।

উপসংহার।

আরো কয়েক বৎসর অতীত হইল। এই অল্প কালের মধ্যেই ধ্বংশ-শীল জগতের ক্ষতিগ্রস্ত ভাগ কত পুরিয়া উঠিল। কত দরিদ্র ধনবান হইল, কত পলাতক রাজা আবার আপন রাজ্যে অধিবেশন করিল। যে স্থান শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল তাহা আবার পুনর্জীবিত হইল। এই অল্প কালের মধ্যে কত মাতার পুত্রশোকের লাঘব হইয়া আসিল; কত বন্ধু বন্ধুর শোক ভুলিলেন, কত পত্নীব্রত স্বামী, যাঁহারা একদিন স্ত্রীর নিকট শপথ করিয়া বলিয়াছিলেন, স্ত্রীর মৃত্যু হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদেরও প্রাণ বিয়োগ হইবে, যাঁহারা স্ত্রীর মৃত্যু কল্পনামাত্র করিতে শিহরিয়া উঠিতেন, তাঁহারা আবার দ্বিতীয়বার স্ত্রীগ্রহণ করিয়া সুখে সংসার নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। প্রমোদও এই অল্পকাল মধ্যে কনককে ভুলিলেন, কেবল মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্নের ন্যায় কখনো কখনো কনকের কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় হইত মাত্র। প্রমোদের এখন একটি কন্যা ও একটি পুত্র হইয়াছিল, তাহাদের দেখিয়া কখনো কখনো প্রমোদের শৈশব কাল মনে পড়িত, কখনো কখনো কনকের কথা মনে পড়িয়া একটু কষ্ট হইত, কিন্তু আবার নীরজার মুখপানে চাহিলেই সকল ভুলিয়া যাইতেন।

কনকের মৃত্যুর পর হইতে হিরণের উপর আর প্রমোদের বিদ্বেষ ভাব রহিল না। হিরণের তিনি বিশেষ বন্ধু হইয়া পড়িলেন, হৃদয়ের সহিত তাঁহার দুঃখে সমদুঃখী হইতেন। কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে যে ব্যক্তির বিন্দুমাত্র দয়া পাইলেও হিরণ চিরসুখী হইতে পারিতেন, এখন তাহার কাছ হইতে সহস্র মমতা পাইয়াও তাঁহার দুঃখের ভার কিছুমাত্রও কমিল না। অনেক ক্ষতি কালে পূরণ হয় বটে, কিন্তু সকল রূপ ক্ষতি কাল পূরণ করিতে পারে

না; সকল রূপ যাতনা কাল নিভাইতে পারে না। কত কত সমুদ্র লোপ হইয়াছে কালে তাহার চিহ্নমাত্রও নাই, কত মহানগরী ধ্বংশ হইয়াছে এখন তাহার নাম মাত্র অবশিষ্ট আছে, কত পর্ব্বতশৃঙ্গ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে তাহা আর ওঠে নাই, হিরণেরো ভগ্ন-হৃদয় আর জোড়া লাগিল না; তাঁহার হৃদয়-আগুণ আর নিভিল না।

একদিন প্রত্যূষে প্রমোদ উদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে নদীতীরে আসিয়া দেখিলেন জলের অব্যবহিত উপরের সোপানে এক ব্যক্তি শয়ান, মাঝে মাঝে সোপান-প্রতিহত জলরাশি উচ্ছ্বলিত হইয়া তাহার অঙ্গে ছড়াইয়া পড়িতেছে, সে ব্যক্তির তাহাতে চেতনা নাই, যেন গভীর নিদ্রাভিভূত। প্রমোদ নিকটে আসিলেন, শোক-বিহ্বল চিত্তে দেখিলেন, সে ব্যক্তি হিরণকুমার—দেখিলেন হিরণকুমার মুমূর্ষু। প্রমোদ নিকটে আসিয়া তাহাকে সোপান হইতে উঠাইতে চেষ্টা করিলেন, আস্তে আস্তে তখন হিরণকুমার একবার চক্ষু উন্মীলিত করিলেন, তাঁহার অশ্রুময় নেত্র প্রমোদের চক্ষুতে সংলগ্ন করিয়া অন্তিম কালের যাতনাকম্পিত স্বরে বলিলেন, "আমায় উঠাইও না—আমি এইখানেই মরিব, এই খানেই শুনিয়াছিলাম, কনক আমায় ভালবাসে।"

বলিতে বলিতে হিরণ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল; প্রমোদ বিষাদ-আকুল চিত্তে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হিরণের এই শেষ কথাগুলি অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার মনে ছিল।

সমাপ্ত।

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র।

আমাদের ব্রাইটনের বাড়িটি সমুদ্রের কাছে একটি নিরালা জায়গায়, এক সার ২০। ২৫ টি বাড়ি, বাড়িগুলির নাম হোচ্চে midina villas। villa শুনলে তোমাদের হঠাৎ মনে হবে বাগান-বাড়ি; আমি লণ্ডন থেকে যখন প্রথম শুনলুম যে, আমরা মেদিনা ভিলায় বাস কোর্ত্তে যাচ্চি, তখন কত কি কল্পনা কোরেছিলুম তা'র ঠিক নেই, বাগান, গাছ, পালা, ফল, ফুল, মাঠ, সরোবর ইত্যাদি ইত্যাদি। বাড়িতে এসে যে দিকে চেয়ে দেখি, সেই দিকেই বাড়ি ঘর রাস্তা গাড়ি ঘোড়া, "ভিলা"র মধ্যে আমাদের বাড়ির সামনে দু চার হাত জমীতে দু চারটে গাছ পোঁতা আছে। বাড়ির দরজায় একটা লোহার কড়া (knocker) লাগানো আছে, সেইটেতে ঠক্ ঠক্ কোরলেম, আমাদের land lady এসে দরজা খুলে দিলে। আমাদের দেশের

তুলনায় এখানকার ঘরগুলো লম্বা চোড়া ও উঁচুতে ঢের ছোট। ছোট ছোট ঘর গুলো চারদিকে জানলা বন্ধ, একটু বাতাস্ আস্‌বার যো নেই, কেবল জান্‌লা গুলো সমস্ত কাঁচের বোলে আলো আসে। শীতের পক্ষে এরকম ছোট্ট খাটো ঘর গুলো খুব ভাল, একটু আগুন জ্বাল্‌লেই সমস্ত বেশ গরম হোয়ে ওঠে; কিন্তু তা' হোক্,— যে দিন মনে কর মেঘে চার দিক অন্ধকার হোয়ে গেছে, টিপ্ টিপ্ কোরে বৃষ্টি পোড়্‌ছে, তিন চার দিন ধোরে মেঘ বৃষ্টি অন্ধকারের এক মুহূর্ত্ত বিরাম নেই, সে দিন এই ছোট্ট অন্ধকার ঘরটার এক কোণে বোসে আমার মনটা অত্যন্ত বিগ্‌ড়ে যায়, কোন মতে সময় কাটে না; এক, দুই, তিন কোরে গুণে গুণে দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে সময় কাটাতে ইচ্ছে করে। খালি আমি বোলে নয়, আমার ইংরেজ আলাপীরা বলেন, সে রকম দিনে তাঁদের অত্যন্ত swear করার প্রবৃত্তি জন্মায়, (swear করা রোগটা সম্পূর্ণ য়ুরোপীয়, সুতরাং ওর বাঙ্গালা কোন নাম নেই), মনের ভাবটা অধার্ম্মিক হোয়ে ওঠে। ঘর গুলো যদি আরো একটু দরাজ হোত, তা হোলেও মনের এরকম খুঁৎ খুঁতে ভাব অনেকটা দূর হোত। ছোট হোক্ ঘর গুলো যথেষ্ট সাজানো; ছবি, টেবিল, চৌকি, কৌচ, ফুলদানি, পিয়ানো ইত্যাদি গৃহ-সজ্জা। প্রায় প্রতি ঘরে এক একটা বড় বড় আয়না আছে, খেতে শুতে বোস্‌তে নিজের মুখ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সুশ্রী মানুষের পক্ষে এ রকম মন্দ নয়, কিন্তু প্রতি পদে এই কালো মূর্ত্তি দেখ্‌লে আয়না গুলো ভেঙ্গে ফেল্‌তে ইচ্ছে করে; যত মনে করি সাহেব হোয়েছি, "নেটিব"ত্ব যতই ভুলে যেতে চেষ্টা করি, ততই যে ঘরে যাই, চার দিক থেকে আয়নাগুলো আমাদের কালো মুখ প্রকাশ কোরে যেন ভেংচোতে থাকে; এক এক সময় জ্বালাতন হোয়ে উঠ্‌তে হয়। এখানকার বাড়ি গুলো আমাদের দেশের কোঠা বাড়ির মত তেমন মজবুৎ নয়, বাড়ির অধিকাংশ কাঠের; আমাদের দেশে এরকম বাড়ি হোলে বোধ হয় উয়ে হজম কোরে ফেলে, বাতাসের ফুঁয়ে উড়ে যায়। যা' হোক্ এখানকার ঘর দুয়ারগুলি বেশ পরিষ্কার কোরে রাখে; বাড়ির ভিতরে প্রবেশ কোর্‌লে আর কোথাও এক তিল ধূলো দেখ্‌বার জো নেই, মেজের সর্ব্বাঙ্গ কার্পেট প্রভৃতি দিয়ে মোড়া, সিঁড়িগুলি পরিষ্কার তক্ তক্ কোরচে, কোথাও একটুখানি দাগ নেই। আমাদের দেশের পরিষ্কারের সঙ্গে এখানকার পরিষ্কারের অনেকটা তফাৎ আছে। শিল্পজ্ঞান সৌন্দর্য্যজ্ঞান থেকে এখানকার লোকদের পরিষ্কার-ভাবের জন্ম, আমাদের পরিষ্কার-ভাব বোলে যেন একটা স্বতন্ত্র মনোবৃত্তি আছে। চোকে দেখ্‌তে খারাপ হোলে এরা সইতে পারে না। প্রতি সামান্য বিষয়ে এদের ভাল দেখ্‌তে হওয়াটা প্রধান আবশ্যক। প্রতি পদে এরা সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা করে। এখানকার পুরুষেরা টুপি খুলে সম্মান প্রদর্শন করে,

কিন্তু এমন কোরে খোলে, যা'তে সেই সামান্য টুপি খোলাতেও শ্রী প্রকাশ পায়। বিশেষতঃ এখানকার মেয়েরা প্রতি হাত পা নাড়ায় শ্রীর প্রতি লক্ষ্য করে। কিছু নেবার জন্যে হাত বাড়ালে এমন কোরে বাড়ায়, যাতে সুন্দর দেখায়, খাবার সময়ে এতটুকু মুখ মোছে, যা'তে খারাপ না দেখায়, পাছে লম্বা পদক্ষেপ হয় বোলে বিবিদের এক রকম নতুন ফেসানের কাপড় উঠেছে তা'তে তা'দের হাঁটুর কাছটা বাঁধা থাকে, এমন কি আমি সম্প্রতি দুই একটা কাগজে দেখ্‌তে পাই, একজন কাপড়ওয়ালা খুব ভাল দেখতে mourning dress এর বিজ্ঞাপন দিয়েছে, শোক-বস্ত্রও সুশ্রী দেখ্‌তে হওয়া আবশ্যক। দোকান থেকে যা কিছু জিনিষ আসে, তা' সুশ্রী কোরে মোড়া থাকে, দোকানদারেরা এরকম কোরে মোড়ার খরচটা অপ্রয়োজনীয় মনে করে না, যা' দুদণ্ডের বেশী ব্যবহার কোর্ত্তে হবে না তা'ও সুন্দর দেখ্‌তে হওয়া আবশ্যক। এই রকম প্রতি পদে এদের শিল্প চর্চ্চার উন্নতি হয়। প্রথম হয়ত এই রকম সুশ্রী অঙ্গ-চালনা প্রভৃতি অভ্যাস-সাধ্য, কিন্তু ক্রমে সেটা স্বাভাবিক হোয়ে যায়, ও বংশাবলী ক্রমে সংক্রামিত হোতে থাকে। এরকম শিল্প-চর্চ্চার ভাব খুব ভাল তা'র আর সন্দেহ নেই, কিন্তু একটা স্বতন্ত্র পরিষ্কারের ভাব থাকাও আবশ্যক। এখানকার লোকেরা খাবার পরে আঁচায় না, কেননা আঁচানো জল মুখ থেকে পোড়্‌চে, সে অতি কুশ্রী দেখায়, শ্রী হানি হয় বোলে পরিষ্কার হওয়া হয় না। এখানে যে রকম কাশী সর্দ্দির প্রাদুর্ভাব, তা'তে ঘরে একটা পিকদানি থাকা নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু সে অতি কুশ্রী পদার্থ বোলে ঘরে রাখা হয় না, রুমালে সমস্ত কাজ চলে; আমাদের দেশের যে রকম পরিষ্কার-ভাব, তা'তে আমরা বরঞ্চ ঘরে একটা পিকদানি রাখ্‌তে পারি, কিন্তু জামার পকেটে এরকম একটা বীভৎস পদার্থ রাখ্‌তে ঘৃণা হয়। কিন্তু এখানে চোখেরি আধিপত্য। রুমাল কেউ দেখ্‌তে পাবে না তা' হোলেই হোল। চুলটি বেশ পরিষ্কার কোরে আঁচড়ানো থাক্‌বে, মুখটি ও হাত দুটি বেশ সাফ থাক্‌বে, তা' হোলেই লোকে সন্তুষ্ট থাকে, স্নান করবার বিশেষ আবশ্যক নেই। এখানে জামার উপরে অন্যান্য অনেক কাপড় পরে বোলে জামার সমস্তটা দেখা যায় না, খালি বুকের ও হাতের কাছে একটু বেরিয়ে থাকে; একরকম জামা আছে, তার যতটুকু বেরিয়ে থাকে ততটুকু জোড়া দেওয়া, সে টুকু খুলে ধোবার বাড়ি দেওয়া যায়; তাতে সুবিধে হোচ্চে যে, ময়লা হোয়ে গেলে জামা বদ্‌লাবার কোন আবশ্যক করে না, সেই জোড়া টুক্‌রো গুলো বদ্‌লালেই হোল। এখানকার দাসীদের কোমরে এক apron বাঁধা থাকে, সেইটি দিয়ে তাঁরা না পোঁছেন এমন পদার্থ নেই; খাবার কাঁচের প্লেট যে দেখ্‌ছ ঝক্‌ ঝক্‌ কোর্‌চে, সেটিও সেই সর্ব্ব-পাবক apron টি দিয়ে মোছা হোয়েছে, কিন্তু তা'তে কি হানি, দেখ্‌তে তো কিছু খারাপ

দেখাচ্ছে না। এখানকার লোকেরা কিছু অপরিষ্কার নয়, আমাদের দেশে যা'কে "নোংরা" বলে, তাই। আমাদের দেশের পরিষ্কার ও এখানকার পরিষ্কারের একটা মিলন হোলেই বেশ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর মিলন হয়। ভাল দেখ্‌তে হওয়ার প্রতি আমাদের অত্যন্ত কম লক্ষ্য; কিন্তু তার প্রধান কারণ আমরা গরীব। শিল্পের দিকে মনোযোগ দেবার আমাদের অবসর নেই। এখানে পরিষ্কার ভাবের যে অভাব আমরা দেখতে পাই, সে অনেকটা শীতের জন্যে। আমরা যে কোন জিনিষ হোক্‌না কেন, জল দিয়ে পরিষ্কার না হোলে পরিষ্কার মনে করিনে। এখানে অত জল নিয়ে নাড়াচাড়া পোষায় না। তা' ছাড়া শীতের জন্য এখানকার জিনিষপত্র শীঘ্র "নোংরা" হোয়ে ওঠে না। আমাদের দেশে প্রায় সর্ব্বদা গা খোলা থাকে, তা' ছাড়া গর্ম্মিতে এমন অপরিষ্কার হোয়ে উঠ্‌তে হয়, যে, না নাইলে তিষ্ঠোবার জো নেই। এখানে শীতে ও গায়ের আবরণ থাকাতে শরীর তত অপরিষ্কার হয় না। এখানে জিনিষ পত্র পোচে ওঠে না, এই রকম পরিষ্কারের পক্ষে নানা বিষয়ে সুবিধে। আমাদের দেশে যে রকম পরিষ্কারের ভাব আছে, তেমনি পরিষ্কার হওয়ার বিষয়ে অনেক কুসংস্কারও আছে। মনে কর আমাদের দেশের পুষ্করিণীতে কিনা ধোয়, কি না ফেলে? সে ত্রৈলোক্য অপরিষ্কার জলকুণ্ডে স্নান কোর্‌লে আবার স্নান করবার আবশ্যক হয়। তেল মেখে জলে দুটো ডুব দিলেই আমরা গা সাফ হোল মনে করি। আমরা নিজের শরীর ও খাওয়া দাওয়া সংক্রান্ত জিনিষের বিষয়ে বিশেষ পরিষ্কার থাকি, কিন্তু ঘর দুয়ার যথোচিত পরিষ্কার করিনে। আমাদের চারদিক এই রকম অপরিষ্কার থাকে বোলে আমাদের স্বাস্থ্যও খারাপ। যা'হোক্, এবিষয়ে আর অধিক বক্তৃতা দেব না। অন্যান্য দুই এক কথা বলি।

আমাদের দুই একটি কোরে আলাপী হোতে লাগল, ডাক্তার M একজন আধবুড়ো চিকিৎসা ব্যবসায়ী। তিনি একজন প্রকৃত ইংরাজ, ইংলণ্ডের বহির্ভূত কোন জিনিষ তাঁর পছন্দসই নয়। তাঁর কাছে ক্ষুদ্র ইংলণ্ডই সমস্তপৃথিবী, তাঁর কল্পনা কখনো Dover Channel পার হয় নি। আমাদের তিনি অত্যন্ত কৃপাচক্ষে দেখতেন, বোধ হয় তার প্রধান কারণ, আমাদের ইংলণ্ডে জন্ম হয় নি। তাঁর কল্পনার এমন অভাব যে, তিনি মনে কোর্ত্তে পারেন না, যারা Ten commandments মানে না, তাদের মিথ্যে কথা বোলতে কি কোরে সঙ্কোচ হোতে পারে? অখৃষ্ট লোকদের নীতির বিরুদ্ধে এই তাঁর প্রধান যুক্তি। যে ইংরাজ নয়, যে খৃষ্টান নয়, এমন একটা অপূর্ব্ব-সৃষ্টি দেখ্‌লে তাঁর কল্পনা অত্যন্ত বিহ্বল হোয়ে পড়ে, তা'র মনুষ্যত্ব কি কোরে থাকৃতে পারে ভেবে পান না। তাঁর motto হোচ্চে Gladly he would learn and gladly teach, কিন্তু আমি দেখলুম তাঁর learn করবার ঢের আছে, কিন্তু teach

করবার মত সম্বল খুব কম। তাঁর স্বদেশীয় সাহিত্যের বিষয়ে তিনি আশ্চর্য্য কম জানেন; কতকগুলি মাসিক পত্রিকা পোড়ে তিনি প্রতি মাসে দুই চারিটি কোরে ভাসা ভাসা জ্ঞান লাভ করেন। ক্রমশঃ জান্‌তে পারলুম, তিনি আমাদের মনে মনে uneducated বোলে জানেন, কেন না তিনি কল্পনা কোর্‌তে পারেন না একজন Indian কি কোরে educated হোতে পারে? এখানকার বিবিরা শীতকালে হাত গরম রাখবার জন্যে এক রকম গোলাকার পদার্থের মধ্যে হাত গুঁজে রাখে তা'কে muff বলে, প্রথম বিলেতে এসে সেই অপূর্ব্ব পদার্থ-যখন দেখি, তখন Dr M কে সে দ্রব্যটা কি জিজ্ঞাসা করি। আমার প্রশ্ন শুনে তিনি আকাশ থেকে পোড়লেন muff পদার্থটা আমি জানিনে শুনে তিনি ভেবে খুন। এর চেয়ে education-এর অভাব কি হোতে পারে বল? muff বোলে একটা সামান্য পদার্থ, যা, বিলেতের একটা সামান্য অশিক্ষিত চাষা পর্য্যন্ত দেখ্‌লে বোলে দিতে পারে তা' আমি জানিনে! এমন ভয়ঙ্কর ভোঁতা কল্পনা আমি আর কখনো দেখিনি। কিন্তু আমি এখানকার অনেক লোকের রোগ দেখিছি, তারা আশা করেন, আমরা তাঁদের সমাজের প্রতি ছোট খাটো বিষয় জানব। একদিন একটা নাচে গিয়েছিলুম, একজন বিবি আমাকে জিজ্ঞাসা কোরলেন, বধূটিকে (Bride) তোমার কি রকম লাগ্‌ছে? আমি জিজ্ঞাসা কোরলুম, নব-বধূটি কে? অতগুলি মেয়ের মধ্যে একজন নব-বধূ কোথায় আছেন তা' আমি কিছুই জানতুম না। শুনে সে বিবিটি একেবারে আশ্চর্য্য হোয়ে গেলেন, তিনি বোল্লেন তা'র মাথায় orange blossom দেখে চিন্‌তে পারনি? আমার অপ্রস্তুত হবার কোন কথা ছিল না, কিন্তু বিবিটি যে রকম আশ্চর্য্য হোয়ে উঠেছিলেন তাতে আমাকে খানিকটা অপ্রস্তুত হোতে হোল। থতমত খেয়ে আমি জিজ্ঞাসা কোরলুম ওঁর স্বামী সঙ্গে এয়েছেন? বিবিটি একটু বিরক্ত হোয়ে বোল্লেন "স্বামী আসেন নি! নব-বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী নেই!" আমি ভয় পেয়ে ভাব্‌লেম, আর অধিক প্রশ্ন করা শ্রেয় নয়। বিবিটি ভাব্‌লেন, "কোথাকার একটা নিউজিলাণ্ডেরের সঙ্গে কথা কচ্চি! এ orange blossom দেখে bride চিন্‌তে পারে না, আবার জিজ্ঞাসা করে, brideএর সঙ্গে স্বামী এয়েছে কি না! shocking!!" তাঁরা মনে করেন, এত সামান্য বিষয় আমাদের আত্ম-প্রত্যয় থেকে জানা উচিত। এই রকম এখানকার অনেক লোকের ভাব দেখিছি। যা হোক Dr Mএর কাছে এই রকম অনেক বিষয়ে আমার education-এর অভাব প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি সহজেই মনে কোরেছিলেন, যে ব্যক্তি muff কাকে বলে জানে না সে যে shakespeare পোড়েছে সে একেবারে "absurd!"

দুই মিস্ k-র সঙ্গে আলাপ হোলো। তাঁরা এখানকার পাদ্রির মেয়ে। পাদ্রির পরিবারদের দেখাশুনো, sunday school-

এর বন্দোবস্ত করা, working menদের জন্যে Temperence সভা স্থাপন ও তাদের আমোদ দেবার জন্যে সেখেনে গিয়ে গান বাজনা করা এই সকল কাজে তাঁরা দিন রাত্রি ব্যস্ত আছেন। বিদেশী বোলে আমাদের তাঁরা অত্যন্ত যত্ন কোর্ত্তেন। নগরে কোথাও আমোদ উৎসব হোলে আমাদের খবর দিতেন, আমাদের সঙ্গে কোরে নিয়ে যেতেন, অবসর পেলে সকালে কিম্বা সন্ধ্যে বেলায় এসে আমাদের সঙ্গে গল্প কোর্ত্তেন, ছেলেদের নিয়ে গিয়ে মাঝে মাঝে গান শেখাতেন, এক এক দিন তাঁদের সঙ্গে রাস্তায় বেড়াতে যেতুম। এই রকম আমাদের যথেষ্ট যত্ন ও আদর কোর্ত্তেন। বড় miss k—অত্যন্ত ভাল মানুষ ও গম্ভীর। একটা কথার উত্তর দিতে কেমন থতমত পেতেন। "হাঁ—না—তা হবে—জানিনে" এই রকম তাঁর উত্তর। এক এক সময় কি বোলবেন ভেবে পেতেন না, এক এক সময় একটা কথা বোলতে বোলতে মাঝ খানে থেমে পোড়তেন, আর কথা জোগাত না, সুতরাং বাকি টুকু আমাদের কল্পনার ওপর রেখে দিতেন। তাঁকে কোন বিষয়ে তাঁর মত জিজ্ঞাসা কোরলে তিনি বিব্রত হোয়ে পোড়তেন। তাঁকে যদি জিজ্ঞাসা করা যেত-আজ কি বৃষ্টি হবে মনে হোচ্চে? তিনি বোলতেন, কি কোরে বলব! তিনি বুঝতেন না সে বিষয়ে আমরা তাঁর মুখ থেকে একথা অভ্রান্ত বেদবাক্য শুনতে চাচ্চিনে, তিনি কি আন্দাজ করেন তাই জানতে চাচ্চি। কিন্তু তিনি আন্দাজ কোর্ত্তে নিতান্ত নারাজ। ছোট miss k-র মত প্রশান্ত প্রফুল্লতার ভাব আর দেখি নি: একটি মূর্ত্তিমান সন্তোষের ভাব। দেখে মনে হয় কোন কালে তাঁর মনের কোন খানে এক তিল আঁচড় পড়েনি। খুব ভাল মানুষ, সর্ব্বদাই হাসি খুসি গল্প। কাপড় চোপড়ের আড়ম্বর নেই—কোন প্রকার ভাণ নেই; অত্যন্ত সাদাসিদে।

ডাক্তার mএর বাড়িতে এক দিন আমাদের সান্ধ্য-নিমন্ত্রণ হোল। এখানকার নেমন্তন্নে আমাদের দেশের মত খাওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়, গান বাজনা আমোদ প্রমোদের জন্যই দশ জনকে ডাকা হয়। আমরা সন্ধ্যের সময় গিয়ে হাজির হোলুম। একটি ছোট ঘরে অনেকগুলি মহিলা ও পুরুষের সমাগম হোয়েছে। ঘরে প্রবেশ কোরে কর্ত্তা গিন্নিকে আমাদের সম্মান জানালুম। সমাগত লোকদের সঙ্গে যথাযোগ্য অভিবাদন সম্ভাষণ ও আলাপ হোল। ঘরে জায়গার এত টানাটানি ও লোক এত বেশী যে চৌকির অত্যন্ত অভাব হোয়েছিল; অধিকাংশ পুরুষে মিলে আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প জুড়ে দিয়েছিলুম। নতুন কোন অভ্যাগত মহিলা এলে গিন্নি কিম্বা কর্ত্তা তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ কোরে দিচ্চেন, আলাপ হবা মাত্র তাঁর পাশে গিয়ে একবার বসচি কিম্বা দাঁড়াচ্চি ও দুই একটা কোরে কথা বার্ত্তা আরম্ভ কোরচি, প্রায় weather নিয়ে কথা আরম্ভ হয়; মহিলাটি বোল্লেন 'Dreadful weather'। সে বিষয়ে তাঁর

সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ মতের ঐক্য হোল। তা'র পরে তিনি অনুমান কোল্লেন যে আমাদের পক্ষে অর্থাৎ Indianদের পক্ষে এমন weather বিশেষ trying ও আশা কোল্লেন, আকাশ শীঘ্র পরিষ্কার হোয়ে যাবে, ইত্যাদি। তার পরে এই সূত্রে নানা কথা উঠল আর কি। সভার মধ্যে দুই জন সুন্দরী উপস্থিত ছিলেন, বলা বাহুল্য যে, তাঁরা জানতেন তাঁরা সুন্দরী। বিলেতে আত্ম-সৌন্দর্য্য-অনভিজ্ঞা যুবতী দেখ্বার যো নেই। এখেনে সৌন্দর্য্যের পূজো হয়; এখেনে রূপ কোন মনে গুপ্ত থাকৃতে পারে না, রূপাভিমান সুপ্ত থাকতে পারে না; চার দিক থেকে প্রশংসার কোলাহল তা'কে জাগিয়ে তোলে; রূপের আলো দেখ্বামাত্র ভক্তদের পতঙ্গ হৃদয় চারদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তাকে ঘিরে ফেলে ও রূপসী যে দিকে যান, সেই ফড়িঙের দল তার চতুর্দ্দিকে লাফিয়ে চোল্তে থাকে। Ball room এ তাঁর দর অত্যন্ত চড়া; নাচে তাঁর সাহচর্য্য-সুখ পাবার জন্যে দরখাস্তের পর দরখাস্ত আস্‌চে; তাঁর রুমাল কুড়িয়ে দেবার জন্যে শত শত হাত প্রস্তুত, তাঁর তিল মাত্র কাজ কোরে দেবার জন্য শত শত কায়মনোবাক্য দিবারাত্রি নিযুক্ত। রূপবান্ পুরুষদেরও যথোচিত আদর আছে, তারা এখানকার drawing room-এর darling হোয়ে ওঠে, যুবতীরা তা'দের আদর দিয়ে দিয়ে অনর্থ কোরে তোলে। আমি দেখ্ছি, একথা শুনে তোমার এখানে আস্তে অত্যন্ত লোভ হবে। তোমার মত সুপুরুষ এখানকার মত রূপমুগ্ধ দেশে এলে এখানকার হৃদয়-রাজ্যে এত ভাঙ্গচুর লোক্‌সান্ কোরতে পারে যে, সে একটা নিদারুণ করুণ-রসোদ্দীপক ব্যাপার হোয়ে ওঠে, তা'হোলে চতুর্দ্দিক থেকে

"———ঘন
নিশ্বাস প্রলয় বায়ু, অশ্রুবারি ধারা
আসার, জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব—"

তুলে দেও। তা হোলে তোমার হৃদয়টিকেও খরচের খাতায় লিখ্তে হয়; এত নিশ্বাস-প্রলয়-বায়ুতে ও অশ্রুবারিধারা-আসারে তিনি যদি টিঁকে থাকতে পারেন, তা হোলে তেমন মন spiritএ ডুবিয়ে যত্নপূর্ব্বক preserve কোরে British museum-এ রেখে দেওয়া উচিত, তেমন মন ফরমাস দিলে পাওয়া যায় না। বিলেতে রূপের চেয়ে recommendation letter খুব কম আছে। এ রকম অবস্থায় রূপ কখনো লুকিয়ে থাকতে পারে না। যা' হোক্ নিমন্ত্রণ সভায় miss H. দ্বয় রূপসী-শ্রেষ্ঠ ছিলেন; কিন্তু তাঁরা দুজনেই কেমন চুপচাপ গম্ভীর হোয়েছিলেন। বড় যে মেশামেশি হাসি খুসী তা' ছিল না। ছোট মিস্ একটা কৌচে গিয়ে হেলান দিয়ে বোস্‌লেন, আর বড় মিস্ দেয়ালের কাছে এক চৌকি অধিকার কোর্‌লেন। আমার বোধ হয়, তা'র কারণ আমরা দুই এক জন ছাড়া ঘরে আর কেউ যুবক ছিল না। তরুণ-নেত্র তাঁদের রূপ ও সাজসজ্জা যেমন উপভোগ কোর্‌তে পারে, এমন ত আর চস্‌মা-চক্ষু

পারে না। যা হোক আমরা দুই এক জনে তাঁদের আমোদ রাখ্‌বার জন্যে নিযুক্ত হলুম। দুর্ভাগ্য ক্রমে আমি কথোপকথন-শাস্ত্রে তেমন বিচক্ষণ নই, এখানে যাঁকে উজ্জ্বল (bright) বলে তা' নই, অনর্গল গল্প হাসি আসে না, ও আকারে, ইঙ্গিতে, কথার আভাসে আমি রূপসীকে জানিয়ে দিতে পারি নে যে, আমার চকোর-নেত্র তাঁর রূপের জ্যোৎস্না ও আমার কর্ণ চাতক তাঁর বাক্য-ধারা পান কোরে স্বর্গ-সুখ ভোগ কোরচে। বরঞ্চ এক এক সময় তাঁরা আমার গম্ভীর মুখ ও সংক্ষিপ্ত কথা-বার্ত্তা শুনে তার উল্টো স্থির করেন। এ রকম অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়; কেন না আমার হৃদয় বাস্তবিক অত্যন্ত "gallant," যদিও আমার বাইরের ভাব দেখ্‌লে লোকের মন ঠিক তা'র উল্টো সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবে। গৃহ-কর্ত্তা এক জন সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞতাভিমানিনী প্রৌঢ়া মহিলাকে বাজাতে অনুরোধ কোর্‌লেন. তিনি এই অনুরোধের জন্যে এতক্ষণ আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা কোরছিলেন। গৃহের মহিলাদের মধ্যে তাঁর বয়স সব চেয়ে বেশী, এই জন্যে তিনি সব চেয়ে বেশী সাজ গোজ কোরে এয়েছিলেন, তাঁর দু হাতের দশ আঙুলে যত আংটি ছিল, সভাস্থ সকল লোকের আঙুলের আংটির সমষ্টি তার অর্দ্ধেক হবে—কিন্তু হাজার সাজ সজ্জা করুন, তিনি বেশ জান্‌তেন যে, তাঁর রূপের বাজার সম্পূর্ণ দেউলে হোয়ে গেছে, সুতরাং তিনি আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা কোরছিলেন, কখন তাঁর বাজাবার অবসর আস্‌বে। আমি যদি নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা হোতুম আর আগে থাক্‌তে না জান্‌তুম যে, তিনি পিয়ানো বাজাতে পারেন, তা হোলে তাঁর দশ আঙুলের বিশটা আঙটি দেখে আমি বুঝ্‌তে পার্‌তুম যে, তিনি পিয়ানো বাজাবেন বোলে বাড়ি থেকে স্থির সংকল্প কোরে এয়েছেন। যখন একজন কোন বিখ্যাত বাজিয়ে আপনার কেরামতী দেখাবার জন্যে বাজাতে বসে, তখন তা' আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হোয়ে ওঠে। আমি এখানকার গান বা বাজনার টপ্পা বা খেয়াল বেশ বুঝ্‌তে পারি, এক একটা খুব ভাল লাগে, কিন্তু কালোয়াতি কোলাহলে এক একবার আমাকে অত্যন্ত অধীর কোরে তোলে। তাঁর বাজনা সাঙ্গ হোলে পর গৃহকর্ত্রী আমাকে গান গাবার জন্যে অনুরোধ আরম্ভ কোরলেন। আমি বড় মুস্কিলে পোড়লুম। আমি জান্‌তুম, আমাদের দেশের গানের ওপর যে তাঁদের বড় অনুরাগ আছে তা' নয়; তবে আমাকে গান কোরতে বল্‌বার তাৎপর্য্য কি? গৃহকর্ত্তা ও গৃহকর্ত্রী দুজনেই আমার গান পূর্ব্বে শুনেছিলেন, সে গান গুলো তাঁদের অত্যন্ত হাস্য-জনক লেগেছিল, তাঁদের তাতে এত আমোদ বোধ হোয়েছিল, যে, বাড়িতে গিয়েই কর্ত্তা গিন্নিতে মিলে পরামর্শ কোর্‌লেন যে, আগামী নেমন্তন্নে এই কালো Indian টাকে চীৎকার করাতে হবে, তা হোলে অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গের পক্ষে সে ভারি একটা "treat" হবে। আমি মনে

মনে সে সমস্তই জানি, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে কি করি বল? যদি বা ভদ্রতার খাতিরও লঙ্ঘন কোর্ত্তে পার্ত্তেম, কিন্তু পাশ থেকে যখন সুন্দরী miss H তাঁর মিষ্টতম আদরের স্বরে বোল্লেন "yes do give us a song Mr T.! তখন Mr T. বাক্য ব্যয় না কোরে গান গাওয়ার ভূমিকা স্বরূপ দুই একটি আরম্ভ-সূচক কাশী-ধ্বনি কোর্লেন। সমস্ত সভা শান্ত হোল। আমি ভাব্‌তে লাগলুম, কি গান গাব। আমি নিজে যে গানগুলি ভাল বাসি, সে গুলিকে এমন উলুবনে ছড়াতে কেমন প্রাণে লাগে; সে গান গুলি শুনে যে সকলে হাস্‌বে, তা' আমি সহ্য কোর্ত্তে পার্ত্তুম না। একটা গান ত আরম্ভ কোর্লেম। এমন শোচনীয় অবস্থায় আমি আমার জীবনে আর কখনো পড়িনি; কোন প্রকার কোরে গোটাকতক সুর ও কথার সমষ্টি গলার ভিতর থেকে বের কোরেছিলেম আর কি। সভাস্থ miss ও missess দের এত হাসি পেয়েছিল, যে সে স্রোতের উচ্ছ্বাসে ভদ্রতার বাঁধ টলমল কোর্‌ছিল; কোন মতে তাঁরা হাসি গোপন কোর্ত্তে পার্‌ছিলেন না, কেউ কেউ হাসিকে কাশির রূপান্তরে পরিণত কোর্‌লেন, কেউ কেউ হাত থেকে কি যেন পোড়ে গেছে ভাণ কোরে ঘাড় নিচু কোরে হাসি লুকোতে চেষ্টা কোর্‌চেন, এক জন কোন উপায় না দেখে তাঁর পার্শ্বস্থ সহচরীর পিঠের পেছনে মুখ লুকোলেন; যাঁরা কতকটা শান্ত থাক্‌তে পেরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে চোখে চোখে টেলিগ্রাফ চোলছিল। সেই সঙ্গীত-শাস্ত্র বিশারদ প্রৌঢ়াটির মুখে এমন একটু মৃদু ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের হাসি লেগেছিল যে, সে দেখে শরীরে রক্ত জল হোয়ে আসে। এই রকম অবস্থায় আমার মত ভাল মানুষ যে কি দুরবস্থায় পোড়েছিল, তা' তোমরা বেশ কল্পনা কোর্ত্তে পার্‌চ। গান যখন সাঙ্গ হোল তখন আমার মুখ কান লাল হোয়ে উঠেছে, কেবল কালো রঙ্‌বোলে কেউ দেখ্‌তে পায় নি। চারদিক থেকে একটা প্রশংসার কোলাহল উঠ্‌ল, কিন্তু অত হাসির পর আমি আর সে দিকে বড় কর্ণপাত কোর্‌লেম না। ছোট miss H. আমাকে গানটা ইংরিজিতে অনুবাদ কোরে বোল্‌তে অনুরোধ কোরলেন আমি অনুবাদ কোরলেম, গানটা হোচ্চে "প্রেমের কথা আর বোল না।" তিনি অনুবাদটা শুনে আমাকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা কোর্‌লেন, তোমাদের দেশে প্রেমের স্বাধীনতা আছে নাকি? ভারতবর্ষের লোকেরা হ্যাট্ কোট্ পরে কিনা, জোয়ে অবধি ইংরিজি কয় কিনা ও শীতকালে কখনো বরফের ওপরে skate করে কিনা যিনি জান্‌তেন না, তিনি এ খবরটি কোথা থেকে পেয়েছেন! আমি ত মুস্কিলে পোড়ে গেলুম, নত শিরে দুই একটা, আঁয়ে আঁ কোর্‌লুম আর কি! যা হোক্ সেই সন্ধ্যের মধ্যে আমাকে দুবার গান কোর্‌তে হোয়েছিল। এই রকম গান বাজনা গল্পস্বল্প চোলতে লাগল; কতকগুলি রোমের ভগ্নাবশেষের ফোটগ্রাফ ছিল, সেই গুলি নিয়ে

গৃহকর্ত্রী কতকগুলি অভ্যাগতকে জড় কোরে দেখাতে লাগলেন; ডাক্তার M. একটা Telephone কিনে এসেছেন, সেইটি নিয়ে তিনি কতকগুলি লোকের কৌতূহল তৃপ্ত কোরচেন। পাশের ঘরে টেবিলে খাবার সাজানো আছে। এক একবার গৃহকর্ত্তা এসে এক একজন পুরুষের কানে কানে বোলে যাচ্চেন, miss অথবা missess অমুক কে supper স্থানে নিয়ে যাও; তিনি গিয়ে সেই মহিলার কাছে তাঁকে খাবার ঘরে নিয়ে যাবার অনুমতি প্রার্থনা কোরলেন ও তাঁর বাহুগ্রহণ কোরে তাঁকে পাশের ঘরে আহার স্থলে নিয়ে গেলেন। এ রকম সভায় সকলে মিলে একেবারে খেতে যায় না, তার কারণ তা' হোলে আমোদ প্রমোদের স্রোত অনেকটা বন্ধ হোয়ে যায়। একে একে সকলের খাওয়া হোয়ে যায়। এই রকম এক সঙ্গে পুরুষ মহিলা সকলে মিলে গান বাজনা গল্প, আমোদ প্রমোদ আহারাদিতে একটা সন্ধ্যা কাটানো গেল।

আমরা একটা কোন বিশেষ অনুষ্ঠান বা উৎসবের সময়েই লোক জন একত্রে ডেকে খাওয়া দাওয়া করি। আমাদের মধ্যে পরস্পর মিলনের উপলক্ষ্য খুব কম। তা' ছাড়া, যাঁদের সভায় অধিষ্ঠাত্রী করা উচিত, সেই মহিলারাই আমাদের নিমন্ত্রণ সভায় উপস্থিত থাকেন না। খাওয়া দাও যাই হোক্কে আমাদের প্রধান আমোদ, তা' ছাড়া, আর বাকী যে সব আমোদ, যেমন বাইনাচ, যাত্রা, গান, প্রভৃতি সমস্তই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্যে। কিন্তু ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির চেয়ে উচ্চতর আমোদ যে মানুষ পরস্পরে সমভাবে মিলে মেশামেশি করা, পরস্পর পরস্পরকে আমোদ দেবার জন্যে নিজের সমস্ত গুণ প্রকাশ করা, পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে প্রশংসা ও মমতা পাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা, সে সকল আমাদের মধ্যে নেই। কতকগুলো নীচ শ্রেণীর ভাড়াটে মেয়ে বা এক রাত্তিরের জন্যে ধার করা গাইয়ে যখন জঘন্য অঙ্গ-ভঙ্গী কোরচে, বা ভাবসম্পর্ক-শূন্য রাগিণী ভাঁজচে, তখন আমরা এক দল নিমন্ত্রিত লোক হাঁ কোরে তাকিয়ে থাকি, ও "বাহবা বাহবা" করি। কিন্তু পরস্পরকে আমোদ দেবার জন্যে আমরা সকলে মিলে গান বাজনা আমোদ প্রমোদ করিনে। এই রকম কেনা বা ভাড়া করা আমোদ আমরা নাট্যশালা বা রঙ্গভূমিতে প্রত্যাশা করি কিন্তু যখন এক-জন বন্ধুর বাড়িতে জড় হোয়েছি, তখন সকল ভদ্রলোকে মিলে পরস্পরের মধ্যে বন্ধুতা ও সদ্ভাবের চর্চ্চা করাই উচিত। আমরা যখন বাইনাচ দেখা, গান শোনা বা ঐ রকম কোন আমোদের জন্যে একত্র হই, তখন মনে হয় কতকগুলো লোক একটা নাট্য গৃহে গেছে, কেবল প্রভেদের মধ্যে সেখেনে টিকিট কিনতে হয় না। সে রকম নিমন্ত্রণ-সভায় গেলে, মানুষ যে সামাজিক জীব, সে কেবল কতগুলো প্রাণী আঁচড়া আঁচড়ি না কোরে একত্রে রোয়েছে দেখে বোধ হয়। পরস্পরকে আমোদের জন্যে পরস্পরের উপর নির্ভর কোরতে হয় না। একজন গান কোরচে

বা নাচচে আমরা সকলে মিলে শুনছি বা দেখছি, যদি নিজের নিজের বাড়িতে বোসে শোনা বা দেখা যেত, তা হোলে আমরা পরিশ্রম স্বীকার কোরে এক জায়গায় জড় হোতেম না। মেয়ে পুরুষে একত্রে মিলে আমোদ প্রমোদ করাইত স্বাভাবিক। মেয়েরাত মনুষ্য-জাতির অন্তর্গত, ঈশ্বর ত তাঁদের সমাজের এক অংশ কোরে সৃষ্টি কোরেছেন। মানুষে মানুষে আমোদ প্রমোদে মেশা মেশি করাকে একটা মহাপাতক, সমাজ-বিরুদ্ধ, রোমাঞ্চজনক ব্যাপার কোরে তোলা শুদ্ধ অস্বাভাবিক নয়, তা' অসামাজিক, সুতরাং এক হিসেবে অসভ্য। পুরুষেরা বাইরের সমস্ত আমোদ প্রমোদে লিপ্ত রোয়েছে, আর মেয়েরা তাদের নিজস্ব সম্পত্তি একটা পোষা প্রাণীর মত অন্তঃপুরের দেয়ালে শৃঙ্খলে বাঁধা আছে। এক দল বুদ্ধিমান বিবেচনা-শক্তি-বিশিষ্ট জীবকে কত শত শতাব্দী হোতে নির্দ্দয় লোকাচারের শাসন, পীড়ন, দমন, বন্ধন কোরে কোরে পোষা জন্তুর চেয়ে নির্জ্জীব, বশীভূত, সঙ্কুচিত সঙ্কীর্ণ-মন কোরে তোলা হোয়েছে, সে একবার ভাল কোরে কল্পনা কোরে দেখতে গেলে সর্ব্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। কোন এক জন মানুষের ওপর আর এক জন মানুষের এরকম সম্পূর্ণ একাধিপত্য করা, এক জন বুদ্ধি ও হৃদয়-বিশিষ্ট মানুষকে, জন্তুর মত, এমন কি, তা'র চেয়ে অধম, একটা ব্যবহার্য্য জড় পদার্থের মত সম্পূর্ণ রূপে নিজের প্রয়োজনের জিনিষ কোরে তোলা, যদি তার এক তিল সুখের জন্যে তোমার এক তিল সুখের ব্যাঘাত হয়, তা' হোলে সে টুকুও উচ্ছিন্ন কোরে দেওয়া, যদি তোমার ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্যে তা'কে চিরস্থায়ী কষ্ট পেতে হয়, তবে তা'ও অম্লান বদনে তার স্কন্ধে স্থাপন করা, এ সকল যদি পাপ না হয় তবে নরহত্যা করাও পাপ নয়; সমাজের অর্দ্ধেক মানুষকে পশু কোরে ফেলা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত বোলে প্রচার কর, তা হোলে তাঁর নামের অপমান করা হয়। মেয়েদের সমাজ থেকে নির্ব্বাসিত কোরে দিয়ে আমরা কতটা সুখ ও উন্নতি থেকে বঞ্চিত হই, তা' বিলেতের সমাজে এলে বোঝা যায়। আমরা অনেক জিনিষ না দেখ্‌লে দূর থেকে কল্পনা কোর্ত্তে পারিনে, এমন কি বিশ্বাস কোর্ত্তে পারিনে। এখেনে যতগুলি ভারতবর্ষীয় এয়েছেন, সর্ব্ব প্রথমেই তাঁদের চোখে কি ঠেকেছে? এখানকার সমাজের সুখ ও উন্নতি-সাধনে মহিলাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা। যাঁরা স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন, এখেনে এসে নিশ্চয়ই তাঁদের মতের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হোয়েছে। *

* স্ত্রী-স্বাধীনতা-বিষয়ে অতি সাবধানে কথা-বার্ত্তা কহা উচিত। ইংলণ্ডে গেলেই বঙ্গীয় ইউরোপযাত্রীদের চর্ম্ম-চক্ষে কি যে এক বিস্ময়জনক ছবি পড়ে, তাহাতে করিয়া তাঁহাদের জ্ঞান-চক্ষুর উন্মীলন একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়; ইংলণ্ডের জল বায়ু স্বতন্ত্র, ইংলণ্ডের পুরাবৃত্ত স্বতন্ত্র, ইংলণ্ডের জনসমাজের রুচি স্বতন্ত্র,—আমাদের দেশের জল বায়ু, পুরাবৃত্ত, জনসমাজের রুচি

এখানকার নিমন্ত্রণ-সভা শিক্ষার যে কত সাহায্য করে তার ঠিক নেই। মুখে মুখে কথাবার্ত্তায় মেয়ে পুরুষদের মধ্যে জ্ঞান ছড়িয়ে যায়। বিনা কষ্টে ও অলক্ষিত ভাবে মনের একটা শিক্ষা হোতে থাকে। একটা বিষয়ে নানা লোকের মত শুনতে পাওয়া যায়; কি রকম কোরে মত গঠিত কোর্ত্তে হয়, কি রকম কোরে মত ব্যক্ত কোর্ত্তে হয়

স্বতন্ত্র,—ইংলণ্ডীয় প্রকৃতির উপর ইংলণ্ডের সমাজ প্রতিষ্ঠিত, আমাদের দেশীয় প্রকৃতির উপর আমাদের দেশীয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত,—ইউরোপযাত্রী বঙ্গ যুবকদের এজ্ঞানটি সহসা বিলুপ্ত হইয়া যায়। লেখককে যদি জিজ্ঞাসা করি, "তুমি কি আমাদের দেশীয় প্রকৃতিকে সমূলে উন্মূলন করিয়া তাহার স্থানে ইংলণ্ডীয় প্রকৃতিকে সিংহাসনস্থ করিতে চাও" তাহা শুনিবামাত্র তিনি হয় ত শিহরিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ স্পষ্টাক্ষরে "না" বলিবেন;—আমাদের দেশের আচার ব্যবহার সভ্যতা যাহা কিছু সমস্তই আমাদের দেশীয় প্রকৃতির গর্ব্ভজাত সন্তান-সন্ততি, অগ্রে সেই প্রকৃতিকে উন্মূলন না করিয়া তিনি কিরূপে তাহার সেই সন্তান সন্ততিগুলির উচ্ছেদ-কামনাকে মনে স্থান দিতে পারেন? অনতিপূর্ব্বে বহুতর ইংলণ্ডীয় স্ত্রী-সমারোহের মধ্যে তিনি যখন এক জনের মুখে দেশীয় স্ত্রীলোকোচিত মাধুর্য্য ও ভাবভঙ্গী অবলোকন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার কেন এত ভাব লাগিয়াছিল? তখন ত বহিশ্চারিণী. বহুভাষিণী, ব্যাপিকা সমাজ-রাজ্ঞী অপেক্ষা অন্তঃপুরচারিণী মৃদুভাষিণী লজ্জাশীলা গৃহলক্ষ্মীর সৌন্দর্য্য তাঁহার চক্ষে ভাল লাগিয়াছিল, এখন কি তাঁহার সে ভাব অন্তরিত হইয়াছে? তাহা ত বোধ হয় না,—তিনি এক দিকে অধিক ঝোঁক দেওয়াতে লেখনীর বেগ সম্বরণ করিতে পারেন নাই, ইহাই সম্ভব মনে হয়। শুধু কেবল স্বাধীনতা হইলেই যদি স্ত্রীদিগের আর কোন গুণের প্রয়োজন না হইত তাহা হইলে আমরা লেখকের মতে সম্পূর্ণ মত দিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা ত নহে—যেমন স্বাধীনতা চাই তাহার সঙ্গে তেমনি শোভন লজ্জাশীলতা, বিনয়, সরলতা, উচ্চের প্রতি ভক্তিমত্তা, নীচের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য ইত্যাদি অনেকগুলি গুণ থাকা চাই, তবেই তাঁহারা স্ত্রীলোকের আদর্শ রূপে বরণীয় হইতে পারেন; নচেৎ স্ত্রী-স্বাধীনতার আর এক নাম স্বৈরচারিতা, ব্যাপিকতা, প্রগল্‌ভতা, হইয়া দাঁড়ায়। প্রকৃত কথা এই যে আমাদের দেশে এক্ষণে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, শিক্ষা বিষয়ক স্বাধীনতা, রুচি-বিষয়ক স্বাধীনতা, ইত্যাদি অনেক স্বাধীনতার অপ্রতুল রহিয়াছে তাহার সঙ্গে কি-মাত্রা স্ত্রী-স্বাধীনতা ভালোয় ভালোয় টেঁকিয়া থাকিতে পারে তাহাই এখন বিবেচনা-স্থলে; ইংলণ্ডের আর আর স্বাধীনতার সঙ্গে ইংলণ্ডোচিত স্ত্রী-স্বাধীনতা ইংলণ্ডেই শোভা পায়; তেমনি যদি আমাদের দেশের আর আর স্বাধীনতার সঙ্গে আমাদের দেশোচিত স্ত্রী-স্বাধীনতা নৈসর্গিক শোভায় সমুত্থিত হয় তবেই ভাল নইলে—মাথাটা খুব প্রকাণ্ড ধড় খানি ছোটোখাটো অথবা মাথায় হ্যাট্ গায়ে জামা পায়ে চটি এইরূপ এক বিস্তুত কিমাকার স্বাধীনতা সকলের সহিত খাপ ছাড়া হইয়া দিন কতক মিথ্যা দাপাদাপি করিয়া বেড়াইলে তাহাতে কাহার যে কি উপকার হইবে তাহা ত বুঝা যায় না। "উঃ ইনি স্বাধীনতার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন" এরূপ যদি কেউ মনে করেন তবে তাঁহাদের জানা উচিত যে, এ স্বাধীনতা আত্মার স্বাধীনতাও নহে, দেশের স্বাধী-

ও কি রকম কোরে, মতের প্রতিবাদ কোর্ত্তে হয়, সে বিষয় প্রতি মুহূর্ত্তে অভ্যাস হোতে থাকে। সমাজে মিশতে গেলে নানা বিরোধী মতের একটা সঙ্ঘাত উপস্থিত হয়, সুতরাং একটা বিষয়ের চারদিক দেখতে পাওয়া যায়, যদি দৈবাৎ বিবেচনা না কোরে একটা মত স্থির কর, অমনি সে মত চারদিক থেকে হুঁচট খেতে থাকে, সুতরাং তোমাকে অনেকটা সাবধান হোতে

নতাও নহে, কেবল পরপুরুষগণের সহিত স্ত্রী-লোকগণের আমোদ-প্রমোদে মেলা-মেশা, ইহা কতদূর প্রকৃত রূপে স্বাধীনতা নামের যোগ্য তাহাই সন্দেহ-স্থল। স্ত্রীরা যেমন গৃহকর্ম্মের উপযুক্ত, পুরুষেরা সেইরূপ বহির্ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিবার উপযুক্ত; স্ত্রীগণের মধ্যে যাঁহারা কাজের লোক তাঁহারা অধিকাংশ কাল গৃহাভ্যন্তরে থাকিতে বাধ্য হন, এবং পুরুষদিগের মধ্যে যাঁহারা কাজের লোক তাঁহারা অধিকাংশ কাল বাহিরে বিচরণ করিতে বাধ্য হন—অন্তঃপুরে থাকা স্ত্রীজনের পক্ষে সুবিধা বলিয়াই স্ত্রীলোকের অন্তঃপুর-বাসের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে; পুরুষেরা স্বার্থপর বলিয়া ওরূপ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে একথা কোন কার্য্যের কথা নহে; পুরুষেরা স্বার্থপর বলিয়া ছেলে-পিলে মানুষ করে না, রাঁধে বাড়ে না ইত্যাদি কথা যদি সত্য হয়, তবে এ কথাও কেননা সত্য হইবে যে, স্ত্রীরা স্বার্থপর বলিয়া আপিসে বেরোয় না, লাঙল চসে না, মোট বয় না, ইত্যাদি। অন্তঃপুর একটা কারাগার, অন্তঃপুরবাসিনীরা একটা বোবা জানোয়ার, পিতা-মাতাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করা দাসত্ব, এ সকল ইংরাজি বাঁধি বোল ইংরাজের মুখেই শোভা পায়, বিশেষতঃ সেই সব মানোয়ারীই বল আর জানোয়ারই বল তাঁহাদের মুখে—যাঁহারা নারিকেলের ছোবড়া ভক্ষণ করিয়া তাহার অবশিষ্ট অংশকে আঁটি মনে করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন। যে ব্যক্তি আপন পিঙ্গল-নয়নে কল্পনার দূরবীক্ষণ প্রয়োগ করিয়া আমাদের অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে কেবল শাসন-ভয়ে জড়সড় হইয়া সকল কার্য্য করিতে দেখে, যাহারা দেখে যে পতিকে রাঁধিয়া বাড়িয়া খাওয়ানোতে পতির প্রতি পত্নীর ভালবাসা প্রকাশ পায় না, পত্নীর প্রতি পতির নির্দ্দয় শাসনই প্রকাশ পায়; কুলরমণীরা যে, যে-সে পুরুষের সঙ্গে আমোদ করিয়া বেড়ায় না সে কেবল পতির শাসন-ভয়ে, পতির প্রতি ভাল বাসা তাহার কারণ নহে, এমন কি যাহারা পুত্রের ভূমিষ্ঠ প্রণামে পিতৃভক্তি দেখে না—দাসত্ব মাত্রই দেখে; তাহারা আমাদের দেশীয় সভ্যতার ছোবড়া টুকুই সার পদার্থ সুতরাং সেই মহার্হ সভ্যতাকে নিতান্ত অসার পদার্থ মনে করিবে ইহা ত ধরাই আছে; কিন্তু তাহার প্রকৃত সার পদার্থ যে তাহার ভিতরকার শাঁস ইহা যদি একজন বাঙ্গালিরও চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে হয় তবে সে বড় রহস্য; একজন বাঙ্গালিকে যদি শিখাইতে হয় যে অন্তঃপুর গৃহিণীগণের কারাগার নহে কিন্তু তাঁহাদের সাধের নিকেতন, পিতা-মাতার প্রতি পুত্রের নম্র ব্যবহার ভক্তি এবং ভালবাসার নিদর্শন, তাহার মধ্যে কঠোরতা কিছু মাত্র নাই; স্ত্রীলোকেরা যে, যে সে পুরুষের সঙ্গে মিলিয়া-মিসিয়া আমোদ করে না সে কেবল এই জন্যে যে, তাহাদের পবিত্র গার্হস্থ্য ভাব আমোদ প্রমোদ অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক যত্নের ধন, এই সকল যৎপরোনাস্তি দুরূহ বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব যদি বাঙ্গালীকে শিক্ষা দিতে হয়, তবে নূতন একটা বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি না করিলে আর চলে না। সং

হয়। সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি সম্বন্ধীয় খবর দেখতে দেখতে মুখে মুখে সমস্ত দেশময় রাষ্ট্র হোয়ে যায়। একটা নতুন বই যদি ভাল হোয়ে থাকে, তবে মুখে মুখে তা'র বিজ্ঞাপন প্রচার হয় ও দেশের মেয়ে পুরুষ সকলেই সে বইয়ের অস্তিত্ব জানতে পারে। এই রকম কোরে চার দিকের বাতাসে যেন জ্ঞান ছড়িয়ে যায়, নিশ্বেসের সঙ্গে যেন জ্ঞান লাভ করা যায়। এখানকার নিমন্ত্রণ-সভা গুণীদের উৎসাহ দেবার প্রধান স্থান। সভায় তাদের সম্মানের আর সীমা নেই। যাঁদের সঙ্গতি ও যোগাতা আছে, সকলেই গুণীদের নিমন্ত্রণ কোর্ত্তে চান। এখানকার নিমন্ত্রণ-সভার তাঁরা ("Lion") সিংহ। মহা মহা কুলীন ব্যক্তিদের ঘরে তাঁরা পদধূলি দিলে শত শত duchess countessরা আপনাদের কৃতার্থ মনে করেন। এখানে গুণের আদর দেখলে আশ্চর্য্য হোয়ে যেতে হয়। আমাদের দেশের গুণীলোকদের যখন মনে করি, তখন মনে হয়, তাঁরা যদি ইংলণ্ডে জন্মাতেন, তা' হোলে তাঁদের পক্ষে ভাল হোত। স্ত্রী পুরুষে পরস্পরের কাছে থেকে প্রশংসা ও মমতা পাবার জন্যে আপনার আপনার গুণের চর্চ্চা কোর্ত্তে থাকে। সবশুদ্ধ জড়িয়ে এখানকার মেশামেশির ভাব অতি সুন্দর। সে না দেখলে ভাল বোঝবার যো নেই। বাইনাচ দেখে গান শুনে ও লুচি সন্দেশ হজম বা বদ-হজম কোরে যে ফল হয়, তা'র চেয়ে এখানকার সমাজে মিশলে যে মনের কত উন্নতি হয় তা' আমি এই ক্ষুদ্র চিঠির মধ্যে যথেষ্ট বর্ণনা কোরতে পারিনে।

এখানে আবার মিলনের উপলক্ষ্য কত প্রকার আছে, তার সংখ্যা নেই। ডিনার, বল্, Conversazione, চা-সভা, lawn-parties, Excursions, Picnics, ইত্যাদি। Thackeray বলেন "English Society has this eminent advantage over all other—that is if there be any Society left in the wretched distracted old European continent—that it is above all others a dinner-giving Society." অবসর পেলে এক সন্ধ্যে বন্ধু বান্ধবদের জড় কোরে আহারাদি করা ও আমোদ প্রমোদ কোরে কাটানো এখানকার পরিবারের অবশ্য কর্ত্তব্য কাজের মধ্যে। ডিনার সভার বর্ণনা কোর্ত্তে বসা বাহুল্য। ডাক্তার M-এর বাড়িতে যে partyর কথা পূর্ব্বে উল্লেখ কোরেছি, তার সঙ্গে ডিনার-পার্টির প্রভেদ কেবল দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারে (এ ম্লেচ্ছদের দেশে ভক্ষণটা আবার দক্ষিণ বাম উভয় হস্তের ব্যাপার)। আমি একবার এখানকার একটি বোট-যাত্রা ও picnic-partyর মধ্যে ছিলুম। এখানকার একটি রাবিবারিক সভার সভ্যেরা এই বোট-যাত্রার উদ্‌যোগী। এই সভার সভ্য ও সভ্যারা sabath পালনের বিরোধী। তাই জন্যে তাঁরা রবিবারে একত্র হোয়ে নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ করেন। এই রাবিবারিক সভার সভ্য আমাদের এক বাঙ্গালী মিত্র ম—মহাশয় আমাদের অনুগ্রহ কোরে

টিকিট দেন। লণ্ডন থেকে রেলোয়ে কোরে টেম্‌সের ধারের এক গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছলেম। গিয়ে দেখ্‌লুম টেম্‌সে একটা প্রকাণ্ড নৌকা বাঁধা রোয়েছে, আর প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন রবিবার-বিদ্রোহী মেয়ে পুরুষে একত্র হোয়েছে। দিনটা অন্ধকার, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, আর যাঁদের যাঁদের আসবার কথা ছিল, তাঁরা সকলে আসেন নি। আমার নিজের বড় এ পার্টিতে যোগ দেবার ইচ্ছে ছিল না; কিন্তু ম-মহাশয় নাছোড় বান্দা; তিনি আমাকে বিশেষ কোরে লোভ দেখালেন যে, সেখেনে অনেক সুন্দরী-সমাগম হোচ্চে। শুনে আমি একটু যত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বক সাজগোজ কোরে যথাসময়ে হাজির হোলুম। গিয়ে দেখি, বোটে কেবল একটি মহিলা আছেন, যাঁকে দূর থেকে দেখ্‌লে হঠাৎ সুন্দরী বোলে ভ্রম হয়, আর বাকী মহিলাদের (তাঁদের প্রতি আমি অসম্মান করচিনে) কাউকেই আমার চোখে দর্শন-যোগ্য বোলে ঠেকে নি। যে একটিমাত্র রূপসী ছিলেন, তাঁর চার দিকে এমন একটি ঘন ব্যূহ বদ্ধ হোয়েছিল, যে, তা' ভেদ করবার চেষ্টা করা আমার মত ক্ষীণ প্রাণীর পক্ষে দুরাশা। সুতরাং আমি সে টক্ আঙ্গুর ফল পরিত্যাগ কোরে ম—মহাশয়ের কাছে গিয়ে কৈফিয়ৎ চাইলুম। কিন্তু কৈফিয়ৎ সন্তোষ-জনক হোক্ আর না হোক্ ফলে সমানই কথা। আমরা অনেক ভারতবর্ষীয় একত্র হোয়েছিলুম। বোধ হয় ম—মহাশয় সকলকেই সুন্দরীর লোভ দেখিয়েছিলেন, কেন না সকলেই প্রায় বাহারে সাজগোজ কোরে গিয়েছিলেন। অনেকেই গলায় লাল ফাঁসি (neck tie) বেঁধে এয়েছিলেন, অন্যের গলায় ফাঁসি লাগানো তাঁদের আন্তরিক অভিপ্রায়; আর ম—মহাশয় স্বয়ং তাঁর (neck-tie-এ) একটি তলবারের আকারের পিন গুঁজে এয়েছিলেন। আমাদের মধ্যে এক জন তাঁকে ঠাট্টা কোরে জিজ্ঞাসা কোরলেন, "দেশের সমস্ত tie-এ যে তলবারের আঘাত করা হোয়েছে, ওটা কি তারি বাহালক্ষণ?" তিনি হেসে বোল্লেন "তা' নয় গো, বুকের কাছে একটা কটাক্ষের ছুরি বিঁধেছে, ওটা তারি চিহ্ন।" দেশে থাক্‌তে বিঁধেছিল, কি এখানে এসে বিঁধেছে, তা' কিছু বোল্লেন না। ম—মহাশয়ের হাসি তামাসার বিরাম নেই; সে দিন তিনি নৌকার সমস্ত লোকের সঙ্গে সমস্ত দিন ঠাট্টা ও গল্প কোরে কাটিয়েছিলেন। একবার তিনি সমস্ত মহিলাদের হাত দেখে গুণ্‌তে আরম্ভ কোরেছিলেন, তখন তিনি এত হাস্যজনক কথা বোলেছিলেন, ও বোট শুদ্ধ মহিলাদের এত প্রচুর পরিমাণে হাসিয়েছিলেন, যে, সত্যি কথা বোলতে কি, তাঁর উপর আমার মনে মনে একটু খানি দ্বেষের উদ্রেক হোয়েছিল; বোট শুদ্ধ মেয়ে যখন হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছিলেন, তখন আমি এবং আর দুই চারটি পুরুষ অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে দাঁড়িয়েছিলেম। যথাসময়ে বোট ছেড়ে দিলো। নদী এত ছোট যে, আমাদের দেশের খালের কাছা কাছি পৌঁছোয়। জায়গায় জায়গায় নদীর ধারের

দৃশ্য মন্দ নয়, কিন্তু সবশুদ্ধ জড়িয়ে যে বিশেষ সুন্দর দেখতে তা নয়। নৌকোর মধ্যে আমাদের আলাপ পরিচয় গল্প স্বল্প চোলতে লাগল। এক জন ইংরেজের সঙ্গে আমাদের এক জন দিশি লোকের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় তর্ক উঠল। আমাদের সঙ্গে এক জনের আলাপ হোল, তিনি তাঁদের ইংরিজি সাহিত্যের কথা তুললেন; তাঁর শেলীর কবিতা অত্যন্ত ভাল লাগে; সে বিষয়ে আমার সঙ্গে তাঁর মতের সম্পূর্ণ মিল হোল দেখে তিনি ভারি খুসী হোলেন; তিনি আমাকে বিশেষ কোরে তাঁর বাড়ি যেতে অনুরোধ কোরলেন, ও বোল্লেন. সেখানে গিয়ে আমরা দুজনে সাহিত্য আলোচনা কোরব। ইনি ইংরিজি সাহিত্য ও তাঁর নিজের দেশের রাজনীতি ভাল রকম কোরে চর্চ্চা কোরেছেন, কিন্তু যেই ভারতবর্ষের কথা উঠল, অমনি তাঁর অজ্ঞতা বেরিয়ে পোড়ল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা কোরলেন, কোন্ রাজার অধীনে? আমি অবাক্ হোয়ে বোল্লুম—ব্রিটিষ গবর্মেণ্টের। তিনি বল্লেন, "তা' আমি জানি, কিন্তু আমি বোলচি, কোন্ ভারতবর্ষীয় রাজার অব্যবহিত অধীনে!" কি ভয়ানক! কলকাতার বিষয়ে এঁর জ্ঞান এই রকম! তিনি অপ্রস্তুত হোয়ে বোল্লেন, "আমার অজ্ঞতা মাপ কোর্ব্বেন; ভারতবর্ষের বিষয়ে আমাদের ঢের জানা উচিত, কিন্তু লজ্জার সঙ্গে স্বীকার কোরচি আমি এ বিষয়ে খুব কম জানি। এই রকম বোটের ছাতের উপর আমাদের কথাবার্ত্তা চোল্‌তে লাগল; আমাদের মাথার উপরে একটা কাপড়ের আচ্ছাদন আছে; বোটের ঘরের মধ্যে আহারের আয়োজন হোচ্চে, সেখেনে স্থান নেই। মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ কোরে বৃষ্টি হোচ্চে, কাপড়ের আচ্ছাদনে সেটা নিবারণ কোর্‌চে। কিন্তু হঠাৎ এমন ঘোরতর বাতাস ও বৃষ্টি হোতে আরম্ভ হোল, যে কিছুতে নিবারণ হবার যো নেই। যে দিকে বৃষ্টির ছাঁট পৌঁছচ্ছে না, সেই দিকে মেয়েদের রেখে আমরা আর এক পাশে এসে ছাতা খুলে দাঁড়ালুম। ওমা-দেখি আমাদের দিশি বন্ধু ক—মহাশয় সেই মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন, আমি তাঁকে যথেষ্ট ঠাট্টা কোরে নিয়েছিলেম, তিনি বার বার কোরে বোল্লেন, বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়া ছাড়া তাঁর অন্য অভিসন্ধি ছিল না, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমি তা' বিশ্বাস করিনে। আমি তাঁকে তখনি শাসিয়ে রেখেছিলেম যে, দেশে একথা রাষ্ট্র কোরে দেব—তিনি তখন বিশ্বাস করেন নি; তুমি এক কাজ কোর ত; বিকেলে সেই ঘরটাতে যখন তোমাদের পাশার বৈঠক বোস্‌বে, তখন তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে এই কথাটা ঘরের চারদিকে বিস্তার কোরে দিও। কিম্বা তা' যদি না কর ত, বিশ্বস্তর দাদাকে এই কথাটা অতি গোপনে বোলো ও কাউকে বোল্‌তে বিশেষ কোরে বারণ কোরো, তা' হোলেই সপ্তাহের মধ্যে সকলের কানেই উঠ্‌বে। যাহোক সে দিন আমরা বৃষ্টিতে তিন চার বার কোরে ভিজেছিলেম। এই রকম ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে আমরা আমাদের গম্য স্থানে গিয়ে পৌঁছ-

লেম। তখন বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু আকাশে মেঘ আছে ও জমি ভিজে। মাঠে নেবে আমাদের খাওয়া দাওয়া করবার কথা ছিল, কিন্তু আকাশের ভাবগতিক দেখে তা' আর হোল না। খাবার সময়ে দেখি, আহারের অত্যন্ত বিস্তৃত আয়োজন। আমাদের partyর যিনি প্রধানা, তিনি আমার অল্প খাওয়া দেখে বোল্লেন যে, আমার picnic-এর উপযুক্ত ক্ষিধে নেই; কিন্তু তাঁর খাওয়ার পরিমাণ থেকে যদি picnic-এর ক্ষিধের পরিমাণ অনুমান কোরে নিতে হয়, তাহোলে, আমি যদি গাছের পাতা ও হত্তুকী খেয়ে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে সহস্রবৎসর উপরে পা ও নিচে মাথা রেখে বৃকোদর ও অগস্ত্য মুনির আরাধনা করি তবু আমার picnicএর উপযুক্ত ক্ষিধে হয় না। খাওয়া দাওয়ার পর আমরা নৌকা থেকে নেবে বেড়াতে বেরোলেম; কোন কোন প্রণয়ী-যুগল একটি ছোট নৌকা নিয়ে দাঁড় বেয়ে চোল্লেন, কেউ বা হাতে হাতে ধোরে নিরিবিলি কানে কানে কথা কইতে কইতে মাঠে বেড়াতে লাগলেন। আমাদের সঙ্গে একজন ফোটগ্রাফ্‌ওয়ালা তার ফোটগ্রাফের সরঞ্জাম সঙ্গে কোরে এসেছিল, আমরা সমস্ত দল মাঠে দাঁড়ালেম, আমাদের ফোটগ্রাফ নেওয়া হোল, সে যন্ত্রে এক সেকেণ্ডের মধ্যে ফোটগ্রাফ নেওয়া যায়, সুতরাং একটু আধ্‌টু নোড়্‌লে চোড়্‌লেও বড় একটা হানি হয় না। সহসা ম— মহাশয়ের খেয়ালে গেল যে আমরা যতগুলি কৃষ্ণমূর্ত্তি আছি, একত্রে সকলের ছবি নেওয়া হবে। আমাদের মধ্যে দুই একটি জন্-বুষের পুষ্যি বাছুর ছিলেন, তাঁরা এ প্রস্তাবে ইতস্ততঃ কোরতে লাগলেন পাছে কৃষ্ণমূর্ত্তির দলের মধ্যে তাঁরাও পড়েন, কিন্তু এরকম একটা "invidious distinction" করা তাঁদের মনঃপুত নয়; কিন্তু ম— মশায় ছাড়বার পাত্র নন; তিনি ধোরে বেঁধে দাঁড় করিয়ে আমাদের ছবি নেওয়ালেন। যা হোক্ ছবি নেওয়া প্রভৃতি সাঙ্গ হোলে পর নৌকা লণ্ডন অভিমুখে ছাড়া হোল। তখন ভগবান মরীচিমালী তাঁহার সহস্র রশ্মি সংযমন পুরঃসর অস্তাচল-চূড়াবলম্বী কনক-জলধর-পটল-শয়নে বিশ্রান্ত মস্তক বিন্যাস পূর্ব্বক অরুণ-বর্ণ নিদ্রাতুর লোচন মুদ্রিত করিলেন; বিহগকুল স্ব স্ব নীড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, গাভীবৃন্দ হম্বারব করিতে করিতে গোপালের অনুবর্ত্তন করিয়া গোষ্ঠাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। আমরা লণ্ডনের অভিমুখে যাত্রা কোরলেম। আমরা এক গাড়িতে কতকগুলি দিশিলোক ছিলেম, ও আমাদের সঙ্গে একজন ইংরেজ পুরুষ ও ইংরেজ মহিলা ছিলেন। ম— মহাশয় আমাদের সঙ্গে ছিলেন, সুতরাং আমাদের হাসি তামাসার আর অন্ত ছিল না। এইখানে তোমাকে একটা ঘোরতর গুপ্ত খবর দিচ্চি, খবরদার আর কাউকে বোল না। গাড়িতে আমাদের চ—মহাশয়ের রকম সকম যদি দেখতে তবে অবাক হোয়ে যেতে। মিস্ ড—য়ের সঙ্গে তিনি যে রকম ফিস্ ফিস্ কোরে কথাবার্ত্তা আরম্ভ কোরে দিলেন, মাঝে মাঝে তাঁর মুখের পরে যে

রকম ভাবপূর্ণ-দৃষ্টিপাত কোর্ত্তে লাগলেন ও ঠিক তাঁর পাশে যে রকম চিরস্থায়ী বন্দো-বস্ত কোরে নিলেন যে তাতে ক—মহাশয় ম—মহাশয় ও র—মহাশয়ের মধ্যে একটা রহস্য-পূর্ণ চোক-টেপাটেপি পোড়ে গেল ও ম—মহাশয় বাঙ্গলায় বোলে উঠ্‌লেন, "দুই ডাক্তারে মিলে দুজনের মনের উপর surgery প্র্যাক্‌টিষ কোর্‌চেন নাকি ?" ক—মহাশয় ডাক্তার এবং মিস্ ড—ও ডাক্তার।

প্রকৃতি এবং তাহার মূল-নিয়ম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভারতীর ৩ ভাগ ৬ সংখ্যা ২৬৯ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, প্রথমতঃ বস্তু-গণের স্বাতন্ত্র্য এবং দ্বিতীয়তঃ তাহাদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, এ দুটি ব্যাপার প্রকৃতির পক্ষে অলঙ্ঘনীয়। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হইতে কার্য্য-প্রবাহ যাহা উৎপন্ন হয় তাহা সর্ব্বত্রই (কোথাও বা সুব্যক্ত ভাবে কোথাও বা গূঢ় ভাবে) আবৃত্তি-চক্রের আকার ধারণ করে। রাত্রি দিনের আবৃত্তি জগতের যাব-তীয় আবৃত্তির আদর্শ-স্বরূপ। ২৪ ঘণ্টা পরি-মাণ দিন-রাত্রি ত আছেই, তদ্ব্যতীত মাসিক রাত্রি-দিন—শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ, বার্ষিক রাত্রি দিন—রাত্রি-প্রধান শীতের ছয় মাস এবং দিবা-প্রধান অবশিষ্ট ছয় মাস, তদুত্তরে সূর্য্যের বার্ষিক দিন রাত্রি, অর্থাৎ আমা-দের এই সূর্য্য তাহার নিজের সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করাতে-করিয়া আমাদের সূর্য্যের যে এক সূর্য্যোচিত বৎসর উদ্‌যাপিত হয় তাহাকে দুই ভাগ করিলে যে দিন-রাত্রি হয় সেই দিন রাত্রি; ধর যেন তাহা এক যুগ পরি-মাণ; তাহা হইলে তাহার উপরকার সূর্য্যের রাত্রি দিন তেমন যে কত শত যুগ পরিমাণ তাহা হয় ত কাহারো কল্পনাতেও আ-সিতে পারে না, এই রূপ পৃথিবীর রাত্রি দিন হইতে ব্রহ্মার রাত্রি দিন পর্য্যন্ত ক্রমশঃ প্রসারিত বিশাল হইতে বিশালতর চক্র-পরম্পরা ক্রমাগত আবর্ত্তিত হইতেছে, এবং সকলের মধ্যে এমনি বলবৎ বন্ধন যে ব্রহ্মার দিন রাত্রি অর্থাৎ আদি-সূর্য্যের দিন রাত্রি কত কাল পরে সাঙ্গ হইবে তাহার ঠিক্ নাই অথচ সূর্য্য এবং তস্য সূর্য্যের দিন-রাত্রি অবধি করিয়া ২৪ ঘণ্টা পরিমাণ আমাদের এই নিতান্ত শিশুপম দিন-রাত্রিগুলি পর্য্যন্ত সমস্তই সেই এক

অনির্ব্বচনীয় বিশাল দিন রাত্রির হস্ত ধারণ করিয়া স্ব স্ব প্রয়াণ-পথে চলিতেছে।

ব্রহ্মাণ্ডের যে এক আবর্ত্ত-চক্র উপরে প্রদর্শিত হইল সেই আবর্ত্তে সকলই আবর্ত্তিত হইতেছে। সে আবর্ত্ত এমনি যে তাহার টানে পড়িয়া সকল বস্তুই চক্রায়মান হইয়া চলিয়াছে ও যেখানে যে কেহ একবার পদার্পণ করিয়াছে দ্বিতীয়বার কস্মিন্ কালেও আর সে সেখানে ফিরিয়া আসিতেছে না ইহা অকাট্য বচন। পূর্ব্বে যেরূপ ঘটিয়াছে ফিরিয়া ঘুরিয়া তাহাই যে ঘটিবে এমন নহে—কিন্তু পূর্ব্ব-ঘটনার সদৃশাকার দ্বিতীয় তৃতীয় ঘটনাবলী পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতে দেখা গিয়া থাকে। সমুদ্র-গর্ব্ভ হইতে পর্ব্বত সকল ক্রমে ক্রমে মস্তকোত্তোলন করিয়া আকাশাভিমুখে উত্থান করিতেছে,আবার জল বায়ুর অবিশ্রান্ত সংঘর্ষণে কালক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সমুদ্র-গর্ব্ভে বিলীন হইতেছে, আবার নূতন স্থানে নূতন পর্ব্বত পূর্ব্ববৎ গাত্রোত্থান করিবার উপক্রম করিতেছে; বীজ মৃত্তিকা ভেদ করিয়া বৃক্ষাকারে আকাশে উত্থান করিতেছে আবার বীজাকারে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে, পুনরায় আবার নূতন নূতন বৃক্ষাকারে আকাশে উত্থান করিতেছে; এইরূপ প্রকৃতির সকল ব্যাপারই চক্রাবর্ত্তনের ব্যাপার, কিন্তু সে আবর্ত্তনের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন নাই; এক স্থানে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় দ্বিতীয় স্থানে তাহার বীজ নিপতিত হয়, এবং তাহা হইতে পুনর্ব্বার যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় তাহা যদিও জাতিতে এক তথাপি তাহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ব্ব-বৃক্ষ হইতে কোন না কোন অংশে ভিন্ন হইতেই চায়, শুদ্ধ কেবল তাহা নয়, ঐরূপ ব্যক্তিভেদ বংশ-পরম্পরা-ক্রমে সুদীর্ঘ কাল চলিতে থাকা হেতু তাহা অবশেষে জাতিভেদে পরিণত হয়; তাহার সাক্ষী আর্য্যবংশের ইউরোপীয় এবং ভারতবর্ষীয় শাখাদ্বয়ের মধ্যে প্রথমে কেবল ব্যক্তিভেদ মাত্র ছিল, সেই ব্যক্তিভেদ এখন এমনি এক জাতিভেদে পরিণত হইয়াছে যে উভয়কে এক বংশজাত বলিয়া মনে করাই সুকঠিন।

নূতন ঘটনা যাহা কিছু হয় তাহা কোন না কোন অংশে পুরাতনের আবৃত্তি হইতেই চায়, কিন্তু সর্ব্বাংশে নহে। যেমন এক বৃক্ষের বীজ হইতে আর এক বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে জাতাংশে শেষোক্ত বৃক্ষ পূর্ব্বোক্তের পুনরাবৃত্তি ইহা সত্য কিন্তু ব্যক্তি-অংশে একটি আর একটি হইতে অনেক বিভিন্ন। দুই মুহূর্ত্তে জগতের কোন বস্তুরই না আছে একস্থানে অবস্থিতি, না আছে এক ভাবে অবস্থিতি,—সুতরাং জগতে এক মুহূর্ত্তে যেরূপ কার্য্য হয় তাহার পর মুহূর্ত্তে অবিকল একই প্রকার কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না; তেমনি আবার একেবারে সৃষ্টি ছাড়া নূতন ব্যাপারও হইতে পারে না। নূতন এবং পুরাতনের মধ্যে কালের যেরূপ একটি সোপান-পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা অনতিক্রমণীয়—আজিকে মনে কর সমস্ত দিন বাদলা বৃষ্টি হইবার কথা ও কাল নিশ্চিত আকাশ পরিষ্কার হইয়া যাইবার

কথা এমত স্থলে আজিকের দিনটা যতক্ষণ না ফুরায় ততক্ষণ আকাশের নূতন ভাব দর্শনের প্রত্যাশা করা বৃথা, পুনশ্চ মনে কর আজি বৈশাখ মাসের সবে আরম্ভ,কাল পৌষমাসের শীতভোগের প্রত্যাশা করা যার পর নাই দুরাশা; এই রূপ এক যুগ পরে যে নূতন ভাব আবির্ভূত হইবে, এক বর্ষের মধ্যে সে ভাবটি প্রত্যাশা করা নিতান্তই দুরভিষন্ধি। এই প্রকার যুক্তি অনুসারে ইহা বলা যাইতে পারে যে যতটুকু নূতন ভাব এখনকার পক্ষে সম্ভব-পর সেই টুকু মাত্রে যত্ন সমর্পণ করা সমাজ-সংস্কারকের কর্ত্তব্য, নচেৎ বামন হইয়া চাঁদে হাত বাড়ানো মাত্রই সার। কোন কিছুই পূর্ব্বতন কোন-কিছু-হইতে একেবারে সম্পূর্ণ নূতন হইতে পারেও না পারিবেও না, ইহা স্থির নিশ্চয়। ব্রহ্মার এক দিন ফুরাইলে নূতন যে কিছু ঘটিবে তাহাকেই যদি নূতন বল, তবে সে দিনও ফুরাইবে না, নূতনও কোন কালে কেহ দেখিতে পাইবে না; সে কথা ছাড়িয়া দেও, আমাদের এই সূর্য্য তাহার নিজের সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিলে পৃথিবী যেরূপ নূতন আকার ধারণ করিবে, তাহাকেই যদি নূতন বল তবে তাহার সহিত আজিকার কালের সহিত কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই বলিলে বিশেষ কিছুই অত্যুক্তি হয় না।

আবৃত্তি-নিয়মের মূলে দুই শক্তির অধিষ্ঠান—কেন্দ্রাতিগ এবং কেন্দ্রানুগ। জগৎ যদিও প্রভূত পরিবর্ত্তনের স্রোতে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে তথাপি কেন্দ্রানুগ শক্তি তাহাকে পুরাতনের দিকে টানিয়া রাখিয়াছে এবং জগৎ যদিও মূলেতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে তথাপি কেন্দ্রাতিগ শক্তি তাহাকে প্রত্যহ নূতন নূতনের দিকে চালনা করিতেছে।

ফলিত-জ্যোতিষের মধ্যে যদি কিছু সত্য থাকে তবে উপরি-উক্ত আবৃত্তির নিয়মানুসারে তাহার এক প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। ব্যক্তি-বিশেষ জন্মিবামাত্র তাহার উপর সমুদায় জগতের শক্তি-প্রভাব অলক্ষিত রূপে কার্য্য করিতে থাকে; সে শক্তি-প্রভাব যদিও প্রতি-মুহূর্ত্তে নূতন বেশ ধারণ করে,যেমন কখনো উত্তাপের প্রভাব, কখন শীতের ইত্যাদি, তথাপি গ্রহাদি সকলের সদৃশ স্থানে পুনরাবৃত্তি হইলে তাহাদের শক্তি-প্রভাব যে সদৃশ-রূপে কার্য্য করিবে ইহা বিচিত্র নহে; অমুক মাসে বীজ বপন করিলে প্রচুররূপে শস্য উৎপন্ন হইবে, অমুক মাসে বীজ বপন করিলে তেমন হইবে না, ইহা গণনা করিয়া বলা যেমন পরীক্ষার উপর নির্ভর করে, সেই রূপ গ্রহাদির অমুক অবস্থায় যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে তাহার প্রকৃতি এবং সুতরাং ফলাফল অমুক প্রকার হয়, ইহা পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করা সম্ভব হইলেও হইতে পারে, না হইলেও না হইতে পারে, কিন্তু একেবারে যে হইতে পারেই না এরূপ কথা বলপূর্ব্বক বলা যাইতে পারে না।

তাহার পরে আসিতেছে সঙ্গের নিয়ম। জগৎ যেরূপ বিচিত্র শক্তির ব্যাপার, তাহাতে কখনই এরূপ সম্ভবে না যে জগতে

কেবল পূর্ব্বের আবৃত্তি এবং পুনরাবৃত্তি ক্রমাগতই সমান-ভাবে চলিতে থাকিবে; পূর্ব্বের অভ্যাসাধীন ভাবকে যদি আনুপূর্ব্বিক ভাব বলা যায় এবং বর্ত্তমানের সংসর্গাধীন ভাবকে যদি আনুসঙ্গিক ভাব বলা যায়, তবে এই রূপ দাঁড়ায় যে আনুপূর্ব্বিক ভাব দ্বারা মনুষ্যের স্বভাব আপনাতে বদ্ধমূল হয় এবং আনুষঙ্গিক ভাবেতে করিয়া মনুষ্যের স্বভাব পরিবর্ত্তন হয়।

ক্রমশঃ

কালিদাস ও অভিজ্ঞান শকুন্তল। *

"অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ শিরসি মালিখ মালিখ মালিখ"

বররুচিঃ।

কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভার এবং সংস্কৃত কবিকুলের প্রধান রত্ন। প্রায় দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে তিনি উজ্জয়িনীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ১ এই দুই সহস্র বর্ষ মধ্যে কতই অদ্ভুত ঘটনা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে সকল কালের গর্ভে তমোলীন রহিয়াছে। কত কবি, কত বীর কত রাজা কালের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, তাহাদের চিহ্নমাত্র নাই। কিন্তু কালিদাস যে এতকাল জগতের পাঠকবৃন্দকে তৃপ্ত ও মোহিত করিয়া আসিতেছেন, ও দিন দিন দেশ বিদেশে তাঁহার যশোবৃদ্ধি হইতেছে ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে তিনি এক জন প্রধান কবি সন্দেহ নাই। অতএব আমরা যে এমন মহাত্মার গ্রন্থ সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ইহাতে অনেকে বিরক্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাহা বলিয়া যে আমরা নিজ নিজ মত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইব, ইহা সহৃদয়তা-বিরুদ্ধ এবং কাপুরুষের কার্য্য। আমরা পাঠক মহাশয়কে পূর্ব্বেই বলিতেছি যে আমরা যদি তাঁহার মতের বিরুদ্ধ কিছু বলি তাহা কখন অসদভিপ্রায়ে নহে।

* এই প্রস্তাবের অনেক স্থলে এমন সমস্ত মত দৃষ্ট হইতেছে যে তাহাতে আমরা কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারি না। লেখক এই প্রস্তাবে অনেকটা স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়াছেন, এবং বর্ত্তমান শিক্ষিত-দলের মধ্যে কাহারও কাহারও কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল সম্বন্ধে এইরূপই অভিপ্রায় দেখা যায়। আমরা পাঠকগণকে কেবল এই রুচিবৈচিত্র প্রদর্শন করিবার জন্য এই প্রস্তাবটি ভারতীতে গ্রহণ করিলাম। ভবিষ্যতে কালিদাস ও অভিজ্ঞানশকুন্তল সম্বন্ধে আমাদের কি অভিপ্রায় তাহা স্বতন্ত্র প্রস্তাবে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। সং

১ আমরা মোটামোটী এইরূপ বলিলাম। কালিদাস কোন সময়ে আবির্ভূত হন ও কোন বিক্রমাদিত্যের সভা অলঙ্কৃত করেন তাহার বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

"Nothing extenuate nor set down aught in malice."

কালিদাস আমাদের দেশের বস্তু, আমরাই তাঁহার দোষগুণ বিচার করিতে অধিকারী। আমরা যদি কোন দোষ দেখাই তাহাতে নিন্দা নাই। কিন্তু কোন বিদেশীয় জর্ম্মাণ পণ্ডিত আসিয়া আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিবেন তাহা আমরা সহ্য করিতে চাহি না।

এই প্রস্তাবে আমরা প্রথমতঃ অভিজ্ঞান শকুন্তলের বিশেষ সমালোচনা করিব, কারণ ইহা দ্বারা কালিদাসের নাম বিদেশে প্রখ্যাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ তিনি কীদৃশ নাটককার ছিলেন ও তাঁহার কবিত্ব শক্তি কি রূপ ছিল তাহার বিচার করিব।

এখানে আমাদের পাঠক মহাশয়ের নিকট একটী অনুরোধ আছে—তিনি যেন ভাষার প্রতি মমতাশূন্য হইয়া আমাদের মতের বিচার করেন। সংস্কৃত ভাষার স্বভাবত এমন একটী মোহিনী শক্তি আছে যে ভাবের চমৎকারিত্ব না থাকিলেও পাঠকের মনে শব্দ-মাধুরীর দ্বারা কুহক লাগাইয়া দেয়—তখন তাঁহার ভাবের প্রতি লক্ষ্য থাকে না—ভাষাতে মুগ্ধ হইয়া মনে করেন ভাবও চমৎকার—আমরা তাহার দুই চারিটী উদাহরণ দিতে বাধ্য হইলাম—

"স গরুত্বনতুর্গহুগ্রহান্ কটুকীটান্ দশতঃ সতঃ ক্বচিৎ।

"হৃহুদে তহুকণ্ড পণ্ডিতঃ পটুচঞ্চুপুটকোটিকুট্টনৈঃ॥ নৈষধ

"নবপলাশপলাশবনং পুরঃস্ফুটপরাগপরাগতপঙ্কজম্।

"মৃদুলতান্তলতান্তমলোকয়ৎ স সুরভিং সুরভিং সুমনোভবৈঃ॥ মাঘ

উন্মীলন্মধুগন্ধলুব্ধমধুপব্যাধূতচূতাঙ্কুরক্রীড়ৎকোকিলকাকলীকলকলৈরুদ্গীর্ণকর্ণজ্বরাঃ।

নীয়ন্তে পথিকৈঃ কথং কথমপি ধ্যানাবধানক্ষণপ্রাপ্তপ্রাণসমাসমাগমরসোল্লাসৈরমী বাসরাঃ॥

চন্দনচর্চ্চিতনীলকলেবরপীতবসনবনমালী,
কেলিচলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডযুগস্মিতশালী,

হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে॥

ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।

গীতগোবিন্দ।

সংস্কৃত ভাষায় এরূপ কবিতা ভূরি ভূরি আছে,কিন্তু এ সকলেতে বাস্তবিক চমৎকার ভাব কিছুই নাই কিন্তু হয় ত অনেকেই এ সকল শ্লোককে পরমাদরণীয় মনে করেন, বিশেষতঃ নৈষধের বা মাঘের নিন্দা করিলে প্রাচীন পণ্ডিতমণ্ডলী একেবারে খড়্গহস্ত হইবেন। এ সকল কেবল শব্দচিত্র—কেবল ললিত-পদ-বিন্যাস দ্বারা আমাদের কর্ণকে পরিতৃপ্ত করে। অতএব যদি সংস্কৃত কবিদের সাধারণতঃ ভাষার এত ক্ষমতা তবে কালিদাসের ভাষার ক্ষমতা যে কতদূর তাহা বলিতে পারি না—কালিদাসের ভাষা পাঠ করিলে মনে হয়

প্রশ্চ্যোতনং নু হরিচন্দনপল্লবানাং নিষ্পীড়িতেন্দুকরকন্দলজোনু সেকঃ।

আতপ্তজীবিততরোঃপরিতর্পণোমে স-ঞ্জীবনৌষধিরসোহ্নু হৃদি প্রসিক্তঃ॥

যখন কোন সুন্দরীর সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা হয় তখন তাহার বেশ ভূষার প্রতি লক্ষ্য করা উচিত নয় সেইরূপ ভাবের বিচার করিবার সময় ভাষার প্রতি নিরপেক্ষ হওয়া কর্ত্তব্য।

এক্ষণে আমরা অভিজ্ঞান শকুন্তলের বিচার আরম্ভ করি। নাটকের উপকরণ চারিটী সামগ্রী—আখ্যায়িকা (plot) বাক্তিগণ, ভাব (sentiment) এবং ভাষা বা রচনা। এই কয়েকটী বস্তু যে পরিমাণে উত্তম হইবে নাটকের উপাদেয়তাও সেই পরিমাণে বাড়িবে। অভিজ্ঞান শকুন্তলে এ গুলি কতদূর চমৎকার হইয়াছে দেখা যাক্।

সকলেই অবগত আছেন যে মহাভারতের আদিপর্ব্বে যে শকুন্তলোপাখ্যান আছে তাহা অবলম্বন করিয়া কালিদাস স্বীয় নাটক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন উপাখ্যান অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। দুর্ব্বাসার শাপ, অঙ্গুরীয় দর্শন, মারীচাশ্রমে রাজার সহিত শকুন্তলার মিলন প্রভৃতি মহাভারতে নাই। কালিদাস এ সকল ঘটনা মূল উপাখ্যানে সংযোজন করিয়াছেন ২। এরূপ করাতে নাটক অতি মনোহর হইয়াছে বটে কিন্তু "অভিজ্ঞান শকুন্তল যে অলৌকিক পদার্থ" এবং "মনুষ্যের ক্ষমতায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভবিতে পারে না" এরূপ আমরা স্বীকার করিতে পারি না ৩। মিলটন বাইবেলের কয়েকটী কথা অবলম্বন করিয়া কি অদ্ভুত কাব্য রচনা করিয়াছেন। দান্তে তাঁহার আশ্চর্য্য কল্পনাশক্তির সহায়ে জগদ্বিখ্যাত "দিভাইনা কম্মিদিয়া" লিখিয়াছেন। সেক্সপেয়ার এবং স্কট অতি সামান্য গল্প অবলম্বন করিয়া অপূর্ব্ব নাটক এবং উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। অতএব যিনি যথার্থ কবি তাঁহার পক্ষে সকলই সম্ভব। সেক্সপেয়ার বলিয়াছেন

"The poet's eye in a fine frensy rolling
Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven,
And, as, imagination bodies forth the forms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shapes and gives to airy nothing
A local habitation and a name.

অতএব আমাদের বিশ্বাস এই যে যদি কালিদাস ইহা অপেক্ষা আখ্যায়িকা আরও চমৎকারিণী করিতে না পারিলেন তাহা

২ এরূপ ঘটনা না থাকিলে নাটক হয় না কালিদাস তাহা স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন।

৩ কালিদাসের প্রশংসার জন্য সকলেই গেটের প্রণীত কবিতা উদ্ধৃত করেন। কিন্তু সে স্তুতিবাদ কোন কাজের নহে কারণ গেটে সর উইলিয়ম জোন্সের গ্রন্থের জর্ম্মাণ অনুবাদ পাঠ করেন। ইহা দ্বারা মূলের সমস্ত সৌন্দর্য্য নিশ্চয় লুপ্ত হইয়াছিল। তবে যে গেটে এত প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহার কারণ যে ভারতবর্ষে যে এমন বস্তু আছে ইহা তিনি কখন আশা করেন নাই।

হইলে তিনি উচ্চশ্রেণীর নাটককারদিগের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন না।

আমরা বলিয়াছি যে শকুন্তলার আখ্যায়িকার চমৎকারিত্ব কিছু নাই। তাহার বিচার করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এই নাটকের ঘটনা সকল সামান্য, যেরূপ সচরাচর হইয়া থাকে। কারণ একজন রাজা মৃগয়া করিতে গিয়া তপোবনে এক পরমাসুন্দরী বালা দেখিতে পাইলেন। ইহাতে তাঁহার মনে প্রেমের সঞ্চার হইল ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই। সকলেরই এরূপ হওয়া সম্ভব, তাহাতে আবার সে কালের রাজারা, বহুবিবাহ এবং অন্যায় প্রেমকে দোষ বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। পরে রাজা সেই যুবতীকে গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করিলেন এবং শীঘ্রই নবোঢ়াকে রাজবাটীতে লইয়া যাইবেন স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিলেন। ইহাতেও কিছু মনোহারিত্ব নাই। পরে দুর্ব্বাসার শাপ-প্রভাবে রাজার স্মৃতিরোধ হইল এবং সেই জন্য তিনি পরিণীতা ভার্য্যাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিছুকাল পরে অভিজ্ঞান-দর্শনে স্মৃতি লাভ করিয়া বিস্তর অনুতাপ করেন এবং সৌভাগ্য বশত মারীচের সম্বর্দ্ধনা করিতে গিয়া প্রিয়তমার সহিত মিলন হইল। ইহাতেও বিশেষ চমৎকারিত্ব কিছু নাই। যদ্যপি এমন হইত যে কোন ইয়াগোর ন্যায় সয়তানের দুরভিসন্ধিতে রাজার প্রেমময় মন কলুষিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য তিনি শকুন্তলাকে অবমাননার সহিত দূরীকৃতা করিলেন, পরে সমস্ত অবগত হইয়া যথাকর্ত্তব্য করিয়া শকুন্তলাকে পাইলেন তাহা হইলে কল্পনার পরিচয় পাওয়া যাইত। কারণ রাজার মনকে অবস্থান্তরে লইয়া যাওয়া ও পরে ক্রমশঃ যথার্থ ঘটনা সকল প্রকাশ করা ইহাতে অনেক কৌশলের আবশ্যক হইত। কিন্তু দুর্ব্বাসার শাপ সংযোজনা করাতে বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহাতে মূল উপাখ্যান অপেক্ষা নাটক ভাল হইয়াছে বটে কিন্তু একটী দোষ ঘটিয়াছে। যখন আমরা জানিলাম যে দুর্ব্বাসার শাপবলে এরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল তখন আমাদের যাদৃশ ঔৎসুক্য হওয়া সম্ভব তাদৃশ হইল না। কারণ ঋষিরা প্রায় দেবতা বলিলেই হয়, এমন কি কেহ কেহ দেবতা অপেক্ষাও ক্ষমতাশালী। তাঁহারা যাহা বলিবেন তাহা বিধাতার আজ্ঞার ন্যায় কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না; অতএব অদৃষ্টে আছে বলিয়া যেমন লোকে শোক সম্বরণ করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করে আমরাও তেমনি শকুন্তলার অদৃষ্টে দুঃখ ভোগ আছে বলিয়া ক্ষান্ত হই এবং আমাদের ঔৎসুক্য হ্রাস হয়।

অভিজ্ঞান শকুন্তলের আখ্যায়িকা সম্বন্ধে আরও একটী দোষ আছে। ইহাতে ঘটনাবাহুল্য একবারে নাই কেবল একটী সাদাসিধা প্রণয়োপাখ্যান। রত্নাবলী, তদনুকরণে রচিত ৪ মালবিকাগ্নিমিত্র, এবং

৪ এই নাটক যে কালিদাস কর্ত্তৃক বিরচিত নহে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। যদি যথার্থই কালিদাস ইহার গ্রন্থকর্ত্তা হন তাহা

মৃচ্ছকটিক প্রেমোপাখ্যান বটে কিন্তু নানাবিধ ঘটনার দ্বারা এমন সুসজ্জিত যে অভিজ্ঞান শকুন্তলের অপেক্ষা উহাদের উপাখ্যান মনোহর এবং কুতূহলজনক। শকুন্তলা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে অবশেষে কি ঘটিবে। পরে যখন দুর্ব্বাসার শাপ পর্য্যন্ত পাঠ করাগেল তখনই সমস্ত রহস্য একবারে ভিন্ন হইল। আমাদের কৌতূহল নষ্ট হইয়া গেল ৫। রাজা যে প্রত্যাখ্যান করিবেন পরে স্মৃতিলাভ করিবেন এবং প্রিয়তমার সহিত পুনর্ম্মিলন হইবে এ সমস্তই বুঝিতে পারিলাম। কালিদাস যে চতুর্থ অঙ্কের প্রবেশকে দুর্ব্বাসার শাপের বর্ণনা করিয়াছেন ইহা অভিজ্ঞান শকুন্তলের প্রধান দোষ: ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে কালিদাসের নাটকীয় শক্তি তাদৃশী চমৎকারিণী ছিল না।

আখ্যায়িকার চমৎকারিত্ব থাকা আবশ্যক এবং উপসংহারের ৬ প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নানাবিধ ঘটনা সংযোজনা করিলে পাঠকের মনে ঔৎসুক্য জন্মে। চমৎকারিত্ব থাকিবে বলিয়া যে ঘটনা সকল ইন্দ্রজালের ন্যায় হইবে এমন নহে। কবি যত দূর স্বভাবের অনুকরণ করিবেন ততই নাটক মনোহর হইবে কিন্তু তাহারই মধ্যে কল্পনা প্রভাবে ঘটনা সকল এরূপ সংযোজন করা আবশ্যক যে পূর্ব্বাপর পাঠ বা দর্শন করিলে কোন অংশ অসংলগ্ন বা অসম্ভব বোধ হইবে না। ঘটনা সকল পরস্পর-সাপেক্ষ এবং ক্রমশ: অভিব্যক্ত হইবে। তাহাদের ক্রমাভিব্যক্তিই ৭ নাটকের প্রধান গুণ। ক্রমাভিব্যক্তি কাহাকে বলে তাহা অদ্বিতীয় কবি সেকস্‌পিয়ারের গ্রন্থ সকল পাঠ করিলে সুস্পষ্ট রূপে দেখা যায়। হেমলেট যে পিতৃআজ্ঞা পালন করিয়া স্বয়ংহত হইবেন এরূপ প্রথমে কখনই মনে হয় না, কিন্তু ঘটনাক্রমে তাহা স্পষ্টই সম্ভব, এমন কি আবশ্যক হইয়া উঠিল। ওথেলো যে প্রিয়তমার প্রাণ বিনাশ করিবেন তাহা ঘটনার দ্বারা ও ইয়াগোর ক্রুরাভিসন্ধিতে কেমন সম্ভব হইয়া উঠিল।

হইলে সে কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তলের রচয়িতা নন। ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ভবর নামক জর্ম্মান পণ্ডিত বলেন যে মালবিকাগ্নিমিত্র কালিদাস-রচিত এবং এই স্থির করিয়া কালিদাসের আধুনিকতার প্রমাণ করিয়াছেন।

৫ মৃচ্ছকটিক, রত্নাবলী, মালবিকাগ্নিমিত্রে এরূপ দোষ নাই। শেষ পর্য্যন্ত আমাদের ঔৎসুক্য প্রবল থাকে। এবং উপসংহার নানাবিধ ঘটনার দ্বারায় সম্পাদিত হইয়াছে। এখানে আমাদের বলা কর্ত্তব্য যে কালিদাস বস্তু সঙ্কলন করিতে বিশেষ নিপুণ ছিলেন না। তাহার অন্য কাব্য ও নাটকে আখ্যায়িকার চমৎকারিত্ব নাই। ফলত: কালিদাস plot নির্ম্মাণ বিষয়ে অপারগ ছিলেন।

৬ এ প্রস্তাবে উপসংহার শব্দের ইংরাজীতে অর্থ catastrophe অথবা denouement.

৭ যাহাকে ইংরাজীতে gradual development of the plot বলে।

মেক্‌বেথকে আমরা প্রথমতঃ একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী অথচ প্রভুভক্ত লোক বলিয়া জানি, কিন্তু কি আশ্চর্য্য কৌশলে কবি তাহাকে ভয়ানক নৃশংস কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইলেন। এইরূপ বিস্তর উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু তাহা অনাবশ্যক। সহৃদয় পাঠক মাত্রেই জানেন যে কিসে কবির ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে সেরূপ ক্ষমতার পরিচয় কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তলে দেন নাই। অতএব এ নাটককে আমরা অলৌকিক বস্তু বলিতে পারি না। ইহাতে বাস্তবিক চমৎকারিত্ব কিছুই নাই কেবল ভাবের ও রচনার গুণে বোধ হয় মাত্র। কিন্তু পাঠক যদি অলৌকিক শব্দের অন্য অর্থ গ্রহণ করেন তাহা হইলে দুর্ব্বাসার শাপকে অলৌকিক পদার্থ বলা যাইতে পারে। কিন্তু কেহ এরূপ স্বীকার করিবেন না।

এক্ষণে আমরা ঐ নাটকের ব্যক্তিদিগের স্বভাব কিরূপ চিত্রিত হইয়াছে তাহা দেখি। এ নাটকে রাজা দুষ্মন্ত, শকুন্তলা এবং মহর্ষি কণ্ব এই তিন জন প্রধান ব্যক্তি। ইহাঁদের বিষয় কিঞ্চিৎ সবিস্তরে বলা যাক।

রাজা দুষ্মন্ত একজন ধীরললিত নায়ক। তাঁহাতে উদাত্ত গুণও কিছু লক্ষিত হয়। তিনি আত্মশ্লাঘাবর্জ্জিত বিনয়ী ধর্ম্মভীরু এবং ক্রূরতাশূন্য এই সকল পরিচয় আমরা অতি স্পষ্টরূপে পাই ৮। বস্তুতঃ দুষ্মন্ত যে একজন প্রশংসনীয় ব্যক্তি তাহা নহে কিন্তু প্রাচীন কালে সচরাচর রাজারা যেরূপ ছিলেন তাহা কালিদাস চিত্রপটের ন্যায় লিখিয়া গিয়াছেন। দুষ্মন্তের ঋষিদিগের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও যত্ন ছিল। তাঁহারা নিরুদ্বেগে তপশ্চরণ করিতেছেন কিনা ইহা জানিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল; এবং যখন তপোবনের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন তখন সূতকে বলিলেন "তপোবননিবাসিনাং উপরোধো মাভূৎ এতাবত্যেব রথং স্থাপয়।" দুষ্মন্ত অতিশয় বিনীতস্বভাব; তিনি বনে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আভরণ ও ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়া গেলেন কারণ "বিনীতবেশেন প্রবেষ্টব্যানি তপোবনানি নাম।" (তাঁহার বিনয়ের পরিচয় সপ্তম অঙ্কেও যথেস্ট আছে, তিনি মাতলির প্রশংসা শুনিয়া যেন বিরক্ত হইতেছেন ও আপনাকে ইন্দ্রের অনুগ্রহের যোগ্যপাত্র মনে করেন না।) তপোবন প্রবেশ-কালে তাঁহার মন শারদীয় আকাশের ন্যায় নির্ম্মল ছিল। ক্ষণকাল পরে তাঁহার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হওয়াতে তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল কিন্তু তিনি যেন তাচ্ছিল্য করিয়াই বলিলেন "অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্ব্বত্র।" এই কথার দ্বারা তাঁহার প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য স্পস্টই সূচিত হইতেছে। পরে তাঁহার বিশুদ্ধ

৮ সাহিত্য দর্পণে ধীরোদাত্ত নায়কের যে লক্ষণ আছে দুষ্মন্ত সেরূপ নহেন, সেই জন্য তাঁহাকে ধীরললিত বলা গেল, যথা "নিশ্চিন্তোমৃদুরনিশং কলাপরোধীরললিতঃ স্যাৎ'। কিন্তু ধীরোদাত্ত যথা 'রামযুধিষ্ঠিরাদি। আলঙ্কারিকদিগের মতে নাটকের নায়ক ধীরোদাত্ত হওয়া আবশ্যক।

গম্ভীর চিত্তে কিরূপে প্রগাঢ় প্রেম জন্মিল, তাহা কালিদাস উত্তম রূপে দেখাইয়াছেন। প্রথম প্রবেশ করিয়া রাজা যখন শকুন্তলা ও তৎসখীদ্বয়কে জলসেচন করিতে দেখিলেন তখনই যে একবারে লঘুপ্রকৃতির ন্যায় মন্মথ-বাণে আবিদ্ধ হইলেন তাহা নহে, তিনি দেখিয়া বলিলেন "আহো মধুরমাসাং দর্শনম্।" এই প্রশংসা-বাক্যে বিস্ময় বুঝাইতেছে কিন্তু প্রেমের কোন লক্ষণ নাই—সুন্দরী কিশোরবয়স্কা বালা দেখিয়া কাহার না চক্ষুঃপ্রীতি জন্মে ও হৃদয় আহ্লাদিত হয়। প্রথমে রাজারও সেইরূপ হইয়াছিল। পরে কিয়ৎক্ষণ দর্শন করিতে করিতে তাঁহার মনে করুণার উদয় হইল। তিনি মহর্ষি কণ্বকে অসাধুদর্শী মনে করিলেন, কারণ তিনি শকুন্তলাকে তপঃকার্য্যে নিযুক্তা করিয়াছেন। এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে রাজার মনে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছে, কিন্তু তথাপি এখনও স্পষ্ট রূপে প্রেমের ভাব উদিত হয় নাই। আমরা জানি যে "pity melts the soul to love" ইহার পর রাজা সতৃষ্ণ নয়নে শকুন্তলার প্রতি অবলোকন করিতে লাগিলেন। তিনি শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ হইয়া বলিতেছেন "কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্"। এখন তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছে। তিনি "লোভনীয় কুসুমকে" কি রূপে লাভ করিবেন তাহাই ভাবিতেছেন। তিনি মনে করিতেছেন যে শকুন্তলা যদি মহর্ষির অসবর্ণক্ষেত্রসম্ভবা হয় তাহা হইলে তিনি বিবাহ করিতে পারেন। ইহা দুষ্মন্ত রাজার প্রকৃতি-অনুযায়ী, তিনি ধার্ম্মিক এবং তাঁহার মনে ক্রূর বা অসদভিপ্রায় নাই। তিনি অসৎ প্রেমের কথা ঘুণাক্ষরেও মনে করেন নাই. শকুন্তলাকে বিবাহ দ্বারা লাভ করিবেন কিন্তু অনুরাগ তাঁহার মনে এত বদ্ধমূল হইয়াছে যে শকুন্তলাকে নিশ্চয় পাইব এইরূপ স্থির করিলেন, ও মুগ্ধ হইয়া ঈষৎ গর্ব্বের সহিত বলিতেছেন "অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা যদার্য্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ।" এরূপ গর্ব্বও এখানে অতি সুন্দর, কারণ যখন লোকে প্রেমে মত্ত হয় তখন তাহাদের আত্ম অভিমান বৃদ্ধি হয়। ক্রমে রাজা আত্মপ্রকাশ করিলেন ও নানাবিধ কথোপকথন হইতে লাগিল। রাজার কথোপকথন অতি মনোহর এবং স্ত্রীদিগের প্রতি সম্মানসূচক। আমরা প্রথম অঙ্ক পাঠ করিলে উপরোক্ত ভাব সকল অতি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। কিন্তু রাজার স্বভাবের মধ্যে কোন প্রশংসনীয় গুণ লক্ষিত হয় না। সমস্ত নাটক পাঠ করিলে প্রথম অঙ্কে যে সকল গুণ দেখিলাম সেই সকল পূর্ব্বাপর দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় অঙ্কে রাজা যখন তাঁহার প্রণয়-ব্যাপার মনে মনে আন্দোলন করিতেছেন তখন তাঁহার সেই গম্ভীর স্নেহময় স্বভাব প্রকটিত হইতেছে। তিনি বলিতেছেন

"কামং প্রিয়া ন সুলভা মনস্তু তদ্ভাবদর্শনায়াসি।

অকৃতার্থেঽপি মনসিজে রতিমুভয়প্রার্থনা কুরুতে॥"

আবার মৃদুহাস্য করিয়া বলিতেছেন।

" এবমাত্মাভিপ্রায় সম্ভাবিতেষ্টজনচিত্ত বৃত্তিঃ প্রার্থয়িতা বিড়ম্বাতে।" ইত্যাদি

ইহাতে যেন আমরা রাজা চিন্তামগ্ন ও লক্ষ্যশূন্য হইয়া এক দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন তাহা চিত্রপটের ন্যায় দেখিতেছি। পঞ্চম অঙ্কে রাজার চরিত্র সেইরূপ ধর্ম্মভীরু বিনীত এবং ক্রূরতাশূন্য। তাঁহার স্মৃতি লোপ হইয়াছে কি করেন আপনাকে ক্ষত্রিয় স্বীকার করিয়া শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে পারেন না। আর শকুন্তলার সৌন্দর্য্যদর্শনে যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিবেন তাঁহার প্রকৃতি এরূপ লঘু নহে৯। এ অঙ্কে ঋষিদের সহিত কথাবার্ত্তাতে তাঁহার সেই বিনয় ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। ষষ্ঠ অঙ্কে তাঁহার অনুতাপের মধ্যেও সেই প্রশান্ত সরল স্নেহযুক্ত প্রকৃতি। অতএব দেখা যাইতেছে যে তাঁহার স্বভাব যেরূপ বর্ণনা করা কালিদাসের অভিপ্রেত তাহা উত্তম হইয়াছে কিন্তু আমাদের বিশেষ মনোজ্ঞ নহে। রামের চরিত্র পাঠ করিলে আমাদের হৃদয় যেমন স্নেহরসে আর্দ্র হইয়া যায়, রাবণের পরাক্রম ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা দেখিয়া আমরা যেমন বিস্মিত হই; যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মনিষ্ঠতা দেখিলে আমাদের মনে যেমন ভক্তির উদয় হয়; এরূপ কোন ভাব দুষ্মন্ত-চরিত্র-পাঠে আমাদের হৃদয়ে উদয় হয় না। অতএব দুষ্মন্ত রাজার চরিত্র বর্ণনাতে কোন দোষ ঘটে নাই বটে কিন্তু কালিদাসের ক্ষমতার পরিচয় কিছু পাওয়া যায় না। দুষ্মন্ত রাজার ন্যায় ব্যক্তি সংস্কৃত নাটকে বিস্তর দেখা যায়।

এখন আমরা শকুন্তলার চরিত্রের প্রতি নিরীক্ষণ করি। আমরা বলিয়াছি যে রাজার চরিত্র সম্বন্ধে কালিদাসের কোন দোষ ঘটে নাই কিন্তু শকুন্তলার স্বভাব বর্ণনাতে তাঁহার ক্রটী লক্ষিত হইতেছে। শকুন্তলা অতি সরলস্বভাবা ও স্নেহময়ী, কিন্তু তাহার প্রকৃতি অতি লঘু। ফুৎকারের ভরে যেমন তৃণখণ্ড উড়িয়া যায় শকুন্তলা সেইরূপ অল্পেতেই একবারে অধীরা হয়. ইহা আমরা পরে দেখিব। রাজাকে দেখিবা মাত্র শকুন্তলার মনে তপোবন-বিরোধী এক ভাব উদিত হইল। ইহাতে আমরা কোন দোষ দেখিতেছি না কারণ ইহা অসম্ভব নহে এবং ইহা দ্বারা শকুন্তলার সরলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সরলা বালার হৃদয় অতিশয় কোমল তাহাতে প্রেম শীঘ্রই বদ্ধমূল হইয়া থাকে। এখানে আমরা ফর্ডিনাণ্ড ও মিরাণ্ডার কি ঘটিয়াছিল তাহা স্মরণ করিব। মিরাণ্ডা ফর্ডিন্যাণ্ডকে দেখিয়াই একবারে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল। শকুন্তলার স্বভাব প্রায়

৯ রাজা যে শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ হইয়াও তাহাকে গ্রহণ করেন নাই এরূপ ধর্ম্মভীরুতা দেখিয়া অনেকে প্রতীহারীর ন্যায় বিস্মিত হইবেন কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য মনে করি না, কারণ তিনি প্রথমে অস্বীকার করিয়া কিরূপে আবার গ্রহণ করেন! আবার তিনি একজন মহান রাজা, তাঁহার এরূপ লঘুচিত্ত হওয়া সম্ভব নহে। অতএব প্রত্যাখ্যান করাই উচিত, ইহাতে প্রশংসা নাই, না করিলে বরঞ্চ দোষ পড়িত।

মিরাণ্ডার মত, পর্ডিটার মতও বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ শকুন্তলা, মিরাণ্ডা, পর্ডিটা ইহাদের তিন জনেরই স্বভাব ও অবস্থা এক প্রকার। শকুন্তলা জন্মাবধি ঋষিদের কর্তৃক তপোবনে প্রতিপালিতা; মিরাণ্ডাও শৈশবাবধি তাহার ঋষিকল্প পিতা প্রস্পেরো কর্তৃক লালিতা, এবং পর্ডিটা অতি সরলচিত্ত রাখালদের গৃহে আজন্ম কাল বর্দ্ধিতা হইয়াছিল। আবার আরও একটী চমৎকার সৌসাদৃশ্য আছে, তিন জনেই উচ্চ বংশোদ্ভবা. কিন্তু তিন জনই হীনাবস্থায় পতিত। ইহাদের চরিত্রের মধ্যে যে সামান্য প্রভেদ আছে তাহা প্রত্যেকের অবস্থানুরূপ। মিরাণ্ডা তাহার পিতা ও এক অদ্ভুত ভৃত্য ব্যতীত আর জগতের কাহাকেও দেখে নাই এ জন্য তাহার সরলতাও বালিকাস্বভাব শকুন্তলা অপেক্ষা অধিক। পর্ডিটা ফ্লোরিজেলের সহিত পলায়ন করিল, কিন্তু আবশ্যক হইলে শকুন্তলাও করিত, কারণ যখন পিতৃআজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়া রাজাকে পতিত্বে বরণ করিল তখন যে পলায়ন করিবে ইহা ত সামান্য কথা। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ইহাদের স্বভাব এক প্রকারের। কিন্তু কালিদাস এমন মুগ্ধা সরলা বালার বর্ণনা যাহা করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয় নহে, এমন কি শকুন্তলার স্বভাববিরুদ্ধ। প্রথম অঙ্কে শকুন্তলাকে মুগ্ধা সরলা স্নেহময়ী দেখা যায়, চতুর্থ অঙ্কে যখন শকুন্তলা সকলের নিকট বিদায় লইতেছে তখন অবিকল সেই স্বভাব এবং পঞ্চম অঙ্কেও সেই রূপ; ইহাতে কবির যা অভিপ্রায় তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সে অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ আচরণ অনেক স্থলে বিশেষতঃ তৃতীয় অঙ্কে ১০ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শকুন্তলা যখন রাজাকে ছাড়িয়া যাইতেছে তখন তাহার আচরণ সরলার ন্যায় নহে। কুশ দ্বারা চরণ ক্ষত হইয়াছে বলিয়া কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিল এবং শাখাতে বল্কল লগ্ন হইয়াছে এই ছলে রাজার প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। এই সকল ব্যাপার চতুরা প্রগল্‌ভা রমণীর শোভা পায় কিন্তু শকুন্তলার পক্ষে অত্যন্ত মন্দ। শকুন্তলা ও তাহার সখীগণ নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রেম কি বস্তু তাহা কতক বুঝিয়াছিল, কিন্তু তাহা বলিয়া এরূপ পরিপক্কতা পাইয়াছে ইহা নিতান্ত অসম্ভব। হিন্দুমহিলারা শালীনতার জন্য জগতে প্রসিদ্ধা। কালিদাসের বর্ণনাতে সেরূপ শালীনতা নাই। শকুন্তলা যেন লজ্জার মাথা খাইয়াছে। ১১

শকুন্তলার বর্ণনাতে আরও একটী মহৎ

---

১০ গৌড়ীয় গ্রন্থেতে যেরূপ রাজার ও শকুন্তলার প্রেমালাপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা কালিদাসের রচিত এরূপ নিশ্চয় বলা যায় না। কালিদাস ঐরূপ বর্ণনা করিতে ভাল বাসেন। কিন্তু এরূপ বর্ণনা সুরুচি লোকের আদরণীয়া হইতে পারে না।

১১ ভবভূতি মালতীমাধবে যেরূপ মালতীর স্বভাব বর্ণনা করিয়াছেন তাহা শকুন্তলা অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ মনে হয়। মালতীর কথাবার্ত্তাতে শকুন্তলার মত উন্মত্ততা নাই। এবং শকুন্তলার অপেক্ষা মালতীর শালীনতা অধিক।

দোষ আছে। গোপনে শকুন্তলা রাজার পানিগ্রহণ করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করিল। ইহা দ্বারা তাহার চরিত্র হেয় জ্ঞান হয়। সরলচিত্ত লোকেরা গুপ্তকার্য্য পাপ বলিয়া জ্ঞান করে; শকুন্তলা অসঙ্কুচিতচিত্তে যে এরূপ গুরুতর গুপ্তকার্য্য করিল ইহা স্বভাব-বিরুদ্ধ এবং আজন্মকাল তপোবনে সাধুসঙ্গে থাকিয়া শকুন্তলা যে নীতিশিক্ষা পাইয়াছিল তাহারও বিরুদ্ধ। ইহাতে আমরা স্পষ্ট রূপে দেখিতেছি যে কালিদাস মানব হৃদয় সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারেন নাই। সেক্‌স্‌পেয়ার এরূপ দোষে লিপ্ত নহেন। মিরাণ্ডার মনে প্রেমের সঞ্চার প্রথমেই হইয়াছিল বটে কিন্তু পিতার আজ্ঞা পাইয়া তবে ফর্ডিনাণ্ডকে পতিত্বে বরণ করে; পর্ডিটা ফ্লোরিজেলের সঙ্গে পলায়ন করিয়াও বিবাহ করে নাই। ইহাদের প্রেমের ভাব শকুন্তলা অপেক্ষা কতদূর উন্নত এবং রমণীয় তাহা সহৃদয় মাত্রেই স্বীকার করিবেন। এখানে আমরা দেখিতেছি যে মিরাণ্ডা ও পর্ডিটার অপেক্ষা শকুন্তলার সাহস অধিক। ইহার কারণ যে শকুন্তলা প্রেমে একেবারে উন্মত্ত ও অধীরা হইয়াছিল ১২। ঐ উন্মত্ততা বশতঃ সে রাজার প্রেমে অসংকুচিতচিত্তে আত্মবিসর্জ্জন করিল, ইহা নিতান্ত গর্হনীয় এবং আমাদের হৃদয়গ্রাহি নহে। কালিদাসের প্রেম কিরূপ তাহা আমরা কিছু সবিস্তরে বলিব সে জন্য এখানে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

ক্রমশঃ

জ্যামিতির নূতন সংস্করণ।

সকলেই জানেন যে ভারতবর্ষই গণিত শাস্ত্রের জন্মভূমি, কিন্তু অনেকের এখনো এরূপ সংস্কার আছে যে, জ্যামিতি-বিদ্যার জন্মভূমি আমাদের এ দেশ নহে—গ্রীস্ দেশ; কথাটাই শুনিতে কেমন ঠেকে যে, যে দেশ—গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, রসায়ন, তত্ত্ববিদ্যা, প্রভৃতি সকল বিদ্যারই আদিম বাসস্থান, সে দেশে ভূমিমান বিদ্যা একেবারেই অপরিজ্ঞাত ছিল; কিন্তু পুরাতত্ত্ব-বিদ্‌গণের অধ্যবসায়কে ধন্য—তাঁহারা খুঁজিয়া পাইয়াছেন যে, বৈদিক যুগেও আমাদের দেশে জ্যামিতির অনুশীলন ছিল; জ্যামিতিক প্রণালী অনুসারে যজ্ঞকুণ্ডের ইষ্টক সাজাইবার ব্যবস্থা বৈদিক শাস্ত্রেও স্পষ্টা-

১২ অনেকে বলিবেন যে সেক্‌সপেয়ারের কোন কোন নায়িকা এই রূপ। জুলিয়েটের সহিত শকুন্তলার সাদৃশ্য আছে। জুলিয়েট এইরূপে ধৈর্য্যশূন্যা হইয়া কায়মনোবাক্যে রোমিওর ভাবনাতে মগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু এখানে বক্তব্য যে জুলিয়েটের অবস্থা এবং শকুন্তলার অবস্থাতে অনেক প্রভেদ আছে। আর জুলিয়েট যখন নির্জনে রোমিওর কথা আন্দোলন করিতেছিল তখন অতি গোপনে অলক্ষিত ভাবে রোমিও শুনিতে পাইয়া দুষ্মন্তের ন্যায় আত্ম প্রকাশ করে। কিন্তু শকুন্তলা আবার কামাতুরা জুলিয়েটকে জিনিয়াছে। কারণ রাজার নিকট লিপি পাঠাইতে উদ্যতা হইয়াছিল।

ক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। অনেকের এরূপ বিশ্বাস এবং সে বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক নহে যে, গ্রীক দেশীয় আদি তত্ত্ববিৎ পিথাগোরাস্ আমাদের এ দেশ হইতে তত্ত্বজ্ঞানের বীজ লইয়া গিয়া তাঁহার নিজ দেশে তিনিই সর্ব্ব-প্রথমে তাহার চাস আরম্ভ করেন; এই পিথাগোরাস্ই ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম সর্গের ৪৭ সিদ্ধান্তের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত; এ দিকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ঐ ৪৭ সিদ্ধান্তটিই বৈদিক কালীন যজ্ঞীয় ইষ্টক সাজাইবার সময় বিশেষ রূপে প্রয়োজন হইত; ইহাতে কি বুঝাইতেছে? পিথাগোরাস্ ইউক্লিডের সেই সিদ্ধান্তটিরই আবিষ্কর্ত্তা—বৈদিক সময়ে আমাদের দেশে যেটির অধিক-মাত্রা অনুশীলন ছিল; অবশ্য—তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এদেশ হইতে জ্যামিতি-বিদ্যার বীজ গুলিও সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন, নহিলে ওরূপ আশ্চর্য্য মিল ঘটিবার সম্ভাবনা কি? আর একটি কথা এই যে, পিথাগোরাস্ সংখ্যার প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন; সকলেই জানেন যে দশান্ত-মূলক সংখ্যার লিখন-প্রণালী আমাদের দেশের একটি স্বজাত সামগ্রী; তাহার সাক্ষী—রোম দেশীয় সংখ্যা-লিখন-প্রণালী অদ্যাপি যাহা ঘড়ির অঙ্কে ব্যবহৃত হয় তাহা পঞ্চান্ত-মূলক; দশান্ত-মূলক সংখ্যা প্রণালীর যেমন শূন্য হইতে নয় পর্য্যন্ত সংখ্যা চিহ্ন ব্যতীত আর কোন নূতন সংখ্যা চিহ্ন প্রয়োজন হয় না, উহার সেরূপ নহে;—উহার প্রত্যেক দশকের আদিতে নূতন নূতন সংখ্যা-চিহ্ন সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। আমাদের দেশের দশান্ত-মূলক সংখ্যা-প্রণালী দেখিয়া সংখ্যার প্রতি পিথাগোরাসের যে একটি অপূর্ব্ব ভক্তি জন্মিবে ইহা কিছুই বিচিত্র নহে; অতএব আপাততঃ ইহা একরূপ স্থির-সিদ্ধান্ত বলিয়া ধরা যাইতে পারে যে তত্ত্বজ্ঞান গণিত ও জ্যামিতি তিনেরই বীজ আমাদের দেশ হইতে গ্রীস্‌দেশে যায়, পরে তাহা সেখানকার নানা স্থানে নানা প্রকারে অঙ্কুরিত হইয়া নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। পিথাগোরাসের শিষ্যানুশিষ্য প্লেটোর মতের সহিত আমাদের দেশীয় তত্ত্বজ্ঞানের মত-সাদৃশ্য উহার আর একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

জ্যামিতি-বিদ্যা যদিও আমাদের দেশ হইতে গ্রীস্‌দেশে গিয়াছে সত্য, কিন্তু গ্রীস্‌দেশে তাহার অনুশীলনের যেমন একটি অপূর্ব্ব প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে তেমনটি আমাদের দেশে কস্মিন্ কালেও হয় নাই; পুঙ্খানুপুঙ্খ যুক্তি-প্রণালী দ্বারা সত্য নির্ণয় করিবার যে একটি পদ্ধতি, ইউক্লিডের জ্যামিতি তাহার একটি অনন্য-সাধারণ আদর্শ। ইহা সত্বেও আমরা এটুকু বলিতে ছাড়িব না যে, ইউক্লিডের জ্যামিতির ভিত্তিমূল সম্পূর্ণরূপে দোষ-শূন্য নহে। ইউক্লিডের গোড়ার তত্ত্বগুলি যদি আমাদের দেশোচিত সহজ বুদ্ধি দ্বারা স্থিরীকৃত হইত তাহা হইলে ইউক্লিডের জ্যামিতি সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ হইত—ইহা অচিরাৎ প্রদর্শন করা যাইবে; সহজ বুদ্ধিতে যাহা সহজে

ধরা পড়ে, অত্যন্ত মার্জ্জিত বুদ্ধিতে তাহা অনেক সময়ে এড়াইয়া যায়; এই কারণে ইউক্লিডের জ্যামিতির ভিত্তি-মূলে কতকগুলি দোষ পৌঁছিয়াছে;—আমরা ইউক্লিডের বিরোধী পক্ষ বলিয়া নহে পরন্তু আমরা তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত বলিয়া তাঁহার সেই দোষ গুলির সংশোধনে এতাধিক আয়াস পাইতেছি; আমাদের চেষ্টা কিঞ্চিৎ মাত্রও যদি সফল হয়, তাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

ইউক্লিড প্রথমেই বিন্দু এবং রেখার এইরূপ সংজ্ঞা করিয়াছেন——যাহার স্থান মাত্র আছে কিন্তু আয়তন নাই তাহাকেই বিন্দু কহে, আর যাহার দৈর্ঘ্য আছে প্রস্থ নাই তাহাকে রেখা কহে; কিন্তু এ দুটি কথা বুঝিতে হইলে অতীব মার্জ্জিত বুদ্ধিকেও পরাস্ত মানিতে হয়; প্রথমতঃ আয়তনই জ্যামিতি-বিদ্যার যথা-সর্ব্বস্ব, আদবেই যাহার আয়তন নাই জ্যামিতি সম্বন্ধে তাহা কিছুই নহে, যাহা কিছুই নহে তাহার স্থান-নির্দ্দেশ করা অসম্ভব, অতএব বিন্দুর আয়তন নাই অথচ তাহার স্থান আছে এ কথা যুক্তিতে স্থান পাইতে পারে না; দ্বিতীয়তঃ আদবেই যাহার প্রস্থ নাই এরূপ দৈর্ঘ্য অসম্ভব; পুনশ্চ দৈর্ঘ্য কি, প্রস্থ কি, বেধ কি, তাহা জানিতে হইলে তিনটি সরল রেখা একটি বিন্দু হইতে আড় কোণে (right angle) ত্রিধা প্রসারিত হইয়াছে এটি অন্তত জানা চাই, সুতরাং সরল রেখা কি তাহা জানা চাই; এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, রেখার সংজ্ঞা আয়ত্ত করিতে গেলে সরল-রেখার সংজ্ঞা না জানিলে চলে না—কিন্তু রেখার সংজ্ঞানিরূপণের পূর্ব্বে সরল-রেখার সংজ্ঞা নিরূপণ আর শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া—একই ব্যাপার; সুতরাং ইউক্লিডের কৃত রেখার উক্ত সংজ্ঞা নাম-মাত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ইউক্লিড সরল-রেখার এইরূপ সংজ্ঞা করিয়াছেন—দুই বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী যত রেখা হইতে পারে তাহাদের মধ্যে যে রেখা সর্ব্বাপেক্ষা ছোটো সেই রেখা সরল-রেখা বলিয়া উক্ত হয়; কিন্তু ইউক্লিডের এ সংজ্ঞাটি সংজ্ঞা-নামের উপযুক্ত নহে; তাহার সাক্ষী—যুক্তি প্রয়োগ দ্বারা ইউক্লিড্‌কে স্বতন্ত্র এই একটি সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে হইয়াছে যে, ত্রিকোণের দুই ভুজ অপেক্ষা তাহার তৃতীয় ভুজ ছোটো, আর এক কথায় এই যে দুই বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী সরল রেখাদ্বয়ের সমষ্টি-জাত ভগ্ন-রেখা অপেক্ষা উক্ত বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সরল রেখা ছোটো; দুই বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী উক্তরূপ ভগ্ন-রেখা অপেক্ষা তাহাদের মধ্যবর্ত্তী সরল রেখা ছোটো ইহা যদি প্রমাণ-সাপেক্ষ হইল তবে দুই বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী বক্র-রেখা অপেক্ষা তাহাদের মধ্যবর্ত্তী সরল-রেখা ছোটো ইহার প্রমাণ আবশ্যক না হয় কেন?

ইউক্লিড কোণের এইরূপ সংজ্ঞা করিয়াছেন যে, দুই যোগযুক্ত রেখার পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অবনতিকে কোণ কহে, এই সংজ্ঞাই যদি ঠিক হয় তবে অবশ্য

সেই অবনতির ন্যূনাধিক্য-অনুসারে কোণ ছোটো কি বড় তাহা নিরূপিত হইবে, কিন্তু ফলে ঠিক তাহার বিপরীত দেখিতে পাওয়া যায়,—অবনতির মাত্রাধিক্য হইলে কোণ বড় না হইয়া ছোটো হয় এবং উহার মাত্রা অল্প হইলে কোণ ছোটো না হইয়া বড় হয়, এইরূপ কোণের পরিমাণ-কালে তাহার সংজ্ঞার বিপর্য্যয় দশা উপস্থিত হয়।

সমান্তর রেখা ঘটিত ইউক্লিডের দ্বাদশ স্বতঃসিদ্ধ বচনটি স্বতঃসিদ্ধতা-হইতে বহুদূরে স্থিতি করে ইহা সকল জ্যামিতি গ্রন্থকর্ত্তারাই একবাক্যে স্বীকার করেন। ইউক্লিডের উক্ত কতকগুলি দোষ সংশোধন মানসে নূতন একটি পদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক আমরা জ্যামিতির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

সে নূতন পদ্ধতি এই যে, ইউক্লিড শুদ্ধ কেবল শূন্য আকাশের আয়তনই জ্যামিতির মধ্যে স্থানে দিয়াছেন, আমরা তাহাতেই বদ্ধ না থাকিয়া জড়বস্তু-গত আকাশের আয়তনও আমলে আনিব ; ইহাতে কেহ যদি ইউক্লিডের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক আমাদিগকে এই বলিয়া দোষ দেন যে, ভৌতিক বস্তুর আয়তন সকলকে আমলে আনা বাড়ার ভাগ—তাহাতে ফল কিছুই নাই, লাভের মধ্যে জ্যামিতির বিশুদ্ধতাটি নষ্ট করা হয় ; তবে তাঁহার প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, শূন্য আকাশে বদ্ধ থাকাই যদি জ্যামিতির বিশুদ্ধতা হয় তবে তাহা ইউক্লিডের হস্তে বহুকালে যাবৎ মারা গিয়াছে; ইউক্লিড যখন তাঁহার প্রথম সর্গের চতুর্থ প্রস্তাবে একটা ত্রিকোণকে আর একটা ত্রিকোণের গাত্রসাৎ করিয়া বসাইতে বলিয়াছেন তখনই পূর্ব্বোক্ত ত্রিকোণকে জড়বস্তু স্বীকার করা হইয়াছে, যেহেতু শূন্য আকাশ-খণ্ডকে একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া কোন মতেই সম্ভবে না ; —সুতরাং সেই প্রস্তাবের সিদ্ধান্তের উপর আর যতগুলি প্রস্তাবের সিদ্ধান্ত নির্ভর করিতেছে সকলেরই বিশুদ্ধতা নষ্ট হইয়াছে ; হইল-হইল তাহাতে ক্ষতি কি ? জড় বস্তুগত আকাশও আকাশ শূন্যাকাশও আকাশ—আয়তন-সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে জাতিভেদের প্রসঙ্গই উঠিতে পারে না, তবে একটিকে আমলে আনিব আর একটিকে আমলে আনিব না এরূপ পক্ষ-পাতিতা কেন ? আমরা উল্টা আরো বলি যে ঐরূপ পক্ষপাতিতাটাই দোষ।

ইউক্লিডের জ্যামিতির পাঁচটি পৃথক্ অবয়ব—সংজ্ঞা (Definition) স্বতঃসিদ্ধ বচন (Axiom) স্বতঃসাধ্য ক্রিয়াবিধি (Postulate) মীমাংস্য সিদ্ধান্ত (Theorem) সমস্যা (Problem); কিন্তু আমরা জ্যামিতি কর্ত্তাদিগের অনেকের মতানুগামী হইয়া সমস্যা অবয়বটি নিষ্প্রয়োজন বোধে পরিত্যাগ করিতেছি। আকাশ-ঘটিত আয়তন সম্বন্ধে সত্য নির্ণয় করাই জ্যামিতির মুখ্য উদ্দেশ্য তাহার আনুষঙ্গিকরূপে কতকগুলি সমস্যা পূরণ যাহা আপাতত আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় তাহা যে একান্তই আবশ্যক তাহা নহে ; মনে কর একটা প্রশ্নের বিষয় প্রমাণ করিবার জন্য একটা রেখাকে দুই সমান

ভাগে বিভক্ত করা আবশ্যক হইয়াছে, তাহা হইলে সেই রেখাকে কল-কৌশল-দ্বারা ঠিক সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিতেই যে হইবে এমন কিছু নয়; শুদ্ধ কেবল মানিয়া লইলেই হইতে পারে যে, উক্ত রেখার অমুক স্থানটি তাহার মধ্যস্থল; অমুক রেখাকে দুই সমান ভাগে বিভক্ত কর, ইহাও যা, আর মনে কর যেন উক্ত রেখা অমুক স্থানটিতে দুই সমান ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, ইহাও তা', একই কথা। এই কারণ বশতঃ জ্যামিতির প্রথম চারিটি অবয়ব শিরোধার্য্য করিয়া শেষের অবয়বটি পরিত্যাগ করিলাম।

প্রচলিত প্রথানুসারে উক্ত চারিটি অবয়বকে চারিটি পৃথক্ অধ্যায়ে সন্নিবেশ করিতে গেলে অনেক অসুবিধা ঘটে বলিয়া তাহাতে ক্ষান্ত হইয়া তাহাদের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিবার জন্য নিম্ন লিখিত সঙ্কেতগুলি নির্দ্ধারণ করা গেল, (১) (২) এইরূপ ঘের দেওয়া সংখ্যাচিহ্ন সজ্ঞার স্থান জ্ঞাপক, [১] [২] এইরূপ ঘের দেওয়া সংখ্যা-চিহ্ন স্বতঃসিদ্ধ বচনের স্থান জ্ঞাপক, {১} {২} এইরূপ ঘের দেওয়া সংখ্যাচিহ্ন স্বতঃসাধ্য ক্রিয়াবিধির স্থান জ্ঞাপক এবং ১। ২। এইরূপ বেষ্টন-রহিত সংখ্যা চিহ্ন মীমাংস্য সিদ্ধান্তের স্থান-জ্ঞাপক।

মন্তব্যস্থলে আমরা এখানে বলিয়া রাখিতে চাই যে, বীজগণিতের অন্ততঃ একটি-মাত্র অজ্ঞাত-বর্ণ সংযুক্ত সমীকরণ পর্য্যন্ত যাঁহারা শিখিয়াছেন তাঁহাদেরই শিক্ষোপযোগী করিয়া এই জ্যামিতি-খানি প্রস্তুত করা হইতেছে; এজন্য যে স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বগুলি বীজগণিত এবং জ্যামিতি উভয়েরই সাধারণ, তাহা বাহুল্য বোধে দেওয়া গেল না; যথা ক = খ, গ = খ } এরূপ স্থলে ক = গ হইবে ক + ঘ = খ + ঘ = গ + ঘ হইবে ইত্যাদি স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বগুলিকে উহ্য রাখা হইল।

প্রথম অধ্যায়।

বীজাধ্যায়।

(১) যে জড়বস্তুর আয়তন এত অল্প যে, তদপেক্ষা অল্পায়ত বস্তু ইন্দ্রিয়-মনের গ্রহণ-সাধ্য নহে তাহাকে বিন্দু কহে।

(২) যে কোন আকাশ-খণ্ডকে যে কোন জড়বস্তু সর্ব্বাংশে অধিকার করিয়া থাকে, তাহা সেই জড়বস্তুর ব্যাপ্তিস্থান এবং যে কোন আকাশ খণ্ডকে যে কোন বস্তু ঐরূপে অধিকার করিয়া থাকিলেই থাকিতে পারে, তাহা সেই বস্তুর ব্যাপ্যস্থান বলিয়া উক্ত হয়। বিন্দুর স্থান বলিলেই বিন্দুর ব্যাপ্তিস্থান বুঝায়।

(৩) জড় বস্তুর ব্যাপ্তিস্থান-বহির্ভূত সমস্ত আকাশ তাহার বহিরাকাশ বলিয়া উক্ত হয়।

(৪) বহুবিন্দু-সমন্বিত বস্তুগণের মধ্যে যাহা এরূপ যে, তাহার সীমা-প্রদেশ-ভিন্ন আর কোন প্রদেশ তাহার বহিরাকাশ স্পর্শ করে না তাহা পিণ্ড বলিয়া উক্ত হয়।

(৫) পিণ্ডের সীমা প্রদেশস্থিত যাবতীয় বিন্দু-সমষ্টিকে তল কহে।

(৬) সীমাবচ্ছিন্ন তলখণ্ডকে ক্ষেত্র কহে।

(৭) যে বস্তুর ব্যপ্তিস্থান বিন্দুর প্রয়াণোপযোগী একটি-মাত্র পথ তাহাকে রেখা কহে। ইহা হইতে আসিতেছে এই যে, রেখা এত সরু যে, তদপেক্ষা সরু বস্তু ইন্দ্রিয়-মনের গ্রহণ-সাধ্য নহে।

(৮) বস্তুর ব্যাপ্তিস্থানকে তদাকাশ কহে, যেমন—রেখার ব্যাপ্তিস্থান রেখাকাশ, ক্ষেত্রের ব্যাপ্তিস্থান ক্ষেত্রকাশ, পিণ্ডের ব্যাপ্তিস্থান পিণ্ডাকাশ ইত্যাদি।

(৯) যে রেখার দুই প্রান্ত স্থানের মধ্যে তাহার একটি বই আর ব্যাপ্যস্থান নাই তাহাকে সরল রেখা কহে।

{ ১ } সমদীর্ঘ সরল রেখাদ্বয়ের একটির প্রান্তদ্বয়েতে আর একটির প্রান্তদ্বয় যুগপৎ সংলগ্ন করা যাইতে পারে।

[১] অসমান সরল রেখাদ্বয়ের একটির প্রান্তদ্বয় আর একটির প্রান্তদ্বয়কে যুগপৎ স্পর্শ করিতে পারে না।

(১০) বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সরল-রেখা-ব্যবধানকে দূরত্ব কহে।

(১১) যে কোন বহুবিন্দু বস্তু যথেচ্ছা যথা তথা চালিত হইলেও তাহার কিছু মাত্র রূপান্তর ঘটে না তাহা দৃঢ় বস্তু বলিয়া উক্ত হয়; অদৃঢ় বস্তুর সহিত আপাততঃ আমাদের কোন সম্পর্ক নাই এ জন্য যখন যে কোন বস্তু উল্লেখ করা যাইবে তাহাকে দৃঢ়-বস্তু বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহা হইতে আসিতেছে এই যে, দৃঢ় বস্তুর চলাচলি-বশতঃ তাহার কোন বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে দূরত্বের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিতে পারে না।

[২] সমদীর্ঘ (অবশ্য দৃঢ়) সরল রেখাদ্বয়ের একটির প্রান্তদ্বয় আর একটির প্রান্তদ্বয়ের সহিত সংলগ্ন হইলে উভয়ে পরস্পরের গাত্রসাৎ হইয়া যায়।

(১২) যে ক্ষেত্র এরূপ যে, তাহার যে কোন বিন্দুদ্বয় হউক তাহাদের মধ্যবর্ত্তী সরল রেখা সেই ক্ষেত্রের গাত্রসাৎ হইবেই হইবে তাহাকে সমতল ক্ষেত্র কহে। ক্ষেত্র বলিলেই সমতল ক্ষেত্র বুঝাইবে কেননা অসমতল ক্ষেত্রের সহিত আদবেই এখানকার কোন সম্পর্ক নাই।

ইতি বীজাধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কোণাধ্যায়।

(১৩) কোন একটি বিন্দু হইতে দুই রেখা দুই দিকে প্রসারিত হইলে উভয়ের মধ্যবর্ত্তী আকাশ-উন্মীলনকে কোণ কহে, এবং সেই রেখাদ্বয়কে সেই কোণের ভুজ কহে, এবং ভুজদ্বয়ের সন্ধিস্থলকে কোণের চূড়া কহে।

(১৪) কোণের ভুজদ্বয় একই সমতলস্থিত হইলে সে কোণ সামতলিক কোণ বলিয়া এবং সরল রেখা হইলে উহা সরল-ভুজ কোণ বলিয়া উক্ত হয়, সামতলিক সরল ভুজ কোণ ভিন্ন অন্য কোন কোণের

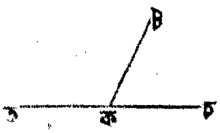
সহিত এখানকার কোন সম্পর্ক নাই এজন্য কোণের উল্লেখ মাত্রেই সামতালিক সরল-ভুজ কোণ বুঝাইবে। কোন কোণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে তাহার চূড়ার মধ্য দিয়া ভুজদ্বয়ের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত নির্দ্দেশ করা বিধেয় ; যথা—



ক খ গ কোণ কিম্বা গ খ ক কোণ বলিয়া এস্থলের কোণটি নির্দ্দেশ করা বিধেয়।

[৩] দুই কোণ (অবশ্য দৃঢ় কোণ) যদি এরূপ হয় যে, উভয়ের চূড়া-দ্বয় একত্র সম্মিলিত করিয়া একটির ভুজদ্বয়ের কোন অংশ আর একটির ভুজদ্বয়ের সমাংশের গাত্রসাৎ করিয়া যুগপৎ বসানো যাইতে পারে তবেই উভয়ের আয়তন সমান নচেৎ নহে।

(১৫ যে কোণের ভুজদ্বয় একই সরল রেখার অন্তর্গত তাহাকে সমসূত্র কোণ কহে। যথা,

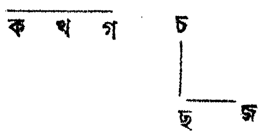


মনে কর তকচ একটি সরল রেখা। তকট কোণের সহিত টকচ কোণ যোগ করিলে তকচ সমসূত্র কোণ ফলিত হয় ; সুতরাং তকচ সমসূত্র কোণের একটি অংশ তকট-কোণ আর একটি অংশ টকচ-কোণ

(১৬) সমসূত্র কোণকে অর্দ্ধা অর্দ্ধি করিয়া বিভাগ করিলে তাহার অর্দ্ধাংশদ্বয়ের প্রত্যেকে আড় * কোণ বলিয়া উক্ত হয়।

কেহ কেহ আড়কোণকে সমকোণ বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা যুক্তি সঙ্গত নহে; কেন না যে কোন কোণ হউক না কেন তাহা আর একটি কোণের সমান হইলেই তাহা শেষোক্তের সমাকোণ বলিয়া উক্ত হইতে পারে।

মন্তব্য। কোন একটি সরল-রেখার কোন বিন্দু হইতে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট কোণ উৎপাদন করিয়া দ্বিতীয় একটি সরল রেখা টানা উল্লেখ করিতে হইলে, সংক্ষেপে অমুখ রেখার অমুক কোণে দ্বিতীয় রেখা টানা বলিলেই চলিতে পারে; আর সে কোণ যদি সমসূত্র কোণ কিংবা আড় কোণ হয়, তবে কোণ শব্দ উহ্য রাখিয়া দ্বিতীয় রেখাকে প্রথম রেখার সমসূত্রে টানা অথবা আড়ে টানা বলিলেই চলে যথা



কখ রেখার সমসূত্রে খগ রেখা টানা হইয়াছে, ও চছ রেখার আড়ে ছজ রেখা

* সার্দ্ধ শব্দ হইতে সাড়ে শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে ইহা কাহারো অবিদিত নাই ; ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে অর্দ্ধ শব্দ হইতে আড় শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে ; একটা সরল রেখা আর একটা সরল রেখার সমসূত্র কোণকে অর্দ্ধাংশে বিভাগ করিলে তবেই বলা গিয়া থাকে যে, একটি আর একটির আড়ে রহিয়াছে ; অতএব আড় কোণের অর্থ আর কিছু নয়—অর্দ্ধ সমসূত্র কোণ। তাহার সাক্ষী—আড়-চক্ষে দেখা বলিলে এই রূপ অর্থ বুঝায় যে, সম্মুখ দিক্ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া উক্ত দিকের অর্দ্ধ-সমসূত্র কোণে দৃষ্টিক্ষেপ করা।

টানা হইয়াছে, ইহাতে এই আসিতেছে যে, কথগ সমসূত্র কোণ, চছজ আড কোণ।

}২ { কোন একটি সরল রেখার সমসূত্রে দ্বিতীয় সরল রেখা এবং তাহার সমসূত্রে তৃতীয় সরল রেখা ইত্যাদি ক্রমে রেখা টানিয়া প্রথম সরল রেখাটিকে যথেচ্ছা বর্দ্ধন করা যাইতে পারে।

(১৭) কোন একটি সরলরেখাকে যথেচ্ছা বর্দ্ধিত করিলে, তাহার যে কোন অংশ হউক তাহার ব্যাপ্তি স্থানকে সেই সরল রেখার সমসূত্র স্থান কহে।

১। সমসূত্র কোণ-দ্বয় মাত্রেরই আয়তন সমান।

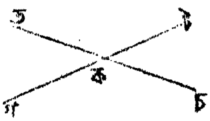
ক ত থ থ গ   চ ট ছ ঠ জ   মনে কর কথগ কোণ এবং চছজ কোণ উভয়ই সমসূত্র কোণ তাহা হইলে (১৫ সংজ্ঞা অনুসারে) কথ, থগ এ দুই ভুজ,—— তেমনি চছ, ছজ এ দুই ভুজ একই সরলরেখার অন্তর্গত।

মনে কর চছ রেখার ছট অংশ—কথ-রেখা থগ-রেখা এবং ছজ-রেখা তিনেরই অপেক্ষা ছোটো, ও মনে কর ছঠ-রেখা= ছট-রেখা=থত-রেখা=থথ-রেখা, তাহা হইলে অবশ্য সরল রেখা টঠ=সরল রেখা তথ সুতরাং (১স্বতঃ সাধ্য ক্রিয়া-বিধি অনুসারে) টঠ রেখার ট এবং ঠ প্রান্ত দ্বয়কে তথ রেখার ত এবং থ প্রান্ত দ্বয়ে যুগপৎ বসানো যাইতে পারে অতএব উহাদিগকে ঐরূপ করিয়া বসাও তাহা হইলে (২ স্বতঃসিদ্ধ বচন অনুসারে) টঠ রেখা তথ রেখার গাত্রসাৎ হইয়া যাইবে, এবং টঠ রেখার মধ্যস্থল ছ বিন্দু তথ রেখার মধ্যস্থল থ বিন্দুর সহিত মিলিত হইবে; তাহা হইলে কোণ-দ্বয়ের চূড়া-দ্বয় থ এবং ছ যেহেতু মিলিত হইয়াছে ও একটির ভুজদ্বয় ছট ছঠ আর একটির ভুজদ্বয় থত থথ-য়ের যুগপৎ গাত্রসাৎ হইয়া বসিয়াছে এ জন্য (২ স্বতঃসিদ্ধ বচন অনুসারে) কোণ দ্বয়ের আয়তন সমান। অতএব মীমাংসা বিষয় প্রমাণীকৃত হল।

উপসিদ্ধান্ত। উহা হইতে আসিতেছে এই যে, কোন সরল রেখার কোন বিন্দু হইতে তাহার সমসূত্রে দুই বিভিন্ন সরল রেখা দুই বিভিন্ন পথে টানা যাইতে পারে না; কেননা তাহা হইলে (২ স্বতঃসিদ্ধ বচন অনুসারে) সমসূত্র কোণ দ্বয়ের একটি বড় একটি ছোট হইবে, উপরের সিদ্ধান্ত অনুসারে যাহা একান্ত অসম্ভব।

দ্বিতীয় উপসিদ্ধান্ত। আড় কোণ যেহেতু সমসূত্র কোণের অর্দ্ধাংশ এজন্য আড় কোণ দ্বয় মাত্রই একটি আর একটির সমান।

২। দুই সরল রেখা পরস্পর কাটাকাটি করিলে তদুৎপন্ন যে কোন কোণদ্বয় পরস্পরের সম্মুখা-সম্মুখি হইয়া অবস্থিতি করে তাহাদের উভয়েরই আয়তন সমান



মনে কর দুই সরল রেখা তচ এবং গট ক স্থানে পরস্পর কাটাকাটি করিয়াছে তাহা হইলে তকট কোণ তাহার সম্মুখবর্ত্তী গকচ কোণের সমান হইবে; কেন না কত এবং কচ যেহেতু একই সরল রেখার অন্তর্গত এজন্য (১৫ সংজ্ঞা অনুসারে) কোণদ্বয়

তকট+টকচ=সমসূত্র কোণ

তেমনি গকচ+টকচ=সমসূত্র কোণ

সুতরাং (১ সিদ্ধান্ত অনুসারে) তকট+টকচ= গকচ+টকচ সুতরাং তকট=গকচ; অমনি করিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, তকগ =টকচ। অতএব মীমাংসা বিষয় প্রমাণীকৃত হইল।

ইতি কোণাধ্যায় সমাপ্ত।

কালিদাস ও অভিজ্ঞান শকুন্তল।

এক্ষণে মহর্ষি কণ্বের স্বভাব কিরূপ তাহার বিচার করা যাক। কণ্বের স্বভাব অতি চমৎকার হইয়াছে। তিনি প্রশান্ত-চিত্ত এবং দয়ালু। দুর্বাসার মত উদ্ধত-স্বভাব নহেন। এবং কালিদাস যেমন বিক্রমোর্বশীতে বলিয়াছেন "বেদাভ্যাসজড়ঃ * * * বিষয়ব্যাবৃত্তকৌতূহলঃ" কণ্ব সে রূপ নহেন। সে রূপ হইলে তাঁহার সহিত আমাদের সহানুভূতি থাকিত না এবং তিনি আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিতেন না। তিনি সাংসারিক লোকের অন্তঃকরণের ভাব সমস্ত বুঝিতে পারেন। তাঁহার হৃদয় ক্ষমাশীল এবং স্নেহরসে পরিপূর্ণ। লোকে বলিয়া থাকে "ক্ষমা ব্রহ্ম তপস্বিনাম্" ইহা কণ্বের স্বভাবে স্পষ্ট রূপে প্রকটিত হইয়াছে। এজন্য আমাদের হৃদয় তাঁহার প্রতি ভক্তিরসে পরিপ্লুত হয়। তিনি দৈববাণীর দ্বারা শকুন্তলার গর্ভের বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, সে জন্য শকুন্তলাকে কোন ভৎর্সনা করিলেন না, আর সৎপাত্রে কন্যাদান করিবেন ইহা তাঁহার চিরাভিপ্রেত। কালিদাস এখানে দৈববাণীর সংযোজনা করাতে বিশেষ কৌশল দেখাইয়াছেন। এরূপ না করিলে কণ্বের চরিত্রে দোষ পড়িত ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। কারণ মহাভারতের ন্যায় শকুন্তলা যদি স্বয়ং আসিয়া নির্লজ্জা হইয়া প্রণয়ের কথা বলিত ও মহর্ষি তাহার অনুমোদন করিতেন তাহা হইলে মহর্ষির প্রতি শ্রদ্ধা হইত না। কিন্তু যখন তিনি দৈববাক্য (১৩) দ্বারা অবগত হইলেন।

"দুষ্মন্তেনাহিতং তেজোদধানাং ভূতয়েভুবঃ।
অবেহি তনয়াং ব্রহ্মন্ অগ্নিগর্ভাং শমীমিব॥

তখন তাঁহার মনে আর সংশয় উপস্থিত হইল না এবং শকুন্তলার অপরাধ তিনি ক্ষমা করিলেন কারণ সে কথার জন্য শকুন্তলাকে কিছুই বলেন নাই। ইহাতে তাঁহার ক্ষমাশীলতার বিশেষ প্রমাণ পাইতেছি। তাঁহার কথা বার্ত্তা ও আচরণ সমস্তই অতীব হৃদয়গ্রাহী। শকুন্তলার বিবাহের অনুমোদন করা, তাহাকে স্বচ্ছন্দে আশীর্বাদ করা, তাহার প্রতি স্নেহবশতঃ বিদায় দিবার সময় তাঁহার চিত্তবৈক্লব্য, শকুন্তলার প্রতি উপদেশ, রাজার প্রতি আদেশ এ সমস্ত অতিশয় রমণীয় এবং তাঁহার স্বভাবানুযায়ী। অব-

১৩ এক্ষণে আমরা দৈববাণীর কথা বিশ্বাস না করিতে পারি, কিন্তু সে কালে করিত তাহা স্বীকার করিতে হইবে। হেমলেটে যে ভূতের কথোপকথন আছে তাহা আমরা অসম্ভব মনে করিতে পারি কিন্তু তখনকার লোকে বিশ্বাস করিত। যে সময়ের কথা পাঠ করা যায় সে সময়ের লোকের ন্যায় বিশ্বাস না করিলে নাটকের প্রকৃত রসাস্বাদ পাওয়া যায় না।

শেষে বিদায় দিয়া তিনি বিষণ্ণ ও হৃষ্ট হইয়া বলিতেছেন।

"অর্থোহি কন্যা পরকীয় এব তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।

জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা॥

এই শ্লোকটী অতি মনোহর। বস্তুতঃ মহর্ষি কণ্বের চরিত্র শকুন্তলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এমন হৃদয়গ্রাহী ব্যক্তি বোধ হয় কালিদাসের কোন নাটকে বা কাব্যে নাই।

আমরা অভিজ্ঞান শকুন্তলের প্রধান ব্যক্তিদের সমালোচনা করিলাম। এ নাটকে সমালোচনার যোগ্য লোক আর নাই। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা ইহারা দুজনেই এক প্রকার; কে অনসূয়া কে প্রিয়ম্বদা তাহা আমরা শীঘ্র চিনিতে পারি না। দুজনেই চতুরা ও কৌতুকানুরক্তা, এবং শকুন্তলার প্রতি স্নেহ ও যত্ন উভয়েরই সমান। ইহাতে কালিদাসের এক দোষ দেখা যাইতেছে যে তাঁহার নাটকে ব্যক্তি ভেদ নাই (১৪) (ইহা আমরা পরে আরও ভাল করিয়া দেখিব, এখানে কেবল ইঙ্গিতচ্ছলে উল্লেখ করিলাম।) তবে যদি পাঠক নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন তাহা হইলে যেন অনসূয়াকে প্রিয়ম্বদা অপেক্ষা চতুরা বলিতে পারেন, কারণ সে অতি কৌশলের সহিত রাজাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু অনসূয়াকে কিঞ্চিৎ অশিষ্টা বলিতে হইবে কারণ সে রাজার কাছে শকুন্তলার উৎপত্তি বর্ণনা করিতে কুণ্ঠিতা হয় নাই। আবার প্রিয়ম্বদাও সেইরূপ। সেও তৃতীয় অঙ্কে রাজার নিকট শকুন্তলার প্রণয়-বৃত্তান্ত স্পষ্টাক্ষরে বর্ণনা করিয়াছিল। অতএব দুই জনেই যেন এক মৃত্তিকার গঠন ইহাদের মধ্যে কোন তারতম্য নাই।

অভিজ্ঞান শকুন্তলের বিদূষক যথার্থই মৃৎপিণ্ডবুদ্ধি (১৫) তাহার বিষয় কিছু বক্তব্য নাই। পঞ্চম অঙ্কে ক্রুদ্ধ যুবক শার্ঙ্গরবের বর্ণনা যাহা আছে তাহা মন্দ নহে, কিন্তু তাহাতে বক্তব্য বিষয় কিছু নাই। আর আর যে সকল ব্যক্তি আছে তাহাদের বিষয় আমরা উল্লেখ করিলাম না ও করিবার প্রয়োজন নাই।

এক্ষণে শকুন্তলের ভাব ও রচনা কিরূপ তাহা বলিতে হইবে। কিন্তু সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এবং সকল পাঠকই তাহা অবগত আছেন, আমাদের বলিবার প্রয়োজন নাই, এখানে শকুন্তলের কোন্ কোন্ অংশ অতিশয় মনোজ্ঞ তাহা বলিব। চতুর্থ অঙ্কে যথেষ্ট চমৎকারিত্ব আছে। সকলে শকুন্তলাকে বেষ্টন করিয়া দুঃখিত চিত্তে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন; শকুন্তলার দৃষ্টি অশ্রুপূর্ণা হওয়াতে তাহার গতি স্খলিতা হইতেছে; হরিণ হরিণী দর্ভ-কবল ফেলিয়া চাহিয়া রহিয়াছে; শকু-

১৪ Variety and discrimination of character.

১৫ শকুন্তলের ও বিক্রমোর্ব্বশীর বিদূষকের মৃৎপিণ্ডবুদ্ধিতা দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারি যে মালবিকাগ্নিমিত্র কালিদাসের নহে। এ নাটকের বিদূষক অতিশয় ধূর্ত্ত ছিল, কিন্তু কালিদাসের বিদূষকগণ সেরূপ নহে।

ন্তলার পালিত হরিণশাবক আসিয়া তাহার নিকট দাঁড়াইয়াছে, অনসূয়া প্রিয়ম্বদা শোকে আকুল; মহর্ষি প্রশান্ত অথচ দুঃখিত, শার্ঙ্গরব কেবল শকুন্তলাকে ও মহর্ষিকে ত্বরা দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে "বেলা অতীত হইল এবং বন্ধু জনের জলাশয়-তীর অবধি যাওয়া উচিত" এইরূপ বলিতেছে; কবে পুনর্দর্শন পাইব বলিয়া শকুন্তলার আশ্রম প্রতি দৃষ্টি-পাত; অবশেষে শকুন্তলার প্রস্থানের পর তৎসখীদ্বয় তপোবনশূন্য জ্ঞান করিতেছে, এই সকল বিষয় আমাদের অতীব হৃদয়-গ্রাহী। এরূপ চমৎকার বস্তু প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, অন্ততঃ সংস্কৃত ভাষায় নাই। অভিজ্ঞান শকুন্তলে যাহা চমৎ-কারিত্ব আছে তাহা এই চতুর্থ অঙ্কে অন্যত্র নাই। অন্যান্য বর্ণনার মধ্যে রাজার অনু-তাপ (৬ষ্ঠ অঙ্কে) অতি চমৎকার। রাজা শোকে বিবর্ণ হইয়াছেন, বসন্তকালের উৎ-সব তাঁহার পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর; তিনি রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারেন না; এবং চিত্তবিনোদনার্থ শকুন্তলার আ-কৃতি চিত্রপটে লিখিতেছেন, এ সমস্ত যথার্থ স্বাভাবিক। রাজার মত ব্যক্তি এরূপ অব-স্থাপন্ন হইলে যাহা হওয়া উচিত ষষ্ঠাঙ্কে তাহা সুচারুরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা সর্ব্বাপেক্ষা চতুর্থ অঙ্ক ও তাহার পর ষষ্ঠা-ঙ্ককে অতি উত্তম মনে করি সেই জন্য কিছু বিশেষ করিয়া বলিলাম। আর কোন স্থানে এরূপ মনোহারিত্ব নাই। তবে ভাষা ও ভাব সর্ব্বত্রই মনোহর। প্রথম অঙ্কে স্ত্রীলোকদের কথা বার্ত্তা হাস্য পরিহাস অতি চমৎকার কিন্তু তাহা তপস্বিনীর যোগ্য হয় নাই এই জন্য চমৎকার হইয়াও সে অংশ বিশেষ হৃদয়গ্রাহী নহে কারণ ঔচিত্যবিরুদ্ধ।

আমরা এক্ষণে কালিদাসের ক্ষমতার বিচার করিব। প্রথমে দেখা যাক কালি-দাস কীদৃশ নাটককার ছিলেন। আমরা দেখিয়াছি শাকুন্তলের আখ্যায়িকাতে চমৎ-কারিত্ব নাই। ব্যক্তিগণের মধ্যে একান্ত হৃদয়গ্রাহী কেহ নাই, কেবল মহর্ষি কণ্ব, কিন্তু তিনি প্রধান ব্যক্তি নহেন। অভিজ্ঞান শকুন্তল পাঠ করিলে কালিদাসের নাটক-রচনা শক্তির উত্তম পরিচয় পাওয়া যায় না। নাটক কিরূপ হইলে যে কবির ক্ষমতা প্রকাশ পায় তাহা বুঝান অতি কঠিন, কিন্তু জগতের প্রধান নাটককারদের গ্রন্থ পাঠ করিলে তাহা স্পষ্টই বোধগম্য হয়। মানব-হৃদয়ের গতি স্পষ্টরূপে কার্য্যের দ্বারা প্রকটিত করাই দৃশ্য কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য, ইহাতেই কবির ক্ষ-মতা প্রকাশ পায়। যিনি স্বয়ং মানব হৃদয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিয়াছেন এবং সেই সকল তত্ত্ব ব্যক্তিগণের কার্য্যে ও উক্তিতে আদর্শতলের ন্যায় প্রতিবিম্বিত করিতে পারেন, তিনিই অদ্বিতীয় কবি, প্রগাঢ় দার্শনিক এবং অভ্রান্ত নীতিশিক্ষক। তাঁহার অভিজ্ঞতা এত অধিক যে কপিল ও গোতম তাঁহার নিকট শিশুতুল্য এবং উপদেশ লইবার পাত্র। স্বর্গ ও মর্ত্ত্য তাঁহার নয়নোপান্তে অবস্থান করে; তিনি মনে করিলে স্বর্গের

সুখ ও মর্ত্ত্যের মায়া, দেবতুল্য পবিত্রতা এবং সয়তানের নৃশংসতা সীতার ন্যায় সতীত্ব ও ১৬ গটরুড়ের ন্যায় ব্যভিচারিত্ব সমস্তই দেখাইতে পারেন। ইঁহার অপেক্ষা আর মহৎ শিক্ষক কে হইতে পারে? ধন্য বাল্মীকি, ধন্য সেক্‌স্‌পেয়ার, ধন্য গেটে তোমাদের গ্রন্থ সকল কল্পান্তস্থায়ী, তোমাদের নাম প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ে জগতের অসংখ্য লোকে স্মরণ করিয়া থাকে। তোমাদের শিক্ষা জগতে নবসূর্য্যোদয়ের সহিত নূতন বল প্রাপ্ত হয়। জগতের যত বয়োবৃদ্ধি হইতেছে ততই তোমাদের যশোবৃদ্ধি হইতেছে। তোমাদের ন্যায় লোক আর জন্মায় নাই ও বোধ হয় জন্মিবে না। তোমরাই অবতার সন্দেহ নাই। তোমাদিগকে নিভৃত হৃদয়-কন্দরে নমস্কার করি।

এখানে যে মহাত্মাদিগের (১৭) নাম করিলাম তাঁহারা মানব প্রকৃতি তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিয়াছিলেন। ইঁহাদের গ্রন্থে মানবতত্ত্ব, নীতিশিক্ষা, ভাবের গভীরতা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অতএব ইঁহারা অদ্বিতীয় কবি। কিন্তু কালিদাসের গ্রন্থে সে রূপ মানবতত্ত্ব ও ভাবের গভীরতা কোথায়? যাহা আছে সে সমস্ত অতি লঘু, প্রগাঢ় তত্ত্ব কালিদাসে নাই। ১৮ কালিদাস যে দুই খানি নাটক লিখিয়াছেন তাহা আদিরস-প্রধান। এই রসের অপকৃষ্টাংশ এ দুইখানি নাটকে বিশেষরূপে প্রকটিত হইয়াছে। বস্তুতঃ কালিদাস প্রেমের অপভ্রংশ বর্ণনা করিতে বিলক্ষণ নিপুণ ছিলেন এ বিষয়ে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। কিন্তু শান্ত, পবিত্র, দেবতুল্য, শারদ শশীর ন্যায় একেবারে হৃদয়গ্রাহী চক্ষুপ্রীতিপ্রদ ও নির্ম্মল প্রেমের বর্ণনা কালিদাস কুত্রাপি করেন নাই। তাঁহার নায়ক ও নায়িকা সকল মন্মথ-বাণে একেবারে জর্জ্জরীভূত হইয়া পড়ে। তাহাদের মনে তখন অন্য কোন ভাব স্থান পায় না। কেবল একমাত্র ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি করণেচ্ছাই তাহাদের হৃদয়কে গ্রাস করে। ইষ্টলাভ না হইলে তাহারা গাত্রের জ্বালায় কাতর হয়; তখন জগৎ বিষময়, আকাশ অন্ধকারময়, মলয়ানিল হুতাশনময়, এবং চন্দ্রকে তেজোময় জ্ঞান করে। তাহাদের মনের উপর তখন কোন ক্ষমতা থাকে না। যেমন এক জন অশিক্ষিত ও অশিষ্ট লোকের হওয়া সম্ভব কালিদাসের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের সেইরূপ দেখা যায়। রাজা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা উভয়েই প্রেমোন্মত্ততা বশতঃ

১৬ হেমলেটের মাতা

১৭ বালমীকি নাটক লেখেন নাই বটে কিন্তু নাটকের উপাদেয় বস্তু সকল রামায়ণে যথেষ্ট আছে।

১৮ এস্থলে বলা আবশ্যক যে সংস্কৃত নাটক কখন বিয়োগান্ত হয় না। এজন্য অন্তঃকরণের প্রবল চেষ্টা সকল সংস্কৃত নাটকে প্রকাশিত হয় না। ইহা কেবল নাটককারদিগের এক ভ্রান্তিমূলক নিয়মের ফল, যে অশুভ ঘটনার দ্বারা উপসংহার করিতে নাই। এজন্য tragedy নামক অলৌকিক পদার্থ সংস্কৃত ভাষায় নাই। এ অভাব অতিশয় শোচনীয়।

অধীর হইয়াছেন। উর্ব্বশী এবং পুরূরবা সেইরূপ, বরঞ্চ অধিক কাতর হইয়াছেন। (১৯) অতএব দেখা যাইতেছে যে ইহারা সকলেই কেবল ইন্দ্রিয়ের বশ। ইহাদের প্রেমের ফল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, মনস্তৃপ্তি নহে। ইহাদের সমস্ত কার্য্যে ও কথাতে এই ভাব ব্যক্ত হইতেছে, নির্ম্মল ভাব ইহাদের মনে আদৌ উদিত হয় না। দুষ্মন্ত যখন শকুন্তলার রূপ বর্ণনা করিতেছেন তখন বলিতেছেন,

"অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিশলয়মলূনং কররুহৈঃ
অনাবিদ্ধং রত্নং মধুনবমনাস্বাদিতরসম্
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং,২০

এই সকল ভাব অতি চমৎকার, আমরা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হই, কিন্তু ইহার পর রাজা যেন আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি যেন মনে করিলেন এমন রত্ন যদি না পাই তাহা হইলে হা হতোঽস্মি। অতএব তিনি বলিতেছেন

ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি ভুবি।

এখানে ভোক্তারং শব্দ ব্যবহার করাতে আমাদের মনের ভাব একেবারে নষ্ট হইল এবং রাজাকে কামাতুর বলিয়া জানিলাম। এরূপ বিস্তর উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু অনাবশ্যক। পুরূরবাও মদনযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বিস্তর বলিতেছেন। তাঁহার কথা বার্ত্তাতে আসঙ্গলিপ্সা বলবতী দেখা যায়। বিক্রমোর্ব্বশীর আদ্যন্ত কেবল ঐ সকল ভাবে পরিপূর্ণ। শকুন্তলার স্থানে স্থানে রসান্তর আছে। বিক্রমোর্ব্বশীতে অন্য রস কিছুই নাই। কালিদাসের সর্ব্বত্র এইরূপ বর্ণনা আছে। (২১) এমন কি তিনি মহাদেব কে পর্য্যন্ত প্রায় কামাতুরের ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। যথা

পশুপতিরপি তান্যহানিকৃচ্ছ্রাদগময়দদ্রিসুতাসমাগমোৎকঃ।

আমরা এক্ষণে দেখিলাম যে কালিদাসের প্রেম অপকৃষ্ট পদার্থ। তাঁহার ব্যক্তিগণ সকলেই প্রেমে স্বার্থপর, তাহারা স্বার্থসিদ্ধির উপায় ভাবিতেছে। তাহাদের প্রেম যেন জ্বলন্ত সূর্য্যরশ্মির ন্যায় তাপ

---

১৯ মালবিকাগ্নিমিত্র যদি কালিদাসের হয় তাহা হইলে ইহাতেও দেখা যায় যে রাজা এবং মালবিকা উভয়েই কালিদাসের অন্যান্য নায়ক নায়িকার ন্যায়। কোন প্রভেদ নাই।

২০ ভবভূতির এ বিষয়ে মহৎগুণ আছে তিনি দুর্ব্বৃত্ত রাবণের মুখেও এরূপ ভাব দেন নাই। রাবণ সীতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,

"মুখংযদিকিমিন্দুনা যদি চলাঞ্চলে লোচনে
কিমুৎপলকদম্বকৈ যদি তরঙ্গভঙ্গীভ্রুবৌ।
কিমাম্বুভববল্গনা যদি সুসংযতাঃ কুন্তলাঃ।
কিমম্বুবহডম্বরৈ র্যদিপুনরিয়ং কিং প্রিয়া॥

এখানে " নজানে ভোক্তারং" ইত্যাদি কোন অশ্লীল ভাব নাই তাহা পাঠক মহাশয় দেখিবেন।

২১ মালবিকাগ্নিমিত্রে রাজার এই রূপ অবস্থা। তিনি বলিতেছেন

"শরীরং ক্ষামং স্যাদসতি দয়িতালিঙ্গনসুখে।'

এরূপ নানা স্থানে আছে।

দিয়া আত্মাকে শোষণ করে, চন্দ্রের ন্যায় শীত রশ্মি বিস্তার করিয়া হৃদয়কে সন্তর্পিত করে না। তাহাদের প্রণয়বর্ণনা পাঠ করিলে বোধ হয় যে সেরূপ প্রেম কখন স্থায়ী নহে, তাহাতে শীঘ্রই তৃপ্তি ও অরুচি জন্মায় কারণ এ প্রেম ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করে মনকে করে না। কিন্তু যে প্রণয় অন্তরাত্মাকে বশীকৃত এবং পরিতৃপ্ত করে. তাহাই প্রকৃত প্রণয়, তাহা পাঠ করিলে আমরা মুগ্ধ হই, আমাদের আত্মা যেন শীতল হয়, আমাদের মনের মলিন ভাব সকল বিশুদ্ধ হইয়া যায়, আমরা যেন মানব দেহে স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগ করি, মানবাত্মা যে ঈশ্বরের অংশ তাহা আমরা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করি, কারণ আমরা তখন দেবগণের সহিত সহানুভূতি অনুভব করি। পাঠক মহাশয় যদি কালিদাসের কোন নায়িকার সহিত আয়েসার (২২) তুলনা করেন তাহা হইলে দেখিবেন যে কোন্ ব্যক্তি অধিকতর আমাদের হৃদয়াকর্ষণ করে, এবং কাহার প্রণয় বিশুদ্ধ ও দেবতুল্য। আয়েসা জগৎসিংহের সুখেই আপনাকে চরিতার্থ মনে করে, কিসে জগৎসিংহ সুখী হইবে আয়েসা দিবানিশি তাহাই ভাবিতেছে, তাহার সমস্ত আত্মা যেন জগৎসিংহময় হইয়াছে—কিন্তু এতদূর হইয়াও সে জগৎসিংহের আসঙ্গলিপ্সা করে না, তাহার উন্নত মনে এতাদৃশ নীচ ভাব স্থান পায় না। আসঙ্গলিপ্সা যে প্রেমের এক উপাদান নয় আমরা এতদূর বলিতেছি না, কিন্তু তাহা বলবতী হইলে পবিত্র স্থায়ী প্রেম পশুতুল্য, ক্ষণিক হইয়া যায়। মানুষের যে সমস্ত পশু-সাধারণ প্রবৃত্তি আছে তাহা যত দমন করা যায় ততই আমরা দেবতা ও মানবের নিকট প্রশংসনীয় হই, এবং ততই আমাদের প্রকৃতি যে ক্রমোন্নতিশীলা তাহা সপ্রমাণ করি।

আবার যদি আমরা ভবভূতির (২৩) সহিত কালিদাসের তুলনা করি তাহা হইলে উভয়ের মনের ভাব কি রূপ তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাইব। ভবভূতি প্রকৃত প্রেম যে কি পদার্থ তাহা উত্তম রূপে বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরচরিত পাঠ করিলে আমাদের মনে যেরূপ অলৌকিক আনন্দ হয় কালিদাস পাঠ করিলে সে রূপ কখনই হয় না—এখানে আমরা কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যথা

ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়োঃ,
অসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুসি বহলশ্চন্দনরসঃ।

* * *

কিমস্যাঃ ন প্রেয়ো যদি পুনরসহ্যোস্ত বিরহঃ।

২২ আইভান হোতে যে রেবেকা আছে তাহার সহিতও তুলনা করিতে পারেন।

২৩ আমরা একণে সেক্সপেয়ারের সহিত তুলনা না করিয়া ভবভূতির সহিত করিলাম, কারণ প্রায় সকলেই কালিদাসকে ভবভূতি অপেক্ষা বড় বলিয়া থাকেন, কিন্তু কালিদাসের রচনার চমৎকারিত্ব থাকিলে কি হয়, ভবভূতির ক্ষমতা অধিক ছিল। ইহা আমাদের দেখান উদ্দেশ্য।

অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু যৎ
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ।
কালেনাবরণত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতং
ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য, কথমপ্যেকং হি তৎ-প্রাপ্যতে॥
"ম্লানস্য জীবকুসুমস্য বিকাশনানি সন্তর্পণানি সকলেন্দ্রিয়মোহনানি।
এতানি তানি বচনানি সরোরুহাক্ষ্যাঃ কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি॥

ইহা দুষ্মন্ত, পুরূরবার (অগ্নিমিত্রের) ন্যায় মদনজ্বালা নহে। ইহা স্থায়ী, পবিত্র, দেবতুল্য প্রেম। বস্তুতঃ রাম ও সীতার প্রণয় যে রূপ চমৎকার সেরূপ কালিদাসে এবং অন্যান্য সংস্কৃত কবিগণের মধ্যে কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। ইহাদের প্রণয়ের মধ্যে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে পরস্পরের প্রতি একটা শ্রদ্ধা ছিল। রাম ও সীতা পরস্পরকে ইন্দ্রিয়তর্পণ বলিয়া জানিতেন না তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে বিশেষ বোধ হইতেছে। রাম সীতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন।

ত্বয়া সহ নিবৎস্যামি বনেষু মধুগন্ধিসু।
ইতি হারমতেবাসৌ স্নেহস্তস্যাঃ স তাদৃশঃ॥
অকিঞ্চিদপি কুর্ব্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখান্যপোহতি।
তৎ তস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়ো জনঃ।

ইহা যে কি চমৎকার প্রেম তাহা অনির্ব্বচনীয়। আবার আর এক স্থানে ভবভূতি বলিয়াছেন।

হৃদয়ন্তেব জানাতি প্রীতিযোগং পরস্পরং।

আমরা কিছু বলিতে চাহি না পাঠক কেবল উভয়বিধ প্রেম ভাবিয়া দেখুন, তিনি নিশ্চয় আমাদের কথা স্বীকার করিবেন। আমাদের বোধ হয় যে এরূপ ভাব কালিদাসের মনে কখন উদয় (২৪) হয় নাই, কারণ তিনি স্ত্রীলোকের প্রতি কামাতুর নেত্রে দৃষ্টি করিতেন। স্ত্রীলোক যে চমৎকার বস্তু ও তাহারা কত রকমে আমাদের জগৎকে সুখের স্থান করিয়াছে কালিদাস

২৪ কেহ কেহ বলিতে পারেন যে রাম সীতার প্রণয়ের সহিত দুষ্মন্ত প্রভৃতির প্রেমের তুলনা করা অনুচিত কারণ দুষ্মন্ত পুরূরবা প্রভৃতি রাজারা সকলেই রামের ন্যায় প্রেমিক এবং এক ভার্য্যাপরায়ণ ছিলেন না। তাঁহারা বহু স্ত্রী বিবাহ করিতেন, তাঁহাদের কেবল ইন্দ্রিয়-সুখই উদ্দেশ্য, যখন সুন্দরী রমণী দেখিলেন তখনই তাহাকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রাম বিষ্ণু অবতার অবধি কেবল এক লক্ষ্মীর প্রতি অনুরক্ত এবং সেই জন্য ভবভূতি এরূপ বিশুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন। এরূপ আপত্তি করা বৃথা। আমরা যাহা বলিয়াছি তাহাতে কালিদাসের নিজের মন কি ছিল তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি আপনার মনের ভাব যেরূপ সেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। নায়কদের বর্ণনা মনে করিলেই ভাল করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সেরূপ অভিপ্রায় নয়। ভবভূতি রাবণকেও নিতান্ত কামাতুরের ন্যায় বর্ণনা করেন নাই তাহা আমরা দেখাইয়াছি যদিও রাবণ কেবল কামাতুর হইয়া সীতাহরণ করে।

তাহা জানিতেন না। তাঁহার মতে স্ত্রী-লোকেরা কি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

বাহূ দ্বৌ চ মৃণালমাস্যকমলং লাবণ্যলীলা জলং

শ্রোণীতীর্থশিলা চ নেত্রশফরং ধম্মিল্লশৈবালকম্।

কান্তায়াস্তনচক্রবাকযুগলং কন্দর্পবাণানলৈ

র্দগ্ধানামবগাহনায় বিধিনা রম্যং সরোনির্ম্মিতম্।

বাস্তবিক এইরূপ ভাব পাঠ করিলে কালিদাসের উপর আমাদের ঘৃণা হয়। (২৫) এবং যখন তিনি স্থানান্তরে বলিয়াছেন

অবিদিতসুখদুঃখং নির্গুণং বস্তু কিঞ্চিৎ

জড়মতিরিহ কশ্চিৎ মোক্ষ ইত্যাচচক্ষে।

মম তু মতমনঙ্গস্মেরতারল্যঘূর্ণন্-

মদকলমদিরাক্ষীনীবিমোক্ষস্তু মোক্ষঃ॥

তখন তিনি জগতের প্রধান কবিদিগের মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য নহেন। তাঁহার অন্তঃকরণ অত্যন্ত দূষিত। তাঁহার গ্রন্থ পাঠে কোন উপদেশ পাওয়া যায় না, এমন কি আমাদের মন ইহাতে দূষিত হইতে পারে। (২৬)

আমরা কালিদাসের ক্ষমতার বিচার করিতে গিয়া দেখিলাম যে কালিদাস কেবল একটী রস ও দুইটী ব্যক্তি বর্ণনা করিতে বিলক্ষণ পারিতেন। তিনি হোমর, সেক্সপেয়ার, মিল্‌টন্ ভবভূতি প্রভৃতি কবিদের ন্যায় নানাবিধ রস বা নানাবিধ ব্যক্তি বর্ণনা করিতে পারিতেন না। ২৭ আমাদের স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে বায়রণের যেমন নাটকীয় শক্তি ছিল না কালিদাসেরও তেমনি ছিল না। ২৮ বায়রণ কেবল দুই

---

২৫ Contrast Milton P, Lost. Heavens last best gift my ever new deliget.

২৬ আমরা উক্ত সকল শ্লোককে কালিদাসের নীতিমালা এরূপ বলিতেছি না, কিন্তু তাঁহার স্বভাব কখনই বিশুদ্ধ ছিল না তাহা স্পষ্ট বোধ হয়।

কালিদাসের কল্পনা আদিরসে পরিপূর্ণ এজন্য অনাবশ্যক স্থলেও অশ্লীল বর্ণনা করেন। যথা কুমারে হিমালয় বর্ণনা এবং অন্যান্য স্থানেও বিস্তর আছে কারণ আমরা যখন Ovid বা Anacreon পাঠ করি তখন উহাদের জীবন বৃত্তান্ত না জানিয়াও বলিতে পারি যে এক জন লম্পট ও আর এক জন মদ্যপায়ী ছিল। পরে সেই বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হয় যখন আমরা অবগত হই যে ovid এর নির্বাসন ও Anacreon এর হঠাৎ মৃত্যু স্বীয় স্বীয় চরিত্রের পরিণাম মাত্র। যদি কালিদাসের কোন ইতিহাস থাকিত তাহা হইলে আমাদের অনুমান দৃঢ়ীকৃত হইত।

২৭ অর্থাৎ ব্যক্তিভেদ এবং রসভেদ নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কালিদাসের গ্রন্থে variety নাই। এখানে সেই বিষয়ের আলোচনা করিতেছি।

২৮ আমরা নাটকীয় শক্তি প্রশস্ত অর্থে ব্যবহার করিলাম। এই শক্তি যে কেবল নাটকে থাকে এমন নহে, কাব্য মাত্রেই থাকা আবশ্যক। যেমন গদ্য রচনায় কবিত্ব শক্তি থাকে ইহাও সেই রূপ। ইহা কালিদাসের এক মহৎ দোষ যে তিনি সর্ব্বত্র প্রায় এক রূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন। এমন কি তাঁহার ব্যক্তিগণ সময়ে সময়ে এক রূপ আচরণ করেন। যথা শকুন্তলা এবং উর্ব্বশী

ব্যক্তি বর্ণনা করিতে পারিতেন, এক জন সাহসিক নিরানন্দ জগদ্দ্বেষী অথচ প্রেমিক পুরুষ, আর এক জন মুগ্ধা, কামাতুরা, প্রিয়-জন-পরায়ণা রমণী। বায়রণের যে গ্রন্থ পাঠ করা যায় কেবল এই দুই জন। অন্য রূপ স্বভাব বর্ণনা বায়রণে নাই। কালিদাসও তদ্রূপ। কি কুমারে, কি মেঘদূতে, কি অভিজ্ঞান শকুন্তলে, কি বিক্রমোর্ব্বশীতে (কি মালবিকাগ্নিমিত্রে) সর্ব্বত্রই আমরা চিরপরিচিত সেই দুই জনকে দেখিতে পাই অর্থাৎ এক কামার্ত্ত পুরুষ ও এক নির্লজ্জা রমণী। ইহাতে বোধ হইতেছে যে বায়রণ তাঁহার নিজের স্বভাব কাব্য সকলে প্রকাশিত করিয়াছেন, কালিদাসও সেই রূপ তাঁহার স্বার্থপর প্রেমোন্মত্ত লঘু প্রকৃতি স্বকীয় কাব্য সমূহে দেখাইয়াছেন। *

কালিদাসের বায়রণের সহিত যে সাদৃশ্য আছে তাহা দেখিলাম কিন্তু বায়রণকে কোন কোন অংশে আমরা কালিদাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি মনে করি, কারণ বায়রণ আমাদের অন্তঃকরণে নানারসের উদ্রেক করিতে পারেন কালিদাস তাহা পারেন না। বায়রণের কাব্য সমূহে যে রূপ ওজোগুণ আছে কালিদাসে সে রূপ প্রায় নাই। †

এই নিমিত্ত তিনি রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, শান্ত প্রভৃতি উৎকৃষ্ট রস সকলের বর্ণনা করিতে পারেন না। আমরা সবিস্তরে কবিতা সকল উদ্ধৃত করিয়া সময় নষ্ট করিব না। পাঠক মহাশয় যদি রঘুবংশের তৃতীয় সর্গে ইন্দ্রের সহিত রঘুর যুদ্ধ, চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয়, সপ্তমে রাজাগণের সহিত অজের যুদ্ধ, একাদশে পরশুরামের সহিত রামের যুদ্ধ, দ্বাদশে রাম রাবণের সমর—এই সকল অংশের সহিত ভবভূতির বীরচরিতের এবং উত্তর চরিতের পঞ্চম অঙ্কের তুলনা করেন তাহা হইলে দেখিবেন যে কালিদাসের বর্ণনা কেবল বীররসের বিড়ম্বনা মাত্র। এই রূপ অন্যান্য রসেরও উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ভয়ানক রসের বর্ণনা কালিদাসে অতি বিরল, যথা রঘুর দ্বিতীয় সর্গে কামধেনু কর্ত্তৃক দিলীপের ছলনা, পঞ্চম সর্গে মত্ত বারণের আগমন, কুমারের তৃতীয় সর্গে এ সকল স্থল কিছু বিশেষ রূপ ভয়াবহ বলিয়া বোধ হয় না। রৌদ্ররসের বর্ণনা কালিদাস ভাল করিতে পারেন না। কিন্তু কুমারের তৃতীয় সর্গে শিবের ক্রোধবর্ণনা অতি চমৎকার হইয়াছে। যথা

"তপঃপরামর্শবিবৃদ্ধমন্যোঃ ভ্রূভঙ্গদুষ্প্রেক্ষ্য-
মুখস্য তস্য।
স্ফুরন্নুদর্চ্চিঃ সহসা তৃতীয়াৎ অক্ষ্ণো কৃশানুঃ
কিল নিষ্পপাত॥

এ শ্লোকে ভবভূতির ন্যায় ওজোগুণ

প্রথম অঙ্কে শাখাতে বস্ত্র লগ্ন হইয়াছে এই রূপ বলিয়া রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

* অতএব কালিদাস যে মানবপ্রকৃতির তত্ত্ব সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতে পারেন নাই তাহা এতদ্দ্বারা প্রমাণীকৃত হইতেছে।

† (আমরা কুমারের তৃতীয় সর্গের কথা বলিতেছি না, ইহার পরে উল্লেখ করা যাইবে)।

নাই বটে কিন্তু তথাপি উত্তম হইয়াছে। আরও স্থলে স্থলে উত্তম বর্ণনা আছে।

"বাহুপ্রতিস্টম্ভবিরুদ্ধমন্যুঃ অভ্যার্ণমাগস্কৃত-মস্পৃশদ্ভিঃ।
রাজা স্বতেজোভিরদহ্যতান্তঃ ভোগীব মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্যঃ॥

অর্ঘ্যমর্ঘ্যমিতি বাদিনং নৃপং সোঽনবেক্ষ্য ভরতাগ্রজোযতঃ।
ক্ষত্রকোপদহনার্চ্চিষং ততঃ সন্দধে দৃশমুদগ্রতারকাম্॥

কিন্তু এরূপ বর্ণনা কালিদাসের সকল স্থানে নাই।

ক্রমশঃ

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র।

আর বারে আমি অন্য লোকদের মুখ থেকে তাঁদের বিলেতের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ কোরেছিলুম, তোমাদের উপকারার্থে তা' আমি সংক্ষেপে লিপি-বদ্ধ কোরে যথা সময়ে পাঠিয়েছি। আমার যা' কর্ত্তব্য তা' আমি কোরেছি, এখন তোমাদের কর্ত্তব্য হোচ্চে, সেটি আদ্যোপান্ত পাঠ করা ও সে বিষয়ে তোমাদের মতামত ব্যক্ত কোরে, যত শীঘ্র পার, আমাকে একটা উত্তর লিখে পাঠানো। কেমন?

এর আগে তোমাদের যে সব চিঠি পাঠিয়েছি, তা'তে যখন যা' দেখেছি, লিখেছি, যখন যা' মনে হোয়েছে বোলেছি, এখন সেই গুলোকে আর একটু শৃঙ্খলবদ্ধ কোরে লিখ্‌তে চাই; এখেনে কি কি দেখে আমার মনে কি রকম সংস্কার হ'ল, আমি কি নতুন জ্ঞান লাভ কোর্‌লুম, আমার মনে কি নতুন মত গড়া হ'ল ও কি পুরোণো মত ভেঙ্গে গেল, তাই লিখ্‌তে চেষ্টা কোর্ব্ব। অতএব এবারকার চিঠির প্রধান নায়ক হোচ্চেন "আমি।" প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত, আমি। সুতরাং খুব সম্ভব যে, এই চিঠির কাগজের চার পৃষ্ঠা-পূর্ণ অহমিকা পোড়্‌তে পোড়্‌তে অর্দ্ধ পথে তোমার গা ঝিমিয়ে আস্‌বে, চোখের দ্বার রুদ্ধ হোয়ে যাবে ও নাসা-রন্ধ্র হোতে একটা বেসুরো কোলাহল উত্থিত হোতে থাক্‌বে। "আমি" পদার্থের মত প্রিয় ও আমোদজনক আর কি হোতে পারে বল? কিন্তু আমরা সকল সময়ে বিবেচনা করিনে যে, "আমি" আমারই কাছে "আমি," কিন্তু তোমার কাছে তুমি বই আর কিছুই নয়। এই রকম সাত পাঁচ ভেবে "আমি" বোলে একটা বস্তুকে সহসা তোমাদের সভার মধ্যে নিয়ে গিয়ে বল পূর্ব্বক খাড়া কোরে তুলতে আমার কেমন সঙ্কোচ বোধ হোচ্চে। বিলেত সম্বন্ধে আমার নিজের যৎসামান্য অভিজ্ঞতার সারাংশ প্রকাশ কোর্ত্তে প্রস্তুত হো-

য়েছি। এই খানে একটা কথা বোলে রাখি ; কথাটা কিছু গম্ভীর ছাঁচের। অভিজ্ঞতা বোল্‌তে কি বোঝায়? কতকগুলি বিশেষ ঘটনার বিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহ করা ও তা'র থেকে একটা সাধারণ মত প্রতিষ্ঠা কোরে নেওয়া। আমি অতি বিনীত ভাবে নিবেদন কোর্‌চি যে, যে দিক থেকে দেখ, আমার অভিজ্ঞতার মূল্য বড় অধিক নয়। প্রথমত আমি এখেনে এত অধিক দিন নেই ও এত বিশেষ স্থবিধে পাই নি, যা' থেকে এখানকার সমাজের অনেক দেখে শুনে নিতে পারি ; দ্বিতীয়ত:, বিশেষ ঘটনাবলী থেকে একটি যথার্থ সাধারণ মত তৈরি কোরে নিতে যতটা বুদ্ধির আবশ্যক, ততটা আপাততঃ আমার তহবিলে আছে কি না, সে বিষয়ে আমার নিজের ও আমার আলাপী বন্ধুবর্গের ঘোরতর সন্দেহ রোয়েছে। অতএব আমার এই আধ-সিদ্ধ অভিজ্ঞতার ব্যঞ্জন-গুলো তোমাদের পাতে দিচ্চি, যদি রুচিজনক হয় ও তোমাদের পাক-যন্ত্রের হানি-জনক বিবেচনা না কর, তা' হোলে সেবা কোরো। এই খানে আমার উদ্যোগ-পর্ব্ব ও বিনয়-পর্ব্ব শেষ কোরে, প্রবন্ধের যথাশাস্ত্র মুখ-বন্ধ কোরে প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভ করি।

আমরা লণ্ডনে দুই এক ঘণ্টা থেকেই ব্রাইটনে প্রস্থান করি। ব্রাইটন সমুদ্রের ধারে—একটা বড় সৌখীন (fashionable) সহর। দেখ্‌তে শুন্‌তে আকারে ইঙ্গিতে লণ্ডনেরই মত, কেবল লণ্ডনের মত সে রকম অন্ধকার, মেঘাচ্ছন্ন, ভ্রূকুটী-কুটিল মুখ নয়। আমাদের একটি বাঙ্গালী পরিবার ব্রাইটনে বাস করেন, তাঁ'দের সেখেনে গিয়ে আশ্রয় নিলুম ; দেখি যে আমাদের গৃহিণী তাঁর দিশি বস্ত্র পোরে ছেলে পিলে নিয়ে ঘরে অন্নপূর্ণার মত বিরাজ কোর্‌চেন ; তাঁর দিশি কাপড় দেখে তাঁর বিলিতি বন্ধুরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট আছেন, ও তাঁর দিশি বন্ধুরা সেই পরিমাণে খুঁৎখুঁৎ কোর্‌চেন। তাঁর দিশি কাপড় দেখে তাঁর বিলিতি বন্ধু miss— বলেন, যে, ঐ রকম ভাঁজ ভাঁজ কাপড়ে যে একটি সুন্দর শ্রী আছে, তা' আঁট্‌সাঁট্‌ ছাঁটা ছোঁটা গাউনে পাওয়া যায় না, তাঁর দিশি বন্ধু miss—(একজন বিলিতি বাঙ্গালী) বলেন, যে, যে কাপড়টা পরা হোচ্চে, সেটা একেত সম্পূর্ণ দিশি নয় (অর্থাৎ ফিন্‌ফিনে শান্তিপুরে সাড়ি নয়), তার উপরে তা'তে যদি এক রত্তি শ্রী থাকৃত, তা' হোলেও না হয় ভদ্রসমাজে পরা যেত, কিন্তু তা'ও নেই।" এই রকম বিলিতি ও দিশি বন্ধুদের মধ্যে মতের আকাশ পাতাল তফাৎ দেখা যাচ্চে। আমিত আগেই বোলেছি, যে, বাঙ্গালী সাহেব হোয়ে উঠ্‌লে তিনি সাহেবের ঠাকুর দাদা হোয়ে ওঠেন ; আপনার লোক পর হোয়ে গেলে সে যেমন পর হোয়ে যায়, এমন আর কেউ হয় না। যা হোক্‌, আমাদের দেবীর যে, এখনো অনেক গুলি "কুসংস্কার" আছে, দেখে আমরা তৃপ্তি লাভ কোর্‌লেম। এমন কি তিনি বোল্লেন, যে, বিলেতে এসে তাঁর "কুসংস্কার" গুলি আরো বদ্ধ-মূল হোচ্চে। কি সর্ব্বনাশ! দেশের উপর ভালবাসা আরো

বেড়েছে। কি আশ্চর্য্য! তিনি বোল্লেন তাঁর মনের এতদূর পর্য্যন্ত উন্নতি হয় নি যে, সার্ব্বভৌমিক ভাব তাঁর মনে বদ্ধমূল হোতে পারে, বরঞ্চ সে বিষয়ে তাঁর মন আরো সংকীর্ণ হোয়ে এসেছে। তোমরাই বল, বিলেতে এসেও এঁর যদি এই দুর্দ্দশা, তা হলে এঁর কি আর শোধ্‌রাবার উপায় আছে? ছেলে পিলেরা দেখ্‌লুম, অত্যন্ত খুসীতে আছে, তাদের স্ফূর্ত্তি ও উদ্যম দেখে কে? সমস্ত দিনের মধ্যে লাফালাফি ছুটোপাটির তিলেক বিশ্রাম নেই। এইমাত্র স্থ—এসে আমার লেখার সম্বন্ধে কত শত প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরছিল; জিজ্ঞাসা কোর্‌ছিল, কি কোরে আমি এত বড় চিঠি বাড়িতে লিখি, সে এর অর্দ্ধেকও লিখ্‌তে পারে না, দ্বিতীয় প্রশ্ন হ'ল, এত বড় চিঠি লেখ্‌বার আবশ্যক কি, ছোট কোরে লিখ্‌বার আবশ্যক কি, ছোট কোরে লিখ্‌লেত সেই একই কথা, তৃতীয় প্রশ্ন হ'ল, অত কষ্ট কোরে হাতে কোরে না লিখে যদি ছাপিয়ে পাঠিয়ে দেও তা হ'লে কি হানি, ছাপিয়ে পাঠালে তার মতে কত প্রকার সুবিধে তাই একে একে বোলতে লাগ্‌ল; তা'র পরে আমার চিঠি পোড়তে চেষ্টা কোর্ত্তে লাগল, তার পরে তার শেষ উপসংহার হোচ্চে যে আমার লেখা অত্যন্ত খিজি বিজি বাঁকা চোরা অপরিষ্কার (সে নিজে বুঝ্‌তে পারলে না বোলে বোধ হয়), মুক্ত কণ্ঠে এই মতটি ব্যক্ত কোরে টেবিলের চার দিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ কোরলে। ইতি মধ্যে কখন বি—এসে আমার চৌকির পিছন দিক থেকে আমার কাঁধে চোড়ে বস্‌বার বন্দোবস্ত করচে, তা'কে কাঁধে চোড়তে দেখে স্থ—র জেদ হোল, সেও কাঁধে চোড়বে, অবশেষে দুজনে আমার দুই কাঁধে চোড়ে বোসেছে, আমিও এই অবস্থায় লিখ্‌ছি। তোমরা এ কথা শুনে হয়ত অবাক হোয়ে গেছ, বিশেষতঃ তুমি যে শাসনভক্ত, তোমার চুল হয়ত দাঁড়িয়ে উঠেছে, "যেন তাদের প্রত্যেকের জীবন আছে," এ ছেলেদের পেলে তুমি দিন কতক পিটিয়ে মনের সাধ মেটাও।—না? দুরন্ত ছেলে তুমি দু চক্ষে দেখতে পার না। তুমি চাও, ছেলেরা গুরুলোকদের কাছে চুপ চাপ কোরে ঘাড়টি গুঁজে বোসে থাক্‌বে, কথা জিজ্ঞাসা কোরলে তবে কথা কবে, কথা কবার সময় গলার স্বর অত্যন্ত নিচু হবে, গুরুলোকদের সাক্ষাতে কোন প্রকার নিজের মত ব্যক্ত কোরবে না* তাঁদের অত্যন্ত ভক্তি

* এ জায়গাটা ভারি গোলমেলে,—ছোটো ছেলেরা ঘাড় গুঁজে ব'সে থাক্‌বে এটি আমাদের দেশের কোন্ পিতা বা কোন্ হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি চক্ষে দেখিতে পারে? আর ছেলেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহারা বিনয় নম্রতা ও ভদ্রতা শিক্ষা না করিয়া ভদ্রসমাজে পুতলো বাজির ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইবে, ইহাই বা কোন পিতা সভ্যতার চরম সীমা জ্ঞান করিতে পারে। আমাদের দেশের কোন্ পিতার মন এরূপ কঠিন তাহা জানি না যে প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র তাঁহার কোন কথার উত্তর না দিয়া ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া থাকিলে তিনি মনে মনে বড়ই আহ্লাদিত হ'ন—আহ্লাদের কারণ শুধু এই যে, পুত্রের উপর দেখ

ও মান্য কোরবে ইত্যাদি, এ যে শুধু ছেলে পিলেদের প্রতিই খাট্‌বে তা নয়, গুরু লোকদের কাছে লঘু লোক মাত্রেরই এই সকল কর্ত্তব্য। তোমার মত হোচ্চে, "লালনে বহবোদোষাস্তাড়নে বহবোগুণাঃ, তস্মাৎ পুত্রঞ্চ ভৃত্যঞ্চ তাড়য়েন্নতু লালয়েৎ*।" যা হোক্, এই গুরুভক্তির বিষয়ে আমার অনেকটা মত পরিবর্ত্তন হোয়েছে, সে বিষয়ে তোমাদের একটু বিস্তৃত কোরে বোলচি। আমাদের সমাজের পথে ঘাটে ভালবাসার চেয়ে ভক্তির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। আমাদের দেশে পরিবারের মধ্যে গুরুজনের সম্বন্ধে ভালবাসার সম্পর্ক যেন একেবারে নেই †; সমস্তই ভক্তি ও স্নেহ। বয়সের অতি সামান্য তারতম্যে, সম্পর্কের অতি সামান্য উঁচু নিচুতে ভক্তি ও স্নেহের সম্পর্ক স্থাপিত হয়; অত কথায় কাজ কি, আমাদের তা' ছাড়া আর কোন সম্পর্ক মূলে নেই, কেবল যমজ সন্তানদের মধ্যে কি রকম হয় বোলতে পারিনে। কিন্তু এ রকম ভক্তিকে ভক্তি নাম দিলে সে নামের অসদ্ব্যবহার করা হয়, এ এক রকম অস্বাভাবিক মনোবৃত্তি, এক রকম অস্বাভাবিক ভয়। বড়দের আমরা স্বভাবতই ভক্তি করি, তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেখে আমরা স্বভাবতই তাঁদের উপর নির্ভর করি, কিন্তু আমাদের পরিবারের মধ্যে যে ভক্তি, যে নির্ভরের ভাব বদ্ধমূল, সে কি স্বাভাবিক? প্রতি পদে শিক্ষা, শাসন, ও অভ্যাসের প্রভাবেই কি তার জন্ম হয় না? ছেলে-

---

কেমন আমার প্রভুত্ব! এ সকল অত্যুক্তির প্রতিবাদ করিতে হইতেছে—ইহাতে হাসিও পায় কান্নাও পায়। সং

* লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ ॥

† ভালবাসা ব্যতীত ভক্তি হ'তেই পারে না; ভক্তি হ'তে যদি ভালবাসা উঠাইয়া লওয়া যায় তবে শুষ্ক কেবল শাসন-ভয় মাত্র অবশিষ্ট থাকে; ভালবাসা পাত্র-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে, দম্পতির ভালবাসা পুত্র-কন্যার প্রতি কিছু অর্শিতে পারে না; পুত্র-বাৎসল্য কিছু বন্ধুবর্গের প্রতি অর্শিতে পারে না, ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ কখনো গুরুজনের প্রতি অর্শিতে পারে না; দম্পতির ভালবাসাকে দম্পতি-প্রেম কহে, পুত্রকন্যার প্রতি যে ভালবাসা তাহাকে স্নেহ কহে, বন্ধুবর্গের ভালবাসাকে বন্ধুতা, সখ্য, প্রণয় ইত্যাদি কহা যায়, উচ্চের প্রতি যে ভালবাসা তাহাকে ভক্তি কহে; অতএব ভক্তি ভালবাসা-হইতে স্বতন্ত্র একটি বস্তু নহে, তবে কি—না ভক্তির ভালবাসা প্রণয়ের ভালবাসা নহে, স্নেহের ভালবাসা নহে, দম্পতি-প্রেমের ভালবাসা নহে, উহা অপেক্ষা আর একটু উচ্চ দরের ভালবাসা। যাঁহারা কেবল যাত্রার গীতেরই মর্ম্মজ্ঞ—উচ্চ অঙ্গের গীত তাঁহাদের কাছে গীতই নহে, তেমনি শুদ্ধ যাঁহারা কেবল সখ্য-রসেরই মর্ম্মজ্ঞ—ভক্তি তাঁহাদের চক্ষে ভালবাসাই নহে; সখ্যকে ধরিয়া বাঁধিয়া ভক্তির সিংহাসনে বসাইলে তবেই তাঁহাদের মনঃপূত হয়; কিন্তু তাঁদের জানা উচিত যে, যাত্রার সুরে খেয়াল ধ্রুপদ গান করা আর ভক্তিভাজন ব্যক্তির সহিত সখ্যরসের আলাপ করা, উভয়ই সমান—বেসুরো বেতালা বেমানান;—সমজদার ব্যক্তি তাহা শুনিবা মাত্র কাণে হাত দেন। সং

বেলা থেকে প্রতি পদে আমাদের কানে মন্ত্র দিতে হয় যে, পিতা দেবতুল্য, গুরু দেবতুল্য; কেন, দেবতুল্য কেন? দেব ভাবের কঠোর ও সুদূর সম্ভ্রম কেন তাঁদের ওপর অর্পণ করা হয়? তাঁরা আমাদের ভালবাসার পিতা, ভালবাসার মাতা, ভালবাসার সঙ্গে আমরা তাঁদের মুক্ত আলিঙ্গনে দৌড়ে ঝাঁপিয়ে পোড়্‌ব†, না, যোড়হস্তে বিনীত ভাবে আমাদের মানুষ পিতার কাছে না গিয়ে আমাদের জাতের বহির্ভুক্ত কোন দেবতুল্য ব্যক্তির কাছে গিয়ে অতি সন্তর্পণে বোসে থাক্‌বো, অতি মৃদুস্বরে কথা কব, অতি নত ভাবে আত্মনিবেদন কোরব? যুক্তি দেখাতে গেলেই তাঁরা মনে করেন, তবে বুঝি এটাতে কোন প্রকার সন্দেহ আছে, এটা একটা স্থির সিদ্ধান্ত নয়; অমনি তাঁরা চোক টেপা টিপি কোর্‌তে থাকেন; অত্যন্ত অবিশ্বাসের ভাব দেখান; মনে করেন, এবিষয়ে অনেক কথা ওঠানো যেতে পারে, অর্থাৎ আমি যদি বা না পারি, আমার চেয়ে আর কোন বুদ্ধিমান জীব হয়ত পারেন; যুক্তিটা শুনেই যে আমি বোলে যাব হাঁ সত্যি, আবার দুদণ্ড বাদে যদি ওর একটা ভুল বেরিয়ে পড়ে ত' হোলে কি অপ্রস্তুত হোয়ে পোড়ব? পাঠকেরা যে লেখকের কথা পালন কোর্ত্তে চান, সে লেখকের পাঠকদের চেয়ে একটা স্বতন্ত্র প্রাণী হওয়া আবশ্যক; পাঠকদের কাছে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিতে হবে যে, তিনি সব জানেন, তাঁর উপরে আর' কারু কিছু বলবার কথা নেই, বলবার কথা থাক্‌লেই তিনি একেবারে মাটি হোয়ে গেলেন। তার মূল কারণ, ছেলেবেলা থেকে আমরা শাসনের বশ, যুক্তির রাম্-রাজ্যে আমরা বাস করিনি। তুমি ঘর থেকে গোড়ে পিটে তৈরি কোরে আমাদের একটা অসন্দিগ্ধ আজ্ঞা দেও আমরা পালন কোরব, কিন্তু তোমার ঝুড়ি থেকে তোমার যুক্তির মাল মস্‌লা গুলি বের কোরে আমাদের সুমুখে একটি পরামর্শ তৈরি কর, সে কোন কাজে লাগ্‌বে না। কেননা আমরা ছেলে বেলা থেকে আমাদের গুরু লোকদের অভ্রান্ত বুদ্ধির উপর নির্ভর কোরচি, আমরা যেখেনেই আমাদের নিজের মত খাটাতে গিয়েছি সেই খেনেই তাঁরা ছেলে মানুষ বোলে আমাদের চুপ করিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু কখনো যুক্তি দিয়ে আমাদের মুগ্ধ করেন নি। ছেলে মানুষের কাছে যুক্তি প্রয়োগ করা তাঁরা বৃথা পরিশ্রম মনে করেন। আমাদের শাস্ত্রকারেরাও এক কালে তাই মনে কোর্ত্তেন, তাঁরা শ্রম সংক্ষেপ করবার জন্যে সত্য কথা গুলিও মিথ্যার আকারে

† অবশ্য শৈশব কালে এই রূপ আচরণই স্বাভাবিক কিন্তু এক জন ষোল বর্ষ বয়স্ক পুত্র ওরূপ ব্যবহার করিলে সেটা অত্যন্ত বেতালা ও বেসুরো হয় কি না একবার ভাবিয়ে দেখা হউক্—একটু যাহার বুদ্ধি হইয়াছে সে পুত্র শুধু শুধু কেনই বা ওরূপ করিবে, ষোল বর্ষের বালক পিতার নিকট পাঁচ বর্ষের শিশুর ভান করিয়া, অথবা দম্পতি-প্রেমোচিত অধীর ভালবাসার ভান করিয়া দৌড়া-দৌড়ি পিতাকে আলিঙ্গন করিলে সে যে কি এক অদ্ভুত দৃশ্য হয় তাহা বর্ণনাতীত। সং

প্রচার কোরেচেন, ও যুক্তির বদলে বিভীষিকা দেখিয়ে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছেন। যদি বল, গুরু লোকেরা আমাদের চেয়ে জ্ঞানী, সুতরাং তাঁদের হাতে আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে গচ্ছিত রাখা আমাদের পক্ষে ভাল। তা' যদি বল, তা হোলে ইংরাজদের কাছ থেকে কতকগুলি স্বাধীনতা পাবার জন্যে আমরা খবরের কাগজে দাপা দাপি কোরে মরি কেন? ইংরাজরা যে আমাদের চেয়ে জ্ঞানে ও গুণে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। সম্পর্কে-বড় কিম্বা বয়সে-বড়র চেয়ে গুণে-বড়র কাছে আত্ম-বিসর্জ্জন করা ঢের বেশী যুক্তিসিদ্ধ*। তবে কেন তাঁদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না কোরে আমরা নিজের হাতে কতকগুলি স্বাধীনতা নিতে চাই? তুমি বোলবে, যাঁদের আমাদের উপরে স্বাভাবিক অধিকার আছে, তাঁদের কাছে আমরা সর্ব্বতোভাবে আজ্ঞাবহ হোয়ে থাকব। তা' থাক না কেন? কিন্তু ফলে যে সমানই কথা। তোমার চড় মারবার অধিকার আছে বোলে যে চড় খাবে তার যে কিছু কম লাগ্‌বে তা'ত নয়। উদয়পুরের মহারাজ শত সহস্র যুক্তির বাণ বর্ষণ কোরলেন, আমি রণে অটল, কিন্তু যেই তিনি তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র বের কোরেছেন. যেই তিনি বোলেছেন যে, কার্লাইল ও কথাটা মানেন না, অমনি আমাকে রণে ভঙ্গ দিতে হয়। আমরা বড় লোকের নামের ঢেউ দেখ্‌লেই যুক্তির হাল ছেড়ে দিয়ে বোসে থাকি। কিন্তু এরকম না হওয়াই আশ্চর্য্য। আমাদের নীতিশাস্ত্রে গুরু লোকের কাছে সম্পূর্ণ রূপে আত্ম বিসর্জ্জন করাই হোচ্চে পুণ্য*। ছোটদের পক্ষে গুরুদের আজ্ঞা পালন করা বাস্তবিকই ভাল, আমি ছোটদের গুরুদের বিপক্ষে বিদ্রোহ কোর্ত্তে বলচি নে, কিন্তু গুরুদের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন যে, তাঁরা যেন ছোটদের আজ্ঞা না করেন; হয় অনুরোধ করেন নয় কারণ প্রদর্শন করেন,

* একথাটি হৃদয়-শূন্য মস্তিষ্কের কথা। সম্পর্কের বড়র সঙ্গে হৃদয়ের যেমন যোগ, জ্ঞানে ও গুণে বড়র সঙ্গে সেরূপ হওয়া দুর্ঘট। সং

* মস্তিষ্কের গুরুলোককে আমি মস্তিষ্কের ভক্তি করিব হৃদয়ের গুরু লোককে হৃদয়ের ভক্তি করিব, একথাটি লেখক বোধ হয় বিস্মৃত হইয়াছেন। কার্লাইলের মতের সহিত আমার মতের অনৈক্য হইলে আমি তাঁহার সহিত কঠোর সঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতে তাঁহার মনে আঘাত লাগিবে কি না লাগিবে তাহা আমি একবার মনেও করিব না, কিন্তু গুরু জনের সহিত কোন বিষয়ের তর্ক করিবার সময় একেবারেই তাঁহার বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করিতে মনের প্রবৃত্তিই হইবে না,—ভালবাসার রীতিই এইরূপ। যদি বা গুরু জন অপেক্ষা কোন বিষয় আমি ভাল বুঝি তাই বলিয়া কি সেই ভাল-বোঝাটুকুর মূল্য এতই অধিক যে, "এ বুদ্ধির কাছে, কেবা কোথা আছে," যদি বুদ্ধি জারি করা নিতান্তই প্রয়োজন হয় তবে তার দেশ কাল পাত্র আছে, তার প্রথা আছে,—তর্কের অনুরোধে গুরু জনের মনে পীড়া দিতেই হইবে, কোন মতে ছাড়া হইবে না, কোন দেশের কোন শাস্ত্রে এরূপ লেখে না। সং

যখন কারণ প্রদর্শন কোরেও ফল হোল না, তখন একটুখানি গুরুত্ব প্রয়োগ কোর্ত্তে পারেন। কেন না, অপরিমিত ভক্তির রাজ্যে যুক্তির অত্যন্ত হীন পদ; তিনি ক্রমে মুষড়ে যেতে থাকেন যে, অবশেষে তাঁর আর মাথা তোলবার শক্তি থাকে না। দুর্ভাগ্য ক্রমে আমাদের আবার একটা আধটা গুরুলোক নয়, পদে পদে গুরুলোক। এই রকম ছেলে বেলা থেকে গুরুভারে অবসন্ন হোয়ে একটি মুমূর্ষু জাতি তৈরি হোচ্চে। ছেলে বেলা থেকে বলের অন্ধ দাসত্ব কোরে আস্‌চে সুতরাং বড় হোলে সে অবস্থা তার নতুন বা অরুচিজনক বোলে ঠেকে না, তা'র কাছে এ অবস্থা স্বাভাবিক হোয়ে গেছে। আজ্ঞা * পালন কোরে কোরে তার এমন অবস্থা হোয়ে যায়, যে, আজ্ঞা কোরে বোল্লেই তবে সে একটা কথা গ্রাহ্য করে, বুঝিয়ে বোলতে গেলেই তবে বেঁকে দাঁড়ায়। এখনকার বিখ্যাত বাঙ্গলা লেখকদের লেখার কেমন একটা আজ্ঞার ভাব দেখতে পাওয়া যায়, কথাগুলি অসন্দিগ্ধ, স্পষ্ট, জোর দেওয়া; পাঠকদের সঙ্গে সমান আসনে বোসে যে বিচার কোর্‌চেন তা মনে হয় না, কিম্বা কথা কোয়ে কোয়ে যে চিন্তা কোর্‌চেন তা'ও মনে হয় না; তাঁরা কতকটা গুরু মহাশয়ের মত কথা কন; মনে হয় হাতে একটা বেত আছে, চোখে একটা চস্‌মা আছে, মুখে একটা কঠোর স্বাতন্ত্র্যের ভাব বর্ত্তমান; ইরাংজিতে যাকে dogmatic বলে, তাঁদের লেখার আপাদ মস্তক সেই রকম। তা'তে তাঁদের দোষ নেই; নইলে পাঠকেরা তাঁদের কথা মানে না; পাঠকেরা যেই দেখেছেন, তুমি একটু ইতস্ততঃ কোরচ, কিম্বা একটা কথা খুব জোর দিয়ে বোলচ না, কিম্বা তোমার উচ্চ আসন থেকে এতদূর পর্য্যন্ত নেবে

* পুত্র বড় ও উপযুক্ত হইলে গুরুজনেরা কখনই তাহাকে বল-পূর্ব্বক পরিচালন করেন না। গুরু-জনেরা সত্য সত্যই কিছু এরূপ বোধশূন্য পাষাণ-অবতার নহেন যে, ছেলেপিলেদের উপর ক্ষমতা জারি করিবার জন্য তাহাদের উপর তাঁহারা প্রভুত্ব করেন; আর ছেলে পিলেরাও পেটে থেকে পোড়েই কিছু এতদূর বুদ্ধি-বিদ্যার বৃহস্পতি হয় না যে গুরুজনের কথা শুনিয়া চলিলে তাহাদের উপকার না হইয়া অপকার হয়—তাহার স্বাধীন বুদ্ধি খেলিতে পায় না—বুদ্ধিবৃত্তি দমনে থাকে, মন দমিয়া যায়, ইত্যাদি। প্রকৃত কথাটা এই, ছোট বালকদিগের পক্ষে শরীর চালনা ও সামান্য স্মরণ-শক্তি চালনাই যথেষ্ট, বালকদিগকে অতিশয় বুদ্ধি-চালনা শিক্ষা দিয়া তাহাদের অল্প বয়সেই প্রবীণ করিয়া তুলিলে তাহাদের মূলে আঘাত করা হয়। প্রকৃতি এইরূপ শিক্ষা দেন যে শরীরের স্ফূর্ত্তি প্রথমে, মনের স্ফূর্ত্তি তাহার পরে এবং বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি সবাকার শেষে হইলেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়; এমন কি নিউটন রাফেএল প্রভৃতি অসাধারণ লোকেরাও তাঁহাদের গুরুদিগকে দেবতুল্য (অর্থাৎ আপনা হইতে অনেক বড়) জ্ঞান করিতেন। আগে যাঁহারা শ্রদ্ধাবান ভক্তিমান আজ্ঞাকারী সাকরেত না হয়, পরে তাহারা কখনই ওস্তাদ হইতে পারে না—ইহা বেদবাক্য। সং

এসেছ যে, তাঁদের সঙ্গে সমান ভাবে বিচার কোর্ত্তে প্রবৃত্ত হোয়েছ, তা' হোলেই তোমার কথা একেবারে অগ্রাহ্য হোয়ে দাঁড়ায়। তুমি যুক্তি না দেখিয়ে একটা কথা জোর কোরে বল', (অবিশ্যি তোমার একটু নাম থাকা দরকার, তাঁরা মনে করেন, "এটা বুঝি, একটা ধরা কথা, কেবল অজ্ঞতা বশতঃ আমরা জানিনে," তাঁরা অপ্রস্তুত হোয়ে সমস্বরে সবাই মিলে বোলে ওঠেন "হাঁ একথা সত্য, একথা সত্য" তাঁদের এর মধ্যে কোনটা স্বাভাবিক ‡? আমাদের পরিবারে গুরুলোকদের পরে এই রকম একটা অস্বাভাবিক ভক্তির উদ্রেক কোরে দেওয়া হয়, গুরুলোকেরাও সেই অন্ধ-ভক্তির প্রভাবে বলীয়ান্ হোয়ে ছোটদের উপর যথেচ্ছ-ব্যবহার করেন। তাঁরা চান, তাঁদের সমস্ত মত, সমস্ত আজ্ঞা ছোটরা অবিচারে শিরোধার্য্য কোরে নেয়, সে বিষয়ে তারা তিলমাত্র দ্বিরুক্তি বা দ্বিধা না করে; যেন ছোটরা কতকগুলি কলের কাঠের পুতুল, তাদের মন নেই, তাদের মনোবৃত্তি নেই, তাদের ইচ্ছে নেই, তাদের বিচার-শক্তি নেই! সংসারে তোমার যত প্রকার বড় আছে (কেবল লম্বায় বড় ছাড়া) তা'দের কাছে তোমার বিবেচনা ও ইচ্ছে কিছুমাত্র খাটিয়ো না, সে গুলি আপাততঃ সঞ্চিত কোরে রেখে দেও, অবসর পেলে তোমার ছোটদের কাছে তা অন্ধভাবে খাটাতে পার্ব্বে; তা'তে সমাজের কোন আপত্তি নেই। আমাদের শাস্ত্রে বলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা * পিতৃতুল্য, কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুত্রতুল্য;

---

‡ গুরুজনের সঙ্গে সখারসের আলাপ করা অস্বাভাবিক কি স্বাভাবিক ইহা হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর—যিনি সর্ব্বতোভাবে তোমার ভাল চা'ন তাঁকে কোন রূপে কোন পীড়া দিতে তুমি চাও না; তুমি জান যে তোমার কোন বিষয়ে একটু কিছু ত্রুটি দেখিলে তাঁহার মনে যত লাগিবে এত আর কাহারো মনে লাগিবে না, এই জন্য তাঁর কাছে তুমি ভয় ভয় করিয়া চল; ইহা নিশ্চয় জানিও এরূপ ভয় ভালবাসা-হইতেই জন্মগ্রহণ করে; পুত্র যদি পিতাকে ভাল না বাসে তবেই সে তাহার পিতার মনে আঘাত দিতে কিছুমাত্র ভীত বা সঙ্কুচিত হয় না—সুতরাং সে-তাহার-ভয় কঠোর শাসন-ভয় হওয়া দূরে থাকুক তাহা অতি সুকোমল ভালবাসার ভয় সুতরাং অতি সন্তর্পণে রাখিবার সামগ্রী। বন্ধুবর্গের সহিত যখন আমরা সখারসে মিলিত হই তখন আমরা অনেকটা অসংকোচ ভাবে চলাবলা করি,—কেন? না বন্ধুরা পিতার ন্যায় আমাদের মঙ্গলের জন্য একান্ত লালায়িত নহে; বন্ধুদিগের লক্ষ্য আমোদ প্রমোদের দিকে, পিতার লক্ষ্য প্রকৃত মঙ্গলের দিকে; আমোদ-প্রমোদের পক্ষে ঢিলাঢালা ভাব যেমন আবশ্যক, মঙ্গলের পক্ষে সংযত ভাব তেমনি আবশ্যক—বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে মনের শৈথিল্য স্বভাবত শোভা পায়, গুরুজন সন্নিধানে মনের সংযত ভাব স্বভাবতঃ শোভা পায়; তা' যদি না বল, তবে ভক্তি শব্দটাকে অভিধান হইতে উঠাইয়া দেও। সং

* ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে শাস্ত্রের অভিপ্রায় এরূপ নয় যে এক আধ বৎসরের ছোটবড় ধর্ত্তব্য, এখানে এই ইংরাজি প্রবাদটি স্মরণ করা উচিত, Letter killeth but spirit giveth life। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে জন্মিতে দেখিয়াছে; পিতা মাতা

শুনে শুনে অভ্যেস হোয়ে গেছে বোলে ও আমাদের দেশে এই রকম একটা ভাব বর্ত্তমান আছে বোলে এর হাস্যজনকতা ঘুচে গিয়েছে; নইলে এর চেয়ে অদ্ভুত আর কি হোতে পারে? ভ্রাতা কি ভ্রাতার তুল্য হোতে পারে না? সংসারে কি পিতা পুত্র ছাড়া আর কোন প্রকার সম্পর্ক নেই? ভাই ভাইয়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বোলে কি একটা ভাব বর্ত্তমান নেই? কোন প্রকারে কান ধোরে ভাই ভাইয়ের সম্পর্ক কি পিতা পুত্রের সম্পর্কের সঙ্গে মেলাতে হবেই? এমন যন্ত্রণাও ত দেখি নি। তা' হোলে ত তুমি বোল্‌তে পার, হাত মাথার তুল্য; কিন্তু আমি বলি ওরকম তুলনার স্পৃহাটি পরিত্যাগ কোরে হাতকে হাতের স্থানে ও মাথাকে মাথার স্থানে স্ব স্ব কাজে বজায় রাখা হোক্। প্রকৃতি যা'কোরে দিয়েছেন সেটাকে ভেঙ্গে চুরে মুচ্‌ড়ে একটা বিকৃতাকার কোরে তুল'না। আমাদের দেশের শাস্ত্র যেমন (শাস্ত্র বোধ হয় সকল দেশেই সমান) আজ্ঞা করে, বুঝিয়ে বলে না, ভয় দেখায়, কারণ দেখায় না, আমাদের গুরুলোকেরাও তাই করেন। তাঁরা প্রতি-পদে কারণ না দেখিয়ে আজ্ঞা করেন, ছোট যদি একবার জিজ্ঞাসা করে, "কেন?" তা' হোলে তাঁরা চোক রাঙিয়ে বলেন "হাঁ, এত বড় আস্পর্দ্ধা!" এতে যে ছোটদের মনের একেবারে সর্ব্বনাশ করা হয়, তা' তাঁরা বোঝেন না। একটা ঘোড়া কিম্বা একটা গাধা কিম্বা এক পাল গরুকে অবিচারে যেখানে ইচ্ছে চালিয়ে বেড়াও তাতে হানি নেই, কেন না তাতে বড় জোর তাদের শরীরের কষ্ট হবে, কিন্তু তাতে তাদের মনোবৃত্তির বিকাশ ও বিচার-শক্তি পরিস্ফু-

---

যেমন তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া আদর করে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও তাহাকে সেইরূপ আদর করিয়াছে, তাহার পাঠাদি শিক্ষার সহায়তা করিয়াছে, তাহার যাহাতে প্রকৃত মঙ্গল হয় তাহাতে সচেষ্ট হইয়াছে, বন্ধুবর্গ যেমন বন্ধুবর্গের সহিত আমোদ করিতে পারিলেই পরস্পরের মঙ্গলামঙ্গলের অতি অল্পই খোঁজ খবর রাখে—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভাব সেরূপ নহে; কনিষ্ঠ ভ্রাতার যদি কোন অমঙ্গলের সূত্রপাত হয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অমনি তাহার প্রতিবিধানের জন্য সচেষ্ট হয়; এ সকল আমলে না আনিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলে যে, "তুমি কেবল বয়সেই জ্যেষ্ঠ" এরূপ কথাতে ভ্রাতৃভাব না ভ্রাতৃ-ভাবের অভাব কোন্‌টি প্রকাশ পায়? ইংরাজরা যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হুট্ করিয়া উড়াইয়া দেয়, অথবা তাহার সহিত বয়ো-বিরুদ্ধ সখ্য ভাবের কথাবার্ত্তা কহিতে লজ্জা বোধ না করে, তাই বোলে আমা-দেরও কি সেইরূপ না করিলেই নয়! ইং-রাজদিগের সভ্যতার ছোবড়া ভক্ষণ করিতে যাঁহারা ভালবাসেন তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দেও;—তাঁহারা দেখেন স্বাধীনতা, শেখেন পর-জাতির দাসত্ব; দেখেন civilization, শেখেন Devilization; দেখেন স্বদেশানু-রাগ, শেখেন স্বদেশের প্রতি নির্ম্মমতা; দেখেন স্বদেশীয় পরিচ্ছদ, স্বদেশীয় আচার ব্যবহার, স্বদেশীয় চাল-চলন, ইত্যাদি সকলের প্রতি ন্যায়-সঙ্গত পক্ষপাত, শেখেন কি? না স্বদেশীয় পরিচ্ছদের প্রতি স্বদে-শীয় আচার ব্যবহারের প্রতি, স্বদেশীয় সু-রীতি সকলের প্রতি ন্যায়-বিরুদ্ধ বিরাগ। সং

টনের কোন ব্যাঘাত হবে না, কিন্তু কোন মানুষকে সে রকম কোর না, বিশেষতঃ তোমার নিজের ভাই, নিজের ছেলেকে। তুমি নিশ্চয় জেনো যে, ছেলেবেলা, যখন আমাদের মন খুব কোমল থাকে, তখন থেকে যদি আমরা ক্রমাগত যুক্তিবিহীন আজ্ঞা পালন কোরে আস্‌তে থাকি, বড় লোক বোলচেন বোলেই দ্বিরুক্তি না কোরে সব কথা আমাদের শিরোধার্য্য কোরে নিতে হয়, তা'হোলে বড় হোলেও আমাদের মনের সে অস্বাভাবিক অভ্যাস দূর হয় না, প্রশ্ন করার স্বভাবটা একবারে চোলে যায়, আর সে রকম মনে কুসংস্কার অতি শীঘ্র আপনার শিকড় বিস্তার কোর্ত্তে পারে *। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের একবার দেখ না, তাঁরা অনেক পোড়েছেন, কিন্তু তবু নিজের একটা স্বাধীন মত প্রকাশ কোর্ত্তে তাঁদের কেমন সাহস হয় না; যদি মিল কিম্বা স্পেন্সেরের নাম কোরে তাঁদের নিতান্ত একটা আজগুবি কথা বল, দ্বিরুক্তিমাত্র না কোরে তা' তাঁরা মাথায় কোরে নেন; বিলিতি কেতাবে ইংরাজি ছাপার অক্ষরে যা' লেখা আছে, তা' তাঁরা আর বুঝে হজম কোর্ত্তে শ্রম স্বীকার করেন না, শুক পাখীর মত মুখস্থ কোরে যান, কেননা বিলিতি "authority"র উপর তাঁদের এমন অটল ভক্তি যে, বিচার না কোরেই ধোরে নেন যে, কথা গুলো সত্য হবেই! তা'তে আমি তাঁদের দোষ দিতে পারিনে; কেন না ছেলে বেলা থেকে তাঁদের মন এমনি ছাঁচে গড়া যে, বড় লোকের মুখের সামনে একটা প্রশ্ন কোর্ত্তে তাঁদের বুক ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করে, বড় লোক যা' বোলেছেন তা'র উপরে আর কথা নেই †।

* গুরুজনের প্রতি ভক্তি-অভক্তি ও শিক্ষার সুপ্রণালী কুপ্রণালী এ দুটি বিষয় স্বতন্ত্ররূপে বিচার্য্য। সং

† আমরা আমাদের নিজের জীবনের পরীক্ষাতে দেখিয়াছি যে, লেখক যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। আমরা দেখিয়াছি যে, যাঁহারা যথার্থ ভক্তির পাত্র তাঁহাদিগকে ভক্তি করিলে মনুষ্যের স্বাধীনতা বৃদ্ধি হয় বই হ্রাস হয় না; শুভাকাঙ্ক্ষী গুরুজনের প্রতি, জননী জন্মভূমির প্রতি, মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ত্বের প্রতি যদি ভক্তি সমর্পণ না কর, তবে কাজেই চটকলাগানো,মন-ভোলানো, ভড়ঙ্‌-দেখানো যা' তা' তোমার চক্ষের সামনে পড়িলেই তা'রি কাছে ভক্তির অপব্যয় করিতে মন তোমার ধাবিত হইবে; আমি বিশেষ এক ব্যক্তিকে জানি, যাহার স্বদেশের প্রতি ও গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তি থাকাতেই সে এত গুলি মহা প্রভুর দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে রক্ষা পাইয়াছে—(১) মিল প্রভৃতি পণ্ডিতগণের অতিবাদ (২) রঙচঙে ইংরাজী সভ্যতা, (৩) ছুট্‌পেটে ইংরাজী চাল-চলন, (৪) সুরুচি-বিরুদ্ধ সংক্ষিপ্ত-সার ইংরাজী ঢঙের কোর্ত্তা—যাহা তাহারা নিজেই তাহাদের স্বদেশীয় বড় লোকদের প্রস্তর মূর্ত্তির গায়ে পরাইতে নারাজ, (৫) দেশীয় ভাষার প্রতি অবহেলা, ইত্যাদি। সার কথা এই যে গুরুভক্তি (অর্থাৎ শুভাকাঙ্ক্ষী উচ্চ উচ্চ লোকদের প্রতি ভক্তি) এবং সর্ব্বোচ্চ ধরিতে গেলে ঈশ্বর-ভক্তি স্বাধীনতার প্রাণ; স্বাধীনতা হইতে ভক্তিটিকে তফাৎ কর, অমনি তাহা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হইবে। সং

তবে দুই বড় লোকের মধ্যে যখন মতের অনৈক্য হয়, তখন আমরা চুপ কোরে অপেক্ষা কোর্ত্তে থাকি আর এক জন বড় লোক এসে তার কি মীমাংসা কোরে দেন। যেখানেই অন্ধ একাধিপত্য সেইখানেই খারাপ। যখন গুরুলোকেরা আপনার ইচ্ছা ও সংস্কার, এমন কি কুসংস্কারের বিরোধী হোল বোলে ছোটর প্রতি ইচ্ছা অবিচারে দলন না কোর্ব্বেন, তখন অনেক উপকার হবে *। আমাদের দেশের অশুভের মূল ঐখান থেকে অনেকটা পোষণ পাচ্চে। এখানকার তুলনায় আমি সেইটি ভাল কোরে বুঝ্‌তে পেরেছি। স্থ—বি—দের দেখ, তাদের উদ্যম, উৎসাহ, অধীর বাল্য ভাব ও স্বাধীনতা-স্পৃহার সঙ্গে আমাদের দেশের ছেলেদের শুষ্ক, মলিন, গম্ভীর ধীর ভাব, † ও সম্পূর্ণরূপে পর-নির্ভরতার তুলনা কোরে দেখ, সে কি অনৈক্য! আমি ইংরেজের ছেলেদের সঙ্গে তুলনা কোরলুম না, পাছে তুমি বল তা'দের জাতিগত স্বভাবের সঙ্গে আমাদের জাতীয় স্বভাবের ভিন্নতা আছে। কিন্তু আমাদের দেশীয় ছেলেই যথোপযুক্ত স্বাধীনতার সঙ্গে পালিত হোলে তার কি রকম স্ফূর্ত্তি হয়, তা'র মনের স্বাস্থ্য কি রকম অক্ষুণ্ণ থাকে তাই দেখ। ছেলেদের স্বাভাবিক ভাব হোচ্চে প্রশ্ন করা, একটা জান্‌বার ইচ্ছে; এখানকার ছেলেরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরে কোরে সারা হয়। স্থ-আমাকে প্রশ্ন কোরে কোরে অস্থির কোরে তোলে; আকাশের তারা থেকে পৃথিবীর তৃণ পর্য্যন্ত এমন কোন পদার্থ নেই, বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটি কোরে সে যার ঘরের খবর না জান্‌তে চায়। আমি যখন টর্কিতে ছিলুম, তখন একটি ছেলে আমার সঙ্গে খুব ভাব কোরে নিয়েছিল; পৃথিবীর যা'কিছু দেখ্‌তো, তা'ই যেন তার ভারি আশ্চর্য্য লাগ্‌ত, প্রতিপদে প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন কোরে আমাকে ভারি মুস্কিলে ফেলত; তার কৌতূহলের আর আদি অন্ত নেই। তা'ছাড়া এখানকার ছেলেদের এক রকম স্বাধীন ও পৌরুষের ভাব দেখলে অবাক্ হোয়ে যেতে হয়। তা'র প্রধান কারণ, এখানকার গুরুলোকেরা তাদের প্রতিপদে বাধা দেয় না, আর অনেকটা সমান সমান ভাবে রাখে। আমি এখানকার একটা প্রাইবেট স্কুল দেখেছিলেম; মাষ্টার ছেলেদের সঙ্গে ঠাট্টাঠুট্টি করেন, খেলা করেন; কত যে স্বাধীনতা দেন তা'র ঠিক নেই; অথচ তা'তে কিছু তা'দের "মাথা খাওয়া" হয় নি; পড়া শু-

* পুত্র পিতার অসম্মতিতে বিবাহ করাতে পিতা তাহাকে বাটী হইতে দূর করিয়া দিয়াছে—ইংলণ্ডে ত সর্ব্বদাই এরূপ ঘটিতে দেখা যায়। সং

† রুগ্ন ছেলে-ভিন্ন অন্য কোন ছেলেকে আমি ত আজ পর্য্যন্ত শুষ্ক মলিন ধীর গম্ভীর দেখি নি। যে বয়সের যেটি স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম তাহা এখানেও যেমন বিলাতেও তেমনি—বিলাতে নয় ব্যাট বল্ খেলে আমাদের দেশে নয় গুলিডাণ্ডা খেলে, বিলাতে হাইড্ অ্যাণ্ড সীক্ খেলে আমাদের দেশে নয় লুকাচুরি খেলে—প্রভেদের এই পর্য্যন্ত সীমা। সং

নোতে তাঁদের কিছুমাত্র ত্রুটি নেই ‡। এই ত গেল, ছেলেদের কথা। আর বড়রা যে গুরুর সঙ্গে খুব কম সম্পর্ক রাখে তা' বলাই বাহুল্য। এখানে এমন স্বাধীন ভাব বর্ত্তমান, যে, প্রভু ভৃত্যের মধ্যেও সে রকম আকাশ পাতাল সম্পর্ক নেই *। এখানে চাকরকে গালাগালি দেওয়া ও মারাও যা, এক জন বাইরের লোককে গালাগালি দেওয়া ও মারাও তাই। আমাদের দেশের মত চাকরদের বেঁচে থাকা ছাড়া অন্য সমস্ত অধিকার মনিবদের হাতে নেই। চাকর কোন কাজ কোরে দিলে "Thank you," ও তাঁকে কিছু আজ্ঞা করবার সময় "Please" বলা আবশ্যক †। একবার কল্পনা কোরে দেখ দেখি, আমরা চাকরদের বলচি, "অনুগ্রহ কোরে জল এনে দেও।" বা "মেহেরবাণিকরকে পানি লেওয়াও।" ও জল এনে দিলে বলচি "বাধিত রইলুম।‡" তুমি হয়ত বলবে Thank you ও Please ও কেবল একটা মুখের কথা মাত্র। কিন্তু জাতীয় আচার ব্যবহার প্রতি পদে যে কথা তুটোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, জাতীয় হৃদয়ে তা'র কারণ নিশ্চয়ই বর্ত্তমান আছে। কিন্তু এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে হয়ত জোর কোরে তর্ক কোরচি, তুমি হয়ত মান যে, হৃদয়ের মাটিতে শিকড় না থাক্‌লে একটা কথা তিন দিনে শুকিয়ে মারা যায়। এখানে মনিবরা টাকা দেন ও চাকরেরা কাজ কোরে দেয় উভয়ের মধ্যে কেবল এইটুকু বাধ্যবাধকতা আছে; তুমি টাকা না দিলে চাকর কাজ করবে না, চাকর কাজ না কোরলে তুমি টাকা দেবে না; কিন্তু একটু খানি কাজের

---

‡ আমাদের দেশের টোলে এই রূপ প্রথাতেই শিক্ষা দেওয়া হইত, এক্ষণকার ইংরাজী বিদ্যালয়ের routine business প্রণালীতে বালকদিগের মন দমিয়া যায় ইহা আমি সম্পূর্ণ শিরোধার্য্য করি। সং

* আমাদের দেশের পাড়াগাঁ অঞ্চলেও এই রূপ দেখা যায়—লেখক সহরে Lord-দের ঘরে স্বতন্ত্র রূপ প্রথা দেখিবেন ইহা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি। সং

† লেখক এই মাত্র বলিলেন চাকর মনিবে বেশী তফাৎ ভাব নাই, ইহাতে বুঝায় যে, তাহারা বাড়ির লোকেরই সামিল; আমাদের দেশের গৃহস্থ মানুষদের ঘরেও চাকর মনিবের মধ্যে ঐরূপ ভাব দৃষ্ট হয়—তাহার সাক্ষী চাকরাণীকে ঝি বলিয়া সম্বোধন করিবার প্রথা; কিন্তু চাকরদের সঙ্গে পদে পদে সম্মানসূচক ব্যবহার করা—আষ্টে পৃষ্টে কাষ্ঠ-সভ্যতার ভার বহন করা—আমাদের দেশের সহজ-সভ্য লোকদিগের পোষায় না; গর্দ্দভও ভার বহন করিতে ভার বোধ করে, আমরা মনুষ্য হইয়া যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক আপন স্কন্ধে আপনি ভার চাপাই তবে তা'র চেয়ে আমরা বড় কিসে? সং

‡ এ সকল কৃত্রিম সভ্যতার না আছে অর্থ, না আছে কিছু; আমাদের দেশে এরূপ মৌখিক ভদ্রতার যত কম আমদানি হয় ততই ভাল; মনে কর ছেলের জ্বর হয়েছে আর যেই তার বাপ একটা হাতপাখা তুলে নিয়ে তার গায়ে বাতাস দিতে লাগল অমনি ছেলে বোলে উঠ্‌লেন " thank you বাবা"—এরূপ কাষ্ঠ সভ্যতা কাষ্ঠ হৃদয়ের উপরেই গুণ করিতে পারে, সহজ হৃদয়কে আগুন করিয়া তোলে। সং

ত্রুটি হোলে তা'কে ও তা'র অনুপস্থিত নির্দ্দোষ পিতা পিতামহ বেচারীদের সম্পর্ক-বিরুদ্ধ বিশেষণ প্রয়োগ করবার কি অধিকার আছে? এখানে চাকরদের মধ্যে দাসত্বের ভাব যে কত কম, তা' হয়ত তুমি না দেখ্‌লে ভাল কোরে বুঝতে পারবে না। আমি একটি পরিবার জানি, সেখানে মনিবরা রান্না ঘরে যেতে হলে রাঁধুনীর অনুমতি চেয়ে পাঠাতেন, পাছে তার কাজের মধ্যে intrude কোরলে সে বিরক্ত হোয়ে ওঠে! এর থেকে কতকটা বুঝতে পারবে। এই রকম এখানকার পরিবারে স্বাধীনতা মূর্ত্তিমান,কেউ কাউকে প্রভুভাবে আজ্ঞা করে না, ও কাউকে অন্ধ আজ্ঞা পালন কোর্ত্তে হয় না। এমন না হোলে একটা জাতির মধ্যে এত স্বাধীন ভাব কোথা থেকে আস্‌বে? কিম্বা হয়ত আমি উল্‌টো বলচি, একটা জাতির হৃদয়ে স্বভাবতঃ এতটা স্বাধীন ভাব না থাক্‌লে এমন কি কোরে হবে? যা'দের হৃদয়ে স্বাধীন ভাব নেই, তারা যেমন অম্লান বদনে নিজের গলায় দাসত্বের রজ্জু বাঁধতে পারে একটু অবসর পেলেই পরের গলায়ও তেমনি অকাতরে দাসত্বের রজ্জু বাঁধতে ভাল বাসে। আমাদের সমাজের আপাদ মস্তক দাসত্বের শৃঙ্খলে বদ্ধ। আমরা পারিবারিক দাসত্বকে দাসত্ব নাম দিই নে; কিন্তু নামের গিল্‌টি কোরে আমরা বড় জোর দাসত্বের লোহার শৃঙ্খলকে সোনার আকার ধরাতে পারি, কিন্তু তার শৃঙ্খলত্ব ঘোচাতে পারিনে, তা'র যা কুফলতা' থেকে যায়। আমি আগে মনে কোর্‌তুম যে, হিন্দুদের মনে একটা সহজ স্বাভাবিক ভাব আছে, কোন প্রকার অস্বাভাবিক বাঁধা বাঁধি, আইন কানুন নেই। কিন্তু কোন্ লজ্জায় আর তা' বোল্‌ব বল? হিন্দুদের মধ্যে অস্বাভাবিক আইন কানুন নেই? তাদের পরিবারের মধ্যে দেখ! আপনার ভাই বোন্ পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্রের মধ্যে কতটা বাঁধা বাঁধি আছে একবার দেখ! ভাইয়ের প্রতি কি রকম ব্যবহার কোর্ত্তে হবে তা' কোন্ দেশে শেখাতে হয় বল দেখি? তবে যদি বল যে, ভাইয়ের প্রতি পিতা বা পুত্রের মত ব্যবহার কোর্ত্তে হবে, তা' হ'লে শেখাবার খুব আবশ্যক করে বটে;* কোন মানুষের সহজ অবস্থায় আত্ম-

* মনে কর একটি বড় পুত্র এবং একটি ছোট পুত্র রাখিয়া পিতামাতা লোকান্তর গমন করিয়াছেন, এখন ছোটটিকে তাহার পিতা যেমন যত্ন করিতেন, তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহাকে সেইরূপ যত্ন না করিলে তাহার পক্ষে তাহা কর্ত্তব্য-বিরুদ্ধ, হৃদয়-বিরুদ্ধ ও নিন্দনীয় হয় কি না? পিতার অবর্ত্তমানে যাহা এইরূপ অবশ্যম্ভাবী—পিতা বর্ত্তমানে তাহা হইলে আরো ভাল হয় কি না? যে যাহাকে পুত্রের মত যত্ন করে তাহাকে সে পিতার মত ভক্তি করিবে কি না? ধাত্রীকে তাহার দুগ্ধ-পোষ্য শিশু স্বভাবতই মাতার মত এবং স্থল-বিশেষে তাহা অপেক্ষা অধিক ভালবাসে কি না? ধাত্রী পর হইয়াও যদি মাতার ন্যায় হইতে পারে তবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আপনার হইয়া কেন না পিতৃতুল্য হইতে পারিবে? বড়র প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা করিবে না ত কাহার প্রতি করিবে? সং

প্রত্যয় থেকে ও কথা মনে আস্‌বার কোন সম্ভব নেই। গুরু লোকদের কাছে বেশী কথা কওয়া বা হাসা পর্য্যন্ত নিষেধ। কি ভয়ানক! যাদের সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা * অনবরত থাকতে হবে, তা'দের সঙ্গে যদি মন খুলে কথা বার্ত্তা না কবে, প্রাণ খুলে না হাস্‌বে, তা'দের কাছেও যদি জিবের মুখে লাগাম লাগিয়ে, হাস্যোচ্ছ্বাসের মুখে পাথর চাপিয়ে, আর মুখের ওপর একটা সম্ভ্রমের মুখস্ পোরে দিন রাত্রি থাকতে হয় তা' হোলে কোথায় গিয়ে আর বিশ্রাম পাবে† ? ইনি দাদা, উনি কাকা, তিনি মামা, এ ছোট ভাই, ও ভাই-পো, সে ভাগ্নে, কারু কাছে ভাল কোরে মুখ খোলবার যোনেই *। কি করা যায়? বাড়ি থেকে বেরিয়ে বোসেদের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে আড্ডা গাড়তে হয়, সেখেনে পাঁচ জনে মিলে তামাক খাওয়া, দাবা খেলা, ও হাসি তামাসা করা যায়। এ দুর্দ্দশা কেন বল দেখি? আফিস থেকে এসে যেমন আফিসের কাপড় চোপড় ছেড়ে হাঁফ ছাড়া যায়, তেমনি বাড়িতে প্রবেশ করেই লৌকিক ব্যবহারের খোলষ পরিত্যাগ কোরে মনটাকে কেন একটুখানি হাত পা ছড়াতে দেওয়া হয় না? তখনো কেন আমি স্ত্রীর সঙ্গে চুপি চুপি ফিস্ ফিস্ কোরে কথা কব, পাছে পাশের ঘর থেকে শ্বশুর ভাশুর বা ঐ রকম একটা কোন মান্যবর পরম পূজনীয় সম্পর্কের ব্যক্তি আমার স্ত্রীর গলা শুনতে পায়? স্ত্রীর গলা বা হাসি শুন্‌লে কার কি সর্ব্বনাশ হয় বল দেখি? একেই কি সহজ-শোভন ভাব বলে? এর মধ্যে সহজ ভাব টা কোন্ খানে বল দেখি? বিলিতি-বাঙ্গালীরা যে দেশে ফিরে গিয়ে খুঁৎ খুঁৎ করেন, ও বলেন, আমাদের দেশে "Home" নেই, বিলেতেই যথার্থ "Home" আছে; তাঁরা বোধ হয় তা'র এই অর্থ করেন যে, বিলাতের পরি-

* চব্বিশ ঘণ্টা গুরুলোকদের সঙ্গে থাকলে ছেলেরা দুদিনে বুড়িয়ে যায়—কোন ছেলেকে আজপর্য্যন্ত ওরূপ করিতে দেখি নাই। সং

† গুরুলোকেরা শিক্ষার স্থান, ভক্তি শ্রদ্ধার স্থান; বিশ্রামের স্থান বা বিনোদের স্থান নহেন; তাঁহারা যদি বিনোদের স্থান হইবেন, তবে সমবয়স্কেরা কি করিতে রহিয়াছে;—ক্ষুধার জন্য অন্ন রহিয়াছে, তৃষ্ণার জন্য জল রহিয়াছে, ইহা বিস্মৃত হইয়া ক্ষুধা পাইলে যে ব্যক্তি জল খায় ও তৃষ্ণা পাইলে ভাত খায়, সেই ব্যক্তিরই কর্ম্ম—বিনোদ ইচ্ছা হইলে গুরু-লোকের নিকট যাওয়া ও সদুপদেশ এবং উচ্চ সহবাসের ইচ্ছা হইলে সমবয়স্কদিগের নিকট যাওয়া; ভক্তিভাজন ব্যক্তির সম্মুখে মন স্বভাবতই প্রশান্ত সংযত ভাব ধারণ করে—মনঃসংযম যাহা অনেক শিক্ষার ফল তাহা আপনাআপনি হয়, এ কিছু কম কথা নহে। সং

* কেন মুখ খুলিবার জো নাই? অবশ্য মুখ খুলিবার জো আছে—কেবল এলোমেলো যা ইচ্ছা তাই বকিবার জো নাই। গুরুজনদিগের কথা বার্ত্তা, রীতি চরিত্র, দেখিয়া শুনিয়া বালকেরা কথা বার্ত্তা কহিতে বসিতে দাঁড়াইতে যত দিন না শেখে তত দিন তাহারা অসম্বদ্ধ প্রলাপ

বারে একটা স্বাধীন-উচ্ছ্বাসের ভাব আছে।† বাপ মা, ভাই বোন, স্ত্রী পুত্রে মিলে হাসি, গল্প, গানে, অগ্নিকুণ্ডের চার ধার উচ্ছ্বাসময় কোরে তোলে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর বাড়িতে এসে একটা উল্লাস একটা মেশামেশির ভাব দেখতে পাওয়া যায়।‡ এক ঘরে শ্বশুর তাঁর দুই চারটি বৃদ্ধ বন্ধু জুটিয়ে তামাক খেতে খেতে এখনকার ছেলে পিলেদের অশাস্ত্রীয় ব্যবহারে কলির দ্রুত উন্নতির আশঙ্কা কোরিছেন, আর এক ঘরে বউ সাত হাত ঘোমটা টেনে তাঁর

করিলে আদর বই ভৎর্সনা লাভ করে না এবং বালকদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চাপল্য হ্রাস পায় ও গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তিভাবের উদয় হয়, ইহা সকল দেশেই সমান। সং

† এইরূপ স্বাধীন উচ্ছ্বাসের ভাব দেখিবার জন্য বিলাতে যাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, এক জন সামান্য খৃষ্টান বাঙ্গালীর ঘরেও ঐরূপ স্বাধীন উচ্ছ্বাসের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সেরূপ উচ্ছ্বাস বাস্তবিক স্বাধীন উচ্ছ্বাস কিম্বা প্রবৃত্তির অন্ধ উত্তেজনা এইটির প্রতি একটু মনোযোগ করিলে ভাল হয়; দেশ কাল পাত্রোচিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া যে কার্য্য করা হয় তাহাই স্বাধীন নামের যোগ্য; স্বাধীন কিনা স্ববশ, কিন্তু স্ববশ দূরে থাকুক আমি যখন এরূপ অবশ হইয়া পড়িয়াছি যে গুরুজনের প্রতি একটুও দৃক্পাত নাই, আপনার সুখেই আপনি অচেতন, তখনকার সে মূঢ় ভাবকে স্বাধীনতা বলা আর পা-কে মাথা বলা—উভয়ই সমান; স্ত্রীর সহিত যেরূপ মন-খোলাখুলি করিয়া কথা-বার্ত্তা কহা যায় তাহা কি গুরুজনের শ্রুতি-যোগ্য, না গুরুজনেরা তাহা শুনেন ইহা কাহারো প্রার্থনীয়? স্ত্রী পুরুষদের নির্জ্জনে কথা বার্ত্তা কহিবার রীতি সকল দেশেই প্রচলিত আছে কেবল আমাদের দেশে নহে; ইহার কারণ এই যে, পতি-পত্নীর মধ্যে এরূপ অভেদ সম্বন্ধ যে উভয়ের মধ্যে গোপনীয় কিছুই নাই, সুতরাং পতি-পত্নী নির্জ্জনে যেরূপ কথা-বার্ত্তা কহে গুরু-জন-সমক্ষে তাহারা সেরূপ কথা বার্ত্তা কহিলে তাহাদের পতি-পত্নীত্ব ভূত-পেত্নীত্বে পরিণত হয়; পতি-পত্নী যখন গুরুজনসমক্ষে সর্ব্বান্তঃকরণে আলাপ করিতে পারে না, তখন সে জায়গায় আলাপ না করাই ত ভাল, যে জায়গায় আমি মন খুলিয়া হাসিতে না পারি সেখানে না হাসাইত ভাল, এই সকল সোজা বিষয়কে নানা রূপে বাঁকাইয়া তাহা কোন জন্মে যা' নয় তাই করিয়া তোলা বক্তৃতা-শক্তির অপব্যবহার ভিন্ন আর কিছুই নহে। সং

‡ একটা গল্প মনে পড়িল,—এক জন সহস্রমারী দলের কবিরাজ রোগীকে দেখিতে আসিয়া তাহার ঘরের লোকদের জিজ্ঞাসা করিলেন "আর কোন চিকিৎসককে কি দেখানো হইয়াছিল?" তাঁহারা বলিলেন "অমুক চিকিৎসককে দেখানো হইয়াছিল" কবিরাজ বলিলেন "তিনি কি বলিয়াছেন?" তাঁহারা বলিলেন তিনি বলিয়াছেন নাড়ীতে এখনো একটু বেগ আছে, আজকের দিন স্নানটা স্থগিত রাখিলে ভাল হয়" কবিরাজ ক্রোধান্বিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "আরে আমি কি বলচি ওকে অষ্ট-প্রহর জলে চুবিয়ে মেরে ফ্যাল!—আর কি বল্লেন?" উত্তর "আর বলেছেন আজকের দিন ভাত না দিয়ে খই বাতাসা এমনি-সকল সামগ্রী খেতে দেওয়া হয়" কবিরাজ বলিলেন "আরে আমি কি

খাশুড়ির কাছ থেকে নীরবে তাঁর দৈনিক তিরস্কার সেবন কোর্‌চেন, আর এক ঘরে স্বামী তাঁর দুই একটি যুবা বন্ধু জুটিয়ে নিন্দালাপ * কোর্‌চেন, এরকম চিত্র এ-খানকার কেউ কল্পনা কোরতে পারে না। আমাদের মুখ খোলবার জায়গা পরের কাছে। বউয়ের দুই চারটি সমবয়সী সই আছে, তাঁদের কাছে অবসর মত স্বামীর

বলচি ওকে গাণ্ডে পিণ্ডে যা' তা' খাইয়ে ওকে একেবারে শেষ কোরে ফ্যাল্‌" —ইত্যাদি। বিলাতি শাস্ত্র বোল্‌চেন—লোক জন মিলে মিসে আমোদ করা ভাল, আরে আমাদের শাস্ত্র কি বোল্‌চে—যে, দুজন লোককে এক ঠাঁই মিলে আমোদ কর্ত্তে দেখেচ কি আর অমনি মারো লাঠি! আমাদের দেশে কি, বন্ধুবর্গেরা একত্র মিলে মিসে আমোদ করে না, বাপ মার কাছে ছেলেরা বসিয়া কি কখন সুখের আস্বাদ পায় না, না স্ত্রী পুরুষেরা পরস্পরের সহবাসে সুখভোগ করে না, না ছেলে পিলেরা আপনাদের মধ্যে বাল্যক্রীড়া করিয়া সুখী হয় না? অপরাধের মধ্যে পতি-পত্নীরা পিতা মাতা শ্বশুর শাশুড়ীর সমক্ষে পরস্পরের সহিত বাক্যালাপ করে না, না করিল তাহাতে কাহার কি ক্ষতি হইল—পতি-পত্নীর পরস্পর হৃদয়-বিনিময়ের কিছু ব্যাঘাত জন্মিল, না বন্ধু-জনগণের আমোদের কিছু ব্যাঘাত জন্মিল, না পিতা পুত্রের স্নেহ ভক্তির কোন ব্যাঘাত জন্মিল,—যাহা ঠিক, যাহা স্বাভাবিক, যাহা সভ্যোচিত, যাহা শোভন তাহাই হইল—যাহা বেঠিক, বেচাল, অসভ্যোচিত, অশোভন তাহাই হইল না। অন্তঃপুরবাসিনীরা আপনাদের মধ্যে যেমন সখ্যরসের আলাপ করিতে পারে পুরুষদের সঙ্গে কখনই তেমন পারে না; যেখানে পাঁচ জন স্ত্রীলোকে মিলিয়া সখ্যরসের আলাপে নিমগ্ন হয় সেখানে পুরুষ মানুষ গেলে তাহাদের আমোদে ব্যাঘাত পড়ে; এজন্য সখার সখায় সম্মিলনের জন্য বহিরালয় এবং সখীতে সখীতে সম্মিলনের জন্য অন্তঃপুর সৃস্ট হইয়াছে; ইহাতে পরিবারের স্ত্রীলোকদের এবং পুরুষদের সম্মিলনের কোন বাধা নাই, দুই এক স্থলে যা বাধা আছে তাহা দেশাচারের কোটায় ফেলিয়া দেওয়া উচিত (কোন্‌ দেশের দেশাচার একেবারেই কুসংস্কার-বিহীন?) "বাধা নাই" কেবল নহে পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদের পুরুষদের মধ্যে সম্মিলন ঘটনার সময়ও নির্দ্ধারিত হইতে পারে, যেমন মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় ইত্যাদি; স্ত্রীলোকেরা আপনাদের মধ্যে যেমন অসংকোচে সখ্যরসের আলাপ করিতে পারে, পুরুষদের সঙ্গে তাহারা তেমনটি পারে না বলিয়া সখ্যালাপ-স্থলে এদেশে স্ত্রীলোকদের পুরুষদের একত্র সম্মিলনের প্রথা নাই। যদি কেবল অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে পুরুষেরা সন্ধ্যা-যাপন করে তবে তাহারা বাহিরের বন্ধুদিগের সঙ্গে মিলিয়া প্রকৃত পক্ষে সখ্যরস উপভোগ করিবে কখন্‌? যদি বল যে সখারা এবং সখীরা সকলে একত্রে মিলিয়া বন্ধুতালাপ করিতে হানি কি? তাহার এই উত্তর যে, তাহা হইলে ক্রমে এইরূপ দাঁড়াইবে যে, সখার সঙ্গে সখার কিংবা সখীর সঙ্গে সখীর বন্ধুতা অতি নিচু-দরের বন্ধুতা—সখা-সখীর মধ্যে চখা-চখীর ভাবই আসল বন্ধুতা! তাহার সাক্ষী—বল-মজলিসে পর-পুরুষদের সঙ্গে নাচিবার জন্য ইউরোপ-বাসিনীদের মন কেমন নাচিয়া উঠে। সং

* ইহাতে বুঝাইতেছে এই যে, নিন্দালাপই আমাদের একমাত্র আলাপ ও

ভালবাসার গল্প করে; শাশুড়ির কতকগুলি প্রৌঢ়া প্রতিবাসিনী আছে, সকলে মিলে পাড়ার অন্তঃপুরের সুস্বাদ গুপ্ত খবরের আলোচনা করা হয়, স্বামীর কতকগুলি যুবা বন্ধু আছে তাঁ'দের সঙ্গে কালেজীয় অশাস্ত্র আলোচনা চলে, আর শ্বশুরের চণ্ডীমণ্ডপে পাড়ার কতকগুলি খুড়ো ও দাদা মহাশয়ের আমদানি হয়, ও ঐ সকল পাকাবুদ্ধিতে মিলে ইহকাল ও পরকালের অনেক কঠিন বিষয় মীমাংসা করেন। আমাদের পরিবার পরকে আপনার কোরে নিতে হয়, কেননা আপনার সকলে পর। † অসদ্ব্যবহার বা পাপ-কার্য্যে লোকের স্বাধীনতা যত কমাও, ততই ভাল, কিন্তু নির্দ্দোষ এমন কি উপকারজনক বিষয়ে স্বাধীনতা যতকম ছাঁটা যায় ততই ভাল। শ্বশুরে স্ত্রীর গলা শুনলে পৃথিবীর কি হানি ও সরকের কি শ্রীবৃদ্ধি হয় বল দেখি? আপনার লোক সকলে মিলে মিশে গল্প স্বল্প কোরলে উপকার ছাড়া অপকার কি হয় বল দেখি? অনেকে সমাজের অনেক রকম বড় বড় সংস্কারের কথা পাড়েন, আমি একটা ছোট খাটো পরামর্শ দিচ্চি শোন দেখি, আমাদের পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্যজনক স্বাধীনতা সঞ্চার কোরে দেও দেখি; টানাটানি বাঁধাবাঁধি শাসন ও পরনির্ভরতা কমিয়ে দেও দেখি। তুমি হয়ত ভারি চোটে উঠেছ, তুমি বলচ যে "তুমি বিলেতে গিয়েছ, বিলেতে কি দেখেছ শুনেছ, তাই বল, আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনি; কিন্তু এরকম যদি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ কর, তাহোলে ত আর আমাদের ধৈর্য্য থাকে না!' কিন্তু তোমাকে এইখেনে বোলে রাখছি, আমি এ চিঠিতে টেম্‌স্‌টানেল ও ওয়েষ্টমিনিস্টর হলের বর্ণনা কোর্ত্তে বসি নি। বিলেতের সমাজ আদি দেখে আমার কি মনে হোল ও আমার কি রকমে মত পরিবর্ত্তন ও গঠিত হোল তাই বোলব। আজ আমার যে মত তোমাদের বিস্তৃত কোরে লিখলুম, তা' এখানকার সমাজ দেখে আস্তে আস্তে আমার মনে বদ্ধমূল হোয়েছে। একটা সমাজের ভিতরে না থেকে বাইরে থেকে বাইরে থেকে তা' আলোচনা কোরলে তা'র অনেক বিষয় যথার্থ রূপে চোখে পড়ে, ভিতরে থাকলে খুবকম বিষয় আমাদের চোখে পড়ে, সকলি স্বাভাবিক বোলে মনে হয়। আমার তাই একটি মহা সুবিধে, আর একটি সমাজের সঙ্গে তুলনা কোর্ত্তে পারচি। তোমার নিজের মতের সঙ্গে মিলিল না বোলে তুমি হয়ত বোলবে বিলেতে গিয়ে লোকটার মাতা ঘুরে গিয়েছে। এ কথা বোল্লে কোন যুক্তি না দেখিয়ে আমার সমস্ত কথাগুলো একতোপে

ইংরাজেরা সে রসে বঞ্চিত—gossiping শব্দের অর্থ তবে কি? বিবিদের সম্মিলনে নিন্দাবাদের ফোয়ারা কেমন খুলিয়া যায় তাহার একটি জাজ্বল্যমান ছবি লেখকের হস্ত দিয়া ভারতীতে পূর্ব্বে একবার বাহির হইয়া গিয়াছে।

† বিলাত হইতে ফিরে এলে অধিকাংশেরই এইরূপ দশা ঘটে।

উড়িয়ে দিতে পার। কিন্তু আমি তোমাদের বিশেষ কোরে বোলচি বিলেতে এসে কারু যদি মাথা না ঘুরে থাকে ত সে তোমাদের এই বিনীত দাসের।

সাধের ভাষাণ।

(গাথা)

কে ও উন্মাদিনী, কে ওই বালিকা,
সুধার সুরেতে ছাড়িছে তান,
আকাশ পাতাল, মোহিয়া কে ওই,
আপনার মনে গাহিছেগান ?

মলিন বসন, মলিন ভূষণ
এলো চুল রাশি উড়িছে বায়,
শইবাল পরে শতদল সম,
মুখানির শোভা বেড়েছে তায়।

নীল উতপল জিনিয়া দীঘল
নীল আভাময় নয়ন দুটি,
শূন্য ভাব ভরে. এদিকে ওদিকে,
চারিদিকে যেন বেড়ায় ছুটি।

কি যেন খুজিছে নিজেই জানেনা,
অথচ পরাণ কি যেন চায়,
চোখের সমুখে গিরি নদীবন,
দেখে ও যেন না দেখিছে তায়।

গরবে উথলি তটিনী ওইযে
আপনার মনে বহিয়ে যায়,
তীরে তীরে তার উন্মাদিনী বালা
ঐ শুন—ঐ—কি গান গায়,

ভৈরবী।

"ভুলে যাও ভুলে যাও ভুলে যাও দুখিনীরে
নহিলে হবে না সুখী একটি দিনের তরে।
এমনি অভাগী বালা, বিষাদ যাতনা জ্বালা
যেখানে যেখানে আমি মোর সাথে সাথে ফিরে,
কি বেদনা লাগে প্রাণে কহিতে ভুলিবার কথা
কেবলি যাতনা জীর্ণ মরমি জানে সে ব্যথা,
হোক তবু তাও সবে. তুমি নাথ সুখে রবে
তাই ভিক্ষা, হও সুখী ভুলে যাও অভাগীরে"

গাইতেছে বালা, জানে নাসে তবু
কি গান গাইছে ? কি মানে তার ?
স্মৃতি হ'তে সুধু আপনি উথলে
এছাড়া কিছুসে জানেনা আর।

গাহিতে গাহিতে চলেছে বালিকা
কিছুতেই যেন খেয়াল নাই,
আপনার ভাবে আপনিই ভোর
ধরায় যা হয় হোক্‌না তাই।

প্রখর হয়েছে রবির উতাপ,
প্রহর তিনেক হয়েছে বেলা,
নদীর উরসে, কিরণের রাশি,
চমকিছে যেন দামিনী মালা।

ও পারে অদূরে, ছোট ছোট ছোট,
শ্যামল সুনীল পাহাড়গুলি,
তাকায়ে রহেছে বালিকার পানে,
অটল শিখর মেঘেতে তুলি।

ঝর ঝর ঝর পড়িছে নিঝর,
কোথায় অথচ না যায় দেখা,
মাঝে মাঝে মাঝে, ভূধরের গায়,
ঝলসিছে সুধু রজত রেখা।

নদীর মধুর মৃদুল স্বরেতে,
মিশিছে মধুর নিঝর-তান,
বালিকা গাইছে আপনার মনে,
কোন দিকে তার নাহিক কান।

প্রখর উত্তাপ, হয়েছে, হোক না,
বালিকার তায় আসিবে কিবা,
বহে যদি ঝড়, বহুক ঝটিকা,
কিবা এল গেল নিশি কি দিবা।

কিন্তু একি একি, চমকি উঠিয়ে,
সহসা বালিকা থামিল কেন!
পরিচিত স্বরে, কে গাহিছে গান,
কেন রে হৃদয় অবশ হেন?

মনে পড়ে পড়ে—পড়ে না যে মনে,
কি ভাবে হৃদি এ উঠিল পূরে,
কে গাইছে গান, কে গাইছে গান
সেই সেই পুরান মোহিনী স্বরে!

কাঁপে যে হৃদয়, বেঁধে যে পরাণে,
গানের একটি একটি কথা,
একিরে বালার, বিভল হৃদয়ে
একিরে সহসা একিরে ব্যথা।

নিজেই জানে না, কি ভাবে আকুল,
মাথাটি ঘুরিয়ে আসিল তার,
নদীর ধারেতে গাছের তলায়,
রাখিল বালিকা শরীর ভার।

তরঙ্গে তরঙ্গে, তরনীটি রঙ্গে
নেচে নেচে নেচে চলিয়ে যায়,
যুবক কেওই, দাঁড়াইয়ে হোথা
বালার বেহাগ গানের উত্তর গায়?

"কেন বা ভুলিব তোরে কে ভোলে হৃদয় ধনে,
শূন্য এ হৃদয় লয়ে কি হবে বাঁচিয়ে প্রাণে।
আশাতে নিরাশ বলে, তোমারে কি যাব ভুলে,
সেতো নয়রে ভালবাসা সুখ আশা সঙ্গোপনে
চাহিব না ভালবাসা, রাখিব না সুখ আশা,
ভাল বেসেই সুখী আমি রব সখিমনে মনে,
প্রেমের প্রতিমা খানি, হৃদয় মন্দিরে আনি,
জীবন অঞ্জলি দিয়ে পূজিব লো সযতনে।"

ক্ষণেকে তরীটি, লাগিল তীরেতে,
যুবক একটি বিষাদ চেতা,
যে গাছের তলে, পড়েছিল বালা
আসিয়ে অমনি দাঁড়াল সেথা।

"সরলে আমার, একি তোর বেশ!
দেখেয়ে পরাণ ফাটিয়ে যায়"!
ফুটিল না আর, কথা বিনোদের,
নীরবে কেবল কাঁদিল হায়।

অবাক বালিকা, পাথর মূরতি
কথাও একটি নাহিক মুখে,
চাহিয়া রহিল, বিনোদের পানে
কি ভাবে কে জানে সুখে কি দুখে।

থেকে থেকে থেকে, নীরব নয়নে,
উথলি উঠিল শতেক ধারা,
ঝাঁপিয়া ধরিয়ে বিনোদের গলা,
কাঁদিয়া উঠিল আকুল পারা।

"চিনি যে তোমায়-সেই যে আমার,
এতদিন বল আছিলে কোথা,"
আবার অমনি, থামিল বালিকা,
সরিল না আর একটি কথা!

কি যেন বলিবে, সাধ আছে মনে
অথচ সকল গিয়েছে ভুলে,
আকুল পরাণে, চাহিল কেবল
সজল দুইটি নয়ন তুলে।

নীরব নয়নে, প্রেম তিরস্কার
বুঝিয়ে যুবক পাইল ব্যথা,
বালার হৃদয় বালা যা বোঝে না
যুবক বুঝিল নিগূঢ় কথা।

মুছায়ে সে ধীরে, নয়নের জল
বলিল যাতনা অস্ফুট স্বরে,
"শোন গো ললনে, কি জানিবে তুমি
কি দুখ পেয়েছি তোমার তরে।

যে দিন জানিনু, এ জগতে আর
তোমার সহিত হোল না বিয়ে,
যে দিন আমারে, ভুলিতে বলিলি
তুই লো যাতনা দলিত হিয়ে,
উঃ কি জ্বলনে, জ্বলে ওঠে প্রাণ,
যখনি সেকথা মনেতে পড়ে,
ছিঁড়ে খুঁড়ে যায়, মরম বাঁধুনি
তোর সে বিষণ্ণ মুখানি স্ম'রে।

জীবনের আশা, সুখের পিপাসা
সেই দিন হতে ছাড়িয়ে বালা,
সঙ্কল্প সঙ্কল্পিনু জীবন ত্যজিতে
এড়াতে সকল যাতনা জ্বালা।
জয়পুর আর, মেবারের সনে
শুনিনু বেধেছে বিষম রণ,
সেনানী হইয়ে কামানের মুখে
যুঝিনু করিয়ে পরাণ পণ।

কিন্তু হা এ ভাগ্যে, মরনো যে নাই
জানিনে জানিনে তখন বালা,
ভাবিনু নিশ্চিত কামান আগুণে
জ্বলি শেষ হ'বে হৃদয় জ্বালা।

মরণ হোলনা সমরে আমার
দেখলো বাঁচিয়ে রয়েছি আমি,
কিন্তু কি যাতনা, জ্বলেছে হৃদয়ে
জানেন কেবল অন্তর্যামী।"

বলিয়া যুবক চকিত নয়নে
চাহিল তখন স্বরগ পানে,
বালিকা তা দেখি কাঁদিল অধীরে
না বুঝিয়ে কিছু কথার মানে।

বলিতে বলিতে দুখের কাহিনী
যুবারো নয়নে বহিল ধারা,
গভীর সুখের জাগন্ত স্বপনে
আপনে হইয়ে আপনা-হারা।

ধরিয়ে বালার সজল মুখানি
রাখিয়ে আপন বুকেতে মাথা,
সুধাইল যুবা "বলগো সরলে,
তুমি গো কেমনে আসিলে হেথা?"
উত্তর না দিয়ে বলিল বালিকা
এক দিঠে তার মুখানি হেরে,
"বিনোদ তুমি যে বিনোদ আমার,
দিব না দিব না তোমায় ছেড়ে"
বলিয়ে ঈষৎ মাথাটি নাড়িয়ে
হাসিয়ে হাসিয়ে মধুর হাসি,
ধরিল যতনে, বিনোদের হাত
পাগল বালিকা হরষে ভাসি।

হরষে তাহার, উথলিত মন
কি করিবে কিছু ভেবে না পেয়ে,
নদী হতে গিরি, গিরি হতে পুন
আকাশের পানে দেখিল চেয়ে।

সহসা আবার কি ভাবে কে জানে
হাতটি তখনি ছাড়িয়ে ধীরে,
হরষে বিষাদে আধো আধো হাসি
ছুটিয়ে চলিল নদীর তীরে।

তীরের যেথায় একটি ধারেতে
বন ফুলে ফুলে পড়েছে ছেয়ে,
তুলিয়ে আনিল কত ফুল রাশি
বালিকা তখনি সেথায় যেয়ে।

নব নব নামে দীক্ষি ফুল গুলি
হরষে গাহিতে গাহিতে গান।
যুবার চরণে দিল উপহার
বিভল বালিকা বিভল প্রাণ।

"ফোটা ফুলগুলি আনিয়াছি তুলি
আঁখি দুটি মেলি, হের গো হের,
এইটি নলিনী, কাহাকে বলিনি
চুপি চুপি আমি, এনেছি ধর,
গোলাপটি অই, মোর হৃদি সই
সে যে তোমা বই, হবে না কারো,
হৃদিধনে ভুলে, তুলেছি বকুলে
সেঁউতির ফুলে, পর গো পর"
নয়নের জল, নয়নে শুকাল,
যুবক অমনি আহত হিয়া,
স্তম্ভিত ভাবে, রহিল দাঁড়ায়ে
বহেনা শোণিত হৃদয় দিয়া।

"এই সেই বালা, সেই সে মূরতি
অথচ বালিকা সে নয় যেন!
এত দিনু পরে, পেনু যদি নিধি,
কে জানে কপালে ঘটিবে হেন"
তড়িতের মত, কি তীব্র বেদনা,
চমকিয়ে গেল যুবার বুকে,
ভাঙ্গি গেল মোহ, দাঁড়ায়ে রহিল
অভিভূত হয়ে বিষাদ দুখে।

ফুল রাশি লয়ে ছড়াল সে অঙ্গে
বালিকা অবোধ চেতনা হীন,
সুখে দুখে যুবা, তা দেখি কাঁদিল,
হরষে বিষাদে হইয়ে লীন।
কাঁদিল যুবক, কাদিল বালিকা,
সামালিয়ে পুনঃ নয়ন ধারা,
বলিয়া উঠিল সহসা যুবক
যাতনায় যেন পাগল পারা।

"কি বলিব আর বলার কি আছে?
শোনগো ললনে শোনগো তুমি,
সাক্ষী রবিশশী সাক্ষী দেবতারা
সাক্ষী এ পবিত্র জনম ভূমি।

আজ হতে তুমি আমার ললনে
আমিও সরলে হইনু তোর,
এখনি যে তোরে করিব বিবাহ
হইবি ধরম বনিতা মোর।

দেখি আজি এতে কেবা দেয় বাধা
আসুক সহস্র প্রলয় ঝড়,
মরমের চির অতৃপ্ত বাসনা
পুরাইব এত দিনের পর।

বলি হাত হতে খুলিয়ে অঙ্গুরী
পরাইয়ে দিল বালার হাতে।
অনিমেষ চোকে, দেখিয়ে দেখিয়ে
হাসিল পাগল বালিকা তাতে।

ক্ষণেকে দুজনে উঠি তরণীতে
তখনি দিল সে তরণী খুলি,
চলিল তরণী, তর তর রঙ্গে
নদীর বুকেতে লহরী তুলি।
যুবাক্সে হৃদয়ে উঠিল লহরী
বিষাদ যাতনা সকল ভুলে,
গাহিল তখন হরষের গান
প্রমোদে হৃদয় পরাণ খুলে।
প্রণয় বিভল ঘুম ঘুম প্রাণে
হরষে যুবক গাহিল গান,
প্রতিধ্বনি দিল দূর হতে গিরি,
কাঁপিয়ে উঠিল তটিনী প্রাণ।

মেঘে মেঘে মেঘে, ছেয়েছে আকাশ
দেখা নাহি যায় চাঁদিমা আর,
নদীর উরসে, ঢেউ সাথে চলি
খেলেনা জোছনা রজত ধার।
মৃদুল পবন, বহেনাকো আর
গাছের একটি পাতা না নড়ে,
বহে কি না বহে, তটিনী কে জানে
ঢেউ তো একটি নাহিক পড়ে।
আঁধার আকাশ, স্তম্ভিত ধরা,
মন্ত্র-স্তব্ধ যেন চারিটি ধার,
কি বিপ্লব কথা, নীরবে কহিছে
থাকে না বুঝি বা জগৎ আর।
এ কাল-নিশায়, নাহি ভুক্ষেপি
ঝপ ঝপ ঐ চলেছে তরী,
প্রকৃতির ঘোর-নিস্তব্ধ-আকার
সে শবদে আরো ভীষণ করি।
সহসা অশনি কড় মড় মড়
ঘোষিল ভেদিয়া আঁধার নিশি,
নিবিড় জলদ, ভীম গরজনে
সঘনে কাঁপায়ে তুলিল দিশি।

বীর পরাক্রমে, এদিকে ও দিকে
মাতিয়ে বহিল পবনরাশি,
ধাঁধিয়ে দিগন্ত বেড়াইছে ছুটে
সুবিকট ঐ দামিনী হাসি।

নাহি সে তটিনী, প্রশান্ত মূরতি
সংহার মূরতি ধরেছে এবে।
সফেন তুফানে, আক্রমিছে বেলা,
ভেঙ্গেচুরে রেগে ফেলিছে সবে।

দুরবল তরী, তুফানে উঠিছে
আবার তুফানে পড়িছে কভু,
বিনোদের সাথে বালা সে তরীতে
কোন ভয় ডর নাহিক তবু।

হাসিলে দামিনী, হাসিছে বালিকা
উথলিলে ঢেউ উথলে হৃদি,
গরজিলে মেঘ হেসেই আকুল
কি ভয় কাছেতে বিনোদ যদি।

বায়ুর হুঙ্কারে উড়িছে তরণী
কোথা মাস্তুল, কোথায় হাল,
অটল গম্ভীর দাঁড়ায়ে বালিকা
উড়িছে পবনে চিকুর জাল।
হৃদয়ে তাহার, নারে প্রবেশিতে
বাহিরের দুঃখ বিষাদ কোন।
তাহারি আদেশে বহে যেন ঝড়
অধিষ্টাত্রী দেবী ঝড়েরি যেন।
"বহিছে ঝটিকা, ভীষণ তুফানে
গেল গেল আর রহেনা তরী,
আমরা দুজনে-দুজনে আমরা-
কি সুখ বালিকা যদি বা মরি"

বলিয়া বিনোদ বালিকার মাথা
রাখিয়া প্রণয়-পূরিত বুকে,
নাহি ভুরুক্ষেপি, সে প্রলয় ঝড়ে
ভাসিল গাহিতে গাহিতে সুখে।

মল্লার।

"ঘোষে বজ্র কড় মড়, কাঁপে পৃথ্বী থর হর
প্রলয় বিপ্লবে কাঁপে সর্ব্ব চরাচর,
উন্মত্ত পবন ছোটে, তটিনী গরজি ওঠে
তরঙ্গ ছুটিছে যেন সচল ভূধর।
পাগলিনী শোন ওরে,তোরে এই বুকে ধোরে
বাহিরের ঝড় জ্বালা পশে না অন্তর,
তরী যায় যায় ডুবে, কি ভয় আমরা উভে
সুখের শয়নে রব, নদীর ভিতর।
আয় সখি হৃদে রাখি, তুমি দেখ আমি দেখি
বাহিরে প্রলয় ঝড় হোক্ যা হবার"

জ্যামিতির নূতন সংস্করণ।

সমান্তরাধ্যায়।

[৩] রেখা বা ক্ষেত্র বা অন্য যে কোন জ্যামিতিক বস্তু, এবং তাহার ব্যাপ্তি স্থান দুয়ের মধ্যে শুদ্ধ কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে কথিত জ্যামিতিক বস্তু এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইতে পারে, কিন্তু তাহার ব্যাপ্তিস্থান স্থানান্তরিত হইতে পারে না, এই প্রভেদটি যদি ধরা না যায় তবে জ্যামিতির চক্ষে উভয়েই অবিকল সমান, এজন্য উভয়ের একটির সম্বন্ধে যাহা কিছু স্থিরীকৃত হয় অন্যটির সম্বন্ধে তাহাই খাটিতে চায়।

মন্তব্য। কখ রেখার ব্যাপ্তিস্থান নির্দ্দেশ করিতে হইলে সংক্ষেপে কখ স্থান বলিলেই চলিতে পারে। যদি এরূপ বলা আবশ্যক হয় যে, কখ সরল রেখাকে তাহার ব্যাপ্তিস্থান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া গঘ-সরল-রেখাকে সেই স্থানে বসাও, তবে সংক্ষেপে এই মাত্র বলিলেই চলিতে পারে যে, কখ রেখাকে গঘ স্থানে বসাও, কেন না তাহা হইলেই বুঝাইবে যে, গঘ রেখা সে স্থান হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। পুনশ্চ কোন রেখাকে যদি কোন রেখার গাত্রসাৎ করিয়া বসাইতে বলা হয় তবে তাহাতে ইহাই বুঝায় যে পূর্ব্বোক্ত রেখাকে শেষোক্ত রেখার স্থানে বসাইতে বলা হইতেছে।

(১৮) যে কোন রেখার দুই প্রান্ত দুই বিভিন্ন রেখার গাত্র স্পর্শ করিয়া রহে তাহা শেষোক্ত রেখাদ্বয়ের যোজক রেখা বলিয়া উক্ত হয়।

(১৯) যদি কোন রেখাদ্বয়কে স্ব স্ব স্থানে অবিচলিত রাখিয়া উভয়কে তাহাদের যোজক রেখার সহিত এরূপ অচ্ছেদ্য ভাবে বদ্ধ করা যায় যে, তিন রেখায় মিলিয়া একটি দৃঢ় বস্তু রূপে পরিণত হয়, তবে উক্ত রেখাদ্বয় উক্ত যোজক রেখার সহিত দৃঢ় বদ্ধ বলিয়া উক্ত হয়। (১১ সংজ্ঞা অনুসারে) ইহা হইতে আসিতেছে এই যে,

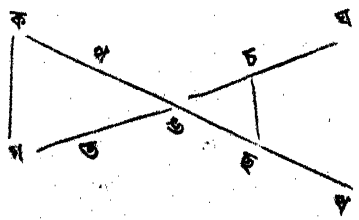
দৃঢ় বদ্ধ রেখাদ্বয়ের যতই চলাচলি হউক না কেন, তাহাদের অন্তর্গত কোন বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে দূরত্বের কিছুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে না।

{ ৩ } সরল রেখা-মাত্রই স্বীয় সমসূত্রে পথের উপর দিয়া (অর্থাৎ তাহার কোন বিন্দু তাহার সমসূত্র স্থানের বাহিরে না পড়ে এরূপ করিয়া) যতদূর ইচ্ছা ততদূর চালিত হইতে পারে।

(২০) যে কোন অসমসূত্র সরল রেখা-দ্বয় এরূপ যে, কোন যোজক রেখার সহিত তাহাদিগকে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া উভয়কে স্ব স্ব সমসূত্র-পথে যুগপৎ চালনা করা যাইতে পারে, তাহারা উভয়ে পরস্পরের সমান্তর বলিয়া উক্ত হয়।

৩। দুই সমান্তর রেখা পরস্পরের গাত্র স্পর্শ করিতে পারে না।

ক————খ　মনে কর দুই
গ————ঘ　রেখা কখ এবং
গঘ উভয়ে পরস্পরের সমান্তর তাহা হইলে উহারা কেহ কাহারো গাত্র স্পর্শ করিয়া থাকিতে পারে না।



যদি বল যে দুই সমান্তর রেখা কখ, গঘ, ঙ-স্থানে পরস্পরের গাত্রস্পর্শ করিয়াছে তাহা হইতে পারে না, কেননা,—কখ এবং গঘ এই দুই সমান্তর রেখা-দ্বয়কে কগ যোজক রেখার সহিত দৃঢ় বদ্ধ কর, তাহা হইলে কখ, গঘ উভয়ে যেহেতু সমান্তর এজন্য (২০ সংজ্ঞা অনুসারে) তাহাদিগকে যুগপৎ স্ব স্ব সমসূত্রে চালনা করা যাইতে পারে, মনে কর যে, কখ এবং গঘ স্ব স্ব সমসূত্র পথে চালিত হওয়াতে গঙ রেখাংশ তচ-স্থানে এবং কঙ রেখাংশ থছ স্থানে উপনীত হইয়াছে, তাহা হইলে ইতি পূর্ব্বে চ এবং ছ বিন্দু যখন ঙ-স্থানে ছিল তখন ও দুইটি বিন্দুর মধ্যে কিছু মাত্র ব্যবধান ছিল না এখন তাহাদের মধ্যে চছ সরলরেখা-পরিমাণ ব্যবধান বর্দ্ধিল, কিন্তু কখ এবং গঘ উভয়ে যেহেতু কগ-রেখার সহিত দৃঢ়বদ্ধ সুতরাং (১৯ সংজ্ঞানুসারে) কগ, কখ এবং গঘ তিন রেখায় মিলিয়া একটা দৃঢ় বস্তু এজন্য (১১ সংজ্ঞানুসারে) চ এবং ছ বিন্দুর মধ্যে ওরূপ দূরত্ব-বৃদ্ধি অসম্ভব। অতএব সমান্তর রেখাদ্বয় কখ, গঘ, কোন স্থানে পরস্পরের গাত্রস্পর্শ করিতে পারে না। অতএব মীমাংস্য বিষয় প্রমাণীকৃত হইল।

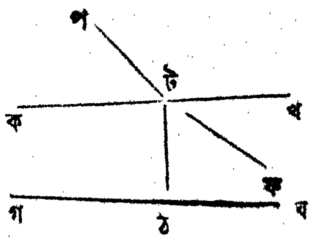
৪। অসমসূত্র রেখাদ্বয়ের প্রত্যেকে তৃতীয় কোন রেখার সমান্তর হইলে তাহারা পরস্পর পরস্পরের সমান্তর।

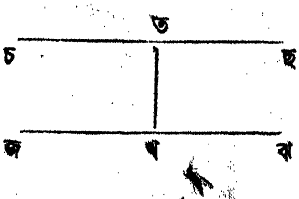
ক————খ　মনে কর অসমসূত্র
গ————ঘ　সরল-রেখা কখ এ-
চ————ছ　বং চছ উভয়েই গঘ
জ————ঝ　কিংবা জঝ রেখার

সমান্তর তাহা হইলে কখ এবং চছ উভয়ে পরস্পর সমান্তর। কেননা গঘ কিম্বা জঝ রেখার সহিত কখ এবং চছ রেখা উভয়েই যেহেতু সমান্তর এজন্য (২০ সংজ্ঞানুসারে) উভয়ই গঘ কিংবা জঝ রেখার সমসূত্রে গতির সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ স্ব স্ব সমসূত্রে চালিত হইতে পারে, সুতরাং (২০ সংজ্ঞানুসারে) উভয়ে পরস্পরের সমান্তর। অতএব মীমাংস্য বিষয় প্রমাণীকৃত হইল।

{৪} সমান কোণদ্বয়ের একটির কোন ভুজ বা ভুজাংশ আর একটির ভুজ স্থানে বসাইয়া পূর্ব্বোক্তের দ্বিতীয় ভুজ বা ভুজাংশকে শেষোক্তের দ্বিতীয় ভুজ স্থানে বসানো যাইতে পারে।

৫। কোন সমান্তর রেখা-দ্বয়ের যোজক-রেখা যদি দ্বিতীয় কোন সমান্তর রেখাদ্বয়ের যোজক-রেখার সমান হয় এবং যোজক রেখাদ্বয়ের একটির সন্নিহিত কোন কোণ যদি আর একটির সন্নিহিত কোন কোণের সমান হয় তবে সমান কোণদ্বয়ের সম্মুখবর্ত্তী কোণদ্বয় সমান হইবে।



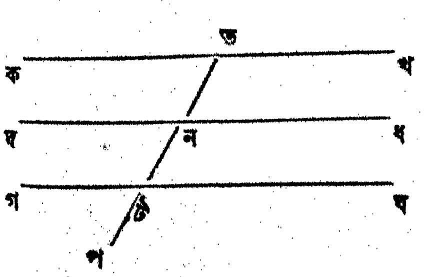


মনে কর টঠ সরলরেখা, কখ,গঘ সমান্তর রেখাদ্বয়ের যোজক-রেখা এবং তথ সরল-রেখা চছ জঝ সমান্তর রেখাদ্বয়ের যোজক রেখা, এবং টঠ রেখা এবং তাহার সন্নিহিত কোন একটি কোণ টঠঘ ক্রমান্বয়ে = তথ রেখা এবং তাহার সন্নিহিত কোন একটি কোণ তথঝ, তাহা হইলে তথঝ কোণের সম্মুখবর্ত্তী থতছ-কোণ = টঠঘ-কোণের সম্মুখবর্ত্তী ঠটখ কোণ।

যেহেতু সরলরেখা তথ = সরল রেখা টঠ এজন্য (১ স্বতঃসাধ্য ক্রিয়া-বিধি অনুসারে) একের প্রান্তদ্বয় ত এবং থ বিন্দুকে অন্যের প্রান্তদ্বয় ট এবং ঠ বিন্দু-স্থানে যুগপৎ বসানো যাইতে পারে অতএব ত এবং থ বিন্দুকে ট এবং ঠ বিন্দু স্থানে বসাও তাহা হইলে যেহেতু টঠ = তথ এজন্য (১ স্বতঃসিদ্ধ বচন অনুসারে) তথ সরল-রেখা টঠ সরল রেখা-স্থানে বসিবে, এবং যেহেতু তথঝ কোণ = টঠঘ কোণ, এজন্য (৪ স্বতঃসাধ্য ক্রিয়া বিধি অনুসারে) তথ রেখাকে টঠ স্থানে বসাইয়া থঝ রেখাকে ঠঘ স্থানে বসানো যাইতে পারে, অতএব ঐরূপ করিয়া বসাও, তাহা হইলে চছ-রেখা কখ স্থানে বসিবে, কেননা তাহা অন্য কোন স্থানে (যেমন পফ স্থানে) বসিতে পারে না; যদি মনে কর যে, তাহা পফ

স্থানে বসিয়াছে তবে জঝ এবং চছ সমান্তর রেখাদ্বয় যেহেতু গঘ এবং পফ স্থানে বসিয়াছে এজন্য (৩ স্বতঃসিদ্ধ বচন অনুসারে) পফ স্থান গঘ-স্থানের সমান্তর, এবং কখ-রেখা যেহেতু গঘ-রেখার সমান্তর সুতরাং (৩স্বতঃসিদ্ধ বচন অনুসারে) তাহাগঘ-স্থানের সমান্তর, অতএব কখ-রেখা এবং পফ স্থান এই দুই অসমসূত্র রেখাদ্বয়ের উভয়েই গঘ স্থানের সমান্তর সুতরাং (৪ সিদ্ধান্ত অনুসারে) তাহারা পরস্পর সমান্তর, সুতরাং (৩ সিদ্ধান্ত অনুসারে) অসমসূত্র অবস্থায় তাহারা কেহ কাহারো গাত্র স্পর্শ করিতে পারে না, অতএব চছ-রেখা কখ রেখার সমসূত্রে স্থানে বসিবে, তাহা হইলে অবশ্য থতছ-কোণ ঠটথ কোণ-স্থানে বসিবে সুতরাং থতছ কোণ = ঠটথ কোণ। অতএব মীমাংসা বিষয় প্রমাণীকৃত হইবে।

৬। সমান্তর রেখাদ্বয়ের যোজক রেখার দুই প্রান্তস্থিত পার্শ্বান্তরবর্ত্তী কোণদ্বয় সমান, এবং উক্ত যোজক রেখাকে বর্দ্ধিত করিলে তাহার এক প্রান্তস্থিত বহিষ্কোণ অপর প্রান্তস্থিত সমপার্শ্ববর্ত্তী অন্তঃকোণের সমান হয়, ও তাহার সমপার্শ্ববর্ত্তী অন্তঃকোণ দ্বয় একটি সমসূত্র কোণের সমান।

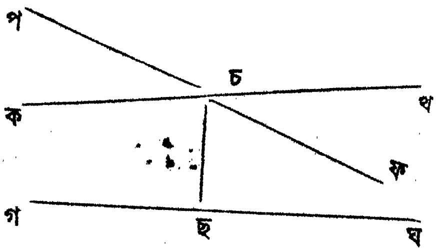


মনে কর দুই সরলরেখা কখ, গঘ উভয়ে পরস্পরের সমান্তর এবং তট তাহাদের একটি যোজক রেখা তাহা হইলে তট-রেখার ত-প্রান্তস্থিত কোণ খতট = তাহার ট-প্রান্তস্থিত পার্শ্বান্তরবর্ত্তী কোণ তটগ, এবং তট-রেখাকে প পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিলে তাহার ট-প্রান্তস্থিত বহিষ্কোণ পটঘ = ত-প্রান্তস্থিত সমপার্শ্ববর্ত্তী অন্তঃকোণ পতথ এবং তাহার সমপার্শ্ববর্ত্তী অন্তঃকোণদ্বয় তটঘ + টতথ = সমসূত্র কোণ। কেননা,—

মনে কর ন-বিন্দুটি তট-রেখার মধ্যস্থলবর্ত্তী সুতরাং নত = নট, আর সরল রেখা দনধ কখ-য়ের সহিত সমান্তর, সুতরাং (৪ সিদ্ধান্ত অনুসারে) উহা গঘ-রেখারও সহিত সমান্তর; তাহা হইলে যেহেতু (২ সিদ্ধান্ত অনুসারে) তনধ কোণ = দনট কোণ, এবং যেহেতু যোজক-রেখা নত = যোজক রেখা নট এজন্য (৫ সিদ্ধান্ত অনুসারে) তনধ-কোণের সম্মুখবর্ত্তী নতখ কোণ = দনট-কোণের সম্মুখবর্ত্তী নটগ কোণ ; অতএব প্রমাণ হইল যে, তট রেখার পার্শ্বান্তরবর্ত্তী ত এবং ট প্রান্তস্থিত কোণদ্বয় সমান। পুনশ্চ (২ সিদ্ধান্ত অনুসারে) যেহেতু নটগ কোণ = পটঘ কোণ এবং এই মাত্র প্রমাণ করা হইল যে, নটগ কোণ = নতখ-কোণ, এজন্য নতখ কোণ = পটঘ কোণ ; অতএব প্রমাণ হইল যে, ট প্রান্তস্থিত বহিষ্কোণ = ত প্রান্তস্থিত তট রেখার সমপার্শ্ববর্ত্তী অন্তঃকোণ। পুনশ্চ যেহেতু পটঘ-কোণ + নটঘ কোণ = সমসূত্র কোণ ও পটঘ কোণ = নতখ কোণ এজন্য নতখ-কোণ + নটঘ কোণ = সমসূত্র কোণ। অত-

এব প্রমাণ হইল যে ৩ট রেখার সমপার্শ্ব-বর্ত্তী অন্তঃকোণদ্বয় সমান। অতএব মীমাংস্য বিষয় প্রমাণীকৃত হইল।

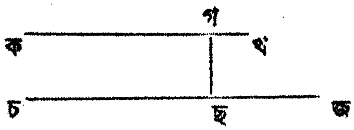
৭। কোন একটি সমতল-স্থিত * রেখা-দ্বয়ের কোন যোজক রেখার দুই প্রান্তস্থিত পার্শ্বান্তরবর্ত্তী কোণদ্বয় সমান হইলে উক্ত রেখাদ্বয় সমান্তর হইবে।



মনে কর একই সমতলস্থিত কখ এবং গঘ রেখাদ্বয়ের যোজক রেখা চছ-র চ-প্রান্তস্থিত কোণ কচছ=ছ-প্রান্তস্থিত পার্শ্বান্তরবর্ত্তী কোণ চছঘ, তাহা হইলে রেখাদ্বয় কখ এবং গঘ সমান্তর হইবে। যদি বল যে চ-বিন্দু-স্পর্শী কখ রেখা গঘ রেখার সমান্তর নহে তাহা হইতে পারে না, কেন না মনে কর যে ঐ একই সমতলস্থিত চ-বিন্দুস্পর্শী আর কোন রেখা—যেমন পফ রেখা— গঘ-রেখার সমান্তর তাহা হইলে (৬ সিদ্ধান্ত অনুসারে) পচছ-কোণ=চছঘ-কোণ, কিন্তু এখানে ধরা হইয়াছে যে কচছ-কোণ= চছঘ কোণ সুতরাং পচছ কোণ=কচছ-কোণ কিনা বড় কোণ=ছোট কোণ, যাহা কোনমতেই সম্ভবে না, অতএব কখ-রেখা গঘ-রেখার সমান্তর-স্থান ভিন্ন আর কোন স্থানে বসিতে পারে না সুতরাং (৩স্বতঃসিদ্ধ বচন অনুসারে) উক্ত রেখাদ্বয় পরস্পরের সমান্তর। অতএব মীমাংস্য বিষয় প্রমাণী-কৃত হইল।

* এখানকার সমান্তর রেখার সংজ্ঞা সমতল নির্ব্বিশেষে খাটে। ইউক্লিডের উক্ত সংজ্ঞা বিশেষ কোন একটি সমতলেই সংলগ্ন হয়।

৮। যদি তিন-টি সরল রেখার প্রথমটি দ্বিতীয়টির সমান্তর হয় এবং যদি দ্বিতীয়টির কোন প্রান্ত হইতে উহার সমসূত্রে তৃতীয় একটি রেখা টানা যায় তবে সেই তৃতীয় রেখা প্রথম-রেখাটির সমান্তর হইবে



মনে কর চ ছ-রেখা ক খ-রেখার সমান্তর আর চছ-রেখার ছ প্রান্ত হইতে চছ-রেখার সমসূত্রে তৃতীয় একটি রেখা ছজ টানা হইয়াছে তাহা হইলে ছজ রেখা কখ রেখার সমান্তর ; কেন না,—

কখ রেখার মধ্যস্থিত কোন একটি বিন্দু গ হইতে ছ বিন্দু পর্য্যন্ত গছ-সরল রেখা টানো তাহা হইলে ছজ-রেখাকে যেহেতু চছ রেখার সমসূত্রে টানা হইয়াছে এজন্য চছগ-কোণ+গছজ-কোণ=সমসূত্র কোণ এবং কগখ-কোণ (যাহার ভুজদ্বয় গক এবং গখ রেখা কখ-রেখার অন্তর্গত সুতরাং)=সমসূত্র কোণ=কগছ-কোণ+খগছ কোণ ; আবার গছ যেহেতু সমান্তর রেখাদ্বয়ের যোজক রেখা এজন্য (৬ সিদ্ধান্ত অনুসারে) চছগ=খগছ কোণ ; অতএব সর্ব্বশুদ্ধ দাঁড়াইতেছে যে

কগছ+খগছ=চছগ+গছজ

ও

খগছ=চছগ

অতএব কগছ=গছজ

সুতরাং (৭ সিদ্ধান্ত অনুসারে) ছজ রেখা কখ রেখার সমান্তর। অতএব মীমাংস্য বিষয় প্রমাণীকৃত হইল।

উপসিদ্ধান্ত। ইহা হইতে আসিতেছে এই যে সমান্তর রেখাদ্বয়কে যথেচ্ছা বৰ্দ্ধিত করিলে তাহাদের বৃদ্ধি-রেখাদ্বয়ও পরস্পর সমান্তর হইবে, সুতরাং (৩ সিদ্ধান্ত অনুসারে) সমান্তর রেখাদ্বয়কে সহস্র-বৰ্দ্ধিত করিলেও কেহ কাহারো গাত্র স্পর্শ করিতে পারে না।

ইতি সমান্তরাধ্যায়
সমাপ্ত।

হৃদয়-মন্থন।

(জনৈক সন্ন্যাসী প্রেরিত।)

আ। আচ্ছা, প্রণয়ের কথা এখন উহ্য রাখিয়া স্নেহ ও প্রেমের কথাই এখন আলোচনা করা যাউক। আমি ত বহু পূৰ্ব্বেই বলিয়াছি যে সম্পর্ক-বিশেষে ভাল বাসা, স্নেহ ও প্রেম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। নচেৎ উচ্চ আদর্শের প্রকৃত প্রেমের সঙ্গে স্নেহের এমন কি বিশেষ জাতিগত, প্রকৃতিগত, আত্মাগত প্রভেদ আছে যাহাতে একটি প্রকৃত পক্ষে আর একটির স্থানীয় হইতে পারে না?

ধী। আপনি যে উচ্চ আদর্শের প্রকৃত প্রেমের কথা কহিতেছেন, আমিও সেই প্রেমের কথা কহিতেছি। আমার মনে হয় যে প্রেমের ওরূপ বিশেষণ দেওয়াতেই প্রেমের অবমাননা করা হয়। প্রেম প্রেমই—উহা আপনাপনিই আত্ম-মহিমা-প্রভাবেই উচ্চ আদর্শের। আপনি যে ভয়ে প্রেমের পূর্ব্বে অতগুলি বিশেষণ প্রয়োগ করিতে ব্যাকুল হইয়াছেন, আমি সে ভয় রাখি না। কারণ আমি জানি যে পৰ্ব্বত বলিতে কেহ বল্মীক বুঝিবে না, এবং সমুদ্র বলিতে কেহ তড়াগ বুঝিবে না। আপনি যে পরিশ্রমে প্রেমের বিশেষণ গুলি অভিধান হইতে আহরণ করিতেছেন, আপনার সে পরিশ্রম অনর্থক; কারণ প্রেম বলিতে যদি আশাশূন্য হৃদয়-উৎসর্গ ও —স্বার্থশূন্য আত্মবিসর্জনের এদিক ওদিক অন্য কিছু বুঝায়, ত সে প্রেম প্রেমই নহে, হয় তাহা জঘন্য ইন্দ্রিয়-লালসার নামান্তর মাত্র, নয় তাহা আত্মভাব গোপনের আড়ম্বর মাত্র।

আ। আমি তোমার কথা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি, তবে আমি কেবল চলিত ভাষার দুর্নিবার দুষ্প্রবৃত্তির উপর লক্ষ্য

রাখিয়া প্রেম-শব্দের অবমাননা করিতে উৎসুক হইয়াছিলাম। কিন্তু একটি কথা আমি জিজ্ঞাসা করি যে, প্রেম-শব্দে ইন্দ্রিয়-লালসা কি কিছুই বুঝায় না? আমার বোধ হয় কতকটা বুঝায়। গ্রীকদের প্রসিদ্ধ দার্শনিক প্লেটো বলিয়াছেন বটে যে, যে প্রেমে শরীরের নাম গন্ধও আছে, তাহা প্রেমই নয়,—কিন্তু প্লেটোই কি প্রকৃতির প্রকৃত কথা বলিয়াছেন?

ধী। আমি যতদূর দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, ও বুঝিয়াছি, তাহাতে তোমার কথাও আমি মানি না, প্লেটোর কথাও আমি মানি না। প্লেটোর কথা স্বর্গের কাল্পনিকদের কথা, আর তোমার কথা পৃথিবীর ইতরদের কথা। যত দিন আত্মা শরীরগত, তত দিন প্রেমে শরীরের নাম-গন্ধ থাকিবেই থাকিবে—কিন্তু শরীরগত হইলেও আত্মা কখনই ইন্দ্রিয়-চালিত হইবে না। জবা পুষ্পের ভিতরে হীরকখণ্ড রাখিলেও তাহাতে লোহিত বর্ণের আভাস প্রতিফলিত হইবে, কিন্তু সেই জন্য এ কথা বলিতে পারা যায় না যে হীরকখণ্ড রক্তবর্ণ; অথবা যত দিন পর্য্যন্ত সে হীরকখণ্ড সেই জবাপুষ্পের ভিতরে আছে, ততদিন পর্য্যন্ত ইহাও বলা যায় না যে ঐ হীরকখণ্ড সম্পূর্ণ বিশদ বর্ণ। যতদিন শরীর আছে, ততদিন শরীরের সঙ্গে একেবারে নিঃসম্পর্ক হইয়া মনের কোন বৃত্তিরই চালনা হইতে পারে না। স্বয়ং রাম কেন সীতাহরণের পর অতদূর অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন? তিনি স্বয়ং দেবাবতার হইয়া কেন মর্ত্ত্যের মানুষের মত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন? ইহা কেবল এই শরীরের মাটির গুণ, পৃথিবীর হাওয়ার প্রভাব, আত্মার পার্থিব অবনতি। নহিলে প্রেম অবশ্যই স্বর্গের নন্দন কাননের পারিজাত কুসুম, বৃত্তি সমূহের শিখরস্থ মণিখণ্ড, মানব প্রকৃতির নির্ম্মল কারী স্ফটিক, এবং পরকালের অনন্ত সুখের অঙ্গীকার স্বরূপ।

আ। তোমার মতে কি তাহা হইলে কৃষ্ণের প্রেম প্রেমই নহে?—যে প্রেমের মহিমা কীর্ত্তনে শ্রীমৎভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, গীত গোবিন্দ পর্য্যন্ত কল্পনা-কাননের সুন্দরতম কুসুমে সুরঞ্জিত হইয়াছে, তুমি কি সে প্রেমকে প্রেম নামেই অভিহিত করিবে না?

ধী। না,—কৃষ্ণের প্রেম প্রেমই নহে,—যে প্রেমে ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসা এত প্রবল, লীলাই যে প্রেমের জীবন এবং স্বার্থ-সাধনই যে প্রেমের আত্মা, সে প্রেম প্রেমই নহে। ইহা শ্রীমৎভাগবতকার ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণকার আপনারাই বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই তাঁহারা কৃষ্ণের মর্ত্ত্যলীলা-সমূহকে প্রকৃতি-পুরুষ অথবা শ্রেয় ও প্রেয়জ্ঞান-রূপ অলঙ্কারের আড়ম্বরে উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আমার মতে দেবদেব মহাদেবের প্রেমই প্রেমের আদর্শস্থল, অথবা, তাহাই প্রেম। বল দেখি, পার্ব্বতীর দেহত্যাগের পর যখন সেই মহান যোগীন্দ্র সর্ব্বত্যাগী হইয়া হিমালয়ের নিভৃত স্থানে যোগ ধ্যানে আত্ম উৎসর্গ করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত প্রবৃত্তি, সমস্ত বাসনার

নির্ব্বাপন সাধন করিতে লাগিলেন, তখন কে না তাঁহাকে দেখিয়া বলিবে যে এইই প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি, এই প্রেমের অবয়ব।

আমি। কিন্তু মহাদেবেও কি ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ ছিল না। তাহা যদি না থাকিবে, তবে মদন-ভস্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে উমার স্পর্শে কেন তিনি বিচলিত হইলেন, কেন চন্দ্রোদয়ে প্রশান্ত সাগরের মত তাঁহার হৃদয়ও উথলিত হইয়া উঠিল এবং কেনই বা তিনি মুহুর্মুহু গিরিবালার ওষ্ঠাধরের প্রতি লালায়িত নয়নে চাহিতে লাগিলেন?

ধী। আমি ঐ সকল কারণেই বলিয়াছিলাম যে মহাদেবের প্রেমই প্রেম। উহাতে কৃষ্ণের হীন প্রবৃত্তি-সমূহের অসংযত উদ্দাম লীলা-তরঙ্গ নাই, অথচ উহাতে গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটোর স্বপ্নময় কল্পনার অলীক শব্দাড়ম্বরের আভাসও নাই। কৃষ্ণের প্রেম মর্ত্ত্যলোকের মাটী, কিন্তু প্লেটোর প্রেম আকাশের কুসুম। কৃষ্ণের প্রেম পৃথিবীর পঙ্কিল বীভৎস, আর প্লেটোর প্রেম স্বর্গীয় স্বপ্নের উপচ্ছায়া। মহাদেবের প্রেমই প্রেম, কারণ সে প্রেমে ইন্দ্রিয়সম্পর্কও আছে, অথচ সে প্রেমে মদনভস্ম হইয়া যাইবারই কথা। যে প্রেমে মহাদেব গিরিবালিকার ওষ্ঠাধরের প্রতি তৃষিত নয়নে চাহিতে চাহিতেই নিজের তেজেই আবার কন্দর্পকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন, সে প্রেমে ইহলোক ও পরলোক উভয়ই সম্মিলিত, সে প্রেমে শরীর ও আত্মা উভয়ই প্রভাবিত, সে প্রেমে কৃষ্ণের কেবল শরীর নাই এবং প্লেটোর কেবল আত্মা নাই। ইহাই মর্ত্ত্যলোকের অবিকৃত প্রেম।

আ। কিন্তু প্লেটোর প্রেম কি প্রেমের চরম উৎকর্ষ নয়?

ধী। চরম উৎকর্ষ হইতে পারে, কিন্তু তাহা পৃথিবীর প্রেম নহে। শরীর না থাকিলে ওরূপ প্রেম সম্ভাবিত, শরীর থাকিতে ও প্রেম অসম্ভব। প্লেটো প্রেমের কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা বরং পৃথিবীর পক্ষে অমঙ্গলকর, কারণ একজন ইংরাজি কবির সঙ্গে আমিও বলি যে "প্লেটো, প্লেটো! তোমার কথাতে যত যুবক যুবতী পৃথিবীর বিকৃত প্রেমের পঙ্কে শেষে ডুবিয়া পড়িয়াছে এমন আর কাহারও কথাতে নহে। তুমিই তাহাদিগকে প্রথমে বিমল পথের প্রলোভন দেখাইয়া সমল পথে আনিয়াছ, এবং তাহাদিগকে ভ্রমের অন্ধকারে আত্ম-হারা করিয়া শেষে বিপদের শেষ সীমায় আনিয়া পরিত্যাগ করিয়াছ।" কিন্তু প্রেম ইন্দ্রিয়গতই হউক, বা কল্পনাগতই হউক, প্রকৃত প্রেমের বিশেষ একটি লক্ষণ এই যে ইহার আশা-ভরসা পরকাল পর্য্যন্ত প্রসারিত।

আ। কিন্তু স্নেহেও কি তাহাই নহে? পুত্রবৎসল পিতাও কি পুত্রের অকাল মৃত্যুতে এরূপ আশা করেন না যে পরকালে আবার সেই পুত্রের সহিত সম্মিলিত হইয়া পরম সুখে অনন্ত জীবন অতিবাহিত করিবেন?

ধী। আমি তোমার কথা সম্পূর্ণরূপে মানি, কিন্তু একটি বিষয় এখানে অনুভব করা উচিত। পুত্রবৎসল পিতা পুত্রের অকাল মৃত্যু নিবন্ধন এইমাত্র আশা করেন যে পরকালে তাঁহার ইহকালের দুঃখের অবসান হইবে, কিন্তু প্রেমিকের আশা ঠিক সেরূপ নহে—প্রেমিক এরূপ আশা করেন না যে ইহ কালের সুখের অভাব পরকালে মোচন হইবে, প্রেমিক এইরূপই আশা করেন যে ইহকালের সুখ সুখের নমুনামাত্র, পরকালে ইহার চরম উৎকর্ষ সাধিত হইবে, অনন্ত কাল পর্য্যন্ত এই সুখের পরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, এবং অনন্ত কালের কাল্পনিক অন্তে "আমি তুমি" আর "তুমি আমি" এমন মিশাইয়া যাইবে যে অভেদ-আত্মা শব্দের প্রকৃত অর্থ গোচর হইবে। স্নেহের আকাঙ্ক্ষা পরকালে অভাব পূরণ, প্রেমের আকাঙ্ক্ষা পরকালে উৎকর্ষসাধন।

আ। হ্যাঁ, পরকাল-সম্বন্ধে প্রেম ও স্নেহে তোমার উক্ত ভেদ থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু ইহকাল-সম্বন্ধে ঐ দুয়েতে আত্মগত প্রভেদ কি আছে? দেখ, প্রেমের সামগ্রী ও স্নেহের সামগ্রী উভয়েই যত্নের সামগ্রী, প্রেমে ও স্নেহে উভয়েই মানুষ অন্ধ হইয়া পড়ে, প্রেমে ও স্নেহে মানুষ আদরের সামগ্রীর সহবাস প্রার্থনা করে, এবং সহবাসে আপনাকে পরম সুখী জ্ঞান করে, ও প্রেমে ও স্নেহে উভয়েই মানুষ আপন-হারা হইয়া পড়ে। কবিশ্রেষ্ঠ সেক্‌সপিয়ার বলিয়াছেন, যে উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি, কবি, আর প্রেমিক,—এই তিনই এক উপাদানে গঠিত, কারণ তিন জনই বিকৃত কল্পনাময়, কিন্তু তিনি কেন যে স্নেহময় মানুষকে তাহার অন্তর্গত করিলেন না, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আমি জানি এক সময়ে লক্ষ্মী তাঁহার বাহন পেচাকে বলিয়াছিলেন যে "পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যাহাকে সুন্দর দেখিবে, তাহার গলাতেই আমার এই অমূল্য মুক্তাহার পরাইয়া আসিবে।" পেচক সমস্ত ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিয়া নিজ কোটরে আপন শাবককে দেখিয়া তাহার গলাতেই সেই দুর্লভ মুক্তাহার পরাইয়া দিল। সুতরাং প্রেমের অপেক্ষা স্নেহের মাতোয়ারা শক্তি যে কোন অংশে কম তাহা ত আমার বোধ হয় না।

ধী। আমি জানি যে অনেক স্থলে অনেক পুত্রবৎসল পিতা উপযুক্ত পুত্রের অকাল মৃত্যুতে সংসারে বিরাগী হইয়া সন্ন্যাসী-বেশে শ্মশানে শ্মশানে ভ্রমণ করিতেছেন, এবং অনেক স্নেহময়ী মাতাও উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতেছেন। কিন্তু তুমি যদি সসাগরা পৃথিবীর সমস্ত শ্মশান ও মশান-ভূমি ভ্রমণ করিয়া দেখ, তুমি যদি অতলস্পর্শ সমুদ্রের তলপর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখ, তুমি যদি মহারণ্যের নিভৃত নিলয় পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিয়া দেখ, ত দেখিতে পাইবে যে স্নেহের অপেক্ষাও প্রেমের অনুরোধে, প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় বা অত্যাচারে অধিকতর লোক আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে। ধর্ম্মের সম্মান রক্ষা

করিতে যেমন দেশে দেশে বর্ষে বর্ষে অসংখ্য লোক স্বীয় শোণিত-লহরী দ্বারা নিজ ধর্ম্মের বিজয়-পতাকা রঞ্জিত করিয়া পরকালের অনন্ত আশা-সাগরে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছে—প্রেমেও সেইরূপ অসংখ্য লোক হৃদয়ের রুধির দিয়া প্রেমের জ্বলন্ত নিশান সংরঞ্জিত করিয়া তাহা শূন্যে শূন্যে সংসার-সমক্ষে উড্ডীয়মান করিয়া অথবা মর্ম্মের নিভৃত বিজনে লুকাইয়া রাখিয়া, ভবিতব্যতার করাল তরঙ্গে আত্ম-উৎসর্গ করিয়াছে। একজন পুত্রবৎসলা জননী পাঁচটী পুত্রের মধ্যে একটি পুত্রের অকাল মৃত্যুতে বাকী চারটী পুত্রের আশায় জীবন ধারণ করিতে পারে, একজন পুত্রবৎসল পিতা সকল পুত্রের নিধনেও একটী ভাবী পুত্রের স্বপ্নেও আপাততঃ দুঃখের সান্ত্বনা বিধান করিতে পারেন, কিন্তু এক জন প্রেমিকের আর সে রূপ জীবন ধারণের উপায় নাই, সে রূপ সান্ত্বনার আশা নাই। পুত্রের শোক পৌত্রে নিবারণ হইতে পারে, ভ্রাতার শোক ভগিনীতে শমিত হইতে পারে, কিন্তু প্রণয়িনীর শোক প্রণয়ী ব্যতীত আর কিছুতেই মিটিতে পারে না। তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি হ্রদ, বা তড়াগ বা নদী বা সমুদ্রের জলে পিপাসা শান্তি করিতে পারে, কিন্তু তৃষ্ণাতুর চাতক পক্ষী সেই আষাঢ়ের মেঘের জল ব্যতীত আর কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতে পারে না।

আ। আমি তোমার কথা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। যদি স্নেহে ও প্রেমে সকল বিষয়েই মিল, আদরে, যত্নে এমন কি আত্ম-বিসর্জ্জনে পর্য্যন্ত সমস্ত মিল, তবে এক ইন্দ্রিয়-লালসা ব্যতীত এমন আর কি উপাদান আছে যাহাতে প্রেম কখনই স্নেহের স্থানীয় হইতে পারে না?

ধী। আমি এক কথায় তোমার সকল কথা বুঝাইতে পারি না। কিন্তু তুমি কেবল স্নেহের ও প্রেমের চুম্বন পরীক্ষা করিয়া দেখ। স্নেহের ও প্রেমের সামগ্রীকে চুম্বন করিতে আপনাপনি স্বতই ব্যাকুলতা জন্মে, কিন্তু সেই দুই চুম্বনের তারতম্য উপলব্ধি করিয়া দেখ। তুমি দেখিবে যে যেমন স্নেহের চুম্বনে বসন্ত কালের শিশিরের মত হৃদয় আপনাপনি প্রশান্ত ও পরিতৃপ্ত হইয়া আইসে, প্রেমের চুম্বনে দাবানলের মত হৃদয় তেমনি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে. স্নেহের চুম্বন যেমন বর্ষার জলধারা, প্রেমের চুম্বন তেমনি বর্ষার বিদ্যুতাগ্নি, উভয়েই শরীর লোমাঞ্চিত হয় সত্য বটে, কিন্তু একটি তৃপ্তির প্রভাবে, অপরটি অতৃপ্তির প্রভাবে, একটি পূর্ণিমা-জ্যোৎস্নার প্রভাবে, অপরটি পর্ব্বতে অগ্ন্যুৎপাতের প্রভাবে, একটির চুম্বনে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে, অপরটির প্রভাবে হৃদয়ে বিপ্লব উপস্থিত হয়।——কিন্তু কেন?—কারণ, স্নেহ স্নেহেতেই পরিসমাপ্ত, প্রেমে সকলই অপরিসমাপ্ত. স্নেহেতে পরিতৃপ্তি আছে, প্রেমেতে সকলই স্বপ্নময়, কল্পনাময়, আশাময়, অনির্দ্দিষ্ট সুখের বাসনাময়!

আ। কিন্তু সেই অনির্দ্দিষ্ট সুখটি কি? তাহা কি ইন্দ্রিয়গত নহে—মুক্তকণ্ঠে বলিতে গেলে শকুন্তলা কাদম্বরীর প্রেম কি বিদ্যাসুন্দরের "প্রেম" নহে?

ধী। না,—কখনই তাহা নহে? তুমি বলিতে পার যে এই পবিত্র সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তুমি কি সুখের অনুবর্ত্তী হইয়াছ? তুমি কি কথায় বুঝাইতে পার যে তোমার চরম উদ্দেশ্য কি? তুমি বলিবে তোমার ইষ্ট দেবতার সহিত সম্মিলিত হইবার জন্যই এত দূর কঠোর ত্যাগ-স্বীকার করিতেছ, কিন্তু তোমার কথায় তোমার উদ্দেশ্যের, তোমার সঙ্কল্পের প্রকৃত অর্থ আমাকে জলের মত কখনই বুঝাইতে পার না, কারণ তোমার উদ্দেশ্য অর্দ্ধস্ফুট কল্পনার—অথবা কবিতাময় স্বপ্নের নীহার-পরিবৃত।—প্রেমের উদ্দেশ্যও সেইরূপ, যাহাকে আমি ভালবাসি, তাহারি অনুবর্ত্তী হইতেছি, তাহার নিকটে অগ্রসর হইতেছি, তাহাতেই সম্মিলিত হইতে চাহিতেছি—ইহাই প্রেমের প্রকৃতি, প্রেমের জীবন, প্রেমের আশা, প্রেমের তৃপ্তি এবং প্রেমের অতৃপ্তি।

আ। প্রেমের উদ্দেশ্য যদি অনির্দ্দিষ্ট রহিল তবে স্নেহের উদ্দেশ্যও কি অনির্দ্দিষ্ট নহে?

ধী। না,—স্নেহের উদ্দেশ্য অনির্দ্দিষ্ট কখনই নহে। পিতা পুত্রের মুখাবলোকন করিয়া ভাবেন যে "ইহা হইতেই আমার বংশ সপ্রাণ থাকিবে," মাতা প্রিয় পুত্রের মুখাবলোকন করিয়া বলেন যে "আসন্ন সময়ে এই পুত্রই আমার অন্ধের লাঠি, বিপন্নের আশ্রয়, এবং বৃদ্ধাবস্থায় অবলম্বন স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে," কিন্তু প্রেমের আশা প্রেমেতেই সমাপ্ত।

আ। কিন্তু তুমি কি বল যে স্ত্রীপুরুষের প্রেমে পার্থিব আশার সম্পর্ক নাই? তুমি কি বল যে স্ত্রী আশা করেন না যে স্বামীর দ্বারাই তাঁহার ভবিষ্যৎ সুখ সমৃদ্ধি হইবে, এবং স্বামীও কি আশা করেন না যে সেই স্ত্রীর দ্বারাই তিনি সংসারী ও গৃহস্থ হইয়া আমরণ সুখী হইবেন?

ধী। মুক্তকণ্ঠে ও বিষয়ে কথা কহিতে গেলে আমাকে বলিতেই হইবে যে স্ত্রীপুরুষের প্রেম সকল সময়ে ও সকল স্থলে প্রেমই নহে। স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক বলিলেই যে প্রেমের সম্পর্ক বুঝায়, তাহা আমি স্বীকার করি না। সম্মানের আশায়, ধনের আশায়, রূপ-লালসায়, এবং আমাদের দেশে পিণ্ড দানের অভিলাষে অনেকে বিবাহ করিয়া থাকেন, কিন্তু সে সকল বিবাহ ত বৈষয়িক বন্দোবস্ত মাত্র। জমীদারে প্রজাতে যে সম্পর্ক, ব্যবসাদারে ব্যাবসাদারে যে সম্পর্ক, সে বিবাহে সেই সম্পর্ক মাত্র। পিণ্ডার্থী প্রথম বিবাহে সন্তান সন্ততি না পাইলে দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন না, এবং সম্মানার্থী প্রথম বিবাহে আশানুরূপ সম্মান না পাইলে স্ত্রীকে পর্য্যন্ত নির্যাতন করিতে ত্রুটি করেন না। তুমি কি এই সকল বিবাহের কথা বলিতেছ?

আ। না,—আমি সে সকল বিবাহের কথা কল্পনাতেও আনি নাই। কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ বিবাহের কথাই বলিতেছি। এ বিবাহে যে প্রেমের সম্পর্ক ওতপ্রোত ভাবে সর্ব্ব দিকে প্রসা-

রিত, তাহা ত তুমি আর অস্বীকার করিতে পার না ?

ধী। হ্যাঁ, তাহাও আমি অস্বীকার করি। সরল ভাবে সকল কথা বলিতে গেলে অনেক স্বামীকে তাহাদিগের স্ত্রীর নিকটে প্রবঞ্চক সাব্যস্ত করা হয়, এবং কাল্পনিক ন্যায় শাস্ত্রের ন্যায়রত্ন প্রমাণ করা হয় বটে, কিন্তু এই বিজন হিমাচল প্রদেশে অত ঢাকাঢাকির বিশেষ আবশ্যকতা কোথায় ? আমি জানি যে একজন গৃহস্থ কর্ত্তব্য-জ্ঞানশীল সুচরিত্র মমতাময় স্বামীকে অনেক স্ত্রী প্রেমময় স্বামী ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, কিন্তু স্বামী গৃহস্থ হইলেও, কর্ত্তব্যজ্ঞানশীল হইলেও, সুচরিত্র হইলেও, মমতাময় হইলেও, প্রেমময় না হইতে পারেন। সংসারে এই প্রহেলিকাময় দৃশ্য তুমি সর্ব্বক্ষণ দেখিতে পাইবে। মমতাময় এবং আদর্শস্থ স্বামীরা স্ত্রীর মন রাখিয়া ভাবেন যে তাঁহাদের মত প্রেমময় স্বামী আর নাই, এবং স্ত্রীরাও ভাবেন যে তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে কায়মনোবাক্যে কত শিবপূজা করিয়াই ঐরূপ স্বামীর স্ত্রী হইতে পারিয়াছেন।

ক্রমশঃ।

ভট্টি।

আমরা এই প্রস্তাবে ভট্টিকাব্য প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কবি ভট্টি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। মহাত্মা ভট্টি, কাব্য জগতের শীর্ষস্থানীয় স্রষ্টা না হইলেও তাঁহার গ্রন্থ ভারতীয় সাহিত্য-সংসারের একটী অপার্থিব মহারত্ন। ভট্টিকাব্য পাঠে ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় জটিল সংস্কৃত অতি বিশদ রূপে শিক্ষা লাভ করা যায়। এই গ্রন্থখানি ভালরূপ অভ্যাস থাকিলে মহোদধি-পরিবেষ্টিত সুদৃঢ় বৈয়াকরণিক দুর্গ উল্লঙ্ঘন করা বড় কষ্টকর ব্যাপার নহে। পরন্তু ভট্টিকাব্য ভারতীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট পঞ্চ মহাকাব্যের অন্যতম মহাকাব্য * বলিয়া পরিগণিত। ইহাতে মাঝে মাঝে রচনার বিচিত্রতা, ভাবের উৎকর্ষতা এবং কাব্যের অমৃতময়ী মধুরতা পরিলক্ষিত হয়। গুণগ্রাহী ভট্টি-পাঠকগণ অবশ্য জানেন যে, ভট্টি-কাব্যের ঐ উৎকৃষ্ট উপাদান গুলি কোন দেশীয় প্রথম শ্রেণীর মহাকাব্য হইতে নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। তবে, এবম্প্রকার উৎকৃষ্টতম অংশ ভট্টিতে অতি বিরল। কিন্তু তথাচ আমরা ভট্টিকাব্য প্রণেতাকে ভূয়সী প্রশংসা করি; কেননা যে উদ্দেশ্য সংসাধন জন্য এতদ্ গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে তাহাকে, তন্মধ্যে কাব্যের স্বর্গীয় মাধুর্য্যের স্থান পাওয়া

* মহাকাব্যানি "রঘু, মাঘ, ভারবি, কুমার সম্ভব, ভট্টিরূপাণি" [কোষ রত্নাকরান্তর্গত অঙ্কাভিধান টীকা, ৫ পৃষ্ঠা]

কথনি সম্ভবপর নহে। ঈদৃশ মহান প্রতিবন্ধক থাকিতেও যখন পণ্ডিত-প্রধান ভট্টি তদীয় গ্রন্থে অনেক পরিমাণে কাব্যের অমৃত ধারা বিকীর্ণ করিয়াছেন, তখন আমরা তাঁহাকে এক জন অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন লেখক বলিয়া শতমুখে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিব। যদি মহাত্মা ভট্টি ব্যাকরণের বাধা-বিরোধী নিগড়ে নিরদ্ধ না থাকিয়া একাগ্র চিত্তে কবিতা দেবীর উপাসনা করিতেন তবে তাঁহার কাব্য সর্ব্বথা প্রথম শ্রেণীর মহাকাব্যের উপযোগী হইত, সন্দেহ নাই। যাহা হউক; বৈয়াকরণ-কেশরি ভট্টি ও যে একজন ভারতীয় আর্য্যকুলের গৌরবস্থানীয়, বোধ হয় তাহাতে কেহ দ্বিরুক্তি করিবেন না; সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করা ও তদীয় জীবনী অবগত হওয়া হিন্দুমাত্রেরই কর্ত্তব্য। বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডারে কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি আর্য্যকুলতিলকদের সম্বন্ধে দুই একটী প্রস্তাব লিখা আছে কিন্তু ভট্টি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন মহোদয়ই একটীও কথা বলেন নাই। ইহা অবশ্য দুঃখের বিষয়। তাই আমরা এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবটি লিখিতে আরম্ভ করিলাম। ভট্টির জীবন-বৃত্তান্ত অন্যান্য শত শত আর্য্য-নৃপতি, ঋষি আচার্য্য ও পণ্ডিতমণ্ডলীর জীবনীর ন্যায় দেহ-বুদ্বুদের সহিত অতীত-কাল-গর্ব্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আমরা তাঁহার জীবনী জানিবার জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছি কিন্তু আশানুরূপ কিছুই জানিতে পারিলাম না। আশা করি কোন সৌভাগ্যশালী লেখক এতদপেক্ষা বহু বৃত্তান্ত-ভূষিত ভট্টি-জীবন-বৃত্ত আবিষ্কার করিয়া আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন। আমরা যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে লিখিতেছি—

১ম। ভট্টি কাব্যের সর্ব্বশেষ শ্লোকে লিখিত আছে "শ্রীধরপুত্র নরেন্দ্র নামক নৃপতির পালিতা বলভী পুরীতে আমার দ্বারায় এই গ্রন্থ লিখিত হয়। তথাহিঃ—

কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং
শ্রীধর-সূনু-নরেন্দ্রপালিতায়াম্। ১
কীর্ত্তিরতো ভবতান্নৃপস্য তস্য
ক্ষেমঙ্করঃ ক্ষিতিপোযতঃ প্রজানাম্॥

(ভট্টি, ২২ সর্গ; ৩৫ শ্লো ২)

এতদ্ব্যতীত গ্রন্থকার আর কোন নিজ পরিচয় দেন নাই।

২য়। জয়মঙ্গল নামক ভট্টির টীকাকার তাঁহার টীকার সূচনা ও সমাপ্তি স্থলে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে জানা যায় শ্রীধরস্বামীর পুত্র ভট্টি

১ কোন কোন মুদ্রিত ও হস্তলিখিত পুস্তকে "শ্রীধরসেননরেন্দ্রপালিতায়াম্" এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে নৃপতির নাম নরেন্দ্র না হইয়া শ্রীধরসেন হয়; এবং নরেন্দ্র শব্দ শ্রীধরের (বাভিচার) বিশেষণ হইয়া পড়ে। কিন্তু এইরূপ পাঠান্তর আমাদের নিকট শুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না, কেন না জয়মঙ্গল এই শ্লোকার্দ্ধের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

ময়েদং কাব্যং 'বিহিতং' কৃতং, শ্রীধর-সূনুনা নরেন্দ্রনাম্না নৃপেণ 'পালিতায়াং' রক্ষিতায়াং 'বলভ্যাং' বলভীনামপুর্য্যাং।

নামক কবি শ্রীরাম-কথাশ্রিত এই মহা কাব্য প্রণয়ন করেন ; এই ভট্টি মহাবৈয়াকরণ মহাব্রাহ্মণ এবং বলভী-প্রবাসী ছিলেন।

সূচনা স্থলে :—

"শ্রীস্বামিসূনুঃ কবির্ভট্টিনামা
রামকথাশ্রয়-মহাকাব্যং চকার।"

সমাপ্তি স্থলে :———

"ইতি বলভীবাস্তব্যস্য শ্রীস্বামি
—সুনোর্ভট্ট মহাব্রাহ্মণস্য মহা
বৈয়াকরণস্য ———"

৩য়। ভট্টি-কাব্যের অপর টীকা মুগ্ধ-বোধিনী-প্রণেতা ভরতমল্লিক বলেন "ভর্তৃহরি নামক কবি শ্রীরামকথাশ্রিত এই মহাকাব্য প্রণয়ন করেন :—

"ভর্তৃহরির্নাম কবিঃ শ্রীরাম-
কথাশ্রয়ং মহাকাব্যং চকার।"

৪র্থ। এদেশীয় অনেকের বিশ্বাস, আদিশূর-আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম ব্রাহ্মণ বেণীসংহার নাটক প্রণেতা ভট্ট-নারায়ণ ভট্টি-কাব্য প্রণয়ন করেন। কিন্তু এ কথার কোনও প্রমাণ নাই এবং সম্ভবপরও নহে।

৫ম। আবার এদেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন "মহাবৈয়াকরণ দুর্গসিংহই ভট্টি-কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন।" কিন্তু একথা আমরা একটুকুও বিশ্বাস করি না। এদেশীয় পণ্ডিতগণ দুর্গসিংহ সম্বন্ধে যেরূপ অলৌকিক উপন্যাস বলিয়া থাকেন তাহাতে দুর্গসিংহকে একটী "কল্পতরু" বলিতে হয়। বাস্তবিক প্রমাণ এবং যুক্তিহীন এবম্ভূত কিংবদন্তীতে বিশ্বাস স্থাপন করা কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে।

৬ষ্ঠ। আমরা একজন শাস্ত্রপ্রবীণ মহাত্মার নিকট শুনিলাম "নরেন্দ্র-পদ-বিদ্বেষী একজন বিখ্যাত নৃপতি, রাজত্ব ছাড়িয়া অন্য এক রাজার আশ্রমে থাকিয়া ভট্টি-কাব্য প্রণয়ন করেন" ১ এ কথার কোন মূল থাকুক কি না থাকুক আমরা একথাও প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। আমরা ভট্টি-প্রণেতা সম্বন্ধে এরূপ অনেক অলৌকিক উপাখ্যান শুনিয়াছি। কিন্তু অনাবশ্যক বোধ হওয়াতে আর কিছু উদ্ধৃত করিলাম না।

আমরা এখন ভট্টিকাব্য-প্রণেতার নাম ভট্টি কি ভর্তৃহরি তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার করি। "ভট্টি-কাব্য" এই নাম দেখিয়া যদি [ভট্টির (ভট্টির কৃত) + কাব্য] এই অর্থ করিয়া লই তবে জয়মঙ্গলের নির্দ্দেশিত নামই যথার্থ বলিয়া প্রতীতি হয়, সুতরাং ভরতমল্লিকের কথার কোনও গুরুত্ব থাকে না। কিন্তু ভরতমল্লিকের ন্যায় এক জন অসাধারণ পণ্ডিত যে কিছু প্রমাণ না পাইয়াই কল্পনা-বলে একটী মিথ্যা কথা লিখিবেন তাহাও আমরা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারি না। যদিও আমরা উল্লিখিত ষষ্ঠ মতটী প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করি না তথাচ যদি

১ এই পণ্ডিত কোন সংস্কৃত গ্রন্থে এরূপ লেখা দেখিয়াছেন কিন্তু কোন্ গ্রন্থে দেখিয়াছেন এখন স্মরণ নাই।

তাহার কোন মূল থাকে তবে তাহাও ভরতমল্লিকের কথারই এক অর্থে সমর্থন করিতেছে। কেন না সংবৎ-প্রবর্ত্তক প্রাতঃস্মরণীয় উজ্জয়িনী-অধিপতি বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরির জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে এ কথার একাতা দৃষ্ট হইবে। আমরা অতি সংক্ষেপে ভর্ত্তৃহরি নৃপতির উপন্যাস বলিয়া লই :—

ত্রিদিবে, ইন্দ্রের সুধর্ম্মা নামক সভায় এক দিন নৃত্য গীত হইতেছিল। তথায় ইন্দ্রের পুত্র গন্ধর্ব্বসেন একটী অপূর্ব্ব সুন্দরী অপ্সরার প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে ছিলেন। ইহাতে ইন্দ্র অতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "রে কামুক পশু তুই এ সভা কলঙ্কিত করিলি। শীঘ্র গর্দ্দভ শরীর ধারণ করিয়া মর্ত্ত্য লোকে অবস্থিতি কর্।" কিন্তু কথা রহিল, ধাররাজ যে দিন গর্দ্দভ-শরীর ভস্ম করিবেন সেই দিন গন্ধর্ব্ব সেন সশরীরে স্বর্গে আসিতে পারিবেন। এদিকে গন্ধর্ব্ব সেন মর্ত্ত্যে অবতরণ করিলেন। এবং কয়েক ব্রাহ্মণের সঙ্গে চক্রান্ত করিয়া ধাররাজার কন্যাকে বিবাহ করার যোগাড় করিলেন। ধাররাজার কথা রহিল, যদি গন্ধর্ব্বসেন এক রাত্রির মধ্যে আড়ে দীর্ঘে চল্লিশ ক্রোশ এবং উচ্চে তিন ক্রোশ এক লৌহ দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে পারেন তবেই জানিব তিনি ইন্দ্রের পুত্র ; তাহা হইলে আমি তাঁহাকে নিরাপত্তিতে কন্যা সংপ্রদান করিব। গন্ধর্ব্বসেন এক রাত্রির মধ্যেই ফর্ম্মাইস মত এক দুর্গ প্রস্তুত করিলেন। সুতরাং রাজকন্যাকে বিবাহ করিলেন। কতিপয় দিবস মধ্যে এক দাসীর গর্ব্ভে ও গন্ধর্ব্বসেনের ঔরসে এক পুত্র হইল। এই পুত্রের নামই ভর্ত্তৃহরি। ইহার কিছু দিন পরে রাজকন্যার গর্ব্ভে গন্ধর্ব্বসেনের আর এক পুত্র হইল। ইনিই প্রাতঃস্মরণীয় ভুবনবিখ্যাত বিক্রমাদিত্য। গন্ধর্ব্বসেন দিনে গর্দ্দভ-শরীর এবং রজনীতে মনুষ্য-শরীর ধারণ করিতেন। বিক্রমাদিত্য জন্মিবার কিছু পূর্ব্বে গন্ধর্ব্বসেন যেই একদিন রজনীতে গর্দ্দভ্-শরীর রাখিয়া মনুষ্য-শরীর ধারণ করিয়াছিলেন, ধাররাজ অমনি তাঁহার গর্দ্দভ-শরীর ভস্ম করিয়া ফেলিলেন, সুতরাং গন্ধর্ব্বসেন শাপ হইতে মুক্ত হইলেন। তখন ধাররাজার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পিতৃভবনে চলিয়া গেলেন। এদিকে বিক্রমাদিত্য এবং ভর্ত্তৃহরি বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত নানাশাস্ত্রে বিশারদ হইয়া উঠিলেন। ধাররাজ স্বীয় দৌহিত্র বিক্রমাদিত্যকে মালব দেশ প্রদান করিয়া তথাকার রাজা করিয়া দিলেন। জ্ঞানবৃদ্ধ ও পরম ধার্ম্মিক বিক্রমাদিত্য জ্যেষ্ঠ থাকিতে কনিষ্ঠের রাজত্ব করা যুক্তি ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ জানিয়া স্বেচ্ছাক্রমে ভর্ত্তৃহরিকে রাজত্ব ছাড়িয়া দিলেন। ভর্ত্তৃহরি সুখে উজ্জয়িনীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ভর্ত্তৃহরির অঙ্গনা ও পিঙ্গলা নামে দুই স্ত্রী ছিল। অঙ্গনার অপ্সরা-নিন্দিত রূপ-লাবণ্য দেখিয়া ভর্ত্তৃহরি এরূপ মোহিত হইয়া গেলেন যে রাজকার্য্য ছাড়িয়া সর্ব্বদা অঙ্গনাকে লইয়া দিনপাত করিতেন। সুশাসন

অভাবে রাজ্যে নানারূপ অরাজকতা আরম্ভ হইল। একদা মহারাজ বিক্রমাদিত্য ভর্ত্তৃহরিকে তাঁহার ত্রুটী প্রদর্শন করিয়া নানা সদুপদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু স্ত্রৈনতা-নিবন্ধন তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। বরং অঙ্গনার কুপরামর্শে বিক্রমাদিত্যকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিলেন।

একদা ভর্ত্তৃহরি তাঁহার দুই স্ত্রীর নিকট একটী পতিরতা স্ত্রীর সহমরণের কথা বর্ণনা করিতে ছিলেন। তাহা শুনিয়া পিঙ্গলা সেই সতীর নানা প্রশংসা করিয়া তাহাকে দেবীর ন্যায় বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অঙ্গনা সে কথায় দৃক্‌পাতও করিলেন না। ইহাতে নৃপতির অঙ্গনার চরিত্রের উপর বিষম সন্দেহ হইল। একদা নৃপতি মৃগয়ায় গিয়াছিলেন; তিনি স্ত্রীদের চরিত্র পরীক্ষার জন্য বাটীতে 'রাজাকে ব্যাঘ্রে নষ্ট করিয়াছে' এইরূপ মিথ্যা সংবাদ প্রেরণ করিলেন। এই কথা শুনিবামাত্র পিঙ্গলা বিষাদে প্রাণত্যাগ করিলেন। কিন্তু অঙ্গনার এই সংবাদ শুনিয়া আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন এখন উপপতিকে লইয়া নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করিতে পারিব।

আর একদিন একজন তপস্বী ব্রাহ্মণ ভর্ত্তৃহরিকে একটী অলৌকিক ফল আনিয়া দিলেন। ঐ ফল উদরস্থ করিলে মনুষ্য অমর হয়। ভর্ত্তৃহরি অঙ্গনাকে প্রাণাধিক ভাল বাসিতেন সুতরাং ফলটি নিজে না খাইয়া অঙ্গনাকে দিলেন, অঙ্গনা তাহার উপপতিকে দিল, উপপতি তাহার প্রিয়তমা এক বারাঙ্গনাকে দিল, সে আবার উহা ভর্ত্তৃহরি মহারাজাকে পাঠাইয়া দিল। রাজা পুনরায় ফল পাইয়া অঙ্গনার সমুদায় চক্রান্ত অনুসন্ধান করিয়া লইলেন। অঙ্গনার চরিত্রের পরিচয় পাইয়া তাহাকে রাক্ষসীর ন্যায় বিষদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। তখন সতীসাধ্বী পতিরতা পিঙ্গলার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার বিরহে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। নিজের সমুদয় ভ্রম বুঝিয়া হৃদয়-বিদারক অনুতাপ উপস্থিত হইল। সংসার স্বপ্নের ন্যায় জ্ঞান হইতে লাগিল। পরিশেষে রাজত্ব ছাড়িয়া বনে গমন করিলেন। ১

যদিও আমরা উল্লিখিত প্রাচীন মতটিকে উপন্যাস বলিয়াছি, কিন্তু দেখিতে গেলে উহার মধ্যে ভর্ত্তৃহরি সম্বন্ধে অনেক বাস্তবিক ঘটনা নিহিত আছে। উহার শেষ ভাগের সার সংগ্রহ করিলে এই মাত্র জানা যায় প্রিয়তমা স্ত্রীর লোক-বিগর্হিত কার্য্যে অতিমাত্র মর্ম্মাহত হইয়া ভর্ত্তৃহরির সংসারের উপর ঘোরতর বিতৃষ্ণা জন্মিল, পরিশেষে বনবাসী হইলেন। তিনি এই উদাসীন অবস্থায় বলভীপতি নরেন্দ্রের আশ্রয়ে থাকিয়া ভর্ত্তৃকাব্য প্রণয়ন করিবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। সুতরাং উল্লিখিত ষষ্ঠ মতটী প্রামাণ্য

১ যাঁহারা সংবৎ-প্রবর্ত্তক বিক্রমাদিত্য এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরি সম্বন্ধে পাশ্চত্যাদের ইতিহাস ব্যতীত আর কিছু না জানেন তাঁহারা রাজ তরঙ্গ প্রভৃতি একবার খুলিয়া দেখুন :—

না হউক নিতান্ত অসংলগ্ন বলিয়া বোধ হয় না। তাই বলি একথায় ভরতমল্লিকের মতেরই পুষ্টি সাধন করিতেছে। কিন্তু কোন গ্রন্থকার বলেন ভর্ত্তৃহরি স্বয়ং স্বাধীন নৃপতি হইয়া অন্য রাজার আশ্রমে অবস্থিতি করিবেন ইহা কদাপি সম্ভবপর নহে। একথা আমরা অসঙ্গত জ্ঞান করি না। কিন্তু তর্কস্থলে বলিতে পারি যে, (মনে করুন) ভর্ত্তৃহরি নরেন্দ্র নৃপতির একজন বন্ধু ছিলেন তখন তাহার মন সাংসারিক কষ্টে নিতান্ত জর্জ্জরিত হইয়াছিল, বন্ধুর নিকট মনের দুঃখ প্রকাশ করিলে দুঃখের কিঞ্চিৎ লাঘব হইবে এই মনে করিয়া তিনি তখন কিয়ৎকাল বন্ধুর আশ্রয়ে ছিলেন এবং এবং সেই সময়ে ভট্টি-কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এইরূপ কোন অবস্থায় পতিত হইয়া একজন স্বাধীন নৃপতি অন্য নৃপতির আশ্রমে অবস্থিতি করিলে তাঁহার কোন গৌরবের হানি হইতে পারে না।

ক্রমশঃ

কালিদাস ও অভিজ্ঞান শকুন্তল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তিনি যখন শকুন্তলার ক্রোধ বর্ণনা করিতেছেন তখন রাজার মনে হইতেছে

মযোব বিস্মরণদারুণচিত্তবৃত্তৌ
বৃত্তং রহঃপ্রণয়মপ্রতিপদ্যমানে।
ভেদাদ্‌ভ্রুবোঃ কুটিলয়োরতিলোহিতাক্ষ্যা
ভগ্নং শরাসনমিবাতিরুষা স্মরস্য॥

ইহা দ্বারা আমাদের মনে তাদৃশ ক্রোধের ভাব হয় না। এখানে উপমা অতি লঘু, কিন্তু অনেকে বলিবেন যে, রাজার সে সময় মনের ভাব যেরূপ ছিল তদুপযুক্ত উপমা হইয়াছে—ইহা বলিলে কালিদাসকে দোষ হইতে মুক্ত করা হয় না, তিনি অন্য ব্যক্তির দ্বারা অথবা রাজার অন্য উপমা দ্বারা ক্রোধ দেখাইতে পারিতেন। ইহা কালিদাসের ওজোহীনত্বের পরিচয়। আমরা মহাভারতের এই বিষয়ে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করি।

নৈবমুক্তা বরারোহা ব্রীড়িতেব তপস্বিনী।
নিঃসংজ্ঞেব চ দুঃখেন তস্থৌ স্থূণেব নিশ্চলা॥
সংরম্ভামর্ষতাম্রাক্ষী স্ফুরমানোষ্ঠসম্পুটা।
কটাক্ষৈর্নির্দহন্তীব তির্য্যগ্রাজানমৈক্ষত॥
আকারং গূহমানা চ মন্যুনা চ সমীরিতা।
তপসা সম্ভৃতং তেজোধারয়ামাস বৈ তদা॥

এ বর্ণনা যদিও সরল তথাপি কালিদাসের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শকুন্তলা যখন ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে ভর্ৎসনা করিতেছে এবং বলিতেছে "অনার্য্য, আত্মনোহৃদয়ানুমানেন প্রেক্ষসে" ইত্যাদি, তখন বর্ণনা উত্তম হইয়াছে সন্দেহ নাই। আমরা এক্ষণে দেখিলাম যে কালিদাস ওজোগুণবিশিষ্ট বর্ণনা করিতে সচরাচর সমর্থ নহেন। অতএব ওজোগুণের অভাব তাঁহার তৃতীয় দোষ। এবার আমরা তাঁহার করুণরসের বর্ণনার বিষয় কিছু বলিব। কালিদাস কয়েক স্থানে শোকের বর্ণনা করিয়াছেন। কুমারের চতুর্থ সর্গে রতিবিলাপ, রঘুর অষ্টম সর্গে অজবিলাপ এবং শকুন্তলার ষষ্ঠাঙ্কে রাজা দুষ্মন্তের অনুতাপ। * এ সকল বর্ণনা শোকোদ্দীপক নহে। ইহা প্রকৃত করুণরস নহে, ইহা বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার। ইহাদের সহিত যদি উত্তর চরিতে রামবিরহের † তুলনা করা যায় তাহা হইলে আমরা দেখিব, যে কালিদাসের বর্ণনা অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ এবং আমাদের হৃদয়গ্রাহী নহে। এ সকল বর্ণ-

* বিক্রমোর্ব্বশীর চতুর্থ অঙ্কে যে বর্ণনা আছে তাহা শোকের নহে। তাহা উন্মত্ততার বর্ণনা, সেই জন্য আমরা এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম না।

† উত্তর-চরিতের অঙ্গী রস কি এ সম্বন্ধে আলঙ্কারিকদের মতামত আছে। আমরা কিন্তু উত্তরচরিতকে করুণরস-প্রধান বলিব। যদিও এরূপ বলা নাটকের নিয়মবিরুদ্ধ। আর উত্তরচরিতের বিরহ ও অভিজ্ঞানশকুন্তলের বিরহ প্রভৃতির সহিত প্রভেদ দেখাইবার জন্য এসকলকে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার বলা গেল।

নাতে আমরা স্পষ্টরূপে পূর্ব্বোক্ত প্রেমের ভাব সকল দেখিতে পাই, সেই আসঙ্গলিপ্সা, সেই কামুকতা। এখানে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম। রতি খেদ করিয়া পূর্ব্বঘটনা স্মরণ করিতেছেন ও বলিতেছেন

শিরসা প্রণিপত্য যাচিতা-
ন্যুপগূঢ়ানি সবেপথূনি চ।
* * চ তানি তে রহঃ
স্মর সংস্মৃত্য ন শান্তিরস্তি মে॥

ইহা অতি কদর্য্য ভাব, বিশেষতঃ শেষ চরণটী জঘন্য, এরূপ শোকের সময় সেই সকল ব্যাপার মনে করিয়া যেন ইন্দ্রিয়জ্বালায় কাতর হওয়া অতি কদর্য্য। আবার এসময়ে সুরকামিনীদিগের প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়াও অসম্ভব, কিন্তু রতি বলিতেছে

অহমেত্য পতঙ্গবর্ত্মনা
পুনরঙ্কাশ্রয়িণী ভবামি তে।
চতুরৈঃ সুরকামিনীজনৈঃ
প্রিয় যাবন্ন বিলোভ্যসে দিবি॥

এরূপ ভাব বিস্তর আছে কিন্তু এসকল অনৈসর্গিক, ইহাতে কালিদাসের অশ্লীলতা এবং কুরুচির পরিচয় পাওয়া যায় *। রঘুতে অজবিলাপ রতিবিলাপ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু সেখানেও অনেক দোষ দেখা যায়। অনেক স্থানে রতি এবং অজর ভাব এক প্রকার তাহা পাঠ মাত্রেই অবগত হওয়া যায়। আমরা অজবিলাপ হইতে কেবল দুটী অশ্লীল ভাবের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছি যে এরূপ ভাব শোকের সময় আসিলে আমাদের মনে করুণার উদ্রেক হয় না, বরঞ্চ আমরা তাহাতে বিরক্ত হই ও আমাদের রসভঙ্গ হয়।

"ইয়মপ্রতিবোধশায়িনীং
রসনা ত্বাং প্রথমা রহঃসখী।
গতিবিভ্রমসাদনীরবা
ন শুচা নানুমৃতেব লক্ষ্যতে॥"

আবার,

"ননু শব্দপতিঃ ক্ষিতেরহং
ত্বয়ি মে ভাবনিবন্ধনা রতিঃ॥
মদিরাক্ষি মদাননার্পিতং
মধু পীত্বা রসবৎ কথং নু মে।
অনুপাস্যসি বাষ্পদূষিতং
পরলোকোপনতং জলাঞ্জলিম্॥"

রতিবিলাপের মধ্যে মধ্যে যত জঘন্য ভাব আছে, ইহা সেরূপ নহে তথাপি সময়োচিত নহে।

অভিজ্ঞানশকুন্তলের ষষ্ঠাঙ্কের কথা আর কি বলিব, ইহাতে কিছু অশ্লীলতা নাই কিন্তু সেই মদনজ্বালা আছে, ইহাতেও আমাদের শোক উদয় হয় না। কিন্তু রামবিরহ পাঠ করিলে আমরা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না, আমাদের হৃদয় শোকে

* কেহ বলিবেন যে রতি রত্যাখ্য ভাবের মূর্ত্তি, তাহার এইরূপ হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা নয়, (See note 24) কালিদাসের সর্ব্বত্র এইরূপ ভাব আছে, অজর বর্ণনাতে কেবল সেইরূপ ভাব কিন্তু অজও কি এত কামুক ছিলেন? তাহা নহে, এ সকল ব্যক্তি দ্বারা কালিদাস আপনার অন্তঃকরণের অবস্থা দেখাইতেছেন।

অভিভূত হইয়া যায়। আমরা তখন এরূপ তন্মনা হই যে রামের ভাব সকল আমাদের নিজের ভাব মনে করি। যাহা হউক এখানে আর একটী বিষয় বক্তব্য আছে। কালিদাসও রামচরিত আদ্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু সে বর্ণনা অকিঞ্চিৎকর, রামের প্রকৃত স্বভাব কালিদাস বর্ণনা করিতে পারেন নাই। তাঁহার বীরত্ব স্নেহবত্তা প্রভৃতি হৃদয়গ্রাহী গুণ সকল কালিদাসের লেখনীতে প্রকাশিত হয় নাই, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রাম-রাবণের সমর বর্ণনা কিছুই হয় নাই, তাহা বীররসের বিড়ম্বনা। এখানে করুণ রসের কথা বলিতে গিয়া দেখিতেছি যে রাম সীতা পরিত্যাগ সময়ে বলিতেছেন

"তস্যাপনোদায় ফলপ্রবৃত্তৌ
উপস্থিতায়ামপি নির্ব্ব্যপেক্ষঃ।
ত্যক্ষ্যামি বৈদেহসুতাং পুরস্তাৎ
সমুদ্রনেমিং পিতুরাজ্ঞয়েব॥"

ইহা পাঠ করিলে মনে হয় যে রাম অতি নিষ্ঠুর। তিনি অনায়াসে গর্ভমন্থরা সীতাকে ত্যাগ করিবেন, আর যেন সীতা ও "সমুদ্রনেমি" এক প্রকারের বস্তু ও সুতরাং সমান আদরণীয়। এ সকল ভাব রামের স্বভাববিরুদ্ধ সন্দেহ নাই। রাম যে সীতার প্রতি কিরূপ স্নেহবান ছিলেন ও এক দিকে সীতা নির্ব্বাসন আর এক দিকে প্রজাদিগের সন্তোষবিধান, এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া কি মানসিক যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন তাহা ভবভূতি অদ্বিতীয় ক্ষমতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। উত্তরচরিতের সে সকল অংশ পাঠ করিলে এরূপ মর্ম্মভেদী শোক উপস্থিত হয় যে অপি গ্রাবা রোদিত্যপি দলতি বজ্রস্য হৃদয়ম্।

Creates a soul
Under the ribs of death

গোবর্দ্ধনাচার্য্য একজন যথার্থ রসগ্রাহী, তিনি ভবভূতির উপর একটী কবিতা লিখিয়াছেন।

ভবভূতেহি সম্পর্কাৎ
ভূধরভূরেব হি ভারতী ভাতি।
তস্মিন্ করুণাস্পর্শিনি
কিমন্যথা রোদিতি গ্রাবা॥

এখানে পাঠক দেখিবেন যে ভূধরভূঃ বলাতে ভারতীর মহত্ব ও গভীরত্ব সূচিত হইতেছে। কালিদাসের এতাদৃশ ক্ষমতা ছিল না। এবং সীতাপরিত্যাগের পর রামের যে শোক হইয়াছিল তাহার বর্ণনা কালিদাসে প্রায় কিছুই নাই। বোধ হয় কালিদাস নিজের ক্ষমতা জানিতেন। পাছে আবার এক অজবিলাপ লিখিয়া বসেন এই জন্য রামের শোক বর্ণনা বাহুল্যরূপে করেন নাই। বস্তুত রামচরিতের ন্যায় আদরণীয় এবং বর্ণনার বস্তু সমস্ত রঘুবংশে নাই কিন্তু এ অংশে কালিদাসের কবিত্ব কিছুই প্রকাশ পায় নাই। *

আমরা যে সকল উদাহরণ দিয়াছি

* মধ্যে মধ্যে সমুদ্র বর্ণনা, দণ্ডকারণ্য বর্ণনা প্রভৃতি উত্তম বস্তু আছে, কিন্তু রামচরিতের সহিত তাহার বিশেষ সম্পর্ক নাই, রাম চরিত বর্ণনা কালিদাসের ভাল নাই।

তাহা করুণ রসের নহে। আমরা বলিয়াছি যে এ সকল বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার। অভিজ্ঞান শকুন্তলের চতুর্থ অঙ্কে, এবং রঘুর স্থানে স্থানে কালিদাস করুণ রসের বর্ণনা করিয়াছেন *। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্ক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ, এবং সাতিশয় হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু এ স্থলে আমাদের স্নেহরস উদ্রিক্ত হয় কারণ যথার্থ শোক উদয় হইবার বিষয় নহে। কন্যা শ্বশুরালয়ে গমন করিবে, ইহাতে কিঞ্চিৎ দুঃখ হইবে শোক হওয়া অলক্ষণের কথা। অতএব আমরা দেখিলাম যে প্রকৃত মর্ম্মভেদী করুণ রস কালিদাসে নাই। এখানে আমরা কালিদাসের রস সকলের পর্য্যালোচনা সমাপ্ত করিলাম এবং তাঁহার শক্তি সকল রস ভাল বর্ণনা করিতে পারে না তাহাও স্পষ্ট বুঝা গেল। কালিদাসের কবিত্ব শক্তির বিচার করিয়া দেখিলাম যে তাঁহার কয়েকটি দোষ আছে যে সকল দোষ নাটকীয় শক্তির অনিষ্ট করে। অতএব আমাদের মতে তিনি নাটককার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি। কবিত্বের কথা ধরিতে হইলে তাঁহার গুণ যথেষ্ট আছে। তাঁহার বর্ণনা সকল অতি চমৎকার, সেরূপ বর্ণনা সংস্কৃত ভাষায় আর নাই। যদি কালিদাসের বর্ণনা শক্তির কথা ধরা যায় তাহা হইলে কালিদাস একজন জগতের প্রধান কবি। কিন্তু তাঁহার শক্তি বহির্জ্জগৎ বর্ণনা করিতে যেরূপ পারে নাটকীয় শক্তির অভাব বশতঃ অন্তর্জ্জগৎ বর্ণনা করিতে সেরূপ পারে না। গিরি নদী, তপোবন, সমুদ্র, আকাশ, অলকা, অযোধ্যা, উজ্জয়িনী, দণ্ডকারণ্য এ সমস্ত যেন চিত্রপটে ন্যস্ত দেখিতে পাই। কালিদাসের উপমা সকল পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে তন্ন তন্ন করিয়া তিনি নিসর্গ-শোভা অবলোকন করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার উপমা সকল এত চমৎকার, যেন বর্ণিত বস্তু সকল প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেয়, যখন তিনি বাহ্য জগৎ বর্ণনা করেন তখন তাঁহার কল্পনাশক্তি যেন পাঠকের মনকে উড়াইয়া লইয়া যায়, এবং বর্ণিত বস্তু সকল প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেয়। মেঘদূত পাঠ করিলে আমাদের শরীর পুলকিত হয়, আমরা যেন মেঘের সঙ্গে সঙ্গে ব্যোম মার্গে উড়িয়া যাই, আমরা যেন উজ্জয়িনীতে মহাকালের আরতি দেখিতে পাই এবং নর্ত্তকীদের নূপুরধ্বনি যেন আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, আমরা যেন হিমালয়ের তুষার-মণ্ডিত শিখরমালাকে দৃষ্টিগোচর করি, এবং আমাদের মনে হয় যে "রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ" আমরা দেখিতেছি। পরে মেঘ যখন অলকা-

* রঘুর যে সকল স্থানে করুণ রস আছে তাহার বর্ণনা কালিদাস কিছুই করেন নাই যথা দশরথ কর্ত্তৃক মুনিপুত্র বধ। এমন শোকোদ্দীপক ব্যাপার কালিদাস উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। আবার যখন লক্ষ্মণ সীতাকে বনে ছাড়িয়া আসিতেছেন, তখন বর্ণনা যাদৃশ শোকাবহ হওয়া উচিত তাদৃশ হয় নাই—ভবভূতির যেরূপ বর্ণনা, তাহার সহিত তুলনা করিলে অতিশয় অকিঞ্চিৎকর মনে হয়।

পুরীতে উপনীত হইল আমরাও যেন সে খানে গিয়া যক্ষ সকলের বিহার মধুপান সমস্তই অনুভব করি, আবার যখন যক্ষপত্নীর বর্ণনা হইতেছে তখন আমাদের মনে হয় যেন কালিদাস এক খানি ছবি প্রস্তুত করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিলেন। এরূপ আশ্চর্য্য বর্ণনা আর দেখিতে পাওয়া যায় না, য়ুরোপীয় কবিদের মধ্যেও বিরল।

আমাদের মনে হয় যে কালিদাস যত গ্রন্থ লিখিয়াছেন সকলের মধ্যে মেঘদূত, বিক্রমোর্ব্বশীর ৪র্থ অঙ্ক এবং কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট—কুমারের তৃতীয় সর্গে কি অলৌকিক বস্তু আছে তাহা অনির্ব্বচনীয়। কালিদাসের কাব্যে উন্নত গভীর ভাব সচরাচর নাই, কারণ, তিনি অনাবশ্যক স্থলেও আদিরস আনিয়া ফেলেন। কিন্তু তৃতীয় কুমারে তাঁহার মোহিনী তন্ত্রীতে হোমর ও মিলটনের গভীর তান শুনিতে পাওয়া যায়। যথা—

"ততো ভুজঙ্গাধিপতেঃ ফণাগ্রৈঃ,
অধঃ কথঞ্চিদ্ধৃতভূমিভাগঃ।
শনৈঃকৃতপ্রাণবিমুক্তিরীশঃ,
পর্য্যঙ্কবন্ধং নিবিড়ং বিভেদ॥"

Comp. Iliad I. Book.

হোমর জুপিটারের এইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন

"He spoke and awful bends his sable brow,
"Shakes his ambrosial curls and gives the nod,
"The stamp of fate, and sanction of the God;
"High heaven with trembling the dread signal took,
"And all Olympus to the centre shook."

আবার যে সকল শ্লোকে শিবের ধ্যান ও লতাগৃহ দ্বারে নন্দী নিস্তব্ধ তপোবন প্রভৃতির বর্ণনা আছে তাহা অতিশয় চমৎকার এবং লোমহর্ষণ—আমরা কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

লতাগৃহদ্বারগতোঽথ নন্দী
বামপ্রকোষ্ঠার্পিতহেমবেত্রঃ।
মুখার্পিতৈকাঙ্গুলিসংজ্ঞয়ৈব
মা চাপলায়েতি গণান্ ব্যনৈষীৎ॥ ৪১

নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃতদ্বিরেফং
মূকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারম্।
তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্ব্বং
চিত্রার্পিতারম্ভমিবাবতস্থে॥ ৪২

অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহম
অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধাৎ
নির্ব্বাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥ ৪৮

মনোনবদ্বারনিষিদ্ধবৃত্তি
হৃদি ব্যবস্থাপ্য সমাধিবশ্যম্।
যমক্ষরং ক্ষেত্রবিদোবিদুস্তম্
আত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তম্॥ ৫০

স্মরস্তথাভূতমযুগ্মনেত্রং
পশ্যন্নদূরান্মনসাপ্যধৃষ্যম্।
নালক্ষয়ৎ সাধ্বসসন্নহস্তঃ
স্রস্তং শরং চাপমপি স্বহস্তাৎ॥ ৫১

শেষোক্ত শ্লোকে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে মহাদেবকে দর্শন করিয়া কন্দর্প এতাদৃশ

ভীত হইল যে ধনুর্ব্বাণ হস্ত হইতে যে স্খলিত হইল তাহা জানিতে পারিল না। এ ভাবটী অতি চমৎকার এবং যথার্থ ভয়-সূচক।

এ সর্গে অন্যান্য বর্ণনাতেও যথেষ্ট চমৎকারিত্ব আছে। ওজোগুণ-বিশিষ্ট বর্ণনা কালিদাসে বিরল তাহা দেখিয়াছি কিন্তু এ সর্গে অনেক স্থলে সে গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার পার্ব্বতীর বর্ণনা ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬ শ্লোক যেমন তৃতীয় সর্গে চমৎকার, এরূপ প্রথম সর্গে হয় নাই এবং মেঘদূতের যক্ষপত্নীর বর্ণনা ব্যতিরেকে এরূপ আর কুত্রাপি নাই। এ বর্ণনাতে কালিদাসের যাহা প্রধান দোষ—আদিরসের প্রাচুর্য্য—তাহা নাই। হরপার্ব্বতীর ভাব-ব্যক্তি কিরূপ হইল তাহাও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। যথা

হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্য
শ্চন্দ্রোদয়ারম্ভইবাম্বুরাশিঃ।
উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে
ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি॥ ৬৭
বিবৃণ্বতী শৈলসুতাপি ভাবং
অঙ্গৈঃ স্ফুরৎবালকদম্বকল্পৈঃ।
সাচীকৃতা চারুতরেণ তস্থৌ
মুখেন পর্য্যস্তবিলোচনেন॥ ৬৮

আবার যদি কুমারের তৃতীয় সর্গের বসন্ত বর্ণনার সহিত রঘুর নবম সর্গের বসন্ত বর্ণনার তুলনা করা যায়, তাহা হইলে বিস্তর প্রভেদ দেখা যায়। অতএব আমরা দেখিলাম যে কুমারের তৃতীয়তে যা যা বস্তু আছে তাহা সমস্তই অলৌকিক কবিত্বের পরিচয়। কুমারের পঞ্চম সর্গেও চমৎকার বর্ণনা আছে কিন্তু তৃতীয় অপেক্ষা ঈষৎ নিকৃষ্ট। এ সর্গে ছদ্মবেশী মহাদেব ও তপস্বিনী পার্ব্বতীর যে কথোপকথন আছে তাহাতে কালিদাস কবিত্বের একশেষ দেখাইয়াছেন।

কালিদাসের যে সমস্ত গুণ আছে তাহা সংস্কৃত পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। কালিদাসের কবিতার ন্যায় মধুময় প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট সরস কবিতা কোথাও নাই। আমরা কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি মাত্র কিন্তু তাঁহার যে কি কি গুণ আছে তাহা উত্তম রূপে দেখিতে গেলে তাঁহার কাব্য সকল আদ্যন্ত পাঠ করা উচিত। আমরা যে সকল দোষ দেখাইয়াছি তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু এ সকল দোষ সত্ত্বেও তিনি একজন প্রধান কবি তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিতেছি যে কালিদাসের মন কখন ভবভূতি অথবা Wordsworth অথবা Tennyson এর মত ছিল না। অনেকে বলিবেন যে তাহা ছিল না এতে ক্ষতি কি। কবি যে একজন স্মার্ত্তবাগীশ হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই এবং অনেক কবি এমন কি Shakespeare পর্য্যন্ত অশ্লীল বর্ণনা করেন। কিন্তু আমরা বলি যে প্রধান কবিদের সে গুণ থাকা আবশ্যক, কারণ কাব্যের উদ্দেশ্য যে কেবল কিয়ৎক্ষণ চিত্তবিনোদন করা এরূপ নহে, চিত্তবিনোদনের সহিত আমাদের

স্বভাব ও মন পরিমার্জ্জিত হইবে। রাস্কিন বলিয়াছেন যে প্রধান প্রধান চিত্রকরগণের নীতিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক, তেমনি কবিদের হওয়া অধিকতর আবশ্যক।

আবার কাব্যপ্রকাশে প্রথমেই বলা হইয়াছে যথা—

"কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে
ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে
কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে॥

মম্মটভট্টের সূত্র দেখিয়া কিছু কালিদাস গ্রন্থ রচনা করেন নাই, কিন্তু নানা গ্রন্থে উপরোক্ত গুণ সকল দেখিয়া তবে মম্মট কাব্যের লক্ষণ লিখিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি যে কালিদাসের কাব্য সমূহে কোন উপদেশ পাই না। বরঞ্চ মানুষের যে সমস্ত রিপুকে দমন করা উচিত কালিদাস সেই সকল রিপুকে আদরণীয় ও জগতে সার বস্তু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আর অন্য কবিদের দোষ দেখাইয়া কালিদাসের দোষাপনয়ন করা হয় না। Shakespeare যেখানে অশ্লীল বর্ণনা করিয়াছেন সেখানে তিনি নিশ্চয় দোষী। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ সকলে উপদেশ যথেষ্ট আছে, ভাব ওরূপ আর কোথাও নাই। Shakespeare পাঠ করিলে বোধ হয় যে তাঁহার মন অতিশয় উন্নত ছিল, তাঁহার অশ্লীলতা তৎসময়ের রুচিনিবন্ধন। কিন্তু কালিদাসের মন সেরূপ নহে। যাহা হউক এ বিষয়ে যদিও কালিদাস দোষী তথাপি অন্যান্য কর্ত্তব্য বিষয়ের বর্ণনাতে তাঁহার ঔচিত্য ভঙ্গ দেখা যায় না, যথা দিলীপের ধেনু রক্ষা, রঘুর বদান্যতা, পার্ব্বতীর মনস্বিতা ইত্যাদি। এ সকল বর্ণনাতে আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে কালিদাস গুণগ্রাহী ও ভাবুক ছিলেন এবং ঐ সকল গুণ তাঁহার আদরণীয় ছিল। কালিদাসের জীবনের ইতিহাস কিছু নাই, এজন্য তাঁহার স্বভাব কিরূপ ছিল তাহা আমরা জানি না, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ পাঠে যাহা কিছু অবগত হওয়া যায় তাহা আমরা ইঙ্গিতচ্ছলে বলিলাম, কোন কাব্যপ্রিয় পণ্ডিতের এ সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করা উচিত।

আমরা এ প্রস্তাব শেষ করিবার পূর্ব্বে আর একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি, কালিদাস বাহ্য জগৎ বর্ণনাতে অদ্বিতীয়, কিন্তু বাহ্য জগৎ দর্শন করিলে সময় ও অবস্থানুসারে মনে যে কিরূপ ভাব উদিত হয় কালিদাসে তাহা কোথাও নাই। আমরা দেখিতেছি যে, এ দোষ কেবল কালিদাসের নহে, সংস্কৃত কবি মাত্রেরই আছে। তাঁহারা মনের ভাব সকল স্পষ্টাক্ষরে বর্ণনা করেন না। দিগন্তবিস্তীর্ণ মহাসাগর, অভ্রভেদী পর্ব্বতশিখর, জনশূন্য নিবিড় বন প্রভৃতি প্রকৃতির শোভা দেখিয়া আমাদের মনে কত উন্নত ভাবের উদয় হয়, কিন্তু সে সকল ভাব সংস্কৃত কবিগণ বর্ণনা করেন না। কিন্তু ইয়ুরোপীয় কবিগণের ক্ষমতা শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। তাঁহারা বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ উভয় বর্ণনাতে সমান নিপুণ এবং

প্রকৃতির শোভা অবলোকন করিয়া মনে যে কি অদ্ভুত ভাব সকলের উদয় হয় তাঁহারা চমৎকার রূপে বর্ণনা করেন এবং তাঁহাদের বর্ণনার এমনি গুণ যে পাঠকের মনেও সেই সব ভাবের উদয় হয়—Pope বলিয়াছেন যে যথার্থ কবি—

Can make me feel each passion that he feigns
Enrage compose with more than magic art,
With pity and with terror tear my heart.

ইহা ইয়ুরোপীয় কবিদের মধ্যে বিশেষ রূপে দেখা যায় কিন্তু সংস্কৃত কবিদের মধ্যে পাই না—

আমরা যাহা বলিলাম তাহার প্রমাণ করিবার জন্য এখানে কালিদাস ও বায়রণ * হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইবে যে আমরা যাহা বলিলাম তাহা সত্য। এক বস্তু দ্বারা উভয়ের মনে কি ভাব উদিত হইতেছে পাঠক তাহা দেখুন—

সমুদ্র বর্ণনা—রঘুবংশ ১৩ শ সর্গ।

বৈদেহি পশ্যামলয়াৎ বিভক্তং
মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্।
ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্ন-
মাকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্॥

এ উপমাটী চমৎকার,

৫ তাং তামবস্থাং প্রতিপদ্যমানং
স্থিতং দশ ব্যাপ্য দিশো মহিম্না।
বিষ্ণোরিবাস্যানবধারণীয়ম্
ঈদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা॥

৭ পক্ষচ্ছিদা গোত্রভিদাত্তগন্ধাঃ
শরণ্যমেনং শতশো মহীধ্রাঃ।
নৃপাঃ ইবোপপ্লবিনঃ পরেভ্যঃ
ধর্ম্মোত্তরং মধ্যমমাশ্রয়ন্তে॥

১০ সসত্ত্বমাদায় নদীমুখাম্ভঃ
সম্মীলয়ন্তো বিবৃতাননত্বাৎ।
অমী শিরোভিস্তিময়ঃ সরন্ধ্রৈঃ
ঊর্দ্ধং বিতন্বন্তি জলপ্রবাহান্॥

১১ মাতঙ্গনক্রৈঃ সহসোৎপতদ্ভিঃ
ভিন্নান্ দ্বিধা পশ্য সমুদ্রফেনান্।
কপোলসংসর্পিতয়া য এষাং
ব্রজন্তি কর্ণক্ষণচামরত্বম্।

১৪ প্রবৃত্তমাত্রেণ পয়াংসি পাতুম
আবর্ত্তযোগাদ্ ভ্রমতা ঘনেন
আভাতি ভূয়িষ্ঠময়ং সমুদ্রঃ
প্রমথ্যমানো গিরিণেব ভূয়ঃ॥

এ সকল কবিতা উত্তম হইয়াছে। সমুদ্রের যেরূপ শোভা তাহা (২) শ্লোকে বলা হইয়াছে, অন্যান্য শ্লোকে তিমি নক্র প্রভৃতি ভীষণ জন্তুদের ক্রীড়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ আশ্চর্য্য প্রকাণ্ড ভীষণ বস্তু দেখিলে যে মনে কিরূপ আনন্দ ও কিরূপ উন্নত উদার ভাব সকল জন্মায় তাহা এ

* বায়রণের সহিত কালিদাসের সাদৃশ্য কতক আমরা দেখিয়াছি, এখানে অন্য কবির সহিত তুলনা না করিয়া বায়রণের সসহিত করিলাম। কারণ বায়রণ কালিদাসের ন্যায় বর্ণনা বিষয়ে প্রায় অদ্বিতীয়। সেই জন্য উভয়ের বর্ণনা-শক্তির তুলনা করা আবশ্যক।

সকল শ্লোকে নাই—এখানে বায়রণের সমুদ্র বর্ণনার সহিত তুলনা করা যাক্—

(CHILDE HAROLD IV. CLXXV.)

*   *   *   *

Yet once more let us look upon the sea ;
The midland ocean breaks on him and me,
And from the Alban mount we now behold
Our friend of youth, the Ocean. * *

178

There is a pleasure in the pathless wood,
There is a rapture on the lonely shore,
There is society, where none intrudes,
By the deep Sea, and music in its roar !
I love not Man the less, but Nature more,
From these our interviews, in which I steal
From all I may be, or have been before,
To mingle with the Universe, and feel
What I can ne'er express, yet cannot all conceal.

(এখানটী পাঠ করিলে আমরা যথার্থই বায়রণের আনন্দ অনুভব করি।) *

179

Roll on, thou deep and dark blue Ocean—roll !
Ten thousand fleets sweep over thee in vain ;
Man marks the earth with ruin,—his control
Stops with the shore ;—upon the watery plain
The wrecks are all thy deed, nor doth remain
A shadow of man's ravage, save his own,
When for a moment, like a drop of rain,
He sinks into thy depths with bubbling groan
Without a grave, unknelled, uncoffined and unknown.

181

The armaments which thunderstrike the walls
Of rock-built cities, bidding nations quake,
And monarchs tremble in their capitals,
The oak-leviathans, whose huge ribs make
Their clay creator the vain title take
Of lord of thee, and arbiter of war ;
These are thy toys, and, as the snowy flake,
They melt into thy yeast of waves, which mar
Alike the Armada's pride, or spoils of Trafalgar.

182

Thy shores are empires, changed in all save thee—
Assyria, Greece, Rome, Carthage, what are they ?
Thy waters washed them while they were free,

* আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে সংস্কৃত কবিদের মধ্যে এমন চমৎকার ভাব কোথাও নাই, কিন্তু ইহা কেবল সংস্কৃত কবিগণের মধ্যে নাই এমন নহে, ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি ব্যতিরেকে অন্য সময়ের কবিগণের মধ্যে আমরা পাইতে পারি না, এরূপ ভাব সকল আধুনিক, অতএব সংস্কৃত কবিদের নাই বলিয়া আমরা কখনই দোষারোপ করিতে পারিব না। আমরা এস্থলে অন্যান্য উদার ভাবের সহিত কালিদাসের বর্ণনার তুলনা করিতেছি।

And many a tyrant since; their shores obey
The stranger, slave, or savage; their decay
Has dried up realms to deserts:—not so thou,
Unchangeable save to thy wild waves' play—
Time writes no wrinkles on thy azure brow—
Such as creation's dawn beheld, thou rollest now.

183

Thou glorious mirror, where the Almighty's form
Glasses itself in tempests; in all time,
Calm or convulsed—in breeze, or gale, or storm,
Icing the pole, or in the torrid clime
Dark-heaving;—boundless, endless, and sublime—
The image of Eternity—the throne
Of the Invisible; even from out thy smile,
The monsters of the deep are made; each zone
Obeys thee; thou goest forth, dread, fathomless, alone.

এখানে দুই তিন স্থানে পাঠক কালিদাস হইতে উদ্ধৃত শ্লোকের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য দেখিবেন, কিন্তু সেই সাদৃশ্য মধ্যে কত প্রভেদ; ৫ম শ্লোকে সাদৃশ্য আরও অধিক, এ শ্লোকের সহিত বায়রণের 183 st পাঠ করা উচিত, কালিদাস সমুদ্রের মহিমা ও রূপ বিষ্ণুর ন্যায় অনবধারণীয় বলিতেছেন, বায়রণও সমুদ্রকে ঈশ্বরের ছায়া বলিতেছেন, এবং "তাং তাং অবস্থাং" বায়রণ কি ক্ষমতার সহিত লিখিয়াছেন! কালিদাস বলিতেছেন

"ঈদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া" বা

বায়রণ বলিতেছেন "boundless, endless, and sublime"—এই বর্ণনা দ্বয়ের মধ্যে অন্যান্য ভাবেরও সাদৃশ্য আছে। কিন্তু বায়রণ কি অপূর্ব্ব মনোহর গভীর ভাব আনিয়াছেন তাহা কালিদাসে নাই। আমরা বিস্তর উদাহরণ এবং অন্যান্য কবিগ্রন্থ সকল উদ্ধৃত করিতে পারি, তাহাতে কেবল সময় নষ্ট করা হইবে, কারণ যাহা বলিয়াছি কেবল তাহা দৃঢ়ীভূত হইবে। কিন্তু আর একটী উদাহরণ দিতে ইচ্ছা করি। এবার উদার ভাবের কথা নহে কিন্তু তথাপি গভীরতা যথেষ্ট আছে।

অযোধ্যা বর্ণনা—১৬শ সর্গ রঘু—

কুশ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তুমি কে, কাহার স্ত্রী এবং আমার নিকট আসিবার প্রয়োজন কি?

৭। "বিভর্ষি চাকারমনির্বৃতানাং
মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্"

প্রশ্নের উত্তর দিয়া অযোধ্যার অধিদেবতা বলিতেছেন,

বস্বোকসারাম্ অভিভূয় সাহং
সৌরাজ্যবদ্ধোৎসবয়া বিভূত্যা।
সমগ্রশক্তৌ ত্বয়ি সূর্য্যবংশ্যে
১০। সতি প্রপন্না করুণামবস্থাং॥
বিশীর্ণতল্পাট্টশতো নিবেশঃ
পর্য্যস্তশালঃ প্রভুনা বিনা মে।

বিড়ম্বয়ত্যস্তনিমগ্নসূর্য্যং

১১। দিনান্তমুগ্রানিলভিন্নমেঘম্॥

ইহার পর কালিদাস এবং সংস্কৃত কবিদিগের যেমন রীতি আছে, শিবাসঙ্কুল রাজপথ, রমণীশূন্য সোপান, বানর কর্ত্তৃক ক্লিষ্ট উদ্যান-লতা প্রভৃতির বর্ণনা চলিল—কিন্তু এ সকল দেখিয়া মনে যে কিরূপ ভাব উদয় হয়, তাহার কোন উল্লেখ নাই। বায়রণ গ্রীশকেও এক রমণী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু উভয়ের প্রভেদ বিস্তর। কালিদাসে অযোধ্যা এক জীবিতা রমণী, বায়রণের গ্রীশ এক সদ্যোপরতা সুন্দরী, বায়রণ কেবল "বিভর্ষি চাকারমনির্বৃতানাং মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্" এরূপ একটী উপমা দিয়া ক্ষান্ত হইবার কবি নহেন, ওরূপ রমণী দেখিতে হইলে পাঠকের মনে কি হইত, তাহা পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া পাঠককে সমদুঃখিত করেন।

GIAOUR.

He who hath bent him o'er the dead
Ere the first day of death is fled,
The first dark day of nothingness,
The last of danger and distress,
(Before Decay's effacing fingers,
Have swept the lines where beauty lingers,)
And mark'd the mild angelic air,
The rapture of repose that's there,
The fix'd yet tender traits that streak
The langour of the placid cheek,
And—but for that sad shrouded eye,
That fires not, wins not, weeps not, now,
And but for that chill, changeless brow,
Where cold obstruction's apathy
Appals the gazing mourner's heart,
As if to him it could impart
The doom he dreads, yet dwells upon;
Yes, but for these and these alone,
Some moments, aye, one treacherous hour,
He still might doubt the tyrant's power;
So fair, so calm, so softly seal'd,
The first, last look by death revealed!
Such is the aspect of this shore;
'Tis Greece, but living Greece no more!
So coldly sweet, so deadly fair,
We start, for soul is wanting there.

আমরা বায়রণের রোম-বর্ণন উদ্ধৃত করিতাম, কিন্তু তাদৃশ উন্নত গভীর ভাব না দিয়া কালিদাসের ন্যায় মৃদুভাব দিলাম, কত প্রভেদ! তথাপি এখানেও বিস্তর অনৈক্য। আমরা বলিয়াছি যে এক প্রকারের বস্তু উভয়ের মনে বিভিন্ন ভাব উৎপাদন করে, আমরা তাহার প্রমাণ দিলাম—এখানে পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন কাহার ভাবের চমৎকারিত্ব অধিক—কে আমাদের অন্তঃকরণকে ভাবার্দ্র করিতে পারে। এই শেষোদ্ধৃত বর্ণনাদ্বয়ের আর একটী বিষয় লক্ষ্য করা উচিত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে কালিদাসের বহির্জগৎ বর্ণনাতে বিশেষ ক্ষমতা ছিল, এই জন্য তাঁহার উপমা সকল সমস্তই বহির্জগৎ সম্বন্ধীয়, এখানে বায়রণের সহিত তুলনা করাতে তাহা সবিশেষ দেখা যাইতেছে—কালিদাস অযোধ্যার দেবীকে নীহারপীড়িতা মৃণালিনীর ন্যায় বলিতেছেন, কিন্তু বায়রণ সেরূপ উপমা দেন নাই—

গ্রীশের অবসন্ন ভাব দেখিয়া ভাবুকের মনে যে সকল সূক্ষ্ম ভাব ক্রমশ উদিত হয়, বায়রণ তাহা আশ্চর্য্য কৌশলের সহিত চিত্রিত করিয়াছেন—এ সকল সূক্ষ্ম ভাব * আমরা সংস্কৃত কবিদের মধ্যে পাইতে বৃথাই যত্নবান হইব।

পরিশেষে বলা কর্ত্তব্য যে নৈসর্গিক বস্তু অবলোকন করিলে হৃদয়ে যে নানাবিধ উদার ভাব উপস্থিত হয়, কালিদাস স্থানে স্থানে সে সকল ভাবের বর্ণনা করিয়াছেন—যথা শাকুন্তলে

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাং
আবির্ভবত্যরুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং
লোকোনিয়ম্যত ইবাত্মদশান্তরেষু॥
রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকীভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥

এবঞ্চ

অভিতপ্তময়োঽপি মার্দ্দবং
ভজতে কৈব কথা শরীরিষু॥ ইত্যাদি

এরূপ শ্লোক সকল কালিদাসে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না, কিন্তু কালিদাস যখন কোন বিরহী প্রেমিকের বর্ণনা করেন, তখন তাঁহার অন্তঃকরণের সূক্ষ্ম ভাব (pathos) সকল উত্তম রূপে দেখাইতে পারেন, এ বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতা অতিশয় প্রশংসনীয়—আমরা এখানে বাহুল্যভয়ে আর অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না, কালিদাসের পাঠক মাত্রেই জানেন যে মেঘদূতে যক্ষপত্নীর বিরহ বর্ণনা এবং বিক্রমোর্ব্বশীর ৪র্থ অঙ্কে * পুরূরবার উন্মত্ততা—এই দুই স্থলে উভয়বিধ ভাব যথেষ্ট আছে—এবং বহির্জগৎ দেখিলে কাম-পরায়ণ জনের মনের যে অবস্থা হয়, তাহা অতি চমৎকার রূপে বর্ণিত হইয়াছে—বিশেষত পর্ব্বত, কানন, পশু, পক্ষী প্রভৃতি দর্শন করিয়া একজন কামান্ধ বিরহীর যেরূপ অবস্থা হয়, পুরূরবার যথার্থ সেইরূপ হইয়াছে—এমন বর্ণনা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না—

শ্রীকালীপদ ঘোষ।

* এ প্রস্তাবে "ভাব" শব্দটী দুই প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে sentiment এবং pathos পাঠক তাহা স্থান বিশেষে বুঝিতে পারিবেন—pathos শব্দের প্রকৃত বাঙ্গালা শব্দ না থাকায় অগত্যা "ভাব" শব্দ ব্যবহার করা গেল। এখানে ভাবের অর্থ pathos কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে উহার অর্থ sentiment পাঠক মহাশয় উপমা প্রভৃতির এবং ভাবের প্রভেদ স্মরণ রাখিবেন।

* আমরা দুঃখিত হইতেছি যে এ প্রস্তাবে বিক্রমোর্ব্বশীর কথা কিছু বলা হয় নাই—কারণ উহা আমাদের সীমার বহির্ভূত। আমরা কেবল প্রসঙ্গক্রমে কালিদাসের অন্যান্য গ্রন্থের কথা বলিয়াছি মাত্র।

ভট্টি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিশেষতঃ কেবল ভরতমল্লিকই যে ভর্ত্তৃহরিকে ভট্টিকাব্যের প্রণেতা বলিয়াছেন তাহাও নহে। রাজতরঙ্গ-প্রণেতা মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা বলেন "এই ভর্ত্তৃহরি (বিক্রমাদিত্যের অগ্রজ) কৃত অনেক কাব্যাদি শাস্ত্রের প্রচার অদ্যাবধি লোকেতে আছে।"* এক ভট্টিকাব্য-প্রণেতা ভর্ত্তৃহরি ব্যতীত অন্য কোন ভর্ত্তৃহরিনামক কবি সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রের উন্নতি করেন নাই। সুতরাং রাজতরঙ্গ-প্রণেতার সময়ে, (১৮০২ খৃঃ অব্দে) লোকে ভর্ত্তৃহরি নৃপতিকেই ভট্টিকাব্যের প্রণেতা জানিতেন, কিন্তু একথা সত্য নহে। ভট্টিকাব্য-প্রণেতাকে যে অনেকে ভর্ত্তৃহরিনামক ব্যক্তি জানিতেন তাহা দেখাইবার জন্যই এ সকল মত গ্রহণ করিতেছি।

আমরা এ সম্বন্ধে আরো একটী প্রমাণ দিতে সমর্থ, যাহাতে প্রতীতি হইবে যে ভরতমল্লিকের পূর্ব্ববর্ত্তী বুধমণ্ডলীও ভট্টিকাব্য-প্রণেতাকে ভর্ত্তৃহরি বলিয়া জানিতেন, যতদূর জানা যায় তাহাতে পুণ্ডরীকাক্ষ-কৃত "কলাপ-দীপিকা" নাম্নী ভট্টিকাব্যের টীকা ভরত মল্লিকের টীকার কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ। কেননা ভরত মল্লিক অনেক স্থলে পুণ্ডরীকাক্ষ-টীকা একেবারে উদ্ধৃত করিয়াছেন— ভরতমল্লিকের টীকা মুগ্ধবোধ-সম্মত গ্রন্থ হইলেও পুণ্ডরীকাক্ষের কাতন্ত্র-সম্মত গ্রন্থ হইতে মধ্যে মধ্যে কাতন্ত্রের মত উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা হস্ত-লিখিত কয়েক খানি প্রাচীন পুণ্ডরীকাক্ষের টীকা দেখিয়াছি, তাহার দুই একখানিতেও

"ভর্ত্তৃহরির্নাম কবিঃ শ্রীরাম-
কথাশ্রয়ং মহাকাব্যং চকার।"

এই কথাটী লিখিত আছে; আবার কয়েক খানিতে এ কথা লিখিত হয় নাই। ইহাতে এই মাত্র উপলব্ধি হয় যে পুণ্ডরীকাক্ষ ঐ কথা লিখিয়া গিয়াছেন, লিপিকর-প্রমাদ-বশতঃ তাহা কোন কোন গ্রন্থে পতিত হইয়া গিয়াছে, এবং ইহাও হইতে পারে যে ভরতমল্লিকের গ্রন্থ হইতে পরে কেহ উহা

---

* রাজতরঙ্গ ৪৭ পৃষ্ঠা, রাজতরঙ্গ প্রায় ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়মস্থ পাঠশালার পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা (তর্কালঙ্কার !) কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হয়। শুনা যায় বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিবর্দ্ধক মিসনারী সাহেবগণ ইহার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে অনেক দুষ্প্রাপ্য ও অত্যাবশ্যক বিষয় সন্নিবেশিত আছে। এই মত প্রয়োজনীয় গ্রন্থ লুপ্তপ্রায়, গ্রন্থখানি পুনর্মুদ্রিত হওয়া কর্ত্তব্য। বাঙ্গালা ভাষা এমন হতভাগিনী যে নিজের মূল্যবান্ সম্পত্তিও রক্ষা করিতে পারেন না, অথচ অন্যের নিকট ভিক্ষা করিতে পটু।

পুণ্ডরীকাক্ষের টীকায় যোজনা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের নিকট পুণ্ডরীকাক্ষের উদ্ভাবিত মত বলিয়াই বিলক্ষণ বিশ্বাস হয়। এখন কথা এই—যদি পুণ্ডরীকাক্ষ উহা লিখিয়া থাকেন তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ভরতমল্লিকের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরাও ভর্ত্তৃহরিনামক ব্যক্তিকে ভট্টিকাব্যের প্রণেতা জানিতেন।

আমরা ইহা অপেক্ষাও একটী অমোঘ প্রমাণ দিতে পারি। 'ত্রিকাণ্ডশেষ' নামক প্রসিদ্ধ অভিধান-কর্ত্তা পুরুষোত্তম দেব, উক্ত গ্রন্থের ব্রহ্মবর্গে বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস ভবভূতি, ভারবি প্রভৃতি অনেক প্রাচীন কবিদের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে ভর্ত্তৃহরির নামোল্লেখও আছে;———

"————————

হরির্ভর্ত্তৃহরিঃ স্মৃতঃ।
রঘুকারঃ কালিদাসো
মেধারুদ্রশ্চ কোটিজিৎ॥
ভারবিঃ শতপুষ্পঃ স্যাদ্
ভবভূতিশ্চ বিস্মৃতঃ।"

মেদিনী-কোষ-প্রণেতা মেদিনীকর খৃঃ ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন*। তিনি মেদিনীকোষে ত্রিকাণ্ডশেষের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।†

* Preface to the Medini; by Som Nath Mokharji.

† মেদিনী-কোষের উপসংহার-স্থল দ্রষ্টব্য।

সুতরাং ত্রিকাণ্ডশেষ-প্রণেতা পুরুষোত্তম খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর অনেক পূর্ব্বের লোক,* তাহা হইলে ভরতমল্লিকের অনেক পূর্ব্বেও লোকে ভর্ত্তৃহরিনামক কবির নাম জানিতেন। পুরুষোত্তম যখন অন্যান্য ভারতীয় শীর্ষস্থানীয় গ্রন্থকারদের নামের সহিত ভর্ত্তৃহরির নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তখন ইনি সুপ্রসিদ্ধ ভট্টিকাব্য-প্রণেতা ভর্ত্তৃহরি ব্যতীত আর কেহ নহেন; কেননা পুরুষোত্তম; কালিদাস, ভবভূতি, পাণিনি, চাণক্য প্রভৃতি ব্যতীত নিম্ন শ্রেণীর গ্রন্থকারদের কাহারও নামোল্লেখ করেন নাই; ভট্টিকাব্য-প্রণেতা ভর্ত্তৃহরি ব্যতীত যদি ঐ রূপ কোন উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থকার থাকিতেন তবে তিনি কখনই সাধারণ্যে অপরিচিত থাকিতেন না। অতএব পুরুষোত্তম-উল্লিখিত ভর্ত্তৃহরিই যে ভট্টিকাব্য-প্রণেতা তাহার কোনও সন্দেহ নাই।

এখন আমরা দেখিতেছি, অধিকাংশ মহোদয়ই ভট্টিকাব্য-প্রণেতার নাম ভর্ত্তৃহরি জানিতেন। আবার জয়মঙ্গল প্রভৃতি তাঁহাকে ভট্টি নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাসা করি এই দুই ভিন্ন মতের কোন্ মতের কথা অধিক সারবান্ বলিব? অনেকে বলিয়া থাকেন, জয়মঙ্গল ভরতমল্লিক হইতে পূর্ব্ব-সাময়িক, সুতরাং তাঁহার মতই

* পুরুষোত্তম সম্বন্ধে শীঘ্র একটী স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিবার ইচ্ছা রহিল, এজন্য এস্থানে তৎসম্বন্ধে কিছু লিখিলাম না।

সমধিক সারবান্। এ কথায় আমাদের এই মাত্র বক্তব্য ; জয়মঙ্গল ভরতমল্লিক হইতে প্রাচীন লোক হইতে পারেন, কিন্তু পুরুষোত্তম হইতে কখনই প্রাচীন নহেন, অতএব আমরা পুরুষোত্তম ভরতমল্লিক প্রভৃতির কথাই অধিক প্রামাণ্য বলিব।

তবে কি জয়মঙ্গলের মত একেবারে অগ্রাহ্য হইবে ? না, তাহাও নয় ; এস্থলে আমাদের একটী বক্তব্য আছে। পাঠক এই ক্ষুদ্র লেখকের নিকট ভুবনবিখ্যাত মোক্ষমূলর প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতদের ভাষা সমালোচনা এবং অধ্যাপক গোল্ডষ্টুগারের পানিনি-বিচারের ন্যায় সমালোচনা দেখিয়া হাসিবেন না।

একটুকু বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে অর্থের মিল না থাকিলেও ভর্ত্তৃহরি শব্দের সংক্ষেপ "ভর্ত্তৃ" হইয়া, পরে ভর্ত্তৃ শব্দ অপভ্রংশ হইয়া ভট্টি বা ভত্তি রূপে পরিণত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। যাঁহারা সংস্কৃত ও তদপভ্রংশ প্রাকৃতের শব্দ-সাদৃশ্য মিলাইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা এ কথায় একটুকুও আপত্তি করিতে পারেন না। আমাদের বিবেচনা হয়, তৎকালীন সাধারণ প্রাকৃত-ভাষীগণ ভর্ত্তৃহরিকে সংক্ষেপ করিতে যাইয়া ভর্ত্তৃ করিয়া ফেলাইয়াছিলেন এবং সর্ব্বসাধারণ-জনগণ ঐ "ভর্ত্তৃ" নামকেই ভট্টি বলিয়া উচ্চারণ করিত আর এই সাধারণের উচ্চরিত নামই পরে দেশবিখ্যাত হইয়া গিয়াছিল। বোধ হয়, মহাত্মা ভর্ত্তৃহরি তাঁহার কাব্যের কোন নামকরণ করেন নাই। পরে সাধারণ প্রচলিত নাম "ভট্টি" হইতে ভট্টিরকাব্য (ভর্ত্তৃর কাব্য) এই অর্থে "ভট্টি-কাব্য" নাম হইয়া গিয়াছে। এবং এই সাধারণ-প্রচলিত নামই জয়মঙ্গল ও অন্যান্য গ্রন্থকারগণ লিখিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক জয়মঙ্গল বা ভরতমল্লিক প্রভৃতি কাহারই কোন রূপ প্রমাদ লক্ষিত হয় না—তাঁহাদের ন্যায় অসাধারণ পণ্ডিতদের ভ্রম প্রমাদ হওয়া বা বিনা প্রমাণে কল্পনা করিয়া একটী অলীক কথা সৃষ্টি করা কখনই সম্ভাবিত নহে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভট্টি নামটি ভর্ত্তৃহরির নামান্তর বলিতে হইবে। যেমন কৃষ্ণ নামের পরিবর্ত্তে বিষ্ণু নাম প্রয়োগ করিলে কোন দোষ হয় না, সেই রূপ ভর্ত্তৃহরি নামের পরিবর্ত্তে ভট্টি নাম লিখিলে দোষ নাই।—ভর্ত্তৃহরি নাম হইতে ভর্ত্তৃনাম উৎপন্ন হওয়া যে আশ্চর্য্য নহে তাহা এখনকার দৃষ্টান্ত দিয়াও দেখান যাইতে পারে। সকলেই জানেন এখনো সাধারণ লোক শ্রীনাথকে "ছিরু" শ্রীদামকে "ছিদাম" বিশালাক্ষীকে "বিশুনী" মাধবকে "মাধাই" বলিয়া থাকেন। এবং অপভ্রংশ নামই এত বিখ্যাত হইয়া পড়ে যে প্রকৃত নাম বলিলে সহসা কেহই বুঝিতে পারে না*—

* "ভাট্টি" এই শব্দটী ভর্ত্তৃহরির উপাধি বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কেননা ভট্ট শব্দের এক অর্থ পণ্ডিত। তাহার উত্তর অস্ত্যর্থে ইন্ করিয়া নিপাতনে ভট্টি হইতে পারে এবং ভট্টির (ভট্টি উপাধি-

রাজতরঙ্গ এবং উল্লিখিত ষষ্ঠ মতানুসারে ভট্টি কাব্য-প্রণেতা ভর্তৃহরিকে বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া প্রতীতি হয়। কিন্তু একথা আমাদের নিকট নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়; কেননা জয়মঙ্গলের টীকার সূচনা এবং সমাপ্তি-স্থলে যাহা লিখিত আছে, তাহাতে জানা যায়, ভট্টিকাব্য-প্রণেতা ব্রাহ্মণ ছিলেন, ও তাঁহার পিতার নাম শ্রীস্বামী। ত্রিকাণ্ডশেষ-প্রণেতা পুরুষোত্তম দেবও ভর্তৃহরিকে অন্যান্য ভুবনবিখ্যাত ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব মহাত্মাদের সহিত ব্রহ্মবর্গে—একাসনে স্থান দিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন। এ দিকে বিক্রমাদিত্যের অগ্রজ ভর্তৃহরি নৃপতি ইন্দ্রাত্মজ গন্ধর্ব্বসেনের পুত্র। যদিও তিনি ধাররাজাশ্রিত দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাচ ক্ষত্রিয় বলিয়া সাধারণের নিকট সুপরিচিত। কিন্তু তিনি শাস্ত্রানুসারে আরও নিম্নতম জাতি হইবার পাত্র। সুতরাং ভট্টিকাব্য-প্রণেতা এবং নৃপতি ভর্তৃহরি কখনই অভিন্ন ব্যক্তি হইতে পারেন না।—এই জন্যই রাজতরঙ্গ-প্রণেতা এবং উল্লেখিত ষষ্ঠ মত-প্রচারক নাম-সাদৃশ্য দেখিয়া বিষম ভ্রমে পড়িয়াছেন।

ধারীর) কাব্য এই অর্থে ভাট্টি-কাব্য হইতে পারে। কিন্তু এরূপ কল্পনা করা তাদৃশ সমীচীন বোধ হয় না। এবং ব্যাকরণগতও তত শুদ্ধ হয় না। বিশেষতঃ ভাট্টিকাব্য-প্রণেতার সময়ে এত উপাধির বর্ষণ ছিল না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভট্টিকাব্য-প্রণেতা নিজ পরিচয়-স্থলে বলিয়াছেন যে তিনি শ্রীধরের পুত্র, নরেন্দ্র নৃপতির বলভী-পুরীতে ভট্টিকাব্য প্রণয়ন করেন। এই বলভী বা বল্লভী পুরী গুজরাটের অন্তর্গত কাটিয়ার প্রদেশে কাম্বে উপসাগর-কূলে অবস্থিত।

বলভীপতি নরেন্দ্র কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা নির্দ্ধারণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। কাহারো মতে বল্লভী নামক নৃপতির নামানুসারে তদীয় রাজধানীর নাম বল্লভী হয়। গুজরাট দেশে বল্লভী সংবৎ নামে এক অব্দ প্রচলিত ছিল। সুবিখ্যাত কোষ-প্রণেতা জৈনেন্দ্র হেমচন্দ্র বা হেমাচার্য্যের আদেশে কুমারপাল নামক নৃপতি ৮৫০ বল্লভী সংবৎ মধ্যে সোমেশ্বরের ভগ্নপ্রায় মন্দিরের পুনঃসংস্কার করেন, একথা উক্ত মন্দিরের প্রস্তরফলকে লিখিত ছিল। শ্যামদাস বাবু বলেন রাসমালার মতে হেমচন্দ্র ১১৭৪ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন। কুমার পালের প্রায় ত্রিংশৎ (৩০) বৎসর বয়ঃক্রম কালে হেমচন্দ্র আপনাকে অতি প্রাচীন জানিয়া নির্ব্বাণ-কামনায় ৮৪ বৎসর বয়ঃক্রমে অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন। যদি আনুমানিক ২৪ বর্ষ বয়ঃক্রমে (১১৬৮ খৃষ্টাব্দে) কুমারপাল হেমচন্দ্রের আদেশে মন্দিরের পুনঃসংস্কার করিয়া থাকেন তবে (১১৬৮—৮৫০=) ৩১৮ খৃষ্টাব্দে বল্লভী সংবৎ আরম্ভ হয়, ইহা স্পষ্ট চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়; ইতিহাসপাঠে

জানা যায় যে গুপ্তোপাধিক একটী হিন্দু-রাজবংশ (সম্ভবতঃ যাঁহারা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে কান্যকুব্জে ছিলেন) ৩১৮ খৃষ্টাব্দে সুরাষ্ট্র এবং গুজরাট অধিপতি সাহ বংশীয় নৃপতিকে পরাজয় করিয়া বল্লভীতে দ্বিতীয় রাজধানী সংস্থাপন করেন। এই গুপ্তবংশই বল্লভী রাজবংশ বলিয়া পরিচিত *। সুতরাং কুমারপালের মন্দির-সংস্কার করার সময় এবং গুপ্তবংশের গুজরাট-বিজয়ের সময়—এ উভয় পর্য্যালোচনা করিলেই দেখা যায়, বল্লভী সংবৎ ৩১৮ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয়। সুতরাং যিনি প্রথম সাহ নৃপতিকে বিতাড়িত করিয়া ৩১৮ অব্দে বল্লভীতে রাজধানী স্থাপন করেন, তিনিই বল্লভী গুপ্ত। এই বল্লভীর বংশে কয়েকটী নৃপতি অতি পরাক্রমশালী হইয়া আর্য্যাবর্ত্ত এবং দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থানে জয়পতাকা উড্ডীন করেন। বল্লভী রাজবংশের ছয় জন নৃপতি মহারাজাধিরাজ (Lord paramount) উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। ইহার দ্বিতীয় নৃপতি সমুদ্রগুপ্ত সমস্ত গুজরাট এবং সিংহল দ্বীপ অধিকার করেন। এই বল্লভী রাজবংশাবলী ৪৯৮ খৃষ্টাব্দে তোরমান নৃপতি হইতে শেষ হয়। অতঃপর ৫২৪ খৃষ্টাব্দে পারস্যরাজ নসিরবানের পুত্র বল্লভীপুরী লুঠ করেন। কেহ বলেন, সম্ভবতঃ নসিরবানের আদেশে পারস্যদেশীয় সসেনীয়ান্ সৈন্য কর্তৃক গুজরাট আক্রান্ত হয়। নসিরবান ৫২১ হইতে ৫৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পারস্যের অধিপতি ছিলেন।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বল্লভীপতি নরেন্দ্রও এই বল্লভীবংশীয় নৃপতি ছিলেন। তিনি যখন বল্লভীপুরীর রাজা, তখন তিনি যে বল্লভীগুপ্ত (৩১৮ খৃষ্টাব্দ) হইতে অনেক পরবর্ত্তী লোক, তাহা নিঃসন্দেহ। আবার তাঁহার আশ্রিত পণ্ডিত ভর্ত্তৃহরি (ভট্টি) মহাকবি কালিদাসের পূর্ব্ব-সামায়িক ছিলেন; সংস্কৃতগ্রন্থাবলীতে এ কথার সুন্দর আভাস পাওয়া যায়।

(ক) ভোজ-প্রবন্ধ-প্রণেতা, কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতিকে ভোজরাজার সভায় উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ভুকুণ্ড নামক চোর দ্বারায় ভোজরাজকে কি বলিতেছেন শুনুন—

ভট্টির্নষ্টো ভারবিশ্চাপি নষ্টো
ভিক্ষুর্নষ্টো ভীমসেনোঽপি নষ্টঃ।
ভুকুণ্ডশ্চেদ্ ভূপতিশ্চাপি নষ্টঃ
অস্যাং পংক্তাবন্তকঃ সম্প্রবিষ্টঃ॥

সুতরাং ভোজপ্রবন্ধ-প্রণেতা জানিতেন কালিদাস * প্রভৃতি যখন বর্ত্তমান ছিলেন,

* ভারত-ইতিহাস-লেখক হন্টার সাহেব কহেন—৩১৯ খৃষ্টাব্দে বল্লভীগণ গুজরাটের গুপ্ত রাজবংশীয় নৃপতিদিগকে পরাস্ত করেন। কিন্তু এই কথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, কেননা ৩১৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বল্লভী রাজবংশ বা বল্লভী নামে কোন পুরী ছিল না; বল্লভী সংবৎই এ কথা সপ্রমাণ করিতেছে। এ কথা লইয়া আরো অনেক বিচার করা যাইতে পারে, বাহুল্য-ভয়ে ক্ষান্ত থাকিলাম।

* অনেকে এই কালিদাসকে মহাকবি

তখন ভট্টি পার্থিব লীলা সংবরণ করিয়াছেন, পত্তিকেই তাঁহার মতে ভট্টি কালিদাস অপেক্ষা অনেক প্রাচীন।

(খ) আবার পুরুষোত্তম দেব কালিদাস প্রভৃতির পূর্ব্বে ভট্টির নাম স্থাপন করিয়া ভট্টিকে কালিদাস প্রভৃতি হইতে প্রাচীন বলিয়া আভাস দিতেছেন। কিন্তু এ যুক্তি ততদূর বলবৎ নহে।

(গ) পুনশ্চ; কাতন্ত্র-পরিশিষ্টকার শ্রীপতি যিনি প্রায় (খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন) কোন সূত্রের উদাহরণ-স্থলে একটী শ্লোক প্রাচীন প্রয়োগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ঐ শ্লোকটী ভট্টিকাব্যের দ্বিতীয় সর্গস্থ ৪২ সংখ্যক শ্লোক—

অভিগ্রহস্তং জনকোধনুস্তৎ
যেনার্দ্দিতদৈত্যপুরং পিনাকী।
জিজ্ঞাসমানোবলমস্য বাহ্বো-
র্হসম্রভাজ্যৌরঘুনন্দনস্তং ॥

শ্রীপতিদত্ত; মহাকবি কালিদাস, মাঘ, ভারবি, বাণভট্ট প্রভৃতি অনেকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন ও তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু আর কাহাকেও প্রাচীন বলেন নাই। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, শ্রীপতি ভট্টিকে কালিদাস হইতে অনেক প্রাচীন বলিয়া জানিতেন।

এই সকল কারণে আমাদেরও ভট্টিকাব্য-প্রণেতাকে কালিদাসের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি হইতেছে। সুতরাং আমরাও ভট্টিকাব্য-প্রণেতা ভর্ত্তৃহরিকে কালিদাসের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব-সাময়িক বলিব *।

কালিদাস হইতে স্বতন্ত্র ও পরবর্ত্তী লোক বলিতে চাহেন; কিন্তু আমরা এ কথায় সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। যদি ভোজপ্রবন্ধের কালিদাস, রঘুবংশ-প্রণেতা হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইলেন, তবে ভোজপ্রবন্ধের ভবভূতি এবং দণ্ডীকে স্বতন্ত্র ভবভূতি এবং দণ্ডী বলা উচিত; কেননা মহাত্মা দণ্ডী ও ভবভূতি ভোজরাজ হইতে প্রায় ছয় শতাব্দীরও পূর্ব্ববর্ত্তী। তাঁহাদিগকেই যখন ভোজপ্রবন্ধ-প্রণেতা কল্পনা-বলে ভোজরাজার সভায় আনিতে পারিলেন, তখন মহাকবি কালিদাসকে ভোজরাজার সভায় আনিবেন, তাহা একটুকু আশ্চর্য্য নহে। আমাদের বিবেচনায় ভোজপ্রবন্ধের কোন কথাতেই ঐতিহাসিক সত্য নাই। উহা কোন আধুনিক লোক প্রায় কল্পনাছলে প্রণয়ন করিয়াছেন।

* অনেকে এ কথায় আপত্তি করিবেন সন্দেহ নাই। কেন না কাহার কাহার সংস্কার আছে, ভট্টি মধ্যে মধ্যে কালিদাসের ভাব চুরি করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এ কথায় সমাদর করিতে সাহসী হইলাম না। কেন না এইরূপ অনিশ্চিত আনুমানিক কথায় ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কার হইতে পারে না। কালিদাস অনেক পুরাণ হইতে উৎকৃষ্ট উপাদান সংগ্রহ করিয়া নিজের অতুলন কাব্যকে আরো অত্যুজ্জ্বল করিয়াছেন। তিনি যে ভট্টি হইতে দুই একটী ভাব গ্রহণ করেন নাই; তাহাই বা কে জানে। যাঁহারা এইরূপ অনর্থক কথা লইয়া গোল করেন, তাঁহারা একজন কৃতবিদ্য লোক কি বলেন, শুনুন—"ইহাদের (পৌর্ব্বাপর্য্য-নির্ণয় কারীদের) নির্ণয়-প্রণালী অপূর্ব্ব। আজি

কালিদাস প্রভৃতি মহারাজ হর্ষবিক্রমাদিত্যের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। হর্ষবিক্রমের (খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর) পূর্ব্বে বল্লভীতে যে সকল নৃপতি ছিলেন, তাঁহারা সকলেই বল্লভী-রাজবংশ-সম্ভূত। আর যিনি এই বংশের শেষ নৃপতি, তিনি হর্ষবিক্রমের সমসাময়িক। সুতরাং নরেন্দ্র নৃপতিকে তোরমান গুপ্তের (৪৯৮ খৃষ্টাব্দের) অন্ততঃ এক শতাব্দীর পূর্ব্বের এবং বল্লভী গুপ্তের (৩১৮ অব্দের) পরের লোক বলিতে হয়। আর নরেন্দ্র নৃপতিকে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পরার্দ্ধের লোক বলিতে হয়। আমরা বিশেষ আশঙ্কা না করিয়া ভর্ত্তৃহরিকেও খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর লোক বলিতেছি।

নরেন্দ্র ভূপতিকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক বলিলাম না; কেননা সে সময় নবরত্ন-স্থাপয়িতা হর্ষ-বিক্রমাদিত্যের সময়। বল্লভী রাজবংশ মোটমাট ১৮০ বৎসর বল্লভী পুরীতে রাজত্ব করেন, ইহা হইতে যদি পঞ্চম শতাব্দীর ৯৮ বৎসর বাদ দিই, তবে আর ৮২ বৎসর অবশিষ্ট থাকে। গড়পড়তা প্রতি রাজার রাজত্ব ২০ বৎসর ধরিলেও এই ৮২ বৎসরের মধ্যে চারিটীর অধিক নৃপতি হইতে পারেন না। যদি নরেন্দ্রকে বল্লভী-রাজবংশের তৃতীয় নৃপতি বলা যায়, তবে তিনি ৩৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে রাজা হন ইহা স্পষ্ট দেখা যায়।

নরেন্দ্র নৃপতিকে বল্লভী গুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে পারি না, কেননা ইঁহার পূর্ব্বে বল্লভী পুরী নামই হয় নাই। নরেন্দ্র যখন বল্লভীর রাজা, তখন অবশ্য তিনি বল্লভী গুপ্তের উত্তরবর্ত্তী।

নরেন্দ্রকে তোরমাণ গুপ্তের পরবর্ত্তী বলা যায় না, কারণ তোরমানের পরে বল্লভীতে—

কীর্ত্তিরতো ভবতান্নৃপস্য তস্য।
ক্ষেমংকরঃ ক্ষিতিপো যতঃ প্রজানাম্ ॥

এই শ্লোকার্দ্ধ-চরিতার্থক কোন নরেন্দ্র নৃপতি যে বল্লভীতে ছিলেন, ভারত-ইতিহাসে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ ভর্ত্তৃহরি (ভট্টি) যখন হর্ষবিক্রমের (খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর) পূর্ব্বের লোক, তখন নরেন্দ্র কোনক্রমেই তোরমানের পরবর্ত্তী নহেন।—যদি ভারত-ইতিহাসে কোনরূপ প্রমাদ না থাকে, তবে দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে, "ভট্টি" বা ভর্ত্তৃহরি নামক কবি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

কালিদাসের মধ্যে ভবভূতির ভাবের একটী কবিতা পাইয়া একজন বলিলেন "কালিদাস ভবভূতির পর"; কালি আর একজন (যিনি আগে কালিদাস পড়িয়াছেন) বলিলেন "ভবভূতিই ও স্থলে কালিদাসের অনুবর্ত্তী"। কে সত্য কে মিথ্যা জানিবার কোন উপায় নাই, অথচ উভয়েই প্রাণ দিবেন সেও স্বীকার, মত ত্যাগ করিবেন না। যেমন কাব্যাদিতে তেমনি দর্শনেও। আজি গৌতম-সূত্রে বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদ নিরাকরণ দেখিয়া বলিলাম গৌতম আগে, বুদ্ধ পরে; কাল হয় ত বৌদ্ধসূত্রে ন্যায় শাস্ত্রের পরমাণুবাদ নিরাকৃত দেখিব," ইত্যাদি (বঙ্গ দর্শন)—

ভট্টিকাব্য-প্রণেতা ভর্ত্তৃহরি সম্বন্ধে আর অধিক কিছু জানিবার উপায় নাই, সুতরাং সে চেষ্টা বৃথা। তবে তাঁহার কাব্যের উপসংহার-স্থলের কয়েকটী শ্লোক পাঠে জানা যায়, তিনি কিয়ৎ পরিমাণে আত্ম-গুণস্পর্দ্ধী ছিলেন। সে শ্লোক তিনটী এই—

ইদমধিগতমুক্তিমার্গচিত্রং
বিবদিষতাং বদতাঞ্চ সন্নিবন্ধাৎ।
জনয়তি বিজয়ং সদা জনানাং
যুধি সুসমাহিতমৈশ্বরং যথাস্ত্রম্॥ ১
দীপতুল্যপ্রবন্ধোহয়ং
শব্দলক্ষণচক্ষুষাম্।
হস্তামর্ষ ইবান্ধানাং
ভবেদ্ ব্যাকরণাদৃতে॥ ২
ব্যাখ্যাগম্যমিদং কাব্য-
মুৎসবঃ সুধিয়ামলম্।
হতা দুর্মেধসশ্চাস্মিন্
বিদ্বৎপ্রিয়তয়া ময়া॥ ৩

ইহার স্থূল অর্থ এই—(১) যেমন সুশৃঙ্খলতা নিবন্ধন যুদ্ধে সুশাণিত ঐশ্বরাস্ত্র—(পাশুপত) সদা বিজয় জন্মায়, সেইরূপ এই জ্ঞাতব্য এবং বচন-সোপান চিত্রিত মহাকাব্য বচন প্রবর্ত্তমান এবং বাক্যাভিলাষী ব্যক্তিদের সদা জয় জন্মায়। অর্থাৎ এই কাব্য জানা থাকিলে সুসংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ জন্য ঠেকিতে হয় না।

(২) এই প্রবন্ধ শব্দ-লক্ষণ-পারদর্শিদের দীপতুল্য, কিন্তু ব্যাকরণ বিনা ইহা অন্ধদের হস্তামর্ষ স্বরূপ। অর্থাৎ শব্দলক্ষণ-পারদর্শিগণ ভট্টি পাঠ করিয়া প্রদীপ লইয়া অন্ধকারে বিচরণ করার ন্যায় যে কোন জটিল সংস্কৃত বুঝিতে পারিবেন। আর ব্যাকরণ না জানা থাকিলে, অন্ধগণ যেরূপ হস্তস্থিত বস্তুর গুণ না বুঝিয়া ক্রোধ করেন, সেইরূপ ভট্টি হাতে লইয়া ইহার কিছু না বুঝিয়া ক্রোধ করিবেন।

(৩) পণ্ডিতগণেরও এই গ্রন্থ ব্যাখ্যান বিনা বুঝিবার ক্ষমতা নাই। এই কাব্যে (ব্যাকরণানভিজ্ঞ) দুর্মেধাগণ আমাদ্বারা অনুগৃহীত হইবেন না, সুতরাং ইহা পণ্ডিত-গণের জন্য—(বিরচিত।)

এই সকল উক্তিতে ভর্ত্তৃহরির গর্ব্ব প্রকাশ পাইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার উক্তি অত্যুক্তি-দোষ-দূষিত নহে। তিনি তাঁহার গ্রন্থ সুকাব্য বলিয়া গর্ব্ব করেন নাই। তিনি যে গুণে ভট্টিকাব্য লইয়া গর্ব্ব করিয়াছেন, তাহার একটুকু মিথ্যা নহে, সুতরাং তাঁহার কথা প্রত্যেক অক্ষরে স্বীকার করি।

ভট্টিকাব্যের টীকাকারগণ।

আমরা এপর্য্যন্ত ভট্টিকাব্যের তিন খানি টীকা দেখিয়াছি।

(১) জয়মঙ্গল-কৃত "জয়মঙ্গলা" নাম্নী পাণিনি-সম্মত টীকা।

(২) পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগরকৃত "কলাপদীপিকা" নাম্নী কাতন্ত্র-সম্মত টীকা।

(৩) ভরতমল্লিক-কৃত "মুগ্ধবোধিনী" নাম্নী মুগ্ধবোধ-সম্মত টীকা।

(জয়মঙ্গল)

ভট্টির টীকার মধ্যে জয়মঙ্গলের টীকাই প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। জয়মঙ্গলের অপর দুই নাম জটেশ্বর (বা জটীশ্বর) এবং জয়দেব।—ইনি অনেক শাস্ত্রের ব্যাখ্যা অনুকরণ করিয়া ভট্টি-টীকা প্রণয়ন করেন। এ কথা তৎকৃত ভট্টি-টীকার সমাপ্তি-স্থলে উল্লেখ আছে—

* * * * * * জটীশ্বরো জয়দেবো
জয়মঙ্গল ইতি চ নামভিস্ত্রিভিঃ সুপ্রসিদ্ধস্য
অনেকশাস্ত্রব্যাখ্যানুকৃতৌ টীকায়াম্ ॥
ইত্যাদি।

(পুণ্ডরীকাক্ষ)

পুণ্ডরীকাক্ষের পিতার নাম ত্রিকাণ্ড পণ্ডিত। ইনি বিদ্যাসাগর উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। ইঁহার উপাধি অনুসারে ইঁহার টীকাও বিদ্যাসাগর নামে খ্যাত। ইনি কাতন্ত্র ব্যাকরণেরও এক উৎকৃষ্ট টীকা প্রণয়ন করেন। তথাহি—

নত্বা শঙ্করচরণং
জ্ঞাত্বা সকলং কলাপতত্ত্বঞ্চ।
দৃষ্টা পাণিনিতন্ত্রং
বদতি শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষঃ ॥ ১
* * * * *
কুনিবন্ধতমস্তোম-
মপহন্তুয়িতুং ময়া।
কলাপদীপিকা চক্রে
সৎপথালোকনায় চ ॥
(পুণ্ডরীকাক্ষ)

পুনশ্চ—

ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীমত্রিকাণ্ড-পণ্ডিতাত্মজ-শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ-বিদ্যাসাগর কৃত-কলাপ-দীপিকাখ্যায়াং ভট্টিটীকায়াং ইত্যাদি।

ভরতমল্লিক।

ভরতমল্লিক বৈদ্যবংশীয় সেন-কুলোদ্ভব ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম শঙ্করসেন। এই ভরতসেনের অমর-কোষের টীকা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদি আছে।

তথাহি—

নত্বা শঙ্করমম্বষ্ঠঃ
গৌরাঙ্গমল্লিকাত্মজঃ।
ভট্টিটীকাং প্রকুরুতে
ভরতো মুগ্ধবোধিনীম্ ॥

পুনশ্চ—

কুলবিতরণবিদ্যাবৈভবাম্বষ্ঠগোষ্ঠী-
বরহরিহরখানখ্যাতবংশাম্বুধীন্দোঃ।
ভুবনবিদিতকীর্ত্তিঃ সেন-গৌরাঙ্গতো যো-
হজনি স ভরতসেনো ভট্টিটীকাং চকার ॥
(ভরতঃ)

সারদামঙ্গল।*

লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখকের এই গ্রন্থখানি বঙ্গ-ভাষার একটি অমূল্য রত্ন—এরূপ সরস কল্পনার জ্যোৎস্নাময় কাব্য আমরা আর দেখিয়াছি কি না, কিম্বা অচিরাৎ আর দেখিতে পাইব কি না, সন্দেহ। আমরা স্বীকার করি যে, বঙ্গ সমাজের সকল স্থানেই ইহা সমাদৃত হইবে না, কারণ ইহাতে উপন্যাসের নাম গন্ধ নাই,—ইহাতে শব্দের আড়ম্বর নাই,—ইহাতে অপহৃত বিজাতীয় ভাব-সমূহের অবতারণা নাই,—"ভারত-মাতার" নিরবচ্ছিন্ন রোদন-ধ্বনি নাই।—সমস্ত কাব্য খানি পাঠ করিলে কেহ কেহ হয় ত বলিতে পারেন যে, কাব্যখানি এক-জন উন্মত্তের প্রলাপ-মাত্র, কিন্তু যদি কেহ ইহার মর্ম্মস্তল পর্য্যন্ত অবগাহন করেন, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, ইহা উন্ম-ত্তের প্রলাপ নহে, ইহা একজন উন্মত্তের মর্ম্মোচ্ছ্বাস,—প্রকৃত কবি-রূপ উন্মত্তের হৃদ-য়ের তরঙ্গ-ভঙ্গ!—ইহা যেন একজন প্রগাঢ় সারদা-ভক্তের কাতর দীর্ঘ শ্বাস—একজন সেবকের ধূপ ধূনার তরল ধূমরাশি! সেই ধূম-রাশির স্রোত-প্রবণতা বহির্দ্দিকে নয়,—অন্তর্দ্দিকে,—মর্ত্ত্যদিকে নয়,—স্বর্গের সীমন্ত-দিকে!

সংসার রূপ জলন্ত অনলকুণ্ডে একজন প্রকৃত কবির সমস্ত শান্তি সরস্বতী-বন্দ-নাতে, সমস্ত উল্লাস সরস্বতী সেবাতে, সমস্ত প্রমোদ সরস্বতী-ভাবনাতে। এই দুরন্ত মরুভূমির মধ্যে কল্পনাই তাঁহার বিনোদ নন্দন-কানন, এবং সরস্বতীই সেই কান-নের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।—কবিতার জ্যোৎস্না-ময় উচ্ছ্বাসে যখন তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে, এবং মরমের শিরায় শিরায় যখন সেই মোহময় তুফান প্রবাহিত হইতে থাকে, যখন নিজের ভাবেই কবির নয়ন-পল্লব নিমুদিত হইয়া আইসে এবং সমস্ত শরীর এক অপূর্ব্ব রসে লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে,—সেই সুখের অবস্থা, সেই উন্মত্ত অবস্থা, সেই এক প্রকার "নির্ব্বাণ" অবস্থা, মর্ত্ত্যলোকে অমরের বাঞ্ছিত, পৃথিবীতে স্বর্গের সুখ-স্বপ্ন—একজন প্রকৃত কবিকে এই অবস্থায় দেখিলে কে না উর্দ্ধকণ্ঠে সেই কবিকে এই রূপ অমৃতময় ভাষাতে সম্বোধন করেন—

"হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু দুনয়নে
বিভোর বিহ্বল প্রাণে কাঁহারে ধেয়াও।
কমলা ঠমকে হাসি,
ছড়ান্ রতন-রাশি,
অপাঙ্গে ভ্রূভঙ্গে আহা ফিরেও না চাও!

* শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী-বিরচিত। কলিকাতা, নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভাবে ভোলা খোলা প্রাণ—
ইন্দ্রাসনে তুচ্ছ-জ্ঞান—
হাসিয়ে পাগল বলে, পাগল সকলে ?"

* * * *

যাও লক্ষ্মী অলকায়,
যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস' না এ যোগী-জন তপোবন স্থলে !"

কিন্তু সেই সুখের দশা, সেই "বিচিত্র মত্ত দশা"-হারা হইলে,—সুমেরু-শিখরস্থিত কবির হৃদয় আঁধার পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে ধূলিসাৎ হইলে—কবিতার মোহময় স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়া নীরস সংসারের কঠোরতায় আবার সে হৃদয় প্রতিহত হইলে, কবির চক্ষে সেই কল্পিত নন্দনকানন আবার বিকট শ্মশানাকারে পরিণত হইয়া পড়ে ! তখন তাঁহার মনে আর উল্লাস থাকে না, সুখ থাকে না, শান্তি থাকে না,—সংসারের ভীষণ কল্লোল ক্রমাগতই তাঁহার শ্রবণে ধ্বনিত হইতে থাকে, সমাজের কুটিল তরঙ্গ-ভঙ্গ ক্রমাগত তাঁহার আত্মাকে ছিন্ন বিছিন্ন করিতে থাকে, এবং পার্থিব ধন-মান রূপ আলেয়া-আলোকে ক্রমাগতই তিনি যাতনার পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া পড়েন।

প্রকৃত কবির মনের এই সকল বিচিত্রতা চিত্রিত করাই "সারদামঙ্গলের" উদ্দেশ্য ! কিন্তু "উদ্দেশ্য" কথাটি আমরা নিতান্ত সঙ্কুচিত মনে ব্যবহার করিলাম। কারণ, "সারদামঙ্গলের" প্রকৃত উদ্দেশ্য কিছুই নাই—আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইহা কেবল একজন প্রকৃত কবির মর্ম্মোচ্ছ্বাস ;—সংসার-পীড়িত প্রকৃত কবির হৃদয়ভেদী দীর্ঘ শ্বাস, এবং সময়ে সময়ে সারদা-মিলিত প্রকৃত কবির হর্ষ তুফান ! এই রূপে "সারদামঙ্গল" সঙ্গীতকার নিজের সহিত সরস্বতীর বিরহ, বিচ্ছেদ ও মিলন বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত ভাবই প্রেমের ভাবে সংরঞ্জিত !————কেন ? প্রেমের প্রহেলিকা বুঝিতে গেলে ইহা অগ্রেই বোঝা উচিত যে আরাধ্য বস্তুর দিকে প্রথমে আমরা ভক্তি ও ভয়ের সহিত আগুয়ান হই—তাহার পরে ভক্তি ও স্নেহ, তাহার পরে সখ্যতা, তাহার পরে প্রেম, এবং প্রেমের চরম উৎকর্ষ স্বরূপ অদ্বৈত ভাব ! যখন শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন "সোহং ব্রহ্ম" তখন তিনি বুঝিয়াছিলেন প্রেমের চরম উৎকর্ষ কি ? যখন রিকৃটর বলিয়াছিলেন যে "হে গ্রহনক্ষত্রগণ ! তোমরা আমাকে তোমাদের সহিত সম্মিলিত করিয়া লও" তখন রিকৃটর বুঝিয়াছিলেন, প্রেমের চরম উৎকর্ষ কি,——যখন শেলী প্রকৃতির সুন্দর ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন "হে প্রকৃতি ! আমাতে তোমাতে অভেদ আত্মা !" তখন শেলীই বুঝিতে পারিয়াছিলেন প্রেমের চরম উৎকর্ষ কি ! কিন্তু এই চরম উৎকর্ষ লাভ করা যুগযুগান্তরের তপস্যার ফল—ইহা প্রকৃত ঘটনা অপেক্ষাও কল্পনার প্রভাত-স্বপ্ন-বিশেষ !

আমাদের "সারদামঙ্গল"-গায়ক কবি বি-

মল-কমল-বাসিনী-সারদা-প্রেমের সেই চরম উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন নাই বটে,—কিন্তু তাঁহার কাব্য পাঠ করিলে বিলক্ষণ বোধ হয় যে তিনি সারদাকে ভক্তি ও ভয় অথবা ভক্তি ও স্নেহ, অথবা সখ্য ভাবে আর দেখেন না,—তিনি সারদা-প্রেমে প্রেমিক, সারদা-প্রেমে মাতোয়ারা। এই উন্মত্ত প্রেমের প্রভাবে সারদাকে তিনি নানা ভাবে দেখিতেছেন বটে, কিন্তু প্রধানতঃ প্রেমের ভাবেই তিনি মুগ্ধ——প্রেমের জ্যোৎস্নাতেই তিনি আলোকিত,—প্রেমের তরঙ্গেই তিনি তরঙ্গিত। সেই প্রেমের প্রভাবেই তিনি সারদাকে সংসার-মরুভূমির মানস-সরোবর—সংসার-সমুদ্রের ধ্রুবনক্ষত্র রূপে দেখিতেছেন! কিন্তু সেই সারদা কে?—এই মৃত্তিকাময় পৃথিবীতে কেমন করিয়া এবং কোথা হইতে তিনি অবতীর্ণ হইলেন?—সহৃদয় পাঠক, তাহা শ্রবণ কর——

অম্বরে অরুণোদয়,
তলে দুলে দুলে বয়
তমসা তটিনী-রাণী কুলু কুলু স্বনে;
নিরখি লোচনলোভা
পুলিন-বিপিন-শোভা
ভ্রমেন বাল্মীকি মুনি ভাবভোলা মনে।
শাখি-শাখে রসসুখে
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী মুখে মুখে
কতই সোহাগ করে বসি দুজনায়,
হানিল শবরে বাণ,
নাশিল ক্রৌঞ্চের প্রাণ,
রুধিরে আপ্লুত পাখা ধরণী লুটায়।
ক্রৌঞ্চী প্রিয় সহচরে
ঘেরে ঘেরে শোক করে,
অরণ্য পূরিল তার কাতর ক্রন্দনে।
চক্ষে করি দরশন
জড়িমা-জড়িত মন,
করুণ-হৃদয় মুনি বিহ্বলের প্রায়;
সহসা ললাটভাগে
জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যা জাগে,
জাগিল বিজলী যেন নীল নব ঘনে।
কিরণে কিরণময়,
বিচিত্র আলোকোদয়,
ম্রিয়মাণ রবি-ছবি, ভুবন উজলে।
চন্দ্র নয়, সূর্য্য নয়,
সমুজ্জল শান্তিময়,
ঋষির ললাটে আজি না জানি কি জ্বলে!
কিরণ-মণ্ডলে বসি
জ্যোতির্ম্ময়ী সুরূপসী
যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে,
নামিলেন ধীর ধীর,
দাঁড়ালেন হয়ে স্থির
মুগ্ধ নেত্রে বাল্মীকির মুখ পানে চেয়ে।
করে ইন্দ্রধনু-বালা,
গলায় তারার মালা,
সীমন্তে নক্ষত্র জ্বলে, ঝলমলে কানন;
কর্ণে কিরণের ফুল,
দোদুল্ চাঁচর চুল
উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঢাকিয়ে আনন।
হাসিহাসি-শশী-মুখী,
কতই কতই সুখী!

মনের মধুর জ্যোতি উছলে নয়নে।
কভু হেসে ঢল ঢল,
কভু রোষে জ্বল জ্বল,
বিলোচন ছল ছল করে প্রতিক্ষণে।"

তাঁহাকে দেখিতে চাও ?——দেখ—

"রূপের ছটায় ভুলি
শ্বেত শতদল তুলি
আদরে পরাতে যান সীমন্তে সবার,
তাঁরাও তাঁহারি মত
পদ্ম তুলি যুগপত
পরাতে আসেন সবে সীমন্তে তাঁহার।
অমনি স্বপন প্রায়
বিভ্রম ভাঙিয়া যায়,
চমকি আপন পানে চাহেন রূপসী;
চমকে গগনে তারা,
ভূধরে নির্ঝর ধারা,
চমকে চরণ তলে মানস-সরসী।
কুবলয়-বনে বসি
নিকুঞ্জ-শারদশশী
ইতস্তত শত শত সুরসীমন্তিনী,
সঙ্গে সঙ্গে ভাসি যায়,
অনিমেষে দেখে তায়,
যোগাসনে যেন সব বিহ্বলা যোগিনী।
কিবে এক পরিমল
বহে বহে অবিরল!
শান্তিময়ী দিগঙ্গনা দেখেন উল্লাসে।
শূন্যে বাজে বীণা বাঁশী,
সৌদামিনী ধায় হাসি,
সংগীত অমৃত-রাশি উথলে বাতাসে।
তীরে ঘেরে, যোড় করে
অমর কিন্নর নরে
সম স্বরে স্তব করে, ভাসে অশ্রুজলে—
অমর কিন্নর নরে ভাসে অশ্রুজলে॥

সেই রূপরাশি ধ্যান করিতে করিতে, সেই স্বর্গীয় সুষমার ভাবে ভোর হইয়া, কবি সারদার চরণেই হৃদয় মন উৎসর্গ করিলেন। প্রেমে মাতোয়ারা কবি প্রেমের যোগাসনে বসিয়া, উথলিত সোহাগে উচ্ছ্বসিত হইয়া, সারদাকে সম্বোধন করিয়া গম্ভীর গদ গদ স্বরে বলিতেছেন—

তুমিই মনের তৃপ্তি,
তুমি নয়নের দীপ্তি,
তোমা-হারা হ'লে আমি প্রাণ-হারা হই;
করুণা-কটাক্ষে তব
পাই প্রাণ অভিনব,
অভিনব শান্তিরসে মগ্ন হয়ে রই।
যে ক দিন আছে প্রাণ,
করিব তোমায় ধ্যান,
আনন্দে ত্যেজিব তনু ও রাঙা চরণতলে॥
অদর্শন হ'লে তুমি,
ত্যেজি লোকালয় ভূমি,
অভাগা বেড়াবে কেঁদে নিবিড় গহনে;
হেরে মোরে তরু লতা
বিষাদে কবে না কথা,
বিষণ্ণ কুসুম কুল বন-ফুল-বনে—
'হা দেবী, হা দেবী,' বলি
গুঞ্জরি কাঁদিবে অলি;
নীরবে হরিণীবালা ভাসিবে নয়নজলে॥
নির্ঝর ঝর্ঝর রবে
পবন পূরিয়ে যবে

আঘোষিবে সুরপুরে কাননের-করুণ ক্রন্দন-
হাহাকার,
তখন টলিবে হায় আসন তোমার,—
হায় রে তখন মনে পড়িবে তোমার!
হেরিবে কাননে আসি
অভাগার ভস্মরাশি,
অথবা হাড়ের মালা, বাতাসে ছড়ায়;
করুণা জাগিবে মনে,
ধারা ববে দুনয়নে,
নীরবে দাঁড়ায়ে রবে, প্রতিমার প্রায়।
ভেবে সে শোকের মুখ
বিদরে আমার বুক,
মরিতে পারিনে তাই আপনার হাতে;
বেঁধে মারে, কত সয়!
জীবন যন্ত্রণাময়
ছাগ্‌থার্ চুরমার্ বিনি বজ্রাঘাতে।
অন্তরাত্মা জর জর,
জীর্ণারণ্য চরাচর,
কুসুমকানন—মন বিজন শ্মশান;
কি করিব, কোথা যাব,
কোথা গেলে দেখা পাব,
হৃদি-কমল-বাসিনী কোথা রে আমার!
কোথা সে প্রাণের আলো,
পূর্ণিমা-চন্দ্রিমাজাল,
কোথা সেই সুধামাখা সহাস বয়ান!
কোথা গেল সঞ্জীবনী!
মনি-হারা মহা খনি,
অহো সেই হৃদিরাজ্য কি ঘোর আঁধার!
তুমি তো পাষাণ নও,
দেখে কোন্ প্রাণে সও,
অয়ি সুপ্রসন্ন হও কাতর পাগলে!

ক্রমে সংসারের অত্যাচারে, সমাজের তাড়ণায়, কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানে কবি সারদা-হারা হইয়া, এই বলিয়া মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন—

কেমনে বা তোমা বিনে
দীর্ঘ দীর্ঘ রাত্র দিনে
সুদীর্ঘ জীবন-জ্বালা সব, অকাতরে,
কার আর্ মুখ চেয়ে
অবিশ্রাম যাব বেয়ে
ভাসায়ে তনুর তরী অকূল সাগরে!
কেন গো ধরণী রাণী
বিরস বদনখানি,
কেন গো বিষণ্ণ তুমি উদার অকাশ,
কেন প্রিয় তরু লতা
ডেকে নাহি কও কথা,
কেন রে হৃদয় কেন শ্মশান উদাস!
কোন সুখ নাহি মনে,
সব গেছে তার সনে;
খোলো হে অমরগণ স্বরগের দ্বার!
বল কোন্ পদ্মবনে
লুকায়েছ সংগোপনে,
দেখিব কোথায় আছে সারদা আমার!

কিন্তু কবিবর বিশেষ অনুসন্ধানেও সারদাকে আর কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তখন দারুণ বিরহে সন্তপ্ত হইয়া, মর্ম্ম যাতনায় উৎপীড়িত হইয়া, প্রেমের পরাধীনতায় আপনাকে নিতান্ত দুর্ব্বল ভাবিয়া কবি জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

কেনগো পরের করে

সুখের নির্ভর করে,
আপনা আপনি সুখী নহে কেন নর!
সদাশিব সদানন্দ,
সতী বিনে নিরানন্দ,
শ্মশানে ভ্রমেন্ ভোলা ক্ষেপা দিগম্বর।
হৃদয়-প্রতিমা লয়ে
থাকি থাকি সুখী হয়ে,
অধিক সুখের আশা নিরাশা শ্মশান;
ভক্তিভাবে সদা স্মরি,
মনে মনে পূজা করি,
জীবন-কুসুমাঞ্জলি পদে করি দান।

গভীর অপমানে, গভীর মর্ম্মবেদনায়, কবি অবশেষে নিতান্ত নাস্তিক ভাবে আবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

তবে কি সকলি ভুল!
নাই কি প্রেমের মূল!
বিচিত্র গগন-ফুল কল্পনা লতার?
মন কেন রসে ভাসে
প্রাণ কেন ভালবাসে
আদরে পরিতে গলে সেই ফুলহার?
শত শত নর নারী
দাঁড়ায়েছে সারি সারি,
নয়ন খুঁজিছে কেন সেই মুখখানি?
হেরে হারা-নিধি পায়,
না হেরিলে প্রাণ যায়;
এমন সরল সত্য কি আছে না জানি!
ফুটিলে প্রেমের ফুল
ঘুমে মন ঢুলু ঢুলু,
আপন সৌরভে প্রাণ আপনি পাগল;
সেই স্বর্গ-সুধা পানে
কত যে আনন্দ প্রাণে,
অমায়িক প্রেমিকে তা জানেন কেবল।

কিন্তু যখন কবি তাঁহার মরমের অন্তস্তল পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, যখন স্বাতন্ত্রের বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং "যে যার সে তার"—রূপ ন্যায়শাস্ত্রের সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কুচিত পরিধি অতিক্রম করিয়া মরমের সূক্ষ্ম শিরা পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, তখন সহসা তাঁহার মনে এই অনৈসর্গিক সত্য প্রতিভাত হইল—

এ ভুল প্রাণের ভুল,
মর্ম্মে বিজড়িত মূল,
জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত-বল্লরী;
এ এক নেশার ভুল,
অন্তরাত্মা নিদ্রাকুল,
স্বপনে বিচিত্র-রূপা দেবী যোগেশ্বরী।

তখন কবিবর প্রেমের সার্থকতা দেখিয়া, প্রেমের নেশায় উন্মত্ত হইয়া, বিরহ-সন্তপ্ত হৃদয়েও সারদাকে দেখিতে গেলেন—কিন্তু তখন তাঁহার সেই পদ্মবন-বিহারিণী সারদা, সেই উল্লাসিনী সারদা, সেই সঙ্গীত-মুগ্ধকারিণী সারদা আর সে সারদা নাই—কবি দেখিলেন, শারদীয় বিমল পূর্ণশশীকে আবার মেঘ আসিয়া ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—দেখিলেন বাল্মীকি-তনয়া কি ভাবিয়া, কি চিন্তিয়া, অবসন্ন হৃদয়ে নলিনী-নয়নে অশ্রুপাত করিতেছেন—কাহার দুঃখে জানি না, কাহার বিরাগে জানি না, কি সঙ্কল্প করিয়া জানি না, সেই হাস্যময়ী সারদা আজ নলিনী-নয়নে অশ্রুপাত করিতেছেন। তাহা দেখিয়া

আর কবি থাকিতে পারিলেন না—তিনি সেই অবস্থায় সারদাকে দেখিবামাত্রই এই বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন—

হায় ফের বিষাদিনী!
কে সাজালে উদাসিনী!
সম্বর এ মূর্ত্তি দেবী, সম্বর সম্বর!
বটে এ শ্মশান মাজে
এলোকেশী কালী সাজে,
দানব-রুধির-রঙ্গে নাচে ভয়ঙ্কর।—
আবার নয়নে জল!
ওই সেই হলাহল,
ওরি তরে জীর্ণজ্বরা জীবন আমার;
গরজি গগন ভোরে
দাঁড়াও ত্রিশূল ধোরে!
সংহার-মূরতি অতি মধুর তোমার।
আমার এ বজ্রবুক,
ত্রিশূলেরো তীক্ষ্ণ মুখ,
দাও দাও বসাইয়ে এড়াই যন্ত্রণা!
সমুখে আরক্তমুখী,
মরণে পরম সুখী,
এ নহে প্রলয়-ধ্বনি, বাঁশরী-বাজনা।
অনন্ত নিদ্রার কোলে,
অনন্ত মোহের ভোলে
অনন্ত শয্যায় গিয়ে করিব শয়ন,
আর আমি কাঁদিব না,
আর আমি কাঁদাব না,
নীরবে মিলিয়ে যাবে সাধের স্বপন!
তপন-তর্পণ-আল
অসীম যন্ত্রণা-জাল,
প্রশান্ত অনন্ত ছায়া অনন্ত যামিনী;
সে ছায়ে ঘুমাব সুখে,
বজ্র বাজিবে না বুকে,
নিস্তব্ধ ঝটিকা ঝঞ্ঝা, নীরব মেদিনী।
বাঁধ বুক, ত্যজ ভয়,
পুণ্য এ, পাতক নয়;
খুনে আর পরিত্রাণে অনেক অন্তর।
ভালবাসা তারি ভাল,
সহে যারে চিরকাল;
বাঁচুক্ বাঁচুক্ তারা হউক্ অমর!
হবে না হবে না আর,
হয়ে গেছে যা হবার,
ধোরো না ধোরো না, বৃথা রুধ না আমাকে!
এ পোড়া পিঞ্জর রাখি
উড়ুক পরাণ পাখী,
দেখুক দেখুক যদি আর কিছু থাকে!

কিন্তু সারদা আর ফিরিয়া দেখিলেন না, সেই গলদশ্রু লোচনেই তিনি কবির মানস চক্ষু হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন—তখন কবির কি অবস্থা হইল?—তখন তিনি কি বলিয়া আপনার হৃদয়ের দুর্জ্জয় মর্ম্মযাতনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন?—

অহহ! কিসের তরে
অভাগা নরকে জরে,
মরু—মরু—মরুময় জীবন-লহরী;
এ বিরস মরুভূমে
সকলি আচ্ছন্ন ধূমে,
কোথাও একটিও আর নাহি ফোটে ফুল;
কভু মরীচিকা মাজে
বিচিত্র কুসুম রাজে,
উঃ! কি বিষম বাজে যেই ভাঙে ভুল!

এত যে যন্ত্রণা জ্বালা,
অবমান অবহেলা,
তবু কেন প্রাণ টানে ! কি করি, কি করি !
ভাবিতে পারিনে আর !
অন্ধকার—অন্ধকার—
ঝটিকার ঘূর্ণী ঘোরে মাথার ভিতর ;
তরঙ্গিয়া রক্তরাশি
নাকে মুখে চকে আসি
বেগে যেন ভেঙে ফেলে ; ধর ধর ধর ;—
ধর, আত্মা, ধৈর্য্য ধর,
ছিছি এ কি কর কর,
মর যদি, মরা চাই মানুষের মত ;
থাকি বা প্রিয়ার বুকে,
যাই বা মরণ-মুখে,
এ আমি, আমিই রব ; দেখুক্ জগত।

এই সারদা-বিচ্ছেদে কাতর হইয়া, দাব-দগ্ধ হৃদয়ে, বিচূর্ণিত মরমে কবি সারদার অন্বেষণে দিগ্‌দিগন্তে উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে হিমালয়ের কঠোর প্রদেশে আসিয়া পড়িলেন—সেখানে সারদার সহিত তাঁহার সম্মিলন হইল,—কমলার সেই ত্যজ্য ভূমি—উদারতার সেই বিহার-ক্ষেত্র—ঔদাস্যের সেই রঙ্গস্থলে এবং সরস্বতীর সেই লীলা-কাননে সারদার সহিত তাঁহার সম্মিলন হইল—প্রকৃতির সেই অপ্রাকৃতিক মহান ব্যাপার তাঁহার চক্ষে প্রতিভাত হইল—হিমালয়কে দেখিয়াই তিনি মনের ভ্রম সংশোধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

অসীম নীরদ নয় ;
ও-ই গিরি হিমালয় !
উথুলে উঠেছে যেন অনন্ত জলধি ;
ব্যেপে দিগ্ দিগন্তর,
তরঙ্গিয়া ঘোরতর,
প্লাবিয়া গগনাঙ্গন জাগে নিরবধি।
বিশ্ব যেন ফেলে পাছে
কি এক দাঁড়ায়ে আছে !
কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান্ ব্যাপার !
কি এক মহান্ মূর্ত্তি,
কি এক মহান্ স্ফূর্ত্তি,
মহান্ উদার সৃষ্টি প্রকৃতি তোমার !
পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম,
তুচ্ছ তারা সূর্য্য সোম,
নক্ষত্র, নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে ;
সমুখে সাগরাম্বরা
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা,
কটাক্ষে কখন, যেন দেখিছে তাহারে।
কত শত অভ্যুদয়,
কতই বিলয় লয়,
চক্ষের উপর যেন ঘটে ক্ষণে ক্ষণে ;
হরহর হরহর
সুর নর থরথর
প্রলয়-পিণাক-রাব বাজেনা শ্রবণে।
ঝটিকা দুরন্ত মেয়ে,
বুকে খেলা করে ধেয়ে
ধরিত্রী গ্রাসিয়া সিন্ধু লোটে পদতলে।
জ্বলন্ত-অনল-ছবি
ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে রবি,
কিরণ-জ্বলন-জ্বালা-মালা শোভে গলে।
কালের করাল হাসি

দলকে দামিনী রাশি,
কড়্ কড়্ দন্তে দন্তে ভীষণ ঘর্ষণ ;
ত্রিজগত ত্রাহি ত্রাহি ;
কিছুই ভ্রূক্ষেপ নাহি ;
কে যোগেন্দ্র ব্যোমকেশ যোগে নিগমন !

এই ভয়াবহ ভীষণ স্থানে সারদার সঙ্গে কবির মিলন হইল—এই সেই স্থান, যেখানে বিভবের আড়ম্বর নাই, সুখ্যাতির সুরভি-নিঃশ্বাস নাই, পদমর্য্যাদার শূন্য আস্ফালন নাই—সেই খানে কবির সহিত সারদার সুখের মিলন হইল—এই সেই স্থান, যেখানে সংসারের কোলাহল নাই, সমাজের অত্যাচার নাই, গৃহস্থাশ্রমের মোহময় বন্ধন-জ্বালা নাই, সেই খানে সারদার সহিত কবির আবার সুখের মিলন হইল—এবং ভগ্ন-হৃদয় কবি সেই বিজন বিকট স্থানে দিগন্ত—চমৎকারিণী সারদাকে সহসা দেখিয়া মনের অপ্রতিহত, অনিবার্য্য, অসংযত সোহাগ-বিলাস-ভরে বলিয়া উঠিলেন—

উদার—উদারতর
দাঁড়ায়ে শিখর-পর
এই যে হৃদয়-রাণী ত্রিদিব-সুষমা !
এ নিসর্গ-রঙ্গভূমি,
মনোরমা নটী তুমি,
শোভার সাগরে এক শোভা নিরুপমা !
আননে বচন নাই,
নয়নে পলক নাই,
কাণ নাই মন নাই আমার কথায় ;
মুখখানি হাস হাস,
আলুথালু বেশ বাস,
আলুথালু কেশপাশ বাতাসে লুটায়।
না জানি কি অভিনব
খুলিয়ে গিয়েছে ভব
আজি ও বিহ্বল মত্ত প্রফুল্ল নয়নে !
আদরিণী, পাগলিনী,
এ নহে শশি-যামিনী ;
ঘুমাইয়ে একাকিনী কি দেখ স্বপনে !
আহা কি ফুটিল হাসি !
বড় আমি ভালবাসি
ওই হাসিমুখখানি প্রেয়সী তোমার,
বিষাদের আবরণে
বিমুক্ত ও চন্দ্রাননে
দেখিবার আশা আর ছিল না আমার !
দরিদ্র ইন্দ্রত্ব লাভে
কতটুকু সুখ পাবে,
আমার সুখের সিন্ধু অনন্ত উদার ;—
কবির সুখের সিন্ধু অনন্ত উদার !
ও বিধু-বদন-হাসি
গোলাপ-কুসুম-রাশি,
ফুটে আছে যে জনার নেশার নয়নে ;
সে যেন কি হয়ে যায়,
সে যেন কি নিধি পায়,
বিহ্বল পাগল প্রায়,
বেড়ায় কি ঝোঁকে ঝোঁকে আপনার মনে,
এস বোন, এস ভাই,
হেসেখেলে চ'লে যাই
আনন্দে আনন্দ করি আনন্দ কাননে !
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে !
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে !
হে প্রশান্ত গিরি-ভূমি,

জীবন জুড়ালে তুমি,
জীবন্ত করিয়ে মম জীবনের ধনে!
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে!
প্রিয়ে সঞ্জীবনী লতা,
কত যে পেয়েছি ব্যথা
হেরে সে বিষাদময়ী মূরতি তোমায়!
হেরে কত দুঃস্বপন
পাগল হয়েছে মন,
কতই কেঁদেছি আমি কোরে হাহাকার!
আজি সে সকলি মম
মায়ার লহরী সম
আনন্দ সাগর মাঝে খেলিয়া বেড়ায়।
দাঁড়াও, হৃদয়েশ্বরী,
ত্রিভুবন আলো করি,
দুনয়ন ভরি ভরি দেখিব তোমায়!
দেখিয়ে মেটে না সাধ,
কি জানি কি আছে স্বাদ,
কি জানি কি মাখা আছে ও শুভ আননে!
কি এক বিমল ভাতি,
প্রভাত করেছে রাতি;
হাসিছে অমরাবতী নয়ন-কিরণে!
এমন সাধের ধনে
প্রতিবাদী জনে জনে,
দয়া মায়া নাই মনে, কেমন কঠোর!
আদরে গেঁথেছে বালা
হৃদয়-কুসুম-মালা,
কৃপাণে কাটিবে কে রে সেই ফুলডোর!
পুনঃ কেন অশ্রুজল!
বহ তুমি অবিরল!
চরণ কমল আহা ধুয়াও দেবীর!
মানস-সরসী-কোলে
সোণার নলিনী দোলে,
আনিয়ে পরাও গলে সমীর সুধীর!
বিহঙ্গম! খুলে প্রাণ
ধর রে পঞ্চম তান!
সারদা-মঙ্গল গান গাও কুতূহলে!

আমরা বলিয়াছি ও আবার বলিতেছি যে, যে কোন পাঠক "সারদা-মঙ্গলের" উচ্চ আদর্শের প্রকৃত কবির লেখায় উন্মত্ত না হইয়া,—সেই মোহে মুগ্ধ না হইয়া, সেই নেশায় "মস্‌গুল্‌" না হইয়া, সেই ভাবে আত্মহারা না হইয়া, "সারদা মঙ্গল" পাঠ করিবেন, তিনি হয় ত হতাশ হৃদয়ে বিফল যত্ন হইয়া ফিরিয়া আসিবেন,—কিন্তু যদি কোন পাঠকের হৃদয়ের রক্তরাশি, কথন' সারদা ধ্যানে আবর্ত্তময় হইয়া এই লেখকের সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে, তালে তালে, তরঙ্গিত হয়, সেই সুরের তানে তানে, সেই উচ্ছ্বাসের ঘূর্ণ তুফানে বিলোড়িত হয়, তাহা হইলে সেই পাঠকই বুঝিতে পারিবেন যে "সারদা-মঙ্গল" বঙ্গসাহিত্যের একটি অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ—বঙ্গদেশীয় কবিত্বের একটি অনন্ত সাক্ষীস্বরূপ।

মালতী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তর মধ্যদিয়া বালুকাময় বেলাভূমি চুম্বন করিয়া সুখময়ী নদী বক্র ভাবে বহিয়া যাইতেছে। তীরে লতাচ্ছাদিত একখানি কুটীর, কুটীরের দুই পার্শ্বে মালতী-লতাবেষ্টিত দুইটি ঝাউ গাছ, তাহার তলায় দুইজনে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে; চতুর্থীর চাঁদ, নিরাশ হৃদয়ে ক্ষীণ আশার মত গগন প্রাঙ্গনে একটি ধারে মলিন জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিয়াও যেন করিতে পারিতেছে না; চঞ্চল নদীবক্ষ ঈষৎ উজ্জ্বল করিয়া, ফুটন্ত মালতী ফুলগুলি আরো ফুটাইয়া মালতীর মুখে সেই চাঁদ পড়িয়াছে। মালতী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা, মালতী জ্যোৎস্নাময়ী প্রতিমা—মালতী মৃদুহাসাময়ী কুসুমকলিকা। মালতী কথা কহিতে কহিতে একবার চাঁদের পানে চাহিয়া দেখিল, একবার জ্যোৎস্না-ধৌত সুখময়ীর তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস দেখিল, একবার সন্ধ্যাসমীর আন্দোলিত মালতীলতা হইতে কতকগুলি ফুল লইয়া দেখিতে দেখিতে হাসিয়া বলিল,

"দাদা, আর দশ দিন আছে মাত্র, তবুও আমার মনে হচ্চে দিন বুঝি আর ফুরাবে না।"

যুবকের হর্ষোৎফুল্ল মুখ এই কথায় আরো প্রফুল্ল হইল, ঈষৎ রক্তিম আভায় রঞ্জিত হইল, যুবক একটু হাসিতেই তাহার কথায় উত্তর করিলেন। মালতী গোলাপ-কলির মত রাঙা মুখ খানি নাড়িয়া হাসিয়া হাসিয়া আবার বলিল,

"দাদা, আমরা দু'জনে চিরকাল এই কুটীরটিতে আছি, শোভনা এলে আমাদের একটি লোক বাড়বে, তুমি যখন দিনের বেলা কাজে যাবে আমাকে আর একলা থাকতে হবে না।" যুবক হাসিয়া বলিলেন, "সেই জন্যই মালতী তোর বুঝি এত আহ্লাদ?"

মালতী ঈষৎ লজ্জিত ভাবে বলিল, "না, দাদা, আমি শোভনাকে কত ভাল বাসিয়াছি তুমি তা জান না।"

যু। "তাকে না দেখেই এত ভালবাসা কি করে হোলো? তোদের বুঝি স্বপ্নে স্বপ্নে এত ভাব হোয়ে গেল?"

মা। আমি নাই বা দেখলুম তোমার কাছে তার কথা শুনেশুনেই আমার ভালবাসা হয়েছে, তাকে দেখতে যে কি ব্যগ্র হয়েছি তা আর কি বলব। বিয়ের আগে, দাদা, একদিন তাকে দেখাবে না?"

যু। "সেতো এ গ্রামে নয়, যে দূরে যেতে হয়, তুই ছেলেমানুষ কষ্ট হবে যে—নইলে কি আর আমি তোকে তার কাছে নিয়ে যেতেম না? শোভনাও যে তোকে কতবার দেখতে চেয়েছে তার ঠিক নেই।"

মা। "তবে কি, দাদা, সেও আমাকে ভালবাসে?"

যুবকের উত্তর অপেক্ষা না করিয়াই পূর্ণ উচ্ছ্বাস ভরে বালিকা তখনি আবার বলিল, "আহা, দাদা, তোমার বিয়ে হবে, আমার যে কি আহ্লাদ হচ্ছে কি বলব। তুমি যখন না থাকবে, তাতে আমাতে আমার ঐ বাগানটিতে বেড়াব, তাকে কত সাজাব, তুমি এলে দেখে কতই খুসী হবে, দু'জনে কতই গল্প করব।"

যু। "তুই দেখছি এখন থেকেই মনে মনে সব কল্পনা করে রেখেছিস।"

সহসা গল্পের মধ্যে বালিকা মৌন হইয়া পড়িল, তাহার প্রফুল্ল মুখ খানি বিষাদে আচ্ছন্ন হইল, যুবার কথায় কাণ না দিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "দাদা, আহা আজ যদি মা থাকিতেন, তাঁর এ বিয়েতে কত আহ্লাদই হোত।"

যুবাও যেন এই কথায় বিমর্ষ হইলেন, কি যেন ভাবিতে ভাবিতে আপন মনেই বলিয়া উঠিলেন "তাই কি? তিনি থাকিলে কি এ বিবাহ হইত?"

বালিকা আশ্চর্য্য হইল, বালিকা কুতূহল হইয়া বলিল, "তিনি থাকিলে এ বিবাহ হইত না? কেন?"

যুবক নিস্তব্ধ, যুবক গম্ভীর, এ কথায় কোন উত্তর করিলেন না।

বালিকা আবার বলিল, "দাদা, মা থাকিলে এ বিবাহ হইত না কেন?"

যুবা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে স্থির-গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মালতি, তুই এখন বড় হ'য়েছিস্ তোর এখন সকল কথা বুঝিবার ক্ষমতা হয়েছে, এতদিন ধরে তোর নিকট যে একটি কথা লুকিয়েছি, আজ তা' বলিব, মালতি তুই আমার সোদরা ভগিনী ন'স্।"

মালতী সোদরা ভগিনী নহে! মালতীর তবে সংসারে কেহই নাই? যুবাকে সে একমাত্র সংসার বন্ধন—একমাত্র ভাই—বলিয়া জানিত। যুবাও তাহার ভাই নহেন! মালতীর বুকে বজ্রের মতন কথাটি পড়িল। যুবা আবার বলিলেন, "মালতি, তুই মায়ের একজন সখীর মেয়ে। এক বৎসর বয়সে তোর বিধবা মা মরিলে আমার মা তোকে আপনার মেয়ের মত করিয়া রাখেন—তখন আমার বয়স সাত বৎসর, সেই জন্য সে সব কথা আমার বেশ মনে আছে। মায়ের ইচ্ছা ছিল তোর সঙ্গে আমার বিবাহ দেন, তাতেই মনে হয় মা থাকিলে এ বিবাহ হইত কি না সন্দেহ।"

সব কথা গুলি মালতীর কাণে গেল না, সে চারি দিক যেন অন্ধকার দেখিল, কি একটি অসহ্য বেদনায় তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—অথচ তাহার কারণ সে নিজেই বুঝিতে পারিল না।

যাহাকে অন্ধকার মধ্যে আলো বলিয়া জানিত—অন্য আপন কেহ না থাকা সত্ত্বেও যে ভাইটিকে পাইয়া তাহার আর অভাব মনে হইত না—যাহাকে সে প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাসে সে তাহার ভাই নয়। সে তাহার কেহই নয়। তাহার সহিত কোন সম্পর্কই নাই। সে ভাল বাসা-তেও তাহার অধিকার নাই। এ সংসারে মালতী অনাথা বালিকা, রমেশের ন্যায্য স্নেহের সামগ্রী নহে, তাহাতে তাহার জোর নাই, তাহার কৃপা-ভাজন আশ্রিত মাত্র। হয়তো এই সকল কারণেই তাহার হৃদয় ব্যথিত হইল, কিন্তু এত কথা তাহার মনে আসে নাই; কেন যে তাহার কষ্ট, কষ্টের কথা রমেশ কি বলিলেন, সে তাহা বুঝিল না, অথচ অকারণে কি একটি মর্ম্মভেদী তীব্র-যাতনায় তাহার হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে চতুর্থীর ক্ষীণচন্দ্র মেঘের কোলে লুকাইল, উদ্যান নদী পৃথিবী অন্ধকার করিয়া চন্দ্র নিভিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে চিরহাস্যময়ী মালতীর হৃদয় অন্ধকার করিয়া চন্দ্র আজ অস্তমিত হইল। শোক বিহ্বল চিত্তে অজ্ঞানের মত বালিকা কাঁদিতে লাগিল।

রমেশ যেন তাহার মনের ভাব বুঝি-লেন। ব্যথিত হইয়া বলিলেন,

"মালতি কাঁদিস কেন? আমার সো-দরা না হইলেও তুই আমার ভগিনী। আমি সোদর না হইয়াও তোর ভাই। কোন সম্পর্ক না থাকিলেও আমাদের এ আশৈশব স্নেহ কখনই ঘুচিবে না, ইহা হৃদয়ে বদ্ধমূল। তুই জানিস, মা-লতি, আমার আপন ভগিনী হইলেও তোকে ইহা অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতে পারিতাম না। আমাদের এ ভালবাসা অকাট্য, বিশুদ্ধ স্বর্গীয়। ইহা দেবতারও লোভনীয়!"

মালতীর অশ্রুজল শুকাইল, মালতীর বিষাদময়ী মূর্ত্তি এই কথায় আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। যদি তাহাদের সেই ভাল-বাসাই রহিল, যদি মালতী তেমনি ক-রিয়া হৃদয় পুরিয়া ভাল বাসিতেই অধিকারী হইল, তবে আর মালতী কি চায়? তাহার আর তবে কিসের দুঃখ।

দ্বিতীয়—পরিচ্ছেদ।

দুই তিন বৎসর অতীত হইয়া গি-য়াছে,—ঘটনারূপ পদচিহ্ন প্রত্যেক মানুষের জীবনে অঙ্কিত রাখিয়া, এই দুই তিন বৎসর কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। আজ রমেশের শয়ন কুটীরে প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া শোভনা পান সাজিতেছিল, রমেশ শ-য্যায় অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় বসিয়া সংস্কৃত রত্না-বলী নাটক হইতে শোভনাকে পড়িয়া শুনা-ইতেছিলেন। রমেশ গঙ্গারাম বিদ্যারত্নের পুত্র, সেই জন্য সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার বেশ ব্যুৎপত্তি ছিল। শোভনার পান সাজা হইল,

হাত ধুইয়া শোভনা হাতে মুখটী রাখিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া রত্নাবলী শুনিতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে রমেশ বলিলেন, "শোভনা আজ মালতী কোথায়? সে যে এখনো রত্নাবলী শুনিতে এলো না?"

শোভনা ধীরে ধীরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে বলিল, "আমি কি ডেকে আনব?"

রমেশ। "সে কোথায় ফুল তুলছে, কোথায় পাখীকে পড়াতে শেখাচ্ছে, কোথায় নদীর ধারে নুড়ী কুড়াচ্ছে, তুমি তাকে কি করে খুজে পাবে? সে আপনি আসবে এখন।"

যুবা আবার পড়িতে লাগিলেন,

"দুল্লহজণঅণুরাও
লজ্জা গুরুই পরব্বসো অপ্পা।
পিঅসহি বিসমং পেম্মং
মরণং সরণং ণবরিঅমেক্কং॥"

পড়িয়া তাহার মানে বলিতে বলিতে শোভনার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন শোভনার পদ্মকোরক সদৃশ নয়নে দুই বিন্দু অশ্রু শোভিতেছে। যুবা হাসিয়া বলিলেন, "শোভনে, এই কবিতাটি কি তোমার এতই মনে লাগিল, যে চোকে জল আসিল?"

শোভনা চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "কি কবিতা?"

যুবক দেখিলেন শোভনা অন্যমনা, শোভনা চিন্তামগ্ন, শোভনা কবিতা শুনিয়া কাঁদে নাই। যুবার আর পড়া হইল না। বই খানি রাখিয়া শোভনাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "শোভনা তোমার সে আগেকার হাসি এখন কোথায়? বিবাহের আগে যখন তোমাদের বাড়ী যাইতাম, তখন তোমার মুখে যে হাসি দেখিতাম, যে একটি প্রফুল্লভাবে মুখখানি উৎফুল্ল দেখিতাম—আজ কাল তোমার সে ভাব নাই কেন? তোমাকে সর্ব্বদাই প্রায় বিষণ্ণ দেখি—জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাই না; শোভনে, আমাকে বিবাহ করিয়া কি অনুতাপ হইয়াছে?"

শোভনার নয়ন হইতে অশ্রুধারা উথলিয়া উঠিল—গদ গদ কণ্ঠে বলিল, "সর্ব্বস্ব ধন! তোমাকে বিবাহ করিয়া অনুতাপ! তোমার সহিত চিরজীবন নরকে থাকিলেও আমার অনুতাপ হইবে না—তোমার সহিত নরকবাসও আমার স্বর্গ—তোমাকে বিবাহ করিয়া অনুতাপ! কিন্তু—"

যু। "কিন্তু কি শোভনে বল? তোমার এইরূপ ভাব দেখিয়া আমার কি ভয়ানক যাতনা হয়, তাহা যদি বুঝিতে—" শোভনার হৃদয়ে কথাটি প্রবেশ করিল, শোভনা ব্যথিত হইয়া বলিল "ভাই—আমার কি হইয়াছে জানি না, আমার মনে হয় আমাকে বিবাহ করিয়া তোমার অনুতাপ হইয়াছে।"

যু। "সে কি কথা শোভনা? আমার কি কার্য্যে, কি কথায়, কি ভাবে, আমি তোমাকে ও রকম মনে করিতে দিয়াছি শোভনে?"

শোভনা দুই হস্তে আঁচলের একটি কোন্ নখাগ্রে খুঁটিতে খুঁটিতে আনত মস্তকে

বাধ' বাধ' স্বরে বলিল, "নাথ, আমার কি গুণ আছে যে আমাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইবে? আমার এমন রূপ নাই যে দেখিলেই ভালবাসা জন্মাইতে পারে, আমার এমন গুণ নাই যাহাতে রূপের অভাব সত্বেও তোমার হৃদয়কে মুগ্ধ করিতে পারে, আমার বিদ্যা নাই—যে আমার সহিত কথা কহিয়া তুমি সুখী হইবে; আমি মূর্খ, লেখা পড়ার কথায় তোমার সহিত যোগ দিতে পারি না, এমন বুদ্ধিও নাই যে শীঘ্র লেখা পড়া শিখিয়া তোমাকে সন্তুষ্ট করি, এক কথায়, আমা হইতে তোমার সকল রূপ অভাব পূরণ হইতে পারে না—এমন কি তুমি যে গান শুনিতে এত ভাল বাস, দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহাও আমার আসে না, তবে কিসের জন্য তুমি আমাকে ভাল বাসিবে? রূপে গুণে বিদ্যা বুদ্ধিতে তোমার সমকক্ষ হওয়া দূরে থাক, কিছুতেই আমি তোমার পায়ের নিকটও পৌঁছিতে পারি না, আপন অযোগ্যতা প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমি বুঝিতে পারিতেছি। আগে মনে করিতাম, রূপ গুণ নাই থাক আমার এ অসীম ভাল বাসার তো প্রতিদান আছে, কিন্তু এখন আর তাও মনে করিতে পারি না——"

রমেশ নিস্তব্ধে সকল শুনিলেন, শোভনার কথা শেষ হইলে একটু হাসিয়া বলিলেন, শোভনে কে বলে যে বিদ্যা বুদ্ধিতে তুমি আমার অসমযোগ্য। কজন পুরুষ আজ এ বিষয়ে তোমার মত বক্তৃতা করিতে পারিত! আর তোমার রূপের বিচারক? সে তুমি নও সেও আমি। ইহাই যদি তোমার কষ্টের কারণ হয় তো আশ্বাস দিতেছি তোমার কষ্ট অমূলক। না শোভনে ঠাট্টা নয়, কোন্ দেবী তোমা হইতে গুণবতী, তা তো আমি জানি না, আর তা হইলেও আমি কোন স্বর্গীয় দেবীর সহিতও তোমাকে বিনিময় করিতে প্রস্তুত নই—তুমি আমার হৃদয়, আমার রত্ন, আমার দেবতা—তুমি আমার কে নও আমি বলিতে পারি না—তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তোমাকে পাইয়া আমি সুখী নই শোভনে? তুমি আমার সুখের প্রতিমা।"

শোভনার আহ্লাদে কথা ফুটিল না। শোভনার তবে কি সকলি কল্পনামাত্র, সকলি ভ্রম? শোভনা স্বামীর চরণে মাথা লুকাইয়া বলিল, "আমি পাপী, নরকেও আমার স্থান হইবে না—তাই তোমার মত স্নেহময় স্বামীর প্রতি সন্দেহ করিয়াছি—আমার কিসে প্রায়শ্চিত্ত হইবে জানি না—কিন্তু আজ যখন মন খুলিতে বসিয়াছি, আজ মুক্তকণ্ঠে আমার হৃদয় খুলিব—আমি কি নরক যাতনা মৌনে সহ্য করিয়া আসিতেছি, আজ তাহা তোমাকেই খুলিয়া বলিব, যদি আমার অপরাধের মার্জ্জনা না থাকে তো তুমিই তাহার শাস্তি দাও, তোমার হাতেই আমার জীবন মৃত্যু নির্ভর করিতেছে। নাথ, আমার হৃদয়ে দাবানল জ্বলিতেছে, তোমার মত, দেবতার মত স্বামী পাইয়াও আমার নিজের মনের গুণে আমি সুখী হইতে পারিলাম না—হৃদয়ধন, আমার মনে হয়

তুমি আর আমাকে ভালবাস না, তুমি মালতীকে—"শোভনার আর কথা ফুটিল না লজ্জায় অনুতাপে কষ্টে সে থামিল।

যুবা তাহার কথায় বিস্মিত হইলেন, তাহার সম্পূর্ণ মনের ভাব বুঝিলেন না, ধীরে ধীরে তাহাকে উঠাইয়া বলিলেন "শোভনে, কি বলিলে! মালতীকে কি?"

শোভনা থামিয়া থামিয়া বলিল, "ভালবাস।"

যুবা বিস্মিত নেত্রে বলিলেন "মালতীকে ভালবাসি! ইহার মর্ম্ম? মালতী আমার ভগিনী না হইয়াও আমার ভগিনী—তাহাকে তো আমি ছেলে বেলা হইতে ভালবাসি।"

এই কথায় শোভনার আবার কথা কহিবার শক্তি হইল, দৃঢ়তার স্বরে বলিল, "এ আমি সে ভালবাসার কথা বলিতেছি না—আমা হইতেও ভালবাস, এ প্রেমের ভালবাসা।"

"প্রেমের ভালবাসা!" যুবা অবাক হইলেন, যুবা এতক্ষণে শোভনার মন বুঝিলেন, তাঁহার কষ্টের ভিতর একটু হাসিও আসিল, বলিলেন, "শোভনে, তাহা হইলে কি মালতীকে বিবাহ করিতাম না? তবে তোমাকে বিবাহ করিলাম কেন?"

শো। "যখন বিবাহ করিয়াছিলে তখন আপনার মন বোঝ নাই।"

যুবা। "তা যদি না বুঝিয়া থাকি তাহা হইলে এখনো বুঝি নাই—আমি তাহাকে বরাবর যেমন ভালবাসি, এখনো তাহা অপেক্ষা বেশী ভাল বাসি বলিয়া বুঝিতে সক্ষম হই নাই; এ ভালবাসা বিশুদ্ধ ভগিনী স্নেহ, ইহা প্রণয়ের ভালবাসা নহে।"

শো। "প্রেম যখন অল্পে অল্পে হৃদয়কে অধিকার করে, তখন নিজেই তাহা বোঝা যায় না—তোমার হৃদয় তুমি যাহা না বোঝ—আমি তাহা বুঝিতে পারি।" এই স্থির সন্দেহে যুবার মনে বড় আঘাত লাগিল, কি করিয়া তাহা দূর করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া বলিলেন,

"আমার কি ব্যবহারে তোমার ঐরূপ ধারণা হইল।"

শো। "তোমার সকল কথায়, সকল ভাবে সকল ব্যবহারেই তোমার মনের ভাব প্রকাশ পায়। প্রেমে বাধা না পড়িলে অনেক সময় তাহা পূর্ণতা লাভ করে না; হয়তো ছেলেবেলা হইতে তোমার যে অঙ্কুর হইয়াছে, তাহা তুমি তখন প্রেম বলিয়া বোঝ নাই, তাই আমাকে ভালবাসিয়া প্রেমে মনে করিয়াছ; কিন্তু এখন দেখিতেছি, মালতীকেই তুমি ভালবাস।"

যুবা ঈষৎ বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "শোভনে, প্রেমে বাধা না পাইলে তাহা পাকে না—ইহা অনেকে বলে বটে, তুমিও বলিতেছ কিন্তু যদি মালতীকে ভালই বাসি, কি বাধা পাইয়া আজ তাহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে?"

শো। "আমাকে বিবাহ করিয়া। আমিই তোমাদের বাধা"। বলিতে বলিতে শোভনার আবার কষ্টে কথা বন্ধ হইল; যে যাতনা এতদিন হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিয়া-

ছিল, তাহা যেন উচ্ছলিত হইয়া নয়নে উথলিয়া উঠিল, কষ্টে অশ্রুজল সামালিয়া শোভনা আবার বলিল, "নাথ, আমিই তোমাদের বাধা। যখন বিবাহ হয় নাই, তখন মালতী ছাড়া তোমার আর কেহই ছিল না; মালতীকে লইয়া সারাদিন গল্প করিলে সোহাগ করিলে কেহই কাঁদিবার ছিল না। তখন অবাধে মন পুরিয়া তুমি তাহাকে স্নেহ করিতে পারিতে, মন পুরিয়া তাহাকে ভালবাসিতে পারিতে, তাহাতে তোমার সঙ্কুচিত হইবারও কোন কারন ছিল না—সেই জন্য তখন সে ভালবাসা পাকে নাই, অন্ততঃ তাহা প্রেম বলিয়া বোঝ নাই। কিন্তু এখন সকল সময় ইচ্ছা হইলেও মালতীর সহিত মন খুলিয়া কথা কহিতে পার না, এখন অনিচ্ছা হইলেও আমার সহিত থাকিতে হয়, আমিই তোমার বাল্যসুখ ভাঙ্গিয়াছি, আমিই তোমাদের ভালবাসায় বাধা হইয়া তাহা প্রেম রূপে পরিণত করিয়াছি।"

শোভনার যুক্তি শুনিয়া সেই কষ্টের মধ্যেও তাঁহার হাসি আসিল, হাসিয়া বলিলেন "তুমি শোভনা যে এক দিন কোন ন্যায় পঞ্চাননের সহিত তর্কে জয়ী হইবে, তাহাতে বড় সন্দেহ হইতেছে না, কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়, তার পর? তোমার সকল যুক্তিই কি ফুরাইল? না আরো কিছু বাকি আছে?"

শোভনার মুখে ঈষৎ হাসির রেখা পড়িল, কিন্তু দেখিতে দেখিতে তাহা মিলাইল, বিষাদ-গম্ভীর ভাবে শোভনা বলিল, "ভাই হাসিও না, যদি তুমি আমাকে বোঝাইতে পার যে ইহা প্রেম নয়, যদি আমি বিশ্বাস করিতে পারি তুমি আমারি, তাহা হইলে আর আমি কি চাই, তাহা হইলে আর আমার মত সুখী কে? আমার হৃদয়ে যে আগুণ জ্বলিতেছে তাহা তুমি কি বুঝিবে? ঐ আমার তপ, জপ, ঐ আমার ধ্যান হইয়াছে, সমস্ত দিন রাত আমি ঐ ভাবিতেছি, ঐ লইয়া মনে মনে কখনো সন্দেহে কখনো বিশ্বাসে বিচলিত হইতেছি; আমার নিকট ইহার যুক্তির আর অভাব নাই। এক কথায় ঐ ভাবিয়া ভাবিয়া এখনো আমি পাগল হই নাই—এই আশ্চর্য্য।"

যু। "শোভনে, আমি আর শুনিতে পারি না, যাহাকে দেখিয়া আজও আমার আশ মেটে নাই, যাহাকে ভালবাসিয়া আমার এখনো তৃপ্তি হয় নাই, যাহাতে আমার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ, তাহার মুখ হইতে আর এরূপ অবিশ্বাস সহ্য হয় না, ইহা অপেক্ষা বজ্রেও আমার অধিক লাগিত না।"

তড়িতের মত কথাগুলি শোভনার বুকে বিঁধিল, স্বামীর চরণে ধরিয়া শোভনা বলিল, "নাথ, আমার এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত করিব? আমি থাকিতে তোমার সুখ নাই। এ জঘন্য-ঘৃণিত মন থাকিতে কাহারো সুখ হইতে পারে না, আমাকে মরিতে দেও, আমি এ প্রাণ দিয়া আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।"

যুবা শোভনাকে এখনো হৃদয়ের কোথায় রাখিবেন খুঁজিয়া পাইতেন না, এখনো তাঁহার ভালবাসার উচ্ছ্বাস কিছুমাত্র

শমিত হয় নাই, শোভনার কথায় তাঁহার মন গলিয়া গেল, তিনি অশ্রুজল মুছিয়া বলিলেন, "না, শোভনা, যাহা বলিলাম উহাতে কিছু মনে করিও না, তীব্র কষ্টে উহা বাহির হইয়া গিয়াছে। তুমি হৃদয় খুলিয়া বলিয়াছ ভালই হইয়াছে, তাহাতে কষ্টের মধ্যেও আমি সুখ অনুভব করিতেছি। তোমার আরো যাহা মনে হইয়াছে সকল খুলিয়া বল, কিছু লুকাইও না।" শোভনা বলিল, "আজ যেকালে মন খুলিয়াছি, সেকালে কিছুই লুকাইব না, ইহাতে আমার অদৃষ্টে যাহাই হউক তাহা অবাধে সহ্য করিব সঙ্কল্প করিয়াই আমি বলিতে বসিয়াছি, সকল শুনিয়া এ পাপীকে পরে চরণে স্থান দেও দিও, নহিলে মরিতে আমার ভয় নাই, কত শতবার দিনে নিশীথে আমি মৃত্যুকামনা করি, তাহা দেবতাই জানেন," বলিয়া শোভনা অশ্রুজল মুছিল, যুবা ব্যথিত-চিত্তে তাহার কথা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

আপনাকে শামলাইয়া লইয়া সোভনা আবার বলিল, "নতুন বিবাহের পর তুমি সন্ধ্যা-কালে বাড়ী আসিয়া আমাকে দেখিতে যেরূপ ব্যগ্র হইতে এখন আর সেরূপ দেখিতে পাইনা কেন? এখন তাহার পরিবর্ত্তে কাহাকে সন্ধ্যাকালে না দেখিলে ব্যাকুল হইয়া পড়? আবার কাহাকে দেখিলে সেই বিষণ্ণ-মুখে স্বর্গীয় প্রফুল্লতার ভাব আসিয়া পড়ে? কত সময় তোমার সেই ছবি আঁকিবার জন্য আমার চিত্রকর হইবার ইচ্ছা হইয়াছে, কেন না তাহা হইলে তোমাকে তাহা আঁকিয়া দেখাইতে পারিতাম, কিন্তু আঁকিতে পারি না পারি, তোমার সেই ছবি আমার মনে অঙ্কিত আছে। মালতীর সহিত গল্প করিতে করিতে কিরূপ ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়, তাহা বলিয়া বোঝান যায় না। তোমার প্রতি কথায়, প্রতি ব্যবহারে, প্রত্যেক ভাবে, মালতীর প্রতি তোমার ভালবাসা আমাকে দেখাইয়া দেয়, আমাকে জীবন্তে পোড়াইতে থাকে। প্রতি পদে আমি বুঝিতে পারি, মালতী ও আমি তোমার নিকট কত ভিন্ন। আমার নিকট তোমার সেই মন-খোলা হর্ষের হাসি বিকাস পায় না, আমার নিকট তুমি আপন-হারা হও না, মালতী না থাকিলেই তুমি যেন মুমূর্ষু হইয়া পড়।"

যু। "মালতীকে দেখিলে যে আমার ভাল লাগে, মালতীকে যে আমি ভাল বাসি তাহা তোমার নিকট কখনই অস্বীকার করি নাই, এখনো করিব না, কিন্তু তুমি আপন কল্পনা দ্বারা স্নেহ হইতে তাহা যেরূপ উচ্চে উঠাইয়াছ, তাহার কিছুই তাহাতে নাই! তোমাকে কি বলিয়া বোঝাইব আমি কিছুই ভাবিয়া পাইতেছি না, যদি বিশ্বাস কর—"

স্বামীকে কথা শেষ করিতে না দিয়া শোভনা বলিল, "একটি কথা তোমাকে বলা হয় নাই, তাহাও লুকাইব না, মালতীর বিবাহের সম্বন্ধ হইল, তুমি তাহাতে গড়িমসি করিয়া এখনো তাহার

বিবাহ দিলে না, ইহাও আমার সন্দেহ বৃদ্ধির একটা কারণ হইয়াছিল।"

যুবা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "সেকি! মালতী যাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, সম্বন্ধের পরেই সে বিদেশে কার্য্যে গিয়াছে, দুই তিন বৎসর হইল, এখনো আসিল না, আসিলেই তাহাদের বিবাহ হইবে, মালতীর অমতে অন্যের সহিত আমার বিবাহ দিতে ইচ্ছা হইল না বলিয়া কি ইহাতেও তুমি প্রেম দেখিলে ঈর্ষাতে মানুষকে কি অন্ধই করে!"

শোভনা লজ্জিত হইল, আপনার ভ্রম যেন বুঝিল। যুবা আবার বলিলেন "শোভনা, তুমি ওরূপ ভাবিয়া আর নিজের অনর্থক অসুখের কারণ হইওনা, আমাকেও আর এরূপ আহত করিও না, বল আমি কি করিলে তোমার অবিশ্বাস দূর হইবে? যাহা করিতে বল এখনি করিব। পবিত্র ভালবাসার শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমাকে বই আমি আর কাহাকেও জানি না। শোভনা, আমি মালতীকে ছাড়িয়া চিরকাল থাকিতে পারি, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমাকে না দেখিতে পাইলে আমার কষ্ট হয়। যতক্ষণ বাহিরে কাজের জন্য থাকিতে হয়, তখন কাহার কথা সমস্ত ক্ষণ মনে জাগিতে থাকে? কাহার জন্য ব্যাকুল ভাবে সমস্ত কাজ ভুলিয়া যাই? কাহার ছবি মনের নিভৃত কক্ষে ধ্যানে দেখিয়া আবার মনে বল পাই? শোভনা! শোভনা! তুমি আর আমাকে অবিশ্বাস করিয়া আঘাত দিওনা—শোভনা, আমার হৃদয় এরূপ নির্দ্দয় ভাবে আর ভাঙ্গিও না," মনের ব্যাকুলতায় যুবা তাহার চরণে হাত দিলেন। চমকিয়া শোভনা তাঁহার হাত উঠাইয়া বক্ষে রাখিল, পৃথিবী তাহার চক্ষে ঘুরিতে লাগিল, তাহার যেন সমস্ত স্বপ্নবৎ জ্ঞান হইল। শোভনা তাহার নিজের মত জগতে আর কাহাকেও সুখী দেখিল না, শোভনা বুঝিল তাহার স্বগঠিত কল্পনা-গুণেই বৃথা দোষে স্বামীকে দোষী করিয়াছে। শোভনার হৃদয় অনুতাপে পূর্ণ হইল। স্বামীর বুকে মুখ রাখিয়া শোভনা কাঁদিতে লাগিল, মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করিল, কিন্তু ফুটিতে সাহসী হইল না। যুবা তাহার মনের ভাব বুঝিলেন, বুঝিলেন তাহার সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে, আর ওরূপ ভাব মনে আসিবে না। সুখে অভিভূত হইয়া উভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

এই সময় মালতী সহসা তাঁহাদের গৃহে প্রবেশ করিল, হাসিয়া একটি গোলাপ ফুল যুবার হাতে দিয়া বলিল "দেখ দেখ আজ তোমার জন্য কেমন একটি নতুন জিনিস এনেছি—আমার সেই শুকনো গাছটিতে আজ নতুন এই ফুলটি ফুটেছে।"

সেই শোকাকুল গৃহ যেন মালতীর হর্ষোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইল। মালতীর অজ্ঞান-সরল-হর্ষের ভাবে যুবার চক্ষে এক বিন্দু জল আসিল। মালতী বালিকা জানে না, তাহাকে লইয়াই তাহার ভ্রাতার যত বিপদ, তাহাকে ভাল বাসিয়াছে বলিয়াই আজ রমেশ অসুখী, রমেশের শোভনা অসুখী, তাহার জন্যই

তাহাদের এত যাতনা।" যুবা সেই সরলা বালিকার পানে চাহিয়া চাহিয়া হর্ষ-বিষাদ ভাবে একটু হাসিলেন, হাসিতে হাসিতে গোলাপটি লইয়া আঘ্রাণ করিলেন।

আবার আগুণ জ্বলিল, শোভনা সেই হাসি দেখিল, সে আর আপন সঙ্কল্প স্থির রাখিতে পারিল না। মানুষ আত্ম-বিরোধী অস্থিরচেতা। এই ক্ষণকাল পূর্ব্বে শোভনা ভাবিয়াছিল তাহার মনে আর ওরূপ সন্দেহ কখনো স্থান পাইবে না, কিন্তু কেন যে আবার তাহা আসিল সে নিজেই বুঝিল না। রমেশের অত কথায় যে ফল হইয়াছিল, রমেশের ঐ হাসিটুকুতে তাহা উবিয়া গেল। অমন প্রেমময়, অমন স্বপ্নময় হাসি রমেশের মুখে শোভনা আর কখনো দেখে নাই। রমেশ নিশ্চয়ই আপন মন বোঝেন না—নহিলে এ হাসি কি করিয়া হাসিলেন? কই, ইহাতো শোভনার কপালে আর ঘটে না; অমন মধুর সোহাগময় হাসি,—অমন প্রেমে বিজড়িত, আদরে সুমার্জ্জিত অনুরাগে সুরঞ্জিত হাসি ত শোভার কপালে কখনো ঘটে না। রমেশ শোভনাকে তবে কি এতক্ষণ ছলনা করিয়া ভুল বুঝাইলেন? না, তাহা নহে, রমেশ আপন মনের ভাব আপনিই বোঝেন না। রমেশ, সত্যই কি তুমি আর শোভনার নও? সত্যই কি তুমি তবে মালতীর? রমেশের সেই হাসি শোভনার মনে জাগিতে লাগিল, তাহার হৃদয়ে আবার বজ্রাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

ক্রমশঃ।

শকুন্তলা-সমালোচনার সমালোচনা।

দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল ভারতীদেবীর একটি অমূল্য বর দান বলিয়া তাঁহার ভক্ত-জনগণের নিকট প্রথিত আছে, আজ যদি কোন সমালোচক হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহার অকিঞ্চনতা ঘোষণা করেন—সার্ব্বলৌকিক মতের বিরুদ্ধে স্বমতের জয়-ঘোষণা করেন—তবে অবশ্য লোকের মনে এই এক সন্দেহ জন্মিতে পারে যে, সমালোচক কালিদাসের কবিত্বের মর্ম্ম গ্রহণ করিতেই অশক্ত। ভারতীতে ঐ গ্রন্থের যে সমালোচনা চলিতেছে, তাহাতে তাহার লেখকের সম্বন্ধে আমাদের ঐরূপ ধ্রুব বিশ্বাস। আজ্‌কের কালের যেরূপ বিচিত্র

শিক্ষাপ্রণালী—কালিদাসের সমালোচনাটি ঠিক তাহারই উপযোগী হইয়াছে;—হৃদয়ের বস্তুকে হৃদয় দিয়া বিচার কর, তা নয়—তেমন সুকুমার সামগ্রীর উপর অলঙ্কারশাস্ত্রের কঠোর দণ্ডবিধি প্রয়োগ! তাহাও আবার যথাযথ রূপে নয়—আপনার স্বকপোল-কল্পিত ভাষ্য-অনুসারে! অসম্পূর্ণ শিক্ষা একটি অতি ভয়ানক লোক—তিনি ছাত্রদিগের মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দিয়া উকিলের ন্যায় উভয়েরই যথা-সর্ব্বস্ব শোষণ করিয়া ছাড়িয়া দেন,—নিরীহ হৃদয় একেবারেই মুসড়িয়া যায়, মস্তিষ্ক সর্ব্বস্বান্ত হইলেও আপনার বড়ত্বের গর্ব্ব কিছুতেই ভুলিতে পারে না;—অদ্ভুত বলো, কিম্ভূত বলো, সৃষ্টিছাড়া বলো, এমন কোন বিস্ময়-জনক সামগ্রী জগতে নাই যাহা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের ন্যায় ঐ প্রকার শুষ্ক মস্তিষ্ক হইতে অজস্রধারে বাহির হইতে না পারে। সমালোচক স্বচ্ছন্দে বলিতেছেন যে, কালিদাস মানব-প্রকৃতি কিছুই বুঝিতেন না!—কিন্তু, বাহ্য জগতের তিনি একজন অদ্বিতীয় মর্ম্ম-গ্রাহী ছিলেন! একটি গল্প আছে যে, জন-কতক জন্মান্ধ ব্যক্তি হস্তী কিরূপ তাহা জানিবার জন্য কেহ বা হস্তীর লাঙ্গূল কেহ বা পদ, যে যাহা সম্মুখে পাইল সে তাহা স্পর্শ দ্বারা নিরূপণ করিয়া একো একো ব্যক্তি একো একো সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। লাঙ্গূলধারী বলিল হস্তী একগাছি দড়ির মত, পদস্পর্শী বলিল হস্তী একটা স্তম্ভের মত, ইত্যাদি! আমরা নিম্নে প্রমাণ করিব যে বাহ্য-জগৎ পর্য্যন্তই সমালোচকের দৃষ্টির সীমা; কাজেই কালিদাসের কবিতাতে মানব-প্রকৃতিগত-সৌন্দর্য্য যতই থাকুক না কেন তাহা তাঁহার অধিকার-বহির্ভূত; হস্তীর লাঙ্গূলধারী অন্ধ ব্যক্তি যদি সেই লাঙ্গূলকেই হস্তীর সর্ব্বস্ব মনে করিতে পারিল, তবে একদিক্-দর্শী সমালোচক কালিদাসের একাংশকেই কালিদাসের সর্ব্বস্ব মনে করিবেন ইহাতে আর বিচিত্র কি! আমরা যে কথা গুলি বলিলাম তাহা সত্য কি মিথ্যা ক্রমে প্রকাশ পাইবে।

প্রথমেই সমালোচক ভাষা এবং ভাব দুয়ের মধ্যে একটা ঘরাও বিবাদ বাধাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন, ইহাতে ভারতীদেবীর উপাসকেরা ভীত হইবেন না, এ বিষয়ে তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকুন যে, সেরূপ বিবাদ আকাশ-কুসুমের ন্যায় অসম্ভব। সমালোচক বলিতেছেন "এখানে আমাদের পাঠকমহাশয়ের নিকট একটি অনুরোধ আছে——তিনি যেন ভাষার প্রতি মমতা-শূন্য হইয়া আমাদের মতের বিচার করেন। সংস্কৃত ভাষার স্বভাবতঃ এমন একটি মোহিনী-শক্তি আছে যে, ভাবের চমৎকারিত্ব না থাকিলেও পাঠকের মনে শব্দ-মাধুরি দ্বারা কুহক লাগাইয়া দেয়——তখন তাঁহার ভাবের প্রতি লক্ষ্য থাকে না—ভাষাতে মুগ্ধ হইয়া মনে করেন ভাবও চমৎকার।" এ কথাটির প্রতিবাদ-কার্য্যে বেশি কাল-ক্ষেপ করিতে আমাদের ইচ্ছা নাই, তথাপি এবিষয়ের একটা মী-

মাংসা করিয়া রাখা ভাল বোধ করিতেছি; ভাব-শূন্য শব্দ-মাধুর্য্যে ভাষা-মাধুর্য্য হয় না, তাহা যদি হইত তবে অর্থ-শূন্য ভাব-শূন্য সেতারের বোল অতি সুন্দর ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইত, ও জয়দেবের ভাষা কালিদাসের ভাষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? নিম্নলিখিত দুইটি কবিতার কোন্‌টির ভাষা (সুমধুর শব্দ-বিন্যাস নহে কিন্তু ভাষা) ভাল?

"ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলনকোমল-
মলয়-সমীরে।
মধুকরনিকরকরম্বিত-কোকিল-
কূজিত-কুঞ্জকুটীরে॥"

জয়দেব।

"সা নিন্দন্তী স্বানি ভাগ্যানি বালা
বাহুৎক্ষেপং ক্রন্দিতুং চ প্রবৃত্তা।
স্ত্রীসংস্থানং চাপ্সরস্তীর্থমারাৎ
উৎক্ষিপ্যৈনাং জ্যোতিরেকং তিরোঽভূৎ॥"

কালিদাস।

"স্ত্রীসংস্থানং জ্যোতিঃ"—কি সুন্দর ভাষা—কি সুন্দর ভাব! জ্যোতির্ম্ময়ী স্ত্রী বলিলে কত যে ভাব-হানি হইত তাহা বলা যায় না; তাহা হইলে অলৌকিক একজন নারী বিদ্যুতের মত আসিয়া শকুন্তলাকে উঠাইয়া লইয়া গেল, ইহা অমনধারা ঠিকঠাক প্রকাশ পাইত না। শব্দ মনে কর, যেন মৃত্তিকা, ভাষা মনে কর যেন মৃণ্মূর্ত্তি,—মৃত্তিকা এবং শব্দ উভয়কেই ভাবের সহায়তা ব্যতীত আয়োজন করা যাইতে পারে, কিন্তু ভাবের সহায়তা ব্যতীত ভাষাও সুন্দর হইতে পারে না মৃণ্মূর্ত্তিও সুন্দর হইতে পারে না; মূর্ত্তি-নির্ম্মাতার ভাব ভাল হইলে তবেই তাঁহার নির্ম্মিত মূর্ত্তি ভাল হইতে পারে, নচেৎ তাহা কখনই ভাল হইতে পারে না—কিন্তু যদি মৃত্তিকাও ভাল হয় অর্থাৎ মসৃণ এবং পেশল হয় তবে সোনার উপর সোহাগা হয়; তেমনি লেখকের ভাব ভাল হইলে তবেই তাহার ভাষা ভাল হইতে পারে নচেৎ তাহা কখনই ভাল হইতে পারে না—কিন্তু তাহার উপর শব্দ-গুলিও যদি সুশ্রাব্য হয়, তবে ত তাহার কথাই নাই। মৃত্তিকা, ভাব এবং নির্ম্মাণ-শক্তি এই তিনের উৎকর্ষের উপর মৃণ্মূর্ত্তির উৎকর্ষ নির্ভর করে, তেমনি—শব্দ, ভাব এবং ভাবপ্রকাশের শক্তি এই তিনের উৎকর্ষের উপর ভাষার উৎকর্ষ নির্ভর করে; বরং মৃত্তিকার উৎকর্ষ না হইলেও চলে কিন্তু ভাব এবং নির্ম্মাণ-শক্তির উৎকর্ষ না হইলে মৃণ্মূর্ত্তির উৎকর্ষ কোন মতেই সম্ভবে না; তেমনি বরং শব্দের উৎকর্ষ না হইলেও চলে, কিন্তু ভাব এবং রচনাশক্তির উৎকর্ষ ভিন্ন ভাষার উৎকর্ষ কোন মতেই সম্ভবে না; অতএব সমালোচকের এটি মস্ত ভুল যে, ভাবের চমৎকারিত্ব না থাকিলেও ভাষার চমৎকারিত্ব হইতে পারে। কিন্তু মূর্ত্তি নির্ম্মাণ এবং ভাষা-রচনা দুয়ের মধ্যে এই একটু প্রভেদ দেখা যায় যে, ভাল মৃত্তিকা বাহির হইতে সংগ্রহ করিতে হয়, কিন্তু ভাল শব্দ স্মরণের পুঁজি হইতে আহরণ করিতে হয়—কল্পনার তেমন তেজ থাকিলে

ভাল ভাল, শব্দ কল্পনার তোড়ে আপনা আপনি বাহির হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্ত-চ্ছলে আমরা সামান্য একটি কবিতা-পংক্তি নিম্নে প্রদর্শন করিলাম,

টল টল করে জল মন্দ মন্দ বায়।

বঙ্গভাষায় টল টল শব্দ যদি না থাকিত তাহা হইলে, ঐ পংক্তিটির ভাব অন্য কোন প্রকারে প্রকাশ করা যাইতে না পারিত এমন নয়—কিন্তু ওরূপ ভাল করিয়া কিম্বা উহা অপেক্ষা ভাল করিয়া উক্ত ভাবটি প্রকাশ করা লেখকের ক্ষমতা-সাপেক্ষ; লেখকের মনে ভাব না থাকিলে ওরূপ ভাব-প্রকাশোপযোগী শব্দগুলি কখনই স্ব স্ব স্থানে বসিতে পারিত না। ঐস্থানে যদি আর একজন লেখক এইরূপ পংক্তি রচনা করেন—

বিচলিত জলদল সুললিত বায়।

তাহা হইলে শব্দলালিত্য উভয়েরই ত সমান দেখা যাইতেছে, তবে কেন আমরা বলি যে, পূর্ব্বোক্তের ভাষা শেষোক্তের ভাষা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট? পূর্ব্বোক্তে জলের এবং বায়ুর ভাব উৎকৃষ্ট রূপে প্রকাশ করা হইয়াছে বলিয়া কি নহে? তাহা যদি হয় তবে দাঁড়াইতেছে—ভাষাতে মুগ্ধ হওয়া এবং ভাষার ভাবে মুগ্ধ হওয়া একই কথা। বড় বড় কবিদিগের লেখনী হইতে ভাবের তোড়ে অনুপ্রাস-যুক্ত ভাল ভাল শব্দ-বিন্যাস আপনা আপনি বিনির্গত হইয়া পড়ে, যথা—

"How sweet the moonbeam sleeps
upon this bank"
সেক্‌স্‌পিয়র।

"In maiden-meditation fancy-free"
ঐ

sweet-শব্দ এবং sleep-শব্দ অনুপ্রাস-যুক্ত, তেমনি maiden-শব্দ এবং meditation-শব্দ. fancy-শব্দ এবং free-শব্দ। এরূপ শব্দালঙ্কার যেখানে দেখা যায় তাহা যে শুদ্ধ কেবল শব্দালঙ্কার মাত্র—তাহার মধ্যে ভাবের থাকিবার স্থান নাই, এই অলীক অতিবাদটি বিশ্বাস করিতে হইলে জয়দেবকে শুধু কেবল শব্দালঙ্কার পদবী দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে। জয়দেব অবশ্য আদিরস ভিন্ন আর কোন রসকেই গীতগোবিন্দের মধ্যে স্থান দান করেন নাই—সুতরাং তাঁহার কবিতাতে বীররসের ভাব নাই, করুণরসের ভাব নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া জয়দেবের কবিতা ভাবশূন্য ললিত শব্দাবলী ভিন্ন আর কিছুই নহে, এরূপ কথা গীতগোবিন্দ-পঠন-ক্ষম শুকপক্ষীর মুখেই শোভা পায়; তবে ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, জয়দেব কালিদাসের মতও কবি নন, ভবভূতির মতও কবি নন, তাঁহাদের অপেক্ষা তিনি অনেক নিম্নশ্রেণীর কবি। সমালোচক সাধারণতঃ সংস্কৃত ভাষার শ্রুতিমাধুর্য্য এবং ভাবশূন্যতা প্রমাণ করিবার জন্য প্রথমেই নৈষধের (!) একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন; নৈষধের ভাবশূন্য শব্দাড়ম্বর একটি দেশ-বিখ্যাত

বিষয়; যদি সাধারণতঃ সকল কাব্য নৈষধের মত হইত তবে নৈষধ ঐ দোষটির জন্য বিশেষরূপে খ্যাতি লাভ করিতেন না; নৈষধকে দিয়া সাধারণ কবিদিগের (এমন কি কালিদাস—যাঁহার কবিতার শব্দাড়ম্বর-শূন্য প্রসাদ-মাধুর্য্য যে দেখে সেই মোহিত হয়—তাঁহার পর্য্যন্ত) অনুপ্রাস-বাহুল্য এবং শব্দাড়ম্বর প্রমাণ করিবার এই যে চেষ্টা ইহাতে লেখকের অভিসন্ধিতে দোষ পৌঁছিতেছে; তিনি যে ব্রতটি পালন করিতে মনস্থ করিয়াছেন—"Nothing extenuate nor set down aught in malice"—এখানে তাহা রক্ষা পাওয়া ভার। মনে কর একজন ইংরাজকে আমি এই বার্ত্তাটি জানাইলাম যে, সাধারণতঃ বাঙ্গালিরা মধ্যাহ্নে রুটি খায়, এবং তাহার দৃষ্টান্ত-চ্ছলে আমি এরূপ একজন বাঙ্গালির নাম উল্লেখ করিলাম যাহাকে সকলেই জানে যে, সে মধ্যাহ্নে রুটি খায়, তবে সেই অনভিজ্ঞ ইংরাজটির প্রতি কিরূপ আচরণ করা হয়? মনে কর ইংরাজি-ভাষানভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে সাধারণতঃ ইংরাজি কাব্য কিরূপ? আমি Hudibras খুলিয়া তাহার গোটাকত পংক্তি অনুবাদ করিয়া তাহাকে শুনাইলাম, ইহাই বা কিরূপ আচরণ। এই জন্য বলি—সাধারণতঃ সংস্কৃত কাব্যের বিচারস্থলে নৈষধকে আনা ভাল কাজ নহে—তাহাতে সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠক-গণের প্রতি অন্যায়াচরণ করা হয়; ও স্থলে জয়দেবকে আনাও ভাল কাজ নহে; কেননা জয়দেবের দোষই থাকুক আর গুণই থাকুক তাহা জয়দেবেরই; সাধারণতঃ সংস্কৃত-কাব্য—না সে দোষের ভাগী না সে গুণের ভাগী, তবে কেন সাধারণতঃ সংস্কৃত কাব্যের বিচারস্থলে জয়দেবকে বলপূর্ব্বক আনিয়া দাঁড় করানো? আবার মাঘ হইতে যে কবিতাটি লেখক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা শব্দালঙ্কারের একটি সুন্দর আদর্শ বলিয়া গণ্য হইতে পারে; মাঘের কবি জানিয়া শুনিয়া তাঁহার গ্রন্থের বিশেষ কোন কোন স্থলে শব্দালঙ্কার ফলাইয়াছেন, অতএব প্রমাণ হইল যে, সংস্কৃত কাব্যের অধিকাংশ কেবল এক শব্দালঙ্কারেরই ব্যাপার! এরূপ যুক্তির সম্মোহন বাণ যাঁহাদের সহায় তাঁহাদের পক্ষে কালিদাসকে কেন—স্বয়ং বৃহস্পতিকে তৃণজ্ঞান করা অতি সহজ ব্যাপার। সমালোচক প্রমাণ করিতে গিয়াছেন যে, সংস্কৃত কাব্যের অনেক স্থলে ভাষা ভাল কিন্তু ভাব ভাল নয়, এবং কেমন যে ভাষা ভাল তাহা দেখাইবার জন্য এরূপ কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহাতে ভাল ভাষার অসামান্য কোন চিহ্নই লক্ষিত হয় না, শুদ্ধ কেবল শব্দাড়ম্বরেরই বাহুল্য দৃষ্ট হয়; আশ্চর্য্য এই যে কালিদাসের গ্রন্থাবলীতে ভাল-ভাষার কবিতা এত রহিয়াছে যে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য কিছুমাত্র আয়াস পাইতে হয় না, কিন্তু সমালোচক তাঁহার রচিত একটি কবিতা-ও উদ্ধৃত করেন নাই—অথচ কালিদাসের

কবিতাই তাঁহার প্রকৃত সমালোচ্য বিষয়! ভাল ভাষা যে কাহাকে বলে তাহার দুটি নমুনা আমরা কালিদাসের মেঘদূত হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

গচ্ছন্তীনাং রমণ-বসতিং
যোষিতাং তত্র নক্তম্
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে
সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ।
সৌদামিন্যা কনক-নিকষ-
স্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্ব্বীং
তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো
মাস্মভূর্বিক্লবাস্তাঃ॥

সূচিভেদ্য অন্ধকারে* রুদ্ধ পথ ঘাট।
নিশীথে অভিসারিণী গণিবে বিভ্রাট॥
কষ্টি-শিলে যেইরূপ স্নিগ্ধ হেম-রেখা।
তেমনি বিদ্যুৎ দিবে পথ যাবে দেখা॥
ধারা-বরিষণ আর গরজন-স্বরে
মুখর হয়োনা যেন—একে ভয়ে মরে॥

মেঘদূত।

এখানে অভিসারিকার ব্যথার ব্যথিত্ব—যক্ষের চরিত্রের সহিত কেমন লাগিয়া গিয়াছে! যে পাঠক মানব-চরিত্র-বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তিনি বলিতে পারেন উহা সুরুচি-সঙ্গত হয় নাই; কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, কণ্বমুনির পক্ষে উহা সুরুচি-সঙ্গত না হউক্ একজন যক্ষের মুখে উহা অতি সুন্দর মানাইয়াছে। মিল্‌টনের palpable darkness অপেক্ষা "সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ" আরো ভাল বসিয়াছে, "সৌদামিন্যা কনকনিকষস্নিগ্ধয়া" কি চমৎকার কবিভাষা! ভাব যদি ভাল না হইত, তবে ভাষা কি এরূপ ভাল হইতে পারিত? তেমনি আবার

জাতং বংশে ভুবনবিদিতে
পুষ্করাবর্ত্তকানাং
জানামি ত্বাং প্রকৃতি-পুরুষং
কামরূপং মঘোনঃ।
তেনার্থিত্বস্ত্বয়ি বিধিবশাৎ
দূরবন্ধুর্গতোঽহং
যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে
নাধমে লব্ধকামা॥

ঐ

এখানে যক্ষ পাগলের মত হইয়াছে তথাপি স্বকার্য্য কেমন করিয়া উদ্ধার করিতে হয় সে বিষয়ে তাহার বিলক্ষণ জ্ঞান আছে—আর একজন যে-সে কবি হইলে যক্ষকে বিচারশক্তি-বর্জ্জিতের মত করিয়া অভিনয় করাইত; সে মনে করিত যে পূর্ব্বে যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছি—

"অচেতন-ভূতে সে চেতন করি মানে।
স্মরের প্রভাব এত বিরহীর প্রাণে॥"

এখন কেমন করিয়া তাহাকে দিয়া বলাই—

হে মেঘ-কুলের গর্ব্ব খ্যাত সর্ব্বভূমি।
ডানিহাত—জানি আমি—বাসবের তুমি॥

* সূচিভেদ্য অন্ধকার, অর্থাৎ ছুঁচ-দিয়ে বুঝি বা বেঁধা যায় এমনি ঘন অন্ধকার।

বিধির বিপাক হেতু পড়েছি সংকটে।
আনুকূল্য মাগি তাই তোমার নিকটে ॥
মহতে যাচঞা যদি নিরর্থক হয়।
সেও ভাল তথাপি অধমে কভু নয় ॥

ইহাতে যক্ষের সচেতন ভাব বেস্ প্রকাশ পাইতেছে! কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে, যে কারণে যক্ষ অচেতন মেঘকে সচেতন জ্ঞান করিল, সেই কারণেই সচেতন ব্যক্তির নিকট হইতে যেরূপ করিয়া কাজ আদায় করিতে হয় তদুপযোগী বাক্য ব্যবহার করিল। প্রেয়সীর নিকট সংবাদ পাঠাইবার জন্ত যক্ষ এমনি খেপিয়া উঠিয়াছে যে, অচেতন মেঘকে সচেতন করিতেও তাহার কিছুমাত্র বাধে নাই; এবং তাহাকে যত কেন স্তব-স্তুতি করিতে হয়—সব স্বীকার, কিন্তু তাহাকে-দিয়া প্রেয়সীর নিকট সংবাদ পাঠাইতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করা হইবে না। মানব-প্রকৃতি-অনভিজ্ঞ নিকৃষ্ট কবি হদ্দমুদ্দ একটা পাগলের বর্ণনা করিতে পারে, কিন্তু রকম বকম পাগলের রকম রকম পাগলামি বর্ণনা করিতে পারে না; যক্ষ এবং পুরূরবা উভয়ে তেমন কোন নিকৃষ্ট কবির হাতে পড়িলে উভয়েরই পাগ্লামি একই রকম হইয়া দাঁড়াইত। সে যা' হো'ক্—"যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা"—কি সুন্দর ভাষা! সুন্দর ভাবের সহায়তা ব্যতীত কি ওরূপ সুন্দর ভাষা বাহির হইতে পারিত? শুদ্ধ কেবল শব্দ-বিন্যাসের পারিপাট্যে একটা অর্থশূন্ত ভাবশূন্য বাহ্য-শোভন ভাষা খাড়া হইতে পারে, কিন্তু সে প্রকার নির্জীব ভাষা নির্ম্মাণ করা কাহাদের কার্য্য? তাহা—না পারস্যদেশীয় হাফেজের কার্য্য, না ইংলণ্ডদেশীয় সেক্স্পিয়রের কার্য্য, না ভারতবর্ষীয় কালিদাসের কার্য্য; তাহা যাঁহাদের কার্য্য, তাঁহাদিগকে সকল দেশেই অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়, তাঁহাদের ইংরাজি নাম (Poetaster অর্থাৎ) উপর চাখা কবি; তাঁহারা প্রকৃত কবিদিগের ভাবগর্ভ সুন্দর শব্দ বিন্যাসের মধ্য হইতে শব্দ-বিন্যাসের সৌন্দর্য্য-টুকুই সাত করিবার চেষ্টা পান—ভাব-সৌন্দর্য্যটি তাঁহাদের আয়ত্তের মধ্যে আইসে না। বোধ হয় সমালোচক শব্দ বিন্যাসের পারিপাট্যকে ভাষার উৎকর্ষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, জীবন-শূন্য ভাষাকে উৎকৃষ্ট ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা যদি হয় তবে সেরূপ ভাষার উৎকর্ষ না কালিদাসের সম্ভবে, না ব্যাসের সম্ভবে, না বাল্মীকির সম্ভবে—তবে যদি ক্রীড়াচ্ছলে কখন কখন সেরূপ ভাষা তাঁহাদের লেখনী হইতেও বাহির হইয়া থাকে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। প্রকৃত কথা এই যে, কালিদাস-প্রভৃতি মহাকবিদিগের ভাষার প্রকৃতিই স্বতন্ত্র, তাঁহাদের মনঃসম্ভূত ভাব-সকল এরূপ জীবন্ত যে, উদয়-মাত্রেই তাহারা সুন্দর ভাষা পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন হইয়া বাহির হয়—ভাষার জন্য তাহাদিগকে বসিয়া থাকিতে হয় না; সকলেই অবগত আছেন যে, সেক্স্পিয়রের নাটকের পাণ্ডুলেখায় কখন কোন কাটাকুটি দেখা যায় নাই।

কবিতার হীনাবস্থায় সকল দেশেই ভাবের অনটন হয়—তখনকার সময়ের কবি-যশঃ প্রার্থীরা ভাবের অভাব বশতঃ প্রাচীন কবিদিগের অনুকরণে ধাবিত হন, কিন্তু ভাব অনুকরণের আয়ত্তাধীন নহে—সুতরাং পরিচ্ছদেরই আড়ম্বরে তাঁহাদের সমস্ত কবিত্ব ক্ষেপিত হয়।*

এই ত গেল সংস্কৃত ভাষার বিচার; ইহার পর আসিতেছে "অভিজ্ঞানশকুন্তল যে, অলৌকিক পদার্থ এবং মনুষ্যের ক্ষমতায় যে, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভবিতে পারে না এরূপ আমরা স্বীকার করি না;"—এরূপ আমরাও স্বীকার করি না, কারণ আমরা ভবিষ্যদ্‌বক্তা নহি, ভবিষ্যতে কালিদাসের সমান বা তাঁহা-অপেক্ষা উচ্চতর কবি জন্মিবে কি না তাহা দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত নিঃশঙ্কে বলিতে পারি যে, সেক্‌স্‌পিয়র ভিন্ন কালিদাসের সমকক্ষ কবি অদ্যাপি পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে নাই; ইহা যদি নিশ্চয় জানিতাম যে, অনন্ত ভবিষ্যৎকালের কোন কালে মর্ত্ত্য জীবের পক্ষে উহাঁদের মত কবি হওয়া একেবারেই অসম্ভব, তবে তাঁহাদিগকে অলৌকিক বলিতে সাহসী হইতাম,—আমাদের জ্ঞানের যতটুকু দৌড় তাহাতে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, উভয়ই অভূত-পূর্ব্ব অদ্বিতীয় কবি। কিন্তু সমালোচক বলেন যে, "দুর্ব্বাসার শাপ, অঙ্গুরীয় দর্শন, মারীচাশ্রমে রাজার সহিত ত নহেনই, কিন্তু কালিদাসকে তিনি যে পরাস্ত করিয়াছেন ইহাতে আর লেশমাত্রও সংশয় নাই,—কে এমন সাহসী পুরুষ যিনি এরূপ কথা অকুতোভয়ে বলেন? আর কে—মাইকেল মধুসূদন স্বয়ং! এ বোধ নাই যে, বিবেচনা করিয়া দেখিলে কালিদাস বড় কি মিল্‌টন বড় তাহাই সন্দেহ স্থল।

* মিল্‌টন্ ডান্টে প্রভৃতির নানা রঙের ত্যক্ত-পরিচ্ছদ-পরিধানা মাইকেল মধুসূদনের শব্দাড়ম্বরপূর্ণ জোড়া-তাড়া-লাগানো ভাষা অপেক্ষা কবি-কঙ্কণের টাট্‌কা টাট্‌কা হৃদয়-প্রসূত খাঁটি বাঙ্‌লা-ভাষা যে কত উৎকৃষ্ট তাহা তুলনা করিয়া দেখিলেই জানা যাইতে পারে। মাইকেল মধুসূদন—অনুকরণের মধ্যে কবিকঙ্কণের "দেউটি" (প্রদীপ) "দেউল" (দেবালয়) প্রভৃতি কতকগুলি শ্রুতি-কোমল শব্দ অনুকরণ করিয়াছেন—এ ভিন্ন কবিকঙ্কণের গ্রন্থের অকৃত্রিম দেবভক্তি—দেবীর অকৃত্রিম ভক্তবৎসলতা—অকৃত্রিম স্নেহ—অকৃত্রিম প্রেম, অকৃত্রিম পিতৃভক্তি ইত্যাদির কোন একটিরও অনুকরণে সমর্থ হন নাই। তিনি "হায়" "কি আর বলিব" "হায়রে যেমতি" "মরি" "দানিনু" (দিনু) "কূজনিল" (কূজিল) প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ-যোজনা এবং পয়ার-ছন্দের মানান্-সই এক প্রকার স্বৈর গতি সম্পাদন দ্বারা ভাবের অপ্রতুলতা চাপা দিতে সমূহ চেষ্টা পাইয়াছেন—এমন কি অনভিজ্ঞ জনেরা তাঁহাকে জানেন যে তিনি পৃথিবীর মহাকবিদিগের মধ্যে এক জন; আবার এমনও ব্যক্তি আছে যিনি এ কথাও মুখে আনিতে কিছুমাত্র লজ্জিত হন নাই যে, মাইকেল মধুসূদন মিলটনের মত অতদূর উচ্চ কবি

শকুন্তলার মিলন প্রভৃতি মহাভারতে নাই, কালিদাস এ সকল ঘটনা মূল উপাখ্যানে সংযোজন করিয়াছেন, এরূপ করাতে নাটক অতি মনোহর হইয়াছে বটে, কিন্তু (!) * * * * যদি কালিদাস ইহা অপেক্ষা আখ্যায়িকা আরো চমৎকারিণী করিতে না পারিলেন তাহা হইলে তিনি উচ্চ শ্রেণীর নাটককারদিগের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন না।" এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, মূল উপাখ্যান এরূপ সংক্ষিপ্ত পদার্থ যে, তাহা আর কোন কবির হস্তে পড়িলে তিন-অঙ্কের নাটক বাহির হওয়াও দুর্ঘট হইত, ভাগ্যে তাহা কালিদাসের হস্তে পড়িয়াছে, তাই সাত অঙ্কে পরিণত হইতে পারিয়াছে; বড় বড় নাট্য-লেখক প্রায়ই নাটকের আখ্যায়িকাংশটি বাহির হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকেন, এবং তাহাকে আবশ্যকমতে রূপান্তরিত করিয়া ও তাহার ভিতরে আপনাদের কবিতা-রস-মাধুর্য্য নিঃশ্বসিত করিয়া তাহাতে নূতন এক প্রাণ সঞ্চার করেন। সেক্স্‌পিয়রের আখ্যায়িকাংশ সেক্স্‌পিয়রের নিজের নহে, কালিদাসের আখ্যায়িকাংশ কালিদাসের নিজের নহে,—কি তবে তাঁহাদের নিজের? না সেই আখ্যায়িকাতে নূতন জীবন সঞ্চার করা। উপন্যাসেরই আখ্যায়িকাংশ সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ, কিন্তু নাটকের প্রধান অঙ্গ মনুষ্য-প্রকৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাব-মাধুর্য্য বা ভাব-মাহাত্ম্য অবিতথ-রূপে প্রদর্শন করা। এজন্য কালিদাস এবং সেক্স্‌পিয়র উভয়ই মূল-উপাখ্যানকে গড়িয়া পিটিয়া মানব-প্রকৃতির বিশেষ কোন কোন ভাব-সৌন্দর্য্য প্রকাশের উপযোগী করিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের রচিত নাটক-সকল স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিতেছে যে, আখ্যায়িকার বিশেষ এমন কোন গুণ নাই যাহা নাটকে কবিতা সৌন্দর্য্য দিয়া দিতে পারে। ওথেলোর আখ্যায়িকাংশটি অতি যৎসামান্য, —ডেস্‌ডেমোনার সহিত ওথেলোর বিবাহ, উভয়ের বিদেশ যাত্রা, আইয়াগোর পাকচক্র, ওথেলোর ঈর্ষা, স্ত্রীহত্যা এবং আত্মহত্যা,—বস্; শকুন্তলার আখ্যায়িকাংশও ঐরূপ; উভয়ের কোনটিই সর্ ওয়ালটর্ স্কটের আইবান্‌হো উপন্যাসের ন্যায় নানাবিধ শাখা-উপশাখায় পরিকীর্ণ নহে—তাই বলিয়া কি কবিত্ব-অংশে সেক্স্‌পিয়র বা কালিদাসকে স্কট্ অপেক্ষা অপকৃষ্ট বলিতে হইবে? কালিদাস কিংবা সেক্স্‌পিয়রের আখ্যায়িকা সর্ ওয়াল্টর স্কটের মত চমৎকারিণী নহে বলিয়া তাঁহাদের কবিতা-মাধুর্য্যের—কি-তাহাতে ব্যতিক্রম হইতেছে? অতএব কালিদাসের আখ্যায়িকা আপনা অপেক্ষা আরো চমৎকারিণী হইয়া কাজ নাই—যেমনটি আছে তাহাই থাকুক—ঐ সামান্য একটি আখ্যায়িকার মধ্যে যে এত অপর্য্যাপ্ত সৌন্দর্য্য ধরিয়াছে, ইহা অসাধারণ কবিতা-শক্তির ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার ভিন্ন আর কিছু নহে। কালিদাসের শকুন্তলার আখ্যায়িকার গুণপনা দেখিয়া নহে—কবিতা মাধুর্য্য দেখিয়াই জর্ম্মানদেশীয় মহাকবি গেটে বলিয়াছেন,

Would'st thou the young year's [blossoms
and the fruits of its decline
And all by which the soul is charmed
enraptured feasted fed,
Would'st thou the earth and heaven [itself
in one sole name combine,
I name thee O Sakuntala
and all at once is said.

তরুণ-বয়সের নব কুসুম-কলি,
প্রবীন-বয়সের শাঁসালো ফল,—
যা কিছু হরে মন, করে আপনা-হারা,
পিয়ে যা' জিয়ে প্রাণ—সুধা বিমল,—
এতেক সবাকারে, চাহ কি একাধারে,
স্বরগ-বসুমতী একই ঠাঁই,—
তবে শকুন্তলা, নাম করিনু তোর
আর না কিছু আমি বলিতে চাই।

যে সে লোক নয়—গেটে এইরূপ বলিয়াছেন,—যিনি জগতের মধ্যে প্রধান এক জন কবি এবং প্রধান এক জন সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানী বলিয়া প্রসিদ্ধ! কিন্তু এ কবিতাটি সমালোচকের মনঃপূত হয় নাই, তাই তিনি নিম্ন-লিখিত টিপ্পনীতে বলিয়াছেন "কালিদাসের প্রশংসার জন্য সকলেই গেটের প্রণীত কবিতা উদ্ধৃত করেন, কিন্তু সে স্তুতিবাদ কোন কাজের নহে, কারণ গেটে সর উইলিয়ম জোন্সের গ্রন্থের জর্ম্মান অনুবাদ পাঠ করেন ইহা দ্বারা মূলের সমস্ত সৌন্দর্য্য নিশ্চয় বিলুপ্ত হইয়াছিল। তবে যে, গেটে প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহার কারণ এই যে, ভারতবর্ষে যে এমন বস্তু আছে ইহা তিনি কখন আশা করেন নাই।" সমালোচক যখন কালিদাসকে বলিয়াছেন যে তিনি মানবপ্রকৃতির কিছুই জানেন না তখন বলিলেই হইত যে, গেটে কবিতার মর্ম্ম কিছুই বোঝেন না, তাই তিনি শকুন্তলার প্রশংসায় ওরূপ উন্মত্ত-ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন! নিশ্চয়ই তিনি জর্ম্মানদেশীয় গেটেকে ভারতবর্ষীয় কালিদাস অপেক্ষা সমীহ করেন, কেননা—কোথায় তিনি কালিদাসের স্তুতি-কারী গেটের বক্ষ লক্ষ করিয়া ছুরি চোখাইবেন, তা' নয়—তিনি (Falstaff) ফাল্‌ষ্টাফের রাজনির্ণায়ক (instinct) সংস্কারের অনুগামী হইয়া গেটেকে বড় কিছু বলেন নাই,* বরং তাঁহাকে বাঁচাইবারই চেষ্টা পাইয়াছেন। গেটের সরল এবং উৎসাহপূর্ণ ভাষা দেখিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে গেটে, সত্য সত্যই শকুন্তলার কবিত্ব-রসপানে মত্ত

* *Falstaff.* * * * * should I turn upon the true prince? Why, thou knowest I am as valiant as Hercules: but beware instinct; the lion will not touch the true prince. Instinct is a great matter; I was a coward on instinct. &. Shakespeare.

হইয়া ঐ চারিপংক্তি কবিতা-কুসুমাঞ্জলি কালিদাস-ভারতীর চরণে অর্পণ করিয়াছেন, কিন্তু সমালোচক টিপ্পনী-বলে কালিদাসের প্রাপ্য সেই যজ্ঞ-ভাগটি লোপ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন! অনেকের বিশ্বাস এই যে অনুবাদ পাঠেই যখন গেটের হৃদয় ওরূপ ভাবে-উচ্ছ্বসিত হইয়া আপনাকে আপনি ধারণ করিতে অক্ষম হইয়াছিল, না জানি মূলগ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহার মন কিরূপ হইত! কিন্তু এখনকার নূতন মতানুসারে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, মূলগ্রন্থ পাঠ করিলে গেটে ভারতবর্ষকে নয় আর একটু বেশী আশ্চর্য্য মনে করিতেন—এই পর্য্যন্ত, কালিদাসের শকুন্তলা কেবল একটা উপলক্ষ মাত্র হইত! এ বড় হাসির কথা যে, সর্ উইলিয়ম জোন্স্ শকুন্তলার অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য আংশিক-রূপেও প্রকাশ করিতে পারেন নাই,—হয় তিনি শকুন্তলার সৌন্দর্য্য কিছুই বোঝেন নাই, নয় ইংরাজি ভাষায় তাঁহার এতটুকুও ব্যুৎপত্তি ছিল না যে, মূলের সৌন্দর্য্য আংশিক-রূপেও অনুবাদে প্রতিবিম্বিত করিতে পারেন! প্রথম পক্ষ যদি সত্য হয়, তবে অনুবাদ-কার্য্যে তাঁহার প্রবৃত্তিই হইতে পারে না, দ্বিতীয় পক্ষ যদি সত্য হয়, তবে অনুবাদ-কার্য্য তাঁহার সাধ্যায়ত্তই হইতে পারে না,—কে তিনি? না অদ্বিতীয় ভাষা-বিৎ পণ্ডিত সর্ উইলিয়ম জোন্স্! আবার গেটে ইংরাজি ভাষায় এমনি অনভিজ্ঞ ছিলেন যে, সর্ উইলিয়ম জোন্সের অনুবাদের জর্ম্মান অনুবাদ ভিন্ন শকুন্তলা-রসাস্বাদনের তাঁহার আর উপায়ান্তর ছিল না—গেটে-তিনি কে? না হ্যাম্লেটের একজন সুবিচক্ষণ প্রথম-শ্রেণীর সমালোচক! এরূপ যখন সব কাণ্ড-কারখানা, তখন অগত্যা বলিতে হইতেছে যে, শকুন্তলার অনুবাদ-পাঠে মনকে অতদূর মুগ্ধ হইতে দেওয়া গেটের মত অসামান্য কবির পক্ষে উচিত কার্য্য হয় নাই—তাহাতে তাঁহার কীর্ত্তি কলঙ্কিত হইবার আটক নাই—অত বড় কাব্য-রসজ্ঞ হইয়া তিনি কিনা বলেন শকুন্তলা সর্ব্বগুণে গুণবতী—ধিক্! তবে গেটেকে বাঁচাইবার কেবল একটি পথ আছে—এবং সেই পথের জন্য গেটের এবং তাঁহার ভক্তগণের উচিত আমাদের সমালোককে ধন্যবাদ দেওয়া—সে পথ এই যে, ঐ সরস কবিতাটি গেটের সর্ব্বান্তঃকরণ-হইতে উচ্ছ্বসিত হয় নাই—তাঁহার কেবল মনে হইয়াছিল যে, ভারতবর্ষীয় লোকদিগেরও কবিতা-লেখা আসে—অসভ্য ভারত-বাসীরাও মিউসের (বিলাতি সরস্বতীর) হার্প (বিলাতি বীণা) লইয়া টুং টাং করিতে পারে! এবং শুদ্ধ কেবল সেই বিস্ময়-ভাবটির উপর নির্ভর করিয়া সর্ব্বোচ্চ কবিকে যেরূপ প্রশংসাবাদ করিতে হয়, তিনি কালিদাসকে তাহার এক শেষ করিয়াছেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার কবিতা-উপহারে তিনি ভারতবর্ষের নামোল্লেখ করিতেও ভুলিয়া গিয়াছেন! গেটে নাকি খুব বড় কবি তাই তিনি উধো-র একটি বিস্ময়-জনক গুণ দেখিয়া বুধো-র

যৎপরোনাস্তি প্রশংসাবাদ করিতে পারিয়াছেন, এবং অল্প একরত্তি গুণ দেখিয়া তাঁর মনে সামান্য একটু ভাবোদয় হইলেও ওরূপ ভাবাতিশয্য প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন—তাঁহার মনে যদি আদবেই কোন ভাবোদয় না হইত, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি উহা অপেক্ষাও সরস কবিতা লিখিতে পারিতেন! কাজেই আমাদের স্বীকার করিতে হইতেছে যে, গেটের অত গভীর অভিষন্ধি অমন অনায়াসে তলাইয়া পাওয়া যে-সে ডুবুরির কাজ নহে!

ক্রমশঃ

সরস্বতী-আহ্বান।

(হিমাচলে)

সাধের নিকুঞ্জ বন, সোহাগের পদ্মাসন,
ত্যেজিয়ে কেন গো আজি হিমাদ্রি-শিখরে?
দুরন্ত উত্তর বায়, অলকা উড়িয়ে যায়,
চৌদিকে নীহার-রাশি, ঘিরে স্তরে স্তরে—
শিথিল আঁচল খানি, কেন আজ, বীণাপাণি,
বলাকা রেখার মত উড়িছে জলদে?
ঘোর উন্মাদিনী প্রায়, স্খলিত কবরী হায়,
অবাধে তুষারে পোড়ে আছে, গো সারদে?
বিমল জোছানা ত্যেজে, ঘোর কুহেলিকা মাঝে,
—হেমন্তে পূর্ণিমা-শশী-সম বিমলিন,—
কহ কোন্ অভিমানে, এ ঘোর বিকট স্থানে,
কোন্ প্রাণে আসি, দেবি, র'হেছ আসীন?
নাহি সূর্য্য, নাহি শশী, না ভাতে তারকা-রাশি,
নাহিক শ্যামল কুঞ্জ—উপবন হেথা—
না ফোটে একটি ফুল, না গাহে বিহঙ্গ-কুল,
না চলে তটিনী রাণী গাহি মৃদু গাথা!
না বহে মৃদুল বায়, ঈষৎ লোমাঞ্চ কায়,
ধ্বনিয়ে মরম-তারে ঈষৎ ঝঙ্কার—
না নাচে সরসী-বালা, তুলিয়ে তরঙ্গমালা,
না দোলে কমল-কলি উরসে তাহার!

চারিদিক ভীতিময়, তুষারে তুষারময়,
অনন্ত তুষার-ঢেউ দিগন্ত প্রসারি—
ঘন ঘোর তমোরাশি, উথলে চৌদিকে আসি,
ভীষণ তরঙ্গে, দেবি, ও পদ আবরি—
নির্ম্মম উত্তর বায়, অবাধে বহিয়ে যায়,
কড় কড় ভেঙ্গে পড়ে জমাট তুষার,
গড়ায়ে গড়ায়ে যায়, শব্দে ব্যোম ছিন্ন প্রায়,
শব্দে দিগঙ্গনাগণ স্তম্ভিত আকার!
সুদূরে দেবতাচয়, তটস্থ দাঁড়ায়ে রয়,
নিঃশব্দে সুদীর্ঘ শ্বাসে, করে আর্ত্তনাদ,
সুদূরে প্রকৃতি হায়, জড় পুত্তলিকা-প্রায়,
মরমের শিরে শিরে গণে পরমাদ!
ধূ ধূ করে চারি ধার, দিগন্ত নাহিক তার,
বিভীষিকা-সমাকীর্ণ—শূন্যাকার প্রায়,
উঠি শৃঙ্গ স্তরে স্তরে, উঠেছে জলদ পরে,
উঠেছে জলদ লঙ্ঘি—কে জানে কোথায়!
এ হেন বিকট স্থানে, কেন আজ, বরাননে!
রহিবে সকল ত্যেজি উদাসিনী প্রায়—
কিজানি কিভাবে ভোর, কি লেগেছে ঘুমঘোর
—উন্মাদিনী কেন আজ এ মুরতি হায়!
সেই সে মুকুতাহার, সুষমা কোথায় তার?
ছিঁড়িয়ে কেন গো আজ ভূমেতে লুটায়?

একটি একটি খুলে খুলে, গড়ায় শিখর-মূলে,
অথচ ভ্রূক্ষেপ মাত্র, নাহিক তাহায়!
মণির মুকুট তব, (নিতি নিতি অভিনব)
অদূরে কন্দরে ওই ভেঙ্গে চুরমার—
গলদশ্রু দেবতারা, পাঁতি পাঁতি খুঁজি তারা,
যতনে কুড়িয়ে রাখে রতন তাহার!—
—বুঝেছি বুঝেছি মনে, দেবতার ত্যজ্য স্থানে—
—দেবতার ত্যজ্য এই আর্য্য মরুস্থলে
দেখিবে না ও নয়নে, মাড়াবে না ও চরণে,
বাঁচো যেন—আর্য্যাবর্ত্ত সিন্ধুসাৎ হোলে—
কিন্তু গো থাকিতে প্রাণ, এ ভক্তির অপমান,
কখনো করিতে, দেবি, দিব না তোমায়,
অমরা, অলকা, পুরে, থাকুন্ কমলা ঘিরে,
ছড়ান রতন-রাশি,—কে তাঁহারে চায়!
তুমি কিন্তু ত্যেজ বেশ, বাঁধো গো স্খলিত কেশ,
সাধের বীণাটি তব, ধর গো উরসে—
পরিয়ে মুকুতাহার, ঝলসিয়ে চারি ধার,
নামিয়ে এস' গো দেবি, উন্মত্ত হরষে!
শত শত শত নরে, শত হৃদি এক ক'রে,
পেতে আছে তোমা তরে শতদলাসন!
শত কণ্ঠ সমস্বরে, ধ্বনিয়ে গগন ভোরে,
করিবে তোমারি দেবি মহিমা-কীর্ত্তন!

এস তবে সরস্বতী, উর তবে সাধ্বী সতী,
হৃদয়-রুধিরে আজ প্লাবিব চরণ—
শত শত নারী নর, দাঁড়ায়েছে স্তরে স্তর,
"উরঃ উরঃ সরস্বতী" করে আবাহন—
শোকের বেদনা ভুলে, সাধের বীণাটি তুলে,
ছিন্নতার বীণা সুরে মিলায়ে গভীরে—
বাজায়ে করিবে গান, সপ্তমে তুলিয়ে তান,
ঝাঁপিয়ে পড়িবে ঢেউ সাগরের তীরে,
মধুর সে ঘোর রব, ধ্বনিয়ে হিমাদ্রি সব,
জাগাইবে প্রতিধ্বনি কুমারিকা দেশে—
ব্রহ্মপুত্র তরঙ্গিয়ে, সিন্ধুনদ আলোড়িয়ে,
বিকম্পিত আর্য্যাবর্ত্তে ভাসাবে উল্লাসে—
দিগন্ত-দিগন্ত আহা, ভাসাবে উল্লাসে!

সংশোধনী।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	স্তম্ভ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৮৯	৪	২	ভুবি	বিধিঃ
৩৯১	নোট, শেষ লাইন		সীতা হরণ করে।	সীতাহরণ করে। (২০) নোট দেখ
৩৯২	(২৫) নোট		deliget	delight
৩৯২	(২৫) নোট insert after "delight" the following passage: "কালিদাসের কল্পনা" &c to "এবং অন্যান্য স্থানেও বিস্তর আছে।			
৩৯২	নোট ২৬, insert after "স্পষ্ট বোধ হয়।" the following sentence "যদি কালিদাসের কোন ইতিহাস থাকিত তাহা হইলে আমাদের অনুমান দৃঢ়ীকৃত হইত।" and after this insert "কারণ আমরা যখন Ovid বা Anacreon পাঠ করি" &c to "চরিত্রের পরিণাম মাত্র"।			
৩৯৩	১২	১	যে বায়রণ	যে বায়রণ যেমন

মালতী।

তৃতীয়—পরিচ্ছেদ।

সেই দিন হইতে শোভনা আর সহস্র কষ্টেও মুখ ফুটিত না, কখনো সন্দেহে কখনো অনুতাপে তাহার হৃদয় বিচলিত হইতে লাগিল। কিন্তু মনে মনেই সে তাহা সহ্য করিতে সঙ্কল্প করিল। মালতী এ সকল কিছুই জানিল না,তাহাকে লইয়া তাহাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীটির মধ্যে যে কি রূপ বিপ্লব চলিতেছে তাহা সে কিছুই জানিল না, সেই জন্য তাহার হাসিমাখা মুখখানির হাসি আর নিভিল না।—কখনো কখনো মাত্র কুটীরের অন্ধকার সেই জ্যোৎস্নাময়ী বালিকাকেও স্পর্শ করিত। শোভনা আর তাহার সহিত হাসিয়া হাসিয়া বাগানময় ঘুরিয়া বেড়ায় না, আর লুকাচুরি খেলিবার ছলে মালতীকে ফাঁকি দিয়া রমেশের নিকট পালাইয়া মালতীকে জব্দ করে না, মালতীর ফুলগুলি ছিড়িয়া আর মালতীকে কাঁদায় না—মালতীর সঙ্গে আড়ি করিয়া তাহাকে আর সাধায় না—রমেশের রাত্রের গল্প করিয়া আর তাহাকে হাসায় না—আজ কাল শোভনা বড় গম্ভীর, বড় বিষণ্ণ। শোভনা বলে তাহার আর ছেলেমানষি করিবার সময় নাই। চিরকাল কি ছেলেমানুষ থাকিবে? চিরকাল কি আর খেলিয়া বেড়াইবে? মালতী তাহার কথার অর্থ যেন বুঝিতে পারে না—মালতী অবাক হইয়া ভাবে সে আবার কি? চিরকাল আমরা খেলিব না? ছেলেমানুষ ছাড়া কি আর কাহাকেও খেলিতে নাই? তবে মালতীর বিবাহ হইলে তাহারও কি খেলা বন্ধ হইবে? মালতী যেন কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিত না, তাহার সহিত রঙ্গ করিতেছে ভাবিয়া সে হাসিয়া হাসিয়া শোভনাকেও হাসাইতে চেষ্টা করে—শোভনার সাধের ফুলগুলি তুলিয়া তাহাকে মারিতে থাকে, তাহাকেও শোভনার গম্ভীর বিষণ্ণ মুখটি প্রফুল্ল না হইলে তখন মালতীর চমক ভাঙ্গে, সেই অন্ধকার তখন তাহাকেও স্পর্শ করে। সত্যই তবে শোভনা বড় হইয়াছে, আর সে খেলিবে না, সে আর হাসিবে না, অমনি মালতীও বিষণ্ণ হইয়া পড়ে—তাহার কান্না পায়, লুকাইয়া কাঁদিতে সে সেখান হইতে নিঃশব্দে চলিয়া যায়। বনে বনে বেড়াইয়া আবার হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসে। আসিয়া যদি রমেশকে দেখিতে পায়,যদি রমেশকে প্রফুল্ল দেখিতে পায় তো বড়ই আমোদ, নহিলে বিষণ্ণ দেখিলে স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে থাকে। সে জানে স্ত্রীলোকেই বড় হইলে সংসারী হইয়া গম্ভীর হয়, বিষণ্ণ হয়; শোভনার কাছে সে তাহা শুনিয়াছে, শোভনাতে সে তাহা দেখিয়াছে, কিন্তু রমে-

শের আবার কেন ও ভাব আসিবে? সে দেখিয়া শুনিয়া বিষণ্ণ ভাবে না খাইয়া ঘুমাইতে যায়। রমেশকে প্রফুল্ল দেখিলে সে কতকি বকে, কত গল্প করে—কিন্তু বিষণ্ণ দেখিলে কথা কহিতে সাহস করে না। এক দিন রাত্রে শুইয়া শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে সঙ্কল্প করিল এবার বিষণ্ণ দেখিলে সে রমেশকে কারণ জিজ্ঞাসা করিবেই করিবে। ইহাতে তাহার অদৃষ্টে যাহা ঘটে ঘটুক। কিন্তু প্রত্যাশিত দিন আসিল, রমেশকে বিষণ্ণ দেখিল, কিন্তু কই? তাহার প্রতিজ্ঞা রহিল কোথায়? সে প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিল না—তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না—কতবার জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া থামিয়া গেল, শেষে না পারিয়া ভগ্ন হৃদয়ে কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নদী তীরে আসিয়া কাঁদিতে বসিল। কিছু পরে হঠাৎ রমেশ আসিয়া সে খানে দাঁড়াইলেন, মালতীকে একাকী বিজনে কাঁদিতে দেখিয়া যেন আশ্চর্য্য হইলেন, যেন ব্যথিত হইলেন, ধীরে ধীরে সাদরে তাহার স্কন্ধে হাত দিয়া বলিলেন "একি মালতি,—এখানে কাঁদছিস?" মালতী সে কণ্ঠস্বর চিনিল, মালতী মুখ ফিরাইয়া একবার চাহিয়া দেখিল, মালতী আর পারিল না, মালতীর অশ্রুধারা উথলিয়া উঠিল। কেন যে মালতী কাঁদিতেছে মালতী তাহা বুঝিতেই পারিল না, সুতরাং সে আর রমেশকে বুঝাইবে কি? রমেশ ধীরে ধীরে অশ্রুধারা মুছাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "মালতি, কাঁদিস কেন? শোভনা তোর সঙ্গে কি আড়ি করেছে মালতি?" রমেশ জানেন শোভনা আড়ি করিলেই মালতী কাঁদে। মালতী অনেক কষ্টে অশ্রু জল সামলাইয়া বলিল "না, শোভনা আর আড়ি করে না"—এমন বিষাদার্দ্র স্বরে মালতী ঐ কথাটি কহিল যে রমেশ চমকিয়া বলিলেন—

"তবে তোর কিসের দুঃখ, মালতি?" মালতী ধীরে ধীরে বলিল আড়ি করেনা বোলেই আমার কষ্ট।" রমেশ হাসিয়া বলিলেন "তাই তোর এত দুঃখ, তবে আমি আড়ি করিতে বলিব এখন; চল্ তবে তার কাছে নিয়ে যাই।"

মালতী উঠিল না, মালতী হাসিল না, মালতী বিষণ্ণ মনে বসিয়া রহিল, মালতী ভাবিতে লাগিল "কি করিয়া রমেশের বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করি।" রমেশ দেখিয়া শুনিয়া আবার বলিলেন, "শোভনা আড়ি করে না বলেই তোর এত দুঃখ?" মালতী এবার তাহার ইচ্ছা পুরাইতে সহসা সুযোগ পাইল, সে কত বার থামিয়া থামিয়া অতি ধীরে ধীরে অতি মৃদু স্বরে বলিল "আরো একটি কারণ আছে,—দাদা, তোমার কি হয়েছে, কেন আর সারাদিন তেমন কোরে গল্প কর না—আমি কি—কোন দোষ করেছি।"

মালতীর সরল প্রশ্নে, তাহার সেই সশঙ্কিত অর্দ্ধস্ফুট জড়িমা-জড়িত প্রশ্নে রমেশের চক্ষে জল আসিল, এক বিন্দু অশ্রু ধীরে ধীরে মালতীর হস্তে পড়িল, মালতীর হৃদয় স্তম্ভিত হইল, মুখ শুকাইয়া গেল,

মালতী নিশ্চয়ই কোন অপরাধ করিয়াছে, নহিলে তাহার কথায় রমেশের চক্ষু দিয়া জল পড়িল কেন? মালতীর সমস্ত সঙ্কোচ দূর হইল, আর কথা বাধিল না—ব্যগ্রতার ব্যাকুল ভাবে আবার মালতী বলিল—"দাদা, আমি কি দোষ করেছি বল?"

অশ্রু মুছিয়া যুবা বলিলেন "তুই কি দোষ করিবি মালতি?"

মালতি। "দাদা রাগ করিলে? না, রাগ করিও না—বল ভাই কি দোষ করেছি—" যুবা তাহার কাতরতায় ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "না মালতি, তুই তো কিছুই দোষ করিস নি।"

মা। "তবে কেন তুমি আর তেমন করে আমার সহিত কথা কওনা? কেন আজ আমার সহিত কথা কহিতে কহিতে কাঁদিলে?"

সুখেই যে মানুষে হাসে তাহা নহে, নিভিবার আগেও প্রদীপ জ্বলিয়া ওঠে—অন্ধকারেও বিদ্যুৎ চমকে। আজ যুবা বালিকার কথায় অতি দুঃখেও হাসিয়া বলিলেন, "মালতি, তোর জন্য কি আমি কাঁদিলাম? না। কি দুখে আমার যে আগেকার সে ভাব নাই, কি দুখে যে এ কঠোর চোকেও জল পড়িল তাহা তুই কি বুঝিবি, মালতি? আজ তোর মত ছেলেমানুষ অজ্ঞান বালিকা তা কি ক'রে বুঝিবে, মালতি?"

মালতী ছেলেমানুষ হইলেও মালতী স্ত্রীলোক; স্ত্রী-লোকে দুঃখের দুঃখী, ব্যথার ব্যথী, না হইয়া থাকিতেই পারে না—আর কিছু বুঝুক না বুঝুক, পরের ব্যথা বুঝিবার সময় স্ত্রীলোকে আর ছেলে মানুষ থাকে না, অন্য সকল বিষয়ে বালিকা থাকিলেও সে সময় শত বর্ষের বৃদ্ধও তাহার মত হৃদয়ের সহিত অন্য হৃদয়ের কষ্ট বুঝিতে সক্ষম হইবে না। বালিকা মালতী আজ গম্ভীর প্রৌঢ়ার মত বলিল "দাদা, আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিব না? ছেলেমানুষ! আজ তিন বৎসর আগে একদিন আমাকে কি অন্য রূপ ভেবে তোমার মনের কথা বলনি? আমি কি এখনো দাদা তার চেয়েও বড় হই নি?"

পৃথিবীতে যথার্থ ব্যথার ব্যথী অতি দুর্লভ। একটি সুন্দর গোলাপ দেখিয়া যত্নে কে না গ্রহণ করে? তাহাকে কে না ভাল, বাসে? কেন না তাহাতে চক্ষের তৃপ্তি হয়, তাহাতে নিজের সুখ হয়—কিন্তু সেই গোলাপটি শুকাইলে কে তাহাকে মায়া-দৃষ্টিতেও একবার চাহিয়া দেখে? কজনের চক্ষু হইতে তাহাতে অকৃত্রিম শোকাশ্রু পড়ে? তাহা পড়ে না বলিয়াই অকৃত্রিম অশ্রুর এত আদর, নিস্বার্থ ভালবাসার এত আদর। স্বর্গ তুচ্ছ করিয়াও লোকে তাহা পাইতে ইচ্ছা করে—তাহাতে লোকে এত মুগ্ধ হয়। রমেশও মানুষ, তিনিও সে দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিতে পারিলেন না—তাঁহার হৃদয়-দ্বার খুলিয়া গেল, একজন ব্যথার ব্যথী পাইবার জন্য তাহারও হৃদয় ব্যগ্র হইল, তিনি বলিলেন, "আমার কষ্টের কথা শুনিবে, মালতি? যাহা হইতে আমার সুখ, তাহা হইতেই মালতি আমার দুঃখ,

শোভনা আজ কাল কল্পনার প্রাচুর্য্যে নিজেও অসুখী, আমাকেও অসুখী করিয়াছে" বলিয়া যুবা সংক্ষেপে শোভনার সন্দেহ বৃত্তান্ত বলিলেন।

মালতী নীরবে অনিমেষ নেত্রে সকল শুনিল। মালতীতে আর মালতী নাই। শুষ্ক অধর ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল। দীন যাতনাময় দৃষ্টি শূন্যে সংলগ্ন হইল, মালতী থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল। যুবাও কাঁদিতে লাগিলেন। নীরবে সেই সন্ধ্যা কালে সুখময়ীর চঞ্চল বক্ষে সে জল মিশাইল। আকাশে চাঁদ নাই, শত শত তারা উঠিয়াছে। তাহারা সে দুঃখ বুঝিল না, তাহা দেখিয়া হাসিল মাত্র। হাসিবে নাই বা কেন?—তাহাদের নিকট মমতা কে প্রত্যাশা করে? তাহারা ত অনন্ত কাল পর্য্যন্ত হাসিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে—সুতরাং সেই নির্ম্মমতায় কাহারো হৃদয়কে আহত করিতে পারে না কিন্তু সুখের বিষয় এই যে সেই প্রশান্ত সুখময়ী-তীরে জনমানবের আর নাম গন্ধও ছিল না। মালতীদের অশ্রুজল দেখিয়া হাসিবার, তাহাদের দীর্ঘশ্বাসে উপহাস করিবার, তাহাদের কাতরতায় আমোদ উপভোগ করিবার এক জনও গুপ্ত বা প্রকাশ্য আত্মীয় পর কেহই ছিল না। যাহাদের মমতাশূন্য মূর্ত্তি দেখিলে অশ্রুজল প্রবাহিত না হইতে হইতেই নীহারবৎ জমাট হইয়া পড়ে, দীর্ঘশ্বাস আপনা আপনি মরমের নিভৃত কন্দরে অবরুদ্ধ হইয়া যায়, এমন জনপ্রাণীও সে খানে ছিল না। সুতরাং মালতী আজ অবাধে কাঁদিয়া ফেলিল। থাকিয়া থাকিয়া বালিকা বলিয়া উঠিল "দাদা কি বলিলে? শোভনা কি মনে করে তুমি আমাকে শোভনা হইতে ভাল বাস? আমিই তোমাদের তবে অসুখের কারণ? আমার জন্যই তোমার প্রফুল্ল মুখ, ও শোভনার হাসিমুখ আজ মলিন! আমিই তোমাদের অশান্তির মূল! আমিই তোমাদের কষ্টের কারণ! দাদা, কি করিলে তোমাদের পূর্ব্ব সুখ আবার ফেরে? কি করিলে তোমাদের শান্তি বজায় থাকে?"

মালতীর নিস্বার্থ স্নেহ-উথলিত বাক্যে যুবার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কি বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া বলিলেন "মালতি, মালতি, তুই আমাদের অসুখের কারণ কি করে হবি মালতি? আমাদের অকারণ—"

মালতীর আজ কথা ফুটিয়াছে, মালতী আর রমেশকে কথা কহিতে না দিয়া বলিল "না দাদা, আমাকে আর ভুলাইও না—আমি তোমার কথায় আর ভুলিব না। দাদা বল, কি করিলে তোমাদের সুখ ফিরিয়া আসে? আমি দাদা মরিলেও কি তোমাদের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রনা শেষ হয় না?"

সকল রূপ ভালবাসার কি মর্ম্মান্তিক ভাব একই প্রকার? মরিতে ইচ্ছাই কি ভালবাসার স্বাভাবিক? তাহার কথায় রমেশ নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার মনের ভাব বুঝিয়া কোন কথা কহিতে

পারিলেন না—মালতীও কোন কথা কহিল না, মনে মনে যাহা সঙ্কল্প করিল মনেই রাখিল। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধেই কাটিল, দুজনের মনে কত কথা বহিয়া গেল দুজনে বলিতে ইচ্ছাও করিলেন না। ক্রমে দুজনে এত গভীর চিন্তামগ্ন হইলেন, দুজনের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যেন ভুলিয়া গেলেন, একাকী আছেন জ্ঞানে যুবা আপন মনেই যেন বলিলেন "যাহাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালবাসি তাহার নিকট অবিশ্বাসই কি প্রতিদান। তাহার নিকট এই দারুণ আঘাতই কি আমার পুরস্কার!" এই কথায় মালতীর চিন্তা ভঙ্গ হইল—আবার বলিল "কি বলিলে দাদা? শোভনার চেয়ে তুমি আমাকে ভাল বাস? এই কি শোভনার বিশ্বাস?"

যুবা কোন উত্তর করিলেন না।

মালতী আবার বলিল "সত্যিই কি শোভনার এই বিশ্বাস? তুমি শোভনা হইতে আমাকে ভালবাস!

যু। "হাঁ।"

সহসা এই সময় শোভনা পশ্চাৎ দিকে আসিয়া দাঁড়াইল—মালতীর শেষ প্রশ্ন ও যুবার শেষ উত্তর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। আর কোন ভুল নাই, এই বার শোভনার চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভাঙ্গিল,—এ তো আর কল্পনা নহে। মালতী ও রমেশের প্রেমালাপ সে স্বকর্ণে শুনিতে পাইল। উন্মত্ত বেদনায় শোভনা অজ্ঞানের মত সেখান হইতে ছুটিয়া কিছু দূরে নদী তীরে আসিয়া দাঁড়াইল—আপন সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার আগে একবার আকাশ পৃথিবী নদী কুটীরপানে চাহিয়া দেখিল, নিমেষ মধ্যে একবার কত কথা তাহার হৃদয় মধ্যে বহিয়া গেল। "আমি কে? আমি কার? আমি যখন আমার স্বামীরই নই তখন আমি কার? আমার স্বামীই যখন আমায় চান না, তখন আমাকে আর কে চায়? সংসার আমাকে চায় না, সমাজ আমাকে চায় না, আমার আত্মীয়েরাও হয় তো আমাকে চায় না, অন্য সব দূরে থাক—আমি নিজেই আমাকে চাইনে, তবে বাঁচিয়া আর নরক ভোগ কেন? আমি আজ মরিলে সেই পূর্ব্বের মত পৃথিবী মেরুদণ্ডে ঘুরিবে, সংসার সেই পুরাতন ভাবে সমান চলিবে, আবার হেমন্তের পর বসন্ত আসিবে, আমাবস্যার পর চাঁদের উদয় হইবে, আত্মীয়েরা সেই আগেকার মত খাইবে শুইবে, বন্ধুরা একবার মাত্র অশ্রু জল ফেলিয়া আবার নূতন আমোদে মত্ত থাকিবে, আর আমার সর্ব্বস্বধন—যারপর নাই সেই স্বামী?—তিনি?—তিনি কি করিবেন? এক ফোটা অশ্রুজল ফেলা দূরে থাক, হয় ত নিষ্কণ্টক হইয়াছেন ভাবিয়া তিনি সুখীই হইবেন, তবে—তবে?" আর একবার শোভনা চারিদিক চাহিয়া দেখিল, মাথা ঘুরিতেছিল, চারিদিকে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইল না—অন্ধকার পৃথিবী, অন্ধকার আকাশ, অন্ধকার নদীর অন্ধকার জল, তাহার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। শোভনা সেই ঘূর্ণ-নদীর আবর্ত্ত মধ্যে বিঘূর্ণীত হৃদয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

শোভনাকে নিকট দিয়া ছুটিতে দেখিয়া কিছু কারণ না বুঝিয়াও সঙ্গে সঙ্গে রমেশ ও মালতী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, পড়িতে না পড়িতে রমেশও লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে তীরে তুলিলেন, মালতী প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির ন্যায় স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

চতুর্থ—পরিচ্ছেদ।

শোভনাকে লইয়া যুবা তাঁহার শয়নাগারে আসিলেন। গৃহে আসিয়া তাহাকে শয্যায় বসাইয়া আপনিও পার্শ্বে বসিলেন। শোভনা একবার চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, যাহা আর জনমে দেখিতে পাইবে না ভাবিয়াছিল—আবার সেই সকল পরিচিত সামগ্রী তাহার চক্ষে পড়িল। সেই কুটীর, যে কুটীরে বিবাহ অবধি দু জনে কাটাইয়াছে, যাহাতে তাহাদের জীবনের কত সুখদুঃখময় ঘটনা যেন অঙ্কিত আছে, সেই কুটীর সেই সাধের কুটীর আবার দেখিল। কুটীরে, তাহাদের শয্যা তেমনই সজ্জিত রহিয়াছে, শয্যার শিয়র দেশে সেই রত্নাবলী উত্তররামচরিত শকুন্তলা সজ্জিত, আবার যে কখনো স্বামীর সুধা কণ্ঠে তাহা শুনিতে পাইবে সে আশা তাহার ছিল না। দীপটি জ্বলিতেছে, কিন্তু তেলের অভাবে তেমন উজ্জ্বল রূপে জ্বলিতেছে না—মুমূর্ষুর জীবনের মত মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে, নিভ নিভ হইয়াছে, অথচ নিভিতেছে না। শোভনার জীবনও নিভ নিভ হইয়াছিল কিন্তু নিভিল না। শোভনা লজ্জায় এতক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে পারে নাই, এইবার চাহিল; যাহাকে—যে হৃদয়রত্নকে আর জনমে দেখিবার আশা করে নাই তাহাকে কি আর দেখিতে সত্যই পাইবে? ব্যগ্র ভাবে সে স্বামীর পানে চাহিল। রমেশের সেই বিষাদ-গম্ভীর ছবি দেখিয়া শোভনা বজ্রাহত হইল, তখনি চক্ষু নত হইয়া পড়িল, শোভনা নীরবে কাঁদিতে লাগিল, রমেশও নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

মুহূর্ত্তের একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় মানুষের জীবনকে যেরূপ পরিবর্ত্তিত করে, এমন একটি বহু-কাল-ব্যাপি মহা কাণ্ডতেও পারে না। এই জন্যই ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজমন্ত্রী ডিজরেইলি বলিয়াছেন যে, মনুষ্য জীবন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলীর সমষ্টি মাত্র। শত শত বৎসরের বিপ্লবে যাহা না করিতে পারে, একটি মুহূর্ত্তের ক্ষুদ্র ঘটনাতেও তাহা সম্পন্ন হয়। পশুচুরি অপরাধে দণ্ডিত না হইলে মহা কবি সেক্সপিয়রের নামও হয়ত কেহ শুনিতে পাইতেন না। বৃহৎ ঘটনায় মানুষকে দলিত করিতে পারে, কিন্তু পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। সম্রাট পথের ভিখারী হইয়াও জীবন ধারণ করেন, প্রিয়তম পুত্র কন্যা বিয়োগও সহ্য করিতে পারা যায়, প্রণয়ে আহত হইয়া কত ভগ্ন হৃদয়ও জীবিত থাকে, কিন্তু আবার কখনো কাহারো এক মুহূর্ত্তের একটু অনাদর বাক্যেই হয়ত হৃদয়ের অন্তর-তার সহসা এমন ছিন্ন হইয়া যায়, যে তাহা আর কিছুতেই জোড়ে না, তাহা হইতেই হয়ত জীবনের

কাঁটা একেবারে এমন বিপথে গিয়া পড়ে, যে তাহা আর কিছুতেই সোজা হয় না। আবার তেমনি যে গর্ব্বিত-হৃদয় ভাগ্যের সকল প্রকার উৎপীড়ন জীবনের সকল প্রকার অত্যাচারকে ভ্রূকুটী করিয়া উড়াইয়া দেয়,যে পাষাণ হৃদয়ে শত শত মনুষ্য শোণিত কিছুমাত্র বিকার জন্মাইতে পারে না, যাহা কিছুতেই নরম হয় না, সেই গর্ব্বিত পাষাণ হৃদয়ও কাহারো একটী স্নেহ বাক্যেতেই একেবারে দ্রব হইয়া যায়। যে আণ্টনি অসীম কষ্টে পড়িয়াও অপার বিপত্তি অতিক্রম করিয়া, অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়াই কেশিয়াস ও ব্রটাসকে পরাজীত করিয়াছিলেন, সেই ভীম পরাক্রমশালী মহাবীর আণ্টনিই কি ক্লিয়োপেট্রার একবিন্দু অশ্রু দর্শনে বিজয়ী হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তই কাপুরুষের ন্যায় যুদ্ধে বিমুখ হইয়া পলায়ন করেন নাই? কিসে যে হৃদয়ের কি হয়—কি প্রাকৃতিক নিয়মে তাহা যে চলিতেছে তাহা নির্ণয় করা বড় সহজ নয়। নিউটন গেলিলিও অনেক ভাবিয়া বাহ্যিক জগতের নিয়ম বাহির করিয়াছেন, কিন্তু মনের নিউটন এখনো জন্মায় নাই। কবে জন্মাইবে কে জানে?

আজকের সন্ধ্যাকালের এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি হইতে শোভনার জীবন-স্রোত যেন উলটাইয়া ফেলিল, শোভনা সকলি নূতন দেখিল, জলময়ের পরক্ষণ হইতে শোভনার যেন জীবন আবার নূতন হইয়া আরম্ভ হইল। রমেশকে সে পূর্ব্বকার সেই স্নেহময় স্বামীই দেখিল,তাঁহাতে প্রণয় ছাড়া সে আর কিছুই দেখিতে পাইল না। কি করিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও অন্য রূপ মনে করিতে পারিয়াছিল শোভনা নিজেই যেন বুঝিতে অক্ষম হইল।

আস্তে আস্তে তাহাদের কথা আরম্ভ হইল, আস্তে আস্তে নূতন প্রেম-সম্ভাষণের মত শোভনা স্বামীর ক্ষমা প্রার্থনা করিল, রমেশের নিকট আনুপূর্ব্বিক সকল শুনিয়া তাহার হৃদয় অনুতাপে পূর্ণ হইল। এ অনুতাপ হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ হইতে উথলিত, ইহা মিশ্রিত নহে, ইহাতে সন্দেহ বা অবিশ্বাস কিছুই ছিল না।

রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল, এখনো তাঁহারা সেই জলসিক্ত পরিচ্ছদ ত্যাগ করেন নাই, তাহা গাত্রেই শুকাইয়া গিয়াছে। সহসা শোভনার তাহা মনে পড়িল, রমেশের কাপড়ে হাত দিয়া দেখিয়া বলিল "কেন আমার মরণ হইল না,যাহাকে বুকে রাখিয়া তৃপ্তি হয় না, আমার জন্যই তাহার এত কষ্ট, উঠ উঠ—এত রাতে কি না আমার জন্যই এখনো ভিজা কাপড়ে কষ্ট পাইতেছ?" শোভনার চক্ষু দিয়া জল পড়িল। রমেশ বলিলেন "শোভনে, এ কি আর কষ্ট! এখন আমার মত সুখী এ সংসারে কে? তোমার পূর্ব্ব মন ফিরিয়া পাই যাছি, তোমার অবিশ্বাস ঘুচিয়াছে, এখন কি শত শত অন্য বিপদ আসিলেও আমি তাহা কটাক্ষে উড়াইয়া দিতে পারি না?" সহসা নিশাকালের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, তাঁহাদের সেই সুখ-বিহ্বল মোহ ভঙ্গ করিয়া, দূরে নিশীথ গগণ গীত ধ্বনিতে

পূর্ণ হইল। রমেশ মালতীর গলা চিনিতে পারিলেন। এত রাত্রেও মালতী ঘরে আসে নাই, একাকী বেড়াইতেছে, তিনি আশ্চর্য্য হইলেন, বলিলেন "শোভনা, মালতী এখনো কুটীরে আসে নাই, একাকী বেড়াইতেছে!" বলিয়াই যেন রমেশের কি মনে হইল; একটু হাসিয়া বলিলেন "শোভনা, ইহা হইতে না জানি আবার আমার কত ব্যাকুলতাই কত প্রেমই দেখিবে?" শোভনা লজ্জিত হইয়া বলিল "সত্যি মালতী এখনো একেলা বেড়াচ্ছে, হয়তো সব দেখে শুনে কষ্টে সে আজ ঘরে আসে নাই। আমি মালতীর নিকট ঘোর অপরাধে অপরাধী, আমি যাই—তাহাকে ডেকে আনি, আমি যাই, তাহার কাছে কেঁদে মার্জ্জনা ভিক্ষা করি, আমি হাজার দোষ করিলেও মালতী কখনো রাগ করে নাই, আজ কি আমি পায়ে ধরিলেও আমাকে মাপ করিবে না?" রমেশ বলিলেন "না শোভনে, বাহিরে বড় অন্ধকার, মালতী কোথায় তার ঠিক নেই, তোমার গিয়ে কাজ নেই, আমিই খুঁজে আনি"

সহসা আবার গীত ধ্বনি উথলিয়া উঠিল, স্পষ্ট রূপে কথাগুলি তাঁহাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, তাঁহারা শুনিলেন—

দূর বিজন বনে একাকী যাইব চ'লে
মানুষ-নিশ্বাস-বায়—যে থানে নাহি উথলে,
অনাথিনী উদাসিনী, যাব চলি একাকিনী,
আরতো দোসর আশা রাখিনা মরম তলে।
ভালবাসা প্রতিদান, সে আশাও অবসান
অবসান সুখআশা সব সাধ এ কপালে—
সুখেরি জনম যার, এই এ দুখিনী আর
দিবেনা সে সুখে বাধা—কাঁদাবে না পলে পলে,
সাক্ষী থেকো রবি শশী, জ্বলন্ত তারকারাশি
সাক্ষী থেকো গিরি নদী তোমরা সকলে—
যতই যাতনা স'ই, যে থানেই যেরে রই,
সুখে রব সুখী ভেবে দেখিও হৃদয় খুলে।

গানটি তাঁহাদের হৃদয়ের গভীর তল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল, সেই বিষাদময় অথচ সুধাবর্ষী গগণ স্পর্শী স্বরে রমেশ চমকিয়া উঠিলেন, অজ্ঞাত কারণে তাঁহার হৃদয় বড়ই চঞ্চল হইল, হৃদয়ে কি একটি যেন বেদনা বোধ হইতে লাগিল, উঠিয়া কুটীর দ্বার খুলিলেন, অমনি বাতাস আসিয়া দীপটি নিভিয়া গেল, কুটীর অন্ধকারময় হইল। শোভনার অন্ধকারে ভয় ছিল না, সহসা আজ নূতন অজ্ঞাত ভয়ে সে কাঁদিয়া উঠিল। রমেশ একবার ফিরিয়া চাহিলেন, শোভনার ঝাঁপ দিবার কথা মনে করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। সহসা গান বন্ধ হইল, সেই আঁধার নিশীথের নিস্তব্ধতা আবার মুহূর্ত্ত কাল জন্য সম্পূর্ণ রূপে আপন আধিপত্য বিস্তার করিল, রমেশের হৃদয়ে ও কেমন একটি স্থির বিষাদ ভাব আসিয়া আধিপত্য করিল। রমেশ দৌড়িয়া ব্যাকুল ভাবে সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া কুটীর হইতে নিক্রান্ত হইলেন। কেন যে তাঁহার মন দারুণ ভারাক্রান্ত হইল তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

চারি দিক কি অন্ধকার, চারিদিক কি প্রশান্ত—কি গম্ভীর কি নিস্তব্ধ। আকাশে শত শত তারা জ্বলিতেছে

তবু আকাশ অন্ধকার, গাছে গাছে পাতায় পাতায় অসংখ্য অসংখ্য খদ্যোত জ্বলিতেছে তবু পৃথিবী অন্ধকার। সেই আঁধার নিঃস্তব্ধ প্রান্তর দিয়া চলিতে চলিতে একটি অসাধারণ ভয়ে রমেশ শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার হৃদয় যেন স্তম্ভিত হইল, শিরার শিরায় রক্তপ্রবাহ যেন বন্ধ হইল, চলৎশক্তি তাঁহার যেন রহিত হইল। কিন্তু সহসা একি এ! এই প্রান্তরের ভীষণ নিঃস্তব্ধতা মুহূর্ত্তের জন্য কিসের শব্দে ভীষণ ভাবে ভঙ্গ হইল? কই, আর শুনা যায় না; নদীগর্ভে কিছু কঠিন দ্রব্য পড়িবার শব্দ কি এ?"

আবার সেই সন্ধ্যাকালের ভয়ানক ঘটনার কথা রমেশের মনে পড়িল, রমেশ যেন মনশ্চক্ষে তাহা দেখিলেন রমেশ, কণ্টকিতকায় হইলেন।

রমেশের নির্জীব প্রাণে প্রাণ আসিল, শোণিত বেগে বহমান হইল, দেহে আবার বল আসিল, রমেশ কাতর চিত্তে মালতী মালতী বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে ডাকিতে নদীতীরে ছুটিয়া আসিলেন। দেখিলেন নদীবক্ষে তরঙ্গ নাই, উচ্ছ্বাস নাই, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের ভাব-প্রকাশক অসাধারণ কোন ভাবই নাই, মৃদু মৃদু নিয়মিত ভাবে নিঃস্তব্ধে সুখময়ী বহিয়া যাইতেছে।

রমেশ এদিকে ওদিকে চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন। মালতীর কোন চিহ্ন পাইলেন না।

রমেশ উন্মত্তের মত আবার মালতী মালতী বলিয়া ডাকিলেন, নদী, প্রান্তর আকাশ পৃথিবী তাঁহার আর্ত্তনাদে প্রতিধ্বনিত হইল, কিন্তু হায়—কোন মালতীই আর উত্তর করিল না।

সমাপ্ত।

শকুন্তলা সমালোচনার সমালোচনা।

সমালোচক এক কটাক্ষেই জানিতে পারিয়াছেন যে কালিদাস উচ্চ শ্রেণীর নাটককার নহেন—সে কটাক্ষটি এই, "দান্তে তাঁহার আশ্চর্য্য কল্পনা-শক্তির সহায়ে জগদ্বিখ্যাত ডিবাইনা কমেদিয়া লিখিয়াছেন। সেক্সপিয়র এবং স্কট অতি সামান্য গল্প অবলম্বন করিয়া অপূর্ব্ব নাটক এবং উপন্যাস রচনা করিয়াছেন*। অতএব যিনি যথার্থ কবি তাঁহার পক্ষে সকলি সম্ভব।

* সেক্সপিয়রের প্রধান প্রধান মুদ্রাঙ্কনকারেরা দেখাইয়াছেন যে, উহার আখ্যায়িকা-সকল তাহাদের মূল উপাখ্যান-সমস্ত

* * * * * অতএব আমাদের বিশ্বাস এই যে যদি কালিদাস ইহা অপেক্ষা আখ্যায়িকা আরো চমৎকারিণী করিতে না পারিলেন তাহা হইলে তিনি উচ্চ শ্রেণীর নাটককারদিগের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন না।" লেখকের অভিপ্রায় এই যে, যিনি যথার্থ কবি তাঁহার পক্ষে সকলি সম্ভব —কালিদাসের পক্ষে সেক্সপিয়র হওয়া সম্ভব—মিল্‌টন হওয়া সম্ভব—দান্তে হওয়া সম্ভব—নিদেন পক্ষে স্কট হওয়াও ত সম্ভব, তবে কেন তিনি উঁহাদের এক জনের মতও না হইলেন, ইহাতে অবশ্য তাঁহার হার—আর উঁহাদের সকলেরই জিত! আর এক সমালোচক এইরূপ বলিতে পারেন যে, মিল্‌টনের কবিতাবলী যেমন বাটালি-খোদা ধরণের, সেক্সপিয়রের কবিতা তেমন নহে, সেক্সপিয়রের কবিতা দেখিলে মনে হয় যেন তাহা জলের মত অবাধে চলিয়াছে—"যিনি যথার্থ কবি তাঁহার পক্ষে সকলই সম্ভব" সেক্সপিয়র যদি যথার্থ কবি হইতেন তবে মিল্‌টনের মত কবি হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত, কিন্তু সেক্সপিয়র মিল্‌টনের মত কবিতা লিখিতে পারেন নাই, অতএব প্রমাণ হইল যে সেক্সপিয়র উচ্চ শ্রেণীর নাটককার নহেন! যা'ক্‌,—প্রকৃত কথা এই যে, সেক্সপিয়রও মিলটনের মত নহেন, মিল্‌টন্‌ও দান্তের মত নহেন, দান্তেও সেক্সপিয়রের মত নহেন, সেক্সপিয়রও কালিদাসের মত নহেন, ইহাতে বিধাতার সৃষ্টি-বৈচিত্র্য ভিন্ন আর কিছুই প্রমাণ হয় না। দান্তের মত বা মিল্টনের মত কবি হইতে চেষ্টা করা বর্ত্তমান কালের কোন বঙ্গ-কবিকুল-চূড়-কেই শোভা পায় —তাহা কালিদাসকেও শোভা পায় না, সেক্সপিয়রকেও নহে; সেক্সপিয়র এবং কালিদাস উভয়ই স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ—ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু সেক্সপিয়রের গ্রন্থ-হইতে লেখক যে সুন্দর কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন সে-বিষয়ে কালিদাস কোন অংশেই হীন নহেন, সে কবিতাটি এই

The poet"s eye in fine frenzy rolling

হইতে প্রায় কিছুই ভিন্ন নহে—সুতরাং সেক্সপিয়র তাঁহার নাটকের গল্পচাতুরীর জন্য বড় একটা সম্মান পাইতে পারেন না,—সেক্সপিয়রের কবিত্বই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। টেম্পেস্টের গল্প-চাতুরী শকুন্তলার অপেক্ষা কম বই বেশী নহে —তবে কেন টেম্পেস্ট একটি অতি চমৎকার নাটক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল? সুবিখ্যাত সমালোচক শ্লেগেল এইরূপ বলেন "The Tempest has little action or progressive movement; the union of Ferdinand and Miranda is settled at their first interview, and Prospero merely throws apparent obstacles in their way: the shipwrecked band goleisurely about the island; the attempt of Sebastian and Antonio on the life of the king of Naples and the plot of caliban and the drunken sailors against Prospero are nothing but a feint for we foresee that they will be completely frustrated by the magical skill of the latter.

Doth glance from heaven to earth and earth to heaven &. &.

যে কালিদাস আসমুদ্রক্ষিতীশানাং আনাকরথবর্ত্মনাং-রাজাদিগের জীবন-চরিত-গানে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন তাঁহার যদি চক্ষু পৃথিবী হইতে স্বর্গে স্বর্গ-হইতে পৃথিবীতে ঘূর্ণায়িত না হইবে তবে আর কাহার হইবে? কালিদাস যতবার তাঁহার নায়ক নায়িকাদিগের সহিত পৃথিবী-হইতে স্বর্গে এবং স্বর্গ-হইতে পৃথিবীতে যাতায়াত করিয়াছেন ততবার সেক্সপিয়র নিজে করিয়াছেন কিনা সন্দেহ! ইন্দ্র, দেব-দেবী, মাতলী-সারথী, চিত্ররথ, যক্ষ, অযোধ্যা-পুরলক্ষ্মী, অলকা-পুরী, মারীচাশ্রম ইত্যাদি কত যে তাহা সংখ্যাতীত সমস্তই কালিদাসের ঘরের সামগ্রী—এ ত গেল অমরকোষের স্বর্গবর্গ, আবার যদি ক্ষিতিবর্গ দেখিতে চাও তবে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত—সমুদ্রের গর্ত্ত হইতে হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়া পর্য্যন্ত সকলই কালিদাসের নখদর্পণে! অথচ লেখক কালিদাসের কবিতাতে আশ্চর্য্য কিছুই দেখিতে পা'ন নাই, তিনি বলেন "এক জন রাজা মৃগয়া করিতে গিয়া তপোবনে এক পরমা সুন্দরী বালা দেখিতে পাইলেন। ইহাতে তাঁহার মনে প্রেমের সঞ্চার হইল ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই!" তিনি ইহাও বলিতে পারেন যে, টেম্পেষ্ট-নাটকের ফর্‌ডিনাণ্ড একটা উপদ্বীপে উঠিয়া এক পরমা সুন্দরী বালা দেখিতে পাইলেন, ইহাতে তাঁহার মনে প্রেমের সঞ্চার হইল ইহাতেও কিছুই আশ্চর্য্য নাই! তবে যদি ডাইনের পুত্র কালিবানকে দেখিয়া মিরাণ্ডার মনে প্রেমের সঞ্চার হইত অথবা কালিবানের মাতাকে দেখিয়া ফর্ডিনাণ্ডের মনে প্রেমের সঞ্চার হইত, তাহা হইলে অবশ্য একটা অত্যাশ্চর্য্য পরমাদ্ভুত ব্যাপার হইত সন্দেহ নাই; সেক্সপিয়র তাঁহার "আখ্যায়িকাকে আরো চমৎকারিণী" করিবার অমন সুযোগ পাইয়াও ছাড়িয়া দিলেন—হায় কি দুরদৃষ্ট! তাহার পরে সমালোচক দুষ্মন্ত-রাজার প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিতেছেন "সকলেরই এরূপ হওয়া (কিনা রূপবতী যুবতীকে দেখিয়া হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হওয়া) সম্ভব, তাহাতে আবার সে-কালের রাজারা বহু বিবাহ এবং অন্যায় প্রেমকে দোষ বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।" এ স্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, রাজাদিগের বহুবিবাহ সে-কালের দেশাচার ছিল সুতরাং সে দোষের জন্য দুষ্মন্ত রাজা দায়ী হইতে পারেন না—কিন্তু তাই বলিয়া যে-সকল রাজা অবৈধ প্রেমকে দোষ বলিয়া জ্ঞান করেন না দুষ্মন্ত রাজা কি সেই দলের লোক? লেখক দুষ্মন্ত রাজার চরিত্রের মর্ম্মই বুঝিতে পারেন নাই; দুষ্মন্ত রাজা যদিও শকুন্তলার অসামান্য রূপলাবণ্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন তথাপি যতক্ষণ না তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, শকুন্তলা তাঁহার বৈধ প্রেমের পাত্রী ততক্ষণ তিনি আপনার মনের রশ্মি সংযমন করিয়া রহিয়াছিলেন—

কেন? তিনি অবৈধ প্রেমকে দোষ-জ্ঞান করিতেন না বলিয়া কি? এবং অমন পরমাসুন্দরী শকুন্তলাকে তিনি যে প·শ্চাতে পরস্ত্রী-বোধে প্রত্যাখ্যান করেন —তাহারও কি কারণ ঐ? এখানে লেখক হয় "Nothing extennate nor set down aught in malice" এই তাঁহার ব্রতটি ভঙ্গ করিয়াছেন, নয় দুষ্মন্ত রাজার চরিত্রের কণা-মাত্রও বুঝিতে পারেন নাই! লেখক অতঃপর বলিতেছেন "পরে রাজা সেই যুবতীকে গান্ধর্ব্ব-মতে বিবাহ করিলেন এবং শীঘ্রই নবোঢ়াকে রাজবাটীতে লইয়া যাইবেন স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিলেন। ইহাতেও মনোহারিত্ব নাই।" রোমিও জুলিয়েট্‌কে লুকাইয়া বিবাহ করিয়াছিল, ইহাতেও মনোহারিত্ব নাই,—কেন না শত শত পঞ্চম শ্রেণীর নবেলে ঐরূপ ঘটনা নিত্যই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যাহা আশ্চর্য্য এবং মনোহারী, দুষ্মন্ত যাহা দেখিয়া পাগল, তাহা লেখকের হৃদয়ে আমলই পায় নাই—এমনি মনোহারী যে, তাহা দেখিবা-মাত্র দুষ্মন্ত বলিয়া উঠিলেন।

অহো মধুরমাসাং দর্শনং।
শুদ্ধান্ত-দুর্ল'ভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনোযদি জনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলুগুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ॥

দুষ্মন্ত। অহো! কি মধুর-দর্শন!
অন্তঃপুর-দুর্লভ রূপ-মাধুরী,
আশ্রম-বাসি-জনের এ যদি—বলিতে কি বা ভবে·—
গুণ-গরিমায়, এযে, বন-লতা
দূরে ফেলি দিয়াছে উদ্যান-লতা-সবে॥

এস্থলে কালিদাস যে প্রগাঢ় বিস্ময়ের ভাবটিকে দুইটি পংক্তির মধ্যে পুঞ্জীভূত করিয়াছেন এবং যাহা তিনি ইসারায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাকে যে, কত বিস্তার করিয়া বলা যাইতে পারে তাহা সেক্সপিয়র নিম্নলিখিত কতিপয় পংক্তিতে দেখাইয়াছেন।

Ferdinand. Admired Miranda
Indeed the top of admiration; worth
What's dearest to the world! Full many
I have eyed with best regard; and many a time
The harmony of their tongues hath into bondage
Brought my too deligent ear; for several virtues
Have I liked several women; never any
With so full soul, but some defect in her
Did quarrel with the noblest grace she owed,
And put it to the foil: but you, O you!
So perfect and so peerless are created
Of every creature's best.

এস্থলে ফর্ডিনাণ্ড আপনার মনের বিস্ময়-

ভাব প্রেয়সীর শ্রবণগোচরে অনাবৃত্ত করিয়া ঢালিয়া দিতেছে, এজন্য ইহা এত বিস্তারিত না হইলে ঠিক হইত না, কিন্তু দুষ্মন্তের ঐ যে বিস্ময়ের ভাব উহা তাঁহার আত্মগত, এজন্য তাঁহার মুখ হইতে অল্প একটু আভাস যাহা বাহির হইয়াছে তাহা তাঁহার মনের ভিতরকার প্রভূত বিস্ময়-ভাবের পরিচয় দিতেছে; এস্থলে কালি-দাস দুষ্মন্তকে অধিক কথা কহাইলে দুষ্মন্তের দর্শনেন্দ্রিয়ের একনিষ্ঠ তন্মাদ-ভাবের ব্যাঘাত জন্মানো হইত—দুষ্মন্তকে কালিদাস এখানে এরূপ করিয়া দাঁড় করা-ইয়াছেন যে, বাহুল্য কথা একটিও উচ্চারণ করিবার তাঁহার অবকাশ নাই—তবে দুষ্ম-ন্তের মনে নিতান্ত যখন এরূপ কোন ভাব উদয় হইয়াছে যাহাকে মনোমধ্যে ধরিয়া রাখা যায় না তখনই কেবল তাঁহার কণ্ঠ হইতে তৎকালোচিত বাক্য নিঃসারিত হইয়াছে। আশ্রম-বাসিনী এক জন রূপ-যৌবন-সম্পন্না বালার অকৃত্রিম সখ্যালাপ ও হৃদয়ের সরল প্রেমোচ্ছ্বাস আশ্চর্য্য কিছুই নহে—রাফেয়েলের কৃত মেরি এবং শিশু যীশুর ছবিই বা কি এমন আশ্চর্য্য পদার্থ? মাতা শিশুকে কোলে করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে এতে কা'র কি এ'ল গেল, অথচ যে দেখে সেই বলে—চমৎ-কার! কালিদাস বলো, সেক্সপিয়র বলো, মিলটন্ বলো, সকলকেই জিতিয়াছে—এক যা' গ্রন্থ আরব্য উপন্যাস। সেই গ্রন্থখানিকে চক্ষের সামনে ধরিয়া তা-হার মধ্য দিয়া কালিদাসের শকুন্তলাকে দেখিলে মনে হইবে যে, এ এক জন আশ্রম-বাসিনী সামান্য বালিকা বই নহে—রাজা-রাজড়ার মেয়ে নহে—ইহাকে লাভ করিবার জন্য রাজাকে কোন অলৌ-কিক ভৌতিক ব্যাপারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাই—তবে একে নিয়ে কেন এত গণ্ডগোল! দুর্ব্বাসার শাপে রাজার স্মৃতিরোধ অবধি করিয়া শকুন্তলার সমাপ্তি পর্য্যন্ত লেখক একটি কোথাও আশ্চর্য্য খুঁজিয়া পা'ন নাই; তিনি বলেন "যদ্যপি এমন হইত যে, কোন ইয়াগোর ন্যায় সয়্-তানের দুরভিসন্ধিতে রাজার প্রেমময় মন কলুষিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য তিনি শকু-ন্তলাকে অবমাননার সহিত দূরীকৃত করি-লেন, পরে সমস্ত অবগত হইয়া যথাকর্ত্তব্য করিয়া শকুন্তলাকে পাইলেন তাহা হইলে কল্পনার পরিচয় পাওয়া যাইত *। কারণ রাজার মনকে অবস্থান্তরে লইয়া যাওয়া ও পরে ক্রমশ যথার্থ ঘটনা-সকল প্রকাশ করা ইহাতে অনেক কৌশলের আবশ্যক হইত। কিন্তু দুর্ব্বাসার শাপ সংযোজনা করাতে বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহাতে মূল উপাখ্যান অপেক্ষা নাটক ভাল হইয়াছে বটে কিন্তু একটি দোষ ঘটি-য়াছে। যখন আমরা জানিলাম যে দুর্ব্বা-সার শাপ-বলে এরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল তখন আমাদের যাদৃশ ঔৎসুক্য †

* এস্থলে কল্পনা-শব্দের পরিবর্ত্তে গল্প-রচনা-কৌশল বলিলে ঠিক হইত।

† আখ্যায়িকা-সম্বন্ধীয় ঔৎসুক্য স্বতন্ত্র এবং কবিত্ব-সম্বন্ধীয় ঔৎসুক্য স্বতন্ত্র; আমরা

হওয়া সম্ভব তাদৃশ হইল না। কারণ ঋষিরা প্রায় দেবতা বলিলেই হয়, এমন কি কেহ কেহ দেবতা অপেক্ষাও ক্ষমতাশালী *। তাঁহারা যাহা বলিবেন

যদিও জানিলাম যে দুর্ব্বাসার শাপ-বলে শকুন্তলাকে নিশ্চয়ই বিপদে পড়িতে হইবে তথাপি কবি কিরূপ করিয়া একই দুষ্মন্ত রাজাকে দুই অবস্থায় দুইরূপ আচরণ করাইবেন, অমন সরলা বালা শকুন্তলাকেই বা কিরূপ আচরণ করাইবেন, ইহার ঔৎসুক্য আমাদের মনে প্রবল না হইয়া থাকিতে পারে না পরে যখন শকুন্তলা-দর্শনে দুষ্মন্ত রাজাকে অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে বলিতে শুনা যায় "কেয়মবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীর-লাবণ্যা" তখন আমাদের মনে কি যে এক অপূর্ব্ব কৌতূহল জন্মে তাহা বলা যায় না; তখন মনে হয় যে, রাজার মর্ম্মাভ্যন্তর হইতে প্রসুপ্ত স্মৃতি উঠ্ব উঠ্ব করিতেছে কিন্তু শাপের গুরুভার কিছুতেই ঠেলিয়া ফেলিতে পারিতেছে না—রাজা কি বলে শুনা যাক—শকুন্তলাই বা কি বলে শুনা যা'ক! গল্প-চাতুরী আমাদের মনে যেরূপ কৌতূহল জন্মাইয়া দেয় তাহা অবস্থা প্রধান, কিন্তু আমরা যে কৌতূহলের কথা বলিতেছি তাহা ভাব-প্রধান! রাজপুত্র সদাগরের পুত্র পাত্রের পুত্র কোটালের পুত্র চারিজন চারি পথে চলিল, এখন কাহার কি অবস্থা হয় দেখা যা'ক—এই এক কৌতূহল, আর এ এক কৌতূহল যে, এমন সুকুমার বস্তু শকুন্তলা—তাহার সম্মুখে কি না জানি এক নিদারুণ বিপদ মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, তেমন কঠোর বিপদের সময় ওরূপ কোমল হৃদয়টির ভাব কিরূপ হয় দেখা যা'ক, শকুন্তলার প্রেমে উন্মত্ত এমন যে রাজা দুষ্মন্ত, শাপভারে প্রপীড়িত হইয়া তাহারই বা মনের কিরূপ ভাব হয় দেখা যাক্, এইরূপ কৌতূহল উদ্দীপন করা, ও তাহাকে রীতিমত চরিতার্থ করাতেই নাটকের নাট্যনিপুণতা প্রকাশ পায়। এমন এমন স্থল আছে যেখানে গল্প-নিপুণতা দেখাইতে গেলে নাট্য-নিপুণতার ব্যাঘাত হয় ও নাট্য-নিপুণতা দেখাইতে গেলে গল্প-নিপুণতার ব্যাঘাত হয়; এ সকল স্থলে নাটককারের গল্প-নিপুণতা না নাট্য-নিপুণতা, কি হইলে ভাল হয়? ষড়যন্ত্র দ্বারা রাজাকে শকুন্তলার পাণিগ্রহণে বঞ্চিত করানো হইলে খুব নয় একটা ভাল গল্প খাড়া হইত, কিন্তু তাহা হইলে,—স্মৃতি প্রসুপ্ত, ধর্ম্ম প্রহরীরূপে জাগ্রত, প্রেম দুয়ের মধ্যে দোলায়মান, এই যে একটি মনোহর নাট্য, এটির কি দশা হইত?

* টেম্পেস্ট সম্বন্ধেও স্লেগেল বলেন যে, The attempts of Sebastian and Antonio on the life of the king of Naples and the plot of Caliban and the drunken sailors against Prospero are nothing but a feint for we foresee that they will be completely frustrated by the magical skill of the latter. কিন্তু এই দোষটি খণ্ডন করিয়া তিনিই আবার বলিয়াছেন যে, Yet this want of movement is so admirably concealed by the most varied display of the fascinations of poetry * * * that it requires no small degree of attention to perceive that the denuement is in some degree anticipated in the exposition. ইহার ভিতরকার ভাব এই যে, নাটকের গল্প-চাতুরী অপেক্ষা কবিতা-মাধুর্য্যের মূল্য অধিক—এত অধিক যে গল্পচাতুরীর অভাব সত্ত্বেও টেম্পেস্ট সেক্সপিয়রের একটি ওস্তাদি রচনা বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ।

তাহা বিধাতার আজ্ঞার ন্যায় কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না; অতএব অদৃষ্টে আছে বলিয়া যেমন লোকে শোক সম্বরণ করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করে আমরাও তেমনি শকুন্তলার অদৃষ্টে দুঃখ ভোগ আছে বলিয়া ক্ষান্ত হই এবং আমাদের ঔৎসুক্য হ্রাস হয়।" ইহার প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, বড় বড় নাট্যকারদিগের নাটক মাত্রই একটি সর্ব্বাঙ্গীন অখণ্ড বস্তু, ইংরাজীতে যাহাকে বলে Organic whole; তাহার মধ্য হইতে একটা কোন কিছু নড়াইয়া তাহার স্থানে আর একটা কিছু বসাইলে আশ্চর্য্য একটা ব্যাপার খাড়া হইতে পারে সত্য কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যটি একবারে লোপ পাইয়া যায়—তাহা হইলে কার্ত্তিকটি গণেশ হইয়া পড়ে। হস্তীর কি সৌন্দর্য্য নাই? আছে, কিন্তু যদি হস্তীর মুণ্ডে মানুষের ধড় যোগ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে হস্তীর সৌন্দর্য্যটিও প্রস্থান করে মনুষ্যের সৌন্দর্য্যটিও অন্তর্ধান হয়, তাহা হইলে হইবার মধ্যে একটা গণেশ ঠাকুর খাড়া হন। শকুন্তলা কিরূপ, দুষ্মন্ত কি রূপ, কণ্ব মুনি কিরূপ, এ-গুলি একবার অনুধাবন করিয়া দেখিলেই ইয়াগোর ন্যায় এক ব্যক্তিকে শকুন্তলার মধ্যে স্থান দেওয়া যাইতে পারে কি না এবং দুর্ব্বাসাকে কণ্বাশ্রমে আনা সঙ্গত হইয়াছে কি না তাহা স্পষ্টাক্ষরে বুঝা যাইতে পারিবে। দুষ্মন্ত একজন রাজধর্ম্মপরায়ণ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন, দয়া-দাক্ষিণ্যশালী, শ্রদ্ধাভক্তি-সমন্বিত প্রজাবৎসল রাজা; শকুন্তলা একটি নিসর্গসুন্দর বনলতা, ছলচাতুরী জানে না—মনে প্রেম উদয় হইলে তাহা ছলে কলে প্রকাশ করিতে জানে না—রাজাকে পষ্টাপষ্টি এক চিঠি লিখিয়া বসিল—(লেখক একস্থানে এই ভাবে বলিয়াছেন যেন শকুন্তলা নাগরী জনের ন্যায় হাব ভাব প্রকাশ করিয়াছিল, ইহার প্রতিবাদ যথাস্থানে আসিবে) শকুন্তলা গান্ধর্ব্ব বিবাহের কথা ইতিহাসে শুনিয়াছিল সুতরাং উহার বৈধতা-বিষয়ে তাহার একটুও সংশয় ছিল না, এবং রাজা যখন তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, তিনি তাহাকে অচিরাৎ অন্তঃপুরের গৃহিনী করিবেন তাহাতেও তাহার একটুও সংশয় হয় নাই—সুতরাং দাম্পত্য-প্রেমের বিধান অনুসারে বিচার করিলে না রাজাকে না শকুন্তলাকে উভয়ের কাঁহাকেও কোন অংশে দোষী করা যায় না। কণ্বমুনির চরিত্র যেমনটি হইতে হয় তাই—তিনি অরণ্যবাসী তপস্বী কিন্তু তাঁহার হৃদয় অতি অমায়িক, প্রশস্ত, স্নেহ-মমতায় পরিপূর্ণ; তিনি সংসারের সকলই তুচ্ছ করিয়াছেন, অথচ সকলেরই প্রতি তাঁহার প্রাণের টান বিলক্ষণ দেখা গিয়াছে; মারীচমুনি এবং কণ্বমুনি দোঁহার সহিত দোঁহার তুলনায় উভয়ের গুণ বৈপরীত্য-বশতঃ উভয়েরই সৌন্দর্য্য স্পস্টরূপে ফুটিয়া বাহির হয়; এতদ্ব্যতীত শার্ঙ্গরব বলো, শারদ্বত বলো, রাজার শ্যালক নগরপাল বলো, একজনও কু-অভিবন্ধির লোক নহে;

ধর্ম্মের তপোবন, ধর্ম্মের রাজ্য, ধর্ম্মের সংসার, দুষ্মন্তরাজা রাজধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্ এবং শকুন্তলা মূর্ত্তিমতী সৎক্রিয়া, এমনি যে—তাহার গুণে প্রথমতঃ তপোবনের সখীদিগের সরস সখ্যালাপ, দ্বিতীয়তঃ অতবড় রাজার আশ্রমবাসিনী সখীদের নিকট অতদূর নীচু হওয়া, তৃতীয়তঃ শকুন্তলা-বিরহে রাজার রাজকার্য্যে অপ্রবৃত্তি—ইত্যাদি-সমুদয় অশাস্ত্রীয় কাজগুলিও উল্‌টো আরো পবিত্র মাধুর্য্য ধারণ করিয়াছে; সখীদিগের ধর্ম্ম-জ্ঞান থাকাতেই তাহাদের সরস সখ্যালাপের মধ্যে কু কোন কিছু প্রবেশ করিতে পারে নাই, তপোবনের প্রতি রাজার অসাধারণ শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকাতেই সেখানে রাজার হেঁট মস্তক সুন্দর শোভা পাইয়াছে, এবং রাজকার্য্যে রাজার অপ্রবৃত্তি হইলেও তিনি প্রকারান্তরে কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহের ত্রুটি করেন নাই ইহাতে তাঁহার মহৎ প্রকৃতি আরো জাজ্বল্যরূপ ধারণ করিয়াছে। এইরূপ যেখানে—সেখানে ইয়াগোর ন্যায় একটা ঘোর নারকীকে আনিয়া দাঁড় করাইলে কি যে এক অদ্ভুত কাণ্ড করা হয় তাহা আর বলিবার নহে। সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে যে, সমালোচ্য নাটক-খানি কিভাবের নাটক—তাহার অঙ্গ-বিশেষ কিরূপ হওয়া উচিত তাহার বিচার পরে; যদি নাটক হস্তীর মত হয় তবে তাহার গজ-দন্ত না থাকিলে তাহার মুখে গজ দন্ত বসাইয়া দেও, সে অতি উত্তম কাজ; কিন্তু নাটক যদি অশ্বের মত হয় তবে তাহার দন্ত-গুলি ভাঙিয়া ফেলিয়া তাহার পরিবর্ত্তে বৃহৎ দুইটা গজদন্ত বসাইয়া দিলে তাহা কেবল যন্ত্রণারই কারণ হয়। পুনশ্চ, সে-কালের কালিদাস যেন দুর্ব্বাসার শাপের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন, একালের আর কোন বড় নাটককার কি সেরূপ কোন অলৌকিক ক্ষমতার সহায়তা গ্রহণ করেন নাই? সেক্সপিয়র্ কি করিয়াছেন? প্রস্পেরো আপনার মন্ত্র-বিদ্যা-বলে ফর্ডিনাণ্ড এবং মিরাণ্ডাকে পরস্পরের প্রেম-পাশে বদ্ধ করিতে পারিলেন—আর দুর্ব্বাসা শাপ-দ্বারা রাজার স্মৃতি-রোধ করিতে পারিবেন না?—বড় বড় কবিরা ওরূপ যে করেন, তাহা কি অক্ষমতাবশতঃ না তাহার আর কোন অর্থ আছে—এটাও ত একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। কালিদাস রাজার স্মৃতি-ভ্রংশ মহাভারত হইতে পাইয়াছেন, কিন্তু কালিদাসের দুষ্মন্তও মহাভারতের দুষ্মন্ত নহে, কালিদাসের শকুন্তলাও মহাভারতের শকুন্তলা নহে; কালিদাসের ভাবনা এই যে, দুষ্মন্তের মহৎ চরিত্র, তপোবনের বন্য সরল ভাব, এবং আর আর দেশ কাল পাত্র অবস্থার সঙ্গে ঠিক্ সংলগ্ন হইবে অথচ দুষ্মন্তের স্মৃতি-ভ্রংশ হইবে—এই বিষম সমস্যাটি কিসে পূরণ হয়; কোন দুষ্ট ব্যক্তির কল-কৌশলে রাজার স্মৃতি-ভ্রংশ করা একটা কিম্ভূত ব্যাপার, তাহাতে আবার শকুন্তলা যে ভাবের নাটক তাহাতে চানক্যের মত দুষ্ট লোক তাহার ত্রিসীমাতেও পদার্পণ করিবার যোগ্য নহে, এরূপ স্থলে দুর্ব্বাসার শাপকে আনা যে, কত ক্ষমতার কার্য্য তাহা বলা যায় না; ঐ একটিতে করিয়া সকল দিক

রক্ষা পাইয়াছে,—তপোবনের তপোবনত্ব, রাজার মহত্ব, মহাভারতের আখ্যায়িকা, শকুন্তলার প্রেমাতিশয্য, সখীদের শকুন্তলা-গত-প্রাণ সখীত্ব, এত গুলি যে কেবল রক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে—অতি সুন্দর রূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। সেক্স্পিয়রের টেম্পেস্টে ইয়াগোর মত ষড়-যন্ত্র নাই বলিয়া কি টেম্পেস্ট্ ওথেলো-অপেক্ষা নিকৃষ্ট? বরং সেক্স্পিয়র প্রস্পেরোর সহায়তা ব্যতিরেকেও তাঁহার নায়ক-নায়িকার মনে প্রেমোদ্দীপন করিতে পারিতেন—কিন্তু কালিদাস যাহা করিয়াছেন কাহারো সাধ্য নাই যে,তাহার পরিবর্ত্তে আর একটি-কোন-কিছু স্থাপন করেন। মহাভারতের আখ্যায়িকার গল্পাংশটির উপর কালিদাস হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না, তাহার কোন অংশ ছাঁটিয়া ফেলিতেও পারেন না, কিন্তু তাহাকে চাই বাড়া'ন, চাই তাহার ভাব পরিবর্ত্তন করুন—তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে এবং তাহাই তিনি করিয়াছেন। বাড়াইবার অধিকার আছে কেন—না মহাভারত দুষ্মন্তের জীবনের সকল বৃত্তান্ত বলেন নাই, যাহা তিনি বলেন নাই তাহা আর এক জন বলিলে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায় না, আখ্যায়িকার ভাব-পরিবর্ত্তনে অধিকার আছে কেন—না মহাভারতের মূল কথাটি বজায় রাখিয়া যিনি যে ভাবে তাহা দেখুন বা বলুন না কেন তাহাতেও মহাভারতের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায় না, কিন্তু মহাভারতে যেখানে আছে স্মৃতিভ্রংশ আর এক জন যদি সেই খানে তাহার পরিবর্ত্তে ক্রোধান্ধতা বা অন্য কোন কিছু বসা'ন তাহা হইলে মহাভারতের প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। মিল্টন বাইবেলের সয়তানের যার পর নাই ভাব-পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এবং আদমের সহিত গেব্রিএল প্রভৃতির কথোপকথন যাহা বাইবেলে নাই তাহাও তিনি আপনার পুস্তকে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু বাইবেলের একটা কোন বৃত্তান্তের পরিবর্ত্তে আর একটা বৃত্তান্ত তিনি কোথায় বসাইয়াছেন দেখাইয়া দেও। অলৌকিক ফলভক্ষণের পরিবর্ত্তে তিনি আর একটা এমন উপন্যাস সাজাইতে পারিতেন যাহাতে আদম ঈশ্বরের কোপে পড়েন অথচ অলৌকিক কোন কিছুর সহিত তাঁহার সম্পর্ক না থাকে—কিন্তু খ্রীষ্টান হইয়া তিনি তাহা করিবেন কেন? ঐ কারণেই কালিদাস হিন্দু হইয়া মহাভারতের আখ্যায়িকার কোন অংশ পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই,—পারিয়াছেন কেবল ভাব-পরিবর্ত্তন করিতে এবং বাড়াইতে। অতএব কালিদাস দুষ্মন্ত রাজার স্মৃতি-ভ্রংশের পরিবর্ত্তে আর কোন কিছু বসাইতে পারেন না,—এই গেল এক কথা, আর এক কথা এই যে, কাহারো বিপক্ষে সহস্র ষড়-যন্ত্র করিলেও তাহার স্মৃতি-ভ্রংশ সম্ভবে না, তবে যদি কোন শত্রু-পক্ষীয় লোক গুপ্ত-ভাবে রাজাকে কোন মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া তাঁহার স্মৃতি-সংহার করে, তাহাই যা' এক হইতে পারে, কিন্তু রাজার স্মৃতিসংহার করিবার জন্য

ওরূপ উপায় অবলম্বন করা একটি অতি হাস্যজনক ব্যাপার,—এরূপ স্থলে দুর্ব্বাসার শাপ যে কি লগ্ন-মাফিক আসিয়াছে তাহা বলা যায় না; বিশেষত শকুন্তলার অন্য-মনস্কতা কবিত্ব-রসে পরিপূর্ণ। নাটকের প্রধান গুণ যেটি—যাহাতে সহজে বড় কবি ছোট কবি ধরা পড়ে—সেটি কি? না আগা গোড়া চরিত্র ঠিক রাখা; সেই উদ্দেশেই কালিদাস দুর্ব্বাসার শাপের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন—তাহাতে আ-খ্যায়িকার বিশেষ কিছু চমৎকারিতা বাড়ে নাই—কেবল কবিত্ব-শক্তির একশেষ প্র-কাশ পাইয়াছে।

"আখ্যায়িকার চমৎকারিত্ব" এই যে একটি ধুয়া লেখক ধরিয়াছেন, ইহা ক্রমা-গতই চলিয়াছে। লেখক বোধ হয় নবে-লের বিশেষ এক জন অনুরাগী,—ভাবের উচ্ছ্বাস কবিতা-মাধুর্য্য ইত্যাদি অপেক্ষা আখ্যায়িকার মনোহারিত্ব তিনি কিছু বেশী বোঝেন,—কিন্তু যাঁহারা শকুন্তলা নাটকের প্রকৃত চমৎকারিত্ব হৃদয়ঙ্গম করেন তাঁহারা আখ্যায়িকার গুণপনার দিকে ভ্রুক্ষেপও করেন না, শকুন্তলা পাঠ করিতে করিতে তাঁহাদের মনে আশ্চর্য্য এক ভাবের ফোয়ারা খুলিয়া যায়; গেটের মনে কিরূপ ভাবের ফোয়ারা খুলিয়া গিয়াছিল তাহা কাহারো অবিদিত নাই; গেটের ন্যায় কবিতা-সমালোচক ক-জন আছে—তিনি যেমন কবিদিগের মধ্যে এক জন শ্রেষ্ঠ কবি, তেমনি প্রকৃত কবিদিগের এক জন প্রধান গুণ-গ্রাহী, তিনি যেমন রত্ন তেমনি জহরী—তাঁহারই লেখনী-প্রসাদাৎ সেক্‌স-পিয়রের হ্যামলেটের অসাধারণ কবিত্ব সম্যক প্রকারে জন-সাধারণের চক্ষে পড়ে; সেক্‌স-পিয়রের যেমন গেটে কালিদাসের তেমনি একজন সমালোচক হইলে তবেই ঠিক মানায়। বোধ হয় লেখক সেক্‌সপিয়রের রুদ্ররসাত্মক নাটককে (Tragedyকে) আদর্শ করিয়া শকুন্তলার বিচার করিয়াছেন, তাই তিনি শকুন্তলাতে কিছুই চমৎকারিত্ব (অর্থাৎ গুরুতর ঘটনার লোমহর্ষণ ব্যাপার) আদ-বেই খুঁজিয়া পা'ন নাই। এ জ্ঞান তাঁহার নাই যে, রুদ্র-রসাত্মক নাটক এবং শান্তি-রসাত্মক নাটক দুয়ের অবয়ব ঠিক একই প্রকার হইতে পারে না। ঘটনা-সকলের ক্রম-পরিপাক বশতঃ দারুণ এক রুদ্রকার্য্যে তাবতের পরিসমাপ্তি এ যে একটি ব্যাপার—যাহা ম্যাগবেথে বা ওথেলোতে ভয়ানকরূপে দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা টেম্পেটের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না—তবে আর টেম্পে-ষ্টের কবিত্ব কবিত্বই নহে—অবাক্ কাণ্ড! ওথেলো বা ম্যাকবেথের কার্য্যাবলীর অলক্ষিত-অথচ-অব্যর্থ-গতি নিদারুণ পরি-পাক যেমন একটি গুণ, শকুন্তলার প্রশান্ত সরল মাধুর্য্য এবং সৌন্দর্য্য তেমনি একটি গুণ, যবা-ফুলের রক্তবর্ণ যেমন একটি গুণ, গোলাব ফুলের পাটল বর্ণ তেমনি একটি গুণ, দোষ কোনটিই নহে; গায়ে রক্ত মাখিয়া যবা-ফুলের মত হওয়া গোলাব-ফুলকে শোভা পায় না; মিরাণ্ডা বরং কাটের বোঝা বহন করিতে পারে, কিন্তু ওথেলোর ন্যায় ঈর্ষার ভার, এবং ম্যাক্‌বে

থের ন্যায় দারুণ হত্যাকাণ্ডের ভার বহন করা তাহার কার্য্য নহে। আর একটা দেখিতে হইবে এই যে, মিথ্যা বলিলে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য আর দশটা মিথ্যা বলা আবশ্যক হয়—কুকার্য্য-মাত্রই এইরূপ; তাহার সাক্ষী ম্যাক্‌বেথের খুনাখুনি ব্যাপার; তেমনি আবার একটা দারুণ দুষ্কর্ম্ম করিতে গেলে কতদিক না সামলাইয়া চলিতে হয় ও আপনার অভিসন্ধি গোপন করিবার জন্য কত না আয়াস পাইতে হয়; দেখ আইয়াগো কত চেষ্টার পর তবে আপনার দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিল; অতএব ইহা বলা বাহুল্য যে, দারুণ দুষ্কর্ম্মের পরিণাম এবং "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি" দেখানো যে নাটকের উদ্দেশ্য তাহাতে ঘটনার গতি-বৈচিত্র্য অলঙ্ঘনীয় কিন্তু মনুষ্যের ভালোর দিকটা দেখানো যে নাটকের উদ্দেশ্য তাহাতে ওরূপ ঘটনার জটিলতা কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না; মিথ্যাকেই ডালপালা দিয়া সাজাইতে হয়—সত্যকে নহে,মনুষ্যের মন্দের দিক দেখাইতে গেলেই একটা কুকার্য্যকে বাঁচাইবার জন্য আর দশটা কুকার্য্য আবশ্যক হয়, এবং পরিশেষে ঐরূপ-সমস্ত কার্য্য চারিদিক হইতে ঘনীভূত হইয়া মহা এক দারুণ কার্য্যে পরিণত হয়। কিন্তু মনুষ্যের ভালোর দিক্ দেখাইতে গেলে অমন-ধারা ঘন-ঘটা আড়ম্বরের আবশ্যক হয় না। শকুন্তলা যদি ম্যাক্‌বেথ এবং ওথেলোর মত কুটিল ষড়যন্ত্রে পূর্ণ হইত তবে শকুন্তলা-নাটকের শকুন্তলাত্ব ঘুচিয়া যাইত। একটা উপবনে প্রবেশ করিয়া কেহ যদি বলেন যে, এস্থানের একটি প্রধান দোষ এই যে,শ্মশানে যেমন শকুনিরা মাংস ছেঁড়াছিঁড়ি করে এখানে সেটি নাই, তবে তিনি যেমন রসজ্ঞ ও ভাব-গ্রাহী—কালিদাসের শকুন্তলার মধ্যে আইয়াগোর মত লোক দেখিতে না পাইয়া যিনি ক্ষুব্ধ হ'ন তিনি তাঁহা-অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। লেখক যে দুটি বিষয়কে শকুন্তলার বিশেষ দোষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, উভয়ই টেম্পেস্টে দেদীপ্যমান রহিয়াছে—সে দুটি বিষয় কি? না অলৌকিক ক্ষমতা দ্বারা ঘটনা-বিশেষ উৎপাদন করা এবং আখ্যায়িকাতে গল্পচাতুরী না থাকা। সমালোচকের নূতন দণ্ড-বিধি অনুসারে নাটকের দোষ গুণ বিচার করিতে গেলে টেম্পেস্টকে আকাশ হইতে পাতালে নিক্ষেপ করিতে হয়; ভাবুক ব্যক্তিরা যে রত্নটি সেক্‌সপিয়রের মুকুট-শোভী বলিয়া জানেন তাহাকে সেক্‌সপিয়রের পাদুকাতলেরও অনুপযুক্ত বলিতে হয়। টেম্পেস্ট যেরূপ একটি সাদা সীদা গল্প তাহাতে সমালোচক সচ্ছন্দে বলিতে পারেন;—ফর্ডিনাণ্ড সুন্দরী যুবতী মিরাণ্ডাকে দেখিয়া প্রেম-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া গেলেন ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই, তাহাতে আবার প্রস্পেরোর যাদু-বিদ্যা তাহাদের উপর কার্য্য করিয়াছে! দুর্ব্বাসা রাগের মাথায় একটা শাপ দিয়া বসিলেন—কিন্তু প্রস্পেরো সজ্ঞান অবস্থায় কেবল যাদুই করিতেছেন যাদুই করিতেছেন—আর তাঁহার কোন কর্ম্ম কাজ নাই। ক্যালিবান্ একটা ডাইনের ছেলে—

সে যে অমন-ধারা বন্য কুৎসিৎ এবং হিংসা-পরায়ণ জীব হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই; আর কতক-গুলা নিম্ন-শ্রেণীর লোক যে মাতলামি করিবে ইহা-তেও আশ্চর্য্য কিছুই নাই; আর এরিয়েল যদিও আশ্চর্য্য একটা পদার্থ বটে কিন্তু সে দুর্ব্বাসার ন্যায় অলৌকিক ক্ষমতা-শালী—যাহা মনে করে তাহাই করিতে পারে, সুতরাং তাহার পরিবর্ত্তে আইয়াগো প্রভৃতির ন্যায় নৈসর্গিক কোন কিছু কল্পনা করিলেই ভাল হইত। আর কুচ-রিত্র ব্যক্তি সুযোগ পাইয়া রাজ্য এবং ঐশ্ব-র্য্যের লোভে ভ্রাতৃ-হত্যা করিবে ইহাতেও আশ্চর্য্য কিছুই নাই। আর গঞ্জালো ত এক জন গরিব বেচারা ভাল মানুষ তাহার চমৎকারিত্ব কিছুই নাই,—অতএব হুকুম হইল যে টেম্পেস্ট-নাটককে চারি শ্রেণী নীচে নাবাইয়া দেওয়া যায়—শকুন্তলা অ-পেক্ষাও এক শ্রেণী নীচে। ইহার পর আসিতেছে—নাটকীয় ব্যক্তিগণের চরিত্র।

পুরুষোত্তম।

"কবিঃ প্রবর্য্যোঽমর-পার্থিবাচ্চ
পূজ্যোপিভূপাদমরোপি দেবাৎ।
কবেশ্চরিত্রং সুখদং সুরাণাং
সম্মান-শিক্ষা-প্রতিভা-প্রবৃদ্ধং॥"

শাব্দিক-প্রধান মহাত্মা পুরুষোত্তম দেব ত্রিকাণ্ড-শেষ, হারাবলী প্রভৃতি সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন করিয়া ভারতীয় সাহিত্য-সংসারে কয়েকটী অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হারাবলী ও ত্রিকাণ্ড-শেষ;—অমর, মেদিনী, বিশ্ব প্রভৃতি কো-ষের ন্যায় বিখ্যাত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন ঐ সুপ্রসিদ্ধ কোষদ্বয়ের প্রণেতার নাম জিজ্ঞাসা করিলে শীর্ষস্থানীয় বুধ-মণ্ড-লীর মধ্যেও অনেকে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন। ইহার প্রধান কারণ পুরুষোত্তমের গ্রন্থাবলীর দুষ্প্রাপ্তি ও ঐতিহাসিক চর্চ্চার অভাব। এতন্নিবন্ধনই অনেকে ত্রিকাণ্ড-শেষের প্রণেতার নাম "অমরসিংহ" বলিতে কিঞ্চিন্মাত্রও সঙ্কুচিত হয়েন না। কিন্তু যাঁহারা ত্রিকাণ্ড-শেষের প্রথম পৃষ্ঠার দুই চারি পংক্তিও দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা একথা বলিতে কদাপি সাহসী হইতে পারেন না। ত্রিকাণ্ড-শেষের সূচনা-স্থলে স্পষ্টতঃ লেখা আছেঃ—

"অলৌকিকত্বাদমরঃ স্বকোষে
ন যানি নামানি সমুল্লিলেখ।
বিলোক্য তেষামধুনা প্রচার-
ময়ং প্রযত্নঃ পুরুষোত্তমেন। ২

বর্গক্রমস্তথানাম-

লিঙ্গয়োস্তূপদেশতঃ।

পরিভাষাদিকং সর্ব্ব-

মত্রাপ্যমরকোষবৎ। ৩

অর্থাৎ—অলৌকিকতা (অপ্রচলিত ?) জন্য যে সকল নামাদি অমর সিংহ স্বকোষে উল্লেখ করেন নাই অধুনা তাহাই অনুসন্ধান করিয়া পুরুষোত্তমের প্রযত্নে এই গ্রন্থ (ত্রিকাণ্ড-শেষ) প্রচারিত হইল। আর ইহাতে বর্গক্রম, নাম, লিঙ্গ, পরিভাষাদি সকলই অমরকোষের ন্যায় ব্যবহৃত হইল।

ইহা দ্বারা এই জানা গেল যে ত্রিকাণ্ড-শেষের প্রণেতার নাম পুরুষোত্তম,—অমর সিংহ নহে। তবে ত্রিকাণ্ড-শেষ যখন অমরকোষের অভাব পূরণ করিবার জন্য বিনির্ম্মিত হইয়াছে অথচ অমরসিংহের উল্লিখিত নামাবলী প্রায় অনেক স্থলেই পুনরুল্লেখ হয় নাই; তখন ইহাকে অমর-কোষের পরিশিষ্ট বলিতে হয়। বাস্তবিক দূরদর্শী পণ্ডিতদের মধ্যে ত্রিকাণ্ডশেষ অমরকোষের পরিশিষ্ট বলিয়াই বিখ্যাত। এবং ত্রিকাণ্ডশেষ-প্রণেতার যে তাহাই উদ্দেশ্য উল্লিখিত শ্লোকদ্বয় পাঠ করিলে তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়।

আর "ত্রিকাণ্ড শেষ" এই নামটীও সেই কথার প্রমাণ করিতেছে। কেন না অমর-কোষ তিন কাণ্ডে বিভক্ত। স্বর্গবর্গ হইতে পাতালবর্গ পর্য্যন্ত—প্রথম কাণ্ড। ভূমি-বর্গ হইতে শূদ্রবর্গ পর্য্যন্ত—দ্বিতীয় কাণ্ড। আর বিশেষ্যনিঘ্ন বর্গ হইতে লিঙ্গাদি সংগ্রহ বর্গ পর্য্যন্ত,—তৃতীয় কাণ্ড। ত্রিকাণ্ড-শেষের কাণ্ডবিভাগও ঠিক অমরকোষের ন্যায়। তিন কাণ্ড অমরকোষের শেষ (পরি-শিষ্ট) এই অর্থেই যে "ত্রিকাণ্ড-শেষ" নাম হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ।

অমর-কোষের প্রকৃত নাম যে—"নাম-লিঙ্গানুশাসন" তাহা অনেকেই জানেন। পুরুষোত্তমও ত্রিকাণ্ড-শেষের প্রত্যেক বর্গের সমাপ্তিস্থলে লিখিয়াছেন—

"ইতি পুরুষোত্তম দেবকৃতে

নামলিঙ্গানুশাসনে

ত্রিকাণ্ডশেষে

* * বর্গঃ

সমাপ্তঃ।"

অতএব ত্রিকাণ্ড-শেষ-প্রণেতা পুরুষোত্তম যে সুবিখ্যাতনামা অমরসিংহ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি তাহাতে আর একটুকুও সন্দেহ নাই।

পুরুষোত্তমের বিষয় অধিক কিছুই জানিবার উপায় নাই; এমন কি তিনি কোন্ সময়ে ভারতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডার অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন তাহা নির্দ্ধারণ করাও বড় সহজ ব্যাপার নহে। পুরুষোত্তম হারাবলীর উপসংহার-স্থলে লিখিয়াছেনঃ—

"শব্দার্ণবউৎপলিনী

সংসারাবর্ত্ত ইত্যপি।

কোষা বাচস্পতিব্যাড়ি-

বিক্রমাদিত্যনির্ম্মিতাঃ॥

আদায় সারমেতেভ্যো-

মনোযাঙ্ক বিশেষতঃ।

হারাবলী নির্ম্মিতেয়ং
ময়া দ্বাদশবৎসরৈঃ॥"

অর্থাৎ—শব্দার্ণব, উৎপলিনী সংসারাবর্ত্ত এবং বাচস্পতি, ব্যাড়ি ও বিক্রমাদিত্য-প্রণীত কোষাদি বিশেষতঃ অন্যান্য গ্রন্থাদির সার সংগ্রহ করিয়া আমা কর্ত্তৃক দ্বাদশ বৎসরে এই হারাবলী নির্ম্মিত হইল।

ইহার মধ্যে বাচস্পতির সময় নির্ণয় করা বড় কঠিন ব্যাপার নহে। ভারতবর্ষে ন্যায়-দর্শন শাস্ত্রের উন্নতিবর্দ্ধক বাচস্পতি মিশ্র ব্যতীত অন্য কোন বাচস্পতি দেখা যায় না। এই বাচস্পতি-কৃত "ন্যায়-বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-টীকা" শঙ্করাচার্য্যের বেদান্তসূত্রের "ভামতি" নাম্নী টীকা, সাঙ্খ্য-তত্ত্ব-কৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থ আছে*। আমরা "উদয়নাচার্য্য" শীর্ষক প্রস্তাবে বাচস্পতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি, সুতরাং এস্থলে অধিক কিছু বলিব না। বাচস্পতিকে কাউয়েল সাহেব খৃঃ দশম শতাব্দীর লোক বলিয়াছেন। আবার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি সাঙ্খ্য-তত্ত্ব-কৌমুদীর ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন, "বাচস্পতি মিশ্র কৃত, শ্রীহর্ষ-প্রণীত "খণ্ডন খণ্ড খাদ্যের" "খণ্ডনোদ্ধার" নামক একখানা প্রত্যুত্তর স্বরূপ গ্রন্থ আছে। "খণ্ডনকার শ্রীহর্ষ খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। এই শ্রীহর্ষ উদয়নাচার্য্যের কুসুমাঞ্জলির শ্লোক খণ্ডন খণ্ড খাদ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন। খণ্ডনখণ্ড-খাদ্যের প্রতিবাদ করিয়া আবার বাচস্পতি খণ্ডনোদ্ধার প্রণয়ন করিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য আবার বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায় বার্ত্তিকতাৎপর্য্য-টীকার "ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। সুতরাং এখন স্পষ্টতঃ দেখিতে পাওয়া যায় শ্রীহর্ষ, উদয়ন এবং বাচস্পতি; ইঁহারা তিন জনই সমসাময়িক লোক†।" যদি অধ্যাপক তর্কবাচস্পতি মহোদয়ের কথার অকাট্য প্রমাণ থাকে তবে উল্লিখিত যুক্তির বলে বাচস্পতিকে শ্রীহর্ষ উদয়ন প্রভৃতির সমকালবর্ত্তী অর্থাৎ খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক বলিতে হয়। মাধবাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্রকে সুবিশ্রুত নামা শঙ্করাচার্য্যের (খৃঃ নবম শতাব্দীর প্রারম্ভের) অনেক পরবর্ত্তী লোক জানিতেন। সুতরাং কাউয়েল সাহেবের আনুমানিক সময় অপেক্ষা বাচস্পতিকে পরবর্ত্তী লোক বলিয়া বোধ হয়। এই জন্যই তাঁহাকে উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির সমসাময়িক নির্দ্দেশ করিতে নিতান্ত সন্দিহান হই না।

যখন পুরুষোত্তম দেব বাচস্পতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন তখন তিনি নিশ্চয়ই খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী লোক।

এ দিকে মেদিনীকোষ-প্রণেতা মেদিনীকর পুরুষোত্তমের ত্রিকাণ্ডশেষ এবং হারা-

* ভামতি নাম্নী টীকায় বাচস্পতি কৃত গ্রন্থাবলীর তালিকা আছে।

† ভারতী, তৃতীয় খণ্ড ২৪৭ পৃ, উদয়নাচার্য্য শীর্ষক প্রস্তাব।

বলীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং পুরুষোত্তমকে মেদিনীর পূর্ব্ববর্ত্তী এবং বাচস্পতির পরবর্ত্তী বলিতে হয়। এক্ষণে আমরা মেদিনী সম্বন্ধে কিছু বলিয়া লইঃ—

জনৈক কৃতবিদ্য মহাত্মা বলেনঃ—"কয়েকটী নিশ্চয় যুক্তি দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে বিশ্বপ্রকাশ-প্রণেতা মহেশ্বর আচার্য্য খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন। আর মুকুট,—পূর্ণাবয়ব রায় মুকুটমণি-উপাধিক বৃহস্পতি, তাঁহার কৃত পদচন্দ্রিকা নামক অমরকোষের উৎকৃষ্ট টীকা ৪৫৩২ কলিগতাব্দে (যাহার সহিত ১৪৩০ খৃষ্টাব্দের ঐক্য আছে ‡) প্রণয়ন করেন। মেদিনীকর তাঁহার গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে বিশ্বপ্রকাশের নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি রায়মুকুট কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছেন। অতএব আমরা মেদিনীকরের সময় নির্ণয় জন্য মহেশ্বর এবং রায়মুকুটের মধ্যে তিন শতাব্দী প্রাপ্ত হই।

যদি আমরা তাঁহাকে গোবর্দ্ধন আচার্য্য (যাঁহাকে তিনি উপসংহার-স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন) এবং রায়মুকুটের মধ্য স্থলে স্থান দিই তবে সন্ধিস্থল আরো সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। যে সময় গোবর্দ্ধনাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হয়েন তাহা প্রায় খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের সন্নিকটবর্ত্তী বলিয়া নিরূপিত। অতএব আমরা যদি তাঁহার (মেদিনীর) সময় ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যে নির্দ্ধারণ করি, তবে বড় অন্যায় হইবে না।" §

প্রোক্ত লেখক আর্য্যসপ্তশতীর প্রস্তাবনার মত গ্রহণ করিয়া গোবর্দ্ধনকে খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এস্থলে কিছু প্রমাদ লক্ষিত হয়। কেন না, গোবর্দ্ধন মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভার পঞ্চ রত্নের অন্যতম রত্ন ছিলেন। অধিকাংশ সুপ্রসিদ্ধ লেখকদের মতে লক্ষ্মণসেন ১১০১ হইতে ১১২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং গোবর্দ্ধনকে বিশ্বপ্রকাশ-প্রণেতা মহেশ্বর আচার্য্যের সমসাময়িক বলিতে হয়। যাহা হউক, আমরা যদি মেদিনীকরকে মহেশ্বর এবং গোবর্দ্ধনের পরবর্ত্তী এবং রায়মুকুটকে বৃহস্পতির এক শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধের লোক বলি তবে উল্লিখিত মহাত্মার যুক্তির সহিত কিছুই মতভেদ হয় না।

এক্ষণে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে পুরুষোত্তম দেবকে খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর পরার্দ্ধের লোক বাচস্পতি এবং খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধের লোক মেদিনীকরের সময়ের সন্ধিস্থলে স্থান দিতেছি। অতএব অধিক প্রমাদ আশঙ্কা না করিয়া শাব্দিক-প্রধান পুরুষোত্তম দেবকে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগের লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম।

‡ Colbrook Essays; Asiatic reserches. Vol. V11 P 215,

§ Preface to the Medine by Som Nath mukharje 1869.

পুরুষোত্তমের নামের অন্তে "দেব" উপাধি দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে কায়স্থ মনে করিতে পারেন। বাস্তবিক তাহা নহে। ইনি দেব উপাধিধারী অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) ছিলেন। বৈদ্য বংশীয় মহাত্মাগণ আধুনিক বঙ্গীয় সংস্কৃতসাহিত্যের বিলক্ষণ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অসংখ্য বৈদ্য গ্রন্থকারগণ বহু গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রেতেও বহু বৈদ্য গ্রন্থকার আছেন। বোপদেব শ্রীপতি বিশ্ব প্রণেতা মহেশ্বর, মেদিনীকর, বিশ্বনাথ কবিরাজ, প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থকারগণ সকলেই বৈদ্য। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ হইতে বৈদ্যগ্রন্থকারের সংখ্যা কম নহে। কিন্তু কায়স্থদের প্রণীত কয়খানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে? যাঁহারা পুরুষোত্তমকে কায়স্থ করিবার জন্য লালায়িত আমরা তাঁহাদের কথা সমাদর করিতে একটুকুও সাহসী হই না। বৈদ্যকুলে দেববংশে ঈশানদেব প্রভৃতি অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন আয়ুর্ব্বেদ-টীকাকার ছিলেন। বিশেষতঃ পুরুষোত্তম যে সময়ের লোক সে সময়েই বৈদ্যগ্রন্থকারগণ বঙ্গদেশকে সংস্কৃত গ্রন্থাদি দ্বারা প্লাবিত করিয়াছিলেন। এই জন্যই মহামহোপাধ্যায় পুরুষোত্তম দেবকে অম্বষ্ঠ বংশীয় বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি হইতেছে।

পুরুষোত্তম যে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন নিম্নে তৎ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুই একটী বিবরণ লিখিতেছি।—

ক। ত্রিকাণ্ডশেষ। ত্রিকাণ্ডশেষের বিবরণ পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। এখানি অমরকোষের পরিশিষ্ট। সমুদয় গ্রন্থ ১০৩২ শ্লোকে সমাপ্ত হইয়াছে। এখানি হেমচন্দ্রের অভিধানের ন্যায় বিশেষ উপাদেয় গ্রন্থ।

খ। হারাবলী। হারাবলী ২৭৮ শ্লোকে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি এক সুন্দর অভিনব নিয়মে রচিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে এক একটী শব্দের নামাবলী ঠিক এক একটী শ্লোকে সমাপ্ত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের নাম "শ্লোকাবধি।" দ্বিতীয় অধ্যায়ের এক একটী শব্দের নামাবলী ঠিক এক একটী অর্দ্ধ শ্লোকে শেষ হইয়াছে। এই অধ্যায়ের নাম "অর্দ্ধশ্লোকাবধি।" তৃতীয় অধ্যায়ের নাম "পাদাবধি"। এই অধ্যায়ে এক একটী শব্দের নামাবলী ঠিক এক একটী পাদে (শ্লোকের চতুর্থাংশে) শেষ হইয়াছে। অতঃপর চতুর্থ অধ্যায়ে নানার্থ (Dictionary of Homonymous words) লেখা হইয়াছে। এই চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমার্দ্ধ পূর্ব্বোক্ত অর্দ্ধশ্লোকাবধি প্রণালীতে এবং পরার্দ্ধ সাধারণ নিয়মে লেখা হইয়াছে। তথাহিঃ—

অব্যাধশব্দতঃ শ্লোকৈ
রর্দ্ধৈরাতলিনান্ততঃ।
শব্দাঃ পাদৈর্ব্বিবোদ্ধব্যাঃ
প্রাগনেকার্থতস্ততঃ॥

(সূচনা—হারাবলি)

এই অভিধান খানি পর্য্যায়-বিভাগের সুনিয়ম থাকাতে বুঝিবার পক্ষে অতি সহজ হইয়াছে। হারাবলি অল্পের মধ্যে একখানি

অত্যুৎকৃষ্ট অভিধান। বোধ হয় হারাবলিই পুরুষোত্তম দেবের সর্ব্ব প্রথম অভিধান।

(গ) "একাবলিকোষ"। এই কোষ ক, খ. হইতে হ, ক্ষ * প্রভৃতি ৩৪ চৌত্রিশটী ক্রমপঠিত বর্ণের প্রত্যেক বর্ণ শুধু এক এক স্বরবর্ণ-যোগ করিয়া তাহার অর্থ লেখা হইয়াছে। একাবলি-কোষ ৫৪ শ্লোকে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার প্রথম শ্লোকে লেখা আছেঃ—

ধ্যাত্বা বিশ্বস্য ধাতারং
পাতারং পুরুষোত্তমং।
পঙ্ক্তেন ক্রিয়তে কোষো
বিহায় পুরুষোত্তমং।

(ঘ) একাক্ষরা-কোষ। একাক্ষরা কোষ ঠিক একাবলী-কোষের নিয়মে বিরচিত হইয়াছে। এখানিকে একাবলী-কোষের পরিশিষ্ট বলিতে হয়। কেন না ইহাতে কেবল একাবলী-কোষের অভাব পুরণ হইয়াছে অথচ একাবলীতে যে অক্ষরের যেরূপ অর্থ বলা হইয়াছে তাহা আর পুনরুল্লেখ হয় নাই। তবে অধিকন্তু ইহাতে অ, আ প্রভৃতি চতুর্দ্দশটী স্বর এবং অং অঃ এই দুইটী বর্ণ সহিত ষোলটী বর্ণের অর্থ লেখা হইয়াছে। ইহা ৩২টী শ্লোকে সমাপ্ত হইয়াছে †।

পুরুষোত্তম ধৃতিসিংহ এবং জনমেজয় নামক পণ্ডিতদ্বয় ও অন্যান্য বহুদর্শী পণ্ডিতদের কোষের সাহায্য লইয়া দ্বাদশ বৎসরে হারাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন। তথাহিঃ—

উপাস্য সর্ব্বজ্ঞমনন্তমীশং
ভূম্বাতিথিঃ শ্রীধৃতিসিংহবাচাম্।
হারাবলী দ্বাদশ-মাস-মানৈ * *
বিনির্ম্মিতেয়ং পুরুষোত্তমেন। ২৭৫
... ...
সুধিয়া জনমেজয়েন যত্নাদ্
ধৃতিসিংহেন সমং নিরূপিতেয়ম্।
বিদিতো বহুদৃশ্বভিঃ কবীন্দ্রৈ
র্ভূরি-কোষানুমতঃ শ্রমো মদীয়ঃ॥ ২৭৭

বোধ হয় ধৃতিসিংহ এবং জনমেজয় নামক তদানীন্তন কোন খ্যাতনামা পণ্ডিতদ্বয় পুরুষোত্তমের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

পুরুষোত্তম যে যে গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া হারাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন তাহার এক তালিকা দিয়াছেন। অনাবশ্যক বোধে উদ্ধৃত করিলাম না। ২৭৮ শ্লোক আয়তনের হারাবলী প্রণয়ন করিতে দ্বাদশ বৎসর লাগিয়াছে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব বোধ হইল। আমাদের মতে তেমন কৃতবিদ্য মহাত্মার পক্ষে এরূপ ক্ষুদ্রায়তনের গ্রন্থ

* "ক্ষ" এই সংযুক্ত বর্ণটী পুরুষোত্তম ও ব্যঞ্জন বর্ণের শেষ বর্ণরূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

† কেহ কেহ একাবলী কোষকেও একাক্ষরার পরিশিষ্ট বলিতে পারেন। সব সমান কথা।

* * কালগ্রন্থিঃ সমা সংবৎ মাস মানো যুগাং শকঃ। (হারাবলী ২৮)

অর্দ্ধ বৎসরেই বিরচিত হইতে পারে। গতিকেই ইহা পুরুষোত্তম হারাবলী প্রণয়নে প্রতি বৎসর ১৫ দিনের অধিক গড়ে কর্ত্তন করেন নি।

বলিতে গেলে পুরুষোত্তমের "ত্রিকাণ্ড শেষ" হারাবলী হইতে অনেক উচ্চ দরের গ্রন্থ। কিন্তু পুরুষোত্তম হারাবলী লইয়া অতিমাত্র গর্ব্বোক্তি করিয়াছেনঃ—

আরম্ভ স্থলেঃ—

১। মুক্তাময়াতিমধুরা মসৃণাবদাত
চ্ছায়াধিরাগ তরলামল সদ্‌গুণশ্রীঃ।
সাধ্বী সতাং ভজতু কণ্ঠমসৌ প্রিয়েব
হারাবলী বিরচিতা পুরুষোত্তমেন। ৪
২। কিংনৈব সন্তি সুধিয়ামভিধান কোষাঃ
কিন্তু প্রসিদ্ধ বিষয় ব্যবহার ভাজঃ।
গোষ্ঠীষু যাদপরমোহফলাসু কেষাং
হারাবলী ন বিদধাতি বিদগ্ধিমানং। ৫
৩। একতমেব গণয়ন্তি পরং বিদগ্ধা
বাচাং বিদগ্ধিমনিমজ্জতি যস্য লোকঃ।
গোষ্ঠীষু যঃ পরম শাব্দিক-দুর্গমাসু
দুর্ব্বোধশব্দগত সংশয় মুচ্ছিনত্তি। ৬

উপসংহার স্থলেঃ—

৪। হিত্বা মহাশাব্দিকতাভিমানং
মাৎসর্য্যমন্যত্র মুহুর্নিধায়।
হারাবলীং যঃ প্রকরোতি কণ্ঠে
বিদগ্ধগোষ্ঠীষু পরং স ভাতি॥ ২৭৮

উল্লিখিত উক্তিতে পুরুষোত্তমের সামান্য গর্ব্ব প্রকাশ পায় নাই। হারাবলী লইয়া এই রূপ গর্ব্ব করাতে গর্ব্বের গুরুত্ব রক্ষা পাইয়াছে কি না তাহা সন্দেহের বিষয়।

শ্রী যঃ

প্রেম-মরীচিকা।

(রাগিণী ঝিঁজিট খাম্বাজ।)

ও কথা বোল না তারে, কভু সে কপট নারে,
আমার কপাল-দোষে চপল সে জন!
অধীর হৃদয় বুঝি শান্তি নাহি পায় খুঁজি,
সদাই মনের মত করে অন্বেষণ।
ভাল সে বাসিত যবে করে নি ছলনা,
মনে মনে জানিত সে,সত্য বুঝি ভাল বাসে,
বুঝিতে পারে নি তাহা যৌবন-কল্পনা।
হরষে হাসিত যবে হেরিয়া আমায়
সে হাসি কি সত্য নয়?—সে যদি কপট হয়
তবে সত্য বোলে কিছু নাহি এ ধরায়!
স্বচ্ছ দর্পণের মত বিমল সে হাস—
হৃদয়ের প্রতি ছায়া করিত প্রকাশ।
তাহা কপটতাময়?—কথনো কখনো নয়,
কে আছে সে হাসি তার করে অবিশ্বাস।
ও কথা বোল না তারে,কভু সে কপট নারে
আমার কপাল-দোষে চপল সে জন,
প্রেম-মরীচিকা হেরি, ধায় সত্য মনে করি
চিনিতে পারে নি সে যে আপনার মন॥

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র।

দেখ, তোমাকে যে পত্র লিখেছি, তা' ভারতীতে আমার ইচ্ছামতে প্রকাশ করা হোয়েছে। তাতে এক জায়গায় স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমার মত প্রকাশ কোরেছিলুম, সম্পাদক মহাশয় তার বিরুদ্ধে এক নোটের বাণ বর্ষণ কোরেছেন। কিন্তু সেটা সম্পাদক মহাশয়ের লেখা কিনা, সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ বর্ত্তমান। তিনি যে সেটা লেখেন নি, তা'র প্রধান প্রমাণ হোচ্চে এই যে, সম্পাদক মহাশয়ের গাম্ভীর্য্য এতদূর বিচলিত হোতে আর কখনো দেখিনি; দ্বিতীয়তঃ যে-সকল যুক্তি প্রয়োগ করা হোয়েছে, তা' সম্পাদক মশায়ের লেখনীর অযোগ্য। খুব সম্ভব, কোন উদ্ধত যুবক সম্পাদকের ক্ষমতা নিজের তরুণ স্কন্ধে গ্রহণ কোরে ভারতীর এক কোণে অলক্ষিত ভাবে এই নোটটি গুঁজে দিয়েছেন। নোটে খোঁচা মারার প্রধান গুণ হোচ্চে যে, তা'র উত্তর দিতে বোস্‌তে প্রবৃত্তি হয় না। একটা নোটের বিরুদ্ধে "যুদ্ধং দেহি" বোলে কোমর বেঁধে আড়ম্বর করা শোভা পায় না। গোলা দিয়ে ওড়াতে এলে রীতিমত যুদ্ধসজ্জা কোর্ত্তে হয়, কিন্তু তুড়ি দিয়ে ওড়াতে এলে আর কথাটি নেই। কিন্তু নানা কারণে একটা উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হোলুম। লেখক মহাশয় আমার মুখে কতকগুলো কথা গুঁজে দিয়েছেন, যা' আমি একেবারেই বলিনি ১; তিনি কতকগুলো কথা নিয়ে অনর্গল বকাবকি কোরে গিয়েছেন যা একেবারে উত্থাপন করবারই কোন আবশ্যক ছিল না ২; তিনি অনেক জায়গায় তলোয়ার নিয়ে তুমুল আস্ফালন কোরেছেন, কিন্তু তা'র ঘা লেগেছে বাতাসের গায়ে; আবার অনেক জায়গায় তিনি আমার লেখার বিরুদ্ধে বন্দুক ছুঁড়েছেন, তার থেকে আগুনও ছুটেছে, ধোঁয়াও বেরিয়েছে, শব্দও হোয়েছে, কিন্তু তা'তে গুলি নেই, ফাঁকা আওয়াজ; ধোঁয়ার প্রাচুর্য্য ও শব্দের প্রাখর্য্য থেকে পাঠকেরা কল্পনা কোর্ব্বেন যে,

১ যথার্থ যদি এরূপ হইয়া থাকে তবে সে কথা-গুলা লেখকের উচিত ছিল উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া। সং

২ কেন যে, আবশ্যক ছিল না তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। লেখক আমাদের নিরীহ দেশটির প্রতি সচ্ছন্দে ধিক্কারের খরশাণ কৃপাণ এবং উপহাসের তীক্ষ্ণ বাণ অনর্গল চালাইতে পারেন আর এক ব্যক্তি ঢাল দিয়া তাহা আটকাইতে গেলে সে তাহা পারিবে না কেননা লেখকের মতে তাহা অনাবশ্যক! এমন কি হইতে নাই যে, লেখক এক পক্ষে বেশী ঝোঁক দেওয়াতে তাঁহার চক্ষে তিনিই দেখিতেছেন যে, তাঁহার বিরোধী পক্ষের কথাগুলি উত্থাপনেরই যোগ্য নহে? সং

যার প্রতি লক্ষ্য করা হোয়েছে সে ব্যক্তি বাসায় গিয়ে মোরে থাকবে; কিন্তু সে ব্যক্তির কানে তালাধরা ও নাকে ধোঁয়া যাওয়া ছাড়া আর কোন রকম সাঙ্ঘাতিক অপকার হয় নি ১। লেখক মশায় বোলে-ছেন যে, "শুধু কেবল স্বাধীনতা হইলেই যদি স্ত্রীলোকদের আর কোন গুণের প্রয়োজন না হইত, তাহা হইলেই আমরা লেখকের মতে সম্পূর্ণ মত দিতে পারিতাম; কিন্তু তাহা ত নহে, যেমন স্বাধীনতা চাই তেমনি তাহার সঙ্গে শোভন লজ্জাশীলতা, বিনয়, সরলতা, উচ্চের প্রতি ভক্তিমত্তা, নীচের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য ইত্যাদি অনেক গুণ থাকা চাই," ইত্যাদি। কিন্তু এতটা হাঙ্গামা কেন? বাঙ্গালা বা সংস্কৃত, আর্য্য বা অনার্য্য, সাধু বা অসাধু কোন ভাষার অভিধানে যদি স্বাধীনতা অর্থে বেহায়ামো, অবিনয়, অসরলতা, উচ্চের প্রতি অভক্তিমত্তা, নীচের প্রতি অদয়া দাক্ষিণ্য লেখা থাক্‌ত, তা' হোলে এতটা বাক্যব্যয় শোভা পেত, নইলে সরল-হৃদয় পাঠকদের চোকে ধূলো দেওয়া ছাড়া, নাথি মেরে মেরে এতটা বাক্যের ধূলো ওড়ানোর আরত কোন ফল দেখিনে ১। এই

১ লেখক কি ভাবে কি কথা বলিতেছেন তাহার প্রতি তত আমাদের লক্ষ্য নহে যত—পাঠকেরা তাঁহার কথা কি ভাবে গ্রহণ করিবেন, তাহার প্রতি। আজিকার কালের কৃতবিদ্য ব্যক্তিমাত্রেরই লক্ষ্য দেশীয় কুসংস্কারের উপর—যিনি একটু কলম ধরিতে জানেন তিনি সর্ব্বাগ্রে তাহার উপরেই আপনার গোলোন্দাজির পরীক্ষা করিতে যা'ন, কিন্তু তাহার বন্দুকের গুলি-গুনো লাগে কোথায়? না, দেশীয় রীতি নীতি প্রথা যত কিছু আছে সকলেরই গাত্রে—তা' সে সু-ই হউক আর কু-ই হউক—তা'র আর বাক্‌বিচার নাই। আমাদের লক্ষ্য আর এক দিকে—আমাদের দেশের ভাল রীতি ভাল প্রথা ইংরাজি রীতি-নীতি-প্রথার সহিত না মিলিলেই আজকের কালের কৃতবিদ্য লোকেরা সমস্ত-গুলিকেই কুসংস্কারের কোটায় ফেলিয়া দেন—সেই-গুলিকে বাঁচানই আমাদের লক্ষ্য। পাছে লোকের মনে এই একটি কুসংস্কার জন্মে যে, বিবিদিগের চাল্-চোল্ ধরণ-ধারণের নামই স্ত্রী-স্বাধীনতা, আর আমাদের কুল-স্ত্রীদিগের চাল্ চোল্ ধরণ ধারণের নামই হাতে হাতকড়ি পায়ে বেড়ি—অধুনা কেবল তাহারই প্রতিবাদ করা আমাদের এক মাত্র লক্ষ্য। সং

১ অবশ্য কোন অভিধানে স্ত্রীস্বাধীনতার ওরূপ অর্থ পাওয়া যায় না—কিন্তু কাজে কি দেখা যায়? লেখক যদি বিলাতি বিবিদিগকে আদর্শ না করিয়া বিশুদ্ধরূপে স্ত্রী-স্বাধীনতা-বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহা হইলে স্ত্রী-স্বাধীনতার অতগুলি পার্শ্ব-রক্ষক Body-guard আবশ্যক হইত না; কিন্তু লেখক বিলাতি বিবিদিগের চাল্-চোল্ ধরণ ধারণের আনুষঙ্গিক রূপে স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, এ জন্য বিলাতানভিজ্ঞ অধিকাংশ লোকের মনে সহসা এইরূপ একটা কুসংস্কার জন্মিতে পারে যে কার্য্যতঃ স্ত্রী-স্বাধীনতা আর কিছুই নহে—কেবল বিবিদিগের চাল্-চোল্, ধরণ-ধারণ ইত্যাদি। ইহা একটি লোক-বিখ্যাত বিষয় যে, বিবিদিগের shoping-এর জ্বালায়, নির্দোষ (?) আমোদাসক্তির জ্বালায়, তাহাদের স্বামীরা

সকল বকাবকির পর লেখক মহাশয় যেখানে " প্রকৃত কথা " বোলেছেন, সেই খানেই আমি সব চেয়ে কম আয়ত্ত কোরতে পেরেছি। তিনি বলেন, " প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের দেশে এক্ষণে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, শিক্ষা বিষয়ক স্বাধীনতা, রুচি বিষয়ক স্বাধীনতা , ইত্যাদি অনেক স্বাধীনতার অভাব আছে, তাহার সঙ্গে কি মাত্রায় 'স্ত্রী-স্বাধীনতা ভালোয় ভালোয় টেকিয়া থাকিতে পারে, তাহাই এখন বিবেচনা-স্থলে !" "প্রথমতঃ শিক্ষা-বিষয়ক স্বাধীনতা, রুচি বিচয়ক স্বাধীনতা" ও "ইত্যাদি অনেক স্বাধীনতার" অর্থ আমিত ভাল কোরে বুঝ্‌তেই পারলুম না ১ ; দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে স্ত্রী-স্বাধীনতার কোন্‌খানটা যোগ আছে, তাই আমি ভাল কোরে দেক্‌তে পেলেম না। আমাদের দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নেই বোল্লে এই বোঝায় যে, আমরা ইংরাজদের

ধনে প্রাণে মারা যায়, অথচ স্ত্রী-স্বাধীনতার একটু কোথাও পাছে আঁচড় লাগে এই ভয়ে তাঁহারা সকল অত্যাচার ঘাড় পাতিয়া ল'ন, সকল বিষ হজম করিয়া ফেলেন। ইউরোপ-ভিন্ন আর কোথাও যে, স্ত্রী-স্বাধীনতা নাই এমন নহে—জাপানে আছে, বোম্বাইয়ে আছে, কিন্তু সে সকল নিয়ে আলোচনা করা লেখকের উদ্দেশ্য নহে—সর্ব্বদেশ-সম্মত স্ত্রী-স্বাধীনতার বিশুদ্ধ আদর্শ নিয়ে আলোচনা করাও লেখকের উদ্দেশ্য নহে, ইংলণ্ডে যেরূপ স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচলিত তাই যা' কেবল লেখকের এক মাত্র আলোচ্য বিষয় ; এরূপ যখন—তখন ইংলণ্ডের প্রচলিত স্ত্রী-স্বাধীনতা যে কি ভয়ানক বস্তু—তাহা যে শত সহস্র স্থানে নামে স্বাধীনতা কাজে স্বৈরচারিতা—তাহা যে ঔদ্ধত্য, প্রগল্‌ভতা, গুরু-জনের প্রতি অবজ্ঞা, দেহ-পীড়ন-বেশ-বাহুল্য এরূপ কত-শত দোষে দূষিত, Saturday Review প্রভৃতি কাগজে যাহার চীৎকার কাঁদুনি মধ্যে মধ্যে ভুক্ত-ভোগী জনের বুক ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়িতে শুনা গিয়া থাকে, লেখক সে সকল কথার একটুও উল্লেখ না করাতে দেশীয় লোকের চক্ষে এক রূপ ধূলি দেওয়া হইয়াছে—প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে, বিবিদিগের অনুকরণ করিলেই আমাদের কুল রমণীরা নিষ্কণ্টকে স্বাধীনতা-পথে বিচরণ করিতে পারিবেন ; আমরা সেই ধূলি অপনয়ন করিবার জন্যই বলিতেছি যে, যখন স্বাধীনতার সঙ্গে শোভন লজ্জাশীলতা, বিনয়, সরলতা, গুরু-জনের প্রতি ভক্তি, নীচের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য, অপ্রগল্‌ভতা, ঔদ্ধত্য-বিহীনতা ইত্যাদি গুণ-সমূহ থাকিবে তখনই জানিবে যে তাহা প্রকৃত স্বাধীনতা—ইংলণ্ডীয় স্ত্রী-স্বাধীনতা তাহা হইতে বহুদূরে স্থিতি করে ; বোম্বাই দেশে যেমন স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে সেরূপ তীব্রতা-বিহীন নির্বিষ স্ত্রী-স্বাধীনতা যদি লেখকের অভিপ্রেত হইত তবে তাহার প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক তাহা আমরা অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিতাম। যে স্ত্রী-স্বাধীনতার নামের দোহাই দিয়া শত সহস্র স্বেচ্ছাচারিতা নিত্য নিত্য পার পাইয়া যাইতেছে সে স্ত্রী-স্বাধীনতার নাম শুনিলেই আমাদের আপাদ-মস্তক শিহরিয়া উঠে। সং

১ অর্থাৎ আমাদের আপনার দেশের রাজ্য-শাসন-প্রণালী স্বদেশীয় লোকের আয়ত্তাধীন নহে। তাহা যদি আমাদের আপনাদের আয়ত্তাধীন হয় তাহা হইলে আমরা রাজনীতি-বিষয়ক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই।

অধীনে বাস কোরচি ১ ; যদি এমন হোত যে, স্ত্রী-লোকেরা অত্যন্ত বলিষ্ঠ জাতি, তা'দের অন্তঃপুর থেকে মুক্ত কোরে দিলে ইংরাজদের রাজত্ব লোপ হবার সম্ভাবনা, তা'হোলে বুঝতাম যে, রাজ-নৈতিক স্বাধীনতা নেই বোলে আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতার ঘোরতর ব্যাঘাত বর্ত্তমান! একটা স্বাধীনতা নেই বোলে পৃথিবীতে

শূন্য-গর্ব্ভ উপাধির টানে পড়িয়া আমাদের দেশের লোক স্বাভিপ্রেত শিক্ষালাভে বঞ্চিত হয়, ও যেরূপ শিক্ষা তাহাদিগকে জোর করিয়া গিলাইয়া দেওয়া হয় তাহাই তাহারা কণ্ঠস্থ করে। শিক্ষাদান যদি আমাদের আপনাদের অভিপ্রায় মাফিক হয়, তবেই আমরা শিক্ষা-বিষয়ক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই।

কোট্ হ্যাট্ পরিলে কালোয় কালোয় মিসিয়া বাঙ্গালিকে ভূতের মত দেখিতে হয় তবু তাহা ভাল—কেন? না যেহেতু তাহা ইংরাজ-পছন্দ! রুচিরও কখনও কখনও দাসত্ব-শৃঙ্খল পরিতে সাধ যায়। রুচি যদি আমাদের আপনাদের আদর্শ-মাফিক হয়, অন্যের ধামাধরা না হয়, তবেই আমরা রুচি-বিষয়ক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই। সং

১ বটেই ত; ইংরাজদের অধীনে বাস করচি বোলেই ত আমরা আমাদের স্ত্রী-দিগকে তাহাদের সমক্ষে বাহির করিতে সঙ্কুচিত হই। আমাদের দুই দিকেই সঙ্কট; যদি আমরা ইংরাজদিগকে জেতৃ-জাতীয় লোক মনে করিয়া তাহাদের নিকটে কুঁকড়িয়া সুঁকড়িয়া থাকি তবে তাহারা আমাদের অতি অপদার্থ জ্ঞান করিবে ও আমাদের স্ত্রীগণকে আমাদিগের হইতে এক ধাপ নয় উঁচু মনে করুক—কিন্তু ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকদিগকে যেরূপ সম্মান-চক্ষে দেখিতে হয়, তাহা তাহারা কখনই করিবে না; ক্রমাগতই শুনা যায় যে, বাঙ্গালীর স্ত্রীস্বাধীনতা রেল-গাড়িতে ইংরাজের পুরুষ-স্বাধীনতার হস্তে যার পর নাই অপমানিত হইয়া থাকে; এই একদিক্, আর এক দিক্ এই যে, যদি আমরা ইংরাজদিগের সহিত সমকক্ষ ভাব ধারণ করিতে যাই তবে প্রথম প্রথম হয় ত তাহারা মুখে একটু আপ্যায়িত করিবে এই পর্য্যন্ত, ভিতরে ভিতরে যে আমাদিগের স্পর্দ্ধা-নিবারণের উপায় চিন্তা করিবে ইহাতে আর কিছু মাত্র ভুল নাই। ইংরাজেরা কত বাঙ্গালিকে খুন করিয়া স্বচ্ছন্দে পার পাইয়া যাইতেছে, আর, একজন স্ত্রীলোকের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে ভয় পাইবে—ইহার কি কোন অর্থ আছে? যদি পরিশেষে বাঙ্গালি বিচার-কর্ত্তার হস্তে পড়িবার সম্ভাবনা থাকিত তবেই যা তাহাদের ভয়ের কারণ হইত—কিন্তু আমাদের দেশীয় বিচারালয়ের বিচার যেরূপ ইংরাজ-ঘেঁসা তাহাতে আমাদের দেশের যেমন না কেন রাজ-রাণী হউন না, এক জন সামান্য ইংরাজ তাঁহার যথেষ্ট অপমান করিলেও আদালতের সূক্ষ্ম বিচারে দাঁড়াইবে যে, বরং বাদিনীর দোষ—কেন সে প্রতিবাদীকে রাগাইয়া দিল—প্রতিবাদীর কোন দোষ নাই। আবার, আমাদের দেশের এমন কতকগুলি ভাব আছে যাহা বিদেশীয় বিচারকের আমলেই আসিতে পারে না; আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকের গায়ে সামান্য একটু অপমানের আঁচ লাগিলে তাহা যে কত অধিক বলিয়া বোধ হয় তাহা বিদেশীয় সর্ব্ব-সহন-ক্ষম কঠোর মনে এক মুহূর্ত্তও স্থান পাইতে পারে না। আমাদের দেশীয় লোকেরা আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোক দিগকে যেরূপ সম্মান-চক্ষে দেখে ইংরাজেরা কখনই সেরূপ দেখে না ইহারও আবার প্রমাণ দিতে হইবে নাকি? এই

যদি আর কোন রকম স্বাধীনতা না থাকে, তা'হোলে আমাদের দেশে পুরুষদের স্বাধীনতা আছে কি কোরে? আমাদের দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নেই, অতএব পুরু-

সে দিন একজন ইংরাজ বিচারকর্ত্তা প্যায়দাকে দিয়া একজন দেশীয় স্ত্রীলোকের ঘোমটা খোলাইলেন—এ কি বল দেখি? একজন বাঙ্গালি বিচারকর্ত্তা যদি ইউরোপীয় কোন স্ত্রীলোকের প্রতি ওরূপ ব্যবহার করিত—তবে কাণ্ডটা কি হইত বল দেখি! এই সব বিচার-কর্ত্তার হস্তে যখন আমাদের ধন প্রাণ মান নির্ভর করিতেছে তখন স্ত্রীস্বাধীনতাতে কি আর রুচি হয়? বরং একজন কেরাণীর পক্ষে বহুমূল্য ইংরাজী আসবাব কেনা শোভা পায়—কেন না তাহাতে সে কেবল ধনে এবং পরিশেষে প্রাণে মারা যায় মাত্র; কিন্তু একজন রাজরাণীর পক্ষেও স্ত্রী-স্বাধীনতা শোভা পায় না—কেন না অমূল্য কুলমানের বিনিময় ভিন্ন আমাদের দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা কিনিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—জেতৃজাতি জিতজাতির কুলমানের মূল্য অতি যৎসামান্য মনে করে; আমাদের ভদ্রলোকের স্ত্রীদিগকে আয়াদেরই সামিল মনে করে—তা-চেয়ে নীচু বই উঁচু মনে করে না। কোন বাঙ্গালি ভদ্র ঘরের স্ত্রী দুর্ভাগ্যবশতঃ কতিপয় সভ্য ইংরাজমণ্ডলীর সঙ্গে এক টেবিলে খানা খাইতে বসিয়াছিল, সেই সভ্য-মণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ বলা কহা করিতে লাগিলেন যে, "শেষকালে মেৎরাণীর সঙ্গে আমাদের এক টেবিলে খানা খাইতে হইল।" বিদেশীয় রাজ্যে বাস করাতেই আমাদের ভাগ্যে সময়ে সময়ে ঐরূপ ঘটে; ম্যাঞ্চেষ্টরের একজন তাঁতির ছেলে যেখানে আমাদের দেশের ভদ্রবংশীয় কায়স্থ-কন্যাকে মেৎরাণী বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না, সেখানে ভদ্রবংশীয় স্ত্রী-লোকদিগকে কত সাবধানে আগলিয়া রাখা কর্ত্তব্য তাহা কি আর বলিবার কহিবার বিষয়। ঠিক্ বিপরীত পৃষ্ঠ দেখিতে চাও ত বলি শুন;—আমাদের জ্ঞাতসারে একবার কোন নৌকাযাত্রী-ভদ্রলোকের নৌকার তলা ফুটা হইয়া যাওয়াতে তিনি স্ত্রী-পুত্র সমভিব্যাহারে তাড়াতাড়ি ডাঙায় উঠিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; ডাঙায় কতকগুলি কুঁড়ে ঘর ও চাল-ডালের দোকান ছিল; তথাকার সকল লোকে মিলিয়া অতি যত্নপূর্ব্বক স্ত্রী-লোকটির সম্মান রক্ষার জন্য একটি কুঁড়ে ঘরের চারদিকে ঘের-ঘার দিয়া দিব্য একটি নিভৃত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল এবং আবশ্যক যত কিছু—সকলেরই সহায়তা করিল, পারিতোষিকের কথা একবার মুখেও আনিল না; যে ব্যক্তি ঘর ছাড়িয়া দিয়াছিল সে ঘর ভাড়া স্বরূপ যাহা পাইল তাহাতেই সন্তুষ্ট। দেখ আমাদের দেশের চাসা-ভূষা ইতর লোকেরাও কুল-স্ত্রীকে কিরূপ সম্মান-চক্ষে দেখে; ইহা ইউরোপ-দেশের অতি-ভক্তি-পূর্ণ গ্যালেণ্ট্রী নহে—ইহা আর এক বস্তু; কি? না পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ পবিত্রভাবে দেখা। স্ত্রীলোকদিগকে মাতৃসম্বোধনে সম্মান করিবার প্রথা আমাদের দেশের যেটি আছে তাহার সহিত এবং ইউরোপ দেশীয় Gallantryর সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে দুয়ের মধ্যে স্বর্গ-নরক প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। দেশীয় কুলরমণীর যে একটি পবিত্র মর্য্যাদা তাহা কি Gallantry-পরায়ণ ব্যক্তিরা জানে? না তাহাদিগকে তাহা বলিয়া বুঝানো যাইতে পারে?—কিন্তু গ্যালাণ্ট্রী যে কি বস্তু তাহা আমরা বিলক্ষণ বুঝি—

ষরা অন্তঃপুরে প্রবেশ করে না কেন ১? রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে স্ত্রী-স্বাধীনতার যদি কোন যোগ থাকে, তবে পুরুষ-স্বাধীনতার সঙ্গেও তা'র সেই পরিমাণে যোগ আছে সন্দেহ নাই। দেশীয় রাজার অধীনে থাকলে স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে আমাদের এখনকার চেয়ে কি সুবিধা হোত ও কেন সুবিধা হোত, সেইটে বোল্লেই আমি চুপ কোরব ২। লেখক মহাশয় হয়ত বোলবেন, এখনো আমাদের দেশে স্ত্রী স্বাধীনতার সময় আসে নি, সময় এলে স্বাধীনতা আপনাআপনিই আস্‌ত। হঠাৎ যদি আজই সমস্ত স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন হয়, তা' হোলে তা'র থেকে খারাপ ফল হোতে পারে। খুব সম্ভব আমাদের দেশে আজো স্ত্রীলোকদের স্বাধীন হবার সময় হয় নি, কিন্তু আমি ত আর তলবার হাতে কোরে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচার কোরচি নে; কিম্বা আমিত আজই ভারতবর্ষের Governor general হোয়ে আইন বের কোরচিনে যে, যারা স্ত্রী-কন্যাদের স্বাধীনতা না দেয় তা'দের ফাঁসি দেওয়া হবে! আমি একটা কাগজে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রার্থনীয় কি না, সে বিষয়ে আমার মত প্রকাশ কোরেছি; আমার আশাও ছিল না, উদ্দেশ্যও ছিল না যে, আমার প্রবন্ধটি পড়বামাত্র অমনি ভারতবর্ষের বিংশতি কোটি লোক তৎক্ষণাৎ তাদের স্ত্রী কন্যা ভগ্নীদের অন্তঃপুর থেকে মুক্ত কোরে তাঁদের অসূর্য্যম্পশ্য রূপের গর্ব্ব থেকে বঞ্চিত কোরবে। আমি বিলক্ষণ জানতেম, সূর্য্যের এত সৌভাগ্য আজো হয় নি, যে, এত সহজে তার যুগযুগান্তরের আশা পূর্ণ হবে। আমার অভিপ্রায় এই

তাহার ববশর্ত্তী হইয়া একটি সুন্দরী মিস্ তাহার গুরুজনকে পশ্চাতে ফেলিয়া আপনি স্বচ্ছন্দে হট্ হট্ করিয়া প্রধান আসন গ্রহণ করেন—আমাদের দেশে এই সকল চাল্-চোল্ শিক্ষা হইলেই সর্ব্বনাশ! ইংরাজেরা যখন জেতৃজাতি এবং তাহারা আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের কুল মর্য্যাদার কোন তক্কাই রাখে না তখন আমাদের কী এত দায় পড়িয়াছে যে, তাহাদের সমক্ষে আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে বাহির না করিলেই নয়। সং

১ পুরুষের অপমানিত হওয়া এবং স্ত্রীলোকের অমপানিত হওয়া যদি একই কথা হইত তাহা হইলে লেখক ঠিক্‌ই বলিতেছেন যে, স্ত্রীজাতিকে যেরূপ সাবধানে রক্ষা করা হয় পুরুষ জাতিকে সেরূপে রক্ষা করা না হয় কেন? কিন্তু বিলাতি গ্যালাণ্ট্রী-শাস্ত্রেও ত আছে যে স্ত্রীর গায়ে আঘাত লাগিলে যত লাগে পুরুষের গায়ে আঘাত লাগিলে উহার তুলনায় তাহা কিছুই নহে। সং

২ আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে অতি এক নির্ব্বিষ নিষ্কণ্টক স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচলিত ছিল ইহা কাহারও অবিদিত নাই; বোম্বাই প্রদেশে এখনো তাহার কতকটা আভাস দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাতেই যথেষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে স্বদেশীয় স্ত্রী-স্বাধীনতা স্বদেশীয় রাজ্য-শাসন-প্রণালীর আয়ত্তাধীনেই সুন্দর শোভায় পরিস্ফুট হইতে পারে। যেমন মুসলমানদিগের বাহুবল, তেমনি ইংরাজদিগের বাহুবল-তিরস্করিণী মন্ত্র-বিদ্যা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর দিশী স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী। সং

ছিল যে, যদি বা স্ত্রী-স্বাধীনতার সময় আমাদের দেশে এখনো না এসে থাকে তবে সেই সময় যত শীঘ্র আসে আমাদের তার চেষ্টা করা উচিত ১। প্রথমে আন্দোলন তার পরে কাজ, তার পরে সিদ্ধি। সময় আসে নি বোলে যদি মুখ বন্ধ কোরে বোসে থাক্‌তে হয়, তাহোলে সময় কোন কালে আসে না। পৃথিবীতে কোন্ দেশে এমন কোন্ বৃহৎ সমাজ-সংস্কার হোয়েছে যা' আন্দোলন না কোরেই হোয়েছে? অত কথায় কাজ কি আমাদের বাঙ্গলা দেশে অতি অল্প দিন পূর্ব্বে যে ধর্ম্ম-সংস্কারের আরম্ভ হয় ও আজ পর্য্যন্ত যার আন্দোলন চোলচে, সেই বিষয়ে উদাহরণ দিলেই আমার যুক্তি অতি সহজে বোধগম্য হবে ২। ভারতবাসীদের মন এখনো অজ্ঞতা কুসংস্কারাচ্ছন্ন আছে, নিরাকার ঈশ্বরের ভাব তারা বুঝতে পারবে না, সুতরাং এখনো সত্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার সময় হয়নি বোলে যদি রামমোহন রায় নিশ্চেষ্ট হোয়ে বোসে থাকতেন, যদি তখনকার বৃদ্ধ পৌত্তলিক সমাজের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রাম না কোরতেন, সময়ের অভাব, সময়ের শূন্য ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করবার চেষ্টা না কোরে তিনি যদি ভিক্ষুক ভাবে অঞ্জলি পেতে সময়ের মুখ প্রতীক্ষা কোরে বোসে থাক্‌তেন, তাহোলে আজকের এই ব্যাপ্যমান ব্রাহ্মধর্ম্ম কোথায় থাকত ৩, আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতার অভাব লোকে এখনো ভাল কোরে অনুভব কোর্ত্তে পারে নি, কিন্তু তাই বোলে কি চুপ কোরে বোসে থাক্‌তে হবে? ব্যক্তি বিশেষের যদি অস্বাভাবিক কারণে ক্ষিদে আদবে না থাকে, তা হোলে তাকে খেতে দিওনা, কেননা, সে হজম কোরতে পারবে না; কিন্তু তৎক্ষণাৎ তা'কে কবিরাজ দেখানো

১ যত শীঘ্র আসে" এ চেষ্টা অপেক্ষা যত শোভন-ভাবে, নির্ব্বিঘ্ন ভাবে, নিরুপদ্রব ভাবে আসে, এই চেষ্টা অধিক প্রার্থনীয়। যদি বল যে শেষোক্ত চেষ্টা বৃথা হইবে, তবে আর একজন বলিবে পূর্ব্বোক্ত চেষ্টাও বৃথা হইবে; প্রকৃত কথা এই যে, দুই চেষ্টারই ফলের আশা এত অল্প যে,আমাদের ভাগ্যে উভয়ই এক প্রকার দুরাশা; কিন্তু যদি "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধ্যতি কোঽত্র দোষঃ" এই ভাবিয়া কোমর বাঁধিয়া চেষ্টা করিতে হয় তবে শেষোক্ত প্রকারের চেষ্টাই সর্ব্বোত্তোভাবে শ্রেয়। সং

২ আন্দোলন যাহাতে রীতিমত হয় অর্থাৎ এক-দিক্-ঘেঁসা না হয় এই জন্যই বর্ত্তমান প্রস্তাবটির পদে পদে টিপ্পনী-সংযোগের এত আয়াস পাওয়া যাইতেছে। সং

৩ রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দেওয়া হোক্,—তিনি যেরূপ দেশীয় আকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, স্ত্রী-স্বাধীনতা সে-ভাবে প্রচারিত হইলে আমরা ত বাঁচিয়া যাই—কিন্তু এ ত তা নয়—এ হচ্চে বিবিদের গৌণের আঁচল ধরিয়া চলা—আয়া-গিরি করা। বোম্বাই দেশেও ত স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে; স্বাধীন যুক্তি ও রুচি সহকারে স্ত্রী-স্বাধীনতার ভাল একটা আদর্শ দাঁড় করাও—তাহা আমরা মাথায় করিয়া লইব; কিন্তু তাহা বলিয়া স্ত্রী-স্বাধীনতার নামের খাতিরে তাহার একটা অন্তঃসার-শূন্য চিকণ-চাকণ আদর্শকে "এই উচ্ছিষ্টই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট" বলিয়া গলাধঃকরণ করিতে পারি না। সং

কর্ত্তব্য, যাতে তার ক্ষিদে হয়, এমন বটিকা সেবন করানো আবশ্যক। আমি তাই ভেবে চিন্তে ভারতীতে সমাজের জন্যে এক রত্তি বটিকার ব্যবস্থা কোরেছিলুম; কিন্তু রোগ এমন বদ্ধমূল, ও কবিরাজের সাধ্যমত বটিকার মাত্রা এমন যৎসামান্য, যে, তা'তে উপকার হবার সম্ভাবনা অতি অল্প। কিন্তু আমাদের দেশের সকল কবিরাজ মিলে যদি এই রকম বটিকা সেবন আরম্ভ করান, তাহোলে অচিরাৎ রোগীর ক্ষুধার সঞ্চার হবে। লেখক মহাশয় বলেন "উঃ ইনি স্বাধীনতার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ কোরেছেন" এরূপ কেউ যদি মনে করেন, তবে তাঁহাদের জানা উচিত যে, এ স্বাধীনতা দেশেরও স্বাধীনতা নহে, আত্মারও স্বাধীনতা নহে, কেবল পর পুরুষগণের সহিত স্ত্রীলোকগণের আমোদ প্রমোদে মেলা মেশা! কথা গুলো এমন কোরে বসানো হোয়েছে যে, শুনলে অনেক পাঠকের গা শিউরে উঠবে! "পর পুরুষ!" "আমোদ প্রমোদ!!!" "মেলা মেশা!!!" কি সর্ব্বনাশ!!! আমাদের ভাষায় "পর পুরুষ" কথাটার সঙ্গে একটা দারুণ বিভীষিকা লিপ্ত আছে, লেখক মহাশয় সেই সুবিধা পেয়ে কথাটা ব্যবহার কোরেছেন। কিন্তু আমি জানতে চাই, গরিব "পর পুরুষ" কথাটি কি অপরাধ কোরেচে, যে, সে বেচারীর ওপরে এত নিগ্রহ! পর বোলেই কি তার এত দোষ ১? কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে বলে মহাত্মা লোকদের "বসুধৈব কুটুম্বকং।" "আমোদ প্রমোদ" ও "মেলা মেশা" কথা দুটো এমন ভাবে ব্যবহার করা হোয়েছে যে তার মধ্যে থেকে একটা ঘোরতর রহস্যপূর্ণ অর্থ প্রকাশ পাচ্চে। কিন্তু আমি আশা করি, আমাদের দেশের রুচি এখনো এমন বিকৃত হোয়ে যায় নি দেশীয় লোকের মন এমন পশুত্বে পরিণত হয় নি, তাঁদের দৃষ্টি এমন "পিঙ্গল" হোয়ে যায় নি ও তাঁদের "কল্পনার দূরবীক্ষণ" এত দূর পর্য্যন্ত বিগড়ে যায় নি যে, তাঁরা "আমোদ প্রমোদ" ও "মেলা মেশা" মাত্রেরই মধ্যে একটা হীন, একটা জঘন্য একটা বীভৎস ভাব দেখতে পা'ন ১। অতএব

১ এক জন পর-মানুষ কিছু দোষ করে নাই বলিয়া তাহার সহিত আত্মীয় স্বজনের মত ব্যবহার করিতে হইবে, তাহাকে ঘরের স্ত্রী-লোকদিগের সহিত মেলা-মেসা করিতে দিতে হইবে, ইহা কোন্ ইংরাজি আইনে পাওয়া যায়? সং

১ লেখকের মত এই যে, যেমন পুরুষে পুরুষে আমোদ-প্রমোদে মেলা-মেসা নিষ্কণ্টকে চলিতে পারে, পরপুরুষে পরস্ত্রীতেও তাহা তেমনিই নিষ্কণ্টকে চলিতে পারে; কিন্তু কাজে কি দেখা যায়? দুইজন পুরুষ মানুষের মধ্যে যতই কেন বন্ধুতা ও ঘনিষ্টতার মাত্রা বাড়ুক না তাহাতে বিশেষ কাহারো কিছু আইসে যায় না; কিন্তু পরস্ত্রী এবং পরপুরুষের মধ্যে নির্দোষ বন্ধুতার মাত্রা বাড়িলে অনেকেরই তাহা শঙ্কার বিষয় হয় কেন? ইংরাজ-সমাজের বিধানানুসারে পর-পুরুষদের সঙ্গে পরস্ত্রীদের হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতে-পর্য্যন্ত কোন দোষ নাই,—কিন্তু আমাদের চক্ষে ওটা কিছু আমোদ-প্রমোদ মেলা-মেসার

যদি "আমোদ প্রমোদ" ও "মেলা মেশা" মাত্রেরই খারাপ অর্থ না থাকে ও "পর-পুরুষ" মাত্রেই যদি বাঘ ভাল্লুক বা চোর ডাকাত না হয়, তাহোলে "পর-পুরুষের সঙ্গে "আমোদ প্রমোদ" "মেলা মেশায়" কি দোষ আছে? এক জন অন্যায় রূপে কারাবদ্ধ ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দেবার বিরুদ্ধে তুমিত বোল্‌তে পার যে, "এ স্বাধীনতা আত্মারও স্বাধীনতা নহে, দেশেরও স্বাধীনতা নহে, কেবল স্বজাতিবর্গের সহিত এক ব্যক্তির আমোদ প্রমোদে মেলা মেশা, এ কতদূর স্বাধীনতা নামের যোগ্য তাহাই সন্দেহ স্থল!" আত্মার স্বাধীনতা ও দেশের স্বাধীনতা ব্যতীতও আরো অসংখ্য স্বাধীনতা আছে, যা প্রার্থনীয় ১। উপসংহারে

আতিশয্য বলিয়াই ঠেকে। আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা ছিল না এমন নহে এবং এখনো তাহা কোথাও কোথাও আছে, কিন্তু তথাপি স্ত্রীলোকেরা আমাদের এমনি সম্মানের পাত্রী যে পর-কেহ তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে ইহা আমরা দেখিতে পারি না। সখ্য এবং দাম্পত্য দুয়ের মধ্যে কেবল একটা বালির বাঁধ সংস্থাপন করিয়া যাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকেন তাঁহারাই বলিতে পারেন—এতে দোষ কি, তা'তে দোষ কি, কিন্তু যাঁহারা স্ত্রী-স্বাধীনতা চা'ন অথচ সখ্য ও দাম্পত্য দুইকে সম্পূর্ণ পৃথক্ রাখিতে চা'ন তাঁহারা ঐ স্থানে প্রস্তরের বাঁধ ভিন্ন আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। লেখক যে বলিবেন—সু-চক্ষে দেখিলে সকলই সু, কুচক্ষে দেখিলে সকলই কু, তাহার জো নাই,—সহস্র বন্ধুনী হউন না কেন তাঁহার বাড়িতে যদি পুরুষ-মানুষ কেহ না থাকে তবে ইংরাজি শাস্ত্রে তাঁহার ঘরে গিয়া তাঁহার সহিত সখ্যালাপ করা অবিধি হইল কেন? সু চক্ষে দেখিলে তাহাতে ত কোন দোষ নাই। সং

১ আত্মার স্বাধীনতা সকল অবস্থাতেই নির্দোষ কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতা যে অংশে বুঝায় "পর পুরুষগণের সহিত একত্রে আমোদ-প্রমোদে মেলা-মেসা" সে অংশে তাহা নির্দোষ হইতেও পারে, না হইতেও পারে; কে বলিতে পারে যে, তাহা নির্দোষ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং আমরা এখনো বলিতেছি যে, পর পুরুষদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদে মেলা-মেসা আত্মার স্বাধীনতার ন্যায় দোষাশঙ্কার সীমা-বহির্ভূত এমন কোন বস্তু নহে যে, তাহা স্ত্রীলোকের অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইবে; উহা অপেক্ষা বরং আপনাদিগকে মিথ্যা-অপবাদ নিন্দা-গ্লানি প্রভৃতি হইতে রক্ষা করা স্ত্রীলোকদিগের বেশী কর্ত্তব্য কর্ম্ম। স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রার্থনীয় নহে—ইহা আমরা কোন কালে বলিও নাই বলিবও না, কিন্তু যে-প্রকার স্ত্রীস্বাধীনতা হইতে সু-ফল অপেক্ষা কুফলেরই অধিক সম্ভাবনা, সে স্ত্রী-স্বাধীনতা থাকা অপেক্ষা না থাকা-ই অধিক প্রার্থনীয়। যে দেশে বুদ্ধিমান লোকের নিকট বিবাহ বিভীষিকা-বিশেষ, সে দেশের স্ত্রীস্বাধীনতার অনুকরণ করিবার জন্য হিন্দুসমাজের কি যে দায় পড়িয়াছে তাহা ত বুঝা যায় না;—বোম্বাই দেশে কি স্ত্রীস্বাধীনতা নাই—মহারাষ্ট্রীয় দেশে কি স্ত্রী-স্বাধীনতা নাই—সে-সব অগ্রাহ্য করিয়া ভয়ানক উৎপেতে ইউরোপীয় স্ত্রী-স্বাধীনতাকে আদর্শ করিয়া চলিতে আমাদের যে, এত ব্যগ্রতা, তাহার অর্থ আর কিছুই নয় খালি—বিধাতার বিড়ম্বনা; তাহার অর্থ,—অর্থের অপব্যয়, সময়ের অপব্যয়, শরীরের কষ্ট, মনের কষ্ট আর মেম্‌-সাহেবি একটা-ভামো—এই যা' কিছু। সং

সম্পাদক মহাশয় বোলেছেন যে, স্ত্রীগণকে অন্তঃপুরে রাখা পুরুষদের স্বার্থপরতার ফল নয়, সাংসারিক কাজ কর্ম্মের অনুরোধে তা' স্বভাবতই হোয়ে দাঁড়িয়েছে! স্ত্রী স্বাধীনতা বিরোধীদের এই এক অতি পুরোনো যুক্তি আছে; কিন্তু আমার বোধ হয় এটা আর কারো চক্ষে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে না যে, প্রাচীরবদ্ধ অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকালের জন্যে প্রবেশ করা ও সমস্ত পৃথিবীর থেকে আপনাকে রুদ্ধ কোরে রাখা স্বাভাবিক হওয়াই নিতান্ত অস্বাভাবিক ১। যদি সত্যই স্বাভাবিক হোত, তা' হোলে য়ুরোপে কেন এ স্বভাবের নিয়মের পরিবর্ত্তন হোল? এখানে কি স্ত্রীলোকদের স্বামী নেই, না সন্তান হোলেই তারা গঙ্গাসাগরে বিসর্জ্জন দিয়ে আসে? লেখক মহাশয় বলেন "কুল-রমণীরা যে, যে-সে পুরুষের সঙ্গে আমোদ করিয়া বেড়ায় না, সে কেবল পতির শাসন-ভয়ে নহে, পতির প্রতি ভালবাসাই তাহার কারণ।" ও হরি! আমি কি বোলেছি যে কুল-রমণীরা "যে-সে" পুরুষের সঙ্গে কেবল "আমোদই" কোরে বেড়াবে? রেখা গুলিকে ঈষৎ বেঁকিয়ে চুরিয়ে বাড়িয়ে কমিয়ে, একটি সুশ্রী ছবিকে ও কদর্য্য করা যায়, শিবকেও বাঁদর গোড়ে

১ স্বাভাবিক-অস্বাভাবিকের সহিত এখানকার সম্পর্কই নাই—এখনকার যা'কিছু বিচার তা' কেবল সুবিধা অসুবিধা নিয়ে। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থাতে স্ত্রীলোকদের অন্তঃপুর-বাস-প্রথা সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ বলিয়াই তাহা প্রার্থনীয়; যদি চতুর্দ্দিকে মান-হানির ভয় সত্য সত্যই বিদ্যমান না থাকিত তাহা হইলে অন্তঃপুরকে কারাগারের সহিত তুলনা করিলে দোষের হইত না, কিন্তু দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, অন্তঃপুর কুল-স্ত্রীদিগের কঠোর কারাগার নহে তাহা তাহাদের নিরাপদ-দুর্গ, অভয়-নিকেতন; আগে যথার্থ ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা চারিদিকের জঞ্জাল পরিষ্কার কর তাহার পরে অন্তঃপুর-প্রথা অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তন কর—তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র অমত নাই। কিন্তু তা'ও বলি অন্তঃপুর-প্রথা একেবারেই উচ্ছেদ করা কখনই হইতে পারেও না পারিবেও না; এমন কি ইউরোপেও অন্তঃপুর-প্রথা একেবারে যে নাই তাহা বোধ হয় না; ও-দেশে যদি পুরুষদিগের মেলামেসা করিবার স্বতন্ত্র স্থান ও স্ত্রীলোকদের মেলামেসা করিবার স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট না থাকে তবে সে অভাব যত শীঘ্র পূরণ হয় ততই ভাল। Boudoir বোধ হয় কতকটা আমাদের অবরোধের কাছা-কাছি যায়। যাহা হউক্—আমাদের দেশের অন্তঃপুর-প্রথা পরিবর্ত্তন করিবার যদি আবশ্যক হয় তবে আমাদের আপনাদের রকমে তাহা করা উচিত। "আপনাদের রকমে" কাহাকে বলে তাহার একটি দৃষ্টান্ত;—আমাদের দেশের অতিথি-সেবা যেমন স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা যত্নের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহাকে আদর্শ করিয়া আমাদের অন্তঃপুর-প্রথা পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে, এমন কি অন্তঃপুরের গৃহিণী কোন অভ্যাগত ব্যক্তির অতিথি-সৎকার করিলে তাহা আমাদের দেশাচারের চক্ষে ভাল বই মন্দ দেখিতে হয় না। বোম্বাই প্রদেশে এই রূপ প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

সং

তোলা যায়। কোন পাঠক মহাশয় কি আমার লেখা থেকে মনে কোরেছেন যে আমাদের কুল-রমণীরা পথে ঘাটে যাকে তাকে দেখবে তারই সঙ্গে আমোদ কোরে বেড়াবে ১? অত কথায় কাজ কি? কোন্ দেশের পুরুষেরাই 'যে-সে' পুরুষের সঙ্গে 'আমোদ' কোরে বেড়ায়? আমরাত অনেক লোকের সঙ্গে মিলে থাকি, আমরা কি কেবলমাত্র আমোদ করবার জন্যেই মিলি? আমরা কাজ কর্ম্মের জন্যে মিলি, ভদ্রতার খাতিরে মিলি, বন্ধুভাবে মিলি, সাহায্য কোরতে মিলি, সাহায্য গ্রহণ কোরতে মিলি এবং মেলবার এমন আরো অসংখ্য উপলক্ষ আছে। পৃথিবীতে শত সহস্র মানুষ আছে ও মানুষ সামাজিক জীব, সুতরাং মানুষে মানুষে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হওয়াই স্বাভাবিক। নিতান্ত চোকে ঠুলি দিয়ে না বেড়ালে বা অন্তঃপুরের সিন্ধুকে চাবি বন্ধ না থাক্‌লে এরকম দেখা সাক্ষাৎ নিবারণের আর ত কোন উপায় নেই। তা ছাড়া অন্য লোকের সঙ্গে মেশা কি স্বামীর প্রতি অপ্রীতির চিহ্ন? আমি ত তার একটা অর্থ খুঁজে পাইনে ১। তোমার একটি নিতান্ত

---

১ যে-সে লোকের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া বেড়ানো সর্ব্বদাই হউক আর কদিচ কখনই হউক্, তাহা কুল-স্ত্রীকে শোভা পায় না,—যে-সে লোক বলিলে শুদ্ধ যে, কেবল দুষ্ট লোকই বুঝায়, শুদ্ধ যে কেবল অভদ্র লোকই বুঝায়, শুদ্ধ যে কেবল পথের লোকই বুঝায় তাহা নহে; শান্তশিষ্ট লোক বল, ভদ্র লোক বল, পরিচিত লোক বল, অবস্থা-বিশেষে সকলেই যে-সে লোকের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন। লোকটি ভদ্রবংশীয়, লেখা পড়া জানে, কথাবার্ত্তা বেস্, ভদ্র আচার ব্যবহার, আমার পরিচিত—এই পর্য্যন্ত, কিন্তু আমি তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং চরিত্রের জন্য দায়ী নহি—এমন যে ব্যক্তি ইনিও এক হিসাবে যে-সে লোকের মধ্যে ধর্ত্তব্য—কোন্ হিসাবে? না যখন তাঁহাকে অন্তঃপুরের স্ত্রীগণের সহিত আলাপ করাইয়া দিবার কথা। যাহার সহিত সবে নূতন আলাপ হইয়াছে তাহার সহিত হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতে স্ত্রী জনের যদি কোন বাধা না থাকে তবে যে-সে লোকের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিয়া বেড়াইতে যে কিসের বাধা, তাহা বুঝা যায় না—সকল সময়েইত কিছু আর আমোদ-প্রমোদ দোষে কলঙ্কিত হয় না। সং

১ কুল স্ত্রীরা যে পর-পুরুষদিগের সহিত বেশী মেলা-মেসা ও আমোদ-প্রমোদ করে না তাহার কারণ অনেক্ গুলি যথা; (১) পাছে কুলোকে কুভাবে; যাহাকে খুব ভাল বলিয়া জানা আছে তাঁহারও অন্তঃকরণ কু হইবার আটক নাই; (২) পাছে সু-লোকে কু ভাবে,—ইহাতেও আটক নাই; পরস্ত্রী পরপুরুষে মেলা-মেসা কতটুকু পর্য্যন্ত শোভা পায় তাহার একটা মাত্রা রাজ-নিয়ম দ্বারা আজি পর্য্যন্তও নির্দ্ধারিত হয় নাই; আমি যাহা দেখিয়া বলিব "ইহাতে দোষ নাই" আর একজন বলিবে "এতটা ভাল নয়"; সেক্সপিয়রের উইণ্টর্‌স্ টেলের হরমিওনী বেচারির ও তাঁহার স্বামীর দুর্দশা বিবিসাহেবদিগকে বিলক্ষণই ভোগ করিতে হয়, কিন্তু কি করিবেন? দুর্জ্জয় দেশাচার—সুতরাং নাচার! (৩) পাছে স্বামীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পায়; স্বামীর মনে হয় ত এই রূপ একটা মাত্রা নির্দ্ধারিত আছে যে,

পর-পুরুষদের সহিত স্ত্রীলোকের এইটুকু পর্য্যন্ত মেলা মেশাই ভাল তাহা-অপেক্ষা বেশী ঘনিষ্ঠতা ভাল না; যে-স্ত্রী স্বামীকে ভাল বাসে সে স্ত্রী সেই মাত্রাটি অতিক্রম করিয়া স্বামীর মনে আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হইবে না ত আর কে হইবে? সে মাত্রা কতটুকু স্বামীই তাহা জানে, স্ত্রী তাহা জানে না, সুতরাং যদি স্বামীর মনঃপীড়া জন্মানো স্ত্রীর প্রার্থনীয় না হয়, তবে শেষোক্তের উচিত পর-পুরুষদের সহিত আমোদ-প্রমোদে মেলা-মেসা না করা; যে স্ত্রী স্বামীকে অধিক ভালবাসে তাহার তাহাতে প্রবৃত্তিই হয় না। সেক্সপিয়রের উইন্টর্‌স্‌ টেলে লিয়ণ্টীসের স্ত্রী হরমিওনী যখন লিয়ণ্টীসের এক জন বন্ধুর সহিত সেক্‌হ্যাণ্ড করিতেছেন তখন লিয়ণ্টীস আপন মনে বলিতেছেন।

Too hot, too hot!
To mingle friendship far, is mingling bloods.
I have *tremor cordis* (হৃৎকম্প) on me my heart dances:
But not for joy,—not joy.— This entertainment
May a free face put on: derive a liberty
From heartiness from bounty, fertile bosom,
And well become the agent; it may I grant:
But to be paddling palms and pinching fingers;
As now they are; and making practised smiles,
As in a looking glass; and then to sigh, as twere
The mort of the deer (হরিণের মরণ কালীন দীর্ঘ নিশ্বাস); O, that is entertainment
My bosom likes not, nor my brows.

এইত গেল সেক্সপিয়র;—আমাদের কোন সুবিচক্ষণ সাহেব-বন্ধুর মুখে আমরা স্বকর্ণে এইরূপ শুনিয়াছি;—"কি! আমার স্ত্রীর গাত্র অন্য লোকে স্পর্শ করিবে;—আমি অন্য লোকের স্ত্রীর গাত্রস্পর্শ করিব—ছি!" (৪) স্বামী মনে করিতে পারে যে, আমি আমার স্ত্রীর চরিত্র যেরূপ জানি তাহাতে সে পরপুরুষদের সহিত সহস্র মেলা-মেসা করিলেও কোন দোষের সম্ভাবনা নাই কিন্তু সে রূপ করিলে অমুক অমুক ব্যক্তিরা কুমনে করিতে পারে—মিছামিছি একটা কলঙ্ক কুড়াইয়া প্রয়োজন কি? এরূপ যখন হইতেও পারে হইয়াও থাকে, তখন পরপুরুষদিগের সহিত আমোদ প্রমোদ করিবার কী-এমন মূল্য যে, তাহার জন্য স্ত্রী স্বামীর মনে একমুহূর্ত্তেও ঐরূপ দুর্ভাবনা উদ্দীপন করিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিবে। সং

১ অত্যুক্তি। অন্তরঙ্গ লোকের নিকট কে ঘোমটা টানিয়া বসিয়া থাকে? ঘোমটা যা' দেওয়া থাকে তাই থাকে, টানিয়া বাড়াইবার প্রয়োজনাভাবে শুধু শুধু কেন তাহা করিবে? অন্তরঙ্গ—প্রাণের কেন—মুখের বন্ধুর সঙ্গেও সকল স্ত্রীলোকেরই ত সহজভাবে কথাবার্ত্তা চলিয়া থাকে। তবে যদি বল যে ঘোমটা দেওয়াটাই অন্যায়—তবে সে কোন কাজের কথা নহে, কেন না তাহা ন্যায়ও নহে, অন্যায়ও নহে, তাহা দেশাচার

অন্তরঙ্গ প্রাণের বন্ধু আছে, কিন্তু তাই বোলে কি তুমি ঘোমটা টেনে বোসে থাকবে ১? ও পর-পুরুষের (অর্থাৎ বন্ধু ছাড়া অন্য কোন পুরুষের) মুখ দেখবে না

বা তাদের সঙ্গে কথা কবে না ১? তাদের মুখ দেখলে বা তাদের সঙ্গে কথা কইলে কি তোমার বন্ধুর ভালবাসার প্রতিদান দেওয়া হোল না? এমন বন্ধুর সঙ্গে আমি ত কোন কারবার রাখিনে ২।

যাহোক্—"এই সকল যৎপরোনাস্তি দুরূহ বিষয়ের তত্ত্ব" এই বাঙ্গালিকে শিক্ষা দেবার জন্যে লেখক মহাশয় একটা নূতন বিশ্ব বিদ্যালয় সৃষ্টি করবার পরিশ্রম স্বীকার নাকোরে যদি তাঁর অবসর মত এই ভারতীতে এবিষয়ে মাঝে মাঝে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন, তা'হোলে এই য়ুরোপ প্রবাসী বঙ্গ-যুবক গুরু দক্ষিণা স্বরূপ তাঁর নোটানলের ইন্ধন-যোগ্য আরো কতকগুলো সৃষ্টিছাড়া সমাজ সংস্কারক মত পাঠিয়ে দেবে।

সেক্‌সপিয়রের নায়িকা-কল্পনা।

আজকাল কালিদাস ও সেক্সপীয়ার লইয়া সাহিত্য-সমাজে হুলস্থূল পড়িয়াছে। কেহ সেক্সপীয়ারের বিন্দু বিসর্গও না জানিয়া তাঁহাকে কালিদাসের পদানত করিতেছেন, কেহ বা কালিদাসের বিন্দুবসর্গও না জানিয়া কালিদাসকে সেক্সপীয়ারের পদানত করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উভয় কবিই স্বকীয় মহিমায় বিরাজ করি-

---

মাত্র; তাহা দেখিতেও ভাল বই মন্দ নহে, যদি ঘোমটা না দেওয়া প্রথা থাকিত তাহা হইলে কালিদাসের এই সুন্দর কবিতাটি আমরা দেখিতে পাইতাম না "কেযমব-গুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীর-লাবণ্যা।" অতি-পরিস্ফুট লাবণ্যের তীব্রতাও নহে, অপরিস্ফুট লাবণ্যের মন্দতাও নহে, কিন্তু উভয়ের মাঝা মাঝি অনতিপরিস্ফুট লাবণ্যের যে একটি মাধুর্য্য তাহা কেবল অবগুণ্ঠন দ্বারাই রক্ষিত হইতে পারে। সং

১ মুখ দেখিতেও দোষ নাই, কথা কহিতে দোষ নাই, আলাপ করিতেই দোষ, সুতরাং এটাও অত্যুক্তি। সং

২ আমার বন্ধুর সহিত আমি কোন কারবার রাখিব না, এমনকি তাহার মুখ দর্শন করিব না,—অপরাধ? না তিনি তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ করাইয়া দেন নাই; একটা ব্যাঘ্রের মুখ হইতে আমিষ কাড়িয়া লইলে তাহারই বটে ঐরূপ ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে কিন্তু লেখকের অতবড় রাগের তেমন ত কোন গুরুতর কারণ দেখা যায় না; ইংরাজেরা দেখ কেমন ধীর-প্রকৃতির লোক, তাঁহাদের স্ত্রীরা পরপুরুষদিগের সহিত নাচিলেও তাঁহাদের ধৈর্য্যলোপ হয় না। সং

তেছেন। সেক্সপীয়ার যদি এক সৌর-জগতের সূর্য্যস্বরূপ হয়েন, তাহা হইলে কালিদাস, আর এক সৌর জগতের সূর্য্য ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারেন না। সত্য বটে, 'দিগন্তব্যাপিনী,—দিগন্ত-অতিক্রম-কারিণী সেক্সপীয়ারের কল্পনার সমক্ষে রুদ্র রস, ভয়ানক রস, অদ্ভুত রস, বীভৎস রস, মনুষ্য-প্রকৃতির সুন্দর ও কুৎসিৎ কোমল ও কঠোর ভাব সকলই নখাগ্রবৎ পরিদৃশ্যমান, সকলই দর্পনবৎ চক্ষের সম্মুখে। কালিদাসের বিষয়ে আমরা ঠিক সে কথা যদিও বলিতে পারি না, তবুও একথা বলিতে হইবে যে কালিদাসের স্বর্গ-মর্ত্ত্য-ব্যাপিনী মহতী কল্পনা সুন্দর ও চমৎকার রসে এতদূর মগ্ন হইতে—এতদূর পরিপ্লুত হইতে—এতদূর 'মস্‌গুল' হইতে ভাল বাসিত যে কালিদাস ভয়ানক বস্তু হইতেও—বীভৎসময় বস্তু হইতেও—অদ্ভুতবস্তু হইতেও সুন্দর ভাবটুকু বাছিয়া লইয়া তাহাই কল্পনার অপূর্ব্ব সুন্দরতম কুসুমে সাজাইতে ভাল বাসিতেন। সৌন্দর্য্যই তাঁহার কল্পনার পরিধি—কালিদাস সৌন্দর্য্য-জগতের রাজা। লজ্জাশীলা শকুন্তলা; ছলনাময়ী উর্ব্বশী, তপস্বিনী পার্ব্বতীই তাঁহার কল্পনার চরম উদাহরণ। সে সময় শুভ কর্ম্ম ও দেবতাদিগের যাত্রার সময় নাটক অভিনীত হইত সুতরাং সে সময়ে রৌদ্রাদি রসের অবতার-সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপ সাধিত হইবে কি না ভাবিয়াই হয়ত কালিদাস ঐ সকল রসের অবতারণা হইতে বিরত হইয়াছিলেন কিন্তু কালিদাস কি করেন নাই সে বিষয়ের আলোচনায় বিশেষ ফল নাই—তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাই আমাদের আলোচ্য। সেক্সপীয়রের কল্পনার প্রকৃতি এই যে সেক্সপীয়ারের কল্পনা সমুদ্রবৎ বিস্তৃত ও গভীর, কিন্তু যদিও প্রভাত-শিশিরবৎ অফেলিয়া হইতে ঝটিকাবৎ ক্যাথারিণী পর্য্যন্ত, স্বজন-ত্যাগী টাইমন হইতে সর্ব্বগ্রাসী কুব্জ রিচার্ড পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার আয়ত্তাধীন; বিলাসিনী ক্লিয়োপেট্রা, ও সতী সাবিত্রী ডেস্‌ডিমোনা, নিশাচরী লেডী ম্যাক্‌বেথ্ ও ফুল-বিহারিণী পর্‌ডিটা—সকলই সেই আকাশ-পাতাল ভেদকারী কল্পনার আয়ত্তাধীন,—কি এরিএল্, কি পক্,কি ডাকিনী-দল,কি সুরনারী মণ্ডলী—সকলই সেই বিশ্ব-অতিক্রম-কারিণী কল্পনার নিয়মাধীন—শাসনাধীন—আজ্ঞাধীন—কিন্তু সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির সূক্ষ্ম গঠনবিধিতে কালিদাস কোন কোন বিষয়ে যে সেই অদ্বিতীয় সেক্সপীয়রকে পর্য্যন্ত পরাভূত করিয়াছেন—তাহা বলিতে আমরা কথনই কুণ্ঠিত হইব না। সেক্সপীয়ার একটি নন্দনকানন সৃজনে অতিশয় নিপুণতা দেখাইতে পারেন বটে, কিন্তু সেই নন্দনকাননের প্রত্যেক ফুলের, প্রত্যেক ফুলের প্রত্যেক পাপড়ীর, প্রত্যেক পাপড়ীর প্রত্যেক শিরায় যে কত মুগ্ধকর সৌন্দর্য্য নিহিত আছে, তাহা কালিদাস ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন কবিই আর প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। সে সৌন্দর্য্যের নিগূঢ় তত্ত্ব অনুভব করা নিতান্ত সহজ নহে। যে রমণীয় উপাদানে, যে

পারিজাতের পরিমলে, যে ইন্দ্রধনুর বর্ণে, যে কবিতার কল্পনাতে,সে কল্পনার জ্যোৎনাতে শকুন্তলা সৃজিত হইয়াছিল—তাহা সহজে কে বুঝিবে ?—দ্বীপবাসিনী মিরান্দা ত সে শকুন্তলার সম্মুখে সূর্য্যালোকে দীপালোক মাত্র,—চন্দ্রালোকে খদ্যোতালোকমাত্র। কালিদাস ও সেক্‌সপীয়রকে তুলনা করিয়া এক জন ফরাসী গ্রন্থকর্ত্রী এইরূপ বলিয়াছেন—"বোধ হয় ভারতবর্ষীয় কবি পারিপাট্য (Finesse), সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণদর্শিতাতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করিয়াছেন; যাহা ধরিতে ছুঁইতে পারা যায় না, ইনি তাহাই ধরিয়া পাইয়াছেন, তিনি অতি এক গভীর প্রদেশ হইতে সত্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা যে সে স্থান নহে—স্ত্রীলোকের হৃদয় ১।"

আমরা এই কথা প্রতিপন্ন করিবার আশায় এক জন প্রখ্যাত-নামা সমালোচকের "শকুন্তলাও মিরান্দা" সমালোচনার সমালোচন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের নিগূঢ় উদ্দেশ্য এই যে কালিদাসের সৌন্দর্য্য-প্রতিমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগত সুষমার গভীর আলোক কতদূর দুরবগাহনীয় তাহাই সকলের সম্মুখে আজি প্রকাশ করি।

বিখ্যাত সমালোচকের কথাগুলিই আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ২—

"কিন্তু শকুন্তলা সরলা হইলেও অশিক্ষিতা নহেন। তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন তাঁহার লজ্জা, লজ্জা তাঁহার চরিত্রে বড় প্রবলা। মিরান্দার সে রূপ নহে। মিরান্দা এত সরলা যে তাহার লজ্জাও নাই। কোথা হইতে তাহার লজ্জা হইবে ? তাহার জনক ভিন্ন অন্য পুরুষকে সে কখন দেখেই নাই।

...　　...　　...　　...

অথচ স্বভাবদত্ত স্ত্রী-চরিত্রের যে পবিত্রতা, যাহা লজ্জার মধ্যে লজ্জা, তাহা মিরান্দার অভাব নাই, এ জন্য শকুন্তলার সরলতা অপেক্ষা মিরান্দার সরলতায় নবীনত্ব এবং মাধুর্য্য অধিক।

...　　...　　...　　...

শকুন্তলা সমাজ-প্রদত্ত সংস্কার-সম্পন্না, লজ্জাশীলা, অতএব তাহার প্রণয় মুখে অব্যক্ত থাকিবে, কেবল লক্ষণেই ব্যক্ত হইবে, কিন্তু মিরান্দা সংস্কারশূন্যা, লৌকিক লজ্জা কি তাহা জানে না, অতএব তাহার প্রণয়-লক্ষণ বাক্যে অধিক পরিস্ফুট হইবে।"

সুবিচক্ষণ সমালোচকের এই কয়েকটি পংক্তিতে মানব-প্রকৃতি-বিষয়ক, রমণী-হৃদয়-বিষয়ক, এমন কি,—সেক্সপীয়ার-বিষয়ক এতগুলি বিকট ভ্রান্তি প্রকটিত হইয়াছে যে তাহা মুক্তকণ্ঠে প্রদর্শন না করিলে সাধারণ পাঠকের মনে একটা বিষম ভ্রান্তি থাকিয়া যাইবে। সমালোচক আরম্ভেই বলিতেছেন যে "শকুন্তলা সুশিক্ষিতা"—এ গূঢ় গুপ্ত কথা তিনি কোথা হইতে জানিলেন ?—কালিদাস ত কোথাও

১ Les Heroines de Kalidasa te. Les Heroines de Shakespeare, Per Mary Summer (Madame Foucoux) Paris : 1879-P 117.

২ বিবিধ সমালোচন, শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

বলেন নাই যে শকুন্তলা জন্মেও কোন শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শকুন্তলা হইতেও যে মিরান্দা সুশিক্ষিতা,তাহা সেক্সপীয়ার আপনিই মিরান্দার পিতা প্রস্পেরোর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—প্রস্পেরো নিজেই বলিতেছেন যে "এই জন-মানব-শূন্য দ্বীপে আসিয়া তোমার শিক্ষা-গুরু রূপে আমি তোমাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দান করিয়াছিলাম,—এমন কি, অন্য অন্য রাজকুমারীরা এমন শিক্ষা কখনই পাইতে পারে না *।" যদি কেহ বলেন যে সে শিক্ষা পিতার দেয় শিক্ষা, অর্থাৎ তাহাতে সংসারের নাম-গন্ধও নাই—রসাভাসের নাম গন্ধও নাই—সমাজের নাম গন্ধও নাই—উহা কেবল নৈতিক ও ধর্ম্ম-শিক্ষা মাত্র,—আমরা তাহার উত্তরে এই বলি যে সে কথা ভ্রান্তিমূলক। যখন প্রস্পেরো আপন নির্ব্বাসনের কথা মিরান্দার কাছে ব্যক্ত করিয়া,—তাঁহার প্রতি তাঁহার সহোদরের অত্যাচার বর্ণনা করিয়া মিরান্দাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এখন বল দেখি,—এই রূপ ব্যক্তি আমার সহোদর হইতে পারে কি না?"—মিরান্দা উত্তর করিলেন—

"আমার পিতামহীকে অসতী ভাবিলেও আমার পাতক আছে—কিন্তু অনেক উন্নতমনা জননী ও জঘন্য পুত্র প্রসব করিয়াছে"———এই উত্তরেই মিরান্দার সংসার জ্ঞান,সমাজ-জ্ঞান,মনুষ্য-প্রকৃতির রহস্য জ্ঞান পর্য্যন্ত কি প্রকাশ পাইতেছে না? তবে মিরান্দা অপেক্ষা শকুন্তলা যে সুশিক্ষিততর, তাহা কিরূপে প্রকাশ পাইতেছে? কণ্বমুনির কাছে শকুন্তলা কখনই সাংসার ও সমাজের শিক্ষা পাইতে পারেন না ১, কারণ কণ্বমুনি নিজেই বলিয়াছেন যে তিনি সে সব বিষয়ের কিছুই জানেন না, প্রিয়ম্বদা ও অনসূয়া যে কখন আশ্রমের বহির্দ্বারে গিয়েছিলেন এমন কথা কালিদাস কোথাও বলেন নাই, গোতমী ও আগন্তুক ঋষিবৃন্দ যে শকুন্তলার কাছে কখন' প্রণয়-রহস্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা সম্ভবই নহে, অথচ মিরান্দা জানেন যে নিজের খুল্লতাতকে মন্দ বলিলে পিতামহীর সতীত্বের উপর নিন্দা অর্শায়, এবং তা অপেক্ষা আরও তিনি জানেন যে শুদ্ধমনা জননীরাও নীচমনা পুত্র প্রসব করিয়া থাকে ২। —সুতরাং ইহাতে কি এই প্রতিপন্ন হয় না যে শকুন্তলা অপেক্ষাও মিরান্দা সুশিক্ষিততর ছিলেন? তবে সুপ্রসিদ্ধ লেখক কিরূপে সিদ্ধান্ত করিলেন যে শকুন্তলা বিশেষ সুশিক্ষিতা ও সংস্কারসম্পন্না ছিলেন? তিনি বলিতেছেন "শকুন্তলা সরলা হইলেও অশিক্ষিতা নহেন,—তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন তাঁহার লজ্জা।" লেখককে জিজ্ঞাসা কর যে শকুন্তলা লজ্জাশীলা কেন?—তিনি বলেন যে শকুন্তলা সুশিক্ষিতা। আবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর যে শকুন্তলা কিসে সুশিক্ষিতা

* Tempest, act I. Scene II.

১ ইহা ঠিক নহে, সখীমুখে ব্যক্ত আছে যে তাহারা ইতিহাসে অনভিজ্ঞ ছিল না। সং

২ যখন সখীরা শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত রাজার গোচর করিয়াছিল তখন ইহা সম্ভব নহে। সং

হইল ?—তাহার উত্তর এই যে তিনি লজ্জাশীলা। ইহাকেই ন্যায়শাস্ত্রে চক্রভ্রান্তি কহে। জিজ্ঞাসা কর "পর্ব্বতে ধূম উঠিতেছে কেন?" উত্তর—"পর্ব্বতে বহ্নি আছে"—আবার জিজ্ঞাসা কর "পর্ব্বতে যে বহ্নি আছে, তাহা কিরূপে জানিলে?" উত্তর—"কেন না পর্ব্বতে ধূম উঠিতেছে?

প্রকৃত প্রস্তাবে, শিক্ষার সঙ্গে লজ্জার যে কতদূর নিগূঢ় সম্বন্ধ তাহা আমরা পরে দেখাইব—আমরা পরে দেখাইব যে আশ্রম-বাসিনী শকুন্তলার লজ্জাশীলতা অপেক্ষা দ্বীপান্তর-বাসিনী মিরান্দার লজ্জাশূন্য সরলতা কখনই মধুরতর নহে। কিন্তু তাহা দেখাইবার পূর্ব্বে অগ্রে দেখা আবশ্যক যে সেক্সপীয়ারের "সুশিক্ষিতা ও সমাজ-সংস্কার-সম্পন্ন।" নিয়ত-উচ্চারিত-নামা নায়িকাদের মধ্যে লজ্জার ভাব কতদূর পরিণত। তাহা হইলেই সহজে বুঝিতে পারিব যে ঐ লজ্জা-সম্বন্ধে কালিদাসের কল্পনা সেক্সপীয়ারের কল্পনা হইতে কতদূর বিভিন্ন। সেই প্রভেদের কারণ বুঝিতে পারিলেই মিরান্দা অপেক্ষা শকুন্তলাকে সহস্রগুণে "লোকললামভূতা' বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। পাখার আড়ালে মুখ লুকাইলে, বা রুমালে চক্ষু ঢাকিলে যে লজ্জার উদ্দেশ্য সাধন হয়, আমরা সে লজ্জার কথা বলিতেছি না,—সে লজ্জা ত ছলনার নামান্তর মাত্র,—সে লজ্জা ত বিভ্রম-বিলাসের রূপান্তর মাত্র। কিন্তু যে লজ্জা রমণী-হৃদয়ের নিভৃত উৎস হইতে উৎসারিত, যাহার প্রভাবে প্রাণমন স্তরে স্তরে আপনাপনি কাঁপিয়া উঠে ও অভিপ্রেত কথা গুলি রসনাতে আপনাপনি বিজড়িত হইয়া যায়, যে লজ্জা প্রকৃত সরলতার সঙ্গিনী, বিনয়ের জননী ও সৌন্দর্য্যের নিদানভূত, আমরা সেই লজ্জার কথাই বলিতেছি, এবং দেখিব যে সেক্সপীয়ারের কল্পিত সুশিক্ষিত সংস্কার-সম্পন্ন নায়িকা-মণ্ডলে সে লজ্জা কতদূর বলবতী।

ব্রেবান্‌ষীয়ো-দুহিতা ডেস্‌ডিমোনা ওথেলোর সঙ্গে পিতৃগৃহ হইতে পলায়ন করিলে পর, তাহারা বিচারালয়ে আনীত হইল। তখন মর্ম্মপীড়িত ব্রেবানষীয়ো নিজ দুহিতার নির্দ্দোষিতার বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত থাকিয়াই তিনি ডেস্‌ডিমোনাকে বলিলেন, "এস, এস, তোমার কি বক্তব্য আছে বল। তুমি ত জানই যে এখানে কাহার প্রতি তোমার বশম্বদতা প্রদর্শন করা উচিত।' তখন ডেস্‌ডিমোনা উত্তর করিলেন, "পিতঃ এখানে আমার কর্ত্তব্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আপনার নিকটে আমি আমার জীবন ও শিক্ষার কারণে ঋণী আছি বটে, এবং সেই হেতুই আমি আপনাকে সম্মান করিব, আমার সমস্ত কর্ত্তব্যের নিয়ন্তৃ আপনিই, আপনি আমার পিতা, কিন্তু ইনি আমার স্বামী, সুতরাং আমার জননী তাঁহার নিজ পিতার অপেক্ষাও আপনার প্রতি যত অধিক যত্ন ও কর্ত্তব্যশীলতা দেখাইয়াছিলেন, আমিও আপনার অপেক্ষাও এই আমার স্বামীর প্রতি অধিকতর সেইরূপ যত্ন ও কর্ত্তব্য-শীলতা দেখাইতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইব না"। (১)

(১) Othello. Act 1. Scene III.

বৃদ্ধ রাজা লীয়ার যখন দুহিতাত্রয়কে ডাকিয়া প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন, তখন সেক্‌সপীয়ারের নায়িকা-শ্রেষ্ঠা কর্ডিলিয়া শুভ্র-কেশ-শির হিমালয়-সদৃশ রাজপিতার মুখের উপরেই বলিলেন,—

"পিতঃ, আপনি আমাকে জন্ম দিয়াছেন, আমাকে লালন পালন করিয়াছেন, আদর যত্ন করিয়াছেন;—আমিও সেই অনুসারে—সেই আদান প্রদানের উচিত নিয়মানুসারে আপনাকে মান্য করি, ভালবাসি এবং সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তি করি। * * *

"কিন্তু আমি যখন বিবাহ করিব, তিনিই যিনি আমার পাণিগ্রহণ করিবেন, তিনিই আমার ভাল বাসা যত্ন ও কর্ত্তব্যশীলতার অর্দ্ধেক অধিকারী হইবেন। আমি নিশ্চয়ই এমন বিবাহ করিব না যে আমার ভগিনীদের মত বিবাহ করিয়াও পিতাতেই সকল ভালবাসা উৎসর্গ করিব।"

লীয়ার। "কিন্তু এই কি তোমার হৃদয়ের কথা?"

কর্ডিলীয়া। "হাঁ পিতঃ।"

লীয়ার। "এত অল্প বয়সেও এত নিষ্ঠুর?"

কর্ডিলীয়া। "রাজন! এত অল্প বয়সেও আমি এত সত্যবাদিনী।" (২)

আবার যখন ইংলণ্ডাধিপতি সিম্বেলাইন তদীয় দুহিতা ইমোজেনকে অজ্ঞাত কুলশীল পস্থুমসের সহিত বিবাহের জন্য ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন—

"রে দুর্বৃত্ত পামরি!—তোর এই যে উচিত কায, অর্থাৎ, আমার বিগত যৌবনকে পুনরুদ্ধার করা,—তাহা না করিয়া তুই আমার এই বৃদ্ধ বয়সের উপর আরও বৎসরেকের বার্দ্ধক্য স্বচ্ছন্দে চাপাইতেছিস্?"

ইমোজেন্। "হে পিতঃ, আমি আপনাকে অনুনয় করিতেছি যে আপনি বিরক্ত হইয়া আর কষ্ট পাইবেন না। আপনার ক্রোধ আমি এখন অনুভব করিতে অক্ষম, কেন না আপাততঃ আমার কষ্টের প্রভাবে আমার অন্য সকল প্রকার জ্বালা-যন্ত্রণা শমিত হইয়াছে।"— ... ...

... ...

সিম্বে। "তুই এক জন ভিখারীকে বিবাহ করিয়া আমার সিংহাসনকে কি নীচত্বের আসন করিতে চাস্?"

ইমো। না, আমি তাহাতে বরং উজ্জ্বলতর আভা প্রদান করিয়াছি।"

সিম্বে। "রে তুই নীচ পামরি!"

ইমো। "মহাশয়! আমি পস্থুমসকে যে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছি, সে কেবলই আপনার দোষে! আপনিই তাহাকে আমার খেলার সঙ্গীরূপে প্রতিপালিত করিয়াছিলেন, আর এখন আমি দেখিতেছি যে তিনি রমণীমাত্রেরই উপযুক্ত পাত্র—সুতরাং আমাকে তিনি বরং আমার অনুচিত মূল্যে কিনিয়াছেন।"

সিম্বে। "কি? তুই কি পাগল হইয়াছিস্?"

ইমো। "প্রায়ই তাই। ঈশ্বর আমাকে নীরোগ করুন! এই আমার চড়ান্ত

(২) King Lear. Act I. Scene 1.

বাসনা যে আমি এক জন চাষার দুহিতা হইয়া পস্থুমস্‌-রূপ এক জন চাষা-পুত্রের কেন প্রণয়িনী হইলাম না।”

সিম্বে। “রে তুই মূর্খ পামরি!” (৩)

আচ্ছা, যদি পিতাই না লজ্জার পাত্র হইল,—যদি বৃদ্ধ “উন্মাদিগ্রস্ত” জনকই না লজ্জার পাত্র হইল,—কিন্তু প্রণয়ের সদ্য বিকাশে প্রণয়ীত লজ্জার পাত্র হইলেও হইতে পারে? কিন্তু সেক্সপীয়ার সেখানেই বা কিরূপ লজ্জা রক্ষা করিয়াছেন তাহা দেখা যাক্—

রোমীয়ো জুলীয়েট্‌কে কখন দেখে নাই—জুলিয়েট্‌ও রোমিওকে কখন দেখে নাই, দুজনে কেহই কাহাকেও চিনে না, জানে না, ভাবেও নাই—এই অবস্থায় জুলিয়েট্‌দের রাজ-ভবনে এক দিন মহা সমারোহ হইল। রোমীয়ো নিজ প্রণয়িনী রোজালীনকে দেখিবার আশাতে ছদ্মবেশে সেই থানে উপস্থিত হইলেন। সেই থানে উপস্থিত হইয়া সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা জুলিয়েট্‌কে দেখিতে পাইলেন।—তাঁহাকে দেখিয়াই রোমিয়োর হৃদয় হইতে রোজালীনার প্রতিমা বিসর্জ্জিত হইল; এবং জুলীয়েটের উজ্জ্বল রূপ-মাধুরী জাগিয়া উঠিল। জুলীয়েট্‌ও সেই ভাবে গদগদ হইলেন, রোমীয়োর রূপে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া অপরিচিত শত্রুর হস্তেই মনে মনে প্রাণ মন উৎসর্গ করিলেন। এই দুই অপরিচিত মুগ্ধ মুগ্ধাদের মধ্যে—রাশি রাশি লোক-সমাজের মধ্যে, সেই ছদ্মবেশের মধ্যে দুই জনে এইরূপ কথা বার্ত্তা চলিতে লাগিল,—

রোমীয়ো। “আমি আপনার শরীর-রূপ পবিত্র মন্দিরকে যদি এই অনুপযুক্ত হস্তে কলঙ্কিত করি, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে আমার ওষ্ঠাধর-রূপ লজ্জাশীল যুগল তীর্থযাত্রী সে কলঙ্ক মোচন করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে।” ১

জুলিয়েটও সেই কথার তেমনি একটী উত্তর দিলে পর, দুই অপরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে অধরে অধরে চুম্বনের “অষ্টম আইন্” অর্থাৎ “চিরোবন্দোবস্ত” দিব্য রূপে সংস্থাপিত হইল। কায়িক সুখের পরিণামে রোমীয়ো জুলিয়েট্ উভয়েই জানিলেন যে উভয়েই শত্রু পক্ষীয়।

এইরূপ Twelfth Night এ, এইরূপ As You Like It এ—এইরূপ সেক্সপীয়ারের যত্র তত্র। এইরূপে সেক্সপীয়ারে লজ্জার বলিদানে সরলতা, বিনয়ের বলিদানে মুক্তকণ্ঠতা, রমণীর রমণীয়তার বলিদানে পৌরুষিক ওজস্বিতা পদে পদে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কালিদাসে ওরূপ নির্লজ্জতার আভাসমাত্রও পাওয়া যায় না। তাহার কারণ কি? শকুন্তলার জড়িমা-জড়িত কথা বার্ত্তা, উর্ব্বশীর লতামণ্ডপে অঞ্চল বিজড়ন, পার্ব্বতীর সখীসমাজে অপ্রস্তুত ভাব, এ সকল কোথা হইতে আসিল? এ সকল কোথা হইতে কালিদাসের কল্পনায় প্রতিফলিত হইল? যদি বল, যে কালিদাস আসিয়ায় জন্মিয়াছিলেন বলিয়া—তাহা হইলে সেক্সপিয়ারের দিগন্ত-ব্যাপিনী কল্পনার উপর দোষারোপ করা হয়। ক্রমশঃ

(৩) Cymbeline. Act I. Scene I.

১ Romeo and Juliet, Act I. Scene 1.

বুদ্ধদেবের স্বপ্ন ভঙ্গ।

আর ঘুমাব না, আর ঘুমাব না,
আর না মুদিব অলস আঁখি—
যা ঘটে ঘটুক, যাতনার জ্বালা
সহিব না আর ভবনে থা ক।
বিজন কাননে আপনার মনে
আপনার ধ্যানে মগন রব—
মায়ার বিকারে, মোহের যাতনা,
বুঝিয়েও আর কেনই সব';
আহা, সেই সেই প্রথম প্রহরে
যে স্বপন আমি দেখিনু হায়—
এখনো স্মরিলে কেঁদে ওঠে প্রাণ
মরমে মরম গলিয়ে যায়।
আহা, কেই বা সে অশীতি-বয়সী—
লাঠির উপরে রাখিয়ে ভর,
হেরিনু যাহারে পাহাড়ের পথে
যায় ধিরি ধিরি সাঁজের পর!
বাতাসে দশন কেঁপে কেঁপে পড়ে,
লোল হয়েছে গলিত মাস,
ভাঙ্গিয়ে গিয়েছে কোমরের হাড়,
চলিতে সঘনে বহিছে শ্বাস।
দৃষ্টি নাহি চলে দুনয়নে আর,
দুনয়নে তার পড়েছে ছানি,
এলিয়ে পড়িছে হস্ত-পদ তার,
লুটিয়ে পড়িছে শরীর খানি,
চলিতে চলিতে খেতেছে হোঁচট্,
পাহাড়ের পথে গড়ায়ে যায়,
হাড় গোড় হয় ভেঙ্গে চুরমার,
জানু ধরি পুনঃ উঠিতে চায়।
কাঁপিতে কাঁপিতে, উঠিতে উঠিতে
আবার—আবার সাপটি পড়ে,
আর্ত্তনাদ তার বাতাসে মিশায়,
প্রাণ যেন আর না রয় ধড়ে!
অনেক কাঁপিয়ে, অনেক হাঁপিয়ে
অশীতি বয়সী শেষেতে উঠি—
বেঁকে চুরে ভয়ে চলিতে লাগিল,
স্থান ছেড়ে পড়ে অধীর লাঠি!
উঃ কি ভীষণ ভয়ানক স্থানে
উপজিনু গিয়ে তাহার পরে,
দিগন্ত-ব্যাপিনী মরুভূমি মাঝে
চমক ভাঙ্গিল কাহার স্বরে?
বলিষ্ঠ গঠন যুবা এক জন
ভূমেতে লোটায় বিকার-দায়,
অনলের কণা বালুকা মাঝারে
উলটি পালটি গড়ায়ে যায়!
অরুণ-বরণ, যুগল নয়ন,
অথচ নয়নে কলুষ নাই,
আঙ্গার বরণ হয়েছে শরীর,
অধর শুখায়ে হয়েছে ছাই—
তৃষার জ্বালায়, যাতনা জ্বালায়—
মিছে বলে বলী হইয়ে হায়,
দন্ত কড়মড়ি উঠিছে যেমন
অমনি আবার গড়ায়ে যায়।
অনল মাখিয়ে অনিল বহিছে,
ছুটিছে বালুকা অনল-ধারা,
ভিতরের তাপে জ্বলিছে যুবক,
উপরে তপন আগুন পারা।

কভু করাঘাত করে নিজ বুকে,
আপনার কেশ আপনি ছেঁড়ে,
তখনি আবার জড়ের মতন
—মড়ার মতন লুটায়ে পড়ে।
সঙ্গে ছিল যারা, পলায়েছে তারা,
লোক জন সব কোথায় এবে,
এমন বিপদে একটি ও প্রাণী
নিকটে নাহি যে তাহারে সেবে।
এক ফোঁটা জল করি আহরণ
কেহই নাই যে মুখেতে দেয়,
ঝামা হোয়ে গেছে লোল রসনা;
তৃষায় বক্ষ ফাটিয়া যায়।
চারি ধারে তার, বিকট আকার
যমদূত সব তাকায়ে রয়,
কেহ বা নাচিছে, কেহ বা হাসিছে
—ছায়ার আকারে আমোদময়!
কেহ বা নয়নে উগরে অনল,
কার (ও) বা রসনা বিজলী ঝলে,
কেহ বা গরজি খাইবারে ধায়,
কেহ বা বসিছে উরস-স্থলে!
উঃ কি ভীষণ, সেই সে স্বপন,
হৃদি কেঁপে ওঠে স্মরি তা যেই,
—আবার—আবার—তৃতীয় প্রহরে
ছিঃ ছিঃ কি স্বপন দেখিনু সেই!
ছিঃ ছিঃ স্মরিব না আর সে স্বপন,
স্মরিতেও ঘৃণা উপজে মনে,
কিন্তু যেন সেই ভাগিরথী-তীর
গ্রথিত রহেছে মরম সনে।
সেই সে পুলিনে তৃতীয় প্রহরে
নেহারিনু মৃত রমণী—কে সে?
আ-নাভি মগন জাহ্নবীর জলে,
ষোড়শী শয়ান পুলিন-দেশে।
নৈশ পদ্মবৎ কান্তিহীন তনু,
অথচ রূপের আভাস-ময়,
শীয়রে নিকট বিকট শ্মশান,
অধোভাগে ধীরে তটিনী বয়।
কাদায় জড়িত চাঁচর চিকুর,
হেথায় হোথায় অবাধে পোড়ে,
বসনের চীর যা ছিল শরীরে
কোথায় গিয়েছে স্রোতের তোড়ে।
না মুদিতে সেই নলিনী-নয়ন—
নখরে শকুনী অবাধে ছেঁড়ে;
গৃধিনীর দলে তাড়ায়ে শৃগাল
নিলীম অধর খেতেছে কেড়ে।
প্রতাড়িত হয়ে গৃধিনীর দল
বিছাইয়া পাখা আকাশ-দেশে,
বামার নিটোল পীন পয়োধরে
গভীরে গরজি বসিছে এসে।
হেথায় বিশুষ্ক গোলাপ-কপোলে
বায়স ছিঁড়িয়ে খেতেছে ঠোঁটে,
বাম হাত খানি টানিয়ে হোথায়
অদূরে কুকুর গরজি ওঠে—
নিরখিয়ে ছিঃ! ছিঃ! সে বর বপুর
হইতেছে দশা এমন ধারা,
তেড়ে গেনু যেই শৃগাল কুকুরে
অমনি আসিল গরজি তারা।
আচম্বিতে তাই ভেঙ্গে গেল ঘুম,
জাগিয়ে উঠিনু তরাশ ভরে,
আবার—আবার জাগিয়ে জাগিয়ে
অচেতন হ'নু ঘুমের ঘোরে।
সহসা স্বপনে আসিনু যেথায়
মানস-সরসী বিছায়ে রয়,

হিমাদ্রীর শির করিয়ে অধীর
মৃদুল মধুর বাতাস বয়—
ঈষৎ ঈষৎ সরসীর জল
থাকিয়ে থাকিয়ে কাঁপিয়ে ওঠে,
হোথায় সারস সারসীরে ল'য়ে
অস্ফুটো কমল কাননে ছোটে।
শূন্যে শূন্যে ওড়ে চক্রবাকী দল,
শূন্যে শূন্যে ওঠে শিখর-মালা—
সুদূরে সেথায় মেঘের আড়ালে
চকিতে চমকে বিজলী-বালা!
সেই সে শ্যামল সরোবর জলে
ওই কে দাঁড়ায়ে তাপস-বর—
জটা জাল তাঁর অবাধে এলায়ে
পোড়েছে সরসী সলিল পর।
দণ্ড কমণ্ডলু শোভে দুই হাতে
গেরুয়া বসনে আবৃত কায়,
রজত-বরণ-শ্মশ্রু কেশরাশি
বাতাসে দুপাশে উড়িয়ে যায়।
জানি না—জানি না কিসের কারণে,
কিসের ভাবেতে হইয়ে ভোর,
প্রশান্ত ভাবেতে—উদার ভাবেতে
মুদিত নয়নে ফেলিছে লোর—
সে লোর লহরী শান্তি-মাখা যেন,
অনল আভাস নাহিক তায়,
হিমালয়-সম উন্নত হৃদয়ে
যেন রে জাহ্নবী উথলি ধায়।
ভাবে জ্ঞান হয় মায়া-মোহ-ক্লেশ
সে মনে যেন না পশিতে পায়,
মহান—উদার—প্রশান্ত ভাবের
জোছানা যেন সে বদনে ভায়।
কমলাও যেন সে চরণ-তলে
লুটাতেও নাহি ভরসা পান,
বাসব আপনি যেন তাঁরে হেরে
দিগন্তে সভয়ে মিশায়ে যান।
সে মুরতি চিতে, ভাবিতে ভাবিতে
সহসা ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর—
রাজ-আড়ম্বর!—দূরে থাক্ তুই
চরণে বিদায় লইনু তোর!
এখনি ছিঁড়িব রাজ-আভরণ,
মায়ার শীকল, মোহের ফাঁশ,
জরা-মৃত্যু-ময় আশ্রম আলয়ে
কার্ রে বাসনা করিতে বাস?
কার্ রে বাসনা অনল-মাঝারে
জ্বলিয়ে পুড়িয়ে করিতে বাস—
রাজ আড়ম্বর! দূরে থাক্ তুই,
ছিঁড়িব আজিকে মোহের ফাঁশ!
বিজনে বিজনে, বনে বনে বনে
বাকলে ঢাকিয়ে মাটীর কায়—
বন-ফল খেয়ে, নদী-জল পিয়ে
ভাসিব আপন ভাবেতে হায়!
চাহি না হইতে রাজ-অধিরাজ—
ঝড়ে মহীরুহ আগেই পড়ে,
বিভব-বাসনা নাহি রাখি চিতে
—মণির কারণে ফনিনী মরে—
প্রণয়?—প্রণয়?—প্রণয় কারণে
আজি কি আটক্ রহিব গেহে?
কিবা সে প্রণয়!—কার বা প্রণয়!
কিসেরি প্রণয় মাটীর দেহে?
বিজনে বিজনে, বনে বনে বনে
বাকলে আবরি ধূলার কায়—
বন-ফল খেয়ে, নদী জল পিয়ে,
ভাসিব আপন ভাবেতে হায়!

শকুন্তলা সমালোচনার সমালোচনা।

নাটকীয় ব্যক্তি-গণের চরিত্র-সম্বন্ধে লেখক যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এই ;—

"রাজা দুষ্মন্ত একজন ধীরললিত নায়ক। তাঁহাতে উদাত্ত্ব গুণও কিছু লক্ষিত হয়। তিনি আত্মশ্লাঘাবর্জ্জিত বিনয়ী ধর্ম্মভীরু এবং ক্রূরতাশূন্য এই সকল পরিচয় আমরা অতি স্পষ্টরূপে পাই। বস্তুতঃ দুষ্মন্ত যে একজন প্রশংসনীয় ব্যক্তি তাহা নহে।"

দুষ্যন্ত প্রশংসনীয় ব্যক্তি ছিলেন না এ-বিষয়ে লেখকের এমনি ধ্রুবজ্ঞান যে তিনি কেবল ঐ কথাটি উল্লেখ-মাত্র করিয়াই নিশ্চিন্ত; কোন্ বিষয়ে যে, দুষ্যন্ত রাজা অপ্রশংসনীয় তাহা ভুলেও একবার উত্থাপন করেন নাই; তিনি দুষ্যন্তের প্রশংসনীয় গুণ-গুলি আনুপূর্ব্বিক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন অথচ পদে পদে পাঠকগণকে সাবধান করিয়া দিতেছেন—খবরদার যেন তাঁহারা সে সমস্ত গুণ-গুলিকে প্রশংসনীয় মনে না করেন, এ কথার প্রতি তাঁহারা যেন দ্বিরুক্তি না করেন যে, শ্রদ্ধা ভক্তি বিনয় নম্রতা শৌর্য্য বীর্য্য ভদ্রতা দাক্ষিণ্য সৌন্দর্য্য-রসাভিজ্ঞতা—এসকল গুণ প্রশংসার অযোগ্য —কেন তাহা? না যেহেতু লেখকের সে বিষয়ে আদবেই সংশয় নাই;—ইহা অপেক্ষা গুরুতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে? দুষ্যন্ত-রাজা যে কেমন অপ্রশংসনীয় ছিলেন তাহা লেখক অতঃপর প্রদর্শন করিতেছেন, তিনি কিন্তু-পূর্ব্বক বলিতেছেন ;—

"কিন্তু প্রাচীন কালে সচরাচর রাজারা যেরূপ ছিলেন তাহা কালিদাস চিত্রপটের ন্যায় লিখিয়া গিয়াছেন। দুষ্মন্তের ঋষিদিগের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও যত্ন ছিল। তাঁহারা নিরুদ্বেগে তপশ্চরণ করিতেছেন কিনা ইহা জানিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল; এবং যখন তপোবনের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন তখন সূতকে বলিলেন তপোবন-নিবাসিনাং উপরোধো মাভূৎ এতাবত্যেব রথং স্থাপয়। দুষ্মন্ত অতিশয় বিনীতস্বভাব; তিনি বনে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আভরণ ও ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়া গেলেন কারণ বিনীতবেশেন প্রবেষ্টব্যানি তপোবনানি নাম। (তাঁহার বিনয়ের পরিচয় সপ্তম অঙ্কেও যথেষ্ট আছে, তিনি মাতলির প্রশংসা শুনিয়া যেন বিরক্ত হইতেছেন ও আপনাকে ইন্দ্রের অনুগ্রহের যোগ্যপাত্র মনে করেন না।) তপোবনে-প্রবেশ-কালে তাঁহার মন শারদীয় আকাশের ন্যায় নির্ম্মল ছিল। ক্ষণকাল-পরে তাঁহার দক্ষিণ-বাহু স্পন্দন হওয়াতে তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ

চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল কিন্তু তিনি যেন তাচ্ছিল্য করিয়াই বলিলেন অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্ব্বত্র। এই কথার দ্বারা তাঁহার প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য স্পষ্টই সূচিত হইতেছে। পরে তাঁহার বিশুদ্ধ গম্ভীর চিত্তে কিরূপে প্রগাঢ় প্রেম জন্মিল. তাহা কালিদাস উত্তম রূপে দেখাইয়াছেন। প্রথম প্রবেশ করিয়া রাজা যখন শকুন্তলা ও তৎসখীদ্বয়কে জলসেচন করিতে দেখিলেন তখনই যে একবারে লঘুপ্রকৃতির ন্যায় মন্মথ-বাণে আবিদ্ধ হইলেন তাহা নহে, তিনি দেখিয়া বলিলেন 'আহো মধুরমাসাং দর্শনম্।' এই প্রশংসা-বাক্যে বিস্ময় বুঝাইতেছে কিন্তু প্রেমের কোন লক্ষণ নাই—সুন্দরী কিশোরবয়স্কা বালা দেখিয়া কাহার না চক্ষুঃপ্রীতি জন্মে ও হৃদয় আহ্লাদিত হয়। প্রথমে রাজারও সেইরূপ হইয়াছিল। পরে কিয়ৎক্ষণ দর্শন করিতে করিতে তাঁহার মনে করুণার উদয় হইল। তিনি মহর্ষি কণ্বকে অসাধুদর্শী মনে করিলেন, কারণ তিনি শকুন্তলাকে তপঃকার্য্যে নিযুক্তা করিয়াছেন। এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে রাজার মনে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছে, কিন্তু তথাপি এখনও স্পষ্ট রূপে প্রেমের ভাব উদিত হয় নাই। আমরা জানি যে 'pity melts the soul to love' ইহার পর রাজা সতৃষ্ণ নয়নে শকুন্তলার প্রতি অবলোকন করিতে লাগিলেন। তিনি শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ হইয়া বলিতেছেন 'কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্।' এখন তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছে। তিনি "লোভনীয় কুসুমকে" কি রূপে লাভ করিবেন তাহাই ভাবিতেছেন। তিনি মনে করিতেছেন যে শকুন্তলা যদি মহর্ষির অসবর্ণক্ষেত্র-সম্ভবা হয় তাহা হইলে তিনি বিবাহ করিতে পারেন। ইহা দুষ্মন্ত রাজার প্রকৃতি-অনুযায়ী, তিনি ধার্ম্মিক এবং তাঁহার মনে ক্রূর বা অসদভিপ্রায় নাই। তিনি অসৎ প্রেমের কথা ঘুণাক্ষরেও মনে করেন নাই, শকুন্তলাকে বিবাহ দ্বারা লাভ করিবেন কিন্তু অনুরাগ তাঁহার মনে এত বদ্ধমূল হইয়াছে যে শকুন্তলাকে নিশ্চয় পাইব এইরূপ স্থির করিলেন, ও মুগ্ধ হইয়া ঈষৎ গর্ব্বের সহিত বলিতেছেন "অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা যদার্য্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ।" এরূপ গর্ব্বও এখানে অতি সুন্দর, কারণ যখন লোকে প্রেমে মত্ত হয় তখন তাহাদের আত্ম-অভিমান বৃদ্ধি হয়।" (লেখকের এ কথাটি ঠিক নহে; প্রেম আত্মাভিমানের গর্ব্বকে এমনি খর্ব্ব করিয়া দেয় যে, অত বড় রাজা এক জন আশ্রম-বাসিনী কন্যাকে আপনার রাজ-মর্য্যাদা অপেক্ষা অধিক মনে করিতে একটুও কুণ্ঠিত হ'ন নাই; ও-শ্লোকটির তাৎপর্য্য কেবল এইমাত্র যে, "অনার্য্য আচরণের প্রতি স্বভাবতই আমার মন পরাঙ্মুখ, তবে আজ কি আমার মন তাহার প্রতি ধাবিত হইবে? এ কখন হইতে পারে না, এ যুবতী নিশ্চয়ই ক্ষত্র-পরিগ্রহক্ষমা"—ইহা আত্মাভিমান নহে, ইহা আশার প্রবোধ-বাক্য।) "ক্রমে রাজা আত্মপ্রকাশ করিলেন ও নানাবিধ কথোপ-

কথন হইতে লাগিল। রাজার কথোপকথন অতি মনোহর এবং স্ত্রীদিগের প্রতি সম্মান-সূচক। আমরা প্রথম অঙ্ক পাঠ করিলে উপরোক্ত ভাব সকল অতি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই।"

লেখক এই যে কথাগুলি বলিলেন ইহা খুব ঠিক্; দুষ্যন্তের প্রকৃতি-চরিত্র ঐরূপই বটে—অর্থাৎ প্রকৃত এক জন হিন্দু রাজার যেমনটি হইতে হয়; দুষ্যন্তের সহিত এক জন মুসলমান রাজার তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ দৃষ্ট হইবে; আমাদের দেশের প্রকৃতি গত একটি যে সহজ-শোভন ভাব দুষ্যন্তরাজা আপদ-মস্তক সেই উপাদানে গঠিত; সে উপাদান যে কি তাহা বলিয়া বুঝানো বড় সহজ নহে,—তাহাতে নবাবি হাঙ্গামা নাই কিন্তু অন্তঃসার-সূচক রাজ-মহিমা সম্পূর্ণই আছে, তাহাতে আদব-কায়দার আড়ম্বর নাই অথচ তাহাতে বিনয় নম্রতা ভদ্রতা সভ্যতা মনুষ্যত্ব যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অদ্যকার কালের সভ্যতম জাতির সভ্যতম ব্যক্তিকে শিক্ষাদান করিতে পারে। বিনীতবেশে তপোবনে প্রবেশ করাতে দুষ্যন্তের মনের যে-এক মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে তাহা আকবরসার হীরা-জহরত-শোভিত মুকুটই বল, আর নেপোলিয়নের দিক্‌ধর্ষী কিরীটই বল, সে-সবকে তৃণ অপেক্ষাও লঘু করিয়া দিয়াছে; কেননা আধ্যাত্মিক মহত্ত্বের নিকট পার্থিব মহত্ত্ব, তপোবলের নিকট বাহুবল, বাস্তবিকই তৃণ অপেক্ষা লঘু; রামায়ণে আছে "ধিক্‌বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলং"—যথার্থই তাহা। লেখক দুষ্যন্ত রাজার ভাব-চরিত্র ঠিকঠাক্ বর্ণনা করিয়া আসিতেছিলেন, আমাদেরও তাহা বেস হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল—গীত বেস্ জমিয়া আসিতেছিল—এমন সময় কোথা-হইতে এক বে-সুরো "কিন্তু" আসিয়া সব মাটি করিয়া দিল; যথা,—"কিন্তু রাজার স্বভাবের মধ্যে কোন প্রশংসনীয় গুণ লক্ষিত হয় না;"—বিনা-মেঘে বজ্রাঘাত! কোথাও কিছু নাই মধ্যে-থেকে এমনি এক 'কিন্তুর' অবতারণা করা হইল যে, তাহা দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে অবাক্! লেখক এতক্ষণ পর্য্যন্ত দুষ্যন্ত রাজার কথাবার্ত্তা আচার ব্যবহার ভাব ভঙ্গি সকলই সুন্দর ও মনোহর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়া পথিমধ্যে হঠাৎ বেঁকিয়া দাঁড়াইলেন, অনেক ক্ষণ ধরিয়া দিব্য একটি প্রতিমা গঠন করিয়া এক আছাড়ে তাহা ভাঙিয়া চুরমার করিলেন, দুষ্যন্ত-রাজার যথেষ্ট গুণ বর্ণনা করিয়া অবশেষে স্বচ্ছন্দে বলিলেন "কিন্তু রাজার স্বভাবের মধ্যে কোন প্রশংসনীয় গুণ লক্ষিত হয় না;" কেন? না "সমস্ত নাটক পাঠ করিলে প্রথম অঙ্কে যে-সকল গুণ দেখিলাম সেই সকল পূর্ব্বাপর দৃষ্ট হয়।" দুষ্যন্ত রাজার গুণ-গুলি পূর্ব্বাপর-সমান—তবে আর সে-গুলিকে কেমন করিয়া গুণ বলিয়া প্রশংসা করা যাইতে পারে? উচিত—বাহুবটের কন্যার সঙ্গে দুষ্যন্ত রাজা সমস্বরে বলেন "দুষধাতো

রিবাস্মাকং দোষনিষ্পত্তয়ে গুণাঃ” অর্থাৎ দুষ-ধাতুর গুণেতেই যেমন দোষ হয় আমাদেরও দশা সেই রূপ! দুষ্যন্ত রাজার যদি আজ এক রূপ গুণ, কাল আর এক রূপ গুণ, পরশ্ব আর এক রূপ গুণ হইত, তবেই যা' তাঁহার গুণের একটা মূল্য থাকিত, তাহা যখন হয় নাই তখন সে-সব গুণ কোন কার্য্যেরই নহে! তবে, লেখকের মতানুসারে, দুষ্যন্ত রাজাকে এক-বিষয়ে প্রশংসা দেওয়া যাইতে পারে,—শকুন্তলার-বিরহে তিনি দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং শকুন্তলার পুনর্মিলনে তিনি আনন্দিত হইয়াছিলেন দুই অবস্থায় তাঁহার দুই রূপ গুণ দেখা দিয়াছিল—এক অবস্থায় চিত্তের অধীরতা, আর এক অবস্থায় চিত্তের প্রফুল্লতা,—অতএব এই একটি ছুতা ধরিয়া দুষ্যন্ত রাজাকে একটু প্রশংসা দেওয়া হোক, তাহাতে রাজারও মান রক্ষা হয়, লেখকের ও কোট বজায় থাকে, আপসে বিবাদ মিটিয়া যায়! লেখক ত দুই চারি কথায় বিচারনিষ্পত্তি করিয়া দিলেন, কিন্তু আসল বৃত্তান্তটা কি দেখা যা'ক্,—দুষ্যন্ত রাজা তপোবনে আপনার হৃদয়ের সৌন্দর্য্যানুরাগিতা-গুণের পরিচয় দিয়াছেন; শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি আপনার আধ্যাত্মিক বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন; শকুন্তলা-বিরহে রাজকার্য্যে যখন তাঁহার অপ্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল তখনও তিনি বিধিমত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থ প্রজাপালনের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে; ইন্দ্রের সহায়তা করিতে যাওয়াতে তাঁহার বীরত্ব প্রকাশ পাইয়াছে; এই রূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন গুণের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে; তবে—শকুন্তলার সহিত প্রেমালাপ, শকুন্তলার বিরহ, এবং শকুন্তলার মিলন এই গুলিই গ্রন্থের প্রধান অঙ্গ, এজন্য অন্যান্য-গুণ অপেক্ষা রাজার সহৃদয় প্রেমিকতা গুণ অধিক-মাত্রা জায়গা জুড়িয়াছে—এই পর্য্যন্ত; সেক্সপিয়রের রোমিওর-ও তাই—ফার্ডিনাণ্ডেরও তাই; সেক্সপিয়রের ম্যাক্‌বেথের গুণও প্রধানতঃ একটিমাত্র—বড় হইবার ইচ্ছা; হ্যামলেটেরও প্রধানতঃ একই প্রকার গুণ—অন্যায় ব্যবহারে অসহ্য মনোবেদনা অথচ তাহার প্রতিশোধ-কার্য্যে অপটুতা; কিন্তু তাহাতে মন্দটা কি হইয়াছে তাহা ত আমরা বুঝিতে পারি না, তাহার বিপরীত-টাই ত আমাদের চক্ষে মন্দ ঠেকে; আমরা ত চিরকালই শুনিয়া আসিতেছি যে, নাটকীয় ব্যক্তির পূর্ব্বাপর একই প্রকার গুণ রক্ষা করিতে পারাই নাটককারদিগের যা-নইলে-নয় এমনি একটি গুণ ও যে-নাটককার তাহা না পারে সে ব্যক্তির নাটক না লেখাই কর্ত্তব্য।

লেখক অতঃপর বলিতেছেন,—

“দ্বিতীয় অঙ্কে রাজা যখন তাঁহার প্রণয়-ব্যাপার মনে মনে আন্দোলন করিতেছেন তখন তাঁহার সেই গম্ভীর স্নেহময় স্বভাব প্রকটিত হইতেছে। তিনি বলিতেছেন।

“কামং প্রিয়া ন সুলভা মনস্তু তদ্ভাবদর্শনায়াসি।

অকৃতার্থেঽপি মনসিজে রতিমুভয়প্রার্থনা কুরুতে ॥”

আবার মৃদুহাস্য করিয়া বলিতেছেন।

“এবমাত্মাভিপ্রায়সম্ভাবিতেষ্টজনচিত্তবৃত্তিঃ প্রার্থয়িতা বিড়ম্বাতে। ” ইত্যাদি

ইহাতে যেন আমরা রাজা চিন্তামগ্ন ও লক্ষ্যশূন্য হইয়া এক দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন তাহা চিত্রপটের ন্যায় দেখিতেছি।”

উহা অপেক্ষা নাটকের অধিক গুণ আর কি হইতে পারে—তাহা ত জানি না; দৃশ্য-কাব্যের ঐ গুণটি সেক্সপিয়রের বিশেষ রূপে মনে ধরিয়া ছিল, তাই তিনি নাটক-অভিনয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন

“Overstep not the modesty of nature; for any thing so overdone is from the purpose of playing whose end both at the first and now was and is to hold as'twere the mirror up to nature. ”

কিন্তু প্রকৃতির ঐ যে একটি অবগুণ্ঠনবতী চারু লজ্জাশীলতা তাহা লেখক দেখিতে পারেন না, তিনি চান বাড়াবাড়ি একটা কিছু,—কি-যে তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য তিনি বলিতেছেন।

“এ অঙ্কে (অর্থাৎ পঞ্চম অঙ্কে) ঋষিদিগের সহিত কথাবার্ত্তাতে তাঁহার সেই বিনয় ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। ষষ্ঠ অঙ্কে তাঁহার অনুতাপের মধ্যেও সেই প্রশান্তা সরলা স্নেহ-যুক্তা প্রকৃতি। অতএব দেখা যাইতেছে যে তাঁহার স্বভাব যেরূপ বর্ণনা করা কালিদাসের অভিপ্রেত তাহা উত্তম হইয়াছে কিন্তু আমাদের বিশেষ মনোজ্ঞ নহে।”

আবার “কিন্তু”—লেখক কালিদাসের যেখানেই প্রশংসনীয় কোন কিছু দেখিতে পান সেইখানেই তাঁহার মনে বিদ্যুতের মত একটা “কিন্তু” উদয় হইয়া চকিতে বিলুপ্ত হইয়া যায়; কি ভাগ্য এবারে লেখক কিন্তুর একটা কারণ দর্শাইয়াছেন, তিনি বলেন,

“রামের চরিত্র সবিস্তরে পাঠ করিলে আমাদের হৃদয় যেমন স্নেহরসে আর্দ্র হইয়া যায়, রাবণের পরাক্রম ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা দেখিয়া আমরা যেমন বিস্মিত হই; যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মনিষ্ঠতা দেখিলে আমাদের মনে যেমন ভক্তির উদয় হয়; এরূপ কোন ভাব দুষ্মন্ত-চরিত্র-পাঠে আমাদের হৃদয়ে উদয় হয় না। অতএব দুষ্মন্ত রাজার চরিত্র বর্ণনাতে কোন দোষ ঘটে নাই বটে কিন্তু কালিদাসের ক্ষমতার পরিচয় কিছু পাওয়া যায় না। দুষ্মন্ত রাজার ন্যায় ব্যক্তি সংস্কৃত নাটকে বিস্তর দেখা যায়।”

এ কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে আমরা হার মানিলাম; আমাদের ছাড়িয়া দেও—এমন সুবিজ্ঞ জহরী জগতে কেহ আছে কি না সন্দেহ যিনি একখণ্ড হীরক্ দেখিয়া বলেন যে, স্বর্ণের ন্যায় ইহার মনোহর পীত বর্ণ নাই, নীলকান্ত মণির ন্যায় নীল বর্ণ নাই, রজতের ন্যায় উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ নাই, এ ত একটা ক্ষুদ্র বেলোয়ারি এর আবার মূল্য কি? এমন ধারা কতশত স্ফাটিক পদার্থ পথে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে, এমন কি একটুক্‌রা মিছরির দানার সঙ্গে ইহার সঙ্গে বেশী প্রভেদ দেখিতে

পাওয়া যায় না," এইরূপ একজন জহরী ব্যতীত আর কাহার সাধ্য লেখকের ওকথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে ;—দুষ্মন্ত রাজা রামের মত নহেন, যুধিষ্ঠিরের মত নহেন, রাবণের মত নহেন, সেক্সপিয়রের লিয়র রাজাও উহাদের কাহারো মত নহেন, অতএব উভয়ের কাহারো চরিত্র পাঠে আমাদের মনে যদি কোন ভাবের উদয় হয় তবে সেটি আমাদের মস্ত ভুল।

মনুষ্য-প্রকৃতির মুখের সমক্ষে আয়না ধরিলে মনুষ্য, একেবারেই দেবতা কিংবা একেবারেই পশু, দেখিতে দেখায় না; আর গুণাতিশয্যে দেবতার মত না হইলেই যে মনুষ্য প্রশংসনীয় হইবে না এমন কোন কথা নাই ; মনুষ্যের মত মনুষ্য হইলেই তিনি যথেষ্ট প্রশংসা পাইতে পারেন ; কিন্তু লেখক তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন,—তিনি বলিতেছেন ;

"পঞ্চম অঙ্কে রাজার চরিত্র সেই রূপ ধর্ম্মভীরু বিনীত এবং ক্রূরতাশূন্য। তাঁহার স্মৃতিলোপ হইয়াছে, কি করেন আপনাকে ক্ষত্রিয় স্বীকার করিয়া শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে পারেন না। আর শকুন্তলার সৌন্দর্য্য-দর্শনে যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিবেন তাঁহার প্রকৃতি এরূপ লঘু নহে।" এ বেস্ কথা, কিন্তু পরে আসিতেছে এই যে একটি টিপ্পনী—যে,

"রাজা যে শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ হইয়াও তাহাকে গ্রহণ করেন নাই এরূপ ধর্ম্মভীরুতা দেখিয়া অনেকে প্রতীহারীর ন্যায় বিস্মিত হইবেন কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য মনে করি না, কারণ তিনি প্রথমে অস্বীকার করিয়া কিরূপে আবার গ্রহণ করেন! আবার তিনি এক জন মহান রাজা, তাঁহার এরূপ লঘুচিত্ত হওয়া সম্ভব নহে। অতএব প্রত্যাখ্যান করাই উচিত; ইহাতে প্রশংসা নাই, না করিলে বরঞ্চ দোষ পড়িত।"

এটা কিরূপ কথা? রাজা যে, লঘুচিত্ত নহেন, ও তাঁহার চিত্তে যে একটু অধর্ম্মের লেশ সহ্য হয় না, ইহা প্রশংসনীয় নহে? লেখক সজোরে বলিতেছেন—"না" বিচার-কর্ত্তার যে প্রচণ্ড ধমক—দুষ্যন্ত রাজার কৌন্সলী কাজেই নিরুত্তর! দুষ্যন্ত রাজা এক জন মানুষের মত মানুষ—এক জন রাজার মত রাজা, কিন্তু তাহা হইলে হইবে কি—তাঁহাতে এমন একটা ঘোরতর অদ্ভুত পদার্থ কিছুই নাই যা লেখকের মুখ হইতে প্রশংসা-ধ্বনি বাহির করিতে পারে। এক হিসাবে নাটকের দোষ গুণ বিচার-স্থলে তাহার নায়ক প্রশংসনীয় কি অপ্রশংসনীয় এ কথাটাই অপ্রাসঙ্গিক,—নায়কের চরিত্র আগা-গোড়া ঠিক্ আছে কি না ইহাই কেবল বিচার্য্য। সেক্সপিয়রের লিয়র্ রাজা কি বড় প্রশংনীয়? না লিয়ণ্টীস্ রাজা বড় প্রশংসনীয়? নাটকের নায়ক নিন্দনীয় বলিয়া নাটক নিন্দনীয় হইবে? না নাটকের নায়ক প্রশংসনীয় বলিয়া নাটক প্রশংসনীয় হইবে? সেক্সপিয়রের রোমিও এমন কি প্রশংসনীয় তা'ও নয় এমন কি নিন্দনীয় তা'ও নয়—সে তাহার দেশের এবং তাহার কালের একজন বড় ঘরের সুন্দর যুবা

পুরুষ আর জুলিয়েটের প্রেমে উন্মত্ত—এই যা' কেবল ;—দুষ্মন্ত রাজা প্রশংসনীয় হউন বা না হউন্ তাহাতে শকুন্তলা নাটকের কিছুই আইসে যায় না, তিনি তাঁহার দেশের এবং তাঁহার কালের এক জন রাজার মত রাজা—এই পর্য্যন্ত হওয়াতেই ঠিক্ হইয়াছে—এক জন ভাল রাজার যেরূপ প্রকৃতি হইয়া থাকে তাহারি মুখে আয়্না ধরা হইয়াছে ও সেই আয়নার ভিতর জীবন্ত এক রাজ-শ্রী প্রতিবিম্বিত হইতেছে— এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট;—করিতে যাও অধিক, হইবে কেবল ধিক্। এ সম্বন্ধে সেক্সপিয়র কি বলিয়াছেন একবার শোনা কর্ত্তব্য,—এই তাঁহার অনুশাসন "Overstep not the modesty of nature; for any thing so overdone is from the purpose of playing."

ক্রমশঃ

সুখ-দুঃখ।

মানুষ দুইটী পরস্পর-বিভিন্ন উপাদানে নির্ম্মিত, মানুষ দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল—একটী সেই অসীম অশরীরী আত্মা আর একটী এই জড় দেহ যাহা সেই আত্মাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে। আত্মা ও শরীর ভিন্ন দুই পদার্থ কি না সে বিষয়ে তর্ক করা আমাদের উদ্দেশ্যের সীমা-বহির্ভুত। আত্মা ও শরীর—এই দুয়ের প্রকৃতি যদিও বিরুদ্ধ-স্বভাবাপন্ন তথাপি ইহাদের একটা স্পষ্ট-লক্ষণাক্রান্ত সম্পর্ক-আছে। সৃষ্টির প্রত্যক্ষপরিদৃশ্যমান অবস্থাতে ইহাদের পরস্পর সম্পর্ক ঠিক একটা বস্তুর আয়তন (volume) ও তাহার গাঢ়ত্বের (density) পরস্পর-সম্পর্কের ন্যায়। একটার বৃদ্ধি হইলে অপরের নিশ্চয়ই ক্ষয় হইবে কিন্তু একটা একেবারে না থাকিলে অন্যটীও বর্ত্তমান অবস্থাতে সংরক্ষিত হইতে পারে না—মানুষ পৃথিবীর মানুষ রূপে থাকিতে পারে না। শরীরের অতিরিক্ত সেবা শুশ্রূষা করিলে মানুষের জড়ত্বের আনুসঙ্গিক যত প্রকার গুণ তাহার উৎকর্ষ ও সেই পরিমাণে আধ্যাত্মিক গুণের হ্রাস হয়। উদ্ভাবনীশক্তি প্রভৃতি গুণ, যাহার প্রকৃতি সীমাবদ্ধ নহে এবং সেই জন্য যাহাকে মানুষের আত্মার অসীমোন্মুখী বৃত্তির গুণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহা ও-রূপ শরীর-পরায়ণ লোকের সম্ভবে না। পৃথিবীর মহাকবিদিগের মধ্যে কেহই বোধ হয় স্থূলকায় ছিলেন না, কাহারো শরীর বোধ হয় বিশেষ উৎকর্ষ লাভ

করে নাই—অবশ্য শারীরিক সৌন্দর্য্য কখন শরীরের উৎকর্ষের ফল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। আবার উপবাসাদির দ্বারা শরীরকে ক্লিষ্ট ও ক্ষীণ করিলে লোকের আধ্যাত্মিক শক্তির বৃদ্ধি হয়। যে সকল আতিভৌতিক দৃষ্টির বিষয় শুনিতে কিম্বা পড়িতে পাওয়া যায় সে সকল বোধ হয় কেবল শরীরকে ক্লিষ্ট করিয়া আধ্যাত্মিক শক্তির বর্দ্ধনের দ্বারাই মানুষের চক্ষুর গোচর হইয়াছে। দিব্য-চক্ষুষ্মান (clairovoyant) মাত্রেই বোধ হয় অল্পাহারী ও নিরামিষভোজী; বিখ্যাত দিব্য-চক্ষুষ্মান স্বেডেনবর্গ কখনো অপরিমিতাহার কিম্বা আমিষভোজন করেন নাই; কেবল একবার মাত্র তিনি এই অপরাধে অপরাধী হইয়াছিলেন বলিয়াই স্বর্গবাসী আত্মারা তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া ছিল, কথিত আছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে যদিও আত্মা ও শরীর পরস্পর-বিরোধি-স্বভাবাপন্ন বস্তু, তথাপি একের সম্পূর্ণ অভাব হইলে অন্যের কার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। একটা এমন অবস্থা আছে যে সেখানে উপস্থিত হইলে পর এ দুয়ের আর পূর্ব্ববৎ হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, তখন দুইটীরই একত্রে হ্রাস হইতে থাকে; কিন্তু নিশ্চয়ই ইহাতে দুয়ের একত্ব সপ্রমাণ হইতেছে না। পাত্রের আকৃতির পরিবর্ত্তনের সহিত জলেরো আকৃতির পরিবর্ত্তন হয়; তাহা বলিয়াই কি জল ও পাত্র একই বস্তু? কাল-ব্যাপী অনশনে মনুষ্যের আধ্যাত্মিক শক্তির হ্রাস হয় বলিয়াই কি আহারীয় ও আত্মার একত্ব সপ্রমাণ হইতেছে? শরীরকে আত্মার বাসোপযোগী করিতে কতক পরিমাণে আহারীয়ের প্রয়োজন হয়, নচেৎ আত্মার সহিত জড় ইন্দ্রিয়ের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না। এই দুই বিরুদ্ধ-স্বভাবাপন্ন বস্তুর পরস্পর প্রতিঘাত দ্বারাই মানুষের জীবন; এই দুয়ের পরস্পর বাধাই জীবনের মূল। আমরা শীঘ্রই দেখাইতেছি যে মানুষের দুঃখেরো ইহাই মূল।

সুখ-দুঃখের একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা একপ্রকার অসাধ্য। মিষ্টের সংজ্ঞা নিরূপণ করা বচন-দ্বারা হইবার নহে, রসনাই কেবল তাহার ভাব-গ্রহণে সমর্থ,—উহাও সেইরূপ। তবে সংক্ষেপে এইরূপ বলা যাইতেপারে যে অনতিক্রমণীয় বাধার ভাবই দুঃখ, আর তাহার অভাবই সুখ।* ইহা হইতে স্পষ্টই আসিতেছে যে মানুষের জীবনের ও কারণ যাহা মানুষের দুঃখেরও কারণ তাহাই। মানুষের আত্মা অসীম, শরীর সেই আত্মাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে; সীমাবদ্ধ করাও যাহা আর বাধা দেওয়া তাহা; অতএব জীবনই দুঃখ সুতরাং দুঃখই মানুষের স্বভাব-সিদ্ধ।

এই জন্যই একজন চিন্তাশীল বিজ্ঞ ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন যে, "পৃথিবীর সমুদায় রাজা ও রাজমন্ত্রী মিলিয়াও একজন জুতাবুরুষকারীকে সুখী করিতে পারে না।

* See Mill's Examination of Hamilton's Philosophy—The Chapter on Pleasure and Pain.

জুতাবুরুষকারীর শরীরের সকল অভাবই তাহাদের দ্বারা নিরাকৃত হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে তাহার যথার্থ সুখ হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই; যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে তাহার অসীম প্রকৃতিকে ভুলিয়া থাকিতে পারে ততক্ষণই তাহার কিছুমাত্র সুখ হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু সে কতক্ষণ? যাহা অসীম তাহার অসীম না মিলিলে কখনই দুঃখের অপলোপ হইতে পারে না। লর্ড বায়রণ্ চাইল্ড্ হ্যারল্ডে বলিয়াছেন যে হ্যারল্ড যদিও সম্পূর্ণরূপে পার্থিব সুখে নিমগ্ন ছিলেন তবুও সময়ে সময়ে কি যে দুঃখ তাঁহার বুকের উপর দিয়া চলিয়া যাইত তাহা তিনি বুঝিতেই পারিতেন না (At times strange pangs would flash across Childe Harold's breast;) বায়রণ্ এখানে মুক্তকণ্ঠে নিজের কথাই বলিতেছেন, সেই জন্য এই কথাটা বিশেষ মূল্যবান। ইহা হইতে স্পস্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে মানুষের অসীম প্রকৃতি তাহার পার্থিব সুখের স্রোতে নিমগ্ন থাকিলেও মাঝে মাঝে মাথা ভাষাইয়া উঠে। জর্ম্মাণ মহা-কবির সুবিখ্যাত ফাউস্ট (Faust) নামক নাটকেও এসত্যটী অতিসুন্দর রূপে বিবৃত রহিয়াছে। বাস্তবিকই আধ্যাত্মিক-আত্মহনন ব্যতীত মানুষের শুধু পার্থিব সুখে সুখী হইবার কোন সম্ভাবনার লেশ মাত্রও নাই। আর এ প্রকার অবস্থাতে, বোধ হয়, মানুষ নামের উপযুক্ত কেহই এরূপ সুখে সুখী হইতে ইচ্ছাও করিবেন না, যদিও প্রতিক্ষণে মানুষে সুখী হইতে ইচ্ছা না করিয়া থাকিতে পারে না; কেননা মানুষের আত্মা চিরন্তন অসীম অভিলাষী, অসীম মিলিলেই তাহার সুখের চরম হইবে, সুতরাং মানুষের আত্মার সুখাভিলাষ স্বভাব-সিদ্ধ। আবার অসীমের দিকে ধাবমান হইতে প্রতিপদে বাধা পাইতে হয় কাজেই প্রতিপদে মানুষ দুঃখ পায়।

কার্লাইল জিজ্ঞাসা করেন যে, "যখন সুখ ও দুঃখ উভয়ই স্বাভাবিক; তখন, তোমার সহিত এমন কি লেখা-পড়া আছে যে তুমি কেবল সুখেরই অধিকারী হইতে চাও?" যদিওএই কথাটী সত্য কিন্তু এটা সম্পূর্ণ সত্য নহে, সত্যের অংশ মাত্র। মানুষের সুখী হইবার তো কোন স্বত্বই নাই কিন্তু দেখা যাইতেছে যে জীবনের সত্তা ও দুঃখের সত্তা অবিচ্ছেদ্য; দুঃখই স্বাভাবিক, সুখ অস্বাভাবিক। মানুষের জীবনের জন্য যেরূপ বায়ুর আবশ্যক, মানুষের মনুষ্যত্বের জন্য সেইরূপ দুঃখ প্রয়োজনীয়। দুঃখই মানুষের মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের বন্ধন—দুঃখই পৃথিবী ও স্বর্গের সেতু। যে লোক আমাকে বলে যে "আমি কখনো দুঃখ ভোগ করি নাই." তিনি খুব বড় লোক হইতে পারেন কিন্তু তাঁহাকে বন্ধুত্বে বরণ করিতে আমি কুণ্ঠিত হইব। প্রাচীন ঋষিদিগের যে দুঃসহ তপশ্চর্য্যা দ্বারা সুখ-দুঃখ-সমান জ্ঞান জন্মাইত তাহার অর্থ আর কিছুই নহে, কেবল এই যে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন যে দুঃখ স্বাভাবিক, এমন কি অবস্থা-বিশেষে দুঃখ প্রার্থনীয়। দুঃখ ভোগ করিতেই মানুষের জন্ম। দুঃখ ভোগ

করিবার অধিকারেই মানুষ ও পশুর প্রভেদ হইয়াছে। বয়ঃ-প্রাপ্ত শিশু ল্যাম্ (Lamb) একখানি চিটীতে লিখিয়াছেন যে "জীবনই দুঃখ; দুঃখ যত তীব্রতর জীবনের অস্তিত্বের ততো অধিক পরিচয়।" জীবনের এক প্রধান উদ্দেশ্যই এই, যে দুঃখ ভোগ করিয়া মানুষ আত্মার উন্নতি সাধন করিবে। দুঃখ ভোগ না করিলে মানুষ আপনাকে বুঝিতে পারে না। দুঃখ ভোগ করা একটা শ্লাঘার কথা। যাহার মন যত উন্নত দুঃখ ভোগ করিবার পক্ষে তাহার তত অধিক অধিকার জন্মে; যে যত অধিক দুঃখ ভোগ করে পৃথিবী হইতে সে তত অধিক উচ্চ। এই জন্যই পৃথিবীতে মহাকবি ও সমসাময়িক দিগের অপেক্ষা উন্নত-মনা লোকদিগকে কখনো সুখী হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না; আর এইজন্যই তাহাদের দুঃখ যে-সে লোকে বুঝিতেও পারে না। দুঃখ মানুষের মন্দ অংশ হইতে ভাল অংশকে বাছিয়া লইয়া তাহার উৎকর্ষ সাধন করে। এই জন্য ইংরাজিতে দুঃখের এক নাম tribulation এই শব্দের উৎপত্তি লাটিন tribulum শব্দ হইতে; ইহা এক প্রকার যন্ত্র; এই যন্ত্রের দ্বারা রোমদেশীয়েরা শস্যের অসার অংশ হইতে সারাংশের প্রভেদ করিত। আর এই সব বুঝিয়াই কেটো বলিয়াছিলেন যে "এক জন উন্নতমনা লোকের পৃথিবীর দুঃখের সহিত যুদ্ধ দেবতাদেরও দেখিবার উপযুক্ত দৃশ্য।"

প্রস্তাবের এই অংশ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আমাদের আর একটী বক্তব্য আছে। এই প্রস্তাবে ব্যবহৃত "দুঃখ" শব্দকে কেহ "কষ্ট" এই শব্দের সহিত মিশাইয়া এরূপ বলিবেন না যে শরীরে ছুরিকা প্রবিষ্ট করিলে যে দুঃখ হয় তাহার দ্বারাও তো মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে; অসূয়াপরবশ লোকেরা পরশ্রী দেখিয়া মনে যে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে তবে তাহাও তো অপ্রার্থনীয় নহে, কিন্তু সেই জাতীয় দুঃখ সকলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমি পূর্ব্বোক্ত কথা গুলি বলি নাই। এরূপ নীচ কষ্টকে আমি দুঃখ শব্দের উন্নত শিখরে সমান ভাবে বসাইতে পারি না; আমার মনে দুঃখের যে উন্নতিকারী উচ্চ স্বর্গীয় আদর্শ স্থাপিত আছে ইহাতে তাহার কিছুই দৃষ্ট হয় না। এরূপ কষ্ট দুঃখ নামেরই বাচ্য নহে। যে কষ্টে হৃদয়কে উন্নত করে, আত্মাকে ক্রমশঃ মহান হইতে মহান করিয়া তোলে; সেই উপভোগ্য কষ্টই দুঃখ নামের যোগ্য।

প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞানের চক্ষে দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে যাহাকে আমরা দুঃখ বলি অনেক সময় তাহা হইতে আমাদের সুখেরও উৎপত্তি হয়; অনেক সময় দুঃখই আমাদের সুখের একটা উপকরণ হয়; অর্থাৎ, অনেক সময় দুঃখ আমাদের মনে এরূপ ভাব জন্মায় যাহা আমাদের ভাল লাগে। দুঃখ ভোগ করিয়া মানুষ নিজের স্বর্গীয়ত্ব বুঝিতে পারে এবং বুঝিতে পারিয়া এমন এক আত্ম-প্রসাদ অনুভব করে যে কোন দুঃখই সে আত্মপ্রসাদকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে না। এই স্বর্গীয়ত্ব

হেতু মানুষ যদি পার্থিব পদার্থ হইতে দুঃখ পায় তবে সে সেই দুঃখের কারণ পার্থিব পদার্থ অপেক্ষা আপনাকে উচ্চতর মনে করিয়া পৃথিবীর ঝটিকা ঝঞ্ঝার মধ্যেও শান্তিময় আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিয়া থাকে; নিজের যোগ্যতার প্রতি অন্যায় ব্যবহার মনে করিয়া তাহার সহস্র দুঃখের মধ্যেও আত্ম-প্রসাদ বিচলিত হয় না। ইহাতে বোধ হয় আত্ম-প্রসাদের হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধিই হয়; যাহাতে দুঃখের উৎপত্তি (বাধা) তাহাতেই মানুষের স্বর্গীয় ভাব আরো স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।

এক এক সময় মনের এমনই এক অবস্থা হয় যে সে সময় দুঃখ একটা ভোগ্য বস্তুর মধ্যে হইয়া দাঁড়ায়; তখন মনের সে অবস্থাটাকে একটা শান্তিময় অবস্থার সহিত বিনিময় করিতেও ইচ্ছা হয় না। কোন্ জননী তাহার মৃত শিশু সন্তানটীকে ভুলিতে স্বীকার করিবে, যদিও প্রতিমুহূর্ত্তে স্মৃতি-জাত দুঃখের আর শেষ থাকে না? কোন নিরাশ প্রেমিক তাহার প্রেমের বৃত্তান্ত ভুলিতে স্বীকার করিবে, যদিও স্মৃতি তাহার হৃদয়ে রাবণের চিতা জ্বালান ব্যতীত আর কোন সান্ত্বনাই দিতে পারে না? অভিমান হইতেও মানুষের বিশেষ দুঃখ উৎপন্ন হয় কিন্তু তাহা বলিয়া কি কেহ অভিমান পরিত্যাগ করিতে স্বীকার করিবে? অভিমানের দুঃখ ভোগ করিতে মনুষ্যের এই মনে করিয়া ভাল লাগে যে, "কাহার জন্য আমি এত ভোগ করিতেছি?—যাহাকে আমি এত ভালবাসি তাহার জন্য দুঃখ ভোগ করিতেও আমার সুখের অনুভব হয়।" এই সকল ভাবিয়া হৃদয়ের পূর্ণ উচ্ছ্বাস-ভরে একজন কবি বলিয়াছেন যে,

যাতনার এই দুঃখময় সুখ,
তুই কি বুঝিবি, সজনি;
কি বুঝিবি তুই কি যে এত সুখ
কাঁদিয়ে দিবস রজনী।

আর এই বুঝিয়াই ইংলণ্ডের বর্ত্তমান কবিকুলশিরোভূষণ গাহিয়াছেন,

Ti's better to have lov'd and lost,
Than never to have lov'd at all. *

বাস্তবিকই দুঃখ উপভোগ্য ও প্রার্থনীয়; কিন্তু দুঃখ উপভোগ্য ও প্রার্থনীয় হইয়াও সকল সময় উপভোগ্য ও প্রার্থনীয় না হইবার কয়েকটী কারণ আছে। মানুষ কিসে নিজের হিত, তাহা সকল সময় বুঝিতে পারে না। মায়াবিনী কার্কীর উপদ্বীপে ইউলিসীস যখন শূকররূপে পরিণত অনুচরবর্গের উদ্ধারের জন্য যত্নশীল হন তখন তাহারাই তাঁহার প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছিল। এইরূপ হইবার আর একটী কারণ আছে এই যে অনাগত দুঃখের কল্পনা করিবার সময় আমরা কেবল তাহার ভীষণতাই কল্পনা করিতে পারি, তাহার সুখ-জনক ভাব আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। কিন্তু দুঃখ যখন আমাদের উপর আসিয়া পড়ে তখন আমরা দেখিতে

* ভালবেসে খোয়ানও ভাল
কভু ভাল না বাসার চেয়ে।

পাই যে আমাদের কল্পনা আমাদিগকে কতদূর প্রতারণা করিয়াছে; তখন আমরা যেখানে কেবল বিভীষিকাময় মরুভূমি প্রত্যাশা করিতেছিলাম সেখানে শ্যামল শস্য-পূর্ণ সুমিষ্ট-জল-বিশিষ্ট ভূমি-খণ্ড দেখিয়া আশ্চর্য্য হই। আমার নিজের জীবন হইতে আমি বলিতে পারি যে আমার জীবনে যে সকল দুঃখময় ঘটনা অতীত হইয়া গিয়াছে—তাহাদের স্মৃতি হইতে আমি এত সুখময়-দুঃখ অনুভব করি যে সেই জন্য আমি ঐ সকল দুঃখের ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়াই সন্তুষ্ট আছি। বিগত দুঃখেরও স্মৃতি একেবারে দুঃখময় নহে; তাহাতেও সুখ মিশ্রিত। বিগত সুখের স্মৃতিও সুখ ও দুঃখে বিজড়িত। কোন বিখ্যাতনামা কবি বলিয়াছেন,

A sorrow's crown of sorrow is
remembr'ing happier things. *

কিন্তু এই উক্তিটা অত্যন্ত একদিক-ঘেঁসা, ইনি পূর্ব্ব-স্মৃতি-জাত বিষাদময় সুখ একেবারে দেখিতেই পান নাই। কবিতা মাত্রেই স্মৃতি; মানুষ নিজে উপস্থিত মুহূর্ত্তে যে কি—তাহা কখনো বুঝিতে পারে না; বর্ত্তমানের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে কি ছিল তাহাই কেবল বুঝিতে মানুষ সক্ষম। পূর্ব্বোল্লিখিত কবির মত যদি ঠিক হয় তাহা হইলে কবিতা মাত্রেই শুধু দুঃখময়ই হইবে অর্থাৎ কবিতা কাহারো নিকট সুখ-প্রদ হইবে না। তাহা হইলে অন্ততঃ, সুখের গান হইতেই শুধু আমোদ হইত, দুঃখের গান কাহারো ভাল লাগিত না; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, সুখের কবিতা আমাদের মনের উপর তেমন মুদ্রিত হয় না; দুঃখের কবিতাই আমরা বিশেষরূপ উপভোগ করি, ঐরূপ কবিতারই রসাস্বাদন করিয়া আমরা স্থায়ী সুখ অনুভব করি। দুঃখময় কবিতার সুখ-প্রদায়িত্ব বিষয়ে অধুনাতন সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং সকল সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিদিগের মধ্যে একজন যথার্থ স্বর্গীয় কবি, অসামান্য ক্ষমতা সহকারে গাহিয়াছেন,

Our sweetest songs are those that
tell of saddest thought. *

আমরা বোধ হয় আমাদের ন্যায্য সীমা অতিক্রম করিতেছি; আমাদিগকে পুনরায় প্রস্তাবিত বিষয়ে আসিতে হইবে। দুঃখ সাধারণতঃ প্রার্থনীয় ও উপভোগ্য হইয়াও সকল সময় প্রার্থনীয় ও উপভোগ্য না হইবার আর একটী বিশেষ কারণ আছে। পৃথিবীর অতি,সুখ-প্রদ বস্তুও একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করিলে আর তাহার সুখপ্রদায়িত্ব থাকে না। আলোকের সম্পূর্ণ অভাব হইলে মানুষ চক্ষে কিছুই দেখিতে পায় না আবার আলোক একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করিলে তাহা হইতেই মানুষের চক্ষু অন্ধ হয়। সেইরূপ দুঃখেরও একটা মাত্রা আছে যাহার অধিক হইলে দুঃখ আর

* দুঃখের চরম দুঃখ পূর্ব্ব সুখ-স্মৃতি।

* সেই গান সুমধুরতম
কহে যাহা গাঢ়তম দুঃখের কাহিনী।

প্রার্থনীয় ও উপভোগ্য থাকে না ; দুঃখ মনের উপর তখন কেবল ক্লেশময় ফলই উৎপন্ন করে। অতিশয় তীব্র দুঃখে মানুষের শরীর ও আত্মা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতে পারে কিম্বা শরীর এমন বিকৃত হইতে পারে যে মানুষ চিরকালের মত উন্মাদ হইয়া যায়। কুমারসম্ভবে রতির সমক্ষে যখন হরকোপানলে মদন ভস্মাবশেষ হইল তখন রতি হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, তাহার পর, দুঃখের তীব্রতার হ্রাস হইলে রতি যখন ভূতপূর্ব্ব দাম্পত্য সুখ স্মরণ করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছে তখন যে রতির অমিশ্র দুঃখই হইতেছে এরূপ বোধ হয় না, রতির দুঃখের ভিতর হইতেও একটু একটু সুখের আভাস পাওয়া যাইতেছে।

তীব্র দুঃখের অনুপভোগ্যতা ও সেই দুঃখই মন্দীভূত হইলে উপভোগ্য হওয়ার এক প্রধান দৃষ্টান্ত-স্থল মানুষের কাব্যরসাস্বাদনীশক্তি। যে সকল ঘটনা বাস্তবিক জীবনে দেখিলে আমরা দুঃখে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি সেই সকল ঘটনাই আবার নাটকে পড়িয়া কিম্বা রঙ্গভূমিতে অভিনীত দেখিয়া আমাদের দুঃখ হয় বটে কিন্তু সে দুঃখের মধ্যেও আমরা অতি বিশুদ্ধ সুখ উপভোগ করি। একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে এই রূপ হইবার আর কোন কারণই নাই, কেবল দুঃখের মাত্রাভেদই ইহার মূল। যে দুঃখময় ঘটনা বাস্তবিক জীবনে দেখিলে আমরা তীব্র দুঃখে একেবারে মুহ্যমান হই তাহার তীব্রতা মন্দীভূত হইলেই তাহা আবার আমাদের উপভোগ্য হয় ; বর্ণিত বা অভিনীত ঘটনা যে অলীক গল্প মাত্র অজ্ঞাতসারে এই কথাটী আমাদের মনে উপস্থিত থাকিয়া ঐ দুঃখের তীব্রতার হ্রাস করে, সেই জন্যই আমরা দুঃখের বর্ণনাতে দুঃখ-ভোগ করিয়াও সুখ পাই।

যাহা হউক এই হৃদয়বেগ সামলাইয়া আমাদিগকে দুঃখের আর দুই একটী কারণের উল্লেখ করিতে হইবে। আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতার ভিত্তির সহিত দুঃখের দুইটী কারণ এমনই বিজড়িত যে তাহার নিরাকরণ সম্ভবে না। সে দুইটী এই—রাজনৈতিক বন্ধন ও সামাজিক বন্ধন। এ দুই বিষয়ে অধিক কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই ; সকলেই অবগত আছেন এই দুইটীর কি অর্থ। মনুষ্য জাতির বর্ত্তমান অবস্থাতে সকল মনুষ্যই যে নিজের স্বাভাবিক স্বাধীনতা ভোগ করিবার উপযুক্ত পাত্র এরূপ নহে যথার্থই অধিকাংশ লোক স্বেচ্ছাচার ও স্বাধীনতার প্রভেদ বুঝিতে পারে না। কাজেই সকলের শাসনের জন্য প্রত্যেককে তাহাদের স্বাধীনতার কতক অংশ শাসন-কর্ত্তাদিগের হস্তে দিতে হয়। অবশ্য "শাসন-কর্ত্তা" শব্দ এখানে অতি বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হইল, ইংরাজীতে হয় ত ইহাকে Sovereign Power বলিবে। শাসন-তন্ত্রের আদর্শ যত দূর উচ্চ, মানুষ যত দিন তাহার মধ্যে অবস্থিতি করে তত দিন রাজনৈতিক বন্ধন হইতে কোন বাধা পায় না বলিয়া এই কারণ হইতে কোন দুঃখও পায়

না; কিন্তু যখন কোন উন্নতমনা মানুষ এই আদর্শ হইতে উচ্চে উঠিতে যান তখনই তিনি নিজের কারাগারের আয়তন বুঝিতে পারেন, তখনই তাহার মাথায় বাধা পড়ে। যখন এই আদর্শ অতি নীচু হয় এবং সেই জন্য যখন অধিকাংশ লোকেরই মাথা ইহাতে আহত হয় তখন সজোরে এই আদর্শকে উন্নমিত করিতে রাজবিপ্লবের উৎপত্তি হয়।

রাজনৈতিক বন্ধনের বিষয় যাহা বলা হইল মোটমাট সামাজিক বন্ধনের বিষয়েও সেইরূপ সুতরাং এবিষয়ে আর অধিক কিছু বলা হইল না।

এখানে কষ্টের বিষয় একটা কথা বলিতে হইবে। যে কষ্টের বিষয় বলিতেছি তাহা যদিও দুঃখের নিকটবর্ত্তী তথাপি ইহাদের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যদিও এই কষ্টের মূলে এমন কিছু নাই যাহাতে এই কষ্টকে অলঙ্ঘ্য করে কিন্তু পৃথিবীতে প্রায়ই ইহা এমন হইয়া দাঁড়ায় যে ইহাকে এড়ান বড় দুর্ঘট। মানুষের কতকগুলি মানসিক গুণের অস্তিত্বই এই কষ্টের কারণ। এই সকল মনোবৃত্তি নিয়মিত পথে চালিত হইলে শুভ-ফল-প্রদ হয় কিন্তু ইহারা বড় অস্থির. অতি অল্পেতেই ইহাদিগকে বিপথে চালাইয়া ইহাদের প্রকৃতিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। আমি কোন্ কোন্ মনোবৃত্তির উপর দৃষ্টি রাখিয়া এই কথা গুলি বলিলাম বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন, সেগুলি বিপর্য্যস্ত অবস্থাতে হিংসা, ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি নামে অভিহিত। ইহারা এক প্রকার স্বর্গচ্যুত শয়তান; অন্যের উন্নতি দেখিয়া নিজের উন্নতি করিবার ইচ্ছা অতি প্রশংসনীয়, অতি মহৎ, কিন্তু বিপথে গমন করিলে এই দেবতা যথার্থই শয়তান রূপ ধারণ করে। এই সকল মনোবৃত্তি না থাকিলে পৃথিবীর অর্দ্ধেক কষ্ট অন্তর্দ্ধত হইত। যাহার হৃদয়কে ইহারা একবার অধিকার করিয়াছে, ঈশ্বর তাহার মঙ্গল করুন, কিন্তু এ পৃথিবীতে তাহার আর কষ্টের সীমা থাকে না। উপরের কয়েক ছত্রে আমি "দুঃখ" শব্দ ব্যবহার না করিয়া কেন যে "কষ্ট" শব্দ ব্যবহার করিলাম তাহা ইতিপূর্ব্বে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই বিপর্য্যস্ত মনোবৃত্তিগুলিকে প্রশ্রয় দেওয়ার ন্যায় মনকে অতুন্নত দুঃখ দিবার অন্য এমন কোন সুন্দর উপায় আছে কি না বলিতে পারি না। যাহার মন এই সকলের উপস্থিতি দ্বারা কলুষিত নয় তিনি পৃথিবীতে থাকিয়াই প্রকৃত পক্ষে স্বর্গের উপযুক্ত।

ক্রমশঃ

গাথা।

খড়্গ-পরিণয়।*

(১)

ঘুমঘোরে ঢোলে, তারকার কোলে
শোভিছে চাঁদিমা আকাশ মাঝে;
অম্বরের রাজা, পৃথিরাজ বালা
দ্বিতীয় চাঁদিমা প্রাসাদে রাজে।

নব উষা জিনি বরণ-মাধুরী,
কল্পনারি স্বধু প্রতিমা হেন,
বাসব ধনুর মাধুরীটি দিয়ে,
জোছনা মাখিয়ে সৃজিত যেন।

স্থির-বিজলির স্নিগ্ধ-দ্যুতি সম
বিছানায় বালা রহেছে শুয়ে,
ঈষৎ ঈষৎ এক পাশে ফিরে
রয়েছে হাতটি উরসে থুয়ে।

মুক্ত বাতায়নে আসিছে জোছনা
ঝলসে ওই যে কৃপাণ গায়,
এক দৃষ্টে বালা অনিমেষ চোখে
আপনা ভুলিয়ে দেখিছে তায়।

কল্পনা লহরী ছুটিছে তাহার,
উথলে হৃদয়ে সুখের তোড়,
বিভল হৃদয়ে আশার নেশায়
সাধের স্বপনে রয়েছে ভোর।

সহসা বালিকা উঠিল চমকি
সাধের স্বপন ভাঙ্গিয়া গেল,
ডাকিয়া তাহারে, সজনী চপলা
হাসিয়া হাসিয়া কাছেতে এল।

"ডাকিছেন রাণী আয়লো, অলকা,
শুনেছিস কিলো খবর, তবে ?
বিখ্যাত সুরয বুন্দি-নরপতি
তার সনে তোর বিবাহ হবে"।

"সুরযের সনে হইবে বিবাহ;"—
অশনির সম বাজিল বুকে,
শোণিত লহরী থামিল বহিতে
গোলাপ কলিকা শুকালো মুখে।

নীহার পীড়িত শ্বেত পদ্ম সম,
এলায়ে পড়িল, অবশ কায়;
নয়নের জ্যোতি হইল মলিন,
প্রভাতে-চাঁদিমা যেমতি, হায়!

শোভিল বদনে হিম-স্বেদ-কণা,
বুক হ'তে হাত পড়িল খসি,
ক্রমে ধীরে ধীরে ভাঙ্গিল সে মোহ,
বলিল ব্যাকুলা উঠিয়া বসি ;—

---

* Rutna (Rana of Mewar) had married by stealth the daughter of Prithuraj of Amber .... His double edged sword, the proxy the Rajput cavalier, represented Rutna on this occasion.
—Tod's Rajasthan Vol I—Page 308.

"উপহাস তুমি করিও না আর
সখিলো, তোমায় মিনতি করি,
হাসিবার কথা নয় এতো, সখি,
বল সত্য কথা চরণে ধরি।

শুনিয়ে যে আমি নেইলো আমাতে,
আমি যে-সধবা-আমার বিয়ে?
মাথা খাস, সখি, রাখ্ উপহাস,
কি সুখ আমারে বেদনা দিয়ে?"

কহিল চপলা শুনিয়ে একথা
ব্যথিত পরাণে মুছিয়ে বারি,—
"হেসে যদি থাকি ক্ষমগো, অলকা,
সুখের সে নয়, শপথ করি।

সত্যই, সকল, হইয়াছে স্থির,
তব সনে হবে বিবাহ তার,
প্রকাশ্যে এবার বিবাহ তোমার
গোপনে কেমনে রাখিবে আর।

মুমূর্ষু বালিকা ধীরে ধীরে ধীরে
বলিল যাতনা অস্ফুট স্বরে;—
"বিবাহের কথা কেমনে প্রকাশি,
প্রাণেশ যে মানা করেছে মোরে।

ঐ তরবারি তাঁরি প্রতিনিধি,
যা' দেখি বাঁচিয়ে রয়েছি আমি,
রাজা হ'লে পর উঁহার বদলে
প্রকাশ্যে আমারে লবেন স্বামী।

এখন একথা প্রকাশ হইলে
তাঁরে যে বিপদে পড়িতে হবে,
না পাবে রাজত্ব প্রাণেশ তাহ'লে
কেমনে সেকথা প্রকাশি, তবে?"

চপলা নয়নে জ্বলিল চপলা,
শুনিয়ে সরোষে কহিল সখী,—
"মুক্তকণ্ঠে আজ বলিব সকল
এত দিন যাহা রেখেছি ঢাকি।

পাপিষ্ঠ অধম সেই দুরাচার,
জানিনে কি বল্যে দেবরে গালি;
ছলে সরলার হৃদি অধিকারি
চরণে দলে সে কোমল কলি!

হয়েছে সে রাজা, পেয়েছি খবর
কোথায় প্রতিজ্ঞা রহিল তার?
তুমি হেথা একা দহিছ বিরহে
তাহারি ধেয়ান করিয়ে সার।

কিসের বন্ধন—গেছে সে বাঁধুনি;
কর, কর সখি বিবাহ পুন,
ফেলে দেও দূরে প্রতিনিধি অসি
ভোল সে প্রণয় মিনতি শুন"।

"হয়েছে সে রাজা, হয়েছে সে রাজা
তবু সে প্রতিজ্ঞা রাখিল নারে!"
—পারিল না বালা সামালিতে আর
মূরছি পড়িল যাতনা-ভারে।

---

(২)

নাহি সে অলকা, সে শরীর এবে
প্রভাহীন যেন ঊষার তারা,
মলিন বরণ, মলিন মু'খানি
নয়নে কেবল বহিছে ধারা।

এক মাস শুধু পেয়েছে সময়,
বিবাহ তাহার মাসেক পরে,
চিতোর-রাণায় পাঠায়েছে লিপি,
পথ চেয়ে আছে তাহারি তরে।

অবশ্যই রাজা লইতে আসিবে
ভগন পরাণে রেখেছে বাঁধি,
ভয়ে ধুক ধুক করে তবু হিয়া,
দিবস যামিনী কাটায় কাঁদি।

"ঐ যে বাজনা-বাজে ও কিসের
আসিছে আমার প্রাণেশ নাকি" ?—
অধীর পরাণে ছোটে বাতায়নে
খোঁজে চারিদিক আকুল আঁখি।

"ও কিসের গোল?—আসিছে কি সেনা ?
ঐ না বিষম উড়িছে ধূলী ?
অশ্বের হ্রেষাতে পুরে যে গগন"—
দূর পানে চায় মাথাটি তুলি।

নিমেষে নিমেষে, পলকে পলকে,
দেখে মরীচিকা আশার ছলে,
আবার তখনি নিরাশায় পড়ে
স্বরগ হইতে পাতাল তলে।

কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুম এল যদি,
স্বপনে চমকি জাগিয়া ওঠে,—
"ঐ বুঝি এল প্রাণেশ আমার "—
আশার কুহকে আবার ছোটে।

দিন যায়, ক্রমে গেল আধা মাস,
সমাচার তবু এল না কোন,
দেখিয়ে চপলা অলকার দশা
বলিল, "সজনি, শোন লো শোন।

স্বরগ-কুসুম তুমি, লো অলকা,
পিশাচ অধম চিতোর রাণা,
তার তরে তুমি সঁপিবে পরাণ,
শুনিবে না তবু কাহারো মানা ?

রাগে-দুখে হৃদি জ্বলে যায় মোর,
বল, লো সজনি, বল, লো, মোরে,
তো-হেন এমন অমূল রতনে
সে মূঢ় কি কভু চিনিতে পারে ?

যদি সখিত্বের থাকে মূল্য কিছু,
তাহারি শপথ সখিলো তোরে,
বিয়ে কর পুন প্রকাশিয়ে সব,
ক দিন রহিবি কৃপাণ ধোরে" ?

কেঁদে কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত আঁখি দুটি,
ক্লান্ত কায়-মন সহিয়ে জ্বালা,
শূন্য-পারা আঁখি তুলি সখী পানে
স্খলিত বচনে বলিল বালা ;—

"যাতনার এই দুখময় সুখ
তুই কি বুঝিবি, সজনি ?—
কি বুঝিবি তুই, কি যে এত সুখ
কাঁদিয়ে দিবস-রজনী ?

এমনি অমূল্য যাতনার এই
জীবন আমার ঠাঁই, লো,
চির হাসিময়-সুখের জীবন
বিনিময়ে নাহি চাই, লো।

হাসিবার কথা নয় এ তো, সখি,
হেসো না এ কথা শুনিয়ে,
হেসো না, হেসো না, দিও না-ক ব্যথা
আর, লো, ভুলিতে বলিয়ে।

আজীবন ধরে জ্বলিব, পুড়িব
সারাটি দিবস রজনী,
তবুও, তবুও, হৃদয়ের ধনে
ভুলিব না কভু, সজনি।

তবু, তবু, এই সাধের আগুন
নিভাব না কভু জনমে,
পুষিয়ে রাখিব যতন করিয়ে
মরমের জ্বালা মরমে"।

রাগে দুখে জ্বলি বলিল চপলা,
"থাক্ তবে তারি ভাবেতে ভোর,
নতুন আমোদে নব প্রেমে মজি
হেলয়ে যে জন হৃদয় তোর।"

অবহেলা করে রতন তাহারে
মজিয়ে নূতন আমোদে প্রেমে!—
বাজিল কথাটি অলকার বুকে
বলিল বালিকা একটু থেমে।—

"সত্যিই কি তবে ফুরায়েছে সব
সকলি এখন স্বপন প্রায়?
ভক্তি, স্নেহ, প্রেম, হৃদয়ের ভাব
তাও ফুল হেন শুকায়ে যায়?

উঃ! একি কথা, কি মরম ব্যথা,
একিরে প্রণয় কি রীতি তোর!
পার হাসি হাসি গলে দিতে ফাঁসি
পরায়ে সোহাগে কুসুম-ডোর।

ছি! ছি! ছি! একিরে প্রলাপ আবার
কি কথা বলিনু মরম-দুখে?
প্রাণের প্রেয়সী ললনা লইয়ে
থাক সে আমার মনের সুখে।

বিবাহের কথা হবে না প্রকাশ
প্রকাশ করিতে আছয়ে মানা,
এ প্রাণ থাকিতে হ'বে না তাহা তো
যদিন আদেশ না দেন রাণা।

নিন্দো না লো তায়, মিনতি তোমায়
ভুলুন আমারে ক্ষতি তো নাই;
অধীনী এ জনে চরণে দলিয়ে
হয় যদি সুখ হোক্ না তাই।

আমিতো, সজনি, মরিতে বসেছি,
নাহি সাধ আর কোনো-ই সুখে,
আমি তো প্রবাহে দিয়েছি লো ঝাঁপ
ভেসেছি তো আমি স্রোতের মুখে;

মরিতে তো আমি করিয়াছি পণ
মরণে কিছুই ভয় তো নাই,
মরিবার আগে দু'একটি কথা
তাঁর কাছে সুধু শুনিতে চাই।

কি বলেন তিনি তাই শুনিবারে
এ প্রাণ এখনো রয়েছি ধ'রে,
কি তাঁর বলিতে আছে তা' না শুনি
সুখী ও, সজনি, হব না ম'রে"

বলিতে বলিতে তীব্র যাতনায়
আলোড়ি উঠিল হৃদয় তল,
মরম ভেদিয়া উৎসের মত
নয়নে উথলি উঠিল জল।

নীরবে নীরবে কাঁদিল অলকা,
সখীও কাঁদিল তাহার দুখে,
সামালিয়া পুন বলিল সখীর
হাতটি রাখিয়া আপন বুকে,—

"ব্যথার ব্যথিনী, তুমি গো সজনি
একটি মিনতি করি গো তোরে,
তুই না বাঁচালে কে বাঁচাবে আর
এ হেন দারুণ বিপদ ঘোরে?

দিগন্ত বেয়াপী বিকট শ্মশানে
তুমি গো একটি কুসুম মম,
আঁধার আঁধার, অনন্ত আকাশে
জ্বলিতেছ ধ্রুব তারকা-সম।

রাখ কথাটি লো স্বহাতে লিপিটি
দিয়ে এস তাঁরে মিনতি ধর,
পূর্ব্ব পত্রটির না পেনু উত্তর
জানিনে সখি, এ কেমন তর।"

করুণ-হৃদয়া সম-সুখ-দুখী
চিঠিখানি লয়ে আপন হাতে,
সন্ন্যাসিনী সাজে চপলা রূপসী
চলিল চিতোর সেই সে রাতে।

---

(৩)

বিবাহ হইয়ে গেছে অলকার
ফুল শয্যা আজি—লেগেছে ঘটা,
বুন্দি নগরেতে বাজিছে বাজনা
ধাঁধিছে নয়নে দীপের ছটা।

কুসুমে কুসুমে সাজান সহর—
ফুলের বিছানা ফুলের ঘর,
সুবাসে সুবাসে উথলায় দিক,
ফুলময়-তনু বধূ ও বর।

চার দিক হতে পড়ে হুলু ধ্বনি,
বরের বামেতে বসেছে ক'নে,
কিন্তু ওকি, হায়! ও কিসের ছবি,
হ'তেছে কি বিয়ে মৃতের সনে?

নেত্রে নাহি জ্যোতি, না পড়ে পলক,
স্তবধ শোণিত বালার বুকে,
নিশ্বাস প্রশ্বাস পড়েনা তো—কই?
অমানুষি শ্বেত-বরণ মুখে।

কি ঘোর বিষন্ন আনত মু-খানি
দেখিয়ে পরাণ শিহরে হায়,
উৎসব আমোদ উথলে চৌদিকে
সে-সবে বালিকা মৃতের প্রায়।

মু-খানি শুখানো ফুলের মতন
তবু সে মুখের নাহিক তুল,
অঙ্গের কুসুম কি কবিবে আর—
ফুলের সমাধি করিছে ফুল!

সহসা থামিল মঙ্গলাচরণ
ঘোর কোলাহলে পুরিল দিশি,
ভয়ে শিহরিল কুলনারী গণ,
রণ বাদ্যে কাঁপি উঠিল নিশি।

এসে, মহারাজে দিল সমাচার—
"নগর বেড়েছে চিতোর রাজ,
বলে অলকারে লইবেন তিনি
উৎসবের শিরে পড়িল বাজ"।

বজ্রের মতন পড়িল কথাটি,—
নবোঢ়া রমণী ফেলিয়ে থুয়ে,
ছেড়ে সুকোমল কুসুম শয়ন
চলিল ভূপতি সমর ভুঁয়ে।

ছিঁড়ি, নারীগণ, ফুল আভরণ—
ফেলিয়া রাখিয়া আমোদ হাসি,
বিদায় লইতে স্বামীগণ সাথে
চলিল নয়ন-সলিলে ভাসি।

সবে গেল চলি, একাকী অলকা
বসিয়ে রহিল বিছানা পরে,
হৃদয় মাঝারে কি যে হুলস্থূল
বর্ণিয়া কে তাহা বলিতে পারে ?

সহসা চপলা দেখা দিল আসি
পত্র একখানি সঁপিল হাতে,
নিভিবার আগে জ্বলে যথা দীপ,
জ্যোতিহীন আঁখি জ্বলিল তাতে।

বলিল চপলা,—"তোর নাম করি
রাজা সনে আগে করিনু দেখা,
পত্রখানি এই দিলেন আমায়
উত্তর এ নয়, আগের লেখা।

পরে, তোর সব কহিনু কাহিনী,
হাতে দিনু তোর লিপিটি লয়ে,
এসেছেন তাই উধারিতে তোরে
লিপির উত্তর আপনি হয়ে।"

বালিকা অধীর বিকম্পিত হিয়া
হিম আর্দ্র হাতে লিপিটি খুলি,
সুরা-পায়ী যথা চায় সুরা পানে
পড়িল সতৃষ্ণে আপনা ভুলি——

"গত নিশি স্বপনে, মরমের বিজনে
মরি কি তোমার রূপ দেখেছিনু, অলকে,
সেই ছটা মহিমা, সেই প্রেম প্রতিমা
দেখিতে দেখিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল পলকে।

যেন হেসেহেসে, লো, প্রেমময়ী বেশেলো,
সোহাগে প্রেয়সি তুমি কাছে এসে দাঁড়ালে,
কিবা ধীর তাকানি, লাজ মাখা মুখানি
ঈষৎ পড়েছে ঢাকা অলকের আড়ালে।
কতগুলি এলোচুল-করিয়ে লো যেন ভুল
ছেয়েছে ঝাঁপায়ে পড়ি আধো-বাম নয়নে,
প্রেমাশ্রুতে মাজিয়ে, অপরূপ সাজিয়ে
লতাইয়া পড়িয়াছে ফণিনীর ধরণে।
নীহারেতে ধোয়ানো একরতি নোয়ানো
গোলাপটি যেন মরি মুখখানি বিকাশে,
আঁখি দুটি ঢলিয়ে ভাবে যেন গলিয়ে
স্নিগ্ধ বিজলির মত দ্যুতি নব প্রকাশে।

সুধা মাখা অধরে হাসি রাশি না ধরে,
মনের উচ্ছ্বাস যেন তরঙ্গিছে শরীরে,
সরমের লাগিয়ে রাঙা রাগে রাগিয়ে
কি মধুর সাজিয়াছে মুখ খানি মরিরে।

আমি উঠি অধীরে, কণ্টকিত শরীরে
যেমন ধরিতে যা'ব তোমারে লো হরষে,
তুমি সেই রমণী, উবে গেলে অমনি,
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর প্রভাতের পরশে।

সে অবধি, সরলে, জ্বলি মনো-অনলে
কি দুখে কাটাই দিন বলিব তা' কেমনে ?
একবার আয়, লো, পরাণ যে যায়, লো,
জ্যোতির প্রতিমা তুই এ আঁধার জীবনে।

রাজ-ব্রত ধরিয়ে ছিনু যেন মরিয়ে
কি যাতনা সহিনু যে নাহি পারি কহিতে,
আর যে তা হয় না, প্রাণ তাতে রয় না
সসৈন্য সেনাপতি ভেটি তোরে লইতে।

তোর পিতা মাতারে ভাই বন্ধু সবারে
প্রকাশিয়ে এ বিবাহ, আর স্বামি আসনে,

তোর ধন এ হিয়ে হাতে হাতে সঁপিয়ে
যতকিছু অপরাধ ডুবাইব মিলনে।"

সজল নয়ন, দুরু দুরু হিয়া,
কি পড়িছে যেন জানে না বালা,
কতই পড়িল, কতই চুমিল
বুকেতে রাখিল নিভাতে জ্বালা।

বলিল সখিরে,—"শেষ ভিক্ষা মোর
শেষ অনুরোধ রাখ, লো সই,
ছদ্মবেশে তারে আনগে এখানে
জনমের মত দেখিয়ে লই;

মুহূর্তের তরে দেখিব রতনে
একবার তারে আনিয়ে দেহ
সন্ন্যাসীর বেশে আন গে তাহারে,
বাধা তাহা হ'লে দেবে না কেহ।

কি আশে বাঁচিব অদভূত কথা
তুই বিয়ে, জায়া কাহার আমি?
বিবাহের দিন প্রতি মুহূর্তেকে
ভাবিনু লইতে আসিছে স্বামী।

মরিবারে গেনু, মরিতে দিলে না,
জানিনে কেমনে হয়েছে বিয়ে,
জানিনে কেমনে কি যে কি হয়েছে
যামিনী কেটেছে কোথায় দিয়ে।"

শুষ্ক অধর নীরস রসনা
আশাতেও যেন ভরষা নাই,
সম সুখ দুখী চপলা তখন,
চলিল রতন রাণার ঠাঁই।

একেলা অলকা, কেবা দিবে বাধা?
এলোথেলো করি ফেলিল কেশ,
ফুলের গহনা ফেলিল ছুড়িয়া,
ধরিল বালিকা বিধবা বেশ।

কুসুম বিছানা টেনে ফেলি দূরে
কঠিন ভূতলে সঁপিয়া কায়,
আপনার মনে গুণ গুণ স্বরে
কাতর পরাণে গানটি গায়,—

"তারে দেহ গো আনি,
ঐ যে ফুরায় বুঝি অন্তিম যামিনী;
একটি শুনিব কথা একটি শুনাব ব্যথা,
একবার দেখেনিব ও-মধুর মুখানি,
সেই কোলে জীবনের শেষ সাধ মিটিবে—
সেই কোলে জীবনের শেষ স্বপ্ন ছুটিবে,—
জনমে পুরেনি যাহা, আজ কি পুরিবে তাহা,
জীবনের চির সাধ মিটালো সজনি।"

---

(৪)

শত শত তারা দলে হাসিয়া অম্বর কোলে
ভ্রূভঙ্গে উড়াতে চায় অন্ধকার স্থির,
শতেক জোনাকি ভাতি চমকে ভীষণ রাতি,
ভীষণ আঁধার তবু অটল গম্ভীর।
সৈন্যগণ হুহুঙ্কারে, রণসজ্জা আড়ম্বরে,
রজনীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিবারে চায়,
বিজনে উদ্যান মাঝে, তবু কি প্রশান্তি রাজে,
সে-রবে নিস্তব্ধভাব দ্বিগুণ বাড়ায়।
নিস্তব্ধ হেথায় দিশি, নিস্তব্ধ গভীর নিশি,
নিস্তব্ধ রতন রাণা, অলকা কুমারী,
কথা তার নাহি সরে, নয়ন ধরণী পরে,
দর দর অবিরত বহে অশ্রু বারি।

দেখিয়ে হৃদয় ধন, উথলি উঠেছে মন—
এই সেই ? দেবজ্ঞানে যাহারে সে বালা—
পূর্ণ বিশ্বাসের ভরে, হৃদয় সঁপেছে করে
সে-ই আজ অবিশ্বাসী !—কি অসহ্য জ্বালা !

এই সে কি ? যেই জন, পাইতে বালার মন
পারিত ঠেলিতে পায়ে, স্বরগের ধন,
আজিকে হৃদয় পেয়ে বিষাক্ত কৃপাণ দিয়ে
ছিন্ন করি সুখে তাহা দেখিছে এখন।”

বালা নম্র বিষাদিনী, আজিকে সে গরবিনী
বহিতে দিবে না ধারা গর্ব্বিত নয়নে,
মরমের শিরা, টুটো, একবিন্দু অশ্রু উঠে
হাসিয়ে দেখিবে কেহ তাই বাজে মনে।

আঁখি হ'তে উৎস ধায়, দিবেনা বহিতে তায়
আটকি রাখিতে তারে চায় প্রাণপণে ;
প্রণয়ের অপমানে, দারুণ বেজেছে প্রাণে
ছিন্ন ভিন্ন মনঃ প্রাণ বিষম বেদনে।

বেদনা পাইছে এত, ব্যথা না ভাবিছে তা তো
সাধ করি উপভোগে যেন সেই জ্বালা,
কার তরে পায় দুখ ? দুখেতেই তার সুখ
দুখ জানাতেও বাম, অশ্রু ঢাকে বালা।

কিন্তু শৈল শির দিয়া, ভেদিয়া পাষাণ হিয়া
নিরঝর ঝর ঝর ওই যে উথলে ;
বাধা কোন নাহি মানে, চলেছে আপন টানে
আটকি রাখিতে গিরি পারে কি তা বলে ?

অলকার অশ্রু মুখ দেখিয়ে দহিছে বুক
তবু না ফুটিতে পারে চিতোরের রাজ, ·
দোষী মনে মনে হায় সাহস নাহিক পায়,
কেমনে কি বুঝাইবে অলকারে আজ ?

মৌন তাই নরপতি, তাহাতে ভাবিছে সতি
তাহার বিষাদ দুখে স্বামী অন্যমনা,
নূতন প্রণয় কথা, হয়তো হৃদয়ে গাঁথা
ভেঙ্গেছে কপাল তার গেছে গেছে জানা।

নিবারিতে অশ্রু জল, আরো বালা করে বল
গরবিনী ম্রিয়মানা তাতে বাধা পেয়ে,
রাখি মাথা বাহু পরে, তখন দৃঢ়তা স্বরে
বলিল আগের সেই লজ্জাবতী মেয়ে।

“উথলিত অশ্রুবারি, এ পোড়া নয়নে হেরি,
ভাবিওনা—আমারে যে ভুলেগেছ কাঁদি তাই.
তুমি আছ শান্তি সুখে, কাঁদিব আমি কিদুখে ?
কে আমি করিব আশা ও হৃদয়ে পেতে ঠাঁই।

ভাল যে বাসনা মোরে, ভুলেছ যে একেবারে
ভালই করেছ সখে কি আর ভাবনা তবে,
ভাবি দুখিনীর কথা, আর তো পাবেনাব্যথা
তুমিতো নিশ্চিন্ত হলেহোক যা আমার হবে।

পাছে সম দুখী জনে, ব্যথা দিই অকারণে,
আমা দুখে পাছে তব মুখানি মলিন হয়,
এই যে আশঙ্কা ছিল, সে আশঙ্কা দূরে গেল
আরতো বাস না ভাল হয়েছ পাষাণময়।

তবে আর কিসে ডরি, যাহা ইচ্ছা তাহা করি,
নাইতো প্রেমের ডোর কে আর রাখিবে বাঁধি,
নিশ্চিন্তে মরণ বুকে, যেতেছি ঘুমাতে সুখে
সুখ অশ্রু পড়ে তাই ভেবোনা দুখেতে কাঁদি।”

শুনি সে বিষাদ কথা কাঁপিল উদ্যান লতা
বিষাদে কুসুম বায়ু নীরবে কাঁদিল.
হয়ে দুখ-বিচঞ্চল কাঁপিল কমল দল
নীরবে নীহার বিন্দু খসিয়া পড়িল।

বাজিল রাজার বুকে, কথা বাহিরিল মুখে
ধীরে ধীরে বিনাইয়া বলিল তখন,——
“তুমিই প্রেয়সি মোর, কেন এ সন্দেহ ঘোর,
ম্রিয়মান অভিমানে কেন গো এমন ?

কাজে ব্যস্ত সর্ব্বদাই,আসিতে পারিনি তাই
আমারি অদৃষ্ট দোষে আমারি মরণ,
কি দারুণ বেদনায়, হৃদয় জ্বলিয়ে যায়
তোমার কোমল হৃদে দিয়াছি বেদন !

কেঁদনা কেঁদনা হায়, প্রিয়ে লো হৃদয়ে আয়
তোরে বই চন্দ্রাননে কাহাকে না জানি,
একবার পেলে তোরে,আর না ছাড়িব ওরে,
হৃদয় রাজ্যের মোর তুই রাজরাণী ।

তুমিই প্রাণের প্রাণ, মনে ভাবিও না আন,
আর কারো নই আমি দুষ' না আমায়,
ভুলে কি ছিলাম সাধে,হাত কি বিধির বাদে ?
এখন এ বক্ষ হতে কে লবে তোমায় ?"

একিরে একিরে কেন, হৃদয় কাঁপেরে হেন
সত্যই কি সেই স্বর পশিল শ্রবণে ?
সেই মধু মাখা সুরে, হৃদিতো উঠিল পুরে
অথচ প্রভেদ কেন আগেকার সনে ?

সেই কথা মধুমাখা, কিন্তু যেন মন-রাখা
প্রণয়ের উন্মত্ততা কইগো তেমন ?
সব সেই, সব সেই, কি যেন অথচ নেই,
অভাব কি এক যেন অনুভবে মন ।

আগের উচ্ছ্বাসময়, সে ভাব এভাব নয়
মর্ম্ম যেন কথা হয়ে দেখা দিত মুখে,
কথা আজ হৃদি মাঝে তেমনি মধুর বাজে
হৃদয় বঞ্চিত কেন তেমন সে সুখে ?

কি যেন পাইয়ে ব্যথা, একটি কহিতে কথা
খুলিবে খুলিবে মুখ অলকা-সুন্দরী,
অমনি চপলা সতি, আসিয়ে সত্বর গতি,
বলিল, "এসগো রাজা মোরে অনুসরি—
শুন গো আমার কাছে সম্মুখে বিপদ আছে,
বিবরিয়া কহিবার নাহি অবকাশ ।"

চলিল চপলা-মেয়ে,—বারেক ফিরিয়ে চেয়ে
পশ্চাতে চলিল রাজা হইয়া হতাশ ।

---

(৫)

কে ওই ললনা শান্ত জ্যোতির্ম্ময়ী
দাঁড়ায়ে প্রাসাদ শিখরোপরি ?
মধুর ঝলকে শুকতারা যেন
উষাতে আকাশ আলোক করি ।

তেজোময় বটে, নহে তীব্র তেজ
প্রখরতা গেছে বিষাদে ঢাকি,
স্নিগ্ধ মাধুরীতে, স্নিগ্ধ চারিদিক,
ওরূপে নাহিক ঝলসে আঁখি ।

এলোথেলো দীন পাগলিনী বেশ
শূন্যে উড়ি উড়ি ছড়ায় কেশ,
নিরাশা মাখান মধুর মুখানি
অটল গম্ভীর যোগিনী বেশ ।

মধুর অধরে নাহিক সুহাস
বিষাদ কপাট দিয়াছে তায়,
নলিনী নয়ন নহে ফুল্ল কোটা
ফুটিয়েও যেন মুদিত প্রায় ।

শরীরে তাহার কিসের যতন
লুটিছে ধরায় লুটুক চুল,
কিছুতেই কিছু নাহি ভুরুক্ষেপ
সকলি মায়ার, সকলি ভুল ।

স্বামী প্রতিনিধি অসিখানি শুধু
এখনো রয়েছে বুকের পরে,
সকলি গিয়াছে আছে সেই খানি
মরণেও তাহা থাকিবে ধোরে ।

দেখিতে দেখিতে পূরব গগনে
উদয় হলেন উষার রাণী,
রাঙা করি তুলি ভাঙা মেঘ গুলি
থুইলেন তা'তে চরণ খানি।

একিরে সহসা ভীমগরজনে
চকিতে দিগন্ত কাঁপিল কেন ?
শান্ত উষা সনে অশান্তি উদয়
কেন বিপরীত নিরখি হেন ?

রবির উদয়ে হাসে যদি নভ
ধরায় একি রে জলদ মালা ?
মাঝে মাঝে ওকি জ্বলে কড়মড়ি
আঁধারে ও কিও বিজলি খেলা ?

ঘোরতর মহা বাধিল সমর
সেনাপদ-দাপে কাঁপিল ভূম,
ঝন ঝনি অসি, চমকে পরাণ
কামান গরজি উগারে ধূম।

শোণিতে শোণিতে বহি গেল নদী
উঠে জয়ধ্বনি, উড়ে নিশান ;
"অলকাকুমারী আমাদের রাণী"
চারিদিকে এই উঠিল তান।

সহসা থামিল সে ঘোর গর্জ্জন
মন্ত্র স্তব্ধ যত সেনানী চয়,
রাজার ইঙ্গিতে নত করি অসি
যেথায় যেজন দাঁড়ায়ে রয়।

সুরয রতনে ধরিল কৃপাণ
দোঁহার ঝগড়া মিটাতে দোঁহে,
স্তব্ধ সেনানীরা রহিল চাহিয়া
সভয়ে বিস্ময়ে চমক মোহে।

ঝনঝনি অসি অশনি গর্জ্জনে
বলিল সরোষে চিতোর রাজ,—
"দাস অনুদাস বুন্দি অধিকারী
মিবারের রাণী হবে সে আজ ?

হুঙ্কারে যাহার কাঁপে ত্রিভুবন
তার অপমান, ও হীন হাতে ?
প্রতিশোধ এর, প্রতিশোধ চাই
প্রতিশোধ লব শোণিত পাতে"।

রাগে অপমানে উন্নত মস্তক,
নয়নে ঝলকে অনল জ্যোতি,
বিকম্পিত স্বরে সতেজে, অধীরে
উত্তরিল সূর্য্য বুন্দিপতি,—

"সাক্ষী ঐ রবি, সাক্ষী দেবদেবী
কাহার অন্যায়, কাহার ন্যায়,
কাহার অলকা ধরম বনিতা
কে পাষণ্ড বলে হরিতে চায় ?

যদি ধর্ম্ম বোলে থাকে একজন,
সত্যের প্রভাব আজিও রয়,
দেখিব দেখিব আজি এ সমরে
কার পরাজয়, কার বা জয়।"—

বলিয়া দুজনে, নীরবে গরজি
রাখিবারে প্রথা রণের আগে,
নমিয়ে অসিরে, প্রণমিতে রবি
চাহিল অমনি আকাশ তাগে।

হোলনা হোলনা, রবিরে প্রণাম
প্রাসাদ শিখরে পড়িল আঁখি
অনিমেষ চোখ, রতন রাণার,
কে বালা হোথায় কাহাকে দেখি ?

হোলনা প্রণাম হোলনা প্রণাম,
কোথায় আকাশ, কোথায় ধরা ?
আপনা পাসরি রতন কুমার
চাহিয়ে রহিল বিহ্বল পারা।

পূর্ব্ব অনুরাগে উথলিল হৃদি
পুরাণ স্বপন উঠিল জেগে;
প্রেমের তুফাণ আবার বহিল
কি এক সহসা বেদনা লেগে।

নব রাজ্য মদে, নতুন প্রমোদে,
শুকায়ে গেছিল যে প্রেম, আহা !
ফিরিল সে নেশা নিরাশ অন্তিমে,—
শ্মশানে আবার জ্বলিল তাহা।

কে যেন সমুখে মূরতি করাল
হাসে সুবিকট ভীষণ হাসি,
নিমেষে এখনি ফুরাইবে সব—
দুঃখ, জ্বালা, সুখ, প্রমোদ রাশি।

এ দারুণ কালে, আবার আবার
মরমে একিএ মরম টান ?
ও মুখানি দেখে আবার এখন
পূর্ব্বভাবে কেন উথলে প্রাণ ?

আবার আবার ঘুমন্ত এ হৃদে
প্রণয় তুফান কেনরে বয় ?
শুষ্ক প্রেমহীন সেই সে নয়ন,
কেন রে হইল সলিল-ময়,

অসময়ে একি আলেয়ার আলো
দেখাইছে ঠাট ছলিবে বলো ?
বিস্মৃতি-মগন ছিল, ভাল ছিল,
কি আগুন পুনঃ উঠিল জ্বলে ?

বিগত সেই সে সুখের স্বপন,
সবে-ফোটা সেই হৃদয় কথা,
মোহময় সেই নব অনুরাগ,—
কেন মনে পড়ি জাগায় ব্যথা ?

প্রেম-অশ্রু-মাখা সেই আঁখি দুটি
জ্বলন্ত, বিঘোর ভাবের ভরে,
অনুরাগ মাখা প্রদীপ্ত মুখানি
কেন মনে পড়ে—কিসের তরে ?

আধো ফুটো ফুটো প্রেমময় সেই
ফুলের সুবাস জিনিয়া বাণী,
প্রথম যে দিন দেখিনু তাহারে,
দেখা দিল যেন স্বরগ রাণী।

সেই সে রূপসী ভুবন মোহিনী
আজিকে তাহার এ হেন বেশ,
ধূলায় লুটিছে আহা মরি মরি
কুসুমে সাজান সেই সে কেশ !

কুসুম কলিকা—নাই কেন বাস ?
অকালেতে মরি শুকালো, হায় !
আমিই নিঠুর নাশিয়াছি তায়—
যাতনায় হিয়া জ্বলিয়া যায়।

ভুলেছিনু সে যে ছিল মোর ভাল
আবার এ দেখা হইল কেন ?
দেখা যদি হ'ল কেন গো আবার
আইল সে প্রেম নবীন যেন ?

প্রেম যদি ফিরে এল পুনরায়,
শ্মান ব্যবধান কেন রে মাঝে ?
হৃদয়ে হৃদয়ে মিশাইতে সাধ
এ বিষম বাধা বড়ই বাজে।

কুসুম কাননে মিলন যাহার
দেখা হ'ল আজি শ্মশানে তার,
এখনিরে যদি ফুরাইবে সব,
নিভে যাক প্রেম চাহিনে আর।"

নিমেষে চকিতে কতশত ভাব
বহে গেল তার হৃদয় দিয়ে,
চাহিয়ে রহিল অলকার পানে
অনুতাপে দুখে দলিত হিয়ে।

মন হ'তে গেল সমরের কথা,
হাত হতে অসি পড়িল নেমে,
ভুলিয়ে সকল সম্ভাষি বালারে
বলিল ভূপতি মাতিয়া প্রেমে।

"আকাশের পটে মধুর মূরতি
আবার আজিকে দেখি রে কেন?
কেন রে আবার নয়নে উদিলি
প্রভাতি চাঁদের জোছনা হেন?

জাননাকি প্রিয়ে, ও মূরতি দেখি
কঠোর পাষাণও গলিয়ে যায়?
জাননাকি প্রিয়ে, ও মূরতি দেখি
শবের তনুও জীবন পায়?

জাননাকি প্রিয়ে; ও মূরতি দেখি
এই এ আমার অসাড় প্রাণে?
মাতিয়ে বহিছে প্রেমের তুফান
আপনি ভাবিয়ে যাই সে টানে।

জাননাকি প্রিয়ে, ও মূরতি দেখি
এহৃদি কবাট আপনি খোলে,
গালে গালে যায় মরম আমার,
মধুর কি এক নেশার ভোলে?

তবে কেন তুই দেখা দিলি ওই
হাসিলি কেন ও দুঃখের হাসি?
বিষাদের ঐ ম্লান-চাহনিতে
কেন বরষিলি পীযূষ রাশি?

দেখা দিলি যদি জুড়াতে এ হৃদি
সুদূর অম্বরে কেন লো তবে?
তোর লাগি এই পেতেছি হৃদয়
আয় হৃদে হৃদে মিশাই এবে।"

চিতোরের রাণা বকে কি প্রলাপ,
সহসা উন্মাদ হইল একি?
সম্মুখ সমরে কই সে বিক্রম,
কই সে সিংহের গরব দেখি?

একিএ ভীরুতা? একি অসম্ভব
হাত হতে অসি পড়িছে খসি!—
চিতোর সেনানী অধীর সরমে
উন্মত্তে ঝননি উঠিল অসি।

সুরয অবাক ফিরাইল মুখ
দেখিল প্রাসাদ শিখরে চেয়ে,
বুঝিল রতন হতজ্ঞান কেন,
প্রাসাদে দেখিল অলকা মেয়ে।

গরজি উঠিয়া বলিল সুরয,
রোষে তাপি উঠে শোণিত বারি,—
"কাপুরুষ ভীরু, ধররে কৃপাণ,
উন্মত্ত হেরিয়ে পরের নারী!"

ভাঙ্গিল চমক অপমানে, তেজে
সবলে কৃপাণ ধরিল করে,
বিঁধিবার আগে শত্রু বক্ষে তাহা
উঁচুতে চাহিল বারেক তরে।

বারেকের তরে আর একবার
দেখি অলকায় নয়ন ভরি,
হানিল কৃপাণ সতেজে সজোরে,
আঘাতে আঘাতে ব্যাকুল করি।

ঝন ঝন ঝন চমকে কৃপাণ,
এ বিঁধিছে অসি উঁহার গায়,
অলকা প্রাসাদে যেন জ্ঞান হীন
দাঁড়ায়ে রয়েছে পাথর প্রায়।

চারিবার রাণা ঝননিয়ে অসি
বিঁধে বিঁধে যেন সুরয বুকে,
চারিবার তাকে করিয়ে বিফল
সুরয আঘাত করিল রুখে।

এই মুখ'মুখি, পিছু হঠে পুন
রক্তেরক্ত অসি সমুখে ধরে;
অবসন্ন তবু অটল উভয়ে,
দ্বিগুণ ভীষণ বিফল তরে।

ঐ না সুরয পড়িল এবার?—
হাতের কৃপাণ পড়িল খসি,
অন্তিম নিশ্বাস পড়িল তাহার—
বুকেতে রতন বিঁধেছে অসি।

অবসন্ন রাণা বিক্ষত শরীর
সেও মাটী পরে পড়িল শুয়ে;
শেষ বলটুকু গিয়াছে তাহার,
সহজে সুরয পড়েনি ভুঁয়ে।

শোণিত লহরী উঠিছে ঝলকি
নিদান আঘাতে চেতনা হারা,
দেখিল অলকা দেখিল সকলি
চেতনা বিহীন পাগল পারা।

পারিল না আর, পারিল না আর,
অটল মাথাটি হইল নত,
ক্ষনেক তবুও রহিল দাঁড়ায়ে
বোঁটায় নোয়ান কমল মত।

ধীরে ধীরে খুলি বুক হতে অসি
বারেক তাহারে দেখিয়া লয়ে,
চুমিল আবার অধীরে যতনে
কত ভাব গেল নিমেষে বয়ে।

তোরি সনে অসি পরিণয় মোর
জানিনে তোছাড়া কাহাকে আমি,
স্বামীরূপে তোকে বুকে ধরি, ওরে
কেটেছে সুখের দিবস যামী।

তোমারি চিরদিন তরে আছিনু,
চিরদিন তরে থাকিব তোরি,
বিবাহ হোয়েছে তোর সাথে অসি,
মরিবও তোরে বুকেতে ধরি।

বলিয়ে সে বালা অনন্য হৃদয়া
বুকেতে বিঁধেয় খড়গ আজ,
শূন্য দেশ হতে তারাটির মত
পড়িল যুগল পতির মাঝ।

দুর্গসিংহ ও ময়ূরভট্ট।

আমরা ভারতীতে "কাতন্ত্র-জীবনী" নামক প্রস্তাবে দুর্গসিংহ সম্বন্ধে একটী অধ্যায় লিখি। আমরা উক্ত প্রস্তাবে প্রমাণ করিয়াছি যে, দুর্গসিংহ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পরার্দ্ধে বিশ্ব-সংসারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অধুনা একটী প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে আমাদের পূর্ব্বোক্ত নিরূপিত সময়ের গুরুত্ব লইয়া ভ্রান্তি উপস্থিত হইতে পারে। বাস্তবিক দুর্গসিংহ সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্ব-নিরূপিত সময় যে ভ্রান্তিমূলক নহে তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আজ এই ক্ষুদ্র প্রস্তাব লিখিতেছি।

বৈয়াকরণ-প্রধান মহাত্মা দুর্গসিংহ কাতন্ত্রের আখ্যাত বৃত্তির দ্বিতীয় পদে "ইনঞ যজাদেরুভয়ং" এই সূত্রের উদাহরণ জন্য ময়ূরভট্টের "সূর্য্যশতক" এবং ভারবি হইতে দুইটী স্থল উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথাঃ—

(১) তবদর্শনং কিং ন ধত্তে। (ভারবি)

(২) কমলবনোদ্ঘাটনং কুর্ব্বতে যে।

(সূর্য্যশতক, শ্লো, ২)

দুর্গসিংহকৃত বৃত্তির ঐ উদাহরণ স্থলে ত্রিলোচন বলিয়াছেনঃ—

* * * মহাকবিনিবন্ধপ্রয়োগাশ্চ দৃশ্যান্তে; যদাহ ভারবিঃ—"তবদর্শনং কিন্ন ধত্তে" * * * * ॥ তথা ময়ূরোঽপি—'কমলবনোদ্ঘাটনং কুর্ব্বতে যে' ইতি* কে বশ্যয় ইত্যর্থঃ।

(কাতন্ত্র-পঞ্জিকা, ৭০।২।৫)

ভারবির সময় এখনো নিশ্চয় রূপে জানা যায় নাই। আমাদের বিশ্বাস তিনি খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্ত্তী লোক নহেন। সময়ান্তরে এ কথার প্রমাণ করিব। "বাণভট্ট" নামক প্রস্তাবে বাবু রামদাস সেন ময়ূরভট্টকে বাণভট্টের শ্বশুর এবং সমসাময়িক লোক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ঐ প্রস্তাবে বাণ ও ময়ূর সম্বন্ধে যে কয়টি উপন্যাস উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতেও ময়ূরকে বাণের শ্বশুর এবং সমসাময়িক বলিয়া উপলব্ধি হয়। আবার—

অহো প্রভাবো বাগ্দেব্যা
যন্ মাতঙ্গদিবাকরঃ।
শ্রীহর্ষস্যাভবৎ সভ্যঃ
সমো বাণ-ময়ূরকঃ॥

শার্ঙ্গধর পদ্ধতির এই শ্লোকানুসারেও বাণ এবং ময়ূরকে শ্রীহর্ষ রাজার সভাপণ্ডিত ও সমসাময়িক লোক বলিয়া জানা যায়।

রামদাস বাবু বাণভট্টের সময় নির্ণয় করিবার জন্য বলিয়াছেন—

* কুলচন্দ্র শিরোমণি প্রভৃতি টীকাকারগণ কর্ত্তৃক এই দৃষ্টান্ত দুর্গ সিংহের প্রয়োগ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

"বাণভট্ট হর্ষচরিত-প্রণেতা। কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের সহিত তাঁহার বাল-সখিতা ছিল, এজন্য হর্ষচরিতে তাঁহার গুণাবলী বর্ণন করিয়াছেন। হর্ষবর্দ্ধন ৬০৭ খৃঃ অঃ হইতে ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু চীনদেশীয় লেখক মাতললিনের মতানুসারে তাঁহার ৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ চীনদেশীয় বৌদ্ধ-পরিব্রাজক হিয়াঙ সিয়াঙ হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্য-শাসন-সময়ে কান্যকুব্জে গমন করিয়াছিলেন। আবুরিহান কহেন এই হর্ষবর্দ্ধন কর্তৃক "শ্রীহর্ষ অব্দ" প্রচলিত হইয়াছিল। এই অব্দ ৬০৭ হইতে ১১০০পর্য্যন্ত কান্যকুব্জ ও মথুরায় প্রচলিত ছিল। এই শ্রীহর্ষ কানাকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন, এবং ইনিই হিয়াঙ সিয়াঙের শ্রীহর্ষ শিলাদিত্য। বাণভট্ট তাঁহার পার্ষদ সুতরাং তিনি খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন।"

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে রামদাস বাবুর মতে ময়ূবভট্টও খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর লোক। আমরা "কাতন্ত্র-জীবনী" নামক প্রস্তাবে লিখিয়াছি যে "দুর্গ সিংহ খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর পরার্দ্ধে বিশ্ব-সংসারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।" কিন্তু যখন দুর্গসিংহ ময়ূরভট্টের গ্রন্থ হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন তখন সাধারণ যুক্তিতে সকলেই বলিবেন, দুর্গসিংহ ময়ূবভট্ট হইতে অবশ্যই পরবর্ত্তী লোক। তাহা হইলে দুর্গসিংহ সম্বন্ধে যে সময় নিরূপণ করিয়াছি তাহার গুরুত্ব লইয়া সন্দিহান হইতে হয়। কিন্তু একটুক সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে আমাদের নিরূপিত সময়ে কিছুই প্রমাদ লক্ষিত হইবে না। মনে করুন, ময়ূরভট্ট যদি ৮০।৯০ বৎসর বয়ঃক্রমে—শ্রীহর্ষের রাজ্যাভিষেকের প্রথম অবস্থায় শ্রীহর্ষের সভাপণ্ডিত হয়েন তবে তিনি প্রায় খৃষ্টীয় ৫২০ কিম্বা ৫৩০ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর দুর্গসিংহ যদি খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর পরার্দ্ধে অর্থাৎ প্রায় ৪৯৫ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে তিনি ময়ূর হইতে মাত্র ২৫।৩০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়েন। যদি দুর্গসিংহ খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগেও বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিত থাকিয়া, প্রায় সেই সময়ে কাতন্ত্র বৃত্তি প্রণয়ন করিয়া থাকেন; তবে ঐ সময়ে ময়ূরভট্টের বয়ঃক্রম প্রায় ২৫ বৎসর ছিল। ময়ূরভট্টের ন্যায় এক জন অসামান্য প্রতিভাশালী মহাত্মা ২০।২৫ বৎসর বয়ঃক্রমে সূর্য্যশতকের ন্যায় একখানা ক্ষুদ্রায়তনের কাব্য লিখিবেন এবং দুর্গসিংহ সেই গ্রন্থ হইতে দুই এক পংক্তি উদ্ধৃত করিবেন তাহা তত আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। যদি কেহ বলেন যে, দুর্গসিংহের ন্যায় একজন ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিত একটী সমকালবর্ত্তী অল্পবয়স্ক যুবকের গ্রন্থ হইতে কখনি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেন নাই। তবে আমরা বলিব যে দুর্গসিংহ, কাতন্ত্রবৃত্তি প্রণয়নের ২০।৩০ বৎসর পরে যখন ময়ূরভট্টের গ্রন্থ এক খানি গণনীয় গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তখন আবশ্যক বোধে তাহা হইতে এক

ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছিলেন তাহাই বা আশ্চর্য্য কি? পরন্তু মাধবাচার্য্যের মতে ময়ূর অবন্তী দেশ বাসী ছিলেন। দুর্গসিংহ ও অবন্তীতে বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিত ছিলেন। অতএব এ উভয় মহাত্মার পরস্পর পরিচয় থাকা নিতান্ত সম্ভব। ময়ূর ভট্ট আবির্ভাব সময় হইতেই দেশে এক জন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। দুর্গসিংহ সেই প্রসিদ্ধ মহাত্মার গ্রন্থ হইতে যে এক পাদ শ্লোক উদ্ধৃত করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন, এমত বোধ হয় না। এই সকল কারণেই ময়ূরভট্ট দুর্গসিংহ হইতে অল্পবয়স্ক এবং দুর্গসিংহের সমসাময়িক হইলেও তাঁহার গ্রন্থ হইতে দুর্গসিংহ দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া একটুকু আশ্চার্য্য হই না। আর ঐ সকল কারণে দুর্গসিংহের জন্ম, পঞ্চম শতাব্দীতে হওয়া অযৌক্তিক জ্ঞান করি না।

আমরা প্রস্তাবান্তরে ষট্‌কারিকা-প্রণেতা ভব-সনন্দি (বা রভস) সম্বন্ধে কয়েক পংক্তি লিখিয়াছি। * ষট্‌কারিকার শেষ শ্লোক পাঠে জানা যায় উক্ত গ্রন্থ ভবসনন্দি ৪২০ অব্দে (এই অব্দ অবশ্য সংবৎ) প্রকাশ করেন। উক্ত ভব-সনন্দি দুই তিন স্থলে "টীকাকার" বলিয়া দুর্গসিংহকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। যখন ৪২০ সংবতে (৪৭৬ খৃষ্টাব্দে) ভবসনন্দি দুর্গসিংহের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তখন দুর্গসিংহকে খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী লোক বলিতে হয়। সুতরাং ময়ূরভট্টের আবির্ভাবের প্রথম সীমা এবং সূর্য্যশতক প্রণয়ন কালকে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ হইতে পর সাময়িক বলিতে পারি না।

গাঙ্গেয় বদ্বীপ ও কলিকাতার ভূতত্ত্ব।

বদ্বীপ কাহাকে বলে ও কিরূপে তাহা সংগঠিত হয় সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিয়া আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে অবতরণ করিব।

সমুদ্র কিম্বা হ্রদে প্রবেশ করিবার সময় কোন নদীর স্রোত কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত হইয়া যখন মন্দীভূত হয়, তখন তৎপ্রবাহিত বালুকা ও কর্দ্দম রাশি নদীর তলদেশে নিমগ্ন হয়। ক্রমে ক্রমে এই তল দেশের কিয়দংশ হইতে নদীর উপরি ভাগ পর্য্যন্ত বালুকা কর্দ্দমে ভরাট হইয়া গিয়া মূল স্রোতস্বিনীর উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত সমতল জলা-ভূমি সকল গঠিত হয়। জলপ্লাবনের সময় এই সকল ভূমি কর্দ্দমময় জলে প্লাবিত হওয়াতে, মৃত্তিকা কিম্বা বালু-

* ভারতী, তৃতীয় ভাগ, ১৯ পৃষ্ঠা।(১২৮৬)

কার একটি সূক্ষ্ম আবরণ তাহার উপর সঞ্চিত হয়, এবং এইরূপে ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া অল্পে অল্পে নদীর সাধারণ সমতল কে ছাড়াইয়া উঠে। এবং ঐ সকল ভূমির মধ্য দিয়া ঐ নদীর অসংখ্য শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হয়। ক্রমে এই সকল সমতল জলা-ভূমির উপর নানাবিধ উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়; ক্রমে জীবজন্তু সকলও সেখানে আহার ও আশ্রয় লাভ করে; এইরূপে, নদীর ক্রিয়া-প্রভাবে একটি নূতন রাজ্য সৃষ্ট হয়। নদীসংগঠিত এই সমতল ভূমিকে ইংরাজি ভাষায় Delta বলে—নীল নদী-সংগঠিত এই প্রকার ভূমির আকার গ্রীক ভাষার Delta অক্ষরের ন্যায় প্রাচীন গ্রীকদিগের নিকট প্রতীয়মান হওয়ায় তাহারা প্রথম উহার Delta নাম দেয়। এই Delta অক্ষরের সঙ্গে আমাদিগের বাঙ্গালা ব অক্ষরের সাদৃশ্য থাকায় Deltaর অনু-বাদে বদ্বীপ আমাদের ভাষায় ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। নদী-মুখে মৃত্তিকা সঞ্চিত হইয়া যে সকল ভূমি উৎপন্ন হয়, সাধারণত তাহাদের আকার প্রায় ব অক্ষ-রের মত, কারণ এই সমভূমি বদ্বীপগুলি প্রথমে সংকীর্ণ ভাবে আরম্ভ হয়। পরে সমু-দ্রের দিকে যতই অগ্রসর হয় ততই প্রশস্ত আকার ধারণ করে।

সাধারণতঃ বদ্বীপ কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহা বলা হইল, এক্ষণে গাঙ্গেয় বদ্বীপের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বিবৃত করা যাক। বঙ্গ-দেশের অধিকাংশই যে এই প্রকার গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর স্রোতোগতিতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং এই জন্যই বঙ্গদেশ অসাধারণ উর্ব্বরতা লাভ করিয়াছে। বদ্বীপের যেখান হইতে প্রথম সূত্রপাত হয়, তাহাকে বদ্বীপের শিরঃস্থান কহে। বঙ্গদেশীয় মহা বদ্বীপের দুইটি শিরঃস্থান আছে,সমুদ্র হইতে উভয়ই প্রায় সমদূর। প্রথমটি গঙ্গানদী-সমুৎপন্ন—রাজমহলের ১৫ ক্রোশ নিম্নে তাহার আরম্ভ এবং তাহা সমুদ্র হইতে ১০৮ ক্রোশ দূরে। দ্বিতীয়টি ব্রহ্মপুত্র-সমুদ্ভূত,চিরাপুঞ্জীর নিম্ন-দেশ হইতে তাহার আরম্ভ, এবং তাহা বঙ্গ-উপসাগর হইতে ১১২ ক্রোশ দূরে। যখন নদীর জল নিম্ন থাকে, তখন সমুদ্রের জো-য়ার বদ্বীপের শিরঃস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিন্তু যখন বর্ষাকালীন বৃষ্টিজলে নদী সকল ফাঁপিয়া উঠে, তখন তাহাদের জলরাশি ও স্রোতোবেগ সমুদ্রের স্রোতকে বাধা দেয়, এই জন্য সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থান ব্যতীত জোয়ারের স্রোত তখন আর বড় অনুভব করা যায় না। অতএব এই সময়ে বদ্বীপে সমুদ্রের গতিবিধি, নদীর গতি-ক্রিয়ার অধীন হইয়া পড়ে, সুতরাং নদীর কার্য্যে অতি অল্পই ব্যাঘাত দিতে সমর্থ হয়। এই বার্ষিক জলপ্লাবনকালেই উচ্চতা ও বিস্তৃতিতে বদ্বীপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বৎ-সরের অন্য সময়ে আবার সমুদ্র স্বীয় স্রোতোবেগে জল-পথ সকল খনন করিয়া এবং কখন কখন উর্ব্বর পলি-গঠিত ক্ষেত্র সকল গ্রাস করিয়া প্রতিশোধ দিয়া থাকে।

Major Colebrooke তাঁহার গঙ্গানদীর গতি বিষয়ক বিবরণে বলেন যে, উক্ত নদীর

কতকগুলি শাখা প্রশাখা ভরাট হইয়া গিয়াছে ও কত বর্গ ক্রোশ পরিমাণ ভূমি অল্পকাল মধ্যে অপসারিত হইয়া নূতন জল-প্রণালী সকল প্রস্তুত হইয়াছে, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তিনি বলেন এক স্থানে ৪০ বর্গ মাইল মৃত্তিকা কয়েক বৎসরের মধ্যে অপসারিত হয়। একজন মনুষ্যের জীবন-কাল অপেক্ষাও কম সময়ের মধ্যে কত বড় বড় দ্বীপ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র-নদীর শাখা প্রশাখা মধ্যে সৃষ্টি হয়, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে কত রাশি রাশি মৃত্তিকা উক্ত নদীদ্বয়ে প্রবাহিত হয়। ইহার মধ্যে কতকগুলি ক্রোশব্যাপী দ্বীপ নদীর বাঁকের কোণে বালুচর পড়িয়া সৃষ্ট হয়; তৎপরে কোন কোন স্থলে স্রোতের গতি ফিরিয়া যাওয়ায় সেই চর গুলির চারিদিকে জল জমিয়া দ্বীপাকারে পরিণত হয়। নদীর তলদেশে কোন প্রকার প্রতিবন্ধক থাকা নিবন্ধন আর কতকগুলি দ্বীপ উদ্ভূত হয়। একটা বৃহৎ বৃক্ষ কিম্বা কোন বাত্যাহত নৌকা জলগর্ব্ভে থাকায় নদীর স্রোত আটকিয়া গিয়া বালুরাশি তল দেশে থিতিয়া পড়ে, এবং এই বালুরাশি জমিয়া নদীর অনেকটা অংশ ভরাট হয়, এই সময় সমস্ত নদীর তল দেশ সমানরূপে পূরণ করিবার জন্য নদীর প্রত্যেক দিকের তট ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়, এবং প্রত্যেক বার্ষিক জল-প্লাবনের সময়ে আবার নূতন মৃত্তিকারাশি সঞ্চিত হওয়াতে এই দ্বীপ সকল পরে আরও বর্দ্ধিত হয়।

রেনেল বলেন, লক্ষ্মীপুরের নিম্নে গঙ্গা ও মেঘনা নদীর সঙ্গম-মুখে কতকগুলি দ্বীপ আছে, যাহা উর্ব্বরতা ও আয়তনে ওয়াইট দ্বীপের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই নদীর কোন কোন অংশে নূতন দ্বীপ সকল সংগঠিত হইতেছে, এবং অপরাংশে আবার পুরাতন দ্বীপ সকল ধ্বংশ হইয়া যাইতেছে। এই সকল নূতন দ্বীপ শীঘ্রই কুশ কাশ এবং অন্যান্য তৃণ গুল্মে আচ্ছাদিত হইয়া দুর্গম অরণ্যে পরিণত হয়, এবং ব্যাঘ্র গণ্ডার মহিষ হরিণ এবং অন্যান্য বন্য পশুর আবাসস্থান হইয়া পড়ে। এই জন্য জীব জন্তু ও উদ্ভিজ্জের দেহাবশেষ কখন কখন নদীর স্রোতে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় বদ্বীপ প্রদেশে যে মৃত্তিকা থিতিয়া পড়ে, তন্মধ্যে সেই সকল দেহাবশেষ সমাবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন এরূপ ঘটিয়া থাকে, যে সময়ে বার্ষিক জল-প্লাবনের চূড়ান্ত প্রকোপ, সেই সময় প্রবল ঝটিকা উত্থিত হয়, এবং তৎসঙ্গে সমুদ্রের প্রবল স্রোতের প্রাদুর্ভাব হয়—এই উভয় এক যোগে সম্মিলিত হইয়া নদীর নিম্নবহমান স্রোতকে কখন কখন ঠেলিয়া রাখে এবং এই কারণে ভয়ানক সর্ব্বগ্রাসী জলপ্লাবন সকল সংঘটিত হয়। তাবৎ সামুদ্রিক বদ্বীপের অধিবাসী বিশেষরূপে এই প্রকার দুর্ঘটনার আয়ত্তাধীন। এবং ইহা এক প্রকার নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে, গাঙ্গেয় বদ্বীপে যে অবধি মনুষ্যের বসতি হইয়াছে সে অবধি এই প্রকার শোচনীয় দুর্ঘটনা তথায় বারম্বার সংঘটিত হইয়াছে।

এই কারণ বশতঃ ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মীপুরে নদীর জল সচরাচর সমতল হইতে ৬ ফীট ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া পশু মনুষ্য ঘরবাড়ির সহিত সমস্ত একটি প্রদেশকে একবার ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল।

যে মৃত্তিকারাশি, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের জলে আটক থাকিতে দেখা যায়, তাহা পরিমাণে পৃথিবীর আর সকল নদীর অপেক্ষা অধিক। তাহার কারণ, প্রথমতঃ তাহাদিগের শাখা সকল উচ্চতম পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত হয়. এবং যেরূপ রাইন নদী কনস্ট্যান্‌স্ নামক হ্রদে ও সোন নদ জেনিবা-হ্রদে পড়িয়া পরিষ্কৃত হয়, সেই রূপ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের জল পরিষ্কৃত হইবার কোন উপায় নাই। দ্বিতীয়তঃ উক্ত নদীদ্বয় মিশিসিপি প্রভৃতি নদী অপেক্ষা বিষুব রেখার অধিক সন্নিকট। এতদ্‌ব্যতীত হিমালয়ের যে প্রথম পর্ব্বত শ্রেণী ভারতবর্ষের সমভূমি হইতে উত্থিত হইয়াছে তাহার দক্ষিণ ধারে অত্যন্ত বৃষ্টি হয়। যেখানে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র, প্লাবনের সময় তাহাদের প্রধান প্রবাহ বিস্তার করে সেখানকার সমুদ্র, বদ্বীপ হইতে ৩০ কিম্বা ৫০ ক্রোষ দূরে গিয়া তবে স্বীয় স্বাভাবিক স্বচ্ছতা পুনর্লাভ করে; এবং ইহাও মানিয়া লইতে পারা যায়—যেখানে সমুদ্রের জল প্রথম পরিষ্কার হইতে আরম্ভ হয়—তাহার আরও দক্ষিণে কর্দ্দমের সূক্ষ্মতর অংশ গুলি স্রোতে প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই নূতন স্তরের সাধারণ ঢালু অতীব মন্দ-গতি। উৎকৃষ্ট সমুদ্রের চিত্র দেখিয়া অবগত হওয়া যায় যে,—বদ্বীপের তল দেশ হইতে বঙ্গ উপসাগরের ৫০ ক্রোশ পর্য্যন্ত যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই অল্পে অল্পে এই উপসাগরের গভীরতা ৪০ হইতে ৬০ বাঁউ বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। অতদূরে কোন কোন স্থলে ৭০ কিম্বা ১০০ বাঁউ পর্য্যন্ত গভীর।

কিন্তু এই সমতল-নিয়মের একটি বিশেষ ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। বদ্বীপের মধ্যদেশের সম্মুখে, উপকূল হইতে ১৫ কিম্বা ২০ ক্রোশ দূরে, একটি সামুদ্রিক খাত আছে—তাহার নাম অতলস্পর্শ—তাহার পরিসর ৭॥ ক্রোশ। সেখানে ১৮০ হইতে ৩০০ বাঁউ পর্য্যন্ত তলমান যন্ত্র ফেলিয়াও তাহার তল পাওয়া যায় নাই। উপকূলস্থ চড়ার ৫ মাইল ব্যবধান হইতে ঐ খাদের ঢালু আরম্ভ হইয়াছে; নদীর কর্দ্দম-ভারাক্রান্ত জল যে শুধু ইহার উপর দিয়া সর্ব্বদাই প্রবাহিত হয় এরূপ নহে কিন্তু বাণিজ্য-বায়ু প্রবাহ কালে কর্দ্দম ও বালুকা-ভার বহন করত সমুদ্র আবার বদ্বীপ অভিমুখে প্রধাবিত হয়—এই রূপ অবস্থায় এই অতলস্পর্শ খাত কি রূপে যে উৎপন্ন হইল ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। উপসাগরের আর ৪০ ক্রোশ পর্য্যন্ত যখন কর্দ্দম রাশি বিস্তৃত বলিয়া জানা আছে—তখন এই অতলস্পর্শে যে অত্যন্ত গাঢ় কর্দ্দম রাশি সঞ্চিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া

যায় যে, হয় বঙ্গীয় উপসাগরের এই অংশের আদিম গভীরতা অত্যন্ত অধিক ছিল, নয় ইদানীন্তন কালে, মধ্যে মধ্যে ভূমি বসিয়া গিয়া এই রূপ ঘটনা হইয়াছে। এই শেষোক্ত অনুমানটি অধিকতর সম্ভব বলিয়া বোধ হয়, যে হেতু বদ্বীপের সংগঠন কালে —কলিকাতার নিকটস্থ বদ্বীপ যে বসিয়া যাইতেছিল তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অধিকন্তু পুরাকালে ভূমিকম্প প্রভাবে বঙ্গদেশের কিয়দংশ বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছিল এবং চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী উপকূলের অনেকাংশ যে বসিয়া যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। আরও দেখা যায়, সুমাত্রা অনুর্ব্বর দ্বীপ এবং রামারি প্রভৃতি আগ্নেয়-গিরি প্রদেশ হইতে "অতলস্পর্শ" অধিক দূরে অবস্থিত নহে।

Fergusson সাহেব অনুমান করেন যে, যে অতলস্পর্শে ১৮০০ ফীট পর্য্যন্ত তলমান যন্ত্র নিঃক্ষেপ করিয়াও তল পাওয়া যায় নাই—তাহা আর কিছুই নয়—তাহা একটি জল-পথ মাত্র—সামুদ্রিক স্রোতের প্রবল বেগে তাহা প্রস্তুত হইয়াছে কিম্বা স্রোতবেগে ঐ স্থানে কোন মৃত্তিকারাশি সঞ্চিত হইতে পারে নাই। এই প্রকার অনুমান সপ্রমাণ করিবার জন্য তিনি উল্লেখ করেন যে গঙ্গা নদীর জোয়ার কালে স্রোতের গতি ঘূর্ণায়মান দৃষ্ট হয়। কিন্তু ভূতত্ত্ববিৎ লায়েল সাহেব বলেন—যদি Fergusson সাহেব ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেন যে, সেই গতির বেগ-পরিমাণ কি রূপ—তাহা হইলে সেই বেগ-প্রভাবে এরূপ অতলস্পর্শী-খাত প্রস্তুত হইতে পারে কি না অনুমান করা যাইতে পারে। লায়েল সাহেব বলেন তাঁহার মতে এই অনুমানটি আরও সহজ যে পূর্ব্ব হইতেই ২০০০ ফিট কিম্বা ততোধিক গভীর একটি সামুদ্রিক খাত বর্ত্তমান ছিল—সেইটি হয়তো বঙ্গ উপসাগরের আদিম মূল-আধার-স্থানের একটি অংশ মাত্র! গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এই দুই বৃহৎ-নদী বঙ্গীয় উপসাগরের এই গভীর ও মধ্য অংশটিতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সামুদ্রিক স্রোতের সহিত মিলিত হওয়াতে তাহাদিগের স্রোত মন্দীভূত হয় এবং তন্নিবন্ধন তাহাদিগের কর্দ্দম সেই স্থানেই থিতিয়া পড়ে. সুতরাং "অতলস্পর্শী খাত" পর্য্যন্ত সেই কর্দ্দম প্রবাহিত হইয়া সে স্থান ভরাট করিতে অবসর পায় নাই।

বঙ্গ-উপকূলের কোন কোন অংশে যদিও বিলক্ষণ বৃদ্ধি দেখা যায় কিন্তু সাধারণতঃ উপকূলের বর্দ্ধনক্রিয়া অতীব মন্দগতিতে সাধিত হইতেছে; কারণ, যখন নদীর জল নিম্ন থাকে, তখন জোয়ার ভাটায় কর্দ্দমরাশি অনবরত অপসারিত হয়। সুন্দরবনে জোয়ার ভাটার উত্থান পতনের পরিমাণ প্রায় ৮ ফীট কিন্তু বদ্বীপের পূর্ব্বদিকে, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে শীতকালে Hooker সাহেব দেখিয়াছিলেন, জোয়ারের জল ৬০ হইতে ৮০ ফীট পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল এবং এই কারণে মেঘনা ও ফেণী নদীর মুখ-স্থিত দ্বীপ সমূহ-মধ্যে প্রবল 'বাণ' ডাকে এবং এই জল-

রাশি ক্রমশঃ নদীতে উঠিয়া নদীর জল ঠেলিয়া লইয়া যায়, আবার ভাটার সময় সেই জলরাশি প্রবল বেগে হটিয়া আইসে। এই জন্য চট্টগ্রামের দক্ষিণে বঙ্গ উপসাগরের জল ২০ ক্রোশ পর্য্যন্ত এরূপ লবণ-শূন্য যে সেখানে সামুদ্রিক উদ্ভিদ আদবেই জন্মায় না। অতএব বেশ বুঝা যাইতে পারে উক্ত জলরাশির প্রবাহ বেগে কর্দ্দমের সূক্ষ্মাংশ সকল কত দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়।

মিসিসিপি নদীর ন্যায় গঙ্গার তলদেশের ও তটের সমভূমি ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতেছে।

গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীগত বদ্বীপের কোন অংশে কিম্বা সমুদ্রের ২০০ ক্রোশ অপেক্ষা কম নিকটে কর্করের ন্যায় কোন স্থূল পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কলিকাতা সমীপস্থ কোর্ট উইলিয়ামে ১৮৩৫। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে যে কূপ খনন করা হইয়াছিল, তাহাতে ১২০ ফীট নিম্নে কর্দ্দমের সহিত উপলখণ্ড বাহির হইয়াছিল। কলিকাতার সমতলভূমি হইতে ৪৮১ ফীট পর্য্যন্ত নীচে খনন হইয়াছিল এবং তৎকালে তত্রস্থ ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যে অবস্থা প্রকাশ হয় তাহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। তাহাতে দেখা যায় কলিকাতার উপরকার মাটীর প্রায় ১০ ফীট নিচে প্রায় ৪০ ফীট পুরু, এক প্রকার নীল মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়; তাহার নীচে বেলে মাটি, এই বেলে মাটির অব্যবহিত নিম্নে জীর্ণ উদ্ভিদরাশি এবং তন্নিম্নে ২ ফীট পুরু কৃষ্ণবর্ণ জীর্ণ উদ্ভিদে এক প্রকার মৃত্তিকাস্তর রচিত হইয়াছে। পোর্টল্যাণ্ডের "জঞ্জাল-স্তরের" (Dirtbed) ন্যায়, এই জীর্ণ উদ্ভিদের মৃত্তিকারাশি দেখিয়া এই রূপ অনুমান করা যায় যে উহা সুন্দরবনের কোন প্রাচীন ভূখণ্ডের সুস্পষ্ট নিদর্শন। রক্তবর্ণ কাষ্ঠের গুঁড়ি ও শাখা প্রশাখা সকল এই মৃত্তিকাস্তরের উপরে এবং অব্যবহিত নীচে এরূপ অবিকৃত ভাবে ছিল যে তদ্দৃষ্টে Dr Wallich সুন্দরি কাঠ বলিয়া স্পষ্ট চিনিতে পারিয়াছিলেন। Dr Falconer বলেন যে কলিকাতার চতুর্দ্দিকস্থ অন্যান্য স্থানেও ৯ কিম্বা ২৫ ফীট নিম্নে এই প্রকার মৃত্তিকা-স্তর আরও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

ইহাতেই প্রতীয়মান হয় যে, এই প্রদেশে প্রথমে যে ভূমি ছিল, তাহা অনুান ৭০ ফীট বসিয়া গিয়াছে; কারণ কলিকাতা সমুদ্রের সমতল হইতে কতিপয় ফীট মাত্র উচ্চ এবং এই সকল উদ্ভিদ-জাত মৃত্তিকাস্তর থাকাতেই বোধ হয় যে এই ভূমি ক্রমশ অল্পে অল্পে বসিয়া গিয়াছে।

এই উদ্ভিদ স্তরের নিম্নে ১০ ফীট পুরু ঈষৎ হরিদ্রা বর্ণের আর একটি মৃত্তিকা স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে বিস্তর কর্করের স্তবক আছে। এই কর্কর মধ্যে কিয়দংশ অতি অল্পদিনের বলিয়া বোধ হয়—সাহারণপুরের নিকট নদীপ্লাবনে যে কর্কর সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই ইহার উৎপত্তি। তৎপরে ১২০ ফীট নিম্নে প্রবেশ করিয়া কোমল মৃত্তিকা পওয়া যায়—তাহাতে

অভ্র-শ্লেট এবং অন্যান্য প্রকার প্রস্তরের জীর্ণ অংশ সকল দৃষ্ট হয়, সে-সকল অংশ গঙ্গার স্রোতে প্রবাহিত হইয়া সে স্থানে আসিবার সম্ভাবনা নাই। এই সমস্ত স্তরে কোন মৃত সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় নাই—যাহা কিছু সকলই নদী-জাত ও স্থলজাত জীবের দেহাবশেষ। তাহার পর ৩ ফীট নিম্নে আর একটি জীর্ণ উদ্ভিদ-স্তরের উপর কর্দ্দম স্তর সন্নিবেশিত—ইহাতে এইরূপ বুঝা যাইতেছে আবার কিয়ৎকালের জন্য একটি বিরাম উপস্থিত হয়, এবং আরও বুঝা যায় যে ঐ অরণ্যাচ্ছাদিত ভূমি ৩০০ ফীট বসিয়া গিয়াছিল। ইহাতে অনেকে অনুমান করেন যে উপরি উক্ত অধোগত ভূমিখণ্ডের উপর যখন বৃক্ষাদি ছিল তখন এখনকার অপেক্ষা বঙ্গভূমির আয়তন সমুদ্রের দিকে অধিক বিস্তৃত ছিল এবং ইদানীন্তন কালে গঙ্গার স্রোতঃক্রিয়ায় বদ্বীপের আয়তন যাহা কিছু বৃদ্ধি হইতেছে তাহা আসলে বৃদ্ধি নয়—সমুদ্র-অপহৃত ভূমি গঙ্গাদেবী অল্পে অল্পে পুনরায় অধিকার করিয়া লইতেছেন এই মাত্র। তৎপরে ৪০০ ফীট নিম্নে স্তর-সন্নিবেশ বিষয়ে একটি প্রকৃতি-গত আকস্মিক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়—এই স্থানের স্তরটি বালুকা ও স্থূল উপলখণ্ডে নির্ম্মিত। খনন-যন্ত্রে কোন দৈব-ব্যাঘাৎ উপস্থিত হওয়ায় খনন ক্রিয়া এই পর্য্যন্ত স্থগিত হয়।

১২০ এবং ৪০০ ফীট নিম্নে উপল খণ্ড দৃষ্ট হওয়ায় এইরূপ বুঝাইতেছে যে ঐ সময়ে কলিকাতার নিকটস্থ কিম্বা চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানে ভৌগোলিক অবস্থায় একটি গুরুতর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। নদী-প্রপাত কিম্বা পলিময় ভূক্ষেত্রের সাধারণ ঢালু হয়তো পূর্ব্বে অধিক মাত্রায় ছিল কিম্বা ভূমির সাধারণ অধোগমনের পূর্ব্বে যে সকল ক্ষুদ্র পর্ব্বত, বদ্বীপের বর্ত্তমান তল-প্রদেশের নিকটতর স্থানে ছিল তাহারা হয়তো কয়েক শত ফীট ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া বঙ্গ উপসাগরে দ্বীপাকারে পরিণত হয় এবং সেই সকল দ্বীপ হয়তো ক্রমে বসিয়া গিয়া নদীগত সঞ্চিত কর্দ্দম মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায়।

গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের স্রোতে প্রতি বৎসর গড়ে কত পরিমাণ মৃত্তিকা প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে গিয়া পতিত হয়, তাহা যদি পরীক্ষা করিয়া কিয়ৎপরিমাণে নিরূপণ করা যায়, তাহা হইলে এই গাঙ্গেয় বদ্বীপ কত দিনে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। গঙ্গার স্রোতে কত পরিমাণ মৃত্তিকা আনীত হয়, সে বিষয়ে Rev Mr Everest ১৮৩১-২ খৃষ্টাব্দে, সমুদ্র হইতে ২৫০ ক্রোশ দূরে, গাজিপুর নগরে পরীক্ষা-পরম্পরা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে, প্রতি সেকেণ্ডে গঙ্গা নদীতে যে জলরাশি প্রবাহিত হয় তাহার পরিমাণ ঘনফীট

বর্ষাকালে (৪ মাস)	৪৯৪,২০১
শীতকালে (৫ মাস)	৭১,২০০
গ্রীষ্মকালে (৩ মাস)	৩৬,৩৩০

অতএব দেখা যাইতেছে গড়ে প্রায় ৫০০,০০০ ঘণফীট জলরাশি বর্ষাকালের ছয় মাস এবং ৫৫০০০ ফীট জলরাশি বাকি ৮ মাস প্রতি সেকেণ্ডে প্রবাহিত হয়।

বর্ষাকালে এই প্রবাহিত জল রাশিতে যে কর্দ্দমরাশি আলম্বিত ছিল তাহার গুরুত্ব, $\frac{১}{৪২৪}$ অংশ; জলের বৈশেষিক গুরুত্ব শুষ্ক মৃত্তিকার গুরুত্বের প্রায় অর্দ্ধেক। এই জন্য নীরেট মৃত্তিকা পরিমাণে $\frac{১}{৪৫৬}$ অংশ কিম্বা ৫৭৭ ঘণফীট প্রতি সেকেণ্ডে। অতএব বর্ষাকালের ১২২ দিনের প্রবাহিত মৃত্তিকার পরিমাণ মোট ৬,০৮২,০৪১ ঘণফীট—অন্য ঋতুতে যে মৃত্তিকা প্রবাহিত হয় তাহার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অতি অল্প। শীতকালীন ৫ মাসের পরিমাণ ২৪৭,৮৮১৬০০ ঘণফীট এবং তিন মাস গ্রীষ্মকালের পরিমাণ ৩০,১৫৩,২৪০ ঘণফীট অতএব এক বৎসরের মৃত্তিকা-প্রবাহের সমষ্টি ৬,৩৬৪, ০৭৭,৪৪০ ঘণফীট।

এই মৃত্তিকা রাশি এক বৎসর কাল মধ্যে ১১৪$\frac{১}{৪}$ বর্গ ক্রোশ পরিমাণ ভূমি উঠাইতে পারে—তাহার প্রত্যেক দিক ৭$\frac{১}{২}$ ক্রোশ এবং তাহার উচ্চতা এক ফুট। ইহা কি প্রকাণ্ড ব্যাপার তাহা একবার পাঠকের মনে ধারণা করিয়া দিবার জন্য, আমরা প্রথমে এইটি ধরিয়া লইতেছি যে শুষ্ক কর্দ্দমের বৈশেষিক গুরুত্ব গ্রেনাইট প্রস্তরের গুরুত্বের অর্দ্ধেক (একটু হয়তো বেশি)। তাহা হইলে, এক বৎসরে যে মৃত্তিকারাশি গঙ্গা স্রোতে প্রবাহিত হয়, তাহার পরিমাণ ৩,১৮৪,০৩৮,৭২০ ঘণফীট গ্র্যানীট প্রস্তরের সমান। এক্ষণে দেখা যায়, ১২$\frac{১}{২}$ ঘণফীট গ্র্যানীট ওজনে এক টন এবং ইহাও গণনায় নিরূপিত হইয়াছে যে মিশর দেশের বৃহৎ পীরামিড যদি নীরেট গ্রেনাইট প্রস্তর হইত তাহা হইলে তাহা ওজনে ৬,০০০,০০০ টন হইত। অতএব এই গণনানুসারে প্রতি বৎসরে গঙ্গায় যে কর্দ্দমরাশি প্রবাহিত হয় তাহা ওজনে ও আয়তনে ৪২ টা পীরামিড অপেক্ষাও অধিক এবং বর্ষাকালে ৪ মাসে যে কর্দ্দম রাশি প্রবাহিত হয় তাহার পরিমাণ ৪০টা পীরামিডের সমান হইবে। কিন্তু কর্দ্দমরাশির বৈশেষিক গুরুত্ব আনুমানিক রূপে না ধরিয়া নীরেট মৃত্তিকার পরিমাণ Everest সাহেব বাস্তবিক ওজন করিয়া যাহা পাইয়াছিলেন তাহাই যদি ধরা যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে বর্ষাকালের ১২২ দিন ধরিয়া যে কর্দ্দম রাশি গঙ্গায় প্রবাহিত হয় তাহা ওজনে ৩৩৯,৪১৩,৭৬০ টন—৫৬$\frac{১}{২}$ পিরামিডের সমান এবং সমস্ত বৎসরে কর্দ্দমরাশির ওজন ৩৫৬,৩৬১,৪৬৪ টন কিম্বা প্রায় ৬০টা পিরামিডের সমান।

মিসরদেশের বৃহৎ পিরামিডের তল দেশের আয়তন ১১ acres এবং ইহার খাড়াই উচ্চতা প্রায় ৫০০ ফীট। অতএব গঙ্গা নদীতে শান্ত ভাবে ও অলক্ষিত

ভাবে কি প্রকাণ্ড ব্যাপার চলিতেছে, তাহা এই পিরামিডের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই কল্পনায় কিয়ৎপরিমাণে ধারণ করা যাইতে পারে।

১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে এটনা নামক আগ্নেয়-গিরি হইতে যত ধাতুপিণ্ড নিঃসারিত হয়, তত অধিক পরিমাণে ঐতিহাসিক কাল মধ্যে আর কখনই নিঃসৃত হয় নাই। Ferrara গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে এটনা হইতে ঐ কালে ১৪০,০০০,০০০ ঘণগজ ধাতু নিঃসৃত হইয়াছিল, এই হিসাব অনুসারে গাজিপুর দিয়া প্রতি বৎসরে গঙ্গা নদীতে যে কর্দ্দমরাশি প্রবাহিত হয়, তাহার পঞ্চম অংশের এক অংশের সমান হয় না; সুতরাং পরিমাণে ইহার সমান হইতে গেলে এটনা গিরির এইরূপ ৫টা অগ্ন্যুৎপাত বা মহাধাতু-নিস্রব আবশ্যক হয়। Bengal Engineer দলের Colonel R. Strachey বলেন যে Everest সাহেব যে খানে তাঁহার পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন সেই গাজিপুর, সমুদ্র হইতে শুধু ২৫০ ক্রোশ দূরে এরূপ নহে, আবার এই একটি কথা যে, সেখানে গঙ্গা নদীর প্রধান প্রধান পোষক শাখা নদীগুলি আসিয়া মিলিত হয় নাই। এই সকল শাখা-নদী হিমালয়ের সমস্ত ৩৭৫ ক্রোশ আয়তনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। ইহার মধ্যে যে সকল শাখা-নদী গাজিপুরে আসিয়া মূল নদীর সহিত মিশিয়াছে তাহারা ঐ পর্ব্বত শ্রেণীর ৭৫ ক্রোশ আয়তনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। গাজিপুরের নিম্ন স্থানে, উত্তর হইতে ঘর্ঘরা, গণ্ডকী, কুশী ও তিস্তা এবং দক্ষিণ হইতে বৃহৎ সোন নদ আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত হিমালয়ের যে অবশিষ্ট ৩০০ ক্রোশ রহিল—সেই তিন শত ক্রোশের মধ্যেই বর্ষার অধিক প্রাদুর্ভাব। অতএব গাজিপুর দিয়া যে পরিমাণ জল প্রবাহিত হয়—তাহার ৪ কিম্বা ৫ গুণ পরিমাণ জলরাশি গঙ্গা নদী দিয়া সমুদ্রে নিপতিত হয়।

* Major Wilcoxএর গণনানুসারে ব্রহ্মপুত্র দিয়া পৌষ মাঘ মাসে গোয়ালপাড়ায় ১৫০,০০০ ঘণফীট জলরাশি নিঃসৃত হয়। বিভিন্ন ঋতুতে গাজিপুরে জল প্রবাহ সংক্রান্ত যেরূপ নিয়ম দৃষ্ট হয়—সেই নিয়মটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই রূপ আনুমানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার জল-প্রবাহের পরিমাণ গড়ে প্রায় সমান। এইটি অনুমান করিয়া লইয়া এবং অত্যুক্তির আশঙ্কা এড়াইবার জন্য, এভেরেস্ট সাহেবের গণনার প্রায় তিন অংশের এক অংশ বাদ দিয়া পণ্ডিতবর Lyell বলেন যে বঙ্গ উপসাগরে এক বৎসরে যে কর্দ্দমরাশি প্রবাহিত হয় তাহার পরিমাণ ৪০,০০০০০০ ঘণফীট কিম্বা গাজিপুরের কর্দ্দম-প্রবাহ অপেক্ষা প্রায় ৬।৭ গুণ অধিক। Colonel Strachey গণনা করিয়া বলেন বঙ্গীয় বদ্বীপের যত

* Asiatic Researches Vol XVII P. 466.

খানি অংশ প্রতি বৎসর প্লাবিত হয় তাহা দীর্ঘে ১২৫ ক্রোশ এবং প্রস্থে ৪০ ক্রোশ— সবশুদ্ধ আয়তনে ১০,০০০ বর্গ ক্রোশ। ইহার দক্ষিণে উপসাগর মধ্যে যতখানি স্থান ব্যাপিয়া কর্দ্দম প্রক্ষিপ্ত হয় তাহার আয়তন ২২,৫০০ বর্গ ক্রোশ—এই দুইটি অঙ্ক যোগ করিলে ৩২,৫০০ বর্গ ক্রোশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব এই ৩২৫০০ বর্গ ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া উক্ত মহা-নদীদ্বয়ের কর্দ্দমরাশি প্রসারিত হয়। মনে কর যদি এই মর্দ্দম রাশির নিরেট অংশ ৪০০,০০০ ঘণফীট হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত ভূমির-আয়তন এক ফুট উর্দ্ধে উঠাইবার জন্য—৪৫ $\frac{৩}{১০}$ বৎসর কাল ক্রমাগত মৃত্তিকা-সঞ্চয়ের আবশ্যক কিম্বা ৩০০ ft ভূমি উঠাইবার জন্য ১৩,৬০০ বৎসর আবশ্যক হয়। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে [আমরা] দেখিয়াছি যে কলিকাতায় কূপ খনন-যন্ত্রে নদী-স্তর যত দূর পর্য্যন্ত বাস্তবিক খনন করা হইয়াছিল তাহার গভীরতা ৩০০ ft অপেক্ষা অনেক অধিক।

যাহা হউক এই বদ্বীপ ভবিষ্যতে কি পরিমাণে অগ্রসর হইবে, তাহা কখনই উপরোক্ত তথ্যগুলি হইতে নিরূপণ করা যায় না—এবং এই সমস্ত ভূমি সমভাবে থাকিবে কিম্বা কালে সমুদ্রের স্থান অধিকার করিবে তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। ইদানীন্তন ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের পর্য্যবেক্ষণে এই আশ্চর্য্য সত্যটি প্রকাশ পাইয়াছে যে, দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল, Scandinavia দেশ এবং প্রশান্ত [সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ যেরূপ এক দিকে ধীরে ধীরে অলক্ষিত ভাবে উন্নত হইতেছে—সেইরূপ পক্ষান্তরে গ্রীনল্যাণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য দেশ সকল ক্রমশ অধোগত হইতেছে। গ্রীনল্যাণ্ডের ন্যায় যদি আমাদের এই প্রদেশে অধোগতি ক্রিয়া চলিতে থাকে তাহা হইলে ১৩,০০০ বৎসরের পর বঙ্গ উপসাগর এক্ষণকার অপেক্ষা গভীর হইলেও হইতে পারে। Lyell বলেন, যদি প্রতি শতাব্দিতে বঙ্গীয় বদ্বীপ ২ফীট ৩ ইঞ্চ করিয়া বসিয়া যায়—[এত অল্প পরিমাণ যে বঙ্গবাসীরা তাহা উপলব্ধি করিতেও পারিবে না]—তাহা হইলে উক্ত মহানদীদ্বয় তদীয় বদ্বীপের সীমা পরিবর্দ্ধনের যতই চেস্টা করুক না কেন, ঐ পরিমাণ অধোগমনে যথেষ্ট প্রতিবিধান ও প্রতিক্রিয়া সাধিত হইবে। এই বঙ্গীয় বদ্বীপে নদীগত মৃত্তিকা প্রবাহের শক্তি অপেক্ষা, ভূমির অধোগমন রূপ বিরোধী শক্তি যে অধিকতর প্রবল, তাহার নিদর্শন "অতলস্পর্শের" অস্তিত্বেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং কলিকাতার খনন-ক্রিয়ায় তাহা সপ্রমাণ হয়। এই জন্যই বঙ্গভূমি উন্নত হইতে সমর্থ হয় না, এবং এই জন্যই বঙ্গ উপসাগরের অধিকাংশ, কর্দ্দমরাশিতে পূর্ণ হইতে পারে না। কিন্তু কালে উন্নমন কি অধোগমন কোন্ শক্তিটি বঙ্গদেশে প্রবল হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

সেক্সপিয়রের নায়িকা-কল্পনা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

মহাকবি সেক্সপিয়রের নানা স্থল উদ্ধৃত করিয়া গতবারে আমরা দেখিয়াছি যে সেই মর্ম্ম-উৎসারিত লজ্জা, যাহা রমণী-সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ উপকরণ, তাহা সরস্বতীর ইংলণ্ডীয় বর-পুত্রের নায়িকা-মণ্ডলে অতি বিরল। কি সুশিক্ষিতা, কি "অশিক্ষিতা," তাঁহার সকল নায়িকাতেই পুরুষোচিত মুক্তকণ্ঠতা এত দূর প্রবল, যে তাহাতে তাহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে সরল-স্বভাবা মিরাণ্ডা, ফুল বিহারিণী পরডিটা, তেজস্বিনী হরমাইয়োনী, সুচতুরা রোজালিণ্ড, একাগ্রমনা জুলিয়েট, প্রেম-মুগ্ধা অফিলীয়া, সর্ব্বত্যাগিনী ডেস্‌ডিমোনা, পিতৃ-বৎসলা কর্ডিলীয়া, আমাদের স্নেহের সামগ্রী, ভালবাসার সামগ্রী, ভক্তির সামগ্রী—কেহ বা আমাদের পূজারও সামগ্রী। নানা গুণে তাহারা বিভুষিত বলিয়া আমরা তাহাদিগের দোষ অনুসন্ধান করিতে কখন ভ্রমেও সঙ্কল্প করি না,—কখন ভ্রমেও সে রূপ কৌতূহল জন্মায় না। কিন্তু স্থির-চিত্তে ও বিষয় অনুধাবন করিলে দেখিতে পাই যে তাহাদের গুণে কি যেন একটি অভাব আছে,—কি একটি যেন "নাই—নাই" মনে হয়, সেই অভাব-নিবন্ধন তাহাদের সকল গুণের কি একটি যেন পাপ্‌ড়ী ঝরিয়া গেছে। বিশেষ প্রনিধান করিলে বুঝা যায় যে তাহাদের লজ্জার ভাব হয় একেবারেই নাই, অথবা স্থল-বিশেষে লজ্জার কেবল আভাস মাত্র আছে। যদি কেহ বলেন যে লজ্জাতে প্রকৃত সরলতার কেবল বিঘ্ন হয়,—লজ্জা কেবল ছলনার আবরণ ও চাতুরীর আড়ম্বর, আমাদের মতে কেবল অঙ্ক শাস্ত্র ও প্রতি বৎসরের "নূতন পঞ্জিকা" ব্যতীত কাব্য-শাস্ত্র কখনই তাঁহার স্পর্শ করা উচিত নহে। প্রাকৃতিক অনেক পদার্থে, মানসিক অনেক ভাবে, হৃদয়ের অনেক উচ্ছ্বাসে এমন একটি অনির্দ্দিষ্ট—সূক্ষ্ম, প্রগাঢ়, অথচ স্বপ্নময় সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য গভীর ভাবে নিহিত আছে যে তাহা অনুভব করা সকলের সাধ্যে নাই, সকলের সৌভাগ্যে নাই। বর্ষাকালে গভীর রাত্রে বিদ্যুৎ-বজ্র সমাকীর্ণ বৃষ্টি-ধারা মুশলধারে পড়িতে দেখিয়া একজন কৃষক হয়ত বলিবে যে "এবারে ধান্য অত্যন্ত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইবে;" একজন শরীর-তত্বজ্ঞ হয় ত বলিবেন যে "এই বিদ্যুৎপাতে বায়ু অত্যন্ত পরিষ্কৃত হইবে;" কিন্তু সেই নিশীথ নিস্তব্ধতা-ভঙ্গকারী মেঘ-গর্জ্জনে, সেই

দিগন্ত-বিহারিণী বিজলী রঙ্গে, সেই অজস্র বৃষ্টি-ধারায় কি যে এক মোহ-মন্ত্র, কি যে এক স্বপ্নের আভাস, কি যে এক কল্পনাময় মাধুর্য্য গ্রথিত আছে তাহা কেবল অনুভবের সামগ্রী, বর্ণনার সামগ্রী নহে।—সে মাধুর্য্য ন্যায়-শাস্ত্রে সমর্থন হয় না, অঙ্কশাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করা যায় না, তর্কবিতর্কে সিদ্ধ করা অসম্ভব। সেই রূপ রমণী-চরিত্রে লজ্জার সুষমা বর্ণনার পদার্থ নহে, তর্কবিতর্কের পদার্থ নহে, তাহা কেবল অনুভবের বিষয়,—ভোগের বিষয়—স্বপ্নের বিষয়। যদি এ বিষয়ে কাহারো দার্শনিক কৌতূহল নিতান্তই পরিতুষ্ট করিতে হয়, ত আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, লজ্জা সাহসের বিরোধী বলিয়াই রমণী-মাধুর্য্যের একটী প্রধান উপকরণ। সাহসিক মুক্তকণ্ঠতা নিতান্ত পৌরুষিক, বিশেষতঃ প্রেমের বিষয়ে তাহাতে কতকটা অরমণীয় ভাব আছে। কারণ, মর্ত্ত্য লোকের প্রেমের অরুণ-আভা-তেও শরীরের ঈষৎ ছায়া পড়ে, সেই ছায়া-মাত্রটীর স্বপ্নময় অনুভবে রমণী-হৃদয় আপনাআপনি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে—সেই দুর্ব্বলতা প্রকাশের আশঙ্কায় রমণী-হৃদয় আপনাআপনি জড়সড় হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ প্রেমের প্রথম প্রহরে, যখন প্রণয়ী প্রণয়িনীর পরস্পরের মন জানা-জানি হয় নাই, যখন প্রণয়িনী "প্রজ্বলিত অনুরাগে" জ্বলিয়াও প্রতিদানের আশা রাখিতেও তাহার সাহস হয় না, তখন প্রেম-রূপ কমল-কলি লজ্জার সুকুমার কিস-লয়ে আবৃত থাকে,—ক্রমে কুসুমকলি যতই স্ফুটন্ত হইবার উপক্রম হইতে থাকে, ততই সেই কিসলয় অপসারিত হইয়া যায়, এবং অবশেষে সেই প্রস্ফুটিত কুসু-মের বৃন্তদেশে এলাইয়া পড়ে। এ কথা বাল্মীকি হইতে জয়দেব পর্য্যন্ত সকলেই জানিতেন, বুঝিতেন, ও কল্পনাতেও অনু-ভব করিতে পারিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ইংলণ্ডীয় মহাকবিতে এ বিষয়ে ততদূর সূক্ষ্মদর্শিতা দেখিতে পাই না। প্রণয়ের প্রথম উদ্রেকের অপরিহার্য্য যে লজ্জা, তাহা তিনি স্বীয় বিশ্বব্যাপিনী প্রতিভা বশতঃ জানিতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা তিনি জ্ঞানে জানিতে পারিয়াছিলেন মাত্র—হৃদয়ে অনুভব করিতে পারেন নাই। আমরা যে বলিয়াছি যে, লজ্জাই মুকুলিত প্রেমের অপরিহার্য্য সঙ্গিনী, তাহা সেক্সপীয়-রের দ্বারাই প্রমাণ করিতে সঙ্কুচিত নহি, কিন্তু সেই সেক্সপীয়রের দ্বারাই ইহাও প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছি, যে তিনি সে লজ্জার মর্ম্মগত সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হয়েন নাই বা হইতে পারেন নাই। উল্লিখিত প্রসিদ্ধ সমালোচক (১) বলিয়াছেন যে "মিরান্দা সং-স্কার-শূন্যা, লৌকিক লজ্জা কি তাহা জানে না"—একথা আমরা স্বীকার করি না। "সংস্কারশূন্যা" মিরান্দা প্রখ্যাত-নামা সমালোচকের অপেক্ষাও জানিতেন "লৌ-কিক লজ্জা" কাহাকে বলে। যখন

১ শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিবিধ সমালোচন—১৩১ পৃষ্ঠা।

মিরান্দা ও ফরদিনান্দ্ দুইজনে বিজনে প্রেমালাপের সুবিধা পাইল, যখন "সংস্কার-শূন্যা" মিরান্দা স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইল, তখন মিরান্দা ফরদিনান্দকে এই বলিলেন যে (২) "আমি আমার নিজের অযোগ্যতা ভাবিয়াই কাঁদিতেছি! কারণ, আমি আমার অযোগ্যতা ভাবিয়া আপনাকে সেই ভালবাসা দিতে সাহস করিতেছি না, যে ভালবাসা আপনার নিকট হইতে না পাইলেই আমার মৃত্যু অপরিহার্য্য।—কিন্তু ইহাও ত সামান্য কথা, তা' ছাড়া যতই আমার ভালবাসা আপনাআপনি লুকাইতে চেষ্টা করিতেছে ততই তাহা পূর্ণতর অবয়ব ধারণ করিতেছে। অতএব, হে লজ্জাময়ী কপটতা, তুমি আমা হইতে দূরে থাকো, এবং, হে পবিত্র সরলতা! তুমিই আমাকে উত্তেজিত কর!" মিরান্দার এই উক্তিতে স্পষ্ট প্রকাশ হইতেছে যে, "সংস্কার-শূন্যা" মিরান্দা তিনটি বিষয় বিলক্ষণ জানিতেন—প্রথম, লজ্জা প্রকারান্তরে কপটতা-মাত্র, দ্বিতীয়, প্রেম ঢাকিতে গেলেই তাহা আরও প্রকাশ হইয়া পড়ে, তৃতীয় "লজ্জাময়ী কপটতার" সহিত "পবিত্র সরলতার" বিশেষ বিরোধ আছে। আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে—সংস্কার-শূন্যা মিরান্দা কোথা হইতে এসকল জ্ঞান লাভ করিল? মিরান্দা তিন বৎসর বয়স হইতে পিতার সহিত দ্বীপে আসিয়াছে—তাহার পরে মানব-শূন্য বিজন দ্বীপে বাস করিয়া পূর্ণ যৌবনে উপনীত হইয়াছে। সেই অবস্থায় তাহার সহিত ফরদিনান্দের দেখা হইল—দেখা হইয়া মমতা হইল—মমতা হইয়া দুঃখ হইল,—দুঃখ হইতেই প্রেম হইল। কিন্তু প্রেম হইবামাত্রই কোথা হইতে লজ্জা আসিল? কেনই বা ফরদিনান্দের কাছে মনের কথা খুলিতে গিয়া মিরান্দা বলিল, "রে লজ্জাময়ী কপটতা! আমা হইতে তুমি দূরে থাক!"—লজ্জা যে কপটতাময়ী—এ কথা, এ গূঢ় সত্য, এ মর্ম্মভেদী রহস্য মিরান্দা কেমন করিয়া জানিতে পারিল? এবং "পবিত্র সরলতা" যে লজ্জার বিরোধী—তাহাই বা কেমন করিয়া তাহার "অশিক্ষিত" হৃদয়ে প্রতিভাত হইল?—প্রসিদ্ধ সমালোচকের "অশিক্ষিতা, সমাজ-সংস্কার-শূন্যা" মিরান্দাতে যত দূর শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কার দেখিতে পাইতেছি, এত দূর শিক্ষা ও সংস্কার আমরা স্বর্গবিলাসিনী উর্ব্বশীতেও দেখিতে পাই কি না সন্দেহ—ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে—প্রেমের প্রথম উদ্রেকে লজ্জা রমণী-স্বভাব-সুলভ,—কি সুশিক্ষিতা, কি অশিক্ষিতা,—যে রমণী প্রেম অনুভব করিতে পারে, সে রমণী লজ্জাও অনুভব করে। প্রেমের অরুণ-আভাসে প্রেম লজ্জার অস্ফুট রক্তিম রাগে রঞ্জিত হইবেই হইবে। মহাকবি সেক্সপীয়ারের বিরুদ্ধে আমরা একথা বলিতেছি বটে, কিন্তু তিনিই আমাদের প্রধান সাক্ষী। শুদ্ধ "অশিক্ষিতা ও সমাজ-সংস্কার-শূন্যা" মিরান্দাতে

২ Tempest. Act III. Scene II.

নহে,—সুশিক্ষিতা ও সমাজ-সংস্কার-সম্পন্না ইমোজেন্ ও জুলিয়েটেও তিনি তাহা দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু কি রূপে, তাহা দেখা যাইতেছে—

অজ্ঞাত কুলশীল রোমিয়োর সঙ্গে নৃত্য ভূমিতে প্রেম-পূজার গণ্ডূস-স্বরূপ চুম্বনাদি ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিয়া কুমারী জুলিয়েট রোমীয়োর ধ্যানেই নিমগ্ন হইলেন। এক রাত্রে জুলিয়েট বিরহ-ব্যথায় উৎকণ্ঠিত হইয়া শয্যা হইতে উঠিয়া নিজ ঘরের বাতায়নে দাঁড়াইয়া প্রকাণ্ড আকাশের দুইটি নক্ষত্রকে মাত্র লক্ষ্য করিয়া রোমিয়োর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় প্রেম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে রোমিয়োও প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া সেই বাতায়নতলে উপস্থিত ছিলেন। প্রেম-মুগ্ধ জুলিয়েটের মনোগত সকল কথা শুনিয়া প্রেমময় রোমীয়ো আর আত্ম-গোপন করিতে পারিলেন না,—তিনি সুচতুর ভাবে নিজের পরিচয় দিয়া জুলিয়েটের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।——প্রণয়ী প্রণয়িনীতে দেখা-সাক্ষাৎ হইল—প্রেমের প্রথম আলাপ হইল—মন খোলা খুলি হইল——দুজনেই জানিতে পারিল যে দু জনেই পরস্পরকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসে।—তখন জুলিয়েট্ ইতিপূর্ব্বের স্বগত-উক্ত প্রেমের সকল কথা গুলির উপর লক্ষ্য রাখিয়া রোমীয়োকে বলিতেছে—

"তুমি ত জানিতেই পারিতেছ যে আমার মুখ এই নিশীথের অন্ধকারে আবৃত; তাহা যদি না হইত, ত আমি ইতিপূর্ব্বে যাহা আপনাআপনি বলিতেছিলাম, সে সকল কথা স্মরণ করিয়া নিশ্চয়ই শরম-রাগে আমার মুখ রঞ্জিত দেখিতে পাইতে। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে আমি লৌকিক প্রথাই অবলম্বন করি, এবং আমার ইতিপূর্ব্বের স্বগত উক্তি সকল অস্বীকার করি। কিন্তু, রে লৌকিক আড়ম্বর! তোর নিকট হইতে আমি বিদায় লইলাম।

* * * *

হা প্রশান্ত রোমীয়ো! তুমি যদি সত্যই আমাকে ভালবাস, ত তাহা সরল হৃদয়ে আমার নিকট প্রকাশ কর,—কিন্তু যদি তুমি মনে কর যে এইরূপে তুমি নিতান্ত অল্প আয়াসে আমার হৃদয় অধিকার করিতে পারিয়াছ—ত তাহাও সরল হৃদয়ে বল'— কেন না তাহা জানিতে পারিলে আমিও সাধারণ প্রথানুযায়ী তোমার প্রেমের মুক্তকণ্ঠতায় প্রথমে বিরুদ্ধ ভাব দেখাইব, এবং কথাতে তোমার প্রেমের প্রতিদান দিতে কখনই চাহিব না; তাহা হইলেই তুমি আরও আমার মন রাখিবার চেষ্টা করিবে।"*

আমরা আরও বিস্তর উদাহরণ দ্বারা ইহা দেখাইতে পারি, লজ্জা যে রমণী-হৃদয়ের একটি সহজ ও স্বাভাবিক ভাব, তাহা সেক্সপীয়ার বিলক্ষণ জানিতেন। কিন্তু আমরা আবার বলিতেছি যে তিনি সে লজ্জার ইন্দ্রধনুবৎ সুকোমল বর্ণচ্ছটা কল্পনার চক্ষে দেখেন নাই এবং

* Romeo and Juliet. Act II, Scene II.

তাহার মাধুর্য্য মরমের স্তরে স্তরে অনুভব করেন নাই। আমাদের বোধ হয় যে এই লজ্জা যদি সেক্সপায়ারের কল্পনারই পদার্থ না হইল, তবে তাহা তাঁহার জ্ঞানের পদার্থ না হইলেই ভাল ছিল। কারণ, প্রকৃতির একটি অত্যন্ত মধুর ও সুকোমল ভাব জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করিয়া যদি আমরা তাহা কল্পনায় ধারণা করিতে না পারি তবে কেবল কষ্টকর ফলই উৎপন্ন হয়; যদিও সেক্‌সপিয়ার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা লইয়া কোন রূপ উপহাস করিতে আমাদের হৃৎকম্প হয়, তবুও এ কথা আমরা জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারি না যে রোমিয়োর সঙ্গে জুলিয়েটের যে আলাপ আমরা উপরে উদ্ধৃত করিলাম, তাহা কি প্রেমের বাজারে "দোকান্‌দারীর" মত শুনায় না? যখন জুলিয়েট্ বলিতেছেন, "হে রোমিয়ো! তুমি সত্য করিয়া বল আমাকে ভালবাস কি না? কিন্তু যদি তুমি এমন মনে কর আমাকে বিনা আয়াসে তুমি হস্তগত করিলে, তাহা হইলে প্রেমের প্রাচীন প্রথা-অনুসারে আমিও কপট রোষ প্রকাশ করিয়া তোমার প্রেমের প্রতি প্রতিকূলতা দেখাই। এই রূপ করিলেই তুমি আমাকে সাধ্য-সাধনা করিতে বাধ্য হইবে! কিন্তু তাহা না হইলে, হে মণ্টেগু—সমস্ত পৃথিবীর জন্যও আমি সে সকল কপট আড়ম্বর করিব না।" প্রেমময়ী জুলিয়েটের এই কথাগুলি পড়িতে পড়িতে কি মনে হয়? সকলেই জানেন যে কোন কোন "দোকান্‌দার" এক এক জন "পাড়াগেঁয়ে খরিদ-দারকে" বলিয়া থাকে যে "বাপু! আমি তোমার সঙ্গে কোন দর্-দাম্ করিব না,—কেনা দরেই তোমাকে জিনিস্ ছেড়ে দিব, কারণ তুমি আমার বহুনীর খ'দ্দের!——এতেও যদি তুমি মনে কর যে আমি তোমাকে ঠকাচ্ছি, তা হ'লে বাপু তোমার সঙ্গে আমাকে নিতান্তই দরদাম করিতে হবে,—নিতান্তই কেনা দামের উপর পাঁচসিকে চড়িয়ে বলিতে হবে। নহে ত, এই লও তোমার জিনিষ, ধর্ম্ম সাক্ষী, দরদাম আর আমি করিলাম না।"

এরূপ "দোকানদারী,"—এরূপ সরলতাময় পৌরুষিকতা, এরূপ কষ্টকর মুক্তকণ্ঠতা আমাদের চক্ষে নিতান্ত কদর্য্য। পূর্ণমাত্রায় "বেহায়ামী" করিতে গিয়া, আমি যে লজ্জা করিতে জানি, এরূপ হৃদয়-শূন্য জ্ঞানের ভান করা অপেক্ষা, লজ্জা যে কি পদার্থ তাহা জানি না,—এরূপ অজ্ঞতা সহস্র গুণে মধুরতর। এই রূপ মিরান্দাও যখন ফর্দিনন্দের মুখের উপরে বলিতেছেন "রে লজ্জাময়ী কপটতা! আমি তোমাকে চাই না,"—তখন কাহার না মনে হয় যে সরলমতি "অশিক্ষিতা" মিরান্দা যাত্রার সখীদের মত অভিনয় করিতেছে? কাহার না মনে হয়,—মিরান্দা ভাবিতেছে যে লজ্জা-রূপ নৃশংস দানবকে প্রেমের নন্দন-কানন হইতে "জোর-যবরদস্তী" করিয়া তাড়াইতে হইবেই? কিন্তু প্রেমিক রমণী-হৃদয়ের লজ্জার ভাব বাস্তবিক কি রূপ?—কখনই তাহা রাগের পদার্থ নহে,—

বিরক্তির পদার্থ নহে—এমন কি, জ্বলন্ত জ্ঞানেরও পদার্থ নহে। প্রেমের প্রথম উদ্রেকে শকুন্তলা যখন দুষ্মন্তের মুখের দিকেও চাহিতে পারে নাই, উর্ব্বশীর অঞ্চল যখন মাধবী-লতাতে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, পার্ব্বতী যখন ধ্যানমগ্ন মহাদেবের হস্তে ফুল-মালা উৎসর্গ করিতে গিয়াও লজ্জার "চমকে চমকিত" হইয়া পড়িতেছেন, তখন কি ইহাই মনে হয় না যে দারুণ লজ্জার সময়েও লজ্জার প্রকৃত জ্ঞান তাহাদের বুদ্ধিতে বিকাশ পাইতেছে না?—

কেহ বলেন যে সেক্সপীয়ারের নায়িকারা লৌকিক আড়ম্বরের অধীনা নহে বলিয়াই তাহাদের মুক্তকণ্ঠতা অপেক্ষাকৃত মার্জ্জনীয় ও মধুর। কিন্তু তাহার উত্তরে আমরা এই কথা বলি যে লৌকিক আড়ম্বরের সঙ্গে স্বাভাবিক বিনয় ও লজ্জাশীলতার কোন সম্পর্কই নাই।—যদি বল যে "স্বাভাবিক বিনয় বা লজ্জাশীলতা" ব্রহ্মাণ্ডে নাই, তাহা হইলে আমরা এই বলিয়া উত্তর করি যে সেক্সপীয়ার নিজেই সে বিষয়ে সাক্ষী দিলে প্রকাশ হইবে যে, প্রেম ও লজ্জা এক সূত্রে চির দিন আবদ্ধ। আমরা সমস্ত সেক্সপীয়ারে ইহাই দেখিতে পাই যে সেক্সপীয়ার জানিতেন, প্রেম ও লজ্জা এক বৃন্তে দুইটি পদ্মের মত সমান প্রস্ফুটিত হয়,—একটি যেমন স্বাভাবিক, অন্যটিও তেমনি স্বাভাবিক;—কিন্তু সেক্সপীয়ার কেবল দেশ-কালের অধীন হইয়া, সেই সময়ের সামাজিক ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া, তিনি স্বীয় প্রতিভার নির্দ্দিষ্ট স্থল হইতে এবং স্বীয় কল্পনার অধিকৃত স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, নহিলে মিরাণ্ডা, জুলিয়েট্, ওলিভিয়া, জুলিয়া ইত্যাদি নায়িকামণ্ডলে কেনই বা তিনি রমণী-লজ্জার ঈষৎ আভাস তুলিয়া, পরক্ষণেই ঘোর পৌরুষিক কঠোরতায় তাহা পরিণত করিয়াছেন?—মহাকবি সেক্সপীয়ার জানিতেন যে রমণীমণ্ডলে লজ্জা বলিয়া একটি সুকোমল সামগ্রী আছে, অথচ তিনি জানিয়াও জানিতেন না যে রমণী-হৃদয়ের সৌন্দর্য্য বর্ণনায় তাহাই একটি অপরিহার্য্য উপকরণ;—তিনি জানিতেন যে কি স্ত্রীলোকে, কি পুরুষে,—উভয় সম্প্রদায়েই আমরা লজ্জাশীলতা না দেখিতে পাইলেও অন্য অন্য উন্নততম গুণরাশি দেখিয়াই বিমুগ্ধ হইতে পারি—তিনি জানিতেন যে একজন স্ত্রীলোক-নেপলীয়ন বা স্ত্রীলোক-সক্রেটীস পৌরুষিক নেপোলীয়নত্ব ও সেক্রেটীসত্ব রক্ষা করিয়া আমাদের প্রশংসার, ভক্তির, আদরের সামগ্রী হইতে পারেন; কিন্তু স্ত্রীলোকে এবং পুরুষে লজ্জা-বিষয়ে যে প্রকৃতিগত প্রভেদ, তাহা সেক্সপীয়ারের হৃদয়ে সূক্ষ্ম রূপে কখনই প্রতিভাত হয় নাই। একটি উদাহরণেই আমরা সমস্ত দেখাইতে পারি।

রোমিও ও জুলিয়েটে, জুলিয়েট্ যাহা প্রাচীর-উল্লঙ্ঘন-কারী লম্পট রোমীয়োকে বুঝাইবার জন্য এতদূর কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, প্রেম-পাগলিনী শকুন্তলা তাহা দুষ্মন্তকে কি ভাবে বুঝাইয়াছি

লেন? যখন দুষ্মন্ত বলিতেছেন যে "আমাদের কথায় শকুন্তলা যোগ দিতেছেন না, অথচ আমি কথা কহিলেই তিনি যে অনন্যমনা হইয়া আমার কথাই শুনিতে থাকেন;—নিজ অঙ্গভঙ্গীর উপর কোন শাসন-প্রমাদ না ঘটাইয়াও তিনি যে আমার পানেই ক্রমাগত চাহিয়া আছেন—ইহাই কি প্রেমের চিহ্ন নহে?" (১)

——এই যে শকুন্তলা সকল কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াও কিছুই বলিতে পারিতেছেন না,—এই যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভাবের দ্বারা মর্ম্মের গভীর অথচ সরল সত্য সকল অজ্ঞাতসারে বিজ্ঞাপিত করা,—শকুন্তলার এই যে "বলি-বলি-আর-বলা-হ'ল-না"—রূপ লজ্জার আভাসটুকু জ্বলন্ত অক্ষরে প্রকাশ করা,—ইহা যতদূর মধুর, জুলিয়েটের "দোকানদারী" কি ততদূর মধুর? আরও যদি দেখিতে চাও ত দেখ! দুষ্মন্ত রাজা বিরহ-কাতরা শকুন্তলার হস্তে মৃণাল-বলয় পরাইতে পরাইতে বলিতেছেন—(২)

দুষ্মন্ত।—কি চমৎকার কোমলতা! এই সুন্দর হস্তদ্বয় পুনর্জ্জীবিত কমললতার মত আবার বিগতশ্রী ও শক্তি ধারণ করিয়াছে, অথবা ইহা কন্দর্পের মত হর-কোপানলে দগ্ধ হইয়া আবার দেবতা-বর্ষিত অমৃতে পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে।

শকু। শীঘ্র শীঘ্র, আর্য্যপুত্র, আমাকে এই মৃণাল-বলয় পরাইয়া দাও।

এই "আর্য্যপুত্র" রূপ সম্বোধন শুনিয়া দুষ্মন্ত যে পুলকিত রোমাঞ্চিত, আহ্লাদিত—হইলেন, তাহার অর্থ কি?—আর, স্বামীর প্রতি প্রযোজ্য "আর্য্যপুত্র" সম্বোধনটি যে শকুন্তলা ব্যবহার করিলেন, তাহারই বা অর্থ কি?—যে কেহ কালিদাসের শকুন্তলা পাঠ করিয়াছেন তাহার মনে ইহা প্রতিভাত হইবেই হইবে যে এই মর্ম্ম-প্রকাশক "আর্য্যপুত্র"—সম্বোধনটী শকুন্তলা ভাবিয়া, গুছাইয়া, ছলনা করিয়া ব্যবহার করেন নাই। এই সম্বোধনটি অন্যমনস্কে—সহসা—মর্ম্মের উচ্ছ্বাস-ভরেই লজ্জাশীলা শকুন্তলা বলিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু কেন?—শকুন্তলা মনে মনে দুষ্মন্তের চরণে হৃদয় উৎসর্গ করিয়াছিল, মনে মনে দুষ্মন্তের আশা-অনুরূপ ভালবাসার প্রতিদানে এতদূর আশ্বাসিত হইয়াছিল, এতদূর দুষ্মন্তের প্রণয়িনী রূপে তাঁহার সঙ্গে "একপ্রাণ" হইয়া পড়িয়াছিল যে দুষ্মন্তকে এক দণ্ডের জন্যও নিকটে পাইয়া আর দুষ্মন্তকে "পর" ভাবিতে পারিল না—সেই জন্য সহসা—অন্যমনস্কে—উৎসারিত হৃদয়ের পূর্ণ উচ্ছ্বাসে, অজ্ঞাতসারে দুষ্মন্তকে "আর্য্যপুত্র" বলিয়া ফেলিয়াছিল।——ইহাতে ছলনা নাই—দোকানদারী" নাই—লজ্জার চতুর আড়ম্বর নাই—প্রচলিত প্রেমের সূক্ষ্ম "কারুগিরি" নাই—বিনা-আয়াসে মুগ্ধা শকুন্তলার মুখ হইতে ঐ কথা যেন

১ শকুন্তলা ৩য় অঙ্ক।

২ এই অংশটুকু কুন্তলার কোন কোন মুদ্রাঙ্কনে দৃষ্ট হয় না। সং

লজ্জাকে প্রবঞ্চনা করিয়া নির্গত হইয়া পড়িয়াছে। এই স্থলেই আমরা নৈসর্গিক জগতের উপরে হৃদয়-জগতের প্রাধান্য—ঘটনার উপর ভাবের প্রাধান্য, মাটীর উপর আত্মার প্রাধান্য দেখিতে পাইতেছি।—কিন্তু এই প্রাধান্য কালিদাস বুঝিয়াছিলেন, সেক্‌সপিয়র পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই।

অন্য অন্য অনেক বিচক্ষণ সমালোচক সেক্‌সপীয়ারের নায়িকামণ্ডলের সপক্ষ হইয়া আরও অনেক কথা বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে লজ্জা, কি সুশিক্ষিতা এবং কি অশিক্ষিতা, সকল রমণীর স্বভাবসিদ্ধ হইলেও, অবস্থা বিশেষে তাহা অপ্রকাশ থাকে বা স্ফূর্ত্তি পায়। তাঁহারা বলেন, প্রেমেও যে মিরান্দার লজ্জা স্ফূর্ত্তি পায় নাই, তাহার কারণ এই যে, শকুন্তলার মত সেই বিজন দ্বীপে মিরান্দার এমন কোন সখীই ছিল না, যাহার সমুখে মিরান্দা লজ্জা করিতে পারে। সুতরাং ফরডিনণ্ডকে "মনের মানুষ"-রূপে পাইয়া মিরান্দা অবাধে মুক্তকণ্ঠ হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি যে লজ্জা যদি স্বভাবসিদ্ধই হইল, তাহা হইলে, মিরান্দার বৃদ্ধ পিতা অপেক্ষাও কি শকুন্তলার সখীদ্বয় লজ্জাস্ফূর্ত্তির বিশেষ কারণ হইতে পারে? বৃদ্ধ প্রস্পেরো যখন ফরডিনণ্ডের প্রতি মিরাণ্ডার অনুরাগ দেখিয়া তিরস্কারছলে তাহাকে বলিলেন যে "এই ফরডিনণ্ডকে অন্য সকল লোকেদের সঙ্গে তুলনা করিলে, তাহাকে কুৎসিত কদাকার ক্যালিব্যানের মত বোধ হইবে, এবং সেই অন্য সকল লোককে দেবতা বলিয়া প্রতীতি জন্মাইবে" তখন মিরান্দা উত্তর করিল যে "তা হোক্—আমার অনুরাগ তাহা হইলে নিতান্ত বিনীত এবং অতি অল্পেই সন্তুষ্ট, কারণ ফরডিনণ্ড্ অপেক্ষা আমি আর সুন্দরতর পুরুষ দেখিতে চাই না।" আজন্মসহচরী সখীদের কাছেও শকুন্তলা প্রেমের প্রথম উদ্রেকে এত দূর মুক্তকণ্ঠ হইতে সাহস পায় নাই। আর ফরডিনণ্ডের সমুখে মুক্তকণ্ঠ হইবার কথা সমালোচকেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা ত নিতান্ত অসার। এক জন প্রণয়িনী তাহার চির-বিশ্বাসী সখীর কাছে প্রেমের যে কথা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারে, সে কথা তাহার প্রণয়ীর কাছে সহজে কখনই বলিতে পারিবে না। প্রণয়িনীর মনের ভাব অবগত হইয়া সখীরা নিতান্ত পক্ষে উপহাস করিতে পারে. কিন্তু তাহার প্রণয়ী হয় ত তাচ্ছিল্য করিতে পারে—বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারে—এমন কি, ঘৃণা পর্য্যন্ত করিতে পারে। এই সকল তীব্র আশঙ্কা স্বয়ং প্রকৃতি দেবীই রমণী-হৃদয়ে নিহিত করিয়া রাখেন। রমণী-হৃদয়ের এই গূঢ় রহস্যটী সংস্কৃত কবিরা বিলক্ষণ জানিতেন—এই জন্যই শকুন্তলার মনের ভাব দুষ্মন্ত জানিবার অগ্রে অনুসূয়া ও প্রিয়ম্বদা জানিতে পারিয়াছিল, এইজন্যই উর্ব্বশীর চিত্রলেখা, মালতীর লবঙ্গিকা ও রত্নাবলীর সুসঙ্গতা সর্ব্বাগ্রেই স্ব স্ব সখীদের প্রেমের-স্ফূর্ত্তি বুঝিতে পারিয়াছিল।

অন্য আর এক সম্প্রদায়ের সমালোচকেরা

বলেন যে মিরান্দা ও ফরডিনণ্ড, রোমীয়ো ও জুলীয়েট ইত্যাদি প্রায় সকল নায়ক নায়িকা প্রায় সমান পদবীগত, সুতরাং পদবীর তারতম্যে যে লজ্জা ও ভয়ের উদ্রেক হওয়া সম্ভব, তাহা তাহাদের মধ্যে আর ঘটিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু কালিদাস মর্ত্ত্যের পুরূরবার সহিত স্বর্গের অপ্সরার প্রেম-বর্ণনায় ও ভবভূতি সমান পদবীগত মালতী-মাধবের প্রেম বর্ণনায় ঐ স্বভাবসিদ্ধ লজ্জার একটি পাপড়ীও খসাইয়া ফেলেন নাই। প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর পদবীর তারতম্যে প্রেমের প্রতিদান-বিষয়ে ভয়ের ও আশঙ্কার তারতম্য উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত লজ্জার সঙ্গে তাহার কি সম্পর্ক?

আর এক সম্প্রদায়ের সমালোচকেরা বলিয়া থাকেন যে সেক্সপীয়ারের নায়িকাদের প্রেম এতদূর প্রচুর ও প্রবল যে তাহা লজ্জার "আধা-বাধা" অতিক্রম করিয়া পূর্ণ উচ্ছ্বাসে রসনায় উৎসারিত হইয়া পড়ে। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে সেক্সপীয়ারের নায়িকাদের অপেক্ষা যে, কালিদাস বা ভবভূতির নায়িকারা সহস্রগুণে অধিক মাত্রায় প্রেমে উন্মত্ত, তাহা কি কেহই অস্বীকার করিতে পারেন? যদি ত্যাগ-স্বীকার প্রেম-প্রাচুর্য্যের জ্বলন্ত প্রমাণ হয়, তাহা হইলে সেক্‌সপীয়ারের কোন্ নায়িকা প্রেমের আশায় পার্ব্বতীর মতন যৌবনে যোগিনী হইয়া দারুণ কঠোর ব্রত-সাগরে আপনাকে বিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছিল? তাঁহার কোন্ নায়িকা উর্ব্বশীর মত স্বর্গের অনন্ত সুখ-সচ্ছন্দতা প্রায় ইচ্ছাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্যে থাকিতে অভিলাষিণী হইয়াছিল? তাঁহার কোন্ নায়িকা রত্নাবলীর মত লজ্জার ভয়ে, অথচ প্রেম-প্রাচুর্য্য-নিবন্ধন মৃত্যুর হস্তে আপনাকে উৎসর্গ করিতে গিয়াছিল? জুলিয়েটের মৃত্যুর কথা ত আমরা জানি; কিন্তু জুলিয়েট্ কখন্ আত্মহত্যা করিয়াছিল?

ক্রমশঃ

ভারতী

ভানুসিংহের কবিতা।

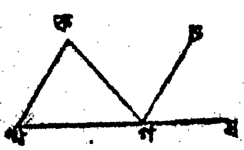
দেখলো সজনী, চাঁদনি রজনী,
সমুজল যমুনা গাওত গান,
কানন কানন করত সমীরণ
কুসুমে কুসুমে চুম্বন দান।
কাহ লো যমুনা জোছন-ঢল ঢল
সুহাস সুনীল বারি ?
আজু তোঁহারই উজল সলিল পর
নয়ন সলিল দিব ডারি।
কাহ সমীরণ লুটই কুসুম-বন
অলসি পড়সি যমুনায় ?
তোঁহার চম্পক-বাসিত লহরে
মিশাব নিশাস-বায়।
জনম গোঁয়ায়নু রোয়ত রোয়ত
হম তব কোই ত কাঁদল না !
জনম গোঁয়ায়নু সাধত সাধত
হমকো কোই ত সাধল না !
সকল তয়াগনু যো ধন আশে
সো বি তয়াগল মোয়
অপন ছোড়ি সব, অপন করনু যোয়
সো বি সজনি পর হোয় !
যমুনে হাস হাস লো হরখে
হম তব রোয়বে কে ?
তোঁহারি সুহসিত নীল সলিল পরি
রাধা সঁপবে দে।
এক দিবস যব মাধ হমারা
আসবে কিনার ভোর,—
যব সো পেখবে তোঁহার সলিলে
ভাসত তনুয়া মোর—
তব্ কি শ্যাম সো মানস পাশে
তিল দুখ পাওবে না ?
শ্যামক নয়নে বিন্দু নয়ন জল
তব্ কি আওবে না ?
নিশায় কুঞ্জে আসবে যব সখি
শ্যাম হমারই আশে,
ফুকারবে যব্ রাধা রাধা
মুরলী উরধ-শ্বাসে,
যব সব গোপিনী আসবে ছুটই
যব হম আসব না;
যব সব গোপিনী জাগবে চমকই
যব হম জাগব না,
তব কি কুঞ্জ পথ হমারি আশে
হেরবে আকুল শ্যাম ?
বন বন ফেরই সো কি ফুকারবে
রাধা রাধা নাম ?
না যমুনা, সো এক শ্যাম মম
শ্যামক শত শত নারী;
হম যব যাওব শত শত রাধা
চরণে রহবে তারি !
তব সখি যমুনে, যাই নিকুঞ্জে,
কাহ তয়াগব দে ?
রাধিকার তরে এ ব্রজ ধামে
সখিলো রোয়বে কে ?
ভানু কহে চুপি ‘মান ভরে রহ
আও বনে ব্রজ-নারী.
মিলবে শ্যামক শত শত আদর
শত শত লোচন বারি !

জ্যামিতির নূতন সংস্করণ।

সরল-সীমক ক্ষেত্রধ্যায়।

(২১) যে কোন ক্ষেত্র-খণ্ড তিন বা ততোধিক সরল রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত তাহা সরল-সীমক বলিয়া উক্ত হয়; তাহার মধ্যে যাহা ত্রিসীমক তাহা ত্রিকোণ এবং যাহা চতুঃসীমক তাহা চতুষ্কোণ বলিয়া উক্ত হয়। ত্রিকোণের কিংবা চতুষ্কোণের সীমা প্রদেশস্থিত রেখাকে সেই ত্রিকোণ কিংবা চতুষ্কোণের ভুজ কহে।

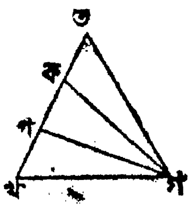
৯। ত্রিকোণের কোণত্রয় একটি সমসূত্র কোণের সমান।

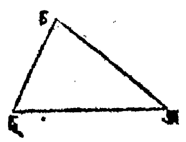


মনে কর কখগ একটা ত্রিকোণ তাহা হইলে কখগ-কোণ + খগক-কোণ + গকখ-কোণ = সমসূত্র-কোণ। কেননা,—

খগ-রেখাকে ঘ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত কর, এবং মনে কর গচ-রেখা খক-রেখার সমান্তর; তাহা হইলে (৬ সিদ্ধান্ত অনুসারে) চগঘ কোণ = কখগ কোণ এবং চগক কোণ = খকগ কোণ, অতএব কোণ-সমষ্টি কখগ + খকগ = চগঘ + চগক সুতরাং কখগ + খকগ + কগখ = চগঘ + চগক + কগখ = সমসূত্র কোণ। অতএব মীমাংস্য বিষয় প্রমাণীকৃত হইল।

১০। যদি দুই ত্রিকোণের একটির কোন কোণদ্বয় এবং তাহাদের সাধারণ ভুজ ক্রমান্বয়ে আর একটির কোন কোণদ্বয় এবং তাহাদের সাধারণ ভুজের সমান হয়, তাহা হইলে ত্রিকোণ-দ্বয় সমান হইবে এবং উভয়ের যে যে ভুজ সমান কোণ-দ্বয়ের সম্মুখবর্ত্তী তাহারা পরস্পর সমান হইবে।





মনে কর কখগ এবং চছজ ত্রিকোণদ্বয়ের কখগ, কগখ, এই দুটি কোণ এবং উভয়ের সাধারণ ভুজ খগ ক্রমান্বয়ে = চছজ, চজছ কোণদ্বয় এবং উভয়ের সাধারণ ভুজ ছজ, তাহা হইলে কখগ ত্রিকোণ = চছজ ত্রিকোণ এবং কখগ কোণের সম্মুখবর্ত্তী ভুজ কগ = চছজ কোণের সম্মুখবর্ত্তী ভুজ চজ, এবং কগখ কোণের সম্মুখবর্ত্তী ভুজ কখ = চজছ কোণের সম্মুখবর্ত্তী ভুজ চছ। কেন না,—

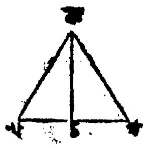
চছজ ত্রিকোণের ছ বিন্দুকে খ স্থানে বসাও এবং ছজ রেখাকে খগ স্থানে বসাও

তাহা হইলে যেহেতু ছজ রেখা = খগ রেখা এজন্য জ বিন্দু গ স্থানে বসিবে এবং যেহেতু চছজ কোণ = কখগ কোণ এজন্য চছ-রেখা কখ-রেখার স্থান জুড়িয়া বসিবে, সুতরাং চ-বিন্দু হয় কখগ-ত্রিকোণের ভিতর-প্রদেশে—যেমন প-প্রদেশে, কিংবা তাহার বহিঃ প্রদেশে—যেমন ত প্রদেশে, কিংবা ক-স্থানে বসিবে; চ বিন্দু প-প্রদেশে বসিলে চজছ কোণ (= পগখ-কোণ) কগখ কোণ অপেক্ষা ছোট হইয়া দাঁড়ায়, এবং উহা ত-প্রদেশে বসিলে চজছ কোণ (= তগখ কোণ) কগখ কোণ অপেক্ষা বড় হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু চজছ কোণকে কগখ কোণের সমান বলিয়া ধরা হইয়াছে এজন্য উক্ত দুই পক্ষের কোনটাই হইতে পারে না—সুতরাং চ বিন্দু ক-স্থানেই বসিবে, এবং পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, জ বিন্দু গ স্থান-স্থিত সুতরাং (১ স্বতঃসিদ্ধ বচন অনুসারে) চজ রেখা = কগ রেখা এবং উভয়েই সমান কোণ-দ্বয়ের সম্মুখবর্ত্তী, আর (২ স্বতঃসিদ্ধ বচন অনুসারে) চজ-রেখা কগ-স্থানে বসিতে চায়, এবং পূর্ব্বে প্রমাণ হইয়াছে যে চছ-রেখা কখ-স্থানে বসিয়াছে সুতরাং (৪ * স্বতঃসিদ্ধ বচন অনুসারে) চছ-রেখা = কখ রেখা, এবং উভয়েই সমান-কোণ-দ্বয়ের সম্মুখবর্ত্তী;

* ভুল ক্রমে উপর্য্যুপরি দুইটি বিভিন্ন স্বতঃসিদ্ধ বচনকে ৩ সংখ্যা-দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এজন্য এখানে তাহা সংশোধন পূর্ব্বক প্রথমটিকে ৩ সংখ্যা দ্বারা এবং দ্বিতীয়টিকে ৪ সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইল।

আর যেহেতু ছচ এবং চজ-রেখা, ক্রমান্বয়ে খক এবং কগ-স্থানে বসিয়াছে এজন্য (৩ স্বতঃসিদ্ধ বচন অনুসারে) খকগ-কোণ = ছচজ-কোণ সুতরাং কখগ-ত্রিকোণ সর্ব্বাংশে = চছজ ত্রিকোণ। অতএব মীমাংস্য বিষয় প্রমাণীকৃত হইল।

১১। কোন ত্রিকোণের দুই কোণ যদি সমান হয় তবে তাহার অবশিষ্ট কোণের ভুজদ্বয় সমান হইবে।



মনে কর কখগ ত্রিকোণের কখগ কোণ = কগখ কোণ তাহা হইলে কখ = কগ।

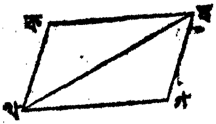
কেন না,—

মনে কর খকগ-কোণ-কচ রেখা কর্ত্তৃক অর্দ্ধা-অর্দ্ধি বিভক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ খকচ কোণ = গকচ কোণ, তাহা হইলে কোণ-সমষ্টি খকচ + কখচ = গকচ + কগচ এবং (৯ সিদ্ধান্ত অনুসারে) কোণ সমষ্টি খকচ + কখচ + কচখ = গকচ + কগচ + কচগ অতএব কচখ = কচগ।

ইহাতে দাঁড়াইতেছে এই যে, কখচ এবং কগচ এই দুই ত্রিকোণের একটির কচখ-কোন, খকচ-কোণ এবং তাহাদের সাধারণ ভুজ কচ-রেখা ক্রমান্বয়ে = আর একটির কচগ কোণ, গকচ কোণ এবং তাহাদের সাধারণ ভুজ কচ রেখা অতএব (১০ সিদ্ধান্তে অনুসারে) কচখ কোণের সম্মুখবর্ত্তী ভুজ কখ = কচগ কোণের সম্মুখবর্ত্তী ভুজ কগ। অতএব মীমাংস্য বিষয় প্রমাণী-কৃত হইল।

(২২) যে চতুষ্কোণ এরূপ যে, তাহার কোন কোণ-কৃৎ ভুজদ্বয় স্ব স্ব সম্মুখবর্ত্তী ভুজদ্বয়ের সমান্তর, তাহা সমান্তরিক বলিয়া উক্ত হয়। এবং তাহার কোন কোণ-চূড়া হইতে তাহার সম্মুখবর্ত্তী কোণ-চূড়া পর্য্যন্ত সরল রেখা টানিলে সেই সরল রেখা তাহার ব্যাস বলিয়া উক্ত হয়।

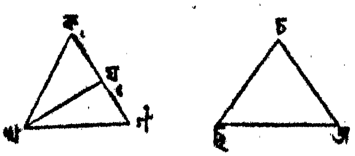
১২। সমান্তরিকের প্রত্যেক ভুজ এবং কোণ ক্রমান্বয়ে তাহাদের সম্মুখবর্ত্তী ভুজ এবং কোণের সমান। এবং সমান্তরিকের ব্যাস সমান্তরিককে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করে।



মনে কর কখগঘ ক্ষেত্রটি সমান্তরিক তাহা হইলে কখ=গঘ, কঘ=খগ, খকঘ কোণ=খগঘ কোণ, কখগ কোণ=গঘক কোণ; এবং কখঘ ত্রিকোণ=খগঘ ত্রিকোণ; কেন না,—

খ হইতে ঘ পর্য্যন্ত খঘ সরলরেখা টানো তাহা হইলে (২২ সংজ্ঞানুসারে খগ রেখা যেহেতু কঘ রেখার সমান্তর অতএব (৬ সিদ্ধান্ত অনুসারে) ঘখগ কোণ=খঘক কোণ এবং (২২ সংজ্ঞানুসারে) কখ রেখা যেহেতু গঘ রেখার সমান্তর এজন্য (৬ সিদ্ধান্ত অনুসারে) কখঘ কোণ=গঘখ কোণ; ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, কখঘ এবং খগঘ ত্রিকোণদ্বয়ের একটির কোণ-দ্বয় ঘখগ গঘখ এবং উভয়ের সাধারণ ভুজ খঘ=আর একটির কোণ-দ্বয় খঘক, কখঘ এবং উভয়ের সাধারণ ভুজ খঘ, অতএব (১০ সিদ্ধান্ত অনুসারে) সমান কোণ-দ্বয়ের সম্মুখবর্ত্তী ভুজ-দ্বয় কঘ, খগ সমান, তেমনি আবার ঐরূপ ভুজ-দ্বয় কখ, গঘ সমান এবং কখঘ ত্রিকোণ=খগঘ ত্রিকোণ। পুনশ্চ রেখা-দ্বয় কঘ, কখ যেহেতু ক্রমান্বয়ে খগ, গঘ রেখাদ্বয়ের সমান্তর, এজন্য (৬ সিদ্ধান্ত অনুসারে) খঘক কোণ=ঘখগ কোণ গঘখ কোণ=কখঘ কোণ অতএব কোণ সমষ্টি খঘক+গঘখ=ঘখগ+কখঘ অতএব কখগ কোণ=গঘক কোণ। অমনি করিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে যে খকঘ কোণ=খগঘ কোণ। অতএব মীমাংসা বিষয় প্রমাণীকৃত হইল।

১৩। যদি দুই ত্রিকোণের একটির কোন কোণ এবং সেই কোণের ভুজদ্বয় ক্রমান্বয়ে আর একটির কোন কোণ এবং সেই কোণের ভুজ দ্বয়ের সমান হয় তবে উক্ত ত্রিকোণ-দ্বয়ের সমান ভুজ-দ্বয়ই-মাত্রে সম্মুখবর্ত্তী কোণ-দ্বয় সমান হইবে, ত্রিকোণ-দ্বয়ের অবশিষ্ট ভুজদ্বয় সমান হইবে, এবং ত্রিকোণ-দ্বয় সমান হইবে।

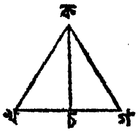


মনে কর কখগ এবং চছজ ত্রিকোণ-দ্বয়ের খকগ কোণ=ছচজ কোণ, এবং কখ, কগ রেখাদ্বয় ক্রমান্বয়ে=চছ, চজ রেখাদ্বয়, তাহা হইলে কগ কখ রেখাদ্বয়ের সম্মুখবর্ত্তী কখগ, কগখ কোণদ্বয় ক্রমান্বয়ে

= চজ, চছ রেখাদ্বয়ের সম্মুখবর্ত্তী চছজ, চজছ কোণদ্বয়; এবং খগ = ছজ, এবং কখগ ত্রিকোণ = চছজ ত্রিকোণ। কেন না,—

যদি বল যে, কখগ কোণ চছজ কোণের সমান নহে, তাহা হইলে উক্ত কোণদ্বয়ের একটি অবশ্য আর একটি অপেক্ষা বড়, মনে কর যেন কখগ কোণ চছজ কোণ অপেক্ষা বড়, ও মনে কর খ হইতে ঘ পর্য্যন্ত খঘ সরল রেখা টানিলে কখঘ কোণ = চছজ কোণ হইয়া দাঁড়ায় ; তাহা হইলে যেহেতু কখ রেখা = চছ রেখা ও খকঘ-কোণ কখঘ-কোণ ক্রমান্বয়ে = ছচজ-কোণ চছজ-কোণ, এজন্য (১০ সিদ্ধান্ত অনুসারে) কঘ রেখা = চজ রেখা কিন্তু কগ রেখাকে ইতি পূর্ব্বে চজ রেখার সমান বলিয়া স্থির করা হইয়াছে, ইহাতে দাঁড়াইতেছে এই যে কগ রেখা = কঘ রেখা কিনা বড় = ছোটো, ইহা অসম্ভব, অতএব কখগ কোণ অপেক্ষা চছজ কোণ ছোটা হইতে পারে না ; ঐরূপ আবার প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, কখগ-কোণ চছজ-কোণ অপেক্ষা ছোট হইতে পারে না ; সুতরাং কখগ-কোণ = চছজ কোণ ; ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, কোণদ্বয় কখগ, খকগ এবং উভয়ের সাধারণ ভুজ কখ ক্রমান্বয়ে = কোণদ্বয় চছজ, ছচজ এবং উভয়ের সাধারণ ভুজ চছ এজন্য (১০ সিদ্ধান্ত অনুসারে) খগ = ছজ, কোণদ্বয় কখগ, কগখ ক্রমান্বয়ে = কোণদ্বয় চছজ, চজছ, এবং ত্রিকোণ কখগ = ত্রিকোণ চছজ। অতএব মীমাংস্য বিষয় প্রমাণীকৃত হইল।

১৪। সমদ্বিভুজ ত্রিকোণের সমভুজদ্বয়ের সম্মুখবর্ত্তী কোণদ্বয় সমান।



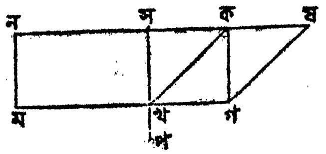
মনে কর কখগ ত্রিকোণের কখ ভুজ = কগ ভুজ তাহা হইলে কগখ কোণ = কখগ কোণ, কেন না,—

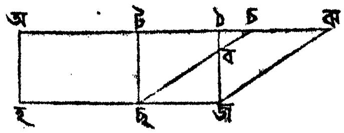
মনে কর খকগ কোণ অর্দ্ধাংশে বিভক্ত হইয়াছে ও তাহার একার্দ্ধ খকচ কোণ এবং অপরার্দ্ধ চকগ কোণ সুতরাং খকচ কোণ = চকগ কোণ, ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, কখচ এবং কগচ এ দুটি ত্রিকোণের খকচ কোণ = চকগ কোণ এবং খকচ কোণের ভুজদ্বয়, কচ, কখ ক্রমান্বয়ে = চকগ কোণের ভুজদ্বয় কচ, কগ, অতএব (১৩ সিদ্ধান্ত অনুসারে) কচ ভুজের সম্মুখবর্ত্তী কখগ কোণ = ঐ ভুজের সম্মুখবর্ত্তী কগখ কোণ। অতএব মীমাংস্য বিষয় প্রমাণী কৃত হইল।

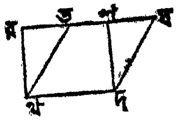
(২৩) যদি কোন সমান্তরিকের কোন ভুজের (বা সেই ভুজের সমসূত্র প্রবাহের) আড়-কোণে সম্মুখবর্ত্তী ভুজ (বা তাহার কোন সমসূত্র প্রবাহ) পর্য্যন্ত সরল রেখা টানা যায় তবে সেই সরল রেখা উক্ত সমান্তরিকের লম্ব বলিয়া উক্ত হয় এবং যে ভুজের গাত্র হইতে লম্ব উত্থিত হয় তাহা উক্ত সমান্তরিকের ভূমি বলিয়া উক্ত হয়। ত্রিকোণের কোন কোণ হইতে তাহার সম্মুখবর্ত্তী ভুজের আড়ে সরলরেখা পাত করিলে সেই রেখা উক্ত ত্রিকোণের লম্ব এবং উহার যে ভুজের উপর লম্বপাত করা

যায় তাহা উক্ত ত্রিকোণের ভূমি, বলিয়া উক্ত হয়।

১৫। দুই সমলম্ব এবং সমভূমি সমান্তরিক সমান।







মনে কর কন-রেখা কথগঘ সমান্তরিকের কঘ ভুজের সমসূত্র-প্রবাহ এবং খম রেখা উহার খগ ভুজের সমসূত্র প্রবাহ এবং নম উহার একটি লম্ব, তেমনি অচ-রেখা চছজঝ সমান্তরিকের চঝ ভুজের সমসূত্র প্রবাহ এবং ইছ রেখা উহার ছজ ভুজের সমসূত্র প্রবাহ, এবং অই রেখা উহার একটি লম্ব আর মনে কর যে, লম্ব নম=লম্ব অই ও ভূমি খগ=ভূমি ছজ, তাহা হইলে সমান্তরিক কখগঘ=সমান্তরিক চছজঝ।

খগ ভুজের খ এবং গ প্রান্ত হইতে দুইটি লম্ব টানো, তাহা হইলে গ প্রান্তোত্থিত লম্ব হয় সম্মুখবর্ত্তী ক কোণে ঠেকিবে, নয় তাহা কখগঘ ক্ষেত্রের বাহিরে পড়িবে, যেমন চছজঝ সমান্তরিকের জঠ লম্ব তাহার বাহিরে পড়িয়াছে, নয় সম্মুখবর্ত্তী ভুজের কোন প্রান্তেতর বিন্দুতে ঠেকিবে যেমন তৃতীয় চিত্র-গত তথদধ সমান্তরিকের দল লম্ব ল স্থানে ঠেকিয়াছে।

প্রথমতঃ মনে কর যেন তাহা (অর্থাৎ কখগঘ সমান্তরিকের গ-বিন্দু হইতে উত্থিত যে লম্ব—তাহা) ক-কোণে ঠেকিয়াছে, তাহা হইলে (১ সিদ্ধান্তের উপসিদ্ধান্ত এবং ২ সিদ্ধান্ত অনুসারে) কগখ কোণ=সখগ কোণ=মখপ কোণ অতএব (৭ সিদ্ধান্ত অনুসারে) সখ রেখা কগ রেখার সমান্তর; ও সক রেখা যেহেতু খগ রেখার সমান্তর এজন্য) ১২ সিদ্ধান্ত অনুসারে) সখগক একটি সমান্তরিকের ত্রিকোণ সকখ=ত্রিকোণ কখগ ও কখগঘ সমান্তরিকের ত্রিকোণ কগঘ=ত্রিকোণ কখগ; অতএব ত্রিকোণ সকখ=ত্রিকোণ কগঘ সুতরাং ত্রিকোণ কখগ+ত্রিকোণ সকখ=ত্রিকোণ কখগ+ত্রিকোণ কগঘ; সুতরাং সমান্তরিক সকগখ=সমান্তরিক কখগঘ

দ্বিতীয়তঃ মনে কর যে গ প্রান্তোত্থিত লম্ব ক কোণে ঠেকে নাই মনে কর যে প্রথম সমান্তরিকের নম, সখ, এবং কগ লম্ব ত্রয়ের ন্যায় দ্বিতীয় সমান্তরিকের অই, টছ, ঠজ. লম্বত্রয় টানা হইয়াছে, কিন্তু জ প্রান্তোত্থিত জঠ লম্ব চ কোণে না ঠেকিয়া চছজঝ সমান্তরিকের বহির্দ্দেশে ঠ বিন্দুতে ঠেকিয়াছে তাহা হইলে (৬ সিদ্ধান্ত অনুসারে হছট আড় কোণ=ছটঠ কোণ এবং ছজঠ আড় কোণ=জঠঝ কোণ সুতরাং ছটঠ কোণ=জঠঝ কোণ এবং চছ-রেখা যেহেতু ঝজ-রেখার সমান্তর এজন্য (৬ সিদ্ধান্ত অনুসারে)=টচছ-কোণ চঝজ-কোণ এবং

(১২ সিদ্ধান্ত অনুসারে) টঠ রেখা = ছজ রেখা = চঝ রেখা, সুতরাং টঠ রেখা + ঠচ রেখা = চঝ রেখা + ঠচ রেখা অর্থাৎ টচ রেখা = ঠঝ রেখা অতএব দাঁড়াইতেছে এই যে, ছটচ এবং জঠঝ এই দুই ত্রিকোণের একটির ছটচ কোণ, ছচট কোণ এবং উভয়ের সাধারণ ভুজ টচ ক্রমান্বয়ে = আর একটির জঠঝ কোণ জঝঠ কোণ এবং উভয়ের সাধারণ ভুজ ঠঝ; অতএব (১০ সিদ্ধান্ত অনুসারে) ছটচ ত্রিকোণ = জঠঝ ত্রিকোণ সুতরাং ছটচ ত্রিকোণ—ঠবচ ত্রিকোণ + ছবজ ত্রিকোণ = জঠঝ ত্রিকোণ—ঠবচ ত্রিকোণ + ছবজ ত্রিকোণ অর্থাৎ ছচঠজ সমান্তরিক = চছজঝ সমান্তরিক।

তৃতীয়তঃ গ প্রান্তোত্থিত লম্ব যদি সম্মুখবর্ত্তী ভুজের কোন প্রান্তেতর বিন্দুতে ঠেকে, যেমন তৃতীয় চিত্রের দল-লম্ব তধ-রেখার ল-বিন্দুতে ঠেকিয়াছে, তাহা হইলেও থর এবং দল লম্ব দ্বয়ের মধ্যগত রথদল সমান্তরিক = তথদধ সমান্তরিক; কেন না,

পূর্ব্ব প্রদর্শিত কারণে থরত কোণ = দলধ কোণ, (৬ সিদ্ধান্ত অনুসারে) থতর কোণ = দধল কোণ ও পূর্ব্ব প্রদর্শিত কারণে রল রেখা = থদ রেখা = তধ রেখা সুতরাং রল রেখা—তল রেখা = তধ রেখা—তল রেখা অতএব রত = লধ অতএব (১০ সিদ্ধান্ত অনুসারে) থতর ত্রিকোণ = দধল ত্রিকোণ সুতরাং থতর + তথদল ক্ষেত্র = দধল + তথদল ক্ষেত্র অর্থাৎ রথদল সমান্তরিক = তথদধ সমান্তরিক অতএব প্রমাণ হইল যে, কোন সমান্তরিকের ভূমির প্রান্তদ্বয় হইতে লম্বদ্বয় টানা হইলে সেই লম্বদ্বয়াবচ্ছিন্ন সমান্তরিক = পূর্ব্বোক্ত সমান্তরিক। এখন ছ হইতে ঠ পর্য্যন্ত একটা সরলরেখা টানো * তাহা হইলে (১২ সিদ্ধান্ত অনুসারে) সখ রেখা (= লম্ব নম = লম্ব অহ) = লম্ব টছ এবং (১২ সিদ্ধান্ত অনুসারে সক রেখা (= ভূমি থগ = ভূমি ছজ) = টঠ রেখা অতএব (১৩ সিদ্ধান্ত অনুসারে) সকথ ত্রিকোণ = টঠছ ত্রিকোণ এবং (১২ সিদ্ধান্ত অনুসারে) সকথ ত্রিকোণ = ½ সকগথ সমান্তরিক এবং টঠছ ত্রিকোণ = ½ টছজঠ সমান্তরিক অতএব সমান্তরিক সকগথ = সমান্তরিক টছজঠ এবং ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, সমান্তরিক সকগথ = সমান্তরিক কথগঘ এবং সমান্তরিক টছজঠ = সমান্তরিক চছজঝ অতএব সমান্তরিক কথগঘ = তাহার সমলম্ব এবং সমভূমি সমান্তরিক চছজঝ অতএব মীমাংস্য বিষয় প্রমাণীকৃত হইল।

* এখানকার চিত্রে ঠছ রেখা ভুল ক্রমে টানা হয় নাই, পাঠক তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন।

সাশ্রু সম্প্রদান।

গাথা।

প্রভাত পরশে হাসিছে হরষে
কুসুম-কানন খানি,
মৃদুল মৃদুল মলয়ের বায়ে
কাঁপিছে সরসী রাণী।
জলেতে রাখিয়ে রাঙ্গা পা দু'খানি
নলিনী, নলিনী-মেয়ে,
ঢল ঢল ঢল দুলিছে কমল,
দেখিছে তাহাই চেয়ে।
হোথায় অদূরে যুবক একটি
কাননে তুলিছে ফুল,
মল্লিকা তুলিছে মালতী ভাবিয়া,
এমনি মনের ভুল।
তুলিবারে গিয়া কামিনী কুসুম
ফেলিছে নিশ্বাস তায়,
সে ঘায়ে অমনি খসে দল গুলি—
চমক ভাঙ্গিয়ে যায়।
তুলিতে চামেলী পাতার উপরে
ফুঁ দেয় ভ্রমর বলি;
কে জানে কোথায় মনটি তাহার,
পাতায় ভাবিছে অলি।
মাধবী লতাটি ফুলে ফুলে ভরা,
খুঁজে না একটি পায়,
বারে বারে শুধু সরসীর পানে
ফিরিয়ে ফিরিয়ে চায়।

হোলো অবশেষে ফুল তোলা তার;
আসিয়ে সরসী তীরে
সোপান উপরে নলিনীর কাছে
রাখিল কুসুম ধীরে।
বারেক তাকায়ে দেখি যুবকেরে,
বারেক কুসুমে হেরে,
আবার নলিনী নলিনী-নয়ন
রাখিল নলিনী পরে।
বালিকা চাহিয়ে নলিনীর পানে,
যুবক হেরিছে তাই,
মোহময় প্রাণ, অবশ হৃদয়,
নয়নে পলক নাই।
মৃদুল সমীরে ঢলিয়ে ঢলিয়ে
চপল অলক রাশি
চুমিছে কেমন বালার কপোল,
অজিত দেখিছে হাসি।
ফুটন্ত গোলাপ লাল দুটি গাল
মধুপ অলক তায়,
মরি কি সেজেছে মধুর মধুর,
আঁখি কি ফিরান যায়?
কেমন-কেমন কি একটি ভাবে
শোভিত ও-আঁখি দুটি
মানস সরসে সোনার নলিনী
থাকে কি অমন ফুটি?

দেখি দেখি যুবা অনিমেষ চোকে
লইয়ে একটি ফুলে
বালার কুন্তলে দিল পরাইয়ে
যেন, রে, আপনা ভুলে।

অমনি সে বালা তুলি আঁখি দু'টি,
একটু বিষাদে হেসে
বলিল,—"অজিত, ফুল-আভরণ
সাজে কি আমার কেশে?"

তুলি সে ফেলিল মাথা হতে ফুল,
যুবক পাইল ব্যথা,
তা' না দেখি বালা দেখে শতদল
আনত করিয়ে মাথা।

আহাহা! যুবক হইলে নলিনী
থাকিত সরসে ভেসে,
অমনি সোহাগে দেখিত বালিকা,
অমনি ভালই বেসে।

জলেতে নামিয়ে অধীর যুবক,
না জানি কি ভাব ভরে,
তুলিয়ে ফুলটি না ভাঙ্গিতে মোহ
সঁপিল বালার করে।

নিল সে হরষে দেখিয়ে যুবক
বলিল, হরষ-হৃদি—
"বলিলে না কেন তুলিতাম আগে,
এতই সাধের যদি?"

হাসিয়ে একটু চুমি সে কমলে
বলিল নলিনী বালা,—
"ভাল বাসি ইহা ছেলেবেলা হ'তে
ছিল এ বালিকা-খেলা।"

—শুনিয়ে উদিল যুবকের মুখে
ঈষৎ হাসির ধার,
কি যেন একটি আশার-আভাস
ভাতিল হৃদয়ে তার।

দুরু-দুরু হিয়া, সুধাতে বাসনা
কি আর একটি কথা,
ফুটে ফুটে তবু ফুটিছে না মুখ
অথচ হৃদয়ে গাঁথা;

কি শুনিতে সাধ, তবুও কেমন
ভয়ে না ফুটিছে মুখ;
থাকিতে অথচ পারিছে না যেন,
উথলি উঠিছে বুক।

আশ্বাসি মরমে ভয়ে ভয়ে ভয়ে
বলিল যুবক পরে;—
"বল, গো নলিনি, আর একটি কথা,
ভাল কি বাসগো মোরে?"

"ভাল বাসি কিনা?—ও কেমন কথা,
ভাল কি বাসিনা আর?"
থেকে থেকে থেকে বলিল নলিনী
মুখেতে ভাবনা ভার;

"ভাল কি বাসি না?"—ও কেমন সুরে
বলিল বালা ও কথা,
কেন গো উহাতে পাগল হৃদয়ে
বাজিল দারুণ ব্যথা?

"যা' শুনিতে সাধ তাই তো শুনিনু
জুড়াল না কেন হিয়া?
প্রতিধ্বনি কেন বহিয়া না গেল
হৃদয়-শোণিত দিয়া?

ভাবের তরঙ্গ কই ও-কথায়,
জীবন উহাতে কই ?
তবে ও কেবল কথার কথা কি,
নয় কিছু তাহা বই ?

তবে কি, তবে কি, হৃদয়-প্রতিমা
বাসে না আমায় ভাল ?
দায়ে পড়ামত লজ্জার খাতিরে
ও-কথা বলিয়ে গেল ?"

আঘাত পাইয়ে মরমে তাহার
বলিল যুবক পুন—
"তোমারি হাতেতে জীবন মরণ
শুনলো, নলিনি, শুন;

যে দিন হইতে দেখিছি তোমায়
হয়েছি পাগল প্রায়,
সে দিন হইতে প্রেমের তুফান
হৃদয়ে উথলি যায়।

পিতামাতা তব বিবাহে সম্মত,
তাহাতে নাহিক ডর,
দুখ মোর, বালা, নাই আর কোন,
তুমি না হইলে পর।"

কি উত্তর দিবে বাধে যেন কথা
কি বলিবে বালা তায়,
জানে যে বালিকা ভাঙ্গিবে তা'হ'লে
যুবার হৃদয়, হায়!

নব-বিকশিত নব-অনুরাগ,
নতুন এ প্রেম তার,
অশিক্ষিত হৃদি শিখেছে নতুন
জানেনা কিছুই আর।

কেমনে কেমনে ভাঙ্গিবে ও-হিয়া
বলিয়ে আসল কথা ?
কিন্তু তবু, হায়! বলিতে হইবে
ঘুচাবার নহে ব্যথা।

বলিল বালিকা থেমে থেমে যেন—
"কোরনা বিয়ের আশা,
যদিও তোমায় ভালবাসি আমি
বোনের সে ভালবাসা।"

বাসনা-কামনা আশা-সুখ-সাধ
একটি কথাতে, হায়!
গেল মন হ'তে চলিয়া যুবার
রহিল স্তম্ভিত প্রায়।

একটি আলো যে যতনে জ্বালিয়ে
রেখেছিল হৃদিমাঝ,
ভীষণ আঁধারে ফেলিয়ে তাহারে
নিভিল সেইটি আজ।

আঁখি হতে জল পড়ে পড়ে তবু
বহিতে না দিয়া ধারা,
নিরাশার বলে বল আনি পুন
বলিল পাগল পারা;—

"না যদি বাস গো ভাল সেকথা বলোনা মোরে
কি ফল জাগায়ে বল সুখী যদি ঘুম ঘোরে ?
এই স্বপ্নে ভর করি জীবন রয়েছি ধরি—
স্বপ্নই জীবন মম, নিঠুর বালিকা ওরে!

না, না, লো, ভাঙ্গি এহৃদি সুখী কিছু হও যদি,
বল, বল, যা বাসনা, বারণ করি না তোরে।
কিছু না চাহিব আর, দাও শুধু অধিকার,
নীরবে বাসিতে ভাল হৃদয় পরাণ ভ'রে;

চাহিবনা ভালবাসা, রাখিবনা কোন আশা,
ভালবেসে সুখী রব,তা'তে কি বাজিবে তোরে?

দেখিয়ে যুবকে দারুণ আকুল
বালারো বাজিল তা'তে,
মুছি বিন্দু অশ্রু বলিল নলিনী
হাতটি রাখিয়া হাতে,—

"একটি শৈশব সখাকে আমার
বরণ করেছি মনে,
গিয়াছে বিদেশে, আসে যদি হবে
বিবাহ তাহারি সনে;

কিন্তু এই হাতে হাত রাখি তব
বলিনু শপথ করে,—
সখা বলি হৃদে রাখিব যতনে
বাঁচিব যদিন তরে।"

*　　*　　*　　*　　*

না ফুরাতে কথা কে ছবিটি ঐ
সমুখে উদয় হইল তার ?
"প্রাণেশ আমার"—বলি একবার
না ফুটিল কথা বালার আর।

হরষে বিহ্বল নীরব বালিকা,
আধা জ্ঞান আধা চেতনা হারা,
অত সুখ-রাশি সহিবে কেমনে ?
কাঁদিল সে ভারে আকুল পারা।

অজিত বুঝিল কে যুবাটি ওই
কা'রে দেখি বালা বিহ্বল মন,
পারিল না আর দাঁড়ায়ে দেখিতে—
কেমনে তা' দেখে তাড়িত জন।

নিঃশব্দে সে চলি গেল সেথা হতে
প্রণয়ি-যুগলে রাখিয়া একা,

বালিকা তখন উঠি জল হ'তে
আসিয়ে দাঁড়াল যেথায় সখা।

কিন্তু এ কি, হায়! হরিষে বিষাদ
কেন সে যুবার মু'খানি ম্লান ?
কত দিন পরে মিলন দু'জনে
কই তার সুখে উথলে প্রাণ ?

দারুণ বাজিল বালার বুকেতে,
অভিমানে বালা দুখের ভরে
নীরবে রহিল, যুবক তখন
বলিল সুধীরে বিষাদ-স্বরে—

"এই তো মিলন, সখি, হইল আবার
এই সেই বন স্থল, এই সে অশোক তল,
এই সে পাপিয়া ঢালে অমৃতের ধার।

এই তো মলয় বায় মৃদুল বহিয়ে যায়
দোলাইয়ে দুল-দুল অলক তোমার।
এই সে সরসী মাঝে প্রফুল্ল নলিনী সাজে,
এই সেই থেকে থেকে ভ্রমর ঝঙ্কার;

এই সব এই সব, সখি ওলো, সেই সব
সেই সব, চপলে লো, বলনা আবার,
কই সে এলান কেশ, সেই পাগলিনী বেশ,
প্রেমের স্বপনময়ী ছায়া সে তোমার ?

কই সেই অশ্রুময় ঢুলু ঢুলু আঁখিদ্বয়
থেকে থেকে জ্বলে ওঠে জ্বলন্ত সোহাগে ?
কই সে অবশ বানী, কই সেই মুখ খানি
শুকানো অথচ দীপ্ত দীপ্ত অনুরাগে ?

আর তো তেমন করে,তেমন সোহাগ ভরে,
হাসিতে নয়ন দুটি নাহি উথলায়

মরমের সাধ মরমে মিশিল
মরমে আগুণ জ্বলিল তায়।

শিথিল হয়েছে দেহের বাঁধুনি,
ভুলিছে বহিতে শোনিত ধার,
ফুরায়ে এসেছে নয়নের জল,
এক ফোটা নাহি ফেলিতে আর।

কেবল কেবল জ্বলিছে অনল
হিয়ার যতেক মরম-গাঁটে
তবু কেন, হায়! এ পাপ হৃদয়
শতধা শতধা নাহিক ফাটে!

বলেদে, বলেদে, বলেদে, আমারে
কত দিন আর এমন করি,
পুষিয়া রাখিব এচিতা-অনল
মরমের এই শ্মশান ভরি?

সে সুখের দিন হইবেরে কবে
যে দিন অভাগা জনম-দুখী
মরণের শান্ত শীতল কোলেতে
ঘুমায়ে পড়িবে মাথাটি রাখি?"

ফুরালো বালার ধ্যান, সব শক্তি অবসান,
আবার পুরানো স্মৃতি করিল দংশন,
আবার নিঝর পারা ছুটিল সলিল ধারা,
হইল হইল মিছে সন্ন্যাসিনী পণ।

দেখিতে দেখিতে শেষে কে হেথা দাঁড়াল এসে?
নয়নে নয়নে ওই হোল সম্মিলন,
"নলিনী, নলিনী হেথা"?—আরনা ফুটিল কথা
দোঁহারে দেখিয়া দোঁহে যেন অচেতন।

---

(৩)

বিজন একটি বনের মাঝারে
কালের কালিমা মাখিয়ে গায়,
দাঁড়ায়ে একটি কালিকা মন্দির
অনিত্যের স্থির প্রতিমা প্রায়।

ভেঙ্গে গেছে তার শিখর প্রদেশ
ঝর ঝর ইট পড়িছে খসি,
বট অশথের গভীর শিকড়
রহেছে তাঁহার মরমে পশি।

ভিতরে কালিকা—করাল মূরতি
সিঁদুরে কপাল ঢেকেছে তাঁর,
চন্দন চর্চ্চিত ভীষণ কৃপাণ,
গলায় দুলিছে জবার হার।

আঁধার সে বনে মন্দির মাঝারে
নিভ-নিভ এক প্রদীপ জ্বলে,
লক্ষ্য করি তায় যুবক যুবতী
বহু দূর হতে আসিছে চলে।

বহু পথ হাঁটি, বহু শ্রম করি,
বহু সাধ আশা করিয়া মনে,
শ্রান্তি ক্লান্তিময় নলিনী ও যুবা
পশিল সেই সে গভীর বনে।

যোগিনীর সাজ ফেলেছে খুলিয়ে
কুসুমে সাজান নলিনী কায়,
তবুও এখনো বিভূতির চিনা
মাঝে মাঝে দেখা দিতেছে তায়।

জটিল কেশেতে বেঁধেছে কবরী
তাহাতে শোভিছে কুসুম কুল
যোগিনী সেজেছে কুলের রমনী—
শ্মশানে যেন রে ফুটেছে ফুল।

পশিল দোঁহে সে বনের মাঝারে
অলসে অবশ নলিনী-কায়,
মাথাটি রাখিয়ে যুবকের কাঁধে
অধীরে সকল দিকেতে চায়।

কহিল যুবক,—"কে আছ হেথায়,
কে পূজক তুমি ধেয়ানে রত ?
উঠ এক বার, বিবাহ শিকলে
বাঁধ আমাদের জনম মত।"

উঠিল পূজক পূজা সমাপিয়া,
চাহিল যে দিকে উভয়ে ছিল,
আধো ছায়া-ছায়া আঁধারে আলোকি
নিভ-নিভ দীপ উজলি দিল।

চকিতে নেহারি যুবা যুবতীরে
থমকিয়া গেল পূজক-বর,
তখনি আবার মুদিল নয়ন
আবার চাহিল ক্ষণেক পর।

দীপের আলোকে উজলিত মুখ
পূজক আবার দেখিল মোহে,
আবার তখনি নত করি আঁখি
বিবাহ বাঁধনে বাঁধিল দোঁহে।

মন্ত্র পাঠ করি পরাইয়ে মালা
বালার হাতটি স্ব-হাতে নিয়ে,
সম্প্রদান তাহা করিল যুবারে,
বিধি মতে দিল তাদের বিয়ে।

একবার স্থধু আটকিল কথা
একবার হিয়া কাঁপিল তাতে,
এক ফোটা তার আঁখি-জল শুধু
পড়িল সেকালে বালার হাতে।

রুসিয়া প্রবাসীর পত্র।

আপনার নিকট ক্রমাগত কয়খানি পত্র লিখিলাম, কিন্তু এ পর্য্যন্ত এক খানিরও উত্তর পাইলাম না। * * * গত পত্রে এখানে থাকিয়া পরীক্ষা দেবার কথা যাহা কিছু লিখিয়াছিলাম তাহা এখন ব্যর্থ হইল। কারণ ইতিমধ্যে নানা কারণে বাধ্য হইয়া অবশেষে রাজমন্ত্রীর সহিত—কার্য্যতঃ তাঁহার চরের সহিত—সকল প্রকার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছি। তিনিই প্রথমে আমার অধ্যাপকতা প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এখন আর আমার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, এখন আবার আকাশের পাখীর ন্যায় স্বাধীন—যে-খানে ইচ্ছা যাইতে পারি যাহা ইচ্ছা করিতে পারি। যদিও রুসিয়ায় থাকা হইল না—ঈপ্সিত ভাষাগুলি ও ভাষাতত্ত্ব শিখিয়া পরীক্ষা দেওয়া হইল না—তবুও নানা কারণে এই ঘটনায় আরাম ও সন্তোষ লাভ করিতেছি। এখানে আসা অবধি এই অধ্যাপকতা লইয়া গত এক বৎসর কি ভয়ানক গোলযোগ চক্রেই ছিলাম। শিক্ষা বিভাগের রাজমন্ত্রী (যাহা দ্বারা আমি আ-হূত হই) তিনি বলেন এক কথা, বিশ্ববিদ্যা-লয় বলেন আর এক কথা—উচ্চ পরিবারস্থ

বন্ধুগণ বলেন "ইহা করিলেই তোমার অধ্যাপকতা লাভ হইবে", অধ্যাপক ও আচার্য্যগণ বলেন "উহা করিলে কিছুই হইবে না।"

এস্থানীয় সমাজ নানা দলে বিভক্ত—দলীয়গণের পরস্পরের প্রতি কুকুর বিড়ালের অনুরাগ। একদলে যাহা বলিবেন ও করিবেন, অপরদলে তার যতদূর প্রতিকূল আচরণ করিতে পারেন করিবেনই—নিশ্চয় বলা যাইতে পারে। যদি ইহার এক দলের পক্ষাবলম্বী অথবা এমন কি পক্ষপাতীও হইয়া পড়, তবে বিপক্ষ দল তোমার অনিষ্ট করিতে জীবন মরণে ব্রতী, ইহারা তোমার নামে নিন্দাবাদ প্রচার করিতে, তোমার যাহাতে প্রতিপত্তি ক্ষয় হইতে পারে তার জন্য সমস্ত অর্পণ করিতে প্রস্তুত। ঘোর অবিশ্বাস পরনিন্দা, পরানিষ্ট চিন্তা অশ্রাব্য চরিত্র দোষের (স্ত্রীগণের এবিষয়ে হয়ত প্রাধান্য!) সংযোগে এই রুসির রাজধানী পুরাকালীন সোডম, রোম, পম্পায়ি অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর বেরসাইয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। যাহাদিগকে নিতান্ত আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান হয় তাহাদিগকেও মন খুলিয়া সকল ভাব ও চিন্তা বলা যায় না—কাফে (Cafe´) ও রেস্তোরাঁর (Restaurant) ত কথাই নাই—সেখানে যে অর্ব্বাচীন রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি অথবা সমাজ-নীতি সম্বন্ধে আলাপ করিবে তার সত্বরে শ্বেতদ্বীপকূলস্থ কোন চিরবরফাবৃত নির্জ্জন কারাবাস দর্শন সম্ভব। মানব-চিত্ত যে সমুদায় প্রশ্ন সম্বন্ধে তর্ক ও আলোচনা করিয়া ক্রমশঃ মনুষ্যত্ব ও উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, তাহা যখন ঘুণাক্ষরেও অসম্ভব তখন সে নগরে, সে দেশে, ভয়ানক অশ্রুতপূর্ব্ব লম্পটতা নিয়ম হইবে আশ্চর্য্য কি? যেখানে স্বজাতিহন্তা পশুবৎচরিত্র যোদ্ধৃগণের অথবা নর্ত্তকী—কমেদিয়েনগণেরই—পশার, যেখানে গুপ্তচর অথবা মানব হৃদয়ের প্রিয়তম আশা ভরসার ধ্বংশকারী পামরগণই Star দ্বারা বিভুষিত হয়, যেখানে উচ্চপরিবারের বালকগণ শৈশবাবধিই Diplomacy শিক্ষা করে এবং বালিকাগণ ফরাসী ও জর্ম্মান্ রাজ্যের নীতি আদর্শানুসারে চরিত্র গঠন করিতে থাকে, সেখানে যে পূর্ব্বতন পম্পায়ি নগরের খেলা পুনরায় খেলিত হইবে না তা কি সম্ভব হয়? সোডম মরুসাগরে, পম্পায়ি বিসুভিয়স্ গর্ভে; আমার কখন কখন মনে হয় যেন সেণ্টপিটরস্বর্গও সেই রূপে কোন দিন অকস্মাৎ উত্তরমহাসাগরের তুষার পর্ব্বতের দ্রবসম্ভূত জলপ্লাবনে "মাতা ইরার" গর্ভে স্বকীয় পাপ কলঙ্কিত মুখ লুক্কায়িত করিতে বাধ্য হইবে।

আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক আহূত না হইয়া মন্ত্রী কর্ত্তৃক আহূত হই। আসিবা মাত্রই দেখিলাম মন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরস্পর কি সম্বন্ধ—কাজে কাজেই অধ্যাপকগণ আমায় প্রথম হইতেই এক জন মন্ত্রী-চর রূপে দেখিতে লাগিলেন এবং আমি যাহাতে এখানে কোনরূপে কোন প্রতিপত্তিলাভ করিতে না পারি তার জন্য একতার সহিত কাজ করিতে লাগিলেন। আমি কোন

দলের পক্ষপাতী নহি—আমি বিদ্যার্থী ও স্বদেশহিতার্থী; জাতি ও শিক্ষা অনুসারে আমি স্বভাবতই জ্ঞানী ও শাস্ত্রী Noblesse-এরই বরং পক্ষপাতী ইত্যাদি রূপ সরল-ভাবে বলিলেও কি হইবে? অধ্যাপকগণ আমায় ত্যাগ করিতে লাগিলেন—শুধু তা-হাই নহে—প্রকাশ্যেও গোপনে বিদ্বেষাচরণ করিতেও ক্রটী করিলেন না। তাঁহাদের সমাজে ভুক্ত হইবার আমার লালায়িত আকাঙ্ক্ষা বরং আমার প্রতি অধ্যাপকগণের সন্দেহ উদ্ঘাটন করিতে লাগিল—বিশেষতঃ তাঁহারা পড়িয়াছেন যে ব্রাহ্মণজাতি চতুরতায় চিরপ্রসিদ্ধ। এই চতুরতাতেই ভারতবর্ষে তাঁহারা স্বকীয় Hierarchy স্থাপন করিয়াছেন যাহা হিমাচলের ন্যায় অনন্তকাল হইতে তথায় স্থির-গম্ভীর ভাবে শিরোত্তোলন করিয়া রহিয়াছে—আর কি? চাণক্য, নন্দকুমার, নানা সাহেবও এই জাতীয়; অতএব এই ব্রাহ্মণকে কি করিয়া বিশ্বাস করা যায়? আমার সামাজিক প্রকৃতি এইরূপে এক স্থানে রুদ্ধ-দ্বার দেখিয়া স্থানান্তর অন্বেষণ করিল—অতএব বড় একটা সহানুভূতি থাক্ আর নাই থাক্ আহূত অধ্যাপক বলিয়া স্থানীয় ফরাসীভাষাবাদী ও ফরাসী-নীতি-আদর্শ-গঠিত-চরিত্র Aristocratগণের সহিত পরিচয় হইতে লাগিল। সেই অ-বধি স্থানীয় কয়েকটী প্রধান প্রধান পরি-বারেই আমার যাতায়াত—এখানে আমি এই দলভুক্ত বলিয়াই পরিচিত। Nihilist গণের এক খানি হত্যা খাতা খুঁজিয়া পাইলে হয়ত লিষ্টের মধ্যে একটী ব্রাহ্মণ-বধের আদেশ পাওয়া যাইতে পারে। ইহাঁরা পড়িয়াছেন ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীর Aristocratএর Aristocrat, অতএব একটা ব্রাহ্মণ হত্যা করিলে অন্ততঃ অসংখ্য অসংখ্য পারিয়ার দুঃখের কিঞ্চিৎ প্রতি-শোধ লওয়া হইবে। "বিশেষতঃ এখানে আসিয়াও এই চাণক্য-পুত্র কেবল রাজকর্ম্ম-চারীদের মধ্যেই ফেরাফিরি করে—এ ভার-তবর্ষ নয়, আমরা পারিয়া নই, একবার দেখা যাবে।"

সে যাহা হউক, এখন কিছু দিনের মধ্যেই এই সমস্ত ভয় হইতে নিস্কৃতি লাভ হইবে। আমার গম্য পথ অতি সরল—পুনরায় জর্ম্মানিতে গিয়ে ডাক্তারি পরীক্ষা দেওয়া ও উপাধি গ্রহণ। * * * এখন এই উপাধিটী গ্রহণের জন্য আ-মার আর বড় অধিক সময় ও ক্লেশ ব্যয় করিতে হইবে, বোধ হয় না। শুধু একটী প্রবন্ধ লেখার দরকার। এই প্রবন্ধটী লিখিতে হয়তঃ আমার ছয় মাসের অধিক লাগিবেক না। আমি এখন দুইটী প্রবন্ধ লিখিতে বাসনা করিতেছি। একটী ভার-তীয় পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে—(লিখিবার কতই আছে)। দ্বিতীয়টী ভারতীয় নব আর্য্যভাষা অবলম্বন করিয়া (যাহা আমার স্থানীয় অধ্যাপকতালাভের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়া-ছিল।) উভয় সম্বন্ধেই আমি গত তিন বৎসরে অনেক পাঠ, অনেক আলোচনা, অনেক গবেষণা করিয়াছি। পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পূর্ব্বেই আরম্ভ করিয়া-ছিলাম। কিন্তু অবসরের অভাব বশতঃ

এতদিন বিশেষ কিছুই লিখিয়া উঠিতে পারি নাই। এত শিখিতে হইয়াছিল—ভাষার পর ভাষা, সাহিত্যের পর সাহিত্য, জানিবার জন্য চিত্ত সর্ব্বদা এত ব্যাপৃত থাকিত যে রচনা-বন্ধন জন্য চিন্তা করিবার সময় হয় নাই। এখন অবসর পাইলাম বলিয়া মনে আনন্দ জন্মিতেছে; ফলতঃ, যদিও সেণ্টপিটর্সবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকতা লাভ রূপ হৃদয়ের একটী অতি যত্ন-পোষিত বাঞ্ছা জলবুদ্বুদ আকার ধারণ করিল, যদিও যে বিশেষ উদ্দেশে গত তিন বৎসরে এত আয়াশ স্বীকার করিলাম (স্বাস্থ্য পর্য্যন্ত দুর্ব্বল করিলাম) তাহা মরীচিকার ন্যায় আমার সতৃষ্ণ উদ্বেলিত চিত্তকে বঞ্চনা করিল, তবুও এই অধ্যাপকতা ব্যপদেশে তিন বৎসরে আমি যত শিখিয়াছি, যত দেখিয়াছি, যত উচ্চ সুখভোগ করিয়াছি, তাহা জীবনে আর কখনো হইবে কি না সন্দেহ। জর্ম্মণির প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান নগর পরিদর্শন করিলাম, পারী নগরে সাধারণ মেলার বৎসরে কত দেখিলাম, কত শিখিলাম, তৎপরে এই পিটর্সবর্গে, ভাল হউক মন্দ হউক, কত কত অশ্রুতপূর্ব্ব বিষয় শুনিলাম, কত কত অকল্পনীয় বস্তু প্রত্যক্ষগোচর করিলাম, ইয়োরোপীয় রাজারাজড়ার অর্থাৎ Aristocracyর রীতি নীতি কেমন তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে অনেকটা অবকাশ পাইলাম। ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় আর্য্য-ধর্ম্ম-নিয়োজিত জাতি-প্রথার মধ্যে কতদূর প্রভেদ তাহার প্রতিলব্ধি জন্মিল। তাহার পর পারীতে অধ্যাপক গারসেঁ দে-তাসী ও রেণা হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত কত কত সুবিজ্ঞ ও সুবিখ্যাত ব্যক্তির পরিচয় লাভে কৃতার্থ হইলাম—ফরাসি ভাষাও ইতিমধ্যে ইংরেজী ও জর্ম্মণের ন্যায় শিখিবার অবকাশ পাইলাম এবং আর ২।৩ মাস এখানে থাকিলে রুসিয়ভাষাও সেইরূপ শেখা হইবে, স্থিরচিত্তে এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে বলিতে কি বাধ্য হইব না যে রুসিয়ার প্রস্তাবিত অধ্যাপকতা আমার বিশেষ অনুকূলই হইয়াছে? গোলাপেও কণ্টক, তবে আমার ভাগ্য একেবারে সাধারণ-নিয়ম বর্জ্জিত হইবে কিরূপে আশা করা যায়? গত তিন বৎসরের মধ্যে ভারতের অতীত ও বর্ত্তমান বিষয় সম্বন্ধে দিবানিশি পরিশ্রম করিয়া আমি যে সমস্ত জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছি—তাহার ফল আমার বাস্তবিক জীবনে এখনই দৃষ্ট হইতেছে এবং ভাবী জীবনে যে আরো কত হইবে তাহা কল্পনা করা অসম্ভব। * * *

আমি খৃীস্ট-ব্রাহ্ম হইয়া দেশ ছাড়িয়াছিলাম। খৃীষ্টিয়গণের মধ্যে ৭।৮ বৎসর থাকিয়া হিন্দু ব্রাহ্ম হইয়া, প্রকৃত ভট্টাচার্য্য হইয়া, প্রকৃত ছান্দোগা-ব্রহ্মচারী হইয়া দেশে ফিরিব। "ভবিতব্যানি ভবন্তি সর্ব্বত্র।" * * *

প্রবন্ধ ব্যতীত উপাধিলাভের জন্য আরো দুইটী অন্যান্য বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এই পরীক্ষা দুইটীর জন্য আমি হয়ত পৃথিবীর সাধারণ ইতিহাস ও সাধারণ সাহিত্য-ইতিহাস নির্ব্বাচন করিব। কিন্তু প্রথম কথা প্রবন্ধ—প্রবন্ধ প্রস্তুত ও

গৃহীত হইলে অপর বিষয় দ্বয়ের চিন্তা করিবারই নিয়ম। অতএব দেখিতেছি সমুদায়ে আমার এই সমস্ত বৎসরটী (১৮৮০) লাগিবে। * * *

ইয়োরোপে শিক্ষা ও মানসিক উন্নতিলাভ করিব বাসনায় ১৮৭৩ সেপ্টেম্বর মাসের শেষে ভারতবর্ষ ত্যাগ করি * *

প্রথমে লাইপ্‌সিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিয়া উপাধিগ্রহণের পরীক্ষা দিবার আয়োজন করিতেছিলাম * এমন সময়ে কোন কারণ বশত সেখানে থাকার অসুবিধা হওয়ায় আমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে (হিন্দু-সাহিত্য, বৌদ্ধধর্ম্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে) প্রকাশ্য সভায় জর্ম্মাণ ভাষাতে বক্তৃতা আরম্ভ করিলাম। এই শীতে (১৮৭৬-৭৭) যখন আমি নানা স্থানে বক্তৃতা করিতেছিলাম—এবং যখন বক্তৃতাগুলি প্রথমতঃ আংশিক তৎপরে সম্পূর্ণ আয়তনে সম্বাদপত্রে প্রকাশ হইতেছিল—তখন ঐ স্থানীয় মন্ত্রীচর লাইপসিকে উপস্থিত হন—এবং আমার ভারতীয় নব্য আর্য্য ভাষাগণের অধ্যাপকতা প্রস্তাব করেন। তাহার পর কি কি ঘটিয়াছে তাহা বোধ হয় জানেন। এ পর্য্যন্ত সেই প্রস্তাব অনুসারে এক রকম চলিতেছিল, পুনরায় আবার অদৃষ্ট-চক্রের নূতন পরিবর্ত্তন হইল। আমার অতীত ও বর্ত্তমান জীবন আলোচনা করিলে অনেকটা স্বপ্ন ও উপন্যাসের ন্যায় বোধ হয়; আমার জীবন এখনও অনেকটা অন্ধকার—কবে আলো হইবে তাহা কে বলিবে ? * * *

আগামী বৎসর হইতে আমাকে কেবল এক খণ্ড করিয়া "ভারতী" পাঠাইবেন। কারণ আমার ছাত্রগণ বাঙ্গালা পড়া ত্যাগ করিয়াছেন। শুনিলাম অধ্যাপক মিনায়ফ ভারতবর্ষে গিয়াছেন। এখানে এখন ভারতবর্ষীয়েরা বর্ত্তমান আফগান যুদ্ধ সম্বন্ধে কি মনে করেন—সাধারণ বিদ্রোহ অথবা উত্থানের চক্রান্ত আছে কি না—তাহা জানিতে অশেষ কৌতূহল। আমাকে কত প্রধান প্রধান ডিপ্লোমাট এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এখানে Diplomacy কাহাকে বলে তাহা চূড়ান্ত দেখা যায়,কত খবরই প্রকাশ—কত হুজুকই উঠান হয়, যাহার প্রকৃত ঘটনার সহিত লেশমাত্রও সম্বন্ধ নাই। কিছুদিন হইল এস্থানীয় একজন রাজপুত্র ও আর একজন রাজমন্ত্রী দৃঢ়তার সহিত আমাকে বলিলেন "আপনি কি জানেন না যে আপনার স্বদেশীয় নানাসাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র এখন কাবুলে ?" "বটে ! কাগজে ত দেখি নাই, হইতে পারে।" এদিকে তার দিন দুই পরে রামচন্দ্র (যে মহারাষ্ট্রীয়ের কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছি) আসিয়া আমার ঘরে উপস্থিত "Good morning, how do you do ?" বলিলাম,"আমি মনে করিতেছিলাম তুমি আজ কাবুলে—ইয়াকুব খাঁয়ের শিবিরে রুসিয়ার সংযোগে ভারতীয় ব্রিটিশ রাজ্যের উচ্ছেদ করিতে প্রাণপণ করিতেছ। কি আশ্চর্য্য ! একি স্বপ্ন না কি ? একি তুমি, না যুদ্ধে আহত তোমার প্রেতাত্মা ? রামচন্দ্র সম্বন্ধে দুই এক অখণ্ড্য

যুক্তি দ্বারা আমার সন্দেহ ভঞ্জন না করিলে, অর্থাৎ স্বকীয় আত্মতা (personal identity) বিশেষরূপে প্রমাণ না করিলে, আমি হয়ত ডেনমার্কের রাজকুমারের দশায় পতিত হইতাম। এই রাজ পরিবারগণের উক্ত রূপ বলিবার বিশেষ কারণ আছে; ইহাঁরা মনে করেন যে ইহাঁরা যা যা বলেন তাহাই আমি বেদবাক্য জ্ঞানে দেশে লিখিয়া পাঠাইব। যেন আমি এতদিন ইয়োরোপে থাকিয়া ইয়োরোপীয়গণের চরিত্রের Diplomacyর অন্তর্ব্বাহ্য কিছুই জানি না।

*　　　*　　　*

অদ্য এখানেই বিদায় লই। গত "ভারতীতে" "শকুন্তলা" সম্বন্ধে প্রস্তাবটি পড়িয়া দুঃখ ও হাসা উভয়ই জন্মিল। সময় থাকিলে লেখকের সঙ্গে এমন ঝগড়া করিতাম কিন্তু তিনি ঝগড়ার উপযুক্ত কি না সন্দেহ হয়; কারণ তিনি গইটীর উক্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমার ও অন্যান্য ভারতবর্ষীয়গণের মনে তাহা পড়িয়া ঠিক বিপরীত ভাবের উদয় হইয়াছে। গইটী যদি অনুবাদের অনুবাদ না পড়িয়া (যাহা লেখকও স্বীকার করেন) কালিদাসের অমৃত মধুর সংস্কৃত রচনাই (যাহা লেখকও স্বীকার করেন) পড়িতে পারিতেন তবে না জানি কত কি বলিতেন। শুধু গইটীই নন, সমগ্র জর্ম্মণ ও ইয়োরোপীয় সাহিত্য খুঁজিলে "শকুন্তলা" পড়িয়া বিমোহিত হইয়াছেন এমন মহাকবি ও মহা পণ্ডিতগণের সংখ্যা এত অধিক যে লেখক এক ভয়ানক মেজরিটীর বিপক্ষে দাঁড়াইবেন। লেখকের স্মরণ রাখা উচিত ছিল যে কালিদাস হিন্দু কবি, শকুন্তলা হিন্দু মেয়ে। অতএব কবির ভাব, বর্ণনা ও আদর্শ হিন্দু হওয়া চাই। লেখককে কে বলিল হিন্দুমতে বহু বিবাহ ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ দূষণীয়? তিনি কি বেদ বেদান্ত, মনু যাজ্ঞবল্ক্য, রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি পাঠ করেন নাই? ভগবান মনু বলিয়াছেন।

"ষড়ানুপূর্ব্ব্যা বিপ্রস্য ক্ষত্রস্য চতুরোঽবরান্।
বিট্‌শূদ্রয়োস্তু তানেব বিদ্যাদ্ধর্ম্ম্যানরাক্ষ-
সান্॥"

মনু। ৩ অধ্যায়। ২৩

বহু বিবাহ সম্বন্ধে কেবল এই বলিলেই হইবে যে শুধু ক্ষত্রিয়বংশীয় রাজগণই একের অধিক পত্নী গ্রহণ করিতেন—এমন নহে কিন্তু যাঁহারা পরমার্থ-চিন্তায় জীবন কাটাইতেন এমন বিখ্যাত মুনি ঋষিগণেরও কখন কখন বহু পত্নী থাকিত, বেদান্তে যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁহার দুই পত্নীর উল্লেখ দেখা যায়; তন্মধ্যে মৈত্রেয়ীর সহিত আলাপটী জগৎবিখ্যাত। এ স্থানে আমাদের বর্ত্তমান সমাজ-নীতির আদর্শ অথবা ভাবানুসারে উক্ত সামাজিক প্রথাদ্বয় ভাল কি মন্দ তাহার কথা হইতেছে না। কালিদাস কবি—তিনি সমাজ যেরূপ সেইরূপ চিত্র করিয়াছেন কিনা তাহা দেখা আবশ্যক।

স্বীকারই যেন করিলাম যে শকুন্তলা নাটকের "ঘটনা সকল সামান্য যেরূপ সচরাচর হইয়া থাকে সেইরূপ; যে তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য অথবা মনোহারিত্ব নাই।" কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই ছিল যে, যে

কবিরত্ন এরূপ "সামান্য ঘটনা—যেরূপ সচরাচর হোয়ে থাকে"—লইয়া এরূপ মনোহর নাটক রচনা করিতে পারেন তাঁহাকে পৃথিবীর অতি প্রধান কবি অথবা "উচ্চশ্রেণীর নাটককারদিগের মধ্যে পরিগণিত" করা উচিত। লেখকও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন, এবং সেক্সপীয়র, স্কট্, মিল্টন ও দান্তেকে তজ্জন্য প্রশংসা করিয়াছেন। রাত্রি অধিক হইয়াছে অবসর থাকিলে লেখকের প্রত্যেক অযৌক্তিক কথা ধরিয়া ঝগ্ড়া করিবার অনেক ছিল। কিন্তু তিনি শকুন্তলার চরিত্র সম্বন্ধে যে কয়েকটী, বিশেষতঃ একটী দোষারোপ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে কিছু না লিখিয়া চক্ষু বুজিতে পারি না। "সরল স্বভাব স্নেহময়ী, মুগ্ধা" হিন্দুবালার প্রথম প্রেমে যেরূপ লঘুতা (বস্তুতঃ আমি শব্দটী অন্যায় মনে করি) প্রকাশ পাওয়া আবশ্যক, শকুন্তলার আচরণে তাহা হইতে অধিকতর লঘুতা প্রকাশ পায় নাই। হিন্দু বালা বলি কেন, জগতের প্রধান প্রধান নাটককারগণের রচনায় তদবস্থাপন্না নায়িকাগণের চরিত্রে কি উক্ত রূপ লঘুতা সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয় না? সেক্সপীয়রের জুলিয়েট্ অথবা গইটীর মারগেরীটা কি শকুন্তলার ন্যায়ই অধীরা নহেন? অনেকে হয়তঃ ইহাদিগকে শকুন্তলা হইতেও অধিকতর "অধীরা" বলিতে বাধ্য হইবেন। প্রেমমুগ্ধা, সরলা বালার নিকট লেখক কিরূপ ধীরতা—সক্রেতীস, না এপিকৃটটীসের ধীরতা——আশা করেন তাহা আমরা জানি না। যেমন প্রকৃত ঘটনায় বাস্তবিক হইয়া থাকে কালিদাস তাঁহার নায়িকা তেমনি বর্ণন করিয়াছেন। কি হওয়া উচিত তাহা তাঁহার কার্য্য নহে। শকুন্তলার গান্ধর্ব্ব বিবাহ উল্লেখ করিয়া লেখক যে কয়েকটী অপ্রাসঙ্গিক অন্যায্য বাক্য বলিয়াছেন তজ্জন্য তিনি ক্ষমার অযোগ্য। "শকুন্তলা" কতদূর "চমৎকারিত্ব" এবং "ঔৎসুক্য" জন্মাইতে পারে তাহা আমি ইয়োরোপে অনেক সময়ে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। কারণ আমি নিমন্ত্রিত পরিবারে অনেক সময়ে শকুন্তলার আখ্যায়িকাটী বলিতে আহূত হইয়া বলিবার সময় শ্রোতৃগণ যে রূপ অসাধারণ "ঔৎসুক্যের" সহিত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছেন তাহা দেখিলে লেখক কখনই ওরূপ বলিতেন না। তিনি হেমলেট অথবা ওথেলোর আখ্যায়িকা অত ঔৎসুক্যের সহিত পড়িয়াছেন তাহার কারণ এই যে তিনি উক্ত নাটকদ্বয়ের আখ্যায়িত বিষয় সম্পর্কে বিদেশী, পক্ষান্তরে শকুন্তলা হিন্দু আখ্যায়িকা এবং হয় ত মহাভারতে পূর্ব্বেই পড়িয়াছেন।

সেণ্টপিটর্শবর্গ
১২ জানুয়ারী } শ্রী নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়

সুখ-দুঃখ।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

পূর্ব্ব প্রস্তাবে আমরা মনুষ্য জীবনের সহিত সুখ-দুঃখের সম্বন্ধ ও সুখ-দুঃখের পরস্পর সম্পর্ক দেখাইতে ও তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যত্নশীল হইয়াছি, এবং সুখ-দুঃখের প্রকৃতি কিরূপ বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বর্ত্তমান ও তাহার পরবর্ত্তী প্রস্তাবে সুখ-দুঃখ বিষয়ে প্রধান প্রধান দার্শনিকদিগের মত উদ্ধৃত করিয়া তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। পূর্ব্বোক্ত সত্যগুলি হৃদয়ঙ্গম না করিয়া কিম্বা সত্যের অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া জীবন যাত্রার নিয়ম স্থির করিলে বিষম ভ্রমে উপস্থিত হইতে হয়। এই কারণ বশতঃ অধিকাংশ দর্শনে ভ্রম পৌঁছিয়াছে।

মনুষ্য জাতির আদিম অবস্থাতে, যখন অসভ্য মনুষ্যকে প্রতিদিনের আহার সংগ্রহ করিবার জন্য যারপর নাই অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হইত, তখন মনুষ্যের ভাবিবার সময় হইত না। তখন মানুষ অন্যান্য জন্তু হইতে নিজের বিশেষ কোন প্রভেদ দেখিতে পাইত না—চতুর্দ্দিকস্থ বস্তু অপেক্ষা নিজের যে কোন মহত্ব আছে একেবারে অনুভব করিতেই পারিত না, তাহার অন্তরে উন্নত হইবার যে ক্ষমতা নিহিত আছে তাহা একবারো তাহার মনের উপর দিয়া চমকিয়াও যাইত না। উপস্থিত অবস্থাতেই সে অত্যন্ত সন্তুষ্ট থাকিত,—নিজের অবস্থাতে তাহার অসন্তুষ্ট হইবার সময়ই হইত না। সে আজন্ম যে অবস্থা দেখিতেছে তাহার যে পরিবর্ত্তন হইতে পারে—একথা স্বপ্নেও তাহার মনে আসিত না। পার্থিব কষ্টে তাহার মন যেরূপ পরিপ্লুত থাকিত তাহাতে আত্মার অভাব দূরে থাকুক শরীরের বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের অভাব নিবারণ করা ব্যতীত অন্য কোন কথা কখনো তাহার মনে আসিত কি না সন্দেহ। পরে সময়ক্রমে যখন কোন একজাতি মনুষ্যকে শরীরের সামান্য অভাব মোচনের জন্য দিনরাত্র উৎকণ্ঠিত থাকিতে হইত না, যখন মানুষ কিছুক্ষণ চুপচাপ করিয়া বসিয়া থাকিবার সময় পাইত, তখন সে দেখিতে পাইত, যে শরীরের সকল অভাব দূর হইলেও তাহার কি এক অভাব অনুভূত হইত যাহা সে সহস্র পার্থিব সুখেও নিরাকরণ করিতে সমর্থ হইত না। তখন সে আত্মার অস্তিত্ব বুঝিতে পারিল, আত্মার অভাব দেখিতে পাইয়া তাহা মোচন করিবার জন্য সচেষ্ট হইল। যতই শরীরের অভাব মোচন করা অল্পায়াসসাধ্য হইতে লাগিল ততই মানুষের আধ্যা-

ত্মিক অভাবের দিকে অধিক দৃষ্টি পড়িতে লাগিল। যেদেশে যত শীঘ্র আহারদ্রব্য সুলভ হইয়াছে সেই দেশে তত শীঘ্র দর্শনশাস্ত্রের উদয় হইয়াছে। অন্যান্য দেশের সভ্যতা অপেক্ষা ভারতবর্ষের সভ্যতাও যেমন প্রাচীন ভারতবর্ষের দর্শনও সেই রূপ অন্য দেশের দর্শন হইতে প্রাচীন। প্রাচীন দর্শন মাত্রেরই মুখ্য উদ্দেশ্য মনুষ্যের আধ্যাত্মিক অভাব মোচন করিয়া সুখ লাভ। অবশ্য এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আনুষঙ্গিকরূপ অনেক বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। সুখ লাভ করাই দর্শনের প্রধান লক্ষ্য। আমাদের দেশের সকল দর্শনেরই উদ্দেশ্য শরীর হইতে আত্মার মুক্তি লাভ করিয়া চির সুখ উপভোগের অধিকারী হওয়া। তবে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক এই কার্য্য সিদ্ধি করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। কিন্তু যত প্রকার উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার মধ্যে বেদান্ত দর্শনের প্রদর্শিত উপায়ই আমাদের দেশের লোকসাধারণের মনকে বদ্ধমূল ভাবে অধিকার করিয়াছে। অতএব সর্ব্বাগ্রে সংক্ষেপে এই দর্শনের মত প্রকাশ করিয়া তাহার সমালোচনায় আমরা অবতরণ করিতেছি— বেদান্ত দর্শনের মতব্যাখ্যা করিবার সময় যতদূর সম্ভব পারিভাষিক শব্দ পরিত্যক্ত হইয়াছে, সাধারণ লোক যাহাকে বেদান্তের মত বলিয়া গ্রহণ করে তাহাই আমাদের বিশেষ সমালোচ্য, কেন না তাহার দ্বারাই একটা বিকৃত ফল হইয়াছে।

পৃথিবীতে কোন বস্তুই নিশ্চিতরূপ জানিতে পারা যায় না—কোন বস্তুরই অস্তিত্বের স্থিরতা নাই—সকল বস্তুই সন্দেহ-মগ্ন। চিন্তা দ্বারা কোন একটা এমন সুদৃঢ় ভিত্তি পাওয়া যায় না যাহার উপর আমরা যুক্তি দ্বারা কোন মত স্থাপন করিতে পারি, কিম্বা যাহাকে ভর করিয়া আমরা জ্ঞান বাড়াইতে পারি— সকল বস্তুই অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কিন্তু বস্তুর অস্তিত্বের বিষয়ে সন্দেহ দ্বারাই একটী বস্তুর অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে, আমরা সকল বিষয়েই সন্দেহ করিতে পারি কিন্তু এই সন্দেহের ভিতর যে এমন এক বস্তু আছে যে সন্দেহ করিতেছে ইহাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না— সন্দেহকারীর অস্তিত্ব আর সন্দেহের অধিকার-অন্তর্ভুত থাকে না। বেদান্ত দর্শনের মূলে এই প্রধান সত্য—এই সত্যটিকেই দেকার্ত্ত এই বিখ্যাত সূত্র দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন—Cogito ergo sum (আমি ভাবিতেছি অতএব আমি আছি।) তাহার পর আমি ব্যতীত অন্য বস্তুর (Non-egoর) অস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ পাই না, আর কোন কালে যে পাইব তাহার সম্ভাবনাও নাই অতএব আমি ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই এই প্রমাণীকৃত হইল। যাহাকে আমরা অন্য কোন বস্তু মনে করি তাহা বস্তু নহে, বস্তুর ভান মাত্র। বারক্লি এই রূপ বলেন ঈশ্বর-ইচ্ছা আমাদের মনের উপর এমন ভাবে কার্য্য করে যাহাতে আমাদের মনে এরূপ পরি-

বর্ত্তন উৎপন্ন হয় যে তাহাতে আমাদের বাহ্য-বস্তুর-অস্তিত্ব-রূপ জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। বেদান্ত-দর্শন স্বীকার করে না, যে বাহ্যবস্তুর সহিত আমাদের মন সংশ্লিষ্ট হইয়া Perception উৎপন্ন করে। অবিদ্যাকেই ভিত্তিহীন বাহ্য-বস্তু জ্ঞানই বেদান্ত দর্শনে মায়া নামের বাচ্য। কিন্তু এখন মায়া শব্দের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইল তাহা সম্পূর্ণ নহে—তাহাতে অব্যাপ্তি দোষ আছে। মায়ার আর একটি উপকরণ আছে তাহা পরে প্রকাশিত হইবে।

ইহা ব্যতীত আর একটি সিদ্ধান্ত লইয়া বেদান্ত-দর্শনের ভিত্তি নির্ম্মিত। অস্ট্ কাম পরমাত্মা হইতে আমি উৎপন্ন হইয়াছি, এখন বিবেচ্য এই যে পরমাত্মাতে ও আমি বলিয়া যে আত্মাকে জানি তাহার সম্বন্ধ কি। বেদান্ত দর্শনের পরব্রহ্মের জ্ঞান বেদ বা উপনিষদ হইতে সংগৃহীত। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি" বোধ হয় এই বৈদিক সূত্র অনুসরণ করিয়া বেদান্ত দর্শন আত্মা ও ব্রহ্ম অভেদ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। আমরা নিশ্চিতরূপ অবগত নহি যে কি যুক্তি অবলম্বন করিয়া আমাদের প্রাচীন বৈদান্তিকেরা এই সিদ্ধান্ত করেন, কিন্তু আধুনিক বৈদান্তিক য়ুরোপীয়দিগের যুক্তি আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি। প্রকলাস, পর ফাইরী প্রভৃতি Neo Platonist গণ ও মুসলমান দার্শনিক Avicenna দ্বারা য়ুরোপে বেদান্ত ঈষৎ ছদ্মবেশে প্রচারিত হইয়া নানা শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে*। আধুনিক য়ুরোপীয় বৈদান্তিকেরা বলেন যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও অভিজ্ঞতা দ্বারা আমরা জানিয়াছি যে জগতে যত শক্তি আছে তাহার সমষ্টি সকল সময়েই এক—কখন তাহার কিছুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। ইহার অন্যথা হইলে কখনই প্রাকৃতিক নিয়ম সকলের নিত্য সমভাব রক্ষিত হইতে পারে না। অতএব আত্মারূপ শক্তিবিশেষও ঐ নিয়মের বশবর্ত্তী হইবে। এখন দেখা যাইতেছে যে একটি মানুষ জন্মাইলে তাহার আত্মাও উৎপন্ন হয়। যদি প্রত্যেক নূতন মানুষের জন্য ঈশ্বরকে নূতন আত্মা সৃজন করিতে হয় তাহা হইলে ক্রমিকই আধ্যাত্মিক শক্তির সমষ্টি বৃদ্ধি হইতে থাকে—যাহা অসম্ভব। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান বটেন কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান অর্থে এরূপ নহে যে ঈশ্বর আত্মঘাতী হইতে পারেন। আমরা আরো দেখিতেছি যে, শক্তি কেবল অবস্থান্তরিত হইতে পারে সুতরাং শক্তির মূলাধার ঈশ্বরের অংশ বিশেষ অবস্থান্তরিত হইয়া মানুষের আত্মা রূপে পরিণত হইয়াছে।" যদি কেহ এরূপ বলে যে জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যা তুল্য, অতএব মৃত মানুষের আত্মা লইয়া ভূমিষ্ঠ মানুষের আত্মা সৃজিত হইতে পারে কিন্তু এরূপ যুক্তি অতীব অমূলক। বাস্তব পক্ষে আমরা দেখিতে পাই যে উত্তরোত্তর পৃথিবীর লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে। য়ুরো-

* Draper's Conflict between Science and Religion গ্রন্থ দেখ।

পীয় বৈদান্তিকেরা আরো দেখান যে যখন সৃষ্টি থাকিবে না—অর্থাৎ যখন প্রলয় উপস্থিত হইবে তখন আত্মা ও পরমাত্মার ভিতর কোন প্রভেদই থাকিবে না—কেননা প্রভেদ থাকিলেই কার্য্য থাকিবে অর্থাৎ সৃষ্টি চলিতে থাকিবে; ইহা হইতে স্পষ্টই আসিতেছে যে ঈশ্বর ও আত্মা অভেদ; শঙ্করাচার্য্যের অহং ব্রহ্মের ইহাই অর্থ। ঈশ্বরের ইচ্ছা বশতঃ এই একত্ব আমি অনুভব করিতেছি না, ইহাও মায়া। মায়ার পূর্ব্বোক্ত সংজ্ঞার যে টুকু অসম্পূর্ণ ছিল তাহাকে এই অংশ যোগ করিয়া দিলে তাহার সে দোষ খণ্ডিত হইবে। সংক্ষেপে এই রূপ বলা যায় যে আমাদের মনের অর্থাৎ ঈশ্বরের অংশ-বিশেষের উপর ঈশ্বরের ইচ্ছার ক্রিয়ার সকল ফলের নামই মায়া।

এখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, বেদান্তদর্শন দুইটি সিদ্ধান্তের উপর নির্ম্মিত —একটি এই যে ঈশ্বর ও আমি অভেদ, এবং অপরটি এই যে আত্মা ব্যতীত আর সকলই মায়া। মায়া দ্বারা মনুষ্যের আত্মা ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন হইতেছে বলিয়া মায়া মানুষের আত্মার দুঃখের কারণ, কেন না মায়াই মানুষের অসীম-প্রত্যাশী আত্মাকে অসীম হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। এই মায়া খণ্ডন করাই মানুষের কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই মানুষ অক্ষয় সুখে সুখী হইতে পারিবে। অবশ্য এ বিষয়ে কেহ বিসম্বাদী হইবে না যে, যাহা বেদান্ত দর্শনের কল্পিত আত্মার চরম সুখ বাস্তবিকই তাহা ঐ রূপ। এখন দেখা যাউক বেদান্তদর্শন মায়া হইতে মুক্ত হইবার কি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে।

বেদান্ত স্থির করিল যে বিশ্বসংসার সকলই মায়া—স্নেহ প্রেম ভক্তি সকলই মায়া—আর এই মায়াকে পরিত্যাগ করিয়া যোগাদি দ্বারা আত্মা ও পরমাত্মার একত্ব অনুভব করা ব্যতীত সংসারের দুঃখ ও কষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করিবার অন্য কোন উপায় নাই। মায়ার ধ্বংশ করিতে পারিলে মানুষের অসীম-প্রত্যাশী আত্মা অসীম পরমাত্মাকে পাইয়া ভূমানন্দ লাভ করে। কাজে কাজেই পৃথিবীর বিষয়ে অর্থাৎ মায়াতে মন যত আকৃষ্ট হইবে ততই আমাদিগকে ঈশ্বর হইতে অধিক বিচ্ছিন্ন হইয়া দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। অতএব পৃথিবীকে ও যাহাকে আমরা পৃথিবীর সুখ মনে করি সেই সকলকে পরিত্যাগ করিয়া বেদান্ত দর্শনের প্রদর্শিত নিয়ম অনুসারে আধ্যাত্মিক উন্নতি করিলে ক্রমে ক্রমে আমরা চিরস্থায়ী সুখের অধিকারী হইতে পারি। পৃথিবীর বিষয় চিন্তা করিয়া সময় ক্ষেপণ করিবার আমাদের কোন আবশ্যকতাই নাই; বরঞ্চ ঐরূপ চিন্তা আমাদিগকে ঈশ্বর হইতে আরো দূরে লইয়া যায় বলিয়া উহা মহা পাপ। পরমাত্মার সহিত অদ্বৈত ভাব উপলব্ধি করিবার এক প্রধান উপায় হইতেছে শরীর ও মনের নিগ্রহ করিয়া পৃথিবীর প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা। বেদান্ত-প্রদর্শিত-পথানুসারী লোকের পৃথিবীর সম্বন্ধে মনের ভাব যে ঠিক প্রাচীন Lotos-eater-

দের ঔদাস্যের মত তাহা নহে; ইহারা শুধু পৃথিবীর বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকিয়া ক্ষান্ত হইত না—ইহাদের আবার নিজের শরীর ও মনকে ইচ্ছা করিয়া কষ্ট দেওয়াটা অধিক ছিল; এই উপায়ে ইহারা পৃথিবী হইতে উচ্চ হইতে প্রত্যাশা করিত। একেত আমাদের দেশের জল বায়ুর দোষ লোক-দিগকে যেরূপ কার্য্যে পরাঙ্মুখ করিয়া ফেলে তাহাতে যে এই নিশ্চেষ্ট ধ্যান-প্রধান বেদান্ত মত আমাদের এত হৃদয়গ্রাহী হইবে—তাহার আর আশ্চর্য্য কি? বাস্তবিক, কি সাধু কি অসাধু কি ইতর কি ভদ্র কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর আবাল বৃদ্ধ বনিতার অস্থিমজ্জায় বেদান্তের এই নিশ্চেষ্ট ও ঔদাস্য ভাব প্রবেশ করিয়াছে এবং ইহাই জাতীয় তৌলযন্ত্রে ভারতবর্ষের ক্রমাবনতির এক প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকলেই নিজের নিজের আত্মা লইয়াই ব্যতিব্যস্ত এবং পৃথিবীর বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, কাজেই এই হতভাগ্য দেশকে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে শত্রু-পদানত হইতে হইয়াছে। অবশ্য এই দুর্ঘটনাটি আমাদের জল বায়ুর দোষই বলিতে হইবে; কেন না য়ুরোপীয় বৈদান্তিকেরা বেদান্তের এই মতটা গ্রহণ করেন নাই।

বেদান্ত দর্শনের এই মায়াসংক্রান্ত মতটী আমাদের সাধারণ লোকের ভিতর যে রূপ অবস্থাতে প্রবেশ করিয়াছে তাহা অবলম্বন করিয়া কাহারো আত্মহত্যায় প্রবৃত্তি হয় না কেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না; তবে এই এক কারণ আমাদের মনে উপলব্ধি হইতেছে যে, বেদান্তের মত এ নহে যে, শরীর হইতে স্বতন্ত্র হইলেই আত্মা মুক্তি লাভ করে; দেহ হইতে মুক্ত হইলেও যদি দৈহিক সুখের প্রতি আত্মার আসক্তি থাকে তাহা হইলেই সে আত্মা পুনর্জন্মের দায়ে পড়িবে; আর দেহের মধ্যে থাকিয়াও যদি আত্মা দেহাভিমান-শূন্য হয় ও পরব্রহ্মের জ্ঞান অপরোক্ষ লাভ করে তাহা হইলেই সে আত্মা জীবন্মুক্তির আনন্দ উপভোগে কৃতার্থ হয়। অবশ্য আত্মা পরমাত্মাকে লাভ করিলে যে অক্ষয় অখণ্ড আনন্দ লাভ করে ইহা অপেক্ষা কোন সত্যই অধিক সত্য নয়। বেদান্তের মতে দেহ এই আনন্দ উপভোগের বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী নহে।

পুন-র্জন্মের বিষয় একটুকু বিস্তারিত রূপে আলোচনা করিতে হইবে। এই দুঃখময় পৃথিবীতে আমাদিগকে প্রেরণ করিবার জন্য অনেকের ঈশ্বরের ন্যায়-পরায়ণতার বিষয়ে সন্দেহ জন্মাইতে পারে বলিয়া, কল্পনা করা হইল যে, আমি পূর্ব্ব-জন্ম-কৃত দুষ্কৃতির জন্য পুনর্ব্বার পৃথিবীতে জন্মিয়াছি; আমার নিজের পাপাচরণের শাস্তি ভোগ করিবার জন্যই আমার জন্ম গ্রহণ করা। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরূপ যুক্তির ভ্রম দেখিতে পাওয়া যাইবে। মনে কর, বর্ত্তমান জন্মেই আমি পূর্ব্ব জন্মের পাপের জন্য শাস্তি ভোগ করিতেছি কিন্তু যখন সর্ব্বপ্রথমে জন্ম হয় অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে, আমি কি পাপের জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলাম? আমার

আত্মা ঈশ্বরের অংশ অতএব সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহার দ্বারা কোন পাপ আচরিত হই-বার সম্ভাবনা নাই, কেন না তাহা হইলে ঈশ্বরকেও সেই পাপের অংশ গ্রহণ করিতে হয়—যাহা অসম্ভব। ইহাতে কেহ এইরূপ উত্তর করিতে পারেন যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে পৃথিবী এপ্রকার দুঃখময় স্থান ছিল না। কিন্তু একথাও সারগর্ভ নহে। প্রথমতঃ, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না যা-হাতে ওরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। এবং তাহার বিপরীতে আমরা প্রথম প্রস্তাবে প্রমাণ করিয়াছি যে অসীমকে সীমাবদ্ধ করিলেই তাহার দুঃখ উৎপন্ন হয়। আর সৃষ্টি করিতে হইলেই আত্মাকে সীমা-বদ্ধ করিতে হইবেই; কেন না সৃষ্টি করিতে হইলেই স্রষ্টা ও সৃষ্টের আবশ্যক; এখন সৃষ্ট (আত্মা) স্রষ্টা পরমাত্মার অংশ-মাত্র, সৃষ্টির পূর্ব্বে উভয়েই এক ছিল পরে সৃষ্টির সময় উভয়ের মধ্যে প্রভেদ উৎপন্ন হইয়াছে অতএব সৃষ্টির সময় আত্মা ও পরমাত্মার একত্বের লোপ হইয়াছে—অসীম আত্মা সীমাবদ্ধ হইয়াছে—কাজে কাজেই আত্মা দুঃখের অধীন হইয়াছে। কোন পাঠক ই,বোধ হয়, ইহা হইতে মনে করিবেন না যে,এখানে আমরা ঈশ্বর সৃষ্টির অভিপ্রায়ের সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতেছি। সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য কি,আমরা বিশেষরূপ বুঝিতে অক্ষম কিন্তু এরূপ নিশ্চিত বলিতে পারা যায় যে সৃষ্টি ও দুঃখ অবিচ্ছেদ্য।*

এবং আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি যে, আত্মার উন্নতি দ্বারা সৃষ্টিজনিত বাধা অতিক্রম করিয়া চিরস্থায়ী বিশুদ্ধ সুখ লাভ করা আমাদের জীবনের এক প্রধান উদ্দেশ্য। যাহা হউক আমরা এখন দেখি-তেছি যে যদি সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের ন্যায়-পরায়ণতায় দোষ পৌঁছায় ত তাহা পুন-র্জ্জন্মের অবতারণার দ্বারা রক্ষিত হয় না। পুনর্জ্জন্মকে আমাদের দেশের দর্শনে যে কার্য্য সম্পন্ন করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে তাহার কোন প্রয়োজন নাই; এবং আমরা উপরে দেখাইলাম যে, পুনর্জ্জন্মের দ্বারা সে কার্য্য সাধিত হইতেছে না। আদৌ পুনর্জ্জন্ম সম্ভব কি না, শক্তি একবার রূপান্তরিত হইলে তাহা আবার পূর্ব্বরূপ ধারণ করিতে পারে কি না—সে সকল বিষয়ের সমালো-চনা করা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূত নহে।

আমরা এখন বেদান্ত দর্শনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া তাহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিতে যত্নশীল হইব। বেদান্ত দর্শনে বলে যে আত্মা ব্যতীত আর সকলই মায়া। বাহ্য বস্তুর বাস্তবিক কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে কি যাহাকে আমরা বাহ্য বস্তু মনে করি তাহা আমাদের মনের উপর অন্য এক শক্তির (ঈশ্বরের ইচ্ছার) ক্রিয়ার ফলমাত্র-ইহা কেহ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই আর কোন কালেও যে কেহ ইহার মীমাংসা করিতে পারিবে এরূপ বোধ

* "Unity in Nature" by the Lord Bishop of Carlisle in a recent number of the *Nineteenth Century.*

হয় না। কিন্তু ইহার দ্বারা নিশ্চয়ই এরূপ সপ্রমাণ হইতেছে না যে বাহ্য বস্তু নাই। সে যাহা হউক যদিও আমরা জ্ঞানের দ্বারা বাহ্য বস্তুর বাস্তবিক অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না, কিন্তু তথাপি আমাদের মনের গঠন এমনি যে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব নাই এরূপ আমরা ভাবিতে পারি না। যখন "আমি"—এইটা আমি ভাবি, তখনই সেই ভাবনার আর একটা উপকরণ আমার মনে থাকে, এই যে "আমি" ব্যতীত আর কিছু যাহা হইতে "আমি" ভিন্ন। পৃথিবীতে শুধু কেবল একটি বস্তু থাকিলে চিন্তা অসম্ভব হইত—" চিন্তা নিত্য দ্বিত্ববাহিনী।" কোন একটা বস্তু থাক্, আর নাই থাক্, যখন তাহার অস্তিত্বের বিষয়ে আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস আছে তখন আমার পক্ষে তাহা নিশ্চয়ই আছে। একজন পাগল মানুষ মনে করিত যে তাহার পৃষ্ঠদেশ কাচের দ্বারা নির্ম্মিত—এব্যক্তিকে অপর কোন বিষয়ে কেহ কখন পাগল বলিয়া সন্দেহ করে নাই। চিকিৎসক উক্ত ব্যক্তির সহজ জ্ঞানের দ্বারা এই ভুল ভাঙ্গাইবার জন্য একটু বল পূর্ব্বক তাহার পৃষ্ঠে একটা কঠিন বস্তুর দ্বারা আঘাত করিলেন। পাগল যথার্থই কাচ-নির্ম্মিত পৃষ্ঠ দেশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। বিখ্যাত চিন্তাশীল কবি কোলরিজ এইরূপ একটি ঘটনা চাক্ষস করিয়া ছিলেন।* যখন দেখা যাইতেছে যে মানুষের উপর বিশ্বাসের এতদূর ক্ষমতা আছে তখন আমাদের পৃথিবী যথার্থ একটা কিছু এই ভাবিয়াই জীবনযাত্রার নিয়ম স্থির করিতে হইবে। যদি কেহ সম্মুখে প্রস্তর স্তম্ভ দেখিয়া তাহাকে কেবল মায়া-প্রসূত মনে করে এবং সজোরে তাহাতে মস্তক আহত করে তবে অবশ্যই তাহার প্রাণ বিনাশ হইবে। অতএব বিশ্বসংসার মায়া হইলেও একেবারে আমাদের তাচ্ছিল্যের সামগ্রী হইতে পারে না।†

আমরা পূর্ব্বপ্রস্তাবে বলিয়াছি যে মানুষ দুইটি পরস্পর-বিরোধি-স্বভাবাপন্ন পদার্থের সমষ্টি। তাহার মধ্যে একটিকে একেবারে ছাঁটিয়া ফেলিয়া শুধু অন্যটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জীবন নির্ব্বাহের নিয়ম স্থির করিলে কিরূপ ভ্রমে পড়িতে হয় কতক পরিমাণে উপরে প্রদর্শিত হইল। আমাদের সদা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে আমাদের জন্ম হওয়া কোন একটা ভ্রম হইতে উৎপন্ন নহে, আর কেবল সেই কল্পিত ভ্রম সংশোধন করিতে চেষ্টা করাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নহে। পৃথিবীতে আমরা চারিদিকে যাহা পাই আমাদের আত্মা তাহাদের ক্ষমতা হইতে একেবারে স্বাধীন থাকিতে পারে না। সুতরাং আমরা শরীরকে একেবারে চক্ষের অন্তরাল করিয়া ফেলিতে পারি না। যদি আমরা পৃথিবীর সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল

* Coleridge's Table talk—p.97 *et Seq.*

† বিখ্যাত সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত গোল্ড্‌ষ্টুকার বলেন যে মূল বেদান্তে মায়ার উল্লেখ নাই—উহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কল্পনা।

সন্ন্যাস ধর্ম্মের চর্চ্চা করি তাহা হইলে সম্ভবতঃ পৃথিবীর উপভোগ্য সুখের পরিবর্ত্তে আমরা কেবল হৃদয়ের মধ্যে এক অসহনীয় অভিমানকে পাইব।

ভগবান মনু সকল আশ্রমের উপর গার্হস্থ্য আশ্রমকে স্থাপিত করিয়া নিজের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি একস্থানে ব'লয়াছেন, যে

"ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ।
যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।

এই শ্লোকটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত। ইহাতে মানুষের প্রকৃতি অতি সুন্দররূপ বুঝিয়া মানুষকে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথ দেখাইয়া দেওয়ান হইয়াছে। মনু বুঝিয়াছিলেন যে জ্ঞানকে সহায় করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিলে তাহাতে আত্মার উন্নতি ব্যতীত অবনতির কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি আরো বুঝিয়া ছিলেন যে একেবারে আধ্যাত্মিক বিষয়ে অন্ধ হইয়া কেবল পৃথিবীর সুখের অনুসন্ধানে অনুরক্ত থাকিলে আত্মার যতদূর সম্ভব অবনতি হইবেই হইবে এবং পৃথিবীকে একেবারে ছাড়িয়া দিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেও যে কি কি দোষের উৎপত্তি হয় তাহাও তিনি বিশেষরূপ বুঝিয়া ছিলেন। সেই জন্য তিনি বলিয়াছেন যে মনুষ্য গৃহস্থ হইবে এবং তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণও হইবে। পৃথিবীতে লোককে দুঃখ খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না; দুঃখ আত্মার উন্নতির জন্য অত্যাবশ্যক এবং অযাচিত হইয়াও সকল স্থানেই তাহা উপস্থিত হইবে। প্রথম প্রস্তাবে দেখান হইয়াছে যে জীবনের সত্তা ও দুঃখের সত্তা অবিচ্ছেদ্য। সংসার ত্যাগ করিয়া দুঃখের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলে কেবল কষ্ট ভোগই সার হয়। মনুর আদেশের অর্থ এই যে যদি আমরা তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে অবস্থিতি করি তাহা হইলে পৃথিবীর সুখে স্বর্গের সুখের ছায়া দেখিতে পাইব এবং পৃথিবীর দুঃখ ভোগ করিয়া মানুষের আত্মা স্বর্গের উপযুক্ত হইবে।

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র।

স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে আমার ঝগড়াটা নিতান্তই চল্‌ল দেখ্‌চি। কিন্তু সে ত এক প্রকার সুখেরি বিষয়। বিষয়টা গুরুতর; সে সম্বন্ধে দু পক্ষের মতামত ব্যক্ত হোয়ে একটা আন্দোলন হওয়াই প্রার্থনীয়। কিন্তু কথাটা যতই গুরুতর ও সারবান হোক্ না, আমার গলার দোষে মারা যায় বা! অর্থাৎ সম্পাদক মহাশয় পাছে তাঁর অতুচ্চ অট্টহাস্যের প্লাবনে আমার ক্ষীণ-কণ্ঠের কথাগুলো একেবারে ভেঙ্গে চুরে, উল্‌টে পাল্‌টে, তোল পাড় কোরে ভাসিয়ে নিয়ে যান, কথাগুলো একেবারে পাঠকদের কানে ভাল কোরে না পৌঁছোয়! এখেনে একটা

সেখেনে একটা তাঁর ছুঁচোলো নোটের হাস্য-বিষাক্ত খোঁচা খেয়ে খেয়ে আমার গরীব ভাল মানুষ মত গুলি প্রাণের দায়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দেশ ছাড়া হয় বা! পাঠক মহাশয়েরা আমার কথাটা একবার অবধান করুন; আর কিছু নয়, লেখক মহাশয় আমার কথাটা আপনাদের ভাল কোরে শুন্‌তে দিচ্চেন না। আমি একটি কথা বোল্‌তে মুখ খোল্‌বার উপক্রম কোরেছি কি, অমনি তিনি দশটা কথা কোয়ে একটা ঘোরতর কোলাহল উত্থাপন কোরেছেন, আর আমার কথাটা একেবারে মাথা তুলতে পারে নি। পাঠক মহাশয়েরা যদি এক পক্ষের কথা শুনতে না পান ও গোলেমালে একটা ভুল বুঝে যান্‌ তবে বড় দুঃখের বিষয় হবে।

লেখক মহাশয়ের নোটের বিরুদ্ধে আমার প্রধান নালিশ ছিল এই যে, আমি যে কথা বলিনি, সেই কথা আমার মুখে বসানো হোয়েছে। তার উত্তরে তিনি বলেন যে, "লেখক কি ভাবে কি কথা বলিয়াছেন তাহার প্রতি তত আমাদের লক্ষ্য নহে যত পাঠকেরা তাঁহার কথা কি ভাবে গ্রহণ করিবেন তাহার প্রতি!" দোহাই পাঠক মহাশয়দের, আমি এক কথা বোল্লে আপনারা আর এক কথা যদি শোনেন তবে আমি গরীব মারা যাই কেন? আমি যদি বলি, বিশ্বম্ভর দাদার দুই পা আর আপনাদের মধ্যে কেউ শোনেন, বিশ্বম্ভর দাদার চার পা, তা হোলে যদি সম্পাদক মহাশয় আমার চুলের ঝুটি ধোরে বিধি মতে নিগ্রহ করেন, ও দশটা শাস্ত্র থেকে প্রমাণ উদ্ধৃত কোরে, দশ জন পশুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মত নিয়ে আমাকে দশ ঘণ্টা ধোরে গম্ভীর ভাবে বোঝাতে আরম্ভ করেন যে, বিশ্বম্ভর দাদার দুই পায়ের অধিক পা হবার কোন প্রকার সম্ভাবনা নেই; শুদ্ধ তাই নয়, তাই নিয়ে হাসি টিট্‌কিরি কোরে, ঠাট্টা মস্‌করা কোরে দশ জন ভদ্র লোকের কাছে আমাকে বিধি মতে অপদস্থ করেন যদি, তবে আমি সহ্য করি কি কোরে বলুন দেখি? শাশুড়িরা যে ঝিকে মেরে বউকে শিক্ষা দেন, তাতে যে অনেক সময়ে অনেক উপকার হয় সে বিষয়ে আমি দ্বিরুক্তি করিনে, কিন্তু আপনারা কি অস্বীকার কোর্ত্তে পারেন যে, উপকারটা বউয়ের হোক কিন্তু যদি কারু পিঠে বেদনা হয় ত সে ঝিয়েরি! আচ্ছা ভাল—আমার পিঠ বেকার অবস্থায় পোড়ে আছে, আর সম্পাদক মহাশয়ের মুষ্টির যদি আর কোন কাজ না থাকে তবে আমার নিরীহ পিঠের ওপর যথেচ্ছাচার করুন কিন্তু এটা যেন মনে থাকে, সে কিল গুলো প্রাপ্য আপনাদের,* কেবল সম্পাদক মহাশয়ের অপূর্ব্ব

* "মোকদ্দমার শুনানির দিন বিচারকের নিকট বাদী যদি এরূপ কতকগুলি কথা বলেন যে, তলাইয়া দেখিলে তাহার মধ্যে অনেক গুলি মার্‌-পাঁচ দেখিতে পাওয়া যায়; আর যদি প্রতিবাদী বিচার কর্ত্তাকে সেই গুলি খুলিয়া দেখান, তাহা হইলে বিচারালয়ের প্রতি অবজ্ঞা-প্রকাশ হেতু তাহাকে

বিচারে সে কিল তার যিশুখৃষ্টের মত আপনাদের হোয়ে সমস্ত আমাকেই বহন কোরতে হোচ্চে !

লেখক মহাশয়ের সঙ্গে আমার একটা বিবাদ ছিল এই যে, তিনি স্বাধীনতা অর্থে বেহায়ামো, অবিনয়, অসরলতা, উচ্চের প্রতি অভক্তিমত্তা, নীচের প্রতি অদয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি ঠাউরেছেন কেন ? তার উত্তরে তিনি যা' বলেন, তার ভাবটা হোচ্চে এই যে, পাছে পাঠকেরা তাই ঠাউরে থাকেন, এই কারণ বশতঃ আর কিছু নয় ! কিন্তু আমার অপরাধ ? তাঁর ভাষাটা উদ্ধৃত কোরে দিই। "লেখক বিলাতি বিবিদের চাল চোল ধরণ ধারণের আনুষঙ্গিক রূপে স্ত্রী স্বাধীনতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, এজন্য বিলাতানভিজ্ঞ অধিকাংশ লোকের মনে এইরূপ একটা কুসংস্কার জন্মিতে পারে যে, কার্য্যতঃ স্ত্রীস্বাধীনতা আর কিছু নহে, কেবল বিবিদিগের চাল চো'ল ধরণ ধারণ ইত্যাদি। ইহা একটি লোক-বিখ্যাত বিষয় যে, বিবিদের Shoppingএর জ্বালায়, নির্দোষ (?) আমোদাসক্তির জ্বালায়, তাহাদের স্বামীরা ধনে প্রাণে মারা যায়, অথচ স্ত্রীস্বাধীনতার একটু কোথাও পাছে আঁচড় লাগে, এই ভয়ে তাঁহারা সকল অত্যাচার ঘাড় পাতিয়া ল'ন, সকল বিষ হজম করিয়া ফেলেন।" ইত্যাদি। এর থেকে অনেক কথা উঠতে পারে। প্রথমতঃ সম্পাদক মহাশয় তা হোলে এই কথা বলেন যে, বিবিদের চাল্ চোল্ ধরণে অবিনয়, অসরলতা, বেহায়ামো, উচ্চের প্রতি অভক্তিমত্তা, নীচের প্রতি অদয়াদাক্ষিণ্য প্রকাশ পায়; দ্বিতীয়তঃ যেন আমি বিবিদের অবিনয়, অসরলতা, বেহায়ামো প্রভৃতির আনুষঙ্গিক স্বরূপেই স্ত্রী স্বাধীনতা উল্লেখ কোরেছিলুম ? সম্পাদক মহাশয় যে কেন বলেন, বিবিরা অবিনয়ী, অসরল, উচ্চের প্রতি তাদের ভক্তি নেই, নীচের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য নেই তা' সম্পাদক মহাশয়ই জানেন; এক মাত্র Shoppingএর উদাহরণ দিয়ে তিনি ইংরেজ-মহিলাদের স্কন্ধে অত গুলো পাপের বোঝা চাপিয়েছেন। আমি ইংলণ্ডে যতই বেশী দিন থেকেছি ততই সেখানকার ইংরেজ পরিবারের মধ্যে ভাল কোরে মিশেছি; আমি যতদূর জানি তাতে একথা আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌তে পারি (অনেক পাঠক মহাশয়ের অযথা দেশানুরাগে হয় ত আঘাত লাগ্‌তে পারে যে, সম্পাদক মহাশয় ইংরাজ-মহিলাদের প্রতি যতগুলি দোষারোপ কোরেছেন তার কোনটা সত্য নয়। কোন ব্যক্তি-বিশেষের বিশেষ অভিধানে যদি বিনয় অর্থে যথাসাধ্য কথার উত্তর না দিয়ে ঘোমটা টেনে সঙ্কোচে নিতান্ত ম্রিয়মান হোয়ে বোসে থাকা না হয়, তা' হোলে* ইংরেজ ভদ্র মহিলারা বিনয়ের আদর্শ। ইংরাজ পরিবারের মধ্যে এমন কত শত বালিকা

কি দণ্ডনীয় হইতে হয় ? প্রতিবাদী জজের নিকট কোন কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে বলিয়াই কি সে ফরাক্কাবাদের হরসহায় ! সং

(আমাদের দেশের পূর্ণ-যৌবনা) দেখা যায় যারা সরলতার প্রতিমা, যারা তুষারের মত, নিজের শুভ্র ললাটের মত নিষ্কলঙ্ক; নিষ্কলঙ্ক অর্থে শুদ্ধ কার্য্যতঃ নিষ্কলঙ্ক নয়, তাদের মন বিশুদ্ধ; ছেলেবেলা থেকে তা'দের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস স্ফূর্ত্তি পেয়েছে, দাসীদের কাছ থেকে বা অসৎমনা সমবয়স্কা প্রতিবেশিনীদের কাছ থেকে বিয়ের কথা, বরের কথা, সংসার ধর্ম্মের কথা বা কোন রকম অসৎ কথা একটিমাত্র শোনেনি; সর্ব্বদা হাস্যোচ্ছ্বাসময়ী। উচ্চের প্রতি ভক্তি মত্তা যদি বল তবে তা ইংলণ্ডে যেমন আছে, এমন অন্যত্র সচরাচর পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। যেখেনে Carlyleকে গাড়ি চোড়ে যেতে দেখলে কত শত রাস্তার লোক টুপি খুলে গাড়ির পেছনে পেছনে ছুটেছিল; যেখানে কোথায় Shakespeare একটা গাছ পুঁতেছিলেন, কোথায় Addison এর একটা চৌকি আছে, সে সমস্ত, লোকে একেবারে তীর্থস্থান কোরে তুলেছে; যেখেনে একজন কবির পাণ্ডুলিপি, একজন খ্যাত ব্যক্তির নিজের হাতের নাম সই পেলে লোকে আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করে, সেখেনে উচ্চের প্রতি ভক্তি-মত্তা নেই কি কোরে বোলব; আর সেই উচ্চের প্রতি ভক্তিমত্তা হোতে সেখানকার স্ত্রীলোকেরাই যে, বিশেষ বঞ্চিত এমন নয়? একথার উত্তর তেমন আর কিছু হোতে পারে না যেমন, একটিবার বিলেতে যাওয়া। কেননা আমি বলব 'না,' সম্পাদক মহাশয় বোলবেন 'হাঁ' আবার আমি বোলব 'না' আবার তিনি বোলবেন 'হাঁ;' এমন কোরে যতক্ষণে না হাঁপিয়ে পড়া যায় ততক্ষণ হয়ত 'হাঁ' 'না" চালানো যেতে পারে। কিন্তু খুব সম্ভবতঃ এ বিষয়ে সম্পাদক মহাশয়ের আমার চেয়ে ঢের বেশী অভিজ্ঞতা আছে, সুতরাং এমন স্থলে আমার চুপ কোরে থাকাই শাস্ত্র-সম্মত; কিন্তু সম্পাদক মহাশয়ের মতে যা'ই হোক আমি কখনো বিবিদের অবিনয়, অসরলতা ইত্যাদির আনুষঙ্গিকরূপে স্ত্রী-স্বাধীনতার উল্লেখ কোরেছি কি না সেইটি বিবেচ্য স্থল। বিলেতে নিমন্ত্রণ-সভায় স্ত্রীপুরুষ সকলে মিলে নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ করে, একটা নতুন ভাল বই উঠলে সে বিষয়ে পরস্পর আপনাদের মতামত ব্যক্ত করে, একটা নতুন যন্ত্র উঠ্‌লে গৃহকর্ত্তা তাই নিয়ে অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গকে দেখান, গৃহকর্ত্রী রোমে গিয়েছিলেন সেখানকার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানের যে সকল ফোটগ্রাফ নিয়েছিলেন তাই দেখিয়ে সকলকে আমোদে রাখেন ইত্যাদি প্রসঙ্গ উপলক্ষে কথায় কথায় আমি স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে নিজের মত ব্যক্ত করি; এর থেকে যদি কোন বিলাতানভিজ্ঞ ব্যক্তি মনে কোরে থাকেন যে, Shoppingকরাকেই স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে, বা বিলাতের মহিলারা যা কিছু মন্দ-আচরণ করেন (সত্যই হোক্ আর জন-শ্রুতিই হোক্) তারই নাম স্ত্রী-স্বাধীনতা, তাহোলে (বেয়াদবি মাপ কর্ব্বেন) তাঁদের মস্তিষ্কের দোষ জন্মেছে একথা স্বীকার কোর্ত্তেই হয়।

সত্য সত্য যা কিছু দোষ করি একে ত তার জন্যই আমরা ইহকালে পরকালে দায়ী কিন্তু যে দোষ করিনি তার জন্যেও যদি কৈফিয়ৎ দিতে হয় তা' হোলে সংসারের পায়ে গড় করি! সম্পাদক মহাশয় মহা খাপা হোয়ে চক্ষু রাঙিয়ে বোলচেন; "য়ুরোপ ভিন্ন আর কোথাও যে, স্ত্রী-স্বাধীনতা নাই এমন নহে—জাপানে আছে, বোম্বাইয়ে আছে, কিন্তু সে সকল নিয়ে আন্দোলন করা লেখকের উদ্দেশ্য নহে—সর্ব্বদেশ-সম্মত স্ত্রী-স্বাধীনতার বিশুদ্ধ আদর্শ নিয়ে আলোচনা করাও লেখকের উদ্দেশ্য নহে, ইংলণ্ডে যেরূপ স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচলিত তাই যা' কেবল লেখকের এক মাত্র আলোচ্য বিষয়; এরূপ যখন—তখন ইংলণ্ডের প্রচলিত স্ত্রী-স্বাধীনতা যে কি ভয়ানক বস্তু তাহা যে শত সহস্র স্থানে নামে স্বাধীনতা কাজে স্বৈর-চারিতা—লেখক সে সকল কথার উল্লেখ না করাতে প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে বিবিদের অনুকরণ করিলেই আমাদের কুল-রমণীরা স্বাধীনতা পথে বিচরণ করিতে পারিবেন।" ইংলণ্ডে ধান ভান্‌তে গিয়ে আমি জাপানের বা বোম্বায়ের শিবের গান তুলব, সম্পাদক মহাশয় যদি কখনো এরকম আশা কোরে থাকেন, তাহোলে বলা বাহুল্য আমার মত প্রকৃতিস্থ লোকের কাছে সে আশা করা দুরাশা! আমি চোখে চষমা এঁটে, চাপকান পোরে, জগতের অজ্ঞান-তিমির-মোচন আমার নিতান্ত মহামূল্য মতগুলি অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠকদের বিতরণ করছিলুম না; আমি বৈঠকখানায় বোসে তামাক খেতে খেতে পাঠক মশায়দের সঙ্গে দুদণ্ড গল্প স্বল্প করছিলুম। একটা গল্প থেকে আর একটা গল্প ওঠে! একটা নিমন্ত্রণ-সভা বর্ণনা কোরে হঠাৎ স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা আমার মনে এল, সে বিষয়ে আমার যা' কিছু বক্তব্য ছিল সব বোলে ফেল্লেম। আমার সে বক্তব্যের মধ্যে ইংলণ্ডের স্ত্রী-স্বাধীনতার উল্লেখমাত্র ছিল না, আর, সত্যের খাতিরে সম্পাদক মহাশয়ের কাছে নিতান্ত লজ্জার সহিত স্বীকার কোরতে হোচ্চে, জাপানের ও বোম্বায়ের স্ত্রী-স্বাধীনতা আমার মনেও আসেনি! মনে আসেনি! অপরাধ হোয়েছে বটে! তা' সম্পাদকীয় বেত্রাঘাতে মনে না আস্‌বার জন্যে যথেষ্ট শাস্তিও পেয়েছি। আচ্ছা, না হয়, এবার থেকে আমি যখনি স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা ভাব্‌ব, তখনি জাপান ও বোম্বায়ের কথা মনে কোরতে ভুলব না। সে কথা যাক্, আমার মত হোচ্চে এই—যে, বুট জুতো পরাকেও স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে না, গৌণ পরাকেও স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে না, আর মটন দিয়ে রাই খেলেও স্ত্রী-স্বাধীনতার ব্যত্যয় হয় না। যদি কোন পাঠক এমন বুঝে থাকেন যে, বিবিরা যা' করে তা'ই স্ত্রী-স্বাধীনতা, ও সেই জন্যে আমার প্রতি মহা রুক্ষ হোয়ে থাকেন, তা'হোলে তাঁকে আমার বিনীত-নিবেদন এই যে, এই ভুল-বোঝা সম্বন্ধে যদি কারু কোন দোষ থাকে ত সেটা তাঁর বুদ্ধির! তাঁর কানের যদি এমন একটা সৃষ্টি ছাড়া রোগ হোয়ে

থাকে যে, যা তাঁকে বলা যায়নি তা তিনি শোনেন, তা'হোলে সে কান দুটো যতক্ষণে না বিশেষরূপে মেরামত করা হয় ততক্ষণ তাঁর সঙ্গে আমার মত লেখক কোন এলাকা রাখেন না! যাহোক্—আমি যদি বলি যে, ইংরাজ বিবিয়ানাকে স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে না (কিন্তু সেই সঙ্গে এও বলি, জাপান-বিবিয়ানা বা বোম্বাই-বিবিয়ানাকেও স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে না) তা হোলেই বোধ করি সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে ও সম্বন্ধে আমার বিবাদটা চুকে গেল। কেননা সম্পাদক মহাশয় এক প্রকার স্বীকারই কোরেচেন যে বিবিদের বিষাক্ত (!) অশোভন (!!) স্বাধীনতা পরিত্যাগ কোরে যদি "নির্ব্বিষ শোভন" স্বাধীনতা লেখক প্রচার করেন তা'হোলে তিনি তা' আদরের সহিত গ্রহণ কোর্ব্বেন। অনর্থক একটা ভুল বোঝা'র দরুণ গোড়াতেই তিনি তা' কোরতে পারেন নি; ভাল এখন ত সব মিট্‌মাট হোয়ে গেল তবে এখন স্বস্তি-বাচন পূর্ব্বক স্বাগত সম্ভাষণ কোরে আমার মতটিকে আদরের সহিত ঘরে নিয়ে যাওয়া হোক্—দরজা থেকেই হাঁকিয়ে না দেওয়া হয়!

সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে সাধারণ বিষয়ে ত এক রকম ঐক্য হোল, এখন বিশেষ বিশেষ বিষয়ে এমনি ভালয় ভালয় মতের মিল হোয়ে গেলে বড় খুসী হওয়া যায়। সম্পাদক মহাশয় ত বোল্লেন, "নির্ব্বিষ" স্ত্রী-স্বাধীনতার সঙ্গে তাঁর কোন মনান্তর নেই; এখন কাকে তিনি "নির্ব্বিষ স্ত্রী-স্বাধীনতা" বলেন, সেইটে মীমাংসা হোয়ে গেলেই আর অধিক বক্তব্য থাকে না। সম্পাদক মহাশয়ের লেখা দেখে বোধ হয়, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে আলাপ মাত্র হওয়া তাঁর মতে প্রার্থনীয় নহে, (১) কেননা "তাহাতে পাছে কুলোকে কুভাবে; সুলোকে কুভাবে ও স্বামীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পায়।" তা' যদি হয়, তা'হোলে বাইরের কিছু দেখবার জন্যে মহিলাদের অন্তঃপুর থেকে বের হওয়াও প্রার্থনীয় নয় কেননা পাছে তাতে কোরে "কুলোকে কুভাবে, সুলোকে কুভাবে, ও স্বামীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পাবার কোন কারণ ঘটে! (২)

---

১ ইহা কোন কালেই আমাদের অভিপ্রেত নহে,—আমরা প্রখর স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী—এই পর্য্যন্ত। প্রখর স্ত্রী-স্বাধীনতা কাহাকে বলে তাহার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই। সং

২ আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা নাই সুতরাং স্ত্রী-স্বাধীনতাকে কতরূপে যে মারপ্যাঁচ হইতে বাঁচাইয়া চলিতে হয় সে-বিষয়েও তাঁহাদের অভিজ্ঞতা নাই. এমত স্থলে যদি "স্ত্রী-স্বাধীনতা চাই-ই-চাই" এই ভাবটি তাঁহাদের মনের ভিতর প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে খেপাইয়া তোলা হয়, তবে যাঁহারা ঐ মতানুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। তাঁহারা স্ত্রী-স্বাধীনতার যে একটি ভাল আদর্শ আছে তাহা অমান্য করিয়া প্রখর স্ত্রী-স্বাধীনতার দিকেই আপনাদের সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি বল পৌরুষ প্রয়োগ করিবেন ইহা সম্ভব বোধ হয়; এই জন্য আমরা বলিতে চাই যে, যখনই স্ত্রী ও পুরুষদিগের মধ্যে মেলা মেশার কথা উত্থাপন করা হয়, তখনই এই বিষয়ে পাঠককে সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত যে,

তা' হোলে দাঁড়াচ্চে এই যে আমাদের দেশে স্ত্রীলোকের যতটুকু স্বাধীনতা আছে তা'ই "নির্ব্বিষ" স্বাধীনতা। কেন, তাঁদের ত নিশ্বাস ফেলবার স্বাধীনতা আছে, সেটা একটা "নির্ব্বিষ স্বাধীনতা;" হাই তোলবার ও পান সাজবার স্বাধীনতা আছে, সেটা আর একটা "নির্ব্বিষ স্বাধীনতা;" আহার করবার স্বাধীনতা আছে, যদি কেউ আড়ি কোরে তা'তে বিষ না মিশিয়ে দেয়, তাহোলে সেটাও একটা "নির্ব্বিষ স্বাধীনতা!" তা'হোলে ত আমাদের অনেক পরিশ্রম বেঁচে গেল, আর কিছু করবার নেই। কিন্তু সেইটে গোড়ায় বোল্লেই ত হোত। এটা কি রকম হোল জান? করুণরসে নিতান্ত উচ্ছ্বসিত হোয়ে একজন গরীবকে বলা হোল, "আমার পকেটে যা' আছে বাপু, সব তুই নে!" অথচ পকেটে একটি সিকি পয়সা মাত্র নেই। ভাগ্যি ছিল না, তাইত এতটা করুণ রসের কথা শোনা গেল। "পাছে কুলোক কুভাবে, ও সুলোক কুভাবে এই জন্যেই কোন স্ত্রীলোকের কোন পরপুরুষের সহিত মেশা অবৈধ" এর চেয়ে অযৌক্তিক কথা সচরাচর শোনা যায় না। এমন কি কাজ করা যেতে পারে যা' কুলোকে কু না ভাবতে পারে, এমন কি, সুলোকের কু ভাবতে আটক না থাকে। বল না কেন, আহার করা অবৈধ; দুধেতে প্রসিক আ-

স্ত্রীস্বাধীনতা মাত্রা অতিক্রম করিলে তাহা ঘোরতর বিষাক্ত হইয়া উঠে। সং

সিড মেশানো থাকতে পারে, মাছের ঝোলে খানিকটা আফিম গোলা থাকতে পারে, আর ভাতের মধ্যে খানিকটা হোর্ত্তেল থাকাও নিতান্ত অসম্ভব নয়। যদি সম্পাদক মহাশয় বোলতেন, পরপুরুষের সঙ্গে এমন কোরে মেশা কর্ত্তব্য নয় যা'তে কোরে সাধারণতঃ প্রকৃতিস্থ লোকে স্বভাবতই কু-ভাবতে পারে সে এক স্বতন্ত্র কথা হোত, কিন্তু পাছে লোকে কু ভাবে এই জন্যে একেবারে পর পুরুষের সঙ্গে মেশাই কর্ত্তব্য নহে এ যে বড় ভয়ানক কথা! যদি বল এমন স্থলে সাবধানে আহার করা উচিত, যেখানে খাদ্যে বিষ থাকবার যথার্থ সম্ভাবনা আছে, তা হোলে কথাটা মানি, কিন্তু খাদ্যে বিষ থাকা অসম্ভব নয় বোলে আহার বন্ধ কোর্ত্তে পরামর্শ দিলে আর যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তা' পালন করুন না কেন আমি করিনে! (৩) পাছে স্বামীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পায়," এ সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্ত কথাটা খাটে; অর্থাৎ পর-পুরুষের সহিত যদি এমন কোরে মেশা যায়, যা'তে কোরে স্বামীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পাবার সম্ভাবনা থাকে তা হোলে তার থেকে হানি হোতে পারে, নতুবা নয়! সম্পাদক মহাশয় বলেন "স্বামীর হয়ত এইরূপ একটা মাত্রা নির্দ্ধারিত আছে যে, পরপুরুষের

৩ স্ত্রী-স্বাধীনতা মাত্রা অতিক্রম করিলে তাহা দোষাক্রান্ত হয় ইহা লেখক স্বীকার করেন সে মাত্রা যে কতটুকু তাহা গড়ে জন সাধারণে বিদিত আছে—তাহার কোন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্ভবে না। সং

সহিত স্ত্রীলোকের এইটুকু মেলামেশাই ভাল তাহা অপেক্ষা বেশী ঘনিষ্ঠতা ভাল না, যে স্ত্রী স্বামীকে ভাল বাসে সেই স্ত্রী সেই মাত্রাটি অতিক্রম করিয়া স্বামীর মনে আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হইবে না ত কে হইবে?" সত্যইত! সচরাচর ত এমন হোয়েই থাকে। Jealous স্বামীরা পাছে মনে আঘাত পায় এই জন্যে ত য়ুরোপে অনেক হতভাগ্য রমণী ইচ্ছা কোরেই হোক বা শাসন-ভয়েই হোক্ সমাজে মেশে না। এখানেও অনেক সময়ে তাই ঘোট্‌বে। রমণীদের জীবন পর্য্যন্ত যখন স্বামীর ওপর নির্ভর করে তখন স্বামীর মন যুগিয়ে চল্‌বার জন্যে প্রাণ-পণ কোর্‌তে ভালবাসার না হোক্ দায়ে পোড়ে হয়। সম্পাদক মহাশয় বলেন "সে মাত্রা (মেলা মেশার মাত্রা) কতটুকু স্বামীই তাহা জানে, স্ত্রী তাহা জানে না;" সে কি কথা? স্ত্রী তাহা জানে না এমনো হয়? হোতে পারে, কোন স্ত্রী-বিশেষ কোন স্বামী-বিশেষের মনের ভাব ভাল কোরে বুঝতে পারে নি; কি করা যাবে বল? তার জন্যে তা'কে কষ্ট সইতেই হবে। কিন্তু তাই বোলে চুলটা কাট্‌তে মাথাটা কাট্‌বে কেবল? দু চার জনের জন্যে সকলে কষ্ট পাবে কেন? অন্তঃপুর-বদ্ধ এমন ত অনেক স্ত্রীলোক আছে যারা স্বামীর মনের ভাব ভাল কোরে আয়ত্ত কোর্ত্তে পারে নি বোলে পদে পদে কষ্ট পায়, তবে কি তুমি বিবাহটা একেবারে উঠিয়ে দেবে! অতএব কথা হোচ্চে এই যে, পর পুরুষের সহিত এমন কোরে মেশা উচিত নয় যা'তে কোরে স্বামীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পায় ও সাধারণতঃ প্রকৃতিস্থ কুলোক বা সুলোকে ন্যায্য-রূপে কু ভাবতে পারে। এতেও একটা "কিন্তু" আছে। লোকের কু ও সু ভাবা অনেক সময়ে আবার দেশাচারের ওপর নির্ভর করে। এক জন স্ত্রীলোক অতি ফিন্‌ফিনে শান্তিপুরে সাড়ি পোর্‌লে কুলোকেও কু ভাবে না, সুলোকেও কু ভাবে না, স্বামীর মনেও কু আশঙ্কা স্থান পায় না, কিন্তু সে যদি সেই ফিন্‌ফিনে সাড়িতে দৈবাৎ ঘোম্‌টা দিতে ভুলে যায়, তা হোলে কুলোকেও কু ভাবে, সুলোকেও কু ভাবে, আর স্বামীর মনেও হয়ত কু-আশঙ্কা স্থান পায়! অতএব নিরর্থক দেশাচারের পান থেকে একটু চুন খোস্‌লে যদি কু বা সুলোকে কু ভাবে, তা' হোলে সেটা গ্রাহ্য করা যাবে না। আজ আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে খোলা গাড়িতে একটু হাওয়া খেয়ে এলুম বোলে যদি লোকে কু বলে তা' তারা বলুক, কিন্তু যদি আমার স্ত্রী কোন একক পুরুষের বাড়িতে সমস্ত দিন বা রাত্রি যাপন কোরে আসে, তা' হোলে লোকে যদি কু ভাবে তা হোলে সে কু ভাবাকে যথার্থ একটু সমীহ কোরে চোল্‌তে হয়!

সম্পাদক মহাশয় নানা উদাহরণ প্রয়োগ কোরে, রাজকীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে যা বোল্লেন, সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার মতের ঐক্য হয়। উদ্ধত, গর্ব্বিত, বিকৃত নীচ-স্বভাব অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা আমাদের

যে রকম নীচু নজরে দেখে, তা'রা যে আপনাদের স্বজাতি-প্রচলিত গেল্যাণ্টি আমাদের পুরস্ত্রীদের প্রতি প্রয়োগ না কর্‌বে তা' আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু তা'তে বিশেষ কি এল গেল? স্ত্রী পুত্র পরিবার সমেত লাঙ্গুল নাড়্‌তে নাড়্‌তে একটা গর্ব্ব-স্ফীত অ্যাঙ্গ্লো-ইণ্ডিয়ানের পা চাট্‌তে যাবার প্রয়োজন কি? অধীনতার প্রতি আমাদের যে রকম অনুরাগ, খোসামোদ আমাদের যে রকম উপজীব্য হোয়ে উঠেছে, তা'তে হয়ত আমাদের অনেকে স্ত্রী কন্যা-গণকে স্বচ্ছন্দে এক জন শ্বেত-বদনের কাছে নিয়ে যাবেন, যদিও হয়ত নিজের কৃষ্ণ-চর্ম্ম বন্ধুর কাছে বের কোর্‌তে কুণ্ঠিত হবেন! সে রকম স্থলে তাঁরা ঠেকে শিখ্‌বেন। যদি আপনাদের নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করবার বল না থাকে তা হোলে না হয় ট্রেণে প্রভৃতি যাবার সময় বক্ষ সঙ্ক কোরে নিয়ে যাবেন, অ্যাঙ্গ্লোইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে সহস্র হস্ত দূরে থাক্‌বেন। আমি বলি কি, আমাদের আপনাদের বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষে পরস্পর মেলা-মেশা আলাপ-পরিচয় হোক্। নিমন্ত্রণ সভায় স্ত্রীলোকেরা উপস্থিত থাকুন! যেখানে নানা প্রকার বিষয় আলোচনা চোল্‌চে সেখেনে তাঁরাও যোগ দেন। এই প্রকারে সঙ্কীর্ণ-স্থান-বদ্ধ তাঁদের কুঞ্চিত মন বিস্তার লাভ করুক, স্বাধীন মুক্ত বায়ু সেবনে স্বাস্থ্য উপভোগ করুন।

ক্রমশঃ।

শকুন্তলা সমালোচনার সমালোচনা।

শকুন্তলার চরিত্র-সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন—

"আমরা বলিয়াছি যে রাজার চরিত্র সম্বন্ধে কালিদাসের কোন দোষ ঘটে নাই কিন্তু শকুন্তলার স্বভাব বর্ণনাতে তাঁহার ত্রুটি লক্ষিত হইতেছে।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে দুষ্যন্ত রাজার বেলায় কালিদাসের গুণ যা কিছু দেখা যায় তাহা প্রকৃত পক্ষে গুণ নহে তাহা দোষের অভাব মাত্র, কিন্তু শকুন্তলার বেলায় তিনি একেবারে চলাইয়াছেন—কি আক্ষেপ! লেখক বলিতেছেন—

"শকুন্তলা অতি সরল-স্বভাবা ও স্নেহ-ময়ী কিন্তু তাহার প্রকৃতি অতি লঘু।"

লেখকের এ কথাটি সর্ব্বতোভাবে সত্য না হউক্—কতকটা সত্য ইহাতে আর ভুল নাই—এইটুকু সত্য যে, শকুন্তলা ধৈর্য্যে বসুমতী নয়, গাম্ভীর্য্যে রত্নাকর নয়, বিজ্ঞতায় নবদ্বীপের টোলাধিপতি নয়—সে বেচারী একটি বনের ফুল—নূতন বসন্তের

বাতাস লাগিয়াছে তাই একটু বিচলিত হইয়াছে—এই তার অপরাধ! লেখকের হইয়া কেহ বলিতে পারেন যে, শকুন্তলার চরিত্র যেমন লঘু, তাহার ও-অপরাধটি তেমনি গুরু, কিন্তু শকুন্তলার হইয়া আমরা এইটুকু বলিতে ইচ্ছা করি যে, সে বেচারী দুষ্যন্ত রাজার বিচারে যথেষ্ট দণ্ডিত হইয়া শেষে নির্দ্দোষী সাব্যস্তে খালাস পাইয়াছে—তাহার চরিত্র-বিষয়ে কোন্ কালে একটা যে দোষের কথা উঠিয়াছিল সমস্তই চুকিয়া গিয়াছে—এখন ভারতে বিদিত যে শকুন্তলার বাস্তবিক কোন চরিত্র-ঘটিত দোষ ছিল না, প্রত্যুত শকুন্তলা "মূর্ত্তিমতী সৎক্রিয়া," তবে কেন পুনরায় আবার সে বেচারীকে বিচার-কর্ত্তার হুজুরে হাজির করিয়া অমন সুকুমার পুষ্পটির উপর এই এক নিদারুণ বজ্রাঘাত করা হয় যে, "তাহার প্রকৃতি অতি লঘু;" স্ত্রী-লোকদের লঘু-প্রকৃতি বড় ত ভাল কথা নহে; তবে যদি "লঘু-প্রকৃতি" শব্দটির অর্থ এরূপ হয় যে সে প্রকৃতি প্রেমের বশে পড়িলেই তাহাতে বিকৃতি উপস্থিত হয়, তা' যদি বল তবে প্রেমাসক্ত চিত্ত লঘু ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না; এ বিষয়ে সেক্স্‌পিয়রের রোমীও কি বলিতেছেন শোনা হোক্

"*Romeo.* with love's light wings did
I o'erperch these walls."

লেখকের বিচার-নৈপুণ্যের বিশেষ একটি চমৎকারিতা এই যে, তিনি করিতে চা'ন একটি—হইয়া দাঁড়ায় আর একটি—অথচ তাহাতে তাঁহার ভ্রুক্ষেপ নাই যথা,—তিনি প্রথমে বলিয়াছেন "শকুন্তলার স্বভাব বর্ণনাতে তাঁহার (কি না কালিদাসের) ত্রুটি হইয়াছে।" কেমন যে ত্রুটি হইয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন যে, "শকুন্তলা অতি সরলস্বভাবা ও স্নেহময়ী কিন্তু তাহার প্রকৃতি অতি লঘু" ইহাতে পাঠকের অবশ্য মনে হইতে পারে যে শকুন্তলার ঐ যে লঘু প্রকৃতি উহা একটা অতি বিশ্রী সামগ্রী; কিন্তু লেখক তাহার পরেই বলিতেছেন—না—তাহা নহে—শকুন্তলার লঘু-প্রকৃতি হওয়াই স্বাভাবিক; লেখকের অভিপ্রায় কালিদাসের ত্রুটি প্রদর্শন করা, কিন্তু ভুল-ক্রমে কালিদাসের বিচক্ষণতা দর্শন করিয়া ফেলিয়াছেন, যথা—

"রাজাকে দেখিবা-মাত্র শকুন্তলার মনে তপোবন-বিরোধী এক ভাব উদিত হইল। ইহাতে আমরা কোন দোষ দেখিতেছি না কারণ ইহা অসম্ভব নহে এবং ইহা দ্বারা শকুন্তলার সরলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সরলা বালার হৃদয় অতিশয় কোমল, তাহাতে প্রেম শীঘ্রই বদ্ধমূল হইয়া থাকে। এখানে আমরা ফর্ডিন্যাণ্ড ও মিরাণ্ডার কি ঘটিয়াছিল তাহা স্মরণ করিব। মিরাণ্ডা ফর্ডিন্যাণ্ডকে দেখিয়াই একবারে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল,(১)। শকুন্তলার স্বভাব প্রায় মিরা-

(১) ভাগ্যে ফর্ডিনাণ্ড প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল—তাই রক্ষে, নহিলে শকুন্তলার ঐ বিষয়টি—অর্থাৎ যে দেখা আর সেই প্রেমে মজিয়া যাওয়া ব্যাপারটি—তাঁহার

ওার মত, পর্ডিটার মতও বলা যাইতে পারে (২)।' বস্তুতঃ শকুন্তলা, মিরাণ্ডা, পর্ডিটা ইহাদের তিন জনেরই স্বভাব ও অবস্থা এক প্রকার। শকুন্তলা জন্মাবধি ঋষিদের কর্ত্তৃক তপোবনে প্রতিপালিতা; মিরাণ্ডাও শৈশবাবধি তাহার ঋষিকল্প পিতা প্রস্পেরো কর্ত্তৃক লালিতা, এবং পর্ডিটা অতি সরলচিত্ত রাখালদের গৃহে আজন্ম কাল বর্দ্ধিতা হইয়াছিল। আবার আরও একটী চমৎকার সৌসাদৃশ্য আছে, তিন জনেই উচ্চ বংশোদ্ভবা, কিন্তু তিন জনই হীনাবস্থায় পতিত। ইহাদের চরিত্রের মধ্যে যে সামান্য প্রভেদ আছে তাহা প্রত্যেকের অবস্থানুরূপ (৩)। মিরাণ্ডা তাহার পিতা ও এক অদ্ভুত ভৃত্য ব্যতীত আর জগতের কাহাকেও দেখে নাই এ জন্য তাহার সরলতাও বালিকাস্বভাব শকুন্তলা অপেক্ষা অধিক। পর্ডিটা ফ্লোরিজেলের সহিত পলায়ন করিল, কিন্তু আবশ্যক হইলে শকুন্তলাও করিত, কারণ যখন পিতৃআজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়া রাজাকে পতিত্বে বরণ করিল তখন যে পলায়ন করিবে ইহা ত সামান্য কথা (৪) অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ইহাদের স্বভাব এক প্রকারের।"

এই খানটা পাঠ করিয়া শকুন্তলার সম-দুঃখ-সুখী লোকদিগের মুখে ভয় দুঃখের বাদল কাটিয়া গিয়া হর্ষের চিহ্ন যেমন ফুটিয়া বাহির হইয়াছে—যেমন মনে হইয়াছে যে, তবে বুঝি অবলা বালাটি এ যাত্রায় নিষ্কৃতি পাইল, এই যেই মনে হওয়া—আর, কি ভয়ানক—অমনি কি বিকট মুখ-ব্যাদান করিয়া মহাবল-পরাক্রম এক কিন্তু আসিয়া উপস্থিত! দেখিয়া আশার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল, হর্ষের অন্তঃকরণ দমিয়া গেল; ভয়ে তাহারা থরহরি কম্প; কিন্তু-টা এই

"কিন্তু কালিদাস এমন মুগ্ধা সরলা বালার বর্ণনা যাহা করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয় নহে, এমন কি শকুন্তলার স্বভাববিরুদ্ধ।"—বাঃ।

যদি "প্রশংসনীয় নহে" তবে ইতি-পূর্ব্বেই বলা হইল কেন যে, "রাজাকে

লঘু প্রকৃতির গুরুতর একটি প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইত সন্দেহ নাই! সং

(২) এমন ধারা? তবে শকুন্তলার সাত খুন মাপ! সং

(৩) ইহাতে বুঝাইতেছে যে, প্রত্যেকের অবস্থা স্বতন্ত্র, কিন্তু উপরে লেখক বলিয়াছেন যে, "তিন জনের স্বভাব ও অবস্থা একই প্রকার"—কোন্‌টা ঠিক? সং

(৪) উপযুক্ত পাত্রে শকুন্তলা সমর্পিত হয় ইহা কণ্বমুনির একান্ত বাসনা—শকুন্তলা তাহা জানিত—তাহাতে আবার অন্য কেহ নয় রাজা দুষ্মন্ত—সোনার উপর সোহাগা, তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতে শকুন্তলার মনে "কিন্তু" উপস্থিত হইবে—কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার সহিত পলায়ন করিতে কিছুমাত্র বাধা মনে হইবে না—এরই নাম সেই মানব-প্রকৃতি যাহা লেখক অতি উত্তম জানেন, আর কালিদাস আদবে জানিতেন না। সং

দেখিবামাত্র শকুন্তলার তপোবন-বিরোধী এক ভাব উদিত হইল ইহাতে আমরা কোন দোষ দেখিতেছি না কারণ ইহা অসম্ভব নহে এবং ইহা-দ্বারা শকুন্তলার সরলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সরলা বালার হৃদয় অতি কোমল তাহাতে প্রেম শীঘ্রই বদ্ধমূল হইয়া থাকে” ইত্যাদি। লেখকের অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে ভাল গুণ গুলি অনাবিধ গুনের সহিত মিশ্রিত হওয়াতে তাহাদের উল্‌টা শ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তিনি বলেন—

“প্রথম অঙ্কে শকুন্তলাকে মুগ্ধা সরলা স্নেহময়ী দেখা যায়, চতুর্থ অঙ্কে যখন শকুন্তলা সকলের নিকট বিদায় লইতেছে তখন অবিকল সেই স্বভাব এবং পঞ্চম অঙ্কেও সেই রূপ; ইহাতে কবির যা অভিপ্রায় তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সে অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ আচরণ অনেক স্থলে বিশেষত তৃতীয় অঙ্কে দৃষ্ট হইয়া থাকে। শকুন্তলা যখন রাজাকে ছাড়িয়া যাইতেছে তখন তাহার আচরণ সরলার ন্যায় নহে। কুশ দ্বারা চরণ ক্ষত হইয়াছে বলিয়া কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিল এবং শাখাতে বল্‌কল লগ্ন হইয়াছে এই ছলে রাজার প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। এই সকল ব্যাপার চতুরা প্রগল্‌ভা রমণীর শোভা পায় কিন্তু শকুন্তলার পক্ষে অত্যন্ত মন্দ। শকুন্তলা ও তাহার সখীগণ নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রেম কি বস্তু তাহা কতক বুঝিয়াছিল, কিন্তু তাহা বলিয়া এরূপ পরিপক্কতা পাইয়াছে ইহা নিতান্ত অসম্ভব। হিন্দুমহিলারা শালীনতার জন্য জগতে প্রসিদ্ধা। কালিদাসের বর্ণনাতে, সেরূপ শালীনতা নাই শকুন্তলা যেন লজ্জার মাথা খাইয়াছে।”

ইহার ভিতরকার কথাটি আমরা তবে একটু খুলিয়া দিই,—“শকুন্তলার মনে প্রেম হইয়াছে প্রেমই হইয়াছে, প্রেম লইয়া দিব্য আরামে ঘরে চলিয়া যা'ক্, তা নয়—রাজার দিকে ফিরে চাহিতেছে, তা-ও আবার চাহিতেছে কি চাহিতেছে না তাহা বুঝা ভার, যদি চাহিতে হয় ত স্পস্ট করিয়া চা—না চাহিতে হয় চলিয়া যা—সরলা বালার মত কাজ কর্; সাধ করিয়া শাখায় বস্ত্র বাধানো, কুশে চরণ বিঁধানো—এ সব ত চতুরা রমণীর কাজ।” প্রেম-বিষয়ে লেখকের যেরূপ ব্যুৎপত্তি, এই ত তাহা আমরা দেখিলাম—সেক্সপিয়র ও-বিষয়টা কিরূপ বুঝিতেন তাহা নিম্ন-দৃষ্টে প্রকাশ পাইবে—

Juliet. By whose direction found'st thou out this place?
Romeo. By love who first did prompt me to enquire
He lent me counsel and I lent him eyes

ইউরোপীয় কন্দর্প অন্ধ তাই রোমীওর এ কথাটি খুব ঠিক্ বলিয়াছে; উহার অর্থ এই যে, কন্দর্প আমাকে তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়াছেন আমি কন্দর্পকে আমার চক্ষু-দুটি দিয়াছি; ইহার তাৎপর্য্য এই যে,আমি আপনার বুদ্ধিতে চলিলে এখানে আসিতে পারিতাম না, আমি কন্দর্পের মন্ত্রণা-অনুসারে

এখানে আসিয়াছি,সে মন্ত্রনা এমনি কার্য্যকারী যে আমার চক্ষুতে আর আবশ্যক হয় নাই; আমার চক্ষু আমি কন্দর্পকে দিয়াছি, সে-ই আমার নেতা হইয়া আমাকে এখানে আনিয়াছে; আমি এক প্রকার চক্ষু বুজিয়া আসিয়াছি তাই আমার সম্মুখস্থিত বিঘ্নরাশি আমি দেখিয়াও দেখি নাই—চক্ষু মেলিয়া দেখিলে হয় ত আমি ভয়ে আসিতে পারিতাম না। লেখক এইটি ভাল করিয়া বুঝুন যে, প্রেমের মন্ত্রনা-অনুসারে রোমীও পাঁচিল টপ্‌কাইয়াছিল—আপনার বুদ্ধিতে নহে; তেমনি প্রেমের মন্ত্রনা-অনুসারে শকুন্তলা ওরূপ শাখা-কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইল, কুশ দ্বারা ক্ষত-চরণ হইল,—বড় যে একটা চতুরা রমণী তাহা বলিয়া নহে;—প্রেম বৃহন্নলা সারথী, শকুন্তলা কেবল উত্তর বেচারা; যেমন বৃহন্নলা-সারথী যুদ্ধ জয় করাতে উত্তরের যুদ্ধজয় করা হইয়াছিল, তেমনি প্রেম-মন্ত্রী কল-কৌশল খেলাতে শকুন্তলার কল-কৌশল খেলা হইয়াছে—এই পর্য্যন্ত, কিন্তু ইহাতে আর ভুল নাই যে, উত্তরও যেমন যোদ্ধা পুরুষ, শকুন্তলাও সেইরূপ প্রগল্‌ভা রমণী। আসল কথাটা এই,—শকুন্তলা যখন রাজাকে ছাড়িয়া যায় তখন শকুন্তলার মনে প্রেমের নিদারুণ একাধিপত্য—রাজাকে তাহার কত কি কথা বলিবার আছে—মুখে তাহা ব্যক্ত করা নিতান্ত প্রগল্‌ভতার কার্য্য, এজন্য চোখে চোখে কথা কহিবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে—ইচ্ছা হইতেছে যে যদি কাপড়টা গাছে বাধিয়া যায় ত ভাল হয়,—শকুন্তলা তাহার সেই প্রবল ইচ্ছার টানে পড়িয়া গাছে কাপড় বাধাইয়া ফেলিল, এই যা' কিছু,—একজন চতুরা স্ত্রীর ন্যায় কৌশল খেলিয়া রাজার মন বশ করিতেও যায় নাই, আর হাব-ভাব প্রদর্শনের দোকানদারী দ্বারা আপনার রূপ-লাবণ্যের মূল্য চড়াইতেও যায় নাই। লেখক বলিয়াছেন যে "ফুৎকারের ভরে যেমন তৃণখণ্ড উড়িয়া যায়, শকুন্তলা সেইরূপ অল্পতেই অধীরা হয়" ইহার উত্তর এই যে, প্রেমের বল বড় অল্প নহে—দেখিতে ফুৎকার কিন্তু ঝটিকা তাহার নিকট পরাভব মানে, রোমিওকে এমনি উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল যে তাহাকে বলিতে হইয়াছে

"With love's light wings did I o'er-perch these walls :"

ইহার নাম যদি হয় "ফুৎকারের ভরে উড়িয়া যাওয়া" তবে সেক্সপিয়রের গ্রন্থ হইতে তাহার এক উত্তর এই পাওয়া যায় "He jests at scars who never felt the wound." লেখকের দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটিও চমৎকার, তিনি বলেন,

"শকুন্তলার বর্ণনাতে আরও একটী মহৎ দোষ আছে। গোপনে শকুন্তলা রাজার পাণিগ্রহণ করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করিল। ইহা দ্বারা তাহার চরিত্র হেয় জ্ঞান হয়। সরলচিত্ত লোকেরা গুপ্তকার্য্য পাপ বলিয়া জ্ঞান করে; শকুন্তলা অসঙ্কুচিতচিত্তে যে এরূপ গুরুতর গুপ্তকার্য্য করিল ইহা স্বভাব-বিরুদ্ধ এবং আজন্মকাল তপোবনে সাধুসঙ্গে

থাকিয়া শকুন্তলা যে নীতিশিক্ষা পাইয়াছিল তাহারও বিরুদ্ধ। ইহাতে আমরা স্পষ্ট রূপে দেখিতেছি যে কালিদাস মানব হৃদয় সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারেন নাই।”

শকুন্তলার ইহা ধ্রুব-জ্ঞান ছিল যে, কণ্ব মুনি তাহাকে যেরূপ উপযুক্ত পাত্রে সমর্পন করিবার জন্য অভিলাসী দুষ্যন্ত-রাজা তাহার একটি অসামান্য আদর্শ, তাহাতে আবার শকুন্তলার হৃদয়ে প্রেমের পরাকাষ্ঠা আবির্ভূত, এরূপ স্থলে দুষ্যন্ত রাজার পাণিগ্রহণে যদি শকুন্তলাকে বঞ্চিত হইতে হয় তবে শকুন্তলার পক্ষে তাহা মৃত্যু তুল্য। শকুন্তলা এমনি এক বিষম দায়ে পড়িয়াছে যে, রাজার নিকট অচিরাৎ আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করা ভিন্ন তাহার আর উপায়ান্তর নাই—তাহা হইলে আপাতত সংশয়ের দোলা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াও ত বাঁচে,—তাহার যেমন রাজার প্রতি মন গিয়াছে, রাজার তেমনি তাহার প্রতি মন গিয়াছে কিনা ইহা জানিয়াও ত সুস্থির হয়। শকুন্তলার মন যদিও আশার দিকেই অধিক ঝুঁকিয়া রহিয়াছিল কিন্তু তথাপি দৈবাৎ যদি অভীষ্ট সিদ্ধির কোন ব্যাঘাত উৎপন্ন হয় তবে তাহার জীবন-সংশয় উপস্থিত হইবে, এই কারণে তাহাকে অতীব শঙ্কিত চিত্তে থাকিতে হইয়াছিল,—তাহার সাক্ষী

“শকুন্তলা। হলা চিন্তেমি অহং। অবহীরণভীরুকং পুণো বেবই মে হিঅয়ং।

(সংস্কৃত) হলা চিন্তয়ামি অহং। অবধীরণ-ভীরুকং পুনর্ব্বেপতে মে হৃদয়ং।

গঙ্গা নদীতে ভাঁটার সময় দক্ষিণা বাতাসের ঝড় উঠিলে যেমন তুমুল তরঙ্গ-উত্থিত হয়, শকুন্তলার মনে সেইরূপ এক দিকে আশার একটানা স্রোত আর এক দিকে শঙ্কার বিষম উদ্‌বেগ দুয়ের কোস্তাকুস্তিতে বিপর্য্যয় তুফান বাধিয়াছে, রাজার সহিত মিলন ব্যতীত এ রোগের আর দ্বিতীয় ঔষধি নাই। রাজার সহিত যখন মিলন হইল তখন রাজা আপনি গান্ধর্ব্ব বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, সে প্রস্তাবে শকুন্তলা কেন যে সম্মত না হইবে, এবং সম্মত হইয়াছিল বলিয়া কেন যে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ইহার অর্থ বুঝা ভার। পাত্র যদি উপযুক্ত হয় এবং দুই পক্ষের প্রেম যদি সমান হয়, তাহা হইলে বিবাহ করিতে দোষ কি—তা সে গোপনেই হউক্ আর প্রকাশ্যেই হউক। বিবাহ শুভ কার্য্য—আনন্দের ব্যাপার, তাহা অসঙ্কুচিত চিত্তে করা হইবে না—অতীব সঙ্কুচিত চিত্তে করিতে হইবে—ইহারই বা অর্থ কি? তবে যদি লেখক বলেন যে, গান্ধর্ব্ব বিবাহ বিবাহই নহে—সে কথার অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। বিবাহ বৈধ হয় কিসে? দেশের আইন অনুসারে বিবাহ হইলে লোকতঃ তাহা বৈধ—এবং দুই পক্ষের পরস্পর যথার্থ প্রেমাসক্তি সত্ত্বে উপযুক্ত পাত্রের সহিত বিবাহ হইলে ধর্ম্মতঃ তাহা বৈধ; সুতরাং দুষ্যন্ত রাজার সহিত শকুন্তলার ঐ যে বিবাহ উহা লোকত ধর্ম্মত—সর্ব্বতই—বৈধ; তবে লেখকের মতে গোপনে বিবাহ করাটা

অন্যায় হইয়াছে—কেন না "সরল চিত্ত লোকেরা গুপ্ত-কার্য্য পাপ বলিয়া জ্ঞান করে," লোকে বলে বিবাহ শুভ-কার্য্য কিন্তু হইলে হইবে কি—তাহা যে গোপনে নিষ্পন্ন হইয়াছে, অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে তাহা পাপ কার্য্য ; এই সিদ্ধান্তটি আজিকের কালের অনেক রাজা রাজড়ার কাজে লাগিতে পারে ; তাঁহারা অনেককে অনেক অর্থ দান করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা গোপনে সেরূপ কার্য্য করিতে নিতান্ত নারাজ—অতীব সরল-চিত্তে তাঁহারা তাঁহাদের দান-কার্য্য সংবাদ পত্রে ঘোষণা করিয়া থাকেন ; ইহাঁরা এখন অবধি এই বাক্যটি বেদবাক্য মনে করিবেন সন্দেহ নাই যে, যাঁহারা গোপনে দান ধ্যান তপস্যা বা অন্য কোন শুভ অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা অতি অসরল-চিত্ত লোক এবং তাঁহাদের সে কার্য্য পাপকার্য্য! শকুন্তলার আজন্ম কাল হইতে না হউক্, যৌবন কালের প্রথম উন্মেষ হইতে কণ্ব-মুনি এবং অন্যান্য আশ্রম বাসিদিগের মধ্যে একথাটির বিলক্ষণই আন্দোলন চলিয়াছে যে শকুন্তলা যেমন রূপবতী গুণবতী এবং উচ্চ-বংশীয়া কন্যা, তেমনি একটি উপযুক্ত পাত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিতে হইবে, দুষ্মন্ত-রাজার সহিত শকুন্তলার সখীদ্বয়ের প্রথম আলাপ স্থলেই কণ্ব মুনির উক্ত মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত আছে, সুতরাং কণ্ব মুনির অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করা দূরে থাকুক, তাঁহার সাধের আশাটিকে শকুন্তলা চিরাভিলষিত ফলে ফলবতী করিয়াছে ; যদি শকুন্তলা কণ্ব মুনির অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করিত, অথবা লোকতঃ কিম্বা ধর্ম্মতঃ অবৈধ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত তাহা হইলে লেখকের এই যে মহা শাসন বাক্য—যে "শকুন্তলা অসঙ্কুচিত চিত্তে যে এরূপ গুরুতর গুপ্ত-কার্য্য করিল ইহা স্বভাব-বিরুদ্ধ এবং আজন্মকাল তপোবনে সাধু সঙ্গে থাকিয়া যে নীতি-শিক্ষা পাইয়াছিল তাহারও বিরুদ্ধ" ইহার একটা অর্থ আছে বুঝিতাম। আর যে তিনি বলিয়াছেন যে, কালিদাস মানব প্রকৃতি জানেন না, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার অত আয়াস পাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না—কেননা কালিদাসের আপনার কথাতেই আপনি ধরা পড়িয়াছেন—তিনি শকুন্তলা-গ্রন্থের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন যে, "বলবদপি শিক্ষিতানাং আত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ" অতিমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের চিত্তেরও আপনার প্রতি প্রত্যয় হয় না ; কিন্তু লেখক যথেষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন যে, তাঁহার ন্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিরও আপনার কথার উপর পাঁচ কাহন প্রত্যয় বর্ত্তমান,—তিনি জানেন যে, তিনি ঐ যে মস্ত কথাটা মুখে উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহার একটুও লজ্জিত হইবার প্রয়োজন নাই ; ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে কালিদাস সে-কালের মানব প্রকৃতি যতই জানিয়া থাকুন না কেন, এ কালের মানব প্রকৃতির—নিকটেও তিনি ঘেঁসিতে পারেন নাই। কালিদাস যদি মানব প্রকৃতি বুঝিতেন তাহা হইলে শকু-

ন্তলার প্রেম তাহাকে (শকুন্তলাকে) ওরূপ জ্বালাইয়া তুলিত না, রাজার সহিত যদি বা তাহার মিলনেচ্ছা হইত কিন্তু তৎপরে অমনি আবার এইরূপ একটা "কিন্তু" উদয় হইত, যথা—

"কিন্তু রাজার সহিত মিলন প্রার্থনীয় নহে," এবং এইরূপ একটি জ্ঞানগর্ব্ভ যুক্তি ঐ কিন্তুটির পোষকতা করিত, যথা—"তাড়াতাড়ি করিবার প্রয়োজন নাই; সবে এই প্রথম বারের দেখা, এই রূপ আর দশ-বিষ বার দেখা সাক্ষাৎ হইতে হইতে যখন এমন সুসময় আসিবে যে, স্বচ্ছন্দে সকলকে বলিয়া কহিয়া বিবাহ করিবার আর কোন বাধা থাকিবে না, সেই সময়টির জন্য প্রতীক্ষা করা কর্ত্তব্য, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে সময়টি আসে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভাবনা চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া পূর্ব্বেকার ন্যায় সুখে কাল-যাপন করা ভাল;"—এরূপ শান্ত-শিষ্ট ভদ্রলোক-গোচের প্রেম যে, মানব-প্রকৃতিতে সম্ভবে ইহা কালিদাস জানিতেন না, তাই তিনি একটা চঞ্চল অধীর হাড়-জ্বালানিয়া প্রেমকে আসরে নাবাইয়াছেন—জানিলে তিনি কখনই ওরূপ করিতেন না, অতএব তাঁহাকে আর বেশী কিছু বলিয়া কাজ নাই,—হাজার হো'ক তিনি এক জন বড় কবি ত বটেন—অন্ততঃ জগতের লোকে ত তাঁহাকে এক জন প্রধান কবি বলিয়া জানে—এস্থলে ক্ষমাই বিধি। লেখক অতঃপর বলিতেছেন

"সেক্সপিয়ার এরূপ দোষে লিপ্ত নহেন। মিরাণ্ডার মনে প্রেমের সঞ্চার প্রথমেই হইয়াছিল বটে কিন্তু পিতার আজ্ঞা পাইয়া তবে ফর্ডিন্যাণ্ডকে পতিত্বে বরণ করে; পর্ডিটা ফ্লোরিজেলের সঙ্গে পলায়ন করিয়াও বিবাহ করে নাই। ইহাদের প্রেমের ভাব শকুন্তলা অপেক্ষা কতদূর উন্নত এবং রমণীয় তাহা সহৃদয় মাত্রেই স্বীকার করিবেন। এখানে আমরা দেখিতেছি যে মিরাণ্ডা ও পর্ডিটার অপেক্ষা শকুন্তলার সাহস অধিক। ইহার কারণ যে শকুন্তলা প্রেমে একেবারে উন্মত্তা ও অধীরা হইয়াছিল। ঐ উন্মত্ততা বশতঃ সে রাজার প্রেমে অসংকুচিতচিত্তে আত্মবিসর্জ্জন করিল, ইহা নিতান্ত গর্হনীয় এবং আমাদের হৃদয়গ্রাহি নহে। কালিদাসের প্রেম কি রূপ তাহা আমরা কিছু সবিস্তরে বলিব সে জন্য এখানে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।"

মিরাণ্ডার মনে প্রথমেই প্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল অতএব শকুন্তলার মনে প্রথমেই সঞ্চার হওয়াটা খুব ভাল হইয়াছে,—কিন্তু তা'ও বলি, দৈবক্রমে যদি মিরাণ্ডার মনে একটু দেরিতে প্রেমের সঞ্চার হইত তাহা হইলে শকুন্তলার ঐ যে প্রেম, যাহা এখন সোনার দরে বিকাইতেছে তাহা মাটির দরেও বিকাইত না; মিরাণ্ডার মনের উপর প্রস্পেরোর জাদু মন্ত্রের চাবুক না পড়িলে হয় ত ঐরূপ বিপদ ঘটিত—ঘটিত না যে তাহা কে বলিতে পারে? সরস্বতীর চরণে কোটি কোটি প্রণাম যে, তিনি সেক্সপিয়রের মাথায় প্রস্পে-

রোর বাহু-ব্যাপারটা নিঃশ্বসিত করিয়া দিয়া কালিদাসকে ঐ একটি মহাবিপদ হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন—সেক্সপিয়র তাঁহার যেমন প্রিয়পুত্র কালিদাসও ত সেই রূপ বটেন—মাতার স্নেহ কোথায় যাইবে! তবে কি না ইহার মধ্যেও একটা কিন্তু আছে, যথা, "কিন্তু পিতার আজ্ঞা পাইয়া তবে ফর্ডিনাণ্ডকে পতিত্বে বরণ করে;" লেখকের মত এই যে, যে প্রেম মনুষ্যকে পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করে, সে প্রেম মহাকবির লেখনীর উপযুক্ত নহে—সেক্সপিয়র সেরূপ দুর্ব্বিনীত প্রেমের সহিত কোন কারবার রাখেন নাই; লেখক যখন এরূপ বলিতেছেন তখন তাঁহারই কথা অবশ্য ঠিক্; কত যে ঠিক্ তাহা নিম্ন লিখিত সেক্সপিয়রের কয়েকটি পংক্তিতে দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইবে যথা—

Ferdinand * * * what is your name?

Miranda-Miranda.—O my father! I have broke your hest to say so."

শকুন্তলা যদিও তাহার পিতার অভিপ্রায়ের প্রতিকূলাচরণ করে নাই, কিন্তু লেখকের মতে তাহাতে বিশেষ কিছু আইসে যায় না; শকুন্তলা যখন কণ্ব মুনির বাচনিক আদেশ পায় নাই—অথচ দুষ্যন্ত রাজার সহিত বিবাহ-সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে.—তখন তা' অপেক্ষা কবিত্ব-দোষ আর কি হইতে পারে? এই জায়গাটায় সরস্বতী বোধ হয় মনে করিয়া থাকিবেন যে, পিতার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া বরং তাহার অনুমোদিত পথে পদার্পণ করা আজ্ঞা পালনেরই সামিল—কিন্তু ওরূপ বৃথা প্রবোধ-বাক্যে লেখক ভুলিবার পাত্র নহেন। কণ্ব-মুনিকে তীর্থ পর্য্যটনে পাঠানটাই কালিদাসের অন্যায় হইয়াছে—কেন না কণ্ব-মুনি আশ্রমে উপস্থিত থাকিলে সরস্বতী আগে ভাগে তাঁহার বাচনিক আজ্ঞাটার জোগাড় করিয়া রাখিতে পারিতেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে সরস্বতীর যতটুকু সাধ্য তাহাই তিনি করিয়াছেন—যা' হোক্ গতস্য শোচনা নাস্তি। মিরাণ্ডা যদি আর একটু বুদ্ধিমতী হইত—সে যদি তাহার পিতার মনোগত অভিপ্রায়টি অবগত হইত—আর সেই অভিপ্রায়ানুসারে ফর্ডিনাণ্ডকে পতিত্বে বরণ করিত—পিতার বাচনিক আজ্ঞার অপেক্ষা না করিত—তাহা হইলে কি যেভাল হইত তাহা বলা যায় না, তাহা হইলে কালিদাস একেবারেই বেকসুর খালাস পাইতেন—যা' হো'ক এখন যে তাঁহার পক্ষে চারি-আনা ডিক্রী বারো আনা ডিস্‌মিস্ হইয়াছে ইহাই কালিদাসের পরম সৌভাগ্য। শকুন্তলা যদি দুষ্যন্ত-রাজাকে বিবাহ না করিয়া তাঁহার সহিত পলায়ন করিত তাহা হইলে শকুন্তলার শালীনতা বলো, নীতিজ্ঞান বলো, মনের ধীর-প্রকৃতি বল, প্রেমের উচ্চ আদর্শ বল, সকল দিকই রক্ষা পাইত; যদি কারণ জিজ্ঞাসা কর—উত্তর,—কারণ যা' তা' একটি বই দুটি নয় কিন্তু তাহার গুরুত্ব অপরিসীম,—কারণ শুধু এই যে, পর্ডিটা ফ্লোরিজেলের সহিত বিবাহ না করিয়া

তাহার সহিত পলায়ন করিয়াছিল। পর্ডিটা ফ্লোরিজেলের সহিত পলায়ন করিতে সাহসী হইয়াছিল, কিন্তু—তাহার সাহস শকুন্তলা অপেক্ষা অনেক কম, পর্ডিটার প্রেম শুধু হইয়াছিল মাত্র—কিন্তু সে প্রেমে সে অধীরাও হয় নাই, উন্মত্তাও হয় নাই, তবে কি না সচরাচর লোকের মন যেমন-ধারা দেখা যায়, তা' অপেক্ষা তার মনের নাড়িটা কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইয়াছিল, তাই সে ফ্লোরিজেলের সঙ্গে পলায়ন না করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে নাই,—কিন্তু!—সে অধীরা হয় নাই! শকুন্তলা ঠিক্ পর্ডিটা কিংবা মিরাণ্ডার মত হইলে আর তাহাকে অধীরা বলিবার জো থাকিত না; কিন্তু হইলে হইবে কি শকুন্তলা-বেচারীর উভয়-সংকট; ও-বেচারী যদি লেখকের লেখনী-বাণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে চায় তবে দুষ্যন্তকে পাইবার আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হয়, আর যদি দুষ্যন্তকে পাইতে চায়, তবে লেখকের বাণ-বর্ষণ হইতে আর কিছুতেই নিস্তার নাই—এরূপ বিপদে মানুষেও পড়ে! প্রকৃত কথা এই যে ফ্লোরিজেলের সহিত পর্ডিটার যখন তখন দেখা সাক্ষাৎ হইতেছে ও কথা-বার্ত্তা চলিতেছে; তাহারা এবিষয়ে নিশ্চিন্ত আছে যে, আর যাহা কেন হউক্ না দোঁহার প্রতি দোঁহার প্রেম কখনই ঘুচিবার নহে; কিন্তু শকুন্তলা দুষ্মন্ত রাজাকে আর কখন দেখিতে পাইবে কি না তাহা সে কিছুই জানে না; এ অবস্থায় শকুন্তলা বেচারী অধীরা না হইয়া করে কি? শকুন্তলা কি এই বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে যে, "কালে ভদ্রে আবার যদি কখনো রাজার সহিত আমার দেখা সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি আমাকে ভাল বাসেন কিনা ও আমার পাণিগ্রহণ করিতে সম্মত হ'ন কি না তাহা জানা যাইবে, এখন তা' ভেবে আর হ'বে কি—কাজ কর্ম্ম করিগে যাই।" প্রকৃত কথা এই যে, শকুন্তলার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে যে রাজার মুখে এই কথাটি একবার সোনে যে, রাজার প্রতি তাহার যেরূপ তাহার প্রতিও রাজার সেইরূপ আন্তরিক আসক্তি হইয়াছে, প্রেমের সঙ্গে এইরূপ একটা উদ্বেগ লাগিয়া থাকাতে শকুন্তলার মন অশান্তির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে; দাবানলের সঙ্গে প্রবল বায়ু লাগিয়া-থাকাতে যেমন বনের মধ্যে একটা তুমুল কাণ্ড হইতে থাকে, শকুন্তলার মনের মধ্যে সেইরূপ হইতেছে; এ অবস্থায় কোন্ মানব-প্রকৃতি-বিদ্যার বৃহস্পতি শকুন্তলাকে চুপ করিয়া বসাইয়া রাখিতে পারেন? রাজার সহিত মিলনের ইচ্ছা শকুন্তলার মনে এমনি বলবতী হইয়াছে যে তাহা শকুন্তলাকে চিটি পর্য্যন্ত লিখাইয়াছে—প্রেম বলিতেছে "হয় চিটি লেখো নয় দুষ্যন্তকে পাইবার আশায় জলাঞ্জলি দেও" শকুন্তলা চিটি না লিখিয়া করে কি? যদি লেখকের সুবিজ্ঞ রুচি সেখানে উপস্থিত থাকিত তবে সে শকুন্তলাকে নিষেধ করিয়া বলিত "কর কি? রাজাকে পাইবার আশায় জলাঞ্জলি দিলেই-বা তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি নাই কিন্তু চিটি লেখা

কোন মতেই হইতে পারে না। কিন্তু হায় এ সকল অতিবৃদ্ধ পিতামহের জ্ঞান-গর্ব্ভ উপদেশ শুনে কে? ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে "Wisdom cries in the streets but nobody hears it." কি করা যায়—মানব প্রকৃতি! রোমীও যখন পাঁচিল ডিঙাইতে যাইতেছে তখন কি তাহার মনের এক কোণেও এ কথাটি স্থান পাইয়াছিল যে, ছি ছি ছি কি অভদ্র আচরণেই আমি প্রবৃত্ত হইতেছি, চোরের মত এক জন গৃহস্থের বাড়িতে লুকাইয়া প্রবেশ করিতেছি—কি লজ্জাকর কার্য্য! রাজার সহিত যখন শকুন্তলার মিলন হইল যখন শকুন্তলা জানিতে পারিল যে রাজা তাহাকে যথার্থই ভাল বাসেন ও গান্ধর্ব্ব বিধানানুসারে রাজা তাঁহাকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করিবেন, তখন তাহার অধীরতার বিষ টুকু চলিয়া গেল, পরে যে অধীরতাটি অবশিষ্ট রহিল তাহা সেই মিষ্ট রকমের অধীরতা যাহার নাম প্রেম, সে অধীরতা পডিটারও হইয়াছিল মিরাণ্ডারও হইয়াছিল—মানব-প্রকৃতিতে ওরূপ হইয়া থাকে, পাষাণ প্রকৃতিতে উহা আমল পায় না। লেখক দিব্য একটি টিপ্‌পনি দিয়াছেন, যথা—

" অনেকে বলেন যে সেক্‌সপেয়ারের কোন কোন নায়িকা এই রূপ। জুলিয়েটের সহিত শকুন্তলার সাদৃশ্য আছে। জুলিয়েট এই রূপে ধৈর্য্যশূন্য হইয়া কায়মনোবাক্যে রোমিওর ভাবনাতে মগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু এখানে বক্তব্য যে জুলিয়েটের অবস্থা এবং শকুন্তলার অবস্থাতে অনেক প্রভেদ আছে। জুলিয়েট যখন নির্জ্জনে রোমিওর কথা আন্দোলন করিতেছিল তখন অতি গোপনে অলক্ষিত ভাবে রোমিও শুনিতে পাইয়া দুষ্মন্তের ন্যায় আত্ম প্রকাশ করে। কিন্তু শকুন্তলা আবার কামাতুরা জুলিয়েটকে জিনিয়াছে। কারণ রাজার নিকট লিপি পাঠাইতে উদ্যতা হইয়াছিল। "

লেখকের যুক্তির দৌড়টা কোন্ দিকে তাহা এতক্ষণে আমরা জানিতে পারিলাম, যথা,—পডিটা এবং মিরাণ্ডার সহিত শকুন্তলার কোন কোন অংশে সাদৃশ্য আছে অতএব প্রমাণ হইল যে, তাহাদের সহিত শকুন্তলার কোন অংশে অবস্থা-বৈচিত্র সম্ভবে না। সুতরাং পর্ডিটা এবং মিরাণ্ডা বা তদবস্থাপন্ন অন্য কোন রমণী ভিন্ন আর কাহারো সহিত শকুন্তলার কোন অংশে অবস্থা-সাদৃশ্য সম্ভবে না; কিন্তু লেখকের এইটি জানা উচিত যে পর্ডিটার সহিত ফ্লোরিজেলের বিশেষরূপ আলাপ পরিচয় হইয়াছে, উভয়ের মন উভয়ের নিকট জানা শুনা হইয়াছে, দুষ্যন্তের সহিত শকুন্তলার এখনো তেমন-ধারা ঘনিষ্ঠতা হয় নাই—এই গেল পর্ডিটার সহিত শকুন্তলার অবস্থা-বৈষম্য; আর মিরাণ্ডা ও ফর্ডিনাণ্ডের পরস্পরের প্রথম দেখা সাক্ষাৎ হওয়া অবধি তাহারা ক্রমাগত একত্রে রহিয়াছে বলিলেই হয়, ও তাহাদের যথেষ্ট মন খোলাখুলি হইয়া গিয়াছে; কিন্তু শকুন্তলা এখনো রাজার মন বুঝিতে পারে

নাই, কেন না রাজার সহিত মন খোলা-খুলি করিয়া কথাবার্ত্তা কহে—এখনো তাহার অবসর পায় নাই ; মিরাণ্ডার সহিত শকুন্তলার মিলে না,—যৎকিঞ্চিৎ যা মিলে তা' জুলিয়েটের সহিত, কেন না জুলিয়েটও রোমীওর সহিত এখনো (অর্থাৎ তাহাদের দ্বিতীয় বারের মিলনের পূর্ব্বে) মনখোলাখুলি করিতে পারে নাই ; জুলিয়েটও পুনর্মিলনের জন্য নিদ্রা তন্দ্রা বর্জ্জিত, শকুন্তলাও তাহার জন্য একেবারে যায় যায় অবস্থা প্রাপ্ত ; জুলিয়েটের সহিত শকুন্তলার এইরূপ অবস্থা-সাদৃশ্য ; কিন্তু লেথকের মতে তাহা সঙ্গত নহে ;—একবার যখন তাঁহার লেখনী হইতে এই কথাটি বাহির হইয়াছে যে, কতক-গুলি বিষয়ে শকুন্তলার সহিত মিরাণ্ডা এবং পর্ডিটার মিল আছে, তখন সেই লেখনী দিয়া আবার কেমন করিয়া বাহির হইবে যে, প্রেমের বাধা-প্রাপ্তি এবং তজ্জনিত তাহার অধীর পরাক্রম—এ বিষয়ে শকুন্তলার অবস্থা জুলিয়েটের ন্যায়,—এ ত হইতে পারে না, অতএব শকুন্তলা পর্ডিটা এবং মিরাণ্ডা তিন জনের অবস্থা এক ছাঁচে ঢালা ইহার একটুও ব্যত্যয় হইতে পারে না ! লেথক এতই যদি ঐ তিন নায়িকার সাদৃশ্য-প্রিয় তবে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার পরিবর্ত্তে ফর্ডিনাণ্ড-মিরাণ্ডা কিম্বা ফ্লোরিজেল্-পর্ডিটা বসাইয়া শকুন্তলার একটা নূতন সংস্করণ করিলেই ত ভাল হয়, কালিদাসের শকুন্তলার একটা কোন প্রকার গতি করা ত উচিত ! লেথক শকুন্তলার প্রতি তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়া গতব্যথ হইয়াছেন আগামী বারের ভারতীতে আমরা তদ্বিষয়ে আমাদের মতামত প্রকাশ করিতে মানস করি।

দুদিন।

আরম্ভিছে শীতকাল, পড়িছে নীহার জাল
শীর্ণ বৃক্ষশাখা যত ফুল পত্র হীন ;
অর্দ্ধমৃত পৃথিবীর মুখের উপরে
বিষাদে প্রকৃতি মাতা,শুভ্র বাষ্পজালে গাঁথা
কুজ্ঝটি-বসন খানি দেছেন টানিয়া ;
পশ্চিমে গিয়াছে রবি স্তব্ধ সন্ধ্যাবেলা,
বিদেশে আসিনু শ্রান্ত পথিক একেলা।

রহিনু দুদিন
এখনো রোয়েছে শীত—বিহঙ্গ গাহেনা গীত
এখনো ঝরিছে পাতা পড়িছে তুহিন।
বসন্তের প্রাণ-ভরা চুম্বন পরশে
সর্ব্ব অঙ্গ শিহরিয়া পুলকে আকুল হিয়া
মৃত শয্যা হোতে ধরা জাগেনি হরষে।
এক দিন দুই দিন ফুরাইল শেষে
আবার উঠিতে হোল চলিনু বিদেশে।

এক খানা ভাঙ্গা লঘু মেঘের মতন
কত গিরি হোতে গিরি বেড়াতেছি ফিরিফিরি
যে দিকে লইয়া যায় অদৃষ্ট পবন।
আসিলাম একবার শুভদৈব বলে
ফুলে ফুলে ভরা এক হরিত অচলে।
রহিনু দুদিন—
সাঁঝের কিরণ পিয়া—নির্ঝরের জলে গিয়া
ইন্দ্রধনু নিরমিয়া খেলিলাম কত,
ডুবে গেনু জোছনায়, আঁধার পাথার প্রায়
বসালেম তারা শত শত।

ফুরালো দুদিন—
সহসা আরেক দিকে বহিল পবন
দুদিনের খেলা ধুলা ফুরালো আমার
আবার—আরেক দিকে চলিনু আবার।

এই যে ফিরানু মুখ চলিনু পূরবে,
আর কি গো এ জীবনে ফিরে আসা হবে ?
কত মুখ দেখিয়াছি দেখিব না আর—
ঘটনা ঘটিবে শত, বরষ বরষ কত
জীবনের পর দিয়া হোয়ে যাবে পার ;
হয় ত গো এক দিন অতি দূর দেশে
আসিয়াছে সন্ধ্যা হোয়ে,বাতাস যেতেছে বোয়ে
একেলা নদীর তীরে রহিয়াছি বোসে,
হুহু কোরে উঠিবেক সহসা এ হিয়া,
সহসা এ মেঘাচ্ছন্ন স্মৃতি উজলিয়া
একটি অস্ফুট রেখা, সহসা দিবেক দেখা
একটি মুখের ছবি উঠিবে জাগিয়া,
একটি গানের ছত্র পড়িবেক মনে
দুয়েকটি সুর তার উদিবে স্মরণে !
অবশেষে একেবারে সহসা সবলে
বিস্মৃতির বাঁধগুলি ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া ফেলি
সে দিনের কথা গুলি বন্যার মতন
একেবারে বিপ্লাবিয়া ফেলিবে এ মন।

পাষাণ মানব মনে লহিবে সকলি।
ভুলিব, যতই যাবে বর্ষ বর্ষ চলি—
কিন্তু আজ দুদিনের তরে হেথা এনু,
একটি কোমল হৃদি ভেঙ্গে রেখে গেনু।

তার সেই মুখ খানি কাঁদো কাঁদো মুখ,
এলানো কুন্তল জালে ছাইয়াছে বুক,
বাস্পময় আঁখি দুটি, অনিমিষ আছে ফুটি
আমারি মুখের পানে ; অঞ্চল লুটিছে—
থেকে থেকে উচ্ছ্বসিয়া কাঁদিয়া উঠিছে,
সেই সে মুখানি, আহা করুণ মুখানি—
সুকুমার কুসুমটি—জীবন আমার—
বুক চিরে হৃদয়ের হৃদয় মাঝার
শত বর্ষ রাখি যদি দিবস রজনী
মেটেনা মেটেনা তবু তিয়াষ আমার ;—
শত ফুল দলে গড়া সেই মুখ তার
স্বপনেতে প্রতিনিশি হৃদয়ে উদিবে আসি
এলানো কুন্তল জাল আকুল নয়ন।
সেই মুখ সঙ্গী মোর হইবে বিজনে—
নিশীথের অন্ধকার আকাশের পটে
নক্ষত্র তারার মাঝে উঠিবেক ফুটে
ধীরে ধীরে রেথা রেথা সেই মুখ তার
নিঃশব্দে মুখের পানে চাহিয়া আমার।
চমকি উঠিব জাগি শুনি ঘুম ঘোরে
"যাবে তবে ? যাবে" সেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে।
সাহারার অগ্নিশ্বাস একটি পবনোচ্ছ্বাস
স্নিগ্ধচ্ছায়া সুকুমার ফুল বন পরে
বহিয়া গেলাম চকি মুহূর্ত্তের তরে—
কোমলা যূথীর এক পাপড়ি খসিল
ম্রিয়মান বৃন্ত তার নোয়ায়ে পড়িল।

ফুরালো দুদিন—

শরতে যে শাখা হোয়েছিল পত্র হীন
এ দুদিনে সে শাখা উঠেনি মুকুলিয়া।
অচল শিখর পরি যে তুষার ছিল পড়ি
এ দুদিনে কণা তার যায় নি গলিয়া,
কিন্তু এ দুদিন মাঝে একটি পরাণে
কি বিপ্লব বাধিয়াছে কেহ নাহি জানে !—
ক্ষুদ্র এ দুদিন তার শত বাহু দিয়া
চিরটি জীবন মোর রহিবে বেষ্টিয়া !
দুদিনের পদ চিহ্ন চিরকাল তরে
অঙ্কিত রহিবে শত বরষের শিরে !

শ্রী দিক্ শূন্য ভট্টাচার্য্য।

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র।

আমরা এখন লণ্ডন ত্যাগ কোরে এসেছি। লণ্ডনের জন-সমুদ্রে জোয়ার ভাঁটা খেলে তা' জান ? বসন্তের আরম্ভ থেকে গর্ম্মির কিছুদিন পর্য্যন্ত লণ্ডনের জোয়ার অর্থাৎ Season ; এই সময়ে লণ্ডন উৎসবে পূর্ণ থাকে, থিয়েটার, নাচ, গান, প্রকাশ্য ও পারিবারিক "বল," আমোদ প্রমোদে চারদিক ঘেঁসাঘেঁসি ঠেলাঠেলি। ধনীলোকদের বিলাসিনী মেয়েরা রাতকে দিন কোরে তোলে। আজ তাদের নাচের নেমন্তন্ন, কাল ডিনারের নেমন্তন্ন, পশু থিয়েটরে যেতে হবে, তশু রাত্তিরে ম্যাডাম প্যাটির গান শুনতে যেতে হবে, দিনের চেয়ে রাত্তিরের ব্যস্ত ভাব। সুকুমারী

মহিলা, যাঁরা দু-পা চোল্লে হাঁপিয়ে পড়েন, ছুটো কাজ কোরলে চোক উলটে চৌকিতে এলিয়ে পড়েন, একটু গরম হোলে অবসন্ন হোয়ে পাখার বাতাস খেয়ে খেয়ে সারা হন, যাঁদের সুখ শান্তির জন্য শত শত মহিলা-সেবকেরা দিন রাত্রি প্রাণ পণ কোরচেন; চৌকিটা সরিয়ে দেওয়া, প্লেটটা এগিয়ে দেওয়া, দরজাটা খুলে দেওয়া, মাংসটা কেটে দেওয়া, পাখাটা কুড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি উপায়ে যাতে কুসুম-সুকুমার-তনু অবলাদের তিলমাত্র শ্রম স্বীকার না কোর্ত্তে হয়, তার চেষ্টা কোরচেন, তাঁরা রাত্তিরের পর রাত্তির নটা থেকে ভোর চারটে পর্য্যন্ত গ্যাসের ও মানুষের নিশ্বাসে গরম ঘরের মধ্যে অবিশ্রান্ত নৃত্য কোরচেন; সে আবার আমাদের দেশের মত অলস নোড়ে চোড়ে বেড়ানো বাইনাচের মত নয়, অনবরত ঘুরে ঘুরে দৌড়ে বেড়ানো; একে শ্যাম্পেনের তরঙ্গ মাথায় গিয়ে আবর্ত্ত তুলেছে, তা'তে আবার এই অবিশ্রাম ঘুরপাক, এতে মহা মহা জোয়ান পুরুষের মাথা ঘোরবার কথা, (পুরুষদের আবার দুরকম মাথা ঘোরে, শ্যাম্পেন ও ঘুরপাকে বাইরের মাথা ও পার্শ্বস্থ সুন্দরী সহনর্ত্তকীর মধুর হাসির প্রভাবে ভিতরের মাথা ঘুরে যায়) এ রকম স্থলে ললিতা বালিকারা কি রকম কোরে টি'কে থাকেন, আমি তা'ই ভাবি; এ পরিশ্রমটা তাঁদের নিজে কোর্ত্তে হয়, কোন মহিলা-ভক্ত পুরুষ তাঁদের হোয়ে নেচে দেয় না। এই ত গেল আমোদ প্রমোদ, তা' ছাড়া এই সময়ে পার্লামেণ্টের অধিবেশন হয়; ব্যাঙের একতান স্বর, নাচের পদশব্দ, ডিনার টেবিলের হাস্যালাপ-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে একটা political কোলাহল লণ্ডনের প্রাসাদারণ্য ধ্বনিত কোর্ত্তে থাকে। আমরা নির্জ্জীব পর-রাজ্যবাসী জাতি, এখানকার political উত্তেজনা না দেখলে হয় ত বুঝতে পারিনে। রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল দলভুক্তরা প্রতি রাত্রের পার্লামেণ্টের রাজনৈতিক-মল্লযুদ্ধের বিবরণ কি আগ্রহের সঙ্গে পোড়তে থাকে, (এমন কি দোকানদার ও গাড়োয়ান পর্য্যন্ত), এক একটা রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে কত সভার সৃষ্টি হয়, ও কত তুমুল সংগ্রাম বাধে, Conservative ও Liberal রা দুই পক্ষেই দুই-পক্ষের দুর্ব্বল স্থান কি যত্নের সঙ্গে দিনরাত্রি অনুসন্ধান ও আক্রমণ কোরচে, সে ভাব আমাদের উত্তেজনা-শূন্য ঝিমন্ত দেশে দুই প্রহরের রৌদ্রে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে হাই তুলতে তুলতে কল্পনা করা একেবারে অসম্ভব। Season এর সময় লণ্ডন এই রকম নানা প্রকার উত্তেজনায় সরগরম থাকে। তার পরে আবার ভাঁটা পোড়তে আরম্ভ হয়, লণ্ডনের কৃষ্ণপক্ষ আসে। তখন লণ্ডনের আমোদ কোলাহল বন্ধ হোয়ে যায়, লোকজন চোলে যায়; কেবল অল্প স্বল্প লোক, যা'দের শক্তি নেই বা দরকার আছে, বা বাইরে যাবার ইচ্ছে নেই তারাই লণ্ডনে পোড়ে থাকে। যখন লণ্ডনে season নয়, তখন লণ্ডন থেকে চোলে যাওয়া একটা fashion। আমি একটা বইয়ে (Sketches and Travels in London

Thackeray) পোড়েছিলুম, যে এক পরিবার বাড়ির সুমুখে দরজা জানলা সব বন্ধ কোরে বাড়ির পেছন দিকের ঘরে লুকিয়ে চুরিয়ে বাস কোর্ত্ত, তার কারণ, অন্য লোকেরা তা'হোলে মনে কোরবে যে Season-এর সঙ্গে সঙ্গে তারা লণ্ডন ছেড়ে চোলে গেছে। Season ফুরিয়ে গেলে লণ্ডনে মুখ দেখাতে হয়ত অনেকের লজ্জা করে, সুতরাং লণ্ডন শূন্য-প্রায় হোয়ে আসে। South Kensington বাগানে যাও; ফিতে, টুপি, পালক, রেশম, পশম ও গাল-রং-করা-মুখের সমষ্টিরা চোক ঝোলসে প্রজাপতির ঝাঁকের মত বাগান আলো কোরে বেড়াচ্চে না; মহা মহা সুন্দরীরা অশ্ব ও রথের উপর থেকে পদাতিকদের প্রতি কটাক্ষের শতঘ্নী বর্ষণ কোরচেন না, কুঞ্জচ্ছায়ায় প্রণয়ী যুগল ফুস ফুস কোরে কথা কইতে কইতে আপনাদের তুলনায় পৃথিবীর আর সকল লোককে হতভাগা মনে কোরচে না; বাগান তেমনি সবুজ আছে, সেখেনে তেমনি ফুল ফুটছে কিন্তু তা'র জীবন্ত শ্রী চোলে গিয়েছে। গাড়ি ঘোড়া লোকজনের হিজিবিজি ঘুচে গিয়ে লণ্ডনটা পরিষ্কার হোয়ে গেছে।

সম্প্রতি লণ্ডনের Season ভেঙ্গে গেছে, আমরাও লণ্ডন ছেড়ে Tunbridge Wells বোলে একটা পাড়াগাঁর মত জায়গায় এসেছি। অনেক দিনের পর পাড়াগাঁয়ের বাতাস খেয়ে বাঁচা গেল। লণ্ডনের বাতাসের মত বাতাস কোথাও দেখলেম না। হাজার হাজার chimney অর্থাৎ ধূম-প্রণালী থেকে অবিশ্রান্ত পাথুরে কয়লার ধোঁয়া ও কয়লার গুঁড়ো উড়ে উড়ে লণ্ডনের বাতাসের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ কোরেছে। ক্ষণও লণ্ডনের রাস্তায় বেড়িয়ে এসে হাত ধুলে সে হাত-ধোয়া জলে বোধ করি কালীর কাজ করা যায়, কয়লার গুঁড়োয় বাতাস এমন ভরপুর। নিশ্বেসের সঙ্গে অবিশ্রান্ত কয়লার গুঁড়ো টেনে মাথায় একস্তর কয়লা জোমে যায়; ও মাথার ঘিয়ে ও কয়লার গুঁড়োয় মাথাটা বোধ হয় অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ হোয়ে দাঁড়ায়। অনেক দিনের পরে এখানকার সূক্ষ্ম বাতাস টেনে লণ্ডনের ভার-গ্রস্ত বাতাসের প্রভেদ বুঝতে পারচি। Tunbridge Wells অনেক দিন থেকে তার লৌহ-পদার্থ মিশ্রিত স্বাস্থ্যকর উৎসের জন্যে বিখ্যাত। এই উৎসের জল খাবার জন্যে এখানে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। আমরা এখেনে এসে কল্পনা কোরলেম উৎসটা না জানি কি সুন্দর দৃশ্য হবে। চার দিকে পাহাড় পর্ব্বত গাছপালা থাকবে, "সারস-মরাল-কুলকূজিত, কনক-কমল-কুমুদ-কহ্লার বিকসিত সরোবর" "কোকিল কূজন," "মলয়-বীজন" "ভ্রমর গুঞ্জন" দেখতে ও শুনতে পাব, ও অবশেষে এই মনোরম স্থানে বসন্ত-সখার পঞ্চশরের প্রহার খেয়ে ও এক ঘটি জল খেয়ে বাড়ি ফিরে আসবো। ও হরি! গিয়ে দেখি, একটা হাটের মধ্যে একটা ছোটো গর্ত্ত পাথর দিয়ে বাঁধানো, সেখেনে একটু একটু কোরে জল উঠছে, একটা বুড়ি একটা কা-

চের গেলাস হাতে দাঁড়িয়ে আছে!—একটা বুড়ি!—একটি গজেন্দ্র-গমনা, বিম্বোষ্ঠী, কম্বুকণ্ঠী, শুকচঞ্চু-নাসা, কেশরী-মধ্যা, কোকিল-ভাষিণী, মধুর হাসিনী, বিলাসিনী ষোড়শী নলিনী পত্রের ঠোঙা হাতে কোরে দাঁড়িয়ে নেই, ("ঠোঙা" কথাটা বড় 'গ্রাম্য' হোয়ে পোড়ল, ওর সংস্কৃতটা কি?) একটা গাউন জুতো পরা বুড়ি এক এক পেনী নিয়ে কাঁচের গেলাসে কোরে জল বিতরণ কোচ্চে ও অবসর মতে একটা খবরের কাগজে গত রাত্রের পার্ল্যামেন্টের সংবাদ পোড়ছে। চার দিকে দোকান বাজার; গাছ পালার কোন সম্পর্ক নেই; সুমুখেই একটা কশাইয়ের দোকান, সেখেনে নানা চতুষ্পদ ও দ্বিপদের মধ্যে, "হংস মরাল কুলের" ডানা ছাড়ানো মৃত দেহ দড়িতে ঝুলচে; এই সব দেখে আমার মন এমন চোটে উঠলো যে, আমার কোন মতে বিশ্বাস হোল না যে, এ জল খেলে আমার কোন প্রকার রোগ নিবারণ হবে বা শরীরের কোন প্রকার উন্নতি হবে।

Tunbridge Wells কতকটা পাড়াগাঁয়ের মত। এটা একটা পাহাড়ে জায়গা। এখেনে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। এখানকার আকাশ মুখ-গোঁ-করা নয়, বাড়ি গুলো অনাতিথ্য ভাব-সূচক নয়, পথিক দের মুখ ঘোরতর ব্যস্তভাবময় নয়, রাস্তা গুলো ঘর্ঘর-ধ্বনিত পাষাণ-হৃদয় নয়। আসল সহরটা খুব ছোটো, দুপা বেরোলেই গাছ পালা মাঠ জঙ্গল দেখতে পাওয়া যায়। সহরটা অবিশ্যি কতকটা লণ্ডনের ছাঁচে গড়া। বাড়ি গুলো লণ্ডনের মত থাম-বারন্দা শূন্য, ঢালু-ছাত ওয়ালা সারি সারি এক ঘেয়ে ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে; অত্যন্ত শ্রীহীন দেখতে। দোকান গুলো তেমনি সুসজ্জিত,পরিপাটী,কাঁচের জানলা দেওয়া। কাঁচের ভিতর থেকে সাজানো পণ্য দ্রব্য দেখা যাচ্চে; কসাইয়ের দোকানে কোন প্রকার কাঁচের আবরণ নেই, চতুষ্পদদের আস্ত আস্ত শ্রীচরণ ঝুলচে, ভেড়া, গরু, শুওর বাছুরের নানা অঙ্গ নানা প্রকার ভাবে চোখের সামনে টাঙ্গিয়ে রাখা হোয়েছে, হাঁস প্রভৃতি নানা প্রকার বিচিত্র মরা পাখী লম্বা লম্বা গলাগুলো নীচের দিকে ঝুলিয়ে আছে, আর খুব একটা জোয়ান ভুঁড়িওয়ালা ব্যক্তি হাতে একটা প্রকাণ্ড ছুরি নিয়ে কোমরে একটা আঁচলের মত কাপড় (apron) ঝুলিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বিলেতের ভেড়া গরুগুলো তাদের মোটা সোটা মাংস চর্ব্বিওয়ালা শরীরের জন্যে ও সুস্বাদের জন্য বিখ্যাত, যদি কোন মানুষ-খেগো সভ্য জাত থাকৃত, তা' হোলে বোধ হয় বিলেতের কসাই গুলো তাদের হাটে অত্যন্ত মাগ্গি দামে বিকোত; আমি একটা কসাই রোগা দেখিনি, এমন জোয়ান মোটা ভীষণাকার জানোয়ার খুব অল্প আছে। এখানকার কসাইয়ের দোকান গুলো দেখ্লে আমার গা শিউরে ওঠে, এখানকার সূক্ষ্ম স্নায়ু বিশিষ্ট বিবিরা এ দৃশ্য কি কোরে সহ্য করেন, বোলতে পারিনে। অনেক বিবি ইচ্ছে কোরে বাজার কোর্ত্তে আসেন। ফলের

দোকানে বা তরকারীর দোকানে সক্ কোরে বাজার কোর্ত্তে পারা যায়; কিন্তু কশাইয়ের দোকানের মত অমন নিষ্ঠুর জায়গায় ভদ্রলোকদের কোমল-হৃদয়া মেয়েরা কি কোরে সাধ কোরে আ-সেন আমি তাই ভাবি; সকলি অভ্যেস। এক জন বিবি বলেন যে, কশাইয়ের দোকান দেখ্‌লে তাঁর মনে বেশ তৃপ্তি হয়; তাঁর মনে হয় যে, দেশে আহারের অপ্রতুল নেই, দেশের পেট ভরবার মত খাবার প্রচুর আছে, দুর্ভিক্ষের কোন সম্ভাবনা নেই। ইংরেজদের খাবার টেবিলে যে রকম আকারে মাংস এনে দেওয়া হয়, তাতেও কেমন অহৃদয়তা প্রকাশ পায়; কেটে কুটে মস্‌লা দিয়ে মাংস তৈরি কোরে এনে দিলে এক রকম ভুলে যাওয়া যায় যে, একটা সত্যিকার জন্তু খেতে বোসেছি; কিন্তু মুখ পা বিশিস্ট একটা আস্ত প্রাণীকে অবিকৃত আকারে টেবিলে এনে দিলে একটা জীবন্ত প্রাণীর মৃত দেহ খেতে বোসেছি বোলে গা কেমন কোর্‌তে থাকে। কশাইয়ের দোকানের ওপর অনেক কথা বল্লুম, কেননা বিলেতে এসে অবধি আমার ঐটের ওপর অত্যন্ত ঘৃণা আছে, সেই ঝাল ঝাড়্‌তে গিয়ে কথাটা অত্যন্ত বিস্তৃত হোয়ে পোড়্‌ল। নাপিতের দোকানের জানলায় নানা প্র-কার কাঠের মাথায় নানা প্রকার কোঁক্‌-ড়ানো পরচুলো বসান রোয়েছে, দাড়ি গোঁফ ঝুল্‌চে, শত শত মার্কা মারা শিশিতে টাক-নাশক চুল উঠে-যাওয়া-নিবারক শত প্রকার অব্যর্থ ওষুধ রোয়েছে; দীর্ঘকেশী মহিলারা এই দোকানে গেলে সেবকেরা (সেবিকা নয়) তাঁদের মাথা ধুয়ে দেবে, চুল বেঁধে দেবে, চুল কুঁক্‌ড়ে দেবে, এবং এই রকম নানা প্রকার বাহার কোরে দিতে পারে। এখেনে মদের দোকান গুলোই সব চেয়ে জম্‌কালো দেখ্‌তে, সন্ধ্যের সময় সে গুলো আলোয় আলোয় আলাকীর্ণ হোয়ে যায়, বাড়িগুলো প্রায় প্রকাণ্ড হয়, ভিতরটা খুব বড় ও সাজানো, ও খোদ্দেরের ঝাঁক দোকানের বাইরে ও ভিতরে সর্ব্বদাই বিশেষতঃ সন্ধে বেলায় লেগে থাকে। দরজীর দোকানও মন্দ নয়। নানা ফেষানের কোট্ প্যাণ্ট্‌লুন কাঁচের জানলার ভিতর থেকে দেখা যাচ্চে, বড় বড় কাঠের মূর্ত্তিকে কাপড় পরিয়ে সাজিয়ে রাখা হোয়েছে; মেয়েদের কাপড় চোপড় এক দিকে সাজানো; সে সকল নানা প্রকার সাজ সজ্জা টুক্‌রো টাক্‌রা আমার মত এক জন বিদেশী Bachelorএর কাছে ঘো-রতর রহস্য, তার মধ্যে দন্তস্ফুট করা আ-মার সাধ্য নয়; এই খানে যে কত লুব্ধ নেত্র দিন রাত্রি তাকিয়ে আছে তার সংখ্যা নেই; সাজ সজ্জার দিকে সকল দেশের মেয়েদেরই সমান টান। এখানকার বি-লাসিনীরা, যাদের নতুন ফেষানের দামী কাপড় কেন্‌বার টাকা নেই, তারা দোকানে এসে দামী কাপড়গুলো ভাল কোরে দেখে যায়, তার পরে বাড়িতে গিয়ে সস্তায় নি-জের হাতে তৈরি করে। এখানকার দো-কান বাজার গুলো এই রকম লণ্ডনের

ছাঁচে তৈরি। আমাদের বাড়ির কাছে একটা খোলা পাহাড়ে জায়গা আছে; সেটা Common অর্থাৎ সরকারী জায়গা; চারদিক খোলা, বড় গাছ খুব অল্প; ছোট ছোট গুল্মের ঝোপ, ও ঘাসে পূর্ণ, চারদিক সবুজ, বিচিত্র গাছ পালা নেই বোলে কেমন ধূধূ কোর্‌চে, কেমন বিধবার মত চেহারা, উঁচু নিচু জমী, কাঁটাগাছের ঝোপ ঝাপ, জায়গাটা আমার বেশ লাগে; মাঝে মাঝে এই রকম কাঁটা খোঁচা এব্‌ড়ো থেব্‌ড়োর মধ্যে এক এক জায়গায় একরকম ছোট ছোট নীল ফুল ঘেঁসাঘেঁসি ফুটে সবুজের মধ্যে স্তূপাকার নীল রং ছড়িয়ে রেখেছে, কোথাও বা ঘাসের মধ্যে শাদা শাদা ডেজি ও হোল্‌দে বাটার-কপ্‌ এক রাশ্‌ ফুটে রোয়েছে, চারদিকে এই রকম একটা অনুর্ব্বর সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাচ্চে। মাঝে মাঝে ঝোপ ঝাপের মধ্যে ও গাছের তলায় এক একটা বেঞ্চি রোয়েছে, এইটে সাধারণের বেড়াবার জায়গা। কি ভাগ্যি গাছ পালা বসিয়ে এটা বাগান কোরে তোলা হয় নি, "আশ্রম-বাসিনী" প্রকৃতিকে সাজিয়ে গুজিয়ে "শুদ্ধান্ত" যোগ্যা কোরে তোলা হয় নি। এখানে মানুষ এত অল্প ও জায়গা এত বড়, যে মানুষের ঘেঁসাঘেঁসি নেই, লণ্ডনের বড় বড় বেড়াবার বাগানের মত যে দিকে চাই সেই দিকেই ছাতা-হস্ত, টুপি-মস্তক চোক-ধাঁধক ভিড়ের চারদিক থেকে আনা গোনা নেই; দূর দূর বেঞ্চীর মধ্যে নিরালা যুগলমূর্ত্তি রোদ্দুরে এক ছাতার ছায়ায় বোসে আছে; কিম্বা হাত ধরাধরি কোরে নিরিবিলি বেড়াচ্ছে, পাছে পাশের লোক শুনতে পায় বোলে গলা নাবিয়ে কথা কইতে হোচ্চে না কিম্বা প্রাণ খুলে হাসির ব্যাঘাত হোচ্চে না। যাঁরা বলেন, গাছ পালা লতা পাতা ঘাস গুল্ম কেবল ছাগল গরুদের কাছেই আমোদ জনক, আরক্ত কপোল, আকর্ণ চক্ষু, আকুঞ্চিত কুন্তলের দিকেই যাঁদের আন্তরিক টান, তাঁরাও যে এখেনে এসে নিতান্ত নিরাশ হবেন, তা'নয়; তাই বল্‌চি সবশুদ্ধ জড়িয়ে Common জায়গাটা খুব উপভোগ্য। এখনো গর্ম্মিকাল শেষ হয় নি। এখেনে গর্ম্মিকালে সকাল ও সন্ধে অত্যন্ত সুন্দর। গর্ম্মির পূর্ণ যৌবনের সময় রাত দুটো তিনটের পরে আলো দেখা দিতে আরম্ভ করে, চারটের সময় রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ কোর্ত্তে থাকে ও রাত্রি নটা দশটার আগে দিনের আলো নেভে না। আমি একদিন ৫ টার সময় উঠে Common এ বেড়াতে গিয়েছিলুম। উঁচু একটা পাহাড়ের ওপর একটা গাছের তলায় গিয়ে বোস্‌লুম, দূরে ছবির মত সহর দেখা যাচ্চে, একটি লোকও তখন ওঠে নি, একটুও কোয়াষা নেই, চারদিক অত্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্চে। ঘুমন্ত সহরটা খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। তার নির্জ্জন রাস্তাগুলি, গির্জ্জের উন্নত চূড়া, রৌদ্র-রঞ্জিত বাড়িগুলি নীল আকাশের পটে যেন একটি অতি স্পষ্ট ছবির মত আঁকা! খুব ভাল লাগ্‌চে বটে কিন্তু ভাল লাগার প্রধান কারণ হোচ্চে, একটা

সহরের ঘুমন্ত ভাব কল্পনা করা! একটা ঘুমন্ত গ্রামের চেয়ে একটা ঘুমন্ত সহরের গাম্ভীর্য্য আছে; পরিশ্রম,নড়া চড়া, ও যুঝা-যুঝি বোলে একটা প্রকাণ্ড দৈত্য অসহায় শিশুটির মত ঘুমিয়ে আছে, তার কপাল থেকে ভাবনার ভ্রূকুঞ্চন মিলিয়ে গেছে; মুখের একটা দৃঢ় ভাব চোলে গিয়েছে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো শিথিল হোয়ে এলিয়ে পোড়েছে। দিনের বেলায় আফিসের মূর্ত্তিতে যাঁকে খারাপ দেখাচ্ছিল এই ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর মুখেই একটু সৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছে দেখে আমার ভাল লাগে, নইলে আসলে এই সহরটা কিছুই ভাল দেখতে নয়, এখানকার বাড়িগুলো আমি দুচক্ষে দেখতে পারিনে। জানলা-কাটা-কাটা চারটে দেয়াল, একটা ঢালুছাত ও তার ওপরে ধোঁয়া বেরোবার কতকগুলো কুশ্রী নল হোচ্চে এখানকার বাড়ির বাহ্য আকার; এ আর কি ভাল দেখাবে বল! ক্রমে ক্রমে যতই বেলা হোতে লাগল শত শত chimney থেকে অমনি ধোঁয়া বেরোতে লাগল, ধোঁয়াতে ক্রমে সহরটা অস্পস্ট হোয়ে এল, রাস্তায় ক্রমে মানুষ দেখা দিলে, গাড়ি ঘোড়া বেরোতে আরম্ভ হোল, হাতগাড়ি কিম্বা ঘোড়ার গাড়িতে কোরে দোকানীরা মাংস রুটি তরকারী বাড়িতে বাড়িতে বিতরণ কোরে বেড়াতে আরম্ভ কোরলে, (এখানে দোকানীরা বাড়িতে বাড়িতে জিনিষ পত্র দিয়ে আসে,) ক্রমে Common এ লোক জোমতে আরম্ভ হোল, আমি বাড়ি ফিরে এলেম।

আমার এখানে একটি সাধের বেড়াবার জায়গা আছে আমি সেখেনে রোজ বিকেলে বেড়াতে যাই। সেটা একটা পাড়াগাঁর রাস্তা, পাথর দিয়ে বাঁধানো কিম্বা খুব সমতল করা নয়, গাড়ির চাকার দাগে এবড়ো খেবড়ো উঁচু নিচু পাহাড়ে রাস্তা, দুধারে black-berrey ও ঘন লতা গুল্মের বেড়া, বড় বড় গাছে ছায়া কোরে আছে, রাস্তার আশে পাশে ঘাস উঠেছে, ও ঘাসের মধ্যে daisy প্রভৃতি বুনো ফুল ফুটে আছে, পাড়াগাঁয়ের ছোটলোকেরা ধুলো কাদা মাখানো ময়লা কোট প্যাণ্টলুন ও ময়লা মুখ নিয়ে আনাগোনা কোরচে (বর্ণনার এ অংশটা বড় romantic হোল না,) ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলো তাদের লাল লাল ফুলো-ফুলো মুখে বাড়ির দরজার বাইরে কিম্বা রাস্তায় খেলা কোরচে, এমন মোটাসোটা গোলগাল ছেলে কোন দেশে দেখিনি; তাদের গাল দুটোর অযথা প্রাদুর্ভাবে নাক ও চোক নিতান্ত হীন অবস্থায় উপত্যকার অন্ধকারে পোড়ে আছে,হাত পা গুলো অত্যন্ত মোটা, গাল দুটো অত্যন্ত লাল, এক একটা জীবন্ত মাংসের ঢিবি আর কি। এক একটা বাড়ির কাছে ছোট ছোট পুকুরের মত আছে, সেখেনে পোষা হাঁস গুলো ভাসচে; মাঠ গুলো যদিও পাহাড়ে উঁচু নিচু, কিন্তু চসা জমী এমন সমতল ও পরিষ্কার যে, আমাদের দেশের কোন সমভূমিতে এমন দেখিনি; ঘাস গুলো অত্যন্ত সবুজ ও তাজা, এখানে রৌদ্র তেমন তীব্র নয় বোলে ঘাসের রং আমাদের দেশের মতন হেজে যায় না, তাই জন্যে এখানকার মাঠের

দিকে চেয়ে থাকৃতে অত্যন্ত ভাল লাগে, অজস্র সবুজ রঙ্গে চোক যেন ডুবে যায়, উঁচু নিচু পাহাড়,যতদূর দেখা যাচ্চে ঘাসের সবুজ প্লাবনে প্লাবিত, মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ ও শাদা শাদা বাড়িগুলো দূর থেকে ছোট ছোট দেখাচ্চে, এই রকম শূন্য মাঠ ছাড়িয়ে অনেক দূরে এসে এক একটা প্রকাণ্ড পাইন (pine কেলু) গাছের অরণ্য পাওয়া যায়, ঘেঁসা ঘেঁসি pine গাছে অনেক দূর জুড়ে অন্ধকার কোরে আছে, সে খুব গম্ভীর দেখতে। বাড়ি গুলো আমাদের দেশের কুঁড়ে ঘরের মত গরিবানা ও গাছ পালা ঘাস মাঠের মধ্যে থাকবার উপযুক্ত সুন্দর দেখতে না, সোজা, খাড়া, পরিপাটি দোতালা বাড়ি, বাস কোর্ত্তে খুব আরামের বটে, কিন্তু গাছ পালার মধ্যে দেখতে ভাল লাগে না, তবে এক একটা বাড়ি আপাদ মস্তক লতা ও ফুলে ঢেকে গিয়ে খুব ভাল দেখ্‌তে হোয়েছে।

বর্ণিমা নিয়ে আর বেশী বকাবকি কোরব না। তুমি হয়ত এত ক্ষণ মনে করচ যে, এব্যক্তি কোথা থেকে আকাশ-থেকে-পড়া গোটাকতক কথা পেড়ে তাই নিয়ে অনর্গল বোকে যেতে লাগ্‌ল। কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করেনি, কেউ জান্‌তে চায় নি, অথচ গায়ে পোড়ে ধোরে বেঁধে কতকগুলো লম্বা চৌড়া Information দিতে আরম্ভ কোরলে। যা হোক্—এখন আমি ছেড়ে দিলুম তুমি কেঁদে বাঁচ।

ক্রমশঃ

হিয়োন সাঙের বাঙ্গালা ভ্রমণ।

কপিলবাস্তুর সাক্যবংশীয় রাজকুমার সিদ্ধার্থ বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ২৪২২ বৎসর অতীত হইল (অর্থাৎ ৬২১ পূর্ব্ব শকাব্দে ১) মানব-লীলা সম্বরণ করেন ২। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না ভারত মাতার কুলতিলক নন্দন দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী শ্রীধর্ম্মাশোকের অভ্যুদয় হইয়াছিল,সে পর্য্যন্ত

১ আমরা খৃষ্টাব্দের পরিবর্ত্তে শালিবাহনাব্দ ব্যবহার করিব।

২ বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থানুসারে বিগত কল্পে এক সহস্র বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৯৯৭ জনের নাম লুপ্ত। পরবর্ত্তী তিনজন বুদ্ধ বিপশ্চিত, শিক্ষী, ও বিশ্বভূ। প্রচলিত কল্পেও এক সহস্র বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিবেন। তন্মধ্যে চারিজন ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া "নির্ব্বাণ" লাভ করিয়াছেন। ৯৯৬ জন অবশিষ্ট। লব্ধ-নির্ব্বাণ বুদ্ধদিগের নাম

প্রথম　ক্রকচ চন্দ্র
দ্বিতীয়　কনকমুনি
তৃতীয়　কশ্যপ
চতুর্থ　সিদ্ধার্থ। (সাক্যসিংহ বা সাক্যমুনি।)

পঞ্চম বুদ্ধ "মৈত্রেয়" নামে খ্যাত হইবেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত ও সম্পূর্ণ উন্নতি হয় নাই। "জম্বুদ্বীপপতি," "চক্রবর্ত্তী" অশোক মগধেশ্বর সুবিখ্যাত চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র ও বিন্দুসারের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সুষীমকে জয় করিয়া ২৮০ বৌদ্ধাব্দে (৩) বা ৩৪১ পূর্ব্ব শকাব্দে অশোক মগধের রাজাসন অধিকার করেন। তিনি প্রথমত বৈদিক ৪ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন ; কিন্তু রাজ্যাভিষেকের তিন বৎসর পরেই বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার অধিকার-কালে পাটলীপুত্র নগরে বৌদ্ধদিগের মহাসভার তৃতীয় অধিবেশন হয়। সেই সভার অনুমত্যানুসারে চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরিত হইয়াছিল। অদ্যাপি সিংহল, পূর্ব্বোপদ্বীপ,চীন,জ্যাপান, তাতার, সাইবেরিয়া, নরওয়ে ও গ্রীষ প্রভৃতি দেশে তাঁহাদের কৃত কার্য্যের চিহ্ন অল্প বা অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

চতুর্দ্দিক হইতে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মানবগণ ধর্ম্মশিক্ষা, শাস্ত্র অধ্যয়ন ও তীর্থ দর্শন জন্য ভারতে উপনীত হইত। ফাহিয়ান নামক চীন দেশীয় জনৈক বৌদ্ধধর্ম্মযাজক শকাব্দের চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি ৩২১—৩৩৫ শকাব্দে (৩৯৯—৪১৩ খৃঃ অঃ) সিন্ধুনদের তীর ভূমি হইতে গঙ্গাসাগর-তীরস্থ তাম্রলিপ্তাবধি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রন্থখানির অধিকাংশই তীর্থস্থানের বর্ণনাতে পূর্ণ। তৎপাঠে ঐতিহাসিক তত্ত্ব অতি অল্পই জ্ঞাত হওয়া যায়। চীন দেশীয় দ্বিতীয় পর্য্যটক সংজুন ৪২৪ শকে কাবুল ও পঞ্জাবের কিয়দংশ মাত্র দর্শন করিয়াছিলেন।

চীন দেশীয় তৃতীয় পর্য্যটক শ্রমণ হিয়োন সাঙ। ইনি শকাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে ক্রমে পঞ্চদশ বৎসর ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই জন শিষ্য "তদীয় ভারত-ভ্রমণবৃত্তান্ত" চীন ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞবর ফরাসী ষ্টানিস্‌লাস জোলিয়ান কুড়ি বৎসর পরিশ্রম করিয়া সেই গ্রন্থখানি অতি দক্ষতার সহিত ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ বিস্তৃত, তিন খণ্ডে সমাপ্ত। এই গ্রন্থ প্রণয়ন জন্য তাঁহাকে সংস্কৃত ও চীন ভাষা শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। বিজ্ঞবর উইলসন ৫ কাওয়েল ৬ কনিংহাম ৭ ও ফারগিউসন

৩ সাক্যসিংহ ২৫৫৭ কলিগতাব্দে বৈশাখী পূর্ণিমাতে জীবলীলা সংবরণ করেন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণ সেই দিবস হইতে তাহাদের ধর্ম্মশক (Religious Era) গণনা করিয়া থাকে। ইহাই বৌদ্ধাব্দ।

৪ সুবিখ্যাত টোমাস সাহেব প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে অশোক প্রথমত জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

৫ Travels in India of Heown Thsang By Professor H. H. Wilson Journal, Royal As. Society Vol XVII —Page 206 to 137.

৬ Elphinstone's History of India (Cowell's 6th Ed) Chinese Buddhist Pilgrims in India Page 287 to 299.

৭ Verification of the travels

৮ প্রভৃতি যশস্বী পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত-মণ্ডলী হিয়োন সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ইংরেজি ভাষায় আংশিক অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থসমূহ ফরাসী লেখক মহোদয়কৃত ভ্রমণ বৃত্তান্তের সবিস্তার ও সর্ব্বাঙ্গীন অনুবাদ নহে, কিন্তু তাহার সমালোচন মাত্র। বিজ্ঞবর লেড্‌লে ও বিল সাহেব দ্বয় "ফাহিয়ানের—ভ্রমণবৃত্তান্ত" ইংরেজি ভাষায় লিখিয়াছেন ৯। লেড্‌লে ও বিল সাহেবের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আমরা "হিয়োন সাঙের বাঙ্গলা ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

৫৫১ শকাব্দে হিয়োন সাঙ ভারত-ভ্রমণাভিলাষে গৃহত্যাগ করিয়া, ৫৫২ শকাব্দের বর্ষারম্ভে কাবুলে উপনীত হন। সেই অব্দের বসন্ত প্রভাতে তিনি ওহিন্দ নামক স্থানে সিন্ধু অতিক্রম করিয়া তক্ষশিলায় পদার্পণ করেন। সেস্থানে কতিপয় মাস অবস্থিতি করিয়া তিনি তক্ষশিলার নিকটবর্ত্তি তীর্থস্থান সকল দর্শন করিলেন। তৎপরে পর্য্যটক কাশ্মীরে যাইয়া দুই বৎসরকাল সংস্কৃত পাঠ করিয়াছিলেন। কাশ্মীর হইতে সঙ্গলায় যাইয়া তিনি তত্রত্য প্রাচীন অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ দর্শন করেন এবং সেস্থান হইতে গমন করিয়া চীনাবতীতে চৌদ্দ মাস ও জালন্ধরে চারি মাস বাস করেন।

৫৫৬ শকাব্দের শরৎ ঋতুতে পরিব্রাজক মথুরায় উপনীত হন। তথা হইতে তিনি পুনর্ব্বার লাহোরে গমন করিয়াছিলেন। তৎপর লাহোর হইতে যমুনা অতিক্রম করিয়া শ্রুঘ্নায় ১০ ও তথা হইতে গঙ্গাদ্বার হরিদ্বার) দিয়া উত্তর পঞ্চালের (রোহিলখণ্ড) রাজধানী অহিচ্ছত্রে ১১ পদার্পণ করেন। তৎপরে তিনি দক্ষিণ পঞ্চালস্থ (দোয়াব) সাঙ্কাস্যা ১২ কান্যকুব্জ ও কৌ-

---

of Heown Thsang By A Cunningham—Journal As. Society, Bengal of 1648 page 13 to 60 Cunningham's Archological servey Report. Cunningham's Ancint Geography of India. I.

৮ বিজ্ঞবর ফারগীউসন সাহেব হিয়োন সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত মূলক কএকটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে একটী মাত্র বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত সম্পর্ক বিশিষ্ট। Heown Thsang's journey from Patna to Ballabhi By J. Ferguson D. C. L Journal Royal As. Society (N. S.) Vol VI. art IX. Page 213 to 289.

৯ লেড্‌লে সাহেবের গ্রন্থে তাহার নাম প্রকাশ নাই। এই গ্রন্থখানি ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতাস্থ বেপটিস্ট মিসন যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। সেমোয়েল বিল সাহেবের গ্রন্থ অনুবাদের অনুবাদ নহে। তিনি চীন ভাষা হইতে একবারে ইংরেজিতে ভাষান্তরিত করিয়াছেন।

১০ শ্রুঘ্না, মইসুরীর ১৫ মাইল পশ্চিম দিকে খালসির নিকটবর্ত্তি স্থানে অবস্থিত ছিল।

১১ ইহার প্রাচীন অপর নাম "অহিক্ষেত্র"। কিন্তু অধুনা অহিচ্ছত্র বা রামনগর নামে পরিচিত।

১২ সাঙ্কাস্যা, মইনপুরি ও ফতেগড়ের

শাম্বী ১৩ দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিব্রাজক ফাহিয়ান মথুরা হইতে এককালে সাঙ্কাস্যা হইয়া কানোজে উপনীত হন। হিয়োন সাঙের ভারত-ভ্রমণ-কালে জগৎবিখ্যাত বৈশ্য (Sei-she) বংশজ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য কানোজের রাজাসন উজ্জ্বল করিতে ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন তাঁহার অগ্রজ রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর রাজ্য প্রাপ্ত হন। কিরণস্থবর্ণের অধিপতি বৌদ্ধদ্রোহী মহারাজ শশাঙ্কের হস্তে রাজ্যবর্দ্ধন জীবলীলা সংবরণ করেন। কামরূপ হইতে কাম্বোজ অবধি তাঁহার বিজয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে দণ্ডস্থাপন করিতে পারেন নাই; চিরপরাক্রান্ত মহারাষ্ট্র জাতির নিকট তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। হর্ষবর্দ্ধন সম্ভবত ৫৩০ শকাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মৃত্যুঞ্জয়ের মতে তিনি ৪৬ বৎসর রাজ্য পালন করিয়াছিলেন। কনিংহাম প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাঁহার রাজ্যশাসন কাল ৩০—৩৫ বৎসর মাত্র নির্দ্ধারণ করেন। ১৪

তৎপরে হিয়োন সাঙ অযোধ্যা,শরাবতী ও টণ্ডা ১৫ প্রভৃতি দর্শন করিয়া ভগবান সাক্য সিংহের জন্মভূমি কপিলবাস্তুতে উপনীত হন। তদনন্তে তিনি কোশি ও বারাণসী ১৬ দর্শন করিয়া বিশালায় ১৭ গমন করেন। বিশালা বিস্তৃত ত্রিজি প্রদেশের একটী অংশ মাত্র। পরিব্রাজক তথা হইতে নেপাল দর্শন করিয়া ব্রিজির প্রান্তবাহিনী গঙ্গা অতিক্রম পূর্ব্বক জগদ্বিখ্যাত রাজধানী পাটলীপুত্রে উপনীত হন। পাঠনা হইতে তিনি পুঞ্জপুঞ্জকীর্ত্তিপূর্ণ বৌদ্ধগয়ায় যাইয়া তীর্থ সমূহ দর্শন করিয়া ছিলেন। তৎপরে তিনি কোষগৃহ ও

মধ্যে অবস্থিত। ইহা বৌদ্ধদিগের একটী প্রধান তীর্থ। ভগবান সাক্যসিংহ এস্থানে দেবলোক হইতে ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এই স্থানে সাতটী বিখ্যাত স্তুপা ছিল। মহারাজ অশোক এই স্থানে ৭০ ফিট উচ্চ একটী উপলস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

১৩ কৌশাম্বী, আলাহাবাদ হইতে ৩০ মাইল দূরবর্ত্তি,যমুনা তীরে অবস্থিত। প্রাচীন হস্তিনা নগরী নদীগর্ভে প্রবিষ্টা হইলে সুবিখ্যাত মহারাজ নেমীচক্র কৌশাম্বী নগরে চন্দ্রবংশীয়দিগের প্রাচীন রাজপাঠ সংস্থাপন করেন।

১৪ হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর বীরসিংহ নামক নরপতি কানোজ শাসন করেন। বোধ হয় ইনিই বঙ্গে ব্রাহ্মণ ওকায়স্থ প্রেরক "বীরসিংহ"। তাহা হইলে আদিশূর শকাব্দের ৫৭৬—৫৮৯ মধ্যে জীবিত ছিলেন।

১৫ বুদ্ধদেব কশ্যপের জন্মস্থান।

১৬ সরনাথ বৌদ্ধ বারাণসী। ইহা বর্ত্তমান কাশীর ৩ মাইল দূরবর্ত্তী।

১৭ গণ্ডক বা নারায়ণী নদীর তীরবর্ত্তি ত্রিহুতের অন্তঃপাতি বর্ত্তমান বোকুরাই প্রাচীন বিশালা রাজধানী অনুমিতি হইয়াছে। বিশালা পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের অতি আদরের স্থান। সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে "বিশালা" একটী পরাক্রমশালী সাধারণতন্ত্র রাজ্য Republican government ছিল। চীন পরিব্রাজকগণ ইহার প্রাচীন সমৃদ্ধির চিহ্নমাত্র দর্শন করিয়াছিলেন।

রাজগৃহ দর্শন করিয়া নালন্দায় ১৮ গমন করেন। বৌদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীর বসতিস্থান বলিয়া নালন্দা এক সময়ে জগদ্বিখ্যাত ছিল। ন্যায়দর্শন প্রভৃতি শিক্ষার জন্য এই স্থানে উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় সংস্থাপিত ছিল। হিয়োন সাঙ তথায় পাঁচ বৎসর বাস করিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কনিংহাম সাহেব পাঁচ বৎসরের পরিবর্ত্তে পোনর মাস লিখিয়াছেন। নালন্দা অবস্থিতি কালে তিনি সর্ব্বদা দার্শনিকদিগের সহিত তর্কাহবে লিপ্ত হইতেন। সাঙ্খ্য ও বৈশেষিকগণই তাঁহার প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল। কনিংহাম বলেন "পরিব্রাজক ৫৬০ শকাব্দের (৬৩৮ খ্রঃ অঃ) অন্তভাগে মদ্‌গগিরি দর্শন করিয়া অঙ্গ দেশের রাজধানী চম্পানগরে উপনীত হন।" চম্পা আধুনিক ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী। ইহার সহিত বাঙ্গলার নৈকট্য সম্পর্ক আছে। বিষ্ণু পুরাণের মতে চন্দ্রবংশজ রাজা বালীর জ্যেষ্ঠ পুত্র অঙ্গ, স্বনামখ্যাত অঙ্গ-রাজ্য-স্থাপয়িতা। অঙ্গের উত্তরাধিকারী ও তাঁহা হইতে নবম পুরুষে অবতীর্ণ রাজা চম্প স্বনামখ্যাত নগরী (চম্পা) নির্ম্মাণ করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। রামায়ণে অঙ্গ নামকরণের অন্য কারণ লিখিত হইয়াছে—যথা "এই প্রদেশে কাম হরকোপানলে ভস্মসাৎ হইয়াছিলেন বলিয়া ইহা অঙ্গদেশ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ১৯।" কর্ণ অঙ্গ দেশের অধিপতি ছিলেন; তজ্জন্য এই রাজধানী "কর্ণপুর" নামেও পরিচিত ছিল ২০। রাজস্থানের ইতিহাসবেত্তা কর্ণেল টড্ সাহেবের নির্দ্দেশ অনুসারে চম্পা সূর্য্যবংশীয়দিগের স্থাপিত রাজধানী ২১। পালিগ্রন্থকারদিগের মতানুসারে মগধের রাজগণ দীর্ঘকাল অঙ্গপতিদিগের অধীন ছিলেন। বোধ হয় কবিগুরু বাল্মীকি ইহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী; এজন্যই তিনি গঙ্গা ও সরযুর সঙ্গমস্থল অঙ্গ রাজ্যের পশ্চিম সীমা

---

১৮ বিহার উপবিভাগের অন্তর্গত বর্ত্তমান বড় গাঁও। অদ্যাপি ইহার অর্দ্ধভগ্ন মন্দির ও প্রাচীন অট্টালিকাদির রাশীকৃত ভগ্নাবশেষ দর্শন করিলে বিস্মিত হইতে হয়। See Brodlo's Paper Journal As. So. Bengal of 1872 part 1 No 111 and 1V পিপসাহেব লিখিয়াছেন—Burragaon. There is no place in this district where the rains are so extensive, or on such a large scale * * The place is the site of the ancient Nalanda, * * where the greatest monastery in all India existed.

১৯ অনঙ্গ ইতি বিখ্যাতস্তদা প্রভৃতি রাঘব। স চাঙ্গবিষয়ঃ শ্রীমান যত্রাঙ্গং স মুমোচ হ। রামায়ণ, বালকাণ্ড, ত্রয়োবিংশসর্গ, ১৪ শ্লোক।

২০ অঙ্গপতি "কর্ণ" ও কৌন্তেয় 'কর্ণ'কে অভিন্ন বিবেচনা করা হইয়া থাকে কিন্তু সুবিখ্যাত ডাক্তর বকনন, অঙ্গপতিকে অঙ্গ বংশজ জৈনধর্ম্মাবলম্বী কর্ণ স্থির করিয়াছেন। See Marten's Eastern India Vol 11 pp 32, 46.

২১ See Tod's Rajasthan (Mukerjee's Ed) Vol 1 pp 29 33.

নির্দ্দেশ করিয়াছেন ২২। প্রায় সার্দ্ধ চতুর্ব্বিংশতি শতাব্দী পূর্ব্বে মগধেশ্বর মহাপদ্ম ভুজবলে,স্বদেশের স্বাধীনতা সংস্থাপন করেন। হিয়োন সাঙ বলেন,—"চম্পা (অঙ্গ) রাজ্যের পরিধি ৬৬৬—৮০০ মাইল (৪০০০ লি); এই রাজ্য গ্রীষ্মপ্রধান, ইহার ভূমি উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী। রাজধানী গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত, ইহার পরিধি ৮ মাইল। রাজধানীতে কতকগুলি ভগ্ন মঠ ছিল, তাহাতে প্রায় ২০০ যতি বাস করিতেন।" হিয়োন সাঙের ভ্রমণকালে চম্পানগরের প্রান্তবাহিনী গঙ্গা বোধ হয় পূর্ব্ববাহিনী ছিল। পরিব্রাজক চম্পার অনতিদূরবর্ত্তী গঙ্গাবক্ষস্থ পর্ব্বতশৃঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন। ২৩

---

২২ রামায়ণ, বালকাণ্ড, ত্রয়োবিংশসর্গ দেখ।

(২৩) ১২৮৫বঙ্গাব্দের ৩রা অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশ পত্রে কহঁলগাওঁর (কাহালগ্রামের) ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হয়। উক্ত ইতিবৃত্ত লেখক বলেন—"এখনকার গঙ্গার ঠিক তীরে ৯০।৯৫ ফীট উর্দ্ধ ওকেবল প্রস্তরাবলিবিশিষ্ট মোচাগ্রবৎ পরস্পর সন্নিহিত দুইটি পাহাড় আছে। অল্প দিবস পূর্ব্বে ইহারা গঙ্গার ঠিক্ মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকায় গঙ্গাদেবী দ্বিধা বিভক্ত ও সঙ্কীর্ণ ছিলেন, * * * গঙ্গা * * আর দ্বিধা বিভক্ত নাই। এখন পাহাড়দ্বয় গঙ্গার এক পার্শ্বে পড়িয়া যাওয়াতে গঙ্গা একধারবিশিষ্টা হইয়াছেন। প্রায় ৭০।৭৫ বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার বকনন ও এইস্থানে গঙ্গাবক্ষে কয়েকটী পর্ব্বত-শৃঙ্গ দর্শন করিয়াছিলেন। (See Marten's Eastern India Vol II page 37.)

হিয়োন সাঙ চম্পা হইতে পূর্ব্ব মুখে কিঞ্চিদধিক ৬৭ মাইল (৪০০ লি) গমন করিয়া গঙ্গাতীরস্থ "কঙ্কজোল" বা "কুজঘিরা" প্রাপ্ত হন। কনিংহাম কঙ্কজোলকে আধুনিক "কহঁলগাওঁ" বিবেচনা করেন। কাওয়েল ও ফারগিউসন সাহেব ইহাকে "কুজ ঘিরা" লিখিয়াছেন। যদি ইহাঁদের বর্ণবিন্যাস সঙ্গত হয়, তবে নিশ্চয়ই এই স্থানটী "কুব্জগৃহ" বা "কুব্জগিরি" নামে পরিচিত ছিল। ১৮৪৮ খৃস্টাব্দে কনিংহাম ইহাকে "কচ্ছুবেত্র,"—"কচ্ছুগৌড় বা অগণাগৌড়" বর্ণবিন্যাস করিয়া বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী "গৌড়" স্থির করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কুব্জগৃহের বর্ত্তমান স্থিতিস্থান নির্ণয় করা সুকঠিন। ফারগিউসন ও ওয়েস্টমেকট সাহেব এই স্থানটী আধুনিক রাজমহল বা তন্নিকটবর্ত্তী অনুমান করেন। এস্থানে গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তিত দেখা যাইতেছে, কুব্জগৃহ গঙ্গার পশ্চিম তীরে ছিল। পূর্ব্বদিকযাত্রিকে দক্ষিণবাহিনী গঙ্গা উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল।

হিয়োন সাঙ কুব্জগৃহের ভগ্নাবস্থা দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "কুব্জগৃহ স্বাধীনতা হারাইয়া উচ্ছিন্ন হইয়াছে ও তত্রত্য অধিবাসীগণ নগর ছাড়িয়া গ্রামে আশ্রয় লইয়াছে। এইস্থানে ৬।৭টী মঠ ও ১০টী দেবমন্দির আছে।" সে সময় কুব্জগৃহ একটী পরাধীন রাজ্য। পরিব্রাজক বলেন "ইহার পরিধি ৩৩৩ মাইল (২০০০লি)' কনিংহাম বলেন "বোধ হয় স্বতন্ত্রাবস্থার

এই রাজ্য রাজমহলের দক্ষিণদিকস্থ পর্ব্বত হইতে—মুরশিদাবাদের প্রান্তবাহিনী গঙ্গা তীর অবধি বিস্তৃত ছিল২৪।" হিয়োন সাঙের নির্দ্দেশ অনুসারে সে সময়ে রাজমহলও তাহার নিকটবর্ত্তি পার্ব্বত্য প্রদেশে বন্য হস্তী পাওয়া যাইত। কুজ্জগৃহের প্রান্তবাহিনী গঙ্গা অতিক্রম করিয়া, পরিব্রাজক অনুান ১০০ মাইল পূর্ব্বাভিমুখে গমন করত "পোন্নাফাটন্না" রাজধানী প্রাপ্ত হন।

পৌণ্ড্র বর্দ্ধন।

(Pun-na-fa-tau-na)

ফরাসী পণ্ডিত স্টানিসলাস জোলিয়ান, হিয়োন সাঙ লিখিত "পোন্নাফাটন্না" কে পৌণ্ড্র বর্দ্ধন নির্ণয় করিয়াছেন। পণ্ডিতবর ভাইডেল ডি মার্টিন ইহাকে বর্দ্ধমান বিবেচনা করেন। প্রফেসার উইলসন মার্টিনের মত অনুসরণ করিয়াছেন। কনিংহাম সাহেব ইহাকে পাবনা বিবেচনা করেন। মার্টিন ও কনিংহামের মত অভ্রান্ত বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

মনুসংহিতায় "পৌণ্ড্র" নামক একটী অনার্য্য জাতির উল্লেখ আছে। মহাভারতে লিখিত আছে, বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের বিরোধকালে নন্দিনীর ফেন হইতে ম্লেচ্ছ পৌণ্ড্র জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই 'পুণ্ড্র' বা 'পৌণ্ড্র' জাতির বসতিস্থানই 'পৌণ্ড্র দেশ' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে ২৫ চন্দ্রবংশজ রাজা বালীর পাঁচজন ক্ষেত্রজ পুত্র পাঁচটী রাজ্য স্থাপন করেন। জ্যেষ্ঠ অঙ্গ "অঙ্গ" রাজ্যস্থাপয়িতা; অঙ্গরাজ্যের বিবরণ যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কুমার বঙ্গ, "বঙ্গ" রাজ্য স্থাপন করেন। তৃতীয় কুমার উড়িষ্যার নিকটবর্ত্তী স্থানে স্বনামখ্যাত কলিঙ্গরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন ২৬। চতুর্থ কুমার সুহ্ম "সুহ্ম রাজ্যের" স্থাপনকর্ত্তা ২৭। পঞ্চম বা সর্ব্বকনিষ্ঠ কুমার পুণ্ড্র "পৌণ্ড্র রাজ্য" স্থাপন করেন। মহাভারতে পৌণ্ড্র রাজ্যের উল্লেখ আছে। বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকারাভিধানপ্রবন্ধ লেখক বলেন ২৮ "এক্ষণে যাহাকে বঙ্গদেশ বলা

২৪ একটু বিবেচনা করিলে প্রতিপন্ন হইবে; যবনাধিকার হইতে কুজ্জগৃহ রাজ্যটি বাঙ্গলার অন্তর্গত ছিল। এই প্রদেশের অধিকাংশ ভূমি লইয়া "লক্ষ্মণাবতী" বা "জান্নতাবাদ" সরকার সংস্থাপিত হইয়াছিল।

২৫ See Wilson's Vishnu Puran, Book IV Chp. XVIII Page 444. বরদাপ্রসাদ বসাক প্রকাশিত বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ অংশ, ১৮ অঃ ১৮৭—১৯১ পৃষ্ঠা।

২৬ কালিদাসের বর্ণনানুসারে উড়িষ্যার দক্ষিণ পশ্চিমদিকস্থ সমুদ্রউপকূল (উত্তর সরকার) কলিঙ্গ নির্ণীত হইতেছে। শক্তিসঙ্গমতন্ত্র ইহার দ্বিতীয় প্রমাণ;—"জগন্নাথাৎ পূর্ব্ব ভাগাৎ কৃষ্ণাতীরান্তগঃ শিবে। কলিঙ্গদেশঃ সংপ্রোক্তো—" কিন্তু উইলসন বঙ্গ ও উড়িষ্যার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে কলিঙ্গ লিখিয়াছেন।

২৭ ত্রিপুরা। টীকাকার হল সাহেব ত্রিপুরা ও অরাকাণকে সুহ্ম অবধারণ করিয়াছেন।

২৮ বঙ্গদর্শন, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা; (১২৮০ সাল, ভাদ্র।)

যায় তাহার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ পৌণ্ড্র নামে খ্যাত ছিল। যে অংশ মধ্যে কলিকাতা, বর্দ্ধমান, মুরশিদাবাদ তাহা সেই অংশের অন্তর্গত। যাহারা সবিশেষ অবগত হইতে চাহেন তাঁহারা উইলসন কৃত বিষ্ণুপুরাণানুবাদের প্রদেশতত্ব বিষয়ক পরিচ্ছেদটী দেখিবেন। ২৯ * * * চীন পরিব্রাজক হোয়েন্থ্‌ সাঙ ভারতবর্ষে এই পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র দেশে আসিয়াছিলেন। * * জেনেরল কনিঙহাম বলেন, যে আধুনিক পাবনাই প্রাচীন রাজধানী পৌণ্ড্র বর্দ্ধন। বোধ হয় মালদহের অন্তঃপাতী পাণ্ড্রয়া নামক গ্রামের অস্তিত্ব তিনি অবগত নহেন। এই পাণ্ড্রয়া যে পৌণ্ড্র বর্দ্ধন এমত বিবেচনা করিবার বিশেষ কারণ আছে।" মার্টিন, উইলসন ও উক্ত প্রবন্ধ লেখক প্রভৃতির প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়া আমরা বলিতেছি—তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। রাজমহল, কুঁহলগাওঁ কিম্বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে ৬০০ লি (১০০—১২০ মাইল) গমন করিলে ৩০ কি বর্দ্ধমান বা পণ্ড্রয়ায় উপ-

---

২৯ উইলসন সাহেব "ওরিএণ্টেল কোয়ার্টার্লি মেগেজিন" নামক সাময়িক পত্রিকার চতুর্থ খণ্ডে, তিনি ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, ভবিষ্যৎপুরাণ ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া পৌণ্ড্র দেশ সম্বন্ধে যাহা লিখেন, তৎপ্রকাশিত বিষ্ণুপুরাণের টীকায় তাহার সমরকে বিবৃত করিয়াছেন। বঙ্গদর্শনের উক্ত প্রবন্ধ লেখক তাহাই পাঠ করিতে পাঠকদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; প্রবন্ধ লেখকের উক্তির সহিত মূলের কতদূর ঐক্য আছে তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন।—

Pundra—The Western Provinces. of Bengal, or as sometimes used in a more comprehensive sense, it includes the following districts—Rajshahi, Dinajpure, Rangpure, Nodia, Beerbhoom, Burdowan, parts of Midnapure and Jungle mahals, Ramgar Pachat, Palamo and part of Chunar."

Wilson's Vishnu Purna, Vol. II. P. P. 170-171. Hall's ED—

P. Page 160. of 1848 (Ed)

—যদিচ হল সাহেবকে আমরা অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না; তথাপি লেখককে জিজ্ঞাসা করি—তিনি কি রূপে কলিকাতা পৌণ্ড্রের অন্তর্গত লিখিলেন। প্রকৃত পক্ষে গঙ্গা বক্ষস্থিত "ব" দ্বীপের সহিত পৌণ্ড্রের কোন সম্পর্ক নাই।

৩০ From Kankjol the pilgrim crossed the ganges and travelling for 600 *li* or 100 miles he reached thd kingdom of *Punnafatanna* (Cunnigham's Ancient Geograply of India Buddhist period, Vol. I. page 480—

"After crossing the river, the Chinaman went 600 li or from 100 to 120 miles eastward and found himself in the kingdon of Pundra Vardhan—Westmacott's note on For-

স্থিত হইতে হয়? কখনই নহে। রাজমহলের নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীর হইতে ১০০ কিম্বা ১২০ মাইল গমন করিলে দিনাজপুর, রঙ্গপুরের দক্ষিণ ও বগুড়ার উত্তর প্রান্তে উপনীত হইতে হয়।

পৌণ্ড্রের রাজধানী "পৌণ্ড্রবর্দ্ধন" নামে খ্যাত হইয়াছিল। তদনুসারে চীন পরিব্রাজক সেই রাজ্যের নামই "পৌণ্ড্রবর্দ্ধন" লিখিয়াছেন। চীন ও পূর্ব্বোপদ্বীপবাসিগণ প্রায়ই রাজধানীর নাম দ্বারা রাজ্যের নামকরণ করিয়া থাকেন।

বিজ্ঞবর ফারগিউসন সাহেব উইলসন সাহেবের প্রাচীন প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া বলেন ৩১; যে. পৌণ্ড্র দেশের নিবৃত্তি বিভাগে (আধুনিক দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও কুঁচবিহার এই বিভাগের অন্তর্গত) বর্দ্ধন কোট, কচ্ছপ ও শ্রীরঙ্গ বা বিহারিকাই প্রধান নগরী। যবনদিগের ভারত প্রবেশ কালে বোধ হয় পৌণ্ড্রবর্দ্ধন "বর্দ্ধন কোট" ৩২ নামেই পরিচিত ছিল। পাল গৌড়েশ্বরদিগের অধঃপতনের সহিত ইহার নামটিও বিকৃত হইয়াছিল। বিখ্যাত যবন ঐতিহাসিক মিনহাজ সিরাজ, আজার্জদ্দিন অবুল কাতভুগ্রল তুগন খাঁর বঙ্গ শাসন কালে, ৬৪০ হইতে ৬৪২ হিজিরি শক মধ্যে, আপন গ্রন্থ "তবকত-ই-নেছরি" সংকলন করেন। তিনি বলেন, বিজয়োন্মত্ত মহম্মদ বখতিয়ার যখন তিব্বত আক্রমণাভিলাষে লক্ষ্মণাবতীর রাজধানী হইতে উত্তরদিকে গমন করেন, তখন জনৈক মেঁচ ৩৩ সরদারের সহিত তিনি বন্ধুত্ব সংস্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত সরদার তাঁহাকে প্রথমত বর্দ্ধন কোট নগরে লইয়া যান।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজধানী সম্বন্ধে বিজ্ঞবর ওয়েস্টমেকট সাহেব যাহালিখিয়াছেন, তাহাই আমরা সঙ্গত বিবেচনা করি। তিনি গোবিন্দ গঞ্জের নিকটবর্ত্তী "রাজবাটি" অনতি প্রাচীন "বর্দ্ধন কোট" বা "বর্দ্ধন কোটা প্রাচীন "পৌণ্ড্রবর্দ্ধন" নির্ণয় করিয়াছেন। ৩৪ যশস্বী পুরাতত্ত্ববিদ ডাক্তর শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুরও ওয়েস্টমেকট সাহেবের নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ৩৫

ক্রমশঃ

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

ban dighee copper plate Journ As. Soc. Beng Vol XLV1 part 1 page 7.

৩১ Quarterly Oriental magazine Vol IV page 190.

৩২ কায়স্থ কৌস্তুভ প্রণেতা গৌড় রাজ্যের প্রাচীন রাজধানীর নাম "বর্দ্ধ কোট" লিখিয়াছেন। বোধ হয় ইহা বর্দ্ধন কোটের অপভ্রংশ।

৩৩ মেঁচ জাতির সম্বন্ধে পাঠকগণ অল্পই অবগত আছেন। কুঁচ ও মেঁচগণ এক মূল হইতে উৎপন্ন। বিশেষতঃ কুঁচ বিহারের রাজবংশ মেঁচজাতি সম্ভূত। মহারাজ শিবসিংহের পিতা দুর্ভাগা "হরুয়া" বা "হরিদাস" কে তৎবংশধর গণ "পিতৃ" পদ প্রয়োগ করিতে সঙ্কুচিত হন।

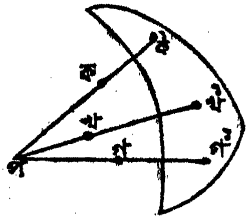
৩৪ Traces of Buddhism in Dinagepore By E. V. Westmacott. J. A. S. B. XLVII part 1 page 188.

৩৫ Journal. As. Society of Bengal Vol XLVII part 1 pp. 375 396.

জ্যোতিষিক পরিভাষা।

সংখ্যা এবং পরিমাণ দ্বারা নিশ্চিত সূর্য্য, গ্রহ, কেতু ও নক্ষত্রাদির গতিপ্রতিপাদক শাস্ত্রকে জ্যোতিষ শাস্ত্র কহে।

দর্শকের চক্ষু যে গোলকের কেন্দ্র এবং যাহার ব্যাসার্দ্ধ অতি বিস্তীর্ণ তাহাকে খগোলক কহে। এই গোলকের উপরিদেশে গগনবিহারীগণ প্রক্ষিপ্ত প্রতীয়মান হয়। যথা ১ম চিত্রক্ষেত্রে যদি 'চছজ'



দ্বারা গোলকের কিয়দংশ 'প' দ্বারা উহার কেন্দ্র অথবা দর্শকের চক্ষু, এবং 'ক' 'খ' 'গ' দ্বারা জ্যোতিষ্কগণ বিজ্ঞাপিত করা যায়, এবং 'প' হইতে 'ক' 'খ' এবং 'গ' দিয়া রেখা টানা যায়, এবং তিনটী রেখা যদি যথাক্রমে 'ক^{১}' 'খ^{১}' এবং 'গ^{১}' নামক বিন্দুতে গোলক স্পর্শ করে, তাহা হইলে এই রেখাত্রয় দ্বারা উক্ত গগনবিহারীগণ গোলকে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলা যায়।

কোন ব্যক্তি তিমিরাচ্ছন্ন কিন্তু মেঘশূন্য রজনীর নিশীথ সময়ে দক্ষিণ মুখে দাঁড়াইয়া কিয়ৎক্ষণ গগনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিলে তাঁহার বোধ হইবে যে তাঁহার অপসব্য দিকস্থ জ্যোতিষ্কগণ ঈষদ্বক্র ভাবে গমন করতঃ ক্ষিতিজবৃত্তের নিম্ন দেশে অন্তর্হিত হইতেছে, এবং তাঁহার বাম দিক হইতে পূর্ব্বাদৃষ্ট জ্যোতিষ্কগণ আকাশকক্ষার উপরিভাগে প্রকাশ হইতেছে এবং সকল জ্যোতিষ্কই সমান্তর মণ্ডলাকার পথে বিচরণ করিতেছে।

তিনি যদি উত্তরদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তাহা হইলে দেখিবেন যে যদিও কতকগুলি জ্যোতিষ্ক ক্ষিতিজবৃত্তের নিম্ন দেশে অদৃশ্য হইতেছে, অপর গুলি এই বৃত্তে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগের আবর্ত্তনের অধঃসীমা প্রাপ্ত হইয়া গগন মণ্ডলের উপরিদেশে প্রত্যাগমন করিতেছে। এই জ্যোতিষ্কগণও সমান্তর মণ্ডলাকার পথে পরিভ্রমণ করিতেছে প্রতীয়মান হইবে। যে সকল জ্যোতিষ্ক কখনও অদৃশ্য হয় না তাহাদিগের মধ্যে একটী জ্যোতিষ্ক গতিবিহীন এবং গমনশীল জ্যোতিষ্কগণের মধ্যস্থিত উপলব্ধি হইবেক। এই স্থির * জ্যোতিষ্কের নাম ধ্রুবতারা। য়ুরোপীয়রা ইহাকে পোলারিস্ অথবা মেরুসন্নিহিত নক্ষত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

যদিও জ্যোতিষ্কগণ এই রূপে নিরতই পরিভ্রমণ করিতেছে, তত্রাচ সাধারণতঃ তাহাদিগের পরস্পরের দূরতার কখনই

* সাধারণত এই সকল নক্ষত্রকে "স্থির" বলা হইল কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কোন নক্ষত্রই স্থির নহে কিন্তু ইহারা এত দূরস্থিত যে প্রায়ই পৃথিবী হইতে ইহাদের গতি অনুভূতহয় না। সং

ব্যতিক্রম হয় না। তজ্জন্য পর্য্যবেক্ষণ স্থান এবং ধ্রুবতারা সন্নিহিত কোন বিন্দু সংযোগী রেখা অবলম্বন করিয়াই যেন গগনমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেছে প্রতীয়মান হইবেক। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পৃথিবী কৌণিক সমবেগে নিরন্তর আবর্ত্তন করিতেছে বলিয়াই এই রূপ অনুভূত হইয়া থাকে।

নক্ষত্র এবং গগনবিহারীর ন্যায় পৃথিবীর প্রতি ও জ্যোতির্ব্বিদগণের সবিশেষ মনোযোগ করা আবশ্যক; কারণ এই পৃথিবী হইয়া আমরা গগনবিহারীগণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদিগের স্থানসন্নিবেশ এবং তাহাদিগের পরস্পরের এবং আমাদিগের হইতে তাহাদিগের দূরতা নির্ণয় করি।

গগনবিহারীগণের মধ্যে পৃথিবীকে গণ্য করাতে এবং এরূপ বিসদৃশ পদার্থ সকল একই ধর্ম্মাক্রান্ত বলাতে আপাততঃ আশ্চর্য্য জ্ঞান হইতে পারে। কারণ পৃথিবী দৃশ্যতঃ অসীম এবং অমেয়, কিন্তু জ্যোতিষ্কগণ বিন্দুবৎ আয়তনবিহীন। পৃথ্বী তমসাবৃত এবং নিস্প্রভ, কিন্তু গগনবিহারীগণ স্বত উজ্জ্বল। পৃথিবীর কোন রূপ গতিই আমাদিগের উপলব্ধি হয় না; কিন্তু নভোবিহারীগণ নিয়তঃ স্ব স্ব স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে দেখিতে পাই। সুতরাং প্রাচীন পণ্ডিতেরা পৃথিবী এবং অন্যান্য গগনবিহারীর পরস্পর কোন সৌসাদৃশ্য নাই বিবেচনা করিতেন। বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টির প্রকৃত অবস্থা না জানিতে পারিলে এই ভ্রম কখনই দূরীভূত হইবার নহে।

গগনবিহারীদিগের বিষয় যাহা কিছু আমরা জানিতে পারিয়াছি তাহা তাহাদিগের পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা মাত্র। অতএব জ্যোতিষ্কগণের পর্য্যবেক্ষণ স্থান, পর্য্যবেক্ষক এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থ সমূহ গতিবিহীন কি না, অথবা গতিবিশিষ্ট হইলে তাহাদিগের গতিই বা কিরূপ তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। কতকগুলি পদার্থের পরস্পর সম্বন্ধে দৃশ্যমান স্থান-সন্নিবেশ পর্য্যবেক্ষকস্থানের উপর নির্ভর করে। সুতরাং পর্য্যবেক্ষকের অজ্ঞাতসারে এই পর্য্যবেক্ষণস্থানের পরিবর্ত্তন হইলে, দৃষ্ট পদার্থগুলিই স্ব স্ব স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছে প্রতীয়মান হইবেক। নক্ষত্রগণের গতি দৃশ্যমান গতি মাত্র; প্রকৃত গতি নহে। পর্য্যবেক্ষক স্থানের গতি বশতই জ্যোতিষ্কগণের এইরূপ গতি অনুভূত হইয়া থাকে।

য়ুরোপীয় ইদানীন্তন জ্যোতির্ব্বিদেরা প্রায় এক প্রকার স্থির করিয়াছেন যে, যে সকল নক্ষত্রের আলোক "মিট-মিট" করে তাহারা এক এক সূর্য্যসম অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায় বৃহদাকৃতি, নিজে তেজোময়,এবং এক এক জগতের কেন্দ্রীভূত। সূর্য্যের অত্যুগ্র কিরণে নক্ষত্রগণের মৃদুল জ্যোতি অদৃশ্য হওয়াতে আমরা দৌরবীক্ষণিক অনুসন্ধান ব্যতিরেকে ইহাদিগের সম্বন্ধে সূর্য্যের প্রকৃত স্থান নিরূপণে সমর্থ হই না। নক্ষত্রগণ মধ্যে সূর্য্যের গতি ঋজু, অর্থাৎ সূর্য্য পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করে। ইহার প্রমাণ এই যে যখন

পশ্চিমাকাশস্থিত কোন জ্যোতিষ্ক সূর্য্যাস্তের অল্পকাল পরেই অস্তমিত হইতে দেখা যায়, তখন উক্ত জ্যোতিষ্ক সূর্য্যের পূর্ব্বদিকে থাকে ; এবং ক্ষিতিজবৃত্তের উপর ইহার স্থিতি কালের দৈর্ঘ্যের প্রতিদিন হ্রাস হইতে থাকে, এবং অবশেষে সূর্য্যালোকে অদৃশ্য হইয়া যায় ; এবং অল্পকাল মাত্র অদৃশ্য থাকিয়া পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পুনরায় আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়। ক্রমশ এই নক্ষত্রের উন্নতি, এবং ইহার উদয় ও সূর্য্যোদয় ব্যবহিত সময় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অতএব প্রমাণ হইল যে সূর্য্য জ্যোতিষ্কের পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্বদিকে আসিয়াছে। সুতরাং স্থির জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে সূর্য্যের গতি ঋজু স্বীকার করিতে হইবে। স্থির জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে সূর্য্যের গতির অপর একটী প্রমাণ আছে তাহা এই যে সূর্য্যের মাধ্যাহ্নিক উন্নতি পরিবর্ত্তনশীল। সৌর মাধ্যাহ্নিক উন্নতি (Meridian attitude) গ্রীষ্মকালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এবং শীতকালে 'সর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইয়া থাকে। সুতরাং সুমেরু হইতে সূর্য্যের দূরতা শীতকালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং গ্রীষ্মকালে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। পৃথিবীর প্রকৃত গতিই সূর্য্য এবং গগনমণ্ডলের দৃশ্যমান গতির কারণ।

কতকগুলি গগনবিহারী, যথা চন্দ্র এবং গ্রহগণ, স্থির জ্যোতিষ্কগণ সম্বন্ধে স্ব স্ব স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে।

চন্দ্র এত দ্রুতবেগে গমন করে যে অল্পকাল মধ্যেই আমরা ইহার পূর্ব্বস্থান চ্যুতি অনুধাবন করিতে পারি। খগোলকে চন্দ্রকক্ষ অঙ্কিত করিলে উহা খগোলকের একটী বৃহদ্বৃত্ত হইবে। এই উপগ্রহ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে (অর্থাৎ ইহার দৃশ্যমান গতির বিপরীত দিকে) গমন করে। গ্রহ অথবা উপগ্রহগণের পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে যে গতি তাহাকে ঋজুগতি, এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে যে গতি তাহাকে বক্রগতি কহে। সুতরাং স্থির জ্যোতিষ্কগণ সম্বন্ধে চন্দ্রের গতি ঋজু। *

চন্দ্রকক্ষ বৃত্তাভাসাকার। চন্দ্রের মধ্য দূরতা প্রায় ১২০,০০০ ক্রোশ, অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধের প্রায় ৬০ গুণ। চন্দ্রের দৃশ্যমান ব্যাস ২৯ কলা হইতে ৩৩কলা পর্য্যন্ত আয়ত। চন্দ্র আপন মেরুদণ্ড অবলম্বন

---

* সূর্য্য সিদ্ধান্তে গ্রহগণের অষ্ট প্রকার গতি উল্লিখিত হইয়াছে। তদ্যথা—

১ বক্র (Decreasing retrograde motion)

২ অতিবক্র Increasing retrograde motion)

৩ বিকলা (Stationary)

৪ মন্দ (Increasing direct motion less than the mean motion)

৫ মন্দতর (Decreasing direct motion less than the mean motion)

৬ সম (Mean motion)

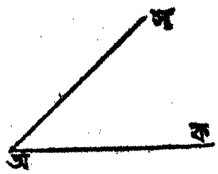
৭ শীঘ্রতর বা অতিশীঘ্র (Increasing direct motion greater than the mean motion)

৮ শীঘ্র (Decreasing direct motion greater than the mean motion) ইহাদিগের মধ্যে ৪, ৫, ৬, ৭ এবং ৮ ঋজুগতি।

করিয়া পরিভ্রমণ করে ; এবং ২ ঌ দিবসে একবার পরিভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া জ্যোতিষ্কগণ মধ্যে স্বস্থান পুনঃপ্রাপ্ত হয়।

পৃথিবী স্বরূপতঃ গোলক নহে। একটী বৃত্তাভাস ellipseকে তাহার লঘিষ্ট ব্যাসের উপর ঘুরাইলে তাহার যেরূপ আকৃতি হয় পৃথিবীর আকৃতিও সেইরূপ। পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম ব্যাস প্রায় ৩৯৫০ক্রোশ,এবং ইহার বৃহত্তম ব্যাস প্রায় ৩৯৬৪ ক্রোশ। অর্থাৎ পৃথিবীর গরিষ্ঠ ব্যাস লঘিষ্ঠ ব্যাসাপেক্ষা প্রায় ১৪ ক্রোশ বৃহৎ। কিন্তু সাধারণতঃ পৃথিবী গোলাকার বলা যাইতে পারে।

খগোলকে স্থিরজ্যোতিষ্কগণের মধ্যে কোন বিন্দুর অবস্থান দ্বারা কোন রেখার দিঙ্ নির্ণয় হইতে পারে। কারণ পর্য্যবেক্ষক হইতে সেই বিন্দু পর্য্যন্ত কোন রেখা টানিলে পর উক্ত রেখা পর্য্যবেক্ষক স্বস্থান পরিত্যাগ করিলেও প্রথমোক্ত দিকে দেখা যাইবে। 'অ' পর্য্যবেক্ষণ স্থান (২য় চিত্র



ক্ষেত্র) এবং 'স' জ্যোতিষ্ক কল্পনা করিয়া'অস' রেখা টানা যাউক ; এবং বোধ কর যে পর্য্যবেক্ষক স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া ভূপৃষ্ঠে স্থানান্তর আশ্রয় করিলেন। পর্য্যবেক্ষকের পূর্ব্বস্থান হইতে কোন রেখা টানিলে তাহা যে দিকস্থ হইত, এই নূতন স্থান হইতে রেখা টানিলে তাহাও সেই দিকস্থ হইবেক। কারণ স্থির জ্যোতিষ্কগণ পৃথিবী হইতে এত দূরবর্ত্তী যে পৃথিবীর ব্যাস ও তাহাদিগের কাহার ও সহিত কোন অনুমেয় কোণোৎপাদন করে না।

পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে আপন কক্ষ নিষ্কাশিত করে। কিন্তু অচল নক্ষত্রগণ পৃথিবী হইতে এরূপ অন্তরস্থিত যে এই কক্ষের ব্যাস ও তাহাদিগের সহিত কোন অনুভবনীয় কোণ উৎপন্ন করে না। সুতরাং পৃথিবীর গতি বশতঃ 'অস' রেখার দিকের কোন ব্যত্যয় হয় না। সুতরাং পর্য্যবেক্ষকের চক্ষু হইতে জ্যোতিষ্ক পর্য্যন্ত আয়ত কোন রেখা নিয়তই আপন সমান্তর থাকিবে।

পর্য্যবেক্ষণের স্থান 'অ' হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট দিকে 'অক' রেখা টানা যাউক। পৃথিবীর গতি বশতঃ দর্শক নিয়তই স্বস্থান পরিবর্ত্তন করিতেছেন ; সুতরাং 'অক' শূন্যে কোন নির্দ্দিষ্ট দিকস্থিত বলিয়া কল্পনা কর। 'অস' দিক অপরিবর্ত্তনীয় হওয়াতে 'সঅক' কোণ নিত্য হইবে।

অতএব 'অক' নামক কোন রেখা সকল সময়েই আপন সমান্তর থাকাতে ইহা গতিবিহীন নক্ষত্রগণ সম্বন্ধে কোন স্থির বিন্দুতে খগোলক ছেদ করিবে। পৃথিবীর আবর্ত্তন শলাকা ইহার উদাহরণ স্থল। এই আবর্ত্তন শলাকা সূর্য্য পরিভ্রমণ কালে পৃথিবীর সমান্তর থাকে। ইহা যে দুই বিন্দুতে খগোলক স্পর্শ করে তাহাদিগকে গগনমণ্ডলের মেরু (Pole) কহে। এই মেরুদ্বয় স্থির জ্যোতিষ্কগণ সম্বন্ধে গতিবিহীন। নিরক্ষ বৃত্তের সমতল,(Plane of Earth's Orbit) পৃথিবীর আবর্ত্তন সময়ে ইহার সমান্তর

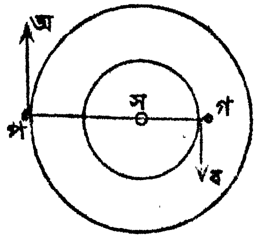
থাকে, এবং নক্ষত্রগণ সম্বন্ধে গতিবিহীন কোন বৃহদ্বৃত্তে খগোলক স্পর্শ করে। পৃথিবীর আবর্ত্তন শলাকার দিক নিত্য নহে, কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তন অতি সামান্য।

সূর্য্য পরিভ্রমণ বশতই গ্রহগণের গতির বিশৃঙ্খলতা উৎপন্ন হইয়া থাকে যশোজীবিত কোপার্নিকস্ এই মত প্রচার করেন। গ্রহগণ আকাশমণ্ডল সমতলে পরিভ্রমণ করে। সকল গ্রহই পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে, অর্থাৎ নভোমণ্ডলের দৃশ্যমান দৈনন্দিন গতির বিপরীত দিকে গমন করে।

গ্রহ এবং পৃথিবীর গতি বশতই গ্রহগণের গতি কখন ঋজু এবং কখন বক্র প্রতীয়মান হয়; এবং এই কারণেই তাহারা এক স্থানে স্থিরভাবে রহিয়াছে অনুভূত হইয়া থাকে। সূর্য্যস্থিত পর্য্যবেক্ষক গ্রহগণের গতির নিয়ম অতি সামান্য বিবেচনা করিবেন, কারণ সূর্য্য গ্রহগণের মধ্যবর্ত্তী। কিন্তু গ্রহগণের গতি পৃথিবীস্থ পর্য্যবেক্ষকের পক্ষে অতিশয় দুরূহ হইবে; কারণ প্রথমতঃ, পৃথিবী গ্রহগণের মধ্যস্থিত নহে, এবং দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবীও অপরাপর গ্রহের ন্যায় সূর্য্য পরিভ্রমণ করিতেছে।

কি জন্য গ্রহগণ কখন পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে এবং কখন পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করে, এবং কি জন্যই বা কখন কখন এক স্থানে স্থিরভাবে অবস্থিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা নিরূপণ করিতে হইলে, সূর্য্য পৃথিবী এবং গ্রহগণের সাপেক্ষ স্থান সন্নিবেশ পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

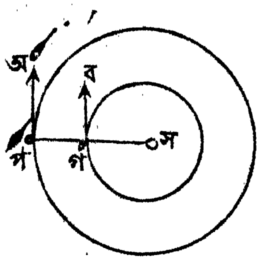
প্রথমতঃ, একটী কনিষ্ঠ গ্রহ (inferior planet যাহার কক্ষ সূর্য্য ও পৃথিবীর কক্ষের মধ্যস্থিত) যথা বুধ অথবা শুক্রের বিষয় বিচার করা যাউক। শুক্র গ্রহ পৃথিবী অপেক্ষা দ্রুতবেগে সূর্য্য পরিভ্রমণ করিবে; কারণ যে গ্রহ যত সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী তাহার বেগ ততই অধিক। ৩য় ক্ষেত্রে বোধ কর



'প' দ্বারা পৃথিবী, 'স' দ্বারা সূর্য্য এবং 'গ' দ্বারা গ্রহের অবস্থান বিজ্ঞাপিত হইতেছে। শরচিহ্ন দ্বারা পৃথিবী এবং গ্রহের কক্ষ পরিভ্রমণের দিঙ্‌নির্দ্দেশিত হইতেছে। শুক্র যে পরিমিত সময়ে আপন কক্ষে ১০ ক্রোশ গমন করিবে, পৃথিবী সেই পরিমিত কালে ৮½ ক্রোশ মাত্র গমন করিবে; পৃথিবীর গতির বেগ ও শুক্রের গতির বেগের সমানুপাত ৮½=১০।

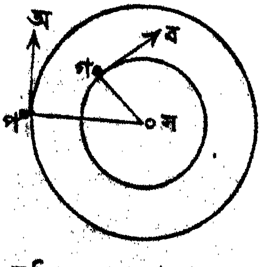
পৃথিবী ৮½ ক্রোশ গমন করাতে শুক্র ৮½ ক্রোশ গমন করিয়াছে অনুভূত হইবে; কিন্তু শুক্রের দৃশ্যমান গতি শুক্রের প্রকৃত গতিতে (১০ ক্রোশ) সংযোগ করিলে 'ব' শরচিহ্ন দিকে শুক্রের ১৮½ ক্রোশ গতি প্রতিপন্ন হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ৪র্থ চিত্রক্ষেত্রে 'স' সূর্য্য 'গ' গ্রহ, এবং 'প' পৃথিবী কল্পনা কর পৃথিবীর গতি বশতঃ গ্রহ 'ব' শরচিহ্নের বিপরীত দিকে ৮½ ক্রোশ গমন করিয়াছে প্রতীয়মান হইবেক। শুক্র 'ব' শরচিহ্ন দ্বারা বিজ্ঞাপিত দিকে ১০ ক্রোশ গমন করিতেছে। সুতরাং এক্ষণে প্রকৃত গতি হইতে দৃশ্যমান গতি বিয়োগ করিলে 'ব' শরচিহ্নের দিকে ১½ ক্রোশ মাত্র গতি অবশিষ্ট থাকিবে।



সুতরাং শুক্র ৩য় ক্ষেত্রে যদ্রূপ তদ্রূপ অবস্থিত হইলে পৃথিবীস্থ পর্য্যবেক্ষকের প্রতীয়মান হইবে যে উহা পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে আপন প্রকৃত গতির দ্বিগুণ বেগে গমন করিতেছে। কিন্তু ৪র্থ ক্ষেত্রে যথা তথা অবস্থিত হইলে শুক্র আপন প্রকৃত বেগের এক পঞ্চমাংশ মাত্র বেগে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে গমন করিতেছে অনুভূত হইবে।

তৃতীয়তঃ, সূর্য্য গ্রহ এবং পৃথিবী ৫ম চিত্রক্ষেত্রে যথা তথা সন্নিবেশিত হইলে গ্রহ এবং পৃথিবীর গতি পরস্পর নিরাকরণ করিবে, এবং গ্রহ অচল প্রতীয়মান হইবে।



বহিস্থ গ্রহগণের (Superior Planet) গতির নিয়মও প্রায় এইরূপ।

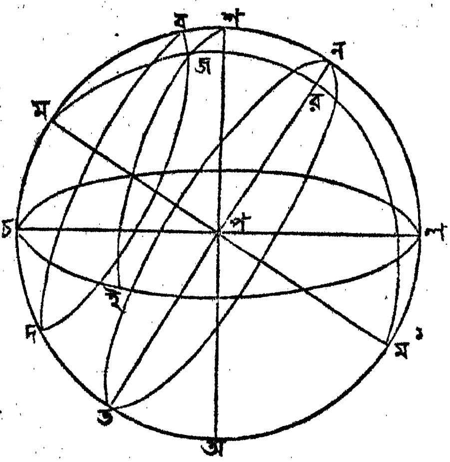
কোন বস্তু পৃথিবীর উপর হইতে নিক্ষেপ করিলে উহা সরল রেখা ক্রমে প্রায় পৃথ্বী কেন্দ্রে পতিত হয়। পৃথিবী প্রকৃত গোলক না হওয়াতে নিক্ষিপ্ত পদার্থ ঠিক্ ভূমধ্যে পতিত হয় না। পৃথিবীর আকর্ষণই পতনশীল পদার্থের এইরূপ গতির কারণ। পতনশীল পদার্থ যে সরল রেখা ক্রমে পতিত হয়, তাহাকে লম্বক কহে। কোন গুরুভার পদার্থ, যথা সীষকখণ্ড রজ্জুবদ্ধ করিয়া ঝুলাইয়া রাখিলে লম্বক রেখা নির্ণীত হইবে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারাই লম্বক রেখার দিক্ নিশ্চিত হয়।

যে সমতলের উপর লম্বক রেখা লম্বভাবে পতিত হয় তাহাকে চক্রবালীয় (Horizontal) সমতল কহে। জল, পারদ প্রভৃতি তরল পদার্থের স্থিরাবস্থাপন্ন পৃষ্ঠদেশ চক্রবালীয় সমতলের উদাহরণ স্থল।

লম্বক রেখা যে সমতলের অন্তর্গত অথবা চক্রবালীয় সমতলের উপর লম্বভাবে পতিত সমতলকে লম্বক সমতল (Vertical) কহে।

গগন মণ্ডলের যে বিন্দু ঠিক আমাদিগের মস্তকোপরিস্থ তাহার নাম শিরোবিন্দু; (Zenith) এবং যে বিন্দু আমাদিগের পদতলের অধোদিকস্থ তাহার নাম অধোবিন্দু। (Nadir) অথবা কোন স্থির তরল পদার্থের উপরিভাগ হইতে একটী সরলরেখা লম্বভাবে টানিলে পর সেই সরল রেখা যে দুইটী বিন্দুতে খগোলক স্পর্শ করে তাহাদিগকে

শিরোবিন্দু এবং অধোবিন্দু বলে। যথা ৬ষ্ঠ চিত্রক্ষেত্রে 'শ' এবং 'অ'।

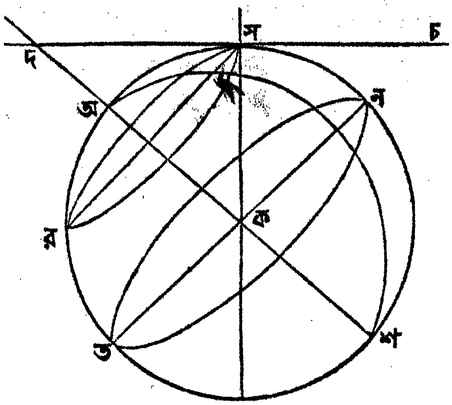


শিরোবিন্দু হইতে কোন জ্যোতিষ্কের দূরতাকে উহার শিরোবিন্দু অন্তর কহে। যথা ৬ষ্ঠ চিক্ষেত্রে 'জ' জ্যোতিষ্ক হইলে 'শজ' শিরোবিন্দু অন্তর হইবে।

যে বৃহদ্বৃত্তে চক্রবালীয় সমতল খগোলক ছেদ করে তাহাকে আকাশ কক্ষা, অথবা চক্রবাল অথবা দিগ্বলয় (Horizon) কহে।

অতএব আকাশকক্ষা খগোলকের একটি বৃহদ্বৃত্ত। শিরোবিন্দু এবং অধোবিন্দু এই বৃত্তের মেরু; এবং ইহার প্রত্যেক বিন্দু শিরোবিন্দু হইতে ৯০ অংশ অন্তর।

যে বৃত্তপরিধি আমাদিগের দৃষ্টিপথের সীমাসূচক, অর্থাৎ পরিষ্কার দিবসে যে বৃত্তের পরিধিতে নভোমণ্ডল এবং পৃথিবী সংলগ্ন বোধ হয়, সেই বৃত্তকে দৃশ্যমান চক্র বলে; যথা, ৭ম চিত্রক্ষেত্রে 'দচ' সমতল।



উক্ত দৃশ্যমান চক্রবালের সমস্তের একটী সমধরাতল পৃথিবীর কেন্দ্র সংলগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে গগন মণ্ডলকে স্পর্শ করে এরূপ কল্পনা করিলে, সেই কল্পিত বৃত্তকে প্রকৃত (Rational চক্রবাল কহে।

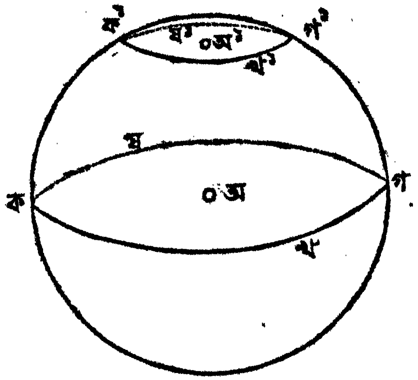
যে বৃহদ্বৃত্তে খগোলকে এবং প্রকৃত চক্রবাল পরস্পর স্পর্শ করে তাহার নাম খগোলক চক্রবাল। যথা, ষষ্ঠ চিত্রক্ষেত্রে 'চল'।

আকাশকক্ষা অথবা অম্বরান্তের সমান্তর রেখার নাম অম্বরান্ত রেখা।

যে পরিধির প্রত্যেক বিন্দু মধ্য বিন্দু হইতে সমান্তর তাহার নাম গোলক।

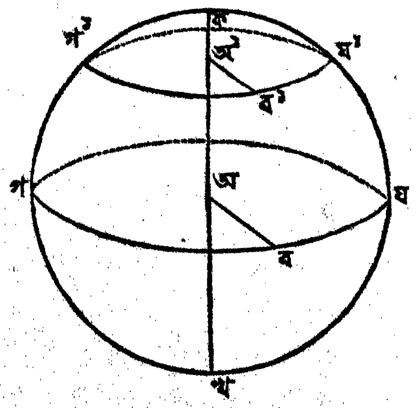
যে সকল বৃত্ত গোলক দুই সমান অংশে বিভক্ত করে, এবং যাহাদিগের কেন্দ্র এবং ব্যাস ও গোলকের কেন্দ্র এবং ব্যাস অভিন্ন তাহাদিগকে গোলকের বৃহদ্বৃত্ত কহে। যথা আকাশ কক্ষা, নিরক্ষবৃত্ত ইত্যাদি।

যে সকল বৃত্ত গোলক দুই সমান অংশে বিভক্ত করে না, এবং যাহাদিগের কেন্দ্র এবং ব্যাস ও গোলকের কেন্দ্র এবং ব্যাস বিভিন্ন, তাহাদিগকে গোলকের ক্ষুদ্রবৃত্ত কহে। যথা ৮ম চিত্রক্ষেত্রে ‘কখগঘ’ দ্বারা



১১১১
একটী বৃহদ্বৃত্ত, এই কখগঘ দ্বারা একটী ক্ষুদ্রবৃত্ত, ‘অ’ দ্বারা ‘কখগঘ’ বৃত্তের এবং
১　　১১১১
গোলকের কেন্দ্র, এবং ‘অ দ্বারা ‘কখগঘ বৃত্তের কেন্দ্র স্থাপিত হইতেছে।

৯ম ক্ষেত্রে ‘অ’ গোলকের কেন্দ্র। ‘ক’



এবং ‘খ’ বিন্দুদ্বয়ে, গোলক পরিধি ছেদ করে এরূপ একটী রেখা গোলকের কেন্দ্র দিয়া টানা যাউক; এবং ‘অ’ বিন্দু দিয়া ‘কখ’ রেখার লম্বভাবে ‘অব’ রেখা টানা যাউক। ‘অব’ ‘ব’ বিন্দুতে গোলক স্পর্শ করিতেছে।

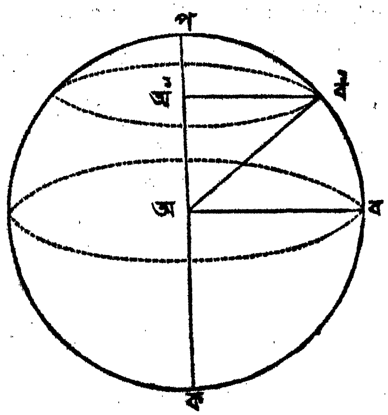
‘কখ’ আবর্ত্তন শলাকা এবং ‘অব’ ইহার লম্ব রেখা কল্পনা করা যাউক। ‘কখ’ র আবর্ত্তন দ্বারা ‘ব’ ‘গবঘ’ নামক বৃহদ্বৃত্ত (কারণ ‘অ’ ইহার কেন্দ্র) নিষ্কাশিত করিবে।

১১
‘অবকে ‘কখ’ আবর্ত্তন শলাকার অপর
১
একটী লম্বরেখা কল্পনা করিলে ‘ব বিন্দু
১১১
দ্বারা ‘গবঘ নামক একটী ক্ষুদ্র বৃত্ত (কারণ ইহার কেন্দ্র এবং গোলকের কেন্দ্র বিভিন্ন) অঙ্কিত হইবে। ‘ক’ এবং ‘খ’ বিন্দু দ্বয়কে এই বৃত্তদ্বয়ের মেরুদ্বয় কহে।

সাধারণ মেরু বিশিষ্ট বৃত্ত সকলকে সমান্তর-বৃত্ত কহে। যথা ‘গবঘ’ এবং
১১১
‘গবঘ।

বৃহদ্বৃত্তের প্রত্যেক বিন্দু ইহার মেরু হইতে ৯০অংশ (degrees) অন্তর; কিন্তু ক্ষুদ্র বৃত্তের এরূপ নহে। ক্ষুদ্র বৃত্তের প্রত্যেক বিন্দুর দূরতা এক মেরু হইতে ৯০ অংশের অধিক, এবং অপর মেরু হইতে ৯০ অংশের ন্যূন হইবে।

১০ ম চিত্রক্ষেত্রে 'পবক' বৃত্তার্দ্ধ, 'পক'



বৃত্তের ব্যাস, 'অ' কেন্দ্র, 'বঅ' এবং 'ব১ অ১' 'পক' র উপর লম্বভাবে পতিত হইয়াছে। 'পবক' বৃত্তার্দ্ধ 'পক' রেখা অবলম্বন করিয়া আবর্ত্তন করে কল্পনা করিলে, 'পবক' একটী গোলাকার পরিধি নিষ্কাশিত করিবে, এবং 'ব' একটী বৃহদ্বৃত্ত এবং 'ব১' একটী ক্ষুদ্রবৃত্ত অঙ্কিত করিবে। 'অ' এবং 'অ১' যথাক্রমে এই বৃত্তদ্বয়ের কেন্দ্র কল্পনা করা যাউক। এই বৃত্তদ্বয়ের সাপেক্ষ আয়তন তুলনা করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য।

বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ যত বৃহত হইবে, বৃত্তপরিধি তদনুসারে বৃহৎ হইবে। যদি কোন বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ অপর বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধের দ্বিগুণ হয়, তাহা হইলে প্রথমোক্ত বৃত্তের পরিধি শেষোক্ত বৃত্তের পরিধির দ্বিগুণ হইবে, যদি তিন গুণ হয় তিন গুণ হইবে; ইত্যাদি। অতএব 'অ১ব১ এবং 'অব' যে অনুপাতীয় হইবে ক্ষুদ্রবৃত্ত যাহার ব্যাসার্দ্ধ 'অ১ব১ এবং বৃহদ্বৃত্ত যাহার ব্যাসার্দ্ধ 'অব' তাহাও সেই অনুপাতীয় হইবে।

'পব১ গোলীভুজ দ্বারা 'প' মেরু হইতে ক্ষুদ্রবৃত্তের প্রত্যেক বিন্দুর দূরতা বিজ্ঞাপিত হইতেছে। 'পব১ ভুজকে সচরাচর ক্ষুদ্র বৃত্তের মেরু দূরতা কহে।

যে সকল বৃহদ্বৃত্ত আকাশ কক্ষের সমান্তর এবং খমধ্য যাহাদিগের সাধারণ মেরু তাহাদিগের নাম দৃগ্বৃত্ত অথবা দৃঙমণ্ডল। যথা ৬ষ্ঠ ক্ষেত্রে 'শজই'। এই সকল বৃত্ত দ্বারা আকাশ কক্ষের উপর জ্যোতিষ্কগণের উন্নতি নির্ণীতি হয়।

উন্নতি দুই প্রকার (১) প্রকৃত (২) দৃশ্যমান। পৃথিবীর কোন স্থান হইতে দৃষ্টি করিলে জ্যোতিষ্কগণের যে উন্নতি প্রতীয়মান হয় তাহার নাম দৃশ্যমান উন্নতি। কিরণ বক্রীভবন এবং লম্বন বশতঃ উন্নতি পর্য্যবেক্ষণ ভ্রমাত্মক হইয়া থাকে। এই ভ্রম সংশোধন করিলে প্রকৃত উন্নতি নিরূপিত হয়।

যে বৃত্ত জ্যোতিষ্কের দৈনন্দিন পৃথিবী প্রদক্ষিন দ্বারা উৎপাদিত হয় তাহাকে অহোরাত্র বৃত্ত কহে যথা ৬ষ্ঠ ক্ষেত্রে 'দব'।

যে কল্পিত ব্যাস অবলম্বন করিয়া পৃথিবী প্রতিদিন পরিভ্রমণ করে তাহার নাম পৃথিবীর মেরুদণ্ড। যথা, ৭ম চিত্রক্ষেত্রে 'অশ'। এই আবর্ত্তন শলাকার এক প্রান্তকে উত্তর মেরু এবং অপর প্রান্তকে দক্ষিণ মেরু কহে।

মেরু হইতে কোন জ্যোতিষ্কের দূর-

তাকে উহার মেরু অন্তর কহে। যথা ৬ষ্ঠ ক্ষেত্রে 'মজ'।

উত্তর মেরু অথবা সুমেরু হইতে যে অন্তর তাহাকে সুমেরু অন্তর,(N. P. D.) এবং দক্ষিণ মেরু অথবা কুমেরু হইতে যে অন্তর তাহাকে কুমেরু অন্তর (S. P. D.) কহে।

শ্রী নীঃ—

শকুন্তলা সমালোচনার সমালোচনা।

শকুন্তলার চরিত্র-সম্বন্ধে লেখক খুঁজিয়া পাতিয়া এমনি একটি সূক্ষ্ম বাহির করিয়াছেন যে, তাহা জন-সাধারণের বুদ্ধির অগোচর—স্বপ্নের অগোচর—বড় একটি অদ্ভুত রহস্য! সেটি এই যে,মানব-প্রকৃতির বিষয়টা কালিদাসের বড় একটা জানা শুনা ছিল না! লেখকের অসাধারণ সাহস বলিতে হইবে যে, তিনি কালিদাসকে মানব প্রকৃতির নিগূঢ় মর্ম্ম শিক্ষা দিতে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছেন—কালিদাসের মহা অপরাধ যে, লেখকের অভিপ্রায়ানুসারে তিনি শকুন্তলাকে মিরাণ্ডা কিংবা পর্ডিটার মত করিয়া গঠন করেন নাই। তবে, ইতর ভাষায় একটি প্রবাদ আছে "মারি ত গণ্ডার —লুটি ত ভাণ্ডার," তাই উচ্চতা শিক্ষা দিতে হইলে হিমালয়কেই দেওয়া উচিত, বিস্তার শিক্ষা দিতে হইলে সমুদ্রকেই দেওয়া উচিত, মানব-প্রকৃতি শিক্ষা দিতে হইলে কালিদাসকেই দেওয়া উচিত, একথা লেখক বলিতে পারেন এবং তদুত্তরে আমরাও বলিতে পারি যে, তবে তিনি এক জন অসামান্য বীর পুরুষ তাহার আর সন্দেহ নাই! যখন জগৎ-শুদ্ধ সকলেই শকুন্তলার কবিত্ব-রস-মাধুর্য্য শত সহস্র মুখে ঘোষণা করিয়াও তৃপ্তি মানিতেছে না, তখন তাহার নিগূঢ় মর্ম্মটা তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা কর, তাহা নহে—কালিদাসের বিরুদ্ধে লেখনীর লৌহ মুদ্গার হস্তে করিয়া কোমর বাঁধিয়া দাঁড়ানো—কি সর্ব্বনাশ! আশ্চর্য্য এই যে, বঙ্কিম বাবু আমাদের দেশের এক জন সুপ্রসিদ্ধ লেখক, তিনি যেমন কৃতবিদ্য তেমনি রসজ্ঞ, যেমন গুণী তেমনি গুণ-গ্রাহী বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত,—আশ্চর্য্য এই যে তিনিও কালিদাসের উপর লেখনীর ঠোকর দিতে ছাড়েন নাই! কালিদাস যদি জুলিয়স্ সীজার হইতেন তবে তিনি নিশ্চয়ই বলিতেন "Et tu Brute"—এটা যেন আমরা চক্ষের সামনে দেখিতে পাইতেছি! বলিতে কি আমাদের মনে এইরূপ একটা সন্দেহ জন্মিয়াছে যে, বুঝিবা তাঁহারই দেখা-দেখি লেখক কালিদাসের উপর

কলম চালাইতে সাহসী হইয়াছেন—সাহস এবং স্পর্দ্ধার কথা ধরিতে গেলে চেলা গুরুকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া দিয়াছেন। বঙ্কিম বাবুরও পূর্ব্বে কবিকুল-চূড়-মহোদয় মাইকেল মধুসূদন ইঙ্গিতচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে তিনি কালিদাসকে এক ঘুসিতে পাড়িয়া ফেলিতে পারেন! শকুন্তলার চরিত্র সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু গোটা-ছুত্তিন কথা যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে জোর-জবর্দস্তির কিছুমাত্র অপ্রতুল নাই বরং তাহা মাত্রা অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু যুক্তির বাঁধুনি তেমন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার সমালোচনার প্রথমেই তিনি শকুন্তলা এবং মিরান্দা উভয়ের অবস্থা-সাদৃশ্য দেখাইয়া তাহাদের মধ্যে কোন্ খানটায় অমিল তাহা দেখাইতেছেন—

"শকুন্তলা সরলা হইলেও অশিক্ষিত নহেন। তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন, তাঁহার লজ্জা। লজ্জা তাঁহার চরিত্রে বড় প্রবলা; তিনি কথায় কথায় দুষ্মন্তের সম্মুখে লজ্জাবনতমুখী হইয়া থাকেন—লজ্জার অনুরোধে আপনার হৃদ্গত প্রণয় সখীদের সম্মুখেও সহজে ব্যক্ত করিতে পারেন না। মিরান্দার সেরূপ নহে। মিরান্দা এত সরলা যে, তাহার লজ্জাও নাই। কোথা হইতে লজ্জা হইবে? তাহার জনক ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখন দেখেই নাই। প্রথম ফর্দিনন্দকে দেখিয়া মিরন্দা বুঝিতেই পারিল না যে, কি এ?

Lord! how it looks about! Believe me Sir,
It carries a brave form;—but 'tis a spirit.

সমাজপ্রদত্ত যে সকল সংস্কার, শকুন্তলার তাহা সকলই আছে, মিরন্দার তাহা কিছুই নাই। পিতার সম্মুখে ফর্দিনন্দের রূপের প্রশংসায় কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই—অন্যে যেমন কোন চিত্রাদির প্রশংসা করে, এ তেমনি প্রশংসা;

I might call him
A thing divine, for nothing natural
I ever saw so noble.

অথচ স্বভাবদত্ত স্ত্রীচরিত্রের যে পবিত্রতা যাহা লজ্জার মধ্যে লজ্জা. তাহা মিরন্দার অভাব নাই, এজন্য শকুন্তলার সরলতা অপেক্ষা মিরান্দার সরলতায় নবীনত্ব এবং মাধুর্য্য অধিক। যখন পিতাকে ফর্দিনন্দের পীড়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া মিরান্দা বলিতেছে,

O dear father
Make not too rash a trial of him, for
He's gentle, and not fearful.

যখন পিতৃমুখে ফর্দিনন্দের রূপের নিন্দা শুনিয়া মিরন্দা বলিল,

My affections
Are then most humble; I have no ambitions
To see a goodlier man.

তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, মিরান্দা সংস্কার বিহীনা, কিন্তু মিরান্দা পরদুঃখকাতরা, মিরান্দা স্নেহশালিনী; মিরান্দার লজ্জা নাই। কিন্তু লজ্জার সারভাগ যে পবিত্রতা, তাহা আছে।"

বঙ্কিম বাবুর উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের মধ্যে ছাঁট ছোঁট দিয়া এইটুকু কেবল আমরা শিরোধার্য্য করিতে পারি যে, "শকুন্তলা সরলা হইলেও অশিক্ষিত নহেন" ও "সমাজ-প্রদত্ত যে সকল সংস্কার, শকুন্তলার তাহা সকলই আছে, মিরান্দার তাহা কিছুই নাই;" শকুন্তলা মিরন্দা অপেক্ষা শিক্ষিতা ইহাতে আর সন্দেহ নাই, কেননা এক ত বিদ্যা-শিক্ষা বিষয়ে উভয়ের কেহ যে কাহারো ন্যূন ছিল ইহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না, তদ্ব্যতীত লৌকিক আচার-ব্যবহার শিক্ষা মিরান্দার অবস্থা-সুলভ ছিল না সুতরাং সে বিষয়ে শকুন্তলা অনেক অগ্রগামী; এ যেন হইল,—কিন্তু মাঝে মাঝে গ্রন্থকার অকাট্য সিদ্ধান্তের ভঙ্গী করিয়া এমনি এক একটি আজগুবি কথা গুঁজিয়া রাখিয়াছেন যে, রকম সকম দেখিয়া হঠাৎ লোকে ভড়্‌কিয়া যায়,—মনে করে, যে-সব সেপাই সান্ত্রি পাহারা দিতেছে ওখানে এগোনো দায়! কিন্তু একটু কাছে গিয়া দেখ অমনি তোমার ভুল ভাঙ্গিয়া যাইবে—দেখিবে যে, সিপাই-গুলি তালপাতার সিপাই হইতে অধিক কিছুই নহে। "মিরান্দা এত সরলা যে তাহার লজ্জাও নাই" এ কথাটি বঙ্কিম বাবু কিসের জোরে বলিতেছেন? কোন্ শাস্ত্রে বলে—কোন যুক্তিতে বলে যে, স্ত্রীজাতি-সুলভ নৈসর্গিক লজ্জা সরলতার অভাব জ্ঞাপন করে; এ রকম অকাট্য-ভানের বচন-গুলি দেখিলে আমাদের মনে হয় যে, বুক্তির হালে পানি পাইতেছে না—অথচ লেখনীর দাঁড় টানিতে কসুর করা হইতেছে না—ভরষা কেবল যা' এক গায়ের-জোর-কাণ্ডারী! "মিরান্দার লজ্জা নাই" এ কথাটির মর্ম্ম-খানা কি একবার ভাবিয়া দেখা যা'ক;—এক প্রকার জাল-লজ্জা আছে বটে যাহা প্রকৃত পক্ষে লোকাচারেরই কন্যা, তবে কি না মানব-প্রকৃতির সঙ্গে তাহার সহবাসের ঘনিষ্টতা দেখিয়া লোকে জানেযে, তাহা মানব প্রকৃতিরই গর্ব্ভজাত কন্যা। বড়-ঠাকুরকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া পলায়ন করা ঐ দলের লজ্জা—মনে হইতে পারে যে স্ত্রীলোকের পক্ষে উহা স্বাভাবিক কিন্তু বাস্তবিক তাহা লোকাচার ভিন্ন আর কিছুই নহে। লজ্জা-শব্দে শুদ্ধ যদি কেবল ঐরূপ লজ্জা বুঝাইত তবে বঙ্কিম বাবু উপরে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা সম্পূর্ণ শিরোধার্য্য করিতাম। ইহা আমরা খুবই স্বীকার করি যে, মিরান্দা তাহার পিতার সমক্ষে ফর্ডিনাণ্ড উপলক্ষে স্বচ্ছন্দে যেরূপ আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিল, শকুন্তলা হইলে কখনই তাহা পারিত না—লোকাচার-জ্ঞান লজ্জা-বেশে উপস্থিত হইয়া তাহার মুখে চাবি দিয়া রাখিত। কিন্তু ও একরূপ লজ্জা আর শিশুদের স্তন্য-পান-প্রবৃত্তির ন্যায় যাহা মনুষ্যের, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির, স্বভাব-সিদ্ধ—এ একরূপ লজ্জা। এরূপ লজ্জা মিরান্দার আছে ইহা বঙ্কিম বাবু কোন স্থানেই বলেন নাই; তিনি বলিয়াছেন বটে যে, "মিরান্দার লজ্জা নাই কিন্তু লজ্জার সারভাগ যে পবিত্রতা তাহা আছে;" কিন্তু পবি-

ত্রতা কিছু আর লজ্জার নামান্তর নহে—লজ্জা মাত্রই ত আর অপবিত্র নহে,—এক জন স্বৈরচারিণী স্ত্রী যদি এক জন সরলা সুশীলা অবগুণ্ঠনবতী কুল-বধূকে অপবিত্র বলিয়া তিরস্কার করে, তবে কোন্ সহৃদয় শ্রোতা তাহা ঘাড় পাতিয়া লইতে পারে? বঙ্কিম বাবু যদি বলিতেন যে,মিরান্দার অশিক্ষা-সুলভ নৈসর্গিক লজ্জা আছে, লোকজনের-দেখিয়া-শেখা লজ্জা নাই, তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে আমাদের আর কোন কথা বলিবার থাকিত না। এই টুকু পর্য্যন্ত কেবল আমরা স্বীকার করি যে, মিরান্দা তাহার পিতা প্রস্পেরোর নিকটে আপনার মনের সকল কথা অসংকোচে ব্যক্ত করাতে এটি খুব প্রকাশ পাইয়াছে যে, লোকাচার-নিবন্ধন লজ্জা যে কাহাকে বলে তাহা সে জানিত না; কিন্তু মিরান্দা যখন ফর্ডিনাণ্ডের নিকট আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিতেছিল, তখন যে স্ত্রীজাতি-সুলভ নৈসর্গিক লজ্জা তাহার মনে অধিকার পায় নাই ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না;—বিশেষতঃ যখন দেখা যায় যে পশুরাও ওরূপ লজ্জার সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত নহে—পুরুষ-পশুর ভাব-পূর্ণ আহ্বানে স্ত্রী-পশু স্বভাবতই সঙ্কোচ প্রকাশ করিয়া থাকে। মিরান্দার মনে যদি লজ্জার উদয় না হইবে তবে "Hence bashful cunning" এ কথা বলিয়া কাহাকে সে দূর করিয়া দিতে ইচ্ছা করিল? যদি বল যে, মিরান্দার লজ্জা একেবারেই নাই যে তাহা নহে—তবে কি না শকুন্তলার যত লজ্জা তত তাহার নাই; তবে তাহাও সকল পক্ষে খাটে না,—শুদ্ধ কেবল লোকাচার-মূলক লজ্জার পক্ষেই খাটে; কেননা নৈসর্গিক লজ্জা মিরাণ্ডাতেও যেমন শকুন্তলাতেও তেমনি—দুই পক্ষেই সমান প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়, তবে প্রেম নাকি তাহা অপেক্ষা আরো প্রবল এজন্য উভয়ের কাহারো তেমন-ধারা লজ্জা প্রেমের হস্তে নিস্তার পাইতে পারে নাই। নিম্নে এবিষয়টা একটু বিবৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

ভালবাসার পাত্রের নিকট মনের ভাব আগা-গোড়া সমস্তই খুলিয়া বলিতে স্বভাবত ইচ্ছা যায় সত্য কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে তবে কেন তাহা একেবারে খুলিয়া বলিতে বাধো-বাধো ঠেকে? ইহার কারণ স্পষ্টই পড়িয়া আছে,—এক কথায় এই যে, দু'হাত নহিলে তালি বাজে না; নায়িকা যে নায়কের নিকট আপনার মন খুলিয়া দেখাইতে পারিলেই বাঁচে তাহার এক কারণ—মনের ভার-লাঘব করিবার ইচ্ছা, আর এক কারণ মনের বিনিময়ে মন পাইবার ইচ্ছা—এই দ্বিতীয় কারণ স্থলটি লজ্জা শঙ্কা প্রভৃতি অনেক গুলি গুহাশয় জন্তুর বাসস্থান; শঙ্কা এই যে, মনের বিনিময়ে মন না পাইয়া যদি শুদ্ধ কেবল কপট ভালবাসা পাই তবেই ত সর্ব্বনাশ! লজ্জা এই যে, মনের বিনিময়ে মন না পাইয়া যদি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা তিরস্কার পাই তবে ত আর আমি নাই! কিন্তু প্রেমের তোড়ের মুখে লজ্জা কত

কাল টেঁকিয়া থাকিতে পারে? মিরাণ্ডার মনে যে-মাত্র লজ্জা উদয় হইয়াছে—প্রেম আসিয়া অমনি তাহাকে এক ধমক "Hence bashful cunning;" "cunning" শব্দটি প্রেমের স্বাভাবিক cunning-ত্ব "অশিক্ষিত-পটুত্ব" ব্যক্ত করিতেছে; লজ্জার সঙ্গে চাতুরি শব্দটি যুড়িয়া না দিলে লজ্জাকে ভৎসনা করিবার সুবিধা পাওয়া যায় না বলিয়া প্রেম অলক্ষিত ভাবে "চাতুরি" শব্দটি গুঁজিয়া দিল; কেননা লজ্জা ভৎসনার যোগ্য নহে,চাতুরিই কেবল ভৎসনার যোগ্য, তবে যে লজ্জা ওখানে চোর দায়ে ধরা পড়িয়াছে সে কেবল চাতুরি-শব্দের অসাধু-সঙ্গ বশতঃ;—অতএব আর কিছু না লজ্জাকে তাড়াইবার জন্য প্রেম অলক্ষিত ভাবে তাহার ললাটে চাতুরি-শব্দের ছাপ মারিয়া দিল,—মিরান্দা তাহাতে ভুলিয়া মনে করিল "আপনার মনকে গোপন করা এক রূপ চাতুরী খেলা"। মিরান্দার মনে অমঙ্গল আশঙ্কাও যে বিলক্ষণ জাগরূক ছিল তাহা পরের কতিপয় পংক্তিতেই জ্বল্ জ্বলাট্ যথা,

"Iam your wife,if you will marry me
—If not, I die your maid: to be [your fellow
You may deny me, but I will be [your servant
Whether you will or no."

ফর্ডিনাণ্ডের নিকট মন অনাবৃত করিলে ফর্ডিনাণ্ড তাহা অগ্রাহ্য করিলেও করিতে পারে এই এক শঙ্কা এবং উপযাচক হইয়া প্রেম জ্ঞাপন করা এই এক লজ্জা,—দুইই মিরাণ্ডার মনে যথেস্ট পরিমানে ছিল তথাপি প্রেমের মন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া আপনার মনকে এই রূপ প্রবোধ দিতে গিয়াছে যে, মন গোপন করাটা চাতুরি খেলা—চাতুরি-খেলাটা একরূপ প্রতারণা করা—প্রতারণা করাটা একরূপ মিথ্যা কথা কহা—মিথ্যা কথা বলাটা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য! এত গুলি কথা কিছু আর তাহার মনে আনুপূর্ব্বিক গ্রথিত হইয়া আইসে নাই—হয় ত অমন-ধারা একটা কথাও তাহার মনে লিপি-বদ্ধ হয় নাই—তবে কিনা ভাবটা ঐ। মন গোপন করাটাই যে আশঙ্কিত বিপদ হইতে—আশঙ্কিত অপমান তিরস্কার লাঞ্ছনা গঞ্জনা ইত্যাদি হইতে—নিস্তার পাইবার এক মাত্র উপায়, এ কথা তখন আমলেই আইল না—মনো-গোপনের মন্দ দিক্‌টাই নেত্র-পথে আবির্ভূত হইল। দারুণ বিরহাবস্থায় পড়িয়া শকুন্তলারও মনে বিলক্ষণ ভয় হইয়াছিল যে, চাই কি রাজা তাহার প্রার্থনা একেবারেই অগ্রাহ্য করিতে পারেন; শকুন্তলা তখন ভাবিতেছে,"এমনেও গিয়াছি নয় অমনেও যাইব, ভাগ্যে যা আছে তাই হইবে—উপায়ের মধ্যে এক যা উপায় দেখিতেছি রাজাকে একখানা পত্র লেখা"; এই রূপ বিষম এক উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া তবে শকুন্তলা রাজাকে এই পত্র খানি লিখিয়াছিল।

"তুজ্ঝ ণ আণে হিঅঅং মম উণ কামো
দিবাবি রত্তিম্পি।

নিগ্‌ঘিণ তবেই বলিঅং তুই বুত্ত মনোর-
হাই অঙ্গাইং॥"

শকুন্তলার মনে ভয়-লজ্জা যেরূপ ঢেউ খেলিতেছে তাহাতে, "তুজ্‌ঝ ণ আণে হি অঅং" "তোমার হৃদয় আমি জানি না" (কিন্তু আমার এইরূপ অবস্থা) একথাটি কি ঠিক্ জায়গায়ই বসিয়াছে! মিরান্দা অতগুলি কথাতে যে আশঙ্কাটি প্রকাশ করিয়াছে গরিব বেচারী শকুন্তলা "তোমার হৃদয় আমি জানি না কিন্তু" ইত্যাদি গোটা দুই কথাতে সমস্তই বলিয়া চুকিয়াছে; ঐ কথাটি যদি শ্লোকের গোড়াতেই না বসিত তাহা হইলে উহার মনোহারিত্ব মারা পড়িয়া যাইত; "তোমার হৃদয় আমি জানি না" এই কথাটিকে মুখপাত করিয়া আপনার হৃদয়ের অবস্থা জ্ঞাপন করাতে প্রেমের মুন্সিগিরির চূড়ান্ত প্রকাশ পাইয়াছে—তাহাতে বলা হইয়াছে যে, তুমি আমাকে অগ্রাহ্য করিতে পার, আমাকে তিরস্কার করিতে পার, আমাকে ভৎসনা করিতে পার, আমার আস্পার্দ্ধার কথা শুনিয়া হাস্য করিতে পার—সবই তুমি পার ইহা আমি জানি, কিন্তু তথাপি আমার অবস্থা এরূপ নিদারুণ যে, তোমার নিকট মন খুলিয়া বলা ভিন্ন আর আমার গতি নাই!" পত্র-খানি শঙ্কা-পূর্ব্বক হওয়াতেই এত মনোহর হইয়াছে; এক জন নিকৃষ্ট কবির হাতে পড়িলে শকুন্তলা আগে আপনার মনের অবস্থার কথা লিখিয়া পরে রাজার মনের অবস্থার কথা জানিতে চাহিত—আগে ন্যায়-শাস্ত্রের পদ্ধতি-অনুসারে জানা কথাটা ব্যক্ত করিয়া অজানা কথার মীমাংসা চাহিত—কিন্তু কালিদাস কি জায়গাটিতেই ঐ নির্দোষ সরল হৃদয়ের সদ্যোজাত আশঙ্কাটি কয়েকটি কম্পিত-স্বরে শব্দিত করিয়াছেন—ইহাতেও আজিকার কালের কোন কোন ব্যক্তি এ কথা মুখে আনিতে লজ্জা বোধ করেন না যে, কালিদাস মানব প্রকৃতি বুঝিতেন না! অতএব আর অধিক বলা বাহুল্য যে, নৈসর্গিক লজ্জা শকুন্তলারও যেমন মিরাণ্ডারও তেমনি, উভয়েরই সমান তবে কি না প্রেমের তাড়া খাইয়া দুটার কাহকেও বেশী ক্ষণ তিষ্ঠিয়া থাকিতে হয় নাই। বঙ্কিম বাবু এক জায়গায় লৌকিক লজ্জার কথা উল্লেখ করিয়াছেন যথা "মিরন্দা সংস্কার-শূন্যা, লৌকিক লজ্জা কি তাহা জানে না, অতএব তাহার প্রণয় লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে।" লৌকিক লজ্জা জানে না—তবে যেন সে আর কোন রকমের জানে লজ্জা জানিলেও জানিতে পারে ইহাতে বঙ্কিন বাবুর কোন আপত্তি নাই—কিন্তু তাহা তিনি কোন স্থানে ইঙ্গিতেও ব্যক্ত করেন নাই; বঙ্কিম বাবু ক্রমাগতই বলিয়া আসিতেছেন মিরান্দার লজ্জা নাই, তাহাতে আবার বলিতেছেন যে "তাহার প্রণয়-লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে;" অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে এই যে কথা ইহা নৈসর্গিক লজ্জা পক্ষে খাটে না,—কেন না সে-পক্ষে শকুন্তলা অপেক্ষা মিরান্দা কোন অংশে ন্যূন নহে; উভয়েরই নৈসর্গিক লজ্জা যথেষ্ট রহিয়াছে

এবং উভয়েই প্রেম-সমক্ষে সে লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়াছে। বঙ্কিম বাবু মিরান্দার "Hence bashful cunning" এ কথাটি শুদ্ধ কেবল তাহার লজ্জা-হীনতার নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—তাহার লজ্জা হইতেছে ও সে-তাহার-লজ্জাকে সে ভৎর্সনা করিয়া তাড়াইয়া দিতেছে—ইহার উপর বঙ্কিম বাবুর আদবেই চক্ষু পড়ে নাই,—বঙ্কিম বাবুর যুক্তি এই যে, ফর্ডিনাণ্ডের সমক্ষে Hence ইত্যাদি কথা বলিতে মিরান্দার যখন লজ্জা করে নাই তখন সে লজ্জা-হীনা; এস্থলটিতে তাঁহার দেখা উচিত ছিল যে, "দূর হও লজ্জা-বেশী চতুরতা" ইত্যাদি, কথা গুলি প্রেমের শিখাইয়া দেওয়া কথা; কিন্তু তাহার মনের কথা খুলিয়া বলিতে অবশ্যই তাহার লজ্জা করিতেছে—নৈসর্গিক লজ্জা অবশ্যই তাহার আছে, তা' নহিলে *H*ence ইত্যাদি কথাগুলির সমস্ত তাৎপর্য্যই মাঠে মারা যায়—Hence বলিয়া যাহাকে তাড়াইবে তাহারই অভাব হইয়া যায়। বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন "স্বভাব-দত্ত স্ত্রী-চরিত্রের যে পবিত্রতা, যাহা লজ্জার মধ্যে লজ্জা, তাহা মিরান্দার অভাব নাই," বঙ্কিম বাবুর এ কথাটির যে কি অর্থ তাহা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না; মিরান্দা বলিয়াছে

"Hence bashful cunning :
—And prompt me, plain and
holy innocence."

মিরান্দা এখানে লজ্জা-বেশী চতুরতা হইতে নিস্তার পাইবার জন্য পবিত্রতার শরণাপন্ন হইতেছে—সুতরাং পবিত্রতা এখানে লজ্জার বিরোধী পক্ষ তবে আর তাহা কেমন করিয়া লজ্জা শব্দের বাচ্য হইবে, অন্ধকার কেমন করিয়া আলোক শব্দের বাচ্য হইবে? অতএব বঙ্কিম বাবুর ও জায়গাটা এইরূপে পরিবর্ত্তন করিলে ভাল হয়,— স্বভাবদত্ত স্ত্রী-চরিত্রের যে লজ্জা, যাহা লৌকিক লজ্জা অবিদ্যমানেও রমনী-হৃদয়ে আধিপত্য করে, তাহা মিরান্দার অভাব নাই। আর বঙ্কিম বাবু যে, বলিয়াছেন "তাহার (অর্থাৎ মিরান্দার) প্রণয় লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষা-কৃত পরিস্ফুট হইবে" ইহাও নৈসর্গিক লজ্জা-পক্ষে খাটে না;—শকুন্তলার প্রণয়-লক্ষণ "তুজ্ঝ ণ আণে হিঅঅং" ইত্যাদি বাক্যে পরিস্ফুট হইয়াছে, এবং মিরান্দার প্রণয়-লক্ষণ "Hence" ইত্যাদি বাক্যে পরিস্ফুট হইয়াছে, ইহাতে "উভয়ের কাহারো লজ্জা-হীনতা প্রকাশ পাইতেছে না—প্রকাশ পাইতেছে তবে কি? না লজ্জার সহিত প্রেমের যোঝাযুঝি এবং অন্তে প্রেমের জয় লাভ—এই যা' কেবল।

বাঙ্গালা সাহিত্য-রাজ্যে আজকাল গোঁজা-মিলনের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব তাহা আমরা জানি কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, বঙ্কিম বাবুর ন্যায় এক জন বিচক্ষণ ব্যক্তিও সে দোষ হইতে সম্পূর্ণ রূপে নির্মুক্ত নহেন। বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন যে,

"যখন রাজপুত্রের সঙ্গে মিরন্দার সাক্ষাৎ হইল, তখন তাহার হৃদয় প্রণয়-সংস্পর্শ-শূন্য

ছিল; কেননা শৈশবের পর পিতা ও কালিবন ভিন্ন আর কোন পুরুষকে তিনি কখন দেখেন নাই। শকুন্তলাও যখন রাজাকে দেখেন, তখন তিনিও শূন্যহৃদয়, ঋষিগণ ভিন্ন পুরুষ দেখেন নাই।"

মিরন্দা এবং শকুন্তলার মধ্যে অবস্থা সাদৃশ্য ঘনীভূত করিবার জন্য বঙ্কিম বাবু উপরে ঐ যে কথাটি বলিলেন, যে, শকুন্তলা ঋষিগণ ভিন্ন পুরুষ দেখেন নাই—উহা গোঁজা মিলনের একটি সুন্দর উদাহরণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে; কিন্তু ঐ চোরা চালটিতে করিয়া গ্রন্থকর্ত্তার কোন উপকার হওয়া দূরে থাকুক, লাভের মধ্যে তিনি এক পা বাড়াইতেই কিস্তিমাত হইয়া পড়িয়াছেন; তিনি একটু পরেই বলিতেছেন যে "শকুন্তলা সমাজ-প্রদত্ত সংস্কার সম্পন্না;" "ঋষিগণ ভিন্ন পুরুষ দেখেন নাই" এমন যে শকুন্তলা তিনি কি না "সমাজ-প্রদত্ত সংস্কার-সম্পন্না"! ঐ যে সমাজ-প্রদত্ত সংস্কার উহা শকুন্তলা কি যোগ-বলে পাইয়াছিল না স্বপ্নে পাইয়াছিল? ইহার পরেই বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থে আসিতেছে।

"উভয়েই তপোবন মধ্যে—এক স্থানে কণ্বের তপোবন—অপর স্থানে প্রস্পেরোর তপোবন—অনুরূপ নায়ককে দেখিবামাত্র প্রণয়শালিনী হইলেন।"

প্রস্পেরোর উপদ্বীপকে তপোবন বলিয়া স্বচ্ছন্দে চালাইয়া দেওয়া, লোকালয়ের সহিত একেবারেই সম্পর্ক-শূন্য ইন্দ্রজাল-গুপ্ত অগম্য উপদ্বীপকে লোকালয়ের অনতিদূরবর্ত্তী স্বচ্ছন্দ-গম্য তপোবন বলিয়া অনায়াসে চালাইয়া দেওয়া গোঁজা মিলন প্রদানের আর একটি সুন্দর উদাহরণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

প্রকৃত কথা এই যে, রাজ-পুরুষেরা প্রায়ই ঋষিদিগের তপশ্চর্য্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তপোবনে যাতায়াত করিত; কেননা মনুতে পাওয়া যায় যে ঋষিদিগের তপস্যা যাহাতে নিষ্কণ্টকে চলে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা রাজাদের একটা প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম; অত কেন—শকুন্তলাতেই ব্যক্ত আছে যে, "যঃ পৌরবেন রাজ্ঞা ধর্ম্মাধিকারে নিযুক্তঃ সোঽহং অবিঘ্ন ক্রিয়োপলম্ভায় ধর্ম্মারণ্যং ইদং আয়াতঃ।" তপস্যার কুশলাদির তত্ত্বাবধারকদিগের তপোবনে যাওয়া আসা এমনি একটা চল্‌তি ব্যাপার যাহা মধ্যে মধ্যে ঘটিয়া থাকে, এরূপ না হইলে দুষ্মন্ত রাজা সহসা ওরূপ একজন তত্ত্বাবধারকের ছদ্মবেশ ধারণ করিতে কখনই সাহসী হইতেন না; তা' ভিন্ন তপোবন অবারিতদ্বার—সেখানে প্রবেশ করিতে কাহারো নিষেধ নাই এ অবস্থায় সেখানে মধ্যে মধ্যে লোকের গমনাগমন হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি—তপোবন ত আর প্রস্পেরোর উপদ্বীপ নয় যে, তাহা দুস্তর সমুদ্র এবং ততোধিক দুস্তর মায়া-মন্ত্র দ্বারা লোকালয় হইতে একেবারেই বিচ্ছিন্ন। ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, নানা শ্রেণীর লোককে ভট্টাচার্য্যদিগের চতুষ্পাঠীতে যাইতে ত

দেখা যায়, তবে তপোবনের ঋষিদিগের নিকট লোকের গমনাগমন অসম্ভব হইবে কেন? সশিষ্যে এবং সপরিবারে ঋষিরা তপোবনে বাস করিতেন; শরীর-শোষণ-কারী লোকদ্বেষী কঠোর তপস্যা কখন যে তপোবনে আচরিত হইত এ রূপ বোধ হয় না; ইহার প্রমাণের জন্য দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই—কণ্বমুনির চরিত্রই উহার যথেস্ট প্রমাণ; কণ্বমুনিকে কেহ স্বপ্নে ও মনে করিতে পারে না, যে তিনি হৃদয়কে পাষাণে পরিণত করিয়া চতুরগ্নি বেষ্টিত হইয়া জীর্ণ শীর্ণ দেহে উর্দ্ধ-পদে দিন রাত্রি তপস্যা করিতেছেন—লোক জন দিগের তাঁহার কাছে যাইতে নিষেধ। তপোবনের অর্থ আর কিছুই নয়—পৃথিবীর ঝঞ্ঝাট্ হইতে দূরে থাকিয়া স্বাভিমত ব্যক্তিগণের সহিত পারমার্থিক চর্চা করিবার স্থান এবং তাহার সঙ্গে—যেমন কাশীরাম দাস বলিয়াছেন—"পড়িবে পড়াবে যজ্ঞ করিবে ব্রাহ্মণ" ইহারই উপযোগী এমন একটি নিভৃত নিবাস যেখানে লোকালয়ের কোলাহল প্রবেশ পাইতে পারে না। কণ্ব-মুনির ন্যায় ব্যক্তিরা অবশ্য পৃথিবীর দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত,—কিন্তু তা' বলিয়া এমন নয় যে তাঁহারা একেবারে পৃথিবী-ছাড়া লোক; এমন সুবিধা থাকিতে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা শান্তি করিবার জন্য লোকেরা যে মধ্যে মধ্যে তপোবনের সাধু সঙ্গে আপনাদের দেহ মন পবিত্র করিয়া আসিবে তাহা ত হইতেই পারে—না হওয়াই বিচিত্র।

বঙ্কিম বাবু এক স্থানে বলিয়াছেন "দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার প্রথম প্রণয় সম্ভাষণ এক প্রকার লুকাচুরি খেলা। সখি রাজাকে ধরিয়া রাকিস্ কেন? (!) তবে আমি উঠিয়া যাই, (!!) আমি এই গাছের আড়ালে লুকাই (!!!) শকুন্তলার এ সকল বাহানা আছে মিরান্দার সে সকল নাই।" উপরি-উদ্ধৃত তিনটি কথার গাত্রে পরপর বিস্ময়-চিহ্নের সংখ্যা-বৃদ্ধি দেখিয়া কেহ আশ্চর্য্য হইবেন না, কেননা প্রথম কথাটির আর সব রহিয়াছে কেবল মাথাটি নাই, রাজার সহিত নির্জ্জন প্রেমালাপের সময় দ্বিতীয় কথাটি শকুন্তলা মূলেই বলে নাই শুদ্ধ কেবল উঠিয়া যাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল; তৃতীয় কথাটির ছায়ামাত্রও শকুন্তলা-গ্রন্থে কুত্রাপি নাই। প্রথম কথাটি শকুন্তলা-গ্রন্থে এই রূপ আকারে রহিয়াছে

শকুন্তলা॥ প্রিয়ম্বদামবলোক্য॥ হলা কিং অন্তেউরবিরহপজ্জুস্সুঅস্স রাএসিণো উবরোহেন।

গুলো, রাজর্ষি অন্তঃপুর বিরহে উতলা ওঁরে আর উপরোধ কেন?

শকুন্তলার এ কথাটির শেষ ভাগের দু-রকম অর্থ করা যাইতে পারে; এক অর্থ এই—ওঁরে ধরে৷ রাখিস্ কেন? আর এক অর্থ এই যে, উপরোধের প্যাঁচে ফেলে রাজাকে আমাদের মনের মত কথা বলাচ্চিস কেন? বঙ্কিমবাবু উদ্ধৃত অংশটি প্রথম অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন—তাহা করুন, তাহাতে আমরা তত দোষ দেখিতেছি না, কিন্তু রাজার মনের ভিতরের কথাটা শুনিবার জন্য

শকুন্তলা যে অন্তঃপুর বিরহের কথা উল্লেখ করিল, বঙ্কিম বাবু তাহার আভাস পর্য্যন্তও দেন নাই—ইহাতে আমাদের সবিশেষ আপত্তি আছে। বিশেষ কোন কারণ নাই শুধু শুধু "সখি ওঁকে ধরিয়া রাখিস্ কেন" বলিলে কি যেন একটা গায়ে পড়া গোচের কথা—এই রূপ তাহা কাণে শুনায়; কিন্তু তাহা ত নয়;—যা'র জন্যে এখন শকুন্তলার মন একান্তই আঁকু বাঁকু করিতেছে তা' এই যে, রাজার মনের সঠীক সংবাদটি রাজা আপন-মুখে ব্যক্ত করিলে বাঁচা যায়; রাজার মন অন্তঃপুরের জন্য ছট্ ফট্ করুক্ আর না-ই করুক্, অন্তপুর বাসিনীদিগের অ-পেক্ষা রাজা শকুন্তলাকে অধিক ভালবাসেন কি না, এইটি অবিতথ রূপে জানিবার জন্য শকুন্তলার মন খুবই ছট্ ফট্ করি-তেছে; তাই শকুন্তলার মুখ হইতে অন্তঃ-পুরের কথাটা আপনা আপনি বাহির হইয়া পড়িয়াছে;—এটা নিতান্তই মনের মর্ম্মান্তিক কথা—উহার মধ্যে "বাহানা", কথার ছল, কিংবা দোকান-দারীর নাম গন্ধও নাই; যা'ক,—কিন্তু আর একটা কথা হচ্চে এই যে, "রাজাকে ধরিয়া রাখিস্ কেন" এরূপ প্রশ্ন আশপাশের কথাবার্ত্তার সঙ্গে আদ-বেই জোড় খায় না; রাজা ভাবে-মস্‌গুল্ হইয়া বসিয়া আছেন—উঠিয়া যাইবার কোন প্রসঙ্গই নাই—তবে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবার কথাই আসিবে কেন? হই-য়াছে এই যে, প্রিয়ম্বদা এমনি ভাবে রাজার নিকট শকুন্তলার মনের অবস্থা জ্ঞাপন করিতেছে যে, তাহা শুনিয়া শকু-ন্তলার প্রতি রাজার যেন দয়ার উদ্রেক হয়; রাজা তাহা শুনিয়া বলিলেন যে, তোমার সখীর যেমন ভালবাসা আমার প্রতি, আমারও তেমনি তোমার সখীর প্রতি। ইহা শুনিয়া শকুন্তলার মন তৃপ্ত হইল না—শকুন্তলা ভাবিল প্রিয়ম্বদা অত করিয়া আমার কষ্টের অবস্থা জানাইল—রাজা ভালবাসা না জানাইয়া করেন কি? শকুন্তলার মনোগত অভিপ্রায় এই যে, কাহারো কর্ত্তৃক কোন অংশে উপরুদ্ধ না হইয়া রাজা আপনা হইতে মনের কথাটা যতক্ষণ না খুলিয়া বলিতেছেন ততক্ষণ তিনি যতই কেন আমার মন-যোগানে কথা বলুন না, আমার মনে তাহা আমল পাইবে না; যদি এমন হয় যে, রাজা অন্তঃপুর অপেক্ষা আমাকে ভাল বাসেন না—চক্ষু লজ্জার দায়ে পড়িয়া আমার প্রতি লোক-দেখানে ভাল বাসা জানান, কিংবা দয়া করিয়া আমার কষ্ট নিবারণ মানসে আমার প্রতি ভাল বাসা জানান, ইহার কিছুই আমি চাই না। শকুন্তলা যাহা মুখে বলিয়াছে তাহার ভিতরের কথা এই "কই রাজা ত আপনা হইতে বলিতেছেন না যে, অন্তঃপুর অপেক্ষা তিনি আমাকে অধিক ভাল বাসেন, তবে তোমরা সখি ধরিয়া-বাঁধিয়া পেড়াপিড়ি করিয়া রাজাকে ভালবাসা স্বীকার করাইয়া লইতেছ কেন—উপরোধে আবশ্যক কি? আমরা যাহা বলি-লাম তাহা সত্য কি মিথ্যা কালিদাসের পুঁথি খুলিয়া দেখিলেই প্রকাশ পাইতে পারে—তথাপি পাঠকের সুবিধার জন্য আমরা

শকুন্তলার আবশ্যকীয় অংশের সমস্তটা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;

"প্রিয়ম্বদা। আবন্নস্‌স বিসঅবাসিণো জনস্‌স অত্তি-হরেণ রণ্ণা হোদব্বংত্তি এসো বো ধম্মো।

রাজা। নাস্যাৎপরং

প্রিয়ম্বদা। তেণ হি ইঅং ণো পিয়সহী তুমং উদ্দিসিঅ ইমং অবত্থন্তরং ভঅবদা মঅণেণ আরোবিদা। তা অরুহসি অব্‌ভু-ববত্তীএ জীবিদং সে অবলম্বিদুং।

রাজা। ভদ্রে! সাধারণোয়ং প্রণয়ঃ। সর্ব্বথানুগৃহীতোহস্মি।

শকুন্তলা॥ প্রিয়ম্বদামবলোক্য॥ হলা কিং অন্তেউর বিরহ পজ্জুস্‌সুঅস্‌স রাএসিণো উবরোহেণ।

ইহার মধ্যে "বাহানা" ই বা কোন্‌ খানে, কথার লুকাচুরিই বা কোন্‌খানে, হাব ভাব প্রকাশই বা কোন্‌খানে, কিছুই ত আমরা দেখিতে পাইতেছি না; এখানে শকুন্তলার যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে তবে তাহা এই যে, রাজা যদি অন্তঃপুর অপেক্ষা আমাকে ভাল না বাসেন তবে যেন তিনি অনুরোধে পড়িয়া আমার প্রতি প্রেম প্রদর্শন না করেন,—আমার জন্য রাজা অতটুকুও কষ্ট পা'ন—মন যাহা বলিতে চাহে না ভদ্রতার খাতিরে তাহা বলিয়া কষ্ট পা'ন ইহা আমি চাহি না" এই তা'র মনে হইয়াছিল।—এ সব খাঁটি সোনাকে সোনার গিল্‌টি করা অতি যৎসামান্য ধাতুর সহিত তুলনা করা—হৃদয়ের গূঢ়তম কথা-একটিকে "বাহনা"র সহিত তুলনা করা আর দেবালয়ে মূত্র ত্যাগ করা উভয়েই সমান।

এই ত গেল "সখি রাজাকে ধরিয়া রাখিস্‌ কেন?" তাহার পরে আসিতেছে "তবে আমি উঠিয়া যাই", এ কথাটা শুনিলে মনে হয় যে, রাজার সহিত শকুন্তলার অনেক দিন হইতে সখীত্ব চলিয়া আসিতেছে—অর্থাৎ "তবে ভাই আমি উঠিয়া যাই" বলিলেও যেন বলিতে পারিত; কিন্তু আশ্চর্য্য এই ও-কথা শকুন্তলা বলেই নাই, শকুন্তলা কেবল বলিয়াছে

"ণ মাণনীত্রস্‌স অত্তাণং অপরাহইস্‌সং"

"মাননীয় ব্যক্তির কাছে আমি আপনাকে অপরাধ-গ্রস্ত করিব না"

ইত্যুত্থায় গন্তু মিচ্ছতি

এই বলিয়া উঠিয়া যাইবার ইচ্ছা করিতেছে।

বঙ্কিম বাবু শকুন্তলার মুখ নিঃসৃত অতকটি শব্দের বদলে কেবল এক "তবে" শব্দ দিয়াই সারিয়াছেন, আর শকুন্তলা যেখানে কথা শেষ করিয়া উঠিয়া যাইতে উদ্যত সেখানে তাহার মুখে"আমিউঠিয়া যাই"কথাটি গুঁজিয়া দিয়াছেন, ইহাতেই দাঁড়াইয়াছে "তবে আমি উঠিয়া যাই।" আমাদের শাস্ত্রে পতি গুরুজনের সামিল; মিল্‌টন সেক্সপিয়র প্রভৃতি বড় বড় ইংরাজি পুঁথিতেও পতি Lord বলিয়া সম্বোধিত হইতে দেখা যায়; প্রেম-জনিত দুই হৃদয়ের প্রগাঢ় ঐক্য সত্ত্বেও শকুন্তলা দুষ্মন্তকে গুরুলোক বলিয়া জানিতেছে; সুতরাং দুষ্যন্ত যখন শকুন্তলার আরাম সাধনার্থে তাহাকে বাতাস

করিতে ও তাহার পায়ে হাত বুলাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল, তখন সত্য-সত্যই শকুন্তলার মনে যাহা হইল তাহাই সে বলিল; কি? না মাননীয় ব্যক্তির কাছে আমি আপনাকে অপরাধ-গ্রস্ত করিব না,—এই বলিয়া উঠিয়া যাইবার ইচ্ছা করিল। শকুন্তলার এরূপ সরলতা-পূর্ণ সাধু ব্যবহারকে একটা নর্ত্তকী-মুখোচিত বাক্চপলো পরিণত করা—"তবে আমি উঠিয়া যাই" এই রূপ একটা মানের ভানে পরিণত করা—বড় যে একটা কঠিন কার্য্য তাহা নহে; সুন্দর একটি দুর্গাঠাকুরাণীর প্রতিমার নাশিকায় জোরে এক ঘা লাঠি মারিলেই তাহাকে স্পূর্পনখা রাক্ষসী করিয়া তোলা যাইতে পারে। এই ত গেল দ্বিতীয় কথা; ইহার পর আসিতেছে "আমি এই গাছের আড়ালে লুকাই" এ কথা শকুন্তলা যে কোনস্থানে বলিয়াছেন—আমরা এত চেষ্টা করিলাম কিছুতেই খুঁজিয়া পাইলাম না; শেষে এই স্থির করিলাম যে, এক জায়গায় শকুন্তলা রাজাকে বলিয়াছেন

"ততক্ষণ গাছের আড়ালে লুকাও" তবে বুঝি বঙ্কিম বাবু ভুল ক্রমে ব্যাকরণের মধ্যম পুরুষকে উত্তম পুরুষ করিয়া ফেলিয়াছেন! শকুন্তলার সে জায়গাটি এই

"শকুন্তলা॥ সসম্ভ্রমং॥ পোরব। অসংসঅং মম সরীর বুত্তন্তোবলম্ভস্স অজ্জা গোদমী ইদো এব্ব আঅচ্ছদি তাব বিড়বন্তরিদো হোহি।"

বঙ্কিম বাবু কালিদাসের শকুন্তলার উপর এইরূপ কতক গুলি শ্লেষোক্তির ছিটা গুলি বর্ষণ করিয়াই মার্ মার্ শব্দে যুদ্ধের মাঝ খানে গিয়া পড়িয়া নিম্ন লিখিত-রূপে লেখনী অস্ত্র চালাইয়াছেন;

"ইহার (অর্থাৎ মিরাণ্ডার) অনুরূপ অবস্থায়, লতামণ্ডপতলে, দুষ্মন্ত শকুন্তলায় যে আলাপ,—যে আলাপে শকুন্তলার চিরবদ্ধ হৃদয়কোরক প্রথম অভিমত সূর্য্য-সমীপে ফুটাইয়া হাসিল—সে আলাপে তত গৌরব নাই—মানবচরিত্রের কূলপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রঘাতী সেরূপ টল টল চঞ্চল বীচিমালা তাহার হৃদয়মধ্যে লক্ষিত হয় না। যাহা বলিয়াছি, তাই—কেবল, ছি ছি, কেবল লুকাচুরি—একটু একটু চাতুরী আছে—যথা "অদ্ধপধে স্মুমরিঅ এদস্স হত্থব্ভংসিণো মিণাল বলঅস্স কদে পড়িণিবুত্তম্হি।" ইত্যাদি। একটু অগ্রগামিণীত্ব আছে, যথা দুষ্মন্তের মুখে "নমু কমলস্য মধুকরঃ সন্তুষ্যতি গন্ধমাত্রেণ।" এই কথা শুনিয়া শকুন্তলার জিজ্ঞাসা, "অসন্তোসে উন কিং করেদি?"—এই সকল ছাড়া আর বড় কিছুই নাই। ইহা কবির দোষ নহে—বরং কবির গুণ। দুষ্মন্তের চরিত্র-গৌরবে ক্ষুদ্রা শকুন্তলা এখানে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ফর্দ্দিনন্দ বা রোমিও ক্ষুদ্র ব্যক্তি, নায়িকার প্রায় সমবয়স্ক, প্রায় সমযোগ্য, অকৃতকীর্ত্তি—অপ্রথিতযশাঃ কিন্তু সসাগরা পৃথিবীপতি মহেন্দ্রসখ দুষ্মন্তের কাছে শকুন্তলা কে? দুষ্মন্ত মহাবৃক্ষের বৃহচ্ছায়া এখানে শকুন্তলা কলিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—সে ভাল করিয়া মুখ তুলিয়া ফুটিতে পারিতেছে না। এ প্রণয় সম্ভাষণ প্রণয় সম্ভা-

ষণ নহে—রাজক্রীড়া, পৃথিবীপতি কুঞ্জবনে বসিয়া সাধ করিয়া প্রেম করা রূপ খেলা খেলিতে বসিয়াছেন; মত্তমাতঙ্গের ন্যায় শকুন্তলা-নলিনীকোরককে শুণ্ডে তুলিয়া, বনক্রীড়ার সাধ মিটাইতেছেন, নলিনী তাতে ফুটিবে কি?

"যিনি এ কথাগুলি স্মরণ না রাখিবেন তিনি শকুন্তলা চরিত্র বুঝিতে পারিবেন না; যে জলনিসেকে মিরন্দা ও জুলিয়েট ফুটিল, সে জলনিষেকে শকুন্তলা ফুটিল না; প্রণয়াসক্তা শকুন্তলায় বালিকার চাঞ্চল্য, বালিকার ভয়, বালিকার লজ্জা দেখিলাম; রমণীর স্নেহ কই? ইহার কারণ কেহ কেহ বলিবেন, লোকাচারের ভিন্নতা, দেশভেদ। বস্তুতঃ তাহা নহে। দেশী কুলবধূ বলিয়া শকুন্তলা লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়িল,—আর মিরন্দা বা জুলিয়েট বেহায়া বিলাতী মেয়ে বলিয়া মনের গ্রন্থি খুলিয়া দিল, এমত নহে। ক্ষুদ্রাশয় সমালোচকেরাই বুঝেন না যে, দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয় মাত্র; মনুষ্যহৃদয় সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মনুষ্যহৃদয় থাকে। বরং বলিতে গেলে—তিন জনের মধ্যে শকুন্তলাকেই বেহায়া বলিতে হয় "অসন্তোসে উণ কিং করেদি?" তাহার প্রমাণ। যে শকুন্তলা, ইহার কয় মাস পরে, পৌরবের সভাতলে দাঁড়াইয়া দুষ্মন্তকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল "অনার্য্য! আপন হৃদয়ের অনুমানে সকলকে দেখ?"—সে শকুন্তলা যে, লতামণ্ডপে বালিকাই রহিল, তাহার কারণ কুলকন্যাসুলভ লজ্জা নহে। তাহার কারণ—দুষ্মন্তের চরিত্রের বিস্তার। যখন শকুন্তলা সভাতলে পরিত্যক্তা, তখন শকুন্তলা পত্নী, রাজমহিষী, মাতৃপদে আরোহণোদ্যতা, সুতরাং তখন শকুন্তলা রমণী; এখানে তপোবনে,—তপস্বিকন্যা, রাজপ্রসাদের অনুচিত অভিলাষিণী,—এখানে শকুন্তলা কে? কবিগুণে পদ্মমাত্র। শকুন্তলার কবি যে টেম্পেস্টের কবি হইতে হীন প্রভ নহেন, ইহাই দেখাইবার জন্য এস্থলে আয়াস স্বীকার করিলাম।"

বঙ্কিম বাবু উপরে যে কথা-গুলি বলিলেন তাহার মধ্যে এক আধ জায়গার নয় অনেক স্থানেরই গাঁথুনি কম-মজবুত—এক এক জায়গার ভিত এমনি কাঁচা যে, একটু ঠোকর দিলেই ঘর দরজা সব শুদ্ধ হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া যায়। প্রথমতঃ বঙ্কিম বাবু কালিদাসের শকুন্তলারই সমালোচন করিতেছেন—যদি তাহা না করেন তাহা হইলে তাঁহার সমলোচনার মূল্য এত কমিয়া যায় যে তাহা বৃথা কেবল পণ্ডশ্রম হইয়া দাঁড়ায়। "অসন্তোসে উণ কিং করেদি" ইত্যাদি যে-কয়টি বচন তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন অনেক বঙ্গবাসী ব্যক্তি সে-গুলিকে কালিদাসের বলিয়া জানেন ইহা আমরা জানি, ইহাও জানি যে নিম্ন-লিখিত শ্লোকটিকেও অনেকে কালিদাসের বলিয়া জানেন

"উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভো রাজন মুখং প্রক্ষালয়স্ব টঃ। প্রভাতে ভাবতে কুক্কু চ বৈতুহি চ বৈতুহি॥

এই যে অপূর্ব্ব শ্লোক ইহার প্রসব দ্বারা যে, কোন জন্মে কালিদাসের লেখনী কলঙ্কিত হইয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই—তবুও যদি জনশ্রুতির দোহাই দিয়া জোর করিয়া বলিতে চাও যে, উহা কালিদাসেরই বটে তাহা হইলে কাজেই আমাদিগকে চুপ করিয়া যাইতে হয়—কেননা আমাদের হস্তেও এমন কোন দলিল নাই যাহা জনশ্রুতির বিরুদ্ধে আমাদের কথা সপ্রমাণ করে; কিন্তু শকুন্তলার উপরি-উদ্ধৃত কথা গুলি যে কোন জন্মে কালিদাসের নহে তাহার আমরা যথেষ্ট প্রমাণ দিতে পারি। কি আশ্চর্য্য—একে কালিদাস তাহাতে আবার তাঁহার আর কোন গ্রন্থ নয় শকুন্তলা—সেই শকুন্তলার সমালোচনা করা হইতেছে, অথচ এতটুকুও আয়াস স্বীকার নাই যে, একবার একটু যাচাই করিয়া কালিদাসের আসল জিনিস্‌টার মূল্য ঠিক্ করিয়া ল'ন। তাহা দূরে যা'ক্—বিজ্ঞাপন দ্বারা আসল জিনিস্ এবং নকল জিনিস দুয়ের একই মূল্য ঘোষণা করিয়া বেড়াইয়াছেন! বিজ্ঞাপনের বাগাড়ম্বর দেখিয়া পাঠকেরা পাছে ভুলেন এ জন্য অধ্যাপক মোনিয়ার উইলিয়মস্ কর্ত্তৃক গ্রন্থবদ্ধ শকুন্তলার ভূমিকা হইতে নিম্ন লিখিত অংশটুকু সবিস্তরে উদ্ধৃত করা নিতান্ত আবশ্যক বোধ করিলাম; মোনিয়র উইলিয়মস্ কি বলেন শুনা যা'ক

The various manuscripts separate themselves into two groups or classes: the one class embracing all those in Devanagari writing, which, without perfect uniformity, had still a community of character; the other, all those in Bengali.

German scholars distinguish these two classes of manuscripts by the names "Devanagari recension" and "Bengali recension," which terms may conveniently be adopted. The Devanagari recension is the older and purer: the Bengali however, must have existed at least 400 years since it is followod by the "Sahitya-darpana," one MS. of which bears the date 1504 of our era. The MSS. of the Devanagari class are chiefly found in the Upper Provinces of India, where the great demand has produced copyists without scholarship, who have faithfully transcribed what they did not understand and therefore, would not designedly alter. On the other hand, the copists in Bengal have been Pandits, whose *cacoethes* for emending, amplifying, and interpolating, has led to the most mischievous results. The bold and nervous phraseology of Kalidasa has been either emasculated or weakened, his delicate expressions of refined love clothed in a mere-

tricious dress, and his ideas, -grand in their simplicity, diluted by repeti tion or amplification. Many examples might be here adduced : but I will only refer the student to the third Act of the Bengali recension, where the love-scen between the King and Sakuntala has been expanded to five times the length it occupies in the MSS. of the Devanagari recension, and the additions are just what an indelicate imagination might be expected to supply. Even the names of the dramatis-personæ have been tampered with: the King Dushyanta is changed into Dushmanta : Anasuya into Anusuya Vatayana into Parvatayana Sanumati into Misrakesi : Taralika into Pingalika : Dhanamitra into Dhanavriddhi ; Markandeya into Sankochana.

Unfortunately it was a MS of this recension, and not a very good spoeimen of its class, that Sir W. Jones used for his translation.

কালিদাসের যথার্থ পাঠ কি জানিতে হইলে মোনিয়র উইলিয়মসের পথ অনুসরণ করা কর্ত্তব্য—তিনি যে কিরূপ আয়াসে কালিদাসের প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশ পাইতেছে

In regard to the text of the preasent drama, if 1 have succeded in producing a more correct edition of the Devanagari recension than that of Dr. Boehtlingk, the merit is due to the more ample materials at my command, I have taken care to avail myself of Dr. Boehtlink's correctiens of himself, and his after-thought at the end of his work, as well as of such critical remarks as coincided with my own views. Often working independently of him, I have arrived at similar results,because I have had access to all the materials whence his *Apparatus Criticus* was composed. More than this: Dr. Boehtlingk tells us that his edition was not prepared from original MSS, but that Professors Brockhaus and Westergard having more or less carefully collated certain MSS. in the East-India House Library, and in the Bodleian at Oxford, and made only partial extracts from three native commentaries, handed over the results of their labours to him. All these MSS. and Commentaries have been placed at my dispesal, and most of them left in my possession until the completion of my work. Not a

passage has been printed without a careful collation of all of them., and the three Commentaries have been consultad from begining to end.

The MSS. which I have principally used, are:—

1 A MS. from the Colebrook collection, and, therefore. from the Eastern side of India, unmbered 1718.

2 A MS. from the Mackenzie, collection, and therefore from Southern India numbered 2696,

3 A MS. from the Taylor collection, and therefore from Western India, numbered 1858, dated Saka, 1784.

All these belong to the East-India House Library, gnd represent the three Indian Presidencies respectively.

4 A copy of a very good MS. at Bombay, presented to me by Mr. Shaw, of the Bombay Civil Service.

5 An old Bengali MS. belonging to the Library of the East India House, numbered 1060.

6. A very old Cengali MS. from Professor Wilson's collection in the Bodleian.

I have from time to time consulted other Bongali MSS., but have rarely admitted readings from them, unless subported by some one of the Devanagari.

মোনিয়র উইলিয়মসের গ্রন্থ হইতে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার নির্জ্জন প্রেমালাপ, যাহা লইয়া এত ধস্তাধস্তি, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

প্রিয়ংবদা ॥ সদৃষ্টিক্ষেপং ॥ অণসুএ। জহএসো ইদো দিগ্গদিঠ্ঠী উস্সুঅো মিঅপোদঅো মাদরং অণ্ণেসদি। এহি। সঞ্জোএম ণং ॥ ইত্যুভে প্রস্থিতে ॥

শকুন্তলা। হলা। অসরণম্হি। অণ্ণদরা বো আঅচ্ছদু।

উভে। পুহবীএ জো সরণং। সো তুহ সমীবে বট্টই ॥ ইতি নিষ্ক্রান্তে।

শকুন্তলা। কহং গদাও এব্ব।

রাজা। অলম্ আবেগেন। নম্বয়ম্ আরাধয়িতা জনস্ তব সমীপে বর্ত্ততে।

কিং শীতলৈঃ ক্লমবিনোদিভির্ আর্দ্র বাতান্
সঞ্চারয়ামি নলিনীদলতালবৃন্তৈঃ।
অঙ্কে নিধায় করভোরু যথাসুখং তে
সংবাহয়ামি চরণাব্ উত পদ্মতাম্রৌ ॥৭৪

শকুন্তলা। ণ মাণণীএসু অত্তাণং অবরাহইস্সম্ ॥ ইত্যুত্থায় গন্তুম্ ইচ্ছতি।

রাজা। সুন্দরি। অপরিনির্ব্বাণো দিবসঃ। ইয়ং চ তে শরীরাবস্থা।

উৎসৃজ্য কুসুমশয়নং নলিনীদলকল্পিতস্তনাবরণং।

কথঞ্চ্ আতপে গমিষ্যসি পরিবাধাপেলবৈর্
অঙ্গৈঃ ॥

শকুন্তলা। পোরব রক্ খ বিণঅং। মঅ-ণসন্তত্তাবি ণ হু অত্তণো পহবামি।

রাজা। ভীরু। অলং গুরুজনভয়েন। দৃষ্ট্বা তে বিদিতধর্ম্মা তত্রভবান্ নাত্র দোষং গ্রহীষ্যতি কুলপতিঃ। অপি চ
গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন বহ্ব্যো রাজর্ষিকন্যকাঃ।
শ্রূয়ন্তে পরিণীতাস্ তাঃ পিতৃভিশ্চাভি-
নন্দিতাঃ ॥

শকুন্তলা। মুঞ্চ দাব মং। ভুঅোপি সহীজণং অণুমাণইস্সং।

রাজা। ভবতু। মোক্ষ্যামি।

শকুন্তলা। কদা।

রাজা

অপরিক্ষতকোমলস্য তাবৎ
কুসুমস্যেব নবস্য ষট্পদেন।
অধরস্য পিপাসতা ময়া তে
সদয়ং সুন্দরি গৃহ্যতে রসোঽস্য ॥ ৭৭

॥ ইতি মুখম্ অস্যাঃ সমুন্নময়িতুম্ ইচ্ছতি। শকুন্তলা পরিহরতি নাট্যেন ॥

নেপথ্যে। চক্কবাকবহুএ আমন্তেহি সহঅরং। উবট্ঠিদা রঅণী।

শকুন্তলা ॥ সসম্ভ্রমং ॥ পোরব। অসংসঅং মম সরীরবুত্তন্তোবলম্ভস্স অজ্জা গোদমী ইদো এব্ব আঅচ্ছদি। দাব বিড়বন্তরিদো হোহি।

রাজা। তথা। ইত্যাত্মানম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি ॥

উপরের উদ্ধৃত অংশের মধ্যে যদি বঙ্কিম বাবু "কেবল ছি ছি, কেবল যাই যাই কেবল লুকোচুরি—একটু একটু চাতুরী * * একটু অগ্রগামিনীত্ব" দেখিয়া থাকেন দেখুন কিন্তু আমরা উহার মধ্যে স্বতন্ত্র আর একটা ব্যাপার দেখিতেছি—আমরা দেখিতেছি, বড় ছি ছি নয়, "হৃদয়ের কূল-প্রান্ত-প্রঘাতী-টল টল-চঞ্চল-বীচি-মালা 'র আকম্পিত প্রকম্পিত ব্যাপার ;—বড় লুকাচুরি নয়—হৃদয় হইতে, কথা হইতে, আচরণ হইতে, অকৃত্রিম ভালবাসা স্পষ্টাক্ষরে ফুটিয়া বাহির হইতেছে ; বড় যাই যাই নয়---একটু চক্ষের আড়াল হইলেই প্রাণের যায় যায় দশা উপস্থিত হইবার কথা ;—চাতুরিও নয় অগ্রগামীণীত্বও নয়,—কালিদাসের যাহা স্বপ্নেরও অগোচর সেই-সকল ভাবভঙ্গীর কথা রসিক চূড়ামণি বঙ্গপণ্ডিতগণ শকুন্তলার মুখে গুঁজিয়া দিয়াছেন, তাই বঙ্কিম বাবু শকুন্তলাকে চতুরা এবং অগ্রগামিনী দেখিয়াছেন,—এমন যে নিসর্গ সুন্দরী বনলতা—শকুন্তলা, তাহাতে উদ্যানলতার কৃত্রিম শোভা আরোপ করিয়াছেন ! কালিদাস কোন সমালোচকের চক্ষের মধ্য দিয়া অন্ধকারে মানব-প্রকৃতি হাতড়াইয়া বেড়াইতে যা'ন নাই—তিনি তাঁহার পরিষ্কার হৃদয়-দর্পণ একেবারে মানবপ্রকৃতির মুখের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন, তাই তাঁহার নাটকের মধ্যে মনুষ্যের যে অবস্থায় যেটি ঘটে সেই অবস্থায় ঠিক্ তাহাই প্রতিফলিত হইয়াছে। কালিদাস যদি সমালোচকগণের মতানুসারে চলিতেন

তবে যাহা হইত তাহা আমরা বিলক্ষণই বুঝিতে পারিতেছি; আর কিছু না—উদোর ঘাড়ে বুধোর বোঝা রাশীকৃত হইয়া অমন সুন্দর নাটক খানির রস-কস সমস্তই রবিষ-চাপা পড়িয়া মারা যাইত। শকুন্তলা জানে যে, রাজার অন্তঃপুর বড় একটা সাধারণ ব্যাপার নহে—অথচ কোন সমালোচকের মতানুসারে যদি তাহার মুখে এরূপ আশ-ঙ্কার কথা একবারও বাহির না হইত যে, "আমার কি গুণ যে,তাহাদের ফেলিয়া রাজা আমাকে ভালবাসিবেন" তবে শকুন্তলাকে হয় একটি কাঠের পুতুল নয় একটি কচি খুকি মনে হইত,—মিরান্দা যে এমন লোক-চরিত্র জ্ঞান-বর্জ্জিত সে-ও ফর্ডিনাণ্ডের মনের ভাল-বাসা বিষয়ে নিজের সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল।

শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্ত রাজার প্রেমা-লাপে বঙ্কিম বাবু এক দিকে বিপুল পরা-ক্রম রাজার দোর্দণ্ড প্রতাপ, আর এক দিকে ভয়াতুর ক্ষুদ্র বালিকার জড় সড় ভাব, এই যা কিছু দেখিয়াছেন; যেন নবাব সিরাজুদ্দৌলা এক জন বাঁদীকে ক্ষ-ণেকের জন্য প্রেম বিতরণ করিয়া কৃতার্থ করিতেছেন—যেন শকুন্তলার প্রেমের নি-জের কোন মূল্য নাই, তাহার যাহা কিছু মূল্য সকলই রাজ-অনুগ্রহ প্রসাদাৎ। কিন্তু এ বিষয়ে দুষ্মন্ত রাজার নিজের মতটা কি একবার শুনা যা'ক—

"পরিগ্রহ বহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্যমে।
সমুদ্র রসনা চোর্ব্বী সখীচ যুবয়ো রিয়ং॥"

রাজার নিকট সসাগরা পৃথিবীর আধি-পত্য অপেক্ষা শকুন্তলার প্রেম কোন অংশে ন্যূন নহে। সখীদিগের একটি গুরু-তর সন্দেহ ভঞ্জনার্থ রাজা ঐ কথাটি বলিয়া আপনার মনের যথার্থ ভাবটি অকপটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তা'-বই দুষ্মন্তের ন্যায় অমন ধর্ম্মভীরু রাজর্ষি যে, খেলা খেলিবার মানসে ওরূপ কথা বলিবেন,ইহা হইতেই পারে না; তাহা যদি হইত তাহা হইলে খোয়া-যাওয়া অভিজ্ঞান-অঙ্গুরী দর্শনে তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইত না—সহসা তাঁহার হৃদয়ে কি যেন এক দারুণ শেল বিঁধিল এরূপ ছট্‌ফটানি হইত না। কিন্তু রাজার ঐ হলফনামায় কি আসে যায়,—বঙ্কিম বাবু তেজ-কলমে বলিতেছেন যে,সসগরা পৃথিবীপতি মহেন্দ্র-সখ দুষ্মন্তের কাছে শকুন্তলা কে? শকুন্তলা উগ্রতপা প্রবল পরাক্রম রাজর্ষি-কন্যাই হো'ন, আর অলোক-সামান্য সৌন্দর্য্যের প্রতিমাই হো'ন, আর অমানুষী প্রভা-তরল জ্যোতি-রূপিনীই হো'ন—দুষ্মন্তের নিকট তিনি কে? দুষ্ম-ন্তের কাছে শকুন্তলার মূল্য যদি এতই অল্প তবে অত বড় রাজা অমন নিঃসহায়া অবলা যুবতীর জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া সারা হই-তেছেন তবুও দু চারি পা অগ্রসর হইয়া যে তাহার নিকট আপনার মন খুলিয়া বলি-বেন এ সাহস তাঁহার হইতেছে না—ইহার মীমাংসাটা না জানি কিরূপ? বঙ্কিম বাবু নিজেই বলেন যে "রোমিও ক্ষুদ্র ব্যক্তি, নায়িকার প্রায় সমবয়স্ক, প্রায় সমযোগ্য অকৃত-কীর্ত্তী অপ্রথিত-যশা;" কিন্তু এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির ন্যায়ই "সসাগরা পৃথিবীপতি মহেন্দ্র-সখ দুষ্মন্ত" আড়াল থেকে প্রেয়সীর

মনের কথা-গুলি গ্রাস করিতে কিছু মাত্র হেয়-জ্ঞান করেন নাই, আসল কথাটা এই যে দুষ্মন্ত মহেন্দ্র সখ সসাগরা পৃথিবীপতি হইয়াও শকুন্তলার সম্বন্ধে তিনি আর কিছু না—এক জন দীন হীন ভিখারী—প্রেমের ভিখারী। অতএব বঙ্কিম বাবুর এই যে এক জোরালো উপমা-প্রয়োগ, যে, দুষ্মন্ত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শকুন্তলা-নলিণী-কোরককে শুণ্ডে তুলিয়া বন-ক্রীড়ার সাধ মিটাইতেছেন, নলিনী তা'তে ফুটিবে কি?" ইহার কোন অর্থ নাই; ফুটিবে না কেন? সূর্য্যের ন্যায় দুষ্মন্ত প্রথম প্রথম পূর্ব্বদিকের পর্দার আড়াল-থেকে তাহার প্রতি রাগ-লাঞ্ছিত দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া শেষে যখন তাহার সমক্ষে আপনাকে অনাবৃত করিলেন—তখন সে কি আর না ফুটিয়া বাঁচিতে পারে? ফুটে নাই তবে কখন্? যখন বিরহ-মেঘ দোঁহার মাঝখানে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছে, যখন এক দিক্ হইতে সংশয়ের কুজ্ঝটিকা উঠিয়া আর একদিকের ভালবাসার জ্যোতিকে স্পষ্ট করিয়া দেখিতে দিতেছে না; যখন শাপ-রাহু-গ্রাসে সে জ্যোতি ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; সেই সেই সময়ে নলিনীকোরকটি মুষড়িয়া পড়িয়াছে—তাহা ত হইবেই। এক চিড়িয়াখানায় যদি ব্যাঘ্র এবং মৃগ পাশাপাশি রক্ষিত হয়, তবে মৃগ নির্জীববৎ হইয়া থাকে এই আমরা জানি কিন্তু যদি শক্ত সমর্থ সহকার বৃক্ষ ও সুকোমল ও মাধবী লতা উভয়ে এক জায়গায় থাকে তবে উপযুক্ত সময়ে মাধবীলতার ফুল ফুটিবে না ত আর কি হইবে? বঙ্কিম বাবু কিছু পরে বলিতেছেন

"প্রণয়াসক্ত শকুন্তলার বালিকার চাঞ্চল্য, বালিকার ভয় বালিকার লজ্জা দেখিলাম, কিন্তু রমণীর গাম্ভীর্য্য রমণীর স্নেহ কই?"

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে প্রেমের নবোন্মেদের সময় চাঞ্চল্য, ভয়, লজ্জা, আপনা হইতেই আসিয়া তাহার সঙ্গ গ্রহণ করে;—তা' সে বালিকারই হউক্ আর যুবতীরই হউক্—শকুন্তলারই হউক্ আর মিরান্দারই হউক্। রমণীর গাম্ভীর্য্য কথাটা বঙ্কিম বাবু যে কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট বোঝা যায় না; প্রেম-জনিত অধীরতাকে যদি গাম্ভীর্য্যের অভাব বলিয়া ধরা যায়, তবে তাহা ত নূতন প্রেমি-জন মাত্রেরই ঘটিয়া থাকে—শকুন্তলা একা কি দোষ করিল; কিছু পূর্ব্বে শকুন্তলা এবং রাজার মিথঃপ্রেমালাপের সমস্ত অংশটাই আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার মধ্যে কোন্ খানটায় শকুন্তলার অশোভন চাপল্য

তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না—চাপল্য যেটুকু আছে তাহা প্রেমের নৈসর্গিক অধীরতা মাত্র—যাহা স্বয়ং ব্রহ্মা আইলেও খণ্ডন করিতে পারেন না।

তবে এক এই বলিতে পারা যায় যে, প্রেমের-অধীরতা স্নেহে দৃষ্ট হয় না; স্নেহ প্রেম-অপেক্ষা স্থির ও গম্ভীর; মিরান্দার মনে স্নেহের যখন সঞ্চার হইয়াছিল তখন অবশ্য তাহাতে অপেক্ষা-কৃত গাম্ভীর্য্য বর্ত্তিয়াছিল—কিন্তু সে শুধু অবস্থার গতিকে, তাহাতে চরিত্র-গৌরবের এমন কোন কিছু বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না; শকুন্তলার সহিত রাজার যে কয়েকটি বার মিলন হইয়াছিল—তাহা অতি অল্প কালের জন্য—মিরাণ্ডা ফর্ডিনাণ্ডে প্রেমের সূত্রপাত হওয়া অবধি বিরহ কাহাকে বলে তাহা তাহারা জানিতে পারে নাই; তাহাদের পরস্পরের গাঢ় সংস্রব বশত পরস্পরের প্রেম পাকিয়া উঠিবার অবসর পাইয়াছিল; বিশেষতঃ ফর্ডিনাণ্ডের কাঠের বোঝা বহিবার কষ্ট দেখিয়া এক জন কোমল হৃদয়া অবলার মনে স্নেহের সঞ্চার হইবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? এরূপ অনুকূল-অবস্থা বিরহে শকুন্তলার মনে স্নেহের আবির্ভাব কিরূপে হইবে? যদি হইত, তবে তাহা একটা অস্বাভাবিক কাণ্ড হইত। ভালবাসা "থিতিয়ে" গিয়ে ঠাণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করিলে তাহা স্নেহের দিকে অবনত হয় সত্য কিন্তু ভালবাসার প্রথম উদ্রেকে সে ভাব প্রত্যাশা করা—মানব প্রকৃতি-বিষয়ে কিছু যাঁহাদের বোধ আছে তাঁহাদের কার্য্য নহে। কালিদাস শকুন্তলার এমন কোন অবস্থাই বর্ণনা করেন নাই যেখানে প্রেমের গাত্রে স্নেহের রঙ ধরিতে পারে। শকুন্তলার যেরূপ প্রেমাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রেমের সবে নূতন উদ্রেক, তাহার মধ্যে স্নেহের ভাব দেখা দিলে—শিশুর মুখে যেমন দাড়ি গোঁপ হইলে হয়—তেমনি একটা অসময়োচিত সুতরাং অস্বাভাবিক ব্যাপার হইত। বঙ্কিম বাবুর আর একটি সুবিচারের উদাহরণ দেখাইয়া এবারকার পালা সাঙ্গ করিব। বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন

"যে শকুন্তলা ইহার কয় মাস পরে পৌরবের সভাতলে দাঁড়াইয়া দুষ্মন্তকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল, অনার্য্য আপন হৃদয়ের অনুমানে সকলকে দেখ? সে শকুন্তলা যে লতা মণ্ডপে বালিকাই রহিল তাহার কারণ কুলকন্যা সুলভ লজ্জা নহে। তাহার কারণ দুষ্মন্তের চরিত্র বিস্তর।" ইহার যদি কিছু অর্থ থাকে তবে তাহা এই যে, শকুন্তলা বাস্তবিক বালিকা নহে (অর্থাৎ

তাহার স্বভাব বালিকার মত নহে) কিন্তু দুষ্যন্তের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের সান্নিধ্য বশতঃ শকুন্তলা কুঁকড়িয়া শুঁকড়িয়া বালিকাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তৃতীয় অঙ্কে যে-দুষ্যন্ত রাজা তপস্যার বিঘ্ন-কারী রাক্ষসদিগকে বধ করিয়াছিলেন এবং তৎপরে দেবাসুরের যুদ্ধে ইন্দ্রের পক্ষে যোগ দিয়া তাঁহাকে জয়ী করিয়াছেলেন সেই দুষ্যন্ত রাজা এক জন অরণ্য পালিতা অবলা বালাকে স্বীয় প্রতাপে অভিভূত করিলে তাঁহার চরিত্রের কি যে মাহাত্ম্য বাড়ে তাহা বুঝিতে পারি না। ইহার অব্যবহিত পরেই বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন।

"যখন শকুন্তলা সভাস্থলে পরিত্যক্তা তখন শকুন্তলা পত্নী, রাজমহিষী, মাতৃ-পদে আরোহণোদ্যতা সুতরাং তখন শকুন্তলা রমণী; এখানে তপোবনে,—তপস্বী কন্যা,* রাজপ্রসাদের অনুচিত অভিলাষিণী (?) এখানে শকুন্তলা কে? করিশুণ্ডে পদ্ম-মাত্র।" অর্থাৎ শকুন্তলা লতা-মণ্ডপেও "রমণী" সভামণ্ডপেও "রমণী" কিন্তু লতা-মণ্ডপে রাজার প্রতাপে জড় সড় হইয়া তাহার রমণী-ভাব কিছুই স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে নাই, সভামণ্ডপে তাহার রাজ্ঞীত্ব এবং মাতৃত্ব মিলিয়া তাহার অনৈসর্গিক বালিকাত্ব ঘুচাইয়া তাহাকে রমণী পদে উঠাইয়া দিল। ইহার অর্থ যদি এই টুকু মাত্র হয় যে, সভানীতা শকুন্তলার মন পুত্রবতী কুলবধূচিত অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল—তবে তাহা ত হইতেই পারে; কিন্তু শকুন্তলা পূর্ব্বে "রাজ-প্রসাদের অনুচিত অভিলাসিনী" ছিলেন এখন তিনি তাহা ন'ন এ বলিয়া যে তাহার মনের ঐ ভাব-পরিবর্ত্তনটি হইয়াছে ইহা আমরা কোন মতেই স্বীকার করিতে পারি না। কেন না শকুন্তলা রাজার পানি-গ্রহণের ঠিক্ উপযুক্ত পাত্রী এ বিষয়ে শকুন্তলার সখীদ্বয় যার পর নাই নিশ্চিন্ত —শকুন্তলার মনে সে জন্য কিন্তু আসিবার কোন কারণ নাই, কেননা শকুন্তলা শুদ্ধ যে কেবল ঋষিকন্যা তাহা নহে—মস্ত একজন রাজর্ষির কন্যা। চতুর্থ অঙ্কের বিষ্কম্ভের সর্ব্ব প্রথমেই অনসূয়া প্রিয়ম্বদাকে সম্বোধন করিয়া এই ভাবে বলিতেছে যে শকুন্তলা অনুরূপ ভর্ত্তৃ-গামিনী হইয়াছে বাঁচা গিয়াছে কিন্তু একটা চিন্তার বিষয় এই যে রাজর্ষি অন্তঃপুর-সমাগত হইয়া এখানকার বৃত্তান্তটা পাছে ভুলিয়া গিয়া থাকেন। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, শকুন্তলা যে

* নেহাৎ তপস্বী কন্যা নহে—রাজর্ষি-কন্যা,—যে সে রাজর্ষি নহে, স্বর্গমর্ত্ত্য ওলট-পালট কারী বিশ্বামিত্র।

অনুরূপ ভর্ত্তৃগামিনী—এবিষয়ে অনুসূয়ার লেশ-মাত্রও সংশয় নাই,—সংশয় যা হইয়াছিল, তা সম-দুঃখসুখ সখী জনের হইতেই পারে;—এমন ত কোন ছোট খাটো মাম্‌লা নয়—রাজ প্রাসাদের অন্তঃপুর। সেখানে যদি রাজার মন কারাবদ্ধ হইয়া গিয়া থাকে, তবে আর উপায় কি? শকুন্তলা যদিই বা নীচ-কুলোদ্ভবা হইত, তথাপি প্রেম তাহাকে উচ্চ করিয়া লইত—প্রেমের শাস্ত্রে জাতি-জাত্যের বিচার নাই। এইরূপ—স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, রাজা-দুষ্যন্তের নিকট শকুন্তলার সংকোচের কারণ আর কিছুই নহে, কেবল—মন বিনিময় করিবার সময় প্রেমার্থিনীদের স্বাভাবিক ভয়-লজ্জা; এ বিষয়ে পূর্ব্বে আমরা বিস্তর বলিয়াছি—আর বলা অনাবশ্যক।

ক্রমশঃ

সংশোধনী।

ভারতী, দ্বিতীয় ভাগ, ১২৮৫ সন।

কাতন্ত্র-জীবনী।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	বিশুদ্ধ
৪০৩	১	৭	বর্ণ-সমন্নায়	বর্ণ-সমাম্নায়ঃ
"	২	১৬	সিদ্ধিবর্ণ-সমন্নায়	সিদ্ধোবর্ণ-সমাম্নায়ঃ
৪০৮	১	১৯	বোপদেবের নাম	বোপদেব নাম
৪০৯	২	১৬-২৬	এস্থলে বিশ্ব প্রকাশের অবতরণিকার শ্লোক খাটিবে না সুতরাং উহা অশুদ্ধ।	
৪১০	এবং	৪১১	পৃষ্ঠায় যে যে স্থলে	"কাত্যায়ণ" লিখিত হইয়াছে
ঐ	ঐ	স্থলে	"কচ্ছায়ণ" পাঠান্তর হইবে।	
৪১০	১	২০-২১	কাত্যায়ন সম্বন্ধীয়	পালিভাষাও তৎসমালোচন।
৪৬১	২	১২	কাণভূতি	কানভূতি
৫২৮	২	১৭	সেই নামে পরিচয়	সেই নাম ব্যতীত অন্যান্য পরকীয় নামে পরিচয়
৫৩৩	২	৫৬	পতঞ্জলি কি বেদ ভাষ্যকার শঙ্কর দেব হইবেন	পতঞ্জলি হইবেন
৫৩৯	২	১৩	বৃহৎবৃত্তি	কৃৎবৃত্তি

ভারতী, তৃতীয় ভাগ, ১২৮৬ সন।

১৯	২	১৬	অব্দে প্রকাশিত হইল (৪)	অব্দে ভব-সনন্দি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইল এবং তিনি সম্বন্ধদ্যোত সম্পাদন করিয়া লোক সমাজে "র-ভস" নামে পরিচিত হয়েন (৪)
১৯	২	১৯	৪৯৮	৩৪১
"	"	২০	৩৬৩	৪৭৬

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	বিশুদ্ধ
"	৩১	২	আন্তাং	আন্তাং স রভসো লোকে দুষ্কোদ্যোতসিদ্ধিঃ ॥
৬৯	২	১০	বাম হস্তেন	বাহনস্তেন
"	২	১৩	জাহুবকে	জুহুবকে
৬৮	২	১৮	তৃতীয় অধ্যায়	চতুর্থ অধ্যায়

(উদয়নাচার্য্য)

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	বিশুদ্ধ
১৯৮	১	২১	শ্রীহর্ষ প্রসাদ	শ্রীহর প্রসাদ
"	২	৩৪	Desent	Decent
১৯৯	১	৪	পচম্ম	পচম্য
"	১	৫	দিইল	দিলৈ
২৪৪	২	১৭	বাচস্পতি মিশ্রের	বাচস্পতি মিশ্রের টীকার
২৪৭	১	২৭	খৃঃ দ্বাদশ	খৃঃদশম
২৮৯	২	২-৩	উদয়নাচার্য্যকে সমসাময়িক	উদয়নাচার্য্যকে কসুমাঞ্জলির প্রণেতার সমসাময়িক
২৯০	২	৪-৫	পরিণত	পরিণীত
২৯১	২	২৮	ভাণ্ডার	ডাক্তার
২৯৪	২	১৫ ১৬	অবশ্য আবিষ্কার	অবশ্য কেহ আবিষ্কার

ভট্টি।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	বিশুদ্ধ
৪৫১	১	৩	(খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর)	(খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর)
"	১	১৭	হর্ষবিক্রমাদিত্যের সময়	হর্ষবিক্রমের কিছু পূ সময়
৪৫৩	১	১৫	ত্রিকান্ত	ত্রিকাণ্ড
"	২	৭	ঐ	ঐ
"	২	১২	শঙ্কর সেন	গৌরাঙ্গ সেন

হৃদয় মন্থন।

অনৈক সন্ন্যাসী প্রেরিত।

আমি আপনাদিগকে অনেক দিবস হইল কোন পত্রই লিখি নাই; তাহার দুইটি কারণ আছে—প্রথমতঃ আমি ভাবিয়াছিলাম যে একজন সমাজ-পরিত্যাগী সন্ন্যাসীর মনোভাব প্রচার করিয়া সমাজের কোন উপকার নাই, ব্যক্তি বিশেষেরও কোন উপকার নাই; দ্বিতীয়তঃ হরিদ্বারের মেলা দর্শনের জন্য আমাদিগকে এতদূর ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল যে ইচ্ছা থাকিলেও তোমাদিগকে পত্র লিখিবার সময় পাই নাই। তোমরা ত জানই যে দ্বাদশ বৎসর অন্তে বৃহস্পতি গ্রহ কুম্ভ রাশিস্থ হয়েন, এবং বৈশাখ মাসের সেই সময়ে "সুরধুনি মুনিকন্যাতে" স্নান করা অপেক্ষা অধিকতর পুণ্য আর কিছুতেই নাই। এই সময়েই জনতা উপলক্ষে হরিদ্বারে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন লোক—ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়িক, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন সন্ন্যাসী, ও ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী একত্রে সম্মিলিত হয়। কোথাও বৈষ্ণবে ও শাক্তে একত্র হইয়া, কোথাও বৌদ্ধে ও তান্ত্রিকে মিলিত হইয়া শাস্ত্রের নানা প্রকার তর্ক তুলিয়াছে; কোথাও সঙ্কল্পিত ব্রতধারীর সহিত আজন্ম সন্ন্যাসীর হৃদয়োচ্ছ্বাস তরঙ্গিত হইতেছে; আবার অন্য দিকে কান্ধারের অশ্ব সমূহ, কাশ্মীরের বিচিত্র শাল, জয়পুরের শ্বেত প্রস্তর-নির্ম্মিত বাসন রাজি, উড়িষ্যার রজত-নির্ম্মিত অলঙ্কারাদি, বঙ্গদেশের তাল তমাল কাষ্ঠাদি, বারানসীর স্বর্ণতন্তুবিশিষ্ট বসনাদি এবং বম্বাই প্রদেশের হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত ক্রীড়া-সামগ্রী স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে। এই সময়ে এই স্থানে তোমরা ভারতবর্ষের সকল জাতীয় লোককে দেখিতে পার। এখানে এক দল উলঙ্গ বঙ্গদেশবাসী; ওখানে একদল পরিচ্ছন্ন মহারাষ্ট্রীয়, এখানে একদল ভীরু উড়িষ্যাবাসী, ওখানে একদল বীর্য্যবান রাজপুত। নানা প্রকার দেহের গঠন, নানা প্রকার ভাষার বৈচিত্র্য, নানা প্রকার পরিচ্ছদের বৈষম্য, এবং নানা ভাবের তারতম্য দেখিয়া মনে হয় যে, এই ক্ষুদ্র হরিদ্বার আজ বৈশাখ মাসে সমস্ত পৃথিবীর আদর্শভূত—সমস্ত পৃথিবীর বিনোদ-সম্মিলন-ক্ষেত্র। এই হরিদ্বার তীর্থে আসিবার জন্য আমরা এত দিন পর্য্যন্ত এতদূর ব্যাকুল হইয়াছিলাম যে তোমাদিগকে পত্রাদি লিখিতেও বিস্মৃত হইয়াছিলাম। বহু কষ্টে ও বহু বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শেষে হরিদ্বার তীর্থে উপনীত হইতে পারিয়াছি।

কিন্তু এই মহাতীর্থ স্থানে আসিয়াও আমি ভাল করিয়া মেলাটি দেখিতে পাইলাম না। ইচ্ছা ছিল যে এই বৈশাখী

মেলার সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার সকল বৃত্তান্ত পুংখানুপুংখরূপে তোমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইব। কারণ, এই মেলাকে আমি নিতান্ত আমোদের চক্ষে দেখি না,—আমি জানি যে এই প্রতিষ্ঠিত মেলা জাতীয় সম্মিলনের একটি প্রধান গ্রন্থি—ধর্ম্ম-উৎসাহের একটি প্রধান উত্তেজক—দেশহিতৈষিতার একটি প্রধান মন্ত্র এবং গৌরব-সমৃদ্ধির একটি প্রধান সোপান। ভারতবর্ষের অনন্ত মহিমার চির সাক্ষী-স্বরূপ এই দিগন্ত-প্রসারিত হিমালয়ের চরণতলে সমস্ত বৎসরের মধ্যে একদিনও যে আমরা ধর্ম্মের উদ্দেশে, সম্মিলনের অভিলাষে একত্র হই, বা একত্র হইতে পারি, ইহা সামান্য উত্তেজনার কথা নয়। সত্য কালের বর্ণনায় কবিরা যেমন বলেন যে, সে সময়ে এক উৎস হইতে নিরীহ হরিণ শিশু ও ভীষণ শার্দ্দূল উভয়ই একত্র জল পান করিত ও ময়ূরে এবং সর্পে অকৃত্রিম প্রণয়-ভাবে কুঞ্জে কুঞ্জে নৃত্য করিত, এখানেও সেইরূপ ঘোর তান্ত্রিকের সহিত বৈষ্ণবেরা মিশিতেছে, এবং দারুণ শাক্তের সহিত সর্ব্বত্যাগী বৌদ্ধেরাও একাসনে বসিয়া আহার করিতেছে। জাতীয় সম্মিলনের অমোঘ আবর্ত্ত-স্বরূপ এই বৈশাখী হরিদ্বারমেলায় যে কেহ পড়ে, সেই দেখিতেছি বিঘূর্ণিত হইয়া জাতীয়ত্বের গভীর গহ্বরে আকর্ষিত হয়। কিন্তু এই সম্মিলনের সুখদ দৃশ্য, এই জনতার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ-তুফান [illegible] মনের সহিত এক দিনও [illegible] পাই নাই। আমি পুণ্যবতীকে লইয়া বিষম ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। হরিদ্বারের উত্তরে ভাগীরথীর ক্রোড়-দেশে যে এক বিকট অরণ্য আছে, তাহা এই জনতার রঙ্গভূমি হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে। এই মেলার সময় সেখানে জনপ্রাণী যাতায়াত করে না, কারণ সকলেই মেলার দৃশ্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে ভাল বাসে, কিন্তু আমাদের পুণ্যবতী সেই বিকট ও বিজন বনের মধ্য হইতে একদিনও বাহির হইতে চাহে নাই। যখনি আমি তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম, তখনই দেখিতাম যে তিনি সেই ভয়-সমাকীর্ণ অরণ্যে গঙ্গার অঙ্কস্থ একটি নিভৃত প্রদেশে বসিয়া মহামায়ার পূজায় ঘোর নিমগ্ন। কখন দেখিতাম যে পুণ্যবতী অর্দ্ধ মুদিত নেত্রে উর্দ্ধকণ্ঠে

"দেবি, প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোখিলস্য"

বলিয়া অরণ্যানী বিকম্পিত করিয়া গিরি-বালিকার উপাসনা করিতেছেন, কখন বা দেখিতাম তিনি নিমীলিত নেত্রে অজস্র অশ্রুধারে দেবী শৈলনন্দিনীর চরণযুগল প্লাবিত করিতেছেন। আহা, পুণ্যবতীর সেই ধ্যানের মূর্ত্তি আমি আমরণ কখনই ভুলিতে পারিব না। যখন দেখিতাম সেই স্বর্ণকান্তিময় শীর্ণ শরীরখানি ছিন্ন ভিন্ন গেরুয়া বসনে অর্দ্ধাবৃত, ও নিবিড় জলদ-জাল-সদৃশ আলুলায়িত কেশরাশি অবাধে স্কন্ধে, কপোলে, বক্ষে অসংযত ভাবে বায়ু-হিল্লোলে ইতস্ততঃ তরঙ্গিত হইতেছে, যখন দেখিতাম যে

সেই ঈষৎ-নিমীলিত নলিনীনয়ন হইতে বর্ষার স্রোতের মত মর্ম্মভেদী অশ্রুলহরী উৎসারিত হইতেছে এবং দেখিলেই বোধ হইত যে পুণ্যবতীর মন সপ্তম স্বর্গের দূর দিগন্ত বিচরণ করিয়াও যেন পরিতৃপ্ত হইতেছে না, তখন মহামায়াকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যবতীকেই উপাসনা করিতে এই দুর্ব্বল হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা জন্মিত। পুণ্যবতীর এই গভীর ধ্যানের এক অবস্থাতেই আমি তাহাকে দেখিলাম, দেখিয়া আর চক্ষু ফিরাইতে পারিলাম না। স্থির দৃষ্টে—সেই ধ্যানমগ্না নবীনা যোগিনীর উজ্জ্বল-মধুর দেবী-প্রতিমাখানি দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে তাহার ধ্যান সমাপ্ত হইল; গেরুয়া বসনের অঞ্চল দিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়ন-যুগল মুছিয়া দেখিতে পাইল যে আমি প্রস্তর-মূর্ত্তির মত তাহার দিকেই চাহিয়া আছি; আমাকে দেখিয়া পুণ্যবতী জিজ্ঞাসা করিল "দেব! এ সময়ে আপনি যে আজ এখানে অধিষ্ঠান?"

আ। পুণ্যবতি! আজ মেলাতে বিশেষ সমারোহ হইয়াছে। সেই জন্য তোমাকে ডাকিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু আসিয়া দেখিলাম যে তুমি কঠোরব্রতধারিণী গিরিবালিকার মত গভীর ধ্যানে নিমগ্ন, সেই জন্য তোমাকে বিরক্ত করিতে আর সাহস হইল না। কিন্তু, পুণ্যবতি, আজ আমাকে মুক্তকণ্ঠে এই কথা বলিতে দাও—যে তুমি আমাদিগকে লজ্জা দিয়াছ, তোমার পূজার প্রণালী, তোমার ধ্যানের গভীরতা, তোমার ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়া মনে হয় যে তোমারই সার্থক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম, তোমারই সার্থক সংসার-বৈরাগ্য—তোমারই সার্থক দেবতা-ভক্তি।

পুণ্য। দেব! আমাকে আর উপহাস করিবেন না। আমি মর্ম্মের স্তরে স্তরে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাইভস্ম হইয়াছি, আমাকে আর উপহাস করিবেন না। আমি ঘোর পাতকিনী।

আ। বৎসে! আমি তোমাকে উপহাস করি নাই—আমি তোমাকে ঘোর পাতকিনীও ভাবি নাই।

পুণ্য। কি? আপনি আমাকে কি আজও ঘোর পাতকিনী ভাবেন নাই? দেব! যদি এ পর্য্যন্ত তাহা না ভাবিয়া থাকেন তবে অন্তত আজ হইতে তাহাই ভাবিবেন। প্রবঞ্চনা করিয়া এই বিকট বিজনের কঠোর মাহাত্ম্যের আমি অপমান করিতে চাহি না, এই সম্মুখে প্রবহমানা পবিত্রসলিলা জাহ্নবীকে আমি কলঙ্কিত করিতে চাহি না, এই হরিদ্বার তীর্থের গৌরব আমি লোপ করিতে চাহি না, সত্য কথা বলিতেই হইবে, এবং সত্য কথাটি এই যে, আমি ঘোর পাতকিনী। আমি আপনাদিগকে ক্রমাগতই প্রবঞ্চনা—করিয়া আসিতেছি।

আ। সে কি পুণ্যবতি! তুমি কি রূপে আমাদের প্রবঞ্চনা করিলে? তোমার বিগত জীবনের সকল ঘটনাই ত আমরা জানি এবং তোমার সন্ন্যাসিনী-জীবনের সকল দিনই ত আমাদের সহিত

অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু প্রবঞ্চনা কোথায়?

পুণ্য। প্রবঞ্চনা কোথায়? প্রবঞ্চনা আমার হৃদয়ে, আমার মর্ম্মের স্তরে স্তরে—প্রবঞ্চনা আমার এই বিগলিত অশ্রুবারিতে। আমি সুরেন্দ্রকে—

আ। কি আশ্চর্য্য! এখনও তুমি তোমার সুরেন্দ্রকে ভুলিতে পার নাই? এই এত ত্যাগস্বীকার, এত কঠোর ব্রত, যোগ-ধ্যানে এত দূর আত্ম-বিসর্জ্জন, কিছুতেই কি তুমি আজও তোমার সেই বাল্য-সখাকে ভুলিতে পারিলে না?

পুণ্য। দেব! আমার তপ-জপ, আমার আত্ম-বিসর্জ্জন সকলই মিথ্যা। আমি যোগিনী হইয়াছি বলিয়া মনকে যতই প্রবোধ দিই না কেন, আমি উদাসিনী হইয়াছি বলিয়া যতই আত্ম-প্রতারণা করি না কেন, আমি হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে মহামায়াকে যতই ভক্তিভাবে প্রতিষ্ঠা করি না কেন, কিন্তু এই দুর্ব্বল রমণী-হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে কাহার প্রতিমা সততই জাজ্বল্যমান? আমি ত মনে মনে শত সহস্রবার প্রতিজ্ঞা করি যে সে প্রতিমা আর দেখিব না, দেব-ভক্তিরূপ হোমাগ্নির ঘন ঘোর ধূমাবরণে সে মূর্ত্তি আবরিত রাখিব, কিন্তু, দেব, এখন দেখিতেছি যে রমণীর প্রতিজ্ঞা কিছুই নয়, প্রণয়েতে অভিমানের প্রতিজ্ঞা কিছুই নয়, যোগিনীর যোগ-প্রতিজ্ঞাও কিছুই নয়!

আ। তবে তোমার সন্ন্যাসিনী-ব্রতে দীক্ষিত হওয়াই অন্যায় হইয়াছিল। তুমি যখন প্রণয়-ভঙ্গের প্রথম মুহূর্ত্ত হইতে সুরেন্দ্রকে বিস্মৃত হইবার ব্রতে ব্রতী হও নাই, তখন সন্ন্যাসিনী হইবামাত্রই কি রূপে তাহাকে বিস্মৃত হইতে পার? যোগিনী হইলেই হৃদয় পাষাণ হইয়া যায় না, সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেই সাংসারিক বৈরাগ্য অভ্যস্ত হয় না।

পুণ্য। দেব! আপনি আমাকে অকারণ তিরস্কার করিতেছেন। যখন আমি প্রথমেই দেখিলাম যে তিনি আমার সংসর্গ হইতে ইন্দ্রাণীর সংসর্গে অধিকতর সুখী হইতেন এবং নানা প্রকারে আমাকে প্রতারণা করিয়া ইন্দ্রাণীর পাশে যাইয়া বসিতে ব্যাকুল হইতেন, তখনি জানিয়াছিলাম যে আমাদের প্রেমের অবসান ঘটিয়াছে। প্রথমে অবশ্যই দারুণ মর্ম্ম-যাতনা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর হৃদয়কে এই বলিয়া বুঝাইলাম যে, "আমার প্রেম নিঃস্বার্থ প্রেম, সুতরাং সুরেন্দ্র যাহাতেই ভাল থাকেন, তাহাই ভাল—আমি তাহাতে কষ্ট পাইব কেন?" কিন্তু এই মর্ম্মান্তিক প্রশ্নের উত্তর আমি আপনি দিতে পারিলাম না। কষ্ট যে কেন পাই,—তাহা কোন মতেই বুঝিতে পারিলাম না,—চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারিলাম না, কেবল এই মাত্র জানিতাম যে ইন্দ্রাণীর জন্য সুরেন্দ্রের ব্যাকুলতা দেখিয়া আমার হৃদয়ভেদী যন্ত্রণা উপস্থিত হইত। তাহার পর এই প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, উঁহাদের আদর-সম্ভাষণ বা প্রেম-দৃশ্য আর দেখিব না। দেখিয়াই

যদি এত কষ্ট, ত তাহা আর স্বচক্ষে দেখিব না, বা অন্যের মুখে সে কাহিনী শুনিব না। কিন্তু রমণী-হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বশতই হউক, ঈর্ষার স্বাভাবিক প্রভাবেই হউক, অভাগিনীর কপালের দোষেই হউক, আমি ছলে বলে কৌশলে তাহার প্রেম-রহস্য জানিবার জন্য মনে মনে নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পড়িতাম—তাহাদের প্রেম-দৃশ্য দেখিয়াও যেন দেখিতাম না, অথচ গম্ভীর গূঢ়ভাবে নিজের মনেতেও আত্ম-প্রবঞ্চনা করিয়া তাহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতাম। চক্ষুর প্রমাণ কষ্টকর মনে করিয়া চক্ষু মুদিত করিতে চাহিতাম বটে, কিন্তু তাহাতে কল্পনার চক্ষু উন্মীলিত হইয়া বিকট বিভীষিকার দৃশ্যে আমাকে অহোরাত্র জ্বলন্ত আগুনে যেন দাহন করিত, সুতরাং আমি কি করিব?—তাহাদের প্রেম-অভিনয় দেখিলেও ভয়ানক মর্ম্মান্তিক যাতনা, না দেখিলেও কল্পনার প্রভাবে অধিকতররূপে সেই যাতনা! দেব! আপনি মনে করিতে পারেন যে, আমি অত্যন্ত স্বার্থপর, অত্যন্ত হীনমনা, অত্যন্ত সুখাভিলাষী। কিন্তু আমি মনে জানি যে আমি—কিন্তু সেকথায় আর কাজ কি। প্রকৃত ঘটনা সকল ত আপনাকে খুলিয়া বলিলাম, এখন আপনি আমাকে যাহা মনে করিতে হয় করিতে পারেন। আমার স্থূল কথা এই যে, যখন দেখিলাম ইন্দ্রাণীই সুরেন্দ্রের চক্ষুর আনন্দ এবং আমিই তাঁহার চক্ষুর শূলস্বরূপ, যখন দেখিলাম ইন্দ্রাণীই তাঁহার মস্তকের মণি ও আমিই তাহার চরণের কণ্টক প্রায়;—আমি কেবল তাঁহার ঔদাস্যের পাত্রী নহি, তাঁহার বিরক্তির কারণ, তখন—তখনই আমি দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া সন্ন্যাসিনী ব্রতে দীক্ষিত হইলাম। যখন দেখিলাম যে দেবতার আশ্রমে থাকিয়া হৃদয়কে শত সহস্ররূপে বুঝাইয়াও বুঝাইতে পারিলাম না, যখন সুরেন্দ্রকে ভুলিবার জন্য বিপুল যত্ন করিয়াও কোন মতেই তাঁহাকে ভুলিতে পারিলাম না, যখন দেখিলাম যে ইন্দ্রাণীর প্রতি সুরেন্দ্রের একটী সোহাগের কটাক্ষ দেখিয়া বা আমার প্রতি ইন্দ্রাণীর একটি ভ্রুকুটী-সন্ধান দেখিয়া হৃদয় যে স্তরে স্তরে কি এক ভয়ানক যাতনায় দগ্ধ হইয়া যাইত, তখনই আমি সন্ন্যাসিনী ব্রতে দীক্ষিত হইলাম। যখন দেখিলাম যে সুরেন্দ্রকে ভুলিয়া যাইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াও তাঁহাকে অন্তরাল হইতে একটীবার দেখিয়া লইতেও জ্বলন্ত অভিলাষ হইত, আবার একটিবার দেখিলে সমস্ত মন আলোড়িত হইত এবং সমস্ত ভালবাসা জ্বলিয়া উঠিত, তখনই আমি সন্ন্যাসিনী ব্রতে দীক্ষিত হইলাম; যখন দেখিলাম যে নিতান্তই সুরেন্দ্র আমার আরাধনার দেবতা, সেই দেবতাই আমার সকল যাতনার কারণ, সেই যাতনাই আমার সংসারের সর্ব্বস্ব, তখনই আমি সন্ন্যাসিনী ব্রতে দীক্ষিত হইলাম। কিন্তু সন্ন্যাসিনী ব্রতে দীক্ষিত হইয়াই বা আমার কি হইল? এখন সুরেন্দ্রকে চর্ম্ম-চক্ষুতে দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু জাগ্রতে মানস চক্ষুতে এবং ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে তাঁহাকে

অহোরাত্রই দেখিতে পাই। জাগ্রতে ক-ল্পনার প্রভাবে তাঁহাকে ইন্দ্রাণীর সহবাসে অনন্ত সুখে সুখী দেখিয়া যেমন মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা পাই, ঘুমন্ত অবস্থায় আবার কখনো কখনো স্বপ্নে তেমনই আমার নিজস্ব প্রণয়ীরূপে দেখিয়া আমি ত সুখী হই, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে সাধের কুসুম-কানন বিকট শ্মশানে পরিণত হইয়া উঠে। মনের যাতনায়, মনের বৈরাগ্যে, মহামায়াকে হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই ছার, দুর্ব্বল মর্ম্ম তাঁহারই চরণে উৎসর্গ করিতে চাই—এই ছার, দুর্ব্বল মর্ম্ম তাঁহারি নি-কটে বলিদান দিতে চাই, কিন্তু সমস্ত পূজা-ধ্যান সমাপ্ত না হইতে হইতেই মহামায়ার প্রতিমা তিরোহিত হইয়া সুরেন্দ্রের প্রতিমা যেন আপনা আপনি—অবাধে—স্বপ্নবৎ—মন্ত্রবলে সেই মহামায়ার বেদীতে জাজ্বল্যমান দেখিতে পাই—মন্ত্রবলে আমিও যেন সন্ন্যাসিনী ব্রত ভুলিয়া যাই—মোহমন্ত্রে আমি তখন অভিভূত হইয়া হৃদয়ের নিভৃত উৎস হইতে উৎ-সারিত অশ্রুজলে মহামায়ার চরণ ছাড়িয়া সুরেন্দ্রের চরণই প্লাবিত করিতে থাকি।

সর্ব্বদাই আমার হৃদয়ের ভিতর যে কি বিপ্লব হইতেছে তাহা কে বুঝিবে? সুরেন্দ্রের উপরে আমার যে যে বিষয়ে অভিমান হইয়াছিল, সেই সকল স্মরণ করিয়া হৃদয় কখন গভীর বৈরাগ্য-ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িতেছে—কখন বা ইন্দ্রা-ণীর সুখের অবস্থা ভাবিয়া হৃদয় যাতনায় ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে, আবার কখন বা এই সকল পার্থিব চিন্তার দ্বারা পবিত্র সন্ন্যাস-ধর্ম্মের অবমাননা করিতেছি বলিয়া প্রাণ-মন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে। এক এক দিন সুখের স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গে এই বলিয়া নিজেকেই তিরস্কার করিয়াছি—'হায় কেন আমি সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া হিমালয়ের এই নিভৃত কন্দরে লুকা-ইয়া রহিয়াছি? কেন আমি সুরেন্দ্রের আশে পাশে থাকিয়া তাঁহাকে দেখিয়াই স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিবার যত্ন করিলাম না? ইন্দ্রাণীর না হয় সুখেরি কপাল, কিন্তু আমি চিরদুঃখিনী হইয়াও সুরে-ন্দ্রকে কেবল দেখিয়াই সুখী হইতে চাহি-লাম না কেন?—তিনি হয় ত আমাকে দেখিয়া বিরক্ত হইতেন, কিন্তু আমি তাঁ-হাকে দেখা না দিয়া কেবল তাঁহাকে দেখিবার আশাতেই সংসারে রহিলাম না কেন? এই বিকট শূন্য প্রদেশে আত্ম-বলিদান দিবার আবশ্যকতা কোথায়?—এই রূপ ভাবিতেছি, এমন সময় হয় ত আপনাদের সকলের সম্মিলিত ভগবতী-উপাসনার জলদ-গম্ভীর নিনাদ সপ্তম স্বর্গের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিকম্পিত করিয়া এই অভাগিনীর কর্ণে আসিয়া প্রতিধ্ব-নিত হইত—অমনি আমার মোহ ভঙ্গ হইত, অমনি যেন ঐ সকল পার্থিব চিন্তা কর্পূরের মত উবিয়া যাইত, শেষে কষ্টে, অনুতাপে, ঘৃণায় জর্জ্জরিত হইয়া বিকম্পিত হৃদয়ে আপনাদের উপাসনায় যোগ দিবার চেষ্টা করিতাম। স্বীকার করিতেই হইবে যে সে উপাসনার সময়

আমার হৃদয় যে রূপ একটি বিমল আনন্দ উপভোগ করিত, সেরূপ বিমল আনন্দ পৃথিবীর আর অন্য কিছুতেই হইতে পারে না। সে সময়ে অভাগিনীর এই ক্ষুদ্র হৃদয়ও হিমালয়ের মত উন্নত ও সাগরের মত প্রসারিত হইয়া অকিঞ্চিৎকর এক জন মনুষ্যের প্রেম-ভিখারী বলিয়া আপনাকে অনুভবই করিতে পারিত না। সেই উপাসনার সময় আমি আপনিই বুঝিতে পারিতাম সেই সঙ্গীতময় উপাসনার প্রভাবে আমার প্রাণমন পৃথিবীর সঙ্কীর্ণ পরিধি ছাড়িয়া সংসারের ঘূর্ণায়মান আবর্ত্ত ছাড়িয়া কোন্ এক জ্যোতির্ম্ময় লোকে যাইয়া আপনাতে আপনহারা হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু জানি না, মাটীর পৃথিবীর আকর্ষণ বশতই হউক, রমণী-হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বশতই হউক, মন্দভাগিনীর অদৃষ্টের দোষেই হউক, বা প্রেমের কঠোর অত্যাচারেই হউক,—এ পোড়া প্রাণমন অধিক ক্ষণ সেই জ্যোতির্ম্ময় লোকে বিচরণ করিতে পারিত না, পলকেই ভগ্নপক্ষ বিহঙ্গনীর ন্যায় ধূলিময় পৃথিবীতে পড়িয়া ধূলায় ধূসরিত হইত।—দেব, এই আমার প্রকৃত অবস্থা,—এই আমার নরক-যন্ত্রণা। আমি আশ্রম-বাসিনী হইয়া আশ্রমের সুখ হইতে বঞ্চিত হইলাম, আবার সন্ন্যাসিনী হইয়া বৈরাগ্য শিখিতে পারিলাম না। আমার দেব-আরাধনাতে পার্থিব সুখ-অভিলাষের কলঙ্ক—আবার পার্থিব সুখাভিলাষে বৈরাগ্যের প্রতিজ্ঞা।—আমি বিস্তর চেষ্টা করিয়া, বিস্তর কঠোরতা সহ্য করিয়া, বিস্তর ত্যাগ স্বীকার করিয়া আজ এই সর্ব্বসাক্ষী-রূপী হিমালয়ের চরণতলে দাঁড়াইয়া, পবিত্র-সলিলা জাহ্নবীর পুলিন দেশে দাঁড়াইয়া মুক্তকণ্ঠে এই বলিতেছি যে, অভিমানের দায়ে যদি কেহ কখন প্রণয়ের সামগ্রীকে একেবারে ভুলিতে চাহেন' তিনি শূন্যেও দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে যত্ন করিতে পারেন। এবং তাহার একটি বিশেষ কারণও আছে। বিস্তর যত্নে, বিস্তর কঠোর ত্যাগ-স্বীকার দ্বারা প্রণয়ের সামগ্রীকে ভুলিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াও ভুলিতে অনেক সময় ইচ্ছা হয় না। ভুলিবার জন্য কঠোর প্রতিজ্ঞা করিতেছি' অথচ পাছে একেবারে ভুলিয়া যাই—এই দুই বিরোধী বাসনার প্রতিকূল স্রোতে হৃদয়-মন যে কি বিপর্য্যস্ত হয়, তাহা প্রণয়ী ব্যতীত আর কেহই বুঝিতে পারিবে না। যাঁহার চরণে আমি প্রাণমন উৎসর্গ করিয়াছি, যাঁহার প্রতিমা আমার মর্ম্মের প্রত্যেক উপশিরাতে পর্য্যন্ত গ্রথিত রহিয়াছে, যাঁহার ক্ষণেকের সহবাসেও আমি স্বর্গের সুখ উপভোগ করিয়াছি, যাঁহার সকল কথাই আমার মর্ম্মের গীতিময় কাব্য-বিশেষ, তাঁহাকে একেবারে ভুলিতে কখনই প্রাণের ভিতর হইতে ইচ্ছা হয় না। তাঁহাকে ভুলিয়া যাইবই যাইব বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতে পারি, অভিমানের মান রাখিতে পারি, উৎপীড়িত প্রেমের গৌরব রক্ষা করিতে পারি, কিন্তু তবুও "তিনি কি আমার ভুলিবার ধন"-রূপ গভীর যাতনাময় ভাবটী ফল্গু

নদীর মত সকল প্রতিজ্ঞার মর্ম্ম ভেদ করিয়া অলক্ষিত ভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। কিন্তু তবুও সেই—”

এই সময়ে সহসা মেলার দিকে একটি ভয়ানক কোলাহল উত্থিত হইল। আমি ও পুণ্যবতী, দুজনেই সেই দিকে চমকিত ভাবে চাহিয়া রহিলাম,—উভয়েরই মুখে কোন কথা নাই,—কোলাহল ক্রমে ক্রমে আরও—আরও—আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল,—দূর হইতে দেখিতে পাইলাম যে জন-তরঙ্গ ক্রমে আমাদের এই নিভৃত প্রান্তরের দিকেই তরঙ্গিত হইয়া আসিতেছে। আমি পুণ্যবতীর জীবন-ভয়ে পুণ্যবতীকে সেইখানে একেলাই রাখিয়া জন-কোলাহলের দিকে দৌড়িয়া যাইলাম। প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ না যাইতে যাইতেই শুনিতে পাইলাম যে এক দল দস্যু আসিয়া মেলার ব্যাপারীদের সকল সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে ও এক জন মনুষ্য পর্য্যন্ত হত হইয়াছে।—দূর হইতে দেখিলাম যে জন-সমারোহের মধ্যে দস্যুদের কৃপাণ শূন্যে শূন্যে ঝলকিতেছে, “মার মার্” শব্দ দিগন্তে গর্জ্জিতেছে—শূন্যে শূন্যে বিপক্ষদের লাঠী ও দণ্ড হস্তী-শুণ্ডের মত আস্ফালন করিতেছে—মহা কোলাহল, মহা বিপ্লব—আমি সাহসে নির্ভর করিয়া সেই বিপ্লবের আবর্ত্তে যাইয়া প্রবেশ করিলাম,—দেখিলাম যে ইংরাজ কোতোয়ালীর প্রভাবে শরৎকালের মেঘের মত দস্যুদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়নপর হইয়াছে—পূর্ব্বে, পশ্চিমে, দক্ষিণে ও উত্তরে লোকেরা দস্যু উদ্দেশে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।

এই কোলাহল কিঞ্চিৎ শমিত হইলে আমি ধীর পদক্ষেপে এদিক ওদিক করিতেছি, এমন সময় একটি নিভৃত নদী গহ্বর হইতে মানুষের যাতনা-নিঃসৃত অর্দ্ধ-রুদ্ধ আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম। সেই থানে যাইয়া দেখিলাম একটি লোক অত্যন্ত আহত হইয়া এ পাশ ও পাশ করিতেছে। তাহার যাতনা দেখিয়া আমি তাহার সেবা করিবার সঙ্কল্পে গঙ্গা হইতে জল আনিতে উদ্যত হইতেছি, এমন সময় সে ব্যক্তি আমাকে কহিল যে “মহাশয়! আপনি সন্ন্যাসী আপনার নিকট হইতে কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই, সুতরাং আপনাকে আমি মুমূর্ষু অবস্থায় এই অনুরোধ করিতেছি যে আপনি আমার সেবা সুশ্রূষা পরিত্যাগ করিয়া অন্য আর এক ব্যক্তির সেবা করিলে আমি নিতান্তই আপনার নিকটে বাধিত হইব। আমি ঐ দস্যুদিগের মধ্যে এক জন প্রধান দস্যু—আপাততঃ আহত হইয়া পড়িয়া আছি। কিন্তু আমি নিজের জন্য কাতর নহি—আমাদের নেতা ও নায়ক ধৃত হয়েন নাই—তিনি নিদারুণ রূপে আহত হইয়া ঐ উত্তর দিকে গঙ্গার ক্রোড়স্থ অরণ্যের ভিতরে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়াছি—তাঁহাকে একবার দেখুন।”—এই বলিয়া আহত দস্যু নীরব হইল, আমিত ভাবিলাম যে পুণ্যবতী ঐ অরণ্যের নিরালয়ে একেলাটী আপনার ধ্যানে নি-

মগ্ন রহিয়াছে সুতরাং দস্যু-প্রধান কর্তৃক তাহার ধ্যানের কোন বিঘ্ন না হয় তাহা দেখা নিতান্তই আবশ্যক। এই ভাবিয়া আমি আহত দস্যুটীকে পরিত্যাগ করিয়া সেই অরণ্যের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ভয়ে ভয়ে রুদ্ধশ্বাস পুণ্যবতীর সেই নির্জ্জন লতামণ্ডপের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া যাইল।—দেখিলাম নিদারুণ রূপে আহত দস্যু-নায়ক মূর্চ্ছিত হইয়া পুণ্যবতীর ক্রোড়ে শয়ান রহিয়াছে। দেখিলেই বোধ হয় যেন আজ আমূল উৎপাটিত তমাল বৃক্ষ ধরাশায়ী হইয়াও বেষ্টিত মাধবীলতার মর্ম্মান্তিক আলিঙ্গনে সংরক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু সেই দৃশ্য দেখিবামাত্রই আমি যেন তাড়িৎ প্রভাবে চমকিত হইয়া উঠিলাম। ভাবিলাম—কি, আজ এক জন দস্যুর দেহস্পর্শে পুণ্যবতীর পবিত্র দেহ কলঙ্কিত হইবে? পুণ্যবতী আমাদেরই পুণ্যবতী, আর দস্যু-নায়ক দস্যুদেরই নায়ক, সুতরাং পুণ্যবতীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিতে কিরূপে সে স্পর্দ্ধিত হইতে পারে?—আবার, পুণ্যবতী?—পুণ্যবতী কেন নিজ গেরুয়া বসনের অঞ্চলদ্বারা তাহার ক্ষত-প্রবাহিত শোণিত-ধারা মুছাইয়া দিবে?—কেন তাহার সেই অবসন্ন মুখের দিকে স্থির নয়নে চাহিয়া বিগলিত অশ্রুধারায় তাহার শরীর প্লাবিত করিবে? কেনই বা তাহার বিজড়িত কেশরাশি গুছাইতে গুছাইতে মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাসে আপনার মস্তকের স্খলিত জটাজাল তরঙ্গিত করিয়া তুলিবে?—উঃ দস্যু-নায়কের কি স্পর্দ্ধা! পুণ্যবতীর কি অন্যায়!—কিন্তু আমিত সন্ন্যাসী!—

—না, না, দস্যু নায়ক ত মূর্চ্ছাগ্রস্ত আর পুণ্যবতীওপর-দুঃখ-কাতরা! কিন্তু পর-দুঃখ-কাতরা হইলেও পুণ্যবতীর মুখে ওরূপ দীন ভাব কেন, শরীরে ওরূপ অবসন্ন ভাব কেন? আবার দেখ, দস্যু-নায়কের মৃতকল্প মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া পুণ্যবতী সেই মুখ নিজ মৃণাল-হস্তে সযত্নে ধরিয়া তাহা আবার নিজ বক্ষের দিকে টানিয়া লইতেছে, সেই মুখ যেন কোথায় রাখিবে খুঁজিয়া পাইতেছে না, হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে যেন লুকাইয়া রাখিতে কঠোর যত্ন করিতেছে—উঃ কি অন্যায়!—কিন্তু আমি সন্ন্যাসী! ভাবিলাম পুণ্যবতী সন্ন্যাসিনী হইয়াও রমণী-হৃদয়ের দুর্ব্বলতার সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই, পার্থিব প্রবৃত্তির শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে পারে নাই,—নহিলে দস্যুর প্রতি এত অনুরাগের ভাব কেন? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমার হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে কি যেন একটা বৃশ্চিক দংশন করিয়া উঠিল—কিন্তু আমি ত সন্ন্যাসী! ভাবিলাম, যে আমি সন্ন্যাসী না হইয়া যদি ঐ দস্যুনায়ক হইতাম, দস্যুনায়ক হইয়া যদি ঐরূপে আহত হইতাম, ঐরূপে আহত হইয়া যদি এই নিভৃত প্রদেশে আসিয়া পড়িতাম,—এই নিভৃত প্রদেশে আসিয়া যদি পুণ্যবতীর ক্রোড়ে অবসন্ন মস্তক রাখিতে পারিতাম, অবসন্ন মস্তক রাখিয়া—কিন্তু আমি ত সন্ন্যাসী!

অথচ এই পার্থিব হইতে পার্থিব-তর দৃশ্য দেখিয়া স্বর্গ-সুখের জলস্তম্ভ হইতে কেন আমার হৃদয় মর্ত্ত্যলোকের আবর্ত্তে বিঘূর্ণিত হইয়া পড়িল ?—সন্ন্যাসীর শ্মশান হৃদয়ে এ আবার কি সাংঘাতিক চিন্তানল জ্বলিয়া উঠিল ?—আমি কি এত দিন পর্য্যন্ত পুণ্যবতীকে প্রেমের ভালবাসা বাসিয়া আসিতেছিলাম ?—নহিলে হৃদয়ের আজ এ বিপ্লব কেন উপস্থিত হইল ? কিন্তু এ বিপ্লব ত কিছুই নয় !—পুণ্যবতী পুণ্য-বতীর মত কর্ম্ম করিতেছে না দেখিয়াই আমার মর্ম্মে এত আঘাত লাগিতেছে—আর ত কিছুই নয় ! পুণ্যবতী যদি আজ দয়ার প্রভাবে ঐ নিকৃষ্ট পাষণ্ড দুরাত্মা দস্যুনায়ককেই যত্ন করে, তাহাতে আমার কি এল গেল—পুণ্যবতীর নিজেরই পুণ্যের অবমাননা করিতে বসিয়াছে, আমি তাহার কি করিব, কারণ আমি ত সন্ন্যাসী।

ক্রমে যখন দেখিলাম দস্যুনায়কের সুদীর্ঘ নয়নদ্বয় ঈষৎ বিস্ফারিত হইয়া শূন্য দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিতেছে, অথচ কোথায় রহিয়াছে সে তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না, কেবল থাকিয়া থাকিয়া নিজের যাতনা মৃদুস্বরে প্রকাশ করিতেছে, দস্যুর এই অবস্থায় দেখিলাম যে পুণ্যবতী কি এক উন্মত্ত উচ্ছ্বাস প্রভাবে সেই দস্যুর কপোল যেন আত্মহারা হইয়া প্রগাঢ় ভাবে চুম্বন করিল, তখন আর আমি থাকিতে পারিলাম না, তখন পুণ্যবতীর সম্মুখে যাইয়া সুতীব্র স্বরে কহিলাম 'পুণ্যবতী ! দস্যু নায়ককে এরূপ নির্জ্জন স্থানে চুম্বন করা কি তোমার কঠোর ব্রত রক্ষা করা—না সন্ন্যাস ধর্ম্মের সম্মান রাখা, না রমণী-হৃদয়ের গৌরব প্রচার করা।" এই কথা শুনিয়া ও আমাকে দেখিয়া পুণ্যবতী কিয়ৎ ক্ষণ নিস্পন্দ থাকিয়া ঊর্দ্ধফণা ফণিনীর ন্যায় সদর্পে দাঁড়াইয়া দৃঢ়তাব্যঞ্জক, গম্ভীর স্বরে কহিল

"দেব ! ইনিই আমার সুরেন্দ্র !"

ক্রমশঃ

হিয়োন সাঙের বাঙ্গালা ভ্রমণ।

চতুর্থ ভাগ, ২ সংখ্যা ৭৫ পৃষ্ঠার পর।

তবকত ই-নেছরি গ্রন্থের সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদক মেজর রেভারটী সাহেব, এই বর্দ্ধন কোট নগরের স্থাননির্ণয়ের চেষ্টা করেন নাই। বরং তিনি ভ্রম ক্রমে সিকিমের উত্তর প্রান্তবর্ত্তী কোন নগর বিবেচনা করিয়াছেন। [৩৭] বিজ্ঞবর ইলিয়ট সাহেব ও তদ্রূপ বর্দ্ধন কোটের স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা

৩৭ Major Raverty's Tabavat-i-Naciri page 562. কিন্তু পশ্চাৎ তিনি

করেন নাই। ৩৮ মৃত মহাত্মা ব্লকমান সাহেব বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব সংগ্রহে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ ব্লকমান অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। তল্লিখিত যবনশাসিত বঙ্গের পুরাতত্ত্ব অসম্পূর্ণ হইলেও তুলনারহিত। তিনি এই নগর সম্বন্ধে এই রূপ লিখিয়াছেন "বর্দ্ধনকোট বা বর্দ্ধনকোটী নগরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি করতোয়া নদীর তীরে দৃস্ট হয়। এই স্থানটী বগুড়ার ঠিক উত্তর দিকে গোবিন্দগঞ্জের নিকটবর্ত্তী। ইহার উত্তর অক্ষাংস্র ৮৯ অংশ ২৪ কলা, পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ২৫ অংশ ৮ $\frac{১}{৪}$ কলা।" ৩৯ মানচিত্রে এই স্থানটী "রাজবাড়ী" নামে পরিচিত।

বিজ্ঞবর মিত্র মহোদয়ের মতে দিনাজপুর, রঙ্গপুর, বগুড়া, রাজসাহি মালদহ ও ত্রিহুত প্রভৃতি লইয়া প্রাচীন পৌণ্ড্র বর্দ্ধন রাজ্য সংগঠিত হইয়াছিল। ৪০ ত্রিহুত (মিথিলা) পৌণ্ড্র রাজ্যের অন্তর্নিবিস্ট ছিল, আমরা এইরূপ অনুমান করিতে পারি না। কনিংহাম সাহেব পৌণ্ড্র রাজ্যের এইরূপ সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "পূর্ব্বদিকে তিস্তা (ত্রিস্রোতা) ও ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে গঙ্গা (পদ্মা) পশ্চিমে মহানন্দা।" ৪১ ফারগিউসন সাহেব বলেন, পৌণ্ড্র বর্দ্ধন রাজ্য কৌশীর পূর্ব্বতীর হইতে ব্রহ্মপুত্রাবধি বিস্তৃত ছিল। ৪২ ওয়েষ্টমেকট সাহেব, ফারগিউসন সাহেবের মতানুসরণ করিয়া, অতিরিক্ত বক্তব্যস্থলে ব্যক্ত করেন, যে এই রাজ্য দক্ষিণ দিকে পদ্মাতীর হইতে পর্ব্বতাবধি প্রসারিত ছিল। ৪৩ বারেন্দ্র ভুমিই পৌণ্ড্র রাজ্য এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু পণ্ডিতমণ্ডলী বারেন্দ্র বিভাগের পূর্ব্ব সীমান্তে করতোয়া নদীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে পৌণ্ড্র রাজ্য এক দিকে ত্রিপুরার সীমা দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। তিব্বত দেশীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার তারানাথ লিখিয়াছেন যে, পৌণ্ড্র বর্দ্ধন রাজ্যের উত্তর-

---

আত্মভ্রম সংশোধন করিয়াছেন। See Journal As-So-Bengal Vol XLV part 1 page 346.

৩৮ Elliots History of India Vol II page 310.

৩৯ Prof H. Blockmann's contributions to the Geography and History of Bengal—(I. A. S. B.)

৪০ "Tarhut, Malda. Rajshahi. Dengapore, Rangpore and Bagura, which constituted the ancient Kingdom of Pundr Vardhan." J. A. S. B. XLVII para I. p 396.

৪১ Cunningham's ancent Georaphy of India. page 481.

৪২ Journal R. As Society (N. S.) Vol VI page 255.

৪৩ The Kingdom of Pundra Varddhan extended from the Kosi in Purneah to Burmaputra, and from the Ganges to the Hills—(Westmacott.)

পূর্ব্ব ৪৪ সীমান্তে "কামরূপ, আসাম ৪৫ ও ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্য অবস্থিত। হিয়োন-সাঙ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের পরিধি অনুমান ৬৬৭ মাইল লিখিয়াছেন। মোগল সম্রাট-আকবরের অধিকার-কালে তাহার রাজস্ব সংক্রান্ত সুপারগ মন্ত্রী রাজা তোড়ল মল্ল বাঙ্গলা উনবিংশ সরকারে বিভক্ত করিয়াছিলেন। একটু বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে তন্মধ্যে তাজপুর, পাঁজরা, ঘোড়াঘাট ও বারবকাবাদ (সন্তোষ) প্রভৃতি ৪টী সরকার পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের এক একটী অংশ মাত্র।

হিয়োনসাঙ বলেন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যে ২০ টী মঠ, কিন্তু দেবমন্দিরের সংখ্যা তাহার পঞ্চগুণ অধিক অর্থাৎ ১০০ শত। রাজধানীর সন্নিকর্ষে মহারাজ অশোকের একটী স্তূপা ও ইহার ৩।৪ মাইল দূরে "পুষ্পাশ্রম" নামক একটী বিখ্যাত মঠ ছিল। হিয়োনসাঙের সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতি পরিলক্ষিত হয়। বিশেষতঃ বোধ হয় বাঙ্গলায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের জ্যোতি সর্ব্বতোভাবে বিকসিত হয় নাই। শ্রীধর্ম্মাশোকের সময়েও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনবাসী জনৈক (নিগ্রন্থী) পণ্ডিত এক খানি চিত্রপটে নিজ মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া, সেই মূর্ত্তির পদতলে ভগবান সাক্যসিংহের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া সাধারণে প্রচার করিয়াছিলেন। সত্য বটে পাল রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা হিন্দু দেব দেবীর সেবা পূজার জন্য ভূমিদান ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন। (৪৬) হিয়োনসাঙের ভারত ভ্রমণ সময়ে কোন্ বংশীয় নরপতি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন সিংহাসনের গৌরববর্দ্ধন করিতেছিলেন, তাহার নির্ণয় নাই। পাল বংশের অভ্যুদয় ইহার পরবর্ত্তী অনুমিত হয়।

হিয়োনসাঙ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যটী মধ্য ভারতের অন্তর্গত লিখিয়াছেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বাসীগণ গৌরবর্ণ। ইহাদের চরিত্র সৎ, পূর্ব্বভারতবাসীদিগের ভাষার সহিত ইহাদের ভাষা পৃথক, ইহাদের আচার ব্যবহারও সম্পূর্ণ পৃথক। বাঙ্গলার অন্যান্য প্রদেশ, কামরূপ ও উড়িষ্যা প্রভৃতি লইয়া হিয়োনসাঙের "পূর্ব্বভারত" সংগঠিত হইয়াছিল।

কামরূপ।

(Kia-mo-leu-po-)

পরিব্রাজক হিয়োন সাঙ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে কিঞ্চিদধিক ১৫০ মাইল (৯০০ লি) গমন

---

৪৪ তারানাথের গ্রন্থের যে অনুবাদ অংশ অবলম্বন করিয়া আমরা এতদ্বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে "কামরূপ, আসাম ও ত্রিপুরা," পৌণ্ড্রাজ্যের উত্তর দিকস্থ রাজ্য লিখিত আছে। অনুবাদের অনুবাদ ভ্রমশূন্য নহে, এ বিবেচনায় আমরা "উত্তরের" পরিবর্ত্তে উত্তর পূর্ব্ব লিখিলাম এবং ইহাই সঙ্গত।

৪৫ জাতীয় নাম "আহম" অর্থ অসম। অসম হইতে আসাম নামের উৎপত্তি।

৪৬ পাল বংশীয়দিগের সম্বন্ধে আমাদের অনেক বলিবার আছে। তাহা প্রবন্ধান্তরে অবতারিত হইবে।

করিয়া কামরূপ রাজধানী প্রাপ্ত হন। ৪৭ পথিমধ্যে তাঁহাকে একটী বৃহৎ নদী অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। কনিংহাম সাহেব বলেন, পরিব্রাজক পৌণ্ড্র বর্দ্ধন হইতে উত্তর দিকে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু হিয়োনসাঙের পথপ্রদর্শক চীনদেশীয় প্রাচীন ভারত মানচিত্রে দৃষ্ট হইতেছে, পরিব্রাজক প্রায় পূর্ব্বাভিমুখেই গমন করিয়াছিলেন। অন্যান্য পণ্ডিতমণ্ডলীও ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। কনিংহাম সাহেব বলেন,—"কামরূপের রাজধানী গোহাটী প্রাচীন কিন্তু চীন পরিব্রাজক হিয়োনসাঙ যখন কামরূপে উপনীত হন, সে সময়ে "কোমতাপুর" নামক বিখ্যাত নগরে সেই দেশের রাজপাট সংস্থাপিত ছিল। পর্য্যটক যে স্রোতস্বতী অতিক্রম করেন; তাহা "তিস্তা" ব্রহ্মপুত্র নহে। বিজ্ঞবর কনিংহাম সাহেবের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া আমরা বলিতেছি তিনি ভ্রমে পতিত ৪৮ হইয়াছেন। হিয়োন সাঙের ভারতভ্রমণের অন্যূন ছয় শত বৎসর অন্তে "কোমতাপুর" রাজা নীলধ্বজ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছিল। নীলধ্বজের পৌত্র নীলাম্বরের রাজ্যশাসনকালে ৯০৩ হিজিরি শকে (১৪৯৮ খৃঃ অঃ) গৌড়েশ্বর হুসন সাহ কোমতাপুর ধ্বংশ করিয়াছিলেন। কোমতারাজবংশের অধঃপাত দ্বারা কুঁচবিহারের বর্ত্তমান রাজবংশের আদি পুরুষ বিশ্বসিংহের মাতামহ হাজুর রাজ্য সংস্থাপনের উপায়দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। এই সকল ঘটনা যবন ও আসাম দেশীয় ঐতিহাসিকগণ স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন। কোমতাপুর সংস্থাপনের সময় অবধারণ করিতে গিয়া প্রতি পুরুষে গড়ে ২০।২৫ বৎসরের স্থলে ১০০ বৎসর ধরিয়া ১৪৯৮ হইতে তিন পুরুষে ৩০০ বৎসর বিয়োগ করিলে ও আমরা ঐ ঘটনা ১১৯৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বতন বলিয়া কোন ক্রমেই নিরূপণ করিতে পারি না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমাদের বিবেচনায় শকাব্দার চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোমতাপুর নগরী সংস্থাপিত হইয়াছিল। অতএব আমরা লিখিতে পারি হিয়োনসাঙ নিশ্চয়ই নদরাজ লৌহিত্য ৪৯ অতিক্রম করিয়া গোহাটী

৪৭ এস্থলে আমরা বিজ্ঞবর উইলসন ও তন্মতাবলম্বীদিগের বিরুদ্ধে আর একটী কথা না বলিয়া বিরত হইতে পারিলাম না। বর্দ্ধমানকে পৌণ্ড্র বর্দ্ধন ধরিয়া লইলে হিয়োনসাঙ সমসূত্র রেখায় ৩০০ মাইল গমন করিয়াও কামরূপ রাজধানী প্রাপ্ত হইতে পারেন না।

৪৮ কনিংহাম সাহেব পশ্চাৎভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রমাদমার্গে পাদবিক্ষেপ করেন নাই। তিনি সেই সময় লিখিয়াছেন—The distance mentioned by Hewon-Thsang points to the neighbourhood of Gohati as the position of the capital—

J-A-S-B XV part II page 40.

৪৯ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ব্রহ্মপুত্রের নাম "লৌহিত্য" লিখিত। মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে। কামরূপের বর্ণন স্থলে

নগরে উপনীত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান গোহাটী প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষ পুরের একটী অংশমাত্র ৫০। নরক নরপতির অধিকার হইতে কোমতেশ্বরদিগের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বাবধি কামরূপের রাজাসন অটল ভাবে গোহাটীতে সংস্থাপিত ছিল। তাহার প্রাচীন উন্নতির চিহ্ন অদ্যাপি ভূগর্ভে সমাহিত রহিয়াছে। গোহাটী, বর্দ্ধনকোটের কিঞ্চিৎন্যূনাধিক ১৫০ মাইল উত্তর পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। বর্দ্ধনকোট হইতে ঠিক উত্তর দিকে গমন করিলে পরিব্রাজক সিকিমস্থ তামলং নগরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব ভাগে উপনীত হইতেন। বর্দ্ধন কোট হইতে কোমতাপুর ৭১ মাইল অপেক্ষা দূরবর্ত্তী হইবে না। অদ্যাপি কোমতাপুরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সুবিখ্যাত ডাক্তর বুকনন এই নগরের পরিধি ১৯ মাইল নির্ণয় করিয়াছেন। তাহার মতে চৈনিক প্রথানুসারে কোমতেশ্বরদিগের রাজপ্রাসাদ নগরের মধ্যস্থলে ছিল। এই নগর শত্রুর দুরাক্রম্য, ইহা কেবল অতীতসাক্ষী ইতিহাস আমাদিগকে বলিতেছে এমত নহে। ৫১ কোমতেশ্বরদিগের "শ্মশানক্ষেত্র" দর্শন করিলে অদ্যাপি প্রাচীন বাঙ্গালিদিগের বীরত্ব স্মৃতির নেত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোমতাপুর দর্লানদীর পূর্ব্ব তীরে। দর্লা একটী উপনদী; আসামের পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া (কুঁচ) বিহার নগরের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইয়া মহাল "ভিতরবন্দ"কে "বাহেরবন্দ" হইতে পৃথক রাখিয়া, বাগুয়া নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে।

হিয়োনসাঙের ভ্রমণকালে কুমারভাস্কর বর্ম্মা কামরূপ শাসন করিতেছিলেন। পরিব্রাজক বলেন "এই নরপতি ব্রাহ্মণ-কুলজ ও নারায়ণ হইতে উৎপন্ন। ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ কুমার উপাধির সহিত প্রায় সহস্রাব্দাবধি কামরূপ রাজ্য ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন।" কনিংহাম সাহেব বলেন, "ব্রাহ্মণ-বংশজ ভাস্করবর্ম্মা গোঁড়া বৌদ্ধ। তিনি ৫৬৫ শকাব্দে চক্রবর্ত্তী হর্ষবর্দ্ধনের সহিত ধর্ম্মোৎসবে পাটলীপুত্র হইতে কানাকুব্জে গমন করিয়াছিলেন। ৫২

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে,—"অত্রাস্তি নদরাজোয়ং লৌহিত্যো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।' কবিচূড়ামণি কালিদাস লিখিয়াছেন "বিজয়ী রঘু লৌহিত্য পার হইলে প্রাগজ্যোতিষেশ্বর কম্পিত হইলেন।" (চকম্পে তীর্ণলৌহিত্যে তস্মিন প্রাগজ্যোতিষেশ্বরঃ।) আফ্রিকা দেশীয় পর্য্যটক ইবন বতোতিয়া ব্রহ্মপুত্রকে "নীলনদ" লিখিয়াছেন।

৫০ The modern Gowhati is on the sovthbank; but the ancient capital called Prazjoitishpore occupied a vast area on both banks (Col. E. T. Dalton C. S. I.) গুবাহাটীক পুরানত প্রাগজ্যোতিষ পুর বোলে।" (আসামিভাষা)

বাবু গুণাভিরাম বড়ুয়া প্রণীত, আসাম বুরঞ্জী, ৬ পৃষ্ঠা।

৫১ হুসন সাহার কোমতাপুর অধিকার কেবল চক্রান্ত ও কৌশলমূলক। ইহা যথা স্থানে বর্ণিত হইবে।

৫২ Cuningham's ancient Geography of India 1 page 501.

কিন্তু কাওয়েল সাহেবের অনুবাদ ইহার সহিত সম্পূর্ণ বিসংবাদী। তিনি বলেন,—"কামরূপবাসীগণ বৌদ্ধ নহে। এই রাজ্যে একটীও মঠ নাই। ৫৩ কিন্তু শত শত দেবমন্দির দৃষ্ট হয়। রাজা ব্রাহ্মণ, নাম ভাস্কর বর্ম্মা, উপাধি কুমার। তিনি সৌগত না হইয়াও হিয়োনসাঙকে সম্মান ও আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন।" ৫৪ পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তর শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুর স্বয়ং ফরাসী পণ্ডিত জোলিয়ানকৃত হিয়োন সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমাকে যেরূপ বুঝাইয়াদিয়াছেন, তদ্দ্বারা কাওয়েল সাহেবের লিখার অধিকাংশ সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

হিয়োনসাঙ বলেন—এই রাজ্যের ভূমি নিম্ন ও উর্ব্বর। কাঁঠাল ও নারিকেল এস্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অধিবাসীগণও এই দুইটী ফলের বড় আদর করে। এই রাজ্যের জল বায়ু স্বাস্থ্যকর। অধিবাসীগণ খর্ব্ব, কৃষ্ণবর্ণ,বলবান ও ভীষণদর্শন। কিন্তু ইহারা সচ্চরিত্র ও বিদ্যোৎসাহী, ইহাদের ভাষা মধ্যভারত হইতে পৃথক। কামরূপেশ্বর ও তাঁহার প্রজাবর্গ সকলেই (হিন্দু) দেবোপাসক। এই রাজ্যে একটী মাত্র মঠ আছে। শ্রমণগণ তাহাতে যাইয়া বুদ্ধের উপাসনা করেন। রাজা অতি সচ্চরিত্র,তিনি বিধর্ম্মী বলিয়া ইহাদের প্রতি কোন অত্যাচার করেন না। অত্রত্য শ্রমণগণ নালন্দায় যাইয়া ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। অত্রত্য হিন্দুগণও বুদ্ধদেবকে মান্য করেন।

পরিব্রাজক বলেন---কামরূপের রাজধানীর পরিধি ৩০ লি (৫—৬ মাইল।) রাজ্যের পরিধি ১০০০০ লি (১৬৬৬—২০০০ মাইল) আমাদের প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের মতে—এই রাজ্য শত যোজন বিস্তীর্ণ ও ত্রিকোণ। ৫৫ হিয়োনসাঙ বলেন "কামরূপ রাজ্যের পূর্ব্ব সীমান্তে চৈনিক "সু" জাতি বাস করে। রাজধানী হইতে সীমান্ত প্রদেশে "গমন করিতে দুই মাসের প্রয়োজন। পথ অতি দুর্গম। কামরূপের পূর্ব্ব দক্ষিণ সীমান্ত বন্য হস্তীতে পূর্ণ।

সমতট।

(San-mo-ta-cha)

হিয়োনসাঙ কামরূপ হইতে ১২০০—১৩০০ লি (২০০—২৬০ মাইল) দক্ষিণ দিগভিমুখে গমন করিয়া সমুদ্র তীরবর্ত্তী রাজধানী সমতটে উপনীত হন। "সমতট" প্রাচীন বঙ্গ ব্যতীত অন্য কিছুই অনুমান করা যাইতে পারে না। তবে "সমতট" নামটী কোথাহইতে আসিল ? প্রাচীন গ্রন্থ রামায়ণে বঙ্গের উল্লেখ আছে। কিন্তু মহাভারতে "বঙ্গ" বিশদরূপে পরিচিত। তৎ-

৫৩ প্রকৃত পক্ষে একটী মাত্র মঠ ছিল।

৫৪ Elphinstone's History of India, (Cowels 6th ED.) page 294.

৫৫ করতোয়াং সমাসাদ্য যাবৎ শিখরবাসিনীং, শতযোজনবিস্তীর্ণং ত্রিকোণং সর্ব্বসিদ্ধিদং।

(তন্ত্র চূড়ামণি, পীঠ নির্ণয়।)

পর উনবিংশ শতাব্দী অতীত হইলে কালিদাস গঙ্গা ও লৌহিত্যের স্রোতোমধ্যবর্ত্তী দ্বীপ পুঞ্জময় দেশকে বঙ্গ নামে আখ্যাত করিয়াছেন। ৫৬ শালিবাহন-প্রচলিত অব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে "সমতট" নামের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রয়াগনগরে গুপ্ত বংশীয় চতুর্থ নরপতি "মহারাজ অধিরাজ শ্রীসমুদ্র গুপ্তের" ৫৭ যে "লাট" প্রস্তর আবিষ্কৃত হয়, তাহাতে "সমতট "আড়বক্র" "কামরূপ" "নেপাল" ও "ত্রিপুরা" প্রভৃতি প্রত্যন্ত নরপতিগণকে সম্রাটের করদ শ্রেণীতে গণনা করা হইয়াছে। ৫৮ বৃহৎ সংহিতা প্রণেতা বরাহমিহির "সমতট" নামটী জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু তিনি সমতটকে বঙ্গ হইতে পৃথক্ করিয়াছেন। ৫৯ কোলব্রুক সাহেবের মতে

৫৬ বোধ হয় কালিদাস পৌণ্ড্র ও তাম্রলিপ্তকে বঙ্গ হইতে পৃথক করেন নাই। তিনি কামরূপ, সুহ্ম (ত্রিপুরা) ও উড়িষ্যার মধ্যবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জময় দেশকে সাধারণত বঙ্গ আখ্যাদান করিয়াছেন।

৫৭ আমরা সমুদ্র গুপ্তকে দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক বিবেচনা করি। প্রফেসার লাসেনের মতে ইনি ২৩০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। কনিংহাম সাহেব প্রথমত বলেন যে ইনি ৩৮০ খৃঃঅঃ জীবিত ছিলেন। (I. A. S. B. XXX. 146.) কিন্তু তাহার মতের স্থিরতা নাই; কারণ তিনি আর এক স্থানে লিখিয়াছেন যে সমুদ্রগুপ্ত খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। (J. A. S. B. XXXIV 1. 221.)

৫৮ 'সমতটাড়বক্র কামরূপ নেপাল কর্ত্তিপুরাদি * প্রত্যন্ত নৃপতিভি র্মালবার্জ্জুনায়ন যৌধেয় মাদ্রকাভীর প্রার্জ্জুন সনকানীক কাকখর পরিকাদিভিশ্চ সর্ব্বকরদানাজ্ঞাকরণ প্রণামাগমন।" লাট প্রস্তাবের ১৯ পংক্তি। See J. A. S. B. VI. 971. and the Pholozinograph of the plate পুরাতত্ত্বজ্ঞ মৃত মহাত্মা প্রিনসেপ সাহেব ভ্রমক্রমে "সমতটাড়বক্র" হইতে "সমতা" ও "তরবক্র" দুইটী অসংলগ্ন নাম পাঠ করিয়াছেন।

* প্রিনসেপ সাহেব "কর্ত্তৃপুরাদি" পাঠোদ্ধার করিয়া মন্তব্য স্থলে ইহাকে "ত্রিপুরা"ই স্থির করিয়াছেন।

(৫৯) বৃহৎ সংহিতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়টী ভারতের প্রাচীন ভূগোল বিবরণ। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় ডক্টর কর্ণ (Dr. Kern.) লিখিয়াছেন, Interesting for the Geography of India is an entire chapter which Varaha mihera, only changing the form, but leaving the matter almost in tact has given in the 14th chap of the Brh. sanheta, উক্ত অধ্যায়ে বরাহ মিহির ভারতবর্ষ নয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা মধ্য, পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, অগ্নি, বায়ু, নৈঋত। ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্লোকে পূর্ব্ব ভাগস্থ দেশ সমূহের নাম। তন্মধ্যে লৌহিত্য তীরস্থ প্রাগ জ্যোতিষ ও খস পর্ব্বত হইতে বাঙ্গালা বিহারের কতক অংশ ও উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশ সকল লইয়া পূর্ব্বভাগ হইয়াছিল। "সমতট" ইহার অন্তর্গত। মিথিল সমতটোড্রাশ্ববদনদন্তুরকাঃ। ৬ শ্লোকের দ্বিতীয়চরণ।) অষ্টম, নবম ও দশম শ্লোকে পূর্ব্ব দক্ষিণ (অগ্নি কোণ) বিভাগস্থ দেশ সমূহের নাম। এই বিভাগে বঙ্গের নাম দৃষ্ট হয়। (কলিঙ্গ বঙ্গোপবঙ্গ জঠরাঙ্গাঃ। ৮ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ।) এই

বরাহমিহির ৪৯৯ খৃষ্টাব্দে (৩৬০০ কলিগতাব্দে ৪২১ শকাব্দে) জীবিত ছিলেন।(৬০) ডাক্তার হণ্টারের অনুমোদিত উজ্জয়িনীর জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতমণ্ডলীর মতে বরাহ মিহির ৪২৭ শকে (৫০৫—৬ খৃঃ অঃ) জীবিত ছিলেন। (৬১) ডাক্তর ভাওদাজীর মতে বরাহ মিহির ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে জীবলীলা সংবরণ করেন। (৬২) ভাওদাজী অমর রাজের মতানুসরণ করিয়াছেন এবং আমাদের বিবেচনায় ইহাই সঙ্গত। (৬৩) এতাবতা স্থির হইতেছে যে বরাহ মিহির, হিয়োনসাঙের ভারতে পঁহুছিবার ৪৩ বৎসর পূর্ব্বে জীবালীলা সংবরণ করেন। (৬৪) শকাব্দের দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্দীতেও আমরা "সমতটের" অস্তিত্ব অবগত হইতেছি। তৎপর ষষ্ঠ শতাব্দীতে আমরা চৈনিক পরিব্রাজক হইতে সমতট নাম শ্রবণ করিতেছি। শকাব্দের নবম শতাব্দীতেও "সমতটের" অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। ভাগলপুরে গৌড়েশ্বরনারায়ণ পালের যে তাম্রফলক আবিষ্কৃত হয়, শ্রদ্ধাস্পদ রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় তাহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। সেই শাসন-খোদকের জন্মভূমি সমতট বলিয়া লিখিত হইয়াছে; "শ্রীমতা মদ্য দাসেন শুভ দাসস্য স্নুনা। ইদং শাসনমুৎকীর্নং সৎ সামতট জন্মনা॥" রাজেন্দ্র বাবুর মতে নারায়ণ পাল ৯৩৫ খৃঃ অঃ (৮৫৭ শকাব্দ) জীবিত ছিলেন। তৎপর খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মিনহাজ সিরাজ বাঙ্গালার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করেন। তিনি স্বীয় "তবকতই নসরি" গ্রন্থে লিখিয়াছেন "মহাম্মদ বখ্তিয়ার লক্ষ্ণাবতী অধিকার করিলে রায় লক্ষ্মণ সেন দেব সমতট (সকনট ৬৫) বঙ্গাভি মুখে পলায়ন

ভাগ গুলি যে ভ্রম প্রমাদ হইতে এক কালে বিমুক্ত তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ উড়ু দেশ পূর্ব্ব বিভাগে সন্নিবেশিত করিয়া বঙ্গ উপবঙ্গ ও ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যগুলি পূর্ব্ব দক্ষিণ বিভাগে সন্নিবেশিত করা নিতান্তই ভ্রমের কার্য্য।

৬০ Celebrook's Algebra of the Hindoo's page XLIV.

৬১ Colebrook's Essay's Vol II page 461.

৬২ Journai, Royal, As Society (N. S.) Vol I art XIV pape 408.

৬৩ ব্রহ্ম গুপ্ত প্রণীত খণ্ডখাদ্যের টীকায় অমররাজ লিখিয়াছেন,—"নবাধিক পঞ্চশত সংখ্য শাকে বরাহ মিহিরাচার্য্যো দিবং গতঃ।"

৬৪ পাঠকগণ এস্থলে বিস্মিত হইতে পারেন যে আমরা বরাহ মিহিরকে কালিদাসের পরবর্ত্তী লিখিলাম। কিন্তু যদি কোন পাঠক "রঘুবংশ" ও "বৃহৎসংহিতা" অবলম্বনে দুই খানি ভারত-ভূগোল রচনা করিয়া পরস্পর তুলনা করেন, তবে আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, তিনি অবশ্য আমাদের মত পোষণ করিবেন। এই দুই খানি গ্রন্থ কখনই ভারতের এক সময়ের চিত্রপট নহে।

৬৫ তবকত ই নসরির ইংরেজি অনুবাদক মেজর রেভার্টি ও ইলিয়ট সাহেব লিখিয়াছেন যে হস্তলিখিত গ্রন্থ গুলিতে এই নামের সমতা পরিলক্ষিত হয় না, কোনটীতে "সকনট" কোনটীতে "সনকট"

করেন। তৎপর আর আমরা সমতটের নাম শুনিতে পাই নাই। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এইক্ষণও বলিতেছি যে চৈনিক পরিব্রাজক রাজধানীর নাম দ্বারা রাজ্যের নামকরণ করিয়াছেন। সেন রাজগণ ইহাকেই বিক্রমপুর আখ্যাদান করেন। সেন বংশের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হইলে বিক্রমপুর "রাজপুর" নামে খ্যাত হইয়াছিল। অধুনা এই স্থনটী "রামপাল" নামে পরিচিত। (৬৬) রামপাল, ঢাকার প্রায় ৮ মাইল দূরে, ধলেশ্বরী নদীর তীরস্থ "রিকাবি বাজার" ও "ফেরিঙ্গি বাজারের" নিকটবর্ত্তী। গৌহাটী হইতে রামপালের দূরতা অনধিক ২২০ মাইল হইবে। ঢাকা (প্রাচীন বঙ্গ) বিভাগ লইয়া যে প্রাচীন হিয়োনসাঙের সমতল রাজ্য সংগঠিত হইয়াছিল, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ফারগিউসন সাহেব, সমতট পার্ব্বত্য রাজ্য বিবেচনায় ত্রিপুরাও তদন্তঃপাতী লিখিয়াছেন। তিনি তাঁহার এই উক্তি পোষণ জন্য সমুদ্র গুপ্তের প্রস্তর ফলকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় ফারগিউসন সাহেব, প্রিনসেপ সাহেবের প্রদর্শিত ভ্রমমার্গে পাদ বিক্ষেপ করিয়াছেন। (৬৭) ত্রিপুরা চিরস্বতন্ত্র রাজ্য, সমতটের অধীন নহে।

পরিব্রাজক হিয়োনসাঙ সমতট রাজ্যের পরিধি ৫০০—৬০০ মাইল (৩০০০ লি) লিখিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় আধুনিক নদীয়া, ২৪ পরগনা, কলিকাতা, সুন্দরবন, যশোহর, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও ঢাকার কিয়দংশ লইয়া সমতট রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। সেন বংশের বিভাগ অনুসারে "বঙ্গ" ও বাগ্‌ড়ি" ইহার অধীন। কনিংহাম সাহেব লিখিয়াছেন—ভাগীরথী ও

কোনটীতে "সনকনট" ইত্যাদি ইত্যাদি লিখিত রহিয়াছে। বোধ করি সমতটই "তিন নকলে আসল খাস্ত" হইয়া গিয়াছে। ইহা যে সম্ভব ও বিশ্বাসযোগ্য অনুমান তাহা অপভ্রংশ নামটী পাঠ করিলেই বোধ হইবে একটী বিন্দুর (নকতা) দ্বারা পারস্যভাষায় অর্থের ও শব্দের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া যায়।

৬৬ আমরা আধুনিক "রামপাল" (বা বল্লালবাটী) নামক স্থানই "সমতট" নির্দ্দেশ করিলাম। অন্যান্য পণ্ডিত মণ্ডলীও ঢাকা ও সুবর্ণগ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানে "সমতটের" স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এক মাত্র কনিংহাম সাহেব যশোহর নগরী অনুমান করেন। তিনি বলেন, "তাম্রলিপ্ত হইতে ইহার দূরতা গণনা করিলে, হরিণঘাটা নদীর তীর হইতে বাখরগঞ্জের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে এই রাজধানী ছিল এরূপ অনুমিত হয়।"

৬৭ বিজ্ঞবর প্রিনসেপ সাহেব, সমুদ্র গুপ্তের প্রস্তর ফলকের উনবিংশ পংক্তির "প্রত্যন্ত নৃপতি" পদের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—"The kings of the neighbouring hilly countries." "প্রত্যন্ত" শব্দের "পার্ব্বত্য" অর্থ সঙ্গত নহে। "প্রত্যন্ত" শব্দের অর্থ—(বিশেষ্যে) ম্লেচ্ছ দেশ, (বিশেষণে) প্রান্তবর্ত্তী হইয়া থাকে। অতএব "প্রত্যন্ত নৃপতি" পদের ম্লেচ্ছ দেশাধিপতি কিম্বা প্রান্তবর্ত্তী দেশাধিপতি অর্থই বিশুদ্ধ ও সঙ্গত।

পদ্মার মধ্যবর্ত্তী "ব" কারাকৃতি প্রদেশই প্রাচীন "সমতট রাজ্য"। আকবর বাদসাহের সময়ে এই "ব" কার প্রদেশ ৫টী সরকারে বিভক্ত ছিল।

হিয়োনসাঙ বলেন "সমতটবাসীগণ খর্ব্বকায় ও কৃষ্ণবর্ণ। ইহারা নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর কিন্তু বিদ্যোৎসাহী। এই রাজ্যে ৩০টী মঠ আছে, তাহাতে প্রায় ২০০০ সহস্র বৌদ্ধ স্থবির বাস করেন। দেব মন্দিরের সংখ্যা এক শত। হিন্দুগণ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে নিগ্রন্থ সম্প্রদায়ীর সংখ্যাই সর্ব্বাধিক।

বঙ্গের দক্ষিণ প্রান্তস্থ সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানগুলি বাণিজ্যোন্নত, সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও জনপূর্ণ ছিল। হিয়োনসাঙ যদিও সমতট প্রভৃতি (বঙ্গ দেশস্থ) রাজ্যগুলির সংক্ষিপ্ত অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন; তথাপি তাহার শত বৎসরের কনিষ্ঠ আরব দেশীয় পর্য্যটক সুলেমানের সাক্ষ্যে আমাদের উক্তির সত্যতা পোষণ করিতেছে। ক্রমাগত ঝড় ও জলপ্লাবনে দক্ষিণ বঙ্গের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রতীরবর্ত্তী সম্পন্ন অবশিস্ট নগর গুলির চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ হইয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

শকুন্তলা সমালোচনার সমালোচনা।

মিরান্দার সহিত শকুন্তলার তুলনা করিয়া বঙ্কিম বাবু শকুন্তলাকে কেমন নীচু করিয়াছেন তাহা গত বারে দেখা গিয়াছে, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই, তিনি আর একবার শকুন্তলাকে তৌল করিয়া দেখিয়াছেন যে, দেস্‌দেমোনা অপেক্ষা শকুন্তলা ওজনে অনেক কম। কিন্তু তাঁহার তুলা-যন্ত্র যে ঠিক—তাহা যে একদিক্ ঝোঁকা নহে ইহা আমরা বলিতে সাহস করি না। বঙ্কিম বাবু শকুন্তলাকে এই বলিয়া দোষ দিয়াছেন যে, সে দুষ্মন্ত-কর্ত্তৃক সহস্র অপমানিত হইয়া থাকিলেও তাঁহাকে অনার্য্য সম্বোধন করিয়া যে ভর্ৎসনা করিয়াছিল সে-টি তাহার ভাল কাজ হয় নাই; দেস্‌দেমোনাকে ত অনেক ভাল বলিতে হইবে যে, ওথেলো তাহাকে যার পর নাই কটূক্তি ও অপমান (চপেটাঘাত পর্য্যন্ত) করিতে ত্রুটি করে নাই অথচ দেস্‌দেমোনা সমস্তই অকাতরে সহ্য করিয়াছিল; ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, শকুন্তলার প্রেম স্বল্প-প্রাণী—একটু আঘাত সহ্য করিতে পারে না, দেস্‌দেমোনার প্রেম অন্তঃসারে পরিপূর্ণ, সুতরাং উহা অপেক্ষা ইহা উচ্চ অঙ্গের বস্তু। বঙ্কিম বাবুর এ বিচারটি কেমন—না একই রকমের জল যদি দুইটি

কাচ-পাত্রে রাখা হয়, আর যদি একটি কাচ-পাত্র শুভ্র ও অপরটি কালো হয়, তবে কালো কাচ-পাত্র-স্থিত জল দেখিয়া বিচারক-মহাশয় বলিতে পারেন যে, ও জল অপেক্ষা এ জল অতীব অপরিষ্কার—ইহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে; অপরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যাইবে না কেন—কাচ-পাত্র যে কালো, জলের কি দোষ? শকুন্তলা দুষ্মন্তকে প্রাণ-তুল্য ভাল বাসিত তবুও তাঁহাকে অনার্য্য সম্বোধন পূর্ব্বক ভৎর্সনা করিয়াছিল—করিবে না কেন? দুষ্মন্ত রাজা কি তখন দুষ্মন্ত রাজা ছিলেন—শকুন্তলার চক্ষে তিনি যে পিশাচ অপেক্ষাও অধম হইয়াছিলেন,—হইয়াছিলেন যে, সে দৈবের বিপাকে—শকুন্তলার কি দোষ? কিন্তু ওথেলো দেস্‌দেমোনার প্রতি যেরূপ কুব্যবহার করিয়াছিল তাহাকে পিশাচবৎ ব্যবহার—কদর্য্য নীচ ব্যবহার—বলিয়া কাহারো মনে হইতে পারে না, এই শুধু মনে হইতে পারে যে, এ খাম-খেয়ালি লোকের মত ব্যবহার—পাগলের মত ব্যবহার—বড় জোর নয় গোঁয়ারতামি ব্যবহার; ওথেলোর রকম সকম দেখিয়া হঠাৎ এক জন লোক বলিতে পারে যে, "এ ব্যক্তি বলে কি, কয় কি, করে কি, এ লোকটার দেখ্‌চি মাথার ঠিক নেই।" যথা,

Lodovico. * * How does lieutenant Cassio?

Iago. Lives, sir.

Desdemona. Cousin, there's fallen between him and my lord
An unkind breach: but you shall make all well.

Othello. Are you sure of that?

Desdemona. My Lord?

Othello. (Reading) "This fail you not to do, as you will—"

Lodovico. He did not call: he's busy in the paper.
Is there division, twixt my lord and Cassio?

Desdemona. A most unhappy one: I would do much
To atone them, for the love I bear to Cassio.

Othello. Fire and brimstone!

Desdemona. My lord?

Othello. Are you wise?

Desdemona. What, is he angry?

Lodovico. May be, the letter moved him;
For, as I think, they do command him home,
Deputing Cassio in his government.

Desdemona. Trust me, I am glad on't.

Othello. In deed?

Desdemona. My lord?

Othello. I am glad to see you mad.

Desdemona. How, Sweet Othello?

Othello. Devil! [*strtking her*]

ওথেলোর এই রূপ ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগের মনে কি রূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল। তাহা নিম্নে দেখা যাইতেছে।

Lodovico. Are his wits safe? [is he not light of brain?

... ...

Is it his use?
Or did the letters work upon his blood,
And new-create this fault?

দেস্‌দেমোনা নিজে কিরূপ ধন্দে পড়িয়াছিল তাহা দেখা যাউক্।

Othello. Pray, chuck, come hither.

Desdemona. What is your pleasure?

Othello. Let me see your eyes;
Look in my face.

Desdemona. What horrible fancy's this.

... ...

Upon my knees what doth your speech import?
I understand a fury in your words,
But not the words.

... ...

Othello. O Desdemona! away! away! away!

Desdemona. Alas the heavy day;—Why do you weep
Am I the occasion of these tears, my lord?
If, haply, you my father do suspect
An instrument of this your calling back,
Lay not your blame on me.

ইহাতে কি প্রকাশ পাইতেছে? বিকার-গ্রস্ত স্বামীর প্রলাপ বাক্য শুনিয়া কোন্ স্ত্রী তাঁহাকে ভৎসনা করে,—ওথেলোর কথার রকম-সকম দেখিতে শুনিতে কি ঠিক প্রলাপের মত নহে? তাহাতে দেস্‌দিমোনার মনে ক্রোধের উদয় হওয়া দূরে থাকুক দুঃখেরই উদ্রেক হইতে পারে ও তাহাই হইয়াছে;—দেস্‌দেমোনার মনে হইয়াছিল—"হয় ত কি একটা অশুভ সংবাদ আসিয়াছে তাই ওঁর মন খারাপ হইয়া গিয়াছে, আর কিছু নয়, আমার পিতা শত্রুতা করিয়া যাহাতে উনি অপদস্থ হ'ন তাহার কোন একটা কুচক্র করিয়াছেন;" ইহাতে দেস্‌দেমোনার মনে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইতে পারে—এই যা,'—ক্রোধ হইবে কেন? কিন্তু শকুন্তলাকে দুষ্যন্ত কেমন ধীর গম্ভীর হাস্যরসাত্মক ভাবে ঠিক্ ঠাক্ কথার উত্তর দিয়া—বাক্য-ছুরিকার উপর বাক্য-ছুরিকা চালনা করিয়া—অম্লান-বদনে অব্যথিত-হৃদয়ে অবিচলিত-চিত্তে তাহার মর্ম্ম নিকৃন্তন করিয়াছেন; ইহাতে শকুন্তলা দুষ্যন্তকে উন্মাদও মনে করিতে পারে না—দৈব-গতিকে দুষ্যন্তের মনোমধ্যে

সহসা কোন বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে ইহাও মনে করিতে পারে না; এই কেবল মনে করিতে পারে যে, "অত বড় রাজার এমন ধারা কদর্য্য মন! সমস্তই জানিতেছেন অথচ এমনি ভান করিতেছেন যেন কিছুই জানেন না! আমি লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া হরিণ শিশুর কথাটি পর্য্যন্ত স্মরণ করাইয়া দিলাম, তাহাও অরণ্যে রোদন হইল—রাজার ভালবাসাকে ধিক্!" শকুন্তলার ইহাই মনে হইতেছে যে, দুষ্যন্ত পূর্ব্বে তাহাকে এত যে ভালবাসা জানাইয়াছিলেন সমস্তই মৌখিক, তাহা কেবল আপন অভীষ্ট সাধনের উপায়, তা' ভিন্ন আর কিছুই নহে। যতক্ষণ শকুন্তলার মনে রাজার স্মৃতি-ভ্রংশ মাত্র আশঙ্কা হইয়াছিল ততক্ষণ তাহার কেবল দুঃখই হইয়াছিল যথা,

"ইমং অবত্থন্তরং গদে তারিসে অনুরাএ কিংবা সুমরাবিদেন। অত্তা দানিং মে সোঅণীও ববসিদং।"

কিন্তু যখন সে মনে করিল যে, দুষ্যন্ত তাহাকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিতেছেন, তখনই তাহার সতী-সুলভ তেজ উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। শকুন্তলার মত ওরূপ অবস্থায় পড়িলে দেস্‌দেমোনা যদি ওথেলোকে ভর্ৎসনা না করিত তাহা হইলে বুঝিতাম বটে,—বুঝিতাম যে তাহার এমনি গণ্ডার-চর্ম্মী প্রেম যে কোন ছুরিকাঘাতই তাহাকে চেতাইতে পারে না; অথবা প্রেমই নাই আঘাত লাগিবে কিসে,—শিরোনাস্তি শিরঃ পীড়া।

ওরূপ মর্ম্মান্তিক আঘাতে স্ত্রীলোকের ভালবাসা যে একেবারেই ধ্বংস হইয়া যায় তাহা নহে,—তবে এই হয় যে, ভালবাসার পাত্রের নীচত্ব-দোষ সেই ভালবাসাতে সংক্রমিত হওয়াতে সেই ভালবাসার প্রতি ধিক্কার জন্মে—তেমন অযোগ্য পাত্রের উপর ভালবাসাকে কখনও সে মনে স্থান দিয়াছিল বলিয়া নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মে; আর ভালবাসার এই রূপ যে একটা দারুণ অপমান ইহাতে করিয়া মনে এমনি এক অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয় যে, তাহা আর সকল মনোবৃত্তিকে ছাপাইয়া উঠিয়া সমস্ত মনো-রাজ্য অশ্রুজলে উত্প্লুত করিয়া ফেলে; এরূপ অবস্থায় প্রেমের যে একটি স্বাভাবিক সৌকুমার্য্য তাহা চলিয়া যায়; প্রেম মহাপ্রলয়ের রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করে—গৌরী মূর্ত্তি কালী মূর্ত্তিতে পরিণত হয়।

ওথেলো ডেস্‌ডেমোনাকে বধ পর্য্যন্ত করিয়াছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহার ভালবাসা অটুট ছিল; দেস্‌দেমোনাকে বধ করিবার পূর্ব্বে ওথেলো তাহাকে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া পাপ-মুক্ত হইতে বলিয়াছিল। ভালবাসা অতিশয় সংক্রামক বস্তু—ভিতরে ভিতরে কার্য্য করে; দেস্‌দেমোনা ওথেলোর কার্য্য দেখিয়া যদিও তাহার কোন অর্থই খুঁজিয়া পাইতে ছিল না, কিন্তু এ বিষয়ে তাহার কোন দ্বিধা ছিল না যে, ভালবাসার অভাব-বশত নহে—একটা দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ ওথেলোর মন বিকল হইয়া গিয়াছে।

বঙ্কিম বাবু একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, এ রাগ, "এ অভিমান, এ ব্যঙ্গ

দেস্‌দেমোনায় নাই;” আমরা বলি ও-শ্লোকটি কালিদাসের শকুন্তলায় নাই; তবে যদি কোন বঙ্গদেশীয় পুঁথিতে থাকে তাহার জন্য কালিদাস দায়ী নহেন। বঙ্কিম বাবুর অভিপ্রায় এই যে, প্রেম ও সতীত্ব পূর্ণ মাত্রায় থাকিলে কোন অবস্থাতেই রাগ, অভিমান বা ঐ দলের আর কোন মনোবৃত্তি সেখানে ঘেঁসিতে পারে না। মনুষ্যের মন যদি এমনি একটা সহজ-পাঠ্য গ্রন্থ হইত যে, ব্যাকরণের সাদা সীধা দুই একটি নিয়ম-অনুসারে তাহার শ্লোকের অন্বয় করিলেই হইতে পারে—যদি এরূপ হইত যে, প্রেম যেখানে—সেখানে কেবল প্রেমই থাকিবে, আর কোন বৃত্তি তাহার চতুঃসীমায় স্থান পাইবে না, তাহা হইলে কবি হওয়া অতি সহজ হইত—তাহা হইলে কালিদাস সেক্‌সপিয়র পৃথিবীতে আর ধরিত না। এ বিষয়ে আর বাহুল্য না করিয়া সংক্ষেপে এই টুকু বলিলেই বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে যে, ডেস্‌ডেমোনা ওথেলোর মনের ব্যতিক্রম দেখিয়া তাহাকে নীচ প্রকৃতির লোক মনে করে নাই, এই পর্য্যন্ত মনে করিয়াছিল যে তাহার মনে সহসা কি এক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে—পাগলের মত হইয়াছে, ইহাতে ক্রোধ বা অভিমান বা মর্ম্মান্তিক অপমানের জ্বালা এ সকলের প্রসঙ্গই আসিতে পারে না; কিন্তু শকুন্তলা রাজার এক একটি মর্ম্মভেদী শ্লেষোক্তির অশনির জ্বালায় এমনি অধীর হইয়া পড়িয়াছিল যে, শেষে সামলাইতে না পারিয়া দুষ্মন্তকে অনার্য্য-প্রভৃতি বলিয়া ফেলিল,—তাও সে এমনি সরল ও সহজ-শোভন ভাবে যে, যেমন শকুন্তলা তেমনিই তাহার রাগ-প্রকাশ—তাহার একটুও ইদিক্‌ উদিক্‌ হয় নাই।

বঙ্কিম বাবু দেস্‌দেমোনার সহিত শকুন্তলার আর একটি বিষয়ে যে সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন তাহাও ঠিক্‌ হয় নাই; সে বিষয়টি গুরুজনের প্রতি উপেক্ষা। দেস্‌দেমোনা গুরুজনের অভিপ্রায়ের নিতান্ত প্রতিকূলে ওথেলোকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল, এমন কি দেস্‌দেমোনার পিতা তাহার বিবাহ-বার্ত্তা শুনিবামাত্র একেবারে আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু শকুন্তলা কণ্ব-মুনির অভিপ্রায়ের প্রতিকূলে দুষ্মন্তকে আত্ম-সমর্পণ করে নাই—কণ্বমুনির অমত হইবে-না জানিয়াই তাহা করিয়াছিল, কণ্বমুনিও বিবাহ-বৃত্তান্ত অবগত হইবামাত্র তাহাতে অনুমোদন করিয়াছিলেন; অতএব উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য অধিক না বৈসাদৃশ্য অধিক ইহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা হোক্‌।

কথা প্রসঙ্গে আমরা আমাদের গম্য পথ হইতে একটু সরিয়া পড়িয়াছি এরূপ মনে হইতে পারে কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, আমরা নূতন একটা পথ দিয়া গম্যস্থানের দিকে অগ্রসর হইয়াছি এই পর্য্যন্ত; এখন পূর্ব্ব-পথে প্রত্যাগমন করিয়া যত শীঘ্র পারি, যাত্রা-সমাপনের চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

ক্রমশঃ

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বাঙ্গীয় যুবকের পত্র।

গর্ম্মি কাল। আজ অতি সুন্দর সূর্য্য উঠেছে। এখন দুপর দুটো বেজেছে। আমাদের দেশের শীতকালের দুপর বেলাকার বাতাসের মত বেশ একটি মিষ্টি বাতাস বইচে, রোদ্দুরে চার দিক ঝাঁ ঝাঁ কোর্‌চে। এমন ভাল লাগ্‌চে, আর এমন একটু কেমন উদাস ভাব মনে আস্‌চে যে কি বোল্‌ব। মনের Sentimental অবস্থায় যে যে লক্ষণ হোয়ে থাকে, তা' আমার সব হোয়েচে—যথা নিশ্বাস পোড়্‌চে, একটু চুপ চাপ হোয়ে আছি, মুখটা একটু গম্ভীর হোয়ে গেছে—ইত্যাদি! কিন্তু আজকের রোদ্দুরে, গরমে, চারদিকের গাছ পালায়, বসন্তের বাতাসে, পাখীর ডাকে, যদি আমার এ রকম ভাব হোয়ে থাকে তা' হোলে কি "লোকটা দেখ্‌ছি নিতান্তই কবি হোয়ে গিয়েছে" বোলে আমার একটা বদ্‌নাম হবার সম্ভাবনা আছে? দেশে যদি আমার "কান্ত" থাক্‌ত, তা' হোলে আজ হয়ত এই দুরন্ত বসন্তে একান্ত প্রাণান্ত, ও "ন্ত" অক্ষর-বিশিষ্ট আরো অসংখ্য ঘটনা ঘোটত। এদেশে "বসন্ত" বোলে বাস্তবিক একটা পদার্থ আছে। আমাদের দেশে বসন্ত নেই কেবল বসন্ত বসন্ত কোরে বিরহীগুলো ভারি গোলমাল করে; বলে, মলয় বাতাসে তাঁ'দের গা দগ্ধ হয়, আরে হবে না কেন? সে চৈত্রি মাসের মলয় বাতাসে সহজ মানুষের গা পুড়ে যায়, তাঁ'দের ত তবু অনেক দিনকার একটা বাঁধা দস্তুর আছে! সেই বিরহীগণ একবার এখানে আসুন্‌ দেখি—দেখি কেমন কোরে চন্দন আর পঙ্ক মাখেন, আর নলিনী-পত্রের বাতাস খান!

আমরা এখন Devon-Shire এর অন্তর্গত টর্কী (Torquay) বোলে এক নগরে আছি। এমন সুন্দর জায়গা আমি কখনো দেখি নি। সমুদ্রের ধারে। চারু দিকে পাহাড়। অতি পরিষ্কার দিন। মেঘ নেই, কোয়াশা নেই, অন্ধকার নেই; চারি দিক হাস্য ময়। চারি দিকে সবুজ বর্ণ, চারিদিকে গাছ পালা, চারিদিকে পাখী ডাক্‌চে, ফুল ফুটচে। যখন Funbridge Wells এ ছিলুম, তখন ভাবতুম, এখেনে যদি মদন থাকে, তবে সে ব্যক্তি তার ফুল শর তৈরি করবার জন্যে এত ফুল পায় কোথা? অনেক বন বাদাড়, ঝোপ ঝাপ, কাঁটা গাছ হাতড়ে দু চারটে বুনো ফুল নিয়েই কাজ চালাতে হয়। কিন্তুTorquayতে মদন যদি গ্যাট্‌লিংএর কামানের মত এমন একটা বাণ উদ্ভাবন কোরে থাকে, যার থেকে প্রতি মিনিটে হাজারটা কোরে তীর ছোঁড়া যায়, আর

সেই বাণ দিন রাত যদি কাজে ব্যস্ত থাকে, তবু মদনের ফুল শরের তহবিল এখেনে দেউলে হবার কোন সম্ভাবনা নেই। এত ফুল। যেখানে সেখানে, পথে ঘাটে, ফুল। ফুল মাড়িয়ে চোল্‌তে হয়। আমরা রোজ পাহাড়ে বেড়াতে যাই। গরু চোর্‌চে, ভেড়া চোর্‌চে। এক এক জায়গায় রাস্তা এত ঢালু যে, উঠ্‌তে নাব্‌তে কষ্ট হয়। এক এক জায়গা খুব সঙ্কীর্ণ পথ, দুধারে গাছ উঠে আঁধার কোরে আছে, ওঠ্‌বার সুবিধের জন্যে জায়গায় জায়গায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা সিঁড়ির মতন আছে, পথের মধ্যেই লতা গুল্ম উঠেছে, ফুল ফুটে রোয়েছে। চার দিকে এমন মধুর রোদ্দুর, (হাস্‌চ কি! রোদ্দুর মধুর হোতে পারে কি না, এখেনে এসে একবার দেখে যাও দিকি!) এত অগণ্য ফুল, যে মনের মধ্যে বসন্ত জেগে ওঠে, মলয় বাতাস বইতে থাকে। এখানকার বাতাস বেশ গরম। ভারতবর্ষ মনে পড়ে। এই টুকু গরমেই লণ্ডনের প্রাণীদের চেয়ে এখানকার জীব জন্তুদের কত নির্জ্জীব ভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। ঘোড়া গুলো আস্তে আস্তে যাচ্চে, মানুষগুলোর তেমন ভারি ব্যস্ত ভাব নেই, গড়িমসি কোরে চোলেছে। আমি আজ কাল এমন আলস্য চর্চ্চায় ব্যস্ত আছি যে তোমাদের একটু ভাল কোরে চিঠি লেখ্‌বার সময় পেয়ে উঠিনে। দিনের মধ্যে তিন শো হাই উঠ্‌চে, এক একটা বই খুল্‌চি ও তার ওপরে আধ ঘণ্টা চোক বুলিয়ে দু ঘণ্টা চোক বোজবার বন্দোবস্ত কোরে নিচ্চি, দোয়াতে কলম ডুবিয়ে কালী তুলে লেখা সমুদ্র মন্থনের মত একটা ঘোরতর ব্যাপার বোলে মনে হোচ্চে, চোখের পাতা ফেল্‌তে ও নিশ্বাস প্রশ্বাস নিতে পরিশ্রম বোধ হোচ্চে! তুমি এখেনে এলে বড় আরামেই থাক। এখানকার মত দৃশ্য, নদীর ধার, মাঠ, পড়বার বই, গল্প করবার সময়, গান করবার নির্জ্জনতা, পর নিন্দা করবার অবসর আর যদি কোথাও আছে।

এখানকার সমুদ্রের ধার আমার বড় ভাল লাগে। যখন জোয়ার আসে, তখন সমুদ্রতীরের খুব প্রকাণ্ড পাথর গুলো জলে ডুবে যায়, তাদের মাথা বেরিয়ে থাকে। খুব ছোট ছোট দ্বীপের মত দেখায়। জলের ধারেই ছোট বড় কত পাহাড় উঠেছে। ঢেউ লেগে লেগে পাহাড়ের নীচে সব গুহা তৈরি হোয়ে গেছে; যখন ভাঁটা পড়ে যায়, তখন আমরা এক এক দিন এই গুহার মধ্যে গিয়ে বোসে থাকি। বেশ নির্জ্জন। সুমুখে দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র। গুহার মধ্যে জায়গায় জায়গায় অতি পরিষ্কার একটু একটু জল জোমে রোয়েছে, ইতস্তত Sea-weeds সমুদ্র উদ্ভিদ পোড়ে রোয়েছে, সমুদ্রের এক রকম স্বাস্থ্য-জনক গন্ধ পাওয়া যাচ্চে, চার দিকে পাথর ছড়ানো আছে। আমরা সবাই মিলে এক এক দিন সেই পাথর গুলো ঠেলাঠেলি কোরে নড়াবার চেষ্টা করি, নানা শামুক ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে আসি। এক একটা পাহাড় সমুদ্রের জলের ওপর খুব ঝুঁকে পোড়েছে; আমরা প্রাণপণ কোরে এক এক দিন সেই অতি

দুর্গম পাহাড় গুলোর ওপর উঠে বোসে নীচে সমুদ্রের ঢেউয়ের উত্থান পতন দেখি। সমুদ্রের একটা হু হু শব্দ উঠছে, জলে এক একটা ছোট ছোট নৌকা পাল তুলে চোলে যাচ্চে, চার দিকে রোদ্দুর হাসচে মাথার ওপর এক একটা ছাতা খোলা রোয়েচে, পাথরের ওপর মাথা দিয়ে আমরা শুয়ে শুয়ে গল্প কোরচি। আলস্যে কাল কাটাবার এমন জায়গা আর পাবে? তুমি যে Thomson এর Castle of Indolence পোড়েছ এখানটা তার একটা জীবন্ত ছবি। এক এক দিন পাহাড়ে যাই, আর পাথর দিয়ে ঘেরা ঝোপঝাপে ঢাকা একটি প্রচ্ছন্ন জায়গা দেখলে সেই স্থানটিতে গিয়ে একটি বই নিয়ে পোড়তে বসি। কিন্তু অতি একমনে বই পড়বার জায়গা টর্কী নয়। মনের এমন শিথিল অলস অবস্থায় অত মনোযোগ দেওয়া পোষায় না। তাই যদি পারবে তবে একদিকে এমন হরিত প্রান্তর, আর একদিকে এমন সুনীল সমুদ্র কি কোরতে, এমন রোদ্দুর উঠেছে কেন, এমন অতি পরিষ্কার আকাশ কি জন্যে? দুছত্র বই পোড়বে, আর দুদণ্ড সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাক্‌বে, চেয়ে থেকে থেকে সাত শ ভাবনা ভাববে, অথচ ভাবচ কি না ভাবচ তা' বিশেষ মনোযোগ না দিলে টের পাওয়া যাবে না, হঠাৎ বইয়ের দিকে চোক পড়বামাত্র আবার পড়া আরম্ভ করবার জন্যে খুব দৃঢ় সঙ্কল্প কোরবে, কিন্তু দ্বিতীয় ছত্রের একটা কথা পর্য্যন্ত যেই পৌঁচেছ অমনি মনটা অলক্ষিত ভাবে তোমার হাত ফোসকে এমন একটা অদ্ভুত জায়গায় গিয়ে হাজির হবে, যে জায়গার বিষয় ইতিপূর্ব্বে তুমি কখনো ভাবও নি। মনটা সমস্ত দিন এই রকম লুকোচুরী খেলে বেড়ায় একটা বইয়ের দেড় পাতা পোড়তে আড়াই দিন লাগে।

আমি বড় বাজে কথা বোকে যাচ্চি, এ কিন্তু টর্কীর বাতাসের গুণে। মনের ভিতর হাজারটা কথা চলাফেরা কোরে বেড়ায়, কিন্তু কথা গুলো হাত ধরাধরি কোরে আসে না, পরস্পরের মধ্যে চেনা শুনো নেই, খাপছাড়া, দল ছাড়া কথা গুলো মনের বড়রাস্তা দিয়ে খুব ঘেঁসাঘেঁসি কোরে চোলেছে, কিন্তু পথিকদের মত কেউ কারো কোন এলাকা রাখে না। এমন ভাঙ্গাচোরা কথার জোড়াতাড়া চিঠি পোড়তে কি তোমাদের ভাল লাগ্‌চে?

তুমি যদি এখানে আসতে ভাই, তা' হোলে সমুদ্রের শব্দ শুনতে শুনতে, সমুদ্রের ঢেউ গুণতে গুণতে, ফুলের রাশে মাথা রেখে, ফুলের রেণু গায়ে মেখে, ফুলের মালা গেঁথে গেঁথে, ফুলের মধু খেতে খেতে, সন্ধে বেলায় সাগর বেলায়, দুজনেতে গলায় গলায়, ঘাসের পরে গাছের তলায়, গল্প হোত, হাসি হোত, ঠাণ্ডায় যদি কাশী হোত বাড়ি যেতেম, চা খেতেম, হেসে খেলে দিন কাটাতেম। কেমন! লোভ হোচ্চে কি? আমি ভাই কবি নই, একটা ঘোরতর কাজের লোক। তবে যে, এ জায়গাটা খুব ভাল লাগচে বলচি, তার কারণ হোচ্চে বরাবর শুনে আস্‌চি ভাল জায়গা দেখলে

লোকের ভাল লাগা উচিত। না ভাল লাগলে বড় লজ্জার বিষয়। তুমি হোচ্চ কবি মানুষ, ছড়া টড়া লিখে থাক, তুমি এখানে এলে বাস্তবিক তোমার লাগত ভাল।

একটা গল্প বলি শোন। আমাদের এ-খেনে, দিন কতক Miss H ও Miss N ছিলেন। Miss H একজন চিত্রকরী। তাঁর বড় সুন্দর ছবি আঁকা আসে। তিনি প্রায় প্রত্যহ breakfast খেয়েই সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে ছবি আঁকতে বেরোতেন। Miss N ক্রমিক কবিতা ও নভেল পড়েন, ও তিনিও না কি শুনেছি কাগজে খুব ভাল ভাল Sonnet মাঝে মাঝে লিখে পাঠান। মাঝে মাঝে আমরা তাঁদের সঙ্গে বেড়াতে যেতেম। কোনখানে একটা এবড়ো খেবড়ো রাস্তা, কোথাও বা একটা ভাঙ্গা-চুরো বেড়া, কোথাও বা খানিকটা বন-জঙ্গল ঝোপঝাপ, কখনো বা এক খণ্ড মেঘের বিশেষ একটা রং দেখে তাঁরা মুগ্ধ হোয়ে যেতেন, ও শত মুখে ব্যাখ্যা কোরতেন। আমার ত ভ্যাবাচ্যাকা লেগে যেত, আমি তাদের বিশেষ সৌন্দর্য্য বড় একটা বুঝতে পারতেম না; ঝট কোরে একটা মত ব্যক্ত কোরতে বড় ভয় কোরত। দ্বিরুক্তি মাত্র না কোরে তাঁদের মতে সায় দিয়ে যেতেম। রোজ রোজই ত এই রকম ব্যাপার হোত, রোজ রোজই আমি অতি ভাল মানুষটির মত তাঁদের প্রতি কথায় বিনীত ভাবে সায় দিয়ে যেতেম। শেষ কালে আমার বড় লজ্জা বোধ হোতে লাগল। একদিন বেড়াতে বেরোবার সময় প্রতিজ্ঞা কোরলেম, "আজ আমি নিজে হোতে প্রকৃতির একটা কিছু সৌন্দর্য্য বের কোরে আগে থাকৃতে তাঁদের দেখাব, তাঁদের মুখ থেকে বাহবা নিতেই হবে।" এই পণ কোরে ত বেরোনো গেল। চার-দিকে নজর কোরে দেখতে দেখতে চোলেছি। চার দিকে ফুল আছে, গাছ পালা আছে, পাহাড় পর্ব্বত আছে, কিন্তু সে সব ত পুরোনো, একটা নতুন কিছু বের কোরতে হবে। খানিক দূর গিয়ে দেখি, একজনদের বাড়ির সুমুখে তারা একটি বাগান তৈরি কোরেচে, গাছ গুলোর ডাল পালা কেটে নানাবিধ আকারে পরিণত করা হোয়েচে। কোনটা গোল, কোনটা বা অস্ট কোণ, কোনটা মন্দিরের চূড়োর মত। দেখেত আমার তাক্ লেগে গেল। পাছে তাঁরা আগে থাকৃতে কিছু বোলে ফেলেন এই ভয়ে তাঁরা মুখ খুলতে না খুলতে তাড়া তাড়ি আমি চেঁচিয়ে উঠেছি, How beautiful!" Miss H.-কে তার একটা ছবি নিতে অনুরোধ কোরলেম। Miss H ও Miss N ত একেবারে হেসে আকুল, তাঁরা বোলে উঠলেন, "Oh! Mr T.! Surely you are joking! Mr T. ত কাল বিলম্ব না কোরে তাড়াতাড়ি হেসে উঠলেন; যেন তিনি ঘোরতর একটা ঠাট্টা কোরে নিয়েচেন ও তার জন্যে মনে মনে ভারি তৃপ্তি ও গর্ব্বের উদ্রেক হোয়েচে। ভাল কোরে সামলাতে পেরেচি কি না বোলতে পারিনে। কিন্তু বড় লজ্জা হোল! "যাবৎ কিঞ্চিৎ" বাক্যব্যয় না কোরে ছিলেম,

"ভাবচ্চ" যথা কথঞ্চিৎরূপে শোভা পেয়েছিলেম, কিন্তু প্রথম যে দিনই মুখ খুললেম সেই দিনই এই রকম হাস্যভাজন হোতে হোল। আমি কিন্তু Miss H ও Miss N. এর ভাব আজ পর্য্যন্ত বুঝতে পারলেম না; তাঁরা একটা যা'চ্ছেতাই বন বাদাড় দেখলে হাঁ কোরে চেয়ে থাকৃতেন,আর অমন সুন্দর নানা আকৃতিতে ছাঁটা গাছ পালা তাঁদের পছন্দসই হোল না। সে দিন একটা ভিক্ষুক একটা ছেঁড়া টুপি পোরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ তাঁদের খেয়ালে কেমন লেগে গেল, তৎক্ষণাৎ তাকে আট গণ্ডা পয়সা (এক শিলিং) দিয়ে দাঁড় করিয়ে ছবি নেওয়া হোল, আর রাস্তা দিয়ে কত মহা মহা সুন্দরী চোলে যায়, যাদের এক দিন দেখলে তিরিশ দিন মলয় সমীরণ ও চাঁদের কিরণে দগ্ধ কোরতে থাকে তাদের সম্বন্ধে তাঁরা একটি কথাও কন না। কেন বল দেখি? যাহোক অপ্রস্তুত হোয়ে বাড়ি গিয়েই একটা বাঙ্গালা কবিতা লিখতে বোসলেম। Miss N. আমাকে জিজ্ঞাসা কোরলেন, আমি কি বাড়িতে চিঠি লিখচি? আমি বিনয় সহকারে হাসতে হাসতে বোল্লেম যে, "আমি মাঝে মাঝে কবিতা লিখ্‌তে চেষ্টা কোরে থাকি, তাই দুই এক ছত্র কবিতা লিখচি।" শুনে অবধি Miss Nএর আমার প্রতি ভারি ভক্তি হোয়েছে। তিনি মনে কোরলেন, লোকটা খুব ভাবুক হবে। তিনি তাঁর লেখা দুই একটা Sonnet আমাকে শোনাতে আরম্ভ কোরলেন। কবিতা পোড়তে পোড়তে যেখানটা ভাল লাগত আমাকে চেঁচিয়ে শোনাতেন। আমার উচ্ছ্বাস দেখে কে! আমার পূর্ব্বকৃত কোন ত্রুটি তাঁর আর মনে রৈল না। ক্রমে ক্রমে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ভারি পরিপক্ক হোয়ে উঠতে লাগল। এতদূর পর্য্যন্ত যে, একটা ফুসফাস উঠল। ম—সন্দেহ কোরলেন যে Miss Nএর নেত্র, রূপ ও বাক্য-বাণ বর্ষণের মধ্যে পোড়ে আমার বুকটা দু তিন টুক্‌রো হোয়ে গেছে। আমি তাঁকে বোঝাতে গেলেম, "মাথা নেই তার মাথা ব্যথা। আমি একটা হৃদয়হীন শীতলশোণিত জীব। আমার হৃদয় দগ্ধও হয় না, ভস্মও হয় না, হারায়ও না, ভাঙ্গেও না চূরেও না। অমন একটা বিষম নট্‌খোটে পদার্থের আমি কোন সম্পর্কই রাখিনে।" তিনি ত বিশ্বাসই কোরলেন না। তিনি বোল্লেন, Courtship চালাও। আমার মত চুপচাপ লাজুক মানুষ কি Courtship চালাবার উপযুক্ত নায়িক? আমি কি মশায় তার দিকে হাঁ কোরে চেয়ে ফোঁস ফোঁস কোরে নিশ্বেস ফেলতে পারি! ডিনার টেবিলে আমার দিকে একটা লবণ দানী সরিয়ে দিলে অমনি অতিমাত্র কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হোয়ে ঢল ঢল নেত্রে অত্যন্ত কোমল ভাবপূর্ণ হাস্য-রসে মুখখানা টসটোসে কোরে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা কি আমার কর্ম্ম? বায়রণ থেকে বেচে বেচে এমন কবিতা পোড়ে শোনানো, যাতে আমার মনের ভাব ব্যক্ত হয়, পোড়তে পোড়তে বিশেষ একটা

লাইনে থেমে অতিশয় করুণ-রসের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলা, সে সব কি আমার পোষায়? আমি কি হাঁটু গেড়ে বোলতে পারি "সুন্দরি ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং?" তোমরা কবি মানুষ তোমরা হোলে পারতে। কিন্তু এ কথা নিয়ে আর বেশী ঠাট্টা উচিত নয়, বিষয়টি গুরুতর, একটা মনুষ্য মনের সুখশান্তি নিয়ে কথা হোচ্চে। আমার আলাপী অনেক লোকের মুখেই এই রকম একটা গুজব শুনতে পাচ্চি যে, আমি ভালবাসায় পোড়েচি ও সেই জন্যে মনে মনে আমার অত্যন্ত কষ্ট হোচ্চে, সংবাদটা অত্যন্ত ভাবনা-জনক এবং শুনে অবধি আমি ভারি চিন্তিত আছি। কি কোরব্ বল দিকি? বিবাহের প্রস্তাব কোরব কি? অবিশ্যি, লোকের মুখে এক কথা শুনেই আমি তাড়াতাড়ি কোরে বিয়ে কোরতে যাচ্চিনে, আমি প্রথমতঃ তদারক কোরব যে, আমি ভাল বাসায় পোড়েচি কি না, তার পরে যদি প্রমাণ হয় তা হোলে তোমাদের এবং অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শ নিয়ে যা' হয় স্থির করা যাবে। কি বল? তার পরে গল্পের শেষ দিকটা শোন। সেই বাঙ্গালা কবিতাটা লিখ্‌ছিলেম। চতুর্থ ছত্রে লাইনের শেষে ডেজি (Daisy) কথাটা পোড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার আর কোন মিল না পেয়ে সেই থেনেই কবিতাটা বন্ধ থাকে। এ দিকে Miss N. রোজই আমাকে পীড়াপীড়ি করেন, বলেন, তোমার কবিতাটা অনুবাদ কোরে শোনাও। আমি ত আজ কাল কোরে রোজই স্থগিত রাখি। পর্‌শু দিন তাঁরা এখান থেকে লণ্ডনে চোলে গিয়েচেন, ও আমাকে বিশেষ কোরে অনুরোধ কোরে গিয়েচেন "কবিতাটা অনুবাদ সমেত লিখে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।" কি করা যায় বলত! ভারি মুস্কিলেই পোড়েচি। আমি বলি কি, তুমি ভাই আমার হোয়ে যত শীঘ্র পার একটা কবিতা লিখে পাঠাও। বিষয়টা কি জান? টর্কীর বর্ণনা। টর্কী না দেখে টর্কীর বর্ণনা কি অসম্ভব মনে কোরচ? কিচ্ছুই না। ভাল জায়গা মাত্রেরই যে রকম বর্ণনা করা হয়, সেই রকম কোর্‌লেই চুকে যাবে। অর্থাৎ, ফুল ফুট্‌চে, পাখী ডাক্‌চে, বাতাস বয়, জ্যোৎস্না ওঠে। যত প্রকার মিষ্টি জিনিষ আছে, কোন প্রকারে কবিতাটার মধ্যে গুঁজে দেওয়া। গাছ পালার বর্ণনা সমাপ্ত কোরে যদি কোন রকম কোরে খানিকটা অশ্রুজল, হৃদয় ভাঙ্গাভাঙ্গী, নিরাশা, প্রিয়তমা, নিবিড় কুন্তল, সুদীর্ঘ নয়ন বসাতে পারো, তা হোলেই জিনিষটা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হবে। দেখ, Nightingale, Violet, Forget-me-not Hyacinth প্রভৃতি কথা গুলো বাঙ্গালা কবিতার মধ্যে ভাল শোনাবে না। কিন্তু তার জন্যে বেশী ভেবো না। তুমি ত, কোকিল, পাপিয়া, মালতী, মল্লিকা, চামেলি, চম্পা লিখে দিও, তার পরে অনুবাদ কোরে দেবার সময় আমি যা হয় একটা উপায় কোরে দেব।

সমস্ত গল্পটা কি নিতান্ত আজ্‌গুবি

মনে হোচ্চে? তবে আসল কথাটা খুলে বোল্‌চি। এটা আমার কথা নয়। এক ব্যক্তি তাঁর নিজের ঘটনা চিঠিতে আ-মাকে লিখেছিলেন, তাঁর চিঠি থেকে আমি উদ্ধৃত কোরে দিলেম। ব্যক্তিটি কে শুন্‌বে? না; কাজ নেই বাপু; তোমরা আবার দশ জনের কাছে গল্প কোরে বেড়াবে! তোমাদের পেটে যদি একটি কথা থাকে! ভারি কৌতুহল হোচ্চে? আচ্ছা তাঁর নামের প্রথম অক্ষর লিখ্‌চি। শ। বুঝেছ?

ক্রমশঃ।

বাঙ্গালা কবিতা।

পেনু যদি আজ ভারতী সঙ্গ,
অভিনব কিছু দেখাব রঙ্গ।
বীণা বাদিনীর সাধের তনয়
  কেমনে সাজায় কবিতা অঙ্গ।
কেমনে কি ভাবে, কি রসে কি ভাবে
  কবিতা লতায় ছাইল বঙ্গ।
বিবিধ বরণ বরণ গুলি,
কেমনে তাহারা টানয় তুলী,
কেমনে ফলায় বিবিধ রং,
কেমনে গড়ায় বিবিধ ঢং,
কেমনে তাহার সাজায় বেশ,
কেমনে তাহায় মজায় দেশ,
কেমনে তাহায় প্রদানে প্রাণ,
কেমনে তাহায় গাহায় গান,
তাই আজ দীন দেখাবে তোমায়
  নলিন নয়নে-দেখ মা চেয়ে,
কবি কল্পনায়, পাতায় লতায়
  কেমনে বাঙ্গালা গিয়েছে ছেয়ে!
অনুকরণের আভাস ছটা,
অনুপ্রাস ধায় ভাষার ঘটা,
ভাবের অভাব ভাবনা তাই,
বোলের বাঁধনে বেলয় নাই,
চাকচিক জাঁক জমক সাজ,
ভিতরে ভুয়া উপরে কাজ;
কবির কাহিনী-কুহক জাল,
কবিতা কাননে কাটায় কাল;
দুখিরে দেখায় দেবের সুখ,
ধনী সে ধেয়ানে দীনের দুখ;
হাপুতী হেরয় তনয় চাঁদ,
বিরহী ভাঙ্গয় বিরহ বাঁধ;
কত যে আজব ঘটনা ঘটে,
কত যে আজব রটনা রটে,
কত যে খেয়াল ক্ষণেকে হয়,
ক্ষণেকে উদয় ক্ষণেকে লয়;
তাই মাত আজ দেখাব তোমায়,
এসো মা, বসো মা, মম রসনায়;
পুরাতে মানস সাধিব কাজ,
হারি জিনি, তায় কিসের লাজ?
চল মা, আজকে হেরিব গোকুল,
হেরিব বিলাসী ব্রজ বধূ কুল।

অথ বৃন্দাবন—প্রাতঃ দৃশ্য।

তরুণ অরুণ সিঁদুর রেখা,
উষার ললাটে দিয়াছে দেখা।
বিভুর বিভব বিভার মেয়ে,
হেরিছে ত্রিলোক হরষে চেয়ে।
নিশী নাশি আসি ভাসিল ভাস,
ভরিল ভুবন মধুর হাস।
পাখী শাখা পরে গাহিছে গান,
জগত জনের জুড়ায়ে প্রাণ।
উষার অরুণ উদয় জানি,
জাগে জগতের যতেক প্রাণী।
উঠিল আরাব এ চারিধার,
ছুটিল কাজেতে এবে যে যার।
অই দেখ বাছা বারেক চেয়ে,
শোভে সরোবরে শতেক মেয়ে।
চিকন কাঁকালে কলসী কারু,
দ্বিগুণ বাড়ায় চেহারা চারু।
চটুল চরণে চুট্‌কী রাজে।
ঝমর ঝমর ঘুমুর বাজে।
ঝট পট সব সারিছে পাট,
সরসী ঘাটে রে চাঁদের হাট।
তরাসি তাবত যে যার কাজে,
ঘস্ ঘস্ ঘস্ বাসন মাজে।
দুল্ দুল্ দুল্ নোলক নড়ে,
চমকি চমকি পলক পড়ে।
তাবিজ বাজুর ঝুলিছে ফুল,
দুলিছে কাণের দোলনী দুল।
উড়ি উড়ি পড়ে বয়ন বাস,
অলকা অলিকা তাহে প্রকাশ।
কিরণ মালায় চপলা ছটা,
মৃদু মৃদু তায় হাসির ঘটা।
আলি আলি মেলি আলাপে কেউ,
সদা উঠে তায় সুধার ঢেউ।
আঁখি আঁখি তায় তাড়িত তার,
বহিছে নিমেষে খবর ভার।
শীতল সলিলে ঢালিয়া দেহ,
সারয় সিনান সেয়ানী কেহ।
ওই শুন বাছা পাতিয়া কাণ,
বাদিত বাদন ধ্বনি মহান।
ধেনেনা ধেনেনা নবত বোল,
তাকিটি ধাকিটি বাজায় ঢোল।
ন্যাংনা নেন্যাং বাজিল কাঁসী,
পোঁও পোঁও পোঁও ধরিল বাঁশী।
ঘাঁকড় কাঁকড় বাজিল কাড়া,
মাতিল ব্রজের গোয়াল পাড়া।
টুনু টুনু টুনু ঘণ্টা মাঝে,
ঢং ঢং ঢং কাঁসর বাজে।
ভোঁপ্‌পো ভোঁপ্‌পো বাজিল ভেরি,
ঝর্ ঝর্ ঝর্ বাজে ঝাঁঝরী।
উঁছিয়ে চেঁচিয়ে বাজায় ঢাক,
জুড়ীদার তার সাগর শাঁখ।
উঠিল ভীষণ বাদন রোল,
থর করতাল মাদল খোল।
হরি হরি হরি হরির ধ্বনি,
কাঁপায়ে গগন উঠে তখনি।
মধুর মধুর মধুর গান,
কার না তাহায় জুড়ায় প্রাণ?
হেন সুসময় পূজার ছলে,
গোকুল বাসিনী গোপিনী দলে।
সহ সহচরী আভিরী আলি,
ক্ষীণ কটিতটে ফুলের ডালি।
ডালি করে চারু জলের ঝারি,

পূরিত পতিত-পাবনী বারি।
একে রসবতী রস আধার,
বাড়িল দ্বিগুণ এ গুরু ভার।
তাই তনু খানি ঈষৎ বাঁকা,
আধ রাকা চাঁদ জলদে ঢাকা।
আধই জলদে বিজলি খেলে,
আধই জলেতে কুমুদী মেলে ;
আধই কমল নীলীম সরে,
মিহুর মারুতে মাতি বিহরে।
পেখম ধরিয়া ময়ুর দলে,
তুটী তুটী নাচে হেম অচলে।
মণিচূণী ময় বিবিধ বরণ,
বর বপু বেড়া চারু আভরণ।
মানিনী ফণিনী গরব নাশা,
চিকন চাঁচর চিকুর খাষা।
ঘেরি চারু ফুলে নয়ন লোভা,
দ্বিগুণ বাড়ায় দেহের শোভা।
থমকে থমকে ফেলই পা,
দলমল করি দুলই গা।
রুণু রুণু রুণু ঘুমুর বাজে,
(মন ছিল না কি সেকেলে সাজে ?)
ঝটিত চরণে ছাড়িয়া বাট,
মন্দির মাঝার পশিল ঝাট।
নিমিলি নলিন নয়ন দুটী,
চারু চাঁপা কর কমল পুটি,
ভকতি ভরেতে গলায় বাস,
তদগত প্রাণ মন উদাস।
জানু পাতি ভুমে রয়েছে বসি,
জনু সুধাময় শারদ শশী।
অথবা অচল চপলা বালা,
করপদ্মে ধরি কিরণ মালা
নভে নীরধরে নীরবে বসি,
তপ নিমগনা নব তাপসী।
দেবীর চরণে চাহিয়া বর,
চলে ব্রজ বালা যে যার ঘর।
হৈ হৈ হৈ রাখাল রব,
হম্বা হম্বা রবে গোপাল সব,
সমান সমান বাছিয়া জুটে,
দড় বড় করি দউড়ে ছুটে,
ফন্ ফন্ ফন্ ঘুরায় লেজ,
বদন হইতে বাহিরে তেজ,
হরষে বাছুর ধাইয়া আসে,
আপন আপন জননী পাশে।
লাফায় ঝাঁপায় অধীর দেহ,
লেহনি লেহনে জানায় লেহ,
আনন্দ আসারে অমনি মা,
চপ্ চপ্ চপ্ চাটিছে গা,
মায়ের মতন মমতা হরি,
আর কার আছে ভুবন ভরি ?
জগতে জীবের জননী সার,
স্বরগ হতেও গরিমা তাঁর।
ঝট পট পাখী ঝাড়িছে পাখা,
মর্ মর্ মর্ নড়িছে শাখা,
শর শর শর করিয়া রব,
ঝর ঝর পাতা ঝরিছে সব,
ঘন ঘটাকারে উড়ায়ে ধূলী,
ছুটিল গোপের গোপাল গুলি,
গাহিল গোপাল গোপের গান,
শীতলি পরাণ, জুড়ায়ে কাণ,
পদ মদ ভরে কাঁপায়ে ধরা,
যে যাহার কাজে ধাইল ত্বরা।

মাঃ—নেঃ।

সম্পাদকের বৈঠক।

জুলিয়স সীজর।

(অ্যাণ্টনির বক্তৃতার অনুবাদ।)

রোমে যুদ্ধ বিগ্রহ, গৃহ বিচ্ছেদ থামিয়া গিয়াছে। সীজর এখন রোম সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা। সুখ শান্তি লাভ করিয়া প্রজারা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে। কেবল কতকগুলি ব্যক্তি, যাহারা পূর্ব্বে সীজরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু সীজর জয়লাভের পর যাহাদের মার্জ্জনা করিয়া উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহারা আজো হিংসায় জ্বলিতেছে। মার্জ্জনা পাইলে যে, লোকে সকল সময়ে কৃতজ্ঞ হয় তাহা নহে; অনেক সময়ে দণ্ডের অপেক্ষা মার্জ্জনা লজ্জা, রোষ ও প্রতিহিংসা উদ্রেক করে। Cassius, Trebonius, Tullins Cimber প্রভৃতি কতকগুলি পদমর্য্যাদাবান্ ব্যক্তিরা সীজরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে Marcus Brutus লিপ্ত আছেন; লোকে বলে অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের ন্যায় ব্রুটসের কোন প্রকার দুরভিসন্ধি ছিল না; তিনি সত্যই মনে করিতেন, যে, সীজরের প্রতাপ যে রূপ দিনে দিনে বাড়িতেছে, তাহাতে সাধারণতন্ত্র রোমের স্বাধীনতা অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারে কি না সন্দেহ। ব্রুটস, কেটোর ভগ্নী সর্ভিলিয়ার (Servilia) পুত্র। লোকে কানাকানি করে যে, সর্ভিলিয়া সীজরের উপপত্নী, এমন কি ব্রুটস্ সীজরের ঔরসজাত। তাহা সত্য না হউক সীজর ব্রুটস্‌কে অত্যন্ত ভাল বাসেন, এবং ব্রুটস্‌ও সেই জন্য সীজরের প্রতি অনুরক্ত। ষড়যন্ত্রের মধ্যে আর একটি ব্রুটস্ আছেন, তাঁহার নাম Decimus Brutus; তাঁহার পরেও সীজরের যার-পর-নাই অনুগ্রহ।

Ides of march অর্থাৎ পনরই মার্চ্চ নিকটবর্ত্তী। সীজর শীঘ্রই পার্থিয়া আক্রমণ করিতে যাইবেন। কিন্তু একটি দৈববাণী হইয়াছে যে, রাজা নহিলে আর কেহ পার্থিয়দিগকে জয় করিতে পারিবে না; জুলিয়স্ সীজর রাজা নহেন, তিনি রোমের সাধারণ লোকদের প্রতিনিধি মাত্র; কিন্তু যাহা হউক্, সীজর যুদ্ধে যাইবেন স্থির করিয়াছেন। তাঁহার যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে ১৫ই মার্চ্চ একটি সভা বসিবে, সকলে কহিতেছে, সেই সভায় পুরোহিতগণ তাঁহাকে রাজ-মুকুট পরাইবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। এদিকে বিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্র পরিপক্ব হইয়া উঠিতেছে। দুই এক জন জানিতে পারিয়া সীজরকে সাবধান করিতে লাগিল; কিন্তু সীজর সাবধান হইলেন না। দৈবজ্ঞেরা অনিষ্ট আশঙ্কা করিতে

লাগিল। ১৪ই মার্চ্চে সন্ধ্যাকালে সীজর লেপিডসের বাড়িতে ভোজে গিয়াছিলেন। সে দিন নিমন্ত্রণ সভায় একবার কথা উঠিয়াছিল, যে, কিরূপ মৃত্যু ভাল। সীজর তখন কাগজে নাম সই করিতেছিলেন, সহসা মুখ তুলিয়া বলিলেন "হঠাৎ-মৃত্যু!"

আজ ১৫ই মার্চ্চ। আজ একটি সভা বসিয়াছে। সভাগৃহ লোকে পূর্ণ। বিদ্রোহীরা তাহাদের কাগজ পত্রের মধ্যে ছুরিকা লুকাইয়া প্রস্তুত হইয়া আছে। সকলেই সীজরের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় কথা উঠিল, সীজর আজ আসিবেন না। অনেক প্রকার কুলক্ষণ দেখা দিয়াছে; সীজরের মহিষী Calpurnia কুস্বপ্ন দেখিয়াছেন, এবং অকারণে সীজরের মন খারাপ হইয়া আছে। বিদ্রোহীরা কুফল আশঙ্কা করিতে লাগিল। তখন তাহাদের মধ্য হইতে সীজরের প্রিয় বান্ধব ডেসিমস ব্রূটস্ সীজরের নিকট গেলেন, ও নানা প্রকার যুক্তি দেখাইয়া তাঁহাকে সভাগৃহে লইয়া আসিলেন। আসিবার কালে এক জন সীজরের হস্তে এক খানি কাগজ দিল, তাহাতে বিদ্রোহের বিবরণ ও বিদ্রোহীদের নাম ধাম লেখা ছিল, সীজরকে সে ব্যক্তি সেই মুহূর্ত্তেই পড়িতে অনুরোধ করিল, সীজর পড়িলেন না।

সীজর সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন, আসন গ্রহণ করিলেন। বিদ্রোহীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল কেহ বা গল্প বলিতে লাগিল, কেহবা একটা কিছু প্রার্থনা করিতে লাগিল। Tullius Cimber তাঁহার কাছে এক বিষয় লইয়া আবেদন করিল, তিনি অস্বীকার করিলেন। ক্রীড়াচ্ছলে Cimber তাঁহার কাঁধ হইতে চাদর সরাইয়া দিল; কেশিয়স্ পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল, সে অমনি তাঁহার কাঁধে এক ছুরি বিঁধাইয়া দিল। সীজর চীৎকার করিয়া উঠিয়া কেশিয়সের হাত ধরিলেন। অমনি তাঁহার বক্ষে আর একটি ছুরিকা বিদ্ধ হইল, তিনি চারিদিকে চাহিলেন—চারিদিকেই ছুরিকাগ্র ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না—অমনি সীজর তাঁহার মুখের উপর কাপড় টানিয়া দিলেন ও একটি কথা না বলিয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। ব্রূটস্ সীজরের রক্তে ছুরিকা ডুবাইয়া সেই ছুরী বাগ্মী সিসিরোর দিকে কাঁপাইয়া কহিলেন—স্বাধীনতা প্রত্যাহৃত হইল।

সীজরের মৃত্যুতে লোকেরা অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। সীজরের বন্ধু অ্যাণ্টনি Froumএ সীজরের মৃত দেহ আনয়ন করিলেন, সীজরের বস্ত্র এখনো বদলানো হয় নাই, সেই রক্তমাখা ছিন্ন ভিন্ন বস্ত্র এখনো তাঁহার মৃতদেহের উপর নিপতিত আছে। প্রথমে অ্যাণ্টনি সীজরের উইল সমাগত লোকদিগের মধ্যে পাঠ করিলেন। ইহাতে লিখিত আছে, যে, "প্রত্যেক রোমবাসীই সীজরের মনে সর্ব্বদা জাগ্রত আছে, তিনি প্রত্যেককে ৭৫ drachma (ইংরাজি ৩ পাউণ্ড, প্রায় চল্লিশ টাকা) দান করিলেন। টাইবরের তীরস্থ তাঁহার বাগান সাধারণের বিনোদের

জন্য রাখিয়া গেলেন। অক্টেভিয়স্ তাঁহার উত্তরাধিকারী, তদভাবে ডেসিমস্ ব্রুটস্।" সীজর তাহাদের ৭৫ ড্রাক্মা রাখিয়া গিয়াছেন, ও যে ডেসিমস্ ব্রুটসকে তিনি আপনার উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছিলেন সেই তাঁহার হত্যাকারীদের মধ্যে একজন ছিল, শুনিয়া রোমীয় শ্রোতারা উন্মত্ত হইয়া উঠিল। অ্যাণ্টনি সময় বুঝিয়া সীজরের গুণ গান করিতে লাগিলেন, তিনি কহিলেন।

ক্ষমতাপ্রাপ্তি অনেক মানুষের দোষ বাহিরে প্রকাশ করিয়া দেয়, কিন্তু ক্ষমতা সীজরের গুণগ্রামই প্রকাশ করিয়াছে। উন্নতি তাঁহাকে অহঙ্কৃত করিয়া তুলে নাই, কারণ ইহা তাঁহার মত মহান্ মানব মনের ক্রীড়া করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র। * * তাঁহার অন্তরে কেমন একটি স্বাভাবিক সততা বিরাজ করিত। সর্ব্বদাই তাঁহার সমান অবস্থা, কখন ক্রোধে হতজ্ঞান হইতেন না কখনো কার্য্যসিদ্ধিতে গর্ব্বিত হইয়া উঠিতেন না। অতীতে কেহ দোষ করিলে তিনি তাহার প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিতেন না, এবং বিপদে পড়িয়া ভবিষ্যতে তাহার জন্যে অতিমাত্র সাবধান হইতেন না। যাহারা পরিত্রাণ চায় তাহাদের মুক্তি দেওয়াই তাঁহার একমাত্র চেষ্টা ছিল। * * * তোমরা তাঁহাকে পিতার ন্যায় মান্য করিতে, উপকারীর ন্যায় ভাল বাসিতে, তোমরা তাঁহাকে রাজ্যের অধিপতি করিলে, কেন? না তাঁহার উপকার সমূহের সম্পূর্ণ প্রত্যর্পণ করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও তোমাদের যথাসাধ্য করিবার জন্য। দেবতাদের তিনি পুরোহিত ছিলেন, তোমাদের তিনি প্রতিনিধি ছিলেন, সৈন্যদের তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন ও তাঁহার দেশ-শত্রুদের তিনি শাসয়িতা ছিলেন। এক কথায় তিনি পিতাদের পিতা ছিলেন। এই তোমাদের পিতা, পুরোহিত, বীর, যাঁহার দেহ স্পর্শাতীত পবিত্র বলিয়া গণ্য ছিল, তিনি আজ মৃত পড়িয়া; পীড়ায় নহে—বয়সে নহে—যুদ্ধে নহে;—কিন্তু এই খানে—তাঁহার স্বদেশে, তোমাদের পুরভিত্তির মধ্যেই এই নিরস্ত্র বীর, এই ন্যায্যবিচারক তাঁহার বিচারাসনে বসিয়া, এই শান্তি-রক্ষক তাঁহার শত্রুদের সম্মুখে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থাতে সভাগৃহ মধ্যে নিহত হইলেন। যাঁহাকে কোন বিদেশীয় শত্রু পরাভূত করিতে পারে নাই; তিনি তাঁহার আপনার স্বদেশীয় লোকদের দ্বারা নিহত হইলেন! সে লোক কাহারা? যাহাদের তিনি কত দয়া দেখাইয়াছেন, কত বার ক্ষমা করিয়াছেন! হা সীজর—মানুষদের প্রতি প্রেম এখন আর তোমার কোথায় রহিল? তোমার পবিত্র-জীবনই বা কোথায় রহিল? তোমার প্রচলিত রাজনীতি সমূহই বা কোথায় রহিল? আজ এই ফোরমে তোমার মৃতদেহ পড়িয়া আছে, ইহার মধ্য দিয়া কত বার তুমি বিজয়-গৌরবে মালা গলায় দিয়া চলিয়া গিয়াছ? হায়—আজ তোমার রক্তে অভিষিক্ত শুক্ল-কেশ, এই ছিন্ন বসন দেখিয়া যায়া হয়!

আমরা সেক্‌স্‌পিয়র-রচিত জুলিয়স্‌ সীজর নাটক হইতে অ্যাণ্টনির বিখ্যাত বক্তৃতা অনুবাদ করিয়া দিতেছি, এবং তদুপলক্ষে ইতিহাস হইতে সীজরের মৃত্যু-বর্ণনা লইয়া ভূমিকা রচনা করিলাম।

অ্যাণ্টনির বক্তৃতা।

অ্যাণ্টনি—

বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ, শুনগো তোমরা,
সীজরে সমাধি দিতে আসিয়াছি আমি,
মহিমা গাহিতে তাঁর আসিনি হেথায়!
লোকে যা' কুকর্ম্ম করে, মৃত্যুর পরেও
বাঁচিয়া রহেগো তাহা; কিন্তু ভাল কাজ
ধূলায় মিশায়ে যায় মৃত-দেহ সাথে!
সীজরের অদৃষ্টেও ঘটুক তাহাই!
মহাত্মা ব্রুটস্‌ মুখে শুনেছ তোমরা
দুরাকাঙ্ক্ষী অতিশয় ছিলেন সীজর,
সত্য যদি, তবে তাহা ঘোর দোষ বটে;—
পেলেন তেমনি তার ঘোর প্রতিফল!
এসেছি হেথায় আমি সমাধি-বেলায়
বলিতে দু এক কথা সীজরের হোয়ে;
ব্রুটস্‌ ও তাঁর যত সহকারীগণ
দিয়াছেন অনুমতি অনুগ্রহ করি,
কারণ, ব্রুটস্‌ অতি মহাশয় লোক,
তাঁরা সকলেই অতি মহাশয় লোক!
সীজর ছিলেন মোর পরম বান্ধব
বিশ্বাসী, সদয়; কিন্তু ব্রুটসের মতে
দুরাকাঙ্ক্ষী অতিশয় আছিলেন তিনি,
তা' হবে, ব্রুটস্‌ অতি মহাশয় লোক!
কত শত বন্দী তিনি আনিলেন রোমে,
অর্থ যাহা দিল তারা মুক্তি লাভ তরে
সাধারণ ধনাগারে রাখিলেন তাহা,
সীজরের দুরাকাঙ্ক্ষা এরেই কি বল'?
দরিদ্রের অশ্রু হেরি সীজরের আঁখি
বরষিত অশ্রুধারা, কিন্তু জেনো ইহা,
দুরাকাঙ্ক্ষীদের মন এর চাতে কঠিন!
তথাপি ব্রুটস্‌ কন দুরাকাঙ্ক্ষী তাঁরে,
তা' হবে, ব্রুটস্‌ অতি মহাশয় লোক!
জান ত তোমরা সবে লুপার্কলে তাঁরে
তিন বার দিয়েছিনু মুকুট পরায়ে
তিন বার তুচ্ছ করি দিলেন ফেলিতা'
এরেই কি দুরাকাঙ্ক্ষা বল গো তোমরা?
তথাপি ব্রুটস্‌ ক'ন দুরাকাঙ্ক্ষী তাঁরে,
তা' হবে ব্রুটস্‌ অতি মহাশয় লোক!
আসি নি হেথায় আমি ব্রুটসের কথা
প্রতিবাদ করিবারে, যাহা জানি আমি
তাহাই এসেছি হেথা জানাতে সবারে।
তোমরা সকলে ভাল বাসিতে তাঁহারে
এক কালে, অকারণে নহে তা' কখনো,'
তবে কি কারণে এবে করিবে না শোক
সেই সীজরের তরে? হায়, ধর্ম্ম, তুমি
পশুদের হৃদয়েতে গিয়াছ পালায়ে,
মানুষেরা হারায়েছে বুদ্ধি তাহাদের!
ক্ষমা কর, আর আমি পারি না বলিতে;
সীজরের মৃতদেহে হৃদয় আমার
কোরেছে প্রবেশ, আগে আসুক সে ফিরে!

প্রথম পুর-বাসী—

আমার ত মনে হয় বলিলেন যাহা,
অনেকটা সত্য বটে।

দ্বিতীয়— তবে দেখ যদি,
হোয়েছে অন্যায় করা সীজরের পরে।

তৃতীয়—কে জানে আসিবে কোন্‌ দুরাত্মা
আবার

সীজরের পদে এবে।
চতুর্থ— শুনেছ ত ভাই,
রাজা হোতে সীজরের ছিল না লালসা
তবে কেন দুরাকাঙ্খী বলিব তাঁহারে?
প্রথম— সত্য যদি হয় ইহা, এর ফল তবে
তাদের ভুগিতে হবে।
দ্বিতীয়— আহা বেচারীর
কেঁদে কেঁদে অাঁখি দুটি গেছে রাঙা হোয়ে!
তৃতীয়—অমন মহাত্মা লোক অ্যাণ্টনির মত
রোমে দুটি নাই আর।
চতুর্থ— রোস, শোন এবে,
আবার কি বলিবেন শোন মন দিয়া!
এণ্টনি—কালিকে একটি তাঁর কথায়, ইঙ্গিতে
কাঁপিত সমস্ত ধরা; আজ তিনি হোথা!
এক জনো তাঁরে আজি করে না ভ্রূক্ষেপ!
ও গো পৌর জন, যদি তোমাদের হৃদে
বিদ্রোহ জ্বালাই আমি, ব্রুটসের কাছে,
কেশ্যাসের কাছে আমি হব অপরাধী;
জানত তাঁহারা সবে মহাশয় লোক!
চাহি না তাঁদের পরে করিতে অন্যায়;
মৃত মানুষের পরে, তোমাদের পরে,
বরঞ্চ নিজের পরে করিব অন্যায়,
তবুও অমন সব মহাশয় লোক
অন্যায় তাঁদের প্রতি চাহিনা করিতে।
সীজরের বক্ষ হোতে পাইয়াছি আমি
এই যে লিখন তাঁর সাক্ষর সহিত,
ইহা তাঁর দান-পত্র অন্তিম কালের;
একবার শোন যদি, এখনি তা হোলে
সীজরের প্রতি ক্ষত করিবে চুম্বন,
ভিজাবে বসন ওই পবিত্র শোণিতে,
চির কাল স্মরণেতে রাখিতে তাঁহারে
একটি মাথার কেশ মাগিবে তাঁহার,
অবশেষে সেই কেশ মরিবার কালে
মহা মূল্য এক খানি রত্নের মতন
পুত্র পৌত্রদের তরে যাইবে রাখিয়া;
কিন্তু ক্ষমা কর, তাহা চাহিনা বলিতে!
চতুর্থ—পড় পড় দানপত্র, পড়গো অ্যাণ্টনি!
সকলে—দানপত্র, দানপত্র, শুনিব আমরা!
এণ্টনি—ক্ষম মোরে, কখনই পড়িবনা ইহা,
তোমাদের কত ভাল বাসিত সীজর
জেনে কাজ নাই তাহা। নহত তোমরা
নির্জ্জীব পাষাণ, কাষ্ঠ; তোমরা মানুষ
রক্ত মাংসে গড়া; তাই বলি, শোন যদি,
একবার সীজরের দানপত্র এই,—
জ্বলিয়া উঠিবে, হবে উন্মাদের মত!
তোমরাই বিষয়ের অধিকারী তাঁর
একথা যে জাননা তা' হোয়েছে ভালই
একবার জানিলে কি হইত না জানি!
চতুর্থ—পড় দানপত্র মোরা শুনিব অ্যাণ্টনি,
সীজরের দানপত্র, পড়-পড়-পড়!
এণ্টনি—
দাঁড়াবে কি সোরে? ধৈর্য্য ধরিবে একটু?
হয়ত এতটা বলা ভাল হয় নাই
তাই ভাবিতেছি আমি, ভয় করি পাছে
সেই সব মহাশয় লোকদের কাছে
অপরাধী হই আমি, সীজরের বুকে
বিঁধায়ে দিয়াছে যারা ছুরিকা তাদের!
চতুর্থ—মহাশয় লোক! নানা পাষণ্ড তাহারা!
সকলে—পড় পড় দানপত্র—পড় দানপত্র!
দ্বিতীয়—খুনী তারা, নরাধম। পড় সে লিখন।
এণ্টনি—নিতান্তই দেখিতেছি হইল পড়িতে!
এস তবে সবে মিলে দাঁড়াও ঘিরিয়া

সীজরের মৃতদেহ। দেখাই তাঁহারে
এ পত্র রচনা যাঁর। নামিব কি তবে?
অনুমতি দিবে কি আমারে?

অনেকে— এস এস—
দ্বিতীয়—নেমে এস, নেমে এস—
তৃ— দিনু অনুমতি।
(অ্যাণ্টনি অবতরণ করিলেন।)
চতুর্থ—সকলে দাঁড়াও ঘিরে!
প্রথম— মৃতদেহ হোতে
সরিয়া দাঁড়াও!
দ্বি— স্থান দাও এণ্টনিরে!
এণ্টনি—গায়েতে পোড়না ঝুঁকে দাঁড়াও
সরিয়া!
অনেকে—সোরে যাও—স্থান দাও—পিছে
এস সবে।
এণ্টনি—অশ্রুজল থাকে যদি চক্ষে তোমাদের
এখনই তবে তাহা কর বরষণ!
তোমরা সবাই চেনো এ বসন তাঁর;
প্রথম যে দিন তিনি পরেন এ বাস,
স্পষ্ট মনে আছে তাহা। শিবিরে তাঁহার
এক দিন নিদাঘের অপরাহ্ন-কালে
পরেন এ বস্ত্র খানি, যে দিন তাঁহার
নর্ভিয়স্ শত্রুদের করিলেন জয়।
এই হেথা ক্যাশিয়স্ বসায়েছে ছুরি;
কতখানি ছিন্ন হোয়ে গেছে দেখ, আহা
ক্যাস্কার অস্ত্রের ধারে; হেথায় ব্রূটস,
সীজরের প্রিয়তম, মারিয়াছে ছুরী,
দারুণ সে ছুরী যবে লয়েছিল টানি—
অমনি কত না রক্ত উঠিল উচ্ছ্বসি,
যেন দ্বার হোতে তারা ছুটিয়া আসিয়া
দেখিতে আইল, একি ব্রূটসের কাজ?
জানত তোমরা সবে আছিল ব্রূটস্
সীজরের প্রিয়তম পরম বান্ধব;—
দেবগণ! তোমরাই কর গো বিচার—
সীজর কত না ভাল বাসিত ব্রূটসে!
এই যে আঘাত হেথা দেখিছ তোমরা,
এ হোতে নিষ্ঠুরতর নাইক আঘাত;
মহান্ সীজর যবে দেখিলা ব্রূটস্
বিঁধাইল ছুরী তাঁরে তখনি অমনি
বিদ্রোহীর ছুরী চেয়ে তীক্ষ্ণ কৃতঘ্নতা
একেবারে অভিভূত করিল তাঁহারে!
মহান্ হৃদয় তাঁর হইল শতধা!
বসনে বদন তাঁর ঢাকিয়া অমনি
পম্পির মূরতি তলে পড়িলা সীজর—
কি দারুণ পতন সে ওগো ভ্রাতৃগণ!
সেই সাথে সকলের, তোমার, আমার,
সমস্ত দেশের এই, হইল পতন,
রক্তাক্ত বিদ্রোহ শুধু তুলিল মস্তক!
কাঁদিছ তোমরা এবে, দেখিতেছি আমি
তোমাদের হৃদয়েতে জন্মিয়াছে দয়া!
পবিত্র এ অশ্রু বারি! কাঁদিছ তোমরা
দয়ার্দ্র হৃদয় সবে, হেরিয়া কেবল
সীজরের এই বসনের ছিদ্র গুলি;—
কিন্তু দেখ এই দিকে—হেথা তিনি নিজে
বিদ্রোহীর অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন কায়া!
প্রথম— কি দারুণ দৃশ্য!
দ্বিতীয়— আহা মহাত্মা সীজর!
তৃতীয়— হায় কি দুর্দ্দিন!
চতুর্থ— হারে পাষণ্ড পিশাচ!
প্রথম— একি ভয়ানক!
দ্বিতীয়— এর প্রতিশোধ চাই!
সকলে—প্রতিশোধ, প্রতিশোধ, চল, মার, কাট,

লাগাও আগুন—তবে কর ছারখার !
একটি পাষণ্ড যেন নাহি পায় ত্রাণ !
এণ্টনি— স্থির হও বন্ধুগণ !
প্রথম— থাম—থাম সবে
শোন কি বলিতে চান মহাত্মা এণ্টনি !
দ্বিতীয়—যাহা কিছু বলিবেন শুনিব আমরা,
যেথায় যাবেন লোয়ে যাইব সেথাই—
থাকিয়া উঁহারি পাশে মরিব সকলে !
এণ্টনি—বন্ধুগণ ! ভ্রাতৃগণ ! মোর কথা শুনি
সহসা বিদ্রোহে যেন উঠোনা মাতিয়া !
যাঁদের একাজ তাঁরা মহাশয় লোক !
সীজর যে কি তাঁদের কোরেছেন হানি
কিছুই জানি না আমি, শুধালে তাঁদের
কারণ কিছুনা কিছু দেখাবেন তাঁরা—
কেন না তাঁহারা বিজ্ঞ মহাশয় লোক !
হেথায় আসিনি আমি মন তোমাদের
লইতে হরণ করি। ব্রুটসের মত
বাগ্মী শ্রেষ্ঠ নই আমি ; জানত তোমরা
আমি অতি শাদাশিদা স্পষ্টবক্তা লোক;—
বন্ধুরে আমার আমি ভাল বাসি বড় ;
যাদের আদেশ লোয়ে এসেছি হেথায়,
সে কথা জেনেও তারা দেছে অনুমতি
বলিতে দু এক কথা সে বন্ধুর হোয়ে !
কেন না তাহারা জানে,নাই বুদ্ধি মোর—
নাইকো পদার্থ কিছু, নাই বাক্য-বল,
অথবা নাইক হেন বক্তৃতা শকতি
যাহে মানুষের মন হয় উত্তেজিত !
যাহা মুখে আসে বলি ; তোমরা যা' জান
তার চেয়ে বেশী আমি বলিনি কিছুই !
সীজরের ক্ষত-চিহ্ন কর অনাবৃত !
তাহারা নীরব কণ্ঠে কবে মোর হোয়ে !

আমি যদি হতেম ব্রুটস্, আর যদি
ব্রুটস অ্যাণ্টনি হোত, তাহোলে অ্যাণ্টনি
সীজরের শরীরের প্রতি ক্ষত হোতে
বাহির করিত হেন অগ্নিময়ী ভাষা
রোমের পাষাণ শুদ্ধ জাগিয়া উঠিয়া
মাতিত বিদ্রোহ মদে।
সকলে— মাতিব আমরা।
প্রথম—আগুন লাগায়ে দিব ব্রুটসের ঘরে !
তৃতীয়—এস, চল,যাই তবে, খুঁজিগে তাদের
এণ্টনি—ধৈর্য্য ধর বন্ধুগণ শোন মোর কথা !
সকলে—থাম,শোন,কি বলেন মহাত্মা এণ্টনি !
অ্যাণ্টনি—বন্ধুগণ করিছ কি? কি জন্য সীজর
হোয়েছেন প্রণয়ের পাত্র তোমাদের
এখনো জাননা তাহা ! বলি তবে শুন—
এ দানপত্রের কথা গিয়াছিনু ভুলে !
সকলে—ঠিক বটে,দানপত্র,পড়, শুনি তাহা
এণ্টনি—সীজরের সাক্ষরিত দানপত্র এই।
প্রত্যেক পুরবাসীরে দিয়াছেন তিনি
এক শত রৌপ্য মুদ্রা।
দ্বিতীয়— মহাত্মা সীজর !
প্রতিশোধ নিতে হবে তাঁর মরণের !
তৃতীয়—আহা উদার সীজর !
এণ্টনি— শোন ধৈর্য্যধরি !
সকলে—থাম, থাম সবে !
এণ্টনি— রাখিয়া গেছেন তিনি
প্রমোদ কানন তাঁর তোমাদের তরে,—
বংশ পরম্পরা তাহা তোমরা সকলে
পারিবে করিতে ভোগ। এই সীজরের
যোগ্য বটে ! এমন কি হবে আর দুটি ?
প্রথম—কখন না ! এস চোলে,পুণ্যস্থানে নিয়ে
করিব অনল দান এ পবিত্র দেহে।

সেই চিতানল দিয়ে জ্বালাব আমরা
বিদ্রোহীদিগের ঘর!
দ্বিতীয়— যাও আন অগ্নি
তৃতীয়— টেনে আন কাষ্ঠাসন গুলা
চতুর্থ— ভেঙ্গে আন
জানালা দরজা!
অ্যাণ্টনি— এখন যা হয় হোক্
কাল শনি! এবে তুই উঠিলি জাগিয়া—
যে পথে বাসনা তোর কর্ বিচরণ!

ইংলণ্ডে স্বাধীনতার উন্নতি।

আজকাল আমাদিগের মধ্যে স্বাধীনতার একটা ধুয়া উঠিয়াছে। পুত্র পিতার অবাধ্য হইয়া স্বাধীন হইতে চাহে, শিষ্য গুরুকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন হইতে চাহে, স্ত্রী স্বামীর শাসন কঠোর মনে করিয়া স্বাধীন হইতে চাহে। বাঙ্গালী জাতি "নাকে মুখে গুঁজে দুটো আলু ভাতে ভাত"সভার সমর-অঙ্গনে কথার তোপে ইংরাজদিগকে উড়াইয়া ভারত উদ্ধার করেন। তাঁদের যুক্তি প্রণালী এইরূপ—

ইংরাজ মানুষ
ইংরাজ স্বাধীন
বাঙ্গালী মানুষ
অতএব বাঙ্গালী কেন না স্বাধীন?—

কিন্তু ইংরাজেরা যে কত যুগযুগান্তর হইতে যুঝাযুঝি করিয়া কত রক্তপাতের পর অল্পে অল্পে সোপান-পরম্পরা অবলম্বন করিয়া তবে স্বাধীনতা-শিখরে আরোহণ করিয়াছেন তাহা আমরা অনুধাবন করিয়া দেখি না—আমরা বালকের ন্যায়, বাতুলের ন্যায় এক লম্ফে তদুপরি আরোহণ করিতে আকাঙ্ক্ষা করি, সুতরাং জগতের সমক্ষে হাস্যাস্পদ হইয়া পড়ি। ইংরাজদিগের ন্যায় স্বাধীন হইবার পূর্ব্বে কি করিয়া তাঁহারা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিলেন তাহা আমাদিগের আলোচনা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য এবং এই প্রবন্ধে আমরা সেই বিষয় আলোচনা করিব।

আধুনা ফ্রান্সদেশের ইতিহাস, ইতর লোকদিগের অপরিমিত আধিপত্যেরই ইতিহাস উহা স্বাধীনতার ইতিহাস নহে, পক্ষান্তরে সেইরূপ ইংলণ্ডের ইতিহাস প্রকৃতরূপে স্বাধীনতারই ইতিহাস, ইতর লোকদিগের যথেচ্ছাচারের ইতিহাস নহে। রাজ্যের প্রাচীন তন্ত্র উচ্ছিন্ন না করিয়া কিরূপে সাধারণ প্রজাগণ নিজস্ব অধিকার ক্রমশঃ অর্জ্জন, রক্ষণ ও বর্দ্ধন করিয়াছে তাহা ইংলণ্ডের ইতিহাসে জাজ্বল্যরূপে প্রকাশ পায়। ইংলণ্ডের ইতিহাস সংস্কারের ইতিহাস, তাহা বিপ্লবের ইতিহাস

নহে।(১) ইংলণ্ডের ইতিহাস এক-নায়ক তন্ত্রের ইতিহাস, কিন্তু এই এক-নায়ক তন্ত্রের অধীনে প্রজাবর্গ সাধারণ-তন্ত্র-সুলভ সমস্ত স্বাধীনতাই অর্জ্জন করিয়াছে।(২) যে দেশে একরাজতন্ত্র,সম্ভ্রান্ততন্ত্র ও সাধারণ তন্ত্রের প্রণালী এরূপ ভাবে মিলিত করা হইয়াছে যে তাহা আর কুত্রাপি দেখা যায় না, সেই দেশের ইতিহাসের নামই ইংলণ্ডের ইতিহাস।(৩)

স্বয়ং প্রকৃতিই ইংলণ্ডকে বণিক ও নাবিকের আবাসভূমি করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইংলণ্ডদ্বীপে এই জন্য উহার অধিবাসীগণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই সমুদ্রের সহিত পরিচিত এবং উহার উপকূলে এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপসাগর, খাড়ি ও স্বাভাবিক বন্দর সকল অবস্থিত, যে তাহা নাবিকতার পক্ষে আশ্চর্য্য রূপ অনুকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভূগোল মধ্যে ইংলণ্ডের যেরূপ স্থান-সন্নিবেশ তাহাতে অনেক জাতির সহিত বিস্তৃত বাণিজ্য সম্বন্ধ হইবার সুগমতা আছে। ইংলণ্ড পূর্ব্বদিকে নেদরল্যাণ্ড ও উত্তর য়ুরোপের দিকে প্রসারিত, দক্ষিণ দিকে ফ্রান্স ও স্পেনদেশের উপকূলের নিকটবর্ত্তী, পশ্চিমদিকে বিশাল আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর, পৃথিবীর বাণিজ্য-পথ তাহার জন্য উন্মুক্ত রাখিয়াছেন।

ইংলণ্ডের বায়ু যদিও ফ্রান্সের ন্যায় তত সুমধুর নয়, কিন্তু উহা নাতি শীতোষ্ণ স্বাস্থ্যকর এবং বলপ্রদ। যদিও ইংলণ্ডের বায়ু পরিবর্ত্তনশীল, আর্দ্র এবং অনেক সময় দারুণ কষ্টপ্রদ কিন্তু তথাপি অতিরিক্ত শীত অতিরিক্ত গ্রীষ্ম হইতে একেবারে বিবর্জ্জিত। যে সকল বলবান জাতি বিভিন্ন সময়ে এদেশে আসিয়া বাস করিয়াছে, তত্তাবতেরই বল, শক্তি, উদ্যম উহার আব হওয়া গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে—এই উত্তরদেশীয় ভূমি আরাম ও বিলাসের আবাস-ভূমি রূপে সঙ্কল্পিত হয় নাই—উহা যুদ্ধ, শীকার, সাহস, কষ্ট, বলবিক্রম, মনুষ্য ও প্রকৃতির সহিত যুঝাযুঝি, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অটল বিশ্বাস, এবং পুরুষোচিত স্বাধীন ভাবের আবাস-স্থান রূপে সৃষ্ট।

ইংলণ্ডের মৃত্তিকা সাধারণতঃ উর্ব্বর।

(১) Il en est de meme dans tout le cours de l'histoire d'Angleterre: Jamais aucun element ancien ne perit completement, Jamais aucun element nouveau ne triomphe tout-a-fait, Jamais aucun principe special ne parvient a une domination exclusive. I ly a toujours developpement semultané des defferentes forces, transactions entre leurs pretentions et leurs interets—Guizot, Hist. de la Civ. 335.

(২) M. Thiers,speaking in the National Assembly,at Mersailles, on June 8.1871. declared thathe found greater liberty existing in London than in Washington.—Times,June 10, 1871. In a recent political satire, the constitutional monarchy has been irreverently described as a democratic republic, tempered by snobbism and corruption—Prince Florestan.

(৩) M. le Play says,England is patriarchal in the home, demorcratic in the parish, aristocratic in the country, and monarchical in the state—La constitution d'Angleterre. 1876.

যদিও ফ্রান্সের ন্যায় ইহার ক্ষেত্র সকল বিচিত্র প্রাচুর্য্যে ভারাক্রান্ত নহে তথাপি পশু-পালনের জন্য বিশেষতঃ অশ্বের বংশোন্নতির (horse-breeding) জন্য প্রসিদ্ধ। কৃষকের পরিশ্রম ও পটুতায় দিব্য ফসল উৎপন্ন হয় কিন্তু যেরূপ আমাদের দেশে প্রকৃতির বদান্যতার উপর আরামের সহিত সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করা যায়, সেখানে সে জো নাই। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিলে তবে কৃষক ফললাভ করিতে পারে। পল্লীগ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য সকল অতীব বিচিত্র এবং মনোহর, ক্ষুদ্র পর্ব্বত, উপত্যকা, বনভূমি, ঘূর্ণমান নদী, বিচিত্র বিচিত্র মাঠ, এবং বায়ু-সেবিত Downs ও Common, এই সকল সেখানকার বিশেষ লক্ষণ। যে জাতি গ্রাম্য জীবনের আরাম উপভোগ করিতে পারে ইংলণ্ডকে প্রকৃতি দেবী সেই জাতির উপ-যুক্ত আবাস করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এক জন ফরাসী নগরে থাকিয়া যেরূপ সুখী হয় এরূপ আর কোথাও হয় না,—এক জন ইংরাজ রাস্তায় মুমূর্ষু হইয়া পড়ে কিন্তু পর্ব্বত-পার্শ্বে, নদী এবং সমুদ্রের উপকূলের মুক্ত বায়ুতে যেন নূতন জীবন পায়, এবং ইংরাজদিগের এই চিরন্তন স্বাভাবিক পল্লী-প্রেম ইংলণ্ডের সমাজ ও রাজনৈতিক অবস্থার উপর বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

ইংলণ্ডের আর একটি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ তাহার খনিগর্ভ-ঐশ্বর্য্য—মৃদঙ্গার, লৌহ, টিন, দস্তা, তাঁবা প্রভৃতি ইংলণ্ডে যেরূপ প্রচুর এরূপ য়ুরোপের আর কোন দেশেই নহে। প্রকৃতি দেবী ইংলণ্ডকে যেমন একদিকে সমুদ্র-বাণিজ্যের জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন তেমনি আবার তাহাকে সর্ব্বপ্রকার শিল্পের আধার করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু বিনা পরিশ্রমে, বিনা কষ্টে, নিরাপদে এই খনিগর্ভ-ঐশ্বর্য্য লাভ করিবার জো নাই। যেরূপ সমুদ্র-গর্ভে সেই রূপ খনিগর্ভে নানা প্রকার ভয়ানক বিপদ; কি সমুদ্রে কি ভূগর্ভে ব্যবসায়ের উদ্দেশে তাহাদিগকে কতই না পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়, কতই না কষ্ট সহ্য করিতে হয়, এমন কি সময়ে সময়ে প্রাণ ও স্বাস্থ্য অকাতরে বিসর্জন করিতে হয়। আর দেখা যায় যে ইংরাজ-দিগের স্বাভাবিক শারীরিক বল ও দৃঢ়তা তাহাদিগকে য়ুরোপীয় সমস্ত শ্রমজীবী-দিগের মধ্যে প্রধান করিয়া তুলিয়াছে। এই প্রকার শারীরিক ও নৈতিক বল থাকা প্রযুক্তই বৃটিস জাতি সভ্যতা, সামা-জিক উন্নতি ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার দিকে ক্রমিকই স্থির ভাবে অগ্রসর হই-য়াছে ও হইতেছে।

রোমীয়দিগের রাজত্ব-কাল হইতে ইং-লণ্ড কি করিয়া ক্রমশঃ স্বাধীনতা শিখরে আরোহণ করিল তাহা সবিস্তরে বর্ণনা করিতে গেলে একটি বৃহৎ গ্রন্থ লিখিতে হয়, এই স্বল্পায়তন পত্রিকা তাহার উপযোগী নহে। এই উনবিংশতি শতা-ব্দির মধ্যে ইংলণ্ডে কি কি আন্দোলন উপ-স্থিত হইয়াছে ও তাহার ফল কি হইয়াছে তাহাই সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে বিবৃত করা

যাইতেছে। আমাদিগের এক্ষণে আন্দোলনের কাল উপস্থিত হইয়াছে। নানা বিষয়ের আন্দোলন করিয়া ইংলণ্ডে কিরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিবার ঠিক এই সময় উপস্থিত।

তৃতীয় জর্জের রাজত্বকাল হইতে ইংলণ্ড দ্রুতগতি উন্নতি-পথে অগ্রসর হইতেছে। আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন এবং নেদরল্যাণ্ডের বাণিজ্য হ্রাস হওয়া অবধি ইংলণ্ড নাবিকতা, বাণিজ্য এবং শিল্প কার্য্যে ক্রমাগত উন্নতি লাভ করিতেছিল। কিন্তু এই উনবিংশতি শতাব্দির আরম্ভ হইতে ইংলণ্ডের উন্নতি আরও জাজ্বল্যমানরূপে পরিলক্ষিত হয়। লোক-সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল(১) (প্রধানত নগর ও উপনগরে); কৃষি-বিদ্যা উৎসাহিত হইল এবং কৃষি-কার্য্য উন্নতি ও বিস্তৃতি লাভ করিল। কিন্তু বাণিজ্য ও শিল্প কৃষিকার্য্যকে ছাড়াইয়া উঠিল (২)। পূর্ব্বে ভূমিই ধনাগমের প্রধান উপায় এবং প্রজাবর্গের প্রধান উপজীবিকা ছিল, এক্ষণে ভূমির তত আদর অনেকটা খর্ব্ব হইল। অল্প সময় মধ্যে বিস্তৃত নগর উপনগর সকল সমুত্থিত হইতে লাগিল লণ্ডনের লোকসংখ্যা সমস্ত স্কটলণ্ডের সমান হইয়া উঠিল। Liverpool Manchester, Birmingham, Leeds, Sheffield এবং Glasgow বৃহৎ বৃহৎ রাজ্যের রাজধানীর ন্যায় প্রাধান্য লাভ করিল। সুতাকাটার কল (spinning jenny) এবং বাষ্পীয় যন্ত্রের আবির্ভাবে পশম এবং তুলা-জাত দ্রব্যের কারখানা সকল প্রভূত উদ্যম ও উত্তেজনা লাভ করিল এবং সেই সকল দ্রব্য ইংলণ্ড সমস্ত পৃথিবীকে যোগাইতে লাগিল। লৌহ প্রভৃতি ধাতু এবং যন্ত্রের কারখানায় খুব কাজ চলিতে আরম্ভ হইল। এই সকল শ্রমজ শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে খনি-খননের উন্নতি হইল।

খাল খনন দ্বারা নাব্য নদীর উন্নতি সাধন ও উৎকৃষ্ট রাজপথ নির্ম্মাণ এবং বাষ্পীয় শকট ও বাষ্পীয় পোতের আবির্ভাবে আভ্যন্তরিক গতিবিধি এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের যৎপরোনাস্তি সুবিধা হইল।

Arkwright Watt এবং Stephenson ইংলণ্ড ও পৃথিবীর শিল্পরাজ্যে মহাবিপ্লব আনয়ন করিয়া সমাজকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া তুলিলেন। ধনী সদাগর, পোতাধিকারী এবং কারখানাওয়ালারা ঐশ্বর্য্যে ও মান মর্য্যাদা বিষয়ে জমিদারদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। সহস্র সহস্র ব্যবসাদার উন্নতিশীল প্রজাগণের বিবিধ অভাব মোচন করিয়া ধনী হইয়া উঠিল এবং কৃষকের সংখ্যা অপেক্ষা শিল্পীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইল। সামাজিক পরিবর্ত্তনের এই খানেই সীমা নহে। ক্রমাগত মূলধন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় একদল স্বাধীন সম্ভ্রান্ত লোক এবং আর এক দল নূতন মধ্যম শ্রেণীর ভদ্র লোকের উৎপত্তি হইল। ইহাঁরা জমিদারও নহে বণিকও নহে; কিন্তু তথাপি রাজনৈতিক ক্ষমতা হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিবার জো নাই। Bath, Cheltenham, Leamington, Brighton, Hastings, এবং লণ্ডনের উপনগর সকল তাহাদিগের সংখ্যা ও ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্য প্রদান

(১) In 1801 the population of Great Britain was 10,942,854, in 1831, it had incrdasod to 16, 539, 378. Population Return of 18018 1831; Porter, Progres of the Nation. Chap I.

(২) In 1811,895, 998 families were employed in agriculture in Great Britain, and 129,049 in trade and manufactures; in 1831, 961,134, families were employed in the former aand 1,434,873 in the latter. In 1841, 14 80, 785 persons were employed in agriculture and 3,092,787 in trade and manufactures,—Porter, Chap 1.

করে। দেশের সাধারণ উন্নতিতে জমিদারগণও পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ধনী হইয়া উঠিল এবং তাহাদিগের পদোচিত কর্ত্তব্য সাধন পূর্ব্বক তাহাদিগের চিরাগত স্থানিক আধিপত্য রাখিয়া ছিল। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদিগের আর অবিসম্বাদিত প্রাধান্য রহিল না। এই সকল সামাজিক পরিবর্ত্তন ৪র্থ জর্জের রাজত্বকালে বিশেষ রূপে লক্ষিত হয়, এবং ইহা আবহমান কাল ক্রমাগত চলিতেছে। এই সময়ে সামাজিক উন্নতি অপেক্ষা রাজনৈতিক উন্নতি আরও জাজ্বল্যরূপে লক্ষিত হয়।

যেমন একদিকে বনিকদলের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া জমিদারদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইতে লাগিল তেমনি আবার রাজাধিষ্ঠিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের আর একাধিপত্য রহিল না। Restoration এর পর Puritan সম্প্রদায় একেবারে পদদলিত ও নির্ম্মূলিত হয়, এবং ১৯শ শতাব্দির প্রাক্‌কালে Non-confomists Churchmenদিগের ন্যায় নিদ্রাভিভূত হয়। পূর্ব্বকালের ভীষণ ধর্ম্ম-বিবাদের পর কিয়ৎকাল শান্তির অধিষ্ঠান হইল। তার পরে আবার Wesley এবং Whitfield একটি নূতন ধর্ম্ম-আন্দোলন উপস্থিত করিলেন।—প্রতিবাদ-সম্প্রদায় (Dissenters) দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। Wales রাজ্য-প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের প্রায় একেবারে অধিকারচ্যুতি হইল; কারখানাওয়ালা নগরের অসংখ্য অধিবাসীগণ প্রতিবাদী সম্প্রদায়ের দলভুক্ত হইতে লাগিল। এইরূপে রাজ্যপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমন্দির অপেক্ষা প্রতিবাদী সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমন্দিরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল। যদিও প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় স্বকীয় চিরাগত বৈধ অধিকার ও নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হয় নাই তথাপি সাধারণ প্রজাদিগের উপর আর তাহার একাধিপত্য রহিল না। তাহার পর Presbyterian সম্প্রদায় দলভুক্ত Scotland এবং ক্যাথলিক সম্প্রদায় ভুক্ত Irelandএর যখন সম্মিলন হইল তখন রাজ্যপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের পদবী আরও বিচলিত হইয়া উঠিল।

ভূমাধিকারী ও রাজ্যপালিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় উভয়ই উভয়ের চির-সহায়। এই উভয়েরই আধিপত্যের হ্রাস হইল। বিধর্ম্মীর অধিকার-চ্যুতি, সংকীর্ণ নির্ব্বাচন-প্রণালী, ভয়ানক কঠোর ফৌজদারি দণ্ড-বিধি, অসমান ও দুর্ব্বহ কর স্থাপন, বাণিজ্য ও সাধারণ প্রজাবর্গের খাদ্য সামগ্রী ও পরিশ্রম বিষয়ে নানা প্রকার হানিজনক ও বাধাজনক নিয়ম স্থাপন— এই সকল অত্যাচার ও কুনিয়ম এই উভয় দলের পরস্পর সহায়তায় বরাবর অবাধে চলিয়া আসিতে ছিল। এক্ষণে সমাজের রক্ষণশীল ও পরিবর্ত্তনশীল এই দুই দলের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল। পল্লীগ্রাম নগরের বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করিল এবং ক্যাথলিক ও সর্ব্বপ্রকার প্রতিবাদী খৃষ্ট সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে রাজ্যপালিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বদ্ধপরিকর হইল। বাহ্য সুখ সমৃদ্ধি ও সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাতিসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষারও উন্নতি হইতে লাগিল। পার্লামেণ্ট সভার বাদানুবাদ সকল সাধারণের নিকট মুক্তভাবে প্রকাশ করা তাহার একটি প্রধান কারণ বলিতে হইবে। দেশের সর্ব্ব সাধারণ লোক তাহাদিগের বাদানুবাদের ন্যায় অন্যায় বিচার করিবে এই ভরসায় সভার মধ্যে কোন সভ্য-দল সংখ্যায় হীন হইলেও সাহস পূর্ব্বক মন খুলিয়া তর্ক বিতর্ক করিতে পারিল। এই রূপে সর্ব্ব সাধারণ মতের একটি স্বতন্ত্র প্রভাব ও আধিপত্য সৃষ্ট হইল। এই সাধারণ মতের নিকট রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষ দলকেও নতশির হইতে হইল। যদি মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে আর

কোনও উপকার না হইয়া থাকে, অন্ততঃ এই উপকারটি হইয়াছে, মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। প্রজা সাধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি সম্বন্ধে মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা আরও অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। যদিও তখন নানা প্রকার কঠোর নিয়মে মুদ্রাযন্ত্র বদ্ধ ছিল, তথাপি উহার প্রভাব ক্রমশই বিস্তৃত হইতে লাগিল। সাধারণ সমাজ যেমন জ্ঞানানুশীলনে উন্নত হইতে লাগিল সেই সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক সাহিত্য-পত্র ক্ষেত্রে উচ্চ দরের লোক সকল আকৃষ্ট হইতে লাগিল। *

অধ্যাত্ম-বিদ্যার প্রথম প্রস্তাব।

যে বিদ্যা-দ্বারা আধ্যাত্মিক সত্য উপার্জ্জন করা যায় তাহাই অধ্যাত্ম-বিদ্যা নামের বাচ্য। আধ্যাত্মিক সত্য—কি না আত্মা-বিষয়ক সত্য। এ সত্য অনেকে জানিতে চাহেন না—তাঁহারা বলেন "তাহাতে কোন লাভ নাই, তা' চেয়ে ভৌতিক সত্য জানিলে তাহাতে অনেক ফল দর্শে। তাহাতে অন্ন বস্ত্র গৃহ এবং আর আর নানা বিধ উপকরণ সামগ্রীর উৎকর্ষ সাধনের উপায় আবিষ্কৃত হইতে পারে।"

উত্তর পক্ষ। "কিন্তু সে উৎকর্ষ সাধন কাহার জন্য?—যাহার জন্য এত কাণ্ড তাহাকে কি জানিতে ইচ্ছা করে না? অন্ততঃ সে স্থায়ী কি অস্থায়ী এটাও ত জানা প্রয়োজন। একটা বাড়ি যদি দৈবগতিকে তোমার অধিকারায়ত্ত হয়, তবে তাহার দলিল কাঁচা কি পাকা তাহা জানিতে কি তোমার ইচ্ছা হয় না? যদি জানিতে পার যে, দু দিন পরেই সে বাড়ির উপরে আর তোমার কোন স্বত্ব থাকিবে না তবে তাহার উৎকর্ষ সাধনে তোমার প্রবৃত্তি হয় কি?"

পূর্ব্বপক্ষ। "বাড়ির দলিল কাঁচা কি পাকা তাহা জানিতে ইচ্ছা হইলে হইবে কি? যতক্ষণ না দলিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় ততক্ষণ করা যায় কি? আপাততঃ বাড়ির উপর যে অধিকার-টুকু আমার বর্ত্তিয়াছে তাহাই যথালাভ মনে করিয়া সন্তোষ অবলম্বন করাই শ্রেয়; বাড়ির দলিল পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া যে বাড়ি পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করে সত্য,—যদি আমার চিরস্থায়িত্বের একটা পাকা দলিল পাওয়া যায়, তবে তাহার মত সুখের বিষয় আর কিছুই নাই। কিন্তু তাহা পাওয়া যায় কই? আত্মাকে জানিতে খুবই ইচ্ছা করে কিন্তু জানিতে পারা যায় কই?

উত্তর পক্ষ। জানিতে পারা যায় না কি? তুমি যে কোন বস্তু দেখো, শোনো, বা স্পর্শ কর তাহার সঙ্গে ত এটা জান যে তুমিই দেখিতেছ শুনিতেছ স্পর্শ করিতেছ? না তা'ও জান না?

পূর্ব্বপক্ষ। অনেক সময় বাহ্য বিষয়ে আমাদের মন এরূপ মগ্ন থাকে যে তখন আপনার প্রতি আমাদের আদবেই লক্ষ্য

* এই সময়ে Edinburgh Review Quarterly Review এবং Westminster Review প্রকাশিত হয়—ব্রুম, বেন্থাম, মিল প্রভৃতি বড়বড় লোক লেখক ছিলেন।

থাকে না, তখন আমরা আপনাকে ভুলিয়া থাকি; তবে আর কিরূপে বলিব যে, সে অবস্থাতেও বাহ্য-বিষয় জানিবার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে তাহার জ্ঞাতা বলিয়া জানিয়া থাকি? তখন ত বহির্বিষয়েতেই মন ষোলো আনা মগ্ন থাকে—আপনাতে এক আনাও ত অবস্থিতি করে না।

উত্তর পক্ষ। তাই কি ঠিক? তোমরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ভক্ত, পরীক্ষা না করিয়া কোন একটা কথা ঠিক কি অঠিক্ তাহা বলিতে চাও না—আন্দাজে কোন কথা বলিতে চাও না; আমারও সেই মত। তোমার ও-কথাটা একবার তৌল করিয়া না দেখিয়া তাহা যে, ঠিক্, তাহাও বলিতে পারি না, অঠিক্, তাহাও বলিতে পারি না; পরীক্ষায় যাহা দাঁড়াইবে তাহাই ঠিক। পরীক্ষায় কি দঁাড়ায় তাহাই দেখা যা'ক। তুমি অনন্য-মনে একটা উপন্যাস পাঠ করিতেছ—তোমার মতানুসারে সেই উপন্যাসের প্রতি তোমার মন ষোলো আনা, তোমার আপনার প্রতি এক আনাও নহে। তোমার মতানুসারে তুমি উপন্যাসই পাঠ করিতেছ কিন্তু তুমিই যে তাহা করিতেছ, তাহা তোমার মনের অগোচর। তাহার পরে পাঠ সাঙ্গ করিয়া তুমি যখন উঠিয়া আইলে তখন আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,

"ও ঘরে এতক্ষণ কে ছিল?"

উত্তর। "আমি ছিলাম"

প্রশ্ন। "তুমি কি করিতেছিলে?"

উত্তর। "আমি উপন্যাস পড়িতেছিলাম?"

প্রশ্ন। "তুমি না আর কেহ?"

উত্তর। "আর কেহ নহে আমিই পড়িতেছিলাম।"

প্রশ্ন। "তোমার বেস্ স্মরণ হইতেছে যে তুমি পড়িতেছিলে?"

উত্তর। "এই মাত্র আমি পাঠ সাঙ্গ করিয়া উঠিয়া আসিতেছি—স্মরণ আর হইবে না?"

এখন আমি জিজ্ঞাসা করি যে, যে কথা পূর্ব্বে কোন্ সময়েই জ্ঞানের গোচর ছিল না, তাহা কি পরে স্মরণে উদিত হইতে পারে? মনের অভ্যন্তরে জ্ঞাত-পূর্ব্ব বিষয়ের অনুবৃত্তির নামই না স্মরণ,—জ্ঞাত-পূর্ব্ব বিষয়ের সহিত সম্পর্ক রহিত স্মরণ কি কেহ কখন স্বপ্নেও অনুভব করিতে পারে? আজ আমার স্মরণ হইতেছে যে, গত কল্য আমি মধ্যাহ্ন-ভোজন করিয়াছিলাম কিন্তু ও-বৃত্তান্তটি গত কল্য আমার জ্ঞানের অগোচর ছিল—ইহাও কি কখন হইতে পারে? অতএব ইহা আর বলিয়া বুঝাইবার কথা নহে যে জানা-বিষয়েরই স্মরণ হয়, ও যত অধিক জানা বিষয় হয় তত তাহা অধিক স্মরণ-গম্য হয়, যত অল্প জানা বিষয় হয় তত তাহা অল্প স্মরণ-গম্য হয়, এ ভিন্ন ঐকান্তিক অজানা বিষয় কোন মতেই স্মরণ-গম্য হইতে পারে না। তবে,—তুমি উপন্যাস পাঠ করিতেছ কিন্তু তুমিই যে তাহা করিতেছ ইহা তোমার একেবারেই জ্ঞানের অগোচর, এ কথাটি পরীক্ষায় টেঁকিল না;—পরে যখন তোমার স্মরণ হইয়াছে যে তুমিই পাঠ করিতেছিলে, তখন, পাঠ-কালেও তোমার জ্ঞান ছিল যে, তুমিই পাঠ করিতেছ; কেন না স্মরণ নূতন কোন বিষয়ের কথা বলে না, পূর্ব্বে যাহা জানা হইয়াছে তাহাই পুনরাবৃত্তি করে মাত্র; পূর্ব্বে কোন কালে যদি সাক্ষাৎ জ্ঞান না হইয়া থাকে তবে স্মরণ কাহার কথা পুনরাবৃত্তি করিবে? যদি সূর্য্যই না থাকে তবে চন্দ্র কাহার জ্যোতি প্রতিফলিত করিবে? অতএব ইহা অকাট্য যে, যখনই আমরা কোন বিষয় দেখি বা শুনি বা কোন প্রকারে জানি, তখনই আমরা জানি যে, আমিই দেখিতেছি, শুনিতেছি, জানি-

তেছি—সকল জানার সঙ্গেই আত্ম-জ্ঞান (অর্থাৎ আপনাকে জানা) লাগিয়া থাকে। জ্ঞানের সহিত অন্য কোন বিষয় (যেমন হাতি বা ঘোড়া) যুক্ত থাকিতেও পারে বিযুক্ত থাকিতেও পারে; কিন্তু জ্ঞানের সহিত আত্মজ্ঞান নিরন্তরই যুক্ত রহিয়াছে,—তবে তুমি কেমন করিয়া বল যে, আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করে বটে কিন্তু জানিতে পারা যায় না। এ বস্তু যখন দেখিতেছ তখনও তুমি আপনাকে জানিতেছ যে, আমিই ইহার দ্রষ্টা; এ বস্তু না দেখিয়া যদি ও-বস্তু দেখ তখনও তুমি আপনাকে জানিবে যে, আমিই উহার দ্রষ্টা; যখন চক্ষু মুদিয়া কোন বস্তু চিন্তা করিতেছ তখনও আপনাকে ধ্যাতা বলিয়া জানিতেছ;—জ্ঞান-মাত্রেরই সঙ্গে আপনাকে নিরন্তর জানিতেছ;—তবে আর কোন্ লজ্জায় বল যে, আত্মা তোমার জ্ঞানের অগোচর,—সাত কাণ্ড রামায়ণ পাঠ করিয়া কোন্ লজ্জায় বল "সীতা কাহার ভার্য্যা?"

পূর্ব্ব পক্ষ। ভাল, পরীক্ষায় তোমারই কথা যেন বলবৎ রহিল, কিন্তু তাহা যদি হইল—জ্ঞান-মাত্রেরই সঙ্গে নিরন্তর আমরা আত্মাকে জানিয়া থাকি এ যদি সত্য হইল—তবে কেন মনে হয় যে, বাহ্য-বিষয়-সকল যেমন আমরা জানি আত্মাকে তেমনটি জানি না, এমন-কি এক এক সময়ে বাহ্য-বিষয়ের টানে পড়িয়া আপনাকে ভুলিয়া ছিলাম বলিয়াও মনে হয়।

উত্তর পক্ষ। ওরূপ যে হয় তাহার কারণ স্পষ্টই ত পড়িয়া আছে। বেশী-মাত্রা ঘনিষ্ঠতা অবজ্ঞার উৎপাদক (Familiarity breeds contempt)। আমরা যা' যখন জানি তা'রই সঙ্গে নাকি আত্মাকে জানি তাই আত্মজ্ঞান বিশেষ-কোন-কিছু বলিয়া আমাদের চক্ষে ঠেকে না। পঞ্চদশী-গ্রন্থে আছে যে এক-এক-জন করিয়া দশজন নদীর পরপারে নীত হইলে-পর প্রত্যেকে গণনা করিয়া নয়জন বই আর দেখিতে পাইল না—কেননা সকলেই আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছে। আর এক কথা এই যে, যখন তদ্গদ চিত্তে উপন্যাস পাঠ করা যায় তখন সেই উপন্যাসের প্রতি মনের বেগ ষোলো আনা না হউক—বেশী মাত্রা যায়, এজন্য মোটামুটি এক প্রকার বলিতে পারা যায় যে, আপনাকে তখন আমরা ভুলিয়া আছি। কিন্তু ধরিতে গেলে তখনও আপনার প্রতি আমাদের কতক না কতক মাত্রা মনের লাগ থাকেই থাকে; এমন কি উপন্যাসের নায়কের সঙ্গে আপনার সঙ্গে একাত্মা পাতানো হইয়া থাকে,—আর সেই গতিকে আমরা আমাদের সাংসারিক অবস্থা ভুলিয়া থাকি—সত্য বটে, কিন্তু তা' বলিয়া তখন ত আর আমরা আপনাকে একেবারেই ভুলিয়া নাই—কল্পনা-রাজ্যে তখন আপনাকে খুবই জাগ্রত দেখিতেছি। পাঠ সাঙ্গ হইলে উপন্যাস-হইতে মন যখন প্রত্যাবৃত্ত হয় তখন স্মৃতি-পটে, পঠিত উপন্যাস এবং পাঠক আপনি এ দুই জ্ঞান অপেক্ষা-কৃত সাম্যে পরিণত হয়; এজন্য তখন আত্মজ্ঞান অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতা প্রাপ্ত হয়; পূর্ব্বে নয় বারো আনা উপন্যাস-জ্ঞান চারি আনা আত্ম-জ্ঞান ছিল, এখন নয় আট আনা উপ-ন্যাস-জ্ঞান আট আনা আত্মজ্ঞান বা তাহার একটু এদিক্ ওদিক্ হইল—এই যা' কেবল; কিন্তু এমন কোন জ্ঞান হইতে পারে না যাহার সহিত একেবারেই আত্মজ্ঞানের কোন সংস্রব নাই।

ইহা হইতে আসিতেছে এই যে, তুমি আত্মাকে জান কিন্তু বলিতে চাহ না যে, তুমি জান; তোমার অভিপ্রায় এই যে, তোমার সে জানা অতি যৎসামান্য—তাহা কোন কাজের নহে। কিন্তু তোমার জানা উচিত যে মনুষ্য প্রথমে জঙ্গলা ভূমি পায়, পরে চাস আবাদ করিয়া তাহাকে সুন্দর

শস্য-ক্ষেত্র ও ফল-পুষ্পোদ্যানে পরিণত করে; লোকে জঙ্গলা ভূমিতে অধিকার পাইলে তাহাতে বড় যে একটা লাভ মনে করে তাহা নহে কিন্তু অভাব-পক্ষে তাহাই তাহার যথা-লাভ; কেন না সে জঙ্গলা-ভূমিকে মূল্যবান শস্য-ক্ষেত্র করিয়া তোলা তাহার আপনারই হাত। কেবল---তাহাতে যত্ন চাই। যে আত্মজ্ঞান অযত্ন-সুলভ তাহার মূল্য যে অতি সামান্য মনে হইবে ইহা কিছুই বিচিত্র নহে; বায়ু আমাদের সাক্ষাৎ জীবন, কিন্তু তাহার মূল্য আমাদের নিকটে কিছুই নহে,—কেন না তাহা অযত্ন-সুলভ; কোন কল-কৌশল দ্বারা যদি কোন স্থানের বায়ুকে এমনি নির্ম্মল করিয়া গড়িয়া তোলা যায় যে, সেখানে দিন দুই বাস করিলেই শরীর সকল-প্রকার ব্যাধি হইতে মুক্ত হয়,—তখন তাহার কত না মূল্য হয়!—কেন? না তখন তাহা প্রভূত যত্ন-সম্ভূত। আধ্যাত্মিক চর্চায় যত্ন অতি অল্প লোকের দেখা যায় বটে—শুধু কেবল এখনকার কালে নহে, সর্ব্ব কালেই,—প্রাচীন কালের ভগবদ্গীতা বলেন

"মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে"

সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে একজন যদি কেহ যত্ন করে—তাহার অধিক নহে। কিন্তু যত্ন করিলে যে, কিছুই ফল লাভ হইবে না এ কথা কথাই নহে। এ বিষয়ে রামমোহন রায়ের আমলের একটি গান আছে,

চিত্ত ক্ষেত্র পবিত্র করিয়ে ওরে মন
আত্মা-উপাসনা বীজ কররে বপন।
প্রযত্ন-সেচনী ধরি, বিবেক বৈরাগ্য বারি
প্রাণ-পণে প্রতিক্ষণে কররে সেচন।
হবে বৃক্ষ মোক্ষময় নিত্যজ্ঞান ফলোদয়
নিশ্চিত অমৃত লাভ সে ফল ফলিলে;
ইহাতে হইলে মতি ঘুচিবে দুঃখ দুর্গতি
পাইবে পরম গতি, নিত্য সুখী হবে মন॥

আত্ম-উপাসনা শব্দের অর্থ এখানে পরমাত্মার উপাসনা—কিন্তু চিত্ত-ক্ষেত্র পবিত্র করা তাহার একটি প্রধান আয়োজন এবং তাহা করিতে হইলে আত্মার প্রতি দৃষ্টি চাই। চিত্রক্ষেত্র পবিত্র করা কাহাকে বলে? না আত্মাকে বিষয়ের আধিপত্য হইতে মুক্ত করা, বিষয়াকর্ষণকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আত্মাকে সিংহাসনস্থ করা। আমরা যদি জাগ্রত জীবন্ত আত্মার ন্যায় কার্য্য করি তাহা হইলেই জাগ্রত জীবন্ত আত্মা বলিয়া আপনাকে জানিতে পারি;—তাহাতে আমরা যত কৃতকার্য্য হইব ততই আমাদের আত্মজ্ঞানে মূল্য বর্দ্ধিবে—তখন আর আত্মজ্ঞানকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইবে না। এখন যে, আত্মজ্ঞানকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়, সে কেবল—দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা জানা যায় না—এই গতিকে; কেননা আমাদের আত্মজ্ঞান যদি চলিয়া যায় তবে আমাদের কোন জ্ঞানই থাকে না, কিছুই থাকে না। ইহা হইতে পাওয়া যাইতেছে এই যে, সুপরিস্ফুট আত্মজ্ঞান যত্ন-সাপেক্ষ—কাল-সাপেক্ষ, কিন্তু তা বলিয়া তাহা আমাদের ক্ষমতা বহির্ভূত বা অধিকার-বহির্ভূত নহে, আর অপরিস্ফুট আত্মজ্ঞান অযত্ন-সুলভ জঙ্গলা ভূমি বটে কিন্তু তা বলিয়া তাহা অকিঞ্চিৎকর ত্যাজ্য বস্তু নহে।

রাজসূয়যজ্ঞ।

রাজসূয় যজ্ঞে সাধারণের অধিকার নাই। ইহা গুণবান, বলবান, ধনবান ক্ষত্রিয় রাজা ভিন্ন অন্যের অসাধ্য। কি প্রকার গুণসম্পন্ন রাজা এ যজ্ঞের অধিকারী হইতে পারেন, তাহা মহাভারতের সভা-পর্ব্বে সবিস্তরে বর্ণিত আছে।

শতপথব্রাহ্মণে এই যজ্ঞের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। তন্মধ্যে ইহার প্রধান অঙ্গ ইষ্টি, পশু, সোম, ও দর্ব্বী হোম। অগ্রে পবিত্র নামক সোম-যাগ, পরে অভিষেচ-নীয় যাগ, তৎপরে দশপেয় যাগ, অনন্তর কেশবপনীয়, তদনন্তর ব্যুষ্টি, তৎপরে দ্বিরাত্র এবং অবশেষে ক্ষত্রধৃতি নামক যাগ।

এই সাতটী যজ্ঞের সমষ্টিই রাজসূয়। "যো রাজসূয়েন যজতে দেবসৃষ্টোবা এষ যজ্ঞ ক্রতুঃ—"ইত্যাদি ক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ কাণ্ডে বিবৃত আছে। এতদনুসারে কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে রাজসূয়ের বিশেষ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। যথা—

"রাজ্ঞোরাজসূয়ঃ (১) অর্থাৎ রাজসূয় যজ্ঞে রাজারই অধিকার। "অনিষ্টিনো বাজ পেয়েন"। (২) যিনি বাজপেয় নামক যজ্ঞ করেন নাই তিনি এই যজ্ঞের অধি-কারী। "ইষ্টিসোমপশবো ভিন্নতন্ত্রাঃ কাল ভেদাৎ"। (৩) আনুমতি প্রভৃতি ইষ্টি নামক যাগ, পবিত্র নামক সোম যাগ, পশু যাগ, এই যজ্ঞে ভিন্ন ভিন্ন কালে বিহিত আছে। ইত্যাদি—

আপস্তম্বসূত্রে ইহার বিস্পষ্ট বিধি আছে। "রাজা স্বর্গকামোরাজসূয়েন যজেত" অর্থাৎ স্বর্গকামী রাজা রাজসূয় নামক যজ্ঞ করিবেন।

অথর্ব্ববেদের বৈতানসূত্রে সপ্তম অধ্যায়ের প্রারম্ভে ১৩টী সূত্র দ্বারা ইহার সংক্ষিপ্ত ক্রম নির্ণীত আছে। যথা—

"অথ রাজসূয়ঃ" (১) "তৈষ্যাঃ পুরস্তাৎ পবিত্রঃ" (২) পৌষী পূর্ণিমার পূর্ব্বে পবিত্র নামক সোমযাগ। "মাসান্তরেষু দশসং-সৃপঃ" (৩) মাসান্তরে দশসংসৃপ নামক কার্য্য। "মাঘ্যা অভিষেচনীয়ঃ" (৪) মাঘী পূর্ণিমায় অভিষেচনীয় যাগ। "মরুত্বতীয়া-দ্বার্হস্পত্যোষ্টিঃ" (৫) মরুত্বতীয় নামক কা-র্য্যের পর বৃহস্পতিসব নামক যাগ। "হবির্ধানয়োঃ পুরস্তাদ্বৈয়াঘ্রং চর্ম্ম" (৬) হবির্ধান নামক মণ্ডপের সম্মুখে ব্যাঘ্র চর্ম্ম স্থাপন। ইত্যাদি—

ফলতঃ এই যজ্ঞে বেদবিহিত হোম ও বলিদানাদি দ্বারা দেবগণের পূজা, দ্যূত ক্রীড়া, দিগ্বিজয়, শুনঃশেফীয় উপাখ্যান

শ্রবণ, * পঞ্চ বিধ সোম যাগ, † প্রভৃতি অনেক গুলি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইত। সুতরাং ইহা বহুদিন-সাধ্য।

"পবিত্র" নামক সোমযাগটী ইহার প্রথম অঙ্গ। ইহা বিধানানুসারে সমাপ্ত হইলে "চাতুর্মাস্য" যাগ করিতে হয়। পরে "দেবিকা" নামধেয় "ইষ্টির" অনুষ্ঠান, তৎপরে "অরত্নিহোম" নামক হোম করিতে হয়। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যাগ-স্বতন্ত্র প্রস্তাবে বিবৃত করা যাইবে। তৎপশ্চাৎ "অভিষেচনীয়" নামক সোম যাগ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ‡ এই দিবসে সমুদ্র, নদ, নদী, পুণ্য সরোবর, পুণ্য হ্রদ, এবং বিবিধ তীর্থ হইতে জল আনীত হইয়া, তদ্দ্বারা চারি প্রকার কাষ্ঠময় পাত্র মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক প্রপূরিত করা হয়। পাত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে একটী পলাশ কাষ্ঠের, একটী উডুম্বর কাষ্ঠের, একটী অশ্বত্থ কাষ্ঠের এবং একটি বট কাষ্ঠের দ্বারা গঠিত। এই তীর্থ-জল-পরিপূরিত চারিটা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত কলস চাতুর্বর্ণ্য সভার চারিদিকে স্থাপিত করা হয়। *

সভার মধ্যস্থানে খদির কাষ্ঠের অথবা উডুম্বর কাষ্ঠের মঞ্চ, তাহা ব্যাঘ্রচর্ম্মের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং তদুপরি সুবর্ণ-নির্ম্মিত ফলক বা পীঠ ন্যস্ত করিয়া তাহার উপরে সহস্র-ছিদ্রযুক্ত এক সুবর্ণ কলস (অভিষেকের নিমিত্ত) স্থাপন করা হইত।

অনন্তর "ব্রহ্মা" নামক পুরোহিত যজমানকে আগ্নীধ্র মণ্ডপের বাহিরে আনিয়া কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করাইতেন। সে সকল মন্ত্র কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ১ কাণ্ডীয় ৮ প্রপাঠকের ১২ অনুবাকে উক্ত আছে। তাহার একটী মন্ত্র এই——

মাভৃত মাস্বস্তঃ ক্ষত্রস্যোল্বমসি ক্ষত্রস্য যোনিরস্যাবিন্নো অগ্নির্গৃহপতিরাবিন্ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবা আবিন্নঃ পূষা বিশ্ববেদা আবিন্নৌ মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাবাবিন্নে। ইত্যাদি

* এই উপাখ্যান ঋগ্বেদে আছে। তাহা পুনরায় ব্যাসদেব মহাভারতে বিস্তার রূপে বর্ণন করিয়াছেন।

† পবিত্র, চাতুর্ম্মাস্য, দেবিকা, অরত্নিহোম এবং অভিষেচনীয়।

‡ এই দিবসে অর্ঘ দ্বারা সমাগত রাজগণের সৎকার করা হয়। ইহা "ততোঽভিষেচনীয়েঽহ্নি ব্রাহ্মণা রাজভিঃ সহ। অন্তর্বেদীং প্রবিবিশুঃ সৎকারার্হা মহর্ষয়ঃ।" ইত্যাদি ক্রমে সভা পর্ব্বীয় অর্ঘ্যাহরণ পর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষেই শিশুপাল বধ হইয়াছিল।

* রাজসূয় সভায় চারি বর্ণেরই আগমন হইত। মহাভারতের বর্ণনা দৃষ্টে বোধ হয় বর্দ্ধিষ্ণু ও অন্ত্যজ বর্ণেরাও সভায় প্রবেশ করিত। যথা—"আমন্ত্রয়ধ্বং রাষ্ট্রেষু ব্রাহ্মণান্ ভূমিপানথ। বিশশ্চ মান্যান্ শূদ্রাংশ্চ সর্ব্বানানয়তেতি চ।" পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মহাত্মা সহদেবকে অনুমতি করিলেন, তিনি "রাজ্যস্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং মানার্হ শূদ্র সকলকে আমন্ত্রণ কর এবং আনয়ন কর" ইহা বলিয়া দিয়া দেশে দেশে দূত প্রেরণ করিলেন।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, অগ্নি যেমন যজ্ঞের দ্বারাই গৃহপতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইন্দ্র যেমন যজ্ঞের দ্বারা পূর্ণকীর্ত্তি হইয়াছেন, পুষাদেব যেমন সর্ব্বশিল্পজ্ঞানী, মিত্রাবরুণ নামক দেবতাদ্বয় যেমন সত্যসন্ধ, পৃথিবী যেমন ধারণ-শক্তি-সম্পন্না এবং অদিতি যেমন সর্ব্বদেবস্বরূপিণী অর্থাৎ সর্ব্বদেব-মাতা হইয়াছেন, সেইরূপ অমুক রাজার পুত্র, অমুক রাজার পৌত্র, অমুক নামা এই যজমান এই যজ্ঞের দ্বারা এই রাজ্যের সমস্ত প্রজার উপর মহাধিপত্য ও মহারাজ্য প্রাপ্ত হইলেন এবং এই রাজ্যের মধ্যে মহাকুলত্ব লাভ করিলেন।

স্বর সহকারে মন্ত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে পর, রাজা তাঁহার অভিপ্রেতার্থ প্রকাশ করত বলিতে থাকেন যে, "যজ্ঞফলদাতুঃ পরমেশ্বরস্য প্রসাদফলমিতি ভবন্তাঃ সূচয়ামি নত্বহং গর্ব্বোক্তিং ভনামীতি বিদন্তু ভবন্তঃ" অর্থাৎ আমি গর্ব্বোক্তি করিতেছি না। ইহা যজ্ঞফলদাতা পরমেশ্বরের অনুগ্রহের ফল, আমি ইহাই আপনাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি।

যাগপ্রবৃত্ত রাজা এইরূপ বলিলে, ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্ সভাস্থ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ব্যক্তি সমূহকে সম্বোধন করিয়া বলিতে থাকেন,—"ভো ভারতাঃ অয়ং বঃ সর্ব্বেষাং রাজা সোমোঽস্মাকং ব্রাহ্মণানাং রাজা।" হে ভারতবাসিগণ। ইনি আপনাদের সকলেরই রাজা, সোম (লতা) আমাদের সকল ব্রাহ্মণের রাজা। †

অনন্তর রাজা দিগ্বিজয়ার্থ গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন ‡ সমস্ত ঋত্বিক একত্রিত হইয়া যজমানের সর্ব্বত্র রক্ষা এবং জয়াশীর্ব্বাদ-সূচক বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। অগ্রে অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে হোম, পরে তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা, তৎপরে আশীর্ব্বাদ ও দেবতা-প্রসন্নতাবোধক কতিপয় বেদমন্ত্র জপ করেন।

এই কার্য্যের পর যজমান পত্নী-সমভিব্যাহারে পূর্ব্বোল্লিখিত স্নানপীঠে উপবিষ্ট হন। পরে "অধ্বর্য্যু" প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সভাবর্গ একত্রিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত জলপূর্ণ পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক এক সহস্রছিদ্র অভিষেক-পাত্র দ্বারা তাঁহাকে অভিষেক করিতে থাকেন। এই অভিষেকের কতকগুলি বৈদিক মন্ত্র আছে, অনাবশ্যক বিধায় তাহা এস্থানে উদ্ধৃত করা হইল না।

অভিষেক সমাপ্ত হইলে রাজা বিভব অনুসারে, বস্ত্র, মালা, ও আভরণে ভূষিত হইয়া, যদি শত্রু থাকে তবে তাহাকে জয় করিতে ইচ্ছুক হন এবং যে দিকে তাঁহার

---

† ইহাতে একটি গূঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে, রাজা রাজসূয় যজ্ঞ দ্বারা সকল প্রজার উপর আধিপত্য লাভ করিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাঁহার অধীনত্ব স্বীকার করিলেন না এবং তাহাই তাঁহারা কৌশল দ্বারা সভাস্থলে ব্যক্ত করিলেন।

‡ দিক্ সকল যদি পূর্ব্ব হইতে বিজিত থাকে, তবে এখন কেবল ইচ্ছা মাত্র প্রকাশ করা হয়, অবিজিত থাকিলেই তাহার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে; যুধিষ্ঠির পূর্ব্বেই দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন।

শত্রু বাস করে, সেই দিক লক্ষ্য করিয়া সসৈন্যে গমন করেন। যুদ্ধ ঘটিলে তাঁহাকে জয় করিয়া মহাসমারোহে নিজ রাজধানীতে আগমন করেন। (শত্রু না থাকিলে এই প্রয়াণ কার্য্যটীর অনুষ্ঠান হয় না)।

অনন্তর সভার চতুর্দ্দিকে পংক্তি ক্রমে মঞ্চ সকল বিন্যস্ত করা হয়। মধ্যস্থলে এক উন্নত সুবর্ণ পীঠ স্থাপন করা হয়। রাজা সেই সৌবর্ণ মঞ্চে উপবিষ্ট হন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উন্নত বিভিন্ন বর্ণেরা যথাযোগ্য নিম্নতন প্রদেশে উপবেশন করেন এবং তাঁহার বিজয়-প্রশস্তি বা যশোগান করিতে থাকেন। এই সময়ে দ্যূতক্রীড়া করিবার বিধান আছে। ইহার পর "অন্ন"।

এবম্প্রকারের রাজসূয় যজ্ঞটী যেমন পবিত্র নামক সোম যাগ দ্বারা আরম্ভ হয়, সেইরূপ সৌত্রামনী নামক অপর একটী যাগ দ্বারা সমাপ্ত করা হয়। এই সৌত্রামনী যাগের বিধি ব্যবস্থা কল্পসূত্রে আছে। সাধারণ সোমযাগ অপেক্ষা ইহাতে বিশেষ এই যে অশ্বিনীকুমার, সরস্বতী, সুত্রামা এবং ইন্দ্র ইহার প্রধান দেবতা। কাষ্ঠনির্ম্মিত তিনটী "সোম-পাত্র" এবং মৃত্তিকানির্ম্মিত তিনটী "সুরা-পাত্র"।

পিতৃউদ্দেশে যাগ এবং যাগের পর সুরাপান বিহিত আছে। "সৌত্রামন্যাং সুরাং পিবেৎ" এই শ্রুতিবাক্য সফল করিবার নিমিত্ত সুরা পান করা হইত, আমোদ উপভোগের নিমিত্ত নহে।

পূর্ব্বকালের রাজারা এইরূপ রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া আত্মাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান এবং সম্রাট-উপাধি ধারণ করিতেন। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ও এবম্বিধানে সমাপ্ত হইয়াছিল। ইহার অভ্যন্তরে "অর্ঘ্যাহরণ" "সমাগত সৎকার" "রাজার্হনা" প্রভৃতি যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে বাহুল্য ভয়ে গ্রথিত করা হইল না।

অশ্বমেধ।

রাজসূয় অপেক্ষা অশ্বমেধ যজ্ঞটী সমধিক প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ, ঋগ্বেদসংহিতা যাহা ভট্টমোক্ষমূলার দ্বারা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে রাজসূয়ের কোন প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু অশ্বমেধের প্রসঙ্গ আছে। *

বস্তুতঃ আদিমতম কালে এ সকল যজ্ঞের প্রচার ছিল না, শ্রৌত কালেই এ সকল আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই জন্যই পৌরাণিক কালের ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন "তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং যজ্ঞমুচ্যতে"।

রাজসূয়ের ন্যায় অশ্বমেধেও রাজা ভিন্ন অন্যের অধিকার নাই। শুক্ল যজুর্ব্বেদের শতপথব্রাহ্মণের উত্তর ভাগগত পাঁচটি অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত আছে। ১৩ প্র, ১, ৩, ৮=১,

* "অশ্বমেধস্য দানাঃ সোমা ইব আশিরঃ"

"ইন্দ্রাগ্নী শতদাব্যাশ্বমেধে সুবীর্য্যং"

ব্রাহ্মণে "প্রজাপতিরশ্বমেধমসৃজত।" প্রজাপতি অশ্বমেধ যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছেন। "প্রজাপতিরকাময়ত অশ্বমেধেন যজেয়মিতি" প্রজাপতি ইচ্ছা করিলেন, আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব। "রাজা বা এষ যজ্ঞানাং যদশ্বমেধঃ।" এই যে অশ্বমেধ, ইহা সকল যজ্ঞের রাজা, ইত্যাদি মন্ত্রে, ক্রমে অশ্বমেধ যজ্ঞের উৎপত্তি, ইতিহাস, ইতিকর্ত্তব্যতা, এবং তাহার ফল প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এতদনুসারেই অথর্ব্ববেদীয় বৈতান সূত্র রচিত হইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণ যেরূপ ক্রমে বলিয়াছেন, বৈতানসূত্রেও সেই রূপ ক্রমে লিখিত আছে। যথা——সপ্তমাধ্যায়ে "অথাশ্বমেধঃ। ১৪। ফাল্গুন্যা ব্রহ্মৌদনমুদ্ধাতৃ চতুর্থেভ্যোদদাতি। ১৫। হুতায়াং প্রাতরাহুতৌ ব্রহ্মণে বরম্। ১৬। আগ্নেয়ীষ্টিঃ পৌষ্ণী চ। ১৭। বাতরংহা ভবত্যশ্বম্ নিযুজ্যমানমনুমন্ত্রয়তে। ১৮। ইত্যাদি ২।

কাত্যায়নীয় শ্রৌত সূত্রের বিংশতি তম অধ্যায়েও এই যজ্ঞের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। উপাধ্যায় কর্কাচার্য্য তাহার উত্তম বৃত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন। "রাজ যজ্ঞোঽশ্বমেধঃ সর্ব্বকামস্য।" এইটীই তাহার প্রথম সূত্র। অত্র কর্কাচার্য্য—"রাজশব্দোঽভিষেকবতি ক্ষত্রিয়ে বর্ত্তত ইত্যুক্তং প্রদেশান্তরে। তথাচ ক্ষত্রিয়যজ্ঞং যদশ্বমেধঃ (১৩, ৪, ১, ২) তস্মাদ্রাষ্ট্র্যশ্বমেধেন যজেতেতি (১, ৬, ৩) রাজ্ঞো যজ্ঞঃ রাজযজ্ঞঃ ন ব্রাহ্মণবৈশ্যয়োরিতি। অশ্বমেধ ইতি ত্রিরাত্রস্য যজ্ঞক্রতোর্নামধেয়ম্। স সর্ব্বকামস্য ভবতি"। ইত্যাদি।

অর্থাৎ রাজ শব্দের অর্থ অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়। অশ্বমেধ তাহাদেরই যজ্ঞ, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের নহে। "অশ্বমেধ" এই শব্দটী যজ্ঞ বিশেষের নাম, অশ্ব থাকাতে নামের সার্থক্যও আছে। ইত্যাদি।

যাহা এই যজ্ঞের প্রধান অংশ তাহাই এস্থলে শতপথব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় যজুঃসংহিতা, বৈতান সূত্র, কাত্যায়ন সূত্র ও জৈমিনীয়াশ্বমেধ, এই সকল গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিলাম। উল্লিখিত গ্রন্থনিচয় হইতে উহার ক্রম-পরিপাটী ও প্রধান প্রধান দ্রব্য ও দেবতার বিষয় সংক্ষেপে পরিচয় প্রদান করিতেছি।

এই যজ্ঞের প্রধান পশু অশ্ব। তদ্ভিন্ন ছাগ প্রভৃতি অন্যান্য পশুও এই যজ্ঞে আবশ্যক হইয়া থাকে। যজ্ঞমণ্ডপের দ্বারদেশে এক বিংশতি যূপ উচ্ছ্রিত করা হয়।*

এই সকল যূপের মধ্যবর্ত্তী যূপস্তম্ভে যজ্ঞীয় অশ্ব বন্ধন করা হয়। অন্যান্য পশু অন্যান্য যূপে আবদ্ধ করা হয়। অনন্তর কএকটী বেদমন্ত্রের দ্বারা সেই যজ্ঞীয় অশ্বের

* কৃষ্ণ যজুঃ সংহিতায় ১ কাণ্ডের ৪ প্রপাঠকে ৪৫ অনুবাকের ভাষ্যে লিখিত আছে "এক যূপো বৈকাদশিনী বা অন্যেষাং যজ্ঞানাং যূপা ভবন্তি। এক বিংশিনাশ্বমেধস্য" ইত্যাদি। অর্থাৎ অন্যান্য যজ্ঞে এক অথবা একাদশ যূপ, কিন্তু অশ্বমেধে একবিংশতি যূপ আবশ্যক হয়।

সংস্কার সমাধা করিয়া যথেচ্ছ সঞ্চরণের নিমিত্ত তাহাকে মহারাজের আজ্ঞা ক্রমে মুক্ত করা হয়। রক্ষার নিমিত্ত অস্ত্রশস্ত্রধারী বীর রাজকুমারগণ তাহার অনুগমন করেন। যাঁহারা অশ্বরক্ষক হন, মহারাজা তাঁহাদিগের প্রতি এইরূপ অনুজ্ঞা করেন—তোমরা এই অশ্বকে বাড়বানল, দাবানল, জল, বিবিধ সঙ্কট স্থান হইতে সাবধানে রক্ষা করিবে। এ যখন পররাজ্যে সঞ্চরণ করিবে তখন যদি কোন রাজা ইহাকে নিরুদ্ধ করে, তবে তোমরা তাহাকে পরাজয় করিয়া অশ্বের উদ্ধার করিবে। যে যে ইহার বিরোধী হইবে, তোমরা তৎক্ষণাৎ তাহাদের প্রতিবিধান করিবে। যজ্ঞাশ্ব রক্ষা করার ফল আছে, যাও, তোমাদের কুশল হউক।"

অনন্তর রাজকুমারেরা সকল দিকেই অশ্বকে সঞ্চারিত করিয়া পুনর্ব্বার যজ্ঞস্থানে আনয়ন করেন। এই কার্য্যে অন্যূন ছয় মাস, অনধিক এক বৎসর কাল অতিবাহিত হয়। এক বৎসরের মধ্যে ফিরিয়া আসাই বিধি, বিঘ্নক্রমে অধিক কাল হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যজ্ঞ সমাপ্ত করিতে হয়। যিনি রাজাধিরাজ মহারাজ ক্ষত্রিয়চূড়ামণি, তিনিই এই যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার প্রতাপবলে ইহা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। অশ্ব ফিরিয়া আসিলে সংজ্ঞপন ধর্ম্মে তাহাকে বধ এবং হোমকার্য্য সমাপ্ত করা হয়।

জৈমিনীয়াশ্বমেধ গ্রন্থে এতৎ সম্বন্ধে যেরূপ বিধি ব্যবস্থা আছে, তাহাও এস্থলে প্রদান করিতেছি।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ব্রাহ্মণাঃ কতিসংখ্যাকাঃ দক্ষিণা কীদৃশী ক্রতৌ।
হয়শ্চ কীদৃশো ভাব্যস্তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥৩৮

ব্যাস উবাচ।

দ্বিজা বিংশতিসাহস্রা মখাদৌ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ।
কুলীনাঃ সম্মতাঃ প্রাজ্ঞা বেদশাস্ত্রার্থপারগাঃ।
একৈকস্মৈ দ্বিজায়াত্র দক্ষিণাং প্রবদামি তে।৩৯
একোগজো রথশ্চৈকোহয়শ্চৈকঃ সকাঞ্চনঃ।
প্রত্যেকং গোসহস্রঞ্চ রক্তপ্রস্থং সকাঞ্চনম্। ৪০
ভারশ্চ কাঞ্চনস্যোকঃ প্রদেয়া দক্ষিণা মখে।
যস্মিন্ দিনে হয়ো রাজন্ মুচ্যতে প্রথমাহিসা। ৪১
দক্ষিণা কথিতা রম্যা তুরগং কথয়ামি তে।
গোক্ষীরসমবর্ণঞ্চ কুন্দেন্দুহিমসন্নিভম্। ৪২
পীতপুচ্ছং শ্যামকর্ণং সর্ব্বতোগতিমুত্তমম্।
শ্যামঞ্চাপি মহীপাল যজ্ঞেহস্মিন্ তুরগং বিদুঃ। ৪৩
চৈত্র মাসস্য রাকায়াং মোচ্যোহয়ং তুরগো নৃপ।
বর্ষমাত্রং রক্ষণীয়ঃ সর্ব্বযোধৈ র্মহাবলৈঃ।৪৪
পুত্রো বা বান্ধবঃ শূরো রক্ষণার্থং নিযুজ্যতে।
স্বয়ং যঃ কুরুতে যজ্ঞ মসিপত্র ব্রতং চরেৎ।৪৫
নিয়তঃ সচ রাজেন্দ্র নাত্র কার্য্যা বিচারণা।

ইষ্টভোগান্ বর্ষমাত্রং সেবন্ নারীবির্জ্জিতান্। ৪৬

একত্র শয়নং কার্য্যং পত্ন্যা সহ নরাধিপ।
যাবদাগমনং তস্য পুনরেব প্রজাপতে। ৪৭
তাবৎ প্রযত্নবান্ কর্ত্তা নিবসেৎ ধৈর্য্যসংযুতঃ।
হয়ঃ পুরীষং মূত্রংবা কুরুতে যত্র যত্র চ।৪৮
গোসহস্রং প্রদেয়ংহি কর্ত্তব্যংহবনং দ্বিজৈঃ।
পূজনীয়াশ্চ তে বিপ্রা দক্ষিণাভির্ন সংশয়ঃ।৪৯
ললাটে তুরগস্যাপি পত্রং সংলিখ্য কাঞ্চনম্।
বদ্ধা স্বনামসংযুক্তং স্বপ্রতাপ সমন্বিতম্। ৫০
কথনীয়মিদং বাক্যং ময়ায়ং তুরগোত্তমঃ।
বিমুক্তোস্তি নৃপঃ কশ্চিৎ প্রতিগৃহ্লাতু চেৎ বলী। ৫১
যস্তু তং প্রতিগৃহ্লাতি স জেতব্যো বলাৎ স্বয়ম্।
অনেন বিধিনা বীর ক্রতুরেষ প্রজায়তে।৫২
অসিপত্রব্রতযুতো বহুপুণ্যফলপ্রদঃ।
এবমেব পুরা শক্রশ্চক্রে হয়ক্রতোঃ শতম।৫৩

(ইতি প্রথম অধ্যায়ঃ॥)

যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন এই (অশ্বমেধ) যজ্ঞে কতগুলি ব্রাহ্মণ, কিরূপ দক্ষিণা এবং কি প্রকার অশ্ব আবশ্যক হয় তাহা বিশেষ করিয়া কীর্ত্তন করুন। ৩৮

ব্যাস কহিলেন এই যজ্ঞে বিংশতাধিক সহস্র ব্রাহ্মণের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহারা সৎকুলসম্ভূত, সকলের মান্য, প্রাজ্ঞ, এবং বেদশাস্ত্রে পারগ। এই যজ্ঞে প্রত্যেকের উদ্দেশে যেরূপ দক্ষিণা বিহিত আছে তাহা বলিতেছি। ৩৯

এক হস্তী, এক রথ, এক কাঞ্চনভূষিত অশ্ব, সহস্র গো, (অথবা মূল্য) প্রস্থ-পরিমিত কাঞ্চনান্বিত রত্ন, এবং কেবল সুবর্ণও দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়। মহারাজ! যে দিনে অশ্ব ত্যাগ করা হয়, সেই দিনের দক্ষিণা প্রথম দক্ষিণা। ৪১

হে মহীপাল! এই যজ্ঞে দক্ষিণার কথা বলা হইল, এক্ষণে মনোজ্ঞ অশ্বের কথা বলিতেছি। দুগ্ধ, কুন্দফুল, কিংবা চন্দ্ররশ্মির সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট, পীতপুচ্ছ, শ্যামবর্ণ, সর্ব্বপ্রকার ও উত্তম গতিশক্তিসম্পন্ন অশ্ব আবশ্যক হয়। শ্যামবর্ণ অশ্ব হইলেও হানি নাই। ৪৩

রাজন্! চৈত্রী পুর্ণিমা তিথিতে অশ্ব মোচন করিতে হয়। এক বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধবিশারদ মহাবল ক্ষত্রিয় সমূহ দ্বারা তাহার রক্ষা করিতে হয়। ৪৪

পুত্র কি অন্য কোন শূর বান্ধবকে অশ্ব রক্ষার্থে নিযুক্ত করিয়া যজ্ঞকর্ত্তা স্বয়ং "অসিপত্র" ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন। হে রাজেন্দ্র! সংযত থাকিয়া এই কার্য্য করিবেক, কোন প্রকার বিচারণা করিবেক না। এই এক বৎসর নারীভোগ ব্যতীত অন্যান্য অভীপ্সিত বস্তু ভোগ করিতে পারিবেক। ৪৬

অশ্বের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত ভোগ বিমুখ হইয়া নারীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতে হইবেক। ইহা বড় সহজ ব্রত নহে—(ইহা খড়্গাধারে শয়নের তুল্য বলিয়া অসিপত্র নামে খ্যাত) ৪৭

অশ্বের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অতিশয়িত

যত্ন ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিবেক। যে যে কালে অশ্ব পুরীষ অথবা মূত্র পরিত্যাগ করিবেক, সেই সেই স্থানে গোদান ও হোম করা কর্ত্তব্য। যাহারা হোম করিবেক, দক্ষিণা দান দ্বারা তাহাদিগকে পূজা করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে সংশয় নাই। ৪৮—৪৯ অশ্বের ললাট প্রদেশে আপনার নাম ও প্রতাপ-চিহ্ন-যুক্ত কাঞ্চন-পত্র বাঁধিয়া দিবেক। এবং এই বাক্য উচ্চারণ করিবেক যে, "আমি এই উৎকৃষ্ট অশ্ব বিমুক্ত করিলাম, যদি কেহ বলবান রাজা থাকেন তবে তিনি ইহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করুন। ৫০—৫১। পরে যে ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করিবেক, তাহাকে বলপূর্ব্বক জয় করিতে হইবেক। হে বীর! এইরূপ বিধানেই এই যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়া থাকে। "অসিপত্র" ব্রতযুক্ত এই অশ্বমেধ যজ্ঞে অনন্ত ফল হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে ইন্দ্র এইরূপ বিধানে শত অশ্বমেধ করিয়াছিলেন। ৫৩।

উল্লিখিত বিধানে অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা করিয়া যজমান মহাসমারোহে স্নান করিয়া থাকেন। এই স্নানের নাম "অবভৃথ"। সমস্ত মহাযজ্ঞেই এই স্নান বিহিত আছে। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—

"শিষ্ট্বা বা ভূমিদেবানাং নরদেবসমাগমে।
স্বমেনোঽবভৃথে স্নাত্বা হয়মেধে বিশুধ্যতে।"

ঋত্বিক ও যজমান একত্র মিলিত হইয়া যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের অবভৃথ স্নান করেন, তখন অন্য পাপীও তৎসঙ্গে স্নান করিলে (আপনার পাপ খ্যাপন পূর্ব্বক) বিশুদ্ধ হইতে পারেন।

প্রাচীন কালের অশ্বমেধ যজ্ঞ এই, পরন্তু এতদ্ভিন্ন অন্য অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গ আছে। বাহুল্য ভয়ে সে সকল এস্থলে গ্রথিত করিলাম না।

পুরুষমেধ যজ্ঞ।

ইহা একটী ভয়ানক লোমহর্ষণ ব্যাপার। প্রাচীন কালে ইহা অনুষ্ঠিত হইত কি না, তাহা জানি না কিন্তু শুক্ল যজুর্ব্বেদে * এ বিষয়ের প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। অনেকে অনুমান করেন নরবলি তান্ত্রিক কাল হইতেই প্রচলিত কিন্তু তাহা নহে; উহা বৈদিক কালের পুরুষমেধের রূপান্তর মাত্র। কারণ মাধ্যন্দিনী শাখার শত পথ ব্রাহ্মণে এই যজ্ঞের বিস্পষ্ট উপদেশ আছে।

যথা—"অথ যস্মাৎ পুরুষমেধো নাম। ইমে বৈলোকাঃ পুরুষমেব পুরুষো যোঽয়ং পবতে সোঽস্যাং পুরিশেতে তস্মাৎ পুরুষস্তস্য যদেষু লোকেষন্নং তদস্যান্নং মেধঃ—" ইত্যাদি—

(উত্তরভাগের ষষ্ঠাধ্যায় দেখ)। অর্থ এই যে, যে কারণে যজ্ঞের "পুরুষ মেধ" নাম, তাহা ব্যাখ্যাত হইতেছে। এই

* আমরা ইহার প্রমাণ আর্য্য সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার প্রস্তাবে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি।

লোক পূর্ণ করিতেছেন বলিয়া "পুরুষ"। এই যিনি বাহিরে পবিত্র করিতেছেন (অর্থাৎ বায়ু) তিনিই এই পুরি অর্থাৎ শরীরে বাস করিতেছেন। এই হেতু ইহার নাম পুরুষ। এইরূপে, ক্রমে "পুরুষ'' শব্দের নিরুক্তি, "মেধ" শব্দের নিরুক্তি, যজ্ঞের উপর "পুরুষমেধ" নামের প্রবৃত্তি, এবং এতাদৃশ যজ্ঞে কি কি কার্য্য করিতে হইবে সমস্তই এই অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। মহর্ষি কাত্যায়ন তাঁহার শ্রৌত সূত্রে এই যজ্ঞের কার্য্যবিভাগ সমস্ত উত্তম রূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যথা—" পুরুষমেধস্ত্রয়োবিংশতি দীক্ষোহঃ-তিষ্টা কামস্য।" (১) "ব্রাহ্মণ রাজনায়োঃ" (২) অগ্নিষ্টোমাবস্তরেনাতিরাত্র উকথ্য যজ্ঞঃ"। (৩) "তাবন্তোঽগ্নিযোমীয়াঃ" (৪) (ইত্যাদি একবিংশ অধ্যায় দেখ।)

উল্লিখিত কাত্যায়ন-সূত্র-নিচয়ের দ্বারা পুরুষমেধের এইরূপ সংক্ষেপ সংকলন করা যায়। "সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ হইব" এইরূপ কামনা-বিশিষ্ট পুরুষেরা পুরুষমেধের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় এই উভয় জাতিই এই যজ্ঞের অধিকারী; বৈশ্য ও শূদ্রেরা করিতে পারেন না। ইহা এক প্রকার পঞ্চরাত্র যজ্ঞ। ইহার আদ্যন্তে "অগ্নিষ্টোম" যজ্ঞ এবং মধ্যে "অতিরাত্র" যজ্ঞ। এই যজ্ঞের পশু ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় হওয়া আবশ্যক। যাজক ব্রাহ্মণ হইলে ব্রাহ্মণ পশু, ক্ষত্রিয় হইলে ক্ষত্রিয় পশু †। এই যজ্ঞের দক্ষিণা অশ্বমেধের সমান কিন্তু ব্রাহ্মণ যাজক হইলে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয়, পশ্চাৎ অরণ্য প্রবেশ অর্থাৎ সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়।

অথর্ব্ববেদের বৈতান সূত্রেও এইরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। যথা—

"পুরুষমেধোঽশ্বমেধবৎ" (১০) "যজমানস্য বিজিতং সর্ব্বং সমৈত্বিতি জনপদ মুচ্চৈঃ শ্রাবয়তি (১৩) পুরুষমেধ অশ্বমেধের ধর্ম্ম ক্রমেই অনুষ্ঠিত হইবেক। যাজকের সমস্তই জয় করা হইয়াছে, পুরোহিত ইহা জনপদবাসীকে শ্রবণ করাইবেন।

যাজক যদি ব্রাহ্মণ হন, তবে ব্রাহ্মণ পশু এবং ক্ষত্রিয় হইলে ক্ষত্রিয় পশু, অলাভ হইলে শত্রু জয় করিয়া তাহাকেই পশু করিয়া এই যজ্ঞ করিবেক। (১৬) তাহাকে স্নান করাইয়া, অলঙ্কার পরাইয়া, উৎসর্গ করিবেক, এবং "সহস্রবাহুঃ পুরুষঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ দ্বারা আমন্ত্রণ করিবেক (১৯) ইত্যাদি ইত্যাদি (সপ্তম অধ্যায় দেখ)

"হরিনীতি শামিত্রে স্ত্রিয়মানম্" "হরিনীতি" ইত্যাদি ঋক্ মন্ত্র পাঠ করিলে বধস্থানেতে লইয়া যাইবেক। "স্যোনাচার্য্য একটী শ্রুতি প্রমাণ দিয়া বলিয়াছেন, যে, পুরুষ পশু বধ করিতে হয় না, পর্য্যাগ্নিকৃত করিয়া উৎসর্গ মাত্র করিতে হয়। যথা—" কপিঞ্জলাদিবদুৎসৃজন্তি ব্রাহ্মণাদীন্" (শ্রুতি) "পর্য্যাগ্নিকৃতানুৎসৃজতীত্যর্থঃ" (বৃত্তি) অর্থাৎ কপিঞ্জল পক্ষী প্রভৃতির ন্যায় ইহাকে পর্য্যাগ্নিকৃত করিয়া উৎসর্গ (ত্যাগ) করিবেক।

† কাত্যায়ন সূত্রের বৃত্তিকার কর্কা-

ভব পৃথিবী" ইত্যাদি ক্রমে ঋক মন্ত্র দ্বারা নিপাতন এবং "সহস্র বাহুর্যায় সারস্বতৈ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সংজ্ঞপ্ত অর্থাৎ বধ করিবেক।

এই যজ্ঞের অপর নাম "প্রাজাপত্য ইষ্টি"। এই ভয়ানক যজ্ঞকাণ্ড বৈদিক কালেই লোপ হইয়াছে।

শ্রীরামদাস সেন।

হিয়োন সাঙের বাঙ্গালা ভ্রমণ।

চতুর্থ ভাগ, ৩ সংখ্যা ১২৫ পৃষ্ঠার পর।

শিলাচল।

(She-li-cha-ta-lo.)

হিয়োনসাঙ সমতটের পূর্ব্বদিকে কতিপয় রাজ্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সে গুলি তিনি দর্শন করেন নাই। প্রথমেই "সি-লি-চ-ট-ল"। ইহা সমতটের উত্তর পূর্ব্ব দিকে। ফরাসী পণ্ডিত ইহাকে "শ্রীক্ষেত্র" অনুমান করেন। কনিংহাম সাহেব "শ্রীক্ষেত্র" কে "শ্রীহট্ট" নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার এবম্প্রকার নির্দ্দেশের প্রতি ফারগিউসন সাহেব একটু সন্দিহান হইয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় তাঁহার সন্দেহ নিতান্ত অমূলক নহে। পুরাতত্বালোচনায় "সিলিচটল" কে হেরম্ব রাজ্যের রাজধানী "সিলাচল" অনুমান করিবার জন্য আমাদের হৃদয় নিতান্ত উৎসুক হইয়াছে। হেরম্ব যে একটী প্রাচীন রাজ্য ইহা একপ্রকার অসন্দিগ্ধ বিষয়। (৬৮) শ্যান ইতিহাস আলোচনায় অনুমিত হয়, শকাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে ভারতের পূর্ব্ব প্রান্ত কামরূপ, হেরম্ব ও ত্রিপুরা দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। সে সময় শ্যানদিগের পরাক্রমে সমস্ত পূর্ব্বোপদ্বীপ কম্পিত হইয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয় তাহারা, বীরেন্দ্র-বৃন্দ-রক্ষিত প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর স্বরূপ কামরূপ হেরম্ব ও ত্রিপুরা অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

হিয়োনসাঙ শিলিচটল রাজ্যটী সমুদ্র (বা হ্রদ) তীরবর্ত্তী লিখিয়াছেন। অদ্যাপি শ্রীহট্ট প্রদেশের যেরূপ অবস্থা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা প্রায় ১২।১৩ শত বৎ-

---

(৬৮) বঙ্গ দর্শন, ষষ্ঠ খণ্ড, আশ্বিন, ২৬৫ পৃষ্ঠা। মল্লিখিত "মণিপুরের বিবরণ" দ্রষ্টব্য, মুদ্রাকর-ভ্রমবশতঃ সেই প্রবন্ধের কোনও কোনও স্থানে এই রূপ অক্ষর ও বাক্য সংযোগ করা হইয়াছে যে তৎপাঠে স্থানে স্থানে আমার উদ্দেশ্যের বিপরীত অর্থ বোধ হইয়া থাকে, সুতরাং পাঠক মহাশয়েরা তাহা সাবধানে পাঠ করিবেন।

সর পূর্ব্বে যে ইহা একটী সমুদ্র ছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। বহু প্রাচীন তত্বানুসন্ধানে ইহা বিশিষ্ট রূপে প্রতীত হয় এবং মহাভারতেও অনেক স্থলে কামরূপপতি ভগদত্ত সাগরতীরবাসী নরপতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। সত্য বটে শ্রীহট্টের উত্তর, পূর্ব্ব দক্ষিণ ভাগ পার্ব্বত্য প্রদেশ। আমরা ইহা বিশেষ রূপে জ্ঞাত আছি, যে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভাগে ত্রিপুরা ও কাছারের অংশ লইয়া শ্রীহট্টের অঙ্গপুষ্টি করা হইয়াছে। (৬৯) উত্তর ভাগটী অবশ্য কামরূপের অধীন ছিল। মুসলমানদিগের ভারতপ্রবেশ-কালে শ্রীহট্ট দুইটী স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। যথা "গৌড়" ও "লাউড়"। গৌড় নগরী জয়ন্তীয়া পর্ব্বতোপরি সংস্থাপিত ছিল। লাউড় খশ পর্ব্বতে, আধুনিক চড়াপুঞ্জীর পশ্চিম দিকে ছিল বলিয়া অদ্যাপি সেই পর্ব্বতকে "লাউড়ের পাহাড়" বলে। ইহার পূর্ব্বে শ্রীহট্ট নামক স্বতন্ত্র রাজ্যের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। "শ্রী হট্ট" নামের অর্থ সুন্দর—হাট (বা বাজার)। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীহট্ট গৌড় (জয়ন্তীয়া) রাজ্যের একটী নগরী ছিল। দেবানুগ্রহে সাহজালাল ১৩০৬ শকাব্দে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাবিশারদ গৌড়েশ্বর গোবিন্দ (৭০) কে জয় করিয়া শ্রীহট্ট অধিকার করেন। জাতীয় কিম্বা বিজাতীয় ইতিহাসে ইহার পূর্ব্বে শ্রীহট্টের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। কবিবর ভারতচন্দ্র পাঠমালায় শ্রীহট্টের নামোল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত সংস্কৃত পীঠ নির্ণয়ে শ্রীহট্টের নামটী দৃষ্ট হয় না। কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হইলেও তাহাকে আমরা শ্রীহট্টের প্রাচীনত্বের প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ এবম্প্রকার তন্ত্রের বয়ঃক্রম ৩।৪ শতাব্দীর অধিক নহে। শ্রীহট্টের প্রাচীনত্বের প্রমাণাভাবে আমরা "শিলিচটল" কে হেরম্ব রাজ্যের রাজধানী সিলাচল নির্ণয় করিলাম। ইংরাজগণ সিলাচলকে "সিলচর" কহে।

(৬৯) প্রাচীন কথা উল্লেখের প্রয়োজন কি। কাপ্তান পেম্বাবটন প্রভৃতি ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রাচীন মানচিত্রের সহিত—১৮৬৩-৬৪ খৃষ্টাব্দের অঙ্কিত ত্রিপুরা ও ব্রিটীষ রাজ্যের সীমা-নির্ণায়ক কর্ত্তৃপক্ষদিগের—মানচিত্রের—তুলনা করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন এই অল্পকাল মধ্যে ত্রিপুরার কলেবর কতদুর খর্ব্ব হইয়াছে।

(৭০) মুসলমানগণ শ্রীহট্টবাসীদিগকে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাবিশারদ বলিয়া বড় ভয় করিত। যবন ঐতিহাসিকগণ শ্রীহট্ট ও কামরূপবাসীদিগকে যাদুকর বলিয়া গালি দিয়াছেন। শ্রীহট্টবাসীগণ নিতান্ত দুশ্চরিত্র ছিল। প্রাচীন কালে শ্রীহট্ট হইতে খোজা ভারতের সর্ব্বত্র রপ্তানি হইত। সম্রাট জাঁহাঙ্গির এই কুপ্রথা উঠাইয়া দেন। মুসলমানগণ বাঙ্গালাকে "ভুস্বর্গ" বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীহট্টের এই সকল দুষ্কার্য্যের উল্লেখ করিয়া পারস্যবাসীগণ বাঙ্গালাকে "নরক" লিখিয়াছেন। এক সময় শ্রীহট্ট বঙ্গের কলঙ্কস্বরূপ ছিল। বোধ হয় কালে শ্রীহট্ট বঙ্গের গৌরব স্বরূপ হইবে।

কমলাঙ্ক।

(Kia-mo-lang-kia.)

সমতটের পূর্ব্বদিকে "কিয়ামোলাঙ্কিয়া" রাজ্য। ইহা বোধ হয় ত্রিপুরার তদানীন্তন রাজধানী "কমলাঙ্ক"। আধুনিক কুমিল্লা তাহার অপভ্রংশ। শকাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে ত্রিপুরার রাজপাট কুমিল্লাতে ছিল। গণনা দ্বারা নির্ণীত হইতেছে ত্রিপুরাব্দ প্রচলিত ৪০ বৎসর অন্তে হিয়োনসাঙ কাবুলে উপনীত হন। মহারাজ বীররাজদেব ত্রিপুরাব্দ প্রচলিত করেন। সম্ভবত তাঁহার পুত্রের রাজ্য-শাসন-কালে হিয়োনসাঙ ভারত ভ্রমণ করিতেছিলেন।

* হিয়োনসাঙ কমলাঙ্ক রাজ্য বৃহৎ উপসাগরের তীরবর্ত্তী লিখিয়াছেন। মহাভারতেও ত্রিপুরা সাগরতীরবর্ত্তী লিখিত আছে। কবিচূড়ামণি কালিদাস সুহ্ম বা ত্রিপুরা 'মহাসাগরের তালীবনশ্যাম উপকণ্ঠ' বর্ণন করিয়াছেন। (তালীবনশ্যাম মুপকণ্ঠং মহোদধেঃ।) বলা বাহুল্য যে ত্রিপুরারাজ্য—এক সময়ে—কামরূপের সীমান্ত হইতে নিগ্রেইস অন্তরীপ পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। চট্টগ্রাম ও আরাকাণ ইহার অন্তর্ভূত ছিল। ডাক্তর ফারগিউসন ত্রিপুরাকে সমতটের অন্তর্নিবিষ্ট লিখিয়া চট্টগ্রাম ও আরাকান প্রভৃতি কমলাঙ্ক রাজ্য লিখিয়াছেন। সমুদ্র গুপ্তের লাট প্রস্তরের প্রিনসেপ-কৃত ভ্রমাত্মক অনুবাদই এইরূপ অনুমানের মূল সূত্র। যাহা হউক এস্থলে আমরা ত্রিপুরা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিতে অভিলাষী নহি। দেশীয় ও বৈদেশিক গ্রন্থাদি হইতে আমরা ত্রিপুরার নিম্নলিখিত নামগুলি সংগ্রহ করিয়াছি।

কিরাত রাজ্য
সুহ্ম রাজ্য
ত্রিপুরা রাজ্য
কমলাঙ্ক রাজ্য
পাটিক্কারা রাজ্য
উদয়পুর রাজ্য
অমরপুর রাজ্য
জাহাজ নগর রাজ্য
মরুৎ রাজ্য
তথ্লেঙ রাজ্য

হিয়োনসাঙ কমলাঙ্ক রাজ্যের পূর্ব্বদিকে আরও কয়েকটী রাজ্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন। সে গুলির সহিত বাঙ্গালা কিম্বা ভারতের কোন সম্পর্ক নাই।

তাম্রলিপ্ত।

(Tan-mo-li-ti.)

সমতট হইতে ১৫০ মাইল (৯০০ লি) গমন করিয়া হিয়োনসাঙ তাম্রলিপ্ত বা তাম্রলিপ্তি নগর প্রাপ্ত হন। প্রাচীন তাম্রলিপ্ত অদ্যাপি তামলুক নামে পরিচিত রহিয়াছে। তামলুক এক সময়ে বাণিজ্য দ্বারা জগতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। দিগ্দেশীয় বণিকগণ বাণিজ্যার্থে তামলুকে সম্মিলিত হইতেন। বাঙ্গালী বণিকগণ এস্থান হইতে পোতারোহণে "সমুদ্রের বুকে পদাঘাত" করিয়া দেশ দেশান্তরে গমন করিত। একবিংশ শতাব্দী

পূর্ব্বে মহারাজাধিরাজ শ্রীধর্ম্মাশোকের কৃত তাম্রলিপ্ত নগরে অর্ণবযান আরোহণ করত সিংহল দ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। শকাব্দের চতুর্থ শতাব্দীতে পরিব্রাজক ফাহিয়ান তাম্রলিপ্ত দর্শন করেন। তাঁহার "ভ্রমণবৃত্তান্তে" লিখিত আছে তিনি সহচরদ্বয়ের সহিত চম্পা নগরী হইতে প্রায় ৫০ যোজন পূর্ব্বমুখে গমন করিয়া তাম্রলিপ্তে উপনীত হন। বঙ্গোপসাগরের অগাধ জলরাশি এই নগরের পাদ মূল প্রক্ষালন করিত। এই রাজ্যে ২৪টী বিহার ছিল। বিহার সকল শ্রমণগণের দ্বারা পূর্ণ থাকিত। এস্থানে বৌদ্ধ বিধি উন্নত ভাবে প্রচলিত ছিল। পরিব্রাজক দুই বৎসর তাম্রলিপ্তে বাস করিয়া ধর্ম্ম গ্রন্থাদি অধ্যয়ন ও বৌদ্ধদেব-মূর্ত্তি চিত্র করিয়াছিলেন।" বিল সাহেব বলেন ফাহিয়ান তামলুকে বসিয়া তাহার "সূত্রগ্রন্থ" লিখিয়াছেন। জনৈক বাঙ্গালী বণিকের বৃহৎ অর্ণবপোত আরোহণে ফাহিয়ান সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। ক্রমে চতুর্দ্দশ দিবারাত্র সমভাবে গমন করিয়া সেই বাণিজ্যতরী সিংহলে পঁহুছিয়াছিল। ফাহিয়ান তাম্রলিপ্তবাসীদিগের নিকট শুনিয়াছিলেন যে "সিংহল তাম্রলিপ্তির সাত শত যোজন দূরবর্ত্তী একটী দ্বীপ। ইহার পূর্ব্ব পশ্চিম দৈর্ঘ্য ৫০ যোজন, পরিসর ৩০ যোজন। এই দ্বীপে নানা প্রকার মণি মুক্তা পাওয়া যায়। সিংহলের পার্শ্বে কতক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে।"

পরিব্রাজক হিয়োনসাঙ বলেন,—"তাম্রলিপ্ত রাজ্যের পরিধি ২৫০—৩০০ মাইল (১৫০০ লি) (৭১) ইহার অন্তর্ব্বাণিজ্য স্থলপথে ও বহির্ব্বাণিজ্য জলপথে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই রাজ্যটী ক্ষুদ্র, কিন্তু শস্যশালী। ইহার ভূমি উর্ব্বরা ও প্রায় সর্ব্বদাই আর্দ্র দৃষ্ট হয়। এই রাজ্যে ১০টী মঠ আছে। তাহাতে প্রায় সহস্র শ্রমণ

(৭১) সেই মহাভারতের সময় হইতে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেও তাম্রলিপ্ত একটী স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। ক্রমে তাহার এতদূর বলবৃদ্ধি হইয়াছিল যে তত্রত্য নরপতি ১০৫০ শকাব্দে কেশরীবংশীয়দিগকে জয় করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করেন। তথাকার বিজয়ী বাঙ্গালী রাজবংশ "গঙ্গারাঢ়ী" নামে পরিচিত। সেই সময় কয়েক শতাব্দী তাম্রলিপ্ত আত্ম সন্তান কর্ত্তৃক শাসিত হইয়াও অধীন রাজ্যমধ্যে পরিগণিত ছিল। ১৮৯ শকাব্দে গঙ্গারাঢ়ীবংশের হস্ত হইতে উড়িষ্যার রাজদণ্ড স্খলিত হইলে, হিজ্‌লায় (আধুনিক হিজলী) একটী স্বতন্ত্র রাজ্য সংস্থাপিত হয়। তাম্রলিপ্ত সে সময়ে হিজ্‌লার অধীন ছিল এরূপ অনুমিত হয়। রাজা তোড়ল মল্ল সুবে উড়িষ্যা ৫টী সরকারে বিভক্ত করেন। সরকার 'মেদিনীপুর' হিজ্‌লা' তাহার অন্যতম। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ১৫৫২ শকাব্দার পূর্ব্বে হিজ্‌লা যবনসাম্রাজ্য ভুক্ত হয় নাই। সুলতান সুজা স্বীয় শাসনকর্ত্তৃত্ব সময়ে হিজ্‌লা সুবে উড়িষ্যা হইতে পৃথক করিয়া তথায় একটী স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। (F Valentyan Vol V.) ১৫৫২ শকাব্দে হিজ্‌লা রাজ্যের বিধিসঙ্গত অধিকারী যবন কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া ভুজবলে স্বদেশ উদ্ধার করেন। কিন্তু তৎপর বৎসর আওরঙ্‌জীব উদ্যান্দাজদিগের সহায়তায় হিজ্‌লাপতিকে পুনর্ব্বার কারারুদ্ধ করেন।

বাস করেন। এই রাজ্যে বিধর্ম্মিদিগের (হিন্দু) ৫০টী দেবমন্দির আছে।" তাম্রলিপ্ত নগরপ্রান্তে মহারাজ অশোক লব্ধনির্ব্বাণ বুদ্ধচতুষ্টয়ের সম্মানার্থ একটী উৎকৃষ্ট স্তম্ভ ও অন্যান্য স্মরণার্থ চিহ্ন সংস্থাপন করিয়া যান। হিয়োনসাঙ সেই সকলের ভগ্নাবস্থা দর্শন করিয়াছিলেন।

অদ্যাপি তামলুক মেদিনীপুরস্থ একটি বাণিজ্য-স্থান। ইহা রূপনারায়ণের খাড়ির তীরে অবস্থিত। তামলুক ভাগীরথী ও রূপনারায়ণ উপনদের সঙ্গম-স্থল হইতে দ্বাদশ মাইল দূরবর্ত্তী। তামলুক জেলা মেদিনী পুরস্থ একটী উপবিভাগের প্রধান নগরী।

প্রাচীন তাম্রলিপ্তি রাজ্যের উত্তর সীমান্ত বর্দ্ধমান ও পূর্ব্বদিকে "হুগলি নদী দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া কনিংহাম সাহেব অনুমান করেন। আমরাও এই অনুমানকেই সঙ্গত বোধ করি। কিন্তু ফরগিউসন সাহেব "ব" কারাকৃতি প্রদেশের কিয়দংশ ইহার অন্তর্গত লিখিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ইহা ভ্রমাত্মক।

কিরণ সুবর্ণ।

Kee-to-na-suta-ta-na

পরিব্রাজক হিয়োনসাঙ তাম্রলিপ্ত হইতে ১১৭—১৪০ মাইল (৭০০লি) উত্তর পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া "কি য়ে লো না সুফলনা' রাজধানী প্রাপ্ত হন। (৭২) পণ্ডিত মণ্ডলী ইহাকে "কিরণ সুবর্ণ" নগর অনুমান করেন। এই রাজধানী উড়িষ্যার রাজধানীর উত্তর পূর্ব্ব দিকে ও ৭০০ লি দূরবর্ত্তী। (কিরণ সুবর্ণ নগরের স্থান নির্ণয় জন্য আমাদিগকে জ্যামিতি শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। হিয়োনসাঙের নির্দ্দেশ অনুসারে তামলুক, কিরণ সুবর্ণ ও উড়িষ্যার রাজধনী হইতে পরস্পরস্পর্শী এক একটী রেখা অঙ্কিত করিলে; ৭০০ লি দীর্ঘ বাহু সমন্বিত একটী সুন্দর সমবাহু ত্রিভুজ হইতে পারে। আমরা "তামলুক' ও "জাজপুর" সেই সমবাহু ত্রিভুজের দুইটী কোন স্থিত 'বিন্দু' স্থির রাখিয়া বাঙ্গলার মানচিত্রোপরে একটী সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কিত করিয়াছিলাম। তদনুসারে 'কিরণ সুবর্ণ' আধুনিক সিংহভুম জেলার প্রধাননগরী চৈবসার প্রায় ১০ ক্রোশ উত্তর দিকে নির্ণীত হইতেছে।) কনিংহাম সাহেব বলেন 'কিরণ সুবর্ণ' আধুনিক সিংহভুম ও বীরভুম প্রদেশের কোন স্থানে সুবর্ণ রেখা নদীতীরে অবস্থিত ছিল।' তিনি "বড় বাজারের' নিকটবর্ত্তী স্থানে কিরণসুবর্ণের স্থান নির্ণয়ের প্রয়াস পাইয়াছেন।

বিজ্ঞবর ফারগিউসন সাহেব বলেন, "মোগল শাসিত বঙ্গের রাজধানী মুরশিদাবাদ নগরের দ্বাদশ মাইল, দক্ষিণদিকস্থ "রাঙ্গামাটী" ই প্রাচীন "কিরণ সুবর্ণ" নগরী। কাপ্তান লেয়ার্ড এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণেলে রাঙ্গামাটীর পুরাতত্ত্ব

(৭২) ফারগিউসন সাহেবের মতে পরিব্রাজক পৌণ্ডবর্দ্ধন হইতে কিরণ সুবর্ণ দর্শন করিয়া সমতটে গমন করিয়াছিলেন।

মূলক একটী প্রবন্ধ লিখেন। (৭৩) লেয়ার্ড বলেন বঙ্গদেশের অতি প্রাচীন নরপতি "করণ সেন" বা "কর্ণসেন" যে রাজধানী নির্ম্মাণ করেন তাহার প্রকৃত নাম "কর্ণ সেনপুরী" কিন্তু সাধারণত এই রাজধানী "কর্ণসেনকা ঘর' বলিয়া উক্ত হইত। এই কর্ণসেনপুরীই বর্ত্তমান সময়ে রাঙ্গামাটী নামে পরিচিত হইয়াছে। ফারগিউসন সাহেব এই "কর্ণসেন কা ঘর" কেই কিরণ সুবর্ণ নগর স্থির করিয়াছেন। তাহার এবম্প্রকার উক্তির ঐতিহাসিক মূল্য অতি সামান্য।

সুবর্ণরেখা নদীর তীরস্থ আধুনিক "ডুলমি" ও "সুফরাণ" "সুইস্যা" নামক পল্লিদ্বয়কে বিজ্ঞবর বেগলার সাহেব প্রাচীন "কিরণ সুবর্ণ" নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় তাঁহার যত্ন নিতান্ত অমূলক নহে। অধিকন্তু তিনি বলেন তৎপ্রদেশস্থ উপবিভাগ "করণপুর" ও সুইস্যার ৩ মাইল দূরবর্ত্তী পল্লি "সুফরাণের" নাম হিয়োন সাঙের "কিয়েলো না সুফল না" হইতেই উৎপন্ন। ডুলমি সুফরাণ ও সুইস্যা পল্লিতে প্রাচীন অট্টালিকাদির রাশীকৃত ভগ্নাবশেষই তাহার প্রাচীন উন্নতির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। (৭৪)

হিয়োনসাঙ শস্যশালিনী উর্ব্বরা কিরণসুবর্ণ রাজ্যের পরিধি ৭০০—৯০০ মাইল (৪০০০—৪৫০০লি) লিখিয়াছেন। এই রাজ্য একদিকে দামোদর ও অপর দিকে বৈতরিণী দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বোধ হয় মেদিনীপুর ও সরগুজার মধ্যবর্ত্তী রাজ্যগুলি ইহার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল।

শকাব্দার ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ভাগে মহারাজ শশাঙ্ক কিরণসুবর্ণের রাজাসনের গৌরববর্দ্ধন করিতেছিলেন। যাঁহার ভুজবলে সমস্ত ভারত কম্পিত হইয়াছিল, আজি সেই শশাঙ্ক কোথায়, যাঁহার নাম শ্রবণে বৌদ্ধ নৃপমণ্ডলীর হৃৎকম্প হইত, সেই প্রাতঃস্মরণীয় বীরেন্দ্র বাঙ্গালী আজি কোথায়, সম্রাট রাজ্যবর্দ্ধনের প্রাণহন্তা গৌড়েশ্বর (৭৫) শশাঙ্ক আজি কোথায়, বৌদ্ধগয়া হইতে ভগবান বুদ্ধদেবের প্রতিকৃতি উৎপাটন কিম্বা চূর্ণ করিবার জন্য যাঁহার অলঙ্ঘনীয় অনুজ্ঞা ঘোষিত হইয়াছিল, সেই বীরকেশরী বাঙ্গালী আজি কোথায়, তিনি অনন্ত ধামে গমন করিয়াছেন। বঙ্গবাসীগণ সেই প্রাতঃস্মরণীয় বীর পুরুষের নামটী পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। যে রাজ্য এক সময়ে বেদজ্ঞ মহর্ষিদিগের আবাস-ভূমি ছিল অধুনা সে স্থানে কেবল কোল, ধাঙ্গড় প্রভৃতি অনার্য্য জাতি ও বন্য পশু পক্ষীদিগের বাসস্থান হইয়াছে। অদ্যাপি কিরণ সুবর্ণ রাজ্যের

(৭৩) Journal Asiatic Society of Bengal Vol XX11 Page 281—282.

(৭৪) See the Arch. Survey Report of India Vol VIII page 186-87-88-89-90-91 and the plate III.

(৭৫) কোন কোন গ্রন্থে শশাঙ্ক নরপতির "গৌড়েশ্বর" উপাধি দৃষ্ট হয়। বোধ হয় বাঙ্গলার পরাক্রান্ত প্রদেশাধিপতিগণই এই উপাধি ধারণ করিতেন।

কোন কোন স্থানে দেবমন্দিরের অসংখ্য ভগ্নাবশেষ স্তূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। হিয়োনসাঙের ভ্রমণকালে বাঙ্গালায় অনার্য্য সংখ্যা অধিক কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইতেছে।

ওড্র উড়িষ্যা।

(Ucha or Oda)

কামরূপের সহিত বাঙ্গালার যে সম্পর্ক উড়িষ্যার সহিতও তাহাই বটে। চীন পর্য্যটক উভয় স্থানের ভাষাই পার্শ্ববর্ত্তী (বাঙ্গালা) স্থানের ভাষা হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন লিখিয়াছেন। কিঞ্চিদধিক দ্বাদশ শতাব্দী অন্তে আমরাও চীন পর্য্যটকের উক্তি পোষণ করিতেছি। কিন্তু আসামী ও উড়িয়া ভাষা বাঙ্গালা ভাষার সহিত নিঃসম্পর্ক আমরা এরূপ বলিতে প্রস্তুত নহি। আমেরিকা দেশীয় পরিব্রাজক রেবারেণ্ড ব্রাউন লিখিয়াছেন আসামী ভাষায় শত ভাগের পঞ্চাশ ভাগ বাঙ্গলা। (৭৬) আমরাও ব্রাউনের উক্তি সম্পূর্ণ সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করি। আমাদের বিবেচনায় উড়িয়া ভাষায় ও প্রায় শতভাগে পঞ্চাশ ভাগ বাঙ্গালা। (৭৭)

কিরণ সুবর্ণ হইতে ৭০০ লি গমন করিয়া পরিব্রাজক উড়িষ্যার রাজধানী প্রাপ্ত হন। কিন্তু কনিংহাম সাহেব লিখিয়াছেন "বোধ হয় পর্য্যটক কিরণসুবর্ণ হইতে তামলুকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তথা হইতে উড়িষ্যায় গমন করিয়াছিলেন। তামলুক হইতেও এই রাজধানী ৭০০ লি দূরবর্ত্তী। দূরতানুসারে এই রাজধানীটী বৈতরণী নদীর তীরস্থ অনুমিত হইতেছে। অতি প্রাচীন কালে মহানদী তীরস্থ "কটক" উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। কিন্তু শালিবাহনপ্রচলিত অব্দের চতুর্থ শতাব্দীর অন্ত ভাগে বৌদ্ধ (তাম্রফলকে বৌদ্ধের পরিবর্ত্তে "যবন" লিখিত) দিগকে জয় করিয়া শৈব নরপতি যযাতিকেশরী উড়িষ্যা অধিকার করেন। বোধ হয় তিনি মগধেশ্বর ভবগুপ্তের করাধীন ছিলেন। (৭৮) যযাতি কেশরী বৈতরিণী নদীর তীরস্থ স্বনাম-খ্যাত নগরী "যযাতিপুর" নির্ম্মাণ করেন। সাধারণতঃ এই রাজভবন "চৌদ্দুয়ারি" নামে পরিচিত ছিল। যযাতি কেশরীর সময় হইতে অবিচ্ছেদে পাঁচ শত বৎসর উড়িষ্যার রাজপাট যযাতিপুরে সংস্থাপিত ছিল। ঐ কালের পর ৯১১ শকাব্দে নৃপকেশরী রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সেই যযাতিপুরই অধুনা "যাযপুর" নামে পরিচিত। এতাবতা স্থির হইল হিয়ানসাঙের ভ্রমণকালে ও যাযপুরই উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। অধিকন্তু যদি লেখনীর বক্রগতিতে পবিত্র ইতিহাস কলু-

(৭৬) See Journal As society of Bengal Vol V1 p. 1028.

(৭৭) পরিশিষ্ট দেখ।

(৭৮) See copper plate grant found in the record office of the Cuttac callectorate journal Asiatic society of Bengal Vol XLVI part 1 (No 2) p 149 to 158.

ষিত না হইয়া থাকে, তবে ইহাও বলিতে পারি যে মহারাজ ললিতেন্দ্রকেশরী সেই সময় কৈলাস-ধাম-সমন্বিত ভুবনেশ্বর নামক প্রসিদ্ধ শৈব ক্ষেত্রের জগদ্বিখ্যাত মন্দির নির্ম্মাণে ব্যস্ত ছিলেন। ভুবনেশ্বরের মন্দির অদ্যাপি কেশরীবংশের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এই মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্যে এক শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছিল। যযাতিকেশরী ইহার ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া যান, ললিতেন্দ্রকেশরী কর্ত্তৃক ইহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়। ভুবনেশ্বরের মন্দির যেরূপ বৃহৎ সেরূপ প্রশস্ত। এরূপ সুশ্রী মন্দির জগতে অতি অল্পই আছে।

ভুবনেশ্বরের ৫ মাইল দূরে উড়িষ্যার বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান কীর্ত্তি-নিলয় 'খণ্ডগিরি" ও "পুষ্পগিরি" বিরাজিত রহিয়াছে। ইহা কটকের প্রায় ২০ মাইল দূরে পশ্চিম দক্ষিণ দিকে। ইহার গিরি-গহ্বর-খোদিত দ্বিতল ত্রিতল প্রশস্ত গৃহাদি দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। পুরাতত্ত্ববিদগণ বলেন শ্রীধর্ম্মাশোকের সময়ে ও তাঁহার পূর্ব্বে এই সকল খোদিত গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। (৭৯) কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ফাহিয়ান ও হিয়োনসাঙ এইরূপ একটী কীর্ত্তি-পুঞ্জময় পুণ্য ভূমির কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। বোধ হয় অল্পকাল মধ্যেই শৈবগণ বৌদ্ধদিগকে প্রায় নির্জ্জীব করিয়া তুলিয়াছিল।

হিয়োনসাঙ উড়িষ্যা রাজ্যের পরিধি ৭০০০ লি (১১৬৭ মাইল) লিখিয়াছেন ইহা পূর্ব্ব দক্ষিণ মহাসাগর দ্বারা সীমাবদ্ধ। "ছি-লি-টা-লোছিং" নামক বাণিজ্যোন্নত সাগর-তীরবর্ত্তী প্রধান নগরী এই রাজ্যের অন্তর্গত। অনুবাদকগণ ইহাকে "চরিত্রপুর" আধুনিক "পুরী" অনুমান করেন।

হিয়োনসাঙ উড়িষ্যা হইতে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। সমুদয় ভারত পর্য্যটন করিয়া তিনি সুস্থ শরীরে ৫৬৭ শকাব্দের বসন্ত ঋতুতে পশ্চিম চীনের রাজধানীতে পহুঁছিয়াছিলেন।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

ইংলণ্ডে স্বাধীনতার উন্নতি।

চতুর্থ জর্জের রাজত্বকালের আরম্ভ হইতে, মুদ্রাযন্ত্রের উপর সাধারণ লোকের এতদূর বিশ্বাস ও অনুরাগ জন্মিয়াছিল, যে কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহার প্রতি কঠোর অত্যাচার করিতে আর সাহস পাইলেন না, ক্রমে উহা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিল। দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৩০।৩১ খৃষ্টাব্দে কর্ত্তৃপক্ষগণ মুদ্রাযন্ত্রের লোকদিগের নামে যে সকল অভিযোগ আনয়ন করেন, সেই অভিযোগই শেষ অভিযোগ। তাহার পর

(৭৯) খণ্ড গিরির কতকগুলি তাম্র ফলকের বিবরণ এসিয়াটীক সোসাইটীর জর্ণলে

হইতেই ইংলণ্ডের রাজসরকার প্রজাদিগকে রাজনৈতিক বিষয়ে বাদানুবাদ করিবার অসংযত স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। এই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা স্থাপনের পরেই ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞাপনের শুল্ক ও সংবাদ পত্রের মাশুল এবং ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কাগজের শুল্ক রহিত হইল। উপর্য্যুপরি এই কয়েকটি বাধা অপসারিত হওয়ায় মুদ্রাযন্ত্র স্বীয় স্বাভাবিক উদ্যম লাভ করিল। এইরূপে মতের স্বাধীনতা উন্মুক্ত হওয়ায় সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই রাজনৈতিক বিষয় সকল মুক্তভাবে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এই প্রকার রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং মুদ্রাযন্ত্রের উদ্যম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সাধারণ শিক্ষারও উন্নতি হইল। কেবল যে রাজনৈতিক বিষয়ের প্রবন্ধ মুদ্রাযন্ত্রে প্রকাশ হইত এরূপ নহে। বিজ্ঞান সাহিত্য, এবং শিল্পবিদ্যা যাহাতে সাধারণ পাঠকমণ্ডলীর সুপাঠ্য, বুদ্ধিগম্য ও সুলভ হয়, এই প্রকার গ্রন্থ সকল প্রচার হইতে লাগিল। সাধারণ মানবমণ্ডলী অবাধে বিদ্বানদিগের ঐশ্বর্য্যের অংশভাগী হইল। "প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রচারিণী" সভার অধ্যাপকগণ—Lord Brougham, Mr Mathew Davenport Hill, এবং Mr Charles Knight—এই হিতকর কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর ছিলেন—তাঁহাদিগের পর "খৃষ্টীয় জ্ঞানোন্নতিসাধিনী সভা"। পরে Messrs Chambers এই মহৎ ব্রতে ব্রতী হয়েন। বিদ্যালয় সকল শিক্ষার পত্তন ভূমি স্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু সাধারণ শিক্ষা ও জ্ঞানালোক সাধারণের মধ্যে বিস্তার হওয়ার কারণ একমাত্র মুদ্রাযন্ত্র।

মুদ্রাযন্ত্র ব্যতীত সাধারণ মত প্রকাশের আর একটি পথ প্রসারিত হইতেছিল। রাজনৈতিক সম্মিলন ও সাধারণ লোকের সভার সংখ্যা ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তৃতীয় জর্জের রাজত্বের প্রাক্‌কাল হইতেই আন্দোলনের এই সকল ভীষণ যন্ত্র সঞ্চালিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সকল সভার আন্দোলন প্রভাবেই লোকপ্রিয় wilkes এর পক্ষ সমর্থিত হয়, পার্লেমেণ্টের সংস্কার সাধিত হয়, Lord George Gorden এবং তাঁহার সহচরদিগের উন্মত্ত প্রটেষ্টাণ্টধর্ম্মাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, এবং দাস-ব্যবসায় রহিত হয়। কিন্তু তৎপূর্ব্ববর্ত্তী শতাব্দির শেষাশেষি যে রাষ্ট্রবিপ্লবের ঝটিকা উত্থিত হয়, সেই বিপ্লব-ঝটিকাতেই এই সকল সাধারণ লোকের আন্দোলন বন্ধ হইয়া গেল। শান্তির সময় যে সকল সভার অধিবেশনে আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই, তাহা এক্ষণে কর্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক নিরুৎসাহিত ও প্রতিরুদ্ধ হইল। বিশৃঙ্খলা, রাজদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র নিবারণ করিবার উদ্দেশে কিয়ৎকালের জন্য সাধারণের স্বাধীনতা অপহৃত হইল। কিন্তু এ অবস্থা চিরস্থায়ী হইবার নহে

প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ষষ্ঠ খণ্ডে প্রকাশিত দুই খানি প্রাচীন পালি ভাষায় লিখিত। এই ২ খানির বয়ঃক্রম অন্যূন ২২।২৩ শতাব্দী অনুমিত হয়।

See J. A, S. B. V1 pp. 1072. 1085.

সাধারণের মত আবার শাসনকর্ত্তৃপক্ষগণের মত অপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। মুদ্রাযন্ত্রের শক্তি ও স্বাধীনতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সভার প্রভাবও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সাধারণ মতের উপর মুদ্রাযন্ত্র যে প্রভাব প্রকটিত করে, তদপেক্ষা সাধারণ সম্মিলনের প্রভাব অনেক গুণে অধিক সন্দেহ নাই। সভাস্থলে শুদ্ধ মতের বল নয়, শারীরিক শক্তি ও সংখ্যার বলও নেত্র-সমক্ষে দেদীপ্যমান প্রকাশ পায়, শুদ্ধ সংখ্যার বল নহে—অধিক সংখ্যক লোকের সম্মিলিত উৎসাহের বলও প্রকাশ পায়। মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের সংস্পর্শেই উৎসাহ-অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। নিভৃত শাস্ত্রালোচনায় নূতন নূতন ভাব ও মতের সৃষ্টি হইতে পারে বটে কিন্তু সাধারণ সম্মিলনে বাদানুবাদ, সংক্রামিত উৎসাহ ও নেতৃগণের জ্বলন্ত বক্তৃতা ব্যতীত—জাতিসাধারণের শিরায় শিরায় এই সকল ভাব ও মত প্রবিষ্ট করিয়া দিবার আর অন্য উপায় নাই।

সাধারণ লোকের আন্দোলনের ফল একমাত্র মত প্রচার নহে। কোন এক বিষয়ের জন্য বহুসংখ্যক লোক একত্র সম্মিলিত হইলে শারীরিক বলের বিরুদ্ধে শারীরিক বল প্রদর্শিত হয়। এই রূপে মারামারি দাঙ্গা উপস্থিত হইবারও আটক নাই। বিশেষতঃ গ্রেট ব্রিটেনের লোকারণ্য নগর সকলের মধ্যে এই প্রকার বহু সংখ্যক লোকের সম্মিলনে জীবন-সম্পত্তি ও রাজ্য পর্য্যন্ত বিপদাপন্ন হইবার আশঙ্কা আছে। সাধারণ লোকে যুক্তিবলে সন্তুষ্ট না হইয়া অবশেষে বাহু-বলের আশ্রয় লইতে পারে। ইতর লোককৃত বিপ্লবের বীজ এই সকল সাধারণসম্মিলনের মূলে নিহিত এবং এইরূপেই অন্যান্য দেশে বিশেষতঃ ফ্রান্সে এই সকল বীজ হইতেই দারুণ বিপ্লব-কাণ্ড উৎপন্ন হয়। প্রজাবর্গের কষ্ট, উগ্রচণ্ড অন্ধউৎসাহী নেতৃগণ, লোক-বিদ্বিষ্ট রাজশাসন, এবং কর্ত্তৃপক্ষদিগের দুর্ব্বলতাই যে আকস্মিক রাষ্ট্রবিপ্লবের কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে রাজ্যে যে পরিমাণে রাজশাসন উৎকৃষ্ট সেই রাজ্যে সেই পরিমাণে বিপ্লবের আশঙ্কা কম। যে রাজ্যের রাজশাসন ও বিচার-কার্য্যে প্রজাবর্গের বিশ্বাস আছে—যেখানে অধিক সংখ্যক লোকে কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত, যে রাজ্যের জাতীয় সভায় বিজ্ঞতা, সুবিচার ও মিতব্যবহারের আধিপত্য, সে রাজ্যে বিপ্লবের আশঙ্কা সর্ব্বাপেক্ষা কম সন্দেহ নাই। গত পঞ্চাশৎ বৎসরের ইংলণ্ডীয় ইতিহাসে এই সকল সত্যের দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারা কি করিয়া মহৎ মহৎ ব্যাপারে কৃতকার্য্যতা লাভ হয় এবং রাজশাসনে বিশ্বাস ও রাজনিয়মে প্রজাদিগের ভক্তি অবিচল থাকিলে বৈপ্লবিক শক্তি সকল কিরূপে দমনে থাকে তাহা ইংলণ্ডের ইতিহাসে বিলক্ষণ প্রকাশ পায়।

রাজনৈতিক আন্দোলনের কতদূর বল ও তাহাতে কি প্রকার বিপদের সম্ভাবনা

তাহা আমরা বলিয়াছি—একণে ইংলণ্ডের তৎসংক্রান্ত আধুনিক ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করিব। যদিও সমস্ত বিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞেরাই, ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কতকগুলি বিশেষ ফৌজদারি আইন স্থাপন করা নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া মুখে স্বীকার করিতেন কিন্তু কার্য্যতঃ অনেক দিন পর্য্যন্ত সেই সকল আইন জারি ছিল। এবং সেই সকল আইন রহিত করিবার জন্য কয়েক বৎসর ধরিয়া পার্লেমেণ্টে ও সংবাদ পত্রে আন্দোলন হইতেছিল। কিন্তু পার্লেমেণ্টের অধিকাংশ সভ্য চিরাগত সংকীর্ণ নীতির পক্ষাবলম্বী থাকায় তাহা রহিত হইতে পারে নাই। অবশেষে ১৮২৩ খৃস্টাব্দে ক্যাথলিকদিগকে অত্যাচার হইতে মুক্ত করিবার জন্য একটি দলবন্ধন হইল—এই দল সমস্ত আয়র্লাণ্ডে ছাইয়া পড়িল।

তাহাদিগের প্ররোচনায় সমস্ত ক্যাথলিক অধিবাসীগণ সমস্বরে স্বীয় সত্ব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। ডব্লিন নগরে একটী বৃহৎ প্রতিনিধি-সভা স্থাপিত হইল। তাহারা পার্লেমেণ্টের অনুকরণে কার্য্য করিতে লাগিল। পল্লীতে পল্লীতে তাহাদিগের সংকল্প-উদ্দেশে চাঁদা সংগ্রহ হইতে লাগিল—সংবাদ পত্র সকল সাধারণ প্রজাবর্গকে উত্তেজিত করিয়া দিতে লাগিল—কাথলিক ধর্ম্ম-মন্দির সকল পাদ্রিদিগের জ্বলন্ত বক্তৃতায় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। যেমন একদিকে ক্যাথলিকগণ এই রূপে আন্দোলন করিতেছিল, ও দিকে আবার প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় নানা সভা স্থাপন করিয়া উৎসাহের সহিত তাহাদিগের প্রতিবন্ধকাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ে একটি ধর্ম্মযুদ্ধ আসন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইল। পাছে শান্তিভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায় পার্লেমেণ্ট, কি প্রটেষ্টাণ্ট কি ক্যাথলিক উভয় সম্প্রদায়ের সভার অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু এই উপায়ে বিপদ নিবারণ হইল না। আইনকে বঞ্চনা করিয়া ছলে কৌশলে সভার অধিবেশন হইতে লাগিল এবং তিন বৎসরের মধ্যে ঐ আইন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। এক্ষণে বিপদের চূড়ান্ত সময় উপস্থিত। উত্তেজিত প্রজাবর্গের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, সভা সকল আরও উগ্রচণ্ড হইয়া উঠিল—এবং বহুসংখক ক্যাথলিকদিগের একত্র সম্মিলন হইতে লাগিল; তাহাদিগের মধ্যে যুদ্ধ-শাস্ত্রানুযায়ী দল বন্ধন ও ইঙ্গিত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মত প্রকাশ অপেক্ষা বাহুবল প্রদর্শনই এই সকল সভার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। যদি তাহাদিগের পথে কোন প্রতিবন্ধক না দেওয়া হয় তাহা হইলে সাধারণ শান্তির ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা এবং গবর্ণমেণ্ট ও ক্যাথলিক সম্প্রদায়কে ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয়, আর যদি তাহাদিগকে সৈন্য-বল দ্বারা দমন করিতে হয়, তাহা হইলেও সৈনিকগণের সহিত সাধারণ প্রজামণ্ডলীর যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। উভয় দিকেই সঙ্কট। যাহাই হউক অবশেষে কর্ত্তৃপক্ষগণ, পাছে শান্তি-ভঙ্গ প্রজাবর্গের মধ্যে ত্রাস উপস্থিত হয়, এই জন্য ঐ

সভা বন্ধ করিয়া দিলেন। গবর্ণমেণ্টের সহিত বল-পরীক্ষা করিতে অনিচ্ছু হইয়া এবং অধিকাংশ লোকের মত গবর্ণমেণ্টের অনুকূল বলিয়া বুঝিতে পারিয়া, ঐ কাথলিক সভা শাসনকর্ত্তৃপক্ষগণের আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন।

এইরূপে, কর্ত্তৃপক্ষ-দলের দৃঢ়তা ও ক্যাথলিক নেতাদিগের বিজ্ঞতা নিবন্ধন রক্তপাত পূর্ব্ব হইতেই নিবারিত হইল। কিন্তু ক্যাথলিকদিগকে অত্যাচার হইতে মুক্ত করিবার জন্য অধিকতর উদ্যম সহকারে আন্দোলন চলিতে লাগিল।

পার্লেমেণ্টের অধিকাংশ সভ্য ও মন্ত্রিদল প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-ভুক্ত হওয়ায় ক্যাথলিকদিগের প্রার্থনা-বিরুদ্ধে দৃঢ়রূপে প্রতিবাদ করিতে তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু সাধারণের মধ্যে এরূপ ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল, যে তাহার প্রতিরোধ করিতে আর তাঁহারা সাহস পাইলেন না। সাধারণ প্রজাবর্গ রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের উপর জয়লাভ করিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ক্যাথলিকগণ রাজনৈতিক অত্যাচার হইতে মুক্তি লাভ করিল। ন্যায়ের পক্ষ, ধর্ম্মের পক্ষই জয়লাভ করিল। সংকীর্ণ রাজনীতি এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কুসংস্কার অনেক দিন পর্য্যন্ত উহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু পার্লেমেণ্ট ও দেশের প্রাজ্ঞ ও উদার ব্যক্তিগণ ঐ পক্ষের সহায় ছিলেন। এই সকল ঘটনার মধ্যে এইটি দেখা যায় যে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ সাধারণ মতের উপর নির্ভর করিয়াই বিশৃঙ্খলা নিবারণ করিলেন এবং বিনা রক্তপাতে কেবল সাধারণের আন্দোলন দ্বারাই ন্যায়ের পক্ষ জয়লাভ করিল।

ইহার পর পার্লেমেণ্টের সংস্কার লইয়া আর একটি ঘোরতর জাতীয় আন্দোলন উপস্থিত হইল। ফ্রান্সের অভিনব বিপ্লবকাণ্ডে ইতর সাধারণ প্রজাবর্গের অত্যন্ত উৎসাহ হইয়াছিল, এবং তৎকালীন ইংলণ্ডের অবস্থাও সেই উৎসাহানল প্রজ্জ্বলিত করিবার পক্ষে অনুকূল ছিল। সাধারণ প্রজাবর্গকে রাজনৈতিক অনধিকার হইতে মুক্তি দিবার জন্য তৎকালীন লোক-প্রিয় মন্ত্রিদল একটি আইন প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—কিন্তু যে পুরাতন দল, প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের সংকীর্ণ প্রণালী এবং মুখাপেক্ষী পার্লেমেণ্টের দ্বারাই এত দিন ইংলণ্ডকে শাসন করিয়া আসিয়াছিলেন তাঁহারা উহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন। এই প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে এক দল লোক এতদূর প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিলেন যে ঐ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পক্ষে বিলক্ষণ সন্দেহ উপস্থিত হইল। কিন্তু সাধারণ প্রজাবর্গ অতিমাত্র আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে তৎসমর্থনার্থ অগ্রসর হইল। সংবাদপত্র সকল উগ্রভাব ধারণ করিল, রাজনৈতিক সম্মিলন সকল সংগঠিত হইবার উপক্রম হইতে লাগিল—সাধারণ লোকের প্রকাণ্ড অশ্রুতপূর্ব্ব সভা সকলের অধিবেশন হইতে আরম্ভ হইল। রাষ্ট্র-বিপ্লব আসন্ন। এই সময় হাউস অফ্ লর্ড্সের টোরি দল দুর্দ্দমনীয় সাধা-

রণ মতের নিকট অবশেষে মস্তক অবনত করিলেন। এইরূপে বিপ্লব নিবারিত হইল। সম্ভ্রান্ত দল পরাভূত ও নতশির হইলেন, সাধারণের আন্দোলন আবার প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু এই পরাজয় প্রকৃত কর্তৃপক্ষ দলের পরাজয় নহে। যেহেতু রাজ্যের মন্ত্রিদল, হৌস অফ্ কমন্সের অধিকাংশ এবং পার্লেমেণ্টের সম্ভ্রান্ত বিভাগেরও কিয়দংশ সভ্যগণ-প্রস্তাবিত সংস্কার আইনের পক্ষাবলম্বী ছিলেন। এই ব্যবস্থার কল্পনা বিপ্লবপ্রিয় ইতর লোকদিগের উষ্ণ মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত হয় নাই, স্বকার্য্যদায়ী প্রাজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞেরা, যাঁহাদিগের উপর সাধারণ প্রজাবর্গের সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তাঁহারাই উহার প্রবর্ত্তক। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও ভদ্র লোকেরা এই আন্দোলনের নেতা; এবং মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবি লোকেরাও এই আন্দোলনের সহযোগী ছিল। ইহার দ্বারা কোন বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই—সর্ব্বসাধারণ প্রজাবর্গ প্রতিনিধিত্বের অধিকারী, এই মতটি মুখেই এতদিন অবস্থিতি করিতেছিল এক্ষণে তাহা কার্য্যে পরিণত হইল এই মাত্র। যদি সম্ভ্রান্ত দল অনেক দিন ধরিয়া অধ্যবসায় সহকারে উহার প্রতিরোধী না হইতেন, তাহা হইলে সাধারণের মধ্যে এরূপ ঘোরতর আন্দোলন উত্তেজিত হইত না—পার্লেমেণ্টের মধ্যেই তর্কবিতর্ক হইয়া যা হয় একটা নিষ্পত্তি হইয়া যাইত। অতএব এবারও দেখা যাইতেছে যে বৈধ উপায় অবলম্বন করিয়া ন্যায়ের পক্ষ জয়লাভ করিল।

যৎকালে ইংলণ্ডে এই সঙ্কটাবহ আন্দোলন চলিতেছিল, সেই একই সময়ে ইংলণ্ড ও আয়রল্যাণ্ডের সম্মিলন (Legislative union) রহিত করিবার জন্য আর একটি ঘোরতর আন্দোলন আয়রলণ্ডে প্রবর্ত্তিত হয়। ক্যাথলিক পক্ষের সহায় ও নেতা Mr O' Connel অনতিপূর্ব্বে ক্যাথলিকদিগের অধিকার সমর্থন পূর্ব্বক জয়লাভ করিয়া, এক্ষণে আবার এই সম্মিলনের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু এবার তিনি যে পক্ষ অবলম্বন করিলেন তাহা পূর্ব্বাবলম্বিত পক্ষ হইতে অনেক ভিন্ন। এ পক্ষের কোন প্রাজ্ঞ নেতা ছিল না, কেবল কতকগুলি নির্ব্বোধ ইতর দলপতি মাত্র ছিল—সকল দলের রাজনীতিজ্ঞেরাই এই জন্য এই প্রস্তাবটিকে অগ্রাহ্য করিলেন এবং সমস্ত রাজ্যের লোকে এই প্রস্তাবের দোষ দর্শাইতে লাগিল। রহিতকারী দল নানা প্রকার বাহ্য কোলাহল আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণ পার্লেমেণ্ট ও সমস্ত দেশের সহায়তার উপর নির্ভর করিয়া অনায়াসে তাহাদিগকে দমন করিতে সমর্থ হইলেন।

কএক বৎসর পরে আবার এই বিষয় লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইল। এবার আরও বিস্তৃত ভাবে দল প্রস্তুত হইল, এরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড "রাক্ষস" সভার অধিবেশন হইতে লাগিল যে সাধারণের শান্তিভঙ্গ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। কিন্তু শাসনকর্ত্তৃপক্ষগণ পুনর্ব্বার এই আন্দোলনকে দমন করিতে সমর্থ হইলেন।

ন্যায়সঙ্গত নহে বলিয়া উহা সর্ব্বসাধারণের রুচিজনক হয় নাই—সুতরাং সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য্য হইল।

এইরূপে Orang Lodges দিগেরও দলকে অনায়াসেই দমন করা হইল। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ঘৃণা ও দলাদলীর উগ্রভাব এই দলের পত্তন ভূমি হওয়ায়—শীঘ্রই সাধারণের শান্তিভঙ্গ এবং রাজকার্য্যের ব্যাঘাত হইবার উপক্রম হইল, সাধারণের মতও ঐদলের পোষক ছিল না—সুতরাং উহাও অচিরাৎ ধরাশায়ী হইল।

যেমন এক দিকে কতকগুলি অযোগ্য বিষয়ের আন্দোলন নিস্ফল হইল—তেমনি আর এক দিকে "দাসত্ব-বিরোধী সভা" শান্তভাবে স্বদেশীয় লোকদিগের উচ্চভাব জাগরূক করিয়া কেমন আস্তে আস্তে স্বীয় সাধু সঙ্কল্প সিদ্ধ করিলেন—সমস্ত ব্রিটিস রাজ্যের দাসদিগকে মুক্তিদান করিলেন।

যৎকালে আয়রলণ্ডে সম্মিলন রহিত করিবার আন্দোলন চলিতে ছিল ইংলণ্ডে Chartistsদিগের দল ক্রমে জাঁকিয়া উঠিতে ছিল। সমস্ত শ্রমজীবিরাই প্রায় এই দলভুক্ত। তাহারা তাহাদের charter এর পাঁচটি বিষয় মনোনীত করিয়াছিল;—প্রতিনিধিত্বের সার্ব্বজনিক অধিকার (Universal suffrage)—Ballot দ্বারা সম্মতিদান (vote) পার্লেমেণ্টের বাৎসরিক অধিবেশন—সভ্যদিগের বেতন নির্দ্দেশ এবং সম্পত্তি অনুসারে প্রতিনিধির অধিকার নিরূপণ রহিত করা। সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী যাঁহারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের হাল বন্দবস্তে সন্তুষ্ট ছিলেন, বিশেষত যাঁহারা শ্রমজীবিদিগের নিয়োজক, তাঁহাদিগের নিকট এই প্রস্তাবটি আদৌ আদরণীয় হইল না। কিন্তু অসন্তুষ্ট শ্রমজীবিগণ আইনের দ্বারা স্বীয় হীন অবস্থার উন্নতি করিতে উৎসুক হইয়া এবং অন্যান্য আন্দোলনের সফলতায় উৎসাহিত হইয়া বড় বড় সভা করা—বড় বড় দরখাস্ত দাখিল করা প্রভৃতি চিরপরিচিত উপায় সকল অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিল।

অনেক সময় তাহাদিগের উদ্যম উৎসাহ দাঙ্গায় পরিণত হইত এবং তৎক্ষণাৎ ম্যাজিষ্টেট্ কর্ত্তৃক শাসিত হইত। তাহাদিগের সংখ্যা কম ছিল না—এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহাদিগের দল অটুট ছিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে যখন ফ্রান্সে রাষ্ট্রবিপ্লব বাধিয়া উঠে, সেই সময় এই চার্টিস্ট দল তাহাদিগের চার্টরের অনুকূলে বৈপ্লবিক আন্দোলন পুনরায় উপস্থিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইল। তাহাদিগের আবেদন সকল অনাদৃত হওয়ায় তাহারা আর একটা দরখাস্ত পাঁচ লক্ষ লোক দ্বারা স্বাক্ষর করাইয়া দল বল সমভিব্যাহারে হউস্ অফ্ কমন্সে যাত্রা করিবার জন্য স্থির করিল। এই উদ্দেশে Kensington Common এ ১০ই আপ্রিলে একটি বৃহৎ সভা আহূত হইল। সেই স্থান হইতে সকলের একত্র যাত্রা করিবার কথা ছিল।

প্যারিস নগরে, এ প্রকার বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হইলে রাষ্ট্রবিপ্লব উপ-

স্থিত হয়। কিন্তু লণ্ডনে সাধারণ-মত-বিরোধী বৈপ্লবিক আন্দোলন সকল কি প্রকারে সমাজ ও কর্তৃপক্ষগণের বলবৎ শাসনে প্রতিরুদ্ধ হয়, তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ সেই দিনকার ব্যাপারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ আহূত সভা অবৈধ বলিয়া ঘোষণা-পত্র দ্বারা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। শান্তিরক্ষার জন্য, এই বিশেষ উপলক্ষে নূতন ১৭০,০০০ চৌকিদার নিযুক্ত হইল। Westminister Bridge এবং পার্লেমেণ্ট বাটীর সন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের চতুর্দ্দিকে কামান ও পদাতিক সৈন্য প্রচ্ছন্ন ভাবে স্থাপিত হইল। সভার কার্য্য ভণ্ডুল হইয়া গেল। Westminister Bridge দিয়া যাত্রা নিষিদ্ধ হইল এবং সমাগত লোকেরা কোন প্রকার উৎপাত না করিয়া হতাশ হইয়া আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিল।

এই চার্টিষ্ট দলের কার্য্যপ্রণালী অপরিপক ছিল। তাহাদিগের নেতৃগণের তেমন আন্তরিক উৎসাহ ছিল না এবং তাহারা অক্ষম ও ভীরু ছিল। উৎকৃষ্ট নেতা থাকিলেও তাহাদিগের সঙ্কল্প নিষ্ফল হইবার কথা—তাহাদিগের সহিত অন্য শ্রেণীর সহৃদয়তা ছিল-না—পার্লেমেণ্টের কোন সভ্য দলই তাহাদিগের সহায় ছিল না—তাহারা সংখ্যায় বলবান ছিল কিন্তু সমাজ ও রাজ্যের সমবেত বল তাহাদিগের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছিল—তাহারা কিয়ৎকালের জন্য শান্তিভঙ্গ করিতে পারিত এই মাত্র কিন্তু কখনই স্বীয় সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে পারিত না। ইতিমধ্যে আর একটি আন্দোলন উপস্থিত হইয়া পরিণামে জয় লাভ করিল। উহা শস্য-আইন-বিরোধী সম্মিলনের (Anti-Corn-Law League) আন্দোলন। যে প্রস্তাব সমর্থনার্থ এই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল তাহা ন্যায়সঙ্গত ও জাতি-সাধারণ-সম্মত—সুতরাং তাহা সম্পূর্ণরূপে সুসিদ্ধ হইল। এই বিষয়ে শ্রমনিয়োজক ও শ্রমজীবি উভয় দলেরই সমান স্বার্থ হওয়ায় তাহারা একত্র সম্মিলিত হইয়াছিল। এই আন্দোলনের নেতা—Mr Cobden এবং Mr Bright উভয়ই সুযোগ্য এবং লোক-প্রিয় বক্তা—তাঁহারা বার্ত্তাশাস্ত্রের সত্য সকল পরিষ্কার রূপে ব্যাখ্যা করিতে যেরূপ সক্ষম, লোকদিগের মনকে উত্তেজিত করিতেও তেমনি সমর্থ। এবং অনেক দিন হইতে দেশের প্রখ্যাত ব্যক্তিগণ এবং পার্লেমেণ্টের একদল তাহাদিগের মত পোষণ করিয়া আসিয়াছিলেন—ইহাঁদের মধ্যে Mr Charles Villiers প্রধান ছিলেন। কিন্তু ইহাঁদের বিরুদ্ধ মতের লোকও অসংখ্য ছিল। বিদেশীয় বাণিজ্যের অবরোধ দ্বারা দেশীয় বাণিজ্য সংরক্ষণ (Protection) অনেক দিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডীয় বাণিজ্য-নীতির একটি স্থির মত ছিল। জমিদার ও ধনী কৃষকগণ (Farmers) মনে করিত বিদেশ হইতে ইংলণ্ডে শস্য মুক্তভাবে আমদানি হইবার পথে প্রতিবন্ধক প্রয়োগ করাই ব্রিটিশ কৃষিকার্য্যের উন্নতি পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। স্বাধীন বাণিজ্য কতদূর সু-

ফলপ্রদ, তাহা কারখানা-অধ্যক্ষেরা প্রথমে তেমন বুঝিতে পারেন নাই। পার্লেমেণ্টের বহুসংখ্যক সভ্য উহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাবের অনুকূলে প্রভুত উদ্যম ও অধ্যবসায় সহকারে আন্দোলন চলিতে লাগিল। তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাও এই আন্দোলনের অনুকূল ছিল—বিশেষত আয়রলণ্ডের দুর্ভিক্ষের আলোচনায় স্বাধীন বাণিজ্যের উপকারিতা লোকে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিল। ৮ বৎসরের মধ্যে সাধারণের মত ফিরিয়া গেল। পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিজ্ঞেরা,এমন কি পার্লেমেণ্ট পর্য্যন্ত অবশেষে স্বাধীন বাণিজ্যের মতে দীক্ষিত হইলেন।

সাধারণ লোকের বল যেরূপ এই আন্দোলনে প্রকাশ পায়, স্বাধীন রাজ্যে বুদ্ধি জ্ঞানের কতদূর প্রভাব তাহাও বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। দেশের সমস্ত প্রজাবর্গ এবং কর্ত্তৃপক্ষগণ বিচার করিয়া একটি সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন—এস্থলে বাহুবলে নহে, জ্ঞানবলেই জয় লাভ হইল।

ইহার পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রজাসাধারণের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই। অবশেষে ১৮৬৬খৃষ্টাব্দে আইন সম্বন্ধে পার্লমেণ্টের সংস্কারের প্রস্তাব পুনরুদ্দীপিত হওয়ায় সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে একটা ঘোঁট পড়িয়া গেল। "সংস্কার সম্মিলন সভা" (Reform League) ঘোষণা করিয়া দিলেন যে ২৩ জুলাই মাসে Hyde Park নামক স্থানে তাহাদিগের একটি অধিবেশন হইবে। কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহা নিষেধ করিয়া দিলেন। কিন্তু নিষেধ আজ্ঞা বলবৎ রাখিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে যে সকল উপায় অবলম্বন করা উচিত ছিল, তাহার প্রতি মনোযোগী না হওয়ায় Hyde Park এর রেলিং ভঙ্গ করিয়া ইতর লোকেরা কিরূপে ঐ প্রখ্যাত উদ্যান অধিকার করিয়াছিল তাহা সংবাদ পত্রের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। তাহার পর বৎসরে সভার আর একটি অধিবেশন নিষিদ্ধ হয় কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণের নিষেধ সত্বেও ঐ সভা বসিয়াছিল। এই দুই বারেই সাধারণ প্রজাবর্গ কর্ত্তৃপক্ষগণের উপর জয়লাভ করে। রাজশাসনকে সাধারণ প্রজাবর্গ যে এইরূপে অবজ্ঞা করিতে সমর্থ হইল তাহার প্রকৃত কারণ কর্ত্তৃপক্ষগণের দুর্ব্বলতা ও দৃঢ়সঙ্কল্পবিহীনতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেই অবধি হাইড্ পার্কে সভার উদ্দেশে লোকসমাগম একেবারে নিষিদ্ধ হয় নাই বটে—কিন্তু তৎসম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম স্থাপিত হইয়াছে।

কিয়ৎ বৎসর পরে আর একটি ছোটখাটো আন্দোলন উপস্থিত হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে Chancellor of the Exchequer উপস্থিত বৎসরের আয়ব্যয়ের আনুমানিক হিসাবে দেশলাইয়ের উপর কর স্থাপন করিবার প্রস্তাব করায়, দেশলাইয়ের প্রধান কারখানাওয়ালারা হঠাৎ তাহাদিগের লোকদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন—এই শ্রমজীবীগণ একত্র সমবেত হইয়া এই ট্যাক্সের প্রতিবাদ করিবার জন্য Westminster পর্য্যন্ত যাত্রা করিল। এই সামান্য

কর একটি বিশেষ শিল্পের উপর হওয়ায় সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে ও হাউস অফ্ কমন্সে এই করের প্রস্তাব আদরের সহিত গৃহীত হইল না—গরিব দেশলাইওয়ালাদিগের প্রতি সাধারণ লোকের মমতা উপস্থিত হইল। এবং এই প্রস্তাব অচিরাৎ পরিত্যক্ত হইল।

ইংলণ্ডের আইন ও ব্যবস্থার উপর সাধারণ লোকের কতদূর প্রভাব তাহা এই সকল আন্দোলন হইতে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। ইতর লোক সমাগমে অনেক সময় শান্তি ভঙ্গ হইবার উপক্রম হয়—লোকপূর্ণ নগর সকল বহু সংখ্যক ইতর লোকের একত্র সমাগম যে সঙ্কটাবহ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংলণ্ডে রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। ইংলণ্ডের ইতিহাসে দেখা যায়—যে, যে সকল বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তাবের আন্দোলন ন্যায়ের উপর স্থাপিত এবং পার্লেমেণ্টে কোন দল বিশেষ যাহার সহায়—অনেকটা সাধারণ মত যাহার পরিপোষক—এবম্বিধ প্রস্তাব সকলই পরিনামে জয়যুক্ত হইয়াছে। এই রূপে সাধারণ লোকের ইচ্ছাক্রমে অনেক সময়ে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ হিতকর প্রস্তাব সকল গ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং যে সকল প্রস্তাব অন্যায়মূলক, তাহার জন্য লোকে হাজার চীৎকার করুক—গবর্ণমেণ্ট ও পার্লেমেণ্ট দৃঢ়তা সহকারে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছেন।

ক্রমশঃ

দেশ-কাল এবং তাহার অতীত প্রদেশ।

তত্ত্বান্বেষণ করিবার দুইটি প্রণালী;—(১) সূক্ষ্ম বস্তু-সকলের যোগাযোগ দ্বারা স্থূল বস্তু গড়িয়া তোলা, (২) স্থূল বস্তু ভাঙিয়া চুরিয়া সূক্ষ্ম অংশাবলিতে পরিণত করা। প্রথম প্রণালী অপেক্ষা দ্বিতীয় প্রণালী সহজ—গড়া অপেক্ষা ভাঙা সহজ। কিন্তু তাহার মধ্যে একটা কথা আছে,—জীবন্ত একটা জন্তুকে কাটিয়া কুটিয়া তাহার ভিতরকার নানাবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেস্ তন্ন তন্ন করিয়া দেখানো যাইতে পারে—কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, তখন তাহার প্রাণ প্রস্থান করিয়াছে। ভাঙা সহজ কিন্তু যাহার জন্য ভাঙা তাহা হস্তে পাওয়া—আসল ভিতরের বস্তু তলাইয়া পাওয়া অতীব কঠিন। হাজার হউক্ দ্বিতীয় প্রণালীটি বুঝিবার বুঝাইবার পক্ষে সবিশেষ উপযোগী, আর তাহা আমাদিগকে চরম গম্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিতে না পা-

রুক্—কতকটা পথ বেস্ নির্বিঘ্নে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে। এই সমস্ত কারণে আপাততঃ দ্বিতীয় প্রণালীটি অবলম্বন করা যাইতেছে—স্থূল বস্তুতে গোড়া-পত্তন করিয়া ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মের দিকে অগ্রসর হওয়া যাইতেছে; স্থূল জড় বস্তু ভাঙিয়া দেশ-কাল-ঘটিত সূক্ষ্ম-তত্ত্বে উপনীত হইবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

জড়-বস্তুর সত্তাকে প্রথমে ধরা যাউক্;—জড় জগৎ স্থায়ী কি অস্থায়ী?

জড়-বস্তু-মাত্রই আকাশে বিস্তৃত; এ-জন্য, যদি তাহার ধ্বংস সম্ভব হয় তবে তিনটি বই আর তাহার পথ নাই,—(১) বিকীরণ (অর্থাৎ বিকীর্ণ হওয়া), (২) সংকীরণ (অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ হওয়া), (৩) বিভাজন,—এই তিনটি পথ। মনে কর তুল-রাশি অগ্নি-সংযোগে ধূমাবশিষ্ট হইয়া অল্প পরিমাণ স্থান হইতে ক্রমশই অধিক পরিমাণ স্থানে বিকীর্ণ হইতেছে; যতই তাহার বিস্তার বাড়িতেছে ততই তাহার গাঢ়তা বা ঘনত্ব কমিতেছে; যদি তাহার বিস্তার কোন-কালে অসীম হয়, তবেই তাহার গাঢ়তা একেবারে শূন্যাবশিষ্ট হইয়া যাইবে—সর্ব্ব-সমেত অসীম আকাশ-রূপে পরিণত হইবে। বাহ্য-বিষয়কে দিয়া অসীম আকাশের সংজ্ঞা করিতে হইলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, সেই বাহ্য-বিষয় যাহা ব্যাপ্তিতে অসীম বৃহৎ ও গাঢ়তায় অসীম অল্প তাহারই নাম অসীম আকাশ। কিন্তু বিকীরণ দ্বারা অসীম আকাশে পরিণত হওয়া সীমাবদ্ধ বস্তুর পক্ষে অনন্ত-কাল সাপেক্ষ—কোন নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যেই তাহা সম্ভবে না, সুতরাং কোন কালেই তাহা সম্ভবে না। এ যেমন—তেমনি আবার উহা বিভাজন-দ্বারা খণ্ড আকাশ-বিশেষের অসংখ্যক বিন্দু-সমষ্টিতে পরিণত হইয়া (এক কথায় এই যে খণ্ড আকাশ-বিশেষে লয় প্রাপ্ত হইয়া) বিলুপ্ত হইতে পারে না; কেননা উহাকে অর্দ্ধেক তদর্দ্ধেক তস্য অর্দ্ধেক করিয়া অনন্ত-কাল ধরিয়া বিভাগ না করিলে আর তাহা সম্ভবে না; অতএব তাহাও কোন নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে হইতে পারে না—সুতরাং কোন কালেই হইতে পারে না। এমনি আবার—উহাকে নিপীড়ন দ্বারা আকাশের একটি-মাত্র বিন্দুতে পরিণত করিয়া বিলুপ্ত করা যায় না; এক ত যদি কোন বস্তুর কোন পরমাণু-দ্বয়ের মধ্যে আদবেই কোন ছিদ্র না থাকে তবে চতুর্দ্দিক্ হইতে তাহার উপর প্রভূত বল প্রয়োগ করিয়াও তাহাকে আর অধিক সংহত করিতে পারা যাইবে না (কেননা নিপীড়নের মাত্রা যত বাড়াও প্রতি-ঘাতের মাত্রা তত বাড়িবে, তাহাতে করিয়া কোন কার্য্য হইবে না); আর যদি বল যে, কোন বস্তুর কোন অংশ একেবারেই নিশ্ছিদ্র হইতে পারে না, তবে ত আর কথাই নাই;—কোন বস্তুর কোন অংশ-দ্বয়ের মধ্যে যত ক্ষণ পর্য্যন্ত ছিদ্র থাকে—আকাশের ব্যবধান থাকে,—ততক্ষণ তুমি বলিতেই পার না যে, উহা একটি মাত্র অসীম ক্ষুদ্র আকাশ-বিন্দুতে সংক্ষিপ্ত হই-

য়াছে,—ছিদ্র আছে যখন বলিতেছ, তখন প্রকারান্তরে ইহাই বলা হইতেছে যে, তাহার চতুর্দ্দিকস্থ পরমাণুগণ একটি মাত্র আকাশ-বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত নহে। অতএব স্থির হইল যে, সঙ্কীরণ-দ্বারা একটি মাত্র বিন্দুত্ব প্রাপ্ত হওয়া জড় বস্তুর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। এইরূপ,—জড়-বস্তুর বিলোপ-সম্ভাবনার যে তিনটি পথ বই আর পথ নাই (বিকীরণ, বিভাজন, এবং সঙ্কীরণ) সে তিনটি একে একে রুদ্ধ হইয়া গেল। জড় বস্তুগণের মধ্যে বাষ্পীয় পদার্থে বিকীরণের—জলীয় পদার্থে বিভাজনের—এবং ভূপ্রস্তরাদি সংহত পদার্থে সঙ্কীরণের—বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু প্রকরণ-তিনটির একটিরও অসীম মাত্রাধিক্য সম্ভবে না। বিলোপের ভাব না হউক্ বিলোপের ভান শুদ্ধ কেবল বাষ্পীয় পদার্থেই দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে—বিকীরণ দ্বারা অদৃশ্য হওয়াকেই আমরা বিলোপ কহিয়া থাকি, কিন্তু বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম দৃষ্টির কাছে ও-কথায় কোন মূল্য নাই।

পূর্ব্ব পক্ষ। ভাল, ও তিন প্রকারে না হউক্, আর এক রূপ করিয়া ত জড়বস্তু লোপ পাইতে পারে। জড়বস্তু-মাত্রই আকর্ষণ এবং বিক্ষেপ এই দুটি পরস্পর-বিরোধী ক্রিয়ার উপর ভর করিয়া স্থিতি করিতেছে; যদি কোন উপায়ে কোন জড়বস্তুর মধ্য হইতে আকর্ষণ-ক্রিয়া সমূলে অপহৃত হয়, তবে বিক্ষেপ ক্রিয়াকে সীমাবদ্ধ করিবার কেহ না থাকাতে উক্ত বস্তু একেবারেই অসীম আকাশে বিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার সংস্থিত তন্ময় হইয়া যায় সুতরাং বিলুপ্ত হয়; আর তাহার মধ্য-হইতে যদি কোন উপায়ে বিক্ষেপ-ক্রিয়া সমূলে অপহৃত হয় তবে (আকর্ষণ-ক্রিয়ার বাধক-বিরহে) বস্তুটি তাহার ভারকেন্দ্রে সংক্ষিপ্ত হইয়া—বিন্দুত্ব প্রাপ্ত হইয়া—বিলুপ্ত হয়; আর যদি উভয়-ক্রিয়া বিলুপ্ত হয় তবে আকর্ষণের অভাব প্রযুক্ত তাহার কোন অংশ-দ্বয়ের মধ্যে বাঁধুনি না থাকাতে তাহা বিন্দু-বিন্দু হইয়া স্বকীয় আকাশ-খণ্ডে বিলয় প্রাপ্ত হয় সুতরাং বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব জড় বস্তু হইতে উক্ত ক্রিয়াদ্বয়কে বা তাহার কোনটিকে অপহরণ করিতে পারিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা সমূলে বিনাশ পায়;—তবে আর কেমন করিয়া বলি যে, তাহার ধ্বংস আদবেই সম্ভবে না।

উত্তর পক্ষ। কোন জড় বস্তু-হইতে উক্ত ক্রিয়াদ্বয় অপহরণ করা অসম্ভব। আকাশ-ব্যাপী বস্তুর লোপ যেমন অসম্ভব, কাল-ব্যাপী ক্রিয়ার লোপও সেই রূপ অসম্ভব। আকর্ষণ এবং বিক্ষেপ উভয়ই গতি-ক্রিয়া, গতি-ক্রিয়া কোন কালেই বিলুপ্ত হইবার নহে। যদি একটা গোলা বাধা-বিহীন শূন্য প্রদেশে একবার চালিত হয় তাহা হইলে যতক্ষণ না তাহা কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত হইবে ততক্ষণ ক্রমাগতই চলিতে থাকিবে, কেন না তাহা পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত হইতে বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যখন চলিয়াছে, তখন বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত হইতে পর মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কেন যে চলিবে না তাহার কোন কারণ নাই; তবে যদি সম্মুখে একটা কোন

উপযুক্ত কারণ উপস্থিত হইয়া তাহার গতি-রোধ করে—তবেই তাহার গতি-রোধ হইবে—নচেৎ নহে; কেন না বিশেষ কোন কারণাভাবে বিশেষ কোন কার্য্য সম্ভবে না। কিন্তু সে গতি-রোধ—গতির রোধ ভিন্ন আর কিছুই নহে—গতির লোপ নহে; গতি-রোধ যদি ক্ষণিক হয় তবে দুই দ্বন্দ্বী-পক্ষ স্ব স্ব উপচয় (mass) অনুসারে পরস্পর গতি-বিনিময় করিয়া দুই বিপরীত দিকে বা একই দিকে সমবেগে বা দ্রুত-মন্দ বেগে ক্রমাগতই চলিতে থাকিবে; ঠেকা-ঠেকির পরে একটির যদি গতি-মাত্রা (momentum) বৃদ্ধি হয় তবে অপর-পক্ষের গতি-মাত্রা সেই পরিমাণে কমিয়া যাইবে; সুতরাং মোট গতি-মাত্রা পূর্ব্বেও যা ছিল পরেও তাই থাকিবে, তাহার বিন্দু মাত্রও ধ্বংস হইবে না,—গতি-মাত্রা যা একটু কমিতে দেখা যায় তাহা উত্তাপ-রূপ ধারণ করিয়া উভয়ের পরমাণুগণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে;—এ একরূপ অজ্ঞাত-বাস—ধ্বংস নহে। আবার, কোন বস্তুকে যদি এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে দেখা যায়, তথাপি ইহা বলিতে পারা যায় না যে, তাহা নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে, কেন না তখনও তাহার পরমাণু-গণের মধ্যে আকর্ষণ এবং বিক্ষেপ-শক্তি এক মুহূর্ত্তও কার্য্যে ক্ষান্ত নাই। মনে কর খড়ের গাদার উপর একটা লোহার গোলা রহিয়াছে তাহা হইলে তুমি বলিবে যে,গোলাটার গতি-ক্রিয়া বিলুপ্ত হইয়াছে—কিন্তু তাহা বলিতে পার না; কেননা প্রতি-মুহূর্ত্তই তাহা পৃথিবীর দিকে গতি-প্রবণ হইয়া রহিয়াছে; শক্তির কার্য্য-করাকে যদি ক্রিয়া বলা যায় তবে তাহার গতি-ক্রিয়া প্রতিমুহূর্ত্তই চলিতেছে—তাহার গতি-শক্তি তাহার অভ্যন্তরে প্রতি মুহূর্ত্তই কার্য্য করিতেছে; কেবল খড়ের গাদার প্রতিবন্ধকতা-বশতঃ তাহা আমাদের প্রত্যক্ষ-গোচর হইতেছে না; খড়ের গাদা আগুণ দিয়া জ্বালাইয়া দেও, অমনি তাহার সেই গতি ক্রিয়া প্রকটীভূত হইবে। সেই গোলা এবং তদাশ্রিত আকাশ উভয়ই ত প্রথমে খড়ের গাদার উপর ছিল, কিন্তু খড়ের গাদা অগ্নিসাৎ হইয়া গেলে গোলা ভূতলে পড়িল তদাশ্রিত আকাশ যে খানকার সেই খানেই রহিল; ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, গোলা উক্ত আকাশ-খণ্ডের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ছিল না,—গোলার গতি-চেষ্টা ক্রমাগতই ছিল; সে চেষ্টা আর কিছু নহে গতিক্রিয়ার প্রথম আরম্ভ,—কিন্তু তা' বলিয়া তাহাকে গতি-ক্রিয়ার বিলোপ বলিতে পার না। গতি-ক্রিয়া এবং প্রতি-ঘাত-ক্রিয়া উভয়কে যদি ভৌতিক ক্রিয়া বলিয়া এক নামে নির্দ্দেশ করা যায় তবে বলা যাইতে পারে যে ভৌতিক ক্রিয়ার কিছুতেই বিলোপ সম্ভবে না। একটা গোলাকে যথাসাধ্য জোরে নিক্ষেপ কর তাহা দৌড়িয়া চলিবে—একটা রেল গাড়ির পিছন দিক হইতে তাহার উপর সেই জোরে একটা ধাক্কা মারো তাহা অতি ধীরে ধীরে চলিবে, কিন্তু ভৌতিক ক্রিয়া দুয়েরই সমান—একটার যেমন প্রতিঘাত ক্রিয়া (অর্থাৎ গতি-বাধকতা কার্য্য) অধিক তেমনি

তাহার গতি ক্রিয়া অল্প, অন্যটির যেমন গতি-ক্রিয়া অধিক তেমনি প্রতিঘাত-ক্রিয়া অল্প,—হরে দরে একই দাঁড়াইতেছে। গতি-ক্রিয়া যখন অধিক বাধা অতিক্রমণে নিযুক্ত থাকে তখন তাহার বেগ-মান্দ্য হয়, যখন অল্প বাধা অতিক্রমণে নিযুক্ত থাকে তখন তাহার বেগাধিক্য হয়, কিন্তু কোন গতি-ক্রিয়া কোন অবস্থাতেই বিলুপ্ত হইতে পারে না। মনে কর আমি দ্রুতবেগে একটা গোলা গড়াইয়া দিলাম ; আমার হস্তের সেই যে গতি তাহা কোন কালেই ধ্বংস হইবে না, ক্রমাগতই চলিতে থাকিবে; আমার হস্তের গতি যেমন গোলাতে সংক্রমিত হইয়া তাহার বাধা অতিক্রমণ করিল তেমনি গোলার গতি গোলা হইতে চলিয়া গিয়া আর আর নানা প্রকার বাধা অতিক্রমণে নিযুক্ত হইতে পারে,—হয়-ও তাই ; চলন্ত গোলা চারিদিকের বস্তুতে গতি বাঁটিয়া দিতে দিতে যায়, সুতরাং সে যত চলে ততই তাহার গতির পুঁজি ফুরাইয়া আসে ; তাহার সে গতি কতক বা অন্যের হস্তে কতক বা আপনার উদরাভ্যন্তরে (উত্তাপ-রূপে) নিঃশেষে সঁপিয়া দিয়া তবে তাহা স্থৈর্য্য অবলম্বন করে,নচেৎ নহে। চালিত গোলা ভূমি ঘর্ষণ করিয়া চলাতে তাহার গতি মন্দীভূত হয়,—কেন ? না ভূমি তাহার নিকট গতি আদায় না করিয়া তাহাকে অমনি যাইতে দেয় না ; ভূমি গতি লইয়া এমনি এক নিভৃত স্থানে চাবি দিয়া রাখে যে তাহা সহজে কেহ খুঁজিয়া পায় না ; কোথায় সে ? না পরমাণুর ভিতরে,—কি আকারে ? না উষ্ণতা-বৃদ্ধি আকারে। উত্তাপ একরূপ পারমাণব গতি, তা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভূমি যেমন, বায়ুও তেমনি একটি গতি-তস্কর—কে যে তাহা নয় তাহা বলা দুষ্কর। কিন্তু গোলা যে বিনা-মূল্যে তাহার আশপাশে গতি বিলাইতে থাকে তাহা নহে,—সেই সঙ্গে সে নিজেও উত্তাপ-রূপী পারমাণব গতি কুড়াইতে থাকে; গোলার গতি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়,—(১) ভূতল-প্রভৃতি বহির্ব্বস্তুর উষ্ণতা এবং তাহার নিজের উষ্ণতা ;—সে গতি অদৃশ্য হইয়া যায় এই পর্য্যন্ত—ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। বারুদ যেমন অগ্নি-সংযোগে অদৃশ্য হয়—বিলুপ্ত হয় না, উহাও সেইরূপ। এই রূপ করিয়া গতি-ক্রিয়া নানা হস্তে ফিরে,—তাহার ব্যয় হইতে পারে কিন্তু তাহার ধ্বংস কোন ক্রমেই সম্ভবে না। এই একটা কথা এখানে উঠিতে পারে যে, চালিত গোলা যেন চালকের হস্ত হইতে গতি উপার্জ্জন করিল কিন্তু চালকের হস্ত যে গতি বিলাইয়া দিল তাহা সে উপার্জ্জন করিল কোথা হইতে ? আয় ব্যতিরেকে ত আর ব্যয় সম্ভবে না। ইহার উত্তর এই যে, অবশ্য চালকের হস্ত তাহা কাহারো না কাহারো নিকট হইতে উপার্জ্জন করিয়াছে ; আমাদের এই যে শরীর, গতির ইহা একটি অদ্বিতীয় ভাণ্ডার ; রক্ত না চলুক দেখি—শরীরের ভিতরকার উষ্ণতা কমুক দেখি—গতির ভাণ্ডার শূন্য হউক দেখি—তখন দেখিবে যে হস্ত চাল-

নার উপর তোমার আর হস্ত নাই। রক্ত-ও কিছু আপনা হইতে গতি সৃষ্টি করিয়া পায় নাই, কালের যেমন মূলান্বেষণ করা— গতির-ও তেমনি মূলান্বেষণ করা অতএব তাহাতে ক্ষান্ত দেওয়া যাক্। এ ত দেখা গেল যে, গতিক্রিয়ার ধ্বংস নাই,— তবে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে তাহার ব্যয় হইতে না পারে এমন নয়; কিন্তু এখনো প্রস্তাব সাঙ্গ হয় নাই;—গতির ব্যয় হয় বটে কিন্তু গতির বিনিময়েই গতির ব্যয় হইতে পারে—বিনা-মূল্যে নহে; এজন্য কোন বস্তু হইতে গতি-ক্রিয়া একেবারের নিঃশেষিত হইয়া যাইতে পারে না; কিরূপ সে? না মনে কর যেন বড় ছোটো গোলা গুলি দুই বিপরীত দিক্ হইতে দ্রুত বেগে পরস্পরের উপর নিক্ষিপ্ত হইল, আর মনে কর যেন সে-গুলি কাচ-নির্ম্মিত, তাহা হইলে উহারা পরস্পরের আঘাত-প্রত্যাঘাতে ভাঙিয়া চুরিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া চারিদিকে ছট্‌কিয়া পড়িবে; তাহাদের মধ্যেকার মোট গতিক্রিয়া হইতে ন্যায্য-মতে যাহার যেটুকু পাওনা তাহা সে আদায় করিবে,—বড়-বস্তুকে ছোটো বস্তু অল্প গতি প্রদান করিয়া তাহার নিকট হইতে অধিক গতি প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু তা বলিয়া এমন হইতে পারে না যে, উপরিউক্ত কোন ভগ্ন-খণ্ড আদবেই কোন প্রকার গতি (অন্ততঃ উষ্ণতা-রূপ পারমানব গতি) অন্যের নিকট হইতে গ্রহণ না করিয়া আপনার সমস্ত গতি অন্যকে বিলাইয়া দিয়াছে; প্রকৃতির ন্যায়-রাজ্যে বিনা-মূল্যে অন্যের নিকট হইতে কেহ যে কিছু আত্মসাৎ করিবে তাহার জো নাই। ইতি পূর্ব্বে দেখানো হইয়াছে যে, ভূতলোপরি চলন্ত গোলা শুদ্ধ যে কেবল ভূমিকে উষ্ণ করে তাহা নহে আপনি সেই সঙ্গে উষ্ণতা উপার্জ্জন করে; গোলার গতি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়, (১) ভূতলের উষ্ণতা এবং (২) তাহার আপনার উষ্ণতা। অন্যকে গতি প্রদান করিলে আপনাকেও গতি ভোগ করিতে হয়; খুব জোরে ইঁট ছুঁড়িলে ইঁটের যেমন গতি-সাধন হয়—হস্তাভ্যন্তরেও সেইরূপ প্রযত্ন-জনিত পারমাণব গতি সাধিত হয়; যাঁহাতক ক্রিয়া তাঁহাতক প্রতিক্রিয়া—একটিকে ছাড়িয়া অন্যটি থাকিতে পারে না।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, গতির আয় ব্যতিরেকে—বিনা মূল্যে—গতির ব্যয় সম্ভবে না; সুতরাং কি আকর্ষণ-ক্রিয়া কি বিক্ষেপ-ক্রিয়া কোন গতিক্রিয়ার বিলোপ দূরে থাকুক্ আয়াতিরিক্ত ব্যয় পর্য্যন্তও সম্ভবে না। বাহ্য বস্তু যেমন আকাশ ব্যাপিয়া স্থিতি করে তাহাদের গতি ক্রিয়া (অর্থাৎ স্থান পরিবর্ত্তন ক্রিয়া) সেইরূপ কাল ব্যাপিয়া স্থিতি করে; আর উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ এইরূপ যে, একটি ব্যতীত অন্যটি থাকিতে পারে না।

জড়-বস্তু যদিচ বিকীরণ-প্রণালী অনুসারে আকাশত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না, কিন্তু ইহা আমাদের জ্ঞানের একটি সুনিশ্চিত তত্ত্ব যে, যদি কোন জড়-বস্তু অসীম আকাশে বিকীর্ণ হয় তবে তাহা আর জড়-

বস্তু থাকে না। মনে কর যেন এক মুষ্টি বারুদ অগ্নি সংযোগে আকাশে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে—পূর্ব্বে তাহা দৃশ্য পদার্থ ছিল এখন তাহা অদৃশ্য পদার্থ হইয়াছে, এই পর্য্যন্ত; এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি একেবারেই অসীম আকাশে বিকীর্ণ হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হইত, তাহা হইলে কি রূপ হইত? এখন বারুদ এবং সেই বারুদ যে-আকাশ-টুকু ব্যাপিয়া আছে—সংক্ষেপে বারুদ এবং তদাকাশ—উভয়ের একটিকে আর-একটি হইতে পৃথক্ করিয়া ভাবা যাইতে পারে; বারুদ যদি স্থানান্তরিত হয় তাহা হইলে তদাকাশ যেখানকার সেই খানেই থাকিবে; কিন্তু যখন তাহা অসীম বিকীর্ণ হইয়া শূন্যাবিশিষ্ট হইয়াছে তখন বারুদ বিলুপ্ত হইয়া তাহার স্থানে কেবল মাত্র এক অসীম আকাশ—সংক্ষেপে মহাকাশ—দাঁড়ায়। অসীম আকাশ—মহাকাশ—যদিচ কোন জড়-বস্তুর ব্যাপ্তি-গম্য নহে কিন্তু তাহা আমাদের জ্ঞানের প্রত্যয়-গম্য; আমাদের জ্ঞানেতে ইহার এক বিন্দুও সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, আকাশ অসীম। জড়-বস্তু-ব্যাপ্য আকাশকে যদি জড়াকাশ বলা যায়—তবে অসীম আকাশকে কোন মতেই জড়াকাশ বলা যাইতে পারে না (কেননা তাহা জড়বস্তুর ব্যাপ্য নহে),—তাহাকে জ্ঞানাকাশ বলাই যুক্তি-সঙ্গত।

পূর্ব্বপক্ষ। অসীম আকাশকে কিংবা জড়বস্তু-নির্লিপ্ত বিশুদ্ধ আকাশকে আমরা একত কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না—না পারি চক্ষু দ্বারা দর্শন করিতে, না পারি হস্ত-দ্বারা স্পর্শ করিতে; তাহাতে আবার মন দ্বারা ভাবিয়া উঠিতেও পরাস্ত মানি—যতই কেন বিস্তৃত হইতে বিস্তৃততর আকাশ ভাবি অসীম আকাশ হইতে তাহা অসীম পশ্চাদ্ধে পড়িয়া থাকে; আবার খণ্ড-আকাশ ভাবিতে গেলে হয় তাহাকে জড়াকাশ (অর্থাৎ জড়-বস্তু-সমাশ্রিত আকাশ) বলিয়া ভাবিতে হয়, নয় তাঁহাকে,জড়-বস্তু দ্বারা পরিব্রত বলিয়া ভাবিতে হয়; প্রথম পক্ষে তাহা ত বিশুদ্ধ আকাশ নহেই—দ্বিতীয় পক্ষে তাহার সীমা-প্রদেশ জড়-বস্তুতে সংক্রমিত সুতরাং সে পক্ষেও তাহা সর্ব্বাংশে বিশুদ্ধ নহে; শুদ্ধ কেবল জড়-বস্তু দ্বারাই আকাশ সীমাবদ্ধ হয়,—সুতরাং জড়-বস্তু-নির্লিপ্ত বিশুদ্ধ আকাশ ভাবিতে হইলে সীমাবদ্ধ আকাশ ভাবিলে চলে না; কিন্তু উপরে দেখা গেল যে,সীমাবদ্ধ আকাশ ভিন্ন অসীম আকাশ ভাবিয়া ওঠা আমাদের সাধ্যাতীত, কাজেই বিশুদ্ধ আকাশও আমাদের ভাবনার গম্য হইতে পারে না; এরূপ যখন—তখন কেমন করিয়া আমরা বলিব যে, আকাশ অসীম ইহা সুনিশ্চিত; যাহা আমারা ভাবনাতেও আয়ত্ত করিতে পারি না তাহার অস্তিত্বে আমরা কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি?

উত্তর পক্ষ। আমি আরব-দেশ চক্ষে দেখি নাই। কিন্তু তত্রত্য আকাশের অস্তিত্বের প্রতি আমার বিশ্বাস একেবারেই অটল; আমার সম্মুখে আমি যে সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহার অস্তিত্বে আমার বিশ্বাস যেমন দৃঢ়, আরব দেশের

অস্তিত্বে তাহা তেমন দৃঢ় না-ও হইতে পারে—ইতি পূর্ব্বে আমার অজ্ঞাত-সারে আরব দেশ জল-মগ্ন হইয়া গিয়া থাকিলেও থাকিতে পারে,—কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা নিকট-তম আকাশে—আমার শরীরাকাশে—আমার যেমন বিশ্বাস, আরব দেশীয় আকাশে আমার বিশ্বাস তেমনিই—তাহার এক বিন্দুও ন্যূন নহে; আকাশের দূরত্ব নৈকট্য অনুসারে তাহার প্রতি আমাদের বিশ্বাসের একটুও হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। নেত্র-পথবর্ত্তী দূরতম-নক্ষত্র-সমাশ্রিত আকাশের প্রতি আমাদের যেমন বিশ্বাস—আমাদের নেত্রপথাতীত তাহা-অপেক্ষাও-দূরবর্ত্তী নক্ষত্র যে-আকাশে কল্পিত হইতে পরে সে আকাশের প্রতিও আমাদের তেমনি বিশ্বাস,—আমাদের সম্মুখস্থিত ঘটাকাশ যেমন সুনিশ্চিত, উহাও তেমনি সুনিশ্চিত—তাহা অপেক্ষা এক বিন্দুও ন্যূন নহে। অতএব এমন কোন নিয়ম নাই যে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকিলেই আকাশ আমাদের অধিক প্রত্যয়-ভাজন হইবে, তাহার ওদিকে থাকিলে তদপেক্ষা অল্প প্রত্যয়-ভাজন হইবে, আর অমুক স্থান উত্তীর্ণ হইলে তাহা আদবেই আমাদের প্রত্যয়-ভাজন হইবে না। কোন নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকার উপর যখন আকাশের বিশ্বসনীয়তা এক বিন্দুও নির্ভর করিতেছে না, তখন তাহার অসীমতার প্রতি বিশ্বাস করিবার প্রতিবন্ধকতা কিছুই আর রহিল না; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে বদ্ধ আছে তাহার ওদিকে নাই—আকাশকে এরূপ মনে করা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং আকাশ অসীম—ইহা বিশ্বাস করিতে কেবল যে কোন বাধা নাই তাহা নহে, তাহাকে সীমাবদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধা যৎপরোনাস্তি দৃষ্ট হইতেছে,—সুতরাং আকাশ অসীম ইহা বিশ্বাস করিতে বাধা নাই কেবল নয়—উহা বিশ্বাস না করিলেই নয়।

পূর্ব্ব পক্ষ। তা যেন মানিলাম, কিন্তু কেমন করিয়া—কি সূত্রে—অসীম আকাশ আমাদের জ্ঞান-গম্য হয় তাহা যতক্ষণ না ঠিক্ হইতেছে ততক্ষণ অন্ধকারে ঢেলা মারা হইতেছে; আমি বেস্ জানিতেছি যে চক্ষু-দ্বারা রূপ দর্শন করিতেছি কর্ণ-দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিতেছি, মন দ্বারা পরিমিত বস্তু-সকলের চিন্তা করিতেছি কিন্তু কোন্ যে বৃত্তি দ্বারা অসীম আকাশ অবধারণ করিতেছি তাহা ত আমি খুঁজিয়া পাই না। এই জন্যই আমার বোধ হয় যে, অসীম-আকাশ-ঘটিত বিশ্বাসের ভিতর একটা কোন গলদ্ আছে—আমরা তাহা দেখিতে পাই আর না-ই পাই।

উত্তর পক্ষ। অসীম আকাশের অস্তিত্বের প্রতি তুমি অবিশ্বাস করিতেছ না—কোন্ পথ দিয়া তাহা আমাদের জ্ঞানে প্রবেশ করে, তাহাই কেবল জানিতে চাও। সীমাবদ্ধ বস্তু-সকল কোন্ কোন্ পথ দিয়া আমাদের জ্ঞানাভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাহা কাহারো অবিদিত নাই। বাহির হইতে আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর কিংবা শরীরের এক প্রদেশ-হইতে আর এক প্র-

দেশের উপর গতিক্রিয়া উপস্থিত করিয়াই সীমাবদ্ধ বস্তু-সকল আমাদের জ্ঞানাভ্যন্তরে প্রবেশ করে; আলোকের স্পন্দন আমাদের চক্ষুর অভ্যন্তরে সংক্রমিত হইয়া দৃশ্য-বস্তুকে আমাদের জ্ঞানের নিকট পরিচিত করিয়া দেয়; রক্তের গতি-দ্বারা সর্ব্ব শরীরে নাড়ী-স্পন্দন হয়—এবং স্নায়ু সকল দূত-স্বরূপ হইয়া তাহার সমাচার মস্তিষ্কে বহন করে; শরীরের যেখানকার যে অংশ আমাদের জ্ঞান-গোচর হয় তাহা ঐ প্রকার স্পন্দন-পথ দিয়াই হইয়া থাকে। এখন জিজ্ঞাসা এই যে অসীম আকাশ কোন্ পথ দিয়া আমাদের জ্ঞানে প্রবেশ করে;— সীমাবদ্ধ বস্তু সকল যে পথ দিয়া তথায় প্রবেশ করে সে পথ দিয়া ত তাহা সম্ভবে না,—তবে কোন্ পথ দিয়া? অবশ্য তাহার বিপরীত পথ দিয়া। স্নায়ু স্পন্দনের পথ দিয়া নহে—কিন্তু অবিচলিত জ্ঞানের পথ দিয়া। একদিকে আমরা পুস্তকের লেখা চক্ষে দেখি, আর এক দিকে তাহা আমরা মনে মনে আবৃত্তি করি; সেই রূপ এক দিকে আমরা পরিমিত বাহ্য-বস্তু প্রত্যক্ষ করি, আর এক দিকে আমরা জানি যে তাহা অসীম আকাশের অভ্যন্তরে স্থিতি করিতেছে। বুদ্ধি মন প্রভৃতি বহির্মুখী জ্ঞান-বৃত্তি দ্বারা আমরা পরিমিত বস্তু সকলের সত্তা উপলব্ধি করি—অন্তর্মুখী জ্ঞান-বৃত্তি দ্বারা আমরা অসীম আকাশের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। এই যে অন্তর্মুখী জ্ঞান-বৃত্তি তাহা দার্শনিক ভাষায় প্রত্যক্-জ্ঞান অথবা প্রত্যক্ বোধ বলিয়া উক্ত হয়। প্রত্যক্ কি না বিষয়-প্রাতিকূল্যেন অঞ্চতি গচ্ছতি—বিষয়ের প্রতিকূল পথে যায়—তাই প্রত্যক্। অসীম আকাশ জড় বস্তুর কেহই নহে—জড়বস্তু কেবল সীমাবদ্ধ আকাশ-বিশেষ অধিকার করিয়া স্থিতি করে। বিশুদ্ধ আকাশ—অসীম আকাশ—জ্ঞানেরই একটা অবয়ব;— অলঙ্কার-চ্ছলে বলা যাইতে পারে যে তাহা জ্ঞানের হস্ত; জ্ঞান বহির্ব্বস্তু যখন যাহা কিছু প্রাপ্ত হয়—সেই হস্তের মুষ্টির মধ্যেই তাহা প্রাপ্ত হয়। আমাদের সম্বন্ধে আমাদের দেহাকাশই সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম আকাশ—তথা হইতে যে আকাশ যতদূরে ততদূর পর্য্যন্ত (পদদ্বারা না পারি কল্পনা-দ্বারা) গমন করিয়া আমরা তাহা পাই। কিন্তু অসীম আকাশকে আমরা ওরূপ করিয়া দূর হইতে দূর তর প্রদেশে গিয়া পাইতে পারি না। অসীম আকাশের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আমাদের স্ব স্ব শরীরকে ছাড়িয়া দিয়া ভাবিলে তবেই তাহার যা' কিছু ভাব-গ্রহ সম্ভবে। বহির্ব্বিষয় যেমন আমাদের ইন্দ্রিয়াভ্যন্তরে গতি-ক্রিয়া উত্থাপন করিয়া আমাদের সমক্ষে প্রতিভাত হয়, বিশুদ্ধ আকাশ সেরূপ করিয়া প্রতিভাত হয় না; বিশুদ্ধ আকাশ আমাদের জ্ঞানেতে অবিচলিত-রূপে সংলিপ্ত রহিয়াছে—ভিন্ন ভিন্ন বহির্ব্বস্তু যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গৃহীত হইতে পারে তেমনি একটি গ্রহণ-ক্ষেত্ররূপে সংলিপ্ত রহিয়াছে। শরীরাকাশ মহাকাশের একটা খণ্ডাংশ-মাত্র, সুতরাং শরীরের দিক্ হইতে মহাকাশ আমাদের জ্ঞান-গম্য হয়

না; অশরীরী আত্মার দিক্ হইতেই তাহা জ্ঞান-পথে উপস্থিত হয়। অশরীরী আত্মার সম্বন্ধে কোন বস্তুর দূরত্ব নৈকট্য থাকিতে পারে না—কেননা বিশেষ এমন কোন একটি আকাশ-খণ্ডে তিনি বদ্ধ ন'ন, যাহা অন্যান্য সমস্ত বহিরাকাশ অপেক্ষা তাঁহার নিকটতম ও যেখান-হইতে আপনা-সম্বন্ধে অন্যান্য বস্তুর দূরত্বের মাত্রা নির্দ্ধারিত হইবে,—তিনি শরীরাকাশে বদ্ধ ন'ন। অশরীরী আত্মার নিকট সকল আকাশ-খণ্ডেরই দূরত্ব-নৈকট্য সমান সুতরাং সেখানে এক-ক্রোশ চলা আর দশ-ক্রোশ চলার মধ্যে প্রভেদ নাই, চলা আর না চলা উভয়ই সমান—তিনি চলেন না অথচ সর্ব্বগত। খণ্ড আকাশ যেমন মহাকাশে—তেমনি শরীরী আত্মা অশরীরী আত্মাতে বদ্ধমূল রহিয়াছে; সেই অশরীরী আত্মার ভাব হইতে অসীম আকাশের ভাব আমাদের প্রত্যক্ জ্ঞানে উদিত হয়। মহাকাশের মুষ্টির অভ্যন্তরে যেমন আমাদের শরীরাকাশ অবস্থিতি করিতেছে, অশরীরী আত্মার মুষ্টির অভ্যন্তরে সেইরূপ মহাকাশ অবস্থিতি করিতেছে; বাহির হইতে যেমন আমরা খণ্ড আকাশ—জড়াকাশ—প্রাপ্ত হই, অশরীরী আত্মা হইতে সেইরূপ আমরা মহাকাশ—বিশুদ্ধ আকাশ—জ্ঞানাকাশ—প্রাপ্ত হই; এবং যে বৃত্তি দ্বারা প্রাপ্ত হই তাহা অন্তর্মুখী বৃত্তি—প্রত্যক্-বোধ।

দেহাকাশ যেমন সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের নিকটতম আকাশ তেমনি বর্ত্তমান গতি-মুহূর্ত্ত সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের নিকটতম গতি-মুহূর্ত্ত; দেহ বা তাহার কোন ইন্দ্রিয়ে গতি-ক্রিয়া উপস্থিত না হইলে কোন প্রকার গতিই আমাদের অনুভবায়ত্ত হয় না; সুতরাং দেহাকাশাশ্রিত গতি-ক্রিয়া ভিন্ন আর কোন গতি-ক্রিয়া সাক্ষাৎ বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে আমাদের জ্ঞান-গোচর হয় না। আলোক দ্বারা বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ে গতি উপস্থিত হইলে তবে ভূতকালে সে আলোক কোথায় ছিল সে বিষয়ে আমাদের অনুসন্ধান যায়; হস্ত দ্বারা চক্ষু কর্ণ আবরণ-করিলে আলোক ও শব্দ আটক পড়িয়া যায় তাই আমরা স্থির করি যে, তাহা আবরণকারী হস্তের ও দিক্ হইতে আসিয়াছে সুতরাং বহিরাকাশ হইতে আসিয়াছে। বর্ত্তমান গতিমুহূর্ত্ত যদিও আমাদের নিকটতম গতিমুহূর্ত্ত কিন্তু তাহা দ্রুত-বেগে আমাদের জ্ঞানের হস্ত এড়াইয়া যায়; নিখুঁত বর্ত্তমান গতিক্রিয়া আমাদের জ্ঞান-চক্ষে ধরা দেয় না; আমরা অতীত ক্রিয়ার সহিত বর্ত্তমান ক্রিয়া মিশ্রিত করিয়া সমস্তটাকে বর্ত্তমান বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি—বিশুদ্ধ (অর্থাৎ অমিশ্র) বর্ত্তমান ক্রিয়া আমাদের জ্ঞানায়ত্ত নহে। একটা শলাকায় আগুন ধরাইয়া তাহাকে দ্রুত বেগে ঘুরাইলে প্রতিমুহূর্ত্তে একটা জ্বলন্ত চক্র দৃষ্ট হইবে, কিন্তু আসল ধরিতে গেলে প্রতি বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে একটি মাত্র জ্বলন্ত বিন্দুই যা কেবল আমাদের চক্ষে পড়ে—জ্বলন্ত চক্র তাহার পরের কথা। আমাদের সম্বন্ধে আমাদের শরীরই গতি-ক্রিয়ার নিকট-তম ক্ষেত্র,—এই নিকটতম ক্ষেত্র বিরহে নিকটতম গতিক্রিয়া অশরীরী

আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না;—যখন নিকটতম গতি-ক্রিয়া স্পর্শ করিতে পারে না তখন দূরবর্ত্তী গতিক্রিয়া সকলের ত কথাই নাই; এমন-কি দূর নিকট শব্দই তাঁহার সম্বন্ধে অপ্রাসঙ্গিক যথা "দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াং।" অতএব অনাদি অনন্তকালের গতিক্রিয়ার মধ্যে কোন্‌টি নিকটতম অর্থাৎ বর্ত্তমান কালাশ্রিত, কোনটি বা ভূতকালাশ্রিত এপ্রকার জিজ্ঞাসা শরীরী আত্মা সম্বন্ধেই খাটে—অশরীরী আত্মা-সম্বন্ধে নহে। কাল-পরিমাপক গতি-ক্রিয়া নহে—পরন্তু মহাকাল ব্যাপী এক অবিচলিত জ্ঞান-ক্রিয়া যাহা সর্ব্বকালে সমান, তৎ সহকারেই অশরীরী আত্মা অসীম মহাকাশে পরিব্যাপ্ত—প্রত্যেক বিন্দু আকাশে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে প্রবিষ্ট—রহিয়াছেন।

পূর্ব্বপক্ষ। আমাদের অন্তঃকরণের যত গুলি বৃত্তি আছে প্রত্যেকেরই দ্বারা আমরা কোন না কোন প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকি; কিন্তু প্রত্যক্‌-বোধ দ্বারা আমরা কি উপকার প্রত্যাশা করিতে পারি? একটা সীমাবদ্ধ ভূমি পাইলে তাহা আমাদের কাজে লাগিতে পারে, কিন্তু অসীম আকাশে আমাদের কি কাজ দেখে?—কিছুই ত নহে; মহাপণ্ডিত কঁৎ (Comte) সেই জন্য বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞানের পরিধি সৌর জগৎ পর্য্যন্ত হইলেই যথেষ্ট হয়, তাহার ওদিকে হাত বাড়ানো নিতান্ত নির্ব্বোধের কাজ; কেননা তাহা পৃথিবীর কোন উপকারে লাগিতে পারে না।

উত্তর পক্ষ। তুমি যে অতি আশ্চর্য্য কথা বলিতেছ! বুদ্ধি-বৃত্তির যৎকিঞ্চিৎ যা' কিছু সঙ্গতি আছে তাহা সে খাটাইয়া খুটাইয়া আপনার এবং অন্যের যথাসাধ্য উপকার করিতেছে, কিন্তু প্রত্যক্‌-বোধের অসীম ভাণ্ডার কৃপণের ধনের ন্যায় সমস্তই বিফলে নষ্ট হইয়া যাইতেছে,—এ কেমন ধারা কথা! প্রকৃতির আর কোনোখানেই ত এরূপ দৃষ্ট হয় না।

পূর্ব্বপক্ষ। প্রকৃতির কোনখানে ওরূপ দৃষ্ট হয় কি না হয়, সে কথা লইয়া মাথা বকাইবার প্রয়োজন দেখি না; যে কথা চলিতেছে তাহাই চলুক,—অনাদ্যনন্ত কাল, অসীম আকাশ, অশরীরী আত্মা—এ-সব আমাদের এই ক্ষুদ্র শরীরী আত্মার কি কাজে লাগে আমাকে দেখাইয়া দেও—তাহা হইলেই বিবাদ মিটিয়া যাইবে।

উত্তর পক্ষ। আকাশ অসীম—কাল অনন্ত, এই সত্যটি দ্বারা যদি আর কোন কাজই না হয়, তবু এটা ত বলিতে হইবে যে অনন্ত কাল উন্নত লোক হইতে উন্নত লোকে উত্থান করিবার ইচ্ছা উৎপাদন করাটি তাহা কর্ত্তৃক হইয়া থাকে। আত্মা চিরকালই বিশেষ একটি আকাশ-পিঞ্জরে বদ্ধ থাকিতে চায় না যে,সে কেবল ঐ সত্যটি জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী বিষয় বলিয়া তাহারই প্রসাদাৎ। কিন্তু সেই যে অসীম আকাশ তাহার মূল কোথায়? ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ পরিমিত আকাশ যেমন আমাদের মনের একটা অবয়ব-বিশেষ—মনকে ছাড়িয়া তাহা কিছুই নহে কেবল শূন্য-মাত্র, অশরীরী আত্মাকে

ছাড়িয়া সেইরূপ মহাকাশ কিছুই নহে, কেন না মহাকাশ ইন্দ্রিয়-মনের অগম্য—অশরীরী আত্মা হইতেই তাহা প্রত্যক্ বোধে সংক্রমিত হয়। এক মহাকাশ সকল আত্মারই সাধারণ বিষয়—সুতরাং সেই মহাকাশের মূলীভূত এক অশরীরী আত্মাও সকল আত্মার সাধারণ কেন্দ্র-স্থান। লোকেরা যে স্ব স্ব শরীরী আত্মাকে কেন্দ্রস্থান মনে করে তাহা আর কিছু নহে—পৃথিবীকে কেন্দ্রস্থ এবং সূর্য্যকে পরিধিস্থ মনে করা।

অশরীরী মহান্ আত্মার সহিত শরীরী আত্মা সকলের সম্বন্ধ একটা আছেই তাহার আর ভুল নাই—সম্বন্ধ না থাকিলে তিনি প্রকাশ পাইবেন কেন? কিন্তু তাহা কিরূপ? আত্মায় আত্মায় সম্বন্ধ যদি আকাশ ঘটিত সম্বন্ধের ন্যায় হইত তবে বলিতে পারা যাইত যে মহাকাশের সহিত খণ্ড আকাশের যেমন সম্বন্ধ উহা তা' অপেক্ষা অধিক কিছুই নহে। অর্থাৎ মহাকাশ যেমন খণ্ড-আকাশের মূলাধার, অশরীরী মহান্ আত্মা সেইরূপ শরীরী আত্মার মূলাধার—তাহা অপেক্ষা অধিক কিছুই নহে। কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে প্রকাশ পাইবে যে, অশরীরী আত্মার সহিত শরীরী আত্মার আশ্রয় আশ্রিত সম্বন্ধ ত আছেই (কেননা শরীরী আত্মা দেহ-বদ্ধ হইয়াই পরিমিত হইয়াছে—যত দেহ-মুক্ত হইবে ততই অশরীরী আত্মার দিকে—মূল আশ্রয়ের দিকে—অগ্রসর হইবে—অশরীরী আত্মা এখনো যেমন পরেও তেমনি চিরকালই তাহার মূলাধার আছেন ও থাকিবেন) কিন্তু উভয়ের মধ্যে উহা অপেক্ষা উচ্চতর আর একটি সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে—আত্মার সহিত আত্মার যেরূপ সম্বন্ধ সেইরূপ এক আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ। আমাদের প্রত্যক্-বোধে অশরীরী আত্মার যে আবির্ভাব তাহা যে নিরর্থক—আছে এই পর্য্যন্ত তাহা দ্বারা কোন কাজ হয় না, ইহা ত হইতেই পারে না; কিন্তু কাজ যাহা হয় তাহা ভৌতিক নিয়মানুসারে হয় না, আধ্যাত্মিক নিয়মানুসারেই হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক রাজ্য বন্ধনের রাজ্য নহে—মুক্তির রাজ্য; সে রাজ্যের নিয়ম বলের নিয়ম নহে কিন্তু জ্ঞানের এবং প্রেমের নিয়ম; যাহার যেরূপ আন্তরিক ইচ্ছা—আন্তরিক প্রার্থনা—ভালবাসার সহিত আন্তরিক প্রার্থনা (মুখস্থ প্রার্থনা নহে) সে রাজ্যে তাহা পূরণ হইবেই হইবে; কেমন করিয়া কখন যে কাহার মনে এক উচ্চ ভাব হইতে আর এক উচ্চ ভাবের আবির্ভাব হইবে—তাহা সে না জানে না-ই জানিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার ইচ্ছার টান যখন উন্নতির দিকে লাগিয়াই আছে, তখন এক না এক সময়ে তাহা অনিবার্য্য; কেবল একটা উপলক্ষ-মাত্রের প্রয়োজন—ব্যক্তি-বিশেষের গ্রহণ-ক্ষমতা বুঝিয়া তাহা চক্ষের সামনে উচ্চ ভাবের একটা আদর্শ ক্ষেপণের কেবল প্রয়োজন। কত পরিমাণ উচ্চতার আদর্শ কোন অবস্থার উপযোগী আমরা তাহা ঠিক ঠাক না জানিতে পারি, কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যের নিয়ম-পুস্তকে

সে-সমস্তই ধরা-বাঁধা রহিয়াছে। আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা আমাদের কার্য্যে যেমন স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, কথাতে ততটা নহে; কিন্তু কথাতে যে আদবেই প্রকাশ পায় না তাহা নহে। আত্মার গভীর প্রদেশ হইতে সম্যক জ্ঞান-প্রেম ইচ্ছার সহিত কায়মনোবাক্যে যিনি যত কার্য্য করিবেন ততই স্পষ্ট প্রকাশ পাইবে যে, তাঁহার আত্মার টান উচ্চের দিকে, ও তাঁহার প্রার্থনা আন্তরিক; প্রার্থনা আন্তরিক হইলে আধ্যাত্মিক নিয়মে তাহা পূরণ হইবেই হইবে। ফল কথা এই যে, সমস্ত জগতের টান আত্মার দিকে আত্মার টান পরমাত্মার দিকে; কিন্তু অনন্ত উন্নতি সোপানের একধাপ হইতে আর এক ধাপে আরোহণ করিবার যে একটা নিয়ম বাঁধা আছে—তাহার কখন ব্যতায় হইতে পারে না। পরমাত্মার প্রতি আত্মার আকর্ষণই আত্মার স্থায়িত্বের বিধান। আত্মার স্থায়িত্বের এমন একটি পাকা দলিলকে অকার্য্যকর বলিয়া ফেলিয়া দিলে কাজে-কাজেই আত্মার উন্নতির প্রতি আমাদের যত্ন শৈথিল্য হয়—অনন্ত কালের জ্ঞানোন্নতি এবং প্রেম-স্ফূর্ত্তির বিনিময়ে ক্ষণিক সুখ উপার্জ্জন করিতে করিতে সার শূন্য পদার্থশূন্য নিঃসম্বল হইয়া আমাদের আত্মা মৃত্যুবৎ হইয়া পড়ে।

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বাঙ্গীয় যুবকের পত্র।

ভারি কাজে ব্যস্ত। হাই তোলবার সময় নেই। সময় যদি নিলেমে বিক্রি হয়, তা হোলে যত ব্যস্ত লোক সংসারে আছে, আমি সকলের চেয়ে চড়াদাম ডাকি। এত কাজ। এমন অবস্থায় তোমাদের চিঠি লেখা সামান্য কথা? এত ব্যস্ত অবস্থায় লিখতে বোস্‌লে কি বিপদ ঘটে জান? মনের বাক্সের চাবি পকেট হাৎড়ে খুঁজে পাওয়া যায় না, যদি বা বাক্স খোলা গেল, তাড়াতাড়ি, ব্যস্ত সমস্ত ভাবে, হাঁস্‌ফাঁস কোরতে কোরতে, হুটপাট কোরে, যেখানে যত ভাব গোছানো ছিল, খুঁজতে গিয়ে সমস্ত ওলট্ পালট্ বিপর্য্যস্ত কোরে ফেলি; এটা তুল্‌চি, ওটা তুল্‌চি কিন্তু যেটা আবশ্যক সেইটে পাওয়া যায় না। লিখতে গেলে কথা পোড়ে যায়। তাড়াতাড়িতে কর্ত্তার আগে ক্রিয়াকে আসন দেওয়া হয়, ও কর্ত্তা জায়গা না পেয়ে হয় ত কর্ম্মের পিছনে হতবুদ্ধি হোয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আজকেরকার চিঠিতে এই রকম নানা ত্রুটি হবার সম্ভাবনা আছে, তবু কোন প্রকারে আজকের মধ্যে চিঠিটা লিখতেই

হবে। মনে আছে, তিন চার মেল আগে তোমাকে লাইন দশেকের যে একটি চিঠি লিখেছিলেম, তাতে তোমাকে আশ্বাস দিয়ে ছিলেম যে "শীঘ্রই তোমাকে একখানি বড় চিঠি লিখ্‌ব।" "লিখব" ভবিষ্যৎ কাল-বাচক ক্রিয়া। আজ থেকে প্রলয় কাল পর্য্যন্ত ভবিষ্যতের সীমা। তা' ছাড়া যেমন একটি বাঁধা নিয়ম আছে যে, পয়সা চৌষট্টিটা হোলেই টাকায় পরিণত হয়; তেমন কোন শাস্ত্রেই এমন একটা ধরাবাঁধা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নেই "যাতে অবিসম্বাদে বলা যায় যে, "শীঘ্র" এত আনায় হোলে "দেরী" টাকায় পরিণত হয়। অতএব তোমাদের এমন একটা অনিশ্চিত অনির্দ্দিস্ট আশায় আর বেশী দিন ফেলে রাখতে চাই নে। Christmas ফুরোলো, আবার দেখ্‌তে দেখ্‌তে আর একটা উৎসব এসে পোড়ল। আজ নূতন বর্ষের প্রথম দিন। কিন্তু তার জন্যে কিছুই গোলমাল দেখতে পাচ্চিনে। নূতন বৎসর যে এখানে এমন নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে আস্‌বে তা জানতেম না। শুনেছি ফ্রান্সে লোকে নতুন বৎসর-কে খুব সমাদরের সঙ্গে আবাহন করে। কাল পুরাতন বৎসরের শেষ রাত্রে আমাদের প্রতিবেশীরা বাড়ির জানলা খুলে রেখে-ছিল। তার কারণ এই হোতে পারে যে, পাছে পুরাণো বৎসর ঘরের মধ্যে আট্‌কা পোড়ে থাকে, তার চোলে যাবার ব্যাঘাত হয়; আর পাছে নতুন বৎসর এসে জান্‌-লার কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় তার ঘরে ঢুক্‌তে বিশেষ কষ্ট হয়। এখেনে শীতে জান্‌লা দরজা সমস্ত বন্ধ থাকে কিনা, সুতরাং দরজা খুলে না দিলে নতুন বৎসর ঘরে ঢুক্‌তে পান না, বাইরে দাঁড়িয়ে স-র্দ্দিতে মারা যান। আর পুরোণো বৎসরের বাড়ি যাবার সময় হোয়েছে, তাকে যদি অমন দরজা বন্ধ কোরে রাখ, তবে সে ব্যক্তি দরজায় মাথা ঠুকে ঠুকে বাড়িময় দাপা-দাপি কোরে বেড়াতে থাক্‌বে। কিন্তু দুর্দ্দ-শার কথা কি বোল্‌ব, আমরা হচ্চি ঘোর-তর অসভ্য অজ্ঞান লোক; আমাদের বাড়ির জানলা কাল রাত্রে খুলে রাখা হয় নি, আ-মাদের চিম্‌নির (ধোঁয়ার নলের) ভিতর দিয়ে ছাড়া পুরাতন বৎসরের আর বেরো-বার জায়গা ছিল না। আজ সকালে উঠে এই কথাটা আমাদের হঠাৎ মনে পোড়ল। মনে পোড়ে অবধি আমরা অনুতাপে সারা হচ্চি। মনে কর প্রতি বাড়িতে ১৮৮০ খৃস্টাব্দ, আমাদের বাড়িতে ১৮৭৯। মনে কর যদি আমরা আর বাড়ির জানলা দরজা একেবারে না খুলি. তাহোলে আর পঁচাত্তর বৎসর বাঁচলেও ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে মরি। কিম্বা যদি চিত্রগুপ্তের খাতায় ১৯৫৩ খৃস্টাব্দে তাঁর প্রভুর আলয়ে আমার শুভ পদার্পণ নির্দ্দিষ্ট থাকে, তা'হোলে সে শুভদিন আমার ভাগ্যে একেবারেই আসে না, চিরকালই আমি ১৮৭৯-তে থাকি। মন্দ কি? চিরকালই যদি ১৮৭৯ এ থাক্‌তে পারি সে ত বেশ হয়। কিন্তু রোস,' একটু ভেবে দেখি। ১৮৭৯ খৃস্টাব্দ এমনিই কি আমার সুখের বৎসর গিয়েছে? আহা! এর আগে এমন কত বৎসর গিয়েছে, যাদের খোরে

রাখ্‌তে পারলে চির জীবন ধোরে রাখ্‌তুম। যা' হোয়ে গেছে, তাতো হোয়ে গেছে। এখন, আমার কুষ্ঠিতে লেখা আছে, যে, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে আমার "ধন রত্নানি" একটি ভার্য্যা ও অনেক মিত্র লাভ হবে; মনে কোর্‌চি, ১৮৮২ কে আর ঘরে ঢুক্‌তে দেব না। যা' হোক্, নতুন বৎসরকে অনেক ক্ষণ ঘরের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হোয়েছিল, আস্‌বা মাত্রেই তাঁকে আবাহন কোর্ত্তে পারিনি, তার জন্যে আমরা তাঁর কাছে শত শত ক্ষমা চাচ্চি। নতুন বৎসরের আগমনে আজকের দিনের মুখশ্রী বড় উজ্জ্বল হোয়ে ওঠেনি। আজ ভারি মেঘ ও অন্ধকার কোরে আছে। নতুন বৎসরের উপক্রমণিকা যদি এই রকম অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তবে এর উপসংহার না জানি কি রকম হবে। টর্কি থেকে বহু দিন হোল আমরা আবার লণ্ডনে এয়েছি। টর্কিতে বসন্তের সঙ্গে প্রকৃতির ফুলশয্যা দেখেছিলেম। সেই উৎসব থেকে লণ্ডনের এই ব্যস্ত ভাবের মধ্যে এসে পোড়ে বড় ভাল লাগ্‌বে না। এখন আমি Mr K. র পরিবারের মধ্যে বাস করি। Mr K., Mrs, K., তাঁদের চার মেয়ে, দুই ছেলে, তিন দাসী, আমি ও Toby বোলে এক কুকুর হোচ্চে এই বাড়ির জন সংখ্যা। Mr K. হোচ্চেন এক জন ডাক্তার। তাঁর মাথার চুল ও দাড়ি প্রায় সমস্ত পেকে গিয়েচে। বেশ বলিষ্ঠ ও সুশ্রী দেখ্‌তে। যেমন অমায়িকস্বভাব তেমনি অমায়িক মুখশ্রী। তাঁর পরিবারের সকলেই বড় ভাল লোক। আমার সঙ্গে অল্প দিনের আলাপেই বেশ বন্ধুত্ব হোয়েছে। Mrs K. আমাকে আন্তরিক যত্ন করেন। শীতের সময় আমি বিশেষ গরম কাপড় না পোরলে তাঁর কাছে ভৎর্সনা খাই। খাবার সময় যদি তাঁর মনে হয়, আমি কম কোরে খেয়েছি, তা হোলে যতক্ষণ না তাঁর মনের মত খাই, ততক্ষণ পীড়াপীড়ি করেন। বিলেতে লোকে কাশীকে বড় ভয় করে; যদি দৈবাৎ আমি দিনের মধ্যে দুবার কেশেছি তা' হোলেই, তিনি জোর কোরে আমার স্নান বন্ধ করেন, আমাকে দশরকম ওষুধ গেলান্, শুতে যাবার আগে আমার পায়ে খানিকটা গরম জল ঢালবার বন্দোবস্ত করেন তবে ছাড়েন। বাড়ির মধ্যে সকলের আগে বড় Miss K. ওঠেন। তিনি নীচে এসে ব্রেক্‌ফাস্ট তৈরি হোয়েচে কি না তদারক করেন; অগ্নিকুণ্ডে দু চার হাতা কয়লা দিয়ে ঘরটি বেশ উজ্জ্বল কোরে রাখেন। খানিকক্ষণ বাদে সিঁড়িতে একটা দুদ্দাড় পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। বুড়ো K. শীতে হিহি কোর্ত্তে কোর্ত্তে খাবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত। তাড়াতাড়ি আগুনে হাত, পা, পিট, বুক তাতিয়ে খবরের কাগজ হাতে খাবার টেবিলে এসে বোসলেন। তাঁর বড় মেয়েকে চুম্বন কোরলেন, আমার সঙ্গে সুপ্রভাত অভিবাদন হোল। লোকটা ভারি প্রফুল্ল। আমার সঙ্গে খানিকটা হাসি তামাসা হোল, খবরের কাগজ থেকে এটা ওটা পোড়ে শোনাতে লাগ্‌লেন। তাঁর

এক পেয়ালা কফি শেষ হোয়ে গেছে, এমন সময়ে তাঁর আর দুটি মেয়ে এসে তাঁকে চুম্বন কোরলেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁর বন্দোবস্ত ছিল যে, তাঁরা যে দিন Mr K. র আগে উঠ্‌বেন, সে দিন Mr K. তাঁদের পাঁচ সিকে দেবেন, আর যে দিন Mr K. তাঁদের আগে উঠ্‌বেন, সে দিন Mr K. কে তাঁদের চার আনা দিতে হবে। যদিও এত অল্প দিতে হোত, তবু Mr K. র তাঁদের কাছে প্রায় দু তিন পাউণ্ড পাওনা হোয়েছে। রোজ সকালে Mr K. তাঁর পাওনার জন্যে দাবী করেন। কিন্তু তাঁর দেনদাররা হেসেই উড়িয়ে দেন। Mr K. বলেন "এ ভারি অন্যায়!" তিনি আমাকে মাঝে মাঝে মধ্যস্থ মেনে বলেন "আচ্ছা, Mr T. তুমিই বল,এরকম debt of honour ফাঁকি দেওয়া কি ভদ্রতা।" যাহোক্ রোজ রোজই Mr K. র পাওনা বাড়চে। তার পরে Mrs K. এলেন। আমাদের ব্রেকফাস্ট প্রায় সাড়ে নটার মধ্যে শেষ হয়। Mr K. র বড় ছেলে আমাদের আগেই খাওয়া সেরে কাজে গিয়েচেন। আর Mr K. র ছোট ছেলেটি ও ছোট মেয়েটি অনেকক্ষণ হোল খাওয়া শেষ কোরেচে। এক জনের কথা বোলতে ভুলে গিয়েছি। Toby কুকুরটি অনেকক্ষণ হলো এসে আগুনের কাছে আরামে বোসে আছে। ছোট্ট কুকুরটি। তার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রোঁয়া। রোঁয়াকে চোক মুখ ঢাকা। বুড়ো হোয়েছে আর তার একটা চোক কানা হোয়ে গেছে। আদর পেয়ে পেয়ে এই ব্যক্তির কতক গুলি নবাবী চাল হোয়েছে। Drawing room ছাড়া অন্য কোন ঘরে তার মন বসে না। কথা নেই বার্ত্তা নেই, ঘরের সকলের চেয়ে ভাল কেদারাটিতে অম্লান বদনে লাফিয়ে উঠে বসা হয়; ঘরে একঘর লোক হয় ত বোসে আছে, এক ব্যক্তির হয় ত বসবার জায়গা হোচ্চে না, কিন্তু Toby র তাতে আসে যায় না, সে কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ দৃক্‌পাত না কোরে দিব্যি আরামে চৌকিতে যুৎ কোরে বোসে নেয়। তাঁর আবার গুমর কত। যে চৌকিতে তিনি বোসেচেন, তার এক পাশে যদি আর কেউ এসে বসে, অমনি তিনি মহা বিরক্ত হোয়ে দর্পে সে চৌকি থেকে উঠে গিয়ে তৎক্ষণাৎ পাশের কৌচটির ওপরে গিয়ে বোসে পড়েন। সকাল বেলায় ব্রেকফাস্টের সময় তাঁর তিনটি বিস্কুট বরাদ্দ আছে। সে বিস্কুট গুলি নিয়ে সে খাবার ঘরে বোসে থাকে, যতক্ষণ না আমি গিয়ে সেই বিস্কুট গুলি নিয়ে তার সঙ্গে খানিকটা খেলা করি, একবার তার মুখের থেকে কেড়ে নিই, একবার গড়িয়ে দিই, ততক্ষণ তার খাওয়া হয় না। আমি খেলা না কোরলে সে কোন মতেই খেতে রাজি হয় না। আমাকে সে বড় ভাল বাসে। আগে আগে যখন আমার উঠতে দেরী হোত; সে তার বরাদ্দ বিস্কুট নিয়ে আমার শোবার ঘরের কাছে বোসে ঘেউ ঘেউ কোরত। কিন্তু গোল কোরলে আমি বিরক্ত হোতুম দেখে সে এখন আর ঘেউ ঘেউ করে না। আস্তে আস্তে পা দিয়ে দরজা ঠেলে; যতক্ষণ না

আমি দরজা খুলে দিই চুপ কোরে বাইরে বোসে থাকে। দরজা খুলে ঘর থেকে বেরলেই সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে লেজ নেড়ে সুপ্রভাত সম্ভাষণ করে; তার পরে এক-বার বিস্কুটের দিকে চায়, একবার আমার মুখের দিকে চায়। মনোগত ভাবটি এই যে, "প্রাতঃকৃত্য সারা হোয়েছে? তা' বেশ হোয়েছে। এখন আমার বিস্কুটটি একবার গড়িয়ে দেও; আমার বড় খেলা করবার ইচ্ছে গিয়েছে।" এক এক সময় সন্ধে বেলায় পেছন দিকের দুটো পা গুটিয়ে সুমুখের দুটো পায়ের ওপর ভর দিয়ে মহা চিন্তিত ভাবে বৃদ্ধ আগুনের দিকে এক দৃস্টে চেয়ে থাকে। আধ ঘণ্টা যায়, এক ঘণ্টা যায়, Tobyর হুঁস নেই, তখন তাকে আদর কোর্ত্তে যাও, মাথায় হাত বুলোও, মহা অসন্তুষ্ট ভাবে গোঁগোঁ করে, মাথা নাড়ে। "বিরক্ত কর কেন? ভাবতে ভাবতে আমার মাথা ঘুরে যাচ্চে এখন উনি আমার মাথায় হাত বুলোতে এলেন!" এ ব্যক্তি পূর্ব্ব জন্মে কি ছিল বল দিকি? অ্যারিষ্টটেল ছিল না, কি? যাহোক, সাড়ে ন টার মধ্যে আমাদের ব্রেক্‌ফাষ্ট শেষ হয়। তার পরে Mrs K. হাতে দস্তানা পোরে দাসীদের নিয়ে চৌতলা থেকে একতল পর্য্যন্ত, জিনিষ পত্র গোছানো, ঘর দ্বার পরিষ্কার করানো ও সমস্ত গৃহকার্য্য তদা-রক কোরে উঠানাবা করেন। একবার রান্না ঘরে যান, সেখেনে শাকওয়ালা, রুটিওয়ালা, মাংস ওয়ালার বিল দেখেন, যাকে যার চুকিয়ে দেবার দেন। মাঝে মাঝে ওপরে এসে Mr K. র সঙ্গে গৃহ-কার্য্যের পরামর্শ হয়। রান্না ঘরের উপ-করণ পরিষ্কার আছে কিনা ও যথা স্থানে আছে কিনা দেখেন, ভাল মাংস এনেছে কি না, ওজনে কমবেশী হোয়েছে কিনা সে সব দেখেন। রাঁধুনীর সঙ্গে মাঝে মাঝে রান্নাতে যোগ দেন। এই রকম ব্রেকফাষ্টের পর থেকে প্রায় বেলা একটা দেড়টা পর্য্যন্ত তাঁকে নানাবিধ কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে তাঁর বড় মেয়ে যোগ দেন। মেজ মেয়ে Miss J. দেখি, প্রত্যহ একটি ঝাড়ন নিয়ে Drawing-room সাফ করেন। দাসীরা ঘর ঝাঁটদিয়ে যায়, আর জিনিষ পত্রে যা' কিছু ধুল লাগে তা' তিনি নিজের হাতে ঝেড়ে ঝুড়ে সাফ করেন। এখানকার অনেক ভদ্র পরিবা-রেই Drawing roomএর জিনিষ পত্র সাফ করবার ভার বাড়ির মেয়েরাই নেন। দা-সীদের হাতে পাছে জিনিষ পত্র ভেঙ্গে যায় বা ভালরূপে পরিষ্কার না হয়। তৃতীয় মেয়ে Miss A. বালিষের আচ্ছাদন, আসন, মোজা, কাপড় প্রভৃতি নানাবিধ সেলাইয়ে নিযুক্ত হন, চিঠি পত্র লেখেন, এক একদিন বাজনা ও গান অভ্যেস করেন। বাড়ির মধ্যে তিনিই গাইয়ে বাজিয়ে। আজ কাল স্কুল বন্ধ, ছোট ছেলেটি ও মেয়েটি ভারি খেলায় মগ্ন। দেড়টার সময় আমাদের Lunch খাওয়া আছে। Lunch সমাপন কোরে আবার যিনি যাঁর কাজে নিযুক্ত হোলেন। এই সময়ে Visitorদের আস-বার সময়। হয়ত Mrs K. Mr K. র

এক জোড়া ছেঁড়া মোজা নিয়ে চসমা পোরে Drawing room এ বোসে সেলাই কোরচেন। Miss A. একটি পশমের জামা তাঁর ভাইপোর জন্যে তৈরি কোরে দিচ্চেন। Miss J. একটু অবসর পেয়ে আগুনের কাছে বোসে হয়ত Green's History of the English People পো-ড়তে নিযুক্ত হোয়েছেন। বড় Miss K. হয়ত তাঁর কোন আলাপীর বাড়িতে Visit কোরতে গিয়েচেন। তিনটের সময় হয়ত একজন Visitor এলেন। দাসী Drawing roomএ এসে বোল্লে "Mr ও Mrs A.।" বোলতে বোলতে ঘরের মধ্যে Mr ও Mrs A এলেন। মোজা জামা রেখে বই মুড়ে Mrs K. ও তাঁর কন্যারা আগন্তুকদের অভ্যর্থনা কোরলেন। Weather ভাল কি মন্দ, সে বিষয়ে পরস্পরের মতামত ব্যক্ত কোরলেন। Mrs A. বোল্লেন, Mr X. এর ৩ বৎসর তিন মাস বয়সে হাম হয়। হাম হয়েছিল বোলে তিনি চার দিন আ-পিশে যেতে পারেন নি। কাল আফিশে গিয়েছিলেন। তাঁর হাম হোয়েছিল বোলে আফিশের লোকেরা তাঁকে নির্দ্দয় রূপে ঠাট্টা কোরতে আরম্ভ কোরেচে। Miss J. বোল্লেন, অমন ব্যামো হোলে কি দুর্দ্দশা! একেত ব্যামোর কষ্ট; তার ওপর কারো মমতা পাবার যো নেই; শুধু তাই নয়, ব্যামো হোলে আবার তাই নিয়ে হাসি তামাসা ঠাট্টা খেয়ে বেড়াতে হয়। এই কথা থেকে ক্রমে হাম রোগের বিষয়ে যত কথা উঠতে পারে উঠল। Miss A. বো-ল্লেন, Mr Z-এর তৃতীয় ছেলেটির হাম হোয়েছে। তার থেকে কথা উঠল যে, Mr Zর যে এক Cousin Miss Y. অষ্ট্রে-লিয়ায় আছেন, তাঁর Captain W-র সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেছে। এই রকম খানিক ক্ষণ কথোপকথন হোলে পর তাঁরা চোলে গেলেন। বিকেলে হয়ত আমরা সবাই মিলে একটু বেড়াতে গেলুম। বেড়িয়ে এসে সাড়ে ছটার সময় আমাদের ডিনার খাওয়া হয়। ডিনার খেয়ে ৭টার সময় আমরা সবাই মিলে Drawing-roomএ গিয়ে বসি। আগুন জোল্‌চে। ঘরটি বেশ গরম হোয়ে উঠেচে। আমরা আগুনের চার দিকে ঘিরে বোস্‌লুম। এক এক দিন আমাদের গান বাজনা হয়। আমি ইতি মধ্যে অনেক ইংরাজি গান শিখেছি। জাঁক করতে চাই না কিন্তু তবু সত্যি কথা বল্‌তে কি এখানকার লোকে আমার গলার বেশ প্রশংসা করে। আমি গান করি। Miss A. বাজান। Miss A. আমাকে অনেকগুলি গান শিখিয়েছেন। কিন্তু প্রায় সন্ধে বেলায় আমাদের একটু আধটু পড়াশুনা হয়। আমরা পালা কোরে ৬ দিনে ছ রকমের বই পড়ি। বই পোড়তে পোড়তে এক এক দিন প্রায় ১১॥।১২ হোয়ে যায়। ছে-লেরা এখন শুতে গেছে।

ছেলেদের সঙ্গে আমার ভারি ভাব হোয়ে গেছে। তারা আমাকে Uncle Arthur বলে। Ethel ছোট মেয়েটি আমাকে ভারি ভাল বাসে। তার ইচ্ছে যে, আমি কেবল একলা তারই

Uncle Arthur হই। তার ভাই Tom যদি আমাকে Uncle Arthur বলে তবেই তার ভারি কষ্ট উপস্থিত হয়। একদিন Tom তার ছোট বোনকে রাগাবার জন্যে একটু বিশেষ জোর দিয়ে বোলেছিল, "He is my Uncle Arthur." এইত Ethel আমার গলা জড়িয়ে ধোরে, তার ছোট ঠোঁট্ দুটি ফুলিয়ে ফুলিয়ে কাঁদতে আরম্ভ কোরে দিলে। কত কোরে তাকে থামাই। Tom একটু অস্থির, কিন্তু ভারি ভাল মানুষ। খুব মোটাসোটা। মাথাটা খুব প্রকাণ্ড। মুখটা খুব ভারি ভারি। সে এক এক সময়ে আমাকে এমন এক একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে যে কি বোলব। একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা কোরছিল, "আচ্ছা, Uncle Arthur, ইন্দুররা কি করে?" Uncle Arthur বোল্লেন "তারা রান্না ঘর থেকে চুরী কোরে খায়।" সে একটু ভেবে বোল্লে, "চুরী করে? আচ্ছা, চুরী করে কেন?" Uncle বোল্লেন, "তা'-দের কিদে পায় বোলে।" শুনে Tom-এর বড় ভাল লাগল না। সে বরাবর শুনে আসচে যে, জিজ্ঞাসা না কোরে পরের জিনিষ নেওয়া অন্যায়। আর একটি কথা না বোলে সে চোলে গেল। যদি তার বোন কখনো কাঁদে, সে তাড়াতাড়ি এসে সান্ত্বনার স্বরে বলে, "Oh, Poor Ethel, don't you cry! Poor Ethel!" এমন মজা কোরে বলে যে সে হাসি চেপে রাখা দুঃসাধ্য। Ethelএর মনে মনে জ্ঞান আছে যে, সে একজন Lady। সে কেমন গম্ভীর ভাবে কেদারায় গিয়ে ঠেসদিয়ে বসে। Tomকে এক এক সময়ে ভর্ৎসনা কোরে বলা হয়, "আমাকে বিরক্ত কোর না।" এক দিন Tom পোড়ে গিয়ে কাঁদছিল। আমি তাকে বল্লেম "ছি! কাঁদিতে আছে।" অমনি Ethel আমার কাছে ছুটে এসে জাঁক কোরে বোল্লে "Uncle Arther, Uncle Arther, আমি একবার ছেলে বেলায় রান্না ঘরে পোড়ে গিয়ে ছিলেম, কিন্তু কাঁদিনি।" উঃ! বয়স কত?

Mr N ডাক্তারের আর এক ছেলে বাড়িতে থাকেন, কিন্তু তাঁকে প্রায় দেখতে পাই নে। তিনি সমস্ত দিন আফিশে থাকেন। কিন্তু আফিশ থেকে এলেও তাঁর বড় একটা দেখা পাওয়া যায় না। তার কারণ কি জান? তিনি Miss I. এর সঙ্গে Engaged। তাঁদের দুজনে কোর্টশিপ চোলচে। রবিবার দুবেলা তাঁকে নিয়ে তাঁর চর্চ্চে যেতে হয়। যখন বিকেলে একটু অবসর পান, তাঁর বাড়িতে গিয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে আসেন। প্রতি শুক্রবার সন্ধে বেলা তাঁদের বাড়িতে তাঁর নেমন্তন্ন আছে। এই রকমে তাঁর সময় ভারি অল্প। উভয়ে পরস্পরকে নিয়ে এমন সুখী আছেন যে, অবসর কাল কাটাবার জন্যে অন্য কোন জীবের সঙ্গ তাঁদের আবশ্যক করে না। শুক্রবার সন্ধে বেলায় যদি আকাশ ভেঙ্গে পড়ে তবু Mr N. পরিষ্কার কোরে চুলটি ফিরিয়ে, পমেটম মেখে, কোট brush কোরে, ফিট্‌ফাট হোয়ে, ছাতা হাতে কোরে বাড়ি থেকে বেরো-

বেনই। একবার খুব শীত পোড়ে ছিল, আর তার ভারি কাশি হোয়ে ছিল; মনে কোরলেম, আজ বুঝি বেচারীর আর যাওয়া হয় না। কি আশ্চর্য্য! ৭ টা বাজতে না বাজতেই দেখি তিনি ফিটফাট হোয়ে নেবে এসেচেন। তাঁর বাপ, মা, বোনরা, সবাই বোল্লে "It is very foolish of you, N।" কিন্তু বোল্লে হয় কি? "নদী যবে চলে সিন্ধুপানে, কার সাধ্য রোধে তার গতি।" নদী ত বাপ মা, বোনের উপরোধের শিলা-বাধা লঙ্ঘন কোরে, কাশি হাঁচি ও রুমালে সর্দ্দিঝাড়ার কল স্বর কোরতে কোরতে সিন্ধুর উদ্দেশে চোল্লো। (উপমা কেমন হোল বল দেখি!) তখন বৃষ্টি পোড়চে বরফ পোড়চে রাস্তায় কাদা জোমেচে। তার পর দিন সকালে সর্দ্দিতে বেচারী মাথা তুলতে পারে না। এমন যন্ত্রণা।

যা হোক, আমার এই K. পরিবারের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হোয়ে গেছে। সে দিন Miss N. আমাকে বোলছিলেন, যে, প্রথম যখন তাঁরা শুনলেন যে, একজন ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক তাঁদের মধ্যে বাস কোরতে আসচে, তাঁদের ভারি ভয় হোয়েছিল। "ব্যক্তিটা কি রকম হবে, না জানি। তার সাক্ষাতে আবার কি রকম আদবকায়দা রেখে চোলতে হবে? আমাদের কথা সে ভাল কোরে বুঝতে পারবে কি না, ও তার কথা আমরা ভাল কোরে বুঝতে পারব কি না"—এই রকম নানাবিধ ভাবনায় তাঁদের ত রাত্তে ঘুম হয় না। যে দিন আমার আসবার কথা ছিল, সেই দিন Miss A ও Miss J. তাঁদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় এক হপ্তা বাড়িতে আসেন নি। তার পরে হয়ত যখন তাঁরা শুনলেন যে, একটা পোষ মানা জীব তাঁদের বাড়িতে এসেচে, সে ব্যক্তির চেহারা দেখে বোধ হয় না যে, তার কখনো মানুষের মগজের লাড়ু, মানুষের ঠ্যাংএর শিক্‌কাবাব বা খোকা খুকী ভাজা খাওয়া অভ্যেস ছিল, মুখে ও সর্ব্বাঙ্গে উল্কি নেই, ঠোঁট বিঁধিয়ে অলঙ্কার পরে না, তখন তাঁরা বাড়িতে ফিরে এলেন। Miss J. বলেন যে প্রথম প্রথম এসে যদিও আমার সঙ্গে কথা বার্ত্তা কোয়ে ছিলেন তবুও দুদিন পর্য্যন্ত আমার মুখ দেখেন নি। হয়ত তাঁর ভয় হোয়েছিল যে, কি অপূর্ব্ব ছাঁচে ঢালা মুখই না জানি দেখবেন। তার পরে যখন আমার মুখ দেখলেন—তখন? তখন কি? আমার ত বিশ্বাস, তখন তাঁর মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তোমরা হয়ত বিশ্বাস কোরবে না, যে, এই মুখ দেখে কোন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির মাথা ঘুরতে পারে। কিন্তু সেটা তোমাদের ঘোরতর কুসংস্কার। ওইত সুমুখের আয়নায় আমার মুখটা দেখতে পাচ্চি। কেন, কি মন্দ? এ মুখ দেখে তোমাদের কারো মাথা ঘোরে নি সত্যি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের মাথা আছে?

যা হোক্, এই পরিবারে আমি বেশ সুখে আছি। সন্ধে বেলা বেশ আমোদে কেটে যায়। গান বাজনা, বই পড়া। সকলের সঙ্গে ভারি বন্ধুত্ব হোয়েছে। আর Ethel তার Uncle Arthur কে মুহূর্ত্ত ছেড়ে থাকতে চায় না।

সম্পাদকের বৈঠক।

বাঙ্গালির সত্যনিষ্ঠতা।—হুগলী নদীর পরপারে য়ুরোপীয়দের জন্য একটা হাঁসপাতাল আছে। এই হাঁসপাতালের লাগাও কবর-স্থানে আমি একটি অল্প-বয়সে মৃত য়ুরোপীয় নাবিকের গোর দেখিতে পাইয়া এক জন দরিদ্র দেশী মালিকে সেই গোরের উপর ফুলের গাছ রোপণ করিতে নিযুক্ত করি। মালী বরাবর ঐ কাজ করিয়াছিল। তার পর শেষ বার কলিকাতা ছাড়িয়া আসিবার সময় আমি মালীকে বলিয়াছিলাম যে তাহার সঙ্গে আমার আর দেখা হইবার কোন সম্ভাবনা নাই এবং আগেকার মতন ঐ কাজ করিবার জন্য তাহাকে কিছু টাকা দিয়া আসি। মালী নিয়মিত রূপে কাজ করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল এবং সে সম্পূর্ণ রূপে নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া ছিল। দুই বৎসর পরে ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইয়া দেখিলাম যে আমি থাকিলে মালী যে রকম নিয়মিত রূপে ফুলের গাছের কেয়ারি করিত আমার অনুপস্থিতি-কালেও ঠিক সেই রকমই করিয়াছিল। আমার ভারি সন্দেহ আছে যে আমি ও রকম উচ্চ দরের আচরণ ইংলণ্ডে দেখিতে পাইতাম কি না।

Routtedge's British Rule in India

বিজয়ী বীর।—একটা টিনের পাত্র লেজে বাঁধা কুকুর যখন ভয়ে পাগলের মতন দৌড়ে বেড়ায় তখন সেটা ঠিক এক-জন বিজয়ী বীরের উপমা-স্থল। অধৃষ্য বীরের অন্তরে প্রতিভা ও পাগলামি এই দুই উপকরণ মিশাইয়া তাহার লেজে একটা উচ্চ আকাঙ্ক্ষার টিন পাত্র বাঁধিয়া দেয়। বীরপুরুষ যতই বেগে দৌড়িতে থাকে ততই এই টিন পাত্রের শব্দ তাহাকে পাগলের মতন দিগ্বিদিক শূন্য ভাবে চালাইয়া দেয়।

Carlyle

প্রকৃতি।—ঈশ্বরের জীবন্ত পরি-দৃশ্যমান পরিচ্ছদের নাম প্রকৃতি।

Goethe

স্ত্রীলোক।—স্ত্রীলোকেরা নিয়তির যাজক। পুরুষ উচ্চ কার্য্য কল্পনা করিতে পারে কিন্তু স্ত্রীলোকে তাহাকে সেই উচ্চ কার্য্যে পৌছাইয়া দেয়। পুরুষ বলিতে পারে যে "আমি উচ্চ হইব" কিন্তু স্ত্রীলো-কের স্নেহ মমতাই সাধারণতঃ তাহাকে উন্নত করে।

Earl of Beaconsfield.

মূল জ্ঞান।—প্রত্যেক বস্তুকে অ-পরাপর সকল বস্তুর সঙ্গে মিলাইয়া দেখাই জ্ঞানের মূল।

ঐ

প্রতিভা-শালী ব্যক্তি।—এটি অ-ত্যন্ত ভুল যে এক জন প্রতিভাশালী ব্যক্তি পৃথিবীর প্রতিদিনের কার্য্য করিতে অক্ষম।

যে আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে পারে সে মনে করিলে ডাকের সঙ্গে দৌড়িতে পারে; বড়টা হইলে ছোটটা তাহার ভিতর আছেই আছে। কিন্তু বৃদ্ধা পৃথিবী এতবার পারা মাখান পয়সাকে টাকা বলিয়া ভুল করিয়াছে যে সে আর কখনো সাধারণ তামা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে বিশ্বাস করিতে পারে না।

Carlyle.

প্রেম।—স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক তাড়িতাকর্ষণকে আমরা সচরাচর প্রেম বলি।

ঐ

অত্যন্ত উন্নত অবস্থাতেও প্রেম একটা বিভ্রম মাত্র, অজ্ঞান কোন একটা কিছুর নিয়মে ইহা মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে প্রচারিত রহিয়াছে। আর এই বিভ্রমের দ্বারা একটা অত্যন্ত গুরুতর কার্য্য সাধিত হয়; সে কার্য্য জীব-শ্রেণীর স্থায়িত্ব।

Goethe

মানুষের দেহ।—পৃথিবীতে একটি মাত্র পূজার মন্দির আছে এবং সেই মন্দির মনুষ্যের দেহ। পৃথিবীতে মানুষের উন্নত আকৃতি অপেক্ষা আর কিছুই অধিক পবিত্র নাই। মানুষের নিকটে অবনতজানু হওয়া আর রক্তমাংসের দেহে প্রকাশিত ঈশ্বরের উপাসনা করা একই। মনুষ্যের শরীরে হাত দেওয়া ও স্বর্গ স্পর্শ করা একই।

Novalio.

স্বর-রহস্য।

স্বর-বিন্যাসের পরিপাটো গীতের পরিপাট্য হয় ইহা সকলেই জানেন—কিন্তু কোন্ প্রকার স্বরের পর কোন্ প্রকার স্বর বসাইলে সাধারণতঃ গীতের পারিপাট্য হয়, ও কেন হয়, ইহা আমাদের দেশের বড় বড় ওস্তাদও হয় ত বলিতে পরাস্ত মানিবেন। এ জন্য সংক্ষেপে স্বর-বিন্যাসের কতিপয় মূলতত্ত্ব (ক-খ-গ-ঘ-মাত্র) প্রদর্শন করা যাইতেছে।

নিম্ন লিখিত এই আটটি স্বর দৃষ্টি কর

সা॰॰॰॰রে॰॰॰গ॰॰ম

প॰॰॰॰ধ॰॰॰নি॰॰সা

এক এক করিয়া ক্রমান্বয়ে নীচু স্বর হইতে উঁচু স্বরে উত্থান-পূর্ব্বক নীচের সা হইতে এক-সপ্তক উপরের সা পর্য্যন্ত ওঠা হইল।

উক্ত স্বরাষ্টকের কাহার কাহার মধ্যে কি-মাত্রা ব্যবধান, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য, চারি-চারিটি স্বর করিয়া ঐ যে দুইটি পংক্তি তাহার প্রথম স্বর-দ্বয়ের মধ্যে চারিটি বিন্দু, তাহার দ্বিতীয় স্বরদ্বয়ের মধ্যে তিনটি বিন্দু, তৃতীয় স্বরদ্বয়ের মধ্যে দুইটি বিন্দু সন্নিবিষ্ট হইল; ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, সা এবং রে তথা পা এবং ধা দুয়ের মধ্যে ষোলো আনা ব্যবধান, রে এবং গ তথা ধা এবং নি দুয়ের মধ্যে বারো আনা ব্যবধান, গা এবং মা তথা নি এবং সা দুয়ের মধ্যে আট আনা ব্যবধান।

প্রথম সপ্তকের সা যদি বীণায় ঝঙ্কারিত হয় তবে দ্বিতীয় সপ্তকের পা এবং তৃতীয় সপ্তকের গা তাহার সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম-স্বরে অনুরণিত হইয়া উঠে। এজন্য সা গা এবং পা এই তিন স্বর সম্বাদি বলিয়া উক্ত হইতে পারে (আমাদের দেশীয় সঙ্গীত শাস্ত্রে গা সম্বাদি বলিয়া পরিগণিত হয় না কিন্তু তাহা লইয়া বাদানুবাদ করা এখানকার উদ্দেশ্য নহে—স্বদেশ বিদেশ নিরপেক্ষ সাধারণ-স্থলে দাঁড়াইয়াই এ-

খানে কথা কহা হইতেছে)। কোন যন্ত্রে ঐ তিন স্বর একত্রে বাজাইলে তাহাদের মধ্য হইতে দিব্য একটি ঐকতান ভাব ফুটিয়া বাহির হইবে—তেমনটি আর কোন স্বর-ত্রয়ের মধ্যে সম্ভবে না ; উপরে যাহা বলা হইল ঐটি স্বর-রহস্যের বীজ-রহস্য ; পরে যাহা কিছু আসিবে তাহা উহারই শাখা-প্রশাখা।

এখন, কেবল সা গা পা, গা পা সা, পা গা সা উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া বাজাইলে শুনিতে ভাল লাগে বটে কিন্তু বৈচিত্র-বিরহে তাহা সর্ব্বাঙ্গীন একটি গীতোচ্ছ্বাস বলিয়া গণ্য হইতে পারে না ; চিত্র-কর্ম্মে যেমন আলোক এবং ছায়া উভয়ের সঙ্ঘাত আবশ্যক গীত-কার্য্যে সেইরূপ সংবাদী-এবং বিবাদী স্বরের ঘাত-প্রতিঘাত চাই—তবেই গীতের সর্ব্বাঙ্গীনতা হয়। এখন বিবাদী স্বর কাহাকে বলে, তাহা দেখা যাইতেছে।

বিবাদী-স্বর বিষয়ে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে স্বর-সপ্তকের গ্রাম-নির্ব্বাচন করা আবশ্যক অতএব প্রথমে তদ্বিষয়ে একটু প্রণিধান করা হউক।

সাত স্বরকে ভাঙিয়া বারো স্বরার্দ্ধে পরিণত করিলে তাহাতে কাজের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না ; তবে খুব একজন বিচক্ষণ-সমজদার ব্যক্তি বলিলেও বলিতে পারেন যে উহা ঠিক্ ব্যাকরণ-শুদ্ধ হইল না ; কিন্তু সঙ্গীতের ক-খ-শিক্ষা স্থলে ও-সকল বিচারাড়ম্বরে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা এইখানেই পুঁথি পাঁজি বন্ধ করাই শ্রেয়। সাত-স্বরকে এইরূপ করিয়া বারো ভাগে বিভাগ কর যে, গা মা তথা নি সা উভয়ের মধ্যে যেরূপ আট আনা ব্যবধান, উক্ত বারো স্বরের প্রত্যেক স্বর স্বরের মধ্যে সেইরূপ আট-আনা ব্যবধান থাকিবে ; যথা,—

(১) সা
(২) সা॥০—অর্থাৎ কোমল রে
(৩) রে
(৪) রে॥০—অর্থাৎ কোমল গা
(৫) গা
(৬) মা
(৭) মা॥০—অর্থাৎ কড়ি মধ্যম
(৮) পা
(৯) পা॥০—অর্থাৎ কোমল ধা
(১০) ধা
(১১) ধা॥০—অর্থাৎ কোমল নি
(১২) নি

এখানে বলিতে পার যে সা এবং রে উভয়ের মধ্যে ষোলো আনা ব্যবধান কিন্তু রে এবং গা উভয়ের মধ্যে বারো আনা বই নয় ; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ব্যবধানকে অর্দ্ধা অর্দ্ধি বিভাগ করিলে যদিচ আট আনা ব্যবধান পাওয়া যায় কিন্তু শেষোক্ত ব্যবধানকে অর্দ্ধা-অর্দ্ধি বিভাগ করিলে ছ-আনা মাত্র পাওয়া যায় তাহার অধিক নহে। ইহার প্রতি বক্তব্য এই যে, ষোলো আনা এবং বারো আনা ব্যবধানের পরিবর্ত্তে উভয় ব্যবধানকে গড়ে সমান করিয়া পরিণত করিলে—ষোলো আনা এবং বারো আনার মাঝামাঝি চৌদ্দ আনায় পরিণত করিলে—বিশেষ কিছুই ক্ষতি হয় না, এবং তাহাদিগকে অর্দ্ধা অর্দ্ধি বিভাগ করিলে আট আনা ব্যবধান না হউক সাত আনা ব্যবধান পাওয়া যায়, তাহাই যথেষ্ট;—এক আনা ব্যবধানের ইতর বিশেষে কাজের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। আসল কথাটা এই যে সাত স্বর ভাঙিয়া উপরি উক্ত রূপ বারো স্বরে পরিণত করিলে এত সুবিধা হয় যে, তাহার ভিতরকার ক্ষুদ্র দোষ-গুলি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। অতঃপর গ্রাম-নির্ণয়ের পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়া বিবাদী স্বর কিরূপ তাহা দেখা যাইতেছে।

ক্রমশঃ।

হৃদয় মন্থন। ✓।।৮

জনৈক সন্ন্যাসী প্রেরিত।

আমরা হরিদ্বারের মেলা দেখিয়া এখন কেদারেশ্বরের মন্দিরে যাত্রা করিতেছি। হরিদ্বার হইতে কেদারেশ্বরের মন্দির প্রায় ১৫।১৬ ক্রোশ উত্তরে, এবং সে স্থান হইতে হিমাচলের দৃশ্য অতি মনোহর। এক দিকে হরিদ্বর্ণ তরুশ্রেণী স্তরে স্তরে হিমালয়ের চরণদিকে নিম্নগামী হইয়াছে, আবার অন্যদিকে শৈলের উপর শৈলমালা, শৃঙ্গের উপর শৃঙ্গরাজি, অনন্ত তুষারাবৃত হইয়া প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে আকাশ ভেদ করিয়া কোথায় যে উঠিয়াছে তাহা যেন দেবতারাও বলিতে পারেন না। সৌন্দর্য্য ও মহান্ ভাবের এমন সম্মিলন-স্থল আর কোথাও নাই। একদিকে সৌন্দর্য্য ও মর্ত্ত্যলোক, অপর দিকে মহান্ গাম্ভীর্য্য ও অমর লোক,—এই বিচিত্র সন্ধিস্থলে দেব দেব কেদারেশ্বর অধিষ্ঠান করিতেছেন। কিন্তু কেদারেশ্বরের মন্দিরে পৌঁছিতে এখনো আমাদের দুই তিন দিন লাগিবে। এত দিনে আমরা হরিদ্বার হইতে প্রায় দশ ক্রোশ উত্তরে আসিয়াছি।

আজ পূর্ণিমার রাত্রি। এখানে আমি, পুণ্যবতী ও সুরেন্দ্র একটি পুরাতন মহীরুহের তলায় বসিয়া অগ্নি জ্বালাইয়া এই দ্বিপ্রহর রাত্রে পরস্পরের মনের কথা কহিতেছি। বলা বাহুল্য যে সুরেন্দ্রকেও আমরা সহযাত্রী করিয়া লইয়াছি। এই গভীর নিশীথে এরূপ স্থানে অগ্নি জ্বালাইয়া হৃদয় খুলিয়া হৃদয়ের কথা বিনিময় করিতে যে কি অপার আনন্দ হয়, তাহা বোধ হয় তোমরা অনুভবও করিতে পার না। সাগরে নিক্ষিপ্ত ছিন্ন তৃণ যেমন তরঙ্গবেগে বেলাভূমিতে আসিয়া পড়িয়া থাকে, আমরাও সেইরূপ সংসারের তরঙ্গে বিতাড়িত হইয়া নির্জ্জন এই হিমালয় প্রদেশে আসিয়া পড়িয়াছি। এখান হইতে আমাদের রোদন সংসারের আর কেহই শুনিতে পাইবে না, সংসারের আর কাহারও রোদন আমরাও শুনিতে পাইব না। বাস্তবিক আমরা কি সুখী। একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি—দেখি যে চারিদিক যেন এক অপূর্ব্ব মোহমন্ত্রে মুগ্ধ, সমস্ত প্রকৃতি জ্যোৎস্নাময়, সেই জ্যোৎস্না যেন নিদ্রাময়,—সেই নিদ্রা যেন স্বপ্নময়—সেই স্বপ্ন যেন প্রমোদময়। সুদূরে শুভ্রবৎ জাহ্নবী দেবী চূর্ণিত চন্দ্রমা মাখি.া সুষুপ্ত রহিয়াছেন। কোথাও নিকটস্থ লতাপল্লবে সেই নিদ্রিত জ্যোৎস্না, থাকিয়া থাকিয়া যেন উত্তর বাতাসে চমকিয়া উঠিতেছে, আবার কোথাও বা সুদূরে নীহাররাশির মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া শীতলতা-প্রভাবে সেই জ্যোৎস্না যেন জমাট হইয়া গিয়াছে। আ-

বার চক্ষু নিমীলন করিয়া দেখি—দেখি যে হৃদয়েও সেই স্বপ্নময় জ্যোৎস্নাভাস। সমস্ত হৃদয় তন্ন তন্ন করিয়া দেখি—দেখি যে, তাহাতে শত সহস্র লোকের মন রাখিয়া চলিবার হীন অভিলাষ, ধন বা সম্মান উপার্জ্জনের অকিঞ্চিৎকর লালসা, দীন হীন ভিক্ষুকদের পর্য্যন্ত নিন্দাভাজন হইবার ভয়, এসকল কিছুই আর নাই—সুদূরে ঐ মন্দাকিনী যেমন শতমুখী হইয়া সাগর-গর্ভে পড়িয়াছেন, হৃদয়ের সহস্র ভাবও সেইরূপ এখানে কেবল সেই মহামায়ার চরণে গিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। এখানকার বায়ু, পৃথিবীর নিঃশ্বাসে দূষিত নহে, এখানকার পবিত্রতা পৃথিবীর স্পর্শে কলঙ্কিত নহে। এখানে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়,ত সে জীবন কেবল মহামায়ার আরাধনায় যাপিত হইবে, আর এখানে যদি মরিতেও হয়, ত সে জীবন কেবল মহামায়ার চরণেই অর্পিত হইবে। এখানে জীবদ্দশায় আনন্দ, মৃত্যুতেও নিশ্চিন্ততা, সেই নিশ্চিন্ততাতেই স্বর্গ-সুখ।

কিন্তু সুরেন্দ্রের কথা সকল শুনিয়া অবধি আমার মনে এক দারুণ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। এখনও আমি সুরেন্দ্রের সকল কথা শুনি নাই—সুরেন্দ্র কেন যে চন্দন গ্রামের ধনশালী সদ্বংশীয় ভূম্যধিকারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়াও কঠোর-হৃদয় দস্যুদের নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা অদ্যাপি আমি শুনি নাই। সুরেন্দ্র সকল কথা বলিতে এখন লজ্জিত হন। তোমরা মনে করিতে পার যে সুরেন্দ্র তত সরল ও মুক্তকণ্ঠ নহেন। কিন্তু সে কথা আমি স্বীকার করি না। সরলতা ও মুক্তকণ্ঠতা তোমাদের মতে যতই প্রশংসার সামগ্রী হউক না কেন, আমার মতে পূর্ণমাত্রায় সরলতা ও মুক্তকণ্ঠতা সংসারে অসম্ভব। এ কথা অবশ্য আমি স্বীকার করি যে, ব্যক্তি-বিশেষের কাছে—হৃদয়ের প্রণয়িনীর কাছে, প্রাণের বন্ধুর কাছে সরল ও মুক্তকণ্ঠ হওয়া যাইলেও যাইতে পারে, কিন্তু তাহাই বা কতদূর সম্ভব? আশৈশব বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত মানুষের মনে কি এমন ভাব উদয় হয় না, ভ্রম বা অদূরদৃষ্টি-বশত বা মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার আতিশয্য বশত সেই সকল ভাব কি এমন কার্য্যে পরিণত হয় না যে সেই সকল ভাব বা সেই সকল কার্য্য স্বীয় স্মৃতিপটে পুনরুদ্দীপিত দেখিতে বা স্বীয় হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী-দেবীকে জানাইতে পর্য্যন্ত শরীরের রক্ত তুষারময় হইয়া যায়? তোমরা মনে করিতে পার যে আমি কি ভয়ানক গূঢ় কথা ভাবিয়াই এত কথা বলিতেছি—কিন্তু তোমরাই বল দেখি যে হৃদয় বিশেষে একটি সামান্য অন্যায় কার্য্য পর্য্যন্ত কি ভয়ানকরূপে মর্ম্মঘাতী হইয়া দাঁড়ায়? যদি আপনাকে আপনি জানিতেই অনেক সময়ে লজ্জিত হইতে হয়, তাহা হইলে অন্যের নিকটে পূর্ণমাত্রায় মুক্তকণ্ঠ হওয়া কি রূপে সম্ভব হইতে পারে? সুতরাং এ বিষয়ে সুরেন্দ্রকে আমি কোন মতেই দোষী করিতে পারি না। কিন্তু যাহাই হউক। সুরেন্দ্রের যে সকল

কথা শুনিয়াছি তাহাতেই আমার হৃদয় কেমন একপ্রকার চঞ্চল হইয়া উঠিল। নিদ্রাবেশে একটি চমৎকার স্বপ্ন দেখিয়া সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইলে যেমন সেই অলীক স্বপ্নটীও কতকটা বাস্তবিক বলিয়া প্রতীত হয়, সেই রূপ সুরেন্দ্রের মুখে পৃথিবীর নানা প্রসঙ্গ শুনিয়া আমার সহসা মনে হইতে লাগিল যে আমি যেন সেই কঠোর পৃথিবীতে আজও আছি। কোথায় হিমালয়ের প্রশান্ত ও অটল গাম্ভীর্য্য,আর কোথায় বা সেই পৃথিবীর তরল তরঙ্গভঙ্গ! কিন্তু এই মহান্ প্রদেশে থাকিয়াও কেন আমার উদাসীন হৃদয় আজ সুরেন্দ্রের কথায় আলোড়িত হইয়া উঠিল। বোধ হয় আমি আজিও প্রকৃত প্রস্তাবে সন্ন্যাসী হইতে পারি নাই, নহিলে কেন আজ সন্ন্যাসীর কঠোর ব্রতের বিঘ্ন করিয়া সংসারের স্বপ্নময় মোহদৃশ্য সকল আমার স্মৃতিপটে সজীব ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। কোথায় সেই হৃদয়ের বন্ধু—কোথায় সেই প্রাণের প্রণয়িনী—কোথায় সেই আদরের কুসুম-কলিকা—আহা, সে সকল কেন আবার জাজ্বল্য ভাবে জ্বলিয়া উঠিল। —দেব হিমালয়! কেনই বা তুমি এই মৃত্তিকা-ময় দুর্ব্বল-হৃদয় মানুষকে আশ্রয় দিয়া তোমার মহত্ত্বের অবমাননা করিতেছ? উঃ, আমি কোন কালেই কাহারও যোগ্য হইতে পারি নাই ও পারিলাম না! ইহা আমি বুঝিয়াছিলাম—ইহার জন্যই আমি সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে—হে হিমাচল! আমি তোমারও অযোগ্য! এখনো যদি তোমার কঠোর মহান্ ভাবে আমার হৃদয়ের শৈশব ক্রীড়া শমিত না হইল, এখনো যদি তোমার এই বিকট বিজনতায় হৃদয় বৈরাগ্যে দীক্ষিত না হইল, এখনো যদি তোমার এই প্রশান্ত দেব-ভাবে মনের পার্থিব ভাব সকল নির্ম্মূল না হইল, তবে আমার সন্ন্যাস-ব্রত আড়ম্বরমাত্র। কিন্তু আমি সন্ন্যাসী হইলেও মানুষ ত বটে, মানুষ বলিয়াই দুর্ব্বল-হৃদয়, দুর্ব্বল-হৃদয় বলিয়াই আজ সংসারের নানা কথা শুনিয়া এরূপ চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছি। শৈশবে যে সংসার আমাদের শুশ্রূষার স্থল—বাল্য কালে যাহা আমাদের ক্রীড়ার বিনোদ-ক্ষেত্র—যৌবনে যাহা আমাদের প্রমোদের আনন্দ-কানন—সে সংসার আমরা সহজে কেমন করিয়া ভুলিতে পারি? বন্ধুদের চপলতায় ভগ্নহৃদয় হইয়া—মমতাময়ীদের নির্ম্মমতায় প্রজ্বলিত হইয়া—মর্ম্মঘাতী অভিমানে জর্জ্জরিত হইয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করা সহজ বটে—কিন্তু রীতিমত পালন করা কি কঠিন ব্যাপার! দুঃখের বিষয় এই যে, এই সংসারে পরাধীনতাই আমাদের সুখের নিদান। যাহারা যশঃপ্রার্থী তাহারা সামান্য দাস-দাসীদের পর্য্যন্ত দুর্গন্ধময় নিঃশ্বাসের অধীন, যাহারা ধন ভালবাসে, তাহারা সামান্য পণ্যবাহকদের পর্য্যন্ত হিসাবের অধীন, যাহারা উচ্চ পদ ভাল বাসে, তাহারা অকিঞ্চিৎকর উচ্চপদস্থ লোকদের অনুজীবীদিগের পর্য্যন্ত অধীন,

ইহার উপরে আবার সকলেই অদৃষ্টের অধীন, অথচ "স্বাধীনতা স্বাধীনতা" করিয়া পৃথিবীর মধ্যে মহা হুলস্থূল! কোন্ বিষয়ে আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা আছে? অর্থাৎ, কোন্ বিষয়ে স্বাধীনতা নিবন্ধন আমাদের প্রকৃত সুখ আছে? দিব্য চক্ষুতে দেখিতে গেলে দেখিতে পাইবে যে পরাধীনতাতেই মানুষের প্রকৃত সুখ! মনে কর, আমার এই হৃদয় এখনো স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতেছে,—স্থল-বিশেষের বা ব্যক্তি-বিশেষের অধীন না হইয়া অসীম আকাশে বিচরণ করিতেছে!—কিন্তু এই স্বাধীন হৃদয় লইয়া আমি কি সুখী? না, কখনই না! স্বাধীন হইয়াও আমি এই পরাধীনতার অভিলাষ করি যে, আমার মনের মত কেহ আমার এই স্বাধীন-প্রাণ হৃদয়কে পিঞ্জরাবদ্ধ করুক—অসীম আকাশে আলুলায়িত এই স্বাধীন হৃদয়কে চতুর্দিক হইতে সংযত করিয়া কারারুদ্ধ করুক ও এই অসংযত হৃদয়ের চরণে অবিচ্ছেদ্য শৃঙ্খল বাঁধিয়া রাখুক।—ইহাই সংসারে প্রেমের সুখ এবং ইহাই এই হিমাচলে ধর্ম্মের সুখ!

ক্রমে রাত্রি গভীর হইয়া আসিল—তখন আমি সুরেন্দ্র ও পুণ্যবতীকে বলিলাম যে "গুরুদেব বীরশ্রেষ্ঠ আমাদের অগ্রে হরিদ্বার হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঐ দূর কন্দরে বাস করিতেছেন, আজও পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই,—আইস, অবশিষ্ট রাত্রি তাঁহার সঙ্গে শাস্ত্রালাপে কাটাইয়া দেই"। এই কথাতে সুরেন্দ্রের মুখ অতিশয় গম্ভীর—অতিশয় বিষণ্ণ ভাব ধারণ করিল। তাহা দেখিয়া আমি সুরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম "সুরেন্দ্র! গুরুদেবের সহিত এই রাত্রে সাক্ষাৎ করিতে তোমার কি ইচ্ছা নাই?"

সু। না,—আরও কিছু দিন না অতীত হইলে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার কোন মতেই সাহস হইবে না। আমার মত পাপিষ্ঠকে তাঁহার সম্মুখে লইয়া যাইয়া কেন তাঁহার অপমান করিবেন?

আ। কিন্তু এখন তুমি যখন আমাদের মতই সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছ, তখন তুমি আর কেন এতদূর সঙ্কুচিত হইতেছ! মনুষ্য-জন্ম গ্রহণ করিয়া পাপে লিপ্ত কে না হয়? এক দিকে পৃথিবীর ভয়ানক প্রলোভন, অপর দিকে হৃদয়ের দারুণ দুর্ব্বলতা, ইহাতে মনুষ্য যে ক্ষুব্ধ সাগরে জীর্ণ নৌকার ন্যায় ভগ্ন চূর্ণ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! অনেকে বিস্তর আড়ম্বর করিয়া আপনাদের অন্যায় কার্য্য সকল ঢাকিতে যায় বটে, অনেকে ন্যায়শাস্ত্রের কুটিল তর্ক বিতর্ক দ্বারা আপনাদের অন্যায় কার্য্য সকল ন্যায়-কার্য্য রূপে প্রতিপন্ন করিতে চাহে বটে, অনেকে আপনাদের মনকে পর্য্যন্ত প্রবঞ্চনাময় যুক্তি দ্বারা প্রতারিত করিয়া অনুতাপের অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে প্রয়াস পায় বটে, কিন্তু হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্ব্বদাই জাগ্রত রহিয়াছেন,—সেই দেবীকে কে প্রবঞ্চনা করিতে পারে? তবে সু-

রেন্দ্র! তুমি পাপিষ্ঠ বলিয়া কেন আজ গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে এত সঙ্কুচিত হইতেছ?

সু। কেবল পাপিষ্ঠ বলিয়া নয়, কিন্তু দেব! আমি তাঁহারই কাছে ঘোর অপরাধে অপরাধী আছি, সেই জন্যই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কোন মতেই আমার সাহস হইতেছে না।

আ। সে কি, সুরেন্দ্র! আমি ত তোমার কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

সু। দেব! আমি তাঁহার কাছে যে অপরাধে অপরাধী তাহা এখন স্মরণ করিতেও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

পুণ্য। না, সুরেন্দ্র! তোমার সে বিষয়ে কিছুই ভয় নাই। তুমি কি মনে কর আমার পিতা এতদূর কঠোর-হৃদয় যে এখন তিনি তোমার সেই অপরাধ মনে করিয়া তোমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন? কখনই নয়! যাঁহার হৃদয় মমতায় গঠিত, ধর্ম্মে উজ্জ্বল, বৈরাগ্যে প্রসারিত, স্বর্গ-লোকের চিন্তায় উন্নত, তিনি কি আজ তোমার অনুতাপের পবিত্র হোমাগ্নি দেখিয়াও পূর্ব্বভাবে থাকিবেন?

সু। পুণ্যবতি! তোমার কি সেই ভাদ্র-মাসের অমাবস্যার গভীর রাত্রি মনে নাই?

পুণ্য। না, আমার কিছুই মনে নাই—আমার মনে থাকিবার কথা নাই—কারণ, আমি কে? কিন্তু সেই অমাবস্যার গভীর রাত্রি আজও পর্য্যন্ত আমার মর্ম্মস্থল ছাইয়া আছে—উঃ—কি ভয়ানক রাত্রি।

আ। পুণ্যবতি! তোমার অভিমানের এই অসংলগ্ন কথাতেই, তোমার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু—

পুণ্য। দেব! আপনি আমার হৃদয়ের ভাব ভুল বুঝিয়াছেন।—অভিমান? অভিমান আর আমার নাই—কারণ পার্থিব প্রেম-লালসা আর আমার হৃদয়ে নাই—এখন আমি এই হিমাচল অপেক্ষাও কঠোর—ঐ তুষাররাশি অপেক্ষাও শীতলতর! অথচ—অথচ—অথচ—সেই ভয়ঙ্কর অমাবস্যার দ্বিপ্রহরা রাত্রি এখনো আমার মর্ম্মের স্তরে স্তরে—

আ। পুণ্যবতি! যদি সেই রাত্রির কথা এই নির্জ্জন স্থানে আমাকে বলিতে এতই তোমরা উভয়েই সঙ্কুচিত হও তাহা হইলে আর সে কথায়—

পুণ্য। দেব! আপনি রাগ করিবেন না, আমি সকল কথা বলিতেই প্রস্তুত আছি। কিন্তু সুরেন্দ্র—সুরেন্দ্র

সু। ভাই পুণ্যবতি! তুমি কেন এত সঙ্কুচিত হইতেছ? বল, বল, আমাদের সকল কথাই তুমি বল—দেখিব, আজ সকল কথা বলিয়াও যদি এই অশান্তিময় হৃদয় শান্ত হয়।

পুণ্য। ভাল, আমিই তবে সকল কথা বলিতেছি। যে কথা আমি এত দিন পর্য্যন্ত মরমের নিভৃত গহ্বরে নিহিত রাখিয়াছিলাম, তাহা আজ প্রকাশ করিতে অনুমতি পাইয়াছি—তবে আর আমার কিসের সঙ্কোচ? কিন্তু দেব! সে সকল কথা তুলিতে গেলে পুরাতন যাতনা আবার

যেন নূতন তেজে জ্বলিয়া উঠে! তবে যদি বলিতেই হয়, ত সকল কথাই বলিব,—তাহা হইলেও বোধ হয় হৃদয়ের মর্ম্মান্তিক যাতনার অনেক উপশম হইবে। দেব! পিতা আমার জন্মাবধিই প্রকৃত সন্ন্যাসী—আমার অষ্টম বৎসর বয়সে মাতার মৃত্যু হয়—সেই অবধি তিনি লোকালয়ে আর বাহির হইতেন না, কাহারও সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখিতেন না, সদা সর্ব্বদাই কঠোর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। আমরা কুলে শীলে চন্দনগ্রামের মহা প্রবল জমিদারদিগের সমকক্ষ ছিলাম, কিন্তু আমরা দরিদ্র, আর তাঁহারা ধনবান! কিন্তু আমরা তাঁহাদের অপেক্ষা দরিদ্র হইলেও, আমাদের ঐশ্বর্য্যও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল না। আনত মুখে আমাদিগকে কখন কাহার দ্বারস্থ হইতে হইত না। আমাদের বিজন ভবন, আমাদের সসাগরা পৃথিবী ছিল;—সঙ্কীর্ণ তুলসীমণ্ডপই আমাদের ধর্ম্মের নন্দনকানন ছিল, পিতার সহবাসই আমার পক্ষে দেবতার সহবাস ছিল!—আহা, কি সুখের সময়!—আমি আপনার মনে খেলিতাম, আপনার মনে নৃত্য করিতাম, আপনার মনে আনন্দে চীৎকার করিয়া পিতার ধ্যানভঙ্গ করিতাম,—কিন্তু মমতাময় পিতা ধ্যানভঙ্গে বিরক্ত না হইয়া বরং ঈষৎ-বিস্ফারিত নেত্রে ইঙ্গিতে আমাকে ডাকিয়া, আমাকে অঙ্কে লইয়া, আমাকে হৃদয়ে ধরিয়া আমাকে যেন মর্ম্মে বিতাড়িত করিয়া উচ্ছ্বসিত স্নেহে আমাকে চুম্বন করিতেন——উঃ কি স্বর্গ-সুখই আমি হারাইয়াছি! কখন বা পিতা আমার অর্থশূন্য—উদ্দেশ্য-শূন্য কৌশল-শূন্য রঙ্গ ভঙ্গ দেখিয়া, আমার দিকে সজল নয়নে চাহিয়া চাহিয়া যেন অতি কষ্টে বলিয়া উঠিতেন—"বুদ্ধদেব! তুমিই ধন্য!" —আমি একথার অর্থ কিছুই বুঝিতাম না, তবুও যেন এই কথা গুলি উচ্চারণেই আমি কেমন এক প্রকার জড়সড় হইয়া পড়িতাম। কিন্তু জনকের পরক্ষণের আদরেই আমি সকল ভুলিয়া যাইয়া এই ভাবিতাম যে আমার মত কে আর সুখী আছে! পিতা প্রায়ই আমাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া সস্নেহ ভাবে বলিতেন যে "মা, তোমাকে একটি উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ করিয়া আমি চির জীবনের জন্য সংসারের কাছে বিদায় লইব!" এইরূপে বিমল স্নেহের ক্ষেত্রে, মনের বিমল আনন্দে আমার দ্বাদশ বর্ষ কাটিয়া গেল! আমিও বাড়ির বাহিরে কোথাও যাইতাম না, পিতাও শেষ রাত্রে গঙ্গাস্নান ব্যতীত বাটীর বাহিরে কোথাও যাইতেন না। এক দিবস পিতার অসুখ হওয়াতে আমি তাঁহার জন্য গঙ্গাজল আনিতে গঙ্গায় গিয়াছিলাম,—তখন প্রভাত হয় নাই। গঙ্গাতীরে আসিয়া দেখিলাম যে একটি অতি কদাকার যুবক ও একটি অতি সুন্দরী যুবতী গঙ্গার ঈষৎ আন্দোলিত উর্ম্মিমালা ভঙ্গ করিয়া গঙ্গার বক্ষে সন্তরণ করিতেছে। উভয়ের হাসির ধ্বনিতে গঙ্গাপ্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইতেছে; উভয়ের উল্লাসে সমস্ত গম্ভীর ধরণী যেন প্রগল্ভ হইয়া উঠিতেছে—এবং উভয়ের আনন্দ

কিরণে যেন সমস্ত অন্ধকার আলোকিত হই-তেছে। আমি পিতার জন্য গঙ্গাজল তুলিয়া আনিতেছি, এমন সময় সেই যুবক আসিয়া আমার অঞ্চল ধরিয়া কহিল "সুন্দরি, কোথায় যাইতেছ।" আমি পশ্চাদ্ভাগে ফিরিয়া দেখি যে সেই উল্লাসময় কদাকার যুবক আজ———পিছনে দণ্ডায়মান। আমার মুখে আর কথা সরিল না, সেই বিকটাকার পিশাচকে দেখিয়া আমার প্রাণ যেন প্রাণের ভিতর শুষ্ক হইয়া যাইল।—এখনও তাহার সেই জবাফুল-সদৃশ নয়নদ্বয়, সেই উগ্র বরাহের মত মাথার কুন্তল-কণ্টক, সেই বিকট দশন ও সেই পীনোন্নত গণ্ডস্থল আমার মনে যেন জাগরূক রহিয়াছে। তাহাকে আমার অঞ্চল ধারণ করিতে দেখিয়াই আমি ভয়ের আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলাম; আর অমনি সে পাষণ্ড আমার অঞ্চল ছাড়িয়া দিল। তখন আমি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু গৃহের কবাট রুদ্ধ করিতে গিয়া দেখিলাম যে সেই নিশাচর অদূরে একটি বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া আমাদের বাড়ির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। সেই পাষণ্ডের ভয়ে আমি প্রায়ই আর গঙ্গাতীরে যাইতাম না, কদাপি কখন নিতান্ত প্রয়োজন বশতঃ যখনই যাইতাম, তখনই দেখিতাম যে সে আমাকে অনুসরণ করিতেছে। পরিশেষে পিতাকে আমি সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলাম। তিনি গঙ্গাতীরে যাইতে আ-মাকে বিশেষরূপে নিষেধ করিলেন। আমিও সেই নিষেধ অনুসারে গঙ্গাতীরে যাওয়া দূরে থাকুক, বাটীর বহির্দ্বারেও আর যাইতাম না।

এইরূপে দুই এক বৎসর গত হইল। আমি পিতার সেবাতেই থাকি, পিতাও আমাকে আদর করিয়া ও পূজাধ্যানে আসক্ত থাকিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। একদিন শারদীয় প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলেই শুনিলাম যে রাজপুত্র সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যা-অধ্যয়ন শেষ করিয়া বারাণসী হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। লোকদের আর আহ্লাদের সীমা নাই, নহবতের আকাশ-ভেদী শব্দে, প্রজাদের আনন্দ-নিনাদে, দিকদিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আমি পিতার কাছে এই অনুনয় করিলাম যে আমি রাজপুত্রকে এক দিন দেখিব। তাহাতে পিতা বলিলেন যে "বৎসে, তা-হাকে তুমি কিরূপে দেখিবে? তিনি যখন আমোদ আহ্লাদ পরিত্যাগ করিয়া কেবল আপন মনে মাতার জন্য গম্ভীর চিন্তায় বিরলে দিন যাপন করেন, তখন তাঁহাকে কোথায় আর দেখিবে?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে তাঁহার এই বিষাদের কারণ কি? তাহাতে তিনি বলিলেন যে "রাজ-কুমার সুরেন্দ্রের মাতা অনেক দিন হইল আত্মঘাতী হইয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। রাজার প্রধান দেওয়ান—আপন সুন্দরী কন্যার সহিত রাজার বিবাহ দিয়া আপন আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য প্রধানা রাণীর বিরুদ্ধে বিস্তর ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে। পতিব্রতা ইন্দুমতীর নামে দেশ বিদেশে

অশ্রাব্য নিন্দা প্রচার করিতে থাকে, সেই সকল নিন্দাধ্বনির প্রতিধ্বনি নানা প্রকার অলঙ্কারে স্ফীত হইয়া রাজার শ্রবণে প্রবেশ করে। কিন্তু অজ্ঞান শিশু, উন্মাদ, সুরা-উন্মত্ত ব্যক্তি ও বৃদ্ধ বয়সে প্রণয়-কাঙ্গাল একই উপাদানে গঠিত। তাহারা বিন্দুমাত্র বিচার না করিয়া আপনাদের মনের ঝোঁকে লোক-প্রবাদ বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করে। বৃদ্ধ রাজা ইন্দুমতীর কলঙ্কের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বিশেষরূপে নির্য্যাতন আরম্ভ করিলেন। পতিব্রতা ইন্দুমতী, আপন প্রেমের অপমান দেখিয়া, বৃদ্ধ রাজার স্নেহে অবনতি দেখিয়া, দেশ বিদেশে আপন নামের কলঙ্ক রটনা দেখিয়া, অভিমানে আত্মহত্যা করিলেন। তখন রাজকুমার সুরেন্দ্রনাথ বারাণসীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেছেন। তিনি এ সকল কথার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। তিনি কেবল এই মাত্র জানিতেন যে তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু দেশে ফিরিয়া আসিয়া জানিতে পারিলেন যে,অমূলক লোকাপবাদে তাঁহার মাতা স্বহস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমি কুমারের বাল্যকালে কুমারকে অত্যন্ত ভাল বাসিতাম এবং অত্যন্ত যত্নে তাঁহাকে সংস্কৃত শিখাইতাম। তাঁহার দ্বাদশ বৎসর বয়সে রাজা তাঁহাকে বারাণসী ধামে প্রখ্যাতনামা মহারাষ্ট্রীয় অধ্যাপক সোমাচার্য্যের নিকট বেদান্ত দর্শন ও সাহিত্য পাঠ করিতে প্রেরণ করেন। আজ দ্বাদশ বৎসরের পরে আবার সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমি সে দিন গোপনে কুমারের সহিত পূর্ব্ব অনুরাগ বশতঃ সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু কুমারের অতুল ব্যুৎপত্তি ও বুদ্ধির অতুল প্রাখর্য্য দেখিয়া যেমন আহ্লাদিত হইলাম, তেমনি আবার তাঁহার সেই প্রশস্ত ললাটের বিষাদ-রেখা ও আকর্ণ-বিস্ফারিত চক্ষুর সজল ভাব দেখিয়া মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইয়াছিলাম। তরল মেঘাচ্ছন্ন পূর্ণ চন্দ্রের মত তাঁহার মুখের সুদীন বিষন্ন ভাব মনে পড়িলে এখন আমার চক্ষে জল আইসে—আহা, লোক নিন্দায় পতিব্রতা ইন্দুমতী যে দিন আত্মহত্যা করিয়া জ্বালা যন্ত্রণা এড়াইলেন সেই দিনের কথা আজও যেন আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে—

আ। কিন্তু লোকনিন্দায় কেনই বা রাণী ইন্দুমতী প্রাণত্যাগ করিলেন?—অকিঞ্চিৎকর ইতর লোকদের নিন্দায় এক জন সহৃদয় ব্যক্তি কেনই বা এতদূর অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আমার জীবনের যদি সমস্ত সুখ প্রত্যেক সামান্য ব্যক্তির সামান্য অপেক্ষাও সামান্যতর নিঃশ্বাসের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে আমার জীবনের মূল্য?

আমি লোক-নিন্দার অমোঘ শক্তির কথা পূর্ব্বে পূর্ব্বে আমাদের সহচর সন্ন্যাসীদের নিকটে শুনিয়া ছিলাম বটে কিন্তু মনের সহিত তাহা কখনই হৃদয়ঙ্গম করিতেই পারি নাই,—আজ ইন্দুমতীর আত্মহত্যার কথা শুনিয়া আমি বাস্তবিক স্তম্ভিত হইয়াছি।

সু। দেব!—আপনি কেন যে স্তম্ভিত হইলেন, তাহাই আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি আজ এই মহান-মূর্ত্তি হিমালয়ের নিভৃত হৃদয়ে বসিয়া লোকনিন্দাকে তৃণ-জ্ঞান করিতে পারেন বটে, কিন্তু আপনি আজই যদি সংসারের কোলাহলময় তরঙ্গ ভঙ্গের উপরে ঝাঁপ দিয়া পড়েন, ত দেখিতে পাইবেন যে চন্দ্র যেমন সূর্য্যের আলোকে আলোকিত, ও সূর্য্যের অদর্শনে অন্ধকারময়, সেই রূপ অপরের নিঃশ্বাসই আমাদের জীবনের সুখ দুঃখের নিদানভূত। আপনি এই কঠোর অথচ প্রশান্ত প্রদেশ ছাড়িয়া যদি পৃথিবীর সমস্ত শ্মশানক্ষেত্র বিচরণ করেন, এবং বিচরণ করিয়া প্রত্যেক জ্বলন্ত বা নির্ব্বাপিত চিতা তন্ন তন্ন করিয়া দেখেন, ত দেখিতে পাইবেন, শত সহস্র পতিব্রতার চিতা-ধূম এই কথা জগৎ সমীপে প্রচার করিতেছে যে "আমরা আজ অন্যায় নিন্দায় প্রাণত্যাগ করিলাম!" উঃ, সে সব কথা থাক্!—দেব! কেবল আমি এই আপনাকে বলিতে চাই যে সংসারে কাহারও জীবন নিজের জীবন নহে,—নিজের জীবন অন্যের কথায়, নিজের আয়ুঃ অন্যের নিঃশ্বাসে, নিজের সুখ দুঃখ অন্যের কল্পনা অথবা অন্যের "খেয়ালে" নির্ভর করে।

আ।—আমি আপনার কথা মানিলাম! সামাজিক ব্যক্তিরা সমাজের প্রতি-হিল্লোলে আন্দোলিত হয়, কিন্তু ছিন্ন তৃণের মত সংসারের প্রতি-লহরীতে আলোড়িত হওয়া অপেক্ষা বদ্ধমূল পর্ব্বতের ন্যায় অটল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকা কি জীবনের মহান ভাবের পরিচয় নহে? এই মহান ভাব না থাকিলে গেলিলিয়োর দ্বারা পৃথিবীর গতি নির্ণয় হইত না, এই মহান ভাব না থাকিলে লুথরের দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম্মের সারাংশ কখনই প্রচারিত হইত না। পৃথিবীর সকল উন্নতিই পৃথিবীর সামান্য লোকদের নিঃশ্বাসে মুহূর্ত্ত কালের জন্য রুদ্ধ হইয়াছে—পৃথিবীর সকল উন্নতিই অবশেষে সেই সামান্য লোকদের নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া সম্পাদিত হইয়াছে। যদি আজ অকিঞ্চিৎকর লোকদের ঈর্ষ্যাময় নিঃশ্বাসের দ্বারা পৃথিবীর উন্নতির গতিরোধ হইতে পারিত, তাহা হইলে আমাদের ধর্ম্ম বিষয়ে শঙ্করাচার্য্য বা চৈতন্য জন্মাইয়া, ইউরোপীয় বিজ্ঞান বিষয়ে কোপর্নিকস্ বা লাপ্লাস্ জন্মাইয়া সমাজে একটি ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিও উত্থাপিত করিতে পারিতেন না।

পু। কিন্তু আমি পৃথিবীর মহান্ উন্নতির কথা কহিতেছি না। আমি কেবল সামান্য সুখ দুঃখের কথা কহিতেছি—আপনি যদি আজই সমাজে ফিরিয়া যান, ত দেখিতে পাইবেন যে দয়ার প্রত্যেক হিল্লোল, প্রেমের প্রত্যেক বিকম্পন, অপরের নিঃশ্বাসের উপরই নির্ভর করিতেছে।

আ। এ কথা যদি সত্য হয় ত সাংসারিক বা সামাজিক জীবনকে আমি হৃদয়ের সহিত হেয় জ্ঞান করি।

সু।—কিন্তু আপনাদের তর্কে আমি পড়িতে চাই না;—আমি পৃথিবীর মধ্যে

এই মাত্র কেবল জানিতে চাই যে আমি যাঁহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসি, তিনি আমাকে কতদূর ভাল বাসেন। ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড হইতে পারে, সমাজ সমাজ হইতে পারে, বিস্তর লোক বিস্তর লোক হইতে পারে, কিন্তু প্রেমিকে প্রেমিকে মিলন হইলে, উভয়ের হৃদয়ই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাণ্ড, উভয়ের মর্ম্মান্তিক কথাবার্ত্তাই পৃথিবীর সমগ্র নিঃশ্বাস, এবং উভয়ের হৃদয়-হিল্লোলেই সমস্ত ত্রিভুবনের অস্তিত্ব! আমার জীবনের ঘটনা হইতেই আমি তাহা দেখিয়াছি, কিন্তু আপনাদের তর্ক-স্রোতে আমি ত স্থলই পাইতেছি না।

আ। পুণ্যবতি! বল, তোমার জীবনের কথাই বল,—আমি শুনিব।

পু। ভাল, আমি বলিয়া যাইতেছি—শ্রবণ করুন।

এই সময়ে পশ্চিম দিকে এক খানি মেঘের রেখা দেখিতে পাইলাম, দেখিতে না দেখিতে তাহা গাঢ়তর—অন্ধকারতর—উন্নততর হইয়া দিগন্তব্যাপিনী হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে উত্তর বায়ু দ্বিগুণ প্রতাপে বহিতে লাগিল, হিমালয়ের শিখর-চ্যুত শিলা-রাশি সদর্পে কন্দরভূমিকে বিকম্পিত করিতে লাগিল, সমগ্র হিমালয়-প্রদেশ বিভীষিকা মূর্ত্তি ধারণ করিল,—আমাদের প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল, সুতরাং পুণ্যবতীর কথা আর অধিক শুনা হইল না।

ক্রমশঃ

পৃথিবীর পরিণাম।

পৃথিবী-জাত সকল বস্তুই পরিবর্ত্তন-নিয়মের-বশবর্ত্তী হইয়া জন্ম, জীবন ও মৃত্যু, এই তিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সকল বস্তুই যে সমান সময়ে এই তিন অবস্থা পায় এমন নহে। আমরা যে সময়কে এক মুহূর্ত্ত বলি সেই সময়ের মধ্যেই অনেক কীট পতঙ্গ এই তিন অবস্থা অতিক্রম করে। জন্ম হইতে মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী কালকে জীবন কহা যায়। পৃথিবী-জাত সকল বস্তুই এই নিয়মের অধীন, কিন্তু পৃথিবী নিজে এই নিয়মের অধীন কি না? পৃথিবীর জীবনের বিষয় আমরা জানি কিন্তু ইহার মৃত্যু হইবে কি না তাহা আমরা জানি না; আবহমান কাল হইতে পৃথিবীকে আমরা যেরূপ সমভাবে চলিতে দেখিয়া আসিতেছি তাহাতে আপাততঃ মনে হয় পৃথিবী মৃত্যুর আয়ত্তাধীন নহে।

এখন, দেখা যাক পৃথিবীর ন্যায় একটা গ্রহের জীবন ও মৃত্যু বলিলে কি বুঝায়। পৃথিবীর এখনকার অবস্থাই

ইহার জীবনের অবস্থা। এখন পৃথিবীতে উদ্ভিজ্জ জন্মাইতেছে, নদী বহিতেছে, সমুদ্র তরঙ্গিত হইতেছে; এখন দিনের পর রাত আসিয়া, ঋতুর পর ঋতু আসিয়া, পৃথিবীকে জীব জন্তুর বাসোপযোগী করিয়াছে; এক কথায়, এখন পৃথিবীতে যাহা হইতেছে তাহাতেই তাহার জীবনের অস্তিত্ব জাজ্জ্বল্যমান। এই অবস্থার অভাবের নামই মৃত্যু। এই অবস্থার অভাব হেতুই চন্দ্রকে আমরা মৃত গ্রহ বলি। *

পৃথিবীর বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্ম বস্তু ভেদ করিয়া যাইতে হইলেও তাহাতে বাধা পাইয়া আলোকের তির্য্যগ্ গতি (Refraction) হয়। কিন্তু চন্দ্র হইতে আলোক আসিবার সময় তাহার তির্য্যক গতি হয় না। ইহা হইতেই জানিতে পারা যায় যে চন্দ্রে বায়ু নাই, আর যদিই বা থাকে, তাহা অত্যন্ত লঘু। অত্যন্ত লঘু বায়ুতে জীবজন্তু বাঁচিতে পারে না। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে চন্দ্রে বায়ু নাই, জলও নাই। আমরা যাহাকে চন্দ্রের কলঙ্ক বলি তাহা প্রকাণ্ড গহ্বর মাত্র, ঐ সকল গহ্বর পূর্ব্বে সমুদ্র ছিল, এখন শুকাইয়া ঐরূপ গহ্বর হইয়াছে। চন্দ্র এরূপ মন্দ-গতি যে নিজের চারিদিকে ঘুরিতেই উহার ১৫ দিন লাগে। এই সকল এবং অন্যান্য কারণে Proctor প্রভৃতি জোতির্বেত্তারা বলেন যে চন্দ্রে উদ্ভিজ্জ কিম্বা প্রাণী নাই। যে গ্রহের চন্দ্রের মত অবস্থা হয় তাহাকেই মৃত কহা যায়।

পৃথিবীর মৃত্যু সম্ভব কিনা জানিতে হইলে দেখা আবশ্যক, পৃথিবীতে এমন কোন পরিবর্ত্তন হইতেছে কি না যাহাতে তাহার জীবনী-শক্তির হানি করে। দেখা আবশ্যক, পৃথিবীর জীবনী-শক্তির সঙ্গে এমন কোন প্রতিকূল শক্তি অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্বদ্ধ রহিয়াছে কি না যাহার অনিষ্ট-জনক কার্য্য অলক্ষিত ভাবে পৃথিবীর পরমায়ু হ্রাস করিতেছে। যদি আমরা সেইরূপ প্রতিকূল শক্তি দেখিতে পাই তবে তাহার কার্য্য এখন অতীব সূক্ষ্ম হইলেও তাহা হইতে কালে পৃথিবীরও যে চন্দ্রের মত মৃত দশা হইবে না—এরূপ কে বলিতে পারে?

গ্রহের জীবনের একটি প্রধান কারণ, বৈষম্য। বৈষম্য না থাকিলে কোন কার্য্যই হইতে পারে না; যদি সমস্ত পৃথিবী সমতল হইত অর্থাৎ পৃথিবীতে কিছু উঁচু নীচু না থাকিত, তাহা হইলে নদী বহিত না; নদীর গতির কারণ মাধ্যাকর্ষণ বটে, কিন্তু উঁচু নীচু না থাকিলে মাধ্যাকর্ষণ জলরাশিকে কোথা হইতে কোথায় টানিয়া আনিত? উষ্ণতার বৈষম্যই বায়ুর গতির কারণ। যদি সমস্ত বায়ু সমান গরম হইত তাহা হইলে বায়ু বহিত না। বায়ুর কোন একস্থান অধিক উষ্ণ হইলে,

* আমাদের দেশের নামকরণ অনুসারে চন্দ্রকে গ্রহ বলা হইল। কিন্তু আসলে, যে সকল জোতিষ্ক সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে তাহাদিগকেই গ্রহ কহে; আর যাহারা কোন একটি গ্রহের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে তাহারা উপগ্রহ। চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে পরিভ্রমণ করে, সেই নিমিত্ত ইহা প্রকৃত পক্ষে একটি উপগ্রহ।

তাহা লঘু হইয়া উপরে উঠে এবং তাহাদের পরিত্যক্ত স্থানে চতুষ্পার্শ্বস্থ অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু আসিতে থাকে; এইরূপে বায়ু বহে। জলের উষ্ণতার বৈষম্যই সমুদ্রের স্রোতের প্রধান কারণ। সমস্ত সমুদ্রের জল যদি সমান গরম হইত তাহা হইলে জলাশয়ের ন্যায় সমুদ্র নিশ্চল থাকিত। সমুদ্রে স্রোত বহিত না। ঔপসাগরিক স্রোত (Gulf stream) দ্বারাই ইংলণ্ড মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়াছে। যদি ঔপসাগরিক স্রোত হইতে ইংলণ্ডের চতুষ্পার্শ্বস্থ সমুদ্র উষ্ণ জল না পাইত তাহা হইলে ইংলণ্ড প্রায় মেরুসন্নিহিত দেশের মত শীতপ্রধান হইত। (১) পৃথিবীর কোটি সন্নিহিত প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের উত্তাপ বেশী, এ জন্য সেখানকার জল হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বাষ্প উঠিতে থাকে; এবং সেই বাষ্পে পরিণত জলরাশির স্থান গ্রহণ করিবার জন্য মেরুর নিকটস্থ শীতল জলের স্রোত বহিতে থাকে। এক কথায় বলিতে এই, জগতে যদি উষ্ণতার বৈষম্য না থাকিত তাহা হইলে জগতের সমস্ত জীবন-রক্ষণ-কার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া যাইত। অথচ উষ্ণতার একটি বিশেষ গুণ এই দেখিতে পাওয়া যায় যে চতুষ্পার্শ্বে সমান ভাবে বিস্তৃত হইবার দিকে ইহার প্রবণতা। কোন স্থানে কোন একটা অত্যন্ত উষ্ণ বস্তু রাখিলে ক্রমে তাহার উষ্ণতা চারিপাশে সমান ভাবে বিস্তৃত হইতে থাকে। একটা গরম ও একটা শীতল বস্তু এক সঙ্গে রাখিলে কিছুক্ষণ পরে উভয়েরই উষ্ণতা সমান হয়, শীতল বস্তু যতটা উষ্ণতা পায়, উষ্ণ বস্তু ততটা হারায়। ইহাকেই বৈজ্ঞানিকেরা আয়-ব্যয়ের নিয়ম (Law of Exchange) বলেন। এবং সকল প্রকার তেজই (Energy) ক্রমে উষ্ণতায় পরিণত হইবার দিকে উন্মুখ। কাজে কাজেই মনে হয় যে, এমন এক সময় আসিবে যখন সকল প্রকার তেজই উষ্ণতায় পরিণত হইয়া জগৎময় সমভাবে বিস্তৃত হইবে। সে অবস্থায় পৃথিবী যে, কেবল চন্দ্রের ন্যায় মৃত হইবে, তাহা নহে, তাহার প্রলয় হইবে।

প্রলয়ে গ্রহের মৃতদেহের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকে না। আমরা জীবন, মৃত্যু কাহাকে বলে দেখিয়াছি; এখন, প্রলয় কাহাকে বলে তাহা সবিস্তারে আলোচিত হইতেছে।

সকলেই জানেন যে দুই শক্তির কার্য্য-ফলে গ্রহ স্বীয় কক্ষ হইতে বিচ্যুত না হইয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। প্রথম, সূর্য্যের

(১) ব্যারণ দে লেসেপ যে পানামার যোজকে খাল কাটিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, এক খানি আমেরিকা-দেশীয় সংবাদ পত্র তাহাতে একটি গূঢ় অভিসন্ধি দেখিয়া বলেন যে, ফ্রান্সের চিরশত্রু ইংলণ্ডের অনিষ্ট সাধনের জন্যই এ প্রস্তাব। পানামার খাল কাটা হইলে ইংলণ্ডের জীবন রক্ষক ঔপসাগরিক উষ্ণ স্রোত এই নূতন পথে প্রবাহিত হইয়া ইংলণ্ডকে বাসের অযোগ্য করিবে। ইহা বোধ করি, কবি রামদাস শর্ম্মার ভারত-উদ্ধারের পাশ্চাত্য সংস্করণ। সং

নিজাভিমুখে আকর্ষণ অথবা কেন্দ্রানুগ শক্তি, (Centripetal force)। দ্বিতীয়, সৌর আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া গ্রহের সরল রেখা পথে পলায়নের চেষ্টা অথবা তাহার কেন্দ্রাতিগ শক্তি (Centrifugal force)। যদি কখনও কোন জ্যোতিষ্কের এমন অবস্থা হয় যে তাহার কেন্দ্রাতিগ শক্তি অতীব অল্প হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সূর্য্যের আকর্ষণের প্রভাব বৃদ্ধিহেতু সেই জ্যোতিষ্ক ক্রমে সূর্য্যের উপর গিয়া পড়ে এবং তাহার প্রচণ্ড উত্তাপে তাহা বাষ্পাকারে পরিণত হয়। (২) এইরূপ সূর্য্যের গ্রাসে পতিত হওয়াকেই গ্রহের প্রলয় বলা যাইতে পারে।

পৃথিবীতে যখন উত্তাপের সীমা হইবে, তখন পৃথিবী গতি শক্তিহীন হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিনষ্ট হইবে। (৩)

ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, একটা জ্যোতিষ্কের জীবন রক্ষণের প্রধান কারণ তাহার গতি; কাজেই পৃথিবীর মৃত্যু চিন্তা করিতে গেলে তাহার গতির বিষয় আলোচনা আবশ্যক। যদি আবহমান কালের মধ্যে পৃথিবীর গতির কোন বৈলক্ষণ্য না দেখা গিয়া থাকে তাহা হইলে পৃথিবীর পরিণামের বিষয় এ সূত্র হইতে কিছুই ঠিক করিতে পারা যায় না। কিন্তু বহুকালব্যাপী জ্যোতিষিক অনুসন্ধান দ্বারা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীর গতির কিছু লাঘব হইয়াছে। যদিও ইহার মাত্রা চুলের মত বই নয়, তথাপি ইহা হইতে পৃথিবীর গতিহ্রাস সপ্রমাণ হইয়াছে।

অতি প্রাচীন কাল অপেক্ষা চন্দ্রের গতি এখন কিছু বৃদ্ধিশীল বলিয়া হঠাৎ মনে হয়। ইংরাজি ভাষায় ইহাকে Secular acceleration of the Moon's mean motion বলে। কিন্তু চন্দ্রের গতি বৃদ্ধি হওয়া অতিশয় অসম্ভব বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক করিয়াছেন। চন্দ্রের গতি আসলে বাড়ে নাই, পৃথিবীর গতি হ্রাস হেতু চন্দ্রের গতি বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা বলেন চন্দ্রের গতিবৃদ্ধির কোন কারণই তাঁহারা দেখেন নাই। গতি বৃদ্ধির অর্থই কার্য্যের বৃদ্ধি, ও শক্তি না হইলে কার্য্য হইতে পারে না—অতএব চন্দ্রের গতি বৃদ্ধির অর্থই এক নূতন শক্তির আবির্ভাব। কিন্তু কোথা হইতে এ নূতন শক্তির আবির্ভাব হইবে? জগতের শক্তি-সমষ্টির কখনও বৃদ্ধি হইতে পারে না; ইহা

(২) জ্যোতির্বেত্তারা বলেন ধূমকেতু ও গ্রহ-খণ্ড মাঝে মাঝে সূর্য্যের উপর এইরূপে পড়িয়া তাহার চিরন্তন প্রচণ্ড উত্তাপ সমান ভাবে রক্ষা করিতেছে।

(৩) এইরূপে অনেক গুলি গ্রহ উপগ্রহ সূর্য্যের সহিত মিশিয়া গেলে সেই মিশ্রিত পদার্থ সমষ্টির কতক অংশ আঘাত জনিত উত্তাপে বাষ্পাকারে পরিণত হয়; ক্রমে আবার তাহা হইতে নূতন গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টি হইতে পারে। অনেক বৈজ্ঞানিকদিগের মত যে বর্ত্তমান গ্রহ উপগ্রহ এইরূপ জ্বলন্ত বাষ্পরাশি হইতে ক্রমে অভিব্যক্ত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে, এই মঙ্গলময় ঈশ্বরের রাজ্যে কিছুই একেবারে বিনষ্ট হয় না, রূপান্তরিত হয় মাত্র।

জগতে চিরকাল সমান আছে ও থাকিবে। শক্তি রূপান্তরিত হয় মাত্র, তাহার ক্ষয় বৃদ্ধি সম্ভবে না—ইহাকেই বৈজ্ঞানিকেরা শক্তি-সংরক্ষণ (Conservation of Energy) কহেন। এরূপ না হইলে প্রাকৃতিক নিয়মাবলী নিত্য সমান ভাবে রক্ষিত হইত না, তাহাতে বৈলক্ষণ্য হইত। প্রাকৃতিক নিয়মের নিত্যতার (Uniformity of Natural Laws) উপরেই সমস্ত বিজ্ঞান শাস্ত্র অবস্থিত। এবং যে হেতু চন্দ্রের গতি-বৃদ্ধির কোন কারণ দেখা যায় না, অতএব ইহা নিশ্চয় যে, চন্দ্রের গতি বৃদ্ধি হয় নাই। তবে গতি-বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় কেন? বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, পৃথিবীর গতি হ্রাস হইয়াছে বলিয়া ঐরূপ মনে হয়। কিন্তু এই রূপ কেবল একটা অনুমান কখন কোন একটা মতের ভিত্তি হইতে পারে না। পৃথিবীর গতি হ্রাস করিতে প্রত্যক্ষ পক্ষে যত্নশীল কোন বিশেষ কারণ দেখিতে না পাইলে আমরা উপরি উক্ত যুক্তিকে নিতান্ত আনুমানিক বলিয়া অবহেলা করিতে পারিতাম; কিন্তু ঐরূপ একটি প্রত্যক্ষ কারণ বৈজ্ঞানিকেরা নির্দ্ধারিত করিতে পারিয়াছেন।

সমুদ্রের জলের এক প্রকার গতি আছে যাহাকে আমরা জোয়ার ভাঁটা বলি। এই জোয়ার ভাঁটা পৃথিবীর গতি অপহরণ করিয়া তাহার প্রাণ বিনাশে যত্নশীল। পৃথিবীর স্থলীয় ও জলীয় অংশের উপর চন্দ্রের আকর্ষণের বৈষম্যই (Differential attraction) এই জোয়ার ভাঁটার প্রধান কারণ।* সূর্য্য এতদূরে অবস্থিত যে তাহার জল ও স্থলের উপর প্রায় সমানই আকর্ষণ,

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তৃতীয় ভাগ চারুপাঠের ১২৭ পৃঃ "জোয়ার ভাঁটা" শীর্ষক প্রস্তাবে বলিয়াছেন, "চন্দ্র অবশ্যই পৃথিবীর স্থল জল উভয় ভাগই আকর্ষণ করে, কিন্তু স্থল ভাগ কঠিন ও দৃঢ়, এ নিমিত্ত বিচলিত হয় না। জল ভাগ অতিশয় তরল এই জন্য চন্দ্রের আকর্ষণে চলিত ও স্ফীত হয়।" ঐ পুস্তকের ১২৯ পৃঃ তিনি আবার বলিয়াছেন "পৃথিবীর কেন্দ্র * * চন্দ্র কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া চন্দ্রের দিকে উত্থিত হয়" এই দুইটির অর্থ পরস্পর-বিরোধী। বোধ হয় কেবল ভাষা সংক্ষেপ করিবার জন্যই ওরূপ অর্থের বৈপরীত্য হইয়াছে। তবে অক্ষয় বাবু যে বলিয়াছেন যে চন্দ্রের আকর্ষণে জল "চলিত" হয়—ইহা ঠিক নহে। এবিষয় মূল প্রবন্ধে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

আসল কথাটা এই, আকর্ষক ও আকৃষ্ট বস্তুর মধ্যে দূরত্ব বাড়িলে আকর্ষণের প্রভাব হ্রাস হয়, এবং তরল বস্তুর কোন এক অংশ অপর অংশ হইতে সহজেই বিচ্ছিন্ন হয় কিন্তু দৃঢ় বস্তুর সে রকম হয় না। এই কারণে কোন তরল বস্তু আকৃষ্ট হইলে, তাহার উপরিভাগেই আকর্ষণের কার্য্য আরম্ভ হইয়া সে তরল বস্তুকে সহজে স্ফীত করে, এবং দৃঢ় বস্তু আকৃষ্ট হইলে তাহার কেন্দ্রে আকর্ষণের কার্য্য আরম্ভ হইয়া তাহার সমুদায় অংশকে এক সময়ে সমানভাবে (as a whole) আকর্ষণ করে। কিন্তু জলের উপরিভাগ হইতে পৃথিবীর কেন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ৩৫০০ মাইল বলিয়া জল অপেক্ষা স্থল ভাগের উপর চন্দ্রের আকর্ষণের প্রভাব কম হয়, সেই জন্য স্থল অপেক্ষা জলভাগ অধিক স্ফীত হইয়া উঠে। সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব এত অধিক যে তাহার তুল-

তাহার বৈষম্য অতি কম; সেই জন্য সূর্য্যের সহিত জোয়ার ভাঁটার গৌণ সম্পর্ক। চন্দ্র জলরাশিকে আকর্ষণ দ্বারা ফাঁপাইয়া তোলে কিন্তু কোথা হইতে সে জলরাশির পার্শ্বগামী গতি হয়? চন্দ্র ত আর তাহাকে অন্য কোন দিকে গতি দিতে পারে না, এবং বাহিরের কোথা হইতেও গতি পাইবারও সম্ভাবনা নাই। তবে এ গতি কোথা হইতে আসে?

চন্দ্র কর্ত্তৃক উন্নমিত এই জলরাশি পৃথিবীর ঘুরিবার সময় তাহার কঠিন স্থল অংশের সহিত ঘর্ষণে সেই স্থলভাগের গতি লইয়া গতি পায়।—এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দেখানো যাউক।

একটি গোলা চালাইয়া একটি স্থির গোলাকে আঘাত করিলে যেমন সেই গমনশীল গোলার শক্তি পাইয়া স্থির গোলাটি চলিতে থাকে তেমনি পৃথিবীর ঘূর্ণমান কঠিন অংশের আঘাতে গতি পাইয়া জলরাশি চলিতে থাকে। পৃথিবী যে জলকে এইরূপ গতি দেয়, পৃথিবী এ শক্তি কোথা হইতে পায়? সে ত আর অন্য কোন স্থান হইতে নূতন শক্তি পাইয়া জলকে চালাইতে পারে না, নিজের গতিশক্তিরই অংশ দিয়া জলকে চালায়। ইহাতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে,এইরূপে পৃথিবীর গতি শক্তির কিছু লাঘব হয়। পূর্ব্বের দৃষ্টান্তে উল্লিখিত গোলার মধ্যে যদি দুইটিরই সমান ভার ও আয়তন হয়, তাহা হইলে স্থির গোলাকে চালাইতে গিয়া গমনশীল গোলা শীঘ্রই থামিয়া যায় এবং তাহার গতি পাইয়া স্থির গোলা চলিতে থাকে। যদি পৃথিবীর স্থলীয় অংশ ও তাহার সহিত যে জল রাশির ঘর্ষণ হয়, এ দুয়ের ভার সমান হইত তাহা হইলে পৃথিবীর গতিও থামিয়া যাইবার সম্ভাবনা হইত। সমান নহে বলিয়াই তাহার গতির কেবল অল্প মাত্র বেগহ্রাস হয়। এবিষয়ে আর একটা দৃষ্টান্ত দেখা যাউক। যদি একটি দ্রুতগামী চাকার উপর এক খণ্ড প্রস্তর কোন প্রকারে রাখা যায় তাহা হইলে চাকার গতি পাইয়া সেই প্রস্তর খণ্ড দূরে চলিয়া যায়, কিন্তু এই কার্য্যে যতটুকু শক্তি ব্যয়িত হয়, তাহা চাকার গতির হিসাবে খরচ পড়ে। উহাতে দ্রুতগামী চাকার কিছু বেগ কমিয়া যায়। সেই রূপ দেখা যায়, পৃথিবীর গতিশক্তি পূর্ব্বোক্ত কারণে কিছু কমিয়া গিয়াছে। এখন, পৃথিবীর নিজের চারিদিকে ঘুরিতে পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিক সময় লাগে কাজে কাজেই দিবসের দৈর্ঘ্য এখন কিছু বাড়িয়াছে। এই জন্যই চন্দ্রের গতির বৃদ্ধি হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প সংখ্যক দিবসে চন্দ্র ঘুরিতেছে মনে হয়।

ন্যায় ৩৫০০ মাইল কিছুই নহে, কাজেই জল স্থলের উপর সূর্য্যের আকর্ষণের বৈষম্য অতি অল্প। সেই জন্য বাস্তবিক পক্ষে পৃথিবীর উপর সূর্য্যের আকর্ষণ শক্তি চন্দ্রের অপেক্ষা অধিক হইলেও তাহাতে চন্দ্রের আকর্ষণের মত জলকে স্ফীত করিতে পারে না। চন্দ্র অপেক্ষাকৃত পৃথিবীর অনেক নিকটে অবস্থিত বলিয়া ৩৫০০ মাইলেই তাহার আকর্ষণের অনেক তারতম্য হয়।

ইহা ব্যতীত পৃথিবীর গতি-লাঘব হইবার আর একটী কারণ দেখিতে পাওয়া যায়।

নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা স্থির হইয়াছে যে আকাশের এমন কোন স্থানই নাই যেখানে ঈথর (Ether) না আছে। যদিও ঈথর এত সূক্ষ্ম যে উহা মাধ্যাকর্ষণের অধিকার বহির্ভূত বলিয়া কল্পিত হয়, তথাপি বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে ঈথরের সহিত ঘর্ষণেও শক্তির হানি হয়; এইরূপ বলিবার কারণ এই যে, এন্‌কি দ্বারা আবিষ্কৃত একটি ধূমকেতুর কক্ষ ক্রমশই ছোট হইয়া আসিতেছে অর্থাৎ ক্রমশই ঐ ধূমকেতুর কেন্দ্রাতিগ গতি কমিয়া যাইতেছে। ইহার অন্য কোনই কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না; কাজেকাজেই বৈজ্ঞানিকেরা ঐরূপ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। যদি একটী জ্যোতিষ্ক ঈথর ঘর্ষণে শ্লথগতি হইতে পারে তবে অন্যান্য জ্যোতিষ্কই বা কেন সেরূপ না হইবে? এই কারণ হইতে যদিও অতি অল্পই ফল হইবার সম্ভাবনা তথাপি ইহাও পৃথিবীর মৃত্যুর অন্য কারণের সহায়তা করিতে পারে।

এইত দেখিতে পাওয়া গেল পৃথিবীর গতি কমিবার দিকে উন্মুখ। এই কার্য্য অপ্রতিহত ভাবে চলিলে কালে যে পৃথিবী সূর্য্যে মিশাইয়া যাইবে—ইহাই সম্ভাব্য। বলিবার আবশ্যক নাই এই ঘটনার অনেক পূর্ব্বেই পৃথিবীতে আর জীবের বসতি থাকিবে না, পৃথিবী চন্দ্রের মত হইয়া পড়িবে।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদিগের মতানুসারে পৃথিবীর বিনাশ এক প্রকার নিশ্চিত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে নূতন সত্যের আবিষ্ক্রিয়া সহকারে এত অধিক বৈজ্ঞানিক মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে সে বিষয়ে উদাহরণ সংগ্রহের প্রয়োজন নাই। এখন উপরে সন্নিবেশিত মতগুলি যে কালে পরিবর্ত্তিত কিম্বা পরিত্যক্ত হইবে না—ইহাই বা কে নিশ্চয় বলিতে পারে? চন্দ্র যে প্রকার মন্দগতি হইয়াছে তাহাতে বৈজ্ঞানিকদিগের উপরি উক্ত মতানুসারে পৃথিবীর আগেই তাহার অস্তিত্ব লোপ হইবার সম্ভাবনা। এবং চন্দ্র না থাকিলে জোয়ার ভাঁটার প্রভাব অনেক কমিয়া যাইবে, সুতরাং এ কারণ হইতে পৃথিবীর জীবন হ্রাসের সম্ভাবনাও অনেক কমিয়া যাইবে। কিন্তু পৃথিবীর সহিত চন্দ্রের যে প্রকার সম্পর্ক তাহাতে চন্দ্র না থাকিলে পৃথিবীর যে আবার কত প্রকার অনিষ্ট হইবে তাহা এখানে বলা বাহুল্য।

বাঙ্গালি কবি নয়।

একটা কথা উঠিয়াছে, মানুষ মাত্রেই কবি। যাহার মনে ভাব আছে, যে দুঃখে কাঁদে, সুখে হাসে, সেই কবি। কথাটা খুব নূতনতর। সচরাচর লোকে কবি বলিতে এমন বুঝে না। সচরাচর লোকে যাহা বলে তাহার বিপরীত একটা কথা শুনিলে অনেক সময় আমাদের ভারি ভাল লাগিয়া যায়। যাহার মনোবৃত্তি আছে সেই কবি, এ কথাটা এখনকার যুবকদের মধ্যে অনেকেরই মুখে শুনা যায়। কবি শব্দের ঐরূপ অতি-বিস্তৃত অর্থ এখন একটা ফ্যাষাণ হইয়াছে বলিলে অধিক বলা হয় না। এমন কি নীরব-কবি বলিয়া একটি কথা বাহির হইয়া গিয়াছে, ও সে কথা দিনে দিনে খুব চলিত হইয়া আসিতেছে। এত দূর পর্য্যন্ত চলিত হইয়াছে যে, আজ যদি আমি এমন একটা পুরাতন কথা বলি যে, নীরব কবি বলিয়া একটা কোন পদার্থই নাই, তাহা হইলে আমার কথাটাই লোকের নূতন বলিয়া ঠেকে। আমি বলি কি, যে নীরব সেই কবি নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমার যা' মত অধিকাংশ লোকেরই আন্তরিক তাহাই মত। লোকে বলিবে "ও কথা ত সকলেই বলে, উহার উল্‌টাটা যদি কোন প্রকারে প্রমাণ করাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে বড় ভাল লাগে।" ভাল ত লাগে, কিন্তু বিষয়টা এমনতর যে, তাহাতে একটা বই দুইটা কথা উঠিতে পারে না। কবি কথাটা এমন একটা সমস্যা নয় যে তাহাতে বুদ্ধির মারপ্যাঁচ খেলানো যায়; "বীজ হইতে বৃক্ষ কি বৃক্ষ হইতে বীজ?" এমন একটা তর্কের খেলেনা নয়। ভাব প্রকাশের সুবিধা করিবার জন্য লোক সাধারণে একটি বিশেষ পদার্থের একটি বিশেষ নামকরণ করিয়াছে, সেই নামে তাহাকে সকলে ডাকিয়া থাকে ও অনেক দিন হইতে ডাকিয়া আসিতেছে, তাহা লইয়া আর তর্ক কি হইতে পারে? ভাব প্রকাশের সুবিধার জন্য লোকে পদতল হইতে আরম্ভ করিয়া কটি দেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত অঙ্গকে পা বলিয়া থাকে, তুমি যদি আজ বল যে, পদতল হইতে আরম্ভ করিয়া স্কন্ধদেশ পর্য্যন্তকে পা বলা যায় তাহা হইলে কথাটা কেমন শোনায় বল দেখি? পুণ্ডরীকাক্ষ নিয়োগী তাহার এক ছেলের নাম ধর্ম্মদাস, আর এক ছেলের নাম জন্মেজয়, ও তৃতীয় ছেলের নাম শ্যামসুন্দর রাখিয়াছে, তুমি যদি তর্ক করিতে চাও যে, পুণ্ডরীকাক্ষের তিন ছেলেরই নাম জন্মেজয় নিয়োগী, তাহা হইলে লোকে বলে যে, বৃদ্ধ পুণ্ডরীকাক্ষ তাহার তিন ছেলের যদি তিন স্বতন্ত্র নাম রাখিয়া থাকে,

তুমি বাপু কে যে, তাহাদের তিন জনকেই জন্মেজয় বলিতে চাও? লোকে কাহাকে কবি বলে? যে ব্যক্তি, বিশেষ শ্রেণীর ভাব সমূহ, (যাহাকে আমরা কবিতা বলি) ভাষায় প্রকাশ করে।* নীরব ও কবি দুইটি অন্যোন্য-বিরোধী কথা, তথাপি যদি তুমি বিশেষণ নীরবের সহিত বিশেষ্য কবির বিবাহ দিতে চাও, তবে এমন একটি পরস্পর-ধ্বংশী দম্পতির সৃষ্টি হয়, যে, শুভ দৃষ্টির সময় পরস্পর চোখাচোখি হইবা-মাত্রেই উভয়ে প্রাণ ত্যাগ করে। উভয়েই উভয়ের পক্ষে ভস্মলোচন। এমনতর চোখাচোখিকে কি অশুভ দৃষ্টি বলাই সঙ্গত নয়, অতএব এমনতর বিবাহ কি না দিলেই নয়? এমন হয় বটে, যে, তুমি যাহাকে কবি বল, আমি তাহাকে কবি বলি না; এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া তুমি বলিতে পার বটে যে, "যখন বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন লোকে কবি বলিয়া থাকে তখন কি করিয়া বলা যাইতে পারে যে, কবি বলিতে সকলেই এক অর্থ বুঝে?" আমি বলি কি, একই অর্থ বুঝে। যখন গদ্য-পুণ্ডরীকের গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রাম বাবুকে তুমি কবি বলিতেছ, আমি কবি বলিতেছি না, ও কবিতা-চন্দ্রিকার গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত শ্যাম বাবুকে আমি কবি বলিতেছি তুমি বলিতেছ না, তখন তোমাতে আমাতে এই তর্ক যে, "রাম বাবু কি এমন কবি যে তাঁহাকে কবি বলা যাইতে পারে?" বা "শ্যাম বাবু কি এমন কবি যে তাঁহাকে কবি বলা যাইতে পারে?" রাম বাবু ও শ্যাম বাবু এক স্কুলে পড়েন, তবে তাঁহাদের মধ্যে কে ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়েন, কে লাষ্ট ক্লাশে পড়েন তাহাই লইয়া কথা। রাম বাবু ও শ্যাম বাবু যে এক স্কুলে পড়েন, সে স্কুলটি কি? না প্রকাশ করা। তাঁহাদের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়? না প্রকাশ করা লইয়া। বৈসাদৃশ্য কোথায়? কিরূপে প্রকাশ করা হয়, তাহা লইয়া! তবে, ভাল কবিতাকেই আমরা কবিতা বলি, কবিতা খারাপ হইলে তাহাকে আমরা মন্দ কবিতা বলি, সুকবিতা হইতে আরো দূরে গেলে তাহাকে আমরা কবিতা না বলিয়া শ্লোক বলিতে পারি, ছড়া বলিতে পারি, যাহা ইচ্ছা, যথা,

হরপ্রতি প্রিয় ভাষে কন হৈমবতী
বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি।
ইত্যাদি।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীবকে আমরা মানুষ বলি, তাহার কাছাকাছি যে আসে তাহাকে বনমানুষ বলি, মানুষ হইতে আরো তফাতে গেলে তাহাকে মানুষও বলি না, বনমানুষও বলি না, তাহাকে বানর বলি। এমন তর্ক কখনো শুনিয়াছ যে Wordsworth শ্রেষ্ঠ কবি না ভজহরি (যে ব্যক্তি লেখনীর আকার কিরূপ জানে না) শ্রেষ্ঠ কবি? অতএব এটা দেখিতেছ, কবিতা প্রকাশ না করিলে

* এ প্রবন্ধটির মধ্যে আড়ম্বর করিয়া কবিতা কথাটির একটি দুরূহ সংজ্ঞা নির্ণয় করিতে বসা সাজে না বলিয়া আমরা নিরস্ত হইলাম।

কাহাকেও কবি বলা যায় না। বিশ্বব্যাপী ঈথর-সমুদ্রে যথোপযুক্ত তরঙ্গ উঠিলে তবে আমাদের চক্ষে আলোক প্রকাশ পায়। তবে কেন অন্ধকারে বসিয়া আমরা বলি না যে, আমরা আলোকের মধ্যে বসিয়া আছি? সর্ব্বত্রই ত ঈথর আছে ও ঈথরের মধ্যে ত আলোক প্রকাশের গুণ আছে, এমন কি হয়ত আমাদের অপেক্ষা উন্নততর চক্ষুষ্মান জীব সেই অন্ধকারে আলোক দেখিতেছে। কেন বলিনা শুনিবে? অতি সহজ উত্তর। বলি না বলিয়া। অর্থাৎ লোকে ভাব প্রকাশের সুবিধার জন্য বস্তু-প্রকাশক শক্তি বিশেষের নাম আলোক রাখিয়াছে। চক্ষে প্রকাশিত না হইলে তাহাকে আলোক বলিবে না, তা' তুমি যাহাই বল আর যাহাই কর। ইহার উপর আর তর্ক আছে? তোমার মতে ত বিশ্ব শুদ্ধ লোককে চিত্রকর বলা যাইতে পারে। এমন ব্যক্তি নাই, যাহার মনে অসংখ্য চিত্র অঙ্কিত না রহিয়াছে, তবে কেন মনুষ্যজাতির আর এক নাম রাখ না চিত্রকর? আমার কথাটি অতি সহজ কথা। আমি বলি যে, যে ভাব-বিশেষ ভাষায় প্রকাশ হয় নাই তাহা কবিতা নহে, ও যে ব্যক্তি ভাব বিশেষ ভাষায় প্রকাশ করে না, সেও কবি নহে। যাঁহারা নীরব কবি কথার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা বিশ্ব চরাচরকে কবিতা বলেন। এ সকল কথা কবিতাতেই শোভা পায়। কিন্তু অলঙ্কার-শূন্য গদ্যে অথবা তর্ক স্থলে বলিলে কি ভাল শোনায়? একটা নামকে এরূপ নানা অর্থে ব্যবহার করিলে দোষ হয় এই যে, তাহার দুইটা ডানা বাহির হয়, এক স্থানে ধরিয়া রাখা যায় না ও ক্রমে ক্রমে হাত-ছাড়া এবং সকল কাজের বাহির হইয়া বুনো হইয়া দাঁড়ায়, "আয়" বলিয়া ডাকিলেই আর খাঁচার মধ্যে আসিয়া বসে না। আমার কথাটা এই যে, আমার মনে আমার প্রেয়সীর ছবি আঁকা আছে বলিয়াই আমি কিছু চিত্রকর নই, ও ক্ষমতা থাকিলে আমার প্রেয়সীকে আঁকা যাইতে পারিত বলিয়া আমার প্রেয়সী একটি চিত্র নহেন।

অনেকে বলেন, সমস্ত মনুষ্য জাতি সাধারণতঃ কবি, ও বালকেরা, অশিক্ষিত লোকেরা বিশেষরূপে কবি। এ মতের পূর্ব্বোক্ত মতটির ন্যায় তেমন বহুল প্রচার হয় নাই। তথাপি তর্ক কালে অনেকেরই মুখে একথা শুনা যায়। বালকেরা যে কবি নয়, তাহার প্রমাণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। তাহারা কবিতাময় ভাষায় ভাব প্রকাশ করে না। অনেকে কবিত্ব অনুভব করেন, কবিত্ব উপভোগ করেন, যদি বা বল-পূর্ব্বক তুমি তাঁহাদিগকেও কবি বল, তথাপি বালকদিগকে কবি বলা যায় না। বালকেরা কবিত্ব অনুভব করে না, কবিত্ব উপভোগ করে না, অর্থাৎ বয়স্ক লোকদের মত করে না। অনুভব ত সকলেই করিয়া থাকে; পশুরাও ত সুখ দুঃখ অনুভব করে। কিন্তু কবিত্ব অনুভব কয়জন লোকে করে? যথার্থ সুন্দর ও যথার্থ কুৎসিত কয়জন ব্যক্তি পরখ করিয়া, তফাৎ করিয়া দেখে ও বুঝে? অধিকাংশ লোক সুন্দর চিনিতে ও উপভোগ

করিতেই জানে না। সুন্দর বস্তু কেন সুন্দর তাহা বুঝিতে পারা, অন্য সমস্ত সুন্দর বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া তাহাকে তাহার যথাযোগ্য আসন দেওয়া, একটা সুন্দর বস্তু হইতে দশটা সুন্দর বস্তুর কথা মনে পড়া, অবস্থা বিভেদে একটি সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য্য বিভেদ কল্পনা করিতে পারা কি সকলের সাধ্য? সকল চক্ষুই কি শরীরী পদার্থের মধ্যে অশরীরী কি-একটি দেখিতে পায়? অল্পই হউক আর অধিক হউক কল্পনাত সকলেরই আছে। উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির অপেক্ষা কল্পনা কাহার আছে? কল্পনা প্রবল হইলেই কবি হয় না। সুমার্জ্জিত, সুশিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর কল্পনা থাকা আবশ্যক। কল্পনাকে যথাপথে নিয়োগ করিবার নিমিত্ত বুদ্ধি ও রুচি থাকা আবশ্যক করে। পূর্ণ চন্দ্র যে হাসে, বা জ্যোৎস্না যে ঘুমায়, এ কয়জন বালকের কল্পনায় উদিত হয়? এক জন বালক যদি অসাধারণ কাল্পনিক হয়, তবে পূর্ণ চন্দ্রকে একটি আস্ত লুচি বা অর্দ্ধচন্দ্রকে একটি ক্ষীর পুলি মনে করিতে পারে। তাহাদের কল্পনা সংলগ্ন নহে, কাহার সহিত কাহার যোগ হইতে পারে, কোন্ কোন্ দ্রব্যকে পাশাপাশি বসাইলে পরস্পর পরস্পরের আলোকে অধিকতর পরিস্ফুট হইতে পারে, কোন দ্রব্যকে কি ভাবে দেখিলে তাহার মর্ম্ম, তাহার সৌন্দর্য্য চক্ষে বিকাশ পায়, এ সকল জানা অনেক শিক্ষার কাজ। একটি দ্রব্য অনেক ভাবে দেখা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা এক ভাবে জগৎ দেখেন, দার্শনিকেরা এক ভাবে দেখেন ও কবিরা আর এক ভাবে দেখেন। তিন জনে তিন প্রকার পদ্ধতিতে একই বস্তু দেখিতে পায়েন। তুমি কি বল, উহার মধ্যে দুই প্রকার পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে শিক্ষার আবশ্যক করে, আর তৃতীয়টিতে করে না? শুদ্ধ করে না তাহাই নয়, শিক্ষাতেই তাহার বিনাশ! কোন্ দ্রব্য কোন্ শ্রেণীর, কিসের সহিত তাহার ঐক্য ও কিসের সহিত তাহার অনৈক্য, তাহা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে নির্ণয় করা দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও কবি তিন জনেরই কাজ। তবে, একটা দ্রব্যের তিনটি দিক আছে, তিন জন তিন বিভিন্ন দিকের ভার লইয়াছেন। তিন জনের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ, আর কিছু প্রভেদ আছে কি? অনেক ভাল ভাল কবি যে ভাবের পার্শ্বে যে ভাব বসানো উচিত, স্থানে স্থানে তাহার ব্যতিক্রম করিয়া শিক্ষার অসম্পূর্ণতা প্রকাশ করিয়াছেন। Marlowর Come live with me and be my love" নামক সুবিখ্যাত কবিতাতে ইহা লক্ষিত হয়।

"হ'বি কি আমার প্রিয়া, র'বি মোর সাথে?
অরণ্য, প্রান্তর, নদী, পর্ব্বত, গুহাতে
যত কিছু, প্রিয়তমে, সুখ পাওয়া যায়,
দুজনে মিলিয়া তাহা ভোগ করি আয়!

শুনিব শিখরে বসি পাখী গায় গান,
তটিনী শবদ সাথে মিশাইয়া তান;
দেখিব চাহিয়া সেই তটিনীর তীরে
রাখাল গরুর পাল চরাইয়া ফিরে।

রচি দিব গোলাপের শয্যা মনোমত ;
সুরভি ফুলের তোড়া দিব কত শত ;
গড়িব ফুলের টুপি পরিবি মাথায়,
আঙিয়া রচিয়া দিব গাছের পাতায়।

লয়ে মেষ শিশুদের কোমল পশম
বসন বুনিয়া দিব অতি অনুপম ;
সুন্দর পাদুকা এক করিয়া রচিত,
খাঁটি সোনা দিয়ে তাহা করিব খচিত।

কটি-বন্ধ গড়ি দিব গাঁথি তৃণ-জাল,
মাঝেতে বসায়ে দিব একটি প্রবাল।
এই সব সুখ যদি তোর মনে ধরে
হ' আমার প্রিয়তমা, আয় মোর ঘরে।

হস্তি-দন্তে গড়া এক আসনের পরে,
আহার আনিয়া দিবে দু জনের তরে,
দেবতার উপভোগ্য, মহার্ঘ্য এমন,
রজতের পাত্রে দোঁহে করিব ভোজন।

রাখাল-বালক যত মিলি একত্তরে
নাচিবে গাইবে তোর আমোদের তরে।
এই সব সুখ যদি মনে ধরে তব,
হ' আমার প্রিয়তমা, এক সাথে রব'।

এ কবিতাতে একটি বিশেষ ভাবকে সমগ্র রাখা হয় নাই। মাঝ খানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। যে বিশাল কল্পনায় একটি ভাব সমগ্র প্রতিবিম্বিত হয়, যাহাতে জোড়া-তাড়া দিতে হয় না, সে কল্পনা ইহাতে প্রকাশিত হয় নাই। কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত একটা ভাব সম্পূর্ণ রহিয়াছে, তাহার পরে আর একটি ভাব গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দুই ভাবের মধ্যে এমন অসামঞ্জস্য যে, উভয়ে পাশাপাশি ঘেঁসাঘেঁসি থাকিয়াও উভয়ের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে, উভয়েই ভাবিতেছে, "এ এখানে কেন? পরস্পরের মধ্যে গলাগলি ভাব নাই। অরণ্য, পর্ব্বত, প্রান্তরে যত কিছু সুখ পাওয়া যায়, তাহাই যে রাখালের আয়ত্তাধীন, যে ব্যক্তি গোলাপের শয্যা ফুলের টুপি ও পাতার আঙিয়া নির্ম্মাণ করিয়া দিবার লোভ দেখাইতেছে সে স্বর্ণ খচিত পাদুকা, রজতের পাত্র, হস্তি-দন্তের আসন পাইবে কোথায়? তৃণ-নির্ম্মিত কটিবন্ধের মধ্যে কি প্রবাল শোভা পায়? আমাদের পাঠকদের মধ্যে যে কেহ কখনো কবিতা লিখিয়াছেন, সকলেই বলিয়া উঠিবেন, আমি হইলে এরূপ লিখিতাম না। সে কথা আমি বিশ্বাস করি। তাহার অর্থ আর কিছুই নহে, তাঁহারা শিক্ষা পাইয়াছেন। কবিতা রচনায় তাঁহারা হয়ত অমন একটা জাজ্জ্বল্যমান দোষ করেন না, কিন্তু ঐ শ্রেণীর দোষ সচরাচর করিয়া থাকেন। যাঁহারা বাস্তবিক কবি, অন্তরে অন্তরে কবি, তাঁহারা এরূপ দোষ করেন না; কিসের সহিত কিসের ঐক্য অনৈক্য আছে তাহা তাঁহারা অতি সূক্ষ্ম রূপে দেখিতে পান। কবিকঙ্কনের কমলে-কামিনীতে একটি রূপসী ষোড়শী হস্তি গ্রাস ও উদ্গার করিতেছে, ইহাতে এমন পরিমাণ-সামঞ্জস্যের অভাব হইয়াছে, যে, আমাদের সৌন্দর্য্য-জ্ঞানে অত্যন্ত আঘাত দেয়।* শিক্ষিত, সংযত,

* অনেকে তর্ক করেন যে, গণেশকে

মার্জ্জিত কল্পনায় একটি রূপসী যুবতীর সহিত গজাহার ও উদ্গীরণ কোন মতেই একত্রে উদয় হইতে পারে না। ইহাতে কেহ না মনে করেন, আমি কবিকঙ্কনকে কবি বলি না। যে বিষয়ে তাঁহার শিক্ষার অভাব ছিল, সেই বিষয়ে তাঁহার পদস্খলন হইয়াছে; এই মাত্র। পরিমাণ-সামঞ্জস্য, যাহা সৌন্দর্য্যের সার, সে বিষয়ে তাঁহার শিক্ষার অসম্পূর্ণতা দেখিতেছি।

কল্পনারো শিক্ষা আবশ্যক করে। যাহাদের কল্পনা শিক্ষিত নহে, তাহারা অতিশয় অসম্ভব, অলৌকিক কল্পনা করিতে ভাল বাসে; বক্র দর্পণে মুখ দেখিলে নাসিকা পরিমাণাধিক বৃহৎ এবং কপাল ও চিবুক নিতান্ত হ্রস্ব দেখায়। তাহাদের কুগঠিত কল্পনা-দর্পণে স্বাভাবিক দ্রব্য যাহা কিছু পড়ে তাহার পরিমাণ ঠিক থাকে না; তাহার নাসা বৃহৎ ও তাহার কপাল খর্ব্ব হইয়া পড়ে। তাহারা অসঙ্গত পদার্থের জোড়াতাড়া দিয়া এক একটা বিকৃতাকার পদার্থ গড়িয়া তোলে। তাহারা শরীরী পদার্থের মধ্যে অশরীরী ভাব দেখিতে পায় না। তথাপি যদি বল' বালকেরা কবি, অর্থাৎ বালকদের হৃদয়ে বয়স্কদের অপেক্ষা কবিতা আছে, তবে নিতান্ত বালকের মত কথা বলা হয়। প্রাচীন কালে অনেক ভাল কবিতা রচিত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়, এই মতের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে যে, অশিক্ষিত ব্যক্তিরা বিশেষ রূপে কবি। তুমি বল দেখি, ওটাহিটি দ্বীপবাসী বা এস্কুইমোদের ভাষায় কয়টা পাঠ্য কবিতা আছে? এমন কোন্ জাতির মধ্যে ভাল কবিতা আছে, যে জাতি সভ্য হয় নাই? যখন রামায়ণ মহাভারত রচিত হইয়াছিল, তখন প্রাচীনকাল বটে, কিন্তু অশিক্ষিত কাল কি? রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিয়া কাহারো মনে কি সে সন্দেহ উপস্থিত

দুর্গা এক একবার করিয়া চুম্বন করিতেছিলেন, তাহাই দূর হইতে দেখিয়া ধনপতি গজাহার ও উদ্গীরণ কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। কারণ কবিকঙ্কন চণ্ডীতেই আছে, যে, চৌষট্টি যোগিনী পদ্মের দলরূপ ধারণ করিল, ও জয়া হস্তিনী রূপে রূপান্তরিত হইল। অতএব গণেশের সহিত ইহার কোন সম্পর্কই নাই। কেহ বা তর্ক করেন যে, যখন কবির উদ্দেশ্য বিস্ময় ভাবের উদ্দীপন করা, তখন, বর্ণনা যাহাতে অদ্ভুত হয়, তাহারই প্রতি কবির লক্ষ্য। কিন্তু এ কথার কোন অর্থ নাই। সুকল্পনার সহিত বিস্ময় রসের কোন মনান্তর নাই।

যখন অগাধ সমুদ্রের মধ্যে মরাল শোভিত কুমুদ কহ্লার পদ্ম বনের মধ্যে এক রূপসী ষোড়শী প্রতিষ্ঠিত করিলেন; সমস্তই সুন্দর; নীল জল, সুকুমার পদ্ম, পুষ্পের সুগন্ধ, ভ্রমরের গুঞ্জন, ইত্যাদি ইত্যাদি তখন মধ্য হইতে এক গজাহার আনিয়া আমাদের কল্পনায় অমন একটা নিদারুণ আঘাত দিবার তাৎপর্য্য কি? সুন্দর পদার্থ যেমন কবিত্ব-পূর্ণ বিস্ময় উৎপন্ন করিতে পারে, এমন কি আর কিছুতে পারে? অপার সমুদ্রের মধ্যে পদ্মাসীনা ষোড়শী রমণীই কি যথেষ্ট বিস্ময়ের কারণ নহে? তাঁহার মস্তকের চারিদিকে ইন্দ্রধনুর মণ্ডল স্থাপন কর, তাঁহার করে তারকার বলয়, গলে তারকার হার বসাইয়া দেও দেখিয়া কে না আশ্চর্য্য হইবে?

হইতে পারে? উনবিংশ শতাব্দীতে যে মহা মহা কবিরা ইংলণ্ডে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কবিতায় কি উন বিংশ শতাব্দীর প্রভাব লক্ষিত হয় না? Copleston কহেন "Never has there been a city of which its people might be more justly proud, whether they looked to its past or to its future than Athens in the days of Æschylus."

অনেকে যে কল্পনা করেন যে, অশিক্ষিত অবস্থায় কবিত্বের বিশেষ স্ফূর্ত্তি হয়, তাহার একটি কারণ এই বোধ হয় যে, তাঁহারা মনে করেন যে, একটি বস্তুর যথার্থ স্বরূপ না জানিলে তাহাতে কল্পনার বিচরণের সহস্র পথ থাকে। সত্য একটি মাত্র, মিথ্যা অগণ্য। অতএব মিথ্যায় কল্পনার যে রূপ উদর পূর্ত্তি হয়, সত্যে সেরূপ হয় না। পৃথিবীতে অখাদ্য যত আছে, তাহা অপেক্ষা খাদ্য বস্তু অত্যন্ত পরিমিত। একটি খাদ্য যদি থাকে ত সহস্র অখাদ্য আছে। অতএব এমন মত কি কোন পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছ যে, অখাদ্য বস্তু আহার না করিলে মনুষ্য বংশ ধ্বংশ হইবার কথা?

প্রকৃত কথা এই যে, সত্যে যত কবিতা আছে, মিথ্যায় তেমন নাই। শত সহস্র মিথ্যার দ্বারে দ্বারে কল্পনা বিচরণ করিতে পারে, কিন্তু এক মুষ্টি কবিতা সঞ্চয় করিতে পারে কিনা সন্দেহ, কিন্তু একটি সত্যের কাছে যাও, তাহার দশগুণ অধিক কবিতা পাও কি না দেখ দেখি? কেনই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে বল? আমরা ত প্রকৃতির কাছেই কবিতা শিক্ষা করিয়াছি, প্রকৃতি কখনো মিথ্যা কহেন না। আমরা কি কখনো কল্পনা করিতে পারি যে, লোহিত বর্ণ ঘাসে আমাদের চক্ষু জুড়াইয়া যাইতেছে? বল দেখি, পৃথিবী নিশ্চল রহিয়াছে ও আকাশে অগণ্য তারকারাজি নিশ্চল ভাবে খচিত রহিয়াছে, ইহাতে অধিক কবিত্ব, কি সমস্ত তারকা নিজের পরিবার লইয়া ভ্রমণ করিতেছে তাহাতে অধিক কবিত্ব; এমনি তাহাদের তালে তালে পদক্ষেপ যে, এক জন জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়া দিতে পারেন, কাল যে গ্রহ অমুক স্থানে ছিল আজ সে কোথায় আসিবে? প্রথম কথা এই যে, আমাদের কল্পনা প্রকৃতি অপেক্ষা কবিত্ব পূর্ণ বস্তু সৃজন করিতে অসমর্থ, দ্বিতীয় কথা এই যে, আমরা যে অবস্থার মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি তাহার বহির্ভূত সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারি না।

অনেক মিথ্যা, কবিতায় আমাদের মিষ্ট লাগে। তাহার কারণ এই যে, যখন সেগুলি প্রথম লিখিত হয় তখন তাহা সত্য মনে করিয়া লিখিত হয়, ও সেই অবধি বরাবর সত্য বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। আজ তাহা আমি মিথ্যা বলিয়া জানিয়াছি, অর্থাৎ জ্ঞান হইতে তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি; কিন্তু হৃদয়ে সে এমনি শিকড় বসাইয়াছে যে, সেখানে হইতে তাহাকে উৎপাটন করিবার যো নাই। আমি কবি, যে, ভূত বিশ্বাস না করিয়াও ভূতের বর্ণনা করি, তাহার তাৎপর্য্য কি? তাহার অর্থ এই যে,

ভূত বস্তুতঃ সত্য না হইলেও আমাদের হৃদয়ে সে সত্য। ভূত আছে বলিয়া কল্পনা করিলে যে, আমাদের মনের কোন্ খানে আঘাত লাগে, কত কথা জাগিয়া উঠে, অন্ধকার, বিজনতা, শ্মশান, এক অলৌকিক-পদার্থের নিঃশব্দ অনুসরণ, ছেলেবেলাকার কত কথা মনে উঠে এ সকল সত্য যদি কবি না দেখেন ত কে দেখিবে?'

সত্য এক হইলেও যে, দশ জন কবি সেই এক সত্যের মধ্যে দশ প্রকার বিভিন্ন কবিতা দেখিতে পাইবেন না তাহা ত নহে। এক সূর্য্য কিরণে পৃথিবীতে কত বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করিয়াছে দেখ দেখি! নদী যে বহিতেছে, এই সত্য টুকুই কবিতা নহে। কিন্তু এই বহমানা নদী দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে যে ভাব বিশেষের জন্ম হয় সেই সত্যই যথার্থ কবিতা। এখন বল দেখি, এক নদী দেখিয়া সময় ভেদে কত বিভিন্ন ভাবের উদ্রেক হয়। কখনো নদীর কণ্ঠ হইতে বিষণ্ন গীতি শুনিতে পাই, কখনো বা তাহার উল্লাসের কলস্বর, তাহার শত তরঙ্গের নৃত্য আমাদের মনকে মাতাইয়া তোলে। জ্যোৎস্না কখনো সত্য সত্যই ঘুমায় না, অর্থাৎ সে, দুটি চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া থাকে না, ও জ্যোৎস্নার নাসিকা-ধ্বনিও কেহ কখনো শুনে নাই। কিন্তু নিস্তব্ধ রাত্রে জ্যোৎস্না দেখিলে মনে হয় যে জ্যোৎস্না ঘুমাইতেছে ইহা সত্য। জ্যোৎস্নার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তন্ন তন্ন রূপে আবিষ্কৃত হউক; এমনো প্রমাণ হউক্ যে জ্যোৎস্না একটা পদার্থই নহে, তথাপি লোকে বলিবে জ্যোৎস্না ঘুমাইতেছে। তাহাকে কোন বৈজ্ঞানিক-চূড়ামণি মিথ্যা কথা বলিতে সাহস করিবে বল দেখি?

কেহ কেহ যদি এমন করিয়া প্রমাণ করিতে বসেন, যে, সমুদয় মনুষ্যই কবি, বাঙ্গালী মনুষ্য, অতএব বাঙ্গালী কবি; অশিক্ষিত লোকেরা বিশেষ রূপে কবি, বাঙ্গালী অশিক্ষিত, অতএব বাঙ্গালী বিশেষ রূপে কবি, তবে তাঁহাদের যুক্তি গুলি নিতান্ত অপ্রামাণ্য। তাহা ব্যতীত, তাঁহাদের প্রমাণ করিবার পদ্ধতিই বা কি রূপ? কবিত্ব কিছু একটা অদৃশ্য গুণ নহে, তাহা Algebraর xনহে যে, অমন অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতে হইবে। যদি, বাঙ্গালী কবি কিনা জানিতে চাও, তবে দেখ, বাঙ্গালী কবিতা লিখিয়াছে কি না ও সে কবিতা অন্য অন্য জাতির কবিতার তুলনায় এত ভাল কি না যে, বাঙ্গালী জাতিকে বিশেষ রূপে কবি জাতি বলা যাইতে পারে। তুমি জান যে, অতিরিক্ত মোটা মানুষেরা সহজে নড়িতে চড়িতে পারে না ও অল্প পরিশ্রমে হাঁপাইয়া পড়ে। দৃশ্যমান ব্যক্তি-বিশেষ মোটা কিনা, জানিতে হইলে, তুমি কি প্রথমে দেখিবে সে ব্যক্তি সহজে নড়িতে চড়িতে পারে কি না ও অল্প পরিশ্রমে হাঁপাইয়া পড়ে কি না, ও তাহা হইতে মীমাংসা করিয়া লইবে সে ব্যক্তি মোটা? আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর ত আমি বলি, তাহা অপেক্ষা সহজ উপায় হইতেছে, তাহার প্রকাশমান শরী-

রের আয়তন দেখিয়া তাহাকে মোটা স্থির করা।

বাঙ্গালা ভাষায় কয়টিই বা কবিতা আছে? এমন কবিতাই বা কয়টি আছে, যাহা প্রথম শ্রেণীর কবিতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে? কয়টি বাঙ্গালা কাব্যে এমন কল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে, সমস্ত জগৎ যে কল্পনার ক্রীড়াস্থল। যে কল্পনা দুর্ব্বল-পদ শিশুর মত গৃহের প্রাঙ্গন পার হইলেই টলিয়া পড়ে না? যে কল্পনা সূক্ষ্ম দ্রব্যেও যেমন অনুপ্রবিষ্ট, তেমনি অতি বিশাল দ্রব্যকেও মুষ্টির মধ্যে রাখে। যে কল্পনা বসন্ত বায়ুর অতি মৃদু স্পর্শে অচেতনের মত এলাইয়া পড়ে, এবং শত ঝটিকার বলে হিমালয়ের মত অটল শিখরকেও বিচলিত করিয়া তোলে। যে কল্পনা, যখন মৃদু তখন, জ্যোৎস্নার মত, যখন প্রচণ্ড তখন ধূমকেতুর ন্যায়। কোন বাঙ্গালা কাব্যে কি মনুষ্য চরিত্রের আদর্শ চিত্রিত দেখিয়াছ? নানা প্রকার বিরোধী মনোবৃত্তির ঘোরতর সংগ্রাম বর্ণিত দেখিয়াছ? এমন মহান্ ঘটনা জীবন্তের মত দেখিয়াছ যাহাতে তোমার নেত্র বিস্ফারিত ও সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে? কোন বাঙ্গলা কাব্য পড়িতে পড়িতে তোমার হৃদয়ে এমন ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে, যাহাতে তোমার হৃদয়ে পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ উঠিয়াছে, অথবা পুষ্প-বাস-স্নিগ্ধ এমন মৃদু বায়ু সেবন করিয়াছ যাহাতে তোমার হৃদয়ের সমস্ত তরঙ্গ শান্ত হইয়া গিয়াছে, নেত্র মুদিয়া আসিয়াছে ও হৃদয়কে জীবন্ত জ্যোৎস্নার মত অশরীরী ও অতি প্রশান্ত আনন্দে মগ্ন মনে করিয়াছ?

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে মহা-কাব্যই নাই। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীকে কি মহাকাব্য বল? তাহাকে উপাখ্যান বলা যাইতে পারে কিন্তু তাহা কি মহাকাব্য? কালকেতু নামে এক দুঃখী ব্যাধ কোন দিন বা খাইতে পায় কোন দিন বা খাইতে পায় না। যে দিন খাইতে পায়, সে দিন সে চারি হাঁড়ি খুদ, ছয় হাঁড়ি দাল ও ঝুড়ি দুই তিন আলু ওল পোড়া খায়। "ছোট গ্রাস তোলে যেন তেআঁটিয়া তাল।" "ভোজন করিতে গলা ডাকে হুড় হুড়।" এই ব্যক্তি চণ্ডীর প্রসাদে রাজত্ব পায়। কিন্তু তাহার রাজ সভায় ও একটি ছোট খাট জমিদারী কাছারীতে প্রভেদ কিছুই নাই। তাহার রাজত্বে "হানিফ গোপ" ক্ষেতে শস্য উৎপন্ন করে; ভাঁড়ু দত্ত বলিয়া এক মোড়ল আসিয়াছে, তাহার

"ফোঁটা কাটা মহা দম্ভ,ছেঁড়া যোড়া কোঁচালম্ব
শ্রবণে কলম খরশাণ।"

ধনপতি নামে এক সদাগর আছে; সোনার পিঞ্জর গড়াইতে সে ব্যক্তি গৌড় দেশে যায়, তাহার দুই পত্নী ঘরে বসিয়া চুলাচুলি করে। দুর্ব্বলা বলিয়া তাহাদের এক দাসী আছে, সে উভয়ের কাছে উভয়ের নিন্দা করে, ও দুই পক্ষেই আদর পায়। সমস্ত কাব্যই এইরূপ। গ্রন্থারম্ভে দেব দেবীদের কথা উত্থাপন করা হইয়াছে। কিন্তু কবিকঙ্কণের দেব দেবীরাও নিতান্ত মানুষ, কেবল মাত্র মানুষ নহে,

কবিকঙ্কণের সময়কার বাঙ্গালী। হরগৌরীর বিবাহ, মেনকার খেদ, নারীগণের পতিনিন্দা, হরগৌরীর কলহ পড়িয়া দেখ দেখি। কবিকঙ্কণ মহাকাব্য নহে। আয়তন বৃহৎ হইলেই কিছু তাহাকে মহাকাব্য বলা যায় না। ভারতচন্দ্রের কথা উল্লেখ করাই বাহুল্য। তাহার মালিনী মাসী, তাহার বিদ্যা, তাহার সুন্দর, তাহার রাজা ও কোটালকে মহাকাব্যের বা প্রথম শ্রেণীর কাব্যের পাত্র বলিয়া কাহারো ভ্রম হইবে না। বিদ্যাসুন্দর পড়িয়া কাহারো মনে কখনো মহান্‌ভাব বা যথার্থ সুন্দর ভাবের উদয় হয় নাই। কিন্তু এ গ্রন্থটি বাঙ্গালী পাঠকদের রুচির এমন উপযোগী করিয়া রচিত হইয়াছে, যে, বঙ্গীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতার ইহা অতি উপাদেয় হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দর যত লোকে পড়িয়াছে, তত লোকে কি শ্রেষ্ঠতর কাব্য কবিকঙ্কণ চণ্ডী পড়িয়াছে? বাঙ্গালী জাতি কত খানি কবি, ইহা হইতেও কি তাহার একটা পরিমাণ পাওয়া যায় না? এই সকল প্রাচীন বঙ্গীয় গ্রন্থে কল্পনা বঙ্গ রমণীদের মত অন্তঃপুরবদ্ধ। কখনো বা খুব প্রখরা, মুখরা, গাল ভরা পান খায়; হাতনাড়া ঘন ডাক, সতীনের "কেশ ধরি কিল লাথী মারে তার পিঠে" কখনো বা স্বামী আসিবে বলিয়া

"পরে দিব্য পাট শাড়ি, কনক রচিত চুড়ি
দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ।"

কখনো বা স্বামী প্রবাসে, সতীনের নিগ্রহে ভাল করিয়া খাইতে পায় না, ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া থাকিতে হয়। কত অল্প আয়তন স্থানে কল্পনাকে বদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়। ধনপতি একবার বঙ্গদেশ ছাড়িয়া সিংহলে গিয়াছিল বটে, কিন্তু হইলে হয় কি, স্বর্গে গেলেও যদি বাঙ্গালী ইন্দ্র, বাঙ্গালী ব্রহ্মা দেখা যায়, তবে সিংহলে নূতন কিছু দেখিবার প্রত্যাশা কি রূপে করা যায়? কবিকঙ্কণচণ্ডী অতি সরস কাব্য সন্দেহ নাই। বাঙ্গালীরা এ কাব্য লইয়া গর্ব্ব করিতে পারে, কিন্তু ইহা এমন কাব্য নহে, যাহা লইয়া সমস্ত পৃথিবী গর্ব্ব করিতে পারে, অত আশায় কাজ কি, সমস্ত ভারতবর্ষ গর্ব্ব করিতে পারে। তখনকার বঙ্গবাসীর গৃহ অতি সুচারুরূপে চিত্রিত হইয়াছে। কবিকঙ্কনের কল্পনা তখনকার হাটে, ঘাটে, মাঠে, জমিদারের কাছারিতে, চাষার ভাঙ্গা কুঁড়েতে, মধ্যবিত্ত লোকের অন্তঃপুরে যথেষ্ট বিচরণ করিয়াছে। কোথায় ব্যাধের মেয়ে

"মাংস বেচি লয় কড়ি, চাল লয় ডালি বড়ি
শাক বাইগুণ কিনয়ে বেসাতি।"

কোথায় চাষার—"ভাঙ্গা কুঁড়িয়া, তাল পাতার ছাউনি" আছে, যেখানে অল্প "বৃষ্টি হইলে কুঁড়ায় ভাসিয়া যায় বাণ।" কোথায় গাঁয়ের মণ্ডল ভাঁড়ুদত্ত হাটে আসিয়াছে—

"পসারী পসার লুকায় ভাঁড়ুর তরাসে।
পসার লুটিয়া ভাঁড়ু ভরয়ে চুপড়ি,
যত দ্রব্য লয় ভাঁড়ু নাহি দেয় কড়ি।"

তাহা সমস্ত তিনি ভাল করিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু এই হাট মাঠই কি কল্পনার বিচরণের পক্ষে যথেষ্ট? কল্পনার, ইহা

অপেক্ষা উপযুক্ততর ক্রীড়াস্থল আছে। যে কল্পনা রাম, সীতা, অর্জ্জুন সৃষ্টি করে, তাহার পক্ষে কি, কালকেতু, ভাঁড়ুদত্ত ও লহনা, খুল্লনাই যথেষ্ট? পর্ব্বতে, সমুদ্রে, তারাময় আকাশে জ্যোৎস্নায়, পুষ্পবনে যাহার লীলা, হাট, বাজার, জমিদারীর কাছারীতে তাহাকে কি তেমন শোভা পায়? কবিকঙ্কণের কাব্য অতি সরস কাব্য। কিন্তু উহা লইয়াই আমরা বাঙ্গালী জাতিকে কবি জাতি বলিতে পারি না। যাহাতে আদর্শ সৌন্দর্য্য, আদর্শ মনুষ্য চরিত্র চিত্রিত আছে, বৈচিত্র্যহীন বঙ্গ-সাহিত্যে এমন কবিতা কোথায়?

আধুনিক বাঙ্গালী কবিতা লইয়া তেমন বিস্তারিত আলোচনা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। সাধারণ কথায় বলিতে হইলে বলা যায়, কবির সংখ্যা যথেস্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে; সজনি, প্রিয়তমা, প্রণয়, বিরহ, মিলন লইয়া অনেক কবিতা রচিত হইয়া থাকে, তাহাতে নূতন খুব কম থাকে এবং গাঢ়তা আরো অল্প। আধুনিক বঙ্গ কবিতায় মনুষ্যের নানাবিধ মনোবৃত্তির ক্রীড়া দেখা যায় না। বিরোধী মনোবৃত্তির সংগ্রাম দেখা যায় না। মহান ভাব ত নাইই। হৃদয়ের কতকগুলি ভাসা-ভাসা ভাব লইয়া কবিতা। সামান্য নাড়া পাইলেই যে জল-বুদ্বুদ গুলি হৃদয়ের উপরিভাগে ভাসিয়া উঠে তাহা লইয়াই তাঁহাদের কারবার। যে সকল ভাব হৃদয়ের তলদেশে দিবানিশি গুপ্ত থাকে, নিদারুণ ঝটিকা উঠিলেই তবে যাহা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে, সহস্র ফেনিল মস্তক লইয়া তীরের পর্ব্বত চূর্ণ করিতে ছুটিয়া আসে সে সকল আধুনিক বঙ্গকবিদের কবিতার বিষয় নহে। তথাপি কি করিয়া বলি বাঙ্গালী কবি? হইতে পারে বাঙ্গালায় দুই একটা ভাল কবিতা আছে, দুই একটি মিষ্ট গান আছে, কিন্তু সেই গুলি লইয়াই কি বাঙ্গালী জাতি অন্যান্য জাতির মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিতে পারে যে, বাঙ্গালী কবি?

—:০:—

কামিনী ফুল।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

ছিছি সখা কি করিলে? কোন প্রাণে পরশিলে?

কামিনী কুসুম ছিল বন আলো করিয়া,
মানুষ পরশ তাহা, সহিতে না পারি আহা
অমনি শতধা হোয়ে পড়িল গো ঝরিয়া।
জানত কামিনী সতী—কোমল কুসুম অতি
দূর হোতে দেখিবারে-পরশিতে নহে গো,
দূর হোতে বায়ু তার, এনে দেয় বাস ভার,
কাছে গেলে মানুষের শ্বাস নাহি সহে গো!
মধুপের পদক্ষেপে পড়িতেছে কেঁপে কেঁপে,
কাতর হোতেছে কত প্রভাতের সমীরে,
পরশিতে রবি কর—শুকাইছে কলেবর
শিশিরের ভরটুকু সহিছেনা শরীরে!
হেন কোমলতাময় ফুল কি না ছুঁলে নয়!
হা সখা, কেমন বন ছিল আলো করিয়া,
মানুষ পরশ তাহা সহিতে না পারি আহা,
অমনি শতধা হোয়ে পড়িল গো ঝরিয়া!

স্বর রহস্য।

গত বারে স্থির হইয়াছে যে, সপ্তকের সাতটি স্বরের মধ্যে সা গা এবং পা এই তিনটি স্বর সম্বাদী নামের যোগ্য,—কেননা সা বাজাইলে তাহার সঙ্গে এক সপ্তক উচ্চের পা এবং দুই সপ্তক উচ্চের গা (অর্থাৎ প্রথম সপ্তকের সা বাজাইলে দ্বিতীয় সপ্তকের পা এবং তৃতীয় সপ্তকের গা) সূক্ষ্মরূপে অনুরণিত হইয়া থাকে,—কেন যে এরূপ হয় তাহা পরে দেখা যাইবে। কিন্তু একা কেবল সম্বাদী স্বরে কিছুই হয় না,—এমন এক দল স্বর থাকা চাই যাহার সঙ্গে তাহার পাল্লা দেওয়া চলে, এই দলের স্বরকেই আমরা বিবাদী নামে নির্ব্বাচন করিতেছি;—বিবাদী স্বরের সন্নিকর্ষ ব্যতিরেকে সম্বাদী স্বরের মাধুর্য্য খোলে না —রজনীর সন্নিকর্ষ বশতই উষার রূপ লাবণ্যের এতাধিক মর্য্যাদা। বিবাদী স্বর যে, পদার্থটা কি তাহা জানিতে হইলে অগ্রে গ্রাম কাহাকে বলে তাহা জানা আবশ্যক; কেননা পরে দেখা যাইবে যে, এক-গ্রাম নিমন্ত্রিত সংবাদী স্বর-ত্রয় স্বগ্রামের বিবাদী স্বরের দলভুক্ত।

একটি কথা পূর্ব্বাহ্নে বলিয়া রাখি;—আমরা সংবাদী বিবাদী বা অনুবাদী বলিয়া যাহা কিছু ধার্য্য করিতেছি বা ভবিষ্যতে করিব, তাহার সহিত সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রায় সকল বিষয়েই মিলিবে কেবল নামে মিলিবে না; সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থে ঐ নামগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে—কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা পরে খুলিয়া দেওয়া যাইবে;—সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রে মা এবং পা সা'র সম্বাদী স্বর বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছে। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, আমরা যে অর্থে পা'কে সা'র সম্বাদী স্বর বলিয়া ধার্য্য করিতেছি, সংস্কৃত সঙ্গীত-শাস্ত্রকারেরা বুঝি-বা সেই অর্থে পা'কে সা'র সম্বাদী-শ্রেণীতে নিক্ষেপ করিয়াছেন;—সা এবং পা'র মধ্যে যদি সম্বাদি-সম্বন্ধ থাকিল তবে মা এবং সা'র মধ্যে তাহা ত থাকিবেই; কেননা সা হইতে পা যত দূর উচ্চে অবস্থিতি করে, মা হইতে সা ঠিক তত দূর উচ্চে অবস্থিতি করে, যথা—(১) সা,(২) রে (৩) গ, (৪) ম, (৫) প,—(১) ম, (২) প, (৩) ধ, (৪) নি, (৫)সা; সা'র পঞ্চম যেমন পা, মা'র পঞ্চম তেমনি সা—সুতরাং সা এবং পা'র মধ্যে যদি সম্বাদী সম্বন্ধ থাকে, তবে মা এবং সা'র মধ্যে তাহা না থাকা হইতেই পারে না; তাই বুঝি সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রে পা এবং মা এই দুটি স্বর সা'র সম্বাদী স্বর বলিয়া গৃহীত হইয়াছে,—কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; আমাদের প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রকার যে এমন ধারা একটা কাঁচা সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবেন—

ইহা অসম্ভব; তাঁহারা যে,আমাদের অত্রত্য অভিপ্রায়ানুসারে সম্বাদী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন নাই, তাহার প্রমাণ এই,—

যে স্বরকে সপ্তকের প্রথম-স্থানে বরণ করা যায় তাহাকে বাদী স্বর বলিয়া ধরা হউক্; সা'কে যদি বাদী স্বর বল তবে পা তাহার পঞ্চম স্বর; সা বাজাও আর অমনি পা তাহার সঙ্গে অনুরণিত হইবে; আর মা'কে যদি বাদী স্বর বল—তবে সা তাহার পঞ্চম স্বর, যথা (১) ম, (২) প, (৩) ধ, (৪) নি, (৫) সা; এ জন্য সা বাজাইলে যেমন প অনুরণিত হয়, মা বাজাইলে সেই রূপ সা অনুরণিত হয়; এখানে এইটি বিশেষ করিয়া দেখা উচিত যে, শেষোক্ত কারণে সা এবং মা'র মধ্যে যদিও সম্বাদী সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে, কিন্তু তা বলিয়া আমাদের এখানকার অভিপ্রায় মতে মা'কে সা'র সম্বাদী-স্বর বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না,—কারণ সা বাজাইলে পা-ই অনুরণিত হয়,—মা অনুরণিত হয় না;—মনে কর—ক'র পুত্র খ, খ'র পুত্র গ, তাহা হইলে দাঁড়াইবে যে, পিতা-পুত্র সম্বন্ধ ক-খ'র মধ্যেও বর্ত্তিতেছে, খ-গ'র মধ্যেও বর্ত্তিতেছে,—কিন্তু তা' বলিয়া গ-কে যেমন খ'য়ের পুত্র বলিতেছ, ক-কে তেমন কিছু আর খ'য়ের পুত্র বলিতে পার না; যেমন ক খ গ তেমনি মা সা পা; সা'র সহিত পা'র-ও সম্বাদি-সম্বন্ধ, মা'র-ও সম্বাদী সম্বন্ধ, কিন্তু তা' বলিয়া পা যেমন সা'র সম্বাদী, মা'কে তেমন সা'র সম্বাদী বলিতে পার না,—সা-কেই মা'র সম্বাদী বলিতে পার।

অতএব আমাদের এখানকার অভিপ্রায় মতে পা এবং মা উভয়ই সা'র সম্বাদী স্বর বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না—মা'কে বাদ দিতে হয়; কিন্তু সা বাজাইলে পা যেমন অনুরণিত হয় গা-ও তেমনি অনুরণিত হয়, এ জন্য আমাদের এখানকার অভিপ্রায়ানুসারে পা এবং গা উভয়ই সা'র সম্বাদী স্বর বলিয়া ধর্ত্তব্য। এইরূপ দেখা যাইতেছে যদি আমাদের এখানকার অভিপ্রেত অর্থে সম্বাদী শব্দ ব্যবহার করা যায় তবে, পা এবং মা উভয়ই সা'র সম্বাদী এ কথা আর টেঁকিতে পারে না; অতএব যদি মানিতে হয় যে,প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রকারেরা সঙ্গীতের মূল বিবরণ-গুলি অবগত ছিলেন, তবে তাঁহারা যে আমাদের ঐ অর্থে সম্বাদী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা কখনই সম্ভবে না। আপাততঃ এই অভাবপক্ষীয় (Negative) প্রমাণ-টুকুতেই সন্তোষ অবলম্বন করা হউক্;—প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা যে কি অর্থে সম্বাদী-শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে; এখানে প্রমাণের যে কিছু অভাব রহিল তখন তাহার পূরণের আর কিছু মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না। জটিলতা এড়াইবার মানসে আমরা নূতন নাম-করণে বাধ্য হইতেছি—কিন্তু নামে কি আইসে যায়, ফলের না ব্যত্যয় হইলেই আর কোন চিন্তা নাই। সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রের মতানুসারে গ্রাম শব্দে কি বুঝায় তাহা পরে বলিব; গ্রাম শব্দে এখন আমরা যাহা বুঝিব বলিয়া সংকল্প করিয়াছি, তাহাই নিম্নে ব্যাখ্যাত হইতেছে।

সা রে গ ম পা ধা নি সা এই আটটি স্বরের নি পর্য্যন্ত ধরিলে তাহা সা-গ্রামের সপ্তক এবং সা পর্য্যন্ত ধরিলে তাহা ঐ গ্রামের অষ্টক বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। দ্বিতীয় সা টি উপর-সপ্তকের সা। সা-হইতে রে যত মাত্রা উচ্চে অথবা রে-হইতে সা যত মাত্রা নীচে অবস্থিতি করে তাহাঁকে আমরা পূর্ণ-মাত্রা ব্যবধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিব, এবং উহার অর্দ্ধেক পরিমাণ ব্যবধানকে অর্দ্ধমাত্রা ব্যবধান কহিব। প্রথম সা হইতে অষ্টম সা পর্য্যন্ত আটটি স্বরের মধ্যে ব্যবধানের নিয়ম এইরূপ, যথা,—সা এবং রে-র মধ্যে যেরূপ ব্যবধান, রে এবং গ-র মধ্যেও তেমনি ব্যবধান—অর্থাৎ পূর্ণ ব্যবধান, কিন্তু গ এবং ম'র মধ্যেকার যে ব্যবধান তাহা অর্দ্ধেক মাত্রা বই নহে; আর-একটি অর্দ্ধেক মাত্রার ব্যবধান নি এবং সা'র মধ্যে দৃষ্ট হয়, এই দুই স্থান ব্যতীত অষ্টকের আর কোনখানেই পূর্ণ মাত্রা ভিন্ন অর্দ্ধ মাত্রা ব্যবধান স্থান পাইতে পারে না। অষ্টকের কোন স্বরদ্বয়ের মধ্যেকার ব্যবধান নির্দ্দেশার্থে নিম্ন-প্রকার সংকেত ধার্য্য করা হইল যথা,—

সা-(১)-রে ইহার অর্থ সা এবং রে-র মধ্যে পূর্ণ মাত্রা ব্যবধান; সা-(২)-গ ইহার অর্থ সা এবং গ-র মধ্যে দুই পূর্ণ-মাত্রা ব্যবধান, কেননা সা এবং গা'র মধ্যে দুইটি পূর্ণ ব্যবধান যথা সা-(১)-রে-(১)-গ; গ-(॥০)-ম ইহার অর্থ গ এবং ম'র মধ্যে অর্দ্ধ-মাত্রা ব্যবধান। এইরূপ ব্যবধান-চিহ্ন-সমেত সা-গ্রামের অষ্টক নিম্নে বিন্যস্ত হইল।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
সা (১) রে (১) গ (॥০) ম (১) প(১) ধ(১)নি(॥০)সা

উপরে সাত জায়গাকার সাতটি ব্যবধানের স্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য তাহাদের মস্তকোপরি স্ব স্ব স্থানোচিত অঙ্কপাত করা হইল। উপরে দেখিবে যে তৃতীয় ব্যবধান এবং সপ্তম-ব্যবধান উভয়েই অর্দ্ধ মাত্রা—এই যা' কেবল, নহিলে আর সমস্ত ব্যবধানই পূর্ণ মাত্রা। এখানে এই যে ব্যবধানের কথা বলা হইতেছে তাহা যে একেবারে শুভঙ্করের বচন তাহা মনে করিলে চলিবে না; অর্দ্ধ মাত্রার অর্থ অর্দ্ধেকের একটু আধটু কম, পূর্ণ-মাত্রার অর্থ কোথাও বা পূর্ণ মাত্রা কোথাও বা তাহার একটু আধটু কম; গণিতের অভ্রান্ত বচন অনুসারে অষ্টকের ব্যবধান গুলি কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা যথা-সময়ে আসিবে, এখন ও-সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে কতকগুলা জটিলতায় জড়াইয়া-পড়িয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে করিতেই প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ হইবে,—প্রকৃত বক্তব্য যাহা তাহা নিরুদ্দেশ হইয়া পলায়ন করিবে।

সা-হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টম পর্য্যন্ত অর্থাৎ উচ্চেকার সা পর্য্যন্ত উঠিলে যেমন একটি অষ্টক প্রস্তুত হয়, তেমনি যে-কোন স্বর হউক না কেন তথা-হইতে (ঐ একই নিয়মানুসারে) তাহার অষ্টম স্বর পর্য্যন্ত উঠিলে তেমনি-ধারা আর একটি অষ্টক প্রস্তুত হইবে; কিন্তু ব্যবধান-মাত্রার নিয়ম যাহা ইতি পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার যেন ব্যত্যয় না হয়—

অর্থাৎ নূতন অষ্টকটির তৃতীয় ব্যবধান এবং সপ্তম ব্যবধান যেন অর্দ্ধ-মাত্রা হয় ও অবশিষ্ট পাঁচটি ব্যবধান যেন পূর্ণমাত্রা হয়, —এটির যেন ব্যত্যয় না হয়। যে অষ্টকের আরম্ভ স্থানে সা তাহাই সা-গ্রাম বলিয়া উক্ত হইবে, যাহার আরম্ভস্থানে রে তাহা রে-গ্রাম,—ইত্যাদি-ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম ভিন্ন ভিন্ন নামে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

সা-গ্রামের তৃতীয় ব্যবধান গ-(॥০)-ম এবং সপ্তম ব্যবধান নি-(॥০)-সা এই দুটি ব্যবধান অর্দ্ধমাত্রা আর অবশিষ্ট পাঁচটি ব্যবধান পূর্ণমাত্রা,—এই তথ্যটি মনে জাগরূক রাখিয়া এইখানে এ-টি এক বার মিলাইয়া দেখা অতীব আবশ্যক যে, সা-গ্রামের সকল স্বর অবিকৃত ভাবে অন্য কোন গ্রামে (যেমন ম-গ্রামে) স্থান পাইতে পারে কি না? অর্থাৎ সা রে গ ম পা ধা নি সা এ যেমন সা-গ্রামের অষ্টক, এইরূপ ম প ধ নি সা রে গ ম—ম-গ্রামের অষ্টক হইতে পারে কি না? যদি শেষোক্ত আটটি স্বরের তৃতীয় এবং সপ্তম ব্যবধান অর্দ্ধ মাত্রা হয়—অর্থাৎ ঐ দুই ব্যবধান-স্থানে যদি গ-[॥০]ম কিংবা নি-(॥০)-সা বসে, তবেই শেষোক্ত আটটি স্বর ম-গ্রামের অষ্টক পদে আরূঢ় হইতে পারে; কেন না তাহা হইলে অষ্টকের যে-যে স্থানে যে-যে মাত্রা ব্যবধান থাকা নিয়ম-সঙ্গত সেই-সেই স্থানে সেই সেই মাত্রা ব্যবধান বর্ত্তিবে, তাহা হইলেই হইল—অষ্টকের তা ভিন্ন আর কিছুই চাই না। কিন্তু সা রে গ ম প ধ নি সা-র যে-যে স্থানে যে-যে মাত্রা ব্যবধান, ম প ধ নি সা রে গ ম'রও কি সেই-সেই স্থানে সেই-সেই মাত্রা ব্যবধান?—কই? সা রে গ ম পা ধা নি সা'র সহিত ম প ধ নি সা রে গ ম মিলাইয়া দেখিলে ব্যবধান বিষয়ে উহাদের মধ্যে যে মূলেই অনৈক্য নাই ইহা বলিতে পারা যায় না, যথা,

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

সা(১)রে(১) গ (॥০) ম (১) প (১)ধ (১)নি(॥০)সা

ম (১) প (১) ধ (১) নি (॥০)সা (১) রে(১)গ(॥০)ম

দেখ প্রথম পংক্তির তৃতীয় ব্যবধান ॥০ মাত্রা যথা—গ (॥০)-ম, দ্বিতীয় পংক্তির তৃতীয় ব্যবধান ১ মাত্রা যথা—ধ-(১)-নি; চতুর্থ ব্যবধান-স্থানেও উপরের পংক্তিতে ১ মাত্রা ও নীচের পংক্তিতে ॥০ মাত্রা দেখা যাইতেছে; এ জন্য ম প ধ নি সা রে গ ম সর্ব্বাংশে ম-গ্রামের অষ্টক নহে। ম-গ্রামের অষ্টক তবে কি তাহা দেখা যাউক;—নিম্ন-পংক্তিস্থিত নি'কে যদি অর্দ্ধ মাত্রা কমানো যায় তাহা হইলে ধ-(১)-নি'র পরিবর্ত্তে ধ-(॥০)-নি হয় এবং নি (॥০)-সার পরিবর্ত্তে নি-(১)-সা হয়, তাহা হইলেই উপর-পংক্তি এবং নিচের পংক্তির মধ্যে আদবেই কোন ব্যবধান-বৈষম্য থাকে না। কোন স্বরকে অর্দ্ধ মাত্রা নীচু করিলে তাহার নাম সেই স্বরই থাকে কেবল তাহাতে কোমল-উপাধি বর্ত্তে; যথা, শুদ্ধ-নিখাদকে যদি অর্দ্ধ মাত্রা নীচে নাবানো যায় তবে তাহা কোমল নিখাদ হইয়া দাঁড়ায়; কোমল স্বরের নীচে কসিচিহ্ন দেওয়া যাইবে যথা নি = কোমল নি। কোন স্বরকে

অর্দ্ধমাত্রা উচ্চে উঠাইলে তাহা তীব্র উপাধি প্রাপ্ত হয়,—তীব্র স্বরের মস্তকোপরি কসি চিহ্ন দেওয়া যাইবে যথা,— ম্ন = তীব্র মধ্যম বা কড়ি মধ্যম। সা-গ্রাম এবং ম-গ্রাম নিম্নে মিলাইয়া দেখা যাইতেছে,—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
সা(১) রে(১) গ(॥০) ম(১) প(১) ধ(১) নি(॥০)সা
ম(১) প(১) ধ(॥০) নি(১) সা(১) রে(১) গ(॥০)ম

উপরে দেখ, প্রথম পংক্তির যে স্থানে ১মাত্রা ব্যবধান—দ্বিতীয় পংক্তিরও সেই স্থানে ১ মাত্রা ব্যবধান, ও প্রথম পংক্তির যে স্থানে ॥০মাত্রা ব্যবধান—দ্বিতীয় পংক্তির ও সেই স্থানে ॥০মাত্রা ব্যবধান; ব্যবধানের নিয়ম দুই গ্রামেই সমান বলবৎ রহিয়াছে—দুই গ্রামেরই তৃতীয় এবং সপ্তম ব্যবধান ॥০ মাত্রা, অবশিষ্ট পাঁচটি ব্যবধান পূর্ণ মাত্রা। উপরে দেখ, দেখিবে যে সা-গ্রামের আর সকল স্বরই মগ্রামে অবিকৃত ভাবে প্রবেশ পাইয়াছে—কেবল নি'কে কোমল হইয়া ম-গ্রামে প্রবেশ করিতে হইয়াছে। ম—সা'র চতুর্থ, কিন্তু সা—ম'র পঞ্চম যথা (১)ম, (২)প (৩)ধ (৪) নি, (৫) সা; এজন্য ম'কে যদি প্রথম স্বর সা বলিয়া ধরা যায়, তবে সা'কে পা বলিতে হয়, যেহেতু সা ম'র পঞ্চম; অতএব ম-গ্রামকে যদি প্রথম গ্রাম বলিয়া ধরা যায় তবে সা-গ্রামকে পঞ্চম গ্রাম বলিতে হয়; উপরে দেখিবে যে প্রথমগ্রামের স্বর পঞ্চম গ্রামে লইয়া যাইতে হইলে (যেমন ম-গ্রামের অষ্টককে সা-গ্রামে লইয়া যাইতে হইলে) সেই প্রথম গ্রামের (ম-গ্রামের) মধ্যমকে (নি'কে) তীব্র করিতে হয় অর্থাৎ অর্দ্ধ মাত্রা উচ্চে উঠাইতে হয় (কোমল নি'কে শুদ্ধ নি করিতে হয়); এবং প্রথম গ্রামের অষ্টককে মধ্যম গ্রামে লইয়া যাইতে হইলে (যেমন সা-গ্রামের অষ্টককে ম-গ্রামে লইয়া যাইতে হইলে) সেই প্রথম গ্রামের (সা-গ্রামের) সপ্তমকে কোমল করিতে হয়। পুনশ্চ স্ব-গ্রামের নিখাদ কোমল হইয়া মধ্যম-গ্রামের মধ্যম-স্থানে বসে (যেমন সা-গ্রামের নি কোমল হইয়া মধ্যম গ্রামের মধ্যম স্থানে নি হইয়া বসিয়াছে) এবং স্ব-গ্রামের মধ্যম তীব্র হইয়া পঞ্চম গ্রামের সপ্তম স্থানে বসে (যেমন মধ্যম গ্রামের মধ্যম (নি) তীব্র হইয়া অর্থাৎ অর্দ্ধ মাত্রা উচ্চ হইয়া, নি—নি হইয়া সা-গ্রামে বসিয়াছে)।

এখন ইহা বলা বাহুল্য যে সা-গ্রামের অষ্টক পা-গ্রামে লইয়া যাইতে হইলে সা-গ্রামের মধ্যমকে তীব্র করিয়া প-গ্রামের সপ্তম স্থানে বসাইতে হয়, যথা

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
সা(১) রে(১) গ(॥০) ম(১) প(১) ধ(১)নি(॥০)সা
পা(১) ধ(১) নি(॥০) সা(১) রে(১)গ(১) ম্ন(॥০)প

যদি নীচের পংক্তিতে ম্ন'র পরিবর্ত্তে ম বসানো হইত তাহা হইলে উপরে ৬ষ্ঠ এবং

৭ম ব্যবধান যেমন উভয় পংক্তিতেই সমান তাহা না হইয়া এইরূপ দাঁড়াইত, যথা,

৬ ৭
ধ (১) নি (॥০) সা।
গ (॥০) ম (১) পা।

এখানে দেখ উপরের ব্যবধান যেখানে ১-মাত্রা, নীচের ব্যবধান সেখানে ॥০মাত্রা, আর উপরের যেখানে ॥০মাত্রা, নীচের সেখানে ১মাত্রা।

এখানে এইটি বিশেষ করিয়া দেখা উচিত যে, ব্যবধান বিষয়ে

প(১) ধ(১) নি(॥০) সা, = সা(১) রে(১) গ(॥০)ম
সুতরাং প (২॥০) সা, = সা (২॥০) ম

অর্থাৎ পা হইতে সা ২॥০ মাত্রা উচ্চে অবস্থিতি করে, সা হইতে ম ২॥০ মাত্রা উচ্চে অবস্থিতি করে, পা (২॥০) সা (২॥০) ম; সুতরাং সা-হইতে, ম যত-মাত্রা উচ্চে অবস্থিতি করে, পা ঠিক্ তত মাত্রা নীচে অবস্থিতি করে; এ জন্য মধ্যম-গ্রামকে যদি সা-গ্রামের এক গ্রাম উচ্চ বলিয়া ধরা যায় তবে পঞ্চম গ্রামকে তাহার এক গ্রাম নীচে বলিয়া ধরিতে হয়; এতদনুসারে দাঁড়াইতেছে যে, স্ব-গ্রামের সপ্তম (যেমন সা-গ্রামের নি) কোমল হইয়া উপর-গ্রামের (যেমন মধ্যম-গ্রামের) মধ্যম পদ প্রাপ্ত হয় এবং স্ব-গ্রামের মধ্যম (যেমন সা-গ্রামের ম) তীব্র হইয়া নিম্ন-গ্রামের (যেমন প-গ্রামের) সপ্তম পদ-প্রাপ্ত হয়। উপরের ঐ দুই বিবরণ হইতে গ্রাম পরিভ্রমণের এই দুটি নিয়ম নিষ্কর্ষণ করিয়া পাওয়া যাইতেছে যথা—

প্রথম নিয়ম। স্ব-গ্রামের সপ্তককে এক গ্রাম উচ্চে (অর্থাৎ স্ব-গ্রামের সপ্তককে স্বীয় চতুর্থ-স্বরের গ্রামে) লইয়া যাইতে হইলে স্বীয় সপ্তমকে কোমল করিয়া গম্য গ্রামের চতুর্থ (অর্থাৎ মধ্যম) পদে বসাইতে হয়—তদ্ভিন্ন আর কোন স্বর পরিবর্ত্তন করিতে হয় না।

দ্বিতীয় নিয়ম। স্ব-গ্রামের সপ্তককে এক গ্রাম নীচে (অর্থাৎ স্বগ্রামের পঞ্চম-স্বরের গ্রামে) লইয়া যাইতে হইলে স্বীয় মধ্যমকে তীব্র করিয়া গম্য গ্রামের সপ্তম পদে বসাইতে হয়—তদ্ভিন্ন আর কোন স্বর পরিবর্ত্তন করিতে হয় না।

এই দুই নিয়ম অল্প কথায় বলিতে হইলে এই দাঁড়ায়,—প্রথম, স্বগ্রামের সপ্তম কোমল হইয়া উচ্চ গ্রামের মধ্যম হয়; দ্বিতীয় স্বগ্রামের মধ্যম তীব্র হইয়া নিম্ন গ্রামের সপ্তম হয়।

নি = মধ্যম গ্রামের মধ্যম,—এজন্য (প্রথম নিয়মানুসারে) সা-গ্রামের সপ্তম নি যেমন কোমল হইয়া ম-গ্রামের মধ্যম-পদে আরূঢ় হয়, সেইরূপ ম-গ্রামের সপ্তম (গ) কোমল হইয়া নি গ্রামের মধ্যম পদে আরূঢ় হয়; নি গ্রামে একে নি কোমল-তাহার উপর আবার গ কোমল হইয়া দাঁড়ায়। সা-গ্রামের এক-গ্রাম উচ্চে ম-গ্রাম তাই ম-গ্রামে একটি মাত্র কোমল স্বর—নি; সা-গ্রামের দুই গ্রাম উচ্চে মধ্যমের মধ্যম গ্রাম—নি গ্রাম, তাই নি-গ্রামে দুইটি কোমল স্বর—নি, গ; সা-গ্রামের তিন গ্রাম উচ্চে মধ্যমের-মধ্যম-তস্য-মধ্যম গ্রাম—গ-গ্রাম, তাই গ-গ্রামে তিনটি কোমল স্বর—নি, গ, ধ;—এইরূপ করিয়া যতই উপর-উপর গ্রামে উঠা যাইবে, ততই এক-এক করিয়া কোমলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে; যখন কোমল-পঞ্চম-গ্রামে পৌঁছানো যাইবে—তখন দেখিবে যে, কোমলের সংখ্যা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত

হইয়াছে। এমনি আবার (উপরি-উক্ত দ্বিতীয় নিয়মানুসারে) সা গ্রাম হইতে পঞ্চম গ্রামে, পঞ্চম হইতে পঞ্চমের পঞ্চম গ্রামে, তথা হইতে তাহারো আবার পঞ্চম গ্রামে, এইরূপ করিয়া যত নীচে নীচে নাবা যাইবে ততই এক-একটি করিয়া তীব্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, এবং পরিশেষে যখন শুদ্ধ নিখাদ-গ্রামে পদার্পণ করা যাইবে তখন দেখিবে যে, তীব্রের সংখ্যা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। নিম্নস্থিত গ্রাম-তালিকায় সমস্ত গ্রামের সমস্ত বিবরণ মিলাইয়া পাওয়া যাইবে ;—তাহার মধ্যেকার কোন একটা গ্রাম—যেমন রে-গ্রাম লও, তাহার সপ্তম স্বর কি—দেখ,—রে-গ্রামের সপ্তম স্বর সা ; সা-কে কোমল কর, অর্থাৎ অর্দ্ধ-মাত্রা নীচে নাবাও—সা কর ; দেখিবে যে, রে-র স্ব-গ্রামের সেই কোমল-সপ্তম (সা) উপর গ্রামের (উপর-পংক্তিস্থ প গ্রামের) মধ্যম (কি না চতুর্থ) পদে বসিয়াছে ; এমনি আবার দেখিবে যে, রে-গ্রামের মধ্যম (কি না পা) তীব্র হইয়া—পা-হইয়া—নিম্ন-গ্রামের (নিম্ন-পংক্তিস্থ ধ-গ্রামের) সপ্তম পদে বসিয়াছে। পুনশ্চ, দুইটি অঙ্গুলি-চিহ্ন-স্থানে প্রত্যেক গ্রামেরই ॥০ ব্যবধান, তদ্ব্যতীত আর সকল স্থানেই ১ ব্যবধান জানিবে।

গ্রাম তালিকা।

	১	২	৩	☞	৪	৫	৬	৭	☞	৮	তীব্র কোমলের সংখ্যা।
(১) সা-গ্রাম।	সা,	রে,	গ,		ম,	প,	ধ,	নি,		সা	(০)
(২) পা-গ্রাম।	প,	ধ,	নি,		সা,	রে,	গ,	ম,		প	(১ তীব্র)
(৩) রে-গ্রাম।	রে,	গ,	ম,		প,	ধ,	নি,	সা,		রে	(২ ঐ)
(৪) ধা-গ্রাম।	ধা,	নি,	সা,		রে,	গ,	ম,	প,		ধ	(৩ ঐ)
(৫) গা-গ্রাম।	গ,	ম,	পা,		ধ,	নি,	সা,	রে,		গ	(৪ ঐ)
(৬) নি-গ্রাম।	নি,	সা,	রে,		গ,	ম,	পা,	ধ,		নি	(৫ ঐ)
(৭) প-গ্রাম।	প,	ধা,	নি,		নি,	রে,	গ,	ম,		প	(৬ কোমল)
(৬) রে-গ্রাম।	রে,	গ,	ম,		প,	ধ,	নি,	সা,		রে	(৫ ঐ)
(৫) ধা-গ্রাম।	ধ,	নি,	সা,		রে,	গ,	ম,	পা,		ধ,	(৪ ঐ)
(৪) গ-গ্রাম।	গ,	ম,	প,		ধ,	নি,	সা,	রে,		গ,	(৩ ঐ)
(৩) নি-গ্রাম।	নি,	সা,	রে,		গ,	ম,	প,	ধ,		নি,	(২ ঐ)
(২) ম-গ্রাম।	ম,	প,	ধ,		নি,	সা,	রে,	গ,		ম	(১ ঐ)
(১) সা-গ্রাম।	সা,	রে,	গ,		ম,	প,	ধ,	নি,		স	(০)

উপরে সা-গ্রাম; এক গ্রাম নীচে প-গ্রাম,—প-গ্রামের পঞ্চম—রেখাব, এজন্য প-গ্রামের এক গ্রাম নীচে রে-গ্রাম, রে-গ্রামের পঞ্চম—ধৈবত, এজন্য তাহার এক গ্রাম নীচে ধা-গ্রাম; এইরূপ পঞ্চম, তাহার পঞ্চম, তস্য পঞ্চম করিয়া নীচে নামিয়া চলিলে অবশেষে ম-গ্রামের পঞ্চম সা-গ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে; আর সর্ব্ব নীচেকার সা-গ্রাম হইতে যদি মধ্যম, তাহার মধ্যম তস্য মধ্যম করিয়া উচ্চে উচ্চে আরোহণ করা যায় তাহা হইলে অবশেষে পঞ্চমের মধ্যম সা-গ্রামে উপনীত হইতে হইবে; উপর হইতে সর্ব্ব-নীচে নামিলেও সা-গ্রাম, আর নীচে হইতে সর্ব্বোচ্চে উঠিলেও সা-গ্রাম, প্রভেদ কেবল এই যে আরোহণ-কালে মধ্যম হইতে মধ্যম পরম্পরাকে সোপান করিতে হয়, অবরোহণ কালে পঞ্চম হইতে পঞ্চম পরম্পরাকে সোপান করিতে হয়; পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার মানসে স্বদেশ ছাড়িয়া দূর হইতে দূর দেশে যত যাও ততই স্বদেশের নিকটবর্ত্তী হইতে হইবে, এবং অবশেষে তোমাকে স্বদেশে আসিয়া উপনীত হইতে হইবে, তেমনি উপরের এক গ্রাম ছাড়িয়া দূর হইতে দূরতর গ্রামে প্রয়াণ কর, দ্বাদশটি গ্রাম উত্তীর্ণ হইয়াছ কি আর অমনি স্বস্থানে আসিয়া উপনীত হইয়াছ।

এখন, বিবাদী-স্বর যে কি পদার্থ তাহা বলিবা-মাত্রই বুঝিতে পারা যাইবে—আর কিছু নহে এক গ্রাম নীচেকার সম্বাদী স্বর-ত্রয় স্বগ্রামের বিবাদী স্বরের দলভুক্ত এবং সেই তিন স্বর-ভিন্ন আর একটি স্বরও বিবাদী-শ্রেণী-ভুক্ত,—সে-টি এক গ্রাম নীচেকার কোমল সপ্তম সুতরাং স্ব-গ্রামের মধ্যম (কোমল সপ্তমের যে একটি দূর-সম্পর্কীয় সম্বাদিতা আছে তাহা যথা-সময়ে প্রদর্শিত হইবে, এখন সে বিষয়ে কোন কথা উত্থাপন করা বিবেচনা-সিদ্ধ নহে)। প্রত্যেক গ্রামেরই প্রথম তৃতীয় এবং পঞ্চম স্বর তাহার সম্বাদী স্বর এবং সম্বাদী স্বর তিনটির মধ্যে প্রথম স্বরটি বাদী স্বর বলিয়া উক্ত হয়—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; এখন জানা আবশ্যক যে প্রত্যেক গ্রামের পঞ্চম সপ্তম এবং দ্বিতীয় স্বর তাহার নিম্ন গ্রামের (গ্রাম-তালিকা দেখ) প্রথম তৃতীয় এবং পঞ্চম (সুতরাং সংবাদী) স্বর, ও স্ব-গ্রামের মধ্যম স্বর নিম্নগ্রামের কোমল সপ্তম স্বর; এই সূত্রে স্ব-গ্রামের দ্বিতীয় (নিম্ন গ্রামের পঞ্চম), মধ্যম (নিম্ন-গ্রামের কোমল সপ্তম), পঞ্চম (নিম্ন-গ্রামের প্রথম) এবং সপ্তম (নিম্ন গ্রামের তৃতীয়) এই চারিটি স্বর বিবাদী স্বরের পদারূঢ় হইয়াছে। সা-গ্রামের সংবাদী-বিবাদী-স্বর নিয়ে শ্রেণীবদ্ধ হইল এবং (১) (২) প্রভৃতি অঙ্কদ্বারা স্বরস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল যথা।

সংবাদী	বিবাদী
(১) সা	(২) রে
(৩) গ	(৪) ম
(৫) প	(৬) ধ
	(৭) নি

যেমন সা-গ্রামের তেমনি প্রত্যেক

গ্রামের (১) অর্থাৎ প্রথম স্বর, (৩) অর্থাৎ তৃতীয় স্বর, (৫) অর্থাৎ পঞ্চম স্বর তাহার স্ব-গ্রামের সংবাদী-শ্রেণী-ভুক্ত ও তাহার (২) (৪) (৫) (৭) তাহার স্ব-গ্রামের বিবাদী শ্রেণী ভুক্ত; দেখ, পঞ্চম স্বর সংবাদী এবং বিবাদী উভয় শ্রেণী ভুক্ত। যদি সংবাদী সুরের দুই দিকে [ ] এইরূপ ঘের দেওয়া যায়, বিবাদী সুরের দুই দিকে ( ) এইরূপ ঘের দেওয়া যায়, এবং উভয় জাতীয় সুরের দুইদিকে [( )] এইরূপ উভয়-প্রকার ঘের দেওয়া যায়, তাহা হইলে সা-গ্রামের সপ্তক এইরূপ দাঁড়ায় যথা, [সা] (রে) [গ] (ম) [(প)] ধ (নি); যেমন সাগ্রামের তেমনি সকল গ্রামেরই সপ্তকের [১-ম] (২-য়) [৩-য়] (৪র্থ) [(ম-ম)] ৬ষ্ঠ (৭-ম)।

এখন বক্তব্য এই যে সংবাদী এবং বিবাদী সুরের পর্য্যায় সাধন পূর্ব্বক—তরঙ্গ-ভঙ্গি-ক্রমে স্বর-মালা গ্রথিত হইলে তবেই তাহা গীতাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়। সামান্যত গীত বাঁধিবার নিয়ম এই যে যেখানে জোর দেওয়া আবশ্যক সেইখানেই সংবাদী সুর এবং যেখানে তাহার সঙ্গে লেজুড় দেওয়া চাই সেইখানে বিবাদী সুর-বসানো কর্ত্তব্য; সংবাদী এবং বিবাদী সুরের পর্য্যায় যে কিরূপ—নিম্নে তাহার একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে; যে যে সুরের মস্তকে বিন্দু-চিহ্ন দেখিবে তাহা উচ্চ সপ্তকের সুর, ও যে যে সুরের নিম্ন-স্থানে বিন্দু দেখিবে তাহা নিম্ন সপ্তকের সুর—এই রূপ জানিবে।

০ (সম্বাদী) ১ (বিবাদী)
স স গ গ। ম প প প।
ল লি ত ল। ব-অ ঙ্গ ল।

২ (সম্বাদী) ৩ (বিবাদী)
পা— প প। পা— নি নি।
তা-আ প রি। শী-ঈ ল ন।

০ (সম্বাদী) ১ (বিবাদী)
সা— স স। নি প প ম।
কো-ও ম ল। ম ল য় স।

২ (সম্বাদী) ৩ (বিবাদী)
গা— সা—। নি— পা—।
মী-ঈ রে-এ। এ-এ এ-এ।

০ (সম্বাদী)। ১ (বিবাদী)। ২ (সংবাদী)
স স গ গ। ম প প প। পা——
ল লি ত ল। ব- অ ঙ্গ ল। তা——

উপরে বেহাগ-রাগের একটি উদাহরণ (যত সোজা হইতে পারে তাহার মত' করিয়া) গড়িয়া দেওয়া হইল; জয়দেবের "ললিত লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমল মলয়-সমীরে" এই অংশটুকু সাদা-সীধা রকমে বেহাগরাগে বসানো হইল। প্রত্যেক তালের আরম্ভ-স্থানে সেই তালের সংখ্যা-বাচক অঙ্ক (ফাঁকের জায়গায় ০, প্রথম তালের জায়গায় ১, দ্বিতীয় তালের জায়গায় ২, এবং তৃতীয় তালের জায়গায় ৩) বসানো হইল; যে-যে সুরের পরে কসি টানা হইয়াছে তাহার কাল-মাত্রা দীর্ঘ, তদ্ভিন্ন আর সকল সুরেরই কাল-মাত্রা হ্রস্ব; অর্থাৎ উচ্চারণ

কাল সম্বন্ধে ই-কার-হইতে ঈকার যত মাত্রা দীর্ঘ, (স এই হ্রস্ব স্বর হইতে (স—) এই কল্পি-রেখা-যুক্ত দীর্ঘ স্বর তত মাত্রা দীর্ঘ জানিবে। ইহার পরে আসিতেছে অনুবাদী স্বর,—আগামী বারে তাহাতে হস্তক্ষেপ করা যাইবে; কিন্তু পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে, সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রে সংবাদী প্রভৃতি শব্দের অর্থ—এমন কি গ্রাম শব্দেরও অর্থ—আর-এক-প্রকার করিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে—তাহা যে কিরূপ তাহা যথা-সময়ে প্রদর্শিত হইবে। আমাদের এখানকার সম্বাদী বিবাদী স্বরের এবং গ্রামের নিয়ম অগ্রে না আয়ত্ত করিলে, সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রকারদিগের সিদ্ধান্ত-গুলির মর্ম্ম গ্রহণ করা সুকঠিন; এজন্য আপাততঃ সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রের চর্চ্চায় বিরত হইয়া স্বদেশ-বিদেশ-নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক সত্যের অনুবর্ত্তী হইয়া চলা যাইতেছে।

ক্রমশঃ

দণ্ডিনাচার্য্য।

"পূজ্যতমঃ কবীন্দ্রাণাং
দণ্ডী চ কালিদাসবৎ।"

অমৃতপ্রস্রবিণী বিশালকলেবরা সংস্কৃত ভাষা সুপ্রসিদ্ধ দণ্ডিনাচার্য্যের তুলিকা-সংস্পর্শে অনেক পরিমাণে সুরঞ্জিতা হইয়াছে। তাঁহার প্রণীত "দশকুমার-চরিতে" সুভাবব্যঞ্জক ললিত পদ বিন্যাস দেখিয়া কোন্ সহৃদয় মহাত্মা না বিমোহিত হইয়াছেন? কে না তাঁহাকে এক জন অতি শীর্ষ-স্থানীয় সংস্কৃত-গদ্য-লিখক বলিয়া অন্তরের সহিত অর্চ্চনা করিয়াছেন? কাদম্বরী, দশকুমারচরিত, এবং বাসবদত্তা—এই তিন খানিই সংস্কৃত গদ্য কাব্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তন্মধ্যে দণ্ডি-কৃত দশকুমার-চরিতই সর্ব্বাদিম ও উৎকর্ষতায় বাণভট্টের কাদম্বরীর অব্যবহিত নিম্নাসনে অবস্থিত। আচার্য্য সময়ে মহাত্মা দণ্ডীই অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রথম সূত্র-পাত করেন। তাঁহার "কাব্যাদর্শকে" অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রথম আবিষ্করণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাব্যাদর্শ প্রণয়ন করিয়া দণ্ডী অলঙ্কার শাস্ত্রে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আমরা এই প্রস্তাবে সেই বুধ-কেশরী আচার্য্য-প্রধান দণ্ডীর সময় বিনির্ণয় করিতে প্রয়াসী হইব:—

অনেকের বিশ্বাস, মহাত্মা দণ্ডী খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন।[১] বোধ

১ জ্ঞানাঙ্কুর প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

হয় ভোজপ্রবন্ধ প্রণেতা বল্লালই লোকের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছেন। কেননা, বল্লাল, ভোজরাজ-প্রদত্ত একটী সমস্যা পূরণ করিবার জন্য মহাকবি কালিদাস, ভবভূতির নিকট দণ্ডীর মুখেঃ—

"চলন্তি শিশির-বাতে
মন্দ মন্দ প্রভাতে।" ২

এই শ্লোকার্দ্ধ ব্যক্ত করাইয়াছেন।

পুনশ্চ, এদেশে একটী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে; যাহাতে মহাকবি কালিদাস ও দণ্ডী একই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া প্রতীতি হইবে। সে কিংবদন্তীটী এইঃ—

একদা কালিদাস ও দণ্ডী এক সময়ে একত্র এক গণিকাগৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দণ্ডী ও কালিদাসের কবিত্ব পরীক্ষার অভিপ্রায়ে সেই গণিকা কালিদাসকে একটী খদির-সারশূন্য তাম্বূল এবং দণ্ডীকে একটী চূণ (চূর্ণ)-শূন্য তাম্বূল খাইতে দেয়। খয়ের শূন্য পান পাইয়া কালিদাস গণিকাকে একটী শ্লোক দ্বারা এই কথা বলিলেনঃ—

"বিনা খদিরসারেণ
হারেণ হরিণীদৃশাম্।
নাধরে জায়তে রাগো
নানুরাগঃ পয়োধরে॥

আচার্য্য দণ্ডীও গণিকাকে আর একটী শ্লোক বলিলেন যথাঃ—

তূর্ণ মানীয়তাঙ্কূর্ণং
পূর্ণচন্দ্র-নিভাননে।
বিনা চূর্ণেন পর্ণানি
স্বর্ণবর্ণানি জায়তে ?॥"

গণিকা দুই কবির মুখে এই দুইটী শ্লোক শ্রবণ করিল। কালিদাস অপেক্ষা দণ্ডীর শ্লোক সুললিত ও সুভাবব্যঞ্জক হওয়াতে কালিদাস অপেক্ষা দণ্ডীকেই শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া প্রশংসা করিল। কালিদাস নিজেও বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে তাহার শ্লোক অপেক্ষা বাস্তবিকই দণ্ডীর শ্লোক অধিক কবিত্বপূর্ণ হইয়াছে; সুতরাং ন্যায়ের অনুরোধে অপার্য্যমানে বলিয়া উঠিলেন "আমা অপেক্ষাও আমার ভক্ত দণ্ডী অধিক কবি" ৩। বঙ্গীয় পণ্ডিতাভিমানী ভট্টাচার্য্যগণ এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া এখনো কালিদাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া দণ্ডীকে প্রশংসা করিয়া থাকেন।

কিন্তু উল্লিখিত মতদ্বয়ের কোনটী অনুসরণ করিয়াই দণ্ডীর কাল সম্বন্ধে অসন্দিগ্ধ মনে একটী অভ্রান্ত সীমায় অবস্থান করা যায় না। কেননা প্রথমোক্ত মত ভোজপ্রবন্ধ হইতে গৃহীত। ভোজপ্রবন্ধের ঐতিহাসিক সত্যের যে একটুকুও মূল্য নাই তাহা অনেকেই জানেন। শেষোক্ত

২ সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে মুদ্রিত "ভোজ-প্রবন্ধ" ১২১ পৃষ্ঠা।

৩ এই কিংবদন্তীটী সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে প্রকাশিত "দশকুমার চরিতের বিজ্ঞাপনে কিছু রূপান্তরিত করিয়া লিখিত হইয়াছে।

ষতটী মৌখিক কিংবদন্তী হইতে গৃহীত। ৪ সুতরাং যে পর্য্যন্ত অন্য কোন বলবৎ প্রমাণ প্রদর্শন না করিতে পারা যায় সে পর্য্যন্ত উহার সাময়িক-সংলগ্নতা বাস্তবিক হইলেও তাহা অপ্রামাণিক ও কাল্পনিক বলিয়া পরিগণিত। আমরা দণ্ডি সম্বন্ধে কয়েকটী প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন সময়ের গ্রন্থ সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ বিবৃত করিতেছি। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলেই দণ্ডীর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনেক আভাষ পাওয়া যাইবে:—

(ক) সুপ্রসিদ্ধ মল্লিনাথ স্থরি তদীয় টীকা সকলে পুনঃ পুনঃ দণ্ডীর নাম ও তদীয় গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। মল্লিনাথ, মাধব বৃত্তির নামোল্লেখ করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য ১৪০০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং মল্লিনাথকে খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলা যাইতে পারে না। ৫ খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর সমকালেও দণ্ডী বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় এক জন বিখ্যাত লেখক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইহাতে এই জানা গেল যে দণ্ডী ঐ সময় অপেক্ষাও অনেক প্রাচীনতম লোক।

(খ) দক্ষিণাবরনাথ-প্রণীত রঘুবংশের টীকায় দণ্ডীর নাম দৃষ্ট হয়। ৬ ঐ টীকায় হলায়ুধের (খৃঃ ১১০২ হইতে ১১১৫ অব্দে যিনি বর্ত্তমান ছিলেন) নাম উল্লেখ আছে। আবার কোলাচল মল্লিনাথ সুরি দক্ষিণাবরের টীকা অবলম্বন করিয়া তাঁহার টীকা প্রণয়ন করেন। সুতরাং দক্ষিণাবরনাথ হলায়ুধ ও মল্লিনাথের মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ সম্ভবতঃ খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাংশের কিম্বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধের লোক। দণ্ডী এ সময় অপেক্ষাও প্রাচীনতম লোক।

(গ) "ভোজ প্রবন্ধে" দণ্ডীর নাম উল্লেখ আছে। পণ্ডিত শেষগিরির মতে ১২০০ খৃঃ অব্দে বল্লাল "ভোজ প্রবন্ধ" প্রণয়ন করেন। "পৃথ্বীরাজ চৌহানরাসে" কবি চন্দবর্দাই ভোজ প্রবন্ধের নাম লিখিয়াছেন:—

"কিয়ৌ কলিকা মুখ্য বাসং সুসুদ্ধ।
জিনৈ সেতবন্ধৌ তি ভোজন-প্রবন্ধ ॥"

চাঁদ কবি খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের লোক; যখন তাঁহার গ্রন্থে ভোজ-প্রবন্ধের বিষয় দৃষ্ট হয়, তখন ঐ গ্রন্থ ১২০০ খৃঃ অব্দে লিখিত হইবে তাহাতে আমরা আশ্চর্য্য হই না। সুতরাং দণ্ডী উক্ত সময়েও ভবভূতি কালিদাস প্রভৃতির ন্যায় এক জন সুপ্রসিদ্ধ কবি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। দণ্ডী খৃ ১২০০ অব্দেরও অনেক পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

(ঘ) "বিশ্বগুণাদর্শ" প্রণেতা বেদান্তাচার্য্যের সময়ও দণ্ডী এক জন ভারতীয় অতি শীর্ষস্থানীয় কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ

৪ ইহার প্রসঙ্গ কোন প্রাচীন গ্রন্থাদিতে আছে কি না জানি না।

৫ বাবু রামদাস সেনের মতে মল্লিনাথ বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা প্রায় পাঁচ শত বৎসরের পূর্ব্বের লোক। ঐতিহাসিক রহস্য, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ২৭ পৃষ্ঠা।

৬ বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিতের লিখিত "কালিদাস"। বঙ্গদর্শন, ১ম খণ্ড ৪৭০ পৃষ্ঠা।

ছিলেন। তিনি দণ্ডী প্রভৃতিকে প্রশংসা করিয়াছেন, যথা—

"শ্রীদণ্ডী-ডিণ্ডিমাখ্যাঃ শ্রুতিকুটক গুরুর্ভল্লটো ভট্টবাণৌ।
খ্যাতশ্চান্যো সুবন্ধাদয় ইতি কৃতিভির্বিশ্ব মাহ্লাদয়ন্তি।"

(ঙ) 'সাহিত্য দর্পণ' প্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থে দণ্ডী একজন প্রাচীন আলঙ্কারিক বলিয়া পরিচিত। ঐ সকল গ্রন্থে "কাব্যাদর্শের" নাম পুনঃ পুনঃ উল্লেখ হইয়াছে।

আমরা কেবল সাধারণ-প্রচলিত মত প্রদর্শন করিবার জন্য উল্লিখিত বিবরণ গুলি উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু দণ্ডীর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমরা একটী বলবৎ অকাট্য প্রমাণ প্রকটন করিতে সমর্থঃ—৭

(চ) দুর্গসিংহ কাতন্ত্রের কৃৎ প্রকরণে "দুহকোষশ্চ" এই সূত্রের বৃত্তির উদাহরণ জন্য দণ্ডীর কাব্যাদর্শ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন ৮। এতদ্ব্যতীত দণ্ডীর গ্রন্থাদি হইতে দুর্গসিংহ আরও অনেক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্যই সুষেণ কবিরাজ প্রভৃতি কাতন্ত্র টীকাকারগণ বলিয়াছেনঃ—

"দণ্ডিনঃ পদমাশ্রিত্য
দুর্গেনাপি উদাহৃতঃ।"

দুর্গসিংহ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি যখন দণ্ডীর গ্রন্থ হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন তখন দণ্ডীকে দুর্গসিংহের পূর্ব্বসাময়িক বা সমসাময়িক বলিতে হইবে। যখন আমরা দুর্গসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন গ্রন্থাদিতে দণ্ডীর নাম দেখিতে পাই নাই তখন খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীকে দণ্ডীর কাল নিরূপণ করিবার জন্য একটী চরমসীমা বলিয়া গ্রহণ করিলাম। দণ্ডী এই পঞ্চম শতাব্দীতে কি ইহার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা বিচার সাপেক্ষ; অতএব তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া লই।

দণ্ডীর গ্রন্থাদি পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাতে এরূপ কোন সুপরিচিত গ্রন্থ কি গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায় না যদ্দ্বারা তাঁহাকে কোন গ্রন্থকারের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। দণ্ডিকৃত গ্রন্থাবলী হইতে যে সকল প্রসঙ্গ লইয়া তদীয় আবির্ভাব কাল বিনির্ণয় করা যাইতে পারে তাহা এত প্রাচীন ও সাধারণতঃ এত অপরিচিত ঘটনায় আবর্ত্তিত হইয়া রহিয়াছে যে, তাহা অবলম্বন করিয়া ঐতিহাসিক সোপানে পদবিক্ষেপ করিলে পদে পদে পদস্খলন হইবে বলিয়া মনে মহা আশঙ্কা উপস্থিত হয়। দণ্ডী কাব্যাদর্শে বলিয়া লইয়াছেন :—

"পূর্ব্ব শাস্ত্রাণি সংহৃত্য
প্রয়োগানুপলক্ষ্য চ।

---

৭ খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পরের অনেক গ্রন্থাদিতে দণ্ডীর নাম পাওয়া যায়, অনাবশ্যক বোধে উদ্ধৃত করিলাম না।

৮ আমরা "কাতন্ত্র জীবনী" প্রস্তাবে একথা উল্লেখ করিয়াছি।

যথাসামর্থ্যমস্মাভিঃ
ক্রিয়তে কাব্য-লক্ষণং ॥
২য় শ্লো, ১ ম পরিচ্ছেদ।

"কিন্তু বীজ-বিকল্পানাং
পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ প্রদর্শিতম্।
তদেব প্রতিসংস্কর্ত্তু
ময়মস্মৎপরিশ্রমঃ ॥
(২ য় শ্লো, ২য় পরিঃ)

" ... ...
ইতি বাচামলঙ্কারা
দর্শিতাঃ পূর্ব্বসূরিভিঃ ॥ "
(৭ ম শ্লো, ২য় পরিঃ)

তিনি যে এই কথা গুলি কার্য্যে পরিণত করেন নাই তাহা নহে। কাব্যাদর্শের উদাহরণস্থলে অনেক গুলি শ্লোক আছে যাহা উদ্ধৃত শ্লোক বলিয়া প্রতীতি হয়। কিন্তু সে সকল প্রচলিত কাব্য-সাহিত্যাদিতে দৃষ্ট হয় না। বোধ হয় প্রাচীনত্ব নিবন্ধন ঐ সকল গ্রন্থাদি এক্ষণে লুপ্ত-প্রায়। দণ্ডী, পূর্ব্বাচার্য্য ও পূর্ব্বশাস্ত্রাদি হইতে যুক্তি প্রয়োগ প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোথাও সেই সকল গ্রন্থ বা গ্রন্থকারদের নামোল্লেখ করেন নাই। সুতরাং ঐ সকল অবলম্বন করিয়া দণ্ডীর সময় আলোচনা করা একরূপ অসম্ভব।

মহাত্মা দণ্ডী যদি মহাকবি কালিদাসাদির পরবর্ত্তী হইতেন তবে আমরা তাঁহার কাব্যাদর্শে কালিদাস প্রভৃতির নাম ও তাঁহাদের কৃত কাব্যাদির শ্লোক ইত্যাদি অবশ্য দেখিতে পাইতাম। কেন না তিনি কোন কোন অপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে কোন কোন গ্রন্থের নামও উল্লেখ করিয়াছেন; যদি কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির প্রসিদ্ধ গ্রন্থ গুলি তাঁহার সময়ে প্রচলিত থাকিত,তাহা হইতে দুই এক স্থল অবশ্য উদ্ধৃত করিতেন। যখন করেন নাই তখন দুর্গসিংহ-সংসৃষ্ট যুক্তির উপর আমাদের আরো আস্থা জন্মিতেছে। সুতরাং সেই বলবৎ প্রমাণে পদাঘাত করিয়া ভোজ-প্রবন্ধ প্রভৃতি কাল্পনিক গ্রন্থের যুক্তি সমর্থন করিয়া দণ্ডিনাচার্য্যকে একাদশ শতাব্দীর লোক বলিতে কদাপি সাহসী হই না।

দণ্ডী প্রসঙ্গক্রমে কাব্যাদর্শে যে যে ঘটনা ও গ্রন্থাদির নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে দণ্ডীর সময় আলোচনা করিবার উপযোগী কয়েকটী বিষয় গ্রহণ করিতেছি। এতৎ সম্বন্ধে নিম্নের কয়েকটী বিষয় আমাদের নিকট অধিক সারবান বলিয়া বোধ হয়।

১ "বৃহৎ কথা" নামক ভুতভাষা-লিখিত উপকথা মূলক গ্রন্থ—৯ তথাহি—

"ভুতভাষাময়ীস্ত্বাহু
রদ্ভুতার্থাং বৃহৎকথাং।"

(২) মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখিত "সেতুবন্ধ" নামক কাব্যের উল্লেখ ১০

মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং
প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ।

৯ Bibliotheca Indica Edition of Ka'bya'darsa P. 35.

১০ I bid P. 81.

সাগরঃ সুক্তিরত্নানাং

সেতুবন্ধাদি বন্ময়ং ।

(৩) বুদ্ধ দেব এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে উল্লেখ—১১

"সত্যমেবাহ সুগতঃ

সংস্কারানবিনশ্বরাণ্ ॥"

(৪)সাংখ্যকার কপিলের মত সম্বন্ধে উল্লেখ—১২

"কপিলৈরসদুৎপত্তি

স্থান এবোপবর্ণ্যতে।'

(৫) হেতু বিদ্যা—ন্যায় শাস্ত্র ১৩

"বিরোধে হেতুবিদ্যাসু

ন্যায়াখ্যাসু নিদর্শ্যতে ।"

(৬) রাজবর্ম্মা নৃপতির নামোল্লেখ ১৪

একখানি হস্তলিখিত কাব্যাদর্শে রাজ বর্ম্মার স্থলে "কীর্ত্তিবর্ম্মা" লিখিত আছে—

"——————

রাজ্ঞো যৎ কীর্ত্তিবর্ম্মণঃ ॥"

(৭) কাঞ্চীশ্বর পুণ্ডুক নামা নৃপতির নামোল্লেখ। ১৫

এতদ্ব্যতীত দণ্ডীর কাব্যাদর্শে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির কোন কোন ঘটনায় সংক্ষিপ্ত বিবরণ, বিষ্ণুর দশাবতার পরশুরামের ক্ষত্রিয়কুল-নির্ম্মূল প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ আছে কিন্তু অনাবশ্যক বোধে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম না।

১১ Ibid P. 440.
১২ Ibid P. 440.
১৩ Ibid P. 480.
১৪ Ibid P. 255.
১৫ Ibid P. 399.

উল্লিখিত উদ্ধৃত স্থল গুলি পর্য্যালোচনা করিলে এই মাত্র জানা যায়, রামায়ণ, মহাভারত, ন্যায়শাস্ত্রকার গৌতম ও সাংখ্যকার কপিলের দার্শনিক মত প্রচার এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার প্রভৃতির পর দণ্ডি কর্ত্তৃক "কাব্যাদর্শ" প্রণীত হয়। এই সকল সুপরিচিত ঘটনার মধ্যে বুদ্ধ দেবের প্রসঙ্গই সর্ব্বাপেক্ষা পর সাময়িক। সাধারণ মতে ৫৫০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের পূর্ব্বে বুদ্ধদেব বর্ত্তমান ছিলেন। ভট্ট মোক্ষমূলরের মতে ৪৭৭ খৃ পূর্ব্বাব্দে বুদ্ধের নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয় ১৬। অন্যান্য পুরাবৃত্তজ্ঞদের মতে খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে বুদ্ধের তিরোভাব হয় ১৭। মহাবংশের মতেও পরবর্ত্তী যুক্তিই প্রামাণ্য ১৮।

দুর্গসিংহ দণ্ডীর গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন; দণ্ডী আবার স্বয়ং বুদ্ধের প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং দণ্ডী, খৃ পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভের পূর্ব্বে এবং খৃ. পূঃ ৫৫০ অব্দের পরে—কোন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু উল্লিখিত সময়ের আদি হইতে অন্ত কালের পরিমাণ গণনা করিলে প্রায় ৯৫০ কি ১০০০ বৎসর হয়। এত সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনুমানে কোন একটী সময় নির্ণয় করিলে নিতান্তই

১৬ Muller's "Ancient Sanskrit Literature" P. 298.

১৭ Turnour's "Mahawanso" Appendix P. IX.

১৮ Muller's An: San: Lit: P. 341

স্খলিত পদ হইবার কথা। সুতরাং এই দীর্ঘ সময়কে আরও সংকীর্ণ করিতে হইবে।

উপরে কাব্যাদর্শোল্লিখিত প্রসিদ্ধ ঘটনা লইয়া দণ্ডীর আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল; এখন অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ এবং অপরিচিত ঘটনা লইয়া দণ্ডীর কাল নির্ণয় করিতে প্রয়াসী হইব।

কাব্যাদর্শে রাজবর্ম্মা (পাঠান্তরে কীর্ত্তি বর্ম্মা) এবং কাঞ্চীশ্বর পুণ্ড্রক নৃপতির নামোল্লেখ আছে। আমরা যতদূর জানি কোন পুরাতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মাই এই দুই নৃপতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। এবং আমরা প্রাচীন গ্রন্থাদিতেও ইহাদের প্রসঙ্গ দেখি নাই। এই দুই নৃপতি বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী কি পরবর্ত্তী তাহা নির্দ্ধারণ করা একরূপ অসম্ভব। সুতরাং দণ্ডীর গ্রন্থে ইহাদের নামোল্লেখ থাকিলেও তদ্দ্বারা দণ্ডীর সময় আলোচনা করিবার উপায় নাই।

কাব্যাদর্শের একস্থলে "পঞ্চতন্ত্রের নামোল্লেখ আছে ১৯। পঞ্চতন্ত্র প্রাচীন গ্রন্থ। ৫৩১ হইতে ৫৯৯ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে এই গ্রন্থ পারস্য নৃপতি নশিরবাণের আদেশে অনুবাদিত হয়। মূল পঞ্চতন্ত্র ইহার ও কত পূর্ব্বের গ্রন্থ তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। সুতরাং এই গ্রন্থের উল্লেখ থাকিলেও তদ্দ্বারা দণ্ডীর সময় নিরূপণ করিবার একটী অভ্রান্ত সোপান পাওয়া গেল না।

কিন্তু দণ্ডীর গ্রন্থে ভূতভাষা-লিখিত "বৃহৎ কথার" উল্লেখ অবলম্বন করিয়া দণ্ডীর সময় সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথিত আছে কত্যায়ণ মুনি এই সপ্তলক্ষশ্লোকাত্মক বৃহৎকথা প্রণয়ন করিয়া কাণভূতিকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। পরে এই গ্রন্থের সারাংশ অবলম্বন করিয়া খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে ২০ সোমদেব ভট্ট অনন্ত-পত্নী—সূর্য্যবতীর তুষ্টিসাধন জন্য কথা সরিৎ সাগর প্রণয়ন করেন। কাহার মতে গুণাঢ্য এই ভূতভাষাময়ী "বৃহৎ কথার" রচয়িতা—"বৃহৎকথা ভূতভাষাখ্যে গ্রন্থভেদঃ; গুণাঢ্যস্তৎকর্ত্তা।

"ভূতভাষাপ্রণীতাসৌ
গুণাঢ্যকবিরুচ্যতে"

(নরসিংহ ধৃত বাক্য)

কতিপয় অলৌকিক উপাখ্যান ব্যতীত আমরা গুণাঢ্যের সময়াদি সম্বন্ধে কিছুই জানি না। ভূতভাষা-লিখিত বৃহৎকথা যদি কাত্যায়ন-প্রণীত হয় এবং এই কাত্যায়ণ সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ কাত্যায়ণ বররুচি হয়েন তবে দণ্ডীর সময় নির্ণয় করা অতি সহজ কথা। আমারা "কাতন্ত্র জীবনী" নামক প্রস্তাবে কাত্যায়ণ শীর্ষক অধ্যায়ে প্রমাণ করিয়াছি যে কাত্যায়ণ বররুচি খৃঃ পূঃ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ হইতে খৃষ্টের জন্মের সমকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। এক্ষণ যদি দণ্ডীর আবির্ভাব কালকে কাত্যায়ণের পর এবং

১৯ Bibliotheca Indica Edition of Kabyadarsa p 301.

২০ কাহার মতে ১০৫৯ খৃং অঃ সঙ্কলিত হয়। ঐতিহাসিক রহস্য। ১ম ভাগ। দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৩ পৃষ্ঠা।

দুর্গসিংহের পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে অথবা তাহার কিছু পরে) স্থান দিই তবে দণ্ডী খৃষ্টীয় প্রথম হইতে পঞ্চম শতাব্দীর কোন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন; ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যদি তাহাই হয় তবে আমরা প্রস্তাবের প্রারম্ভে যে দণ্ডীর সম্বন্ধে একটী জনশ্রুতি লিখিয়াছি, তদনুসারে তাহাকে মহা কবি কালিদাসের সমকালিক বলিয়া বিশ্বাস করিলেও নিতান্ত অযৌক্তিক হয় না। কিন্তু যখন বৃহৎ কথার প্রণেতা লইয়া গোলমাল আছে এবং তিনি কাত্যায়ণ হইলেও সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ কাত্যায়ণ বররুচি কি না তৎসম্বন্ধেও নিশ্চয়তা নাই তখন আমরা কেবল এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না।

চীনের সাংগ্রামিক শক্তি।

মোগলদিগের বিপুল সাম্রাজ্য আসিয়ার এখন তিনটী প্রধান সাম্রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে—বৃটিষ, রুষ ও চীন। ঘটনা পরম্পরা অতি শীঘ্রই মধ্য আসিয়ার হিন্দুকুশ পর্ব্বত শ্রেণীর তিন পার্শ্বে এই তিনটী প্রবল সাম্রাজ্যকে পরস্পর সন্নিকট করিতেছে; এই রূপ সান্নিকট্যে যে আসিয়ার ভবিষ্য ইতিহাস রূপান্তরিত হইবে তাহা বলিতে আর দৈব জ্ঞানের আবশ্যক নাই। এ অবস্থায় আমাদের পুরাতন প্রতিবাসী চীনের বর্ত্তমান অবস্থা কখনই বিরাগভাজন হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের প্রতিবাসী চিরকাল যেরূপ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে তাহাতে তাহার বিষয়ে বিশ্বাস-যোগ্য সম্বাদ পাওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। সৌভাগ্য বশতঃ সম্প্রতি এই বিষয়ে দুই এক খানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে এবং সাময়িক পত্রেও এবিষয়ে দুই একটী সুন্দর প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে।

কাপ্তান ব্রিজ যে বিষয়ে প্রবন্ধ * লিখিয়াছেন তাহা বিশেষ জ্ঞাতব্য ও সে বিষয়ে তাঁহার নিজের বহুদর্শিতা আছে; তিনি অনেক দিন চীন সাগরে এক খানি ইংরাজ রণতরীর নেতৃকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। চীনেরা যে একেবারে উন্নতিবিরোধী এই সাধারণ কুসংস্কারের ভ্রম প্রতিপন্ন করাই তাঁহার প্রবন্ধের এক প্রধান উদ্দেশ্য। কাপ্তান ব্রিজ সাধারণের এই বিশ্বাসের ভ্রম প্রতিপন্ন করিতে যে সর্ব্বপ্রথমে কিম্বা একাই চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা নহে; কিন্তু একটা ভ্রমাত্মক সংস্কার একবার সাধারণের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেলে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা ব্যতীত তাহা উৎপাটিত হওয়া অসম্ভব।

আসিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা অধিবাসীশালী সাম্রাজ্যের বাস্তবিক ও সম্ভাবিত সাংগ্রামিক ক্ষমতা নিশ্চিত রূপ জানিতে পারিলে কার্য্যগত অনেক ফল হইতে পারে। উপরি উক্ত তিন রাজ্যের মধ্যে এখন বৃটিষ আফ্‌গানিস্থানে রুষের অগ্রগামী ছায়া দেখিতে পাইয়া তথায় যুদ্ধে সংলিপ্ত হইয়াছেন ও আরো উত্তর পূর্ব্বে রুষ ও চীন অসি উন্মুক্ত করিয়াছেন সুতরাং এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে আগমন না করা বড় বিবেচনার কার্য্য নহে। বুলজার তাঁহার মধ্য এসিয়া

* Revival of the Warlike Power of China by Captain Bridge R. N. (Fraser's Magazine for June 1879,)

বিষয়ক পুস্তকে * বলেন যে সম্প্রতি চীনেরা কিয়ালজা নগর ও তাহার সন্নিহিত প্রদেশ ব্যতীত সমস্ত পূর্ব্ব তুর্কীস্থান সম্পূর্ণ রূপ পুনরধিকার করিয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহাদের স্বাভাবিক দুর্বল অংশেও জাতীয় জীবন পুনর্ব্বার বলবান হইয়া উঠিতেছে। কিয়ালজা নগর ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ এক্ষণে রুষদিগের হস্তগত; দশ বৎসর অতীত হইল রুষেরা উহা এই বলিয়া অধিকার করেন যে তুর্কীস্থানে শান্তি পুনঃস্থাপিত হইলে তাহারা যথার্থ অধিকারীকে উক্ত প্রদেশ ও নগর পুনরর্পণ করিবেন। কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারাই হউক আর কৌশল দ্বারাই হউক রুষ কোন একটা রাজ্য গ্রাস করিয়া যে পুনরুদ্ধার করিবে তাহার বড় সম্ভাবনা নাই; চীনেরাও তাহাদের পুরাতন জাতীয় অধ্যবসায় হারায় নাই। এইরূপ পরস্পর বিরোধী-স্বত্ব বিশিস্ট দুই পরাক্রমশালী জাতির মধ্যে যদিও বর্ত্তমান যুদ্ধের সূত্রপাত অন্তর্দ্ধ্যত হইয়াছে তথাপি বহুকাল যে উহাদের মধ্যে কি প্রকারে শান্তিরক্ষিত হইবে বুঝিতে পারা সহজ নহে। রুষেরা কি তাহাদের বিশেষ রূপে অভিলষিত পদার্থ ফিরাইয়া দিবে? না, অহঙ্কারী চীনেরা তাহাদের পুরাতন স্বত্ব ত্যাগ করিবে?

আবার এদিকে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে তুর্কীস্থানের সহিত বাণিজ্যে চীনেরা হস্তক্ষেপ করিয়াছে বলিয়া সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় বৃটিষ বণিকেরা উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল আরম্ভ করিয়াছে। এটা কিন্তু একটা অতি প্রাচীন পীড়ার নূতন আকার মাত্র। যে অবধি বৃটিষ সাম্রাজ্য নেপাল, ভুটান ও তিব্বত প্রভৃতি চীনের করদ ও মিত্র রাজ্যের দ্বারা উত্তরে ও ব্রহ্মদেশ দ্বারা পূর্ব্বদিকে সীমাবদ্ধ হইয়াছে সেই অবধি বৃটিষেরা চীনের নিকট হইতে বাধা ও প্রতিবন্ধক ব্যতীত আর কিছুই পান নাই। চীনেরা কখন তাহাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য গোপন করিবার চেষ্টাও করে নাই সুতরাং বৃটিষরা চীনের নিকট হইতে অন্য কোন ব্যবহার প্রত্যাশা করিতে পারেন না। অহিফেনের দ্বারা স্বদেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে দেখিয়া চীনেরা অহিফেনের আমদানি বন্ধ করিবার চেষ্টা করিল; ইংরাজের ইহাতে যথেষ্ট আয় কমিয়া যায়। কাজে কাজেই ইংরেজ বলিয়া উঠিলেন যে, "যদ্যপি তোমরা ঐরূপ সর্ব্বনাশ না হইতে দাও ত তোমাদের সহিত যুদ্ধ হইবে।" তাহাই হইল। এক্ষণে ইংলণ্ডে অনেকেই এইরূপ ব্যবহারের দোষ দেখিতে পাইয়া Canterburyর Archbishop এর উপদেশ অনুসারে অহিফেনের ব্যবসা বন্ধ করিবার জন্য Parliamentএ আবেদন করিয়াছিলেন; কিন্তু বণিক-রাজ্যে ওরূপ আবেদন গ্রাহ্য হইবে কেন? চীন সংগ্রামে পরাজিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরাজয় দ্বারা মন হইতে শত্রুতা একেবারে দূর হইতে পারে না। যাহা হউক এইরূপ স্বাতন্ত্র্য যদি যুদ্ধের কারণ (Casus belli) হইতে পারে তাহা হইলে আর কিছু নূতন উত্তেজনার আবশ্যক হইবে না, কেবল অল্প পরিমাণে অধৈর্য্যের বৃদ্ধি হইলেই যথেস্ট হইবে। কিছু কাল পরস্পর বাক্যযুদ্ধ পর ভারতবর্ষ কিছুতেই আর তুর্কীস্থানের সহিত বাণিজ্য বিষয়ে চীনের প্রতিবন্ধকতা সহ্য করিতে চাহিবে না; এবং উক্ত দেশে যথেচ্ছা গমনাগমনের জন্য স্বাধীন পথ স্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে। কিন্তু আবার ভারতবর্ষ ও চীনই কেবল এই বিষয়ে লিপ্ত নহে এ বিষয়ে রুষেরও স্বার্থ আছে। দক্ষিণ দিক হইতে ইংরেজেরা যে রূপ

* Central Asia by C. E. Boulger London, 1879.

চেষ্টা করিবে উত্তর দিক হইতে রুষেরাও ঠিক তাহাই করিবে। ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে এই দুই বলবান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে চীন কিছুই করিতে পারিবে না। ১০ লক্ষ সুশিক্ষিত সৈনিক না থাকিলে অপরিসীম বিস্তৃতি ও অসংখ্য অধিবাসী লইয়াও চীন কোন এক বলবান ইয়ুরোপীয় জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে অপারগ। পূর্ব্বে চীনেরা কখনো উক্ত রূপ সৈন্য সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করে নাই কিন্তু ইহা দেখিয়া যেন এরূপ মনে না হয় যে চীনেরা এই রূপ চেষ্টা করিতে অক্ষম, কিম্বা তাহারা এইরূপ চেষ্টা করিবে না। যদি তাহারা বিশেষ রূপে বুঝিতে পারে যে জাতীয় উন্নতি কিম্বা আত্মরক্ষার জন্য ইয়ুরোপীয় যুদ্ধকৌশল অনুকরণ করা আবশ্যক তাহা হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উহারা ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিবে। আমরা চীনদেশের যত বিবরণ পাঠ করি সকল গুলিই অধিবাসীদিগের অধ্যবসায়ের বিশেষ পরিচয় দেয়। চীন দেশের সুবিখ্যাত প্রাচীরই চীনেদের অধ্যবসায়ের কীর্ত্তিস্তম্ভ। বুলজার গত বারের Nineteenth Centuryতে চীনের বাষ্পীয় শকট প্রস্তুত না করিবার এই কারণ দেখাইয়াছেন যে বাণিজ্য দ্বারা চীন এত ধনশালী হইয়াছে যে তাহাদের লৌহবর্ম্মের দ্বারা আভ্যন্তরিক বাণিজ্য বাড়াইবার আবশ্যক নাই, সেই জন্য তাহারা অকারণে বিদেশীয় লোকদিগকে স্বদেশে আনিতে চাহে না।

১৮৬০ খৃঃ অব্দে ইয়ুরোপীয়দিগের সহিত শেষ যুদ্ধের পর হইতে চীনেরা সৈন্য সংস্কারের যদিও নিয়মিতরূপ চেষ্টা করে নাই তথাপি উহার দ্বারা চীন সৈন্যের ভিতর ইয়ুরোপীয় যুদ্ধ কৌশল ও উন্নত ইয়ুরোপীয় আগ্নেয় অস্ত্র সকল সমাদৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; ইহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে বিপদের ভার পড়িলে কিম্বা জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির উত্তেজনা উপস্থিত হইলে চীন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উত্তমরূপ সুসজ্জিত সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে সক্ষম হইবে। চীনের অধিবাসী সংখ্যা(?)ত এক রকম অক্ষয় এবং তাহারা অতি পরিমিত আহারী। কর্ণাল গর্ডন* স্ব-প্রণীত চীনের বিবরণ গ্রন্থে বলেন যে অতি অল্প আয়াসেই চীনদিগকে খাওয়ান ও শাসন করা যাইতে পারে। কাজে কাজেই চীনের একটী বিশেষ সুবিধা এই যে অন্যান্য সভ্য জাতির ন্যায় ইহাদিগকে কমিস্যারিয়েটের জন্য বিশেষ চিন্তা করিতে হয় না; চীনের সৈন্য করিবার জন্য লোকের ত কোনই অভাব নাই এখন যুদ্ধের অস্থি মজ্জা—অর্থ—বিষয়ে চীনের কিরূপ সুবিধা দেখা যাউক। যুদ্ধের ব্যয় সঙ্কলনের জন্য চীন অতি অনায়াসেই অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। Sir W. Medhurst তাঁহার Nineteenth Centuryতে প্রকাশিত প্রবন্ধে† বলেন যে চীনেদিগের আমেরিকা, মলাক্কা এবং ভারত ও প্রশান্ত সাগরের অন্যান্য দ্বীপে অতি সমৃদ্ধিশালী উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে এবং বিদেশীয় বাণিজ্যের দ্বারা তাহারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। আমেরিকায় ইংরাজ ভ্রমণকারীদিগের পুস্তক ‡ পাঠে অবগত

* যিনি আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারেলের Private Secretary পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়া আবার শীঘ্রই এই পদ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

† The Chinese as Colonists by Sir William Medhurst. (Nineteenth Century No 11, for June, 1878.)

‡ New America by Hepworth Dixon 2Vols. London.

Life and Liberties in America by Charles Mackay London ইত্যাদি

হওয়া যায় যে নূতন পৃথিবীতে চীনেরা অধিবাসীদিগকে বাণিজ্য ক্ষেত্রে এবং শিল্প ও পরিশ্রমে বিশেষরূপে পরাভূত করিতেছে; ইউনাইটেডষ্টেট সে যত পরিশ্রমের কাজ সকলই চীনেদের দ্বারা সম্পাদিত হয়। Sir William Medhurst তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে চীনেরা আমেরিকায় যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছে সেই বিষয়েই অধিবাসীদিগের উপর জয় লাভ করিয়াছে এমন কি অধিবাসীদিগের পরামর্শানুসারে ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌সের শাসন কর্ত্তারা তাহাদের দেশে চীন হইতে কেহ আসিলে তাহার নিকট হইতে ৫০০ ডলার অর্থাৎ প্রায় এক হাজার টাকা আদায় করেন; এরূপ প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়াও চীনেরা আমেরিকায় উত্তরউত্তর সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে। এরূপ ধনী দেশে রাজা যখন তখন ঋণ পাইতে পারেন। ইহা ব্যতীত চীনের গবর্ণমেণ্ট বিদেশীয় ব্যক্তিদের শুল্ক আদায়ের জন্য সম্প্রতি ইয়োরোপীয় তত্ত্বাবধারণের অধীনে একটা Custom House স্থাপন করিয়াছে, ইহা হইতে নিয়মিতরূপে বাৎসরিক অন্ততঃ ৫০ লক্ষ টাকা নিশ্চিত আদায় হয়। এই আয় বন্ধক দিয়া বিদেশ হইতেও অক্লেশে চীন প্রয়োজনীয় টাকা ঋণ লইতে পারেন। চীনের অসংখ্য ধনী অধিবাসীদিগের নিকট হইতে যুদ্ধকর স্বরূপ যে টাকা আদায় হইতে পারে তাহার আর উল্লেখ করা হইল না।

ইহাও একটা চীনেদিগের বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় স্থান যে তাহারা সর্ব্বাগ্রে তাহাদের সমুদ্র-উপকূলস্থিত প্রদেশের রক্ষণার্থে দুর্গ শ্রেণী (Seaboard defences) প্রস্তুত করিতেছে ও সমুদ্র যুদ্ধের উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহে সচেষ্ট। চীন যুবকেরা বৎসর বৎসর ভিন্ন দেশে গিয়া জলযুদ্ধ শিক্ষা করিয়া আসিতেছে। কাপ্তেন ব্রিজ তাঁহার উপরি উক্ত প্রস্তাবে বলেন যে ১৮৬১ খৃ অব্দে চীনেরা Sherard Osborne নামক এক জন আমেরিকের নেতৃত্ব অধীনে জল যুদ্ধের উপযোগী জাহাজাদি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়া ছিল কিন্তু পেকীনের সন্ধিতে স্বাক্ষরকারী ইয়ুরোপীয় জাতিগণের ঈর্ষা বশতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সেই অবধি চীনেরা এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছে এবং এক প্রকার কৃতকার্য্যও হইয়াছে। সেই অবধি তাহারা ক্রোর ক্রোর টাকা ব্যয় করিয়া ইয়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে নূতন রকমের উৎকৃষ্ট রণতরী সকল ক্রয় করিয়াছে এবং যুদ্ধের অন্যান্য উপকরণ প্রস্তুত করিবার জন্য স্বদেশে বৃহৎ বৃহৎ কারখানা স্থাপন করিয়াছে।

১৮৬৭ খৃ অব্দে শ্যাংহেই নগরের সন্নিকটে স্থাপিত জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা হইতে ইতি মধ্যে প্রায় বিশ হাজার টন বোঝাইয়ের উপযুক্ত দুই খানা অতি উৎকৃষ্ট যুদ্ধজাহাজ প্রস্তুত হইয়াছে এবং তিন বৎসর অতীত হইল সেখান হইতে নদীতে গতায়াত করিতে পারে এমন একখানি ক্ষুদ্র বর্ম্মাচ্ছাদিত রণতরি ভাসান হইয়াছে। এই কারখানার সামীল ও ইহার নিকটে যুদ্ধের উপকরণ নির্ম্মাণের কয়েকটা কারখানা আছে; সেখানে ছোট বড় কামান ও ব্রীচলোডিং বন্দুক এবং তদুপযুক্ত বারুদ, গোলা গুলি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত হয়। তুর্কীস্থান বিজয়ী ত্‌ সো-ত্‌ স্যাং ত্যাং ও তেপিং-বিজয়ী লি-হং- চ্যাং-উভয়েই অতি উৎকৃষ্ট রাজনীতি কুশল যোদ্ধা। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত জন ফুচৌনগরের নিকট যুদ্ধের উপযোগী সামগ্রী নির্ম্মাণের একটী বৃহৎ কারখানা খুলিয়াছেন। চীনসাগরে একখানি ফরাসী রণতরীর নায়ক কাওানজিকে (Giquel) ইহার তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই

কারখানাটী অতি উৎকৃষ্ট ইয়ুরোপীয় কারখানা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। এই কারখানা হইতে ইহার মধ্যে পোনর খানা প্রথম শ্রেণীর রণতরী নির্ম্মিত হইয়াছে।

লি-হুং-চ্যাং পেইহো নদীর উপকূলস্থ তিয়াস্তসিন্ নগরে ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ উলিচের কারখানার আদর্শ অনুসারে একটা বৃহৎ কারখানা খুলিয়াছেন। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দ অবধি উলিচ হইতে আনীত উৎকৃষ্ট কারিগরেরা এখানে কর্ম্ম করিতেছে। এত বৃহৎ কাণ্ড করিয়াও পেকীনের কর্ম্মচারীয়েরা ও সমুদ্র উপকূলস্থিত প্রদেশের শাসন কর্ত্তারা সন্তুষ্ট হন নাই। পেইহো নদীর উপকূলস্থ দুর্গ সকল বিখ্যাত প্রুশিয় অস্ত্র শিল্পী ক্রুপ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত অতি বৃহৎ বৃহৎ কামানের দ্বারা কণ্টকিত হইয়া রহিয়াছে এবং এই সমস্ত স্থানে বৈদ্যুতিক উপায়ে নদীর অপর পার্শ্বস্থিত কামানে অগ্নি সংযোগ করিবার সুবিধারও অভাব নাই। এ সকল ব্যতীত যুদ্ধের জন্য ষ্টীমারও ক্রয় করা হইয়াছে। সম্প্রতি চীনেরা কামান বহিবার উপযোগী অতি উৎকৃষ্ট জাতির কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ প্রস্তুত করাইতেছে। সচরাচর ইয়ুরোপে যে সকল জাহাজ ব্যবহৃত হয় তাহাদের সহিত এ গুলির অনেক প্রভেদ আছে। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে * অবগত হই যে ইহাদের আবরণ সচরাচরের ন্যায় [illegible] না হইয়া উৎকৃষ্ট ষ্টীলেতে নির্ম্মিত, সচরাচরের অপেক্ষা ইহারা প্রায় [illegible] এবং ইহাদের দুই মুখ। ইহাদের আর একটী বিশেষ প্রভেদ এই যে ইহাদের যন্ত্র সকল জাহাজের যে অংশে স্থিত তাহা কখনই জলের উপরি ভাগে দেখা দেয় না, কাজে কাজেই এই রূপে জাহাজ কখনো বিপক্ষ দ্বারা একেবারে বিনষ্ট কিম্বা সহজে বিশেষরূপ আহত হইতে পারে না। এই সকল জাহাজের কামান সচরাচরের অপেক্ষা লঘু বটে কিন্তু অন্য সকল বিষয়ে অনেক উৎকৃষ্ট।

এই প্রস্তাব পাঠে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে প্রাচীন মোগল, তাতার ও চীন জাতির সংগ্রামিক ক্ষমতা একেবারে লোপ প্রাপ্ত হয় নাই। এই সকল জাতিই জঙ্গীশ খাঁর নায়কত্ব অধীনে দল বদ্ধ হইয়া পীত সাগর হইতে ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত একটী সাম্রাজ্য গাঁথিয়া ছিল ইহাদের দ্বারা ভারতবর্ষে স্থাপিত আধিপত্যের শেষ চিহ্ন কেবল কুড়ি বৎসর হইল সিপাহী যুদ্ধে বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহারাই চীনের বর্ত্তমান রাজবংশের রাজত্বকালে নেপাল ভূটান ও তিব্বত অর্দ্ধজয় করিয়াছে এবং ব্রহ্মদেশে কর স্থাপন করিয়াছে। চীন কোন প্রকারেই বার্দ্ধক্য জরা গ্রস্ত হইয়া পড়ে নাই। আসিয়ার তিন সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অভিসন্ধি যাহাই হোক না কেন, আর অব্যবহিত ভবিষ্যতে তাহাদের ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন এই তিন সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান সাংগ্রামিক অবস্থা বিশেষত অতি অল্পরূপ বিদিত চীনের সাংগ্রামিক ক্ষমতা জানিলে যে আমাদের কেবল মাত্র কৌতুহল পরিতৃপ্ত হইবে এরূপ নহে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাকে কার্য্যতও অনেক ফল হইতে পারে।

* Capt Bridge's Revival of the Warlike Power of China.

ভূগর্ভ।

পৃথিবীর অভ্যন্তর কি প্রকার? আমরা পৃথিবীর উপরিভাগ যেরূপ দেখিতেছি, পৃথিবীর অন্তর প্রদেশও কি সেইরূপ? প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেওয়া যায় না। পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ প্রায় সাড়ে তিন হাজার মাইল কিম্বা ১৮৪৮০০০০ ফুট, তাহার মধ্যে কেবল ৫০০০ হাজার ফুট মানুষের চক্ষুর্গোচর হইয়াছে মাত্র। ইহা অপেক্ষা অধিক দূর নিম্নে খনন করিয়া দেখিবার কোন উপায় এখনো বাহির হয় নাই, সুতরাং কেন্দ্র পর্য্যন্ত পৃথিবী-গর্ভ যে কি পদার্থে নির্ম্মিত তাহা কেহ এখনো নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। তবে যতদূর দেখা গিয়াছে তাহারই উপর যুক্তি খাটাইয়া, এবং বৈজ্ঞানিক অনুমান দ্বারা সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতেরা ভূগর্ভ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন। তাহার মধ্যে নিম্ন লিখিত চারিটি প্রধান—

(১) পৃথিবীর আবরণ কঠিন কিন্তু নিম্নে কেন্দ্র পর্য্যন্ত দ্রবপদার্থময়।

(২) পৃথিবী কেন্দ্র পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ না হউক প্রায় কঠিন।

(৩) পৃথিবীর আবরণ যেরূপ কঠিন তাহার কেন্দ্রও তদ্রূপ, কেবল ভূপৃষ্ঠ ও কেন্দ্রের মধ্যবর্ত্তীস্থল দ্রবপদার্থময়।

(৪) ভূ-পৃষ্ঠ কঠিন কিন্তু নিম্নে কেন্দ্র পর্য্যন্ত বাষ্পময়।

পৃথিবীর যতদূর নিম্ন পর্য্যন্ত মানুষের পরীক্ষার অন্তর্ভূত হইয়াছে কেবল তাহারই উপর নির্ভর করিয়া ভূবেত্তাগণ প্রথম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। পৃথিবীর নানা স্থান খনন দ্বারা যে পাঁচ হাজার ফুট মানুষের পরীক্ষাধীন হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, নিম্নতা অনুসারে ক্রমশই উত্তাপ বাড়িতে থাকে। এই উত্তাপ বৃদ্ধির পরিমাণ যদিও পৃথিবীর সকল স্থানে ঠিক সমান নহে, নানা স্থানীয় কারণে (Local causes) ইহার অল্প স্বল্প বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, কিন্তু বহু সংখ্যক পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে পৃথিবীর অন্তরে প্রবেশ করিলে সাধারণতঃ প্রত্যেক ১০০ ফুটে তাপমান যন্ত্রের ন্যূনাধিক ১॥ ডিগ্রি উত্তাপ বাড়ে। উত্তাপ বৃদ্ধির এই নিয়মানুসারে ভূগর্ভে এত উত্তাপ জমিবার কথা যে কেন্দ্র পর্য্যন্ত দ্রব-পদার্থময় হইবারই সম্ভাবনা। ইহা ছাড়া এ মতের পক্ষে আরো অনেক বলবান কারণ আছে। পৃথিবীতে এরূপ অনেক বহুদূরব্যাপী স্তর সংস্থিতি (Alternate deposit of sedimentary rocks) দেখিতে পাওয়া যায় যে ভূগর্ভকে তরল মনে করিয়া না লইলে

সে সংস্থিতির কোন কারণ নির্দ্ধারিত করা যায় না। ইহা ছাড়া পৃথিবীর কোন অংশ উচ্চ হইয়া উঠিলে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অপর অংশ নীচু হইয়া পড়ে। ভূগর্ভ তরল না হইলে এরূপ হইত না। কারণ তরল পদার্থের সাধারণ একটি গুণ এই যে তাহার কোন এক স্থানে অধিক চাপ পড়িলে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান উচ্চ হইয়া উঠে।

এই সকল এবং অপরাপর কারণে ভূবেত্তাগণ ভূগর্ভকে দ্রব-পদার্থময় বলেন।

ভূগর্ভ সম্বন্ধে দ্বিতীয় মতটি জ্যোতিষিক গণনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হপকিন্স সর্ব্বতোভাবে এক সমান দুইটি দোলক যন্ত্র (Pendulum) লইয়া একটার নিরেট ধাতব গোলকের বদলে একটি সমান ভারের পারদ পূর্ণ কাঁচের গোলক বসাইয়া দেন। এই দুইটির গতিবিধি আলোচনা করিয়া তিনি দেখেন ধাতব দোলক অপেক্ষা পারদপূর্ণ দোলকটি শীঘ্র-গামী হয়। পৃথিবীর স্বকক্ষ ভ্রমণের উপর এই দৃষ্টান্ত খাটাইয়া, নানা প্রকার জ্যোতিষিক গণনা ও যুক্তি দ্বারা তিনিই প্রথমে সাব্যস্ত করেন যে ভূগর্ভ, কেন্দ্র পর্য্যন্ত প্রায় অখণ্ড-কঠিন। তিনি বলিলেন তাহার অন্যথা হইলে, অর্থাৎ দ্রব-পদার্থ-পূর্ণ হইলে পৃথিবী এখনকার অপেক্ষা শীঘ্রগামী হইত। তাহা হইলে পৃথিবীর কতকগুলি গতি (Precession ও Nutation) এখন যেরূপ আছে নিশ্চয়ই সেরূপ থাকিত না। পরে সার উইলিয়ম টম্‌সন্‌ও কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব আরচ্‌ডিকন প্র্যাট্ অন্য নানা রূপ যুক্তি দ্বারা হপকিন্সের এই মতটির পক্ষ সমর্থন করেন। যত দিন ফরাসি পণ্ডিত ডিলনে এই মতের ভ্রম প্রমাণ না করেন ততদিন পর্য্যন্ত ভুবেত্তাগণ আপনাদিগের প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিপক্ষেও হপ্‌কিন্স প্রভৃতি গণিতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের কথা ঘাড় পাতিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভূবেত্তাদিগের মধ্যে এক জনও এমন অঙ্ক ও জ্যোতিষ শাস্ত্র বিশারদ ছিলেন না যিনি হপ্‌কিন্স প্রভৃতি অসাধারণ গণিতজ্ঞ পণ্ডিতগণের গণনার ভুল ধরিতে পারেন। ফরাসী পণ্ডিত ডিলনে অঙ্ক ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে হপকিন্সদিগের এক জন সমকক্ষ ব্যক্তি। তিনি উপরি-উক্ত মতটির সমালোচনা করিয়া তাহার অসারতা দেখাইয়া বলিলেন, পৃথিবী দ্রবপদার্থে পূর্ণ হইলে তাহার গতির ব্যতিক্রম ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই। তাহা ছাড়া হপ্‌কিন্সের দোলক যন্ত্রের পরীক্ষা পৃথিবীর সম্পর্কে কেমন করিয়া খাটিবে? প্রথমতঃ, দোলকের গোলক লম্বমান রজ্জু অবলম্বন করিয়া দোলে ও পৃথিবী নিজের মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করে, সুতরাং দোলক যন্ত্রের গতির দৃষ্টান্তে পৃথিবীর গতি নিরূপিত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, কাঁচে পারদ যেরূপ অসংলিপ্ত থাকে ভূগর্ভস্থ পদার্থ তাহার উপরিস্থ আবরণের সহিত সেরূপ বিচ্ছিন্ন থাকিলে হপ্‌কিন্‌সের সিদ্ধান্ত নির্ভুল হইত, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে পৃথিবীর

আবরণের সহিত ভূগর্ভের পদার্থ এমনি সংলিপ্ত যে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সত্ত্বেও উভয়ে কঠিন-পদার্থ নির্ম্মিত একটি বস্তুর ন্যায়ই কার্য্য করে।

পৃথিবী কেন্দ্র পর্য্যন্ত সংঘাত-কঠিন মানিয়া লইলে আর একটি গোল বাধে। তাহা হইলে জ্বালামুখীর * অগ্ন্যুৎ-পাতের কি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? যাঁহাদের মতে ভূগর্ভ কঠিন তাঁহারা বলেন, জ্বালামুখীর অগ্ন্যুৎপাত স্থানীয় কারণ-প্রসূত। পর্ব্বতগর্ভে যে সকল পদার্থ নিহিত থাকে, কালে তাহাই উদ্গীরিত হয়, সে সকল পদার্থ সাধারণ ভূগর্ভের নহে। কিন্তু ইহাতে অনেক আপত্তি আছে। বহুসংখ্যক রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় যে কি ইয়ুরোপ, কি আসিয়া, কি আফ্রিকা, কি আমেরিকা, পৃথিবীর সকল স্থানের জ্বালামুখী হইতে একই প্রকার পদার্থ উদ্গীরিত হয়। সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরে অবস্থিত জ্বালামুখী হইতে স্থানীয় কারণ বশতঃ একই প্রকার পদার্থ নির্গত হওয়া সম্ভবপর নহে। ইহা ছাড়া জর্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক সাইমেনস্ গত বৎসর বিসুবিয়াসের অগ্ন্যুৎপাত দেখিয়া ভূগর্ভের তরলতার পক্ষে অতি সারগর্ভ যুক্তি দেখাইয়াছেন।

তিনি বিসুবিয়াস পর্ব্বতে গিয়া দেখেন, পর্ব্বতের গহ্বর মধ্য হইতে দুই তিন সেকেণ্ড অন্তর সশব্দে বাষ্প নির্গত হইতেছিল। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। পর্ব্বতের খুব গভীর প্রদেশে বাষ্প প্রস্তুত হইয়া যদি হঠাৎ উর্দ্ধে উঠে তাহা হইলেই ঐরূপ হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে প্রত্যেক বারের বাষ্পোদ্গীরণের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে উত্তপ্ত ধাতুস্রোত (Lava) উত্থিত হইবার কথা, এবং পর্ব্বতের ধূমনলের ভিতর উপযুক্ত পরিমাণ ধাতব পদার্থ জমিবার জন্য সময় আবশ্যক। কাজেই তাহা হইলে দুই তিন সেকেণ্ডের মধ্যে সশব্দে কেবল মাত্র বাষ্প উদ্গীর্ণ হইত না। অন্য সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়া সাইমেনস্ এইরূপ বাষ্পোদ্গীরণের এই কারণ দেন যে, নিম্নোত্থিত বিশুদ্ধ কিম্বা বিমিশ্র জলজান বাষ্প উপরের বাতাসের অম্লজানের সহিত মিশিয়া সশব্দে জ্বলিতে থাকে। এবং নানা যুক্তি দেখাইয়া তিনি বলেন, যদি ভূগর্ভ দ্রব-পদার্থময় না হইত তাহা হইলে ভূগর্ভে এত প্রচুর পরিমাণে জলজান বাষ্প জমাইত না।

অপর কতকগুলি বৈজ্ঞানিকেরা অন্য প্রকার যুক্তি দেখাইয়া ভূগর্ভের কাঠিন্য প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক জেম্‌স্ টমসন্ গণনা করিয়া বলেন যে চাপের আধিক্য হইলে কোন বস্তুকে গলাইতে ও দ্রব অবস্থায় রাখিতে

---

* সচরাচর বাঙ্গালা ভাষায় "আগ্নেয় গিরি" এই নূতন-সৃষ্ট কথাটি Volcanoর প্রতিশব্দ বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু সংস্কৃত শকুন্তলায় "জ্বালামুখী" শব্দ যখন ঐ অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায় তখন তাহার পরিবর্ত্তে কোন নূতন কথা সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই।

অপেক্ষাকৃত অধিক উত্তাপের আবশ্যক করিবে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে বুন্‌সেন মোম ও গন্ধক প্রভৃতি দ্রব্যের উপর পরীক্ষা করিয়া এই মতের পোষকতা করেন। পরে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হপকিন্‌স্ নিজে ঐ সকল দ্রব্যে পরীক্ষা করিয়া ভূগর্ভ যে কঠিন—এই মতটি অভ্রান্ত বলিয়া দাঁড় করাইতে চেষ্টা করেন। এই পরীক্ষা অবলম্বন করিয়া বুন্‌সেন বলেন পৃথিবী কেন্দ্র পর্য্যন্ত সংঘাত-কঠিন না হইয়া থাকিতে পারে না। মোমকে উপর্য্যুপরি থাক্-থাক্ করিয়া রাখিলে, তাহার সর্ব্ব প্রথম থাক্ গলাইতে যে উত্তাপ লাগে, দ্বিতীয় থাক্ গলাইতে তাহা অপেক্ষা অধিক উত্তাপ লাগিবে, তৃতীয় থাক্ গলাইতে আরো অধিক, এই রূপে যতই নিম্নের থাকে আসা যায় ততই তাহাকে গলাইতে অধিক উত্তাপের আবশ্যক হয়। পৃথিবীর কেন্দ্রে এত অধিক চাপ যে তথাকার কোন পদার্থকে যে-সে উত্তাপ গলাইতে পারে না। যে পরিমাণ উত্তাপে কেন্দ্রস্থ পদার্থ গলিতে পারে তত প্রচণ্ড উত্তাপ ভূগর্ভে থাকিবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং ভূগর্ভ সংঘাত-কঠিন।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি আছে। মোম, গন্ধক প্রভৃতি যে সকল পদার্থের উপর পরীক্ষা দ্বারা উপরি-উক্ত মতটি স্থাপিত, বাস্তবিক পক্ষে, পৃথিবী সে সকল পদার্থে নির্ম্মিত নহে।

এখন দেখা উচিৎ, পৃথিবী যেরূপ পদার্থে নির্ম্মিত সেই রূপ ধাতব ও আকরিক পদার্থে পরীক্ষা করিলে কি ফল দাঁড়ায়? সার উইলিয়াম্ টম্‌সন্ ও হপ্‌কিন্স্ পরে আবার ধাতব দ্রব্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, জেমস্ টম্‌সনের মতটি সকল দ্রব্যের সম্বন্ধে খাটে না। যে সকল পদার্থ তরল অবস্থা হইতে ঘন অবস্থা পাইবার সময় বিস্তৃত হয় চাপবৃদ্ধি সহকারে সেই সকল বস্তুকে গলাইতে ও দ্রব অবস্থায় রাখিতে অল্প উত্তাপের আবশ্যক করে, এবং যে সকল বস্তু ঐরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তনের সময় সঙ্কুচিত হয় চাপাধিক্য সহকারে তাহাদিগকে গলাইতেই অধিক উত্তাপের প্রয়োজন হয়।

গতবৎসরের প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে সাইমেনস্ এ বিষয় সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। জর্ম্মান দার্শনিক কাণ্ট প্রথমে অনুমান করেন যে জ্বলন্ত বাষ্পরাশি ক্রমে শীতল হইয়া পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ হইয়াছে। পরে ফরাসী গণিতজ্ঞ লাপ্লাস্ এই মতটিকে অনেক অকাট্য যুক্তির উপর দাঁড় করান। এখনকার বিজ্ঞান মণ্ডলীতে সর্ব্বত্রই এই মতটি সমাদৃত। জ্বলন্ত বাষ্পরাশি উত্তপ্ত তরল পদার্থে পরিণত হইয়া ক্রমে আরো শীতল হইতে আরম্ভ হইলে দুই প্রকার হইবার সম্ভাবনা। (১) হয়, তাহার উপরের পৃষ্ঠ শীতল ও কঠিন হইয়া ভিতরের অংশ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তরল অবস্থায় থাকিবে (যেমন সীসের গোলা ঢালাই করিবার কারখানায় সুন্দর রূপে দেখিতে পাওয়া যায়)। (২) নয় তাহার ভিতরের পদার্থ কঠিন হইয়া ক্রমে উপর পর্য্যন্ত কঠিন হইবে। উত্তপ্ত

তরল পদার্থ শীতল হইবার সময় তাহার উপরের স্তর ঘন হইয়া নিম্নে ডুবিয়া পড়ে, এই ঘনীভূত পদার্থ আভ্যন্তরিক তাপে আবার তরল হইয়া যদি উপরে উঠে তাহা হইলেই প্রথমোক্ত অবস্থা হয়। কিন্তু উপরের ঘনীভূত পদার্থ নিম্নে ডুবিয়া গেলে যদি আর তরল না হয় তাহা হইলে সেইখানেই তাহা উত্তরোত্তর গাঢ় হইতে থাকে। পৃথিবী যদি প্রথমোক্তরূপে শীতল হইয়া থাকে তাহা হইলে ভূগর্ভ তরল, যদি শেষোক্তরূপে শীতল হইয়া থাকে তবে ভূগর্ভ কেন্দ্র পর্য্যন্ত প্রায় কঠিন। এখন দেখিতে হইবে পৃথিবী যে পদার্থে নির্ম্মিত তাহা উক্তরূপে নিমগ্ন হইয়া গেলে আবার তরল হইয়া উপরে উঠিবে কিম্বা নিম্নে পড়িয়া ক্রমশঃ সেখানে গাঢ়তর হইতে থাকিবে?

যে বস্তু তরল হইতে দৃঢ় অবস্থা পাইবার সময় বিস্তৃত হয় তাহাই লঘু হইয়া একবার নীচে ডুবিয়া গেলেও আবার তরল হইয়া উপরে উঠে এবং যাহা পূর্ব্বোক্তরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তনের সময় সঙ্কুচিত হয় তাহা আর উপরে উঠে না। সুতরাং দেখা আবশ্যক, পৃথিবী যে পদার্থে নির্ম্মিত তাহা পূর্ব্বোক্তরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তনের সময় বিস্তৃত কিম্বা সঙ্কুচিত হয়। যদি বা সঙ্কুচিত হয়, সে সঙ্কোচনের পরিমাণ কত? সঙ্কোচনের মাত্রা যত কম হইবে, ততই কোন বস্তুকে গলাইবার জন্য কম উত্তাপের আবশ্যক। বিসকফ্ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করেন পৃথিবীর পদার্থ তরল হইতে ঘন হইবার সময় শতকরা ২০ ভাগ সঙ্কুচিত হয়। এই পরীক্ষার উপরে গণনা করিয়াই সার উইলিয়ম টম্সন বলেন ভূগর্ভ কঠিন। কিন্তু ম্যালেট্ বড় বড় লৌহের কারখানায় দেখিয়াছেন মৃত্তিকা প্রভৃতি পদার্থ শতকরা ৬ ভাগ সঙ্কুচিত হয়। সাইমেনস্ বলেন তিনি তাহার ভ্রাতার ড্রেস্‌ডেন নগরস্থ কাঁচের কারখানায় দেখিয়াছেন যে দ্রব কাঁচ শীতল হইবার সময় প্রথম খুব সঙ্কুচিত হয় কিন্তু কিছু পরে তাহার সঙ্কোচনের মাত্রা কমিয়া যায়, এমন কি বোধ হয় শেষে দৃঢ় হইবার মুহূর্ত্তে তাহা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পৃথিবী যে পদার্থে নির্ম্মিত তাহা কাঁচের সমধর্ম্মী, সুতরাং ভূগর্ভের পদার্থ চাপবৃদ্ধি হেতু যে কঠিন হইবে এমন বলা যায় না।

ভূগর্ভ সম্বন্ধে আর যে দুইটি মত বলিবার আছে তাহার যুক্তি গুলি অপেক্ষাকৃত সামান্য। একটির স্থূল মর্ম্ম এই পৃথিবী প্রকাণ্ড হাঁসের ডিমের মত। ডিম্বস্থ শ্বেত পদার্থ যেমন তাহার উপরিস্থ খোলা এবং অভ্যন্তরের লোহিতাংশের মধ্যে অবস্থিত, তেমনি পৃথিবীর আবরণ ও কেন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী-স্থান দ্রব পদার্থে পূর্ণ হইয়া পৃথিবীর উপর নিম্ন দুই ভাগকে বিযুক্ত করিতেছে।

বুন্‌সেন্ মোম গন্ধক প্রভৃতি পদার্থের উপর পরীক্ষা করিয়া বস্তুর দ্রাবনের সম্পর্কে উত্তাপের প্রভাবের বিষয়ে যাহা বলেন তাহাকেই অবলম্বন করিয়া উপরি উক্ত মতটি অবস্থিত। এই মতের প্রবর্ত্তকেরা বলেন, পৃথিবীর যত নীচে যাইবে ততই অধিক চাপ

আর চাপাধিক্য সহকারে কোন বস্তুকে গলাইতে যে কালে উত্তরোত্তর অধিক উত্তাপ লাগে, সেকালে নিম্নের পদার্থকে দ্রব অবস্থায় রাখিতে ক্রমশ অধিক উত্তাপের আবশ্যক। কেন্দ্রে সর্ব্বাপেক্ষা চাপ অধিক; তথাকার পদার্থকে গলাইতে যে প্রচণ্ড উত্তাপের আবশ্যক, তাহা কি কেন্দ্রে আছে? তাঁহারা বলেন কেন্দ্রে অতিশয় উত্তাপ আছে বটে, কিন্তু তথাপি সেখানকার পদার্থকে দ্রব অবস্থায় রাখিবার উপযুক্ত প্রচণ্ড উত্তাপ সেখানে নাই, কাজেই তাহা সংঘাতকঠিন। কিন্তু তেমনি কেন্দ্র হইতে যত উপরে আসা যায় তত চাপ কমে, সেই হেতু ক্রমশ অপেক্ষাকৃত কম উত্তাপেই তৎস্থানীয় পদার্থ দ্রব হয়, কাজেই কেন্দ্র ও পৃথিবীর আবরণের মধ্য স্থলে যে পরিমাণে উত্তাপের প্রভাব তাহাতেই সেই স্থানের পদার্থ দ্রব হইবে।

ভূবেত্তারা উপরি উক্ত মতে কোন আপত্তি করেন না; সম্পূর্ণ তরল না বলিয়া কিছু দূর পর্য্যন্ত ভূগর্ভ তরল বলিলেই তাঁহাদের আর কিছু বলিবার থাকে না। কিন্তু উপরি উক্ত মতের যুক্তি সকল এত সামান্য যে তাহার মূল্য বড় কম। ইহা ব্যতীত পৃথিবী যে প্রকারে উৎপন্ন বলিয়া বৈজ্ঞানিক জগতে স্থির হইয়াছে তাহার সহিত এ মতটী সম্পূর্ণ বিরোধী। সংঘাত হইবার কার্য্য যে পৃথিবীর কেন্দ্র স্থান হইতে আরম্ভ হয় না তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

চতুর্থ মতানুসারে পৃথিবীর উপরিভাগ কঠিন, কিন্তু ভূগর্ভ কেন্দ্র পর্য্যন্ত বাষ্পময়। ইহার পক্ষপোষক যুক্তি গুলি নিতান্ত আনুমানিক, পূর্ব্বের মতের অপেক্ষা এই গুলি আরো অসার। এ মতের প্রবর্ত্তকেরা বলেন পৃথিবীর ঘনত্ব (Mean density) জলের ৫½ গুণ মাত্র। কিন্তু ভূগর্ভে এত বেশী চাপ, যে পৃথিবীর উপরিস্থ কঠিন পদার্থের দ্বারা ভূগর্ভ নির্ম্মিত হইলে চাপের আধিক্য বশতঃ ভূগর্ভস্থ পদার্থ এত ভারী হইত যে গড়ে পৃথিবী জল অপেক্ষা ৫½ গুণের অধিক ঘন হইত। কিন্তু তাহা যে কালে হয় না তখন ইহা স্থির যে, ভূগর্ভ এমন পদার্থে নির্ম্মিত যাহা পৃথিবীর উপরি ভাগে আনিলে অত্যন্ত লঘু হইবে। চাপের আধিক্যে বস্তুর যে ঘনত্বের বৃদ্ধি হয় এই সত্যের উপরেই উপরি-উক্ত অনুমানটি স্থাপিত।

এই নিয়ম অনুসারে পৃথিবীর ৮০ মাইল নিম্নে বাতাস জলের মত ভারী হইবে, জল আবার ৩৬০ মাইল নীচে পারদের ন্যায় ভারী হইবে, এবং কর্দ্দম যাহার প্রত্যেক ঘন ফুটের ভার পৃথিবীর উপরি ভাগে ১ মন ২১ সের ৩৬০ মাইল নীচে তাহার ভার ১৬৮ মন ৩০ সের হইবে, কিন্তু তাহা যেকালে হয় না তখন ভূগর্ভ কেন্দ্র পর্য্যন্ত মাটীর মতন কঠিন দ্রব্যে নির্ম্মিত নহে; সম্ভবতঃ ভূগর্ভ বাষ্পময়। সেই বাষ্প পৃথিবীর উপরে অত্যন্ত লঘু, কিন্তু চাপাধিক্য বশতঃ ভূগর্ভে তাহাতেই বেশ ভার হয়।

কিন্তু এই মতের প্রবর্ত্তকেরা যাহা

বলেন প্রকৃত পক্ষে তাহা হয় না, বাষ্পীয় পদার্থের উপর চাপ অর্পণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে চাপ বৃদ্ধি সহকারে ক্রমিকই যে ভারের বৃদ্ধি হইবে এমন নহে। বরঞ্চ দেখা যায় ক্রমাগত চাপ বাড়াইলে শীঘ্রই এমন এক অবস্থা আসে যখন চাপাধিক্য অনুসারে তাহার আর ঘনত্ব বাড়ে না। যাহা হউক চাপ-বৃদ্ধির দ্বারা যে কি হয় তাহা এখনো সম্পূর্ণ রূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। পূর্ব্বে মনে হইত সমুদ্রের তলায় যেরূপ অধিক চাপ তাহাতে জীব জন্তু কিম্বা কর্দ্দম থাকিতে পারে না, কিন্তু আটলাণ্টিক সাগরের তলা হইতে প্রাণী ও নরম কাদা উঠান হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দেখিয়া ওরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। মানুষের আয়ত্তাধীন চাপ প্রয়োগেই সমস্ত বাষ্পীয় পদার্থ যখন জলাকারে পরিণত হইয়াছে তখন এত ভয়ানক চাপে ভূগর্ভে বাষ্প থাকা সম্ভাব্য নহে।

এইতো একটি একটি করিয়া চারিটি মত সংক্ষেপে বিবৃত হইল। ইহাদের সকলের সমর্থনকারী যুক্তি সকল দেখিলে মনে হয় ভূগর্ভ যে তরল দ্রবপদার্থ-পূর্ণ ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্ভবপর।

ইহা ছাড়া ইতালিয় বৈজ্ঞানিক পালমিয়েরি বলেন, তিনি ঈটনা নামক জ্বালামুখীর গর্ভে জোয়ার ভাঁটা দেখিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ের সত্যতা এখনো নিশ্চিত হয় নাই। এ বিষয়টি সপ্রমাণ হইলে ভূগর্ভের তরলতা সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

ইংলণ্ডে বৈজ্ঞানিকদিগের শীর্ষ-স্থান-স্থিত রাজকীয় জ্যোতির্বেত্তা Sir G. Airy এ বিষয়ে বলেন, "I do think that a large portion of the central part of the earth is fluid and hot."—On the Probable Condition of the Interior of the Earth by Sir George Airy, K. C. B., F. R. S. &c.

বাঙ্গালী কবি নয় কেন?

"বাঙ্গালী কবি নয় কেন?" এ প্রশ্ন লইয়া গম্ভীর ভাবে আলোচনা করিতে বসিলে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের হয়ত ঈষৎ হাস্য রসের উদ্রেক হয়। তাঁহারা বলিবেন, প্রথম প্রশ্ন হউক "বাঙ্গালী কি" পরে দ্বিতীয় প্রশ্ন হইবে, "বাঙ্গালী কি নয়"! যদি জিজ্ঞাসাই করিতে হইল, তবে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করা যায় "বাঙ্গালী দার্শনিক নয় কেন," "বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক নয় কেন" "বাঙ্গালী শিল্পী নয় কেন" "বাঙ্গালী বণিক্

নয় কেন” ইত্যাদি ইত্যাদি। বাঙ্গালী জাতির মত এমন একটা অভাবাত্মক গুণ-সমষ্টির সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন করা যায় যে বাঙ্গালীতে অমুক বিশেষ গুণের অভাব দেখা যায় কেন, তাহা হইলে শ্রোতারা সকলে সমস্বরে হাসিয়া উঠিয়া কহিবেন বাঙ্গালীতে কি গুণের ভাব দেখিতে পাইতেছ? এরূপ ঘটনায় আমাদের মনে আঘাত লাগিতে পারে কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে কি আমাদের একটি কথা কহিবার আছে? “বাঙ্গালী কি” ইহা অপেক্ষা দুরূহ সমস্যা কি আর কিছু হইতে পারে? ও বাঙ্গালী কি নয় ইহা অপেক্ষা সহজ প্রশ্ন কি আর আছে?

তবে আজ, বাঙ্গালী কবি নয় কেন, এ প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করিতে বসিবার তাৎপর্য্য কি? তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আজ কাল শত সহস্র বঙ্গীয় বালক আধ পয়সা মূলধন লইয়া (বিদেশী মহাজন-দিগের নিকট হইতে ধার করা) দিন রাত প্রাণপণ পূর্ব্বক বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে কবিত্ব চাষ করিতেছেন; আজ যখন দেখিলেন বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্র তাঁহাদের যত্নে কাঁটা গাছ ও গুল্মে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাঁহারা কপালের ঘাম মুছিয়া হর্ষ-বিস্ফারিত নেত্রে দশ জন প্রতিবাসীকে ডাকিয়া কহিতেছেন, “আহা, জমী কি উর্ব্বরা!” বঙ্গবাসীগণ স্বপ্নেও স্বজাতিকে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক বলিয়া অহঙ্কার করিয়া বেড়ান না, অতএব সে বিষয়ে তাঁহাদের আত্মবিস্মৃতি লক্ষিত হয় না; কিন্তু সম্প্রতি দেখিতেছি তাঁহারা রাশীকৃত অসার কবিত্বের খড় তাঁহাদের কাক পুচ্ছে গুঁজিয়া দিন রাত্রি প্রাণপণে পেখম তুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করেন, এমন কি ভাল ভাল কুলীন ময়ূরদের মুখের কাছে অম্লান বদনে পেখম নাড়িয়া আসেন; অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ময়ূর বলিয়া তাঁহাদের মনে মনে অত্যন্ত অভিমান হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগকে দশ জন লোক নিযুক্ত রাখিতে হইয়াছে, যাহারা অগ্রে অগ্রে যাইয়া উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করিতে থাকে, “আমাদের পশ্চাতে যাঁহাদের দেখিতেছ, তাঁহারা কাক নন, তাঁহারা ময়ূর!” আজ কাল ত এই রূপ দেখিতেছি। বহু দিন হইতে ভাবিতেছি, বাঙ্গালী কেন আপনাকে কবি বলিয়া এত অহঙ্কার করে, জিজ্ঞাসা করিলে অনেকে বলে, “দেখিতেছ না, আজ কাল বাঙ্গালার সকলেই কবিতা লেখে।” সকলেই মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাঙ্গালা বর্ণমালা কাগজে গাঁথিতেছে, তাহা দেখিয়াই যদি বাঙ্গালী জাতিকে বিশেষ রূপে কবি জাতি আখ্যা দেও, হে চাষা, ক্ষেত্রে অগণ্য কাঁটা গাছ দেখিয়া ফসল ভ্রমে যদি তোমার মনে বড় আনন্দ হইয়া থাকে, তবে তোমার মঙ্গলের জন্যই তোমার সে ভ্রম ভাঙ্গা আবশ্যক।

যদি এমন একটা কথা উঠে যে, 'ইংরাজ কবি কেন, তবে তাহা লইয়া দুই দণ্ড আলোচনা করিতে ইচ্ছা করে। ভাবিয়া দেখিলে কি আশ্চর্য্য বোধ হয় না যে, যে

ইংরাজেরা এমন কাজের লোক, বাণিজ্য বৃত্তি যাহাদের ব্যবসায়, সময়কে যাহারা কান ধরিয়া খাটাইয়া লয়, একটি মিনিটকেও ফাঁকি দিতে দেয় না, জীবিকার জন্য যাহাদিগকে সংগ্রাম করিতে হয়, বাহ্য সুখ সম্পদই যাহাদের উপাস্য দেবতা, যাহারা রাজ্যতন্ত্রীয় মহাসাগরে দিন রাত মগ্ন থাকিয়া প্রত্যেকেই নিজ নিজ পুচ্ছ আস্ফালনে সেই সমুদ্রকে অবিরত ফেনিত প্রতিফেনিত করিতেছে, তাহারা এমন কবি হইল কিরূপে? ইংলণ্ড দেশে, অমন একটা ঘোরতর কাজের ভিড়ের মধ্যে, হাট বাজারের দর-দামের মধ্যে, বড় রাস্তার ঠিক পাশেই—যেখানে আমদানি ও রপ্তানির বোঝাই করা গাড়ি দিন রাত আনাগোনা করিতেছে,—সেখানে কি করিয়া কবিতার মত অমন একটি সুকুমার পদার্থ নিজের সাধের নিকেতন বাঁধিল? আর আমরা যে, এই বঙ্গদেশে সূর্য্যাতপে বসিয়া ঘুমন্ত ঝিমন্ত স্বপ্নন্ত জীবন বহন করিতেছি, শত সহস্র অভাব আছে অথচ একটি অভাব অনুভব করি না, বাঁচিয়া থাকিলেই সন্তুষ্ট, অথচ ভাল করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার আবশ্যক বিবেচনা করি না, আমরা কেন উচ্চ শ্রেণীর কবি হইলাম না? অনেক কারণ আছে।

আমাদের জাতীয় চরিত্রে উত্তেজনা নাই। উত্তেজনা নাই বলিতে বুঝায়, আমরা কিছুই তেমন গভীর রূপে, তেমন চূড়ান্ত রূপে অনুভব করিতে পারি না। ঘটনা ঘটে, আমাদের হৃদয়ের পদ্মপত্রের উপর পড়িয়া তাহা মুহূর্ত্তকাল টলমল করে, আবার পিছলিয়া পড়িয়া যায়। এমন কিছুই ঘটিতে পারে না, যাহা আমাদের হৃদয়ের অতি মর্ম্ম স্থলে প্রবেশ করিয়া সেখানে একটা আন্দোলন উপস্থিত করিতে পারে। আমরা সন্তুষ্ট প্রকৃতির লোক। সন্তুষ্ট-প্রকৃতির অর্থ আর কিছুই নহে, তাহার অর্থ এই যে, আমাদের অনুভাবকতা তেমন তীব্র নহে, আমরা সুখ ও দুঃখ তেমন প্রাণপণে অনুভব করিতে পারি না। সুখ যদি আমাদের চক্ষে তেমন স্পৃহনীয় ঠেকিত, দুঃখ যদি আমাদের নিকট তেমন ভীতিজনক দন্ত বিকাশ করিত, তাহা হইলে কি আমরা অদৃষ্ট নামে একটা বল্‌গা রজ্জু হীন ছুটন্ত অন্ধ অশ্বের উপর চড়িয়া বসিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে ঢুলিতে পারিতাম? আমাদের ঘৃণা নাই, আমাদের ক্রোধ নাই, অন্তর্দাহী জ্বলন্ত আগ্নেয় পদার্থের ন্যায় চিরস্থায়ী প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি নাই। একটা অন্যায় ব্যবহার শুনিলে ঘৃণায় আমাদের আপাদ মস্তক জ্বলিতে থাকে না, একটা অন্যায়াচরণ পাইলে আমরা ক্রোধে আত্মহারা হই না, ও যত ক্ষণ না তাহার প্রতিহিংসা সাধন করিতে পারি ততক্ষণ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে রক্ত ফুটিতে থাকে না। আমাদের ক্ষীণ দুর্ব্বল শরীরে অত উত্তেজনা সহিবেই বা কেন? আমাদের এই অল্প-পরিসর বক্ষের মধ্যে, আমাদের এই জীর্ণ-জর্জ্জর হাড় কখানির ভিতরে অত ঘৃণা, অত ক্রোধ যদি জ্বলিতে থাকে, দুখে ও

দুঃখে যদি অত তরঙ্গ তুলিতে থাকে, তবে আমাদের পঞ্চাশ বৎসরের পরমায়ু কত সংক্ষিপ্ত হইয়া আসে! আমাদের মত এমন একটি ভগ্নপ্রবণ এঞ্জিনে অত অগ্নি, অত বাষ্প সহিবে কেন? মুহূর্ত্তে ফাটিয়া যাইবে। আমাদের হৃদয়ে বিস্ফারক মনোবৃত্তি সকল যেমন হীনপ্রভ, সঙ্কোচক মনোবৃত্তি সকল তেমনি স্ফূর্ত্তিমান। আমরা ভয়ে জড়সড় হই, লজ্জায় মাটিতে মিশাইয়া যাই। সে লজ্জা আবার আত্মগ্লানি নহে, আত্মগ্লানির দাহকতা আছে; দোষ করিয়া নিজের নিকট নিজে লজ্জিত হওয়াত পৌরুষিকতা। আমাদের লজ্জা, দশ জনের চোখের সুমুখে পড়িয়া জড়সড় হইয়া যাওয়া, পরের নিন্দা-সূচক ঘৃণার দৃষ্টিপাতে মর'মর' হইয়া পড়া, একটা ঘোমটা থাকিলেই আর এ সকল লজ্জা থাকিত না। যে সকল মনোবৃত্তিতে উত্তেজিত করে ও একটা কোন কার্য্যে উদ্যত করে তাহা আমাদের নাই, কিন্তু যে সকল মনোবৃত্তিতে আমাদের সঙ্কুচিত করে ও সকল কার্য্য হইতে বিরত করে তাহা আমাদের আছে। আমাদের দেশে রাগারাগী হইয়া তৎক্ষণাৎ একটা খুনাখুনি হইয়া যায় না। বলবান জাতিদের মত বিশেষ রাগ হইলেই অমনি ঘুষি আগেই লাফাইয়া উঠে না; রাগ হওয়া ও হাতাহাতি হওয়ার মধ্যে একটি দীর্ঘ ব্যবধান গালাগালিতেই কাটিয়া যায় এবং আমাদের দুর্ব্বল-শরীর ক্রোধ সেই সময়ের মধ্যেই প্রায় প্রাণ ত্যাগ করে। কেবল রাগ নহে আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তিই এত দুর্ব্বল যে তাহারা তাহাদের ক্ষীণ হস্তে ধাক্কা মারিয়া আমাদের কোন একটা কাজের মধ্যে ঠেলিয়া দিতে পারে না। যদি বা দেয় ত সে কাজ সমাপ্ত হইতে না হইতে সে নিজে পলায়ন করে; যদি বা লিখিতে ব'স তবে বড় জোর কর্ত্তা ও কর্ম্ম পর্য্যন্ত লিখা হয়, কিন্তু ক্রিয়া কোন কালে লেখা হয় না; যেমন, যদি লিখিতে চাও যে, "বঙ্গনন্দন বাবু দেশলাই প্রস্তুত করিতেছেন" তবে বড় জোর "বঙ্গনন্দন বাবু" ও "দেশলাই" পর্য্যন্ত লেখা হয়, কিন্তু "প্রস্তুত করিতেছেন" পর্য্যন্ত আর লিখা হয় না। বলাই বাহুল্য যে, যাহার মনোবৃত্তি সকল অত্যন্ত দুর্ব্বল, সে কখনো কবি হইতে পারে না। যে বিশেষরূপে অনুভব করে না সে বিশেষ রূপে প্রকাশ করিতে পারে না। বলা বাহুল্য যে, বাঙ্গালীর হৃদয়ে ভাবের অর্থাৎ অনুভাবকতার গভীরতা, বলবত্তা নাই, তাহা যদি থাকিত তবে কার্য্যের এত দারিদ্র দশা কেন থাকিবে? অতএব বাঙ্গালী জাতি যদি না ভাবে ত সে প্রকাশ করিবে কিরূপে? কবি হইবে কিরূপে?

আমরা যে এত অনুভব কম করি কেবলমাত্র অনুভাবকতার অল্পতা তাহার কারণ নহে। তাহার কারণ আমাদের কল্পনার দৃষ্টি অতি সামান্য। যে ব্যক্তির কল্পনা অধিক, সে ব্যক্তির অনুভাবকতাও তেমনি তীক্ষ্ণ। কল্পনা আমাদের হৃদয়ে দর্পণের ন্যায় বর্ত্তমান। যাহার কল্পনা মার্জ্জিত ও মসৃণ তাহার

হৃদয়ে প্রতিবিম্ব অতি সমগ্র ও সম্পূর্ণ হয়; প্রতিবিম্বও সত্য পদার্থের মত প্রতিভাত হয়, কিন্তু মলিন কল্পনায় প্রতিবিম্ব অতি অস্পষ্ট হয়, ভাল করিয়া দেখা যায় না। একটা ঘটনা যদি হৃদয়ে ভাল করিয়া প্রতিবিম্বিতই না হইল, যদি তাহা ভাল করিয়া দেখিতেই না পাইলাম, তবে তজ্জনিত সুখ বা দুঃখ হইবে কেন? একজন কাল্পনিক ব্যক্তি যখন বহুদিন পরে বিদেশ হইতে দেশাভিমুখে যাত্রা করে, তখন দেশে আসিলে তাহার আত্মীয় বন্ধুদিগের নিকট কিরূপ সমাদর পাইবে, তাহার এমন একটি জাজ্জ্বল্যমান চিত্র তাহার কল্পনাপটে অঙ্কিত হয় যে, সে আনন্দে অধীর হইয়া পড়ে। সে চক্ষু মুদিয়া স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে, যেন সে তাহার সেই পুরাতন বাটির প্রাঙ্গণে গিয়া পৌঁছিয়াছে, সেই সম্মুখে আতা গাছটি রহিয়াছে, এক পাশে গাভীটি বাঁধা রহিয়াছে, ছোট মেয়েটি দাওয়ায় বসিয়া খেলা করিতেছে, সে তাহাকে দেখিয়া কি বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, মা কি বলিয়া ছুটিয়া আসিলেন, বাড়িতে কিরূপ একটা কোলাহল পড়িয়া গেল, সমস্ত সে দেখিতে পায়; কে তাহাকে কি প্রশ্ন করিবে তাহা সে কল্পনা করিতে থাকে এবং সে তাহার কি উত্তর দিবে তাহা পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া রাখে। কল্পনা যদি এমন জাজ্বল্যমান না হয়, তবে সে কখনো স্পষ্ট সুখ অনুভব করিতে পারে না। যখন একজন ভাবী দারিদ্র্য-দুঃখ ভাবিয়া আত্মহত্যা করে, তখন সে তাহার ভবিষ্যৎ দুঃখের দশা বর্ত্তমানের মত অতি স্পষ্ট ও জীবন্ত করিয়া দেখে, নহিলে আত্মহত্যা করিতে পারে না।

যে ব্যক্তির অনুভাবকতা অধিক সে ব্যক্তি কাজ করে, সে কখনো নিরুদ্যম থাকিতে পারে না। সুখ তাহাকে এত আনন্দ দেয় যে, সুখের জন্য সে প্রাণপণ করে, দুঃখ তাহাকে এত কষ্ট দেয় যে, দুঃখের হাত এড়াইতে সে বিধিমতে চেষ্টা করে। বাঙ্গালীরা কাজ করিতে চাহে না, কেন না তাহারা জানে যে, কোনরূপে দিনপাত হইয়া যাইবে। কষ্ট হউক্ দুঃখ হউক্ কোন রূপে দিন পাত হইলেই সন্তুষ্ট। যাহাদের অনুভাবকতা অধিক, তাহাদের কি এরূপ ভাব? এমন হয় বটে, যে, অনেক সময় আমরা অনুভব করি কিন্তু শরীরের দৌর্ব্বল্য বশতঃ সে অনুভাবকতা আমাদের কাযে নিয়োগ করিতে পারে না। কিন্তু তেমন অবস্থায় ক্রমেই আমাদের অনুভাবকতা কমিয়া যায়। অনবরত যদি দুঃখের কারণ ঘটে, অথচ তাহার প্রতিকার করিতে না পারি; চুপ চাপ বসিয়া দুঃখ সহিতেই হয়, জানি যে, কোন চারা নাই, তাহা হইলে মন হইতে দুঃখবোধ কমিয়া যায় ও অদৃষ্টবাদ শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস জন্মে। যেমন করিয়াই হউক্ অনুভাবকতার হ্রাস হয়ই!

বহুকাল হইতে একটা জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে যে, কাজের সহিত কল্পনার মুখ-দেখাদেখি নাই। কল্পনা যদি এখানে থাকে ত কাজ ওখান দিয়া চলিয়া

যায়। সচরাচর লোকে মানুষকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে, কাজের লোক ও কল্পনাপ্রধান লোক। কাজের লোক যদি উত্তর মেরুতে থাকে ত কল্পনাপ্রধান লোক দক্ষিণ মেরুতে থাকিবে। কিন্তু ভাবনা ও প্রকাশের মধ্যে যেরূপ অকাট্য সম্বন্ধ কল্পনা ও কাজের মধ্যে কি ঠিক তেমনি নহে? তুমি একটি ছবি আঁকিতে চাও, আগে কল্পনায় সে ছবি না উঠিলে কি রূপে তাহা আঁকিবে? মাটির উপর তোমাকে একটি বাড়ি গড়িতে হইবে কিন্তু তাহার আগে শূন্যের উপর সে বাড়ি না গড়িলে চলে কি? যদি কাজের বাড়ি গড়িবার পূর্ব্বে কল্পনার বাড়ি গড়া নিতান্তই আবশ্যক, তবে কল্পনার বাড়ি যত পরিষ্কার ও ভাল করিয়া গড় কাজের বাড়িও তত ভাল হইবে সন্দেহ নাই। কল্পনার ভিত্তিতে বাড়ি যদি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ না হয় তবে মাটীর উপর গড়িতে তাহা পাঁচবার করিয়া ভাঙ্গিতে হইবে। *

অতএব দেখা যাইতেছে, যে কল্পনা কাজের বাধা জনক নহে বরঞ্চ শ্রীবৃদ্ধি সাধক। তবে কেন কল্পনার নামে অনর্থক এরূপ একটা বদনাম হইল? বোধ হয় তাহার কারণ এই যে, যাহারা নিত্যনিয়মিত ধরাবাঁধা কাজ করে, যে কাজে একটা যন্ত্রের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধি থাকিবার আবশ্যক করে না, কালও যাহা করিয়াছিলাম আজও তাহা করিতেছি, আর কালও তাহাই করিতে হইবে, তাহাদের কল্পনা খোরাক

* অনেকে ভুল বুঝিতে আশ্চর্য্য রূপে পটু। তাঁহাদের ধন্য বলিতে হইবে। তাঁহাদের যদি বলা যায় যে, কামানের গোলা লাগিলে মানুষ মরিয়া যায়, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠেন, "বিলক্ষণ! এই সে দিন দেখিলাম সাতকড়ি সার্ব্বভৌম মহাশয়ের লোকান্তর প্রাপ্তি হইল, কিন্তু বিশ ক্রোশের মধ্যে একটি কামান ছিল না!" এত ক্রোধ যে, তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া মারিতে উদ্যত। তাঁহাদের বলা গেল যে, কবি হইতে গেলে শিক্ষার আবশ্যক, তাঁহারা বলিলেন "কই, শিক্ষিত ব্যক্তিরা ত কবি হয় না!" তাঁহাদের প্রতি লেখকের এই নিবেদন যে, যখন তাঁহাদের বলা হয় যে, "আগুনের উপর না চড়াইলে পায়স প্রস্তুত হয় না" তখন তাঁহারা মনে না করিয়া বসেন যে, আগুনের উপর জল চড়াইলেও পায়স প্রস্তুত হয়। বক্তার এই বলা অভিপ্রায় যে, আগুনের উপর দুধ ও চাল চড়াইলেই তবে পায়স হয়। বক্তা জানিতেন যে, যাহাকে বলা হইতেছে সে জানে কি কি পদার্থে পায়স প্রস্তুত হয়, কেবল জানে না যে, আগুনের উপর চড়ান' পায়স প্রস্তুত করনের একটা অঙ্গ। যাহার কবিত্ব আছে শিক্ষায় সেই কবি হয়। বর্ত্তমান লেখক যাঁহাদের জন্য এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, কবির কল্পনা থাকা নিতান্ত আবশ্যক, কেবল তাঁহারা অস্বীকার করেন যে, কবির প্রকাশক্ষমতা ও শিক্ষার আবশ্যক, এই জন্য কল্পনার বিষয়ে কিছুই বাহুল্য উল্লেখ করা হয়নি। যাহা হউক, উপরি উক্ত শ্রেণীর পাঠকদিগের জন্য কি এমন একটি বাহুল্য কথা বলিতে হইবে যে, কল্পনা থাকিলেই যে, ভাল বাড়ি গড়া হয় তাহা নহে; দুই সমশ্রেণীর কারিকরের মধ্যে যাহার কল্পনা অধিক সেই অপরের অপেক্ষা ভাল বাড়ি গড়িবে!

না পাইয়া অত্যন্ত ম্রিয়মান হইয়া পড়ে। এবং যাহাদের কল্পনা অধিক, তাহারা এরূপ কাজ করিতে সম্মত হয় না। তাঁহারা এমন কাজ করিতে চায় যাহাতে কিছু সৃষ্টি করিবার আছে, ভাবিবার আছে। একজন কাল্পনিক পুত্রকে যখন তাঁহার পিতা কহেন "ইহার কিছু হইবে না" তখন তাঁহার কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এ হতভাগ্যের পুত্র কেরাণী হইতে পারিবে না বা হিসাব রাখিবার সরকার হইতে পারিবে না। কিন্তু একটা মহান কাজ মাত্রেই কল্পনার আবশ্যক করে তাহা বলাই বাহুল্য। নিউটন বা নেপলিয়নের কল্পনা কি সাধারণ ছিল? ইংলণ্ডের লোকেরা কাজের লোক! এ কথা সত্য বটে কাজের লোক বলিতে বুঝায় যে তাহার মধ্যে অধিকাংশই চিঠি কাপি করা হিসাব রাখা প্রভৃতি ধরাবাঁধা কাজে ব্যস্ত। কিন্তু তাহা হইতে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়? যে দেশে যন্ত্রের বাহুল্য সে দেশে যন্ত্রীর বাহুল্য। একজন বা দুই জন বা কতকগুলি লোকে মিলিয়া একটা প্রকাণ্ড কাজের সৃজন ও স্থাপন করে ও তাহাতেই দশ জনে মিলিয়া খাটে। অন্ধকারে যদি কেবল দেখিতে পাও যে, দুইটি হাত ভারি কাজে ব্যস্ত আছে, তৎক্ষণাৎ জানিবে কাছাকাছি একটা মস্তক আছে। যে শরীরের মাথা নাই, সে শরীরের হাতে কোন কাজ থাকে না। ইংলণ্ডে অত্যন্ত কাজের ভিড় পড়িয়াছে, তাহা হইতে প্রমাণ হইতেছে ইংলণ্ডের মাথা আছে। যখন তুমি দেখ যে শরীরের অধিকাংশ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ না ভাবিয়া যন্ত্রের মত কাজ করে, পা চলিতেছে কিন্তু পায়ের ভিতরে মস্তিষ্ক নাই, পা ভাবিয়া চিন্তিয়া চলে না, অন্যান্য প্রায় সকল অঙ্গই সেইরূপ, তখন তুমি মনে কর না যে সে শরীরটায় মস্তিষ্ক নাই। একজন ব্যক্তির কল্পনা আছে বলিয়া দশজন অকাল্পনিক লোক কাজ পায়। ইংলণ্ডে যে এত কাজ দেখিতেছি তাহার অর্থ ইংলণ্ডে অনেক কাল্পনিক লোক আছে। এক জন দরিদ্র ইংরাজ যে তাহার স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া অতি দূরদেশে গিয়া ধন সঞ্চয় করিয়া সম্পত্তিশালী হইয়া উঠে তাহার কারণ তাহার কল্পনা আছে। এই কল্পনায় ইংরাজদের কোথায় না লইয়া গিয়াছে বল দেখি। কোথায় আফ্রিকার রৌদ্রতপ্ত জ্বলন্ত হৃদয়, আর কোথায় উত্তর মেরুর তুষারময় জনশূন্য মরু প্রদেশ, কোথায় তাহারা না গিয়াছে? যাহা অনুপস্থিত, যাহা অনধিগম্য, যাহা দুষ্প্রাপ্য, যাহা কষ্টসাধ্য, অকাল্পনিক লোকেরা তাহার কাছ দিয়া ঘেঁসিবে না। যাহা উপস্থিত নাই অকাল্পনিক লোকদের কাছে তাহার অস্তিত্বই নাই। বর্ত্তমানে যাহার মূল নিতান্ত স্পষ্ট প্রত্যক্ষ না হইতেছে, এমন কিছু তাহারা বিশ্বাস করিতে চাহে না, এমন কি অনুভব করিতে পারে না। এই জন্য অকাল্পনিক লোকেরা একটা কিছু সৃষ্টিছাড়া আশা করে না। সুতরাং কাল্পনিক লোকেরা যেমন অনেক বিষয়ে

সূর্য্যাস্ত হয়, কিন্তু কয়জন একবার চাহিয়া দেখে? এমন সকল উদাসীন, বাহ্য বিষয়ে নির্লিপ্ত লোকদের জন্য কেন এমন সুন্দর দেশ সৃষ্ট হইয়াছিল? কয়জন বাঙ্গালী কেবলমাত্র চক্ষু চরিতার্থ করিবার জন্য হিমালয়ে যায়? আমাদের পাঠকদের মধ্যে কয়জন ঘাটগিরি দেখিয়াছেন, ইলোরার গুহা দেখিয়াছেন? একটু কৌতূহল থাকিলে দেখিবার শত সহস্র অবসর ও উপায় পাইতেন। বাহ্য দৃশ্য আমরা উপভোগ করিতেই জানি না। একটি সামান্য গুল্মের পর্ণ যতই সুন্দর হউক্ না কেন, আমরা তাহা মাড়াইয়া যাই; কখনো একবার নত হইয়া দেখি? আর আমার পার্শ্বস্থ আমার ইংরাজ সহচরটি কেন তাড়াতাড়ি সেটি তুলিয়া লইয়া শুকাইয়া যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া দেয়? বাহ্য বিষয়ে ঔদাসীন্য বোধ করি আমাদের কুলক্রমাগত গুণ। সংসার অনিত্য, সংসার স্বপ্ন। একটা ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, উহাতে অত মনোনিবেশ করিয়া কি দেখিতেছ? উহাত দুদণ্ডেই শুকাইয়া পড়িবে! সকলই তুচ্ছ, কিছুই চক্ষু মেলিয়া দেখিবার নাই। যাহা কিছু দেখিবার আছে, সকলই চক্ষু মুদিয়া। জীবনের কূট সমস্যা সকল মীমাংসা কর। কিন্তু ইহা কি বুঝিবে না, ঐ অস্থায়ী ফুল যাহা শিক্ষা দেয় তাহা চিরস্থায়ী! সুন্দর দ্রব্যের প্রতি ভালবাসার চর্চ্চা, যেমন শিক্ষা তেমন শিক্ষা আর কি হইতে পারে? এই বাহ্য প্রকৃতির প্রতি ঔদাসীন্য আমাদের কবিতাতে স্পষ্টই লক্ষিত হয়। যে ভাল কবি অর্থাৎ যাহার মনে সৌন্দর্য্য জ্ঞান বিশেষ রূপে আছে, সে কি কখনো এমন সুন্দর জগতের বাহ্য মুখশ্রী দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে? আমাদের বাঙ্গলা কবিতাতে এমন কেন দেখা যায় যে, এক জন কবি একটি কাননের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, আর এক জনও ঠিক সেই রূপ করিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, যখন আমরা একটি কানন দেখি তখন সে কাননের মুখের দিকে আমরা ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি না; কাননের যে কি ভাব আছে তাহা আমরা বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন চোখে দেখি না। দেখিবার ইচ্ছাই নাই, দেখিবার ক্ষমতাই নাই। আমরা কেবল জানি যে, কানন অর্থে একটি ভূমি খণ্ড, যেখানে ফুলের গাছ আছে। আমরা জানি যে, মল্লিকা, মালতী প্রভৃতি ফুল দেখিতে ভাল, এবং কবিতায় সে সকল ফুলের নামোল্লেখ করিলে ভাল শুনাইবে; তাহা তুমিও জান, তাহা আমিও জানি। কিন্তু কাননের মুখে এমন সকল ভাব বিকাশ পায়, যাহা ভাগ্যক্রমে তুমিই দেখিতে পাও, আমি দেখিতে পাই না, তুমিই জানিতে পার, আমি জানিতে পারি না. সে সকল ভাব আমাদের চক্ষে পড়ে না। এই জন্যই বাঙ্গালা কাব্যে নিম্নলিখিত রূপে কানন বর্ণিত হয়—

মোহিনী মোহকর মহীরুহ রাজি
প্রকাশিল সুন্দর কিশলয়ে সাজি।
ধাবিল সমীরণ মলয় সুগন্ধি;
চুম্বনে ঘন ঘন কুসুম আনন্দি।

কাঁপিল ঝর ঝর তরু শিরে সাধে,
শিহরিত পল্লব মরমর নাদে।
হাসিল ফুল্ল ফুল মঞ্জুল মঞ্জুল,
মোদিত মৃদুবাসে উপবন ফুল।
কোকিল হরষিল কুহুরবে কুঞ্জ,
শোভিল সরোবরে সরোজিনী পুঞ্জ।
নাচিল চিত সুখে ময়ূর কুরঙ্গ;
গুঞ্জরে ঘন ঘন মধু পানে ভৃঙ্গ।
সুন্দর শতদল প্রিয়তর আভা
স্ফুরয় অরধ, অরধ শশি শোভা।
শোভিল সুতরুণ সুল জল অঙ্গে;
বিরচিল হ্লাদিনী মায়াবন রঙ্গে।

ইহাতে না আছে কাননের শরীর না আছে কাননের প্রাণ। বীরবর সিংহের বর্ণনা করিতে গিয়া যদি তুমি বল যে, তাহার এক জোড়া হাত, এক জোড়া চোক ও এক জোড়া কান আছে, তাহা হইলে শ্রীযুক্ত বীরবর সিংহের চিত্র আমাদের মনে যেরূপ উদিত হয়, উপরিউদ্ধৃত বর্ণনায় কাননের চিত্র আমাদের হৃদয়ে তেমনি উঠিবার কথা। বীরবর সিংহের ওরূপ হাস্যজনক বর্ণনা করিলে বলা যায় যে, বর্ণনাকারী বীরবরের চেহারা একেবারে কল্পনাই করেন নাই। বাহ্য আকার বর্ণনা ছাড়া আর এক প্রকারে বীরবরের বর্ণনা করা যাইতে পারে; বলা যাইতে পারে, বীরবরের দৃঢ়সংলগ্ন ওষ্ঠাধর তাহার স্থির প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিতেছে, তাহার জ্যোতির্ম্ময় নেত্রের দৃষ্টিপাত মর্ম্মভেদী, ও তাহার উন্নত ললাট ভাবনার ভরে যেন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এরূপ বর্ণনার গুণ এই যে, এক মুহূর্ত্তে বীরবরের সহিত আমাদের আলাপ হইয়া যায়। ইহাতে বুঝায়, বর্ণনাকারী বীরবরের চেহারা বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন। Shelleyর কবিতা হইতে একটি দ্বীপের বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ অসম্ভব।

"It is an isle under Ionian skies,
Beautiful as a wreck of paradise,
* * * *
The light clear element which the isle wears
Is heavy with the scent of lemon flowers,
Which floats like mist laden with unseen showers;
And falls upon the eyelids like faint sleep;
And from the moss violets and jonquils peep,
And dart their arrowy odour through the brain
Till you might faint with that delicious pain.
And every motion, odour, beam, and tone,
With that deep music is in unison
Which is a soul within the soul: *
* * * *
The winged storms, chanting their thunder psalm

To other lands, leave azure chasms of calm
Over this isle, or weep themselves in dew,
From which its fields and woods ever renew
Their green and golden immortality.
And from the sea their rise, and from the sky
There fall, clear exhalations, soft and bright,
Veil ofter veil, each hiding some delight:
Which sun or moon or zephyr draw aside.
Till the isle's beauty like a naked bride
Glowing at once with love and loveliness,
Blushes and trembles at its own excess.

* * * *

But the chief marvel of the wilderness
Is a lone dwelling, built by w hom or how
None of the rustic island people know.

* * * *

And, day and night, aloof, from the high towers
And terraces, the earth and ocean seem
To sleep in one another's arms, and dream
Of waves, flowers, clouds, woods rocks, all that we
Read in their smiles, and call reality.'

অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়া মাঝে মাঝে ছাড়িয়া দিতে হইল এজন্য ইহার অত্যন্ত রসহানি করা হইয়াছে। Shelley এমন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে, ঐ দ্বীপটি তিনি মনে মনে বিশেষ রূপে উপভোগ করিয়াছেন, বড় ভাল লাগিয়াছে তাই এত উচ্ছ্বাস। কেবল মাত্র কতকগুলি সত্যের উল্লেখ করিয়া যান নাই, প্রতি ছত্রে তাঁহার নিজের মনোভাব দীপ্তি পাইতেছে। যে দ্রব্য আমাদের ভাল লাগে, যে দ্রব্য আমরা প্রাণের সহিত উপভোগ করি, তাহা বর্ণনা করিতে হইলে আমরা নানা বস্তুর সহিত তাহার তুলনা করিতে চাই; তাহার নানা প্রকার নামকরণ করি। আমরা আমাদের ভালবাসার লোককে, "নয়ন-অমৃত রাশি," "জীবন-জুড়ান' ধন," "হৃদি-ফুল হার" এবং এক নিশ্বাসে এমন শত প্রকার সম্বোধন করি কেন? সে যে, কত খানি আমাদের আনন্দদায়ক তাহা ঠিকটি প্রকাশ করিতে আমরা কথা হাতড়াইয়া বেড়াই, এটা একবার, ওটা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি কিছুতেই মনস্তুষ্টি হয় না। আমাদের কল্পনার ভাণ্ডারে, তাহার সহিত

ওজন করিবার উপযুক্ত বাটখারা খুঁজিয়া পাই না। মনের আগ্রহে ছটাক হইতে মণ পর্য্যন্ত যাহা কিছু হাতে পাইতেছি সমস্তই তুলাদণ্ডে চড়াইতেছি, কিন্তু কিছুতেই সমান ওজন হইতেছে না। মনে হয়, আমাদের ভাষার ডানা এমন লোহময়, যে, আমার ভালবাসা যে উচ্চে অবস্থিত সে পর্য্যন্ত সে উড়িতে পারে না; বার বার করিয়া চেষ্টা করে ও বার বার করিয়া পড়িয়া যায়। একটি Nightingale-এর গানের বিষয়ে Shelley কি লিখিতেছেন পাঠ কর। কেবল মাত্র যদি বলা যায় যে, কোকিল অতি মিষ্ট গান করিতেছে, তাহার এক কবিতা, আর নিম্ন লিখিত বর্ণনার এক স্বতন্ত্র কবিতা।

A woodman whose rough heart was out of tune
Hated to hear, under the stars or moon,
One nightingale in an interfluous wood
Satiate the hungry dark with melody
And as a vale watered by a flood,
Or as the moonlight fills the open sky
Struggling with darkness—asa tuberose
Peoples some Indian dell with scents which lie
Like clouds above the flowers from which they rose—
The singing of that happy nightingale
In this sweet forest, from the golden close
Of evening till the star of dawn may fail,
Was interfused upon the silentness.
The folded roses and the violets pale
Heard her within their slumbers; the abyss
Of heaven with all its planets; the dull ear
Of the night-cradled earth; the loneliness
Of the circumfluous waters, Every sphere,
And every flower and beam and cloud and wave,
And every wind of the mute atmosphere,
And every beast stretched in its rugged cave
And every bird lulled on its mossy bough,
And every silver moth fresh from the grave
Which is its cradle * * *
* * * and every form
That worshipped in the temple of night.

Was awed into delight, and by the charm
Girt as with an interminable zone,
Whilst that sweet bird, whose music was a storm
Of sound, shook forth the dull oblivion
Out of their dreams. Harmony became love
In every soul but one."

মনে হয় না কি যে, গান শুনিতে শুনিতে কবির চক্ষু মুদিয়া আসিয়াছে, মনুষ্য হৃদয়ে যতদূর সম্ভব তত দূর পর্য্যন্ত উপভোগ করিতেছেন? এই মুহূর্ত্তে আমার হস্তে অবকাশরঞ্জিনী দ্বিতীয় ভাগ রহিয়াছে। সমস্ত বহি খুঁজিয়া দুই একটি মাত্র স্বভাব বর্ণনা দেখিলাম। তাহাও এমন নির্জ্জীব ও নীরস, যে, পড়িয়া স্পষ্ট মনে হয়, কবি যাহা বর্ণনা করিতেছেন, প্রাণের সহিত তাহা উপভোগ করেন নাই। লিখা আবশ্যক বিবেচনায় লিখিয়াছেন। একটি সন্ধ্যার বর্ণনা। মন্দগমনা, বিষণ্ণ সায়াহ্নের মুখ যাহার বিশেষ ভাল লাগে, সে কখনো এরূপ নির্জ্জীব বর্ণনা করিতে পারে না। সূর্য্যের সহিত আলোকের অপসরণ, এই প্রাকৃতিক ঘটনা মাত্রকে সে সন্ধ্যা বলিয়া জানে না। তাহার হৃদয়ে সন্ধ্যার একটি স্বতন্ত্র জীবন্ত অস্তিত্ব আছে। সন্ধ্যা তাহার মনের ভিতরে বসিয়া কথা কহে।

"আইল গোধূলি সৌর রঙ্গ ভূমে,—
নামিল পশ্চিমে ধীরে যবনিকা
ধূসর বরণা; ফুরাইল ক্রমে
দিনেশ দৈনিক গতি অভিনয়।
অষ্টমীর চন্দ্র—রজতের চাপ!
নভোমধ্যে স্থলে বিষণ্ণ বদনে
ভাসিল; লভিতে যেন প্রিয় রবি
আলিঙ্গন, ভ্রমি' অলক্ষেতে শশি
অর্দ্ধ সৌর রাজ্য বিরহেতে কৃশ,
নিরাশা মলিন।"

যখন তুমি বল, আমি অমুক স্থানে একটি মানুষকে দেখিলাম, তখন জানিলাম, তুমি খুব অল্পই দেখিয়াছ; যখন বল যে, হরিহরকে দেখিয়াছ, তখন জানিলাম, যে, হাঁ, একটু ভাল করিয়া দেখিয়াছ; আর যখন বল যে, হরিহরকে দেখিলাম তাহার চোখে ও অধরে ক্রোধ, ও সমস্ত মুখে একটি গুপ্ত সংকল্প প্রকাশ পাইতেছে, তখন বুঝিলাম যে, একটি মানুষকে যতদূর দেখিবার তাহা দেখিয়াছ। আমরা কবিতায় যেরূপ স্বভাব বর্ণনা করি, তাহাতে প্রকাশ পায় যে, আমরা সেই মানুষটিকে মাত্র দেখিয়াছি, হরিহরকে দেখি নাই। যদি বা হরিহরকে দেখিয়া থাকি, অর্থাৎ সেই মানুষটির নাক কান চোক মুখ বিশেষ রূপে দেখিয়া থাকি, তথাপি তাহার নাক কান চোক মুখের মধ্যে আর কিছু দেখিতে পাই নাই। যখন আমরা একটি মানুষের ঠোঁটে, চোখে ও সমস্ত মুখে একটা কিছু বিশেষ ভাব দেখিতে পাই তখন আমরা কেবল মাত্র

সেই মানুষকে জীবন্ত বলিয়া দেখি না; তখন তাহার ঠোঁট ও চোখকে আমরা জীবন্ত করিয়া দেখি। তখন আমরা তাহার ঠোঁটের ও চোকের একটি হৃদয়, একটি প্রাণ দেখিতে পাই। এই হৃদয়, এই প্রাণ দেখিতে পাওয়া দেখিতে পাওয়ার চূড়ান্ত ফল। বাঙ্গলা কবিতার স্বভাব বর্ণনায় প্রকৃতির এই হৃদয়, এই প্রাণ দেখিতে পাই না।

"সরোবরে সরোরুহ, কুমুদ কহ্লার সহ
শরতে সুন্দর হোয়ে শোভা দিয়ে ফুটেছে।"

ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখিতে একরূপ চক্ষুর আবশ্যক, আর—

"Then the pied wind flowers and the tulip tall,
And narcissi, the fairest among them all,
Who gaze on their eyes in the stream's recess
Till they die of their own dear loveliness"
And the rose, like a nymph to the bath addressed,
Which unveiled the depth of her glowing breast,
Till, fold after fold, to the fainting air
The soul of her beauty and love lay bare"

ইহা দেখিতে স্বতন্ত্র চক্ষুর আবশ্যক করে।

একটি narcissus ফুল, যে স্রোতের পার্শ্বে ফুটিয়া দিন রাত্রি জলের মধ্যে নিজের মুখখানি, নিজের সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া মরিয়া যায়, তাহার সে একটি মিষ্ট ভাব, অথবা একটি বিকাশোন্মুখ গোলাপের পাপড়ি গুলি যখন একটী একটি করিয়া খুলিতে থাকে অবশেষে তাহার অতুল রূপ একেবারে অনাবৃত হইয়া পড়ে তখন তাহার সেই লাজুক সৌন্দর্য্য কয়জন লোক দেখিতে পায়? কিন্তু—

মরাল আনন্দ মনে ছুটিল কমল বনে,
চঞ্চল মৃণাল দল ধীরে ধীরে দুলিল;
বক হংস জলচর ধৌত করি কলেবর
কেলি হেতু কলরবে জলাশয়ে নামিল।"

এঘটনা গুলি দেখিতে কত টুকুই বা কল্পনার আবশ্যক করে? ইহা হয়ত সকলেই স্বীকার করিবেন, যাহাকে আমরা বিশেষ ভাল বাসি, যাহাকে আমরা বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করি যাহাকে আমরা মুহূর্ত্তকাল আমাদের চক্ষের আড়াল হইতে দিই না, তাহার নাক চোক আমরা দেখিতে পাই না, অর্থাৎ দেখি না। তাহাকে যখন দেখি তখন তাহার মুখের ভাবটি মাত্র দেখি, আর কিছুই নয়। এই জনাই সে মুখকে আমরা পদ্ম বলি বা চন্দ্র বলি। যখন আমরা মুখপদ্ম কথা ব্যবহার করি তখন তাহার অর্থ এমন নহে, যে, মুখ বিশেষে পদ্মের মত পাপ্ড়ি আছে, তখন তাহার অর্থ এই যে, পদ্মেরও যে ভাব সে মুখেরও সেই ভাব। আমার প্রেয়সীর

মুখের গঠন বাস্তবিক ভাল কি মন্দ, তাহার নাক ঈষৎ চেপ্টা হওয়াতে ও তাহার ভুরু ঈষৎ বাঁকা হওয়াতে তাহাকে কত খানি খারাপ দেখিতে হইয়াছে, তাহাকে চব্বিশ ঘণ্টা নিরীক্ষণ করিয়াও তাহা আমি বলিতে পারি না, অথচ একজন অচেনা ব্যক্তি মুহূর্ত্ত কাল দেখিয়াই বলিয়া দিতে পারে আমার প্রেয়সীর গঠন বাস্তবিক কতখানি ভাল দেখিতে। তাহার কারণ, আমি তাহার মুখের ভাবটি ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাই না। যে কবি প্রকৃতিকে যত অধিক ভাল বাসেন সেই কবি প্রকৃতির নাক মুখ চোক তত অল্প দেখিতে পান। যে কবি গোলাপকে বিশেষরূপে দেখিয়াছেন ও বিশেষরূপে ভাল বাসেন, তিনি সেই গোলাপটীকে একটি আকার বিশিষ্ট ভাব মনে করেন, তাহাকে পাপড়ি ও বৃন্তের সমষ্টি মনে করেন না। এই জন্যই একটি লাজুক বালিকার সহিত একটি গোলাপের আকারগত সম্পূর্ণ বিভেদ থাকিলেও তিনি উভয়ের মধ্যে তুলনা দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন। এই জন্য শেলী একটি nightingaleএর কণ্ঠস্বরের সহিত স্রোতের বন্যা, জ্যোৎস্না ধারা, ও রজনীগন্ধার পরিমলের তুলনা করিয়াছেন। কোথায় পাখীর গান, আর কোথায় বন্যা, জ্যোৎস্না ও ফুলের গন্ধ? জড়ই হউক আর জীবন্তই হউক, একটি আকারের মধ্যে একটি ভাব দেখিতে যে অতি সূক্ষ্ম কল্পনার আবশ্যক, তাহা বোধ করি আমাদের নাই। যদি থাকিত, তবে কেন আমাদের বাঙ্গালা কবিতার মধ্যে তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া যাইত না? বোধ করি অত সূক্ষ্ম ভাব আমরা ভাল করিয়া আয়ত্তই করিতে পারি না, আমাদের ভালই লাগে না। আমাদের খুব খানিকটা রক্তমাংস চাই, যাহা আমরা ধরিতে পারি, যাহা দুই হাতে লইয়া আমরা নাড়াচাড়া করিতে পারি। আমাদের গণ্ডার-চর্ম্ম মন অতি মৃদু সূক্ষ্ম স্পর্শে সুখ অনুভব করিতে পারে না। এই জন্য আমরা বাইরনের ভক্ত। শেলীর জ্যোৎস্নার মত অতি অশরীরী কল্পনা খুব কম বাঙ্গালীর ভাল লাগে।

"দেখিয়াছি ভাগীরথী ভাদ্র মাসে ভরা,
পূর্ণ জোয়ারের জল মন্থর যখন;
দেখিয়াছি সুখস্বপ্নে নন্দনে অপ্সরা
কিন্তু হেন চারু চিত্র দেখিনি কখন।
বিরহেতে গুরুতর উরসের ভারে
ঢলিয়া পোড়েছে বামা কুসুমেষু শরে
কুসুম শয়নে; কিন্তু কুসুমে কি পারে
নিবাইতে যে অনল জ্বলিছে অন্তরে?
সুগোল সুবর্ণ নিভ চারু ভুজোপরে
শোভে পূর্ণ বিকশিত বদন কমল,
(রূপের কমল মরি কাম সরোবরে),
ভানুর বিরহে কিন্তু নিমীলিত দল!
শোভিতেছে অন্য করে বাক্য মনোহর,
স্খলিত অলকা রাশি, পয়োধর থর
বিশ্রামিছে অযতনে কাব্যের উপর,
পুণ্যবান কবি—কাব্য পুণ্যের আকর।
বিনোদ বদন চন্দ্র, বিনোদ নয়ন
পল্লবে আচ্ছন্ন, পাঠে স্থির সন্নিবেশ,

অতুল, বিনোদতম, ত্রিদিব মোহন,
অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গের বিলাস আবেশ।
বিলাস বঙ্কিম রেখা, কুহকী যৌবন
চিত্রিয়াছে কি কৌশলে সর্ব্ব অঙ্গে মরি
পূর্ণতার পূর্ণাবেশ—সুনীল বসন
বিকাশিছে তলে তলে কনক লহরী।"

এমনতর একটা স্থূল নশ্বর মাংসপিণ্ড নহিলে বাঙ্গালী হৃদয়ের অসাড়, অপূর্ণ স্নায়ু বিশিষ্ট, কর্কশ ত্বকে তাহার স্পর্শই অনুভব হয় না। আর নিম্নলিখিত কবিতাটি পড়িয়া দেখ—

"Wherefore those dim looks of thine
Shadowy, dreaming Adeline.
Whence that aery bloom of thine
Like a lily which the sun
Looks thro' in his sad decline
And a rose-bush leans upon,
Thou that faintly smilest still.
As a Naiad in a well,
Looking at the set of day.
* * * * *
Wherefore those faint smile of thine
Spiritual Adeline ?
Who talketh with thee, Adeline ?
For sure thou art not all alone.
Do beating hearts of salient springs
Keep measure with thine own ?
Hast thou heard the butterflies
What they say betwixt their wings ?
Or in stillest evenings
With what voice the violet woos
To his heart the silver dews ?
Or when little airs arise
How the merry bluebell rings
To the moss underneath ?
Hast thou look'd upon the breath
Of the lilies at sunrise ?"

এমন জ্যোৎস্নাশরীরী প্রতিমাকে কি বাঙ্গালীরা প্রাণের সহিত ভাল বাসিতে পারেন? না। কেন না,শুনিয়াছি নাকি যে, বাঙ্গালী কবিকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় "কেন ভালবাস" তখন তিনি উত্তর দেন

"দেখিয়াছ তুমি সেই মার্জ্জিত কুন্তল
সুকুন্তল কিরীটিনী, প্রেমের প্রতিমা খানি,
আচরণ বিলম্বিত দীর্ঘ কেশ রাশি
দেখিয়াছ কহ তবে, কেন ভাল বাসি?"

"আচরণ বিলম্বিত দীর্ঘ কেশরাশি" দেখিলে, "কেশের আঁধারে সেই রূপ কহিনুর" দেখিলে তবে যাঁহাদের প্রেমের উদ্রেক হয়, তাঁহারা অমন একটি ভাবটিকে কিরূপে ভাল বাসিবেন? আর এদিকে চাহিয়া দেখ—

একদিন দেব তরুণ তপন,
হেরিলেন সুর নদীর জলে,
অপরূপ এক কুমারী রতন
খেলা করে নীল নলিনী দলে।
বিকসিত নীল কমল আনন,
বিলোচন নীল কমল হাসে,
আলো করে নীল কমল বরণ,
পূরেছে ভুবন কমল বাসে।
তুলি তুলি নীল কমল কলিকা,
ফুঁ দিয়া ফুটায় অফুট দলে;

হাসি হাসি নীল নলিনী বালিকা,
মালিকা গাঁথিয়া পোরেছে গলে।
লহরী লীলায় নলিনী দোলায়
দোলেরে তাহায় সে নীলমণি;
চারিদিকে অলি উড়িয়ে বেড়ায়,
করি গুন্থ গুন্থ মধুর ধ্বনি।
চারিদিক দিয়ে দেবীরা আসিয়ে
কোলেতে লইতে বাড়ান কোল;
যেন অপরূপ নলিনী হেরিয়ে,
কাড়াকাড়ি করি করেন গোল।
তুমিই সে নীল নলিনী সুন্দরী,
সুরবালা সুর-ফুলের মালা;
জননীর হৃদি কমল উপরি,
হেসে হেসে বেশ করিতে খেলা।
হরিণীর শিশু হরষিত মনে,
জননীর পানে যেমন চায়;
তুমিও তেমনি বিকচ নয়নে,
চাহিয়ে দেখিতে আপন মায়।
শ্যামল বরণ, বিমল আকাশ;
হৃদয় তোমার অমরাবতী;
নয়নে কমলা করেন নিবাস,
আননে কোমলা ভারতী সতী।
কথা কহে দূরে দাঁড়ায়ে যখন,
সুরপুরে যেন বাঁশরী বাজে;
আলুথালু চুলে করে বিচরণ
মরিগো তখন কেমন সাজে।
মুখে বেশী হাসি আসে যে সময়
করতল তুলি আনন ঢাকে;
হাসির প্রবাহ মনে মনে বয়,
কেমন সরেস দাঁড়ায়ে থাকে।"

ইহাতে নিবিড় কেশভার, ঘন কৃষ্ণ আঁখি তারা, সুগোল মৃণাল ভুজ নাই তাই বোধ করি ইহার কবি বঙ্গীয় পাঠক সমাজে অপরিচিত, তাঁহার কাব্য অপঠিত। আন্‌বিষ, মার ছুরী, ঢাল মদ,—এমনতর একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড না হইলে বাঙ্গালীদের হৃদয়ে তাহার একটা ফলই হয় না। এক প্রকার প্রশান্ত বিষাদ, প্রশান্ত ভাবনা আছে, যাহার অত ফেনা নাই, অত কোলাহল নাই অথচ উহা অপেক্ষা ঢের গভীর তাহা বাঙ্গালা কবিতায় প্রকাশ হয় না। উন্মত্ত আস্ফালন, অসম্বন্ধ প্রলাপ, "আর বাঁচিনা, আর সহে না, আর পারি না" ভাবের ছট্‌ফটানি, ইহাইত বাঙ্গালা কবিতার প্রাণ। এমন সফরী অপেক্ষা রোহিত মৎস্যের মূল্য অধিক। বাঙ্গালীর কল্পনা চোখে দেখিতে পায় না, বাঙ্গালীর কল্পনা বিষম স্থূল। তথাপি বাঙ্গালী কবি বলিয়া বড় গর্ব্ব করে।

আর একটি কথা বলিয়া শেষ করি। যেখানে নানাপ্রকার কাজ কর্ম্ম হইতে থাকে, সেই খানেই মানুষের সকল প্রকার মনোবৃত্তি বিশেষরূপে বিকশিত হইতে থাকে। সেইখানে রাগ, দ্বেষ, হিংসা, আশা, উদ্যম, আবেগ, আগ্রহ প্রভৃতি মানুষের মনোবৃত্তি গুলি ফুটিতে থাকে। সেখানে মানুষের অত্যাকাঙ্খা উত্তেজিত হয়, (বাঙ্গালা ভাষায় ambition-এর একটা ভাল ও চলিত কথাই নাই) ও অবস্থার চক্রে পড়িয়া তাহার সমস্ত আশা নির্মূল হয়। সেখানে বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন স্রোত একত্র হইয়া মিশে, তুমুল সঙ্ঘর্ষ

উপস্থিত হয়, আশা নিরাশা, আগ্রহ, উদ্যম, স্রোতের উপরিভাগে ফেনাইয়া উঠে। এই অনবরত সমুদ্র মন্থনে মহা মহা ব্যক্তিদের উৎপত্তি হয়। আর আমাদের এই স্তব্ধ অন্ধকার ডোবার মধ্যে স্রোত নাই, তরঙ্গ নাই, জল পচিয়া পচিয়া উঠিতেছে, উপরে পানা পড়িয়াছে, গুপ্ত নিন্দা ও কানাকানির একটা বাষ্প উঠিতেছে। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে ভালবাসার একটা স্বাধীন আদান প্রদান নাই, ঢাকাঢাকি, লুকাচুরি, কানাকানির মধ্যে ঢাকা পড়িয়া সূর্য্যের কিরণ ও বায়ুর অভাবে ভালবাসা নির্ম্মল থাকিতে পারে না, দূষিত হইয়া উঠে। আমাদের ভালবাসা কখন সদর দরজা দিয়া ঘরে ঢোকে না; খিড়কির সঙ্কীর্ণ ও নত দরজা দিয়া আনাগোনা করিয়া করিয়া তাহার পিঠ কুঁজা হইয়া গিয়াছে, সে আর সোজা হইয়া চলিতে পারে না, কাহারো মুখের পানে স্পষ্ট অসঙ্কোচে চাহিতে পারে না, নিজের পায়ের শব্দ শুনিলে চমকিয়া উঠে। এমনতর সঙ্কুচিত কুব্জ ভালবাসার হৃদয় কখনো তেমন প্রশস্ত হইতে পারে না। মনে কর, "পিরীতি" কথার অর্থ বস্তুতঃ ভাল, কিন্তু বাঙ্গালীদের হাতে পড়িয়া দুই দিনে এমন মাটি হইয়া গিয়াছে যে, আজ শিক্ষিত ব্যক্তিরা ও কথা মুখে আনিতে লজ্জা বোধ করেন। বাঙ্গলা প্রচলিত প্রণয়ের গানের মধ্যে এমন গান খুব অল্পেই পাইবে, যাহাতে কলঙ্ক নাই, লোকলাজ নাই ও নব যৌবন নাই, যাহাতে প্রেম আছে. কেবল মাত্র প্রেম আছে, প্রেম ব্যতীত আর কিছুই নাই। আমাদের এ পোড়া দেশে কাজ কর্ম্ম নাই, অদৃষ্টের সহিত সংগ্রাম নাই, আলস্য তাহার স্থূল শরীর লইয়া স্থূলতর উপধানে হেলিয়া হাই তুলিতেছে, ইন্দ্রিয়পরতা ও বিলাস, ফুল মোজা, কাল্লাপেড়ে ধুতি, ফিন্‌ফিনে জামা পরিয়া, বুকে চাদর বাঁধিয়া, পান খাইয়া ঠোঁট ও রাত্রিজাগরণে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গুড়গুড়ি টানিতেছে, এইত চারিদিকের অবস্থা! এমন দেশের কবিতায় চরিত্র-বৈচিত্র্যই বা কোথায় থাকিবে, মহান্ চরিত্র-চিত্রই বা কোথায় থাকিবে, আর বিবিধ মনোবৃত্তির খেলাই বা কিরূপে বর্ণিত হইবে? সম্প্রতি বাহির হইতে একটা নূতন স্রোত আসিয়া এই স্থির জলের মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। ইহা হইতে শুভ ফল প্রত্যাশা করিতেছি, ইতস্ততঃ তাহার চিহ্নও দেখা দিতেছে।

মনোবিকার।

প্রথম প্রস্তাব।

মানুষের শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ লইয়া দুই সম্প্রদায় বহুকাল হইতে দুই প্রকার মত বাহির করিয়াছেন। এক সম্প্রদায় বলেন যে মন দেহাভ্যন্তরস্থ পদার্থ বিশেষের কার্য্যফল। শরীরের সহিত ইহার জন্ম, শরীরের সহিত ইহার স্থিতি, শরীরের সহিত ইহার বৃদ্ধি, এবং শরীরের সহিত ইহার লয়; সংক্ষেপতঃ, শরীর হইতে ইহা অবিচ্ছিন্ন। পদার্থবাদীরা (Materialists) এই সম্প্রদায় ভুক্ত। অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা অর্থাৎ অধ্যাত্মবাদীরা (Spiritualists) বলেন যে মন একটি আধ্যাত্মিক সার, শরীরের মধ্যে কতক সময়ের জন্য ইহার স্থিতি এবং প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যখন শরীর ক্ষয় হইয়া ভূমিসাৎ হয় তখন ইহা স্বতন্ত্র হইয়া অবস্থিতি করে। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্ সম্প্রদায়ের মত যে যথার্থ সে বিষয় লইয়া তর্ক করা আমাদের উদ্দেশ্যবহির্ভুত, শুদ্ধ এইটুকু বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, মন কারণই হোক্ বা কারণোপায়ই হোক্, এই পৃথিবীতে মনের সমস্ত কার্য্য শরীরের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, এক কথায় শরীরের উপর মনের সম্পূর্ণ নির্ভর।

অনেকে মনের কার্য্য মস্তিষ্কে হয় ইহা স্বীকার করিয়াও হিতাহিত জ্ঞানকে এক স্বতন্ত্র স্থানে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। Dr. Abercrombie মনের কার্য্য মস্তিষ্কে ইহা নিশ্চিত জানিয়াও এই মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বোধ হয় উক্ত দার্শনিক এবং তাঁহার মতানুপোষক ব্যতীত একথা আর কেহই বলিবেন না। Dr Maudsley এ সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা আমাদের অনেকটা যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলেন "When mind undergoes decadence, the moral feeling is the fiirst to suffer." তিনি আরও বলেন, "* * * disease will sometimes do as plain and positive damage to moral character as any which direct injury of the brain will do." ইহা কাহারও অবিদিত নাই যে যদি কোন লোক কিছু কালের জন্যও কোন প্রকার রোগ যন্ত্রণা ভোগ করে, তখন তাহার মনে কিছুমাত্র সুখ থাকে না, তাহার প্রকৃতি তখন অনেকটা বদলাইয়া যায়, সে খিট্‌খিটে হইয়া পড়ে। তাহার কারণ কি? তাহার শরীরের অসুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের অবসন্নতা উপস্থিত হয়, এবং মস্তিষ্কের অবসন্নতার সঙ্গে সঙ্গে মন এবং হিতাহিত জ্ঞানের বিকৃত অবস্থা সম্পাদিত হয়। রোগ আবার অধিক দিন স্থায়ী হইলে মনুষ্যের প্রকৃতির সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

যখন সামান্য শারীরিক রোগ হইলে মনের এত অসুস্থতা হয় তখন মস্তিষ্কের নিজের রোগ হইলে যে মনের ঘোরতর বিকার জন্মে তাহা সহজেই বুঝা যায়। সেই রোগের কথা লিখাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এমন আবশ্যকী পদার্থ মস্তিষ্ক যদি একবার বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয় ত কি কষ্টের বিষয়! অনেকেই একথা স্বীকার করেন যে শারীরিক অন্যান্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শীঘ্রই রোগগ্রস্ত হইতে পারে, কেন না ইহার পরিচালক মস্তিষ্ক আমাদের শারীরিক সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মর্ম্মস্থল, এবং সেই মস্তিষ্ক লইয়াই আমাদের নাড়াচাড়া। মস্তিষ্ক রোগগ্রস্ত হইলে কাজেকাজেই মানুষের হিতাহিত জ্ঞান এবং বুদ্ধি-শক্তির বিচ্যুতি হয়; তাহা হইলেই মনোবিকার উপস্থিত হয়। Dr Beard বলেন যে মনের বিকৃত অবস্থা হইলে মানুষের মনের ভাব যেরূপ তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করা যায় এমন আর সহজ অবস্থায় পারা যায় না।* বিকার প্রাপ্ত হইলে মানুষের মনের ভাব সকল উত্তেজিত হয় এবং মনের বৃত্তিসকল প্রবল হইয়া উঠে। তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি সেই সকল উত্তেজিত মনের ভাব দমন করিতে পারে না, তখন তাহার স্বভাবজ দোষ সকল গোপন করিয়া রাখিবার ক্ষমতা থাকে না; কিম্বা তাহার মনোবৃত্তি সকলকে বাহ্য চাকচিক্য প্রদান পূর্ব্বক অন্যকে মোহিত করিবার চেষ্টা করে না। তখন সে ব্যক্তির নিজের মনের উপর তিলমাত্র প্রভুত্ব থাকে না। একই কল্পনা, একই ভ্রম, একই বিপদ, একই আপদ, অন্য লোকের সহিত সকল বিষয়ে এক হইয়া, একই পৃথিবীতে থাকিয়া কেবল মাত্র মনের বৈলক্ষণ্য হইলে যে মানুষে মনুষ্যত্ব হইতে বিচ্যুত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

পূর্ব্বে বলা হইল যে মস্তিষ্কের রোগ হইলে হিতাহিত জ্ঞানের বিচ্যুতি এবং মনের বিকৃতি হয়। দেখা গিয়া থাকে যে অনেক মহৎ লোকেরা জ্ঞানের অতিশয় চালনা দ্বারা জ্ঞান হারাইয়া বসেন। ইহাও দেখা যায় যে অনেকে জন্মাবধি জ্ঞানহারা হইয়া পৃথিবীর কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া ইহলোক হইতে অপসারিত হয়। এরূপ বুদ্ধিহীন লোকদের আমরা নির্ব্বোধ বলিয়া থাকি। নির্ব্বোধ লোক আবার নানা প্রকারের আছে। কাহারও হয়ত মস্তিষ্কের বিন্দুমাত্রও উন্নতি নাই, না আছে বুদ্ধি, না আছে স্মরণশক্তি, না আছে ইচ্ছা, না আছে কিছু। আবার কাহারও হয়ত খালি স্মরণশক্তিটুকুই আছে, হয়ত যুক্তির কথা তাহাদের মনে থাকে না, কেবল প্রত্যহ বাহিরে যাহা দেখিতেছে তাহারই প্রতিবিম্ব তাহাদের মনে জাগরূক থাকে মাত্র। কৌলিক প্রভাবে এবং মস্তিষ্কের অসম্পূর্ণতা হেতু তাহারা

* "One of the Paradoxes of Psychology that we can best study the mysteries of the mind when that function is eclipsed by disease."

এইরূপ রোগগ্রস্ত হয়। কৌলিক প্রভাব যে কতদূর সত্য তাহা দেখা যাক্। মনে কর আমি একটি সাঁওতাল এবং একটি বাঙ্গালীকে বাল্যকাল হইতে একত্রে রাখিয়া একরূপ শিক্ষা এবং একরূপ উপদেশ দিয়া আসিলাম। এখন কেহ কি মনে ভাবিতে পারেন যে তাহাদের মনের পরিণাম একরূপ হইবে? তাহাদের দুই জনের প্রকৃতি যে স্বতন্ত্র হইবে তাহাতে কোন ভুল নাই। তাহাদের কল্পনা তাহাদের মনোবৃত্তি তাহাদের ইচ্ছা তাহাদের সমস্তই ভিন্ন প্রকার। তাহাদের আকারের বৈলক্ষণ্য যেরূপ সত্য, তাহাদের প্রকৃতিরও বৈলক্ষণ্য যে লক্ষিত হইবেই তাহা সেইরূপ সত্য। কোন উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে গোলাপ এবং ধুতুরার বীজ বপন করিলে, সেই উৎকৃষ্ট ভূমির গুণে ধুতুরার বীজে কিছু গোলাপ গাছ হইতে পারে না। সেইরূপ শিক্ষা এবং উপদেশ কিছু তাহাদের মনোবৃত্তিকে এক করিতে পারে না। তবে এ হইতে পারে যে সেই শিক্ষিত সাঁওতাল তাহার স্বজাতির মধ্যে এক জন শ্রেষ্ঠ লোক, কিন্তু সেই শিক্ষিত বাঙ্গালী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। সন্তান যেরূপ পিতা মাতার সাদৃশ্য অনেকটা প্রাপ্ত হয় সেই রূপ তাঁহাদের প্রকৃতির দ্বারা সে যে কতক অংশে গঠিত হইবে তাহা ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। Dr. Maudsley প্রণীত একখানি গ্রন্থের কোন স্থলে * বংশ-পরম্পরায় প্রকৃতির যে কতটুকু সৌসাদৃশ্য থাকিতে পারে তাহার একটি উদাহরণ আছে। একটি যুবা পুরুষের প্রপিতামহ অতিশয় পানদোষাক্রান্ত, দুর্নীতিপর, এবং ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেন; সেই যুবাপুরুষের পিতামহ তাঁহার পিতার ন্যায় পানদোষাক্রান্ত এবং বায়ুরোগগ্রস্ত ছিলেন, এমন কি তাঁহাকে শেষে পক্ষাঘাতে মরিতে হয়। যুবা পুরুষের পিতা যদিও তাঁহার পিতার ন্যায় পানদোষে আক্রান্ত ছিলেন না বটে, তথাপি তিনি স্তম্ভবায়ু রোগে আক্রান্ত ছিলেন, হত্যা কল্পনা তাঁহার মনে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিত। সেই যুবাপুরুষটি নিজে অত্যন্ত মূর্খ ছিল, ষোড়শ বৎসর বয়সে সে বায়ুরোগে আক্রান্ত হইয়া ক্রমে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, এবং জীবনের অধিকাংশ সময় তাহাকে গারদে থাকিয়া কাটাইতে হয়। তাই বলিয়া যে রোগগ্রস্ত সকল পরিবারের মধ্যে এরূপ ঘটিয়া থাকে তাহা নহে। উক্ত চিকিৎসক বলেন যে তিনি এক পরিবারের অন্য সমস্ত ভ্রাতাকে মানসিক রোগে ভুগিতে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কনিষ্ঠটির মস্তিষ্কের এবং স্নায়ুসমূহের নির্ম্মাণ স্বতন্ত্র প্রকার হওয়ায় তিনি রোগ হইতে নিষ্কৃতি পান। কৌলিক প্রভাবে যে লোকে জ্ঞানহীন ও নির্ব্বোধ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

মস্তিষ্কের অসম্পূর্ণতা হেতু যে লোকে নির্ব্বোধ হয় তাহাও একটি সত্য কথা। ইংলণ্ডীয় প্রধান প্রধান শরীরবেত্তাদিগের এই ধ্রুববিশ্বাস যে মস্তিষ্কের ওজন

* Mind and Brain. Page 45.

পাঁচ পোয়ার (30ozs) কম হইলে লোকে নির্ব্বোধ হয়। আমরা সচরাচর ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক বিশিষ্ট লোকদের নির্ব্বোধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। যাহাদের মস্তিষ্ক ক্ষুদ্র তাহাদের মস্তিষ্কের পূর্ণতা হয় নাই। কিন্তু মস্তিষ্কের লঘুত্ব কিম্বা তাহার ক্ষুদ্রতা যে নির্বুদ্ধিতার কারণ তাহা নহে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মস্তিষ্ক প্রধান প্রধান স্নায়ুসমূহের উৎপত্তিস্থল। সেই সকল স্নায়ুর অভাবই নিবুদ্ধিতার কারণ মাত্র। ফরাসী দেশীয় শরীরবেত্তারা বলেন যে মস্তিষ্কের ক্ষুদ্রতা কিম্বা ইহার লঘুত্ব বুদ্ধিহীনতার কারণ নহে। মস্তিষ্কের রোগ হইতেই লোকে ঐ রূপ হইয়া পড়ে। ক্রমাগত ত্রিশ বৎসর তাঁহারা ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে সমস্ত মূর্খ লোকের মধ্যে দশ আনার মস্তক অন্যান্য বিদ্বান লোকের মস্তক অপেক্ষা আকারে বৃহৎ এবং ওজনে ভারি। সুতরাং হইতে পারে যে মস্তিষ্কে এমন কোন রোগ উপস্থিত হয় যাহাতে ইহা ভারাক্রান্ত হইয়া বৃহদাকার ধারণ করে। ইংলণ্ডের অনেক শরীরবেত্তারা যে ইহা অস্বীকার করেন তাহা নহে।

দুষ্টমতি এবং পাপপ্রকৃতিস্থ লোকদিগের মস্তিষ্কের অবস্থা অতি হীন এবং মন্দ। কৌলিক প্রভাব এবং মস্তিষ্কের পূর্ণতার অভাব যেরূপ নিবুদ্ধিতার কারণ, সেইরূপ যদি লোকের কুপ্রবৃত্তি এবং পাপপ্রকৃতির উৎপত্তি বিষয়ে অন্বেষণ করা যায় ত একই কারণ লক্ষিত হয়। প্রায় সমস্ত দার্শনিকদিগের এই মত যে লোকে তাহাদের প্রকৃতি এবং শিক্ষা অনুসারে পাপ কর্ম্ম করিয়া থাকে। Plato বলেন যে যাহারা পাপ করিয়া দোষী হয় আমাদের উচিত তাহাদের প্রতি দোষারোপ না করা, তাহার জন্য তাহাদের পিতামাতা এবং শিক্ষকেরা দায়ী। গ্রীকদেশের পূর্ব্বতন চিকিৎসক হিপোক্রাটিস্ বলেন যে মনের বৈলক্ষণ্য না হইলে লোকে দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে না। দুষ্কর্ম্ম কতক না কতক অংশে পাগলামির ফল। যাহাদের প্রকৃতি একবার কুদিকে চালিত হইয়াছে তাহাদের হাজার উপদেশ দেওয়া যাক্ না কেন, হাজার শাস্তি দেওয়া যাক্ না কেন, সে সমস্ত উপদেশ তাহাদের মনে স্থান পায় না, সে সকল শাস্তি তাহাদের অগ্রাহ্য। অন্যের ক্ষতি হইবে বা নিজের অতিরিক্ত আমোদ হইবে এ সকল তর্ক করিয়া যে সকল চোর চুরি করে তাহা নহে, চুরি করা তাহাদের কেমন স্বভাবসিদ্ধ। ভাল তাহাদের কাছে কেমন মন্দ বলিয়া অনুভূত হয়, এবং মন্দ তাহাদের নিকট ভাল। যে ব্যক্তি হত্যা করে সে কি জানে না যে সে যে কাজ করিতেছে সে কাজের শাস্তি আছে? তবে জানিয়া শুনিয়া এরূপ দণ্ডার্হ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় কেন? অবস্থাতে পড়িয়া তাহার মনের কেমন বিকার উপস্থিত হয়, তখন সে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়ে। ক্ষণকালের নিবুদ্ধিতার জন্য যে ভবিষ্যতে শাস্তি পাইতে হইবে অপরাধীরা জ্ঞানহারা হইয়া তাহা মনে ধারণা করিতে পারে না।

তাহাদের মনের দৃঢ়তা নাই, বুদ্ধির প্রাখর্য্য নাই, তাহাদের স্বাভাবের উন্নত ভাব নাই। Mr. Chesterton বহুকাল ইংলণ্ডের কোন কারাগারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়া এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন যে, অপরাধীরা তাহাদের অপরাধের জন্য অনুতাপ করে না। ১০০ জনের মধ্যে যদি ১০জন অপরাধীও অনুতাপ করে ত যথেষ্ট হইল এবং দণ্ড পাইয়াও যে ভবিষ্যতে তাহাদের দুষ্কর্ম্ম করিতে সংকোচ হইবে এমন ত তাঁহার বোধ হয় না। তিনি আরও বলেন যে একটি বন্দী তাঁহাকে বলিয়াছিল যে চুরি করার উপর তাহার বড় ভালবাসা পড়ে, যদি যে সহস্র মুদ্রারও অধিকারী হইত তথাপি চুরি করিতে কখন ক্ষান্ত থাকিত না। ইহারা দুষ্কর্ম্মকে প্রশ্রয় দেয় বলিয়াই পাগল হয় না, ইহাদের মস্তিষ্ক এমন কলুষিত হইয়াছে যে যদি দুষ্কর্ম্ম না করিত ত তাহারা প্রকৃত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিত। "Report of the Lunatic Asylum of Bengal" পাঠ করিলে দেখা যায় যে স্ত্রী এবং পুরুষ সংখ্যা একত্রিত করা হইলে গড়ে শতকরা ১৬ জন এইরূপ পাপকর্ম্ম করিতে না পারিয়া এবং কোন প্রকার গুরুতর দুষ্কর্ম্ম করিয়া একেবারে প্রকৃত প্রস্তাবে উন্মাদ হইয়া পড়িয়াছে। Mr. Chestertonএর ন্যায় এই সকল অপরাধী উন্মাদ সম্বন্ধে এখানকার পাগলাগারদের তত্ত্বাবধায়কদিগের এই মত যে "there is great risk in setting such men at liberty until several years of good and rational conduct has elapsed, and it is doubtful if even then there is freedom from risk of relapse"

উন্মাদাবস্থা মনোবিকারের চরম সীমা। অল্পপরিমাণেও যদি লোকের মানসিক পীড়া হয় তবে তাহার উন্মাদ রোগ জন্মিবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে; নির্ব্বোধ লোকেরা সেরূপ অবস্থায় পতিত হইলে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। দুষ্কর্ম্ম করিয়া অধিকাংশ লোক যে উন্মাদ হয় তাহা আমরা মনুষ্য জীবনের অনেক ঘটনায় দেখিতে পাই।

মানসিক সমস্ত রোগ স্নায়ু-বিকারজাত। স্নায়বীয় সমস্ত রোগই কোন না কোন প্রকারে পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট। প্রত্যক্ষ হয়কৌলিক প্রভাববশতঃ সন্তানেরা স্নায়ব রোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। একজন ক্ষিপ্তের পুত্রের স্নায়ু-প্রণালী একজন সজ্ঞ লোকের স্নায়ু-প্রণালী হইতে ভিন্ন অবস্থাপন্ন। এমন ঘটনাও হইয়া থাকে যে বংশ পরম্পরায় স্নায়ুর অবস্থা অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট হইতে থাকে, অর্থাৎ একজন ক্ষিপ্তের পুত্র 'উন্মাদ-রোগগ্রস্ত না হইয়া অপস্মার (Epilepsy) রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে, কিম্বা হয়ত সেই অপস্মার রোগীর পুত্র কেবল স্নায়ব বেদনা ইহজীবন ভোগ করে। এই প্রকারে তাহার পুত্র হয়ত সামান্য কোন প্রকার স্নায়ব রোগে আক্রান্ত হয় এবং ক্রমে ক্রমে সে বংশ হইতে হয়ত স্নায়ব রোগ একেবারে অন্তর্হিত হয়।

আমরা অনেক সময় ছিট্‌ওয়ালা লোক-

দের পাগলের দলে ফেলিয়া থাকি। ছিটগ্রস্ত লোকেরা, বলিতে গেলে, এক প্রকার পাগল বটে, কিন্তু যথার্থ পাগলের সহিত তাহাদের তুলনা করা হইলে তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ লক্ষিত হয়। পাগলেরা যেমন সহজ মানুষদের সহিত কোন বিষয়ে মেলে না, ছিট্‌গ্রস্ত লোকদের পক্ষে তাহা নহে। চিন্তাশক্তি, প্রভৃতি অনেক বিষয়ে তাহারা সহজ মানুষের সহিত সমকক্ষ হয় কিন্তু তাহাদের কল্পনা স্বতন্ত্র। তাহাদের কল্পনা অঙ্গহীন। হয় ত এইরূপ অবস্থায় তাহারা এক নূতন ধর্ম্মের আবিষ্কার করিয়া দেশ বিদেশে তাহা রাষ্ট্র করিতে লাগিল, কিম্বা হয় ত পৃথিবীর কোন অদ্ভুত পদার্থের অস্তিত্ব বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া তাহার অন্বেষণে কৃতসঙ্কল্প হইল। যত তাহাদের মনের অবস্থার বৈলক্ষণ্য হয় ততই তাহাদের উৎসাহের পরিসীমা থাকে না। যদি সেই নূতন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য চারিদিক্ হইতে পোষকতা পায়, কিম্বা অদ্ভুত পদার্থান্বেষণে কৃতকার্য্য হইয়াছে মনে ভাবিয়া নিজে নিজেই খুব পরিতৃপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের রোগকে খুব কমই প্রশ্রয় দেওয়া হইল। আর যদি অভিলাষ পূরণে কৃতকার্য্য না হইল ত নিরাশ হইয়া প্রকৃত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সঙ্কল্প একবার সিদ্ধ হইলে তাহাদের কল্পনার আর বিরাম নাই, তাহাদের রুগ্ন মস্তিষ্ক হইতে উত্তরোত্তর আরো নানা অদ্ভুত দ্রব্যের উৎপত্তি হইতে লাগিল। প্লেটো সক্রেটিসের বিষয় বলিতে বলিতে একস্থলে বলিয়াছেন, "দেবতাদিগের অনুগ্রহে যখন পৃথিবীতে উন্মাদরোগ আসিয়া জুটিল আমাদের তখন অনেক মঙ্গল হইতে লাগিল। কারণ (Delphi) ডেলফির যত দৈববক্তা এবং (Dodona) ডডোনার পুরোহিতগণ যখন ছিটগ্রস্ত হইলেন তখন তাঁহারা গ্রীসের জন্য অনেক মহৎ কার্য্য করিয়াছিলেন, সহজ অবস্থায় তাঁহারা কিছুই করেন নাই।" ছিট্‌গ্রস্ত হইলে লোকে যে আপনার গোঁ ধরিয়া অনেক মহৎ কার্য্য করিয়াছেন তাহা ইতিহাসের অনেক স্থলে দেখা যায়। মহম্মদ তাঁহার এক স্বপ্ন হইতে কি না করিলেন। ইংলণ্ডীয় অনেক চিকিৎসকেরা বলেন যে মহম্মদ অপস্মার রোগে আক্রান্ত ছিলেন বলিয়া ঐরূপ স্বপ্ন দেখেন; এটা যে কতদূর বিশ্বাস্য তাহা বলা যায় না। ছিট্‌রোগ যে স্নায়ব তাহা বলা বাহুল্য। অনেক উন্মাদ তাহার ঘোরতর রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ছিট্‌রোগে আক্রান্ত হয়, কারণ তাহার স্নায়ু কোন মতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারে না। আমরা সচরাচর যাহাদের ছিট্ আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি তাহারা সহজপ্রকৃতি ও উন্মাদপ্রকৃতির মধ্যবর্ত্তী এবং সংযোজক শৃঙ্খল মাত্র; তাহারা একপদ অবতরণ করিলে প্রকৃত প্রস্তাবে উন্মাদ নামের বাচ্য হয়।

তন্তুবায়ু মানসিক রোগ। ইহা উন্মাদাবস্থার একটি অঙ্গ। এই রোগে আ-

ক্রান্ত হইলে মস্তিষ্কের সমস্ত কার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। না থাকে বুদ্ধির চালনা, না থাকে হিতাহিত জ্ঞান, না থাকে মনের বৃত্তি, না থাকে বাক্‌শক্তি, সামান্যতঃ এই রোগে আক্রান্ত হইলে মানুষে একটি বৃক্ষ হইতে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ হয় না। আহার পাইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে বটে, কিন্তু বৃক্ষের ন্যায় স্তম্ভিত থাকিয়া শুকাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে কোন কোন লোক একটি বিষয় লইয়া পাগল এবং সেই একটি বিষয় হইতে সে যে কত প্রকার ভ্রান্তিমূলক কল্পনা বাহির করে তাহার সংখ্যা নাই। মনে কর কোন ব্যক্তি সাধারণের প্রিয়পাত্র ও তাহাদের বিশ্বাস্য হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে এবং কতক পরিমাণে প্রীতি এবং বিশ্বাস পাইয়াও পরিতৃপ্ত হয় না, কল্পনা করে যে সে হয়ত কাহারও প্রীতি পাইবে না, পাইবার উপযুক্ত নয়,—লোকে তাহাকে বিশ্বাস করিবে কেন—ইত্যাদি নানা প্রকার ভিত্তিহীন এবং ভ্রান্তিমূলক কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়া ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং ঐ এক বিষয় লইয়া চিন্তা করিতে করিতে তাহার স্মরণশক্তি লোপ পায়, মনের ভাব সকল নির্ব্বাণ হইয়া যায়, বুদ্ধিক্ষয় হইতে থাকে এবং সময়ে তত্ত্ববায়ুরোগে আক্রান্ত হইতে পারে। এই শ্রেণীর রোগকে ইংরাজীতে Monomania বলিয়া থাকে। অবষাদবায়ু (Melancholia) তত্ত্ববায়ুর আর একটি উৎপত্তি-স্থল। উপরি উক্ত কারণ বশতঃ যদি কোন ব্যক্তি নিজের কোন বিষয় লইয়া মনকে নিয়ত সেই এক কল্পনায় নিযুক্ত রাখে এবং আপনাকে অতিশয় হেয় মনে করিয়া সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকে, সেই বিষাদ দূর করা তাহার ক্ষমতার অতীত হইয়া দাঁড়ায়, তবে তাহার মন নৈরাশ্যভোগ করিয়া একেবারে শিথিল হইয়া পড়ে এবং শীঘ্রই রোগগ্রস্ত হয়। বিষাদযন্ত্রণা অসহনীয় হইলে এই রোগাক্রান্ত লোক বিকারাবস্থায় অনেক সময়ে আত্মহত্যা করিয়া থাকে।

অপস্মার রোগকে উন্মাদ রোগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিলে বেশি বলা হয় না। দেখা যায় যে অপস্মাররোগবিশিষ্ট পিতামাতার সন্তানসন্ততিদিগের অপস্মার রোগে আক্রান্ত হইবার যেরূপ সম্ভাবনা থাকে উন্মাদ হইবার তাহাদের সেইরূপ সম্ভাবনা; আর উন্মাদের বংশাবলি অপস্মার রোগে খুব সচরাচরই আক্রান্ত হইয়া থাকে। কৌলিক প্রভাব অপস্মার রোগের যেরূপ উৎপত্তির কারণ, সেইরূপ মস্তিষ্কে আঘাত কিম্বা স্নায়ুপ্রণালীর হঠাৎ বৈলক্ষণ্যও যে ইহার উৎপত্তি-স্থল তদ্বিষয়ে অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়া থাকে। তাহার একটি মাত্র এখানে উদ্ধৃত করা গেল। "কোন অষ্টম বৎসর বয়স্ক একটি সুস্থ বালক কোন সময় ১২ ফিট্ উচ্চ স্থান হইতে ভূমিতে পড়িয়া যায়, তাহাতে তাহার মস্তকে আঘাত লাগে। আঘাত প্রাপ্তে সে প্রায় ১৫ মিনিট অজ্ঞানাবস্থায় পতিত থাকে, ১০ মিনিটের পর তাহার আবার মূর্চ্ছা হয়। পড়িয়া যাওয়াতে সেই

বালকের মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বের হাড় কিছু দমিয়া যায়। ক্ষতস্থান আরোগ্য হইলে সে প্রায় দেড়মাস সুস্থ অবস্থায় থাকিয়া তাহার পর হইতে ক্রমাগত উপর্য্যুপরি মূর্চ্ছা যাইতে লাগিল। মূর্চ্ছা যাইবার অগ্রে তাহার মুখ বামপার্শ্বে বাঁকিয়া যাইত, জ্ঞান ক্রমে লোপ পাইত, মুখ মলিন হইয়া আসিত, এবং সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে থাকিত। বাইশ বৎসর বয়সে তাহার মনের ভাব এবং বুদ্ধি নির্দ্দিষ্টসীমাবদ্ধ হইল এবং স্মরণশক্তি তাহার মস্তিষ্ক হইতে একেবারে অপসৃত হইয়াছিল।" সচরাচর মূর্চ্ছা অর্থাৎ অজ্ঞানাবস্থা অপস্মার রোগের একটি প্রধান লক্ষণ। মূর্চ্ছার অগ্রে এবং পশ্চাতে অপস্মার রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মনের যথেষ্ট বিকৃতি স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু সকলের মনের লক্ষণ যে একরূপ হয় তাহা নহে। কেহ কেহ বিষণ্ণ, খিটখিটে, বুদ্ধিহীন,ধারণাশক্তিহীন হইয়া পড়ে; কেহ বা মূর্চ্ছাভঙ্গের পর আবার বিপরীতভাব ধারণ করে, তাহারা আরো উল্লসিত হইয়া উঠে, বিষণ্ণতার কোন চিহ্ন তাহাতে দৃষ্ট হয় না, অজ্ঞানাবস্থার অগ্রে সে যে সকল কথা কহিতেছিল, বা যে সকল কার্য্য করিতেছিল, তাহা পুনঃজ্ঞানপ্রাপ্তির পর মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার মনে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তবে এরূপ ঘটনা খুব বিরল। বিষণ্ণতা এবং মনের দুর্ব্বলতা অপস্মার রোগের যে অনিবার্য্য ফল তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন।

অপস্মাররোগজনিত উন্মত্ততা সময়ে সময়ে পরহত্যাপ্রবণ হইয়া দাঁড়ায়। যখন উক্তরোগবিশিষ্ট লোকের হত্যা-কল্পনা মনে জাগরূক হয় তখন তাহার মনের গতি অত্যন্ত মন্দ হইয়া দাঁড়ায়, তখন জানা যায় যে তাহার রোগ অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি যথার্থ ঘটনা এখানে উদ্ধৃত করা গেল। কোন একটি যুবা পুরুষ বাল্যকাল হইতে বাইশ বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমাগত অপস্মাররোগজনিত মূর্চ্ছাপন্ন হইত বলিয়া তাহাকে সৈন্যদল হইতে দূরীকৃত করিয়া দেয়, এবং তখন হইতে প্রায় ৪০ বৎসর তাহার রোগের কোন লক্ষণই দৃষ্ট হয় নাই। যদিও বাহিরে তাহার কোন লক্ষণ ছিল না তথাপি ভিতরে ভিতরে তাহার স্নায়ুর ক্রমিক হীনাবস্থা হইতে ছিল। বাষট্টি বৎসর বয়সে হত্যা-কল্পনা তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠে। তাহার মনের প্রথম এই সংস্কার হইল যে তাহার নির্দ্দোষী মাতাই তাহার অনিষ্ট করিবার জন্য চেষ্টিত। কল্পনায় এইরূপ ভাবিয়া ভাবিয়া সে এক দিবস তাহার বৃদ্ধ মাতার গলদেশে সজোরে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিল। তাহার মাতা ভূমিতে পড়িয়া গেলে তাঁহার বক্ষে আরোহণ করিয়া যতক্ষণ না লোক জন আসিয়া পড়িল ততক্ষণ তাঁহার শরীরে আঘাত করিতে লাগিল। এরূপ শোচনীয় ঘটনা যে অনেক ঘটিয়া থাকে তাহা অনেক পুস্তকে পাঠ করা যায়।

উক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা অধিকাংশ সময় অজ্ঞানাবস্থার অব্যবহিত পূর্ব্বেই এইরূপ হত্যা করিয়া থাকে। হত্যা কল্পনা তাহাদের মনে মুহূর্ত্তের মধ্যে উদয়

হয়। অনেকে মূর্চ্ছাবস্থায় হত্যা না করুক সাংঘাতিক আঘাত করে, এবং মূর্চ্ছাভঙ্গের পর তাহাদের মনের দুর্ব্বলতা হেতু সে সকল কল্পনা আর মনে স্থান পায় না। খুব অল্প লোকে মূর্চ্ছার অব্যবহিত পরে হত্যা এবং সময়ে সময়ে কষ্টের আতিশয্যহেতু আত্মহত্যা করিয়া থাকে। প্রমাণ স্বরূপ আর একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা গেল। অপস্মাররোগাক্রান্ত ত্রিশ বৎসর বয়স্ক একটি যুবা পুরুষ ফরাসীদেশীয় কোন গারদে আবদ্ধ ছিল। এক দিবস মূর্চ্ছার অব্যবহিত পরে সে ইচ্ছাপূর্ব্বক গবাক্ষ হইতে পতিত হইয়াছিল। অন্য কোন অবসরে তাহার পিতাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এই সকল ঘটনার কিছু পরে তাহার বেশ জ্ঞানের উদয় হইত, এবং সহজপ্রকৃতির মানুষের ন্যায় সকলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিত। সেই গারদের রক্ষকের উপর তাহার কিছু বিশেষ টান্ পড়ে, এবং রক্ষকও তাহাকে একটু বিশেষ যত্ন করিত। কিছু দিবস পরে তাহার রোগের কিছু বৃদ্ধি হইল, এমন কি দুই তিন দিবস তাহার উপর্য্যুপরি মূর্চ্ছা হইয়াছিল, সেই অবধি তাহার মনের গতি বিশেষ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। এইরূপ অবস্থার পর এক দিন যখন সেই রক্ষকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, তখন তাহার হস্তে হস্ত সমর্পণ পূর্ব্বক "ঐক্য (union)" এই কথাটি উচ্চারণ করিল মাত্র; সেই সময় তাহার মনের কিম্বা আকৃতির যে বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়াছিল তাহা নহে। অন্য এক দিবস মূর্চ্ছার অব্যবহিত পূর্ব্বে রক্ষককে দেখিয়া তাহার নিজের পদতলে বেদনা হইয়াছে ছলপূর্ব্বক এই কথা বলাতে রক্ষক নত হইয়া যেমন তাহা নিরীক্ষণ করিতে যাইবে অমনি সজোরে তাহার বক্ষে এরূপ অস্ত্রাঘাত করিল যে তাহাতেই তাহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইল। এই ঘটনার পরই সেই রুগ্ন যুবা অজ্ঞান হইয়া পড়িল। হত্যার কারণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিয়াছিল যে ক্রমাগত দুই তিন রাত্রি হইতে কোন গুপ্ত সমাজভুক্ত কতকগুলি লোক তাহাকে এই বলিয়া যাইত 'রক্ষককে না মারিলে জীবনে তুমি সুখ পাইবে না' সেই নিমিত্ত রক্ষক সেই গুপ্তদলভুক্ত কিনা জানিবার জন্য "ঐক," এই সঙ্কেত বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিল। এ সমস্তই তাহার কল্পনা প্রসূত, এবং সেই সমস্ত কল্পনা তাহার রোগপ্রসূত। কথিত আছে তাহার পর হইতে তাহার রোগ আরো প্রবল হইয়াছিল, এবং যে সময়টুকু সে সুস্থাবস্থায় থাকিত সেই সময়টুকু সেই রক্ষকের কথা এবং হত্যার কথা মনে করিয়া মনে বড় কষ্ট পাইত। এই রোগ অধিক দিন স্থায়ী হইলে লোকে আত্মহত্যা-প্রবণও হয়।

J. Farlet বলেন "Whenever we meet with isolated acts of violence, outrages to persons, homicide, suicide, arson, which nothing seems to have instigated, and when, upon attentive

examination and thorough inquiry, we find a loss of memory after the perpetration of the act, with a periodicity in that recurrence of the same act, and a brief duration, we may diagnose larval epilepsy." *

প্রসবের পর অনেক স্ত্রীলোক অপস্মাররোগে আক্রান্ত হইয়া আপনাদের সন্তানদিগকে নষ্ট করিয়া থাকে, কিন্তু সেই রোগজনিত মূর্চ্ছা অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়।

এতদ্ব্যতীত আরো কতকগুলি স্নায়ব রোগ আছে, যথা, স্নায়ব বেদনা (Neuralgia), পানেচ্ছা (Dipsomania), ইত্যাদি; ইহাদের বিশেষ বর্ণনার কোন আবশ্যক দেখিতেছি না; শুদ্ধ এইটুকু জানিলে যথেষ্ট হইবে যে ইহারা উন্মাদরোগের সহিত খুব নিকট সম্বন্ধবিশিষ্ট। উন্মাদরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের বংশে এই রোগগুলি নিতান্ত বিরল নহে। যে যে বংশে এই রোগগুলি বর্ত্তমান সেই সেই বংশ সুবিবেচিত যৌননির্ব্বাচন (Judicious sexual selection) কিম্বা অন্য কোন প্রকার শোধনকারী উপায় দ্বারা শোধিত না হইয়া যদি প্রশ্রয়বশতঃ ক্রমশঃ উত্তরোত্তর অবনত হইতে থাকে তাহা হইলে সন্তানসন্ততিতে উন্মাদরোগ জন্মাইয়া বংশ ক্রমে একটি পাগলাগারদ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। কিছু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে স্নায়বরোগগ্রস্ত বংশ এককালে রোগমুক্ত হইতে পারে; ইহা কেবল উপরিউক্ত এবং অন্যান্য শোধনকারী উপায় দ্বারা ঘটিয়া থাকে।

শরতে প্রকৃতি।

কইগো প্রকৃতি রাণী দেখি দেখি মুখ খানি
কেন গো বিষাদ ছায়া রয়েছে অধর ছুঁয়ে?
মুখানি মলিন কেন গো?
এই যে মুহূর্ত্ত আগে হাসিতে ছিলে গো দেখি
পলক না পালটিতে সহসা নেহারি একি—
মরমে বিলীন যেন গো!
কেন তনু খানি ঢাকা, শুভ্র কুহেলিকা বাসে
মৃদু বিষাদের ভারে সুধীরে মুদিয়া আসে
নয়ন-নলিন হেন গো?

ওই দেখ চেয়ে দেখ—একবার চেয়ে দেখ—
চাঁদের অধর দুটি হাসিতে ভাসিয়া যায়!
নিশীথের প্রাণে গিয়া সে হাসি মিশিয়া যায়।
সে হাসির কোলে বসি কানন গোলাপগুলি
আধ'আধ'কথা কহে সোহাগেতে ঢুলি ঢুলি।
সে হাসির পায়ে পড়ি নদীর লহরীগণ
যার যত কথা আছে বলিতে আকুল মন।
সে হাসির শিশু দুটি লতিকা মণ্ডপে গিয়া
আঁধারে ভাবিয়া সারা বাহিরিবে কোথা দিয়া!
সে হাসি অলসে চলি দিগন্তে, পড়িয়া ঘুমে,
মেঘের অধর প্রান্ত একটু রয়েছে ছুঁয়ে।

* Annal Medico Psychological. Jan 1873.

বল তুমি কেন তবে, এমন মলিন র'বে?
বিষাদ স্বপন দেখে হাসির কোলেতে শুয়ে।

ঘোমটাটি খোল'খোল'-মুখ খানি তোল'তোল'
চাঁদের মুখের পানে চাও একবার!
বল দেখি কারে হেরি এত হাসি তার!
নিলাজ বসন্ত যবে কুসুমে কুসুম ময়—
মাতিয়া নিজের রূপে হাসিয়া আকুল হয়,
মলয় মরমে মরি, ফিরে হাহাকার করি—
বনের হৃদয় হোতে সৌরভ-উচ্ছ্বাস বয়!
তারে হেরি হয় না সে এমন হরষে ভোর;
কি চোখে দেখেছে চাঁদ ওই মুখ খানি তোর!
তুই তবু কেন কেন—দারুণ বিরাগে যেন
চাস্‌নে চাঁদের হাসি চাঁদের আদর!
নাই তোর ফুল বাস—নাইক প্রেমের হাস
পাপিয়া আড়ালে বসি শুনায় না প্রেম গান!
কি দুখেতে উদাসিনী যৌবনেতে সন্যাসিনী?
কাহার ধেয়ানে মগ্ন শুভ্র বস্ত্র পরিধান?

এক কালে ছিল তোর কুসুমিত মধু মাস—
হৃদয়ে ফুটিত তোর অজস্র ফুলের রাশ;—
যৌবন উচ্ছ্বাসে তোর-প্রাণের সুরভি তোর
পথিক সমীরে সব দিলি তুই বিলাইয়া!
শেষে গ্রীষ্ম তাপে জ্বলি শুকাইল ফুল, কলি
সর্ব্বস্ব যাহারে দিলি সেও গেল পলাইয়া!
চেতনা পাইয়া শেষে হইয়া সর্ব্বস্ব-হারা
সারাটি বরষা তুই কাঁদিয়া হইলি সারা!
এত দিন পরে বুঝি শুকাইল অশ্রুধারা!
আজ বুঝি মনে মনে করিলি দারুণ পণ
যোগিনী হইবি তুই পাষাণে বাঁধিবি মন!

বসন্তের ছেলেখেলা ভাল নাহি লাগে আর!
চপল চঞ্চল হাসি ফুলময় অলঙ্কার!
এখন যে হাসি হাস' আজি বিরাগের দিন,
শুভ্র শান্ত সুবিমল বাসনা লালসা হীন।
এত যে করিলি পণ—তবুওত ক্ষণে ক্ষণ
সেদিনের স্মৃতি-ছায়া হৃদয়ে বেড়ায় ভাসি।
প্রশান্ত মুখের পরে কুহেলিকা ছায়া পড়ে—
ভাবনার মেঘ উঠে সহসা আলোক নাশি—
মুহূর্ত্তে কিসের লাগি আবার উঠিস্‌ জাগি
আবার অধরে ফুটে সেই সে পুরাণো হাসি!

ঘুমায়ে পড়িস্‌ যবে বিহ্বল রজনী শেষে,
অতি মৃদু পা টিপিয়া উষা আসে হেসে হেসে,
অতিশয় সাবধানে দুইটি আঙুল দিয়া
কুয়াশা ঘোমটা তোর দেয় ধীরে সরাইয়া!
অমনি তরুণ রবি পাশে আসি মৃদুগতি
মুদিত নয়ন তোর চুমে ধীরে ধীরে অতি!
শিহরিয়া কাঁপি উঠি মেলিস্‌ নয়ন দুটি
রাঙা হোয়ে ওঠে তোর কপোল-কুসুম-দল
শরমে আকুল ঝরে শিশির-নয়ন-জল!

সুদূর আলয় হোতে তাড়াতাড়ি খেলা ভুলি
মাঝে মাঝে ছুটে আসে দুদণ্ডের মেঘ গুলি।
চমকি দাঁড়ায়ে থাকে ওই মুখ পানে চায়
কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষে কাঁদিয়া মরিয়া যায়!
কিসের বিরাগ এত কি তপে আছিস ভোর
এত কোরে সেধে সেধে এত কোরে কেঁদে কেঁদে
যোগিনি, কিছুতে তবু ভাঙিবে না পণ তোর?
যোগিনী, কিছুতে কিরে ফিরিবে না মন তোর?

অকারণ কষ্ট।

অকারণ কষ্ট নামে একটা রোগ আছে অনেকে হয়ত তাহা জানেন না। জন্মান্ধতার ন্যায় এ রোগ সারিবার নহে। যাহার হৃদয়ে এরূপ অঙ্গহীনতা আছে, এ জন্মে তাহার সে অঙ্গ আর পূর্ণ হইবার নহে। বাহিরের কোন দুর্ঘটনা হইতে ইহার জন্ম নহে। জীবনে এমন কিছুই ঘটে নাই, যাহা হইতে ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারি। বোধ করি, পূর্ব্বজন্ম হইতে যখন ইহজন্মে যাত্রা করিবার সমস্ত উদ্যোগ করিতেছিলাম, তখন তাড়াতাড়িতে, ভ্রমক্রমে, পূর্ব্বজীবনের কোন একটা দুঃখের, কোন একটা নৈরাশ্যের, কোন একটা অতৃপ্তির ভগ্নাংশ আমাদের তল্পীর মধ্যে দৈবাৎ রহিয়া গিয়াছিল; আধ খানা দেখিয়া তাহার সমস্ত চেহারাটা আমাদের মনে পড়িতেছে না। আমরা যে মাঝে মাঝে শুনিতে পাই, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সহসা একটা বাঁশী করুণ স্বরে বাজিয়া উঠিল, তাহার কথা নাই, কেবল সুর সমষ্টি, তাহার রাগিনী ভুলিয়া গিয়াছি; বোধ করি সে বাঁশির মুখাগ্রভাগ পূর্ব্বজন্মের দিকে স্থাপিত, কোন একটি অতীত ঘটনার প্রেতাত্মা বসিয়া বসিয়া পূর্ব্ব জীবনের পূরবী রাগিনী বাজাইতেছে।

অনেকে হয়ত জানেন না, যে, তাঁহারা যে কষ্ট পাইতেছেন, তাহার যথার্থ কোন কারণ নাই। তাঁহারা যাহাকে তাহার কারণ মনে করিতেছেন, তাহা তাহার কারণ নহে। ভালবাসার লোকের কাছে ভালবাসা না পাইয়া, বন্ধুর কোন কার্য্যবিশেষ অন্যায় কল্পনা করিয়া তাঁহারা কাঁদেন, কিন্তু সেই জন্যই তাঁহারা কাঁদেন না। না কাঁদিলে তাঁহাদের আর গতি নাই, কারণ ঘটুক্ আর না ঘটুক্। যাহাকে তাঁহারা কারণ মনে করেন তাহা মন ভুলাইবার ওজর মাত্র। তাঁহাদের মনের স্বাভাবিক অবস্থাই কষ্ট পাওয়া। ঘটনাগুলি তাহার উপলক্ষ মাত্র। ঘটনাগুলি তাঁহাদের দুঃখের কারণ নহে দুঃখের আশ্রয়। ঘটনার জমী ফুঁড়িয়া গাছের মত তাঁহাদের দুঃখ ভিতর হইতে উঠে নাই, তেমন একটা সুবিধামত ঘটনা দেখিলেই অমনি তাঁহাদের দুঃখ তাড়াতাড়ি বাহির হইতে গিয়া তাহার উপর দখল করিয়া বসে ও ক্রমে ক্রমে আস্তে আস্তে আপনার শিকড় ছড়াইতে থাকে, এমনতর গাছ কি কোথাও দেখা যায়? তাঁহাদের দুঃখের একটা কারণ সরাইয়া দেও, তিন দিনে তাঁহারা আর একটা কারণ খুঁজিয়া বাহির করিবেন। তাঁহাদের দুঃখ একটি ঘটনার দ্বার হইতে তাড়া খাইলে আর একটা ঘটনার

উপর গিয়া বাসা বাঁধে। তাঁহাদের মত লোক যদি বা জানেন যে, প্রণয়িনী তাঁহাদের ভাল বাসে, তথাপি তাহার প্রতি খুঁটিনাটি লইয়া তাঁহারা খুঁৎ খুঁৎ করিবেন। বলিবেন, আজ চলিয়া যাইবার সময় সে আমা হইতে দেড় ফুট তফাৎ দিয়া গেল কেন, আর চার ইঞ্চি কাছে আসিলে কি হানি হইত? চারি ইঞ্চি কাছ দিয়া গেলেই যে, তাঁহাদের সকল যন্ত্রণা দূরে যাইত, তাহা মনে না করা হয়। কোন রূপে তাঁহারা তাঁহাদের প্রণয়িনীর ভালবাসায় ঈষৎ অবিশ্বাস করিতে চান। তাহা না করিলে তাঁহাদের চলে কিরূপে? প্রাণ কাঁদিতেছে, কিন্তু কাঁদেন কাহার দোহাই দিয়া? আর কিছু নয়, হয়ত তাঁহাদের হৃদয়ে একটা ক্ষমতা, একটা প্রতিভা নিহিত আছে, কিন্তু ঘটনার শত্রুতায় তাহা বাহিরে বিকাশ পায় নাই। তাহারা মাথা তুলিতে পারে নাই বটে কিন্তু মরিয়া যায় নাই। তাঁহারা যে মাঝে মাঝে হৃদয়ের কারাগার হইতে একটা অধীর শিকল নাড়ার শব্দ শুনিতে পান, মনের লৌহ পিঞ্জরের দ্বারে কে যেন পদাঘাত করিতেছে মনে হয়, সহসা একটা আর্ত্তনাদ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস কানে আসে, তাহার কারণ কি সেই কারারুদ্ধ ক্ষমতার অধীরতাই নহে? একটা কিছু কাজ করিতে পারিতাম, কিন্তু করা হইল না, কি কাজ করিব ভাবিয়া পাই না, এমন অবস্থা নহে যে, কাজ করি, এই ভাবেই কি অলক্ষিত ভাবে তাঁহাদের বুকের মধ্যে বসিয়া দিন রাত নিশ্বাস ফেলিতেছে? কি জানি কি, কিন্তু হৃদয় কাঁদে। মনের একটা অসহায় অবস্থা, অসন্তোষ, অতৃপ্তি, একটা অত্যন্ত নিরাশ্রয় ভাব ভূতের মত এই হৃদয়ের শূন্য ঘরে হা হা করিয়া বেড়ায়। দুই প্রহরের রৌদ্রে যখন চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতে থাকে, একলা চুপটি করিয়া জানালার কাছে বসিয়া থাকেন, কিম্বা জ্যোৎস্না রাত্রে যখন চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, শয়ন ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া জনশূন্য রাস্তার দিকে চাহিয়া থাকেন, তখন এই নিরাশ্রয়, অসহায়, অতৃপ্ত ভাব তাঁহাদের হৃদয় ভেদ করিয়া যেন ফুটিয়া উঠে, বুক যেন ফাটিয়া যায়, ইচ্ছা করেন এমন এক জন প্রাণের লোককে পান, যাহাকে, বুকের কথা ঢালিয়া বলিতে পারেন। অথচ, একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখিতে পান, তাঁহাদের কিছুই বলিবার কথা নাই। হঠাৎ মনে হয় কত সহস্র নিরাশা অতৃপ্ত কত সহস্র যন্ত্রণায় তাঁহাদের প্রাণটা হাহাকার করিতেছে। একটা হৃদয়ের লোক পাইলে তাহার বুকে মাথা রাখিয়া মনের জটিল বিশৃঙ্খল ভাবের গ্রন্থি গুলা একে একে খুলিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়া দেখান, কিন্তু একটু স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখিলেই দেখিতে পান তাঁহাদের এমন একটি যন্ত্রণা নাই, একটি নিরাশা নাই, যাহার জন্য তাঁহাদের বুক ফাটিতে পারে, একটি কথা নাই যাহা আর এক জনের কাছে দুই দণ্ড ধরিয়া বলিতে পারেন; সেই জন্যই তাঁহাদের ইচ্ছা করে, এমন একটা ধরিবার

ছুঁইবার জিনিষ পান, যেটাকে উপলক্ষ করিয়া, কেবল অন্যের কাছে নয় নিজের কাছেও, দুই দণ্ড ধরিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া, চোখের জল ফেলিয়া বাঁচেন। আমি কষ্ট পাইতেছি অথচ তাহার কারণ পরকে বুঝাইতে পারিতেছি না এবং নিজেও বুঝিতেছি না, ইহা অপেক্ষা আর কষ্ট কি হইতে পারে? যদি বা সে কষ্ট কেহ বুঝে, তথাপি কেহ অনুভব করে না। এই জন্যই তাঁহারা এমন একটি ঘটনা অন্বেষণ করিতে থাকেন, যাহাকে তিরস্কার বলিয়া বলিতে পারেন, দেখ দেখি, তোমার জন্যই ত আমার এইরূপ হইল। তাঁহারা একজন কাহাকেও দায়ী করিতে চাহেন। সংসারে খুঁৎ ধরিতে গেলে অজস্র পাওয়া যায়; সুতরাং একটা-না-একটা কিছু হাতে থাকেই, যাহা লইয়া তাঁহারা নাড়াচাড়া করিতে পারেন। আসল কথা এই, তাঁহাদের দুঃখের নিজের একটা বাড়ি ঘর নাই, এই জন্য সে ঘর খুঁজিয়া বেড়ায়; একটা দুয়ার দেখিলেই অমনি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অসঙ্কোচে নিজের ঘরকন্না ফাঁদিয়া বসে। এইরূপ অনধিকার প্রবেশ করে বলিয়া কোথাও সে ভাল মুখে আতিথ্য পায় না, জোর জবরদস্তি করিয়া থাকিতে হয়, গালাগালি কানে না আনিয়া পিঠে দুই এক ঘা লাঠি খাইয়াও তাহাকে মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে হয়। বেচারী কোথায় যায় বল? এমন সৃষ্টিছাড়া দুঃখ যাঁহাকে পোষণ করিতে হয় তাঁহার কি যন্ত্রণা? তিনি নিজেও সুখী হন না, তাঁহার আপনার লোকদেরও সুখী করিতে পারেন না। যাহাকে তিনি ভালবাসেন, তাহাকেই তিনি অধিক জ্বালাতন করেন। তাহার প্রতিকাজে তিনি খুঁটিনাটি ধরেন, প্রতি ক্ষুদ্র কথায় অভিমান করেন ও প্রতি পদে তাহার ভালবাসায় স্পষ্ট অবিশ্বাস প্রকাশ করেন। অবশেষে তাহার ফল এই হয় যে, ক্রমে সতাই তাহার ভালবাসা চলিয়া যায়। এরূপ লোককে ভালবাসা বৃথা, কিছুতেই সন্তুষ্ট করা যায় না। ইহার হাতে কাজ রাখিলে তবে ইহাকে কিছু শান্ত করা যায়। যদি তুমি তোমার সমস্ত ভালবাসা ইঁহার কাছে প্রকাশ না কর, কিছু বাকী রাখিয়া দেও, তবে ইঁহার হাতে কাজ পড়ে, তোমার সমস্ত ভালবাসা পাইবার জন্য ইঁহার দিন রাত চেষ্টা থাকে। মনটা কাজে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু যখনি তোমার সমস্ত ভালবাসা পাইলেন, তখনিই তাঁহার অন্যান্য নানা খুঁটিনাটি ধরিবার অবসর হয়। হাতে তখন কাজ নাই কি করেন। প্রাণের ভিতর কাঁদিতে থাকে ও কাঁদিবার নানা উপলক্ষ খুঁজেন। ইহাদের ভালবাসাও প্রায় স্থায়ী হয় না,ক্রমিক স্থান পরিবর্ত্তন করে। কিসে যে মন সন্তুষ্ট হইবে ভাবিয়া পান না, ইহা উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চান। ইহাঁরা দুঃখের ঘটনা অত্যন্ত বাড়াইয়া দেখেন ও বাড়াইয়া বলেন। এই জন্য যখন অতি সামান্য কারণ লইয়া ইহাঁরা অত্যন্ত ঘোরতর হাহুতাশ করেন, সহসা মনে হয় যে, না জানি কি সর্ব্বনাশই হইয়া গিয়াছে, তখন আমাদের অত্যন্ত

আশ্চর্য্য বোধ হয়। উচ্ছ্বাসের প্রকৃত কারণ আমরা জানিতে পারি না। আসল কথা এই যে, যে সামান্য কারণ লইয়া তাঁহারা দুঃখ করিতে থাকেন তাহাই যদি সত্য তাঁহাদের দুঃখের কারণ হইত, তবে তাঁহারা এত দুঃখ করিতেন না। যেমন দুঃখের সম্বন্ধে সুখের সম্বন্ধেও সেইরূপ। যখন একটা সুখের কারণ ঘটে, সেটাকে অত্যন্ত প্রকাণ্ড করিয়া দেখেন, ও একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। একটানা দুঃখের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে যাইতে একটা তৃণ পাইলেও তাহা প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরেন। একটা কিছু ছুঁইতে পারিলেই অমনি তাড়াতাড়ি আহ্লাদে বিহ্বল হইয়া মনে করেন এবার বুঝি একটা কিনারা পাইলাম। কিন্তু সে যে বালীর কিনারা, যতই দৃঢ় মুষ্টিতে তাহা ধরিতে চেষ্টা করা যায়, ততই শিথিল বালুকা খসিয়া খসিয়া পড়ে কিছুতেই আঁকড়িয়া ধরা যায় না। এইরূপে ইহাঁরা সুখের কারণ ও দুঃখের কারণ দুই বাড়াইয়া দেখেন। সমস্ত জীবন আত্মপ্রতারণা করিয়াই কাটাইতে হয়। তাঁহারা যে নিজে জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা করিয়া আপনাকে প্রবঞ্চনা করেন, তাহা নহে। তাঁহাদের মন তাহার নিজের চক্ষে নিজে ধূলা দেয়, ইহাতে তাঁহাদের কোন হাত নাই, তাঁহারা জানিতেও পারেন না। তাঁহাদের সমস্ত জীবনটাই একটা মহা ভুল। ভুল লইয়াই তাঁহারা কাঁদেন, ভুল লইয়াই তাঁহারা হাসেন, ভুলই তাঁহাদের মনের ক্রীড়া, ভুলই তাঁহাদের মনের আহার! "সে ভুল প্রাণের ভুল, মর্ম্মে বিজড়িত মূল।" ভুলের উপরেই তাঁহাদের জীবনের ভিত্তি স্থাপিত। ভারতীর তৃতীয় খণ্ডে একটি গান প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এই ভাব সংক্ষেপে ব্যক্ত হইয়াছে।

"ওকথা বোল না তারে, কভু সে কপট নারে
আমার কপাল দোষে চপল সে জন।
অধীর হৃদয় বুঝি, শান্তি নাহি পায় খুঁজি
সদাই মনের মত করে অন্বেষণ।
ভাল সে বাসিত যবে করে নি ছলনা,
মনে মনে জানিত সে, সত্য বুঝি ভালবাসে
বুঝিতে পারেনি তাহা যৌবন কল্পনা।
হরষে হাসিত যবে হেরিয়া আমায়,
সে হাসি কি সত্য নয়? সে যদি কপট হয়,
তবে সত্য বলে কিছু নাহি এ ধরায়!
স্বচ্ছ দর্পণের মত বিমল সে হাস
হৃদয়ের প্রতি ছায়া করিত প্রকাশ,
সে কি কপটতাময়? কখন—কখন নয়
কে আছে সে হাসি তার করে অবিশ্বাস?
ওকথা বোলনা তারে, কভু সে কপট না রে
আমার কপাল দোষে চপল সে জন,
প্রেম মরীচিকা হেরি ধায় সত্য মনে করি,
চিনিতে পারেনি সে যে আপনারি মন।"

অর্থাৎ যথার্থ ভালবাসা না হইতেই অকারণ-কষ্টগ্রস্তেরা কল্পনা করে যে, তাহারা ভালবাসিতেছে। তাহারা মনে করে এই ভালবাসা পাওয়ার অভাবেই তাহাদের যত কষ্ট। এই ভালবাসা পাইলেই তাহাদের সকল কষ্ট দূর হইবে। ভালবাসিবার অবসর পাইলেই ইহারা মনের আনন্দে তাড়াতাড়ি মনোগত ইচ্ছার

অনুকূল কল্পনা করিতে থাকে। যত দিন ভালবাসা না পায় তত দিন মনটা এক রূপ ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু ভালবাসা পাইলেই তাহাদের অন্তঃকরণ বুঝিতে পারে যে, এখনো সেই সর্ব্বগ্রাসী অভাব বিকট বদন বিস্তার করিয়া বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে। আবার খুঁৎখুঁৎ করিতে আরম্ভ করে। মনে করে, যাহাকে ভালবাসি তাহার দোষেই আমি সুখী হইতে পারিতেছি না। সে যদি এই রূপ না করিত তাহা হইলে আমি কষ্ট পাইতাম না, সে যদি এইরূপ করিত তাহা হইলে আমি সুখী হইতাম। সে যদি এইরূপ না হইয়া এইরূপ হইত, তাহা হইলেই আর কিছু কথা কহিবার থাকিত না। যাহার ভালবাসা ইহারা অনুগ্রহ মনে করে, তাহাকে ভাল বাসিয়াই ইহারা যথার্থ সুখী হইতে পারে। এ জীবনে ইহারা এমন কাহাকেও ভাল বাসিতে পারিবে না, যাহার ভালবাসায় ইহাদের অধিকার আছে। অর্থাৎ যাহাকে ভালবাসিলে ইহাদের সুখী হইবার সম্ভাবনা আছে তাহাকে ইহারা ভাল বাসিতে পারিবে না। ভাল বাসিয়া সুখ না পাইলেই তবে ইহারা অপেক্ষাকৃত সুখে থাকিতে পারিবে।

এরূপ লোকদের কি কেহই মমতা করিবে না? সন্ধ্যাবেলায় যখন একলাটি বসিয়া একটি তারার দিকে চাহিতে চাহিতে ইহাদের চক্ষে জল আসে, তখন কি কেহই ইহাদের দোষর হইবার নাই? কেহই কি এক মুহূর্ত্তের জন্য পাশে বসিয়া বলিবে না "আহা কাঁদিওনা!" যখন স্তব্ধ জ্যোৎস্না রাত্রে বসন্তসমীরে ইহাদের হৃদয় হাহা করিতে থাকে তখন জ্যোৎস্নাও হাসিবে বসন্ত রাত্রিও হাসিবে, কিন্তু এমন কি একটি হৃদয় থাকিবে না যে কাঁদিবে?

আর একদল লোক আছে তাহারা দুঃখ ভালবাসে বলিয়া দুঃখ করে। তাহারা কোন অবস্থায় স্বীকার করিতে চায় না যে তাহারা ভাল আছে। যখন তাহারা খুব হাসিতেছে খেলিতেছে, তখন তাহাদের বল, এখন ত তুমি বেশ সুখে আছ, তাহারা অপ্রস্তুত হয় ও তাড়াতাড়ি Byron আওড়াইয়া বলে—

যদিও বা ত্যজি বিরামের আশা,
যখন গভীর রাতি,
হাসি আলাপেতে থাকি নিমগন
আমোদে প্রমোদে মাতি।
তবু সে ভগন প্রাসাদের মত
লতায় পাতায় পোরা,
বাহিরেতে তার হরিত নবীন
ভিতরেতে ভাঙ্গা চোরা!

তাহারা নিজে জানিতে চায় যে তাহারা দুঃখী, তাহারা সকলকে জানাইতে চায় যে, তাহারা দুঃখী। দুঃখে দুঃখেই যে তাহাদের জীবন কাটিল, সকলেই যে তাহাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে, অদৃষ্টের সমুদয় ঝড় তাহাদেরি উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, সমুদয় বজ্র তাহাদেরি দিকে বিদ্যুদ্দন্ত বিকাশ করিতেছে, ও মধ্যে সেই নিপীড়িত, অত্যাচরিত, নির্দ্দোষী ব্যক্তিরা অনাবৃত মস্তকে ধৈর্য্য

ধরিয়া বসিয়া আছে; তাহাদের মুখে কথাটি নাই; ঝড় বহে বহুক, বজ্র পড়ে পড়ুক্, নিজের এইরূপ একটি আদর্শ চিত্র তাহাদের চখের সম্মুখে দিন রাত্রি জাগিয়া আছে। এই নিমিত্ত অদৃষ্টের সুপ্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিলে ইহারা বড়ই ডরায়। অদৃষ্টের ভ্রূকুটি ইহারা মনে মনে ভাল বাসে। মাঝে মাঝে ইহাদের বড়ই দুঃখ হয় যে, ইহাদের তহবিলে দুঃখ নাই। মাঝে মাঝে ইহাদের বড়ই কান্না আসে যে, ইহাদের কাঁদিবার কোন একটা ঘটনা ঘটিতেছে না। এমন করিবার কারণ কি? ইহারা লোকের মমতা পাইতে বড় ভাল বাসে। যেমন অনেক ভিক্ষুক অন্ধ ভান করিয়া অর্থ ভিক্ষা করে, ইহারা তেমনি দুঃখী ভান করিয়া মমতা ভিক্ষা করে, কেবল প্রভেদ এই, ইহাদের অনেকে নিজেই নিজেকে দুঃখী মনে করিয়া প্রতারিত হইয়াছে। ইহারা চায় যে, লোকে মনে করে, "আহা এ ব্যক্তির বড় কষ্টের জীবন, কাহারো নিকট হইতে ভাল ব্যবহার পায় নাই।" সকল লোকের নিকটে মমতা যদি বা না চায়, তবে নিদেন, যাহাদের ভালবাসে তাহাদের মনে একটা করুণা উদ্রেক করিতে চায়। তাহাও যদি না হয় তবে আপনার কাছেই আপনি মমতার পাত্র হইতে তাহার অভিপ্রায়। সে নিজের মুখের দিকে চাহিয়া করুণ স্বরে বলিতে চায়; "আহা, এ সংসারে তোকে মমতা করিবার কেহই নাই। চোখের জলেই তোর জীবন অবসান হইল।" করুণার পাত্র হইতে তাহার একান্ত ইচ্ছা। তা,' সকলের কাছেই হউক্ বা ভালবাসার লোকের কাছেই হউক্ বা নিজের কাছেই হউক্!

ইহারা যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে পদে পদে জানাইতে চায় "তুমি আমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিতেছ।" তাহাকে কথায় কথায় অপরাধী সাব্যস্ত করিতে চায়। মনে করে,সে নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে চেষ্টা করিবে। সে বলিবে, "আহা, বেচারার পরে বড় অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি!" ও অধিকতর যত্ন ও আদর করিবে। কিন্তু ইহারা যে উদ্দেশ্যে এরূপ করে প্রায়ই তাহার বিপরীত ফল ফলে। এই মমতা ভিক্ষুকেরা যত অল্প মমতা পায়, এমন আর কেহ নহে। ইহাদের অশ্রুর আর মূল্য থাকে না। ইহাদের দুঃখ উপেক্ষিত হইতে থাকে। এমন কি, ক্রমে হাস্য ভাজন হইতে ইহারা বিরক্তি ভাজন হইয়া উঠে। তখন তাহারা কাঁদিয়া আর আদর পায় না, আদর না পাইয়া আরো কাঁদে, আরো আদর পায় না। একটা যে অমূলক দুঃখের গাছ সে বাহির হইতে আনিয়া মনের মধ্যে রোপণ করিয়াছিল, ক্রমে তাহার মূল বাহির হইতে থাকে। এককালে যাহা অকারণ ছিল ক্রমে তাহাই সকারণ হইয়া দাঁড়ায়। অবশেষে অশ্রুজলে দিন কাটিতে থাকে, অশ্রু জলের আর বিরাম নাই, অথচ আদর পায় না, মমতা পায় না, কেহই একটি কথা জিজ্ঞাসা

করে না, সকলেই বলে উহার ঐরূপ দশা। এইরূপে "কিছুই-না"কে মানুষ করিয়া "কিছু" করিয়া তুলিয়া তাহারি হাতে মারা পড়িতে হয়!

হর-হৃদে কালিকা।

কে তুইলো হর হৃদি আলো করি দাঁড়ায়ে,
ভিখারীর সর্ব্বত্যাগী বুকখানি মাড়ায়ে?
নাই হোথা সুখ আশা, বিষয়ের কামনা,
নাই হোথা সংসারের—পৃথিবীর ভাবনা!
আছে শুধু ওই রূপে বুকখানি ভরিয়ে—
আছে শুধু ওইরূপে মনে মন মরিয়ে।
বুকের জ্বলন্ত শিরে রক্ত রাশি নাচায়ে,
পাষাণ পরাণ খানি এখনও বাঁচায়ে,
নাচিছে হৃদয় মাঝে জোতির্ম্ময়ী কামিনী,
শোণিত তরঙ্গে ছুটে প্রস্ফুরিত দামিনী।
ঘুমায়েছে মন খানা ঘুমায়েছে প্রাণ গো
এক স্বপ্নে ভরা খালি হৃদয়ের স্থান গো।
জগতে থাকিয়া আমি থাকি তার বাহিরে,
জগৎ বিদ্রূপ ছলে, পাগল ভিখারী বলে
তাই আমি চাই হোতে আর কিবা চাহিরে!
ভিখারী করিব ভিক্ষা বাঘম্বর পরিয়ে
বিমোহন রূপখানি হৃদি মাঝে ধরিয়ে।

* * * * *

একদা প্রলয় শিঙ্গা বাজিয়া রে উঠিবে!
অমনি নিভিবে রবি, অমনি মিশাবে তারা
অমনি এ জগতের রাশ রজ্জু টুটিবে।
আলোক-সর্ব্বস্ব হারা, অন্ধ যত গ্রহ তারা
দারুণ উন্মাদ হোয়ে মহা শূন্যে ছুটিবে!
ঘুম হোতে জাগি উঠি রক্ত আঁখি মেলিয়া
প্রলয়, জগৎ লোয়ে বেড়াইবে খেলিয়া।
প্রলয়ের তালে তালে ওই বামা নাচিবে,
প্রলয়ের তালে তালে এই হৃদি বাজিবে!
আঁধার কুন্তল তোর মহা শূন্য জুড়িয়া
প্রলয়ের কাল ঝড়ে বেড়াইবে উড়িয়া!
অন্ধকারে দিশাহারা, কম্পমান গ্রহ তারা
চরণের তলে আসি পড়িবেক গুঁড়ায়ে,
দিবি সে জগৎ-চূর্ণ নিঃশ্বাসেতে উড়ায়ে!
এমনি রহিব স্তব্ধ ওই মুখে চাহিয়া—
দেখিব হৃদয় মাঝে, কেমনে ও বামা নাচে
উন্মাদিনী, প্রলয়ের ঘোর গীতি গাহিয়া!
জগতের হাহাকার যবে স্তব্ধ হইবে—
ঘোর স্তব্ধ, মহা স্তব্ধ, মহা শূন্য রহিবে—
আঁধারের সিন্ধু রবে অনন্তের গ্রাসিয়া—
সে মহান্ জলধির নাই ঊর্ম্মি নাই তীর
সেই স্তব্ধ সিন্ধু ব্যাপি রব আমি ভাসিয়া;
তখনো রহিবি তুই এই বুকে দাঁড়ায়ে—
ভাবনা বাসনা হীন এই বুক মাড়ায়ে!

সম্পাদকের বৈঠক।

(ডাকিনী। ম্যাক্‌বেথ্‌)

দৃশ্য। বিজন প্রান্তর। বজ্র বিদ্যুৎ।

তিন জন ডাকিনী।

১ম ডা—ঝড় বাদলে আবার কখন
মিল্‌ব মোরা তিনটি জনে।
২য় ডা—ঝগড়া ঝাঁটি থাম্‌বে যখন,
হার জিত সব মিট্‌বে রণে।
৩য় ডা—সাঁঝের আগেই হবে সে ত;
১ম ডা—মিল্‌ব কোথায় বোলে দে ত।
২য় ডা—কাঁটা খোঁচা মাঠের মাঝ।
৩য় ডা—ম্যাকেথ সেথা আস্‌চে আজ।
১ম ডা—কটা বেড়াল! যাচ্চি ওরে!
২য় ডা—ঐ বুঝি ব্যাং ডাক্‌চে মোরে!
৩য় ডা—চল্‌ তবে চল্‌ ত্বরা কোরে!
সকলে—মোদের কাছে ভালই মন্দ,
মন্দ যাহা ভাল যে তাই,
অন্ধকারে কোয়াশাতে
ঘুরে ঘুরে ঘুরে বেড়াই!

প্রস্থান।

দৃশ্য। এক প্রান্তর। বজ্র।

তিন জন ডাকিনী।

১ম ডা—এতক্ষণ বোন কোথায় ছিলি?
২য় ডা—মারতেছিলুম শুয়োর গুলি।
৩য় ডা—তুই ছিলি বোন, কোথায় গিয়ে?
১ম ডা—দেখ, একটা মাঝির মেয়ে
গোটাকতক বাদাম নিয়ে
খাচ্ছিল সে কচ্‌মচিয়ে
কচ্‌মচিয়ে
কচ্‌মচিয়ে—
চাইলুম তার কাছে গিয়ে,
পোড়ার মুখী বোল্লে রেগে
"ডাইনি মাগী যা' তুই ভেগে।"
আলাপোয় তার স্বামী গেছে,
আমি যাব পাছে পাছে।
বেঁড়ে একটা ইঁদুর হোয়ে
চালুনীতে যাব বোয়ে—
যা বোলেছি কোর্‌ব আমি
কোর্‌ব আমি—
নইক আমি এমন মেয়ে!
২য় ডা—আমি দেব বাতাস একটি
১ম ডা—তুমি ভাই বেশ লোকটি!
৩য় ডা—একটি পাবি আমার কাছে।
১ম ডা—বাকি সব আমারি আছে।

* * * * *

খড়ের মত একেবারে
শুকিয়ে আমি ফেল্‌ব তারে।
কিবা দিনে কিবা রাতে
ঘুম রবে না চোকের পাতে।
মিশ্‌বেনা কেউ তাহার সাথে।
একাশি বার সাত দিন
শুকিয়ে শুকিয়ে হবে ক্ষীণ।
জাহাজ যদি না যায় মারা
ঝড়ের মুখে হবে সারা।

বল্ দেখি বোন, এইটে কি!
২য় ডা—কই, কই, কই, দেখি, দেখি।
১ম ডা—একটা মাঝীর বুড় আঙুল
রোয়েচে লো বোন, আমার কাছে,
বাড়িমুখো জাহাজ তাহার
পথের মধ্যে মারা গেছে।
৩য়—ঐ শোন্ শোন্ বাজ্‌ল ভেরী
আসে ম্যাকেথ, নাইক দেরী।

দৃশ্য—গুহা। মধ্যে ফুটন্ত কটাহ।
বজ্র। তিন জন ডাকিনী।

১ম ডা—কালো বেড়াল তিনবার
করেছিল চীৎকার।
২য় ডা—তিনবার আর একবার
সজারুটা ডেকেছিল।
৩য় ডা—হার্পি বলে আকাশ তলে
"সময় হোল" "সময় হোল!"
১ম ডা—আয় রে কড়া ঘিরে ঘিরে
বেড়াই মোরা ফিরে ফিরে।
বিষ মাখা ওই নাড়ি ভুঁড়ি
কড়ার মধ্যে ফেল্ রে ছুঁড়ি'।
ব্যাং একটা ঠাণ্ডা ভুঁয়ে
একত্রিশ দিন ছিল শুয়ে,
হোয়েছে সে বিষে পোরা
কড়ার মধ্যে ফেল্‌ব মোরা।
সকলে—দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বিগুণ খেটে
কাজ সাধি আয় সবাই জুটে।
দ্বিগুণ দ্বিগুণ জ্বল্‌রে আগুন
ওঠরে কড়া দ্বিগুণ ফুটে।
২য়—জলার সাপের মাংস নিয়ে
সিদ্ধ কর কড়ায় দিয়ে।
গিরগিটি-চোক ব্যাঙের পা,
টিক্‌টিকি-ঠ্যাং পেচার ছা।
কুত্তোর জিব, বাদুড় রোঁয়া,
সাপের জিব আর শুওর শোঁয়া।
শক্ত ওষুধ কোরতে হবে
টগবগিয়ে ফোটাই তবে।
সকলে—দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বিগুণ খেটে
কাজ সাধি আয় সবাই জুটে।
দ্বিগুণ দ্বিগুণ জ্বল্‌রে আগুন
ওঠরে কড়া দ্বিগুণ ফুটে।
৩য়—মকরের আঁশ, বাঘের দাঁত,
ডাইনি-মড়া, হাঙ্গর ব্যাং,
ইষের শিকড় তুলেছি রাতে,
নেড়ের পিলে মেশাই তাতে,
পাঁঠার পিত্তি, শেওড়া ডাল
গেরণ-কালে কেটেছি কাল,
তাতারের ঠোঁট, তুর্কি নাক,
তাহার সাথে মিশিয়ে রাখ।
আনগে রে সেই জ্রূণ-মরা,
খানায় ফেলে খুন-করা,
তারি একটি আঙুল নিয়ে
সিদ্ধ কর কড়ায় দিয়ে।
বাঘের নাড়ি ফেলে তাতে
ঘন কর আগুন-তাতে।
সকলে—দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বিগুণ খেটে
কাজ সাধি আয় সবাই জুটে,
দ্বিগুণ দ্বিগুণ জ্বল্‌রে আগুন
ওঠরে কড়া দ্বিগুণ ফুটে।
দ্বি ডা—বাঁদর ছানার রক্তে তবে
ওষুধ ঠাণ্ডা কোরতে হবে—
তবেই ওষুধ শক্ত হবে।

নক্ষত্র আলোক।

আমরা একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্কার রাত্রে যে সকল তারা আকাশে বিস্তৃত দেখিতে পাই তাহাদের সকল গুলি কিছু এক বর্ণের নয়। শীতকালে ভোরের সময় আমরা যে বড় উজ্জ্বল তারাটি দেখিতে পাই তাহার নাম শুক্র; ইহার বর্ণ উজ্জ্বল সাদা। আর বসন্তকালে সন্ধ্যার পর আমরা যে একটা তিন-কোনা তারা দেখিতে পাই তাহার নাম মঙ্গল। মঙ্গল গ্রহের বর্ণ প্রধানত লাল কিন্তু মধ্যে মধ্যে সবুজের আভা যুক্ত। শুক্র ও মঙ্গল এদুইটিই গ্রহ। ইহাদের হ্রাস বৃদ্ধি আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু ইহা ব্যতীত স্থির নক্ষত্রদিগেরও সকলের একরূপ বর্ণ নয়। জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতেরা অনেক দিন ধরিয়া দেখিয়া দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে নক্ষত্রের বর্ণের উপর তাহার শ্রেণী নির্ভর করে। প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্র সকল উজ্জ্বল সাদা, দ্বিতীয় শ্রেণীর গুলি পীতবর্ণ, তৃতীয় শ্রেণীর নক্ষত্র লাল, চতুর্থের বর্ণ সবুজ।

নক্ষত্রের এরূপ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ হইবার কারণ কি? অনেক বৈজ্ঞানিক বলেন যে, মঙ্গলে যে সকল উদ্ভিদ জন্মায় তাহার বর্ণ লাল সেই জন্য মঙ্গল লাল। আর যে সবুজ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সমুদ্র। কিন্তু আমরা যে সকল নক্ষত্রের বর্ণানুসারে শ্রেণী বিভাগ করিবার কথা উপরে উল্লেখ করিলাম তাহারা যে উদ্ভিদশালী এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, বরঞ্চ তাহার বিপরীত যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। অল্প দিন হইল Spectroscope বলিয়া একটি যন্ত্র বাহির হইয়াছে তাহা দ্বারা আমরা অতি দূরস্থ বস্তুরও আলোকের বর্ণ বিশ্লেষণ করিয়া পরীক্ষা করিতে পারি। সূর্য্যের আলোকের ন্যায় নক্ষত্রের আলোকেও রামধনু-বর্ণ আছে; কেবল গ্রহের উপরকার আচ্ছাদক বাষ্পীয় আবরণ সেই গ্রহ-বিকীরিত আলোকের যে বর্ণের গতি রোধ করে বিশ্লিষ্ট আলোকের বর্ণ সপ্তকের মধ্যে সেই বর্ণের স্থানে কাল কাল রেখা সকল দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে যে নক্ষত্রের আলোক বিশ্লেষণ করিলে লাল রঙের স্থলে কাল রেখা দেখা যায় তাহার লাল রঙের অধিকাংশ আলোক অন্তর্হিত হইয়াছে কাজে কাজেই সে নক্ষত্রের আলোকে নীল, পীত ও সবুজ এই তিন বর্ণের প্রাদুর্ভাব অর্থাৎ ইহার আলোক নীলাভাময়। আবার যাহার আলোকের বর্ণ শ্রেণীতে পীত বর্ণের স্থানে কাল রেখা দেখিতে পাওয়া যায় সে নক্ষত্রের বর্ণ লাল আভাময়। শুক্র গ্রহের বাষ্পীয় আবরণের ভিতর দিয়া প্রতিফলিত সূর্য্যালোক

অবাধে চলিয়া আসে সেই জন্য শুক্রের উজ্জ্বল সাদা রঙ্। যত দিনের কথা আমরা জানিতে পারি তাহাতে এইরূপ মনে করা যায় যে চিরকালই শুক্রের বর্ণ একরূপ। সংস্কৃত, গ্রীক ও লাটিন এই সকল ভাষাতেই এই তারার নামের অর্থ সাদা। কিন্তু আকাশের উত্তর কেন্দ্রের নিকট সিরিয়স্ অথবা কুকুর নক্ষত্র নামক যে একটা অতি উজ্জল তারা আছে তাহার সম্বন্ধে প্রাচীন সময়ের লোকেরা বলেন উহার বর্ণ হরিদ্রার আভাযুক্ত ছিল। সিরিয়সের এই আলোক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন যে সিরিয়স নক্ষত্র পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক তপ্ত হইয়াছে এই জন্য তাহার আলোক উজ্জ্বলতর, আবার অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলেন যে সিরিয়স ক্রমশঃ পৃথিবীর নিকটে আসিয়া পড়িতেছে সেই জন্য তাহার আলোক আমাদের চক্ষে উত্তরোত্তর উজ্জ্বলতর ঠেকিতেছে। এরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার কারণ ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইবে।

এখন সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে হইবে যে আদৌ বর্ণের উৎপত্তি কিরূপে হয়। যে সকল বস্তু আমরা দেখিতে পাই তাহা হয় নিজে আলোক বিক্ষেপ করিতেছে এবং সেই আলোক আমাদের চক্ষে আঘাত করিতেছে কিম্বা অন্য কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন আলোক সেই বস্তুতে প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়িতেছে। আলোক বিক্ষেপ করিবার আর কোন অর্থ নাই কেবল এই যে সেই বস্তুর ভিতরে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই আন্দোলন ক্রমে ক্রমে চারিদিগের Etherএ বিস্তৃত হইয়া অবশেষে আমাদের চক্ষের উপর আসিয়া আঘাত করিতেছে। যেরূপ আন্দোলন Etherএ পরিব্যাপ্ত হইয়া আলোক উৎপন্ন করে তাহা ঠিক নদীর ঢেউয়ের ন্যায়। কোন একটা নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কয়টা ঈথরের ঢেউ আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়ে তাহার উপরে আলোকের বর্ণ নির্ভর করে। ভিন্ন ভিন্ন আয়তনের ঢেউ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রঙ উৎপন্ন হয়। সাত প্রকার ঢেউ সামঞ্জস্য ভাবে আমাদের চক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলে আমরা সাদা রঙ দেখিতে পাই। আবার যখন কোন একটা রঙের ঢেউ অতি বেরিতে কিম্বা অতি শীঘ্র আসিয়া আমাদের চক্ষে পড়ে তখন আমরা তাহা আদতেই দেখিতে পাই না। সাধারণতঃ আমরা সূর্য্যের বিশ্লিস্ট আলোকে বায়লেট রঙের পর আর কোন রঙ দেখিতে পাই না। কিন্তু একখণ্ড কাগজকে কুইনীন মিশ্রিত জলে ডুবাইয়া সেখানে ধরিলে আগে যেখানে কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল না, সেখানে রঙ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার কারণ এই যে এই বায়লেটের পরবর্ত্তী-বর্ণের ঢেউ সকল এত দ্রুত-তরঙ্গিত যে তাহা আমাদের দর্শন ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কিন্তু উক্ত প্রকারে তাহার গতি লাঘব করিলে তাহা আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়।

এখন স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে

যে একটা নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কয়টা আলোকের ঢেউ আমাদের চক্ষের উপর আসিয়া আঘাত করে তাহারি উপর প্রজ্জলিত বস্তুর আলোকের বর্ণ নির্ভর করে। মনে কর যে এক সেকেণ্ডের মধ্যে ১০টা ঢেউ আমাদের চক্ষে আসিলে আমরা লাল রঙ দেখিতে পাই, আর মনে কর যে ঐ সময়ের মধ্যে ১১টা ঢেউ আসিলে আমরা পীত বর্ণ দেখিতে পাই। এখন মনে কর যে,তুমি একটা নদীর মধ্যে দাঁড়াইয়া আছ আর কিছু দুর হইতে অন্য এক জন লোক স্রোতের মুখে সমান সময়ান্তর একটা একটা করিয়া কতকগুলি জবাফুল তোমার দিকে ভাসাইয়া দিতেছে। তুমি যদি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাক তাহা হইলে মনে কর যেন ১০টা জবা ফুল প্রতি সেকেণ্ডে তোমার নিকট আসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু যেদিক হইতে জবাফুল ভাসিয়া আসিতেছে সাঁতার দিয়া সেই দিকে গেলে মনে কর ১১ টা জবাফুল তোমার কাছে উপস্থিত হইতেছে। কেন না তুমি চুপ করিয়া থাকিলে যে দশটা ফুল তোমার নিকটে উপস্থিত হইত তাহারা তোমার কাছে আসিবেই তাহা ছাড়া সেটা তোমার কাছে পৌঁছাইত না তুমি অগ্রসর হইয়া তাহার নিকট গিয়া পৌঁছাইবে। এখন যদি আমরা জানিতে পারি যে, নদীর জল কিরূপ বেগে বহিতেছে আর তুমি স্রোতের বিপরীত দিকে কি রূপ বেগে সাঁতার দিতেছ তাহা হইলে আমরা ঠিক বলিতে পারি যে কয়টা জবাফুল তুমি বেশী পাইবে। কিম্বা নদীর বেগ ও ফুলের সংখ্যা পাইলে আমরা তোমার সাঁতারের বেগ স্থির করিতে পারি; সংক্ষেপতঃ, ইহার কোন দুইটা জানিতে পারিলে আমরা তৃতীয়টা বাহির করিতে পারি। এ গণনাতে অঙ্ক শাস্ত্রের অতি অল্পই সাহায্য প্রয়োজন হয়। অগ্রসর হইবার ও অধিক সংখ্যক জবাফুল পাইবার বিষয় যাহা বলা হইল পিছাইয়া যাইবার ও অল্প সংখ্যক ফুল পাইবার বিষয়েও সে যুক্তি সংলগ্ন হইবে।

নক্ষত্র হইতে আমরা যে আলোক পাই তাহার বর্ণ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধেও ঐরূপ। জবাফুল সম্বন্ধে যাহা বলা হইল ঐরূপ তাহাদের সম্বন্ধেও বলা যায়। পৃথিবী কোন একটা নক্ষত্রের নিকটবর্ত্তী হইলে পূর্ব্বকার অনুমান অনুসারে তাহার পূর্ব্বকার লাল বর্ণ পীত বর্ণে পরিণত হইবে। আমরা আলোকের গতির বেগ জানি আমরা ঢেউয়ের সংখ্যা বৃদ্ধিও জানিতেছি সুতরাং কিরূপ বেগে নক্ষত্র পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইতেছে তাহা আমরা অঙ্কে জানিতে পারি।

সিরিয়স নক্ষত্র পীত বর্ণ হইতে এখন ক্রমে সাদা হইয়া পড়িতেছে। অর্থাৎ পূর্ব্বে সাদা হইবার জন্য যে বর্ণের আলোকের অভাব ছিল অন্য বর্ণ এখন সেই বর্ণে পরিণত হইয়া সাদা বর্ণ উৎপন্ন করিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত রূপ ও অন্যান্য প্রকার গণনা দ্বারা কিরূপ বেগে সিরিয়স পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইতেছে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

এক প্রকার তারা আছে তাহাদের আ-

লোক নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে পরিবর্ত্তিত হয়; ইহারা প্রথমত উজ্জ্বল থাকে তাহার পর ক্রমশ মলিন হইয়া যায়, পরে আবার উজ্জ্বল হয়।

তিমি (Whale) রাশিতে এইরূপ একটা তারা আছে যাহার নাম Mira অর্থাৎ "অদ্ভুত"। এগার মাসের মধ্যে ইহার এই সমস্ত পরিবর্ত্তন হয়। প্রথম এক পক্ষ ইহা উজ্জ্বলতাতে দ্বিতীয় শ্রেণীর তারাদের সমান থাকে তাহার পর তিন মাস ধরিয়া ইহা ক্রমশ মলিন হইতে থাকে শেষে একেবারে অদৃশ্য হয়। খালি চক্ষের কথা দূরে থাকুক অত্যন্ত ক্ষমতাশালী দূরবীনের দ্বারাও উহাকে আর দেখিতে পারা যায় না। এইরূপ পাঁচ মাস ইহা অদৃশ্য থাকে তাহার পর আবার তিন মাস ধরিয়া আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হইতে থাকে এবং পনের দিন দ্বিতীয় শ্রেণীর তারার ন্যায় কিরণ দিয়া আবার মলিন হইতে আরম্ভ হয়।

পারসিয়ুস রাশিতে Algol নাম একটা তারা আছে তাহারও আলোকের পরিবর্ত্তন হয় কিন্তু এই পরিবর্ত্তন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হয় এবং ইহা কখনো একেবারে অদৃশ্য হয় না। তিন দিনের অপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে Algol দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত হইয়া যায়।

কাল পুরুষের (Orion) পায়ের কাছে একটা তারা আছে তাহার নাম Betelgeuse, তাহার ঐরূপ পরিবর্ত্তন ২০০দিনের মধ্যে হয় এবং সর্প রাশির মধ্যে একটা তারা আছে তাহার ছয় দিনের মধ্যে এই পরিবর্ত্তন হয়।

ইহা ব্যতীত সুমেরুর নিকট Al Thuban বলিয়া একটা তারা আছে প্রাচীন Chaldeans ও মিশর নিবাসীদের বিবরণ দেখিয়া বোধ হয় যে উহা তাহাদের সময় আমাদের এখনকার মেরু নক্ষত্র Polestar) অপেক্ষাও অধিক উজ্জ্বল ছিল কিন্তু এখন উহা তৃতীয় শ্রেণীর তারা অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল নহে।

আমাদের সূর্য্যও বোধ হয় দূরস্থ অন্য কোন গ্রহ হইতে এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া বোধ হইবে। সূর্য্যে অনেক কাল কাল দাগ আছে। সূর্য্য আপনার চারিদিকে ঘুরিতেছে কাজেই যখন কোন গ্রহ হইতে সূর্য্যের কেবল মাত্র এই কাল দাগযুক্ত অংশ দেখিতে পাওয়া যায় তখন অন্য সময়ের অপেক্ষা ইহাকে মলিন দেখিতে হইবে। এইরূপ কারণবশতই উপরে উল্লিখিত তারা সকলের আলোক পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া বোধ হয়।

আর কতক তারা আছে যাহাদের আলোকের উজ্জ্বলতা ক্রমশ এমনি মিলাইয়া গিয়াছে যে, তাহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। ইহাদের ভিতরকার আগুন একেবারে নিভিয়া গিয়াছে কিম্বা ইহারা এত দূরে গিয়া পড়িয়াছে যে ইহাদের আলোক আর পৃথিবীতে পৌঁছাইতে পারে না কিম্বা ইহাদের অন্ধকার দিক আমাদের দিকে ফিরাইয়াছে। হয়ত আবার অনেক দিন পরে ঘুরিয়া উজ্জ্বল অংশ দেখা দিবে। ১৫৭২

খৃঃ অব্দে এইরূপ এক আশ্চর্য্য তারা দেখিয়া জ্যোতির্বেত্তারা বিস্মিত হইয়াছিলেন। ধূমকেতুকে যে তারা বলিয়া ভুল হইয়াছিল এরূপ নহে কেননা যে তারার কথা হইতেছে তাহার কেতু অর্থাৎ লেজ ছিল না এবং তাহাকে কখনো স্থান পরিবর্ত্তন করিতে দেখা যায় নাই। এই তারা বৃহস্পতি ও সিরিয়স অপেক্ষাও অধিক উজ্জ্বল ছিল এমন কি শুক্র গ্রহ অপেক্ষাও বোধ হয় ইহার কিরণের অধিক তেজ ছিল কেননা কথিত আছে যে দুই প্রহর বেলার সময়ও ইহাকে অতি পরিস্কার রূপ দেখিতে পাওয়া যাইত। ক্রমশ ইহার আলোক মলিন হইতে লাগিল এবং অল্প দিনের মধ্যে ইহা একেবারেই মিলাইয়া গেল।

অনেক জ্যোতির্বেত্তা এইরূপ বলেন যে কোন ধূমকেতু বা গ্রহখণ্ড কোন সূর্য্যের উপর পড়িলে কিছু দিনের জন্য তাহার আলোক উজ্জ্বলতর হয়। ইহা কতদূর সত্য বলিতে পারা যায় না।

"চাঁদা আয় আয় আয়!"

রাগিণী পরজ কালাংড়া।

বালা খেলা করে চাঁদের কিরণে।
ধরে না হাসি রাশি আননে।
ঝুরু ঝুরু মৃদু বায়
কুন্তল উড়িয়ে যায়,
"চাঁদা আয়, আয় আয়" চায় গগনে।
ধরিয়ে মায়ের গলে
"দেখায়ে চাঁদ দে মা" বলে,
কাঁদ' কাঁদ' আধ' আধ' বচনে!
কাছে কাছে গাছে গাছে
ফুল সব ফুটিয়াছে
করতালি দিয়ে নাচে সঘনে!
হেসে হেসে দুলে দুলে
চুম খায় ফুলে ফুলে
চুম' খায় ধেয়ে মায়ের বদনে।

শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।

চট্টগ্রামের পুরাতত্ত্ব।

(বাঙ্গালা, ত্রিপুরা, ও আরাকাণ ইতিহাসের কিয়দংশ মাত্র।)

প্রথম অধ্যায়।

চট্টগ্রাম প্রদেশ কি সুন্দর। একবার ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিলে আর ভুলিতে পারা যায় না। কেমন সুন্দর প্রাচীর স্বরূপ মেঘমালা-সদৃশ শিখরমালা উত্তর দক্ষিণে ধাবিত। "চন্দ্রনাথ পাহাড়" নামক উচ্চ শিখরের সানুদেশে ভগবান শশাঙ্কশেখর কৈলাসনাথ বিরাজ করিতেছেন। (১) অনতিদূরে কলুষনাশিনী পাতালগঙ্গা ভোগবতী চন্দ্রশেখরের পরিচর্য্যার্থ আবির্ভূত হইয়াছেন। তাহার প্রায় পাঁচ মাইল দূরে একটী কুণ্ডমধ্যে হুতাশন জলের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। (২) সীতাকুণ্ড পাহাড়ে এক সময়ে দুইটী জ্বালামুখী (Volcano) (৩) দৃষ্ট হইয়াছিল। পর্ব্বত মধ্যে স্থানে স্থানে লবণ-কূপ দৃষ্ট হয়।

এই প্রদেশের উত্তর সীমান্তে ফণী (৪) ত্রিপুরাকে চট্টগ্রাম হইতে পৃথক রাখিয়া ও মধ্যস্থলে কর্ণফুলী (৫) কয়েকটী উপনদীর সহিত মিলিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে প্রবাহিত হইতেছে। এই নদীদ্বয়ের জন্মস্থান ত্রিপুরাচল। শঙ্খনদী আরাকাণের (৬) উত্তর

(১) চট্টলে দক্ষবাহুর্মে ভৈরবশ্চন্দ্রশেখরঃ।
ব্যক্তরূপা ভগবতী ভবানী তত্র দেবতা।
বিশেষতঃ কলিযুগে বসামি চন্দ্রশেখরে।
(পীঠ নির্ণয়।)

* * * *

(২) বাড়বকুণ্ড। বঙ্গদেশস্থ তিনটী উষ্ণ প্রস্রবণের অস্তিত্ব আমরা জ্ঞাত আছি। একটী উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়টী পার্ব্বত্য চট্টগ্রামস্থ "লিঙ্গশ্যাম" পর্ব্বতে। তৃতীয়টী বীরভূম প্রদেশে, নাম বক্রেশ্বর। বক্রেশ্বর তন্ত্রোক্ত পীঠস্থান। মুঙ্গের নগরের প্রায় ৬ মাইল পূর্ব্বে সীতাকুণ্ড নামে একটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। উহা বিহার দেশে।

(৩) ত্রিপুরা পর্ব্বত পার্শ্বে—"অষ্ট জঙ্গল" নামক স্থানে একটী জ্বালামুখী দৃষ্ট হইয়াছিল। মরুং (বর্ত্তমান দ্বার ঝিলিং) প্রদেশে "জ্বালাপাহাড়" শেখর শ্রেণী মধ্যে সর্ব্বোচ্চ। বোধ হয় এই জ্বালাপাহাড়ই তন্ত্রোক্ত জ্বালামুখী।

(৪) কর্ণেল উইল ফোর্ড বলেন ইহার প্রাচীন নাম ঐরাবত-(—নাগ)-নদ।

(৫) প্রবাদ আছে চট্টগ্রামের শাসন কর্ত্তার কর্ণের কুণ্ডল ইহাতে পতিত হয়। তজ্জন্যই এই স্রোতস্বতী কর্ণফুলী নামে খ্যাত হইয়াছে। কর্ণেল উইল ফোর্ড ইহাকে "কর্ম্মফুলী" লিখিয়াছেন। পৌরাণিক ভূগোলানুসারে এই নদী জয়াদ্রি হইতে উৎপন্ন।

(৬) এই প্রবন্ধে আমরা বারংবার আরাকাণের নামোল্লেখ করিব। অতএব ইহার নাম-করণের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে। এই প্রদেশে নরভুক

সীমান্ত পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া কর্ণফুলীর মোহনার প্রায় সাত মাইল দক্ষিণে সমুদ্রে পড়িতেছে। দক্ষিণ সীমান্তে "নাভিনদী" বা "স্থবর্ণনদী" আরাকাণ ও চট্টগ্রামের সীমা রক্ষা করিতেছে। এই স্রোতস্বতীর আধুনিক নাম "নাফ" বা "টিকানাফ"। চট্টগ্রামের পূর্ব্বদিকে অত্যুচ্চ শিখর শ্রেণী। (৭) পশ্চিম দিকে অসীম অনন্ত জলরাশি। ইহার দৈর্ঘ উত্তর দক্ষিণে প্রায় দুই শত মাইল। পরিসর অনধিক ৬৪ মাইল। পরিমাণ ফল ৯৩৮০ বর্গ মাইল। (৮) অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ। বার্ষিক নিট রাজস্ব ২৪০৫২১৮ টাকা। এই প্রদেশটী দুইটী স্বতন্ত্র জেলায় বিভক্ত। পশ্চিম ভাগ "চট্টগ্রাম" (৯) পূর্ব্বভাগ চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ" (১০)। পার্ব্বত্য প্রদেশ আইন-বহির্ভূত শ্রেণীতে গণ্য হইয়াছে।

এই সুন্দর ও বাণিজ্যোন্নত প্রদেশটী কোন্ সময়ে কোন্ নরপতির অধীন ছিল, তাহা পরিষ্কার রূপে লিপিবদ্ধ করা নিতান্ত দুরূহ। রাজা তোড়লমল্ল চট্টগ্রাম প্রদেশ বাঙ্গলার দশম সরকারে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহাতে ৭টী মহাল ও তাহার বার্ষিক রাজস্ব ২৮৫৬০৭ টাকা লিখিত হইয়াছে। আরব্য পারস্য ভাষাতত্ত্ববিদ্ মৃত মহাত্মা বুকমান সাহেব বলেন—"রাজা তোডলমল্ল অন্যায় রূপে চট্টগ্রাম বঙ্গান্তর্গত লিখিয়াছেন।" রাজস্থানের ইতিহাসবেত্তা টড সাহেবের লিপি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে আকবরের সেনানী মহারাজ মানসিংহের বাহুবলে মোগল সাম্রাজ্য আরাকাণ অবধি বিস্তৃত হইয়াছিল। আমরা এরূপ উক্তির সত্যতা স্বীকার করিতে পারি না। রাজমালা, বিজাতীয় ইতিহাস ও বৈদেশিক ভ্রমণকারী সাক্ষীগণের সাক্ষ্য পর্য্যালোচনায় বোধ হইতেছে—চট্টগ্রাম দীর্ঘকাল কোন এক রাজার অধীন ছিল না। ত্রিপুরা পতি ও আরাকাণরাজ ইহার আধিপত্য লইয়া নির-

---

রাক্ষসগণ বাস করিত বলিয়া পালি ভাষায় ইহাকে "রাক্ষপুরা" (রক্ষপুর) বলিত। পরে দেশীয়গণ অপভ্রংশে রাক্ষিয়াং—এবং বিদেশীয়গণ আরাকাণ করিয়াছেন। কর্ণেল ফেয়ার বলেন "এই প্রদেশে রাক্ষসগণ বাস করিত বলিয়া পালি ভাষায় ইহাকে রাক্ষহিক বলিত। ইহার অপভ্রংশ রাক্ষিয়াং—এবং তাহা হইতে আরাকান হইয়াছে।

(৭) উচ্চশৃঙ্গ—নীল পর্ব্বত ৫৬০০ ফিট—পিরামিড ৩০০০ ফিট—টিন ৩১০০ ফিট—রিরিঙ্গু ২৩৬০ ফিট—রামুপর্ব্বত ২১৬০ ফিট—সুগারলোফ ১৩৪৯ ফিট উচ্চ।

(৮) মিরকাসিম যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে চট্টগ্রাম দান করেন ইংরাজগণ সে সময়ে ইহার পরিমাণ ফল ২৯৮৭ বর্গ মাইল স্থির করিয়াছেন।

(৯) চট্টগ্রামের উত্তর অক্ষান্তর ২০ অংশ ৪৫ কলা হইতে ২২ অংশ ৫৯ কলা,—পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ৯১ অংশ ৩০ কলা ৯২ অংশ ২৩ কলা।

(১০) পার্ব্বত্য প্রদেশের উত্তর অক্ষান্তর ২১ অংশ ১৩ কলা হইতে ২৩ অংশ ৪৭ কলা,—পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ৯১ অংশ ৪৬ কলা হইতে ৯২ অংশ ৪৯ কলা।

ন্তর আহবে লিপ্ত ছিলেন। যবন রাজগণ স্ুবর্ণ গ্রামে পদার্পণ করিয়াই চট্টলাধিকারে লোলুপ হইলেন। দীর্ঘকালাবধি চট্টগ্রাম ভারতের পূর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তস্থ একটী প্রধান স্থান বলিয়া জগৎ সমক্ষে পরিচিত ছিল। (১১) পাশ্চাত্য বনিকগণ ইহাকে "পোর্টো গ্রাণ্ডো" (Porto Grando) বলিতেন। কিন্তু ১১১৬ শকাব্দে (১১৯৪ খৃঃ অঃ) ভূগোলবেত্তা এদ্‌রসী চট্টগ্রামকে "কর্ণবুল" লিখিয়াছেন। এই বন্দরের জন্মকাল নির্ণয় করা নিতান্ত সুকঠিন। শকাব্দের ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও তথায় চীন ও আরব দেশীয় বনিকদিগের সমাগম হইত। (১২) অদ্যাপি বাণিজ্য বিষয়ে চট্টগ্রাম বঙ্গের অন্যান্য জেলা হইতে উন্নত। চট্টগ্রাম বাসীগণ নৌচালন বিদ্যায় চির পারদর্শী। পুরাকালে ইহারা ত্রিপুরার সমর তরীর (১৩) নাবি-কার্য্যে নিযুক্ত ছিল।

কর্ণেল উইল ফোর্ড বলেন চট্টগ্রামের প্রাচীন নাম "পুষ্পগ্রাম"। তন্ত্রে চট্টগ্রামের নামোল্লেখ আছে। তন্ত্রের বয়ঃক্রম ৩।৪ শতাব্দী মাত্র। কবিতায় চট্টগ্রামের পরিবর্ত্তে "চট্টল" লিখিত। আমরা তদনুসারে গদ্যে ও পদ্যোচিত শব্দ ব্যবহার করিলাম। বোধ হয় প্রাচীন কালে "চট্ট ভট্ট" জাতি (১৪) চট্টগ্রামে বাস করিত। তাহাদের

(১১) আবোল ফাজেল লিখিয়াছেন—চট্টগ্রাম প্রাকৃতিক শোভায় পূর্ণ (পর্ব্বত মধ্যস্থ) ও সাগর তীরবর্ত্তী একটী বৃহৎ নগরী। ইহা খৃষ্টান ও অন্যান্য বৈদেশিক বনিকদিগের প্রধান বাণিজ্য স্থান। (Gladwin's Ayeen Akbhery Vol. II. p. 10)

(১২) ডি, বারাস বলেন—পর্টুগিজদিগের চট্টগ্রামে পঁহুছিবার শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে এদেশস্থ জনৈক ভদ্রলোক ২০০ শত সহচরের সহিত তথায় উপনীত হন। রাজ্যের তদানীন্তন অবস্থা দর্শনে তাহার হৃদয়ে একটী দুরাশা জন্মে। তিনি সেই আশায় মুগ্ধ হইয়া, একটী কুঠী খুলিয়া কারবার আরম্ভ করিলেন। ক্রমে দুই—হইতে পাঁচ শত সৈনা সংখ্যা হইল। বণিক গৌড়েশ্বর নিকট পরিচিত হইয়া একবার উড়িষ্যা পতির বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তৎপর তিনি বঙ্গেশ্বরের শরীররক্ষক সেনাদলের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। তৎপর—আর কি—রাজার প্রাণবধ করিয়া বাঙ্গলার রাজাসন অধিকার।—ইনি হয় (হাব্‌সিরাজ শ্রেণীর) ফেরোজ—নয় হুসন সা।

(১৩) আমাদের দেশীয় রণতরীর বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি। শকাব্দের সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে একটী যুদ্ধ যাত্রায় কয়েক জন ইউরোপীয় নাবিক ও ভ্রমণকারী উপস্থিত ছিলেন। তাহারা যে "বহর" দর্শন করেন, সেই বহরে এই সকল রণতরী ছিল,—ঘরাব, কোস, জলবাস, পোরিন্দা, বজ্রা, পতিলা, লসব, পলিল, ভর, বালাম, খটগিরি, মহালগিরি, পলওয়ার। বোধ হয় এই সকল রণতরীর মধ্যে ঘরাবই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল। সেই সময় একখানি ঘরাব ১৪টী কামান বহন করিত। এইরূপ ১৪টী তোপ লইয়া সংগ্রাম করা সামান্য তরীর কার্য্য নহে। রণকালে চারি খানি কোস এক একখানি ঘরাবের সাহায্যের জন্য থাকিত।

(১৪) আধুনিক ভাট বা ভট্টজাতি বোধ হয় প্রাচীন কালে "চট্ট ভট্ট" নামে পরিচিত ছিল। পাল ও সেনরাজগণের অনুশাসন পত্রে "চট্ট ভট্ট" জাতির উল্লেখ আছে।

নামানুসারে সেই স্থান প্রথমতঃ চট্টের গ্রাম এবং তাহা হইতে ক্রমে চট্টগ্রাম হইয়া থাকিবে। কোন ও কোন ও ব্যক্তি চট্টগ্রাম নামকরণের অন্য রূপ ব্যাখ্যা ও করিয়া থাকেন।

চট্টগ্রাম প্রদেশ ত্রিপুরা রাজ্যের একটী অংশ মাত্র। ইহা আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, (১৫) কর্ণেল উইল ফোর্ড বলেন, যে তিনটী নগরী হইতে "ত্রিপুরা" নিজ (Tripura or Triapura or three towns) (১৬) নাম প্রাপ্ত হয়। "চট্টল" তাহার অন্যতম। চট্টগ্রাম ত্রিপুরেশ্বরদিগের স্বত্ববিশিষ্ট সম্পত্তি, ইহা প্রাচীন বৈদেশিক ভ্রমণকারীদিগের ও বিশ্বাস ছিল। প্রকৃত পক্ষে তাহাদের যত্নেই চট্টগ্রামে আর্য্যোপনিবেশ।

৮৭৫ শকাব্দে আরাকাণ রাজ যোল সিংহ চন্দ্র ত্রিপুর সৈন্য জয় করিয়া চট্টলাধিকার করেন। তিনি উপল দ্বারা চট্টগ্রামে একটী জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কতকাল চট্টল তাহার হস্তে ছিল তাহার নির্ণয় নাই।

চট্টগ্রামে সদর ষ্টেশনের দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রান্তস্থ নসিয়াবাদ নামক পল্লীতে একটী পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার-কালে, একখানি তাম্রফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ ৭।। ইঞ্চ, প্রস্থ ৭ ইঞ্চ। উভয় পৃষ্ঠাই খোদিত অক্ষরে পূর্ণ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ সরস্বতী এম, এ মহোদয় ইহার সমগ্র পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। ইহাতে একাদশটী সংস্কৃত শ্লোকে একখানি ভূমির দান পত্র লিখিত। কিন্তু চতুঃসীমা গদ্যে লিখিত। অক্ষর বাঙ্গালা কিন্তু আজ কালিকার বাঙ্গালা নহে; যে দিবস বাঙ্গালা স্বীয় জননী মৈথিলীর ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতেছিলেন, এ সেকালের বাঙ্গালা। অক্ষরই তাহার প্রমাণ। তাম্রফলকের শীর্ষদেশে, প্রথম পৃষ্ঠায় ত্রিপুরার প্রসিদ্ধ রাজচিহ্ন "চন্দ্র" "সূর্য্যের" প্রতি-

কোন ও কোন ও মহাত্মা চট্ট ভট্টের স্থানে "চণ্ড ভণ্ড" পাঠ করিয়া থাকেন। চণ্ড ভণ্ড জাতির অস্তিত্বই সন্দেহ স্থল। বিশেষত লক্ষ্মণসেন দেব প্রদত্ত—তপণ দীঘির তাম্রফলকের প্রকাশিত অনুলিপির (Pho tozincograph) দ্বিতীয় পৃষ্ঠার চতুর্থ পংক্তিতে "চট্ট ভট্ট" শব্দটী সুন্দররূপে পাঠ করা যায়। যে অক্ষরে ইহা লিখিত তাহার বয়ঃক্রম ৭৬৭ বৎসর।

(১৫) হিয়োন সাঙের বাঙ্গলা ভ্রমণ। ভারতী, চতুর্থ ভাগ, ৪ সংখ্যা, ১৬৬ পৃষ্ঠা। সেনরাজগণ বাঙ্গলা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন, যথা রাঢ়, বারেন্দ্র, বাগড়ি, বঙ্গ ও মিথিলা। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় স্বপ্রণীত বাঙ্গলার ইতিহাসে লিখিয়াছেন "বঙ্গ লইয়াই ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ।" প্রকৃত পক্ষে ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের (চট্টগ্রাম বিভাগ) সহিত সেন শাসিত—বঙ্গের কোন সংশ্রব নাই। বোধ হয় রাজকৃষ্ণ বাবু ভ্রম ক্রমেই এরূপ লিখিয়াছেন।

(১৬) "ত্রিপুরা" নামক আর একটী প্রাচীন নগরী আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা চেদি রাজ্যের রাজধানী। জব্বল পুরের সন্নিকর্ষে "তিওয়ার" (Tewar) নামে একটী সামান্য পল্লিগ্রাম আছে। সেই "তিওয়ার"ই চেদির রাজধানী। See Journal—Am-Or-Society Vol. VI. page 516)

মূর্ত্তি, দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় গরুড়ারূঢ় নারায়ণের মূর্ত্তি অঙ্কিত। প্রথমেই "শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১১৬৫"(**সুমমস্তু মুকাব্দাঃ ১১৬৫**) এত-মধ্যে "শু, ম, স্তু, শ, কা, ১, ৬" অক্ষর ও অঙ্কগুলি আধুনিক বাঙ্গালা হস্তাক্ষরের ন্যায়। "ভ, ব্দা, ৫" বিকৃত। না মৈথিলী (ত্রিকুটে) না বাঙ্গালা। "৫" অঙ্কটীর সহিত ইং "5" অঙ্কের সাদৃশ্য আছে। মস্তকের উপরের টানটী না থাকিলে ঠিক বাঙ্গালা ছয় হইত। প্রথম শ্লোকটী নারায়ণের বন্দনামূলক। দ্বিতীয় শ্লোকটী রাজবংশের আদিপুরুষ ভগবান ঔষধিনাথের গুণানুবাদ মূলক। (১৭) দাতৃস্থলে "চক্রবর্ত্তী" শ্রীদামোদর দেবের নাম (১৮) গ্রহীতা ধার্ম্মিক যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ শ্রীপৃথ্বীধর শর্ম্মা। দান "কামন পোণ্ডিয়া" ও "কেতঙ্গ পাল" গ্রামস্থ পঞ্চ দ্রোণ ভূমি। (১৯)

এই দানপত্রের দ্বারা ১১৬৫ (কিম্বা ১১৬৬) শকাব্দে চট্টগ্রাম ত্রিপুরা পতির হস্তে ছিল বলিয়া লিখা যাইতে পারে। (২০)

---

(১৭) অম্ভোজশ্রীহরণপিশুনঃ
　　প্রেমভূঃ কৈরবাণাং
চূড়ারত্নং ত্রিপুরজয়িনঃ কেলি-
　　কারোনিশায়াঃ।
লীলাগারং কুসুমধনুষো
　　বন্ধুরম্ভোনিধীনাং
শ্রীমানেকো জয়তি জগদা-
　　নন্দকারী মৃগাঙ্কঃ॥

(১৮) দামোদরের অপর নাম কীর্ত্তিধর, সিংহতুঙ্গ প্রভৃতি। ত্রিপুরার ইতিবৃত্তে "সিংহ-তুঙ্গ" লিখিত হইয়াছে। ইতিবৃত্ত লিখিবার কালে পাঁচ খানি বংশাবলী আমাদের হস্তে ছিল। সে সমুদায়ে প্রায়ই নামের একতা নাই। ১৩২৯ শকাব্দের পূর্ব্বে ত্রিপুরার রাজকীয় ঘটনাবলী রাজস্থানের ন্যায় কেবল চারণদিগের মৌখিক কবিতায় প্রকাশ পা-ইত। শ্রীধর্ম্ম মানিক্যের রাজ্যাধিকার কালে ব্রাহ্মণ কুলজ পণ্ডিতদ্বয় শুক্রেশ্বর ও বাণে-শ্বর ইহা পুস্তকাকারে বাঙ্গালা পদ্যছন্দে লিপিবদ্ধ করেন। এই পুস্তকই প্রাচীন "রাজমালা।"

(১৯) বিজ্ঞবর কোলব্রুক সাহেব "দ্রোণ" লইয়া কিছু গোলযোগ করিয়াছেন। আমরা পশ্চিম বঙ্গবাসী ভ্রাতৃবর্গকে দ্রোণের পরিচয় দিব। ত্রিপুরা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান, সমূহে ভূমি পরিমাণ-দ্রোণ, কানি, গণ্ড কড়ায় হইয়া থাকে। (কিন্তু শ্রীহট্টের মাপ স্বতন্ত্র।) "দ্রোণ" বোধ হয় শস্যের পরি-মাপ (সংস্কৃত) হইতে ব্যবহার হইয়া থাকিবে। চারি কড়ায় এক গণ্ডা কুড়ি গণ্ডায় (একপণ) এককানি। ষোল কানিতে এক দ্রোণ। ১২ নল দীর্ঘ ও ১০ নল প্রস্থে (ইহার পুরণ অঙ্ক) ৭॥০ কাহন।) এক কানি প্রেত্যেক নল /০ পন গণনা হইয়া থাকে। চারি প্রকার নলের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যথা—৭,—১৪,—১৮,—২২ হস্ত পরিমিত। ৭ হস্ত নলের এক দ্রোণ ভূমিতে ১৪॥৪ চৌদ্দ বিঘা চৌদ্দ কাঠা; ১৪ হস্ত নলের ১ দ্রোণ ভূমিতে ৫৮॥১ কাঠা; ১৮ হস্ত নলের এক দ্রোণ ভূমিতে ৯৭/৪ কাঠা; ২২ হস্ত নলের এক দ্রোণ ভূমি ১৪৫/৪ এক শত পঁয়তাল্লিশ বিঘা চারি কাঠা। কোলব্রুক সাহেব বলেন এক দ্রোণ প্রায় আট বিঘা ভূমির সমান। (Colebrook's Essay's Vol. II. p, 245) বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র বলেন ৬৪ বিঘায় এক দ্রোণ।

(২০) এই শাসন পত্র খানি, পূর্ব্বোক্ত

আফ্রিকা দেশীয় বিখ্যাত পর্য্যটক ইবন বতোতিয়া ১২৭২ শকাব্দে বাণিজ্যোন্নত চট্টগ্রামে (Sadkawan) উপনীত হন।(২১) বাঙ্গালার প্রথম স্বাধীন যবন ভূপাল ফকিরোদ্দিন আবোল মোজাফর মোবারক সাহ সে সময়ে চট্টলাধিকারী ছিলেন। ঐ অব্দের অন্তে ইহা আরাকাণ রাজ মেঙ্গদির হস্তগত হয়। মেঙ্গদি ১০৩ বৎসর আরাকাণের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ৬৪১ ব্রহ্ম শকে (২২) (১২০১ শকাব্দে) সিংহাসন আরোহণ করেন, ৭৪৭ ব্রঃ শকে (১৩০৭ শকাব্দে) তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৩২৯ শকাব্দে আরাকাণ রাজ মেঙ্গসৃতি সৈও মোওয়ান (বা নরমিত হলা) রাবা রাজ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া বাঙ্গলায় (সুরতন,

লক্ষ্মণ সেন প্রদত্ত—তর্পণদীঘির—শাসন পত্র হইতে ১৩০ বৎসরের কনিষ্ঠ। সেন রাজগণের যে কয়েক খানি তাম্র ও প্রস্তর ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে বারিন্দার (বোধ হয় বারিন্দ্র) প্রস্তর ফলক সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ; তর্পণ দীঘির তাম্র শাসন দ্বিতীয় ; বাখরগঞ্জে প্রাপ্ত (কেশবসেনের) দুই খানি তাম্র ফলক তৃতীয় ও চতুর্থ ; বৌদ্ধ গয়ার অনুশাসন পত্র (সেন বংশের শেষ রাজা অশোক চন্দ্রের সমসাময়িক) পঞ্চম বা সর্ব্ব কনিষ্ঠ। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গ্রন্থে লক্ষ্মণ সেনের এক খানি তাম্র শাসনের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন "ত্রিবেণীর ৺ হলধর চূড়ামণী মহাশয় বিস্তর পরিশ্রম করিয়া ঐ সনন্দের লিপি পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি ও সমুদয় অক্ষর বুঝিতে পারেন নাই।" অথচ দেখিতে পাওয়া যায় সেই সনন্দের প্রতিলিপি পূর্ণাবস্থায় তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। উদ্ধৃত প্রতিলিপির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না বলিয়াই, আমরা ইহাকে আমাদের তালিকা ভুক্ত করিলাম না। সেন রাজগণের শাসন পত্রের অক্ষর গুলি প্রায়ই মৈথিলী (তিরুটে)। আর ত্রিপুরেশ্বরদিগের শাসন পত্রের অক্ষর প্রায়ই বাঙ্গলা। এতদ্দ্বারা শকাব্দের একাদশ শতাব্দীর অন্ত ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ বাঙ্গলা অক্ষরের জন্মকাল অনুমিত হইতেছে।

(২১) মুর পরিব্রাজক কতকগুলি "পিরের মরগা" দর্শন জন্য বাঙ্গলার পূর্ব্ব দিকস্থ পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামে "বদরের মরগা" বিখ্যাত। বোধ হয় পাঠক মাত্রেই নাবিকদিগের মুখে বদরের নাম শুনিয়া থাকিবেন। কিন্তু বদর বতোতিয়ার পর সাময়িক। ১৩৬২ শকাব্দে বদরের মৃত্যু হয়। ইহার ৯০ বৎসর পূর্ব্বে মুর পর্য্যটক চট্টগ্রামে পদার্পণ করেন। কোনও কোনও লিখক (Sadkawan) কে সপ্তগ্রাম বিবেচনা করেন। বতোতিয়া পির বোরাহেমদ্দিনের দর্শন জন্য খানবালিক (পিকিন) নগরে গমন করিয়াছিলেন। তিনি স্বর্ণ গ্রামে চীনাবাণিজ্যতরী (Junik) আরোহণ করেন। বতোতিয়া দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগলকের দূতরূপে চীন সম্রাটের দরবারে উপস্থিত—ও সম্মানের সহিত গৃহীত হন।

(২২) ব্রহ্মরাজ শিববংশীয় অধিকার কালে প্রচলিত "ব্রহ্মা" বা "মঘি" শক প্রচলিত হইয়াছে। ব্রহ্মাগণ ৩৫৪ দিনে বৎসর গণনা করে। প্রত্যেক তৃতীয় বৎসরে ১৩ মাসে বৎসর ধরা হয়। অতিরিক্ত মাসটী ৩০ দিনে গণিত হইয়া থাকে। ইহাদের বৎসর বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়।

(২৩) আশ্রয় গ্রহণ করেন। সে সময় মহা রাজাধিরাজ রায় কংশনারায়ণ লস্কর (২৪) জোয়ান পুরের যবনরাজের সহিত আহবে লিপ্ত ছিলেন। আরাকাণরাজ বঙ্গেশ্বরের সৈন্য বলে পুনর্ব্বার আত্ম সিংহাসন লাভ

---

(২৩) আরাকাণের ইতিহাস "রাজোয়াং" গ্রন্থে থুরতন (Thu-ro-tan) লিখিত। ফেয়ার সাহেব "থুরতন" বাঙ্গলার নামান্তর বিবেচনা করেন। কিন্তু আমাদের একটু সন্দেহ আছে। কারণ ফেয়ার সাহেব "ত্রিপুরা" ও "বঙ্গের" মধ্যে কোন প্রভেদ রাখেন নাই। তিনি অনেক সময় নন্দীর মুণ্ড শিবের স্কন্ধে স্থাপন করিয়াছেন।

(২৪) মহারাজ কংশ নারায়ণ রায় তাহির-পুরের রাজ বংশজ। তাহিরপুর বিথোরিয়ার অন্তর্ভূত (See E. I. Co.'s Fifth Report)। কংশ নারায়ণের পিতামহ রাজা বিজয়,"লস্কর" উপাধি পাইয়াছিলেন। কংশ নারায়ণ বা-রেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের নিরাবিল পটীর নিয়ম বন্ধন করেন। তিনি বাহুবলে সামসুদ্দিনকে জয় করিয়া বাঙ্গলার রাজাসন অধিকার ক-রেন। প্রজারঞ্জন কংশ নারায়ণ সুনিয়মে রাজ্য শাসন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। জনৈক নীচাশয় মুশলমান লিখক (গোলাম হুসন) বঙ্গকুলচূড় কংশের চরিত্র যেরূপ চি-ত্রিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমা-দের শরীর কণ্টকিত হইয়াছিল। এবম্প্রকার ঐতিহাসিক কুলকলঙ্কদিগের লিখায় হিন্দু-জাতি চিরকাল জর্জ্জরিত; গোলাম হুসন লিখিয়াছেন,"সামসুদ্দিন কয়েক বৎসর রাজ্য ভোগ—করিয়া পীড়াগ্রস্ত হন, সেই রোগে তাহার মৃত্যু হয়; কিম্বা সেই "অসুর" "কা-ফের" কংশ চক্রান্ত করিয়া তাহার প্রাণ বধ করে।" অন্যান্য ঐতিহাসিকদিগের মতানুসরণ করিয়া বুকমান সাহেব বলেন "মহারাজ কংশ ভুজবলে বাঙ্গলার রাজাসন অধিকার করিয়া-ছিলেন।" গোলাম হুসন লিখিত "রাই-রাজ সুলতান" (নৃপালবর্গের উদ্যান) নামক গ্রন্থ এক প্রকার নূতন। ইহার বয়ঃক্রম ৯১ বৎসর মাত্র। জর্জ্জ উদেনি সাহেবের অনু-রোধ ক্রমে ১৭৮৭-৮৮ খৃষ্টাব্দে ইহা লিখিত হয়। সুতরাং ইহার ঐতিহাসিক মূল্য অতি অল্প। মার্সমেন, ওয়েষ্ট মেকূট প্রভৃতি লিখকগণ "কংশ" কে গণেশ (দিনাজপুরের রাজা) লিখিয়াছেন। ফলে তাহা ভ্রমাত্মক। কর্ণেল ডেল্টন ভ্রম ক্রমে কংশকে কুঁচরাজা বিবেচনা করিয়াছেন। আরব্য পারস্য ভাষা তত্ত্ববিদ মৃত মহাত্মা বুকমান সাহেব হস্ত লিখিত গ্রন্থ সকল হইতে "কংশ" পাঠোদ্ধার করিয়াছেন—(But all MSS. spell the Raja's name—Kans, not Ganes; and I am inclined to adhere to the spelling of the MSS. and read the name as Kans or Kansa) বিজ্ঞবর লেড্‌লে সাহেব ও ইহাকে "রাজা কংশ" (Raja Kanis) লিখিয়াছেন। বুকমান সাহেব বলেন মহারাজ কংশের সময় হইতে বঙ্গের তদানীন্তন—রাজধানী বিভাগ "রাজ-সাহি" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কংশের মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুনারায়ণ (জিতমল্ল) পশ্চাৎ জেলালুদ্দিন পৈত্রিক আসন অধিকার করেন। যদু কংশের যবন উপপত্নীর গর্ভজ বলিয়া ষ্টুয়ার্ট সাহেব অনুমান করেন। কংশের পৌত্রের বাঙ্গলা শাসনকালে জনৈক চীনরাজদূত বাঙ্গলার রাজদরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কংশের অন্যতম পুত্রের বংশ-ধরগণ দীর্ঘকাল তাহিরপুর রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। শিবপ্রসাদ এই বংশের শেষ নরপতি। তাহিরপুরের রাজগণ বাঙ্গলার দ্বাদশ ভৌমিকের অন্তর্ভব। কংশ নারায়ণ সম্বন্ধে কোন বিশেষ বৃত্তান্ত আমরা কৃতজ্ঞ-চিত্তেও সমাদরের সহিত গ্রহণ করিব।

করেন। আরাকাণ কিয়ৎকালের জন্য বাঙ্গালার অধীন ছিল।

১৪৩৪ শকাব্দে চট্টলের আধিপত্য লইয়া একটী তুমুল কাণ্ড হয়। হিন্দু, যবন ও মঘ এই জাতিত্রয়ের রুধিরে চট্টাচল রঞ্জিত হইয়াছিল। ত্রিপুরসেনানী মহাবীর রায় চয়চাগ হনুমান-মূর্ত্তিলাঞ্ছিত পতাকা লইয়া অগ্রসর হইলেন। আরাকাণ রাজ বৃষভ-ধ্বজ————, ও "কামরূপ ও কোমতা বিজয়ী" আলাউদ্দিন আবোল মোজাফর হুসন সার সৈন্য গণ মহম্মদীয় পতাকা লইয়া রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। দীর্ঘকাল সংগ্রাম চলিয়াছিল। অবশেষে যবন ও মগদিগের ভুজগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া, রায় সেনানী বিজয়ী পতাকায় পরিশোভিত হইলেন। হুসন সা এই অপমান সহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি দুইবার ত্রিপুরার ধ্বংস করিবার জন্য সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই।

রায় সেনানী যে সময় গোমতী সৈকত ভূমি যবন রুধিরে রঞ্জিত করিতে ছিলেন, তখন মগেরা চট্টগ্রাম অধিকার করে। তিনি প্রথমবার যবন জয় করিয়া আরাকাণ পতির প্রতিকূলে যাত্রা করেন। তিনি নাফি নদীর তীরে উপনীত হইয়া সংবাদ পাইলেন, হুসন সার সেনাদল পুনর্ব্বার ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়াছে। তখনই তাহাকে কুমিল্লা আসিতে হইল। দ্বিতীয় যুদ্ধে তিনি যবন জয় করিয়াছিলেন (২৫); কিন্তু চট্টগ্রাম ত্রিপুরেশ্বরের হস্তস্খলিত হইল। ১৪৩৭ শকাব্দে মহারাজ শ্রীধন মাণিক্য দেবের মৃত্যু হয়। সেনাপতিগণ গৃহ বিরোধে সংলিপ্ত হইলেন।

১৪৩৯ শকাব্দে জন, ডি, সেলভেরা আরাকান রাজ কর্ত্তৃক আহূত হন। তিনি চট্টগ্রাম দিয়া গমন করিয়াছিলেন। সে সময় চট্টল আরাকাণ পতির হস্তে ছিল। (২৬) তাহার ৬ বৎসর পর ত্রিপুরেশ্বর দেব মাণিক্য দেব মগসৈন্য জয় করিয়া পুনর্ব্বার চট্টলাধিকার করেন।

মহাবীর রায় সেনানী হুসনসার হৃদয়ে যে আঘাত করেন, তাহার দারুণ বেদনা বঙ্গেশ্বর চিরকাল সহ্য করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডেশ্বরী রাণী মেরী "ক্যালে" "ক্যালে" শব্দ উচ্চারণ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। বঙ্গীয় যবন ভূপাল-গণ-তিলক হুসন মুমূর্ষাবস্থায় তদ্রূপ চট্টগ্রামের নাম জপিয়াছিলেন। তাহার উপযুক্ত পুত্র নসরত, স্বর্গগত পিতার পরিতোষ জন্য চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন। তিনি পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলেন। অনেকেরই এরূপ সংস্কার যে নসরথ সা চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে মহম্মদিয় ধর্ম্মপ্রচার করেন। প্রকৃত পক্ষেও তাহার অত্যাচারে পূর্ব্ব দক্ষিণ বঙ্গবাসী

(২৫) সুবর্ণ গ্রামের একটী মসজিদের দ্বারস্থ প্রস্তর ফলক পাঠে বোধ হয় হুসন সা ত্রিপুরার কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন।

(২৬) See Phayri's History of Pegu (Journal—As. So. Bengal Vol. XLII. part I page 127)

নীচ শ্রেণীর মানবগণ প্রায়ই সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করে।

ডি, বরোস (২৭) বলেন—গোয়ার পর্টুগিজ গবর্ণর মুনো, ডা, চোনা চট্টগ্রামে বাণিজ্য সংস্থাপনে অভিলাষী হইলেন। তিনি পাঁচ খানি জাহাজ দুইশত লোক ও ডি, মোল্লাকে তাহার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়া ১৪৫৭ শকাব্দে (১৫৩৫ খৃঃ অঃ) চট্টলে প্রেরণ করেন। সে সময় চট্টল গৌড়েশ্বর মহম্মদের হস্তে ছিল। ডি, মোল্লা চট্টগ্রামে পঁহুছিয়া বঙ্গেশ্বর সন্নিধানে উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। মহম্মদ স্বীয় ভ্রাতষ্পুত্র শিশু ফিরোজশার শিরশ্ছেদ করিয়া রাজ্যাধিকার করেন। কিন্তু তিনি সুখের অধিকারী হন নাই। পাপীর সন্দিগ্ধ অন্তঃকরণে কখনই শান্তি বিরাজ করিতে পারে না। মানব মাত্রই তাহার বিশ্বাসের অনাস্পদ ছিল। মেকৃবত খাঁ মহেন্দ্র মাণিক্য দেবের ন্যায় মহম্মদ অহোরাত্র যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। ডি, মোল্লার অনুচরগণ গৌড়ে উপনীত হইলে, মহম্মদ তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া, ডি, মোল্লাকে ধৃত করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে তিনিও তাঁহার অবশিষ্ট অনুচরগণ রুদ্ধ হইয়া—নিষ্ঠুরতার সহিত গৌড়ে প্রেরিত হইয়াছিল। এদিকে ব্যাঘ্র নিহন্তা "সের" বিশ্বাসঘাতক মহম্মদের দণ্ডবিধানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মহম্মদ কারারুদ্ধ পর্টুগিজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। মুনো, ডা, চোনা এই সংবাদ শ্রবণমাত্র চট্টগ্রামে বাণিজ্য সংস্থাপনের ইহা একটী উত্তম সুযোগ বিবেচনায়, তিন খানি রণতরী মহম্মদের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। কহলগাঁর নিকট একটী যুদ্ধে পর্টুগিজগণ অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করে। মহম্মদ শা তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের নিকট অতিরিক্ত সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। চোনা তদনুসারে পেরেজ, ডি, সামপিওকে নয়খানি রণতরীর সহিত বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন। সামপিও বাঙ্গালায় পঁহুছিয়া শ্রুত হইলেন,—পাপী মহম্মদের প্রাণ বধ করিয়া মহাবীর সের রাজ্যাসন অধিকার করিয়াছেন।

ত্রিপুরেশ্বর দেবমাণিক্য দেবের মৃত্যুর পর তাহার কুলতিলক পুত্র মহাবীর বিজয় মাণিক্য দেব অভ্যুদিত হইয়া স্বীয় "বিজয়" নাম সার্থক করিয়াছিলেন। তিনি কখনও কোনও সংগ্রামে বিজিত হন নাই। বিজয় চট্টগ্রাম অধিকার করেন। উড়িষ্যা বিজয়ী কর্‌রাণী বংশীয় সুলেমান চট্টলোদ্ধার জন্য দশ সহস্র পদাতি ও তিন সহস্র অশ্বারোহী প্রেরণ করিয়াছিলেন। ক্রমে আট মাস যবন ও ত্রিপুর সৈন্যের রুধিরে চট্টলাচল রঞ্জিত হইয়াছিল। অবশেষে যবন সেনা পরাজিত হইলে সেনানী মহম্মদ খাঁকে চতুর্দশ দেবতার (২৮) নিকট বলি দেওয়া হই-

(২৭) ইনি লিসবনস্থ ইণ্ডিয়া আফিসের অন্যতম কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি ভারতে পদার্পণ করেন নাই। পর্টুগিজ গবর্ণমেণ্টের কাগজ পত্র হইতে আপন গ্রন্থ সংকলন করেন। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়।

(২৮) ত্রিপুর-রাজ-কুল দেবতা—

য়াছিল। বিজয় মাণিক্যের সময়ে আরাকাণপতিদিগের নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা হয়। কিন্তু তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আরাকাণরাজ মেঘমুক্ত ভাস্করের ন্যায় প্রচণ্ড কিরণ জালে দিঙমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। বিজয়ের মৃত্যুর পর আত্মকলহে ত্রিপুরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। (২৯)

ভিনিশীয় বণিক সিজার ফ্রেডরিক ১৪৮৫–১৫৩০ শকাব্দে আসিয়া মহাদেশ ভ্রমণ করেন। তাহার সাক্ষ্যে প্রতিপন্ন হইতেছে যে সে সময় পিগু হইতে প্রচুর পরিমাণে রৌপ্য চট্টগ্রামে আমদানি হইত। (৩০) বোধ হয় পিগু ও আসাম দেশীয় রৌপ্য দ্বারাই প্রাচীন কালে বাঙ্গালার মুদ্রা ও অলঙ্কারাদি প্রস্তুত হইত। ফ্রেডেরিকের লিখা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে,—আমাদের দেশে প্রাচীন কালাবধি ১০।১২ বৎসরান্তে এক একটী ঝড় হইয়া আসিতেছে।

৯০২ ব্রঃ অব্দে (১৪৬২ শকাব্দে) পিগুর অধিপতি তাবংশিউয়তি, চক্রবর্ত্তী (Tsekya wati) উপাধি গ্রহণ করেন। তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র "মহাযুবরাজ" (পালি ভাষায় Maha-Upa-Radza, ব্রহ্ম ভাষায় Ein-She-meng) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আবা, প্রোম, তেং গোযে, মার্ত্তাবান প্রভৃতি দেশের রাজগণ তাহার রাজাসন সমক্ষে মস্তক অবনত করিলেন। স্বাধীন আরাকাণের প্রতি সম্রাটের বিষদৃষ্টি পড়িল।

এই সময় আরাকাণ পতির মৃত্যু হয়। শিশু মহাধর্ম্মরীত পৈতৃক আসন অধিকার করেন। পিতৃহীন শিশু রাজপুত্রদিগের পিতৃব্য এক একটী দ্বিতীয় কৃতান্ত। অগ-

---

"হয়োমা হরিমা বাণী কুমারোগণকোবিধুঃ।
থাক্তি গঙ্গাশিখীকামোহিমাত্রিশ্চ চতুর্দ্দশ।"
ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত। ৪ পৃঃ।

(২৯) কর্ণেল ফেয়ার লিখিয়াছেন—"In the reign of Meng Phaloung, father of the Meng Radzagi, the kings of Bengal had became weakened and he held Chittagong and the country as far as the Magna." যদি মূলগ্রন্থে এস্থলে "স্বরভন" লিখিত হইয়া থাকে তবে ফেয়ার সাহেব আদ্যোপান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এই সময়ের প্রত্যক্ষদর্শী ইংলণ্ড দেশীয় পর্য্যটক রল্‌ফ ফিচ্‌ লিখিয়াছেন, "আমি সপ্তগ্রাম হইতে ত্রিপুরেশ্বরের রাজ্য দিয়া গমন করিয়াছিলাম আরাকাণ ও রামুবাসী মগদিগের সহিত ত্রিপুরনাথ অবিরত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। ত্রিপুরার দুর্ব্বলতায় চট্টগ্রাম বারংবার আরাকাণ রাজের হস্তগত হয়।" (From Satagam I travelled by the country of the king of Tipara, with whom the Mogen have almost continual warres. The Mogen which be of the kingdom of Recon and Rame, be stronger than the king of Tipara, so that Chatigan, or Porto Grando, is oftentimes under the king of Recon.)

ফেয়ার সাহেব যে সময়ের ঘটনা লিখিয়াছেন, সে সময় মুসলমানগণ কর্ণফুলীর স্পর্শ করিতে পারে নাই।

(৩০) আমাদিগের প্রাচীনেরা পিগুকে "স্বর্ণ ভূমি" বলিতেন। পালি ভাষায় ইহার নাম "হংসাবতী"।

তের ইতিহাস তাহার সাক্ষী। মৃত আরাকাণ রাজের ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রাণ বধ করিয়া সিংহাসন অধিকারে লোলুপ হইলেন। তিনি সম্রাটের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। ৯০৮ ব্রঃ অব্দে সম্রাট আরাকাণ জয় করিতে চলিলেন। শিশু মহাধর্ম্মরাজ ভয়াতুর হইয়া দেশপ্রথানুসারে "স্বর্ণ" ও "রৌপ্য"—"কুসুমাঞ্জলি" সম্রাট পাদ পদ্মে সমর্পণ করিলেন। সম্রাট বিনা যুদ্ধে আরাকাণ রাজকে করদ শ্রেণীতে সন্নিবেশিত করিয়া স্বীয় রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রায় ৩০ বৎসর আরাকাণের সৌভাগ্য-সূর্য্য দুর্ভাগ্য ঘনঘটায় আচ্ছাদিত ছিল। পুনর্ব্বার আরাকাণ রাজ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। ৯৪২ ব্রঃ অব্দে সম্রাট আরাকাণের বিরুদ্ধে আট সহস্র পদাতি ও তের রণতরী প্রেরণ করিলেন। ক্রমে এক বৎসর সংগ্রাম চলিল। পরবৎসর কার্ত্তিক মাসে আরও এক দল সেনা পূর্ব্বপ্রেরিত সেনার সাহায্যার্থে প্রেরিত হয়। এই যুদ্ধ যাত্রায় কুমার শ্রীশুধর্ম্মরাজ সেনানী হইয়াছিলেন। এই সময় পর্টুগিজ দিগের সহিত আরাকাণ রাজের সখ্যতা সংস্থাপিত হয়।

শিশুর ঈশ্বর ভোরেং নোয়েং কাল কবলিত হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র পৈতৃক আলয় অধিকার করিয়া স্বীয় ভ্রাতাকে আরাকাণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লিখিলেন। তদনুসারে শ্রীশুধর্ম্ম সসৈন্যে শিগু যাত্রা করিলেন।

আরাকাণ রাজ বিপন্মুক্ত হইয়া মেঘমুক্ত ভাস্করের ন্যায় প্রখর প্রতাপাবলী বিস্তার করিলেন। ১৫০৩ শকাব্দে ত্রিপুরেশ্বর মহাবীর বিজয়মাণিক্য দেব কালকবলিত হন। ১৫০৪ শকাব্দ হইতে আরাকাণের প্রবল উন্নতি। ক্রমে আরাকাণের পরাক্রম এতদূর বৃদ্ধি হয়, যে ১৫২২ শকাব্দে আরাকাণ রাজ মেঙ্গরাযোগি রাজন্যবর্গ পূজিত পিগুর রাজাসন অধিকার করেন। (৩১) পর্টুগিজ ঐতিহাসিক গণ লিখিয়াছেন, তাহাদের সহায়তায় আরাকাণ রাজ এই কার্য্যটী সম্পাদন করিয়া, প্রত্যুপকার স্বরূপ পর্টুগিজদিগকে সিরাম নদীর মোহানাস্থিত সিরাম বন্দর দান করিয়াছিলেন।

১৫০৫ শকাব্দে খিজির পুরের (৩২)

---

(৩১) পর্টুগিজগণ মেঙ্গরাযোগিকে সেলিম সা (সেলিম খা) লিখিয়াছেন। পূর্ব্বোপদ্বীপ বাসী দিগের তিন প্রকার নাম দৃষ্ট হয়। দেশীয়, পালি ও যাবনিক। কোনও কোনও লিখক বলেন "আরাকাণ কিছুকাল বঙ্গের অধীন ছিল,"—যাবনিক নামই তাহার চিহ্ন বা ফল। আমরা ইহা সঙ্গত বোধ করি না। এই উক্তি সত্য হইলে কেবল একমাত্র আরাকাণে এরূপ যাবনিক নাম ও খাঁ উপাধি ব্যবহার হইত। সমগ্র পূর্ব্ব উপদ্বীপে এরূপ ব্যবহারের কোন কারণ ছিল না। আমাদের বিবেচনায় ইহা তাতার বংশীয়দিগের চীনাধিকারের ফল। মগগণ চীনাদিগের অনুকারী।

(৩২) বর্ত্তমান আরাকাণ রাজের এক মাইল উত্তরে "খাজিগঞ্জ" নামে যে স্থান আছে ঐ স্থানটী পূর্ব্বে খিজির পুর নামে পরিচিত ছিল। নবাব আবদুলগণি এই

(সুবর্ণ গ্রামের) ভৌমিক ঈশা খাঁ, আকবারের সেনানী সাহবাজ খাঁ কর্তৃক অধিকার চ্যুত হইয়া চট্টলে উপনীত হন। তিনি মগদিগের অনুকম্পায় তথায় একদল সৈন্য সংগ্রহ করেন। সেই সেনাদলের সহিত তিনি খিজির পুরে পহুঁছিয়া মোগল সৈন্য ও কুঁচবিহারের রাজাকে জয় করেন।

ত্রিপুরেশ্বর অমর মাণিক্য দেব সিংহাসন আরোহণ করিয়া পুনর্ব্বার চট্টগ্রাম অধিকার করিলেন। তিনি তথায় জলাশয় খনন ও দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৫৩২ শকাব্দে চট্টল পুনর্ব্বার মগদিগের হস্তগত হয়। আরাকানরাজ পর্টুগিজদিগের সাহায্যে ত্রিপুর সৈন্য জয় ও ত্রিপুরা লুণ্ঠণ করিয়া বাঙ্গলায় পদার্পণ করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র ইসলাম খাঁ সসৈন্য অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে সম্মিলিত মগ ও পর্টুগিজ গণ পরাজিত হইল। ইসলাম খাঁ তাঁরাবধি তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিলেন।

চট্টগ্রাম রঙ্গভূমির এক অভিনেতার অভিনয় ক্রিয়া শেষ হইল। ত্রিপুরেশ্বর চট্টগ্রাম হারাইলেন। ত্রিপুর রাজ-কিরীট হইতে উজ্বল মণি খসিয়া পড়িল। ত্রিপুরার অধঃপতনের সূত্রপাত হইল। সময় সময় মগেরা ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়া যথেষ্ট অত্যাচার করিত। এই সকল দর্শন করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগের একজন বৈদেশিক ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন ;— "ত্রিপুরা বা উদয়পুর (৩৩) রাজ্য স্বাধীন কিন্তু কোনও কোনও সময় সুবিখ্যাত মোগল ও আরাকাণ রাজ ইহা অধিকার করিয়াছেন।" (Van den Broucke)

কলাক মিবার ব্যতীত ভারতের অন্য কোন রাজ্য ত্রিপুরার ন্যায় উপদ্রব সহ্য করে নাই। (৩৪) ত্রিপুরার চির প্রতিদ্বন্দী আরাকান রাজবংশ ... হইয়াছেন। দুর্দান্ত পাঠান মোগলগণ ... হইয়াছে। ... কখনই তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করে নাই। (৩৫) অল্পকাল হইল ত্রিপুরার পতি

স্থানে একটী সুন্দর পুষ্পবাটিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

(৩৩) ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী। সুলতান সুজা ত্রিপুরা জয় করিয়া, ইহাকে "সরকার উদয় পুর" আখ্যা দান করেন। দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্য দেব ভুজবলে স্বদেশের স্বাধীনতা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু সুজা ত্রিপুরার ললাটে যে কলঙ্ক রেখা অঙ্কিত করেন, তাহার লয় হইল না। ত্রিপুরা জগতে "সরকার উদয়পুর" বা "উদয়পুর রাজ্য" নাম পরিচিত রহিল।

(৩৪) This State was formerly of greater importance than it is at the present day. It was frequently involved in wars with Arracan on the one hand and the musalmans of Bengal on the other.

H. Beverley's Bengal Census Report of 1872, page 108

(৩৫) Independent Tiperah is not held by gift from the British Government or its predecessors, or under any title derived from it or

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বক্র দৃষ্টি পড়িয়াছে। কলিকাতাস্থ রাজকীয় প্রাসাদে উপবেশন করিয়া অনেক শ্বেতকায় মহাপুরুষ ঘোষণা করিয়াছেন যে, "স্বাধীন ত্রিপুরা" পরিবর্ত্তে "পর্ব্বত ত্রিপুরা" লিখিত হইবে। কারণ উহা "জায়গীর মহাল" Feudatory State(৩৬)

ক্রমশঃ

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

---

them, never having been subjected by the Mugals

Aitcheson's Treaties Vol I p 77

(৩৬) ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গির মিবারকে "জায়গির মহাল" লিখেন। সম্রাট লিখিত বাক্যের প্রতি কটাক্ষ করিয়া সহৃদয় টড লিখিয়াছেন—" Such was now the degraded title of the ancient, independent sovereign Mewar." আমরা এইরূপ বলিতে পারি কি? Such was now the degraded title of the ancient, independent sovereign Tripura.

পৃথিবীর উৎপত্তি।

"না ছিল এ সব কিছু আঁধার ছিল অতি
ঘোর দিগন্ত পসারি
ইচ্ছা হইল তব ভানু বিরাজিল
জয় জয় মহিমা তোমারি।"

এই চিন্তা দ্বারা মনুষ্যের মনুষ্যত্ব উত্তেজিত হইয়া উঠে, এ চিন্তা দ্বারা এই ক্ষুদ্র পৃথিবীবাসী ক্ষুদ্রতম মনুষ্য সৌরজগৎ অতিক্রম করিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এ বিষয় চিন্তা করিবার সময় কেবলমাত্র উপরোক্ত বাক্য কয়েকটি অন্তভাবে জপযন্ত্র করিয়াই যে আমাদের উদ্দীপিত কৌতূহল নিবারিত হয়, তাহাও নহে, আমরা সাধ্যমত এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, এবং উৎপত্তির প্রণালী বুদ্ধির আয়ত্তাধীন করিতে চেষ্টা করি।

পৃথিবী আমাদের বাসস্থান, সেই জন্য পৃথিবীর উৎপত্তির তথ্য জানিতেই সর্ব্বাগ্রে আমাদের মন উৎসুক। কিন্তু অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ-বিশিষ্ট সৌর জগতের প্রত্যেক জ্যোতিষ্কের সহিত প্রত্যেক জ্যোতিষ্কের এমন বিশেষ সম্বন্ধ, যে একটির উৎপত্তির বিষয় জানিতে গেলেই, সমস্তগুলির এক সঙ্গে জানিতে হয়।

সৌর জগৎ একটি বৃক্ষ স্বরূপ, সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ তাহার শাখা প্রশাখা। কোন একটি

শাথার উৎপত্তির বিষয় ভাবিতে গেলেই, যেমন সর্ব্বাগ্রে বৃক্ষটির বিষয় ভাবিতে হইবে তেমনি কোন একটি গ্রহের উৎপত্তি দেখিতে গেলেই জগতের উৎপত্তি আগে দেখা আবশ্যক। জগতের উৎপত্তি দেখিলেই পৃথিবীর উৎপত্তি আমরা ক্রমে দেখিতে পাইব।

অতি পুরাতন কাল হইতে প্রায় সকল দেশের সকল জাতির মধ্যেই সৃষ্টি সম্বন্ধে পৌরাণিক কিম্বদন্তি পাওয়া যায়। দু' এক জাতির কিম্বদন্তিতে সত্যের ছায়াও লক্ষিত হয়, কিন্তু সে সত্যের ছায়া এ স্থানে আলোচনা করা বাহুল্য, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর তত্ত্বানুসন্ধানের ফল নহে, তাহা সম্পূর্ণ রূপে কল্পনার মানসসম্ভূত কন্যা।

প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর পর্য্যালোচনা দ্বারা এ বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহাই বৈজ্ঞানিক জগতে পরিগৃহীত, এবং তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

জর্ম্মাণ দার্শনিক কাণ্ট প্রথমে বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, সে বিষয়ে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হয়েন।

এই যে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ছয়টি গ্রহ এবং নয়টি উপগ্রহ * চক্রাকারে আকাশে একই সমতলপথে ঘুরিতেছে ইহা কি কেবল একটি মাত্র দৈবঘটনা হইতে উৎপন্ন, কিম্বা কোন অবিদিত নিয়মের ক্রিয়া ফল? কাণ্ট ভাবিলেন, এতগুলি জ্যোতিষ্কের এরূপ একই পথে গতি কখনও দৈবাৎ হইতে পারে না, অবশ্য কোন এক সাধারণ নিয়ম বলে এই সমস্ত সৌরজগৎ একই পথে প্রধাবিত।

কিন্তু এমন একটি সাধারণ নিয়ম যাহা সমস্ত গ্রহ গুলির উপর খাটান যাইতে পারে তাহা কি?

কোন পদার্থ দ্বারা জ্যোতিষ্ক গুলি পরস্পর সংযুক্ত থাকিলে তাহারা এইরূপ সমসূত্রে চালিত হইতে পারিত কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহারা পরস্পর অসংযুক্ত ভাবে শূন্যে ঘুরিতেছে। গ্রহগণ যে ইথার-ময় আকাশে ঘোরে, সে ইথার এত সূক্ষ্ম যে তাহা পদার্থ নামের বাচ্য হইতে পারে না। তবে কোন পদার্থ দ্বারা সংযুক্ত না হইয়া সমস্ত গ্রহ গুলির আশ্চর্য্যজনক একরূপ গতি হয় কেন? কাণ্ট অনুমান করিলেন, প্রথমে সৌরজগতের সমস্ত স্থান কেবল আবর্ত্তমান বিশৃঙ্খল জলন্ত বাষ্পময় পদার্থরাশিতে ব্যাপ্ত ছিল এবং সেই পদার্থ রাশির কোন, কোন স্থান অপেক্ষা কোন কোন স্থান ঘন থাকায় ক্রমে মধ্যাকর্ষণ বলে সেই বাষ্পজগতের লঘু অংশ, ঘন স্থান গুলির বাষ্পের সহিত মিলিয়া এক একটি গোলক রূপে পরিণত হইয়াছে। বলা বাহুল্য মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রভাবে সকল বস্তুই সকল বস্তুকে টানে এবং মধ্যাকর্ষণ বলেই ঘন পদার্থ লঘু পদার্থকে টানিয়া আত্মসাৎ করে। কিন্তু কাণ্টের অনুমানের একটি এই বিশেষ দোষ দেখিতে পাওয়া যায় যে

—যদি বিশৃঙ্খল পদার্থ রাশি, ঘন স্থান

* এই কয়টি গ্রহ উপগ্রহ মাত্র তখন আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

গুলিকে কেন্দ্র করিয়া গোলক হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গোলক না হইয়া একটি মাত্র গোলক হইবার কথা। কেননা সেই বিস্তৃত বাষ্পরাশির যে কয়েক স্থান অধিক ঘন ছিল, সেই স্থানে চারি দিকের লঘু বাষ্প মিশিতে গিয়া প্রথমে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গোলক হইতে আরম্ভ হইলেও মাধ্যাকর্ষণ ও যন্ত্র বিদ্যার নিয়মানুসারে পরে সেই গুলি আবার একটি সাধারণ কেন্দ্রে আসিয়া একটি বৃহৎ গোলকরূপ ধারণ করিবে—অর্থাৎ ঐরূপে মিশিবার সময় যে সর্ব্বাপেক্ষা আবার ঘন হইবে, সেইটির আকর্ষণ দ্বারা কম ঘন স্থান গুলি তাহাতে মিশিয়া আবার একটি গোলক হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু তাহা না হইয়া এত গুলি গোলক তবে কি করিয়া হইল? এ সমস্যা সম্বন্ধে কাণ্ট কিছুই বলেন নাই। ইহা ছাড়া ছোট গোলক গুলি বড় গোলকের চতুর্দ্দিকে চক্রাকার পথে ঘুরিবার তিনি যে যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহাও সন্তোষজনক নহে।

উইলিয়ম হারসেল যদিও অন্য যুক্তি দেখাইয়া বলেন, নীহাররাশি হইতে জগৎ অভিব্যক্ত, কিন্তু তিনি সৌর জগতের গতি দেখিয়া তাহা বলেন না। দূরবীণ যন্ত্র দ্বারা আকাশে জ্বলন্ত বাষ্পময় নীহারিকা রাশির (Nebula) পরীক্ষা করিয়া তাঁহার মনে হয় ক্রমে গাঢ় অংশের আকর্ষণে লঘু অংশ মিশিয়া এক একটি গোলক সৃষ্ট হইয়াছে। তিনি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন এত বহু সংখ্যক বাষ্পরাশি আবিষ্কৃত করেন যে তাহা হইতে তিনি এইরূপ একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন। সেই হীনপ্রভ বিশাল বিস্তৃত বাষ্পরাশি যাহা এখনো জ্যোতিষ্কে পরিণত হইতে আরম্ভ হয় নাই, আবার তাহা হইতে যাহারা অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল ও ছোট, যাহাদের মধ্যভাগ এতদূর জমাট বাঁধিয়াছে, যে শীঘ্রই একটি জ্যোতিষ্ক হইবে, এবং যাহারা জ্যোতিষ্ক হইতে সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে ও যাহারা সম্পূর্ণরূপে জ্যোতিষ্ক হইয়াছে—এই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন ভিন্ন ভিন্ন বাষ্পখণ্ড দেখিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে জ্বলন্ত নীহারিকা রাশি হইতেই জগৎ অভিব্যক্ত। এবং আকাশে যে সকল নীহারিকা এখন দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও ক্রমে এক একটি জ্যোতিষ্ক রূপে পরিণত হইবে বলিয়া তাঁহার মনে হয়। আধুনিক জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ দূরবীণ পরীক্ষা দ্বারা হারশেলের এই মতের পোষকতা করিয়াছেন।

লাপ্লাস আবার সৌরজগতের গতির আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য দেখিয়া তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলেন, আকাশে এখন যে গ্রহ উপগ্রহ সকল অবস্থিত তাহা এক সময় কেবল মাত্র সূর্য্যের বাষ্পীয় আবরণ দ্বারা পূর্ণ ছিল। কাণ্টের ন্যায় লাপ্লাস কল্পনা করেন না যে, সর্ব্বাগ্রে আকাশমণ্ডল বিশৃঙ্খল বাষ্পময় পদার্থ সমষ্টিতে ব্যাপ্ত ছিল, ক্রমে তাহা হইতে সৌরজগৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার মতে সৌরজগতের আদিম অবস্থায় জ্বলন্ত বাষ্প পরিবেষ্টিত একটিমাত্র বিশাল সূর্য্য ছিল এবং সেই

সূর্য্য আপন বাষ্পাবরণের সহিত একটি আবর্ত্তন শলাকা অবলম্বন করিয়া নিজের চারিদিকে ঘুরিত, ক্রমে ক্রমে এই উত্তপ্ত বাষ্পরাশি শীতল হইয়া কেন্দ্রাভিমুখে সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। সঙ্কোচন অনুসারে সকল পদার্থেরি গতির বেগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সুতরাং সূর্য্যেরও ক্রমে গতিবৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং একটা ঘূর্ণমান গোলকের কোটীস্থ স্থানের গতি অপর সকল স্থান অপেক্ষা অধিক বলিয়া, গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের কোটীদেশস্থ পদার্থের কেন্দ্রাতিগ শক্তি অধিক বাড়িল, সন্দেহ নাই। এইরূপে ক্রমে পূর্ব্বোক্ত বাষ্পময় সূর্য্যের বিষুবরেখা সন্নিহিত স্থল কেন্দ্রাতিগ শক্তি বৃদ্ধি হেতু কেন্দ্রের আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি স্বতন্ত্র অঙ্গুরীয়াকার চক্ররূপ ধারণ করিল। অবশিষ্ট অংশ হইতে আবার এই রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমশঃ সূর্য্যের অতি বিস্তৃত বাষ্পাবরণ কতকগুলি স্বতন্ত্র চক্রে পরিণত হইল।

চক্রের ঘন স্থানের আকর্ষণে চারিদিকের লঘু অংশ সকল মিশিয়া ক্রমে আবার সেই চক্র একটি একটি গ্রহ রূপ ধারণ করিল। (১) সূর্য্যের পরিত্যক্ত অতি বিস্তৃত চক্রের ভিতর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র স্বতন্ত্র হইয়া যে সকল জ্যোতিষ্ক হইয়াছে তাহারা উপগ্রহ। যদি এমন হয় যে কোন চক্রের সকল স্থানের ঘনত্ব এবং সেইহেতু আকর্ষণ সমান, তাহা হইলে তাহার পদার্থরাশি এক স্থানে আসিয়া জমিতে না পাইয়া গোলক রূপে পরিণত হইতে পারে না, হয় তাহা চক্রাকারেই গ্রহের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে, যেমন শনিগ্রহের চক্র, নয় সে চক্র হইতে খসিয়া খসিয়া ছোট ছোট গ্রহমালা সৃজিত হয়।

লাপ্লাসের এই বিখ্যাত মতটি লইয়াই বৈজ্ঞানিক জগতে এত হুল স্থূল। এই মত অনুসারে সৌর জগতের সূর্য্য আদিম জ্যোতিষ্ক পুঞ্জ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছে। যদিও কোন কোন বৈজ্ঞানিক লাপ্লাসের এই মতের স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে চাহেন, কিন্তু স্থূলতঃ ইহা বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীতে সমাদৃত। জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে যত প্রকার মত বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে এই মতটিই জগতের দৃশ্যমান অবস্থার কারণ দর্শাইতে অধিক সক্ষম। জগতের আদিম অবস্থা কল্পনা করিয়া অবরোহী প্রণালীতে লাপ্লাস যে সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন, আরোহী প্রণালী

(১) আধুনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন একটি চক্র না ভাঙ্গিয়া অখণ্ড ভাবে একটি গোলক রূপে পরিণত হওয়া তেমন যুক্তি সঙ্গত নহে। তাহারা বলেন কাল ক্রমে অঙ্গুরীয়কাকার চক্রের ক্ষীণ অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়া অনেক খণ্ড হইল কিন্তু সকল খণ্ডের সমান ভারবিশিষ্ট এবং সমান দূরস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই সুতরাং এই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অংশের অধিক সংখ্যক একত্রে মিশিয়া একটী বৃহৎ বৃহৎ গোলকে পরিণত হইয়াছে।

অবলম্বন দ্বারা আধুনিক পণ্ডিত সারউইলিয়ম টমসন ও হেলমহলটস্, সেই একই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন।

এই পৃথিবীর উপরে যে সকল কাজ হইতেছে সকল কার্য্যেই সূর্য্যের উত্তাপ ব্যয়িত হয়। কি একটি ক্ষুদ্র পতঙ্গের পক্ষ নাড়া, আর কি একটি প্রকাণ্ড পর্ব্বত চূর্ণ হওয়া, সকলি সূর্য্য উত্তাপ দ্বারা সম্পাদিত। একদিন সূর্য্য হইতে উত্তাপ না আসিলেই পৃথিবীর সকল কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবে। এই যে পৃথিবীর জীবন-রক্ষণকারী উত্তাপ, যাহা আমাদের পক্ষে অপরিমিত বলিয়া মনে হয় তাহা সূর্য্যের হিসাবে অতি সামান্য। আমরা সূর্য্য হইতে যত উত্তাপ পাই সর্ব্বশুদ্ধ সূর্য্য তাহার ২১,৭০০,০০,০০০ গুণ উত্তাপ শূন্যে বিকীরিত করিতেছে।

কিছুকাল হইতে একটা কথা উঠিয়াছে এইরূপ উত্তাপ বিক্ষেপ হেতু ক্রমশঃ সূর্য্যের উত্তাপের ভাণ্ডার ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা ; যে হেতু শক্তির ক্ষয় ব্যতীত উত্তাপ-সঞ্চয় হওয়া সম্ভব নহে। এদিকে বিজ্ঞান শাস্ত্রের একটি মূল সত্য এই যে, আপনা হইতে নূতন শক্তি উৎপন্ন হয় না—শক্তি রূপান্তরিত হয় মাত্র।

তাহা হইলে সূর্য্য সেই আদিম কাল হইতে উত্তাপ রূপে যতটা শক্তি ব্যয় করিতেছে, সেই শক্তি আবার ত অমনি আপনা হইতে জন্মাইতে পারে না, তবে কেমন করিয়া সে ক্ষতি পূরণ হইয়া সূর্য্যে উত্তাপ সমভাবে রক্ষিত হইতেছে? আমাদের পৃথিবীতে আগুন জ্বালাইয়া রাখিবার নিমিত্ত ক্রমশই যেরূপ নূতন ইন্ধনের আবশ্যক সূর্য্যেরও ত সেইরূপ কিছু চাই এবং গ্রহখণ্ড সূর্য্যের উপর মাঝে মাঝে দ্রুতবেগে পড়িয়া কতক পরিমাণে সেইরূপ ইন্ধনের কাজ করিয়াও থাকে। কিন্তু যে পরিমাণে গ্রহখণ্ড সূর্য্যের উপর গিয়া পড়ে, তাহা সূর্য্যের উত্তাপ সমভাবে রক্ষা করিবার মত প্রচুর নহে।

সূর্য্য যে পরিমাণ উত্তাপ বিক্ষেপ করে তাহা সমভাবে রক্ষা করিতে গেলে প্রত্যেক ১০০ শত বৎসরে পৃথিবীর মত একটি বিশাল আয়তনের গ্রহ তাহার উপর পড়া চাই, তাহা হইলেই তাহার ১০০ বৎসরের উত্তাপ জমা থাকে, কিন্তু তাহা যেকালে পড়ে না, তবে কোথা হইতে সূর্য্যের উত্তাপ রক্ষা হইতেছে?

ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম যে, বাষ্প শীতল হইবার সময় সঙ্কুচিত হইয়া উত্তাপ বিক্ষেপ করে। সূর্য্যেরও বাষ্প-গোলক শীতল হইয়া ক্রমশঃ যতই সঙ্কুচিত হইতেছে ততই তাহা হইতে আবার নূতন উত্তাপ নির্গত হইয়া বাহিরের উত্তাপ সমান রাখিতেছে। শীতল হইবার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের উত্তাপ বাড়িতেছে শুনিলেই হঠাৎ কেমন ধাঁধা লাগে। কিন্তু শীতল হইবার অর্থই উত্তাপ বিক্ষেপ করা। কোন বস্তু যতই শীতল হইতে থাকে ততই আপন অঙ্গ হইতে বাহিরে উত্তাপ ফেলিয়া দেয়, এইরূপে তাহার উত্তাপ কমিয়া সে শীঘ্র শীতল হয় বটে কিন্তু তাহার ক্ষিপ্ত উত্তাপ চতুর্পার্শ্বস্থ বস্তুর উপর কার্য্য করে—কোন বাষ্পীয় পদার্থে

এই নিয়মটি বিশেষ রূপে খাটে—এখনকার বাষ্পময় সূর্য্য একেবারে শীতল হইয়া যতদিন ঘন না হইবে, ততদিন এই নিয়মানুসারে সে উত্তাপ দিবে, ঘন হইয়া গেলে এ নিয়ম তাহাতে সম্পূর্ণ রূপ আর খাটিবে না। * এইরূপে উত্তাপ বিক্ষেপ দ্বারা সূর্য্য যে উত্তাপ হারাইতেছে, আবার নূতন সঙ্কোচনের দ্বারা সে ক্ষয় পূরণ হইতেছে। উত্তাপ রক্ষণের এই মতটি যে কেবল প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর দ্বারাই সমর্থিত তাহা নহে, অঙ্ক গণনা দ্বারা ইহার সত্যতা প্রমাণীকৃত হয়।

সূর্য্য কত উত্তাপ-শক্তি ব্যয় করে, তাহা বিদিত বলিয়া সমভাবে উত্তাপ রক্ষা করিতে প্রতিবৎসর সূর্য্যের কতটুক সঙ্কুচিত হইবার আবশ্যক তাহাও স্থির করিতে পারা যায়। এখন সূর্য্যের যেরূপ আয়তন, এই আয়তনে প্রত্যেক বৎসরে ২২০ ফিট সূর্য্যব্যাস সঙ্কুচিত হইলেই এখনকার উত্তাপ পরিমাণ রক্ষা হইবে। এই নিয়মানুসারে সূর্য্য ২৫ বৎসরে ১ মাইল ও এক শতাব্দীতে ৪ মাইল সঙ্কুচিত হইবার কথা। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, এখনকার মত দিন সূর্য্যের অধিকাংশ বাষ্পময় থাকিবে, ততদিন শীতলপ্রবণ সূর্য্য ক্রমশ সঙ্কুচিত হইয়া বাহিরের উত্তাপ শক্তি সমভাবে রক্ষা করিবে। সূর্য্য এখন ২১৭০০০০০০০ গুণ উত্তাপ বৎসরে বিকীর্ণ করে, এবং এই পরিমাণে উত্তাপ দিতেছে বলিয়া স্থির হইয়াছে, সূর্য্য আদিমকাল হইতেই এই সম পরিমাণ উত্তাপ দিবার নিমিত্ত প্রত্যেক শতাব্দীতে সূর্য্যের ৪ মাইল সঙ্কুচিত হয়। এই সকল জানিয়া গণনা দ্বারা অতীত কালের সূর্য্যব্যাস স্থির করা আমাদের পক্ষে এখন কঠিন নহে। এই নিয়মানুসারে ১০০ বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্য ৪ মাইল বড় ছিল, দুশ বৎসরে ৮ মাইল, এই রূপে এক সময়ে সূর্য্য বুধের কক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তৎপূর্ব্বে পৃথিবীর কক্ষ পর্য্যন্ত এবং আরো পূর্ব্বে সমস্ত সৌরজগৎময় ব্যাপ্ত থাকিবার কথা! এইরূপে আরোহী প্রণালী অবলম্বন করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা পরিশেষে লাপ্লাসের কল্পিত জগৎব্যাপী সূর্য্যের বাষ্পাবরণেই উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সূর্য্য পরিত্যক্ত বাষ্পীয় চক্র ক্রমে একটী গোলক রূপ ধারণ করিয়া পরে কিরূপে গ্রহ হইয়া দাঁড়ায় এইবার দেখা যাউক।

---

* এ কথাটা বোধকরি বেশ পরিষ্কার হইল না। মনে কর একটা বাষ্পীয় গোলকের উত্তাপের পরিমাণ উ ও তাহার ঘনত্ব ঘ তাহা হইলে তাহার চাপ=উ+ঘ। তাহার পর যখন গোলকের ব্যাস অর্দ্ধেক হইয়া গেল তখন তাহার আয়তন পূর্ব্বাপেক্ষা চারি গুণ কমিয়া গেল এবং কেন্দ্র হইতে পরিধির দূরত্ব হ্রাস হেতু চাপের পরিমাণ চতুর্গুণ হইল। সুতরাং বস্তুতঃ পক্ষে পূর্ব্বে যেখানে যত পরিমাণ তাপ ছিল এখন তাহার ১৬ গুণ হইল কিন্তু এই গোলকের ঘনত্ব ৮ গুণ বাড়িল মাত্র। সুতরাং

১৬ চাপ=৮ ঘ+উ (নূতন উত্তাপের পরিমাণ অর্থাৎ ১৬ উ+ঘ=উ×৮ ঘ।

১৬ উ=৮ উ।

উ=২ উ।

অর্থাৎ বৎসর অর্দ্ধেক কমিয়া গেলে বিক্ষিপ্ত উত্তাপের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়।

ইহার কারণ এই, গোলকটি সূর্য্যের চারি-দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে শীতল হইয়া ঘন অর্থাৎ তরল হইতে থাকে। তরল গোলক ঘুরিলে যন্ত্রবিদ্যার নিয়মানুসারে তাহার দুই মেরু ঈষৎ দমিয়া যায়, এবং তাহার বিষুব-রেখার সন্নিকটস্থ প্রদেশ স্ফীত হইয়া গোলকের আবর্ত্তনকালে তাহার সকল অংশই সমান আবর্ত্তন করে; মেরুর নিকটস্থ ক্ষুদ্র রেখাও যে সময়ে একবার ফিরে, বিষুব রেখার নিকটস্থ বৃহৎ রেখাও সেই এক সময়ে একবার আবর্ত্তন করে। ক্ষুদ্র বৃহৎ দুইটি রেখা যদি একই সময়ে আবর্ত্তন করে তবে বৃহৎ রেখাটি যে অধিক দ্রুতগামী তাহার সন্দেহ নাই। এক কথায় মেরু সন্নিহিত দেশ অপেক্ষা কোটী সন্নিহিত দেশের কেন্দ্রাতিগ গতি অধিক বলিয়া কেন্দ্রানুগ শক্তি অর্থাৎ কেন্দ্রের আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া স্ফীত হইয়া ওঠে এবং উভয় মেরু বিষুবরেখা অভিমুখে দমিয়া দুই দিক চাপা হইয়া পড়ে।

পৃথিবীর সূর্য্য পরিত্যক্ত বাষ্প চক্রটিও এই নিয়ম অনুসরণ পূর্ব্বক এইরূপ একটি গোলক হইয়া দাঁড়াইল। পৃথিবীর গতির পরিমাণ অবলম্বন করিয়াই নিউটন পৃথিবীর বিষুব রেখাস্থ প্রদেশের উন্নতি এবং মেরু সন্নিহিত প্রদেশের অবনতির যে পরিমাণ স্থির করেন, পরে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত মাপিয়া তাহাই প্রতিপন্ন হয়। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বৈজ্ঞানিক সভা কর্ত্তৃক ক্লেইরো কামু লেমনিয়ে লাপ্লণ্ড দেশে প্রেরিত হন। সেখানে তাঁহারা আবি-উটিয়েও শেলস্যাসের সহিত একত্রে যখন পৃথিবীর একটি Arc মাপেন তখন সেই এক সময়েই বুগে ও কঁদামিন দক্ষিণ আমেরি-কায় বিষুবরেখার পরিমাণ স্থির করেন। এই দুইটি পরিমাণ অবলম্বন দ্বারা অঙ্ক গণনা করিয়া নিউটনের গণনার ফল নির্ভুল বলিয়া স্থির হয়।

পৃথিবীর মেরুদ্বয় চাপা ও কোটীদেশ স্ফীত বলিয়া এক প্রকার নিশ্চয় বলা যায় পৃথিবী এক সময় তরল বস্তু ছিল, কেননা একটা কঠিন বস্তু (যেমন প্রস্তর ইত্যাদি) চিরকাল ঘুরিলেও তাহার কোন স্থান চাপা কোন স্থান স্ফীত হইত না। কিন্তু তরল পদার্থ নির্ম্মিত গোলক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঘুরিলে তাহার উপর নিম্ন হইতে পদার্থ সকল নামিয়া মধ্যদেশ স্ফীত করিয়া তুলিবে।

এইরূপে বাষ্পময় পৃথিবী শীতল হইয়া ক্রমে যখন ঘন অবস্থায় আসিল, তখন সমস্ত বাষ্পচয় তরল হইল এমন নহে, বাষ্প অবস্থাতেই কতকটা পৃথিবীর উপরে রহিয়া গেল. এবং তাহার কতকাংশ এখনো পৃথি-বীর উপরে রহিয়াছে, তবে যে সময়কার কথা হইতেছে সে সময়ে এখনকার অপেক্ষা যে অনেক দূর পর্য্যন্ত সে বাষ্প বিস্তৃত ছিল তাহার সন্দেহ নাই। পৃথিবীর তখন-কার বাষ্পাবরণ প্রায় চন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই তরল অবস্থায় পৃথিবীর উত্তাপ সেনটিগ্রেড ডিগ্রির ২০০০ পরিমাণ ছিল (তাপ-মান যন্ত্রের ১০০ ডিগ্রি উত্তাপেই জল ফুটিতে থাকে ১০০ উত্তাপই জীব জন্তুর প্রাণ নাশক) ২০০০ হাজার ডিগ্রি উত্তাপের ফল

কি ভয়ানক তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারি না। লৌহ প্রভৃতি ধাতুময় দ্রব্য এবং অপর যে সকল বস্তু এই ভয়ানক উত্তাপে বাষ্পাকার হইয়া যায় তাহারা বাষ্পীয় অবস্থায় পৃথিবীর উপরে ভাসিতে লাগিল।

এই ২০০০ ডিগ্রি সেনটিগ্রেট উত্তাপ লইয়া দ্রব পৃথিবী শীতল আকাশ পথে ঘুরিতে লাগিল। যে আকাশে এখন গ্রহগণ অবস্থিত, সেখানকার উত্তাপ অতি অল্প। লাপ্লাসের মতে তাপমান যন্ত্রের—শূন্য ডিগ্রির নীচের একশত ডিগ্রি অপেক্ষা অধিক উত্তাপ থাকে না। এই শীতল আকাশ সংস্পর্শে আয় ব্যয়ের নিয়মানুসারে পৃথিবীর উত্তাপ অনেক কমিতে লাগিল, এবং শীতলতা বশতঃ ভূপৃষ্ঠের তরল পদার্থ ক্রমে ঘন হইয়া চটচটে হইতে লাগিল। আর একটি কথা এই, জোয়ার ভাঁটার সাহায্যেও পৃথিবীর শীতল হইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইল। কোন তরল বস্তুকে নাড়িয়া দিলে সে উত্তাপ ফেলিয়া দিয়া শীঘ্রই শীতল হয়, জোয়ার ভাঁটার কার্য্যগুণে পৃথিবীর সকল অংশই এক একবার উপরিভাগে উঠিয়া শীঘ্র শীতল হইতে লাগিল। এইরূপে সময়ে পৃথিবী যখন কিছু শীতল হইল তখন মেরু সন্নিহিত সমুদ্রে ভাসমান নীহার রাশির ন্যায়, অর্দ্ধ তরলাবস্থাপন্ন জমাট পদার্থ রাশি ভূপৃষ্ঠের স্থানে স্থানে ভাসিতে লাগিল। ক্রমে তরল পৃথিবীর সমস্ত পৃষ্ঠদেশ এইরূপ জমাট পদার্থ রাশিতে আবৃত হইয়া তাহার উপরের দিব্য এক আবরণ সৃজিত হইল। কিন্তু এই সূক্ষ্ম আবরণে আভ্যন্তরিক জোয়ার ভাঁটা রোধ করা অসম্ভব, সুতরাং সেই আবরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে তরল পদার্থরাশি প্রচণ্ড বেগে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তখনকার পৃথিবীর অবস্থা—সেই উত্তপ্ত পদার্থ রাশির ভীষণ বলে কম্পমান পৃথিবীর অবস্থা বর্ণনা অসম্ভব। সেই উৎক্ষিপ্ত পদার্থ রাশিই ক্রমে শীতল হইয়া পর্ব্বত শ্রেণীরূপে শোভিত হইল।

আমরা এখন পর্ব্বতশ্রেণী সমাকীর্ণ, বাষ্প রাশি আবৃত উত্তপ্ত মরুময় পৃথিবী দেখিতে পাইতেছি। এখন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে এক-বিন্দু জল নাই। পৃথিবীর উত্তাপ যখন আরো হ্রাস হইল যখন শূন্যে ভাসমান জলীয় বাষ্পের বাষ্পাকারে থাকা অসম্ভব হইল, তখন সেই বাষ্প রাশি জমিয়া উত্তপ্ত জলাকারে পৃথিবীতে পতিত হইল। পৃথিবীর উপর প্রথম বৃষ্টিপতন এক নূতন যুগের আরম্ভ। উষ্ণ পৃথিবীর উপর বৃষ্টি পড়িবামাত্র তাহা আবার উষ্ণ বাষ্পাকারে উঠিয়া গেল, শীতলাকাশের সংস্পর্শে আবার শীতল হইয়া বৃষ্টিরূপে পড়িল। জলের এইরূপ ঘন ঘন অবস্থা পরিবর্ত্তন দ্বারা মুহুর্মুহু বজ্রধ্বনিতে ও বিদ্যুতালোকে, অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবী তোলপাড় হইয়া উঠিল।

এইরূপ ভীষণ কোলাহলময় ভৌতিক যুদ্ধ যে কতদিন চলিল তাহার স্থির নাই, এই পর্য্যন্ত নিশ্চয় বলা যায় যে জলই শেষে বিজয়ী হইয়া সমস্ত পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইল। এইরূপে পৃথিবীর বাষ্পাবরণ কিছু পাতলা হইয়া আসিলে, সেই দিগন্তব্যাপী অন্ধকার

ভেদ করিয়া সদর্পে দুএকটি সূর্য্যকররেখা দেখা দিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে সেই জল-প্লাবিত পৃথিবী সূর্য্যালোক প্রভাবে এখনকার অবস্থায় পরিণত হইয়াছে।

কাব্যের উদ্দেশ্য।

কিছুকাল হইল ইউরোপে হিতবাদী নামক এক দল দার্শনিক উঠিয়াছেন। শুনা যায় ইঁহাদের একজন অধ্যাপক বলিয়াছেন, যখন কাব্যের উদ্দেশ্য আমোদ দেওয়া তখন কাব্য ও Pushpin খেলায় প্রভেদ কি? এই কথায় ভীত হইয়া কেহ কেহ শশব্যস্তে তাড়াতাড়ি করিয়া উদোর বোঝা বেচারা বুধোর ঘাড়ে চাপান; ইঁহারা সভয়ে বলিয়া উঠেন, কাব্য পুলিসম্যান ও ধর্ম্মোপদেষ্টার সহকারী, নীতি সংরক্ষণ করা ইহার কার্য্য। এরূপ একটা গম্ভীর আওয়াজ শুনিয়া অন্ধকারে ভীতি জন্মাইতে পারে কিন্তু দিবসের আলোকে দেখিলে ভয়ের কোনই কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কাব্যের আমোদ দেওয়া উদ্দেশ্য বলিয়াই কি উহা Pushpin-এর সমান দরের বস্তু? আমার রাম কৃষ্ণ চাকরও মনুষ্য, বেদব্যাসও মনুষ্য বলিয়া কি এ দুজনের ভিতর বিশেষ প্রভেদ নাই? এরূপ কথা বেন্থাম না বলিলেই ভাল হইত; তাঁহার প্রতিভার সূর্য্যে ইহা কলঙ্ক মাত্র। একজন ন্যায় শাস্ত্রের ক-খ অধ্যায়ীও এরূপ যুক্তির ভ্রম ধরিতে পারে। আমোদ দেওয়াটা কি একটা তাচ্ছিল্য-ভাজন কাজ? আচ্ছা, যদি একজন হিতবাদীকে জিজ্ঞাসা করি, শাসন তন্ত্র প্রভৃতি পৃথিবীর মহামান্য বস্তুর কার্য্য কি? তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন যে মানুষের দুঃখের অপনয়ন করা ও সুখের বৃদ্ধি করাই এই সকল বস্তুর উদ্দেশ্য। এখানে মানুষের সুখ-দুঃখ অর্থে মানুষের বাহ্য সুখ-দুঃখ অর্থাৎ মানুষের আরাম। যদি বাহ্য দুঃখের হ্রাস ও সুখের বৃদ্ধি করিয়া একটা বস্তু মহামান্য হইতে পারে, তবে মনের দুঃখ অপনোদন ও সুখের বৃদ্ধি সাধন করিলে কেন না একটা বস্তু আরো মহামান্য হইবে? শরীর অপেক্ষা মনের প্রাধান্য বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই।

কাব্য প্রবেশ মাত্র অকুলীন বলিয়া সভা হইতে বহিষ্কৃত হইতেছিল, সে বিষয় ত এক প্রকার মীমাংসা হইল। এখন দেখিতে হইবে যে কাব্য ধর্ম্মোপদেষ্টা ও পুলিসম্যানের অনুচর কিনা। একজন বিখ্যাত চিন্তাশীল কবির এ বিষয়ে মত, "It (Poetry) is an art (or whatever better word our language may afford) of representing

in words external nature, and human thoughts and affections, by the production of as much immediate pleasure in parts as is compatible with the largest sum of pleasure in the whole." এখানে শুধু আমোদের কথাই আছে, নীতির কথা আদতেই নাই। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, কোল্‌রিজ নীতিশিক্ষা দেওয়া কবিতার উদ্দেশ্য বলিয়া ধরেন নাই। কিন্তু এরূপ একটা বড় নামের দ্বারে শরণাগত না হইয়া এ বিষয় সবিস্তরে আলোচনা করিলে কি দাঁড়ায় দেখা যাউক।

এক শ্রেণীর কাব্য আছে যাহা কোমর বাঁধিয়া নীতিশিক্ষা দিতে বসে; সেরূপ কাব্যের মূল্য সর্ব্বত্র বিদিত, তাহা আমাদের এখানকার আলোচ্য নহে। কাব্যের উদ্দেশ্য কি ইহা দার্শনিক তর্কের দ্বারা স্থির করিতে সচেষ্ট হওয়া বড় বিবেচনার কার্য্য নহে। ওরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারা যাইবে কিনা সন্দেহের স্থল। যে সকল গ্রন্থ সর্ব্বত্র, সকল সময়ে, অবিসম্বাদে কাব্য বলিয়া পরিগৃহীত হয় সেই সকল গ্রন্থ হইতে কাব্যের উদ্দেশ্য কি স্থির করা উচিত। এ প্রণালী কখনই অমূলক হইতে পারে না, ইহাতে নিশ্চয়ই ফল লাভ হইবে। বর্ণনা-প্রধান কাব্য যাহাতে বাহ্য-প্রকৃতি যদৃষ্টং তল্লিখিতং হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্যের সহিত যে নীতির অতি দূরতম সম্বন্ধ নাই, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। এরূপ কাব্য খুব উচ্চ শ্রেণীর নহে বটে কিন্তু ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে কাব্যের উদ্দেশ্য নীতি শিক্ষা নহে—"নীতি জ্ঞানেরও যে উদ্দেশ্য কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য" নহে। কাব্যের যাহা উদ্দেশ্য কাব্য নামের বাচ্য সকল বস্তুতেই তাহা জাজ্বল্যমান থাকিবে। এখন উচ্চ শ্রেণীর কাব্যের উদ্দেশ্যের সহিত নীতি জ্ঞানের কিরূপ সম্পর্ক? সকলেই স্বীকার করেন, কালিদাসের কুমার সম্ভবের তৃতীয় সর্গ অতি উচ্চ শ্রেণীর কবিতা কিন্তু ইহাতে কি উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে? পাঠকেরা কেহই কুমারের তৃতীয় সর্গে কোন নীতি দেখিতে পান না সুতরাং ধরিতে হইবে যে তাহাতে কোন নীতিজ্ঞান সন্নিবেশিত হয় নাই। শেলির Skylark, ওয়ার্ডস্বার্থের Peel castle in a storm অতি উৎকৃষ্ট কাব্য কিন্তু ইহাদের নৈতিক উদ্দেশ্য কি? রামায়ণ, মহাভারতের স্থানে স্থানে নৈতিক উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণ মহাভারত ও বাইবেলের জোবের উপাখ্যান একই শ্রেণীর কাব্য। কেহ যেন মনে না করেন যে কাব্যাংশে আমরা রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থের অসম্মান করিতেছি। আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে এক শ্রেণীর কতক গুলি কাব্যগ্রন্থে নৈতিক উদ্দেশ্য লক্ষিত হয় বলিয়া কাব্যের উদ্দেশ্য নৈতিক নহে।

পৃথিবীর ঘটনাচক্রপরম্পরা পরস্পর এমনি সম্বদ্ধ যে একটাকে চালাইয়া দিলে অপর সকল গুলিই চলে। এই ঘটনাচক্রের গতিবিধি আলোচনা করা কাব্যের একটি কার্য্য; কাব্য আমাদিগকে মানুষের কার্য্য কারখা-

নার কল কৌশল দেখাইয়া আমোদ দেয়। এই কল চক্রের ঘর্ষণে মানুষ—ভালই হউক আর মন্দই হউক—সময় সময় পেষিত হইয়া যায়। মন্দলোক পেষিত হইলেই অমনি কাব্যের নৈতিক উদ্দেশ্যের একটা দৃষ্টান্ত স্থল হইয়া দাঁড়ায়, আর যখন একজন ভাল লোক সেই চক্রে চূর্ণ চূর্ণ হন তখন সব চুপ্ চাপ্। ম্যাকবেথ মনস্তত্ত্বের কি অমোঘ নিয়মানুসারে স্ত্রীর উত্তেজনায় ও উচ্চাশার ছলনায় অন্তরাত্মার কথা অবহেলা করিয়া ত্রিবিধ বন্ধন অবহেলা করিয়া ডনক্যানকে হত্যা করিল ও একবার রক্তের নদীতে ঝাঁপ দিয়া আর কূলে উঠিতে পারিল না, এই নিয়ম আলোচনায় আমাদের বুদ্ধি মনস্তত্ত্বের একটা সমস্যার মীমাংসা দেখিয়া পরিতৃপ্ত হয়। আমরা দেখিতে পাই যে ম্যাক্বেথ একটি চক্রে হাত দিয়া কিরূপে সকল চক্র গুলি চালাইয়া দেয়, এই বুদ্ধিগত আমোদ না থাকিলে ম্যাক্বেথের হত্যা কাণ্ডের তালিকা পড়িয়া আমাদের ভাল লাগিবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

কেহ এরূপ বলিতে পারেন, যে কাব্যের গল্প রচনায় নৈতিক উদ্দেশ্য না থাকিতে পারে কিন্তু চরিত্র চিত্র সকল নৈতিক উদ্দেশ্য পূর্ণ। ম্যাক্বেথের কিম্বা ওথেলোর চরিত্রের উপর আমাদের এরূপ বিরাগ জন্মে যে আমরা কখন তাহাদের ন্যায় কার্য্য করিতে পারি না। অলক্ষিত ভাবে আমাদের মনের সহিত এই নৈতিক উপদেশ এমনি মিশিয়া যায় যে, আমরা আপনা হইতে কাব্যে বর্ণিত অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত হই। এ বিষয়ে প্রথম কথা এই যে, বাস্তবিক পক্ষে কখন এরূপ হইয়াছে তাহার প্রমাণাভাব। দ্বিতীয় যদি কাব্য এই উদ্দেশ্যে রচিত হয়, তাহা হইলে ম্যাকবেথ, ইয়াগোর ন্যায় চরিত্র চিত্রিত করিবার বিশেষ ফল দেখিতে পাওয়া যায় না। উহাদের মত অবস্থায় মানুষ সচরাচর পড়ে না সুতরাং অতি অল্প লোকেরই উপর ওরূপ চরিত্র চিত্রের দ্বারা সুফল উৎপন্ন হইবার কথা।

এখানে এমন একটা কথা উঠিতে পারে যে, যে কাব্যে মন্দ লোক শাস্তি পায় তাহার নৈতিক উদ্দেশ্য, সেই লোকের মন্দতা হইতে আমাদিগকে বিরত করা। আর যাহাতে ভাল লোক কষ্ট পায় তাহার উদ্দেশ্য আমাদের মনে এই সকল ভাল লোকের কষ্টের নিদানভূত ষড়যন্ত্রকারী লোকদিগের চরিত্রের উপর বিরাগ জন্মান। কিন্তু এ সকল কথা বুদ্ধির অগ্নি পরীক্ষায় টেকিবে না। এমন কি কাব্য নাই যাহাতে ভাল লোক অদৃষ্ট কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছে; যাহাতে ভাল লোক খুবই কষ্ট পাইয়াছে, কিন্তু কোন লোককেই তাহার কষ্টের কারণ বলিয়া দাঁড় করান যায় না? কিম্বা যাহাতে ভাল লোক এমন লোক হইতে কষ্ট পাইয়াছে, যাহাদের উপর আমাদের অণুমাত্র বিরাগ জন্মায় না? কর্ডিলিয়া কাহা হইতে কষ্ট পাইয়াছে? যদি কোন লোক কর্ডিলিয়ার অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী থাকে ত সে তাহার বৃদ্ধ পিতা লিয়ার কিন্তু তাহা বলিয়া কি কাহারও হৃদয় লিয়রের সম্পর্কে রুদ্ধদ্বার হয়? এরূপ বলা যাইতে

পারে যে, কাব্যে ভাল লোক কষ্ট পাইলেও তাহার প্রতি আমাদের এমন টান হয় ও মন্দলোক সুখ পাইলেও তাহাদের চিত্র এরূপ ঘৃণা করিয়া চিত্রিত হয় যে, দুঃখ সংযুক্ত ভালও আমরা প্রার্থনীয় মনে করি আর সুখময় মন্দকেও পরিত্যজ্য মনে করি। ইহাতে ফল হয় এই যে, বাস্তব জীবনে আমরা মন্দতার প্রলোভনে সুপথ হইতে বিচ্যুত হই না। কিন্তু কাব্য মাত্রেই এরূপ দেখা যায় না। ঈডিপাস অদৃষ্ট নিপীড়িত। গ্রীকরা বিশ্বাস করিতেন যে কোন লোক দুষ্কর্ম্ম করিলে সে কিম্বা তাহার অধস্তন পুরুষের মধ্যে কেহ না কেহ স্বকীয় দুষ্কৃতির ফলভোগ করিবে। ঈডিপাস উক্ত মতানুসারে রচিত। এরূপ অবস্থা সম্পূর্ণ রূপে আমাদের নীতি বিরুদ্ধ কিন্তু তাহা বলিয়া কি আমরা ঈডিপাসের কাব্য রস উপভোগ করিতে পারি না? ঈডিপাসকে আমরা খুব ভাল লোক মনে করি উহার কষ্টে আমাদের হৃদয় দ্রবীভূত হয় কিন্তু আমরা কেহই ঈডিপাসের মত ভাল হইবার জন্য তাহার সহিত আমাদের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে অভিলাস করি না। আমরা মনে মনে প্রার্থনা করি যেন ঈডিপাসের মত অবস্থা আমাদের না হয়। একটা কল্পিত অবস্থায় মানুষ স্বাভাবিক নিয়মাধীনে কিরূপ কার্য্য করে ইহা দেখিয়াই আমরা আমোদ পাই। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া আনন্দাভিসিক্ত হই। ঈডিপাসের নীতিশিক্ষা দেবার যাহা কিছু ছিল তাহা এখন একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে তবুও আমরা ঈডিপাস্‌কে এক খানি উৎকৃষ্ট কাব্য মনে করি। কাব্যের উদ্দেশ্য যে নীতি শিক্ষা দেওয়া নহে, ইহা একটি তাহার প্রমাণ স্থল। আর একটি প্রমাণ এই যে Comedy অপেক্ষা Tragedy আমাদের ভাল লাগে। কিন্তু এরূপ কাব্যে পরিণামে ভাল লোকই কষ্ট পায়।

ওথেলো, ম্যাক্‌বেথ প্রভৃতি হইতে যিনি যে নীতি সংগ্রহ করুন না কেন উহার নীতি শিক্ষা দেওয়া মুখ্য গৌণ কোন উদ্দেশ্যই নহে। কাব্যে মনস্তত্ত্বের দুরূহ সমস্যার মীমাংসা দেখিয়া আমরা আমোদ পাই এবং দুর্নীত না হইলে তাহার নীতির কথা কিছুই ভাবি না।

কাব্যের উদ্দেশ্য আমোদ দেওয়া কিন্তু আনুষঙ্গিক রূপে তাহার দ্বারা মানুষের অনেক উপকার সাধিত হয়। তাহার মধ্যে নীতির উন্নতি একটি। কিন্তু যে কাব্য যত প্রত্যক্ষ পক্ষে নীতি শিক্ষা দিতে যত্নশীল তাহা কাব্যাংশে তত নিকৃষ্ট।

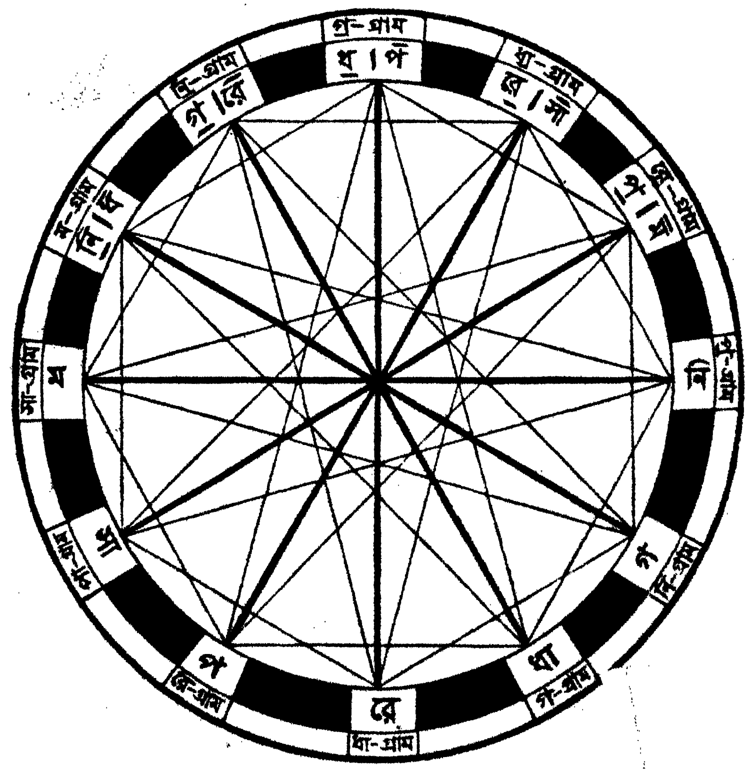
নীতির মূল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় উহা সামঞ্জস্যের উপর অবস্থিত। সৌন্দর্য্যের মূলেও সামঞ্জস্য সুতরাং নীতির বিরোধী হইলে আমাদের অপ্রীতিকর হয়। মানুষ স্বভাবতঃ নীতি জ্ঞান সম্পন্ন। আমরা মৌলিক নীতির কথা বলিতেছি, লৌকিক নীতির কথা বলিতেছি না। যে নীতি সকল দেশে, সকল সময়, প্রচলিত তাহা মৌলিক নীতি ও যাহা সময় বিশেষে,

দেশ বিশেষে আদৃত তাহা লৌকিক নীতি। দু এক স্থানে হঠাৎ ইহার ব্যভিচার বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে, মৌলিক নীতি ভঙ্গ করিলে কখনই আমাদের ভাল লাগে না ও লৌকিক নীতি ভঙ্গ করিয়া মৌলিক নীতি বজায় রাখিলেও আমাদের ভাল লাগে। বায়রণের প্যারিসিনা ইহার একটি দৃষ্টান্ত স্থল। প্যারিসিনায় লৌকিক নীতিভঙ্গ হইয়াছে কিন্তু ইহাতে মৌলিক নীতির ব্যভিচার হয় নাই বলিয়া ইহা আমাদের নিকট কষ্টকর নহে। কিন্তু শেলির চেঞ্চি নামক উৎকৃষ্ট দৃশ্যকাব্য মৌলিক নীতিভঙ্গ হেতু অপ্রীতিকর। বিলাসময় (Voluptuous) কাব্য মানুষের ভাল লাগে কেন? আমরা ওরূপ কাব্যের নায়কের সহিত নিজেকে মিশাইয়া তাহার লীলাখেলার অংশীদার হইয়া পড়ি—তাহাই আমাদের বিলাসময় কাব্য ভাল লাগে। মানুষ সহস্র নীতি জ্ঞান সত্ত্বেও এ জাতীয় মনোবৃত্তির সম্পর্কে আদিম অবস্থাপন্ন। ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস লেখক ফরাসী পণ্ডিত টেন বলেন, কার্য্যতঃ মানুষ ভোগবিলাসে সম্পূর্ণ বিরত হইলেও উক্তরূপ বিষয়ে কল্পনা করিয়া আমোদ পায়—এরূপ কল্পনা অবশ্য কোন নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করে না। এখানে একটা কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত, যৌনিক নীতি (sexual morality) মৌলিক নীতি শ্রেণীভুক্ত নহে। আর এক প্রকার গ্রন্থ চলিত ভাষানুসারে নীতি বিগর্হিত হইলেও আমাদের অপ্রীতিকর হয় না। একটা খুব সাহসিক ডাকাতি কিম্বা একটা সুচতুর চুরির কথা পড়িতে আমাদের ভাল লাগে। কিন্তু এখানে ভাল লাগে কি? না, সাহসিকতা, এবং চাতুর্য্য। ডাকাইতি ও চুরি যদিও দুর্নীত কিন্তু ইহা এত সাধারণ যে ইহাতে কেহই চমকিয়া উঠেন না সুতরাং আস্তে আস্তে ইহা চক্ষুর আড়াল হইয়া যায় ও আমরা সাহসিকতা ও দক্ষতার বিবরণ টুকুমাত্রই পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হই। দস্যু রবিন হুডের বিবরণ পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হই কিন্তু যদি দেখিতাম যে রবিন একটি অসহায়া স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিত, তাহা হইলে কিরূপ হইত? ইহা হইতেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে কাব্য নীতির অনুযায়ী না হইলে প্রীতি পদ হয় না, সুতরাং কাব্যে নীতি বজায় রাখিতে হয়। কাব্যের উদ্দেশ্য আমোদ দেওয়া। নীতি ভিন্ন কাব্য হইতে পারে কিন্তু আমোদ ভিন্ন কাব্য নাই।

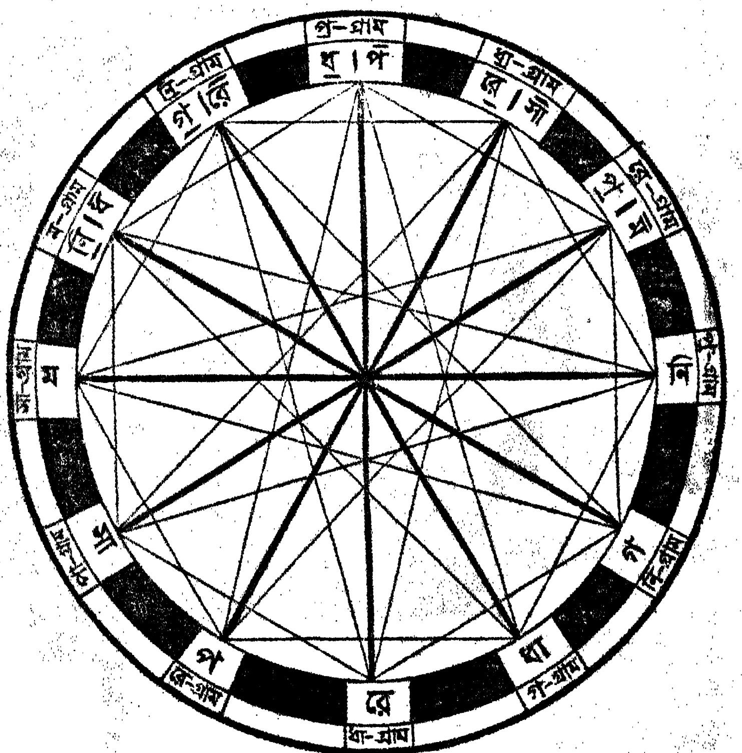
এখন অন্য জাতীয় কাব্য আলোচিত হইতেছে। সেক্‌সপিয়ারের ওথেলো কি নীতিশিক্ষা দিতেছে? না, স্ত্রীর চরিত্রের প্রতি নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া উচিত। এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে স্ত্রীকে কোন নীতি বিগর্হিত কার্য্য করিতে দেখিলেও কি তাহার প্রতি সন্দেহ করা অন্যায়? যদি তাহা না হয় ত ওথেলোর ব্যবহার কি জন্য অন্যায় হইবে? ওথেলো মনে করিতেন ইয়াগো তাঁহার পরম হিতৈষী মিত্র, তাঁহার শান্তিভঙ্গের জন্য ইয়াগোর চেষ্টা করা কোন মতেই সম্ভব নহে। সে যাহা বলিতেছে

ও করিতেছে তাহা ওথেলোর নিতান্ত অনুরোধে ও তাঁহার হিতেরই জন্য। এরূপ মিত্রের কথায় কাহারো কখন অবিশ্বাস জন্মিতে পারে না। সেক্সপিয়রের কবিত্বের এটি সামান্য পরিচয় নহে যে, ওথেলোর পাঠক মাত্রেরই মনে হয়, ইয়াগো তাঁহাকেও ঐরূপ ঠকাইতে পারিত। আমরা কেহ ওথেলোর কার্য্য দুর্নীতি মনে করি না। ওথেলো More sinned against than sinning। তবে যদি বল যে ওথেলো হইতে এই নীতিটি সংগ্রহ করা উচিত যে, কপট মিত্রকে বিশ্বাস করা অন্যায়। কিন্তু কোন মিত্রকে একবার কপট বলিয়া জানিতে পারিলে তাহাকে যে অবিশ্বাস করিব এ কথা আর আমাদের বলিয়া দিতে হইবে না। আর যদি এরূপ বল যে যাহার উপর ভাল, তাহার ভিতর ভালো না হইলেও হইতে পারে ইহাই ওথেলোতে উপদিষ্ট হইতেছে, তবে আমি বলি এ উপদেশ নিতান্ত হানিজনক। যদি আমরা এই নীতি অবলম্বন করিয়া আমাদের প্রাণের বন্ধুকেও সম্ভবতঃ কুলোক বলিয়া সন্দেহ করি তাহা হইলে জীবনে কষ্টের আর শেষ থাকে না। কেহ এরূপ তর্ক করিতে পারেন যে, লোকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিলে শাস্তি পাইতে হয়—ইয়াগোর চরিত্র মধ্যে সেক্সপিয়র যত্ন করিয়া এই সত্যটি লুকাইয়া রাখিয়াছেন। ওথেলোর কোন পাঠক এই নৈতিক সত্যটি উহা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন কি না জানিলে কৃতার্থ হইব। সেক্সপিয়ার ওথেলোর শোকে মগ্ন। ইয়াগোর শাস্তি লইয়া তিনি বিশেষ আড়ম্বর করেন নাই। ইয়াগোর শাস্তি সামাজিক নিয়মানুসারে হইবে বলিয়াই তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

আসল কথাটা এই—কিরূপ অবস্থাতে কিরূপ মনের ভাব হয় তাহাই প্রকাশ করে বলিয়া আমরা কাব্য হইতে আমোদ পাই। কাব্যে যদি এমন কিছু বর্ণিত হয়, যাহাতে আমাদের আমোদ না হয়, তাহা অকাব্য বা কুকাব্য। দুর্নীতির প্রতি আমাদের নাকি বিরাগ, এই নিমিত্তই কবি যখন দুর্নীতিকে কশাঘাত ও সুনীতিকে পূজা করেন তখন আমাদের আমোদ বোধ হয়, তাহার উল্টা হইলে আমাদের খারাপ লাগে। অতএব কাব্যে যে, সুনীতিকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহা পাঠকদিগকে আমোদ দিবারই জন্য। অতএব দেখা যাইতেছে, কাব্যের প্রাণ আমোদ দেওয়া। যদি আমোদ দিবার জন্য কাব্যে স্থান বিশেষে নীতি কথার বিশেষ আবশ্যক করে তবেই তাহাকে কবি আদর করেন। নতুবা তাহার সহিত কবির কোন সম্পর্কই নাই।


গ-গ্রাম
রে
ধা-গ্রাম

স্বররহস্য।



উপরের ঐ চক্রটিতে সমস্ত গ্রামের সমস্ত বিবরণ নখ-দর্পণের মধ্যে পাওয়া যাইবে;—কেবল নিম্নলিখিত গুটিকত সংকেত জানিবার অপেক্ষা।

ঐ চক্রের বহিঃপ্রদেশস্থিত সাদা বেষ্টন-পথে দ্বাদশটি গ্রামের নাম ছোট অক্ষরে লিখিত আছে এবং তাহার অন্তর্নিহিত কালো বেষ্টন-চক্রের সাদা ঘর-গুলিতে দ্বাদশটী সুরের নাম বড় অক্ষরে লিখিত আছে।

দ্বাদশটি সুরের নাম-সম্বলিত কালো বেষ্টন-চক্রটি স্বর-চক্র এবং দ্বাদশটি গ্রামের নাম-সম্বলিত সাদা বেষ্টন চক্রটি গ্রাম-চক্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে।

স্বর-চক্রের অন্তর্গত বড় অক্ষরের দ্বাদশটি ঘর স্বর-স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে।

স্বর-চক্রের যে যে স্বর-স্থানে দুই-দুইটি সুর রহিয়াছে দেখিতেছ তাহা আর কিছু নয়—এক-একটি সুরের দুই-দুইটি নাম ;—যাহাকে বলে নি (কোমল নিখাদ) তাহাকেই বলে ধা (তীব্র ধৈবত), যাহাকে বলে গ (কোমল গান্ধার) তাহাকেই বলে রে (তীব্র রেখাব) ইত্যাদি ; এইরূপ দুই-নাম-সংজ্ঞিত সুর গুলি দ্বিনামক সুর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে। দেখিবে যে, স্বর-চক্রে পাঁচটি বই আর দ্বিনামক সুর নাই, অবশিষ্ট সাতটি সুরের সকল গুলিই শুদ্ধ সুর।

ঘড়ি চলিবার সময় তাহার কাঁটা যে যে ঘণ্টা-স্থান হইতে যে যে ঘণ্টা-স্থানে ঘুরিয়া যায়, স্বর-চক্রের অথবা গ্রাম-চক্রের সেই সেই স্থান হইতে সেই সেই স্থানে ঘুরিয়া যাওয়ার নাম অনুলোম-ক্রমে চলা, আর ঘড়ির কাঁটার উল্টা চালে উক্ত চক্রের এক স্থান হইতে আর এক স্থানে ঘুরিয়া যাওয়ার নাম বিলোম-ক্রমে চলা ; এই কথাটি মনে করিয়া না রাখিলে পদে পদে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। উদাহরণ ;—সা-ম-ক্রম (অর্থাৎ সা-হইতে ম-য়ের দিকে ঘুরিবার ক্রম) অনুলোম-ক্রম, ম-সা-ক্রম বিলোম-ক্রম, সা-প-ক্রম বিলোম ক্রম, পা-সা-ক্রম অনুলোম-ক্রম ইত্যাদি।

দেখিবে যে সা'র দুই পার্শ্বের দুইটি স্বর-স্থানে ম এবং প অবস্থিতি করিতেছে, তাহার মধ্যে ম অনুলোম-ক্রমে (অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার কাল-নির্ণায়ক গতি অনুসারে) সা'র নিকটতম, এবং প বিলোম-ক্রমে (অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার পশ্চাদ্‌গতি অনুসারে) সা'র নিকটতম, এ জন্য ম সা'র অনুলোম-পার্শ্বের এবং প বিলোম-পার্শ্বের সুর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে।

সা'র যেমন দেখা গেল তেমনি—যে কোন সুর হউক তাহার দুই পার্শ্বের স্বর-স্থানের দুইটি সুরের মধ্যে যেটি অনুলোম-ক্রমে নিকট-তম তাহা অনুলোম পার্শ্বের সুর এবং যেটি বিলোম-ক্রমে নিকটতম তাহা বিলোম পার্শ্বের সুর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে। গ্রাম চক্রেরও এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাইবার ঐ দুই প্রকার ক্রম অনুলোম এবং বিলোম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে।

দেখিবে যে, স্বর চক্রের যেখান হইতে হউক না কেন—উত্তরোত্তর সাতটি স্বর স্থান গ্রহণ করিলেই স্বর-চক্রের অর্দ্ধাংশ পরিমাণ একটি "অর্দ্ধ চক্র" গ্রহণ করা হয় ; যথা ম-স্থান-হইতে বিলোম-ক্রমে ম সা প রে ধ গ নি এই সাতটি স্বর-স্থান স্বর-চক্রের অর্দ্ধাংশ জুড়িয়া একটি অর্দ্ধচক্রে অবস্থিতি করিতেছে ; তেমনি আবার অনুলোম-ক্রমে ঐ স্বর-স্থান-হইতে ম নি গ ধা রে প নি এই সাত সুর স্বর-চক্রের অর্দ্ধাংশ জুড়িয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধ-চক্রে অবস্থিতি করিতেছে।

সা হো'ক, ম হো'ক, পা হো'ক, নি হো'ক, যেখান হইতে অনুলোম বা বিলোম ক্রমে সাতটি স্বর-স্থান উত্তরোত্তর ক্রমে গ্রহণ করিবে, সেই খান হইতেই সেই সাত সুর সম্বলিত একটি অর্দ্ধ-চক্র ধরিয়া পাইবে।

গ্রাম-চক্রের যেখানে যে-গ্রামের নাম ছোটো অক্ষরে লিখিত আছে সেইখানকার স্বর-স্থান হইতে (অর্থাৎ বড় অক্ষরের স্থান হইতে) বিলোম ক্রমে (অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার উল্টা চালে) একটি অর্দ্ধচক্র গ্রহণ করিলেই সেই অর্দ্ধচক্রের সাতটি ঘরে সেই গ্রামের সাতটি স্বর বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে দেখিতে পাইবে ; প্রত্যেক গ্রামের সেই সাতটি স্বর গ্রামস্থ স্বর এবং সেই সাত স্বর বাদে অবশিষ্ট পাঁচটি স্বর গ্রাম-বহির্ভূত স্বর—জানিবে।

গ্রাম-চক্রে যেখানে ছোটা অক্ষরে সা গ্রামের নাম লিখিত আছে, সেইখানকার বড় অক্ষরের স্থান হইতে বিলোম-ক্রমে ম সা প রে ধা গ নি এই অর্দ্ধ চক্রটি গ্রহণ কর, দেখিবে যে, তথাকার সাতটি ঘরের সাতটি স্বরই শুদ্ধ স্বর—সুতরাং সা-গ্রামের অধিকার-ভুক্ত ; আর অবশিষ্ট পাঁচটি স্বর-দ্বিনামক স্বর—সুতরাং সা-গ্রামের গ্রাম-বহির্ভূত।

যেখানে ছোটো অক্ষরে সা-গ্রাম লিখিত আছে তাহার অনুলোম-পার্শ্বে ম-গ্রাম এবং বিলোম-পার্শ্বে প-গ্রাম ছোটো অক্ষরে লিখিত আছে দেখিবে ; ম-গ্রাম যেখানে ছোট অক্ষরে লিখিত আছে সেখানকার বড় অক্ষরের স্থান-হইতে বিলোম-ক্রমে সাতটি স্বর লইলে ম-গ্রামের সাতটি স্বর পাওয়া যাইবে ; এবং প-গ্রাম যেখানে ছোটো অক্ষরে লিখিত আছে সেখানকার বড় অক্ষরের স্থান-হইতে বিলোম ক্রমে সাতটি স্বর লইলে প-গ্রামের সাতটি স্বর পাওয়া যাইবে, ইত্যাদি। দেখিবে যে, ম-গ্রাম এবং পা-গ্রাম উভয়েই গ্রাম-চক্র মধ্যে সা-গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম, তাই ও-দুই গ্রামের প্রত্যেক গ্রামে শুদ্ধ কেবল একটি-মাত্র দ্বিনামক স্বর—তাহার অধিক নহে।

সা-গ্রাম হইতে তাহার অনুলোম পার্শ্বের ম-গ্রাম ডিঙাইয়া নি-গ্রামে এবং বিলোম পার্শ্বের প-গ্রাম ডিঙাইয়া রে-গ্রামে দেখিবে যে, ও-দুই গ্রামের প্রত্যেক গ্রামে দুইটি দ্বিনামক স্বর।

সা গ্রাম হইতে তাহার অনুলোম-পার্শ্বের দুই গ্রাম ডিঙাইয়া গ-গ্রামে এবং বিলোম-পার্শ্বের দুই গ্রাম ডিঙাইয়া ধা-গ্রামে দেখিবে যে, ও দুই গ্রামের প্রত্যেক গ্রামে তিনটি দ্বিনামক স্বর।

সা-গ্রাম হইতে তাহার অনুলোম পার্শ্বের তিন গ্রাম ডিঙাইয়া ধা-গ্রামে এবং বিলোম পার্শ্বের তিন গ্রাম ডিঙাইয়া গ-গ্রামে দেখিবে যে, ও-দুই গ্রামে চারিটি দ্বিনামক স্বর।

সা-গ্রাম হইতে তাহার অনুলোম-পার্শ্বের চারিটি গ্রাম ডিঙাইয়া রে-গ্রামে এবং বিলোম-পার্শ্বের চারিটি গ্রাম ডিঙাইয়া নি-গ্রামে দেখিবে যে, ও-দুই গ্রামের প্রত্যেক গ্রামেই পাঁচটি দ্বিনামক স্বর।

সা-গ্রাম হইতে তাহার অনুলোম এবং বিলোম উভয় পার্শ্বের পাঁচ স্বর ডিঙাইয়া প-গ্রামে দেখিবে যে, সেখানেও পাঁচটি দ্বিনামক স্বর। স্বর-চক্রে মোটে পাঁচটি বই আর দ্বিনামক স্বর নাই ; এ জন্য কোন

গ্রামেই দ্বিনামক স্বরের সংখ্যা পাঁচের ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না।

সা-গ্রামের অনুলোম হইতে অনুলোম পার্শ্বের ম, নি, গ, ধা, রে এই পাঁচটি গ্রামে দ্বিনামক স্বরের কোমল নাম গুলি, এবং তাহার বিলোম হইতে বিলোম পার্শ্বের প, রে, ধা, গ, নি, এই পাঁচটি গ্রামে দ্বিনামক স্বরের তীব্র নাম-গুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ও সা-গ্রাম হইতে অনুলোম বিলোম উভয় ক্রমেই সমদূর স্থিত প-গ্রামের দ্বিনামক স্বর গুলির চাই তীব্র নাম গুলি বাদ দিয়া কোমল নাম-গুলি, চাই কোমল নাম গুলি বাদ দিয়া তীব্র নাম-গুলি ব্যবহার কর, সমানই কথা।

স্বর-চক্রের প্রত্যেক স্বর-স্থান হইতে (বড় অক্ষরের ঘর হইতে) যে-সকল সরল-রেখা অন্যান্য স্বর-স্থান পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে দেখিতেছ, তাহাদের মধ্যেকার অপেক্ষা-কৃত স্থূল রেখাটি স্থূল-রেখা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে, অবশিষ্ট রেখা-গুলি সূত্র নামে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

যে যে সূত্র দেখিতেছ উত্তরোত্তর চারিটি স্থূল রেখা কর্ত্তন করিয়াছে, সেই সেই সূত্র দূরগামী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে, এবং যে যে সূত্র দেখিতেছ একটিমাত্র স্থূল রেখা কর্ত্তন করিয়াছে সেই সেই সূত্র পার্শ্বগামী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে। যে কোন স্বর হইতে যে-কোন স্বর পর্য্যন্ত দূর-গামী সূত্র প্রসারিত দেখিবে সে দুটি স্বরের মধ্যে অর্দ্ধমাত্রা স্বর-ব্যবধান জানিবে; আর— যে কোন স্বর হইতে যে কোন স্বর পর্য্যন্ত পার্শ্ব-গামী-সূত্র প্রসারিত দেখিবে, সে দুটি স্বরের মধ্যে একমাত্রা স্বর-ব্যবধান জানিবে। প্রত্যেক গ্রামের তৃতীয় এবং চতুর্থ-স্বরের মধ্যে তথা সপ্তম এবং অষ্টম স্বরের মধ্যে নাকি অর্দ্ধমাত্রা স্বর-ব্যবধান এ জন্য ইহার পরেই দেখিবে যে, ঐ ঐ স্বরদ্বয়ের মধ্যে কেবল দূরগামী সূত্র অবস্থিতি করে, নহিলে গ্রামের আর সমস্ত স্বরদ্বয়ের মধ্যেই পার্শ্বগামী সূত্র অবস্থিতি করে। দেখিবে যে, দ্বিনামক স্বর মাত্রই স্বস্থান-হইতে প্রসারিত দুইটি দূরগামী সূত্র দ্বারা আপনার দুই নামের দুইটি শুদ্ধ স্বরের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে; যথা,—নি।ধা এই দ্বিনামক স্বরটি দুইটি দূরগামী সূত্র দ্বারা ধা, নি, এই দুটি শুদ্ধ স্বরের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে,—ঐ দ্বিনামক স্বরটি (স্বরের মাত্রা-তারতম্য হিসাবে) ধা'র উপরের স্বর বলিয়া ধা (অর্থাৎ তীব্র ধৈবত) এবং নি'র নীচের স্বর বলিয়া নি (অর্থাৎ কোমল নিখাদ) নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

যদি কোন গ্রামের (যেমন সা-গ্রামের) সাত স্বর আরোহী ক্রমে অর্থাৎ প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম এইরূপ পরম্পরা-ক্রমে এবং তাহার পর অবরোহী ক্রমে অর্থাৎ সপ্তম ষষ্ঠ পঞ্চম চতুর্থ তৃতীয় দ্বিতীয় প্রথম এইরূপ পরম্পরা-ক্রমে গাইতে চাও, তবে পূর্ব্বোক্ত সংকেতানুসারে সেই গ্রামের নাম যেখানে ছোটো অক্ষরে লিখিত আছে সেই খানকার বড় অক্ষরের স্বরস্থান হইতে

প্রতিলোম-ক্রমে সাতটি গ্রামস্থ সুর গ্রহণ কর, অবশিষ্ট পাঁচটি সুর হাত দিয়া ঢাকিয়া রাখ; তাহার পর যে-সুরটি দেখিবে গ্রামের নাম-বাচক (যেমন সাগ্রামের সা, ম-গ্রামের ম, পা-গ্রামের পা, ইত্যাদি) সেইটি জানিবে গ্রামের প্রথম সুর; সেই প্রথম সুরের সহিত যে যে গ্রামস্থ (গ্রাম-বহি-র্ভূত নহে—হস্তাবৃত নহে) সুর পার্শ্বগামী সূত্র পরম্পরায় গ্রথিত রহিয়াছে দেখিবে, সেই গুলি উত্তরোত্তর গ্রহণ করিবে,—যেখানে ঠেকিবে (অর্থাৎ যেখানে দেখিবে যে, পার্শ্বগামী সূত্র গ্রামস্থ অপর কোন সুরে লইয়া যাইতে পারে না) সেখানে দূর-গামী সূত্র অবলম্বন করিয়া গ্রামস্থ যে সুরে যাইতে পার সেই সুর গ্রহণ করিবে,—যে পর্য্যন্ত না স্বস্থানে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আইস সেই পর্য্যন্ত ঐরূপ করিতে থাকিবে, তাহা হইলেই আরোহী ক্রমে গ্রামের প্রথম সুর হইতে সপ্তম সুর পর্য্যন্ত একে একে সম্মুখে উপস্থিত হইবে এবং সর্ব্বশেষে প্রথম সুর অষ্টম সুরের পদারূঢ় হইয়া পুনরাগমন করিবে; তাহার পর সেই অষ্টম সুর হইতে দূরগামী সূত্র-পথ দিয়া সপ্তম সুরে প্রত্যা-বর্ত্তন করিবে, এবং সেই সপ্তম সুরের স-হিত যে যে সুর পার্শ্বগামী সূত্র পরম্পরায় গ্রথিত রহিয়াছে সেই গুলি উত্তরোত্তর গ্র-হণ করিবে, যেখানে ঠেকিবে সেখানে দূর-গামী সূত্র অবলম্বন করিয়া গ্রামস্থ যে-সুরে যাইতে পার সেই সুর গ্রহণ করিবে,—যে পর্য্যন্ত না স্বস্থানে ফিরিয়া আইস সে পর্য্যন্ত ঐরূপ করিবে, তাহা হইলেই অবরোহী ক্রমে গ্রামস্থ সমুদায় সুর উত্তরোত্তর পরি-ভ্রমণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রথম সুরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইবে।

যদি গ্রাম-নির্ব্বিশেষে সমস্ত স্বরচক্র আরোহী ক্রমে পর্য্যটন করিতে চাও তবে যে-সুর হইতে যাত্রারম্ভ করিবে সেই সুর হইতে দূরগামী সূত্রপথ দিয়া অনুলোম-পার্শ্বস্থ অর্দ্ধচক্রের যেখানে পার যাইবে, আর যদি অবরোহী ক্রমে চাও তবে দূরগামী সূত্র পথ দিয়া বিলোম পার্শ্বস্থ অর্দ্ধচক্রের যেখানে পার যাইবে, তাহার পর যে পর্য্যন্ত না স্বস্থানে ফিরিয়া আইস সে পর্য্যন্ত ক্রমাগত উত্তরোত্তরবর্ত্তী দূরগামী সূত্র পথ অবলম্বন করিয়া যে সুর হইতে যে সুরে যাইতে পার সেই সুর হইতে সেই সুরে যাইবে তাহা হইলেই সমস্ত স্বরচক্র যথা-ক্রমে পর্য্যটন করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিবে। যদি সা-হইতে আরোহী-ক্রমে যাত্রারম্ভ কর তবে নিম্ন লিখিত ক্রমে দ্বাদ-শটি সুর উত্তরোত্তর প্রাপ্ত হইবে যথা—

সা, রে রে, গ গ, ম, প প, ধা ধা, নি

নি। পরিশেষে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিবে।

বড় অক্ষরে লিখিত যে কোন সুর হউক্ না কেন, দেখিবে যে, তাহার অনুলোম-পার্শ্বে স্ব-গ্রামের মধ্যম এবং তাহার বি-লোম পার্শ্বে স্ব-গ্রামের পঞ্চম অবস্থিতি করিতেছে; যথা,—সা'র অনুলোম পার্শ্বে সা-গ্রামের মধ্যম ম এবং বিলোম পার্শ্বে সা-গ্রামের পঞ্চম প অবস্থিতি করিতেছে। অনুলোম ক্রমে দেখিতে পাইবে যে, ম-গ্রা-

মের মধ্যম নি, নি-গ্রামের মধ্যম গ, গ গ্রামের মধ্যম ধা, ধা-গ্রামের মধ্যম রে, রে-গ্রামের মধ্যম প, প-গ্রামের মধ্যম নি, নি-গ্রামের মধ্যম গ, গ গ্রামের মধ্যম ধা, ধা-গ্রামের মধ্যম রে, রে-গ্রামের মধ্যম প, প গ্রামের মধ্যম সা; বিলোম-ক্রমে দেখিতে পাইবে যে, সা-গ্রামের পঞ্চম প, প-গ্রামের পঞ্চম রে, রে-গ্রামের পঞ্চম ধা, ধা-গ্রামের পঞ্চম গ, গ গ্রামের পঞ্চম নি, নি-গ্রামের পঞ্চম প, প-গ্রামের পঞ্চম রে, রে-গ্রামের পঞ্চম ধা, ধা-গ্রামের পঞ্চম গ, গ গ্রামের পঞ্চম নি, নি-গ্রামের পঞ্চম ম, ম গ্রামের পঞ্চম সা।

ছোটো অক্ষরে লিখিত যে কোন গ্রাম হউক্, দেখিবে যে, তাহার অনুলোম-পার্শ্বে তাহার মধ্যম সুরের গ্রাম, এবং প্রতিলোম-পার্শ্বে তাহার পঞ্চম-সুরের গ্রাম ছোটো অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে;—যথা সা-গ্রামের অনুলোম-পার্শ্বে ম-গ্রাম এবং বিলোম পার্শ্বে প-গ্রাম লিখিত রহিয়াছে। স্বগ্রামের অনুলোম-পার্শ্বের গ্রাম (অর্থাৎ স্ব-গ্রামের মধ্যম সুরের গ্রাম) এক গ্রাম উঁচু এবং স্বগ্রামের বিলোম-পার্শ্বের গ্রাম (অর্থাৎ স্বগ্রামের পঞ্চম সুরের গ্রাম) এক গ্রাম নীচু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রত্যেক গ্রামের ১ম, ৩য় ৫ম, এই তিনটি সুর সংবাদী; ও প্রত্যেক গ্রামের এক গ্রাম নীচের (অর্থাৎ বিলোম-পার্শ্বস্থ গ্রামের) তিনটি সংবাদী সুর ও স্ব-গ্রামের মধ্যম, এই চারিটি সুর বিবাদী; আর একটি কথা বলিবার আছে এই,—প্রত্যেক গ্রামের এক গ্রাম উপরের (অর্থাৎ অনুলোম পার্শ্বস্থ গ্রামের) তিনটি সংবাদী সুর স্বগ্রামের অনুবাদী।

সা-গ্রাম এবং তাহার অনুলোম বিলোম দুই পার্শ্বস্থ দুই গ্রাম এই তিন গ্রামের তিন জাতীয় সুর নিয়ে লতা-বদ্ধ হইল; দেখিবে যে সংবাদী সুর গুলি—প্রথমে একবার এবং শেষে এক বার—দুইবার আবৃত্তি করা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে গীতের উপক্রমণিকা এবং উপসংহার উভয় স্থলেই সম্বাদী সুর একান্ত আবশ্যক, এবং যখনই সংবাদী সুরে আসিয়া বিশ্রাম করিবার অথবা একেবারে গীতে বিরাম দিবার প্রয়োজন হয় তখনই বিবাদী সুরের দ্বার দিয়া সংবাদী সুরে প্রবেশ করিতে হয়,—তা' ভিন্ন দ্বিতীয় পথ নাই।

	সম্বাদী	অনুবাদী	বিবাদী	সম্বাদী
সা-গ্রাম	সা গ প	ম ধা সা	প নি রে সা	সা গ প
ম-গ্রাম	ম ধা সা	নি রে ম	সা গ প নি	ম ধা সা
প-গ্রাম	প নি রে	সা গ প	রে ম ধা সা	প নি রে

উপরের লতায় দেখিবে যে, ম-গ্রামের সংবাদী=সা-গ্রামের অনুবাদী, ও প-গ্রামের সংবাদী=সা-গ্রামের বিবাদী.; বিবাদীর কোটায় নিম্ন-গ্রামের তিনটি সংবাদী সুর ছাড়া আর একটিকে ধরা হইয়াছে দেখিবে, সেটি স্ব-গ্রামের মধ্যম; স্ব গ্রামের মধ্যম যে কি সূত্রে বিবাদি শ্রেণী-ভুক্ত হইল তাহা পরে প্রকাশ পাইবে; কিন্তু এইটি বিশেষ করিয়া মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, যে পর্য্যন্ত না স্পষ্ট-রূপে স্বগ্রামের বিবাদী-সুরের সোপান দিয়া স্বগ্রামের সম্বাদী সুরে প্রবেশ করা যায় সে পর্য্যন্ত তাহা স্বগ্রামের সংবাদী সুর কি আর কোন গ্রামের আর কোন জাতীয় সুর তাহার ঠিকানা হইতে পারে না; তাহা কেবল নয়—বিবাদী সুরের মধ্যে এমন একটি সুর বাছিয়া সংবাদী-সুরের সোপান করা আবশ্যক, যাহা স্বগ্রামের গ্রাম-পরিচায়ক। যদি কড়ি মধ্যমের দ্বার দিয়া পা'তে প্রবেশ করা যায় তবে পা আর সা গ্রামের পঞ্চম থাকে না—তাহা পঞ্চম গ্রামের প্রথম সুরের পদারূঢ় হয়; কেননা এক ত সা-গ্রামে কড়ি মধ্যম নাই, তাহাতে আবার কড়ি মধ্যম পা-গ্রামের ৭ম—সুতরাং বিবাদী, এবং পা-গ্রামের সেই বিবাদী সুরের দ্বার দিয়া তাহার সংবাদী শ্রেণীস্থ পা'তে পদার্পন করা হইয়াছে—এজন্য আর তাহা সা-গ্রামের পঞ্চম নাই—তাহা পা-গ্রামের প্রথম-সুর। তেমনি যদি, সা রে গ ম প ধা এইরূপ ক্রমে ধা'তে আরোহণ কর তবে ধা সা-গ্রামের অনুবাদী সুর ভিন্ন আর কিছুই

বুঝাইবে না ; কিন্তু যদি তাহার পরে কোমল নিখাদে পদার্পন করিয়া ধা'তে প্রত্যাবর্ত্তন কর, তবে আর ধা'কে সা'গ্রামের ষষ্ঠ স্বর বলিতে পারিবে না—তখন তাহা ম-গ্রামের তৃতীয় স্বর,—কেননা নি সা-গ্রামের কেহই নহে কিন্তু তাহা মগ্রামের মধ্যম এবং মধ্যম বিবাদী শ্রেণীস্থ,—অতএব ম-গ্রামের সেই বিবাদী শ্রেণীস্থ নি হইতে তথাকার সংবাদী শ্রেণীস্থ তৃতীয় স্বর ধা'তে অবতরণ করিয়াছ, এজন্য ধা আর সা-গ্রামের অনুবাদী স্বর বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না—এখন তাহা ম-গ্রামের তৃতীয় স্বর। সেইজন্য স্থূল-রেখা-বেষ্টিত ম-এবং-প গ্রামের প্রথম কোটার সংবাদী স্বর গুলি সা-গ্রামের অনুবাদী এবং বিবাদী স্বরের পদবী ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই ; কিন্তু শেষ-বারকার সংবাদী স্বরের কোটায় উহারা স্ব স্ব গ্রামের বিবাদী স্বরের অব্যবহিত পরে বসিয়াছে বলিয়া—বিশেষত সা-গ্রামের গ্রাম-বহিভূ'ত সুতরাং সম্পর্কাতীত নি এবং ম' র পরে বসিয়াছে বলিয়া তাহারা স্ব স্ব গ্রামের (ম-গ্রাম এবং প গ্রামের) সংবাদী পদে বিধি-মতে আরূঢ় হইয়াছে।

আর একটি দেখা যাইতেছে এই যে, (লক্ষ্য দেখ) পা-গ্রামের সম্বাদী স্বর যেমন= সা-গ্রামের বিবাদী স্বর, তেমনি সা-গ্রামের সংবাদী স্বর=ম-গ্রামের বিবাদী স্বর ; কেননা পা'র মধ্যম যেমন সা—সা'র মধ্যম তেমনি ম ; এজন্য সা-গ্রামের সম্বাদী স্বরকে সোপান করিয়া মগ্রামের সংবাদী স্বরে পদার্পন করিলে ম-গ্রামের বিবাদী স্বর হইতে ম-গ্রামের সংবাদী স্বরে পদার্পন করা হয়—যাহা বিধান সঙ্গত তাহাই করা হয়, সুতরাং তাহা করিতে কিছু মাত্র বাধা নাই ; ম-গ্রামের সংবাদী স্বর সা-গ্রামের এইরূপ নিকট সম্পর্কীয় হওয়াতে তাহা সা-গ্রামের অনুবাদী বলিয়া উক্ত হয়। যে সূত্রে সংবাদী স্বর বিবাদী স্বরের সহিত সম্বদ্ধ রহিয়াছে সেই সূত্রেই অনুবাদী স্বর সম্বাদী স্বরের সহিত সম্বদ্ধ রহিয়াছে ; কেননা পা'র মধ্যম সা, সা'র মধ্যম ম ; সুতরাং পা-গ্রামের সংবাদী স্বর যেমন সা গ্রামের বিবাদী স্বর, সেইরূপ সা-গ্রামের সংবাদীস্বর=ম গ্রামের বিবাদী স্বর ; আর ম-গ্রামের সংবাদী স্বর যেমন সা-গ্রামের অনুবাদী স্বর, সেইরূপ সা গ্রামের সংবাদী স্বর পা-গ্রামের অনুবাদী স্বর। আর একটি রহস্য এই দেখিতে পাওয়া যায় যে সা-গ্রামের নিম্নস্থিত পঞ্চম-গ্রামের বিবাদী-স্বর—কিনা সা-গ্রামের বিবাদী-স্বরের বিবাদী স্বর-রে ম ধা সা এই চারিটি, এবং সাগ্রামের অনুবাদী-স্বর ম ধা সা এই তিনটী ; সা-গ্রামের বিবাদীর বিবাদীকে সংক্ষেপে বি-বি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে এবং অনুবাদীকে সংক্ষেপে অ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে এইরূপ দাঁড়ায় যথা,—

বি-বি ॥ রে ম ধা সা।

অ ॥ ম ধা সা ॥

বিবাদী স্বরের বিবাদী স্বরের সঙ্গে অনুবাদী স্বরের এইরূপ অনেকটা মিল আছে বলিয়া অনুবাদী স্বরকে এক প্রকার বিবাদী স্বরের বিবাদী স্বর বলিয়া ধরা যাইতে পারে ; এ-

জন্য অনুবাদী সুরকে সোপান করিয়া বিবাদী সুরে পদার্পন করিতে কোন বাধা নাই; সুতরাং সংবাদী হইতে অনুবাদী, অনুবাদী হইতে বিবাদী, বিবাদী হইতে পুনর্ব্বার সংবাদীতে আসিয়া বিশ্রাম করিলে নিয়মের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় না। তাহার মধ্যে এইটি জানা উচিত যে অনুবাদী সুর চাই দেও চাই না দেও—যাহা ভাল বুঝ তাহাই করিতে পার কিন্তু সংবাদী এবং বিবাদী সুরের উলট্ পালট্ করা চাই-ই-চাই—নহিলে গীত-ই হইবে না। স্বরচক্র দৃষ্টে যে কোন গ্রাম হউক্ তাহারই সম্বাদী বিবাদী এবং অনুবাদী সুরের অতি সহজে সন্ধান মিলিতে পারে—তাহার সঙ্কেত এইরূপ;———

যে কোন গ্রাম হউক তাহার সাত সুর যে অর্দ্ধ-চক্রের মধ্যে অবস্থিতি করে সেই অর্দ্ধচক্রের দুই প্রান্ত-স্থানীয় দুইটি সুর অঙ্গুলি দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট পাঁচটি গ্রামস্থ সুরের মধ্যে যে সুরটি দেখিবে গ্রামের নাম-বাচক অর্থাৎ প্রথম সুর, আর যেটী দেখিবে স্বর-চক্র-মধ্যে সেই প্রথম সুরের নিকট-তম স্থানীয় এবং যেটী দেখিবে সেই প্রথম সুরের দূরতম স্থানীয়,—সেই তিনটী সুর, জানিবে, সেই গ্রামের সম্বাদী সুর। উদাহরণ,—সা-গ্রামের সাতটী সুর ম-সা-প-রে-ধা-গ-নি-এই—অর্দ্ধচক্রের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, আর ম এবং নি এই দুটী সুর ঐ অর্দ্ধ চক্রের প্রান্ত স্থানীয়,—ঐ দুটী সুর অঙ্গুলি দিয়া ঢাকিয়া রাখ; অবশিষ্ট পাঁচটী গ্রামস্থ সুরের মধ্যে সা হচ্ছে গ্রামের নাম-বাচক প্রথম সুর, উহাদের মধ্যে পা স্বরচক্রাভ্যন্তরে সা'র নিকট-তম স্থানীয় এবং গ সা'র দূরতম স্থানীয়—অতএব উপরি-উক্ত সংকেতানুসারে সা প গ এই তিনটী সুর সা'র সম্বাদী সুর।

গ্রামস্থ সাত সুরের যে তিনটী সুর দেখিবে স্বরচক্র মধ্যে প্রথম সুরের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী এবং সেটী দেখিবে প্রথম সুর হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী. সেই চারিটী সুর, জানিবে গ্রামের বিবাদী সুর; উদাহরণ,—সাগ্রামের ভিতর ম প রে এই তিনটী সুর স্বরচক্র-মধ্যে সা'র সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী এবং সা হইতে নি সর্ব্বাপেক্ষা দূর-বর্ত্তী; অতএব উপরি-উক্ত সংকেতানুসারে ম প রে নি এই চারিটি সুর সা-গ্রামের বিবাদী সুর।

গ্রামের সাত সুরের যে দুটি সুর স্বর-চক্র-মধ্যে প্রথম সুর হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরতম-স্থানীয় সে দুটি অঙ্গুলিদ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট পাঁচটী গ্রামস্থ সুরের মধ্যে যে দুটী দেখিবে দুই প্রান্তে অবস্থিতি করিতেছে সেই দুটী সুর এবং প্রথম সুর এই তিনটী সুর গ্রামের অনুবাদী সুর।

সা-গ্রামস্থ সাত সুরের মধ্যে নি এবং গ এই দুটি সুর সা-হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরমতম-স্থানীয়,—ও দুটী সুর অঙ্গুলি দিয়া ঢাকিয়া রাখ, তাহা হইলে দেখিবে যে অবশিষ্ট পাঁচটী গ্রামস্থ সুরের এক প্রান্তে ম এবং অপর প্রান্তে ধা অবস্থিতি করিতেছে; ঐ দুটী সুর এবং প্রথম সুর সা এই তিনটী সুর সা-গ্রামের অনুবাদী সুর। সকল গ্রামেরই স্বর-জাতি-নির্ব্বাচনের প্রণালী ঐ রূপ জানিবে।

সম্বাদী-সুর গীতের গৃহ, বিবাদী সুর সেই গৃহের দ্বার বা সোপান এবং অনুবাদী সুর গৃহের বাহিরে কিয়ৎ কালের জন্য আড্ডা করিবার স্থান। সম্বাদী বিবাদী এবং অনুবাদী সুরের ওলট্ পালট্ যে কি প্রকারে হইয়া থাকে তাহার দৃষ্টান্ত-চ্ছলে নিম্নে একটী বেহাগ রাগের গীত বিন্যস্ত হইল। যেখানে দেখিবে এক বা অনেক ক্ষুদ্র কসি-চিহ্ন সেখানে পূর্ব্ব সুরের অনুবৃত্তি বুঝিতে হইবে। প্রত্যেক অক্ষর এবং প্রত্যেক কসিকা (অর্থাৎ ক্ষুদ্র কসি) এক মাত্রা কাল-স্থায়ী জানিবে। কোন সুরের পরে যদি একটী কসিকা থাকে তবে সেই সুরের অক্ষরের একমাত্রা এবং কসিকার একমাত্রা সব-শুদ্ধ ধরিয়া সেই সুর দুই মাত্রা কাল স্থায়ী—জানিবে; কোন সুরের পর দুইটী কসিকা থাকিলে তাহা তিন মাত্রা কাল স্থায়ী, তিনটী কসিকা থাকিলে তাহা চারি মাত্রা কাল স্থায়ী, সাতটী কসিকা থাকিলে আট-মাত্রা কাল স্থায়ী ইত্যাদি। কোন সুরের পরে যদি আদবেই কসিকা না থাকে তবে শুদ্ধ কেবল তাহার অক্ষরের মাত্রা লইয়া তাহা এক-মাত্রা কাল স্থায়ী—এই রূপ বুঝিতে হইবে। অর্দ্ধ মাত্রা, সিকি মাত্রা, প্রভৃতির সংকেত আপাততঃ অনাবশ্যক। উপর-সপ্তকের সুরের—উপরে, এবং নীচু-সপ্তকের সুরের—নীচে, বিন্দু চিহ্ন দেওয়ার নিয়ম করা হইল। গীতের বচন-বিন্যাস এবং স্বর-বিন্যাস দুই পংক্তিস্থ হইলেও তাহারা এক পংক্তিস্থ বলিয়া গণ্য হইবে। প্রত্যেক পংক্তিকে চারিটি দাঁড়ি দ্বারা চারি ভাগে বিভক্ত করা গেল,—ঐ চারি ভাগের প্রত্যেক ভাগ স্ব-স্ব পংক্তির এক-একটি ঘর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে। প্রথম পংক্তিটী ধুয়া এজন্য ৪র্থ পংক্তির, ৮ম পংক্তির, ১২ শ পংক্তির, ১৬ শ পংক্তির পরে তাহা এক এক বার পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে।

গীত।

(সা-গ্রাম)

গ - স - । গ - ম ম । গ - - - । - - - - ।
ম - ঙ্গ - । ল - - নি । দা - - - । - - - ন ।

প - প - । প - প - । প - ধ - । ধা - প - ।
বি - শ্বে - । র - ক্ষ - । পা - - - । - - - ণ ।

ম - দ্‌প - । গ প - ম । গ - - - । - - - - ।
মু - ক্তি - । র - - সো । পা - - - । - - - ন ।

ম - প - । ম - গ - । গ - - । গ - সা - ।
অ - - - । খ - কে - । বা - - - । - - - - ॥

প - নি - । স̇ স̇ স̇ - । স̇ - - - । - - - - ।
সং - সা - । - র দু - । র্দি - - - । - - - ন ।

স̇ - স̇ - । স̇ - নি - । প - নি - । - - - - ।
শা - ন্তি - । সু - র্য্য - । হী - - - । - - - ন ।

স̇ - স̇ - । স̇ - - - । নি - প - । - - ধ - ।
কা - টি - । দে - - য় । দি - - - । - - - ন ।

নি - - - । প - প - । ম - গ - । গ - সা - ।
অ - - - । না - কে - । বা - - - । - - - - ।

স - স - । ম প - প । প - - - । - - ম - ।

হু - খ - । ক্লে - - শ । ভা - - - । - - - র ।

ধ - - ধ । ধ ধ প - । প - ম - । গ - - - ।

প - - র্ব্ব । ত আ কা - । - - - - । - - - র ।

গ - গ - । ম প ম - । গ - - - । - - - - ।

ক - রে - । প - - রি । হা - - - । - - - র ।

ম প - - । ম - গ - । গ - - - । সা - - - ॥

অ - - - । স্তু - কে - । বা - - - । - - - - ॥

প - প - । সঁ - - সঁ । সঁ - - - । - - - - ।

কা - রে - । ডা - - কি । আ - - - । - - - র ।

সঁ - সঁ - । সঁ - নি - । প - নি - । - - - - ।

যা - ই - । কা - র - । দ্বা - - - । - - - র ।

সঁ - সঁ - । সঁ - - সঁ । নি - প - । - - ধ - ।

স - হা - । য় - - আ । মা - - - । - - - র ।

নি - - - । প - প - । ম - গ - । গ - সা - ॥

অ - - - । স্তু - কে - । বা - - - । - - - - ॥

উপরিস্থিত গীতের প্রত্যেক পংক্তির প্রত্যেক ঘরে স্বরের বা স্বর-সমষ্টির চারি মাত্রা করিয়া স্থিতি-কাল, এ জন্য প্রত্যেক ঘরে অক্ষরের সংখ্যা, কসিকার সংখ্যা, কিংবা অক্ষর এবং কসিকা উভয়ের সংখ্যার সমষ্টি চারি মাত্রার ন্যূনাধিক হইতে পারে না। প্রত্যেক ঘরের প্রথম দুই মাত্রা স্থানই মুখ্য স্থান ; সেই স্থানের সুর যে জাতীয়, সেই ঘর সেই জাতীয় সুরের ঘর বলিয়াই ধর্ত্তব্য ; অবশিষ্ট দুই মাত্রা স্থানে সে জাতীয় সুর বসুক্ বা না বসুক্ তাহাতে কিছু আইসে যায় না। প্রত্যেক ঘরের প্রথম দুই মাত্রা স্থান পূর্ব্বার্দ্ধ স্থান, এবং অবশিষ্ট দুই মাত্রা স্থান শেষার্দ্ধ স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে। কোন ঘরের শেষার্দ্ধ স্থানে যদি পূর্ব্বার্দ্ধ স্থানীয় সুরের স্বজাতীয় সুর না বসানো যায় তবে এমন কোন সুর তথায় বসানো কর্ত্তব্য যে সুর হইতে উত্তর-বর্ত্তী ঘরের প্রথম সুরে সহজে যাওয়া যাইতে পারে।

উপরিস্থিত গীতের প্রথম পংক্তির প্রথম ঘরে সংবাদী শ্রেণীস্থ সা। ঐ পংক্তির দ্বিতীয় ঘরের পূর্ব্বার্দ্ধ স্থানে গ, শেষার্দ্ধ স্থানে ম ; গ সংবাদী সুর ও তাহা পূর্ব্বার্দ্ধে বসিয়াছে, এজন্য দ্বিতীয় ঘর-ও সংবাদী সুরের ঘর ; ম বিবাদী-সুর এজন্য ম'র দ্বার দিয়া প্রথম পংক্তির তৃতীয় এবং চতুর্থ ঘরের সংবাদী শ্রেণীস্থ গ'তে উত্তীর্ণ হইয়া ক্ষণকাল থাকা বিধান-সঙ্গত হইয়াছে। দ্বিতীয় পংক্তির ১ম, ২য়, ৩য়, ঘরের প্রত্যেকের পূর্ব্বার্দ্ধ স্থানে পা ; পা সংবাদী এবং বিবাদী উভয় জাতীয়, এজন্য ঐ তিন ঘরকেই সংবাদী সুরের ঘর বলিয়া ধরা যাইতে পারে অথবা বৈচিত্র্য হেতু ৩য় ঘরের সুরকে বিবাদী শ্রেণীর মধ্যে ধরিলেও হইতে পারে। ২য় পংক্তির ৪র্থ ঘরের স্থানে অনুবাদী-শ্রেণীস্থ ধা, এজন্য ও-ঘর অনুবাদী জাতির ঘর। ম অনুবাদী এবং বিবাদী উভয়-জাতীয় এজন্য ৩য় পংক্তির ১ম ঘর অনুবাদী, ২য় ঘর বিবাদী, ৩য় এবং ৪র্থ ঘর সংবাদী। ৪র্থ পংক্তির ১ম ২য় ঘর

বিবাদী; ৩য় এবং ৪র্থ ঘর সংবাদী। ৫ম পক্তির ২ম ঘর বিবাদী; ১ম, ৩য়, ৪র্থ ঘর সংবাদী। ৬ষ্ঠ পংক্তির ১ম, ২য় ঘর সংবাদী; ৩য়, ৪র্থ ঘর বিবাদী। ৭ম পংক্তির ১ম, ২য় ঘর সংবাদী; ৩য়, ৪র্থ ঘর বিবাদী; ৭ম পংক্তির ৪র্থ ঘরের শেষার্দ্ধে অনুবাদী শ্রেণীস্থ ধা রহিয়াছে, যদি উহা তাহার প্রথমার্দ্ধে থাকিত তবে ও-ঘর অনুবাদী হইত; কিন্তু শেষার্দ্ধের ঐ ধা হইতে সহজে উত্তরবর্ত্তী ঘরের বিবাদী শ্রেণীস্থ নি'তে পৌছানো যায়,—তাহাতে আবার অনুবাদী সুরকে সোপান করিয়া বিবাদী সুরে যাওয়া নিয়ম সঙ্গত,এজন্য ধা'টি ঠিক্ জায়গায় বসিয়াছে। ৮ম পংক্তির ১ম, ২য়, ৩য় ঘর বিবাদী জাতীয়; ৪র্থ ঘর সংবাদী জাতীয়। ৯ম পংক্তির ১ম ঘর সংবাদী; ২য় ঘর বিবাদী; ৩য়, ৪র্থ ঘর সংবাদী। ১০ম পংক্তির ১ম, ২য় ঘর অনুবাদী; ৩য় ঘর বিবাদী; ৪র্থ ঘর সংবাদী। ১১শ পংক্তির ১ম ঘর সংবাদী; ২য় ঘর বিবাদী; ৩য়, ৪র্থ ঘর সংবাদী। ১২শ পংক্তির ১ম, ২য় ঘর বিবাদী; ৩য়, ৪র্থ ঘর সংবাদী। ৫ম পংক্তির ১ম ঘর হইতে ৮ম পংক্তির ৪র্থ ঘর পর্য্যন্ত যেরূপ, ১৩শ পংক্তির ১ম ঘর হইতে শেষ পর্য্যন্ত অবিকল সেইরূপ।

ক্রমশঃ।

ভগ্ন-হৃদয়।

(গীতি কাব্য)

ভুমিকা।

নিম্ন-লিখিত কাব্যটিকে কাহারো যেন নাটক বলিয়া ভ্রম না হয়। দৃশ্যকাব্য ফুলের গাছের মত; তাহাতে ফুল ফুটে, কিন্তু সে ফুলের সঙ্গে শিকড়, কাণ্ড, শাখা, পত্র, কাঁটাটি পর্য্যন্ত থাকা আবশ্যক। নিম্ন-লিখিত কাব্যটি ফুলের তোড়া। গাছের আর সমস্ত বাদ দিয়া কেবল মাত্র ফুল গুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে। নাটকাকারে কাব্য লিখিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, দৃষ্টান্ত স্বরূপেই ফুলের কথা উল্লেখ করা হইল।

কাব্যের পাত্র।

কবি।

অনিল।

মুরলা—অনিলের ভগ্নী ও কবির বাল্যসহচরী

ললিতা—অনিলের প্রণয়িনী।

নলিনী—এক চপল স্বভাবা কুমারী।

সুরেশ বিনোদ প্রমোদ অশোক প্রভৃতি	নলিনীর বিবাহ ও প্রণয়াকাঙ্ক্ষী।

চপলা—মুরলার সখি।

লীলা সুরুচি মাধবী প্রভৃতি	নলিনীর সখীগণ।

উপহার।

রাগিণী—ছায়ানট।

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হবনাক' পথহারা।
যেথা আমি যাইনাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো
আকুল এ আঁখি পরে ঢাল'গো আলোক ধারা।
ও মুখানি সদা মনে, জাগিতেছে সঙ্গোপনে
আঁধার হৃদয় মাঝে দেবীর প্রতিমা পারা।
কখনো বিপথে যদি, ভ্রমিতে চায় এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা।
চরণে দিনুগো আনি—এ ভগ্ন-হৃদয় খানি
চরণ রঞ্জিবে তব এ হৃদি-শোণিত ধারা।

ভগ্ন-হৃদয়।

প্রথম সর্গ।

দৃশ্য—বন। চপলা ও মুরলা।

চপলা—

সখি, তুই হলি কি আপনা-হারা ?
এ ভীষণ বনে পশি, একেলা আছিস বসি
খুঁজে খুঁজে হোয়েছি যে সারা!
এমন আঁধার ঠাঁই—জনপ্রাণী কেহ নাই
জটিল মস্তক বট চারিদিকে ঝুঁকি।
দুয়েকটি রবি-কর সাহসে করিয়া ভর
অতি সন্তর্পণে যেন মারিতেছে উঁকি।
অন্ধকার চারিদিক হ'তে মুখ পানে
এমন তাকায়ে রয় বুকে বড় লাগে ভয়,
কি সাহসে রোয়েছিস্ বসিয়া এখানে ?

মুরলা—

সখি, বড় ভালবাসি এই ঠাঁই!
বায়ু বহে হুহু করি, পাতা কাঁপে ঝর ঝরি
স্রোতস্বিনী কুল কুল করিছে সদাই!
বিছায়ে শুকানো পাতা, বট মূলে রাখি মাথা,
দিনরাত্রি পারি সখি শুনিতে ও ধ্বনি।
বুকের ভিতরে গিয়া কি যে উঠে উথলিয়া
বুঝায়ে বলিতে তাহা পারিনা স্বজনী!
যা সখি, একটু মোরে রেখে দে একেলা,
এ বন আঁধার ঘোর, ভাল লাগিবেনা তোর,
তুই কুঞ্জ বনে সখি কর গিয়ে খেলা!

চপলা—

মনে আছে, অনিলের ফুল-শয্যা আজ ?
তুই হেথা বোসে র'বি, কত আছে কাজ ;
কত ভোরে উঠে, বনে গেছি ছুটে,
মাধবীরে লোয়ে ডাকি,
ডালে ডালে যত ফুল ছিল ফুটে
একটি রাখিনি বাকি !
শিশিরে ভিজিয়ে গিয়েছে আঁচল
কুসুম-রেণুতে মাখা,
কাঁটা বিঁধে সখি হোয়েছিনু সারা
নোয়াতে গোলাপ-শাখা !
তুলেছি করবী, গোলাপ গরবী
তুলেছি টগর গুলি,
যুঁই কুঁড়ি যত বিকেলে ফুটিবে
তখন আনিব তুলি।
আয়, সখি, আয়, ঘরে ফিরে আয়,
অনিলে দেখ্‌সে আজ ;
হরষের হাসি অধরে ধরেনা
কিছু যদি আছে লাজ !

মুরলা—

আহা সখি, বড় তারা ভালবাসে দুইজনে !

চপলা—

হাঁ সখি, এমন আর দেখিনিত বর-কোনে !
জানিস্‌ত সখি, ললিতার মত,
অমন লাজুক মেয়ে ;
অনিলের সাথে দেখা করিবারে
প্রতি দিন যায় বিপাশার ধারে
সরমের মাথা খেয়ে।
কবরীতে বাঁধি কুসুমের মালা,
নয়নে কাজল রেখা ;
চুপি চুপি যায়, ফিরে ফিরে চায়
বন পথ দিয়ে একা !
দূর হোতে দেখি অনিলে, অমনি
সরমে চরণ সরে না যেন !
ফিরিবে ফিরিবে মনে মনে করি
চরণ ফিরিতে পারেনা যেন !
অনিল অমনি দূর হোতে আসি
ধরি তার হাত খানি,
কহে যে কত কি হৃদয় গলানো
সোহাগে মাখানো বাণী।
আমি ছিনু সখি লুকায়ে তখন
গাছের আড়ালে আসি,
লুকিয়ে লুকিয়ে দেখিতেছিলেম
রাখিতে পারিনে হাসি !
ললিতার হাত কাঁপে থর থর
আঁখি দুটি নত মাটির উপর
ভূমি হোতে এক কুসুম তুলিয়া
ছিঁড়িতেছে শত ভাগে।
লাজ-নত মুখ ধরিয়া তাহার,
অনিল রাখিল বুকের মাঝার
অনিমিষ আঁখি মেলিয়া যুবক
চাহি থাকে মুখ বাগে !
আদরে ভাসিয়া ললিতার চোখে
বাহিরে সলিল-ধার,
সোহাগে সরমে প্রণয়ে গলিয়া
আঁখি দুটি তার পড়িল ঢলিয়া
হাসি ও নয়ন-সলিলে মিলিয়া
কি শোভা ধরিল মুখানি তার !
আমি সখি আর নারিনু থাকিতে
সুমুখে পড়িনু আসি।

করতালি দিয়ে উপহাস কত
　　করিলাম হাসি হাসি !
ললিতা অমনি চমকি উঠিল
মুখেতে একটি কথা না ফুটিল
আকুল ব্যাকুল হইয়া সরমে
　　লুকাতে ঠাঁই না পায়,
ছুটিয়ে পলায়ে এলেম অমনি
হেসে হেসে আর বাঁচিনে সজনি,
সে দিন হইতে আমারে হেরিলে
　　ললিতা সরমে মরিয়া যায় !

মুরলা—
আহা, কেন, বাধা দিতে গেলি তাহাদের কাছে?

চপলা—
বাধা না পাইলে সখি সুখেতে কি সুখ আছে?

মুরলা—
সূর্য্যমুখী ফুল সখি আমি ভালবাসি বড়,
ছু চারিটি তুলে এনে আজিকে করিস্ জড়!
মনে বড় সাধ তার দেখে রবি-মুখ পানে,
রবি যেথা, মাথা তার লোয়ে যায় সেইখানে :
তবু মনোআশা হায়, মনেই মিশায়ে যায়
মুখানি তুলিতে নারে সরমেতে জড়সড় !
সাজাবি সে ফুল সাজে দেহ-খান ললিতার,
লজ্জাবতী পাতা দিয়ে ঢাকিবি শয়ন তার ;
কমল আনিয়া তুলি, রাঙা-পানা পাপ্‌ড়ি গুলি
গাঁথি গাঁথি নিরমিয়া দিবি ঘোমটার ধার !
পাতা-ঢাকা আধ-ফুটো, লাজুক গোলাপ ছুটো
আনিস্ ছুলায়ে দিবি সুচারু অলকে তার !
সহসা রজনী-গন্ধা প্রভাতের আলো দেখে
ভাবিয়া না পায় ঠাঁই কোথা মুখ রাখে ঢেকে
আকুল সে ফুল গুলি, যতনে আনিস্ তুলি
তা'ই দিয়ে গেঁথে গেঁথে বিরচিবি কণ্ঠহার।

চপলা—
তুই সখি আয়, একেলা আমার
　　ভাল নাহি লাগে—একিলো জ্বালা,
ছুটি সখি মিলি হাসিতে হাসিতে
গুণ্ গুণ্ গান গাহিতে গাহিতে
　　মনের মতন গাঁথিব মালা !
বল্ দেখি সখি হ'ল কি তোর ?
হাসিয়া খেলিয়া কুসুম তুলিয়া
করিবি কোথায় ভাবনা ভুলিয়া
　　কুমারী জীবন ভোর—
তা না, একি জ্বালা? মরমে মিশিয়া
আপনার মনে আপনি বসিয়া
সাধ কোরে এত ভাল লাগে সখি
　　বিজনে ভাবনা-ঘোর !
তা' হবেনা সখি, না যদি আসিস্
　　এই কহিলাম তোরে—
যত ফুল আমি আনিয়াছি তুলি
আঁচল ভরিয়া ল'ব সব গুলি
বিপাশার স্রোতে দিবলো ভাসায়ে
　　একটি একটি কোরে !

মুরলা—
মাথা খা, চপলা, মোরে জ্বালাস্‌নে আর !

চপলা—
ভাল সই ; জ্বালাবনা চলিনু এবার
　(গমনোদ্যম ; পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া)
না না সখি এই আঁধার কাননে
　　একেলা রাখিয়া তোরে
কোথায় যাইব বল্ দিখি তুই
　　যাইব কেমন কোরে ?
তোরে ছেড়ে আমি পারি কি থাকিতে ?
　　ভালবাসি তোরে কত,

আমি যদি সখি হোতেম তোমার
পুরুষ মনের মত,
সারাদিন তোরে রাখিতাম ধোরে
বেঁধে রাখিতাম হিয়ে,
একটুকু হাসি কিনিতাম তোর
শতেক চুম্বন দিয়ে!
অমিয়া-মাখানো মুখানি তোমার
দেখে দেখে সাধ মিটিত না আর,
ওমুখানি লোয়ে কিযে করিতাম
বুকের কোথায় ঢেকে রাখিতাম,
ভাবিয়া পেতাম তা'কি?
সখি কার তুমি ভালবাসা তরে
ভাবিছ অমন দিনরাত ধোরে
পায়ে পড়ি তব খুলে বল তাহা
কি হবে রাখিয়া ঢাকি?

মুরলা—

ক্ষমা কর মোরে সখি শুধায়োনা আর।
মরমে লুকানো থাক্ মরমের ভার!
যে গোপন কথা সখি, সতত লুকায়ে রাখি
ইষ্ট-দেবতার মন্ত্র সে যেন আমার,
তাহা মানুষের কানে,ঢালিতে যে লাগে প্রাণে
লুকানো থাক্ তা সখি হৃদয়ে আমার!
ভালবাসি, শুধায়োনা কারে ভালবাসি!
সে নাম কেমনে সখি কহিব প্রকাশি!
আমি তুচ্ছ হোতে তুচ্ছ,সে নাম যে অতি উচ্চ
সে নাম যে নহে যোগ্য এই রসনার!
ক্ষুদ্র ওই কুসুমটি পৃথিবী কাননে,
আকাশের তারকারে পূজে মনে মনে—
দিন দিন পূজা করি, শুকায়ে পড়ে সে ঝরি
আজন্ম নীরব প্রেমে যায় প্রাণ তার—
তেমনি পূজিয়া তারে, এ প্রাণ যাইবে হা-রে
তবুও লুকানো রবে একথা আমার!

(নেপথ্যে চাহিয়া)—

জীবন্ত স্বপ্নের মত ওই দেখ্ কবি
একা একা ভ্রমিছেন আঁধার অটবী।
ওই যেন মূর্ত্তিমান ভাবনার মত
নত করি দুনয়ন, শুনিছেন একমন
শুকতারার মুখ হোতে কথা কত শত!

(কবির প্রবেশ)

কবি—

বন-দেবীটির মত এইযে মুরলা,
প্রভাতে কাননে বসি ভাবনা বিহ্বলা!
প্রকৃতি আপনি আসি লুকায়ে লুকায়ে,
আপনার ভাষা তোরে দেছে কি শিখায়ে?
দিনরাত কলস্বরে,তটিনী কি গান করে—
তাহা কি বুঝিতে তুই পেরেছিস্ বালা?
তাই তো প্রতিদিন আসিস্ একালা!
মুরলা—আজিকে তোরে,
বনবালা মত কোরে
চপলা সাজায়ে দিক্ দেখি একবার।
এলোথেলো কেশপাশে লতা দে বাঁধিয়া
অলক সাজায়ে দেলো তৃণফুল দিয়া—
ফুলসাথে পাতা গুলি, একটী একটী তুলি
অযতনে দেলো তাহা আঁচলে বাঁধিয়া!
হরিণ শাবক যত ভুলিবে তরাস
পদতলে বসি তোর চিবাইবে ঘাস।
ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি, মুখে তার দিবি তুলি
সবিস্ময়ে সুকুমার গ্রীবাটী বাঁকায়ে
অবাক্ নয়নে তারা রহিবে তাকায়ে!
আমি হোয়ে ভাবে ভোর, দেখিব মুখানি তোর
কল্পনার ঘুম ঘোর পশিবে পরাণে!

ভাবিব, সত্যই হবে, বনদেবী আসি তবে
অধিষ্ঠান হইলেন কবির নয়ানে!

চপলা—

বল দেখি মোরে কবিগো হ'ল কি
তোমাদের দুজনার?
সখিরে আমার কি গুণ করেছ
বল দেখি একবার!
সখির আমার খেলা ধূলা নেই
সারাদিন বসি থাকে বিজনেই
জানিনা ত কবি এত দিন আছি
কিসের ভাবনা তার!
ছেলেবেলা হোতে তোমরা দুজনে
বাড়িয়াছ এক সাথে,
আপনার মনে ভ্রমিতে দুজনে
ধরি ধরি হাতে হাতে!
তখন না জানি কি মন্ত্র, কবি গো,
দিলে মুরলার কানে!
কি মায়া না জানি দিয়েছিলে পড়ি
সখীর তরুণ প্রাণে!
বেলা হোয়ে এল সজনি এখন,
করিয়াছে পান প্রভাত-কিরণ
ফুল-বধূটীর অধর হইতে
প্রতি শিশিরের কণা,
তুই থাক্ হেথা আমি যাই ফিরে
অমনি ডাকিয়া লব মালতীরে,
একেলা ত বালা, অত ফুল মালা
গাঁথিবারে পারিবনা!

প্রস্থান।

কবি—

মুরলা, তোমার কেন, ভাবনার ভাব হেন?
কতবার শুধায়েছি বলনি আমারে!
লুকায়োনা কোন কথা,যদি কোন থাকে ব্যথা
রুধিয়া রেখোনা তাহা হৃদয় মাঝারে!
হয়ত হৃদয়ে তব কিসের যাতনা
আপনি মুরলা তাহা জানিতে পারনা!
হয়ত গো যৌবনের বসন্ত সমীরে
মানস কুসুম তব ফুটেছে সুধীরে,
প্রণয় বারির তরে তৃষায় আকুল
ম্রিয়মান হোয়ে বুঝি পোড়েছে সে ফুল?
পেয়েছ কি যুবা কোন মনের মতন?
ভালবাসো, ভালবাসা করহ গ্রহণ—
তাহ'লে হৃদয় তব, পাইবে জীবন নব
উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসময় হেরিবে ভুবন!

মুরলা— (স্বগত)

বুঝিলেনা—বুঝিলেনা, কবিগো এখনো
বুঝিলেনা এ প্রাণের কথা!
দেবতা গো বল দাও, এ হৃদয়ে বল দাও!
পারি যেন লুকাতে এ ব্যথা!
জানি কবি ভাল তুমি বাসনাক মোরে
তা' হোলে এ মন তুমি চিনিবে কি কোরে?
এক টুকু ভাল যদি বাসিতে আমারে
তা' হ'লে কি কোন কথা,এ মনের কোন ব্যথা
তোমার কাছেতে কবি লুকায়ে থাকিতে পারে?
তাহা হ'লে প্রতি ভাবে, প্রতি ব্যবহারে.
মুখ দেখে আঁখি দেখে, প্রত্যেক নিশ্বাস থেকে
বুঝিতে যা' গুপ্ত আছে বুকের মাঝারে!
প্রেমের নয়ন থেকে,প্রেম কি লুকানো থাকে?
তবে থাক্ থাক্ সব, বুকে থাক্ গাঁথা—
বুক যদি ফেটে যায়—ভেঙ্গে যায় চুরে যায়
তবু রবে লুকানো এ কথা!
দেবতা গো বল দাও—এ হৃদয়ে বল দাও
পারি যেন লুকাতে এ ব্যথা!

কবি—

বহুদিন হ'তে সখি, আমার হৃদয়
হোয়েছে কেমন যেন অশান্তি-আলয় ?
চরাচর-ব্যাপী এই ব্যোম-পারাবার—
সহসা হারায় যদি আলোক তাহার—
আলোকের পিপাসায় আকুল হইয়া
কি দারুণ বিশৃঙ্খল হয় তা'র হিয়া!
তেমনি বিপ্লব ঘোর হৃদয় ভিতরে
হোতেছে দিবস নিশা, জানিনা কি তরে!
নবজাত উষ্কা-নেত্র মহাপক্ষ গরুড় যেমন
বসিতে না পায় ঠাঁই চরাচর করিয়া ভ্রমণ,
উচ্চতম মহীরুহ পদভরে ভূমিতলে লুটে
ভূধরের শিলাময় ভিত্তিমূল বিদারিয়া উঠে—
অবশেষে শূন্যে শূন্যে দিবারাত্রি ভ্রমিয়া বেড়ায়
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারা ঢাকি ঘোর পাখার ছায়ায়
তেমনি এক্লান্ত-হৃদি বিশ্রামের নাহি পায় ঠাঁই
সমস্ত ধরায় তা'র বসিবার স্থান যেন নাই,
তাই এই মহারণ্যে অমারাত্রে আসিগো একাকী
মহান্-ভাবের ভারে, দুরন্ত এ ভাবনারে
কিছুক্ষণ তরে তবু দমন করিয়া তারে রাখি—
চন্দ্র শূন্য আঁধারের নিস্তরঙ্গ সমুদ্র-মাঝারে
সমস্ত জগৎ যবে মগ্ন হোয়ে গেছে একেবারে,
অসহায় ধরা এক মহামন্ত্রে হোয়ে অচেতন
নিশীথের পদতলে করিয়াছে আত্ম সমর্পণ
তখন অধীর হৃদি অভিভূত হোয়ে যেন পড়ে
অতি ধীরে বহেশ্বাস,নয়নেতে পলক না নড়ে

* * * *

প্রাণের সমুদ্র এক আছে যেন এ দেহ মাঝারে
মহা-উচ্ছ্বাসের সিন্ধু রুদ্ধ এই ক্ষুদ্র কারাগারে
মনের এ রুদ্ধ স্রোত দেহ খানা করি বিদারিত
সমস্ত জগৎ যেন চাহে সখি করিতে প্লাবিত!
অনন্ত আকাশ যদি হ'ত এ মনের ক্রীড়া-স্থল
অগণ্য তারাকারাশি হ'ত তার খেলেনা কেবল
চৌদিকে দিগন্ত আসি রুধিত না অনন্ত আকাশ.
প্রকৃতি জননী নিজে পড়াত কালের ইতিহাস.
দুরন্ত এ মন-শিশু প্রকৃতির স্তন্য-পান করি
আনন্দ-সঙ্গীত স্রোতে ফেলিতগো শূন্যতল ভরি
উষার কনক-স্রোতে প্রতিদিন করিত সে স্নান
জোছনা-মদিরা ধারা পূর্ণিমায় করিত সে পান,
ঘূর্ণামান ঝটিকার মেঘমাঝে বসিয়া একেলা
কৌতুকে দেখিত যত বিদ্যুত-বালিকাদের খেলা.
দুরন্ত ঝটিকা যোথা এলোচুলে বেড়াত নাচিয়া
তরঙ্গের শিরে শিরে অধীর-চরণ বিক্ষেপিয়া।
হরষে বসিত গিয়া ধূমকেতু পাখার উপরে
তপনের চারিদিকে ভ্রমিত সে বর্ষ বর্ষ ধোরে।
চরাচর মুক্ত তার অবারিত বাসনার কাছে.
প্রকৃতি দেখাত তারে যেথা তার যত ধন আছে
কুসুমের রেণুমাখা বসন্তের পাখায় চড়িয়া
পৃথিবীর ফুল্ল বনে ভ্রমিত সে উড়িয়া উড়িয়া,
সমীরণ, কুসুমের লঘু পরিমল ভার বহি
পথশ্রমে শ্রান্ত হোয়ে বিশ্রাম লভিছে রহি রহি.
সেই পরিমল সাথে অমনি সে যাইত মিলায়ে,
ভ্রমি কত বনে বনে, পরিমল রাশি সনে
অতি দূর দিগন্তের হৃদয়েতে যাইত মিশায়ে!
তটিনীর কলস্বর, পল্লবের মরমর—
শত শত বিহগের হৃদয়ের আনন্দ উচ্ছ্বাস,
সমস্ত বনের স্বর, মিশে হ'ত একস্বর,
এক প্রাণ হোয়ে তারা পরশিত উন্নত আকাশ.
তখন সে সঙ্গীতের তরঙ্গে করিয়া আরোহন,
মেঘের সোপান দিয়া, অতি উচ্চ শূন্যে গিয়া
উষার আরক্ত-ভালে পারিত গো করিতে চুম্বন
কল্পনা থাম গো থাম,কোথায় কোথায় যাও নিয়ে

ক্ষুদ্র এপৃথিবী দেখি,কোন্ খেনে রেখেছি ফেলিয়ে
মাটীর শৃঙ্খল দিয়ে বাঁধা যে গো রোয়েছে চরণ
যত উচ্চে আরোহিব, তত হবে দারুণ পতন !
কল্পনার প্রলোভনে নিরাশার বিষ ঢাকা
শূন্য অন্ধকার মেঘে সন্ধ্যার কিরণ মাখা ;
সেই বিষ প্রাণ ভোরে, সখিলো করিনু পান
মন হোয়ে গেল সখি, অবসন্ন ম্রিয়মান !

মুরলা—

কবিগো ও সব কথা ভেবোনাকো আর
শ্রান্ত মাথা রাখ'এই কোলেতে আমার—

কবি—

সখি আর কত দিন, সুখ হীন, শান্তি হীন
হাহা কোরে বেড়াইব, নিরাশ্রয় মন লোয়ে,
পারিনে পারিনে আর—পাষাণ মনের ভার
বহিয়া,পড়েছি সখি,অতি শ্রান্ত ক্লান্ত হোয়ে !
সম্মুখে জীবন মম, হেরি মরুভূমি সম,
নিরাশা বুকেতে বসি ফেলিতেছে বিষশ্বাস।
উঠিতে শকতি নাই, যেদিকে ফিরিয়া চাই
শূন্য—শূন্য—মহাশূন্য নয়নেতে পরকাশ !
কে আছে কে আছে সখি,এ শ্রান্ত মস্তক মম
বুকেতে রাখিবে ঢাকি যতনে জননী সম—
কে আছে অজস্র স্রোতে প্রণয় অমৃত ভরি,
অবসন্ন এ হৃদয় তুলিবে সজীব করি !
মন, যতদিন যায়, মুদিয়া আসিছে হায়
শুকায়ে শুকায়ে শেষে,মাটীতে পড়িবে ঝরি।

মুরলা— (স্বগত)

হা কবি, ও হৃদয়ের শূন্য পুরাইতে
অভাগিনী মুরলাগো কি না পারে দিতে !
কি সুখী হোতেম, যদি মোর ভালবাসা
পুরাতে পারিত তব হৃদয় পিপাসা !
শৈশবে ফুটেনি যবে আমার এ মন
তরুণ প্রভাত সম কবিগো তখন
প্রতি দিন ঢালি ঢালি দিয়েছ শিশির
প্রতি দিন যোগায়েছ শীতল সমীর—
তোমারি চোখের ঐ অরুণ কিরণে
এ হৃদি উঠেছে ফুটি তোমারি যতনে !
তোমারি চরণে কবি দেছি উপহার
যা কিছু সৌরভ এর তোমারি—তোমার!

প্রকাশ্যে——

তোল কবি,মাথা তোল, ভেবোনা এমন
দুজনে সরসী তীরে করিগে ভ্রমন !
ওই চেয়ে দেখ কবি, তটিনীর ধারে
মধ্যাহ্ন কিরণ লোয়ে,বন-দেবী স্তব্ধহোয়ে
দিয়েছে বিবাহ দিয়া আলোকে আঁধারে !
সাধের সে গান তব, শুনিবে এখন
তবে গাই, মাথাতোল, শোন দিয়ে মন !

গান।

কেগো বোলে দেবে এ কেমন ভাব
উঠেছে হৃদয়ে মোর ?
সুমুখে ঘুমায়ে রোয়েছে সাগর
মেঘে মেঘে ঢাকা অচলশিখর,
কেমন গোধূলী আঁধারের মত
পাখা বিছাইয়া ঢেকে আছে হিয়া
কি এক ভাবনা ঘোর ?
কিসের ভাবনা ভাবিয়া পাইনা
আপনি উঠিছে শ্বাস,
শীতের সন্ধ্যায় বিজন শ্মশানে
কোন্-খান হোতে কেহ নহি জানে

ভুতল ভেদিয়া ঘনায়ে ঘনায়ে
উঠে কুয়াশার রাশ ;
তেমনি মনের অন্তর ভেদিয়া
কি যে এক ভাব উঠিছে জাগিয়া,
লঘু বাষ্প জালে ঢাকিছে ক্রমশ
হৃদয়ের চারিপাশ,

কোথা সে কবির মন্ত্র সঞ্জীবনী
যাহার কুহক বলে
অতি সূক্ষ্মতম মনের স্বপন
পায়গো শরীর, লভেগো জীবন ?
বল বল মোরে এ কিসের ভাব
জাগিছে হৃদয় তলে ?

নিস্বার্থ প্রেম।

দেখ ভাই, সে দিন আমার বাস্তবিক কষ্ট হ'য়েছিল। অনেকদিন পরে তুমি বিদেশ থেকে এলে ; আমরা গিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লুম, 'আমাদের 'কি মনে পোড়ত ?" তুমি ঠোঁটে একটু হাসি, চোখে একটু ভ্রূকুটি, কোরে বোল্লে "মনে পোড়বেনা কেন ?" উত্তরটা শুনেইত আমার মাথায় একেবারে বজ্রাঘাত হ'ল; নিতান্ত দুঃসাহসে ভয় কোরে সঙ্কুচিত স্বরে আর একবার জিজ্ঞাসা কোল্লুম "অনেক দিন পরে এসে আমাদের কেমন লাগ্‌চে ?" তুমি আশ্চর্য্য ও বিরক্তি-ময় স্বরে অথচ ভদ্রতার মিষ্টহাসি টুকু হেসে বোল্লে "কেন, খারাপ লাগ্‌বার কি কারণ আছে ?" আর সাহস হ'ল না। ওরকমের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা আর হ'ল না। বিদেশে গিয়ে অবধি তুমি আমাকে দু তিন খানা বই চিঠি লেখনি, সেজন্য আমার মনে মনে একটুখানি অভিমান ছিল। বড় সাধ ছিল,সেই কথাটা নিয়ে হেসে হেসে অথচ আন্তরিক কষ্টের সঙ্গে, ঠাট্টা কোরে অথচ গম্ভীর ভাবে একটু খানি খোঁটা দেব', কিন্তু তোমার ভাব দেখে, তোমার ভদ্রতার অতি-মিষ্ট হাসি দেখে, তোমার কথার স্বর শুনে আমার অভিমানের মূল পর্য্যন্ত শুকিয়ে গেল। তখন আমি-ও প্রশ্নের ভাব পরিবর্ত্তন কোল্লুম ; জিজ্ঞাসা কোল্লুম, "যে দেশে গিয়েছিলে সে দেশের জল বাতাস নাকি বড় গরম ? সে দেশের লোকেরা নাকি মস্ত মস্ত পাগড়ি পরে, আর তামাক খাওয়াকে ভারি পাপ মনে করে? এখান থেকে সেকেণ্ডক্লাশে সেখেনে যেতে কত ভাড়া লাগে ?" এই রকম কোরে তোমার কাছ থেকে সে দিন অনেক জ্ঞান লাভ কোরে বাড়ি ফিরে এয়েছিলুম। তোমার আচরণ দেখে দুঃখ প্রকাশ কোরেছিলুম শুনে তুমি লিখেছ যে, "প্রথমতঃ আমার

যতদূর মনে পড়ে তাতে আমি যে তোমার ওপর কোন প্রকার কুব্যবহার কোরেছিলুম, তা'ত মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ যদি বা তোমার কতক গুলি প্রশ্নের ভাল রকম উত্তর না দিয়ে দু চার কথা বোলে উড়িয়ে দিয়ে থাকি, তা'তেই বা আমার দোষ কি? সে রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবারই বা তোমার কি আবশ্যক ছিল?" তোমার প্রথম কথার কোন উত্তর দেওয়া যায় না। সত্যইত, তুমি আমার সঙ্গে কোন কুব্যবহারই করনি। যত গুলি কথা জিজ্ঞাসা কোরেছিলুম, সকল গুলিরই তুমি একটা-না-একটা উত্তর দিয়েছিলে, তা'ছাড়া হেসেওছিলে, গল্পও কোরেছিলে। তোমার কোন রকম দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু তবু তুমি আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করনি; সে তোমাকে বা আর কাউকে আমি বোঝাতে পারব না সুতরাং তার আর বাহুল্য উল্লেখ করব না। দ্বিতীয় কথাটি হোচ্চে, কেন তোমাকে ও রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরেছিলুম। আচ্ছা ভাই তোমার ত হৃদয় আছে, একবার তুমিই বিবেচনা কোরে দেখনা—কেন জিজ্ঞাসা কোরেছিলুম। তোমার ভালবাসার উপর সন্দেহ হোয়েছিল বোলেই কি তোমাকে জিজ্ঞাসা কোরেছিলুম, যে, "আমাদের কি মনে পোড়ত" কিম্বা "আমাদের কি ভাল লাগ্‌চে", না তোমার ভালবাসার ওপর সন্দেহ তিলমাত্র ছিলনা বোলেই জিজ্ঞাসা কোরেছিলুম? যদি স্বপ্নেও জানুতুম যে, আমাকে তোমার মনে পোড়ত না, কিম্বা আমাকে তোমার ভাল লাগচে না, তা'হলে কি ওরকমের কোন প্রশ্ন উত্থাপন কোত্তুম। তোমার মুখে শোন্‌বার ভারি ইচ্ছা ছিল যে, বিদেশে আমাকে তোমার প্রায়ই মনে পোড়ত। কেবল মাত্র ঐ কথাটুকু নয়, ঐ কথা থেকে তোমার আরো কত কথা মনে আস্‌ত। আমার বড় ইচ্ছা ছিল যে, তুমি বোল্‌বে—"অমুক জায়গায় আমি একটি সুন্দর উপত্যকা দেখ্‌লুম; সেখেনে একটি নির্ঝর বোয়ে যাচ্ছিল, জায়গাটা দেখেই মনে হ'লে, আহা ভা—যদি এখেনে থাক্‌ত তা'হলে তার বড় ভাল লাগ্‌ত!" একটা ছোট প্রশ্ন থেকে এই রকম কত উত্তরই শুনতে পাবার সম্ভাবনা ছিল। যখন প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা কোরেছিলুম তখন মনের ভিতর এই রকম অনেক কথা চাপা ছিল!

আমি তোমার কাছে দুঃখ করবার জন্যে এ চিঠিটা লিখ্‌চিনে; কিম্বা তোমার কাছে অভিমান করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি ভাই, কোন কোন লোকের মত ঢাক ঢোল বাজিয়ে অভিমান কোর্‌তে পারিনে; যার প্রতি অভিমান কোরেছি, তার কাছে গিয়ে "ওগো আমি অভিমান কোরেছি গো, আমি অভিমান কোরেছি" বোলে হাঁকাহাঁকি কোর্‌তেও ভাল বাসিনে। যদি আমি অভিমান করি ত সে মনে মনে। আমার অভিমানের অশ্রু কেউ কখনো দেখ্‌তে পায় না, আমার অভিমানের কথাও কেউ কখনো শোনে নি; অভিমান আমার কাছে এমনই গোপনের সামগ্রী। তাই বোলচি তোমার কাছে আজ আমি অভি-

মান কোত্তে বলিনি। তোমার সঙ্গে আমার কতকগুলি তর্ক আছে, তা'র মীমাংসা কোত্তে আমার ভারি ইচ্ছে।

তোমার সমস্ত চিঠিটার ভাব দেখে আমার এই মনে হ'ল যে, তোমার মতে যারা নিস্বার্থ ভালবাসে তারা আর ভালবাসা ফেরত পা'বার আশা করেনা। যেখানে ভালবাসার বদলে ভালবাসা পা'বার আশা আছে সেই খানেই স্বার্থপরতা আছে। এ সম্বন্ধে তোমাকে একটি কথা বলি শোন'। আমরা অনেক সময়ে ভাল কো'রে অর্থ না বুঝে অনেক কথা ব্যবহার কোরে থাকি। মুখে মুখে কথা গুলো এমন চলিত, এমন পুরানো, হোয়ে যায় যে, সে গুলো আমরা কানে শুনি বটে কিন্তু মনে বুঝিনে। নিস্বার্থ ভালবাসা কথাটাও বোধ করি সেই রকম একটা কিছু হবে। যখন আমরা শুনে যাই তখন আমরা কিছুই বুঝিনে, একটু পীড়াপীড়ি কোরে বোঝাতে বোল্লে হয়ত দশজনে দশ রকম ব্যাখ্যা করি। স্বার্থপরতা কথা সচরাচর আমরা কি অর্থে ব্যবহার কোরে থাকি? আহার করা বা স্নান করাকে কি স্বার্থপরতা অতএব নিন্দনীয় বলে? আহার না করা বা স্নান না করাকে কি নিস্বার্থপরতা অতএব প্রশংসনীয় বলে? মূল অর্থ ধোরতে গেলে আহার বা স্নান করাকে স্বার্থপরতা বলা যায় বৈকি? কিন্তু চলিত অর্থে তাকে স্বার্থপরতা বলে না। সকল মানুষেই মনে মনে এমন সামঞ্জস্যবাদী, যে, যখন বলা হয় যে, "আহার করা ভাল" তখন কেউ এমন বোঝেন না, বিরাম বিশ্রাম না দিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ছাব্বিশ ঘণ্টাই আহার করা ভাল। তেমনি যখন আমরা স্বার্থপরতা কথা ব্যবহার করি, তখন কেউ মনে করে না যে, নিশ্বাস গ্রহণ করা স্বার্থপরতা, বা বাতাস খাওয়া স্বার্থপরতা। যা' কিছু পঙ্ক-জ তাকে যেমন পঙ্কজ বলেনা, যা' কিছু অ-চল তা'কে যেমন অচল বলেনা, তেমনি যা' কিছু স্বার্থপরতা তা'কেই স্বার্থপরতা বলে না। খাওয়া দাওয়াকে স্বার্থপরতা বলে না, কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল মাত্র খাওয়া দাওয়া করে আর কিছু করে না, কিম্বা যার খাওয়া দাওয়াই বেশী, পরের জন্য কোন কাজ অতি যৎসামান্য, তা'কে স্বার্থপর বলা যায়। আবার তার চেয়ে স্বার্থপর হোচ্চে যারা পরের মুখের গ্রাস কেড়ে নিজে খায়। এ ছাড়া আর কোন অর্থে, কোন ভাবে স্বার্থপর কথা ব্যবহার করা হয় না। তা' যদি হয় তা' হ'লে নিস্বার্থ ভালবাসা বোল্‌তে কি বুঝায়? যদি মূল অর্থ ধর' তা' হ'লে ভাল বাসাই স্বার্থপরতা। যখন এক জনকে দেখ্‌তে ভাল লাগে, তা'র কথা শুন্‌তে ভাল লাগে, তার কাছে থাক্‌তে ভাল লাগে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে তা'কে না দেখ্‌লে, তার কথা না শুন্‌লে ও তার কাছে না থাক্‌লে কষ্ট হয়, তার সুখ হ'লে আমি সুখী হই, তার দুঃখ হ'লে আমি দুঃখী হই, তখন অতগুলো ভাবের সম্মিলনকেই ভাল বাসা বলে। ভালবাসার আর একটা উপাদান হোচ্চে, সে আমাকে ভাল বাসুক, অর্থাৎ তার চোখে আমি সর্ব্বাংশে প্রীতিজনক হই এই

বাসনা। ভেবে দেখ্‌তে গেলে এর মধ্যে সকল গুলিই স্বার্থপরতা। এত গুলি স্বার্থপরতার সমষ্টি থেকে একটি স্বার্থপরতা বাদ দিলেই কি বাকী টুকু নিঃস্বার্থ হোয়ে দাঁড়ায়? কিন্তু যেটিকে বাদ দেওয়া হ'ল সেটি অন্যান্য গুলির চেয়ে কী এমন বেশী অপরাধ কোরেছে? তা'ছাড়া এর মধ্যে কোনটাকেই বাদ দেওয়া যায় না। এর একটি যখন নেই তখন বোঝা গেল যে, যথার্থ ভালবাসাই নেই। যাকে তোমার দেখ্‌তে ভাল লাগেনা, যার কথা শুন্‌তে ইচ্ছে করে না, যার কাছে থাক্‌তে মন যায়না তাকে যদি ভালবাসা সম্ভব হয় তা'হোলেই যার ভালবাসা পেতে ইচ্ছে করে না তাকে ভালবাসাও সম্ভব হয়। যাকে দেখ্‌তে, শুন্‌তে ও যার কাছে থাক্‌তে ভাল লাগে, কোন কোন ব্যক্তি দুদিন তাকে দেখ্‌তে শুন্‌তে না পেলে ও তার কাছে না থাক্‌লে তাকে ভুলে যায় ও তার ওপর থেকে তার ভালবাসা চোলে যায়, তেমনি আবার যার ভালবাসা পেতে ইচ্ছে করে তার ভালবাসা না পেলেই কোন কোন ব্যক্তির ভালবাসা তার কাছে থেকে দূর হয়; তাদের সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, তা'দের গভীররূপে ভালবাস্‌বার ক্ষমতা নেই। এটা নিশ্চয় বলা যায় যে, ভালবাসার যত গুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উল্লেখ কোল্লুম, ভালবাসা যেখেনে থাকে তারাও সেইখানে থাক্‌বেই থাক্‌বে। তাদের মধ্যে একটাকে বাদ দিয়ে বাকীটুকুকে নিঃস্বার্থ ভালবাসা বলাও যা আর ঘড়ির কল বা তা'র কাঁটা বা তা'র সময়-চিহ্ন বাদ দিয়ে তা'কে খাঁটি ঘড়ি বলাও তা'। এখন এক এক সময় হয় বটে, যখন ভালবাসার প্রতিদান পাবার কথা মনেই আসে না,—যেমন দ্বার-শূন্য বাতায়ন-শূন্য আলোক-শূন্য জন-শূন্য কারাগারে রুদ্ধ ব্যক্তির মুক্তির কথা কল্পনাতেই আসে না। কিন্তু সেই কারারুদ্ধ ব্যক্তির মুক্তির কথা মনে আসে না বোলে বলা যায় না যে, স্বাধীনতার ইচ্ছা মানুষের স্বভাব-সিদ্ধ নহে। তেমনি যখন আমার ভালবাসার পাত্র আকাশের জ্যোতির্ম্ময় জলদ-সিংহাসনে, আর আমি পৃথিবীর মৃত্তিকায় একটি সামান্য কীট ধূলায় অন্ধ হোয়ে বিচরণ করচি,—যখন তার পদ-জ্যোতির একটু মাত্র আভাস দেখা, যখন সঙ্গীত নয় কথা নয়, কেবল অতি দূর থেকে তার কণ্ঠের অস্ফুট স্বরটুকু মাত্র শোনা আমার অদৃষ্টে আছে, যখন তার নিশ্বাস বহন কোরে তাঁর গাত্র স্পর্শ কোরে তার কুন্তল উড়িয়ে বাতাস আমার গায়ে অমৃত সিঞ্চন করে, ও সেইটুকু সুখেই আমার চোক ঢ'লে পড়ে, আমার গা শিউরে ওঠে, তার চেয়ে আমার আর কোন আশা নেই, তখন যদি আমার ভালবাসার প্রতিদান পা'বার কথা মনে না আসে ত তাথেকে বলা যায় না যে, ভালবাসার প্রতিদান পা'বার আশা স্বভাবতই ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে যে থাক্‌বে এমন নয়; সেরকম অবস্থায় ভালবাসার প্রতিদান পাবার আশা মনে স্পষ্ট না আসুক্,

তবু কি সে ব্যক্তির মনে তৃপ্তি থাকে? সর্ব্বদাই কি তার মনটা হাহাকার কোর্‌তে থাকে না? তার মনের মধ্যে কি এমন-একটা নিদারুণ অভাব, ঘোরতর শূন্যতা থাকে না, যে-শূন্য সমস্ত জগৎ গ্রাস কোরেও পূর্ণ হ'তে পারে না? তার হৃদয়ের সে মরু-ভাব কেন? সে কি, তার প্রতিদানের মর্ম্ম-ভেদী আশাকে নিরাশার সর্ব্বব্যাপী বালুকার তলে নিহিত কেরে ফেলা হোয়েছে বলেই না? এমন কোন অমানুষিক মানুষকে কি কেউ দেখেছে, যে, ভালবাসার প্রতিদান না পেয়েও, প্রতিদানের আশা বা কল্পনা না কোরেও মহা যোগীর মত মনের আনন্দে আছে। প্রতিদানের আশা ত্যাগ কোরেও অনেকে ভালবাসে বটে, কিন্তু ভাল বেসে কি সুখী হয়? আচ্ছা তর্কের অনুরোধে মনেই করা যাক্ যে, ভালবাসার প্রতিদান পাবার আশা যে, ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বেই তা'নয়, কিন্তু তাই বোলে কি প্রতিদান পাবার একটা ইচ্ছা মাত্রই স্বার্থ-পরতা? যোগাভ্যাস-ক্রমে কোন যোগী ক্ষুধা তৃষ্ণা একেবারে দূর কোরে নিষ্কাম হোয়ে থাক্‌তে পারেন, কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা কি স্বার্থপরতা? আমার শরীরের ধর্ম্মই এই যে, অবস্থা বিশেষে আমার ক্ষুধাতৃষ্ণার উদ্রেক হয়, সে উদ্রেক-টুকু অবশ্য স্বার্থ-পরতা নয়; কিন্তু আমার সেই ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে আর একজন ক্ষুধিত ব্যক্তিকে যদি তার আহার থেকে বঞ্চিত করি, তা'হলে আমার স্বার্থপরতা হয় বটে! আমার মনের ধর্ম্ম এই যে, ভালবাসার প্রতিদান পেতে ইচ্ছে করে কিন্তু সেই ইচ্ছা টুকুই স্বার্থপরতা নয়; তবে যদি সেই ইচ্ছায় অন্ধ হয়ে এমন অন্যায় উপায়ে আমার ভালবাসার পাত্রের কাছে প্রতিদান পাবার চেষ্টা করি যে, সে তাতে কষ্ট পায় বা বিপদে পড়ে তা হলেই সেটা স্বার্থপরতা হোয়ে দাঁড়ায়।

তোমার চিঠি পোড়ে একটা কারণে বড় হাসি পে'লে। ভাবে বোধ হয় যে, তোমার মতে যারা নিঃস্বার্থ ভালবাসে তারা ভালবাসার পাত্রের কাছে যে আদর না পেয়েও কেবল সুখী থাক্‌বে তা' নয়, অনা-দর পেয়েও তারা কষ্ট পাবে না। যে রকম অবস্থা হোক্ না তারা কেবল নিজে ভাল বেসেই সুখী থাক্‌বে। ভালবাসার লোকের মিষ্টি হাসি মুখখানি দেখ্‌লে যদি নিঃস্বার্থ প্রেমিকের আনন্দ হয় তবে ত'র কাছে আদর পেলেই বা কেন না হবে। তার মুখখানি না দেখ্‌লে যদি কষ্ট হয় তবে আদর গেলেই বা কষ্ট না হবে কেন?

আমি কাকে স্বার্থপর ভালবাসা বলি জান? যে ভালবাসা খাঁটি ভালবাসা নয়। ভালবাসার গিল্টি করা ইন্দ্রিয়-বিকার। সে ভালবাসায় ভালবাসার চাক্‌চিক্য আছে, ভালবাসার সুবর্ণ বর্ণ আছে, কেবল ভাল-বাসা নেই। সে রকম ভালবেসে যে তোমার ভালবাসার পাত্রকে তোমার চক্ষে অত্যন্ত নীচ কোরে ফেল্‌চ তা'তে তোমার বুকে লাগে না। তোমার চক্ষে যে সে রক্ত-

মাংসের সমষ্টি একটা উপভোগ্য সামগ্রী বই আর কিছুই দাঁড়াচ্চে না, তা'তে তোমার কিছুমাত্র আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় না! যখন তার প্রতিমাকে তোমার হৃদয়ের মধ্যে আনো, তখন তোমার হৃদয়ের মধ্যে এমন এক তিল নির্ম্মল স্থান রাখ নি যেখানে তাকে বসাতে পারো! তোমার বীভৎস দুর্গন্ধময় হৃদয়ে সে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা কোরে, দিন রাত্ত তার পদে কুৎসিত লালসা ও কলুসিত কল্পনা উপহার দিচ্চ, তেমন বীভৎস প্রতিমা পূজাকে যদি ভাল বাসা নিতান্তই বোলতে হয় তা হোলে একেই আমি স্বার্থপর ভালভাসা বলি। আমার মত এই যে, দৈত্যদের যেমন দৈত্যই বলে, কুদেবতা বা কোন রকম বিশেষণ-বিশিষ্ট দেবতা বলে না তেমনি উপরি-উক্ত ব্যবহারকে স্বার্থপর ভালবাসা না বোলে তার যা যথার্থ নাম তাকে সেই নামেই ডাকা উচিত; তার জাল-নাম ভালবাসা তার যথার্থ নাম ইন্দ্রিয়-পরতা। ভালবাসার চক্ষে যাকে দেখা যায়, কল্পনা তাকে স্বর্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করে, তার চার দিকে স্বর্গের কিরণ দীপ্তি পেতে থাকে,—আর ইন্দ্রিয়পরতার চক্ষে যাকে দেখ, সে যদি স্বর্গীয় হয় তবু তোমার কল্পনা তাকে সে স্বর্গের আসন থেকে নামিয়ে পৃথিবীর আবর্জ্জনা মধ্যে স্থাপন করে, এ'র চেয়েও কি স্বার্থপরতা আর আছে?

সংশোধন।

ভারতী, চতুর্থখণ্ড, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ।

হিয়োন সাঙের বাঙ্গালা ভ্রমণ।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৮	২	২৮	২০৬	১০৬
,,	,,	৩২	Travels	Itinerary
৬৯	১	১০।১১	লেড্‌লে ও বিল সাহেবের	এই সকল
,,	,,	১৬	1648	1848
৭০	১	৫	(Sei-she)	(Fei-she)
,,	,,	৯	কিবণস্থবণের	কিরণস্থবর্ণের
৭১	১	২৪	Brodlo's	Broadleys
,,	,,	২৫।২৬	III and IV	III
,,	,,	২৮	rains	ruins
৭৩	২	১১	সুক্ষ "সুক্ষ	সুহ্ম "সুহ্ম
,,	,,	২৯	হল	উইলসন
,,	,,	৩০	সুক্ষম	সুহ্ম
৭৪	১	১৫	সময়কে	সারাংশ
,,	,,	৩৩	হল	উইলসন
,,	২	৩৩	For iban	Tar ipon
৭৫	১	২৬	XLVI	XLIV.
,,	২	৩১	XLVII	XPIV.
১১৭	১	২৭	I	J.
,,	,,	৩২	para	part
১২০	১	২৬	sooth	south
১২২	১	২৩	I	J.
,,	২	৬	লোট প্রস্তাবের	লাটপ্রস্তরের
,,	,,	৮	Pholozinograph	Photozincograph
১২৩	২	২০	লক্ষ্মণ	লাক্ষ্মণের
১২৪	২	১	সমতল	সমতট
১৬৪	২	১৪	বৃন্দ্র	বুন্দ
১৬৬	১	৯	প্রচলিত	প্রচলিত হইবার
১৬৭	২	১৭	১৮৯	১৪৮৯
১৬৮	১	২৩	Kei-to-na-suta-ta-na	Kei-lo-na-sufa-la-na.

ভগ্ন-হৃদয়।

দ্বিতীয় সর্গ।

ক্রীড়া কানন। নলিনী * ও সখীগণ।

নলিনী—

সখি! অলক-চিকুরে কিশলয় সাথে
একটি গোলাপ পরায়ে দে!

চারু! দেখি ও আরশী খানি,

বালা! সিঁথিটি দে ত লো আনি;

লীলা! শিথিল কুন্তল দেখ্ বার বার
কপোলে ছুলিয়া পড়িছে আমার
একটু এপাশে সরায়ে দে!

সুরুচি—

মাধবী, বল্‌ত মোরে একবার
আজিকে হোল কি তোর!
কত খন ধোরে গাঁথিছিস্ মালা
এখনো কি শেষ হোল না তা' বালা?
এক মালা গেঁথে করিবি না কি লো
সারাটি রজনী ভোর?
অনিলের হবে ফুলশয্যা আজ,
সাঁঝের আগেই শেষ করি সাজ
সব সখী মিলি যেতে হবে সেথা
তা কি মনে আছে তোর?

অলকা—

মরি মরি কিবা সাজাবার ছিরি
চেয়ে দেখ্ একবার!
সখীর অমন ক্ষীণ দেহ মাঝে
কমল ফুলের মালা কিলো সাজে?

বিনোদিনী দেখ্ গাঁথিছে বসিয়া
কমলের ফুল হার!

নলিনী—

ওই দেখ্ সখি, দাঁড়ের উপরে
মাথাটি গুঁজিয়া পাখার ভিতরে
শ্যামাটি আমার সাধের শ্যামাটি
কেমন ঘুমায়ে আছে!
আন্ সখি ওরে কাছে!
গান গেয়ে গেয়ে তালি দিয়ে দিয়ে
ঘিরে বসি ওরে সকলে মিলিয়ে,
দেখিব কেমন ফিরে ফিরে ফিরে
তালে তালে তালে নাচে।

(শ্যামার প্রতি গান)

নাচ্ শ্যামা তালে তালে!
বাঁকায়ে গ্রীবাটি তুলি পাখা দুটি
এ পাশে ও পাশে করি ছুটাছুটি
নাচ্ শ্যামা তালে তালে!

রুণু রুণু ঝুনু বাজিছে নূপুর,
মৃদু মৃদু মধু উঠে গীত সুর,
বলয়ে বলয়ে বাজে ঝিনি ঝিনি,
তালে তালে উঠে করতালি ধ্বনি
নাচ্ শ্যামা নাচ্ তবে!
নিরালয় তোর বনের মাঝে

---

* এক চপল-স্বভাবা কুমারী।

সেথা কি এমন নূপুর বাজে ?
বনে তোর পাখী আছিল যত
গাহিত কি তারা মোদের মত
এমন মধুর গান ?
এমন মধুর তান ?
কমল করের করতালি হেন
দেখিতে পেতিস্ কবে ?
নাচ্ শ্যামা নাচ্ তবে !

বন্দী বোলে তোর কিসের দুখ ?
বনে বল্ তোর কি ছিল সুখ ?
বনের বিহগ কি বুঝিবি তুই
আছে লোক কত শত,
যারা শ্যামা তোর মত
এমনি সোনার শিকলি পরিয়া
সাধের বন্দী হইতে চায় !
এই গীত-রবে হোয়ে ভরপুর,
শুনি শুনি এই চরণ-নূপুর
জনম জনম নাচিতে চায় !
সাধ কোরে ধরা দেয় গো তারা !
সাথে সাথে ভ্রমি হয় গো সারা !
ফিরেও দেখিনে—ফিরেও চাহিনে—
বড় জ্বালাতন করেগো যখন
অশরীরী বাক্য করি বরিষণ
উপেখা বাণের ধারা !
তবে দেখ্ পাখী তোর
কেমন ভাগ্যের জোর !
বড় পুণ্য ফলে মিলেছে বিহগ
এমন সুখের কারা !

আয় পাখী আয় বুকে !
কপোলে আমার মিশায়ে কপোল
নাচ্ নাচ্ নাচ্ সুখে !
বড় দুখ মনে বনের বিহগ
কিছু তুই বুঝিলি না !
এমন কপোল অমিয়-মাখা
চুমিলি, তবুও ঝাপটি পাখা
উড়িতে চাহিস্ কি না !
প্রতি পাখা তোর উঠেনি শিহরি ?
পুলকে হরষে মরমেতে মরি
ঘুরিয়া ঘুরিয়া চেতনা হারায়ে
পদতলে পড়িলি না ?

নাচ্ নাচ্ তালে তালে !
বাঁকায়ে গ্রীবাটি তুলি পাখা দুটি
এ পাশে ও পাশে করি ছুটাছুটি
নাচ্ শ্যামা তালে তালে !

দামিনী—
শুনেছিস্ সখি, বিবাহ-সভায়
বিনোদ আসিবে আজ !
ভাল কোরে কর্ সাজ !

নলিনী—
আহা মোরে যাই কি কথা বলিলি !
শুনিয়া যে হয় লাজ !
বিনোদ আসিবে আজ ?
এ বারতা দিয়ে কেন লো স্বজনি,
মাথায় হানিলি বাজ ?
সারাখন মোর সাথে সাথে ফিরে
ক্ষান্ত নহে একটুক,
মুখ খানা তার দেখিবারে পাই
যে দিকে ফিরাই মুখ !

এক-দৃষ্টে হেন রহে সে তাকায়ে
থেকে থেকে ফেলে শ্বাস,
মুখেতে আঁচল চাপিয়া চাপিয়া
রাখিতে পারিনে হাস!

লীলা—

শুনেছি প্রমোদ আসিবে, যাহারে
ভ্রমর বলিয়া ডাকি,
যাহারে হেরিলে হরষে তোমার
উজলিয়া উঠে আঁখি!

নলিনী—

গা ছুঁয়ে আমার বল্‌লো স্বজনি
সত্য সে আসিবে নাকি?
দেখ দেখি সখি অভাগীর তরে
কোথাও নিস্তার নাই,
মরি মরি কিবা ভ্রমর আমার!
ভ্রমরের মুখে ছাই!
সে ছাড়া ভ্রমর আর কি নাই?
তা হোলে এখনি—সখিরে, এখনি
নলিনি-জনম ঘুচাতে চাই!

চারুশীলা—

লুকাস্‌নে মোরে আমি জানি সখি
কে তোমার মনোচোর!
বলিব? বলিব? হেথা আয় তবে
বলি কানে কানে তোর!
(কানে কানে কথা)

নলিনী—

জ্বালাস্‌নে চারু, জ্বালাস্‌নে মোরে
করিস্‌নে নাম তার!
স্থরেশ?—তাহার জ্বালায় স্বজনী
বেঁচে থাকা হোল ভার!

কে জানিত আগে বল্‌ত সখিলো
রূপের যাতনা অতি?
সাধ যায় বড় কুরূপা হইয়া
লভি শান্তি এক রতি!

মাধবী—

(লীলার প্রতি জনান্তিকে)
শোন্ বলি লীলা, জানি কারে সখি
মনে মনে ভাল বাসে!
দেখিনু সে দিন বিজয়ের সাথে
বসি আছে পাশে পাশে।
মৃদু হাসি হাসি কত কহে কথা,
কভু লাজে শির নত,
ল'য়ে কেশ পাশ বেণী ফেলি খুলে,
জড়ায়ে জড়ায়ে মৃণাল আঙ্গুলে
কভু খেলা করে কত!
কখন বা শুনে অতি এক মনে
বিজয়ের কথাগুলি,
শুনিতে শুনিতে শির নত করি
তুলি কুঁড়ি এক, কতখণ ধরি
খুলি খুলি দেয় মুদিত পাপড়ি,
ফুটাইয়া তারে তুলি;
কভু বা সহসা উঠিয়া যায়—
কভু বা আবার ফিরিয়া চায়—
মৃদু মৃদু স্বরে গুন্ গুন্ কোরে
উঠে এক গান গেয়ে;
এমন মধুর অধীরতা তার!
এমন মোহিনী মেয়ে!

বিনো—

সখীলো তা' নয়, কতবার আমি
দেখিয়াছি লুকাইয়া,

অশোকের সাথে বসি আছে একা
প্রমোদ-কাননে গিয়া!
জানি আমি তারে হেরিলে সখীর
সুখে নেচে উঠে হিয়া!

নলিনী—
হেথা আয় তোরা, দে দেখি সাজায়ে
শ্যামা পাখীটিরে মোর!
দুটি ফুল বসা দুইটি ডানায়;
বেল-কুঁড়ি মালা কেমন মানায়
সুগোল গলায় ওর!
ওই দেখ্ সখি! দেখিনি কখনো
এমন দুরন্ত পাখী!
যত গুলি ফুল দিলেম পরায়ে
সব গুলি দেখ্ ফেলেছে ছড়ায়ে—
শত শত ভাগে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া
একটি রাখেনি বাকী!
ভাল, পাখী যদি না চায় সাজিতে
আমারে সাজালো তবে!

চারু—
তোর সাজ ফুরাইবে কবে?

লীলা—
সখি, আবার কিসের সাজ!

সুরুচি—
দেখ্ এসেছে হইয়া সাঁঝ!

নলিনী—
দেখ্‌লো সুরুচি, লীলা ভাল কোরে
বাঁধিতে পারেনি চুল!
এই দেখ হেথা পরায়ে দিয়াছে
অলকে শুকানো ফুল!
বেণী খুলে চুল বেঁধে দে আবার
কানে দে পরায়ে দুল!

সুরুচি—
না লো সখী দেখ আঁধার হোতেছে
বেলা হোয়ে যাবে ঢের—
চল ত্বরা কোরে, যাই দেখিবারে
ফুল-শয্যা অনিলের।

অলকা—
এত খনে সখি, এসেছে সেথায়
যতেক গ্রামের লোক।

দামিনী (হাসিয়া)
এসেছে বিনোদ!

লীলা (হাসিয়া)
এসেছে প্রমোদ!

বিনো (হাসিয়া)
এসেছে সেথা অশোক!

মাধবী (হাসিয়া)
এসেছে বিজয়!

চারু (চিবুক ধরিয়া)
সুরেশ রয়েছে
পথ চেয়ে তোর তরে!

অলকা—
আয় তবে ত্বরা কোরে!

নলিনী—
ভাল, সখি, ভাল, চল্ তবে চল্
জ্বালাসনে আর মোরে!

——:॰:——

তৃতীয় সর্গ।

মুরলা ও অনিল*।

অনিল—
ও হাসি কোথায় তুই শিখেছিলি বোন?

* মুরলা—অনিলের ভগ্নী ও কবির বাল্য সহচরী।

বিষণ্ণ অধর দুটি অতি ধীরে ধীরে টুটি
অতি ধীরে ধীরে ফুটে হাসির কিরণ।
অতি ঘন মেঘ মালা, ভেদি স্তরে স্তরে, বালা,
সায়াহ্ণ জলদপ্রান্তে দেয় যথা দেখা
ম্লান তপনের মৃদু কিরণের রেখা।
কত ভাবনার স্তর—ভেদ করি পর পর
ওই হাসি টুকু আসি পঁহুছে অধরে।
ও হাসি কি অশ্রুজলে সিক্ত থরে থরে?
ও হাসি কি বিষাদের গোধূলির হাস?
ও হাসি কি বরষার সুকুমারী লতিকার
ধৌতরেণু ফুলটির অতি মৃদু বাস?
মুরলারে, কেন আহা, এমন তু' হ'লা?
এত ভালবাসা কারে দিলি জলাঞ্জলি?
যে জন রেখেছে মন শূন্যের উপরে।
আপনারি ভাব নিয়া উলটিয়া পালটিয়া
দিন রাত যেই জন শূন্যে খেলা করে।
শূন্য বাতাসের পটে শত শত ছবি
মুছিতেছে আঁকিতেছে—শতবার দেখিতেছে,
সেই এক মোহময় স্বপ্নময় কবি—
সদা যে বিহ্বল প্রাণে চাহিয়া আকাশ পানে
আঁখি যার অনিমিষ আকাশেরি প্রায়!
মাটিতে চরণ তবু মাটিতে না চায়—
ভাবের আলোকে অন্ধ তারি পদতলে
অভাগিনী লুটাইয়া পড়িলি কি বোলে?
সেকিরে, অবোধ মেয়ে, বারেক দেখিবে চেয়ে?
জানিতেও পারিবে না যাইবে সে চোলে
যুঁথিকা-হৃদয় তোর ধূলি সাথে দোলে।
এত ভালবাসা তারে কেন দিলি হায়?
সাগর উদ্দেশগামী তটিনীর পায়
না ভাবিয়া না চিন্তিয়া যথা অবহেলে
ক্ষুদ্র নির্ঝরিনী দেয় আপনারে ঢেলে!

নিশীথের উদাসীন পথিক সমীর
শূন্য হৃদয়ের তাপে হইয়া অধীর,
কুসুম-কানন দিয়া যায় যবে বোয়ে,
আকুলা রজনীগন্ধা কথ'টি না কোয়ে
প্রাণের সুরভি সব দিয়া তার পায়,
পর দিন বৃন্ত হোতে ঝোরে পোড়ে যায়।
মেঘের দুঃস্বপ্নে মগ্ন দিনের মতন
কাঁদিয়া কাটিবে কিরে সারাটি যৌবন?
কেঁদে কেঁদে শ্রান্ত হোয়ে দীন অতিশয়—
আপনার পানে তবে চাহিয়া দেখিবি যবে
দেখিবি জীবন দিন সন্ধ্যা হয় হয়!
যে মেঘ মাঝারে থাকি উদিলি প্রভাতে
সেই মেঘ মাঝে থাকি অস্ত গেলি রাতে।
মুরলা—

কি জানি কেমন!

মুরলার সুখের কি দুঃখের জীবন!
সুখ দুঃখ দিনরাত মিলিয়া উভয়ে
রেখেছে সায়াহ্ণ করি এ শান্ত হৃদয়ে।
হেন আলিঙ্গনে তারা রয়েছে সদাই
যেন তারা দুটি সখা যেন দুটি ভাই।
জোছনা ও যামিনীতে প্রণয় যেমন
তেমনি মিলিয়া তারা রোয়েছে দুজন।
সুখের মুখেতে থাকে দুখের কালিমা
দুখের হৃদয়ে জাগে সুখের প্রতিমা।
একা যবে বোসে থাকি স্তব্ধ জোছনায়
বহে বাতায়ন পানে নিশীথের বায়,
বড় সাধ যায় মনে যারে ভালবাসি
একবার মুহূর্ত্ত সে বসে কাছে আসি,
দুটি শুধু কথা কহে একটু আদর—
সেই স্তব্ধ জোছনায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া হায়
মরিয়া যাইগো তারি বুকের উপর।

যখনি কবিরে দেখি সব যাই ভুলে
কিছুই চাহিনা আর—কিছুই ভাবি না আর—
শুধু সেই মুখে চাই দুটি আঁখি তুলে।
দেখি দেখি—কি যে দেখি, কি বলিব কি সে!
হৃদয় গলিয়া যায় জোছনায় মিশে।
জোছনার মত, সেই বিগলিত হিয়া
প্রাণের ভিতরে ধরি একবারে মগ্ন করি
কবিরে চৌদিকে যেন থাকে আবরিয়া।
মনে মনে মন যেন, কাঁদিয়া হু'করে
কবির চরণ দুটি জড়াইয়া ধরে—
আঁখি মুদি "কবি—কবি" বলে শতবার,
শতবার কেঁদে বলে "আমার আমার,"
"আমার আমার" যেন বলিতে বলিতে
চাহে মন একেবারে জীবন ত্যজিতে।
সুখেতে কি দুখে যেন ফেটে যায় বুক
সুখ বলে দুখ আমি, দুখ বলে সুখ।
কোথা কবি কোথা আমি, সে যেগো দেবতা
তারে কি কহিতে পারি প্রণয়ের কথা?
কবি যদি ভুলে কভু মোরে ভালবাসে
তা' হোলে যে মোরে যাব সঙ্কোচে উল্লাসে।
চাইনা চাইনা আমি প্রণয় তাঁহার
যাহা পাই তাই ভাল স্নেহ সুধা-ধার।
শুকতারা স্নেহ মাখা করুণ নয়ানে
চেয়ে থাকে অস্তমান যামিনীর পানে,
তেমনি চাহেন যদি কবি স্নেহ ভরে
মুরলার ক্ষুদ্র এই হৃদয়ের পরে,
তাহা হোলে নয়নের সামনে তাঁহার
হাসিয়া ফুরায়ে যাবে জীবন আমার।

অনিল—

স্বার্থপর, আপনারি ভাবভরে ভোর,
আজিও সে দেখিল না হৃদয়টি তোর?
সর্ব্বস্ব তাহারি পদে দিয়া বিসর্জ্জন
কাঁদিয়া মরিছে এক দীন হীন মন,
ইহাও কি পড়িল না নয়নে তাহার?
আপনারে ছাড়া কেহ নাহি দেখিবার?
নিশ্চয় দেখেছে, তবু দেখেও দেখেনি,
দেখেছে সে—নিরুপায়, নিতান্তই অসহায়
ভাল বাসিয়াছে এক অভাগা রমণী,
দেখেছে—হৃদয় এক ফাটিয়া নীরবে,
একান্ত মরিবে তবু কথা নাহি কবে;
দেখেও দেখেনি তবু, পশু সে নির্দ্দয়!
ভাঙ্গিয়া দেখিতে চাহে রমণী হৃদয়।
শতধা করিতে চায় মন রমণীর,
দেখিবারে হৃদয়ের শির উপশির।
এমন সুন্দর মন মুরলা তোমার,
এমন কোমল, শান্ত, গভীর উদার;
ও মহান্ হৃদয়েতে প্রেম জলধির
নাইরে দিগন্ত বুঝি, নাই তার তীর।
করিস্‌নে করিস্‌নে ও হৃদি বিনাশ
যৌবনেই প্রণয়েতে হোস্‌নে উদাস!
কহিগে প্রণয় তোর কবির সকাশে,
শুধাইগে ভাল তোরে বাসে কি না বাসে।
ভাল যদি নাই বাসে কেন সেই জন
মিছা স্নেহ দেখাইয়া বেঁধে রাখে মন?
না যদি করিতে পারে তোরে আপনার,
আপনার মত কেন করে ব্যবহার?
কথা নাহি কহে যেন, না করে আদর,
পরের মতন থাকে, দেখে তোরে পর!
নিরদয়-দয়া তোরে নাইবা করিল!
শত্রুতার ভালবাসা নাই বা বাসিল!
মুহূর্ত্ত সুখের তোরে দিয়া প্রলোভন
অসুখী করিবে কেন সারাটি জীবন?

হৃদণ্ডের আদরেতে কভু ভুলিস্‌না !
আধেক সুখেতে কভু পূরে না বাসনা ।
এখনি চলিনু তবে তার কাছে যাই
ভাল বাসে কি না বাসে শুধাইতে চাই ।

মুরলা—

মনে কোরেছিনু ভাই এ প্রাণের কথা
কাহারেও বলিব না যত পাই ব্যথা !
সেদিন সায়াহ্ন কালে উচ্ছ্বসি উঠিয়া
বড় নাকি কেঁদে মোর উঠেছিল হিয়া,
তাই আমি পাগলের মত একেবারে
ছুটিয়া তোমারি কাছে গেনু কাঁদিবারে !
উচ্ছ্বসি বলিনু যত কাহিনী আমার !
কেন রে বলিলি হা-রে দুর্ব্বল অমার ? '
ভাল বাসিতেই যদি করিলি সাহস
লুকাতে নারিস্ তাহা হা হৃদি অবশ ?
পরের চোখের কাছে না ফেলিলে জল
আশ কি মেটেনা তোর রে আঁখি দুর্ব্বল !
মুরলারে অভাগীরে—কেন ভাল বাসিলিরে?
যদি বা বাসিলি ভাল কেন তোর মন
হোল হেন নীচ হীন দুর্ব্বল এমন ?
একটি মিনতি আজি রাখ গো আমার !
সহস্র যাতনা পাই আর কখনত ভাই
ফেলিব না তব কাছে অশ্রু বারি ধার !
যেওনা কবির কাছে ধরি তব পায়—
ভুলে যাও যত কথা কহেছি তোমায় !
দয়া কোরে আরেকটি কথা মোর রাখ'
যদি গো কবির পরে রোষ কোরে থাক'
মোর কাছে কভু আর কোরনাক' নাম তাঁর
সে নাম ঘৃণার স্বরে কভু সহিব না
জানালেম এই মোর প্রাণের প্রার্থনা !

অনিল—

তবে কি এমনি শুধু মিছে ভাল বেসে
শূন্য এ জীবন তোর ফুরাইবে শেষে ?

মুরলা—

তুমি কি বুঝিবে কত ভাগ্য করেছিনু
কবির প্রেমেতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিনু ।
অবোধ বালিকা আমি মিছে কষ্ট পাই,
এ জীবনে মুরলার কোন কষ্ট নাই ।
স্নেহের সমুদ্র সেই কবি গো আমার,—
অনন্ত স্নেহের ছায়ে—আমারে রেখেছে পায়ে
তাই যেন চিরকাল থাকে মুরলার !
সে স্নেহের কোলে শুয়ে কাটায় জীবন !
সে স্নেহের কোলে প্রাণ করে বিসর্জ্জন !
কুসুমিত সে অনন্ত স্নেহ রাজ্য পরে
তিল স্থান থাকে যেন মুরলার তরে !
যত দিন থাকে প্রাণ—ব্যাপি সেই টুকু স্থান
মাটিতে মিশায়ে রবে হৃদয় আমার ।
কোন—কোন সুখ আমি নাহি চাহি আর ।

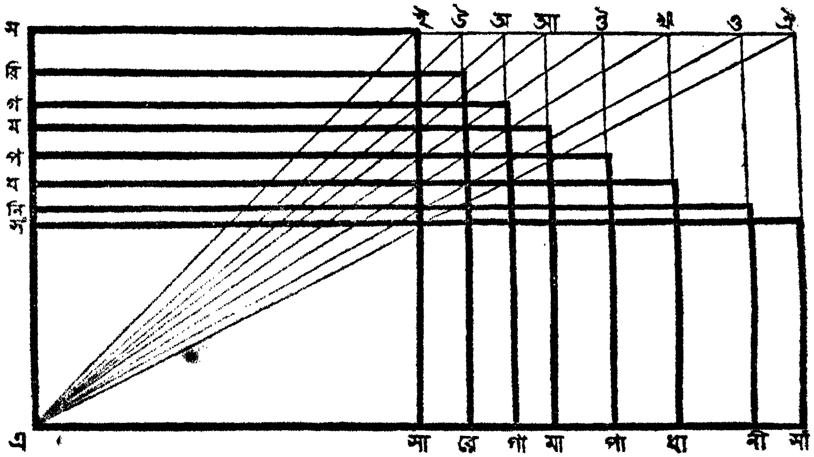
স্বররহস্য।

এতাবৎ কাল দুই দুই পার্শ্বস্থ সুরের মধ্যে (যেমন সা-রে'র মধ্যে, রে-গ'র মধ্যে, গ-ম'র মধ্যে) কোথাও-বা এক মাত্রা কোথাও-বা অর্দ্ধ মাত্রা স্বর-ব্যবধান ধরা হইয়া আসিতেছে;—মোটামুটি-হিসাবে তাহা চলিতে পারে, কিন্তু শক্তাশক্তি করিয়া ধরিলে স্থানে স্থানে তাহার অল্প স্বল্প পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

পার্শ্ব-পত্রে অঙ্কিত ক্ষেত্র-টি স্বর-ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে। ঐ স্বর ক্ষেত্রে প্রথমতঃ এক অষ্টকের (অর্থাৎ সা-হইতে উপর-সপ্তকের সা-পর্য্যন্ত আটটি সুরের) কোন্ সুর কত দ্রুত বায়ু-স্পন্দন হইতে উৎপন্ন হয়—অথবা যাহা একই কথা—কোন্‌টি কাহা-অপেক্ষা কত মাত্রা উঁচু বা নীচু, দ্বিতীয়তঃ কোন্‌টির জন্য কতখানি তারের স্পন্দন আবশ্যক, তৃতীয়তঃ সেতার প্রভৃতি যন্ত্রে কোন্ সুরের পর্দা হইতে কোন্ সুরের পর্দা কত অন্তরে বসাইতে হয়, সমস্তেরই সটীক বিবরণ এক ঠাঁই জড় করা হইয়াছে।

স্বর-ক্ষেত্রের গায়ে যে-অক্ষরগুলি রহিয়াছে তাহার মধ্যে স স্বতন্ত্র, সা স্বতন্ত্র; স স্বতন্ত্র ও মাথায়-বিন্দু-যুক্ত স̇ স্বতন্ত্র; সা স্বতন্ত্র ও মাথায়-বিন্দু-যুক্ত সা̇ স্বতন্ত্র; রি স্বতন্ত্র, রে স্বতন্ত্র; গ স্বতন্ত্র, গা স্বতন্ত্র; নি স্বতন্ত্র, নী স্বতন্ত্র; ইত্যাদি; অতএব সা বলিলে যেন তাহার পরিবর্ত্তে সা̇ গ্রহণ করা না হয়, নি বলিলে যেন নী গ্রহণ করা না হয়, প বলিলে যেন পা গ্রহণ করা না হয় ইত্যাদি।

সা-হইতে বাম-দিকে যতদূর পর্য্যন্ত যতখানি স্থূল রেখা প্রসারিত রহিয়াছে তাহা (অর্থাৎ সা-এ-রেখা) সা-কসি বলিয়া নির্দিষ্ট হইবে, এবং সা-হইতে উপর-দিকে যতদূর পর্য্যন্ত যতখানি স্থূল-রেখা প্রসারিত রহিয়াছে তাহা (অর্থাৎ সা-ই রেখা) সা-দাঁড়ি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে; রে-হইতে বাম দিকে যতদূর পর্য্যন্ত যতখানি স্থূল রেখা প্রসারিত রহিয়াছে তাহা (অর্থাৎ রে-এ-রেখা) রে-কসি বলিয়া নির্দিষ্ট হইবে, এবং রে-হইতে উপর দিকে যতদূর পর্য্যন্ত যতখানি স্থূল-রেখা প্রসারিত রহিয়াছে তাহা (অর্থাৎ রে-উ-রেখার স্থূলাংশ) রে-দাঁড়ি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে; ইত্যাদি-ক্রমে যে স্থূল-রেখা সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নী, সা̇, অক্ষর-গুলির যেটি হইতে যত দূর পর্য্যন্ত বামদিকে প্রসারিত রহিয়াছে তাহা সেইটির নামীয় কসি, আর যে স্থূল রেখা যেটি হইতে যতদূর পর্য্যন্ত উপরদিকে প্রসারিত রহিয়াছে তাহা সেইটির নামীয় দাঁড়ি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে।



☞ গতবারের ভারতীর ৩৩১ পৃষ্ঠায় সা-গ্রামের বিবাদীর কোটায় ভুল-ক্রমে সা প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে মা বসিবে। বর্ত্তমান ভারতীর ৩৬৫ পৃষ্ঠার প্রথম থাকের ১৬ এবং ১৭ পংক্তি যদিও সত্যের কাছাকাছি যায় তথাপি ঠিক সত্য নহে, অতএব ও-দুই পংক্তি পরিত্যজ্য।

রে-উ-রেখার সরু অংশটি রে-তন্ত, গা-অ-রেখার সরু-অংশটি গা-তন্ত, ইত্যাদি ক্রমে যে সরু-রেখাটি যে অক্ষরের নামীয় দাঁড়ির শিরোভাগে অবস্থিতি করে তাহা সেই অক্ষরের নামীয় তন্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে।

স্বর-ক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থিত যে ক্ষেত্রটি দীর্ঘে সা-কসি প্রস্তে সা-দাঁড়ি তাহা সা-ক্ষেত্র বলিয়া নির্দিষ্ট হইবে; যে ক্ষেত্রটি দীর্ঘে রে-কসি প্রস্তে রে-দাঁড়ি তাহা রে-ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে; যে-ক্ষেত্রটি দীর্ঘে গা-কসি প্রস্তে গা-দাঁড়ি তাহা গা-ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে; ইত্যাদি ক্রমে সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নী, স'া ক্ষেত্র-পরম্পরা নির্দ্দিষ্ট হইবে।

দীর্ঘে ১ (১ ক্রোশই হউক, ১ হাতই হউক, ১ যাহাই হউক) এবং প্রস্তে ১—এই-রূপ করিয়া সা-ক্ষেত্রটি রচিত হইয়াছে, এজন্য সা-দাঁড়ি = সা-কসি = ১।

স'া-কসি'কে সা-কসি অপেক্ষা দ্বিগুণ লম্বা করিয়া টানা হইয়াছে, এজন্য সা-ক্ষেত্র অপেক্ষা সা-ক্ষেত্র দীর্ঘে দ্বিগুণ,—দীর্ঘে যেমন দ্বিগুণ প্রস্তে তেমনি অর্দ্ধগুণ, কেননা এ ঐ-রেখা সা-দাঁড়িকে যে-দুই সমান ভাগে কর্ত্তন করিয়াছে—স'া-দাঁড়ি সেই দুই-ভাগের এক ভাগের সমান ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; অতএব সা-ক্ষেত্র অপেক্ষা স'া-ক্ষেত্র যেমন দীর্ঘে দ্বিগুণ বেশী তেমনি প্রস্তে দ্বিগুণ কম, সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেরই মোট আয়তন সমান। এখন,—ইহা অতি সহজে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নী, স'া, এই আটটি ক্ষেত্রের সকল ক'টিরই মোট আয়তন সমান, যথা—

উক্ত ক্ষেত্রগণের মধ্যেকার যে-কোন ক্ষেত্র হউক একটিকে গ্রহণ কর,—যেমন রে-ক্ষেত্র; দেখিবে যে, এ-রে-উ-স চৌকোণ-ক্ষেত্রটির ভিতর রে-ক্ষেত্র এবং সা-ক্ষেত্র উভয়েই অবস্থিতি করিতেছে। এ-রে-উ-স চৌকোণ-ক্ষেত্রের যে-অংশটুকু দীর্ঘে ই-উ এবং প্রস্তে রে-তন্ত (অর্থাৎ রে-উ-রেখার সরু অংশ-টুকু) তাহা সা-ক্ষেত্র এবং রে-ক্ষেত্র উভয়েরই সীমা-বহির্ভূত, এজন্য তাহা বহিঃক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হউক্; এ-রে-উ-স ক্ষেত্রের যে অংশ দীর্ঘে এ-রে প্রস্তে এ-রি, তাহা রে-ক্ষেত্রেরও অন্তর্গত—সা-ক্ষেত্রেরও অন্তর্গত, এজন্য তাহা সাধারণ-ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হউক্; এ-রে-উ-স-ক্ষেত্রের যে অংশ দীর্ঘে রে-দাঁড়ি এবং প্রস্তে সা-রে তাহা কেবল রে-ক্ষেত্রেরই অন্তর্গত—সা ক্ষেত্রের নহে, এজন্য তাহা রে-ক্ষেত্রের বিশেষাংশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হউক্; এ-রে-উ-স ক্ষেত্রের যে-অংশ দীর্ঘে স-ই এবং প্রস্তে স-রি তাহা কেবল সা-ক্ষেত্রেরই অন্তর্গত—রে-ক্ষেত্রের নহে, এজন্য তাহা সা-ক্ষেত্রের বিশেষাংশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হউক্। (১) রে-ক্ষেত্রের বিশেষাংশ, (২) সাক্ষেত্রের বিশেষাংশ, (৩) সাধারণ ক্ষেত্র, (৪) বহিঃক্ষেত্র, এই চারিটি ক্ষেত্র জোড়া দিলে যে একটি-ক্ষেত্র হয় তাহাই এ-রে-উ-স-ক্ষেত্র।

এখন—ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া

যাইতেছে যে, এ-উ রেখাটি—সাধারণ ক্ষেত্র বহিঃক্ষেত্র এবং এ-রে-উ-স-ক্ষেত্র—তিনটি ক্ষেত্রেরই ঠিক্ মধ্য-প্রদেশ দিয়া প্রসারিত হইয়াছে, সুতরাং ঐ তিনটি ক্ষেত্রকে দুটি দুটি সমান ত্রিকোণাংশে বিভাগ করিয়াছে; অতএব এ-রে-উ ত্রিকোণ = এ-স-উ ত্রিকোণ, এবং ও-দুটি ত্রিকোণের যে-দুটি অংশ সাধারণ ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে পড়িয়াছে তাহারাও পরস্পর সমান, আর, যে-দুটি অংশ বহিঃক্ষেত্রের অভ্যন্তরে পড়িয়াছে সে-দুটিও পরস্পর সমান; সংক্ষেপে,—ও-দুটি ত্রিকোণ (এ-রে-উ এবং এ-স-উ) সমান, উভয়ের সাধারণ ক্ষেত্রাংশ সমান, উভয়ের বহিঃক্ষেত্রাংশ সমান। এ-রে-উ এবং এ-স-উ ত্রিকোণদ্বয় যখন সমান এবং উভয়ের বহিঃক্ষেত্রাংশদ্বয় তথা সাধারণ-ক্ষেত্রাংশদ্বয় যখন সমান তখন উক্ত ত্রিকোণ-দ্বয়ের মধ্য হইতে উহাদের সাধারণ-ক্ষেত্রাংশ এবং বহিঃক্ষেত্রাংশ বাদ দিলে দোঁহার দুই অংশ যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহারাও কাজে কাজেই সমান হইবে,—দেখা যাইতেছে যে ও-রূপ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার একটি ক্ষেত্র রে-ক্ষেত্রের বিশেষাংশ, অন্যটি সা-ক্ষেত্রের বিশেষাংশ; অতএব রে-ক্ষেত্রের বিশেষাংশ = সা-ক্ষেত্রের বিশেষাংশ; তাহার মধ্যে রে-ক্ষেত্রের বিশেষাংশে সাধারণ-ক্ষেত্র জুড়িয়া দিলে রে-ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায় এবং সা-ক্ষেত্রের বিশেষাংশে সাধারণ-ক্ষেত্র জুড়িয়া দিলে সা-ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়, অতএব রে-ক্ষেত্র = সা-ক্ষেত্র; এমনি করিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, গা-ক্ষেত্র, মা-ক্ষেত্র, পা-ক্ষেত্র, ধা-ক্ষেত্র, নী-ক্ষেত্র, সা-ক্ষেত্র প্রত্যেকেরই মোট আয়তন = সা-ক্ষেত্রের আয়তন = একই সমান আয়তন। অতএব প্রমাণ হইল যে, সা, রে, প্রভৃতি সকল-ক্ষেত্রেরই মোট আয়তন সমান; সুতরাং উহাদের মধ্যে যে ক্ষেত্র যাহা অপেক্ষা দীর্ঘে যত গুণ বড়, সে ক্ষেত্র তাহা অপেক্ষা প্রস্থে ততগুণ ছোটো; যেমন—ইতিপূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে—এ-সা ক্ষেত্র অপেক্ষা এ-সা-ক্ষেত্র দীর্ঘে দ্বিগুণ প্রস্থে অর্দ্ধেক; অর্দ্ধেককে দুই দিয়া গুণ করিলে ১ হয়; এ যেমন, তেমনি উক্ত ক্ষেত্রগণের প্রত্যেকেরই দৈর্ঘ্যের পরিমাণাঙ্ককে তাহার প্রস্থের পরিমাণাঙ্ক দিয়া গুণ করিলে ১ হইবে, অথবা যাহা একই কথা—সা-দাঁড়িকে সা-কসি-দিয়া, রে-দাঁড়িকে রে-কসি-দিয়া—যে অক্ষরের দাঁড়ি হউক্ তাহাকে সেই অক্ষরের কসি দিয়া—গুণ করিলে ১ হইবে।

এখন,—বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, স্বরোচ্চারক তারের আয়তন যে পরিমাণে কম হয় তাহার স্পন্দনের বেগ সেই পরিমাণে বেশী হয় অথবা—যাহা একই কথা—স্বর সেই পরিমাণে উচ্চ হয়। যতখানি তার হউক্ না কেন তাহাকে যদি এক-গুণ বড় তার বলিয়া ধরা যায় এবং তাহার ধ্বনি-কারক স্পন্দনকে একগুণ দ্রুত স্পন্দন বলিয়া ধরা যায় কিংবা—যাহা একই কথা—সেই স্পন্দন-জাত স্বরকে এক গুণ উচ্চ স্বর বলিয়া ধরা যায়, তবে এক গুণের যত গুণ

বেশী উচ্চ সুর চাও, উচ্চারক তারকে এক গুণের তত অংশ ছোটো করিলেই তাহা পাইবে। এক-গুণ তারের পরিমাণাঙ্ককে তথা সেই তারের স্পন্দন জাত এক-গুণ উচ্চ সুরের পরিমাণাঙ্ককে যদি ১ বলিয়া ধরা যায় তবে যে-তারের পরিমাণাঙ্ক ১-এর যত ভাগ কম হইবে, সেই তারের স্পন্দন-জাত সুরের পরিমাণাঙ্ক ১-এর তত গুণ উচ্চ হইবে; এ জন্য যে কোন তার হউক্ না কেন তাহার আয়তনের পরিমাণাঙ্ককে তাহার সুরের উচ্চতার পরিমাণাঙ্ক দিয়া গুণ করিলে ১ হয়।

উপরে দেখা গিয়াছে যে, যে অক্ষরের দাঁড়ি হউক তাহাকে সেই অক্ষরের কসি দিয়া গুণ করিলে ১ হয়;—অতএব সা-কসি যে-সুরের উচ্চতার পরিমাণ রেখা, সা-দাঁড়ি সেই সুরের উচ্চারক তারের পরিমাণ-রেখা; সংক্ষেপে,—যে সুরের উচ্চতা = সা-কসি, সে সুরের তারের আয়তন = সা-দাঁড়ি। স্বর-ক্ষেত্রের আটটি দাঁড়ি এবং আটটি কসির প্রত্যেকের সম্বন্ধেই ঐ কথা খাটে। সা-অপেক্ষা যে সুর যতগুণ উচ্চ, সা-কসি অপেক্ষা সেই সুরের কসিকে ততগুণ বড় করিয়া আঁকা হইয়াছে; এজন্য প্রত্যেক সুরের কসি = তাহার উচ্চতার পরিমাণ।

বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, যদি একগুণ দ্রুত স্পন্দন-হইতে এবং একগুণ আয়ত তার-হইতে সা (অর্থাৎ যে কোন সুরকে একমাত্রা উচ্চ বলিয়া ধার্য্য করা যায় সেই সুর) উৎপন্ন হয় তবে দ্বিগুণ দ্রুত স্পন্দন-হইতে এবং অর্দ্ধেক ছোটো তার হইতে এক সপ্তক উপরের সা উত্থিত হইবে; দ্বিগুণের দ্বিগুণ (চতুর্গুণ) দ্রুত স্পন্দন-হইতে এবং অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক (চতুর্থাংশ) ছোটো তার-হইতে আর এক সপ্তক উচ্চের সা উত্থিত হইবে; চতুর্গুণের দ্বিগুণ (অষ্টগুণ) দ্রুত স্পন্দন-হইতে এবং চতুর্থাংশের অর্দ্ধাংশ (অষ্টমাংশ) ছোটো তার-হইতে আর এক সপ্তক উচ্চের সা উত্থিত হইবে, ইত্যাদি। অতএব সা-হইতে এক সপ্তক উপরের সা দ্বিগুণ উচ্চ, দুই সপ্তক উপরের সা দ্বিগুণের দ্বিগুণ চতুর্গুণ উচ্চ, তিন সপ্তক উপরের সা তাহার দ্বিগুণ অষ্ট গুণ উচ্চ, চারি সপ্তক উপরের সা তাহার দ্বিগুণ ষোড়শ গুণ উচ্চ। আর একটি বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে একের দ্বিগুণ, তিন গুণ, চারি গুণ, পাঁচ-গুণ, ইত্যাদি প্রকার একোত্তর-ক্রমে যত গুণ উচ্চ সুর শ্রবণেন্দ্রিয়ের আয়ত্তের মধ্যে আসিতে পারে সকল-গুলিই সূক্ষ্মরূপে সা'র সহিত অনুরণিত হয়। তৃতীয় সপ্তক পর্য্যন্ত যে সুর গুলি অনুরণিত হয় সেই গুলিকেই সঙ্গীতজ্ঞেরা—কোমল-নিখাদ-বাদে—স্ব-গ্রামের সংবাদী-সুর এবং নিম্ন গ্রামের অনুবাদী সুর, ও কোমল-নিখাদ-সমেত উচ্চ গ্রামের বিবাদী সুর বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। পঞ্চম সপ্তকের সা পর্য্যন্ত যে যে সুর সা'র সহিত অনুরণিত হয়, তাহার পরিমাণাঙ্ক নিম্ন-স্থিত পাঁচটি পংক্তিতে ক্রমান্বয়ে সন্নিবেশিত হইল।

১
২, ৩
৪, ৫, ৬, [৭]
৮, ৯, ১০, (১১), ১২, (১৩), [১৪], ১৫
১৬ * * * * * * *

প্রথম পংক্তিতে ১, অর্থাৎ ১-গুণ উচ্চস্বর কিনা সা। দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম-স্থানে ২ অর্থাৎ প্রথম সপ্তকের সা-অপেক্ষা ২-গুণ উচ্চ স্বর কিনা দ্বিতীয় সপ্তকের (বা এক সপ্তক উচ্চের) সা। তৃতীয় পংক্তির প্রথম স্থানে ৪, অর্থাৎ গোড়ার সা-অপেক্ষা দ্বিগুণেরও দ্বিগুণ চতুর্গুণ উচ্চ স্বর, কিনা আর এক সপ্তক উচ্চের সা—তৃতীয় সপ্তকের সা। চতুর্থ পংক্তির প্রথম স্থানে ৮, অর্থাৎ গোড়ার সা-অপেক্ষা দ্বিগুণের দ্বিগুণ তস্য দ্বিগুণ ৮গুণ উচ্চ স্বর কিনা চতুর্থ সপ্তকের সা। এই রূপ চারিটি পংক্তির আদিতে চারিটি উত্তরোত্তর উচ্চ সপ্তকের সা'র পরিমাণাঙ্ক স্থাপিত হইল; এবং পঞ্চম পংক্তিতে শুদ্ধ কেবল পঞ্চম সপ্তকের সা'র পরিমাণাঙ্ক স্থাপিত হইল।

দ্বিতীয় পংক্তির দ্বিতীয়-স্থানে ৩, অর্থাৎ প্রথম সপ্তকের সা-অপেক্ষা ৩-গুণ উচ্চস্বর; তাহা দ্বিতীয়-সপ্তকের সা—যাহার পরিমাণাঙ্ক ২—তাহা অপেক্ষা উঁচু স্বর, এবং তৃতীয় সপ্তকের সা—যাহার পরিমাণাঙ্ক ৪—তাহা অপেক্ষা নীচু স্বর,—তাহা দ্বিতীয় সপ্তকের পা।

তৃতীয় পংক্তির দ্বিতীয় স্থানে ৫, তৃতীয় স্থানে ৬ চতুর্থস্থানে ৭। ইহা বলা বাহুল্য যে উহারা ক্রমান্বয়ে প্রথম সপ্তকের সা অপেক্ষা ৫গুণ ৬গুণ এবং ৭গুণ উচ্চস্বর, সুতরাং উহারা তৃতীয় সপ্তকের সা—যাহার পরিমাণাঙ্ক ৪—তাহা অপেক্ষা উঁচু স্বর এবং চতুর্থ সপ্তকের সা—যাহার পরিমাণাঙ্ক ৮—তাহা অপেক্ষা নীচু স্বর; ঐ তিনটি স্বর ক্রমান্বয়ে তৃতীয় সপ্তকের গা, পা এবং নি (কোমল নিখাদ)। নি সা-গ্রামের গ্রাম-বহির্ভূত বটে, কিন্তু তাহা এক গ্রাম উচ্চের বিবাদী শ্রেণীভুক্ত; কেবল সা-গ্রামের গ্রাম-বহির্ভূত বলিয়া তাহা আপাততঃ পরিত্যক্ত হইতেছে; আপাততঃ পরিত্যাজ্যের দুই পার্শ্বে [ ] এইরূপ ঘের দেওয়া হইল, এবং যাহা একেবারেই পরিত্যাজ্য তাহার দুই পার্শ্বে ( ) এইরূপ ঘের দেওয়া হইল।

চতুর্থ পংক্তির দ্বিতীয় স্থানে ৯, তৃতীয় স্থানে ১০, চতুর্থ স্থানে ১১, পঞ্চম স্থানে ১২, ষষ্ঠ স্থানে ১৩, সপ্তম-স্থানে ১৪, অষ্টম স্থানে ১৫। ৯, ১০ প্রভৃতি অঙ্ক-পরম্পরা প্রথম সপ্তকের সা' অপেক্ষা ৯, ১০, প্রভৃতি গুণ উচ্চস্বর, ইহা বলা বাহুল্য। এখন,—

৮ = চতুর্থ-সপ্তকের সা

৯ = চতুর্থ সপ্তকের রে।

১০ = চতুর্থ সপ্তকের গ।

১১ পরিত্যাজ্য।

১২ = চতুর্থ সপ্তকের প।

১৩ পরিত্যাজ্য।

১৪ = চতুর্থ সপ্তকের কোমল নিখাদ। ইহা পূর্ব্বোল্লিখিত কারণে আপাততঃ পরিত্যাজ্য।

১৫ = চতুর্থ সপ্তকের নি।

১৬ = পঞ্চম সপ্তকের সা।

১১ এবং ১৩ অঙ্ক পরিত্যজ্য হইল কেন ?—ইহার অবশ্য বিশেষ একটি কারণ আছে। ৮, ৯, ১০, চতুর্থ সপ্তকের সা-রে-গ স্থানে বসিয়াছে, ১২, ১৫, প-নি-স্থানে বসিয়াছে ; দেখ, ৮ অপেক্ষা ১০ যতগুণ উচ্চ, ১২ অপেক্ষা ১৫ঠিক ততগুণ উচ্চ ; এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সা-গ ব্যবধানের সহিত প-নি ব্যবধানের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে ; কিন্তু ১১ এবং ১৩ অঙ্কের মধ্যে এরূপ একটা সৃষ্টিছাড়া সম্বন্ধ যে অন্য কোন দুই স্বরের পরিমাণাঙ্কের মধ্যে সেরূপ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না, এজন্য ১১ এবং ১৩ অঙ্কের পরিবর্ত্তে এরূপ দুইটি অঙ্ক বসানো কর্ত্তব্য যাহার সহিত অন্যান্য স্বরের পরিমাণাঙ্কের সৌসাদৃশ্য বর্ত্তিতে পারে।

১১ এবং ১৩ অঙ্কের স্থান চতুর্থ সপ্তকের ম এবং ধা'র স্থান; ম এবং ধা'র পরিমাণাঙ্ক যে কি তাহা একটু পরেই কসিয়া বাহির করা যাইবে। সর্ব্বশুদ্ধ ৪র্থ সপ্তকের সা-হইতে ৫ম সপ্তকের সা পর্য্যন্ত গ্রাহ্য (ঘের-বর্জ্জিত) এবং ত্যজ্য (ঘের-দেওয়া) আটটি স্বরের নিম্নস্থিত আটটি পরিমাণাঙ্ক পাওয়া যাইতেছে,—

৮, ৯, ১০, (১১), ১২, (১৩), [১৪], ১৫, ১৬।

এই আটটি অঙ্কের প্রত্যেকেই প্রথম সপ্তকের সমস্থানীয় অঙ্কের আট-গুণ,—অর্থাৎ ৪র্থ সপ্তকের সা-অঙ্ক যেমন ১ম সপ্তকের সা-অঙ্কের (১-এর) আটগুণ,তেমনিই চতুর্থ সপ্তকের রে-অঙ্ক প্রথম সপ্তকের রে-অঙ্কের আট গুণ, চতুর্থ সপ্তকের গা-অঙ্ক প্রথম-সপ্তকের গা-অঙ্কের আট-গুণ ইত্যাদি। অতএব উপরিস্থিত চতুর্থ সপ্তকের গ্রাহ্য এবং ত্যজ্য অঙ্ক-গুলির অষ্টমাংশ গ্রহণ করিলেই প্রথম সপ্তকের গ্রাহ্য এবং ত্যজ্য অঙ্কগুলি পাওয়া যাইবে, যথা,— প্রথম সপ্তকের গ্রাহ্য এবং ত্যজ্য অঙ্ক এই কয়টি,

৮-এর ৮ মাংশ		১
৯-এর ঐ	=	১৵০
১০-এর ঐ	=	১।০
(১১-র ঐ)		
১২-র ঐ	=	১॥০
(১৩-র ঐ)		
[১৪-র ঐ]	=	১৸০
১৫-র ঐ	=	১৸৵০
১৬-র ঐ	=	২

আনা-গণ্ডার দায়-হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ১-কে ৩৬০ অংশের সমষ্টি বলিয়া ধরা-যা'ক্, তাহা হইলে উপরের ঐ ১-হইতে ২-পর্য্যন্ত নয়টি অঙ্কের জায়গায় নিম্ন-লিখিত ৯-টি অঙ্ক বসিবে,—

৩৬০, ৪০৫, ৪৫০, (৪৯৫), ৫৪০, (৫৮৫,) [৬৩০], ৬৭৫, ৭২০।

উপরের ঐ অঙ্কগুলি দেখিবে যে,উহারা উত্তরোত্তর সমান্তর-ক্রমে বসিয়াছে—অর্থাৎ ৩৬০-এর যত অন্তরে ৪০৫, ৪০৫-এর তত অন্তরে ৪৫০ ইত্যাদি-ক্রমে বসিয়াছে। দেখিবে যে, পাশাপাশি-স্থিত প্রত্যেক অঙ্কদ্বয়ের মধ্যে ৪৫ ব্যবধান, যথা,—৩৬০ আর ৪৫=৪০৫, ৪০৫ আর ৪৫=৪৫০, ইত্যাদি।

যে-দুটি অঙ্ক দুই প্রান্ত-স্থিত ৩৬০ এবং ৭২০ অঙ্কের মধ্যস্থলে ঠিক সমান্তর-ক্রমে

বসিতে পারে,এমনি ছুটি অঙ্ক কসিয়া বাহির কর তাহা হইলেই মধ্যম এবং ধৈবতের অঙ্ক পাইবে;—দেখিবে যে, ৩৬০ এবং ৭২০'র মধ্যস্থলে ৪৮০ এবং ৬০০ ঠিক সমান্তর- ক্রমে বসিয়াছে, যথা,—

৩৬০, ৪৮০, ৬০০, ৭২০,

৩৬০ আর ১২০=৪৮০, ৪৮০ আর ১২০= ৬০০, ৬০০ আর ১২০=৭২০। অতএব মাঝের ঐ ছুটি অঙ্ক ৪৮০ এবং ৬০০ মধ্যম এবং ধৈবতের স্থানে রাখা হউক্—মা'র ত্যজ্য অঙ্ক ৪৯৫'এর পরিবর্ত্তে ৪৮০ এবং ধা'র ত্যজ্য অঙ্ক৫৮৫-র পরিবর্ত্তে ৬০০ রাখা হউক্, আর কোমল নিখাদের ৬৩০ অঙ্ক আপাততঃ পরিত্যাগ করা হউক্,তাহা হইলেই সা রে গা মা পা ধা নি সা এই সাতটি স্বরের সাতটি পরিমাণাঙ্কের সমস্ত-গুলি ধরিয়া পাওয়া যাইবে; তাহা যথা-ক্রমে এই,—

৩৬০, ৪০৫, ৪৫০, ৪৮০, ৫৪০, ৬০০, ৬৭৫, ৭২০।

ধা'র পরিমাণাঙ্ক ৬০০ এবং নি'র পরিমাণাঙ্ক ৬৭৫ এ দুয়ের মধ্যস্থলে কোমল নিখাদকে বসাইলে দেখিতে ভাল বই মন্দ হয় না, তাহা হইলে পাশাপাশি-স্থিত অঙ্কদ্বয়-গুলির মাঝ খানকার আটটি ব্যবধান দুই প্রান্ত হইতে মধ্য-দেশ পর্য্যন্ত সমান সমান হইয়া দাঁড়ায়, যথা,—

সা = ৩৬০

ব্যবধান ৪৫

রে = ৪০৫

ঐ..৪৫

গ = ৪৫০

ঐ..৩০

ম = ৪৮০

ঐ..৬০

প = ৫৪০

ঐ..৬০

ধ = ৬০০

ঐ..৩০

নি = ৬৩০

ঐ..৪৫

নি = ৬৭৫

ঐ..৪৫

সা = ৭২০

দেখ যেমন উপর-হইতে ধরিলে মধ্য দেশ পর্য্যন্ত ৪৫, ৪৫, ৩০, ৬০ এই চারিটি ব্যবধান দেখিতে পাওয়া যায়, নীচে হইতে ধরিলেও অবিকল সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর-ক্ষেত্রে যদি নী এবং ধা'র মধ্যস্থলে নী বসানো যায় তবে সা-নী-রেখা হবে=নী-নী-রেখা; তাহা হইলে টুক্‌রা রেখা ব্যবধান গুলি (স্বরের উচ্চতা-ব্যবধান নহে) এই রূপ দাঁড়াইবে,—

সা-রে = সা-নী

রে-গা = নী-নী

গা-মা = নী-ধা

মা-পা = পা-ধা।

কোমল নিখাদ বাদ দিলেও ব্যবধানের বিশেষ কোন অমিল হয় না, যথা,—

সা-রে = সা-নী

রে-মা = নী-ধা

মা-পা = পা-ধা

এ-তিনটি মিল পাওয়া যায়,— কেবল রে-গা = নী-নী এইটির অপ্রতুল হয়।

স্বরের পরিমাণাঙ্ক-গুলির মধ্যেকার মা এবং ধা'র ত্যাজ্য অঙ্ক ৪৯৫ এবং ৫৮৫'র পরিবর্ত্তে ৪৮০ এবং ৬০০ রাখিবা-মাত্র তাবৎ অঙ্কগুলির মধ্যে চারিদিক্ হইতে সৌসাদৃশ্য ঘনীভূত হইয়া উঠিল যথা,—

সা-অঙ্ক-৩৬০-এর যতগুণ উচ্চে রে-অঙ্ক ৪০৫,
মা-অঙ্ক-৪৮০-র ততগুণ উচ্চে পা-অঙ্ক ৫৪০ ;
সা-অঙ্ক-৩৬০-এর যত-গুণ উচ্চে গা-অঙ্ক-৪৫০,
মা-অঙ্ক-৪৮০-র ততগুণ উচ্চে ধা-অঙ্ক-৬০০ ;
ম-অঙ্ক ৪৮০-র যতগুণ নীচে গা-অঙ্ক-৪৫০,
সা'-অঙ্ক-৭২০-র ততগুণ নীচে নি-অঙ্ক-৬৭৫ ;
রে-অঙ্ক ৪০৫-এর যতগুণ উচ্চে মা-অঙ্ক-৪৮০,
ধা-অঙ্ক-৬০০-র ততগুণ উচ্চে সা'-অঙ্ক-৭২০;
সা-অঙ্ক-৩৬০-এর যতগুণ উচ্চে পা অঙ্ক-৫৪০,
মা-অঙ্ক-৪৮০-র ততগুণ উচ্চে সা'-অঙ্ক-৭২০ ;
সা-অঙ্ক-৩৬০এর যতগুণ উচ্চে মা-অঙ্ক ৪৮০,
পা-অঙ্ক-৫৪০এর ততগুণ উচ্চে সা' অঙ্ক-৭২০।

যদি ত্যাজ্য অঙ্ক-দুটিকে স্ব-স্ব-স্থানে থাকিতে দেওয়া যাইত তবে অতগুলি মিলের একটি মিল-ও খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না।

এখন স্বর-ক্ষেত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাঁধুনি কিরূপ তাহা দেখা যাইতেছে; প্রথমে এ-সা-রেখা এবং ই-সা-রেখা এই দুই সমদীর্ঘ রেখার উভয়কেই একগুণ লম্বা বলিয়া ধরা হইয়াছে ; এ-সা-রেখা হচ্চে সা-কসি এবং ই-সা-রেখা হচ্চে সা-দাঁড়ি। এ-সা একগুণ লম্বা হওয়াতে বুঝাইতেছে যে, সা একগুণ উচ্চ স্বর, এবং ই-সা এক-গুণ লম্বা হওয়াতে বুঝাইতেছে যে, সা'র উচ্চারক তার একগুণ আয়ত। সা-সা'-রেখার ঠিক মধ্যস্থলে পা, পা-সা-রেখার ঠিক মধ্য-স্থলে গা, গা-সা-রেখার ঠিক মধ্য-স্থলে রে ; সা-রে যতটুকু রেখা, সা'-নী ততটুকু রেখা; বাকি রইল মা আর ধা ; সা-সা'কে—সা-মা সা-ধা ধা-সা'—এই তিন সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া মা এবং ধা'র স্থান ঠিক করা হইয়াছে। এ-সা' রেখার ঠিক মধ্যস্থলে সা; ইতি পূর্ব্বে এ-সা রেখাকে একগুণ লম্বা বলিয়া ধরা হইয়াছে,— এ-সা'-রেখা তবে দ্বিগুণ লম্বা। ১-গুণ ২-গুণ ৩-গুণ প্রভৃতি লম্বা রেখাকে ১, ২, ৩, প্রভৃতি সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করিলে দাঁড়ায়,—সা-কসি = ১, সা' কসি = ২, কিনা সা-অপেক্ষা সা' দ্বিগুণ উচ্চস্বর। পা ঠিক সা-সা'-রেখার মধ্যস্থলে এজন্য পা-কসি (অর্থাৎ এ-পা-রেখা) = ১৷৷০, কিনা সা-অপেক্ষা পা ১৷৷০ গুণ উচ্চস্বর। গা ঠিক পা-সা-রেখার মধ্যস্থলে এজন্য গা-কসি (অর্থাৎ এ-গা-রেখা) = ১।০, কিনা সা-অপেক্ষা গা ১।০ গুণ-উচ্চ স্বর। রে ঠিক গা-সা-রেখার মধ্যস্থলে, এজন্য রে-কসি (অর্থাৎ এ-রে-রেখা) = ১৵, কিনা সা-অপেক্ষা রে ১৵০ গুণ-উচ্চ স্বর। নী-সা' = রে সা = ৵০, এজন্য নী-কসি (অর্থাৎ এ-নী-রেখা) = ১৸৵০, কি না সা-অপেক্ষা নি ১৸৵০ গুণ উচ্চস্বর। বাকি রইল কেবল ম আর ধা ; সা' যে-তিনটি সমান-ভাগে বিভক্ত হইয়াছে তাহার প্রথম ভাগ হচ্চে সা-মা, দ্বিতীয় ভাগ হচ্চে মা-ধা, অতএব সা-মা = ১-তৃতী-

য়াংশ (অর্থাৎ একের তিন ভাগের এক ভাগ) মা-ধা = তাহার দ্বিগুণ সুতরাং ২-তৃতীয়াংশ; অতএব মা-কসি (অর্থাৎ এ-মা-রেখা) = ১ আর ১-তৃতীয়াংশ = ৩-তৃতীয়াংশ আর ১-তৃতীয়াংশ = ৪-তৃতীয়াংশ (অর্থাৎ ৪এর ৩ভাগের একভাগ); ধা-কসি (অর্থাৎ এ-ধা-রেখা) = ১ আর ২-তৃতীয়াংশ = ৩-তৃতীয়াংশ আর২-তৃতীয়াংশ = ৫-তৃতীয়াংশ; কিনা সা-অপেক্ষা ম ৪-তৃতীয়াংশ গুণ উচ্চ সুর এবং সা-অপেক্ষা ধা ৫-তৃতীয়াংশ গুণ উচ্চ সুর। অতএব সব-শুদ্ধ ধরিয়া এইরূপ পাওয়া যাইতেছে

কসি		পরিমাণাঙ্ক
সা...	...	...১
রে...	...	...১৵৹
গা...	...	...১।৹
মা...	...	৪-৩ য়াংশ
পা...	...	...১৷৹
ধা...	...	...৫-৩ য়াংশ
নী...	...	...১৮৵৹
সা...	...	.. ২

এই গেল সুরের উচ্চতা-জ্ঞাপক কসি গুলির পরিমাণাঙ্ক; এখন তারের আয়তন-জ্ঞাপক দাঁড়ি-গুলির পরিমাণ কিরূপ তাহা দেখা যাউক; সা-তন্ত (অর্থাৎ সা-ঐ-রেখার সরু অংশ) যে অক্ষরে গিয়া ঠেকিয়াছে, এ-হইতে সেই অক্ষর পর্য্যন্ত প্রসারিত এ-ঐ-রেখা-কর্ত্তৃক সা-দাঁড়ি যে-স্থান-টিতে কর্ত্তিত হইয়াছে সেই-স্থান-টির মধ্য দিয়া স-কসি (অর্থাৎ স-হইতে যে স্থূল কসি যত-দুর পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে সেই কসি) যাহা সা-কসির সমান্তর-বাহী (parallel), সেই স-কসির অন্ত-হইতে সা-পর্য্যন্ত লম্বিত রেখা টুকুকে স্থূল করিয়া তাহাকেই সা দাঁড়ি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এইরূপ করাতেই দাঁড়াইয়াছে সা-দাঁড়ি × সা-কসি = ১। এমনি আবার নী-তন্ত (অর্থাৎ নী-ও-রেখার সরু অংশ) যে-অক্ষরে গিয়া ঠেকিয়াছে এ-হইতে সেই অক্ষর পর্য্যন্ত প্রসারিত এ-ও রেখা সা-দাঁড়িকে যে-স্থানে কর্ত্তন করিয়াছে, তাহার মধ্য-দিয়া প্রসারিত নি-কসি যাহা নী-কসির সমান্তর-বাহী, সেই নি-কসির অন্ত-হইতে নী-পর্য্যন্ত লম্বিত রেখা-টুকুকে স্থূল করিয়া তাহাকেই নী-দাঁড়ি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; তাহাতে করিয়াই দাঁড়াইয়াছে—নী-দাঁড়ি × নী কসি = ১। অতএব যে সুরের কসির পরিমাণকে যত দিয়া গুণ করিলে ১হয় তাহাই সেই সুরের দাঁড়ির পরিমাণ, অথবা—যাহা একই কথা—যে-সুরের উচ্চতার পরিমাণঙ্ককে যে অঙ্ক দিয়া গুণ করিলে ১ হয়, তাহাই সেই সুরের উচ্চারক তারের আয়তনের পরিমাণাঙ্ক। সা'র উচ্চতা = ১, তাহাকে কি দিয়া গুণ করিলে ১হয়? অবশ্য ১দিয়া,—তাই সা'র উচ্চারক তারের সুতরাং সা-দাঁড়ির আয়তন = ১। রে'র উচ্চতা = ১৵৹, তাহাকে কিদিয়া গুণ করিলে ১ হয়? ১৵৹ হচ্চে ৯-অষ্টমাংশ (অর্থাৎ ৯-এর ৮-ভাগের এক ভাগ), তাহাকে ৮-নবমাংশ দিয়া গুণ করিলে ১ হয়, অতএব রে-দাঁড়ির আয়তন = ৮-নব-

মাংশ। গা'র উচ্চতা = ১।০ = ৫-৪র্থাংশ, অতএব গা-দাঁড়ির আয়তন ৪-৫মাংশ। মা'র উচ্চতা = ৪-৩য়াংশ অতএব মা-দাঁড়ির আয়তন = ৩-৪র্থাংশ = ৸০। পা'র উচ্চতা = ১৷৷০ = ৩-২য়াংশ, অতএব পা-দাঁড়ির আয়তন = ২-৩য়াংশ। ধা'র উচ্চতা = ৫-৩য়াংশ, অতএব ধা-দাঁড়ির আয়তন = ৩-৫মাংশ। নি'র উচ্চতা = ১৸৶০ = ১৫-৮মাংশ অতএব নি-দাঁড়ির আয়তন = ৮-১৫শাংশ। র্সা'র উচ্চতা = ২, অতএব র্সা-দাঁড়ির আয়তন = ১-২মাংশ = ৷৷০। যদি ৮—৯মাংশ, ৪-৫মাংশ প্রভৃতিকে সংক্ষেপে ৮-৯ম, ৪-৫ম ইত্যাদি রূপ সংকেত দ্বারা জ্ঞাপন করা যায় তবে স্বরোচ্চারক তারের আয়তনের পরিমাণাঙ্কগুলি এইরূপ দাঁড়ায়

স্বর	তারের আয়তন
সা...	১
রে...	৮-৯ম
গ	৪-৫ম
ম	৩-৪র্থ = ৸০
প	২-৩য়
ধ	৩-৫ম
নি...	৮-১৫শ
র্সা...	১-২য় = ৷৷০

স্বর-ক্ষেত্রস্থিত সা-কসি, অর্থাৎ সা'র উচ্চতা এবং সা-দাঁড়ি অর্থাৎ সা'র উচ্চারক তারের আয়তন, উভয়কেই যদি ৩৬০ বলিয়া ধরা যায় তবে নিম্ন-প্রকার ফল দাঁড়ায়,—

স্বর	কসি		দাঁড়ি	গুণ-ফল
সা	৩৬০	×	৩৬০ =	১২৯৬০০
রে	৪০৫	×	৩২০ =	ঐ
গা	৪৫০	×	২৮৮ =	ঐ
মা	৪৮০	×	২৭০ =	ঐ
পা	৫৪০	×	২৪০ =	ঐ
ধা	৬০০	×	২১৬ =	ঐ
নি	৬৭৫	×	১৯২ =	ঐ
র্সা......	৭২০	×	১৮০ =	ঐ

এখন সেতারের পর্দাস্থান স্বচ্ছন্দে পাওয়া পাইতে পারে, যথা,

সা-তন্তু = ৩৬০—৩৬০ = ০

ব্যবধান ৪০

রে-তন্তু = ৩৬০—৩২০ = ৪০

ঐ ৩২

গা-তন্তু = ৩৬০—২৮৮ = ৭২

ঐ ১৮

মা-তন্তু = ৩৬০—২৭০ = ৯০

ঐ ৩০

পা-তন্তু = ৩৬০—২৪০ = ১২০

ঐ ২৪

ধা-তন্তু = ৩৬০—২১৬ = ১৪৪

ঐ ২৪

নী-তন্তু = ৩৬০—১৯২ = ১৬৮

ঐ ১২

র্সা-তন্তু = ৩৬০—১৮০ = ১৮০

অতএব সা-পর্দা-হইতে ৩৬০-এর ৪০ ভাগ অন্তরে রে-পর্দা, রে-পর্দা হইতে ৩২ ভাগ অন্তরে গা-পর্দা, গা-পর্দা-হইতে ১৮ ভাগ অন্তরে মা-পর্দা, মা-পর্দা

হইতে ৩০ ভাগ অন্তরে পা-পর্দ্দা, পা-পর্দ্দা হইতে ২৪ ভাগ অন্তরে ধা-পর্দ্দা, ধা-পর্দ্দা হইতে ২৪ ভাগ অন্তরে নি-পর্দ্দা, নি-পর্দ্দা হইতে ১২ ভাগ অন্তরে সা-পর্দ্দা। অতএব

৩৬০'এর

স-রি-রেখা = ৪০ ভাগ
রি-গ-রেখা = ৩২ ঐ
গ-ম-রেখা = ১৮ ঐ

৯০

ম-প-রেখা = ৩০ ঐ
প-ধ-রেখা = ২৪ ঐ
ধ-নি-রেখা = ২৪ ঐ
নি-স-রেখা = ১২ ঐ

৯০

১৮০

উপরে দেখিবে স হইতে ম পর্য্যন্ত ৯০, এবং ম হইতে স' পর্য্যন্ত ৯০, সুতরাং ম-পর্দা ঠিক্ স-স'-রেখার মধ্যস্থলে বসিতে চায়;—এই কারণেই চতুর্থ স্বরের নাম মধ্যম বলিয়া প্রসিদ্ধ।

পাশাপাশিস্থ স্বর-দ্বয়ের মধ্যে একমাত্রা ব্যবধানই বা কাহাকে বলে, অর্দ্ধ-মাত্রা ব্যবধানই বা কাহাকে বলে, এখন তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম স্পষ্ট প্রকাশ পাইবে;—সা-অঙ্ক-৩৬০-এ তাহার ৮-মাংশ যোগ করিলে রে-অঙ্ক-৪০৫ হয়, রে-অঙ্ক-৪০৫-এ তাহার ৯-মাংশ যোগ করিলে গা-অঙ্ক-৪৫০ হয়; অতএব সা-রে-ব্যবধান (সা-রে রেখা-ব্যবধান নহে সা-রে স্বর-ব্যবধান) একের অষ্টমাংশ ও রে-গ-ব্যবধান একের নবমাংশ; পূর্ব্বোক্ত ব্যবধান অপেক্ষা শেষোক্ত ব্যবধান ১-৭২ম (অর্থাৎ একের ৭২-ভাগের ১-ভাগ) কম,—এই যা' কেবল; সে কতটুকু? না—স্বর-ক্ষেত্রের অন্তর্গত সা-রে-রেখার উপরিস্থিত ক্ষেত্র যাহা দীর্ঘে রে-দাঁড়ি এবং প্রস্থে সা-রে তাহাকে যদি সা-রে-স্তম্ভ বলা যায়, তবে সা-রে-স্তম্ভ হচ্চে সা-ক্ষেত্রের ৯মাংশ ও সা-রে-উ-ই ক্ষেত্র ঐ-একই-ক্ষেত্রের ৮ মাংশ, আর, সা-রে স্তম্ভের মস্তকের উপর যে একটি ছোট চৌকোণ ঘর দেখা যাইতেছে—কেবল সেই টুকু লইয়া উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু প্রভেদ;—সে ঘরটির আয়তন সা-ক্ষেত্রের ৭২ম অংশ মাত্র; নিতান্ত খাদের স্বর না হইলে ওটকু প্রভেদ সামান্য কর্ণে আমল পায় না। সা-রে-ব্যবধান এবং রে-গ-ব্যবধান ঐরূপ প্রায়-একই হওয়াতে মোটামুটি হিসাবে উভয়েকেই একমাত্রা ব্যবধান বলিয়া ধরা যাইতে পারে। গা-অঙ্ক-৪৫০-এ তাহার পঞ্চদশাংশ যোগ করিলে মা-অঙ্ক-৪৮০ হয়; সা-রে-ব্যবধান = ১-৮ম অর্থাৎ একের অষ্টমাংশ, রে-গ-ব্যবধান = ১-৯ম কিন্তু গ-ম-ব্যবধান = ১-১৫শ; অষ্টমাংশের ঠিক অর্দ্ধাংশ হচ্চে ষোড়শাংশ,—ষোড়শাংশ এবং পঞ্চদশাংশের মধ্যে প্রভেদ একের ২৪০ ভাগের এক ভাগ মাত্র,—সে কতটুকু? না—গা-মা-স্তম্ভ (যাহা দীর্ঘে মা-দাঁড়ি প্রস্থে গা-মা তাহা) সা-ক্ষেত্রের ১৬শ অংশ, আর গা-মা-স্তম্ভকে গা-দাঁড়ি পর্য্যন্ত দীর্ঘে বাড়া-

ইলে যে ক্ষেত্রটি উৎপন্ন হয় (অর্থাৎ যাহা দীর্ঘে গা দাঁড়ি প্রস্থে গা-মা) তাহা সা-ক্ষেত্রের ১৫শ অংশ; গা-মা-স্তম্ভের মস্তকের উপর গা-দাড়ির উদ্বৃত্ত অংশ পর্য্যন্ত যে একটি ছোটো ঘর আঁকা যাইতে পারে কেবল সেই টুকু লইয়া উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু প্রভেদ; সে ঘরটি সা-ক্ষেত্রের ২৪০শ অংশ মাত্র; সুতরাং মোটামুটি হিসাবে পঞ্চদশাংশকে ষোড়শাংশ বলিয়া—অষ্টমাংশের অর্দ্ধেক বলিয়া—ধরা যাইতে পারে; এইরূপ করিয়া পাওয়া যায় যে, সা-রে-ব্যবধান = একমাত্রা, রে-গ ব্যবধান = প্রায়-একমাত্রা, গ-ম ব্যবধান প্রায়-অর্দ্ধ-মাত্রা; কাজের সুবিধার অনুরোধে ঐ "প্রায়" কথাটা উঠাইয়া দিলে যেখানে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই সেখানে ও-কথাটা উল্লেখ করিবারই প্রয়োজন করে না। এখন বক্তব্য এই যে অষ্টকের ভিতর-কার পাশাপাশি-স্থিত স্বর দ্বয় মাত্রেরই মধ্যে— হয় একের অষ্টমাংশ ব্যবধান, নয় একের নবমাংশ ব্যবধান, নয় একের পঞ্চদশাংশ ব্যবধান,—হয় একমাত্রা ব্যবধান, নয় প্রায়-একমাত্রা ব্যবধান, নয় প্রায়-অর্দ্ধমাত্রা ব্যবধান,—ইহার ন্যূনাধিক নহে;—যথা—

সা-রে-ব্যবধান = এক-মাত্রা, রে-গ-ব্যবধান = প্রায় একমাত্রা, গ-ম ব্যবধান = প্রায় অর্দ্ধমাত্রা, ম-প-ব্যবধান = এক মাত্রা (কেন না ম-অঙ্ক ৪৮০তে তাহার অষ্টমাংশ যোগ করিলেই প-অঙ্ক-৫৪০ হয়), প-ধ-ব্যবধান = প্রায়-একমাত্রা (কেননা প-অঙ্ক-৫৪০এ তাহার নবমাংশ যোগ করিলেই ধা-অঙ্ক-৬০০ হয়), ধা-নি-ব্যবধান = এক-মাত্রা (কেননা ধা-অঙ্ক ৬০০'এ তাহার অষ্টমাংশ যোগ করিলেই নি-অঙ্ক-৬৭৫ হয়), নি-সা-ব্যবধান = প্রায় অর্দ্ধমাত্রা (কেননা নি-অঙ্ক ৬৭৫এ তাহার পঞ্চদশাংশ যোগ করিলেই সা-অঙ্ক-২ হয়)।

যে কোন স্বর হউক না কেন—(১) তাহাতে যদি তাহার ১-৮ম যোগ করা যায়, অথবা যাহা একই কথা—তাহাকে যদি ৯-৮ম দিয়া গুণ করা যায় তবে তাহাকে একমাত্রা উচ্চে উঠানো হয়, (২) তাহাতে যদি তাহার ১-৯ম যোগ করা যায় কিংবা—যাহা একই কথা—তাহাকে যদি ১০-৯ম দিয়া গুণ করা যায় তবে তাহাকে প্রায়-একমাত্রা-উচ্চে উঠানো হয়, আর (৩) যদি তাহাতে তাহার ১-১৫ম যোগ করা যায় কিংবা তাহাকে ১৬-১৫শ দিয়া গুণ করা যায় তবে তাহাকে প্রায়-অর্দ্ধমাত্রা-উচ্চে উঠানো হয়। (১) সা-হইতে এক মাত্রা উচ্চ ব্যবধান (অর্থাৎ সা-রে, ম-প, এবং ধ-নি'র ন্যায় ব্যবধান), (২) প্রায়-এক মাত্রা-উচ্চ ব্যবধান (অর্থাৎ রে-গ এবং পা-ধা'র ন্যায় ব্যবধান), ও (৩) প্রায় অর্দ্ধমাত্রা-উচ্চ ব্যবধান (অর্থাৎ গ-ম এবং নি-সা'র ন্যায় ব্যবধান), সমস্তেরই পরিমাণাঙ্ক এবং পরিমাণ-ক্ষেত্র নিম্নে লতা-বদ্ধ হইল। স্বর-ক্ষেত্রে সা-ক্ষেত্রকে যদি সা'র উচ্চতা বলিয়া ধরা যায় তবে সা-স্বর হইতে

	পরিমাণাঙ্ক	পরিমাণ-ক্ষেত্র
সা-রে-ব্যবধান =	১-৮ম =	সা-দাঁড়ি × সা-রে-রেখা

রে-গ ব্যবধান = ১-৯ম = রে-দাঁড়ি × রে-গা-রেখা

গ-ম ঐ = ১-১৫ম = গা-দাঁড়ি × গা-মা-রেখা

ম-প ঐ = ১-৮ম = মা-দাঁড়ি × মা-পা-রেখা

প-ধ- ঐ = ১-৯ম = পা-দাঁড়ি × পা-ধা-রেখা

ধ-নি ঐ = ১-৮ম = ধা-দাঁড়ি × ধা-নী-রেখা

নি-স৺ ঐ = ১-১৫শ = নী-দাঁড়ি × নী-স৺া-রেখা

একক্কে ৩৬০ অংশের সমষ্টি বলিয়া ধরিলে এবং সা-রে প্রভৃতি রেখার পরিবর্ত্তে তাহাদের পরিমাণাঙ্ক স্থাপন করিলে উপরের ঐ লতাটি নিম্নরূপ আকার ধারণ করে, যথা, সা-হইতে

	পরিমাণাঙ্ক	পরিমাণ-ক্ষেত্র	
সা-রে-ব্যবধান	= ৪৫	= সা-দাঁড়ি × ৪৫	
রে-গ ঐ	= ৪০	= রে-দাঁড়ি × ৪৫	} ৭৫
গ-ম ঐ	= ২৪	= গা-দাঁড়ি × ৩০	
ম-প ঐ	= ৪৫	= মা-দাঁড়ি × ৬০	
মা-ধ ঐ	= ৪০	= পা-দাঁড়ি × ৬০	
ধা-নি ঐ	= ৪৫	= ধা-দাঁড়ি × ৭৫	
নি-স৺া ঐ	= ২৪	= নি-দাঁড়ি × ৪৫	

ডা'ন দিক্কার অঙ্কগুলির উপর হইতে মধ্য পর্য্যন্ত যে তিনটি অঙ্ক (৪৫, ৭৫, ৬০) উত্তরোত্তর বসিয়াছে, নীচে হইতে মধ্য পর্য্যন্ত, সেই তিনটি অঙ্কই উত্তরোত্তর বসিয়াছে।

অঙ্ক-পাতের তিন প্রকার ক্রম যাহা প্রসিদ্ধ—কিনা (১) সমান্তর ক্রম (Arithmetical progression) অর্থাৎ প্রথম অঙ্ক হইতে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় হইতে তৃতীয়, তৃতীয় হইতে চতুর্থ-প্রভৃতি অঙ্ক পরম্পরা আনুপূর্ব্বিক সমান সমান অন্তরে স্থাপন করিবার ক্রম, যথা ২, ৪, ৬, ৮, ইত্যাদি; (২) সমগুণ ক্রম (Geometircal progression) অর্থাৎ আনুপূর্ব্বিক সমান-সমান-গুণ অন্তরে অঙ্ক স্থাপন করিবার ক্রম, যথা ২, ৪, ৮, ১৬ ইত্যাদি; (৩) সমান্তরাংশ ক্রম (Harmonical progression) অর্থাৎ উত্তরোত্তর একের সমান্তর অংশ পরম্পরা স্থাপন করিবার ক্রম, যথা, ১-২য়, ১-৪র্থ, ১-৬ষ্ঠ, ১-৮ম, অথবা যাহা একই কথা, ও-গুলিকে ২৪দিয়া গুণ করিয়া ২৪এর ১২, ৬, ৪, ৩, এই চারিটি অংশ পরম্পরা; কিংবা ১, ১-২য়, ১-৩য়, ১-৪র্থ, অথবা যাহা একই কথা ১২র ১২, ৬, ৪, ৩, এই চারিটি অংশ পরম্পরা ;—ঐ তিন প্রকার ক্রমের প্রত্যেকেই—হয় স্বরের পরিমাণাঙ্ক, নয় তারের পরিমাণাঙ্ক, নয় উভয়ের পরিমাণাঙ্ক স্থলে নেত্র-পথে উপস্থিত হয় ;—যথা,

প্রথমতঃ,—সা-হইতে স৺া পর্য্যন্ত সা, গা, পা, নি, স৺া, এই কয়টি স্বর যাহার প্রথম তিনটি স্বর স্বগ্রামের সম্বাদী স্বর এবং যাহা সর্ব্বসমেত একগ্রাম উচ্চের বিবাদী স্বর, ঐ কয়টী স্বরের পরিমাণাঙ্ক গুলি ঠিক সমান্তর-ক্রমে বসিয়াছে, যথা,—

স্বর		উচ্চতা
সা	=	৩৬০
ব্যবধান	... ...	৯০

গ	=	৪৫০
ব্যবধান		৯০
প	=	৫৪০
ঐ		৯০
নি	=	৬৩০
ঐ		৯০
স'া	=	৭২০

দ্বিতীয়তঃ,—সা-হইতে স'া পর্য্যন্ত সা, মা, ধা, স'া এই কয়টি স্বর যাহা স্বগ্রামের অনুবাদী স্বর তাহারাও ঠিক সমান্তর-ক্রমে বসিয়াছে যথা,—

স্বর		উচ্চতা
সা	=	৩৬০
ব্যবধান		১২০
ম	=	৪৮০
ঐ		১২০
ধা	=	৬০০
ঐ		১২০
স'া	=	৭২০

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সা-অঙ্ক হইতে স'া অঙ্ক পর্য্যন্ত সমান্তর ক্রমে ৫-টি অঙ্ক গ্রহণ করিলে, সর্ব্বসমেত এক—গ্রাম উচ্চের বিবাদী স্বরগুলির অঙ্ক এবং কোমল-নিখাদ-বাদে স্বগ্রামের সংবাদী স্বরগুলির অঙ্ক পাওয়া যায়, আর সা-অঙ্ক হইতে স'া-অঙ্ক পর্য্যন্ত সমান্তর-ক্রমে চারিটি অঙ্ক গ্রহণ করিলে স্ব-গ্রামের অনুবাদী স্বর পাওয়া যায়।

তৃতীয়তঃ, রে-হইতে নি-পর্য্যন্ত তিনটি স্বর সমান্তর-ক্রমে গ্রহণ করিলে স্ব-গ্রামের যে-তিনটি বিবাদী স্বর নিম্ন গ্রামের সংবাদী স্বর, সেই তিনটি পাওয়া যায় যথা,—

স্বর		উচ্চতা
রে	=	৪০৫
ব্যবধান		১৩৫
পা	=	৫৪০
ঐ		১৩৫
নি	=	৬৭৫

পুনশ্চ যে-যে-স্বর-দ্বয়ের মধ্যে এক-এক সপ্তক ব্যবধান, সেই সেই স্বর-পরম্পরার উচ্চতা এবং তার উভয়েরই পরিমাণাঙ্ক উত্তরোত্তর সমগুণ-ক্রমে অবস্থিতি করে, যথা,—

১ম সা	=	৩৬০
গুণ		২
২য় সা	=	৭২০
ঐ		২
৩য় সা	=	১৪৪০
ঐ		২
৪র্থ সা	=	২৮৮০

১ম-রে, ২য়-রে তথা ১ম-গা ২য়-গা প্রভৃতিও ঐরূপ দ্বিগুণ-দ্বিগুণ দূরে অবস্থিতি করে ইহা বলা বাহুল্য।

আর, যে-যে স্বরের উচ্চতার অঙ্ক পরম্পরা সমান্তর ক্রমে অবস্থিতি করে সেই সেই স্বরের তারের অঙ্ক-পরম্পরা সমান্তরাংশ ক্রমে অবস্থিতি করে; আনা গণ্ডা এড়াইবার জন্য তারের পরিমাণাঙ্ক গুলিকে ৭ দিয়া গুণ করিলে এইরূপ পাওয়া যায়,—

স্বর		তারের পরিমাণ	
সা	=	২৫২০	
ব্যবধান	...	...	৫০৪
গা	=	২০১৬	
ঐ	...	...	... ৩৩৬
পা	=	১৬৮০	
ঐ	...	...	... ২৪০
নি	=	১৪৪০	
ঐ	...	...	... ১৮০
র্সা	=	১২৬০	

সমান্তরাংশ রাশির বিশেষ একটি গুণ এই যে তাহার ভিতরকার কোন অঙ্ক হইতে যদি দ্বিতীয় ডিঙাইয়া তৃতীয় অঙ্ক গ্রহণ করা যায় তবে প্রথম অপেক্ষা তৃতীয় যত-গুণ ছোটো বা বড়, প্রথম-দ্বিতীয়ের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান অপেক্ষা দ্বিতীয়-তৃতীয়ের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান ঠিক ততগুণ ছোটো বা বড়; তাই উপরিস্থিত তারের অঙ্ক-রাশির মধ্যে প্রথম স্থানীয় অঙ্ক ২৫২০ অপেক্ষা তৃতীয় স্থানীয় অঙ্ক ১৬৮০ যতগুণ কম—প্রথম স্থানীয় ব্যবধান ৫০৪ অপেক্ষা দ্বিতীয় স্থানীয় ব্যবধান ৩৩৬ ঠিক ততগুণ কম; যথা—প্রথম-ব্যবধান-৫০৪ × ৫ = প্রথম অঙ্ক ২৫২০—কি না প্রথম ব্যবধান প্রথম অঙ্কের পঞ্চমাংশ, দ্বিতীয় ব্যবধান-৩৩৬ × ৫ = তৃতীয় অঙ্ক ১৬৮০—কি না দ্বিতীয় ব্যবধান তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চমাংশ; অতএব প্রথম অঙ্ক এবং তৃতীয় অঙ্কের মধ্যে যতগুণ তারতম্য—প্রথম ব্যবধান এবং দ্বিতীয় ব্যবধানের মধ্যে ঠিক ততগুণ তারতম্য। তেমনি আবার দ্বিতীয় ব্যবধান ৩৩৬ × ৬ = দ্বিতীয় অঙ্ক ২০১৬, তৃতীয়-ব্যবধান ২৪০ × ৬ = চতুর্থ অঙ্ক ১৪৪০; অতএব দ্বিতীয় অঙ্ক এবং চতুর্থ অঙ্কের মধ্যে যতগুণ তারতম্য—দ্বিতীয় ব্যবধান এবং তৃতীয় ব্যবধানের মধ্যে ঠিক ততগুণ তারতম্য। সা, মা, ধা, র্সা, এই কয়টি অনুবাদী স্বরের তথা রে, পা, নি, এই-তিনটি বিবাদী স্বরের তারের পরিমাণাঙ্ক-গুলির মধ্যেও ঐরূপ সমান্তরাংশ ক্রম দেখিতে পাওয়া যাইবে ইহা বলা বাহুল্য।

ক্রমশঃ

মুখ ও মনোভাব।

অনসূয়া রাজা দুষ্মন্তসম্বন্ধে প্রিয়ম্বদার সংশয় দূর করিবার জন্য বলিল, "এন্থ দাব বীসত্থা হোহি, ণতাদিসা আকিদি বিসেসা গুণবিরহিণো হোন্তি।" (এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক, তাদৃশ আকৃতি গুণহীন হয় না); আকৃতির অর্থ মুখাদির গঠন বুঝিতে হইবেক। মানুষের অবয়বের দৈর্ঘ্যপ্রস্ত হইতে আমরা তাহার মনোগত ভাবের কতকটা আভাস পাইয়া থাকি। অবয়বের গঠন

এবং অবয়ব-মধ্যস্থিত চিহ্নসকল ধরিয়া সমস্ত মনোবৃত্তি কি করিয়া পাঠ করিতে হয় তাহা আমরা জন-বিদ্যা হইতে পাই। মুখের সহিত মনোভাবের সম্বন্ধ নির্ণয় করা জন-বিদ্যার একটি শাখা মাত্র। * মানুষের মুখাকৃতির দুই প্রকার ভাব হইতে আমরা তাহাদের মনোবৃত্তি পাঠ করিতে পারি, একটি স্থায়ীভাব—অপরটি ক্ষণস্থায়ী ভাব। মুখে মানুষের মানসিক ভাব যেরূপ স্পষ্ট প্রতিফলিত হয় তাহা শরীরের আর কোন অঙ্গে হইতেই পারে না। কৃষক তাহার শস্যের শীষ দেখিবামাত্র যেমন তাহার ফসলের ভাবি-বৃত্তান্ত অনায়াসে গণনা করিয়া বলিতে পারে, তেমনি মানুষের মুখ দেখিলেই জন-বিদ্যা-বিৎ তাহার মনের ভাব বলিতে পারেন। য়ুরোপীয় কয়েকটি জন-বেত্তা মুখের স্থায়ী গঠন-ভঙ্গী হইতে যে মনোগত ভাব অনুমান করা যাইতে পারে তাহা স্পষ্ট অস্বীকার করেন। Herbert Spencer তাঁহাদের মত এই বলিয়া খণ্ডন করিতেছেন যে মুখের ক্ষণস্থায়ী পরিবর্ত্তন মানসিক ভাবোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হইয়াই থাকে, এবং সেই পরিবর্ত্তন ক্রমাগত হইতে থাকিলে তাহা মুখে একেবারে বদ্ধমূল হইয়া যায়; এমন কি মুখ-গঠনের সেই পরিবর্ত্তন বংশপরম্পরায়ও প্রবাহিত হইয়া থাকে। এ কথা যে কতদূর সত্য তাহা বলা বাহুল্য। দৃষ্টান্ত দেখ, একটি কোপন-স্বভাব লোকের মূর্ত্তি দেখিলেই আমরা তাহার প্রকৃতি জানিতে পারি। তাহার কারণ কি? ক্রোধ বৃত্তিকে সে এত প্রশ্রয় দিয়াছে যে, ক্রোধ হইলে মুখের যে সমস্ত মাংসপেশী বিস্তৃত ও সঙ্কুচিত হয়, সেই সকল মাংসপেশী পুনঃ পুনঃ বিস্তৃত ও সঙ্কুচিত হওয়াতে মুখ ক্রমে বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধব্যঞ্জক হইয়া দাঁড়ায়। যাহারা প্রফুল্ল-চিত্তে দিন যাপন করে,তাহাদের ওষ্ঠপ্রান্ত এবং কপোলের মাংসপেশী এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, তাহা হইতে তাহাদের মনের হাস্যভাব ফুটিয়া বাহির হয়। মুখের প্রশান্তভাব হইতে আমরা মনের প্রশান্ত ভাব অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারি। উক্ত জনবেত্তারা মুখাকৃতির স্থায়ী পরিবর্ত্তনের সহিত মনোভাবের সম্বন্ধ যদিও স্বীকার করেন না, তথাপি মানসিক ভাবের উদয়ে মুখের যে একটি ক্ষণিক পরিবর্ত্তন হয় তাহা তাঁহারা সত্য বলিয়া মানেন। সর্ব্বপ্রকৃতিদর্শী মহাকবি সেক্ষপীর একস্থলে

"I saw his heart in his face."—

এই কথা বলিয়া মুখে যে ক্ষণকালের নিমিত্ত হৃদয় প্রতিভাত হয় তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন। মুখের সেই ক্ষণ-স্থায়ী পরিবর্ত্তনের বিষয় লেখাই আমাদের উদ্দেশ্য।

Herbert Spencer বলেন যে স্নায়বীয় শক্তির চালনা-বশতঃ আমাদের মনোভাবের উৎপত্তি হয়। সেই শক্তির উত্তেজনা হইলে তাহা শরীরের কোন না কোন স্থানকে তদনুরূপ উত্তেজিত করে। কোন একটি

* ভারতী, ২য় খণ্ড, ২১৯ এবং ২২০ পৃষ্ঠা দেখিলে জানা যাইবে।

আবাহক স্নায়ু যদি বিচলিত হয় তবে সেই ক্রিয়াটি কতকগুলি স্নায়ু-কোষ বাহিয়া অবশেষে তাহা মস্তিষ্কে এবং মেরুদণ্ডের উর্দ্ধভাগে বিচরণ করে;—তথা হইতে ক্রমে ক্রমে শরীরের কতকগুলি নির্ব্বাহক স্নায়ুকে বিচলিত করিলে করিতে পারে। বাহ্য বস্তুর সন্নিকর্ষে স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের সহযোগে আমাদের মনে একটা চেতনার উদ্রেক হয়; এবং সেই চেতনা হইতে আমাদের মনোবৃত্তি-সকলের কার্য্যারম্ভ হয়। এক দল স্নায়ুর উত্তেজনা হইলে যেমন উত্তরোত্তর-ক্রমে অন্যান্য স্নায়ু উত্তেজিত হয়, সেইরূপ তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে একটি মানসিক ভাব কিম্বা বৃত্তি হইতে উত্তরোত্তর আরও নানা ভাব বা বৃত্তির উদ্রেক হইয়া থাকে। * আমাদের হৃদয় অত্যন্ত কোমল বলিয়া মানসিক উত্তেজনা-সমূহ স্নায়ু বাহিয়া অগ্রে হৃদয়ের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে; এবং সেই কারণে হৃদয়ের রক্তের চলাচল বৃদ্ধি হয়। হৃদয় আমাদের ইচ্ছার বশীভূত নয় বলিয়া অভ্যাস-সংস্কার (Habitual association) গুণে তাহা অতি সহজেই বিচলিত হইয়া পড়ে। ক্রোধ কিম্বা অন্য কোন বৃত্তি প্রবল হইলে লোকে স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনা ইচ্ছাপূর্ব্বক দমন করিতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের গতির উপর তাহার কোন প্রভুত্ব থাকে না; হৃদয়ের কার্য্য সম্পূর্ণ ইচ্ছা-নিরপেক্ষ। ক্ষুধাতুর ব্যক্তি সম্মুখে খাদ্য দ্রব্য দেখিলে মুখের ভাবভঙ্গী দমন করিয়া যদিও আপনার ক্ষুধা অন্যের নিকট গুপ্ত রাখিতে পারে, কিন্তু রসনা হইতে যে জল বাহির

* সম-বেদনা-গুণে আমাদের মনে এক প্রকার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। কোন একটি উজ্জ্বল হাস্যের প্রতিমূর্ত্তি দেখিলে সেই হাস্যভাবের অন্ততঃ কতকটা আমাদেরও মনে উদয় হয়। কোন একটি লোকের অবস্থাবিশেষ দেখিয়া আপনাকে সেই অবস্থাপন্ন কল্পনা করিয়া আমার মনে যে একটি ভাবের উদয় হয় তাহা কেবল সম-বেদনা-গুণে ঘটিয়া থাকে। যদি আমি কোন একটি শোকাতুর লোককে কাঁদিতে দেখি তাহা হইলে তাহার কষ্ট হইতে আমার মনে এতদূর কষ্ট হইতে পারে যে আমাকেও অশ্রুবর্ষণ করিতে হয়। সেই সময় তাহার মুখের ভাবভঙ্গী যেরূপ হইবে আমারও, ততটা না হউক, কষ্টহেতু সেইরূপ কতকটা হইবার সম্ভাবনা। আমোদের পক্ষেও সেইরূপ; আমোদ হইতে যে হাস্য উত্থিত হয় তাহা সম-বেদনা-গুণে একটি ঘরে যতগুলি লোক উপস্থিত থাকে তাহাদের প্রত্যেকের দ্বারা প্রতিধ্বনিত না হইয়া নিষ্কৃতি পায় না। আমাদের কতকগুলি রোগ যেমন "ছোঁয়াচে," সেইরূপ আমাদের সমস্ত মানসিক ভাব ও বৃত্তি এক প্রকার ছোঁয়াচে; কেননা আমাদের প্রবৃত্তি হইতে অপর লোকের সেই একইরূপ প্রবৃত্তি উদ্ভূত হইতে পারে। ফরাসীদেশীয় কোন চিকিৎসক একটি গল্প বলেন যে একটি মঠ-বাসিনী (nun) এক সময় খেয়াল-বশতঃ একবার বেড়াল-ডাক ডাকিয়াছিল, তাহার পর হইতে অন্যান্য সমস্ত মঠ-বাসিনী প্রত্যহ সেই সময় একবার করিয়া বেড়াল-ডাক ডাকিত। ইহা যে সম-বেদনা-মূলক অনুকরণগুণে হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

হইবে তাহা সে হাজার চেষ্টা করুক না কেন—কোন প্রকারেই তাহা দমন করিতে কৃতকার্য্য হইবে না ; সেইরূপ উত্তেজিত মনোভাবের দ্বারা অন্যান্য মাংসপেশীর কার্য্য যদিও না হইতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের কার্য্য যে দ্রুত হইবেই তাহা আমরা প্রত্যহই দেখিতে পাই। হৃদয়ের সহিত দেহাভ্যন্তরস্থ আর একটি যন্ত্রের যথেষ্ট যোগ আছে, তাহাকে আমরা "ফুস্‌ফুস্" বলিয়া থাকি। হৃদয় এবং ফুস্‌ফুস্ উভয়ে পরস্পর স্নায়ু দ্বারা যোজিত, এবং তাহাদের কার্য্য একত্রে হইয়া থাকে। যে সমস্ত স্নায়ু হৃদয় এবং ফুস্‌ফুস্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে তাহারাই আবার আমাদের মুখে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া স্থিতি করিতেছে। ফুস্‌ফুস্ যন্ত্রের গতির তারতম্য আমাদের মুখের ভাবকে অনেক পরিমাণে সাহায্য করিয়া থাকে। যদি মনের কোন বৃত্তি প্রবল হয় তাহা হইলে তাহার সঙ্গে হৃদয় বিচলিত হয়, এবং নিশ্বাসপ্রশ্বাসের যথেষ্ট তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। একটি ভয় প্রাপ্ত মনুষ্যের কিরূপ অবস্থা হয় দেখা যাউক। তাহার চক্ষু বিস্তৃত হয়, ভ্রূযুগল উন্নত হয়, তাছাড়া তাহার হৃদয়ের গতি এতদুর বৃদ্ধি হয় যে তাহা আমরা বাহির হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাই। ভালরূপ নিশ্বাস লইতে পারে না। অনেক সময় খুব সুস্থ লোকেও যদি বেশী ভয় পায় ত এমন কি মৃত্যুমুখে পতিত হয় ; তাহার কারণ আর কিছু নয়, শুদ্ধ হৃদয়ের চলাচল বৃদ্ধি এবং ফুস্‌ফুস্ যন্ত্রের বিকলতা। একটি শোকার্ত্ত স্ত্রীলোককে কিরূপে চিত্রিত করা যাইতে পারে। তাহার মনের হীনাবস্থা হইতে তাহার মুখের যথেষ্ট পরিবর্ত্তণ হইয়া থাকে, মুখ বিবর্ণ এবং দৃষ্টি অধোগামী হয় ; ওষ্ঠ কাঁপিতে থাকে ;—এই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে তাহার হৃদয়ের গভীর প্রদেশ হইতে যে এক একটী দীর্ঘনিশ্বাস উত্থিত হয়, তাহাতে কি তাহার যাতনা আরো অধিকতররূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয় না ?

আমাদের শরীর সমস্তই মাংসপেশী দ্বারা বেষ্টিত ; এবং সেই সকল মাংসপেশী অস্থির সহিত সংশ্লিষ্ট। আমাদের মুখে যে সকল মাংসপেশী আছে তাহারা অত্যন্ত কোমল, এবং তাহাদেব সাময়িক বিস্তার ও সঙ্কোচই আমাদের মনোভাব ব্যক্ত করিবার উপায়। মুখের মাংসপেশীর মধ্যে কতকগুলির কার্য্য আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক দমন করিতে পারি, কিন্তু আর অবশিষ্ট কতকগুলির দমনের উপর আমাদের খুব অল্পই ক্ষমতা আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মুখে স্নায়ু শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া স্থিতি করিতেছে, সেই সকল স্নায়ু আবার মুখের মাংসপেশীতে বিস্তৃত রহিয়াছে। ক্রোধের উদ্রেক হইলে আমাদের সমস্ত শরীরের মাংসপেশী কাঁপিয়া থাকে, ক্রন্দনের সময় আমাদের ওষ্ঠ প্রান্তস্থিত মাংসপেশী কাঁপিতে থাকে—এগুলি কেবল স্নায়ুর উত্তেজিত অবস্থা হইতে ঘটিয়া থাকে। মনোভাবে যে যে স্নায়ু উত্তেজিত হয় সেই সেই স্নায়ু আবার কতকগুলি মাং-

সপেশীতে বিস্তৃত রহিয়াছে; সেই মাংসপেশীগুলির বিস্তৃতি ও সঙ্কোচ মনোভাবের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদিত হইয়া থাকে। নবজাত সন্তানের ক্রীড়া দেখিয়া মাতার মনে যে একটি অনির্ব্বচনীয় আমোদ হয় তাহা আমরা মাতার কপোল এবং ওষ্ঠাধর প্রান্তস্থিত মাংসপেশীর অতি অল্পমাত্রও অবস্থান্তর হইতে অনুমান করিয়া লইতে পারি। পত্রের ভাল মন্দ খবর আমরা পাঠকের মুখের ভাব হইতে আঁচিয়া লইতে পারি। যদি খবর মন্দ হয় তাহা হইলে পাঠকের অজ্ঞাতভাবে পড়িবার সময়, হয় ওষ্ঠের দুই প্রকার কিছু নামিয়া পড়ে, নয় তাহার জ্রযুগল কিছু উন্নত হয়, কিম্বা উভয় লক্ষণই যে একত্রে হইতে পারে না এমন নহে। আর পাঠকের ওষ্ঠপ্রান্তের হাস্যরেখা হইতে আমরা পত্রের সুসমাচার অনুমান করিয়া লইতে পারি।

চক্ষু, জ্র, ওষ্ঠাধর, নাসিকা, কপোল, এবং ললাটের অবস্থান্তর হইতে আমরা মনের অবস্থান্তর বুঝিতে পারি। Sir Charles Bell বলেন যে মুখের সমস্ত মাংসপেশী হইতে ওষ্ঠাধরপ্রান্ত এবং জ্রযুগলের মধ্যবর্ত্তী দুই কোনের মাংসপেশী মনের ভাব অতি জাজ্বল্যরূপে প্রকাশ করিয়া থাকে। মুখের মধ্যে উক্ত দুইস্থল অতিশয় চঞ্চল; এবং ঐ দুইস্থলে মুখের সমস্ত মাংসপেশী কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে।* Darwinও সে কথা অস্বীকার করেন না।

সমস্ত মনোবৃত্তিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; একটি অপ্রীতিজনক, অপরটি প্রীতিজনক। যে সকল মানসিক বৃত্তির উত্তেজনায় আমাদের নিজের মনে এক প্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হয় এবং অপর লোকের নিকটেও যাহা সুখকর বলিয়া বোধ হয় না, তাহাদিগকেই আমরা অপ্রীতিজনক মনোবৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি; যথা, ক্রোধ, ভয়, বিস্ময়, ঘৃণা, অহঙ্কার, কষ্ট। মনোমধ্যে এগুলির উদয়ে মুখে যে ভাব প্রকাশিত হয় তাহাও অত্যন্ত অপ্রীতিকর। প্রীতিজনক মনোবৃত্তির উদয়ে আমাদের নিজের মনে কোন কষ্ট ত হইতেই পারে না, এবং অপরের নিকট তাহা অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ বলিয়া অনুমিত হয়। যেমন, উল্লাসভাব, লজ্জাভাব, যোগভাব। এ গুলি হইতে মুখের একটি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এখন দেখা যাউক এই সমস্ত অপ্রীতিজনক এবং প্রীতিজনক মনোবৃত্তি হইতে মুখে কি কি ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ হইতে পারে।

ক্রোধ।—মানসিক সমস্ত বৃত্তি অপেক্ষা ক্রোধ অত্যন্ত প্রবল। কোন লোক আমার সহিত কল্পিত বা বাস্তবিক মন্দ ব্যবহার করাতে অথবা আমার কোন কল্পিত বা বাস্তবিক অনিষ্ট করাতে আমার মনে যে একটি প্রবল ভাবের উদয় হয় তাহাকেই ক্রোধ বলা যাইতে পারে। প্রতিহিংসা লইবার ইচ্ছা ক্রোধের পরিণাম। দুর্ব্বাসা

* Darwin প্রণীত "Expression of the Emotions"-এর Introduction-এর প্রথম চিত্রটি দেখিলে জানিতে পারা যায়।

শকুন্তলাকে যে অভিশাপ দিয়াছিল তাহা প্রতিহিংসা লইবার ইচ্ছা হইতে সংঘটিত হইয়াছিল। সেই প্রতিহিংসার মূলস্থান ক্রোধ। ক্রোধ হইলে মানুষের মুখের এক প্রকার বিকট ভাব হইয়া থাকে, ইহা ব্যতীত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে; যেমন, কখন বা মুষ্টিবদ্ধ হয়, কখন বা হস্ত ঊর্দ্ধে উঠে ও দৃঢ় হয়, এবং শরীরের উপরি ঊর্দ্ধ ভাগ অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়ে। মহাকবি সেক্সপীর ক্রোধ হইলে মুখের ভাব কিরূপ হয় তাহা অতি সুন্দর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা সে স্থল অনুবাদ করিয়া দিলাম—

"কিন্তু যবে সমরের ভীষণ নিনাদ
পশিবে শ্রবণে, ভাবি শার্দ্দূলের ভাব
বিগ্রহে বিকট মূর্ত্তি করিবে ধারণ।
লৌহনিভ করি সব শিরা উপশিরা,
আরক্ত করিবে মুখ রুধির উচ্ছ্বাসে—
... ...
ঝলসিত হবে চক্ষে প্রচণ্ড অনল।
... ...
কড়মড়ি দন্তে দন্তে, বিস্ফারিয়া ঘোর
যুগল নাসিকা-রন্ধ্র, বদ্ধ করি শ্বাস,
পূর্ণমাত্রে প্রজ্জ্বলিবে হৃদয়ের তেজ।" *

ক্রোধান্ধ হইলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত চঞ্চল হয়; চক্ষু বিস্তৃত হয় ও ঘুরিতে থাকে, এবং বোধ হয় যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চক্ষু হইতে নির্গত হইতেছে। ভ্রূযুগল উন্নত এবং সঙ্কুচিত হওয়ায় ললাট প্রদেশ তরঙ্গিত হইয়া পড়ে। নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠে। ওষ্ঠাধরের নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন দেখা যায়; কখন কখন ওষ্ঠ অধরের উপরে গিয়া পড়ে; সময়ে সময়ে ওষ্ঠ এবং অধর এতদূর বিভিন্ন হইয়া পড়ে যে বদ্ধদন্তের কতকাংশ দেখিতে পাওয়া যায়, কখন বা দন্ত দ্বারা আমরা ওষ্ঠ কামড়াইয়া ধরি; ওষ্ঠাধরের এরূপ পরিবর্ত্তন আমরা সচরাচর ক্রোধান্ধ নীচশ্রেণীস্থ লোকদিগের মধ্যে দেখিয়া থাকি। সমস্ত মুখমণ্ডল সময়ে সময়ে রক্তশূন্য (pale) হয়; কখন কখন স্ফীত ও রক্তবর্ণ হইয়া পড়ে; ক্রোধের উদয় হইলে মুখ যে সর্ব্বদা বিবর্ণ হয় তাহা অতি সুবিদিত কথা। সে সময় বাক্য বদ্ধদন্ত হইতে জোরে নির্গত হইতে থাকে। হৃদয়ের চলাচল এতদূর পর্য্যন্তও বৃদ্ধি হইয়া থাকে যে অনেক চিকিৎসকেরা ক্রোধান্ধ রোগীকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াছেন। মস্তিষ্ক অত্যন্ত উত্তেজিত হয় বলিয়া আমাদের ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হয় এবং সমস্ত মাংসপেশী কাঁপিতে থাকে। মাংসপেশী কাঁপিতে থাকে বলিয়া আমাদের কথা তখন ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া বাহির হইতে থাকে; এবং সেই জন্য সময়ে সময়ে ওষ্ঠাধরপ্রান্তে ফেন দেখিতে পাওয়া যায়। শকুন্তলাকে অভিশাপ দিবার সময় দুর্ব্বাসার "জ্বলজ্জটা কলাপস্য ভ্রূকুটীকুটিলংমুখং" যদি কোন চিত্রকর অঙ্কিত করিতে চাহেন তাহা হইলে উপরি উক্ত ভাবগুলি যেন ঠিক্ মুখে বসাইতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে, যে-সে নয়,

* King Henry V. Act 111. Sc. I.

সেই দুর্ব্বাসার ক্রোধওপ্রকাশ পাইতে পারিবে।

আমরা সচরাচর দেখিয়া থাকি যে শিশুরা রাগান্বিত হইলে ভূমিতে গড়াগড়ি দেয়; কামড়াইবার চেষ্টা করে; এবং সময়ে সময়ে নখ দ্বারা আঁচড়াইতে যায়। তাহাদের মনে কোন বৃত্তি প্রবল হইলে তাহারা ক্রন্দন করিয়া থাকে; ক্রোধে, অসন্তোষে, ভয়ে শিশুরা যে সর্ব্বদাই কাঁদিয়া উঠে তাহা কাহারও নিকট অবিদিত নাই।

অল্প অনিষ্ট, অল্পমাত্র মন্দব্যবহার হইতে আমাদের মনে এক প্রকার ভাবের উদ্রেক হয়; সেই ভাব যদিও ক্রোধের সহিত খুব নিকট সম্বন্ধ বিশিষ্ট কিন্তু তাহা অপেক্ষা অনেক নরম প্রকৃতির। সেইটুকু অনিষ্ট এবং কুব্যবহার হইতে আমরা চটিয়া উঠি। সেই ভাব হৃদয়কে অতি অল্পমাত্র বিচলিত করিয়া তিরোহিত হয়। চটিয়া উঠিলে আমাদের মুখমণ্ডল ঈষৎ রক্তবর্ণ এবং চক্ষু উজ্জ্বল হয়; ক্রোধ হইলে যে সকল মাংসপেশী কার্য্য আরম্ভ করে তাহারা তখন ঈষৎ উত্তেজিত হয়মাত্র; বায়ুর গতিবিধির নিমিত্ত নাসিকার দুই রন্ধ্র স্ফীত হয়; ওষ্ঠাধর প্রায়ই যুক্ত থাকে; এবং ভ্রূকুটি স্বাভাবিক।

অসন্তোষ ভাবে ক্রোধের একটু আভাস থাকে মাত্র। মন্দ ব্যবহার হইতেই আমরা অসন্তুষ্ট হই। অসন্তোষে হৃদয়ের কিম্বা ফুস্‌ফুসের কার্য্য হয়ই না; তবে ভ্রূকুঞ্চিত হয় এবং চক্ষু ঈষৎ উজ্জ্বল হয় মাত্র।

ভয়।—অকস্মাৎ কোন বিপদ উপস্থিত হইলে আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হয় তাহাকেই ভয় বলে। মানসিক সমস্ত বৃত্তি অপেক্ষা ইহা হৃদয়ের উপর অত্যন্ত প্রভুত্ব স্থাপন করে, ভয়ে হৃদয়ের মধ্যে একরূপ যাতনা হইয়া থাকে। আমরা যে সকল মন্দকার্য্য করিয়া থাকি তাহার জন্য শাস্তি পাইতে হইবে ভাবিয়া যে ভয়—সে এক প্রকারের; সে ভয় ভাবনার সহিত জড়িত। উপস্থিত ভয় আবার একশ্রেণীস্থ। উপস্থিত ভয়ে আমাদের মুখাকৃতির যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য হয়। মনে কর আমার কোন শত্রুর ভয়ে আমি দেশ পরিত্যাগ করিয়া একটি বিজন প্রদেশে বাস করিতেছি। কিছু দিন পরে সেই শত্রু আমাকে অন্বেষণ করিতে করিতে সেই বিজনে গিয়া উপস্থিত হইল, হটাৎ আমার সহিত তাহার একদিন সাক্ষাৎ হইল,—তখন আমার কিরূপ মুখের ভাব হইতে পারে? এরূপ অবস্থায় আমরা প্রায়ই বিকট চিৎকার করিয়া থাকি, এবং পলায়ন তৎপর হইয়া আশ্রয়ের জন্য অত্যন্ত উতলা হইয়া পড়ি, সময়ে সময়ে আমাদের গমনের ক্ষমতাও থাকে না; আমরা দুএক পদ হটিয়া সেই ভয়োৎপাদক বস্তুর প্রতি বিস্তৃত এবং স্থির নেত্রে চাহিয়া থাকি; ভ্রূযুগল যতদূর উচ্চ হইবার হইয়া পড়ে; ললাট প্রদেশ ঈষৎ তরঙ্গিত হয়; মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়; এবং মস্তকের চুল উর্দ্ধগামী হইয়া পড়ে। কপোলের এবং ওষ্ঠপ্রান্তের মাংসপেশীর কম্পনই ভয়ের প্রধান লক্ষণ। ক্রোধের ন্যায় ভয়ও সর্ব্বা-

ঙ্গের মাংসপেশীকে অত্যন্ত কাঁপাইয়া তুলে। জিহ্বা, হৃদয় ও শ্বাসনালী কাঁপিতে থাকে এবং শুকাইয়া যায় বলিয়া সময়ে সময়ে আমাদের বাক্‌রোধও হয়। ওষ্ঠাধর বিভিন্ন হইয়া পড়ে; Bell বলেন যে ওষ্ঠাধরের বিভিন্নতার আতিশয্যহেতু নিম্নপাটীর দন্ত এবং জিহ্বার অগ্রভাগও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইল যে এক প্রকারের ভয় আছে যাহা ভাবনার সহিত জড়িত, তাহাকে আমরা "আশঙ্কা" বলিতে পারি। উপরি উক্ত ভয়ে আমাদের মুখের যেমন একেবারে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, আশঙ্কার পক্ষে তাহা নহে। মনে কোন ভাবনা কিম্বা যাতনা উপস্থিত হইলে মুখে যে যে লক্ষণ লক্ষিত হয়, আশঙ্কাতেও অনেকটা তাহাই হয়। এই অবস্থায় মুখ বিবর্ণ হয়; চক্ষের পাতা এবং ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তী দুই প্রান্ত নামিয়া পড়ে; ওষ্ঠপ্রান্ত কিছু নিম্ন হয়; হৃদয়ের গতি এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হইতে থাকে।

"ত্রাস" আবার একটি-স্বতন্ত্র প্রকারের ভয়। চকিতের মত আমাদের মনে যে একটি ভয় উদিত হইয়া তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত হয় তাহাকে আমরা ত্রাস বলিতে পারি। বিপদ জনক ঘটনা হইতে তাহার উৎপত্তি নয়। এরূপ অবস্থায় হৃদয় বিচলিত হয়; চক্ষু বিস্তৃত হয়; ওষ্ঠ ও অধর ভিন্ন হইয়া পড়ে এবং মুখ রক্তবর্ণ হয়।

মর্য্যাদাপন্ন কিম্বা গুরুলোকের প্রতি বিনয় এবং ভক্তি মিশ্রিত যে ভয় তাহাকে "সম্ভ্রম" বলা যাইতে পারে। এ অবস্থায় আমাদের হৃদয় অল্পমাত্র বিচলিত হয়, এবং চক্ষের দুই পাতা ও দৃষ্টি অধোগামী হয়; মুখ এবং ঘাড় নত হয়। ইহা হইতেই প্রণামের উৎপত্তি।

বিস্ময়।—অনাশ্বাসিত বা অননুভূতপূর্ব্ব ঘটনার প্রত্যক্ষে আমাদের মনে বিস্ময় ভাবের উদয় হয়। সহজ কথায় বিস্ময়কে আমরা "চমক্ লাগা" বলিয়া থাকি। বিস্ময়-জনক ভাব আমাদের মনকে অতি অল্পক্ষণ অধিকার করিয়া থাকে। সে ভাব আমাদের মনে এত শীঘ্র শীঘ্র উদয় হয় যে সে ঘটনার উৎপত্তি ও পরিণাম জানিতে অবসর পাই না; যখন সেই অজানিত ঘটনাটিকে স্বাভাবিক ঘটনা বলিয়া জানিতে পারি তখন বিস্ময় আমাদের মন হইতে দূরীভূত হয়। বালকেরা অধিকাংশ সময় বিস্মিত হইয়া থাকে, কেননা তাহাদের নিকট অনেক ঘটনা অজ্ঞানিত, এবং সকল ঘটনার উৎপত্তি বিষয়ে তাহারা অনভিজ্ঞ। যত তাহাদের বয়স ও অভিজ্ঞতা বাড়িতে থাকে ততই অবিদিত ঘটনার উৎপত্তি তাহাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং তাহার পরিণাম জানিতে তাহাদের খুব অল্পই সময় লাগে। বালকেরা যখন কোন গল্প শোনে তখন তাহা তাহাদের নিকট অত্যন্ত অদ্ভুত ও বিস্ময়জনক বলিয়া বোধ হয়; গল্পের স্রোতের সঙ্গে তাহার মন ও মুখের ভাব বিচলিত হয়। বিস্ময়-জনক ভাব হইলে আমাদের ওষ্ঠাধর বিভিন্ন হয়, এবং চক্ষু বিস্তৃত হয়। হটাৎ যত ঘটনা হয়

তাহাতে আমাদের ভ্রূযুগল যে উঠিয়া পড়ে তাহা সকলেই বিদিত আছেন। হৃদয় মুহূর্ত্ত কালের জন্য অত্যন্ত বিচলিত হয় এবং তখন নাসিকা অপেক্ষা মুখাভ্যন্তর হইতে শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুতবেগে বহিতে থাকে। অনেক সময় ভয়ের অগ্রে বিস্ময় হইয়া থাকে।

আমরা সচরাচর "আশ্চর্য্য" কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকি। মনুষ্যের আয়ত্তীভূত অথচ অদ্ভুত যে সকল ঘটনা আমরা দেখিয়া থাকি তাহাতেই আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই। "আশ্চর্য্য" কথার উৎপত্তি "আঃ" "চর্য্য" হইতে, অর্থ—"আঃ কি ঘটনা।" ঈষৎ বিস্ময় এবং আনন্দ এই দুই ভাবে মিশ্রিত যে ভাব তাহাকেই আশ্চর্য্য বলা যাইতে পারে। আশ্চর্য্যভাব আমাদের হৃদয়ের গতিকে বিচলিত করে না; তবে চক্ষু বিস্তৃত এবং উজ্জ্বল হয়, ভ্রূযুগল উন্নত হয়, এবং ওষ্ঠপ্রান্তে অল্প হাসির রেখা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ঘৃণা।—রুচির অসঙ্গত দ্রব্য হইতে ঘৃণাভাবের আদিম উৎপত্তি। যে সকল দ্রব্য আমাদের ইন্দ্রিয়ের অসুখকর সেই সেই দ্রব্যের উপর আমাদের ঘৃণা। দুর্গন্ধ আমাদের নিকট অত্যন্ত অসুখকর; বিস্বাদ দ্রব্য আমরা আহার করিতে চাহি না; কতকগুলি জঘন্য দ্রব্য আমরা চক্ষে দেখিতে পারি না; আর এমন কতকগুলি দ্রব্যও আছে যাহা স্পর্শ করিলে আমাদের ঘৃণা জন্মে *। কোন অসুখকর দ্রব্যের সংস্পর্শে মুখমধ্যস্থিত যে ইন্দ্রিয়টি স্নায়ু এবং মস্তিষ্ক সহযোগে আমাদের মনে ঘৃণাভাবের উত্তেজনা করিয়া দেয়, ঘৃণার উদয়ে মুখের সেই ইন্দ্রিয়টির মাংসপেশী অধিকতর বিস্তৃত ও সঙ্কুচিত হয়। যেমন, দুর্গন্ধ ঘ্রাণে আমাদের নাসিকার চতুর্দ্দিক অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়; বিস্বাদ দ্রব্য গ্রহণে আমাদের ওষ্ঠাধর এতদূর বিভিন্ন এবং তাহাদের উভয় পার্শ্ব এতদূর সঙ্কুচিত হয় যে আমাদের সম্মুখের উভয়পাটির দন্ত এবং জিহ্বার অগ্রভাগ বাহির হইয়া পড়ে; নয়নের অপ্রীতিকর কোন দ্রব্যদর্শনে আমরা ভ্রূযুগলের এবং কপোলের মাংসপেশীগুলিকে এতদূর সঙ্কুচিত করি যে আমাদের চক্ষু প্রায় মুদ্রিত হইয়া যায়। তাই বলিয়া এ বলা যাইতে পারে না যে সেই বিশেষ ইন্দ্রিয়টির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মুখের আর কোন ইন্দ্রিয় বিচলিত হয় না; যেমন, দুর্গন্ধ ঘ্রাণে ওষ্ঠাধরের এবং চক্ষু ও ভ্রূযুগলের পরিবর্ত্তন যে লক্ষিত হয় না এমন নহে, তবে নাসিকার সঙ্কুচন সর্ব্বাপেক্ষা বেশি হইবে, ইত্যাদি। সাধারণতঃ, ঘৃণার উদ্রেক হইলে ওষ্ঠাধর অত্যন্ত বিভিন্ন ও সঙ্কুচিত হয়; নাসিকার দুইরন্ধ্র উচ্চ হইয়া উঠে ও তাহার পার্শ্বস্থিত মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয়; চক্ষু ঈষৎ মুদ্রিত এবং ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়। Darwin বলেন

*Darwinএ ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়; তিনি বলেন যে কোন একটি অসভ্য লোক তাঁহার খাদ্য দ্রব্যের শীতলত্ব এবং কোমলত্ব অনুভব করিয়া সম্পূর্ণ ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিল।

যে বমন করিবার সময় আমাদের মুখ যেরূপ বিকৃত হয়, ঘৃণার উদ্রেকে আমাদের মুখভাব ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে। ঘৃণার আতিশর্য্যহেতু আমাদের বমন করিবার ইচ্ছা হয়। "থুথু" ফেলা ঘৃণা প্রকাশ করিবার অন্যতর উপায়। সেই ঘৃণিত বস্তু আমাদের জিহ্বা কলুষিত করিয়াছে এই অনুমান করিয়াই আমরা বমন করিবার চেষ্টা করি ও "থুথু" ফেলিয়া থাকি।

তাচ্ছল্যভাবে ঘৃণাভাবের ঈষৎ আভাস থাকে। ময়লা বস্ত্রের উপর আমাদের ঘৃণা, ছিন্ন বস্ত্রের উপর আমাদের তাচ্ছল্য। কতকগুলি নিকৃষ্ট এবং অকর্ম্মণ্য বস্তুকে আমরা তাচ্ছল্য করিয়া থাকি। সময়ে সময়ে উপহাসব্যঞ্জক হাস্যদ্বারা আমাদের তাচ্ছল্য ভাব প্রকাশিত হয়, চক্ষু ঈষৎ মুদ্রিত করা, কিম্বা আড়্‌চোকে সেই নিকৃষ্ট বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাওয়া, ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করা, কিম্বা সেই বস্তু হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া পার্শ্ব কাটাইয়া চলিয়া যাওয়া ব্যতীত তাচ্ছল্যভাব আর কোন প্রকারে ব্যক্ত করা যাইতে পারে না। ঘৃণা কিম্বা তাচ্ছল্যভাবে আমাদের হৃদয়ের বা ফুস্‌ফুসের গতির কোন তারতম্য প্রত্যক্ষ হয় না।

অহঙ্কার।—আমি আমার নিজের কল্পিত বা সত্য স্বভাব, ক্ষমতা, কিম্বা সদ্‌গুণ হইতে নিজেকে যদি একটি মহৎ এবং অসাধারণ লোক বলিয়া মানিয়া লই তাহা হইলে আমি অহঙ্কারী হইলাম। অহঙ্কারী লোকেরা অন্য সকল হইতে আপনাকে অত্যন্ত উচ্চ মনে করে বলিয়া ময়ূরের ন্যায় সর্ব্বদাই তাহারা তাহাদের সমস্ত অবয়ব এবং মুখমণ্ডল উন্নত ও দৃঢ় করিয়া রাখে। তাহারা অন্য সকলকে তখন তাচ্ছল্যের পাত্র মনে করে; সর্ব্বদা ভূমির প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আবদ্ধ থাকে; ঘাড় উঠাইয়া অন্য মুখপানে চাহিতে ও তাহারা বড় নারাজ। সময়ে সময়ে তাহারা অন্যের উপর তাচ্ছল্য প্রকাশের জন্য নাসিকা এবং ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করে।

কষ্ট।—নৈরাশ্য, আত্মীয় বা প্রিয় জনের বিরহ প্রভৃতি এই শ্রেণীস্থ সমস্ত বৃত্তি হইতে, এবং শারিরীক অসুস্থতা হইতে, আমাদের একপ্রকার মানসিক কষ্ট হইয়া থাকে। এই বৃত্তিগুলির উদয়ে আমাদের মুখের ভাব একরূপই হইয়া থাকে। মানসিক কষ্ট বলবান্ হইলে প্রথমে আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনা অত্যন্ত প্রবল হয়; সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনা আমাদিগকে যখন ক্লান্ত করিয়া ফেলে তখন আমরা অনেকটা সুস্থবোধ করি, এবং তখন একটু কষ্টেরও লাঘব হয়। আমাদের দেশের শোকার্ত্ত স্ত্রীলোকদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনা তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ। দশরথের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে

"বিচুক্রুশু র্ভূমিপতে র্মহিষ্যঃ
কেশান্ লুলুঞ্চুঃ স্ববপুংষি জঘ্নুঃ।
বিভূষণান্যামুমুচুঃ ক্ষমায়াং
পেতু র্বভঞ্জু র্বলয়ানি চৈব॥ * "

* ভট্টিকাব্যং, ৩য় সর্গঃ, ২২ শ্লোকঃ।

ইহা যে কতদূর স্বাভাবিক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যখন কষ্টের কিছু লাঘব হয় তখন আমরা চুপেচাপে অবশিষ্ট কষ্ট টুকু উপভোগ করিতে থাকি। এই অবস্থায় আমাদের মুখ বিবর্ণ হয়; চক্ষু নিস্তেজ এবং ভাবহীন হইয়া ঢলিয়া পড়ে; ভ্রূযুগল তের্চা হয়, কেননা তাহাদের মধ্যবর্ত্তী দুই প্রান্ত উন্নত হয় এবং বাহিরের অপর প্রান্তদ্বয় ঝুলিয়া পড়ে; সেইহেতু ললাট-প্রদেশে কষ্ট-ব্যঞ্জক এক প্রকার সঙ্কোচ হইয়া থাকে। ওষ্ঠাধর ও কপোলের মাংসপেশীগুলি এবং মুখাকৃতির নিম্নঅস্থি (lower Jaw) গুরুত্ব হেতু আনত হয়; এই কারণ বশতঃ কষ্টের অতিশর্য্যে আমাদের মুখমণ্ডল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয় এবং এক পার্শ্বে অবনত হইয়া পড়ে। ক্রোধ এবং ভয়ের ন্যায় এ অবস্থাতেও আমাদের নাসারন্ধ্র স্ফীত ও রক্তবর্ণ হয়। মানসিক কষ্টের সময় আমাদের সমস্ত মাংসপেশী শিথিল হইয়া পড়ে বলিয়া শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই সময় হৃদয়ের কার্য্য দ্রুত হয়; অতি ধীরে নিশ্বাসপ্রশ্বাস বাহির হয় এবং তাহার মধ্যে যে এক একটি দীর্ঘনিশ্বাস সমুত্থিত হয় তাহাতে আমাদের আন্তরিক যাতনা জাজ্জ্বল্যতররূপে প্রতিভাত হইতে থাকে।

এইগুলি গেল অপ্রীতি-জনক মনোবৃত্তি। এক্ষণে প্রীতিজনক মনোবৃত্তি হইতে মুখভাব কিরূপ হয় তাহার বিষয় সংক্ষেপে বলা আবশ্যক।

উল্লাস।—সুখজনক বস্তু কিম্বা ঘটনা হইতে আমাদের মনে যে ভাবের আবির্ভাব হয় তাহাই উল্লাসভাব। প্রিয়জনের সহিত সম্মিলন, আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর লাভ, সুশ্রাব্য শ্রবণ, সুদৃশ্য দর্শন—ইত্যাদি গুলিই সেই ভাবের উৎপাদক। মানসিক কষ্টে আমাদের চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গমন যেমন অনিবার্য্য, উল্লাস ভাবে মুখে হাসি সেইরূপ অনিবার্য্য। Spencer বলেন যে প্রীতিউৎপাদক বৃত্তি প্রবল না হইলে আমাদের হাসি আসে না। মানুষে প্রথমে স্মিত হয় এবং ক্রমে হাসিয়া থাকে। অসংলগ্ন এবং আমোদপ্রদ ঘটনাবলি দর্শনে বা শ্রবণে আমরা হাসিয়া থাকি; যেমন, একটি স্থূলকায় ব্যক্তি হটাৎ যদি ভূমে পতিত হয়, তখন তাহার শরীরের হাস্যজনক অবস্থাবিশেষ দেখিয়া আমাদের মনে হাস্যরসের উদয় হয়। উক্ত লেখকটি ইহাও বলেন যে কতক সময় গুটিকতক স্নায়বীয়শক্তি উত্তেজিত হইয়া পর্য্যায়ক্রমে নূতন নূতন মানসিক ভাব বা বৃত্তি উৎপাদন করে না, তাহার কারণ এই যে তাহাদের গতি হটাৎ কেমন বন্ধ হইয়া যায়। তখন সেই উত্তেজিত শক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি নির্ব্বাহক-স্নায়ু বহিয়া অনেকগুলি মাংসপেশীকে সেইরূপ উত্তেজিত করিয়া ক্ষান্ত হয়; এবং ইহাই আমাদের হাস্যের গূঢ়তত্ব। উল্লাসে আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনা প্রবল হয়; সুন্দর সঙ্গীত শ্রবণে আমরা করতালি দিয়া থাকি; বালকেরা উল্লাসিত হইলে নৃত্য করিয়া থাকে, করতালি দেয়, এবং সময়ে সময়ে

হস্ত দ্বারা পদদ্বয় চাপড়াইয়া থাকে। Sir Charles Bell বলেন যে, সমস্ত উল্লাসজনক বৃত্তি হইতে চক্ষের পত্র, নাসারন্ধ্র এবং ওষ্ঠাধরের দুইপ্রান্ত উন্নত হয়; কষ্টজনক বৃত্তির উদয়ে ঠিক তাহার বিপরীত ভাব হইয়া থাকে। উল্লাসে আমাদের ভ্রূযুগল ঈষৎ উন্নত হয় বলিয়া ললাটপ্রদেশ তরঙ্গিত হয় না; চক্ষু পূর্ণমাত্রায় বিস্তৃত, ভাবপূর্ণ এবং উজ্জ্বল হয়; নাসারন্ধ্র ঈষৎ স্ফীত হয়। এই ভাবে রক্তের চলাচল অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, এবং প্রথম ইচ্ছ্বাসে হৃদয় অতিশয় উত্তেজিত হইয়া ক্রমান্বয়ে স্থির হইতে থাকে।

লজ্জা।—লজ্জা একটি স্বতন্ত্র প্রকারের বৃত্তি। ইহা প্রীতি এবং অপ্রীতিজনক বৃত্তির মধ্যবর্ত্তী, কিন্তু এরূপ লজ্জাও আছে যাহা একেবারে অপ্রীতিজনক। আমার রূপ কিম্বা গুণের বিষয় লইয়া কোন স্থলে আন্দোলিত হইলে এবং তথায় আমি উপস্থিত থাকিলে আমার মনে লজ্জাভাবের উদয় হয়; নব-প্রেমিকদিগের মনে যে এক প্রকার লজ্জা হয় তাহাকে আমরা "সরম" বলিতে পারি। অপরাধিরা তাহাদের পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া একপ্রকার লজ্জা অনুভব করে। যৌবনাবস্থায় লোকে অধিক লজ্জা পাইয়া থাকে; বৃদ্ধাবস্থায় বা শৈশবে মনে ততটা লজ্জা থাকে না। লাজুক যুবতীরা আপনাদের রূপের প্রশংসা শুনিলে কিম্বা পরপুরুষের দ্বারা একদৃষ্টে দ্রষ্ট হইলে লজ্জায় একেবারে মরিয়া যায়। লজ্জা হইলে আমরা কোন প্রকারে মুখ লুকাইতে চেষ্টা করি, কখন বা হাসিয়া থাকি, সময়ে সময়ে কতকগুলি যা-ইচ্ছা বকিয়া আপনার লজ্জা কোন প্রকারে ঢাকিবার চেষ্টা করি। মহাকবি কালিদাস রাজা দুষ্মন্তের মুখ হইতে বিদূষকের নিকট শকুন্তলার নব-অনুরাগ এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন;

"অভিমুখে ময়ি সংহৃতমীক্ষিতং
হসিতমন্যনিমিত্ত কথোদয়ং।"

নব প্রণয়ীদিগের মনে যে এইরূপ লজ্জা হইয়া থাকে তাহা সকলেই বিদিত আছেন। লজ্জিত হইলে আমাদের সমস্ত মুখমণ্ডল, বিশেষতঃ কর্ণ, অত্যন্ত রক্তবর্ণ হয়। ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাস্য রেখা দৃষ্ট হয়, এবং দৃষ্টি নত হয়। সচরাচর আমরা লজ্জায় অধোবদন হইয়া থাকি।

যোগভাব। উপাসনার সময় পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ হইলে মনে যে ভাবের উৎপত্তি হয় তাহাকে যোগভাব বলে। যোগভাবে আমাদের মুখমণ্ডল উন্নত হয়। চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত হয় এবং চক্ষের তারা উর্দ্ধগামী হইয়া থাকে। Sir C. Bell বলেন যে নিদ্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে কিম্বা মূর্চ্ছার সময় আমাদের চক্ষের পাতা যেরূপ ঈষৎ চঞ্চল হয়, যোগভাবে সেইরূপ হইয়া থাকে। সেই সময় আমাদের হস্ত কেমন স্বভাবতঃই যুক্ত হইয়া পড়ে।

সমস্ত অবয়বের মধ্যে মানুষের মুখের উপর আমাদের বিশেষ লক্ষ্য, কেন না

সেই মুখ তাহাদের প্রকৃতি, তাহাদের মানসিক ভাব এবং বৃত্তি, তাহাদের সৌন্দর্য্য প্রকাশের ক্রীড়াস্থল। সেই মুখের ভাব হইতে কোন্ ব্যক্তি আমার সুখে সুখী, আমার দুঃখে দুঃখী, আমার ব্যথায় ব্যথী—তাহা স্পষ্ট জানিতে পারি। আমাদের বাক্য, আমাদের স্বরের তারতম্য, মনোভাবগত মুখভঙ্গি সমেত বাহির না হইলে তাহা বড় একটা অন্যের হৃদয়গ্রাহী হয় না। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে মুখভাব মনুষ্যজীবনে যে যথেষ্ট আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদন করে তাহা স্পষ্ট প্রতীতি হয়।

ভানুসিংহের কবিতা।

সখিলো, সখিলো, নিকরুণ মাধব
  মথুরাপুর যব্ যায়,
মনম করল পণ মানিনী রাধা
রোয়বে না সো না দিবে বাধা,
কঠিন-হিয়া সই, হাসয়ি হাসয়ি
  শ্যামক দিবে স বিদায়!
মৃদু মৃদু গমনে আওল মাধা,
বয়ন পানে তছু চাহল রাধা,
চাহয়ি রহল' স চাহয়ি রহল,'
দণ্ড দণ্ড সখি চাহয়ি রহল,'
মন্দ মন্দ সখি নয়নে বহল'
  বিন্দু বিন্দু জল ধার!
মৃদু মৃদু হাসে বৈঠল পাশে,
কহল শ্যাম কত, মৃদু মৃদু ভাষে,
টুটয়ি গইল পণ, টুটইল মান,
গদ গদ আকুল ব্যাকুল প্রাণ,
ফুকরয়ি কাঁদয়ি উঠইল রাধা,
গদ গদ ভাষ নিকাশল আধা,
শ্যামক চরণে বাহু পসারি
কহল, "শ্যামরে, শ্যাম হমারি,
রহ' তুঁহু, রহ তুঁহু, নাহ গ, রহ তুঁহু,
অনুখন সাথ সাথ রে রহ পঁহু,
তুঁহু বিনে শ্যাম গ, নাহ গ, পঁহু গো,
  আছয় কোন্ হমার!"
পড়ল ভূমি পর শ্যাম চরণ ধরি,
রাখল মুখ তছু শ্যাম চরণ পরি,
উছসি উছসি কত কাঁদয়ি কাঁদয়ি
  রজনী করল প্রভাত!
শ্যাম স বৈসল, মৃদু মৃদু হাসল,
কত অশোয়াস বচন মিঠ ভাষল,
  ধরইল বালিক হাত!
সখিলো, সখিলো, বোল'ত সখিলো
  যত দুখ পাওল রাধা,
শ্যাম কিয়ে তব আপন মনমে
  পাওল সখি তছু আধা?
হাসয়ি হাসয়ি নিকটে আসয়ি
  বহুত স প্রবোধ দেল,
হাসয়ি হাসয়ি পলটয়ি চাহয়ি

দূর—দূর চলি গেল !
সখি লো, সখি লো, শ্যাম স হাসল,
শ্যাম স কাঁদল না !
দারুণ মন-দুখ পাওল রাধা
তবহুঁ স কাঁদল না !
বসন্ত রাতে হাসয়ি যব্ সখি,
রাধা বনমে আসে,
সুনীল অঞ্চল, নয়ন বিচঞ্চল,
তব্ স কানু মৃদু হাসে;
হাত ধরয়ি তছু হিয়য়ি ঢাকি মুখ
বালি রহই যব্ পাশে,
চুম্বয়ি চুম্বয়ি, কপোল চুম্বয়ি
তব্ স কানু মৃদু হাসে !
যব্ সখি আজ স রাধা কাঁদল,
তব্ সখি কাঁদল না !
বেড়ি চরণ তছু তিতল চরণতল
তবহুঁ স কাঁদল না !
অবহুঁ স মথুরাপুরক পন্থমে
ইঁহ যব্ রোয়ত রাধা,
যাতে যাতে অব্ মনে শ্যাম কিয়ে
পায় শোক তিল-আধা ?
যাতে যাতে অব্ পথ মে মাধব
সমরণ করয় কি বেরি
তাকর বিরহে আকুল রাধা
কাঁদি কাঁদি পথ হেরি ?
বরখি আঁখিজল ভানু কহে "অতি
দুখের জীবন ভাই !
হাসিবার তর সখা মিলে বহু
কাঁদিবার কো নাই !"

চট্টগ্রামের পুরাতত্ত্ব।

(বাঙ্গালা, ত্রিপুরা ও আরাকাণ ইতিহাসের কিয়দংশ মাত্র।)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

চট্টগ্রাম আরাকাণপতির কুক্ষিগত হইল। তাহার শাসন জন্য এক জন মগ শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হইল। আরাকাণরাজ পর্টুগিজদিগকে চট্টগ্রামে স্থাপিত করিয়া, তাহাদিগকে স্বীয় রাজ্যের সীমান্ত রক্ষণে নিযুক্ত করিলেন। কোন কোন ব্যক্তি রাজ সরকার হইতে বেতন ও ভূমি জায়গির প্রাপ্ত হইলেন। তাহারা বলের দ্বারা নিঃস্ব প্রজা ও ইতর লোকদিগকে খৃষ্ট মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে লাগিল। অনেক দেশীয় পত্নী সংযোগে এক নূতন জাতীয় জীব সৃষ্টি করিল। সেই মন্ত্র-দীক্ষিত মানবগণ ও মিশ্র পর্টুগিজগণই "চাটগাঁয়ে ফেরিঙ্গি" নামে পরিচিত হইয়াছে। এই সকল ফেরিঙ্গিদিগের অবস্থা অদ্যাপি প্রায় সেইরূপই আছে। অতি অল্প লোকই

উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে। অন্যেরা সাহেবদিগের সেবক, পাচক ও মদিরা বিক্রেতা।

মগগণ বাঙ্গালী সংযোগে আর একটী নূতন জাতি সৃষ্টি করিল; ইহারাই দেশীয় মগ বা রাজবংশী। কিছুকাল মগদিগের অধীনে থাকিয়া চট্টলবাসী হিন্দুসন্তানদিগের একটী সংস্কার জন্মে; সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অদ্যাপি তাহারা অন্যান্য জেলা বাসিদিগকে "বংদেই" (৩৭) (বঙ্গদেশী) বলিয়া থাকে।

মগ ও ফেরিঙ্গিগণ সময়ে সময়ে ত্রিপুরা ও বঙ্গ আক্রমণ করিত। বঙ্গীয় শাসন কর্ত্তা ইসলাম খাঁ মাশহদি মগদিগের দুষ্ক্রিয়ার দণ্ডবিধান জন্য চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন। পরাক্রান্ত শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া শাসনকর্ত্তা মুকুট রায় ১৫৬০ শকাব্দে মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। মতান্তরে আরাকাণ-রাজ কোন গুরুতর দোষের জন্য দণ্ডবিধান করিতে উদ্যত হইলে মুকুটরায় নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মুসলমানদিগের সহিত সখ্যতা করিলেন। কিন্তু অল্পকাল অন্তেই আরাকাণ রাজ চট্টলোদ্ধার করিয়াছিলেন।

১৫৫২ শকাব্দে হর্বার্ট সাহেব, (Sir J. Herbert) চট্টগ্রাম শ্রীপুর (৩৮) বাকলা (চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী) ও সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতি নগরগুলি গঙ্গাতীরস্থ প্রধান, বাণিজ্যোন্নত, সমৃদ্ধি সম্পন্ন ও জনপূর্ণ লিখিয়াছেন।১৫৬১ শকাব্দে মণ্ড্স্লু লুই রাজমহল, কাকা (ঢাকা) ফিলিপাট্টাম ও চাঁটিগাঁ বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রধান নগর লিখিয়াছেন। এই সকল বৈদেশিক সাক্ষীগণের বাক্য দ্বারা দুইশতাব্দী পূর্ব্বেও চট্টগ্রামের যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। শালিবাহনাব্দের সপ্তদশ শতাব্দীর একখানি মানচিত্রে (Blaev's map) চট্টগ্রাম ত্রিপুর রাজধানীর দক্ষিণ পশ্চিমদিকে এক নদীর তীরে নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু ব্রুকের (Mattheus ven den Broucke) মানচিত্রে এই দুইটী নগরী দুইটী পৃথক নদীর তীরে অঙ্কিত। প্রকৃতপক্ষে ব্রুকের লিখাই সত্য। ব্লেভের মানচিত্রে চট্টগ্রামের নিকট নদীর অপর তীরে "বাঙ্গলা" নামক একটী নগর দৃষ্ট হয়। পোরচাস লিখিয়াছেন,—গৌড় (বাঙ্গলার) রাজধানী, "বাঙ্গলা" একটী সুন্দর নগরী। কোন কোন লিখক অনুমান করেন এই "বাঙ্গলা" নগর হইতেই আমাদের জন্মভূমি "বাঙ্গলা দেশ' আখ্যা প্রাপ্ত

(৩৭) পশ্চাৎ চট্টগ্রামের ভাষা সমালোচন করা যাইবে।

(৩৮) শ্রীপুর মেঘনা ও পদ্মার সঙ্গম স্থলে অবস্থিত ছিল। করাল রূপিনী মেঘনা ও কীর্ত্তিনাশা শ্রীপুরের কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি গ্রাস করিয়াছেন। যে অন্তর্দ্বীপ সদৃশ ভূমি খণ্ড অদ্যাপি "শ্রীপুরের টেক" নামে পরিচিত ইহাই প্রাচীন শ্রীপুরের চিহ্ন স্বরূপ। বুকমান সাহেব ভ্রমক্রমে "রিকাবি বাজারের" পূর্ব্ব দিকস্থ "ফেরিঙ্গি বাজার"কে শ্রীপুর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক সময়ে শ্রীপুরের যথেষ্ট উন্নতি ছিল। এস্থান হইতে বৈদেশিক বণিকগণ কার্পাশ বস্ত্র য়ুনানী মণ্ডলেও চীন প্রভৃতি দেশে লইয়া যাইতেন।

হইয়াছে। আমরা জন্মভূমি বাঙ্গলার এক-খানা ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তাহাতে এই সকল বিষয়ে বিশেষরূপে আলোচনা করা যাইবে। বিগত শতাব্দীর অন্তভাগে রেনেল সাহেব এই নগরের (বাঙ্গলা) অস্তিত্ব প্রমান করিতে পারেন নাই। ইবন বতোতিয়া, ফ্রেডিরিক রলফ ফিচ, ডি বরোস ও ব্রুকে প্রভৃতি বিশ্বস্ত লিখক ও ভ্রমণকারীগণ "বাঙ্গলা" নগরের উল্লেখ করেন নাই। অন্য প্রমানাভাবে পোরচাসের লিখা গ্রাহ্য নহে। কারণ তিনি ভারতে পদার্পণ করেন নাই।

পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে মগগণ শাক দ্বীপ হইতে আসিয়া বিহারে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এই জনাই সেই প্রদেশ অদ্যাপি "মগধ" নামে পরিচিত রহিয়াছে। আমাদের বিবেচনায় মগগণ বিহার প্রদেশ হইতে তাড়িত হইয়া প্রথমত পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে। কারণ এইস্থানটীও এক সময়ে "মগধ" নামে পরিচিত ছিল। ব্লেভ ও ব্রুকের মানচিত্রে চট্টগ্রামের পূর্ব্বদিকে "কোডাভাস্কাম" (Codavascam) প্রদেশ লিখিত। কর্ণেল উইলফোর্ড বলেন(৩৯) পর্টুগিজগণ যাহাকে "কোডাভাস্কাম" লিখিয়াছেন আমি তাহাকে "কুতকষান্" (Cu teewa-shan) বিবেচনা করি। কুকি প্রদেশ তাক (বা সাক) জাতির আক্রমণ হইতে এই নাম পাইয়া থাকিবে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, কুকি প্রদেশের কিয়দংশ, সিন্দুজাতির বসতিস্থান ও উক্ত মগধ, কোডাভাস্কাম প্রদেশের অন্তর্গত বোধ হইতেছে। ব্রুকের মানচিত্রে চট্টগ্রাম ও কোডাভাস্কাম প্রদেশের প্রধান নগরী "কোডাভাস্কাম," চট্টগ্রাম নদীর (Xetigam Riv.) তীরে চিত্রিত। কোডাভাস্কাম নগরী ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুরের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোনে।

ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য দেব স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছত্রমাণিক্য দ্বারা রাজ্য চ্যুত হইয়া চট্টগ্রামে গমন করেন। (৪০) তিনি আরাকাণপতি কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন। তিনি কিছুকাল চট্টগ্রাম পার্ব্বত্যপ্রদেশে বাস করেন। গোবিন্দ মাণিক্য তথায় যে সকল অট্টালিকা উদ্যানাদি ও পুষ্করিণী খনন করেন, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি পর্ব্বত মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। (৪১) ১৫৮৩ শকাব্দে (১৬৬১ খৃঃ অঃ) সম্রাট

(৩৯) As. Researches, Vol XIV page 450.

(৪০) ছত্রমাণিক্য স্বাধীনতারত্ন বিক্রয় করিয়া সুজার নিকট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ই ত্রিপুরা "সরকার উদয়পুর" আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

(৪১) Far in the jungles on the banks of the Myanee, an affluence of the Kassalong River, are found tanks, fruit-trees, and the remains of masonry building,—evidence that, at some bygone period, the land here was cultivated and inhabited by men of the plains. Tradition attributes these ruins to a former Rajah of Hill Tipperah who, it is said, was

সাহাজানের পুত্র সুলতান সুজা স্বীয় ভ্রাতা আওরংজীব কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া আরাকাণ যাইতেছিলেন। তিনি কুমিল্লা হইয়া ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী রাঙ্গামাটীতে (৪২) গমন করেন। তৎপর দুর্গম পার্ব্বত্য পথ দ্বারা তিনি রাজর্ষি গোবিন্দমাণিক্য দেবের কুটীরে উপনীত হন। (৪৩) সুজা, গোবিন্দ মাণিক্য হইতে তৎকালোপযুক্ত যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুজা আকাকাণ পতির আবাসে উপনীত হইলে, রাজা সুজা-পুত্রীর রূপে মোহিত হইলেন। সুজার জীবিতাবস্থায় তাঁহার বাসনা পূর্ণ হওয়া দুষ্কর জানিয়া রাজ্যমধ্যে প্রচার করিলেন, যে, সুজা কৌশলক্রমে আরাকাণের রাজাসন অধিকার করিতে আসিয়াছেন। আশু তাহার প্রাণবধ কর্ত্তব্য। বিনাযুদ্ধে রক্তপাত বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম বিরুদ্ধ; সুতরাং সুজাকে জলমগ্ন করা হইল। (৪৪) তাঁহার পত্নী ও কন্যাদ্বয় আত্মহত্যা দ্বারা পামরের অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। কিন্তু সুজার তৃতীয় কন্যা রাজান্তঃপুরে স্থান অধিকার করিলেন। ক্রমে আরাকাণ রাজপামর "সন্দসুধম্ম" Tsan-da-thu-dhamma. ৪৫) এই অবলা বালার হৃদয়ও অধিকার করিয়াছিল। বর্ণিয়ারের লিখা পাঠে

driven from that part of country. Lewin's Hill Tracts of Chittagong page 6.

(৪২ ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত। ৮ ও ৩৯ পৃষ্ঠা দেখ।

(৪৩) ডোস সাহেব স্বপ্রণীত ভারত ইতিহাস (Major Dows' History of Hindoostan) গ্রন্থে লিখিয়াছেন, সুজা পলায়ন কালে রাঙ্গামাটীয়ার অগম্য বন গিরি দিয়া আরাকাণে গমন করেন। কর্ণেল উইলফোর্ড বলেন "বোধ হয় মেজর ডোস ভ্রমক্রমে ত্রিপুরা পর্ব্বতকে "রাঙ্গামাটী" লিখিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় ডোস ভ্রমে পতিত হন নাই। কর্ণেল উইলফোর্ড ই ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী "রাঙ্গামাটীয়ার" নাম জ্ঞাত ছিলেন না। চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশেও একটী "রাঙ্গামাটী" আছে। কিছুকাল এইস্থানে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা ডিপুটী কমিসনরের রাজধানী ছিল।

(৪৪) পূর্ব্ব উপদ্বীপ ও মণিপুরে রাজ বংশীয়দিগের প্রাণ দণ্ড জন্য একটী ভিন্ন প্রণালী দৃষ্ট হয়। অপরাধী (কখন বা নিরপরাধী) ব্যক্তিকে একটী বৃহদাকার থলিয়ায় বন্ধন করিয়া নদীগর্ভে নিক্ষেপ করে। আমরা কতিপয় মণিপুরীয়কে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া এরূপ উত্তর পাইয়াছি,—"রাজ বংশজদিগের রুধির বিন্দু ধারণ করিতে বসুন্ধরা অক্ষম; দৃষ্টান্ত স্থল—বিরাট রাজ সভাস্থ কঙ্ক ওরফে যুধিষ্ঠিরের রক্তপাত ও তাহা স্বর্ণ পাত্রে ধারণ। এই জন্যই তাঁহাদিগকে এরূপে বধ করা হয়।" আমরা বিবেচনা করি বৌদ্ধ-মগদিগের দৃষ্টান্ত অনুসারে অনার্য্য মিতাই ভূমিতে (মণিপুরে) এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

(৪৫) আরাকাণ রাজ সাধুর (Tha-do) মৃত্যু হইলে; তৎপুত্র "সন্দসুধর্ম্ম" ১০১৪ ব্রঃ অঃ (১৬৫২ খৃঃ অঃ) সিংহাসন আরোহণ করিয়া ক্রমে ৩২ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

জ্ঞাত হওয়া যায়, "তাইমোর বংশজ সুজা মৃত্যুকালেও স্বীয় বংশ গৌরব রক্ষা করিয়া, বীরের ন্যায় শত্রু হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। যে পর্য্যন্ত তাঁহার অসিধারণ ক্ষমতা তিরোহিত না হইয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত মগেরা তাঁহার নখাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই।

সুজার প্রতি আরাকাণ পতির নৃশংস আচরণ শ্রবণ করিয়া বোধ হয় নির্দ্দয় আওরংজীবেরও একবিন্দু অশ্রু পতিত হইয়াছিল। তিনি সত্বর মির জুম্লাকে আরাকাণ ও চট্টগ্রাম আক্রমণ করিতে লিখিলেন। প্রতিকূল ঘটনাবশতঃ জুম্লা সম্রাট-আজ্ঞা অবহেলন করিয়া কুঁচবিহার, কুঁচহাজু ও আসাম আক্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তথায় তাঁহার জয় পরাজয় দুইই হইয়াছিল। অবশেষে আসাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে খিজিরপুরের দুই ক্রোশ উত্তরে ১০৭৩ হিজিরি অঃ ২রা রমজান (৩০ মার্চ, ১৬৬৩ খৃঃ অঃ) অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার সময় জুম্লা লোকান্তর প্রাপ্ত হন।

জুম্লার মৃত্যুর পর আওরংজীবের মাতুল সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গলার নবাবি পদে নিযুক্ত হন। তিনি বঙ্গে পদার্পণ করিয়াই আরাকাণ-পতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। এই সকল ঘটনাবলির বৈদেশিক চাক্ষুষ সাক্ষী বর্ণিয়ারের লিখা সমগ্র উদ্ধৃত কিম্বা অনুবাদ করিয়া আমরা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। সেই ভ্রমণকারী মহাত্মার লিখিত বিষয়ের সারাংশ মাত্র উদ্ধৃত করিব।

সায়েস্তা খাঁ পর্টুগিজদিগের জল-রণ-নৈপুন্য দর্শনে ওলন্দাজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। ভেটিভিয়ার গবর্ণর বাঙ্গালায় বাণিজ্য সংস্থাপনের উত্তম সুযোগ পাইয়া, সায়েস্তা খাঁর সাহায্যার্থ এক বহর রণতরী প্রেরণ করিলেন। ওলন্দাজদিগের বঙ্গে পহুঁছিবার পূর্ব্বেই সায়েস্তা খাঁ উৎকোচ ও প্রলোভন দ্বারা চট্টগ্রাম বাসী পর্টুগিজদিগকে হস্তগত করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে অধিক পরিমানে বেতন, ও ভূমি জায়গির দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পর্টুগিজগণ লোভ পরবশ হইয়া তাঁহার সহিত যোগ দিলে তিনি তাহাদের সহায়তায় অপেক্ষাকৃত অল্প পরিশ্রমে চট্টগ্রাম অধিকার করেন। কিন্তু সম্যক অধিকারের পূর্ব্বে বর্ষদ্বয় ব্যাপী সংগ্রাম স্বীকার করিয়া চট্টগ্রাম ও অনতিদূরবর্ত্তী বঙ্গোপসাগর এই উভয়কে নর রুধিরে রঞ্জিত করিতে হইয়াছিল। কথিত আছে এই যুদ্ধ মোগল সম্রাট কর্ত্তৃক সন্দ্বীপ জয়ের সমবায়িক। এবং ইহাতে জনৈক বাঙ্গালী মুসলমান জমীদার অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শণ করিয়াছিলেন। (৪৬) সায়েস্তা খাঁ পর্টুগিজদিগের সাহায্যে

(৪৬) ইনি প্রসিদ্ধ ভৌমিক ঈশাখাঁর প্রপৌত্র। (ময়মন সিংহ) হয়বৎ নগরের জমিদারদিগের পূর্ব্ব-পুরুষের নাম "দেওয়ান মনোয়ার খাঁ"। আওরংজীব তাঁহার বীরত্বে প্রীত হইয়া তাঁহাকে সহস্র পদাতি ও পঞ্চশত অশ্বারোহী সেনার সেনানী মনসবদার উপাধি দান করেন।

জয়ী হইয়া আত্ম প্রতিশ্রুতি পালনে পরাঙ্‌মুখ হইলেন। (৪৭)

১৫৮৮ শকাব্দ (১৬৬৬ খৃঃ অঃ) চট্টগ্রাম রঙ্গভূমির দ্বিতীয় অভিনেতার অভিনয় শেষ হইল। আরাকাণ রাজ চট্টগ্রাম হারাইলেন। ক্রমে তাঁহার সৌভাগ্য ভাস্কর পশ্চিম গগণে ঝুলিয়া পড়িল। বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে বিশাল আবা সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা মহাবীর আলংফ্রা ঐরাবতী তীরে জন্মগ্রহণ করেন। (৪৮) বোধ হয় পাঠকবর্গ মধ্যে অনেকেই এই মহা পুরুষের নাম জ্ঞাত আছেন। ইংরাজ লিখকগণ তাঁহাকে আলম্প্রা (Alompra) লিখিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ইহাঁর নাম "আলংফ্রা" কিম্বা কিম্বা "আলম্প্রা" নহে। "আলংফ্রা" উপাধি মাত্র। "ফ্রা" প্রভু শব্দের অপভ্রংশ। অনেকে বিবেচনা করেন, আলংফ্রা পঙ্কজাত পঙ্কজ সদৃশ নীচ কুলোদ্ভূত। ব্রহ্মাগণ বলে যে বংশে "রঘু" "রাম" প্রভৃতি মহাবীরগণ জন্মগ্রহণ করেন, আলংফ্রা সেই সূর্য্য বংশে দ্বিতীয় মিহির রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যে উপকরণে উইলিয়ম অব অরেঞ্জ নির্ম্মিত,—যে উপকরণে নেপোলিয়ন বোনাপার্টী নির্ম্মিত,—বিধাতা সেই উপকরণে তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি মহাবীর শিবজীর বয়ঃ কনিষ্ঠ,কিন্তু গুণে তাঁহার সমতুল্য। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এক জন ভারতের পশ্চিম প্রান্তে, ও খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দ্বিতীয় ব্যক্তি ভারতের পূর্ব্বসীমান্তে—ঐরাবতী প্রক্ষালিত প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। আরা চিরকাল স্বাধীনতা ভোগ করিয়া কিছুকাল পিগুর দণ্ডাধীন ছিল। যে চিন্তা ডম্রেমির কৃষক বালিকার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে পৌরুষ দান করে, সেই চিন্তা পঞ্চ ফিট একাদশ ইঞ্চ দীর্ঘ একটী পুরুষের হৃদয় অধিকার করিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিল। তিনি ব্রহ্মাদিগের কর্ণে মৃত্যু-সঞ্জীবনী মন্ত্র দান করিলেন। পিগুপতি বিদ্রোহ দমনার্থে অস্ত্রধারণ করিলেন। যখন গিরিনন্দিনী তুঙ্গ শৃঙ্গ ভেদ করিয়া সাগরোদ্দেশে গমন করেন, তখন মানব মণ্ডলীর লীলা বন্ধনে কি তাঁহার গতি রোধ হইতে পারে?

তেলীয়দিগের ভুজবল চূর্ণ হইল। ব্রহ্মা জাতীয় স্বাধীনতার চিহ্ন ধারণ করিল। আলংফ্রা ছত্রধারী নৃপেন্দ্র বলিয়া ঘোষিত হইলেন। মহাবীর আলংফ্রা জন্মভূমি স্বাধীনতা রত্নে মণ্ডিত করিয়াই তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি চতুর্দ্দিকে হস্ত প্রসারণ করিলেন। সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পদে পদে বিজয় লক্ষ্মী

(৪৭) বর্ণিয়ার বলেন,—In regard to the Portuguese, Shaista treats them, not perhaps as he ought, but certainly as they deserve.—

Bernier's Travels Vol I. page 203.

(৪৮) এই মহাবীর যে পল্লিতে ভূমিষ্ঠ হন—তাহার নাম "মৈওয়াক মৈও"—(myouk-myo)। এই গ্রামটী আরা নগরীর ৩০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম দিকে।

আলংফ্রার অঙ্কশায়িনী হইলেন; পিগু, প্রোম ও মার্তাবান প্রভৃতি দেশ সকল তাঁহার কুক্ষিপ্রবিষ্ট হইল। শ্যাম-যুদ্ধ-যাত্রা কালে—৫০ বৎসর বয়ক্রমে ১৬৮২ শকাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বীরসিংহ রণজিতের উত্তরাধিকারীর ন্যায় অকালকুষ্মাণ্ড দায়াদের হস্তে রাজদণ্ড অর্পিত হয় নাই। উত্তরাধিকারী সম্বন্ধে তিনি বালাজী বিশ্বনাথের ন্যায় ভাগ্যবান্। ক্রমে তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণ চতুর্দ্দিকে রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। ১৭০৪ শকাব্দে (১৭৮২-৩ খৃঃ অঃ) আলংফ্রার তৃতীয় পুত্র বদোফায়া (অন্য নাম তরফুমা) আরাকাণ অধিকার করেন। আরাকাণ বাসী মগগণ বলে, ব্রহ্ম-রাজ ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা প্রভাবে আরাকাণ অধিকার করিয়াছিলেন। তাহাদের বাক্যের একতা নাই। কোন কোন ব্যক্তি বলেন ব্রহ্মসৈন্যগণ বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি দর্শনের ছল করিয়া আরাকাণ রাজধানীতে উপনীত হইয়াছিল। (৪৯) কিন্তু লেউইন সাহেব আরাকাণ হইতে তাড়িত মগদিগের নিকট অন্যরূপ শ্রুত হইয়াছেন। (৫০) ব্রহ্মার ইতিহাসে লিখিত আছে,—ব্রহ্মরাজ ৪০০০০ সহস্র সৈন্যের বাহুবলে আরাকাণ জয় করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ।

(৪৯) Outline History of Burma, page 56.

(৫০) Lewin's Hill Tract of Chittagong, page 13.

দণ্ডিনাচার্য্য।*

(উপসংহার)

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি দণ্ডীর কাব্যাদর্শে মহারাষ্ট্রী ভাষায় লিখিত "সেতুবন্ধের" নামোল্লেখ আছে। ঐতিহাসিক রহস্য প্রণেতা রামদাস বাবু বলেন "দণ্ডিকৃত কাব্যাদর্শে মহাকবি কালিদাস প্রণীত "সেতু-কাব্যের" উল্লেখ আছে। (২২) তাঁহার মতে এই "সেতু কাব্য" প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। কিন্তু আমরা কাব্যাদর্শের দুই সংস্করণ ছত্রে ছত্রে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, ইহাতে "সেতু-কাব্য" এই কথাটী স্পষ্টাক্ষরে কোথাও নাই। বোধ হয় ঐতিহাসিক প্রণেতা "সেতুবন্ধকেই" "সেতু-

* ভ্রমক্রমে আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমাংশ মুদ্রিত করিয়া শেষাংশ মুদ্রিত করি নাই। ভ্রম উপলব্ধি করিয়া এবার প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ করিলাম। লেখক মহাশয় ও পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন।

(২২) ঐতিহাসিক রহস্য। ১ম ভাগ, ২য় সংস্করণ, ৪৭ পৃষ্ঠ।

কাব্য" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কোন দোষ নাই। কেননা কবি চন্দবর্দাই কৃত পৃথ্বী রাজ চৌহানরাস, (২৩) রামদাস প্রণীত "সেতু প্রবন্ধ" নামক কাব্যের টীকা, (২৪) এবং কাণ্যকুব্জেশ্বর হর্ষবর্দ্ধন বা শিলাদিত্যের সভাসদ্ সুপ্রসিদ্ধ বাণভট্ট কৃত "হর্ষ চরিত" (২৫) হইতে ঐতিহাসিক রহস্য প্রণেতা যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা দ্বারা আভাস পাওয়া যায় যে কালিদাস "সেতুবন্ধ," "সেতুপ্রবন্ধ" বা "সেতু কাব্য" নামক কাব্যের প্রণেতা ছিলেন। "বারাণসী-দর্পণের" টীকাকার রামাশ্রমেরও নাকি ঐ মত (২৬)। যখন এতগুলি প্রাচীন গ্রন্থে কালিদাসকে "সেতু-বন্ধের" প্রণেতা বলা হইয়াছে তখন আমরা আর এ কথায় কোন আপত্তি করিতে পারি না। কিন্তু ঐতিহাসিক প্রণেতা মাতৃগুপ্ত ও কালিদাসকে যে অভিন্ন ব্যক্তি প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন (কেবল তিনি নহেন, তিনি এ সম্বন্ধে জার্ম্মাণী ও বোম্বাই পণ্ডিতদের অন্তে-বাসী মাত্র) তাহাতে আমাদের কিছু আপত্তি আছে। ঐতিহাসিক প্রণেতা কোন্ যুক্তির বলে কালিদাসকে মাতৃগুপ্ত সাজাইয়াছেন, তাহার সারাংশ এই স্থলে গ্রহণ করিতেছি :—

উক্ত গ্রন্থ প্রণেতা একটী প্রবাদ শুনিয়াছেন যে, বিক্রমাদিত্য কালিদাসের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অর্দ্ধ রাজ্য দিয়াছিলেন, এ দিকে রাজতরঙ্গিণীর মতে বিক্রমাদিত্য মাতৃগুপ্তকে কাশ্মীর রাজ্য প্রদান করেন সুতরাং উভয়ের অবস্থা বেশ্ মিলে গেল। আর, রাজতরঙ্গিণীর মতে মাতৃগুপ্ত প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন এবং শকুন্তলার টীকাকার রাঘবভট্ট তৎকৃত টীকায় মাতৃগুপ্তাচার্য্যের কৃত কতিপয় অলঙ্কারের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই শ্লোক গুলি কালিদাসের লেখনী-নিসৃত বলিলেও শোভা পায়। আবার, ইনিই (মাতৃগুপ্তই) মহাকবি কালিদাস এ কথা ভাওদাজীও লিখিয়াছেন। পরন্তু মাতৃগুপ্ত স্ত্রীর বিরহে কাতর ছিলেন, এটী মেঘদূতের ঘটনার সহিত ঐক্য হইলে কবির স্বীয় বিবরণ বলিলেও বলা যায়।—এই সকল কারণ অবলম্বন করিয়া ঐতিহাসিক-প্রণেতা কালিদাস ও মাতৃগুপ্তকে অভিন্ন ব্যক্তি বিশ্বাস করিয়াছেন, এবং তদনুসারে রাজতরঙ্গিণীর মত সমর্থন করিয়া কালিদাসকে

---

(২৩) "জুটং কলিদাস সুভাষা সুবন্ধং।
জিনৈ বাগবাণী সুবাণী সুবদ্দং॥
কিযৌ কলিকা মুষ্য বাসং সুমুদ্ধ।
জিনৈ সেতবন্ধৌ তি ভোজন-প্রবন্ধ॥

(২৪) বীরাণাং কাব্যচর্চ্চা চতুরি-
মবিধয়ে বিক্রমাদিত্যবাচা
যঞ্চক্রে কালিদাসঃ কবিমুকুট
বিধুঃ সেতু নাম প্রবন্ধং।

(২৫) কীর্ত্তিঃ প্রবর সেনস্য প্রয়াতা
কুমুদোজ্জ্বলা
সাগরস্য পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা।
নির্গতাসুনবাকস্য কালিদাসস্য সুক্তিষু
প্রীতির্মধুরসার্দ্রাসু মঞ্জরীষিব জায়তে॥

(২৬) ঐতিহাসিক রহস্য, ১ম ভাগ ২য় সংস্কঃ, ৪৭ পৃঃ।

প্রবরসেনের সমসাময়িক অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মাতৃগুপ্ত এবং কালিদাসকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন বটে কিন্তু সন্দেহ দূর হয় নাই। কেন না তিনি উপসংহার স্থলে বলিয়াছেনঃ—"যদি কালিদাসের নামান্তর মাতৃগুপ্ত হয় তাহা হইলে তিনি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।"

এ সকল বাহুল্য কথা ক্ষান্ত দিয়া এখন প্রকৃত প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ করা যাউক। রাজতরঙ্গিণী পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় মহারাজ বিক্রমাদিত্য খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে উজ্জয়িনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এবং এক শত বৎসর রাজত্ব করিয়া ৫৪১ খৃঃ অব্দে পার্থিব লীলা সংবরণ করেন। কালিদাস বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্তর্বর্ত্তী; সুতরাং তিনি খৃঃ পঞ্চম শতাব্দী হইতে খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। দুর্গসিংহও ঠিক এই সময়ের লোক। যখন কালিদাস ও দুর্গসিংহ একই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন; তখন মহাত্মা দণ্ডীকেও ঠিক সেই সময়ের লোক বলিতে হইবে। কারণ, দণ্ডীর কাব্যাদর্শে কালিদাসকৃত সেতু কাব্যের নামোল্লেখ আছে এবং দুর্গসিংহ কাব্যাদর্শ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মহাকবি কালিদাস "সেতুবন্ধের" প্রণেতা; "সেতুবন্ধ" কিঞ্চিৎ প্রচরদ্রূপ হইলে দণ্ডী "কাব্যাদর্শ" প্রণয়ন করেন। কেন না কাব্যাদর্শে সেতুবন্ধের নামোল্লেখ আছে। দুর্গসিংহ কাব্যাদর্শ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন সুতরাং সেতুবন্ধ এবং কাব্যাদর্শ প্রচারিত হওয়ার অত্যল্প কাল পরে কাতন্ত্রবৃত্তি প্রণীত হয়। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে এই তিনখানি গ্রন্থ ঠিক এক সময়ে বিরচিত হয় নাই। যদি এই তিনখানির এক এক খানি গ্রন্থ প্রণয়নের আনুমানিক ২০ বৎসর পরেও আর এক খানি গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকে; এবং দুর্গসিংহ যদি অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য যুগে কাতন্ত্রবৃত্তি প্রণয়ন করিয়া থাকেন, (২৭) তবে কালিদাসের "সেতুবন্ধ" খৃঃ পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর সন্ধি স্থলে কিম্বা খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিরচিত হয়। (২৮) সুতরাং "অশেষ-কবি-বৃন্দ-বন্দনীয়" সুপ্রসিদ্ধ দণ্ডিনাচার্য্য খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ভারতীর সাহিত্য ভাণ্ডার অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

মহাত্মা দণ্ডী যে এতদপেক্ষা প্রাচীন-

(২৭) অমরকোষ প্রণীত হইবার পূর্ব্বে দুর্গসিংহ কাতন্ত্রবৃত্তি প্রণয়ন করেন সুতরাং কাতন্ত্র বৃত্তি প্রণয়ন কালকে এই সময় অপেক্ষা পশ্চাৎ স্থাপন করা যায় না।

২৮ Indian Antiquary.

ঐতিহাসিক প্রণেতার মতেও খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে কালিদাস কর্ত্তৃক সেতুকাব্য (সেতুবন্ধ) প্রণীত হয়।

The *Setubandha*, a Prakrit epic probably composed not later than the sixth century of our era. Indian Antiquary, (under the article "Oriental Researches for 1872—73)" Vol III P. 327.

তম নহেন তাহার আর একটী প্রমাণ আছে। কাব্যাদর্শের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের এক স্থলে বিক্রমাদিত্যের নামোল্লেখ আছে।

তথাহিঃ——

"চিত্রমাক্রান্ত বিশ্বোপি
বিক্রমস্তে ন তৃপ্যতি।"

আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমে যে একটী শ্লোকময়ী কিংবদন্তী উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে জানা যায় দণ্ডী ও মহাকবি কালিদাস এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। এক্ষণে দেখা যায় তাহা বাস্তবিক যথার্থ।

শ্রীযাদবানন্দ গুপ্ত

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র।

আমি তিন চার দিন যাবৎ এখানে এসেছি। এসে ভালই হয়েছে। 'বন' নগরটি যদিও স্বাস্থ্য ও বিশ্ব বিদ্যালয়ের জন্য খ্যাত তথাপি বিদেশীয় ভাষানুশীলনের পক্ষে তত অনুকুল নয়। 'বনে' থাকিলে ফরাসি বিশেষতঃ অতি যত্ন-উপার্জ্জিত রুষীয় ভাষা ভুলে যেতে হত। সমস্ত 'বনে" একখানি রুষীয় কাগজও খুঁজে পাওয়া যেত না। পক্ষান্তরে এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে রুষীয় ভাষার একজন অধ্যাপক, সংবাদ পত্রাগারে রুষীয় প্রধান প্রধান দৈনিক ও মাসিক পত্র, অতএব রুষীয় ভাষা চর্চ্চা করিবার বিশেষ সুবিধা দেখা যাইতেছে। এতদ্ব্যতীত এখানে অনেক ফরাসী ও ইটালিয়ন বাস করেন। অতএব ফরাসি ও ইটালি ভাষায় আলাপ ইত্যাদি করিবারও বিশেষ সুবিধা। এ স্থানের জল, বায়ু, প্রকৃতি ইত্যাদিও অতি মনোহর। চতুর্দ্দিকে উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা, মধ্যে একটি স্ফটিক সরোবর। এই সরোবরের জল সবুজ বর্ণ—এরূপ সচরাচর দেখা যায় না। আমি সাঁতার দিতে ও দাঁড় টানিতে বড় ভালবাসি। এখন সাঁতারের কাল অতীত হয়েছে। ক্রমে ক্রমে শীত দেখা দিতেছে। কিন্তু বৈকালে যখন সূর্য্যতেজ একটুকু কমিয়া আসে তখন আমি অবকাশ মতে একটি ফরাসি বন্ধুকে নিয়ে দাঁড় টানিতে যাই। যখন হ্রদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে থাকি—সূর্য্য একটি অগ্নি গোলক হয়ে অদূরবর্ত্তী পর্ব্বত শিখরে লুকায়িত হইতেছে—তখন চক্ষু যে সমস্ত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শন করে তার তুলনা পৃথিবীতে অতি অল্পই পাওয়া যায়। বন্ হইতে সমস্ত রাইন্ বাহিয়া মাইন্স পর্য্যন্ত আসিবার সময় অতি অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়াছি। কোব্লেঞ্জ হইতে বিঙ্গেন (Bingen) পর্য্যন্ত প্রতি পদে যে শোভা, তার কি বর্ণনা করিব। বামে বিখ্যাত লোরেলাই নামক (Laurelei) শৈলটি দেখিলাম। দেখে হাইনের মধুর কবি-

ডাটির কথা মনে পড়িল। উহা এখন লৌকিক গাথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মাইন্স হইতে হাইডেলবের্গ (Heidelberg) পর্য্যন্ত পথে কবিতা অথবা সৌন্দর্য্য বিশেষ কিছুই নাই। কিন্তু হাইডেলবের্গ একটি অতি মনোরম স্থান। হাইডেলবের্গের গড়টি জগৎ বিখ্যাত। উহা একটি পর্ব্বতের উপর Renaissance style অনুসারে নির্ম্মিত। এই ষ্টাইলের এমন একটি পূর্ণ হর্ম্ম্য পৃথিবীতে আর অতি অল্পই দেখা যায়। পারিসের লুব্‌রও (Louvre) এই ষ্টাইলের একটি অতি মনোহর দৃষ্টান্ত। হাইডেলবের্গের গড়টি একশত বৎসরের অধিক হইল এই ভগ্ন দশায় পতিত। বজ্রপাতে ইহাকে অনেকটা এই দুর্দ্দশায় পতিত হইতে হয়। গড়ের টেরাস (terasse) থেকে গহ্বরস্থিত নগরটি ও অদূরবর্ত্তী বিচরণ-পথ (Promenades) ইত্যাদি অতি প্রীতিকর দেখায়। কবিবর গইটে হাইডেলবের্গে আসিলেই এই গড় সংলগ্ন উদ্যানের একটি বিশেষ স্থানে বসিয়া সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কবিতার অনুশীলন ও চিন্তায় নিযুক্ত থাকিতেন। অভ্যাগতদিগকে এই স্থান প্রদর্শন করান হয়।

হাইডেলবের্গ ছেড়ে বাডেন-বাডেনে (Baden-Baden) আসি। ইহাও হাইডেলবের্গ, বিসবাডন ও ফ্রাইবুর্গের (Freiburg) ন্যায় পর্ব্বত-গহ্বরস্থিত। বাডেন-বাডেনে বিসবাডেনের (Wies-baden) ন্যায় কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবন আছে। শুনিলাম উক্ত স্থানে প্রস্রবনের সংখ্যা অন্যূন ২০টা হইবে; আমি ছয় সাতটি দেখিলাম। জলও পান করিলাম। জল আস্বাদ-বিহীন, অথবা চিকেন ব্রথের মত কেমন এক প্রকার আস্বাদ বিশিষ্ট। জল এত উষ্ণ যে পান করিবার জন্য একটু অপেক্ষা করিতে হয়। এই জলে স্নান করিতে (বিশেষতঃ খুব শীতের সময়) বড় আনন্দ বোধ হয়। আমি যে হোটেলে উঠেছিলেম, সেখানে ঐ জলে স্নান করিলাম। বড়ই স্ফূর্ত্তি বোধ হইতে লাগিল। এই জল পান ও জলে স্নান করিবার জন্য এখানে প্রতি বৎসর কত সহস্র সহস্র ব্যক্তি আসে। আগত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজনকে বেশ চিনিলাম। তিনি ঠিক আমার বিপরীত দিকে বসিয়াছিলেন। একটা কন্‌সর্ট হইতেছিল। তাঁর নাম প্রিন্স গোরচাকফ্ (Gorchakoff) দেখিতে বেশ সুস্থ বোধ হইল। অশীতিবর্ষীয় ডিপ্লোমাট তাঁহার যুবতী পুত্রবধূ ও অপর একটি নারীর সহিত নানা প্রকার হাস্য পরিহাসে মত্ত ছিলেন।

বাডেন্-বাডেন্ ছেড়ে ফ্রাইবুর্গে পৌঁছাই। সেখানকার গথিক-ষ্টাইল নির্ম্মিত ভজনালয় অতি চমৎকার। আমি জানি না কেন, কিন্তু এই গথিক-ষ্টাইলের মধ্যে এমন কি আছে যা আমার হৃদয়ের সঙ্গে মিলে। কলনের (Cologne) গথিক-মন্দিরটি দেখে আমি একেবারে বাক্যশূন্য হই। ঐ স্বর্গের দিকে প্রধাবিত উত্তুঙ্গ চূড়া ও শিখাগুলি যেন আমার আত্মাকে তাদের সঙ্গে নিয়ে যায়।

"ভারতী"এখনো রুষিয়ায় পাঠানো হয় কেন?

রাম বসু, হরু ঠাকুর, ইত্যাদির গান ও টপ্পা কি কিনিতে পাওয়া যায়? আমার বড় ইচ্ছা য়ুরোপীয়গণকে আমাদের লৌকিক গাথার কিঞ্চিৎ আভাস দি। এ পর্য্যন্ত ইহাঁরা অনেকেই মনে করেন, এই হিন্দুরা কেবল কঠোর দর্শন ও রোমহর্ষণ বৌদ্ধ-নির্ব্বাণ-মুক্তি চিন্তাতেই পটু। ইহাঁরা জানেন না যে, আমাদের হৃদয় কত মধুময় সঙ্গীত ও সরস কবিতাপূর্ণ! কলিদাসের কথা বলিলে উত্তর দেন, "সে ত গ্রীকদের অনুকরণ মাত্র।" হায়! হায়! বেবর (Weber) কি মতই প্রচারিত কোরে বসেছেন!

শ্রীনিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদকের বৈঠক।

একদিন সেরিডানের সঙ্গে তাঁহার পরিচিত দুই ডিউক্ যুবকের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদের একজন ঠাট্টা করিয়া কহিলেন, "ওহে সেরী, এই মাত্র আমাদের তর্ক হচ্ছিল, তুমি পাজি কিম্বা গাধা, তোমার মতে কোন্‌টা ঠিক!" সেরিডন, নমস্কার করিয়া ঈষৎ হাসিয়া দুই জনের মধ্যে দাঁড়াইয়া কহিলেন "আমি দুয়েরি মধ্যে।"

থ্যাকারে, যশের বিষয়ে কোন কথা উঠিলে এই গল্পটি করিতেন;—এক দিন তিনি সেণ্ট্‌লুইসে ডিনার খাইতে গিয়াছিলেন;—তাঁহাকে দেখিয়া এক জন ভৃত্য আর এক জনকে কহিল; "জান ইনি কে?" সে উত্তর দিল "না।" প্রথম ভৃত্য কহিল "জান না? ইনিই হোচ্চেন, বিখ্যাত মিস্টর থ্যাকারে।" দ্বিতীয় ভৃত্য জিজ্ঞাসা করিল "কেন, উনি কিসের জন্য বিখ্যাত?" উত্তর—"তা কে জানে?"

চার্ল্‌স্ ডিকেন্স একদিন তর্ক করিতেছিলেন যে, যেরূপ অবস্থাতেই লোকে পড়ুক না কেন তাহার একটা না-একটা কিছু সুখের বিষয় থাকেই;—তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ গল্প করিলেন—"দুই জন লোকের নিউগেটে ফাঁসি হইবে। সকাল হইল। ফাঁসির সময় আসিল। বন্দীরা ফাঁসি কাঠের সম্মুখে আনীত হইল। দুই জনের গলায় দড়ি লাগান হইল। চারি দিকে অসংখ্য লোক জড় হইয়াছে। ঠিক এমন সময়ে একটা ষাঁড় দড়ি ছিঁড়িয়া তাহাদের মধ্যে ছুটিয়া আসিল; লোকেরা ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলাইতে সুরু করিল; তাহা দেখিয়া এক জন বন্দী আর এক জনকে কহিল, "ভাগিস্ আমরা ভিড়ের মধ্যে ছিলেম না!"

ইংলণ্ডে পল্লিগ্রামের একটি স্কুলের বালককে পরীক্ষক প্রশ্ন দেন যে, "যদি আমাদের বর্ত্তমান রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া জন্মিয়াই মরিয়া যাইতেন, তাহা হইলে কে রাজা হইতেন?" উত্তর—"তাঁহার বড় ছেলে।"

বিখ্যাত ওয়াল্টর-স্যাবেজ-ল্যাণ্ডরের ফুলের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। ফুল দেখিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন কিন্তু কখনো ছুঁইতেন না। এমন কি ফ্লরেন্সে একটি গল্প উঠিয়াছিল (বোধ করি সত্য হইবে না) যে,—একদিন ভোজনের কি ত্রুটি হওয়াতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া রাঁধুনিকে জানলা হইতে নীচে ফেলিয়া দেন—সে ব্যক্তি হাত পা ভাঙ্গিয়া বিলাপ করুক্—এমন সময়ে তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন "এই যাঃ! ওখানে বোধ করি ফুলের গাছগুলি আছে!"

ডাক্তার বিল্‌কিন্স্ একবার ডাক্তার হলকে "দেহ এবং আত্মা" নামক একটি বিখ্যাত বহি ধার দেন। অনেক দিন ফিরিয়া না পাওয়াতে তাঁহাকে চিঠি পাঠান— "ডাক্তার মহাশয়, আমার "দেহ ও আত্মা" শীঘ্র ফিরাইয়া পাঠাইবেন; উহা নহিলে আর আমার চলিতেছে না!" দৈবক্রমে সে চিঠি তাঁহার চাকর পড়ে, পড়িয়া সে ব্যক্তি নিতান্ত ভীত হইয়া অন্যান্য চাকরদের ডাকিয়া কহিল "এবাড়িতে থাকা পোষাইল না! আমাদের মনিব ডাক্তার উইল্‌কিন্সের দেহ ও আত্মা কি করিয়া হস্তগত করিয়াছেন! এখানে কি রূপে থাকা হয়!"

বিখ্যাত চিত্রকর হেডন্ গল্প করেন— যে, "এক দিন শেরিডন্ সমর্সেট্ হৌসে ডিনার খাইতেছিলেন, এমন সময় এক জন চাকর ছুটিয়া আসিয়া কহিল—"মহাশয় বাড়িতে আগুন লাগিয়াছে।" শেরিডন্ নিশ্চিন্ত ভাবে কহিলেন—"আর এক বোতল ক্ল্যারেট মদ নিয়ে আয়! এ ত আর আমার বাড়ি নয়!"

এক একটা চর্চ্চে এক দিকে স্ত্রীলোক এবং অপর দিকে পুরুষেরা বসিয়া থাকে। একবার এইরূপ কোন এক গির্জ্জায় উপাসকদের মধ্যে কেহ কেহ কথোপকথন করিয়া গোল করিতেছিল। আচার্য্য এ বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করিলে স্ত্রীদলের মধ্য হইতে এক জন উঠিয়া কহিলেন "দেখুন, আমাদের দিক হইতে গোল হইতেছে না।" আচার্য্য কহিলেন "সেই এক সুবিধা; তবু ভরষা রহিল, এ গোল শীঘ্র থামিবে!"

এক জন ইন্‌স্পেক্টর অব্ স্কুল্‌স্ পা— গ্রামের একটি এডেড্ স্কুলে একজামিন্ করিতেছিলেন। তিনি বালকদের যে একটি অঙ্কের প্রশ্ন দেন—সে প্রশ্নটি এই—"তোমার পিতার বয়স যখন ৯০ তখন তোমার জন্ম হয়;—তোমার বয়স যখন ৩০ তখন তোমার পিতার বয়স কত?" একটি বালকের স্লেটে যে উত্তর লেখা থাকে, সে উত্তরটি এই—"তখন বাবা মড়িয়া গিয়াছেন!" একটা বানান্ ভুল থাকুক, কিন্তু উত্তরটি ঠিক হইয়াছিল!

মঙ্ক্‌লুইসের রচিত "The Castle Spectre" নামক নাটক অভিনয় করিয়া ড্রুরিলেন নাট্যশালার অত্যন্ত লাভ হয়। এক দিন শেরিডনের সহিত মঙ্ক্‌লুইসের কি-একটা বিষয়ে তর্ক হইতেছিল। মঙ্ক্‌লুইস্ কহিলেন, "The Castle Spectre"-

এ যত টাকা হইয়াছে আমি তত টাকা বাজি রাখিয়া বলিতে পারি যে, আমার কথাই সত্য! যেরিডন কহিলেন, "আমি নিতান্ত গরীব, অত টাকা বাজি রাখিতে পারিব না। তবে, তোমার পুস্তকে ন্যায্য যত টাকা পাওয়া উচিত ছিল, তাহা আমি বাজি রাখিতে প্রস্তুত আছি!"

গোলাপ-বালা।

(গোলাপের প্রতি বুল্‌বুল্‌)

রাগিণী—বেহাগ।

বলি, ও আমার গোলাপ বালা,
বলি, ও আমার গোলাপ বালা,
তোল' মুখানি, তোল' মুখানি,
কুসুম কুঞ্জ কর আলা।
বলি, কিসের সরম এত?
সখি, কিসের সরম এত?
সখি, পাতার মাঝারে লুকায়ে মুখানি
কিসের সরম এত?
বালা, ঘুমায়ে পোড়েছে ধরা,
সখি, ঘুমায় চাঁদিমা তারা,
প্রিয়ে, ঘুমায় দিক্ বালারা,
প্রিয়ে, ঘুমায় জগত যত।
সখি, বলিতে মনের কথা
বালা, এমন সময় কোথা?
প্রিয়ে, তোল' মুখানি আছে গো আমার
প্রাণের কথা কত!
আমি এমন সুধীর স্বরে
সখি, কহিব তোমার কানে
প্রিয়ে, স্বপনের মত সে কথা আসিয়া
পশিবে তোমার প্রাণে!
আর কেহ শুনিবেনা, কেহ জাগিবেনা,
প্রেম-কথা শুনি প্রতিধ্বনি বালা
উপহাস সখি করিবেনা!
পরিহাস সখি করিবেনা।
তবে মুখানি তুলিয়া চাও!
সুধীরে মুখানি তুলিয়া চাও!
সখি একটি চুম্বন দাও।
গোপনে একটি চুম্বন চাও!
সখি তোমারি বিহগ আমি,
বালা, কাননের কবি আমি,
আমি সারারাত ধোরে, প্রাণ,
করিয়া তোমারি প্রণয় পান,
সুখে সারাদিন ধোরে গাহিব স্বজনি,
তোমারি প্রণয় গান!
সখি, এমন মধুর স্বরে
আমি গাহিব সে সব গান,
দূরে, মেঘের মাঝারে আবরি তনু
ঢালিব প্রেমের তান।
তবে— মজিয়া সে প্রেম গানে,
সবে চাহিবে আকাশ পানে,
তারা ভাবিবে গাইছে অপসর কবি
প্রেয়সীর গুণ গান।
তবে মুখানি তুলিয়া চাও!
সুধীরে মুখানি তুলিয়া চাও!
নীরবে একটি চুম্বন দাও
গোপনে একটি চুম্বন চাও!

সংশোধন।

ভারতী, চতুর্থ খণ্ড, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ।

পৃথিবীর উৎপত্তি।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩১২	১	১৬	সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্তে
৩১৩	,,	১২	যে	যেটি
৩১৫	,,	৬	সকল পদার্থেরি	আবর্ত্তমান সকল পদার্থেরি
,,	২	১৫	জ্যোতিষ্ক	জ্যোতিষ্ক, অন্যান্য জ্যোতিষ্ক সকল ক্রমশঃ
,,	,,	১ (নোট)	খণ্ডের	খণ্ড
৩১৬	১	১০	নিয়মাবলীর দ্বারাই সমর্থিত	নিয়মাবলীর অনুযায়ী
,,	,,	১১	দ্বারা	দ্বারাও
,,	,,	৪ (নোট)	+	+
,,	,,	১০ (,,)	তাপ	চাপ
,,	,,	১৩ (,,)	+	+
,,	,,	১৪ (,,)	+	+
,,	,,	১৭ (,,)	বৎসর	ব্যাসের
,,	,,	১৮ (,,)	দ্বিগুণ হয়	দ্বিগুণ হয়। ভারতী সং
,,	২	৮	এখনকার যতদিন	যতদিন
,,	,,	১১	সূর্য্য	পৃথিবী সূর্য্য হইতে যে পরিমাণ উত্তাপ পায় সূর্য্য
৩১৭	১	১	ইহার কারণ এই,	সেই বাষ্পময়
,,	,,	৬	স্ফীত হইয়া	স্ফীত হইয়া উঠে।
,,	,,	১০	রেখাও	রেখার উপরিস্থিত স্থানও
,,	,,	,,	বিষুব রেখার নিকটস্থ বৃহৎ রেখাও	বৃহত্তর বিষুব রেখার উপরিস্থ স্থানও
,,	,,	১২	ক্ষুদ্র বৃহৎ	যদি দুই বস্তু ক্ষুদ্র বৃহৎ
,,	,,	,,	রেখা যদি	রেখাকে
,,	,,	১৩	রেখা	রেখা আবর্ত্তক বস্তু
,,	,,	১৫	দেশ	স্থান
,,	,,	১৬	দেশের	স্থানের
৩১৮	,,	১০	তাপমান	সেখানে তাপমান

কাব্য ও দুর্নীতি।

এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা দুর্নীতির উত্তেজক বলিয়া কাব্যের প্রতি দোষ আরোপন করেন। তাঁহারা বলেন কাব্যের উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, উহার দ্বারা যে ফল হয় তাহা নীতি-বিরুদ্ধ। এমতটি ইয়ুরোপে সময় সময় মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। St. Augustine বলেন কাব্যে অনেক কল্পনা-প্রসূত মিথ্যা কথা আছে, সুতরাং উহা মিথ্যার আদি পুরুষ সয়তানের মদিরা স্বরূপ (Vinum daemonum)। এ যুক্তির বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যক নাই, তবে একথাটা অরিজেনের মুখ-নিঃসৃত হইলে আরো ভাল হইত। কাব্যজাত মিথ্যা মনের উপর দিয়া গড়াইয়া পড়ে কিন্তু তাহাতে মনের উর্ব্বরতার অনেক বৃদ্ধি হয়।

অপর এক শ্রেণীর নীতিবেত্তারা অন্য কারণে কাব্যের নীতি-বিরোধ প্রমাণ করিতে চাহেন। তাঁহারা বলেন, কাব্যের দ্বারা মনোবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইয়া কার্য্যকারিতার দিকে উন্মুখ হইয়া উঠে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কোন কার্য্যেই তাহার পরিসমাপ্তি হয় না। এইরূপে উত্তেজিত মনোবৃত্তি উপযুক্ত উদ্‌যাপনে বঞ্চিত হইয়া ক্রমে নিজের কার্য্যকারিতা হারায়। তখন তাহার ফল হয় এই যে বাস্তব কোন ব্যবহার কিম্বা ঘটনাতেও মনোবৃত্তি আর তাহার নিয়োজিত কার্য্য করিতে চাহে না। একটা অন্যায় আচরণ দেখিলে আর আমাদের ক্রোধের উদ্রেক হয় না এবং ক্রোধ তাহার নিয়োজিত কার্য্য করে না, অর্থাৎ অন্যায়াচারীকে শাস্তি দেয় না। কাব্যে কোন একটা অন্যায় আচরণ দেখিলে আমাদের ক্রোধ হয় বটে কিন্তু তাহাতে অন্যায়াচারীর শাস্তি হয় না। সুতরাং ক্রমে ক্রমে এমন হইয়া পড়ে যে বাস্তব জীবনে অন্যায়াচরণ দেখিলে আমাদের ক্রোধ আর উত্তেজিত হয় না; আমরা অবিবাদে এক জনের উপর অত্যাচার দেখিয়া অত্যাচারীর অপ্রত্যক্ষ ভাবে সহায়তা করি। এরূপ ফল উৎপন্ন করিলে কাব্য যে নীতি-বিরোধী সে বিষয়ে আর বিসম্বাদ থাকে না।

সম্প্রতি একটি বাঙ্গালা পুস্তকে দেখিলাম পেলির এই মতটি বিয়োগান্ত কাব্যের সম্বন্ধে খাটান হইয়াছে। বলা বাহুল্য উক্ত মত কেবল মাত্র যে বিয়োগান্ত কাব্য সম্বন্ধেই খাটে এমন নহে, মিলনান্ত কাব্যেও ইহার প্রয়োগ হইতে পারে। মনে কর, আমরা কাব্যে পড়িলাম যে, এক ব্যক্তি আপনার প্রাণ সঙ্কটেও আমাদের মমতাভাজন এক পাত্রের উপকার করিল, তাহাতে তাঁহার প্রতি আমাদের যে কৃতজ্ঞতার উদ্রেক হয়, তাহা আমাদের প্রকাশ করিবার উপায় নাই। এইরূপ অনেকবার হইলে

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে, বাস্তব জীবনে উপকার পাইলেও আমাদের কৃতজ্ঞতার উদয় হইবে না। এক কথায় সাধারণতঃ সকল কাব্যের প্রতিই এই দোষ অর্পিত হইতে পারে। একজন সমালোচক এই পুস্তকের সমালোচনায় উক্ত মতের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দিয়াছেন। আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই যে, পাকা ভিত্তির উপর মিথ্যা দাঁড়াইয়া, এবং কাঁচা ভিত্তির উপর সত্য দাঁড়াইয়া,—উপস্থিত মত ও তাহার সমালোচনাই তাহার এক প্রমাণ। সুতরাং এ বিষয়ে দুই একটি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

কাব্যে বর্ণিত ঘটনা গল্প মাত্র এই জ্ঞানের উপরেই আমাদের কাব্য-রসাস্বাদিনী শক্তি নির্ভর করে; যে ঘটনা আমরা বাস্তব জীবনে দেখিলে শোকে অভিভূত হই, কাব্যে তাহাই পড়িয়া আমরা সুখ উপভোগ করি। দুঃস্বপ্ন দেখিবার সময় যদি আমাদের মনে হয় যে ইহা কেবল স্বপ্নমাত্র তাহা হইলে আমাদের বিশেষ কষ্ট হয় না, বরঞ্চ অনেক সময় ভাল লাগে।* ইহা হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাস্তব জীবনে যে পরিমাণে আমাদের মনোবৃত্তি উত্তেজিত হয় কাব্যে ততদূর হয় না; সুতরাং কাব্য পাঠে আমাদের মনোবৃত্তি উত্তেজনামান-যন্ত্রের কার্য্যকারিতা ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে না। যদি উঠিত তবে দুঃখময় কাব্য পাঠ কখনই সুখকর হইত না, বরং তাহা যন্ত্রনার নিদান হইয়া উঠিত। এরূপ অবস্থায় কাব্যালোচনায় মনোবৃত্তির কার্য্যকালে অকর্ম্মণ্য হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যদি কাব্যালোচনায় কতক পরিমাণে উত্তেজিত মনোবৃত্তিকে বশীকরণ শিক্ষা পাই তাহা হইলে কাব্য আমাদের উপকারী ব্যতীত অপকারী নহে। সকল সময় মনোবৃত্তি কার্য্যে পরিণত হওয়া, অসভ্য অবস্থায় যাহা হউক, বর্ত্তমান সভ্যতার অবস্থায় অপ্রার্থিত। যদি মনোবৃত্তি বশীকরণ পূর্ব্বোক্ত নীতিবেত্তাদের মতে দুর্নীত হয় তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দোষ পড়ে বর্ত্তমান সভ্যতার ঘাড়ে। যদি কাব্য পূর্ব্বোক্ত নীতিবেত্তাদিগের মতানুসারে মনোবৃত্তির উপর কার্য্য করে, তাহা হইলে কাব্য যে শুধু নীতি-গর্হিত ফল উৎপন্ন করে এরূপ নহে। তাহা হইলে অনায়াসেই কাব্যকে নীতি সংরক্ষণ কার্য্যেও নিযুক্ত করা যাইতে পারে। একটি সুন্দরী কুলরমণীকে দেখিবামাত্র মনে কুচিন্তাকে স্থান দেওয়া একটা নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নীতিবেত্তাদের মতানুসারে ঐরূপ কুচিন্তা উদ্রেকোপযোগী কাব্য পাঠ করিলে ক্রমশ ওরূপ অবস্থায় আর কুচিন্তা উদিত হইবে না। সুতরাং কাব্যের দ্বারা যদি ভাল মনোবৃত্তি ক্রমে ভোঁতা হইয়া যায় তবে কাব্যের দ্বারা মন্দ মনোবৃত্তিরও ক্রমে ক্রমে বিষদাঁত ভাঙ্গা যাইতে পারে।

আসল কথাটা এই, অন্যান্য চারুশিল্পের (Fine arts) ন্যায় কাব্য একটী চিত্তরোষিণী বিদ্যা। ইহা মূলতঃ নীতি

* এবিষয় ভারতীর তৃতীয় খণ্ডে "সুখ দুঃখের" প্রথম প্রস্তাবে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

রক্ষকও নহে নীতি ভক্ষকও নহে। তবে পৃথিবীর অপর সকল বিষয়ের ন্যায় ইহা দুর্নীতও হইতে পারে সুনীতও হইতে পারে। কিন্তু এটা বিশেষ রূপ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে কাব্যের উদ্দেশ্য সুরুচি ও সুপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তিদের আমোদ দেওয়া; যে কাব্য আমোদ না দিয়া অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধন করে তাহা অপর বিষয়ে খুব উৎকৃষ্ট হইলেও কাব্যাংশে নিকৃষ্ট।

একখানি কাব্যের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দোষ দুর্নীতি। একখানি কাব্যের যত অধিক সংখ্যক লোকের নিকট পরিচিত ও সমাদৃত হওয়া সম্ভব ও তাহার যেরূপ দীর্ঘ জীবন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে তাহাতে দুর্নীত কাব্য হইতে ভয়ানক অনিষ্ট উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। দুর্নীতি দুই কারণে দূষনীয়। প্রথমতঃ দুর্নীতির কার্য্যের দ্বারা প্রত্যক্ষ পক্ষে সমাজের অনিষ্ট সাধিত হয় আর দ্বিতীয়তঃ, দুর্নীত কার্য্যে অন্য লোককে আকৃষ্ট করিয়া সমাজের অনিষ্টকারী একটা ভয়ঙ্কর রক্তবীজ সৃষ্টি করে। দুর্নীত কার্য্যের দ্বারা প্রত্যক্ষ পক্ষে যত অনিষ্ট হয় পরক্ষে তদপেক্ষা অনেক গুণ বেশী। প্রথমোক্তরূপ অনিষ্ট সাধিত হইবার পর তবে জানিতে পারা যায় সুতরাং তাহা দুর্নিবার্য্য, দ্বিতীয় প্রকার অনিষ্ট কাল-সাপেক্ষ সুতরাং তাহার প্রতিবিধান সম্ভব ও সকলেরই তাহার নিরাকরণে বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। স্পৃহনীয় বস্তুর সংস্রব বশতঃ দুর্নীত কার্য্য বিশেষ রূপ সংক্রামক হইয়া পড়ে, সেই জন্য দুর্নীত কাব্য বিশেষরূপ অনিষ্টকর ও দণ্ডার্হ। দুর্নীতি অপেক্ষা কাব্যের আর গুরুতর দোষ হইতে পারে না; কাজেই এই অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া কোন কাব্য বিচারালয়ে আনীত হইলে অনেক বুঝিয়া সুঝিয়া আমাদের মত দেওয়া উচিত। চুরির আসামীকে বিচারের সময় জজ সাহেব যত বিবেচনা করিয়া কাজ করেন খুনের মকদ্দমা নিষ্পত্তির সময় তাহার সহস্র গুণ অধিক সতর্ক হইয়া কার্য্য করা তাঁহার উচিত। ইহার অন্যথা হইলে অনেক কুফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অকাট্য যুক্তি দেখাইয়া গ্রন্থ রচনা করিলে হতভাগ্য গ্রন্থকারকে কেহ বা নাস্তিক কেহবা দুর্নীত বলিয়া অবজ্ঞা করিবার ভান করেন। সামান্য বিষয়ে মতভেদ হইলেও যেরূপ গালাগালি হইয়া থাকে, বোধ করি কাহারো অবিদিত নাই। কাজেই এক জন গ্রন্থকারের নামে এই দোষ আরোপিত হইলে তাহাকে অস্পৃশ্য মনে না করিয়া তাহার যথার্থ দোষ গুণ বিচার করিয়া আমাদের মতস্থির করা উচিত।

বস্তুতঃ পক্ষে সচরাচর ভাষায় ব্যবহৃত "দুর্নীত" শব্দের বিশেষ কোন আকৃতি নাই। উহা অনেকটা গ্রীক দেবতা প্রোটিয়ুসের ন্যায়। তুমি একটা কিছু মনে করিয়া তাহাকে ধরিতে গেলে সে অমনি আর একটা আকার ধরিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তবে এই একটা বুঝিতে পারা যায় যে কাহারো কোন একটা বদ্ধমূল কুসংস্কারের বিরোধী হইলেই তাহার নিকট তাহা

দুর্নীত। ব্যক্তি মাত্রের পক্ষেও এইরূপ গ্রন্থ মাত্রের পক্ষেও এইরূপ।

যে গ্রন্থ লোককে নীতিপথ হইতে বিচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে রচিত তাহা দুর্নীত। এখানে "অভিপ্রায়ে" কথার ব্যবহারের কারণ বলিতে হইবে।

সৌন্দর্য্য-লিপ্সা উত্তেজিত করা এক, এবং ইন্দ্রিয়-লিপ্সা উত্তেজিত করা স্বতন্ত্র। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ অনেক সময়ে সৌন্দর্য্যের সহিত ইন্দ্রিয়-লিপ্সা জড়িত হইয়া থাকে। এক জন কবি আমাদের সৌন্দর্য্য-লিপ্সা উত্তেজিত না করিয়াও ইন্দ্রিয় লালসা উদ্রেক করিতে পারেন, এবং আর এক জন কবি যখন আমাদের সৌন্দর্য্য-লালসা চরিতার্থ করিতে যত্নশীল হন, তখন আমাদের কল্পনার দোষে আমাদের মনে আনুষঙ্গিক রূপে ইন্দ্রিয়-লিপ্সা জাগ্রত হইতেও পারে। এক্ষণে নীতি পরায়ণ পাঠকদের নিকটে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, উপরোক্ত উভয় কবিই কি তাঁহাদের চক্ষে দণ্ডার্হ? প্রথমোক্ত কবির কাব্য হইতে কুফল ব্যতীত আর কিছুই উৎপন্ন হয় না, তিনি সুমিষ্ট খাদ্যের প্রলোভন দেখাইয়া অপচ্য দ্রব্য ভক্ষণ করান্, কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত কবির উদ্দেশ্য অতি প্রশংসনীয়। মনে কর, মনুষ্য-শরীরের পরিমাণ-সামঞ্জস্য ও তাহার সুঠাম পূর্ণতাপ্রাপ্ত অবয়ব-সৌন্দর্য্য ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে যদি গ্রীক ভাস্কর ফিডিয়স্ তাঁহার সজীবপ্রভ প্রস্তর মূর্ত্তি সমূহকে উলঙ্গ করিয়া গঠিত করিয়া থাকেন, ও তাহাতে করিয়া যদি কোন মাংস-পিণ্ডের কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়-লালসাই উদ্দীপ্ত হয়, তবে উভয়ের মধ্যে দণ্ডার্হ কে? —শিল্পী না দর্শক? ভাস্কর বিদ্যায় অতুলনীয় গ্রীক্ ফিডিয়স্ কিম্বা পলিক্লীনিস্ রচিত উলঙ্গ প্রস্তর মূর্ত্তির একটি ভগ্নাংশ মাত্র পাইলেও তাহা সৌন্দর্য্য-উপাসক ইয়ুরোপের অত্যন্ত আদরের সামগ্রী হইয়া পড়ে। এবং ঐ সকল উলঙ্গ প্রস্তর মূর্ত্তির অনুকরণ সমূহই দর্শকদের বিশুদ্ধ আনন্দ বর্দ্ধনের জন্যই য়ুরোপের প্রকাশ্য স্থানে রক্ষিত হয়; এমন কি লণ্ডনের য়ুনিবর্‌সিটি কলেজে—যে স্থানে স্ত্রী পুরুষে একত্র হইয়া বিদ্যানুশীলন করেন, যে স্থানে বৃদ্ধ অধ্যাপক ও অল্প বয়স শিষ্যগণ একত্রে শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত থাকেন—সেখানেও সর্ব্বত্রেই ওইরূপ উলঙ্গ প্রস্তর মূর্ত্তি দর্শকদের সৌন্দর্য্য-প্রীতি চরিতার্থ করে। কিন্তু প্যারিসের জঘন্য স্থান সমূহে যে সকল চিত্র ও প্রস্তর মূর্ত্তি রক্ষিত হয়, তাহার উদ্দেশ্য কদর্য্য বলিয়াই তাহা নিন্দনীয়। যে গ্রন্থ হইতে কুফল উৎপন্ন হয় তাহাই যে দুর্নীত, এমন নয়। গোলাপ ফুল হইতে মাকড়সা গরল সংগ্রহ করে কিন্তু সেই জন্য গরলাধার বলিয়া কেহ গোলাপকে ত্যাজ্য মনে করিবেন না। বলিংব্রুক দুইটি Puritan ধর্ম্মোপদেশ পড়িয়া নাস্তিকতায় দীক্ষিত হন কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ উক্ত ধর্ম্মোপদেষ্টাকে নাস্তিকতা শিক্ষা দেওয়ার দোষে দোষী করিবেন না। এক-জন যদি যথার্থ মনের বিশ্বাসের উপর

নির্ভর করিয়া বেশ্যাবৃত্তির প্রয়োজনীয়তার সাপক্ষে এমন গ্রন্থ রচনা করেন যে তাহা পরিবার মণ্ডলীতে পাঠ করিলে সকলে কানে হাত দিবেন, তথাপি তাহা দুর্নীত নয় কেননা তাহার অভিপ্রায় মানুষকে কুপথে লইয়া যাওয়া নহে। শারীর-তত্ত্ববিদ্যায় এমন অনেক কথা আছে যে তাহা লোকের সামনে উচ্চারণ করা অসম্ভব কিন্তু তাহা বলিয়া কি শারীরতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ দুর্নীত? পৃথিবীর প্রাচীন কবিরা কিছু খোলাখুলী কথা কহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা সে জন্য দুর্নীত আখ্যা পাইতে পারেন না। লরেন্স স্টার্ণ নিজের গ্রন্থের দুর্নীতি সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন প্রাচীন কবিদের বিষয়ে তাহা খুব খাটে: একদিন স্টার্ণ একজন ভদ্র মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি আমার Tristram Shandy পড়িয়াছেন?" ভদ্র মহিলা উত্তর করিলেন, "না, মহাশয়, আমি পড়িনাই; আর সত্য কথা বলিতে কি, আমি শুনিয়াছি যে উহা স্ত্রীলোকের অপাঠ্য।" ইহাতে স্টার্ণ বলিলেন, Madam, he is like your little heir playing on the carpet. At times he shows a good deal of his person which is generally hidden—but in perfect innocence.

আসল কথাটা এই যে—গ্রন্থের আলোচিত বিষয়ের উপর তাহার নীতি নির্ভর করে না রচনা-প্রণালীর উপর করে। পাঠকের মনে দুর্নীত ভাব উৎপন্ন করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হইলে নিশ্চয়ই গ্রন্থ দুর্নীত।

আর যদি গ্রন্থকারের অপর কোন উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায় তবে সে গ্রন্থ দুর্নীত নহে। গ্রন্থকারের মনের ভিতরকার উদ্দেশ্য অন্তর্যামীই জানিতে পারেন, তবে গ্রন্থে যে উদ্দেশ্য অভিব্যক্ত থাকে আমরা তাহারই কথা কহিতেছি। আলোচ্য গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন সূত্র হইতে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া তাহা লইয়া কোলাহল করা অনাবশ্যক।

ভগ্ন হৃদয়।

চতুর্থ সর্গ।

কবি।

(প্রথম গান।)

বিপাশার তীরে ভ্রমিবারে যাই,
প্রতিদিন প্রাতে দেখিবারে পাই
লতা-পাতা-ঘেরা জানালা মাঝারে
একটি মধুর মুখ!
চারিদিকে তার ফুটে আছে ফুল,
কেহবা হেলিয়া পরশিছে চুল,

দুয়েকটি শাখা কপাল ছুঁইয়া,
দুয়েকটি আছে কপোলে দুইয়া,
কেহবা এলায়ে চেতনা হারায়ে
চুমিয়া আছে চিবুক!
বসন্ত প্রভাতে লতার মাঝারে
মুখানি মধুর অতি!
অধর দুটির শাসন টুটিয়া
রাশি রাশি হাসি পড়িছে ফুটিয়া,
দুটি আঁখি পরে মেলিছে মিশিছে
তরল চপল জ্যোতি।

(দ্বিতীয় গান।)

প্রতিদিন যাই সেই পথ দিয়া,
দেখি সেই মুখ খানি;
কুসুম মাঝারে রোয়েছে ফুটিয়া
কুসুমগুলির রাণী!
আপনাআপনি উঠে আঁখি মোর
সেই জানালার পানে,
আন-মন হোয়ে রহি দাঁড়াইয়া
কিছু খণ সেই খানে!
আর কিছু নহে, এ ভাব আমার
কবির সৌন্দর্য্য-তৃষা,
কলপনা-সুধা-বিভল কবির
মনের মধুর নেষা!
গোলাপের রূপ, বকুলের বাস,
পাপিয়ার বন-গান,
সৌন্দর্য্য-মদিরা দিবস রজনী
করিয়া করিয়া পান,
শিথিল হইয়া পোড়েছে হৃদয়,
নয়নে লেগেছে ঘোর,
বিকশিত রূপ বড় ভাল লাগে
মুগধ নয়নে মোর!

(তৃতীয় গান।)

প্রতিদিন দেখি তারে,কেন না দেখিনু আজি?
আলিঙ্গিতে গ্রীবা তার লতাগুলি চারিধার
আছে শত বাহু তুলি শত ফুল-হারে সাজি!
দূর-বন হোতে ছুটি আসিয়া প্রভাত-বায়
সে মুখটি না দেখিয়া, শূন্য বাতায়ন দিয়া
প্রবেশি আঁধার গৃহে করিতেছে হায় হায়!
কতখণ—কতখণ—কতখণ ভ্রমি একা
গণিনু ফুলের দল, মাটিতে কাটিনু রেখা,
কতখণ—কতখণ—গেল চলি কতখণ
ক্ষণে ক্ষণে দেখি চাহি তবু না পাইনু দেখা!
ফিরিনু আলয় মুখে চলিনু আপন মনে,
চলিতে চলিতে ধীরে ভুলে ভুলে ফিরে ফিরে
বার বার এসে পড়ি সেই—সেই বাতায়নে!
নিরাশ-আশার মোহে চেয়ে দেখি বারবার,
শূন্য—শূন্য—শূন্য সব বাতায়ন অন্ধকার,
ফুলময় বাহু দিয়া অন্ধকারে বুকে নিয়া—
অন্ধকারে আলিঙ্গিয়া রোয়েছে সে লতাগুলি,
তবু ফিরি ফিরি সেথা আসিলাম ভুলি ভুলি!
তেমনি সকলি আছে, বাতায়ন ফুলে সাজি,
দুলিছে তেমনি করি বাতাসে কুসুম-রাজি!
শুধু এ মনে আমার, এক কথা বার বার
এক সুরে মাঝে মাঝে উঠিতেছে বাজি বাজি
"প্রতিদিন দেখি তারে কেননা দেখিনু আজি?
"কেননা দেখিনু তারে কেননা দেখিনু আজি?"
অতিধীর পদক্ষেপে আলয়ে আসিনু ফিরি,
শতবার আন-মনে বলিলাম ধীরি ধীরি—
"প্রতিদিন দেখি তারে কেননা দেখিনু আজি?"

(চতুর্থ গান।)

কাল যবে দেখা হোল পথে যেতে যেতে চলি
মোরে হেরে আঁখি তার কেনগো পড়িল ঢলি?
অজানা পথিকে হেরি এত কি সরম হবে?
কি যেন গো কথা আছে,আটকিয়া রহিয়াছে,
আধ-মুদা দুটি আঁখি কি যেন রেখেছে ঢাকি,
খুলিলে আঁখির পাতা প্রকাশ তা হয় পাছে!
সরম না হয় যদি, এ ভাব কিসের তবে?
কাল তাই বোসে বোসে ভাবিয়াছি সারাক্ষণ,
স্বপনে দেখেছি তার ঢোলে-পড়া দুনয়ন!
প্রভাতে বসিয়া আজ ভাবিতেছি নিরিবিলি
"মোরে হেরে আঁখি তার কেন গো পড়িল
ঢলি?"

(পঞ্চম গান।)

সত্য কি তাহারে ভালবাসি?
ভুলিনু কি শুধু তার দেখে রূপ রাশি?
স্বপনে জানি না তার হৃদয় কেমন,
সহসা আপনা ভুলে—শুধু কি রূপসী বোলে
জীবন্ত পুত্তলী পদে বিসর্জ্জিনু মন?

(ষষ্ঠ গান।)

মোর এ যে ভালবাসা রূপ-মোহ এ কি?
ভাল কি বেসেছি শুধু তার মুখ দেখি?
মুখেতে সৌন্দর্য্য তার হেরিনু যখনি
তখনি কি মন তার দেখিতে পাইনি?
মধুর মুখেতে তার আঁখি-দরপনে
মনচ্ছায়া হেরিয়াছি কল্পনা-নয়নে!
সেই সে মুখটি তার মধুর আকার
বেড়াতেছে খেলাইয়া হৃদয়ে আমার!
কত কথা কহিতেছে হরষে বিভোর,
কত হাসি হাসিতেছে গলা ধোরে মোর!
কি করিয়া হাসে আর কি কোরে সে কয়,
কি কোরে আদর করে ভালবাসাময়,
মুখানি কেমন হয় মৃদু অভিমানে,
সকলি হৃদয় মোর না জানিয়া জানে!
যেন তারে জানি কত বর্ষ অগণন,
এ হৃদয়ে কিছু তার নহে গো নূতন!
মুখ দেখে শুধু ভাল বেসেছি কি তারে?
মন তার দেখিনি কি মুখের মাঝারে?

(সপ্তম গান।)

দু জনে মিলিয়া যদি ভ্রমিগো বিপাশা-পারে!
কবিতা আমার যত সুধীরে শুনাই তারে!
দোঁহে মিলি এক প্রাণ গাহিতেছি এক গান,
দু জনের ভাবে ভাবে একেবারে গেছে মিশে,
দু জনে দুজন পানে চেয়ে থাকি অনিমিষে,
দু জনের আঁখি হোতে দু জনে মদিরা পিয়া
আসিবে অবশ হোয়ে দোঁহার বিভল হিয়া!
মুখে কথা ফুটিবে না,আঁখি পাতা উঠিবেনা,
আমার কাঁধের পরে নোয়াবে মাথাটি তার,
দু জনে মিলিয়া যদি ভ্রমি গো বিপাশা পার!

(অষ্টম গান।)

শুনেছি—শুনেছি কি নাম তাহার—
শুনেছি—শুনেছি তাহা!
নলিনী—নলিনী—নলিনী—নলিনী—
কেমন মধুর আহা!
নলিনী—নলিনী—বাজিছে শ্রবণে
বাজিছে প্রাণের গভীর ধাম,
কভু আন-মনে উঠিতেছে মুখে
নলিনী—নলিনী—নলিনী নাম!

বালার খেলার সখীরা তাহারে
নলিনী বলিয়া ডাকে,
স্বজনেরা তার, নলিনী—নলিনী—
নলিনী বলে গো তাকে!
নামেতে কি যায় আসে?
রূপেতে কি যায় আসে?
হৃদয় হৃদয় দেখিবারে চায়
যে যাহারে ভাল বাসে!

নলিনীর মত হৃদয় তাহার,
নলিনী যাহার নাম;
কোমল—কোমল—কোমল অতি
যেমন কোমল নাম!
যেমন কোমল, তেমনি বিমল
তেমনি সুরভ-ধাম!
নলিনীর মত হৃদয় তাহার
নলিনী যাহার নাম!

ত্রিবেদ কি চতুর্ব্বেদ?

অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতবর্গের মধ্যে অনেকেই চারি বেদ স্বীকার করিয়া থাকেন; তাঁহারা বলেন ব্রহ্ম এক সময়েই সাম্ ঋক্, যজু ও অথর্ব্ব বেদকে নিশ্বাসের ন্যায় অবলীলাক্রমে প্রচার করেন, তজ্জন্যই বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া থাকে। (১) বেদ পৌরুষেয় কি অপৌরুষেয় আমরা এ প্রবন্ধে তাহার বিচার না করিয়া এই মাত্র দেখাইব যে, আদি বেদ চারি নয়; সাম্, ঋক্, যজু, এই তিনটীই আদি, অথর্ব্ব বেদ উক্ত বেদত্রয়ের সার সংগ্রহ স্বরূপ উহা অথর্ব্ব নামক জনৈক ঋষি কর্ত্তৃক প্রচারিত। আমার বৈদিক কালের ও পৌরাণীকি কালের প্রামাণ্য সূত্রাদি উদ্ধৃত করিয়া বেদ তিন, কি চারি-বেদ, তাহা পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিলাম, তাঁহারা প্রমাণাদি দেখিয়া যে রূপে বিচার করিবেন তাহাই মাননীয়।

বৈদিক কালের প্রমাণ।

১ম। ঋগ্বেদে যথা—অহো বুধ্নিয় মন্ত্রং মে গোপয়া যং ঋষয় স্ত্রয়ীবেদা বিদুঃ ঋচো যজুংষি সামানি"

২য়। "পুমান রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং বহ্বী প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ তস্মাদৃচঃ সাম যজুংষি"

৩য়। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের চার্ব্বাক মত সমালোচনে বৃহস্পতির যে সূত্রগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেন তাহাতেও তিন বেদ যথা, নস্বর্গো নাপবর্গো বা নৈ-

(১) কিয়ৎকাল অতীত হইল কোন বন্ধুর গৃহে জনৈক সংস্কৃত-শাস্ত্রজ্ঞ পরমহংস সমাগত হন, আমি বন্ধুর অনুরোধে তাঁহার সহিত বেদ বিষয়ক কিছু আলাপ করি। তিনি, বেদ তিনটী নয়, চতুর্ব্বেদ স্বীকার করেন, তদুত্তরে আমি এই প্রমাণ প্রয়োগ করি।

বাত্মা পারলৌকিকঃ নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ। অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদা স্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্। অপিচ ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ

৪র্থ শতপথ ব্রাহ্মণে যথা—

৪র্থ।—"প্রজাপতি র্বা ইদমগ্র আসীৎ সোঽশ্রাম্যৎ সতপোঽতপ্যত তস্মাচ্ছ্রান্তং তে পানাৎ ত্রয়ো লোকা অসৃজ্যন্ত পৃথিব্যান্তরীক্ষংদ্যৌ স ইমান ত্রীন্ লোকান্ অভিততাপ তেভ্যস্তপ্তেভ্যস্ত্রীনি জ্যোতিংষ্যজায়ন্ত অগ্নি যোঽয়ং পবতে সূর্য্যঃ সইমানি ত্রীনি জ্যোতিংষ্যভিততাপ তেভ্যস্তপ্তেভ্যস্ত্রয়োবেদা অজায়ন্ত অগ্নে ঋগ্বেদোবাযো যজুর্বেদঃ সূর্য্যাৎ সামবেদঃ স ইমাংস্ত্রীন্ বেদান্ অভিততাপ তেভ্যস্তপ্তেভ্যস্ত্রীনি শুক্রাণ্যজায়ন্ত ভূরিত্যৃগ্বেদাদ্ভুব ইতি যজুর্বেদাৎ স্বরিতি সামবেদাৎ।" অর্থাৎ প্রজাপতিই অগ্রে ছিলেন, তিনি শ্রম পূর্ব্বক তপঃ করিলেন; তাঁহার শ্রম এবং তপ হইতে ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্লোক, সৃষ্ট হইল। তিনি ঐ তিন লোককে অভিতপ্ত করিলেন। ঐ অভিতপ্ত লোকত্রয় হইতে অগ্নি বায়ু এবং সূর্য্য এই জ্যোতিত্রয় উৎপন্ন হইল। তিনি ঐ জ্যোতিত্রয়কে অভিতপ্ত করাতে অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং সূর্য্য হইতে সামবেদ উৎপন্ন হইল। পুনশ্চ ঐ বেদত্রয়কে অভিতপ্ত করাতে তিন শুক্র উৎপন্ন হইল, ঋগ্বেদ হইতে ভূ, যজুর্ব্বেদ হইতে ভুব, সামবেদ হইতে স্বঃ।

বৈদিক সূত্র সমালোচনা।

বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ অতি প্রাচীন। ১ম সূত্রে আছে তিন বেদ, ঋক্, যজু, ও সাম। ২য় সূত্রে আছে সেই পরম পুরুষ হইতে সাম, ঋক ও যজুর উৎপত্তি হইয়াছে। ৩য় সূত্রে আছে স্বর্গ অপবর্গ বা পরলোকগামী কোনও আত্মা নাই, বর্ণাশ্রমের ক্রিয়াদিও নিস্ফল, অগ্নিহোত্র, বেদত্রয় (সাম, ঋক, ও যজু) ত্রিদণ্ড ও ভস্মলেপন বৃথা। ৪র্থ সূত্রে আছে প্রথমে মাত্র প্রজাপতি ছিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া প্রথমে ভূলোক, ভুবলোক ও স্বর্গোক সৃষ্টি করিলেন। ঐ লোকত্রয় হইতে অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য এই তিনের উৎপত্তি হইল। জ্যোতিত্রয়ের অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং সূর্য্য হইতে সাম বেদ উৎপন্ন হয়। পাঠক পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক সূত্রগুলি অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে বৈদিক কোনও সূত্রে অথর্ব্ব বেদের নামোল্লেখ নাই। বৈদিক কালের অব্যবহিত পরেই ভগবান মনু স্মৃতিশাস্ত্র প্রচার করেন। আমি মনু হইতে সেই প্রমাণগুলি দেখাইতেছি যে তাহাতেও চতুর্ব্বেদের উল্লেখ নাই।

১ম "অগ্নি, বায়ু, রবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনং দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্‌যজুঃসাম লক্ষণং"

অর্থাৎ তিনি যজ্ঞ কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত অগ্নি হইতে সনাতন ঋগ্বেদ বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ, এবং সূর্য্য হইতে সাম বেদ উদ্ধৃত করিলেন। ১ম অং ২৩।

২য় অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ। বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতিচ”

৩য় ত্রিভ্য এবতু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ। তদিত্যুচোহস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ।

৪র্থ ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োহব্যয়াঃ। ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণোমুখং॥

অর্থাৎ ব্রহ্মা, ঋক, যজু, সাম এই বেদ ত্রয় হইতে ওঁকারের অকার, উকার, মকার ও ভূ ভুবঃ স্বঃ এই তিন ব্যাহৃতি ক্রমে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ২ অং ৭৭ পরমেষ্ঠী পিতামহ ঋক, যজুঃ, সাম এই বেদত্রয় হইতে তদিত্যাদি গায়ত্রীর এক এক পাদ করিয়া পাদত্রয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। ২অ ৭৭

ব্রহ্ম প্রাপ্তির কারণ ওঁকার, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন মহা ব্যাহৃতি ও ত্রিপদা গায়ত্রী প্রভৃতিকে বেদত্রয়ের নিদান বলিয়া জানিবে। ২অং ৮১। ইত্যাদি

অপিচ ঋগ্বেদো দেবদৈবত্যো যজুর্ব্বেদস্তু মানুষঃ।

সামবেদঃ স্মৃতঃ পিত্র্যস্তস্মাত্তস্যাশুচিধ্বনিঃ॥

এতদ্বিদন্তো বিদ্বাংসস্ত্রয়ীনিষ্কর্ষমন্বহং,

ক্রমশঃ পূর্ব্বমভ্যস্য পশ্চাদ্বেদমধীয়তে।

অর্থাৎ যেহেতু ঋগ্বেদের দেবই দেবতা, যজুর্ব্বেদের মানুষই দেবতা সামবেদের পিতৃগণই দেবতা অতএব সামবেদ অধ্যয়নের পর অন্যবেদের ধ্বনি অশুচির ন্যায়॥ বিদ্বানগণ বেদ ত্রয়ের এইরূপ দেবতা অবগত ইহার প্রথমে বেদের সারভূত প্রণব সহকৃত গায়ত্রী অধ্যয়ন করিবে পরে বেদাধ্যয়ন করিবে। ৪র্থ অং ১২৪। ১২৫

মনুসংহিতা সমালোচন।

মনু বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিন জ্যোতি হইতে সাম, ঋক, ও যজু এই তিন বেদের উৎপত্তি বলেন, এবং অন্যান্য অধ্যায়ে যথায় বেদের উল্লেখ করিয়াছেন তথাতেই সুস্পষ্টরূপে তিন বেদ উল্লেখ করিয়াছেন কোথাও অথর্ব্ববেদের নামোল্লেখ করেন নাই। অপরাপর প্রাচীন সংহিতাতেও অথর্ব্ব বেদের নাম পাওয়া যায় না। যাহা হোক যাঁহারা চতুর্ব্বেদ স্বীকার করেন তাঁহারা এইরূপে তর্ক উপস্থিত করেন আমি পাঠকবর্গের গোচরার্থে চতুর্ব্বেদস্বীকারকারী মহাত্মাদিগের বচন প্রমাণও যথাসাধ্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

তাঁহারা বৃহদারণ্যকের অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস” অর্থাৎ সেই পরমাত্মা হইতে ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্বাঙ্গিরস বেদ নিশ্বাসের ন্যায় অবলীলা ক্রমে নির্গত হইয়াছে।

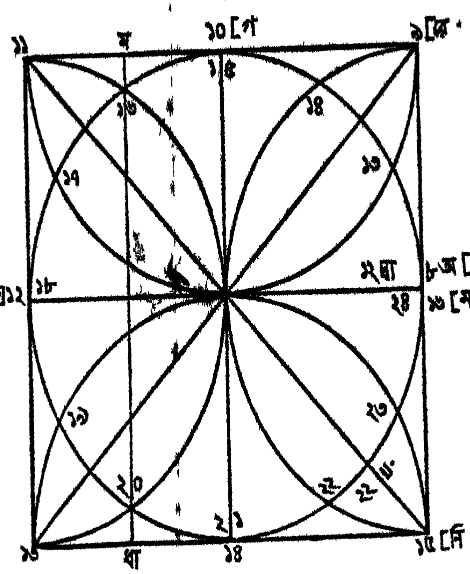
যাঁহারা এই বচনা দ্বারা চতুর্ব্বেদের প্রমাণ দেখান তাঁহারা আংশিক অথবা পূর্ণ রূপে সত্যের অপলাপ করিয়া স্বমত রক্ষা করেন। কিন্তু ঐ বচনের পূর্ব্বেও উত্তরার্দ্ধ পাঠ করেন না।

পূর্ব বচনটী এই যথা “স যথার্দ্রৈধাগ্নে রভ্যাহিতাৎ পৃথগ্ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা

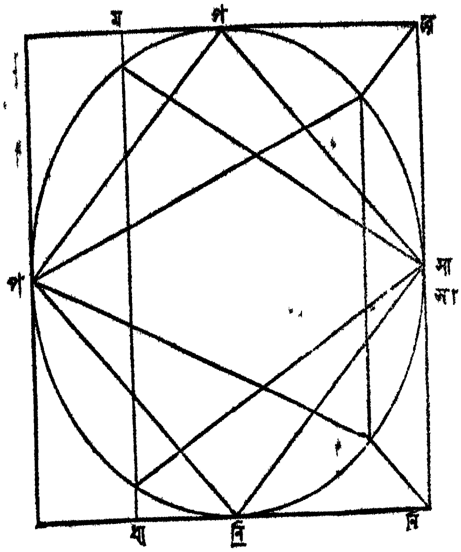
অরেহস্য মহতোভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্য দৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো হথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসপুরাণবিদ্যাউপনিষদঃ শ্লোকা সূত্রাণাম্নুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্মৈ বৈতানি সর্ব্বানি শিক্ষাকল্পব্যাকরণনিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষর মধিগম্যতে”—এই বচনানুসারে দেখান যে বেদচতুষ্টয় সেই পরমাত্মার নিঃশ্বসিত তাহা নয় ইতিহাস, পুরাণ, সূত্র, ব্যাখ্যা, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ছন্দ, জ্যোতিষ ইত্যাদিও বেদের ন্যায় সৃষ্ঠ, বেদ পৌরুষেয় কি অপৌরুষেয় যখন তাহার বিচার এপ্রবন্ধে করিব না তখন বেদরচক কে তাহা বলিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু বৃহদারণ্যকে ইতিহাস ও শিক্ষা কল্পাদিতেও যে ঈশ্বরনিঃশ্বসিত বলায় তাহারই বিশেষ সমালোচন ও তত্তৎশাস্ত্র প্রণেতাগণের নামোল্লেখ করিব। বেদ, সাম, ঋক্, যজু, অথর্ব্ববেদ কেবল শান্তিক পৌষ্টিক অভিচারিক কার্য্যে প্রতিপন্ন হয়। বেদাঙ্গ ছয়। শিক্ষাশাস্ত্র দ্বারা উদাত্ত অনুদাত্ত স্বর ও ব্যঞ্জনাদি বর্ণ সকলের উচ্চারণ জ্ঞান হয়, কল্প শাস্ত্র দ্বারা বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানের বিশেষ বিশেষ জ্ঞান জন্মে। ব্যাকরণ মহেশ প্রণীত মাহেশ, ও ঋষিপ্রণীত পানিনী ইহা দ্বারা বৈদিক সূত্রের শুদ্ধাশুদ্ধি জ্ঞান জন্মে। যাস্ক ঋষি নিরুক্ত শাস্ত্র রচনা করেন, ইহাতে বৈদিক মন্ত্রের অর্থ নির্ণয় হয়। ছন্দ শাস্ত্র পিঙ্গল ঋষি প্রস্তুত করেন ইহাতে বেদোক্ত মন্ত্রের ছন্দ নিরূপণ আছে। জ্যোতিষ, আদিত্যগর্গ প্রভৃতি ঋষিগণ প্রণয়ন করেন, ইহাতে অদৃস্টাধীন ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান কালের শুভাশুভ পরিজ্ঞান হয় ও তিথি নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্যাদির গ্রহণ জানা যায়। এই গেল বেদাঙ্গ। বেদের উপাঙ্গ চারি, যথা, পুরাণ মহর্ষি বেদব্যাস ও অন্যান্য ঋষিপ্রণীত মৎস্য কূর্ম্ম, ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, অগ্নি, ভবিষ্য, বরাহ, স্কন্দ, বামন, গারুড়, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, নারদীয়, ও মার্কণ্ডেয় এই অস্টাদশ খানি। আবার পুরাণের অন্তর্ভূত উপপুরাণ যথা সানৎকুমার, নারসিংহ ইত্যাদি ২৩ খানি। ন্যায় শাস্ত্র মহর্ষি গৌতম রচনা করেন। ইহাতে ষোড়শ পদার্থ জ্ঞানে মুক্তি ইত্যাদি বর্ণিত আছে। মীমাংসা, বাদরায়ণপ্রণীত ব্রহ্মমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন, ইহাতে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য এবং সমস্ত বস্তুই মিথ্যা ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মুক্তি ইত্যাদি। আর জৈমিনী প্রণীত কর্ম্মমীমাংসা। ইহাতে কর্ম্মকাণ্ডের ও বেদের অপরিসীম মহিমা বর্ণিত আছে। ধর্ম্ম শাস্ত্র মন্বাদির স্মৃতি, ইহাতে সৃষ্টি প্রকরণ, চাতুর্ব্বর্ণ্যের ধর্ম্ম, স্ত্রীধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত, ইত্যাদি মানবের যাবতীয় করণীয় কর্ম্ম বিধিবদ্ধ আছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিশেষতঃ বৃহদারণ্যকে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে পূর্ব্বোক্ত বেদাদি ও শিক্ষা কল্পাদি অপরা বিদ্যা কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যাই পরা বিদ্যা, যখন বেদাদিকে সামান্য ইতিহাস ব্যাকরণের ন্যায় সৃষ্ট বলিয়া বর্ণন করিলেন তখন তাঁহার কথা প্রমাণ স্বরূপে

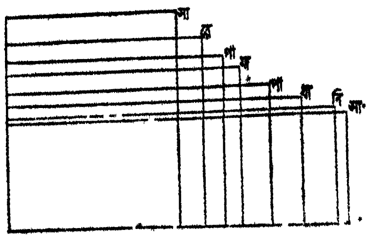
১ চিত্র

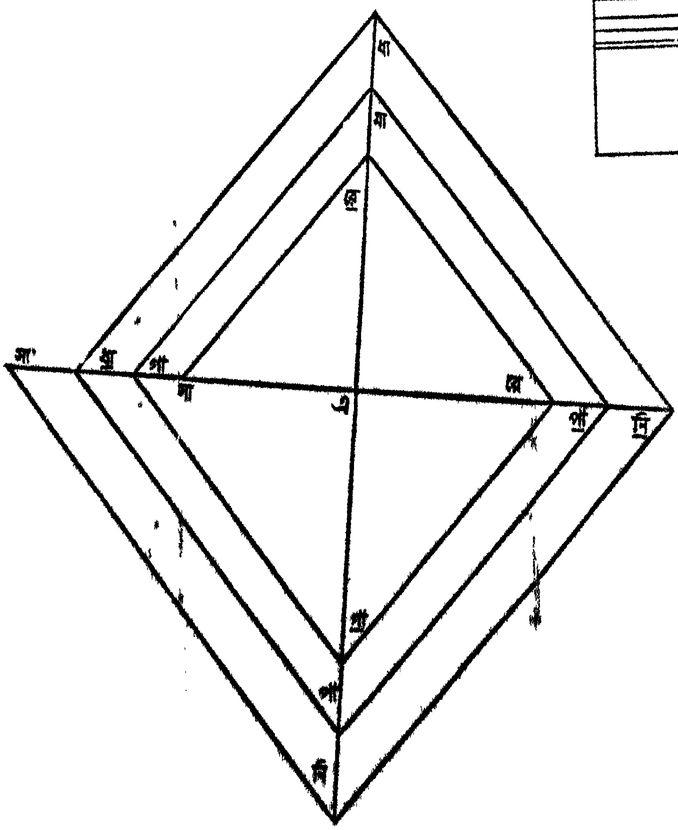


৪ চিত্র



৩ চিত্র





২ চিত্র

বিভক্ত হইয়াছে, এবং চক্রটির গায়ে ১২ হইতে ২৩পর্য্যন্ত যে ১২টি অঙ্ক বসিয়াছে তাহাতে-করিয়া ঐ চক্রটি ১২ সমান অংশে বিভক্ত হইয়াছে। চক্রের পরিধিকে কিনা বেস্টন-রেখাকে ১ বলিয়া ধরা হইয়াছে সুতরাং তাহা সা'র পরিমাণ-রেখা। সা ১=৮ অস্টমাংশ=১২ দ্বাদশাংশ। চক্রটির ১২ দ্বাদশাংশ হইতে ২৪ দ্বাদশাংশ পর্য্যন্ত জ্ঞাপন করিবার জন্য চক্রের গায়ে ১২ হইতে ২৪ পর্য্যন্ত অঙ্ক উত্তরোত্তর বিন্যস্ত হইয়াছে, আর চক্রটির ৮ অস্টমাংশ হইতে ১৬ অস্টমাংশ পর্য্যন্ত জ্ঞাপন করিবার জন্য চৌকোণ-ক্ষেত্রটির গায়ে ৮ হইতে ১৬ পর্য্যন্ত অঙ্ক উত্তরোত্তর বিন্যস্ত হইয়াছে। চক্রের বেস্টন-পথের কোন এক স্থান হইতে এক পাক ঘুরিয়া স্ব-স্থানে আসিলে একগুণ পথ পরিভ্রমন করা হয়,দুই পাক ঘুরিয়া সেই একই স্থানে আসিলে দ্বিগুণ পথ পরি-ভ্রমণ করা হয়,—এই জন্য একই স্থানে ৮ অস্টমাংশ ও ১৬ অস্টমাংশ তথা ১২ দ্বাদশাংশ ও ২৪ দ্বাদশাংশ বসিয়াছে; অর্থাৎ একবার ৮অস্টমাংশ অতিবাহন করিয়া সেখানে না থামিয়া আর একবার ৮অস্টমাংশ অতিবাহন করিলে ১৬ অস্টমাংশ অতিবাহন করা হয়, তাই যে খানে ৮-অস্টমাংশ সা, সেইখানে ১৬ অস্টমাংশ সা়। ৮ অস্টমাংশ এবং ১৬ অস্টমাংশের মধ্য-পথে পাওয়া যাইবে—(১) ৯-অস্টমাংশ রে, অতএব ৮-এর যত গুণ উচ্চে ৯—সা'র ততগুণ উচ্চে রে; (২) ১০-অস্টমাংশ গা, অতএব ৯'এর যতগুণ উচ্চে ১০—রে'র ততগুণ উচ্চে গা; (৩) ১৫ দ্বাদশাংশ গা, ১৬ দ্বাদশাংশ মা, অতএব ১৫'র যতগুণ উচ্চে ১৬—গা'র ততগুণ উচ্চে মা; (৪) ১৬ দ্বাদশাংশ মা, ১৮দ্বাদশাংশ পা,অতএব ১৬'র যতগুণ উচ্চে ১৮ কিংবা যাহা একই কথা ৮'এর যতগুণ উচ্চে ৯—মা'র ততগুণ উচ্চে পা (এই মাত্র দেখা গিয়াছে যে, সা-রে'র মধ্যেও ঠিক্ এইরূপ ব্যবধান); (৫) ১৮ দ্বাদশাংশ পা, ২০ দ্বাদশাংশ ধা, অতএব ১৮'র যতগুণ উচ্চে ২০ কিংবা যাহা একই কথা ৯'এর যতগুণ উচ্চে ১০ পা'র ততগুণ উচ্চে ধা (রে-গা'র মধ্যেও ঠিক এইরূপ ব্যবধান দেখা গিয়াছে); (৬) ধা ২০ দ্বাদশাংশ, নি ২২॥০ দ্বাদশাংশ, এখন—২০'র যতগুণ উচ্চে ২২॥০, ৮'এর ততগুণ উচ্চে ৯, কেননা ৮কে ২॥০ গুণ করিলে ২০ হয় ও ৯কে ২॥০ গুণ করিলে ২২॥০ হয়, অতএব ৮'এর যতগুণ উচ্চে ৯—ধা'র ততগুণ উচ্চে নি (সা-রে'র মধ্যেও এইরূপ ব্যবধান দেখা গিয়াছে);(৭) ১৫ অস্টমাংশ নি,১৬ অস্টমাংশ সা়, অতএব ১৫'র যতগুণ উচ্চে ১৬ নি'র ততগুণ উচ্চে সা় (গা-মা'র মধ্যে ঠিক্ এই-রূপ ব্যবধান দেখা গিয়াছে); এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সুর সাতটি কিন্তু পাশাপাশি-স্থিত দুই দুইটি সুরের মধ্যে তিন প্রকার বই আর ব্যবধান নাই ও সা রে-গ-ম এই প্রথম চারিটি সুরের মধ্যে তিনটিরই দেখা পাওয়া যায়, যথা,—৮'এর সম্বন্ধে যেমন ৯ সা'র সম্বন্ধে তেমনি রে,৯'এর সম্বন্ধে যেমন ১০ রে'র সম্বন্ধে তেমনি গা, ও ১৫'র সম্বন্ধে যেমন ১৬ গা'র সম্বন্ধে তেমনি মা। ৮এ তাহার অস্টমাংশ যোগ করিলে ৯ হয়,

৯'এ তাহার নবমাংশ যোগ করিলে দশ হয়, ১৫তে তাহার ১৫শাংশ যোগ করিলে ১৬ হয়; এই হিসাবেই বলা হইয়াছে যে সা-রে ব্যবধান অষ্টমাংশ—ধর একমাত্রা, রে-গ-ব্যবধান নবমাংশ—প্রায় এক-মাত্রা, গ-ম ব্যবধান পঞ্চদশাংশ—প্রায় অর্দ্ধমাত্রা।

নি-সা'র মধ্যেই বা কেন প্রায় অর্দ্ধমাত্রা ব্যবধান, আর সা-রে'র মধ্যেই বা কেন একমাত্রা ব্যবধান ইহা এখন জলের ন্যায় স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে; ৮ ৯ ১০ অবধি করিয়া ১৫ ১৬ পর্য্যন্ত হ'চ্চে সা রে গা অবধি করিয়া নি সা পর্য্যন্তের পরিমাণাঙ্ক,—৮-এ তাহার অষ্টমাংশ যোগ করিলে ৯ হয়, ১৫তে তাহার পঞ্চদশাংশ যোগ করিলে ১৬ হয়, পঞ্চদশাংশ অষ্টমাংশের প্রায় অর্দ্ধাংশ, এই সূত্রেই নি-সা-ব্যবধান সা-রে ব্যবধানের প্রায় অর্দ্ধাংশ। তাহা যেন হইল—গা-মা-ব্যবধান কেন অর্দ্ধমাত্রা হইল? ইহার উত্তর এই যে, পা'র এক মাত্রা নীচের স্বরকেই মা বলিয়া ধরা হইয়াছে, অর্থাৎ রে'র যত টুকু নীচে সা পা'র ততটুকু নীচে মা; সুতরাং ৯ হইতে ৮ যত গুণ কম কিংবা যাহা একই কথা ১৮ হইতে ১৬ যত গুণ কম পা-হইতে মা ততটুকু নীচে আর ১৮ হইতে ১৫ যত গুণ কম পা হইতে গা তত নীচে,—কেননা পা হ'চ্চে ১২ অষ্টমাংশ, গা হ'চ্চে ১০ অষ্টমাংশ সুতরাং ১০ অপেক্ষা ১২,৬ অপেক্ষা ৫,কিংবা ১৮ অপেক্ষা ১৫ যতগুণ কম গা-হইতে পা ততটুকু নীচে; এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ১৮ হইতে ১৬ যতগুণ কম পা হইতে মা তত নীচে ও ১৮ হইতে ১৫ যতগুণ কম পা হইতে গা তত নীচে, সুতরাং ১৬ হইতে ১৫ যতগুণ কম মা হইতে গা ততটুকু নীচে; এই সূত্রেই গ-মা-ব্যবধান অর্দ্ধমাত্রা হইয়াছে।

পূর্ব্বে ইহা যথেষ্ট বলা হইয়াছে যে, এক গ্রামের সাত স্বরের মধ্যে যেরূপ ব্যবধান, সকল গ্রামের সাত স্বরের মধ্যেই ঠিক সেই রূপ ব্যবধান। সা-গ্রামের প্রথম স্বরের পরিমাণাঙ্ক ১, কিংবা যদি আনা গণ্ডা হইতে নিষ্কৃতি চাও—৩৬০, তাহাতে তাহার অষ্টমাংশ (৪৫) যোগ করিলে সা-গ্রামের দ্বিতীয় স্বরের অঙ্ক ৪০৫ উৎপন্ন হইবে; সংক্ষেপে সা'র সা ৩৬০, সা'র রে ৪০৫; রে'র সা (অর্থাৎ রে-গ্রামের প্রথম স্বর) ৪০৫, ৪০৫এ তাহার অষ্টমাংশ যোগ যোগ করিলে রে'র রে (রে-গ্রামের দ্বিতীয় স্বর) = ৪৫০॥১/০ পাওয়া যাইবে; কিন্তু ৪০৫এ তাহার নবমাংশ যোগ করিলে সা'র গা ৪৫০ হয়; অতএব সা'র রে এবং রে'র সা যদিও একই কিন্তু সা'র গা এবং রে'র রে একটু এদিক্ ওদিক্ যথা,—সা'র গ ৪৫০, রে'র রে ৪৫০॥১/০। রে-অঙ্ককে সা-অঙ্ক দিয়া গুণ করিলে রে'র সা অঙ্ক পাওয়া যাইবে, রে-অঙ্ককে রে-অঙ্ক দিয়া গুণ করিলে রে'র রে অঙ্ক পাওয়া যাইবে, রে-অঙ্ককে গা-অঙ্ক দিয়া গুণ করিলে রে'র গা অঙ্ক পাওয়া যাইবে ইত্যাদি—যথা রে-অঙ্ক হ'চ্চে ৯-৮ম তাহাকে সা-অঙ্ক ১ দিয়া গুণ করিলে রে'র সা হইবে, উহাকে রে-অঙ্ক ৯-৮ম দিয়া গুণ করিলে রে'র রে-অঙ্ক ৮১-৬৪ ম হইবে,

উহাকে গা-অঙ্ক-৫-৪র্থ দিয়া গুণ করিলে রে'র গা-অঙ্ক ৪৫-৩২ শ হইবে, ইত্যাদি,—সকল গ্রামেরই এইরূপ। এক সপ্তক উচ্চের সা হ'চ্চে ২, এ জন্য সা বা রে বা যাহা-কেই হউক দ্বিগুণ করিলে এক সপ্তক উচ্চের সা বা রে বা আর যে কোন সুর ধরা গিয়া থাকে তাহাই হইবে, অর্দ্ধগুণ করিলে এক সপ্তক নীচের সেই সুর হইবে,—তারের পরিমাণাঙ্ক ঠিক ইহার বিপরীত অর্থাৎ উচ্চ সপ্তকের তারকে অর্দ্ধেক ছোটো এবং নিম্ন সপ্তকের তারকে দ্বিগুণ বড় করিতে হয়। মা-গ্রামের সহিত সা-গ্রামের যদিও খুব মিল আছে—নিম্নে দেখা যাইবে যে, উহাদের মধ্যে এক জায়-গায় মিলে না। সা-গ্রামের অঙ্কগুলিকে মা-অঙ্ক ৪-৩য় দিয়া গুণ করিলেই মা-গ্রামের সমস্থানীয় অঙ্ক-গুলি পাওয়া যাইবে, যথা—

সা-গ্রামের			মা-অঙ্ক		মা-গ্রামের		সা-গ্রামের
সা	১	×	৪-৩ য়	=	সা ৪-৩ য়	=	মা
রে	৯-৮ ম	×	ঐ	=	রে ৩-২ য়	=	পা
গা	৫-৪ র্থ	×	ঐ	=	গা ৫-৩ য়	=	ধা
মা	৪-৩ য়	×	ঐ	=	মা ১৬-৯ ম	=	নি
পা	৩-২ য়	×	ঐ	=	পা ২	=	সা'
ধা	৫-৩ য়	×	ঐ	=	ধা ২০-৯ ম	=	*
নি	১৫-৮ ম	×	ঐ	=	নি ৫-২ য়	=	গা'
সা'	২	×	ঐ	=	সা' ৮-৩ য়	=	মা'

উপরে দেখিবে যে, মা'র পা = সা' (অর্থাৎ সা'র সা') কিন্তু মা'র ধা = রে' (সা'র রে) নহে,—ইহার কারণ এই যে, যে গ্রাম হউক্ না কেন তাহারই পা অপেক্ষা ধা প্রায়-এক-মাত্রা উচ্চ, কিন্তু সা অপেক্ষা রে ঠিক এক মাত্রা উচ্চ; কোন সুরকে প্রায়-এক মাত্রা উচ্চে চড়াইতে হইলে তাহাতে তাহার নবমাংশ যোগ করিতে হয়, আর তাহাকে এক-মাত্রা উচ্চে চড়াইতে হইলে তাহাতে তাহার অষ্টমাংশ যোগ করিতে হয়; মা'র পা-অঙ্ক ২য়েতে তাহার নবমাংশ যোগ করিলে ২০-৯য় হয়—ইহাই মা'র ধা, কিন্তু সা-অঙ্ক ২য়েতে তাহার অষ্টমাংশ যোগ করিলে তবেই তাহা রে' অঙ্ক (অর্থাৎ এক সপ্তক উচ্চ রে-অঙ্ক) ৯-৪র্থ হয়। এ-জন্য সা-গ্রামের সুর-গুলিকে মা-গ্রামে ভর্ত্তি করিতে হইলে শুধু যে কেবল নিখা-দকে কোমল করিলেই হয় তাহা নহে, রেখাবকেও একটু নীচে নাবাইতে হয়। ঐ একই কারণ-বশতঃ সা'র ধা-অঙ্ক (৫-৩য়) পা'র রে অঙ্ক হইতে পারে না; কেননা পা-অঙ্ক হ'চ্চে ৩-২য়, তাহাকে প্রায়-এক

মাত্রা উচ্চে চড়াইলে ধা-অঙ্ক ৫-৩য় হয়, কিন্তু তাহাকে ঠিক্ এক মাত্রা উচ্চে চড়াইলে তবে তাহা পা'র রে-অঙ্ক ২৭-১৬শ হয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, প্রায়-এক-মাত্রা এবং ঠিক এক মাত্রার ইতর-বিশেষই যত গোলোযোগের মূল। যদি কড়ি-কোমল সমেত ১৩-টি সুর লওয়া যায় যথা—

সা, রে রে, গ গ, ম, প প, ধা ধা, নি নি, সা ; আর যদি উহাদের ব্যবধান-মাত্রা এইরূপ হয় যে, সা-হইতে রে যতগুণ উচ্চ—রে হইতে রে ঠিক ততগুণ উচ্চ, রে-হইতে গ ঠিক্ ততগুণ উচ্চ, গ হইতে গ, গ হইতে ম, মা হইতে পা, পা হইতে পা, ইত্যাদি অর্থাৎ এক সুর হইতে তাহার অব্যবহিত পর-বর্ত্তী সুর মাত্রই, ঠিক্ ততগুণ উচ্চ, তবে সা-বাদে ঐ ১২টি সুরের অতিরিক্ত কোন সুরই কোন গ্রামে আবশ্যক হয় না ; তাহা হইলে প্রায়-এক-মাত্রা ও প্রায়-অর্দ্ধমাত্রা এ দুটি কথা উঠিয়া গিয়া সপ্তকের পাশাপাশিস্থ সুর-গুলির মধ্যে কোথাও বা খাঁটি এক মাত্রা ব্যবধান এবং কোথাও বা খাঁটি অর্দ্ধমাত্রা ব্যবধান দাঁড়ায়। স্বর-চক্রে যে দ্বাদশ-টি সুর ধরা হইয়াছে তাহা ঐরূপ হিসাবেই ধরা হইয়াছে—নহিলে দ্বাদশ সুরের অতিরিক্ত বিস্তর সুর আবশ্যক হইত,—এইমাত্র দেখা গিয়াছে যে মা'র ধা ও পা'র রে ঐ দ্বাদশ সুরের অতিরিক্ত; সা-গ্রাম হইতে যে গ্রাম যত দূরবর্ত্তী সেই গ্রামে ঐ প্রকার অতিরিক্ত সুরের ততই সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার কথা। উক্ত ত্রয়োদশ সুরের পাশাপাশিস্থ স্বর-দ্বয় মাত্রেরই মধ্যে সমান ব্যবধান স্থাপন করিলে দাঁড়ায় এই যে সা-অঙ্ক ১, এককে যাহা দিয়া ১২-বার গুণের উপর গুণ করিলে ২ হয় তাহাই রে-অঙ্ক, সংক্ষেপে ২-এর দ্বাদশ মূল (twelveth root of two) রে অঙ্ক, তাহার (রে-অঙ্কের) দ্বি-স্বগুণ (square) রে, ত্রি-স্বগুণ (cube) গ, চতুঃস্বগুণ গ, ৫-স্বগুণ ম এবম্প্রকারে চলিয়া সর্ব্বশেষে পাওয়া যাইবে যে, তাহার ১২-স্বগুণ সা-অঙ্ক ২। পার্শ্ব-পত্রস্থিত দ্বিতীয়-চিত্রে এ-সা রেখা অপেক্ষা এ-রে যতগুণ বড়, এ-রে অপেক্ষা এ-রে ততগুণ বড়, এ-রে অপেক্ষা এ-গ ততগুণ বড়, এ-গ অপেক্ষা এ-গ ততগুণ বড়, ইত্যাদি-ক্রমে চলিয়া সর্ব্ব শেষে এ-সা অপেক্ষা এসা দ্বিগুণ বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে; অতএব এসা-রেখা সা'র পরিমাণ রেখা, এরে-রেখা রে'র পরিমাণ রেখা, ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলে উক্ত ত্রয়োদশটি সুরের মধ্যেকার পাশাপাশিস্থ প্রতি দুই দুই সুরের মধ্যেই ঠিক্ সমান মাত্রা ব্যবধান বর্ত্তিবে। তৃতীয় চিত্রে পূর্ব্বেকার স্বর-ক্ষেত্রকে ঐরূপ সাম-মাত্রিক ব্যবধান-প্রণালী অনুসারে গঠন করা হইয়াছে। পূর্ব্বেকার স্বরক্ষেত্রের সহিত বর্ত্তমান স্বরক্ষেত্রের অন্ততঃ এটুকু সাদৃশ্য আছে যে, উভয় ক্ষেত্রেই গা মা এবং নি সা'র মধ্যেকার ব্যবধান অন্যান্য ব্যবধান অপেক্ষা কম। সা-দাঁড়ি প্রভৃতি দাঁড়ি-গুলি উচ্চারক তারের পরিমাণ-রেখা ইহা বলা বাহুল্য, আর সা-দাঁড়ির সাত-টি

ছেদ-স্থান পর্দা বসাইবার স্থান ইহাও বলা বাহুল্য।

চতুর্থ চিত্রের চক্রাভ্যন্তরস্থিত চৌকোণ-ক্ষেত্রটির চারি কোণে সা-গ্রামের তিনটি সম্বাদী সুর সা গা পা, আর নি, সব-শুদ্ধ ধরিয়া মা-গ্রামের চারিটি বিবাদী সুর সা গা পা নি সমান্তরে সমান্তরে বসিয়াছে দেখিতে পাইবে; তেমনি আবার সা-গ্রামের অনুবাদী সুর তিনটি সা মা ধা যাহা মা-গ্রামের সম্বাদী সুর তাহারা চক্রাভ্যন্তরস্থিত সম ভুজ-ত্রিকোণের তিনটি কোণে সমান্তরে সমান্তরে বসিয়াছে দেখিতে পাইবে; ও সা গ্রামের তিনটি বিবাদী সুর রে পা নি যাহা পা-গ্রামের সম্বাদী সুর তাহারা সম-দ্বিভুজ ত্রিকোণটির তিনটি কোণে বসিয়াছে —সুতরাং রে হইতে পা এবং পা হইতে নি সমান্তর-বর্ত্তী। সমান্তরবর্ত্তী স্বতন্ত্র এবং সম-গুণ উচ্চ স্বতন্ত্র—ইহা যেন মনে থাকে; ১ হইতে ২ যত অন্তরে ২ হইতে ৩ তত অন্তরে অবস্থিতি করে বটে কিন্তু ১ অপেক্ষা ২ দ্বিগুণ বেশী, ২ অপেক্ষা ৩ ১৷৹ গুণ বই বেশী নয়।

চতুর্থ চিত্রের চক্রাভ্যন্তর-স্থিত চতুঃকোণ-ক্ষেত্রের কোণ-চতুষ্টয়বর্ত্তী সা গা পা নি সা এই কয়টি উত্তরোত্তর সমান্তর-স্থিত সুরের মধ্যে সম্বন্ধ এইরূপ,—৪ হইতে ৫ যতগুণ উচ্চ সা হইতে গা ততগুণ উচ্চ; ৫ হইতে ৬ যতগুণ উচ্চ—গা হইতে পা ততগুণ উচ্চ; ৬ হইতে ৭ যত গুণ উচ্চ—পা হইতে কোমল-নি ততগুণ উচ্চ; ৭ হইতে ৮ যতগুণ উচ্চ কোমল-নি হইতে সা ততগুণ উচ্চ; ইহার সহিত একটানে পাওয়া যায়,—৮ হইতে ৯ যতগুণ উচ্চ—সা হইতে রে ততগুণ উচ্চ; ৯ হইতে ১০ যত গুণ উচ্চ—রে হইতে গা ততগুণ উচ্চ। সমভুজ-ত্রিকোণের কোণ-ত্রয়বর্ত্তী সা মা ধা সা এই চারিটি উত্তরোত্তর সমান্তর-স্থিত সুরের মধ্যে সম্বন্ধ এইরূপ,—৩ হইতে ৪ যতগুণ উচ্চ সা হইতে মা ততগুণ উচ্চ, ৪ হইতে ৫ যতগুণ উচ্চ মা হইতে ধা তত গুণ উচ্চ, ৫ হইতে ৬ যতগুণ উচ্চ ধা হইতে সা ততগুণ উচ্চ। সম-দ্বিভুজ ত্রিকোণের কোন-ত্রয়-বর্ত্তী রে পা নি এই তিনটি সমান্তরস্থিত সুরের মধ্যে সম্বন্ধ এইরূপ,—৩ হইতে ৪ যতগুণ উচ্চ রে হইতে পা ততগুণ উচ্চ, ৪ হইতে ৫ যত গুণ উচ্চ পা হইতে নি ততগুণ উচ্চ।

ব্যবধান-সম্বন্ধে একটি বিষয় বলিবার এখনো অবশিষ্ট আছে। উচ্চ গ্রামের বিবাদী দল-ভুক্ত স্বগ্রামের কোমল নিখাদটি ধা অপেক্ষা ২১-২০শগুণ উচ্চ; যে তিন প্রকার ব্যবধানের কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে উহা তাহার ভিতরকার একটিও নহে। পাশাপাশিস্থ স্বরদ্বয়ের মধ্যে কেবল ৯-৮ম, ১০-৯ম, এবং ১৬-১৫শ গুণ উচ্চতা থাকিবার কথা, কিন্তু এস্থলে তাহার ব্যভিচার দৃষ্ট হইতেছে। প্রথমতঃ কোমল নিখাদটি সাত সুরের অতিরিক্ত—এজন্য সাত সুরের মধ্যে যেরূপ ব্যবধানের নিয়ম দেখা যায় তাহা যে উহার সম্বন্ধেও খাটিবে এমন কোন কথা নাই; দ্বিতীয়ত ধা অপেক্ষা ১৬-১৫শ গুণ উচ্চ সুরই সাধারণ নিয়মা-

নুসারে কোমল নিখাদের বাচ্য,এই শেষোক্ত কোমল নিখাদ-টিই মা-গ্রামের মধ্যম। নিম্ন গ্রামের কোমল নিখাদ হ'চ্চে স্ব-গ্রামের মধ্যম—কোমল নিখাদ যদি দুই প্রকার হইল কাজেই মধ্যমও দুই প্রকার হইতে চায়। এখন বক্তব্য এই যে এক প্রকার মধ্যম অনুবাদী স্বরের শ্রেণীভুক্ত, আর এক প্রকার মধ্যম বিবাদী-স্বরের শ্রেণীভুক্ত, যেটি অনুবাদী শ্রেণীভুক্ত সেইটিই গান্ধার অপেক্ষা ১৬-১৫শ গুণ উচ্চ (অর্থাৎ ১৫ অপেক্ষা ১৬ যতগুণ উচ্চ), আর যেটি বিবাদী-শ্রেণীভুক্ত তাহা গান্ধার অপেক্ষা ২১-২০শ গুণ উচ্চ (২০ অপেক্ষা ২১ যত গুণ উচ্চ); অথবা ৬০ অপেক্ষা ৬৪ যত গুণ উচ্চ গান্ধার অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত মধ্যম ততগুণ উচ্চ, আর, ৬০ অপেক্ষা ৬৩ যত-গুণ উচ্চ গান্ধার অপেক্ষা শেষোক্ত মধ্যম ততগুণ উচ্চ। প্রথম-চিত্রকীয় চক্রের ১০॥০ অষ্টমাংশ স্থান (অর্থাৎ বহিস্থিত চৌকোণ ক্ষেত্রের গায়ে যেথানে ১০ এবং ১১ লিখিত আছে সেই-থানকার সেই ১০ এবং ১১র মধ্যবর্ত্তী চক্রাংশটির ঠিক মধ্যস্থল) শেষোক্ত মধ্যমের স্থান;—এ মধ্যমটি, বাহুল্য-ভয়ে, ব্যবধান-নির্দ্দেশক চক্রে দেওয়া হয় নাই—যে মধ্যমটি দেওয়া হইয়াছে তাহা অপেক্ষা এ মধ্যম গান্ধারের একটু নিকটবর্ত্তী। কিন্তু তৃতীয়-চিত্রের অনুযায়ী পাশাপাশিস্থ অর্দ্ধ-মাত্রা-উচ্চনীচ স্বর-সকলের মধ্যে যদি সামমাত্রিক ব্যবধান দাঁড় করানো যায় তাহা হইলে ওরূপ দ্বিবিধ মধ্যমের প্রসঙ্গই উঠিতে পারে না।

ক্রমশঃ

ভূ-পঞ্জর।

প্রথম প্রস্তাব।

সূর্য্য হইতে খসিয়া ক্রমে পৃথিবীর বাষ্পচক্র কিরূপে একটি গ্রহরূপ ধারণ করিয়া পরে আবার তাহা উষ্ণ সমুদ্রে মগ্ন হইল, তাহা আমরা "পৃথিবীর উৎপত্তি" নামক প্রবন্ধে দেখিয়া আসিয়াছি, পরে সেই আদিম মহাসমুদ্র হইতে কিরূপে আবার অল্পে অল্পে দেশ মহাদেশ জীব জন্তু উদ্ভিদ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে—তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আমরা বলিয়া আসিয়াছি যখন পৃথিবীর বাষ্পাবরণের উত্তাপ ২০০০ ডিগ্রি সেনটিগ্রেড পরিমাণ ছিল তখন সেই বাষ্পাবরণে লৌহ প্রভৃতি ধাতব ও নানা প্রকার আকরিক পদার্থ বাষ্পাকারে মিশ্রিত ছিল। উষ্ণতার হ্রাস সহকারে ক্রমে সেই বাষ্পরাশি জল রূপে ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া যখন সমুদ্র উৎপন্ন করিল, তখন সেই বাষ্পাকার ধাতব ও আকরিক পদার্থ-রেণুও সেই বৃষ্টি জলের সহিত মিশিয়া ভূপৃষ্ঠে পড়িয়াছিল। সেই

সকল রেণুই কালে সমুদ্র তলে স্থিতাইয়া স্থিতাইয়া স্তরসংস্থিতি দ্বারা ক্রমে দেশ মহাদেশ সৃষ্ট করিয়াছে। ইহা ছাড়া ভূগর্ভস্থ অগ্নির কার্য্য হেতুও পৃথিবীর পৃষ্ঠে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে।

সকল দ্রব্যই প্রায় তরল হইতে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইবার সময় আয়তনে ছোট হইতে থাকে। দ্রব ধাতব পদার্থ ঘন হইবার সময় সঙ্কুচিত হইয়া আয়তনে অনেক কমিয়া যায়। সেই নিমিত্ত ভূগর্ভ কালে শীতল হইয়া ঘন হইবার সঙ্গে সঙ্গে হ্রস্বায়তন হইয়া পৃথিবীর কঠিন আবরণের সহিত অসম্বদ্ধ হইতে লাগিল। যেমন একটি তুলা পূর্ণ বালিসের কতকগুলি তুলা খুলিয়া লইলে বালিসটি তুবড়াইয়া যায়, তেমনি পৃথিবীর আভ্যন্তরিক পদার্থের আয়তন হ্রাস বশতঃ পৃথিবীর কঠিন আবরণ অন্তরে পূর্ব্বের ন্যায় নির্ভর না পাইয়া, তুবড়াইয়া কোন কোন স্থানে দমিয়া গেল,কোন কোন স্থানে উচ্চ হইয়া পর্ব্বত মালায় পরিণত হইল। হিমালয় আল্‌প্ প্রভৃতি আধুনিক উচ্চ পর্ব্বত সকল অধিকাংশ এইরূপে নির্ম্মিত। তাহাদের নিম্নস্থ স্তর প্রথম যুগের নিম্ন ভূমি কিম্বা সাগরতল বটে, কিন্তু ভূগর্ভের উষ্ণতার হ্রাস সহকারে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে হঠাৎ বিপ্লব দ্বারা চারি দিকের ভূমি দমিয়া গেলে হিমালয় ও আল্‌প্ প্রভৃতি পর্ব্বত রূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল পর্ব্বত শ্রেণী দেখিলে আমাদের মনে কি ভাব হয়? আমরা মনে করি চিরকাল হইতেই ইহা এইরূপ উন্নত অবস্থায় বিরাজমান। কত অল্পে অল্পে কত যুগযুগান্তের স্তর সংস্থিতি দ্বারা ইহার ভিত্তি নির্ম্মিত হইয়া, অবশেষে উপরোক্ত প্রকারে উচ্চ হইয়া পর্ব্বত শ্রেণী রূপে পরিণত হইয়াছে,ইহা আমরা হঠাৎ কল্পনা করিতে পারি না।

এইরূপ প্রণালী ছাড়া, অন্তরস্থ অগ্নির প্রভাবে কোন কোন অপেক্ষাকৃত পাতলা স্থান ফাটিয়া সেই গহ্বর দিয়া ধাতু স্রোত নির্গত হওয়াতে কালে তাহা জমিয়াও বড় ছোট নানা প্রকারের পর্ব্বত হইতে লাগিল। কিন্তু এইরূপে প্রথমে যে সকল পর্ব্বত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই সমুদ্রজলে পুনরায় বিনস্ট হইয়াছে; তাহার ভগ্নাবশিষ্ট মৃত্তিকা ছাড়া এখন আর কিছুই নাই। সেই গহ্বর দিয়া গ্র্যানিট প্রস্তর (granite) ও অন্যান্য ধাতব পদার্থ ব্যতীত, ধাতব ও অঙ্গারিক পদার্থ মিশ্রিত উষ্ণ জল স্রোতও বহমান হইতে লাগিল। ঐ জল মিশ্রিত ধাতুরেণুও স্থিতাইয়া কালে ভূপঞ্জর গঠিত করিয়াছে।

নদীতে যে প্রণালীতে চর পড়ে সেই প্রণালীতে সমুদ্রস্থ পদার্থ রেণু স্থানে স্থানে স্থিতাইয়া স্থল হইয়া উঠিল, আবার কোন স্থানের বা নব নির্ম্মিত স্তর রাশিকে অমনি চূরমার করিয়া আপন প্রভাবে সমুদ্র ভাসাইয়া লইয়া গেল। তাহা হইতে কালে আবার অন্যত্রে স্থল উৎপন্ন হইয়াছে। কত পর্ব্বত সমুদ্র জলে গলিয়া, কত স্তর চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া সেই রেণু রাশিতে অবশেষে এই সকল দেশ মহাদেশ সৃষ্ট হইয়াছে

তাহার ইয়ত্তা নাই। এখন আমরা যে সকল দেশ মহাদেশ দেখিতেছি, এইরূপ কত দেশ আবার সমুদ্র গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহারও স্থিরতা নাই। পার্ব্বত্য গ্রিক উপদ্বীপ অ্যাটিকা যে এককালে ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, নানা বৃক্ষ সমাকুল বন পূর্ণ একটি দেশ ছিল—তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ভূবেত্তাগণ বলেন তাহা নহিলে তৎ স্থানীয় সমুদ্রস্তরে এত বৃহৎ জন্তুর দেহাবশেষ কোথা হইতে আসিবে? ভূবেত্তাগণ নানা কারণ দেখাইয়া বলেন যখন হিমালয় সমুদ্র গর্ভে নিহিত ছিল তখন ভারতবর্ষ মাডাগাস্কার দ্বীপ ও মধ্য ও আফ্রিকা সংযুক্ত ছিল এবং ইহার পূর্ব্বে এক সময়ে উক্ত দেশ ভারত সাগরের দ্বীপ পুঞ্জ ও অষ্ট্রেলেসিয়া এবং এক সময় আমেরিকা ও ইয়োরোপ যে যুক্ত ছিল তাহার সন্দেহ নাই।

যে সকল পদার্থে ভূপঞ্জর গঠিত হইয়াছে, তাহা তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

প্রথম—উৎপাত-জনিত মৃত্তিকা। * (Eruptive Rocks) অর্থাৎ যে সকল তরল পদার্থ সকল যুগেই মাঝে মাঝে ভূগর্ভ হইতে সবলে নির্গত হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী-স্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তাহা উৎপাত জনিত মৃত্তিকা। এ মৃত্তিকা ভূপৃষ্ঠের অন্যান্য পদার্থ হইতে বিভিন্ন বটে কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর মৃত্তিকার মত স্ফটিকাকৃতি দানাদার (Crystalline)। রাজমহল পাহাড়ে ও আসানসোলের ডাক বাংলার নিকট এবং অন্যান্য স্থানে এই জাতীয় মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়—মূল মৃত্তিকা। যে উত্তপ্ত পদার্থ সর্ব্ব প্রথমে শীতল হইয়া পৃথিবীর আবরণ সৃজিত করিয়াছিল, (যাহা আমরা পৃথিবীর উৎপত্তিতে বরফের দৃষ্টান্তে উত্তপ্ত ভূগর্ভের উপর জমাট বাঁধিতে দেখিয়া আসিয়াছি,) সেই সর্ব্ব প্রথমের মৃত্তিকা পরে রূপান্তরিত হইয়া স্ফটিকাকৃতি দানাদার হইয়াছে। এই মৃত্তিকাকেই মৌলিক মৃত্তিকা (Fundamental gneiss) কহা যায়। এই মৃত্তিকা হাজারিবাগ, ছোটনাগপুর প্রভৃতি ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে প্রাপ্তব্য।

পর্ব্বত প্রভৃতি যে সকল স্থানে স্তরাবলি পর্য্যায় ক্রমে মূল দেশ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতে পারা যায় সেখানে সর্ব্বশেষ স্তরে ইহা অবস্থিত বলিয়া এই মৃত্তিকা সর্ব্ব প্রথম উৎপন্ন স্থির করা যায়।

তৃতীয়—স্থিতান মৃত্তিকা (Sedimentary Rocks)। নানা প্রকার ধাতব ও আকরিক পদার্থ যাহা সমুদ্রে স্থিতাইয়া স্থিতাইয়া স্থল উৎপন্ন করিয়াছে—তাহাকেই স্থিতান মৃত্তিকা বলা যাইতে পারে। যেমন বালি চূণ ম্যাগনেসিয়া ইত্যাদি। বাঙ্গালার সমুদ্র সন্নিকটস্থ প্রদেশ মাত্রেই এরূপ মৃত্তিকা অপরিমেয়।

এই সকল ধাতব ও আকরিক দ্রব্যের দ্বারা সামুদ্রিক স্তর সংস্থিতির এমনি একটি পর্য্যায় দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে

* প্রস্তর ধাতু কর্দ্দম ইত্যাদি যত প্রকার পদার্থে পৃথিবী পঞ্জর গঠিত, তাহার সমস্তই 'মৃত্তিকা' নামের বাচ্য হইবে।

তাহাদের উৎপত্তির সময় স্পষ্টই ব্যক্ত করে।

প্রত্যেক স্তর যে সকল আকরিক পদার্থে নির্ম্মিত,এবং তাহাতে যে সকল প্রাণী দেহাবশেষ পাওয়া যায় তাহারা পরস্পর এরূপ অসমধর্ম্মী যে. সে সকল পরীক্ষা করিয়াই স্তরের উৎপত্তির সময় নিরূপিত হয়। ভূগর্ভ হইতে মাঝে মাঝে গ্র্যানিট পরফায়েরি ইত্যাদি প্রস্তর ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া সবলে উঠিবার সময় যদি সমস্ত স্তর-পর্য্যায় লণ্ড ভণ্ড না করিত, যদি মাঝে মাঝে সমুদ্র দ্বারা সমস্ত স্তর ধৌত হইয়া আবরণ-বিচ্যুত না হইত, তাহা হইলে ভূতত্ত্ব বিদ্যা আয়াস-সাধ্য হইত না। প্রত্যেক স্তর চিরকাল একই রূপ সাজান থাকিলে ভূবেত্তারা মাটী খুঁড়িয়া অতি সহজেই তাহার উৎপত্তির সময় নিরূপন করিতে পারিতেন। কিন্তু সর্ব্বদা গ্র্যানীটাদির উৎপাত হেতু এবং বন্যা প্রভাবে ঐ সকল স্তর এত বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে অনেক কষ্টে ভূবেত্তাদিগকে স্তরের বয়স নির্ণয় করিতে হয়।

পৃথিবীতে প্রত্যহই পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু এক এক সময় কিছু কাল ধরিয়া এক প্রকার বিশেষ পরিবর্ত্তন-শৃঙ্খলা লক্ষিত হয়, এই পরিবর্ত্তন-শৃঙ্খলা তাহার পূর্ব্ব কিম্বা পরবর্ত্তী শৃঙ্খলা হইতে বিভিন্ন। এক প্রকার পরিবর্ত্তন-শৃঙ্খলার দ্বারা যে সকল প্রাণী কিম্বা মৃত্তিকা উৎপন্ন হইয়াছে অপর প্রকার পরিবর্ত্তন শৃঙ্খলাদ্বারা তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপ বিভিন্ন প্রাণী ও মৃত্তিকা উৎপাদিত। এইরূপ এক একটি পরিবর্ত্তন-শৃঙ্খলার সময়কে ভূতত্ত্ববিদ্যায় এক একটি যুগ কহা যায়। যুগ আবার অন্তর যুগে, ও অন্তর যুগ গর্ভ যুগে বিভক্ত। পৃথিবীর জীবন কাল দুইটি প্রণালীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। প্রথম, যুগের পর্য্যায় অনুসারে,আর দ্বিতীয়, তৎসাময়িক প্রাণীর প্রকৃতি অনুসারে। পৃথিবীর যুগ বিভাগ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—

যুগ			অন্তরযুগ
প্রারম্ভ বা ইনফ্‌রা-সাইলুরিয়ণ (Infra-Silurian) কাল	আদি জীব বা Paleozoic		লরেনসিয়ন বা মৌলিক মৃত্তিকা Laurention or Fundamental gneiss ক্যাম্ব্রিয়ান (Cambrian)
১ ম যুগ (Primary Epoch)			সাইলুরিয়ন (Silurian) ডিবোনিয়ান (Devonian) অঙ্গার জনক বা কার্বনিফেরাস (Carboniferous)
২ য় যুগ (Secndary Epoch)	মধ্য জীব বা Mesozoic	Neo-zoic	ট্রায়াসিক বা ত্রিস্তর(Triassic) জুরাসিক (Jurassic) ক্রিটেসস্ বা চা-খড়ি (Cretaceous)
৩ য় যুগ (Tertiary Epoch)	নব্য জীব বা Cainozoic		ইয়োসীন (Eocene) মায়োসীন (Miocene) প্লায়োসীন(Pleiocene)
৪ র্থ যুগ (Post Tertiary Epoch)			বর্ত্তমান কাল

উপরের তালিকায় দুই প্রণালীতে পৃথিবীর যুগ বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম স্তম্ভে পর্য্যায়-ক্রমানুসারে যুগ-বিভাগ হইয়াছে, আর দ্বিতীয় স্তম্ভের বিভাগ তৎসাময়িক প্রাণীর প্রকৃতি অনুযায়ী; তৃতীয় স্তম্ভে অন্তর-যুগবিভাগ সন্নিবেশিত। যুগ পরম্পরার মধ্যে চারিটি স্পষ্ট লক্ষণাক্রান্ত, তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সময় সে রূপ নহে সেই জন্য তাহাকে সাধারণতঃ প্রারম্ভ বা সাইলুরিয়নের পূর্ব্ববর্ত্তী (Infra-Silurian) কাল কহা যায়। দ্বিতীয় স্তম্ভের নামকরণের আর ব্যাখ্যা আবশ্যক করে না।

এখন প্রত্যেক যুগ ও তাহার অন্তর যুগ কিরূপ মৃত্তিকাতে নির্ম্মিত, কিরূপ জীব জন্তু ও উদ্ভিদ সে যুগের উৎপন্ন তাহার সংক্ষেপে আলোচনা আরম্ভ হইতেছে।

আদিম কালের সেই ভয়ানক ঝটিকা, সেই ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাৎ যাহা আমরা "পৃথিবীর উৎপত্তি"তে দেখিয়া আসিয়াছি তাহা ক্ষান্ত হইলে প্রকৃতি শান্ত গম্ভীর হইয়া পড়িল। প্রারম্ভ কালে যখন পৃথিবীর প্রথম আবরণ নির্ম্মিত হয় তখন কোন প্রাণী মাত্রেরই চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন পৃথিবীর উত্তাপ এত অধিক ছিল, যে সে উত্তাপে কোন প্রাণী * জন্মান অসম্ভব। তারাহীন অমাবস্যার রাত্রির ন্যায় নানাপ্রকার বাষ্পীয় পদার্থ সমাচ্ছন্ন অন্ধকার পৃথিবীর নিবিড় মেঘ ভেদ করিয়া সূর্য্য তখন কিরণ দিতে পারিত না। সেই উত্তপ্ত এবং চিররাত্র অন্ধকার পৃথিবীতে কি করিয়া প্রাণী দেখা দিবে? এই সময়কে azoic অর্থাৎ জীব শূন্য সময় কহা যায়।

ক্রমে একদিকে নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টি হইয়া মেঘমুক্ত সূর্য্য দেখা দিতে লাগিল, আর একদিকে পৃথিবীর আবরণ ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রাণীর বাসোপযোগী হইতে লাগিল। সূর্য্যালোকই পৃথিবীর জীবন, সূর্য্যালোক না থাকিলে প্রাণী-উৎপত্তি হইতে পারিত না।

অগ্রে উদ্ভিদ কিম্বা অগ্রে জন্তু জন্মাইয়াছিল তাহা নিশ্চিত করা দুরূহ, অতি পুরাকালের সমুদ্র কর্দ্দমে (argillaceous schists) উদ্ভিদ ও জন্তু-উভয়েরই দেহাবশেষ দেখা যায়। কিন্তু প্রথম যুগের অধিকাংশ সময়ে, বিশেষতঃ অঙ্গার জনক যুগে উদ্ভিদই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, সে যুগে প্রাণী অতি বিরল। ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা যায় যে উদ্ভিদই জীবের অগ্রে জন্মিয়াছিল। বিশেষতঃ পৃথিবীর জীবন আলোচনা করিয়া দেখিলে যখন দেখা যায় পৃথিবী অল্পে অল্পে ক্রমশই উন্নতির দিকে গিয়াছে, তখন উদ্ভিদ হইতে জীব জন্তু উন্নততর প্রাণী বলিয়া অগ্রে উদ্ভিদ হইবারই অধিক সম্ভাবনা।

প্রারম্ভ বা ইনফ্রা সাইলুরিয়ান কাল।

ইনফ্রা সাইলুরিয়ান, অর্থাৎ সাইলু-

* বিজ্ঞানে জীব জন্তুর ন্যায় উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, সুতরাং এই প্রস্তাবে প্রাণী শব্দে উদ্ভিদাদিও বুঝাইবে।

রিয়ান অন্তর-যুগের নিম্ন স্তর দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম লরেনসিয়ান বা মৌলিক মৃত্তিকা, দ্বিতীয় ক্যামব্রিয়ান।

সেণ্টলরেন্স নদীর নাম হইতে মৌলিক মৃত্তিকার নাম লরেনসিয়ান হইয়াছে। পৃথিবীর উৎপত্তিতে বলা হইয়াছে যে প্রাচীন কালে পৃথিবীর বাষ্পাবরণের ভার এখনকার অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক ছিল। এই প্রভূত চাপ ও ভূগর্ভ নিঃসৃত উষ্ণ জলের কার্য্য দ্বারা প্রথম-উৎপন্ন ভূপৃষ্ঠ মৃত্তিকা এমন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে তাহার আদিম রূপ এখন স্থির করা যায় না, সেই জন্য ইহার আর একটি নাম রূপান্তরিত মৃত্তিকা। এই দ্রবীভূত মৃত্তিকা পুনর্ব্বার ঘন হইবার সময় স্ফটিকাকৃতি দানাদার হইয়াছে। মৌলিক মৃত্তিকা ছাড়া অন্য দুই জাতীয় মৃত্তিকাও উক্ত রূপ কোন নৈসর্গিক কারণে সময় সময় রূপান্তরিত (Metamorphosed) হইয়াছে। লরেনসিয়ান কালে ভারতবর্ষে হিমালয়ের ও আসাম এবং ব্রহ্মদেশের স্থানে স্থানে মূল মৃত্তিকা মাত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। এ সাময়িক স্তরে কোথাও কোথাও ফরমানিফেরা (Formanifera) নামক কীটানুর দেহাবশেষ দেখা যায়। তাহা ছাড়া এ মৃত্তিকায় আর কোন প্রাণী চিহ্ন দেখা যায় না।

ক্যামব্রিয়ান কাল।

যে সকল পরিবর্ত্তন দ্বারা ভূপৃষ্ঠ বর্ত্তমান আকারে পরিণত লইয়াছে তাহা এই কেমব্রিয়ান সময় হইতেই আরম্ভ। ওয়েলস্ দেশে প্রথমে এইরূপ মৃত্তিকা আবিষ্কৃত হয় সেই জন্য ওয়েলসের প্রাচীন নাম কেমব্রিয়া হইতে ইহার নাম ক্যামব্রিয়ান হইয়াছে।

ভূবেত্তাগণ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া কেমব্রিয়ান যুগের মৃত্তিকায় অতি অল্পই জীবনের চিহ্ন পাইয়াছেন।

কেমব্রিয়ান মৃত্তিকার কোন কোন স্থানে কেবল কীট-চিহ্ন ও কোন কোন স্থানে পুরুভুজের চিহ্নমাত্র পাওয়া যায়। এইরূপ প্রাণী বিরল স্তরের উপরিভাগেই শম্বুক-জাতীয় প্রাণীবহুল স্তর সংস্থিতি দেখিয়া বোধ হয় ক্যামব্রিয়ান যুগের শেষ সময়ে হঠাৎ ভূপৃষ্ঠের বিশেষ অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। সেই নিমিত্ত ইহার পরের স্তর সংস্থিতি হইতেই প্রকৃত পক্ষে প্রথম যুগের আরম্ভ ধরা যায়। কেননা এই সময় হইতেই পৃথিবীতে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণী-সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে।

কাশ্মীরের উত্তরস্থ ল্যাডাকের সন্নিহিত পীরপঞ্জল এই যুগে উৎপন্ন।

প্রথম যুগ।

প্রথম যুগে জল দ্বারাই প্রায় সমস্ত পৃথিবী বেষ্টিত ছিল,এবং সেই জলেই আমরা প্রথমে উদ্ভিদ ও জীবের জন্ম দেখিতে পাই। ব্র্যাকিওপোডা (Brachiopoda) —বা বাহুপদী এবং অর্থসিরেটাইটীস (Orthoceratites) বা ঋজুশৃঙ্গ এবং আরো কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় শম্বুক, এবং ট্রাইলোবাইটীস (Trilobites) বা ত্রিকুণ্ডলী বলিয়া একরূপ কাঁকড়া জাতীয় প্রাণী অতি পুরাতন সমুদ্র জীব। ইহা ভিন্ন প্রবালকীট অতি পুরাতন কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত

বর্ত্তমান। একরূপ জলজ উদ্ভিদ এই সকল প্রাণীর সমকালীন। যখন সমুদ্র সরিয়া পড়িয়া আরো দেশ মহাদেশ বিস্তৃত হইল, তখন ক্রমে অপেক্ষাকৃত উন্নত জাতীয় উদ্ভিদ যেমন Equisetaceae জাতীয় শরগাছ ও দুই এক প্রকার পর্ণীতরু (Fern) এবং অন্যান্য প্রকার উদ্ভিদ জন্মাইতে লাগিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি প্রথম যুগের আবার অন্তর-যুগ আছে। প্রথম যুগটি ৪ ভাগে বিভক্ত—সাইলুরিয়ান, ডিবোনিয়ান বা লোহিত প্রস্তর, কারবনিফরস বা অঙ্গারজনক, পারমিয়ান।

সাইল্যুরিয়ান অন্তর যুগ।

সাইল্যুরিয়ান অন্তর-যুগ কেমব্রিয়ান কালের পরবর্ত্তী। এ যুগের মৃত্তিকা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রায় দৃষ্ট হয়। ইংলণ্ড-দেশের স্রপসিয়র ও ওয়েল্‌স দেশে এই মৃত্তিকা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া উক্ত প্রদেশের সাইলিয়োরিস নামক প্রাচীন অধিবাসীদিগের নাম হইতে বিখ্যাত-নামা ভূবেত্তা মারকিসন এই মৃত্তিকার সাইল্যুরিয়ান নামকরণ করেন।

সাইল্যুরিয়ান যুগে প্রাণী চিহ্ন—অর্থাৎ উদ্ভিদ এবং জীব দেহাবশেষ বহুল-রূপে লক্ষিত হয়। এ সময়ে এখনো পৃথিবী অন্ধকার। মেঘ ভেদ করিয়া সূর্য্য এখনো সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। তবে অনবরত বৃষ্টি হইয়া পৃথিবীর বাষ্পাবরণ পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু পরিষ্কার হইয়াছে, কালে যে সূর্য্য রশ্মি প্রভাবে পৃথিবীর উন্নত অবস্থা হইবে তাহার লক্ষণ আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। এই যুগের অতি বিস্তৃত স্বল্প-গভীর সমুদ্র মধ্য দিয়া স্থানে স্থানে কোথাও বা অনুর্ব্বর, কোথাও বা জলজ-উদ্ভিদ-বেষ্টিত ভূখণ্ড কোথাও বা অনুচ্চ পাহাড়গুলি মস্তক তুলিয়া আছে। নানা জাতীয় শম্বুক এবং ক্ষুটাঙ্গ (Articulated) জীব সেই বিস্তৃত সমুদ্র এবং সেই সঙ্কীর্ণ ভূভাগের অধীশ্বর। একরূপ পুষ্পহীন জলজ-উদ্ভিদ সাইল্যুরিয়ানের সর্ব্ব নিম্ন স্তরে পাওয়া যায়। সাইল্যুরিয়ান অন্তর যুগ আবার দুই গর্ভ-যুগে বিভক্ত। অধঃ সাইল্যুরিয়ান এবং উর্দ্ধ সাইল্যুরিয়ান। আমরা এই যুগের অভ্যন্তরে প্রথম উদ্ভিদ চিহ্ন দেখিতে পাই। ইহার আগে আর উদ্ভিদের চিহ্ন পাওয়া যায় না, কেমব্রিয়ান যুগে কেবল মাত্র পোকা ও পুরুভুজ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। ইহা হইতে উদ্ভিদ যে জীব অন্তর পরবর্ত্তী ভূবেত্তারা এরূপ নিষ্পত্তি করেন না। তাঁহারা বলেন সম্ভবতঃ উদ্ভিদই অগ্রে জন্মিয়াছে, তবে উদ্ভিদ যেরূপ অল্পে বিনষ্ট হয় তাহাতে সেই বিপ্লব পরায়ণ লরেন্সিয়ান ও কেমব্রিয়ান কালে উদ্ভিদ জন্মাইলেও তাহাদের চিহ্ন থাকিবার সম্ভাবনা নাই। ডাক্তার হুকার বলেন সাইল্যুরিয়ান যুগের উর্দ্ধ স্তরে উন্নত জাতীয় একরূপ শৈবাল (Lycopodaceu) উদ্ভিদের অসংখ্য বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। অরথোসেরাটাইটিস্ বলিয়া এ সময়ে যে এক রূপ সমুদ্র জীব ছিল তাহাদের শারীরিক গঠন দেখিয়া বোধ হয় তাহারা অন্যান্য

সমুদ্র জীব আহার করিয়া জীবন ধারণ করিত।

তাহা ছাড়া এই সময়ে কাঁকড়া ও শম্বুক জাতীয় বহুসংখ্যক জীব দেখিতে পাওয়া যায়। সমেরু জীবের (Vertebrata) মধ্যে সাইলুরিয়ানের ঊর্দ্ধ স্তরে এক জাতীয় মৎস্যের দেহাবশেষ ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না। ইহাই সর্ব্ব প্রথম মৎস্য।

সাইল্যুরিয়ান অন্তর-যুগে যেরূপ স্তর বিপ্লব দেখিতে পাওয়া যায় এমন আর কোন যুগে নহে। দর্বিঞি (D'orbigny) সমুদ্র হইতে ৪৬০০০ ফুট উচ্চ আণ্ডিস পর্ব্বত শিখরে প্রাণী দেহাবশেষ সহ সাইল্যুরিয়ন মৃত্তিকা স্তর পাইয়াছেন। কি ভয়ানক বিপ্লব দ্বারাই ইহা এত উচ্চে উঠিয়াছিল! ওয়েলস পর্ব্বত শ্রেণী সাইল্যুরিয়ান যুগে উৎপন্ন।

সাইল্যুরিয়ান অন্তর-যুগে পৃথিবীর অধিকাংশ জলমগ্ন ছিল, ইয়োরোপে কেবল কয়েকটি দ্বীপ সমুদ্র হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়াছিল। ব্রিটনের পশ্চিম প্রান্তে একটি দ্বীপ, ফ্রান্সের বর্ত্তমান ব্রিটনি ও ফ্রান্সের মধ্য দেশে অপর কএকটি দ্বীপ মাত্র তখন হইয়াছিল। উত্তরে নরওয়ে, সুইডেন ও রুসিয়া পরস্পর সংযুক্ত ভাবে একই মহাদেশের অন্তর্গত ছিল। উত্তর আমেরিকায়, নিউ ব্রিটন, দক্ষিণ আমেরিকায় চিলি ও ব্রাজিলের কতকাংশ, ভারতবর্ষে বাঙ্গালার কতকাংশ, বুন্দেলখণ্ড, আরবলি পর্ব্বতের সন্নিহিত প্রদেশ, পঞ্জাব, ছোটনাগপুর ইত্যাদি সাইল্যুরিয়ান অন্তর যুগে বর্ত্তমান ছিল।

ডিবোনিয়ান বা লোহিত প্রস্তর অন্তর যুগ।

এই দুই জাতীয় মৃত্তিকা একই যুগে উৎপন্ন। ইহাদের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না। সাইল্যুরিয়ান যুগের সমুদ্র ক্রমে যখন আরো শুকাইয়া আসিল, যখন স্বল্প গভীর সমুদ্র হইতে স্থানে স্থানে কোথাও বা মিষ্ট কোথাও বা লবনাক্ত জলাশয় হইয়া সময় ক্রমে আবার সেই জলাশয় সমুদ্র হইতে দূরে স্থিত হ্রদরূপে পরিণত হইল, তখন সেই হ্রদে যে স্তর-সংস্থিতি হইয়াছিল সেই মৃত্তিকাই লোহিত প্রস্তর, অর্থাৎ লাল বেলে পাথর। আর সেই একই সময়ে হ্রদের পরিবর্ত্তে সমুদ্র মধ্যে যে সকল মৃত্তিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাকেই ডিবোনিয়ান মৃত্তিকা নামে ভূবেত্তারা আখ্যাত করিয়াছেন। ইংলণ্ডের ডিবন নামক স্থানে এই মৃত্তিকা প্রচুর পাওয়া যায় বলিয়া এই যুগকে মারকিসন এবং সেজবিক ডিবোনিয়ান নাম দিয়াছেন।

লোহিত-প্রস্তর-মৃত্তিকা-স্তর লাল, এবং তাহাতে প্রাণী চিহ্ন বিরল দেখিয়া অধ্যাপক র‍্যামজে বলেন তাহা সমুদ্রজাত নহে হ্রদ জাত।

ডিবোনিয়ান অন্তর যুগের যে সকল প্রাণী দেহাবশেষ পাওয়া যায় তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নততর। পৃথিবীর বয়ঃক্রমের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণী সকল যে ক্রমশ উৎকর্ষ লাভ

করিয়া আসিয়াছে তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। সর্ব্বপ্রথম লরেনসিয়ান কালে ভারতবর্ষ প্রভৃতি দুই একস্থানে কীটাস্থির চিহ্নই পাওয়া যায়, কেমব্রিয়ান কালে কেবল মাত্র পোকা ও পুরুভুজের চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহার পর সাইলুরিয়ান অন্তর-যুগে জলজ উদ্ভিদ, শম্বুক, কাঁকড়া ইত্যাদি দেখা যায়। ডিবোনিয়ান অন্তর যুগে শম্বুক কাঁকড়া ও মৎস্য জাতীয় জীব অপেক্ষা উচ্চতর জীব জন্মে নাই বটে কিন্তু ইহারা পূর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণতর। বাহুপদী শম্বুকই এ সময়ের প্রধান জীব। এখন ইহারা যেমন বহুসংখ্যক তেমনি বর্দ্ধিতায়তন। অন্যান্য মৎস্য ছাড়া এখন অর্দ্ধ ভাগ আঁইস ও অর্দ্ধ কঠিন চর্ম্মাচ্ছাদিত একরূপ আশ্চর্য্যজনক মৎস্য ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী উদ্ভিদ ছাড়া ক্যালেমাইট ও ব্যাঙ্গের ছাতার ন্যায় একপ্রকার উদ্ভিদ এ সময়ে প্রথম জন্মে। সাইলুরিয়ান যুগের ক্রমশ অল্প অল্প পরিবর্ত্তন দ্বারা হঠাৎ আর একটি ভিন্ন যুগ আসাতে সাইলুরিয়ানেরশেষভাগ ও ডিবোনিয়ানের প্রথমাংশ এত মিশিয়া গিয়াছে, যে ডিবোনিয়ানের আরম্ভ স্থান নির্ণয় করা বড় সহজ নয়।

কারবনিফরস্ বা অঙ্গার জনক অন্তর-যুগ।

অঙ্গারজনক অন্তর-যুগ ডিবোনিয়নের পরবর্ত্তী। এই সময়ের উদ্ভিদ হইতেই মৃদঙ্গারের উৎপত্তি। কার্ব্বনিফরস্ দুই গর্ভযুগে বিভক্ত, মৃদঙ্গার গর্ভ-যুগ, এবং চুনে পাথর (Carboniferous limestone) গর্ভ-যুগ। কার্ব্বনিফরসের যে সময়ে উদ্ভিদ হইতে ক্রমে মৃদঙ্গার হইয়াছে সেই বিভাগেই মৃদঙ্গার গর্ভ-যুগ। এবং যে সময় সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ-সঙ্কুল স্তরের সংস্থিতি হইয়াছে তাহাই লাইমস্টোন অর্থাৎ চুনে পাথর গর্ভ-যুগ। ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া গ্র্যানিট পরফায়েরি প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত-নির্গত-উষ্ণ জল, চুণ ও বালি পূর্ণ ছিল। সমুদ্র জলে মিশ্রিত সেই চুণ দ্বারা শম্বুক জাতীয় জীবের কঠিন আচ্ছাদন নির্ম্মিত। সুতরাং এই আচ্ছাদন হইতেই আবার পরে চুণ উৎপন্ন হয়। চুনে পাথরের স্তরগুলি মৃদঙ্গার স্তরের নিম্নস্থিত অতএব ইহা তাহার পূর্ব্ব সাময়িক। চুনে পাথরের পর্ব্বত সকল সমুদ্রের স্থিতান মৃত্তিকা হইতে নির্ম্মিত। এই সকল পর্ব্বতে পুরুভুজ ও দুই তিন প্রকার শম্বুক জাতীয় জীবের এবং মৎস্যের দেহাবশেষ পাওয়া যায়, তাহাতেই এই সকল পর্ব্বতের সামুদ্রিক উৎপত্তি প্রমাণীকৃত হইয়াছে। উদ্ভিদ বহুলত্বই কার্বনিফরসের বিশেষ লক্ষণ। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কাল যেমন উদ্ভিদ বিরল, ইহা তেমনি উদ্ভিদ-বহুল। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে পূর্ব্বের অসীম সমুদ্র বক্ষে এখন উদ্ভিদাবৃত বহুসংখ্যক দ্বীপপুঞ্জ উঠিয়া স্থলের পরিমাণ বাড়াইয়াছিল।

এ সময়ের জলবাতাস নিতান্ত স্যাঁতসেঁতে ও গরম; নহিলে, যে প্রকার উদ্ভিদ হইতে মৃদঙ্গার জন্মিয়াছে, তাহার উৎপত্তি

অসম্ভব হইত। তখনকার উদ্ভিদাদি পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে তখন ঋতুর বিশেষ পরিবর্ত্তন হইত না, সমস্ত বৎসরেই একটি মাত্র গ্রীষ্ম ঋতু প্রবল থাকিত। তখন পৃথিবীর কোন অংশেই শীতাতপের বৈষম্য ছিল না, প্রায় সকল অংশেই সমান গরম ছিল। ইহার অনেক পরে, তৃতীয় যুগেই শীতের প্রাধান্য দেখা যায়। তখন আভ্যন্তরিক উত্তাপেই সমস্ত পৃথিবী এত উত্তপ্ত ছিল যে সূর্য্যের উত্তাপে তাহার বিশেষ কোন হ্রাস বৃদ্ধি হইত না। বিষুব রেখার সন্নিহিত গ্রীষ্ম প্রধান দেশ হইতে উত্তর মহাসাগরের চির তুষারময় মেলবিল দ্বীপ পর্য্যন্ত এবং স্পিটজবর্জেন হইতে আফ্রিকা পর্য্যন্ত সমস্ত দেশেই এ সময়ে সম জাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়।

পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উদ্ভিদ-প্রাচুর্য্য এই সময়ের একটি বিশেষ লক্ষণ, এবং মৃদঙ্গারের তৈলময় পদার্থে (bitumenous matter,) অধিক পরিমাণে অঙ্গারাম্ল এবং জলজান বাষ্প দেখিয়া বোধ হয় এ গর্ভযুগে অঙ্গারাম্ল বাষ্পের প্রাচুর্য্য বশতই প্রাণীর সংখ্যা এত বিরল। যাহা হউক কেবল অনুমান ছাড়া এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেবল এইটুক আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি যে আমাদের বর্ত্তমান যুগে যে সকল জাতীয় পর্ণীতরু (Fern) নিতান্ত ক্ষুদ্র, অঙ্গারজনক অন্তর যুগে সেই সকল জাতিই অতি বৃহৎ বৃহৎ সুন্দর বৃক্ষ ছিল। এখনকার যে সকল শৈবাল-লতা (Lycopod) দুই হাতের অধিক দীর্ঘ হইতে দেখা যায়না, তখন সেই জাতীয়েরাই আশি নব্বই ফুট উচ্চ বৃক্ষ হইত। এক প্রকার শল্কদেহী বৃক্ষ (Lepedodendrons) দ্বারাই তখন প্রায় সমস্ত জঙ্গল পরিপূর্ণ ছিল। ইহার এক একটি পাতা ২০ ইঞ্চি লম্বা, এবং স্কন্ধ দুই হাত পরিমাণ পর্য্যন্ত দেখা যায়। এই জাতীয় আর এক রূপ বৃক্ষ ইহা অপেক্ষাও দীর্ঘায়তনের। এ সময়ের আর এক রূপ বৃক্ষ (Sigellarias) কখন কখন দৈর্ঘ্যে ১০০ ফুট ছাড়াইয়া উঠিত। এই সকল বৃহৎ বৃক্ষ এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র পর্ণীতরু দ্বারা তখনকার জঙ্গল পূর্ণ ছিল। সমুদ্র তীরও এই সময় নানা প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষে আবৃত থাকিত। ক্যালামাইট নামে এক প্রকার শরগাছ তখন উর্দ্ধে বিশ কি ত্রিশ ফুট এবং বেড়ে এক কিম্বা দুই ফুট হইতে দেখা গিয়াছে। ইহাদের ক্ষুদ্রায়তন বংশজ এখন ইংলণ্ডে অশ্বপুচ্ছ (Mare's tail) নামে বিখ্যাত। এ সময়ে ঝাউ জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পুষ্টিকর কোন ফল কিম্বা ফুল তখনো জন্মে নাই। ফুলহীন ফলহীন বৃক্ষাদি পূর্ণ হরিৎ ক্ষেত্রই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত। বৃক্ষাদি সংখ্যায় বহুল, অথচ জাতিতে অত্যল্প। এই অন্তর-যুগের শেষ ভাগে কাঁকড়া জাতীয় ট্রাইলোবাইট জীব একেবারে লোপ পাইয়াছিল।

মৃদঙ্গার গর্ভ যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী যে ভাগে জীব-দেহ-সঙ্কুল স্তর হইয়াছিল তাহা চুনে প্রস্তর গর্ভ যুগ। শম্বুক জাতীয় ৪০০ প্রকার প্রাণী,

কাঁকড়া ও মৎস্য জাতীয় অল্প সংখ্যক প্রাণী, এবং পুরুভুজ এই সময়ের অধিবাসী। এসময়ে একরূপ জলজ সরীসৃপের (Archegosaurus) কেবল মস্তক মাত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে মনে হয়, এই সময়েই প্রথম সরীসৃপ জন্মে। এতদিন যত প্রকার জীব জন্মিয়াছে তাহার মধ্যে এ সময়ের গ্যানয়েড (ganoid) নামে একপ্রকার মৎস্য দেখিতে অতি সুন্দর। এ সময়ের উদ্ভিদ হইতেও অল্প পরিমাণে মৃদঙ্গার উৎপন্ন হইয়াছে।

এই চুনে পাথরের স্তর নির্ম্মিত হইতে যে বহু সহস্র সহস্র বৎসর লাগিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। প্রোফেসর ফিলিপস্ গণনা করিয়া বলেন যে এক লক্ষ ২২ হাজার ৪০০ বৎসরে ৬০ ফুট মাত্র মৃদঙ্গার কিম্বা চুনে পাথরের স্তর নির্ম্মিত হইতে পারে। এইরূপ মৃদঙ্গারের স্তরের উপরস্তর নির্ম্মিত হইতে কত সহস্র বৎসরই লাগিয়াছে! এতাবৎকাল কোন বিশেষ ভৌতিক বিপ্লব লক্ষিত হয় না। কিন্তু মৃদঙ্গার গর্ভ যুগের শেষ কালে ভূপৃষ্ঠের প্রবল বিপ্লব দ্বারা অঙ্গার শৈল সকল উৎপাদিত রূপান্তরিত ও ভগ্নাবয়ব হইয়া ভিন্ন অন্তর যুগ উৎপন্ন হইয়াছে।

পারমিয়ান অন্তর যুগ।

অঙ্গার জনক অন্তর যুগের পরেই পারমিয়ান অন্তর যুগের আরম্ভ। রুসিয়ার পারম্ প্রদেশের স্তর সংস্থিতি দেখিয়া মারকিসন ইহার এই নাম দিয়াছেন। সায়েনাইট ও পরফাইরি প্রস্তর এই যুগে উৎক্ষিপ্ত হয়। এই উৎপাৎ জনিত উত্তাপে সমুদ্র হইতে বহুল পরিমাণ বাষ্প উত্থিত হইতে লাগিল, এই বাষ্প উপরে উঠিতে উঠিতে শীতল হইয়া বৃষ্টি রূপে আবার পৃথিবীতে পড়িল। সেই বৃষ্টি-সিক্ত মাটীতে সরীসৃপ জাতির পদচিহ্ন লক্ষিত হয়। পারমিয়ানের প্রাণী প্রায় কার্বনিফরসেরই অনুরূপ, কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী যুগের জীব দু একটিও এই যুগে দেখা যায়। এ যুগেই প্রথম ঝিনুক জন্মে। শম্বুক প্রভৃতি অন্যান্য জীব ছাড়া গ্যানয়েড ও প্লাসয়েড মৎস্য এ সময়ে অনেক দেখা যায়। এ সময়ের আবহাওয়া অনেকটা পূর্ব্ববর্ত্তী অন্তর-যুগের ন্যায়, কিন্তু অধ্যাপক র‍্যামজে দেখাইয়াছেন যে এ সময়ে দুই এক স্থানে হিম শৈলের কার্য্য (Glacial action) লক্ষিত হয়।

এই তো প্রথম যুগের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া দেখা গেল প্রাণীর প্রথম আবির্ভাবই বর্ত্তমান যুগের বিশেষ লক্ষণ। প্রাণীদিগের মধ্যে মনুষ্য এখন যেমন শ্রেষ্ঠ জীব তেমনি এ যুগের সমুদ্রে গেনইড নামক যে উজ্জ্বল বর্ণ মৎস্য বাস করিত, তাহারা তখনকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ট্রাইলোবাইট জাতীয় কাঁকড়া এই যুগে জন্মে এবং এই যুগে তাহা লোপ পায়। পক্ষী কিম্বা স্তন্যপায়ী জীব এখনো জন্মে নাই। উদ্ভিদাদি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে নাই, এ যুগের শেষ দিকে দুএকটি সরীসৃপের পদচিহ্ন পাওয়া যায়। এই কালের পৃথিবীর

সর্ব্বত্রই প্রায় আব-হাওয়া একরূপ, মেরু-সন্নিহিত প্রদেশেও যেরূপ আর বিষুবরেখা-সন্নিহিত প্রদেশেও সেইরূপ। পৃথিবী নিজে এই যুগে এত উষ্ণ ছিল যে তাহার উপর সূর্য্য উত্তাপের বিশেষ প্রভাব ছিল না। পৃথিবীর উত্তপ্ত তরল গর্ভ হইতে প্রথমে গ্র্যানিট Granite তৎপরে পরফায়েরি এবং শেষে সায়েনাইট উৎক্ষিপ্ত হয়। স্কটলাণ্ডের বেননেবিস পর্ব্বতে ইহা অতি সুন্দর রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পর্ব্বত শ্রেণীর মূল প্রদেশ গ্র্যানিটের; তন্মধ্য দিয়া পরফায়েরি উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, এবং এই পর্ব্বতের সর্ব্বোপরিস্থ সায়েনাইট স্তর পারফায়েরি ভেদ করিয়া উৎপন্ন।

পথিক।

(প্রভাতে।)

উঠ, জাগ' তবে—উঠ', জাগ' সবে—
প্রভাত এসেছে—প্রভাত এসেছে
স্বরণ-বরণ গো!
নিশার দারুণ প্রাচীর আঁধার
শতধা শতধা করিয়া বিদার—
তরুণ বিজয়ী তপন এসেছে
অরুণ চরণ গো।
মাথায় বিজয়-কিরীট জ্বলিছে,
গলায় বিজয় কিরণ-মাল,
বিজয়-বিভায় উজলি উঠেছে
বিজয়ী রবির তরুণ ভাল!
উষা নব-বধু দাঁড়াইয়া পাশে,
গরবে, সরমে, সোহাগে, উলাসে,
মৃদু হেসে হেসে সারা হোল বুঝি,
বুঝিবা সরম রহে না গো;
আঁখি দুটি নত, কপোলটি রাঙা,
পদতলে শুয়ে মেঘ ভাঙা ভাঙা,
অধর টুটিয়া পড়িছে ফুটিয়া
হাসি সে বারণ সহে না গো!

এস' এস' তবে—ছুটে যাই সবে,
কর' কর' তবে ত্বরা,
এমন বহিছে প্রভাত বাতাস,
এমন হাসিছে ধরা!
সারা দেহে যেন অধীর পরাণ
কাঁপিছে সঘনে গো,
অধীর চরণ উঠিতে চায়,
অধীর চরণ ছুটিতে চায়,
অধীর হৃদয় মম
প্রভাত বিহগ সম
নব নব গান গাহিতে গাহিতে,
অরুণের পানে চাহিতে চাহিতে
উড়িবে গগনে গো!
ছুটে আয় তবে, ছুটে আয় সবে,
অতি দূর—দূর যাব',
করতালি দিয়া সকলে মিলিয়া
কত শত গান গাব!
কি গান গাইবে? কি গান গাইব!
যাহা প্রাণ চায় তাহাই গাইব,

গাইব আমরা প্রভাতের গান,
হরষের গান,—জীবনের গান,
ছুটে আয় তবে—ছুটে আয় সবে
অতি দূর দূর যাব !
কোথায় যাইবে ? কোথায় যাইব !
জানি না আমরা কোথায় যাইব,
সুমুখের পথ যেথা লয়ে যায়,
কুসুম কাননে, অচল শিখরে,
নিঝর যেথায় শত ধারে ঝরে,
মণি-মুকুতার বিরল গুহায়—
সুমুখের পথ যেথা ল'য়ে যায় !
দেখ—চেয়ে দেখ—পথ ঢাকা আছে
কুসুম রাশিতে গো,
কুসুম দলিয়া—যাইব চলিয়া
হাসিতে হাসিতে গো !
ফুলে কাঁটা আছে ? কই ! কাঁটা কই !
কাঁটা নাই—নাই—নাই,
এমন মধুর কুসুমেতে কাঁটা
কেমন থাকিবে ভাই !
যদিও বা ফুলে কাঁটা থাকে ভুলে
তাহাতে কিসের ভয় !
ফুলেরি উপরে ফেলিব চরণ,
কাঁটার উপরে নয়।
ত্বরা কোরে আয়, ত্বরা কোরে আয়,
যাই মোরা যাই চল্।
নিঝর যেমন বহিয়া চলেছে
হরষেতে টল মল,
নাচিছে, ছুটিছে, গাহিছে, খেলিছে,
শত আঁখি তার পুলকে জ্বলিছে,
দিন রাত নাই কেবলি চলিছে,
হাসিতেছে খল খল,

তরুণ মনের উছাসে অধীর
ছুটেছে যেমন প্রভাত সমীর ;
ছুটেছে কোথায়?—কে জানে কোথায় !
তেমনি তোরাও আয় ছুটে আয়,
তেমনি হাসিয়া—তেমনি খেলিয়া,
পুলক-উজল নয়ন মেলিয়া,
হাতে হাতে বাঁধি করতালি দিয়া
গান গেয়ে যাই চল।
আমাদের কভু হবে না বিরহ,
এক সাথে মোরা রব' অহরহ,
এক সাথে মোরা করিব গমন,
সারা পথ মোরা করিব ভ্রমন,
বহিছে এমন প্রভাত পবন,
হাসিছে এমন ধরা !
যে যাইবি আয়—যে থাকিবি থাক্—
যে আসিবি—কর ত্বরা !

আমি যাব গো !—
প্রভাতের গান আর জীবনের গান
দেখি যদি পারি তবে আমি গাব গো,
আমি যাব গো !
যদিও শকতি নাই এ দীন চরণে গো,
যদিও নাইক জ্যোতি এ পোড়া নয়নে গো,
শরীর সাধিতে নারে মন মোর যাহা চায়—
শতবার আশা করি শতবার ভেঙ্গে যায় ;
আমি যাব গো !
সারারাত বোসে আছি নয়নেতে নাইক নিমেষ
প্রাণের ভিতরদিকে চেয়ে দেখি অনিমিখে,
চারিদিকে হৃদয়ের—যৌবনের ভগ্ন অবশেষ !
ভগ্ন আশা—ভগ্ন সুখ—
ধূলি মাখা অতি জীর্ণ স্মৃতি !

সামান্য বায়ুর দাপে ভিত্তি থর থর কাঁপে,
একটি আধটি করি ইস্টক খসিছে নিতি নিতি;
আমি যাব গো।
নবীন আশায় মাতি পথিকেরা যায়,
কত গান গায়—
এ ভগ্ন প্রমোদালয়ে পশে স্বর ভয়ে ভয়ে,
প্রতিধ্বনি মৃদুল জাগায়,
প্রতি ভগ্ন ঘরে ঘরে ভ্রমিয়া বেড়ায়।
তখন নয়ন মুদি কত স্বপ্ন দেখি!
কত স্বপ্ন হায়!
কত দীপালোক—কত ফুল—কত পাখী!
কত সুধামাখা কথা, কত হাসিমাখা আঁখি!
কত পুরাতন স্বর কে জানে কাহারে ডাকে!
কত কচি হাত এসে খেলে এ পলিত কেশে,
কত কচি রাঙ্গা মুখ কপোলে কপোল রাখে!
কত স্বপ্ন হায়!
হৃদয় চমকি উঠি চারিদিকে চায়,
দেখেগো কঙ্কালরাশি হেথায় হোথায়:
সে দীপ নিভিয়া গেছে—
সে ফুল শুকায়ে গেছে—
সে পাখি মরিয়া গেছে—
সুধামাখা কথাগুলি চিরতরে নীরবিত,
হাসিমাখা আঁখিগুলি চির তরে নিমীলিত।
আমি যাব গো!
দেখি যদি পারি তবে প্রভাতের গান
আমি গাব গো!
এ ভগ্ন বীণার তন্ত্রী ছিঁড়েছে সকল আর—
দুটি বুঝি বাকী আছে তার।
এখনো প্রভাতে যদি হরষিত প্রাণ
এ বীণা বাজাতে যাই—চমকি শুনিতে পাই
সহসা গাহিয়া উঠে যৌবনের গান
সেই দুটি তার।
টুটে গেছে ছিঁড়ে গেছে বাকী যত আর।
যুগ-যুগান্তের এই শুষ্ক জীর্ণ গাছে
দুটি শাখা আছে;
এখনো যদিগো শুনে বসন্ত পাখীর গীত,
এখনো পরশে যদি বসন্ত মলয় বায়,
দুচারিটি কিশলয় এখনো বাহির হয়,
এখনো এ শুষ্ক শাখা হেসে উঠে মুকুলিত,
একটি ফুলের কুঁড়ি ফুটিয়া উঠিতে চায়,
ফুটো-ফুটো হয় যবে ঝরিয়া মরিয়া যায়।
এই জীর্ণ শুষ্ক গাছে
দুটি শাখা আছে;—
বাকী ছিল যত
শ্যামল যৌবনে হায়, অদৃষ্ট কুঠার ঘায়
বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে এ জন্মের মত,
সুমুখে রয়েছে পোড়ে শুষ্ক পাতা যত।
অদৃস্টের বজ্রানলে কেহ বা গিয়েছে জ্বোলে,
সে কখনো মুকুলিবে এ জন্মে কি আর?
সমুখে বাতাসে উড়ে ভস্মশেষ তার।
এ ভগ্ন বীণার দুটি ছিন্নশেষ তারে
পরশ ক'রেছ আজি গো—
নব-যৌবনের গান ললিত রাগিণী
সহসা উঠেছে বাজি গো।—
এই ভগ্ন ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনি খেলা করে,
শ্মশানেতে হাসিমাখা শিশুটির প্রায়,
লইয়া মাথার খুলি, আধ পোড়া অস্থিগুলি,
নিঃশঙ্কে ভস্মের পরে ছুটিয়া বেড়ায়,
হাসিয়া নিরখে, কি সে ভাবিয়া না পায়:
ভগ্ন গৃহে বাজে আজি যৌবনের গান;
জীর্ণ শাখে ফুটে আজি যৌবনের ফুল;
বহুদিন পরে আজি উলসিত প্রাণ

হরষে আকুল!
আমি যাব গো।—
তোমরা তরুণ পাখী উড়েছ প্রভাতে
সকলে মিলিয়া এক সাথে,
এ পাখী এ শুষ্ক শাখে একেলা কেমনে থাকে!
সাধ—তোমাদেরি সাথে যায়—
সাধ—তোমাদেরি গান গায়;
তরুণ কণ্ঠের সাথে এ পুরাণ' কণ্ঠ মোর
বাজিবে না স্বরে?
না হয় নীরবে রব'—না হয় কথা না কব'
শুনিব তোদেরি গান এ শ্রবণ পূরে।
এই ছিন্ন জীর্ণ পাখা বিছায়ে গগনে
যাব প্রাণ পণে—
পথমাঝে শ্রান্ত যদি হই অতিশয়
তবে দিস্‌রে আশ্রয়।
আমি যাব গো।
পথে যে কণ্টক আছে কি ভাবিলি তার?
কত শুষ্ক জলাশয়, কত মাঠ মরুময়,
পর্ব্বত-শিখর-শায়ী অনন্ত তুষার,
কত শত বক্রগতি নদী খরস্রোত অতি,
ঘুরিছে দারুণ বেগে আবর্ত্তের জল,
হা দুর্ব্বল, তুই তার কি ভাবিলি বল?—
ভাবিয়াত কাটায়েছি সারাটি জীবন,
ভাবিতে পারি না আর—জীবন দুর্ব্বহ ভার;
সহিব এ পোড়াভালে যা আছে লিখন।
প্রতি পদে পদে যদি অদৃষ্টের কাঁটা বিঁধি,
প্রতি কাঁটা তুলে তুলে কত আর চলি!
না হয় চরণে বিঁধি মরিব গো জ্বলি।
আমি যাব গো।

(মধ্যাহ্নে।)

"আর কত দূর?" "যত দূর হোক্"
ত্বরা চল সেই দেশ।
বিলম্ব হইলে আজিকার দিনে
এ যাত্রা হবে না শেষ।"
"এ শ্রান্ত চরণে বিঁধিয়াছে বড়
কণ্টক বিষম গো।"
"প্রখর তপন হানিছে কিরণ
অনলের সম গো।"
"বিঁধিয়াছে কাঁটা? কি হয়েছে তার!
যত বিঁধিয়াছে দ্বিগুণ তাহার
পাইবে কুসুম গো।
খেলিবার তরে আসিনিত হেথা,
বহিতে ফুলের ভার,
বিঁধিবেক কাঁটা, হানিবে তপন
প্রখর কিরণ ধার।
ছি ছি ছি সামান্য শ্রমেতে কাতর
করিছ রোদন গো!
ছি ছি ছি সামান্য ব্যাথায় অধীর
শিশুর মতন গো!"
"যাহা ভেবেছিনু সকাল বেলায়
কিছুই তাহা যে নয়।"
"তাহাই বোলে কি আধ'পথ হোতে
ফিরিবারে সাধ হয়?"
"তবে চল যাই—যত দূর হোক
ত্বরা চল সেই দেশ—
বিলম্ব হইলে আজিকার দিনে
এ যাত্রা হবে না শেষ।"
"বল'বল মোরে এই মরুময়
পথের কি শেষ আছে?

পাব কি আবার শ্যামল কানন,
ঘন ছায়াময় গাছে ?"
"হয়ত বা পাবে—হয়ত পাবে না
হয়ত বা আছে—হয়ত নাই।"
"ওই যে সুদূরে দূর-দিগন্তরে
হরিত কানন দেখিতে পাই।"
"হরিত কানন—হরিত কানন—
ওই যে গো হেরি হরিত কানন!
চল, সবে চল, হসিত আনন,
চল ত্বরা চল—চলগো যাই!"
"ওযে মরীচিকা ;"—"ও কি মরীচিকা ?"
"মরীচিকা ?" "তাই হবে!"
"বল, বল মোরে, এ দীর্ঘ পথের
শেষ কোন খানে তবে ?"

অবশ চরণ হেন উঠিতে চাহে না যেন—
পারি না বহিতে দেহ ভার।
এ পথের বাকী কত আর!
কেন চলিলাম ?
সে দিনের যত কথা কেন ভুলিলাম ?
ছেলেবেলা একদিন আমরাও চলেছিনু—
তরুণ আশায় মাতি আমরাও বোলেছিনু—
"সারাপথ আমাদের হবেনা বিরহ,
মোরা সবে এক সাথে রব অহরহ।"
অর্দ্ধপথে না যাইতে যত বাল্যসখা
কে কোথায় চলে গেল না পাইনু দেখা।
শ্রান্ত-পদে দীর্ঘ-পথ ভ্রমিলাম একা।
নিরাশা-পুরেতে গিয়া সে যাত্রা করেছি শেষ,
পুন কেন বাহিরিনু ভ্রমিতে নূতন দেশ ?
ভগ্ন-আশা ভিত্তি পরে নব-আশা কেন
গড়িতে গেলাম হায় উনমাদ হেন ?
যেথা ছিনু বেশ ছিনু নিরাশার সমাধি ভূমিতে,
শ্রান্ত এচরণ লোয়ে পুন কেন এলেম ভ্রমিতে?
আঁধার কবরে সেথা মৃত ঘটনার
কঙ্কাল আছিল পোড়ে, স্মৃতি নাম যার।
একদিন ছিল যাহা তাই সেথা আছে,
আর কভু হবে না যা' তাই সেথা আছে ;
এক দিন ফুটেছিল যে ফুল সকল
তারি শুষ্ক দল,
এক দিন যে পাদপ তুলেছিল মাথা—
তারি শুষ্ক পাতা,
এক দিন যে সঙ্গীত জাগাত রজনী
তারি প্রতিধ্বনি,
যে মঙ্গল ঘট ছিল দুয়ারের পাশ
তারি ভগ্ন রাশ!
যে বৃক্ষ মরিয়া গেছে তাই সেথা আছে,
যে অঙ্কুর বাড়িবে না তাই সেথা আছে।
সে প্রেত-ভূমিতে আমি ছিনু রাত্রিদিন
প্রেত-সহচর।
কেহবা সমুখে আসি দাঁড়ায়ে কাঁদিত
শীর্ণ-কলেবর।
কেহবা নীরবে আসি পাশেতে বসিয়া,
দিন নাই রাত্রি নাই—নয়নে পলক নাই—
শুধু বোসে ছিল এই মুখেতে চাহিয়া।
সন্ধ্যা হলে শুইতাম—দীপ হীন শূন্য ঘর;
কেহ কাঁদে—কেহ হাসে—
কেহ পায়—কেহ পাশে—
কেহ বা শিয়রে ব'সে শত প্রেত সহচর!
কেহ শত সঙ্গী লোয়ে,আকাশ মাঝারে রোয়ে
ভাব-শূন্য স্তব্ধ মুখে করিত গো নেত্রপাত—
এমনি কাটিত দিন এমনি কাটিত রাত!
কেন হেন দেশ ত্যজি আইলাম হা—রে—

ফুরাত জীবন-দিন চিন্তাহীন, ভয়হীন,
মরিয়া গো রহিতাম মৃত সে সংসারে,
মৃত আশা, মৃত সুখ, মৃতের মাঝারে!
আবার নূতন করি জীবনের খেলা
আরম্ভ করিতে কি গো সময় আমার?
ফুরায়ে গিয়েছে যবে জীবনের বেলা
প্রভাতের অভিনয় সাজে কি গো আর?
তবে কেন চলিলাম?
সে দিনের যত কথা কেন ভুলিলাম?
এখন ফিরিতে নারি,অতি দূর—দূর পথ,
সমুখে চলিতে নারি শ্রান্ত দেহ জড়বৎ।
হে তরুণ পান্থগণ, যেওনাক' আর,
শ্রান্ত হইয়াছি বড় বসি একবার।
ছায়া নাই, জল নাই, সীমা দেখিতে না পাই
অতি দূর—দূর পথ—বসি একবার।

"আর কতদূর?" "যত দূর হোক্,
ত্বরা চল সেই দেশ।
বিলম্ব হইলে আজিকার দিনে
এ যাত্রা হবে না শেষ।"
"কোথা এর শেষ?" "যেথা হোক্‌নাক'
তবুও যাইতে হবে,
পথে কাঁটা আছে শুধু ফুল নহে
তাহাও জানিও সবে!
হয়ত যাইব কুসুম-কাননে,
হয়ত যাইব না;
হয়ত পাইব পূর্ণ জলাশয়,
হয়ত পাইব না।
এ দূর পথের অতি শেষ সীমা
হয়ত দেখিতে পাব—
হয়ত পাব না, ভুলি যদি পথ
কে জানে কোথায় যাব!
শুনিলে সকল, এখন তোমরা
কে যাইবে মোর সাথ।
যে থাকিবে থাক, যে যাইবে এস—
ধর সবে মোর হাত।
দিন যায় চোলে, সন্ধ্যা হোল বোলে,
অধিক সময় নাই,
বহু দূর পথ রহিয়াছে বাকী,
চল ত্বরা কোরে যাই।"
"ওপথে যাব না, মিছা সব আশা,
হইব উত্তর গামী?"
"দক্ষিণে যাইব" "পশ্চিমে যাইব"
"পূরবে যাইব আমি।"
"যে যাইবে যাও, যে আসিবে এস,
চল ত্বরা কোরে যাই।
দিন যায় চোলে, সন্ধ্যা হোল বোলে,
অধিক সময় নাই।"

যেওনা ফেলিয়া মোরে, যেওনাক আর;
মুহূর্ত্তের তরে হেথা বসি একবার।
ছায়া নাই, জল নাই,সীমা দেখিতে না পাই
যেওনা, বড়ই শ্রান্ত এ দেহ আমার।

"চলিলাম তবে, দিন যায় যায়,
হইনু উত্তর গামী।"
"দক্ষিণে চলিনু" "পশ্চিমে চলিনু"
"পূরবে চলিনু আমি।"
"যে থাকিবে থাক,' যে আসিবে এস,'
মোরা ত্বরা কোরে যাই।
দিন যায় চোলে, সন্ধ্যা হোল বোলে,
অধিক সময় নাই।"

হাসিতে হাসিতে প্রাতে আইনু সবার সাথে,
সায়াহ্নে সকলে তেয়াগিল।
দক্ষিণে কেহবা যায়, পশ্চিমে কেহবা যায়,
কেহবা উত্তরে চলে গেল।
চৌদিকে অসীম মরু, নাই তৃণ, নাই তরু,
দারুণ নিস্তব্ধ চারিধার,
পথ ঘোর জনহীন, মরিয়া যেতেছে দিন,
চুপি চুপি সমুখেতে আসিছে আঁধার।
অনল-উত্তপ্ত ভুঁয়ে নিস্পন্দ রয়েছি শুয়ে,
অনাবৃত মাথার উপর।
সঘনে ঘুরিছে মাথা,মুদে আসে আঁখি পাতা,
অসাড় দুর্ব্বল কলেবর।
কেন চলিলাম ?
সহসা কি মদে মাতি আপনারে ভুলিলাম ?
দক্ষিণা-বাতাস বহা ফুরায়েছে এ জীবনে,
হৃদয়ে উত্তর বায় করিতেছে হায় হায়—
আমি কেন আইলাম বসন্তের উপবনে ?
জানিস্ কি হৃদয় রে, শীতের সমাধি পরে
বসন্তের কুসুম শয়ন ?
অরুণ-কিরণ-ময় নিশার চিতায় হয়
প্রভাতের নয়ন মিলন ?
একেলা থাকিতে যবে নারি কোন মতে,
মাঝে মাঝে ছুটে আসি তরুণ জগতে।
তাহারা যেমন হাসে তেমনি হাসিতে চাই,
তাহারা যে গান গাহে আমিও সে গান গাই,
তবুও তবুও কেন মিশিতে পারিনে যেন,
হাসিময় জনময় যৌবনের বিজনতা,
বুঝিতে পারিনে যেন তাহাদের কোন কথা!
যেন তাহাদের গান পশি এই শূন্য প্রাণ
খুঁজিয়া না পায় কোথা লইবে আশ্রয় ;
হেথা ভ্রমে হোথা ভ্রমে, না পায় আলয়।
যৌবন বীণার মাঝে আমি কেন থাকি আর,
মলিন, কলঙ্ক-ধরা একটি বেসুরা তার!
কেন আর থাকি আমি যৌবনের ছন্দ মাঝে
নিরর্থ অমিল এক কানেতে কঠোর বাজে!
আমার আরেক ছন্দ, আমার আরেক বীণ,
সেই ছন্দে একি গান বাজিতেছে নিশি দিন।
সন্ধ্যার আঁধার আর শীতের বাতাসে মিলি
সে ছন্দ হোয়েছে গাঁথা মরণ কবির হাতে ;
সেই ছন্দ ধ্বনিতেছে হৃদয়ের নিরিবিলি,
সেই ছন্দ লিখা আছে হৃদয়ের প্রতি পাতে!
তবে কেন চলিলাম ?
সহসা কি মদে মাতি আপনারে ভুলিলাম!
তবে যত দিন বাঁচি রহিব হেথায় পড়ি ;
এক পদ উঠিবনা মরি ত হেথায় মরি।
মাথার উপর দিয়া যাইবে দিবস রাত ;
পড়িবে মাথার পরে রবিকর বৃষ্টিপাত।
হেথা হোতে উঠিব না, মৌনব্রত টুটিব না,
চরণ অচল রবে, অচল রবে এ হাত।
দেখিস্, প্রভাত কাল হইবে যখন,
তরুণ পথিক দল করি হর্ষ-কোলাহল
সমুখের পথ দিয়া করিবে গমন,
আবার নাচিয়া যেন উঠেনারে মন!
উল্লাসে অধীর-হিয়া দুখ শ্রান্তি ভুলি গিয়া
আর উঠিস্ না কভু করিতে ভ্রমণ।
প্রভাতের মুখ দেখি উনমাদ হেন
ভুলিস্নে—ভুলিস্নে—সায়াহ্নেরে যেন!

বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের ইতিহাস।

সূচনা।

প্রাচীন কালে রাজা ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী বঙ্গীয় ভূম্যধিকারীগণ "ভৌমিক" আখ্যা দ্বারা পরিচিত হইতেন। * "ভূঞা" ইহার অপভ্রংশ। এক সময়ে বাঙ্গালা দ্বাদশ ভৌমিকের রাজ্য (বারভুঞকা মুল্লুক) বলিয়া খ্যাত ছিল। † কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন, গঙ্গা-বক্ষস্থিত বদ্বীপ দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত ছিল। সেই সকল বিভাগের জমীদারগণই "দ্বাদশ ভৌমিক" বা "বারভূঞা" নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ‡ ভাগীরথী, পদ্মা ও মেঘনার মধ্যবর্ত্তী "ভাটী" প্রদেশই যে দ্বাদশ ভৌমিকের "মুল্লুক" ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। পাঠানদিগকে দূরীকৃত করিয়া সমগ্র বাঙ্গলা পদদলন করিতে মোগলদিগের সপ্তদশ বর্ষ অতীত হইয়াছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন এই সপ্তদশ বর্ষই দ্বাদশ ভৌমিকের পরমায়ু। এই উক্তি কোন মতেই সঙ্গত বোধ হয় না; ভৌমিকশ্রেণীতে যে সকল মহাত্মার নাম গ্রথিত রহিয়াছে, তাঁহারা সকলেই আকবরের সমসাময়িক নহেন। বিশেষত আকবরের জন্মের পূর্ব্বেও বাঙ্গালা দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। || প্রকৃত পক্ষে পাঠানদিগের শাসন কালেই বাঙ্গলা দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত ছিল। সেই সকল বিভাগের জমীদারগণ সংস্কৃতে "ভৌমিক"—অপভ্রংশে "ভূঞা" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহাদিগের "রাজা" কিম্বা "রায়" উপাধি ছিল। "মহারাজাধিরাজ" "মহারাজেন্দ্র বাহাদুর" ও "মহারাজা বাহাদুর" প্রভৃতি অনেক অদ্ভুত উপাধি সে কালে প্রচলিত ছিল না কিন্তু ভারতীয় বর্ত্তমান স্বাধীন নৃপতিগণ হইতে বঙ্গীয় ভৌমিকগণ ভাল অবস্থাপন্ন ছিলেন। তাহাদের দুর্গ ছিল, সৈন্য ছিল, রণতরী ছিল। ইচ্ছানুসারে জলে-স্থলে সমভাবে আপনাদের বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া গৌরবান্বিত হইতেন। আমরা এই সকল ভৌমিক-

* রাজস্থানেও ভৌমিক আখ্যা পরিলক্ষিত হয়।

Tod's Rajasthan. (Mokerjees Ed) Vol I page 123.

† আসামেও ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতীয় দ্বাদশ ভৌমিক ছিল। কিন্তু তাঁহারা জমীদার নহেন। (বাবু গুণাভিরাম বড়ুয়া প্রণীত আসাম বুরঞ্জী, ৪৮ পৃষ্ঠা।

‡ কর্ণেল উইলফোর্ড বলেন—ভাটী প্রদেশের আধিপত্য লইয়া ত্রিপুরা ও আরাকাণ রাজের নিয়ত জলযুদ্ধ চলিত এবং তাহারা উভয়ই "বারভুঞার অধিপতি" উপাধি ধারণ করিতেন।

Aseaatic Resrches Vol XIV page 451.

|| ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত; ১৬ পৃষ্ঠা দেখ।

দিগের বিবরণ ক্রমে পাঠকদিগকে উপহার দিব।

দ্বাদশ ভৌমিকের নাম এই রূপ উল্লেখ হইয়া থাকে—

১। রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়, চন্দ্রদ্বীপ। (কায়স্থ, বসু।)
২। রাজা প্রতাপাদিত্য, যশোহর। (কায়স্থ গুহ।)
৩। চাঁদ রায়,কেদার রায়,শ্রীপুর,বিক্রমপুর। (কায়স্থ, দেব।)
৪। মুকুন্দরাম রায়, ভুষণা। (কায়স্থ ?)
৫। রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য, ভুলুয়া। (কায়স্থ, সুর।)
৬। ঈশা খাঁ মসনদ আলি, খিজিরপুর, সুবর্ণগ্রাম। *
৭। ফাজেল গাজি, ভাওয়াল।
৮। চাঁদ গাজি, চাঁদ প্রতাপ।
৯। রাজা কংশনারায়ণ লস্কর রায়, তাহারপুর (বা তাহিরপুর। (ব্রাহ্মণ।)
১০। রাজা রামকৃষ্ণ, সাতৈল, পাবনা † (ব্রাহ্মণ।)
১১। পুটিয়ার ঠাকুর বা রাজা। (ব্রাহ্মণ।)
১২। রাজা গণেশ রায়,দিনাজপুর। (কায়স্থ। ‡)

* ঈশা খাঁর পিতা হিন্দু ও মাতা যবন কন্যা।

† চাটমহল স্টেসনের অধীন।

‡ ডাক্তার ওয়াইজ এতন্মধ্যে পাঁচ জন ভৌমিকের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছেন। See Journal As. So. Bengal Vol XLIII. part I page 197—214. উক্ত প্রবন্ধের সূচনায় ডাক্তার সাহেব বলেন The following notes regarding five of these governors, imperfect though they are, will it is to be hoped excite others, who have the opportunity, to add further particulars and complete what is still wanting of the history of Bengal previous to the final conquest by the Muhammadans.

চন্দ্রদ্বীপের রাজ বংশের বিবরণ।

চন্দ্রদ্বীপ জেলা বাখরগঞ্জের অন্তঃপাতী একটী পরগণা। এই পরগণার নামানুসারে সমুদ্রতীরবর্ত্তী বাখরগঞ্জ প্রদেশ "চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু বৈদেশিক লেখকগণ চন্দ্রদ্বীপের পরিবর্ত্তে "বাকলা" বা "বাগোলা" রাজ্য লিখিয়াছেন। * বাকলা একটী স্বতন্ত্র পরগণা। আমাদের বিবেচনায় "বাকলা" বা "বাগোলা" কেশবসেন দেবের তাম্রশাসনাঙ্কিত "বাগুলী"র অপভ্রংশ মাত্র। †

আমরা ভৌমিকদিগের বিবরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের লিখাই যে নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ হইবে এরূপ আশা করিতে পারি না। সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন বিশেষ বৃত্তান্ত আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে ও সমাদরের সহিত গ্রহণ করিব।

* রাজমালা, ব্রহ্মার ইতিহাস ও আইন আকবরি প্রভৃতি গ্রন্থে "বাকলা" বা "বাগোলা"ই লিখিত। ছায়রল মতাক্ষরিণ প্রণেতা ইহাকে "হুগলা" লিখিয়াছেন।

† See Kasava Sen's Inscriptions of Bakerganj.

চন্দ্রদ্বীপের নামকরণ ও উৎপত্তি সম্বন্ধে বেব্রিজ সাহেব পশ্চাদুক্ত দেশপ্রচলিত প্রবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন।—বিক্রমপুর নিবাসী চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। এক ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। বিবাহান্তে তিনি তাঁহার পত্নীর নাম "ভগবতী" শ্রবণ করিয়া একান্ত বিষণ্ণ হইলেন। তিনি ইষ্টদেবীর সংজ্ঞাবিশিষ্টা রমণীর সহিত সহবাস করিতে অসম্মত হইলেন। ব্রাহ্মণ অবশেষে আত্মনাশে কৃতসংকল্প হইলেন। নির্ব্বেদ পরতন্ত্র চন্দ্রশেখর এক ক্ষুদ্র তরী আরোহণ করিয়া জলে জীবন বিসর্জ্জন করিতে চলিলেন। সে সময় বাখরগঞ্জ প্রদেশের নাম গন্ধও ছিল না। নদরাজ লৌহিত্য এতদূর না আসিয়াই বঙ্গোপসাগরের দর্শন পাইয়াছিলেন। বঙ্গ বা সমতট রাজ্যের অর্দ্ধাংশ সে সময় লবণাক্ত জল রাশিতে আবৃত ছিল। * চন্দ্রশেখর ক্ষেপণী সঞ্চালনে দক্ষিণ দিগভিমুখে গমন করিলেন। অহোরাত্র গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন,—দ্বিতীয়মৎস্যগন্ধারূপিণী এক ধীবর-কন্যা ক্ষুদ্র নৌকারোহণে একাকিনী সমুদ্র বক্ষে বিচরণ করিতেছে। চন্দ্রশেখর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বালে? অসীম অর্ণবে একাকিনী বিচরণ করিতেছ, তোমার কি ভয় নাই?" বালিকা উত্তর করিল—"দেব! আমি জালজীবীর কন্যা, অর্ণবে বিচরণ আমার জাতীয় ব্যবসায়, ইহাতে আমার ভয় কি। কিন্তু আপনি জন্মপরিগ্রহ দ্বারা বর্ণগুরু ব্রাহ্মণকুল উজ্জ্বল করিয়াছেন, আপনি গোস্বামী, কি কারণে এখানে আসিলেন। তদুত্তরে চন্দ্রশেখর তৎসমক্ষে স্বীয় মর্ম্মপীড়া বিবৃত করিলেন। তখন বালিকা ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "মূর্খ! জাননা জগজ্জননী ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছেন। রমণী মাত্রই প্রকৃতির অংশভূতা।" ব্রাহ্মণ ধীবর বালিকার মুখে এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি বালিকার ক্ষুদ্র জলযানে লম্ফপ্রদান করিলেন এবং বালিকার পদধারণ করিয়া বলিলেন,—"মাতঃ! আপনি কে?" বালিকা পুনঃ পুনঃ আপনাকে ধীবরকন্যা বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ কোন মতেই

Journal As, So, Bengal Vol V11 page 56.

* দ্বাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে বঙ্গের রাজধানী সমতটের পাদমূলে বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গ খেলা করিত। ত্রিপুরা ও বঙ্গের মধ্যস্থলে সাগরশাখা বিস্তৃত ছিল। "ঝাপটার" বিস্তৃত মোহনা অদ্যাবধি তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে, অধিকন্তু রামপাল ও দাউদ কাঁদীর মধ্যবর্ত্তী চরস্থিত গ্রামগুলির বয়ঃক্রম ৩। ৪ শতাব্দীর অধিক হইবে না। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দী পূর্ব্বেও সমতটের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে বঙ্গের কলেবর কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ছিল। শকাব্দের একাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান বাক্‌লা (প্রাচীন বাগুলী) প্রদেশে চট্টভট্টজাতি বাস করিত। গৌড়েশ্বর কেশব সেনদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে ঐ স্থান শ্রীঈশ্বর দেবশর্ম্মাকে দান করা হইয়াছিল।

নিরস্ত হইলেন না। অবশেষে বালিকা বলিল, বৎস আমি তোমার ইস্টদেবী। তদনন্তর বরদা তাঁহাকে বরদান করিলেন, এই স্থান শুষ্ক হইয়া দ্বীপে পরিণত হইবে। তোমার নামানুসারে এই দ্বীপ "চন্দ্রদ্বীপ" নামে খ্যাত হইবে এবং তুমি ইহার অধিপতি হইবে। বর দিয়া বরদা অন্তর্হিত হইলেন।

মতান্তরে,—

চন্দ্রশেখর নামে এক সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার, দনুজমর্দ্দন দেব নামে কায়স্থ জাতীয় জনৈক শিষ্য ছিল। চন্দ্রশেখর সতত ক্ষুদ্র জলযানে ভ্রমণ করিতেন। নৌকারোহী সন্ন্যাসী একদা নিশীথ সময়ে স্বপ্ন দেখিলেন, কালী বলিতেছেন—"বৎস! এই স্থানে জলতলে কয়েকটী দেবমূর্ত্তি পতিত রহিয়াছে। তুমি ইহাঁদের উদ্ধার কর।" পরদিবস সন্ন্যাসী তাঁহার শিষ্যকে তিন বার ডুবদিয়া তিনটী দেবমূর্ত্তি উদ্ধার করিতে বলিলেন। দনুজমর্দ্দন দুইবার ডুব দিয়া কাত্যায়নী ও মদনগোপাল নামে ২টী বিগ্রহ উঠাইয়াছিলেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, ইহা অদ্যাপি মাধবপাসা রাজবাটীতে স্থাপিত রহিয়াছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ সন্ন্যাসীশিষ্য তৃতীয়বার ডুবিতে চেস্টা করেন নাই, কিন্তু করিলে তিনি রাজলক্ষ্মীর মূর্ত্তি উঠাইতে পারিতেন। অনন্তর অন্তরীক্ষে এই বাণী উচ্চরিত হইল "এই স্থানটী শুষ্ক হইয়া একটী দ্বীপের উৎপত্তি হইবে এবং দনুজমর্দ্দন ইহার অধিপতি হইবেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর নামানুসারে এই দ্বীপ "চন্দ্রদ্বীপ" আখ্যাপ্রাপ্ত হইবে। * আকাশবাণী সফল হইল। রাজা দনুজমর্দ্দন দেব—অপভ্রংশে দনুজ রায় চন্দ্রদ্বীপের প্রথম ভূপতি।

চন্দ্রদ্বীপের প্রথম রাজ বংশাবলী।

১

রাজা দনুজমর্দ্দন দেব রায়।

২

রাজা রমাবল্লভ রায়।

৩

রাজা কৃষ্ণবল্লভ রায়।

৪

রাজা হরিবল্লভ রায়।

৫

রাজা জয়দেব রায়।

চন্দ্রদ্বীপ-রাজ্যস্থাপয়িতা রাজা দনুজমর্দ্দনদেব কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। পুরুষানুক্রমে গণনা করিলে তিনি শকাব্দের ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়েন। বিখ্যাত যবন ঐতিহাসিক মিনহাজ সিরাজ স্বীয় "তবকতই নসরি" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"মহাম্মদ বখ্তিয়ার লক্ষ্মণাবতী অধিকার

* ৪।৫ বৎসর অতীত হইল, একখানি ইংরাজি সংবাদ পত্রে (বোধ হয় Bengalee) চন্দ্রদ্বীপ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। তাহাতে (যদি স্মৃতিভ্রম না হয়) লিখিত ছিল—প্রতাপাদিত্যের দুহিতার (রামচন্দ্রের পত্নী) নামানুসারে এই দ্বীপ চন্দ্রদ্বীপ আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

করিলে রায় লাক্ষ্মণের বঙ্গের রাজধানী সমতটে আশ্রয় গ্রহণ করেন।" তবকতই নসরি" সঙ্কলন কালে (৬৪০—৪২ হিজিরি শক মধ্যে) তদ্বংশধরগণ বঙ্গ শাসন করিতেছিলেন। * তওয়ারিখে বারনি বলেন ৬৮০ হিঃ অব্দে গৌড়ের বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা "সুলতান মোঘিসুদ্দিন তুগ্রল" "সম্রাট বলবন কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া স্বীয় বন্ধু রত্নমাণিক্য দেবের আশ্রয়ে যাইতেছিলেন। সম্রাট সেন বংশজ সুবর্ণগ্রাম (বা সমতটাধিপতি দনুজরায়ের সাহায্যে জাহাজ নগর ত্রিপুরার) প্রান্তে তুগ্রলের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। পুরাতত্ত্ববিদ ডাক্তার ওয়াইজ অনুমান করেন—এই দনুজরায়ই পশ্চাৎ পাঠান কর্ত্তৃক সুবর্ণগ্রাম হইতে তাড়িত হইয়া চন্দ্রদ্বীপে রাজ্য স্থাপন করেন। ডাক্তর ওয়াইজ সাহেবের অনুমান সত্য হইলে সচিবপ্রবর আবেলফাজেল ও জোসেফ টিফেফনতল্লারের উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। অনুশাসন পত্রে সেনরাজগণের নামের অন্তে "দেব" উপাধি পরিলক্ষিত হয়, রাজা দনুজ মর্দ্দনও কায়স্থ "দেব" বংশ সম্ভূত। †

রাজা দনুজ রায়ের জীবনী সংক্রান্ত প্রধান ঘটনা বঙ্গজ কায়স্থদিগের সমাজ বন্ধন। বল্লাল কায়স্থদিগকে যেরূপ সামাজিক শ্রেণীতে বন্ধন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই নিয়ম অনুসারে ঘোষ, বসু ও মিত্র এই তিন ঘর কুলীন; দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস ও গুহ এই আট ঘর মৌলিক। এতদ্ভিন্ন কায়স্থগণ "বাহাত্তুরে" নামে খ্যাত। দনুজ রায় এই নিয়ম সংশোধন করেন। কুলজি গ্রন্থানুসারে তিনি প্রথমতঃ "বঙ্গজকায়স্থ সমাজপতি" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সামাজিক আধিপত্য-সীমা ততদূর প্রসারিত ছিল না; পূর্ব্ব সীমা ব্রহ্মপুত্র নদ, দক্ষিণ সীমা সমুদ্র, পশ্চিমে যশোহর, উত্তর সীমা ঢাকা জেলাস্থ ইচ্ছামতী নদী।

দনুজ রায়ের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে চারি ঘর কুলীন, যথা—ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র। তৎপর আট ঘর। সেই আটঘরে আবার দুই শ্রেণী, মধ্যল্য ও মহাপাত্র। দত্ত (মধুকুল্য গোত্রী)। নাগ, নাথ ও দাস মধ্যল্য; মধ্যল্য কুলীনদিগের বিশ্রামস্থল। সেন,

* Maior H. G. Raverty's Sapakat -I Nasiri page 558.—and Calliots Inpia Vol 11 page 309.

† শ্রদ্ধাস্পদ পুরাতত্ত্ববিদ ডাক্তর শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুর সেন রাজগণের ক্ষত্রিয়জাতি নিরূপণ করিয়াছেন। (I. A. S. XXX1V. 1280) কতিপয় নবীন লেখক আবার মিত্র মহোদয়ের লিখিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া, রাজবল্লভের মতানুসরণ করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে রাজবল্লভের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে সেন রাজগণ জনসমাজে কায়স্থ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। রাজবল্লভই তাঁহাদিগকে বৈদ্য নির্ণয় করিয়া, আপনাকে সেই বংশজ প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। নবীন লেখকদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার এ উপযুক্ত স্থান নহে। সেন রাজগণের সম্বন্ধে আমাদের অনেক বলিবার আছে।

সিংহ,দেব ও রাহা—মহাপাত্র। মহাপাত্রের ৭ সহিত আদান প্রদান করিলে কুলীনদিগের কিঞ্চিৎ মানহানি হয়; কিন্তু কুল নষ্ট হইতে পারে না। মধ্যল্য ও মহাপাত্রের সর্ব্বথা কুলকার্য্য হওয়া উচিত। এই উৎকৃষ্ট কায়স্থ দ্বাদশ গৃহের নিম্নে পশ্চাল্লিখিত পনের ঘরের গণনা হইয়া থাকে; ইহারা মধ্যবিধ, যথা—কর, দাম, পালিত, চন্দ্র, পাল, ভদ্র, ধর, নন্দী, কুণ্ড, সোম, রক্ষিত, কুর,বিষ্ণু,আঢ্য ও নন্দন। এতদ্ভিন্ন চৌষট্টি ঘর কায়স্থ নিকৃষ্ট শ্রেণীতে গণ্য; যথা—কেতু, সাই, সিল্ল, সর্ম্ম, থর্ম্ম, সুর, শাম, পাহি, বিদি, হোর, আদিত্য, ভুয়, বর্দ্ধন, লধ, লোধ, বিধি, বিদ, গুণ, বল, বর, ধীর, ব্রহ্ম, আইচ, ভুঞ্জ, ভূতক, নাহা, কুন্দ, এন্দ, সুবুদ্ধিদ, হীরা, ইর্ষা, নন্দ, চম্পক, অম, শুক অনো, হন, হরি, গুশচ, কুশ, ক্রুঞ্চ, মাঝি, রাহুত, রাজক, আখণ্ড, মুটেক, সাধু, গর, পানি, হদেশ, সুত, শুক্ল, অন্য, রধ, রাধ, মালি, হাতি, বধ, শ্যাম, অঞ্জ, ভঞ্জ, সির্ছ্যা, বির্ছা, রুদ্র। বঙ্গজ কায়স্থ কুলজি গ্রন্থে এতাধিক কোন কায়স্থের উল্লেখ নাই।

রাজা দনুজ রায় কতকগুলি ব্রাহ্মণের প্রতি দুইটী ভার অর্পণ করেন। সেই কার্য্য অনুসারে তাহারা স্বর্ণামাত্য ও কুলাচার্য্য (ঘটক) নামে খ্যাত। কায়স্থদিগের বংশাবলী তাহাদের বিবাহ-সংখ্যা ও উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট পুস্তকে লিখিয়া রাখা কুলাচার্য্যের কর্ম্ম। কায়স্থদিগের কুলকার্য্যাদির বিবরণ রাজসমক্ষে বিবৃত করা স্বর্ণামাত্যের কার্য্য। তদতিরিক্ত তাহারা রাজসভায় ও ভোজসভায় উপস্থিত থাকিয়া কায়স্থগণের উপবেশন স্থান নির্দ্দেশ করিতেন। চন্দ্রদ্বীপ রাজভবনে কায়স্থদিগের জন্য "চিলছত্র" নামে একটি ভোজনালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যস্থলে রাজা, তাঁহার চতুঃপার্শ্বে কুলীন, তৎপর কুলজ, মধ্যল্য ও মহাপাত্র; তাঁহাদের চতুঃপার্শ্বে অন্যান্য কায়স্থগণ বসিতেন।

চন্দ্রদ্বীপপতিদিগের রাজধানী কচুয়া নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। রাজা কৃষ্ণবল্লভের কন্যা তথায় একটী সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। রাজা জয়দেব রায় অপুত্রাবস্থায় কাল-কবলিত হইলে তাঁহার দৌহিত্র "দেহড়গাতি" নিবাসী বসু-বংশজ পরমানন্দ মাতামহ-রাজ্য ও বঙ্গজ কায়স্থ সমাজপতির আসন প্রাপ্ত হন। ৮ বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র বলেন পরমানন্দ, কান্যকুব্জ হইতে আগত পুষণ বসু হইতে ত্রয়োদশ পুরুষে অবতীর্ণ। আমাদের বিবেচনায় এই উক্তি সঙ্গত নহে।

চন্দ্রদ্বীপের দ্বিতীয় রাজবংশের বংশাবলী।

১

রাজা পরমানন্দ রায়।

৭ শাণ্ডিল্য, অগ্নিবাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয়, বশিষ্ঠ ও আলম্বন গোত্রীয় দত্তগণ সর্ব্বদা সৎসম্বন্ধ করিলে মহাপাত্র শ্রেণীতে স্থান পাইতে পারেন। "সপ্তদত্তা মহাপাত্রঃ সম্বন্ধরূপতঃ সুধীঃ।"

৮ ডাক্তর ওয়াইজ সাহেব ভ্রমক্রমে পরমানন্দকে জয়দেবের পিতৃদৌহিত্র লিখিয়াছেন।

২

রাজা জগদানন্দ রায়।

৩

রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়।

৪

রাজা রামচন্দ্র রায়।

৫

রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ রায়।

৬

রাজা বসুদেবনারায়ণ রায়।

৭

রাজা প্রতাপনারায়ণ রায়।

৮

রাজা প্রেমনারায়ণ রায়।

পরমানন্দ মাতামহের আসন প্রাপ্ত হইয়াই সামাজিক বন্ধনে হস্তক্ষেপ করিলেন। পূর্ব্বে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র যথাক্রমে অগ্রপশ্চাৎ লিখা হইত। পরমানন্দের সময় হইতে কুলজি-গ্রন্থে বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র লিখা যাইতেছে।

আকবরের সেনানী মনিয়ম খাঁ গৌড়াধিকার করিয়া মুরাদ খাঁকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গজয় করিতে প্রেরণ করেন। মুরাদ ১৪৯৬ শকাব্দে (১৫৭৪ খৃঃ অঃ) বাকলা ও ফতেয়াবাদ জয় করিয়াছিলেন। বোধ হয় জগদানন্দের শাসনকালে এই ঘটনা হইয়াছিল।

বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র লিখিয়াছেন—"জগদানন্দ রায়ের মৃত্যু সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে। উক্ত রাজা শক্তি উপাসনায় একজন "সিদ্ধ পুরুষ" ছিলেন। তিনি গঙ্গার নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, যেন অন্তকালে তিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন। একদা গঙ্গার (পদ্মা) জল উচ্ছ্বসিত হইয়া রাজবাটির দ্বার পর্য্যন্ত ধাবিত হইল। রাজা এই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন করিয়া স্মরণ করিলেন, বুঝি গঙ্গা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে আগমন করিয়াছেন। তখন তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে গঙ্গার প্রতি নিবেদন করিলেন, মা! যদি আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়া থাকে, আমাকে গ্রহণ করুন। তাহাতে গঙ্গাদেবী আবির্ভূতা হইয়া তৎপ্রতি হস্ত প্রসারণ করিলেন। রাজা জগদানন্দ দেবীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি অন্তর্হিত হইলেন, গঙ্গার জল ও যথাস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইল। ডাক্তর ওয়াইজ এই ঘটনাটি অন্যরূপ লিখিয়াছেন। ৯ প্রকৃত পক্ষে ১৫০৫ শকাব্দে একটি ভয়ঙ্কর ঝড় ও জলপ্লাবন হইয়াছিল। আইন আকবরি গ্রন্থে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা

৯ "—an astrologer warned Jugadananda Rai the son of Paramananda Rai, that on a certain day and hour he would be drowned in the river. The Raja shut himself up in a tower of his palace at Kachua. The river gradually rose as the hour approached, and just at the time fixed, a mighty wave rolled up on which the goddess Ganga, like another Lurline, rode proudly. She held out her hands to the Raja who clasped them. In a moment he was swept away and disappeared." (J. A. S. B. XLIII. I. 207.)

আছে১০। ইহাতে বাকলারাজ্যবাসী দুই লক্ষ লোক ও জাহাজাদি নষ্ট হয়। মঠ ও নহবদখানা ব্যতীত অন্যান্য গৃহ সমুদয়ের চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ হইয়াছিল। ক্রমে পাঁচ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ২৫। ৩০ হস্ত উচ্চ বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গকলাপ বাগুলীবক্ষে ক্রীড়া করিয়াছিল। আমাদের বিবেচনায়, এই ঘটনাটীই রাজা জগদানন্দের মৃত্যুর সমবায়িক। এই বিপদকালে রাজপুত্র কন্দর্পনারায়ণ একটী উচ্চশীর্ষ দেবমন্দির আরোহণ করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর কন্দর্পনারায়ণ পৈতৃক আসন অধিকার করেন। তিনি এক জন বিখ্যাত ভৌমিক। ১৫০৮ শকাব্দে (১৫৮৬ খৃঃ অঃ) ইংলণ্ড দেশীয় বিখ্যাত পর্য্যটক রল্‌ফ ফিছ বাকলায় উপনীত হন। তিনি "লিখিয়াছেন—" বঙ্গান্তর্গত চট্টগ্রাম হইতে আমি বাকলায় গমন করি। তত্রত্য অধিপতি (King) অতি ভদ্র। তিনি বন্দুক ব্যবহার করিতে ভালবাসেন। তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ও উর্ব্বরা। তথায় প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মে। রেসমি ও কার্পাস বস্ত্র নির্ম্মিত হয়। তথাকার গৃহগুলি উচ্চ ও সুন্দর। পথ প্রশস্ত। অধিবাসীগণের দেহ প্রায় অনাবৃত, কেবল অল্প-পরিসর বস্ত্র দ্বারা কটি ও তাহার নিম্নদেশ আবৃত করিয়া রাখে। স্ত্রীলোকদিগের কণ্ঠ ও বাহু রৌপ্যালঙ্কারের ভাণ্ডারসদৃশ; তাহাদের পদে রৌপ্য, তাম্র, কিম্বা দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত মল।" ১১

রাজা কন্দর্পনারায়ণের বাকল শাসনকালে রাজা তোড়লমল্ল বাঙ্গলার রাজস্ব

১০ "The Sarkar, or district, of Bagla, extends along the seacoast. The fort of the Sarkar is surrounded by a forest. From new moon to full moon, the waves of the sea rise higher and higher; from the fifteenth to the last day of the moon, they gradually decrease. In the 29th year of the present era (A. D. 1583) one afternoon, an immense wave set the whole drstrict under water. The chief of the place was at a feast; he managed to get hold of a boat, whilst his son Pramanand (কন্দর্পনারায়ণ হইবে),with a few others, climbed up a Hindu temple. Some merchants got on a Talar. For nearly five hours the waves remain agitated; the lightening and the wind were terrible; houses and ships were destroyed; only the Hindu temple and the Talar (নহবদখানা) escaped. About two hundred thousand souls perished in this hurricane (Blochmaun's translation.)

ভিনিস নগরের বণিক সিজার ফেডেরিক এই সময় পিগু হইতে চট্টগ্রামে আসিতেছিলেন। তিনি এই ঝড়ে নিতান্ত ক্লেশ পাইয়াছিলেন।

১১ Hackluyts Voyages, Vol II. page 257, (Hackluyts Voyage's নামক বিস্তৃত উপাদেয় গ্রন্থের কয়েক খণ্ড "কলিকাতা পবলিক লাইব্রেরিতে" আছে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে কোন মহাত্মা তন্মধ্য হইতে ফিছের ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্বলিত পত্রগুলি অপহরণ করিয়াছেন।)

বন্দোবস্ত করেন। তন্মধ্যে বাকলা বাঙ্গালার উনবিংশ সরকারের অন্যতম। সরকার বাকলা ৪টি মহালে বিভক্ত, যথা— বাকলা, শ্রীরামপুর,সাহাজাদপুর ও আদিলপুর (বর্ত্তমান ইদিলপুর)। মোট বার্ষিক রাজস্ব ১৭৮৭৫৬ টাকা ১২। আবোল ফাজেল বলেন—বাকলার রাজা সম্রাটের সাহায্যার্থে ৩২০টী গজ ও পঞ্চদশ সহস্র পদাতি যোগাইয়া থাকেন। কিন্তু ফিছের লিখা পাঠে বোধ হয় বঙ্গীয় ভৌমিকগণ নামত মোগল সম্রাটের অধীন ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল।

রাজমালায় লিখিত আছে শকাব্দের সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ভাগে ত্রিপুরেশ্বর অমর মাণিক্য দেব বাকলা আক্রমণ করেন। তিনি সেই স্থান লুণ্ঠন করিয়া বহুতর ধন ও বহু সংখ্যক লোক দাসরূপে লইয়া যান। আরাকাণরাজও বাকলার প্রতি খর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কন্দর্পনারায়ণ, ত্রিপুরেশ্বর,আরাকাণরাজ ও পর্টুগিজদিগের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া কচুয়া হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। প্রথমত বসুরকাঠি—তথা হইতে হুসনপুর ক্ষুদ্র কাঠি—তৎপর মাধবপাশায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। মাধবপাশায় জনৈক "গাজি" উপাধিধারী যবন বাস করিত, কন্দর্পনারায়ণ তাঁহাকে বধ করিয়া সেই স্থানটী অধিকার করেন। অদ্যাপি চন্দ্রদ্বীপের রাজ্যশূন্য রাজগণ তথায় বাস করিতেছেন। মাধবপাশা রাজবাটিতে একটি বৃহৎ পিত্তলের কামান আছে, ইহার দৈর্ঘ্য $\frac{১৩}{৪}$ ফিট। ইহাতে রাজা কন্দর্পনারায়ণের নাম"৩১৮" অঙ্ক ও কামান-নির্ম্মাতা শ্রীপুর-নিবাসী "রুপিয়াখার" নাম খোদিত রহিয়াছে। "৩১৮" অঙ্কটি বোধ হয় কামানের সংখ্যা হইতে পারে।

কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর, শিশু রামচন্দ্র পৈতৃক আসনে আরোহণ করেন। তিনি সুবিখ্যাত রাজা প্রতাপাদিত্যের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বোধ হয় এই উদ্বাহ-কার্য্য কন্দর্পনারায়ণের জীবিতাবস্থায় সম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র ও ডাক্তার ওয়াইজ সাহেবের লিখা দ্বারা এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে না। ব্রজসুন্দর বাবু বলেন—"বিবাহার্থী রাজা রামচন্দ্র বহু সমৃদ্ধি সহকারে সমারোহ পূর্ব্বক প্রতাপাদিত্যের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। রাত্রিতে বিবাহ-কার্য্য সমাপনানন্তর বর কন্যা গৃহপ্রবিষ্ট হইলে, বর (রামচন্দ্র) শুনিতে পাইলেন যে,রাত্রিতে তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজা প্রতাপাদিত্য চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য ও বঙ্গজ কায়স্থসমাজপতিত্ব অধিকার করিবেন, তাহার সমুদয় মন্ত্রণা স্থির হইয়াছে। (কেহ বলেন, রামচন্দ্র তাঁহার নববিবাহিত পত্নীর নিকট এই কথা শুনিতে পান; কেহ বলেন, প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসন্তরায় তাঁহাকে এই সম্বাদ

১২ গ্রাণ্ট সাহেব সরকার বাকলার রাজস্ব ১৭৮২৬৬ টাকা লিখিয়াছেন। (Mr. J. Grant's Analysis of the Finances of Bengal.)

জ্ঞাপন করেন।) রামচন্দ্র ইহাও অবগত হইলেন, যে,যে খাল দিয়া গমন করিতে হয়, তাহা বৃহৎ কাষ্ঠ সকল দ্বারা রুদ্ধ করা হইয়াছে। অন্তঃপুরে রামচন্দ্র এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ভয়ে মৃতকল্প হইলেন। কিন্তু সে সময়, তাঁহার আত্মীয় ভৃত্য ও রক্ষিবর্গ বহির্ব্বাটিতে আনন্দে কালক্ষেপ করিতেছিল। তাহারা ইহার বিন্দুবিসর্গও জ্ঞাত ছিল না। পরিশেষে রাজা রামচন্দ্র তাঁহার নবোঢ়া মহিষীর (কেহ বলেন বসন্ত রায়ের) সাহায্যে অবরুদ্ধ রাজপুরী হইতে বহির্গত হইলেন। রাজা রামচন্দ্রের শরীর-রক্ষকদিগের নায়ক ভীমপরাক্রম রামমোহন মাল স্বীয় প্রভুর মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অনুচরবর্গের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ রাজা রামচন্দ্রকে ৬৪ ক্ষেপণী-যুক্ত এক কোষ নৌকায় আরোপণ পূর্ব্বক কাষ্ঠ ও বৃক্ষাদি পূর্ণ খালে নৌকা টানিয়া লইয়া চলিল। বিঘ্নসঙ্কুল খাল অতিক্রম করিয়া তোপধ্বনিতে রাজা রামচন্দ্র স্বীয় শ্বশুরকে তাঁহার গমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।"

ডাক্তার ওয়াইজ সাহেবের লিখিত বিবরণ ইহার সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য নহে। তিনি বলেন, "বিবাহ-রজনীতে রাজা রামচন্দ্রের অনুচর রামাই ভাঁড় স্ত্রীবেশে প্রতাপাদিত্যের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রতাপ-মহিষীর সহিত হাস্য পরিহাস করিয়াছিল। রাজা প্রতাপাদিত্য এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া নূতন জামাতার প্রাণ-বধে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু প্রতাপ দুহিতা পিতৃপ্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া রাজা রামচন্দ্রকে নির্ব্বিঘ্নে অন্তঃপুর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। চন্দ্রদ্বীপপতি রামমোহনের বাহুবলে নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় রাজধানীতে পহুঁছিয়াছিলেন।"

"প্রতাপাদিত্য চরিত্র" নামক ক্ষুদ্র পুস্তকে লিখিত আছে, রাজা প্রতাপাদিত্য (বিবাহের বহুকাল পরে) লোভাক্রান্ত হইয়া জামাতৃরাজ্য করতলস্থ করিতে মনস্থ করেন। তিনি নিমন্ত্রণ করিয়া রাজা রামচন্দ্রকে নিজ ভবনে আনাইলেন। রামচন্দ্র শ্বশুরের কৌশলজালে রুদ্ধ হইয়া কিছুকাল যশোহরে বাস করিয়াছিলেন। অবশেষে একদা প্রতাপাদিত্য জনৈক দৌবারিককে আহ্বান করিয়া বলিলেন "কল্য প্রাতে রামচন্দ্র যখন অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবেন, তখন তোমরা এক জন যে হউক তাঁহাকে সংহার করিবে।" প্রতাপাদিত্যের এই অনুজ্ঞা তাঁহার কন্যার কর্ণগত হইলে তিনি দুঃখে মৃতকল্প হইলেন। পরে নিশাযোগে সঙ্গোপনে স্বীয় স্বামীকে সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। রাজা রামচন্দ্র পত্নীবাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় শ্যালক যুবরাজ উদয়াদিত্যকে আহ্বান করিলেন এবং তিনি তথায় উপনীত হইলে সবিনয়ে সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিলেন। অনুজার রোদন ১৩ ও ভগিনীপতির বিনয়

১৩ খৃষ্টধর্ম্ম-যাজকদিগের লিখিত পত্র ও প্রবন্ধাদি পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে যুবরাজ উদয়াদিত্য রাজা রামচন্দ্রের চারি বৎসরের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। বোধ হয় রাম-

বাক্যে যুবরাজের অন্তঃকরণ দয়ার্দ্র হইল। তিনি কৌশলে রাজা রামচন্দ্রকে তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুর হইতে নির্ব্বিঘ্নে বাহির করিয়া দিলেন। চন্দ্রদ্বীপপতি শ্যালকের কৃপায় প্রাণ রক্ষা করিলেন। বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র, ও ওয়াইজ সাহেবের লিখা হইতে মহাত্মা রামরাম বসুর লিখার অধিকাংশ সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ রাজা রামচন্দ্রের উদ্বাহকালে তিনি নিতান্ত শিশু ছিলেন। কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর রামচন্দ্রের রাজ্যশাসনকালে খৃষ্টধর্ম্মযাজক ফোনসেকা ১৬০০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বাকলায় উপনীত হন। ফোনসেকা বলেন "রাজার বয়ঃক্রম অনধিক আট বৎসর। রাজা তাঁহাকে সম্মান ও আদরের সহিত গ্রহণ করেন এবং বাকলা রাজ্যে গির্জা প্রভৃতি সংস্থাপন জন্য সনন্দ দান করিয়াছিলেন।" ফোনসেকা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, যে, তিনি অষ্টমবর্ষীয় বালকের পরিণামদর্শিতা দর্শনে নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। ফোনসেকা বলেন সাদর সম্ভাষণের পর রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কোথায় যাইব; আমি বলিলাম, আমি মহারাজের শ্বশুর চাঁদ খাঁর অধীশ্বর সমক্ষে যাইতেছি।" ১৪ এই ঘটনার কিছুকাল পূর্ব্বে যে রামচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল তৎপক্ষে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই এবং উদ্বাহকালে তিনি নিতান্ত শিশু ছিলেন, অতএবই বোধ হইতেছে, যে, কন্দর্পনারায়ণ রায়ের জীবদ্দশায় এই বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। ফোনসেকার বাঙ্গালা ভ্রমণকালে যে যশোহর ও বাকলা রাজপরিবার মধ্যে কোন প্রকার অসূয়া বর্ত্তমান ছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে না।

বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র বলেন" রাজা রামচন্দ্র যশোহরের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া স্বীয় জীবনরক্ষিত্রী পত্নীকে হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন করিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর অন্তে প্রতাপ-দুহিতা কাশী-যাত্রাচ্ছলে চন্দ্রদ্বীপে গমন করেন। তিনি মাধব পাসার নিকটবর্ত্তী স্থানে পঁহুছিয়া নৌকাতেই রহিলেন, কেহ তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক নিতে আসিল না। তাঁহার নৌকার নিকট সপ্তাহে দুইবার হাট বসিত, অদ্যাপি সেই স্থানটী "বউ ঠাকুরাণীর হাট" নামে পরিচিত রহিয়াছে। পরে তিনি সারসী গ্রামে একটী দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। এই সকল সংবাদ রাজমাতার কর্ণগোচর হইলে তিনি স্বয়ং আসিয়া বধুকে লইয়া গেলেন। কিন্তু তাহার অভিলাষ পূর্ণ হইল না, রাজা পত্নী সন্দর্শন করিবেন

চন্দ্রের মহিষী, উদয়াদিত্যের ৫।৬ বৎসরের কনিষ্ঠা ছিলেন।

১৪ "After compliment the king asked me where I bound for and I riplied that I was was going to the king of Ciandcan, who is to be the *Father-in-law* of your Highness." প্রতাপাদিত্যের রাজধানী "চাঁদ খাঁ" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এরূপ নামকরণের ইতিহাস যথা স্থানে বর্ণিত হইবে।

বলিয়া তিন দিবস দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন। হতভাগিনী প্রতাপ-দুহিতা অবশেষে কাশী যাত্রা করিলেন।" আমাদের বিবেচনায় ব্রজসুন্দর বাবুর লিখিত বিবরণ সম্পূর্ণ সত্য নহে। রাজা রামচন্দ্রের ন্যায় একজন সুবোধ নৃপতি তাঁহার জীবনরক্ষিত্রী পত্নীর প্রতি এরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না।

ডু, জারিক বলেন "১৬০২ খৃষ্টাব্দে আরাকাণ রাজ বাকলা জয় করিয়াছিলেন।

প্রবাদ অনুসারে রামচন্দ্রের জীবনী সংক্রান্ত দ্বিতীয় ঘটনা লক্ষ্মণমাণিক্যের প্রাণদণ্ড। এই ঘটনাটী ভুলাযার ভৌমিক বংশের বিবরণে বিবৃত হইবে। বলা বাহুল্য যে রামচন্দ্র আকবরের মৃত্যুর পূর্ব্বে সিংহাসনারোহণ করেন, জাহাঁগীর বাদসাহের শাসনকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর তৎপুত্র কীর্ত্তিনারায়ণ পৈতৃক আসন অধিকার করেন। তিনি একজন মহাযোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার অধিকার কালে মোগল-শাসিত বঙ্গের রাজধানী, ঢাকা (১৫) নগরীতে স্থাপিত হয় (১৬০৮-খৃঃ অঃ)। ঢাকার শাসনকর্ত্তার সহিত কীর্ত্তিনারায়ণের সদ্ভাব জন্মিল। নবাব যুদ্ধযাত্রাকালে প্রায়ই তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া যাইতেন। এক যুদ্ধযাত্রা-কালে, নবাবের রন্ধনালয়ের নিকট দাঁড়াইয়া রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ নবাবের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। হঠাৎ রন্ধনের ঘ্রাণ আসিয়া রাজার নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইল। রাজা বস্ত্র দ্বারা নাশা আবৃত করিলে, নবাব বলিলেন "রাজন, 'ঘ্রাণেনার্দ্ধভোজনং' অতএব আপনার জাতি নষ্ট হইয়াছে।"(১৬) রাজা নবাব বাক্য শ্রবণ মাত্র স্বীয় অনুজ বাসুদেব নারায়ণের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বানপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বন করিলেন।

১৬৩০ খৃষ্টাব্দে হরবার্ট সাহেব (Sir J. Herbert.) বাকল, গঙ্গাতীরস্থ সমৃদ্ধিসম্পন্ন একটী প্রধান নগরী লিখিয়াছেন। ব্লেভ ও ব্রোকের মানচিত্রেও "বাকলা" ("Beacola" Blaev's map; "Baecala" Van den Broucke's map.) প্রধান নগরী রূপেই চিত্রিত রহিয়াছে। এতাবতা অনুমিত হইতেছে খৃষ্টাব্দের সপ্তদশ শতাব্দীতেও বাকলার সৌভাগ্য-দীপিকা নির্ব্বাণ হয় নাই।

রাজা বাসুদেব নারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রতাপনারায়ণ দীর্ঘকাল পৈতৃক

---

১৫ ইহাই ঢাকা নগরীর জন্মকাল। ফেয়ার সাহেবের লিখা দ্বারা (History of Pegu.) ১৪১২ খৃষ্টাব্দেরও পূর্ব্বে ঢাকার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু ফেয়ার সাহেবের লিখিত—বাঙ্গলার ইতিহাস ও ভূগোল সংস্পৃষ্ট অংশগুলি যে প্রায়ই ভ্রমাত্মক তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৬ যশোহর ইসবপুরের জনৈক ব্রাহ্মণ জমীদার এইরূপ সামান্য অপরাধে সমাজচ্যুত হন। সুবিখ্যাত ঠাকুরদিগের পিতৃপুরুষ জগন্নাথ ঠাকুর সেই বংশীয় ভূম্যধিকারী সুধারামের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্যাপি তদ্বংশধরগণ অন্যায়রূপে সমাজ কর্ত্তৃক পীড়িত হইতেছেন।

রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। উলাইল ১৭ নিবাসী গৌরীচরণ মিত্র মজুমদার সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। চন্দ্রদ্বীপ রাজকুমারীর গর্ভে গৌরীচরণের দুই পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ উদয়নারায়ণ, কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ। রাজা প্রতাপ নারায়ণের মৃত্যু হইলে, তাঁহার এক মাত্র পুত্র প্রেমনারায়ণ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তিনি অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইলেন। মাতুলের মৃত্যুর পর উদয়নারায়ণ মিত্র—পশ্চাৎ রাজা উদয়নারায়ণ রায়—চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য ও বঙ্গজ কায়স্থ সমাজপতির আসন অধিকার করেন। রাজনারায়ণ মিত্র "সরকার বাকলার" অধীনস্থ কয়েকটী তালুক লইয়া রাজধানী মাধবপাসার নিকটবর্ত্তী প্রতাপপুরে বাস করিতে লাগিলেন। তদ্বংশধরগণ অদ্যাপি তথায় বাস করিতেছেন। তাঁহাদের তালুক গুলি নিলাম হইয়া গিয়াছে।

তৃতীয় রাজ বংশাবলী।

১

রাজা উদয়নারায়ণ রায়।

২

রাজা শিবনারায়ণ রায়।

লক্ষ্মীনারায়ণ — নরনারায়ণ — নন্দনারায়ণ — ৩ রাজা জয়নারায়ণ

৪ রাজা নৃসিংহনারায়ণ রায়

(পোষ্য পুত্র।)

নরেন্দ্রনারায়ণ — ৫ রাজা বীরসিংহনারায়ণ রায় — ৬ রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়।

১৭। উলাইলগ্রাম জেলা ঢাকার অন্তর্গত বংশ নদীর পশ্চিম তটে ছিল। ঐ গ্রামে মিত্র মজুমদার বংশীয়দিগের অনেক ইষ্টকালয় ছিল। বিগত শতাব্দীর অন্তভাগে সুবিখ্যাত রেনল সাহেব যে মানচিত্র প্রস্তুত করেন তাহাতেও ইহার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। ১২২৬-২৭ বঙ্গাব্দে ধলেশ্বরী নদীর গাজিখালি নামক শাখানদী সাভার নামক স্থানের অভিমুখে নির্গত হইয়া বংশ নদীর সহিত মিলিয়া যায়। তাহাতে ঐ নদীর বেগ বর্দ্ধিত হইয়া উলাইল গ্রামটীকে একেবারে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। ঐ নদীর তীরবর্ত্তী ফুলবেড়িয়া নামক যে স্থানে ওয়াইজ সাহেবের নীল

রাজা উদয়নারায়ণ কোন সময়ে জীবিত ছিলেন, ইহা ডাক্তার ওয়াইজ কিম্বা ব্রজসুন্দর বাবু লিখেন নাই। সৌভাগ্যবশতঃ আমরা মোগল-শাসিত বঙ্গের রাজস্বের তৃতীয় হিসাবে (জমাকামেল তোমারি) তাঁহার নাম পাইয়াছি, সুতরাং তিনি মুরশিদকুলি খাঁ ও সুজাউদ্দিনের সমসাময়িক। এই সময়ে (১১৩৫ বঙ্গাব্দে) সরকার বাকলার রাজস্ব ১৯২৪৪৮ টাকা লিখিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে চন্দ্রদ্বীপপতি উদয়নারায়ণ রায় খালসা ভূমির জন্য ১১৭০ টাকা জায়গীর মহালাতের জন্য ৫৮৫৮১ টাকা মোট ৫৯৭৫১ টাকা কর দান করিতেন। সুতরাং প্রাচীন বাকলা রাজ্যের অধিকাংশ ইহার পূর্ব্বেই তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। ১৮

বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র প্রচলিত প্রবাদ অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন—"উদয়নারায়ণের রাজত্ব লাভ করিবার পরেই নবাবের শ্যালক খাদি মজুমদার তাহাকে অধিকারচ্যুত করেন। তাহাতে তিনি নবাবের সমীপে গমন করিয়া তদ্বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। নবাব বলিলেন—যদি তুমি একটি ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ কর, তাহা হইলে রাজ্যাধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইবে। রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন, এবং দ্বিতীয় ফরিদের ন্যায় মল্লযুদ্ধে এক "সের" নিহত করিয়া অক্ষত শরীরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিন্তু নবাবের বেগম তাঁহার ন্যায্য পুরস্কার লাভের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলেন। তদন্তে রাজা কৌশলক্রমে রাজ্যাধিকার নিজ হস্তগত করিয়াছিলেন।"

উদয়নারায়ণের মৃত্যুর পর শিবনারায়ণ পৈতৃক আসন অধিকার করেন। তাঁহার রাজ্যাধিকার কালে ভারতে ইংরাজ রাজ্যের সূত্রপাত হয়। এই নরপতি ভোগবিলাসী ও ইন্দ্রিয় পরায়ণ ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর শিশু জয়নারায়ণ চন্দ্রদ্বীপের রাজপদে অভিষিক্ত হন। কিন্তু তাঁহাকেও তাঁহার মাতা দুর্গারাণীকে একটি নির্দ্ধারিত বৃত্তি দিয়া রাজকর্ম্মচারী শঙ্কর বকসী প্রকৃত রাজা হইয়া ৭ বৎসর রাজ্যশাসন করেন। অবশেষে দুর্গারাণী ওয়ারেন হেষ্টিংসের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ১৯ সাহায্যে

কুঠি আছে, তাহারই অপর পারে এক চর আছে, তাহাকেই লোকে "চর উলাইল" বলে। এস্থানেই সেই সমৃদ্ধ-সম্পন্ন উলাইল গ্রাম ছিল বলিয়া অনুমান হয়। যাঁহারা নৌকাযোগে গোয়ালন্দ হইতে ঢাকা গমন করিয়াছেন, বোধ হয় তাঁহারা ফুলবেড়িয়া ও চর উলাইল দর্শন করিয়াছেন।

১৮। আদিলপুর প্রভৃতি তিনটী পরগনা রমাবল্লভ রায় ও বুজরগ উমেদপুর মহম্মদ সাদক এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র অংশগুলি অন্যান্য জমীদারদিগের দখলকারিতে নিযুক্ত ছিল। (See E. I. Co's Fifth Report, P. 367. (1812 Ed.) বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র অন্যায় রূপে লিখিয়াছেন "রাজা জয়নারায়ণের সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিশের দশশালা বন্দোবস্ত হয়। তাহাতে পরগণে কোটালিপাড়, ইদিলপুর, সুলতানাবাদ, বুজরগ, উমেদপুর এবং আরো কয়েক স্থান চন্দ্রদ্বীপ হইতে পৃথককৃত হয়।"

১৯ ইনি পাইকপাড়া রাজবংশের-তিলক স্বরূপ। পাইকপাড়ার রাজগণ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। কান্দি নিবাসী হর-

শঙ্কর বকসীকে পদচ্যুত করিয়া পুত্রের রক্ষয়িত্রী স্বরূপ রাজাসন অধিকার করেন। উক্ত রাণী একটী বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি "দুর্গাসাগর" নামে খ্যাত রহিয়াছে। ইহার আয়তন ৩৸৶ তিন দ্রোণ তেরকানি (২৪৪ বিঘা)।

রাজা জয়নারায়ণের সময়ে প্রসিদ্ধ "দশশালা বা চিরস্থায়ী" বন্দোবস্ত হয়। পূর্ব্বেই চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের কলেবর খর্ব্ব হইয়াছিল। এইক্ষণে আবার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুরের "নিলামের আইনের" কৃপায় প্রাচীন জমীদারদিগের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। অবধারিত দিবসে রাজস্ব প্রদান করা তাঁহাদিগের নিতান্ত অনভ্যস্ত কর্ম্ম ছিল। বিশেষতঃ চন্দ্রদ্বীপের রাজ কর্ম্মচারিগণ সময় সময় কোম্পানী বাহাদুরের ধনাগারের পরিবর্ত্তে চন্দ্রদ্বীপের রাজস্ব নিজ ধনাগারে অর্পণ পূর্ব্বক চরিতার্থ হইতেন। এই সকল কারণে বাকী-পড়া রাজস্বের জন্য চন্দ্রদ্বীপ জমীদারি নিলাম হইতে লাগিল। ১২০০ বঙ্গাব্দে ঐ জমীদারির /১৭ ৈক্রান্ত হিস্যা ঢাকার কালেক্টরিতে নিলাম হয়। ঢাকা নিবাসী দলসিংহ তাহা ক্রয় করেন। ১২০২ বঙ্গাব্দে ৵/১২॥০ হিস্যা ও ১২০৪ বঙ্গাব্দে ৵/১৭॥০ হিস্যা নিলাম হয় তাহা ঢাকাবাসী জন পোনয়টি (বোধ হয় আরমেনিয়ান) সাহেব ক্রয় করিলেন। ১২০৬ বঙ্গাব্দে অবশিষ্ট ॥১২॥/ হিস্যা নিলাম হইলে রাজার মুদী মাণিকচাঁদ তাহা ক্রয় করেন। মাণিকমুদী /০ এক আনা হিস্যা মাত্র রাখিয়া অবশিষ্ট ।৺১২॥/ হিস্যা রাজাকে দিতে সম্মত হইয়াছিল। কিন্তু অভিমানী ভূপতি মুদীর সহিত সরিকিতে জমীদারি ভোগ করিতে অসম্মত হইলেন।

চন্দ্রদ্বীপের রাজ বংশধরগণ অধুনা একটী বিস্তৃত নিষ্কর "খানেবাড়ী" ও কয়েক খানা খারিজা তালুকের উপস্বত্ব দ্বারা কথঞ্চিৎ উদর পরিতোষ করিয়া থাকেন।

"অভাগা চন্দ্রদ্বীপের মাণিক মুদী রাজা।"

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

ক্রমশঃ

কৃষ্ণ সিংহ এই রাজবংশের স্থাপন কর্ত্তা। ওয়ারেন হেষ্টিংস ও লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসন কালে এই বংশধরগণ বাঙ্গার রাজস্ব বিভাগের শীর্ষস্থানে বিরাজ করিতে ছিলেন;

Mr. Hastings afterwards abolished the provincial Councils and appointed Gangagovinda Sinha as Divan of the Committee of the revenue. He was also appointed Nayeb kanungo ; and his son, Prankrishna Sinha, Nayeb Divan of the Committee. Thus we see the members of the Kandi family holding the highest offices in the State, and exercising immense influence by virtue of their position. All Zaminders, talukdars, and in fact all those who held lands in any part of the country used to pay their respects to Gangagovenda. The Kandy Family. (T. A. B.) Calcutta Review. Vol. LVIII page 98.

ভূ-পঞ্জর।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

প্রথম যুগের শেষ ভাগে পৃথিবীর অধিকাংশই জলমগ্ন ছিল।

পূর্ব্ববর্ত্তী সময়োৎপন্ন স্কটল্যাণ্ড, উত্তরকূয ও স্কান্‌ডিনেবিয়াকে উত্তরে রাখিয়া পারমিয়ান অন্তরযুগের য়ুরোপীয় সমুদ্র একদিকে আয়ারল্যাণ্ড হইতে ইয়ুরেল পর্ব্বত পর্য্যন্ত এবং সম্ভবতঃ স্পিটজ্‌বার্জেন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অন্য ভাগে সম্ভবতঃ পিরিনীসের উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ফ্রান্সের মধ্যদেশ লইয়া একটি দ্বীপ, আধুনিক ব্রিটনি লইয়া আর একটি দ্বীপ, এবং পাঃদে ক্যালে ও ভ্রুনর প্রদেশ হইতে রাইন নদীর বিপরীত কূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত বেলজিয়াম আর ইংলণ্ডে রথ অন্তরীপ হইতে ল্যাণ্ডস্‌ এণ্ড অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডই, এ সময়ে য়ুরোপের স্থলভাগ।

ভারতবর্ষে বাঙ্গলার কতকাংশ, বুন্দেলখণ্ড, আরাবলি পর্ব্বতের সন্নিহিত প্রদেশ, ছোটনাগপুর প্রভৃতি ব্যতীতও পঞ্জাব, সিকিম, ভুটান ও কাশ্মীরের কতকাংশ এবং ব্রহ্মদেশের মুলমেন প্রদেশ—পারমিয়ান অন্তর যুগে বর্ত্তমান ছিল, সুতরাং য়ুরোপে ও ভারতবর্ষে এই সকল দেশই কেবল দ্বিতীয় যুগের প্রারম্ভ দেখিয়াছে।

জীবদিগের মধ্যে কাঁকড়াও মৎস্যই যেমন প্রথম যুগে প্রধান, তেমনি দ্বিতীয় যুগে সরীসৃপই প্রধান জীব। এই নিমিত্ত প্রথম যুগকে মৎস্যের এবং দ্বিতীয় যুগকে সরীসৃপের যুগ বলা যাইতে পারে। এই যুগের আশ্চর্য্যরূপ বৃহদায়তন অসংখ্য সরীসৃপ দেখিলে মনে হয় ইহারাই এ সময়ের রাজা। জীবরাজত্বের প্রভাব বৃদ্ধি হেতু এ সময়ে উদ্ভিদরাজ্যের প্রাধান্য হ্রাস হইয়া ছিল। ভূবেত্তাগণ দ্বিতীয় যুগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—

১। ত্রিস্তর বা নূতন লোহিত প্রস্তর অন্তরযুগ। (Triassic or new red period)

২। জুরাসিক অন্তরযুগ (Jurassic)

৩। চাখড়ি বা ক্রিটেসস্‌ অন্তরযুগ (Cretaceous)

ত্রিস্তর অন্তরযুগ।

(Triassic)

এই অন্তর যুগের মৃত্তিকা তিন স্তর বিশিষ্ট বলিয়া ভূবেত্তাগণ ইহার ত্রিস্তর নাম দিয়াছেন।

ইহার সর্ব্বনিম্নভাগ নূতন লোহিত প্রস্তর স্তর, মধ্যভাগ কৃষ্ণবর্ণ চুনে প্রস্তর ও শেষ অর্থাৎ সর্ব্বোপরিভাগ লোণা বেলে প্রস্তর স্তরে নির্ম্মিত। এই অন্তর যুগের প্রথম অর্থাৎ লোহিত প্রস্তর স্তরে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের বাহুপদী ও মস্তকপদী শম্বুক, গেনইড ও প্লাকইড মৎস্য অল্পই পাওয়া যায়।

এখন জীবজগতের পরিবর্ত্তনের স-

হিত উদ্ভিদেরও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। যে সকল বৃক্ষ ও লতা অঙ্গারজনক যুগে বিশেষ বৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহাদের স্থান এখন অন্য জাতি আসিয়া গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের উদ্ভিদ এখন অল্প সংখ্যক, কেবল ঝাউ জাতীয় বৃক্ষই (Conifer) কিছু অধিক।

কতক পুরাতন জীবজাতির এসময় যেমন লোপ পাইয়াছে তেমনি অসংখ্য অসংখ্য নূতন জাতীয় জীব তাহাদের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এই অন্তর যুগের লোহিত প্রস্তর স্তর সংস্থিতির সময়ে কচ্ছপের প্রথম জন্ম ও এই সময় হইতেই সরীসৃপ-দিগের আধিপত্য আরম্ভ।

পরে কৃষ্ণবর্ণ চুনে প্রস্তর স্তর সংস্থিতি হইবার সময়ে সমুদ্রে অসংখ্য নূতন শম্বুক জাতীয় জীব ও কচ্ছপ, বার প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় সরীসৃপ এবং কঠিন আচ্ছাদন বিশিষ্ট ছয় প্রকার নূতন মৎস্য উৎপন্ন হয়। উত্তর আমেরিকার কনেকটিকাট নদীর লোনা বেলে পাথর স্তরে উষ্ট্র পক্ষীর মত বৃহৎ পক্ষীর তিনটি পদাঙ্গুল চিহ্ন দেখিয়া এই সময়েই প্রথম পক্ষীর আবির্ভাব অনুমান করা হয়। কিন্তু পক্ষীর কঙ্কাল না পাওয়াতে অনুমান ছাড়া ইহার অন্য প্রমাণ নাই। এ সময়ের মৃত্তিকাতে অনেক প্রকার সরীসৃপের পদ চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে ভেকজাতীয় (Cheirotherium or Labyrinthodon) একরূপ সরীসৃপ অত্যন্ত অদ্ভুত আকার। এই সময়ে অন্য একরূপ বৃহদায়তন অদ্ভুত কুম্ভীর (Nothosaurus) জন্মিয়া ইহার পরবর্ত্তী কালে আরো বৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

হ্রদ-শুষ্ক ভিজা মাটিতেই, এই সকল সরীসৃপের পদচিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। জোয়ারের জল সরিয়া যে মাটী ভিজা থাকে তাহাতে কোন চিহ্ন নিবদ্ধ রহিতে পারে না, অঙ্কিত চিহ্ন আবার জোয়ার আসিলেই ধৌত হইয়া যায়। আমেরিকার লোনা হ্রদের শুষ্কতটে এখনো এইরূপ চিহ্ন নিবদ্ধ হইতে দেখা যায়।

দ্বিকোষক মুক্তবীজ বৃক্ষ জাতি (Dicotyledonous Gymnosperm) এই সময়েই প্রথম উৎপন্ন। এ সময়ের জঙ্গল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ঝাউ বৃক্ষ এবং পর্ণীতরু ও কালেমাইট শর গাছ দ্বারাই পূর্ণ।

লোনা বেলেমাটীর স্তর কৃষ্ণবর্ণ চুনে প্রস্তর স্তরের পরবর্ত্তী। এই মৃত্তিকাতে যে বহুল পরিমাণে লবণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কোথা হইতে আসিল? নিশ্চয়ই সমুদ্রের জলীয় ভাগ বাষ্পাকারে উঠিয়া যাইলে অবশিষ্ট লবণাদি পদার্থ এই সকল স্তরে জমাট রহিয়াছে। সিন্ধু নদের ব-দ্বীপের সন্নিকটস্থ একটি স্থানে এখনো এই রূপে লবণ সঞ্চিত হইতে দেখা যায়। কচ্ছরন্ ঠিক সমুদ্রও নহে, শুষ্ক স্থলও নহে। গ্রীষ্ম কালে এ স্থানের জল শুকাইয়া স্তরে স্তরে লবণ জমিতে থাকে, বৎসরের অপর সময়ে আবার ইহা জলে আবৃত হয়। একবার সমুদ্রের কার্য্য দ্বারা এই ভূখণ্ডের চতুর্দ্দিক বালুকার প্রাচীরে বদ্ধ হইলে ইহা আর সর্ব্বদা জলপ্লাবিত হইবে না।

সেই সময় সমস্ত আবদ্ধ জল শুষ্ক হইয়া লবণস্তর নির্ম্মিত হইতে থাকিবে। পরে সময়ে সময়ে সমুদ্র জল প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া আবার নূতন স্তরের উপকরণ যোগাইবে। ত্রিস্তরের লোণা বেলেমাটীর স্তরও উপরোক্ত প্রকারে উৎপন্ন। এই স্তরের অতি অল্প স্থানেই প্রাণী-চিহ্ন পাওয়া যায়—তাহাও কোন নূতন জাতির নহে। এই সময়ে বৃহৎ হ্রদবেষ্টিত দ্বীপ উপদ্বীপে মাঝে মাঝে দুই চারিটি পর্ব্বতও দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্র কূলে উদ্ভিদের অভাব নাই, সেই উদ্ভিদাবশেষ এখনো অপর্য্যাপ্ত। লোণাস্তরের উদ্ভিদ অনেকটা পরবর্ত্তী অন্তর যুগের ন্যায়।

কটক হইতে ত্রিরুঞ্চিনাপল্লী এবং পুনা হইতে ত্রিবাঙ্কুর পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে ত্রিস্তর যুগের প্রস্তর পাওয়া যায় বলিয়া ভুবেত্তাগণ ঠিক করিয়াছেন ভারতবর্ষে দাক্ষিণাত্যের উভয় পার্শ্বস্থ সমুদ্র উপকূল এই সময়ে উৎপন্ন। এই সময়ে সিকিম ও ভূটান লইয়া প্রায় চীন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড উৎপন্ন হইয়াছিল।

জুরাসিক অন্তরযুগ।

এই যুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং ত্রিস্তর অন্তর যুগের অব্যবহিত পরে উভয়ের মধ্যে আর একটি মৃত্তিকাস্তর পাওয়া যায়। ইহা দুই যুগের কোন যুগেরি অন্তর্গত নহে। এই স্তর অতি অল্পই গভীর বলিয়া ইহার আর বিশেষ বিবরণের আবশ্যক বোধ হইল না, ভুবেত্তারা ইহাকে রিটিক অথবা পেনার্থ গর্ভযুগ বলেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে জুরাসিক অন্তরযুগ একটি প্রধান। ফ্রান্সের জুরা নামক পর্ব্বত-শ্রেণী এই যুগের মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া এই যুগের নাম জুরাসিক হইয়াছে। জুরাসিক যুগ আবার দুই ভাগে বিভক্ত। লায়াস—অর্থাৎ কর্দ্দমময় চুনস্তর, এবং ওয়োলাইট অর্থাৎ ডিম্বাকার প্রস্তর-স্তর। এই দুই রূপ বিভাগ জুরা পর্ব্বতে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া এই দুই ভাগে জুরাযুগকে ভাগ করা গিয়াছে। জুরাসিক যুগের উদ্ভিদ ও জীব সমূহে একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

পূর্ব্ব সময়ের অনেক জাতীয় জীব এ যুগে লোপ পাইয়া নূতন জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। ৪০০০ প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন নূতন জাতীয় জীব এসময়ে উৎপন্ন। দানাদার চুণে পাথর ও চুণযুক্ত বেলে-কর্দ্দম দ্বারা জুরা যুগের প্রথম স্তর লায়াস মৃত্তিকা নির্ম্মিত। লায়াস গর্ভযুগ আবার দুই তিনটি স্তর-বিশিষ্ট। প্রত্যেক স্তরে মৃত্তিকার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

আমোনাইট* ও বেলেম্‌নাইট+ নামক শম্বুক এবং ঝিনুক এই সময়ের সমুদ্রে প্রচুর। অনেক প্রকার নূতন জাতীয় শম্বুক, মৎস্য, পুরুভুজ, ঝিনুক প্রভৃতি সামুদ্রিক জীব ব্যতীত, অসংখ্য অদ্ভুদাকার সরীসৃপ

* অর্থাৎ মেষশৃঙ্গের ন্যায় বক্রাকার।

\+ অর্থাৎ তীরবৎ সূক্ষ্মাগ্র।

এই সময়ে উৎপন্ন। এই অদ্ভুত সরীসৃপদিগের মধ্যে তিনটি প্রধান। এক প্রকার সরীসৃপের (Ichthyosaurus) শরীর বড় আশ্চর্য্য রূপে নির্ম্মিত; এখনকার ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ ইহাতে সন্নিবেশিত দেখা যায়। ইহার মস্তক কৃকলাসের ন্যায়, দন্ত কুম্ভীরের ন্যায়, শরীর ও লেজ চতুষ্পদ জীবের ন্যায়, অস্থি গ্রন্থি (Vertebra) মৎস্যের ন্যায় এবং পাখনা তিমি মৎস্যের ন্যায়।

ইংলণ্ডের লাইম রিজিস নামক স্থানে মেরি অ্যানিং নামক একটি গ্রাম্য বালিকা তৎস্থানীয় পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর কঙ্কাল আনিয়া বিক্রয় করিত। সে ১৮১১ খৃষ্টাব্দে জীব-কঙ্কাল খুজিতে খুজিতে প্রস্তরের মধ্য হইতে নির্গত এক খণ্ড অস্থি দেখিতে পায়, এবং পরীক্ষা দ্বারা ইহা একটা প্রস্তরীভূত প্রকাণ্ড জীবের দেহাবশেষ বুঝিয়া লোক দ্বারা তাহাকে স্থানান্তরিত করে। এ প্রকার প্রকাণ্ড জীব এই রূপে প্রথমে মানুষের নেত্রগোচর হইল। এই অদ্ভুত জীব প্রায় ৩০ফুট লম্বা। ইহার চোয়াল প্রায় ৬ফুট এবং চক্ষুদ্বয় এক একটা বড় রেকাবীর মত। ইহার চক্ষুদ্বয় এমনি সুন্দর অবস্থায় প্রস্তরীভূত হইয়াছিল যে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কাচ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা এমনি হিংস্রজন্তু যে নিজের জাতিকেই নিজে ভক্ষণ করিত।

দ্বিতীয় প্রকার সরীসৃপ(Plosiosaurus) আরো অদ্ভুত, ইহাও সামুদ্রিক হিংস্রজন্তু। ইহারও মস্তক কৃকলাসের ন্যায়, দন্ত কুম্ভীরের ন্যায়,কিন্তু ইহার গলা রাজহংসের গলার মত, অথচ লম্বায় অনেক বড়। ইহার পঞ্জর বহুরূপীর ন্যায়, এবং তিমি মৎস্যের পাখনার ন্যায় ইহার চারিটি পাখনা। ইহার দেহ ও লেজ হ্রস্ব বলিয়া দেখিতে ইহা অনেকটা কচ্ছপের ন্যায়। এই সরীসৃপের তুলনার দ্বারা বোধ হয় যে প্রথমোক্তটি গভীর জলবাসী ও শেষোক্তটি কূলের নিকটে থাকিত।

তৃতীয় প্রকার সরীসৃপ (Pterodactylus)কতকটা বাদুড়ের মত,কিন্তু ইহার ঠোঁট কুক্কুটের মত লম্বা, দন্ত কুম্ভীরের ওষ্ঠাগ্রের মত,অস্থি-গ্রন্থি, পঞ্জর ও পদাদি কৃকলাসের মত। ইহার শরীরে ডানা আছে অথচ পক্ষীদিগের পালক কিম্বা বাদুড়ের ন্যায় লোম ছিল না। বাদুড়দিগের ন্যায় ইহাও রাত্রিচর ও পতঙ্গভুক, কিন্তু ইহার শরীরের প্রধান প্রধান অস্থির গঠন সরীসৃপের ন্যায়। এই জন্তুর শারীরিক গঠন দেখিয়া বোধ হয় পক্ষ সত্বেও ইহা উড়িতে পারিত না। এই সকল সরীসৃপ জীবদেহ যেরূপ অবস্থায় পাওয়া যায় তাহাতে ইহারা হঠাৎ কোন বিপ্লবে বিনষ্ট হইয়াছে বোধ হয়। এই সময়কার উদ্ভিদ ইহার পূর্ব্ব অন্তর যুগের মত কেবল এক জাতীয় নূতন উদ্ভিদ (Cycad) এই যুগে প্রথম জন্মে।

ওয়োলাইট গর্ভ যুগ।

এই গর্ভ যুগের মৃত্তিকা গোল গোল দানা-বিশিষ্ট, সেই নিমিত্ত গ্রীক ভাষায় ইহা উয়োলাইট অর্থাৎ ডিম্বাকৃতি গর্ভ যুগ

অ্যাখ্যাত হইয়াছে। এই যুগের বিশেষ লক্ষণ স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব। স্তন্যপায়ী জীবের সন্তান জীবিত অবস্থায় প্রসূত হয়, অন্য প্রকার জীব অণ্ডজ। সর্ব্ব প্রথমে যে সকল স্তন্যপায়ী জীব জন্মে তাহারা এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী। এ প্রকার জীবের সন্তান প্রসূত হইয়া মাতার উদরের নিকটস্থ একটি চর্ম্মের থলিয়ায় অবস্থিতি করে এবং সেইখান হইতে স্তন পান করিয়া বড় হইলে বাহির হয়, যেমন আধুনিক কাঙ্গারু। এইরূপ স্তন্যপায়ী জীবকে মারস্যুপিয়াল জাতি (Marsupial) কহে। ওয়োলাইট গর্ভযুগে এই রূপ স্তন্যপায়ী জাতিরই জন্ম হয়। পূর্ব্ব অন্তর যুগের ন্যায় এ যুগেও শম্বুক ঝিনুক ইত্যাদি নানা প্রকার নূতন সামুদ্রিক জীব ও প্রবাল কীট জন্মে। এই যুগেও আবার ৩।৪ প্রকার প্রকাণ্ড নূতন সরীসৃপ-কঙ্কাল দেখা যায়। ইহারা অনেকটা আমাদের গাঙ্গেয় কুম্ভীরের মত। ইহার মধ্যে একটি (Ceteosaurus) পঞ্চাশ ফুট লম্বা, এই প্রকাণ্ড তিমি মৎস্যাকার সরীসৃপ দেখিয়া অধ্যাপক ফিলিপস্ বলেন যে ইহার ন্যায় বলবান ও প্রকাণ্ডকায় জীব পৃথিবীতে কখনো জন্মে নাই।

এই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় নানা প্রকার বৃহৎ আরণ্য বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল।

পূর্ব্ব গর্ভ যুগের ন্যায় এগর্ভ যুগও তিন স্তরে বিভক্ত। ওয়োলাইট যুগের চুনে প্রস্তর কি প্রকারে দানাদার হইয়াছে তাহা এখনো সম্পূর্ণরূপে স্থির হয় নাই। অনেকে বলেন যেমন এখন টেনেরীফ জগমগ্ন শৈলে এবং ইটালির ত্রিবলির জলপ্রপাতে জল ঘর্ষণ দ্বারা মৃত্তিকা দানাদার হয়, তেমনি জলের ঘর্ষণ দ্বারাই ওয়োলাইট মৃত্তিকা দানাদার হইয়াছে। কিন্তু যেখানে জলের ঘর্ষণ সম্ভাবনা নাই সেখানেও যখন ঐরূপ মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায় তখন বোধ হয়, যেমন অপরিজ্ঞাত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে স্ফাটিক পদার্থের একটি বিশেষ আকৃতি হয় ইহাও সেইরূপ একটি নিয়মের বশবর্ত্তী। এই জুরাসিক যুগ পর্য্যন্ত পৃথিবী নিয়মিত সমান রূপে শীতল হইয়া আসিতেছিল এবং এখন অবারিত বৃষ্টির প্রাচুর্য্য অনেক কম। পূর্ব্বোক্ত নানা প্রকার অদ্ভুত জন্তুই এখনকার পৃথিবীর প্রধান অধিবাসী; সমুদ্র শম্বুক বহুল এবং প্রকাণ্ড কচ্ছপে পরিপূর্ণ।

কেবল এক জাতীয় স্তন্যপায়ী জীব মাত্র এখন জন্মিয়াছে, পতঙ্গাদি জীবই শূন্যের অধিপতি, পক্ষী এখনো জন্মায় নাই। ভারতবর্ষে রাজমহল কচ্ছাদেশ শ্রীহট্ট ও ব্রহ্মদেশের কিয়দংশ এই সময় উৎপন্ন।

চাখড়ি বা ক্রিটেসস্ অন্তরযুগ

এই যুগের সমস্ত স্তরই প্রায় চাখড়ি নির্ম্মিত বলিয়া ইহার নাম চাখড়ি অন্তর যুগ। কিন্তু এই সময়েই যে প্রথম পৃথিবীতে চাখড়ি দেখাদেয় এমন নহে, সাইল্যুরিয়ান অন্তরযুগ হইতে ক্রমাগতই চাখড়ি উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু চাখড়ি স্তর সংস্থিতিই এই সময়ের একটি বিশেষ লক্ষণ বলিয়া ইহার এই নাম দেওয়া হইয়াছে।

শম্বুক জাতীয় জীবের কঠিন আচ্ছাদ-

নের উপর উষ্ণ জলের প্রাকৃতিক কার্য্য দ্বারা বহুকাল ধরিয়া সমুদ্রগর্ভে চাখড়ির স্তর জমিতেছিল। পরে কি প্রকারে এই সকল স্তর সমুদ্র-গর্ভ হইতে উন্নমিত হইয়া শৈল-শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে তাহা দেখা যাউক। এবিষয়ের যথার্থ কারণ এখনো নিশ্চিত রূপ নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে সর চারল্‌স্‌ লায়েল এবং অধ্যাপক রামজে ইংলণ্ডের চতুষ্পার্শ্বস্থ চাখড়ি পর্ব্বত উৎপত্তি সম্বন্ধে এই বলেন যে এখনকার গ্রেট ব্রিটন ও তৎ-সন্নিহিত দেশ পুরাকালের কোন এক বৃহৎ মহাদেশের মধ্য দিয়া বহমান প্রকাণ্ড নদীর জলমগ্ন বদ্বীপের অবশেষ মাত্র। জোয়ার ভাটার কার্য্য বশতঃ সমুদ্রজলের সহিত মিশ্রিত চাখড়ি, সেই নদীর মোহানায় জমিয়া জমিয়া ক্রমে বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত রূপে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ মহাদেশ য়ুরোপ নহে, উহা এক্ষণে জল-মগ্ন হইয়াছে। লায়েলের মতে উহা আ-মেরিকা কিম্বা আসিয়া অপেক্ষাও বৃহত্তর ছিল; তিনি আরো বলেন যে পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ অনেক মহাদেশ বারম্বার জলমগ্ন হইয়াছে। চাখড়ির যে পর্ব্বত গুলি স্থানে স্থানে দেখা যায় তাহা সেই মহাদে-শের চিহ্নাবশেষ মাত্র। এই সময় হইতে পৃথিবীর বর্ত্তমান আকৃতির সূত্রপাত। ফরাসী ভূবেত্তা লিকক বলেন যতই আমরা বর্ত্তমান কালের নিকট আসিতেছি ততই দেখিতে পাই যে মেরুসন্নিহিত প্রদেশে মৃত্তিকা স্তর সংস্থিতি বন্ধ হইয়া মধ্যদেশেই নূতন মৃত্তিকা সংস্থিতি দ্বারা ফুলিয়া উঠিতেছে। এখনকার শীতাতপ প্রধানতঃ পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং এখন বৎসরে ঋতুর বিভাগ আরম্ভ হইল। শীতাতপের বৈষম্য হেতু পৃথিবীর উপরি ভাগে কোটীবন্ধ প্রথম উৎপন্ন হইল। এখনকার উদ্ভিদ আমাদের বর্ত্তমান উদ্ভিদের প্রথম সোপান স্বরূপ। এ অন্তর যুগের উদ্ভিদজাতিই ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া আমাদের বর্ত্তমান উদ্ভিদ রূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এখন-কার ও তখনকার জীবজন্তুর মধ্যে সেরূপ সাদৃশ্য দেখা যায় না। তাল জাতীয় বৃক্ষ পৃথিবীতে এই প্রথম উৎপন্ন হইল এবং এই সময়ে উৎপন্ন ওক আক-রোট ও বট বৃক্ষ এখনো পৃথিবীতে বর্ত্তমান। এ সময় পর্ণীতরু খুব কমিয়া আসিয়াছিল। জন্তুর মধ্যে এখন সরীসৃপ প্রধান। এখন প্রকাণ্ড দুই জাতির সরীসৃপ দেখা যায়।

একটি, (Iguanodon) লম্বায় ৫০।৬০ ফুট এবং ইহার দেহ একটি বৃহদাকার হস্তীর ন্যায়। অপরটি ইহা অপেক্ষাও লম্বা। বৈ-জ্ঞানিকগুলীতে অনেক বাদানুবাদের পর দ্বিতীয়টি (Megalosaurus) সামুদ্রিক সরী-সৃপ বলিয়া স্থির হইয়াছিল। ইহা লম্বে প্রায় ৬০।৭০ ফুট, এবং দেখিতে কতকটা কুম্ভীরের মত।

এই সময়েই প্রথম পক্ষী দেখিতে পা-ওয়া যায়। ভারতবর্ষে নর্ম্মদা প্রদেশ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সংলগ্ন উপকূল,এই সময়ে উৎপন্ন।

ক্রমশঃ।

শীত

পাখী বলে, আমি চলিলাম;—
ফুল বলে, আমি ফুটিব না;
মলয় কহিয়া গেল শুধু,
বনে বনে আমি ছুটিব না!
কিশলয় মাথাটী না তুলে
মরিয়া পড়িয়া গেল ঝরি,
সায়াহ্ন, ধূমল-ঘন বাস
টানি দিল মুখের উপরি।
নিশীথিনী বাষ্পময় আঁখি
চোখেতে দেখিতে নাহি পায়;
হিমানীর মৃত কোলে শুয়ে
জোছনা সে আড়ষ্টের প্রায়।

পাখী কেন গেলগো চলিয়া?
কেন, ফুল, কেন সে ফুটেনা?
চপল মলয় সমীরণ
বনে বনে কেন সে ছুটেনা?
শীতের হৃদয় গেছে চোলে,
অসাড় হ'য়েছে তার মন,
ত্রিবলী-বলিত তার ভাল
কঠোর জ্ঞানের নিকেতন।
প্রেম নাই, দয়া নাই তার,
নীরস বৈরাগ্য শুধু আছে,
ফুল তার ভাল নাহি লাগে,
কবিতা নিরর্থ তার কাছে!
সে চায় বালক সমীরণ
সম্ভ্রমে দাঁড়ায়ে রবে দীন,
জোছনার হাসি-মুখ হ'তে
হাসিরাশি হইবে বিলীন।
সে কাহারো সঙ্গ নাহি চায়,
একেলা করিতে চায় বাস।
চায় সে একেলা বসি বসি
ফেলিবেক শীতল নিশ্বাস।
জোছনার যৌবনের হাসি,
ফুলের যৌবন-পরিমল,
মলয়ের বাল্যখেলা যত,
পল্লবের বালা-কোলাহল,
সকলি সে মনে করে পাপ,
মনে করে প্রকৃতির ভ্রম,
ছবির মতন ব'সে থাকা
সেই জানে জ্ঞানীর ধরম।
তাই পাখী বলে, চলিলাম;
ফুল বলে, আমি ফুটিব না;
মলয় কহিয়া গেল শুধু,
বনে বনে আমি ছুটিব না।
আশা বলে, বসন্ত আসিবে,
ফুল বলে, আমিও আসিব,
পাখী বলে, আমিও গাহিব,
চাঁদ বলে, আমিও হাসিব।

বসন্তের নবীন হৃদয়
নূতন উঠেছে আঁখি মেলে,
যাহা দেখে তাই দেখে হাসে,
যাহা পায় তাই নিয়ে খেলে।

মনে তার শত আশা জাগে,
কি যে চায় আপনি না বুঝে,
প্রাণ তার দশ দিকে ধায়
প্রাণের মানুষ খুঁজে খুঁজে।
ফুল-শিশু দেখিলে পাতায়
বসিয়া ঝুলায় তারে কোলে,
যখনি চাঁদের মুখ দেখে
তখনি হরষে যায় গোলে।
দখিনা-বাতাস বহিলেই
অমনি সে খুলে দেয় বুক,
খোলা-মন ভোলা-মন তার
মুখ দেখে দূরে যায় দুখ।
ফুল ফুটে তারো মুখ ফুটে;
পাখী গায় সেও গান গায়;
বাতাস বুকের কাছে এলে
গলা ধ'রে দুজনে খেলায়।
প্রণয়ে হৃদয় তার ভরা,
বড়ই করুণ তার মন,
কেমন সুধীরে চুম'খায়
ফুলগুলি ঘুমায় যখন!
অতি মৃদু কথাগুলি কয়,
ফুলের মাথাটি লয়ে কোলে,
চুপি চুপি কি কহে কেজানে
কানেতে স্বপন দিবে বোলে?
তাই শুনি, বসন্ত আসিবে,
ফুল বলে, আমিও আসিব;
পাখী বলে, আমিও গাহিব;
চাঁদ বলে আমিও হাসিব!

শীত তুমি হেথা কেন এলে?
উত্তরে তোমার দেশ আছে,
পাখী সেথা নাহি গাহে গান,
ফুল সেথা নাহি ফুটে গাছে।
সকলি তুষার-মরুময়,
সকলি আঁধার জনহীন,
সেথায় একেলা বসি বসি
জ্ঞানীগো কাটায়ো তব দিন!
এযে হেথা কবিতার দেশ,
হেথা কেন তব আগমন,
হেথায় যে ফুল ফুটে গাছে,
হেথায় যে বহে সমীরণ,
হেথায় সকলি অনুরাগ—
হেথায় বৈরাগ্য কিছু নাই,
তুমিগো দারুণ জ্ঞানবান—
হেথায় তোমারে নাহি চাই!

লক্ষ্মণসেন-প্রদত্ত সুন্দরবনের তাম্রশাসন।

কতিপয় বৎসর অতীত হইল সুন্দর বনের কোন এক লাটে মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের এক খানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। মার্সমান সাহেব স্বপ্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন। অল্পকাল অতীত হইল

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ঐ শাসন-পত্রের একখণ্ড ভ্রমসঙ্কুল প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছেন ১ এবং ভ্রমপ্রমাদের দায় অন্যের শিরে নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং পরিত্রাণের চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি বলেন—"আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও সে তাম্রশাসন খানি আর একবার হস্তগত করিতে পারিলাম না। মজিলপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দত্ত মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা অক্ষরে উহার একটী প্রতিলিপি আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, গ্রন্থের শেষ ভাগে তাহা অবিকল মুদ্রিত করিলাম। ত্রিবেণীর মৃত হলধর চূড়ামনি মহাশয় বিস্তর পরিশ্রম করিয়া ঐ সনন্দের লিপি পাঠ করিয়াছিলেন, তিনিও সমুদয় অক্ষর বুঝিতে পারেন নাই।"

'মিত্রোদয়' সম্পাদক বাবু হিরন্ময় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও ঐ সনন্দের কিয়দংশ প্রকাশ করিয়াছেন। ২ তিনি বলেন—"ঐ তাম্রফলকের প্রতিলিপি আমার নিকট আছে। কিন্তু তাহাতে এত ভুল যে তাহা আদ্যোপান্ত মুদ্রিত করা যায় না।"

সুতরাং ন্যায়রত্ন মহাশয় "যৎ দৃষ্টম্ তৎ প্রকাশিতম্" মাত্র করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যখন দানপত্রের প্রতিলিপি আদ্যোপান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তাহা সংশোধন করিয়া মুদ্রিত করাই উচিত ছিল। বোধ হয় একটু পরিশ্রম করিলেই তিনি তাহা সংশোধন করিতে পারিতেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের অন্তভাগে দিনাজপুরের অন্তর্গত তর্পণদীঘির সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারকালে "পরমেশ্বর পরম বৈষ্ণব পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেব" প্রদত্ত আর এক খানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই তাম্র শাসনের প্রতিলিপি (Photozincograpc.) দৃষ্টে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রকাশিত-সুন্দরবনে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের প্রতিলিপি সংশোধন করিয়া অদ্য আমরা পাঠকদিগকে উপহার অর্পণ করিলাম।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর তর্পণদীঘির তাম্রফলকের বিবরণ ও মন্তব্য প্রতিলিপির সহিত ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় এসিয়াটিক সুসাইটির জর্ণালে মুদ্রিত হইয়াছে। সুতরাং ন্যায়রত্ন মহাশয় আমাদিগের ন্যায় সুবিধা প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু অন্যান্য দুই চারিখানি প্রাচীন শাসন দর্শন করিয়া তিনি অনায়াসে যে সকল বাক্য সংশোধন করিতেন তাহাতেও হস্তক্ষেপ করেন নাই। "চট্ট ভট্টের" ৩ স্থলে

১ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। দ্বিতীয় ভাগ, ৩৭১ পৃষ্ঠা দেখ।

২ মিত্রোদয়, প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা ৩৭ পৃষ্ঠা দেখ।

৩ পাল ও সেনরাজগণের প্রায় সমস্ত শাসন-পত্রে "চট্টভট্ট" জাতির উল্লেখ আছে। দেব পালদেব-প্রদত্ত মুঙ্গেরের শাসনপত্রের অনুবাদক উইলকিন্স সাহেব 'লাস্ট, ভট্ট';—নারায়ণ পাল প্রদত্ত ভাগলপুরের তাম্রফলক হইতে শ্রদ্ধাস্পদ মিত্র মহোদয় 'চাট, ভট,'—কেশবসেন-প্রদত্ত তাম্রশাসনের পণ্ডিত গোবিন্দরাম যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন তাহাতে "চণ্ড ভণ্ড"

'চড়ভচ্ছ', "পরম বৈষ্ণব" ৪ স্থলে "পরমবীর সিংহ "পরম ভট্টারক' ৫ স্থলে—"পরম স্তম্ভাবক" ইত্যাদি ইত্যাদি শব্দ সমূহ পাঠ করিয়া আমরা সাতিশয় বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া থাকি। আমরা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি,বঙ্গীয় পুরাবৃত্ত-বিভাগে এইক্ষণে বিলক্ষণ "গোঁজামিলন" চলিতেছে; কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ন্যায় জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তিকেও অনভিজ্ঞ-জন-প্রদর্শিত মার্গাবলম্বী দর্শন করিলে স্বভাবত আমাদের হৃদয়ে আঘাত লাগে। ৬

বলা বাহুল্য যে সুন্দর বনের ও তর্পণ দীঘির তাম্রফলকদ্বয় একই নরপতির প্রদত্ত শাসনপত্র। পাঠ করিলে বোধ হয় যে একখানি দর্শন করিয়া অন্য খানি লিখিত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় সুন্দরবনের তাম্রফলক, তর্পণদীঘির তাম্রফলক অপেক্ষা পাঁচ বৎসরের জ্যেষ্ঠ। তর্পণদীঘির শাসনপত্রের অন্ত ভাগে লিখিত আছে "সং ৭ ভাদ্রদিনে ৩।" সুন্দর বনের তাম্রফলক খানি আমরা দর্শন করি নাই। হিরন্ময় বাবু লিখিয়াছেন "তাম্র শাসনীয় যে প্রতিলিপি আমার নিকট আছে তাহাতে তারিখ নাই, সুতরাং তাহা আমরা দিতে পারিলাম না।" ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রকাশিত প্রতিলিপির অন্ত ভাগে লিখিত আছে "সংহ মাঘ দিনে ১০।" বোধ হয় মৃত হলধর চূড়ামণি মহাশয় দেবনাগর '২' দুই অঙ্কটিকেই "হ" লিখিয়াছেন। ৭ অত-

শব্দ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু 'চড়ভচ্ছ' বাক্যটী কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তর্পণদীঘির তাম্রফলকের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার চতুর্থ পংক্তিতে 'চট্ট ভট্ট' শব্দটি সুন্দররূপে পাঠ করা যায়।

৪ প্রাচীনকালে রাজগণের শাসনপত্রে স্ব স্ব অবলম্বিত ধর্ম্মানুসারে পরিচয় দেওয়ার পদ্ধতি প্রচলিত থাকা প্রতীতি হয়। যথা বৌদ্ধগণ 'পরম সৌগত',—শৈবগণ 'পরম মাহেশ্বর'—সূর্য্যোপাসকগণ 'পরমাদিত্য-ভক্ত'—শাক্তগণ 'পরমভগবতীভক্ত'—বিষ্ণু উপাসকগণ—'পরমবৈষ্ণব' ইত্যাদি। লক্ষ্মণসেন বিষ্ণু উপাসক ছিলেন বলিয়াই তৎ-প্রদত্ত শাসনপত্রে পরমবৈষ্ণব লিখিত হইয়াছে।

৫ 'পরম ভট্টারক' ইহা প্রাচীন নরপতি বর্গের একটি সাধারণ উপাধি।

৬ ন্যায়রত্ন মহাশয় 'রাজমালা' সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন (বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। প্রথম ভাগ ১৬৬ পৃষ্ঠা) তৎপাঠে আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সত্য বটে, তিনি "রাজমালা" দর্শন করেন নাই। তিনি কিরূপে "রাজমালা ''অদ্যকালের" 'গদ্যগ্রন্থ লিখিলেন। হেবারেও লঙ্গ সাহেব এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিবার তাঁহার বিলক্ষণ সুযোগ ছিল। অতএবই আমাদের বোধ হইতেছে ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রচুর পরিমাণে অনুসন্ধান না করিয়াই ঐতিহাসিক লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি 'আদ্যকালে' যে কয়েকখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, রাজমালা সে সকল হইতে প্রাচীন "পদ্যগ্রন্থ।" অদ্যাপি 'রাজমালা' হইতে একাধিক প্রাচীন গ্রন্থের অস্তিত্ব ঘোষিত হয় নাই এবং ন্যায়রত্ন মহাশয় সেই সর্ব্ব প্রাচীন গ্রন্থের নাম মাত্রও উল্লেখ করেন নাই।

৭ তর্কস্থলে দেবনাগর '১, ২, ও ৩' এই তিনটী অঙ্ক হইতেই 'হ' পাঠোদ্ধার অনুমান

এব ইহা 'সংহ' হইবে। এই "সং" টি "ল সং" অর্থাৎ লক্ষ্মণাব্দে। মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেব যে একটি অব্দ প্রচলিত করিয়াগিয়াছেন ইহা বোধ হয় পাঠক-বর্গ জ্ঞাত আছেন। ঐ অব্দ "ল সং" আখ্যা দ্বারা অদ্যাপি মিথিলা প্রদেশে প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ৭৭২ লক্ষ্মণাব্দ চলিতেছে। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন দেব ১০৩০ শকাব্দে (১১০৮ খৃঃ অঃ, ৫১৫ বঙ্গাব্দে) পৈতৃক আসন অধিকার করিয়া অব্দ প্রচলিত করেন। অনুমিত হইয়াছে যে সুন্দরবনের শাসনপত্র ২ লক্ষ্মণাব্দের (১০৩১ শকাব্দে) ১০ই মাঘ ও তর্পণদীঘির শাসনপত্র ৭ লক্ষ্মণাব্দের (১০৩৬ শকাব্দে) ৩ রা ভাদ্র তারিখে অঙ্কিত হইয়াছিল।

সুন্দরবনে প্রাপ্ত শাসনপত্র দ্বারা মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেব "খাড়ীমণ্ডলিকার অন্তর্গত তিন দ্রোণ ভূমি কৃষ্ণধর দেবশর্ম্মাকে দান করেন। ইহার বার্ষিক কর পঞ্চাশৎ পুরাণ (৫০ কাহন কড়ি) ধার্য্য হইয়াছিল। প্রদত্ত ভূমির চতুঃসীমা এইরূপ লিখিত হইয়াছে—পূর্ব্ব সীমা প্রভাসের ভূমি, দক্ষিণ সীমা চিতাড়ি খাতার্দ্ধ, পশ্চিম সীমা রামদেবের ভূমি, উত্তর সীমা বিষ্ণুপাণি গড়োলী ও কেশব গড়োলীর ভূমি। ৮

তর্পণ দীঘির তাম্রফলক দ্বারা মহারাজ লক্ষ্মণসেন "বিলুহিষ্টী" গ্রামের কিয়দংশ ভূমি—ভরদ্বাজ গোত্রজ হুতাশন দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, মার্কণ্ডেয় দেবশর্ম্মার পৌত্র ও লক্ষ্মীধর দেবশর্ম্মার পুত্র শ্রীঈশ্বর দেব শর্ম্মাকে দান করেন। "বিলুহিষ্টী" সম্ভবত এইক্ষণ "বেলহাটি" আখ্যা ধারণ করিয়া থাকিবে। এইস্থানটি দিনাজপুর অঞ্চলে। সেই প্রদেশবাসী কোন মহাত্মা এই প্রাচীন পল্লীর অনুসন্ধান করিলে আমরা পরম প্রীত হইব।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের লিখিত বিবরণ পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে শাসনপত্রের শীর্ষ দেশে স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র তাম্রফলকে উৎকীর্ণ একটি দেবীমূর্ত্তি কীলক দ্বারা সম্বদ্ধ আছে। তর্পণদীঘির তাম্রশাসনের শিরোপরিও তদ্রূপ একখানি ক্ষুদ্র তাম্রপত্রে দেবী দশভুজার মূর্ত্তি ক্ষোদিত। দুঃখের বিষয় সুন্দর বনের তাম্রফলক আমরা একবার দর্শন করিতে পারিলাম না। বোধ হয় সেই "দেবী" ও দাক্ষায়ণীই হইবেন।

শাসনের প্রতিলিপি।

ওঁ নমোনারায়ণায়।

বিদ্যুদ্যত্র মণিদ্যুতিঃ ফণিপতের্ব্বালে-

করা যাইতে পারে; কিন্তু '২' অঙ্কটিই অধিক সঙ্গত বোধ হইতেছে।

৮ হিরণ্ময় বাবু বলেন।"খাড়ীমণ্ডলিকা, এইক্ষণ শাখা বিভাগ ডায়মণ্ড হারবারের অন্তর্গত একটি পরগণা। চিতাড়ি খালও এইক্ষণ তথায় ঐ নামে চলিয়া আসিতেছে। প্রভাস ও রামদেবের ভূমির বা তাহাদিগের বংশাবলির এইক্ষণ কোনও নিরাকরণ হয় না; সেইরূপ বিষ্ণুপাণি ও কেশব গড়োলীর ভূমিরও নির্ণয় করা যাইতে পারে না।

স্ফুরি ন্দ্রায়ুধং বারি স্বর্গতরঙ্গিণী সিতশিরো-মালাবলাকাবলিঃ। ধ্যানাভ্যাসসমীরণোপনিহিতঃ শ্রেয়ো স্কুরোত্ত্বতয়ে ভুয়াদ্বঃ সভবার্ত্তিতাপভিদুরঃ শম্ভোঃ কপর্দ্দাম্বুদঃ॥ ১

আনন্দোম্বুনিধৌ চকোরনিকরে দুঃখচ্ছিদাত্যন্তিকী কহ্লারেহতমোহতোরতিপতাবেকোহমেবেতিধীঃ। যস্যামী অমৃতাত্মনঃ সম্ভুদয়স্ত্যাশুপ্রকাশাজ্জগত্যস্রেধ্যানপরম্পরাপরিণতং জ্যোতিস্তদাস্তাম্বুদে॥ ২

সেবাবনম্রনৃপকোটিকিরীটরোচিরম্বুল্লসত পদনখদ্যুতিবল্লরীভিঃ। তেজোবিবজুরমুষো দ্বিবতামভূবন্ ভূমীভুজঃস্ফুটমথোষধিনাথবংশে॥ ৩॥ ৯

আকৌমারবিকস্বরৈর্দ্দিশি দিশি প্রসান্দিভির্দ্দোর্যশঃপ্রালেয়ৈররিরাজবক্ত্রনলিনম্লানীঃ সমুন্মীলয়ন্। হেমন্তঃ স্ফুটমেব সেনজননক্ষেত্রৌঘপুণ্যাবলী শালিশ্লাঘ্যবিপাকপীবরগুণস্তেষামভূদ্বংশজঃ॥৪॥

যদীয়ৈরদ্যাপি প্রচিতভুজতেজঃ সহচরৈর্যশোভিঃ শোভন্তে পরি ১০ ধি পরিণদ্ধা ইব দিশঃ। ততঃ কাঞ্চীলীলাচতুরচতুরম্ভোধিলহরী পরীতোর্ব্বীভর্ত্তাজনিবিজয়সেনঃ স বিজয়ী॥ ৫॥

প্রত্যহঃ কলিসম্পদামনলসোবেদায় নৈকাধ্বগঃ সঙ্গ্রামঃ শ্রিতজঙ্গমাকৃতিরভূদ্বল্লালসেন স্তুতঃ। যশ্চেতোময়মেব শৌর্যাবিজয়ী দস্তোষধং তৎক্ষণাদক্ষীণা রচয়াংচকার বশগাঃ স্বস্মিন পরেষাং শ্রিয়ঃ॥ ৬॥

সংভুক্তানাদিগঙ্গনাগণগুণাভোগপ্রলোভাদ্দিশা মীশৈরংশসমর্পণেন ঘটিতস্তস্তৎ প্রভাব স্ফুটৈঃ। দোরুষ্মক্ষপিতারিসঙ্গররসোরাজন্যধর্ম্মাশ্রয়ঃ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনভূপতিরতঃ সৌজন্যসীমাজনি॥ ৭॥

শশ্বদ্বন্দ্বভয়াদ্বিমুক্তবিষয়াস্তস্মাত্ত্রনিষ্ঠীকৃত স্বাস্থা যাস্তু কথং ন নাম রিপবস্তস্য প্রয়োগাল্লয়ম। যৈরাত্মপ্রতিবিম্বিতেপি নিপতপ (বাথ) ত্রেপিচক্রন্তৃণে যাস্বৈস্তেন যতস্ততোপিস পরো দেবঃ পরংবীক্ষতে॥ ৮॥ ১১

কিন্তু শুনিয়াছি গড়োলীদিগের বংশাবলী এইক্ষণও তৎপ্রদেশে বাস করিতেছে।

৯ তৃতীয় শ্লোকের প্রথম পংক্তির ল্ল ও দ্বিতীয় পংক্তির থো,এই দুইটী অক্ষর তাম্রফলকে সমভাবে ঊর্দ্ধ ও নিম্নে (যথা ল্লথো) অবস্থিত। মূর্খ শিল্পী ভ্রমক্রমে "ল্ল" এর 'ল' ফলাটি "ল" হইতে পৃথক করিয়া 'থো' এর মস্তকে স্থাপন করিয়াছে। বোধ হয় এই সামান্য ভ্রম অনুভব করিতে না পারিয়া স্বর্গগত চূড়ামণি মহাশয় "থো" এর পরিবর্ত্তে "থৌ"—তদনুসারে "ঔষধনাথ বংশ" পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ 'ধি' এর "ি" টিও বিসর্জ্জন করা হইয়াছে। সুতরাং ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রকাশিত প্রতিলিপিতে 'ওষধিনাথ' এর পরিবর্ত্তে 'ঔষধনাথ' মুদ্রিত হইয়াছে।

যে সকল উদ্ভিদ ফল পাকিলেই মরিয়া যায় তাহাদিগকে "ওষধি" বলা যায়, যথা ধান্য। ওষধি সকল চন্দ্রকিরণে বর্দ্ধিত হয় বলিয়া, চন্দ্র 'ওষধীশ' "ওষধিপতি" ও— "ওষধিনাথ" প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেনরাজগণ, আপনাদিগকে চন্দ্রবংশোৎপন্ন বলিয়া লিখিয়াছেন। (বাবিন্দার প্রস্তর ফলক, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোক, লক্ষ্মণ সেনের উভয় তাম্রফলক তৃতীয় শ্লোক কেশব সেনের শাসনপত্রে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোক দেখ।)

১০ "রি" অক্ষরটী অনুমানসিদ্ধ।

১১ বোধ হয় ৮ চূড়ামণি মহাশয় বু-

সখলু শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয় স্কন্ধাবারত ১২ মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লালসেন দেব পাদানুধ্যাত পরমেশ্বর পরম বৈষ্ণব পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেব কুশলী ; * * সমুপগতাশেষ রাজরাজন্যক রাজ্ঞী রাণক রাজপুত্র রাজামাত্য পুরোহিত মহাধর্ম্মাধক্ষ্য মহাসান্ধি বিগ্রহিক মহাসেনাপতি মহামুদ্রাধিকৃত আন্তরঙ্গ বৃহদুপরিক মহাক্ষপটলিক মহাপ্রতীহার মহাভোগিক মহাপীলুপতি মহাগণস্কদোস্সাধিক (মহাদোঃসাধ সাধনিক) চৌরোদ্ধরণিক নৌবল হস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকাদিব্যাপৃতক গৌল্মিক দণ্ডপাশিক দণ্ডনায়ক বিষয় পত্যাদীন্ বন্যাংশ্চ সকল রাজপাদোপজীবিনোধ্যক্ষপ্রচারোক্তানিহাকীর্ত্তিতান চট্ট ভট্ট জাতীয়ান্ জনপদান ক্ষেত্রকারশ্চ ব্রাহ্মণান ব্রাহ্মণোত্তরান যথার্হমানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ মতমস্তু ভবতাং। যথা শ্রীপৌণ্ড্ বর্দ্ধনভুক্ত্যান্তঃপাতিখাড়ী মণ্ডলিকান্ত(ন্তঃ)ল্লপুর চতুরকে পূর্ব্বে শান্ত শাবিক প্রভাস শাসনং সীমা—দক্ষিণে চিতাড়ি খাতার্দ্ধং সীমা—পশ্চিমে শান্ত শাবিক রামদেব শাসন পূর্ব্ব পার্শ্বঃ সীমা—উত্তরে শান্ত শাবিক বিষ্ণুপানি গড়োলী কেশব গড়োলী ভূমী সীমা—ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন শ্রীমদ্বৃষভশঙ্কর? শ্রীমদ্গ্রমাধব পাদীয়স্তম্ভাঙ্কিত দ্বাদশাঙ্গুলাধিক হস্তেন দ্বাত্রিংশদ্ধস্ত পরিমিতা ন্মানেনাধস্তয়া সার্দ্ধ কাকিনী দ্বয়াধিক ত্রয়োবিংশত্যান্মানোত্তর খাবকক (কাকবক) সমেত ভূদ্রোণাত্রয়াত্মকঃ ১৩ সংবৎসরেণ পঞ্চাশৎ পুরাণোপত্তিকঃ সবাস্তুচিহ্নঃ মণ্ডলগ্রামীয়ঃ কিয়ানপি ভূভাগঃ সমাট বিটপঃ সজলস্থলঃ সগর্ত্তোষরঃ সগুবাক নারিকেলঃ সহ্য শাপরাধঃ পরিহৃতসর্ব্ব পীড়োঽ চট্টভট্টপ্রবেশোঽকিঞ্চিৎ প্রাগ্রহ্যাস্তৃণ পুতি গোচর পর্য্যন্তঃ জগদ্ধর দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় নারায়ণধর দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় নরসিংহধর দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় গার্গ সগোত্রায় আঙ্গিরস বার্হস্পত্য শিন গর্গভরদ্বাজ প্রবরায় ঋগ্বেদাশ্বলায়ন শাখাধ্যায়িনে শান্ত্য শাবিক শ্রীকৃষ্ণধর দেবশর্ম্মণে পুণোঽ-

---

ঝিতে না পারিয়া অষ্টম শ্লোকটী এককালে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তাম্রফলক দর্শন না করিয়া ইহা নিশ্চয় রূপে বলা যাইতে পারে না।

১২ পৌণ্ড্র বর্দ্ধন, পাল রাজগণের রাজধানী ছিল ; কিন্তু প্রায়ই পাল রাজগণ মুদ্গগিরিতে, ও সেনরাজগণ বিক্রমপুরে বাস করিতেন। কলিকাতা ব্রিটীস ভারতের রাজধানী, কিন্তু শাসনকর্ত্তা প্রতি বৎসর আট মাস শিমলাশৈল-শৃঙ্গে বাস করেন। শিমলা হইতে কোন আদেশ-পত্র প্রচারিত হইলে, তাহাতে "শিবির শিমলা" (Camp Simla) অঙ্কিত থাকে। তদ্রূপ পাল গৌড়েশ্বরদিগের শাসনপত্রে "বিজয়ী শিবির মুদগগিরি (শ্রীমুদ্গগিরি সমাবাসিত শ্রীমজ্জয় স্কন্ধাবারত—) ও সেন রাজগণের সনন্দ পত্রে "বিজয়ী শিবির বিক্রমপুর" অঙ্কিত রহিয়াছে। মৃত চূড়ামণি মহাশয় এই সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত ছিলেন না বলিয়াই, তিনি এস্থলে "শ্রীমজ্জয়স্কন্ধবীরমহা রাজাধি রাজ—" পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। সুতরাং ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

১৩ চট্টগ্রামের পুরাতত্ত্ব। (ভারতী, চতুর্থ ভাগ, ৩০৩ পৃষ্ঠা।) দেখ।

হনি বিধিবদুদকপূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্না-রায়ণ ভট্টারকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্ম-নশ্চ পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে দত্তহেমাশ্বরথ মহাদানে দক্ষিণাত্বেনোৎসৃজ্য আচন্দ্রার্ক ক্ষিতি সমকালং যাবৎ ভূমি চ্ছিদ্র ন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ॥ তস্ত বদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যম। ভাবিভিরপি নৃপতিভিরপহরণে নরকপাতভয়াৎ পালনে ধর্ম্মগৌরবাৎ পালনীয়ম। ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মা-নুশাসন শ্লোকাঃ।

বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ। যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং॥ ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চভূমিং প্রযচ্ছতি। উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মানৌ নিয়তং স্বর্গ গা-মিনৌ॥

স্বদত্তাং পরদত্তাম্বা যো হরেত বসুংধরাং। সবিষ্ঠায়াঃ কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥ ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য জীবিতঞ্চ। সকল মিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়োবিলোপ্যা॥

শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেনোক্ষৌণীভানুসান্ধিবিগ্র-হিকম ১৪ * * শাসনীকৃতং। সং ২ মাঘ দিনে ১০।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

ভৌতিক-বিজ্ঞানের মূল-পত্তন।

জ্যামিতির নূতন সংস্করণ নামক একটি প্রস্তাব যাহা ইতি পূর্ব্বে ভারতীতে বাহির হইয়াছিল তাহাতে একটি নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিবার কথা ছিল; কি? না ইউক্লিড শুদ্ধ কেবল অতীন্দ্রিয় আকাশ খণ্ডের আয়তনাদিকেই আপনার জ্যামি-তির মধ্যে আমল দিয়াছিলেন, আমরা তাহাতে বদ্ধ না থাকিয়া ইন্দ্রিয়-গোচর ভৌতিক বস্তু এবং অতীন্দ্রিয় আকাশ উভয়কে (আয়তন-সম্বন্ধে) অভেদ দৃষ্টিতে দেখিয়াছি; তাহারই গুণে আমরা ইউক্লি-ডের কয়েকটি মূল-গত দোষ হইতে রক্ষা পাইতে পারিয়াছি; সে দোষ-গুলি অনে-কেই জানেন কিন্তু অল্প লোকেই তাহার প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন,—যাঁহারা চেষ্টা পাইয়াছেন তাঁহারা আশা-নুরূপ ফলে বঞ্চিত হইয়াছেন। আমরা এতাবৎকাল ইউক্লিডের দোষ গুলি এড়া-ইতে পারাকেই যথেষ্ট মনে করিয়া সন্তুষ্ট ছিলাম, আর ঐ দোষ-গুলির সংশোধন কার্য্যেই আমাদের নূতন প্রণালীটীকে উৎসর্গ করিয়াছিলাম, বেশী কিছু করি নাই; এখন দেখিতেছি যে নূতন প্রণালী-

---

১৪ লক্ষ্মণাব্দে নারায়ণ দত্ত সান্ধি বি-গ্রহিক ছিলেন। তর্পণ দীঘির তাম্র শাসন দেখ।

টিকে রীতিমত খাটাইলে জ্যামিতি চর্চ্চার সহজ অথচ সুবিচার সঙ্গত নূতন একটি পথ উদ্ঘাটিত হইতে পারে। এখন আমরা এইরূপ সংকল্প করিয়াছি যে (Physical science) ভৌতিক বিদ্যার মূল-তত্ত্ব গুলি, এবং যে সকল অকাট্য তত্ত্ব উহা হইতে সহজে নিষ্কর্ষণ করিয়া পাওয়া যাইতে পারে সেইগুলি, একে একে যথাক্রমে বিবৃত করি। এবার যে আমাদের প্রসঙ্গ শুদ্ধ কেবল জ্যামিতিতেই বদ্ধ নহে তাহা বর্ত্তমান প্রস্তাবের নামেতেই সপ্রকাশ—কার্য্যতঃ প্রকাশ পাইবে যে জ্যামিতি ভৌতিক বিজ্ঞানেরই অঙ্গ-বিশেষ।

আমরা পূর্ব্ব-প্রকাশিতের সংজ্ঞাদির কিয়দংশ পুনরুল্লেখ করিতে অগত্যা বাধ্য হইলাম কিন্তু সে গুলির আকার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমার্জ্জিত করা হইল।

সংজ্ঞা ॥

(১) রেণু ও বিন্দু।

১।১ ॥ যে বস্তুর আয়তন প্রত্যক্ষ-গম্য অথচ এত অল্প যে, তাহা-অপেক্ষা অল্পায়ত বস্তু আমাদের প্রত্যক্ষের গ্রাহ্য নহে তাহা রেণু বলিয়া উক্ত হয়।

১।২ ॥ রেণু কর্ত্তৃক যে-টুকু আকাশ পূরিত হইতে পারে, তাহা বিন্দু বলিয়া উক্ত হয়। আয়তন-বিষয়ে রেণু ও বিন্দুর একের সম্বন্ধে যাহা কিছু স্থির হইবে অন্যের সম্বন্ধে তাহাই খাটিবে।

১।৩ ॥ যে রেণু-কর্ত্তৃক যে আকাশ-টুকু পূরিত হয় তাহা সেই রেণুর স্থান বলিয়া উক্ত হয়।

১।৪ ॥ যে কোন বস্তুর কোন অংশ-বিশেষ স্বতন্ত্র রূপে, অর্থাৎ অপরাংশ হইতে পৃথক্ রূপে, প্রত্যক্ষ-গোচর হইতে পারে, তাহা আয়ত বস্তু বলিয়া উক্ত হয়। (১।১ অনুসারে) রেণুর কোন অংশই স্বতন্ত্র-রূপে প্রত্যক্ষ-গম্য নহে অতএব রেণু অনায়ত বস্তু বলিয়া ধর্ত্তব্য।

মন্তব্য। রেণুর যে বাস্তবিক কোন অংশ নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষাতীত হওয়াতে তাহা জ্যামিতির কোন ব্যবহারে আসিতে পারে না। জ্যামিতির কাছে প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য বস্তুই বস্তু, প্রত্যক্ষের অতীত বস্তু বস্তু নহে; এজন্য জ্যামিতির কাছে রেণুর অংশ অংশই নহে সুতরাং রেণু অনায়ত বস্তু।

১।৫ ॥ যে বস্তু বহুরেণুর সমষ্টি তাহা আয়ত বস্তু বলিয়া উক্ত হয়।

১।৬ ॥ আয়ত বস্তু-দ্বয়ের একটি যদি আর একটির অংশ-বিশেষ হয় তবে পূর্ব্বোক্ত বস্তু শেষোক্ত বস্তুর খণ্ড বলিয়া উক্ত হয়।

১।৭ ॥ যে রেণু যে বস্তুর অংশ, সেই রেণু সেই বস্তুর রেণু বলিয়া উক্ত হয়।

(২) ধারা ও রেখা।

২।১ ॥ যে আয়ত বস্তুর প্রত্যেক খণ্ডের প্রান্ত-রেণু সেই খণ্ডের একটি মাত্র রেণুকে স্পর্শ করিয়া রহে, তদ্ভিন্ন সে খণ্ডের দ্বিতীয় কোন রেণুকে স্পর্শ করে না তাহা ধারা বলিয়া উক্ত হয়। যথা

খ ঘগ
ক————————চ এই বস্তুর যে কোন খণ্ডের—যেমন কগ খণ্ডের—প্রান্ত

রেণু ক উক্ত খণ্ডের একটি মাত্র রেণু খ-কে স্পর্শ করিয়া আছে এবং ঐ খণ্ডের অপর প্রান্ত-রেণু গ উক্ত খণ্ডের একটি মাত্র রেণু ঘ-কে স্পর্শ করিয়া আছে, তাই কচ বস্তু ধারা শব্দের বাচ্য।

২।২॥ ধারা কর্ত্তৃক যতখানি আকাশ পূরিত হইতে পারে তাহা রেখা বলিয়া উক্ত হয়। আয়তন-বিষয়ে ধারা এবং রেখার একের সম্বন্ধে যাহা কিছু স্থির হইবে অন্যের সম্বন্ধে অবিকল তাহাই খাটিবে।

২।৩॥ যতখানি আকাশ যে ধারা কর্ত্তৃক পূরিত হয় তাহা সেই ধারার রেখাঙ্ক বলিয়া উক্ত হয়।

২।৪॥ যে কোন ধাধার যে কোন প্রান্ত সেই ধারার প্রথম রেণু বলিয়া গৃহীত হইবে তাহার উত্তরোত্তরবর্ত্তী রেণু পরম্পরা যথা ক্রমে দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি উত্তরোত্তর স্থানীয় রেণু বলিয়া গণ্য হইবে; আর, কোন একটি ধারার প্রথম রেণু দ্বিতীয় কোন একটি ধারার প্রান্ত-রেণুকে স্পর্শ করিলে শেষোক্ত প্রান্ত-রেণু দ্বিতীয় ধারার প্রথম রেণু বলিয়া গণ্য হইবে। দুই ধারার প্রথম রেণুদ্বয় কিংবা প্রথম রেণুদ্বয়ের সমোত্তরবর্ত্তী দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি রেণুদ্বয় উভয়ের সমস্থানীয় রেণুদ্বয় বলিয়া উক্ত হইবে।

২।৫॥ কোন ধারার বা তাহার কোন খণ্ডের প্রত্যেক রেণু যদি অপর কোন ধারার সমস্থানীয় রেণুকে স্পর্শ করিয়া রহে তবে ধারা-দ্বয় পরস্পরের গাত্র-সাৎ বলিয়া উক্ত হয়।

২।৬॥ বহু ধারা-বিশিষ্ট বস্তু যদি এরূপ হয় যে তাহার যে কোন ধারা হউক্ তাহা ঐ বস্তুর আর কোন না কোন ধারার গাত্র-সাৎ হইয়া রহিয়াছে তবে সে বস্তু বিস্তৃত বলিয়া উক্ত হয়।

মন্তব্য। বর্ত্তমান সংজ্ঞা এবং ১।৫ সংজ্ঞা দুয়ের যোগে দাঁড়াইতেছে যে, বিস্তৃত বস্তু মাত্রই আয়ত কিন্তু আয়ত বস্তু বিস্তৃত না-ও হইতে পারে।

২।৭॥ যে বস্তুর যে-কোন খণ্ড বিস্তৃত সেই বস্তুর সেই খণ্ড বিস্তৃত খণ্ড বলিয়া উক্ত হয়।

২।৮॥ যে ধারার প্রান্তবর্ত্তী রেণু-স্থান-দ্বয়ের মধ্যে উহার একটি বই আর রেখাঙ্ক সম্ভবে না তাহা এবং তাহার প্রত্যেক খণ্ড শলাকা বলিয়া উক্ত হয়।

২।৯॥ দুই বিন্দুর প্রান্তবর্ত্তী সরল-রেখা ব্যবধান বা সরল-রেখাংশ-ব্যবধান দূরত্ব বলিয়া উক্ত হয়। দুই বিন্দুর অন্যূন-মাত্রা দূরত্ব বিদূরত্ব বলিয়া উক্ত হয়।

মন্তব্য॥ এক বিন্দু পরিমাণ ব্যবধানও দূরত্ব; কেন না বিন্দু সরল রেখা না হউক্, তাহা সরল-রেখাংশ তাহাতে আর সংশয় নাই, কেননা তাহা হইতে যে কোন সরল রেখা আকাশে প্রসারিত রহিয়াছে তাহারি তাহা অংশ-বিশেষ।

২।১০॥ দুই বিন্দুর-বর্ত্তী রেণুর মধ্যে শলাকা স্থিতি করিলে, ঐ দুই বিন্দু ঐ শলাকা দ্বারা সংযুক্ত বলিয়া উক্ত হয়।

(৩) ক্ষেত্র ও তল।

৩।১॥ বিস্তৃত বস্তুর প্রত্যেক বিস্তৃত

খণ্ডের সীমা-স্থানীয় ধারা-মাত্রই যদি সেই খণ্ডের দ্বিতীয় একটি-মাত্র ধারার গাত্র-সাৎ হইয়া রহে, তদ্ব্যতীত সে খণ্ডের আর কোন ধারার গাত্রসাৎ হইয়া না রহে তবে সেই বিস্তৃত বস্তু এবং তাহার প্রত্যেক বিস্তৃত খণ্ড ক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হয়। যথা,—

এই কাগজের যে কোন খণ্ড গ্রহণ কর না কেন, তাহার সীমাস্থানীয় সাদা ধারার পার্শ্ব ঘেঁসিয়া বরাবর যদি একটা কালো ধারা টানা যায় তবে সেই সাদা ধারাটি ঐ কালো ধারাটি ভিন্ন সে খণ্ডের আর কোন ধারার গাত্রসাৎ হইয়া থাকিবে না, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে; অতএব বর্ত্ত-মান সংজ্ঞা অনুসারে এই কাগজ একটি ক্ষেত্র।

৩। ২॥ ক্ষেত্র-কর্ত্তৃক যতখানি আকাশ পূরিত হইতে পারে তাহা তল বলিয়া উক্ত হয়। আয়তন-বিষয়ে ক্ষেত্র এবং তলের একের সম্বন্ধে যাহা স্থির হইবে অন্যের সম্বন্ধে তাহা খাটিবে।

৩। ৩॥ যে কোন ধারা যে কোন ক্ষে-ত্রের সীমা প্রদেশস্থিত অথবা সীমাভ্যন্তর-স্থিত তাহা সেই ক্ষেত্রের ধারা বলিয়া উক্ত হয়।

৩। ৪॥ যে ক্ষেত্রের পরস্পর বিদূরবর্ত্তী রেণুদ্বয় মাত্রই সেই ক্ষেত্রের শলাকা-দ্বারা সংযুক্ত তাহা সমতল ক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হয়। সমতল ক্ষেত্র কর্ত্তৃক পূরণ-যোগ্য আকাশ-স্থান সমতল বলিয়া উক্ত হয়।

৩। ৫॥ দুই সমতল-ক্ষেত্রের প্রত্যে-কের প্রত্যেক ধারা যদি অপরটির কোন না কোন ধারার গাত্রসাৎ হইয়া অব-স্থিতি করে তবে ক্ষেত্রদ্বয় পরস্পরের গাত্রসাৎ বলিয়া উক্ত হইবে এবং একটি আর-একটির পৃষ্ঠ-ক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হইবে, ও একটির তলাঙ্ক আর একটির পৃষ্ঠতল বা পৃষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইবে।

মন্তব্য॥ এখনকার মত এইরূপ ধার্য্য করা যাইতেছে যে, যে-কোন বস্তুর কথা উল্লেখ করা যাইবে—মনে করিতে হইবে তাহা একটি নির্দ্দিষ্ট সমতল ক্ষেত্রের নির্দ্দিষ্ট পৃষ্ঠে অবস্থিতি বা চলাচলি করিতেছে; মনে কর যেন এই কাগজটি সেই সমতল ক্ষেত্র, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে, যে কোন বস্তুর কথা বলা যাইতেছে তাহা এই কাগজের এ পৃষ্ঠেই হউক কিংবা ও-পৃষ্ঠেই হউক, একটি নির্দ্দিষ্ট পৃষ্ঠে স্থিতি করিতেছে বা চলাচলি করিতেছে।

(৪) পিণ্ড এবং পিণ্ডাকাশ।

যে বস্তুর সীমা স্থানীয় কোন রেণু স্থান-চ্যুত না হইলে তাহার সীমাভ্যন্তরস্থিত কোন রেণু বহির্ব্বস্তুর স্পর্শ-গম্য হয় না, তাহা পিণ্ড বলিয়া উক্ত হয়। যে পিণ্ড যে আকাশ-স্থান পূরণ করে তাহা সেইপিণ্ডা-কাশ বলিয়া উক্ত হয়। পিণ্ড কর্ত্তৃক অব-চ্ছেদ্য আকাশ খণ্ডাকাশ বলিয়া উক্ত হয়।

(৫) যুক্ত ধারা।

৫।১ ॥ দুই ধারার দুই প্রান্ত যদি পরস্পর স্পর্শ করিয়া রহে এবং একটির সর্ব্বাংশের বা খণ্ডাংশের অন্য কোন রেণু অন্যটির সর্ব্বাংশের বা খণ্ডাংশের অন্য কোন রেণুকে স্পর্শ না করে, তবে উক্ত ধারা-দ্বয় পরস্পর হইতে অথবা উভয়ের সন্ধিস্থল হইতে বিকীর্ণ বলিয়া উক্ত হয়।

৫।২ ॥ সমতল ক্ষেত্র-পৃষ্ঠে যদি ধারাগণ এরূপ গায়ে গায়ে মিলিয়া থাকে যে, প্রত্যেকেই তাহার পার্শ্বস্থ ধারার গাত্রসাৎ হইয়া আছে, তবে উক্ত ধারা-গণ সংস্তীর্ণ ধারা বলিয়া উক্ত হয়।

৫।৩ সংস্তীর্ণ ধারা-গণের মধ্যে যে কোন ধারা-দ্বয় পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া রহে তাহারা নিরন্তরাল ধারা বলিয়া উক্ত হয়, তদ্ব্যতীত উহাদের ভিতরকার অন্যান্য ধারা-দ্বয় সমান্তরাল ধারা বলিয়া উক্ত হয়।

(মন্তব্য) সমান্তরাল ধারা-দ্বয়ের কথা হইলেই সামান্যতঃ এইরূপ মনে করা যাইবে যে, উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সংস্তীর্ণ ধারা বা ধারা-সমষ্টির পরিবর্ত্তে তাহাদের রেখাঙ্ক মাত্র রহিয়াছে; স্থল-বিশেষে আবশ্যক হইলে ঐ রেখাঙ্কগণের যত-গুলিকে হউক ধারা দ্বারা পূরিত মনে করা যাইতে পারে।

৫।৪ ॥ বিকীর্ণ বা সমান্তরাল ধারা-দ্বয়ের একটির যে কোন রেণু হইতে আর একটির যে কোন রেণু পর্য্যন্ত শলকা প্রসারিত হয় তাহা উক্ত ধারাদ্বয়ের যোজক শলাকা বলিয়া উক্ত হয়।

৫।৫ ॥ কোন সমতলবর্ত্তী বিকীর্ণ বা সমান্তরাল ধারা-দ্বয় মাত্রেরই যোজক শলাকা উক্ত ধারা-দ্বয়ের যে দুই পৃষ্ঠ স্পর্শ করে, সে দুই পৃষ্ঠ উক্ত ধারা দ্বয়ের সম্মুখীন পৃষ্ঠ বলিয়া উক্ত হয়।

৫।৬ ॥ বিকীর্ণ ধারা-দ্বয়ের সম্মুখীন পৃষ্ঠ-দ্বয়ের পরস্পরের বিচ্ছেদকে কোণ কহে; সুতরাং উক্ত বিচ্ছেদের ন্যূনাধিক্যে কোণের ন্যূনাধিক্য হয়।

মন্তব্য। বিকীর্ণ ধারা-দ্বয়ের সম্মুখীন পৃষ্ঠ-দ্বয়ের বিপরীত পৃষ্ঠ-দ্বয়ের বিচ্ছেদকেও যে, এক হিসাবে কোণ বলিতে পারা যায়, তাহা যুক্তি দ্বারা প্রমাণী-কৃত হইতে পারে, এজন্য তাহাকে সংজ্ঞার মধ্যে স্থান দেওয়া হইল না।

৫।৭ ॥ কোণ-কারী বিকীর্ণ ধারা-দ্বয় কোণের ভুজ-দ্বয় বলিয়া উক্ত হয় এবং উভয়ের সন্ধি-স্থানীয় রেণু কোণের মুখ বলিয়া উক্ত হয়।

৫।৮ ॥ শলাকা-দ্বয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী কোণ ঋজু-ধার কোণ বলিয়া উক্ত হয়।

মন্তব্য। যদি কোন কোণের মুখ হইতে একটি ধারা প্রসারিত হইয়া উহার দুই ভুজের সহ-যোগে দুইটি কোণ উৎপাদন করে, তবে শেষোক্ত কোণ-দ্বয় পূর্ব্বোক্ত কোণের অংশ-দ্বয় বলিয়া ধর্ত্তব্য, কেন না পূর্ব্বোক্ত কোণ শেষোক্ত কোণ-দ্বয়ের সমষ্টি। (৩৫ সংজ্ঞার মন্তব্য দেখ)।

৫।৯ ॥ যে কোণের ভুজ-দ্বয়ের যোজক শলাকা মাত্রই সেই ভুজ-দ্বয়ের গাত্র-সাৎ হইয়া যায়, তাহা সমসূত্র কোণ বলিয়া উক্ত

হয়, সমসূত্র-কোণের অর্দ্ধাংশ মধ্যম কোণ বলিয়া উক্ত হয়*; সমসূত্র কোণের ছোটো ও মধ্যম কোণের বড় ঋজুধার কোণ ব্যায়ত কোণ বলিয়া উক্ত হয়, এবং মধ্যম কোণ অপেক্ষা ছোটো ঋজুধার কোণ তীক্ষ্ণ কোণ বলিয়া উক্ত হয়।

৫।১০॥ সমধার কোণ মাত্রেরই ভুজ-দ্বয় কোণ-মুখ হইতে দুই বিভিন্ন দিকে প্রসারিত বলিয়া উক্ত হয়।

৫।১১॥ সমসূত্র কোণের ভুজ-দ্বয় কোণ-মুখ হইতে দুই বিপরীত দিকে প্রসারিত বলিয়া উক্ত হয়, ও কোণ-মুখেতর প্রান্ত-দ্বয় হইতে কোণ মুখ পর্য্যন্ত পরস্পরাভিমুখে প্রসারিত বলিয়া উক্ত হয়।

(৬) সীমাবচ্ছিন্ন সমতল-ক্ষেত্র।

৬।১॥ যে কোন সমতল ক্ষেত্র তিনটি শলাকা দ্বারা পরিবেষ্টিত তাহা ত্রিকোণ বলিয়া উক্ত হয়।

৬।২॥ কোন ত্রিকোণের কোন একটি কোণ যদি মধ্যম কোণ হয় তবে তাহা জাত্য ত্রিকোণ বলিয়া উক্ত হয়।

৬। ৩॥ ত্রিকোণের কোণ-ভুজ-ত্রয় ত্রিকোণের ভুজ বলিয়া উক্ত হয়।

৬।৪॥ জাত্য ত্রিকোণের মধ্যম কোণের সম্মুখবর্ত্তী ভুজ কর্ণ বলিয়া উক্ত হয়, অবশিষ্ট ভুজ দ্বয়ের একটিকে ভূমি বলিয়া গ্রহণ করা হইলে অপরটি লম্ব বলিয়া উক্ত হয়।

* শূন্য কোণ সর্ব্বাপেক্ষা ছোটো, সমসূত্র কোণ সর্ব্বাপেক্ষা বড়, উভয়ের ঠিক মধ্যের জায়গায় মধ্যম-কোণ।

৬।৫॥ যে সমান্তরাল ক্ষেত্র চারিটি শলাকা দ্বারা পরিবেষ্টিত তাহা চতুষ্কোণ বলিয়া উক্ত হয়।

৬।৬॥ চতুষ্কোণের কোণ-ভুজ চতুষ্কোণের ভুজ বলিয়া উক্ত হয়।

৬।৭॥ চতুষ্কোণের যে কোন কোণ দ্বয় পার্শ্বাপার্শ্বি অবস্থিতি করে তাহাদের একটি আর একটির পার্শ্ব-কোণ বলিয়া উক্ত হয়, এবং তাহার কোন কোণের পার্শ্বেতর কোণ সেই কোণের সম্মুখীন কোন বলিয়া উক্ত হয়।

৬।৭॥ যে চতুষ্কোণের প্রত্যেক ভুজ উহার আর একটি ভুজের সমান্তরাল শলাকা সে চতুষ্কোণ সমস্তর বলিয়া উক্ত হয়।

মন্তব্য। সমতল ক্ষেত্র পৃষ্ঠে সমান শলাকাগণ একটির পর আর একটি স্তরে স্তরে গাত্রলাৎ হইয়া রহিলে বর্ত্তমান-সংজ্ঞক ক্ষেত্র উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহার নাম দেওয়া হইল—সমস্তর। সমান আস্তরণ এইরূপ চৌকোণ-আকারেই সচরাচর দেখা গিয়া থাকে—এ অর্থেও উহাকে সমস্তর বলা যাইতে পারে।

৬।৮॥ যে সমস্তরের কোণ মধ্যম কোণ তাহা ঋজু সমস্তর বলিয়া উক্ত হয়।

৬।৯॥ যে ঋজু সমস্তরের চারি ভুজ সমান তাহা চতুরক (চক) বলিয়া উক্ত হয়।

৬।১০॥ যে ক্ষেত্রের যত কোণ সে ক্ষেত্র তত-সংখ্যক-কোণ-ক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হয়, চারের ঊর্দ্ধ সংখ্যক-কোণ-ক্ষেত্র বহু কোণ বলিয়া উক্ত হয়।

৬। ১১॥ সমস্তরের সম্মুখীন কোণ-দ্বয়ের

মুখ-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী শলাকা সমস্তরের ব্যাস বলিয়া উক্ত হয়।

৬। ১২॥ কোন সমতল ক্ষেত্রের কোন একটি রেণু হইতে সমদূরবর্ত্তী যত গুলি রেণু সেই ক্ষেত্রে স্থিতি করে তাহারা সকলে মিলিয়া যে ক্ষেত্রটিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহে সে ক্ষেত্র চক্র বলিয়া উক্ত হয়।

৬। ১৩॥ চক্রের বেষ্টন-ধারা পরিধি বলিয়া উক্ত হয়।

৬। ১৪॥ পরিধির রেণুগণের সমদূরবর্ত্তী সাধারণ রেণু কেন্দ্র বলিয়া উক্ত হয়।

৬। ১৫॥ কেন্দ্রের মধ্য দিয়া পরিধির এক রেণু হইতে অন্য রেণু পর্য্যন্ত প্রসারিত শলাকা ব্যাস বলিয়া উক্ত হয়।

৬। ১৬॥ কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত প্রসারিত শলাকা অর বলিয়া উক্ত হয়।

(৭) গতি।

৭। ১॥ কোন বস্তুর, এক স্থান হইতে স্থানান্তর প্রাপ্তি, গতি বলিয়া উক্ত হয়।

৭। ২॥ নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে আয়ত পথ অতিক্রমণ করিবার প্রবৃত্তি বেগ বলিয়া উক্ত হয়।

৭। ৩॥ যে বেগের প্রভাবে প্রত্যেক সমদীর্ঘ কালাংশে সমদীর্ঘ পথাংশ অতিবাহিত হয় তাহা আনুপূর্ব্বিক বেগ বলিয়া উক্ত হয়।

মন্তব্য। কেহ বলিতে পারেন যে সচরাচর কথিতরূপ বেগ সমবেগ বলিয়া উক্ত হয়, তাহার পরিবর্ত্তে আনুপূর্ব্বিক বেগ বলিবার তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য এই—দুই অশ্ব সমবেগে চলিতেছে বলিলে তাহারা সমান আনুপূর্ব্বিক বেগে চলিতেছে এইটিই যে কেবল বুঝায়, তাহা নহে,—এটিও বুঝাইতে পারে যে, উভয়ে যদিও ক্রমাগত পাশাপাশি দৌড়িতেছে তথাপি ক্লান্তিবশতঃ উভয়েরই বেগ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক মন্দীভূত হইয়াছে, শেষোক্ত-পক্ষে প্রতি মুহূর্ত্তে উভয়ের বেগ সমান এই হিসাবে উভয়ে সমবেগে চলিতেছে,—পূর্ব্বে যত বেগে চলিয়া ছিল এখনো তত বেগে চলিতেছে—এ হিসাবে নহে। সমবেগ বলিলে বস্তু-বিশেষের পূর্ব্বানুরূপ বেগও বুঝায়, আর দুই বস্তুর সামকালিক সমবেগও বুঝায়, এজন্য পূর্ব্বানুরূপ বেগ বিশেষ করিয়া জ্ঞাপন করিতে হইলে সমবেগ শব্দের পরিবর্ত্তে আনুপূর্ব্বিক বেগ বলাই যুক্তি সিদ্ধ।

৭। ৪॥ বস্তু-বিশেষের বেগের উৎপত্তি ধ্বংশ ও হ্রাস-বৃদ্ধির কারণকে বল কহে।

৭। ৫॥ যাহা অপেক্ষা অল্প স্থায়ী বল প্রয়োগ কল্পনা করা অসাধ্য তাহা ঘাত-প্রয়োগ বলিয়া উক্ত হয়। ঘাত-প্রয়োগ যতটুকু কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী তাহা মুহূর্ত্ত বলিয়া উক্ত হয়।

৭।৬॥ নিরবচ্ছিন্ন মুহূর্ত্তগণের সমষ্টি আয়ত কাল বলিয়া উক্ত হয়।

মন্তব্য॥ আকাশের বিন্দু যে হিসাবে অনায়ত, কালের মুহূর্ত্তও সেই হিসাবে অনায়ত—ভেদ যাহা তাহা কেবল বহিরিন্দ্রিয় অন্তরিন্দ্রিয় লইয়া।

৭।৭॥ দুই চলমান রেণু যদি ক্রমাগত পরস্পর হইতে সমদূর-বর্ত্তী থাকে তবে উভয়ে যুগপৎ সমবেগে, বা যুগপৎ সমদূরে, চলিতেছে বলিয়া উক্ত হয়।

৭।৮॥ যে গতির বেগ যতকাল পর্য্যন্ত প্রতিমুহূর্ত্তই বাড়িতে থাকে ততকাল পর্য্যন্ত তাহা ত্বরায়মান গতি বলিয়া উক্ত হয় এবং তাহার বেগ বর্দ্ধমান বেগ বলিয়া উক্ত হয়, উহা যত কাল পর্য্যন্ত প্রতি মুহূর্ত্তই কমিতে থাকে ততকাল পর্য্যন্ত মন্দায়মান গতি এবং তাহার বেগ হ্রসমান বেগ বলিয়া উক্ত হয়।

১০।৯॥ যে গতির বেগ প্রতি মুহূর্ত্তই সমগুণ বর্দ্ধিত বা হ্রসিত হয় তাহা আনুপূর্ব্বিক ত্বরায়মান বা মন্দায়মান বলিয়া

উক্ত হয় এবং উহার বেগ আনুপূর্ব্বিক বর্দ্ধমান বা হ্রসমান বলিয়া উক্ত হয়।

৭।১০॥ যদি কোন শলাকার প্রথম রেণু তাহার দ্বিতীয় রেণু-স্থানে, দ্বিতীয় রেণু তৃতীয় রেণু-স্থানে, এইরূপ তাহার প্রত্যেক অন্ত্যেতর রেণু পরবর্ত্তী রেণু-স্থানে যুগপৎ চলিতে থাকে তবে তাহা সমসূত্রে চলিতেছে বলিয়া উক্ত হয়।

৭।১১॥ কোন বিন্দু নিরবচ্ছিন্ন সরল-রেখা পথে চলিলে পর-পর-মুহূর্ত্ত গম্য বিন্দুগণের দিকে চলিতেছে বলিয়া উক্ত হয় এবং সেই সরল রেখা পথ দিয়া প্রত্যাগমন করিতে হইলে যে বিন্দুর পর যে বিন্দুতে উত্তীর্ণ হইতে হয় সেই বিন্দু হইতে সেই বিন্দুতে চলাকে পূর্ব্বোক্ত দিকের বিপরীত দিকে চলা কহে।

৭।১২॥ কোন শলাকা যে কোন পথ দিয়া যতদূর সমসূত্রে চলিতে পারে তাহা বা তাহার কোন অংশ সেই শলাকার সমসূত্র পথ বা সমসূত্র রেখা বলিয়া উক্ত হয়।

৭।১৩॥ চলাচলি বশতঃ যে বস্তুর কোন রেণুদ্বয়ের দূরত্বের হ্রাস বৃদ্ধি সম্ভবে না তাহা দৃঢ় বস্তু বলিয়া উক্ত হয়।

৭।১৪॥ দৃঢ় বস্তুর অন্তর্গত কোণ দৃঢ় কোণ বলিয়া উক্ত হয়।

৭।১৫॥ যদি দুই বস্তু মিলিয়া একটি দৃঢ় বস্তু রূপে পরিণত হয় তবে একটির সহিত আর একটি দৃঢ় বদ্ধ বলিয়া উক্ত হয়।

মন্তব্য॥ দৃঢ় বস্তু ভিন্ন অদৃঢ় বস্তু আপাততঃ আমাদের কোন কাজে আসিবে না এজন্য যে কোন বস্তুর উল্লেখ করা যাইবে তাহাই দৃঢ় বস্তু বুঝাইবে।

৭।১৬॥ দৃঢ় বস্তুর সকল রেণু যদি যুগপৎ সমদূরে চলে তবে তখনকার গতি প্রস্থান বলিয়া উক্ত হয়।

৭।১৭॥ প্রস্থীয়মান দৃঢ় বস্তুর এক রেণু যে দিকে চলিতেছে তাহার প্রত্যেক রেণু বা তদুপরি সংলগ্ন কোন রেণু, সেই একই দিকে চলিতেছে বলিয়া উক্ত হয়।

৭।১৮॥ যদি কোন শলাকা উত্তরোত্তর বর্ত্তী নিরন্তরাল রেখা হইতে নিরন্তরাল রেখায় চালিত হইয়া সমান্তরাল রেখা পরম্পরায় উত্তীর্ণ হয় তবে তাহা সমান্তরালে চলিতেছে বলিয়া উক্ত হয়।

৭।১৯॥ যদি কোন শলাকা তাহার কোন প্রান্ত হইতে বিকীর্ণ পর-পরবর্ত্তী সরল রেখায় নিরবচ্ছেদে চালিত হয়, তবে তাহা সেই প্রান্তের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে বলিয়া উক্ত হয়।

মূল তত্ত্ব।

মূ।১॥ এক শলাকার কোন রেণুদ্বয় যদি আর এক শলাকা স্পর্শ করে তবে দুই শলাকা পরস্পরের গাত্র সাৎ হইয়া যায়।

মূ।২॥ শলাকার গাত্র-সংলগ্ন নিরবচ্ছিন্ন রেণু-পরম্পরা শলাকা।

মূ।৩॥ সমতল ক্ষেত্রের পৃষ্ঠ মাত্রই (৩।৫ সংজ্ঞা দেখ) সমতল।

মূ।৪॥ নিরন্তরাল শলাকাদ্বয়ের সমসূত্র রেখা-দ্বয়ও নিরন্তরাল, সুতরাং সমন্তরাল রেখা-দ্বয়ের সমসূত্রে রেখা-দ্বয়ও সমান্তরাল।

মূ।৫॥ বহির্বস্তু হইতে বাধা প্রাপ্ত না হইলে শলকা যতদূর ইচ্ছা ততদূর সমসূত্রে চালিত হইতে পারে।

মূ।৬॥ রেণু সমষ্টি মাত্রই বাহির হইতে বাধা প্রাপ্ত না হইলে যতদূর ইচ্ছা যুগপৎ সমবেগে, বা যাহা একই কথা যুগপৎ সমদূরে, চালিত হইতে পারে।

মূ।৭॥ কোন দৃঢ় বস্তুর কোন আয়ত্ত অংশের রেণুগণ যুগপৎ সমদূরে চলিলে তাহার অবশিষ্ট রেণুগণও যুগপৎ সমদূরে চলে।

মূ।৮॥ যুগপৎ সমদূরে চালিত রেণু-

দ্বয়ের একটি যে সময়ে আপনার অব্যবহিত পরবর্ত্তী বিন্দুতে উপনীত হয়, আর একটিও সেই সময়ে আপনার অব্যবহিত পরবর্ত্তী বিন্দুতে উপনীত হয়।

মূ। ৯॥ বিশেষ কারণাভাবে বিশেষ প্রকারের পরিবর্ত্তন সম্ভবে না।

মূ ১০॥ শলাকা বা তাহার কোন খণ্ডের প্রান্ত রেণু হইতে উহার এক পৃষ্ঠে যে কোন প্রকার কোণ উন্মীলিত হইতে পারে তাহার অপর পৃষ্ঠে অবিকল সেই প্রকার কোণ উন্মীলিত হইতে পারে, এবং দুই কোণেরই ভুজদ্বয় অবিকল সমান হইতে পারে।

স্বর-রহস্য।

গোড়ার প্রতিজ্ঞা অনুসারে, স্বরগণের মধ্যে প্রকৃত ব্যবধানের নিয়ম কিরূপ তাহা গতবারের ভারতীতে যথাসাধ্য প্রদর্শন করা গিয়াছে; তাহার মধ্যে ঘর-গড়া কিছুই নাই, বিজ্ঞানের তুলাদণ্ডে তৌল করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তাহার ভিতরকার একটি সিদ্ধান্তেরও এক চুল এদিক্ ওদিক হইবার জো নাই। কিন্তু আমাদের মুখ্য আলোচ্য সঙ্গীত বিজ্ঞান তত নয়—যত সঙ্গীত বিদ্যা। বিজ্ঞান হ'চ্চে তত্ত্বনির্ব্বাচন জ্ঞান (Science), বিদ্যা হ'চ্চে কার্য্য-সাধন জ্ঞান (Art); বিদ্যা আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) শাস্ত্র-বিদ্যা যেমন(Mensuration navigation, চিকিৎসা, ইত্যাদি) শিল্প-বিদ্যা, এবং সৌখীন বিদ্যা (Fine art)। সঙ্গীত সৌখীন * বিদ্যার শ্রেণী-ভুক্ত। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, যে-কোন গ্রামেরই হউক সা গা পা † স্ব-গ্রামের সংবাদী স্বর ও এক গ্রাম উচ্চের সা গা পা (অর্থাৎ স্ব-গ্রামের ম প ধ) স্ব-গ্রামের অনুবাদী স্বর, কিন্তু সঙ্গীত বিদ্যার নিজের একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত এই যে সংবাদী-স্থলে স্ব-গ্রামের এবং অনুবাদী স্থলে এক গ্রাম উচ্চের শুদ্ধ গান্ধারের পরিবর্ত্তে কোমল গান্ধার ব্যবহার করিলে তাহা একটু কান্নার ভাব উদ্দীপন করে; তাহার সাক্ষী—ভৈরব ললিত প্রভৃতি রাগাদিতে মধ্যম-গ্রামের কোমল গান্ধার (অর্থাৎ কোমল ধৈবত) এবং তাহার একগ্রাম উচ্চের কোমল গান্ধার (অর্থাৎ কোমল রেখাব) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐরূপ পদ্ধতিতে, যে কোন গ্রামেরই শুদ্ধ গান্ধার এবং শুদ্ধ ধৈবতের পরিবর্ত্তে কোমল গান্ধার এবং কোমল ধৈবত ব্যবহার করিতে পারা যায়। পূর্ব্বে যে দ্বাদশ গ্রাম উল্লিখিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকেই মৌলিক উপাধি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে এবং তাহার গান্ধার এবং ধৈবতকে কোমল করা হইলে উহা বৈকারিক উপাধি দ্বারা নির্দ্দিস্ট হইবে; নিম্নে ইহার একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। যে দুই স্থানে উক্ত দুই জাতীয় গ্রামের শুদ্ধ-

* কুল হইতে যেমন কৌলীন সুখ হইতে তেমনি সৌখীন উৎপন্ন হইয়াছে।

† সা-গ্রামের সা = সা, ম-গ্রামের সা = ম, রে-গ্রামের সা = রে, এইরূপ কোন গ্রামের নাম উল্লেখ করিয়া তাহার সা রে গা প্রভৃতি বলিলে সেই গ্রামের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি স্বর বুঝাইবে, আর গ্রামের কথা উল্লেখ না করিয়া সা রে গা প্রভৃতি বলিলে সা-গ্রামের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি স্বর বুঝাইবে।

কোমল ঘটিত বৈসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় সেই দুই স্থান বিন্দু-মালা দ্বারা চিহ্নিত করা হইল।

মধ্যম গ্রাম

মৌলিক		বৈকারিক
সা = মা		সা = মা
রে = পা		রে = প
গ = ধা	....	গ = ধা
ম = নি		ম = নি
প = সা		পা = সা
ধা = রে	....	ধা = রে
নি = গা		নি = গা

আমাদের দেশের অনেক-গুলি রাগ রাগিণী বৈকারিক মধ্যম গ্রামে গীত হইয়া থাকে।

বৈকারিক গ্রাম মাত্রেরই সংবাদী শ্রেণীস্থ গান্ধার এবং অনুবাদী শ্রেণীস্থ ধৈবত কোমলীকৃত হয়, কিন্তু মৌলিক গ্রাম এবং বৈকারিক গ্রাম উভয়ের বিবাদী স্বর-গুলি সমান; তবে, বৈকারিক গ্রামে বিকল্পে আর একরূপ বিবাদী স্বর ব্যবহৃত হইতে পারে,—কেবল উপান্ত স্থানে (অর্থাৎ উপসংহারের অব্যবহিত পূর্ব্ব স্থানে) নহে,—যে প্রকার বিবাদী স্বর সাধারণতঃ ব্যবহার যোগ্য—উপান্ত স্থানে তাহারি প্রয়োগ বিধি-সঙ্গত। সাধারণতঃ ব্যবহার্য্য বিবাদী স্বর হ'চ্চে নি, রে, ম, প, কিন্তু—শুদ্ধ কেবল বৈকারিক গ্রামে ব্যবহারোচিত বিবাদী স্বর নি, রে, ম, ধ,—এই যা' প্রভেদ; কিন্তু শেষোক্ত বিবাদী স্বরের বিশেষ কতকগুলি সঙ্গীতিক গুণ আছে ইহা যথাকালে প্রদর্শিত হইবে। নিম্নে বৈকারিক মধ্যম গ্রামের একটি গীত প্রকাশিত হইল।

রাগ ভৈরব—তাল ঝাঁপতাল।

বৈকারিক মধ্যম-গ্রাম

☞ (রে, ধা এবং নি কোমল)

২　　৩　　০　　১
সা রে। প প প। ধ প। প ধ ম।
অ নু। প ম ম। হি ম। পূ - র্ণ।

২　　৩　　০　　১
ম প। ম গ ম। গ -। রে - সা।
ব্র -। হ্মা - ক। রো -। ধ্যা - ন।

২　　৩　　০　　১
স স। ম ম ম। ম প। ম ম প।
নি র। ম ল প। বি -। ত্র উ -।

২　　৩　　০　　১
ম -। ম প -। ধা -। প - -॥
যা -। কা - -। লে -। - - -॥

২　　৩　　০　　১
ধা -। ধা সা* সা। রে। রে সা সা।
ভা -। নু ন ব। তাঁ -। র সে ই।

২　　৩　　০　　১
সা গ। রে রে সা। সা -। ধা - -।
প্রে -। ম মু খ। ছা -। য়া - -।

২　　৩　　০　　১
ধা সা। সা সা সা। রে নি। নি ধ ধ।
দে -। খ অ ই। উ দ। য় গি রি।

২　　৩　　০　　১
মা -। মা পা -। ধা -। পা - -।
শু -। ভ্র ভা -। লে -। - - -॥

২　　৩　　০　　১
সা সা। সা রে ধ। ধা ধা। ধা প প।
ম ধু। স মী -। র ণ। ব হি ছে।

২　　৩　　০　　১
পা ধা। মা প ম। প -। ধা - -।
কি আ। জি শু ভ। দি -। নে - -।

* অর্থাৎ এক সপ্তক উচ্চের সা।

২ ৩ ০ ১

ধা - । প প প। ধা - । প প প।

তাঁ - । স্ব গু ণ। গা - । ন ক রি।

২ ৩ ০ ১

ম ম । ম গ রে। গ ম । প ম -॥

অ মৃ। ত ঢা -। - -। -লে -॥

২ ৩ ০ ১

ধা ধা । ধা সা' সা'। রে - । রে' সা' সা'।

মি লি। রে স বে ; যা - । ই চ ল॥

২ ৩ ০ ১

সা' গ । রে' রে' সা। সা' - । রে নি ধা।

ভ গ । ব ত নি। কে ত। নে - -।

২ ৩ ০ ১

সা' সা'। সা' সা' সা'। রে - । নি ধ ধ ।

প্রে - । ম উ প। হা - । র ল রো।

২ ৩ ০ ১

ম ম । মা পা । ধ - । প - - ।

হৃ দ । য় থা । লে - । - - -॥

উপরের ব্যাখ্যা। সা মধ্যম-গ্রামের পঞ্চম—পঞ্চম আদিস্থিত হইলে তাহা সম্বাদী ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না; যেহেতু গীতের আরম্ভ স্থলে সম্বাদী সুর থাকা চাই-ই-চাই; অন্যত্র পঞ্চম থাকিলে স্থান বুঝিয়া বিবাদী শ্রেণীর মধ্যেও গণ্য হইতে পারে। কোমল রে মধ্যম গ্রামের কোমল ধৈবত; বৈকারিক গ্রামের কোমল ধৈবত ঔপাস্তিক ভিন্ন আর সকল বিবাদী-স্থলেই ব্যবহৃত হইতে পারে। তৎপরবর্ত্তী তিনটি প মধ্যমের রে সুতরাং বিবাদী। তাহার পর কোমল ধা হইতে পা = মধ্যম গ্রামের কোমল গা হইতে রে—সম্বাদী হইতে বিবাদী। তাহার পর পা হইতে কোমল ধা এবং মা = মধ্যম গ্রামের রে হইতে কোমল গা এবং সা,—বিবাদী হইতে সংবাদী। পরবর্ত্তী তৃতীয় তাল পর্য্যন্ত সম্বাদী বিবাদীর ওলট পালট্। ফাঁকের তালে বিবাদী; তাহার পরবর্ত্তী প্রথম তালে বৈকারিক বিবাদী কোমল রে (যাহা মধ্যম গ্রামের কোমল ধৈবত তাহা) হইতে মধ্যমের পঞ্চমে (সা'তে) অবতীর্ণ হওয়াতে বুঝাইতেছে যে, ঐ পঞ্চমটি (সা'টি) এবারও সংবাদী বলিয়া ধর্ত্তব্য। পরবর্ত্তী সা-দুটি বিবাদী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, তাহার পরবর্ত্তী তালের ঘরে সংবাদী সুর স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহার পরে সম্বাদী বিবাদীর ওলট্ পালট্, শেষে বিবাদীতে আস্থায়ীটি পরিসমাপ্ত হইয়াছে; বিবাদীতে আসিয়া গীত থামিতেপারে না, তাই পাল্‌টিয়া গোড়া হইতে আরম্ভ করা আবশ্যক, এবং প্রথম পংক্তির শেষের ঘরের বিবাদী প হইতে সংবাদী ধ ম হইয়া দ্বিতীয় পংক্তির সংবাদী ম'ই থামিবার জায়গা; এই বিরাম স্থানটিতে রীতিমত বিবাদী হইতে সংবাদীতে উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক, হইয়াছেও তাই; এখানকার বিবাদী সোপানটি বৈকারিকের বিশেষ-ব্যবহারোচিত বিবাদী দ্বারা অধিকৃত হইতে পারে না —দ্বিতীয় পংক্তির শেষ ঘরে যেমন কোমল রেখাব হইতে সা'তে উত্তীর্ণ হওয়া গিয়াছে এখানে সেরূপ হইলে চলিত না। পঞ্চম পংক্তি হইতে অষ্টম পংক্তি পর্য্যন্ত বিবাদী সংবাদীর ওলট পালট স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে। নবম পংক্তির কতকটা দূর পর্য্যন্ত সম্বাদী চলিয়া শেষে বিবাদী দেখা দিয়াছে, তাহার পর বিবাদী সম্বাদীর ওলট পালট হইয়া অবশেষে আভোগের শেষাংশ সম্বাদীতে পরিণত হইয়াছে; আভোগের পরবর্ত্তী অন্তরা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অন্তরার দ্বিরুক্তি মাত্র। অতঃপর মূল-গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাতায়াতের কিরূপ নিয়ম তাহা প্রদর্শিত হইবে।

ভগ্নহৃদয় ।

পঞ্চম সর্গ ।

কানন ।

রাত্রি ।

অনিল, ললিতা ; নলিনী ও সখীগণ ;
বিজয়, সুরেশ, বিনোদ, প্রমোদ,
অশোক, নীরদ ।
(কাননের একপাশে ললিতার প্রতি
অনিলের গান)
বউ ! কথা কও !

সারাদিন বনে বনে ভ্রমেছি আপন মনে,
সন্ধ্যাকালে শ্রান্ত বড়—বউ, কথা কও !
শুনলো, বকুল ডালে লুকায়ে পল্লব জালে
পিক সহ পিক-বধূ মুখে মুখ মিলায়ে
দুজনেতে এক প্রাণ গাহিতেছে এক গান,
রাশি রাশি স্বর-সুধা বাতাসেরে বিলায়ে ।
সারাদিন তপনের কিরণেতে তাপিয়া
সন্ধ্যাকালে নীড়ে ফিরে আসিয়াছে পাপিয়া।
প্রিয়ারে না দেখি আর ঢালিতেছে স্বর-ধার,
অধীর বিলাপ তার লতাপাতা ভিতরে,
গলি সে আকুল ডাকে বসি অতি দূর-শাখে
প্রাণের বিহগী তার "যাই যাই" উত্তরে ।
অতি উচ্চ শাখে উঠি দেখলো কপোত দুটি
মুখে মুখে কানে কানে কত কথা বলিছে,
বুকে বুক মিলাইয়া—চঞ্চুপুট বুলাইয়া,
কপোতী সে কপোতের আদরেতে গলিছে !
এস প্রিয়ে, এস তবে, মধুর—মধুর রবে
জুড়াও শ্রবণ মোর—বউ ! কথা কও !
যদি বড় হয় লাজ, আমার বুকের মাঝ
পাখার ভিতরে মুখ লুকাও তোমার !
অতি ধীরে মৃদু-মধু বুকের কাছেতে, বধু,
দুচারিটি কথা শুধু বল একবার !

(কিছুক্ষণ থামিয়া)
তবে কি কবেনা কথা পূরাবেনা আশা ?
ভাল ভাল, কোয়োনাকো,মুখ ফিরাইয়া থাকো
বুঝিনু আমার পরে নাই ভালবাসা ।

ললিতা ।—(স্বগত)
কি কহিব কথা সখা ? কহিতে না জানি !
বুদ্ধি নাই—ক্ষুদ্র নারী—ফুটেনাকো বাণী ।
মনে কত ভাব যুঝে, হৃদয় নিজে না বুঝে,
প্রকাশ করিতে গিয়া কথা না যোগায় ।
হৃদয়ে যে ভাব উঠে হৃদয়ে মিলায় ।
তবে কি কহিব কথা—ভেবে নাহি পাই—
কথা কহিবার, সখা, ক্ষমতা যে নাই !
কি এমন কথা কব, ভাল যা' লাগিবে তব ?

তুমি গো শুনাও মোরে কাহিনী বিরলে,
একমনে শুনি আমি বসি পদতলে।
মাথার উপর দিয়া তারাগুলি যত
একটি একটি করি হবে অস্তগত।
শ্রান্তি তৃপ্তি নাহি জানি ও মুখের প্রতি বাণী
তৃষিত শ্রবণে মোর শুনিতে শুনিতে
কখন্ প্রভাত হোল নারিব জানিতে।

অনিল।—

জানত—জানত সখি, মানুষের মন?
যে কথা সে ভালবাসে শত শতবার তা' সে
ঘুরে ফিরে শুনিবারে চায় প্রতিক্ষণ।
জানি, ভালবাস' তুমি, ললিতা, আমারে,
তবু সখি প্রতিক্ষণে বড় সাধ যায় মনে
বাহিরে সে প্রেমের প্রকাশ দেখিবারে।
দুদিনে নীরব-প্রেম হয় পুরাতন!
বিচিত্রতা নাহি তায়, শ্রান্ত হয় মন।
আদর তরঙ্গ-মালা নিয়ত যে করে খেলা,
তাইতে দেখায় প্রেম নিয়ত নূতন।
নিত্য নব নব উঠি আদরের নাম
নিয়ত নবীন রাখে প্রণয়ের ধাম।
আদর প্রেমের, সখি, বরষার জল—
না পেলে আদর-ধারা হয় সে যে বলহারা,
ভুমে মুয়াইয়া পড়ে মুমূর্ষু বিকল।
ওকি বালা, কেন হেন কাতর নয়ানে
এক দৃষ্টে চেয়ে আছ ভুমি-তল পানে!
হাসিতে হাসিতে, সখি, দুটা ক্ষুদ্র কথা
কহিনু, তা'তেই মনে পেয়েছ কি ব্যথা?

ললিতা। (স্বগত)

একা বোসে ভাবিয়াছি কত—কতবার,
কোন গুণ নাই মোর, কি হবে আমার?
হা ললিতা! কি করিস্—দেখিস্ না চেয়ে?
শুধু দুটা কথা হা-রে পারিস্ না কহিবারে?
দুটা আদরের কথা—বুদ্ধিহীন মেয়ে!
দেখিস্ না—দুটা কথা কহিলি না বোলে,
আদরের ধন তোর—প্রাণের সর্ব্বস্ব তোর
হারায়—হারায় বুঝি—যায় বুঝি চোলে!
শুধু দুটা কথা তুই কহিলি না বোলে!
কি কহিবি? হা অবোধ! ভাবনা কি তায়?
মুক্তকণ্ঠে বল্—মন যা' বলিতে চায়?
মনের গোপন ধামে ডাকিস্ যে শত নামে
সেই নামে মুখ ফুটে ডাক্‌রে তাহায়!
একবার প্রাণ খুলে বল্ প্রাণেশ্বরে—
"মোর প্রেম, চিন্তা, আশা, সব তোমা পরে;
নির্ব্বোধ—নির্গুণ বোলে—নাথ, স্বামী, প্রভু,
অসহায় অবলারে ত্যজিও না কভু!"
দিবস রজনী ভুলি বুকে তারে রাখ্ তুলি,
"ভালবাসি" "ভালবাসি" বল্ শতবার,
আলিঙ্গনে বেঁধে বেঁধে হৃদয় তাহার!
কিন্তু লজ্জা?—দূর হ'রে—লজ্জা, দূর হ'রে—
বিষময় বাহু তোর বাঁধি বাঁধি শত ডোর
জীর্ণ করিয়াছে মোর মন স্তরে স্তরে!
আর না—আর না লজ্জা—দূর হ' এখন!
চূর্ণ চূর্ণ ভেঙ্গে আর ফেলিস্ না মন!
শিথিল কোরে দে তোর শতেক বন্ধন ডোর,
মুহূর্ত্তের তরে মুখ তুলি একবার,
বন্ধন-জর্জর মন শুধুরে মুহূর্ত্ত ক্ষণ
বাহিরে বাতাসে গিয়া বাঁচুক আবার!

অনিল।—

আজি শুভদিনে ওকি অশ্রুবারি পাত?
অশ্রুজলে কাটাবে কি ফুলশয্যা রাত?

(কাননের অপর পার্শ্বে অভিমান করিয়া
বিজয়ের প্রতি)

নলিনী।—

মিছে বোলোনাকো মোরে ভালবাস' ভালবাস'
নয়নেতে ঝরে বারি হৃদয়ে হৃদয়ে হাস'!
সারহীন, ভাবহীন দুটা লঘু কথা বোলে,
হেসে দুটা মিষ্টহাসি,দুই ফোঁটা অশ্রু ফেলে,
শূন্য রসিকতা করি দুই দণ্ড কাল হরি,
সরল-হৃদয় চাহ' লভিবারে অবহেলে!
অবশেষে আড়ালেতে কহ হাসি হাসি কত
রমণীর ক্ষুদ্র মন লঘু তৃণটির মত!
ভালবাসা খেলা নয়, খেলেনা নহেগো হৃদি,
নারী বোলে,মন তার দলিতে সৃজেনি বিধি!
ভাল যদি বাস', তবে ভালবাস' প্রাণপণে—
ক্ষুদ্র মনে কোরে খেলা করিওনা মোর সনে!
হৃদয়ের অশ্রু ফেল' দিবানিশি পদতলে,
মিছা হাসিওনা হাসি—কথা কহিওনা ছলে!

বিজয়।—

কেন বালা, আমিত লো দিনরাত্রি ভুলে
অশ্রু ঢালিয়াছি তব প্রেমতরু মূলে,
আজিও ত কিছু তার হয়নিক ফল,
ব্যর্থ হইয়াছে মোর এত অশ্রুজল!

নলিনী।—ওই যে সুরুচি হোথায় আছে,
যাই একবার তাহার কাছে!
(দূরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া)
দেখিনি এমন জ্বালা!
হাত হোতে খসি পোড়েছে কোথায়
বেল ফুলে,গাঁথা বালা!
(সহসা উপরে চাহিয়া)
ওই দেখ হোথা কামিনী-শাখায়
ফুটেছে কামিনীগুলি—
পাতাগুলি সাথে দুচারিটি, সখা,
দাওনা আমারে তুলি!

বিজয়।—কি পাইব পুরস্কার?

নলিনী।—পুরস্কার? মরি লাজে!
একটি কুসুম যদি ঠাঁই পায়
আমার অলক মাঝে,—
একটি কুসুম নুয়ে পড়ে যদি
এ মোর কপোল পরে,
একটি পাপড়ি ছিঁড়ে পড়ে পায়ে
শুধু মুহূর্ত্তের তরে,
ভুলে যদি রাখি একটি কুসুম
রচিতে এ কণ্ঠহার—
তার চেয়ে বল আছে ভাগ্যে তব
আর কিবা পুরস্কার!
(বিজয়ের ফুল তুলিয়া দেওন
ও তাহা চরণে দলিয়া)

নলিনী।—এই তব পুরস্কার!
অনুগ্রহ করি এ চরণ দিয়া
ফুলগুলি তব দিলাম দলিয়া,
এই তব পুরস্কার!

বিজয়।—আহা! আমি যদি হোতেম সজনি
একটি কুসুম ওর,—
ওই পদতলে দলিত হইয়া
ত্যজিতাম দেহ মোর!
(গাছের দিকে চাহিয়া নলিনীর
মৃদুস্বরে গান)

খেলা কর্—খেলা কর্—
(তোরা) কামিনী-কুসুম গুলি,
দেখ্, সমীরণ লতাকুঞ্জে গিয়া
কুসুম গুলির চিবুক ধরিয়া
ফিরায়ে এ ধার—ফিরায়ে ও ধার

দুইটি কপোল চুমে বার বার
মুখানি উঠায়ে তুলি !
তোরা খেলা কর্—তোরা খেলা কর্
কামিনী কুসুম গুলি !
কভু পাতা মাঝে লুকায়ে মুখ,
কভু বায়ু কাছে খুলেদে বুক—
মাথা নাড়ি নাড়ি নাচ কভু নাচ্
বায়ু কোলে দুলি দুলি !
দুদণ্ড বাঁচিবি—খেলা' তবে খেলা,'
প্রতি নিমেষেই ফুরাইছে বেলা,
বসন্তের কোলে খেলা-শ্রান্ত প্রাণ
ত্যেজিবি ভাবনা ভুলি !
অশোক।—(দূর হইতে দেখিয়া)
ওই যে হোথায় নলিনী রোয়েছে
বসি বিজয়ের সাথে !
কত কাছাকাছি !—কত পাশাপাশি !
হাত রাখি তার হাতে !
অসার-হৃদয়, লঘু, হীন-মন
কোন গুণ নাই যা'র—
শুধু ধন দেখে বিকাবি, নলিনী,
তারে দেহ আপনার ?
কতবার প্রেম ! যাস্ পলাইয়া
ভয়ে ফুল ডোর দেখি,
ধনের সোণার শিকল হেরিয়া
আজ ধরা দিলি একি ?
সুরেশ।—খুঁজিয়া খুঁজিয়া পাইনা দেখিতে
নলিনী কোথায় আছে।
ওই যে হোথায় লতা-কুঞ্জতলে
বসিয়া বিজয় কাছে !
কি ভয় হৃদয় ! জানি গো নিশ্চয়
সে আমারে ভালবাসে,
মন তার আছে আমারি কাছেতে
থাকুক্ সে যার পাশে !
বিনোদ।—কথা শুনে তার—ভাব দেখে তার
কতবার ভাবি মনে—
নলিনী আমার—আমারেই বুঝি
ভালবাসে সঙ্গোপনে !
সত্য হয় যদি আহা !
সে আশ্বাস বাণী, সে হাসি মধুর
সত্য যদি হয় তাহা !
নীরদ।—কে আমার সংশয় মিটায় ?
কে বলি দিবে সে ভালবাসে কি আমায় ?
তার প্রতি দৃষ্টি হাসি তুলিছে তরঙ্গ রাশি
এক মুহূর্ত্তের শান্তি কে দিবে গো হায় !
পারিনে পারিনে আর বহিতে সংশয় ভার,
চরণে ধরিয়া তার শুধাইব গিয়া,
হৃদয়ের এ সংশয় দিব মিটাইয়া !
কিন্তু এ সংশয়ো ভাল,
পাছে গো সত্যের আলো
ভাঙ্গে এ সাধের স্বপ্ন বড় ভয় গণি ;
হানে এ আশার শিরে দারুণ অশনি !
(নলিনীর নিকট হইতে বিজয়ের দূরে
গমন, ও নলিনীর নিকটে
গিয়া প্রমোদের গান)
আঁধার শাখা উজল করি,
হরিত পাতা ঘোমটা পরি'
বিজন বনে, মালতী বালা,
আছিস্ কেন ফুটিয়া ?
শুনাতে তোরে মনের ব্যথা,
শুনিতে তোর মনের কথা,
পাগল হোয়ে মধুপ কভু
আসেনা হেথা ছুটিয়া ;

মলয় তব প্রণয় আশে
ভ্রমেনা হেথা আকুল শ্বাসে,
পারনা চাঁদ দেখিতে তোর
সরমে-মাখা মুখানি ;
শিয়রে তোর বসিয়া থাকি
মধুর স্বরে বনের পাখী
লভিয়া তোর সুরভি-শ্বাস
যায় না তোরে বাখানি !
নলিনী ।—(হাসিয়া)
শুনিয়া ধীরে মালতী বালা
কহিল কথা সুরভি-ঢালা,—
"আঁধার বনে আছিগো ভাল
অধিক আশা রাখি না !
তোদের চিনি চতুর অলি,
মনো-ভুলানো বচন বলি
ফুলের মন হরিয়া লোয়ে
রাখিয়া যাস্ যাতনা !
অবলা মোরা কুসুম-বালা
সহিব মিছা মনের জ্বালা,
চিরটি কাল তাহার চেয়ে
রহিব হেথা লুকায়ে !
আঁধার বনে রূপের হাসি
ঢালিব সদা সুরভি রাশি,
আঁধার এই বনের কোলে
মরিব শেষে শুকায়ে !"

(অশোকের নিকটে গিয়া)
নলিনী ।—
অশোক, হোথায়, দূরে কেন তুমি
দাঁড়াইয়া এক ধার ?
কত দিন হোল আমার কাছেতে
আস'নিত একবার !
ভুলেছ যে প্রেম, ভুলেছ যে মোরে
তোমার কি দোষ আছে ?
এ মুখ আমার এ রূপ আমার
পুরাতন হইয়াছে !
ভাল, সখা, ভাল, প্রেম না থাকিলে
আসিতে নাই কি কাছে ?
যেচে প্রেম কভু পাওয়া নাহি যায়
বন্ধুত্বে কি দোষ আছে ?
যদি সারাদিন রহিয়া তোমার
প্রাণের রূপসী সাথে
কোন সন্ধ্যাবেলা মুহূর্ত্তের তরে
অবকাশ পাও হাতে,
আমাদের যেন পড়ে গো স্মরণে
এসো একবার তবে !
দু চারিটা গান গাব' সবে মিলি
দু চারিটা কথা হবে !
অশোক ।—(স্বগত)
পাষাণে বাঁধিয়া মন মনে করি যতবার
কাছে তার যাবনাক মুখ দেখিব না আর,
তার মুখ হোতে তিল আঁখি ফিরায়েছি যবে—
দূরে যেতে এক পদ শুধু বাড়ায়েছি সবে,
অমনি সে কাছে ঢোলে দু একটি কথা বোলে
পাষাণ প্রতিজ্ঞা মোর ধূলিসাৎ করিয়াছে ;
শুধু দুটি কথা বোলে, একবার এসে কাছে !
জানিনা কি শুধু সেগো মন ভোলাবার কথা ?
সে হাসি—সে মিষ্টহাসি-নিদারুণ কপটতা ?
জানে জানে সব জানে, তবু মন নাহি মানে,
প্রতিবার ঘুরে ফিরে তবুও সে যায় তথা ;
জেনে শুনে তবু তার ভাল লাগে কপটতা,
সেই মিষ্ট হাসি, সেই মন ভুলাবার কথা !
যবে ভুলাবার তরে কপট আদর করে,

মোর মুখ পানে চেয়ে গাহে প্রণয়ের গীত,
সাধ কোরে মন যেন হোতে চায় প্রতারিত!
হা হৃদয়! লঘু, নীচ, হীন—হীন অতি—
খেলেনার পরে তোর এতই আরতি?
কখনো না—কখনো না—হোক্ যা হবার,
এই যে ফিরানু মুখ ফিরিব না আর!
ধিক্—ধিক্—শিশু-হৃদি! ধিক্ ধিক্ তোরে—
লজ্জার পাথারে আর ডুবাস্‌নে মোরে!
কপট রমণী এক, অধম, চপল,
নির্দ্দয়, হৃদয় হীন, অসার, দুর্ব্বল—
দুর্ব্বল হাতে সে তার যেথা ইচ্ছা সেই ধার
টলাইবে নুয়াইবে এ মোর হৃদয়?
তৃণ—শুষ্ক পত্র এক, দুর্ব্বলতা-ময়?
কাঁদাইবে, হাসাইবে, দূরে যেতে নাহি দিবে—
নিশ্বাসে উড়ায়ে দেবে প্রতিজ্ঞা আমার!
ইচ্ছা, সাধ, চিন্তা, আশা, দুঃখ, সুখ, ভালবাসা
সমস্ত রাখিবে চাপি পদতলে তার—
শিকলি, পশুর সম—বাঁধিবে গলায় মম
মুহূর্ত্ত নহিবে শক্তি মাথা তুলিবার,
ধূলিতে পড়িবে লুটি এ মাথা আমার!
হা হৃদয়, কি করিলি? তুই কি উন্মাদ হলি?
সমস্ত সংসার তুই দিলি বিসর্জ্জন,
ধন, মান, যশ, আশা—সখাদের ভালবাসা,
লুটিতে শুধু কি এক নারীর চরণ?
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে তার উঠিতে পড়িতে?
কাঁদিতে হাসিতে তার কটাক্ষে ইঙ্গিতে?
খেলেনা হইতে তার ভ্রূকুটি হাসির?
কেন এত গেলি গোলে!
শুধু রূপ আছে বোলে?
ক্ষণ-স্থায়ী জড়রূপ গঠিত মাটির!
কুঞ্চিত-কুন্তল তার, আরক্ত-কপোল,
সুদীর্ঘ নয়ন তার কটাক্ষ-বিলোল,
তাই কি ত্যজিলি তুই সমস্ত সংসার?
জীবনের উদ্দেশ্য করিলি ছারখার?
সমস্ত জগৎ হাসে ধিক্ ধিক্ বলি—
প্রতি ক্ষণে আত্মগ্লানি উঠে জ্বলি জ্বলি—
তবু তার পদতলে লুটাইবি গিয়া
শুধু তার আঁখি দুটি সুদীর্ঘ বলিয়া?
কি মদিরা আছে বালা নয়নে তোমার!
ফেলেছ বিহ্বল করি হৃদয় আমার!
ফিরাও—ফিরাও আঁখি, পাতা দিয়া ফেল ঢাকি
হৃদয়েরে দূরে যেতে দাও একবার!—
কোরেছি দারুণ পণ করিবারে পলায়ন,
নিষ্ঠুর মধুর বাক্যে ফিরায়োনা আর!
ও অনল হোতে সাধ দূরে থাকিবার—
ফিরায়োনা মোরে সখি ফিরায়োনা আর!

অনুতাপের অশ্রুজল।

সকলেই প্রায় অবগত আছেন যে বিখ্যাত নামা Irish কবি Moore—এর লিখিত "লালারুখ্" নামক কাব্যে "Paradise and the Peri" বলিয়া একটি কবিতা আছে। সেই কবিতার সার মর্ম্ম এই যে স্বর্গ ভ্রষ্ট পরীদের মধ্যে একটি পরী

আবার সেই নন্দন কাননে ফিরিয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছিল?—ফিরিয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু ফিরিয়া যাইতে পারিল না।—কারণ, স্বর্গের দ্বার-রক্ষক তাহাকে বলিল যে "মর্ত্তভূমির চূড়ান্ত সার বস্তু আমাকে দেখাইলে, আমি স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটন করিব, নচেৎ এ দ্বার তোমার পক্ষে চিরকালই রুদ্ধ থাকিবে!" ভগ্নহৃদয় পরী মর্ত্তভূমির চূড়ান্ত সার বস্তুর অন্বেষণে দিক-দিগন্তে বিচরণ করিতে লাগিল,——কখন' প্রণয়িনীর দীর্ঘ শ্বাস, কখন' অপোগণ্ড বালকের উপাসনার ধ্বনি, এই মর্ত্তভূমির বিস্তর সামগ্রী লইয়া স্বর্গের দ্বার-রক্ষককে দিল, কিন্তু তবুও দ্বার খুলিল না।—শেষে এক জন প্রকৃত অনুতাপীর অশ্রুজল লইয়া পরী দ্বার-রক্ষককে দিল,—এবং তাহা দিবামাত্রই আপনা আপনি স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িল এবং নির্ব্বিঘ্নে স্বর্গচ্যুতা পরী স্বর্গের নন্দন-কাননে আবার প্রবেশ করিল। অনুতাপের অশ্রুজলের এমনি অমোঘ শক্তি!—কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি না, কেন যে একজন ভাবুক কবি সেই অশ্রুজলের জন্য তাঁর স্বর্গচ্যুতা পরীকে ব্যাগ্‌ড়াতের নিভৃত নিলয়ে লইয়া গিয়াছিলেন? তিনি কি জানিতেন না যে, যে অনুতাপের অশ্রুজলে স্বর্গের দ্বার পর্য্যন্ত উদ্ঘাটিত হয় তাহা এই মর্ত্তভূমের দেশে দেশে—ঘরে ঘরে দিবানিশিই খরস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে?—এক দিন মাত্র কেহ যদি গভীর নিশীথকালে একটি নিরালয় স্থানে বসিয়া কল্পনার চক্ষে সমস্ত মর্ত্তভূমির কার্য্যকলাপ ভাবিয়া দেখেন, ত, তিনি দেখিতে পাইবেন যে এই সংসারে মন্দাকিনী অপেক্ষাও অনুতাপের অশ্রুলহরী অধিকতর প্রবহমানা;—তিনি দেখিবেন যে শতসহস্র কোমল হৃদয়া রমণীর অজ্ঞান পরিহৃত হৃদয়ের উৎসারিত অশ্রুজল;—শতসহস্র স্বামীর অস্থানে পরিন্যস্ত ভালবাসার নিভৃত নিলয় হইতে অনুতাপের অশ্রুজল—শতসহস্র মন্দভাগিনীর মর্ম্ম-অভিলষিত পাতকের জন্য হৃদয়ের গোপনীয় প্রস্রবণ হইতে জ্বলন্ত অশ্রুজল—শতসহস্র মহাপাতকীর মর্ম্মের অদৃশ্য অশ্রুসরোবরের অতল-স্পর্শ হইতে আকাশভেদী অশ্রুজল—এত—এত—এত—অশ্রুজল—একত্রে মিশিয়া সেই ত্রিযামা রাত্রির নিস্তব্ধ আকাশ মণ্ডলে তরঙ্গিত—উচ্ছ্বসিত হইতেছে!—আর কেনই বা তা হইবে না? কোন্ মানুষ বলিতে পারে যে সে অনুতাপের আগুনে জ্বলে নাই?—বাল্যকালের নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে—যৌবনের দুর্দ্দান্ত হৃদয়-ঝটিকায়, প্রৌঢ়াবস্থার অকিঞ্চিৎকর অথচ অপরিহার্য্য বৈষয়িক ব্যস্তসমস্ততে কে আপনাকে এতদূর সঠিক রাখিতে পারিয়াছে যে, সে বলিতে পারে যে "আমি কখনই অনুতাপ করিব না।"—কেহই সে কথা বলিতে পারে না।——

পৃথিবীতে ১২।১৪টি এমন নৈতিক নিয়ম প্রচারিত আছে,—যে তাহা সকলেরই প্রায় কণ্ঠস্থ। পৃথিবীর সুসভ্য প্রায় সকল লোকই জানে যে চুরি করা বা মিথ্যা কওয়া বা পরনিন্দা করা বিষম দোষের কার্য্য—কিন্তু

কত প্রকম অবস্থায় পড়িয়া যে কত লোক কি কায করিয়া ফেলে, তাহা কি কেহই কখন' দেখে ?—পৃথিবীর প্রচারিত নিয়মাবলির একটুমাত্র এদিক বা ওদিক হইলে সকলেই আমাকে ঘৃণা করিতে পারে বটে, কিন্তু পৃথিবীর ঘৃণার কথা আমি ধরিতেছি না—কারণ আমি যে কেন সে কাজ করিলাম, তাহা কি কেহই শুনিতে বা জানিতে বা পরীক্ষা করিতে অপেক্ষা করে ? রামচন্দ্র কেন সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন—যুধিষ্ঠির কেন যে "অশ্বত্থামা হত-ইতি গজ," বলিয়াছিলেন, দুষ্মন্ত কেন আশ্রমবাসিনী শকুন্তলার প্রতি প্রেম প্রকাশ করিয়াছিলেন, রত্নাবলী কেন যেউদয়ন রাজার প্রতি ভালবাসায় উন্মাদিনী হইয়াছিলেন, ইলইসা কেন যে প্রশান্ত ও পবিত্র কুমারিকা-আশ্রম প্রশান্ত প্রেমের অশ্রুজলে ভাসাইয়াছিলেন—তাহা কি সকলে শুনিবে ? অথবা শুনিয়াওবুঝিবে ? পৃথিবীতে মানুষের দোষ-গুণ বিচারের সময় মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার কথা কেহই প্রায় ভাবিয়া দেখে না। এবং তাহা না ভাবিয়া দেখাতে সংসারে যে সকল বিষময় ফল উৎপন্ন হয় তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিয়াছেন ? সুসভ্য সমাজের যেখানেই যাও, সেই স্থানেই গভীর-নৈতিক নিয়ম গুলি এমন কঠোর ও জমাট্-ভাবে মানুষের মনে খোদিত আছে যে তাহার তিলমাত্র ব্যতিক্রম হইলেই অপরাধী ব্যক্তি চিরকলঙ্কের ভাগী হইয়া সমাজ হইতে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। "চুরি করিও না"—"বিশ্বাস-ঘাতকতা করিও না"—"পরস্ত্রী বা পরপুরুষের উপরে অনুরাগের চক্ষে চাহিও না" ইত্যাদি শুভকর নৈতিক নিয়মগুলি চির-প্রচলিত ও বদ্ধমূল হইলেও অবস্থা-ক্রমে—অদৃষ্ট-ক্রমে—হৃদয়ের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার অনিবার্য্য গতি-ক্রমে মানুষে যে কি রূপে ঐ সকল নিয়ম সময়ে সময়ে লঙ্ঘন করিয়া ফেলে, তাহা কে ভাবিয়া দেখে ?—আমি যদি সহসা শুনি যে ম্যাক্‌বেথ নামে একজন বৈলাতিক রাজপুরুষ ও যোদ্ধা নিজের আলয়ে স্বদেশীয় রাজাকে অতিথি রূপে আহ্বান করিয়া পরে রাজ-সিংহাসন অভিলাষী হইয়া তাঁহাকে রাত্রযোগে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বধ করিয়াছিল, তাহা হইলে আমরা কি ম্যাক্‌বেথ্‌কে ঘৃণিত হইতেও ঘৃণিততর পিশাচ বলিয়া গণ্য করি না ? কিন্তু যদি সেই সঙ্গে আবার দেখি যে সেই সাহসী বীরপুরুষ ম্যাক্‌বেথের হৃদয়-বীণায় একটি এমন তার ছিল, যে তার অন্য সকল তার অপেক্ষাও প্রবলতর, কিন্তু একসঙ্গে থাকাতে তাহার প্রবলতা অপরিস্ফুট থাকিত,—অথচ তদীয় চণ্ডালিনী যে তারের সন্ধান পাইয়া ভালবাসা—পরিণামদর্শিতা—অনুরাগ—বিরাগ ও উত্তেজনার আঘাতে ক্রমাগত জাগ্রত করিয়া দুর্ব্বলমনা ম্যাক্‌বেথকে রাজ-হত্যা কার্য্যে প্রযুক্ত করিয়াছিল—যদি দেখি যে পরিণামে সেই ম্যাক্‌বেথ নিতান্ত শিশুর মত স্ত্রৈণ-পীড়নের বশবর্ত্তী হইয়া স্বীয় আলয় রাজরক্তে কলঙ্কিত করিয়াছিল—তখন কি সেই ম্যাক্‌বেথকে একই চক্ষে দেখি ?—আমরা জানি যে, পর-স্বামীর উপর

অনুরাগের চক্ষুতে দেখা ঘোরতর পাতক, কিন্তু যখন দেখি যে রত্নাবলী রাজা উদয়নকে ভালবাসিয়াও ভালবাসিতে চাহিতেছেনা—আবার ভালবাসিতে না চাহিয়াও ভালবাসিতেছে—যখন দেখি যে আত্মসংযমে দৃঢ়ব্রতী হইয়াও তিনি আত্মহারা হইতেছেন, আবার আত্মহারা হইয়াও আত্মসংযম করিতে চেষ্টা করিতেছেন—যখন দেখি যে রাজা উদয়নের চরণে আত্মবিসর্জ্জন করিতে তিনি ব্যাকুল, অথচ সেই আত্মবিসর্জ্জন হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য উদ্বন্ধনেও জীবন বিসর্জ্জন করিতে পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন—তখনও কি রত্নাবলীকে আমরা "পর-স্বামী-লোলুপ পাতকিনী" বলিয়া ঘৃণা করিব?—অ্যাবিলার্ডের সঙ্গে কি সীজর বর্জীয়ার—হিলইসার সঙ্গে কি ক্লিওপেট্রার আমরা তুলনা করিব? কিন্তু সংসারে কে না তাহা করিয়া থাকে? পৃথিবীতে কজন লোক আমাদের পদস্খলনের ভূমিকা হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া থাকে?—একটি কারাগারে প্রবেশ কর—দেখিবে শতসহস্র লোক সেখানে বন্দী—হয় ত শুনিবে যে, সেই শতসহস্র লোকই চোর। তুমি স্বভাবতই সকলের উপর ঘৃণার কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া এই ভাবিতে ভাবিতে গৃহে ফিরিয়া আসিবে যে "পৃথিবীতে কতই চোর আছে, ছিঃ!"—কিন্তু এরূপ কেহই ভাবে না যে হয় ত ঐ সকল বন্দীদের মধ্যে এমন চোরও কেহ কেহ আছে, যাহারা দারুণ দুর্ভিক্ষের সময় নিতান্ত নিঃসহায় ও নিরাশ হইয়া স্বীয় পতিপ্রাণা মুমূর্ষু প্রণয়িনী বা অপোগণ্ড মৃতকল্প শিশুগুলিকে যৎকিঞ্চিৎ আহার দিয়া বাঁচাইবার জন্য একজন পাষাণ-হৃদয় সুকৃপণ ধনীর ধন অপহরণ করিয়াছে। হয় ত সেই অপহরণ কার্য্যের তীক্ষ্ণ শেল তাহাদেরই হৃদয়ে বিষবৎ বিঁধিয়াছে—হয় ত তাহারাই নিজ পাপের জন্য ঈশ্বরের চরণ-যুগল অনুতাপের অশ্রুজলে প্রক্ষালিত করিয়াছে—হয়ত তাহারাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, সম্মুখে স্ত্রী-পুত্র অন্ন বিহনে মরিয়া যাইলেও আর তাহারা ওরূপ কার্য্য করিবে না।—কিন্তু সমাজের কে তাহাদের মনের ভিতর প্রবেশ করে?—কেই বা তাহাদের সকল অবস্থা ভাবিয়া তাহাদের প্রতি ঘৃণার কটাক্ষ একটু-মাত্র অপসারিত করিয়া লয়? সকলেই হয় ত বলিবেন যে "অপরাধীদের সকল অবস্থা জানিতে পারিলে আমরাও মমতা করিতে পারি"—কিন্তু অপরাধীদের সকল অবস্থা জানিবার জন্য কে ব্যাকুল হয়? আমরা কি সচরাচর এক ব্যক্তিকে অপরাধী মাত্র শুনিয়াই তাহাকে মনে মনে দ্বীপান্তরিত করিতে চাহি না? আমরা নিজেই অনেক বিষয়ে দারুণ অপরাধী হইয়াও কি আমাদের অন্যতম দোষে দোষীকে ঘৃণার আদর্শস্থল মনে করি না? ইয়াগোর মত নরপিশাচরাও কি সরল স্বভাব কেশীয়োকে মদ্যপায়ী বলিয়া হাস্যাস্পদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয় না? একজন গৃহ-বিচ্ছেদক—কুটিলমনা—সর্ব্বনাশ-কারিণী তাড়কা রাক্ষসীও কি এক-

জন পবিত্রমনা অথচ প্রেম-মুগ্ধা অবলাকে "অসতী" বলিয়া ঘৃণা করিতে স্পর্দ্ধিত হয় না? ছিঃ ছিঃ সংসারের এই সকল বিচার দেখিয়া কখন হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, কখন হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া যায়! অথচ কেহই কাহারও অপরাধের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে দৃক্‌পাতও করিবেন না। আমরা দেখিতে পাই যে "বেশ্যা" কথাটি উচ্চারণ করিলেই, যে রমণীতে সে কথা প্রযুক্ত হইতে পারে, লোকে তাহাকে একেবারে অধম হইতেও অধমতর পশুর মধ্যে গণনীয় করিয়া লয়—কিন্তু যদি কেহ আজ সমস্ত বেশ্যামণ্ডলের ইতিবৃত্তান্ত জানিতে সাহসী হয়েন, ত হয় ত তিনি শুনিতে পাইবেন যে প্রকৃতির অনেক সরলা বালিকারা প্রবঞ্চকের ঐন্দ্রজালিক ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া, অথবা কল্পিত দেবতার উপর আত্মসমর্পণা করিয়া, অথবা আপনার সঙ্গে দুদ্ধর্ষ সমর করিয়া পরাজিত হইয়া শেষে কলঙ্ক-সাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছে! হয় ত ঐ সকল অভাগিনীদের অবস্থাতে দেবতারাও পড়িলে কি করিতেন বলা যায় না,—কিন্তু মানুষ বলিয়াই তাহারা পৃথিবীর ঘৃণিত ও সমাজের পরিত্যক্ত!—সমাজের পরিত্যক্ত হউক্, কিন্তু তাহাদিগকে একটু দয়ার চক্ষে দেখিলেই কি মহাপাতক হয়? হা হৃদয়! যদি এই মনুষ্য-শরীরেই নিতান্তই বাস করিবে, ত কেন সর্ব্বশক্তিমান হইয়া আসিলে না? হৃদয়-বিহীন লোকেরই ত পার্থিব সমাজে আদর ও প্রতিষ্ঠা!—যিনি ছলে, কলে, কৌশলে ধন উপার্জ্জন করিতেছেন ও সামাজিক নীরস অঙ্কশাস্ত্রের অনুসারে আদান প্রদানের হিসাব ঠিক রাখিতে পারিয়াছেন, এবং ঘড়ীর কাঁটার মত লোক লৌকিকতা বিষয়ে একটী চুল-মাত্র ব্যতিক্রম করেন না, তিনিই সমাজের পূজ্য দেবতা ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানের উপমাস্থল! তবে আর হৃদয়ের আবশ্যকতা কোথায়? আমি কর্ত্তব্য-জ্ঞানে জানিতেছি যে "মিথ্যা কথা কহায় মহা-পাপ"—কিন্তু একদিন দেখিলাম যে একজন নিঃসহায়া যুবতী সতী একটী ঘোর পশুবৎ চণ্ডালের দ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া একটী পর্ব্বত-কন্দরে লুকাইয়া নিতান্ত ব্যাকুল ভাবে আমাকে বলিল যে "আমি যে এখানে লুকাইয়াছি—তাহা ও পামরকে বলিও না"—সহসা সেই পশুবৎ চণ্ডাল আসিয়া সেই যুবতী কোথায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—আমি বলিলাম যে "আমি জানি না।"—সমাজ!—আমি কি এই মিথ্যা কথার অপরাধে বাস্তবিকই অপরাধী হইলাম?—হইলেও হইতে পারি, কিন্তু, হে মানব-সমাজ! তোমার বিচার-ক্ষমতা আমি বুঝিয়াছি! আমি ঘোর পাতকী হইলেও তোমার "ডিক্রী ডিস্‌মিস্" অনুসারে আর লোমাঞ্চিত বা বিকম্পিত হইব না! কবিবর বায়রণের ব্যাপার হইতে জানিয়াছি এবং সামাজিক প্রায় সকল ব্যাপারেই দেখিতে পাইতেছি যে অপরাধীর প্রতি অগ্রে তোমার দণ্ড-আজ্ঞা, তাহার পরে অপরাধের বিবরণ পরীক্ষা, তাহার পরে অপরাধের অপরাধিত্ব আলোচনা, এবং সকল শেষে "কে অপরাধী" তাহাই বিবেচ্য! ছিঃ ছিঃ এই জন্যই

অনেক সহৃদয় লোকেও সমাজ-দ্বেষী হইয়া থাকে! একটি অপরাধের সমস্ত ঘটনাগুলি বিবেচনা না করার জন্য এক পরিবারের মধ্যে কলহ ও অশান্তি বিরাজ করে—উদারতার দ্বার রুদ্ধ হয় ও সাধু ইচ্ছার ভাব মরুময় হইয়া যায়? অপরাধী হয় লোক-গঞ্জনাতে ম্রিয়মাণ হইয়া শেলীর মত চির-কালেই কষ্ট পায়, নহেত ক্রুদ্ধ হইয়া বায়রণের মত প্রতিহিংসার বজ্র চারিদিকে ক্ষেপণ করিতে চেষ্টা করে। হৃদয়ের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা বা অমোঘ অদৃষ্ট-জনিত অপরাধ সমূহের পরিমাণ যন্ত্র সমাজের কথা বা কটাক্ষ নহে—তাহাদের পরিমাণ যন্ত্র অপরাধীদের অনুতাপের অশ্রুজল। রত্নাবলীর অপরাধ বাসবদত্তার তিরস্কারের দ্বারা পরিমিত হয় না, তাহা রত্নাবলীর অনুতাপের অশ্রুজলের দ্বারাই পরিমিত হইতে পারে। শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যানের জন্য দুষ্মন্তের অপরাধ গৌতমী ও কণ্ব-শিষ্য দ্বারা পরীক্ষিত হইতে পারে না, তাহা কেবল দুষ্মন্তেরই অনুতাপের অশ্রুজল দ্বারা পরীক্ষিত হইতে পারে! যদি কেহ যত্ন করিয়া সেই অশ্রুজল বিশ্লেষ করিয়া দেখেন, ত তিনি দেখিতে পাইবেন যে সেই অশ্রুজলে অপরাধ স্বীকার—অপরাধের গুরুত্ব স্বীকার—সে অপরাধ আর করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা—ও আপনার দ্বারাই আপনি দণ্ডিত হওয়ার জন্য কতকটা শাস্তি—এই কয়েকটী উপাদান বিদ্যমান আছে! এই জন্য অনুতাপের অশ্রুজলের এতদূর গৌরব! সে অশ্রুজলে স্বার্থপরতা নাই, পার্থিব কলঙ্ক নাই, সঙ্কুচিত ন্যায়শাস্ত্র নাই! তাহা অনাবৃত হৃদয়ের উদারতাময়, বর্ত্তমান কালে যাতনাময় হইলেও ভবিষ্যতের শান্তির অঙ্গীকার স্বরূপ! পৃথিবীর সকল লোককে যদি আমরা ভাবিয়া দেখি, ত দেখিতে পাইব, যে পৃথিবীতে তিন প্রকার লোক আছে। কোন লোক শত সহস্র প্রলোভনের মধ্যেও হিমাচলের মত অচল ও অটল থাকে,—প্রাকৃতিক সকল দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিয়া—শরীরের উপর, স্বীয় হৃদয়ের উপর, অসঙ্কুচিত আধিপত্য বিস্তার করিয়া মূর্ত্তিমান মহান ভাবের ন্যায় বিরাজ করিতে থাকেন!—ইহাঁদের আর অনুতাপের কারণ নাই—ইহাঁরা ধৈর্য্য বা স্থৈর্য্য বা গাম্ভীর্য্যের উদাহরণ স্থল হইয়া পড়িয়াছেন!—ইহাঁরাই এই পৃথিবীতে ধন্য!—এই জন্যই আমরা লক্ষ্মণ ও ভীষ্মদেব ও অর্জ্জুনকে এত প্রশংসা করি। কিন্তু পৃথিবীতে আর এক শ্রেণীর লোক আছে—তাহারা অন্যায় কার্য্য করে—গভীর অন্যায় কার্য্য করে, অথচ তাহাদের মনে অনুতাপ কখনই হয় না! পাপের কল্পনাতে—পার্থিব ক্ষমতার প্রভাবে পুনঃ পুনশ্চ পাতকের অভিনয়ে স্বীয় হৃদয়কে এতদূর পাষাণ করিয়াছে যে তাহাদের মনে অনুতাপের অগ্নির ধূম পর্য্যন্ত উঠে না! সীজার বর্জীয়া স্বীয় সহোদরাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিতে—স্বীয় পিতাকে হত্যা করিতে—স্বদেশীয় সুরূপা কামিনীকে বিবাহ-যজ্ঞ হইতে সবলে কাড়িয়া লইতে কখন সঙ্কুচিত হয় নাই!—কারণ, সীজার বর্জীয়ার সমস্ত হৃদয় পাপে এতদূর সংলগ্ন—যে মরিবার

কালেও সে ইহাদের কথা উল্লেখ করে নাই! এই সকল লোকের কথা আমরা ধর্ত্তব্যের মধ্যে মনে করি না। চন্দ্রে যেমন কলঙ্ক আছে পৃথিবীতে যেমন সর্প ও শার্দ্দূল আছে, মনুষ্য-সমাজেও বর্জীয়া বা চেঞ্চী বা আইরীণের মত পুরুষ ও রমণী থাকিবে। কিন্তু পৃথিবীতে প্রথম শ্রেণীর পর্ব্বত সদৃশ মহান ভাবের প্রতিমা যেরূপ বিরল, দ্বিতীয় শ্রেণীর বিভীষিকাময় মূর্ত্তিও তদ্রূপ বিরল। পৃথিবী ভীষ্মদেবময় হইলে যেমন তাহা স্বর্গতুল্য হইত, আবার বর্জীয়া বা চেঞ্চীময় হইলে তাহা প্রকৃত নরক-প্রতিম হইত। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে পৃথিবী স্বর্গও নয়, পৃথিবী নরকও নয়—পৃথিবী পৃথিবীই! আমরা প্রথম শ্রেণীর লোক-দিগকে ভক্তি করি—দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক-দিগকে ঘৃণা বা ভয় করি, কিন্তু এই দুই শ্রেণী ব্যতীত আর এক শ্রেণীর লোক আছে. যাহাদিগকে আমরা দয়া করি—যাহাদি-গকে আমরা কৃপাপাত্র মনে করি! তাহারা কে?—তাহারা পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ সকলেই! গভীর রজনীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে জিজ্ঞাসা কর—দূর দূরস্থ পরিহাসময়ী তারকাদিগকে জিজ্ঞাসা কর—তাহারা সকলেই সমস্বরে বলিবে যে ঐরূপ কৃপাপাত্র পৃথি-বীর প্রায় অধিকাংশ সকলেই! প্রতি নৈশ বায়ু হিল্লোলেই কবি ট্যাসোর দীর্ঘশ্বাস শুনিতে পাইবে, এমী রবসার্টের ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিতে পাইবে—সর্ব্বত্যাগিনী ইলাইসার বা সর্ব্বচ্যুতা রেবেকার মর্ম্মভেদী আর্ত্ত-রব শুনিতে পাইবে! কিন্তু সে সকল রোদনধ্বনি কে শুনে? "বাইরণ নীতিভ্রষ্ট ছিল—এমী রবসার্ট পদাভিলাষী ছিল, রেবে-কার দুর্ব্বল হৃদয় ছিল—সুতরাং সকলেই হেয়—ঘৃণ্য—অভিশপ্ত!"—হইতে পারে তাঁহারা অভিশপ্ত!—কিন্তু তাহার জন্যই কি তাঁহারা দয়া ও মমতার সামগ্রী নহেন? এমন শত সহস্র অপরাধী হয় ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য অনবরত অনুতাপের অশ্রু-জল বিসর্জ্জন করিয়াও আবার সেই অপ-রাধে দিন দিন অপরাধী হইতেছে! কিন্তু তথাপি কি তাহারা কৃপাপাত্র নহে! আমরা জানি যে এক সময়ে একটি প্রকাণ্ডকার হস্তী একটি বালুকাময় স্বল্প-জল নদী পার হইতে গিয়া নদীর বালুকা মধ্যে প্রোথিত হইয়া যায়—হস্তী যতই শক্তি সহকারে উ-ঠিতে চেষ্টা করিতে লাগিল ততই আপ-নার দেহের ভরে বালুকা মধ্যে গাঢ়তর রূপে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল,—চারিদিকের লোকেরা নিরুপায় হইয়া দেখিল যে হস্তীটি ক্রমে ক্রমে পাতালসাৎ হইয়া গেল। মানু-ষেরও কি এইরূপ হয় না?—পরিহার্য্য পাপে লিপ্ত হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে যাইয়াও কি সময়ে সময়ে গভীরতররূপে সেই পাপে নিমজ্জিত হইতে হয় না?—প্রতিপদে অপরাধ—প্রতিপদে অনুতাপ—অথচ প্রতিপদে সেই অপরাধের পুনঃ পুনঃ অভিনয়—ইহা সত্ত্বেও কি সেই অপরাধী কৃপাপাত্র নহে? যদি তাহা না হয়—ত—জগদীশ্বর! আর কেন আমাদের উপর জীবনের বিড়ম্বনা!

মনু ও বেদের অব্দ নির্ণয়।

প্রলয়ের পূর্ব্বেও যে শ্রুতির কিয়দংশ রচিত হইয়া পৃথিবীতে প্রচলিত ছিল তাহা প্রলয়ের পর বেদোদ্ধার প্রসঙ্গে অবগত হওয়া যাইতেছে। এবং এই প্রলয় বৃত্তান্তও বেদের শতপথ ব্রাহ্মণের প্রলয়োপাখ্যানে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, ইহাও অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত বিসংবাদী নহে। আমরা ঐ বৃত্তান্তের কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

"স হোবাচ অপীপরং বৈত্বা বৃক্ষে-
নাবং প্রতিবধ্নীষ। স্বং তু ত্বা মা
গিরৌ সন্তমুদক মন্তশ্চৈৎসীৎ যাব-
দুদকং সমবায়াৎ তাবং তাবদন্বব-
সর্পাসীতি। সহ তাবত্তাবদেবান্ববস-
সর্প॥"

তিনি (মৎস্য) কহিলেন আমি তোমাকে রক্ষা করিয়াছি, তুমি এই বৃক্ষে নৌকাবন্ধন কর। কিন্তু তুমি এই পর্ব্বতে থাকিতে থাকিতে জল যেন তোমাকে ছাড়িয়া না যায়। জল যত নীচে নামিতে থাকিবে তুমিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তত নামিতে থাকিবে। তিনিও তত (অর্থাৎ জলের অবতরণ অনুসারে) অবতরণ করিলেন।

যে শৃঙ্গে মনু নৌকাবন্ধন করিয়াছিলেন বেদব্যাসের সময়ে তাহা নৌবন্ধন নামে প্রসিদ্ধ ছিল। যথা—

অথাব্রবীৎ তদা মৎস্যস্তানৃষীন্ প্রহসন্ শনৈঃ।
অস্মিন্ হিমবতঃ শৃঙ্গে নাবং বধ্নীত মা চিরম্।
সা বদ্ধা তত্রত তূর্ণ মৃষিভি র্ভরতর্ষভ।
নৌ মৎস্যস্য বচঃ শ্রুত্বা শৃঙ্গে হিমবতস্তদা।
তস্য নৌ-বন্ধনং নাম শৃঙ্গং হিমবতঃ পরং॥
খ্যাতমদ্যাপীত্যাদি।
মহাভারত।

অনন্তর মৎস্য হাসিতে হাসিতে সেই ঋষিদিগকে কহিলেন এই হিমবানের শৃঙ্গে শীঘ্র নৌকা বন্ধন কর। হে ভরতর্ষভ, মৎস্যের বচন শ্রবণ করিয়া ঋষিরা সেই নৌকাখানি সেখানে বন্ধন করিলেন। সেই হেতু সেই শৃঙ্গ অদ্যাপি নৌবন্ধন নামে খ্যাত আছে।

যদি এই সকল বচন বিশ্বাস করা যায় অর্থাৎ বেদ প্রলয়ের পূর্ব্বেও রচিত হইয়াছে এরূপ বিশ্বাস করা যায় তবে বেদশাস্ত্র দ্বারা ৫০০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা সকলও প্রমাণিত হইতে পারে এ কথাও বিশ্বাস করা যাইতে পারে। কিন্তু বেদের সমুদায় অংশ দ্বারা যে ঐরূপ সপ্রমাণ হয় এ কথা বলা যায় না। কারণ সমুদায় সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ ঐ প্রাচীন কালের রচিত নহে। ঋকৃসূত্র সকলকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম বলিয়া বোধ হয়। ভূরি ভূরি ইতিহাসবিৎ ও ভাষাতত্ত্বজ্ঞেরা তাহাই সপ্রমাণ করিয়াছেন। ইহারাই যে অক্ষর সৃষ্টির পূর্ব্বে আর্য্যজাতির উচ্চার্য্যমান ভাষার সহিত অথবা আর্য্যজাতির সমুদ্ভবের সাহত রচিত, শ্রুত, ও রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে এরূপ অনুমান করা যা-

হইতে পারে। কিন্তু এই ঋক্ সূত্র সকলের মধ্যে আবার কোন্ গুলি পূর্ব্ববর্ত্তী ও কোন্ গুলি তৎপরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়াছে তাহা অনুমান করার কোন সুবিধা নাই, তবে সামান্যতঃ এই কথা বলা যাইতে পারে যে আর্য্যাদিগের এদেশে আগমন, অত্রত্য আদিমবাসীদের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ ও অধিকার বিস্তার সূচক বিবরণ সমুদায়কে যেমন এদেশে আগমনের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময়ে রচিত বলিয়া বোধ হয় তেমনই ইহাঁদের এই সকল ঘটনার পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয় সূচক ও ইহাঁদিগের পূর্ব্বাবাসভূত হিমালয়ের অপর পার্শ্বস্থ দেশ সম্বন্ধীয় নানাবিধ ঘটনাবলী ও তৎসম্বন্ধীয় প্রকৃতিমূলক বিবিধ বিষয় যাহা এদেশ সম্ভাবিত বলিয়া কোন মতে প্রতীত হইতে পারে না সেই সকল রচনাই ঐ সকল রচনার পূর্ব্বকালবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়।

এক্ষণে দেখা যাউক যে এই পূর্ব্ববর্ত্তী কাল কোন্ কাল হইতে পারে। যদি সংস্কৃতভাষী ব্যাসের সময়ের সেই সেই উন্নতি সাধন করিতে ভারতবর্ষীয় ঋক্ সূত্র ভাষা ব্যবহারী অনুন্নত আর্য্যাদিগের অন্ততঃ ১৫০০ বৎসরও লাগিয়া থাকে তবে যুদ্ধ বিগ্রহাদিসূচক ঋক্ সকল অন্ততঃ ৪৩৩০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। ফলতঃ যদি সমভাষা ব্যবহারী ব্যাস ও কালিদাসের সময়ের Accelerating motion এর উন্নতির মধ্যে ১৩০০ বৎসর বিগত হইতে পারে তবে সংস্কৃতভাষী ব্যাস ও ব্রাহ্মীভাষা ব্যবহারী অপেক্ষাকৃত অমার্জ্জিত প্রকৃতিক ছন্দঃপ্রণেতা ঋষিগণের মধ্যে যে অন্ততঃ ১৫০০ বৎসর অতিবাহিত হইয়া থাকিবে তদ্বিষয়ে কোনও আপত্তি হইতে পারে না। অতএব তদনুসারে ব্যাসের প্রাদুর্ভাব সময় এখন হইতে স্থূলতঃ ৩৩০০ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আর ১৫০০ সমুদায়ে ৪৮০০ হওয়াতে ছন্দঃ প্রণেতৃ ঋষিগণের প্রাদুর্ভাব সময় এখন হইতে স্থূলতঃ ৪৮০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমিত হইতে পারে।

এদিকে দেখা যাইতেছে যে প্রায় সমুদায় প্রাচীন জাতীয় শ্রুতি ও শাস্ত্রে জগৎ প্রসিদ্ধ সর্ব্বপ্রধান প্রলয় ঘটনা ঐ রূপ সময়ের বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং পরম সম্মাননীয় ঋক্ সূত্র সকলের মধ্যেও কতক গুলি, দেশান্তর হইতে আর্য্যাদিগের এদেশে আগমন ও রাজ্যাধিকার ঐ প্রলয়ের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বলিয়াই প্রমাণ প্রদান করিতেছে। যথা—

"তেনৈতমুত্তরং গিরিমতিদুদ্রাব। সহোবাচ অপীপরং বৈত্বা বৃক্ষে নাবং প্রতিবধ্নীষ। ত্বং তু মা গিরৌ সন্তমুদক মন্তশ্ছৈৎসীৎ যাবদুদকং সমবায়াৎ তাবৎ তাবদম্ববসর্পাসীতি। সহ তাবত্তাবদেবান্ববসসর্প। তদপ্যেতদুত্তরস্য গিরে র্মনোরবসর্পণমিতি।

শতপথব্রাহ্মণ।

তদ্দ্বারা তিনি (মনু) এই উত্তর পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন। তিনি (মৎস্য) কহিলেন আমি তোমাকে রক্ষা করিয়াছি, তুমি এই বৃক্ষে নৌকা বন্ধন কর। কিন্তু জল যেন গিরি স্থিত তোমাকে ছাড়িয়া দূরে না যায়। যে যে পরমাণে জল নামিতে থা-

কিবে সেই সেই পরিমাণে তুমিও অবতরণ করিবে। তিনিও সেই জলের অবতরণ অনুসারে অবতরণ করিতে লাগিলেন। এই সেই মনুর উত্তর পর্ব্বত হইতে প্রসিদ্ধ অবতরণ বৃত্তান্ত।

অতএব প্রলয়ের অব্যবহিত পরেই মনুর আগমন সূচিত হইতেছে। তাহা হইলে ঐ আগমন অবশ্যই এখন হইতে পশ্চাৎবর্ত্তী ৪৯৮০—৮১ বৎসর মধ্যে হইয়াছিল। ফলতঃ মনু যে এদেশে আসিয়া অত্রত্য অধিবাসীগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন ও অবশেষে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া আর্য্যদিগের এদেশে প্রথম রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা ভূরি ভূরি ঋক্ সূত্র দ্বারাও অবগত হওয়া যাইতেছে। আমরা এস্থলে তাহার দুই একটি উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

অথ দাসস্য নমুচেঃ শিরো
যদাবর্ত্তয়ো মনবে গাতু মিচ্ছন্।
স্ত্রিয়ো হি দাস আয়ুধানি চক্রে
কিংমাং করন্নবলা অস্য সেনাঃ॥
অন্তর্হি অখ্যদুভে অস্যধেনে
অথোপপ্রৈদ্ যুধায় দস্যুমিন্দ্রঃ॥

৫।৩০।৭,৯।

মনুর যশোগান করিতে ইচ্ছা করিয়া তুমি (ইন্দ্র সম্বোধন) নমুচি নামক দাসের শিরশ্ছেদ করিয়াছ। (অর্থাৎ তোমার ইচ্ছায় মনু নমুচিকে হত করিতে সক্ষম হইয়াছেন) দাসেরা তাহাদিগের স্ত্রীগণকেও যুদ্ধ করাইয়াছিল কিন্তু তাহাদিগের অবলা সেনারা আমাদিগের কি করিতে পারে। তাহারা দুইটি সুন্দরী স্ত্রীকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। অনন্তর ইন্দ্র যুদ্ধের নিমিত্ত গমন করিলেন।

ইন্দ্রঃ সমৎসু যজমান মার্য্যং প্রাবদ্ বিশ্বেষু শতমূতি রাজিষু স্বর্মী হেলষু আজিষু। মনবে শাসদব্রতান্ ত্বচং কৃষ্ণামরন্ধয়ৎ॥

ইন্দ্র * পুনঃ পুনঃ শত শত প্রাণঘাতী স্বর্গপ্রদ যুদ্ধে অব্রতদিগকে (দস্যু প্রভৃতি জাতিকে) শাসন করিয়া যজমান আর্য্যদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, তিনি ঐ কৃষ্ণত্বক্দিগকে (দস্যু প্রভৃতিকে) মনুর অধীন করিয়াছেন। অর্থাৎ ইন্দ্রের প্রসাদে মনু জয়ী হইয়াছেন।

প্রাচীনকালের আর্য্যেরা আপনাদিগের কার্য্য সকল দেবতাতে আরোপণ করিতেন, অতএব স্বয়ং ইন্দ্রকর্ত্তৃক এই সকল কর্ম্ম কৃত হইয়াছিল এমন মনে করিবেন না। তাহার প্রমাণার্থ আমি একটি স্পষ্ট উদা-

* ইন্দ্র আর্য্য রাজাদিগের উপাসনীয় যুদ্ধাধিদেব। বজ্র ইঁহার অমোঘ অস্ত্র। মেঘ বৃষ্টি ইঁহার আয়ত্ত। ইঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত শস্যাদি উৎপন্ন হয় না, শস্য না হইলে সমুদায় জীব নষ্ট হয়, সুতরাং সমুদয় লোক ও দেবতারা ইঁহার অধীন যুদ্ধাধিদেব বলিয়া ইঁহাকে দেবরাজ বলা যায়। বিদ্যুৎ হেতুক ইনি সহস্র লোচন, তাহা ইঁহার সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত। ইঁহার পূজা রাজগণ মধ্যে বহু কালাবধি চলিয়া আসিতেছে। এখনও কৌমুদী বা ইন্দ্রধ্বজ নামে একটি উৎসব হইয়া থাকে।

হরণ দিতেছি যথা "ত্বং করঞ্জ মত পর্ণয়ং বধী তেজিষ্ঠয়া হৃতিথিগ্বস্য বর্ত্তনী।" ১।৫৩।৮। তুমি অতিথিগ্বের তীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা করঞ্জ ও পর্ণয়কে বধ করিয়াছ। করঞ্জ ও পর্ণয় বধ স্বয়ং ইন্দ্র কর্তৃক হইলে অতিথিগ্বের ভল্ল দ্বারা এ কথাটির উল্লেখ করার আবশ্যক হইত না। এরূপ স্তোত্র সকলের অর্থ এই যে তুমি অতিথিগ্ব কর্তৃক ভল্ল দ্বারা ঐ উভয় দস্যুকে হত করিয়াছ—বা তোমার উদ্ধার বা অনুগ্রহে বা বরে অতিথিগ্ব উহাদগকে বধ করিয়াছেন।

য ঋক্ষাদং হসো মুচদ্ যো বা
আর্য্যাৎ সপ্তসিন্ধুষু বধর্দাসস্য তু
বিনৃম্ন নীনমঃ। ঋক্ ৮।২৪।২৭।

যিনি আমাদিগকে হিংস্র শত্রু হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সেই শক্তিমান্ সপ্ত সিন্ধু দেশে * আর্য্যগণ হইতে দাসদিগের বজ্র বিনিবর্ত্তিত করিয়াছেন।

এই সকল এবং এরূপ আর আর বহু প্রমাণ দ্বারা প্রলয়ের পরেই অর্থাৎ এখন হইতে ৪৯৮১ বৎসর পূর্ব্বে যে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষভূত আর্য্যেরা ও তাঁহাদিগের প্রধানভূত মনু এদেশে আগমন করিয়া আমাদিগের প্রথম রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন এরূপ প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। এরূপ অনেক ঋক্‌সূত্র দেখা যায় যাহা ঐ সকল যুদ্ধ ঘটনাই বিজ্ঞাপন করিতেছে। অতএব ঐ ঋক্ সকল যে ৪৯৮১ হইতে কোন নিকটবর্ত্তী কালের মধ্যে রচিত হইয়াছে তাহাও অনুমিত হইতে পারে। কারণ মনুর আগমন, মনুর সহিত দাসদিগের যুদ্ধ, মনুর জয়লাভ এই সকল ঘটনা অবশ্যই মনুর সমকালবর্ত্তী বা তাহার পর কোন আসন্নকালবর্ত্তী লোকদিগের রচিত হইবে। কিন্তু মনুর আগমন ৪৯৮০ বৎসর পূর্ব্বে অনুমিত হইতেছে অতএব এতাদৃশ ঋক্ সকলও ঐ কাল বা তাহার সন্নিহিত কোন কাল হইবে। কারণ তাদৃশ কালের রচিত না হইলে "আমাদিগের কি করিতে পারে, আমার কি করিতে পারে, আমি করিতেছি" ইত্যাদি অস্মদ্ শব্দের ও বর্ত্তমান ক্রিয়ার প্রয়োগ হইত না। এবং স্থলে স্থলে এক এক দেশ জয়ের নিমিত্ত উৎসাহ ও স্তুতিপাঠাদিও দৃষ্ট হইত না। আমরা সেইরূপ দুই একটি ঋক্ উদ্ধার করিয়া দিতেছি। যথা—

অভাদমেকমেকো অস্মি নিষাল অভিদ্বা কিমু ত্রয়ঃ করন্তি। খলে ন পর্যান্ প্রতি হন্মি ভূরি কিং মা নিন্দন্তি শত্রবোঽনিন্দ্রাঃ। ১০।৪৮।৭।

আমি একাকী এই এক শত্রু জয় করিতেছি, আমি দুই শত্রু জয় করিয়াছি, তিনজনেই বা আমার কি করিতে পারে। প্রাঙ্গণে শস্য বাহের ন্যায় আমি অসংখ্য শত্রু নিপাত করি। ইন্দ্রদ্বেষী শত্রুরা কেন আমাকে নিন্দা করে।

অহং পুরো মন্দসানো ব্যৈরং নবসাকং নবতীঃ শম্বরস্য শততমং বৈশ্যং সর্ব্বতাতা দিবোদাস মতিথিগ্বং যদাবম্। ।২৬।৩।

আমি উৎসাহিত হইয়া এককালে

* এই সপ্তসিন্ধু দেশ যে ভারতবর্ষ তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

শম্বরের ৯৯ নগর ধ্বংশ করিয়াছি এবং শততম নগর তাহাকে বাসকরণার্থ প্রদান করিয়াছি এবং দিবোদাস অতিথিগ্বকে রক্ষা করিয়াছি।

এই সকলকেও যদিও কেহ অতীত ঘটনার অনেক পরবর্ত্তী অনুমান করিতে পারেন, তথাপি দাসদিগের সহিত যুদ্ধে জয়লাভের ভবিষ্যৎকালসূচক প্রার্থনা গুলিকে কখনই সেরূপ মনে করিতে পারেন না। যথা—

অস্মন্নন্নং সমং তদহি দুনাশং যো ন তে ময়ঃ। অস্মভ্যমস্য বেদনং দদ্ধি সূরিশ্চিদোহতে। ১।

কঠিন হইলেও অহোমকারী, সুতরাং অবহেলনকারীদিগকে তোমরা বধ কর। আমাদিগকে তাহাদিগের ধন প্রদান কর। পূজকেরা ইহা আশা করে।

যো নো দাস আর্য্যো বা পুরুষ্টুত অদেব ইন্দ্র যুধয়ে চিকেতধি। অস্মাভীষ্টে সুসহাঃ সন্তু শত্রবস্ত্বয়া বচং তানং বনুয়াম সঙ্গমে। ১০।৩৮।৩।

হে অনির্ব্বচনীয় ইন্দ্র, দাসই হউক আর আর্য্যই হউক যে অদেব পুরুষ আমাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে সেই শত্রুগণ যেন আমাদিগকর্ত্তৃক অনায়াসে দমিত হয়, আমরা যেন তাহাদিগকে সংগ্রামে বধ করিতে পারি।

দাসা চ বৃত্রা হত আর্য্যাণি চ সুদাসমিন্দ্রাবরুণা বসাবতম্। ৭।৮৩।১।

দাস সকলকে এবং শত্রুভূত আর্য্যদিগকে বধ কর। হে ইন্দ্র বরুণ তোমরা আশ্রয় প্রদান করিয়া সুদাস রাজাকে রক্ষা কর।

হতো বৃত্রাণি আর্য্যা হতো দাসানি সত্যতী হতো বিশ্বা অসদ্বিষঃ। ৬।৬০।৬।

হে ধার্ম্মিকবর সকল তোমরা আমাদিগের আর্য্যশত্রু এবং আমাদিগের দাসশত্রুদিগকে (যাহারা আমাদিগকে ঘৃণা করে) বধ কর।

ত্বং তাং ইন্দ্র উভয়াং অমিত্রান্ দাসা বৃত্রাণি আর্য্যা চ শূরং, বধীঃ। ৬।৩৩।৩।

হে শূর ইন্দ্র তুমি দাস এবং আমাদিগের যে সকল আর্য্য শত্রুপক্ষে গিয়াছে তাহাদিগকে বধ কর।

ইন্দ্র জামর উত যে অজাময়ো অর্ব্বাচীনাসোবনুষো যুযুজে। ত্বমেষাং বিথুরা শবাংসি জাহি বৃষ্ণ্যানি কৃণুহি পরাচঃ। ৬।২৫।২,৩।

হে ইন্দ্র যাহারা আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে তাহারা আত্মীয়ই হউক আর অনাত্মীয়ই হউক তাহাদিগের ক্ষীণবলকে বিনাশ কর, তাহাদিগকে পরাস্ত কর।

যদিও মনুর পরবর্ত্তী কক্ষীবান্ উশশঃ ঋজিশ্বান অতিথিগ্ব পুরুকুৎস তৎপুত্র ত্রসদস্যু ও পুরু, তূর্ব্বযাণ দভীতি, সুদাস সুশ্রবা পুরূরবা দিবোদাস প্রভৃতি রাজাদিগের সহিতও সময়ে সময়ে বিদ্রোহকারী দস্যুদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল ও তত্তৎকালে এরূপ প্রার্থনা সূচক ঋক্ সকল রচিত হইয়াছিল দেখা যাইতেছে এবং মনুসময়ের রচিত বলিয়া কোন বিশিষ্ট ঋক্ আমরা আপাততঃ প্রাপ্ত হইতেছি না

তথাপি ঐ সকল রাজাদিগের সময় ও মনু সময় হইতে অধিক দূরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয় না; কারণ এই পুরূরবা মনু হইতে তৃতীয় পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। যথা—

ইষ্টিং মিত্রাবরুণয়োর্ম্মনুঃ পুত্রকামশ্চকার। তত্রাপহ্নতে হোতুরপচারাদিলা নাম কন্যা বভূব। সৈব মিত্রাবরুণপ্রসাদাৎ সুদ্যুম্নো নাম মনোঃ পুত্রো মৈত্রেয় আসীৎ। পুনশ্চেশ্বরকোপাৎ স্ত্রীমতী সোমসূনোর্ব্বুধস্যাশ্রমসমীপে বভ্রাম। সানুরাগশ্চ তস্যাং বুধঃ পুরূরবসমাত্মজমুৎপাদয়ামাস।

বিষ্ণু পুরাণ ৪।১।৫।৮।

মনু পুত্রকামনায় মিত্রাবরুণের পূজার্থ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে হোতার ত্রুটী বশতঃ পুত্র না জন্মাইয়া ইলা নামে একটী কন্যা জন্মিল। পরে সেই কন্যাই আবার মিত্রাবরুণের প্রসাদে সুদ্যুম্ন নামক পুত্র হইল। এই সুদ্যুম্ন ঈশ্বরের কোপে পুনরায় স্ত্রী হইয়া একদা চন্দ্রপুত্র বুধের আশ্রমসমীপে ভ্রমণ করিতেছিলেন। বুধ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাঁহাতে পুরূরবা নামে পুত্র উৎপন্ন করিলেন।

ফলত এই পুরূরবা মনু হইতে তৃতীয় অথবা পঞ্চম পুরুষই হউন, তাহা হইলেও এই সময় মনুসময় হইতে অধিক দূরবর্ত্তী হইবে না, অতএব ঋক্‌সূত্র সকল যে সামান্যতঃ ৪৮০০ পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে অনুমান করা গিয়াছে, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না এবং মনুর আগমন সময় যে ৩৯৮০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমিত হইয়াছে, তাহাও অসঙ্গত বোধ হয় না।

সম্পাদকের বৈঠক।

দোকান্‌দার বড়লোক।

(নাটক)

(বুর্জোয়া জাঁতিয়ম্ হইতে অনুবাদিত)

সকলেই জানেন, সমালোচকগণ মোলিয়েরকে (MOLIÈRE) হাস্য রস-কবিদিগের শীর্ষ স্থানীয় বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহারই রচিত একটি বিখ্যাত প্রহসন আমরা মূল ফরাসীস্ হইতে অনুবাদ করিয়া নমুনা স্বরূপ নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

প্রথম অঙ্ক। ১ দৃশ্য।

(গান-বাজনার ওস্তাদ, নাচের ওস্তাদ, ও তাহাদের দলবল)

গানের ওস্তাদ।—(দলের প্রতি)

এসহে, তোমরা এই ঘরে এস ; যতক্ষণ না তিনি আসেন এইখানে বোসে একটু আরাম কর।

নাচের ওস্তাদ।—(তার দলবলের প্রতি) তোমরাও এই দিকে ব'স।

গানের ওস্তাদ।—(ছাত্রের প্রতি) সেটা কি তৈরি হয়েছে ?

ছাত্র।—হাঁ হ'য়েছে।

গা-ওস্তাদ।—দেখি ; বাঃ বেশ হয়েছে যে !

না-ওস্তাদ।—ওটা কি কিছু নতুন চীজ্ তৈরি হল নাকি ?

গা-ওস্তাদ।—ওটা একটা বিরহ টপ্পা। আমার ছাত্রকে দিয়ে এই খেনেই ওটা তৈরি করিয়েছি।

না-ওস্তাদ।—আমি কি দেখ্‌তে পারি ?

গা-ওস্তাদ।—যখন আমাদের মনিবের কাছে গাওয়া হবে তখনই শুন্‌তে পাবে। আর বেশী দেরি নেই।

না-ওস্তাদ।—আজ কাল আমাদের দুজনের হাতেই খুব কাজ।

গা-ওস্তাদ।—তা সত্যি। আমাদের ঠিক মনের মতন মনিবটি পেয়েছি। আমাদের মনিবই আমাদের জমিদারী। দোকানদার হঠাৎ বড় মানুষ হ'য়ে উঠেছে, মাথায় কতই সক্ চেপেছে। এই রকম সব কাপ্তেন পেলে আমরা আর কিছুই চাইনে।

না-ওস্তাদ।—কিন্তু ভাই একটু সমজ্‌দার লোক না হলে তেমন সুখ হয় না।

গা-ওস্তাদ।—তা সত্যি। কিন্তু তাতে কি এল গেল ? আমাদের ত বেশ টাকা দেয় ; টাকা পেলেই আমাদের ব্যবসা গুল্‌জার !

না-ওস্তাদ।—আমার কথা যদি বল, ত ভাই, বল্‌তে কি, আমি একটু প্রশংসা চাই। বাহবা পেলে আমার মনটা খুব গলে। আর তাও বলি—একটা উজবুক্ জানোয়ারের কাছে গান বাজনা শোনান' বড় ঝকমারি—হাঁ, যারা বোঝে, তাদের শুনিয়ে সুখ আছে।

গা-ওস্তাদ।—তা' সত্যি ; কিন্তু ফাঁকা বাহবার সঙ্গে কিছু কিছু নিরেট মাল থাকাও চাই। লোকটা নেহাৎ বোকা, নিতান্ত উজবুক্ বটে, কিন্তু ইদিকে টাকা কড়ি বেশ দেয়, আর কি চাই বল ? যে বড় লোকে এখানে আমাদের পরিচয় ক'রে দিয়েছে, তার চেয়ে এই সামান্ত দোকান্‌দারটা অনেক ভাল।

না-ওস্তাদ।—হাঁ, তুমি যা' বল্‌চ তা কতকটা সত্যি বটে—কিন্তু তুমি ভাই টাকা টাকা ক'রে গেলে যে ! টাকাটা বড় নীচ জিনিষ। টাকার উপর অত টান থাকা কি ভাল মানুষের উচিত ?

গা-ওস্তাদ।—কিন্তু মুখে তুমি যাই বল, টাকা নিতে ত বড় কসুর কর না।

না-ওস্তাদ।—তা নিই বটে, কিন্তু আ-

মার তাতে ভাই সুখ হয় না। লোকটা যেমন ধনী তেমনি যদি একটু সমজ্‌দার হ'ত তা'হলে বড় ভাল হত।

গা-ওস্তাদ।—তা' বটে, আমরা ত তাকে সমজ্‌দার কোরে তোল্‌বার চেষ্টায় আছি। কিন্তু আর কিছু নাই হোক্, ও-লোকটার দ্বারায় ত' আমরা দশ জনের কাছে পরিচিত হচ্চি। সেই আমাদের আর একটা লাভ। আমাদের মনিবের কাছ থেকে বাহবা না পাই টাকা পাব, আর সেই বাহবা বাইরের দশ জনের কাচ থেকে পুষিয়ে নেওয়া যাবে।

---

২ দৃশ্য।

দোকানদার বড়লোক জুর্দা্য (একটা আল্‌থাল্লা ও রাত-পোরে টুপি পরিয়া), গান নাচের ওস্তাদ প্রভৃতি।

জুর্দা্য।—এই যে, তোমরা এসেচ যে, ব্যাপারটা কি? তোমাদের তামাসা আমাকে দেখাবে কি?

নাচ-ওস্তাদ।—সে কি? কিসের তামাসা মশায়?

জুর্দা্য।—অ্যাঁ, অ্যাঁ, ঐ যে,—তাকে কি বলে ভাল—ঐ যে যাতে কথাবার্ত্তার সঙ্গে গান আছে, নাচ আছে।

না-ওস্তাদ।—অ্যাঁ, অ্যাঁ।

গা-ওস্তাদ।—আমরা ত মশায় প্রস্তুত আছি।

জু।—আমার একটু আস্‌তে দেরি হ'য়ে গেছে, তোমাদের একটু খানি বোসে থাক্‌তে হ'য়েছে—তা' দেখ, আজ আমি বড়লোকদের মত পোষাক পরছিলুম; আমার দর্জ্জি কতক যোড়া রেশমের মোজা পাঠিয়ে দিয়েছে—সে এমন ভাল যে কি বল্‌ব!

গা-ওস্তাদ।—গোলামরা ত হাজির আছে, হুজুরের ফুরসৎ হলেই হল।

জু।—দেখ, যতক্ষণ না আমার সেই পোষাকটা আসে, ততক্ষণ তোমরা থেকো। আমার পোষাকটা তোমাদের দেখ্‌তে হবে।

না-ওস্তাদ।—হুজুরের যা' মর্জ্জি।

জু।—আজ আমি মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত বড়লোকদের পোষাক পরব।

গা-ওস্তাদ।—তা' পর্‌বেন বৈ কি!

জু।—আমার দর্জ্জি বলে যে বড়লোকেরা সকাল বেলা এই পোষাক পরে।

গা-ওস্তাদ।—হুজুরের গায়ে বড় সরেস মানিয়েছে।

জু।—ওহে পেয়াদা, আমার দুই দুই পেয়াদা!

প্রথম পেয়াদা।—আজ্ঞে হুজুর, কি হুকুম?

জু।—না কিছু না।—আমি দেখ্‌ছিলুম, তোরা হাজির আছিস্ কি না। (ওস্তাদদের প্রতি) চাকরদের পোষাক কেমন হে?

না-ওস্তাদ।—চমৎকার!

জু।—(আল্‌থাল্লা খুলিয়া, লাল মকমলের পায়জামা ও জামা দেখাইয়া) এই রকম পোষাক প'রে সকাল ব্যালা ব্যাড়াতে ট্যাড়াতে বেশ।

গা-ওস্তাদ।—অতি উত্তম।

জু।—পেয়াদা!

প্রথম পেয়াদা।—হুজুর!

জু।—আমার আর এক পেয়াদা!

দ্বিতীয় পেয়াদা।—হুজুর!

জু।—আমার পোষাকটা ধর।—এই রকমেই আমাকে ভাল দেখ্‌ছনা?

না-ওস্তাদ।—অতি উত্তম। এর চেয়ে উত্তম আর কিছু হ'তে পারে না।

জু।—এখন তোমাদের তামাসা দেখা যাক্।

গা-ওস্তাদ।—হুজুর যে বিরহ-টপ্পা ফর্মাস্ করেছিলেন, তা আমার এই সাক্রেদ তৈরি ক'রেছে। সেইটে হুজুরকে প্রথমে শোনাব।

জু। একজন সাক্রেদকে দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, তুমি বুঝি নিজে করতে পার নি?

গা-ওস্তাদ।—সাক্রেদের নামে হুজুর পিছবেন না। এই রকম সাক্রেদ্ ওস্তাদের মতই লায়েক। সুরটা যতদূর ভাল হবার তা' হ'য়েছে।

জু।—তবে আমার পোষাকটা দাও। পোষাক পোরলে ভাল কোরে শুন্‌তে পারব—না—না—থাম—বিনা পোষাকেই শোনা ভাল। না—না—পোষাকটা দাও—তা' হ'লে আরও ভাল হবে।

গান।

যে অবধি নেত্রবাণ হানিয়াছ খরতর,
সে অবধি বিধুমুখি, হ'য়ে আছি মর' মর'।
প্রেমে যে জন গদগদ, তা'রেই যদি প্রাণে বধ'
যে জন তোমার শত্রু তাহার না জানি কি
দশা কর'।*

জু।—এ গানটা কেমন দুঃখের দুঃখের ঠেক্‌চে। শুন্‌লে কেমন ঘুম আসে। এমন একটা গান শুন্‌তে চাই যাতে প্রাণটা উল্‌সে ওঠে।

গা-ওস্তাদ।—যে রকম কথা সেই রকম সুর হওয়া চাইত মহাশয়।

জু।—কিছুদিন হ'ল একটা বড় সরেস গান শিখেছিলুম।—রোস—কি ভাল সে গানটা?

না-ওস্তাদ।—আমি তা মহাশয় জানিনে।

জু।—তাতে একটা পাঁঠার কথা আছে।

না-ওস্তাদ।—পাঁঠা?

জু।—হাঁ, পাঁঠা।

(গানারম্ভ।)

† জাঁন্তু, তোরে বড়ই মিষ্টি ভেবে ছিলেম
আগে,

* Je languis nuit et jour,
et mon mal est extrême
Depuis qu'à vos rigueurs
vos beaux yeux m'ont soumis.
Si vous traitez ainsi, belle
Iris, qui vous aime,
Hélas ! que pourriez-vous
faire à vos ennemis !

† Je croyios Jeanneton

এমন মিষ্টি মুখখানি পাঁঠা কোথায় লাগে ?
হায়, হায়, দেখছি এখন, এমন তোর
কঠিন মন
তোর কাছে (আন্তরে আমার) হার মানে
বনের বাঘে !

এ গানটা খুব সরেস না ?

গা-ওস্তাদ।—বড় সরেস। এমন আর হয় না !

না-ওস্তাদ।—আর হুজুর কি চমৎকার গান করেন ! কি সরেস গলা !

হু।—অথচ আমি কখন গান শিখিনি।

গা-ওস্তাদ।—হুজুর যেমন নাচ শিখ্‌চেন, তেমনি গান শেখাও আপনার কর্ত্তব্য। এই নাচ আর গান বাজ্‌না—এই দুটোতে বড় যোগ আছে।

না-ওস্তাদ।—আর নাচ গান শিখলে যেমন দেল্ খুলে যায় এমন আর কিছুতে না।

হু।—আচ্ছা বড় লোকেরাও কি গান বাজনা শেখে ?

গা-ওস্তাদ।—হাঁ মশায় শেখে বৈ কি !

Aussi douce que belle ;
Je croyios Jeanneton
Plus douce qu'un mouton.
Hélas ! Hélas !
Elle est cent fois, mille fois plus cruelle
Que n'est le tigre aux bois.

আমরা mouton (ভ্যাড়া) শব্দ পাঁঠা বলিয়া অনুবাদ করিয়াছি।

হু।—তবে আমি শিখ্‌ব। কিন্তু কে জানে শিখ্‌তে কতদিন লাগ্‌বে! কেন না তলোয়ার খোল্‌বার ওস্তাদ ছাড়া একজন পণ্ডিতও রেখেছি, তাঁর কাছে আজ সকালে তত্ত্ববিদ্যা শিখ্‌ব।

গা-ওস্তাদ।—হাঁ—তত্ত্ববিদ্যা একটা চীজ্ বটে, কিন্তু হুজুর গান—গান—

না-ওস্তাদ।—গান আর নাচ—গান আর নাচ—এই দুই বিদ্যেই যথেষ্ট।

গা-ওস্তাদ।—রাজ্যের মধ্যে গান যেমন কাজের এমন আর কিছুই না।

না-ওস্তাদ।—নাচ যেমন মানুষের পক্ষে আবশ্যক এমন আর কিছু না।

গা-ওস্তাদ।—গান না হ'লে রাজ্য চল্‌তেই পারে না।

না-ওস্তাদ।—নাচ না হ'লে মানুষ কোন কাজই করতে পারে না।

গা-ওস্তাদ।—পৃথিবীতে যত গোলমাল, যত ঝগড়া ঝাঁটি দেখা যায়, তা কেবল গান না জানার দরুণই হয়।

না-ওস্তাদ।—মানুষের যত কিছু দুর্দ্দশা, ইতিহাসে যত কিছু বিপ্লবের কথা শোনা যায়, রাজমন্ত্রীদের যত কিছু ভুল হয়, বড় বড় সেনাপতিদের যত কিছু চুক হয়, তা' কেবল নাচ্‌তে না জানার দরুণই হয়।

হু।—সে কি রকম ?

গানের ওস্তাদ।—মানুষদের মধ্যে ঐক্যের অভাবেই কি যুদ্ধ বাধে না ?

হু।—তা সত্যি।

গা-ওস্তাদ।—যদি সকলেই সঙ্গীত

শেখে, তা'হলেই কি সকলের মধ্যে মিল হবার উপায় হয় না ?

জু।—তুমি ঠিক বলেছ।

না-ওস্তাদ।—যখন কোন মানুষ, রাজ্যের মধ্যে কিম্বা তার পরিবারের মধ্যে কিম্বা সৈন্য চালনায় কোন ভুল করে, তখন কি লোকে বলেনা যে, অমুক লোকের অমুক কাজে পদস্খলন হ'য়েছে।

জু।—হাঁ লোকে তা'বলে বটে।

না-ওস্তাদ।—আর নাচ না জানবার দরুণ ভিন্ন আর কিসে পদস্খলন হয় বলুন ?

জু।—তা' সত্যি। তোমরা দুজনেই ঠিক বলেছ।

না-ওস্তাদ।—তবে এখন দেখুন, নাচ গান কত কাজে লাগে ?

জু।—এখন আমি বুঝতে পারচি।

গা-ওস্তাদ।—আমাদের দুজনের কাজ কি তবে দেখ্‌তে চান ?

জু।—হাঁ ; *

গা-ওস্তাদ।—আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলেছি, গানেতে যে কত রকমের ভাব প্রকাশ করা যায় তারই একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ এই গান তৈরি করেছি।

জু।—তা' বেশ ?

গা-ওস্তাদ।—(গাইয়ে বাজিয়েদের প্রতি) এদিকে এ'স। (জুর্দ্যাঁর প্রতি) আপনার এখন কল্পনা করতে হবে যে, ওরা রাখালদের মত কাপড় পোরে আছে।

জু।—সারাদিন রাখাল কেন ? সব জায়গাতেই ওদের দেখা যায়।

না-ওস্তাদ।—যখন কোন লোককে দিয়ে গান কোরে কথা কওয়াতে হয়, তখন তাকে রাখাল না সাজালে হয় না। কেননা গান করা চিরকাল রাখালদেরই সাজে, রাজা রাজ্‌ড়া কিম্বা জমিদারদের গান করাটা স্বাভাবিক নয়।

জু।—আচ্ছা, আরম্ভ কর' দেখা যাক্।

(সকলে মিলিয়া গান)

গায়িকা।—

প্রেম যারা করে, শুথাইয়া মরে
দিবানিশি মন দহে ;
লোকে কিন্তু বলে, সুখেই শুথায়
সুখেতেই শ্বাস বহে।
লোকে যা' বলুক্, কিছুই তা নয়,
স্বাধীনতা সম কিছুই নহে।

১ম গায়ক।—

প্রণয় যেমন আছে কি তেমন
মিশিলে মনেতে মনে ?
মানুষের সুখ কোথা বল দেখি
প্রেমের লালসা বিনে,
প্রাণ থেকে যদি প্রেম তুলে লও
প্রাণ থেকে সুখ লইবে ছিনে।

২য় গায়ক।—

প্রেমেতে প্রেমিক খাঁটি থাকে যদি
কি সুখ প্রেমের চেয়ে !
কিন্তু হায় হায়, পাওয়া বড় দায়
খাঁটি রাখালের মেয়ে !
আমি বলি ভাল না বাসাই ভাল
অবিশ্বাসী নারী যত !

১ম গায়ক।—

কি আছে প্রেমের মত!

গায়িকা।—

স্বাধীনতা মজা ভারি!

২য় গায়ক।—

বিশ্বাসঘাতিনী নারী!

১ম গায়ক।—

তুমি মোর সাত রাজার ধন!

গায়িকা —

তুমি রে আমার সোণার চাঁদ!

২য় গায়ক।—

তোরে হেরি জলে ঘৃণায় এ মন!

১ম গায়ক।—

সেত ভাল নয়, দূর কর' ঘৃণা,

ও কিও কথার ছাঁদ!

গায়িকা।—

খাঁটি রাখালিনী নারী

এখনি দেখাতে পারি!

২য় গায়ক।—

হায়, হায়, হায়, কোথায় সে জন!

গায়িকা।—

মোদের জাতির নাম বাঁচাইব,

আমিই রে তোরে সঁপিব মন!

২য় গায়ক।—

কিন্তু মন তোর আজ বাদে কাল

অবিশ্বাসী হবে না সে?

গায়িকা।—

পরখ ক'রেই দেখা যাবে দোঁহে

কে কেমন ভাল বাসে!

২য় গায়ক।—

চপল যে জন, মরুক্ সে জন!

তিন জনে।—

এস মোরা সবে প্রণয়ে মাতি!

প্রণয় কেমন মজার রতন

হৃদয়ে হৃদয় গাঁথি!

জুর্দ্দাঁ।—বস্, হ'য়ে গেল?

গা-ওস্তাদ।—হাঁ।

জুর্দ্দাঁ।—গানটা বেশ পরিপাটি। ওর মধ্যে বড় মজার মজার কতকগুল কথা আছে।

নাচের ওস্তাদ।—আমাদের কাজ তবে আরম্ভ করি। পা ফেলার যত রকম কারিগরী আছে, তা' সব দেখতে পাবেন।

জুর্দ্দাঁ।—ওতেও আবার রাখাল আছে নাকি?

নাচের ওস্তাদ।—এতে আপনি খুসী হবেন। (নাচিয়েদের প্রতি) চলুন্।—

(নৃত্য)

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

ভূ-পঞ্জর ।

তৃতীয় প্রস্তাব ।

তৃতীয় যুগ ।

তৃতীয় যুগের প্রারম্ভে ভারতবর্ষ আফ্রিকা সংলগ্ন একটি মহাদেশ ভুক্ত ছিল। ভারতবর্ষের উত্তর পূর্ব্বে আধুনিক আসামের অধিকাংশ, পশ্চিমে সম্পূর্ণ না হউক প্রায় সমস্ত পারস্য, বেলুচিস্তান ও সিন্ধু নদীর সন্নিহিত প্রদেশ, এবং গাঙ্গেয় প্রদেশের উত্তরাংশ অধিকার করিয়া সমুদ্র অবস্থিত ছিল। এই পশ্চিম সমুদ্রের এক শাখা কাশ্মীরের মধ্য দিয়া ল্যাডাক উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

তৃতীয় যুগের প্রারম্ভে তিব্বত ও হিমালয় প্রদেশ সমুদ্র হইতে অল্পই উচ্চ ছিল, পরে যে বিপ্লব দ্বারা ক্রমশ হিমালয় উন্নত হইয়াছে, যাহার দ্বারা হিমালয়ের স্তর সকল লণ্ড ভণ্ড হইয়া রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা ইয়োসিন অন্তরযুগের শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া বর্ত্তমান কালেও চলিতেছে।

হিমালয় পর্ব্বত আসাম প্রদেশ ব্রহ্মদেশ কচ্ছ ও সিন্ধু দেশে মাঝে মাঝে এখনো যে প্রবল ভূকম্পন দেখা যায় তাহা সেই বিপ্লবের ধারাবাহীত্যের প্রমাণ। এই বিপ্লবের কারণ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ সত্বেও এইরূপ বলা যাইতে পারে যে হিমালয়-সন্নিহিত প্রদেশের অভ্যন্তর শীতল হইয়া সঙ্কুচিত হওয়াতে সেই সকল স্থান দমিয়া হিমালয়কে উচ্চ করিয়া তুলিয়াছে।

এ সময়ে ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশ দাক্ষিণাত্যের সহিত সংলগ্ন ছিল কি না নিশ্চয় বলা যায় না তবে সংলগ্ন থাকাই আধুনিক ভূবেত্তাগণ সম্ভবপর মনে করেন।

অনেক ভূবেত্তাদের মত যে এতাবৎকাল দাক্ষিণাত্য ও হিমালয়-সন্নিহিত প্রদেশ পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল, পরে ইয়োসিন অন্তরযুগের শেষ দিক হইতে আরম্ভ হইয়া তৃতীয় যুগেই প্রথম গঙ্গা ও সিন্ধু মধ্যবর্ত্তী সমুদ্র শুকাইয়া উপরোক্ত উভয় প্রদেশ সংলগ্ন হইল। কিন্তু ভূবেত্তা ব্ল্যানফর্ড বলেন * সম্ভবতঃ চাখড়ি অন্তর যুগের শেষ হইতেই ভারতবর্ষ-উপকূল স্থূলতঃ আধুনিক আকার ধারণ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে তিনি যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহা হইতে দুইটি নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। একটি, যদি চাখড়ি অন্তর যুগের শেষে ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিণ একই-সংলগ্ন-ভূখণ্ড না হইয়া সমুদ্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকিত,

* See Medlicott and Blandford's Manual of the Geology of India. Vol 1—Int.

তাহা হইলে তৃতীয় যুগের প্রারম্ভে উৎপন্ন সমুদ্র মৃত্তিকা-স্তরে সামুদ্রিক জীব কঙ্কাল পাওয়া যাইত, কিন্তু রাজমহেন্দ্রী হইতে গারো পর্ব্বত পর্য্যন্ত এ সময়ের মৃত্তিকার সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়, ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগে স্থূল-চর্ম্মী জন্তু,(pachyderm) হস্তী মহিষ ইত্যাদি জন্মিবার আগে ভারতবর্ষের উত্তর ভাগেই এই সকল জন্তু উৎপন্ন হয়, কেননা উত্তরেই তৃতীয় যুগের প্রথম ভাগ ইয়োসিন অন্তর যুগের মৃত্তিকার হস্তী মহিষ জাতীয় স্থূল-চর্ম্মী জীব কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। পরে শীতের তাড়নে উহারা উত্তর হইতে দক্ষিণে পলায়ন করে। যে সকল প্রাণী উত্তরে লোপ পাইয়াছে তাহারা ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে এবং ইহার সম নিরক্ষান্তর প্রদেশে এখনো বর্ত্তমান, এবং দাক্ষিণাত্যে আবার যে সকল জীব এখন বিলুপ্ত তাহা আফ্রিকায় দেখা যায়। যদি চাখড়ির শেষে ভারতবর্ষ উপকূল সংলগ্ন না থাকিত তাহা হইলে তৃতীয় যুগের প্রথমেও সমুদ্র দ্বারা উত্তর দক্ষিণ বিচ্ছিন্ন থাকিলে কি করিয়া স্থূলচর্ম্মী জাতি দক্ষিণে উপস্থিত হইবে? তাহা হইলে তৃতীয় যুগের মধ্য অন্তর যুগ মায়োসিন কালে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের মৃত্তিকাতে হস্তী মহিষ কঙ্কাল পাওয়া যাইত না।

ব্লান ফর্ডের মতে ভারতবর্ষের উপকূল চাখড়ি অন্তর যুগের শেষাংশ হইতে স্থূলতঃ প্রায় একই রূপ আছে, তবে চাখড়ি অন্তর যুগে ভারতবর্ষের উপকূলে মাঝে মাঝে যে সকল সমুদ্র শাখা প্রবিষ্ট ছিল তাহা কালে শুকাইয়া স্থলে পরিণত হইয়াছে।

কচ্ছ ও কাটিবার প্রদেশ পূর্ব্বে দ্বীপাকার ছিল, ইহা তৃতীয় যুগেই বর্ত্তমান আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু সিন্ধু-গাঙ্গ প্রদেশ তৃতীয় যুগের পূর্ব্বে উৎপন্ন হইলে তাহা এরূপ সমতল ক্ষেত্র কি করিয়া হইল? সমুদ্র-গর্ভ শুকাইয়া মাটী হইলে সেই নূতন স্থল প্রথমে পার্শ্ববর্ত্তী স্থান অপেক্ষা নীচু হয় এবং প্রায় সর্ব্বত্রই এক রূপ উচ্চ বলিয়া সমতল ক্ষেত্র হইয়া পড়ে। কিন্তু সিন্ধু-গাঙ্গ প্রদেশ যদি বহুদিন উৎপন্ন স্থল হয় তবে ইহা কি করিয়া সমতল হইল?

যে কারণে হিমালয় উচ্চ হইয়াছে সেই কারণে সিন্ধুগাঙ্গ প্রদেশ ও সমতল হইয়াছে। একটা গোলাকার বস্তুর কোন স্থান নীচু হইয়া চেপটা হইয়া পড়িলে অর্থাৎ কোন গোলাকার পদার্থ ক্রমশঃ সরল রেখার অনুরূপ হইতে সচেষ্ট হইলে তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকস্থান অধিকার করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং অধিক স্থানের অভাব হইলে এক দিক উচ্চ ও এক দিক নীচু হইয়া পড়ে। সেই নিয়ম অনুসারে ভূগর্ভের সঙ্কোচন হেতু সিন্ধু গাঙ্গ প্রদেশ নীচু ও হিমালয় উন্নত হইয়াছে।

কিন্তু গণনা দ্বারা দেখা যায় যে সিন্ধু গাঙ্গ প্রদেশের অবনতি বশতঃ হিমালয়ের বর্ত্তমান উচ্চতা উৎপন্ন হইতে পারে না; উহাতে হিমালয়কে ঊর্দ্ধ সংখ্যা সাত হাজার ফুট উন্নত করিতে পারে। সুতরাং সিন্ধু-

গাঙ্গ প্রদেশের অবনতি ও হিমালয়ের উন্নতির পরস্পর কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নাই—এতদুভয়ই পৃথিবীর আভ্যন্তরিক শক্তির ক্রিয়া ফল।

তৃতীয় যুগের প্রারম্ভে ইয়োরোপের ভূপৃষ্ঠ অবস্থা কিরূপ ছিল এইবার দেখা যাউক।

ক্রিটেসস অন্তর যুগের শেষে ইয়োরোপে সমুদ্র ভাগই অধিক। স্পেন এবং ইটালির অধিকাংশ, হলাণ্ড, সুইজারলাণ্ড, প্রসিয়া, হাঙ্গেরি, ওয়ালেকিয়া, উত্তর রুসিয়া ও পারিসের কতকাংশ লইয়া চাখড়ি অন্তর যুগের শেষে সমুদ্র বিস্তৃত ছিল। এ সময় জুরাসিক যুগ উৎপন্ন সার বর্গের (Cherbourg) ভূখণ্ডের দ্বারা ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সংযুক্ত ছিল। পরে ঐ ভূখণ্ড সমুদ্রগ্রস্ত হওয়াতে অধুনা ফ্রান্স ও ইংলণ্ড পৃথক হইয়া পড়িয়াছে।

তৃতীয় যুগে ক্রমশঃ ক্রিটেসস অন্তর যুগের এই বিস্তৃত মহা সমুদ্র শুকাইতে আরম্ভ করিয়া ইয়োরোপের আধুনিক স্থল ভাগ উৎপন্ন হইয়াছে।

এ যুগের একটি বিশেষ লক্ষণ-সম্পূর্ণ রূপে নূতন প্রাণী জাতির আবির্ভাব। এ সময় প্রায় সমস্ত পুরাতন স্থলচর প্রাণী অন্তর্হিত করিয়া স্তন্যপায়ী জীবের দ্বারাই পৃথিবীর স্থল ভাগ পূর্ণ হইল। প্রথম যুগে কাঁকড়া, মৎস্য ও দ্বিতীয় যুগে সরীসৃপদিগের যেমন বিশেষ রূপ প্রাদুর্ভাব, তেমনি এই যুগে স্তন্যপায়ী জীবই প্রধান, সেই জন্য ইহার আর একটি নাম স্তন্যপায়ী যুগ। এই সময়ে যে কত আকৃতির কত অসংখ্য প্রকারের স্তন্যপায়ী জীব ছিল তাহা এখন পর্য্যন্ত কেহ নির্ণয়ই করিতে পারেন না।

আমরা দ্বিতীয় যুগের জুরাসিক সময়ের যে কাঙ্গারু জাতীয় স্তন্যপায়ী জীবের কথা বলিয়াছি, তাহাকে ছাড়িয়া দিলে তৃতীয় যুগের স্থূলচর্ম্মী অর্থাৎ হস্তী মহিষ প্রভৃতি জাতীয় জীবই পৃথিবীর প্রথম স্তন্যপায়ী জীব বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তৃতীয় যুগকে যে তিন ভাগে ভাগ করা যায় তাহার প্রথম ভাগে এই জাতীয় জীবেরই অধিক প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এবং আর দুই ভাগের স্তন্যপায়ী জীব সকল এত প্রকাণ্ড ও অদ্ভুত গঠনের যে তাহাদের জাতীয় সাদৃশ্যও এখনকার জীবে পাওয়া যায় না, সে সকল জাতীয় জীব এখন সম্পূর্ণ রূপে লুপ্ত। কেবল তৃতীয় যুগের শেষাংশে যে সকল জীব জন্মিয়াছে তাহার অধিকাংশ এখনও বর্ত্তমান। এ যুগের শেষ দিকে অনেক পক্ষী ছিল বটে কিন্তু তাহারা স্তন্যপায়ী জীবের মত বহু সংখ্যক নহে। কুম্ভীরাকার এক রূপ প্রকাণ্ড সরীসৃপ তৃতীয় যুগের সকল সময়েই দেখা যায়। আমাদের বর্ত্তমান সময়ের মত তৃতীয় যুগের সমুদ্রে নানা জাতীয় নানা প্রকার জীবের বসতি, কিন্তু দ্বিতীয় যুগে আমরা অ্যামোনাইট বেলেমনাইট ইত্যাদি যে সকল শম্বুক জাতির প্রাচুর্য্য দেখিয়াছি তাহা আর এখনকার সমুদ্রে নাই। এ যুগের শম্বুক জাতীয় যে সকল জীব দেখা যায়, তাহা অনেকটা আমাদের সময়ের মত।

এ যুগের আশ্চর্য্য রূপ প্রাণী প্রাচুর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এ সময়ে ফারমিনিফেরা ও নিউমিলাইট নামক শম্বুক জাতীয় ক্ষুদ্র জীব এত বহু সংখ্যক একত্রে বিচরণ করিত যে ইহাদের দেহাবশেষ দ্বারা এক এক স্থানে শতাধিক ফুট পরিমান স্তর নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নহিলে ইহাদের দেখাই যায় না।

এই যুগের কতক উদ্ভিদ আমাদের উদ্ভিদের কাছাকাছি, আর কতক একেবারে আমাদের মত। * দ্বি-পত্র উদ্ভিদ এ যুগে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। ফুল ও ফল এই প্রথম হইল। নানা বর্ণের ফুল ও নানা রূপ ফল দ্বারা এখন চৌদিক সুশোভিত। বন ফুল শোভিত হরি বর্ণ বিস্তৃত ক্ষেত্রে কীট পতঙ্গের সীমা নাই। বৃহৎ বৃহৎ ফুল-বৃক্ষ সঙ্কুল বনে নানা প্রকার পাখীদের বসতি। বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবীর মেঘাচ্ছ বাষ্পাবরণ ক্রমে পরিষ্কৃত হইয়া এই সকল সূক্ষ্ম ফুস ফুস বিশিষ্ট (Delicate pulmonary) জীবের বাসোপযোগী হইয়াছে। ভূপঞ্জর এখন এত স্থূল যে আভ্যন্তরিক উত্তাপ আর বড় উপরে উঠিতে পারে না। তৃতীয় যুগে পৃথিবীর উত্তাপ স্থূলতঃ বর্ত্তমান সময়ের গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ন্যায় ছিল, কিন্তু সূর্য্যের উত্তাপের ন্যূনাধিক্য বশতঃ পৃথিবীর দ্রাঘিমা ভেদে শীতাতপের বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে, এবং মেরু দেশে অল্প অল্প শীত দেখাদিয়াছে।

প্রচুর বৃষ্টি দ্বারা এই সময়ে যে সকল প্রধান প্রধান নদী ও পরিষ্কার জলের হ্রদ উৎপন্ন হইয়াছিল পরে সেই সকল প্রকাণ্ড নদী-মোহানার ব-দ্বীপই ক্রমে নূতন নূতন দেশ রূপে পরিণত হইল। আমরা পৃথিবীর পৃষ্ঠে এখন জল ও স্থল যে অবস্থায় দেখিতেছি ইহা তৃতীয় যুগেরই শেষ ভাগে এই রূপ আকার ধারণ করিয়াছে।

তৃতীয় যুগটি বিখ্যাত লায়েল তিন ভাগে বিভক্ত করেন। ইয়োসিন মায়োসিন ও প্লায়োসিন। ইয়োসিন অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের প্রারম্ভ, মায়োসিন অর্থাৎ অল্পাধুনিক, প্লায়োসিন অর্থাৎ অধিকাধুনিক। এই সকল আখ্যা দ্বারা বর্ত্তমান সময়ের জীব জন্তু হইতে তৎসাময়িক জীব জন্তুর প্রভেদ দর্শাইতে তিনি এই রূপ নামকরণ করিয়াছেন।

এখন এই তিন ভাগের স্থূল লক্ষণ সংক্ষেপে কিছু বলিয়া এ অংশ শেষ করা যাউক।

ইয়োসিন অন্তর যুগ।

পূর্ব্বের সেই মহা সমুদ্রের অনেক অংশ এখন স্থলে পরিণত। নানা নদ নদী হ্রদ ও তড়াগে শোভিত-স্থল এখন নানা প্রকার উদ্ভিদ ও জীব জন্তু পূর্ণ। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের উদ্ভিদ, এবং পরবর্ত্তী অর্থাৎ আমাদের

* যে বৃক্ষের অঙ্কুর উদ্গম কালে একটি মাত্র পত্র উদগত হয় তাহা এক পত্র অর্থাৎ Monocotyledon, যথা, পেয়াজ যব ছোলা ইত্যাদি। যাহার দুইটি পত্র উদ্গত হয় তাহা দ্বি-পত্র অর্থাৎ Dicotyledon, যথা, মটর গোল্ড কুল পেয়ারা ইত্যাদি।

বর্ত্তমান যুগের উদ্ভিদ এই যুগে একত্রে উৎপন্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

নানা জাতীয় লুপ্ত বৃক্ষের সহিত আধুনিক বার্চ আকরোট ওক কেলু ও ঝাউ জাতীয় দেবদারু, ফার, ইউ, সাইপ্রেস ইত্যাদি নানা প্রকার বৃক্ষ একত্রে বিরাজমান।

নানা জাতীয় পর্ণীতরু শৈবাললতা ও জল-উদ্ভিদের অভাব নাই। আশ্চর্য্য এই, তখনকার সরোবরে আধুনিক জলজ উদ্ভিদ অনেক দেখা যায়, যেমন এক রূপ পানিফল (Water caltrop)। তখনকার উদ্ভিদের মধ্যে ২০০০ জাতি বিদিত। ১৪৩ দ্বি-পত্র (Dycotyledon) জাতি; ৩৩ এক-পত্র, (monocotyledon,) 33 পুষ্পহীন (cryptogam) জাতি, যথা, শৈবাল, পর্ণীতরু ঝাউ সাইক্যাড ইত্যাদি। স্তন্যপায়ী, পক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্য, পতঙ্গ, কীট, কচ্ছপ, শম্বুক ইত্যাদি এই যুগের জীব। এ সময়ে ইয়োরোপের উত্তাপ গ্রীষ্ম প্রধান দেশের মত ছিল বলিয়া আধুনিক গ্রীষ্ম দেশের জীব কঙ্কাল এ সময়ে ইয়োরোপের মৃত্তিকাতে অনেক পাওয়া যায়। এই যুগের স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে স্থূলচর্ম্মীরাই প্রধান। এই সময়ে প্যালিওথেরিয়াম অর্থাৎ পুরাতন জন্তু, অ্যানোপ্লিথেরিয়াম অর্থাৎ নিরস্ত্র জন্তু ও জিফাডন (Palaeotherium Anoplotherium Xiphodon) বলিয়া যে সকল স্থূলচর্ম্মী জন্তু ছিল তাহারা উদ্ভিদাহারী এবংপালে পালে থাকিত। তাহাদের শারীরিক আকার ঘোড়া গণ্ডার ও শূকরের মধ্যবর্ত্তী। এই জাতীয় নানা প্রকার ও নানা আয়তনের জীব কঙ্কাল এই যুগে দেখা যায়। পেলিওথেয়েরিয়াম, টেপার নামক শূকর ও গণ্ডারের মধ্যবর্ত্তী, ইহার অতি প্রকাণ্ড চক্ষু, ক্ষুদ্র কলেবর, চারিটা পা প্রকাণ্ড, খর্ব্ব ও মাংসাল, উচ্চতায় ইহা বৃহৎ ঘোড়ার ন্যায়। ইহার শূণ্ড টেপার শূকরের মত ক্ষুদ্র এবং দন্ত গণ্ডারের মত।

অ্যানোপ্লিথেরিয়ম জন্তুর খুর গরুর ন্যায় দ্বিধা বিভক্ত, পদের অগ্রভাগ উষ্ট্রের ন্যায় ও দন্ত গণ্ডারের ন্যায়; আয়তনে ইহা গর্দ্দভের মত ইহার লাঙ্গুল অতি বৃহৎ, এবং গোড়া মোটা। জলে সন্তরণের সময় এই বৃহৎ লাঙ্গুল হালের কাজ করিত।

জিফডনের আয়তন অনেকটা শামা হরিণের ন্যায়। ইহাদের লাঙ্গুল ছোট এবং কর্ণ হরিণের ন্যায় বৃহৎ, কিন্তু ইহাদের গাত্র লোমাচ্ছাদিত নহে।

এই সকল জন্তু ছাড়া ইয়োসিন অন্তর যুগে উৎপন্ন প্যারিসের সন্নিহিত সোহাগার আকরে শূকর প্রভৃতি অন্যান্য প্রকার স্থূলচর্ম্মী জীব কঙ্কাল এবং শ্বাপদ পশুর পদচিহ্ন পাওয়া গিয়াছে।

এই সময়েই নিউমিউলাইট নামক অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শম্বুক দ্বারা সমুদ্র পূর্ণ ছিল এবং এই সকল মৃত জীব-স্তর দ্বারা পিরিনিস পর্ব্বত শ্রেণী স্থানে স্থানে নির্ম্মিত, এবং এই স্তর দ্বারাই ইজিপ্টের লোকেরা পিরামিড নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের কঙ্কাল দ্বারা শত শত ফুট উচ্চ স্তর হইতে কত শত শত বৎসর লাগিয়াছে তাহার ঠিক নাই। তৃতীয় যুগের এই

নিউমিলাইট মৃত্তিকা-স্তর ইয়োরোপ আসিয়া আফ্রিকা প্রভৃতি পৃথিবীর সকল স্থানেই পাওয়া যায়। এক এক স্থানে নিউমিউলাইট স্তর সহস্র ফুট উচ্চ।

ইয়োসিন মৃত্তিকার মধ্য ভাগে নিউমিউলাইট স্তর সন্নিবেশিত, কিন্তু এই স্তর হিমালয়, কারপেথিয়ান, আল্প, পিরানিস পর্ব্বতের অতি উচ্চাংশে দেখিয়া মনে হয় এই যুগে পৃথিবীতে কি ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত হইয়া ছিল! সেই বিপ্লবের দ্বারাই ঐ সকল পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশ নির্ম্মিত।

ইয়োসিন অন্তর যুগে ভারতবর্ষে, সিন্ধু আসামের কতকাংশ, এবং ব্রহ্মদেশে চুনে প্রস্তর স্তর উৎপন্ন। হিমালয় যে এই যুগ হইতেই পর্ব্বত রূপ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

ময়োসিন অন্তর যুগ।

শীত গ্রীষ্ম উভয় দেশের উদ্ভিদ এই অন্তর যুগে একত্রে জন্মিয়া ইহাকে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অন্তরযুগ হইতে ভিন্ন করিয়াছে। গ্রীষ্ম প্রধান আফ্রিকা দেশের নানা প্রকার বৃক্ষ এবং শীত দেশের ম্যাপল আকরোট পিচ এলম ওক, ও বাঁশ তাল প্রভৃতি বৃক্ষাদি ইয়োরপে এই অন্তর যুগে এক সঙ্গে জন্মে। ইহা ছাড়া এ সময়ে ডুম্বুর বটবৃক্ষ প্রভৃতিও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এক-পত্র বৃক্ষ শৈবাল-উদ্ভিদ, পর্ণী-তরু এবং ঝাউ জাতীয় বৃক্ষ পূর্ব্ব অন্তর যুগ অপেক্ষা এখন সংখ্যায় অল্প এবং তাল জাতীয় বৃক্ষই বহু সংখ্যক। পূর্ব্ব অন্তর যুগের বৃক্ষাদি ছাড়া এ সময়ে ঝাউ ও তাল জাতীয় অনেক নূতন গাছ উৎপন্ন হইয়াছে। সংক্ষেপে বর্ত্তমান সময়ের সমস্ত বৃহৎ বৃক্ষেরই প্রথম ছাঁচ এই অন্তর যুগে দেখিয়া মনে হয় উদ্ভিদ রাজ্য এ সময়ে তাহার উন্নততম অবস্থায় উঠিয়াছে। এই যুগের বৃক্ষাদি হইতে এক প্রকার নিকৃষ্ট অঙ্গার উৎপন্ন। *

স্তন্য পায়ী, পক্ষী, এবং সরীসৃপ এ সময়ের প্রধান জীব। এ সময় অনেক নূতন স্তন্যপায়ী জন্মিয়াছে। এ সময়ে উৎপন্ন পশুদের মধ্যে বানর বাদুড় কাঙ্গারু জাতীয় নানাবিধ জন্তু মাংসাশী ও রোমন্থক জীব কুকুর ইন্দুর কাট বিড়াল এবং খরগোস জাতীয় অনেক প্রকার জীব; পক্ষীদিগের মধ্যে চড়াই বক কাক ইত্যাদি, সরীসৃপদিগের মধ্যে সাপ ব্যাং গিরগিটি এখনো বর্ত্তমান। কিন্তু এ সময়ের প্রধান প্রাণী স্থূলচর্ম্মী স্তন্যপায়ী, এখন লোপ পাইয়াছে, তাহাদের কঙ্কাল মাত্র এখন অবশিষ্ট। তাহারা এ সময়ে যেমন অসংখ্যক তেমনি অদ্ভূতাকার ও বৃহদায়তন।

---

* সুইজরল্যাণ্ডের এ অন্তর যুগের মৃত্তিকা এরূপ উদ্ভিদাবশেষ সমাকীর্ণ, যে অধ্যাপক হিয়ারের (Heer) মতে এস্থান তৎকালে ব্রেজিল ও জ্যামেকার সদৃশ নিবিড় অরণ্যময় ছিল। ইহার মধ্যে বর্ত্তমান আমেরিক উদ্ভিদ এত প্রচুর পাওয়া যায় যে উঙ্গের (Unger) বলেন মায়োসিন অন্তরযুগে আ্যাটল্যাণ্টিক মহাসাগর স্থলরূপে আমেরিকা ও ইয়োরোপকে সংযুক্ত রাখিয়াছিল।

এ সময়ের এক রকম প্রকাণ্ড অদ্ভুত স্থূলচর্ম্মী জন্তুর কঙ্কাল দেখিয়া প্রাণীবেত্তারা তাহার নাম ভয়ঙ্কর জীব (Dinotherium) রাখিয়াছেন। ইহার আকার অনেকটা হস্তীর ন্যায়, কিন্তু হস্তী হইতে ইহা অনেক প্রকাণ্ড, এবং ইহার নিম্নের দন্তস্তর হইতে দুইটি দন্ত মহিষ শৃঙ্গের ন্যায় নিম্নে বক্র হইয়া নির্গত। ইহা দেখিতে যদিও ভয়ানক, কিন্তু শষ্যাহারী। এই সময়ের হস্তীজাতীয় আর এক রূপ স্থূলচর্ম্মীকে মাশটডন (অর্থাৎ স্তনবিভকার দন্ত বিশিষ্ট) কহা যায়। ইহাদের বাহ্যিক আকার অনেকটা হাতীর মত, তবে হাতী অপেক্ষা ও ইহারা স্থূলচর্ম্মী এবং লম্বা। ইহাদের কসের দাঁতের বিভিন্ন গড়নই আধুনিক হস্তী হইতে ইহাদিগকে বিশেষ রূপে ভিন্ন করিয়াছে।

পেনসিলভেনিয়া ইউনিভারশিটির অধ্যাপক বারটন, খড়ি মৃত্তিকাস্তরের ৬ ফুট নীচে যে মাশটডন কঙ্কাল পাইয়াছিলেন, তাহার একটি দন্ত সতের পাউণ্ড ওজনে হইয়াছিল। উত্তর আমেরিকার আদিমবাসীরা ইহাকে বৃষের পিতা বলে। ফাব্রি নামে এক জন ফরাসী, প্রাণীবেত্তা বুর্ফকে লেখেন, ক্যানেডা এবং লুইশিইনা প্রদেশে যেখানে মাশটডন কঙ্কাল প্রচুর পাওয়া যায় সেই প্রদেশ-বাসীদের প্রত্যেক শ্রুতি পরম্পরায় ও পুরাণ গানে এই জন্তুর কথা উল্লিখিত। তাহাদের একটি গানে আছে যখন মনিটর অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা পৃথিবীতে নামিয়া, তাঁহার সৃষ্ট জন্তু সকল, কে কেমন সুখে আছে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন বাইসন অর্থাৎ আমেরিক মহিষ বলিল, "ঐ ভয়ানক বৃষপিতা পর্ব্বত হইতে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে নামিয়া আমাদের কখন খাইতে আসেন তাহার দিকে লক্ষ্য না রাখিতে হইলে আমরা এই তৃণ-পূর্ণক্ষেত্রে চরিতে পাইয়া সম্পূর্ণ রূপে সুখী হইতে পারিতাম" আমেরিকার চৈন নামক প্রাচীন জাতির একটি প্রবাদ যে, পূর্ব্বে এই প্রকাণ্ড জন্তুরা, তাহাদের সমান প্রকাণ্ডাকার মনুষ্যের সহিত বাস করিত। কিন্তু ঈশ্বর অনবরত বজ্রাঘাত দ্বারা সেই সকল মানুষ ও জন্তু এক কালে বিনাশ করিলেন। বর্জ্জিনিয়ার আদিম অধিবাসীদের আবার অন্যরূপ গল্প আছে। তাহারা বলে, এই ভয়ানক জন্তু অন্য জন্তুদের বধ করিত বলিয়া ঈশ্বর বজ্র দ্বারা সকলকে বিনষ্ট করিলেন, কেবল একটি মাত্র পুং মাশটডন বজ্র পড়িবার সময় মস্তক নাড়িয়া তাহা ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু পালাইবার সময় গাত্রে বজ্র পতন দ্বারা আহত হইয়া যে হ্রদে সে লুকাইয়াছিল সেই খানেই মরিয়া যায়। এই সকল গল্প হইতে মনে হয় মাশটডন, মামথ হস্তীর সমকালীন, হয় আদিম মনুষ্যে ইহা দেখিয়াছে, কিম্বা ঠিক মনুষ্য জন্মাইবার আগেই ইহা লোপ পাইয়াছে। যাহা হউক ইহা যে মানুষ জন্মের বহু কাল পূর্ব্বে নহে তাহা এই সকল গল্প হইতে প্রকাশ পায়। এই মাশটডন হস্তী সম্বন্ধে আর একটি ঐতিহাসিক সত্য গল্প

আছে। রোন নদীর বাম পার্শ্বে ডফিনি প্রদেশে সোর্ম নামক দুর্গের সন্নিহিত বালুকা স্তর খুঁড়িতে খুঁড়িতে ১৬১৩ খৃস্টাব্দের ১১ ই জানুয়ারিতে সেই খননকারী লোকেরা একটি হস্তীর কতকগুলি অস্থি পায়। তখন এইরূপ পুরাতন জন্তুর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল। সেই দেশীয় মাজুইয়ার (mazuyer) নামক এক জন চিকিৎসক এই অস্থি সকল কিনিয়া রটনা করিলেন যে টিউটবকাশ রাজার (Teutobocchus Rei); নামাঙ্কিত ৩০ ফুট লম্বা এবং ১৫ ফুট চওড়া একটি কবরে তিনি এই অস্থি সকল পাইয়াছেন এবং আরো বলিলেন যে সেই কবরস্থিত মারিয়াস (marius) মূর্ত্তি অঙ্কিত পঞ্চাশ মুদ্রা তাঁহার অধিকারে আসিয়াছে।

টিউটোবোকাস কিম্ব্রি নামক প্রাচীন জর্ম্মান জাতির সেনাপতি হইয়া গল আক্রমন করিতে গমন করেন এবং প্রভেন্‌স প্রদেশের আই নামক নগরে মারিয়াস কর্ত্তৃক পরাজিত ও ধৃত হইয়া রোমে আনিত হয়েন। মাজুইয়ার ২৫ ফুট লম্বা দশ ফুট চওড়া একটি অস্থি কঙ্কাল দেখাইয়া বলিলেন ইহাই মৃত টিউটোবকাস দেহাবশেষ। তিনি এই মিথ্যা টিউটোবকাসের দেহ ফ্রান্স ও জার্ম্মনির প্রায় সর্ব্বত্রই প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশলুই পর্য্যন্ত এই অদ্ভুত কঙ্কাল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। এই কঙ্কাল লইয়া মহা বাকবিতণ্ডা চলিতে লাগিল। শরীর তত্ত্ববিদ রিয়োলা টিউটোবোকাসের এই দেহ হস্তী কঙ্কাল ছাড়া কিছুই নহে এই প্রমাণ করিবার জন্য হারবিকট নামক এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে তর্ক করিয়া যাহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। পরস্পর মহা লেখনী যুদ্ধ চলিতে লাগিল। গাসেনডি (Gassendi) বলিয়া আর এক জন পণ্ডিত প্রমাণ করিলেন যে মারিয়সের মূর্ত্তি-অঙ্কিত মুদ্রাও মাজুইয়ারের প্রবঞ্চনা, কেন না সে মুদ্রায় গথিক অক্ষর অঙ্কিত।

এই মিথ্যা টিউটোবকাস-দেহ ১৮৩২ খৃস্টাব্দ পর্য্যন্ত বোর্দোতে রক্ষিত হইয়াছিল, পরে ইহা পারিসের মিউজিয়ামে প্রেরিত হয়। ব্ল্যাভিল ইহা দেখিয়া মাশটডন অস্থি স্থির করেন। এবং যাহারা এ অস্থি একবার দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন এক মুহূর্ত্তের জন্যও ইহা মনুষ্য কঙ্কাল বলিয়া ভ্রম হওয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য-জনক।

এই অস্তর যুগেই প্রথম বানরের জন্ম। এ সময়ের দুই তিন প্রকার বানর কঙ্কাল পাওয়া যায়। মায়োসিন সমুদ্রে ৯০ জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন নূতন জীব জন্মে। তাহার মধ্যে কয়েক জাতীয় জীব এখনো বর্ত্তমান যেমন এখনকার কাঁকড়া, চিংড়ি মাচ ইত্যাদি।

এই যুগের কয়লায় আর এক অপরূপ দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা হলদে ধুনা, Amber।

তৃতীয় যুগের লুপ্ত দেবদারু জাতীয় বৃক্ষ নির্যাস অনেকদিন ভূমধ্যে প্রোথিত থাকিয়া এইরূপ আকরিক ধুনা হইয়াছে। বালুকা ও কর্দ্দম মধ্যস্থিত এই ধুনা

ব্যালটিক-সমুদ্র-তরঙ্গ-ধৌত হইয়া কূলে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং ইহা দ্বারা বহুকাল হইতে বাণিজ্য চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে ফৈনিসিয়েরা বাণিজ্যার্থে এই ধূনা কুড়াইতে ব্যালটিক-সমুদ্র-তীরে আরোহন করিত। এখন গভর্ণমেণ্টে ইহা নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন। এই ধূনা এখন প্রধানত ডান্‌ৎসিক ও মেমেলের মধ্যস্থিত জর্ম্মান উপকূলে প্রাপ্তব্য। অন্য মূল্য ছাড়া ইহার একটি বিশেষ মূল্য এই, তৃতীয় যুগের যে সকল প্রকার কীট পতঙ্গ দেহ ইহাতে রক্ষিত, তাহাদের বর্ণ এবং আকৃতির কিছুমাত্র, বৈলক্ষণ্য হয় নাই।

মায়োসিন অন্তর যুগে ভারতবর্ষে, ব্রহ্মদেশের পেগু, আসাম ও সিন্ধুর কতকাংশ এবং মারি প্রদেশ উৎপন্ন।

প্লায়োসিন অন্তর যুগ।

তৃতীয় যুগের এই শেষ অন্তর যুগে বিষম বিপ্লব চিহ্ন পাওয়া যায়। সকল সময়ের বিপ্লবের যে কারণ ইহারও তাই। ভূগর্ভ শীতল হইয়া এই সময় এত সঙ্কুচিত হইয়াছিল, যে কঠিন ভূপৃষ্ঠ নিম্নে নির্ভর না পাইয়া তুবড়াইয়া উচ্চনীচ হইতে লাগিল, এবং কোন কোন স্থান ফাটিয়া সেই গহ্বর নিঃসৃত আভ্যন্তরিক দ্রব পদার্থ পর্ব্বতমালায় পরিণত হইল। প্লায়োসিন অন্তর যুগের এই রূপ উৎপাৎ জনিত পর্ব্বতমালা ইয়োরোপে অনেক দৃষ্ট হয়। এই অন্তর যুগে হঠাৎ শীতের প্রাধান্য দেখাযায়, এখন পর্ব্বত চুড়া তুষারাচ্ছন্ন। দেশ মহাদেশ এই সময় হইতেই বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু এই অন্তর যুগের অনেক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হ্রদ এখন শুষ্ক। এই সময়ের উদ্ভিদ প্রায় ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের মত। পর্ণীতরু জাতির এখন আর আধিক্য নাই। শীতাতপ বৈষম্য হেতু ভিন্ন দেশে এখন ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদ জন্মিয়াছে। ইয়োরপে আর গ্রীষ্ম দেশের বৃক্ষের তত প্রাচুর্য্য নাই। এ অন্তর যুগেও নানা প্রকার অদ্ভুত স্থলচর জন্তু দেখা যায়। তবে এ সময়ে স্তন্যপায়ী এবং ভেকজাতীয় সরীসৃপেরই প্রাধান্য অধিক। এ অন্তর যুগের শেষ ভাগে মাস্টডন আর বড় দেখা যায় না। এ যুগের নূতন উৎপন্ন জন্তুর মধ্যে, জল-হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব বৃষ শূকর ও হরিণ এখনো বর্ত্তমান। এ অন্তর যুগের অশ্ব আধুনিক জাতি অপেক্ষা আকারে ছোট ইহা প্রায় গর্দ্দভের সমান।

এখন নানা জাতীয় অসংখ্য বানর দেখা যায়। মায়োসিন অন্তর যুগে গণ্ডারের প্রথম উৎপত্তি, এ সময়ে তাহার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। এ সময় একরূপ দ্বিখড়্গী গণ্ডার (Rhinoceros tichorhinus) দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সুমাত্রা ও আফ্রিকার আধুনিক দ্বিখড়্গী জাতি হইতে অনেক ভিন্ন। ইহাদের নাসারন্ধ্রদ্বয়ের মধ্যে একটা হাড়ের ব্যবধান আছে, আধুনিক জাতিতে তাহা নাই।

এই পুরাতন অদ্ভূত-গণ্ডার-কঙ্কাল হইতে নানাবিধ অদ্ভুত গল্পের উৎপত্তি। আরব্য উপন্যাসে যে রক পক্ষীর গল্প পড়া যায়, ভূগর্ভে এই গণ্ডার শৃঙ্গ পাইয়াই

সেই অদ্ভুত পক্ষীর গল্প সৃষ্টি হইয়াছে। ইয়োরপের বিখ্যাত ড্রাগনের গল্পও ইহা হইতে সৃষ্ট।

ক্যারিনথিয়া প্রদেশের ক্ল্যাগেনভূর্থ নগরের ফোয়ারায় প্রকাণ্ড ৬ ফুট পরিমান এক-শৃঙ্গ-ড্র্যাগন মস্তক অঙ্কিত আছে।

প্রবাদ এই যে, এই ড্র্যাগন পূর্ব্বে এক পর্ব্বত গুহায় বাস করিত এবং মধ্যে মধ্যে গুহা নির্গত হইয়া দেশ ছারখার করিত। এক সাহসী বীর নিজ-প্রাণ দিয়া এই ড্র্যাগনকে হত্যা করেন। ক্লাগেনভূর্থের টৌনহলে রক্ষিত এই ড্র্যাগনমস্তক হইতে শেষে ফোয়ারায় তাহার অনুরূপ অঙ্কিত হয়। ভিয়েনার হের উঙ্গের (Herr unger) এই মস্তক-চিত্র দেখিবা মাত্রেই গণ্ডার মস্তক বলিয়া চিনিতে পারেন।

কোন পর্ব্বত গুহায় এই মস্তক পাইয়া হয় তো এই অদ্ভুত গল্পের সৃষ্টি হইয়াছিল। হিমালয়ের মার্কণ্ড উপত্যকায় এই সময়কার একরূপ অদ্ভুত রোমন্থনকারী জন্তুর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। ইংরাজেরা শিবের নাম হইতে ইহার নাম শিবথেরিয়াম রাখিয়াছেন। ইহার শরীর বৃষের ন্যায় প্রকাণ্ড, এবং আকারে অনেকটা আধুনিক (Elk) এল্ক জাতীয় হরিণের মত। ভিন্ন ভিন্ন শষ্যাহারী-জন্তুর অবয়ব মিশ্রণ সত্বেও ইহার একটি নিজত্ব লক্ষিত হয়। ইহার বৃহৎ মস্তকে বর্ত্তমান সময়ের এক-জাতীয় আমেরিক হরিণের (Prong Buck) শৃঙ্গের মত শাখা প্রশাখা-বিশিষ্ট ৪ টি শূণ্যগর্ভ শৃঙ্গ।

বর্ত্তমান কালে জীবিত ভেক জাতীয় উভচর সরীসৃপ (যথা, গোসাপ ইত্যাদি) ২০ ইঞ্চের অধিক দীর্ঘ নহে। কিন্তু তৃতীয় যুগে এই জাতীয় এক একটি সরীসৃপ কুম্ভীরের ন্যায় দীর্ঘায়তন ছিল।

পূর্ব্বে এই সকল সরীসৃপ কঙ্কালকে চতুর্থ যুগের বন্যাহত মনুষ্য কঙ্কাল বলিয়া বিশ্বাসছিল। এই ভ্রম বিশ্বাসটি ঘুচাইবার জন্য ক্যাপে ও কুভিয়ের অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছে।

হোরেশ দে সোস্যর (Horace de Saussure) তাঁর আল্প পরিভ্রমন (Voyage dans les Alpes) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডে রাইননদীর বামপার্শ্বে ইনিংগেন গ্রামের নিকটে এক-স্থানে প্রস্তর-স্তলে একটি অস্থি-কঙ্কাল পাইয়া মনুষ্য কঙ্কাল বোধে শ্যুকজার (Scheuchzer) নামক এক জন সুইশ প্রাণীবেত্তা ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের ফিলজফিক্যাল ট্রানজ্যাকসন পত্রিকায় ইহার বিশেষরূপ বর্ণনা করিয়া এক প্রবন্ধ লেখেন। এবং ১৭৩১ খৃঃ অব্দে তিনি আবার এই সম্বন্ধে "মনুষ্য বন্যার" সাক্ষী (Homo deluvii testis) নামক এক খানি পুস্তক লেখেন। পবিত্র ভৌতিক বিদ্যা (Physica Sacra) নামক তাঁহার আর একখানি পুস্তকেও ঐ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।

"মনুষ্য বন্যার সাক্ষী" এই কথা লইয়া জার্ম্মানিতে মহা হুলস্থূল চলিল, কিন্তু প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম উপদেষ্টা ও প্রাণী বেত্তা সুইস পণ্ডিত সুকিজারের বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা

কহিতে সাহস করিলেন না—কেবল পিয়ার ক্যাঁপার একাকী এই মতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া, ১৭৮৭ খৃস্টাব্দে নিজে এনিংগেন (OEningen) পর্য্যন্ত গিয়া এই কঙ্কাল পরীক্ষা দ্বারা সরীসৃপ কঙ্কাল বলিয়া স্থির করেন। কিন্তু কোন জাতীয় সরীসৃপ তাহা ক্যাঁপার ঠিক ধরিতে পারেন নাই; কুভিয়ে পরে সে মীমাংসা করিলেন। এযুগের পক্ষীর মধ্যে শকুনি, ঈগল গল, ছাতারি শুকজাতীয় ফেজ্যাণ্ট কুকুট, হংস, ইত্যাদি এখনো জীবিত।

এই সময়ে প্রথম আমরা জলচর স্তন্যপায়ী দেখিতে পাই, ডলফিন এবং তিমি মৎস্য এই সময়ে জন্মে। জিফিউস(Ziphius) বলিয়া আর একরূপ জলচর-জীবদের কুভিয়ে স্তন্যপায়ী জলচর শ্রেণী ভুক্ত করিয়াছেন। ভূমধ্য সাগরে এই জাতি এখনো বর্ত্তমান। এই সময়ে বহুসংখ্যক নূতন শম্বুক জাতীয় জীব জন্মে এবং পৃথিবী ফলতঃ আধুনিক আকারে পরিণত হয়।

ভগ্ন হৃদয়।

ষষ্ঠ সর্গ।

কবি ও মুরলা।

কবি।—

উন্মাদিনী, কল্লোলিনী ক্ষুদ্র এক নির্ঝরিণী,
শিলা হোতে শিলাস্তরে লুটিয়া লুটিয়া,
নেচে নেচে অট্ট হেসে, ফেনময় মুক্ত কেশে
প্রশান্ত হ্রদের কোলে পড়ে ঝাঁপাইয়া;
শুধু মুহূর্ত্তের তরে তিল বিচলিত করে
সে প্রশান্ত সলিলের শুধু এক পাশ,
উনমত্ত কোলাহল, অধীর তরঙ্গদল
মুহূর্ত্তের মাঝে সব পায় গো বিনাশ!
দেখ, সখি, গৃহ মাঝে দেখগো চাহিয়া,
নাচ, গান বাদ্য, হাসি,আমোদ কল্লোলরাশি-
নিশীথ-প্রশান্তি মাঝে পড়িছে ঝাঁপিয়া।
আলোকে আলোকে গৃহ উঠেছে মাতিয়া,
স্ফটিকে স্ফটিকে আলো নাচে বিচ্ছুরিয়া,
শত রমণীর পদ পড়ে তালে তালে;
চরণের আভরণ, নেচে নেচে প্রতিক্ষণ,
শত আলোকের বাণ হানে এককালে;
মূর্চ্ছিয়া পড়িছে আলো হীরকে হীরকে;
শত কৃষ্ণ আঁখিতারা হানিছে আলোক ধারা—
শত হৃদে পড়ে গিয়া ঝলকে ঝলকে!
চারি দিকে ছুটিতেছে আলোকের বাণ,
চারিদিকে উঠিতেছে হাসি বাদ্য গান।

কিন্তু হেথা চেয়ে দেখ কি শান্ত যামিনী!
কি শুভ্র জোছনা ভায়, কি শান্ত বহিছে বায়,
কেমনে ঘুমন্ত আছে প্রশান্ত তটিনী!
বল, সখি, পূর্ণিমা কি আমোদের রাত?
এস তবে দুই জনে বসি হেথা এক মনে,
করি আপনার মনে রজনী প্রভাত!

(গান)

নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়।
ধীরে ধীরে অতিধীরে—অতিধীরে গাও গো!
ঘুম-ঘোরময় গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো!
নিশীথের সুনীরব শিশিরের সম,
নিশীথের সুনীরব সমীরের সম,
নিশীথের সুনীরব জোছনা সমান
অতি—অতি—অতিধীরে কর সখি গান!
নিশার কুহক বলে নীরবতা-সিন্ধুতলে
মগ্ন হোয়ে ঘুমাইছে বিশ্ব চরাচর;
প্রশান্ত সাগরে হেন, তরঙ্গ না তুলে যেন
অধীর-উচ্ছ্বাসময় সঙ্গীতের স্বর!
তটিনী কি শান্ত আছে! ঘুমাইয়া পড়িয়াছে
বাতাসের মৃদু হস্ত পরশে এমনি,
ভুলে যদি ঘুমে ঘুমে তটের চরণ চুমে
সে চুম্বন ধ্বনি শুনে চমকে আপনি!
তাই বলি অতি ধীরে—অতিধীরে গাও গো,
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো!

(মুরলার প্রতি)
কেনলো মলিন সখি, মুখানি তোমার?
কাছে এস, মোর পাশে বোস' একবার!
কেন সখি বল মোরে, যখনি দেখেছি তোরে
মাটি পানে নত দুটি বিষণ্ণ নয়ান!
আননের দুই পাশ এলানো কুন্তল রাশ,
করুণ ও মুখ খানি বড় সখি ম্লান!

মুরলা।—
সত্য ম্লান কিগো কবি এ মুখ আমার?
নিশীথ বাতাস লাগি মনে কত উঠে জাগি
নিস্তব্ধ জোছনা রাতে ভাবনার ভার!
(স্বগত) আহা কি করুণ সখা, হৃদয় তোমার!
কবি গো! বুক যে যায়, ভেঙ্গে যায়, ফেটে যায়—
অশ্রুজল রুধিবারে পারিনাক আর!
পারিনে—পারিনে সখা—পারিনে গো আর!
ভেঙ্গে বুঝি ফেলে তারা মর্ম্ম কারাগার!
একবার পায়ে ধোরে কেঁদে নিই প্রাণ ভোরে,
একবার শুধু, কবি, শুধু একবার!
যুঝিছে বুকের মাঝে শত অশ্রুধার!

কবি।—
একটি প্রাণের কথা রোয়েছে গোপনে,
বলিব বলিব তোরে করিতেছি মনে!
আজ জোছনার রাতে বিপাশার তীরে
কাছে আয়, সে কথাটি বলি ধীরে ধীরে!

মুরলা।—
কি কথা সে? বল কবি! করহ প্রকাশ!

কবি।—
কে জানে উঠেছে হৃদে কিসের উচ্ছ্বাস!
খেলিছে মর্ম্মের মাঝে অধীর উল্লাস।
অথচ, উল্লাস সেই সুকুমার হেন,
শিশিরের বাষ্প দিয়ে গঠিত সে যেন!
হৃদয়ে উঠেছে যেন বন্যা জোছনার,
মধুর অশান্তিময় হৃদয় আমার।
সূক্ষ্ম আবরণ, গাঁথা সন্ধ্যা মেঘ স্তরে,
পড়িয়াছে যেন মোর নয়নের পরে!

কিছু যেন দেখেও দেখেনা আঁখিদ্বয়,
সকলি অস্ফুট, যেন সন্ধ্যাবর্ণময়!
শোন্ বলি মুরলা লো, আরো আয় কাছে!
শূন্য এ হৃদয় মোর ভাল বাসিয়াছে!

মুরলা।—
ভালবাসে? কারে কবি? কারে সখা? কারে?

কবি।—
মধুর নলিনী সম নলিনী বালারে!

মুরলা।—
নলিনী? নলিনী সখা! নলিনী বালারে?
কবি মোর! সখা মোর! ভালবাস' তারে?

কবি।—
হাঁ মুরলা, সেই নলিনী বালারে,
　তারে তুমি জান না কি?
এমন মধুর মুখ-ভাব তার!
　এমন মধুর আঁখি!
এত রাশি রাশি খেলাইছে হাসি
　হৃদয়ের নিরালায়—
নয়ন অধর ভাসাইয়া দিয়া
　উথলি পড়িয়া যায়!
যে দিকে সে চায় হাসিময় চোখে—
　হাসি উঠে চারি ধার;
যে দিকে সে যায় আঁধার মুছিয়া
　চলে জ্যোতি-ছায়া তার!
তার সে নয়ন-নিঝর হইতে
　হাসি সুধারাশি ঝরি,
এই হৃদয়ের আকাশ পাতাল
　রেখেছে জোছনা করি!

মুরলা।—(স্বগত) দেবী গো করুণাময়ী,
কোথা পাই ঠাঁই মাগো, কোথা গিয়ে কাঁদি!
দুর্ব্বল এ মন দে মা পাষাণেতে বাঁধি!

(প্রকাশ্যে)
আহা কবি তাই হোক্—সুখে তুমি থাক'।
এ নব প্রণয়ে মন পূর্ণ কোরে রাখ'!
নয়নের জল তব কিছুতে মোছে নি,
হৃদয়-অভাব কিছুতে ঘোচে নি—
আজ কবি, ভালবেসে সুখী যদি হও শেষে,
আজ যদি থামে তব নয়নের ধার,
দেবতা গো, তাই কর! চিরজন্ম সুখী কর
কবিরে আমার, বাল্য-সখারে আমার!

কবি।—
মুছ' অশ্রুজল সখি কেঁদনা অমন;—
যে হাসির কিরণেতে পূর্ণ হ'ল মন
একেলা বিজনে বসি কবিরে তোমার
কাঁদিতে দেখিতে সখি হবেনাক আর!
আজ হোতে মিলাবে না হাসি এ অধরে,
বিষণ্ণ হবেনা মুখ মুহূর্ত্তের তরে।
আয় সখি. আয় তবে, কাছে আয় মোর,
মুছাইয়া দিই আহা অশ্রুজল তোর!

মুরলা।—
অশ্রু মুছায়োনা আর—বহুক্ যা' বহিবার,
এখনি আপনা হোতে থামিবে উচ্ছ্বাস;
এ অশ্রু মুছাতে কবি কিসের প্রয়াস!
ক্ষুদ্র হৃদয়ের কত ক্ষুদ্র সুখ দুখ
আপনি সে জাগি উঠে—আপনি শুকায় ফুটে
চেয়েও দেখে না কেহ উঠুক্ পড়ুক্!
এস সখা, ওই কাঁধে রাখি এই মুখ;
একে একে সব কথা কহগো আমারে—
বড় ভাল বাস' কি সে নলিনী বালারে?

কবি।—
শুধু যদি বলি সখি ভাল বাসি তায়
এ মনের কথা যেন তাহে না ফুরায়।—

ভালবাসা ভালবাসা সবাইত কয়,
ভালবাসা কথা যেন ছেলেখেলাময়;
প্রতি কাজে প্রতি পলে সবাই যে কথা বলে
তাহে যেন মোর প্রেম প্রকাশ না হয়!
মনে হয় যেন সখি, এত ভালবাসা
কেহ কারে বাসে নাই,কারো মনে আসে নাই
প্রকাশিতে নারে তাহা মানুষের ভাষা!

মুরলা।—
তাই হোক, ভাল তারে বাস' প্রাণপণে!
তারে ছাড়া আর কিছু না থাকুক্ মনে!

কবি।—
সে আমার ভালবাসা না যদি পুরায়!
যেই প্রেম-আশা লোয়ে,রয়েছি উন্মত্ত হোয়ে
বিশ্ব দেখি হাস্যময় যাহার মায়ায়,
যদি সখি ফিরে নাহি পাই ভালবাসা—
ম্রিয়মান হোয়ে পড়ে সেই প্রেম-আশা,
মুমূর্ষু আশার সেই গুরু দেহ-ভার
সমস্ত জগৎময় বহিয়া বেড়াতে হয়—
শ্রান্ত হৃদি দিবানিশি করে হাহাকার!
অসুস্থ আশার সেই মুমূর্ষু-নিশ্বাসে
যদি এ হৃদয় হয় শূন্য মরুভূমি ময়,
হৃদয়ের সব বৃত্তি শুকাইয়া আসে,
দিনরাত্রি মৃত-ভার করিয়া বহন
ম্রিয়মান হোয়ে যদি পড়ে এই মন!

মুরলা।—
ওকথা বোলোনা, কবি, ভেবোনাক আর;
নিশ্চয় হইবে পূর্ণ প্রণয় তোমার!
কি-জানি-কি-ভাবময় ওই তব মুখ—
ওই তব সুধাময়—প্রেমময়—স্নেহময়
সুকুমার—সুকোমল—করুণ ও মুখ—
হাসি আর অশ্রুজলে মাখান' ও মুখ
রাখিতে প্রাণের কাছে,এমন কে নারী আছে
পেতে না দিবেক তার প্রেমময় বুক!
শত ভাব উথলিছে ওই আঁখি দিয়া—
শত চাঁদ ওই খানে আছে ঘুমাইয়া—
মুছাইতে ও মধুর নয়নের ধার
কোন্ নারী দিবেনাক' আঁচল তাহার!
মধুময় তব গান দিবারাত করি পান
ঘুমাইয়া পড়িবে সে হৃদয়ে তোমার;
বসি ওই পদমূলে মুগ্ধ আঁখি-পাতা তুলে
দিন রাত্রি চেয়ে রবে ওই মুখ পানে
সূর্য্যমুখী ফুল সম অবাক্ নয়ানে!
হেন ভাগ্যবতী নারী কে আছে ধরায়—
সেজন কবির প্রেম না চাহিয়া পায়!

(স্বগত) মুরলারে—
কোন আশা পূরিল না তোর—
কাঁদ তুই অভাগিনী এ জীবন ভোর!
এ জনমে তোর অশ্রু মুছাবেনা কেহ,
এ জনমে ফুটিবে না তোর প্রেম স্নেহ;
কেহ শুনিবেনা আর তোর মর্ম্ম-ব্যথা,
ভালবেসে তোর বুকে রাখিবেনা মাথা!
বড় যদি শ্রান্ত হোয়ে পড়ে তোর মন
কেহ নাহি কহিবারে আশ্বাস-বচন;
মাতৃহারা শিশু মত কেঁদে কেঁদে অবিরত
পথের ধূলার পরে পড়িবি ঘুমায়ে,
একটি স্নেহের নেত্র দেখিবে না চেয়ে!

(নলিনীর প্রবেশ)

কবি।—(দূর হইতে)
পূর্ণিমা-রূপিণী বালা! কোথা যাও, কোথা যাও!
একবার এই দিকে মুখানি তুলিয়া চাও!

কি আনন্দ ঢেলেছ যে, কি তরঙ্গ তুলেছ যে
আমার হৃদয় মাঝে, একবার দেখে যাও !
দিবানিশি চায়, বালা, অধীর ব্যাকুল মন
ও হাসি-সমুদ্র মাঝে করে আত্ম বিসর্জ্জন !
হেরি ওই হাসিময়, মধুময় মুখপানে
উন্মত্ত অধীর-হৃদি তিল দূর নাহি মানে ;—
চায়, অতি কাছে গিয়া ওই হাত দুটি ধরি,
অচেতনে কাটাইয়া দেয় দিবা বিভাবরী ;
একটি চেতনা শুধু জাগি রবে অনিবার—
সে চেতনা তুমি-ময়—ওই মিষ্ট হাসিময়—
ওই সুধা মুখ-ময়—কিছু—কিছু নহে আর !
আমার এ লঘু-পাখা কল্পনার মেঘগুলি
তোমার প্রতিমা, বালা, মাথায় লয়েছে তুলি;
তোমার চরণ জ্যোতি পড়িয়া সে মেঘ পরে
শত শত ইন্দ্রধনু রচিয়াছে থরে থরে !
তোমার প্রতিমা ল'য়ে কিরণে কিরণে ভরা
উড়েছে কল্পনা—কোথা ফেলিয়ে রেখেছে
ধরা !

হরিত-আসন পরে নন্দন-বনের কাছে,
ফুল-বাস পান করি বসন্ত ঘুমায়ে আছে,
ঘুমন্ত সে বসন্তের কুসুমিত কোল পরে
তোমারে কল্পনা-রাণী বসায়েছে সমাদরে ;
চারি দিকে জুঁই ফুল, চারি দিকে বেলা ফুল
ঘিরে ঘিরে রহিয়াছে সহস্র কুসুম কুল ;
শাখা হোতে নুয়ে পোড়ে পরশিয়া এলো চুল
শতেক মালতী কলি হেসে হেসে ঢলাঢলি,
কপালে মারিছে উঁকি, কপোলে পড়িছে ঝুঁকি
ওই মুখ দেখিবারে কৌতুহলে সমাকুল ;
অজস্র গোলাপ রাশি পড়িয়া চরণ তলে
না জানি কি মনোদুখে আকুল শিশির জলে !
তোমার প্রতিমা লোয়ে কল্পনা এমনি করি,
খেলাইয়া বেড়াইছে নাহি দিবা বিভাবরী ;
কভু বা তারার মাঝে, কভু বা ফুলের পরে,
কভু বা উষার কোলে, কভু সন্ধ্যা-মেঘ স্তরে;
কত ভাবে দেখিতেছে, কত ছবি আঁকিতেছে;
প্রফুল্ল-আনন কভু হরষের হাসি-মাখা,
অভিমান-নত আঁখি কভু অশ্রুজলে ঢাকা।
কাছে এস' কাছে এস', একবার মুখ দেখি,
তোল গো, নলিনী বালা, হাসি ভারে নত
আঁখি !

মর্ম্মভেদী আশা এক লুকানো হৃদয় তলে,
ওই হাতে হাত দিয়ে, প্রাণে প্রাণে মিশাইয়ে
বসন্তের বায়ু সেবি কুসুমের পরিমলে,
নীরব জোছনা রাতে, বিপাশা তটিনী তীরে,
ফুল-পথ মাড়াইয়া দোঁহে বেড়াইব ধীরে ;
আকাশে হাসিবে চাঁদ, নয়নে লাগিবে ঘোর,
ঘুমময় জাগরণে করিব রজনী ভোর !
আহা সে কি হয় সুখ। কল্পনায় ভাবি মনে
বিহ্বল আঁখির পাতা মুদে আসে দু নয়নে।

মুরলা।—(স্বগত) হৃদয় রে—
এসংসারে আর কেন রয়েছি আমরা ?
তুচ্ছ হোতে তুচ্ছ আমাদেরো তরে আজ
তিল মাত্র স্থান কি রে রাখিয়াছে ধরা।
এখনো কি আমাদের ফুরায় নি কাজ ?
হৃদয় রে ! হৃদয় রে ! ওরে দগ্ধ মন !
আমাদের তরে ধরা হয় নি সৃজন।

কবি।—মুরলা লো !
চেয়ে দেখ্—চেয়ে দেখ্ হোথা।
বল্ দেখি এত হাসি—এত মিষ্ট সুধারাশি,
হেন মুখ, হেন আঁখি দেখেছিস্ কোথা ?

মুরলা।—
এমন সুন্দরী আহা কভু দেখি নাই—

কবির প্রেমের যোগ্য আর কিবা চাই।
কবিতার উৎস সম ও নয়ন হোতে
ঝরিবে কবিতা তব হৃদে শত-স্রোতে।
হাসিময় সৌন্দর্য্যের কিরণ পরশে
বিহঙ্গম-হৃদি তব গাহিবে হরষে;
মধুর সঙ্গীতে বিশ্ব করিবে প্লাবন ;
সুখে থাক' পূর্ণ মনে, ভালবাস' প্রাণপণে
প্রেম-যোগ্য নারী যবে পেয়েছ এমন।
(স্বগত)
কেন এত অশ্রু আজি করি বরিষণ ?
কেন রে কিসের দুখ ? কেন এত ফাটে বুক ?
কিসের যন্ত্রণা মর্ম্ম করিছে দংশন ?
কখনো ত কবির অমূল্য ভালবাসা
অভাগিনী মনে মনে করি নাই আশা।
জানিতাম চির দিন, রূপহীন, গুণহীন,
তুচ্ছ মুরলার এই ক্ষুদ্র ভালবাসা
পূরাতে নারিবে তাঁর প্রণয় পিপাসা ;
মোরে ভালবেসে কবি সুখী হইবে না ;
তবে আজ কিসের গো—কিসের যাতনা !
আজ কবি মুছেছেন অশ্রুবারিধার,
বহুদিনকার আশা পুরেছে তাঁহার !
আহা কবি, সুখে থাক'—আর কিছু চাই-
নাকো,
এই মুছিলাম অশ্রু, আর কাঁদিব না,
কিসের যাতনা মোর, কিসের ভাবনা !
কবি।—
ওই দেখ, ফুল তুলে আঁচলটি ভরি,
কামিনীর শাখা লোয়ে ওই দেখ ভয়ে ভয়ে
অতি যত্নে রাখিয়াছে নুয়াইয়া ধরি,
পাছে কুসুমের দল ভুঁয়েপড়ে ঝরি !
ওই দেখ—উচ্চ শাখে ফুটিয়াছে ফুল,
তুলিবার তরে আহা কতই আকুল !
কিছুতে তুলিতে নারে কত চেষ্টা করি,
শাখাটি ধরিয়া শেষে নাড়িছে মধুর রোষে
কুসুম শতধা হোয়ে পড়িতেছে ঝরি ;
বিফল হইয়া শেষে সখীদের কোলে
ওই দেখ্ হেসে হেসে পড়িতেছে ঢোলে !
মুরলা।—(স্বগত)
আমি যদি হইতাম হাস্যোল্লাসময় !
নির্ঝরিণী, ঝরঝর নবোচ্ছাসময় !
হরষেতে হেসে হেসে কবির কাছেতে এসে
ডুবাতেম ভালবেসে আদরে আদরে !
যদি কভু দেখিতাম মুহূর্ত্তের তরে
বিষাদ ছাইছে পাখা কবির অধরে,
হাসিয়া কত না হাসি—ঢালিয়া সঙ্গীত রাশি.
মৃদু অভিনয় করি, মৃদু রোষ ভরে—
মৃদু হেসে, মৃদু কেঁদে—বাহুতে বাহুতে বেঁধে
দিতেম বিষাদ ভার সব দূর কোরে !
কিন্তু আমি অভাগিনী ছেলেবেলা হোতে
এ গম্ভীর মুখে মম অন্ধকার ছায়া সম
রহিয়াছি সতত কবির সাথে সাথে !
আমি লতা গুরু ভার মেলি শাখা অন্ধকার
হেন ঘন আলিঙ্গনে কোরেছি বেষ্টন,
উন্নত মাথায় তাঁর পড়িতে দিই না আর
চাঁদের হাসির আলো, রবির কিরণ !
হা মুরলা, মুরলারে—এমনি কোরেই হা রে
হারালি—হারালি বুঝি ভালবাসা ধন !
বুক, ফেটে যা'রে, অশ্রু কর বরিষণ,
কবি তোর অশ্রু-ধার দেখিতে পাবেনা আর'
যে কিরণে আছে ডুবি তাঁহার নয়ন !
দুর্ব্বল—দুর্ব্বল-হৃদি ! আবার ! আবার !
আবার ফেলিস্ তুই অশ্রু বারি-ধার ?

আবার আবার কেন হৃদয় দুয়ারে হেন
পাষাণে পাষাণে গাঁথা—কে যেন হানিছে
মাথা,
কে যেন উন্মাদ সম করে হাহাকার—
সমস্ত হৃদয়ময় ছুটিয়া আমার!
থাম থাম্, থাম্ হৃদি, মোছ্ অশ্রুধার!
কবি যদি সুখী হয় কি ভাবনা আর!
আহা কবি, সুখী হও—তুমি কবি সুখী হও।
আমি কে সামান্য নারী?—কি দুঃখ আমার,
তুমি যদি সুখী হও কি দুঃখ আমার!
ও চাঁদের কলঙ্কও হোতে নাহি পারি,
এত ক্ষুদ্র হোতে ক্ষুদ্র, তুচ্ছ আমি নারী।

(চপলার প্রবেশ ও গান)

সখি, ভাবনা কাহারে বলে?
সখি, যাতনা কাহারে বলে?
তোমরা যে বল' দিবস রজনী
ভালবাসা ভাল বাসা,
সখি, ভালবাসা কারে কয়?
সেকি কেবলি যাতনাময়?
তাহে কেবলি চোখের জল?
লোকে তবে করে কি সুখের তরে
এমন দুখের আশ?
জীবনের খেলা খেলিছে বিধাতা,
আমরা তাঁহার খেলেনা,
আমাদের কিবা সুখ!
সখি, আমাদের কিবা দুখ!
সখি, আমাদের কিবা যাতনা।
তোমাদের চোখে হেরিলে সলিল
ব্যথা বড় বাজে বুকে,
তবুত স্বজনি বুঝিতে পারিনে
কাঁদ যে কিসের দুখে।

আমার চোখেতে সকলি শোভন,
সকলি নবীন, সকলি বিমল,
সুনীল আকাশ, শ্যামল কানন,
বিশদ জোছনা, কুসুম কোমল,
সকলি আমারি মত।
কেবলি হাসে, কেবলি গায়,
হাসিয়া খেলিয়া মরিতে চায়,
না জানে বেদন, না জানে রোদন,
না জানে সাধের যাতনা যত।
ফুল সে হাসিতে হাসিতে ঝরে,
জোছনা হাসিয়া মিলায়ে যায়,
হাসিতে হাসিতে আলোক-সাগরে
আকাশের তারা তেয়াগে কায়।
আমার মতন সুখী কে আছে।
আয় সখি, আয় আমার কাছে,
সুখী হৃদয়ের সুখের গান
শুনিয়া তোদের জুড়াবে প্রাণ,
প্রতিদিন যদি কাঁদিবি কেবল
একদিন নয় হাসিবি তোরা,
একদিন নয় বিষাদ ভুলিয়া
সকলে মিলিয়া গাহিব মোরা।

(মুরলার প্রতি)

এই যে আমার সখীর অধরে
ফুটেছে মৃদুল হাসি,
আয় সখি, মোরা দুজনে মিলিয়া
ললিতারে দেখে আসি।
মালতী সেথায়—মাধবী সেথায়,
সখীরা এসেছে সবে,
এতখনে সেথা ফাটিছে আকাশ
কমলার হাসি-রবে।
মুরলা।—চল্ সখি চল্ তবে।

চট্টগ্রামের পুরাতত্ত্ব।

(বাঙ্গালা, ত্রিপুরা ও আরাকাণ ইতিহাসের কিয়দংশ মাত্র।)

তৃতীয় অধ্যায়।

সম্রাট আকবরের সেরেস্তাদার রাজা তোড়লমল্ল চট্টগ্রাম সরকারের বার্ষিক রাজস্ব ২৮৫৬০৭ টাকা স্থির করিয়া কেবল তাহার সেরস্তার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। চট্টলের রাজস্ব বোধ হয় কপর্দ্দক ও রাজকোষে জমা হইত না। তোড়লমল্লের ১৪০ বৎসর অন্তে জাফর খাঁ (মুর্শিদকুলি) বাঙ্গালার তৃতীয় বন্দোবস্ত করেন। (৫১) এই বন্দোবস্ত ১১৩৫ হিঃ অব্দে (১১২৮ বঙ্গাব্দে, ১৭২২ খৃস্টাব্দে) হইয়াছিল: জাফর খাঁর বন্দোবস্তি কাগজ "জমা কামেল তোমারি" নামে খ্যাত। জাফর খাঁ বাঙ্গালা ত্রয়োদশ চাকলায় বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে সরকার চট্টগ্রাম "চাকলে ইসলামাবাদ" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই চাকলায় ১৪৪টী পরগনা ও মহাল; বার্ষিক রাজস্ব ১৭৬৭৯৫ টাকা লিখিত আছে। যথা—

হিসাব চাকলে ইসলামাবাদ সরকার চাটিগাঁ।

হাউলি চট্টগ্রাম	...	২১৮৫৬
জুগদা (জুগিদিয়া কি ?)	...	৩৫১৩৫
দক্ষিণ কুল	...	২১২৩৫
বন্দর অলমগীর নগর	...	১৪৮২৫
ফতেয়াবাদ	...	৫৯২৩
সুদ্রুনা	...	৪০৫০
অরঙ্গানগর	...	২২৬৪
খুরদা খাঁ জাহানাবাদ	...	২৪১৯
তরাঘোড়া	...	৩৪৯১
দেবগ্রাম	...	৪৪০১
সাক্রয়া থলি	...	২১৯৭
সায়ের চট্টগ্রাম	...	১৩১৭৭
নৃসিংহাবাদ ও সেনাবাদ গা ৬ মহাল—		১৩২৯৮
		১৪৪২৮৪
ইজা ...	...	১৪৪২৮৪
১২৬ টী ক্ষুদ্র মহালের বাবত		৩২৫১১
		১৭৬৭৯৫

নবাব জাফর খাঁ ১৭৬৭৯৫ টাকা চট্টলের রাজস্ব স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু

৫১। সম্রাট সাজাহানের পুত্র সুলতান সুজা ১৬৫৮ খৃস্টাব্দে বাঙ্গালার দ্বিতীয় রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন। তোড়ল মল্লের "ওয়াসিল তোমার জমা" র ন্যায় সুজার "জমা তোমারিতে" ও চট্টলের রাজস্ব ২৮৫৬০৭ টাকা লিখিত। আমাদিগের বিবেচনায় আকবর কিম্বা সাজাহান চট্টলের রাজস্ব ভোগ করিতে পারেন নাই।

একটী টাকাও মুর্শিদাবাদে আসিত বলিয়া বোধ হয় না। চট্টগ্রামের উৎপন্ন চট্টগ্রামেই ব্যয় হইত। ৩৫৩২ জন পদাতি সৈন্যের ব্যয় জন্য ১৫০২৫১ টাকা লাভের ভূমি জায়গির ছিল। ফৌজদার ও সেনাপতিগণের বেতনের পরিবর্ত্তে জায়গির ২৪০০০ টাকা ও রণতরীর ব্যয় জন্য দুই জন প্রদেশীয় গোলান্দাজ দারগার জায়গির ২৫৪৪ টাকা—মোট ১৭৬৭৯৫ টাকা ব্যয় নির্দ্ধারিত ছিল। জাফর খাঁর উত্তরাধিকারী সুজাউদ্দিনের সংশোধিত হিসাবে চট্টগ্রামের অতিরিক্ত রাজস্ব ১৫৮৩৪০ টাকা দৃষ্ট হইতেছে। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দাবধি চট্টগ্রামের ফৌজদার থানাদারি (৫২) মহালান্তের জায়গিরদারগণ হইতে একটী নূতন কর সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন, ইহা দ্বারা বার্ষিক ৬৮৪২২ সিক্কা টাকা লাভ হইত। বঙ্গেশ্বর এই লভ্যের অংশভাগী ছিলেন কি না ইহা সন্দেহ স্থল। যাহা হউক এবম্প্রকার রাজস্ব বৃদ্ধি দ্বারা চিরভাগ্যবান ইংরাজ জাতির ভাবি লাভের সূত্রপাত হইল।

কালবশে যবনেরা সৌভাগ্যের উন্নত শিখর হইতে অধঃপতিত হইল। প্রবলপ্রতাপ বঙ্গেশ্বরগণ ব্রিটনবাসী বণিকদিগের ক্রীড়া পুত্তল হইলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ মিরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া মিরকাশিমকে বাঙ্গালার সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। কাশিম সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য ইংরাজ কোম্পানিকে চট্টগ্রাম, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর প্রভৃতি তিনটী চাকলা দান করেন। (৫৩) এই সময়ে চট্টগ্রামে বার্ষিক রাজস্ব ৩৩৫১৩৫ টাকা—"আখেরাজাত" খরচ ১২০০০ টাকা বাদে ৩২৩১৩৫ টাকা ছিল। কিন্তু অল্পকালমধ্যেই ইংরাজগণ চট্টলের রাজস্ব ৪৬৬৪২৮ টাকা স্থির করিয়াছিলেন।

ভারলেষ্ট সাহেব (৫৪) প্রথমতঃ চট্টগ্রামের শাসন কর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার সরদার (Chief) উপাধি ছিল।

১৬৮৪ শকাব্দে (১৭৬২ খৃঃ অঃ) চট্টগ্রামে একটি ভূমিকম্প হয়। অনেক স্থানে বসুন্ধরা বিদীর্ণ হইয়া জলকর্দ্দম নিঃসৃত করিয়াছিলেন। সেই নিঃসৃত দ্রব্যের সহিত গন্ধকের গন্ধ পাওয়া যাইত। বন্দরভূন নামক স্থানে একটি বৃহৎ নদী শুখাইয়া যায়। বাথরচক্র নামক সমুদ্র নিকটবর্ত্তী স্থানটী দুই শত লোক ও তাহাদের গবাদি পশুর সহিত সাগর গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

এই সময় আরাকাণে রাষ্ট্র বিপ্লব উপ-

৫২। সমগ্র চট্টগ্রাম প্রদেশ "থানাদারি মহাল" নামে পরিচিত ছিল।

৫৩। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টাম্বরের সন্ধি-পত্রের পঞ্চম দফার মর্ম্মানুসারে কোম্পানি বাহাদুর এই সকল স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ১০ ই জুলাইর সন্ধি দ্বারা কোম্পানি ঐ সকল প্রদেশের প্রকৃত স্বামী নির্ণীত হন।

৫৪। লর্ড ক্লাইবের স্বদেশ যাত্রার পর—১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ভারলেষ্ট বাঙ্গালার গবর্ণরের পদে অভিষিক্ত হন। তিনি কিঞ্চিদূন তিন বৎসর বাঙ্গলা শাসন করিয়াছিলেন।

স্থিত হয়। ক্রমে মগগণ চট্টগ্রামে পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল।

১৬৯৮ শকাব্দে (১৭৭৬ খৃঃ অঃ) পার্ব্বত্য প্রদেশবাসী সাক-(চাকমা)-নামক মগজাতির সরদার রাজা শ্রীদৌলত খাঁ ও রাম খাওন নামক অপর একজন মগসরদার ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তাহাদিগের দমন জন্য একটি সামান্য যুদ্ধ যাত্রার প্রয়োজন হইয়াছিল।

১৬৯৯ শকাব্দে কোম্পানি বাহাদুর পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে "খেদা" করিয়া হস্তী ধৃত করেন। ঐ অব্দের ৩১ মে চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা তদানীন্তন ইংরাজ গবর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংসকে যে পত্র লিখেন তৎপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে সে সময় প্রায় দশ সহস্র পার্ব্বত্য মানব আরাকাণ হইতে চট্টল পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

১৭০৪ শকাব্দে (১৭৮২ খৃঃ অঃ) আরাকাণ ব্রহ্মরাজ কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয়। নূতন রাজার রাজ্যাধিকারে সচরাচর দেশের যে অবস্থা ঘটিয়া থাকে আরাকাণে তাহাই হইল। দুর্ব্বল শান্তপ্রকৃতি মানবগণ বিজেতার বশ্যতা স্বীকার করিল। তেজস্বিগণ ব্রহ্মরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না এবং অনেকেরই চট্টল পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। রাষ্ট্রবিপ্লব ক্রূরমতি দস্যুদিগের বাঞ্ছনীয়। আরাকাণের দস্যুগণ নিরীহ প্রজা বৃন্দের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ব্রহ্মার সেনাদল দস্যুদমনে প্রেরিত হইল। দস্যুগণ নিরুপায় হইয়া ব্রিটিস অধিকারে পলায়ন করিল। আরাকাণের শাসনকর্ত্তা বন্ধুভাবে চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তাকে দুশ্চরিত্র লোকদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে লিখিলেন। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট বোধ হয় এই সকল নূতন প্রজার মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এই সকল ঘটনা হইতে ক্রমে একটী প্রকাণ্ড—লোমহর্ষণ অভিনয়ের সূত্রপাত হইতে লাগিল। একদিবসের সঞ্চিত মেঘে যে বৃষ্টি হয়, তাহাতে কখনই দেশ প্লাবিত হইতে পারে না।

১৭০৬ শকাব্দের আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগে ব্রহ্মরাজ তরফুমার স্বাক্ষরিত একখানি পত্র চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তার হস্তগত হয়। এই পত্র খানা পাঠ করিয়া আমরা আমোদ পাইয়াছি, পাঠকদিগকে তাহার অংশভাগী না করিয়া বিরত হইতে পারিলাম না। পত্রখানা ব্রহ্ম ভাষায় লিখিত, কিন্তু তাহার একখানি ইংরেজি অনুবাদ মাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। অনুবাদক নিতান্ত অনভিজ্ঞ, সুতরাং ভাষান্তরিত করিবার কালে আমাদিগকে অত্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

(পত্র।)

আমি মানবমণ্ডলীর ঈশ্বর। আমি একশতাধিক রাজ্যের অধিপতি। আমি ছত্রধারী সূর্য্যবংশীয় (৫৫) নরপতি। সতত

৫৫। "মহারাজোয়াং" নামক ব্রহ্মার ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ডে লিখিত আছে,—কপি-

বহু সংখ্যক নরপতি আমার আজ্ঞা বহন করিয়া থাকে। আমার রাজ্যে বসুন্ধরা প্রতিনিয়ত স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মাণিক্যাদি প্রসব করিতেছেন। বিদ্যুদ্বৎ অস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ আমার প্রচুর পরিমাণে আছে। যে সকল অস্ত্র বিদ্যুতের ন্যায় বিপক্ষ দমনে ও বশীকরণে উপযুক্ত তাহা আমারই আছে। সংগ্রামের জন্য আমার সৈনিকবর্গকে আদেশ বা কৌশল বুদ্ধির অপেক্ষা করিতে হয় না। আমার ঘোটক ও হস্তী অগণনীয়। আমার বেতনভোগী দশজন পণ্ডিত ও একশত চারিজন মহাধার্ম্মিক ধর্ম্মযোজকের বিদ্যাবুদ্ধি সহায় করিয়া আজি প্রজাদিগকে সুবিচার দান করিতেছি। তাঁহারা সর্ব্বদা নীতি বিরুদ্ধ কার্য্যে বিরত। আমি সূর্য্য-সদৃশ জ্যোতিষ্মান (জ্ঞানালোক দ্বারা); সুতরাং মনুষ্যের অতি গোপনীয় অভিলাষও আমার সমক্ষে অপ্রকাশিত নহে।

যিনি "রাজ" পদ বাচ্য হইতে অভিলাষী তিনি প্রজার প্রতি দয়াশীল ও সদ্বিচারক হইবেন। আমার বিচারে চোর, দস্যু প্রভৃতি শান্তি দ্রোহিগণ তাহাদের পাপোচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে। আমার মুখ নিঃসৃত বাক্য বিদ্যুতের ন্যায় ভীতিজনক।

লবাস্তুর অধিপতি সাক্যবংশীয় অভিরাজ কৌশল ও পিঞ্চলারিতের রাজা কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। তিনি স্বীয় পরিবার ও সৈনিকবর্গের সহিত পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়া ঐরাবতী তীরে উপনীত হইয়াছিলেন। অভিরাজ সপ্তবিংশ শতাব্দী পূর্ব্বে সেই স্থানে একটী নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার স্থাপিত রাজধানী "সেঙ্গসরত" বা "তেগুয়াং" নামে খ্যাত হয়। ঐরাবতী তীরে অদ্যাপি সেই নগরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; ইহার উত্তর—অক্ষাংস্তর ২৩ অংশ ২০ কলা। দুই পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া অভিরাজ লোকান্তরিত হন। কনিষ্ট কুমার কেনরাজনে বুদ্ধিবলে পৈতৃক আসন অধিকার করেন। জ্যেষ্ঠ কেনরাজ'গী রাক্ষিয়াং প্রদেশে স্বতন্ত্র রাজ্য সংস্থাপন করেন। কেনরাজ্'নে ও তাঁহার অধস্তন একত্রিংশ নরপতি দুই শত বৎসর পৌরুষানিক রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। শেষ নরপতি বিয়েনা'কা একমাত্র পত্নী নগসেনীকে বর্ত্তমান রাখিয়া পরলোক গমন করেন। রাষ্ট্রবিপ্লবে কপিলরাস্তুর অন্যতম রাজকুমার দাজারাজা রাজ্যচ্যুত হইয়া পূর্ব্বদিকে গমন করিলেন। তিনি প্রথমতঃ "মউরিয়া" বা "মউরিঙ্গ" (মিতাই লেইপাকের—আধুনিক মনিপুরের-পূর্ব্বদিকস্থ কাইবো উপত্যকা) নামকস্থানে রাজ্য স্থাপন করেন। মলি নামক স্থানে রাজ্ঞী নগসেনীর সহিত দাজারাজের সাক্ষাৎ হয়। দাজা নগসেনীর পানি গ্রহণ করিলে, তাহাদের একটী পুত্র জন্মে। সেই কুমার বীরগ আখ্যা প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মরাজগণ সেই বীরগকেই আপনাদের পিতৃ পুরুষ নির্দ্দেশ করেন।

রাজস্থানে ইতিহাসবেত্তা কর্ণেল টড সাহেব ব্রহ্মরাজদিগকে চন্দ্রবংশজ নির্ণয় করিয়াছেন। এই সকল বিষয়ে টড সাহেব প্রায়ই ভ্রমমার্গে পদ বিক্ষেপ করিয়াছেন। টডের ভ্রমগুলি সংশোধন করিবার জন্য আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করি। পাঠকগণ শুনিলে অবাক হইবেন যে, টড সাহেব শকুন্তলাকে দুষ্মন্তের কন্যা ও ভরতের ধর্ম্মপত্নী লিখিয়াছেন।

দেশে উপস্থিত হন। (৬২) তিনি মনুষ্য ও পশুকে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহার উপদেশানুসারে রাক্ষিয়াং পাঁচ সহস্র বৎসর একই নিয়মে শাসিত হইয়াছিল। (৬৩) পরস্পর প্রজাগণ একে অন্যের মঙ্গল কামনা করিত। আমি পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার সন্নীতির অনুসরণ করিয়া রাজ্য শাসন করিতেছি। স্থান বিশেষ সমুৎপন্ন সুগন্ধি মৃৎ স্নেহের ন্যায় আমার মহত্ত্ব ও প্রতাপ রাজমণ্ডলীতে শ্রেষ্ঠ। ১১৪৮ শকের (১১৯৩ বঙ্গাব্দ) প্রাসমাসের ১৫ই তারিখে প্রধান ধর্ম্মযাজক জাফরু আমাকে শ্রীবৌৎঠাকুরের বিধি অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন। সেই মুহূর্ত্তে আমি তাহা অবলম্বন করিয়াছি। সেরিতোমচোকার বিধি ও ব্যবহার অবলম্বন করিয়া আমি সুবিচার দ্বারা প্রজাগণের পরিতোষ সাধন করিতেছি।

চট্টগ্রাম রাক্ষিয়াং প্রদেশের নিকটবর্ত্তী। ইংরাজদিগের সহিত আমার বানিজ্য বিষয়ক সন্ধি সংস্থাপিত হইলে পরস্পর একতা ও নৈকট্য সম্বন্ধ জন্মিতে পারে। তজ্জন্য লিখিতেছি, যে আপনার দেশীয় বণিকগণ আমার অধিকার হইতে মুক্তা, গজদন্ত, মম প্রভৃতি ক্রয় করিতে পারিবে; তদ্বিনিময়ে আমার প্রজাবর্গ চট্টগ্রাম সমুৎপন্ন দ্রব্যাদি অবাধে ক্রয় করিতে পারে, আপনি এমত অনুমতি করিবেন। চট্টগ্রামবাসী মগগণ ধর্ম্ম ও আচার ভ্রষ্ট হইয়াছে। (৬৪) বিধি অনুসারে তাহাদের ভ্রম ও কুনিয়ম সংশোধন করা উচিত। ক্ষমতা সত্ত্বে যে ব্যক্তি ধর্ম্মদ্রোহী মানববৃন্দকে সংশোধন না করেন তাহাকে অনন্তকাল নরক যন্ত্রণা (Eternal punishment) ভোগ করিতে হইবে। দয়া ও ধর্ম্মের নীতি অনুসারে যে ব্যক্তি আত্ম সংশোধন করিয়াছেন, তিনি লোকান্তরে স্বর্গবাসী হইবেন। ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতা সংস্থাপনোদ্দেশে আমি ৩০ জন লোক দ্বারা ৪ টী গজদন্ত আপনার সমক্ষে প্রেরণ করিতেছি। পত্রোত্তরে এ বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় জানাইবেন।

অনেকেরই এরূপ সংস্কার যে ব্রহ্মরাজ গায়ে পড়িয়া দুইবার ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের সহিত যুদ্ধ বাধাইয়াছেন। এই পত্র পাঠে তাহাদের সেই সংস্কার দূর হইবে কি? ব্রহ্মরাজ বারংবার মিত্রতা কামনা করিয়াছেন। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামবাসী মগ দস্যুগণ বারম্বার আরাকানে প্রবেশ ও প্রজাবর্গের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া ব্রিটীশ অধিকারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দেও রামরির শাসনকর্ত্তা এই সকল দস্যুর অত্যাচারে জ্বালাতন হইয়া পুন-

৬২। ৯৪৬ বৌদ্ধাব্দে (৩২৫ শকাব্দে) বুদ্ধ ঘোষ পূর্ব্বোপদ্বীপে পদার্পণ করেন।

৬৩। এস্থলেও অনুবাদক ভ্রমে পতিত হইয়াছে। ইতিহাসে লিখিত আছে "তাঁহার উপদেশানুসারে পাঁচ সহস্র বৎসর শাসিত হইবে।"

৬৪। ইহারা ক্রমে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে।

র্ব্বার লিখিলেন, "ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট শান্তি ও বন্ধুত্ব অপেক্ষা যুদ্ধের সমধিক অভিলাষী। দস্যু মগগণ বারংবার আমাদের রাজ্যে অত্যাচার করিয়া ইংরাজ রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে; ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে আমাদের হস্তে অর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াও আত্ম প্রতিশ্রুতি পালন করিলেন না।" (৬৫) ফলে সেই সময় এই সকল দস্যুদিগকে ব্রহ্মরাজের হস্তে সমর্পণ করিলে কখনই লোমহর্ষণ নাটকাভিনয় হইত না। যে ব্যক্তি চট্টগ্রাম ভিন্ন রাজার চির অধিকৃত বলিয়া মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, তিনি মুর্শিদাবাদ অবধি সমগ্র পূর্ব্ব বাঙ্গালা তাঁহার রাজ্যান্তর্গত দাবি করিবেন, ইহা কোন মতেই বিশ্বাস যোগ্য নহে। লর্ড হেষ্টিংস সেই "জাল পত্র" জাল গণ্য করিয়া আত্ম মাহাত্ম্যের পরিচয় দিয়াছেন। কোন কোন নীচচেতা ঐতিহাসিক ব্রহ্মরাজকে কটুবাক্যে অভিহিত করিয়া, তাঁহারাও আপন পরিচয় দিয়াছেন। ১৮২৫-২৬ খৃষ্টাব্দের ব্রহ্মযুদ্ধের বিবরণ ইতিবৃত্তজ্ঞ পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন, আমরা তৎ সম্বন্ধে এস্থলে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রিটীশ ভারত রঙ্গাঙ্গনে যে লোম-হর্ষণ নাটকাভিনয় হইয়াছিল, তাহা অনন্তকাল ইতিবৃত্ত পাঠকগণ স্মৃতির নয়নে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইবেন। ১৮৫৭—৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারত বক্ষে যে অনল প্রজ্বলিত হয় চট্টগ্রামও তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই। ব্রিটীশ ভারত সীমান্ত রক্ষার জন্য তিন শত সুশিক্ষিত সৈন্য চট্টগ্রামে ছিল। (৬৬) তাহারাও বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজ জাতি নির্মূল করিতে উদ্যত হইল। সৌভাগ্য বশতঃ চট্টলবাসী ইংরাজগণ প্রাণ ভয়ে লুক্কায়িত হইলেন। বিদ্রোহী সৈন্যগণ কারাগারের দ্বারভঙ্গ করিয়া বন্দিগণকে মুক্ত করত রাজকীয় ধনাগার লুণ্ঠন করিল। ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া তাহারা ২৭৮২৬৭/৫ পাইয়াছিল। বিদ্রোহীগণ তৎপরে তিনটী হস্তী লইয়া ত্রিপুরাভিমুখে যাত্রা করিল। এই সংবাদ শ্রবণমাত্র কুমিল্লাবাসী কর্তৃপক্ষগণ ভয়ে মৃয়মান হইলেন। (৬৭) কিন্তু সৌ-

৬৫। Gleig's British Empire in India. Vol IV. Page 109.

৬৬। 2d, 3d and 4th Companies of the 34th Regiment Native Infantry.

৬৭। বোধ হয় নোয়াখালীতেও কিছু গণ্ডগোল হইয়াছিল। কান্দি রাজ বংশের ইতিহাস লেখক বলেন—(Kandi Family C. R. LV111. 115.) রাজা প্রতাপ চন্দ্রের অনুপস্থিত কালে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র পাইকপাড়ার জমীদারি কাছারির কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। একদা অবগত হইলেন যে চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সেনাদল নোয়াখালীর রাজকীয় ধানাগার লুণ্ঠন করিতে আসিতেছে। এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র তিনি ভুলুয়ার প্রধান কর্ম্মচারী যশোদাকুমার পাইনকে লিখিলেন—" দেশীয় বলশালী লোকদিগকে বন্দুক ও তরবারি দ্বারা সজ্জিত করিয়া রাজকীয় ধনাগার রক্ষা করিবা, কোন প্রকার অর্থ ব্যয়ে কুণ্ঠিত হইবা না এবং কালেকটার সাহেব যে কার্য্য করিতে

ভাগ্যবশতঃ তাহারা কুমিল্লার পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাধীন ত্রিপুরার রাজধানী আগড়তলার পথাবলম্বন করিল। ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র তাহাদিগকে ত্রিপুরা রাজ্য পরিত্যাগ করিতে আদেশ করেন। বিশালগড় সন্নিহিত স্থানে গয়াদিন পণ্ডিত বিদ্রোহী সুবেদারকে রাজাজ্ঞা জ্ঞাত করাইলেন। তৎপরে তাহারা ব্রিটীশ রাজ্য দিয়া উত্তর দিকে যাত্রা করিল। "সন্দেহ" কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া ত্রিপুরেশ্বরকে বিদ্রোহীগণের সাহায্যকারী বলিয়া ব্রিটীশ-গবর্ণমেণ্ট ত্রিপুরা রাজ্য গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ত্রিপুরার ভূতপূর্ব্ব জজ মহাত্মা মেটকাফ (৬৮) গবর্ণমেণ্টের অমূলক সন্দেহ ও ভ্রম প্রদর্শন করিয়া ত্রিপুরার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। ত্রিপুরার রাজদণ্ড যতকাল ত্রিপুরের বংশধরদিগের হস্তে থাকিবে ততকাল তাঁহারা প্রতি মুহূর্ত্তে মেটকাফের নাম স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন।

বিদ্রোহীগণ গমন কালে পথ পার্শ্বস্থ জমিদারদিগের গৃহে উপনীত হইয়া খাদ্য যাচ্ঞা করিত। নিরস্ত্র দুর্ব্বল ভূস্বামীগণ এক বেলার খাদ্য দান করিয়া প্রাণ রক্ষা করিত। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া শ্রীহট্টের পদাতি দলের "মেজর" বিঙ্গ সাহেব বলিয়াছিলেন—"হারামজাদা লোক কো ফাঁসী দেনে হোগা।"

আদেশ করেন, তৎক্ষনাৎ তাহা সম্পাদন করিবা।" এই সকল কার্য্য দ্বারা রাজা ঈশ্বর চন্দ্রের অকৃত্রিম রাজভক্তি প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু ইতিহাস লেখক কিঞ্চিৎ পরেই ঘটনাটীকে নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছেন। লেখক বলেন—ঈশ্বর চন্দ্রের আদেশ ক্রমে ভুলুয়ার জমিদারি কাছারি দুর্গে পরিণত হইত, দেশীয় বীর পুরুষগণ দুর্গ রক্ষার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। বিদ্রোহীগণ এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র ভয়াতুর হইয়া অন্যত্রে গমন করিল। রাজা ঈশ্বর চন্দ্রের কৃপায় নোয়াখালী ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী জেলাসমূহ রক্ষাপাইল। ইহা দ্বারা লেখকের ভৌগোলিক অনভিজ্ঞতাও প্রকাশ পাইতেছে। ঈশ্বর চন্দ্রের অনুমতি আনাইয়া ভুলুয়া দৃঢ় করিতে অন্যূন ১৩।১৪ দিবস অতিবাহিত হইয়াছিল। এই কাল মধ্যে বিদ্রোহী সেনাগণ শ্রীহট্টের পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তে উপনীত হইয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ১৯ নবেম্বর বিদ্রোহীগণ চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করে। ৩রা ডিসেম্বর রাজ্ঞীর ৫৪ সংখ্যক সেনাদলের ৩০০ সৈন্য ঢাকা হইতে ত্রিপুরায় যাইয়া অবগত হইল যে কয়েক দিবস পূর্ব্বেই বিদ্রোহীগণ ত্রিপুরা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। নোয়াখালী চট্টগ্রাম হইতে গন্তব্য পথের পার্শ্বেও নহে। বিদ্রোহীগণ ধনাগার লুণ্ঠনাভিলাষী হইলে ত্রিপুরায় না আসিয়া নোয়াখালী যাওয়ার কোন কারণ ছিল না; কারণ সে সময়ে নোয়াখালী ত্রিপুরার অধীন একটি "মহকুমা" মাত্র ছিল। যে সকল বীরপুরুষ ত্রিপুরেশ্বরের সুশিক্ষিত সৈনাগণকে "বিল্লি" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল, তাহারা নোয়াখালীর নাবীয়ালদিগের নাম শ্রবণে কম্পিত হইবে, ইহা নিতান্ত হাস্য-জনক।

৬৮। ইনি সুবিখ্যাত লর্ড মেটকাফের ভ্রাতৃজ।

জগৎপিতা জগদীশ্বর অগতির গতি ও দুর্ব্বলের বল; প্রবাদ আছে মিরজাফারের পুত্র পামর মিরন বিহার প্রদেশে যুদ্ধযাত্রা কালে পথমধ্যে বস্ত্রাবাসে বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পর তাঁহার বস্ত্রমধ্যে একখণ্ড কাগজ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই কাগজে লিখিত ছিল—"যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই সকল (তিনশত) ব্যক্তির প্রাণ দণ্ড করিতে হইবে।" বোধ হয় দয়াময় পরমেশ্বর তিনশত মানবের প্রাণ রক্ষার জন্যই মিরনের অকাল মৃত্যু বিধান করিয়াছিলেন। বোধ হয় তদ্রূপ শ্রীহট্টবাসী দুর্ব্বল ভূস্বামীগণের জীবন রক্ষার্থ অনাথের-নাথ দুর্ব্বলের-বল জগদীশ্বর মেজর বিঙ্গেরও অকাল মৃত্যু বিধান করেন। লাতু (করিমগঞ্জ) নামক স্থানে বিদ্রোহীগণের সহিত শ্রীহট্টের পদাতি দলের (Sylhit Light Infantry) একটি যুদ্ধ হয়। যুদ্ধারম্ভমাত্রেই মেজর বিঙ্গ শমন ভবনে গমন করেন। মেজর সাহেবের মৃত্যুর পর সুবাদার অযোধ্যা সিংহ লাতুর যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছিলেন।

লাতুর যুদ্ধান্তে বিদ্রোহীগণ কাছার দিয়া পূর্ব্বমুখে গমন করে। কাছারের ভূতপূর্ব্ব ডিপুটিকমিসনর এডগার সাহেব বলেন,(৬৯) মোহনপুর ও বিননকান্দীর যুদ্ধে ইংরাজ সেনা বিদ্রোহী দিগকে জয় করিয়াছিল।

মণিপুরের অন্যতম রাজকুমার চাইহুম (বা নরেন্দ্র জিত) (৭০) এই সময়ে কাছারে বাস করিতেছিলেন। তিনি দুরাশয়ে মুগ্ধ হইয়া, সহচর বর্গের সহিত সম্মিলিত হইয়া, হতাবশিষ্ট বিদ্রোহী দলের অঙ্গপুষ্টি করিলেন। মণিপুরের রাজ-সর্পাসন অধিকার তাহাদের প্রধান লক্ষ্য হইল। মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি (বা কীর্ত্তিচন্দ্র) সিংহ এই সংবাদ শ্রবণমাত্র চারিশত সৈন্য তাহাদের প্রতিকূলে প্রেরণ করিলেন। ঘোর সংগ্রামে বিদ্রোহীগণ পরাজিত হইল! অল্প সংখ্যক হতাবশিষ্ট বিদ্রোহী কুকিদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

বাণিজ্য। চট্টগ্রাম চির বাণিজ্যোন্নত। ইহার প্রাচীন বাণিজ্যের প্রমাণ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থানে আমরা চট্টালের ইদানীন্তন বাণিজ্যের বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত করিব। চট্টগ্রাম বাণিজ্য বিষয়ে পূর্ব্ববঙ্গে অদ্বিতীয়। অদ্যাপি চট্টগ্রামে একপ্রকার দেশীয় অর্ণবতরী নির্ম্মিত হইয়া থাকে। চট্টগ্রামের প্রধান পণ্য তণ্ডুল। কিন্তু ধান্য চট্টগ্রামে অতি অল্পই জন্মে। ত্রিপুরা, নোয়াখালী, হাতীয়া-সনদ্বীপ ও দক্ষিণ সাহাবাজপুর হইতে চাউল চট্টগ্রামে আমদানি হয়। ইয়োরোপীয় বণিকগণ তাহা দেশ দেশান্তরে প্রেরণ করেন। চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কমিসনর হেঙ্কি. সাহেব স্বীয় বিজ্ঞাপনীতে লিখিয়াছেন, "তণ্ডুলের

৬৯। History and Statistics of Dacca division. Page 358.

৭০। "চাইহুম" অর্থ তিন বৎসর। প্রবাদ আছে নরেন্দ্রজীত মাতৃগর্ব্ভে তিন বৎসর বাস করিয়াছিলেন।

প্রধান বাণিজ্য স্থানের বাণিজ্য কেবল ইয়োরোপীয় বণিকদিগের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। দুই একটি মাত্র দেশীয় গোলাদার আছেন।" বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের উদ্ধৃত তালিকা পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে চট্টগ্রাম হইতে গড়ে প্রতি বৎসর প্রায় ২৯ লক্ষ মন চাউল বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। গত ৯ বৎসর মধ্যে ১২৭৯ বাঙ্গাব্দে অধিক চাউল রপ্তানি হইয়াছিল। তাহার পরিমাণ ২৮২৩২৫৫ মন; তন্মধ্যে ইয়োরোপ, আমেরিকা, ও আফ্রিকায় ৬৪৯১৭ টন, এদেন (১০), সিংহল, মালদ্বীপ প্রভৃতি আসিয়ার অন্তর্গত স্থান সমূহে ২৮৭৭৪ টন।

চট্টগ্রামে ১৫টী চা উদ্যান আছে। এই সকল উদ্যানের স্বত্বাধিকারী ইংরাজ ও বাঙ্গালী। ১২৮১ বঙ্গাব্দে ৪৪২৭ বাক্স চা চট্টল হইতে বিদেশে প্রেরিত হয়, তাহার মূল্য ৩০১৪৭ টাকা।

চট্টগ্রামে দুই প্রকার কার্পাস জন্মে,— ফুল সুতা ও বেণী সুতা। ফুল সুতা শ্বেতবর্ণ ও উৎকৃষ্ট, ইহারই জুম প্রণালীতে চাস হইয়া থাকে। বেণী সুতা ধূসরবর্ণ, ইহার চাস হয় না; ফুলসুতার বিচির সহিত ইহার বিচি মিশ্রিত থাকায় অল্প পরিমাণে জন্মে। কাসলং, রাঙ্গামাটী, বন্দরবন, মানিক ছরি, বোরাডোম, ত্রিপুরাবাজার, চন্দ্রঘোনা, রোয়াজাহাট, পোয়াংহাট কার্পাসের বাণিজ্য স্থান। বিচি শূন্য পরিষ্কার কার্পাসের মূল্য প্রতি মন ২০।২১ টাকা। কষ্টাম হাউসের বার্ষিক বিজ্ঞাপনী পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে ১২৮২ বঙ্গাব্দে ১৬৫৯৯ মন (বা ৬০৯—১ টন) কার্পাস বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর প্রায় এই পরিমাণ কার্পাস চট্টল হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে। এলিসন সাহেব স্বপ্রণীত ইয়োরোপের ইতিহাসে লিখিয়াছেন "ভারতের কার্পাস ব্রিটীস উপকূলে প্রেরিত হয়। ইয়োরোপের শিল্প যন্ত্রে রূপান্তরিত হইয়া তাহা পুনর্ব্বার পূর্ব্বদেশেই প্রেরিত হইয়া থাকে।" আমরা বলি শিল্প ও বাণিজ্যের কৃপায় ইয়োরোপবাসীগণ ভারতের কার্পাস ও কোষ্ঠা দ্বারা আমাদের রক্ত শোষণ করিয়া কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করিতেছে। আর আমরা বলীবর্দ্দ, স্বাদ বুঝি না, চিনির মোট বহিতেছি। শরীরের রক্ত জল করিয়া আমরা কার্পাস ও কোষ্ঠা জন্মাইতেছি, আমরা শিল্প কার্য্যানভিজ্ঞ মূর্খ, যৎকিঞ্চিৎ অর্থের বিনিময়ে সে সকল ইয়োরোপবাসীগণের পাদ-পদ্মে সমর্পণ করিয়া চরিতার্থ হই। তাহারা বিজ্ঞ শিল্প যন্ত্রের সাহায্যে সেই সকল কার্পাস ও কোষ্ঠা রূপান্তরিত করিয়া আমাদিগকে দান করিতেছেন, আমরা পূর্ব্ব প্রাপ্ত টাকার বিংশতি গুণ অধিক দান করিয়া, বাণিজ্যের কুহক হইতে মুক্তিলাভ ও আত্ম অনভিজ্ঞতার পরিচয় দান করিতেছি।

হে ভারত জাগান কবিবৃন্দ! কেন

১০। প্রবন্ধের প্রারম্ভে "এদেনের" উল্লেখ আছে, (ভারতী ১২৮৭, কাঃ, ৩০১ পৃষ্ঠা) কিন্তু মুদ্রাকরের প্রেতগণ "এদেন" এর পরিবর্ত্তে "এদেশ" করিয়াছে।

অকালে বোধন করিয়া "নয় আইনের" সৃষ্টি করিতেছ! শিল্প বাণিজ্যের জন্য ভারতবাসীদিগকে উত্তেজিত কর, আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ প্রাচীন বঙ্গবাসীগণ যে পথে গমন করিয়া উন্নতি শৈলের সানুদেশে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই পন্থা ভিন্ন আমাদের উন্নতির উপায় নাই। সেই এক মাত্র সোপান পরিহার পূর্ব্বক অপথে বিচরণ করিলে কি পার প্রাপ্ত হইবে? কেন অকালে "খোল তরবার" বলিয়া চীৎকার করিতেছ। কুটীরে বাস করিয়া শিল্প বাণিজ্য দ্বারা যখন প্রাসাদ-বাসীগণকে পদতলে আনিতে পারিবে, তখন যাহা বলিবে তাহাই শোভা পাইবে। দেখিতেছ না, ইয়োরোপবাসী বণিকগণ ধনুর্ব্বান হস্তে আমাদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; রাজবিধি তাহাদের অঙ্গে অভেদ্য কবচের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ভীত হইও না, ধৈর্য্য অবলম্বন কর, অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিও না। স্মরণ রাখ—

'Patience and perseverance can overcome mountains.'

প্রাচীন শিল্পীদিগকে (৭১) উৎসাহ দান কর, নব আবিষ্কৃত শিল্প বিদ্যায় পারদর্শী হও বাণিজ্যের আশ্রয় গ্রহণ কর, তোমাদের বাণিজ্য-তরীগুলি সেকালের ন্যায় (৭২) সাগর বক্ষে বিচরণ করুক, তখন দেখিবে শত্রুদল শাল্মলী পুষ্পের ন্যায় উড়িয়া যাইবে।

চট্টগ্রাম পর্ব্বত হইতে প্রায় ৪৪ প্রকার কাষ্ঠ রপ্তানি হয়। তন্মধ্যে "জারোল"ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা দ্বারা জাহাজও নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

প্রতি বৎসর প্রায় ৩০ লক্ষ মন লবণ বিদেশ হইতে চট্টগ্রামে আইসে। যে চট্টগ্রাম চিরকাল সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গকে লবণ দান করিয়াছে অদ্য তাহাকে "লিবারপোল"-এর নিকট লবণ ভিক্ষা করিতে হইল। অদৃষ্টদেব তোমাকে নমস্কার!

"লাবণাম্বুরাশি বেষ্টিত যে স্থল,
জন্মে "লিবারপোলে" লবণ তাহার!"

ভাষা।—ক্রমাগত রাষ্ট্র বিপ্লবে চট্টগ্রামের ভাষা এরূপ বিকৃত হইয়া গিয়াছিল যে অদ্যাবধি অধিকাংশ বাক্যের অর্থ গ্রহণ করা নিতান্ত দুরূহ। কিন্তু ভাষা বিকৃতির সঙ্গে সঙ্গে আর একটী আশ্চর্য্য প্রকার বিশেষ ভাব (Peculiarity) পরিলক্ষিত হয়। কবিগণ কাব্য রচনার জন্য বাঙ্গালা এইক্ষণ যেরূপ পড়িতেছেন, চট্টগ্রামের ভাষায় সচরাচর সেই রূপ পদ্যোচিত বাক্যের প্রয়োগ দেখা যায়। মধুসূদন "চলিলো" শব্দ সৃষ্টি করিয়াছেন। চট্টগ্রামে বহুকাল হইতে "চলিযার" শব্দ প্রচ-

৭১। জগদ্বাসী মানবগণ অদ্যাপি ভারত শিল্পীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। ভায়েনা একজিবিসনের বিজ্ঞাপনীই ইহার প্রমাণ।

৭২। In the Budhist era they (Bengalis) sent warlike fleets to the east and west, and colonized the islands of Archipelago. (Hunter's Orissa.)

লিত। (৭৩) ফলত চট্টগ্রাম বাসীগণ স্বভাব কবি (Natural Poet)।

এই কবিত্বের আভাস চট্টগ্রামের বিকৃত ভাষায় এক অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে। আমরা ইহাকে গুণ মধ্যে অন্তর্ভূত করি। ইহা ভিন্ন চট্টগ্রামের ভাষায় অন্য কোন বিশেষ গুণ পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু ভাষা বিষয়ে এই প্রকার দোষের আধিক্য ও গুণের অল্পতা চিরস্থায়ী হইবে না এরূপ আশা করা যাইতে পারে। বিদ্যানুশীলন, সভ্যপদ্ধতি পদার্পণ এবং অপকৃষ্ট অবস্থা হইতে ক্রমে উৎকৃষ্ট পদবী আরোহণ করিবার অন্যান্য উপায় অবলম্বনে চট্টগ্রাম প্রদেশ অসামান্য উৎসাহ ও দ্রুততা প্রকাশ করিতেছে। তদ্দেশ বাসীদিগের উদ্যমশীলতা ও জাতীয় ভাব যেরূপ অনুকরণাই এবং দিন দিন তাহারা যে প্রকারে উৎকৃষ্ট অবস্থাতে উন্নীত হইতেছে তাহাতে অনতিবিলম্বেই যে তাহারা স্বীয় মাতৃ ভাষার উন্নতি সাধন করিতে পারিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। তদ্দেশে নানা বিষয়ক পরিবর্ত্তন ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে এবং আমরা সাতিশয় আনন্দ ও উৎসাহের সহিত আশা করি যে এই পরিবর্ত্তনের দ্রুতগামী ও মহাবল স্রোত—বঙ্গের একটী প্রধান আশার স্থল—চট্টগ্রামকে অতি সত্বর দূরলক্ষিত সভ্যতাও উন্নতির সুখময় দ্বীপে লইয়া উপনীত করিবে।

ক্রমশঃ

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

৭৩। পাঠক মহাশয়েরা অদ্যাবধি চট্টগ্রামে প্রচলিত ভাষার স্বরূপ কথঞ্চিৎ নির্ণয় করিতে পারেন এই অভিপ্রায়ে এবং আমাদের উল্লিখিত পদ্যোচিত বাক্য-বন্ধের প্রচলন প্রতিপন্ন করিবার জন্য উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

১। গর্ বাইস্যে গর্ বাইস্যে লইত থর লইত থরি পুছ থরি ছুথ থরি বন্দরৎযা।

অর্থ—কুটুম্ব আসিয়াছে কুটুম্ব আসিয়াছে, লৌকিকতা কর্, লৌকিকতা করিয়া (কুশল) জিজ্ঞাসা কর, জিজ্ঞাসা করিয়া শীঘ্র করিয়া বাজার যা।

২। দাই আয় দাই আয় আদর গালাদি এগু থচ্ছপ ছলি যায়।

অর্থ—শীঘ্র এস শীঘ্র এস পথের পার্শ্ব দিয়া একটী কচ্ছপ চলিয়া যায়।

চট্টগ্রামের প্রচলিত ভাষায় প্রায় এক তৃতীয়াংশ মগ ও যাবনিক বাক্যের সংযোগ আছে বোধ হয়। যাহা হউক উচ্চারণ নিতান্ত কদর্য্য।

জ্ঞানের অঙ্গ-বৈচিত্র্য।

প্রশ্ন। শরীরেরই ত অঙ্গ-বৈচিত্র্য জানি—জ্ঞানের অঙ্গ বৈচিত্র্য আবার কিরূপ ?

উত্তর। কথাটা একটু বিস্ময়-জনক শুনায় বটে কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকে না ; জ্ঞানের আর সমস্ত বাদ দিয়া যদি শুদ্ধ কেবল তাহার একত্ব-টুকুকেই জ্ঞান বলিয়া মানা যায় তবে সত্যই ত বটে—তাহার আবার অঙ্গ-বৈচিত্র্য কি-রূপ ? কিন্তু যখন দেখা যায় যে, নানা বিচিত্র বিষয়ে ব্যাপৃত হইবার শক্তি-পুঞ্জ সেই একত্বের সকল দিক্ পূর্ণ করিয়া রহি-য়াছে তখন অবশ্য বলিতে হইবে যে জ্ঞানের সেই যে একত্ব তাহা ফাঁকা একত্ব নহে—তাহা সর্ব্বাঙ্গীন একত্ব; জ্ঞানের এই যে বহু-মুখীন শক্তি-বৈচিত্র্য ইহাই তাহার অঙ্গ বৈচিত্র্য।

প্রশ্ন। তবে বেদান্তদর্শনের এই যে একটি সিদ্ধান্ত—যে, কি স্বগত-ভেদ (অর্থাৎ একই ব্যক্তির অবয়ব-গত ভেদ), কি স্বজা-তীয় ভেদ (অর্থাৎ একই জাতির ব্যক্তি-গত ভেদ), কি বিজাতীয় ভেদ (অর্থাৎ ভিন্ন জাতীয় দুই ব্যক্তির মধ্যগত ভেদ) কোন প্রকার ভেদই জ্ঞানকে স্পর্শ করিতে পারে না, এত বড় কথাটা কি একেবারেই অমূ-লক ?

প্রাশ্ন। বেদান্তের কথা এক ভাবের কথা—এখানে যে কথা হইতেছে তাহা আরেক ভাবের কথা—দুই ভাবের দুইকথা এক সঙ্গে আন্দোলন করা কম গোলোযো-গের ব্যাপার নহে, তথাপি আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, আঁকজোঁক পাড়া দেখিয়া যদি ভয় না পাও—যদিচ ভয়ের একটুও কারণ নাই—তাহা হইলে অতি সহজে উভয়ের মধ্যেকার বিবাদও নিষ্পত্তি হয় আর সেই-সঙ্গে প্রকৃত প্রস্তাবের আ-লোচনা-কার্য্যও অনেক দূর এগোয়।

প্রশ্ন। এক ত আমি গণিত-শাস্ত্রের কোন ধারই ধারি না, তাহাতে আবার নিরা-কার বস্তুর সঙ্গে আঁকজোঁকের যে কেমন করিয়া মিল খাইবে তাহা আমার বুদ্ধিতে আসিতেছে না—আমার ত এইরূপ মনে হয় যে, তেলে জলে যেমন মিল ও-দুয়ের মধ্যেও তেমনি মিল, অতএব আমার নিকট হইতে যদি উত্তর-লাভের প্রত্যাশা কর তবে তোমার প্রকৃত অভিপ্রায়টি ভাল করিয়া খুলিয়া বল।

উত্তর। গণিতশাস্ত্র-বিষয়ে আমিও তোমারি মত পণ্ডিত—সে জন্য ভয় নাই, তবে নিরাকার পদার্থ সম্বন্ধে তুমি যে আ-শঙ্কা করিতেছ—যে, তাহার সঙ্গে আঁকজোঁ-কের কোন মিল খায় না—এক হিসাবে তোমার ও-কথা আমি শিরোধার্য্য করি কিন্তু আর এক হিসাবে আমার কথাও তুমি শিরোধার্য্য না করিয়া থাকিতে পার না।

উত্তর পশ্চিম-অঞ্চলে জন্ম-দিবসকে বলে বরস-গাঁট,*—আমাদের দেশে পুরা-কালে এইরূপ একটা রীতি প্রচলিত ছিল যে, জীবনের এক এক বৎসর অতীত হইলে গৃহজনেরা একগাছি সূত্রে এক-একটি করিয়া গ্রন্থি বন্ধন করিয়া রাখিত; মনে কর ঐরূপ প্রথানুসারে জীবনের দশ বৎসর গত হওয়াতে বর্ষ-নির্ণায়ক সূত্রে দশটি গ্রন্থি পরে পরে নিপতিত হইয়াছে; তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে, কাল নিরাকার —অথচ তাহার দশটি বার্ষিক অংশ দশটি সাকার গ্রন্থি দ্বারা সুনির্দ্দিষ্ট হইতেছে। সাকার গ্রন্থিপাত দ্বারা নিরাকার কালের অবয়ব নিরূপণ এই যা দেখিলে, সাকার রেখা-পাত দ্বারা নিরাকার জ্ঞানের অবয়ব-নির্ব্বাচন তাহা অপেক্ষা নূতন কিছুই নহে, তবে আর তাহাতে আপত্তি কি?

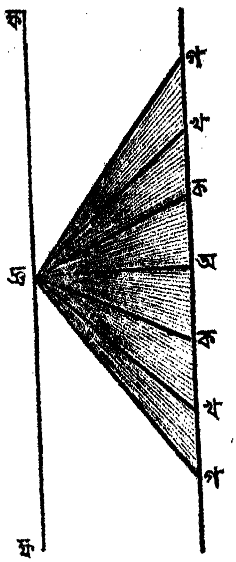
প্রশ্ন। ওরূপ বিষদাঁত-ভাঙা আঁক-জোঁক তুমি যথেচ্ছা খেলাও না কেন—তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই বরং আমোদ আছে।

উত্তর। তুমি যতটা আমোদ মনে করিতেছ তাহা নাও হইতে পারে—তাহার জন্য আমি দায়ী নহি, তবে আমি এই পর্য্যন্ত অসংকোচে বলিতে পারি যে আঁক-জোকের সাহায্যে তোমার আমার উভয়েরই পথ-কষ্টের অনেক লাঘব হইবে। বক্তব্য বিষয়ের নাকি দুইটী পক্ষ—এক পক্ষের আলোচনায় যখন নিমগ্ন হওয়া যায় অপর পক্ষ তখন একেবারেই মনশ্চক্ষুর দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া পড়ে, এইটি যাহাতে না হইতে পায় সেই জন্যই আঁকজোঁকের প্রয়োজন—অন্য কোন কারণে নহে। মনে কর যেন তুমি কোন নাট্যাভিনয় দেখিতেছ, কিন্তু রঙ্গস্থান হইতে দূরে পিছাইয়া থাকা প্রযুক্ত অভিনায়কদিগের কথা বার্ত্তা বুঝিতে পারিতেছ না, অভিনীয়মান নাটক পুস্তক তোমার সঙ্গে আছে, তাহা দেখিয়া তবে তুমি অভিনায়কদিগের কথা বার্ত্তা বুঝিতে পারিতেছ, কিন্তু যখন তুমি পুস্তক দেখিতেছ তখন অভিনায়কদিগের কি অঙ্গভঙ্গী কি মুখের ভাব কিছুই দেখিতে পাইতেছ না, আর যখন তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিতেছ তখন তাহাদের কথাবার্ত্তা বুঝিতে পারিতেছ না; এ যেমন দুর্দ্দশা—জ্ঞানের দুই পক্ষ পর্য্যায়-ক্রমে আলোচনা করাও ঠিক্ সেইরূপ; এ যদি হয় ত ও হয় না, ও যদি হয় ত এ হয় না। শুদ্ধ কেবল কথা দ্বারা ভাব ব্যক্ত করিতে হইলে দুই পক্ষ পর্য্যায়-ক্রমে বলা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না, কিন্তু রেখা-পাত দ্বারা দুই পক্ষকেই এক সঙ্গে চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত করা যাইতে পারে যথা,—

পার্শ্ব পত্রস্থিত চিত্রের জ্ঞ-অক্ষর হইতে দুই দিকের দুই ক্ষ-অক্ষর পর্য্যন্ত যে রেখা প্রসারিত দেখিতেছ তাহাকে সংক্ষেপে ক্ষ-রেখা বলা যাউক—মনে কর যেন, তাহা উপর নীচে দুই দিকেই অসীম বিস্তৃত সুতরাং আদ্যন্ত-বিরহিত, আর মনে কর যেন

---

* সংস্কৃত ভাষায় এই স্থলে বর্ষ-গ্রন্থি শব্দের প্রয়োগ আছে।



তাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানের অসীম-স্ফূর্ত্তি—এই এক পক্ষ, তেমনি আবার মনে কর অ-অক্ষর হইতে দুই গ-অক্ষর পর্য্যন্ত প্রসারিত রেখা উপর-নীচে দুই দিকে অসীম বিস্তৃত ও মনে কর তাহা জ্ঞানের অসীম বৈচিত্র্যশালী জ্ঞাতব্য বিষয়—এই আর এক পক্ষ; এ দুই পক্ষের মধ্যে এ-পিট ও-পিট সম্বন্ধ। যেমন কোন বস্তুর এক পিট আমাদের চক্ষের সম্মুখীন হইলে তাহার অন্য পিট চক্ষের আড়াল হয়,—কোন বস্তুরই দুই পিট এক সঙ্গে নেত্রগোচর হইতে পারে না, তেমনি জ্ঞানের দুই পক্ষ এক সঙ্গে নির্ব্বচনীয় হইতে পারে না,—এ নয় যে, কোন বস্তুর এক পিট ভিন্ন দুই পিট নাই অথবা জ্ঞানের এক পক্ষ ভিন্ন দুই পক্ষ নাই। মনে কর জ্ঞ এক-জন জ্ঞাতা পুরুষ, অ তাঁহার বহিরবয়ব; অ-হইতে দুই ক পর্য্যন্ত প্রসারিত রেখা মনুষ্য-মণ্ডলীর বহিরবয়ব; দর্শকের বহিরবয়ব অ-অপেক্ষা ইহা অবশ্য বিস্তীর্ণ দেশব্যাপী; অ-হইতে দুই গ পর্য্যন্ত প্রসারিত রেখা চেতনাচেতন উভয়-বিধ জীব সমূহের—যেমন তরুলতা জীব জন্তু মনুষ্যের—বহিরবয়ব,—ইহা আরো বিস্তীর্ণ দেশ-ব্যাপী; নীচের ক হইতে উপরের ক পর্য্যন্ত প্রসারিত রেখাকে সংক্ষেপে ক-রেখা বলা যাউক—তেমনি খ-হইতে খ পর্য্যন্ত প্রসারিত রেখাকে খ-রেখা ও গ-হইতে গ-পর্য্যন্ত প্রসারিত রেখাকে গ-রেখা বলা যাউক্। ক-রেখা মনুষ্যমণ্ডলীর বহির্দৃশ্য; খ-রেখা কি মনুষ্য-মণ্ডলী কি পশু পক্ষী সচেতন জীব মাত্রেরই বহির্দৃশ্য, সুতরাং ক-রেখা অপেক্ষা খ-রেখা বিস্তীর্ণ; গ-রেখা—কি মনুষ্য-মণ্ডলী কি পশু পক্ষী কি তরুলতা—চেতনাচেতন জীব মাত্রেরই বহির্দৃশ্য, ইহা আরো বিস্তীর্ণ; মনে কর যেন মনঃকল্পিত ঘ রেখা ঙ-রেখা চ-রেখা প্রভৃতি বিস্তীর্ণ হইতে বিস্তীর্ণতর অসংখ্য রেখা অ-হইতে উপর-নীচে প্রসারিত রহিয়াছে। ঘ-রেখা মনে কর যেন পার্থিব ভূত-নিচয়,ঙ-রেখা মনে কর যেন সৌর-জগতিক ভূত-নিচয়, চ-রেখা মনে কর যেন আরো বিস্তীর্ণ জগতের ভূত নিচয় ইত্যাদি-ক্রমে মনে কর যেন অ হইতে শেষে অসীম-বিস্তীর্ণ রেখা-একটি প্রসারিত রহিয়াছে—চাই কি সেই অসীম রেখাকে অসীম আকাশ বলিয়া মনে করিতে পার তাহাতে কিছু আইসে যায় না। জ্ঞ-স্থান হইতে যে ছটা-গুচ্ছ যে বিষয়ে (ক-রেখাতে হউক্ খ-রেখাতে হউক) নিপতিত হইয়াছে সেই ছটা মনে কর যেন সেই বিষয়ের জ্ঞান, এবং সেই ছটার বিস্ফারণ সেই বিষয়ক তত্ত্বের ব্যাপ্তি। ক-রেখাতে যে ছটা নিপতিত হইয়াছে তাহা ক-ছটা, খ-বিষয়ক ছটা খ-ছটা ইত্যাদি প্রকারে প্রত্যেক-বিষয়ক ছটা

স্বীয় বিষয়ের নাম দ্বারা লক্ষিত হউক্। যে-বিষয়—যেমন ক-রেখা খ-রেখা—যে পরিমাণে বিস্তীর্ণ সে বিষয়ক ছটা—যেমন ক ছটা খ-ছটা—সেই পরিমাণে বিস্ফারিত, ইহাতে বুঝাইতেছে যে সে বিষয়ের তত্ত্ব সেই পরিমাণে ব্যাপক। সচেতন জীব রাজ্য (খ-রেখা) যেমন মনুষ্য-রাজ্য অপেক্ষা (ক-রেখা অপেক্ষা) বিস্তীর্ণ, সচেতন জীব তত্ত্ব তেমনি মনুষ্য তত্ত্ব অপেক্ষা ব্যাপক; এইরূপ ক-ছটা অপেক্ষা খ-ছটার বিস্ফারণের মাত্রাধিক্য দ্বারা ক-তত্ত্ব অপেক্ষা খ-তত্ত্বের ব্যাপ্তির আধিক্য সূচিত হইতেছে। ক-ছটা অপেক্ষা খ-ছটা, খ-ছটা অপেক্ষা গ-ছটা, ক্ষ-রেখার কাছ ঘেঁসিয়া বিস্ফারিত হইয়াছে দেখিবে, ইহাতে দাঁড়াইতেছে এই যে, বুদ্ধির আয়ত্তীকৃত বিষয় যত বিস্তীর্ণ হইতে থাকিবে, তাহার উপলভ্য তত্ত্ব ততই ব্যাপ্তি লাভ করিতে থাকিবে এবং তাহার বৃত্তি-ছটা ততই বিশুদ্ধ জ্ঞান-স্ফূর্ত্তির (ক্ষ-রেখার) কাছ ঘেঁসিতে থাকিবে, কিন্তু কোন কালেই ক্ষ-রেখার গাত্র-সাৎ হইতে পারিবে না। কিন্তু যদি ক-রেখা প্রভৃতি বিষয়-পরম্পরাকে অসীম বিস্তীর্ণ মনে করা যায় এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধির বৃত্তি-ছটাকে অসীম বিস্ফারিত মনে করা যায়, তাহা হইলে সেই বৃত্তি-ছটা ক্ষ-রেখার (অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞান স্ফূর্ত্তির) গাত্র-সাৎ হইয়া আইবে ইহা প্রত্যক্ষবৎ অনুভূত হইতেছে; এরূপ হইলে দাঁড়ায় এই যে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের স্ফূর্ত্তিও যা, বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিষয়ও তা, দুয়ের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই; শেষোক্ত ব্যাপারটিকে জ্ঞানের পূর্ণতার আদর্শ বলিয়া আমরা ভাবে উপলব্ধি করিতে পারি বটে, কিন্তু সৃষ্ট জীব কোন কালেই তাহাকে কার্য্যে ফলিত করিতে পারে নাই পারিবে না—কেন না বুদ্ধি যতই কেন বিস্ফারিত হউক না তাহা অপেক্ষা আরো সহস্র বিস্ফারিত হইলেও অসীম-ব্যাপ্তির অসীম পশ্চাতে পড়িয়া থাকে।

বেদান্ত-দর্শন বুদ্ধির অতীত আদর্শ-রূপী বিশুদ্ধ জ্ঞান সম্বন্ধেই এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন যে, সেখানে জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয় একীভূত—সুতরাং সেখানে কোন প্রকার ভেদ স্থান পাইতে পারে না,—আমরাও এই মাত্র দেখিলাম যে সেখানে জ্ঞান-স্ফূর্ত্তি এবং জ্ঞানের বিষয় এ দুয়ের মধ্যে মূলেই কোন প্রভেদ নাই; কিন্তু পক্ষান্তরে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে আমাদের জ্ঞানের উন্নতি ক্রম-সাপেক্ষ—তাহা নানা বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়া অসীম জগৎব্যাপী পরিপূর্ণ একত্বের দিকে ক্রমশই অগ্রসর হয় অথচ ক্রমাগতই তাহা হইতে অসীম দূরে অবস্থিতি করে; তবে উভয় পক্ষের মধ্যে বন্ধনের টান—সম্বন্ধের গুরুত্ব—অসীম প্রগাঢ় বলিয়া এক পক্ষ হইতে অন্য পক্ষ দূর হইতে দূরতম হইলেও নিকট হইতে নিকটতম ভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

ক্রমশঃ।

সম্পাদকের বৈঠক।

দোকান্‌দার বড় লোক

কিম্বা হটাৎ নবাব।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জুর্দ্যা, গান-বাজানার ওস্তাদ, নাচের ওস্তাদ।

জুর্দ্যা। বাঃ এ নিতান্ত মন্দ নয়, ও লোকগুল বেশ ত্রিংভ্রিং করে লাকায়।

গা-ওস্তাদ। নাচের সঙ্গে যখন আবার গান বাজনা মিশবে, তখন আরও ভাল লাগবে। আর আমরা যে আপনার জন্য একটা নাচ ঠিক করেছি তাতে বেশ মজা দেখতে পাবেন।

জুর্দ্যা। আজ বৈকালে দিদেন তা হওয়া চাই। আমি যে ব্যক্তির জন্য এই সমস্ত উদ্যোগ করেছি তিনি অনুগ্রহ করে এখানে আহার করতে আসবেন।

না-ওস্তাদ। আমাদের সমস্ত প্রস্তুত।

গা-ওস্তাদ। কিন্তু, হজুর এক দিনেই কি বস্ হবে। আপনি যে রকম দেল-দরিয়া মানুষ, ভাল চিজ দেখতে শুনতে আপনার যে রকম সক্, তাতে প্রতি বুধ-বার, আর বেরস্পতিবারে আপনার বাড়িতে গান-বাজনার বৈঠক দেওয়া উচিত।

জুর্দ্যা। বড় লোকেরা কি তাই করে?

গা-ওস্তাদ। আজ্ঞে হাঁ হজুর।

জুর্দ্যা। তবে আমিও করব। তা হলে ভাল হবে?

গা-ওস্তাদ। তার কোন সন্দেহ নেই। তাহলে আপনার তিন রকম গলার সুর যোগাড় করা আবশ্যক। উঁচু নীচু মা-জারি। আর এই সকল গলার সুরের মত যন্ত্রও চাই। ছোট বেয়ালা বড় বেয়ালা, আর—

জুর্দ্যা। আর তার সঙ্গে একটা এক-তারাও চাই। এক তারা যন্ত্রটা আমার বড় ভাল লাগে—ওর আওয়াজ বড় মিঠে।

গা-ওস্তাদ। সে সব বন্দবস্ত আমাদের করতে দিন।

জুর্দ্যা। সে যাই হোক্ আমার টেবিলে গান করবার জন্য কতকগুল গাইয়ে পা-ঠাতে ভুলো না।

গা-ওস্তাদ। যা যা আবশ্যক, সব পাবেন।

জুর্দ্যা। বিশেষ যেন নাচটা খুব খাসা হয়।

গা-ওস্তাদ। তা দেখে আপনি খুসি হবেন। আর তাতে থ্যাম্‌টাও থাকবে।

জুর্দ্যা। আ! থ্যামটাই আমার খাস্ চীজ, আর এই নাচ আমি একবার নেচে তোমাদের দেখাতে চাই। এসো ওস্তাদ্‌জি।

না-ওস্তাদ। আজ্ঞা হজুর একটা টুপি মাথায় দিন। (জুর্দ্যা, পেয়াদার নিকট হইতে একটা টুপি লইয়া, তাঁহার কান ঢাকা রাত্ত পৌরে টুপির উপর পরিধান, ওস্তাদ গান গাইতে গাইতে তাঁহাকে নাচাইতে লাগিলেন) তা না না না না না, না না না না না না; তা না না না না না না না না না না না। তালে তালে হজুর। তা না না না না না। ডান পা, তা না না না না না। কাঁধ অত নড়াবেন না। তা না না না না না। তা না না না না না না না। হাত দুটো জড়সড় আছে। তা না না না না না। মাথা ওঠান্। পায়ের আঙ্গুলগুল উঁচু করে রাখুন—শরীরটাকে সোজা রাখুন।

জুর্দ্যা। অ্যাঁ? কেমন?

গা-ওস্তাদ। বাহাবা! তোফা হয়েছে।

জুর্দ্যা। ভাল কথা! এক জন বেগমকে কি রকম ক'রে সেলাম করতে হয় আমাকে শিখিয়ে দেও। আমার এখনি তা দরকার হবে।

নাচ-ওস্তাদ। এক জন বেগমকে কেমন ক'রে সেলাম করতে হবে?

জুর্দ্যা। হাঁ এক জন বেগম, তাঁর নাম দরিমেনা।

নাচের ওস্তাদ। আপনার হাত দিন।

জুর্দ্যা। না তুমি করলেই হবে, আমার বেশ মনে থাকবে।

না-ওস্তাদ। যদি খুব মান্য দেখাতে হয়, তাহলে পিছু হেটে একবার সেলাম করতে হবে, পরে তাঁর দিকে এগুতে এগুতে তিন বার সেলাম করতে হবে—আর শেষ বারটা তাঁর হাঁটু পর্য্যন্ত নীচু হয়ে সেলাম করতে হবে।

জুর্দ্যা। আচ্ছা একটু খানি তুমি কর দিকি। (নাচের ওস্তাদ তিন বার সেলাম করিল) বেশ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

জুর্দ্যা, গান বাজনার ওস্তাদ্—নাচের ওস্তাদ, একজন পেয়াদা।

পেয়াদা। হজুর, তলোয়ার খেলবার ওস্তাদ এসেছে।

জুর্দ্যা। আচ্ছা তাকে আসতে বল আমাকে তালিম দেবে।

(গান বাজনার ও নাচের ওস্তাদ দুয়ের প্রতি) আমার ইচ্ছে তোমরা একবার আমার খেলা দেখো।

তৃতীয় দৃশ্য।

জুর্দ্যা—তলোয়ার খেলাবার ওস্তাদ, গান বাজনার ওস্তাদ, নাচের ওস্তাদ ছুটো তলোয়ার লইয়া এক জন পেয়াদা।

তল ওস্তাদ। (ছুটো তলোয়ার প্রথমে পেয়াদার নিকট হইতে লইয়া, তার একটা তলোয়ার জুর্দ্যাকে দান করিয়া)—আসুন হুজুর, প্রথমে বন্দেগি। শরীর সোজা করে, বাঁ উরোতের উপর ভর দিয়া একটু হেলে থাক্‌তে হবে। পা অত ফাঁক্ না—এক লাইনের উপর তুই পা থাকবে। হাতের কব্জা উরোতের এক লাইনে, তলোয়ারের মুখটা কাঁধের সামনে থাকবে—হাত অত বাড়িয়ে না—বাঁ হাতটা চোখ পর্য্যন্ত উঁচুতে উঠবে—বাঁ কাঁধটা আরও চৌকোস ভাবে রাখতে হবে। মাথা সোজা,চোখের দৃষ্টি স্থির। এগোন্। শরীর হেল্‌বেনা—এই বার আসুন, পিছনে এক লাফ, এইবার সামাল সামাল (তুই তিন তলোয়ারের ঘা দিয়া,সামাল সামাল বলিতে বলিতে)

জুর্দ্যা। অ্যাঁ! কেমন?

গান-ওস্তাদ। বড় চমৎকার।

ত-ওস্তাদ। আপনাকে তো আগেই বলেছি 'তলোয়ার খেলার ছুটো জিনিস আছে। সেই ছুটো জান্‌লেই সব জানা হয়। ঘা দেওয়া, আর, ঘা না নেওয়া। আর সে দিন আমি প্রমাণের সঙ্গে তা দেখিয়ে দিয়েছি।

জুর্দ্যা। এক জন লোক, যার সাহস নেই, সে তাহলে এই রকম ক'রে নিজে না মরে আর একজনকে মেরে ফেল্‌তে পারে?

ত-ওস্তাদ। তার সন্দেহ নেই। আর তার প্রমাণ শুদ্ধ কি আপনি দেখেন নি?

জুর্দ্যা। হাঁ।

ত-ওস্তাদ্। তবে দেখুন রাজ্যের মধ্যে আমাদের কতদূর মান হওয়া উচিত। আর সকল রকম অকেজো বিদ্যের চেয়ে এ বিদ্যে যে কত উঁচু তাও বিবেচনা ক'রে দেখুন। অকেজো বিদ্যে, যেমন নাচ, গান বাজনা—

না-ওস্তাদ। তলোয়ারের ওস্তাদজি, একটু মুখ সামলে কথা কও—নাচের কথা অমন অমান্য ক'রে বোলো না।

গা-ওস্তাদ। এও তাই তোমাকে বল্‌চি, গান-বাজনার কথা অমন ক'রে বোলো না।

ত-ওস্তাদ। তোমরা তো বড় মজার লোক হে—আমাদের বিদ্যের সঙ্গে কিনা তোমাদের বিদ্যের তুলনা!

গা-ওস্তাদ। কি মস্ত লোকটাই বল্‌চেরে।

না-ওস্তাদ। বুকে কবচ প'রে কি মজার জানোরই সেজেচে।

ত-ওস্তাদ। ও গো নাচের ওস্তাদের পো, তোমাকে এখনি তুর্কি নাচন নাচিয়ে দেব।

না-ওস্তাদ। ও হে তলোয়ারের ওস্তাদ, তোমার ব্যবসার আমিও তোমাকে শিখিয়ে দিতে পারি।

জুদ্দাঁ। (নাচের ওস্তাদের প্রতি) তোমরা কি পাগল হয়েছ না কি?—যে ব্যক্তি প্রমাণ প্রয়োগের সঙ্গে একজন মানুষকে বধ করতে পারে, তার সঙ্গে আবার ঝগড়া?

না-ওস্তাদ। ওর প্রমাণ প্রয়োগ চুলোয় যাক।

জুদ্দাঁ। (নাচের ওস্তাদের প্রতি) চুপ চুপ আস্তে!

ত-ওস্তাদ। কি! অভদ্র কাঁহেকা!

জুদ্দাঁ। আমার তলোয়ারের ওস্তাদজি! কি কর কি কর—

না-ওস্তাদ। (ত-ওস্তাদের প্রতি) কি! গাধা কোথাকারে!

জুদ্দাঁ। আমার নাচের ওস্তাদজি কি কর—কি কর।—

ত-ওস্তাদ। তোমাকে একবার যদি পাকড়ে ধরি—

জুদ্দাঁ। (ত-ওস্তাদের প্রতি) আস্তে!

না-ওস্তাদ। তোমার উপর যদি একবার হাত চালাতে আরম্ভ করি—

জুদ্দাঁ। (না-ওস্তাদের প্রতি) আস্তে আস্তে।

ত-ওস্তাদ। আমি এমন ঠেঙ্গিয়ে দেব—

জুদ্দাঁ। (ত-ওস্তাদের প্রতি) তোমার পায়ে পড়ি।

না-ওস্তাদ। আমিও এমন পিটিয়ে দেব—

জুদ্দাঁ। (না-ওস্তাদের প্রতি) ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও।

গা-ওস্তাদ। হজুর একটু থামুন—কি রকম ক'রে কথা কইতে হয় আমরা ওকে একবার শিখিয়ে দি।

জুদ্দাঁ। (গা-ওস্তাদের প্রতি) কি সর্ব্বনাশ! তোমরা থাম না হে!

---

৪ দৃশ্য।

একজন তত্ত্ববিদ্যার শিক্ষক, জুর্দ্দাঁ, গান বাজনার ওস্তাদ্, নাচের ওস্তাদ তলোয়ারের ওস্তাদ, একজন পেয়াদা।

জুর্দ্দাঁ। এই যে! পণ্ডিত মহাশয়, ঠিক সময়ে আপনি তত্ত্ববিদ্যা নিয়ে এসেছেন—এই ব্যক্তিদের মধ্যে ঝগড়াটা থামিয়ে দিন দেখি।

তত্ত্বজ্ঞানী। মহাশয়েরদের মধ্যে কি হচ্চে? ব্যাপারটা কি?

জুর্দ্দাঁ। কার ব্যবসায় সকলের চেয়ে ভাল এই নিয়ে ওঁদের মধ্যে রাগারাগি হয়েছে, এমন কি গালাগালি পর্য্যন্ত হয়েছে। হাতাহাতি হবারও উপক্রম হয়েছিল।

তত্ত্বজ্ঞানী। কি মহাশয়রা! ক্রোধে কি এ প্রকার বিচলিত হতে হয়? সেনেকা ক্রোধের বিষয় যে প্রবন্ধ লিখে গেছেন তা কি আপনারা পড়েন নি? এই ক্রোধ রিপু অপেক্ষা জঘন্য ও নীচ আর কি কিছু আছে? ক্রোধেতেই কি মনুষ্য পশুবৎ ভীষণ হয় না?

না-ওস্তাদ। কি, মশায়! আমাদের

নাচ ও গানবাজনার পেষাকে তাচ্ছিল্য করে আমাদের দুজনকে ও ব্যক্তি গালাগালি দিতে আস্‌বে!

তত্বজ্ঞানী। যে ব্যক্তি বিজ্ঞ, তিনি অন্যের কটুকাটব্যে বিচলিত হন না—মিতব্যবহার ও সহিষ্ণুতা সেই সকল কটু কাটব্যের একমাত্র উত্তর।

ত-ওস্তাদ। ওদের আস্পর্দ্ধা দেখেছেন মহাশয়—আমাব পেষার সঙ্গে কিনা ওদের পেষার তুলনা!

তত্বজ্ঞানী। তাতে কি আপনার বিচলিত হওয়া উচিত? বৃথা গর্ব্ব নিয়ে মানুষদের মধ্যে কলহ হওয়াটা উচিত নয়। আর বিজ্ঞতা ও ধর্ম্ম নিয়েই অন্যদের সহিত আমাদের যা প্রভেদ।

না-ওস্তাদ। আমি ওকে এই বল্‌ছিলুম যে নৃত্য বিদ্যা যেমন সরেশ এমন আর কিছুই না।

গা-য়স্তাদ। আর আমি বল্‌ছিলেম যে শত শত বৎসর থেকে গান বাজনার যে রকম আদর হয়ে আস্‌চে এমন আর কিছুরই না।

ত-ওস্তাদ। আর আমি ওদের দুজনকেই বল্‌ছিলেম যে অস্ত্র বিদ্যা সকল বিদ্যা অপেক্ষাই ভাল ও কেজো।

তত্বজ্ঞানী। তবে তত্ববিদ্যার কি হবে? তোমাদের তিন জনেরই এত দূর স্পর্দ্ধা ও অহঙ্কার যে, যে সকল জিনিস্‌কে আমি শিল্প বলতেও রাজি নই, সেই নাচ গান বাজনা ও পালোয়ানির নীচ কাজকে কি না আমার সম্মুখে অনায়াসে বিদ্যা ব'লে পরিচয় দিলে?

ত-ওস্তাদ। যাও যাও, পণ্ডিত কোথাকারে।

গা-ওস্তাদ। যাও যাও বিদ্যে-ফলানে ভিক্ষুক ভট্টাচার্য্যি কোথাকার।

না-ওস্তাদ। দূর হ নির্ব্বোধ টুলো পণ্ডিত।

তত্বজ্ঞানী। কি! পাজি বেটারা—

(পণ্ডিত তাহাদের তিন জনের উপর পড়িয়া কিল মারিতে আরম্ভ)

জুর্দ্যাঁ। পণ্ডিত মহাশয়!

তত্বজ্ঞানী। পাজি, নচ্ছার, হতভাগা!

জুর্দ্যাঁ। পণ্ডিত মহাশয়!

ওস্তাদ। গাদা ছুঁচো—

জুর্দ্যাঁ। ও গো ওস্তাদজিরা!

তত্বজ্ঞানী। নির্লজ্জ!

জুর্দ্যাঁ। পণ্ডিত মহাশয়!

না-ওস্তাদ। গর্দ্দভ কোথা কারে!

জুর্দ্যাঁ। ওগো তোমরা কর কি!

তত্বজ্ঞানী। পাজি ব্যাটারা!

জুর্দ্যাঁ। পণ্ডিত মহাশয়!

গা-ওস্তাদ। অসভ্য কোথাকারে!

জুর্দ্যাঁ। ও গো ওস্তাদ জিরা!

তত্বজ্ঞানী। চোর, বাটপারে, জুয়াচোর নচ্ছার!

জুর্দ্যাঁ। ও পণ্ডিত মহাশয়! ও ওস্তাদ্‌জিরা! ও পণ্ডিত মহাশয়! ও ওস্তাদ্‌জিরা! ও পণ্ডিত মহাশয়!

(মারামারি করিতে করিতে সকলে প্রস্থান)

---

৫ দৃশ্য।

জুদ্দাঁ্যা। এক জন পেয়াদা।

জুদ্দাঁ্যা। যত খুশি তোমরা মারামারি কর আমি তো আর পারিনে, আর তোমাদের ছাড়িয়ে দিতে গিয়ে কি আমার পোষাক নষ্ট করব? আর, আমি এমন পাগল নই যে ওদের মধ্যে ঢুকে আমিও দুই চার ঘা খাই।

---

৬ দৃশ্য।

তত্ত্ববিদ্যার শিক্ষক, জুর্দ্দাঁ্যা, এক জন জন পেয়াদা।

ত-শিক্ষক। (তাহার গলাবন্দ ঠিক্ ঠাক করিয়া) এই বার পাঠ আরম্ভ করা যাক্।

জুর্দাঁ্যা। আ, মশায় আপনি যে মার খেয়েছেন, তার জন্য আমি বড় দুঃখিত হয়েছি।

ত-শিক্ষক। সে কিছুই নয়। একজন তত্ত্বজ্ঞানী ওসব অনায়াসে সহ্য করতে পারেন। আর তাঁদের নামে জুবিনালের ছাঁদে উপহাস ক'রে একটা প্রবন্ধ লিখতে যাচ্চি, তাতে তারা খুব জব্দ হবে। ওকথা থাক্—আপনি কি শিখ্‌তে ইচ্ছা করেন?

জুর্দাঁ্যা। যা আমি শিখ্‌তে পারব। কারণ, পণ্ডিত হতে আমার ভয়ানক ইচ্চে। আর ছোট ব্যালায় বাপমারা আমাকে ভাল ক'রে বিদ্যা শিক্ষা দেননি বোলে আমার এমন রাগ ধরে!

ত-শিক্ষক। হাঁ এ কথাটা মনে হওয়া যুক্তি সঙ্গত বটে;* "বিদ্যাভাবাৎ জীবনং-মৃত্যু সদৃশং" এ শ্লোকটা আপনি বুঝ্‌তে পেরেছেন, সংস্কৃত অবশ্য আপনি জানেন।

জুর্দাঁ্যা। আচ্ছা, মনে করুন যেন আমি জানি নে। ওর মানে কি আমাকে বলুন।

ত-শিক্ষ। অস্যার্থ এই—বিদ্যার অভাবে জীবন মৃত্যুবৎ হয়।

জুর্দাঁ্যা। এই সংস্কৃতটাতে খুব জ্ঞানের কথা আছে।

ত-শিক্ষ। বিদ্যার মুলতত্ত্ব কি আপনার কিছু জানা আছে?

জুর্দাঁ্যা। হাঁ আছে বৈ কি। আমি লিখ্‌তে পড়্‌তে জানি।

ত-শিক্ষ। তবে কিসের থেকে আরম্ভ করা আপনার ইচ্ছে?—ন্যায় শাস্ত্র শিখ্‌তে কি ইচ্ছে করেন?

জুর্দাঁ্যা। এই ন্যায়শাস্ত্র জিনিস টা কি?

ত-শিক্ষ। যে বিদ্যা মনের তিন প্রকার কার্য্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়।

জুর্দাঁ্যা। কি এই তিন প্রকার কার্য্য?

ত-শিক্ষ। সে হচ্চে প্রথম, দ্বিতীয় আর তৃতীয়। প্রথম হচ্চে, সার্ব্বভৌমিক পদার্থ সংখ্যার দ্বারা ভাল করে বিচার করা —তৃতীয় কতকগুলি সংকেত দ্বারা সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা যেমন—বার্ব্বারা সেলারেণ্ট, ডারি, ফেরিও, বারালিপটন্ ইত্যাদি।

জুর্দাঁ্যা। কি বিশ্রী কটমটে কথাগুলো। ও সব আমার পোষাবে না। ও ছাড়া আর কোন ভাল জিনিস শেখা যাক্।

---

* মূলে লাটিন আছে।

শিক্ষক। ধর্ম্মনীতি কি শিখবেন?

জুর্দ্যা। ধর্ম্মনীতি?

শিক্ষক। হাঁ।

জুর্দ্যা। এই ধর্ম্মনীতিটা বলে কি?

শিক্ষক। ধর্ম্মনীতি সুখের বিষয় ব্যাখ্যা করে, মনুষ্যদের রিপু দমন কর্‌তে শিক্ষা দেয় আর—

জুর্দ্যা। না না ও থাক্। আমার মেজাজটা বড় গরম। ধর্ম্ম নীতি হোক্ আর অধর্ম্ম নীতিই হোক, আমার রাগতে ইচ্ছে হলে, খুব রাগ্‌তে ভাল বাসি।

শিক্ষক। ভৌতিক বিদ্যা কি তবে আপনি শিখ্‌তে চান?

জুর্দ্যা। এই ভৌতিক বিদ্যাটা বলে কি?

শিক্ষক। ভৌতিক বিদ্যা প্রাকৃতিক পদার্থের মূলতত্ত্ব সকল ব্যাখ্যা করে; পঞ্চভূত, ধাতব পদার্থ খনিজ পদার্থ, প্রস্তর, উদ্ভিদ ও জন্তুদের প্রকৃতি বর্ণনা করে, এবং উল্কা, ইন্দ্রধনু, আলেয়া ধূমকেতু, বিদ্যুৎ, বজ্র বৃষ্টি তুষার, বায়ু ও ঘূর্ণা বায়ু সকলের কারণ নির্ণয় করে।

জুর্দ্যা। ওর ভিতর ভারি গোলমেলে কেত্তন—অনেক হ্যাঙ্গাম।

শিক্ষ। তবে আপনাকে কি শেখাব বলুন?

জুর্দ্যা। আমাকে বানান শেখান।

শিক্ষ। আচ্ছা বেশ।

জুর্দ্যা। তার পরে, আমাকে পাঁজি দেখ্‌তে শেখাতে হবে কারণ কখন্ চাঁদ ওঠে আর কখন্ চাঁদ ওঠে না আমার সব জান্‌তে হবে।

শিক্ষ। আচ্ছা তাই হোক্। আপনি যা ইচ্ছা কচ্চেন তা শেখাবার জন্য বর্ণের তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা দিতে হবে। তা হলে পদার্থ সকলের শৃঙ্খলা অনুসারে, বর্ণের প্রকৃতি এবং সেই সকল বর্ণের উচ্চারণ পদ্ধতি শিক্ষা প্রথম আরম্ভ করতে হবে। আর সে বিষয়ে আপনাকে এই বল্‌তে চাই যে, বর্ণ সকল স্বর বর্ণে বিভক্ত—কারণ তাহারা কণ্ঠ স্বর প্রকাশ করে; এবং ব্যঞ্জন বর্ণে বিভক্ত, কারণ তাহারা স্বর বর্ণের সহযোগে উচ্চারিত হয়—এবং কণ্ঠ স্বরের বিভিন্ন উচ্চারণ সূচনা করে। স্বরবর্ণ সবশুদ্ধ পাঁচটিঃ—আ, এ, ই, ও, উ।

জুর্দ্যা। ও সব আমি বুঝি।

শিক্ষ। মুখ খুব হাঁ ক'রে আ বর্ণটি উচ্চারণ হয়। আ।

জুর্দ্যা। আ—আ—হাঁ।

শিক্ষক। চোয়াল নিচের থেকে উপরে আস্তে আস্তে নিয়ে এলে এ স্বরবর্ণ উচ্চারণ করা যায়; আ—এ।

জুর্দ্যা। আ—এ; আ—এ। ঠিক্। বাঃ! কি চমৎকার!

শিক্ষ। দুটো চোয়াল আরও কাছাকাছি আন্‌লে আর কানের দিকে মুখের দুই কোন্ বিস্তৃত কর্‌লে স্বরবর্ণ ই পাওয়া যায়।

জুর্দ্যা। আ—এ—ই—ই, ই, ই। এ কথা ঠিক্। বিদ্যাকে বলিহারি!

শিক্ষ। চোয়াল দুটো খুলে ঠোঁটের দুই কোন কাছাকাছি আন্‌লে স্বর বর্ণ ও পাওয়া যায়ঃ—ও।

জুর্দ্যাঁ। ও, খুব ঠিক্ঃ আ, এ, ই, ও, ই, ও। বড় চমৎকার! ই, ও, ই, ও।

শিক্ষ। ও (O) যেমন গোলাকার, ও উচ্চারণ করবার সময়ে ঠোঁটের ফাঁক্ একটি ছোট গোল হয়ে ওঠে।

জুর্দ্যাঁ। ও, ও, ও, ঠিক্ বলেছ। আ! সব বিষয়ে কিছু জানা-শুনো থাকা বড় ভাল।

শিক্ষক। দুই পাটি দাঁত একেবারে যোগ না করে কাছাকাছি এনে আর বাহিরের দিকে ঠোঁট্ দুটো লম্বা ক'রে দিলে, উ বর্ণটি উচ্চারণ হয়। উ।

জুর্দ্যাঁ। উ, উ। ওর চেয়ে আর সত্যি কিছু হতে পারে না। উ।

শিক্ষ। যেন ভেংচোচ্চো, এই রকম ভাবে ঠোঁট দুটো লম্বা করতে হয়। এ থেকে এই পাওয়া যাচ্চে যখন আপনার কাউকে ভেম্‌চোবার দরকার হবে, তখন তাকে উ বল্লেই হবে।

জুর্দ্যাঁ। উ, উ, তা ঠিক্ কথা। আঃ এসব জান্‌বার জন্য কেন আরও আগে শিখ্‌তে আরম্ভ করি নি।

শিক্ষ। কাল ব্যঞ্জন বর্ণের বিষয় দেখা যাবে।

জুর্দ্যাঁ। সে সবগুলও কি এই রকম মজার?

শিক্ষ। তার সন্দেহ নেই। তার দৃষ্টান্ত ড। উপরের পাটি দাঁতের উপরে জীবের আগা দিলে এই ড বর্ণ উচ্চারণ হয়। ড।

জুর্দ্যাঁ। ড, ড, হাঁ, বা বাঃ বেশ জিনিস! বেশ জিনিস্!

শিক্ষ। নীচের ঠোঁটের উপর উপরের দাঁত সজোরে ভর দিলে ফ এই ব্যঞ্জন বর্ণ টি পাওয়া যায়। ফ।

জুর্দ্যাঁ। ফ, ফ। ঠিক কথা। আ! মা বাপ! তোমাদের উপর কি রাগই ধর্‌চে।

শিক্ষক। আর, জিবের আগা তালু পর্য্যন্ত নিয়ে গেলে র এই বর্ণটা পাওয়া যায়।

জুর্দ্যাঁ। র—র-র-র। ঠিক্ কথা! আহা আপনি কি বিদ্বান্, আর আমি যে কতটা সময় হারিয়েছি তার ঠিক নেই। র—র—র—র।

শিক্ষক। এই সব চীজ ভাল ক'রে আপনাকে শিখিয়ে দেব।

জুর্দ্যাঁ। আপনার কাছে একটি প্রার্থনা আছে। একটি গোপনীয় কথা বিশ্বাস করে আপনার কাছে বল্‌চি। এক জন বড় লোকের মেয়ের সঙ্গে আমার ভাল বাসা হয়েছে। আমি তাঁর পদতলে একটি প্রেম-লিপি পাঠাতে চাই। আপনি যদি সেই চিঠি লিখ্‌তে আমাকে সাহায্য করেন।

শিক্ষ। আচ্ছা বেশ।

জুর্দ্যাঁ। তাহলে রসিক লোকের মত কাজ করা হয় না?

শিক্ষ। তা সত্য। আপনি কি তাঁকে পদ্য লিখ্‌তে ইচ্ছে করেন?

জুর্দ্যাঁ। না না—পদ্য না।

শিক্ষ। তবে কি খালি গদ্য?

জুর্দ্যাঁ। না আমি গদ্যও লিখ্‌তে চাইনে, পদ্যও লিখ্‌তে চাই নে।

শিক্ষক। হয় পদ্য হবে, নয় গদ্য হবে এদুটের একটাও হবে না তা তো আর হতে পারে না।

জুর্দ্যা। কেন?

শিক্ষক। মশায় তার কারণ হচ্চে এই যে, ভাব প্রকাশ করতে গেলে হয় পদ্যে নয় গদ্যে প্রকাশ করতে হয়।

জুর্দ্যা। গদ্য আর পদ্য ছাড়া কি তবে আর কিছু নেই?

শিক্ষক। না মশায়। যা গদ্য নয় তাই পদ্য, আর যা পদ্য নয় তাই গদ্য।

জুর্দ্যা। যখন আমরা কথা কই, তখন সেটা কি?

শিক্ষক। গদ্য।

জুর্দ্যা। কি! যখন আমি বলি, "নিকোল, আমার চটি জুতো নিয়ে এসো, আর আমার রাত্রে পরবার টুপিটা দেও" এটা কি গদ্য হল?

শিক্ষক। হাঁ মশায়।

জুর্দ্যা। মাইরি, আমি চল্লিস্ বৎসরেরও বেশি গদ্য বোলে আসচি অথচ গদ্য যে কি জিনিষ তা আমি কিছুই জানি নে; আর, আপনি আমাকে এ বিষয় শিক্ষা দেওয়াতে আপনার কাছে আমি বড়ই বাধিত আছি। আমি তবে একটি পত্রে তাকে এই লিখতে চাই, "সুন্দরি বেগম, তোমার সুন্দর চোখ্ দেখে, আমি প্রেমে মরে যাচ্চি," এই কথাগুলি আর একটু রসালো ভাবে লিখতে চাই, এই কথাগুল একটু ভাল রকমে বসাতে চাই।

শিক্ষক। এই কথা লিখুন যে তাঁহার নয়নানলে আপনার হৃদয় ভস্মসাৎ হয়ে গেছে; আর তার জন্য রাত্রি দিন আপনার অসহ্য যন্ত্রণা হচ্চে।

জুর্দ্যা। না না না—ও সব আমি চাইনে, আমি যে কথা আগে তোমাকে বলেছি আমি কেবল তাই লিখতে চাই,—"সুন্দরী বেগম, আমি তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি প্রেমে ম'রে যাচ্চি।"

শিক্ষক। ঐ কথাটা তো একটু বাড়িয়ে বলা চাই।

জুর্দ্যা। না না! আমি ঐ কথাগুলই চিঠিতে লিখতে চাই কেবল একটু ভাল করে গুচিয়ে বলতে হবে। আচ্ছা দেখা যাক্, তুমি একটু বল দেখি ঐ কথাগুল কত রকম ক'রে বলা যেতে পারে।

শিক্ষক। আপনি যে রকম বলছিলেন, প্রথমতঃ তো সেই রকম করে বলা যেতে পারে "সুন্দরী বেগম, আমি তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি প্রেমে ম'রে যাচ্চি।" কিম্বা "প্রেমে ম'রে যাচ্চি সুন্দরী বেগম তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি" কিম্বা "তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি প্রেমে, সুন্দরী বেগম, ম'রে যাচ্চি"—কিম্বা "মরে যাচ্চি তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি, প্রেমে।

জুর্দ্যা। কিন্তু এই সকলের মধ্যে কোনটা সকলের চেয়ে ভাল?

শিক্ষক। আপনি যেটা বলেছিলেন; সুন্দরী বেগম, তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি আমি প্রেমে ম'রে যাচ্চি।"

জুর্দ্যা। তবুও দেখ আমি কখন লিখতে

পড়তে চেষ্টা করিনি। প্রথম চোটেই কেমন এটা আমার বেরিয়ে গেছে। আপনাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ;আর আমার এই অনুরোধ কালও আপনি সকাল সকাল আসবেন।

শিক্ষক। তার ব্যত্যয় হবে না।

---

৭ দৃশ্য।

জুর্দ্যাঁ। একজন পেয়াদা।

জুর্দ্যাঁ। (পেয়াদার প্রতি) কি! আমার পোষাক এখনও আসিনি?

পেয়াদা। না, হুজুর।

জুর্দ্যাঁ। আজ আমার কত কাজ আর আজ কিনা লক্ষ্মীছাড়া দর্জিটা আমাকে সমস্ত দিন অপেক্ষা করিয়ে রেখেছে। আমার ভারি রাগ ধরচে। দর্জিটা জাহান্নমে যাক্—চুলোয় যাক। পাজি দর্জি লক্ষ্মীছাড়া দর্জি হতভাগা দর্জি ছুঁচো দর্জি! হারামজাদাকে যদি এখন একবার পাই—

---

৮ দৃশ্য।

জুর্দ্যাঁ। এক জন কর্ত্তা দর্জি,তার এক জন চাকর দর্জি,জুর্দ্যাঁর পোষাক হস্তে করিয়া এক জন পেয়াদা।

জুর্দ্যাঁ। আঃ এই যে! আমি আর একটু হলেই তোমার উপর রাগ কচ্ছিলুম।

দর্জি। আমি এর চেয়ে আর শীঘ্রির আসতে পারলেম না আপনার এই পোষাক তৈরি করতে আমার ২০ জন ছোগরা লাগিয়েছিলেম।

জুর্দ্যাঁ। তুমি যে রেশমের মোজা পাঠিয়ে দিয়েছিলে তা এত ছোট যে তা আমার পরতে ভয়ানক কষ্ট হয়েছিল, আর এর মধ্যেই তার দুটো সেলাই খুলে গেছে।

দর্জি। কেন, যত টানবেন ততই তো বাড়ান যায়।

জুর্দ্যাঁ। হাঁ ক্রমাগত যদি সেলাইগুল খুলে যায় তাহলে বটে! আর তুমি আমার যে জুতো তৈরি করিয়ে দিয়েছ সেও এমনি কষা যে ভয়ানক পায়ে লাগে।

দর্জি। না মশায় আদপে লাগে না।

জুর্দ্যাঁ। কি! আদপে লাগে না?

দর্জি। না মহাশয় আপনার পায়ে লাগে না।

জুর্দ্যাঁ। আমি বলচি আমার লাগে।

দর্জি। সে আপনার কল্পনা।

জুর্দ্যাঁ। আমার লাগচে বলেই কল্পনা কচ্চি।

দর্জি। দেখুন সমস্ত রাজ বাড়িতেও এমন সরেশ মানানসই পোষাকের স্যুট নেই। কাল রং না হয়েও যে এমন ভদ্র রকম কাপড় হতে পারে সে কেবল কারিগরের বাহাদুরি। আর আমি বাজি রাখতে পারি, খুব ভাল ভাল কারিগরেরা দশবার চেষ্টা ক'রে এই রকম পোষাক তৈরি করতে পারে না।

জুর্দ্যাঁ। এ আবার কি? ফুলগুল সব নীচের দিকে মুখ ক'রে রেখেছে দেখচি।

দর্জি। আপনি তো আমাকে বলেন নি যে উপর দিকে মুখ ক'রে রাখতে হবে।

জুর্দাঁ। তা কি আবার বলতে হবে?

দর্জি। বলতে হবে বৈ কি। কেন না, বড় লোকরা সবাই এই রকম প'রে থাকেন।

জুর্দাঁ। বড় লোকেরা এই রকম উলট্ ক'রে ফুল পরেন?

দর্জি। হাঁ মশাই।

জুর্দাঁ, ওঃ তবে এ বেশ হয়েছে?

দর্জি। আপনি যদি ইচ্ছে করেন তাহলে উপর দিকে মুখ করে দিতে পারি।

জুর্দাঁ। না—না।

দর্জি। আপনি বোল্লেই করে দিতে পারি।

জুর্দাঁ। না না তা করতে হবে না। যা করেছ বেশ করেছ। তোমার মনে হয় কি? আমার গায়ে বেশ লাগবে তো?

দর্জি। বলেন কি! একজন ছবি ওয়ালাও তুলি দিয়ে এমন ফিট ক'রে পোষাক আঁকতে পারে না। আমার কারখানায় একটি ছোগরা কারিগর আছে তার মত রিন্‌গ্রেব কেউ করতে পারে না—তার ও বিষয়ে ভারি জেহেন্। আর একটি ছোগরা আছে তার মত ডবলেট কেউ বানাতে পারে না—সে বিষয়ে সে অদ্বিতীয়।

জুর্দাঁ। পরচুলো ও পালকগুল কি দস্তুর মত হয়েছে?

দর্জি। সব ঠিক হয়েছে।

জুর্দাঁ। (দর্জির প্রতি দৃষ্টি করিয়া) আ! আ! দর্জি সাহেব, শেষ বারে তুমি আমাকে যে কাপড়ের কার্ব্বা করে দিয়েছিলে, তোমার গায়েও দেখচি সেই কাপড়! আমি বেশ চিনতে পাচ্চি।

দর্জি। ঐ কাপড়টা আমার এত ভাল লেগেছিল, যে আমার নিজের জন্য ঐ কাপড়ের একস্যুট তৈরি করেছি।

জুর্দাঁ। কিন্তু আমার কাপড় থেকে তৈরি করাটা তোমার উচিত হয় নি!

দর্জি! কোর্ত্তাটা কি পরে দেখবেন?

জুর্দাঁ। হাঁ আমাকে দাও।

দর্জি। একটু সবুর করুন। ও রকম করে পরা দস্তুর না। তালে তালে কাপড় পরাতে হবে ব'লে আমি সঙ্গে করে লোক এনেছি—এসব পোষাক ঘটা ক'রে প'রতে হয়। ওহে! তোমরা এসো সবাই।

---

৯ দৃশ্য।

জুর্দাঁ—হেড দর্জি, কারিগর দর্জি, নৃত্যকারী কারিগর দর্জি সকল—এক জন পেয়াদা।

হেড-দর্জি। (কারিগরদিগের প্রতি) বড় লোকদের যে রকম করে পোষাক পরাতে হয় সেই রকম করে ওঁকে পোষাক পরিয়ে দাও।

নৃত্যকারীগণের প্রবেশ। (চারি জন কারিগর দর্জি নাচিতে নাচিতে জুর্দাঁর নিকট আগমন—তাহাদিগের মধ্যে দুজন তাঁর কুর্ত্তি করিবার পরে জামা খুলিয়া ফেলিল—আর দুইজন ফতুয়া খুলিয়া লইল;

তার পর নাচিতে নাচিতে তাহার নতুন পোষাক পরাইয়া দিল। জুর্দ্দ্যা তাহাদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে তাহার পোষাক তাহাদিগকে দেখাইতে লাগিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে তাহা ঠিক্ মানান্-সই হইয়াছে কি না)

কারিগর দর্জ্জি। নবাব সাহেব, এই কারিগরদের সরাপ খেতে অনুগ্রহ করে কিছু দিন।

জুর্দ্দ্যা। আমাকে কি বোলে ডাক্‌লে?

কারিগর দর্জ্জি। নবাব সাহেব।

জুর্দ্দ্যা। নবাব সাহেব, বা! দেখ, বড় লোকদের মত পোষাক পরলে কি হয়! সামান্য লোকের মত যদি চিরকাল কাপড় পরে থাকা যায়, তাহলে একবারও কেউ পোঁছে না। নবাব সাহেব। (কিছু টাকা দিয়া) এই নেও, নবাব সাহেব বলবার দরুণ এই দিলুম।

কারিগর। জাঁহাপনা!

জুর্দ্দ্যা। ও! ও! জাঁহাপনা! তুমি একটু দাঁড়াও হে; জাঁহাপনার দরুণ কিছু বকসিস পাওয়া উচিত—জাঁহাপানা বড় কম কথা নয়! এই নেও জাঁহাপানা তোমাকে এই দিলেন।

কারিগর। জাঁহাপানা হুজুরালিকে খোদা সেল্লামৎ রাখুন এই উদ্দেশে আমরা সকলে মিলে সরাপ খাব।

জুর্দ্দ্যা। হুজুরালী! ও! ও! ও! সবুর কর; তোমরা চলে যেও না। আমাকে হুজুরালী! (মৃদুস্বরে জনান্তিকে) মাইরি, যদি বাদশা পর্য্যন্ত ওঠে, তাহলে তো আমি থোলে-ঝাড়া হয়ে পড়বো। (উচ্চস্বরে) হুজুরালীর জন্য এই বকসিস্।

কারিগর। হুজুরালীর কি দরাজ হাত—আমরা সবাই সেলাম ক'রে চল্লুম।

জুর্দ্দ্যা। যাচ্চে বেশ কচ্চে—আর একটু হলেই আমার যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে ফেলতেম।

---

১০ দৃশ্য।

নৃত্যকারীগণের দ্বিতীয়বার প্রবেশ। চারি জন কারিগর নাচিতে নাচিতে জুর্দ্দ্যার জয় জয়কার করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

দুঃখ আবাহন।

আয় দুঃখ আয় তুই,
তোর তরে পেতেছি আসন!
হৃদয়ের প্রতি শিরা টানি টানি উপাড়িয়া
বিচ্ছিন্ন শিরার মুখে তৃষিত অধর দিয়া
বিন্দু বিন্দু রক্ত তুই করিস্ শোষণ;
জননীর স্নেহে তোরে করিব পোষণ!
হৃদয়ে আয়রে তুই হৃদয়ের ধন!

যখনি হইবি শ্রান্ত বুকেতে রাখিস্ মাথা!
সে বিছানা সুকোমল শিরায় শিরায় গাঁথা!

সুখেতে ঘুমাস্ তুই
হৃদয়ের নীড়ে ;
অতি গুরুভার তুই—
দুয়েকটি শিরা তাহে যাবে বুঝি ছিঁড়ে
যাক্ ছিঁড়ে !

জননীর স্নেহে তোরে করিব বহন,
দুর্ব্বল বুকের পরে করিব ধারণ,
একেলা বসিয়া ঘরে অবিরল এক স্বরে
গাব তোর কানে কানে ঘুম পাড়াবার গান !
মুদিয়া আসিবে তোর শ্রান্ত দুনয়ান !
প্রাণের ভিতর হোতে উঠিয়া নিশ্বাস
শ্রান্ত কপালেতে তোর করিবে বাতাস,
সুখেতে ঘুমাস্ !

আয় দুঃখ আয় তুই !
ব্যাকুল এ হিয়া !
দুই হাতে মুখ চাপি
হৃদয়ের ভূমি পরে
পড়্ আছাড়িয়া।
সমস্ত হৃদয় ব্যাপি
এক বার উচ্চ স্বরে
অনাথ শিশুর মত উঠরে কাঁদিয়া !
প্রাণের মর্ম্মের কাছে
একটি যে ভাঙ্গা বাদ্য আছে,
দুই হাতে তুলে নেরে
সবলে বাজায়ে দেরে,
নিতান্ত উন্মাদ সম
ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ ।

ভাঙ্গেত ভাঙ্গিবে বাদ্য,
ছেঁড়েত ছিঁড়িবে তন্ত্রী,
নেরে তবে তুলে নেরে,
সবলে বাজায়ে দেরে,
নিতান্ত উন্মাদ সম
ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ !

দারুণ আহত হোয়ে দারুণ শব্দের ঘায়
যত আছে প্রতিধ্বনি
বিষম প্রমাদ গণি
একেবারে সমস্বরে
কাঁদিয়া উঠিবে যন্ত্রনায়,
দুঃখ, তুই, আয় তুই আয় !

নিতান্ত একেলা এ হৃদয় !
কেহ নাই যারে ডেকে দুটি কথা কয় !
আর কিছু নয়,
কাছে আয় একবার, তুলে ধর্ মুখ তার,
মুখে তার আঁখি দুটি রাখ !
এক দৃস্টে চেয়ে শুধু থাক্ !
আর কিছু নয়—
নিরালয় এ হৃদয়—
শুধু এক সহচর চায় !
তুই দুঃখ, তুই কাছে আয় !
কহিতে না চাস্ যদি
ব'সে থাক্ নিরবধি
হৃদয়ের পাশে দিন রাতি,

যখনি খেলাতে চাস্, হৃদয়ের কাছে যাস্
হৃদয় আমার চায় খেলাবার সাথী !—

যখনি খেলাতে চাস্ প্রাণের প্রান্তরে যাস্,
সেথায় ভস্মের স্তূপ আছে ;
মিলি তোরা দুই ভাই, ফুঁ দিয়ে উড়াস্ ছাই
সতত থাকিস্ কাছে কাছে।

সহসা দেখিতে যদি পাস্
দগ্ধ-শেষ অস্থি রাশ রাশ,
তাই দিয়ে খেলেনা গড়িস্,
তাই নিয়ে হাসিস্ কাঁদিস্!
প্রাণের যেথায়
অলক্ষ্যেতে শোণিতের ফল্গু ব'হে যায়,
যা;স্‌রে সেথায়,
খুঁড়িস বালুকা-রাশি অস্থি খণ্ড দিয়া
শোণিত উঠিবে উথলিয়া!
লোয়ে সে শোণিত ধারা মিশায়ে ভস্মের স্তূপে
গড়িস ভস্মের ঘর,
গড়িস ভস্মের নর,
গড়িস্ খেলানা নানারূপে!
তাই নিয়ে ভাঙ্গিস গড়িস,
তাই নিয়ে খেলানা করিস,
অস্থি, আর ভস্ম, আর হৃদয় শোণিত ধার,
তাই নিয়ে খেলেনা গড়িস,
দুই ভায়ে সতত খেলিস!

দুঃখ, তুই আয় মোর কাছে!
তুই ছাড়া কে আমার আছে!
প্রমোদে হোয়েছি আমি শ্রান্ত অতিশয়,
পারিনে হাসিতে আর কঙ্কালের হাসি,
মাংসহীন অস্থিদন্ত ময়!
শুধু হাসি, শুধু হাসি, আর কিছু নয়!
বেশ ছিনু বেশ ছিনু আগে,
যৌবনের কুঞ্জবন দহি দহি অনুক্ষণ
শুকায়ে আসিয়াছিল জ্বলন্ত নিদাঘে,
মাঝেতে বহিল কেন বসন্তের বায়
শুষ্ক কুঞ্জবনে?
রাশি রাশি শুষ্ক পাতা শুষ্ক শাখা যত
মাতি উঠি বসন্ত পবনে
ঝর ঝর ঝর ঝরে ভাঙ্গা কণ্ঠ স্বরে
উচ্ছ্বাসিল প্রমোদের গান,
সহসা স্বপন টুটে প্রতিধ্বনি এল ছুটে
প্রাণের চৌদিক হোতে,দেখিবারে শুধাইতে
"শুষ্ক কুঞ্জ-বনান্তরে
কত—কত দিন পরে
কে এলরে কে এলরে কে ধরিল তান!
পাতায় পাতায় মিলি
শাখায় শাখায় মিলি
ধোরেছিল গান!
সে কি ভাল লাগে?
শুকান' পাতার স্বর শুকান' শাখার গান
সে কি ভাল লাগে?
তাই এ হৃদয় ভিক্ষা মাগে
বরষা হওগো উপনীত!
ঝর ঝর অবিরল ঝরিয়া পড়ুক জল
শুনি ব'সে অশ্রুর সঙ্গীত!
আয় দুঃখ, হৃদয়ের ধন,
এই হেথা পেতেছি আসন!
প্রাণের মর্ম্মের কাছে
এখনো যা' রক্ত আছে
তাই তুই করিস্ শোষন!

ভূ-পঞ্জর।

চতুর্থ যুগ বা বর্ত্তমান কাল।

তৃতীয় যুগের শেষ হইতে আরম্ভ হইয়া এখন পর্য্যন্ত চতুর্থ যুগ চলিয়া আসিতেছে। দুএকটি বিশেষ স্থানীয় ঘটনা ছাড়া পৃথিবীর সার্ব্বভৌমিক বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন এযুগে দৃষ্ট হয় না। বন্যা এবং হিমশৈলের কার্য্যই এ যুগের বিশেষ লক্ষণ, এবং ইহা অপেক্ষাও এ যুগের আর একটি বিশেষ লক্ষণ মনুষ্যের উৎপত্তি। এই যে তিনটি বিশেষ ঘটনা দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগ হইতে এই যুগটি ভিন্ন তাহাদের পর্য্যায় এইরূপ —

প্রথম—ইয়োরোপীয় বন্যা;

দ্বিতীয়—হিমশৈলের কার্য্য;

তৃতীয়—মনুষ্যের উৎপত্তি এবং আসিয়ার বন্যা;

চতুর্থ যুগের এই ঘটনাত্রয় বর্ণনা করিবার অগ্রে ইয়োরোপীয় বন্যার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের প্রাণী ও প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের কথা সংক্ষেপে বলা আবশ্যক। ভূবেত্তাগণ চতুর্থ-যুগকে দুইভাগে ভাগ করেন, প্রথম প্লায়োসিনের পরবর্ত্তী বা চতুর্থ যুগের প্রারম্ভকাল; দ্বিতীয় আধুনিক কাল।

চতুর্থ যুগের শেষাংশ আধুনিক কালেই পূর্ব্বোক্ত তিনটি ঘটনার জন্ম।

প্লায়োসিনের পরবর্ত্তী কাল।

(Post Pliocene Period)

এই সময়ের উদ্ভিদের কথা বলা এখন বাহুল্য। চতুর্থ যুগের প্রারম্ভের ও আধুনিক সময়ের উদ্ভিদের মধ্যে বিশেষ জাতি-ভেদ লক্ষিত হয় না। জন্তু সম্পর্কেও সাধারণতঃ এই কথা বলা যাইতে পারে। তখনকার তিনচারি জাতীয় জীব মাত্র এখন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত; এবং পরে শীতাতপ বৈষম্য হেতু স্থান বিশেষের জন্তু বিশেষ লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু সে সকল জাতীয় জন্তু পৃথিবীর অন্যত্র বর্ত্তমান।

চতুর্থ যুগের প্রারম্ভেও ইয়োরোপ যে, সিংহ ব্যাঘ্র, হস্তী, মহিষ প্রভৃতি গ্রীষ্ম দেশীয় জন্তুর নিবাস ভূমি ছিল তাহার অনেক প্রমাণ আছে। ধীবরেরা শুক্তি সংগ্রহ করিতে গিয়া কেবল মাত্র নরফোক (Norfolk) তীরে আঠার হাজারেরও অধিক হাতীর কষের দাঁত উঠাইয়াছিল। হস্তীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে যেরূপ সময় সাপেক্ষ তাহাতে এই বহু সংখ্যক দন্ত জমিতে নিশ্চয়ই বহু সহস্র সহস্র বৎসর লাগিয়াছে।

আমেরিকাতে চতুর্থ যুগের প্রারম্ভে মিগেথেরিয়াম (১) মিগেলনিক্স্ (২) মাইলডন (৩) গ্লিপটোডন (৪) বলিয়া যে সকল জন্তু ছিল তাহা লোপ পাইয়াছে।

ভারতবর্ষের ঐরূপ পুরাতন লুপ্ত জন্তুর কঙ্কাল যদিও আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই তথাপি বোধ হয় এখানেও ঐরূপ অনেক পুরাতন জাতির লোপ হইয়াছে। মকর বলিয়া আমরা পুরাতন গ্রন্থে যে জলজন্তুর উল্লেখ পাই, উহা যে কেবল মাত্র কল্পনা-সম্ভূত জীব তাহা কে নিশ্চয় বলিতে পারে? হয়তো সত্য সত্যই ঐরূপ কোন প্রকার জীব পুরাকালে এদেশে বর্ত্তমান ছিল।

মামথ বলিয়া একরূপ হস্তী এই সময় পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই ছিল, তাহারা এখন লোপ পাইয়াছে; ইহা আধুনিক বৃহত্তর হস্তী হইতেও প্রকাণ্ড। দন্তের গঠন প্রভেদ হেতুই মাশ্‌টডন হইতে মামথ ভিন্ন। মামথের দন্ত বিন্যাস আমাদের হস্তীর ন্যায়। এই হস্তীর কঙ্কাল পুরাতন কালে কেহবা দেবতা কেহবা রাক্ষস দেহাবশেষ বলিয়া মনে করিত। গ্রীকগণ এই হস্তীর একটা জানুর অস্থিকে গ্রীকযোদ্ধা এজ্যাক্সের (Ajax) জানু-অস্থি ভাবিয়াছিল এবং এইরূপ কোন অস্থি হইতেই এক্রকস্‌পুর অ্যাসটেরিয়াস্ (Asterius) এবং আরো সহস্র সহস্র প্রকাণ্ড শরীরী মনুষ্যের গল্প নির্ম্মিত।

ইয়োরোপীয় ইতিহাসের মধ্য-যুগে-(Middle ages) রচিত Gigantology বলিয়া প্রকাণ্ড শরীরীদিগের যে বিবরণ পুস্তক পাওয়া যায়, তাহাতে এইরূপ অসংখ্য অসংখ্য অদ্ভুত গল্প সন্নিবেশিত; সে সকলই যে এইরূপ হস্তী-কঙ্কাল হইতে উৎপন্ন তাহার আর সন্দেহ নাই। স্পেনের ইতিহাসেও এইরূপ অনেক গল্প পাওয়া যায়। ক্রিষ্টফার নামক সেণ্টের একটি দাঁত বলিয়া ভেলেন্সের গির্জ্জায় যে অস্থি রক্ষিত আছে তাহা ঐ হস্তীর কষের দাঁত। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে বৃষ্টি কামনায় সেণ্ট ভিন্‌সেণ্ট গির্জ্জার পাদরিরা যে একটা কল্পিত রাক্ষসের হাত স্কন্ধে করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন তাহা এইরূপ প্রকাণ্ড হস্তীর পার্শ্বাস্থি (Femur) মাত্র। ফ্রান্সেও এইরূপ অনেক গল্প প্রচলিত।

১৮-শ শতাব্দীতে মামথ হস্তীর কঙ্কাল ইয়োরোপের নানা স্থানে পাওয়া যায়। প্রথমে লোকেরবিশ্বাস ছিল ইহা আধুনিক হস্তী কঙ্কাল। কোন কোন বিদ্যাভিমানী বলিতেন হানিবল, ইটালি আক্রমণ কালে, এই সকল হস্তী কার্থেজ হইতে লইয়া আসেন। ইহার ভ্রম সপ্রমাণ করিতে কুভিয়েরর অল্পই প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। ইয়োরোপ আমেরিকা আসিয়া ও আফ্রিকার সকল স্থানেই এইরূপ হস্তী কঙ্কাল দেখিতে পাওয়া যায়।

সেনানদীর মোহানায় নূতন মাই-

১ Megatherium অর্থাৎ প্রকাণ্ডজীব।
২ Megalonyx অর্থাৎ লম্বনখর।
৩ Mylodon অর্থাৎ জাঁতাদন্ত।
৪ Glyptodon অর্থাৎ খোদিতদন্ত।

বিরিয়া ও লাচো দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ-স্থান বালি তুষার ও হস্তী দন্তময়। প্রত্যেক ঝড়ে সমুদ্র তরঙ্গাঘাতে যে সকল মামথ হস্তী-দন্ত তীরে নিক্ষিপ্ত হয় তাহা দ্বারা তদ্দেশবাসীদের লভ্যজনক বাণিজ্য চলে। প্রত্যেক গ্রীষ্ম কালে অসংখ্য যাত্রী, নৌকা পথে এই অস্থি-দ্বীপাভি-মুখে গমন করে এবং প্রত্যেক শীতকালে অসংখ্য কুকুর-শকট হস্তী-দন্ত-পূর্ণ করিয়া প্রত্যাগমন করে। এক একটি দন্তের ওজন ৫০ হইতে ১০০ মন পর্য্যন্ত। ৫০০ বৎসর ধরিয়া চীনেরা এই দ্বীপ পুঞ্জ হইতে বানিজ্যের নিমিত্ত হস্তী-দন্ত আহরণ করিতেছে। এবং ১০০ বৎসর ধরিয়া ইহা ইয়োরপে ও অন্যান্য দেশে প্রেরিত হইতেছে তথাপি ইহার এখনো শেষ নাই। এই অপরিমেয় অস্থি-রাশি স্তূপীকৃত হইতে কত অসংখ্য অসংখ্য বৎসরই লাগিয়াছে !

সাইবীরিয়-ভাষা হইতেই এই হস্তীর নাম মামথ হইয়াছে। বিখ্যাত রুসিয়ান পণ্ডিত প্যালাশ যিনি প্রথমে মামথের রীতিমত বর্ণনা করেন তিনি বলেন তাতারেরা পৃথিবীকে মামা কহে, এই মামা হইতে মামথ উৎপন্ন, মামথ অর্থাৎ পৃথিবী-বিবর-বাসী। অন্য মতে, আরবিক মেহিমথ হইতে মামথ উৎপন্ন, মেহিমথ অর্থাৎ অসাধারণ আকার। আশ্চর্য্যের বিষয়, চীনের মধ্যেও এই সকল জন্তু বিবর-বাসী বলিয়া প্রবাদ, চীনে ইহাদের নাম টিয়েনসিউ অর্থাৎ যাহারা মাটীতে লুকায়।

এই সময়ে উৎপন্ন হিমালয়ের নিম্ন স্তরে কয়েকটি কচ্ছপদেহ পাওয়া গিয়াছে তাহার উদর-নিম্নস্থ কঠিনআচ্ছাদনী-অস্থি বার ফুট লম্বা ও ছয় ফুট চওড়া; এবং ইহার পায়ের হাড় গণ্ডারের ন্যায় দৃঢ় ও প্রকাণ্ড।

এই সময়ের নানা প্রকার স্তন্যপায়ী জন্তু-কঙ্কাল ইংলণ্ডের ইয়র্ক সায়ারস্থ বিখ্যাত কার্কডেল গহ্বরে এবং ডিবন সিয়ারে টর্কির নিকটস্থ কেণ্ট গহ্বরে পাওয়া গিয়াছে। এই গহ্বর আবিষ্কৃত কঙ্কাল-রাশি হইতে কত অনুমানই উত্থিত হইয়াছে তাহার ঠিক নাই। সাধারণত এই বিশ্বাস ইহা কোন মাংসাশী পশুর গহ্বর এবং সেই মাংসাশী পশু কর্তৃক আনীত অন্যান্য পশুদের দ্বারা গহ্বর পূর্ণ। কেহ কেহ আবার বলেন রুগ্ন অসামর্থ্য পশুগণ শত্রুর হাত এড়াইতে এই ভয় শূন্য গুহায় আসিয়া মরিত; অপর কেহ বলেন বন্যাতে মৃত পশু কঙ্কাল ভাসিয়া এই গুহায় আসিয়া জমিয়াছে। যে অনুমানটিই সত্য হউক না কেন ইহা নিশ্চয় যে চতুর্থ যুগের প্রারম্ভে এই সকল পশু ইংলণ্ডের অধিবাসী ছিল। গ্রীষ্ম প্রধান আফ্রিকা দেশে এখন যেরূপ বৃহৎ জল হস্তী আছে সেইরূপ জল হস্তী, দ্বি-খড়্গী-গণ্ডার, নানা জাতীয় হরিণ, বৃষ, মহিষ, ঘোড়া, গাধা, ভল্লুক, সিংহ, হায়েনা বিবর, প্রভৃতি যে সকল জন্তুর মধ্যে অধিকাংশই এখন ইংলণ্ডে নাই তাহা তৎকালে ইংলণ্ডের অধিবাসী ছিল। তখন ম্যাক্যাইরডশ্ (Machairodus)

নামে ভল্লুক জাতীয় একরূপ হিংস্রক জন্তু ছিল তাহা সিংহ ব্যাঘ্র হইতেও ভয়ানক। এখন জিজ্ঞাস্য এই ইয়োরোপস্থ চতুর্থ যুগের এই সকল পশু কেমন করিয়া হঠাৎ লোপ পাইল?

কুভিয়ে এবং পুরাতন ভূবেত্তারা বলেন হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা দ্বারা একেবারে এই সমস্ত পুরাতন জন্তু বিনষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিক ভূবেত্তাগণের মতে ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন দ্বারাই এই সকল জাতি বিলুপ্ত হইয়াছে, হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা বশতঃ নহে। ক্রমশ শীতের আধিক্যই এই বিনাশের প্রধান কারণ।

তৃতীয় যুগের প্রারম্ভে ইয়োসিন অন্তর যুগে ইয়োরোপে তাল, নারিকেল ইত্যাদি গ্রীষ্ম দেশীয় বৃক্ষ প্রচুর দেখা যায়। মায়োসিন অন্তর যুগে ইয়োরোপ গ্রীষ্ম প্রধান দেশ থাকিলেও পূর্ব্ববর্ত্তী সময় হইতে এস্থানে শীতের আধিক্য বৃদ্ধি হইয়াছিল; পরে প্লায়োসিন অন্তর-যুগে আরো শীতল হইয়া সেই সময় চতুর্থ যুগের ভাবী শীতের লক্ষণ দেখা দিল। এইরূপে ক্রমশই ইয়োরোপের উত্তাপ হ্রাস হইয়া ভীষণ শীত-প্রভাবে চতুর্থ যুগে ক্রমে হিমশৈলের কার্য্য আরম্ভ হইল।

হিমশৈলের পূর্ব্বে ইয়োরপে যে মহাবন্যা হইয়াছিল, সেই সমুদ্র বন্যায় ধৌত নানা স্থানের ভিন্ন ভিন্ন মৃত্তিকা দ্বারা ইয়োরোপের স্থানে স্থানে যে স্তর সংস্থিতি হইয়াছে সেই স্তর সংস্থিতির পরে ইয়োরোপের উত্তাপ একেবারে কমিয়া একটি ভয়ঙ্কর শীতকাল আসিয়া পড়িল, সেই শীতকালকেই হিমশৈল কাল বলা যায়। এই সময় ব্রিটিশ দ্বীপ পুঞ্জের অধিকাংশ এবং সম্ভবতঃ ইয়োরোপের অন্যান্য দেশও একটি ঘন হিমশৈল আবরনে আবৃত হয়। ইংলণ্ডে ব্রিশটল চ্যানেলের দক্ষিণে একটি ভূখণ্ড এবং টেমস নদীগর্ভ মাত্র তখন জলের উপরিভাগে ছিল। ইংলণ্ডের উত্তরাংশ এবং ব্রিটেনের উচ্চভাগ ও আয়ারলণ্ড এই হিমশৈল চালনে পেষিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। এই সুদূরব্যাপী বন্যা প্রভাবে টেমস নদীর উত্তর দিক যে সেই সময় হইতে ক্রমশ সমুদ্র গ্রস্থ হইতে আরম্ভ হইল ইহার প্রমাণ অনেক পাওয়া যায়। র‍্যামজে প্রমাণ করেন ভীষণ শীতের প্রারম্ভে ইয়োরোপের স্থল ভাগ এখনকার অপেক্ষা অধিক ছিল; তাহার পর, বন্যা আসিয়া ইয়োরোপের অধিকাংশ সমুদ্র মগ্ন করিয়াছিল, পরে আবার তাহা সমুদ্র হইতে উঠিয়া হিমশৈল আবৃত হইল।

আধুনিক কাল।

চতুর্থ যুগের শেষ ভাগ—বর্ত্তমান কাল—তিন ভাগে বিভক্ত। (১) ইয়োরোপের বন্যা, (২) হিমশৈলকাল (৩) মনুষ্যের জন্ম ও আসিয়ার বন্যা।

ইয়োরোপীয় বন্যা।

ইয়োরোপের অনেক স্থানে তৃতীয় যুগেয় স্তরের উপরে নানা জাতীয় মৃত্তিকামিশ্রিত স্তর নির্ম্মিত হইয়াছে। ইয়োরোপ সন্নিহিত ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মৃত্তিকাই

এই স্তরে প্রচুর। ইয়োরোপস্থ পাহাড় নিম্নের ক্ষয়-গ্রস্থ খোদিত ও বিস্তৃত উপত্যকা ভূমি এবং স্থানে স্থানের স্তরীভূত মসৃন গোলাকার কঙ্কর রাশি দেখিলে তাহার উপর অনরবত জল-ঘর্ষণ-কার্য্য লক্ষিত হয়। এই সকল কঙ্কর রাশি প্রবল বন্যা প্রভাবে ধৌত ও স্থান ভ্রষ্ট হইয়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। ইহা দেখিলে মনে হয় সমুদ্রের একটি মহা তরঙ্গ স্থল-পৃষ্ঠে পড়িয়া সমস্ত চুরমার করিয়া দূর দূরান্তরে নিক্ষেপ করিয়াছে। এই ভীষণ বন্যা নিক্ষিপ্ত পদার্থ রাশির স্তরকে বন্যা সম্ভূত স্তর বলা যায়।

সহসা এই ভয়ঙ্কর বন্যা স্রোত আসিয়া ইয়োরোপ আক্রমন করিল কেন? সম্ভবতঃ ইয়োরপের সমুদ্র গর্ভে কিম্বা এই সমুদ্র সন্নিহিত ভূগর্ভের আভ্যন্তরিক অগ্নির কার্য্য বশতঃ কোন ভূখণ্ড উচ্চ হইয়া উঠিবার সময় সমুদ্র-আন্দোলন দ্বারা এই রূপ বন্যার আবির্ভাব হইয়াছিল। এই ভূখণ্ড উঠিবার সময় তরঙ্গিত সমুদ্র জল রাশি ভূ পৃষ্ঠে পড়িয়া দেশ, মহাদেশ, উপত্যকা, ছারখার করিয়া দেয়। অগ্নি-সম্ভূত (volcanic) পর্ব্বত কিম্বা পর্ব্বত মালা যেমন হঠাৎ নির্ম্মিত হয়, এই বন্যা তেমনি সহসা হইয়াছিল; একবার হইয়াই ইহা ক্ষান্ত হয় নাই, এইরূপ বন্যা যে এক সময়ে একের অধিকবার ইয়োরোপ আক্রমন করিয়াছিল এই মহাদেশের অনেক স্থানের স্তর সংস্থিতি তাহার সাক্ষী।

এই স্তর সংস্থিতিই যে ইয়োরপের বন্যার কেবল মাত্র সাক্ষী এমন নহে, স্বস্থান বিচ্যুত আকরিক পদার্থের চাপড়াও এই বন্যার একটি বিশেষ প্রমান।

চতুর্থ যুগের এই বন্যার পূর্ব্বে অন্যান্য যুগে ও যে এইরূপ অনেক বন্যা হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপ হ্রাস বশতঃ ভূগর্ভ শীতল হইয়া হ্রস্বায়তন হইলে ভূপৃষ্ঠ কুঞ্চিত হইয়া সকল যুগেই প্রায় পর্ব্বত ও পর্ব্বত মালা উৎপন্ন হইয়াছে। ঐরূপ পর্ব্বত সৃষ্টি হইবার সময় প্রত্যেকবার ভূগর্ভ আন্দোলন হেতু সমুদ্র উচ্ছ্বাসিত হইয়া বন্যা উৎপন্ন করিয়াছে। কিন্তু চতুর্থ যুগের বন্যার যেরূপ প্রত্যক্ষ স্পষ্ট প্রমান পাওয়া যায় এমন আর কোন যুগের নহে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে চতুর্থ যুগে দুই সময়ে দুইটি বন্যা হয়, প্রথম, ইয়োরপীয় বন্যা, দ্বিতীয়, আসিয়ার বন্যা। ইয়োরপ এক সময়ের মধ্যে দুইবার বন্যাক্রান্ত হয়। নরওয়ের পর্ব্বতমালা সৃষ্ট হইবার সময় ইয়োরপের প্রথম বন্যা আরম্ভ। স্ক্যানডিনেভিয়ায় বন্যা উত্থিত হইয়া সুইডেন নরওয়ে ইয়োরপ-রুসিয়া এবং জার্ম্মানির উত্তরের সমস্ত স্খলিত মৃত্তিকা একত্রে জল-মিশ্রিত হইল।

ভূগর্ভের অগ্নির প্রভাবে এই জল মধ্য দিয়া নরওয়ের পর্ব্বতমালা উঠিতে লাগিল। মেরু সন্নিহিত বন্যাজল রাশি হিম শৈলাকার ধারণ করিল, বন্যা-তরঙ্গ সেই হিমশিলার স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া কর্দ্দম কঙ্কর ইত্যাদির সহিত অন্যত্রে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। সেই হিম শিলার দারুণ আঘাতে

মৃত্তিকা আরো সবলে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে লাগিল।

উত্তর ইয়োরপের সম-ভূমি ও নিম্ন ভূমিতে যেরূপ বিপর্য্যস্ত স্তর সমূহ দেখা যায় তাহাই উত্তর ইয়োরপের এই বন্যার প্রাকৃতিক প্রমাণ। এই লণ্ড ভণ্ড মৃত্তিকা স্তরে (Uustratified Doposits) যে সকল চাপড়া (Block) পাওয়া যায় তাহা সাধারণত বৃহদায়তন। যে বন্যা ভঙ্গ গ্রেনিট চাপড়ার উপর রুসিয়ার সেণ্ট পিটরসবর্গে পিটরের মূর্ত্তি দণ্ডায়মান তাহা অত্যন্ত প্রকাণ্ড।

জর্ম্মনি পোলণ্ড এবং ব্রিটেনের ভিন্ন জাতীয় মৃত্তিকার মধ্যে নরোয়েদেশ উৎপন্ন প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড দেখিয়া বোধ হয় তাহারা নিশ্চয়ই বন্যা দ্বারা আনীত।

উত্তর প্রুসিয়ায় ৬৪০ টন ওজনের একটি এই জাতীয় গ্রেনিট চাপড়া পাওয়া গিয়াছে।

এই সমস্ত প্রকাণ্ড প্রস্তর নরোয়ে হইতে উক্ত সকল দেশে আনিতে কতই নাজানি বলের আবশ্যক হইয়াছিল!

আল্প পর্ব্বত শ্রেণীর কোন কোন অংশ উঠিবার সময় ইয়োরোপের দ্বিতীয় বন্যা হয়। আলপের চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশ যথা, ফ্রান্স, ইটালি, জারমানির উপত্যকা ভূমি এই বন্যা নিক্ষিপ্ত পদার্থ রাশিতে পূর্ণ। পূর্ব্বোক্ত বন্যা হইতে ইহা যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এই পর্ব্বত শ্রেণীর পূর্ব্বাংশে প্রাণী দেহ সঙ্কুল প্রথম যুগের স্তর এবং ওয়োলাইট ক্রিটেসস, এবং তৃতীয় যুগেরও স্তর দেখা যায়—কিন্তু মধ্য আলপে এ সকল কিছুই দেখা যায় না, এস্থানে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইয়োসিন মৃত্তিকার অনেক স্থান রূপান্তরিত দেখিয়া মনে হয় এ সময়ে ক্রমাগত ভূগর্ভ হইতে নূতন নূতন উৎপাৎ বশতঃ নূতন মৃত্তিকা উৎপন্ন হইয়াছে এবং এই উৎপাৎ বশতই ইয়োরোপে বন্যার দ্বিতীয় সংস্করণ।

হিমশৈল কার্য্যকাল।

প্রাণী-জগত যখন উন্নতির শেষ সোপানে উঠিতে যত্নবান তখন সহসা উপরি উপরি পূর্ব্বোক্ত দুই বন্যা দ্বারা সমস্ত ইয়োরোপ জলমগ্ন হইল; সঙ্গে সঙ্গে প্রাণী জগতেরও উন্নতির পদে কণ্টক পড়িল; এই বিপদ না সামলাইতে সামলাইতে আর একটি বিপদ আসিয়া ইয়োরপের পুরাতন প্রাণীদের আর উঠিতে দিল না।

স্কান্ডিনেভিয়া হইতে ভূমধ্যসাগর ও ড্যানুব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে অর্থাৎ মধ্য ও উত্তর ইয়োরপে সহসা একটি অভূতপূর্ব্ব অসাধারণ প্রচণ্ড শীতকাল দেখা দিল, মেরুপ্রদেশের শীত সহসা ইয়োরপে উপস্থিত। ইয়োরোপের গ্রীষ্মদেশীয় সুন্দর বৃক্ষাদি দ্বারা সজ্জিত শ্যামল ক্ষেত্র, যাহাতে আসিয়া ও আফ্রিকার বৃহৎ হস্তী, গণ্ডার, সিংহ, ব্যাঘ্র, অশ্ব প্রভৃতি পশু বিচরণ করিত সেই সকল ক্ষেত্র সহসা দারুণ শীতে হিমশৈলাবৃত হইয়া পড়িল। বহমান নদীর পরিবর্ত্তে জমাট

নীহার রাশি বহিতে লাগিল। বেগে বহমান এইরূপ নীহারনদীর ঘর্ষণে চতুপার্শ্বস্থ মৃত্তিকা কি ভয়ানক রূপে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল তাহা অনুভব করাও দুষ্কর। এই দারুণ শীতের অখণ্ডনীয় কারণ এখন পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হয় নাই।

শীত গ্রীষ্ম ঋতু পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ সূর্য্যোত্তাপ, সেই নিমিত্ত সহসা সূর্য্যের উষ্ণতার হ্রাস না হইলে আর ওরূপ শীত আসিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আমরা যখনকার কথা বলিতেছি, তখন কেবল মাত্র সূর্য্যের উপরেই পৃথিবীর উত্তাপ নির্ভর করিত না, ভূগর্ভ তখনও প্রচুরপরিমাণে পৃথিবীকে উত্তাপ দিত।

তবে ইয়োরোপীয় সমুদ্রের উত্তাপের কারণ ঔপসাগরিক উষ্ণ স্রোত কি হঠাৎ বিমুখে বহমান হইয়া ইয়োরপকে দারুন শীতে মগ্ন করিয়া ছিল? এরূপ অনুমানেরও কোন কারণ নাই।

এই প্রচণ্ড শীতকাল সম্বন্ধে যে জ্যোতিষিক কারণ অনুমানিত হইয়াছে তাহাই কেবল অপেক্ষাকৃত যুক্তিসিদ্ধ।

বর্ত্তমান অবস্থায় পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধে শীতকালের সময় পৃথিবী নিজের অয়নমণ্ডলের যে অংশ সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের সন্নিকটস্থ তথায় উপনীত হয়। সেই হেতু অর্থাৎ পৃথিবীর সূর্য্য সান্নিকট্য হেতু উত্তরার্দ্ধে এখন শীতের প্রাদুর্ভাব কম, শীত কালে যে পরিমানে হিমশিলা জন্মে গ্রীষ্ম কালে তাহার অধিকাংশ দ্রবীভূত হয়। কিন্তু পৃথিবীর অয়নমণ্ডল চিরকাল এক ভাবে নাই। পৃথিবীর এমন একটি মৃদুগতি আছে যাঁহার দ্বারা পৃথিবীর অয়নমণ্ডল অল্পে অল্পে ক্রমশ দিন দিন সরিয়া যাইতেছে। এই গতি হেতু ২৫৮০০ বৎসরে (কাহারো কাহারো মতে ২১০০০ বৎসরে,) পৃথিবীর অয়নমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে ঘুরিয়া যায়, তখন উত্তরার্দ্ধের পরিবর্ত্তে দক্ষিণার্দ্ধ বৎসরের মধ্যে শীতকালে সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিকটে আসে, উত্তরার্দ্ধ বৎসরের মধ্যে শীতকালে সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরে পড়ে। এই২৫৮০০ বৎসরে একবার পৃথিবীর দক্ষিণ একবার পৃথিবীর উত্তর সূর্য্যের সন্নিকটস্থ হয়। ক্রমে আবার অল্পে অল্পে সরিতে থাকে। যে ভাগ শীতকালে সূর্য্য হইতে দূরে থাকে সেইভাগে শীতের ভীষণ প্রভাব বৃদ্ধি ও উত্তাপের হ্রাস হেতু শীতকাল উৎপন্ন সমস্ত হিমশিলা গ্রীষ্মকালে দ্রবীভূত না হইয়া উত্তরোত্তর জমিতে থাকে। এখন পৃথিবীর দক্ষিণার্দ্ধ শীতকালে সূর্য্য হইতে দূরে থাকে বলিয়া, সেখানে শীতের প্রভাব অধিক, কিন্তু উত্তরার্দ্ধ শীতকালে সূর্য্যের নিকটস্থ হয় বলিয়া অপেক্ষাকৃত শীত কম। দক্ষিণে অধিকাংশ স্থান চিরতুষারাবৃত; হিমশৈলের কার্য্য দক্ষিণে অধিক বলবান। সুমেরু পৌছিবার আমাদের আশা আছে, কুমেরু পৌছিবার আশা নাই। পৃথিবীর উপরোক্ত গতি দ্বারা উত্তরার্দ্ধ সূর্য্য হইতে তখন দূরে পড়িয়া ক্রমশঃ ভীষণ শীতাক্রান্ত হইয়াছিল—এই যুক্তি ছাড়া এ সম্বন্ধে আর কোন যুক্তি এখনো পাওয়া যায় নাই।

ইয়োরোপের এই প্রচণ্ড শীতে জীব জগতে বিনাশ আরম্ভ হইল, সমস্ত নদ নদী, হ্রদ সমুদ্র, হিমশৈলাকারে জমাট বাঁধিয়া গেল। মূর্ত্তিমান মৃত্যু সমস্ত ইয়োরোপকে অধিকার করিল। শত শত হস্তী গণ্ডার ইত্যাদি জীব একেবারে যে লোপ পাইল আর ইয়োরপে সে জাতি জন্মাইল না। কতদিন ধরিয়া এই দারুণ শীত ইয়োরোপের অধিকাংশস্থান হিমশৈলাবৃত করিয়া রাখিয়াছিল নির্দ্ধারিত করা অসম্ভব।

ক্রমশঃ

কে জানে কি।

ভাল কি সে বাসে মোরে?—
ভাল সে কি বাসে মোরে?—
ঈষৎ বিষাদ মাখা
মুখেতে সুধীর কথা
ডাগর নয়ন দুটি ক্লান্ত ভাব ভরে।
সবে ফোটা ফুল-বালা
সমীরে করিবে খেলা;
কেন গো?—কিসের এত বিষাদ তাহার?—
হয়ত প্রাণের কাছে
আমারি প্রতিমা আছে,
হয়ত আমারি কথা জাগিছে হৃদয় ভরা—
তাই কি, এমন হবে?
ভাল কি বাসিবে তবে?
বাসিবে কি ভাল তবে—বাসিবেকি ভাল?
হয়ত আপন ফুঁয়ে
পাপড়ি পড়েছে নুয়ে,
হয়তো আপন ছায়া ফেলেছে মনের আলো।
হৃদয় যাহারে চায়
তাহারে নাহিক পায়
তাই বুঝি নম্রমুখী ফুল-কুল-রাণী?
হয় তো গো দুখ নাই,
বিষাদ বুঝিবা তাই
ছায়া প্রায় আসে যায়-কি হোলো কি জানি—
দুখের অভাবে বুঝি দুখী ফুলরাণী।
ভাল কি সে বাসে মোরে?—
হয়ত বাসে না ভাল—
আমার লুকান কথা
জানিয়ে হয়ত ব্যথা
লাগিয়াছে বালিকার কোমল অন্তরে।
তাই বা বিষাদ মাখা
মুখেতে সুধীর কথা
ডাগর নয়ন-দুটি ক্লান্ত ভাব ভরে—
তাই গো বুঝিবা এত বিষাদ বালার—
হয়ত বাসে না ভাল—
তাই কি? বাসে না ভাল?—
কি দিলে জানিতে পারি হৃদয় তাহার।

পারিবারিক দাসত্ব।

সম্প্রতি স্বাধীনতা নামক একটি শব্দ আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু একথাটা আমাদের সাহিত্যের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। এমন নহে যে, স্বাধীনতা বলিয়া একটা ভাব আমাদের হৃদয়ে আগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, পরে আমরা যথা নিয়মে তাহার নামকরণ করিয়াছি; বরঞ্চ স্বাধীনতা বলিয়া একটা নাম আমরা হঠাৎ কুড়াইয়া পাইয়াছি, ও সেই নামটাকে বস্তু মনে করিয়া ষোড়শোপচারে তাহার পূজা করিতেছি। অল্প দিন হইল সংবাদ পত্রে দেখিতেছিলাম যে, দাক্ষিণাত্যের অশিক্ষিত কৃষকদের য়ুরোপ হইতে আনীত কতকগুলি বাষ্পীয় হল যন্ত্র দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা সে গুলি ব্যবহার না করিয়া অলৌকিক দেবতা জ্ঞানে পূজা আরম্ভ করিয়া দিল; আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য কৃষীগণ "স্বাধীনতা" নামক ঐরূপ একটি বাষ্পীয় হল যন্ত্র সহসা পাইয়াছে, কিন্তু না জানে তাহা ব্যবহার করিতে, না তাহা ব্যবহার করিতে অগ্রসর হয়। কেবল দিবানিশি ঐ শব্দটার পূজাই চলিতেছে। কাগজে, পত্রে, পুঁথিতে, সভাস্থলে মহা আড়ম্বর পূর্ব্বক স্বাধীনতা শব্দের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা হইতেছে। "স্বাধীনতা স্বাধীনতা" বলিয়া ঢাকের একটা বোল তৈরি হইয়া গিয়াছে, এবং কবিবর, মহাকবি, ও সুপ্রসিদ্ধ কবি নামক যত বড় বড় সাহিত্য ঢাকীগণ ঐ বোলে বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। শুনিতেছি না কি বড় মিঠা বাজিতেছে, এবং সেই তালে তালে নাকি অধুনাতন বঙ্গ-যুবক-কলের-পুঁতুলগণ (ঈষৎ কল টিপিয়া দিলেই যাঁহারা নাচিয়া উঠেন, এবং নাচা' ব্যতীত যাঁহারা আর কিছু জানেন না) অতিশয় সুদৃশ্য নৃত্য আরম্ভ করিয়াছেন। যাহা যাহা হইতেছে তাহা অতিশয় সুদৃশ্য ও সুশ্রাব্য তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক হৃদয়বান্ ব্যক্তি এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন, যে, স্বাধীনতা শব্দ "তাধিন্‌তা" শব্দের অপভ্রংশ নহে, ঐ শব্দটি লইয়া যে কেবল মাত্র নৃত্যের ও ঢাকের বোল প্রস্তুত হয় তাহা নহে; ঐ হল-যন্ত্র চালনা না করিয়া কেবল মাত্র পূজা করিলে কোন প্রকার ফসলই জন্মাইবার সম্ভাবনা নাই।

স্বাধীনতা ও অধীনতা কাহাকে বলে তাহা বোধ হয় আমরা সকলে ঠিকটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। যে ভাব আমরা ভাল রূপে অনুভব করিতেই পারি না, সে ভাব হৃদয়ঙ্গম করাও বড় সহজ ব্যাপার নহে। সাধারণতঃ আমরা সকলে মনে করি যে, আমরা অধীন, কেননা ইংরাজেরা

আমাদের রাজা, তাহারা আমাদের রাজা না থাকিলেই আমরা স্বাধীন। এরূপ কথা নিতান্তই লঘু। এই কথাটি সর্ব্ব-সাধারণে প্রচলিত থাকাতে ফল হইয়াছে এই যে যাঁহারা দেশ-হিতৈষী বলিয়া পরিচয় দিতে চান, তাঁহারা দেশ-হিতৈষী হইবার একটি সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। সেটি আর কিছু নয়, ইংরাজ জাতিকে যথেচ্ছা গালাগালি দেওয়া! তাঁহারা এই কথা বলেন, যে, আমরা যে পরাধীন ইংরাজ জাতিই তাহার নিমিত্ত সম্পূর্ণ রূপে দায়ী! কাঁঠাল বৃক্ষ যদি তাহার শাখাজাত ফলগুলির উপর মহা রাগ করিয়া বলিয়া উঠে, যে, "আঃ, এই ফলগুলা যদি না থাকিত তবে আমি আম্র বৃক্ষ হইতে পারিতাম," তবে তাহাকে এই বলিয়া বুঝান' যায় যে, তুমি কাঁঠাল বৃক্ষ বলিয়াই তোমাতে কাঁঠাল ফলিয়াছে, তোমার শিকড় হইতে পাতা পর্য্যন্ত কাঁঠাল ফলিবার কারণে পরিপূর্ণ। আমাদের সমাজের শিরায় শিরায় অধীনতার কারণ সঞ্চারিত হইতেছে। ইংরাজেরা আছে, কারণ আমরা অধীন জাতি। ইংরাজ-রাজত্ব কাঁঠাল ফল মাত্র। আমাদের পক্ষে ইহা বড় কম সান্ত্বনার বিষয় নহে যে, আমরা যে পরাধীন, ইংরাজেরাই তাহার কারণ, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে ইহা সত্য নহে। প্রকৃত কথা এই যে, সম্প্রতি আমরা স্বাধীনতা ও অধীনতা নামক দুইটা শব্দ হাতে পাইয়াছি, এবং হঠাৎ-ধনীর ন্যায় তাহার যথেচ্ছা অযথাপ্রয়োগ করিতেছি। যদি স্বাধীনতা কথাটা যথার্থ আমাদের হৃদয়ের কথা হয়, তবে যে, আমরা কতকগুলি অসঙ্গত ব্যবহার করি তাহার অর্থ কে বুঝাইয়া দিবে?

আমরা সংবাদ পত্রে মহা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকি, যে, ইংরাজেরা ভারতবর্ষকে যথেচ্ছা-তন্ত্রে শাসন করিতেছেন। ভারতবর্ষের আইন ভারতবর্ষীয়দের মতামত অপেক্ষা করে না। দুই চারিটি ব্যক্তি মিলিয়া যাহা কিছু নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়, আমরা লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি তাহা চুপচাপ করিয়া পালন করি। ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। ইহা হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে আমরা অধীন জাতি। এবং কেতাবে পড়িয়াছি অধীনতা বড় ভাল দ্রব্য নহে, তাহা যদি হয় তবে দেখিতেছি আমাদের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়! তাহা যদি হয় তবে আমাদের বিলাপ করা নিতান্তই কর্ত্তব্য। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া আমরা আজ কাল যে সকল শূন্যগর্ভ বিলাপ আরম্ভ করিয়াছি, তাহা আমরা কর্ত্তব্য কাজ সমাধা স্বরূপে করিতেছি মাত্র! কিন্তু একথা আমরা কবে বুঝিব যে, যত দিনে না আমাদের হৃদয়ের অস্থিমজ্জাগত দাসত্বের ভাব দূর না হইবে, ও স্বাধীনতা-প্রিয়তার ভাব হৃদয়ের শোণিত স্বরূপে হৃদয়ে না বহমান হইবে ততদিন আমরা দাসই থাকিব। আমরা যে প্রতি পরিবারে এক একটি করিয়া দাসের দল সৃষ্টি করিতেছি! আমরা যে আমাদের সন্তানদের—আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের শৈশব কাল হইতে চব্বিশ ঘণ্টা দাসত্ব শিক্ষা দিতেছি! বড় হইলে

তাহারা যাহাতে এক একটি উপযুক্ত দাস হইতে পারে, তাহার বিহিত বিধান করিয়া দেওয়া হইতেছে; বড় হইলে যাহাতে কথাটি না কহিয়া তাহারা তাহাদের প্রভুদের মার ও গালাগালি গুলি নিঃশেষে হজম করিয়া ফেলিতে পারে, এমন একটি অসাধারণ পরিপাক শক্তি তাহাদের শরীরে জন্মাইয়া দেওয়া হইতেছে! এইরূপে ইহারাও বড় হইলে স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া একটা তুমুল কোলাহল করিতে থাকিবে, অথচ অধীনতাকে আপনার পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহাকে দুধ কলা সেবন করাইবে! প্রাণের মধ্যে অধীনতার আসন ও রসনার উপরে স্বাধীনতার আসন। অমন একটা নর্ত্তনশীল আসনের উপরে স্বাধীনতাকে বসাইয়া আমরা দিবানিশি ঐ শব্দটার নৃত্যই দেখিতেছি। বড় আমোদেই আছি!

বঙ্গদেশের অনেক সৌভাগ্য ফলে আজ কাল দেশে যে সকল মহা মহা জাতীয়-ভাব-গদ্গদ আর্য্য-শোণিত বান্ তেজিয়ান্ দেশহিতৈষীগণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, স্বাধীনতার মন্ত্র যাঁহারা চীৎকার করিয়া জপ করেন, নিজের পরিবারের মধ্যে তাঁহাদের অপেক্ষা যথেচ্ছাচারী শাসনকর্ত্তা হয়ত অতি অল্পই পাইবে। ইহাই এক প্রধান প্রমাণ যে, স্বাধীনতার ভাব তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব নহে।

যাহাদের স্বাভাবিক স্বাধীনতার ভাব আছে, আমাদের দেশের পরিবারের মধ্যে জন্মাইলে রুদ্ধ বায়ুতে তাহাদের হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। বয়স্ক ব্যক্তিরা আজ্ঞা করিবার জন্য সততই উন্মুখ, অবসর পাইলেই হয়। অনেক গুরুজন গুরুজনের আর কোন কর্ত্তব্য সাধন করেন না, কেবল আজ্ঞা করিবার ও মারিবার ধরিবার সময়েই তাঁহারা সহসা গুরুজন হইয়া উঠেন। তাঁহারা "হ্যাঁরে" করিয়া উঠিলেই ছেলে পিলে গুলার মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়ে। এবং তাঁহারা যে তাঁহাদের কনিষ্ঠ সকলের ভীতির পাত্র, ইহাই তাঁহাদের প্রধান আমোদ।

মনুষ্য জাতি স্বভাবতই ক্ষমতার অন্ধ উপাসক। যে পক্ষে ক্ষমতা সেই পক্ষেই আমাদের সমবেদনা, আর অসহায়ের আমরা কেহ নই। এই জন্যই এক জনের হাতে যথেচ্ছা ক্ষমতা থাকিলে অত্যন্ত ভয়ের বিষয়। ব্যবহারের তাহার ন্যায়ান্যায় বিচার করিবার লোক সংসারে পাওয়া যায় না। কাজেই তাহাকে আর বড় একটা ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে হয় না। যাহাদের বিবেচনা করিয়া চলা বিশেষ আবশ্যক, সংসারের গতিকে এমনি হইয়া দাঁড়ায় যে, তাহাদেরই বিবেচনা করিয়া চলিবার কম প্রবর্ত্তনা হয়। এই গুরুজন সম্পর্কেই একবার ভাবিয়া দেখ না। যত আইন, যত বাঁধাবাঁধি, যত কড়াকড় সমস্তই কি কনিষ্ঠদের উপরেই না? কেহ যদি নিতান্ত অসহ্য আঘাত পাইয়া গুরুজনের মুখের উপরে একটা কথা বলে, অমনি কি বড় বড় পক্ক-কেশ মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে না? আর, যদি কোন গুরুজন বিনা কারণে বা সামান্য কারণে বা অন্যায় কারণে

তাহার কনিষ্ঠের উপরে যথেচ্ছা ব্যবহার করে তবে তাহাতে কাহার মাথাব্যাথা হয় বল দেখি? গুরুজন মারুন্, ধরুন্, গালাগালি দিন্, ঘরে বন্ধ করিয়া রাখুন, তাহাতে কাহারো মনোযোগ মাত্র আকর্ষণ করে না, আর কনিষ্ঠ ব্যক্তি যদি তাহার গুরুজনের আদিষ্ট পথের একচুল বামে কি দক্ষিণে হেলিয়াছে, গুরু জনের পান হইতে একতিল চুন খসাইয়াছে, অমনি দশদিক হইতে দশটা যমদূত আসিয়া কেহ তাহার হাত ধরে, কেহ তাহার চুল ধরে, কেহ গালাগালি দেয়, কেহ বক্তৃতা দেয়, কেহ মারে ও তাহার দেহ ও মনকে সর্ব্বতোভাবে ক্ষত বিক্ষত করিয়া তবে নিষ্কৃতি দেয়। সমাজের এ কিরূপ বিচার বল দেখি? যে দুর্ব্বল, যাহার দোষ করিবার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত অল্প, তাহাকেই কথায় কথায় মেয়াদ ফাঁসী ও দ্বীপান্তরে চালান করিয়া দেওয়া হয়, আর যে বলিষ্ঠ, যাহার অন্যায় ব্যবহার করিবার সমূহ ক্ষমতা রহিয়াছে, তাহার কাজ একবার কেহ বিচার করিয়াও দেখে না। যেন ঐ দন্তহীন কোমল শিশুগুলি এক একটি দুর্জ্জয় দৈত্য, উহাদের বশে রাখিতে সমাজের সমস্ত শক্তির আবশ্যক, আর ঐ যমদূতাকার বেত্রহস্ত পাষাণ হৃদয়রা নবনীতে গঠিত কুসুম-সুকুমার, উহাদের জন্য আর সমাজের পরিশ্রম করিতে হইবে না। এই জন্য সকল শাস্ত্রেই লিখিয়াছে যে, গুরুজনের অবাধ্য হওয়া পাপ, কোন শাস্ত্রেই লিখে নাই, কনিষ্ঠদের প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার করা পাপ। কেহই হয়ত স্বীকার করিবেন না (যদি বা মুখে করেন তথাপি কাজে করিবেন না) যে গুরুজনের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা যতখানি পাপ, কনিষ্ঠদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করাও ঠিক ততখানি পাপ। একজন গুরুব্যক্তি তাহার কনিষ্ঠকে অন্যায়রূপে মারিলে যতটুকু পাপে লিপ্ত হন, একজন কনিষ্ঠ ব্যক্তি তাহার গুরুজনকে অন্যায়রূপে মারিলে ঠিক ততটুকু পাপেই লিপ্ত হন, তাহার কিছুমাত্র অধিক নয়। ঈশ্বরের চক্ষে উভয়ই ঠিক সমান। কোন্ ব্যক্তি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারে যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া ঈশ্বর তাহার প্রতি কনিষ্ঠের অপেক্ষা অধিক অন্যায়াচরণ করিবার অধিকার দিয়াছেন! কিন্তু সকলেই যেন মনে মনে সেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই একই কারণ হইতে আমরা অবলাদিগের সামান্য দোষটুকু পর্য্যন্ত বর্দাস্ত করিতে পারি না, অথচ পুরুষদের প্রতিপদেই মার্জ্জনা করিয়া থাকি! যেন সবলেরাই কেবল মাত্র মার্জ্জনার যোগ্য। যেন হীনবল স্ত্রীলোকদিগকে শাসনে রাখিবার জন্য পুরুষের বাহুবলই যথেষ্ট নহে তাহার উপরে ধর্ম্মের বিভীষিকা ও সমস্ত সমাজের নিদারুণতর বিভীষিকার আবশ্যক, আর পুরুষদের জন্য যেন সে সকল কিছুই আবশ্যক নাই। যাহা হউক, ছেলেবেলা হইতেই আমরা কি এইরূপ বলের উপাসনা করিতে শিখিনা? এবং যে শিক্ষা বাল্যকাল হইতে আমাদের হাড়ে হাড়ে

প্রবেশ করে বড় হইলে কি তাহা আমরা দূরে নিক্ষেপ করিতে পারি? সুতরাং যেখানে বাঙ্গালী সেই খানেই পদাঘাত, সেই খানেই গালাগালি, সেই খানেই অপমান, এবং সেই অপমান পদাঘাতবৃষ্টির মধ্যে এই ক্ষীণ-শরীর সুন্দর-বনবাসীদের শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের ন্যায় অবিকৃত মুখশ্রী! ছেলেবেলা হইতে তাহারা পদে পদে শিখিয়াছে যে, গুরু জনেরা মারে, ধরে, যাহা করে তাহার উপরে আর চারা নাই, ইচ্ছা করিলেই সকল করিতে পারেন, এবং সেরূপ ইচ্ছা প্রায়ই করিয়া থাকেন। জন্মগ্রহণ করিয়াই গুরুজনদের নিকট তাহাদের প্রথম শিক্ষা এই যে, "যাহা বলি তাহার উপরে আর কথা নাই!" ভাল করিয়া বলিতে ও বুঝাইয়া বলিতে অনেক বাক্য ব্যয় হয়, অতএব যত অল্প পরিশ্রমে ও যত অল্প কথায় একটা আজ্ঞা দেওয়া যাইবে তাহা দেওয়া হইবে, ও আজ্ঞা লইয়া যত কম আন্দোলন করিয়া যত শীঘ্র পালন করা হইবে ততই ভাল! দাদা আসিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন "কি কর্‌চিস শুতে যা।" যে ছেলে বলে "কেন দাদা এখনো ত সন্ধ্যা হয় নি" তাহার কিছু হইবে না, যে ছেলে বলে "যে আজ্ঞা দাদা মহাশয়" তাহার তুল্য ছেলে হয় না!

ছেলে বেলায় যে আমরা শিক্ষা পাই যে, গুরুজনদের ভক্তি করা উচিত, তাহার অর্থ কি? না গুরুজনদের ভয় করা উচিত। কারণ, ভক্তির ভাব বালকদের নহে। তাহাদের নিকট সকলই সমান। তাহাদের হৃদয়ে কেবল অনুরাগ ও বিরাগের ভাব জন্মে মাত্র তাহারা কাহারো অনুরক্ত হয়, কাহারো হয় না, আবার কাহারো প্রতি তাহাদের স্বতঃই বিরাগ জন্মে। তাহাদের যখন ভৎর্সনা করিয়া বলা হয় "গুরুজন ব'লচেন শুন্‌চিস্‌নে!" তখন তাহারা এই বুঝে, যে, না শুনিলে ভয়ের কারণ আছে। না শুনিলে তাঁহাদের এমন ক্ষমতা আছে, যে শুনিতে বাধ্য করাইতে পারেন। অতএব গুরুজনদের ভক্তি করিবে, অর্থাৎ ভয় করিবে; কেন ভয় করিবে? না তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা বলিষ্ঠ, তাঁহাদের সঙ্গে আমরা কোন মতে পারিয়া উঠি না। এই জন্যই, যখনি ছেলেরা দশজন সমবয়স্কদের লইয়া মনের আমোদে খেলা করিতেছে, এবং যখনি গুরুজন বলিয়া উঠিয়াছেন "কী তোরা গোলমাল কর্‌চিস।" তখনি তাহারা তৎক্ষণাৎ থামিয়া যায়। বেশ বুঝিতে পারে যে, গুরুজন যে, তাহাদের হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়া ঐ আজ্ঞাটি করিলেন তাহা নহে, তবে কেন তাহারা স্তব্ধ হইয়া গেল? না যিনি আজ্ঞা দিলেন তিনি তাহাদের অপেক্ষা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি! আমার বল আছে অতএব তুই আজ্ঞা পালন কর এই ভাব ছেলেদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া, তাহাদের চখের সামনে দিনরাত্রি একটা অদৃশ্য বেত্র নাচান,' এইরূপ একটা ভয়ের ভাবে, একটা অবনতির ভাবে কোমল হৃদয় দীক্ষিত করা কি স্বাধীনতাপ্রিয় সহৃদয় গুরুজনের কাজ?

ভক্তির ভাব ভাল, কিন্তু ভক্তির অপেক্ষা অনুরাগের ভাব আরো ভাল; কারণ, ভক্তিতে অভিভূত করিয়া ফেলে আর অনুরাগে আকর্ষণ করিয়া আনে। যাহার হৃদয় যত প্রশস্ত, তাহার অনুরাগ ততই অধিক। পিতা ত পিতা, সমস্ত জগতের পিতাকে যাঁহারা সখা বলিয়া দেখেন তাঁহারা কে? না, তাঁহারা ভক্তদের অপেক্ষা অধিক ভক্ত! তাঁহারা ঈশ্বরের এত কাছে থাকেন যে, ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদের সখ্যতা জন্মিয়া যায়। কত শত কালীভক্ত আছে, কিন্তু রামপ্রসাদের মত কয় জন ভক্ত দেখা যায়! অন্য ভক্তেরা শত হস্ত দূরে থাকিয়া তটস্থ হইয়া কালীকে প্রণাম করে; কিন্তু রামপ্রসাদ যে কালীর কোলে মাথা রাখিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহিয়াছেন, রাগ করিয়াছেন, অভিমান করিয়াছেন! হাফেজের ন্যায় ঈশ্বর-ভক্ত কয়জন পাওয়া যায়, কিন্তু দেখ দেখি, হাফেজ কি ভাবে ঈশ্বরের সহিত কথোপকথন করেন! হৃদয়ের প্রধান শিক্ষা অনুরাগ শিক্ষা, ভক্তি শিক্ষা তদপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা। যে হৃদয় যত উদার সে হৃদয় ততই অন্য হৃদয়ের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইতে সমর্থ হয়, এবং যতই নিকটবর্ত্তী হয়, ততই ভক্তি অপেক্ষা অনুরাগ করিতে শিখে। পিতার প্রতি পুত্রের কি ভাব থাকা ভাল? না অভক্তির অপেক্ষা ভক্তি থাকা ভাল, আবার ভক্তি অপেক্ষা অনুরাগ থাকা আরো ভাল। সেই পুত্রই সৎপুত্র যে পিতাকে সখা বলিয়া জানে। কর্ত্তব্যের সহিত প্রিয়কার্য্যের যত খানি প্রভেদ ভক্তির সহিত অনুরাগের ঠিক ততখানি প্রভেদ। কর্ত্তব্যজ্ঞান যেমন আমাদের হৃদয়ের দূর সম্পর্কীয় অথচ আত্মীয়, ভক্তি-ভাবও তেমনি আমাদের হৃদয়ের দূর-সম্পর্কীয় অথচ আত্মীয়। ভক্তিভাজন ব্যক্তি আমাদের দূরের লোক অথচ নিজের লোক। আমি যদি জানি যে একজন আত্মীয় নিয়তই আমার শুভাকাঙ্খা করেন, বাল্যকালের বিঘ্ন-সঙ্কুল পথে আমার হাতে ধরিয়া যৌবন কালে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, আমার সুখ দুঃখের সহিত যাঁহার সুখ দুঃখ অনেকটা জড়িত, তাঁহাকে আমার নিতান্ত নিকটের ব্যক্তি মনে না যদি করি তবে সে একটা কৃত্রিম প্রথার গুণে হইয়াছে বলিতে হইবে। মায়ের সহিত পিতার সম্পর্কগত প্রভেদ কিছু অধিক নহে, সমানই বলিতে হইবে। পিতা যদি ভক্তিভাজন হন তবে মাতাও ভক্তিভাজন হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধারণতঃ কি দেখা যায়? পিতার প্রতি পুত্রের যে ভাব মাতার প্রতি কি সেই ভাব? আমি ত বলি মাকে যে ছেলে শুদ্ধ কেবল ভক্তি করে সে মায়ের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে। মায়ের সহিত আমাদের অনুরাগের সম্পর্ক। মায়ের এমন একটি গুণ আছে, যাহাতে তাঁহাকে আমরা অনুরাগ না করিয়া থাকিতে পারি না। সে গুণটি কি? না, তিনি আমাদের মনের ভাবগুলি বিশেষরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন, আমাদের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সমবেদনা আছে, তিনি কখনো জানিয়া শুনিয়া

আমাদের হৃদয়ে আঘাত দিতে পারেন না, তিনি কখনো আমাদের আজ্ঞা দিতে চাহেন না, তিনি অনুরোধ করেন, বুঝাইয়া বলেন, আমরা একটা ভাল কাজে বিরত হইলে তিনি সাধ্য সাধনা করেন। এই জন্য মায়ের প্রতি আমাদের যে একটি আমরণ-স্থায়ী মর্ম্মগত ভালবাসা জন্মে, তাহা আমাদের হৃদয়ের একটি শিক্ষা। যে ব্যক্তি শৈশবকাল হইতে মাতৃ স্নেহে বঞ্চিত হইয়াছে সে একটি শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। নিস্বার্থ ভালবাসা পাওয়া নিস্বার্থপরতা শিক্ষা করিবার প্রধান উপায়। মনে কর, এক জন বালক তাহার সঙ্গীদের লইয়া খেলা করিতেছে, গোল করিতেছে, সেই সময়ে আসিয়া একটি গুরুজন তাহাকে খুব একটা চড় কসাইয়া দিল, ইহাতে তাহাকে স্বার্থ ত্যাগের শিক্ষা দেওয়া হয় না। পরের সুখের প্রতি মনোযোগ দেওয়া শিক্ষা ঐ এক চড়েই হয় না। আমি নিজের সুখের জন্যে আর এক জনের সুখের হানি করিলাম, এবং তাহার উপরে একটা চড় কসাইলাম, ইহাতে তাহাকে কি শিক্ষা দেওয়া হইল? একটা কাজ আপাততঃ বন্ধ করিয়া দেওয়া এক, আর তাহার কারণ উঠাইয়া দেওয়া এক স্বতন্ত্র। প্রতিকাজে একটা কান ধরিবার জন্য একটা হাত নিযুক্ত রাখা, সে কানের পক্ষে ও সে হাতের পক্ষে উভয়ের পক্ষেই খারাপ। যে শাসন করে তাহার চরিত্রেও কুফল জন্মে আর যে শাসিত হয় তাহার চরিত্রেও কুফল জন্মে। শাসনপ্রিয়তার ভাব বর্ব্বর ভাব, সে ভাব যত দমন করা যায় ততই ভাল। আর যে ব্যক্তি শাসনে অভ্যস্ত হইয়া যায় তাহার পক্ষেও বড় শুভ নহে।

আমাদের পরিবারের মূলগত ভাবটা কি? না, শাসনকারী ও শাসিতের সম্পর্ক, প্রভু ও অধীনের সম্পর্ক, গুরু ও কনিষ্ঠের সম্পর্ক। আর কোন সম্পর্ক নাই। সম্মান ও প্রসাদ ইহাই আমাদের পরিবারের প্রাণ! এমন কি স্বামীর প্রতিও ভক্তি করা আমাদের শাস্ত্রের বিধান। স্বামীর আদেশ পালন করা পুণ্য। সেই সুগৃহিনী যাহার পতিভক্তি আছে! যাহার প্রতি স্বতঃই ভালবাসা ধাবিত হয় এমন যে স্বামী, তাহার কথা শুনিবার জন্য কি ভক্তির আবশ্যক করে? স্বামী ভক্তিভাজন অতএব ইহাঁর কথা পালন করিব, ইহা কি স্ত্রীর মুখে শোভা পায়? ভক্তির স্থলে স্বার্থত্যাগ একটা কর্ত্তব্য কার্য্য, অনুরাগের স্থলে স্বার্থত্যাগ একটা প্রিয় কার্য্য। অনুরাগে স্বার্থবিসর্জ্জন দিতেছি বলিয়া মনেই হয় না। অনুরাগের নিশ্বাস প্রশ্বাস স্বার্থ বিসর্জ্জন দেওয়া। লোক মুখে শুনা গিয়াছে অনেক স্ত্রী প্রাতঃকালে উঠিয়া স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করে! এমন হাস্যজনক কৃত্রিম অভিনয় ত আর দুটি নাই! কিন্তু এ ভাবটি আমাদের পরিবারের ভাব। আমরা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছি যে, ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তি আর নাই। ভক্তি ভাব পরিবার হইতে নির্ব্বাসন করিয়া দেওয়া আমার মত নহে ও তাহা দেওয়াও বড়

সহজ নহে, আমার মত এই যে ভক্তি ব্যতীত অন্য নানা প্রকার স্বাভাবিক মনোবৃত্তি আছে, সে গুলিকে কৃত্রিম শিক্ষা দ্বারা দমন করিবার আবশ্যক নাই। ভাইয়ে ভাইয়ে সমান ভাব, সখাতার ভাব, স্ত্রী পুরুষে সমান ভাব, প্রেমের ভাব, পিতা পুত্রে অনুরাগের ভাব, এবং তাহার সহিত শ্রদ্ধার ভাব মিশ্রিত,(ভক্তির ভাব সর্ব্বত্র নহে) এই ত স্বাভাবিক। শ্রদ্ধার ভাব, অর্থাৎ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, চরণ ধূলি লইয়া পূজা করিবার ভাব নহে, সসম্ভ্রমে দশ হাত তফাতে দাঁড়াইবার ভাব নহে, কোন কথা কহিলে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে বা তাহার উপরে তোমার মত ব্যক্ত করিতে নিতান্ত সঙ্কোচের ভাব নহে। এ ভাব শোভা পায় রাজার সম্মুখে, যাঁহার সহিত তোমার রক্তের সম্পর্ক নাই, যাঁহার প্রতি তোমার নাড়ীর টান নাই, যিনি তোমার কোন প্রকার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন কি না তোমার সন্দেহ আছে। পিতার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব কিরূপ? না, তোমার পিতার প্রতি তোমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, তিনি তোমার শুভাকাঙ্খী, জান' যে, তিনি কখন' কুপরামর্শ দিবেন না, জান' যে, তোমার অপেক্ষা তাঁহার অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে, বিপদে আপদে পড়িলে সকলকে ফেলিয়া তাঁহার পরামর্শ লইতে মন যায় এমন একটা আস্থা আছে, তাঁহার সহিত মতামত আলোচনা করিতে ইচ্ছা করে, এই পর্য্যন্ত; একেবারে চক্ষু-কর্ণনাসাবরোধক অন্ধ নির্ভর নহে। আমি নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াও এক-জনকে শ্রদ্ধা করিতে পারি, কিন্তু আমরা যাহাকে ভক্তি বলি, তাহার কাছে আমাদের আর স্বাধীনতা থাকে না। শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি উপদেশ দেন, পরামর্শ দেন, বুঝাইয়া বলেন, মীমাংসা করিয়া দেন, আদেশ দেন না, শাস্তি দেন না। আদেশ ও শাস্তি বিচারালয়ের ভাব, পরিবারের ভাব নহে। উপদেশ, অনুরোধ ও অভিমান আত্মীয় সমাজের ভাব। এ ভাব যদি চলিয়া যায় ও পূর্ব্বোক্ত ভাব পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করে তবে সে পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে শত হস্ত ব্যবধান পড়িয়া যায়, তবে আত্মীয়েরা পর হইয়া, দূরবর্ত্তী হইয়া একত্রে বাস করে মাত্র। সে রূপ পরিবারে ভয়ের ও শাসনের রাজত্ব! দৈবাৎ যদি ভয়টার রাজ্যচ্যুতি হয় (কর্ত্তা ব্যক্তির মৃত্যুতে যেমন প্রায়ই হইয়া থাকে) তবে আত্মীয়দের মধ্যে কাক চিলের সম্পর্ক বাধিয়া যায়। আর কোন সম্পর্ক থাকে না।

আমাদের বঙ্গ সমাজের মধ্যে এই ভয়ের এমন একাধিপত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে, যেখানে ভয় সেই খানে কাজ যে খানে ভয় নাই সেখানে কাজ নাই। এক জন নবাগত ইংরাজ তাঁহার এক বাঙ্গালী বন্ধুর সহিত রেলোয়েতে ভ্রমন করিতেছিলেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল তথাপি গাড়িতে আলো পাইলেন না, অতি নম্রভাবে তিনি ষ্টেষনের একজন ভদ্র (!) বাঙ্গালী কর্ম্মচারীকে কহিলেন, "অনুগ্রহ পূর্ব্বক একটা আলো আনাইয়া দিন, নহিলে বড়

অসুবিধা হইতেছে ;" কর্ম্মচারীটি চলিয়া গেল। অমনি ইংরাজটির বাঙ্গালী বন্ধু কহিলেন "আপনি বড় ভাল কাজ করিলেন না, অমন করিয়া বলিলে বাঙ্গালীদের দেশে কখন আলো পাওয়া যায় না ; যদি আপনি তেরিয়া হইয়া বলিতেন, 'এখনো আলো পাইলাম না, ইহার অর্থ কি" তাহা হইলে আলো পাইবার একটা সম্ভাবনা থাকিত।" আমি সেই বাঙ্গালীটির কথা শুনিয়া নিতান্ত লজ্জা বোধ করিতে লাগিলাম। কিন্তু দুঃখের কথা বলিব কি, কথাটা সত্য হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে সে ইংরাজটি যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া আলো আনাইলেন। এরূপ আরো সহস্র ঘটনা হয়ত আমাদের পাঠকেরা অবগত আছেন। অনেক বাঙ্গালী রেলোয়েতে যাইতে হইলে কোট্ হ্যাট্ পরেন ও গলা বাঁকাইয়া কথা কহেন, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন যে, বাঙ্গালী স্টেষণ কর্ম্মচারীদের জন্য দায়ে পড়িয়া তাঁহারা এই উপায় অবলম্বন করেন। ইঙ্গবঙ্গেরা বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে যে কুণ্ঠিত হন তাহার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহারা জানেন যে, বাঙ্গালীদের বাঙ্গালীরা মানে না। তাহারা বলের দাস। এক জন ভৃত্য তাহার কর্ত্তব্য কাজে শৈথিল্য করিতেছে তাহাকে দুই চড় কসাইলে সে সিধা হয়। ভয় না থাকিলে সে হয়ত কাজ করিবেই না। অতএব দেখা যাইতেছে ভয়ের শাসনে কত কাজের ক্ষতি হয়। তাহাতে আপাততঃ একটু সুবিধা আছে। একটা চাবুক কসাইলে তৎক্ষণাৎ একটা কাজ সমাধা হয়, কিন্তু সেই চাবুকের কাজ অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। ছেলেবেলা হইতে ভয়ের শাসনে থাকিয়া ভয়টাকেই আমরা প্রভু, রাজা বলিয়া বরণ করিয়াছি, সে ব্যতীত আর কাহারো কথা আমরা বড় একটা খেয়াল করি না। স্বাধীনতা শিক্ষার প্রণালী এইরূপ নাকি!

যদি স্বজাতিকে স্বাধীনতা প্রিয় করিয়া তুলিতে চাও, তবে সভা ডাকিয়া, গলা ভাঙিয়া, করতালি দিয়া একটা হট্ট গোল করিবার ত আমি তেমন বিশেষ আবশ্যক দেখি না। তাহার প্রধান উপায়, প্রতি ক্ষুদ্র বিষয়ে স্বাধীনতা চর্চ্চা করা। জাতির মধ্যে স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি ও পরিবারের মধ্যে অধীনতার শৃঙ্খল ইহা বোধ করি কোন সমাজে দেখা যায় না। প্রতি পরিবারেই যদি কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাদের ভ্রাতাদের, পুত্রদের, ভৃত্যদের স্বাধীনতা অপহরণ না করেন, পরিবারের মধ্যে যদি কতকগুলি কৃত্রিম-প্রথার অষ্ট-পৃষ্ঠ-বন্ধন না থাকে, তবেই আমাদের কিছু আশা থাকে। যাঁহারা স্ত্রীকে শাসন করেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের ও সন্তানদের প্রহার করেন, ভৃত্যদিগকে নিতান্ত নীচ জনোচিত গালাগালি দেন, তাঁহারা জাতীয় স্বাধীনতার কথা যত কম ক'ন ততই ভাল। বোধ করি তাঁহারা চাকর বাকর ছেলে পিলে গুলাকে মারিয়া ধরিয়া, গালাগালি দিয়া বীর রসের চর্চ্চা করিয়া থাকেন। এই মহাবীর বৃন্দ, এই পারিবারিক তৈমুর লঙ্গ, জঙ্গিস্ খাঁ

গণ যথেচ্ছাচারের বিষয় যতই বলেন, আর স্বাধীনতার কথায় যত কম লিপ্ত থাকেন ততই তাঁহারা শোভা পান। তাঁহাদের আস্ফালনের প্রবৃত্তিটা কমিয়া গেলেই দেশের হাড় যুড়ায়।

আমাদের পরিবারের মধ্যে একটা স্বাধীন স্ফূর্ত্তি নাই বলিয়া সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই বড় আক্ষেপ করিয়া থাকেন। আমোদের জন্য বিরামের জন্য আমাদের অন্যত্র যাইতে হয়। পরিবারের সকলে মিলিয়া আমোদ আহ্লাদ করিবার শত সহস্র বাধা বর্ত্তমান। ইনি শ্বশুর, উনি ভাসুর, ইনি দাদা, উনি ছোট ভাই, ইনি বড়, উনি ছোট ইত্যাদি কত যে সাত পাঁচ ভাবিবার আছে তাহার আর সংখ্যা নাই। লাভের হইতে হয় এই যে, আত্ম-বিনোদনের জন্য পরের সহায়তা আবশ্যক করে। আমাদের পরিবার আমাদের আমোদের স্থান নহে। (আমোদ বলিতে যাঁহারা দূষনীয় কিছু বুঝেন, তাঁহাদের কল্পনা নিতান্তই বিকৃত।) ইহাকে ছুঁইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, উহার সহিত কথা কহিলে, এমন কি উহার নিকট মুখ দেখাইলে বেহায়া বলিয়া বিষম অখ্যাতি হয়; যেদিন কোন গুরুজন বাড়ির বধুর হাসির স্বর শুনিতে পান, সে দিন সে বালিকা বেচারীর কপালে অনেক দুঃখ থাকে; দিনের বেলায় স্বামী স্ত্রীতে দেখাশুনা কথা বার্ত্তা হইলে পাড়ায় লোকের কাছে তাহাদের মুখ দেখাইবার যো থাকে না। নিজের ঘরেই যত বাঁধা বাঁধি, যত শাসন, যত আইন কানুন, আর বন্ধন মুক্ত স্বাধীন ব্যবহার কি পরের সঙ্গেই! পরিবারের মধ্যেই কি যত ঢাকাঢাকি, লুকাচুরি, ত্রস্তভাব! ইহার অপেক্ষা অস্বাভাবিক কিছু কল্পনা করা যায় না। আধুনিক যে সকল শিক্ষিত পরিবারে এই সকল কৃত্রিম বন্ধন সমূহ দূরীভূত হইয়াছে, আমোদের নিমিত্ত সে পরিবার ভুক্ত কাহাকেও পরের নিকট ভিক্ষা করিতে হয় না। এই সকল বন্ধন-মুক্ত পরিরারে যে কেহ প্রবেশ করেন তিনিই চমৎকৃত হইয়া যান। বুঝিতে পারেন যে, আপনার লোক আপনার হইলে পরের আবশ্যক অনেক কমিয়া যায়।

যাহারা আপনার কনিষ্ঠদের নিজের সম্পত্তি মনে করে, তাহারা যে, নিজের ভৃত্যদেরও তাহাই মনে করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে। লেখক ইংলণ্ড হইতে চিঠিতে লিখিয়াছিলেন যে, "এখানে চাকরকে গালাগালি দেওয়া ও মারাও যা আর একজন বাহিরের লোককে গালাগালি দেওয়া ও মারাও তাই। আমাদের দেশের মত চাকরদের বেঁচে থাকা ছাড়া অন্য সমস্ত অধিকার মনিবদের হাতে নেই। চাকর কোন কাজ ক'রে দিলে 'Thank you' ও তা'কে কিছু আজ্ঞা করবার সময় 'Please' বলা আবশ্যক।" ইহাতে কেহ কেহ এইরূপ বলিয়াছেন,—"চাকরদের সঙ্গে পদে পদে সম্মান সূচক ব্যবহার করা আষ্টে পৃষ্ঠে কাষ্ঠ সভ্যতার ভার বহন করা আমাদের দেশের সহজ সভ্য লোকদের পোষায় না। এ সকল কৃত্রিম সভ্যতার আমদানী যত কম হয় ততই ভাল; মনে কর ছেলের

জ্বর হ'য়েছে আর যেই তার বাপ একটা হাতপাখা তুলে নিয়ে তার গায়ে বাতাস দিতে লাগল, অমনি ছেলে ব'লে উঠ্‌লেন, 'Thank you বাবা!' এরূপ কাষ্ঠ সভ্যতা কাষ্ঠ হৃদয়ের উপরেই গুণ করিতে পারে, সহজ হৃদয়কে আগুণ করিয়া তোলে!" জাতীয় ভাব এমন একটি যুক্তি বিহীন অন্ধ বধির ভাব যে, সে নিতান্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেও অযৌক্তিক করিয়া তুলে। আমাদের দেশে একটা সাধারণ সংস্কার আছে, যে, ইংরাজদের সমস্ত আচার ব্যবহার কাষ্ঠসভ্যতা প্রসূত, এরূপ সংস্কার সাধারণ লোকদের মধ্যেই বদ্ধ থাকা স্বাভাবিক, যাহারা কিছু বিবেচনা করেনা, প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, কেবল তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করিতেই জানে তাহাদেরই মুখে এরূপ কথা শোভা পায়, কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি অত শীঘ্র একটা সংস্কারে উপনীত হন না। Please কথা বলিবার ভাবটার মূল যে রসনায় নহে হৃদয়ে, ইহা মনে করিতে আপত্তিটা কি? আমার যে ভাবটি নাই, আর এক ব্যক্তির সেই ভাব থাকিলেই তাহাকে মৌখিক বলিয়া মনে করা নিতান্ত অন্যায়। তাহা হইলে যত প্রকার অনুষ্ঠান আছে সমস্ত মৌখিক; জাতীয় হৃদয়ের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই বলিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা যে পিতাকে প্রণাম করি, তাহা কৃত্রিম কাষ্ঠসভ্যতার প্রথা, তাহা আন্তরিক নহে। আমি ত বলি, এইরূপ মনে করা উচিত যে, ইংরাজ জাতির হৃদয়গত এমন একটি ভাব আছে. যাহাতে করিয়া তাহাকে স্বতঃই Please বলায়। সে ভাবটি কি? না তাহাদের স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য ভাব। তাহারা সকলেই নিজে নিজেই নিজের কায করিতে চায়, ও তাহাই করে, এই নিমিত্ত অপরে যতটুকুই কাজ করিয়া দেয়, তাহা যতই সামান্য হউক্ না কেন, Thank you কথা আপনি বাহির হইয়া পড়ে, এবং অপরকে সামান্য কাজটুকু করিতে বাধ্য করিতে হইলেও তাহারা Please না বলিয়া থাকিতে পারে না। আমরা যেমন অনেক সামান্য কাজে পরের উপর নির্ভর করি, এবং পরের নিকটে অনেকটা আশা করি, আমাদের অত সহজে Please ও Thank you বাহির হয় না। এমন হইতে পারে যে, প্রতি বারেই যখন তাহারা Please ও Thank you বলে তখন তাহাদের হৃদয়ে ঐরূপ ভাব উদয় হয় না, কিন্তু ঐ ভাব হইতে যে এই প্রথার উৎপত্তি তাহা কি কেহই অস্বীকার করিবেন? আমরা যখন প্রতি অবসরেই প্রত্যেক গুরুজনকে প্রণাম করি তখন যে ভক্তির উচ্ছ্বাস হইতে করি, তাহা নহে, অনেক সময়ে প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া করি, কিন্তু ইহা অসঙ্কোচে বলা যায় যে, গুরুভক্তি আমাদের দেশে বিশেষ প্রচলিত।

জাতীয় ভাব আমাদের কি অন্ধ করিয়াই তুলে! মনে কর আমাদের দেশে যদি কবরের প্রথা প্রচলিত থাকিত, ও ইংলণ্ডে শবদাহ প্রচলিত থাকিত তবে আমরা (অর্থাৎ জাতীয় ভাবোন্মত্ত পুরুষেরা) কি

বলিতাম? আর আজকালই বা কি বলি, একবার কল্পনা করিয়া দেখা যাউক! আজ কাল আমরা বলি, "দেখ দেখি শবদাহে কত সুবিধা! স্থান সংক্ষেপ, ব্যয় সংক্ষেপ, স্বাস্থ্যরক্ষা, ইত্যাদি। এমন কি আমাদের দেখা দেখি দেখ' আজকাল য়ুরোপেও এই প্রথা প্রচলিত হইতেছে!" আর আমাদের দেশে যদি কবর প্রথা প্রচলিত থাকিত, তবে আমরাই বলিতাম, "যে দেশে কাষ্ঠ সভ্যতা প্রচলিত সেই দেশেই শবদাহ শোভা পায়! সুবিধাই কি সর্ব্বস্ব হইল, আর হৃদয় কি কিছুই নহে? যে দেহে সামান্য আঘাত মাত্র দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছি, যে দেহের স্পর্শে প্রভূত আনন্দ লাভ করিয়াছি, আজ তাহা কি না অকাতরে দগ্ধ করিলাম? কি জন্য? না, স্থান সংক্ষেপের জন্য, ব্যয় সংক্ষেপের জন্য, সুবিধার জন্য? সহৃদ-সভ্য দেশের কি এই প্রথা? আবার নিজ হস্তে প্রিয়জনের মুখাগ্নি করা কি সহৃদয় জাতির কাজ!" জাতীয় ভাব এইরূপ একটা অদূর-দৃষ্টি, যুক্তিহীন অথচ গোঁ-বিশিষ্ট ভাব। উহা দ্বারা অতিমাত্র বিচলিত হওয়া সাধারণ লোকদের কাজ, চিন্তাশীল লোকদের নহে!

উপরের প্রস্তাব উপলক্ষে সম্পাদকের মন্তব্য।

পূর্ব্ব কালে চিকিৎসকেরা পুঁথির বচন অভ্রান্ত মনে করিয়া রোগ কেবল নয় রোগের আধার পর্য্যন্ত—রোগী পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে ত্রুটি করিতেন না, লোকের যখন চক্ষু ফুটিতে লাগিল তখন হাতুড়িয়ার দল ক্রমে ক্রমে পসার করিতে আরম্ভ করিল; অব্যর্থ ঔষধির বিজ্ঞাপন সংবাদ-পত্রের আপাদ মস্তক জুড়িয়া আশ্বাস বাক্যের ঘটায় রোগীর অর্দ্ধেক রোগ নিবারণ করিতে লাগিল,—উঁহারা ইঁহাদিগকে হাতুড়িয়া—ইঁহারা উঁহাদিগকে গোবৈদ্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে লাগিলেন, কিন্তু জন-সাধারণের রোগ উড়াইয়া দেওয়া তেমন সহজ ব্যাপার নহে। সমাজ-সংক্রান্ত রোগেরও ঐরূপ দুই দল চিকিৎসক দেখিতে পাওয়া যায়,—এক দল চিকিৎসক পুরাতন রীতি নীতিকে অব্যর্থ ঔষধি মনে করেন আর এক দল আপনাদের নব নব সিদ্ধান্তকে অব্যর্থ মহৌষধি মনে করেন। ফরাসীস্ বিদ্রোহে দুই দলেরই বিশিষ্টরূপে বল-পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে কিন্তু এখনো তাহার জের চলিতেছে,—তাহার সাক্ষী—সম্প্রতি হাতুড়িয়ার হাতে পড়িয়া রুষিয়াকে পতিহীনা হইতে হইয়াছে। দুই দলকেই লক্ষ্য করিয়া বলা যাইতে পারে সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং। বর্ত্তমান প্রস্তাব উপলক্ষে আমরা তাহাই বলিতে বাধ্য হইতেছি।

পারিবারিক দাসত্ব কথাটাই আমাদের কেমন কেমন ঠেকে,—তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া পারিবারিক বন্ধন কথাটাই আমাদের মনের সমক্ষে বল পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হয়,—কিন্তু তাহা বলিয়া বলকে প্রশ্রয় দেওয়া আমাদের অভিপ্রায় নহে। দুই কথাকেই যুক্তির তুলাদণ্ডে তৌল করিয়া যাহা দাঁড়াইবে তাহাই আমরা শিরোধার্য্য

করিতে প্রস্তুত। দাসত্ব শব্দের ভাবটা কিছু গোলমেলে; ও কথা সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে;—ভূতপূর্ব্ব আমেরিকার প্রভুদের নিকট কাফ্রীদের আজ্ঞাধীনতাকে যেরূপ দাসত্ব বলিতে পারা যায়, সেনাপতির নিকট সৈন্যদিগের আজ্ঞাধীনতাকে সেরূপ দাসত্ব বলিতে পারা যায় কি না? প্রভুর নিকট এক জন কিঙ্করের আজ্ঞাকারিতাকে যেমন দাসত্ব বলিতে পারা যায়—পিতামাতার নিকট পুত্রের আজ্ঞাকারিতাকে সেরূপ দাসত্ব বলিতে পারা যায় কি না? দাসত্ব কথাটা শুনিলেই মনে হয় যে তাহার সহিত কাপুরুষত্ব জড়ানো আছে, কিন্তু ছোট ভাই যদি দাদা যাহা বলে তাহা শুনে তাহা হইলে তাহাকে কি কাপুরুষ বলিয়া মনে হয়—কিংবা সৈন্য যদি সেনাপতির কথা শুনে তাহাকে কি কাপুরুষ বলিয়া মনে হয়, তাহা দূরে থাকুক রাম অপেক্ষা লক্ষ্মণকে আরো বেশী বীর পুরুষ বলিয়া মনে হয়। লেখকের লেখার ধরণ দেখিলে হঠাৎ লোকের যাহা মনে হইতে পারে তাহা লক্ষ্য করিয়া আমরা উপরি উক্ত কথা গুলি বলিলাম—কিন্তু লেখক বোধ হয় রামের নিকট লক্ষ্মণের আজ্ঞাধীনতাকে দাসত্ব বলিয়া দোষ দিতে কখনই প্রবৃত্ত হইবেন না। কৈকেয়ীর মতন গুরুজনের নিকট রামের দাসত্বকেই লেখক দাসত্ব বলিয়া দোষারোপ করেন, কিন্তু তাহা হইলেও দাসত্ব শব্দটা শুনিবামাত্র কাপুরুষত্বের ভাব সহসা যাহা আমাদের মনে উদয় হয়, সে ভাব দূরে থাকুক তাহার ঠিক বিপরীত ভাবই আমাদের মনকে ভক্তি ও বিস্ময়-রসে অভিভূত করে; কৈকেয়ীর সমীপে রামের আজ্ঞাকারিতা অসাধারণ বীর পুরুষের লক্ষণ বলিয়া মনে হয়। সৈন্যেরা যে সেনাপতির দাসত্ব করে, পুত্র যে পিতার দাসত্ব করে, সে দাসত্ব মহত্ত্বেরই লক্ষণ; একটি গান আছে "ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যেরই ভয়,"—সেনাপতির দাসত্ব করিলে শত্রুর দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হয় না, পিতার দাসত্ব করিলে অজ্ঞাত-কুলশীল যে-সে লোকের দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হয় না; এক জন জর্ম্মান্ বক্তা বলিয়াছেন Liberty I am thy slave—এ দাসত্ব যেমন, পিতার কাছে দাসত্বও সেইরূপ উচ্চ দরের দাসত্ব। এইরূপ মহত্ত্ব-সূচক দাসত্ব যিনি যত অভ্যাস করেন তিনি তত নীচত্ব-সূচক দাসত্বের হস্ত হইতে দূরে অবস্থিতি করেন,—দুই দাসত্বের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। এই ত গেল শব্দের মার প্যাঁচ—এখন আসল কথাটা কি দেখা যা'ক্;—লেখকের অভিপ্রায় এই যে, রাম কৈকেয়ীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারেন না বলিয়া কৈকেয়ীর কি কর্ত্তব্য যে, তিনি রামকে বনে পাঠান্? এখন—রামের গুরুজন বলিলে অগ্রে কৌশল্যা সুমিত্রা দশরথ বশিষ্ঠ প্রভৃতিকেই মনে পড়ে—কৈকেয়ীকে গুরুজনের ওঁচা বলিয়া মনে হয়। এস্থলে দেখা উচিত যে, কৈকেয়ী আপনার ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে বলিয়া সাধারণতঃ রামের গুরুজন তাহার জন্য দায়ী নহেন। এমনি—কোথায় কোন্ গুরুজন আপনার

ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে বলিয়া সাধারণত সকল গুরুজন সে দোষে দোষী হইতে পারে না;—কিন্তু লেখক বলেন সাধারণতঃ গুরুজনদিগের স্ব স্ব ক্ষমতার অপব্যবহার করিবারই কথা—না করেন ত সে ছোটদের পরম সৌভাগ্য। ক্ষমতার অপব্যবহার করা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ এই মূলতত্ত্বটির উপর দাঁড়াইয়া লেখক গুরুজনদিগের প্রতি ঘোরতর কটাক্ষপাত করিতেছেন,—তিনি বলেন "মনুষ্যজাতি স্বভাবতঃ ক্ষমতার অন্ধ উপাসক। যে পক্ষে ক্ষমতা সেই পক্ষে আমাদের সমবেদনা আর অসহায়ের আমরা কেহ না, এই জন্যই এক জনের হাতে যথেচ্ছা ক্ষমতা থাকিলে অত্যন্ত ভয়ের বিষয়। তাহার ব্যবহারের ন্যায়ান্যায় বিচার করিবার লোক সংসারে পাওয়া যায় না কাজে তাহাকে আর বড় একটা ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে হয় না। যাহাদের বিবেচনা করিয়া চলা বিশেষ আবশ্যক সংসারের গতিকে এমনি হইয়া দাঁড়ায় যে, তাঁহাদেরই বিবেচনা করিয়া চলিবার কম প্রবর্তনা হয় এই গুরুজন সম্পর্কেই একবার ভাবিয়া দেখ না। আইন যত বাঁধাবাঁধি যত কড়াক্কড় সমস্তই কি কনিষ্ঠদের উপরে না?"

এস্থলে বক্তব্য এই যে, ক্ষমতার অপব্যবহার যেমন মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ছোটোদের প্রতি স্নেহও তেমনি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ—বিশেষতঃ ঘরের ছেলেদের প্রতি,—আপনার ছেলেদের ত কথাই নাই। দুষ্ট বালকেরা অনেক জায়গায় গুরুজনদিগেরই স্নেহকে সহায় করিয়া গুরুজনদিগেরই প্রতি অবাধ্যতাচরণ করে—তাহারা মনে মনে বলে "হদ্দ মারিবেন নয় বকিবেন ফাঁসি ত আর দিবেন না,"—গুরুজনদিগের স্নেহ তাঁহাদের প্রভুতাকে ছাপাইয়া উঠে—ইহা বলা বাহুল্য। স্নেহের বাঁধ অতিক্রম করিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার মাল-মোকোদ্দমা স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়—ঐরূপ বিশেষ বিশেষ স্থলে যাহা হয় তাহা সাধারণত সকল স্থলেই সংলগ্ন হইতে পারে না।

অদ্যাপি এমন কোন সমাজ-তত্ত্ববিৎ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ যাঁহাকে না মানিতে হইয়াছে যে—সমাজ-তত্ত্বের অতি অল্পই তাঁহাদের বুদ্ধির আয়ত্তাধীন। সামাজিক সকল তত্ত্বেরই দুই দিক্ আছে এবং দুই দিকেই ভাল মন্দ দুই-ই আছে;—এক দিকের ভাল এক দেশে শোভা পায়, আর একদিকের ভাল আর এক দেশে শোভা পায়, একদিকের ভাল এক কালে শোভা পায়; আর এক দিকের ভাল আর এক কালে শোভা পায়; এক দিকের ভাল এক পাত্রে শোভা পায় আর এক দিকের ভাল আর এক পাত্রে শোভা পায়;—এ ভিন্ন সকল দিকের ভাল একই দেশে একই কালে শোভা পাইবে কি সম্ভবই নহে।

ইংলণ্ডে প্রভু যে দাসকে আজ্ঞা না করিয়া অনুগ্রহ করিতে বলেন তাহার ভালর দিকটাই লেখক দেখাইয়াছেন—কিন্তু আঁটা কায়দা-কানন আমাদের দেশের সহজ-শোভন প্রকৃতির সহিত কোন

মতেই মিল খায় না,—আমাদের দেশের গৃহস্থেরা চাকর বাকরদের তুই-তোকারি করে বটে কিন্তু তাহার মধ্যে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব দূরে থাকুক স্নেহ বাৎসল্যেরই প্রাবল্য দৃষ্ট হয়—আমাদের দেশের "বাপু, বাছা" শব্দ Please, thank you প্রভৃতি শব্দ অপেক্ষা হৃদয়ের গভীরতর প্রদেশ হইতে বাহির হয়; এবং সাধারণতঃ এইরূপ দেখা যায় যে ছেলেদের উপর পিতার কটুকাটব্য করিবার যতটুকু অধিকার তাহার সীমা লঙ্ঘন করিয়া ভৃত্যদের প্রতি কটূক্তি করা আমাদের দেশের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ; তবে—সহর অঞ্চলের প্রকৃতিকে সাধারণতঃ আমাদের দেশের প্রকৃতি বলিয়া গণ্য করিলে আমরা নিরুত্তর।

ভক্তি এবং অনুরাগ সম্বন্ধে লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহাও আমাদের সঙ্গত বোধ হয় না। পূজ্যের প্রতি অনুরাগকেই ভক্তি কহে—সমানের প্রতি অনুরাগকেই প্রেম কহে—শাসন-ভয়কে ত আর ভক্তি বলে না। মনুষ্যের স্থায়ী উন্নতি-স্পৃহাও আছে এবং ক্ষণিক আমোদ-স্পৃহাও আছে, উন্নত লোকদিগের প্রতি ভক্তিও স্বাভাবিক, সমানে সমানে প্রেমও স্বাভাবিক। নেপোলিয়নের প্রতি সৈন্যদের কেমন অনুরাগ ছিল—সে অনুরাগ একরূপ, আর বয়স্যে বয়স্যে অনুরাগ একরূপ; প্রথম প্রকারের অনুরাগের নামই ভক্তি, দ্বিতীয় প্রকার অনুরাগের নামই প্রণয়; ভক্তি-প্রকাশ করা যেমন করিয়াই হউক না কেন তাহাতে কিছু আইসে যায় না,—কিছু না করিয়া ভক্তি প্রকাশ করা হোক, সেলাম করিয়া ভক্তি প্রকাশ করা হোক, প্রণাম করিয়া ভক্তি প্রকাশ করা হোক, যাহাই হউক্ না কেন ভক্তির পাত্রে ভক্তি ভিন্ন নীচু শ্রেণীর অনুরাগ শোভা পায় না; মনে কর ব্যাস দেব আসিয়া তোমার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার সহিত সেকৃহ্যাণ্ড করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিতে তোমার কি মনে একটুও কিন্তু হইবে না? একত্রবাসী ঘরের লোকদের মধ্যে কিছু না করিয়াও ভক্তিই বল, আর প্রণয়ই বল ব্যক্ত করা হইয়া থাকে; পুত্রেরা পিতাকে প্রণাম না করিয়াও ভক্তি প্রদর্শন করে, ভ্রাতারা পরস্পর আলিঙ্গন না করিয়াও সৌহার্দ্দ বিস্তার করে। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি অপেক্ষা প্রেমের মূল্য অধিক বলিয়া যদি মানা যায় তবে তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে—সে কারণ অন্য কোথাও খাটে না, সে কারণ এই যে, তিনি যেমন দূর হইতে দূরতম তেমনি নিকট হইতে নিকটতম—যেমন বৃহৎ হইতে বৃহৎ তেমনি অণু হইতে অণু; কিন্তু সংসারে যে বড় সে বড়, যে ছোটো সে ছোটো,—বড়-ছোটোর মধ্যে এইরূপ প্রাচীরের আড়াল রহিয়াছে; তাহা যদি না থাকে তবে সংসারের বৈচিত্র্য রক্ষা হইতে পারে না।

লেখক বলিয়াছেন "এই জন্য সকল শাস্ত্রেই লিখিয়াছে যে গুরুজনের অবাধ্য হওয়া পাপ কোন শাস্ত্রেই লেখে নাই কনিষ্ঠদের প্রতি যথেচ্ছাব্যবহার করা পাপ।" একথাটি ঠিক নয়। মনু বলিয়াছেন "গুরো-

রূপাবলিপ্তসা কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথ প্রতিপন্নস্য ন্যায্যং ভবতি শাসনং।" গুরু যদি গর্ব্বিত কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান শূন্য ও বিপথগামী হন তাঁহাকেও শাসন করা উচিত। এখনও লোক প্রবাদ আছে "যে দোষা বাচ্য গুরোরপি।"

জ্ঞানের অঙ্গ-বৈচিত্র্য।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের অনুবৃত্তি।

প্রশ্ন। তোমার কথার মর্ম্ম আমি এইরূপ বুঝিতেছি যে, বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপতঃ এক অথচ তাহার বিষয়োম্মুখী বুদ্ধি-বৃত্তি বিচিত্র বিষয়-রাগে রঞ্জিত এবং বহুধা বিকীর্ণ; ইহাতে দাঁড়াইতেছে এই যে, বুদ্ধি-বৃত্তিই জ্ঞানের অঙ্গ বৈচিত্র্যের মূল; এই না তোমার অভিপ্রায়? কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞান আপনার স্বরূপ ছাড়িয়া যে বুদ্ধি বৃত্তি রূপে পরিণত হয়—ইহা কেন হয়—ইহার আবশ্যকতা কি? অসীম আকাশের এবং অনাদ্যন্ত কালের সকল তত্ত্ব ব্যাপিয়া যে এক মূলতত্ত্ব তাহাই যদি বিশুদ্ধ জ্ঞান হয় তবে তাহার কিসের অভাব যে, মুক্ত অবস্থা হইতে নামিয়া বুদ্ধি বৃত্তির সংকীর্ণ ভাব পরিগ্রহ করিবে।

উত্তর। বিশুদ্ধ জ্ঞানের কিছুরই অভাব নাই ইহা আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি কিন্তু তদ্ভিন্ন আর সকল বস্তুতেই একটা না একটা অভাব রয়ে-ই-চে—সেই অভাব সমষ্টির মূলাধার যাহা তাহাই প্রকৃতি এবং সেই অভাব সমষ্টি যদ্দ্বারা পুরিত হয় এমন যে প্রভাব-সমষ্টি তাহার মূলাধার—বিশুদ্ধ-জ্ঞান। প্রকৃতির অভাব কোথা হইতে? বিচ্ছেদ হইতে,—প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তু অন্যান্য বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন, সুতরাং সকল বস্তুতে সকল গুণ সম্ভবে না—এক বস্তুতে যাহা আছে অন্য বস্তুতে তাহা নাই, এই অভাব পূরণের জন্যই যাওয়া-আসার সৃষ্টি,—এক পরমাণুতে যে অভাব আছে তাহার পূরণের জন্য অন্য পরমাণুদের নিকট তাহার যাওয়া আসা আবশ্যক—অভাবই ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক। কিন্তু গোড়ায় যদি প্রভাব না থাকিত তবে অভাবের শুদ্ধ কেবল আঁকু বাঁকুই সার হইত—শিশু ক্ষুধার উত্তেজনায় হাত পা আছাড়িয়া ক্রন্দন করিতেছে কিন্তু তাহাকে স্তন্য পান করাইবার লোক নাই—এইরূপ দশা হইত। অভাব—বিচ্ছেদ হইতে,—প্রভাব কোথা হইতে? পূর্ণতা হইতে। এক অক্ষৌহিণী-পতির অধীনে মনে কর যেন দশ জন সহস্র-পতি দশ জায়গায় যুদ্ধে নিযুক্ত রহিয়াছে, এক এক সহস্র-পতির অধীনে আবার দশ দশ জন শত-পতি দশ জায়গায় যুদ্ধে নিযুক্ত রহিয়াছে। অক্ষৌহিণী-পতির প্রভাব দশজন সহস্র-পতি ভেদ করিয়া, শত জন শত-পতি ভেদ করিয়া, লক্ষ দল-বলে বিকীর্ণ রহিয়াছে। কত সৈন্য কোথায় কখন প্রেরণ করিতে হইবে—কোন জায়গা অধি-

কার করিলে জয়-লাভের কত সম্ভাবনা—ইত্যাদি-প্রকার যুদ্ধ-সম্বন্ধীয় সমস্ত তত্ত্ব দ্বারা অক্ষৌহিনীপতির মন পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সহস্র-পতির মন কতকটা ঐরূপ—কিন্তু উহার মত অতটা নহে, শত-পতির মন তাহা অপেক্ষাও অল্প পরিমাণে ঐরূপ; সৈনাদের ওরূপ কিছুই না—বলিলেই হয়। "শত্রুদের যদি না বধ করি তবে আমরা হত হইব" এই যে একটি অভাব-বোধ ইহা দ্বারা সৈন্যেরা যুদ্ধ কার্য্যে বলপূর্ব্বক আকৃস্ট রহিয়াছে,—কিন্তু তাহারা কেবল বিপক্ষ-দল বধ করিয়াই ক্ষান্ত, তাহাদের কাহার কার্য্যের উপর কত পরিমাণে জয়-লাভ নির্ভর করে তাহা তাহারা বলিতে পারে না—তাহা শত-পতি কতকটা বলিতে পারে—সহস্র-পতি আরো অধিক বলিতে পারে— অক্ষৌহিনী-পতির ত কথাই নাই। উপস্থিত যুদ্ধের সমস্ত নিয়ম-প্রণালী যেমন অক্ষৌহিনী-পতির আয়ত্তাধীন, প্রকৃতির সমস্ত নিয়ম-প্রণালী সেইরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানের আয়ত্তাধীন; অক্ষৌহিনী-পতির প্রভাব যেমন সমস্ত সৈনা-দলে পরিকীর্ণ হইয়া সকলকে এক ডোরে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তেমনি বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রভাব সমস্ত-প্রকৃতিময় পরিকীর্ণ হইয়া সকলকে এক ডোরে বাঁধিয়া রাখিয়াছে; এ জন্য এক বস্তু আর এক বস্তু হইতে সহস্র বিচ্ছিন্ন হইলেও ভিতরে ভিতরে তাহাদের মধ্যে যোগ-সূত্র প্রবাহিত থাকে—সূর্য্য পৃথিবী-হইতে এত যে দূরে অবস্থিতি করে তথাপি সূর্য্যের একটু কিছু হইলে পৃথিবীর মর্ম্মে আঘাত পৌঁছে। বিশুদ্ধ জ্ঞান অসীম আকাশ এবং অনাদ্যন্ত কালের বন্ধন-সূত্র;—এক কালের সহিত আর এক কালের যে ধারাবাহিক যোগ রহিয়াছে, এক দেশের সহিত আর এক দেশের যে ধারাবাহিক যোগ রহিয়াছে, সে কেবল সেই সার্ব্ব-ভৌমিক বন্ধন-সূত্রের গুণে; বিশুদ্ধ জ্ঞানকে শূন্য এক মনে করিলে তাহাকে নির্জীব ভাবে দেখা হয়,—কিন্তু যখন দেখি যে বিশুদ্ধ জ্ঞানের পরিপূর্ণ ভাণ্ডার হইতে সমস্ত প্রকৃতির সমস্ত অভাব অজস্র ধারে পরিপূরিত হইতেছে—অন্ধকারের মধ্য দিয়া জ্যোতি উদ্ভাসিত হইতেছে—অজ্ঞানের মধ্য দিয়া জ্ঞান উন্মেষিত হইতেছে—অভাবের মধ্য দিয়া ভাব উদ্দীপ্ত হইতেছে—তমোগুণের মধ্য দিয়া সত্ত্বগুণ প্রাদুর্ভূত হইতেছে—তখনই বিশুদ্ধ জ্ঞানকে জীবন্ত ভাবে দেখি—দেখি যে বিশুদ্ধ জ্ঞান কেবল জ্ঞানের জ্ঞান নহে, যেমন জ্ঞানের জ্ঞান তেমনি প্রাণের প্রাণ। প্রকৃতি অভাবের মূলাধার—বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রভাবের মূলাধার; বিশুদ্ধ জ্ঞানের আশ্রয় ব্যতীত প্রকৃতি থাকিতে পারে না, প্রকাণ্ড এক অভাব-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়; প্রকৃতি না থাকিলেও বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রভাব স্ফূর্ত্তি পায় না, প্রকৃতি এবং পুরুষের মধ্যে এই রূপ অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের টান। পুরুষকে ছাড়িয়া প্রকৃতির যে অভাব তাহাই তমোগুণ, সেই অভাব পূরণের জন্য ব্যস্ততা রজোগুণ এবং পুরুষের অধিষ্ঠান-প্রভাবে সেই অভাব হইতে ভাবের উদ্রেক সত্ত্ব-গুণ, এ কথা শাস্ত্র এবং

যুক্তি উভয়েরই সহিত সঙ্গত। বিচ্ছিন্ন বস্তু-সকলের পরস্পর-সংসর্গ-জনিত পরস্পরের অভাব মোচন হাওয়াতে-করিয়া প্রকৃতি ক্রমশই অভাব হইতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে—তমোগুণ হইতে সত্ত্বগুণের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সাংখ্য শাস্ত্র সত্ত্ব রজ এবং তমোগুণের ব্যাখ্যা এই রূপ করেন যে, সত্ত্ব-গুণ প্রকাশাত্মক এবং সুখাত্মক, রজোগুণ ক্রিয়াত্মক এবং দুঃখাত্মক ও তমোগুণ স্থিতিশীল (inert) ও মোহাত্মক; ত্রিগুণের প্রত্যেকের এই যে দুই দুই লক্ষণ ইহার তাৎপর্য্য এই,—(১) শুদ্ধ অভাব মাত্র নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্যম, তাহাই তমোগুণ,—(২) অভাবের বোধই দুঃখ এবং তাহাই ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক—তাই রজোগুণ দুঃখাত্মকও বটে ক্রিয়াত্মকও বটে,—(৩) আর পূর্ণতার একমাত্র নিকেতন যে বিশুদ্ধ জ্ঞান তাঁহার আলোক দ্বারা অভাবের পূরণ—বিচ্ছেদের মিলন—ইহারই নাম প্রকাশ, এজন্য সত্ত্ব-গুণ প্রকাশাত্মকও বটে—অভাব-নিরাকরণ জন্য সুখাত্মকও বটে। এখন বক্তব্য এই যে বিশুদ্ধ জ্ঞান হইতেই জ্ঞানের একত্ব—এবং ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি হইতেই জ্ঞানের অঙ্গ-বৈচিত্র্য।

প্রশ্ন। বিশুদ্ধ জ্ঞানের আপনার কোন অভাব নাই—অভাব যাহা তাহা প্রকৃতির; প্রকৃতির অভাব কি প্রকৃতি আপনি পূরণ করিতে পারে না? প্রকৃতির কি কোন শক্তি নাই—যদি আদবেই তাহার শক্তি না থাকে তবে তাহার অস্তিত্বই বা কি রূপ?

উত্তর। তোমার কথার ভাব এই যে প্রকৃতির যদি শক্তিই নাই তবে তাহার আছে কি? ইহার উত্তর এই যে, বালকের ক্রন্দনই বল—প্রকৃতির ক্রন্দনই তাহার শক্তি;—বিচ্ছেদ হইতে অভাব, অভাব হইতে ক্রন্দন,—এক দিক্ হইতে সেই ক্রন্দন উত্থিত হয় আর এক দিক্ হইতে প্রভাব অবতীর্ণ হইয়া প্রকৃতির অভাব পূরণ করে,—এটি হয় জ্ঞানের দিক্ হইতে; উদরস্থ অন্ন হইতে প্রথমে যেমন কালো রক্ত উৎপন্ন হইয়া শিরা বাহিয়া উপরে উঠে, পরে প্রাণ-প্রভাবে সেই রক্ত লোহিত বর্ণ হইয়া শরীরের সকল অভাব পূরণ করত সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হয়, সেইরূপ প্রকৃতি হইতে অন্ধকার ময় ক্রন্দন জ্ঞানাভিমুখে উত্থিত হয়, পরে জ্ঞানের প্রভাবে তাহা জ্যোতির্ম্ময় শক্তিরূপে পরিণত হইয়া প্রকৃতির অভাব দূর করে।

প্রশ্ন। কবিতার দৌড় মন্দ নয়—কিন্তু আমি সাদা কথার ভক্ত,—অত উচ্চে দৌড় না দিয়া আর একটু মাটির কাছে কাছে থাকিলে ভাল হয়।

উত্তর। আর বলিতে হইবে না,—তাহাই হইতেছে। মনে কর যেন এক মুহূর্ত্তের কমে কোন শব্দ আমাদের শ্রবণে উপলব্ধি হইতে পারে না। দুই আধ মুহূর্ত্ত জড়াইয়া এক মুহূর্ত্ত হয়; প্রথম আধ মুহূর্ত্তের শব্দ দ্বিতীয় আধ মুহূর্ত্তের শব্দ হইতে যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন ছিল ততক্ষণ তাহা প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু যখন দ্বিতীয় আধ মুহূর্ত্তের শব্দের সহিত প্রথম আধ

মুহূর্ত্তের শব্দ সংযুক্ত হইল তখনই শব্দ বোধের উৎপত্তি হইল; যখন প্রথম আধ-মুহূর্ত্তের অভাব দ্বিতীয় আধ মুহূর্ত্তের দ্বারা পূরণ হইল তখনই শব্দ-বোধ উৎপন্ন হইল—তাহার পূর্ব্বে নহে। কিন্তু অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি ত আর আপনা হইতে হইতে পারে না, শূন্য ঘটের মধ্য হইতে ত আর আপনাআপনি জলের উৎপত্তি হইতে পারে না;—দুই অর্দ্ধ মুহূর্ত্তের যে দুই শব্দ তাহা শব্দই নহে তাহা শব্দাঙ্কুর মাত্র—উভয়েতেই শব্দের অভাব বিদ্যমান—শব্দ তবে কোথা হইতে আইসে? ও দুটী শব্দাঙ্কুর জাতিতে এক—কালে বিভিন্ন;— দুই অর্দ্ধ মুহূর্ত্তের দুই শব্দাঙ্কুরের মধ্যে জাতিগত ঐ যে ঐক্য তাহাই শব্দ—আর সে ঐক্য কেবল বুদ্ধিই উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা উপলব্ধি করা শ্রবণেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম নহে; শ্রবণেন্দ্রিয়ে যখন যেটি উপস্থিত হয় তখন সেইটিই গৃহীত হয়—কালান্তরীয় শব্দ বর্ত্তমান কালে গৃহীত হয় না; কিন্তু স্মরণ-শক্তির প্রভাবে বর্ত্তমান কালের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে অতীত কালের শব্দ আমাদের অন্তঃকরণে গৃহীত হয়—এবং বুদ্ধি দুয়ের মধ্যে জাতিগত ঐক্য উপলব্ধি করিয়া দুইকে এক বন্ধনে আবদ্ধ করে। আরো ঠিক কথা এই যে বুদ্ধি শব্দরূপী ঐক্য-বন্ধন দ্বারা শব্দাঙ্কুর-দ্বয়ের বিচ্ছেদের উচ্ছেদ করে—শব্দরূপী ভাব দ্বারা তাহাদের অভাব পূরণ করে—তবেই শব্দ বলিয়া একটা বিষয় খাড়া হয়। বিচ্ছিন্ন শব্দাঙ্কুরদ্বয় নিজে তবে কি? না শব্দরূপে পরিণত হইবার জন্য একটা আঁকুবাকু।

অতএব শব্দের অভাব হইতে শব্দরূপী যে একটা ভাবের উৎপত্তি হয়—তাহা অভাবের গুণে হয় না, বুদ্ধির প্রভাব-গুণেই হয়। এই রূপ ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে প্রকৃতির অভাব-সূচক অঁকুবাঁকু জ্ঞানের প্রভাব দ্বারা পূর্ণ হয়—এবং এই ব্যাপারটির ভিতর দিয়াই জ্ঞান এবং প্রকৃতি উভয়েরই সজীব মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি পায়।

প্রশ্ন। সবই বলিলে ভাল—কেবল গোড়াতেই গোল। প্রথম আধ-মুহূর্ত্তের শব্দাঙ্কুর এত অল্প-ক্ষণ-স্থায়ী যে, উপস্থিত হইবা মাত্র তাহা শব্দ বলিয়া গ্রাহ্য হয় না—গ্রাহ্যই যদি না হইয়া থাকে তবে দ্বিতীয় আধ মুহূর্ত্তের শব্দাঙ্কুরের সহিত তাহার সমজাতীয়তা কিরূপে নিরূপিত হইবে; যদি একটা মূষিক আমার সম্মুখ দিয়া এত দ্রুত বেগে চলিয়া যায় যে তাহা আমার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় তবে তাহা আর একটা মূষিকের সহিত জাতিতে এক ইহা আমি কেমন করিয়া বলিতে পারিব।

উত্তর। শব্দাঙ্কুর শব্দেরই অংশ—কিন্তু এত অল্প অংশ যে তাহা স্বতন্ত্ররূপে উপলব্ধি-যোগ্য নহে,সুতরাং তাহা শব্দ-জাতীয় বিষয় হইয়াও শব্দজাতীয় বিষয় বলিয়া স্বতন্ত্ররূপে গৃহীত হইতে পারে না—অন্যান্য শব্দাঙ্কুরের যোগেই তবে তাহা শব্দ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে,—তাহা যে শব্দজাতীয় তাহা বুদ্ধি-যোগে পরে প্রকাশ পায়—প্রথমে তাহা প্রকাশ পায় না,—শব্দাঙ্কুরদ্বয়ের মধ্যে জাতিগত ঐক্য উপলব্ধি বুদ্ধির

এক প্রকাকার—সৃষ্টি, অর্থাৎ ভিতর হইতে পাওয়া—বাহির হইতে নহে; মূষিক গেল কি বিড়াল গেল—তাহা আমরা চক্ষে দেখিলে তবে বলিতে পারি, কিন্তু শব্দাঙ্কুর যে শব্দজাতীয় তাহা বুদ্ধি আপনা হইতে স্থির করে,—দুইটি শব্দাঙ্কুর উপর্য্যুপরি উপস্থিত হইলেই বুদ্ধি আপনার ভিতর হইতে ভাব-বন্ধন—ঐক্য-বন্ধন—বাহির করিয়া তাহাদিগকে শব্দরূপে গঠিয়া তোলে। বৈদান্তিক ভাষায় বলিতে হইলে—রজ্জু যেমন সর্প নহে শব্দাঙ্কুর সেই রূপ শব্দ নহে, তথাপি শব্দাঙ্কুরের সমষ্টিতে শব্দের অধ্যাস বুদ্ধি কর্ত্তৃক হইয়া থাকে। অতএব শব্দের উপাদান কারণ—শব্দাঙ্কুর, শব্দের নিমিত্ত কারণ—বুদ্ধি এবং যে প্রকরণ দ্বারা শব্দাঙ্কুর হইতে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহা ভাবনা;—ভাবনা শব্দটাই ভাবনার অর্থব্যঞ্জক—অভাবকে ভাব করিয়া তোলাই ভাবনা;—শব্দাঙ্কুরদ্বয়ে শব্দের অভাব যা আছে, পরস্পরের যোগ-সংঘটন-দ্বারা সে অভাবের পূরণ চেষ্টাই ভাবনা,—সে যোগ-সংঘটন আসিবে কোথা হইতে—যদি একত্ব গোড়ায় না থাকিবে? বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব স্ফুরিত হইলে তবে ত যোগ কথাটার অর্থ পাওয়া যায়—তাহার পূর্ব্বে ত আর নহে; একত্ব স্ফুরণ করে—বুদ্ধি, যেহেতু একই বুদ্ধি কর্ত্তৃক নানা বিষয় গৃহীত হয়। অতএব বিষয়-জ্ঞানের প্রকরণ-পদ্ধতি তিনটি পাওয়া যাইতেছে—(১) প্রকৃতির বৈচিত্র্য ইন্দ্রিয়-সন্নিধানে উপস্থিত হওয়া—(২) ভাবনা-কর্ত্তৃক তাহাদের যোগ-সংঘটন অথবা আন্দোলন (৩) এবং বুদ্ধি কর্ত্তৃক একত্ব স্ফুরণ। শব্দাঙ্কুর-দ্বয় তমোগুণ, শব্দের ভাবনা-ক্রিয়া রজোগুণ এবং শব্দের প্রকাশ সত্ত্বগুণ—এরূপ বলিলে অসঙ্গত হয় না। এই প্রকার ত্রিগুণের ভিন্নতাই জ্ঞানের অঙ্গ বৈচিত্র্যের মূল।

ক্রমশঃ।

সম্পাদকের বৈঠক।

দোকান্‌দার বড় লোক

কিম্বা

হঠাৎ নবাব।

জুর্দ্যাঁ, দুই জন পেয়াদা।

জুর্দ্যাঁ। তোমরা আমার সঙ্গে এসো, আমার এই পোষাক সমস্ত সহর-ময় একবার দেখিয়ে আসি। আর, তোমরা ঠিক আমার পিছনে পিছনে থেকো, তাহলে লোকে বুঝ্‌তে পারবে যে তোমরা আমারই পেয়াদা।

পেয়াদা। যে আজ্ঞা হুজুর।

জু। আমার দাসী নিকোলকে ডেকে দাও তো হে—তাকে কতকগুল হুকুম দিতে হবে। আর যেতে হবে না; ঐ এসেছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

জুর্দ্যাঁ, নিকোল, দুই পেয়াদা।

জু। নিকোল!

নিকোল। আজ্ঞে?

জু। শোনো।

নি। (হাসিতে হাসিতে)—হি, হি, হি, হি, হি।

জু। আরে, হাস্‌চিস্‌ কেন?

নি। হি, হি, হি, হি, হি, হি।

জু। আরে মর্‌ মাগি ও রকম কচ্চে কেন?

নি। হি, হি, হি: কেমন মজার সাজ হয়েচে। হি, হি, হি।

জু। কেন, কি রকম হয়েচে?

নি। ওমা! আমি যাব কোথা! হি, হি, হি, হি, হি।

জু। আ মর্‌ মাগি, তুই আমাকে নিয়ে তামাসা কচ্চিস্‌?

নি। না মশাই, তা কি করতে পারি। হি, হি, হি, হি, হি, হি।

জু। দেখ্‌, ফের যদি হাসবি, তো কিলিয়ে তোর নাক ভেঙ্গে দেব।

নি। মশাই আমি হাসি রাখতে পাচ্চিনে। হি, হি, হি, হি, হি, হি।

জু। তুই থাম্‌বি নে?

নি। মশাই আমাকে মাপ কর; কিন্তু মশাই তোমাকে এমন মজার দেখ্‌তে হয়েচে, যে না হেসে থাক্‌তে পাচ্চি নে। হি, হি, হি।

জু। দেখ দিকি মাগির আস্পর্দ্ধা!

নি। তোমাকে ভারি মজার দেখতে হয়েচে। হি হি।

জু। আমি তোকে—

নি। আমাকে মশাই মাপ কর। হি, হি, হি, হি।

জু। দেখ্‌, তুই ফের যদি হাস্‌বি, তোর গালে এমনি চড় কষিয়ে দেব যে তখন দেখ্‌তে পাবি।

নি। আচ্ছা মশাই, এইবার হয়েচে আর আমি হাস্‌ব না।

জু। দেখিস খবরদার। আজ বিকেল বেলায় ঝাঁট দিতে হবে—

নি। হি, হি।

জু। দেখিস যেন ভাল করে ঝাঁট দিস্‌—

নি। হি, হি।

জু। শোন্‌ কি বলচি, হলের ঘরটা ভাল ক'রে ঝাঁট, দিস্‌ আর—

নি। হি, হি।

জু। ফের?

নি। (হাসিতে হাসিতে ভূতলে পড়িয়া) বরং আমাকে মারো মশাই, আমি একবার মন খুলে হেসে নি—আমার দম ফেটে যাচ্চে, একটু আমি হেসে বাঁচি। হি, হি, হি, হি, হি।

জু। আমার রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলচে।

নি। মশাই, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে একটু হাস্‌তে দেও।

জু। আমি যদি একবার আরম্ভ করি—

নি। মশাই—ই আমি দম্‌ফেটে মরবো যদি না হাস্‌তে পাই, হি, হি, হি।

জু। এমন লক্ষ্মীছাড়া মাগি কেউ কখন কি দেখেচে—আমি কোথায় ওকে হুকুম দিতে এলুম না ওর এতদূর আস্পর্দ্ধা যে আমার হুকুম না শুনে আমার মুখের উপর ও হাস্‌তে আরম্ভ করেচে।

নি। কি করতে হবে মশাই বল।

জু। আজ বিকেলে নিমন্ত্রন খেতে আমার এখানে লোক আস্‌বে, হারামজাদি তাই বল্‌চি বাড়িটা ঠিকঠাক্‌ করে রাখ্‌।

নি। (উঠিয়া) মাইরি, আর আমার হাস্‌তে ইচ্ছে নেই, তোমার কথায় মশাই আমার রাগ ধর্‌চে, যখনি তোমার লোক-জন আসে, বাড়ির মধ্যে এমন হুলস্থূল প'ড়ে যায়।

জু। তোর জন্যে আমার বাড়ির দরজা বন্দ করে রাখ্‌তে হবে না কি, অ্যাঁ?

নি। নিদেন মশাই কতক লোকের জন্য বন্দ করা দরকার।

---

৩ য় দৃশ্য।

জুর্দ্যাঁর স্ত্রী, জুর্দ্যাঁ, নিকোল, দুই জন পেয়াদা।

স্ত্রী। ভ্যালা যাহোক! এ আবার কি! এ নতুন সাজ আবার কোথা থেকে পেলে? তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি সব লোপ হয়েচে না কি? এই রকম সাজ করে বাহিরে বেরোচ্চো? তোমার কি এই ইচ্ছে তোমাকে দেখে সহর শুদ্ধ লোক হাসুক?

জু। এ তুমি বেশ জেনো ঠাকরণ, কতকগুল পাগল আর পাগলী বই আমাকে দেখে আর কেউ হাস্‌বে না।

স্ত্রী। লোকে হাস্‌তে আর বড় বাকি রাখেনি—তোমার রকম সকম দেখে অনেক দিন থেকেই সবাই হাস্‌তে আরম্ভ করেচে।

জু। আচ্ছা বল দেখি ঠাকরণ সবাই-টা কে?

স্ত্রী। সবাই যাদের বুদ্ধি শুদ্ধি আছে, যারা তোমার মত পাগল নয়। যা হোক্‌ তোমার রকম সকম দেখে আমি অবাক হয়েচি। আমাদের বাড়ি আর চেন্‌বার জো নেই। যে রকম গোলমাল, লোকে শুন্‌লে মনে করতে পারে রোজ রোজ এখানে মোচ্ছব বসে—সকাল থেকে, গাই-য়েদের চিৎকারে আর বেহালার কাঁকো শব্দে পাড়ার লোকেরা তিতিবিরক্ত হয়।

নি। ঠাকরণ ঠিক্‌ বলেছেন। তুমি এই রকম লোকজন রোজ রোজ আন্‌লে আমি তো আর বাড়ি সাফ্‌ রাখ্‌তে পারিনে, তারা পায়ে ক'রে এখানে রাজ্যের কাদা নিয়ে আসে, ঘরের মেজে রগড়াতে রগড়াতে আমার পা খসে পড়ে।

জু। বা রে বা নিকোল, পাড়াগাঁ থেকে এসে যে খুব মুখ ফুটেচে দেখচি!

স্ত্রী। নিকোল, ঠিক বলচে, তোমার চেয়ে ওর বুদ্ধি আছে—আচ্ছা ভাল বল

দেখি, আমি জানতে চাই, তোমার এই বয়েসে নাচের ওস্তাদের দরকার কি ?

নি। আর সেই তলোয়ারের ওস্তাদেরই বা দরকারটা কি—সে যখন খট খট্ করে আসে, আমাদের বাড়িটা কেঁপে ওঠে—মেজের টালিগুল ভেঙ্গে যায়।

জু। আমার চাকরাণী, আর আমার স্ত্রী, দুজনেই তোমরা চুপ্ কর।

স্ত্রী। পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার শক্তি নেই—এই বয়সে কি না তোমার নাচ শিখ্‌তে সখ গেছে !

নি। মশাই তোমার কি কাউকে মেরে ফেল্‌তে ইচ্ছে হয়েছে ?

জু। তোমরা চুপ্ কর বলচি, তোমরা দুজনেই মুখ্‌খু, ও সব লোকের মর্য্যাদা তোমরা কি বুঝবে ?

স্ত্রী। এখন ও-সব রেখে যাতে তোমার মেয়ের বিয়ে হয় তারই ভাবনা ভাবো। তার বিয়ের যুগ্যি বয়েশ হয়েচে।

জু। যখন ভাল পাত্র এসে উপস্থিত হবে, তখন আমার মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাবা যাবে। এখন যাতে ভাল ভাল চীজ শিখ্‌তে পারি, আমার সেই ভাবনা হয়েচে !

নি। ঠাকরণ আরও আমি শুনলুম নাকি ন্যাকাপড়া শেখবার জন্য একজন ভটচায্যি পণ্ডিত রেখেচেন, তাহলেই চুড়োন্ত হবে।

জু। সত্যিই তো আমি রেখেছি। আমার একটু বিদ্যে শিখ্‌তে ইচ্ছে আছে, বড় লোকদের সঙ্গে তাহলে আমি নানা বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করতে পারব।

স্ত্রী। তার চেয়ে এই বয়সে পাঠশালায় গিয়ে গুরুমশায়ের বেত খাও না কেন ?

জু। কেনই বা খাব না ? ইস্কুলে লোকে যা শেখে আমি যদি তা শিখ্‌তে পাই, তাহলে ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা যেন এখনি আমি সকলের সম্মুখে বেত খাই।

নি। হাঁ তাহলে আর কিছু না হোক্, মশাই তোমার পিঠের গড়ন অনেকটা ভাল হয়।

স্ত্রী। গেরস্ত-আলি কাজ করবার জন্য ওসবে তোমার বড় দরকার—না ?

জু। তার সন্দেহ নেই। তোমরা দুজনেই জানোয়ারের মত কথা কচ্চ, তোমাদের মুখখুমি দেখে আমার ভারি লজ্জা হয় (স্ত্রীর প্রতি) তার দৃষ্টান্ত, তুমি এখন যে কথা কোইলে সেটা কি, তা কি তুমি জানো ?

স্ত্রী। হাঁ আমি বেশ জানি, আমি যা তোমাকে বল্লুম তা খুব ভাল কথা—আমি বলছিলুম তোমার ধরণ-ধারণ বদ্‌লানো খুব দরকার।

জু। আমি তা বল্‌চি নে—আমি জিজ্ঞেস কচ্চি, তুমি যে কথাগুল কইলে, সে গুলো কি ?

স্ত্রী। সে গুলো ভাল কথা—তোমার মত পাগ্‌লামি নয়।

জু। আমি তা বল্‌চি নে। আমি এই জিজ্ঞেস কচ্চি, এখন তোমার সঙ্গে যা কথা কচ্চি, তোমাকে যা বল্‌চি, সেটা কি জিনিস্ ?

স্ত্রী। মাথা আর মুণ্ডু।

জু। নানা, তা নয়। যা আমরা দু জনেই এখন বল্‌চি, যে ভাষায় আমরা দু জনে কথা কচ্চি!

স্ত্রী। অ্যাঁ?

জু। তাকে কি বলে?

স্ত্রী। যা তোমার ইচ্ছে তাই বল্‌তে পার।

জু। আরে মুখ্‌খু, একে বলে গদ্য।

স্ত্রী। গদ্য?

জু। হাঁ, গদ্য। যা গদ্য, তা পদ্য নয়। আর যা পদ্য তা গদ্য নয়। অ্যাঁ হ্যাঁ এখন দ্যাখো বিদ্যে কি জিনিস! (নিকোলের প্রতি) আর তুই, তুই জানিস উ বলতে গেলে কি করতে হয়?

নি। সে কি?

জু। যখন তুই উ বলিস্ তখন তুই কি করিস্?

নি। কি?

জু। আচ্ছা একবার বল দেখি উ।

নি। আচ্ছা! উ।

জু। এখন কি করলি?

নি। আমি বল্লুম উ।

জু। হাঁ, কিন্তু যখন উ বলিস্ তখন কি করিস?

নি। যা তুমি আমাকে করতে বল তাই করি।

জু। আঃ! এই সব জানোয়ারদের বোঝানো বড় ঝক্‌মারি! তুই করিস্ কি শোন্ —তুই ঠোঁট দুটো বাহিরের দিকে লম্বা ক'রে দিস্ আর উপরের চোয়াল কাছাকাছি নিয়ে আসিস; উ, দেখ্‌চিস্? আমি যেন তোকে ভেম্‌চোচ্চিঃ—উ।

নি। বাঃ! বেশ!

স্ত্রী। বাঃ! চমৎকার!

জু। এতেই আশ্চর্য্য হলে—যদি তুমি দেখ্‌তে ড, ঢ, ড়, ঢ় কি রকম ক'রে উচ্চারণ করতে হয় তা হলে না জানি কি করতে?

স্ত্রী। ও সব মাথা মুণ্ডু কি বকৃচ?

নি। ও রোগ সারে কিসে?

জু। আঃ মুখ্‌খু স্ত্রীলোকদের দেখ্‌লে আমার ভারি রাগ ধরে।

স্ত্রী। যাও যাও, ঐ লোকদের দূর করে তাড়িয়ে দেও।

নি। সেই তলোয়ারের ওস্তাদটাকে আগে। সে ধুলো উড়িয়ে বাড়িটাকে অন্ধকার ক'রে তোলে।

জু। বটে! ঐ ওস্তাদের উপর দেখ্‌চি বড় রাগ—তোর যে রকম আস্পর্দ্ধা—এখনি তার মজা দেখিয়ে দিচ্চি (দুটো শেখ্‌বার তলোয়ার আনাইয়া, তার মধ্যে একটা নিকোলের হাতে দিয়া) এই দেখ্—সাক্ষাৎ প্রমাণের সঙ্গে দেখিয়ে দেব। শরীরের লাইনে। যখন চার ধার ঘা মারতে হয়, তখন এই রকম করতে হয়, যখন তিনের ঘা মারতে হয় তখন এই রকম করতে হয়—এ জান্‌লে আর কেউ কখন মেরে ফেল্‌তে পারে না। যখন কারও সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, তখন যদি জানা যায় যে আমার কিছু হবে না, তা হলে কেমন মজা! আয় তোকে দেখিয়ে দিচ্চি, ঐ তলোয়ার দিয়ে আমাকে মার দিকি।

নি। (নিকোল জুর্দ্যার গায় দুই চার বার খোঁচা দিয়া) কেমন, হয়েছে?

জু। আরে! আরে! আস্তে! আস্তে অত জোরে না, আরে মর মাগি।

নি। তুমি যে আমাকে খোঁচা দিতে বোল্লে।

জু। হাঁ। কিন্তু তুই চারের ঘা না মারতে মারতেই যে তিনের ঘা মেরে দিয়েচিস্—আর ঘা আট্‌কাবার সময় পর্য্যন্ত আমাকে দিস্‌নি।

স্ত্রী। তুমি নিশ্চয়ই খেপেচ—যে অবধি তুমি বড় লোকদের সঙ্গে মিশ্‌তে আরম্ভ করেছ, সেই অবধি তোমার মাথায় ঐ সব পাগ্‌লামি ঢুকেচে।

জু। যে অবধি আমি বড় লোকদের সঙ্গে মিশ্‌তে আরম্ভ করেছি, সেই অবধি বরং আমার বুদ্ধি খুলেচে—আর, তুমি যেমন সামান্য লোকদের সঙ্গে মেশো, এ তার চেয়ে ঢের ভাল।

স্ত্রী। তা তো বটেই! বড় লোকদের সঙ্গে মেশায় তো ঢের লাভ; সেই নবাবটার সঙ্গে ভাব ক'রে তুমি যে রকম কাজ গুছিয়েছ তা আর—

জু। চুপ; কি বোল্‌চ তুমি একবার ভেবে দেখো—এ তুমি বেশ জেনো স্ত্রী, যার কথা তুমি বল্‌চ—সে কেমন লোক তা তুমি জান না। তুমি জান না যে সে একজন মস্তলোক, একজন রাজ-দরবারের গণ্য মান্য নবাব, আর আমি এখন যেমন তোমার সঙ্গে কথা কচ্চি, তিনি তেমনি রাজার সঙ্গে কথা কন। আর অমন বড় লোক প্রায়ই আমার বাড়িতে আসে, আমাকে প্রিয় বন্ধু বোলে তার সমকক্ষ লোকের মত আমার সঙ্গে ব্যবহার করে—এতে কি আমার খুব নাম বাড়বে না? আর আমার উপর তার এত অনুগ্রহ যে তুমি তা মনেও করতে পার না—আমাকে যখন সে আদর করে তখন আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাই।

স্ত্রী। হাঁ, তোমার উপর তার যথেষ্ট অনুগ্রহ, আর তোমাকে খুব আদর করেও বটে—কিন্তু এদিকে তোমার কাছ থেকে টাকা ধার ক'রে যে তোমার ঘাড় ভাংচে।

জু। অমন বড় লোককে টাকা ধার দেওয়া কি মানের বিষয় নয়? আর যে নবাব আমাকে প্রিয় বন্ধু বোলে ডাকে তাকে কি একটু টাকা ধার দিতেও পারিনে?

স্ত্রী। আর সেই নবাব তোমার জন্য কি করে?

জু। কি করে? সে যে কি করে তা যদি জান্‌তে তাহলে আশ্চর্য্যি হয়ে যেতে।

স্ত্রী। সে কি?

জু। বস্! আমি তা খুলে বল্‌তে চাইনে। এই পর্য্যন্ত তোমাকে বোল্লেই যথেষ্ট হবে, আমি তাকে টাকা ধার দিয়েচি, আর শীঘ্রই সে টাকা শুধে দেবে।

স্ত্রী। বটে। সেই আশায় আছ না কি?

জু। নিশ্চয়ই শুধ্‌বে—সে কি আমাকে সে বিষয় কথা দেয় নি?

স্ত্রী। হাঁ হাঁ শুধবে বত তা গায়ে রইল।

জু। সে শপথ করে আমাকে বলেচে।

স্ত্রী। শপথ না তার মাথা।

জু। কি সর্ব্বনাশ! স্ত্রী, তুমি ভয়ানক একগুঁয়ে দেখ্‌চি, আমি তোমাকে বল্‌চি সে নিশ্চয়ই তার কথা রাখ্‌বে—আমার বেশ বিশ্বাস আছে।

স্ত্রী। আর আমার বিশ্বাস যে সে কথা রাখবে না—আর তোমাকে যে সে এত আদর করে সে কেবল তোমাকে ভোলাবার জন্যে।

জু। চুপ চুপ—ঐ আস্‌চে।

স্ত্রী। এইবার মারবে দেখচি—আবার বুঝি কিছু ধার করতে এসেছে, ওকে দেখলে আমার খিদে তৃষ্ণা উড়ে যায়।

জু। চুপ কর—আমি বলচি।

৪র্থ দৃশ্য।

নবাব দোরাস্তু, জুর্দ্যা, জুর্দ্যার স্ত্রী, নিকোল দাসী।

দোরাস্ত। আমার প্রিয় বন্ধু জুর্দা বাবু তুমি কেমন আছ বল দেখি?

জু। আপনার আশীর্ব্বাদে বেশ আছি মশায়।

দো। আর ঠাকরুণ উনি কেমন আছেন?

স্ত্রী। ঠাকরুণ এক রকম আছেন।

দো। একি! জুর্দ্যা, তোমাকে আজ ভয়ানক ভদ্র দেখতে হয়েছে!

জু। এই দেখুন।

দো। এই পোষাকে তোমাকে বড় ভাল দেখাচ্চে—রাজ-দরবারে যত যুবারা আসে তাদেরও এত ভাল দেখায় না।

জু। আঁা আঁ্যা।

স্ত্রী। (জনান্তিকে) ও লোকটা চুল-কোনির জায়গা বুঝে চুলকে দিচ্চে।

দো। আচ্ছা ফেরো দিকি, বাঃ পিছন দিকটাও বড় চমৎকার।

স্ত্রী। (জনান্তিকে) সামনেও যেমন, পিছনেও তেমন—চৌকোশ পাগল।

দো। মাইরি, জুর্দ্যা, আজ তোমাকে দেখ্‌বার জন্য আমি ভারি অধৈর্য্য হয়েছিলুম। পৃথিবী মধ্যে তোমাকে আমি যে রকম শ্রদ্ধা করি এমন আর কাউকে না, আর আজ এই সকাল বালা রাজ-দরবারে তোমার কথা পেড়েছিলুম।

জু। মশায় আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ (স্ত্রীর প্রতি) কি বলচে শুনেছ, রাজ-দরবারে!

দো। টুপি মাথায় দেও না।

জু। আপনার সামনে টুপি মাথায় রাখাটা বেয়াদবি হয়।

দো। না না না না টুপি পর আমাদের মধ্যে আবার লৌকিকতা কি?

জু। মশায়—

দো। জুর্দ্যা আমি বলচি টুপিটা পর, তুমি হচ্চ আমার বন্ধু।

জু। আমি মশায়ের দাস।

দো। তুমি যদি টুপি মাথায় না রাখ, তা হলে আমিও আমার টুপি খুলে ফেলব।

জু। (টুপি পরিয়া) বিরক্ত করা চেয়ে আমি অভদ্র হতেও রাজি আছি।

ডো। তুমি তো জানই আমি তোমার ধারি।

স্ত্রী। (জনান্তিকে) হাঁ, সে খুব জানি।

দো। অনেক সময়ে তুমি আমাকে মুক্ত হস্তে ধার দিয়েছ, আর আমি তার জন্য যে ভারি বাধিত আছি তা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কচ্চি।

জ্‌। মশায় আপনি ঠাট্টা কচ্চেন।

দো। না না, আর ধার আমি শুধ্‌তেও জানি। আর লোকের উপকার কি রকম করে স্বীকার করতে হয় তাও বিলক্ষণ জানি।

জ্‌। সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই মশায়।

দো। তোমার ঋন থেকে এখন আমি মুক্ত হতে ইচ্ছে কচ্চি, আর সেই জন্য হিসেব নিকেশ কর্‌তে তোমার এখানে আজ এসেছি।

জ্‌। (স্ত্রীর প্রতি মৃদু স্বরে) স্ত্রী, এখন দেখ, তোমার কত দূর বোঝবার ভুল।

দো। যত শীঘ্র পারি আমি লোকের ধার শুধে ফেল্‌তে ভালবাসি।

জ্‌। (স্ত্রীর প্রতি মৃদু স্বরে) আমি তো তখন তোমাকে বলিছিলুম।

দো। দেখা যাক্‌ এখন তোমার আমি কত ধারি।

জ্‌। (স্ত্রীর প্রতি মৃদু স্বরে) এই দেখ দিকি তোমার সন্দেহ করাটা কি পাগলামি।

দো। তুমি যত টাকা আমাকে ধার দিয়েছিলে, তা কি তোমার বেশ মনে আছে ?

জ্‌। হাঁ বোধ হয় মনে আছে। আমি একটি চিরকুটে তা টুকে রেখেছি। এই দেখুন। একবার আপনাকে ২০০ লুই দি।

দো। তা সত্যি।

জ্‌। আর একবার ১২০ লুই।

দো। হাঁ।

জ্‌। আর একবার ১৪০ লুই।

দো। ঠিক বলেছে।

জ্‌। এই সব শুদ্ধ ৪৬০ লুই, তার দাম হচ্চে ৫০৬০ পাউণ্ড।

দো। হিসেব খুব ঠিক্‌। ৫০৬০ পাউণ্ড।

জ্‌। তার পর, ১৮৩২ পাউণ্ড আপনার পালক-বিক্রি ওয়ালাকে দেওয়া যায়।

দো। ঠিক্‌।

জ্‌। ২৭৮০ পাউণ্ড আপনার দর্জিকে দেওয়া যায়।

দো। তা সত্যি।

জ্‌। ৪৩৭৯ পাউণ্ড, ১২ সু, ৮ দেনিয়ে আপনার দোকানদারকে দেওয়া যায়।

দো। ভাল। ১২ সু, ৮ দেনিয়ে। হিসেব ঠিক আছে।

জ্‌। আর ১৭৪৮ পাউণ্ড, ৭ সু, ৪ দেনিয়ে আপনার ঘোড়ার জিন্‌ বিক্রীওয়ালাকে দেওয়া যায়।

দো। ও সব ঠিক্‌। সব শুদ্ধ্‌ কত হল ?

জ্‌। সবশুদ্ধ্‌ হচ্চে ১৫৮০০ পাউণ্ড।

দো। মোট ঐ ঠিক্‌ বটে। ১৫৮০০ পাউণ্ড। আর ২০০ পিস্তোল আমাকে দিয়ে ঐ হিসেবে যোগ ক'রে দেও। তা

হলে মোট ঠিক্ হল ১৮০০০ ফ্র্যাঙ্ক, এক দিনেই আমি এই সমস্ত টাকা শুধে ফেলব।

স্ত্রী। (জুর্দ্যার প্রতি মৃদু স্বরে) এখন দেখ দিকি আমি ঠিক্ আন্দাজ করেছিলুম কি না?

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদু স্বরে) চুপ্।

দো। যে টাকার কথা বল্লুম সে টা কি দিতে তোমার অসুবিধা হয়?

জু। অ্যাঁ! না।

স্ত্রী। (জুর্দ্যার প্রতি মৃদু স্বরে) ও লোকটা তোমাকে কামধেনু পেয়েচে।

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে) চুপ কর।

দো। যদি তোমার অসুবিধে হয়, তা হলে বল আমি অন্যত্র চেষ্টা করি।

জু। না, মশায়।

স্ত্রী। (জুর্দ্যার প্রতি মৃদুস্বরে) তোমাকে সর্ব্বস্বান্ত না করে ও ক্ষান্ত হচ্চে না।

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে)—চুপ কর আমি বল্‌চি।

দো। আমাকে বোল্লেই হয় তোমার অসুবিধে হচ্চে।

জু। না না, মশায়।

স্ত্রী। (জুর্দ্যার প্রতি মৃদুস্বরে) এ একজন আসল জুয়োচোর।

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে) চুপকর বলচি।

স্ত্রী। (জুর্দ্যার প্রতি মৃদুস্বরে) তোমার শেষ পয়সাটি পর্য্যন্ত ও শুষে নেবে।

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে) তুমি কি চুপ করবে?

দো। এমন অনেক লোক আছে যারা আমাকে আহ্লাদের সহিত টাকা ধার দেবে, কিন্তু তুমি নাকি আমার প্রধান বন্ধু, তাই মনে করলুম যদি অন্য জায়গায় ধার করতে যাই তাহলে তোমার প্রতি অন্যায় করা হবে।

জু। আমার উপর মশায়ের যথেষ্ট অনুগ্রহ—এখনি আপনার কাজ নিকেশ ক'রে দিচ্চি।

স্ত্রী। (জুর্দ্যার প্রতি মৃদুস্বরে) কি! আবার তুমি ওকে ধার দিতে যাচ্চ?

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে) কি করা যায়? অমন বড়লোক, আর যে ব্যক্তি আজ সকালে আমার কথা রাজার কাছে বলেচে তার কথা কি অগ্রাহ্য করতে পারা যায়?

স্ত্রী। (জুর্দ্যার প্রতি মৃদুস্বরে) যাও যাও—তুমি খুব ওর ফাঁদে পড়েছ যা হোক্।

---

৫ ম দৃশ্য।

দোরান্ত, জুর্দ্যার স্ত্রী, নিকোল।

দো। তোমাকে ভারি বিমর্ষ দেখচি যে, তোমার হয়েচে কি ঠাকরুণ?

জু-স্ত্রী। আমার আর যাই হোক, আমার মাথা ঠিক আছে।

দো। তোমার মেয়েকে দেখচিনে যে, তিনি কোথায়?

জু-স্ত্রী। আমার মেয়ে যেখানে আছে, সেই খানেই আছে।

দো। তাঁর শরীর গতিক কেমন চলচে?

জু-স্ত্রী। দু পায়ের উপর ভর দিয়ে।

দো। রাজার বাড়ি যে নাচ ও প্রহসন

হবে তা দেখতে এর মধ্যে কি একদিন তোমার মেয়েকে নিয়ে যাবে না ?

জু-স্ত্রী। হাঁ, নিশ্চয়! হাস্‌তে আমাদের ভারি ইচ্ছে আছে—আমাদের ভারি হাস্‌তে ইচ্ছে আছে।

দো। তুমি যেমন সুন্দরী ও রসিকা ছিলে. তাতে বোধ হচ্চে তোমার যৌবন কালে তোমার অনেক গুলি প্রণয়ী ছিল।

জু-স্ত্রী। ওমা কি হবে; তুমি বল কি ? এর মধ্যেই কি তবে আমি বুড়ি হয়ে গিয়েছি—আমার কি শিরকম্প উপস্থিত হয়েছে না কি।

দো। ঠাকরণ আমাকে মাপ করবে তোমার যে অল্প বয়েস সেটা আমি ভুলে গিয়েছিলুম—অনেক সময় অন্য মনস্কে আমি কি ভাবতে কি ভাবি—আমার এই অভদ্রতার জন্য মাপ করবে।

---

৬ ষ্ঠ দৃশ্য।

জুর্দ্যাঁ, জুর্দ্যাঁর স্ত্রী, দোরান্ত, নিকোল।

জু। (দোরান্তের প্রতি) এই নিন ২০০ লুই।

দো। জুর্দ্যাঁ আমি তোমাকে নিশ্চয় ক'রে বলচি যে আমি তোমারই, আর রাজদরবারে তোমার যাতে কোন উপকার করতে পারি তার জন্য আমি অধৈর্য্য হয়েচি।

জু। আমি আপনার কাছে খুবই বাধিত আছি।

দো। যদি আপনার গিন্নি ঠাকরণ রাজবাড়ির নাটক দেখতে ইচ্ছে করেন তাহলে আমি তাঁর জন্য ভাল ভাল জায়গা ঠিক করে রাখি।

জু-স্ত্রী। আমি তার জন্য বাধিত হলুম।

দো। (জুর্দ্যাঁর প্রতি মৃদুস্বরে) আমাদের বেগমও আজ বিকেলে নাচ দেখতে ও আহার করতে এখানে আসবেন—চিঠিতে তো সে বিষয়ে তোমাকে আগেই খবর দিয়েছিলেম। অনেক বলে কয়ে তাঁকে এই নিমন্ত্রণে আসতে মত করিয়েছি।

জু। আসুন আমরা একটু দূরে যাই, তার কারণ আছে।

দো। আট দিন হল তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। আর তুমি তাঁকে উপহার দেবার জন্য যে হীরেটা আমার হাতে দিয়েছিলে, সে বিষয়ের খবরটা তোমাকে তাই দিতে পারি নি; কিন্তু তাঁর সঙ্কোচ ভাংতে আমার ভয়ানক কষ্ট হয়েছিল—আর এত দিন পরে সবে আজ তিনি ঐ উপহার নিতে সম্মত হয়েচেন।

জু। তাঁর সে জিনিসটা কেমন লাগল ?

দো। ভয়ানক ভাল লেগেচে; আর ঐ হিরেটি যে রকম সুন্দর তাতে তোমার উপরে যে তাঁর খুব টান হবে তা আমার বেশ বোধ হচ্চে।

জু। ভগবান যেন তাই করেন।

জু-স্ত্রী। (নিকোলের প্রতি) ওলোকটা একবার এলে ছিনে জোঁকের মত ওকে আর ছাড়তে চায় না।

দো। ঐ উপহারের মূল্য কত, আর তোমার ভালবাসা কত দূর, সমস্ত তাকে আমি খুলে বলেছি।

জু। আপনি আমার প্রতি কতই অনুগ্রহ কচ্চেন—আর, আপনার মত বড় লোক আমার জন্য যে এতদূর নীচতা স্বীকার কচ্চেন এই মনে ক'রে আমি ভারি লজ্জিত হচ্চি।

দো। তুমি বল কি? বন্ধুদের মধ্যে কি এসব সঙ্কোচ হওয়া উচিত? আর আমারও যদি একদিন এই রকম সুবিধে উপস্থিত হয়, আমার হয়ে কি তুমিও ঠিক্ তাহলে এই রকম কর না?

জু। ও! নিশ্চয়ই আহ্লাদের সহিত।

জু-স্ত্রী। (নিকোলের প্রতি) ও লোকটা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ আমার মনে যেন একটা ভার চেপে থাকে।

দো। বন্ধুর যখন কোন উপকার করতে হয় তখন আমি আর কিছুই মানি নে। যে সুন্দরী বেগমের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, যখন শুনলুম তার উপর তোমার অনুরাগ হয়েছে, তখনই তোমার প্রেমে সাহায্য করতে আমি নিজেই তোমার কাছে অগ্রসর হলুম।

জু। তা সত্যি। আপনার এই সকল অনুগ্রহে আমি একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিচি।

জু-স্ত্রী। (নিকোলের প্রতি) লোকটা কি যাবে না?

নিকোল। দু জনে একত্র হলে ওঁরা বেশ থাকেন।

দো। তাঁর মন ভেজাবার জন্য তুমি বেশ উপায় অবলম্বন করেছ। স্ত্রীলোকদের জন্য খরচ পত্র করলেই, স্ত্রীলোকেরা সন্তুষ্ট হয়; তোমার গান, তোমার ফুলের তোড়া, তোমার আতস বাজি, তোমার হিরে যা উপহার দিয়েছ, এই সকলে যেমন কাজ করেচে, এমন কাজ হাজার মুখের কথাতেও হয় না।

জু। তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করবার জন্যে আমি কি না খরচ করতে পারি। বড় ঘরের স্ত্রীলোকদের আমার বড় রূপসী বলে মনে হয়, আর এই মান কেনবার জন্য আমি সর্ব্বস্ব দিতে পারি।

জু স্ত্রী। (নিকোলের প্রতি চুপি চুপি) দু জনে না জানি এত কি কথাই হচ্চে? যা দিকি নিকোল, আস্তে আস্তে একটু শুনে আয় দিকি।

দো। আজ তুমি মনের সাধে তাঁকে দেখতে পাবে, দেখলে তোমার চক্ষু জুড়িয়ে যাবে।

জু। আরও স্বাধীন থাক্‌বার জন্য একটা ফিকির করেচি—আজ আমার স্ত্রীকে আমার বোনের বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে পাঠাচ্চি সমস্ত বিকেল ব্যালাটা সে সেখানে কাটাবে।

দো। বেশ বুদ্ধির কাজ করেছ। তিনি থাকলে আমাদের বাধা হত। রাঁধবার জন্য আর নৃত্য-নাট্যের জন্য যা কিছু দরকার আমি সব হুকুম দিয়েচি—এই নৃত্যনাট্যটা আমার নিজের রচনা—আমার রচনা যে রকম, কাজে যদি ঠিক সেই রকম করতে পারে, তাহলে নিশ্চয় বলতে পারি—

জু। (নিকোল শুনিতেছে জানিতে পারিয়া তাহার গালে এক চপেটাঘাত)

আরে মাগি! তুই তো ভারি বজ্জাৎ (দোরান্তের প্রতি) আসুন আমরা এখান থেকে যাই।

---

৭ ম দৃশ্য।

জুর্দ্যার স্ত্রী, নিকোল।

নি। ঠাকরণ, শুনতে গিয়ে আমার বিলক্ষণ হয়েছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ওঁদের একটা কি চলচে। একটা কিসের কথা হচ্চিল তাতে ঠাকরণ তুমি যে থাক, এ তাঁদের ইচ্ছে নয়।

জু-স্ত্রী। দেখ নিকোল আজ বোলে নয় অনেক দিন থেকে আমার স্বামীর উপর সন্দেহ হয়েচে। একটা নিশ্চয় কি প্রেমের ব্যাপার আছে। এ যদি না হয় তো কি বলিচি—সে ব্যাপারটা কি আমার সন্ধান করে বের করতে হবে। কিন্তু এখন আমার মেয়ের বিষয় ভাবা যাক্। তুই তো জানিস, ক্লেওন্ত আমার মেয়েকে কতদূর ভাল বাসে। সেই ছেলেটিকে আমার বড় মনে ধরেচে, যদি আমি পারি তো আমার লুসিলকে তাকেই দেব।

নি। ঠাকরণ তোমার যে এরকম মত হয়েচে, তাতে আমিও ভয়ানক খুসি হয়েচি, কেন না, মনিবদের যদি তোমার মনে ধরে থাকে, তার চাকরকেও আমার ঠাকরণ মনে ধরেচে। আর আমার এই ইচ্ছে যে তাঁদের বিয়ের সময়, আমাদের বিয়ে হয়ে যায়।

জু স্ত্রী। আমি যা তোকে বল্লুম এখনি তাকে গিয়ে বল্, আর বল্ যেন এখনি সে এখানে আসে, তাহলে যাতে সে লুসিলকে পায়, আমরা দু জনে মিলে আমার স্বামীর কাছে বলব।

নি। ঠাকরণ আমি এখনি যাচ্চি। আমার এতে ভারি আহ্লাদ হচ্চে। এমন মনের মত হুকুম আমি কখন পাই নি।

---

৮ ম দৃশ্য।

ক্লেওন্ত্, কোবিয়েল, নিকোল।

নি। (ক্লেওন্তের প্রতি) বাঃ! ঠিক্ সময়ে দেখা হল, আমি একটা সুখবর নিয়ে এসেছি।

ক্লেওন্ত। দূর হ বিশ্বাস-ঘাতিনী, তোর কথায় আমি ভুলি নে।

নি। তোর এই রকম ব্যবহার—

ক্লে। দূর হ আমি বলচি, আর তোর মনিবকে বলিস্ যে সরল ক্লেওন্ত আর তার কথায় ভোলে না।

নি। এ কি রকম বদল? আমার কোবিয়েল, তুমিই বল দেখি এ সকলের মানে কি?

কো। তোর কোবিয়েল! হতভাগি কোথাকারে! দূর হ এখান থেকে—আমার চোখের সামনে থেকে দূর হ।

নি। তুইও এই রকম কল্লি ——

কো। দূর হ বলচি—তোর কথা শুনতে চাই নে।

নি। (স্বগত) বাঃ! এ দেখচি, একই বিছে দুজনকেই কামড়েছে। ঠাকরণকে সব কথা বলিগে যাই।

৯ দৃশ্য।

ক্লেওত্ত্‌—কোবিয়েল্‌।

ক্লে। কি! একজন প্রণয়ীর সঙ্গে কি না এই রকম ব্যবহার—আর যে প্রণয়ী সকল চেয়ে বিশ্বাসী ও অনুরক্ত!

কো। আমাদের দুজনের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করেছে তা অতি ভয়ানক।

ক্লে। এক জনের উপর যত দূর ভাল বাসা, যতদূর অনুরাগ হতে পারে তা আমি প্রকাশ করেছি। তাকে ছাড়া আর আমি কাউকেই ভালবাসি নে—সে বই আমার হৃদয়ে আর কেউ নেই; আমার সমস্ত যত্ন, সমস্ত বাসনা, সমস্ত সুখ তাকে নিয়েই; আমি তাকে ছাড়া কোন কথা কই নে, তাকে ছাড়া কোন ভাবনা ভাবিনে, তাকে ভিন্ন কোন স্বপ্ন দেখিনে—তাকে ছেড়ে নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ফেলি নে, তাতেই আমার হৃদয় বেঁচে আছে—আর এত ভালবাসার কি না শেষ এই উপযুক্ত পুরস্কার! দুদিন তাকে দেখি নি, আর এই দুদিন যেন দুশ বৎসর বলে মনে হচ্চিল—হটাৎ তার সঙ্গে সে দিন দেখা হল; তাকে দেখে আমার হৃদয় উথলে উঠল—আমার মুখে আহ্লাদ ফেটে পড়তে লাগল—আমি মনের আগ্রহে দৌড়ে তার কাছে গেলুম—আর সেই বিশ্বাসঘাতিনী আমার দিকে কি না একবার ফিরেও তাকালে না—যেন জন্মেও আমাকে দেখি নি, এই ভাবে চট্‌ করে আমার কাছ দিয়ে চলে গেল।

কো। আপনার যে কথা আমারও সেই কথা।

ক্লে। কোবিয়েল, বিশ্বাসঘাতক অকৃজ্ঞ লুসিলের কি আর জুড়ি আছে?

কো। আর সেই, মশায়, সেই হতভাগি নিকোলেরও কি জুড়ি আছে?

ক্লে। এত জ্বলন্ত ত্যাগ-স্বীকার ক'রে, এত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শেষটা কি না এই হল!

কো। এত সাধ্য সাধনা করে, রান্নাঘরে তার হয়ে কত কাজ করে শেষ কি না এই হল!

ক্লে। তার পদতলে কত না অশ্রু বর্ষণ করেচি!

কো। তার হয়ে পাতকুয়ো থেকে কত কলসি না জল তুলিচি!

ক্লে। নিজেকে যতদূর ভালবাসি তার চেয়ে তার উপর আমার জ্বলন্ত ভালবাসা।

কো। তার হয়ে, কতবার গরম হাঁড়ি নাবিয়ে দিয়ে আমি জ্বলে পুড়ে মরেছি।

ক্লে। এখন আমাকে দেখলে তাচ্ছিল্য করে পালিয়ে যায়।

কো। এখন আমাকে দেখলে নাক সিটকে পিছন ফেরে।

ক্লে। এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য খুব শাস্তি দেওয়া উচিত!

কো। এর জন্য খুব চড় কষিয়ে দেওয়া উচিত।

ক্লে। আমি তোমাকে বলচি, কোবিয়েল,—তার পক্ষ হয়ে আমাকে কখনো অনুরোধ কোরো না।

কো। আমি মশায়? তা কখন কোরব না।

ক্লে। ঐ বিশ্বাস-ঘাতিনীর দোষ কাটিয়ে আমার কাছে কিছু বোলো না।

কো। তার কোন ভয় নেই।

ক্লে। দেখ তোকে বলচি—হাজার যদি তার পক্ষ হয়ে তুই আমার কাছে বলিস্, তবুও কিছু হবে না।

কো। তা বলবার জন্য কার এত মাথা ব্যথা?

ক্লে। আমার এই রাগ কিছুতেই পড়তে দেব না—তার সঙ্গে আর কোন সংস্রব রাখব না।

কো। আমারও তাই মত।

ক্লে। ওর বাড়িতে যে নবাব সাহেব আসে সেই ওর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েচে—আমি বেশ দেখছি, বড় লোক দেখেই ওর চোখ ঝলসে গেছে। কিন্তু আমাকে ত্যাগ ক'রেছে বোলে ওযে জাঁক করচে তা আমি ওকে করতে দেব না—ও যতদূর করবে আমিও তত দূর করব।

কোবি। বেশ বলেছেন সব বিষয়েই আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল হচ্চে।

ক্লে। দেখ কোবিয়েল, আমার ঘৃণার একটু তুই সাহায্য করিস। আমার ভালবাসা তার জন্য আমাকে যতই কেন বলুক না, যাতে সেই ভালবাসার অনুরোধে আমার প্রতিজ্ঞা টলে না যায়, তার জন্যে আমাকে তুই সাহায্য করিস;—এমন ক'রে তার শরীরের বর্ণনা আমার কাছে কর, যাতে তার উপর আমার ঘৃণা হয়—আর শোন্ তার উপর আমার বিতৃষ্ণা জন্মাবার জন্য যত কিছু তার দোষ আছে সব খুটিনাটি করে আমার কাছে বল।

কো। তার কথা বলচেন। সে যে রকম কদাকার তার উপর আপনার কি ক'রে যে এত ভালবাসা হল ভেবে পাই নে! তার রূপ অতি সামান্য, ওর চেয়ে হাজার হাজার আপনার যুগ্যি রূপসী আপনি পেতে পারেন। প্রথমতঃ তার চোখ ছোটো।

ক্লে। তা সত্যি, তার চোখ ছোটো বটে, কিন্তু এমন জ্বলজ্বলে, এমন উজ্জ্বল, এমন তীক্ষ্ণ, এমন মর্ম্মভেদী চোখ আমি আর কোথাও দেখিনি।

কো। তার মুখটা বড়।

ক্লে। হাঁ। কিন্তু সে মুখেতে যেরকম সৌন্দর্য্য দেখা যায় সে-রকম সৌন্দর্য্য অন্য কোন মুখে দেখতে পাওয়া যায় না—আর সেই মুখ দেখলে কত যে ভালবাসার উদ্রেক হয় তা বলা যায় না।

কো। তার শরীরটা একটু বেঁটে।

ক্লে। কিন্তু তার গড়ন ভাল।

কো। তার চাল চোল ও কথাবার্ত্তায় কেমন সে একটা খাতির-নদারদ ভাব দেখায়।

ক্লে। তা সত্যি—কিন্তু সে-সবে কেমন একটা লাবণ্য আছে, আর তার ধরণ-ধারণ এমন মিষ্টি, আর কি একটা মোহিনী শক্তি আছে, কেমন চট্ ক'রে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে।

কো। আর তার মন—

ক্লে। কোবিয়েল, তার মনটি বড় কোমল।

কো। তার কথা বার্ত্তা—

ক্লে। তার কথা বার্ত্তায় মোহিত হয়ে যেতে হয়।

কো। তার কথাবার্ত্তা বড় গম্ভীর ধরণের।

ক্লে। অত খোলাখুলি আমোদ প্রমোদ কি তোমার ভাল লাগে? যে মেয়েগুল সব কথাতেই খিক্‌খিক্ ক'রে হাসে, সে মেয়েগুলকে কি ভাল লাগে?

কো। কিন্তু তার মত খাম-খেয়ালি লোক আর ভু-ভারতে নেই।

ক্লে। হাঁ, সে খামখেয়ালি বটে—সে কথা আমি মানি; কিন্তু সুন্দরীর সকলই শোভা পায়—সুন্দরীর ও-সব দোষ সহ্য করা যায়।

কো। এতদূর যখন হল, তবে বেশ বোঝা যাচ্চে আপনি চিরকালই তাকে ভাল বাসবেন।

ক্লে। আমি? বরং আমি মরে যাব। আগে আমি তাকে যে রকম ভাল বাসতেম, এখন আমি তাকে আবার তেমনি ঘৃণা করব।

কো। তাকে যদি অত ভাল মনে করেন তা হলে কি ক'রে করবেন?

ক্লে। এত যে ভাল, এত যে সুন্দরী, এত যে রূপসী, তবুও যে আমি তাকে ত্যাগ কচ্চি, ঘৃণা কচ্চি, এতেই কি আমার জ্বলন্ত প্রতিশোধ আরও প্রকাশ পাচ্চে না?

ক্রমশঃ

বিরহের দীপক-মল্লার।

মেঘমল্লার।

ঘন ঘোর বরষা, মেঘের হুড়ামুড়ি,
দিগঙ্গনা দিয়া আছে মুখ মুড়ি শুড়ি;
দিবসে অকাল সন্ধ্যা, সন্ধ্যায় রজনী;
চমকে বিদ্যুম্মালা গরজে অশনি।
টোলের রতন এক এ হেন সময়
একাকী আছেন বসি নিরানন্দময়।
নাশায় শুঁধিয়া ল'য়ে নস্য এক থাবা
উঁকি দেন বাহিরে হুঁকাটি ল'য়ে ডাবা।
সাঙ্গ করি' ছিলুম শেষের শোষ টানে
দেয়ালের গায়ে হুঁকা থো'ন সাবধানে।
গীত গোবিন্দের পুঁথি সযতনে খুলি,
আওড়ান অনুরাগে মিঠা মিঠা বুলি।

পড়িতে পড়িতে পুঁথি লেগে গেল ভাব,
ঘন ঘন নিশ্বাসের হ'ল আবির্ভাব।
অশ্রুজল-চসমার মধ্য দিয়া শেষে
টাহরিয়া ল'ন বর্ণ অতি কায়ক্লেশে।
অক্ষর পড়িতে তবু পরাজয় মানি,
উঁকি দিয়া বাহিরে বাঁধেন পুঁথি খানি।
ব্রাহ্মণের মুখখানি দেখি দুঃখ হয়,
প্রেয়সী নাহিক কাছে এ-হেন সময়।
ঘন ঘন নিশ্বাস উথলে ক্ষণেক্ষণ
প্রাণের ব্যথায় ব্যথী নাহি কোন জন।
বাদলের সঙ্গে তাঁর আঁখি দেয় যোগ
ব্রাহ্মণের না জানি কেন এ কর্ম্মভোগ।
বেড়ে দিব্য বাদল—চাসারা খুব খুসি,
কান্তাকান্তে করিছে কতকি ফুসাফুসি;
শর্ম্মার বুঝিতে নারি দুঃখের কারণ,
কিছুতেই অশ্রু তাঁর না মানে বারণ।
বুকের মাঝারে তাঁর ডোবা এক রতি,
তাহার ভিতরটিতে প্রাণের বসতি,
বল করি সেই প্রাণ বাহিরিতে চায়,
কিন্তু বাহিরিতে নারে এই বড় দায়।
নিশ্বাস বাহির হয় তাহার বদলে,
নয়ন ভাসিয়া যায় উষ্ণ ধারা-জলে।
বক্ষে হাত দিয়া কভু থামাইছে মন
গালে হাত দিয়া কভু চিন্তায় মগন,
ভালে হাত দিয়া কভু আড়া-পানে চায়
অদৃষ্টেরে একবার দেখিবারে চায়;
বলিবারে আছে তারে অনেক বচন,
"বলবান্ ব'লেই কি দুর্ব্বলে নিধন!"
কিন্তু সে যে অদৃষ্ট কে পায় তার দেখা,
ললাটে চুকেছে লিখে' ভাবনার রেখা।
আশ্রয় করিয়া কবি দ্বারের আড়াল
এই সব ব্যাপার নিরখে কিছুকাল।
বলে "ওকি—ও ঠাকুর? দ্বারোপান্তে তব
ময়ূর নাচিছে দেখি' জলধর নব;
চতকীর এ উল্লাস, কেতকীর বাস,
কদম্বের কেশর' র'বে কি বারোমাস?
দেবতার কান্না যবে ফুরাইয়া যাবে
উহাদের বিহনে আমার কান্না পাবে।
তুমি কিনা এখন কাঁদিছ ঘরে বসি!
কাঁদাইল যে তোমায় কে সে উরবশী?"
শর্ম্মা বলে "না উর্ব্বশী না মেনকা রম্ভা,
এক জন বিহনে হ'য়েছি হতভম্বা।
উরো-মাঝে আছে বসি—তারি পাকে যদি
উর্ব্বশী বলিতে চাও, তা'সে নিরবধি
আছয়ে হৃদি-মাঝারে না জানি বিরাম;
উর্ব্বশীই বলিয়া ডাকিব তার নাম।
উর্ব্বশী—হা—তুই মোরে ছাড়িয়া চলিলি!
বরষার ভরসা আমার তুই ছিলি—
রজনীর সজনী—সন্ধ্যার ছিলি জপ—
বুকের আছিলি সুখ—নারীর দরপ!
মহীপৃষ্ঠে, ধারাবাণ, জলধর ছুঁড়ে—
তোর কাল-বিরহ আমার বক্ষ জুড়ে।

জলে স্থলে ভেকের আনন্দ-কোলাহল
শ্রবণে আমার আজি ঢালে হলাহল।
শিলায় ছাইছে মেঘ মেদিনীর পীঠ,
হায় রে—আমার বক্ষে ছুঁড়েতেছে ইঁট।
ময়ূর নাচিতেছিস্ পাখনা তুলিয়া,
তার কি সে কেশজাল গেছিস্ ভুলিয়া?
এখন—এখন বৈ কি—নাচিবি খঞ্জন,
এ মুলুকে নাই আর সে তোর গঞ্জন,
যাহার অঞ্জন রেখা হৃদয়ে আমার
জাগিছে বিরহ নিশা করিয়ে আঁধার!
ঐ বা উর্ব্বসী মোর ঐ চলি' যায়
আলো করি সারা ধরা হাঁসির ছটায়!
পালায় এমনি দ্রুত নাহি যায় ধরা,
মিলায় বিদ্যুৎ সনে হ'য়ে অপ্সরা।
কি করি এখন তবে—হরি, হরি, হরি!
জীয়ন্তে মরিব কত গুমরি গুমরি।"
বলে কবি, এ "রোগের নাহি প্রতিকার
আবার আসিব—এবে করি নমস্কার।"

দীপক।

শর্ম্মার নিকট হ'তে মাগিয়া বিদায়
* এম্-এ-বন্ধু-সকাশে চলিল কবি রায়।
দেখে এম্-এ-বন্ধুবর নবীন কিশোর
চেয়ারে হেলান দিয়া ভাবে হ'য়ে ভোর,
শুষিয়া চুরট টানি নয়ন মুদিয়া,
ধূম উড়াইয়া, ছাই উড়ান ফুঁদিয়া।
খোলা বাইরণের পুঁথি বক্ষে ধরি' চাপি'
নয়ন আকাশ পানে উঠা'য়ে কদাপি
ঈষৎ হেলা'ন্ ঘাড় ভাবের আবেশে;
ধূমপত্রে পলিতা ধরা'ন্ অবশেষে।
কবিরে দেখিতে পা'ন্ এই অবসরে
সহাস্যে দাঁড়া'য়ে পাশে কুতুহল-ভরে।
"হ্যালো" বলি কবির হাতটি পাকড়িয়া
হা! হা! হা! হা! হাসিলেন পৃষ্ঠ থাবড়িয়া,—
"আশার অতীত এযে আজি অনুগ্রহ;"
কবি বলে "সে যা', হোক্ ঠিক কথা কহ
এই দশ মিনিট কোথায় ছিলে তুমি?
সরগে, না রসাতলে? ছার মর্ত্ত্যভূমি
তোমার পায়ের যোগ্য নহে কদাচন;
বোধ হয় যেন কারো কমল-লোচন
তোমায় সরগে তুলি জাদু-মন্ত্র-বলে
আছাড়িয়া ফেলিয়াছে ঘোর রসাতলে।"
এম-এ বলে "মনে মোর দেওয়া আছে চাবি,
কেমনে পশিলে তথা তাই আমি ভাবি।
ঠিক আঁচিয়াছ কিন্তু, সাবাস তোমায়!
হেবেন * হইতে হেলে † ফেলেছে আমায়।
সেই ভালবাসা! উঃ সেই ভালবাসা!
কোথায় সে! এককালে করেছিনু আশা
ধমনিতে ধমনিতে শিরায় শিরায়

---

* M. A.

* Heaven.
† Hell.

বহিবে তাহার স্রোত অজস্র ধারায়,
রোমে রোমে সঞ্চারিয়া জ্বলন্ত তড়িৎ,
হৃদয়ের অন্তস্তল করি' আলোড়িত!
সে আশার বাসা এবে গিয়াছে ভাঙিয়া—
ভাঙিয়া গিয়াছে হিয়া শতধা হইয়া!
উঁকি দিয়া দেখ যদি হৃদয় আমার,
নিরখিবে ছিঁড়ি খুঁড়ি তন্ত্রী সেথাকার
দাপুটিয়া বেড়াইছে নিরাশার বায়ু!
উপাড়িয়া ফেলিতেছে মরমের স্নায়ু!
এই যে আমার দেহ রক্ত-মাংস ময়
ইহার ভিতরে এযে জ্বলন্ত হৃদয়,
হৃদয়ের মাঝারে এই যে মর্ম্ম খানি,
ইহার মাঝারে—যারে বলে মহাপ্রাণী,
তাহার ভিতরকার প্রত্যেক ধমনী,
তাহার ভিতরকার স্নায়ুর কাঁপনি
তাহার ভিতরকার অণু তস্য অণু
জ্ব'লে হ'ল ছারখার—ম'নু, ম'নু, ম'নু!
প্রাণের কাঁদুনি মোর তুমি কি শুনিবে?
যদি শুন তাহাতে কি মনোযোগ দিবে?
মনোযোগ দেও যদি বুঝিবে কি তাহা?
বুঝিয়াও বন্ধু তুমি বলিবে কি "আহা?"
"আহা" বল যদি বা—মুখেরি শুধু কথা
না মর্ম্মের উচ্ছ্বসিত মমতার ব্যথা?
দেখি আগে উত্তর কি দেও তুমি এর,
পরে বলিবার কথা আরো আছে ঢের।
তোমার সহানুভূতি পাইলে দোয়ার,
হইবে হৃদয়-তন্ত্রী সপ্তমে সোয়ার"।
"আর না" বলিল কবি "পায়ে ধরি ক্ষম'
হাঁপ ছাড়ি ঠাণ্ডা হও, বিরম,' বিরম'!
আর না—বুঝেছি সব, হইয়াছে—থামো!
উঠেছ সপ্তম স্বর্গে মর্ত্ত্যে এবে নামো!
সহা-অনুভূতিকে করি হে নমস্কার—
প্রকাণ্ড শব্দেরি বোঝা, অর্থ বোঝা ভার!
মুখাগ্রে ভারতী তব জ্বলন্ত আগুন!
সরস্বতীর ঘাড়ে চেপেছে বা খুন!
প্রকাশি' সম-বেদনা ধরা যদি দিই
উঁহার এ অবস্থায়,—হয়েছে তবিই!
শুনেছি দীপক রাগ আলাপিল যেই
গায়ক হইল ভস্ম সেই মুহূর্ত্তেই,
তোমার মুখ নির্গত জ্বলন্ত অনলে
দিব্য তুমি দেখিতেছি রয়েছ কুশলে!
নিজে খুব জ্বল না—জ্বলিতে যদি হয়,
রাজ্য-শুদ্ধ জ্বালাবে সেইটি ভাল নয়।"
বলে এম-এ "কি বুঝিবে তুমি মাথা মুণ্ড
He jests at scars who never felt the wound-ও।"
কবি বলে"চেষ্টা নেই—যাবে কিসে জ্বালা?
হাহুতাস কেবল বৈত না জপমালা!
বলি শুন কিসে হবে রোগের দমন
তুমিই না ব'লে থাকো মস্তিষ্কেই মন,—
মনের অগুন তব মস্তকেরই গুণ,
দাবদগ্ধ হ'য়ে সব মরিছে উকুন!

মস্তকে সলিল সেক ক্রমাগত চাই
তা'ভিন্ন উপায় নাই বন্ধু ও-হে ভাই!
তাই কর তাতেও না পাও যদি স্বাস্তি,
কালিঘাটে-স্বস্ত্যয়ন বিনা গতি নাস্তি।"
এম্ এ বলে "Don't know what
you mean by স্বস্ত্যন!
To be or not to be it is the
question.
রই কিম্বা না রই ইহাই এবে প্রশ্ন।"
কবি বলে "ও প্রশ্নের সদুত্তর 'yes no'
এর বেশী ইংরাজী আমার ঘটে নাই
মানে মানে এখন বিদায় হই ভাই।"

হরিদ্বার হইতে পত্র।

আমি যখন হরিদ্বারের মেলা দেখিতে যাই, তখন তোমার এক পত্র পাইয়াছিলাম। সে পত্র এখনো আমার সঙ্গে আছে। তাহাতে তুমি আমাকে দেশে ফিরিয়া যাইতে বিশেষ রূপে অনুরোধ করিয়াছিলে—তুমি লিখিয়াছিলে যে "কত দিন আর তুমি জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সকল অবহেলা করিয়া হিমালয়ের বিজনে বিজনে ভ্রমন করিয়া বেড়াইবে? সমস্ত সমাজ বন্ধন ছিঁড়িয়া অমন দূরে দূরে নিতান্ত অনাথের মত জীবনধারণে সুখও নাই, শান্তিও নাই।" কিন্তু ভাই বাঙ্গালী জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য কি? বাঙ্গালী জীবনের সামান্য উদ্দেশ্যই বা কি? আমি ও বিষয়ে বিস্তর ভাবিয়া দেখিয়াছি—কিন্তু এই ব্যতীত আমার ত আর কিছুই সিদ্ধান্ত হয় না যে,—আমাদের জীবন কেবল নিশ্বাস-প্রশ্বাস মাত্র, ইহার কোন মহৎ বা সামান্য উদ্দেশ্য নাই।

বাঙ্গালীর জীবন ত জীবনই নহে—ঐ নির্জীব ঘুমন্ত জীবনের আবার উদ্দেশ্য কি? ধন উপার্জ্জন—পরনিন্দা—আর পিণ্ডদানের উপায় সংস্থাপন করা ব্যতীত সে জীবনের আবার উদ্দেশ্য কি? তুমি হয় ত আমার এই সকল কথায় নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইতেছ, কিন্তু আমি প্রকৃত কথা না বলিয়াই বা কি করি? তুমি ত জানই যে তোমাতে আমাতে এক সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন করিয়া বাঙ্গালী জীবন ও বাঙ্গালী সমাজ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া কতবার হাসিয়াছি, কতবার কাঁদিয়াছি, কতবার ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছি। সমস্ত বঙ্গ সমাজ যদি একটি প্রকৃত শরীর রূপে কল্পনা করিয়া লই, তা হোলে এ কথা স্পষ্টাক্ষরে আমি বলিতে পারি যে, সে শরীরে মস্তিষ্কও নাই, হৃদয়ও নাই! যদি একটু মাত্রও মস্তিষ্ক থাকে ত তাহা কেবল অন্যের সর্ব্বনাশ করিতে চালিত হয়, যদি

একটুমাত্রও হৃদয় থাকে, ত সে কেবল অন্যের দুঃখে ও যাতনায় প্রচণ্ড হর্ষে স্ফূর্ত্তি পায়! আমি ব্যক্তি বিশেষের কথা বলিতেছি না, কারণ আমি দুই তিন জন বাঙ্গালীকে অ-বাঙ্গালী বলিয়াই ভক্তের ভাবে ভক্তি করিয়া থাকি, কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালী সমাজের কথাই কহিতেছি! আজ—এই রাত্রে—ঐ সুন্দর ধ্রুব নক্ষত্র হইতে যদি কোন জীবন্ত পুরুষ আসিয়া আমাকে বলে যে "সূর্য্য মণ্ডলের একটি গ্রহে এক প্রকার জীব দেখিলাম, যাহা নরকের কীট অপেক্ষাও হীন, কিন্তু আস্ফালনে বাসুকী সদৃশ;—যাহারা বিকট মূর্খ হইলেও আপনাকে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া সমস্ত পৃথিবীকে দৃক্‌পাতই করে না, পরচর্চ্চাই যাহার ব্যবসা এবং পর নিন্দাতেই যাহার প্রমোদ;—শত্রু পদ দলিত হইয়াও যাহারা 'স্বাধীনতা স্বাধীনতা' করিয়া চীৎকার করিতে ছাড়ে না,—এমন কি,—সেই শত্রুর পাদুকা-পেষণে শরীরের প্রত্যেক পঞ্জর যে সময় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে সেই সময়েই জীবন ভিক্ষা করিতে করিতে সাধু পয়ার ও ত্রিপদীতে—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে" ঊর্দ্ধ কণ্ঠে আওড়াইতে কখনই ভুল করে না;—আমি সূর্য্যমণ্ডলের একটি গ্রহে এইরূপ এক প্রকার জীব দেখিয়া আসিয়াছি।"—এই কথা শুনিবা মাত্রই আমি বুঝিতে পারিব যে ধ্রুব নক্ষত্রের সেই পরিব্রাজক পুরুষ সূর্য্যমণ্ডলের পৃথিবী রূপ গ্রহেতে ভারতবর্ষের বঙ্গদেশ দেখিয়া আসিয়াছে। বঙ্গদেশের জলবায়ুর গুণেই হোক—বঙ্গবাসীদের কৌলীক অমানুষত্ব বশতঃই হোক,—বদ্ধমূল কুসংস্কারের প্রভাবেই হোক,—অথবা শৈশবাবস্থা হইতে শিক্ষার দোষেই হোক, বঙ্গবাসীরা যে কখন বিনীত অথচ মহান কোমল অথচ গম্ভীর—সুস্নিগ্ধ অথচ তেজীয়ান মনুষ্যত্বে পরিণত হইতে পারিবে, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না। চারিদিকের সকল বিষয়ের কার্য্য-কারণ জানিতে একটি শিশুর পর্য্যন্ত যে কৌতুহল আছে, হাঁটিতে শিখিয়া পড়িয়া গিয়া আবার উঠিতে একটি শিশুর পর্য্যন্ত উদ্যম হয়, একটি অবিবাহিতা বঙ্গের বালিকাকে অন্যায়রূপে পরিহাস করিলেও তাহার যে ঊর্দ্ধফণাময় তেজস্বীতার ভাব হয়, একজন কৃতবিদ্য বাঙ্গালী পুরুষের সে কৌতুহল, সে উদ্যম, সে তেজস্বীতা নাই। বক্তৃতার বেদীতে এক জন বঙ্গবাসীকে উঠাইয়া দাও, অভিনয়ের রঙ্গ ভূমিতে তাহাকে ছাড়িয়া দাও, অপহৃত ভাবময় ছন্দহীন কবিতা তাহাকে লিখিতে দাও,—তুমি দেখিবে যে এক জন কৃতবিদ্য বঙ্গবাসী দেশহিতৈষীতাতে আদর্শ ও তেজস্বীতার মধ্যাহ্ণ-সূর্য্য স্বরূপ। কিন্তু তুমি তাহার হৃদয়ের ভিতরে প্রবেশ কর,—দেখিবে যে সে হৃদয়ে অকিঞ্চিৎকর দাস দাসীর পর্য্যন্ত কি বলে, সেই ভাবনা, সেই আশঙ্কা, সেই ভয়েই তাহা সমস্ত আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। যে স্বতঃ উৎসারিত সরলতা, যে অপ্রতিহত তেজস্বীতা, কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানে যে অকুতোভয়তা অথচ সহৃদয়তা,—যে সামঞ্জ-

সাতা অথচ উদারতার দ্বারা মানুষের মানুষত্ব নির্দ্ধারিত হয়, কয়জন বঙ্গবাসীতে তাহা সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়? তবে কেন আর তুমি বাঙ্গালী জীবনের উদ্দেশ্যের কথা আমাকে শুনাও? আমি বঙ্গ সমাজ হইতে যে সুদূরে রহিয়াছি—এই কি তোমার পরম আহ্লাদের বিষয় নহে? যেথানে পুরুষেরা লক্ষ্মী রূপা স্ত্রীলোকদিগকে মুসলমানদের মতন হীন পশু বলিয়া জ্ঞান করে, স্বামীরা আপন স্ত্রীদিগকে ক্রীত দাসী রূপে গণনা করে, পিতারা আপন সন্তানদিগকে "পুতুল বাজীর" পুত্তলিকাবৎ মনে করে, পরস্পর পরস্পরকে আপন শীকারের উচিত সামগ্রী ভাবিয়া তাহাকে অনুসরণ করে, সেই দুর্গন্ধ বায়ুময় সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কুচিত সমাজ ছাড়িয়া এই মহান হিমালয়ের উদার বক্ষে যে আজও পর্য্যন্ত আমি থাকিতে পারিয়াছি—ইহাই কি তোমার পরম আহ্লাদের বিষয় নহে? তুমি এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছ যে "বিজনে বিজনে আমি আর কত কাল ভ্রমন করিব?" কিন্তু, সহৃদয়! হিমালয়ের এই বিজন প্রদেশে প্রকৃত বিজনতা কোথায়?

* * * *

এই সমগ্র হিমাচলে বিজনতা কোথাও নাই! বঙ্গ সমাজে—শূন্য শ্মশান দেশে—অলক্ষিত উদাসীনের মত পরিভ্রমণ করা অপেক্ষাও এই হিমালয়ে বিচরণ করিতে যে কি আমোদ, তাহা তুমি কি বুঝিবে? মমতা-শূন্য "বঙ্গ-সমাজ অপেক্ষাও এই কঠোর হিমাদ্রীশিখর আমার স্পৃহনীয় সামগ্রী! এখানে স্বয়ং হিমাচলই আমার স্নেহময় পিতৃ-সদৃশ, কারণ তাঁহার উদার অঙ্কেই আমার সকল পার্থিব যাতনার উপশম হইয়াছে, এখানে প্রত্যেক নিহার-স্তম্ভই আমার সোদর-স্বরূপ, কারণ তাহাদিগকে দেখিয়া আমার হৃদয়ের শান্তি।—এখানে এই উত্তর আকাশের প্রত্যেক নক্ষত্রই আমার সখা-স্বরূপ, কারণ তাহাদের নিকটেই আমি আমার মনের সকল কথা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়া থাকি। বাস্তবিক, এই সুদূর হিমাদ্রী প্রদেশে ঐ সুদূর আকাশ-স্থিত একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রকে যতটা বন্ধুভাবে হৃদয়ের ভিতরে স্থান দিই, তত আর কাহাকেও দিতে ইচ্ছা করে না।

* * * *

শ্রী গিরিধর স্বামী।

ভারতী

মনুষ্যের জন্ম ও আসিয়ার বন্যা।

চতুর্থ যুগ বা বর্ত্তমান কাল।

ঠিক কোন সময়ে যে মনুষ্য জন্মিয়াছে তাহা নির্ণয় করা বড় দুঃসাধ্য। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনেক যত্ন করিয়াও এবিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তবে মনুষ্য যে হিমশৈলকালের পরবর্ত্তী এই মতটিই সাধারণতঃ পরিগৃহীত। কিন্তু কোন কোন গুহায় মৃত জন্তু-দেহ রাশির সহিত মনুষ্য নির্ম্মিত পুরাতন অস্ত্রাদি পাইয়া এবং অন্যান্য কারণে মনুষ্য হিমশৈলকালের পূর্ব্ববর্ত্তী ও চতুর্থ যুগের মামথ প্রভৃতি প্রকাণ্ড জন্তুগণের সমসাময়িক ইহাও অনেকে বলেন।

কার্কডেল গহ্বরে মনুষ্যের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় নাই, কিন্তু কেণ্ট-গহ্বরে বিলুপ্ত এবং আধুনিক জন্তু কঙ্কালের সহিত চর্ব্বিত অস্থি চূর্ণ, মনুষ্য হস্ত নির্ম্মিত অস্ত্র ও দগ্ধ অঙ্গার পাওয়া গিয়াছে। Rev. J. MacEnery বলেন গুহার যে Stalagmite * মৃত্তিকাস্তরের নিম্নে এই সকল অস্ত্রাদি পাওয়া যায় তাহার উপরে আবার আর একটি স্তর। হিমশৈলের পূর্ব্বে মনুষ্য না জন্মিলে অতি পুরাতন Stalagmite মৃত্তিকা নিম্নে কি প্রকারে মনুষ্য চিহ্ন আসিবে? কিন্তু ডাক্তার বক্ল্যাণ্ড বিশ্বাস করেন না যে Stalagmite মৃত্তিকা নিম্নে এই সকল অস্ত্রাদি ছিল। তাঁহার মতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রাচীন ব্রিটনেরা ঐ গুহায় চুল্লী নির্ম্মাণার্থে অস্ত্রাদি দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে যে সকল অস্ত্রাদি নিম্ন স্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল; সেই সকল অস্ত্রাদির উপর কালে আবার স্তর পড়িয়াছে।

* উপর হইতে জল চুয়াইয়া পড়িয়া গুহা অভ্যন্তরে যে চূণে মাটী উৎপন্ন হয় তাহার নাম ষ্ট্যালাগ্‌মাইট।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ফকনর ব্রিক্সহামের নূতন আবিষ্কৃত গুহা নিজে পরীক্ষা করিয়া এ সম্বন্ধে সন্দেহ ভঞ্জন করিতে সেখানে গমন করিলেন। এই গুহার প্রথম Stalagmite স্তর এক হইতে পনের ইঞ্চ পর্য্যন্ত স্থূল, ইহার নিম্নে দুই হইতে ৪ ফুট স্থূল গুহা-মৃত্তিকা-স্তর অশ্ব হস্তী গণ্ডার ভল্লুক হায়েনা হরিণ ইত্যাদি জন্তু কঙ্কাল পূর্ণ এবং তন্নিম্নে গুহার সর্ব্ব নিম্ন স্তর। যদিও এই গুহায় একটিও মনুষ্যাস্থি ছিল না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে পশু কঙ্কালের সহিত অস্ত্রাদি নিক্ষিপ্ত ছিল। একখানি ছুরিকার অতি সন্নিকটে গুহাশায়ী ভল্লুকের একটি পদ এরূপ ভাবে অবস্থিত ছিল যে এই দুই বস্তুর সমকালীত্বের কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহারা কোন সময়ে এই গুহাস্থিত হইয়াছে কে নির্ণয় করিবে? তাহা করিতে পারিলেই আদিম মনুষ্যের উৎপত্তির কাল স্থির করা যাইত।

ইহা ব্যতীত সমনদী তীরে চতুর্থ যুগের প্রারম্ভ-উৎপন্ন স্তরে এবং উদ্ভিদ-দেহাবশেষ মৃত্তিকায়, মনুষ্য হস্ত নির্ম্মিত প্রস্তর-অস্ত্র এবং আমিয়া নগর সন্নিহিত সাঁতাসালের কঙ্কর-গহ্বরে মনুষ্য গণ্ডাস্থি ও মনুষ্য দন্ত পাওয়া গিয়াছে। মনুষ্যচিহ্ন বিশিষ্ট-স্তরের মধ্যে শাঁতাসালের স্তর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু এই স্তর যে কত দিন পূর্ব্বের তাহা এখনো নির্ণীত হয় নাই। এ সম্বন্ধে কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে—সম নদীর উপকূল স্থিত মৃত্তিকাবশেষ উদ্ভিদ-স্তরের ন্যায় স্থূল স্তর হইতে ৭০০০ হাজার বৎসর লাগিবার কথা, সাঁতাসাল-স্তর তাহা হইতেও প্রাচীন, সুতরাং ৭০০০ বৎসর হইতেও ইহার বয়-ক্রম অধিক।

দুই এক শতাব্দী হইতে পৃথিবীর সকল স্থানেই প্রায় মধ্যে মধ্যে মনুষ্য নির্ম্মিত পুরাতন প্রস্তর অস্ত্রাদি পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু স্কান্ডেনেভিয়ার মত অন্য কোন স্থানে রীতিমত তাহাদের অনুসন্ধান হয় নাই।

স্কানডেনেভিয়ার তীরে স্তূপীকৃত শম্বুক খোলার যে সকল পর্ব্বত দেখা যায় তাহা মনুষ্যের প্রাচীনত্ব প্রমাণের আর একটি উপকরণ।

পূর্ব্বে মনুষ্যেরা আহারান্তে যে সকল শম্বুক জাতীয় জীবের খোলা ফেলিয়া দিয়াছে তাহাই স্তূপীকৃত হইয়া পর্ব্বতাকার হইয়া পড়িয়াছে। এই পরিত্যক্ত শম্বুক খোলা-রাশির পর্ব্বতাকার ধারণ করিতে বহুকাল সাপেক্ষ। এই পর্ব্বতে যদিও ধাতব কোন অস্ত্র দেখা যায় নাই কিন্তু পশু কঙ্কালের সহিত মৃত্তিকাপাত্র ও চকমকি প্রস্তর নির্ম্মিত ছুরিকাদি পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকার মাসাচুসেট এবং জর্জিয়া সীমা পর্য্যন্ত এইরূপ পশু কঙ্কাল ও অস্ত্রাদিসঙ্কুল শম্বুক-স্তর পাওয়া গিয়াছে। স্ক্যানডিনেভিয়ার প্রাণীবেত্তাগণ এই সকল অস্ত্রাদির নির্ম্মাণের কাল নির্ণয় করিয়া ইহা হইতে মনুষ্যের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা এই প্রকারে প্রস্তর, পিত্তল, লৌহ অস্ত্রাদির ব্যবহার কাল শ্রেণীবদ্ধ করেন—

প্রথম প্রস্তর ব্যবহার কাল।

দ্বিতীয় পিত্তল ব্যবহার কাল।

তৃতীয় লৌহ ব্যবহার কাল।

প্রস্তর অস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন স্তরে পাওয়া যায় সুতরাং প্রথমে মনুষ্য প্রস্তর অস্ত্রই নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছিল সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ প্রস্তর অপেক্ষা ধাতুকে আকরিক অবস্থা হইতে ব্যবহারোপযোগী করিতে শিক্ষা করা কাল সাপেক্ষ। তারপর রসায়ণ বিদ্যাবিত্তেরা জানেন যে লৌহকে ব্যবহার উপযোগী করিতে আরো অধিক শিক্ষার আবশ্যক। সহজে আকরিক লৌহকে ব্যবহারোপযোগী করা যায় না। সুতরাং প্রস্তর অস্ত্রাদি ৫০০০ হইতে ৭০০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত। এবং পিত্তল নির্ম্মাণ কাল ৩০০০ হইতে ৪০০০ পর্য্যন্ত। লৌহ আরো আধুনিক।

মনুষ্য যে মামথ হস্তীদিগের সমকালীন এবিষয়ে আরো একটি যুক্তি আছে। আসিয়া ও ইয়োরপের নানা স্থানের হ্রদে একরূপ বাসস্থান চিহ্ন পাওয়া যায়। বাঁশ, কাষ্ঠ প্রভৃতি জলের মধ্যে পুতিয়া সেই ভিত্তির উপর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তখন মনুষ্য বাস করিত। তীরে যাইবার আবশ্যক হইলে সেতু ফেলিয়া গমন করিত এবং ইচ্ছামত সে সেতু উঠাইয়া লইত। অরণ্য জন্তুর ভয়েই এইরূপ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবার সম্ভাবনা। সুইজরলণ্ডের হ্রদের এইরূপ বাস স্থানে অসংখ্য অস্ত্র ও মৃত্তিকা পাত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। জুরিজ ও কনস্ট্যানস হ্রদে কোদাল ও কেণ্ট জাতির ব্যবহৃত পাত্রাদি এবং এক-বৃক্ষের গুড়ি-নির্ম্মিত নৌকা পাওয়া গিয়াছে।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ের স্তরে এইরূপ মনুষ্য চিহ্নের কারণ হয় ত চিরকালই রহস্য থাকিবে। নিশ্চয় যে কবে মনুষ্য জন্মিয়াছে তাহা এখন পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই, হইবে কি না তাহাও বলা যায় না, তবে মনুষ্যের বয়ঃক্রম ৭০০০ বৎসরের ন্যূন নহে ইহাই একরূপ সম্ভব পর—কিন্তু বিশেষ প্রমাণ অভাবে এ সম্বন্ধে এখনো ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই।

মনুষ্য জাতির বয়স ছাড়া মনুষ্য সম্বন্ধে আরো অনেক গুলি প্রশ্ন উঠিতে পারে। প্রথমতঃ মনুষ্য কি প্রকারে উৎপন্ন? পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টির যে একটি ক্রম-উন্নতির নিয়ম দেখিতে পাই সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া নিকৃষ্ট জীব হইতে ক্রমশ মনুষ্য অভিব্যক্ত কিম্বা ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে একেবারে মনুষ্য সৃষ্ট হইয়াছে এই কথা লইয়া বিজ্ঞান জগতে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। এ দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা এ ক্ষুদ্র প্রস্তাবের সীমাবহির্ভূত। দ্বিতীয়তঃ, মনুষ্য কি? পশু হইতে মনুষ্যের প্রভেদ কোথায়? এ বিষয়ে আমরা এই বলিতে পারি, মানুষ বুদ্ধিমান; মানুষের ন্যায় অন্যায় বিবেচনা ক্ষমতাই পশু হইতে মানুষকে ভিন্ন করিয়াছে। কিন্তু কেবল মাত্র বুদ্ধিমান বলিলেই

মানুষের ঠিক সংজ্ঞা হইল না। বুদ্ধিতে অনেক সময় পশুদিগকে মনুষ্যের কাছাকাছি হইতে দেখা যায়, কিন্তু মনুষ্যের আর এমন একটি বিশেষ গুণ আছে যাহা পশুতে দেখিতে পাওয়া যায় না। চিন্তাশীলতাই মনুষ্যের সেই বিশেষ গুণ। সুতরাং মানুষ কি, ইহার উত্তরে সংক্ষেপতঃ এই বলা যাইতে পারে—মানুষ বুদ্ধিমান এবং চিন্তাশীল। এই দুই শক্তির বলেই মনুষ্য বাহ্য জগতের অধীশ্বর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা দ্বারাই মনুষ্য সমস্ত পৃথিবীকে দমনে রাখিয়া আবার মনকে মহৎ চিন্তার দ্বারা অত্যুচ্চে উঠাইতে সক্ষম হইয়াছে। ইহার দ্বারাই মনুষ্য কবি, ইহার দ্বারাই মনুষ্য ভাবুক—ইহার দ্বারাই মনুষ্য অঙ্কশাস্ত্র বিশারদ এবং অসীম ভাব ধারণা করিতে সক্ষম। এই চিন্তাশীলতা গুণেই নিউটনের "প্রিনসিপিয়া," লাপ্লাসের "মেকানিক সেলেস্ত" কালিদাসের শকুন্তলা সেক্সপিয়ারের ওথেলো লিয়ার ইত্যাদি রচিত।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে জঙ্গলবাসী বৃক্ষারোহী একজন অসভ্য মনুষ্য পিনেল নামক চিকিৎসকের নিকট আনীত হয়। এই মনুষ্য গাছে চড়িয়া থাকিত, এবং শুষ্ক পর্ণের উপর শয়ন করিত আর মনুষ্য দেখিলেই পলাইয়া যাইত। এক শীকারী ইহাকে দেখিয়া ধৃত করিয়া আনে। এ কথা কহিতে পারিত না, কিম্বা বুদ্ধির কোন লক্ষণ ইহাতে ছিল না। অ্যাভেরন নামক স্থান হইতে ইহা আনীত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম অ্যাভেরনস্থ অসভ্য প্রদত্ত হইল। এই আশ্চর্য্য জীব মানুষ কি না এই কথা লইয়া পারিসের পণ্ডিতেরা অনেক দিন ধরিয়া বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতবর ইটার্ড্ এই অ্যাভিরনের অসভ্য মনুষ্য সম্বন্ধে এক প্রীতিপ্রদ গল্প লিখিয়াছেন। "এই মনুষ্য কখন কখন বাগানে নামিয়া যখন ফোয়ারার এক প্রান্তে বসিয়া জলের দিকে অতি স্থির ভাবে চাহিয়া থাকিত তখন তাহার মুখে একটি অতি গম্ভীর দুঃখের ছায়া পড়িত। অনেক ক্ষণ ধরিয়া সে নিস্তব্ধে এইরূপে বসিয়া জল দেখিতে দেখিতে মাঝে মাঝে তাহার উপর ধীরে ধীরে ঘাস ও শুষ্ক পত্র ভাসাইয়া দিত, রাত্রিতে যখন পরিষ্কার জ্যোৎস্না তাহার গৃহে প্রবেশ করিত, সে উঠিয়া জানালায় আসিয়া অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ-অচল ভাবে ঘাড় নোয়াইয়া এক দৃষ্টে সেই জ্যোস্না দীপ্ত দৃশ্যের উপর চাহিয়া আনন্দ জনক চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়িত।" এই অসভ্য যে মানুষ তাহার কোন সন্দেহ নাই। এরূপ বুদ্ধি ও স্বপ্নময় ভাব—এরূপ ভাবুকতা, এক কথায় এরূপ চিন্তাশীলতা বানরের কখনই সম্ভবে না।

অসভ্য বানরবৎ মনুষ্যের আধুনিক সভ্যতায় আসিতে কত বৎসর লাগিয়াছে তাহা গণনা করিয়া স্থির করা অসম্ভব।

সেই আদিম উলঙ্গ অসহায় দুর্ব্বল মনুষ্যের যে ভয়ঙ্কর হিংস্র পশু ও প্রকৃতির ক্রোধের সহিত অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিয়া জীবন রক্ষা করিতে হইত, তাহার সন্দেহ

নাই। কিন্তু ঐরূপ দিনের ক্রমে শেষ হইল, সমাজিক গুণ সম্পন্ন মনুষ্যগণ পরস্পর স্বার্থলাভে উত্তেজিত ও দল বদ্ধ হইয়া শীঘ্রই প্রকৃতি ও পশুকে দমন করিতে কৃতকার্য্য হইল।

একদিকে ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাৎ অপরদিকে ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তুর দ্বারা স্থান হইতে স্থানান্তরে তাড়িত, ভয়ে কম্পমান, বিপদভারে আক্রান্ত অশিক্ষিত অসহায় মনুষ্যগণ প্রয়োজন বাধ্য হইয়া আত্ম রক্ষার্থে প্রথমে দলবদ্ধ, পরে পরস্পর সাহায্য লইয়া অস্ত্রশস্ত্র আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ, ও বাস স্থান প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিল। সর্ জন লবকের আদিম মনুষ্য নামক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে পারা যায়।

মনুষ্য সম্বন্ধে আর একটি প্রশ্ন এই, মনুষ্যজাতি এক পিতা মাতা হইতে উৎপন্ন কি না? এ সম্বন্ধে অনেক পুস্তক লিখিত হইয়াছে। অনেক প্রাণীবেত্তাদিগের মত, যে মনুষ্য এক পিতা মাতা হইতে প্রথমে উৎপন্ন, পরে স্থানাভাব হেতু সেই মনুষ্যের বংশাবলী যখন পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িল তখন জল বায়ুর বিভিন্নতা বশতঃ সেই এক বংশাবলী হইতেই ভিন্ন দেশে ভিন্ন জাতির উৎপত্তি হইল। কিন্তু আদিম আমেরিকাবাসী চীন কাফ্রী ইয়োরোপ ও আসিয়াবাসী সকলেই বাস্তবিক এক বংশোদ্ভূত কিনা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে ভাষার সমালোচনা দ্বারা ইহা নিশ্চয় প্রমাণ হইয়াছে যে ইয়োরোপ ও আসিয়ার অনেক জাতি এক পিতা মাতা সম্ভূত। এই এক—মূল উৎপন্ন জাতিরাই আর্য্য নামে আখ্যাত। আসিয়ার শ্যাম শোভাশালী উর্ব্বর ভূমি ককেসস পর্ব্বতের নিম্ন প্রদেশ মনুষ্য জাতির, অন্তত আর্য্য জাতির জন্মস্থান ইহাই সম্ভব পর মনে হয়। সমস্ত দেশের আর্য্যজাতিদের সাধারণ প্রচলিত প্রবাদই ইহার সাক্ষী স্বরূপ।

আসিয়া-বন্যা।

বহুদূর বিস্তৃত পর্ব্বত শ্রেণী উত্থানই আসিয়ার বন্যা-কারণ। এই পর্ব্বত শ্রেণী ককেসস পর্ব্বত শ্রেণীর অংশ। পৃথিবীর অভ্যন্তর শীতল হইয়া সঙ্কুচিত হইবার সময় ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া উত্তপ্ত পদার্থ নিঃসৃত হইতে লাগিল। অন্যান্য আকরিক পদার্থের সহিত নির্গত জলীয় বাষ্প, স্তম্ভাকারে উঠিয়া প্রথমে আকাশে মেঘ রূপে জমিতে লাগিল, পরে সেই বৃষ্টিবারি এবং ভূগর্ভ নিঃসৃত কর্দ্দম দ্বারা আসিয়া প্লাবিত হইল। এই উত্তপ্ত পদার্থ উৎপাতের আমরা দুই প্রকার ফল দেখিতে পাই, একটি ক্ষণস্থায়ী, একটি চিরস্থায়ী। উপরোক্ত অগ্ন্যুৎপাৎ হেতু বহু দূর বিস্তৃত তখন যে বন্যা হইয়াছিল, তাহাই ক্ষণস্থায়ী, এবং বহুদূর ব্যাপী ১৭৩২৩ ফিট উচ্চ যে আরারট পর্ব্বত দেখিতে পাই ইহাই চিরস্থায়ী সেই অগ্ন্যুৎপাৎ চিহ্ন। প্রায় সকল জাতির মধ্যেই এই বন্যার উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদ পুরাণ ইত্যাদি প্রাচীন আর্য্যজাতির সকল গ্রন্থেই তো এই কথার উল্লেখ আছে,

এমন কি সংস্কৃত মহাভারত পাঠে জানা যায় মনু যে শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিয়াছিলেন তাহা বেদব্যাসের সময় নৌবন্ধন নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইয়োরপীয় ধর্ম্ম গ্রন্থ বাইবেলের প্রথম খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে এ সম্বন্ধে বিশেষ যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

১১। 'নোয়ার ৬০০ বৎসর বয়সে বৎসরের দ্বিতীয় মাসের ১৭ দিবসে মহাসমুদ্রের উৎস ভঙ্গ হইল এবং স্বর্গের দ্বার সকল উন্মুক্ত হইল—

১২। "এবং ৪০ দিনরাত্র অবিশ্রান্ত পৃথিবীতে বৃষ্টি ধারা পড়িতে লাগিল।

... ...

১৭। "এবং ৪০ দিন পৃথিবীতে বন্যা বহমান হইল। এবং জল বৃদ্ধি সহকারে নোয়ার আর্ক নৌকাকে ভাসাইয়া পৃথিবীর উপর উঠাইল।

... ...

১৯। "এবং জল অত্যন্ত বাড়িয়া, আকাশের নিম্নস্থ সমস্ত উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত জলমগ্ন করিল।

২০। "১৫ হস্তেরও অধিক জল উঠিল এবং পর্ব্বত সকল মগ্ন হইল।

২১। "এবং কুক্কুটাদি পালিত জন্তু, অরণ্য পশু এবং সর্পাদি সরীসৃপ ও মনুষ্য, এই সকল পৃথিবীর সমস্ত জীবিত প্রাণীই মৃত হইল।

২৩। "এবং প্রত্যেক স্থলচর জীবগণই বিনষ্ট হইল, পশু মানুষ, সরীসৃপ এবং শূন্য গামী পক্ষী সকলই মৃত হইল, কেবল মাত্র নোয়া এবং তাহার সহিত আর যাহারা নৌকায় ছিল তাহারাই বাঁচিল।

২৪। এবং ১৫০ দিন পর্য্যন্ত জল পৃথিবীর উপর রহিল।"

যে সময় মূষা এই সকল কথা লিখিতেছেন তার ১৫০০ কি ১৪০০ বৎসর আগে বন্যা হইয়াছিল বলিয়া বাইবেলে লিখিত আছে।

আলেকজ্যাণ্ডারের সমসাময়িক ক্যালডিয়ান ইতিহাস লেখক বিরোসাসের মতে পৃথিবী ব্যাপী এই বন্যা নাইনাস (Ninus) রাজার পিতা বেলাসের (Belus) রাজত্বের ঠিক পূর্ব্বে।

বিখ্যাত চীন জ্ঞানী কনফুকাস যিনি ক্রাইষ্টের ৫৫১ বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়া ছিলেন তিনি চীনের ইতিহাসে লিখিয়াছেন— বন্যার জল আকাশ সমান উচ্চ হইয়া, অত্যুচ্চ পর্ব্বত চরণ ধৌত করিয়া অপেক্ষা উচ্চ পাহাড় ও সমস্ত স্থল, মগ্ন করিল। পরে চীন সম্রাট জাসের আজ্ঞায় সেই জল সরিয়া পড়িল।

এইরূপ আসিয়ার প্রত্যেক জাতিতেই এই স্থানিক বন্যার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আরারট পর্ব্বত নিম্নস্থ ভূপৃষ্ঠ ফাটিয়া উত্তপ্ত পদার্থ নির্গত হওয়াতে, প্রথমে আধুনিক আরারট পর্ব্বত সন্নিহিত প্রদেশেই বন্যা আরম্ভ হইয়া, সেখান হইতে ক্রমে দূর দূরান্তর পর্য্যন্ত জল ব্যাপ্ত হইল।

আধুনিক কালের একটি বন্যার বিবরণ হইতে সেই পুরাতন ভয়ানক বন্যার প্র-

ভাব কতকটা বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্বে মেক্সিকো হইতে ছয় দিনের পথে একটি উর্ব্বর প্রদেশ ছিল, সেখানে ধান্যাদি শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে জুনমাসে ঘন ঘন ভূকম্পন দ্বারা ঐ প্রদেশ ক্রমাগত দুইমাস ধরিয়া আন্দোলিত হইতে লাগিল। ২৮ শে সেপ্টেম্বরে ঝটিকাক্রান্ত সমুদ্রের ন্যায় তরঙ্গিত কঠিন পৃথিবীর উপর সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র মৃত্তিকা-শৈল উঠিতে পড়িতে লাগিল, পরিশেষে ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া উত্তপ্ত প্রস্তর ও ধাতু-পিণ্ড অত্যুচ্চে নিক্ষিপ্ত হইয়া ক্রমে তাহা পর্ব্বতে পরিণত হইল। এই গহ্বর মুখ নিঃসৃত অনেকগুলি পর্ব্বতের মধ্যে জরুলো নামে একটি পর্ব্বত প্রাচীন সমভূমি হইতে প্রায় তিন সহস্র ফুট উচ্চ হইয়াছে। এই বিপ্লবের পর যে স্থানে জরুল পর্ব্বত উৎপন্ন হইল পূর্ব্বে সেই স্থানে কুটিম্বা ও সানপিত্রো নামে দুইটি নদী ছিল। বিপ্লবের সময় এই দুই নদী উজান বহিয়া সমস্ত প্রদেশ জলমগ্ন করিয়াছিল এবং বিপ্লবের পর হইতে ঐ নদীদ্বয় অনেক পশ্চিমে সরিয়া পড়িয়াছে। এই বন্যায় প্রাচীন বন্যার কিছু আভাষ পাওয়া যায়।

চতুর্থ যুগেও নদী এবং সমুদ্রে মৃত্তিকা থিতাইয়া অনেক স্থানে স্তর সংস্থিতি হইয়াছে।

ইয়োরপে সিসিলি দ্বীপে আমেরিকার বিখ্যাত প্যাম্পা সমভূমিতে আফ্রিকার মিশরে ও ভারতবর্ষের বাঙ্গলা প্রদেশে চতুর্থ যুগের স্তর সংস্থিতি বিশেষ রূপে লক্ষিত হয়।

তৃতীয় যুগের শেষ ভাগ ও চতুর্থ যুগ উৎপন্ন স্তর অনেকটা একরূপ তবে প্রভেদ এই যে চতুর্থ যুগের স্তর-সকল সমুদ্র কিম্বা নদীর উপকূলেই দৃষ্ট হয় এবং ইহারা বর্ত্তমান সময়ের ভিন্ন ভিন্ন শম্বুক জাতিতে পরিপূর্ণ।

এই প্রস্তাবটি শেষ করিবার আগে—সূর্য্য হইতে পৃথিবীর বাষ্পচক্র খসিয়া অবধি এখন পর্য্যন্ত আমরা কি দেখিলাম, একবার ভাবিয়া লওয়া উচিত।

বাষ্পময় গোলক হইতে তরল হইয়া কি করিয়া পৃথিবী পৃষ্ঠ ঘন হইল কি করিয়া সমুদ্র দেশ মহাদেশ পর্ব্বত ইত্যাদি সৃষ্ট হইল, কত বিপ্লব পৃথিবীর মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গেল, কি করিয়া প্রথম প্রাণী সৃষ্টি আরম্ভ হইয়া ক্রমে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া আসিল আমরা সকলি দেখিয়া অবশেষে প্রাণী জন্মের উন্নতির চরম সীমায় মনুষ্য জাতির জন্ম দেখিলাম।

এখন পৃথিবীর জলস্থল একটি নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে, আগ্নেয় গিরির উচ্ছ্বাস, পর্ব্বত উত্থান জনিত বিষম বিপ্লব এখন আর সাধারণত সকলস্থানে সর্ব্বদা হয় না, তাহা এখন কদাচিৎ এবং স্থানিক হইয়া পড়িয়াছে। শীতাতপ বৈষম্য হেতু ভিন্নদেশে এখন ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ জন্মিতেছে।

জল জন্তু স্থল জন্তু শূন্যের জন্তু এখন অসংখ্য এবং এই সকল দেখিয়া ভাবিবার জন্য মনুষ্যও সৃষ্টি হইয়াছে।

জীব জগতের উন্নতি সহকারে কি করিয়া ক্রমে মানুষ সৃষ্টি হইল ভাবিতে গেলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সেই সাইলিউরিয়ান-অন্তর যুগের মৎস্য পাথনা কালে উন্নতি লাভ করিয়া কিরূপে দ্বিতীয় যুগের সরীসৃপদিগের পৃষ্ঠে বসিল এবং পরে তাহা হইতে উৎকৃষ্টতর হইয়া কিরূপে পক্ষীর পক্ষ সৃজিত হইল আবার সরীসৃপ দিগের অস্পষ্ট খর্ব্ব পদ চতুষ্পাদ জন্তুদিগের অঙ্গে স্পষ্টীকৃত হইয়া বানরে পূর্ণতা লাভ করিবার পর আরো উন্নতি লাভ করিয়া মনুষ্য অঙ্গে তাহা কেমন শোভিত হইল,এক কথায় কি করিয়া অল্পে অল্পে উন্নত হইয়া পৃথিবী বর্ত্তমান আকারে পরিবর্ত্তিত হইল এই সকল পর্য্যালোচনা দ্বারা ঈশ্বরের সৃষ্টির উন্নতির নিয়ম দেখিয়া আমরা বিস্ময়াভূত হইয়া পড়ি, এবং এই প্রশ্নটি স্বভাবত মনে উচ্ছ্বসিত হয় যে, যে ক্রম-উন্নতির দ্বারা পৃথিবীর আকৃতির আমরা পরিবর্ত্তন দেখিতেছি, সে উন্নতি কি চিরকাল চলিবে? কিম্বা এই খানেই তাহার শেষ? যে সকল শক্তির কার্য্য হেতু হিমালয় আল্প প্রভৃতি পর্ব্বতশ্রেণী উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সকল শক্তি কি চিরকাল কার্য্য করিয়া ভবিষ্যতে শত শত পুরাতন পর্ব্বত ধ্বংশ পূর্ব্বক নূতন পর্ব্বত সৃষ্ট করিতে থাকিবে! কিম্বা আমরা এখন পৃথিবীকে যেরূপ অবস্থায় দেখিতেছি পৃথিবী চিরকালই এইরূপ থাকিবে?

ভূতকাল অনেকটা বিজ্ঞানের আয়ত্তাধীন, কিন্তু ভবিষ্যৎ তাহা নহে, তবে অবরোহী প্রণালী অনুসারে ভূতকাল দেখিয়া ভবিষ্যৎ কালের সম্বন্ধে বিজ্ঞান ইহাই কল্পনা করেন, যে এই উন্নতি পরম্পরা আবহমান চলাই সম্ভবপর। ইহার ধারাবাহিতাই তাহার প্রমাণ স্বরূপ। পৃথিবীর জল স্থল বিভাগ এখন যেরূপ আছে কালে যে পরিবর্ত্তিত হইবে না, ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।

পৃথিবীর ভবিষ্য ইতিহাসের আর একটি পৃষ্ঠা পড়িতে সকলেরই কৌতূহল হয়। আদিম কালের আকরিক পদার্থের প্রাধান্য লোপ করিয়া যেরূপ উদ্ভিদ উৎপন্ন হইয়াছিল, পরে উদ্ভিদের পরিবর্ত্তে জীবজন্তু এবং জীবজন্তুর পরিবর্ত্তে মনুষ্যের প্রাধান্য দৃষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ মনুষ্য জাতির প্রাধান্য গিয়া অপর উন্নত জাতির আবির্ভাব হইবে কি না? বিজ্ঞান এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ। মঙ্গল ও ক্রম-উন্নতি ঈশ্বরের সৃষ্টির নিয়ম। এই উন্নতির চরম সীমার মনুষ্য অবস্থিত কি না তাহা অনন্ত ব্যাপ্যমান জ্ঞান স্বরূপ ঈশ্বরেই লুক্কায়িত, ইহা মনুষ্যের জ্ঞানাতীত।

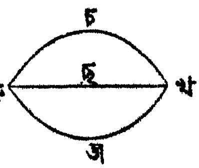
ভৌতিক বিজ্ঞানের মূল পত্তন।

গত মাঘ মাসের ভারতীর ৪৭০ পৃষ্ঠার পর।

সিদ্ধান্ত। ১।

এক শলাকার প্রান্ত-স্থানীয় রেণু-দ্বয় যদি আর এক শলাকার কোন পৃষ্ঠ স্পর্শ করে তবে পূর্ব্বোক্ত শলাকা শেষোক্ত শলাকার গাত্রসাৎ হইয়া যায়।

দৃষ্টান্ত।



মনে কর কছখ-শলাকার কোন পৃষ্ঠ—যেমন উপরকার পৃষ্ঠ—আর একটি-শলাকার প্রান্ত স্থানীয় ক এবং খ রেণু-কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলে, শেষোক্ত শলাকাকে যদি কখ শলাকা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তবে কখ-শলাকাটি কছখ শলাকার গাত্রসাৎ হইয়া যাইবে।

প্রমাণ।

যদি বল যে কছখ-শলাকার পৃষ্ঠ-সংলগ্ন ক এবং খ রেণুর মধ্যবর্ত্তী কখ-শলাকাটি কছখ শলাকার গাত্রসাৎ হইবে না—মনে কর যেন তাহাই ঠিক,—মনে কর যেন উক্ত রেণুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কখ-শলাকাটি কছখ'র গাত্রসাৎ না হইয়া কচখ-স্থানে বসিয়াছে। (উপরিস্থিত প্রথম

মন্তব্য। প্রথম মূল-তত্বটির পরিবর্ত্তে দুইটি মূলতত্ব স্থাপন করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা হইতেছে। প্রথম মূলতত্বটি এই;—এক শলাকার কোন রেণুদ্বয় যদি আর এক শলাকা স্পর্শ করে তবে দুই শলাকা পরস্পরের গাত্রসাৎ হইয়া যায়; ইহার পরিবর্ত্তে এই দুইটি মূলতত্ব স্থাপন করা যাইতেছে—

(১) ধারা-মাত্রেরই যে কোন পৃষ্ঠ-সংলগ্ন রেণুদ্বয় হউক, তাহাদের মধ্যখানে ঐ ধারাটির একটি নিরন্তরাল রেখা বিদ্যমান আছেই আছে।

(২) শলাকা-মাত্রেরই পৃষ্ঠ-পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাকে স্বস্থানে রাখা যাইতে পারে—অর্থাৎ তাহার এপিটের স্থানে ওপিট এবং ওপিটের স্থানে এপিট উল্‌টিয়া রাখা যাইতে পারে; ঐ কথা আরো শক্তাশক্তি করিয়া বলিতে হইলে,—শলাকা-মাত্রেরই যে দুই পৃষ্ঠ যে দুই নিরন্তরাল রেখার সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে, তাহার বিপরীত পৃষ্ঠ-দ্বয়কে যুগপৎ সেই দুই নিরন্তরাল রেখার সহিত সংলগ্ন করিয়া রাখা যাইতে পারে।

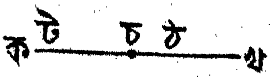
মূলতত্ত্ব অনুসারে) উক্ত রেণু দ্বয়ের মধ্যে যে-একটি নিরন্তরাল রেখা কছথ-শলাকার গাত্রসাৎ হইয়া রহিয়াছে, তাহার স্থানে একটি শলাকা স্থাপন কর এবং তাহার নাম দেও—কথ-শলাকা ; ও কথ-শলাকা এবং কচথ-শলাকাকে পরস্পরের সহিত দৃঢ় বদ্ধ কর এবং কথ-শলাকার নীচেকার পৃষ্ঠ-সংলগ্ন কছথ-শলাকাকে কিয়ৎ কালের জন্য স্থানান্তরিত কর।

কথ-শলাকাটির পৃষ্ঠ পবিবর্ত্তন করিয়া তাহাকে স্ব-স্থানে রাখ; তাহা হইলে তাহার যে পৃষ্ঠে কচথ-শলাকা দুইটি কোণ উন্মীলিত করিয়াছে, সে-পৃষ্ঠ ঐ দুই কোণ-সমেত অপর পৃষ্ঠের স্থান অধিকার করিবে, সুতরাং কচথ-শলাকা কথ-শলাকার নিম্ন পৃষ্ঠস্থিত কোন স্থান—যেমন কজথ-স্থান—অধিকার করিবে ; তাহা হইলে দাঁড়াইবে এই যে কচথ শলাকার ক এবং খ প্রান্তবর্ত্তী রেণু-স্থানের মধ্যে তাহার দুইটি রেখাঙ্ক—(১)কচথ এবং (২) কজথ—কিন্তু ২। ৮ অনুসারে তাহা অসম্ভব। অতএব স্থানান্তরীকৃত কছথ-শলাকাকে স্বস্থানে আনয়ন করিলে দাঁড়াইবে এই যে, তাহার পৃষ্ঠ-সংলগ্ন ক এবং খ রেণু-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কথ-শলাকা উহার গাত্রসাৎ না হইয়া অন্য কোন স্থানে—যেমন কচথ-স্থানে—বসিতে পারে না।

সিদ্ধান্ত। ২।

কোন শলাকা যে দুই খণ্ডে বিভক্ত হউক্ না, সেই দুই খণ্ড একটি সমসূত্র কোণের ভুজ-দ্বয়।

দৃষ্টান্ত।



মনে কর কথ একটি শলাকা ; তাহা হইলে তাহার যে দুই খণ্ড হউক্—যেমন চক এবং চখ, উভয়েই চ স্থানীয় সম-সূত্র কোণের ভুজ।

প্রমাণ।

চখ-খণ্ডের ঠ-রেণু হইতে চক-খণ্ডের ট-রেণু পর্য্যন্ত উক্ত খণ্ডদ্বয়ের মধ্যে একটি যোজক শলাকা স্থাপন কর, তাহা হইলে (১ সিদ্ধান্ত অনুসারে) যোজক শলাকা-টি কথ-শলাকার গাত্র-সাৎ হইয়া যাইবে। অতএব (৫। ৯। অনুসারে) চক এবং চখ এই দুই শলাকা-কর্ত্তৃক অবচ্ছিন্ন কোণটি সমসূত্র কোণ, সুতরাং চক এবং চখ-শলাকা ঐ সম-সূত্র কোণ-টির ভুজ-দ্বয়।

সিদ্ধান্ত। ৩।

দুই বিন্দুর মধ্যে একটির অধিক সরল রেখা সম্ভবে না।

দৃষ্টান্ত।

ক———খ ক এবং খ বিন্দুর মধ্যে একটি সরল-রেখা কথ ভিন্ন দ্বিতীয় সরল রেখা সম্ভবে না।

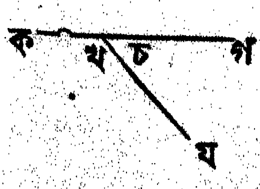
প্রমাণ।

যদি বল যে, ক এবং খ'র মধ্যে দুইটি সরল-রেখা সম্ভবে, তবে (১ সিদ্ধান্ত অনুসারে) ঐ দুই রেখা-স্থানীয় শলাকাদ্বয় পরস্পরের গাত্রসাৎ হইয়া যাইবে; তাহা যদি হয়, তবে, উভয় রেখাই অবশ্য সমদীর্ঘ সুতরাং যে শলাকাটি উক্ত রেখাদ্বয়ের একটির স্থান পূরণ করে সেই শলাকা-কর্ত্তৃক আর একটিরও স্থান পূরিত হইতে পারে; তাহা হইলে হইবে এই—যে, একই শলাকার প্রান্তবর্ত্তী রেণু-স্থান-দ্বয়ের মধ্যে উহার দুইটি রেখাঙ্ক অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু ২।৮ অনুসারে তাহা হইতে পারে না; অতএব ক এবং খ বিন্দু-দ্বয়ের মধ্যে কখ-ভিন্ন দ্বিতীয় সরল রেখা সম্ভবে না।

সিদ্ধান্ত। ৪।

এক বিন্দু হইতে অন্য বিন্দুর মধ্য দিয়া একটির অধিক সরল-রেখা টানা যাইতে পারে না।

দৃষ্টান্ত।



ক-বিন্দু হইতে খ বিন্দুর মধ্য-দিয়া যদি কগ-সরল রেখা প্রসারিত হয়, তবে ক-বিন্দু হইতে খ-বিন্দুর মধ্য-দিয়া দ্বিতীয় কোন সরল-রেখা টানা যাইতে পারে না।

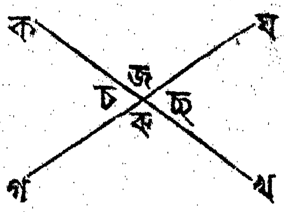
প্রমাণ।

যদি বল যে ক-বিন্দু হইতে খ বিন্দুর মধ্য-দিয়া আর একটি সরল রেখা কখঘ টানা যাইতে পারে, তবে (৪ সিদ্ধান্ত অনুসারে) যেহেতু ক এবং খ'র মধ্যে একটি ভিন্ন দুইটি সরল-রেখা স্থান পাইতে পারে না এজন্য কখ-রেখা—কখগ এবং কখঘ—এ-দুই রেখার সাধারণ অংশ। কখগ যেহেতু সরল-রেখা এজন্য (২ সিদ্ধান্ত অনুসারে) খক, খগ, এই দুই শলাকা খ-স্থানীয় সমসূত্র-কোণের ভুজদ্বয়। এখন—ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, খক এবং খগ এই দুই ভুজাবচ্ছিন্ন সমসূত্র কোণটি খ এবং চ এই দুই কোণের সমষ্টি, সুতরাং ঐ সমসূত্র কোণটি = খ-কোণ + চ-কোণ। পুনশ্চ কখঘ যেহেতু সরল রেখা এজন্য (২ সিদ্ধান্ত অনুসারে) ঐ সরল-রেখার খক এবং খঘ খণ্ড-দ্বয় কর্ত্তৃক অবচ্ছিন্ন খ-কোণ = সমসূত্র কোণ; কিন্তু এই মাত্র দেখা গেল যে, খ কোণ + চ-কোণ = সমসূত্র কোণ; ইহাতে দাঁড়াইতেছে এই যে, খ-কোণ + চ-কোণ = খ-কোণ, অর্থাৎ বড় = ছোটো—ইহা অসঙ্গত; অতএব ক হইতে খ'র মধ্য দিয়া একটি বই আর সরল-রেখা টানা যাইতে পারে না।

সিদ্ধান্ত। ৫।

দুই শলাকা পরস্পর কাটাকাটি করিলে সম্মুখীন কোণ-দ্বয় মাত্রেই সমান হয়।

দৃষ্টান্ত।



মনে কর দুই শলাকা কখ,গঘ, পরস্পর কাটাকাটি করাতে, চ, ছ, জ, ঝ, এই চারিটি কোণ উন্মীলিত হইয়াছে, তাহা হইলে চ-কোণ = তাহার সম্মুখীন ছ-কোণ, ও জ-কোণ = তাহার সম্মুখীন ঝ-কোণ।

প্রমাণ।

(১ সিদ্ধান্ত অনুসারে) চ-কোণ + জ-কোণ = সমসূত্র-কোণ, তথা চ-কোণ + ঝ-কোণ = সমসূত্র কোণ

সুতরাং

চ-কোণ + জকোণ = চ কোণ + ঝ-কোণ

অতএব

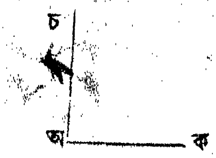
জ কোণ = ঝ-কোণ

এমনি করিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে যে চ-কোণ = ছ-কোণ।

সিদ্ধান্ত। ৬।

কোন দৃঢ় কোণের কোন ভুজ-শলাকা যদি স্বীয় সমসূত্রে চলে তবে তাহার অপর ভুজশলাকা সমান্তরালে চলিবে।

দৃষ্টান্ত।



অচ এবং অক এই দুই দৃঢ়বদ্ধ কোণ-ভুজের যে-টি হউক—যেমন অচ-ভুজ-শলাকা—তাহা যদি স্বীয় সমসূত্রে চলে তবে অক ভুজ-শলাকা সমান্তরালে চলিবে।

প্রমাণ।

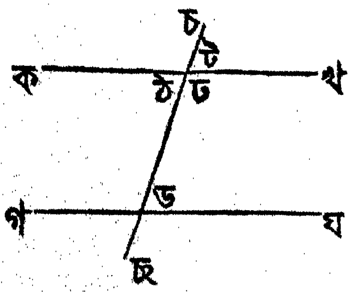
অচ-শলাকা স্বীয় সমসূত্রে চলাতে মনে কর যেন তাহার অ-রেণু অব্যবহিত পরবর্ত্তী বিন্দুতে উপনীত হইয়াছে, তাহা হইলে অচ-শলাকা যেহেতু সমসূত্রে চলিতেছে এই হেতু তাহার সকল রেণুই (৭। ১০ অনুসারে) যুগপৎ অব্যবহিত পরবর্ত্তী বিন্দুতে উপনীত হইয়াছে এবং অক-শলাকা যেহেতু অচ-শলাকার সহিত দৃঢ়বদ্ধ এজন্য (সূ ৭ এবং ৮। অনুসারে) অক-শলাকারও সকল রেণু যুগপৎ অব্যবহিত পরবর্ত্তী বিন্দুতে উপনীত হইয়াছে, সুতরাং ক-রেণু তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী বিন্দুতে উপনীত হইয়াছে সুতরাং (১ সিদ্ধান্ত অনুসারে) অক-শলাকা অ এবং ক-রেণুর অব্যবহিত পরবর্ত্তী বিন্দু-দ্বয়ের মধ্যস্থিত নিরন্তরাল রেখায় উপনীত হইয়াছে; ইহা হইতে আসিতেছে যে, অচ যতক্ষণ স্বীয় সমসূত্রে চলিবে, অক ততক্ষণ নিরন্তরাল রেখা হইতে নিরন্তরাল রেখায় চলিতে

থাকিবে সুতরাং (৭। ১৮ অনুসারে) তাহা সমান্তরালে চলিতে থাকিবে।

সিদ্ধান্ত। ৭।

সমান্তরাল শলাকা-দ্বয় যদি তৃতীয় কোন শলাকা কর্ত্তৃক কর্ত্তিত হয়, তবে বহিষ্কোণ-মাত্রই কর্ত্তক শলাকার সমপৃষ্ঠ-স্থিত পার্শ্বেতর অন্তষ্কোণের সহিত সমান হয়; তথা, কর্ত্তক শলাকার বিপরীত পৃষ্ঠস্থিত পার্শ্বেতর অন্তষ্কোণ-দ্বয় সমান হয়; তথা, কর্ত্তক শলাকার সমপৃষ্ঠস্থিত অন্তষ্কোণদ্বয় মিলিয়া একটি সমসূত্র কোণের সহিত সমান হয়।

দৃষ্টান্ত।



মনে কর দুই সমান্তরাল শলাকা কখ এবং গঘ, চছ-শলাকা-কর্ত্তৃক কর্ত্তিত হইয়াছে; তাহা হইলে যে-কোন বহিষ্কোণ হউক্—যেমন ট-কোণ, তাহা কর্ত্তক শলাকা চছ-য়ের সমপৃষ্ঠস্থিত পার্শ্বেতর অন্তষ্কোণের সহিত—ঐ ট-কোণটি ড-কোণের সহিত—সমান; তেমনি কর্ত্তক-শলাকা চছ'র বিপরীত পৃষ্ঠ-স্থিত যে কোন পার্শ্বেতর অন্তষ্কোণ-দ্বয় হউক্—যেমন ঠ-কোণ এবং ডকোণ—তাহারা সমান; এবং কর্ত্তক-শলাকা চছ'র সমপৃষ্ঠস্থিত যে কোন অন্তষ্কোণদ্বয় হউক্—যেমন ড-কোণ এবং ঢ-কোণ—তাহারা মিলিয়া একটি সমসূত্র কোণের সমান।

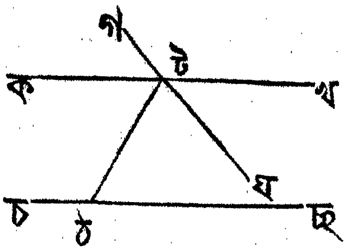
প্রমাণ।

কর্ত্তক শলাকা চছ'কে সমান্তরাল শলাকা-দ্বয় কখ গঘ'র সহিত দৃঢবদ্ধ করিয়া চছ শলাকাকে স্বীয় সমসূত্রে ছচ-দিকে চালনা কর; তাহা হইলে, তিনটি শলাকা মিলিয়া যেহেতু একটি দৃঢ় বস্তু এজন্য (৬ সিদ্ধান্ত অনুসারে) গঘ-শলাকা সমান্তরালে চলিবে; সুতরাং (৫। ৩ অনুসারে) কখ এবং গঘ এই দুই সমান্তরাল রেখার মাঝখানে যতগুলি সংকীর্ণ রেখা অবস্থিতি করে একে একে সকল-গুলিকে অতিবাহন করিয়া গঘ-শলাকা অবশেষে কখ-স্থানে উপনীত হইবে, এবং তদ্দণ্ডে ড-রেণু যেমন ঢ-স্থানে উপনীত হইবে, অমনি চছ-শলাকার সমসূত্রে গতি-বশতঃ ডঢচ শলাকা ঢ-বিন্দু হইতে চ-বিন্দুর মধ্য দিয়া প্রসারিত হইবে; তাহা হইলে ড-কোণ অবশ্য ট-কোণের সহিত একীভূত হইয়া যাইবে। অতএব বহিষ্কোণ ট = কর্ত্তক-রেখার সমপৃষ্ঠস্থিত পার্শ্বেতর অন্তষ্কোণ ড। (৫ সিদ্ধান্ত অনু-সারে) ট-কোণ = ঠ-কোণ—অতএব ঠ-কোণও = ড-কোণ,—এবং ঠ-কোণ যেহেতু = ড-কোণ, এজন্য ড+ঢ = ঠ+ঢ,—(২ সিদ্ধান্ত অনুসারে) ঠ+ঢ = সমসূত্র-কোণ, অতএব ড+ঢ = সমসূত্র-কোণ।

—

সিদ্ধান্ত। ৮।

যদি কোন একটি শলাকা দ্বিতীয় একটি শলাকার সমান্তরাল হয় তবে পূর্ব্বোক্ত শলাকার কোন রেণু স্থান হইতে বিকীর্ণ অন্য কোন শলাকা ঐ দ্বিতীয় শলাকাটির সহিত সমান্তরাল হইতে পারে না।



দৃষ্টান্ত।

মনে কর কথ-শলাকা চছ শলাকার সমান্তরাল, তাহা হইলে কথ শলাকার যে কোন বিন্দু হউক—যেমন ট-বিন্দু—তাহা হইতে বিকীর্ণ কোন শলাকা—যেমন গঘ শলাকা—চছ-শলাকার সমান্তরাল হইতে পারে না।

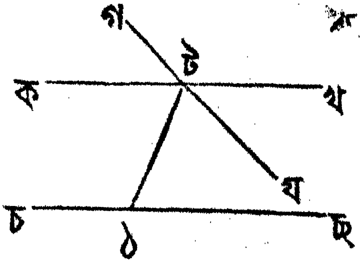
প্রমাণ।

যদি বল যে কথ-শলাকা যেমন চছ শলাকার সহিত সমান্তরাল, গঘ-শলাকাও তেমনি চছ-শলাকার সহিত সমান্তরাল, তাহা হইলে কথ যেহেতু চছ'র সহিত সমান্তরাল—(৭ সিদ্ধান্ত অনুসারে) খটঠ কোণ = টঠচ-কোণ; এবং গঘ যেহেতু চছ'র সহিত সমান্তরাল—(৭ সিদ্ধান্ত অনুসারে) ঘটঠ কোণ = টঠচ-কোণ; এইরূপে দাঁড়াইতেছে যে, ঘটঠ-কোণ এবং খটঠ-কোণ উভয়ই = টঠচ কোণ, সুতরাং ঘটঠ-কোণ = খটঠ কোণ, কিনা ছোটো = বড়,—ইহা অসঙ্গত; অতএব কথ-শলাকার কোন রেণু-স্থান হইতে বিকীর্ণ গঘ-শলাকা চছ-শলাকার সমান্তরাল হইতে পারে না।

সিদ্ধান্ত। ৯।

দুই অসমসূত্র শলাকার কোন যোজক শলাকার বিপরীত পৃষ্ঠস্থিত পার্শ্বেতর অন্তঃকোণ-দ্বয় যদি সমান হয় তবে পূর্ব্বোক্ত শলাকা দ্বয় পরস্পরের সহিত সমান্তরাল।

দৃষ্টান্ত।



মনে কর কথ এবং চছ এই দুই অসমসূত্র শলাকার যোজক শলাকা টঠ'র বিপরীত পৃষ্টস্থিত পার্শ্বেতর অন্তঃকোণ-দ্বয় খটঠ এবং টঠচ সমান, তাহা হইলে কথ-শলাকা চছ'র সহিত সমন্তরাল।

প্রমাণ।

ট-বিন্দুর মধ্য দিয়া প্রসারিত কথ শলাকা যদি চছ-শলাকার সমান্তরাল না হয়, তবে মনে কর যেন উক্ত বিন্দুর মধ্য দিয়া প্রসারিত গঘ-শলাকা চছ-শলাকার সমান্তরাল; তাহা হইলে (৭ সিদ্ধান্ত অনুসারে) ঘটঠ কোণ = টঠচ কোণ; কিন্তু গোড়ায় এইরূপ

ধরা হইয়াছে যে, থটঠ-কোণ = টঠচ-কোণ, ইহাতে দাঁড়াইতেছে—থটঠ কোণ এবং ঘটঠ কোণ উভয়েই = টঠচ-কোণ, কিনা বড় = ছোটো—ইহা অসঙ্গত; অতএব ট-বিন্দুর মধ্যদিয়া প্রসারিত কথ ভিন্ন আর কোন শলাকা চছ-শলাকার সহিত সমান্তরাল হইতে পারে না, অতএব কথ-শলাকা চছ শলাকার সহিত সমান্তরাল।

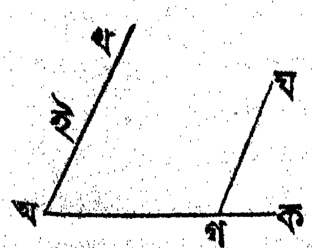
অনুবৃত্তি।

ইহা হইতে সহজে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে দুই শলাকার প্রত্যেকে যদি তৃতীয় কোন একটি শলাকার সহিত সমান্তরাল হয় তাহা হইলে তাহারা পরস্পরের সহিত সমান্তরাল।

সিদ্ধান্ত। ১০।

যদি কোন কোণের কোন ভুজ-শলাকা তাহার কোণ-মুখ-স্থিত রেণু দ্বারা অপর-ভুজ-পথ অঙ্কিত করিয়া সমান্তরালে চলে, তবে, ঐ সমান্তরাল-গামী শলাকার রেণু পরম্পরা সম-দীর্ঘ সংস্তীর্ণ পথ-পরম্পরা যুগপৎ অতিবাহন করে।

দৃষ্টান্ত।



মনে কর অ-কোণের অক ভুজ-শলাকা তাহার অ প্রান্তস্থিত রেণু দ্বারা অথ ভুজ পথ অঙ্কিত করিয়া সমান্তরালে চলিতেছে, তাহা হইলে অক-শলাকার রেণু-পরম্পরা সমদীর্ঘ সংস্তীর্ণ পথ-পরম্পরা যুগপৎ অতিবাহন করিবে।

প্রমাণ।

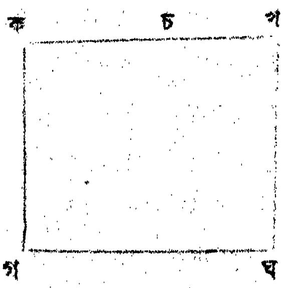
অক শলাকা যেহেতু দৃঢ় বস্তু এজন্য (৭। ১৩ অনুসারে) তাহার যে রেণুর সহিত যে রেণু সংলগ্ন আছে সে-রেণুর সহিত সে রেণু ক্রমাগত সংলগ্ন থাকিবে, সুতরাং উক্ত শলাকার সংলগ্ন রেণু-যুগল-মাত্রেরই পথ-যুগল পরস্পরের গাত্রসাৎ থাকিবে; সুতরাং (৫।২ অনুসারে) অক-শলাকার রেণু পরম্পরা সংস্তীর্ণ রেখা-পরম্পরা-পথে চলিবে। এবং অথ যেহেতু সরল রেখা এজন্য (সূ। ২ অনুসারে) উক্ত সংস্তীর্ণ রেখাগণ সরল-রেখা; আর অক-শলাকা যেহেতু নিরন্তরাল হইতে নিরন্তরাল রেখায় উত্তীর্ণ হইতেছে—এজন্য তাহার সমস্ত রেণুই অব্যবহিত পরবর্ত্তী বিন্দু হইতে অব্যবহিত পরবর্ত্তী বিন্দুতে যুগপৎ উত্তীর্ণ হইতেছে। ইতি পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে অক শলাকার রেণু-পরম্পরা সংস্তীর্ণ সরল-রেখা-পরম্পরায় চলিবে, এখন দেখা যাইতেছে যে এক রেণু যখন স্বীয় অব্যবহিত পরিবর্ত্তী দ্বিতীয় বিন্দু হইতে তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী তৃতীয়-বিন্দুতে উত্তীর্ণ হইবে, সকল রেণুই তখন আপন আপন পথের ঐরূপ তৃতীয় বিন্দুতে উত্তীর্ণ হইবে; ইহাতে দাঁড়াইতেছে এই যে, প্রত্যেক

রেণুই প্রতিক্ষণে সংকীর্ণ সরল-রেখা-গণের এক একটি রেখার সমসংখ্যক বিন্দু পরম্পরা অতিবাহন করিবে—সুতরাং প্রতিক্ষণেই অন্যান্য রেণু-পথের সহিত সমদীর্ঘ সংকীর্ণ সরল রেখা-পথ অতিবাহন করিবে। অতএব প্রমাণ হইল যে, কখ-ভুজ-পথাকাঙ্ক্ষী সমান্তরাল-গামী অক-শলাকার রেণু পরম্পরা সংকীর্ণ সমদীর্ঘ সরলরেখা-পরম্পরা যুগপৎ অতিবাহন করে।

সিদ্ধান্ত। ১১।

সমস্তরের সম্মুখীন ভুজদ্বয় মাত্রই সমান

দৃষ্টান্ত।



মনে কর কখগঘ একটি সমস্তর; তাহা হইলে, তাহার যে কোন সম্মুখীন ভুজদ্বয় হউক—যেমন কখ গঘ—উভয়ে সমান।

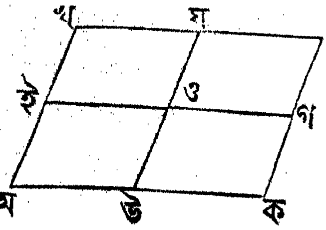
প্রমাণ।

যদি বল কখ এবং গঘ শলাকার একটি বড়—একটি ছোটো, তবে, মনে কর যেন কখ-অপেক্ষা গঘ ছোটো, ও কচ = গঘ। সমস্তরটির ভুজগণকে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া এবং কগ শলাকাকে সমসূত্রে চালনা করিয়া গ-রেণুকে ক-বিন্দু-স্থানে আনয়ন কর, তাহা হইলে (৭ সিদ্ধান্ত এবং ৬। ৭ অনুসারে) গঘ শলাকা সমান্তরালে চলিয়া কচ-রেখা-স্থানে উপনীত হইবে: কারণ তর্ক-ছলে ধরা হইয়াছে কচ = গঘ ও (৮ সিদ্ধান্ত অনুসারে) ক'র মধ্য দিয়া কচখ-ভিন্ন দ্বিতীয় সমান্তরাল রেখা সম্ভবে না। এখন (১০ সিদ্ধান্ত অনুসারে) ঘ-রেণুর ঘচ-পথ কগ'র সহিত সংকীর্ণ সুতরাং তাহা কগ'র সমান্তরাল কিন্তু সমস্তরের সংজ্ঞা অনুসারে ঘখ-ভুজ গক'র সহিত সমান্তরাল, ইহাতে দাঁড়াইতেছে যে, ঘ-হইতে বিকীর্ণ ঘচ এবং ঘখ উভয় রেখাই গক'র সমান্তরাল, কিন্তু ৮ সিদ্ধান্ত অনুসারে তাহা অসম্ভব; অতএব গঘ = কখ। এমনি করিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে যে কগ = খঘ।

সিদ্ধান্ত। ১২

যদি কোন কোণের ভুজ-রেখাদ্বয়ের স্থানে শলাকাদ্বয়ের ছায়াদ্বয় অবস্থিতি করে এবং ঐ কোণের প্রত্যেক ছায়া-ভুজ তাহার প্রান্ত-রেণু-দ্বারা কোণ-মুখ হইতে অপর ভুজ-পথ অঙ্কিত করত সমান্তরালে চলে তাহা হইলে উভয় ছায়ার সন্ধিস্থল কর্তৃক যে-ছায়া-শলাকার যতটা পথ যে সময়ে অতিবাহিত হইবে, সেই ছায়া-শলাকার আদি-স্থানীয় রেখার ততটা পথ অপর ছায়া শলাকার প্রান্ত দ্বারা সেই সময়ে অঙ্কিত হইবে।

দৃষ্টান্ত।



মনে কর অ-কোণ-মুখ হইতে দুই শলাকার দুই ছায়া অখ এবং অক বিকীর্ণ হইয়াছে; ও মনে কর অক-ছায়া স্বীয় প্রান্তস্থিত অ-রেণু দ্বারা অখ-ভুজরেখা-পথ অঙ্কিত করিয়া সমান্তরালে চলিতেছে এবং অখ ছায়া স্বীয় প্রান্তস্থিত অ-রেণু দ্বারা অক ভুজরেখা-পথ অঙ্কিত করিয়া সমান্তরালে চলিতেছে, তাহা হইলে,—অক এবং অখ-ছায়ার সন্ধি-স্থলটি অখ-ছায়ার যতটা পথ যে সময়ে অতিবাহন করিবে, অখ-রেথার ততটা পথ অক-ছায়ার অ-প্রান্ত-দ্বারা সেই সময়ে অঙ্কিত হইবে; এবং উক্ত সন্ধি-স্থলটি অক-ছায়ার যতটা পথ যে সময়ে অতিবাহন করিবে, অক-রেথার ততটা পথ অখ-ছায়ার অ-প্রান্ত দ্বারা সেই সময়ে অঙ্কিত হইবে।

প্রমাণ।

মনে কর যেন অক-ছায়া সমান্তরালে চলিয়া যে কোন সময়ের মধ্যে হউক স্বীয় অ-রেণু দ্বারা অই-পথ অঙ্কিত করত ইগ স্থানে উত্তীর্ণ হইয়াছে, এবং অখ ছায়া সমান্তরালে চলিয়া ঐ সময়ের মধ্যে স্বীয় অ-রেণু দ্বারা অউ-পথ অঙ্কিত করত উঘ-স্থানে উত্তীর্ণ হইয়াছে; তাহা হইলে অবশ্য উভয় ছায়ার সন্ধিস্থান উঘ-স্থানোত্তীর্ণ ছায়া-শলাকাটির উ হইতে ও-স্থানে উপনীত হইয়াছে, সুতরাং অক-ছায়ার অ-রেণু কর্ত্তৃক যে সময়ে অই-পথ অঙ্কিত হইয়াছে, সেই সময়ে উভয় ছায়ার সন্ধিস্থল কর্ত্তৃক উঘ-স্থানোত্তীর্ণ শলাকাটির উও-পথ অতিবাহিত হইয়াছে। এখন,—উভয় ছায়াই যে হেতু স্ব স্ব সমান্তরালে চলিতেছে এই হেতু (৬.৭ অনুসারে) অইওউ ক্ষেত্র একটি সমন্তর; অতএব (১১ সিদ্ধান্ত অনুসারে) উও = অই; সুতরাং উঘ-স্থানোত্তীর্ণ অখ-ছায়ার যতটা পথ (উও) উভয় ছায়ার সন্ধিস্থল কর্ত্তৃক যে সময়ে অতিবাহিত হইয়াছে—অখ-ভুজের ততটা পথ (অই) অক ছায়ার অরেণু কর্ত্তৃক সেই সময়ে অঙ্কিত হইয়াছে। এমনি করিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, ইগ-স্থানোত্তীর্ণ অক-ছায়ায় যতটা পথ (ইও) যে সময়ে উভয় ছায়ার সন্ধিস্থল কর্ত্তৃক অতিবাহিত হইয়াছে—অক ভুজের ততটা পথ (অউ) অখ-শলাকার অ-রেণু কর্ত্তৃক সেই সময়ে অঙ্কিত হইয়াছে।

বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা।

চারিদিকে লোক জন, চারিদিকেই হাট বাজার, সদা সর্ব্বদাই কাজকর্ম্ম, বিষয় আশয়ের চিন্তা। সম্মুখে দেনাদার, পশ্চাতে পাওনাদার, দক্ষিণে বিষয় কর্ম্ম, বামে লোক-লৌকিকতা, পদতলে গত কল্যের খরচ, মাথার উপরে আগামী কল্যের জমা। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি,—পৃথিবীর মৃত্তিকা; দীর্ঘ, প্রস্থ, বেধ; স্বাদ, ঘ্রাণ, স্পর্শ; আরম্ভ, স্থিতি ও অবসান। মানুষের মন কোথায় গিয়া বিশ্রাম করিবে? এমন ঠাঁই কোথায় মিলিবে, যেখানে জড়-দেহ পোষণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা নাই, এক মুঠা আহারের জন্য লক্ষ লক্ষ আকৃতিধারীর কোলাহল নাই, যেখানকার ভূমি ও অধিবাসী মাটি ও মাংসে নির্ম্মিত নয়; অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টা আমরা যে অবস্থার মধ্যে নিমগ্ন থাকি, সে অবস্থা হইতে আমরা বিরাম চাই। কোথায় যাইব?

পৃথিবী কিছু বিশ্রামের জন্য নহে, পৃথিবীর পদে পদে অভাব। পৃথিবীর উপরে চলিতে গেলে মৃত্তিকার সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, পৃথিবীর উপরে বাঁচিতে গেলে শত প্রকার আয়োজন করিতে হয়। যাহার আকার আছে, যাহার আয়তন আছে, তাহার যুঝাযুঝি আছে, তাহার বিশ্রাম নাই। আমাদের হৃদয় আকার-আয়তন-ছাড়া স্থানে বিশ্রামের জন্য যাইতে চায়। বস্তুর রাজ্য হইতে ভাবের রাজ্যে যাইতে চায়। কেবল বস্তু; দিন রাত্রি বস্তু, বস্তু, বস্তু! হৃদয় অশরীরী ভাবের আকাশে গিয়া বলে, “আঃ, বাঁচিলাম, আমার বিচরণের স্থান ত এই!”

এমন লোকও আছেন যাঁহারা ভাবিয়া পান না যে, ভাবগত কবিতা বস্তুগত কবিতা অপেক্ষা কেন উচ্চ শ্রেণীর। তাঁহারা বলেন ইহাও ভাল উহাও ভাল। আবার এমন লোকও আছেন যাঁহারা বস্তুগত কবিতা অধিকতর উপভোগ করেন। উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সুরুচিবান্ লোকদের আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, ইন্দ্রিয়-সুখ ভাল, না অতীন্দ্রিয় সুখ ভাল? রূপ ভাল, না গুণ ভাল? যদি বলেন গুণ ভাল, যদি বলেন অতীন্দ্রিয় সুখ ভাল, তবে তাঁহাদের এক প্রকার বলা হইল যে, ভাবগত কবিতাও ভাল। কারণ, ভাবগত কবিতা, আর কিছুই নহে, তাহা অতীন্দ্রিয় কবিতা। তাহা ব্যতীত অন্য সমুদয় কবিতা ইন্দ্রিয়গত কবিতা।

আমরা সমুদ্র-তীরবাসী লোক। সম্মুখে চাহিয়া দেখি, সীমা নাই; পদতলে চাহিয়া দেখি, সেই খানেই সীমার আরম্ভ। আমরা যে উপকূলে দাঁড়াইয়া আছি, তাহাই বস্তু, তাহাই ইন্দ্রিয়। তাহার চতু-

দিকে ভাষার অনধিগম্য সমুদ্র। এ ক্ষুদ্র উপকূলে আমাদের হৃদয়ের বাসস্থান নয়। যখন কাজকর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া সন্ধ্যা বেলা এই সমুদ্রের তীরে আসিয়া দাঁড়াই, তখন মনে হয় যেন, ওই সমুদ্রের পরপারে কোথায় আমাদের জন্মভূমি,—কে জানে কোথায়? ওই যে, দূর দিগন্তে সূর্য্যের মৃদু রশ্মি-রেখা দেখা যাইতেছে, তাহা যেন আমাদের জন্মভূমির দিক্ হইতে আসিতেছে। সে জন্ম ভূমির সকল কথা ভুলিয়া গেছি, অথচ তাহার ভাবটা মাত্র মনে আছে—অতি স্বপ্নময়, অতি অস্ফুট ভাব। ইচ্ছা করে ঐ সমুদ্রে সাঁতার দিই, সেই দূর দ্বীপ হইতে বাতাস ধীরে ধীরে আসিয়া আমাদের গাত্র স্পর্শ করে, সেই দূর দিগন্তের অস্ফুট সূর্য্য-কিরণের দিকে আমাদের নেত্র থাকে, আর আমাদের পশ্চাতে এই ধূলিময়, কীটময়, কোলাহলময় উপকূল পড়িয়া থাকে। সাঁতার দিতে দিতে মনে হয় যেন পশ্চাতের উপকূল আর দেখা যাইতেছে না ও সম্মুখে সেই দূর দেশের তট-রেখা যেন এক এক বার দেখা যাইতেছে ও আবার মিলাইয়া যাইতেছে। সমস্ত দিন কাজ কর্ম্ম করিয়া আমরা বিশ্রামের জন্য কোথায় আসিব? এই সমুদ্র-কূলেই কি নহে? সমস্ত দিন দোকান বাজারের মধ্যে, রাস্তা গলির মধ্যে থাকিয়া দুই দণ্ড কি মুক্ত বায়ু সেবন করিতে আসিব না? আমরা জানি যে, যেখানে সীমা আরম্ভ সেই খানেই আমাদের কাজ কর্ম্ম, যুঝাযুঝি ও অসীমের দিকে আমাদের বিশ্রামের স্থল আছে, সেই দিকেই কি আমরা মাঝে মাঝে নেত্র ফিরাইব না? সে অসীমের দিকে চাহিলে যে, অবিমিশ্রিত সুখ হয় তাহা নহে, কোমল বিষাদ মনে আসে। কারণ, সে দিকে চাহিলে আমাদের ভাবনা হয় যে, আমাদের বিরামস্থল ঐদিকে বটে কিন্তু না জানি কত দূরে, না জানি কোন কালে সেখানে পৌঁছাইতে পারিব কি না; একটা অস্ফুট ভাব আসে, অথচ তাহা আয়ত্ত করিতে পারি না। সমুদ্রে সাঁতার দিতে ইচ্ছা হয়, অথচ তাহা আমাদের সাধ্যের অতীত! অনেক উপকূলবাসী চিরজীবন এই উপকূলের কোলাহলে কাটাইয়াছেন, অথচ এই সমুদ্র-তীরে আসেন নাই, সমুদ্রের বায়ু সেবন করেন নাই। তাঁহাদের হৃদয় কখন স্বাস্থ্য লাভ করে না। হৃদয়কে এই সমুদ্র-তীরে আনয়ন করা, এই সমুদ্রের বক্ষে ভাসমান করা ভাবগত কবিতার কাজ। ভাবগত কবিতায় হৃদয়ের স্বাস্থ্য সম্পাদন করে। ইন্দ্রিয়জগৎ হইতে মনকে আর এক জগতে লইয়া যায়। দৃশ্যমান জগতের সহিত সে জগতের সাদৃশ্য থাকুক্ বা না থাকুক্ সে জগৎ সত্য জগৎ, অলীক জগৎ নহে।

ভাবুক লোক মাত্রেই অনুভব করিয়াছেন যে, আমরা মাঝে মাঝে এক প্রকার বিষণ্ণ সুখের ভাব উপভোগ করি, তাহা কোমল বিষাদ, অপ্রখর সুখ। তাহা আর কিছু নয়, সীমা হইতে অসীমের প্রতি নেত্রপাত মাত্র। কোন্ কোন্ সময়ে আমা-

দের হৃদয়ে ঐ প্রকার ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলেই উক্ত বাক্যের সত্যতা প্রমাণ হইবে। জ্যোৎস্না-রাত্রে, দূর হইতে সঙ্গীতের সুর শুনিলে, সুখস্পর্শ বসন্তের বাতাস বহিলে, পুষ্পের ঘ্রাণে, আমাদের হৃদয় কেমন আকুল হইয়া উঠে, উদাস হইয়া যায়। কিন্তু জ্যোৎস্না, সঙ্গীত, বসন্ত-বায়ু, সুগন্ধের ন্যায় সুখসেব্য পদার্থের উপভোগে আমাদের হৃদয় অমন আকুল হয় কি কারণে? কেন, সুমিষ্ট দ্রব্য আহার করিলে বা সুস্নিগ্ধ জলে স্নান করিলে ত আমাদের মন ঐরূপ উদাস ও আকুল হইয়া উঠে না! যখন আহার করি তখন সুস্বাদ ও উদরপূর্ত্তির সুখ মাত্র অনুভব করি, আর কিছু নয়। কিন্তু জ্যোৎস্না-রাত্রে কেবল মাত্র যে, নয়নের পরিতৃপ্তি হয় তাহা নহে, জ্যোৎস্নায় একটা কি অপরিস্ফুট ভাব মনে আনয়ন করে। যতটুকু সম্মুখে আছে কেবল ততটুকু মাত্রই যে, উপভোগ করি তাহা নহে, একটা অবর্ত্তমান রাজ্যে গিয়া পৌঁছাই। তাহার কারণ এই যে, জ্যোৎস্না উপভোগ করিয়া আমাদের তৃপ্তি হয় না। চারিদিকে জ্যোৎস্না দেখিতেছি অথচ জ্যোৎস্না আমরা পাইতেছি না। ইচ্ছা করে, জ্যোৎস্নাকে আমরা সর্ব্বতোভাবে উপভোগ করি, জ্যোৎস্নাকে আমরা আলিঙ্গন করি, কিন্তু জ্যোৎস্নাকে ধরিবার উপায় নাই। বসন্ত বায়ু হু হু করিয়া বহিয়া যায়। কে জানে কোথা হইতে বহিল! কোন্ অদৃশ্য দেশ হইতে আসিল, কোন্ অদৃশ্য দেশে চলিয়া গেল! আসিল, চলিয়া গেল; বড়ই ভাল লাগিল; কিন্তু তাহাকে দেখিলাম না শুনিলাম না, সর্ব্বতোভাবে আয়ত্ত করিতেই পারিলাম না। শরীরে যে স্পর্শ হইল, তাহা অতি মৃদু স্পর্শ, কোমল স্পর্শ, কঠিন ঘন স্পর্শ নহে, কাজেই উপভোগে নানা প্রকার অভাব রহিয়া গেল। মধুর সঙ্গীতে মন কাঁদিয়া ওঠে সেই জন্যেই। আবার জ্যোৎস্না রাত্রে সে সঙ্গীত পুষ্পের গন্ধের সঙ্গে, বসন্তের বাতাসের সঙ্গে দূর হইতে আসিলে মন উন্মত্ত করিয়া তুলে। অন্যান্য অনেক ঋতু অপেক্ষা বসন্ত ঋতুতে মন উদাসীন করিয়া তুলে কেন? কেননা বসন্ত ঋতুতে সকলি অপরিস্ফুট, মৃদু, কিছুই অধিক মাত্রায় নহে।

দক্ষিণের দ্বার খুলি মৃদু মন্দ গতি
বাহির হয়েছে কিবা ঋতুকুল পতি।
লতিকার গাঁটে গাঁটে ফুটাইছে ফুল,
অঙ্গে ঘেরি পরাইছে পল্লব দুকুল।
কি জানি কিসের লাগি হইয়া উদাস
ঘরের বাহির হল মলয় বাতাস,
ভয়ে ভয়ে পদার্পয়ে তবু পথ ভুলে,
গন্ধমদে ঢলি পড়ে এ ফুলে ও ফুলে।
মনের আনন্দ আর না পারি রাখিতে,
কোথা হতে ডাকে পিক রসাল শাখিতে,
কুহু কুহু কুহু কুহু কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরে,
ক্রমে মিলাইয়া যায় কানন গভীরে।

কোথা হইতে বাতাস উদাস হইয়া বাহির হইল, কোথায় সে যাইবে তাহার ঠিক নাই, অতি ভয়ে ভয়ে অতিধীরে ধীরে তাহার পদক্ষেপ। কোকিল কোথা হইতে

সহসা ডাকিয়া উঠিল এবং তাহার স্বর কোথায় যে মিলাইয়া গেল, তাহার ঠিকানা পাওয়া গেল না। এক দিকে উপভোগ করিতেছি আর এক দিকে তৃপ্তি হইতেছে না, কেন না উপভোগ্য সামগ্রী সকল আমাদের আয়ত্তের মধ্যে নহে। এক দিকে মাত্র সীমা, অন্য দিকে অসীম সমুদ্র। মনে হয়, যদি ঐ সমুদ্র পার হইতে পারি, তবে আমাদের বিশ্রামের রাজ্যে, সুখের রাজ্যে গিয়া পৌঁছাই। যদি জ্যোৎস্নাকে, যদি ফুলের গন্ধকে, যদি সঙ্গীতকে ও বসন্তের বাতাসকে পাই তবে আমাদের সুখের সীমা থাকে না। এই জন্যই যখন কবিরা জ্যোৎস্না, সঙ্গীত, পুষ্পের গন্ধকে শরীরবদ্ধ করেন, তখন আমাদের এক প্রকার আরাম অনুভব হয়; মনে হয় যেন এইরূপই বটে, যেন এইরূপ হইলেই ভাল হয়!

So, young muser, I sat listening
To my Fancy's wildest word—
On a sudden, through the glistening
Leaves around, a little stirred,
Came a sound. a sense of music,
Which was rather felt than heard.
Softly, finely, it enwound me—
From the world it shut me in—
Like a fountain falling round me
Which with silver water thin
Holds a little marble Naiad
sitting smilingly within.

সঙ্গীত যদি এইরূপ নির্ঝর হইত ও আমরা যদি তাহার মধ্যে বসিতে পারিতাম, তাহা হইলে কি আনন্দই হইত; মুহূর্তের জন্য কল্পনা করি যেন এইরূপই হইতেছে, এইরূপই হয়!

পৃথিবীতে না কি সকল সুখই প্রায় উপভোগ করিয়াই ফুরাইয়া যায়, ও অবশেষে অসন্তোষ মাত্র অবশিষ্ট থাকে; এই জন্যই যে সুখ আমরা ভাল করিয়া পাই না, যে সুখ আমরা শেষ করিতে পারি না, মনে হয় যেন সেই সুখ যদি পাইতাম, তবেই আমরা সন্তুষ্ট হইতাম। এমন লোক দেখা গিয়াছে, যে দূর হইতে সুকণ্ঠ শুনিয়া প্রেমে পড়িয়া গিয়াছে। কেননা তাহার মন এই বলে যে, অমন যাহার গলা না জানি তাহাকে কেমন দেখিতে, ও তাহার মনটিও কত কোমল হইবে! ভাল করিয়া দেখিলে পৃথিবীর দ্রব্যে না কি নানা প্রকার অসম্পূর্ণতা দেখা যায়; কাহারো বা গলা ভাল মন ভাল নহে, নাক ভাল চোক ভাল নহে, তাই আমরা বড় বিরক্ত, বড় অসন্তুষ্ট হইয়া আছি; সেই জন্যই দূর হইতে আমরা আধখানা ভাল দেখিলে তাড়াতাড়ি আশা করিয়া বসি বাকি টুকু নিশ্চয়ই ভাল হইবে। ইহা যদি সত্য হয় তবে দূরেই থাকি না কেন, কল্পনায় পূর্ণতার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করি না কেন, রক্ত মাংসের অত কাছে ঘেঁসিবার আবশ্যক কি? শরীর ও আয়তন যতই কম দেখি, অশরীরী ভাব যতই কল্পনা করি ততই ত ভাল। বস্তুগত কবিতা যতই কম আহার করি ও ভাবগত কবিতাই যতই সেবন করি ততই ত ভাল।

যদি দেখিলাম যে, জ্যোৎস্না, বসন্ত বায়ু

সুগন্ধ ও সঙ্গীতের আকার নাই বলিয়া তাহাদের শরীর সূক্ষ্ম বলিয়া, তাহাদের হইতে আমরা যে এক প্রকার সুখ পাই, তাহা মিষ্টান্ন হইতে পাই না, তবে আইস আমরা ছায়াময় রাজ্যে যাই যাহা কিছু কঠিন, যাহা কিছু ঘন, যাহা কিছু কঠোর-স্পর্শ তাহা পরিত্যাগ করি।

এই যে লৌহের মন ইহাও গলিয়া
দুই আঁখি দিয়া মোর শতধারে ঝরে,
ইহাতেও বুঝিবে না তুমি কি প্রেয়সী
কি দারুণ যন্ত্রণার অগ্নিকুণ্ড মাঝে
এ হৃদয় খণ্ড মোর র'য়েছে স্থাপিত।

এরূপ অগ্নিকুণ্ডময়, যন্ত্রণাময়, লৌহময় কবিতা সকল অসাড়-ত্বক মনের জন্য স্বতন্ত্র রক্ষিত হউক; আইস আমরা স্বতন্ত্র শ্রেণীর কবিতা পাঠ করি;—

Tears, idle tears, I know not what they mean,

Tears from the depth of some divine despair

Rise in the heart, and gather to the eyes,

In looking on the happy Autumn-fields

And thinking of the days that are no more.

Fresh as the first beam glittering on a sail,

That brings our friends up from the under world,

Sad as the last which reddens over one

That sinks with all we love below the verge ;

So sad, so fresh, the days that are no more.

Ah, sad and strange as in dark summer dawns

The earliest pipe of half-awakned birds

To dying ears, when unto dying eyes

The casement slowly grows a glimmering square ;

So sad, so strange, the days that are no more.

Dear as remembered kisses after death,

And sweet as those by helpless fancy feign'd

On lips that are for *others* ; deep as love,

Deep as first love, and wild with all regret ;

O Death in Life, the days that are no more.

ইহা পড়িলে কি হয় বল দেখি? মন উদাস হইয়া যায়, দুই দণ্ড চুপ করিয়া বসিয়া ছায়াময় বিষয় ভাবনা ভাবিতে ইচ্ছা করে। কত কি অসম্পূর্ণ বাসনা, অতৃপ্ত আশা মনে পড়ে। ইহাই ভাবের কবিতা,

ইহা একটি নিঃশ্বাস মাত্র, অতি ধীরে ধীরে হৃদয় হইতে উঠিতেছে।

আমাদের দুইটি জগৎ আছে। এক জগতে আমরা বাস করি, আর এক অদৃশ্য জগৎ আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে। সে জগতের নাম আদর্শ জগৎ। প্রতি লোকের হৃদয়ে হৃদয়ে তাহার রাজত্ব বিস্তার। সে জগতের কত অধিবাসী আছে তাহার আর সংখ্যা নাই। রাম আছেন, লক্ষ্মণ আছেন, যুধিষ্ঠির আছেন, ভীষ্ম আছেন, অর্জ্জুন আছেন, আরো কত নাম করিব? তাঁহাদের সহিত আমরা কত কথা কই, তাঁহারা আমাদের কত পরামর্শ দেন, কত কাজে নিবৃত্ত করেন। তাঁহারা সেই অলক্ষিত জগতে থাকিয়া অলক্ষিত ভাবে এত কার্য্য করেন, আমাদের হৃদয়ের মর্ম্ম স্থলে বসিয়া এত প্রবর্ত্তনা দেন (সেই প্রবর্ত্তনানুসারে আমরা কাজ করি, অথচ হয়ত জানিতে পারি না) যে, সে জগতের ও সে জগতের অধিবাসীর অস্তিত্ব নাই কে বলিতে পারে? সেই জগৎ ভাবের জগৎ। পৃথিবীর অধিবাসীদের উন্নত ভাব মাত্র লইয়া সেখানকার অধিবাসীরা গঠিত। পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের চরম ভাব লইয়া সেখানকার সৌন্দর্য্য গঠিত। সেই জগতই কবিতার জগৎ। বস্তুর জগতে আমাদের কার্য্যক্ষেত্র ও সেই ভাবের জগতে আমাদের হৃদয়ের বিহার-ভূমি। বস্তুর জগতে আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকার ব্যবস্থা করি, ভাবের জগতে গিয়া বিশ্রাম করি, মুক্ত বায়ু সেবন করি, নূতন বল লাভ করিয়া কর্ম্ম ক্ষেত্রে দ্বিগুণ সামর্থ্যের সহিত কাজ করিতে পারি। সেই আদর্শ জগতের জন্য, ভাবের জগতের জন্যই কবিতাকে নিযুক্ত রাখা হউক, হিসাব কিতাবের জন্য, জমা খরচের জন্য, মকদ্দমা মামলার জন্য বাকী সমস্তই নিযুক্ত থাকুক্। কবিতার রাজ্যে যখন যাই তখন যেন এক রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে যাইতে পারি, সেখানেও যেন আমিষের গন্ধ না ছাড়ে। দেখনা কেন, কবিতার ভাষা স্বতন্ত্র; যে ভাষায় আমরা কথা কই, সে ভাষা আমরা কবিতায় ব্যবহার করি না। কবিতার ভাষা ছন্দোবদ্ধ, সুললিত। একটা গদ্যের কথা কবিতার মধ্যে ব্যবহার করিলে কবিতার কোমল দেহে দারুণ আঘাত দেওয়া হয়। অতএব, যেমন কবিতার ভাষা চলিত ভাষা নহে, তেমনি কবিতার বিষয়ও চলিত বিষয় নহে। কবিতার সমস্তই দূরের দ্রব্য, আমরা তাহার আভাস মাত্র পাই, কিয়দংশ মাত্র দেখিতে পারি। তাহাকে স্পর্শ করিতে পারি না, সর্ব্বতোভাবে উপভোগ করিতে পারি না। যেমন গীতের মধ্যে সকলে রাগিণীতে কাঁদে, রাগিণীতে হাসে; তেমনি কবিতায় সকলে কবিতায় হাসে, কবিতায় কাঁদে। তাহার অন্যথা হওয়া কি ভাল? পুত্র-শোকাতুরা জননী যেরূপ সচরাচর বিলাপ করিয়া থাকে, তাহাই যদি ছন্দোবদ্ধ ভাষায় গাঁথিয়া দেওয়া হয়, তবে তাহা বস্তু জগতের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিতার পক্ষে অত্যন্ত অস্বাভাবিক

হয়। হাস্যরসাত্মক বস্তুগত বিষয় ছন্দে প্রকাশ করিলে তাহা লিপি-চাতুর্য্যের জন্য কৌশলের জন্য বিশেষ বিখ্যাত হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে আমরা কবিতা বলিতে পারি না। নৃত্য অঙ্গভঙ্গী, ব্যায়ামও অঙ্গভঙ্গী, কিন্তু নৃত্য ও ব্যায়াম সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর। তাহারা দুই বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধন করে। মেঘনাদবধ কাব্যে নরকের বর্ণনায় যে বীভৎস রসের অবতারণা করা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত নিন্দনীয়। বর্ণনাগুলি নিতান্ত ইন্দ্রিয়গত হইয়াছে, এরূপ বর্ণনায় কল্পনার আবশ্যক অত্যন্ত কম। যে কেহ ইচ্ছা, এমন অশ্রাব্য ভাষায় বীভৎস ভাব বর্ণনা করিতে পারে, যে ঘৃণায় সকলকে কানে আঙুল দিতে হয়।

"অজীর্ণ ভোজন দ্রব্য উগরি দুর্ম্মতি
পুনঃ পুনঃ, দুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে
সুখাদ্য!"

আর এক স্থলে উন্মত্ততার বর্ণনা করিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন—

"—মল মূত্র, না বিচারি কিছু,
অন্ন সহ মাখি, হায়, খায় অনায়াসে!

হইতে পারে উন্মাদগ্রস্ত লোকেরা এই রূপ করিয়া থাকে কিন্তু তাহাই কি কবিতায় বর্ণনীয়। উন্মত্ততার একটা বিকট ভাব মাত্র কবিতায় বর্ণনীয়, তাহার বস্তুগত খুঁটিনাটি গুলি নহে।

উদাহরণ দিয়া আমাদের কথা গুলিকে দৃঢ়-স্থাপিত করা যাউক্।

দ্বার খুলি দেখে কবি বন-ভূমে,
মধুময় জোৎস্নায় জল স্থল মগ্ন যেন ঘুমে।
চৌদিকে বিপিন,
শ্যামল নবীন,
মধ্যে তৃণময় ভূমি খচিত কুসুমে।
ছুটিছে ফোয়ারা হর্ষে মাতোয়ারা,
শূন্যে চড়ি উঠিয়া ধরিতে চায় গগনের তারা।
না পেয়ে নাগাল,
ছাড়ি দিয়া হাল,
মনোদুখে অধোমুখে কাঁদি হয় সারা।
চারি দিকে হইয়াছে জলাশয়।
অল্প নহে পরিসর সরোবর বলিলেও হয়।
প্রবল হিল্লোলে
পড়ি তার কোলে
ঝর্ঝর শবদে জল বেগে উথলয়।
কুমুদিনী সদনে পড়িয়া খসি,
তল্ তল্ থল্ থল্ করিতেছে প্রতিবিম্ব শশি।
এই ফোয়ারার
ঘিরি চারিধার,
বসিয়া-আছয়ে সব নন্দন-রূপসী।
কাঁপিতেছে বনাস্থের ডাল পালা,
দেখা যায় অদূরে, যেমন স্থান তেমনি নিরালা।

ইহা এমন বিষয়ের বর্ণনা ও এমন করিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যে, ইহা আমাদের একটি আদর্শ সৌন্দর্য্যের রাজ্যে লইয়া যায়। কি কি বর্ণে ইহা চিত্রিত হইয়াছে, দেখা যাউক। জ্যোৎস্না, জলস্থলের ঘুমন্ত ভাব, ও সেই স্তব্ধতার মধ্যে সেই সর্ব্বব্যাপী নিদ্রার মধ্যে একটি মাত্র ক্ষুদ্র ফোয়ারার বিনিদ্র ভাব, কেবল মাত্র জলের ঝর্ঝর শব্দ। গম্ভীর স্তব্ধতার মধ্যে জলের বাক্যহীন ভাষাহীন অপরিস্ফুট শব্দ মনের মধ্যে

যে একটি অনির্ব্বচনীয় ভাব আনয়ন করে এমন আর কিছু নয়। বনের প্রান্ত ভাগে ডালপালাগুলি ধীরে ধীরে কাঁপিতেছে দেখা যাইতেছে; নড়িতেছে না, দুলিতেছে না, কেবল মাত্র অতি ধীরে কাঁপিতেছে। স্তব্ধতার, বিরামের, অপরিস্ফুটতার একটি ভাব মাত্রের উপর নির্ভর করিয়া এই বর্ণনাটি লিখিত হইয়াছে। এই কবিতাটির কোন্ কোন্ স্থানে খারাপ লাগে দেখা যাউক।

"চারিদিকে হইয়াছে জলাশয়
অল্প নহে পরিসর, সরোবর বলিলেও হয়।'

এই খানে ঈষৎ মাপজোকের হাঙ্গাম আসিয়া পড়িয়াছে। সীমা নিরূপণের জন্য ভারি ব্যস্ততা পড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে রসের অত্যন্ত ব্যাঘাত পড়িয়াছে। যদিও কবি বলিয়াছেন, "অল্প নহে পরিসর" তথাপি আমাদের মনে হয় তাহার পরিসর অল্প। তাহার পরিসর লইয়া একটা তর্ক উঠিতে পারে; কেহ তাহাকে সরোবর বলিতেও পারে, কেহ নাও বলিতে পারে। এই খানেই বর্ণনা বস্তুগত হইয়া পড়িল। সমস্তটা পড়িতে পড়িতে এই খানটাই কেমন কানে বাজে। পরিসরের কথা উত্থাপন না করিলে পাঠকের স্বভাবতই মনে হইত যে, চারিদিকে জল থৈথৈ করিতেছে (জলাশয় কি সরোবর কে জানে!) মাঝখানে একটি ফোয়ারার জল জ্যোৎস্নায় অবিশ্রান্ত ঝর্ঝর করিয়া পড়িতেছে। কিন্তু কবি জলের চারি দিকে একটি আল্ বাঁধিয়া দিয়াছেন, ও সেই সঙ্গে বস্তুগত কবিতার শৃঙ্খল বাঁধিয়া আমাদের কল্পনার স্বাধীনতা অপহরণ করিয়াছেন। আর এক স্থলে—

"কাঁপিতেছে বনান্তের ডালপালা
দেখা যায় অদূরে;"—

আমরা "অদূরে" শব্দকে দূরে মনে করিয়া পড়ি, নহিলে কল্পনাকে পীড়ন করা হয়। কাছে আমরা কিছু চাহিনা; বিশেষতঃ, এমন জ্যোৎস্নায় বনান্ত কাছে না থাকিয়া দূরে থাকিলেই ভাল হয়, বনান্তের ডালপালা দূর হইতে ধীরে ধীরে না কাঁপিলে চিত্র সম্পূর্ণ হয় না।

মহা কবি শেলি মায়ারথে চড়িয়া অনন্ত আকাশে তারকার রাজ্যে কিরূপে ক্রমশঃ উত্থান করিতেছেন দেখা যাউক্।

The magic car moved on
From the swift sweep of wings
The atmosphere in flaming sparkles flew
And where the burning wheels
Eddied above the mountain's loftiest peak
Was traced a line of lightening
Far, far below the chariot's stormy path
Calm as a Slumbering babe,
Tremendous Ocean lay.
Its broad and silent mirror gave to view
The pale and waning stars,
The chariot's fiery track,

And the grey light of morn
Tinging those fleecy clouds
That cradled in their folds the infant dawn.
The chariot seemed to fly
Through the abyss of an immense concave,
Radiant with million constellations, tinged
With shades of infinite colour,
And semicircled with a belt
Flashing incessant meteors.

আরো ঊর্দ্ধে যখন রথ উঠিল তখন

The sea no longer was distinguished; earth
Appeared a vast and shadowy sphere, suscended
In the black concave of heaven—
With the sun's cloudless orbs,
Whose rays of rapid light
Parted around the chariot's swifter course,
And fell like ocean's feathery spray
Dashed from the boiling surge
Before a vessel's prow.

The magic car moved on.
Earth's distant orb appeard
The smallest light that twinkles in the heavens,
Whilst round the chariot's way
Innumerable systems widley rolled,
And countless spheres diffused
An ever-varying glory.

আরো ঊর্দ্ধে যখন উঠিলেন—

Below lay stretched the boundless universe!
There, far as the remotest line
That limits swift imagination's flight,
Unending orbs mingled in mazy motion
Immutably fulfilling
Eternal Nature's law.
Above, below, around,
The circling systems formed
A wilderness of harmony,
Each with undeviating aim
In eloquent silence through the depths of space
Pursued its wondrous way.

ইহা আমাদের এমন একটা অসীম, অনন্ত, অসংখ্যতার মধ্যে লইয়া যায় যে, "কোথা জল, কোথা স্থল, কোথা তল, কোথা দিগ্বিদিক" কিছুই ঠাহর করিতে পারি না। Wordsworth-এর লিখিত ঐ বিষয়েই আর একটি তুলিয়া দিই,—

Up goes my boat among the stars
Through many a breathless field of light
Through many a long blue field of ether,

Leaving ten thousand stars beneath her :
Up goes my little boat so bright !
The crab, the Scorpion and the Bull
We pry among them all; have shot
High o'er the red-haired race of Mars,
Covered from top to toe with scars ;
Such company I like it not !
The towns in Saturn are decayed,
And melancholy spectres throng them ;—
The Pleiads, that appear to kiss
Each other in the vast abyss,
With joy I sail among them.
Swift Mercury resounds with mirth,
Great Jove is full of stately bowers ;
But these, and all that they contain.
What are they to that tiny grain,
That little Earth of ours.

ইহার প্রথম শ্লোকটি মাত্র ভাল— অর্থাৎ তাহাতে খুঁটি নাটি কিছুই বর্ণিত হয় নাই। সে তারকা-রাজ্যের অসীম আকাশের আমরা কি জানি, কতটুকুই বা জানি! তাহার একটা অপরিস্ফুট ভাব মাত্র আমরা মনে আনিতে পারি—কিন্তু তাহার মধ্যেও কি রাস্তা, গলি, ঘাট বাহির করিতে হইবে? কোথায় কর্কট, কোথায় বৃশ্চিক, কোথায় বৃষ; শনি বৃহস্পতি বুধে কি প্রকার অধিবাসী এই সন্ধানেই কি ফিরিতে হইবে! সে অসীম রাজ্যের মধ্যে গিয়াও এই ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্র অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি অভিভূত হইয়া পড়ে না? অসীম ভাবে ক্ষুদ্র মন বিহ্বল হইয়া পড়ে না?

নব-বর্ষ।

(নিরাশা।)

কালের সাগরে বিশ্ব একটি মিশিল,
মিলাইল স্বপ্ন-এক দিবসের গ্রাসে,
দুখের একটি শ্বাস হৃদে উচ্ছ্বসিল
মনের একটি আলো নিভিল নিরাশে।
শ্মশান ভস্মের স্তূপে একমুষ্টি ছাই
মিশাইল, নিভি আজি, জনমের মত;
কি এক শূন্যতা হৃদে করিল যে ঠাঁই,
কি এক অভাব হৃদে হইল জাগ্রত!
একেলা নিরাশা হেথা করিছে রোদন
মানস কানন আজি করি অধিকার,
হোথায় স্বপন-দ্বার খুলিছে স্মরণ
জাগ্রত আশার বৃন্ত ভাঙ্গিয়ে আমার,
যে সব গিয়াছে চলে ফিরিবে না, হায়!
কোথায় সে দিন গেল—সেজন কোথায়?

(আশা।)

ভাবি যবে কি করিয়ে কাটাচ্ছু জীবন—
অমূল্য জীবন রত্ন কালসিন্ধু জলে
অবহেলা করি আমি করিনু ক্ষেপণ
দারুণ গ্লানির অগ্নি জ্বলে মর্ম্মতলে।
পশ্চাতে অনন্ত কাল গিয়াছে চলিয়ে,
আঁধার সাগর তলে হয়েছে মগন;
সমুখে অনন্ত আছে পথ আগুলিয়ে,
মধ্যে সন্ধিস্থল এই মানুষ জীবন—
একবার হারালে গো পাইব না আর,
ভেবে ভেবে শুধু কেন খোয়াব ইহারে?
মানুষের জীবনের ভাবনাই সার—
এ মিথ্যা কখন কি গো সত্য হতে পারে?
কর্ম্ম—কর্ম্ম—মানুষের লক্ষ্য শুধু এক,
কর্ম্ম—কর্ম্ম—মানুষের উন্নতি কারণ—
কর্ম্মে যদি প্রতিরূপ কর অভিষেক
কর্ম্মহীন মানুষের বৃথায় জীবন।
সিদ্ধি নহে মানুষের আত্মার অধীন,
বিফল হতেই পারে হৃদয় যতন,
তা বলে মানুষ কি গো হবে লক্ষ্যহীন—
শুধুই কি স্বপনেতে কাটাবে জীবন?
উদ্দেশ্যে দোষিব কি গো?—সিদ্ধির শিখরে
উঠিবারে আজি আমি বিফল হইয়া
পর্ব্বতের পদতলে থাকি যদি মরে,
অন্যে ত উঠিবে মোর উপরে চড়িয়া।

শ্রী ম

সম্পাদকের বৈঠক।

দোকান্দার বড় লোক

কিম্বা

হঠাৎ নবাব।

তৃতীয় অঙ্ক।

১০ দৃশ্য।

লুসিল, ক্লেওন্ত, কোবিয়েল, নিকোল।

নিকোল। (লুসিলের প্রতি) আমি তার ব্যাভারে অবাক হয়ে গিয়েছেলুম।

লুসিল। নিকোল, আমি তোকে যা বল্লুম তা ভিন্ন আর কিছুই নয়, কিন্তু ঐ যে আসচে।

ক্লে। (কোবিয়েলের প্রতি) আমি একটি কথাও কব না।

কো। আপনি যা করবেন আমিও তাই করব।

লু। ক্লেয়োস্ত, ব্যাপারটা কি ? তোমার কি হয়েচে ?

নি। কোবিয়েল, তোর কি হয়েচে বল্ দেখি ?

লু। তোমার কিসের দুঃখ ?

নি। তোকে এ রকম হাঁড়ি মুখো দেখ্‌চি কেন ?

লু। ক্লেয়োস্ত, তোমার মুখে কথা নেই কেন ?

নি। কোবিয়েল, তুই কি বোবা হয়েচিস্ ?

ক্লে। কি প্রতারক !

কো। কি জুয়োচোর !

লু। আমি বেশ বুঝতে পাচ্চি, আজ সকাল ব্যালা তুমি যে দ্যাখা করতে এসেছিলে, তার দরুণ তোমার মন খারাপ হয়ে গেছে।

ক্লে। (কোবিয়েলের প্রতি) আ ! আ ! ও বুঝ্‌তে পেরেছে ও কি করেছিল।

নি। আজ সকাল ব্যালাকার অভ্যর্থনায় তোমার মন চটে গেছে, না ?

কো। (ক্লেয়োস্তের প্রতি) ও বুঝেচে কোথায় আমার ঘা লেগেচে।

লু। আচ্ছা সত্যি করে বল দেখি ক্লেয়োস্ত এই জন্যই কি তুমি রাগ কর নি ?

ক্লে। হাঁ, বিশ্বাসঘাতিনী, যদি বল্‌তেই হল তো বলি ; তুমি অবিশ্বাসের কাজ করে মনে মনে যে ভারি জাঁক করবে তা আমি তোমাকে করতে দেব না ; আমিই প্রথমে তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করব। তুমি আমাকে যে ত্যাগ করেছ একথা না তুমি বল্‌তে পার। তবে এ নিশ্চয় যে তোমার উপর আমার যে ভালবাসা আছে তাকে জয় করতে আমার পক্ষে একটু কঠিন হবে, আমার তার জন্য কষ্ট হবে, কিন্তু কি করা যায়—কিছু দিনের জন্য তা আমি সহ্য করব। অবশেষে আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হবেই। কিন্তু কখনই এত দূর দুর্ব্বল হব না যে তোমার কাছে আবার ফিরে আস্‌ব, তার চেয়ে বরং আমি বুকে ছুরি বিঁধিয়ে মরে যাব সেও ভাল।

কো। (নিকোলের প্রতি) মনিবের যে কথা, চাকরেরও ঐ কথা।

লু। একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তোমরা কি গোলটাই কচ্চ। আজ সকাল ব্যালায় তোমাকে যে দেখেও দেখি নি তার কারণ কি শোন, ক্লেয়োস্ত।

ক্লে। (লুশিলের মুখ দেখিবে না এই রূপ ভান করিয়া) নানা আমি কিছুই শুনতে চাই নে।

নি। (কোবিয়েলের প্রতি) কেন কথা না কয়ে তোর কাছ দিয়ে সট্ করে চলে গিয়েছিলুম তার কারণ তোকে বল্‌চি।

কো। (নিকোলের মুখ দর্শন করিবে না এইরূপ ভান করিয়া) আমি কিছুই শুন্‌তে চাই নে।

লু। (ক্লেয়োস্তকে অনুসরণ করিয়া)—শোন বলি, আজ সকালে—

ক্লে। (লুশিলের প্রতি দৃষ্টিপাত না

করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে) আমি বল্‌চি, না।

নি। (কোবিয়েলকে অনুসরণ করিয়া) শোন বলি—আমি—

কো। (নিকোলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া চলিতে চলিতে) না, বিশ্বাসঘাতিনী।

লু। শোন বলি।

ক্রে। আর কোন কথা না।

নি। আমাকে বলতে দেও।

কো। আমি কালা।

লু। ক্রেয়োস্ত!

ক্রে। না।

নি। কোবিয়েল!

কো। কিছু না।

লু। একটু দাঁড়াও।

ক্রে। তোমার মাথা।

নি। আমার কথা শোনো।

কো। তোমার মুণ্ডু।

লু। একটু খানির জন্যে।

ক্রে। আদপে না।

নি। একটু খানি সবুর কর।

কো। রস্তা।

লু। দুটি কথা।

ক্রে। না সব চুকে গেছে।

নি। একটি কথা।

কো। না, আর কোন কথা না।

লু। (থমকিয়া দাঁড়াইয়া)—ভাল! আমার কথা শুনতে যখন তোমার ইচ্ছে নেই, তখন যা তোমার ইচ্ছে তাই কর।

নি। (থমকিয়া দাঁড়াইয়া)—ও রকম যখন কচ্চ—তখন যা খুসি তাই কর।

ক্রে। (লুসিলের দিকে ফিরিয়া আসিয়া) আচ্ছা সকাল বালা ও-রকম অভ্যর্থনা কেন করেছিলে তার কারণটা শোনাই যাক্।

লু। (ক্রেয়োস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া যাইতে যাইতে) সে কথা বল্‌তে আর আমার ইচ্ছে নেই।

কো। নিকোলের কাছে ফিরিয়া আসিয়া) কি ব্যাপারটা হয়েছিল শোনাই যাক্।

নি। (কোবিয়েলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে) আর তা তোমাকে শোনাতে ইচ্ছে নেই।

ক্রে। (লুসিলের অনুসরণ করিয়া) বল না—

লু। (ক্রেয়োস্তের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে) না, আমি কিছুই বলব না।

কো। (নিকোলকে অনুসরণ করিয়া) আমাকে বল না—

নি। (কোবিয়েলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যাইতে যাইতে) না, আমি কিছুই বলব না।

ক্রে। তোমার পায়ে পড়ি!

লু। না, আমি বলব না।

কো। তোমার পায়ের ধুল খাই!

নি। আর কোন কথা না।

ক্রে। তোমার পায়ে পড়ি।

লু। যাও, যাও।

কো। তোমার পায়ে পড়ি।

নি। দূর হ এখান থেকে!

ক্রে। লুসিল।

লু। না।

কো। নিকোল!

নি। না, না!।

ক্লে। দেবতার দোহাই!

লু। না, আমি চাই নে।

কো। বল না আমাকে।

নি। আদপে না।

ক্লে। আমার সন্দেহভঞ্জন কর।

লু। না, আমি কিছুই করব না।

কো। আমার মনটা ভাল কর।

নি। না, আমার ইচ্ছে নেই।

ক্লে। ভাল! আমার কষ্ট নিবারণ করতে যখন তোমার কিছুই ইচ্ছে নেই—আমার ভাল বাসাকে কেন অপমান করলে তারও যখন কোন কারণ বোল্লে না, তখন বিশ্বাসঘাতিনী, আর আমাকে দেখ্‌তে পাবে না—এই শেষ দেখা। আর এখনি আমি দূর দেশে গিয়ে প্রেমের যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করব।

কো। (নিকোলের প্রতি) আর আমিও, মনিবের পিছনে পিছনে যাব।

লু। (গমনোদ্যত ক্লেয়োন্তের প্রতি) ক্লেয়োন্ত!

নি। (গমনোদ্যত কোবিয়েলের প্রতি) কোবিয়েল!

ক্লে। (থমকিয়া দাঁড়াইয়া)—আঁ্যা?

কো। (থমকিয়া দাঁড়াইয়া) কি বলচ?

লু। কোথায় যাচ্চ?

ক্লে। সে তো তোমাকে বলেচি।

কো। আমরা মর্‌তে যাচ্চি।

লু। ক্লেয়োন্ত, তুমি মর্‌তে যাচ্চ?

ক্লে। হাঁ, নৃশংসে, তোমার যখন তাই ইচ্ছে।

লু। আমার! আমার ইচ্ছে যে তুমি মর?

ক্লে। হাঁ, তোমার তাই ইচ্ছে।

লু। কে তোমাকে বোল্লে?

ক্লে। (লুসিলের কাছে আসিয়া) আমার সন্দেহভঞ্জন না করা আর আমার মরণ ইচ্ছে করা কি একই কথা না?

লু। সে কি আমার দোষ? তুমি যদি আমার কথা শুনতে তাহলে কি তোমাকে বলতুম না? আজ সকালে আমার এক জন বুড়ি জেঠাই মা এসেছিলেন, তাঁর এই মত যে, এক জন পুরুষ মানুষ কাছে এলেও স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম যায়। এই বিষয়ে তিনি আমাদের ক্রমাগত উপদেশ দেন, আরও বলেন যে যত পুরুষ মানুষ আছে সবাই দৈত্য, তাদের দেখলেই পালাতে হয়।

নি। (কোবিয়েলের প্রতি) আসল ব্যাপারটা কি শুনলে তো?

ক্লে। লুসিল, আমাকে তো ভুল বোঝাচ্চ না?

কো। (নিকোলের প্রতি) আমাকে তো ভোগা দিচ্চিস্‌নে?

লু। সত্যি কথা বলচি।

নি। (কোবিয়েলের প্রতি) এ ঠিক্ কথা।

কো। (ক্লেয়োন্তের প্রতি) এত যুদ্ধের পর এখন তবে কেল্লাটা ছেড়ে দেওয়া যাক্?

ক্লে। আ! লুসিল! তুমি কি গুণ

জান, তোমার এক কথায় আমার হৃদয়ের সব গোলমাল শান্ত হয়ে যায় ; আর, যাকে ভাল বাসা যায় সে কি শীঘ্রই আমাদের লওয়াতে পারে।

কো। এই অদ্ভুত জানোয়ার গুল কি শীঘ্রই না আমাদের মন গলিয়ে দিতে পারে।

---

১১ দৃশ্য।

জুর্দ্যাঁর স্ত্রী, ক্লেয়োন্ত্, লুসিল্, কোবিয়েল্, নিকোল।

জু-স্ত্রী। ক্লেয়োন্ত তোমাকে দেখে বড় খুসি হলুম, তুমি ঠিক্ সময়ে এসেছ। আমার স্বামী আস্‌বেন, এই অবসরে লুসিল্‌কে বিবাহ করবার জন্য তাঁর কাছে থেকে অনুমতি চেয়ো।

ক্লে। আ! ঠাকরুণ তোমার এই কথা আমার কি মিষ্টি লাগল—আমার এখন কত আশা হল। তিনি কি আমার অনুকূলে উত্তর দেবেন?

---

১২ দৃশ্য।

ক্লেয়োন্ত জুর্দ্যাঁ, জুর্দ্যাঁর স্ত্রী, লুসিল, কোবিয়েল, নিকোল।

ক্লে। মহাশয়, আপনার কাছে একটি নিবেদন আচে, অনেক দিন থেকে আমি ভাবচি, আর, তার উপর আমার নিজের স্বার্থ এতদূর নির্ভর করচে, যে সেটা আমি নিজে না বোল্লে চল্‌বে না। তবে আর কোন গৌরচন্দ্রিমা না করেই আপনার কাছে এই নিবেদন কচ্চি যে আপনার জামাতা হতে আমার অত্যন্ত বাসনা হয়েচে। আমার এই বিনীত নিবেদনটি আপনি অনুগ্রহ করে গ্রাহ্য করুন।

জু। তোমাকে উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমি জান্‌তে চাই তুমি এক জন বড়লোক কি না।

ক্লে। এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌লে অধিকাংশ লোকে বড় ইতস্তত করে না। তখনই উত্তর দেয়। ঐ নামে পরিচয় দিতে কেউ সঙ্কুচিত হয় না—বিশেষত আজ কালের এই রকম ধরণ হয়েচে। কিন্তু আমার এ সম্বন্ধে একটু সংকোচ আছে। আমার এই মত যে সর্ব্বপ্রকার ভণ্ডামিই ভদ্র লোকের অযোগ্য। ভগবান আমাদের যে অবস্থায় জন্ম দিয়েছেন, তা গোপন করা, অন্যের পদবী অপহরণ করে লোকের কাছে আপনার বোলে পরিচয় দেওয়াটা অতি নীচ জঘন্য কাজ। যে পিতা মাতা হতে আমি জন্ম গ্রহণ করেছি তাঁরা অবশ্য সম্ভ্রান্ত পদের কাজ করেছিলেন,আর আমি ৬বৎসর ধরে সৈন্য-শ্রেণীর মধ্যে সম্ভ্রমের সহিত কাজ করে এসেছি—আর আমার যে ধন সম্পত্তি আছে তাতেও লোকের কাছে এক রকম মুখ রাখা যায়; কিন্তু এ সকল সত্বেও, আমি এমন নাম নিতে ইচ্ছে করিনে যা আমার নয়—না মশায়, আমি পষ্টই বলচি আমি বড় লোক নই।

জু। তবে বিদায় হও; আমার মেয়ে তোমার জন্য নয়।

ক্লে। কেন?

জু। তুমি বড় লোক নও; তুমি আমার মেয়েকে পেতে পার না।

জু-স্ত্রী। তুমি যে বড় লোক বড় লোক কচ্চ, বড় লোকের মানেটা কি বল দিকি? আমরা কি সেণ্টলুইর বংশোদ্ভব?

জু। চুপ্ কর স্ত্রী; তুমি কি বলতে যাচ্চ আমি বুঝিচি।

জু-স্ত্রী। সামান্য দোকানদারদের ঘরে কি আমাদের জন্ম না?

জু। সে দুষ্ট লোকের মিথ্যা রটনা।

জু স্ত্রী। আমাদের দু জনেরই বাপ কি দোকানদার ছিলেন না?

জু। মর্ মাগি! ও কথা কি আর ফুরোবে না? তোমার বাপ যদি দোকানদার হন, তবে সেটাতো তাঁর পক্ষে আরও খারাপ; কিন্তু আমার বাপের কথা যদি বল, তা লোকে যদি তাঁর বিষয় ও রকম বলে, সে না জেনে শুনেই বোলে থাকে। আর কিছু না, আমার বক্তব্য এই যে আমি একটি বড়-লোক জামাই চাই।

জু স্ত্রী। তোমার মেয়ের এমন একটি স্বামী চাই, যে তার উপযুক্ত হবে; একজন কদাকার ভিক্ষুক বড় লোকের চেয়ে, ভাল-দেখ্‌তে, টাকা-কড়ি ওয়ালা একজন সামান্য ভদ্র লোকের ছেলেও তার পক্ষে ভাল।

নি। সে কথা সত্যি। আমাদের গাঁয়ে এক জন জমিদারের ছেলে আছে, তার মত কদাকার বোকা লোক আমি আর কখন দেখি নি।

জু। (নিকোলের প্রতি) চুপ কর্, বেয়াদব। তুই সারা দিন তেড়ে ফুঁড়ে আমাদের কথার মধ্যে আসিস কেন বল দিকি? আমার মেয়ের জন্য আমার যথেষ্ট টাকা-কড়ি আছে; আমার কেবল এখন মানের অভাব—আমার মেয়েকে আমি রাণী করব।

জু-স্ত্রী। রাণী?

জু। হাঁ, রাণী।

জু-স্ত্রী। হা! ভগবান যেন তা না করেন।

জু। সে আমি করবই প্রতিজ্ঞা ক-রেছি।

জু স্ত্রী। আমি তো ও কথায় কখনই মত দেব না। যতই বড়লোক হোক না কেন, তাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করলে নানা রকম কষ্টকর অসুবিধা হয়। আমি এ চাই নে যে আমার জামাই আমার মেয়েকে তার বাপ-মার বংশ নিয়ে খোঁটা দেবে, আর তার যে ছেলে পিলে হবে তারা আমাকে দিদি মা বলতে লজ্জা বোধ করবে। যদি আমার মেয়ে কোন সময়ে রাণীর মত পোষাক পোরে লোক-লস্‌কর নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, আর যদি দৈবাৎ পাড়ার কাউকে নমস্কার করতে ভুলে যায় তখনি লোকে কতকি কথা বলবে। তারা বলবে "এখন রাণী হয়ে ওর অহঙ্কারটা দেখেছ? ও জুর্দার মেয়ে, ও ছোট বা-লায় আমাদের সঙ্গে গিন্নি গিন্নি খেলা খেল্‌তে পেলে কত বোর্ত্তে যেত, ও বরাবর ও রকম বড়লোক ছিল না; আর, ওর ঠাকুরদাদারা সেণ্ট্ ইনোসেণ্টের দরজার কাছে কাপড় বিক্রী করত। তারা ছেলে-পুলেদের জন্য অনেক টাকা জমিয়ে গেছে,

আর তার জন্য এখন পরকালেও বোধ হয় জবাব দিতে হচ্চে; কারণ, সৎ-পথে থেকে কখনই অত ধনী হতে পারত না"—আমি এই সব কথা শুন্‌তে চাইনে। আমি এমন লোক চাই, যাকে আমার মেয়ে দিলে সে আমার কাছে বাধিত থাক্‌বে, আর যাকে আমি অনায়াসে বল্‌তে পারব "জামাই এইখানে বোসো, বোসে আমার সঙ্গে একত্র খাও"

জু। যাদের মন অতি ছোট, তারাই ঐ রকম ক'রে বলে—তারা চিরকালই নীচু হয়ে থাক্‌তে চায়। আমার কথার আর উত্তর দিও না! লোকে যাই বলুক না কেন, আমার মেয়ে রাণী হবেই; আর যদি তুমি আমাকে রাগিয়ে দেও, তা হলে আমি তাকে মহারাণী করব।

---

১৩ দৃশ্য।

জুর্দ্যাঁর স্ত্রী, লুসিল, ক্লেয়োন্ত, নিকোল, কোবিয়েল।

জু-স্ত্রী। এখনও ভর্ৎসা ছেড়ো না। (লুসিলের প্রতি) বাছা, আমার সঙ্গে এসো; আর খুব জেদ্ করে তোমার বাপকে বল যে ক্লেয়োন্তকে ভিন্ন তুমি আর কাউকে বিয়ে করবে না।

---

১৪ দৃশ্য।

ক্লেয়োন্ত, কোবিয়েল।

কো। উচু ভাবের কথা কয়ে আপনি তো বেশ কাজ গুছিয়েছেন দেখ্‌চি।

ক্লে। তুই কি চাস্? ও বিষয়ে আমার যে সঙ্কোচ, তা লোকের দৃষ্টান্ত দেখে যাবার নয়।

কো। আপনি কচ্চেন কি? ঐ রকম লোকের সঙ্গে কি গম্ভীর ভাবে কাজ করতে হয়? আপনি কি দেখ্‌চেন না ও-লোকটা পাগল? আর ওর একটু মন যুগিয়ে চোল্লে আপনার কি লোক্‌সান?

ক্লে। তুই ঠিক বলিচিস্; আমি আগে জান্‌তুম না যে জুর্দ্যাঁর জামাই হতে গেলে বড় লোকের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

কো। (হাসিয়া) হা! হা! হা!

ক্লে। হাস্‌চিস্ কেন?

কো। তা কর্‌লে বড় মজা হয়।

ক্লে। কি কর্‌লে?

কো। সম্প্রতি একটা মুখোস্-নাটক হয়ে গেছে, সেইটে এখন বেশ কাজে দেখ্‌বে। ঐ বুড় পাগলটাকে নিয়ে একটা রং তামাসা করা যাক্। যদিও, যে মৎলবটা করেছি, একটু যার বুদ্ধি আছে সেই তা বুঝতে পারে, কিন্তু ও লোকটার কাছে যা ইচ্ছে তাই বেমালুম চালানো যেতে পারে। বেশি ফিকির টিকির করতে হয় না। যা ওকে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে তাই ও বিশ্বাস করবে। সাজবার লোকও আছে, সাজও মজুদ আছে; আমাকে আপনি এখন কেবল কাজটা করতে দিন।

ক্লে। কিন্তু আমাকে আগে বল্—

কো। আমি এখনি সব বল্‌চি। এখন এখান থেকে যাওয়া যাক, বুড়োটা এই দিকে আবার আস্‌চে।

১৫ দৃশ্য।

জুর্দঁ্যা, একাকী।

জু। এর মানে কি? বড়লোক নিয়ে লোকে আমাকে কেবল ঠাট্টা করে; কিন্তু আমি দেখচি বড় লোকদের সঙ্গে মেশাচ্চেয়ে ভাল কাজ আর কিছুই নেই। তাদের ওখানে যেমন ভদ্রতা ও সম্মান এমন আর কোথাও নেই; আর, রাজা কিম্বা মহা রাজা হয়ে জন্মাতে গেলে যদি আমার হাতের দুটো আঙ্গুল কেটে ফেল্‌তে হয়, তাতেও আমি রাজি আছি।

---

১৬ দৃশ্য।

জুর্দঁ্যা, একজন পেয়াদা।

পে। হুজুর, একজন বেগমের হাত ধরে একজন নবাব এসেছেন।

জু। আ! কি সর্ব্বনাশ! আমায় যে কতকগুল হুকুম দিতে হবে। তাঁদের বল, আমি এখনি আস্‌চি।

---

১৭ দৃশ্য।

বেগম দরিমেন, নবাব দোরান্ত্‌, একজন পেয়াদা।

পে। আমাদের কর্ত্তা বোল্লেন যে তিনি এখনি আস্‌চেন।

দোরা। আচ্ছা, বেশ।

---

১৮ দৃশ্য।

দরিমেন, দোরান্ত।

দরিমেন। দোরান্ত, আমি ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্চিনে; যে বাড়ির কাউকেই আমি চিনিনে সে বাড়িতে তোমার সঙ্গে আসাটা আমাকে ভারি অদ্ভুত ঠেক্‌চে।

দো। বেগম, তোমাকে খাওয়াবার জন্য তবে কোন্‌ জায়গা পছন্দ করব বল? কারণ, গোলমাল এড়াবার জন্য, তুমি খানাটা নিজের বাড়িতেও হতে দিতে চাও না—আমার বাড়িতেও দিতে চাও না।

দরি। কিন্তু তুমি কি স্বীকার কর না, কেমন আস্তে আস্তে তোমার প্রেমের উপহার নিতে আমাকে লইয়েছিল? আমি যতই নেবনা বোলে বারণ ক'রে পাঠাই, তুমি আমাকে কিছুতেই ছাড় না—আমি শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম—আর তোমার কি এক রকম ভদ্র একগুঁয়েমি আছে, যে তাতে ক'রে তোমার যা ইচ্ছে তাতেই এক জনকে আস্তে আস্তে লওয়াতে পার। প্রথমে তো ঘন ঘন আমার বাড়ি আস্‌তে আরম্ভ করলে, তার পরে তোমার মনের ভাব প্রকাশ করলে, তার পরে আমার নামে ভালবাসার গান বেঁধে পাঠাতে লাগলে—তার পর আমোদ-প্রমোদে নিমন্ত্রণ করতে লাগ্‌লে—তার পর উপহার পাঠাতে লাগ্‌লে—আমি ও-সব-তাতেই বাধা দিয়েছিলুম, কিন্তু তুমি তো হট্‌বার লোক নও, আস্তে আস্তে, এক পা এক পা ক'রে, এগিয়ে আমার প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে দিলে। আর আমার নিজের উপর কিছুই নির্ভর নেই। আর, আমার এই বিশ্বাস, শেষে তোমার সঙ্গে, বিবাহ করতে পর্য্যন্ত আমাকে রাজি করাবে—যা আমার আদপে ইচ্ছে নেই।

দো। বল কি, বেগম, ও কাজটা ক'রে ফেলাই উচিত ছিল। তুমি বিধবা মানুষ; নিজেরই উপর তোমার নির্ভর; আমিও আমার নিজের প্রভু, আমি তো মাকে প্রাণের চেয়েও ভাল বাসি। তবে কেন বল দেখি আমাকে সুখী না করবে?

দরি। তুমি বল কি, দোরাস্ত, দুজনে একত্র সুখে জীবন কাটাতে গেলে, উভয় পক্ষেই ভাল ভাল গুণ থাকা চাই। পৃথিবীর মধ্যে যারা খুব সুবোধ লোক তাদেরও মধ্যে এমন সুখের যুগল মিলন হতে পারে না যাতে তারা একেবারে বেশ সন্তুষ্ট হতে পারে।

দো। বেগম তুমি খেপেচ না কি, অত বাধা বিঘ্ন কি আগে থাকতে মনে করতে হয়? আর তুমি ভুরুভুগী হয়ে যা শিখেছ, তা যে সব অবস্থায় খাটবে তাও তো নয়।

দরি। আমি আবার সেই কথায় আস্‌চি, আমার জন্যে তুমি যে সব খরচ কর তাতে আমার দুই কারণে ভাবনা হয়। প্রথমতঃ আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তোমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়চি—আর দ্বিতীয়তঃ (রাগ কোরো না) আমার জন্য খরচ পত্র করে তোমার অনেকটা, জড়িয়ে পড়তে হচ্চে, কিন্তু আমার তা ইচ্ছে নয়।

দো। আ! বেগম ও সব কোন কাজের কথা নয়—আর ও রকম ক'রে—

দরি। আমি যা বল্‌চি, তা ঠিকই বল্‌চি। তা ছাড়া, যে হীরেটা জোর ক'রে আমাকে দিয়েছ, তার যে রকম দাম—

দো। ও জিনিসের আবার দাম কি? আমার ভাল বাসার তুলনায় ও জিনিসের এত কম মূল্য যে আমি তোমার যোগ্য ব'লেই মনে করি নে, আর তোমার কাছে এই মিনতি—এই যে এই বাড়ির মালিক আস্‌চে।

---

১৯ দৃশ্য।

জুর্দ্যা, দরিমেন্‌, দোরান্ত।

জু। (দুইবার সেলাম করিতে করিতে দরিমেনের অতি নিকটে আসিয়া পড়ায়) বেগম, আর একটু দূরে।

দরি। কি?

জু। এক পা স'রে যেতে আজ্ঞে হয়।

দরি। সে কি?

জু। তৃতীয় বারের জন্যে একটু পিছু হটুন।

দো। হাঁ হাঁ, কি রকম খাতির করতে হয়, জুর্দ্যা তা বেশ জানেন।

জু। বেগম, এ আমার অতি গৌরবের বিষয় যে আমার উপর এতদূর অনুগ্রহ করে এই অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন, যে আপনার শুভাগমন রূপ অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অনুগৃহীত করেছেন। আর আমার যদি এত দূর গুণ থাকতো যে আপনার মত গুণের যোগ্য গুণজ্ঞ হতে পারতেম, আর যদি ভগবান আমার সৌভাগ্যের ঈর্ষা না ক'রে আমাকে যোগ্য করতেন—

দো। জুর্দ্যা, যথেষ্ট হয়েচে। বেগম বেশি প্রশংসা ভাল বাসেন না—আপনি

যে এক জন রসিক লোক তা উনি বেশ জানেন (দরিমেনের প্রতি মৃদুস্বরে) ও এক জন ভাল মানুষ গ্রাম্য দোকানদার, ওর ধরণ ধারণে বড় হাসি পায়।

দরি। (দোরান্তের প্রতি মৃদুস্বরে) তা বুঝ্‌তে বড় আয়াস পেতে হয় না।

দো। বেগম ইনি আমার এক জন পরম বন্ধু।

জু। ওরূপ বলায় আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ পাচ্চে।

দো। ইনি খুব এক জন রসিক পুরুষ।

দরি। ওঁর উপর আমার খুব শ্রদ্ধা আছে।

জু। বেগম এখনও আমি এমন কিছু করি নি, যাতে এ অনুগ্রহের যোগ্য হতে পারি।

দো। (জুর্দাঁর প্রতি মৃদু স্বরে) দেখো সাবধান, যে হিরেটা তুমি দান করেছ সে হিরের কথা যেন পেড়ো না।

জু। (দোরান্তের প্রতি মৃদুস্বরে) কেমন তাঁর লাগল একথাটাও কি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারি নে?

দো। (জুর্দাঁর প্রতি মৃদু স্বরে) কি? ও বিষয়ে বিশেষ সাবধান হয়ো! তাহলে ভারি চাষাড়ে রকম হবে, ভদ্র লোকের মত কাজ করতে হলে, এই রকম দেখাতে হবে যেন ঐ উপহার তুমি দেও নি। (প্রকাশ্যে) বেগম, জুর্দাঁ বলচেন যে আপনি ওঁর বাড়িতে আসায় উনি ভারি খুসি হয়েচেন।

দরি। উনি আমার খুব সম্মান করচেন।

জু। (দোরান্তের প্রতি মৃদুস্বরে) মশায়, আমার হয়ে ওঁর কাছে এই রকম বলায় আমি আপনার কাছে অত্যন্ত বাধিত হলুম।

দো। (জুর্দাঁর প্রতি মৃদু স্বরে) অনেক কষ্টে আমি ওঁকে এখানে এনেছি।

জু। (দোরান্তের প্রতি মৃদুস্বরে) আমি জানি নে আপনাকে এর জন্য কত ধন্যবাদ দেব।

দো। বেগম, ইনি বলচেন যে আপনার মত সুন্দরী উনি পৃথিবীর মধ্যে কাউকে দেখেন নি।

দরি। আমার উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ আর—

দো। এখন খাওয়া দাওয়ার চেষ্টা দেখা যাক্।

---

২০ দৃশ্য।

জুর্দাঁ, দরিমেন, দোরান্ত, এক জন পেয়াদা।

পেয়াদা। (জুর্দাঁর প্রতি) হজুর, সব প্রস্তুত।

দো। এসো তবে টেবিলে বসা যাক্; আর গাইয়ে বাজিয়েদের এখানে আস্‌তে বলা হোক।

---

২১ দৃশ্য।

নৃত্য-নাট্য। (৬ জন গায়ক নাচিতে নাচিতে আসিয়া নানা প্রকার খাদ্য সামগ্রী টেবিলের উপর আনয়ন)

চতুর্থ অঙ্ক।

১ দৃশ্য।

দরিমেন জুর্দ্যা, দোরান্ত, তিনজন গায়ক, একজন পেয়াদা।

দরি। বাস্তবিক দোরান্ত, এ যে খুব জমকালো খানার আয়োজন হয়েছে।

জু। আপনি বলেন কি বেগম, আপনার যোগ্য কিছুই হয় নি।

(দরিমেন জুর্দ্যা, দোরান্ত এবং তিনজন গায়ক আহারে উপবেশন)

দো। বেগম,জুর্দ্যা যা বলচেন তা ঠিক, উনি আর আপনার প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখিয়ে আমাকে অত্যন্ত বাধিত কচ্চেন। ওঁর সঙ্গে এবিষয়ে আমার মতের মিল হচ্চে; এ আয়োজন আপনার উপযুক্ত নয়। এখানা আমি হুকুম দিয়েছিলেম, তাই তেমন ভাল হয় নি। যদি আমাদের বন্ধু ডামিস এ খানার হুকুম দিতেন তাহলে অনেক ভাল হত। এ সব বিদ্যে আমার বড় আসে না—জুর্দ্যা ঠিক বলেছেন যে এ খানার আয়োজন আপনার যোগ্য হয় নি।

দরি। এর উত্তর আর কি দেব, যে রকম আহার কচ্চি তাতেই যথেষ্ট উত্তর দেওয়া হচ্চে।

জু। আহা হাত দুখানি কি সুন্দর!

দরি। হাত এমনই কি ভাল, তবে হাতে যে হীরটা আছে তার কথা যদি বলেন, হাঁ সেটা অতি সুন্দর।

জু। আমি বেগম, আমি হীরের কথা পাড়ব?—না ভগবান যেন তা হতে আমাকে রক্ষা করেন। তাহলে তো ভদ্র লোকের মত কাজ করা হবে না; আর হীরেটার মূল্য কিছুই নয়।

দরি। আপনার দেখ্‌ছি ভারি উঁচু নজর।

জু। আপনার অত্যন্ত অনুগ্রহ—

দো। (জুর্দ্যাকে ইসারা করিয়া) আরে কে আছিস, জুর্দ্যাকে এবং ঐ ভদ্র লোকদের একটু মদ দেওয়া হোক। ওঁরা অনুগ্রহ করে একটা মদের গান গাইতে আরম্ভ করুন।

দরি। ভাল ভোজের সঙ্গে ভাল গানবাজনা যেমন চাট্‌নি হয় এমন আর কিছু না—যাহোক আমোদের আয়োজনটা বেশ হয়েছে।

জু। বেগম, এতো নয়—

দো। জুর্দ্যা এখন এসো আমরা চুপ ক'রে শুনি—আমরা যাই কথা কই না কেন, তার চেয়ে এই গায়ক মহাশয়দের কথা অবশ্য বেশি ভাল,লাগবে।

(হস্তে পেয়ালা ধরিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় গায়ক একত্রে।)

ঢাল সুরা প্রিয়ে ; ওই চারু করে
মদিরার পাত্র আহা কিবা শোভা ধরে !
মদিরা প্রমদা মিলে প্রাণ করে খুন
দ্বিগুণ জ্বালিয়ে দিয়া প্রেমের আগুন।
এসো তবে তুমি আমি সুরা তিন জনে
পরস্পর বাধি মোরা প্রেমের বন্ধনে।
সুধা সুধাময় মিশি অধর সুধায়,
অধর লাবণ্য ধরে সুধার প্রভায়।
ছুঁয়েতেই তৃষা মোর, বড় হয় সুখ
দিতে যদি পারি ছুঁয়ে সটান চুমুখ।
এসো তবে তুমি আমি সুরা তিন জনে
পরস্পরে বাঁধি মোরা প্রেমের বন্ধনে।

(দ্বিতীয় ও তৃতীয় গায়ক একত্রে)

সবে মিলে এসো ভাই সুরা করি পান
সময় বহিয়া যায় নাহি কি সে জ্ঞান ?
ঢালো সুরা ঢালো সুরা
পাত্র কর ভরপুরা
ক'রে লও সুখ, দেহে যত দিন প্রাণ।
পার হ'তে হবে যদি, ঘোর বৈতরণী নদী,
ফেলে যেতে হবে মদ সে নদীর তটে;
এই বেলা কর পান, যতদিন আছে প্রাণ,
চির কাল পান করা কার ভাগ্যে ঘটে ?
করুক না মূর্খ তত্ত্ববাগীশের দল
সুখ দুঃখ তত্ত্ব নিয়ে ঘোর কোলাহল,
দেখাক না নানা যুক্তি, লইয়ে নির্ব্বাণ মুক্তি,
মোদের নির্ব্বাণ মুক্তি পেয়ালার মাঝে,
আমাদের সুখ যত সেথাই বিরাজে ;
ধন মান প্রিয় জন, তাদের কি, প্রয়োজন,
জীবনের সুখ তারা পারে কি বাড়াতে ?
সংসারে দেখত চেয়ে, কি আছে মদের চেয়ে
জীবনের দুখ জ্বালা ভাবনা তাড়াতে ?

(তিন জনে একত্রে)

ঢাল্ সুরা ঢাল্ সাকী, সময় ত নাই বাকী,
ঢাল্ ঢাল্ আরো ঢাল, ঢাল দ্রাক্ষারস,
যত ক্ষণ নাহি বলি, বস্ বস্ বস্ !

দরি। এর চেয়ে ভাল গান আর হতে পারে না—বড় সরেশ।

জু। কিন্তু ঠাকরণ ওর চেয়েও একটি ভাল চিজ আমি এখানে দেখছি।

দরি। বাহবা ! জুদাঁ বাবু যে এত রসিক তা আমি জানতেম না।

দো। বল কি ঠাকরণ তুমি তবে জুদাঁকে কি ঠাওরেছিলে ?

জু। আমার ইচ্ছে, আমি ওঁকে যে রকম বলব সেই রকম উনি আমাকে ঠাওরান।

দরি। আবার ?

দো। দরিমেনের প্রতি তুমি ওঁকে চেনো না।

জু। যখন ওঁর ইচ্ছে হবে, তখনি উনি চিনবেন।

দরি। না, আমি হার মানলেম।

দো। কথায় ওঁর সঙ্গে পারবার জো নেই, জবাব হাতে হাতে। আর তুমি কি দেখতে পাচ্চ না বেগম, তুমি যে সকল খাবার জিনিস পর্শ করচ, উনি তাই খাচ্চেন।

দরি। জুদাঁ বাবুকে দেখে আমি মোহিত হয়েচি।

জু। আমি যদি আপনার হৃদয়কে মোহিত করতে পারতেম, তা হলে—

—

২ দৃশ্য।

জুর্দ্যার স্ত্রী, জুর্দ্যা, দরিমেন, দোরান্ত, গায়কগণ পেয়াদা।

জু-স্ত্রী। বাঃ! বাঃ! এই যে অনেক লোকজন নেমন্তন্ন হয়েছে। আমি বেশ দেখতে পাচ্চি, আমি এখানে আস্‌ব বলে কেউ মনে করে নি। বলি ও কর্ত্তা, এই কাজটি গোছাবার জন্যই কি আমাকে আমার বোনের বাড়িতে পাঠাতে তোমার এত মাথা ব্যথা হয়েছিল? নীচে একটা নাটক হচ্ছিল এই আমি দেখে এলুম, আবার এখানে যেন একটা বিবাহের ভোজ বোসে গেছে। এই রকম করেই তুমি টাকা গুল নষ্ট কর, আর আমার অবর্ত্তমানে এই রকম করে তুমি বাইরের অন্য মেয়েদের এনে ভোজ দেও, গান শোনাও, নাটক দেখাও, আর আমাকে কিনা তুমি সেই সময় অন্য জায়গায় চালান কর।

দো। তুমি কি বলচ ঠাকরুণ? এ তোমার মাথায় কি করে এল বল দেখি যে তোমার স্বামী এই সব খরচ করেছেন, আর এই বেগমকে খাওয়াচ্চেন? আমিই এই সব খরচ করেছি। উনি কেবল আমাকে ওঁর বাড়ি ধার দিয়েছেন এই মাত্র— তুমি কি কথা বলচ একটু ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখ।

জু। হাঁ, বেয়াদব, নবাব সাহেবই এই বেগমকে ভোজ দিচ্চেন—আর বেগম এক জন মস্ত লোক, আর নবাব সাহেব অনুগ্রহ ক'রে আমার বাড়ি ধার নিয়েছেন—আর আমাকেও এইখানে থাকতে নিমন্ত্রণ করেছেন।

জু-স্ত্রী। ও সব কাজের কথা নয়— আমি যা জানি তা ঠিক জানি।

দো। ঠাকরুণ আসল জিনিসটা কি একবার চষমা দিয়ে দেখ।

জু-স্ত্রী। আমার চষমার দরকার নেই— আমি বেশ পষ্ট দেখতে পাচ্চি। আসল ব্যাপারের আঁচ আমি অনেক দিন থেকেই পেয়েছি, আমি তো আর একটা জানোয়ার নই। এত বড় লোক হয়ে তুমি যে আমার স্বামীর পাগলামিতে সাহায্য কর এ তোমার ভারি অন্যায়। আর তুমি বেগম বড় ঘরের স্ত্রীলোক হয়ে যে একটি সংসারের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিচ্চ, আর তোমার প্রেমে পড়তে আমার স্বামীকে উৎসাহ দিচ্চ, এ তোমার মত লোকের উচিতও নয় উপযুক্তও নয়।

দরি। এ সকলের অর্থ কি? দোরান্ত তোমার ভারি অন্যায় যে তুমি আমাকে এখানে এনে ঐ মুখ-ফোঁড় স্ত্রীলোকের কাছে থেকে কতকগুল কথা শুনালে।

দো। (প্রস্থানোদ্যত দরিমেনের অনুসরণ করিয়া) বেগম, বেগম, কোথায় পালাচ্চ?

জু। বেগম—নবাব সাহেব, আমার হয়ে দু কথা বেগমকে বোলো, আর ওঁকে ফিরিয়ে আনবারও চেষ্টা কোরো।

---

৩ দৃশ্য।

জুদঁ্যার স্ত্রী, জুদঁ্যা, পেয়াদা।

জু। বেয়াদব কোথাকারে, বড় কাজই করেছ! সকলের সামনে আমাকে অপমান করলে আর বড় লোকদের কিনা আমার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে!

জু-স্ত্রী। বড় লোক না মাথা!

জু। হতভাগি তুই যে এই এসে খানাটা ভেঙ্গে দিলি, এই খানার বাকি জিনিস্ গুল তোর মাথায় ছুড়ে তোর মাথাটা যে এখনো ভেঙ্গে দিই নি এই তোর পরম ভাগ্য।

(পেয়াদারা টেবিল উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান)

জু-স্ত্রী। (প্রস্থান করিতে করিতে) ও কথা আমি গ্রাহ্য করি নে। আমার নিজের যে সব হক আছে আমি তাই বজায় রাখচি, আর স্ত্রীলোক মাত্রেই আমার দিকে হবে।

জু। এখন পালিয়ে গিয়ে রক্ষা পেলি —আমার এমন রাগ হয়েছে।

---

৪ দৃশ্য।

জুদঁ্যা একাকী।

কি কুক্ষণেই রায়-বাঘিনীটা এসে পড়েছিল। কত মজার মজার কথা আমার মাথায় এসেছিল—এমন রসিকতার ভাব আমার জীবনে কখনও হয় নি ও আবার কি?

---

৫ দৃশ্য।

জুদঁ্যা, ছদ্মবেশধারী কোবিয়েল।

কো। মশায়, আপনি আমাকে জানেন কি না বলতে পারিনে

জু। না মশায়।

কো। (হস্তের ইঙ্গিতে পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া) আপনি যখন এইটুকু ছিলেন তখন আপনাকে আমি দেখেছি।

জু। আমাকে?

কো। হাঁ। আপনার মত সুন্দর ছেলে পৃথিবীতে ছিল না, স্ত্রীলোকেরা আপনাকে দেখলেই কোলে নিয়ে চুমো খেতো।

জু। আমাকে চুম খেতো?

কো। হাঁ। আপনার স্বর্গীয় পিতা ঠাকুরের আমি একজন পরম বন্ধু ছিলেম

জু। আমার স্বর্গীয় পিতার?

কো। হাঁ। তিনি এক জন খুব বড় লোক ছিলেন।

জু। কি বোল্লে?

কো। হাঁ, আমি বলচি, তিনি একজন খুব বড় লোক ছিলেন।

জু। আমার বাপ?

কো। হাঁ।

জু। তুমি তাঁকে ভাল রকম জান্‌তে?

কো। খুব ভাল জানতেম।

জু। আর তুমি জানতে যে তিনি বড় লোক ছিলেন?

কো। তার সন্দেহ নাই।

জু। তবে লোকগুল কি রকমের আমি তো কিছুই বুঝতে পারি নে।

কো। কেন?

জ। কতকগুল এমন পাগল আছে যারা বলে যে আমার বাপ দোকান্দার ছিলেন।

কো। তিনি দোকান্দার? সে কেবল লোকের মিথ্যা নিন্দা, তিনি কখন তা ছিলেন না। তিনি যা করতেন সে কেবল লোকের উপকার। তিনি কাপড়-টাপড় চিনতেন ভাল, তাই তিনি নানা স্থান থেকে পছন্দ ক'রে সেই সকল কাপড় বাড়ি আনতেন, আর, কিঞ্চিৎ লাভ রেখে তাঁর বন্ধুদের দান করতেন।

জ। তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় আমি ভারি খুসি হলুম। আমার বাপ যে বড় লোক ছিলেন তার একজন সাক্ষী এতদিনে পাওয়া গেল।

কো। সমস্ত জগতের কাছে আমি এর সাক্ষি দেব।

জ। তাহলে তুমি আমাকে বড় বাধিত করবে। এখন কি জন্য আসা হয়েচে?

কো। সেই বড় লোক আপনার স্বর্গীয় পিতার সঙ্গে পরিচয় হবার পর আমি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করতে বেরিয়েছিলুম।

জ। সমস্ত পৃথিবী?

কো। হাঁ।

জ। বোধ হয় সে খুব দূর দেশ?

কো। হাঁ নিশ্চয়ই। আমি সবে চার দিন হল সেই দূর দেশ থেকে এসেছি। আর আপনাদের সংক্রান্ত সকল বিষয়েরই আমি খোঁজ খবর রাখি কি না, তাই একটা ভারি সুখবর আপনাকে দিতে এসেছি।

জ। কি সুখবর?

কো। আপনি জানেন যে তুর্কের বাদসার ছেলে এখানে আছে?

জ। আমি?—না।

কো। সে কি! অনেক লোক-লস্কর আস্‌বাব সঙ্গে এসেছে, সহর শুদ্ধ লোক যে তা দেখতে যায়—আর আমাদের দেশে খুব বড় লোক ব'লে মান পেয়েছে।

জ। মাইরি, এ কথা আমি জানতেম না।

কো। আর আপনার পক্ষে সুবিধে এই যে আপনার কন্যার উপর তাঁর মন পড়েছে।

জ। তুর্ক বাদসার পুত্র?

কো। হাঁ! তিনি আপনার জামাতা হতে চান।

জ। বাদসার পুত্র, আমার জামাতা?

কো। হাঁ তুর্ক বাদসার পুত্র আপনার জামাতা। আমি যখন দেখা করতে গিয়েছিলেম, তাঁর ভাষা বুঝি কি না, তাঁর সঙ্গে অনেক ক্ষণ ধরে কথা বার্ত্তা হয়েছিল—অন্য অন্য কথার মধ্যে তিনি আমাকে বোল্লেন—"আকিয়াম ক্রক সলেব্ অক্ আলা মুস্তাফ গিদেলুম, আমানাহেম বারাহিনী উসসেরে কারুলথ" অর্থাৎ একটি সুন্দরীকে কি তুমি দেখনি? তিনি হচ্চেন সহরের একজন বড় লোক জর্দ্যাঁ বাবুর কন্যা।

জ। তুর্কের বাদসা আমার কথা এই রকম বল্লেন?

কো। হাঁ। তার পর যখন আমি তাকে উত্তর দিলুম যে তাঁর সঙ্গে আমার

বিশেষ পরিচয় আছে, আর আপনার মেয়েকে আমি দেখেছি, তিনি তখন বোল্লেন "মারাবাবা সাহেম" অর্থাৎ আমি ভারি তার প্রেমে পড়েছি।

জু। "মারাবাবা সাহেম" এই কথার মানে আমি ভারি তার প্রেমে পড়েছি ?

কো। হাঁ।

জু। মাইরি, তুমি এ কথা বোলে ভাল করলে। কেন না, আমি কখনই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে "মারাবাবা সাহেমের" মানে হচ্চে আমি ভারি তার প্রেমে পড়েছি। বা তুর্ক ভাষাটা কি চমৎকার।

কো। ভারি চমৎকার। আপনি কি জানেন কাকারাকামুযেন্ কাকে বলে ?

জু। কাকারাকামুযেন ? না।

কো। তার মানে হচ্চে আমার প্রিয় আত্মা।

জু। কাকারাকামুসেনের মানে হচ্চে আমার প্রিয় আত্মা ?

কো। হাঁ।

জু। বা কি চমৎকার! কাকারাকামুযেন্ আমার প্রিয় আত্মা। কখনো কি ওকথা কেউ বলে ? আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্চি নে।

কো। আমার ঘটকালি তবে শেষ করি। তিনি আপনার কন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হয়েচেন। আর তাঁর পুত্রের যোগ্য শ্বশুর করবার জন্য তিনি আপনাকে মামামুষি করতে ইচ্ছা করেন। এই মামামুষি হচ্চে তাঁর দেশের একটা মস্ত পদবীর খেতাব।

জু। মামামুষি ?

কো। হাঁ মামামুষি, অর্থাৎ আমাদের ভাষায় রায় বাহাদুর রায় বাহাদুরের মত অমন মস্ত খেতাব আর নাই—পৃথিবীর যত বড় লোক আছে, আপনি তাহলে তাদের সমকক্ষ হবেন।

জু। তুর্কের বাদসা আমাকে খুব মান দিয়েছেন এখন তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা যে তুমি আমাকে একবার তাঁর ওখানে নিয়ে চল—আমি নিজে গিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ দেব।

কো। এ কি! তিনি যে নিজেই এখানে এসেছেন দেখ্‌চি।

জু। তিনি এখানে এসেছেন ?

কো। হাঁ। আর আপনাকে সেই খেতাব দেবার জন্য যে সব সরঞ্জামের দরকার তাও সব সঙ্গে এনেছেন।

জু। বাঃ! খুব শিগ্‌গির তো।

কো। তাঁর যে রকম অনুরাগ তাতে বিলম্ব আদপে সোচ্চে না।

জু। এখন আমার কেবল এই ভাবনা হয়েছে যে আমার মেয়েটা বড় একগুঁয়ে, তার এই জেদ্ হয়েছে যে ক্লেয়োন্ত বোলে একটা কে লোক আছে তাকে ভিন্ন সে আর কাউকে বিয়ে করবে না।

কো। যখন সেই তুর্ক বাদসার ছেলেকে দেখ্‌বে তখনই তার মন বোদ্‌লে যাবে। আর একটা বড় মজা হয়েচে, তুর্ক বাদসার ছেলেকে খানিকটা ক্লেয়োন্তের মত দেখ্‌তে (আমি ক্লেয়োন্তকে) দেখেছি)। সুতরাং তার উপর যে ভাল

বাসা হয়েচে, তা ওর থেকে গিয়ে শাজাদার উপর অনায়াসে পড়তে পারে— বোধ্ হয় তিনি আসচেন—এই যে।

---

৬ দৃশ্য।

তুর্ক বেশে ক্রেয়োন্ত; তিন জন দাস, ক্রোয়েন্তের পরিচ্ছদ ধরিয়া, জুর্দঁ্যা, কোবিয়েল।

ক্রে। আম্বুসাহিম্ অকি বোরাক্, জর্দিনা, সালামালেকি।

কো। (জুর্দঁ্যার প্রতি) অর্থাৎ জুর্দঁ্যা সাহেব, তোমার হৃদয় সমস্ত বৎসর একটি প্রফুল্ল গোলাপের মত হোক্। ওদের দেশের এই রকম ভদ্রতার কথা।

জু। আমি শাহেন শা শাজাদার অতি বিনীত দাস।

কো। কারিগার কাম্বোডো উস্তিন মোরাক্।

ক্রে। উস্তিনইয়ক্ কাতামালেকি বাসম বাসে আল্লা মোরান।

কো। উনি বোলচেন ভগবান যেন আপনাকে সিংহের ন্যায় বলবান আর সর্পের ন্যায় চতুর করেন।

জু। শাজাদা আমাকে খুব মান দিচ্চেন, আমি তাঁর সর্ব্বপ্রকার উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করি।

কো। ওসা বিনামেন সাউক বাবাল্লি ওরাকাফ্ উরাম।

ক্রে। বেল্ মেন।

কো। উনি বলচেন যে আপনি শীঘ্র ওঁর সঙ্গে গিয়ে এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করুন, তার পরে উনি আপনার কন্যাকে দেখবেন—দেখে বিবাহকার্য্য শেষ করবেন।

জু। এত গুলা ব্যাপার ঐ দুই কথায়?

কো। হাঁ। তুর্ক ভাষাটাই ঐ রকমের। অল্প কথায় অনেক বলা যায়—উনি যেখানে আপনাকে নিয়ে যেতে ইচ্ছে কচ্চেন শীঘ্গির আপনি সেখানে যান।

---

৭ দৃশ্য।

কোবিয়েল, একাকী।

আ! আ! আ! মাইরি বড় মজাই হয়েছে। কি ঠকানটা ঠকেচে! সমস্ত কথা মুখস্থ থাক্‌লেও একজন এমন সরেশ অভিনয় করতে পারতো না। হা! হা!

---

৮ দৃশ্য।

দোরান্তু, কোবিয়েল।

কবি। মহাশয় আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের এই কাজটায় একটু সাহায্য করবেন?

দো। হা! হা! কোবিয়েল কার সাধ্যি তোকে চেনে? কি চমৎকার সেজেচিস্।

কো। দেখুন—হা হা—

দো। হাসচিস্ কেন?

কো। মশায় সেটা হাস্‌বারই বিষয়।

দো। কি রকম?

কো। আমার মনিবের সঙ্গে যাতে

জুর্দ্দ্যা তাঁর মেয়ের বিবাহ দেন তার কি ফিকির হতে পারে আপনি আন্দাজ করে বলুন দেখি।

দো। সে ফিকিরটা আমি ঠাওরাতে পাচ্চিনে। তবে এই পর্য্যন্ত বুঝতে পাচ্চি যে তুই যখন এর ভার নিয়েচিস তখন নিশ্চয়ই সফল হবে।

কো। আপনার কাছে সে জানোয়ারটা যে অপরিচিত নয় তা আমি জানি।

দো। ব্যাপারটা কি আমাকে বল

কো। আপনি কষ্ট করে একটু তফাতে যান—ঐ ওরা সবাই আসচে—আপনি দেখে কতকটা বুঝতে পারবেন—বাকিটা পরে আপনাকে মুখে বলব।

---

৯ দৃশ্য।

তুর্ক অনুষ্ঠান, মুফ্‌তি, দর্বেশ, তুর্ক, মুফ্‌তির সহকারীগণ।

নাচিতে নাচিতে
গাইতে গাইতে প্রবেশ।

---

১০ দৃশ্য।*

মুফ্‌তি, দর্বেশ প্রভৃতি।

জুর্দ্দ্যা। তুর্ক পরিচ্ছদ পরিধান, মস্তক মুণ্ডিত।

মুফ্‌তি। (জুর্দ্দ্যার প্রতি)

সে তি সাবির
তি রেস পান্দির
সে নন সাবির
তাজির তাজির।

(দুই জন দর্বেশ জুর্দ্দ্যার একটু দূরে লইয়া গিয়া)

মুফতি। দিবে, কিস্টার রিস্তা? আনাবাতিস্তা? আনাবাতিস্তা?

তুর্কগণ। ইয়ক্।

মুফতি। জুইঙ্গ্লিস্তা।

তুর্কগণ। ইয়বা।

মুফতি। কফ্‌তা?

তুর্কগণ। ইয়ক?

মুফতি। হুমিতা? মবিসটা? ফ্রুনিস্তা?

তুর্কগণ। ইয়ক, ইয়ক, ইয়ক

মুফতি। হালাবা বালা হু বালাবা

তুর্কগণ। হালাবা বালা হু বালাবা বালাদা।

---

১১ দৃশ্য।

মুফ্‌তি। (জুর্দ্দ্যার মাথায় একটা প্রকাণ্ড পাগ্‌ড়ি পরাইয়া, তাঁকে হাটু গাড়িয়া বসাইয়া তাহার পৃষ্ঠে কোরান চাপাইয়া—উচ্চৈঃস্বরে ঊর্দ্ধদিকে বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া—হু!)

তুর্কগণ—হু হু হু।

জু। (পৃষ্ঠ হইতে কোরান নামাইয়া লইলে পর)

উঃ!—

মুফ্‌তি। (জুর্দ্দ্যাকে তলোয়ার দান) দারা দারা বাস্তোনারা

তুর্কগণ। দারা দারা বাস্তোনারা।

---

* এই সকল দৃশ্য একটু সংক্ষেপ করা গিয়াছে।

পঞ্চম অঙ্ক।

১ দৃশ্য।

জুর্দ্যা, জুর্দ্যার-স্ত্রী।

জু-স্ত্রী। ও মা, এ কি! একি সর্ব্ব-নাশ! এ কি মূর্ত্তি! এ রকম ক'রে বাঁদর সাজিয়ে দিলে কে?

জু। বেয়াদব্ কোথাকারে, এক জন মামামুষিকে তুমি এই রকম করে বল?

জু-স্ত্রী। সে কি?

জু। হাঁ এখন আমাকে সকলের মান্য করতে হবে—এখন আমি মামামুষি হয়েচি।

জু-স্ত্রী। ওর মানে কি?—মামামুষিটা কি আবার?

জু। মামামুষি—মামামুষি।

জু-স্ত্রী। সে কি রকম জানোয়ার?

জু। মামামুষি অর্থাৎ আমাদের ভাষায় রায় বাহাদুর।

জু-স্ত্রী। কি! লাল বাঁদর?

জু। আরে মূর্খ! আমি বলচি রায় বাহাদুর। আমাকে এই মাত্র সবাই ধরে রায় বাহাদুর করে দিলে। তারই এতক্ষণ অনুষ্ঠান হচ্ছিল।

জু-স্ত্রী। সে কি রকম অনুষ্ঠান?

জু। দারা দারা বাস্তনারা।

জু-স্ত্রী। তার মানে কি?

জু। সে তি সাবির, তি রেসপন্ডির।

জু-স্ত্রী। সে কি?

জু। সে নন সাবির, তাজির তাজির।

জু-স্ত্রী। ও সব কি ছাই ভস্ম বলচ?

জু। ইয়ফ ইয়ফ ইয়ফ।

জু-স্ত্রী। ওসবের মানে কি?

জু। (গাইতে গাইতে ও নাচিতে নাচিতে) হলা বা বালাসু, বালাবা বালাহা (ভূমিতলে পড়িয়া)

জু-স্ত্রী। ওমা! কি হবে! আমার স্বামী পাগল হয়ে গেছেন।

জু। (উঠিয়া ও যাইতে যাইতে) চুপ বেয়াদব মামামুষি-সাহেবকে মান্য করিস্।

জু-স্ত্রী। (একাকী) কি ক'রে পাগল হলেন? আমি দৌড়ে যাই, বাড়ি থেকে না বেরিয়ে যান (দরিমেন ও দোরান্তকে দেখিতে পাইয়া) যা বাকি ছিল তাই এই-বার হবে দেখচি! চারি দিকেই বিপদ।

দো। হাঁ, বেগম, এমন মজার ব্যাপার তুমি কখন দেখনি—আর আমার মনে হয় না যে দুনিয়ার মধ্যে ও লোকটার মত পা-গল আর কেউ আছে, ক্লেয়োন্তের যাতে বিবাহটা ঘটে সে বিষয়ে আমাদের চেষ্টা করতে হবে, আর সে যখন ছদ্মবেশ করে আসবে তখন তাতে আমাদের পোষকতা করতে হবে। সে লোকটা বড় ভাল, সে সাহায্য পাবার যোগ্য।

দরি। তার উপর আমার খুব শ্রদ্ধা আছে, তার মনস্কামনা পূর্ণ হলেই ভাল।

দো। তা ছাড়া, এখানে একটা আমাদের ব্যালে-নাচ হবে—সেটা তোমাকে দেখতেই হবে—আমি যেটা কল্পনায় করিছিলুম সেটা কাজে ঠিক্ হল কি না তাও দেখা দরকার।

দরি। ওখানে আমি দেখ্‌ছিলুম ভারি জম‌্‌কালো রকম আয়োজন হচ্চে—কিন্তু দোরান্ত এ সকল আর সহ্য করা যায় না। হাঁ, আমি এইবার তোমার এই খরচের ছড়াছড়ি বন্দ করে দেব, তুমি আমার জন্য যে সব অজস্র খরচ কর তার স্রোত বন্ধ করবার জন্য আমি এই প্রতিজ্ঞা করেছি যে শীঘ্রই তোমার সঙ্গে আমি বিবাহ করব।

দো। আ! বেগম্—এ কখন হতে পারে যে তুমি আমার জন্য এই রকম মধুর প্রতিজ্ঞা করবে।

দরি। তোমার যাতে সর্ব্বনাশ না হয় এই জন্যই আমি বিবাহ করতে রাজি হচ্চি—তা না হলে আমি বেশ দেখতে পাচ্চি আর দিন কতক পরে একটি পয়সাও তোমার হাতে থাকবে না।

দো। বেগম আমার টাকা বাঁচাবার জন্য যে তোমার এত ভাবনা তাতে তোমার কাছে আমি অত্যন্ত বাধিত হলুম। আমার হৃদয় যেমন, তেমনি আমার সমস্ত ধন সম্পত্তিও তোমার—আর তোমার যে রকম ইচ্ছে সেই রকম তার ব্যবহার করতে পার।

দরি। আমি দুয়েরই ভাল ব্যবহার করব। কিন্তু এই যে কর্ত্তা আস্‌চেন। চমৎকার মূর্ত্তি হয়েছে।

---

৩ দৃশ্য।

জুর্দাঁ, দরিমেন, দোরান্ত।

দো। আপনার নূতন পদের সম্মান করতে, আর তুর্ক-রাজার ছেলের সঙ্গে যে আপনার মেয়ের বিবাহ হবে তাতে আহ্লাদ প্রকাশ করতে আমরা দুজনে এসেছি।

জু। (তুর্ক-ধরণে বন্দেগি করিয়া)

মহাশয়, আমি ইচ্ছা করি যে আপনি সর্পের ন্যায় বলবান আর সিংহের ন্যায় চতুর হন।

দরি। প্রথমে যার কথা বল্লেন আমরা তারই ন্যায় আপনার এই উচ্চ পদোন্নতিতে আহ্লাদ প্রকাশ করতে এসেছি।

জু। বেগম, আমি ইচ্ছা করি, তুমি সারা বৎসর প্রফুল্ল গোলাপ হয়ে থাক। আমার পদোন্নতিতে আহ্লাদ প্রকাশ করচ এজন্যে আমি অত্যন্ত বাধিত হলুম—আর তুমি এখানে ফিরে এসেছ বোলে আমি ভারি খুসি হলুম। আমার স্ত্রী যে রকম বাড়াবাড়ি করেছিল তার জন্য মার্জ্জনা চাইতে এখন অবসর পেলুম।

দরি। সে কিছুই নয়, তাঁর ও রকম ব্যবহার আমি মাপ কচ্চি। আপনার মত হৃদয় তাঁর নিকট নিশ্চয়ই খুব মূল্যবান, আর এমন রত্ন পেয়ে তাঁর যে হারাবার আশঙ্কা হতে পারে তাতে আর আশ্চর্য্য কি!

জু। আমার হৃদয়, যে তুমিই অধিকার করেছ।

দরি। দেখ বেগম, সম্পদে যারা অন্ধ হয় সে রকম ধরনের লোক জুর্দাঁ সাহেব নন এখন যে ওঁর এত উঁচু পদ হয়েচে তবু দ্যাখো উনি বন্ধুদের এখনও ভোলেন নি।

দরি। ও মহৎ অন্তঃকরণেরই চিহ্ন।

দো। ভাল, শাজাদা এখন কোথায়? আমরা হচ্চি আপনার বন্ধু, তাঁর সম্মান করা আমাদের কর্ত্তব্য কাজ।

জু। এই যে উনি আসচেন। আর ওঁর সঙ্গে বিবক্ত দেবার জন্য আমার মেয়েকে ডাকতে পাঠিয়েছি।

---

৪ দৃশ্য।

জুর্দাঁ, দরিমেন, দোরান্ত, তুর্ক বেশ-ধারী ক্লেয়োন্ত।

দো। (ক্লেয়োন্তর প্রতি) আপনার রাজশ্রীচরণে আমাদের প্রণাম। আমরা আপনার শ্বশুরের বন্ধু, আমাদের বিনীত অভিবাদন গ্রহণ করুন।

জু। তোমাদের পরিচয় দেবার জন্য, আর তোমরা যা বলবে তা বুঝিয়ে দেবার জন্য দ্বিভাষীর আবশ্যক—কোথায় সেই দ্বিভাষী? তোমরা দেখো তোমাদের কথায় উনি উত্তর দেবেন—তিনি বড় চমৎকার তুর্কভাষা কইতে পারেন। ওহে! কোন্ চুলোয় না জানি সে গেছে।

জু। (ক্লেয়োন্তের প্রতি) স্ত্রুক, স্ত্রুক, স্ত্রুক। ইয়ে সাহেব, বড়া সাহবে বড়া সাহেব; ইয়ে বেগম বড়া বেগম বড়া বেগম (বুঝাইতে পারিতেছেন না দেখিয়া) আ! (ক্লেয়োন্তের নিকট দোরান্তকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া) মশায় উনি একজন এ-দেশী মামামুষী। আর উনি হচ্চেন এদেশী মামামুষিনী। এর চেয়ে ভাল ক'রে আমি তো আর বোঝাতে পারিনে। এই যে দ্বিভাষী এসেছে, এখন বেশ হবে।

---

৫ দৃশ্য।

জুর্দাঁ, দরিমেন্ দোরান্ত, তুর্ক পরিচ্ছদ-ধারী ক্লেয়োন্ত, ছদ্মবেশী কোবিয়েল।

জু। কোথায় যাচ্চ হে? তুমি না থাকলে আমরা কিছুই কথা কোইতে পারব না! (ক্লেয়োন্তকে দেখাইয়া) ভাল ওঁকে একটু বুঝিয়ে বল দেখি যে এঁরা হচ্চেন বড় লোক—আর আমার বন্ধু বোলে ওরা ওঁকে সেলাম দিতে এসেছেন (দরিমেন ও দোরান্তের প্রতি) দেখো কেমন উত্তর দেবে এখন।

কো। আমাবাযা কুকিয়াম আক্‌কি বোরাম আলাবামেন।

ক্লে। কাতালেকি তুবাল উরিন সো-তের আমালুছান।

জু। (দরিমেন ও দোরাস্তের প্রতি) দেখচ।

কো। উনি বোলচেন সম্পদের বৃষ্টি

যেন সকল সময়ে আপনার-পরিবার বাগানে জল দেয়।

জু। আমি তো তোমাদের আগেই বলেছিলুম যে উনি তুর্ক ভাষা চমৎকার বোলতে পারেন।

দরি। বা! বড় চমৎকার!

---

৬ দৃশ্য।

লুসিল, ক্লেয়োন্ত, জুর্দাঁ্যা, দরিমেন, দোরান্ত কবিয়েল।

জু। এসো বাছা; কাছে এসো, এঁর হাতে হাত দেও—ইনি তোমার বিবাহের প্রার্থী হয়ে তোমার মান বাড়াচ্চেন।

লু। একি! বাবা, একি রকম অদ্ভুত সাজে সেজেচ? তুমি কি যাত্রার সং সাজতে যাচ্চ না কি?

জু। না, না এ যাত্রা নয়; এ ভারি গম্ভীর বিষয়—আর এতে বাছা তোমার যেমন মান হচ্চে এমন আর কিছুতে নয়। (ক্লেয়োন্তকে দেখাইয়া) ইনিই তোমার বর।

লু। আমার, বাবা?

জু। হাঁ তোমার। এই এসো, তোমার হাত আমি ওঁকে দিলুম—আর এই সুখের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দেও।

লু। আমার বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই।

জু। আমি তোমার বাপ, আমার এই ইচ্ছে।

লু। আমি তা কিছুতেই করব না।

জু। আঃ! কি গোলমাল! এসো আমি বলচি—হাত দেও।

লু। না, বাবা; আমি তো তোমাকে বলেচি ক্লেয়োন্ত ভিন্ন আর কারও সঙ্গে কেউই আমাকে জোর করে বিয়ে দিতে পারবে না; আর আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে বরং আমি সব অত্যাচার সহ্য করব তবু—(ক্লেয়োন্তকে চিনিতে পারিয়া) সত্যি বটে তুমিই আমার বাবা; তোমার আজ্ঞা পালন করা সম্পূর্ণরূপে আমার উচিত—এখন তোমার যা ইচ্ছে তাই করতে পার।

জু। আ! এত শীঘ্‌ঘির যে তোমার কর্ত্তব্য জ্ঞান ফিরে এসেছে এতে বড় আমি খুসি হলুম, এমন আজ্ঞাকারী মেয়ে কখন কারু হবে না।

---

৭ দৃশ্য।

জুর্দাঁ্যার স্ত্রী, ক্লেয়ান্ত, জুর্দাঁ্যা, লুসিল, দোরান্ত, দরিমেন, কোবিয়েল।

জু-স্ত্রী। ব্যাপারটা কি বল দেখি? এসব কি? শুনতে পাচ্চি না কি তুমি একজন বোবার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেবে।

জু। তুমি কি চুপ করবে বেয়াদব? সকল কথাতেই তোমার না থাকলে চলে না—না? কিছুতেই কি তোমার একটু বুদ্ধি শুদ্ধি হবে না?

জু-স্ত্রী। আমার বুদ্ধি হবে না, না তোমার বুদ্ধি হবে না—তোমার পাগ্‌লামি ক্রমেই দেখ্‌চি বাড়্‌চে—এসব লোকজন কিসের জন্য?

জু। আমি তুর্ক রাজার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব।

জু-স্ত্রী। তুর্ক রাজার ছেলের সঙ্গে ?

জু। (কোবিয়েলকে দেখাইয়া) হাঁ। এই দ্বিভাষীর সাহায্য নিয়ে তুমি একটু ওর সঙ্গে কথা বার্ত্তা কও।

জু-স্ত্রী। আমার দ্বিভাষীর দরকার নেই, আমি নিজেই ওর মুখের সামনে বলব যে ও আমার মেয়েকে কখনই পাবে না।

জু। ফের আমি বল্‌চি তুমি কি চুপ করবে ?

দো। কি! ঠাকরুণ! এমন মানের কাজে তুমি বাধা দিচ্চ? শাজাদাকে তোমার জামাই করতে সম্মত হচ্চ না ?

জু-স্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ! মশাই তুমি আপনার চড়কায় তেল দেও।

দরি। এমন সৌভাগ্যকে অগ্রাহ্য করতে নেই।

জু-স্ত্রী। বেগম তোমাকেও বল্‌চি, তোমার এতো মাথা ব্যাথায় কাজ নেই।

দো। বন্ধুত্ব আছে বোলেই তোমাদের ভাল মন্দ দেখ্‌তে হয়।

জু-স্ত্রী। তোমার বন্ধুত্বে আমার দরকার নেই।

দো। তোমার মেয়েও তো বাপের মতে মত দিয়েচে।

জু-স্ত্রী। এক জন তুর্ককে বিয়ে করতে আমার মেয়ের মত হয়েচে ?

দো। নিশ্চয়ই।

জু-স্ত্রী। ক্লেয়োন্তকে সে ভুল্‌তে পারে ?

দো। বড় লোকের স্ত্রী হবার জন্য কি না করতে পারে ?

জু-স্ত্রী। ও রকম কাজ করলে আমি তার গলা টিপে মেরে ফেলি।

জু। ভাল বকড় বকড় আরম্ভ করেছে! আমি বলচি এই বিবাহ হতেই হবে।

জু-স্ত্রী। আমি বলচি কখনই হবে না।

জু। আ! কি গোলমাল!

লু। মা!

জু-স্ত্রী। যা! যা! তুইও ঐ দলের।

জু। (জু-স্ত্রীর প্রতি) যে মেয়ে আমার এমন আজ্ঞাকারী তার সঙ্গে তুমি ঝগ্‌ড়া কচ্চ ?

জু-স্ত্রী। হাঁ। ও যেমন তোমার মেয়ে, তেমনি আমার ও মেয়ে।

কো। (জু-স্ত্রীর প্রতি) ঠাকরুণ!

জু-স্ত্রী। কি তুমি আমাকে বোলতে চাও ?

কো। একটি কথা।

জু-স্ত্রী। তোমার কথায় আমার কাজ নেই।

কো। (জর্দ্দার প্রতি) মশায় যদি উনি গোপনে আমার একটি কথা শোনেন তাহলে নিশ্চয় বলচি এই বিবাহে মত দেবেন।

জু-স্ত্রী। আমি কখনই মত দেব না।

কো। একবার টি ভাল শুনুন।

জু-স্ত্রী। না—আমি শুনতে চাই নে।

জু। উনি তোমাকে বল্‌বেন—

জু-স্ত্রী। ওর কোন কথা আমি শুন্‌তে চাইনে।

জু। স্ত্রী লোকের কি ভয়ানক এক গুঁয়েমি! ওর কথা একবারটি শুন্‌লে কি তোমার কান পোচে যাবে ?

কো। একবারটি কেবল শুনুন; তার পর যা ইচ্ছে তাই কর বন।

জু-স্ত্রী। আচ্ছা! কি?

কো। (জু-স্ত্রীর প্রতি চুপি চুপি) ঠাকরুণ এক ঘণ্টা ধরে তোমাকে ইসারা কচ্চি! এ তুমি বুঝতে পাচ্চ না যে তোমার স্বামীর মন যোগাবার জন্যই এ সব কচ্চি? এই সব সং সেজে ওঁকে ভোলাচ্চি—ক্লেয়োন্তই তুর্ক-রাজার ছেলে সেজেচে।

জু-স্ত্রী। (কোবিয়েলের প্রতি চুপি-চুপি) আ! আ!

কো। (জু-স্ত্রীর প্রতি চুপি চুপি) আর আমি কোবিয়েল দ্বিভাষী সেজেচি।

জু-স্ত্রী। (কোবিয়েলের প্রতি চুপি চুপি) আ! এই রকম ব্যাপার হয়েছে? তবে আর কি।

কো। (জু-স্ত্রীর প্রতি চুপি চুপি) তুমি যে এ সব টের পেয়েছ যেন প্রকাশ না হয়।

জু-স্ত্রী। (উচ্চৈস্বরে) আচ্ছা ভাল তাই হোক, আমি এই বিবাহে মত দিলেম।

জু। আ! সকলেরই এখন বুদ্ধি শুদ্ধি ফিরে আসছে দেখ্‌চি। (জু-স্ত্রীর প্রতি) তুমি ওঁর কথা শুনতে চাচ্ছিলে না। আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলুম যে তুর্ক রাজার ছেলে যে কি চীজ্ তাই উনি বুঝিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন।

জু-স্ত্রী। উনি আমাকে সব বুঝিয়ে দিয়েছেন—আমি এখন সন্তুষ্ট হয়েছি। এখন একজন পুরুতকে ডাকা যাক্।

দো। ঠিক বলেছেন। আর, আরও আপনি সন্তুষ্ট হবেন যখন শুনবেন যে আপনার স্বামীর উপর আপনার যে সন্দেহ হয়েছে তা ভঞ্জন করবার জন্য সেই একই পুরোহিতের দ্বারা এই বেগমের সঙ্গে আমারও বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হবে।

জু-স্ত্রী। এতেও আমার মত দিলুম।

জু। (দোরান্তের প্রতি চুপি চুপি) ওকে বিশ্বাস করাবার জন্য বুঝি?

দো। (জুর্দ্যাঁর প্রতি) ঠাকরুণকে ভোগা দেওয়া যাচ্চে।

জু। (চুপি চুপি) বেশ, বেশ! (উচ্চৈঃ) কে আছিস্—শীঘ্‌গির পুরুত ডেকে নিয়ে আয়।

দো। যতক্ষণ না পুরুত আসে ততক্ষণ একটু নাচ-গান করে শাজাদাকে আমোদ দেওয়া যাক।

জু। বেশ মৎলব ঠাওরেছ। এসো আমরা নিজের নিজের জায়গায় বসি।

জু-স্ত্রী। আর নিকোল?

জু। ওকে আমি ঐ দ্বিভাষীর হাতে সোঁপে দিলুম; আর আমার স্ত্রীকে?—কেন, যে চায় তাকেই দিচ্চি।

কো। মশায়েরর যথেষ্ট অনুগ্রহ (জনান্তিকে) এর চেয়েও যদি কোন বেশি পাগল থাকে, সে কেবল উলোয়।

—নৃত্য-গীত—

সমাপ্ত।

চট্টগ্রামের পুরাতত্ত্ব।

চতুর্থ অধ্যায়।

চাকমা জাতি।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামবাসী মগদিগকে চট্টগ্রামবাসীগণ "জুমিয়া," "জুমিয়া মগ," বা "পাহাড়িয়া মগ" বলে। এই সকল মগগণ কয়েকটী শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী চাকমা নামে পরিচিত। প্রকৃত পক্ষে ইহাদের জাতীয় নাম "তাক," "সাক" বা "তাক্‌সাক"। ইহাদিগের সংখ্যা প্রায় ২৮ সহস্র। ইহাদের এক জন সরদার বা রাজা আছেন। এই নরপতি ক্রমে হিন্দু বাঙ্গালী শ্রেণীতে স্থানাধিকারে অভিলাষী। উপসংহারভাগে আমরা ইহাদিগের সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া প্রস্তাব শেষ করিব।

সাক রাজবংশাবলী। (৭৪)

।
১
রাজা জমোয়াল খাঁ।
।
২
রাজা সুখদয়াল রায়।
।
৩
রাজা শ্রীদৌলত খাঁ।
।
৪
রাজা জানবকস খাঁ।
।
৫
রাজা তব্বর খাঁ।
।
৬
রাজা জব্বর খাঁ।
।
৭
রাজা শ্রীধর্ম্মবক্স খাঁ।
।
৮
(রাজা ধর্ম্মবক্সের পত্নী)
রাণী কালিন্দী।
।
৯
(তাহাদের দৌহিত্র।)
রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর।

কাপ্তান লেউইন সাহেব অন্যান্য মগজাতির উক্তি অনুসারে লিখিয়াছেন, "একবার চট্টগ্রামের মোগল শাসনকর্ত্তা আরাকানের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। তিনি সসৈন্যে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইলেন। যে সকল মোগলগণ মগপত্নী সংযোগে যে

৭৪ কয়েকটী নাম মাত্র পাওয়া গিয়াছে।

সকল সন্তান উৎপাদন করে তাহারাই সাক বা চাকমা নামে খ্যাত হইয়াছে।" লেউইন রাজাদিগের নাম ও তৎসহ "খাঁ" শব্দ-সংযোগ এই উক্তির পোষণোপযোগী প্রমাণ বিবেচনা করিয়াছেন। আমরা ইহা সঙ্গত বোধ করি না। মগদিগের যবন নাম ও উপাধি-গ্রহণের প্রমাণ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। বিজ্ঞবর হজসন সাহেব, সাকজাতি আরাকানের প্রাচীন অধিবাসীর সন্তান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ পাঠান দিগের দিল্লি অধিকারের বহু পূর্ব্বে সাকজাতির অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। আরাকানের প্রামাণ্য ইতিহাস "রাজোয়াং" গ্রন্থে লিখিত আছে ৩৫৬ ব্রঃ অব্দে (৪০২ বঙ্গাব্দে) রাজা ন্যায় মিং ন্যায় তাইন সাক-জাতির সাহায্যে আরাকানের সিংহাসন অধিকার করেন। সাক রাজগণ বলেন তাঁহারা "আর্য্য সোম বংশ সমুৎপন্ন। চম্পা নগরের (১৫) রাজার দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ সসৈন্যে মগধ (১৬) রাজ্য আক্রমণ করেন। তিনি মগধ অধিকার করিয়া সংবাদ পাইলেন, তাঁহার পিতা কাল-কবলিত হইয়াছেন ও কনিষ্ঠ পৈতৃক আসন অধিকার করিয়াছেন; অগত্যা তাঁহাকে বিজিত রাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিতে হইল।" এই মৌখিক উক্তির পোষণ জন্য প্রামাণ্য ইতিহাস হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। রাজোয়াং গ্রন্থের লেখা ও সাক-রাজগণের উক্তিতে অল্পই প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। রাজোয়াং গ্রন্থে চম্পানগরের রাজপুত্রের পরিবর্ত্তে বারাণসীর রাজপুত্র ক্ষেমসিংহের নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত রাজপুত্র ও তাহার অনুচরদিগকে ভারতবাসী হিন্দু সন্তান লেখা হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় সাকগণ মগধ (বিহার প্রদেশ) হইতে তাড়িত মগদিগের সন্তান। যশস্বী ঐতিহাসিক টড সাহেব "তাক" বা "তক্ষক" জাতি রাজপুতনার রাজ-বংশের তালিকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। (১৭) তাহার নির্দ্দেশ অনুসারে তাক বা তক্ষক জাতি সাক দ্বীপবাসী (Scythis) নাগ-বংশজ প্রতিপন্ন হইতেছে।

৩৫৬ ব্রঃ অব্দে এই জাতির সাহায্যে ন্যায়মিং ন্যায় তাইন কর্ত্তৃক আরাকানের রাজাসন অধিকারের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে। রাজা মেঙ্গদির নাম পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন। ৬৫৬ ব্রঃ অব্দে এই নরপতি সাকজাতির পরাক্রমে অস্থির হইয়াছিলেন। তৎপরে এই জাতির সম্বন্ধে দীর্ঘকাল আমরা বিশেষ কিছু শুনিতে পাই না।

১৭১৫ খৃষ্টাব্দে (১৬৩৭) শকাব্দে) চট্টগ্রামের ফৌজদার ফর্মোকসা সাকরাজ

১৫ চম্পানগর আমাদের পাঠকগণ সমক্ষে বিশেষ পরিচিত। ("হিয়োনসাঙের বাঙ্গালা ভ্রমণ" দেখ।)

১৬ কোডাভাস্কাম অন্তর্গত মগধ।

১৭ See List of the Thirty six Royal Races of Rajasthan Tod's, Rajasthan. Vol. 1.

জমোয়াল খাঁ হইতে কর গ্রহণ করেন। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে রাজা শ্রীদৌলত খাঁ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া পরাজিত হন। ১৭৮২ খৃঃ অব্দে রাজা জানবক্স খাঁ গবর্ণমেণ্টকে বার্ষিক পাঁচ শত মন কার্পাস করদান করেন। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রিটীস-বলে তাঁহাকে নম্রতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট কার্পাসের পরিবর্ত্তে মুদ্রা কর ধার্য্য করেন।

রাজা ধর্ম্মবক্স ১৮১২ খৃঃঅঃ হইতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দাবধি শাকজাতির শাসন-দণ্ড ধারণ করেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজার মৃত্যু হইলে রাণী কালিন্দী রাজ্য-ভার গ্রহণ করিলেন। এই পাতিব্রত্য-সমুজ্জ্বল রমণী-রত্নের গুণানুবাদ করিয়া আমরা এস্থলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। তিনি কিঞ্চিদূন অর্দ্ধ শতাব্দী সাক জাতিকে শাসন করিয়া যশস্বিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ যত্ন ও অধ্যবসায়ে পার্ব্বত্য প্রদেশে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের ভিত্তি দৃঢ় হইয়াছে। তিনি সতত শক্তি-উপাসনায় নিরত ছিলেন। রমণী-কুল-মণি কালিন্দী ক্রমে আপন জাতিকে উন্নত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কালিন্দীর দৌহিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর চাকমা জাতির বর্ত্তমান সরদার, আমরা তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লিখিলাম না।

সাক জাতি ৩৩ গোয়ার (গোত্র,clan or famely) বিভক্ত। সাকরাজার অধীনে আর একটী জাতি আছে। তাহাদের নাম "তং জৈয়ানাং"। তং জৈয়ানাগণ ৬ গোজায় বিভক্ত। প্রতি গোজায় (রাজার অধীনে) এক একজন সরদার আছে। চাকমা গোজার সরদারগণের উপাধি "দেওয়ান" এবং তং জৈয়ানা গোজার সরদারগণ "আমুন" নামে আখ্যাত। সরদার দিগের পদ প্রায়ই পুরুষানুক্রমে পর্য্যবসিত হয় এবং তাহারা রাজার সহিত রাজস্বের কিয়দংশ ভাগ পাইয়া থাকে। গোজা বৃহৎ হইলে সরদার নিজ অধীনে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে পারেন। বেতন স্বরূপ তাহারা কর প্রদান হইতে নিষ্কৃতি ভোগ করে। অল্পকাল যাবত সাকদিগের স্বাধীনতা-রত্ন ব্রিটীস সিংহের কুক্ষি-প্রবিষ্ট হইয়াছে।

সাকদিগের ভাষায় বাঙ্গালা ও ত্রিপুরা ভাষার সংযোগ পরিলক্ষিত হয়। "ভারতের অনার্য্য ভাষা" শীর্ষক-প্রবন্ধ-লেখক বিজ্ঞবর কষ্ট সাহেবের মতে, "চাকমা ভাষা" মগ ও বাঙ্গলার মধ্যবর্ত্তী ভাষা। তাহাদের এক প্রকার অক্ষর আছে। অক্ষর গুলি আরাকাণী অক্ষরের সাদৃশ্যবিশিষ্ট। ইহাদিগের মধ্যে এইক্ষণ হিন্দু ও বৌদ্ধ মতের উৎসবাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা মহাবিষু দিবস সকলেই স্নানান্তে মহামুনি (গৌতম) মন্দিরে যাইয়া উপাসনা করে। ইহাই ইহাদিগের বৌদ্ধ-মত-প্রধান পর্ব্ব। সাকরাজ-ভবনে আমাদিগের নিয়মানুসারে দুর্গা, লক্ষ্মী, ও শ্যামার পূজাদি সমারোহ ও উৎসবের সহিত সম্পাদিত হইতেছে।

চাকমাদিগের সন্তান হইলে প্রসূতি একমাস অশৌচ ধারণ করে। পুত্র হইলে কিছু উৎসব হয়। কন্যার প্রতি কোন প্রকার সম্মান প্রদর্শিত হয় না। তাহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ নাই। চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে সাক পুরুষগণ দার-পরিগ্রহ করে না। ইহাদিগের মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা (৭৮) ও "কোর্টসিপ" প্রচলিত আছে। যদি কোন যুবক যুবতীর প্রণয়ে মুগ্ধ হয় এবং তাহাদের বিবাহে পিতা মাতার অসম্মতি থাকে তবে তাহারা পলায়ন করে এবং পলায়ন করিলে তাহাদের অনুসন্ধানার্থ লোক প্রেরিত হয়; ধৃত হইলে, যুবককে অর্থ দণ্ড দিয়া প্রণয়িনীর পাণিগ্রহণ করিতে হয়। ধৃত না হইলে কোন প্রকার উদ্বেগ নাই; অল্প দিনান্তে তাহারা সমাজে দম্পতীরূপে গৃহীত হইবে। পিতা মাতার সম্মতি ক্রমে বিবাহ হইলে বরকে অনেক প্রকার ব্যয়-ভার বহন করিতে হয়। বিবাহের পর দিবস কন্যার পিতা স্বীয় জামাতাকে এইরূপ একটি উপদেশ দেয়—

"গ্রহণ কর আমি তোমাকে আমার কন্যাদান করিলাম। সে অদ্যাপি বালিকা, গৃহিণীর উপযুক্ত হয় নাই। জুম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তুমি যখন দেখিবে যে তোমার খাদ্য বস্তু নষ্ট হইয়া গিয়াছে কিম্বা উপযুক্ত সময়ে গৃহকার্য্যাদি সম্পাদিত হয় নাই তখন তাহাকে প্রহার করিও না। উপদেশ দ্বারা তাহাকে শিক্ষিত করিও। যদি তিন বৎসর শিক্ষা দ্বারা কোন ফল না দর্শে এবং সে অজ্ঞ থাকিয়া যায় তবে প্রহার করিও, কিন্তু প্রাণবধ করিও না।

ত্রিপুরা ও অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতির ন্যায় সাকগণ স্বামী স্ত্রী একত্র হইয়া জুম কৃষি করে। এক দম্পতী বার্ষিক ।৷/ নয় কানি জুম করিতে পারে।

যদি কখনও কোন বিবাহিতা স্ত্রী পর পুরুষের প্রণয়ে মুগ্ধ হয় তবে সেই পুরুষকে তাহার প্রণয়িনীর পূর্ব্ব-স্বামীর বিবাহের ব্যয় (৭৯) ও অতিরিক্ত অর্থদণ্ড (অনধিক ৬০ টাকা) দিতে হয়। সম্পর্কিত স্ত্রী পুরুষ পরস্পর আসক্ত হইলে প্রত্যেকের ৫০ টাকা অর্থ-দণ্ড হয়। সাকদিগের মধ্যে প্রায়ই চৌর্য্য পরিলক্ষিত হয় না (৮০) এই সকল অপরাধের বিচার চিরকাল গ্রামস্থ পঞ্চাইত দ্বারা সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু অল্পকাল যাবত ইহারা পার্ব্বত্য

৭৮ ব্রহ্মার ইতিহাস লেখক একজন সাহেব বলেন, ব্রহ্মাগণ বাঙ্গালী অপেক্ষা সভ্য, কারণ তাহাদের মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে। আমরা বলি—যদি স্ত্রী-স্বাধীনতাই সভ্যতার লক্ষণ হয়, তাহা হইলে আমাদিগের চতুঃপার্শ্বস্থ পার্ব্বত্য মনবগণ সকলই সভ্য। আমরাই অসভ্য।

৭৯ এই প্রথাটী মণিপুরীয় দিগের মধ্যে ও দৃষ্ট হয়।

৮০ একবিংশ শতাব্দী পূর্ব্বে গ্রীক রাজদূত মেগস্থেনিস ভারত বাসিদিগের যেরূপ গুণানুবাদ করিয়াছিলেন, অদ্য আমরা একটী মাত্র পার্ব্বত্য জাতীতে সেই গুণ দর্শন করিলাম।

চট্টগ্রামস্থ ডিপুটি কমিসনরের নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়াছে।

সাকগণ আমাদের অপেক্ষা সবল ও দীর্ঘায়ু। কিন্তু কুকিগণ হইতে দুর্ব্বল। সাকগণ উত্তম বাঁশী বাজাইতে পারে। ধর্ম্ম-সংগীত ব্যতীত প্রণয়-গীত গ্রামে গাইতে পারে না ; সাকগণ বলে ইহাতে বালিকাদিরে কোমল অন্তঃকরণ বিকৃত হইতে পারে। জুম ক্ষেত্রে প্রণয়-গীত গাইতে নিষেধ নাই। জুমক্ষেত্র অতি মনোহর স্থান, তাহার অতুল সৌন্দর্য্য ও হৃদয়গ্রাহিতা দেখিয়া বোধ হয় যে তাহা প্রকৃতি দেবীর ক্রীড়া-ক্ষেত্র ; এই ক্ষেত্র একবার দৃষ্টিগোচর হইলে আর বিস্মৃত হইবার নহে।

ক্রমে পার্ব্বত্য মানবগণ সভ্যতা-বর্ত্মে অগ্রসর হইতেছে। মগগণ এক দিবস সাক্যসিংহের অনুচর-শ্রেণীতে নিবিষ্ট ছিল। অধুনা যদিচ ইহারা সম্পূর্ণ রূপে সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে নাই, তথাপি ইহারা হিন্দু এবং বাঙ্গালী শ্রেণীতে স্থান অধিকারের অভিলাষী। ইহাদিগের ভাষাও বিকৃত বাঙ্গলা। (৮১) ইহাদিগকে ভ্রাতৃ-ভাবে আলিঙ্গন করা কি আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে ? এক "ব্রহ্ম" মাতার ক্রোড়ে শয়ন করিয়াও পরস্পর সখ্যাভাব বিষদৃষ্টি কি প্রকৃতির অভীপ্সিত। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ কত অসভ্য মানববৃন্দকে সভ্য করিয়াছেন কে তাহার ইয়ত্তা করিবে। রাজেন্দ্র অশোকের জীবনী পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়, তিনি অদ্যাপি পূর্ব্ব উপদ্বীপ ও সিংহল প্রভৃতি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্লাবিত দেশ সকলে "শ্রী ধর্ম্মাশোক" আখ্যা দ্বারা জীবন্ত রহিয়াছেন। আমরা কি আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী মানবদিগকে সভ্যতা-শ্রেণীতে উন্নত করিতে পারিব না। আমাদের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা যাহাদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহাদের জন্য কি আমরা এক বিন্দু রক্ত জল করিতে প্রস্তুত হইব না ; কিন্তু কি উপায়ে তাহাদিগকে সভ্য-পদবীতে উন্নীত করিয়া তাহা-দিগের সহিত সখ্য ভাব স্থাপন করিতে হইবে ? আমরা নিঃশঙ্ক ও নিঃসন্দেহ চিত্তে বলিতে পারি আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বত্য মানবদিগকে একবারে কাঁটা চামচধারী সাহেব হইতে শিক্ষা দেওয়া এই অসাম্য পরিবর্ত্তনের উপায় নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষাকে সদুপায় মনে করিয়া তদবলম্বনও ধৃষ্টতার কার্য্য। কিন্তু আ-মাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণদিগের চেষ্টা এ বিষয়ে অবশ্যই সুফল-প্রসবিনী হইবে। (৮২) পৌত্তলিকতা যতই দোষ-মিশ্রিত

৮১ সাকদিগের ভাষা ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কষ্ট সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন "The Chukmas of uncertain origin, who are Buddhists, merging into Hindus at the same time that their Aracanese is yielding to corrupt Bengali. Cust's non-Aryan Languages of India

৮২ কুঁচবিহার ও মণিপুর প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশবাসী মানবগণই ইহার উদাহরণ স্থল।

হইক না কেন আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী অসভ্য মানবদিগকে ইহাতে আনয়ন করা অতি সহজ। যে ধর্ম্ম উৎসব ও বাহ্য আড়ম্বরে পূর্ণ অসভ্য মানবগণ অবশ্যই তাহার অনুরাগী হইবে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

জুতা-ব্যবস্থা।

(১৮৯০ খৃষ্টাব্দে লিখিত।)

গবর্ণমেণ্ট একটি নিয়মজারী করিয়াছেন; যে, "যে হেতুক বাঙ্গালীদের শরীর অত্যন্ত বে-যুৎ হইয়া গিয়াছে, গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে যে বাঙ্গালী কর্ম্মচারী আছে, তাহাদের প্রত্যহ কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে জুতাইয়া লওয়া হইবে!"

সহরের বড় দালানে বাঙ্গালীদের একটি সভা বসিয়াছে। এক জন বক্তা যাজ্ঞবল্ক, বুদ্ধ, ও বেদব্যাসের জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া, ইংরাজ জাতির পূর্ব্ব পুরুষেরা যে গায়ে রঙ মাখিত ও রথের চাকায় কুঠার বাঁধিত তাহারি উল্লেখ করিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করিলেন যে, এই জুতা-মারার নিয়ম অত্যন্ত কুনিয়ম হইয়াছে, উনবিংশ শতাব্দীতে এমন নিয়ম অত্যন্ত অনুদার। (উনবিংশ শতাব্দীটা বোধ করি বাঙ্গালীদের পৈতৃক সম্পত্তি হইবে; ও শব্দটা লইয়া তাঁহাদের এত নাড়াচাড়া, এত গর্ব্ব!) তিনি বলিলেন "আমাদের যতদূর দুর্দ্দশা হইবার তাহা হইয়াছে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আমাদের দরিদ্র করিবার জন্য সহস্রবিধ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। মনে কর, বন্ধুকে পত্র লিখিতে হইবে, ইস্ট্যাম্প চাই, তাহার জন্য রাজা প্রতিজনের কাছে দুই পয়সা করিয়া লন। মনে কর, ইংরাজ বণিকেরা আমাদের বাজারে শস্তা পণ্য আনয়ন করিয়াছেন, আমাদের স্বজাতীয়েরা ঢাকাই বস্ত্র কিনে না, দেশীয় পণ্য চাহে না, আমাদের দেশের লোকের কি কম সহ্য করিতে হইতেছে, আর ইংরাজেরা কি কম ধূর্ত্ত! এমন কি, মনে কর গবর্ণমেণ্ট ষড়যন্ত্র করিয়া আমাদের দেশে ডাকাতী ও নরহত্যা একেবারে রদ করিয়া দিয়াছেন, ইহাতে করিয়া আমাদের বাঙ্গালী জাতির পুরাতন বীরভাব একেবারে নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, (উপর্য্যুপরি করতালি) সমস্তই সহ্য হয়, সমস্তই সহ্য করিয়াছি, উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে হিমালয় ও বঙ্গদেশ হইতে পঞ্জাব দেশ একপ্রাণ হইয়া উত্থান করে নাই, কিন্তু জুতা মারা নিয়ম যখন প্রচলিত হইল, তখন দেখিতেছি আর সহ্য হয় না, তখন দেখিতেছি আর রক্ষা নাই, সকলকে বদ্ধ-পরি-

কর হইয়া উঠিতে হইল, জাগিতে হইল, গবর্ণমেণ্টের নিকটে একখানা দরখাস্ত পাঠাইতেই হইল! (উৎসাহের সহিত হাত তালি) কেন সহ্য হয় না যদি জিজ্ঞাসা করিতে চাও, তবে সমস্ত সভ্যদেশের, য়ুরোপের ইতিহাস খুলিয়া দেখ, ঊনবিংশ শতাব্দীর আচার ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখ। দেখিবে, কোন সভ্যদেশের গবর্ণমেণ্টে এরূপ জুতা-মারার নিয়ম ছিল না, এবং য়ুরোপের কোন দেশে এ নিয়ম প্রচলিত নাই। ইংলণ্ডে যদি এ নিয়ম থাকিত, ফ্রান্সে যদি এ নিয়ম থাকিত, তবে এ সভায় আজ এ নিয়মকে আমরা আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করিতাম, তবে এই সমবেত সহস্র সহস্র লোকের মুখে কি আনন্দই স্ফূর্ত্তি পাইত, তবে আমরা এই সভ্য-দেশ-সম্মত অধিকার প্রাপ্তিতে পৃষ্ঠ দেশের বেদনা একেবারে বিস্মৃত হইতাম!” (মুষলধারে করতালি বর্ষণ)। বক্তার উৎসাহ-অগ্নিগর্ভ বক্তৃতায় সভাস্থ সহস্র সহস্র ব্যক্তি এমন উত্তেজিত, উদ্দীপিত, উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সমবেত সাড়ে ৫ হাজার বাঙ্গালীর মধ্যে এত অধিক সংখ্যক লোকের মতের এমন ঐক্য হইয়াছিল যে, তৎক্ষণাৎ দরখাস্তে প্রায় সাড়ে চার শত নাম সই হইয়া গিয়াছিল।

লাট্‌সাহেব রুখিয়া দরখাস্তের উত্তরে কহিলেন তোমরা কিছু বোঝ না, আমরা যাহা করিয়াছি, তোমাদের ভালর জন্যই করিয়াছি। আমাদের সিদ্ধান্ত ব্যবস্থা লইয়া বাগাড়ম্বর করাতে তোমাদের রাজ-ভক্তির অভাব প্রকাশ পাইতেছে। ইত্যাদি”

নিয়ম প্রচলিত হইল। প্রতি গবর্ণমেণ্ট কার্য্য-শালায় এক জন করিয়া ইংরাজ জুতা-প্রহর্ত্তা নিযুক্ত হইল। উচ্চপদের কর্ম্মচারীদের ১ শত ঘা করিয়া বরাদ্দ হইল। পদের উচ্চনীচতা অনুসারে জুতা-প্রহার-সংখ্যার ন্যূনাধিক্য হইল। বিশেষ সম্মান-সূচক পদের জন্য বুট জুতা ও নিম্ন-শ্রেণীস্থ পদের জন্য নাগরা জুতা নির্দ্দিষ্ট হইল।

যখন নিয়ম ভালরূপে জারী হইল, তখন বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরা কহিল “যাহার নিমক খাইতেছি, তাহার জুতা খাইব, ইহাতে আর দোষ কি? ইহা লইয়া এত রাগই বা কেন, এত হাঙ্গামাই বা কেন? আমাদের দেশে ত প্রাচীন কাল হইতেই প্রবচন চলিয়া আসিতেছে, পেটে খাইলে পিঠে সয়। আমাদের পিতামহ প্রপিতামহদের যদি পেটে খাইলে পিঠে সইত, তবে আমরা এমনিই কি চতুর্ভুজ হইয়াছি, যে আজ আমাদের সহিবে না? স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। জুতা খাইতে খাইতে মরাও ভাল, সে আমাদের স্বজাতি-প্রচলিত ধর্ম্ম।” যুক্তি গুলি এমনিই প্রবল বলিয়া বোধ হইল, যে, যে যাহার কাজ অবিচলিত হইয়া রহিল। আমরা এমনি যুক্তির বশ! (একটা কথা এই খানে মনে হইতেছে। শব্দ-শাস্ত্র অনুসারে যুক্তির অপভ্রংশে জুতি শব্দের উৎপত্তি কি অসম্ভব? বাঙ্গালীদের পক্ষে

জুতির অপেক্ষা যুক্তি অতি অল্পই আছে, অতএব বাঙ্গালা ভাষায় যুক্তি শব্দ জুতি শব্দে পরিণত হওয়া সম্ভবপর বোধ হইতেছে!)

কিছু দিন যায়। দশ ঘা জুতা যে খায়, সে এক-শ ঘা-ওয়ালাকে দেখিলে যোড় হাত করে, বুটজুতা যে খায় নাগরা-সেবকের সহিত সে কথাই কহে না। কন্যাকর্ত্তারা বরকে জিজ্ঞাসা করে, কয় ঘা করিয়া তাহার জুতা বরাদ্দ। এমন শুনা গিয়াছে, যে দশ ঘা খায় সে ভাঁড়াইয়া বিশ ঘা বলিয়াছে ও এইরূপ অন্যায় প্রতারণা অবলম্বন করিয়া বিবাহ করিয়াছে। ধিক্, ধিক্, মনুষ্যেরা স্বার্থে অন্ধ হইয়া অধর্ম্মাচরণে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। একজন অপদার্থ অনেক উমেদারী করিয়াও গবর্ণমেণ্টে কাজ পায় নাই। সে ব্যক্তি একজন চাকর রাখিয়া প্রত্যহ প্রাতে বিশ ঘা করিয়া জুতা খাইত। নরাধম তাহার পিঠের দাগ দেখাইয়া দশ জায়গা জাঁক করিয়া বেড়াইত, এবং এই উপায়ে তাহার নিরীহ শ্বশুরের চক্ষে ধূলা দিয়া একটি পরমাসুন্দরী স্ত্রীরত্ন লাভ করে। কিন্তু শুনিতেছি সে স্ত্রীরত্নটি তাহার পিঠের দাগ বাড়াইতেছে বই কমাইতেছে না। আজ কাল ট্রেনে হউক্, সভায় হউক্, লোকের সহিত দেখা হইলেই জিজ্ঞাসা করে 'মহাশয়ের নাম? মহাশয়ের নিবাস? মহাশয়ের কয় ঘা করিয়া জুতা বরাদ্দ?" আজকালকার বি-এ এম-এরা না কি বিশ ঘা পঁচিশ ঘা জুতা খাইবার জন্য হিমসিম্ খাইয়া যাইতেছে, এইজন্য পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাকে তাঁহারা অসভ্যতা মনে করেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে তিন ঘায়ের অধিক বরাদ্দ নাই। একদিন আমারি সাক্ষাতে ট্রেনে আমার একজন এম্-এ বন্ধুকে একজন প্রাচীন অসভ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মহাশয়, বুট না নাগরা?" আমার বন্ধুটি চটিয়া লাল হইয়া সেখানেই তাহাকে বুট জুতার মহা সম্মান দিবার উপক্রম করিয়াছিল। আহা, আমার হতভাগ্য বন্ধু বেচারীর ভাগ্যে বুটও ছিল না, নাগরাও ছিল না। এরূপ স্থলে উত্তর দিতে হইলে তাহাকে কি নতশির হইতেই হইত! আজকাল সহরে পাকড়াশী পরিবারদের অত্যন্ত সম্মান। তাঁহারা গর্ব্ব করেন, তিন পুরুষ ধরিয়া তাঁহারা বুট জুতা খাইয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাদের পরিবারের কাহাকেও পঞ্চাশ ঘার কম জুতা খাইতে হয় নাই। এমন কি, বাড়ির কর্ত্তা দামোদর পাকড়াশী যত জুতা খাইয়াছেন, কোন বাঙ্গালী এত জুতা খাইতে পায় নাই। কিন্তু লাহিড়িরা লেপ্টেনেণ্ট-গবর্ণরের সহিত যেরূপ ভাব করিয়া লইয়াছে, দিবানিশি যেরূপ খোষামোদ আরম্ভ করিয়াছে, শীঘ্রই তাহারা পাকড়াশীদের ছাড়াইয়া উঠিবে বোধ হয়। বুড়া দামোদর জাঁক করিয়া বলে, "এই পিঠে ম্যাক্‌ণ্টিথের বাড়ির ত্রিশটা বুট ক্ষোয়ে গেছে!" একবার ভজহরি লাহিড়ি দামোদরের ভাইঝির সহিত নিজের বংশধরের বিবাহ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিল, দামোদর নাক সিটকাইয়া

বলিয়াছিল, তোরা ত ঠন্‌ঠোনে। সেই অবধি উভয় পরিবারে অত্যন্ত বিবাদ চলিতেছে। সে দিন পূজার সময় লাহিড়িরা পাকড়াশীদের বাড়িতে সওগাতের সহিত তিন ঘোড়া নাগরা জুতা পাঠাইয়াছিল; পাকড়াশীদের এত অপমান বোধ হইয়াছিল যে, তাহারা নালিষ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল; নালিষ করিলে কথাটা পাছে রাষ্ট্র হইয়া যায় এই জন্য থামিয়া গেল। আজ কাল সাহেবদিগের সঙ্গে দেখা করিতে হইলে সম্ভ্রান্ত "নেটিব" গণ কার্ডে নামের নীচে কয় ঘা জুতা খান, তাহা লিখিয়া দেন, সাহেবের কাছে গিয়া যোড়-হস্তে বলেন "পুরুষানুক্রমে আমরা গবর্ণমেণ্টের জুতা খাইয়া আসিতেছি; আমাদের প্রতি গবর্ণমেণ্টের বড়ই অনুগ্রহ।" সাহেব তাঁহাদের রাজ ভক্তির প্রশংসা করেন। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চান না; তাঁহারা বলেন, "আমরা গবর্ণমেণ্টের জুতা খাই, আমরা কি জুতাহারামী করিতে পারি!"

সে দিন একটা মস্ত মকদ্দামা হইয়া গিয়াছে। বেণীমাধব শিকদার গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুগ্রহে আড়াইশ ঘা করিয়া জুতা খায়। জুতাবর্দ্দারের সহিত মনান্তর হওয়াতে একদিন সে তাহাকে সাত ঘা কম মারিয়াছিল। ডিষ্ট্রিক্ট জজের কোর্টে মকদ্দমা উঠিল। জুতাবর্দ্দার নানা মিথ্যা সাক্ষী সংগ্রহ করিয়া প্রমাণ করিল যে মারিতে মারিতে তাহার পুরাতন বুট ছিঁড়িয়া যায় কাজেই সে মার বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। জজ মকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া দিলেন। হাই-কোর্টে আপিল হইল। উভয় পক্ষে বিস্তর ব্যারিষ্টর নিযুক্ত হইল। তিন মাস মকদ্দমার পর জজেরা সাব্যস্ত করিলেন সত্যই জুতা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, অতএব ইহাতে আসামীর কোন দোষ নাই। বেণীমাধব প্রিবি কৌন্সিলে আপিল করিলেন। সেখানে বিচারক রায় দিলেন "হাঁ সত্য সত্যই বেণীমাধবের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে। সে যখন বারো বৎসর ধরিয়া নিয়মিত আড়াই শত জুতা খাইয়া আসিতেছে, তখন তাহাকে এক দিন দুই শত তেতাল্লিশ জুতা মারা অতিশয় অন্যায় হইয়াছে। আর জুতা ছেঁড়ার ওজর কোন কাজেরই নহে।" বেণীমাধব বুক ফুলাইয়া বলিল "হাঁ হাঁ, আমার সঙ্গে চালাকী!" সাধারণ লোকেরা বলিল "না হইবে কেন! কত বড় লোক? উঁহাদের সহিত পারিয়া উঠিবে কেন?" এই উপলক্ষে হিন্দু পেট্রিয়টে একটা আর্টিকেল লিখিত হয়; তাহাতে অনেক উদাহরণ সমেত উল্লেখ থাকে যে, "ইংরাজ জুতা-বর্দ্দারেরা আমাদের বড় বড় সম্ভ্রান্ত নেটিব কর্ম্মচারীদিগের মান অপমানের প্রতি দৃষ্টি রাখে না। যাহার যত বরাদ্দ তাহাকে তাহার কম দিতে শুনা যায়। অতএব আমাদের মতে বাঙ্গালী জুতা বর্দ্দার নিযুক্ত হউক। কিন্তু এক কথায় তাঁহার সে সমস্ত যুক্তি খণ্ডিত হইয়া যায়—"যদি বাঙ্গালী জুতাবর্দ্দার নিযুক্ত করা যায় তবে তাহাদের জুতাইবে কে?" আজকাল বঙ্গদেশে একমাত্র আশীর্ব্বাদ

প্রচলিত হইয়াছে,অর্থাৎ "পুত্র পৌত্রানুক্রমে গবর্ণমেণ্টের জুতা ভোগ করিতে থাক আমার মাথায় যত চুল আছে, তত জুতা তোমার ব্যবস্থা হউক।" সেই আশীর্ব্বচনের সহিত এই প্রবন্ধের উপসংহার করি। (১)

সঙ্গীত ও ভাব।

(বেথুন সোসাইটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা)

* অল্প দিন হইল বঙ্গ-সমাজের নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে, এখন তাহার শরীরে একটা নব উদ্যমের সঞ্চার হইয়াছে। তাহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে স্ফূর্ত্তি বিকাশ পাইতেছে। সেই স্ফূর্ত্তি, সেই উদ্যম, সে কাজে প্রয়োগ করিতে চায়, সে কাজ করিতে চায়। সে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে চলিতে ফিরিতে চেষ্টা করিতেছে। একদল লোক মহা শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিয়াছেন "আরে সর্ব্বনাশ হইল; তুই উঠিস্‌নে, তুই উঠিস্‌নে; কে জানে কোথায় পড়িয়া যাইবি! তোর উঠিয়া কাজ নাই, তুই ঘুমা!" কিন্তু শিশুদেরও যে প্রকৃতি, নূতন সমাজেরও সেই প্রকৃতি। যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সে নব উদ্যমে খেলা করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে চায়।

* এই বক্তৃতাতে বক্তার মত উদাহরণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছিল। এই বক্তৃতায় বহু সংখ্যক গান গাহিয়া কি-কি স্বর-বিন্যাস দ্বারা কি-কি ভাব প্রকাশিত হয়, তাহারই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছিল। বিভিন্ন ভাব-ব্যঞ্জক গানের ভাবকে ও তৎসঙ্গে সুরকে বিশ্লেষণ করিয়া বক্তা নিজ-মত সমর্থন করিয়াছিলেন। সে সকল উদাহরণে কণ্ঠের সাহায্য আবশ্যক, এ নিমিত্ত সমস্তই পরিত্যাগ করিতে হইল, কেবল মাত্র ভূমিকা ও উপসংহার প্রকাশিত হইতেছে।—সং।

(১)"This evening's Englishman has discovered the secret of correctly treating the people of Bengal. It says 'Kick them first and then speak to them.'—Indian Mirror যে সমগ্র জাতিকে কোন-বিজাতীয় কাগজ হাটের মধ্যে এরূপ জুতা মারিতে সাহস করে, সে জাতি উপরি-প্রকাশিত প্রবন্ধ পড়িয়া বিস্মিত হইবে না। বোধ হয়, লেখক রহস্যচ্ছলে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, কিন্তু উহা সত্যের এত কাছ ঘেঁসিয়া গিয়াছে যে বাঙ্গালী জাতির পক্ষে উহা রহস্যাত্মক হইবে না। আজ অন্য কোন দেশে যদি কোন কাগজ ঐরূপ অপমানের আভাস মাত্র দিত, তাহা হইলে দেশ-বাসীরা তৎক্ষণাৎ নানা উপায়ে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিত। কিন্তু এত দিন হইতে আমরা জুতা হজম করিয়া আসিতেছি যে, আজ উহা আমাদের নিকট গুরু পাক বলিয়া ঠেকিতেছে না।—সং।

পড়িবে না ত কি! প্রকৃতি যদি শিশুদের হৃদয়ে পড়িবার ভয় দিতেন, তবে তাহারা ইহজন্মে চলিতে শিখিত না। নব-উত্থান-শীল সমাজের হৃদয়েও পড়িবার ভয় নাই। যাহারা খুব ভাল করিয়া চলিতে শিখিয়াছে, এমন সকল বড় বড় বয়ঃপ্রাপ্ত সমাজেরাই পড়িবার ভয় করুক্; তাহাদের শক্ত হাড় দৈবাৎ একবার ভাঙ্গিলে আর ঝট্ করিয়া যোড়া লাগিবে না। আমাদের শিশু সমাজ দশ বার করিয়া পড়ুক্, তাহাতে বিশেষ হানি হইবে না, বরঞ্চ ভাল বই মন্দ হইবে না। তাই বলি, সমাজ একটা নূতন কাজে অগ্রসর হইবামাত্র অমনি দশজনে হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া না আসে যেন! আসিলেও বিশেষ কোন ফল হইবে না। রক্ষণশীল মা বলিতেছেন "তাঁহার ছেলেটি চিরকাল তাঁহার স্তন্যপান করিয়া তাঁহার ঘরে থাকুক্;" উন্নতি-প্রিয় পিতা বলিতেছেন যে, "তাঁহার ছেলেটির উপার্জ্জন করিয়া খাইবার বয়স হইয়াছে, এখন তাহাকে ছাড়িয়া দাও, সে বাহির হইতে রোজগার করিয়া আনুক্!" ছেলেটীরও তাহাই ইচ্ছা। আর তাহাকে বাধা দেওয়া যায় না। এখন তাহাকে অস্বাস্থ্যকর স্নেহের জালে বদ্ধ করিয়া রাখা সুযুক্তি সঙ্গত নহে।

আমাদের বঙ্গসমাজে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, এমন কি সে আন্দোলনের এক একটা তরঙ্গ য়ুরোপের উপকূলে গিয়া পৌঁছাইতেছে। এখন হাজার চেষ্টা কর না, হাজার কোলাহল কর না কেন এ তরঙ্গ রোধ করে কাহার সাধ্য! এই নূতন আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে সঙ্গীতের নব অভ্যুদয় হইয়াছে। সঙ্গীত সবে জাগিয়া উঠিয়াছে মাত্র, কাজ ভাল করিয়া আরম্ভ হয় নাই। এখনো সঙ্গীত লইয়া নানা প্রকার আলোচনা আরম্ভ হয় নাই, নানা নূতন মতামত উত্থিত হইয়া আমাদের দেশের সঙ্গীত শাস্ত্রের বদ্ধ জলে একটা জীবন্ত তরঙ্গিত স্রোতের সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু দিন দিন সঙ্গীত শিক্ষার যে রূপ বিস্তার হইতেছে, তাহাতে সঙ্গীত বিষয়ে একটা আন্দোলন হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে বোধ করি। এ বিষয় লইয়া একটা তর্ক-বিতর্ক দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্ব না হইলে ইহার তেমন একটা দ্রুত উন্নতি হইবে না।

আমাদের সংস্কৃত ভাষা যেরূপ মৃত ভাষা, আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্র সেইরূপ মৃত শাস্ত্র। ইহাদের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, কেবল দেহমাত্র অবশিষ্ট আছে। আমরা কেবল ইহাদের স্থির অচঞ্চল জীবন-হীন মুখ মাত্র দেখিতে পাই, বিবিধ বিচিত্র ভাবের লীলাময়, ছায়ালোকময়, পরিবর্ত্তনশীল মুখ-শ্রী দেখিতে পাই না। আমরা কতকগুলি কথা শুনিতে পাই; অথচ তাহার স্বরের উচ্চ-নীচতা শুনিতে পাই না, কেবল সম-স্বরে একটি কথার পর আর একটি কথা কানে আসে মাত্র। হয়ত ক্রমে ক্রমে তাহার অর্থ বোধ মাত্র হয়, কিন্তু তাহার অর্থ গুলিকে সম্যকরূপে হজম করিয়া ফেলিয়া আমাদের হৃদয়ের রক্তের সহিত মিশাইয়া লইতে পারি না। আজ সংস্কৃত ভাষায়

কেহ যদি কবিতা লেখেন, তবে নস্য-সেবক চালকলা-জীবী আলঙ্কারিক সমালোচকেরা তাহাকে কি চক্ষে দেখেন? তৎক্ষণাৎ তাঁহারা ব্যাকরণ বাহির করেন, অলঙ্কারের পুঁথিখানা খুলিয়া বসেন, ষত্ব ণত্ব, তদ্ধিত প্রত্যয়, সমাস, সন্ধি, মিলাইয়া যদি নিখুঁৎ বিবেচনা করেন, যদি দেখেন যশকে শুভ্র বলা হইয়াছে, নলিনীর সহিত সূর্য্যের ও কুমুদের সহিত চন্দ্রের মৈত্র সম্পাদন করা হইয়াছে তবেই তাঁহারা পরমানন্দ উপভোগ করেন। আর, কেহ যদি আজ গান করেন, তবে তানপুরার কর্ণপীড়ক, খরজ সুরের জন্মদাতাগণ তাহাকে কি চক্ষে সমালোচন করেন? তাঁহারা দেখেন একটা রাগ বা রাগিণী গাওয়া হইতেছে কি না; সে রাগ বা রাগিণীর বাদী সুর গুলিকে যথা রীতি সমাদর ও বিসম্বাদী সুর গুলিকে যথা-রীতি অপমান করা হইয়াছে কি না; এ পরীক্ষাতে যদি গানটি উত্তীর্ণ হয় তবেই তাঁহাদের বাহবা-সূচক ঘাড় নড়ে। আমি সে দিন এক ব্যক্তির নিকট হইতে একটি চিঠি পাইয়াছিলাম, স্বাক্ষরিত নাম কিছুতেই পড়িয়া উঠিতে পারি নাই, অথচ সে চিঠির উত্তর দিতে হইবে; কি করি, সে যেরূপে তাহার নামটি লিখিয়াছিল, অতি ধীরে ধীরে আমি অবিকল সেইরূপ নকল করিয়া দিলাম। যদি নামটি বুঝিতে পারিতাম, তবে সেই নামটি লিখিতাম অথচ নিজের হস্তাক্ষরে লিখিতাম। অবিকল নকল দেখিলেই বুঝা যায় যে, অনুকরণকারী অনুকৃত পদার্থের ভাব আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। মনে করুন, আমি সাহেব হইতে চাই; অথচ আমি সাহেবদিগের ভাব কিছুমাত্র জানি না, তখন আমি কি করি? না, অ্যাণ্ড নামক একটি বিশেষ সাহেবকে লক্ষ্য রাখিয়া, অবিকল তাহার মত কোর্ত্তা ও পাজামা ব্যবহার করি, তাহার কোর্ত্তার যে দুই জায়গায় ছেঁড়া আছে, যত্ন পূর্ব্বক আমার কোর্ত্তার ঠিক সেই দুই জায়গায় ছিঁড়ি, ও তাহার নাকে যে স্থানে তিনটি তিল আছে, আমার নাকের ঠিক সেই খানে কালী দিয়া তিনটি তিল চিত্রিত করি। ঐ একই কারণ হইতে, যাহাদের স্বাভাবিক ভদ্রতা নাই, তাহারা ভদ্র হইতে ইচ্ছা করিলে আনুষ্ঠানিক ভদ্রতার কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে। আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্র না কি মৃত শাস্ত্র, সে শাস্ত্রের ভাবটা আমরা না কি আয়ত্ত করিতে পারি না, এই জন্য রাগ রাগিণী, বাদী ও বিসম্বাদী সুরের ব্যাকরণ লইয়াই মহা কোলাহল করিয়া থাকি। যে ভাষার ব্যাকরণ সম্পূর্ণ হইয়াছে, সে ভাষার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। ব্যাকরণে ভাষাকে বাঁচাইতে পারে না ত, প্রাচীন ইজিপ্ট বাসীদের ন্যায় ভাষার একটা "মমী" তৈরী করে মাত্র। যে সাহিত্যে অলঙ্কার শাস্ত্রের রাজত্ব, সে সাহিত্যে কবিতাকে গঙ্গাযাত্রা করা হইয়াছে। অলঙ্কারশাস্ত্রের পিঞ্জর হইতে মুক্ত হওয়াতে সম্প্রতি কবিতার কণ্ঠ বাঙ্গালার আকাশে উঠিয়াছে, আমার ইচ্ছা যে, কবিতার সহচর সঙ্গীতকেও শাস্ত্রের লৌহ-

কারা হইতে মুক্ত করিয়া উভয়ের মধ্যে বিবাহ দেওয়া হউক্।

একটা অতি পুরাতন সত্য বলিবার আবশ্যক পড়িয়াছে। সকলেই জানেন, প্রথমে যেটি একটি উদ্দেশ্যের উপায় মাত্র থাকে, মানুষে ক্রমে সেই উপায়টিকে উদ্দেশ্য করিয়া তুলে। যেমন টাকা নানা প্রকার সুখ পাইবার উপায় মাত্র, কিন্তু অনেকে সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিয়া টাকা পাইতে চান। রাগ রাগিণীর উদ্দেশ্য কি ছিল? ভাব প্রকাশ করা ব্যতীত আর ত কিছু নয়। আমরা যখন কথা কহি, তখনও সুরের উচ্চ নীচতা ও কণ্ঠ স্বরের বিচিত্র তরঙ্গলীলা থাকে। কিন্তু তাহাতেও ভাব প্রকাশ অনেকটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সেই সুরের উচ্চ নীচতা ও তরঙ্গলীলা সঙ্গীতে উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সঙ্গীত মনোভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায় মাত্র। আমরা যখন কবিতা পাঠ করি, তখন তাহাতে অঙ্গহীনতা থাকিয়া যায়, সঙ্গীত আর কিছু নয়, সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা। যেমন, মুখে যদি বলি যে, "আমার আহ্লাদ হইতেছে," তাহাতে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়, কিন্তু যখন হাস্য করিয়া উঠি, তখনই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়; যেমন মুখে যদি বলি "আমার দুঃখ হইতেছে" তাহাই যথেষ্ট হয় না, রোদন করিয়া উঠিলেই সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ হয়, তেমনি কথা কহিয়া যে ভাব অসম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করি, রাগ রাগিণীতে সেই ভাব সম্পূর্ণতর রূপে প্রকাশ করি। অতএব রাগ রাগিণীর উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা মাত্র। কিন্তু এখন তাহা কি হইয়া দাঁড়াইয়াছে? এখন রাগ রাগিণীই উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে রাগ রাগিণীর হস্তে ভাবটিকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সে রাগ রাগিণী আজ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক ভাবটিকে হত্যা করিয়া স্বয়ং সিংহাসন দখল করিয়া বসিয়া আছেন। আজ গান শুনিলেই সকলে দেখিতে চান, জয়জয়ন্তি, বেহাগ, বা কানেড়া বজায় আছে কি না; আরে মহাশয়, জয়জয়ন্তীর কাছে আমরা এমন কি ঋণে বদ্ধ, যে, তাহার নিকটে অমনতর অন্ধ দাস্যবৃত্তি করিতে হইবে? যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভাল শুনায়, আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে, তবে জয়জয়ন্তি বাঁচুন বা মরুন, আমি পঞ্চমকেই বাহাল রাখিব না কেন—আমি জয়জয়ন্তির কাছে এমনি কি ঘুষ খাইয়াছি যে, তাহার জন্য অত প্রাণপণ করিব? আজ কাল ওস্তাদবর্গ যখন ভীষণ মুখশ্রী বিকাশ করিয়া গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া গান করেন, তখন সর্ব্ব প্রথমেই ভাবের গলাটা এমন করিয়া টিপিয়া ধরেন, ও ভাব বেচারীকে এমন করিয়া আর্ত্তনাদ ছাড়ান যে, সহৃদয় শ্রোতা মাত্রেরই বড় কষ্ট বোধ হয়। বৈয়াকরণে ও কবিতে যে প্রভেদ, উপরি-উক্ত ওস্তাদের সহিত আর এক জন ভাবুক গায়কের সেই প্রভেদ। এক জন বলেন "শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে" আর এক জন বলেন "নীরস তরুরুহ পুরতো ভাতি।"

কোন্ কোন্ রাগ রাগিণীতে কি কি সুর লাগে না লাগে তাহা ত মান্ধাতার আমলে স্থির হইয়া গিয়াছে,তাহা লইয়া আর অধিক পরিশ্রম করিবার কোন আবশ্যক দেখিতেছি না, এখন সংগীতবেত্তারা যদি বিশেষ মনোযোগ সহকারে আমাদের কি কি রাগিণীতে কি কি ভাব আছে তাহাই আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন, তবেই সংগীতের যথার্থ উপকার করেন। আমাদের রাগ রাগিণীর মধ্যে একটা ভাব আছে, তাহা যাইবে কোথা বল? কেবল ওস্তাদবর্গেরা তাহাদের অত্যন্ত উৎপীড়ন করিয়া থাকেন, তাহাদের প্রতি কিছু মাত্র মনোযোগ দেন না, এমন কি তাহারা তাঁহাদের চোখে পড়েই না। সঙ্গীতবেত্তারা সেই ভাবের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করুন। কেন বিশেষ বিশেষ এক এক রাগিণীতে বিশেষ বিশেষ এক একটা ভাবের উৎপত্তি হয় তাহার কারণ বাহির করুন্। এই মনে করুন্, পূরবীতেই বা কেন সন্ধ্যাকাল মনে আসে আর ভৈরোঁতেই বা কেন প্রভাত মনে আসে? পূরবীতেও কোমল সুরের বাহুল্য, আর ভৈরোঁতেও কোমল সুরের বাহুল্য, তবে উভয়েতে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন করে কেন? তাহা কি কেবল মাত্র প্রাচীন সংস্কার হইতে হয়? তাহা নহে। তাহার গূঢ় কারণ বিদ্যমান আছে। প্রথমতঃ প্রভাতের রাগিণী ও সন্ধ্যার রাগিণী উভয়েতেই কোমল সুরের আবশ্যক। প্রভাত যেমন অতি ধীরে ধীরে, অতি ক্রমশঃ নয়ন উন্মীলিত করে, সন্ধ্যা তেমনি অতি ধীরে ধীরে অতি ক্রমশঃ নয়ন নিমীলিত করে। অতএব কোমল সুরগুলির অর্থাৎ যে সুরের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প,যে সুরগুলি অতি ধীরে ধীরে অতি অলক্ষিত ভাবে পরস্পর পরস্পরের উপর মিলাইয়া যায়, সন্ধ্যা ও প্রভাতের রাগিণীতে সেই সুরের অধিক আবশ্যক। তবে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় কি বিষয়ে প্রভেদ থাকা উচিত? না, একটাতে সুরের ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বিকাশ হওয়া আবশ্যক, আর একটাতে অতিধীরে ধীরে সুরের ক্রমশঃ নিমীলন হইয়া আসা আবশ্যক। ভৈরোঁতে ও পূরবীতে সেই বিভিন্নতা রক্ষিত হইয়াছে, এই জন্যই প্রভাত ও সন্ধ্যা উক্ত দুই রাগিণীতে মূর্ত্তিমান।

কোন্ সুর গুলি দুঃখের ও কোন্ সুর গুলি সুখের হওয়া উচিত দেখা যাক্। কিন্তু তাহা বিচার করিবার আগে, আমরা দুঃখ ও সুখ কিরূপে প্রকাশ করি দেখা আবশ্যক। আমরা যখন রোদন করি তখন দুইটি পাশাপাশি সুরের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্পই থাকে, রোদনের স্বর প্রত্যেক কোমল সুরের উপর দিয়া গড়াইয়া যায়, সুর অত্যন্ত টানা হয়। আমরা যখন হাসি—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, কোমল সুর একটিও লাগে না, টানা সুর একটিও নাই, পাশাপাশি সুরের মধ্যে দূর ব্যবধান, আর তালের ঝোঁকে ঝোঁকে সুর লাগে। দুঃখের রাগিণী দুঃখের রজনীর ন্যায় অতি ধীরে ধীরে চলে, তাহাকে প্রতি কোমল সুরের

উপর দিয়া যাইতে হয়। আর সুখের রাগিণী সুখের দিবসের ন্যায়, অতি দ্রুত-পদক্ষেপে চলে, দুই তিনটা করিয়া সুর ডিঙ্গাইয়া যায়। আমাদের রাগ রাগিণীর মধ্যে উল্লাসের সুর নাই। আমাদের সঙ্গীতের ভাবই—ক্রমে ক্রমে উত্থান বা ক্রমে ক্রমে পতন। সহসা উত্থান বা সহসা পতন নাই। উচ্ছ্বাসময় উল্লাসের সুরই অত্যন্ত সহসা। আমরা সহসা হাসিয়া উঠি, কোথা হইতে আরম্ভ করি কোথায় শেষ করি তাহার ঠিকানা নাই, রোদনের ন্যায় তাহা ক্রমশঃ মিলাইয়া আসে না। এরূপ ঘোরতর উল্লাসের সুর ইংরাজি রাগিণীতে আছে, আমাদের রাগিণীতে নাই বলিলেও হয়। তবে আমাদের দেশের সঙ্গীতে রোদনের সুরের অভাব নাই। সকল রাগিণীতেই প্রায় কাঁদা যায়। একেবারে আর্ত্তনাদ হইতে প্রশান্ত দুঃখ, সকল প্রকার ভাবই আমাদের রাগিণীতে প্রকাশ করা যায়।

আমাদের যাহা কিছু সুখের রাগিণী আছে, তাহা বিলাসময় সুখের রাগিণী, গদ-গদ সুখের রাগিণী। অনেক সময়ে আমরা উল্লাসের গান রচনা করিতে হইলে রাগিণী যে ভাবেরই হউক্ তাহাকে দ্রুত তালে বসাইয়া লই, দ্রুততাল সুখের ভাব প্রকাশের একটা অঙ্গ বটে।

যাহা হউক, এইখানে দেখা যাইতেছে যে, তালও ভাব প্রকাশের একটা অঙ্গ। যেমন সুর তেমনি তালও আবশ্যকীয়, উভয়ে প্রায় সমান আবশ্যকীয়। অতএব ভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তালও দ্রুত ও বিলম্বিত করা আবশ্যক—সর্ব্বত্রই যে তাল সমান রাখিতেই হইবে তাহা নয়। ভাব প্রকাশকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া, সুর ও তালকে গৌণ উদ্দেশ্য করিলেই ভাল হয়। ভাবকে স্বাধীনতা দিতে হইলে সুর এবং তালকেও অনেকটা স্বাধীন করিয়া দেওয়া আবশ্যক, নহিলে তাহারা ভাবকে চারিদিক হইতে বাঁধিয়া রাখে। এই সকল ভাবিয়া আমার বোধ হয় আমাদের সঙ্গীতে যে, নিয়ম আছে যে যেমন-তেমন করিয়া ঠিক একই স্থানে সমে আসিয়া পড়িতেই হয়, সেটা উঠাইয়া দিলে ভাল হয়। তালের সমমাত্রা থাকিলেই যথেষ্ট, তাহার উপরে আরো কড়াক্কড় করা ভাল বোধ হয় না; তাহাতে স্বাভাবিকতার অতিরিক্ত হানি করা হয়। মাথায় জল পূর্ণ কলস লইয়া নৃত্য করা যেরূপ, হাজার অঙ্গভঙ্গি করিলেও একবিন্দু জল উথলিয়া পড়িবেনা, ইহাও সেইরূপ একপ্রকার কষ্ট-সাধ্য ব্যায়াম। সহজ স্বাভাবিক নৃত্যের যে একটি শ্রী আছে ইহাতে তাহার যেন ব্যাঘাত করে; ইহাতে কৌশল প্রকাশ করে মাত্র। নৃত্যের পক্ষে কি স্বাভাবিক? না যাহা নৃত্যের উদ্দেশ্য সাধন করে। নৃত্যের উদ্দেশ্য কি? না অঙ্গ-ভঙ্গীর সৌন্দর্য্য অঙ্গ-ভঙ্গীর কবিতা দেখাইয়া মনোহরণ করা। সে উদ্দেশ্যের বহির্ভুক্ত যাহা কিছু, তাহা নৃত্যের বহির্ভুক্ত। তাহাকে নৃত্য বলিব না, তাহার অন্য নাম দিব। তেমনি সঙ্গীত কৌশল প্রকাশের স্থান নহে ভাব প্রকাশের স্থান, যত

থানিতে ভাব প্রকাশের সাহায্য করে তত থানিই সঙ্গীতের অন্তর্গত,যাহা কিছু কৌশল প্রকাশ করে তাহা সঙ্গীত নহে তাহার অন্য নাম। এক প্রকার কবিতা আছে, তাহা সোজা দিক হইতে পড়িলেও যাহা বুঝায়, উল্টা দিক হইতে পড়িলেও তাহাই বুঝায়, সেরূপ কবিতা কৌশল প্রকাশের জন্যই উপযোগী, আর কোন উদ্দেশ্য তাহাতে সাধন করা যায় না। সেইরূপ আমাদের সঙ্গীতে কৃত্রিম তালের প্রথা ভাবের হস্ত পদে একটা অনর্থক শৃঙ্খল বাঁধিয়া দেয়। যাঁহারা এ প্রথা নিতান্ত রাখিতে চান, তাঁহারা রাখুন্ কিন্তু তালের প্রতি ভাবের যখন অত্যন্ত নির্ভর দেখিতেছি, তখন আমার মতে আর একটি অধিকতর স্বাভাবিক তালের পদ্ধতি থাকা শ্রেয়। আর কিছু করিতে হইবে না, যেমন তাল আছে, তেমনি থাকুক, মাত্রা বিভাগ যেমন আছে তেমনি থাকুক, কেবল একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমে ফিরিয়া আসিতেই হইবে এমন বাঁধাবাঁধি না থাকিলে সুবিধা বই অসুবিধা কিছুই দেখিতেছি না। এমন কি, গীতি-নাট্যে, যাহা আদ্যোপান্ত সুরে অভিনয় করিতে হয় তাহাতে, স্থান বিশেষে তাল না থাকা বিশেষ আবশ্যক। নহিলে অভিনয়ের স্ফূর্ত্তি হওয়া অসম্ভব।

যাহা হউক্, দেখা যাইতেছে, যে সঙ্গীতের উদ্দেশ্যই ভাব প্রকাশ করা। যেমন কেবল মাত্র ছন্দ, কানে মিষ্ট শুনাক্ তথাপি অনাবশ্যক, ভাবের সহিত ছন্দই কবিদের ও ভাবুকদের আলোচনীয়, তেমনি কেবল মাত্র সুর সমষ্টি, ভাব না থাকিলে জীবনহীন দেহ মাত্র; সে দেহের গঠন সুন্দর হইতে পারে কিন্তু তাহাতে জীবন নাই। কেহ কেহ বলিবেন, তবে কি রাগ রাগিণী আলাপ নিষিদ্ধ? আমি বলি, তাহা কেন হইবে? রাগ রাগিণী আলাপ, ভাষাহীন সঙ্গীত। অভিনয়ে pantomime যেরূপ, ভাষাহীন অঙ্গ ভঙ্গী দ্বারা ভাব-প্রকাশ-করা-সঙ্গীতে আলাপও সেই রূপ। কিন্তু pantomime-এ যেমন কেবল মাত্র অঙ্গভঙ্গী হইলেই হয় না, যে সকল অঙ্গভঙ্গী দ্বারা ভাব প্রকাশ হয়, তাহাই আবশ্যক; আলাপেও সেইরূপ কেবল কতকগুলি সুর কণ্ঠ হইতে বিক্ষেপ করিলেই হইবে না, যে সকল সুর বিন্যাস দ্বারা ভাব প্রকাশ হয়, তাহাই আবশ্যক। গায়কেরা সঙ্গীতকে যে আসন দেন, আমি সঙ্গীতকে তদপেক্ষা উচ্চ আসন দিই; তাঁহারা সঙ্গীতকে কতকগুলা চেতনাহীন জড় সুরের উপর স্থাপন করেন, আমি তাঁহাকে জীবন্ত অমর ভাবের উপর স্থাপন করি। তাঁহারা গানের কথার উপরে সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপরে দাঁড় করাইতে চাই। তাঁহারা কথা বসাইয়া যান্ সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য। এই খানে গান রচনা সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। গানের কবিতা, সাধারণ কবিতার সঙ্গে কেহ যেন এক তুলাদণ্ডে ওজন না করেন। সাধারণ কবিতা পড়ি-

বার জন্য ও সঙ্গীতের কবিতা শুনিবার জন্য। উভয়ে যদি এতখানি শ্রেণীগত প্রভেদ হইল, তবে অন্যান্য নানা ক্ষুদ্র বিষয়ে অমিল হইবার কথা। অতএব গানের কবিতা পড়িয়া বিচার না করাই উচিত। খুব ভাল কবিতাও গানের পক্ষে হয়ত খারাপ হইতে পারে এবং খুব ভাল গানও হয়ত পড়িবার পক্ষে ভাল না হইতে পারে। মনে করুন, এক জন হাঃ—বলিয়া একটি নিশ্বাস ফেলিল, তাহা লিখিয়া লইলে আমরা পড়িব "হ"য়ে আকার ও বিসর্গ, হাঃ, কিন্তু সে নিশ্বাসের মর্ম্ম কি এরূপে অবগত হওয়া যায়? তেমনি আবার যদি আমরা শুনি কেহ খুব একটা লম্বা চৌড়া কবিত্ব সূচক কথায় নিশ্বাস ফেলিতেছে, তবে হাস্যরস ব্যতীত আর কোনও রস কি মনে আসে? গানও সেইরূপ নিঃশ্বাসের মত। গানের কবিতা পড়া যায় না, গানের কবিতা শুনা যায়!

উপসংহারে সঙ্গীতবেত্তাদিগের প্রতি আমার এই নিবেদন যে, কি কি সুর কিরূপে বিন্যাস করিলে কি কি ভাব প্রকাশ করে, আর কেনই বা তাহা প্রকাশ করে, তাহার বিজ্ঞান অনুসন্ধান করুন। মূলতান, ইমন-কল্যাণ, কেদারা প্রভৃতিতে কি কি সুর বাদী আর কি কি সুর বিসম্বাদী তাহার প্রতি মনোযোগ না করিয়া, দুঃখ, সুখ, রোষ বা বিস্ময়ের রাগিণীতে কি কি সুর বাদী ও কি কি সুর বিসম্বাদী, তাহাই আবিষ্কারে প্রবৃত্তি হউন্। মূলতান, কেদারা প্রভৃতি ত মানুষের রচিত কৃত্রিম রাগ রাগিণী, কিন্তু আমাদের সুখ দুঃখের রাগ রাগিণী কৃত্রিম নহে। আমাদের স্বাভাবিক কথাবার্ত্তার মধ্যে সেই সকল রাগ রাগিণী প্রচ্ছন্ন থাকে। কতকগুলা অর্থশূন্য নাম পরিত্যাগ করিয়া, বিভিন্ন ভাবের নাম অনুসারে আমাদের রাগ রাগিণীর বিভিন্ন নামকরণ করা হউক্। আমাদের সঙ্গীত বিদ্যালয়ে সুর অভ্যাস ও রাগ রাগিণী শিক্ষার শ্রেণী আছে, সেখানে রাগ-রাগিণীর ভাব-শিক্ষারও শ্রেণী স্থাপিত হউক্! এখন যেমন সঙ্গীত শুনিলেই সকলে বলেন, "বাঃ ইহার সুর কি মধুর," এমন দিন কি আসিবে না, যে দিন সকলে বলিবেন, "বাঃ কি সুন্দর ভাব!"

আমাদের সঙ্গীত যখন জীবন্ত ছিল, তখন ভাবের প্রতি যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হইত সেরূপ মনোযোগ আর কোন দেশের সঙ্গীতে দেওয়া হয় কি না সন্দেহ। আমাদের দেশে যখন বিভিন্ন ঋতু ও বিভিন্ন সময়ের ভাবের সহিত মিলাইয়া বিভিন্ন রাগ রাগিণী রচনা করা হইত, যখন আমাদের রাগ রাগিণীর বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জক চিত্র পর্য্যন্ত ছিল, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে, আমাদের দেশে রাগ রাগিণী ভাবের সেবাতেই নিযুক্ত ছিল। সে দিন গিয়াছে। কিন্তু আবার কি আসিবে না?

জাপানের বর্ত্তমান উন্নতির মূল পত্তন।

জাপানের উপর এক্ষণে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। কি করিয়া এত অল্প কালের মধ্যে জাপানীরা স্বীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিল ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যে উন্নতি এক শত বৎসরের কার্য্য তাহা তাহারা দশ বৎসরের মধ্যে সাধন করিয়াছে। ১৩ বৎসর পূর্ব্বে জাপানে "শোগুন"-আধিপত্য অর্থাৎ সেনাপতিবংশের আধিপত্য বলবৎ ছিল। "শোগুন"ই দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। সম্রাট্ কেবল সাক্ষী-গোপাল। সম্রাটের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শোগুন তাঁর নামে সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ১৬০০ শতাব্দিতে শোগুন-আধিপত্য দৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়। জাপানে বরাবর উপরাজ-অধিরাজতন্ত্র (Feudal System) প্রচলিত ছিল। "মিকাডো"র অর্থাৎ সম্রাটের অব্যবহিত অধীনে অনেকগুলি সামন্ত রাজা ছিলেন,—তাঁহাদের নাম "ডেমিও"। ইঁহারাই দেশের অভিজাত-বর্গ (Nobility)। ইঁহারা স্বাধীন ভাবে আপন আপন অধীনস্থ প্রদেশ শাসন করিতেন। এই ডেমিওদিগের অব্যবহিত অধীনে "সমরাই"। সংগ্রাম উপস্থিত হইলে ডেমিওদিগের হইয়া ইহারা যুদ্ধ করিত, এবং এই সামরিক দাসত্বের বিনিময়ে ইহারা ডেমিওদিগের নিকট হইতে জাইগির প্রাপ্ত হইত। ইহারাই দেশের সামরিক শ্রেণী। ইহারাই দেশের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়। "সমরাইগণ" আবার তাহাদিগের অনুচরদিগের সহিত নিজ নিজ অধিকারস্থ ভূমি পত্তনি বিলি করিত। "শোগুন" যদিও নামতঃ ডেমিও-সম্প্রদায়ের সম-পদবীস্থ, কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি তাহাদিগের অধিপতি। শোগুনের রাজধানী "যেদো," বর্ত্তমান "টোকিয়ো" নগর, এবং সম্রাটের রাজধানী "কিয়োটো" নগর ছিল। শোগুন আপনার অনেকগুলি অনুচরকে ডেমিও-পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং স্বীয় অনুগত লোকদিগকে প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিয়োগ করিতেন। তাঁহার যথেচ্ছাচারী প্রভুত্ব ছিল। "খোসিউ" সামন্ত রাজের অধিকারে ১০টা প্রদেশ ছিল, শোগুন তাহার মধ্যে ৮টা প্রদেশ নিজ অধিকার ভুক্ত করিয়াছিলেন। "সাৎসুমা" সামন্ত রাজের অধিকারে ৮টা প্রদেশ ছিল, শোগুন তাঁহার নিকট হইতে ৫টা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। এই অত্যাচার নিবন্ধন, এই দুই রাজ-বংশ "শোগুনের" বিষম শক্র হইয়া দাঁড়াইলেন। শোগুনের প্রভুত্ব ধ্বংশ করিয়া কিরূপে দেশের প্রকৃত সম্রাটের আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন ইহাই তাঁহাদের একমাত্র ব্রত হইয়াছিল। এ দিকে আবার বিদ্যা ও সাহিত্যের পুনরাবির্ভাবে দেশের প্রকৃত

অবস্থা সম্বন্ধে লোকের চোখ ফুটিতে লাগিল। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হয় যে শোগুন-দিগেরই যত্নে জাপানে বিদ্যা ও সাহিত্যর উন্নতি হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দিতে "মিতো"র রাজকুমার "দাই নিহন শি" নামক জাপানের একটি বিস্তৃত ইতিহাস লেখেন, সেই ইতিহাস পাঠ করিয়া সম্রাটের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সাধারণ লোকের চেতনা হয়। তাহার পর হইতে আরও অন্যান্য বিদ্বজ্জন ও গ্রন্থকারসকল মধ্যে মধ্যে সমুদিত হইয়া জাপানের প্রাচীন ধর্ম্ম ও ইতিহাস বিষয়ে লোকের কৌতূহল উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছিল এবং দেশের প্রকৃত সম্রাট "মিকাডো"র স্বত্ব ও অধিকার সকল লোকের স্মরণ-পথে জাজ্বল্যরূপে আনয়ন করিয়াছিল। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে আর একটি জাপানের ইতিহাস প্রকাশিত হয়। যে সকল সেনাপতি-বংশ অবৈধরূপে সম্রাটের ক্ষমতা অধিকার করিয়াছিল সেই সকল বংশের ইতিবৃত্ত ঐ গ্রন্থে গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সমস্ত গ্রন্থের সার মর্ম্ম এই যে—"মিকাডোই" জাপানের একমাত্র প্রকৃত শাসনকর্ত্তা, তাঁহার নিকটেই প্রত্যেক জাপানীর নতশির হওয়া উচিত এবং শোগুনেরা সম্রাটের ক্ষমতা অন্যায়রূপে অধিকার করিয়াছেন। "যেদো"র কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ ও মুদ্রা-যন্ত্র-শাসকগণ এই গ্রন্থ তন্ন তন্ন রূপে আলোচনা করিয়া এবং উহার আপত্তি-জনক অংশ সকল উঠাইয়া দিয়া তবে গ্রন্থকারকে ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সম্মতি দেন। শোগুনেরা বংশপরম্পরাক্রমে যে সাহিত্যের উৎসাহ দিয়া আসিয়াছিলেন সেই সাহিত্যই অবশেষে তাঁহাদিগের আধিপত্যের মূলোচ্ছেদ করিল।

একদিকে যেরূপ নানাপ্রকার আভ্যন্তরিক কারণে শোগুনের আধিপত্য ক্রমশঃ ক্ষয় হইতেছিল, ওদিকে আবার কতকগুলি অপরিহার্য্য বাহ্য ঘটনা উপস্থিত হইয়া সেই ধ্বংশকার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিল। মধ্যে মধ্যে বৈদেশিকেরা জাপানের বন্দরে উপস্থিত হইয়া বাণিজ্য-দ্বার উদ্ঘাটন করিবার জন্য বারবার প্রার্থনা করায় শোগুন ইয়েনোরি বিরক্ত হইয়া এই আদেশ ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন, যে, জাপানের উপকূলে যে কোন বৈদেশিক জাহাজ অগ্রসর হইবে, তাহার উপর গুলি বর্ষণ করা হইবে। এবং জাপানের উপকূল সংরক্ষণের বিবিধ ব্যবস্থা করিবার জন্য "ডেমিও"গণের প্রতি আদেশ প্রচার করিলেন।

সাৎসুমা ও মিতোর রাজকুমার নিজ ব্যয়ে ইয়ুরোপীয় প্রণালীর জাহাজ প্রস্তুত করিয়া শোগুনকে উপহার দিলেন। য়ুরোপীয় সামরিক প্রণালী অনুসারে সৈন্যদিগকে শিক্ষিত করা হইতে লাগিল। অস্ত্রালয় সকল স্থাপিত হইতে লাগিল। এই সময়ে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে কমডোর পেরি (Commodore Perry) ৪ টা জাহাজের নেতা হইয়া জাপান-উপকূলে উপস্থিত হইলেন, এবং বন্ধুত্ব ও বাণিজ্যের সন্ধি স্থাপন করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। শোগুন

তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে,সমস্ত জাতি-সাধারণের মত না লইয়া তিনি এ বিষয়ে কোন উত্তর দিতে পারেন না। পেরি বলিলেন "আচ্ছা তবে আমি আর এক বৎসর পরে আসিব"—এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। এক মাস পরেই এইরূপ সন্ধি স্থাপন প্রার্থনায় একটি রুষীয় জাহাজ উপস্থিত হইল। শোগুন দেশের সংরক্ষণ-কার্য্য ও যুদ্ধ-আয়োজন সকল সমধা করিতে আরও তৎপর হইলেন। যুদ্ধের জাহাজ, কামান, ও দুর্গ চারি দিকে নির্ম্মিত হইতে লাগিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে পেরি আবার যুদ্ধ জাহাজ সমভিব্যাহারে জাপান উপকূলে উপস্থিত হইলেন এবং আবার সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। তিন মাস বিলম্ব করিয়া শোগুন একটি সন্ধি-পত্র সাক্ষর করিতে সম্মত হইলেন। সেই সন্ধির মর্ম্ম এই—পোত-ভগ্ন নাবিকদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে হইবে; কাষ্ঠ, জল, খাদ্য ও জাহাজের অন্যান্য আবশ্যকীয় সামগ্রী আহরণ করিবার এবং "শিমোদা" "হাকোদাতের" বন্দরে জাহাজ লোঙ্গড় করিবার অনুমতি দিতে হইবে। কিছুকাল পরেই রুসীয় ও ওলন্দাজদিগকেও এই সকল অধিকার প্রদত্ত হইল। বিদেশীয়দিগের প্রতি জাপানের দ্বার রোধ করা দেশের প্রচলিত প্রথা ছিল, এবং বিদেশীয়গণের প্রবেশ-নিষেধ জাপানের সুখ-শান্তি স্বাধীনতার পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক—এইরূপ জাপানের বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত লোকদিগের দৃঢ় মত ছিল। কিন্তু শোগুন বৈদেশিকদিগের সহিত এইরূপ সন্ধিবন্ধন করায় একটা মস্ত ঝুঁকি আপনার স্কন্ধে লইলেন। খোসিউ, সাৎসুমা, ও মিতোর প্রভৃতি প্রভাবান্বিত সামন্ত রাজগণ—যাঁহারা বরাবর এই প্রকার রাজনীতির দারুণ বিদ্বেষী ছিলেন, এবং প্রকৃত সম্রাটের রাজকীয় ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যাঁহাদের গূঢ় ব্রত ছিল—তাঁহারা এই উপলক্ষ্যে বিলক্ষণ অবসর পাইলেন। আমেরিকানদিগের বরাবর এই বিশ্বাস ছিল যে জাপানের প্রকৃত সম্রাটেরই সহিত বুঝি তাহাদিগের কথাবার্ত্তা চলিতেছে; কিন্তু পরে তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে শোগুন সম্রাট নহেন, এবং বৈদেশিকদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিবার তাঁহার কোন অধিকার নাই। শোগুন যদিও সন্ধি স্থাপন করিলেন, কিন্তু যুদ্ধ আয়োজনে শিথিল-প্রযত্ন হইলেন না।

এই সময়ে ইংরাজেরা আসিয়া জাপানে আরও গোলমাল বাধাইয়া দিলেন। * তাহাদিগেরও সহিত একটি সন্ধি হইল কিন্তু তখন তাহা দৃঢ়ীকৃত হয় নাই। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে Rear Admiral Sterling জা-

* While troubles internal and external, were thus preparing, the English made their appearance upon the scene, and those who know what sort of men we are abroad, and how we generally bear ourselves in the East (and one may say in the West, North, and South too) to

পানে পুনরাগমন করিলেন, এবং পর বৎসরে Mr. Townsend Harris আমেরিকার শাসন-কর্ত্তৃগণের নিকট হইতে জাপানে বাস করিবার অনুমতি প্রার্থনায় জাপান রাজার নিকট অনুরোধ পত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন।

এইরূপ বৈদেশিকেরা ক্রমাগত জাপানে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় শোগুণ ভারি মুস্কিলে পড়িলেন। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। যদিও তিনি বৈদেশিকদিগের কতকগুলি দাবি মঞ্জুর করিয়াছিলেন কিন্তু জাপানে বৈদেশিকদিগের প্রবেশ-নিষেধ বিষয়ক পুরাতন বিধি যতদূর পারেন এতদিন বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাহা রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন যে, সে রাজনীতি অনুসারে চলিলে বিপুল পরাক্রান্ত বৈদেশিকদিগের সহিত নিশ্চয়ই যুদ্ধ বাধিবে এবং সে যুদ্ধে জাপানেরই পরাভব সম্ভাবনা। নাগাসাকিস্থ ওলন্দাজ বাণিজ্য স্থানের কর্ত্তা—তাঁহার এই মতের পোষকতা করিলেন। তিনি শোগুণকে এইরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন :—

"আমি আপনাকে সাবধান হইতে পরামর্শ দিতেছি, বৈদেশিকদিগের সহিত সংস্রব উপস্থিত হইলে ন্যায় অন্যায় দূরে থাকুক অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া প্রায়ই বিবাদ উপস্থিত হয়। ইহা নিশ্চয় যে নিজ দুর্ব্বলতা বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকা, স্বদেশকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার উপায় নহে। এই কারণেই দশ বৎসর পূর্ব্বে, অহিফেন সংক্রান্ত যুদ্ধের পর চীন রাজ্যের কিয়দংশ চীন-রাজের হস্ত হইতে বিচ্যুত হয়, এবং ক্যান্টন প্রদেশ এক্ষণে মরু ভূমিতে পরিণত হইয়াছে।" এই কথা-শোগুন-মন্ত্রিগণের হৃদয়ঙ্গম হইল। তাঁহারা স্থির করিলেন যে শান্তিরক্ষার জন্য ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দের বৈদেশিক প্রবেশ নিষেধ বিধির কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আমেরিকান দূত হারিসের উপর্য্যুপরি-অনুরোধে পরাভূত হইয়া শোগুন অবশেষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যেদো নগরে প্রবেশ করিতে তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। ইহাতে প্রধান প্রধান সামন্ত রাজগণ অত্যন্ত বিরক্ত ও রুষ্ট হইলেন। তাঁহারা ইহার প্রতিবাদ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু শোগুনের মত ফিরিল না। শোগুন যেদো রাজধানীতে হ্যারিসকে প্রকাশ্যরূপে নিজ দরবার-গৃহে অভ্যর্থনা করিলেন, হ্যারিস তাঁহার প্রার্থনা গুলি মন্ত্রিদিগের নিকট বুঝাইয়া বলিলেন। তাঁহার প্রার্থনা গুলি এই :—স্বর্ণ ও শস্য ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের উভয় দেশের মধ্যে বাধা-বিমুক্ত ও রাজ কর্ম্মচারি-

people weaker in ships and arms than ourselves, may well imagine that our appearance did not greatly contribute to the tranquillity of the Government of Japan.
Japan: by Sir Edward. Reed. K. C. B. F. R. S. M. P.
Vol 1—Page 259.

গণের হস্তক্ষেপ-বহির্ভূত বাণিজ্য সংস্থাপন; শিমোদা বন্দর রুদ্ধ করিয়া, কানাগাবা ও অশক বন্দরের দ্বার উদ্ঘাটন; যেদো নগরে একজন আমেরিকান মন্ত্রিদূতের বাস নিয়ম এবং বিস্তারিত রূপে লিখিত একটি সন্ধিপত্রের দৃঢ় অনুমোদন। শোগুন এক্ষণে সম্রাটের উপর বিচার-ভার সমর্পণ করিলেন এবং দেশের সংকটাপন্ন অবস্থা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবার জন্য এবং এই সন্ধি স্থাপন বিষয়ে সম্মতি আনাইবার জন্য তাঁহার মন্ত্রিগণকে মিকাডোর দরবারে পাঠাইলেন। কিন্তু সেই দরবারের অনুগত অভিজাতগণ ("কুজে") এই বিষয়ে ভয়ানক আপত্তি উত্থাপন করিলেন। হ্যারিস এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে প্রকৃত সম্রাটের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা চলিতেছে না—শোগুনের উপরেও আর এক জন কর্ত্তা আছে। কার্য্য-সিদ্ধির অনেক বিলম্ব দেখিয়া, সম্রাটের দরবারে নিজে গিয়া উপনীত হইবেন—এই বলিয়া শোগুনকে শাসাইলেন। এই সময়ে লী(Li) শোগুনের প্রধান মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে আমেরিকান ও রুশীয় যুদ্ধ জাহাজ সকল য়োকোহামা বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা কর্ত্তৃপক্ষগণকে অবগত করিল যে আর অল্প দিনের মধ্যে ইংরাজি ও ফরাসি যুদ্ধ জাহাজ সকলও আসিয়া পৌঁছিবে। এবং তাহারা সকলেই এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যদি সহজে না হয় তবে তলোয়ার, বন্দুক ও কামানের বলে তাঁহারা জাপানের সহিত সন্ধি স্থাপন করিবেন।

মন্ত্রিবর লী এই শাসন-বাক্যে ভীত হইয়া সম্রাট-দরবারের মত না লইয়া তাড়াতাড়ি আমেরিকানদিগের সন্ধিপত্রে নিজ মোহর মুদ্রিত করিলেন এবং পরে এই বিষয় সম্রাটকে অবগত করাইলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই রুসীয়, ইংরাজ ও ফরাসিগণ জাপানে প্রবেশ করিয়া আমেরিকার সন্ধিপত্রের আদর্শে সন্ধি স্থাপন করিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, জাপানের সহিত য়ুরোপ ও আমেরিকা যে সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা বৈধরূপে হয় নাই—তাহা কামানের মুখে হইয়াছিল। বৈদেশিকদিগের সহিত এইরূপ সন্ধি হওয়ায় সমস্ত জাপানী জাতি, বিশেষতঃ সামরিক-শ্রেণী ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহারা ইংরাজ, ফরাসি, রুষ জাতীয় দৌত্য সংক্রান্ত কর্ম্মচারীগণকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিয়া নিহত করিতে লাগিল। তাহার প্রতিবিধান করা শোগুনের অসাধ্য হইয়া উঠিল। ক্রমশই অরাজকতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এই বিদ্রোহীদিগের দল ক্রমশই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সম্রাট রাজ্যের এইরূপ অবস্থা অবগত হইয়া শোগুনের প্রতি এই হুকুম প্রচার করিলেন যে, শোগুন সমস্ত ডেমিওগণ সমভিব্যবহারে কিয়োটো রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া সমস্ত জাপানি-জাতির অভিপ্রায় অবধারণ করুণ এবং তৎপরে বৈদে-

শিক বর্ব্বরদিগকে দেশ হইতে দূরীভূত করিয়া সম্রাটের স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের রোষ শান্ত করুন। আরও, রাজকার্য্য পরামর্শ করিবার জন্য পাঁচ জন প্রধান সামন্ত রাজ লইয়া একটি মন্ত্রিসভা স্থাপন করিবার বিষয় এবং রাজ্য সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়েও উপদেশ দিলেন।

২৩০ বৎসর ধরিয়া সম্রাট সাক্ষীগোপাল এবং শোগুনই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। এত দিনের পর সম্রাটকে স্বীয় অধিকার সমর্পণ করিতে দেখিয়া লোকেরা আশ্চর্য্য হইল এবং এই লইয়া জাপানী সমাজে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। শোগুন সম্রাটের সমস্ত আজ্ঞা পালন করিবেন বলিয়া দৃঢ়-সংকল্প হইলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মিকাডো শোগুনের প্রতি পুনর্ব্বার আদেশ করিলেন যে তাঁহার দরবারে যে সকল পুরাতন কুপ্রথা আছে সে সমুদায় সংশোধন করিতে হইবে—এবং কিয়োটো রাজধানীতে আসিয়া সমস্ত সামন্ত দলের প্রতি হুকুম প্রচার করিয়া অবিলম্বে বর্ব্বরদিগকে দেশ হইতে দূরীভূত করিতে হইবে। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে আর বিলম্ব করিতে না পারিয়া শোগুন তাঁহার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণ সমভিব্যাহারে সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হইলেন এবং বর্ব্বরদিগকে দূরীভূত করিবার দিন ২৫ জুন স্থিরীকৃত হইল। এই বিজ্ঞাপন সমস্ত সামন্তদলের নিকট প্রচার করিবার জন্য শোগুনের প্রতি সম্রাট আদেশ করিলেন। শোগুন আজ্ঞাপালনের ভান করিয়া ও-বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চেষ্ট থাকিলেন। তাহার পর মিকাডো প্রস্তাব করিলেন যে একটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধ দেবের মন্দিরে গিয়া তিনি বর্ব্বর-বিধ্বংশী তলোয়ার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন। শোগুন পীড়ার ছল করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে তথায় উপস্থিত হইলেন না। সামরিকগণ ভয়ানক উত্তেজিত ও রুষ্ট হইয়া উঠিল, সম্রাট স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রা করুন এই বলিয়া সকলে চীৎকার করিতে লাগিল, অনেক কৌশলে ও শাসনে মন্ত্রিগণ তাহাদিগকে শান্ত করিলেন। এ দিকে মধ্যে মধ্যে উত্তেজিত ইতর লোকেরা বৈদেশিকদিগকে হত্যা করায় বিস্তর টাকা ক্ষতি পূরণ স্বরূপ দিতে হইয়াছিল।

সাধারণের মত-প্রভাবে অভিভূত হইয়া শোগুন সন্ধির নিয়ম অতিক্রম করিয়া বৈদেশিকদিগের বিরুদ্ধে কতকগুলি বাণিজ্য বন্দর রুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই লইয়া খোসিউ সামন্তরাজ দলের যুদ্ধ-জাহাজের সহিত য়ুরোপ ও আমেরিকার যুদ্ধ-জাহাজের সংগ্রাম উপস্থিত হইল। গোলাগুলি বর্ষণে উভয় পক্ষেরই ন্যূনাধিক ক্ষতি হইল।

খোসিউ দলের লোকেরা শোগুনের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে বৈদেশিক জাহাজের উপর গুলি বর্ষণ করায়, শোগুন তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিলেন। এই লইয়া শোগুনের সহিত তাহাদিগের মনান্তর উপস্থিত হইল। সাৎসুমা ও খোসিউ দলকে সম্রাটের প্রাসাদ রক্ষণের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু সাৎসুমা দলকে ঐ কার্য্য

হইতে অবসর দেওয়ায়, কার্য্যের সমস্ত ভার খোসিউ দলের উপর পতিত হইল। খোসিউ দলের উত্তেজনায় সম্রাট স্বয়ং বৈদেশিক দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন! কিন্তু দরবারের অভিজাত বর্গের এ বিষয়ে মত ছিল না। এই কারণে সম্রাটের দরবার ও শোগুন উভয়েই সম্মিলিত হইয়া খোসিউ দলের বিরুদ্ধে কুচক্র আরম্ভ করিল। রাজদ্রোহী অপরাধে অপরাধী করিয়া খোসিউ দলের প্রধান-ব্যক্তিদিগকে বধ করা হইল। খোসিউ দলের অনুচরগণ এক্ষণে বাস্তবিক রাজদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইল। এবং বৈদেশিকদিগকে দূরীভূত করিতে বিলম্ব দেখিয়া অন্যান্য বিদেশীয়-বিদ্বেষী লোকেরা তাহাদিগের দলভুক্ত হইল। এই সময়ে সম্রাটের সহিত শোগুনের মিলন হইয়া গেল। যে সম্রাট এত দিন বৈদেশিক বর্ব্বরদিগকে দূরীভূত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে বৈদেশিক-বিদ্বেষী প্রধানদিগকে শাস্তি দিবার জন্য শোগুনকে আদেশ করিলেন। শোগুন ও তাঁহার অনুচরগণ এই আদেশে অতীব তুষ্ট হইয়া সম্রাটের প্রতি যার পর নাই রাজভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল, সম্রাট্ পুনর্ব্বার শোগুনের হস্তে রাজ্যের সমস্ত ভার সমর্পণ করিলেন এবং খোসিউ দলের বিদ্রোহী প্রধানদিগের প্রতি দণ্ড বিধানের আদেশ করিলেন। শোগুন সাৎসুমা প্রভৃতি দলের সাহায্যে অনেক যুদ্ধের পর খোসিউদিগকে পরাভূত করিলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপ ও আমেরিকা তাহাদিগের সন্ধিপত্রে বল পূর্ব্বক মিকাডোর নিকট হইতে সম্মতি বাহির করিলেন। ইংরাজ, ফরাসি, এবং ওলন্দাজ যুদ্ধ-জাহাজ সকল মিকাডোর রাজধানীর অনতিদূরে আসিয়া লোঙ্গড় করিল। কিছুতেই তাঁহারা বিমুখ হইলেন না—সন্ধির নিয়মে অনুমোদন করিবার জন্য সম্রাট্‌কে পত্র লিখিলেন। সম্মিলিত যুদ্ধ-জাহাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, মন্ত্রিদিগের পরামর্শ অনুসারে সম্রাট্ সন্ধি নিয়মে সাধারণতঃ সম্মতি দিলেন। জাপানদিগের এক্ষণে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইল, যে বিভক্ত প্রভুত্বই তাহাদিগের সকল দুর্দ্দশার মূল। এই কারণে যাহাতে সম্রাটের একাধিপত্য হয় তজ্জন্য সকলেই লালায়িত হইল। টোসার সামন্ত রাজ শোগুণকে পত্র লিখিয়া এই প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন "সম্রাটের হস্তে শাসন-ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করা আপনার নিতান্ত কর্ত্তব্য। তাহা হইলে এমন একটি পত্তন-ভূমি স্থাপিত হইবে যাহার উপর দণ্ডায়মান হইয়া জাপান অন্যান্য সমস্ত দেশের সমকক্ষ হইতে পারিবে। এই সময়কার ইহাই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।" শোগুন এই বিষয় অনুমোদন করিলেন এবং ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে স্বদেশ হিতকামী হইয়া শোগুন মিকাডোর নিকট স্বীয় কর্ম্মের ইস্তফা দিলেন। সম্রাট এই ইস্তফা গ্রহণ করিতে প্রথমে একটু ইতস্তত করিয়াছিলেন—পরে এই ঘোষণা প্র-

চার করিলেন যে শোগুণ স্বীয় কর্ম্মে ইস্তফা দিয়াছেন এবং ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এই রাজ-বিধি প্রচারিত হইল যে এক্ষণ হইতে দেশের শাসন-ভার সম্রাটের হস্তে বিন্যস্ত হইবে। যে দিনে শোগুণের পদ রহিত হইয়া গেল, সেই দিনেই সম্রাট্ শোগুণের অনুগত সৈন্যদলকে বিদায় দিলেন এবং প্রাসাদ রক্ষণ ভার "শাৎসুমা"-দলভুক্ত সৈন্যের প্রতি অর্পণ করিলেন। শোগুণের সহিত কোন প্রকার পরামর্শ না করিয়া এই কাজটি করায় শোগুণ অবমানিত বোধ করিলেন এবং তাঁহার অনুগত দলবলকে সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন। এই সূত্রে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হয়—অবশেষে সম্রাট জয়লাভ করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করিলেন। এখন হইতে জাপানের প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হইল। কি কি বিষয়ে উন্নতি সাধন হইল, ভারতীর আগামী সংখ্যায় তাহা বিবৃত করা যাইবে।

তারকার আত্মহত্যা।

জ্যোতির্ম্ময় তীর হ'তে আঁধার সাগরে
ঝাঁপায়ে পড়িল এক তারা
একেবারে উন্মাদের পারা!
চৌদিকে অসংখ্য তারা রহিল চাহিয়া
অবাক্ হইয়া,——
এই যে জ্যোতির বিন্দু আছিল তাদের মাঝে
মুহূর্ত্তে সে গেল মিশাইয়া!
যে সমুদ্র-তলে
মনো দুঃখে আত্মঘাতী,
চির-নির্ব্বাপিত ভাতি—
শত মৃত তারকার
মৃত-দেহ রয়েছে শয়ান,
সেথায় সে করেছে পয়ান!

কেন গো কি হয়েছিল তার?
একবার শুধালে না কেহ?
কি লাগি সে তেয়াগিল দেহ?

যদি কেহ শুধাইত
আমি জানি কি যে সে কহিত!
যত দিন বেঁচে ছিল
আমি জানি কি তারে দহিত!
সে কেবল হাসির যন্ত্রনা,
আর কিছু না!
মনে তার ছিলনাক' সুখ
মুখে তারে হাসিতে হইত!
প্রতি সন্ধ্যা বেলা
একেলা একেলা—
হাসির রাজ্যের মাঝে একটি বিষাদ শুধু
ম্লান-মনে হাসি মুখে কেবলি ভ্রমিত!

জ্বলন্ত অঙ্গার-খণ্ড ঢাকিতে আঁধার হৃদি
অনিবার হাসিতেই রহে,
যত হাসে ততই সে দহে!
তেমনি—তেমনি তারে হাসির অনল
দারুণ উজ্জ্বল—
দহিত—দহিত তারে—দহিত কেবল!
যে গান গাহিতে হ'ত
সে গান তাহার গান নয়,
যে কথা কহিতে হ'ত,
সে কথা তাহার কথা নয়!
জ্যোতির্ম্ময় তারা-পূর্ণ বিজন তেয়াগি,
তাই আজ ছুটেছে সে নিতান্ত মনের ক্লেশে
আঁধারের তারাহীন বিজনের লাগি!
তবে গো তোমরা কেন সহস্র সহস্র তারা
উপহাস করি তারে হাসিছ অমন ধারা?
কহিতেছ—"আমাদের কি হয়েছে ক্ষতি?
যেমন আছিল আগে তেমনি র'য়েছে জ্যোতি!"
হেন কথা বলিও না আর!
সে কি কভু ভেবেছিল মনে—
(এত গর্ব্ব আছিল কি তার?)
আপনাকে নিভাইয়া তোমাদের করিবে আঁ-
ধার?

নিজের প্রাণের জ্বালা
আঁধারে সে ডুবাতে গিয়াছে!
নিজের মুখের জ্যোতি
আঁধারে সে নিভাতে গিয়েছে!
হৃদয় তাহার
চাহে না হইতে জ্যোতি,
চাহে শুধু হইতে আঁধার!
যেথায় সে ছিল, সেথা চিহ্ন মাত্র রাখে নাই
ভস্ম-শেষ মাত্র থাকে নাই!
ওই কাব্য-গ্রন্থ হ'য়ত নিজের অক্ষর
মুছিয়া ফেলেছে একেবারে,
উপহাস করিও না তারে!

গেল, গেল, ডুবে গেল, তারা এক ডুবে গেল,
আঁধার সাগরে—
গভীর নিশীথে
অতল আকাশে!
হৃদয়, হৃদয় মোর, সাধ কিরে যায় তোর
ঘুমাইতে ওই মৃত তারাটির পাশে?
ওই আঁধার সাগরে!
এই গভীর নিশীথে
ওই অতল আকাশে!

যথার্থ দোসর।

হে তারকা, ছুটিতেছ আলোকের পাখা ধোরে,
তোমারে শুধাই আমি, বল গো বল গো
মোরে,
তুমি তারা, রজনীর কোন্ গুহা মাঝে যাবে?
আলোকের ডানা গুলি মুদিয়া রাখিতে
পাবে?

ম্লান মুখ হে শশাঙ্ক, ভ্রমিছ সমস্ত রাত্রি,
আশ্রয় আলয়-হীন আকাশ-পথের যাত্রী,
দিবসের, নিশীথের কোন্ ছায়াময় দেশে
বিশ্রাম লভিতে তুমি পাইবে গো অবশেষে?

পরিশ্রান্ত সমীরণ, বল গো খুঁজিছ কারে?
আতিথ্য না পেয়ে ভ্রম' জগতের দ্বারে দ্বারে,
গোপন আলয় তব আছে কি মলয় বায়,
তরঙ্গ-শয়নে কিম্বা নিভৃত নিকুঞ্জ-ছায়?

Shelley.

আধুনিক ইংরাজি কবিতার মধ্যে আশ্রয়-প্রয়াসী হৃদয়ের বিলাপ-সঙ্গীত প্রায় শুনা যায়। আধুনিক ইংরাজ কবিরা অসন্তোষ ও অতৃপ্তির রাগিণীতেই অধিকাংশ গান গাহিয়া থাকেন। যাহা ছিল ও হারাইয়া গিয়াছে তাহার জন্য যে কেহ বিলাপ করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য নাই, কিন্তু যাহা ছিল না, যাহা পাইতেছি না, অথচ যাহা জানি না, তাহার জন্যই সম্প্রতি একটা বিলাপ-ধ্বনি উঠিয়াছে। কিছুতেই একটা আশ্রয় মিলিতেছে না, এই একটা ভাব; যেন একটা আশ্রয় আছে, আমি জানি, তাহার ঠিক রাস্তাটা খুঁজিয়া পাইতেছি না বলিয়া মিলিতেছে না, দিক্‌ভ্রম ঘুচিলেই মিলিবে, এইরূপ একটা বিশ্বাস। মনে হইতেছে জানি, অথচ জানি না, কি চাহি তাহা যেন ভাবিলেই মনে আসিবে, অথচ মনে আসে না। এক এক সময়ে এক জনকে ডাকিয়া, যেমন, কি জন্য ডাকিলাম ভুলিয়া যাই, তখন যেমন অধীরতা উপস্থিত হয়, ইহাও সেইরূপ অধীর ভাব। এখনকার কবিরা দেখিতেছেন, প্রেমে তৃপ্তি নাই, সে অতৃপ্তি নিরাশার অতৃপ্তি নহে, অভাবের অতৃপ্তি। তাঁহারা কাহাকে ভাল বাসিবেন খুঁজিয়া পান না, অথচ হৃদয়ে ভালবাসার অভাব নাই। প্রেমের অগ্নি, আলেয়ার আলোক ও বিদ্যুতের শিখার ন্যায় আপনি জ্বলিতেছে। অথচ তাহার ইন্ধন নাই। ভাল বাসিবার জন্য তাঁহাদিগকে কাল্পনিক প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। এমনতর প্রেম পূর্ব্বকার কবিদিগের ছিল না, এমনতর প্রেম সাধারণ লোকেরা বুঝে না। পূর্ব্বকার কবিদিগের প্রেম ব্যক্তিগত ছিল, হাত, পা, নাক, মুখ, চোখ অবলম্বন না করিয়া যে ভালবাসা থাকিতে পারে, ইহা তাঁহাদের কল্পনার অতীত ছিল। তাঁহারা ব্যক্তি বিশেষকে লইয়া মাতিয়া উঠিতেন, এই জন্য তাঁহাদের প্রেমের ধর্ম্মে পৌত্তলিকতার উন্মত্ততা ছিল। তাঁহারা মিলনে একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেন, বিরহে একেবারে মুমূর্ষু হইয়া পড়িতেন। অতৃপ্তির নীচু-সুরের নিঃশ্বাস তাঁহারা ফেলিতেন না, আর্ত্তনাদের উঁচু সুরে তাঁহারা বিরহের গান গাহিতেন। সভ্যতা বৃদ্ধি সহকারে হৃদয়ের বৃত্তি সকল যে, ক্রমশঃ মার্জ্জিত ও সূক্ষ্ম হইয়া আসিয়াছে ইহাই তাহার একটি প্রমাণ। এমন এক সময় ছিল, যখন প্রেম ইন্দ্রিয়গত ছিল, যখন বড় বড় চোখের কটাক্ষে কবিদিগের হৃদয়ে ভূমিকম্প উপস্থিত হইত, তিলফুল নাসা কুঞ্চিত দেখিলে তাঁহারা জগৎ অন্ধকার

দেখিতেন। ফণিনী-গঞ্জিত বেণী তাঁহাদের হৃদয়কে সাতপাকে বাঁধিয়া রাখিত। তখন বিরহিনী গান করিত, "আসার আশা রবে, কিন্তু নবযৌবন রবে না!" ক্রমে প্রেমের অতীন্দ্রিয় ভাব কবিদিগের হৃদয়ে পরিস্ফুট হইতে লাগিল। তাঁহারা এমন ভালবাসা অনুভব করিতে লাগিলেন, যাহাতে মুখ চক্ষু নাসিকার কোন হাত নাই। তাঁহারা যাহাকে ভাল বাসিতেন, তাহার শরীরকেই ভাল বাসিতেন না, কিন্তু কিছুতেই ঠাহর করিতে পারিতেন না, কেনই বা তাহাকে ভাল বাসেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এখন এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে, কবিরা ভাল বাসিতেছেন, অথচ ভাল বাসিবার লোক নাই। এক ব্যক্তির সহিত মিলনের জন্য অত্যন্ত ঔৎসুক্য, অথচ তাহার সঙ্গে কোন জন্মে দেখা সাক্ষাৎ, আলাপ পরিচয়, জানা শুনা পর্য্যন্ত হয় নি। মন যেন কে-এক জনকে ভাল বাসিতেছে, অথচ নিজে তাহার সম্বন্ধে কিছু মাত্র জানে না। পূর্ব্বে নাক-চোক-মুখের উপর ভালবাসার পরগাছা ঝুলিত; অথবা ব্যক্তি বিশেষের উপর ভালবাসার উদ্ভিদ গজাইত, যদিও তাহার বীজ পাখীতেই আনিয়া দিত, বা বাতাসেই বহন করিয়া আনিত, বা কি করিয়া আসিত কেহ ঠিকানা করিতে পারিত না। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, ভালবাসা হৃদয়ে সর্ব্ব প্রথমে জন্ম গ্রহন করিয়া ব্যক্তি বিশেষকে খুঁজিয়া বেড়ায়। তাহার মাপে ঠিক হইবে, এমন ব্যক্তি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ফিরে। দুই চারিটা (বা তাহার অধিক) গায়ে দিয়া দেখে; কোনটা বা ঢিলা হয় কোনটা বা কসা হয়; কোনটা বা মনে হয় হইবে, কিন্তু গায়ে দিলে হয় না; কোনটা বা আর সব দিকে বেশ হইয়াছে কেবল গলার কাছটা আঁট হয়; কোনটা বা ভালরূপে না হউক এক প্রকার চলন সইরূপে হয় ও তাহা লইয়াই ভালবাসা সন্তুষ্ট থাকে। আগে ছিল প্রথমে আমদানী, পরে "চাহিদা" (demand), এখন হইয়াছে প্রথমে 'চাহিদা' পরে আমদানী। ইহাই স্বভাবিক অবস্থা। এখন কবিরা দেখিতেছেন, হৃদয় প্রেমের অতিথিশালা নহে, হৃদয় প্রেমের জন্মভূমি; প্রেম একটি পাত্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু, পূর্ব্বে খুব একটা বড় চোক, সোজা নাক বা বিম্বোষ্ঠের নাড়া না থাইলে কবিরা বুঝিতেই পারিতেন না, যে, হৃদয়ে প্রেমের অস্তিত্ব আছে। সুতরাং তাঁহারা মনে করিতেন যে, ঐ বড় চোক ও বিম্বোষ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে প্রেম বলিয়া এক ব্যক্তি বুঝি হৃদয়ে বল পূর্ব্বক আতিথ্য গ্রহণ করিল; এই জন্যই কেহবা তাহাকে ভাল মুখে সম্ভাষণ করিত, কেহ বা গালাগাল মন্দ দিত; যাহার যেমন স্বভাব! সে যে ঘরের লোক এমন কাহারো মনে হয় নাই।

পূর্ব্বকার কবিরা সহসা আশ্চর্য্য হইতেন যে, ইহাকে ভালবাসিলাম কেন? এ পাষাণ-হৃদয়া, মনোরাজ্য-অধিকার লোলুপ, ইহার নিকট হইতে প্রেমের প্রতিদান পাইবার কোন সম্ভাবনাই নাই, তবে ইহাকে ভাল বাসিলাম কেন? ইহার বিশেষ কোন গুণ

নাই, আমি যে যে গুণ ভালবাসি, তাহা যে ইহার আছে এমন নহে, আমি যে যে দোষ ঘৃণা করি, তাহা যে ইহার নাই এমন নহে, আমি চেষ্টা করিতেছি ইহাকে না ভালবাসি, তবে ইহাকে ভালবাসি কেন ? এখনকার কবিরা এক একবার সহসা আশ্চর্য্য হন যে, ইহাকে ভাল বাসিলাম না কেন ? এ কোমল-হৃদয়া, আমার প্রতি নিতান্ত অনুরাগিণী, যে যে গুণ আমি ভালবাসি সকলি ইহার আছে, যে যে দোষ ঘৃণা করি সকলি ইহার নাই ; আমি ইচ্ছা করিতেছি ইহাকে ভাল-বাসি, তবে ইহাকে ভালবাসিতে পারিলাম না কেন ? সাধারণ লোকে সহজেই উত্তর দিবে, চেষ্টা করিয়া কি ভাল বাসা বা না বাসা যায় ? সে ত অতি সহজ উত্তর, কিন্তু কেনই বা না যাইবে ? ভাল না বাসিলে যাহাকে ঘৃণা করিতাম, কেনই বা তাহাকে ভালবাসিব ? আর যে সর্ব্বতোভাবে ভাল বাসিবার যোগ্য কেনই বা তাহাকে না ভাল বাসিব ? এক দল কবি তাহার উত্তর দিতেছেন ;—

কে জানে কোথায় এই জগতের পরে
রয়েছে অপেক্ষা করি দীর্ঘ—দীর্ঘ দিন
একটি আশ্রয়হীন হৃদয়ের তরে
আরেকটি হৃদয় একেলা সঙ্গীহীন !
উভয়ে উভেরে খুঁজে দিন রাত্রি ধ'রে
অবশেষে তা'দের সহসা একদিন
দেখা হয় দুই জনে কে জানে কি কোরে ;
উভয়ে সম্পূর্ণ হ'য়ে হয়রে বিলীন।
জীবনের দীর্ঘ নিশা তখনি ফুরায়
অনন্ত দিনের দিকে পথ খুলে যায় !

Edwin Arnold.

অর্থাৎ একটি হৃদয়ের জন্য আর একটি হৃদয় গঠিত হইয়া আছেই। তাহারা পরস্পর পরস্পরের জন্য। শত ক্রোশ ব্যব-ধানে, এমন কি, জগৎ হইতে জগতান্তরের ব্যবধানেও তাহাদের মধ্যে একটা আকর্ষণ থাকে। তাহাদের মধ্যে দেখা শুনা হউক বা না হউক, জানা শুনা থাকুক বা না থা-কুক, তাহাদের উভয়ের মধ্যে যেমন সম্বন্ধ, তেমন কোন দুই পরিচিত ব্যক্তির, কোন দুই বন্ধুর মধ্যে নাই। ঘটনা চক্রে পড়িয়া তাহারা বিচ্ছিন্ন, কিন্তু তাহারা বিবাহিত। তাহাদের অনন্ত দাম্পত্য। সামাজিক বিবাহ, অনন্তকালস্থায়ী বিবাহ নহে। সচরাচর বিবাহে হয় একতর পক্ষে নয় উভয় পক্ষে প্রেমের অভাব দেখা যায়, এমন কি হয়ত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আমরণ-স্থায়ী ঘৃণার সম্পর্ক। হয়ত একজন বৃদ্ধ একজন তরুণীকে বিবাহ করিল, উভয়ের মধ্যে সকল বিষয়েই আকাশ-পাতাল প্রভেদ, মাল্য পরিবর্ত্তন হইল, কিন্তু হৃদয় স্ব স্ব স্থানে রহিল। হয়ত একজন রূপবতী এক-জন ধনবানকে বিবাহ করিল ; ধনের আক-র্ষণে রূপ অগ্রসর হইল বটে কিন্তু হৃদয়ের আকর্ষণে হৃদয় অগ্রসর হইল না। হয়ত এমন দুই জনে বিবাহ হইল, শুভদৃষ্টির পূর্ব্বে যাহাদের মধ্যে দেখা শুনা হয় নাই। হয়ত এমন বালক বালিকার বিবাহ দেওয়া হইল, যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দেখিল

উভয়ের প্রকৃতিতে দারুণ বৈসদৃশ্য। এই বৃদ্ধ ও তরুণী, এই রূপবতী ও ধনবান, এই দুই বিসদৃশ-প্রকৃতি সামাজিক দম্পতির বিবাহ কি কখন অনন্ত-কাল-স্থায়ী বিবাহ বলিয়া গণ্য হইতে পারে? কিন্তু দুই দুইটি করিয়া হৃদয় আছে, প্রকৃতি নিজে পৌরোহিত্য করিয়া যাহাদের বিবাহ দিয়াছেন। তাহাদের বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। হৃদয় যে একটি প্রেমের পাত্র চায়, সে প্রেমের পাত্র আর কেহ নহে, সেই নির্দ্দিষ্ট হৃদয়। হয়ত পৃথিবীতে তাহার সহিত দেখা শুনা হইল না, কবে যে হইবে তাহার স্থিরতা নাই। কোথায় সে আছে তাহা জানি না। কিন্তু—

কোথা-না-কোথাও আছেই আছে
যে মুখ দেখিনি, শুনিনি যে স্বর;
সে হৃদয়, যাহা এখনো—এখনো
আমার কথায় দেয়নি উত্তর।
কোথা-না-কোথাও আছেই আছে,
হয়ত বা দূরে হয়ত কাছে;
ছাড়াইয়া দেশ, সাগরের তীরে,
হয়ত বা কোথা দৃষ্টির বাহিরে,
হয়ত ছাড়ায়ে চাঁদের সীমানা,
হয়ত কোথায় তারকা অজানা,
রয়েছে তাহারি কাছে,
কে জানে কোথায় আছে!
কোথা-না-কোথাও আছেই আছে
হয়ত বা দূরে হয়ত কাছে;
একটি হয়ত বেড়া বা দেয়াল
মাঝে রাখিয়াছে করিয়া আড়াল।
নব বরষের ঘাসের পরে
গত বরষের কুসুম ঝরে,
নূতন, পুরাণো, মাঝখানে তার
হয়ত দাঁড়ায়ে সেজন আমার।

Christina Rossetti.

হয়ত ঐ একটি বেড়ার আড়াল পড়িল বলিয়া, যাহার সহিত আমার চির জীবনের সম্বন্ধ, তাহার সহিত ইহজন্মে আর দেখা হইল না। হয়ত রাজ পথে সে আমার পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, মুখ ফিরান'ছিল বলিয়া দেখা হইল না, মিলন হইল না। তোমার জন্য যে হৃদয় নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তোমার মনের এমনি ধর্ম্ম, যে, তাহাকে দেখিয়া তুমি না ভাল বাসিয়া থাকিতে পারিবে না, এবং সেও তোমাকে ভাল বাসিবে, প্রকৃতি এমনি উপায় করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তবে কেন সংসারে প্রণয় লইয়া এত গোলযোগ হয়? তবে কেন "প্রকৃত স্রোত প্রশান্ত ভাবে বহে না?" যতক্ষণে না আমাদের যথার্থ দোসরকে পাই, ততক্ষণে তাহার সহিত যাহার কোন বিষয়ে মিল আছে, আমরা তাহার প্রতিই আকৃষ্ট হই। এমনো সচরাচর হইয়া থাকে, প্রথমে একজনকে ভাল বাসিলাম, তাহার কিছু দিন পরে তাহাকে আর ভাল বাসিলাম না, এমন কি আর একজনকে ভাল বাসিলাম। তাহার কারণ এই যে, প্রথমে তাহার সহিত আমার প্রকৃত দোসরের সাদৃশ্য দেখিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হইলাম, কিন্তু কিছু দিন নিরীক্ষণ করিয়া করিয়া তাহার বৈসাদৃশ্য গুলি একে

একে চক্ষে পড়িতে লাগিল, ও অবশেষে তাহার অপেক্ষা সদৃশতর লোককে দেখিতে পাইলাম, আমার ভালবাসা স্থান পরিবর্তন করিল। এমন এক এক সময় হয়, আমরা সহসা এক ব্যক্তির মুখের এক পার্শ্বভাগ দেখিতে পাইলাম, সহসা মনে হইল, ইহাকে অমুকের মতন দেখিতে, হয়ত তাহার ভুরুর প্রান্তভাগ, তাহার অধরের সীমান্তভাগ মাত্র দেখিয়া মনে হইয়াছে ইহার সহিত অমুকের আদল আসে, হয়ত সমস্ত মুখটা দেখিলে দেখিতে পাই কিছুমাত্র আদল নাই। অনেক সময়ে দূর হইতে দেখিলে সহসা মনে হয় ইহাকে অমুকের মতন দেখিতে, কাছে আসিয়া দেখি তাহা নয়, অনেক সময় পশ্চাৎ হইতে দেখিয়া মনে হয় "এ অমুক হইবে," সম্মুখে আসিয়া দেখি যে সে নয়। আমরা অনেক সময়ে পাশ হইতে ভালবাসি, দূর হইতে ভালবাসি, পশ্চাৎ হইতে ভালবাসি, সুতরাং এমন হয় যে, সম্মুখে আসিয়া কাছে আসিয়া আর ভাল বাসিনা। অনেক সময়ে আবার হয়ত সত্য সত্যই আমরা আদল দেখিতে পাইয়া ভালবাসি, কিন্তু তাহার অপেক্ষা অধিকতর আদল দেখিতে পাইলে আর একজনকেও ভালবাসিতে পারি। এইরূপ অবস্থায় আমরা আমাদের ভাল বাসার প্রতিদান দৈবক্রমে পাইতেও পারি, আবার অনেক সময়ে না পাইতেও পারি। এই সকল কারণেই প্রেমে এত গোলযোগ বাধে। এই সকল কারণেই আমরা (তাহার দোষ থাকুক্ বা গুণ থাকুক্) এক জনকে অন্ধভাবে ভালবাসি, অথচ কেন ভাল বাসি ভাবিয়া পাই না, সে আমাদের প্রতি সহস্র নির্যাতন করুক্, সহস্র অন্যায় ব্যবহার করুক্, কিছুতেই তাহাকে না ভাল বাসিয়া থাকিতে পারি না। এই সকল কারণেই, আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না যে, এইরূপ চরিত্র-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ভাল বাসিব, আর এই রূপকে ভাল বাসিব না।

একটি রঙের সহিত আর একটি রঙ যখন মিলাইয়া গেল, তখন সেই উভয় বর্ণের অতি সূক্ষ্মতম বর্ণাণু গুলি কোন্ সীমায় ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল আমরা দেখিতে পাই না, এই পর্যন্ত বুঝিতে পারি যে, উভয় বর্ণের বর্ণাণুগুলির মধ্যে পরস্পর মিলিবার শক্তি আছে, আর কোন শ্রেণীর বর্ণাণু হইলে মিলিতে পারিত না। তেমনি আমার বর্ণাণু আর কোন্ হৃদয়ের বর্ণাণুর সহিত মিলিতে পারিবে, তাহা কোন পার্থিব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পড়িবার যো নাই, কিন্তু মিল আছেই। এমন বস্তু নাই যাহার মিল নাই। এ জগতে মিলের রাজ্য, প্রতি বর্ণের মিল আছে, প্রতি সুরের মিল আছে, প্রতি হৃদয়েরও মিল আছে। এ জগৎ মিত্রাক্ষরের কবিতা। এত মিল, এত অনুপ্রাস কোন কবিতাতেই নাই।

যখন ভাবিয়া দেখা যায় যে, মনুষ্যের হৃদয়ে দোসর পাইবার ইচ্ছা কি বলবতী, তাহার জন্য সে কি না করিতে পারে, সে ইচ্ছার নিকটে জীবন পর্যন্ত কি অকিঞ্চিৎ-

কর, মনের মত দোসর পাইলে সে কি আনন্দই পায়, না পাইলে সে কি হাহাকারই করে, তখন মনে হয় যে, প্রতি লোকের দোসর আছেই, এক কালে না এক কালে পরস্পরের সহিত মিলন হইবেই। সংসারে যখন মাঝে মাঝে দোসরের মরীচিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন নিশ্চয় বোধ হয়, জলাশয় কোন দিকে না কোন দিকে আছেই, নহিলে আকাশ পটে তাহার প্রতিবিম্ব পড়িতই না। মনের মানুষ পাইবার জন্য যেরূপ দুর্দ্দান্ত ইচ্ছা, অথচ সংসারে মনের মানুষ লইয়া এত অশ্রুপাত, হৃদয়ের এত রক্তপাত করিতে হয়, যে মনে হয় এক দিন বোধ করি আসিবে, যে দিন মনের মানুষ মিলিবে, অথচ এত কাঁদিতে হইবে না। হৃদয়ের প্রতিমার নিকট হৃদয়কে বলিদান দিতে হইবে না। ভালবাসা ও সুখ, ভালবাসা ও শান্তি এক পরিবার ভুক্ত হইয়া বাস করিবে। এ সংসারে লোকে ভাল বাসে, অথচ ভালবাসার সমগ্র প্রতিদান পায় না, ইহা বিকৃত অবস্থা, অসম্পূর্ণ অবস্থা। এ অসম্পূর্ণ অবস্থা, এক দিন-না-এক দিন দূর হইবে। যখন বন্ধুত্বের প্রতারণায় প্রেমের যন্ত্রণায় মন অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকে, মন একেবারে ম্রিয়মান হইয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়ে, তখন ইহা অপেক্ষা সান্ত্বনা কি হইতে পারে? একবার যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাবে, এ সমস্ত মরীচিকা; তাহার যথার্থ ভাল বাসিবার লোক যে আছে সে কখনো তাহাকে কাঁদাইবে না, তাহাকে তিল মাত্র কষ্ট দিবে না, তাহার সহিত এক দিন অনন্ত সুখের মিলন হইবে, তখন কি আরাম সে না পায়! আর এক জন "আমার" আছে, সৃষ্ট জীবের মধ্যে তেমন "আমার" আর কেহ নাই। এমন সময় যখন আসে, যখন ভালবাসিবার জন্য হৃদয় লালায়িত হয়, এমন ঋতু যখন আসে যখন

"How many a one, though none be near to love,
Loves then the shade of his own soul half seen
In any mirror—"

তখন হৃদয়ে সেই দোসরের একটি অশরীরী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকেই ভাল বাস', তাহার সহিত কথোপকথন কর'। তাহাকে বল' "হে আমার প্রাণের দোসর, আমার হৃদয়ের হৃদয়, আমি সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, কবে তুমি আসিবে? এ সিংহাসনে যদি আর কাহাকেও বসাইয়া থাকি তবে তাহা ভ্রম ক্রমে হইয়াছে; কিছুতেই সন্তোষ হয় নাই, কিছুতেই তৃপ্তি হয় নাই, তাই তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি!"

তাহাকে বল'—

In all my singing and speaking,
I send my soul forth seeking;
O soul of my soul's dreaming;
When wilt thou hear and speak?
Lovely and lonely seeming,
Thou art there in my dreaming,

Hast thou no sorrow for speaking ?
Hast thou no dream to seek. ?
In all my thinking and sighing,
In all my desolate crying,
I send my heart forth yearning,
O heart that may'st be nigh !
Like a bird weary of flying,
My heavy heart, returning,
Bringeth me no replying,
Of word, or thought, or sigh.
In all my joying and grieving,
Living, hoping, believing,
I send my love forth flowing,
To find my unknown love.
O world, that I am leaving,
O heaven, where I am going,
Is there no finding and knowing,
Around, within or above ?
O soul of my soul's seeing
O heart of my heart's being,
O love of dreaming and waking
And living and dying for—
Out of my soul's last aching
Out of my heart just breaking—
Doubting, falling, forsaking,
I call on you this once more.
Are you too high or too lowly
To come at length unto me ?
Are you too sweet or too holy
For me to have and to see ?
Wherever you are, I call you,
Ere the falseness of life enthral you,
Ere the hollow of death appal you,
While yet your spirit is free.
Have you not seen, in sleeping,
A lover that might not stay,
And remembered again with weeping
And thought of him through the day
Ah ! thought of him long and dearly,
Till you seemed to behold him clearly
And could follow the dull time merely
With heart and love far away ?
And what are you thinking and saying,
In the land where you are delaying?
Have you a chain to sever ?
Have you a prison to break ?
O love ! there is one love for ever,
And never another love—never,
And hath it not reached you, my? praying
And singing these years for your sake ?
We two made one, should have power
To grow to a beautiful flower,
A tree for men to sit under
Beside life's flowerless stream ;
But I without you am only
A dreamer fruitless and lonely ;
And you without me, a wonder
In my most beautiful dream.

Arthur O'Shaughnessy.

জাতীয়তা ও বিজাতীয়তার উপদ্রব।

আমাদের মধ্যে এক দল আছেন যাঁহারা জাতীয় ভাবের একান্ত পক্ষপাতী ও বিদেশীয় ভাবের দারুণ বিদ্বেষী। তাঁহাদের মত এই, যাহা কিছু আমাদের দেশের তাহাই ভাল, যাহা কিছু বিদেশ হইতে আনীত তাহাই মন্দ। তাঁহারা মনে করেন জাতীয়তা ও দেশ-হিতৈষিতা একই পদার্থ। বাস্তবিক ধরিতে গেলে, প্রকৃত জাতীয়তা ও দেশ-হিতৈষিতা একই পদার্থ বটে। কিন্তু এক দল যেরূপ অন্ধভাবে ও বিকৃতভাবে জাতীয়তার (Nationality) অর্থ করেন, তাহা অনেক অনর্থের মূল। এই জাতীয়তাটি যে কি পদার্থ তাহা সেই জন্য সূক্ষ্ম রূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা উচিত। অনেক সময় একটা কথা লইয়া অনেক গোলযোগ উপস্থিত হয়। সেই কথার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিলে তাহার অর্দ্ধেক গোলযোগ নিষ্পত্তি হইয়া যায়। যেমন সভ্যতা একটি কথা। এই কথা লইয়াও নানা গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই কথার দোহাই দিয়া পরস্পর-বিরোধী মত সকল অনায়াসে পার পাইয়া যায়। কেহ হয়ত বলিলেন "যতই সভ্যতার বৃদ্ধি হইতেছে, ততই দেশের কুনীতি বাড়িতেছে," আর এক জন বলিলেন "যতই সভ্যতা বৃদ্ধি হইতেছে, ততই দেশে জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি হইতেছে,"—ইহার মধ্যে কোন্ মতটি ঠিক, নির্ণয় করিতে হইলে, প্রকৃত সভ্যতা কাহাকে বলে নির্ণয় করা আবশ্যক। এবং তাহা একবার নিরূপিত হইলে ঐ কথা লইয়া আর কখন গোলযোগ হয় না। জাতীয়ভাব এই কথাটি এক্ষণে অতি সঙ্কীর্ণ ভাবে ব্যবহৃত হয়। আহার, পরিচ্ছদ, আচার, ব্যবহার লইয়াই জাতীয়তা; কোন জাতির বাহ্য নিদর্শন ও অনুষ্ঠানের বিশেষত্বকেই আমরা এক্ষণে জাতীয়তা বলি। কোন জাতির আন্তরিক বিশেষত্বের প্রতি আমরা তত লক্ষ্য করি না, কেবল তাহাদিগের বাহ্য বিশেষত্বের প্রতিই আমাদের লক্ষ্য। আমরা একটি ফলের খোসা দেখিয়াই তাহার ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে যাই তাহার অভ্যন্তরস্থ শাঁস দেখি না। এই জন্যই আমাদের জাতীয়তা এক-দেশ-দর্শী অন্ধ জাতীয়তা। বাস্তবিক ধরিতে গেলে, কোন জাতির আভ্যন্তরিক বিশেষ ভাব ও তাহার বাহ্য প্রকাশ উভয় লইয়াই তাহার জাতীয়তা।

আচার ব্যবহার প্রভৃতি সেই আভ্যন্তরিক ভাবের বাহ্য নিদর্শন মাত্র। এ স্থলে আভ্যন্তরিক ভাবই মুখ্য বিষয়, বাহ্য আচার ব্যবহার অনুষ্ঠান সকল তাহার আনুষঙ্গিক মাত্র।

দেশ কাল জল বায়ু প্রভৃতি বাহ্য ঘটনা ও প্রাকৃতিক অবস্থার বিশেষত্ব অনু-

সারে কোন জাতির চরিত্র-গত বিশেষত্ব উৎপন্ন হয়। সেই চরিত্র-গত আভ্যন্তরিক ভাবের উপযোগী হইয়া সেই জাতির আচার ব্যবহার প্রভৃতি বাহ্য অনুষ্ঠান সকল আপনা-আপনিই উদিত হয়। বাহ্য ঘটনা-সকলের পরিবর্ত্তনে কালক্রমে যদি সেই জাতির আভ্যন্তরিক ভাবের পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে সেই সঙ্গে তাহার আচার ব্যবহার সকলও যে আপনা-আপনিই পরিবর্ত্তিত হইবে তাহা কে অস্বীকার করিবে? এই প্রকার স্বাভাবিক অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনের গতি যাঁহারা অস্বাভাবিক উপায়ে রোধ করিতে যান তাঁহারা বাতুলের ন্যায় কার্য্য করেন। তাঁহাদিগের উদ্যম কখনই সফল হয় না। এই উদ্যম উৎসাহ এই প্রকারে নষ্ট না করিয়া যদি তাঁহারা উপযুক্ত বিষয়ে তাহা নিয়োগ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা দেশের অনেক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। যে ঘটনা-স্রোতে কোন জাতির চরিত্রগত পরিবর্ত্তন প্রথম আরম্ভ হয় সেই প্রারম্ভকালে বাধা দিলে বরং কিয়ৎকালের জন্যও সেই স্রোতের গতিরোধ হইতে পারে কিন্তু একবারে চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইলে, তাহার উপযোগী ও আনুসঙ্গিক যে একটি বাহ্য অনুষ্ঠানের স্রোত স্বভাবতঃ নিঃসৃত হইতে থাকে, তাহার গতি রোধ করা একেবারেই অসম্ভব।

মনে কর, আলস্য ও নিরুদ্যম বঙ্গবাসীর একটি জাতীয় ভাব। এই ভাবের উপযোগী করিয়াই আমাদের আহার পরিচ্ছদ কিয়ৎ পরিমাণে প্রস্তুত হইয়াছে। যাহারা পরিশ্রমী তাহারাই গুরুপাক দ্রব্য হজম করিতে পারে, এবং যাহারা কর্ম্মঠ লোক তাহাদেরই আঁট-সাট কাপড় পরা আবশ্যক হয়। সার-হীন ভাত, আর লম্বা কোঁচা ধুতি উভয়ই আমাদের জাতীয় অসত্তার পরিচয় দেয়। এক্ষণে ইংরাজদিগের সংশ্রবে আমাদের মধ্যে একটা উদ্যমের ভাব, একটা কাজের ভাব আসিয়াছে। এই ভাব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আহার পরিচ্ছদও অল্প অল্প পরিবর্ত্তিত হইতেছে। হয়তো কেহ কেহ শরীরে বল সঞ্চয়ের জন্য অল্প পরিমাণে মাংস আহার করিতে বাধ্য হইতেছেন, হয় তো কেহ কেহ কাজের সুবিধার জন্য আভূমি-লম্বমান চাপকানের পরিবর্ত্তে খাটো চাপকান পরিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

কিন্তু এক জন "জাতীয়" পতাকাধারী মহাত্মা আসিয়া হয় তো বলিবেন 'কি! তুমি মাংস খাও, তুমি জাতীয় ভাবের বিরুদ্ধাচারী, তোমার সঙ্গে আমাদের কোন সংশ্রব রাখা উচিত নয়—তোমার পিতৃ পিতামহ চিরকাল ভাত খাইয়া আসিয়াছেন, আর তুমি কিনা আজ মাংস খাইতেছ।'

সে ব্যক্তি হয় তো এইরূপ উত্তর করিল 'মহাশয় আমি সাধ করিয়া ভাত ছাড়ি নাই—আমার যেরূপ ভূতগত পরিশ্রম করিতে হয় তাহাতে একটু মাংস না খাইলে চলে না।' "জাতীয়-ভাব"-গ্রস্ত ব্যক্তি মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিবেন—'না খাইলে চলে না—তার মানে কি? তোমার পিতৃ পিতা-

মহের কিরূপে চলিত?—একবার ভাত খাইয়া তুমি যদি শরীরে বল না পাও, তাহা হইলে একবার ভাত খাও, দুইবার ভাত খাও, তিন বার ভাত খাও, চার বার ভাত খাও। আর, চার বার ভাত খাইয়াও যদি তুমি শরীরে বল না পাও, তাহলে তোমার পক্ষে মরাই ভাল।' কিম্বা তিনি হয়তো কাহাকে খাটো চাপকান পরিতে দেখিয়া মহা ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপ বলিবেন, 'এ কি রকম ফেসিয়ান? ছোট চাপকান তো আমাদের জাতীয় পোষাক নয়—তুমি দেখচি জাতীয় ভাব একেবারে বিসর্জ্জন করেছ। যার জাতীয় ভাব নাই সে কি না করিতে পারে—সে খুনও করতে পারে।' খাটো চাপকান-ধারী বেচারা তো অবাক্—সে দেখে খাটো চাপকান পরিয়া সে খুনের দায়ে দায়ী হয়। সে আত্মসমর্থনে দুই একটা কথা বলিল। সে বলিল "কাজ কর্ম্মের সময় ছোট চাপকানে অনেক সুবিধা হয়—পা পর্য্যন্ত ঝোলা চাপকান গুল কেমন জবড়জঙ্গি, কাজের হুড়াহুড়ি দৌড়াদৌড়িতে হোঁচট খাইবার সম্ভাবনা—কাপড় শীঘ্র শীঘ্র ছিড়িয়াও যায়।" জাতীয়ভাব-গ্রস্তের বিকৃত মস্তিষ্কে এ সকল যুক্তি প্রবেশ করিল না। তিনি বলিলেন, "সুবিধা অসুবিধা আবার কি? যা বরাবর চলিয়া আসিতেছে তাই করিতে হইবে—অসুবিধা হয় বলিয়া তুমি একটা সৃষ্টি-ছাড়া কাজ করিবে না কি? দৌড়িতে গেলেই পড়িতে হয়, তার জন্য কি আবার কাপড় বদলাইতে হইবে"?—

অতি-জাতীয় মহাত্মাদিগের যুক্তির কতদূর দৌড় তাই দেখাইবার জন্যই উল্লিখিত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। তাঁহাদিগের যুক্তির নাড়ি এত সুক্ষ্ম যে নাই বলিলেও হয়। মাংস খাওয়া বাস্তবিক এদেশের পক্ষে ভাল, কিম্বা ছোট চাপকান পরা বাস্তবিক সুবিধাজনক কি না সে বিষয়ে মত প্রকাশ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। ও বিষয়ে অনেক মতামত আছে। জাতীয় ভাব-গ্রস্ত মহাত্মাগণ কেহ বাঁধা রাস্তার একটু এদিক ওদিক গেলে কিরূপ তাহাকে যুক্তিহীন মুখ-খাবড়া দেন তাই দেখাইবার জন্যই উল্লিখিত উত্তর প্রত্যুত্তরের অবতারণা করা হইয়াছে। যদি তিনি বলিতেন, "এ দেশ যেরূপ গরম, তাহাতে মাংসের ন্যায় তাপ-জনক পদার্থ সকল আহার করা আমাদের পক্ষে ভাল নয়'—কিম্বা যদি বলিতেন "খাটো চাপকানগুল লম্বা চাপকানের ন্যায় সুদৃশ্য সুশোভন নহে" তাহা হইলেও খানিকটা যুক্তির আভাস থাকিত। কিন্তু তাঁহার সমস্ত যুক্তির সার মর্ম্ম এই—সকল কথার এই একমাত্র ধুয়া যে "বরাবর যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহার ব্যতিক্রম করা উচিত নহে"—যাহা পুরাতন, যাহা ভুত কালের তাহাই ভাল। তাহা বর্ত্তমান কালের পক্ষেও ভাল, ভবিষ্যৎ কালের পক্ষেও ভাল। যাঁহারা কেবল ভুতকাল লইয়াই ব্যস্ত তাঁহারা নিশ্চয়ই ভুত-গ্রস্ত মনুষ্য—রোজা ডাকাইয়া অচিরাৎ তাঁহাদিগের চিকিৎসা সুরু করিয়া দেওয়া উচিত।

জাতীয়তা-ভুতগ্রস্ত ব্যক্তিদের যুক্তি-

প্রণালীতে যেরূপ সুসঙ্গতি নাই, তাঁহাদের বাহিরের আচার ব্যবহারের সেইরূপ কিছুমাত্র সুসঙ্গতি নাই। তাঁহারা জীবনে এমন অনেক কাজ করেন যাহা তাঁহাদিগের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। যদিও তাঁহারা কিছুতেই তাহা স্বীকার করিবেন না। বিজাতীয় দ্রব্য যে তাঁহারা ব্যবহার করেন না এরূপ নহে। তবে হয় তো তাঁহারা স্বয়ং তাহা প্রবর্ত্তন করেন নাই এই মাত্র। যাহা দশ জনে করিতেছে তাহাই তাঁহারা করিতেছেন। যে সকল বিজাতীয় আচার তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন, কিম্বা যে সকল বিজাতীয় দ্রব্য তাঁহারা ব্যবহার করিতেছেন, অর্থাৎ বিজাতীয় যাহা কিছু তাঁহাদের অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে—তাঁহাদের সহিয়া গিয়াছে, তাহাতে আর কোন দোষ নাই। ছোট চাপকান পরিতেই দোষ,কিন্তু লম্বা চাপকান বিজাতীয় হইলেও তাহাতে দোষ নাই, যেহেতু তাঁহারা তাহা ব্যবহার করেন। যাঁহাদিগের মোজা পরা সহিয়া গিয়াছে তাঁহারা হয় তো বুট পরাকে বিজাতীয় প্রথা বলিবেন—যাঁহাদিগের চৌকিতে বসা অভ্যাস হইয়াছে, তাঁহারা হয় তো টেবিল ব্যবহার করাকে বিজাতীয় বলিবেন। এই জন্যই যাঁহারা 'জাতীয় ভাব' "জাতীয় ভাব" করিয়া ক্রমাগত -চিৎকার করেন তাঁহারা সুশিক্ষিত লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হয়েন। তাঁহারা আসলে লোক ভাল, তাঁহাদের কোন কু-মৎলব নাই; তবে, তাঁহাদিগের একটু মস্তিষ্কের অভাব আছে। জাতীয়তা যে কি পদার্থ তাহা তাঁহারা কখন তলাইয়া বুঝিতে চেস্টা করেন নাই,জাতীয়তা সম্বন্ধে অস্ফুট অনির্দ্দেশ্য, কুজ্‌ঝটিকাচ্ছন্ন, অপরিপক্ক কতকগুলি ভাব তাঁহাদের মস্তিষ্কের মধ্যে ইলি বিলি করিয়া বেড়াইতেছে মাত্র। এবং তদ্দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তিনি সময়ে সময়ে ভূতগ্রস্তের ন্যায় দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া হাত পা ছুঁড়িতে থাকেন।

কেহ না মনে করেন আমরা জাতীয় ভাবের বিরোধী পক্ষ। আমরা প্রকৃত, গোঁড়ামি-শূন্য জাতীয়তার ভক্ত। অন্ধ বিকৃত জাতীয়তার ভক্ত নহি। জাতীয়তা কেবল কি একটি হৃদয়ের অস্ফুট অনির্দ্দেশ্য ভাব মাত্র?— তাহার কি কোন জ্ঞানমূলক সুদৃঢ় পত্তনভূমি নাই? তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য।

বিচিত্রতার মধ্যে একতা, ইহাই প্রকৃতির মূল নিয়ম, এবং এই নিয়মটি অবলম্বন করিয়া প্রকৃতি উন্নতি-পথে অগ্রসর হইতেছে। প্রকৃতির সমস্ত পদার্থের মধ্যেই একটি সাধারন যোগ আছে—সেইটি একতার বন্ধন, এবং তদন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থের আবার কিছু কিছু বিশেষত্ব আছে —ইহাই বিচিত্রতার মূল। সৃষ্টির নিয়মই এই। বিচিত্রতা যে কেবল সৃষ্টির শোভা সম্পাদনের জন্য তাহা নহে, তাহার কার্য্যকারিতাও আছে। প্রকৃতির প্রত্যেক পদার্থের, প্রত্যেক জীবের যে রূপ বিশেষ বিশেষ গুণ আছে, সেইরূপ তাহাদের বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিস্ট কার্য্যও

আছে। একের কার্য্য অপরে পূরণ করিতে পারে না। কাহারও এক বিষয়ে অভাব, কাহারও আর এক বিষয়ে অভাব। পরস্পরে মিলিয়া পরস্পরের অভাব পূরণ করিতেছে। প্রকৃতির মধ্যে এইরূপে একটা গূঢ় বাণিজ্য চলিতেছে। এবং এই বাণিজ্যের ফল—উন্নতি। বিশেষত্বকে কেন আমরা ভাল বলি? না—সেই বিশেষত্ব একটি বিশেষ কার্য্য সাধন করিবার জন্য, একটি বিশেষ অভাব পূরণ করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। বিশেষত্বকে আমরা বিশেষত্বেরই জন্য আদর করি না, তাহার বিশেষ কার্য্যোপযোগিতার জন্যই তাহার আদর।

মনুষ্য-সমাজও এই নিয়মের ব্যতিক্রম-স্থল নহে। একতা ও বিচিত্রতার নিয়মানুসারেই ইহার শ্রেণী-বিভাগ হইয়াছে। সমাজের প্রথম উপকরণ—ব্যক্তি, তাহার পর—পরিবার, তাহার পর—গোষ্ঠী, তাহার পর—বংশ, তাহার পর—স্বজাতি, তাহার পর—স্বদেশ, অবশেষে—মনুষ্য-জাতি। ব্যক্তিই এই মানব-সমাজরূপ বৃহৎ চক্রের কেন্দ্র এবং সমস্ত মনুষ্য-জাতিই ইহার পরিধি। এই বৃহৎ চক্রের অন্তর্গত আরও অনেকগুলি সম-কেন্দ্রিক ক্রমশ-ক্ষুদ্রতর চক্র আছে। এইরূপে প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত সমস্ত মনুষ্যজাতির একটা যোগ নিবদ্ধ রহিয়াছে—এবং সে চক্র এই ব্যক্তিরূপ কেন্দ্রের যত নিকটবর্ত্তী, সেই চক্রের সহিত তাহার সেই পরিমাণে অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এবং এই সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা অনুসারে আমাদিগের কর্ত্তব্যের মুখ্য-গৌণতা নির্দ্ধারিত হয়। সর্ব্ব প্রথমে আপনি। আপনার উন্নতি সাধন সর্ব্ব প্রথমে কর্ত্তব্য। "Charity begins at home" যদিও এই ইংরাজী প্রবচনটি হঠাৎ শুনিতে খারাপ লাগে কিন্তু বাস্তবিক ইহা অপেক্ষা সত্য আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি আপনার উন্নতি সাধনে, প্রকৃত স্বার্থ সাধনে অবহেলা করে, সে স্বীয় পরিবারের উন্নতি সাধন করিতে পারে না—যে স্বীয় পরিবারের উন্নতি সাধনে অবহেলা করে, তাহা কর্ত্তৃক স্বজাতির উন্নতি সাধন বিড়ম্বনা মাত্র, এবং স্বজাতির উন্নতি সাধনে যে ব্যক্তি পরাঙ্মুখ তাহা কর্ত্তৃক সমস্ত মনুষ্য-জাতির উন্নতি চেষ্টা নিতান্তই হাস্যাস্পদ। বস্তুতঃ, ব্যক্তিগত উন্নতির সমষ্টি পারিবারিক উন্নতি,—পারিবারিক উন্নতির সমষ্টি জাতীয় উন্নতি,—জাতীয় উন্নতির সমষ্টি মানবসমাজের উন্নতি। মনুষ্য যেরূপ দুর্ব্বল ও পরিমিত-শক্তি-বিশিষ্ট জীব তাহাতে এইরূপ পদ্ধতিই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ও ফলপ্রদ। বার্ত্তাশাস্ত্রে যে শ্রম-বিভাগের এত গুণ বর্ণনা শুনা যায়, উহা সেই শ্রম-বিভাগেরই (Division of labour) একটি দৃষ্টান্তস্থল। প্রত্যেকে যদি আপন আপন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রের মধ্যেই আপন আপন উদ্যম উৎসাহ মুখ্যরূপে নিয়োগ করেন, তাহাতে সমস্ত মনুষ্য-সমাজের যতখানি উন্নতি হইবার সম্ভাবনা তাহা কদাপি অন্য প্রণালীতে হইতে পারে না। ইহা স্পষ্টই পড়িয়া আছে। এই লইয়া বেশি বাক্যব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই। অতএব দেখা যাই-

তেছে আমাদের সামাজিক কর্ত্তব্যের মুখ্যা-গৌণতা যথেচ্ছরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই—উপযোগিতা রূপ (Utility) সুদৃঢ় পত্তন-ভূমিতে উহা সংস্থাপিত।

উল্লিখিত কর্ত্তব্য সকল যাহাতে যথোপযুক্ত রূপে সাধিত হইতে পারে তজ্জন্য প্রকৃতি তাহার অনুরূপ প্রবৃত্তি, প্রেম, অনুরাগ মানব-অন্তঃকরণে নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, প্রেম, অনুরাগ কর্ত্তব্যের উত্তেজক ও প্রবর্ত্তক। সর্ব্বপ্রথমে আত্ম-প্রেম বা আত্ম-হিতৈষিতা। প্রকৃতির নিয়মানুসারে ইহাই সকল প্রেমের কেন্দ্র-স্থল। তাহার পর পারিবারিক প্রেম—তাহার পর স্বজাতি-প্রেম,—তাহার পর মানবানুরাগ।

এখানে বলা আবশ্যক, প্রেম ও হিতৈষিতার অনেক প্রভেদ আছে। প্রেম কতকটা অন্ধ, হিতৈষিতা দূরদর্শী। পুত্রের প্রতি মাতার অন্ধ প্রেম, পিতার প্রেম হিতৈষিতায় পরিণত। অন্ধ প্রেম হইতে অনেক অনর্থ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু হিতৈষিতা হইতে ভাল বই মন্দ হইতে পারে না। যতই জ্ঞানের উন্নতি হয় ততই এই প্রেম হিতৈষিতায় পরিণত হয়। বস্তুতঃ অন্ধ প্রেম অপেক্ষা জ্ঞান-দীপ্ত হিতৈষিতা যে উন্নত তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। আপনার উপর যাহার অন্ধ প্রেম, সে আপনার কিছুই মন্দ দেখিতে পায় না, সুতরাং আপনার উন্নতি-পথের আপনিই কণ্টক হইয়া পড়ে। সেই রূপ স্বজাতির উপর যাহার অন্ধপ্রেম, সেও স্বজাতির কিছুই মন্দ দেখিতে পায় না, সুতরাং তাহার দ্বারা স্বজাতির উন্নতি-সাধন অসম্ভব। আমাদের মধ্যে এক দল অন্ধ দেশানুরাগী আছেন, তাঁহাদিগকেই আমি ইতিপূর্ব্বে ভূতগ্রস্ত উপাধি দিয়াছি। (অন্ধকারের সহিত ভূতের কেমন একটা চির-সম্বন্ধ আছে!)

প্রত্যেক ব্যক্তি যেরূপ বিশেষ বিশেষ দোষগুণ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, সেই রূপ প্রত্যেক জাতিও বিশেষ বিশেষ দোষ গুণের আধার। যিনি আত্ম-হিতৈষী তাঁহার কর্ত্তব্য নিজ চরিত্রের দোষগুলি অপনীত করিয়া গুণের উন্নতি সাধন করা, যিনি স্বজাতি-হিতৈষী তাঁহার কর্ত্তব্য জাতীয় চরিত্রের দোষগুলি দূরীকৃত করিয়া স্বজাতি-সুলভ গুণ গুলিকে পরিপোষণ করা। আমরা যখন বলি আমাদের জাতীয় ভাব রক্ষা করা কর্ত্তব্য তখন আমরা কখন এরূপ মনে করিয়া বলি না যে আমাদিগের জাতীয় চরিত্রের দোষগুলিও রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু এক্ষণে জাতীয় ভাব সচরাচর যেরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার সহিত নীতিমূলক দোষগুণের সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই। এক্ষণে জাতীয় ভাব অর্থে কোন জাতির বাহ্য আচার ব্যবহার আহার পরিচ্ছদের বিশেষত্ব বুঝায় মাত্র। জলবায়ু, শীতাতপ, ভূমির উর্ব্বরতা, বৈদেশিক আক্রমণ প্রভৃতি পরিবেষ্টিত প্রাকৃতিক অবস্থা ও বাহ্য ঘটনা সকল অনেক সময় কোন জাতির আচার ব্যবহার প্রভৃতির উপর বিলক্ষণ প্র-

ভাব প্রয়োগ করে—এমন কি ঐ সকলের প্রভাবে জাতীয় চরিত্র অনেকাংশে সংগঠিত হয়।

জলবায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি-সকল জাতীয় চরিত্রের উপর এইরূপে যে প্রভাব প্রকটিত করে, তাহার ফল যে সকল সময়েই শুভ হয় তাহা নহে। তাহা হইতে অশুভ ফলও উৎপন্ন হইতে পারে। শারীরিক দুর্ব্বলতা, আলস্য, নিরুদ্যম, হীন অসার গর্ব্ব (vanity) প্রভৃতি আমাদিগের জাতীয় চরিত্রের যে সকল দোষ, তাহা যে অনেক পরিমাণে জলবায়ু ভূমি প্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রভাবের ফল তাহা কে অস্বীকার করিবে? বহু-বিবাহ প্রভৃতি আমাদের দেশে যে সকল কুপ্রথা আছে তাহাও বোধ হয় কিয়ৎপরিমাণে প্রাকৃতিক প্রভাবের ফল। আবার এই প্রাকৃতিক প্রভাবেই দয়া ধৈর্য্য ভক্তি ক্ষমা প্রভৃতি সদ্গুণে আমাদের জাতীয় চরিত্র অলঙ্কৃত হইয়াছে। অনেক বাহ্য প্রথা এই সকল চরিত্র-গত দোষ গুণের ফল। কতকগুলি এরূপ প্রথাও আছে যাহার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে নীতির কোন সংস্রব নাই—তাহা কেবল মাত্র সুবিধা ও উপযোগিতা মূলক। যেমন, ভাত খাওয়া প্রথা কিম্বা ধূতি প্রভৃতি ঢিলা-ঢালা কাপড় পরা প্রথা এতদ্দেশের জলবায়ুর উপযোগী বলিয়াই প্রচলিত হইয়াছে। আবার কতকগুলি এরূপ প্রথাও আছে যাহার সহিত নীতি দুর্নীতি, সুবিধা অসুবিধার কোন যোগ নাই। তাহা নিতান্তই যদৃচ্ছা-সম্ভূত (arbitrary) ও দৈবযোগিক (accidental)। যেমন আমাদের দেশের প্রণাম, মুসলমানদিগের সেলাম—ইংরাজদিগের সেকহ্যাণ্ড।

অতএব কোন দেশের প্রথাকে এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—

১। চরিত্র-মূলক।

২। সুবিধা বা উপযোগিতা-মূলক।

৩। যদৃচ্ছা-সম্ভূত কিম্বা দৈবযোগিক।

চরিত্র-মূলক প্রথা সকলের মধ্যে যাহা সুনীতি-সাধক তাহার পরিপোষণ করিতেই হইবে, যাহা দুর্নীতি-মূলক তাহা পরিবর্জ্জন করিতেই হইবে। তাহা দেশ-কাল-পাত্রের উপর ততটা নির্ভর করে না। নীতি সংশোধন মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

সুবিধা বা উপযোগিতা-মূলক প্রথা-সকল দেশ-কাল-পাত্রের উপর খুবই নির্ভর করে। ইংরাজের আগমনে আমাদিগের যেরূপ উদ্যম বাড়িয়াছে তাহাতে লম্বা-কোঁচা ধুতি এক্ষণে সুবিধাজনক বা উপযোগী নাও হইতে পারে। বাহ্য অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এই সকল প্রথার পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। উপযোগিতাই এই সকল প্রথার পত্তনভূমি। অতএব যতক্ষণ উপযোগী ততক্ষণই এই সকল প্রথাকে আমরা আদর করিব। বরাবর চলিয়া আসিতেছে বলিয়াই যে রাখিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। তা ছাড়া, বরাবর এ পর্য্যন্ত কিছুই চলিয়া আসে নাই।

যে সকল প্রথা যদৃচ্ছা-সম্ভূত—যাহার সহিত নীতি, দুর্নীতি, সুবিধা, অসুবিধার কোন সংস্রব নাই তাহার পরিবর্ত্তে সেই জাতীয় বিদেশীয় প্রথা অবলম্বন করিবার

কোনই অর্থ নাই। যাঁহাদিগের অনুকরণ-স্পৃহা, অসার জাঁকের ভাব অতিমাত্র প্রবল তাঁহারাই এরূপ করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় কোন কোন ইঙ্গ-বঙ্গের এই রোগটি আছে। তাঁহাদিগের অনুকরণের কোন অর্থ নাই—যাহা আমাদিগের অভাব আছে তাহা পূরণ করিবার জন্য কোন বিষয়ে অন্য জাতির অনুকরণ করা যাইতে পারে—কিন্তু কেবল অনুকরণের জন্যই অনুকরণ অতিশয় হেয়, অসার, হাস্যাস্পদ,—তাহা হনুকরণ নামেরই যোগ্য। এই "হনু" শব্দ তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে খাটে। "হনু"র অর্থ বর্ত্তমান কাল বাঙ্গাক"হয়েছি।" ভবিষ্যতে কি পরিণাম হইবে তাহার প্রতি তাহাদিগের আদৌ লক্ষ্য নাই—উনবিংশতি শতাব্দি রূপ বর্ত্তমান কালের কোন সভ্য জাতির যাহা কিছু প্রথা, তাহা দেশ-কাল পাত্র বিবেচনা না করিয়াই তাহা হনুকরন করিতেই হইবে। সাত সমুদ্র পার হইয়া তাঁহারা মনে করেন আমরা না জানি কি "হনু"। তাঁহাদিগের লক্ষ্য ন ভূত ন ভবিষ্যৎ—তাঁহারা বর্ত্তমান কাল লইয়াই সন্তুষ্ট। বর্ত্তমান কালের উপর এতই কেন তাঁহাদিগের অনুরাগ? শব্দ-বিজ্ঞান শাস্ত্রের আশ্রয় লইলে বোধ হয় তাহার মীমাংসা হইতে পারে—বোধ হয় বর্ত্তমান কাল কোন একটি শব্দের অপভ্রংশ। বর্ত্তমান শব্দের ব স্থানে ম হইতে পারে এবং কাল শব্দের কয়ের আকার টি সরিয়া গিয়া লয়ের পাশে দাঁড়াইতে পারে। উনবিংশতি শতাব্দিরূপ বর্ত্তমান কাল কেন তাহাদিগের এত মিস্ট লাগে, তাহার রহস্য উহাতেই বুঝা যাই-তেছে। এক দল যেমন, "আমরা হ্যান ছিনু, আমরা ত্যান ছিনু" করিয়া ভূতগ্রস্ত হইয়াছেন, আর এক দল তেমনি, "আ-মরা হ্যানো হনু আমরা ত্যানো হনু" এই বলিয়া সদর্পে চিৎকার করিতেছেন—এই "হনু"তে যে মান আছে তাহা তাঁহারা চিরকাল উপভোগ করুন, সে মান হইতে আমরা তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিতে চাহি না। তবে এই এক কথা, ভূতের উপদ্রব ও "হনুর" উৎপাত আর আমাদের সহ্য হয় না। কেবল লেখকের এখন এই ভয় হইতেছে, পাছে উভয়ের মাঝে পড়িয়া একের কিল ও অপরের চড় খাইয়া প্রাণ সংশয় হয়।

চীনে মরণের ব্যবসায়। *

একটি সমগ্র জাতিকে অর্থের লোভে বল পূর্ব্বক বিষপান করান' হইল; এমনতর নিদারুণ ঠগীবৃত্তি কখনো শুনা যায় নাই। চীন কাঁদিয়া কহিল, "আমি অহি-

* The Indo-British Opium Trade by Theodore Christlieb DD. PH. D. Translated from the German by David. B. Croom, M. A.

ফেন খাইব না।" ইংরাজ বণিক কহিল "সে কি হয় ?" চীনের হাত দুটি বাঁধিয়া তাহার মুখের মধ্যে কামান দিয়া অহিফেন ঠাসিয়া দেওয়া হইল ; দিয়া কহিল "যে অহিফেন খাইলে তাহার দাম দাও।" বহুদিন হইল ইংরাজেরা চীনে এইরূপ অপূর্ব্ব বাণিজ্য চালাইতেছেন। যে জিনিষ সে কোন মতেই চাহে না, সেই জিনিষ তাহার এক পকেটে জোর করিয়া গুঁজিয়া দেওয়া হইতেছে ও আর এক পকেট হইতে তাহার উপযুক্ত মূল্য তুলিয়া লওয়া হইতেছে। অর্থ-সঞ্চয়ের এরূপ উপায়কে ডাকাইতি না বলিয়া যদি বাণিজ্য বলা যায়, তবে সে নিতান্তই ভদ্রতার খাতিরে! যে জাতি আফ্রিকার দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচন করিয়া শত শত অসহায়ের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন, সেই জাতি আজ চীনকে কামানের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া বলিতেছেন "আমার পয়সার আবশ্যক হইয়াছে তুই বিষ খা'!" আসিয়ার একটি বৃহত্তম,প্রাচীন সভ্যদেশের বক্ষস্থলে বসিয়া বিষ কীটের ন্যায় তাহার শরীরের ও মনের মধ্যে প্রতি মুহূর্ত্তে তিল তিল করিয়া মরণের রস সঞ্চারিত করিতেছেন। ইহা আর কিছু নয়, একটি সবল জাতি দুর্ব্বলতর জাতির নিকটে মরণ বিক্রয় করিয়া ধ্বংশ বিক্রয় করিয়া কিছু কিছু করিয়া লাভ করিতেছেন। এক পক্ষে কতই বা লাভ, আর এক পক্ষে কি ভয়ানক ক্ষতি!

চীনে যেরূপ এই বাণিজ্য প্রবেশ করিয়াছে,তাহা পাঠ করিলে পাষাণ হৃদয়েও করুণা সঞ্চার হইবে। যুদ্ধ বিগ্রহের নিদারুণ হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচার সকল পাঠ করিলেও এত খারাপ লাগে না, তাহাতে মনে বিস্ময়-মিশ্রিত একটা ভীষণ ভাবের উদ্রেক হয় মাত্র, কিন্তু এই চীনের অহিফেন বাণিজ্যের মধ্যে এমন একটা নীচ হীন প্রবৃত্তির ভাব আছে, দস্যুবৃত্তির অপেক্ষা চৌর্য্যবৃত্তির ভাব এত অধিক আছে যে, তাহার ইতিহাস পড়িলে আমাদের ঘৃণা হয়।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি মেকাও-সমীপবর্ত্তী লার্ক উপসাগরে দুইটি ছোট অহিফেনের জাহাজ পাঠাইয়া দেন। তখনো চীনে অহিফেন নেশার দ্রব্য স্বরূপে প্রচলিত ছিল না। ইতিপূর্ব্বে কেবল ঔষধ স্বরূপে ২০০ সিন্দুক অহিফেন চীনে আমদানী হইত। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে যে ২৮০০ সিন্দুক অহিফেন চীনে আসিয়াছিল, দেশে তাহার খরিদ্দার ছিল না। ইষ্টইণ্ডিয়া কম্পানির একমাত্র ব্রত হইল কিসে এই পাপ চীনের মধ্যে প্রবেশ করে। ইংরাজেরা যখন আবশ্যক বিবেচনা করেন, তখন চাতুরী ও ধূর্ত্ততার খেলা চমৎকার খেলিতে পারেন। চীনে সেই খেলা আরম্ভ হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের চেষ্টা এতদূর সফল হইয়া আসিল যে, ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে অহিফেনের আমদানী একেবারে বন্ধ করিবার নিমিত্ত আইন প্রচার করিতে হইল। কিন্তু তথাপি ইংরাজ বণিকেরা বেআইনী গোপন ব্যবসায় (Smuggling) চালাইতে লাগিলেন। ন্যায্য বা অন্যায্য যে উপায়েই

হউক, প্রকাশ্য ভাবেই হউক আর চৌরের ন্যায় অতি গোপন ভাবেই হউক, চীনকে অহিফেন সেবন করাইতে কোম্পানি এক-বারে দৃঢ়-সঙ্কল্প।

গোলযোগ দেখিয়া অহিফেনের জাহাজ লার্ক উপসাগর হইতে হ্বাম্পোয়াতে সরান হইল। চীন গবর্ণমেণ্ট, যাহাতে হ্বাম্পোয়াতে কোন জাহাজে অহিফেন লইয়া না আসে, তাহার জামিন হংকং-এর সমস্ত বণিকদের নিকট হইতে লইলেন। এই আইন হইল যে, যদি কোন জাহাজে অহিফেন থাকে, তবে সে জাহাজ তৎক্ষণাৎ মাল না নামাইয়া বন্দর হইতে চলিয়া যাইবেক এবং জামিনদাতাদের শাস্তি হইবে। এই আইন মাঝে মাঝে প্রায় পুনঃ প্রচারিত হইত, তথাপি তাহার বিশেষ ফল হইল না। অবশেষে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ক্যাণ্টনের শাসনকর্ত্তা বেয়াইনী গোপন ব্যবসায় সকল নিবারণে বিশেষ উদ্যোগী হইলেন। তিনি ইংরাজ, পর্টুগীজ ও মার্কিন্‌দিগকে, এই অতি হীন বাণিজ্য-প্রণালী ও চীনরাজ-কর্ম্মচারীদিগকে নীতিভ্রষ্ট করা রূপ অতি ঘৃণিত কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বিশেষ রূপে অনুরোধ করিলেন।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী হ্বাম্পোয়া হইতে তাঁহাদের জাহাজ সরাইয়া লিন্‌টিন দ্বীপে লইয়া গেলেন। চীনের সমস্ত উপকূল পর্য্যটন করিবার জন্য জাহাজ প্রেরিত হইল। সেই সকল জাহাজ হইতে কিছু দূরে অন্যান্য অহিফেন সমেত জাহাজ সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতে লাগিল। সেই জাহাজ সমূহ হইতে অহিফেন লইয়া লুকাইয়া চুরাইয়া বেয়াইনী বাণিজ্য চলিতে লাগিল। দেশের অভ্যন্তর ভাগে লোক-দের মধ্যে এই নেশা প্রচলিত করাইবার জন্য চীন রাজকর্ম্মচারীদের ইংরাজেরা প্রায় মাঝে মাঝে ঘুস দিতে লাগিল। ক্রিষ্ট্লিয়েব্ বলিতেছেন যে,—এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষীয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট চীনবাসীদের নিজ দেশের আইন লঙ্ঘন করিতে ও উপরিস্থ ব্যক্তিদিগের অবাধ্য হইতে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, এমন আর কেহ দেয় নাই।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে অহিফেন বাণিজ্যের বিরুদ্ধে নূতন শাসন প্রচারিত হইল। কিন্তু তথাপি গোপন ব্যবসায় এতদূর পর্য্যন্ত বাড়িয়া উঠিল যে সমস্ত চীন দেশে অহিফেন লইয়া একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল। চীনের দেশ-হিতৈষীরা ইংরাজদের সহিত সমস্ত বাণিজ্য রদ করিবার প্রস্তাব করিলেন। প্রজাদিগের ঘোর অনিষ্ট সম্ভাবনা দেখিয়া সম্রাট ব্যাকুল হইয়া প্রতিনিধি স্বরূপ লিন্‌কে ক্যাণ্টনে প্রেরণ করিলেন। লিন্ বন্দরস্থিত জাহাজের সমস্ত অহিফেন ধ্বংশ করিয়া দিলেন, ইংরাজদের সহিত বাণিজ্য রহিত করিলেন। ইষ্টইণ্ডিয়া কম্পানির সমস্ত কর্ম্মচারীকে চিন হইতে দূর করিয়া দিলেন। অবশেষে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ বাধিল।

যুদ্ধের ফল সকলেই অবগত আছেন। পরাজিত চীন সন্ধি করিল। পাঁচটি বন্দর ইংরাজ বণিকদের নিকটে উন্মুক্ত হইল,

হংকং ইংরাজেরা লাভ করিলেন, এবং ২১ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ স্বরূপে চীনের নিকট হইতে আদায় করিলেন। ইংরাজেরা অনুগ্রহ করিয়া সন্ধিপত্রে সম্মতি দিলেন যে, "বেয়াইনি সমস্ত পণ্য দ্রব্য চীন গবর্ণমেণ্ট কাড়িয়া লইতে পারিবেন।" এই অবসরে ইংরাজেরা চেষ্টা করিয়াছিলেন যাহাতে অহিফেন বেয়াইনি পণ্যের মধ্যে গণ্য না হয়। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। ইংরাজ প্রতিনিধি সার্ পটিঙ্গজরকে চীন কর্তৃপক্ষীয়েরা অহিফেন বাণিজ্য একেবারে উঠাইয়া দিতে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি কহিলেন "আচ্ছা, জাহাজে অহিফেন দেখিলে কাড়িয়া লইও, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, তবে আমরা তোমাদের সাহায্য করিতে পারিব না।" তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে, অহিফেন-বাণিজ্য-তরী-সকল যুদ্ধ-সজ্জায় যেরূপ সুসজ্জিত, তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত দুর্ব্বল চীন তাহাদের কাছে ঘেঁসিতে পারিবে না। এইরূপে প্রকাশ্য ভাবে, অসহায় চীনের চোখের সামনে বেয়াইনি ব্যবসায় চলিতে লাগিল।

বিদেশীয়েরা উপর্য্যুপরি ও অবিরত তাহাদের দেশের আইন লঙ্ঘন করাতে চীনবাসীরা এত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল যে, "লোহিত-কেশ" বিদেশীদের একেবারে বিনাশ করিতে তাহারা কল্পনা করিল। রাজকর্ম্মচারী ইয়েঃ "অ্যারো" নামক একটি ইংরাজ-জাহাজ ধৃত করাতে পুনর্ব্বার চীনদের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ বাধিল। এবারে ফ্রান্স ইংলণ্ডের সহিত যোগ দিলেন।

হতভাগ্য পরাজিত চীনকে ৭টি বন্দর বিদেশীদের নিকট উন্মুক্ত করিতে হইল। অহিফেন বে-আইনি পণ্যের মধ্যে আর পরিগণিত হইল না। কেবল অহিফেনের উপর মাশুল নির্দ্দিষ্ট হইল। যাহাতে মাশুল গুরুতর হয় চীনেরা তাহার জন্য বারম্বার নিবেদন করে, কিন্তু ইংরাজরা তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছে। এই বারের সন্ধির পর হইতে অহিফেনের বাণিজ্য এমন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিল যে, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে চীনে ৯০০০০ বাক্স অহিফেন আমদানী হইয়াছে।

এখন চীনে কোটি কোটি লোক অহিফেন সেবন করিতেছে। আমাদের দেশে যেমন বাড়িতে কেহ আসিলে আমরা তামাক দিই, চীনে সেই রূপ ধনী লোকেরা ও শ্রীসম্পন্ন ব্যবসায়ীরা প্রায় সাক্ষাৎকারীদের ও খরিদ্দারদের চণ্ডুর হুঁকা দিয়া থাকে। রাস্তায় রাস্তায় চণ্ডুর দোকান খুলিয়াছে। স্যানিহিয়েন নগরে অহিফেন-ধূম সেবনের এমন প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে, অধিবাসীরা নেশায় ভোর হইয়া দিনের বেলায় কোন কাজ করিতে পারে না, মশাল জ্বালাইয়া রাত্রে কাজ করে। এক নিংপো নগরে কেবল দরিদ্র লোকদিগের জন্য ২৭০০ চণ্ডুর দোকান আছে। দেখা গিয়াছে যে যে স্থানে অহিফেন সেবনের বিশেষ প্রাদুর্ভাব, সেই সেই স্থানে দুর্ভিক্ষের প্রভাব অত্যন্ত অধিক হয়।

প্রথম কারণ, লোকেরা অকর্ম্মিষ্ঠ, দ্বিতীয় কারণ, এত অধিক জমী অহিফেনের চাসে নিয়োজিত যে, যথেষ্ট পরিমাণে শস্য উৎপাদনের স্থান নাই। এমন হইয়াছে দুর্ভিক্ষের সময় লোকের হাতে টাকা আছে, অথচ তাহারা টাকা খুঁজিয়া পায় না। তখন তাহারা বুঝিয়াছে যে, অহিফেনে পেট ভরে না। চীনবাসীরা ক্রমশই অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যখন এক হাজার সৈন্য প্রেরিত হয়, তাহার মধ্য হইতে দুই শত অহিফেনসেবী অকর্ম্মণ্য সৈন্য ফেরত পাঠাইতে হইয়াছিল। বিদ্রোহী দলের মধ্যে সকলেই অহিফেন-বিদ্বেষী ছিল, অহিফেনসেবী রাজসৈনিকেরা তাহাদের নিকটে উপর্য্যুপরি পরাজিত হয়। চীনেরা বলে যে, সহজে চীনদেশ জয় করিবার অভিপ্রায়ে ধূর্ত্ত ইংরাজেরা অহিফেন ব্যবসায় চীনে প্রচলিত করিয়াছে। অহিফেনের জন্য প্রতি বৎসর চীন দেশ হইতে এত টাকা বাহির হইয়া যায় যে, ক্রমশই সে দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে চীন ৮ কোটি ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৩ শত ৮১ পাউণ্ড অহিফেন কিনিয়াছে! কি ভয়ানক ব্যয়! অহিফেনসেবীদের নীতি এমনি বিগড়িয়া যায় যে, তাহারা নিজের সন্তান বিক্রয় করে ও নিজের স্ত্রীকে ভাড়া দেয়, চুরি ডাকাতির ত কথাই নাই! (১) এইরূপে এক বিদেশীয় জাতির হীন স্বার্থপরতা ও সীমাশূন্য অর্থলিপ্সার জন্য সমস্ত চীন তাহার কোটি কোটি অধিবাসী লইয়া শারীরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধঃপতনের পথে দ্রুত বেগে ধাবিত হইতেছে। যেন, ইংরাজদিগের নিকট ধর্ম্মের অনুরোধ নাই, কর্ত্তব্য জ্ঞানের অনুরোধ নাই, সহৃদয়তার অনুরোধ নাই, কেবল একমাত্র পয়সার অনুরোধ বলবান। এইত তাঁহাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর খৃষ্টীয় সভ্যতা!

পাদ্রীদিগের ধর্ম্মোপদেশ শুনিলে চীনবাসীদের গা জ্বলিয়া যায়। জ্বলিবার কথাইত বটে! একবার এক জন আমেরিকান পাদ্রী কাইফংফু নগরে গিয়াছিলেন, সে খানে একদল লোক জুটিয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দেয়। তাহারা তাঁহাকে বলে "তোমরা আমাদের সম্রাট্‌কে হত্যা করিলে আমাদের রাজপ্রাসাদ ভূমিসাৎ করিলে, আমাদের ধ্বংশ করিবার জন্য বিষ আনয়ন করিলে, আর আজ আমাদের ধর্ম্ম শিখাইতে আসিয়াছ!!" এক জন ইংরাজ ফাট্‌সান নগরে চণ্ডুর দোকান দেখিতে গিয়াছিলেন, একজন চণ্ডুপায়ী তাঁহার কাছে স্বীকার করিয়াছিল যে, সে তাহার দৈনিক উপার্জ্জনের দশভাগের আট ভাগ চণ্ডুপান করিয়া ব্যয় করে। সে অবশেষে ইংরাজটিকে বলে "তুমি ত ইংলণ্ড হইতে আসিতেছ? তাহা হইলে অবশ্য

(১) এক জন চীনবাসী অহিফেন-ধূমপায়ী বলিয়াছেন যে, "দক্ষিণ পর্ব্বতের সমস্ত বাঁশে (বাঁশের কলম) অহিফেনের দোষ বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না; উত্তর সমুদ্রের সমস্ত জলেও ইহার কলঙ্ক প্রক্ষালিত হয় না!"

তুমি আমাদের মৃত্যুর নিদান বিষ লইয়া কারবার করিয়া থাক। আচ্ছা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের রাণীটি না জানি কিরূপ দুষ্ট স্ত্রীলোক! আমরা তোমাদের ভাল ভাল চা ও রেশম পাঠাই, আর তিনি কি না তাহার পরিবর্ত্তে আমাদের বধ করিবার জন্য বিষ পাঠাইয়া দেন?" ইংরাজদের সম্বন্ধে চীনেরা এইরূপ বলে।

এই এক অহিফেন ব্যবসায় সম্বন্ধে বিদেশীয়দের প্রতি চীনের এতদূর অবিশ্বাস হইয়াছে যে, তাহারা স্বদেশে রেলোয়ে প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে চাহে না পাছে, অহিফেন দেশের অভ্যন্তর দেশে অধিক করিয়া প্রবেশ করিতে পারে। পাছে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় ও তৎসঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত পরিমাণে বিদেশীদের আমদানী হয়! এমন কি, লৌহ ও কয়লার খনি ব্যতীত দেশের অন্যান্য বড় বড় খনি চীন গবর্ণমেণ্ট স্পর্শ করেন না, পাছে খনিতে বিদেশীয় কর্ম্মচারী রাখিতে হয় ও পাছে বিদেশীয় বাণিজ্য আরো বাড়িয়া উঠে। অহিফেনে চীনের রাজস্বলাভ বড় অল্প হয় না, তথাপি চীন যোড় হস্তে বলে "তোর ভিক্ষা দিয়া কাজ নাই, তোর কুকুর ডাকিয়া ল'!" পটিঞ্জর যখন অহিফেনকে নিষিদ্ধ পণ্য-শ্রেণী-বহির্ভূক্ত করিতে সম্রাটের নিকট প্রস্তাব করেন, তখন সম্রাট টাও ক্বাং এই কথা বলিয়াছিলেন "সত্য বটে, এ বিষের সঞ্চরণ আমি কোন মতে রোধ করিতে পারিব না, কারণ অর্থলোলুপ, নীতিভ্রষ্ট লোকেরা লোভ ও ইন্দ্রিয়াসক্তির বশ হইয়া আমার মনের ইচ্ছা বিপর্য্যস্ত করিয়া দিবে। তথাপি আমি বলিতেছি—আমার নিজের প্রজাদের পাপ ও যন্ত্রণা হইতে যে আমি রাজস্ব লাভ করিব, এমন প্রবৃত্তি আমার কিছুতেই হইবে না।"

ইংরাজ জাতির প্রতি চীনের এইরূপ দারুণ অবিশ্বাস থাকাতে ইংরাজদের কম লোকসান হইতেছে না। চীনে ইংরাজ বাণিজ্যের অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে। ইংরাজি পণ্য চীনে অল্প আমদানী হয়, এবং তাহা দেশের অভ্যন্তর ভাগে চালান করিতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়। অল্প দিন হইল লণ্ডন ব্যাঙ্ক-ওয়ালারা চীনে ইংরাজ বাণিজ্যের শোচনীয় অবস্থা বিষয়ে গবর্মেণ্টের নিকট এক দরখাস্ত পাঠাইয়াছে।

এই অহিফেন বাণিজ্যে ভারতবর্ষেরই বা কি উপকার অপকার হইতেছে দেখা যাক্। ভারতবর্ষীয় রাজস্বের অধিকাংশ এই অহিফেন বাণিজ্য হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু অহিফেনের ন্যায় ক্ষতিবৃদ্ধিশীল বাণিজ্যের উপর ভারতবর্ষের রাজস্ব অত অধিক পরিমাণে নির্ভর করাকে সকলেই ভয়ের কারণ বলিয়া মনে করিতেছেন। ১৮৭১।৭২ খৃষ্টাব্দে এই বাণিজ্য হইতে সাড়ে সাত কোটি পাউণ্ডেরও অধিক রাজস্ব আদায় হইয়াছিল। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহা ৬ কোটি ৩ লক্ষ পাউণ্ডে নামিয়া আসে। এরূপ রাজস্বের উপর নির্ভর করা অত্যন্ত আশঙ্কার কারণ।

ভারতবর্ষীয় অহিফেন নিকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে, সুতরাং তাহার দাম কমিবার কথা। তাহা ভিন্ন চীনে ক্রমশঃই অহিফেন-চাস বাড়িতেছে। চীনে স্থানে স্থানে অহিফেন-সেবন-নিবারক সভা বসিয়াছে। ক্যাণ্টনবাসী আমীর ওমরাওগণ প্রায় সহস্র প্রসিদ্ধ পল্লিতে প্রতি গৃহস্থকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, যে,"তোমরা সাবধান থাকিও যাহাতে বাড়ির ছেলে পিলেরা অহিফেন অভ্যাস না করিতে পায়।" যাহারা অহিফেন সেবন করে তাহাদের সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছেন। তিনটি বড় বড় নগরের অধিবাসী বড় লোকেরা সমস্ত অহিফেনের দোকান বন্ধ করাইতে পারিয়াছেন। এইরূপে চীনে অহিফেনের চাস এত বাড়িতে পারে, ও অহিফেন সেবন এত কমিতে পারে যে, সহসা ভারতবর্ষীয় রাজস্বের বিশেষ হানি হইবার সম্ভাবনা। অতএব ঐ বাণিজ্যের উপর রাজস্বের জন্য অত নির্ভর না করিয়া অন্য উপায় দেখা উচিত। এতদ্ভিন্ন অহিফেন চাসে ভারতবর্ষের স্পষ্ট অপকার দেখা যাইতেছে। অহিফেন চাস করিতে বিশেষ উর্ব্বরা জমির আবশ্যক। সমস্ত ভারতবর্ষে দেড় কোটি একর (Acre) উর্ব্বরতম জমী অহিফেনের জন্য নিযুক্ত আছে। পূর্ব্বে সে সকল জমীতে শস্য ও ইক্ষু চাস হইত। এক বাঙ্গলা দেশে আধকোটি একরেরও অধিক জমী অহিফেন চাসের জন্য নিযুক্ত। ১৮৭৭।৭৮-এর দুর্ভিক্ষে বাঙ্গলায় প্রায় এক কোটি লোক মরে। আধ কোটি একর উর্ব্বর ভূমিতে এক কোটি লোকের খাদ্য যোগাইতে পারে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার উইলসন পার্লিয়ামেণ্টে কহিয়াছেন যে, মালোয়াতে অহিফেনের চাসে অন্যান্য চাসের এত ক্ষতি হইয়াছিল যে, নিকটবর্ত্তী রাজপুতনা দেশে ১২ লক্ষ লোক না খাইয়া মরে। রাজপুতানায় ১২ লক্ষ লোক মরিল তাহাতে তেমন ক্ষতি বিবেচনা করি না, সে ত ক্ষণ-স্থায়ী ক্ষতি। এই অহিফেনে রাজপুতানার চির-স্থায়ী সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে। সমস্ত রাজপুতনা আজ অহিফেন খাইয়া আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছে। অত বড় বীর জাতি আজ অকর্ম্মণ্য, অলস, নির্জ্জীব, নিরুদ্যম হইয়া ঝিমাইতেছে। আধুনিক রাজপুতানা নিদ্রার রাজ্য ও প্রাচীন রাজপুতানা স্বপ্নের রাজ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অত বড় জাতি অসার হইয়া যাইতেছে। কি দুঃখ! আসামে যেরূপে অহিফেন প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে আসামের অতিশয় হানি হইতেছে। বাণিজ্য তত্ত্বাবধায়ক ক্রস্‌ সাহেব বলেন, "অহিফেন সেবন রূপ ভীষণ মড়ক আসামের সুন্দর রাজ্য জনশূন্য ও বন্য জন্তুর বাসভূমি করিয়া তুলিয়াছে এবং আসামীদের মত অমন ভাল একটি জাতিকে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধম, দাসবৎ এবং নীতি-ভ্রষ্ট করিয়া তুলিয়াছে!" অহিফেন বাণিজ্য আমাদের ভারতবর্ষের ত এই সকল উপকার করিয়াছে!

চীনের রাজা যদি বলিতে পারেন যে,

"আমার নিজের প্রজাদের পাপ ও যন্ত্রণা হইতে যে, আমি রাজস্ব লাভ করিব, এমন প্রবৃত্তি কিছুতেই হইবে না। তবে খৃষ্টীয় ধর্ম্মাভিমানী ইংরাজেরা কি বলিতে পারেন না যে, "একটি প্রকাণ্ড জাতির পাপ ও যন্ত্রণা হইতে যে, আমরা লাভ করিব, এমন প্রবৃত্তি আমাদের না হয় যেন!" কিন্তু আমরা খৃষ্টান জাতিকে ত চিনি! এই খৃষ্টান জাতিই ত প্রাচীন আমেরিকানদিগকে ধ্বংশ করিয়াছেন! এই খৃষ্টান ইংরাজদের লোভ-দৃষ্টিতে কোন দুর্ব্বল "হীদেন" দেশ পড়িলে তাঁহারা কিরূপ খৃষ্টান উপায়ে তাহা আদায় করেন তাহাও ত আমরা জানি! এই খৃষ্টান ইংরাজগণ বর্ম্মায় কিরূপ খৃষ্টান নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক অহিফেন প্রচলিত করেন তাহাও ত আমরা জানি! ইংরাজদের মুষ্টিতে আসিবার পূর্ব্বে আরাকানে অহিফেনসেবীদের প্রতি মৃত্যু-দণ্ডের নিদেশ ছিল। অধিবাসীরা পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী ও সরল-হৃদয় লোক ছিল। অবশেষে কি হইল? ইংরাজ বণিকগণ অহিফেনের দোকান খুলিলেন। যত প্রকার উপায়ে এই নেশা দেশে প্রচলিত হইতে পারে তাহা অবলম্বন করিলেন। অল্পবয়স্ক লোকদের দোকানে ডাকিয়া আনিয়া অহিফেন দেওয়া হইত। প্রথমে তাহার মূল্য লওয়া হইত না, অবশেষে এই উপায়ে অহিফেন যতই প্রচলিত হইতে লাগিল ততই মূল্যও উঠিতে লাগিল, বণিকদের পকেট পূরিতে লাগিল, গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বাড়িতে লাগিল। তাহার ফল কি হইল? আরাকানের সুস্থ বলিষ্ঠ জাতি অহিফেনের অন্ধ অনুরক্ত হইল, দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য জুয়া খেলোয়াড় হইয়া উঠিল। তাহাদের শরীর ও নীতির ধ্বংশ সাধিত হইল।" এই ত খৃষ্টান জাতি! যাহাদের বল নাই, যাহাদের সহায় নাই, তাহাদের সহিত ইংরাজ খৃষ্টানরা যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা জগতে বিদিত। তাহাদের তাঁহারা লাথি মারিতে চান। খৃষ্টানশাস্ত্রে লেখা আছে,তোমার এক গালে চড় মারিলে আর এক গাল ফিরাইয়া দিবে! খৃষ্টান ইংরাজগণ যখন রাজস্বের লোভ দেখাইয়া চীনের সম্রাটকে চীন হত্যা করিতে পরামর্শ দিতে গিয়াছিলেন, তখন অখৃষ্টান চীনের সম্রাট যে মহদ্বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহাতে ইংরাজদের খৃষ্টানী গালে চড় মারা হইয়াছিল সন্দেহ নাই, দুঃখের বিষয় তাহার কোন ফল হইল না।

ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত।*

জাতীয় গৌরব বাসনা জাতিগত উদ্যমশীলতা ও উন্নতির জীবন স্বরূপ। পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি-কলাপ উত্তর-পুরুষদিগকে তদনুকরণে সমুৎসাহিত করে। অনুদারবুদ্ধি লোকদিগকে পূর্ব্ব-পুরুষগণের সমকক্ষ হইতে এবং মনীষীদিগকে সমধিক উৎকর্ষ লাভে প্রণোদিত করে। জাতীয় ইতিহাস উত্তর-পুরুষগণের নিকট সেই জাতীয় মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে, দেশীয় মহাপুরুষগণের জীবনী-চিত্র দেখাইয়া দেয় এবং তদ্দ্বারা জাতি-সাধারণের উন্নতির স্রোত অব্যাহত রাখে ও পরিবর্দ্ধিত করে।

সকল দেশেই এই মহদুপায়ে জাতীয় জীবন রক্ষিত হইয়াছে। ইহা মনুষ্য সম্বন্ধে প্রাকৃতিক নিয়ম। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন, ভারতও এ নিয়মের বহির্ভূত নহে। অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষও এই নিয়ম-বলে উন্নতি লাভ করিয়াছে। প্রাচীন কালের মহাত্মাগণের পূজা ও তাঁহাদের কার্য্য-কলাপের অবগতি ও স্মরণ যেমন উন্নতির উপায়, সেইরূপ আবার আত্মার প্রসাদন ও উৎকর্ষ-বিধায়ক। হিন্দুজাতির ভক্তি প্রভৃতি যায়া সমূহ যেমন প্রবল, পৃথিবীর অন্য কোনও জাতিরই সেরূপ নহে। প্রাচীন মহাপুরুষগণের নাম কীর্ত্তন ও গুণ কীর্ত্তন তাহাদিগকে মোহিত করিত। অপেক্ষাকৃত সামান্য-মহিমা-সম্পন্ন লোক বা নির্গুণ লোকেরা তাহাদের হৃদয়ে ও পুস্তকাবলীতে স্থান পায় নাই। এই কারণে আমরা গ্রীক ও রোমিয় ইতিহাস গ্রন্থ সমূহের ন্যায় ভারতীয় সমস্ত ঘটনা প্রকাশক ইতিবৃত্ত সচরাচর দেখিতে পাই না। (১) ভক্তি ভক্তিপাত্রকে অপেক্ষাকৃত অধিক গুণে বিভূষিত করে। যাহারা সর্ব্ব-গুণ-সম্পন্ন তাহাদিগকে ঐশিকগুণশালী বলিয়া মনে করে। ইহা মনের ধর্ম্ম, ইহা না করিলে হৃদয়ের পরিতোষ সাধন হয় না। প্রবল-ভক্তি-বৃত্তি-প্রণোদিত হইয়া ভারতবর্ষীয় লেখকগণ এইরূপে স্ব স্ব বর্ণনীয় মহাপুরুষদিগকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

কাল সহকারে ভিন্ন জাতীয় লোকদিগের সংসর্গে হিন্দুজাতিরও প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তন হইল। হিন্দুরাজত্বের অবসান-কালে ও মুসলমান রাজত্বের সময়ে তাঁহারা ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ইতিহাস

* ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত। শ্রীকার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

১ সুবাগ্মী বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য রূপ অবধারণ করিয়াছেন।

লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিনী, গুর্জ্জরের রাসমলা, ত্রিপুরার রাজমালা, রাজস্থানের খোমানরাস—বিজয় বিলাস—জগৎবিলাস— সূর্য্যপ্রকাশ—রাজ-প্রকাশ—জয়বিলাস (২) ও নবদ্বীপের ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত প্রভৃতি গ্রন্থাবলী এই সময়ে এই রূপে প্রণীত হয়।

ইতিপূর্ব্বে ভারত-পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধান ও প্রচার-কার্য্যের গৌরব ও আবশ্যকতা দেশীয় লোকদিগের উপলব্ধি-গোচর ছিল না। পাশ্চাত্য জাতির দৃষ্টান্তই ঐ মহৎ কার্য্যে এতদ্দেশীয় কতিপয় কৃতবিদ্য ব্যক্তির যত্ন ও প্রয়াসের প্রথম প্রবর্ত্তক। কিন্তু তাহাদের যত্নের ফল স্বরূপ যে সকল গ্রন্থ অদ্য পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই ইংরেজী ভাষায় লিখিত। দেশীয় ভাষায় লিখিত পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থের সংখ্যা অত্যল্প। যাঁহারা এই অভাব দূরীকরণার্থ পরিশ্রম ও যত্ন করিতেছেন তাঁহারা আমাদের যথোচিত ভক্তি ও ধন্যবাদের পাত্র।

মুসলমান রাজত্বের অবসান-কালে ব্রিটীস ভারতের গবর্ণর জেনেরেল ওয়েরেণ হেষ্টিংস সাহেবের অনুরোধ ক্রমে নবদ্বীপপতি কৃষ্ণচন্দ্রের জনৈক সভাপণ্ডিত সংস্কৃত "ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত" গ্রন্থ রচনা করেন। পার্শ্চ সাহেব এই গ্রন্থখানি ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। ১৯৩৮ সম্বতে দেওয়ান বাবু কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় মহাশয় সেই "ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত" ও অন্যান্য গ্রন্থ, "ফরমান" প্রভৃতি প্রাচীন কাগজাত অবলম্বনে বাঙ্গালা ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিত সঙ্কলন করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি বঙ্গীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে একটী উজ্জ্বল রত্ন বিশেষ। রত্ন মাত্রই যে নির্দ্দোষ হইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতেও ভ্রম প্রমাদ পরিলক্ষিত হয়। সেই সকল ভ্রম সংশোধন করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

দেওয়ান বাবু ও অন্যান্য লেখকগণ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তদ্বংশধরদিগের অধিকৃত প্রদেশকে 'রাজ্য' আখ্যা দান করিয়াছেন। কিন্তু মুসলমান বঙ্গেশ্বরগণ বিষ্ণুপুর পঞ্চকোট ও ত্রিপুরাপতিগণের অধিকৃত জমিদারী ব্যতীত অন্য কোন জমিদারীর প্রতি "রাজ্য" শব্দ প্রয়োগ করেন নাই।

দেওয়ান বাবু কবিবর ভারতচন্দ্রের মতানুসরণ করিয়া "নদীয়া জমিদারীর" এইরূপ সীমা নির্ণয় করিয়াছেন "রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ, দক্ষিণ সীমা গঙ্গাসাগর, পূর্ব্ব সীমা ধুলিয়াপুর (বড় গঙ্গা পার,) পশ্চিম সীমা ভাগীরথী।" দেওয়ান বাবু ঐতিহাসিক লেখনী ধারণ করিয়া অসঙ্কুচিত ভাবে কবির পদানুসরণ করি-

২ এই সকল গ্রন্থ অবলম্বনে সুবিখ্যাত কর্ণেল টড রাজস্থানের ইতিহাস লিখিয়াছেন। সেই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় তিনি তাহা স্বীকার করিয়াছেন। আমরা টডের গ্রন্থের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রহিয়াছি, ভ্রমেও এই সকল গ্রন্থের অনুসন্ধান করি না।

লেন, ইহা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়। কারণ এই চতুঃসীমার অন্তর্ভূত প্রদেশ মধ্যে অন্যান্য জমিদারের অধিকৃত অনেক গ্রাম ও পরগণা ছিল। মোগল-শাসিত বঙ্গের রাজস্বের হিসাব হইতে আমরা এস্থলে একটী তালিকা উদ্ধৃত করিলাম। দেওয়ান বাবু বলেন—"এই রাজ্যের পরিমাণ ফল ৩৮৫০ বর্গ ক্রোশ। ইহা সুইজারলণ্ড রাজ্য অপেক্ষাও কিঞ্চি বৃহৎ।" ইহাও নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল। কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারকালে তাঁহার অধিকৃত জমিদারীর পরিমাণ ফল ৩১৫১ বর্গ মাইল ছিল। (৩)

হিসাব জমিদারী নদীয়া।

চাকলে হুগলি সরকার সাতগাঁ।

পরগণা ও কিসমত		বার্ষিক রাজস্ব।
পং উখরা	...	৬৬২৬৯
„ এঙ্গুরিয়া	...	৭৫৩৮৪
„ ইসলামপুর	...	১৮৯৫১
„ উলা	...	৩৬৩২
„ ইসমাইলপুর	...	২৬০১
„ আলানিয়া	...	২৪৮০
„ আমিরনগর	...	৩৮৬৭
কিং উমরপুর	...	১৭৯
পং আনারপুর	...	৪৭০৩৫
কিং আমিরাবাদ	...	৪০৯০
পং বাগোয়ান	...	১৪৭০৪
„ ভালুকা	...	২৫৮
„ বালিয়া	...	৯৯৫৮
„ বালন্দিয়া	...	৭৩৩৭
কিং পার ধুলিয়াপুর	...	৮৬১
পং ফতেপুর	...	১০১২
„ গড়ইটবি	...	৪৫৭
„ ঘাটেলিয়া	...	১৫১৪১
„ গয়াশপুর	...	৪১৫৫
কিং কাথুলিয়া	...	৩৪৩৮
„ হাজিথালি	...	১৬৪
„ হালিসহর	...	৮০৯৩
হাট আলমগঞ্জ	...	২৩
পং জাফরাবাদ	...	২২২৪
„ কাশিমপুর	...	৮০৭২
„ খাড়িজুড়ি	...	৬৬২
কিং কলিকাতা	...	২৮৬৭২
পং লেপা	...	১২৮
পং নাটাগড়ি	...	১০৪৫
„ মহবতপুর (বা মহৎপুর)		১৮১৬০
„ মাটিয়ারি	...	১১০২২
„ মাহম্মদপুর	...	১০৭২
„ মাগারা	...	২৪৫১০
„ মশুণ্ডা	...	২১৯
কিং মানপুর	...	২৫২৪
„ মাইহাটি	...	৬৫৪
„ মুর্কইনমক ও মোন		৬৪৮৫
পং নদীয়া	...	৩৯৪৯
„ পাঁচনভর	...	৩৮৯৯৪
কিং পাইকান	...	১৮৭১
„ পাইকহাটি	...	১৮৯
পং রায়পুর	...	৮০৬৯

৩ East India Company's Fifth Report, page 304.

,, রাজপুর	...	১৬৭৫
,, রায়সা	...	১০৭০
,, সাহাপুর	...	৪২০৩
,, সগুণা	...	২৬০৫
,, সুলতান বেদারপুর		৫৫৪০
,, সুলতানপুর	...	১৩১১৪
,, শান্তিপুর	...	৩৪৫৫
,, সাহারপুর	...	২৮০৩
		৪-৬০৭৮

সরকার সেলিমাবাদ।

পং আমিরপুর	...	৫৯০
,, খুসিদপুর	...	১০০৯১
,, মানপুর	...	২৫৯৮২
		৩৬৬৬৩

সরকার খালিপ্তাবাদ।

পং ইমরা	...	৫৩৮
		৪৫৩২৭৯

চাকলে যশোহর।

সরকার খালিপ্তাবাদ।

পং বাগমারা	...	৭৯২৭
,, খাজরা	...	২৯৬৮
,, ভিজুলা	...	১০০৮৩
,, খোচয়াবিল	...	৩৪৩২
,, ধুলিয়াপুর	...	২৪৭১৪

সরকার সাতগাঁ।

,, হিলকি	...	৮৫২
,, ঘুলা	...	৩৩২৮
,, চাবঘাট	...	২৫৭
,, হুসিনপুর	...	৮০২১

সরকার সেলিমাবাদ।

,, আলিমপুর	...	১০২২
		৬২৬২৪

চাকলে মুর্শিদাবাদ।

পং পলাসি } সরকার {		৬৯৬১৬
,, বেলগাঁ } সাতগাঁ {		১০৭৫০
,, বুড়ন } সরকার—সেরিফাবাদ		১৭৮৬
		৮২১৫২

চাকলে ভূষণা।

সরকার মাহাম্মাদাবাদ।

পং হলদহ	...	১৯৩৯৯
,, ইন্দুরখালি	...	৬৮৯
,, খালিশপুর	...	৫০২
,, ভবসিংহপুর	...	৮১৭
,, চণ্ডীজগন্নাথপুর	...	২৪৯৪
		২৩৯০১

চাকলে বর্দ্ধমান।

সরকার সেলিমাবাদ।

কিং জয়পুর	...	২১০৪
কিং কুবাজপুর	...	১২১৬১
		১৪২৬৫

চাকলে ঘোড়াঘাট।

পং ইসপসাহি।

তাং জয়কৃষ্ণ নন্দী	...	৩১১
মোট পেশকশ	...	২৫৩৩১

৭৫ পং ও কিং ১১৩৫ বঙ্গাব্দের বন্দোবস্ত অনুসারে মোট জমা	৬৬১৮৬৩
বিতং—	
খালিসা ভূমির বাং	৬০৭৫৪৫
জায়গির ,, ,,	৫৪৩১৮
	৬৬১৮৬৩

দেওয়ান বাবু লিখিয়াছেন—"যবন রাজত্বকালে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অধিকারে উল্লিখিত ৮৪ পরগণা ও কিসমত্তের (৮২ হইবে) মোট রাজস্ব ৬৫০৮০৬ (১৭৮০ টাকা অবধারিত ছিল তদতিরিক্ত পেশকশ বলিয়া আর ২৫০০০ টাকা দিতে হইত। নির্দ্ধারিত রাজস্বের প্রায় হ্রাস বৃদ্ধি হইত না, পুরুষানুক্রমে প্রায় এক পরিমাণেই থাকিত। (৪) রাজা রুদ্রের অধিকার হইতে তাঁহার প্রপৌত্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত ইঁহাদের সকল পরগণার রাজস্ব একরূপ ছিল, ইহা রাজবাটীর কাগজে স্পষ্ট প্রকাশ আছে।"

১১৩৫ বঙ্গাব্দের বন্দোবস্তে নদীয়া জমিদারীর ৬৬১৮৬৩ টাকা জমা নির্দ্ধারিত থাকা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ১১৭২ বঙ্গাব্দের বন্দোবস্তে এই জমা বৃদ্ধি হইয়া ৮২ পরগণা ও কিসমত্তের মং ১০৯৭৪৫৪ টাকা রাজস্ব অবধারিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে যাহারা সবিশেষ অবগত হইতে চাহেন তাঁহারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পঞ্চম বিজ্ঞাপনীর ৩০৪, ৩০৫ ও ৩৭২, ৩৭৬ পৃষ্ঠা দেখিবেন। বাহুল্য-ভয়ে আমরা সে সমস্ত উদ্ধৃত করিলাম না।

প্রথম হইতে সপ্তম অধ্যায় পর্য্যন্ত অন্যান্য বিবরণ সংগ্রহে কার্ত্তিকেয়চন্দ্র বাবু বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া বিরত হইতে পারিলাম না।

অষ্টম অধ্যায়ে লিখিত আছে—"৯৯৯ শকাব্দে বঙ্গদেশের রাজা আদিশূর কোন যাগের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞ সম্পাদনে এদেশস্থ ব্রাহ্মণগণকে অসমর্থ দেখিয়া, কান্যকুব্জ-রাজের নিকট প্রার্থনা করিয়া, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দড় এবং বেদগর্ভ নামে শাস্ত্রজ্ঞ সদাচারী পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন।" কোন্ প্রমাণ অবলম্বন করিয়া ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত লেখক ৯৯৯ শকাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমনকাল নির্ণয় করিলেন তাহার উল্লেখ নাই। এক শতাব্দীর প্রাচীন ব্যক্তি এ সম্বন্ধে যাহা বলিবেন তাহাই প্রামাণ্য নহে। মিনহাজ সিরাজের ন্যায় কোন একজন প্রাচীন হিন্দু যদি এরূপ লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আমরা তৎপ্রতি কোন প্রকার তর্ক আরোপণ করিতাম না। কিন্তু ক্ষিতীশ

৪ বাঙ্গলার প্রতি বন্দোবস্তে নদীয়া জমিদারির রাজস্বের হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে।

বংশাবলী চরিত হইতে দুই শতাব্দীর প্রাচীন আইন আকবরি গ্রন্থ-প্রণেতা আবুল ফাজেল যখন আদিশূরকে কিঞ্চিদুন দ্বাবিংশ শতাব্দীর প্রাচীন লিখিয়া গিয়াছেন তখন এইরূপ একখানি অভিনব গ্রন্থের লিখা তদ্বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। (৫) বিশেষতঃ যাহারা [ভ্রমসঙ্কুল কুলজি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বলেন "বৌদ্ধ পাল রাজগণের অত্যাচারে বাঙ্গালায় সদ্বিদ্যাশালী ব্রাহ্মণের অভাব হইয়াছিল বলিয়াই আদিশূর কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন।" তাঁহারাই ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতের লিখা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। পাল রাজগণের সভা সর্ব্বদা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা পূর্ণ থাকিত। যাঁহারা পাল গৌড়েশ্বরদিগের তাম্র ও প্রস্তর-ফলক সকল পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই আমাদের বাক্য সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন। আদিশূর কখনই পাল রাজগণের পরবর্ত্তী নহেন। (৬) যাহা হউক এই সকল বিষয়ে যখন মতভেদ রহিয়াছে তখন ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতকে সম্পূর্ণ দোষী করা যাইতে পারে না। কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা এইরূপ এক শতাব্দীর প্রাচীন গ্রন্থের বাক্য প্রমাণ স্বরূপও গ্রহণ করিতে পারি না।

তৎপর ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে লিখিত হইয়াছে পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে ভট্টনারায়ণ সর্ব্বপ্রধান। তিনি কান্যকুব্জান্তর্গত কোন প্রদেশের ক্ষিতীশ নামক রাজার পুত্র।" রাজার পুত্র ম্লেচ্ছ দেশে অযাজ্য যাজন করিতে আসিয়াছিল কে ইহা বিশ্বাস করিবে। মূল কথা যাজক ব্রাহ্মণের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে "মহারাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর" কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন।

তৎপর উক্ত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—"একারণে (রাজপুত্র বলিয়া) বঙ্গাধিপতি তাঁহাকে কতিপয় গ্রাম দান করিবার প্রস্তাব করিলেন।" ভট্টনারায়ণ দান গ্রহণে অসম্মত, মূল্য প্রদান পূর্ব্বক কয়েক খানি গ্রাম ক্রয় করিলেন।

---

৫ আইন আকবরি ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত হইতে প্রাচীন, কিন্তু আমরা আইন আকবরির মতানুসরণ করিতেছি না।

৬ কুলজি গ্রন্থ সমূহে লিখিত আছে আদিশূরের অনুরোধ ক্রমে কান্যকুব্জপতি বীরসিংহ বঙ্গে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। আদিশূরের সময়াবধারণ জন্য আমরা বীরসিংহের অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। আদিশূরের সম্বন্ধে যেরূপ হট্টগোল, বীরসিংহের সম্বন্ধেও তাহাই বটে। কান্যকুব্জের বহু সংখ্যক তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার এক খানিতেও "বীরসিংহ" নামটী দৃষ্টিগোচর হয় না। তাম্রশাসন ও প্রাচীন গ্রন্থাদি অবলম্বন করিয়া আমরা ৫৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কনোজের রাজ-বংশাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এই দীর্ঘকাল মধ্যে "ওরফে" শব্দ সংযোগ না করিলে কনোজ রাজাসনে একটী বীরসিংহও দৃষ্টিগোচর হয় না। আদিশূরের সম্বন্ধে আমাদিগের মত স্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইবে।

কুলজি গ্রন্থে লিখিত আছে "আদিশূর পঞ্চব্রাহ্মণকে পঞ্চগ্রাম দান করিয়াছিলেন।
পঞ্চকোটির্কামকোটির্হরিকোটিস্তথৈবচ।
কঙ্কগ্রামোবটগ্রামস্তেষাং স্থানানি পঞ্চ চ॥

"বেণীসংহার নাটকের" অবতরণিকায় ৺ মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয় লিখিয়াছেন—অথ তে বিধিনা রাজানাময়াজয়ং স্তত্র চ পরিতুষ্টেন নরপতিনা পঞ্চভ্য স্তেভঃ পঞ্চ গ্রামারস্ত্রার্থং বিশ্রাণিতাঃ। তে চ গ্রামাঃ কামকুটী—ব্রহ্মপুরী—হরিকুটী—কঙ্ক গ্রাম—বটগ্রামেত্যভিধানাস্তে চ রাঢ়জনপদেষু (৭)।"

"ভূমিদান গ্রহণ করিলে পাপস্পর্শ করে" ইহা আমরা ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতে প্রথম পাঠ করিলাম। সেই প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুরাজন্যবর্গ ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণগণ ভূমি দান গ্রহণ পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া সানন্দ চিত্তে তাহা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন শাসন-পত্রাদিতে তাহার এই রূপ বর্ণনা আছে।

ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥

লক্ষ্মণসেন-প্রদত্ত সুন্দরবনের তাম্রশাসন।
ভারতী, মাঘ, ১২৮৭ বং ৪৬২ পৃষ্ঠা।

ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥

Lakhan Sen's Copper plate found near Torpon deghi J. A. S. B. XLIV. 12.

ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ

Kesava Sena's Grant from Bakerganj. I. A. S. B. VII. 46.

ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ।

Chittagong copper plate J. A. S. B. XLIII. 323.

ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ

Copper-plate grant of Moharaja Jajati-the founder of the Kesari family of Orissa—J. A. S. B. XLVI. I. 154.

ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
তাবুভৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥

Copper plate Grant of Govinda Chandra of Kanauj—P. A. S. B. for 1876-paoe 132.

ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥

Chandel copper plate of Hanir pore Journal As. So. Bengal Vol-XLVII. Inscription No 1. page 82. No 2. page 84.

অন্যান্য শাসন-পত্রেও এই কবিতাটী উৎকীর্ণ রহিয়াছে। বাহুল্য বিবেচনায় আমরা সে সমস্তের উল্লেখ করিতে বিরত রহিলাম।

এইক্ষণ যদি তর্কস্থলে স্বীকারও করা যায় যে ভট্টনারায়ণ ক্রম পূর্ব্বক একটী ক্ষুদ্র

(৭) মতান্তরে এই সকল গ্রাম বিক্রমপুরের অন্তর্গত।

রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন; তাহা হইলে আমাদের জিজ্ঞাস্য ভট্টনারায়ণের প্রধান ও শাস্ত্রসঙ্গত রাজ্যাধিকারী—জ্যেষ্ঠপুত্র আদি-বরাহ কি কারণে রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত হইলেন। নিপু তাঁহার তৃতীয় পুত্র; তদ্বংশে রাজ্যেশ্বরগণ জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়াই কি তাঁহাদের সম্মানার্থ ভট্টনারায়ণ তাঁহাকে রাজ্যাধিকারী করিয়া গিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতের প্রথম ভাগ এইরূপ অপ্রামাণ্য ও অযৌক্তিক বাক্য সমূহ দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র বাবু এই জন্য দায়ী নহেন।

তৎপর——১ ভট্টনারায়ণ।
|
২ নিপু—|
|
৩ হলায়ুধ।

হলায়ুধ—সামান্য ব্যক্তি নহেন। তিনি "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" গ্রন্থ-প্রণেতা। উক্ত গ্রন্থের বর্ণনানুসারে—হলায়ুধ—কৈশোরে—লক্ষণ সেনের সভাপণ্ডিত, যৌবনে মন্ত্রী ও বার্দ্ধক্যে ধর্ম্মাধিকারের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ভট্টনারায়ণ আদিশূরের সমসাময়িক। তাঁহার পৌত্র হলায়ুধ লক্ষণ সেনের সমসাময়িক হইতে পারেন না। অতএবই বংশাবলী অসম্পূর্ণ বোধ হইতেছে। এ বিষয়ে সুবিখ্যাত ঠাকুরদিগের বংশাবলী সমধিক প্রত্যয়-উপযোগী। ৺ মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রকাশিত বংশাবলীর প্রথম ভাগ আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

ভট্টনারায়ণ।
|
আদিবরাহ।
|
বেণ-তব।
|
সুবুদ্ধি।
|
বাভূদীশ।
|
গয়ু।
|
গঙ্গাধর।
|
পশুপতি।
|
বীণ।
|
বনমালী। ধরণীধর
|
তারাপতি
|
নন্দরাম। গঙ্গারাম।
|
উষাপতি।
|
সুরেন্দ্র। (৮)
|

৮ সুরেন্দ্রের পঞ্চ পুত্র, যথা ১ হরিহর, ২ পদ্মনাভ, ৩ বিভাকর, ৪ গঙ্গাধর, ৫ রামরূপ।

রামরূপ। (৯)

।

হলায়ুধ।

হলায়ুধ—ভট্টনারায়ণের অধস্তন ষোড়শতম পুরুষ; ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস-উপযোগী। কিন্তু ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব গ্রন্থে হলায়ুধ অপনাকে ধনঞ্জয়ের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। অতএবই কোনও বংশাবলীর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না। ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব গ্রন্থপ্রণেতা,—ক্ষিতীশ বংশাবলী—ও ঠাকুর বংশাবলীর "হলায়ুধ" ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হইলে আমরা কোনও গোলে পতিত হই না। ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত অনুসারে হলায়ুধ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এইরূপ বংশাবলী অঙ্কিত করা যাইতে পারে।

৩। হলায়ুধ।

।

৪। হরিহর।

।

৫। কন্দর্প।

।

৬। বিশ্বম্ভর।

।

৭। নরহরি।

।

৮। নারায়ণ।

।

৯। প্রিয়ঙ্কর।

।

---

৯ রামরূপের দুই পুত্র হলায়ুধ ও রঘু।

১০। ধর্ম্মাঙ্গদ।

।

১১। তারাপতি।

।

১২। কামদেব। (১০)

।

১৩। বিশ্বনাথ।

।

১৪। রামচন্দ্র।

।

১৫। সুবুদ্ধি।

।

১৬। কংসারি।

।

১৭। ত্রিলোচন।

।

১৮। যষ্ঠিদাস।

।

১৯। কাশীনাথ। (১১)

---

১০ কামদেবের চারি পুত্র ছিল। তাহার মৃত্যুর পর ইহারা পৈতৃক রাজ্যের অংশ পাইবার জন্য কলহে প্রবৃত্ত হইল। জ্যেষ্ঠ বিশ্বনাথ রাজস্ব প্রদানে সম্মত হইলে দিল্লীশ্বর তাহাকে পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতের লিখা দ্বারা বোধ হয় ইহাঁরা তাহার পূর্ব্বে "স্বাধীন রাজা" ছিলেন।

১১ ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে লিখিত হইয়াছে—"কাশীনাথের অধিকারকালে, ত্রিপুরাধিপতির প্রেরিত কতকগুলি হস্তী তাঁহার জমিদারীর মধ্য দিয়া, দিল্লি অভিমুখে যাইতেছিল; হঠাৎ তন্মধ্যে একটী হস্তী, মত্ত হইয়া এক গ্রামে প্রবেশ পূর্ব্বক,

২০। রামচন্দ্র সমাদ্দার।

২১।ভবানন্দ। জগদীশ। হরিবল্লভ। সুবুদ্ধি।

প্রাচীন কালে বর্ত্তমান হুগলি নগরীর ৪ মাইল উত্তরে সপ্তগ্রাম নামে এক নগরী ছিল। সুবর্ণগ্রামের ন্যায় এই নগরীর বানিজ্য-খ্যাতি সমস্ত জগতে প্রচারিত হইয়াছিল। পর্টুগিজ বণিকগণ ইহাকে "পোর্টো পিকিউনো" (Port Piquens) বলিতেন। বৈদেশিক বণিকগণ এস্থান হইতে কার্পাস বস্ত্র যুনানীমণ্ডলে ও পিগু, চীন প্রভৃতি দেশে লইয়া যাইতেন। খৃষ্টাব্দের ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ ভাগে ইংলণ্ড দেশীয় সুবিখ্যাত ভ্রমণকারী রলফ্ ফিচ সপ্তগ্রাম দর্শন করিয়াছেন। সে সময়েও এই নগরীর যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। *

প্রজাপুঞ্জের যৎপরোনাস্তি ক্ষতি করিতে লাগিল। কাশীনাথ এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া, এই করীকে হত্যা করিতে আদেশ দিলেন। তদানীন্তন বঙ্গদেশের নবাবের সহিত তাঁহার অতিশয় অসরস ছিল। নবাব অনেক দিবসাবধি বৈরনির্যাতনের ছল অন্বেষণ করিতে ছিলেন, * * * এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারে শত্রুনিপাতের একটী বিলক্ষণ সুযোগ ঘটিয়াছে ভাবিয়া নানাবিধ কল্পিত দোষারোপ পূর্ব্বক সম্রাট আকবরের নিকট এই বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইলেন। (আকবর ত্রিপুরা হইতে কোনও প্রকার কর গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং "হস্তী প্রেরণ" সংবাদটী সম্পূর্ণ সত্য জ্ঞান করা যাইতে পারে না।) সম্রাট নবাবের কল্পিত বাক্যে প্রতারিত হইয়া, রোষপরবশ হইলেন এবং কাশীনাথকে বন্দীভূত করিয়া দিল্লি প্রেরণের আদেশ দিলেন। কাশীনাথ, সংবাদ পাইবা মাত্র, স্বীয় সহধর্ম্মিণী ও কতিপয় অনুচরের সহিত দক্ষিণ দিকে পলায়ন করিলেন। কিন্তু তিনি জলঙ্গী নদীর অদূরবর্ত্তী বাগোয়ান পরগণার এক ধীবরপল্লীর পরিচয় অনুসারে ধৃত হইয়া নবাব-সেনানীর হস্তে নিহত হন। মতান্তর দিল্লীর কারাগারে তাঁহার মৃত্যু হয়।"

"কাশীনাথের পত্নী সসত্বা ছিলেন। তিনি বাগোয়ানের জমিদার হরকৃষ্ণ সমাদ্দারের আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাশীনাথপত্নী যথাকালে একটী পুত্র প্রসব করিলেন। হরকৃষ্ণ অপত্যহীন ছিলেন।" সুতরাং কাশীনাথের পুত্রকে দত্তক পুত্র রূপে গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বীয় সম্পত্তি সমূহের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলেন। ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে দত্তক গ্রহণের কোন উল্লেখ নাই; কিন্তু তাহাতে লিখিত আছে—হরকৃষ্ণ সেই বালককে "স্ববংশের সমাদ্দার উপাধি ধারণ করাইলেন। এই কারণেই কাশীনাথ রায়ের পুত্র রাম সমাদ্দার নামে খ্যাত।" ইহাই আমাদের বাক্য-পোষণোপযোগী প্রবল প্রমাণ। মনুর মতে মাতা কিম্বা পিতা অন্যকে বিপদকালে পুত্র দান করিতে পারে।

মাতা পিতা বা দদ্যাতাং যমদ্ভিঃ পুত্রমাপদি।
সদৃশং প্রীতিসংযুক্তং স জ্ঞেয়ো দত্রিমঃ সুতঃ॥
মনু, ৯, ১৬৮॥

আমাদিগের বিবেচনায় নবদ্বীপ-পতিগণ ক্ষিতীশ বংশজের পরিবর্ত্তে সমাদ্দার বংশজ বলিয়া পরিচিত হওয়াই সঙ্গত।

* রেণ্ড ও ব্রোকের মানচিত্রে ও সপ্তগ্রাম উন্নত নগরী রূপেই চিত্রিত রহিয়াছে।

এই সময়ে আকবরের রাজস্ব-সচিব রাজা তোড়লমল্ল বাঙ্গালার সরকার বিভাগ করেন। তদ্দ্বারা পলাশি হইতে মণ্ডলঘাট পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ "সরকার সপ্তগ্রাম" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই সরকারে ৫৩টী পরগণা ও তাহার বার্ষিক রাজস্ব ৪১৮১১৪ টাকা লিখিত আছে। এই সরকারের এক জন শাসনকর্ত্তা সপ্তগ্রাম নগরে বাস করিত। রাম সমাদ্দারের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভবানন্দ এই শাসনকর্ত্তার কৃপায় সরকার সপ্তগ্রামের "জমানবিসেব" পদে নিযুক্ত হন। এই পদের উপাধি মজুমদার। তিনি পশ্চাৎ "কাননগুই" পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাজা মানসিংহ যৎকালে যশোহরপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন; সে সময় তিনি ভবানন্দ হইতে তৎকালোপযুক্ত যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সাত দিবস পর্য্যন্ত ভবানন্দ তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতাপাদিত্য পরাভূত হইয়া দিল্লিতে প্রেরিত হন। মানসিংহ প্রত্যুপকার স্বরূপ ভবানন্দকে ১৪টী পরগণা জমিদারি স্বরূপ প্রদান করেন। তৎপর ভবানন্দ মানসিংহের সহিত দিল্লি গমন করিয়াছিলেন। সম্রাট জাহাঁগির মানসিংহ প্রমুখাৎ সমস্ত অবস্থা শ্রবণ করিয়া সেই চতুর্দ্দশ পরগণার ফরমাণ ও ভবানন্দকে "চৌধুরী" উপাধি প্রদান করেন।

ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে লিখিত সম্রাট ভবানন্দকে জমিদারীর সহিত "রাজা" উপাধি দান করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্ত্তিকেয়চন্দ্র বাবুর প্রকাশিত ফরমাণেই এই উক্তি অসত্য প্রতিপন্ন হইতেছে।

ভবানন্দ ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে ১৪টী পরগণা প্রাপ্ত হন। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় ফরমাণ দ্বারা উখরা প্রভৃতি ৪টী পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হন। যদিচ ভবানন্দ "রাজোপাধি" প্রাপ্ত হন নাই, তথাপি আমরা তাঁহাকেই অসঙ্কুচিত ভাবে নদীয়া রাজ বংশের স্থাপয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান সেরেস্তাদার সুবিখ্যাত জেইম্স গ্রাণ্ট সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন———(১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে)—

According to prevalent tradition or authentic archives of the Khalasa Baba mund, mujnudar or temporary recorder cf the Jamma of the cercar of Hooghly, and Crory, or Zemender of the pergunah of Aukersh, is the first men of note, in his genealegecal history.

Mr. J. Pronts View of the Revenwes of Bengal.

২১। ভবানন্দ।

শ্রীকৃষ্ণ। ২২। গোপাল। গোবিন্দ।

নরেন্দ্র। রামেশ্বর। ২৩। রাঘব

২৪। রুদ্র। প্রতাপনারায়ণ।

রামচন্দ্র। ২৫ রামজীবন। রামকৃষ্ণ।

রাজারাম। কৃষ্ণরাম। ২৬ রঘুরাম। রামগোপাল

২৭। কৃষ্ণচন্দ্র।

২৮। শিবচন্দ্র।

২৯। ঈশ্বরচন্দ্র।

৩০। গিরিশচন্দ্র।

৩১। শ্রীশচন্দ্র।

৩২। সতীশচন্দ্র।

৩৩। ক্ষিতীশচন্দ্র। ১২

ক্রমশঃ।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

গোলাম-চোর।

অদৃষ্ট আমাদের জীবনের তাসে অনেক গুলির মিল রাখিয়াছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে একটা একটা করিয়া গোলাম রাখিয়া দিয়াছেন, তাহার আর মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। চির জন্ম গোলামচোর খেলিয়া আসিতেছি, কত বাজি যে খেলা হইল তাহার আর সংখ্যা নাই, খেলোয়াড়দের মধ্যে কে জাঁক করিয়া বলিতে পারে যে, সে একবারো গোলাম চোর হয় নাই? অদৃষ্টের হাতে নাকি তাস, আমরা দেখিয়া টানিতে পারি না, তাহা ছাড়া অদৃষ্টের তাস খেলায় নাকি গোলামের সংখ্যা একটি নহে, এমন অসংখ্য গোলাম আছে কাজেই সকলকেই প্রায় গোলাম-চোর হইতে হয়।

১২ সুবিখ্যাত ঠাকুরদিগের বংশাবলী অনুসারে ভট্টনারায়ণ হইতে এইক্ষণে ৩৫। ৩৬ পুরুষ হইয়াছে। মহর্ষি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহোদয় ভট্টনারায়ণ হইতে ত্রয়স্ত্রিংশ উত্তর পুরুষ। ইদানীন্তন পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ীগণ গড়ে তিন পুরুষে একশতাব্দী গণনা করেন। (Three generations to a century. Sena Rajas of Bengal By Dr. Rajendralala Mitra Journal As So Bengal Vol XXXIV. Part 1 page 130—Three generations to a century. Land Grant of Mahendra bala Dava of Kanauj By Dr. Rajendra Lala Mitra Journal As so Bengal Vol XXXIII. page 325. তদনুসারে আমাদিগের সম্পূর্ণ দুইখানি বংশাবলী মতে ভট্টনারায়ণ ১১—১২ শতাব্দীর প্রাচীন প্রতিপন্ন হইতেছেন।

আমরা সকলেই চাই,---মিলকে পাইতে ও অমিলকে তাড়াইতে। গোলাম পাইলে আমরা কোন উপায়ে গলাবাজি করিয়া চালাকী করিয়া প্রতিবেশীর হাতে চালান করিয়া দিতে চাই। উদাহরণ দেওয়া আবশ্যক। মনে কর আকাউণ্টেণ্ট জেনেরালের আপিসে গোলাম-চোর খেলা হইতেছে—যতক্ষণ হিসাবে মিল হইতেছে ততক্ষণ কোন গোলযোগ নাই।প্রথম সাহেব খেলোয়াড় যেই অমিলের গোলামটি পাইয়াছেন অমনি একহাত দুহাত করিয়া সকলের শেষ খেলোয়াড় কেরাণী বাবুটির হাতে গোলামটি চালান করিয়া দিলেন, মাঝে হইতে গরীব কেরাণী বাবুটি গোলাম-চোর হইয়া দাঁড়াইলেন। দায়িত্বের গোলামটি কেহই হাতে রাখিতে চায় না। এমন প্রতি বিষয়েই গোলাম-চোর খেলা চলিতেছে। খুব সামান্য দৃষ্টান্ত দেখ। ঘোড়ার নিলামে যাঁহারা ঘোড়া কেনেন, সকলেই জানেন, যাহার হাতে খোঁড়া ঘোড়ার গোলাম আছে, কেমন কৌশল পূর্ব্বক তোমার হাতে তাহা চালান করিয়া দেয়, যখন টানিবার উপক্রম করিয়াছ, তখন হয়ত জানিতে পার নাই গোলাম, টানিয়া চৈতন্য হইল, সেই নিলামেই গোলাম আর এক জনের হাতে চালান করিয়া দিলে। এমন দশ হাত ফিরিয়া জানি না কোন্ হতভাগা গোলাম-চোর হয়।

বাপের হাতে একটি অতি কুরূপা কন্যার গোলাম আসিয়াছে, গোলাম-দায়গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, বেহাত করিতে পারিলে বাঁচেন, হতভাগা বরের হাতে বেমালুম চালান করিয়া দিলেন, বর বেচারী শুভ দৃষ্টির সময়ে দেখিল, সে গোলাম-চোর হইয়াছে!

হোমিওপ্যাথি ডাক্তারেরা প্রায় গোলাম-চোর হন। তাঁহারাই নাকি সকলের শেষ খেলোয়াড়—এমন প্রায়ই হয়, যে,গোলাম ছাড়া আর কোন কাগজ তাঁহাদের টানিবার থাকে না, এলোপ্যাথি ডাক্তার হোমিওপ্যাথির হাতে গোলামটি সমর্পণ করিয়া বিদায় হন, তিনি গোলাম-চোর হইয়া ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরেন।

অদৃষ্টের হাত হইতে যখন তাস টানি, তখন হয়ত আমার হাতের সকল তাসগুলিই প্রায় মিলিয়া গেল, কেবল একটা বা দুইটা এমন গোলাম টানিয়া বসি যে, চিরকালের মত গোলামচোর হইয়া থাকি। মনে কর, আমার বিদ্যার তাস মিলিয়াছে, ধনের তাস মিলিয়াছে, কোথা হইতে একটা অপযশের গোলাম টানিয়া বসিয়াছি, গোলামচোর বলিয়া পাড়ায় ঢাটী পড়িয়া গিয়াছে। মনে কর, আমার ভ্রাতার তাস মিলিয়াছে বন্ধুর তাস মিলিয়াছে, কোথা হইতে একটা স্ত্রীর গোলাম টানিয়াছি, আমরণ গোলাম-চোর হইয়া কাটাইতে হইল। এইরূপ একটা না-একটা গোলাম সকলেরই হাতে আছে। তথাপি মানুষের এমনি স্বভাব, একজন গোলামচোর হইলেই নিকটবর্ত্তী খেলোয়াড়েরা হাসিয়া উঠে; তখন তাহারা ভুলিয়া যায় যে, তাহাদের হাতে, সে রঙের না হউক,অমন দশখানা অন্য রঙের গোলমা

আছে। জীবনের তাস খেলা যখন ফুরায়-ফুরায় হয়, সুখ দুঃখ, আশা ভরসার মিল অমিল সকল তাসই যখন মৃত্যু একত্র করিয়া চির কালের তরে বাক্সয় তুলে, তখন যদি প্রতি খেলোয়াড় একবার করিয়া গণিয়া দেখে, কতবার সে গোলাম চোর হইয়াছে আর কত রঙের গোলাম তাহার হাতে আসিয়াছিল, তাহা হইলেই সে বুঝিতে পারে, অন্যান্য খেলোয়াড়দের তুলনায় তাহার হার কি জিত।

আমাদের দেশের বিবাহ-প্রণালীর মত গোলাম-চোর খেলা আর নাই। প্রজাপতি তাস বিলি করিয়া দিয়াছেন। সত্য মিথ্যা জানি না, বিবাহিত বন্ধু বান্ধবের মুখে শুনিতে পাই, যে, তাসে গোলামের ভাগই অধিক। চৌধুরি হালদারের হাত হইতে তাস টানিবে; দেখিয়া টানা-পদ্ধতি নাই। চৌধুরীর হাতে যদি দুরি থাকে আর হালদারের হাতেও দুরি থাকে তবেই শুভ, নতুবা যদি গোলাম টানিয়া বসেন, তবেই সর্ব্বনাশ। আন্দাজ করিয়া টানিতে হয়, আগে থাকিতে জানিবার উপায় নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কোথায় চৌধুরী কোথায় হালদার; হালদারের হাত হইতে চৌধুরী দৈবাৎ একটা তাস টানিল, চোবট্টিটা তাসের মধ্যে হয়ত সেইটাই মিলিয়া গেল। যেই মিলিল, অমনি মিল-দম্পতি বিশ্রাম পাইল। অন্যান্য অবিবাহিত তাসেরা হাতে হাতে মিল অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল, তাহাদের আর বিরাম বিশ্রাম নাই। এই খানে সাধারণকে বিদিত করিতেছি, আমি একটি অবিবাহিত তাস আছি, আমার মিল কাহার হাতে আছে জানিতে চাই। আমার বন্ধু বান্ধবেরা আমাকে বলেন, গোলাম। বলেন, আমার মিল ত্রিজগতে নাই। যে কন্যাকর্ত্তা টানিবেন তিনি গোলামচোর হইবেন। কিন্তু, বোধ করি, তাঁহারা রহস্য করিয়া থাকেন, কথাটা সত্য নহে।

অনেক অসাবধানী এমন আল্‌গা করিয়া তাস ধরেন, তাঁহাদের হাতের কাগজ সকলেই দেখিতে পায়। পাঠকেরা যেন এমন করিয়া তাস না ধরেন। এমন অনেক বড় বড় ধনী খেলোয়াড় দেখিয়াছি, তাঁহারা এমনি আল্‌গা করিয়া তাস ধরেন যে, প্রতিবেশীরা তাঁহাদের হাত হইতে আবশ্যক মত সাতা টানে, আটা টানে, নহলা টানে, তাঁহারা মনে মনে ফুলিতে থাকেন, তবে বুঝি গোলামটাও টানিবে; তাঁহাদের হাতের কাগজ সব ফুরাইয়া যায়, কেবল গোলামটাই অবশিষ্ট থাকে।

পাঠকদের হাতে যদি গোলাম আসিয়া থাকে, চালাম করিয়া দিবার কৌশল অবগত হউন। কোন মতে মুখ-ভাবে না প্রকাশ হয়, হাতে গোলাম আছে। অনেক বড় বড় বৌসের হাতে গোলাম আসিয়া থাকে, লোকে যদি অনুপ মাত্রে জানিতে পারে যে, বৌসের হাতের কাগজে গোলাম দেখা দিয়াছে, তাহা হইলেই তাহার খেলা সাঙ্গ হয়। যে পরিবারের হাতে স্বর্ণ বরের গোলাম আছে, তাহারা যদি চারিদিকে কেতাব ছড়াইয়া রাখে, সুবক্ত বুলি বলিতে পারে, তাহা হইলে তাহারাও গোলাম

চালাইয়া দিতে পারে। তুমি আমি যদি এ সংসারে মুখের জোরে চলিয়া যাইতে পারি, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে পারি, রায় বাহাদুর হইতে পারি, তাহা হইলে আরো অনেক গোলাম চলিয়া যাইতে পারে।

একেত গোলাম-চোর হইতেই বিশেষ আপত্তি আছে, তাহাতে যদি জানিতে পারি যে, আর এক জন কৌশল করিয়া ভাঁড়াইয়া আমার হাতে গোলামটি চালান করিয়া দিয়াছেন, তাহা হইলে কিছু অপ্রস্তুত হইতে হয়। সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্রের সমালোচনা ও বিজ্ঞাপন যাঁহারা পাঠ করেন তাঁহারা ট্যাঁকের পয়সা খরচ করিয়া সহসা আবিষ্কার করেন যে, গোলামচোর হইয়াছেন। সত্য কথা বলিতে কি, অনেক পাঠক তাসের কাগজ চেনেন না, তাঁহারা অনেক সময়ে জানিতেই পারেন না যে, তাঁহারা গোলাম টানিয়াছেন। রঙ্ চঙ্ দেখিয়া তাঁহারা ভারি খুসী হন, কিন্তু যাঁহারা তাসের কাগজ চেনেন, তাঁহারা গোলামচোরকে দেখিয়া মনে মনে হাসেন।

যাহা হউক, পাঠকেরা একবার ভাবিয়া দেখুন, কতবার গোলামচোর হইয়াছেন, কত রঙের গোলাম তাঁহার হাতে আছে। প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই, কথাটা চাপিয়া রাখুন, কিন্তু প্রতিবেশী গোলামচোর হইলে তাহা লইয়া অতিরিক্ত হাস্য পরিহাস না করেন।

সঙ্গীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা।

(হর্ব্বার্ট্ স্পেন্সরের মত।)

"সঙ্গীত ও ভাব" নামক প্রবন্ধ রচনার পর হর্বার্ট্ স্পেন্সরের রচনাবলি পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম, "The Origin and Function of Music" নামক প্রবন্ধে যে সকল মত অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা আমার মতের সমর্থন করে, এবং অনেক স্থলে উভয়ের কথা এক হইয়া গিয়াছে।

স্পেন্সার সঙ্গীতের শরীরগত কারণ সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, বাঁধা কুকুর যখন দূর হইতে তাহার মনিবকে দেখে, বন্ধন-মুক্ত হইবার আশায় অল্প অল্প লেজ নাড়িতে থাকে। মনিব যতই তাহার কাছে অগ্রসর হয়, ততই সে অধিকতর লেজ নাড়িতে এবং গা দুলাইতে থাকে। মুক্ত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে মনিব তাহার শিকলে হাত দিলে এমন সে লাফালাফি আরম্ভ করে, যে, তাহার বাঁধন খোলা বিষম দায় হইয়া উঠে। অবশেষে যখন সম্পূর্ণ ছাড়া পায় তখন খুব খানিকটা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি

করিয়া তাহার আনন্দের বেগ সামলায়। এইরূপ আনন্দে বা বিষাদে বা অন্যান্য মনোবৃত্তির উদয়ে সকল প্রাণীরই মাংসপেশীতে ও অনুভব জনক স্নায়ুতে উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। মানুষেও সুখে হাসে, যন্ত্রণায় ছট ফট করে। রাগে ফুলিতে থাকে, লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া যায়। অর্থাৎ শরীরের মাংসপেশী সমূহে মনোবৃত্তির প্রভাবে তরঙ্গিত হইতে থাকে। মনোবৃত্তির অতিরিক্ত তীব্রতায় আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি বটে, কিন্তু তাহা সত্বেও সাধারণ নিয়ম স্বরূপে বলা যায় যে, শরীরের গতির সহিত হৃদয়ের বৃত্তির বিশেষ যোগ আছে। তাহা যেন হইল, কিন্তু সঙ্গীতের সহিত তাহার কি যোগ? আছে। আমাদের কণ্ঠস্বর কতকগুলি বিশেষ মাংসপেশী দ্বারা উৎপন্ন হয়; সে সকল মাংসপেশী শরীরের অন্যান্য পেশী সমূহের সঙ্গে সঙ্গে মনোভাবের উদ্রেকে সঙ্কুচিত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত আমরা যখন হাসি, তখন অধরের সমীপবর্ত্তী মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয়, এবং হাস্যের বেগ গুরুতর হইলে তৎসঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠ হইতেও একটা শব্দ বাহির হইতে থাকে। রোদনেও ঠিক সেইরূপ। এক কথায়, বিশেষ বিশেষ মনোভাব উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের নানা মাংসপেশী ও কণ্ঠের শব্দ-নিঃসারক মাংসপেশীতে উত্তেজনার আবির্ভাব হয়। মনোভাবের বিশেষত্ব ও পরিমাণ অনুসারে কণ্ঠস্থিত মাংসপেশী সমূহ সঙ্কুচিত হয়; তাহাদের বিভিন্ন প্রকারের সঙ্কোচন অনুসারে আমাদের শব্দযন্ত্র বিভিন্ন আকার ধারণ করে; এবং সেই বিভিন্ন আকার অনুসারে শব্দের বিভিন্নতা সম্পাদিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, আমাদের কণ্ঠ-নিঃসৃত বিভিন্ন স্বর বিভিন্ন মনোবৃত্তির শরীরগত বিকাশ।

আমাদের মনের ভাব বেগবান হইলে আমাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়, নহিলে অপেক্ষাকৃত মৃদু থাকে।

উত্তেজনার অবস্থায় আমাদের গলার স্বরে সুরের আমেজ আসে। সচরাচর সামান্য বিষয়ক কথোপকথনে তেমন সুর থাকে না। বেগবান মনোভাবে সুর আসিয়া পড়ে। রোষের একটা সুর আছে, খেদের একটা সুর আছে, উল্লাসের একটা সুর আছে।

সচরাচর আমরা যে স্বরে কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকি তাহাই মাঝামাঝি স্বর। সেই স্বরে কথা কহিতে আমাদের বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না। কিন্তু তাহার অপেক্ষা উঁচু বা নীচু স্বরে কথা কহিতে হইলে কণ্ঠস্থিত মাংসপেশীর বিশেষ পরিশ্রমের আবশ্যক করে। মনোভাবের বিশেষ উত্তেজনা হইলেই তবে আমরা আমাদের স্বাভাবিক মাঝামাঝি সুর ছাড়াইয়া উঠি অথবা নামি। অতএব দেখা যাইতেছে, বেগবান মনোবৃত্তির প্রভাবে আমরা আমাদের স্বাভাবিক কথাবার্ত্তার স্বরের বাহিরে যাই।

সচরাচর যখন ধীরভাবে কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকি তখন আমাদের কথার স্বর

অনেকটা একঘেয়ে হয়। সুরের উঁচু নিচু খেলায় না। মনোবৃত্তির তীব্রতা যতই বাড়ে, ততই আমাদের কথায় সুরের উঁচু নীচু খেলিতে থাকে। আমাদের গলা খুব নীচু হইতে খুব উঁচু পর্য্যন্ত উঠানাবা করিতে থাকে। কণ্ঠের সাহায্য ব্যতীত ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া দুরূহ। পাঠকেরা একবার কল্পনা করিয়া দেখুন আমরা যখন কাহারো প্রতি রাগ করিয়া বলি "এ তোমার কি রকম স্বভাব ?" "এ" শব্দটা কত উঁচু সুরে ধরি ও "স্বভাব" শব্দটায় কতটা নীচু সুরে নামিয়া আসি। ঠিক এক গ্রামের বৈলক্ষণ্য হয়।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে, সচরাচর কথাবার্ত্তার সহিত মনোবৃত্তির উত্তেজিত অবস্থার কথাবার্ত্তার ধারা স্বতন্ত্র। পাঠকেরা অবধান করিয়া দেখিবেন যে, উত্তেজিত অবস্থার কথাবার্ত্তার যে সকল লক্ষণ, সঙ্গীতেরও তাহাই লক্ষণ। সুখ দুঃখ প্রভৃতির উত্তেজনায় আমাদের কণ্ঠস্বরে যে সকল পরিবর্ত্তন হয়, সঙ্গীতে তাহারই চূড়ান্ত হয় মাত্র। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, উত্তেজিত মনোবৃত্তির অবস্থায় আমাদের কথোপকথনে স্বর উচ্চ হয়; স্বরে সুরের আভাস থাকে; সচরাচরের অপেক্ষা স্বরের সুর উঁচু অথবা নীচু হইয়া থাকে, এবং স্বরে সুরের উঁচু নীচু ক্রমাগত খেলিতে থাকে। গানের স্বরও উচ্চ, গানের সমস্তই সুর, গানের সুর সচরাচর কথোপকথনের সুর হইতে অনেকটা উঁচু অথবা নীচু হইয়া থাকে, এবং গানের সুরে উঁচুনীচু ক্রমাগত খেলাইতে থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, উত্তেজিত মনোবৃত্তির সুর সঙ্গীতে যথাসম্ভব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তীব্র সুখ দুঃখ কণ্ঠে প্রকাশের যে লক্ষণ সঙ্গীতেরও সেই লক্ষণ।

আমাদের মনোভাব গাঢ়তম তীব্রতম রূপে প্রকাশ করিবার উপায়-স্বরূপে সঙ্গীতের স্বাভাবিক উৎপত্তি। যে উপায়ে ভাব সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপে প্রকাশ করি, সেই উপায়েই আমরা ভাব সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপে অন্যের মনে নিবিষ্ট করিয়া দিতে পারি। অতএব সঙ্গীত নিজের উত্তেজনা-প্রকাশের উপায় ও পরকে উত্তেজিত করিবার উপায়।

সঙ্গীতের উপযোগিতা সম্বন্ধে স্পেন্সর বলিতেছেন—আপাততঃ মনে হয় যেন সঙ্গীত শুনিয়া যে অব্যবহিত সুখ হয়, তাহাই সাধন করা সঙ্গীতের কার্য্য। কিন্তু সচরাচর দেখা যায়, যাহাতে আমরা অব্যবহিত সুখ পাই তাহাই তাহার চরম ফল নহে। আহার করিলে ক্ষুধা-নিবৃত্তির সুখ হয় কিন্তু তাহার চরম ফল শরীর-পোষণ। মাতা স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া আত্মসুখ-সাধনের জন্য যাহা করেন তাহাতে সন্তানের মঙ্গল সাধন হয়; যশের সুখ পাইবার জন্য আমরা যাহা করি তাহাতে সমাজের নানা কার্য্য সম্পন্ন হয়; ইত্যাদি। সঙ্গীতে কি কেবল আমোদ মাত্রই হয়? অলক্ষিত কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয় না?

সকল প্রকার কথোপকথনে দুইটি উপকরণ বিদ্যমান আছে। কথা, ও যে ধরণে সেই কথা উচ্চারিত হয়, কথা ভাবের

চিহ্ন (Signs of ideas), আর ধরণ অনুভাবের চিহ্ন (Signs of feeling)। কতকগুলি বিশেষ শব্দ আমাদের ভাবকে বাহিরে প্রকাশ করে, এবং সেই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়ে যে সুখ বা দুঃখ উদয় হয়, সুরে তাহাই প্রকাশ করে। "ধরণ" বলিতে যদি সুরের বাঁকচোর উঁচুনীচু সমস্তই বুঝায় তবে বলা যায় যে, বুদ্ধি যাহা কিছু কথায় বলে, হৃদয় "ধরণ" দিয়া তাহারই টীকা করে। কথা গুলি একটা প্রস্তাব মাত্র, আর বলিবার ধরণ তাহার টীকা ও ব্যাখ্যা। সকলেই জানেন, অধিকাংশ সময়ে কথা অপেক্ষা তাহা বলিবার ধরণের উপর অধিক নির্ভর করি। অনেক সময়ে কথায় যাহা বলি, বলিবার ধরণে তাহার উল্টা বুঝায়। "বড়ই বাধিত করলে!" কথাটি বিভিন্ন সুরে উচ্চারণ করিলে কিরূপ বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে সকলেই জানেন। অতএব দেখা যাইতেছে, আমরা এক সঙ্গে দুই প্রকারের কথা কহিয়া থাকি। ভাবের ও অনুভাবের।

আমাদের কথোপকথনের এই উভয় অংশই এক সঙ্গে উন্নতি লাভ করিতেছে। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কথা বাড়িতেছে, ব্যাকরণ বিস্তৃত ও জটিল হইয়া উঠিতেছে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যে আমাদের বলিবার ধরণ পরিবর্ত্তিত ও উন্নত হইতেছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে কথা বাড়িতেছে, তাহার অর্থই এই যে, ভাব ও অনুভাব বাড়িতেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে যে, ভাব ও অনুভাব প্রকাশ করিবার উপায় সর্ব্বতোভাবে সংস্কৃত ও উন্নত হইতেছে না তাহা বলা যায় না। বলা বাহুল্য যে, অনেকগুলি উন্নত ভাব ও সূক্ষ্ম অনুভাব অসভ্যদের নাই, তাহা প্রকাশ করিবার উপকরণও তাহাদের নাই। বুদ্ধির ভাষাও যেমন উন্নত হইতে থাকে, আবেগের (emotion) ভাষাও তেমনি উন্নত হয়। এখন কথা এই, সঙ্গীত আমাদিগকে অব্যবহিত যে সুখ দেয়, তৎসঙ্গে সঙ্গে আমাদের আবেগের ভাষার (language of the emotions) পরিস্ফুটতা সাধন করিতে থাকে। আবেগের ভাষাই সঙ্গীতের মূল। সেই কারণ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া আজ ইহা এক স্বতন্ত্র বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু যেমন রসায়ন শাস্ত্র বস্তু-নির্ম্মাণ-বিদ্যা হইতে জন্ম লাভ করিয়া স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে উন্নীত হইয়াছে, ও অবশেষে বস্তু নির্ম্মাণ-বিদ্যার বিশেষ সহায়তা করিতেছে, যেমন শরীরতত্ত্ব চিকিৎসা বিদ্যা হইতে উৎপন্ন হইয়া স্বতন্ত্র শাস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে ও চিকিৎসা বিদ্যার উন্নতি সাধন করিতেছে তেমনি সঙ্গীত আবেগের ভাষা হইতে জন্মাইয়া আবেগের ভাষাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছে। সঙ্গীতের এই কার্য্য।

অনেকে হয়ত সহসা মনে করিবেন এ কার্য্য ত অতি সামান্য। কিন্তু তাহা নহে। মনুষ্য জাতির সুখ-বর্দ্ধনের পক্ষে আবেগের ভাষা, বুদ্ধির ভাষার সমান উপযোগী। কারণ সুরের বিচিত্র তরঙ্গ ভঙ্গী আমাদের

হৃদয়ের অনুভাব হইতে উৎপন্ন হয় এবং সেই অনুভাব অন্যের হৃদয়ে জাগ্রত করে। বুদ্ধি মৃত ভাষায় আপনার ভাব সকল প্রকাশ করে আর সুরের লীলা তাহাতে জীবন সঞ্চার করে। ইহার ফল হয় এই যে সেই ভাবগুলি আমরা কেবল মাত্র যে, বুঝি তাহা নহে, তাহা আমরা গ্রহণ করিতে পারি। পরস্পরের মধ্যে সমবেদনা উদ্রেক করিবার ইহাই প্রধান উপায়। সাধারণের মঙ্গল ও আমাদের নিজের সুখ এই সমবেদনার উপর এতখানি নির্ভর করে, যে, যাহাতে করিয়া আমাদের মধ্যে এই সমবেদনার বিশেষ চর্চ্চা হয় তাহা সভ্য সমাজের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক ও উপকারী। এই সমবেদনার প্রভাবেই আমরা পরের প্রতি ন্যায্য ও সদয় ব্যবহার করিয়া থাকি; এই সমবেদনার ন্যূনাধিক্যই অসভ্যদিগের নিষ্ঠুরতা ও সভ্যদিগের সার্ব্বজনীন মমতার কারণ; বন্ধুত্ব, প্রেম, পারিবারিক সুখ, সমস্তই এই সমবেদনার উপরে গঠিত। অতএব এই সমবেদনা প্রকাশ করিবার উপায় সভ্যতার পক্ষে কতখানি উপযোগী তাহা আর বলিবার আবশ্যক করে না।

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের দ্বন্দ্ব-পরায়ণ ভাব সকল অন্তর্হিত হইয়া সামাজিক ভাবের প্রাদুর্ভাব হইতেছে, কেবল মাত্র স্বার্থপর ভাব সকল দূর হইয়া পরার্থসাধক ভাবের চর্চ্চা হইতেছে। এইরূপ সামাজিক ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সভ্য জাতিদের সমবেদনার ভাব বিকশিত হইতেছে ও সেই সঙ্গে তাহাদের মধ্যে সমবেদনার ভাষাও বাড়িয়া উঠিতেছে।

অনেকগুলি উন্নততর, সূক্ষ্মতর ও জটিলতর অনুভাব অল্প সংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা কালক্রমে জনসাধারণে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, তখন আবেগের ভাষাও বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। এখন যেমন সভ্যদেশে ভাবপ্রকাশক ভাষা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ অবস্থা হইতে এমন দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে যে, অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল ভাব সকলও তাহাতে অতি পরিষ্কার রূপে প্রকাশ হইতে পারিতেছে, তেমনি আবেগের ভাষা যদিও এখনো অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, তথাপি ক্রমে এতদূর উন্নতি লাভ করিতে পারিবে যে, আমরা আমাদের হৃদয়াবেগ অতি জাজ্বল্যরূপে ও সম্পূর্ণরূপে অন্যের হৃদয়ে মুদ্রিত করিতে পারিব। সকলেই জানেন, অভদ্রদের অপেক্ষা ভদ্রলোকদের গলা অধিক মিষ্ট! এক জন অভদ্র যাহা বলে, এক জন ভদ্র ঠিক তাহাই বলিলে অপরের অপেক্ষা অনেক মিষ্ট শুনায়। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, অভদ্রের অপেক্ষা এক জন ভদ্রের অনুভাবের চর্চ্চা অধিক হইয়াছে, সুতরাং অনুভাব প্রকাশের উপায়ও তাঁহাদের সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। তাহার ঠিক সুর গুলি তাঁহারা জানেন, কণ্ঠ-স্বরেই বুঝা যায় যে তাঁহারা ভদ্র। বহুকাল হইতে তাঁহারা ভদ্রতার ঠিক সুরটি শুনিয়া আসিতেছেন, তাহাই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। অনুভাবপূর্ণ

সঙ্গীত যাঁহারা চর্চ্চা করিয়া থাকেন তাঁহাদের যে অনুভাবের ভাষা বিশেষ মার্জ্জিত ও সম্পূর্ণ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে ?

সুন্দর রাগিণী শুনিলে আমাদের হৃদয়ে যে সুখের উদ্রেক হয়, তাহার কারণ বোধ করি, অতি দূর ভবিষ্যতে উন্নত সভ্যতার অবস্থায় যে এক সুখময় অনুভাবের দিন আসিবে, সুন্দর রাগিণী তাহারই ছায়া আমাদের হৃদয়ে আনয়ন করে। এই সকল রাগিণী, যাহার উপযুক্ত অনুভাব আজ্‌কাল আমরা খুঁজিয়া পাই না, এমন সময় আসিবে যখন সচরাচর ব্যবহৃত হইতে পারিবে। আজ সুর সমষ্টি মাত্র আমাদের হৃদয়ে যে সুখ দিতেছে, উন্নত যুগে অনুভাবের সহিত মিলিয়া লোকদের তাহার দ্বিগুণ সুখ দিবে। ভাল সঙ্গীত শুনিলে আমাদের হৃদয়ে যে একটি দূর অপরিস্ফুট আদর্শ-জগৎ মায়াময়ী মরীচিকার ন্যায় প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে, ইহাই তাহার কারণ। এই ত গেল স্পেন্সরের মত।

স্পেন্সরের মতকে আর এক পা লইয়া গেলেই বুঝায় যে, এমন এক দিন আসিতেছে, যখন আমরা সঙ্গীতেই কথাবার্ত্তা কহিব। সভ্যতার যখন এতদূর উন্নতি হইবে যে, আমাদের হৃদয়ের অঙ্গহীন, রুগ্ন, মলিন বৃত্তি গুলিকে সশঙ্কিত ভাবে আর ঢাকিয়া বেড়াইতে হইবে না, তাহারা পরিপূর্ণ, সুস্থ ও সুমার্জ্জিত হইয়া উঠিবে, যখন সমবেদনার এতদূর বৃদ্ধি হইবে যে, পরস্পরের নিকট আমাদের হৃদয়ের অনুভাব সকল অসঙ্কোচে ও আনন্দে প্রকাশ করিব, তখন অনুভাব প্রকাশের চর্চ্চা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিবে, তখন সঙ্গীতই আমাদের অনুভাব প্রকাশের ভাষা হইয়া দাঁড়াইবে। মনুষ্য-সমাজের তিনটি অবস্থা আছে। সমাজের বাল্য অবস্থায় মানুষ হৃদয় আচ্ছাদন করিয়া রাখে না, তাহারা দোষকে দোষ বলিয়া জানে না; যখন দোষ গুণ বিচার করিতে শিখে অথচ বহু-কাল ক্রমাগত অসংযত স্বভাবের উপর একেবারে জয়লাভ করিতে পারে না, তখন সে আপনার হৃদয়কে নিতান্ত অনাবৃত রাখিতে লজ্জা বোধ করে; যখনি সমাজ অনাবৃত থাকিতে লজ্জা বোধ করিতে লাগিল তখন বুঝা গেল সংশোধন আরম্ভ হইয়াছে; অবশেষে যখন এই গোপন চিকিৎসার ফল এতদূর ফলিল যে, ঢাকিয়া রাখিবার আর কিছু রহিল না, তখন পুনর্ব্বার প্রকাশ করিবার কাল আইসে। আধুনিক সভ্যতার গোপন রাখিবার ভাব উত্তীর্ণ হইয়া যখন ভবিষ্যৎ সভ্যতার প্রকাশ করিবার কাল আসিবে, তখন প্রকাশের ভাষার অত্যন্ত উন্নতি হইবার কথা। অনুভাব প্রকাশের ভাষার অত্যন্ত উন্নতিই সঙ্গীত। এক জন মানুষের জীবনে তিনটি করিয়া যুগ আছে। ১ম—বাল্যকালে সে যাহা-তাহা বকিয়া থাকে, তাহার নিয়ম নাই শৃঙ্খলা নাই। ২য়—তাহার শিক্ষার কাল। এই কাল তাহার চুপ করিয়া থাকিবার কাল। প্রবাদ আছে, চুপ না করিয়া থাকিলে কথা কহিতে শিখা যায় না। এখন চুপে চুপে তাহার চরিত্র—তাহার জ্ঞান গঠিত হইতেছে, এখনো

গঠন সম্পূর্ণ হয় নাই। তখন—কথা কহিবার কাল। চুপ করিয়া সে যাহা শিখিয়াছে, এখন সে তাহাই বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার চরিত্র সংগঠিত হইয়াছে, ভাব পরিণত হইয়াছে, ভাষা সম্পূর্ণ হইয়াছে। সমাজেরও সেই তিন অবস্থা আছে। প্রথমে সে যাহা-তাহা বকে; ঈষৎ জ্ঞান হইলেই যাহা-তাহা বকিতে লজ্জা বোধ হয়। সেই সময়টা চুপচাপ করিয়া থাকে। জ্ঞান যখন সম্পূর্ণ হয় তখন তাহার সে লজ্জা দূর হয়, তখন তাহার ভাষা পরিস্ফুটতা প্রাপ্ত হয়। অনুভাব সম্বন্ধে বর্ত্তমান সভ্যতার সেই লজ্জার অবস্থা, চুপ করিয়া থাকিবার অবস্থা। এখন যাহা কথা বলে ছেলেবেলা অপেক্ষা অনেক ভাল বলে বটে, কিন্তু ঢাকিয়া বলে, যাহা মনে আসে তাহাই বলে না। কণ্ঠস্বরে যেন ইতস্ততের ভাব, সঙ্কোচের ভাব থাকে, সুতরাং পরিস্ফুটতার ভাব থাকে না। সুতরাং এখনকার অনুভাবের ভাষা ছেলেবেলাকার ভাষার অপেক্ষা অনেক ভাল বটে কিন্তু সম্পূর্ণ ভাল নহে। এমন অবস্থা আসিবে, যখন অনুভাবের ভাষা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, তখনকার ভাষা, বোধ করি, এখনকার সঙ্গীত। এখন যেমন জ্ঞান প্রকাশের স্বাধীনতা হইয়াছে, Freedom of Thought, যাহা পূর্ব্বে অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া ঠেকিত, যাহা সমাজ দমন করিয়া রাখিত, এখন তাহা সভ্যদেশে বিশিষ্টরূপে প্রচলিত হইয়াছে, এবং জ্ঞান প্রকাশের ভাষাও বিশেষ রূপে উন্নতি লাভ করিয়াছে, নিশ্চয় এমন কাল আসিবে, যখন অনুভাব প্রকাশের স্বাধীনতা হইবে, পরস্পরের মধ্যে অনুভাবের আদান প্রদানের বিশেষ রূপ চর্চ্চা হইবে ও সেই সঙ্গে আবেগের ভাষাও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে।

আমাদের দেশে সঙ্গীত এমনি শাস্ত্রগত, ব্যাকরণগত, অনুষ্ঠানগত হইয়া পড়িয়াছে, স্বাভাবিকতা হইতে এত দূরে চলিয়া গিয়াছে যে, অনুভাবের সহিত সঙ্গীতের বিচ্ছেদ হইয়াছে, কেবল কতকগুলা সুর সমষ্টির কর্দ্দম এবং রাগ রাগিণীর ছাঁচ ও কাঠাম অবশিষ্ট রহিয়াছে; সঙ্গীত একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে হৃদয় নাই, প্রাণ নাই। এইরূপ একই ছাঁচে ঢালা, অপরিবর্ত্তনশীল সঙ্গীতের জড় প্রতিমা আমাদের দেব দেবী মূর্ত্তির ন্যায় বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যে কোন গায়ক-কুম্ভকার সঙ্গীত গড়িয়াছে, প্রায় সেই একই ছাঁচে গড়িয়াছে। এই টুকু মাত্র তাহার বাহাদুরী যে, তাহার সম্মুখস্থিত আদর্শ মূর্ত্তির সহিত তাহার গঠিত প্রতিমার কিছুমাত্র তফাৎ হয় নাই; এমনি তাহার হাত দোরস্ত! মনসা, শীতলা, ওলাবিবি ও সত্যপীর প্রভৃতির ন্যায় দুই চারিটা মাত্র প্রাদেশিক ও যাবনিক মূর্ত্তি নূতন গঠিত হইয়াছে কিন্তু তাহাও প্রাণশূন্য মাটির প্রতিমা। সঙ্গীতে এতখানি প্রাণ থাকা চাই, যাহাতে সে সমাজের বয়সের সহিত বাড়িতে থাকে, সমাজের পরিবর্ত্তনের সহিত পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, সমাজের উপর

নিজের প্রভাব বিস্তৃত করিতে পারে ও তাহার উপরে সমাজের প্রভাব প্রযুক্ত হয়। সমাজ বৃক্ষের শাখায় শুদ্ধ মাত্র অলঙ্কার স্বরূপে সঙ্গীত নামে একটা সোনার ডাল বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, গাছের সহিত সে বাড়ে না, গাছের রসে সে পুষ্ট হয় না, বসন্তে তাহাতে মুকুল ধরে না, পাখীতে তাহার উপর বসিয়া গান গাহে না। গাছের আর কিছু উপকার করে না কেবল শোভা-বর্দ্ধন করে।

শোভাবর্দ্ধনের কথা যদি উঠিল তবে তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। সঙ্গীতকে যদি শুদ্ধ কেবল শিল্প, কেবল মনোহারিণী বিদ্যা বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হয় যে, আমাদের দেশীয় অনুভাব-শূন্য সঙ্গীত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। চিত্র-শিল্প দুই প্রকারের আছে। এক—অনুভাব-পূর্ণ মুখশ্রী ও প্রকৃতির অনুকৃতি, দ্বিতীয়—যথাযথ রেখা-বিন্যাস দ্বারা একটা নেত্ররঞ্জক আকৃতি নির্ম্মাণ করা। কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, প্রথমটিই উচ্চতম শ্রেণীর চিত্রবিদ্যা। আমাদের দেশে শালের উপরে, নানাবিধ কাপড়ের পাড়ে, রেখাবিন্যাস ও বর্ণবিন্যাস দ্বারা বিবিধ নয়নরঞ্জক আকৃতি সকল চিত্রিত হয়, কিন্তু শুদ্ধ তাহাতেই আমরা ইটালীয়দের ন্যায় চিত্র-শিল্পী বলিয়া বিখ্যাত হইব না। আমাদের সঙ্গীতও সেইরূপ স্বর-বিন্যাস মাত্র, যতক্ষণ আমরা তাহার মধ্যে অনুভাব না আনিতে পারিব, ততক্ষণে আমরা উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীতবিৎ বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারিব না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জাপানের বর্ত্তমান উন্নতি।

শোগুনের প্রভুত্ব বিলুপ্ত হইয়া কিরূপে সম্রাটের আধিপত্য জাপানে পুন প্রতিষ্ঠিত হইল তাহা আমরা ইতি পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। এক্ষণে সম্রাট একাধিপত্য লাভ করিয়া কিরূপে জাপানের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, কি কি বিষয়ে সংস্কার করিলেন তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য।

পূর্ব্বে সম্রাটের রাজধানী কিয়োটো নগর এবং শোগুনের রাজধানী যেদো নগর ছিল। এক্ষণে তিনি কিয়োটো নগর পরিত্যাগ করিয়া যেদো নগরেই তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিলেন। এবং যেদোর পরিবর্ত্তে তাহার নাম টৌকিয়ো রাখিলেন। টৌকিয়োর অর্থ "প্রতীচ্য রাজধানী।" ওকুবো নামে তাঁহার এক জন মন্ত্রী, সম্রাটের চির-প্রচলিত অবরোধ নিবাসের বিরুদ্ধে এবং রাজ-

ধানীর পক্ষে কিয়োটো নগরের অযোগ্যতা সম্বন্ধে সম্রাটের নিকট আবেদন করেন, সেই আবেদন পাঠ করিয়াই সম্রাটের রাজধানী পরিবর্ত্তনের সঙ্কল্প হয়। সেই আবেদনটি এই—"মধ্য যুগ হইতে বরাবর আমাদের সম্রাট জবনিকার অন্তরালে বাস করিয়া আসিয়াছেন। পৃথিবীর মৃত্তিকায় কখন তাঁহার পদক্ষেপ হয় নাই; সেই জবনিকার বাহিরে যাহা কিছু ঘটিত তাহা তাঁহার কর্ণে আসিয়া পৌঁছিত না; সম্রাটের আবাস গভীর রূপে অবরুদ্ধ থাকিত সুতরাং বহির্জ্জগতের সহিত তাহার কোন সাদৃশ্য ছিল না। কতকগুলি সম্ভ্রান্ত দরবারের লোক ছাড়া কেহই সিংহাসনের সমীপবর্ত্তী হইতে পারিত না। এ প্রথাটি ঈশ্বরের নিয়মের সম্পূর্ণ বিরোধী। উপরিতম ব্যক্তিকে মান্য করা যদিও মনুষ্যের প্রথম কর্ত্তব্য কিন্তু আবার অতিরিক্ত মান্য করিলে কর্ত্তব্যের অবহেলা হয়, এবং প্রজাগণ স্বীয় অভাব সকল তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করিতে পারে না বলিয়া রাজা প্রজার মধ্যে একটা বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। সকল যুগেই এই পাপজনক প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই ক্ষণে এই আড়ম্বর পূর্ণ আদব-কায়দা যেন পরিত্যাগ করা হয়, এবং সরলাচারিতা যেন আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়। কিয়োটো একটা সৃষ্টিছাড়া স্থান, উহা রাজধানীর অযোগ্য।" টোকিয়ো নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া সম্রাট নানা প্রকার সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। শাসন সংক্রান্ত রাজাজ্ঞা সকল সর্ব্ব সাধারণের নিকট জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত একটি রাজকীয় সংবাদ পত্র প্রকাশ করিলেন, আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়ের সংকুলান জন্য কাগজ মুদ্রা প্রস্তুত হইল এবং ইংরাজ তত্ত্বাবধানে দীপ-মন্দির (Light house) সকল নির্ম্মিত হইতে লাগিল। উপরাজাধিরাজ প্রণালী এখনও সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হয় নাই। এই প্রণালীর মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য সম্রাট এক্ষণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সাৎসুমা, খোসিউ, হিজেব, ডোসা প্রভৃতি প্রধান প্রধান সামন্ত রাজগণ একত্র হইয়া তাহাদের নিজ নিজ রাজ্য ও প্রজাদিগকে সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করিবার অনুমতি প্রার্থনায় সম্রাটের নিকট আবেদন করিলেন। ক্রমে অন্যান্য সমস্ত রাজাও তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। সম্রাট এই আবেদন গ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু সামন্ত রাজগণের সহিত প্রজাদিগের যে অব্যবহিত সম্বন্ধ-সূত্র নিবদ্ধ ছিল সেই সূত্র হঠাৎ একেবারে ছিন্ন করিলে নানা প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া তাহা নিবারণ করিবার জন্য তিনি সেই সকল সামন্ত গোষ্ঠীর নাম-সকল বজায় রাখিলেন এবং সেই সকল সামন্ত রাজের নাম "চি হাজ্জি" অর্থাৎ গোষ্ঠীপতি রাখিলেন। ঐ সকল প্রধানেরা পূর্ব্বে প্রত্যেকে তাহাদের নিজ নিজ রাজ্য হইতে যে রাজস্ব লাভ করিতেন তাহারই দশমাংশ পরিমাণ প্রত্যেকের বৃত্তি রূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। এইরূপে উপরাজাধিরাজ প্রণালী একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়া তাহার

স্থানে সম্রাটের একাধিপত্য দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল।

শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য-প্রণালীর পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া উঠিল। পূর্ব্ব প্রণালী অনুসারে সামরিকগণ (Samurai) প্রধানদিগের দাসত্বপাশে বদ্ধ ছিল—কিন্তু প্রধানদিগের স্থানিক প্রভুত্ব বিলুপ্ত হওয়ায় তাহারাও সে দাসত্ব হইতে মুক্ত হইল। সুতরাং এক্ষণে সম্পূর্ণ একটি নূতন সৈন্যদল প্রস্তুত করা আবশ্যক হইল। স্বেচ্ছা-নিরপেক্ষ সৈন্য সংগ্রহ বিধি অনুসারে ১৭ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক অবধি প্রত্যেক পুরুষকে সৈন্যদল ভুক্ত করা হইল। তাহারা নিত্য-কর্ম্মী সৈন্যদলের সহিত ৩ বৎসর, পৃথক্-সঞ্চিত (Reservo) সৈন্য দলের প্রথম বিভাগের সহিত ২ বৎসর ও তাহার দ্বিতীয় বিভাগের সহিত ২ বৎসর এবং অনিয়মিত সাধারণ (Militia) সৈন্য দলের সহিত অবশিষ্ট সময় কার্য্য করিতে বাধ্য। নিয়মিত সৈন্য শ্রেণীর মধ্যে পদ শূন্য হইলে, উপরোক্ত বহু সংখ্য লোক হইতে অভিনব সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সেই শূন্য পূরণ করা হয়।* শান্তির সময় নিয়মিত সৈন্য সংখ্যা ৩৫,৫৬০ এবং যুদ্ধের সময় ৫০,২৩০। প্রথমে ফরাসি সৈন্য-নেতাদিগের অধীনে এই জাপানী সৈন্য উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু এক্ষণে তাহারা ছাত্রদশা প্রায় অতিক্রম করিয়াছে। সম্রাটের রক্ষক-সকল অতি উৎকৃষ্ট সৈন্যদল—তাহারা প্রধানত সামুরাই শ্রেণী হইতে নির্ব্বাচিত—তাহারাই সৈন্যের শ্রেষ্ঠাংশ। সৈন্যদিগের যুরোপীয় পরিচ্ছদ। কার্য্যকালে যদিও তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক হইয়াছে কিন্তু মসম্যান বলেন পূর্ব্বকার পরিচ্ছদ উহা অপেক্ষা চিত্রবৎ সুদৃশ্য ছিল। জাপানী সৈনিকগণ প্রায়ই খর্ব্বাকৃতি। সেই জন্য কাওয়াজের সময় আঁট-সাঁট কাপড়ে তাহাদিগকে বালকের মত দেখায়—তাহাদিগের জাতীয় আলম্ব পরিচ্ছদে তাহাদিগকে ভাল দেখিতে হয়। যখন তাহারা কুচ্ করে তখন তাহারা কেমন একটু ঘেঁস্ড়িয়া ঘেঁস্ড়িয়া চলে—পূর্ব্বকার কুশিক্ষা এখনও সম্পূর্ণরূপে তাহারা অতিক্রম করিতে পারে নাই। কিন্তু যুদ্ধের সময় ও সব কিছু লক্ষ্য হয় না—সে সময় তাহারা যেরূপ উৎসাহ-ভরে সবেগে চলে (elan) সেরূপ ভাবে চলিতে যুরোপীয় সৈন্যদিগকেও দেখা যায় না।

প্রথমে তাহাদিগের ফরাসিস শিক্ষক ছিল কিন্তু জাপানী দূত যুরোপে গিয়া দেখিতে পাইল যে সৈন্য সংগঠন ও শিক্ষা বিষয়ে প্রুসীয় প্রণালী জাপানী সৈন্যের অধিক উপযোগী। সেই জন্য কোন কোন রেজিমেণ্টে ফরাসি পরিচ্ছদ, কোন কোন রেজিমেণ্টে প্রুসীয় পরিচ্ছদ দৃষ্ট হয়।—এইরূপ সঙ্কর-পরিচ্ছদ দেখিয়া যুরোপীয়গণ এক একবার হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। যুরোপের নব-উদ্ভাবিত উৎ-

* কিন্তু সামুএল মসম্যান বলেন অনিয়মিত সৈন্য দল ব্যতীত জাপানের নিয়মিত সৈন্য সংখ্যা ১৫০,০০০

কৃষ্ট অস্ত্র শস্ত্রে তাহারা সুসজ্জিত। সম্রাট নিজে জরির কাজকরা য়ুরোপীয় সেনাপতির পরিচ্ছদ সচরাচর পরিধান করিয়া থাকেন। তাঁহার চুল য়ুরোপীয়দিগের ন্যায় ছোট করিয়া ছাঁটা—এবং তাঁহার গুম্ফ ও নেপোলিয়ন ফ্যাসিয়ানের দাড়িতে তাঁহার চেহারায় সামরিক ভাব বিস্ফুরিত হয়। সম্রাটের খুল্লতাত রাজকুমার "রিতা শিয়াকোভা" প্রুসীয় রক্ষাগণ সৈনাদলের কাপ্তেন, তিনি বর্লিন নগরে গিয়া সামরিক কৌশল সকল শিক্ষা করিয়া আইসেন। সম্রাট ইহাঁকেই জাপানী সৈন্যের সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন। ইনিই প্রুসীয় প্রণালী অনুসারে সৈন্যগণকে শিক্ষিত ও সজ্জিত করিয়াছেন।

সৈন্য নিবাস ব্যতীত সামরিক বিদ্যালয় সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেখানে সৈন্যনেতা পদের উপযুক্ত করিবার জন্য পতাকাধারী সৈনিকদিগকে (ensign) শিক্ষা দেওয়া হয়। ভদ্র যুবকদিগকে, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের পুত্রদিগকেও প্রুসীয় সেনাপতিদিগের অধীন শিক্ষা দেওয়া হয়। ঠিক প্রুসীয় প্রণালী অনুসারে তাহাদিগের মধ্য হইতে কাপ্তেন, লেফ্‌টিনেন্ট এবং অন্যান্য উপনেতৃবর্গ নির্ব্বাচিত হয়। তাহাদিগের সেনাপতি এক জন জাপানী মেজর কিম্বা কর্ণেল, তাহারা জর্ম্মাণ ভাষা কিছু কিছু বুঝিতে পারে, যুদ্ধ সংক্রান্ত আদেশ সকল জর্ম্মাণ ভাষাতেই প্রদত্ত হয়। সেই মেজর কিম্বা কর্ণেল সামরিক কৌশল, দুর্গনির্ম্মাণ, কামানের ফেরা-ঘোরা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন—দুর্গস্থ প্রায় সমস্ত উপনায়কবর্গই সেই বক্তৃতায় উপস্থিত থাকেন। এক এক সময়ে প্রায় ৫০০ শ্রোতা একত্রিত হয়।

জল-যুদ্ধ বিষয়েও জাপানীরা উন্নতি সাধন করিয়াছে। য়ুরোপীয় প্রণালী অনুসারে লৌহ-আবরণ-বিশিষ্ট ক্রুপ-কামান-সুসজ্জিত সমর-পোতের সংখ্যা ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতেছে। টোকিয়ো নগরে একটি নাবিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে ২৩ জন ইংরাজ শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছে। গড়ে ৫০০ ছাত্র ইংরাজি প্রণালী অনুসারে নাবিকতা, যন্ত্র বিদ্যা ও তাহার শাখা বিদ্যা সকল "হাতে কলমে" শিক্ষা করে। ইংরাজি নাবিকতার পুস্তক সকল ব্যবহৃত হয়। গবর্ণমেণ্টের সকল প্রতিষ্ঠানেই এক্ষণে ইংরাজি ভাষার প্রাদুর্ভাব। ইংলণ্ডে নাবিক বিদ্যালয়ে যেরূপ পাঠ প্রণালী—যেরূপ অনুশাসন প্রণালী প্রচলিত তাহাই অবিকল অবলম্বিত হইয়াছে। এমন কি ইংরাজি নাবিকদিগের পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত অনুকৃত হইয়াছে। জাহাজ নির্ম্মাণের উপযোগী সামগ্রী সকল প্রস্তুত করিবার কারখানা—জাহাজ নির্ম্মাণ ও সংস্কারের স্থান সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেখানে ছোট ছোট যুদ্ধ-পোত সকল নির্ম্মিত হয়। কিন্তু বড় বড় লৌহাবৃত জাহাজ সকল ইংলণ্ড হইতে তৈরি হইয়া আইসে। তলোয়ার বেয়নেট ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তনের কামান সকল জাপানেই নির্ম্মিত

হয়—কিন্তু ১২হইতে ৩৬টনের Armstrong কামান ইংলণ্ড হইতে এবং গুরুভার ক্রুপ কামান সকল জার্ম্মাণি হইতে প্রস্তুত হইয়া আইসে। এক্ষণে বড় বড় জাপানী যুদ্ধ-জাহাজের সংখ্যা প্রায় ৩০টা—এতদ্ব্যতীত আনুসঙ্গিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা প্রকার জাহাজ আছে। এক্ষণে জাপানের যেরূপ পোত-বল তাহাতে ভীষণ পোত-বল সম্পন্ন বড় বড় য়ুরোপীয় জাতির সহিত সংগ্রাম করিতে জাপান সাহসী হইতে পারে। জাপানি নাবিকগণ অন্যান্য সামুদ্রিক জাতির ন্যায় কার্য্য-নিপুন। কিন্তু এক্ষণে যেরূপ ভারিভারি কামান লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হয় তাহাতে তাহাদিগের পক্ষে কষ্টসাধ্য বলিয়া মনে হয়। জাপানি নাবিকদিগের মধ্যে অল্প লোকই দৃষ্ট হয় যাহারা শারীরিক বলে ইংরাজি নাবিকদিগের সমকক্ষ। ইংরাজদিগের তুলনায় তাহাদিগের শরীর ক্ষুদ্র কৃশ এবং তাহারা কামান নাড়া চাড়া করিতে গিয়া শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়ে। এই জন্য ইংরাজ নাবিকদিগের অপেক্ষা তাহাদিগের মধ্যে শীঘ্র শীঘ্র হাত বদলি করিতে হয়। যাহাই হউক, তাহারা সাহস ও সমর-উৎসাহে য়ুরোপীয়গণের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যুন নহে।

রাজ বিপ্লবের পর হইতে জাপানি আইনেও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সুসংস্কৃত ব্যবস্থা-সংগ্রহ প্রথম প্রচারিত হয়। তাহার নাম "অভিনব মূল-ব্যবস্থার মুখ্য অংশ" এবং ১৮৭৩ আর একটি ব্যবস্থা-সংগ্রহ প্রচারিত হয়। তাহার নাম "মূল-গত ও শাখা-গত পরিশোধিত ব্যবস্থাবলী"। শোগুণদিগের আমলে চীন ব্যবস্থা রূপ পত্তন ভূমির উপর জাপানি আইন স্থাপিত ছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন ডেমিওদিগের কর্তৃত্বাধীনে দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে এই সকল আইনের প্রয়োগে কিছু কিছু ইতর-বিশেষ হইত। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে যে সুসংস্কৃত ব্যবস্থার প্রচার হইয়াছিল তাহাও প্রধানতঃ চীন আইনের উপর স্থাপিত। তবে দেশের পরিবর্ত্তিত অবস্থার উপযোগী করিয়া তাহার মধ্যে কতকগুলি পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহার পর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে যে ব্যবস্থা সংগ্রহ প্রচার হয় তাহাতে য়ুরোপীয় ব্যবস্থাবলীর আদর্শে আরও অনেক গুলি পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। এই সকল নূতন আইনে, অপরাধীদিগকে উৎকট শারীরিক যন্ত্রনা দিবার প্রথা ও অনেক সামান্য অপরাধে মৃত্যু দণ্ড বিধান প্রথা রহিত করিয়া দেওয়া হয়। এমন কি শারীরিক আঘাতের শাস্তি জাপানী আইন হইতে এক্ষণে প্রায় একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে তত্রস্থ কারাগারে য়ুরোপীয় নিয়মানুসারে কয়েদিদিগকে নানা প্রকার ব্যবসায় এবং চিত্র কর্ম্ম প্রভৃতি সৌখিন শিল্প কার্য্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়।

দেশের মুদ্রা প্রচলন প্রণালীতেও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যখন য়ুরোপীয় ও আমেরিকান বিদেশীয়েরা প্রথম

জাপানে প্রবেশ করে তখন জাপানীরা স্বর্ণ রৌপ্যের বিশেষ কোন তারতম্য করিত না। এক ভরি রৌপ্যের বিনিময়ে এক ভরি স্বর্ণ তাহারা অনায়াসে বিক্রয় করিত। বিদেশীয়েরা এই রূপে রূপার বদলে জাপানের প্রায় সমস্ত সোনা ফাঁকি দিয়া ক্রয় করে। কিন্তু এক্ষণে তাহাদিগের সে ভ্রম ঘুচিয়াছে। এক্ষণে তাহারা যে মুদ্রা প্রচলন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছে তাহাতে স্বর্ণকেই আর সমস্ত ধাতুর মূল্য-পরিমাপক রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং মুদ্রা-নির্ম্মাণ কারখানায় এক্ষণে স্বর্ণ মুদ্রা, রৌপ্য মুদ্রা এবং ব্রন্‌জ ধাতুর মুদ্রা সকল মুদ্রিত হয়। শোগুণের আমলে কাগজ-মুদ্রা প্রচলন প্রথা ছিল। কিন্তু প্রত্যেক ডেমিয়োর পৃথক পৃথক কাগজ মুদ্রা ছিল— প্রত্যেকের অধিকারের মধ্যেই তাহার প্রচলন ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান শাসনাধীনে একটি জাতি সাধারণ কাগজ মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছে। তাহাতে কারবার ও বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে।

জাপানের নূতন গবর্ণমেণ্ট যে প্রকার ডাক-পত্র বিতরণ প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন তাহা দেখিয়া য়ুরোপীয়েরাও অবাক হইয়াছেন। পূর্ব্বে জাতি-সাধারণ পত্র বিতরণ প্রণালী জাপানে আদৌ ছিল না। পত্র বিতরণ করা ব্যক্তি বিশেষের ব্যবসায় ছিল। ১৮৭১, খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টীয় ডাক-পত্র-বিতরণ-প্রণালী প্রথম আরম্ভ হয়, এক্ষণে তাহার অসাধারণ উন্নতি ও ব্যাপ্তি হইয়াছে। ৬৯১ ডাকঘর, তদ্ব্যতীত 124 Receiving agencies, ৮৩৬ Stamp agencies এবং ৭০৩ রাজপথস্থ ডাক-চিঠির বাকস স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৩০ লক্ষ পত্র বিতরিত হয়। এবং এই পত্র বিতরণের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। বড় বড় নগরে সামান্য পত্রের ডাক ষ্ট্যাম্পের মূল্য (½d.) এবং অবশিষ্ট সমস্ত রাজ্যের জন্য (1 d.) মূল্য। এবং পোষ্ট কার্ডে ইহার অর্দ্ধেক মূল্য ধৃত হয়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে money-order প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। এবং ডাক আফিস সংক্রান্ত Savings banks সকল স্থাপিত হয়। তাড়িত বার্ত্তাবহের তার চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়াছে। এবং বাষ্পীয় শকটের লৌহবর্ত্ম আশানুরূপ না হউক ক্রমশই বিস্তৃত হইতেছে।

নূতন শাসনাধীনে শিক্ষা বিভাগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি হইয়াছে। শোগুনদিগের আমলে অভিজাতবর্গ ও তাহাদিগের অনুচর 'সামুরাই' দিগের জন্যই রাজসরকারি পাঠশালা ও বিদ্যালয় সকল উন্মুক্ত ছিল। সওদাগর, কৃষক, দোকান্দার কারিকর, ও মজুরদিগের সন্তানেরা ঐ সকল বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে পাইত না।

কিন্তু নূতন শাসনাধীনে শিক্ষা বিষয়ক রুদ্ধ-দ্বারিতা একেবারে তিরোহিত হইল। বিদ্যাশিক্ষা রূপ মহারত্ন জাতিসাধারণের পৈতৃক সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইল। সর্ব্ব প্রথমেই শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্য একটি শিক্ষা বিষয়ক অধ্যক্ষ সমিতি

স্থাপিত হইল (Education board)। এই অধ্যক্ষ সমিতি কর্ত্তৃক বৈদেশিক ভাষা-শিক্ষালয় ও পূর্ব্বতন কংফুচীয় বিদ্যালয় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। চিকিৎসা বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় সকল এই সমিতির অব্যবহিত অধীনে আনীত হইল। বিদেশীয় ভাষা হইতে জাপানীদিগের জন্য পাঠ্য পুস্তক সকল সংগ্রহ ও অনুবাদ করিবার নিমিত্ত একটি অনুবাদ-সমিতি স্থাপিত হইল। প্রাথমিক পাঠশালা, উচ্চ-পাঠশালা এবং বিদ্যালয় সকলের পত্তন ও বন্দোবস্ত বিষয়ে অনুকূল আইন সকল জারি হইল। বৈদেশিক ভাষা শিক্ষালয়ে সরকারি ব্যয়ে শিক্ষা দিবার জন্য ভাল ভাল ছাত্র নির্ব্বাচিত করিয়া পাঠাইবার নিমিত্ত রাজ্যের উপবিভাগীয় শাসন কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রতি আদেশ প্রচারিত হইল। এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিদ্যা শিখাইবার জন্য ছাত্র দিগকে বিদেশে প্রেরিত হইতে লাগিল।

মিকাডো টোকিয়ো নগরে পাঠশালা ও উচ্চ বিদ্যালয় সকল স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়া পূর্ব্বতন ডেমিওগণকে নিজ দরবার গৃহে একত্র করিয়া জাতীয় শিক্ষা সংক্রান্ত সংস্কারের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া তাহাদিগের নিকট নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন :—

"শ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল হস্তগত করিবার নিমিত্ত আর কিছুই করিবার আবশ্যক নাই কেবল জ্ঞানকে পরিস্ফুট ও সদ্গুণ সকলকে পরিমার্জ্জিত করা আবশ্যক। আর কিছুই করিবার আবশ্যক নাই কেবল সমস্ত পৃথিবীর সভ্যতার অবস্থার প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিতে হইবে; বাস্তবিক প্রয়োজনীয় বিষয় সকলের অনুশীলন করিতে হইবে। শিক্ষার উদ্দেশে বিদেশে গমন করিতে হইবে এবং সমস্তই হাতে কলমে শিখিতে হইবে। বাড়িতে শিক্ষা করিবার বয়স যাহাদিগের অতীত হইয়াছে তাহাদিগের পক্ষে বিদেশ ভ্রমণই যথেষ্ট। দেখিয়া শুনিয়া তাহাদিগের জ্ঞান-চক্ষু প্রসারিত হইবে এবং তাহাদিগের বুদ্ধি উন্নত হইবে। আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার কোন পদ্ধতি নাই। সে কারণেও তাহাদের অনেকের মধ্যে বুদ্ধির অভাব লক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত, শিশুদিগের শিক্ষার সহিত তাহাদিগের মাতাদিগের শিক্ষার একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এ বিষয়টি নিতান্ত গুরুতর বিষয়। সেই জন্য যাহারা আপন আপন স্ত্রী, কন্যা ভগিনীগণকে সঙ্গে করিয়া বিদেশে গমন করেন, তাঁহাদিগের আচরণে তিলমাত্র আপত্তি হইতে পারে না। যেহেতু তাহারা জানিতে পারে যে বিদেশে স্ত্রী শিক্ষার উৎকৃষ্ট পত্তন ভূমী আছে এবং শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার প্রকৃত পদ্ধতি কি তাহাও তাহারা অবগত হইতে পারে। তোমরা সকলে যদি এই বিষয়ে মনোযোগ দাও এবং তোমাদের শ্রম ও অধ্যবসায়-শক্তির চালনা কর তাহা হইলে সভ্যতা পথে অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে কিছু মাত্র কঠিন হইবে না। আমরা সহজেই অর্থ ও বলের মূল পত্তন করিতে সমর্থ

হইব এবং অনায়াসেই পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত সমান-ভাবে টক্কর দিতে পারিব। অতএব তোমরা আমাদের এই সকল বাসনাকে হৃদয় মধ্যে ভাল করিয়া স্থান দাও। যাহাতে আমাদের এই মনস্কামনা পূর্ণ হয় তদ্বিষয়ে সাহায্য করিতে তোমরা প্রত্যেকে যথা সাধ্য চেষ্টা কর।"

এই অভিপ্রায় অনুসারে জাপানী শিক্ষা দান প্রণালীর প্রসর নির্দ্দেশ করিয়া একটি রাজাদেশ প্রচারিতে হইলঃ—সমস্ত দেশের শিক্ষা সংক্রান্ত বন্দবস্ত ভার একমাত্র শিক্ষা বিভাগের হস্তে থাকিবে। এবং সমস্ত জাপান দ্বীপকে সাতটি চক্রে বিভক্ত করা হইবে; সেই প্রত্যেক চক্রে এক একটি উচ্চ পাঠশালা স্থাপিত হইবে। এই সকল বিভাগে পরিদর্শক নিযুক্ত হইবে, প্রত্যেক পরিদর্শকের অধীনে ২০ কিম্বা ৩০টি করিয়া পাঠশালা নির্দ্দিষ্ট হইবে। সমস্ত প্রজা, কি অভিজাত বর্গ, কি সম্ভ্রান্তগণ, কি কৃষক, যাহারা পাঠশালায় পাঠ করিবে এই বিষয় পরিদর্শককে তাহাদিগের জানাইতে হইবে এবং কোন পরিবারের বালকেরা যদি পাঠশালায় গমন না করে তাহা হইলে পরিদর্শককে যথা রীতি তাহার কারণ জানাইতে হইবে। ছয়মাস কাল, দিনের মধ্যে ৫ঘণ্টা করিয়া পাঠের সময় নির্দ্দিষ্ট এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলি, উচ্চ, মধ্যম, প্রথম এই তিন প্রকার পাঠশালায় বিভক্ত হইবে। টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যোগ্য ব্যক্তিগণ ঐ সকল পাঠশালার শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইবে। এই প্রকার স্বদেশে শিক্ষার উৎকৃষ্ট বিধান ব্যতীত, কতকগুলি ছাত্রকে শিক্ষা দিবার জন্য সরকারি ব্যয়ে বিদেশে পাঠাইতে হইবে। এই শিক্ষা সংক্রান্ত বিধি এত শত্রী কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল যে উহা প্রচারিত হইবার ১৮ মাস পরে সাধারণ শিক্ষার প্রতিনিধি-মন্ত্রি এইরূপ বিবরণ প্রকাশ করেন যে, ১৭৯৯ অসরকারি পাঠশালা এবং ৬৬৩০ সরকারি পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল পাঠশালায় ৩৩৮৪৬৩ পুরুষ ছাত্র ও ১০৯৬৩৭ ছাত্রী—এবং উচ্চ পাঠশালায় ৩০,০০০ ছাত্র। সর্ব্বশুদ্ধ ৪৮০,০০০ ছাত্র। অর্থাৎ সমস্ত লোক সংখ্যা ধরিতে গেলে প্রতি ৬৮ ব্যক্তির মধ্যে একজন করিয়া ছাত্র। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে এই ছাত্র সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে। সমস্ত ছাত্রের সংখ্যা এক্ষণে প্রায় ৭০০,০০০। ভাষা বিদ্যালয়ে ইংরাজি জর্ম্মাণ, ফরাসিস্ রুসীয় এবং চীন ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। ইংরাজি ভাষা শিক্ষার কিছু প্রাধান্য দেখা যায়। ৪০০০ ছাত্র ফরাসিস ও জর্ম্মাণি ভাষা শিক্ষা করে—৮০০০ ছাত্র ইংরাজি শিক্ষা করে। ছাত্রেরা প্রায়ই ভদ্র, শিক্ষানুরক্ত এবং প্রফুল্ল স্বভাব। আমাদের কালেজের ছাত্রদিগের ন্যায় তাহারা অনেকে চক্ষুকে অতিরিক্তরূপে খাটাইয়া চস্‌মা পরিতে বাধ্য হইয়াছে—এবং অনেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার উৎসাহ ও উদ্বেগে আপনার স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন করিয়া থাকে—এমন কি, কেহ কেহ পাগল হইয়া যায়।

বিদ্যালয়ে কোন বিশেষ ধর্ম্মের শিক্ষা দেওয়া হয় না। ধর্ম্ম শিক্ষার ভার বুদ্ধ ও

সিন্তধর্ম্মের পুরোহিতদিগের প্রতি। এক্ষণে সিন্ত ধর্ম্মই জাপানের রাজপালিত ধর্ম্ম। উহাই জাপানের প্রাচীন ধর্ম্ম। যে সকল দেবতা সিন্ত ধর্ম্ম-পুরাণের অন্তর্গত, তাহাদের সকলের পূজা হয় না। কেবল তেন্‌-সিয়োদাই-জিন নামক এক দেবী আছেন—তিনি জাপানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—তাঁহারই পূজা হয়। কিন্তু তিনি এত উচ্চ ও শক্তিমতী যে অব্যবহিতরূপে তাঁহার উপাসনা হইতে পারে না। কামী নামক যে সকল উপদেবতা ও মানব-দেবতা আছে তাহাদিগকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হয়। ইহাদিগের মধ্যে যিনি শেষ মনুষ্য-দেবতা তিনি এক জন মনুষ্য স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহ করেন। তাঁহারা একটি মনুষ্য-পুত্র রাখিয়া যান—তাঁহার নাম "জিম্মু"—ইহাঁ হইতেই জাপানের মিকাডো-সম্রাট্ বংশ প্রসূত হইয়াছে। এই জন্যই সম্রাট সিন্তধর্ম্মাবলম্বী। প্রাচীন অভিজাতবর্গ ও মন্ত্রিবর্গের অনেকেও সিন্ত ধর্ম্মাবলম্বী—অনেকে অভিনব পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে অন্ধ হইয়া আমাদের দেশের ন্যায় সন্দেহবাদী হইয়া পড়িয়াছে—তাহারা কোন ধর্ম্মই মানে না।

অন্যান্য উন্নতির সঙ্গে জাপানী ভাষা ও সাহিত্যেরও উন্নতি হইয়াছে। Mossman বলেন পূর্ব্বাঞ্চলে যত ভাষা আছে তন্মধ্যে জাপানী ভাষার কথোপকথন শুনিতে সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট লাগে। সাধারণ লোকে যে ভাষায় কথা কহে তাহাই কেবল মিষ্ট কিন্তু উচ্চ শ্রেণী লোকেরা যে ভাষায় কথা কহে তাহা অনম্য কঠোর কদর্য্য ও গম্ভীর ভাবের। ইহাই কেতাবি ভাষা। ইহাতে চীনীয় শব্দের প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। অভিজাত বর্গ ও পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহাদের ভাষায় অধিক পরিমাণে চীনীয় শব্দ প্রয়োগ করিতে ভাল বাসিতেন। অন্যান্য পরিবর্ত্তনের ন্যায়, এই ভাষাগত রুক্ষ-স্বরিতাও ক্রমশ চলিয়া যাইতেছে, সাধারণ লোকের কথিত ভাষা সমাজে ক্রমশ পদোন্নতি লাভ করিতেছে। এই চলিত ভাষায় বিদেশীয় ভাষার পুস্তক সকল যেরূপ অনায়াসে অনুবাদিত হইতে পারিতেছে সেরূপ পূর্ব্বে হইতে পারিত না। চীনের ন্যায় জাপানের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন উপভাষা প্রচলিত নাই। সেও জাতীয় সাহিত্যের পক্ষে কম সুবিধা নহে। এক্ষণে সচরাচর কথাবার্ত্তায় ও পুস্তকে চীনীয় বাক্য সকল পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে অন্যান্য বিদেশীয় শব্দ ও ধরণ (বিশেষত ইংরাজি) প্রচলিত হইতেছে। ইংরাজিরই অধিক প্রাধান্য, কারণ বিদেশীয় দূতদিগের সহিত রাজ-কার্য্য সংক্রান্ত যে কথোপকথন হয় তাহা ইংরাজি ভাষাতেই হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত, প্রথম-পাঠ পুস্তক সকল যাহা দেশীয়দিগের জন্য প্রকাশিত হয় তাহাতে জাপানী ও চীনীয় অক্ষরের পরিবর্ত্তে রোমান অক্ষর ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এই প্রথাটি কতদূর জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি পক্ষে সহকারী তাহাতে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে।

জাপানে সপ্ত শতাব্দিতে কাগজ উদ্ভাবিত

হয়। এই কাগজ উদ্ভাবনের পর হইতে জাপানের লিখিত ভাষার প্রভুত উন্নতি হইল। য়ুরোপে মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভাবিত হইবার ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ১২০৬ খৃষ্টাব্দে জাপানে চীন প্রণালী অনুসারে মুদ্রাঙ্কন প্রথা প্রচলিত হয়। জাপানী সাহিত্যে অনেক কবিতা ও দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ আছে। এই সকল উচ্চ শ্রেণীর পুস্তক, উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাই পাঠ করে। সাধারণের পড়িবার জন্য অনেক গল্পের বই আছে। কিন্তু তাহার নীতি সেরূপ বিশুদ্ধ নহে। নীতিতত্ত্ববিদ্যা, ইতিহাস, এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পুস্তক সকল কাষ্ঠ-খোদিত রঙ্গিন চিত্র দ্বারা বিচিত্রিত। এবং তাহাদিগের অনেক শিক্ষা-সংক্রান্ত গ্রন্থ আছে। জাপানের ইতিহাসও অনেক আছে। জাপানী সাহিত্যে নাটক অধিক নাই—যাহা আছে তাহা প্রায়ই ঐতিহাসিক। অনেকগুলি নাটক কবিতা-পূর্ণ ভাষায় লিখিত এবং এক এক জায়গায় বেশ লগ্ন-মাফিক উত্তর প্রত্যুত্তর আছে। জাপানী সাহিত্যে নাটক অপেক্ষা কবিতার অধিক প্রাচুর্য্য। বড় বড় কবিতা খুব কম। ছোট ছোট কবিতা ও গীতের ভাগই অধিক। একটি খুব দুঃখের গান নিম্নে অনুবাদ করিয়া দেওয়া যাইতেছেঃ——

বাতাসে অশথ পাতা পড়িছে খসিয়া
বাতাসেতে দেবদারু উঠিছে শ্বসিয়া।
দিবসের পরে বসি রাত্রি মুদে আঁখি,
নীড়েতে বসিয়া যথা পাহাড়ের পাখী।
শ্রান্ত পদে ভ্রমিতেছি নগরে নগরে
বিজন অরণ্য দিয়া পর্ব্বতে সাগরে।
উড়িয়া গিয়াছে সেই পাখীটি আমার
খুঁজিয়া বেড়াই তারে সমস্ত সংসার॥
দিন রাত্রি চলিয়াছি—শুধু চলিয়াছি,
ভুলে যেতে ভুলিয়া গিয়াছি।
আমি যত চলিতেছি রৌদ্র বৃষ্টি বায়ে
হৃদয় আবার তত যেতেছে পিছায়ে ;
হৃদয়রে, ছাড়াছাড়ি হল তোর সাথে,
এক ভাব রহিল না তোমাতে আমাতে।
নীড় বেধেছিনু যেথা, যা রে সেই খানে,
একবার ডাক্ গিয়ে আকুল পরাণে;
কে জানে, হ'তেও পারে, সে নীড়ের কাছে
হয়ত পাখীটি মোর লুকাইয়া আছে।
কেঁদে কেঁদে বৃষ্টি জলে আমি ভ্রমিতেছি,
ভুলে যেতে ভুলিয়া গিয়েছি।
দেশের সবাই জানে কাহিনী আমার,
বলে তারা—"এত প্রেম আছেবা কাহার ?
পাখী সে পলায়ে গেছে কথাটি না বলে,
এমন ত সব পাখী উড়ে যায় চোলে।
চির দিন তারা কভু থাকে না সমান,
এমনত শত শত রয়েছে প্রমাণ।
ডাকে আর গায় আর উড়ে যায় পরে,
ইহা ছাড়া বল তারা আর কি বা করে!
পাখী গেল যার, তার এক দুঃখ আছে,
ভুলে যেতে ভুলে সে গিয়াছে।"
সারাদিন দেখি আমি, উড়িতেছে কাক,
সারা রাত শুনি আমি পেচকের ডাক।
চন্দ্র উঠে, অস্ত যায় পশ্চিম সাগরে,
পূরবে তপন উঠে, জলদের স্তরে।
পাতা ঝরে, শুভ্র রেণু উড়ে চারিধার,
বসন্ত মুকুল একি, অথবা তুষার ?

হৃদয়, বিদায় লই এবে তোর কাছে,
বিলম্ব হইয়া গেল, সময় কি আছে?
শান্ত হ' রে, এক দিন সুখী হবি তবু,
মরণ সে ভুলে যেতে ভুলেনাক' কভু।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ জাপানী ভাষায় প্রথম সংবাদ পত্র প্রকাশ করে। তাহার পর হইতে অনেক গুলির সংবাদ পত্রের বৃদ্ধি হইয়াছে। কোনটা ৩ দিন অন্তর, কোনটা ৫ দিন, অন্তর কোনটা সাত দিন অন্তর প্রকাশিত হয়। একটির নাম "বান্‌কোকু সাৎসুমা" অর্থাৎ সকল দেশের সংবাদ। "বানকোকু ওমনা" নামে মহিলাদিগের জন্য একটি বিশেষ সংবাদ পত্রও আছে। সংবাদ পত্র-সকল সাহসী ভাষায় লিখিত হওয়ায় অত্যন্ত লোক-প্রিয় হইয়াছিল—ক্রমে উৎসাহ পাইয়া তাহারা রাজসরকারের নামে স্পষ্ট নিন্দাবাদ আরম্ভ করিল। সম্রাট্ মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত একটি আইন প্রচারিত করিলেন এবং সেই আইন অনুসারে কোন কোন সম্পাদককে দণ্ডিত করিলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল লাভ হইল না। সম্রাট এক্ষণে আর একটি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন—উহার মধ্যে একটি সংবাদ পত্রকে স্বীয় আশ্রয়াধীন করিয়া তাহাকে স্বীয় মুখপাত্র করিয়া তুলিয়াছেন।

দীপ মন্দির নির্ম্মাণ, রাজপথ ও সেতুর উন্নতি সাধন, জাপানীদিগের বাণিজ্য-সাহস ও ব্যবসায় উদ্যম উত্তেজিত করিবার জন্য লৌহ কারখানা, রেশম ও কাগজের কারখানা সকল স্থাপিত করিয়া বর্ত্তমান সম্রাট জাপানের অশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। জাপানে অনেকগুলি খনি আছে—সেই সকল খনির কার্য্য য়ুরোপীয় তত্ত্বাবধানে নির্ব্বাহ হয়। তাহাতে, দেশের অনেক মজুর প্রতিপালিত হয়। যে সকল দ্রব্য বিদেশে চালান হয় তাহার মধ্যে চা ও রেশমই প্রধান। প্রতি বৎসর প্রায় ৭ কোটি টাকার বাণিজ্য হয়। জাপানের ভূমী অত্যন্ত ফলবতী, জলবায়ুও স্বাস্থ্যপ্রদ। তবে ভূমিকম্প জলপ্লাবন প্রভৃতি কতকগুলি প্রাকৃতিক উপদ্রব আছে। জাপানীদিগের প্রধান খাদ্য ভাত ও তাহারা বাঙ্গালীর ন্যায় মৎস্যপ্রিয়। অতএব দেখা যাইতেছে খাদ্যের প্রকৃতির উপর জাতীয় মহত্ব ততটা নির্ভর করে না। ইহা হইতে মৎস্যের কাঙ্গালী ভেতো বাঙ্গালীর কতকটা আশার উদ্রেক হইতে পারে। যাহা হউক এই সকল উন্নতির পরিচয় পাইয়া আমাদের বাঙ্গালী কবি কি জাপানকে এখনও "অসভ্য জাপান" বলিতে সাহসী হইবেন?

কি করিয়া এত শীঘ্র জাপানের উন্নতি হইল তাহার মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় যে রাজা হইতে সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত সকলেরই হৃদয়ে প্রগাঢ় নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতা বিদ্যমান। জাপানী ইতিহাসে অনেক সময়ে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমাদিগের ন্যায় তাহারা বাক্‌সর্ব্বস্ব দেশানুরাগী নহে। কিসে জাপানের উন্নতি হয়, কিসে সমস্ত সভ্য জাতিদিগের সহিত জাপান একাসনে উপবেশন

করিতে পারে—ইহাই জাতিসাধারণের ও সম্রাটের জপমালা। এককালে জাপান সমস্ত এসিয়ার মধ্যে যে প্রবলতম জাতি হইবে তাহার আভাস এখন হইতে দেখা যাইতেছে। চীন হয় তো সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতম জাতি হইতে পারিত। কারণ জাপান অপেক্ষা চীনের উদ্ভাবনী শক্তি অধিক। কিন্তু তাহার অভ্যুদয়ের পক্ষে অনেক গুলি প্রতিবন্ধক আছে, প্রথমতঃ এখনও চীনে রুদ্ধদ্বার নীতির প্রাদুর্ভাব। হাজার উন্নতি জনক হউক, বিদেশীয় অনুষ্ঠান কোন ক্রমেই চীনে প্রবর্ত্তিত করা হইবে না। যাহা চিরকালে চলিয়া আসিতেছে তাহাই রক্ষা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ চীন দেশ এত বৃহৎ ও তাহার বিভিন্ন প্রদেশে এত বিভিন্ন উপভাষা প্রচলিত যে সম্পূর্ণ একতার পক্ষে ব্যাঘাৎ হইতে পারে। তৃতীয়ত চীনে যে অহিফেনের বিষ প্রবেশ করিয়াছে তাহাতে জাতিসাধারণের বল বীর্য্য ক্রমেই হ্রাস হইবার কথা। জাপানীরা অহিফেন সেবন করে না ও অহিফেন বানিজ্য জাপানে রাজবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ। কিন্তু কুম্ভকর্ণের ন্যায় চীনের যদি একবার নিদ্রা ভঙ্গ হয় তাহা হইলে আসিয়ার কোন জাতিই তাহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না—এমন কি য়ুরোপকে পর্য্যন্ত সশঙ্কিত হইতে হইবে। কিন্তু সে ঘুম শীঘ্র ভাঙ্গিবার নহে। তাহাতে আবার অহিফেন রূপ ঘুম পাড়াইবার ঔষধ তাহারা অপর্য্যাপ্ত ব্যবহার করিত আরম্ভ করিয়াছে। অতএব চারি দিককার যেরূপ ভাব গতিক ও সূচনা দেখা যাইতেছে, তাহাতে বলা যাইতে পারে যে এক সময়ে জাপানীরা ইংলণ্ডের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে অধিষ্ঠিত হইয়া সমস্ত এসিয়ার অদৃষ্ট নিয়মিত করিবে—কে বলিতে পারে হয় তো আমরা চিরপরাধীন ভারতবাসী কোন্ দিন আবার জাপানের কর-কবলে পতিত হইব!

সুখের বিলাপ।

অবশ নয়ন নিমীলিয়া,
সুখ কহে নিশ্বাস ফেলিয়া—
"নিতান্ত একেলা আমি,
কেহ—কেহ—কেহ নাই হেথা,
কেহ—কেহ—কেহ নাই মোর!
এমন জোছনা সুমধুর,

বাঁশরী বাজিছে দূর—দূর;
যামিনীর হসিত নয়নে
লেগেছে মৃদুল ঘুম-ঘোর।
নদীতে উঠেছে মৃদু ঢেউ;
গাছেতে নড়িছে মৃদু পাতা;
লতায় ফুটিয়া ফুল দুটি
পাতায় লুকায় তার মাথা;
মলয় সুদূর বন-ভূমে
কাঁপায়ে গাছের ছায়া গুলি,
লাজুক ফুলের মুখ হ'তে
ঘোমটা দিতেছে খুলি খুলি।
এমন মধুর রজনীতে
একেলা রয়েছি বসিয়া,
যামিনীর হৃদয় হইতে
জোছনা পড়িছে খসিয়া!"
হৃদয়ে একেলা শুয়ে শুয়ে
সুখ শুধু এই গান গায়,——
"নিতান্ত একেলা আমি যে,
কেহ—কেহ—কেহ নাই হায়!"
আমি তারে শুধাইনু গিয়া—
"কেন, সুখ, কার্ কর' আশা?"
সুখ শুধু কাঁদিয়া কহিল—
"ভাল বাসা—ভাল বাসা গো!
"সকলি—সকলি হেথা আছে,
কুসুম ফুটেছে গাছে গাছে,
আকাশে তারকা রাশি রাশি,
জোছনা ঘুমায় হাসি হাসি,
সকলি—সকলি হেথা আছে,
সেই শুধু—সেই শুধু নাই,
ভালবাসা নাই শুধু কাছে!
নিতান্তই একেলা ফেলিয়া
ভালবাসা, গেলি কি চলিয়া?
আবার কি দেখা হবে রে?
আর কি রে ফিরিয়া আসিবি?
আর কি রে হৃদয়ে বসিবি?
উভয়ে উভের মুখ চেয়ে
আবার কাঁদিব কবে রে?
অভিমান ক'রে মোর পরে
দুখেরে কি করিলি বরণ?
তারি বুকে মাথা রেখে করিলি শয়ন?
তারি গলে দিলি মালা?
তারি হাতে দিলি হাত?
সতত ছায়ার মত
রহিলি কি তারি সাথ?
তাই আমি কুসুম-কাননে
নিতান্ত একেলা বসি রে,
জোছনা হাসিয়া কাঁদিতেছে
সুখের নিশির শিশিরে!"
অবশ নয়ন নিমীলিয়া
সুখ কহে নিশ্বাস ফেলিয়া——
"এই তটিনীর ধারে, এই শুভ্র জোছনায়,
এই কুসুমিত বনে, এই বসন্তের বায়,
কেহ মোর নাই একেবারে,
তাই সাধ গেছে কাঁদিবারে।

আজি এ গভীর রজনীতে—
জোছনা-মগন নীরবতা,
সুদূর বাঁশির মৃদু স্বর
মলয়ের কানে কানে কথা,
সহসা জাগায়ে দিল মোরে,
চমকি চাহিনু ঘুম-ঘোরে,

ভালবাসা সে আমার নাই,
চারি দিকে শূন্য এই ঠাঁই;
ঘুমায়ে ছিলাম, ভাল ছিনু,
জাগিয়া একি এ নিরখিনু;
দেখিনু, নিতান্ত একা আমি,
কেহ মোর নাই একেবারে!
তাই সাধ গেছে কাঁদিবারে!
তাই সাধ যায় মনে মনে—
মিশাব' এ যামিনীর সনে,
কিছুই রবে না আর প্রাতে,
শিশির রহিবে পাতে পাতে!
সাধ যায় মেঘটির মত,
কাঁদিয়া মরিয়া গিয়া আজি
অশ্রুজলে হই পরিণত!"
সুখ বলে—"এ জন্ম ঘুচায়ে
সাধ যায় হইতে বিষাদ!"
"কেন সুখ, কেন হেন সাধ?"
"নিতান্ত একা যে আমি গো—
কেহ যে—কেহ যে—নাই মোর!"
"সুখ, কারে চায় প্রাণ তোর?
সুখ, কার করিস্ রে আশা?"
সুখ শুধু কেঁদে কেঁদে বলে
"ভালব সা—ভালবাসা গো!"

জাতীয়তার নিবেদন।

"জাতীয়তা ও বিজাতীয়তার উপদ্রব" নামক প্রবন্ধের লেখক গত মাসে ভারতীর গয়ায় "জাতীয়তা" নামক একটা ভূতের পিণ্ডদান করিয়াছেন। কিন্তু এই উপায়েই যে, তিনি এই ভূতের উপদ্রব হইতে নিস্তার পাইবেন, এমন মনে না করেন। ভূত একটা যুক্তির কিল তুলিয়া উপস্থিত হইয়াছে; সামলান্।

লেখক মহাশয়ের কথা এই—জাতীয়তা-গ্রস্তেরা আহার পরিচ্ছদ প্রভৃতি কতকগুলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহ্য অনুষ্ঠান লইয়াই ঘোরতর আন্দোলন করিয়া থাকেন। আর তাঁহাদের আন্দোলন করিবার পদ্ধতিও অপূর্ব্ব। ভাত ছাড়িয়া তুমি মাংস খাইলে মাংস খাওয়ার বিরুদ্ধে তাঁহারা এই এক ন্যায়-শাস্ত্র ছাড়া যুক্তি দেখাইবেন যে, "তোমার পিতামহ যদি মাংস না খাইয়া থাকেন তবে তুমি কেন খাইবে?"

জ্ঞান অনেক দূরের বস্তু দেখিতে পায়, অনুরাগের দৃষ্টি অনেকটা কাছাকাছির জিনিষ দেখে। অনুরাগের দৃষ্টির বিশেষ গুণ এই যে, সে ছোট ছোট জিনিষকে অতিস্পষ্ট ও বড় করিয়া দেখিতে পায়। অনুরাগ প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করিয়া দেখিতে পায়, জ্ঞান অনেককে একত্র করিয়া দেখে। আমাদের লেখক মহাশয়

বঙ্গসমাজের প্রতি জ্ঞানের দূরবীন্ কসিয়াছেন, দূর ভবিষ্যতে কিসে কি হইতে পারে তাহারই প্রতি তাঁহার দৃষ্টি, দূরদেশে কি কি ভাল জিনিষ আছে, তাহা তাঁহার নজরে পড়ে। একবার অনুরাগের অণুবীক্ষণ কসিয়া যদি দেখেন, তবে কাছাকাছির অনেক জিনিষ, এমন কি, কাপড়টা চোপড়টা পর্য্যন্ত বড় করিয়া তাঁহার চোখে পড়িবে। কেবল মাত্র উপযোগিতার চক্ষে ঘরের জিনিষ দেখা ঘরের লোকের পক্ষে সকল সময়ে ভাল নহে। সঙ্গে সঙ্গে অনুরাগের দৃষ্টিও থাকা চাই। নহিলে অত্যন্ত হৃদয়-হীনতা প্রকাশ করা হয়। একটা চূড়ান্ত সীমার দৃষ্টান্ত দেখান যাউক। স্ত্রী সংসারের পক্ষে নিতান্ত উপযোগী। কিন্তু যে ব্যক্তি স্ত্রীকে অনুরাগ-শূন্য উপযোগিতার চক্ষে দেখে, বয়স বশতঃ বা রোগ বশতঃ স্ত্রীর উপযোগিতা দূর হইলে বা কমিলে অনুরাগের অনুরোধ না শুনিয়া যে ব্যক্তি সে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহাকে আমরা বিশেষ প্রশংসা করিব না।

অদৃশ্য, অলক্ষিত ও ধীরগতি বড় বড় ভাবের পরিবর্ত্তন সাধারণতঃ লোকের চোখে পড়ে না, তাহার উপরে লোকের ততটা হাতও নাই। তাহা ছাড়া, সময়ের কাঁধে চড়িয়া, বাতাসের সঙ্গে মিশাইয়া, নূতন নূতন ভাব গুলি এমনি পা টিপিয়া সমাজের ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে থাকে যে, প্রায় সকলেরই মনে এক সময়ে না এক সময়ে প্রবেশ করেই। ভাবের পরিবর্ত্তন যখন সমাজে আরম্ভ হয়, তখন অল্প হউক, অধিক হউক, সকলেরই মনে তাহার প্রভাব লক্ষিত হয়। যদি মাঝে মাঝে দুই একজন সকলকে ছাড়াইয়া না ওঠে, তাহা হইলে পরিবর্ত্তন হইল কি না হইল কাহারো নজরেই পড়ে না। বাহিরের একটু কিছু পরিবর্ত্তন হইলেই সকলের চোখে আসে, মনে আঘাত লাগে। ভাব পরিবর্ত্তনের জন্য তুমি তেমন দায়ী নও, তাহা তোমার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ, কিন্তু বস্ত্র পরিবর্ত্তনের জন্য তুমি সম্পূর্ণ দায়ী, তাহা তোমার ইচ্ছা ব্যতীত হইতে পারিত না।

কথাটা সত্য যে, জাতীয়তা-গ্রস্ত লোকেরা পরিবর্ত্তনের বাহ্য খুঁটিনাটি লইয়াই অধিক হাঙ্গামা করিয়া থাকেন, কিন্তু কেন যে তাহা করেন তাহা কি কেহ দেখিবে না? ছেলেবেলা হইতে যাঁহাদের যাঁহাদের তাঁহারা ভাল বাসিয়া আসিতেছেন, যাঁহাদের ভাষা তাঁহারা বুঝিতে পারেন ও যাঁহারা তাঁহাদের ভাষা বুঝে, যাঁহারা তাঁহাদের কোন কাজ কোন কথা কখনো ভুল বুঝেন না, যাঁহাদের প্রতি কাজ প্রতি কথার ঠিক মর্ম্মটি তাঁহারা বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের সকলকেই একপ্রকার বিশেষ কাপড় পরিতে ও বিশেষ বিশেষ আচার অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়াছেন, সেই সকল কাপড় ও আচার ব্যবহার প্রিয়জনদের ভাবের সহিত তাঁহাদের মনে এমন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, যে, উভয়ই একত্রে তাঁহাদের হৃদয়ে বাস করে। প্রিয়জন মনে পড়িলেই সেই সকল বস্ত্র ও আচার ব্যবহার

তাঁহাদের মনে পড়ে। সেই সকল আচার ব্যবহার ও পরিচ্ছদ সমূহ কেবলমাত্র তাঁহাদের উপযোগী নহে, তাহা তাঁহাদের অনুরাগের সামগ্রী। তাঁহাদের আপনার লোকেরা সেই সকল কাপড় পরে ও সেই সকল আচার অনুষ্ঠান করে। সেই সকল আচার ব্যবহার ও বস্ত্র যদি কেহ পরিবর্ত্তন করে, তবে সে যে-কোন যুক্তি দেখাক্ না কেন, আমরা, অর্থাৎ জাতীয় লোকেরা, তাহাকে বলি "তুমি ইহা যদি করিতে পার,' তবে কি না করিতে পার! তবে খুনও করিতে পার'।" অর্থাৎ "তোমার সহৃদয়তা এতই অল্প।" অনুরাগ সকল সময়ে যুক্তি খুঁজিয়া পায় না। তাহার মনের মধ্যে যাহা থাকে তাহা এমন জাগরুক থাকে যে, সে ভাবিয়া পায় না, ইহার আবার প্রমাণ কি দেখাইতে হইবে! এই জন্য অনুরাগের কথা গুলা অনেক সময় অযৌক্তিক শুনায় কিন্তু তাই বলিয়া যে, সকল সময় ভুল হয় তাহা নহে।

কাপড় চোপড় ও ছোট খাট আচার ব্যবহারের অনুভাব-মূলক একটি উপযোগিতাও আছে, ইহাতে শ্রেণীবিশেষের লোকদের অনুরাগের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখে। আমি একজন বাঙ্গালী দূরদেশে বাস করি। আমি যদি পথে কোন বাঙ্গালী পরিচ্ছদধারী ও বাঙ্গালা-ভাষীকে দেখি, তবে তৎক্ষণাৎ চুম্বকের ন্যায় তাহার প্রতি ধাবিত হই। আমি তাহার মনের ভাবও দেখিতে পাই না, কিছুই না, আমি কেবল তাহার বাহিরের কতকগুলি আনুসঙ্গিক দেখিতে পাই। আমাদের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে,—স্বজাতিস্থ লোকের নিকটে সমবেদনা পাইবার অভিলাষ। যদি তুমি বাঙ্গালীর বাহ্য বিশেষত্বের পরিবর্ত্তন কর, তবে সেই সমবেদনা পাইবার ব্যাঘাত ঘটে। দেশের লোকের সমবেদনা চাই না, এমন একটা ভাব যদি কাহারো মনে আসে, তবে তাঁহার মনের সে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সমীপবর্ত্তী স্বজাতির লোকের সমবেদনা পাওয়ার একটা উপযোগিতা আছে, কিন্তু সে উপযোগিতার কথা ছাড়িয়া দিলাম। মনে কর ক এমন একজন অসাধারণ লোক যে, স্বজাতির সহায়তা ও সমবেদনা না পাইলেও তাঁহার সহজে চলিয়া যায়, কিন্তু তাহাই বলিয়া "সমবেদনা চাই না" এমন একটা কঠোর হৃদয়-ভাব কোন মতেই প্রার্থনীয় নহে। হইতে পারে, প্রথমে যাহা উপযোগিতা সাধন করে, অবশেষে তাহাই অনুরাগের সামগ্রী হয়, কিন্তু যখন অনুরাগ বলিয়া একটি স্বতন্ত্র পদার্থ জন্মিল, তখন হিসাবের মধ্যে সেটাকেও আনা উচিত। বীজ হইতে যখন ভিন্ন-আকার বিশিষ্ট একটা বৃক্ষ জন্মিল, তখন জগতের হিসাবের খাতায় কেবল বীজকে ধরিলে ও বৃক্ষকে বাদ দিলে চলিবে না। একটা প্রচলিত বস্ত্র বা আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তন করিবার সময় কেবলমাত্র সুবিধা অসুবিধা ধরিলে চলিবে না, সেই সঙ্গে অনুরাগ কি বলে তাহাও শুনিবে। অনুরাগ বলিতে অনেক কথা বুঝায়—১ম, যে বস্ত্রখণ্ড ছাড়িতে যাইতেছ

তাহার উপর তোমার অনুরাগ। ২য়, স্বজাতির প্রতি তোমার অনুরাগ। ৩য়, সেই বস্ত্র খণ্ডের প্রতি তোমার স্বজাতির অনুরাগ।

যখন আমি দেখি, একজন স্বজাতি-প্রচলিত বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়াছে, তখনই আমার মনে হয় যে, "এ ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে স্বজাতিকে একটি বিশেষ বস্ত্র পরিতে দেখিয়া আসিতেছে, প্রিয়জনদের, পরিজনদের সেই বস্ত্র পরিতে দেখিয়া আসিতেছে, নিজে বহুকাল ধরিয়া সেই বস্ত্র পরিয়াছে, আজ ইহার, না জানি, কি সর্ব্বনাশ-জনক অসুবিধা ঘটিয়াছিল যে, সেই বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছে।" অতখানি অসুবিধা যে তাহার সত্যই ঘটিয়াছিল ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। সুতরাং মনে করি যে, এ ব্যক্তির হৃদয়ের এমন অভাব, পুরাতনের প্রতি এত অল্প অনুরাগ যে, স্বচ্ছন্দে আজ সামান্য কারণ ঘটিতেই অমনি বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছে। না হয়, ঢিলা বস্ত্র পরিয়া তোমাকে একটু বিশেষ সাবধানে কাজ করিতে হইত, তাহা বলিয়াই-কি একেবারে সেটা পরিত্যাগ করা উচিত হয়? তোমার উদ্যম বাড়িয়াছে, আলস্য ঘুচিয়াছে, ভালই হইয়াছে! আলস্য বাঙ্গালীর ভাব বলিয়া আলস্যের উপর যে আমার অনুরাগ জন্মিয়াছে, তাহা নহে; আমার মনে হয়, এই ধুতি পরিয়াই কাজ চলে। না যদি হয়, মালকোচা মারিয়া পর। অর্থাৎ জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া পরিবর্ত্তন কর। কেবল মাত্র সুবিধা অসুবিধার কথা শুনিয়াই যদি পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তাহা হইলে কিছুমাত্র বিচার না করিয়া যাহাতে সুবিধা হয়, তাহাই পরা উচিত। কিন্তু অনুরাগের কথাও ত অবহেলা করা উচিত নহে। সুতরাং জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া পরিবর্ত্তন করিলে দুইজন মন্ত্রীরই মন রাখা হয়।

অতএব জাতীয়-ভাবোন্মত্তগণ যে, সামান্য বাহিরের অনুষ্ঠান সমূহ লইয়াই নাড়াচাড়া করেন, তাহার কারণ দেখাইলাম। সে কারণ যে নিতান্ত অযৌক্তিক ও অন্ধ নহে, তাহাও বোধ করি প্রমাণ হইয়াছে। উপযোগী বোধ করিলেই যে, আর সমস্ত বাধা বিঘ্ন উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বজাতি-অনুরাগের কাতর অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া পরিবর্ত্তন সাধন করিতেই হইবে, তাহার অনৌচিত্য প্রমাণ করা হইয়াছে।

যেখানে লেখক মহাশয় বিজাতীয় হনুমান গুলাকে যষ্টি হস্তে তাড়া করিয়া গিয়াছেন, সেই খানেই প্রমাণ হইয়াছে যে, লেখক মহাশয়ের স্কন্ধেও যে জাতীয়তার ভূত চাপে নাই, এমন নহে। তিনি বলিতেছেন যে, ইঙ্গবঙ্গেরা সুবিধা অসুবিধা না বুঝিয়া এক মাত্র অসার জাঁকের ভাব চরিতার্থ করিবার জন্যই, কেবল মাত্র অর্থহীন অনুকরণের জন্যই অনুকরণ করিয়া থাকেন। এমন হইতে পারে, লেখক মহাশয়ের স্বাভাবিক জাতীয় ভাবের চক্ষে ইঙ্গবঙ্গদের অতিরিক্ত বিদেশীয় পরিবর্ত্তন এত খারাপ লাগে যে, অসার জাঁকজমক ছাড়া তিনি তাহার আর কোন উদ্দেশ্য দেখিতে পান না। তিনি মনেই

করিতে পারেন না, এতখানি পরিবর্ত্তনের কি উপযোগিতা হইতে পারে! হয়ত ইঙ্গ-বঙ্গদের জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা একটা-না-একটা উপযোগিতা দেখাইতে পারিবেন। মনে করুন, ইংরাজি-কাপড়-পরা। শুদ্ধ মাত্র ইংরাজ সাজিয়া জাঁক করা যে তাহার উদ্দেশ্য, তাহা নাও হইতে পারে। ইংরাজি বস্ত্র তাঁহাদের জীবিকার সাহায্য করে। একজন ব্যারিষ্টরের কেবল মাত্র আদালতেই বিলাতীবস্ত্র পরা যে আবশ্যক তাহা নহে! বাড়িতেও পরিয়া থাকা অনেক কারণে প্রয়োজনীয়। বাঙ্গালী মক্কেলগণ তাঁহার ইংরাজী কাপড়ের চটক না দেখিলে বিশ্বাস করিতেই পারেন না যে, একজন ধুতি চাদর-পরা ভেতো ব্যারিস্টর ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে দাঁড়াইয়া খুব দুই চারিটা ইংরাজি বোল শুনাইয়া দিতে পারিবে। তাহা ব্যতীত আমাদের দেশে ইংরাজি বস্ত্র পরা অনেক বিষয়ে সুবিধাজনক। সাধারণতঃ লোকে ভয় ও মান্য করে; স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলে, রেলোয়েতেই হউক্ বা অন্য কোথাও হউক, কেহ তাঁহার সঙ্গিনীকে অমান্য বা অপমান করিতে সাহস করে না, কেহ তাঁহার সঙ্গিনীর প্রতি নিতান্ত অবাক হইয়া হাঁ করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে না। রেলোয়ের কর্ম্মচারীরা তৃষ্ণা পাইলে জল দিতে দেরী করে না, অন্ধকার হইলে আলো দিতে অবহেলা করে না. বিজনতা প্রিয় নেটিব-বিদ্বেষী য়ুরোপীয়ের অনুরোধে তাঁহাকে এক গাড়ি হইতে আর এক গাড়িতে পাঠায় না। এক কথায়, আমাদের দেশের "Struggle for Existence"-এর পক্ষে ইংরাজি বস্ত্র দেশীয় বস্ত্র অপেক্ষা অনেক উপযোগী; বিলাতী আচার ব্যবহার অবলম্বন করাও সেইরূপ। তবে ইহার বিরুদ্ধে তাঁহার আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে? দেশীয়দের পক্ষে ইংরাজি আচার ব্যবহার অবলম্বন করার বিরুদ্ধে কোন্ অস্ত্র ক্ষেপন করিবেন? তাঁহার উপযোগিতার ব্রহ্মাস্ত্র এখানে কোন কাজে দেখিবে না। কিন্তু আমাদের অস্ত্র ফুরায় নি। আমরা আমাদের জাতীয় ভাব লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিব। তাঁহাকে বলিব, "তুমি যদি এতদূর পর্য্যন্ত করিতে পার, তবে সকলি করিতে পার! তোমার সহৃদয়তা এতই অল্প! অতীতের বন্ধন, অনুরাগের বন্ধন তুমি এত অবলীলাক্রমে ছিঁড়িতে পার।"

নিমন্ত্রণ-সভা।

দশ জনে একত্রে মিলিত হইবার অনুষ্ঠান আমাদের নাই। আমাদের সামাজিক ভাব এতই অল্প, যে, সম্মিলনের মূল্য আমরা বুঝিনা। অনেক লোক একত্র

হইলে সেই একত্র হওয়ার জন্যই যে আমোদ, শুদ্ধ পরস্পরের সহিত আলাপ পরিচয়, কথাবার্ত্তা কহিবার যে সুখ, তাহা আমরা ভাল করিয়া উপভোগ করিতেই পারি না। আমরা আলাপ পরিচয়, আমোদ প্রমোদ, হাস্য পরিহাস করিতে নিমন্ত্রণ সভায় যাই না, আহার করিতে যাওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য। নিরাহার নিমন্ত্রণ আমাদের কানে অত্যন্ত হাস্যজনক, ঘৃণাজনক বলিয়া ঠেকে। নিমন্ত্রণের আর এক অর্থই—পরের বাড়িতে গিয়া আহার করা। "নিমন্ত্রণ" বলিলেই আহার করা ভিন্ন আর কোন ভাব আমাদের মনে আসে না। ঘণ্টা দুই ধরিয়া কতকগুলা গোল, চৌকোনা, চেপ্টা, লম্বা, চৌড়া, তরল, কঠিন পদার্থ উদরের মধ্যে বোঝাই করাকেই কি আমরা শ্রেষ্ঠতম সুখ মনে করি না? একেত আমরা শুদ্ধ কেবল সম্মিলনের উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করি না, বিবাহ উপলক্ষে, পূজা উপলক্ষে, ও অন্যান্য ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষে করিয়া থাকি, তাহাতে আবার নিমন্ত্রণ করি কি উদ্দেশ্যে? না, শুদ্ধ কেবল আহারের উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ আমরা ভাবিয়া পাই না, যে, শুদ্ধ কেবল বিশ ত্রিশ জন লোক মিলিয়া, ঘণ্টা দুই ধরিয়া কথা বার্ত্তা কহিয়া যে যাহার বাড়ি ফিরিয়া গেল, এ পাগলা গারদ ভিন্ন অন্য কোথাও সম্ভবে? মনে কর, নিজের বাড়ি হইতে পরের বাড়ি যাইতে হইলে আমাদের কি কম হাঙ্গামা করিতে হয়? ধুতির কোঁচাটা চাদরের কাজ করিতেছিল, সেটাকে তাহার যথা-কাজে নিয়োগ করিয়া আবার একটা চাদর বাহির করিতে হয়, জুতা পরিতে হয়, জামা পরিতে হয়, তাহা ছাড়া আবার যাতায়াতের হাঙ্গামা আছে। এত পরিশ্রম বাঙ্গালী করিতে রাজি আছে, যদি কিঞ্চিৎ আহার পায়। নহিলে বাড়িতে তাঁহার এমনি কি শয্যাকণ্টক উপস্থিত হইয়াছে যে, তাঁহার তাকিয়া ত্যাগ করিয়া, হাই-তোলা কাজ কামাই করিয়া, পরের বাড়িতে বাজে কথা কহিতে যাইবেন? যাহা হউক, দশটা বাঙ্গালীকে একত্রে জড় করিবার প্রধান উপায় আহারের লোভ দেখান, বাঙ্গালীদের অপেক্ষা আরও অনেক ইতর প্রাণীকেও ঐ উপায়ে একত্রিত করা যায়।

একেত আহারের সময়ে ব্রাহ্মণদের কথোপকথন নিষেধ, তাহাতে নিষেধ সত্ত্বেও যদি বা কথোপকথন চলে, তবে সে লুচিগত, সন্দেশগত, রসগোল্লাগত কথোপকথনে সুরুচিবান্ ব্যক্তিদের বড়ই বিরক্তি বোধ হয়। আহারের সময়ে আহারটাই নিমন্ত্রিত বর্গের মনে সর্ব্বাপেক্ষা জাগরূক থাকে, সে সময় যে কথোপকথন নির্ম্মিত হইতে থাকে, তাহার ভিত্তি উদর, তাহার ইষ্টক সন্দেশ, তাহার কড়িকাঠ পানতোয়া, ও তাহার ছাদ লুচির রাশি। নিমন্ত্রণকারীর বাড়িতে যাওয়া, আহারটি করা ও পান চিবাইতে চিবাইতে বাড়িতে ফিরিয়া আসা নিমন্ত্রিতের কর্ত্তব্য কাজ।

আমাদের নিমন্ত্রণের মধ্যে সামাজিক

ভাব এত অল্প যে, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আমরা প্রতিনিধি পাঠাই। আমরা জানি যে, আহার করান'ই আমাদের নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য, আমি আহার না করি, আমার হইয়া আর এক জন করিলেও সে উদ্দেশ্য সফল হইবে। আমার ভাইপোকে বা ভাগ্নেকে বা উভয়কে পাঠাইয়াদিলাম, তাহারা সাটিনের কাপড় পরিয়া এক পেট খাইয়া আসিল। পরস্পরকে আমোদ দেওয়া যদি আমাদের নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য হইত, তবে আমার পরিবর্ত্তে অর্দ্ধস্ফুট-বাণী ঝিসহায় একটি ভাগ্নেকে সভাস্থলে পাঠান কি হাস্যজনক বোধ হইত! নিমন্ত্রণ সারিয়া চলিয়া যাইবার সময় গৃহকর্ত্তা বিনীত ভাবে বলেন "মহাশয়কে অত্যন্ত কষ্ট দেওয়া হইল!" মনে মনে ভাবি কথাটা মিথ্যা নহে, সাড়ে দশটার সময় আমার আহার করা অভ্যাস, সাড়ে চারিটার সময় আহার জুটিল। আহার ব্যতীত আর কোন আমোদের যদি বন্দোবস্ত থাকিত, তাহা হইলেও এ কষ্ট বরদাস্ত হইত। কিন্তু আমরা মনে করি, আহারই শ্রেষ্ঠতম আমোদ এবং আহার ব্যতীত ভদ্র জনোচিত আমোদ আর কিছুই নাই।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া আমরা গল্প করিতে লাগিলাম। যদি নিন্দা করিবার অভিপ্রায় থাকে ত বলি, যে আহারের ব্যবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়াছিল; প্রশংসা করিবার হইলে বলি যে, আহারের আয়োজন অতিশয় পরিপাটি হইয়াছিল। কাহারও কাছে নিমন্ত্রণের রিপোর্ট দিতে হইলে কোন খাদ্যটা ভাল ও কোন খাদ্যটা মন্দ তাহারই সমালোচনা বিস্তারিতরূপে করি। নিমন্ত্রণ-সভা হইতে ফিরিয়া আসিয়া এমন গল্প কোন বাঙ্গালী কখনো করে নাই যে— "হরিশ বাবু আজ নিমন্ত্রণ সভায় যে প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতে গিরিশ বাবু এই কথা বলেন ও যোগেশ বাবু এই কথা বলেন। সুরেশ বাবু যাহা বলেন, এমনি চমৎকার করিয়া বলেন যে, সকলেরই মনে আঘাত লাগে।" নিমন্ত্রণ সভায় লুচি, সন্দেশ ও মিঠায়েরই একাধিপত্য। সেখানে গিরিশ বাবু, যোগেশ বাবু ও সুরেশ বাবু গণ আমার আমোদ সাধনের পক্ষে কিছু মাত্র আবশ্যকীয় পদার্থ নহেন। নাট্যশালায় সমাগত ক্রীত-টিকিট দর্শকবর্গ পরস্পরের আমোদের পক্ষে যতটুকু উপযোগী, প্রাপ্ত-পত্র নিমন্ত্রিত বর্গ পরস্পরের আমোদের পক্ষে ততটুকু উপযোগী।

নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত? যাঁহাদের মধ্যে প্রত্যহ পরস্পরের দেখা শুনা হয় না, তাঁহাদের মিলন করাইয়া দেওয়া, যাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের আলাপ হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাঁহাদের একত্র করিয়া দেওয়া। সামাজিক মানুষের পরস্পরকে আমোদ দিবার ও পরস্পরের নিকট আমোদ পাইবার যে একটা আন্তরিক ইচ্ছা আছে, তাহাই চরিতার্থ করিবার সুযোগ দেওয়া। প্রত্যহ যাহা খাইতে পাই, তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক খাইতে দেওয়া নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য নহে—অথবা নিমন্ত্রণকারীর বাড়িতে পদধূলি দিয়া ও তাঁহার

খরচে এক উদর আহার করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদিগকে কৃতকৃতার্থ করাও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের কার্য্য নহে।

নিমন্ত্রণকারীর কর্ত্তব্য যে যে লোকদের নিমন্ত্রণ করিলে পরস্পরের আমোদ বর্দ্ধন হইবে তাঁহাদের একত্র করা। এখন যেমন আমাদের দেশের নিমন্ত্রণকারী যশ পাইতে ইচ্ছা করিলে সন্দেশ টিপিয়া দেখেন তাহাতে ছানার পরিমাণ অধিক আছে কি না—উৎকৃষ্টতর নিমন্ত্রণ পদ্ধতি প্রচারিত হইলে সুখ্যাতি-প্রয়াসী নিমন্ত্রক দেখিবেন, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আমোদ দিবার ও আমোদ পাইবার গুণ কাহার কিরূপ আছে। কে ভাল গল্প করিতে জানে ও কে মনোযোগ দিয়া শুনিতে জানে। কে ভাল রসিকতা করিতে জানে ও কে ভাল হাসিতে জানে। কে কথা কহিবার কৌশল জানে ও কে চুপ করিয়া থাকিবার কৌশল জানে। তিন জন উকিল যদি থাকেন তবে তাঁহাদের পৃথক পৃথক রাখা উচিত, নহিলে তাঁহারা মোকদ্দামা মামলার কথা পাড়িয়া আদালত-ছাড়া লোকদিগকে দেশ-ছাড়া করিবার বন্দোবস্ত করেন। তিন জন গ্রন্থকার যদি সভাস্থলে থাকেন তবে তাঁহাদের পাশা-পাশি একত্র রাখা যুক্তি সঙ্গত কি না বিবেচনা স্থল, তাহা হইলে তাঁহারা তিন জনেই মুখবন্ধ করিয়া থাকিবেন। আর তিন জন যদি রসিকতাভিমানী ব্যক্তি থাকেন, তবে যে উপায়ে হউক্ তাঁহাদের ছাড়াছাড়ি রাখা আবশ্যক, তাঁহারা বিজ্ঞানের এই সহজ সত্যটি প্রায়ই বিস্মৃত হন যে, দুইটি পদার্থ একই স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না। এক কথায় নিমন্ত্রণকারীর এই একমাত্র ব্রত হওয়া উচিত, যাহাতে নিমন্ত্রিতদিগের সর্ব্বাঙ্গীন আমোদ হয়। নিমন্ত্রিতদিগেরও কর্ত্তব্য কাজ আছে, তাঁহারা যে, মনে করিয়া রাখিয়াছেন যে, নিমন্ত্রকের কর্ত্তব্য লুচি সন্দেশের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া ও তাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য সে গুলি জঠরে রপ্তানি করিয়া দেওয়া, তাহা যথার্থ নহে। উৎকৃষ্টতর নিমন্ত্রণে তাঁহারাই লুচি, তাঁহারাই সন্দেশ। পরস্পরের মানসিক ক্ষুধা পিপাসা নিবারণের জন্য তাঁহারাই খাদ্য ও পানীয়। মহারাজা সামাজিকতার নিকটে তাঁহার অধীনস্থ আমরা সকলেই এই কর্ত্তব্য-সূত্রে বদ্ধ আছি যে, দশজন একত্রে আহূত হইলেই পরস্পরকে সুখী রাখিবার জন্য আমরা যথা শক্তি প্রয়োগ করিব। নিমন্ত্রিত বর্গের সকলেরই একমাত্র কর্ত্তব্য, যথাসাধ্য অন্যকে সুখী করিতে চেষ্টা করা। যাহারা সভাস্থলে গোঁ হইয়া বসিয়া থাকে, তাহারা অসামাজিক, যাহারা নিজেই কথা কহিতে চাহে, পরের কথা শুনিতে চাহে না তাহারা অসামাজিক, যাহারা নিজের রসিকতা ব্যতীত আর কোন কারণে হাসিতে চাহে না তাহারা অসামাজিক। এক এক জন যেন মনের মধ্যে কেবল বিছুটির চাস করিয়াছে, অন্যকে জ্বালাইতে না পারিলে তাহাদের রসিকতা হয় না, তাহারা অসামাজিক,—উন্নততর নিমন্ত্রণ সভায় মানসিক আহার্য্যের পাতে এরূপ

অসামাজিক লুচি সন্দেশ গুলি না থাকে যেন, ইহাঁদের কাহারো বা ঘি খারাপ, কাহারো বা ছানা কম, কাহারো বা রসের অভাব।

আমাদের দেশের নিমন্ত্র সভায় পরস্পরকে আমোদ দিবার ভাব নাই। অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর সামাজিকতার ভাব নাই। একটা আমোদের উপকরণ আছে (যেমন নাচ বা আহার) আর আমরা সকলে মিলিয়া তাহা উপভোগ, করিতেছি তাহাও সামাজিকতার ভাব কিন্তু নিকৃষ্টতর সামাজিকতা। বক্তৃতা স্থল, রঙ্গভূমি, নাট্যশালা প্রভৃতিই সেইরূপ অতি ক্ষীণ সামাজিকতার স্থল, নিমন্ত্রণ সভা নহে। সত্য কথা বলিতে কি আহারই যে আমাদের নিমন্ত্রণ স্থলে প্রধান আমোদ বলিয়া গণ্য হইয়াছে,তাহার একটা কারণ আছে। আমাদের সামাজিকতার ভাব এতই অল্প যে, পরস্পরকে কি করিয়া আমোদ দিতে হয় তাহা আমরা জানি না। আমোদ দিবার শিক্ষাই আমাদের নাই, আর সে শিক্ষাতেও আমরা কিছুমাত্র মনোযোগ দিই না। যে ব্যক্তি আমাদের হাসায়, তাহার কথায় আমরা হাসি বটে, কিন্তু তাহাকে কেমন একটু নীচু-নজরে দেখি, তাহার পদ পাইতে আমরা ইচ্ছা করি না। তাহারো আবার কারণ আছে। আমাদের দেশে সচরাচর যাহারা হাসায় তাহারা এমন অশিক্ষিত-রুচি যে, তাহাদের রসিকতা হয় অশ্লীল নয় ব্যক্তিগত, নয় অর্থশূন্য অঙ্গভঙ্গীময় ভাঁড়ামী হইয়া পড়ে। এমন কি, আমাদের ভাষায় wit বা humour-এর কথা নাই। রসিকতা বলিলে যে ভাবটা আমাদের মনে আসে, সেটা কেমন নির্দ্দোষ, নিরীহ, নিরামিষ নহে। আমাকে যদি কেহ "রসিক" বলে তবে আমার পিত্ত জ্বলিয়া যায়। আমাদের ভাষায় রসিকতার সঙ্গে কেমন একটা কলুষিত ভাবের সংযোগ আছে। ইংলণ্ডের সমাজে কথোপকথন কুশল ব্যক্তিদের যেরূপ অসাধারণ মান, আমাদের দেশে তাহা কিছুই নাই, বরং তাহার উল্টা। ইংলণ্ডে কথোপকথন একটা বিদ্যার মধ্যে পরিগণিত, তাহার নানা পদ্ধতি আছে, নানা নিয়ম আছে। আমাদের দেশে অধিক কথাবার্ত্তাকে লোকে বড় ভাল বলে না। আমাদের দেশে "স্বর্ণময় নীরবতার" মূল্য জনসাধারণ এত অধিক বুঝিয়াছে, যে আমাদের সামাজিক একস্চেঞ্জে কথাবার্ত্তার রূপার বড়ই হানি হইতেছে। Metallic question-এর বিষয়ে আমি কিছু বলিতে প্রস্তুত নহি, কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, আমাদের সমাজে রূপার দর না বাড়িলে বড়ই অসুবিধা হইতেছে। আমাদের দেশের সভায় পরিচয় হয়, আলাপ হয় না। "মহাশয়ের নাম? মহাশয়ের ঠাকুরের নাম?" ইত্যাদি প্রশ্নে "মহাশয়ে"র চতুর্দ্দশ পুরুষের পরিচয় লওয়া হয়, কিন্তু আলাপ হয় না। চুপচাপ করিয়া, সংযত হইয়া বসিয়া থাকাকেই আমরা বিশেষ প্রসংশা করি। নিতান্ত বক্তৃতা স্থলে, প্রকাশ্য সভায় এই রূপ ভাব ভাল। কিন্তু নিমন্ত্রণ সভাতেও যদি চুপচাপ বসিয়া থাকা নিয়ম হয়, তবে

নিতান্তই আমোদের ব্যাঘাৎ হয়, এমন কি শিক্ষার ব্যাঘাত হয়। বিস্তৃত কথোপকথনের প্রথা না থাকিলে ভাবের আদান প্রদান চলিবে কি রূপে? নানা প্রকার ভাব সাধারণ সমাজময় ছড়াইয়া পড়িবে কি উপায়ে? আমোদ দিবার আর এক উপায় গীত-বাদ্য। আজ কাল সঙ্গীত অনেকটা প্রচলিত হইতেছে, কিন্তু ইহার কিছু পূর্ব্বে যে ভদ্রলোক সঙ্গীত শিখিত, তাহার মা-বাপেরা তাহাকে খরচের খাতায় লিখিতেন। এখনো যাঁহারা গান বাজনা শিখেন, তাঁহারা নিজের সখ চরিতার্থ করিতে শিখেন মাত্র। আমাদের সমাজে ভালরূপে মেশামেশি করিবার জন্য গান শিখিবার যে কিছুমাত্র আবশ্যক আছে তাহা নহে। অতএব দেখা যাইতেছে আমাদের নিমন্ত্রণ সভায় হাসান দূষ্য, অধিক হাস্য বা কথা কহা নিয়ম বিরুদ্ধ, (কথা কহিবার বিষয়ও অধিক নাই,) নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে গান বাজনা করা অপ্রচলিত, তবে আর বাকী রহিল কি? আহার। অতএব নিমন্ত্রণে যাও আর আহার কর। মনোরঞ্জনী বিদ্যা শিখি না, শিখিবার আবশ্যক বিবেচনা করি না, এমন কি অনেক স্থলে শিখা দূষ্য মনে করি। সাধারণতঃ আমাদের কেমন ধারণা আছে যে, পরকে আমোদ দেওয়া পেষাদারের কাজ; আমোদ দেওয়ার কাজটাই যেন নীচু। ইহা অপেক্ষা অসামাজিকতার ভাব আর কি আছে। এমন কি, গাহিতে বলিলেই নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ না করিয়া যদি কেহ তৎক্ষণাৎ গায় তবে সে যেন অন্যান্য লোকের চোখে হাস্যাস্পদ বলিয়া প্রতীত হয়। পরকে আমোদ দেওয়া কর্ত্তব্যকাজ, তাহার জন্য ঔৎসুক্য ও আগ্রহ থাকা উচিত, এভাব যে কেন হাস্যাস্পদ বলিয়া প্রতীত হইবে বুঝিতে পারি না। আমার ভাল গলা থাক্ বা না থাক্, আমি ভাল গাহিতে পারি না পারি, তোমার মনোবিনোদনে আমার যথাসাধ্য চেস্টা করিব, এ ভাব সামাজিক জাতিদিগের নিকট প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে হয়। আমাদের দেশে নিমন্ত্রণের সহিত বহুব্যয়সাধ্য আহারের বিশেষ যোগ থাকাতে একটা হানি হইয়াছে। সদাসর্ব্বদা নিমন্ত্রণ করা লোকের পোষায় না। একটা উপলক্ষ্য না হইলে কেহ প্রায় নিমন্ত্রণ করে না। ইহাতে আমাদের দেশে সম্মিলনের অবসর কম পড়িয়াছে। রোগী দেখিতেও যদি কোন কুটুম্বের বাড়ি যাওয়া যায়, তাহা হইলেও খাওয়াইতে হইবে। আপাততঃ মনে হয়, ইহাতে সামাজিক ভাবের আরো বহুল চর্চ্চা হয়, কিন্তু তাহা নহে। ইহার ফল হয় এই যে নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কুটুম্বের বাড়ি যাওয়া হয় না। সদাসর্ব্বদা যাতায়াত করিলে লোকে নিন্দা করে, এবং কুটুম্বও বড় আহ্লাদের সহিত অভ্যর্থনা করে না। অতএব নিমন্ত্রণের আর এক অর্থ যদি আহার না হয়, তাহা হইলে নিমন্ত্রণ অনেক বাড়ে, নিমন্ত্রণের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়। নিমন্ত্রণের অন্যান্য নানা উপকরণের মধ্যে আহার বলিয়া একটা পদার্থ রাখা যায়, কিন্তু সমস্ত নিমন্ত্রণটাই

যেন আহার না হয়। পরস্পরে মিলিয়া গান বাজানা, আমোদ প্রমোদ, কথোপকথনের চর্চ্চা আরো বহুলতর রূপে আমাদের সমাজে প্রচলিত হউক্। তাহা হইলে প্রকৃত রসিকতা কাহাকে বলে সে শিক্ষা আমাদের লাভ হইবে, প্রসঙ্গ কিরূপে আলোচনা করিতে হয়, সে অভ্যাস আমাদের হইবে, আহার ব্যতীত যে ভদ্রজনোচিত আমোদ যথেষ্ট আছে তাহা আমাদের বোধগম্য হইবে।

নিদ্রাদেবী।

১

অয়ি নিদ্রাদেবী, মধুর হাসিনী
বিরাম দায়িনী মোর!
ঢুলু ঢুলু ঢুলু অলস নয়ন,
অলস চরণ তোর!

২

ঘুচাও যাতনা ঘুচাও ভাবনা
ঘুচাও মনের দুখ
শান্তি মূর্ত্তি তব হেরিয়ে নয়নে
কিযে এক পাই সুখ!

৩

সুনীল-প্রতিমা নিশা আগমনে
সমীর হিল্লোল সনে,
আলু থালু বেশে আলু থালু কেশে
বেড়াও আপন মনে।

৪

বেড়াও কমলে পান করি করি
স্নিগ্ধ পরিমল তার,
কুসুমের রেণু শিশিরের কণা
চাঁদের সুধার ধার।

৫

চলি ফুলে ফুলে সমীরণে দুলে
কতই আনন্দ পাও,
না উঠিতে রবি, না ফুটিতে আলো,
কোথায় চলিয়ে যাও।

৬

সুনীল তোমার মধুর আকার
মদির নয়ন দুটি,
স্বচ্ছ সরোবরে অলস নলিনী
আধেক রয়েছে ফুটি।

৭

যেমন তোমার ললিত আকার
তেমনি উদার প্রাণ,
স্বপন সুন্দরী সখিরা মিলিয়া
তোমারে শুনায় গান।

৮

যখন রাতিতে শুনিগো তোমার
সখির মধুর গান,
অফুট সে সুর শ্রবণে পশিয়ে
মাতিয়ে ওঠেগো প্রাণ।

৯

তখনি অমনি হৃদয়ে আমার
কি এক আলোক ভায়,
ক্ষণকাল পরে তখনি আবার
কোথায় মিলিয়ে যায়।

১০

কিন্তু কেহ হায় দেখা নাহি দেয়
আলোক প্রবাহ হতে,
কেবল কেবল আসে গো ভাসিয়ে
সেই গান শূন্য পথে।

১১

যাচি কত আমি দেখিতে তাহায়
তবু দেখা নহি পাই,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে স্বপনে স্বপনে
আবার তাহারে চাই।

১২

এস নিদ্রাদেবী এস কাছে এস
আন পুন ঘুম ঘোর,
সেই গান আমি শুনিতে শুনিতে
হউক রজনী ভোর।

শ্রী অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সম্পাদকের বৈঠক।

ওই যেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়া
কভু বা অবাক্, কভু ভকতি-বিহ্বল হিয়া।
নিজের প্রাণের মাঝে একটি যে বীণা বাজে,
সে বিণা শুনিতেছেন হৃদয় মাঝারে গিয়া।
বনে যতগুলি ফুল আলো করি ছিল শাখা,
কারো কচি তনুখানি নীল বসনেতে ঢাকা,
কারো বা সোনার মুখ, কেহ রাঙ্গা টুক্ টুক্,
কারো বা শতেক রঙ্ যেন ময়ূরের পাখা,
কবিরে আসিতে দেখি হরষেতে হেলি দুলি
হাব ভাব করে কত রূপসী সে মেয়ে গুলি,
বলাবলি করে, আর ফিরিরা ফিরিয়া চায়,
"প্রণয়ী মোদের ওই দেখ্‌লো চলিয়া যায়।"

সে অরণ্যে বনস্পতি মহান্, বিশাল, কায়া,
হেথায় জাগিছে আলো, হোথায় ঘুমায় ছায়া।
কোথাও বা বৃদ্ধ বট—মাথায় নিবিড় জট;
ত্রিবলী অঙ্কিত দেহ প্রকাণ্ড তমাল শাল;
কোথা বা ঋষির মত অশথের গাছ যত
দাঁড়ায়ে রয়েছে মৌন ছড়ায়ে আঁধার ডাল।
মহর্ষি গুরুরে হেরি অমনি ভকতি ভরে
সসম্ভ্রমে শিষ্যগণ যেমন প্রণাম করে,
তেমনি কবিরে দেখি গাছেরা দাঁড়াল নুয়ে,
লতা শ্মশ্রুময় মাথা ঝুলিয়া পড়িল ভুঁয়ে।
এক দৃষ্টে চেয়ে দেখি প্রশান্ত সে মুখছবি,
চুপি চুপি কহে তারা "ওই সেই! ওই কবি"॥

Victor Hugo

যে তোরে বাসেরে ভাল, তারে ভাল বেসে বাছা,
চিরকাল সুখে তুই রোস্।
বিদায়! মোদের ঘরে রতন আছিলি তুই,
এখন তাহারি তুই হোস্।
আমাদের আশীর্ব্বাদ নিয়ে তুই যা রে
এক পরিবার হতে অন্য পরিবারে।
সুখ শান্তি নিয়ে যাস্ তোর পাছে পাছে,
দুঃখ জ্বালা রেখে যাস্ আমাদের কাছে।

হেথা রাখিতেছি ধোরে সেথা চাহিতেছে তোরে,
দেরী হ'ল, যা' তাদের কাছে।
প্রাণের বাছাটি মোর, লক্ষ্মীর প্রতিমা তুই,
দুইটি কর্ত্তব্য তোর আছে।
একটু বিলাপ যাস্ আমাদের দিয়ে,
তাহাদের তরে আশা যাস্ সাথে নিয়ে;
এক বিন্দু অশ্রু দিস্ আমাদের তরে,
হাসিটি লইয়া যাস্ তাহাদের ঘরে!

Victor Hugo

কাল সন্ধ্যাকালে ধীরে সন্ধ্যার বাতাস
বহিয়া আনিতেছিল ফুলের সুবাস।
রাত্রি হ'ল, আঁধারের ঘনীভূত ছায়ে,
পাখীগুলি একে একে পড়িল ঘুমায়ে।
প্রফুল্ল বসন্ত ছিল ঘেরি চারিধার
আছিল প্রফুল্লতর যৌবন তোমার,
তারকা হাসিতেছিল আকাশের মেয়ে,
ও আঁখি হাসিতেছিল তাহাদের চেয়ে।
দুজনে কহিতেছিনু কথা কানে কানে,
হৃদয় গাহিতেছিল মিষ্টতম তানে।

রজনী দেখিনু অতি পবিত্র বিমল,
ও মুখ দেখিনু অতি সুন্দর উজ্বল,
সোনার তারকাদের ডেকে ধীরে ধীরে,
কহিনু "সমস্ত স্বর্গ ঢাল এর শিরে !"
বলিনু আঁখিরে তব "ওগো আঁখি তারা
ঢালগো আমার পরে প্রণয়ের ধারা।"

Victor Hugo

মহীয়সী মহিমার আগ্নেয় কুসুম
সূর্য্য, ধায় লভিবারে বিশ্রামের ঘুম।
ভাঙ্গা এক ভিত্তি পরে ফুল শুভ্রবাস,
চারিদিকে শুভ্রদল করিয়া বিকাশ
মাথা তুলে চেয়ে দেখে সুনীল বিমানে
অমর আলোকময় তপনের পানে,
ছোট মাথা দুলাইয়া কহে ফুল গাছে—
"লাবণ্য-কিরণ ছটা আমারো ত আছে।"

Victor Hugo

ওই আদরের নামে ডেকো সখা মোরে।
ছেলে বেলা ওই নামে আমায় ডাকিত,
তাড়াতাড়ি খেলা ধূলা সব ত্যাগ কোরে
অমনি যেতেম ছুটে, কোলে পড়িতাম লুটে,
রাশি-করা ফুল গুলি পড়িয়া থাকিত।
নীরব হইয়া গেছে সে স্নেহের স্বর,
কেবল স্তব্ধতা রাজে এবে এ শ্মশান মাঝে,
কেবল ডাকি গো আমি ঈশ্বর—ঈশ্বর !
মৃতকণ্ঠে আর যাহা শুনিতে না পাই,
সে নাম তোমার মুখে শুনিবারে চাই !
হাঁ সখা, ডাকিও তুমি সেই নাম ধোরে।
ডাকিলেই সাড়া পাবে, কিছু না বিলম্ব হবে,
তখনি কাছেতে যাব সব ত্যাগ কোরে।

Mrs Browning

নিদাঘের শেষ গোলাপ কুসুমি
একা বন আলো করিয়া,
রূপসী তাহার সহচরীগণ
শুকায়ে পড়েছে ঝরিয়া।
একাকিনী আহা, চারিদিকে তার
কোন ফুল নাহি বিকাশে।
হাসিতে তাহার মিশাইতে হাসি
নিশাস তাহার নিশাসে।

বোঁটার উপরে শুকাইতে তোরে
রাখিব না একা ফেলিয়া,
সবাই ঘুমায়, তুইও ঘুমা'গে
তাহাদের সাথে মিলিয়া।
ছড়ায়ে দিলাম দল গুলি তোর
কুসুম-সমাধি শয়ান,
যেথা তোর বন সখীরা সবাই
রয়েছে মুদিত নয়নে।

তেমনি আমার সখারা যখন
যেতেছেন মোরে ফেলিয়া,
প্রেম হার হতে একটি একটি
রতন পড়িছে খুলিয়া।
প্রণয়ী-হৃদয় গেল গো শুকায়ে
প্রিয়জন গেল চলিয়া,
তবে এ আঁধার—আঁধার জগতে
রহিব বল কি বলিয়া।

Moore

দিন রাত্রি নাহি মানি, আয় তোরা আয়রে,
চির সুখ-রসে রত আমরা হেথায়রে।
বসন্তে মলয় বায় একটি মিলায়ে যায়,
আরেকটি আসে পুনঃ মধুময় তেমনি,
প্রেমের স্বপন হায়
একটি যেমনি যায়
আরেকটি সুস্বপন জাগি উঠে অমনি।
নন্দন কানন যদি এ মরতে চাইরে
তবে তা ইহাই রে !
তবে তা' ইহাই রে।

প্রেমের নিশ্বাস হেথা ফেলিতেছে বালিকা,
সুরভি নিশ্বাস যথা ফেলে ফুল-কলিকা,
তাহাদের আঁখি জল
এমন সে সুবিমল
এমন সে সমুজল মুকুতার পারারে,

তাদের চুম্বন হাসি
দিবে কত সুধারাশি
যাদের মধুর এত নয়নের ধারারে।
নন্দন কানন যদি এ মরতে চাইরে
তবে তা ইহাই রে।
তবে তা ইহাই রে!

থাকুক ওসব সুখ চাইনা গো চাইনা,
যে সুখ-ভিখারী আমি তাহা যে গো পাইনা।
দুই হৃদি এক ঠাঁই
প্রণয়ে মিলিতে চাই
সুখে দুখে যে প্রেমের নাহি হবে শেষরে।
প্রেমে উদাসীন হৃদি
শত যুগ যাপে যদি,
তার চেয়ে কত ভাল এ সুখ নিমেষ রে!
নন্দন কানন যদি এ মরতে চাইরে
তবে তা' ইহাই রে
তবে তা ইহাই রে।

Moore

দামিনীর আঁখি কিবা
ধরে জ্বল' জ্বল' বিভা
কার তরে জ্বলিতেছে কেবা তাহা জানিবে?
চারি দিকে খর ধার
বাণ ছুটিতেছে তার
কার পরে লক্ষ্য তার কেবা অনুমানিবে?
তার চেয়ে নলিনীর আঁখি পানে চাহিতে
কত ভাল লাগে তাহা কে পারিবে কহিতে?
সদা তার আঁখি দুটি
নিচু পানে আছে ফুটি,
সে আঁখি দেখেনি কেহ উঁচু পানে তুলিতে!
যদিবা সে ভুলে কভু চায় কারো আননে,
সহসা লাগিয়া জ্যোতি
সে জন বিস্ময়ে অতি
চমকিয়া উঠে যেন স্বপনের কিরণে।
ও আমার নলিনী গো, লাজমাখা নলিনী,
অনেকের [illegible]
সৌন্দর্য্য বিরাজ করে,
তোর আঁখি পরে প্রেম নলিনী লো নলিনী!
দামিনীর দেহে রয়
বসন কনকময়
সে বসন অপ্সরী স্থজিয়াছে যতনে,
যে গঠন যেই স্থান
প্রকৃতি ক'রেছে দান
সে সকল ফেলিয়াছে ঢাকিয়া সে বসনে!
নলিনী বসন পানে দেখ দেখি চাহিয়া
তার চেয়ে কত ভাল কে পারিবে কহিয়া?
শিথিল অঞ্চল তার
ওই দেখ চারি ধার
স্বাধীন বায়ুর মত উড়িতেছে বিমানে,
যেথা যে গঠন আছে
পূর্ণ ভাবে বিকাশিছে
যে পানে যা' উঁচু নিচু প্রকৃতির বিধানে!
ও আমার নলিনী লো, সুকোমলা নলিনী
মধুর রূপের ভাস
তাই প্রকৃতির বাস,
সেই বাস তোর দেহে নলিনীলো নলিনী!
দামিনীর মুখ জাগে
সদা রসিকতা জাগে,
চারিধারে জ্বলিতেছে খরধার বাণ সে,
কিন্তু কে বলিতে পারে
শুধু সে কি ধাঁধিবারে,
নহে তা' কি খর ধারে বিঁধিবারি প্রাণসে?
কিন্তু নলিনীর মনে
মাথা রাখি সঙ্গোপনে
ঘুমায়ে র'য়েছে কিবা প্রণয়ের দেবতা।
সুকোমল সে শয্যার
অতি যা' কঠিন ধার
দলিত গোলাপ তা'ও আর কিছু নহে তা!'
ও আমার নলিনী লো, বিনয়িনী নলিনী
রসিকতা তীব্র অতি
নাই তার এত জ্যোতি
তোমার নয়নে যত নলিনী লো নলিনী।

Moore

সূচি পত্র।

সূচিপত্র।

বিষয়		পৃষ্ঠা